"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

পূজার রেকর্ড

এইচ এম ভি-র শারদ অর্ঘ্য

ই.পি. রেকর্ড

আগমনী গান/ভক্তিগীতি
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

ভক্তিগীতি
গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়
ও মাধুরী মুখোপাধ্যায়

পদাবলী কীর্তন
গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়

লোক-গীতি
নির্মলেন্দু চৌধুরী

বৃন্দগান
ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার

আধুনিক
আশা ভোঁসলে/রাহুল দেব বর্মণ
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মান্না দে

কৌতুক নক্সা
রাজ-যোটক
অংশ গ্রহণে :
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
অজিত চট্টোপাধ্যায় ও
গীতা দে

এস.পি. রেকর্ড

আধুনিক
অনুপ ঘোষাল
অমিতকুমার
আরতি মুখোপাধ্যায়
কিশোরকুমার
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়
নির্মলা মিশ্র
পিণ্টু ভট্টাচার্য
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
বনশ্রী সেনগুপ্ত
লতা মঙ্গেশকর
শ্যামল মিত্র
শ্রাবন্তী মজুমদার
গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

শ্যামা সঙ্গীত
নির্মল মুখোপাধ্যায়

কৌতুক-গীতি
মিণ্টু দাশগুপ্ত

'সুপার সেভেন' রেকর্ড

লোক-গীতি
শচীন দেব বর্মণ

শিশু-গীতি
আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়

অতুলপ্রসাদের গান
কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়/মঞ্জু গুপ্ত

দাদরা ও ঠুংরী
বেগম আখতার

আবৃত্তি
বুদ্ধদেব বসু স্মরণে
আবৃত্তিকার :
কাজী সব্যসাচী
প্রদীপ ঘোষ
শম্ভু মিত্র
দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ইলেকট্রিক গীটার
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
(গীটারে হিন্দী ছায়াছবির সুর)

এল.পি. রেকর্ড

সঙ্গীত আলেখ্য
রামকৃষ্ণায়ণ
সঙ্গীতে :
মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়,
গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়,
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য,
শিপ্রা বসু, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী,
রামকুমার চট্টোপাধ্যায়,
বনশ্রী সেনগুপ্ত, সমরেশ রায়,
শৈলেন মুখোপাধ্যায়,
গীতা মুখোপাধ্যায়,
উদয়বরণ, চিত্তপ্রিয়
মুখোপাধ্যায়,
গৌতম মুখোপাধ্যায়,
তাপস চট্টোপাধ্যায়, নিশীথ সাধু

অভিনয়ে :
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,
মলিনা দেবী, সবিতাব্রত দত্ত,
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়,
হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়
এবং সমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
দিলীপ ভট্টাচার্য,
বিমল মুখোপাধ্যায়,
তারাপদ বসু ও
নীহাররঞ্জন সিংহ।

পল্লী-গীতি
পূর্ণদাস বাউল
(১২টি অনবদ্য বাউল গান)

আধুনিক
পূজাকুসুম
বিগত কয়েক বছরের সেরা
আধুনিক গানের সংকলন

প্রতি সোমবার রাত ৯৷৷০ টায় কলকাতা 'বিবিধ ভারতী' থেকে প্রচারিত হচ্ছে 'এইচ এম ভি-র পূজোর গানের আসর'। শুনতে ভুলবেন না। এছাড়া, এবারের 'রেকর্ড সঙ্গীতের' শারদীয়া সংখ্যাও পড়ে দেখুন।

HMV
হিজ মাস্টার্স ভয়েস
ধ্বনির জগতে ৭০ বছরের ওপর সবার সেরা নাম

HT-GO-8029-J

অমৃত

সংখ্যা ২১
মূল্য—৬৫ পয়সা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 27th September, 1974 শুক্রবার, ১০ আশ্বিন, ১৩৮১ 65 Paise

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্য গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : তুষার সান্যাল

স

সম্পাদকীয়

উদ্বাস্তুর দায়-দায়িত্ব

কেন্দ্রীয় সরকারের মতে ভারতে উদ্বাস্তু বলে আর কেউ নেই। পুনর্বাসনের সুযোগ-সুবিধা থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হলেন। ভাল কথা। দেশভাগের অভিশাপ মাথায় বহন করে যারা পাকিস্তান থেকে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, সাতাশ বছর পর তাদের তো সম্পূর্ণ পুনর্বাসন হয়ে যাবারই কথা। কিন্তু আসল সত্যটা কি তাই? এই প্রশ্ন নতুন করে আমাদের মনে করিয়ে দিল গত সপ্তাহে মধ্যপ্রদেশে মানা উদ্বাস্তু শিবিরে পুলিশের গুলিচালনায় চারজন হতভাগ্য উদ্বাস্তুর মৃত্যুতে।। এইসব উদ্বাস্তু বলা বাহুল্য সবাই প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা। অর্থাৎ এরা বাঙালী উদ্বাস্তু।

দেশভাগের সময়ে বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ হয়েছিল। এই দুই রাজ্যের সংখ্যালঘুরা রাজি না হলে কিন্তু স্বাধীনতা এত সহজে আসত না। তখন বলা হয়েছিল পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য ভারতবর্ষের দরজা সব সময় খোলা থাকবে। পাঞ্জাবে রক্তস্নান হল এবং লোকবিনিময় ঘটে গেল। পাঞ্জাবের গায়েই রাজধানী দিল্লি। সরকারী নজর তারা সহজেই পেল। পাঞ্জাবী নেতারা উদ্বাস্তুদের জন্য সব আদায় করে নিলেন। প্রত্যেকে পেল সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ। ফলে পাঞ্জাবী উদ্বাস্তু সমস্যাটা বছর কয়েকের মধ্যেই মিটে গেল।

বাঙালী উদ্বাস্তুদের ভাগ্যে কিন্তু তা ঘটল না। প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানে তখনকার সরকার যে সংখ্যালঘুদের সেখানে টিকতে দেবে না, ভারত সরকার সেটা বুঝতে চাননি। তাই সংখ্যালঘুরা বার বার মার খেয়ে এসেছে সীমান্ত পার হয়ে। নয়াদিল্লি সমস্যা যখন যেমন এসেছে তেমনি এড হক ব্যবস্থা করে তা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেছে। রাজ্য সরকারের এমন ক্ষমতা ছিল না যে বিপুল জনস্রোতকে ঠিক খাতে প্রবাহিত করে। ফলে তুষের আগুনের মতো বাঙালী উদ্বাস্তুর সমস্যা ধিকিধিকি জ্বলছে। সাতাশ বছরেও সেই আগুন নেভেনি। মানা শিবিরে তারই একটা স্ফুলিঙ্গ দপ করে জ্বলে উঠল।

কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী খাদিলকার বলছেন, এই উদ্বাস্তুদের এখন রাজ্য সরকার দেখুক। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার আর এদের দায়িত্ব নিতে রাজি নন। যুক্তি হল এই যে, দেশে অনেক অনগ্রসর এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলশ্রেণী আছে। উদ্বাস্তুরা তাদের সমান বলেই গণ্য হবে তার বেশি কিছু নয়। অথচ এদিকে আমাদের রাজ্য সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য দেড়শো কোটি টাকার মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সাহায্য না পেলে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে কি এই টাকা খরচ করা সম্ভব? এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানোও হয়েছিল এবং তাঁরা আশ্বাসও দিয়েছিলেন সাহায্য দেবার। হঠাৎ কী কারণে, দিল্লির মত পরিবর্তন হল তা বোঝা দুষ্কর। পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের জন্য সরকার যা করেছেন এবং যত তাড়াতাড়ি করেছেন প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানের হতভাগ্য ছিন্নমূল মানুষের জন্য সেই সংকল্প, সহানুভূতি ও দরদ তাঁরা দেখাননি। এই সত্য কথাটা রাজ্য সরকার দিল্লিকে মনে করিয়ে দিন। দিল্লির আমলাতন্ত্র বাঙালী উদ্বাস্তুর সমস্যাকে আমল দেয়নি। তার ফলে এই সমস্যার সামগ্রিক চরিত্র কোনোদিনই তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়নি। টাকার অপচয় হয়েছে, ছিন্নমূল মানুষদের ব্যবহার করা হয়েছে পরগাছার মতো। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন এই উদ্বাস্তুরা খোঁচা-খাওয়া ইঁদুরের মতো এসে দাঁড়াবে, এটা কখনই কাম্য হতে পারে না। কার্যত তাই হয়েছে। আজ অত্যন্ত নির্দয়ের মতো নয়াদিল্লি এই উদ্বাস্তুদের বোঝা কাঁধ থেকে ফেলে দিলেন। কিন্তু তাতে বাস্তব অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না। মানা শিবিরে যা ঘটেছে তা থেকে সরকারের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বাঙালী উদ্বাস্তুদের বকেয়া সমস্যা কেন্দ্রীয় সরকার বাতিল বলে গণ্য করতে পারেন না। পশ্চিমবঙ্গের সরকার তাঁদের জানিয়ে দিন উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার এড়াতে পারেন না। এটা জাতীয় সমস্যারই অংশ এবং জাতীয় জীবনস্রোতে উদ্বাস্তুদের মিশিয়ে দেবার কাজটিকে তাঁদেরই —— —

জনক জননী

নির্মলেন্দু রক্ষিত

আজকাল কেমন যেন ক্লান্ত লাগে। একটুতেই যেন আলস্যে সারা শরীর ভেঙে পড়ে। অথচ কিছুদিন আগেও এমন ছিল না। এতবড় সংসারটাকে অনায়াসে চালিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন সুনীতি দেবী। ভোর থাকতে ওঠা তাঁর বরাবরের অভ্যেস। অন্ধকার না কাটতেই তিনি উঠে পড়েন। হাত-মুখ ধুয়ে এসে কেরোসিন কুকারে চায়ের জল চাপিয়ে দেন। সেই সময় ঠিকে-ঝি আসে। উনোন ধরায়। সুনীতি দেবী তার অবসরের কথা ভাবতেই পারেন না। জলখাবার তৈরী করতে হয় হুড়োহুড়ি করে অফিসের ভাত বসাতে হয় রাজীব-বাবুর জন্য।

সেই সময় সুনীতি দেবী বারবার ঘড়ি দেখেন। ভেতরে ভেতরে একটা নির্মম অস্বস্তি যেন তাঁকে সারাক্ষণ ছেয়ে থাকে। মনে হয়, হয়ত ঠিক সময় রান্না হয়ে উঠবে না। আধপেটা খেয়ে রাজীববাবু আর অমুকে চলে যেতে হবে।

ওই সময়টাতে যদি মীলু একটু সাহায্য করত তবু যেন সাহস পেতেন উনি। হয়ত ধীরে-সুস্থে রান্নাঘরের কাজ-[illegible] কিন্তু মীলুর আশা করে লাভ নেই কোনো। এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে। অথচ সংসারের কোনোদিকে একটু মন নেই। পড়ার টেবিলে বসে থাকে সারাক্ষণ। তাও যদি পড়াশোনায় সত্যিই মন থাকত মেয়েটার।

অমু যেদিন প্রথম অফিসে যায় সুনীতি দেবীর ভীষণ চিন্তা হয়ে গিয়েছিল। ভোরে উঠেই [illegible] গিয়েছিলেন। ঘুম-চোখে মীলু বারবার সাড়া দিয়েছে বটে, কিন্তু উঠার কোনো লক্ষণই দেখায় নি।

বাধ্য হয়ে মশারি তুলেছিলেন সুনীতি দেবী।

মেয়ের অবিন্যস্ত বেশবাসের দিকে চেয়ে এক মুহূর্ত কি যেন ভেবেছিলেন। ওর ফোলা ফোলা চোখমুখের দিকে দেখতে দেখতে মমতায় ওঁর মন ভরে গিয়েছিল।

কিন্তু বিরক্ত হয়েছিল মীলু।

শাড়িটা টানটান করে নিয়ে চোখ মেলেছিল।

একটু চেয়ে থেকে বলেছিল—কি ব্যাপারটা কি?

মুখ ভেঙচে উঠে বলেছিল মীলু। এক ঝটকায় উঠে বসে বলেছিল—কিছু না [illegible] কেন? একটা প্রাইভেসী—

অবাক হয়ে সুনীতি দেবী চেয়ে রয়েছিলেন কিছুক্ষণ।

তারপর বলেছিলেন—মানে আজ তো অমু অফিসে যাবে—

—ও, তাই আমাকে এখন রান্নাঘরে ঢুকতে হবে? আমি তোমাদের ঝি-গিরি করতে পারব না। এ মাসে আমার টেস্ট পরীক্ষা। আমি—

সুনীতি দেবী আর দাঁড়ান নি।

সেই থেকে উনি মীলুকে এড়িয়ে চলেছেন এতদিন। মুখ বুজে সংসারের কর্তব্য করে গেছেন ভোর থেকে রাত পর্যন্ত।

কিন্তু কিছুদিন থেকে সন্ধ্যে হলেই কেমন যেন মাথায় যন্ত্রণা হয়। আলস্যে শরীর ভেঙে আসে। রাতের ঘুম ভাল হয় না। আজে-বাজে স্বপ্ন দেখে কয়েকদিনই উনি মাঝ রাতে চিৎকার করে উঠেছেন।

প্রথমে উনি তেমন আমল দেন নি। ভেবেছিলেন, খাওয়া-দাওয়া ঠিক মতো হচ্ছে না বলেই উপসর্গগুলো দেখা দিচ্ছে। একটু বিশ্রাম পেলেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুদিন আগে হঠাৎ একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করেছেন। কয়েকদিন পরেই যেন কেমন অস্বস্তি লাগছিল। কতগুলো বিসদৃশ লক্ষণ দেখা দিতেই উনি চমকে উঠেছিলেন একদিন। সমস্ত পৃথিবী যেন অন্ধকার হয়ে এল। স্পষ্ট বুঝলেন যে, এখন আর কিছু করার নেই। ভুলের মাশুল দিতেই হবে।

তবু সন্দেহ ছিল। রাজীববাবুকেও বলতে ইচ্ছে করছিল না। কয়েকটা দিন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটানোর পর শেষ পর্যন্ত মুখোমুখি হয়েছিলেন। রাজীববাবু সন্দেহের কথাটা শুনেই মাথা নিচু করে ফেলেছিলেন। তারপর উঠে অস্থিরভাবে পায়চারী করেছিলেন কিছুক্ষণ।

দিদির বাড়ি যাবার নাম করে পরদিনই ওঁরা ডাক্তার বসুর কাছে গিয়েছিলেন। নানা ভাবে পরীক্ষার পর গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। জানিয়েছিলেন যে, সন্দেহটা অমূলক নয়।

সুনীতিদেবী ফেরার সময় একটি কথাও বলেন নি। ক্ষোভে অভিমানে ওঁর আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছিল। আর শ্রান্তদেহ প্রৌঢ় স্বামীকে একটা ঘৃণ্য আততায়ীর মতো লাগছিল তাঁর। তীব্র ঘৃণায় তিনি চোখ ফিরিয়ে রয়েছিলেন। বারবার মনে হয়েছিল এই সর্বনাশের জন্য দায়ী এই অপদার্থ লোকটাই।

এক সময় রাজীববাবু বলেছিলেন—ডাক্তারবাবুকে বলছিলাম বরং—

স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে তিনি বোধ হয় ভয়ে কথাটা শেষ করতে পারেননি। ঢোক গিলে অপরাধীর মতো মুখ করে বসেছিলেন।

সেই থেকে সুনীতিদেবী কেমন যেন দূরে সরে গেছেন।

ষোল বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। সেটা প্রায় একুশ বছর আগে। একে একে সংসারে এসেছে অমু, হিমু, মীলু, রুম্পা। দারিদ্র্য আর হতাশা নেমেছে আস্তে আস্তে। মার্চেন্ট অফিসের ছোট কেরাণী রাজীববাবুর সংসারে ক্রমে যন্ত্রণা আর ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছে। পড়া ছেড়ে অমু ঢুকেছে একটা [illegible] কলে। তবু ভাল ছেলেটা মাস গেলেই টাকার গোছাটা মায়ের হাতে তুলে দেয়। হিমু রাজনীতি করত ওই বয়সেই। অনেক করে ওকে বুঝিয়েছিলেন সুনীতিদেবী। সর্বনাশা রাজনীতির পরিণতির কথা ভেবে ওকে ফেরাতে চেয়েছিলেন এতদিন ধরে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি।

হিমু এখন শালকিয়াতে ছোড়দার বাড়িতে পালিয়ে আছে। ওর এখন আর এখানে আসার উপায় নেই। পাড়ার ছেলেরা মাঝে মাঝে দল বেঁধে ওকে খুঁজে যায়।

একবার শিউরে উঠলেন সুনীতিদেবী। ওঁর বুক ঠেলে কান্না এল। অতি কষ্টে নিজেকে সামলালেন তিনি।

অমুর গলা শোনা যাচ্ছে।

আজ তাহলে একটু তাড়াতাড়ি ফিরেছে অমু। একটু কিছু মুখে দিয়েই বেরিয়ে পড়বে।

ফিরতে ফিরতে সেই রাত দশটা। কি যে করে এত বাইরে বাইরে।

সুনীতিদেবী একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন সে কথা।

ভুরু কুঁচকে চেয়ে রয়েছিল অমু।

এক সময় বলেছিল—বাড়িতে ঢুকতে ইচ্ছে করে না। তাই বাইরে সময় কাটাই। গুম হয়ে গিয়েছিলেন সুনীতিদেবী।

একটু থেকে বলেছিলেন—ও বাড়ির সুব্রতবাবু বলছিলেন তোর বিয়ের কথা। ওঁর এক মামাতো বোন—

বেরোতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়েছিল অমু।

বলেছিল—সখ তো আছে খুব। খাওয়াবে কি? ঘেন্না হয় তোমাদের। ভবিষ্যতের কথা কোনোদিন ভেবেছিলে? একটা জিনিসই বুঝতে—সেটা হল বংশবৃদ্ধি।

—কি? কি বললি তুই?

সুনীতিদেবী চিৎকার করে উঠেছিলেন।

সহজ গলায় অমু বলেছে—অপ্রিয় সত্য কথা বলেছি। রাগ করে কি হবে? তোমরা যদি ভবিষ্যতের কথা ভাবতে, তাহলে আজ সংসারের এই অবস্থা হত না।

সুনীতিদেবী সামনা-সামনি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

বলেছিলেন—অমু তুই বিয়ে কর। আমাদের ছেড়ে বরং বৌ নিয়ে আলাদা থাক। তবু কথা শোনাস না। এখনো উনি চাকরী করেন রে। তোর গলগ্রহ হই নি এখন পর্যন্ত। একটু হেসেছিল অমু। অত্যন্ত স্বচ্ছন্দগতিতে বেরিয়ে গিয়েছিল।

নিজের এই অবস্থার কথা ভাবতে গিয়ে ভয় পেলেন সুনীতিদেবী। অমু [illegible] জানবে কি হবে কে জানে। হয়ত ঘৃণায় [illegible] ফিরিয়ে নেবে। হয়ত লজ্জায় বিতৃষ্ণায় স্তব্ধ হয়ে যাবে।

সুনীতিদেবীর মনে হল ছেলের সামনে দাঁড়ানোর মুখ তাঁর আর নেই। চিরদিনের জন্য ছেলের কাছে তিনি অপরাধী হয়ে গেলেন।

• পর্দা ঠেলে মীলু ঢুকল।

সুনীতিদেবী চমকে উঠলেন। নড়েচড়ে বসলেন।

কয়েক মুহূর্ত মীলু চেয়ে রইল। তারপর নিরস গলায় বলল—তোমার শরীর খারাপ? দাদার খাবার—

ক্লান্তিতে শরীর যেন ভেঙে এল সুনীতিদেবীর। অতি কষ্টে যেন চোখ মেললেন। বললেন—একটু করে দে না মীলু। আমি—

—কি হয়েছে তোমার?

—তেমন কিছু না। যা না একটু চা করে দে অমুকে। খাবার তো—

তিক্ত কণ্ঠে মীলু বলল—যত ঝামেলা। আমায় এখন সুজাতাদের বাড়ি যেতে হবে একটা বইয়ের জন্য।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুনীতিদেবী উঠলেন। মাথাটা ঘুরে যাচ্ছিল। একটু থমকে দাঁড়ালেন উনি। সেই সময়ই মীনু ওঁকে ডাক করে দেখল। কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে কিছু একটা আভাস পেয়েই ও যেন চমকে উঠল। বিস্মিত হয়ে মায়ের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

নিজেকে সামলে নিলেন সুনীতিদেবী। কাপড়ের ভাঁজটা ঠিকঠাক করলেন।

চোখ তুলে দেখলেন মীনু চেয়ে আছে ওঁর দিকে। দু-চোখে রুদ্ধ আক্রোশ। অথচ আস্তে আস্তে সেটা যেন ঘৃণায় রূপান্তরিত হল।

মীনু হঠাৎ বলল—থাক তুমি বসো। আমিই বাবাকে খাবার দিয়ে আসছি। কিন্তু সুনীতিদেবী দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি যেন পালাতে চাইলেন মেয়ের সামনে থেকে। সন্তানের ঘৃণা থেকে তিনি যেন বাঁচতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর মনে হল সমস্ত পৃথিবীটা যেন দুলছে। কাঁপছে যেন সব কিছু।

মীনু ওঁর কাছে এল। বলল—থাক আমি যাচ্ছি।

ও ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল।

চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন সুনীতিদেবী।

ওঁর চোখে জল এসে গেল। ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল একটু।

ছেলেমেয়ের ঘৃণার চাইতে বোধ হয় জীবনে কোনো কিছু তিক্ত নয়। তাঁর রক্ত-মাংসের সৃষ্টি এরা। অথচ এদের চিন্তার সঙ্গে তাঁদের আজ আর কোন মিল নেই। ওরা কেমন করে যেন দূরে সরে গেছে আস্তে আস্তে। নিজেদের কিছুটা পৃথিবী গড়ে তুলেছে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মা-বাবার ত্রুটি-বিচ্যুতি-গুলো আবিষ্কার করতে শিখেছে। এখন এরা স্বচ্ছন্দে বলতে পারে যে তাদের সৃষ্টির পেছনে জনক-জননীর মহৎ কোনো আবেগ ছিল না। সবটাই নাকি নিছক এক জৈবিক ব্যাপার।

সুনীতিদেবী বুঝলেন এতদিন পরে এবার তাঁর মনের ভেতরে সন্তানদের প্রতি এক ধরনের ঘৃণার জন্ম হচ্ছে। তাঁর রক্ত-মাংসের সৃষ্টিগুলো আসলে যেন তাঁর কেউ নয়। হিমুর মতো ওরা সবাই অত্যন্ত দূরের।

পর্দা ঠেলে রাজীববাবু ঢুকলেন।
অত্যন্ত কুণ্ঠিত পদক্ষেপ। বলতে চাইলেন।

অপরাধীর ভঙ্গিতে এসে দাঁড়ালেন। নরম গলায় বললেন আজ কেমন আছ ?
মুখ ফিরিয়ে নিলেন সুনীতিদেবী।

প্রৌঢ় স্বামীর ক্লান্ত ছায়াটা ঘরে নেমে আসতেই বিতৃষ্ণায় শরীর কাঁপতে এসেছিল। অক্ষম সংসারবাহীর এই ব্যর্থ নায়কের মতো মনে আসতেই সুনীতিদেবী কেমন যেন একটা অন্ধ আক্রোশে ফুঁসে উঠতে চান। নির্মম দণ্ডে যেন ভূলুণ্ঠিত করতে চান চরম অপরাধীর শেষ সম্বলটুকু।

রাজীববাবু বললেন —মানে—

—তুমি যাও এখান থেকে।

দাঁতে দাঁত চেপে যেন সুনীতিদেবী কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

একটু সরে গেলেন রাজীববাবু। বিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এক সময়ে বললেন, না মানে ডাক্তার-বাবু বললেন এই বয়সে—

—তোমার ডাক্তারবাবুকে নিয়ে তুমি কোথাও একটু যাও। উঃ আমি যে কি করব —দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু হাত কচলালেন রাজীববাবু। সেই অবস্থায় তাঁর কর্তব্যটা যে কী কিছুতেই যেন ভেবে পেলেন না।

—মা।

মীনু ঘরে ঢুকল।

বাবাকে দেখে একটু কেমন করে যেন তাকাল। রাজীববাবু একটুখানি হাসলেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন।

সুনীতিদেবী মীনুকে একটু দেখলেন। বেশ সেজেছে মীনু। ম্যাচিং-করা শাড়ি-ব্লাউজ। সেই রঙের টিপ। বেশ বড় একটা খোঁপা।

সুনীতিদেবী বললেন—তুই কোথায় যাচ্ছিস এই সময় ?

—সুজাতা এসেছে। ওকে একটু এগিয়ে দেব।

—এই সন্ধ্যের সময় ?

মীনু কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে সুনীতিদেবী বললেন মীনু শোন।

—কি বল।

—একটু আমার পাশে বস না।

বিরক্ত মুখে মীনু ধপ করে বসল পাশের চেয়ারে। অস্থিরভাবে ঘড়ি দেখল। শাড়ির ভাঁজ ঠিকঠাক করল।

সুনীতিদেবী নরম গলায় বললেন—সুজাতার দাদার সঙ্গে নাকি তোর—

মীনু ঠোঁট চেপে রইল।

সুনীতিদেবী বললেন—ছেলেটা তো কিছু করে না। লেখাপড়াও শেখে নি। শুনেছি তেমন সুবিধের নয় ওর স্বভাবচরিত্র।

ঝাঁঝ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মীনু।

বলল জানতাম তুমি এই প্রসঙ্গে আসবে। শুনে রাখ তাহলে কেউ আমায় ঠেকাতে পারবে না। আমি ওকেই, ওকেই—

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সুনীতিদেবী।

বললেন আমি তোর ভালর জন্যই

—থাক তোমরা আর কথা বল না। নিজেরা কি ?

ভ্রূ কুঁচকে উঠে দাঁড়ালেন সুনীতিদেবী। স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন মীনুর দিকে। মীনু আবার ঘড়ি দেখল। তারপর গটগট করে বেরিয়ে গেল।

চেয়ারে বসে পড়লেন সুনীতিদেবী। বুকটাতে কেমন যেন একটা তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে জীর্ণ হৃদপিণ্ডটা।

—মা।

সবাইর ছোট রুম্পা ঢুকল। সেভেনে পড়ে। বেশ ডাগর হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

সামনে দাঁড়িয়েই বলল কিছু বললে না যে ? দিদি আবার [illegible]দাদির সঙ্গে বেরোল।

—তুইও যা। সেই [illegible] কে তোকে চিঠি দিয়েছিল ওর সঙ্গে [illegible] পড়। যার যেদিকে খুশী যা। আমায় আর কিছু—

—যাবোই তো।

রুম্পা ফুঁসে উঠল। বলল—ওর একটা চাকরী হলেই চলে যাব। তোমাদের নরককুণ্ডে কোনো মানুষ থাকতে পারে ?

—তাহলে মীনুর দোষ দিচ্ছিস কেন ?

—আমি কারো দোষ দিই নি। সুজাতার ছোড়দা প্রণয়কে আমি চিনি। তাই সাবধান করে দিতে এসেছিলাম।

—তোর সলিলকেও আমি চিনি।

খবরদার—ওর নাম তুমি মুখে আনবে না। তোমার মুখে মোটেই—

ও হনহন করে বেরিয়ে গেল।

বুকটা চেপে ধরলেন সুনীতিদেবী। তবে কি রুম্পাও জানে সব কিছু ? রুম্পাও ঘৃণা করে তাঁকে ? মাথাটা ঘুরছে। সারা পৃথিবীটা যেন দ্রুতগতিতে দুলছে। অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। উনি মুখ ঢেকে বসে রইলেন কিছুক্ষণ।

যে আসছে সে কার মতো হবে কে জানে। হয়ত হিমু আর মীনু বা রুম্পার মতো সেও শুধু আঘাত দেবে। ঘৃণা করতে শিখবে। পরম নির্বিকারভাবে তুলে দেবে নির্মম দণ্ড।

শাড়ির ভাঁজ সরিয়ে সুনীতিদেবী একটু পেটে হাত বোলালেন। পরম মমতায় ছুঁয়ে রইলেন যেন অনাগত আত্মজকে।

ক্রমে সমস্ত বাড়িটা শান্ত হয়ে গেল। ওঘরে রুম্পার পড়ার শব্দ থেমে গেল। রেডিও-র খবর পড়া শেষ হল।

সুনীতিদেবী উঠে চোখ মুছলেন।
আস্তে আস্তে ও ঘরে ঢুকলেন।

রাজীববাবু চোখ বুজে বসেছিলেন। পায়ের শব্দে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সুনীতিদেবীকে দেখে কেমন যেন চমকে উঠলেন।

সুনীতিদেবী বললেন—ডাক্তার কি বলছিল ?

কুণ্ঠিতভাবে রাজীববাবু বললেন—মানে এই বয়সে—তাছাড়া সংসারের যা অবস্থা—সেইজন্যই—মানে—

রাজীববাবুর চেয়ারে হাত রাখলেন সুনীতিদেবী।

বললেন—কিছু হবে না। কোনো ভয় নেই তোমার।

তাঁর কণ্ঠটা আশ্চর্য স্নিগ্ধ হয়ে উঠল।

গোয়েন্দাধাঁধা

গ্র্যাণ্ড মেট্রপলিটনের মোতির মালা আগাথা ক্রিস্টি

হেস্টিংস বললে—'পয়রট, চলো ব্রাইটনে গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে আসি।'

সঙ্গে সঙ্গে রাজী হল হারকুল পয়রট। এলাম ব্রাইটন। কিন্তু মস্তিষ্কের ব্যায়াম থেকে রেহাই পেলাম না। ঘটনাটা ঘটল সেই রাতেই।

পয়রট তো বলেই ফেলল—হেস্টিংস, ইচ্ছে যাচ্ছে কিছু হীরে জহরৎ ছিনতাই করে নিই এই তালে। থামের পাশে ঐ মোটা মেয়েটাকে দেখেছো? গয়নার সচল দোকান তাই না?'

'ও'র নাম মিসেস ওপালসেন', বলল হেস্টিংস।

'চেনো?'

'সামান্য। স্বামী শেয়ার মার্কেটের দালাল। তেলের ছিটেকে আঙুলে ফুলে কলাগাছ।'

খাওয়াদাওয়ার পর লাউঞ্জে দেখা হয়ে গেল ওপালসেন দম্পতীর সঙ্গে। একগাল হেসে মিসেস তাঁর বক্ষশোভা দেখালেন পয়রটকে; মানে, মূল্যবান কণ্ঠহারটি। তাতেও আশ মিটল না। হারকুল পয়রটকে তাঁর মোতির মালা না দেখালেই নয়। ছুটলেন শোবার ঘরে মহামূল্যবান সেই নেকলেস আনতে।

স্বামীদেবতা গম্ভীর চালে বললেন—'মালার মত মালা মশাই। দেখে চোখ ঠিকরে যাবে। দামটা অবশ্য চড়া—'

কথা আটকে গেল এক ছোকরা খানসামার আবির্ভাবে। মেমসাহেব তলব করেছেন কর্তাকে।

দৌড়োলেন ধনকুবের ওপালসেন। দশ মিনিট আর পাত্তা নেই।

ভুরু কুঁচকে বলল হেস্টিংস—'আরে গেল যা! এঁরা কি আর আসবেন না?'

পয়রট বললে—'না। একটা গোলমাল হয়েছে।'

'তুমি জানলে কি করে?'

'এইমাত্র হন্তদন্ত হয়ে অফিসঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন হোটেল ম্যানেজার। লিফটম্যান গুজগুজ করছে ওয়েটারদের সঙ্গে—তিনবার ঘণ্টা বাজল লিফটের—কিন্তু খেয়াল নেই লিফটম্যানের। ওয়েটারদেরও মন নেই খদ্দেরদের দিকে। ওয়েটাররা যখন খদ্দেরদের কথাও ভুলে যায়, তখন জানবে— দেখ পুলিশ এসে গেল।' সত্যি সত্যিই দুজন পুলিশ ঢুকল হোটেলে। তারপরেই দৌড়ে এল একজন হোটেল কর্মচারী।

'স্যার, আপনারা দয়া করে মিস্টার ওপালসেনের ঘরে পায়ের ধুলো দেবেন?'

'নিশ্চয়. নিশ্চয়।' পয়রট যেন এক পায়ে খাড়া ছিল এতক্ষণ।

মিসেস ওপালসেনের ঘরে ঢুকে দেখলাম দেখবার মত এক দৃশ্য। গয়নামোড়া গৃহিণী ইজিচেয়ারে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে কাঁদছেন হাপুসনয়নে। জলের ধারায় ধুয়ে যাচ্ছে মুখের পাউডার। পেছনে হাত দিয়ে রাঙামুখে পায়চারী করছেন কর্তা। পুলিশ অফিসার নোটবই খুলে জেরা করছেন আর লিখছেন। একজন পরিচারিকা বলির পাঁঠার মত কাঁপছে সামনে। আর একজন রাগে ফুলছে পাশে দাঁড়িয়ে।

ব্যাপার অতি গুরুতর। মহামূল্যবান মোতির মালা চুরি হয়ে গেছে। খেতে যাওয়ার আগেও গিন্নী দেখেছিলেন মালাটা। গয়নার বাকসে চাবি দিয়ে রেখে গেছিলেন টেবিলের ড্রয়ারে। গয়নার বাকসের চাবিটা অবশ্য মামুলী। যে কেউ খুলতে পারে। ড্রয়ারেও চাবি থাকে না। কেননা, বলির পাঁঠার মত কাঁপছে ঐ যে মেয়েটা, ও সব সময়ে থাকে ঘরে। ওর নাম সিলেসটিন। ফরাসি মেয়ে। গিন্নীর সেবাদাসী। কর্তার হুকুমমত সে ঘর থেকে বেরোয় না। এমন কি হোটেলের ঝি (রাগে ফুলছে যে মেয়েটা) যখন ঘরে ঢোকে, তখনও সিলেসটিন থাকে ঘরে। তা সত্ত্বেও এইটুকু সময়ের মধ্যে কে যে নিল মোতির মালা। বোঝা যাচ্ছে না।

সিলেসটিন দৌড়ে এল পয়রটের সামনে। সে কি কান্না! পয়রট জাতে ফরাসি (পয়রট বলে, মোটেই না আমি বেলজিয়ান) সুতরাং সিলেসটিনকে বাঁচাতেই হবে। গোলমুখো ঐ ঝি মাগীই হাতসাফাই করেছে মালাটা।

হোটেলের ঝি তেড়ে উঠল। সার্চ করা হোক এখুনি। কিন্তু সার্চ করেও মোতির মালা পাওয়া গেল না কারো কাছে।

সিলেসটিন বললে—'দুবার আমি পাশের ঘরে গেছিলাম। ঐটাই আমার ঘর। একবার তুলো আনতে। আর একবার কাঁচি আনতে।'

পয়রট ঘাড় বের করে বললে—'যাও তো একবার। দেখি কতক্ষণ লাগে।'

দুবার গেল সিলেসটিন। প্রথমবার লাগল বারো সেকেণ্ড। দ্বিতীয়বার পনেরো সেকেণ্ড।

পয়রট নিজে এবার ঘাড় ধরে ড্রয়ার খুলল, গয়নার বাকস বার করল। চাবি খুলল ডালা তুলে ফের বন্ধ করল চাবি বন্ধ করল, ড্রয়ার খুলে রেখে দিল। সবশুদ্ধ লাগল ছেচল্লিশ সেকেণ্ড। তার মানে, হোটেলের ঝি মোতির মালা নেয়নি। সিলেসটিনই চুরনী। সত্যি সত্যিই সিলেসটিনের বিছানার তলা থেকে পাওয়া গেল মালাটা।

পুলিশ ধরে নিয়ে গেল তাকে।

পয়রট দেখল, টেবিলের পাশে একটা খিল আঁটা দরজা। ওদিক থেকেও আঁটা খিল। গেল সেই ঘরে। ফাঁকা ঘর। দরজার পাশেই একটা ধুলিধুসরিত টেবিল। ধুলোর ওপর একটা চৌকো ছাপ।

বেরিয়ে এল পয়রট। হোটেলের ঝিকে নিয়ে গেল মিস্টার ওপালসেনের ঘরে। গিন্নীর ঘরের উল্টোদিকে তাঁর ঘর। পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে বলল—'এরকম একটা কার্ড দেখেছো কোথাও?'

'না তো।' কার্ডটা উল্টেপাল্টে দেখে বলল হোটেল-ঝি।

'খানসামাকে ডাকো।' খানসামা আসতেই কার্ডটা বাড়িয়ে ধরল পয়রট। উল্টেপাল্টে দেখে কার্ড ফিরিয়ে দিয়ে ঘাড় নাড়ল খানসামা—না, এ কার্ড সে আগে দেখেনি।

বেরিয়ে এল পয়রট। দুই চোখ বেশ উজ্জ্বল। বলল হেস্টিংসকে—আমি লণ্ডন যাচ্ছি। হারকুল পয়রটকে এত সহজে ধোঁকা দেওয়া যায় না। মালা-চোর এবার ধরা পড়বে।'

'মালা তো পাওয়া গেছে', বলল হেস্টিংস।

'দূর। ওটা নকল মালা।' বলে গায়ের কোটটা হেস্টিংসের হাতে ধরিয়ে দিল পয়রট। বলল—'কোটের হাতায় সাদা গুঁড়োটা বুরুশ দিয়ে ঝেড়ে রেখো তো।'

'কিসের গুঁড়ো?'

'ফ্রেঞ্চ চক। ড্রয়ারে ছিল—কোটে লেগে গেছে।'

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা ফিরে এল হারকুল পয়রট।

সত্যিই ফিরে এসেছে আসল মুক্তোর মালা। খাঁচায় ঢুকেছে হোটেল-ঝি আর খানসামা।

কিন্তু কি ভাবে? —অদ্রীশ বর্ধন

(সমাধান : ৫৬ পৃষ্ঠায়)

এই বাংলার খবর

দুর্ভিক্ষের দ্বারে এসে

খাদ্য অবস্থার যে-করুণ ছবি বেসরকারি সূত্রে পাওয়া যাচ্ছিল শেষ পর্যন্ত ত্রাণমন্ত্রীর বিবৃতিতেই মিললো তার সমর্থন। রাজ্যের যে সাড়ে তিন কোটি লোকের বাস গ্রামে তাদের মধ্যে শতকরা ৩৫ জন ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। তাদের মোট সংখ্যা সোয়া কোটি। এরা ছাড়া শহর এলাকার আরো লাখ ত্রিশ লোক, অর্থাৎ মোট প্রায় দেড় কোটি লোক এখন অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, ত্রাণমন্ত্রী নিরন্ন মানুষের যে-হিসেব দিয়েছেন তা কমের দিকেই। ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের পরিবারবর্গকে এই হিসেবের মধ্যে ধরা হয় নি। অভাব রাজ্যের প্রায় সর্বত্র, তবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি কোচবিহারে মানুষের দুর্দশা বেশি। কারণ জিনিসপত্রের চড়া দাম আর রুজি-রোজগারের অভাব তো আছেই, তার সংগে এইসব জেলা হয়েছে বন্যা অথবা খরার শিকার। দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা গেলে যে-সব কুলক্ষণ দেখা যায় তা ইতিমধ্যেই দেখা দিতে সুরু করেছে। গাড়ি থেকে খাদ্যদ্রব্য, এমন কি রান্না করা খাবারও চুরি যাচ্ছে। অন্ততঃ রাজ্যের একটি জায়গায় লুঠের চেষ্টা হয়েছে খাদ্যভর্তি গুদামে। রাজ্য সরকার স্বভাবতই উদ্বিগ্ন এই ঘটনায়।

এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য রাজ্য সরকারকে কাজের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে। এপার যে-সব জেলা নাম করা হয়েছে তার মধ্যে ২৪ পরগণা ছাড়া বাকি সাতটিতেই লঙ্গরখানা আর সস্তার ক্যান্টিন খোলা হচ্ছে। ত্রাণের ব্যাপারে প্রত্যেক জেলায় পূর্ণ দায়িত্ব থাকছে একজন মন্ত্রীর ওপর। খাদ্য সঙ্কট আর ত্রাণের প্রশ্ন যে কতো জরুরি হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ, অস্থায়ীভাবে রাজ্যপালের দায়িত্ব নেওয়ার পর শঙ্করপ্রসাদ মিত্র এই দিকেই নজর দিয়েছেন প্রথমে। বিত্তবান মানুষের কাছে বিশেষভাবে আবেদন জানিয়ে বলেছেন, এই সঙ্কটে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। নিজের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন, দাম যতোই চড়া হোক বাজারে কোনো জিনিসই পড়ে থাকে না। সুতরাং কিছু লোকের হাতে পয়সা রয়েছে।

তবে ত্রাণ ভান্ডারে শুধু অর্থ সাহায্য জমা পড়লেই বিশেষ সুবিধে হবে কি? রাজ্যপাল ডায়াসও সাহায্যের জন্যে ব্যবসায়ীদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই আবেদনের ফলে অনেক টাকা জমাও পড়েছে। কিন্তু টাকার চেয়ে বেশি দরকার খাদ্যদ্রব্যের। তারই ঘাটতি, অথবা দাম চড়া। বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানও সেই কথা জানাচ্ছে। কিন্তু রাজ্যে কি সত্যিই খাদ্য নেই, অথবা কম থাকলেও কতোটা কম আছে? মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত নির্দেশে রাজ্য জুড়ে আচমকা হানা দিয়ে পুলিশ যে হাজার হাজার কুইন্টাল চাল-ডাল-তেল আটক করলো তা থেকে প্রমাণ হচ্ছে এই সঙ্কট অনেকটাই মানুষের তৈরি।

মহামারী সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্ন

কলকাতা পৌরসভায় কর্মীদের বিক্ষোভ কর্মবিরতি মোটেই নতুন ব্যাপার নয়। পৌর কমিশনারের হিসেবেই গত সাড়ে আট মাসে আন্দোলনের সংখ্যা এক কুড়ি। ওই পৌর করণিকেরা আবার একবার আন্দোলনে নেমেছেন এবং পৌরসভাকে প্রায় অচল করে দিতে সফল হয়েছেন, এতে অবাক হবেন অল্প লোকই। অবাক হওয়ার কারণ অন্য। সেটা পৌর কর্তৃপক্ষের মনোভাব, যেটা শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকারেরই মনোভাব। নিয়মমাফিক কাজ, প্রতীক কর্মবিরতি ইত্যাদির পর লাগাতার কর্মবিরতি—সব মিলিয়ে করণিকদের আন্দোলন প্রায় এক মাস হতে চললো। পৌরসভা আর কিছু না হোক কর নেওয়ার গোসাই ঠিকই। অথচ এই আন্দোলনের ঠেলায় কর জমা নেওয়াই একরকম বন্ধ হয়ে গেল। তার ফলে পৌর ইতিহাসে নতুন একটা নজির সৃষ্টি হলো। এই মাসের গোড়ায় শমিক ও ঝাড়ুদারেরা ছাড়া আর কেউ মাইনেই পেলেন না।

পৌরসভার যা আয় তার গোটাটাই চলে যায় কর্মচারীদের বেতন মেটাতে। তাই আয় কমে গেলে বেতন মেটানো হবে কী দিয়ে? পৌরসভাকে সচল করে আনতে ডাইনে ছুটোছুটি না করে রাজ্য সরকারের হাতে পাতাই রেওয়াজ। কিন্তু এবার কর্তৃপক্ষ তা করলেন না। তাঁরা বেতন দেওয়া বন্ধ রাখলেন। এটা তাঁদের কড়া মনোভাবেরই পরিচয়। পৌর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এমন কথা পর্যন্ত বলেছেন যে, দরকার হলে তিনি পৌরসভায় লক আউট ঘোষণা করবেন। অফিসাররাই অনভ্যস্ত হাতে করের টাকা জমা নিতে সুরু করেছেন। এদিকে পৌরকর্মীদের যুক্ত সংগ্রাম কমিটি কমিশনারের কাছে আবেদন করেন যে, ধর্মঘটী করণিকদের ধর্মঘটকালীন বেতন কাটা পুজো পর্যন্ত স্থগিত রাখা হোক, তাহলে তাঁরা করণিক ইউনিয়নকে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিতে রাজি করাবেন। কমিশনার সে আবেদন মেনে নেন নি।

তিনি তাঁর তরফ থেকে এই মহানগরীর অধিবাসীদের সামনে একটা মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরেছেন—"কোন্ কলকাতা আপনার কাম্য? সুস্থ সবল কলকাতা, না মৃত বিস্মৃত কলকাতা?" তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে শুধু কর্মীদের আন্দোলন সামলাতে গিয়ে পৌর কর্তৃপক্ষ আর কোনো কাজ করার সময় পাচ্ছেন না। গত এপ্রিলে পৌর কর্মীদের আন্দোলনের সময়ও তিনি নাগরিকদের সামনে একই ধরনের প্রশ্ন তুলে ধরেছিলেন—কাদের স্বার্থ বড়, তেত্রিশ লাখ নাগরিকের না তেত্রিশ হাজার পৌরকর্মীর? কর্মীদের বেতন মেটাতেই যদি পৌরসভার সব টাকা চলে যায় তবে নগর উন্নয়নের জন্যে তাঁরা আর কতটুকু কী করতে পারবেন?

উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব কার?

ঘটনাটা ঘটে সুদূরে মধ্যপ্রদেশের মানায়। উদ্বাস্তু শিবিরে পুলিশের গুলিতে চারজনের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার ধাক্কা দিল্লী দিয়ে ঘুরপথে এসে লেগেছে এই বাংলায়। কারণ উদ্বাস্তুরা সাবেক পূর্বপাকিস্তান থেকে এসেছিলেন এই রাজ্যেই। তারপর তাঁদের পুনর্বাসনের জন্যে পাঠানো হয় বাংলার বাইরে নানা জায়গায়। মানা সেই সব জায়গারই একটি। ঠিক কী কারণে (পুলিশের খবর, দুদল উদ্বাস্তুর মধ্যে বিবাদ লাগে, পুলিশ থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়, শেষ পর্যন্ত গুলি ছোঁড়ে) গুলি চলে, তা মধ্যপ্রদেশ সরকারের কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন পশ্চিম বাংলা সরকার। এই ঘটনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্যে রাজ্যসভায় যে-দাবি ওঠে, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী খাদিলকার তা নাকচ করে দেন।

তাতে সকলে অবাক হবেন না, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পর্কে খাদিলকরের মন্তব্যে অবাক হয়ে গেছেন খোদ পশ্চিম বাংলা সরকার; খাদিলকার যা বলেছেন তার নির্গলিতার্থ হলো, যে-সব উদ্বাস্তুর এখনও পাকা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়নি তাঁদের সমস্যা সামলাবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নয়, পশ্চিমবাংলার। সুতরাং এ-বিষয়ে পশ্চিমবাংলা সরকার যদি কিছু না করেন তবে দিল্লী আর কী করতে পারে? পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে, খাদিলকার এ-কথাও মানতে চান নি। খাদিলকারের এই সব কথা শুনে রাজ্যের ত্রাণমন্ত্রী সন্তোষ রায় বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্যে দিল্লী কতো টাকা খরচ করেছে আর পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্যেই বা কতো টাকা খরচ করেছে তা থেকেই তো বোঝা যাবে কোনো বৈষম্য হয়েছে কিনা। প্রথমোক্তদের জন্যে থেকেই তো বোঝা যাবে কোনো বৈষ্য হয়েছে কিনা। প্রথমোক্তদের জন্যে খরচ করেছে ৪৫৬ কোটি টাকা (১৯১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ); দ্বিতীয়োক্তদের ভাগ্যে জুটেছে মাত্র ১৪৬ কোটি টাকা (কোনো ক্ষতিপূরণ এঁরা পান নি)। দেশভাগের সাতাশ বছর পরেও পূর্ব পাকিস্তানের যে-সব উদ্বাস্তু এই বাংলার নানা কলোনিতে দিন কাটাচ্ছেন তাঁদের পুনর্বাসনের জন্যে রাজ্য সরকার ১৫০ কোটি টাকার একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে দিল্লীর কাছে পেশ করেছেন। কিন্তু সে-বিষয়েও কেন্দ্রের কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না।

নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গলদ

দেশের অন্যান্য স্থানের মতো এই বাংলাতেও বিদেশী গুপ্তচর-চক্র সক্রিয় রয়েছে, এটা হয়ত অনেকেই জানেন। কিন্তু সেদিন আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ যে-মামলার রায় দিলেন তাতে চমকে দেওয়ার মতো অনেক খবরই বেরিয়ে পড়লো। এই মামলায় সাত জনের সাজা হয়েছে— পাঁচ থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড। তাদের মধ্যে একজন পাকিস্তানী নাগরিক। পাঁচজন আমাদের সেনা বাহিনীর লোক। আরো একজন পাক নাগরিক ধরা পড়ে, কিন্তু পরে সে সরকার পক্ষের সাক্ষী হয় বলে খালাস পায়। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এরা উত্তর বাংলা, ত্রিপুরা, কলকাতা, ব্যারাকপুর, পাঠানকোট প্রভৃতি জায়গা থেকে দামী সামরিক খবরাখবর জোগাড় করে পাকিস্তানে পাচার করতো।

এই খবর এমনিতেই যথেষ্ট চাঞ্চল্যকর, কিন্তু তার চেয়েও চমকে দিয়েছে বিচারপতির রায়ে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে নানা কঠোর মন্তব্য। খুব স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেছেন যে, আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখন এসে পৌঁচেছে একেবারে নিকৃষ্ট পর্যায়ে। সামরিক বাহিনীর গোপনীয় আদেশ ব্লু-প্রিন্ট ইত্যাদি রাখার ব্যবস্থায় যথেষ্ট গাফিলতি রয়েছে। গোপনীয় কাগজপত্রের কোনো হিসেবও রাখা হয় না। বিদেশী চরেরা অনায়াসেই ফোর্ট উইলিয়ামের মতো সংরক্ষিত এলাকায় ঢুকে পড়তে পারে, এমনই আমাদের সতর্কতা ব্যবস্থা! কলাইকুণ্ডা বা ব্যারাকপুরেও অবস্থা একই। খোলা জায়গায় রয়েছে সামরিক বাহিনীর অনেক অফিস, যেখানে কোনো পাঁচিল পর্যন্ত নেই। এই ধরনের দায়িত্বহীনতা ও ঔদাসীন্য বন্ধ হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বিচারপতি।

—দেবদত্ত

২৬-৯-৭৪

পটভূমি

খাদ্য নিয়ে রাজনীতি কী সমীচীন ?

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি ভয়াবহ। সব দল ও মতের লোকের একই কথা। এর কারণ এবং ব্যাপকতা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে, এবং থাকবে। মানুষ এই অবস্থায় কি করে বাঁচবে—তাই হল সকলের চিন্তা। কিন্তু বামপন্থীদের শুধু চিন্তা এই সুযোগে তারা কি করে ভেসে উঠবে।

বন্যা, খরা যেমন রাজ্যের মানুষের দুঃখের কারণ, তেমনি মন্ত্রী শাসনের ব্যর্থতা এবং এক শ্রেণীর জোতদার এবং ব্যবসায়ীর অতিমুনাফা বৃত্তিই এই ব্যাপক সঙ্কট সৃষ্টির মূলে। বেশী পয়সা দিলে সর্বত্র জিনিষ মেলে। কাজেই নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের অভাব, খাদ্যের অভাব অনেকটা কৃত্রিম। মুনাফাশিকারীর দল এই সংকট সৃষ্টি করেছে। তারাই অতিলাভের লালসায় জিনিষপত্রের দর বাড়িয়ে চলেছে। এই সংগে যুক্ত হয়েছে প্রশাসনিক এবং সামাজিক দুর্নীতি এবং অপচয়। বহু পাপ আমাদের সমাজে। তাই সঙ্কটমুক্তির জন্য কথা বলি আন্দোলন করি কিন্তু মানুষকে বিপদে রক্ষার জন্য এক হই না, রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠতে পারি না। এই চরিত্রগত দুর্বলতা স্বার্থ-চিন্তা আমাদের সর্বনাশ এনেছে।

গ্রাম বাংলায় ব্যাপক অভাব, অনাহার। অর্থাভাবে দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত মুমূর্ষু। এর মূল কারণ শুধু খাদ্যের অভাব নয়, চড়া দামে চাল ডাল তেল নুন কেনার সামর্থ অধিকাংশেরই নেই। ক্রয়ক্ষমতাহীনতাই আসল ব্যাধি। যে রাজ্যের শতকরা ৭০ জন মানুষ দারিদ্র্য-সীমার তলায় বসবাস করেন তাঁরা এত চড়া দরে খাদ্য কিনবে কি করে? তাই গ্রাম বাংলার শতকরা ৯০ জন, শহরের ২৫ শতাংশ, এমন কি নিম্নমধ্যবিত্তরাও সরকারী সাহায্যপ্রার্থী—শুধু বাঁচার আশায়।

দেরীতে হলেও, রাজ্যের কংগ্রেসী সরকার যুব কংগ্রেস ছাত্র পরিষদ এবং জনসেবীরা মজুত উদ্ধার অভিযানে নেমেছেন। সি পি আই প্রথমে এই অভিযান শুরু করেছিল, ফলশ্রুতি অবশ্য আশাব্যঞ্জক হয় নি। কিন্তু এর সার্থকতার প্রতি তাঁরা সকলের দৃষ্টি এনে দিয়েছেন। আসলে যে চাল-কলের মালিকরা সরকারকে চাল ডাল তেল নুন বা নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি কালোবাজারে চলে গেছে, জিনিষপত্রের দর সকালে-বিকেলে বাড়ছে, অভাবে, দারিদ্র্যে মনুষ প্রায় নিঃস্ব, তখন মজুত অভিযানে আশানুরূপ সাফল্য আসতে পারে না। তবুও যুব কংগ্রেসী এবং সরকারী কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ, দেরীতে হলেও তাঁরা মজুতদার ও কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু করেছেন। বহু মাল ও ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। ন্যায্য দরে তা এখন সাধারণ্যে বিক্রির ব্যবস্থা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে। কিন্তু বাফার ষ্টক করার ব্যবস্থা কোথায়?

যে চাল কলের মালিকরা সরকারকে চাল জমা না দিয়ে কালোবাজারী করেছে তাদের বিরুদ্ধে কি শাস্তি নেওয়া হচ্ছে তাও রাজ্যবাসী জানতে চায়, জানতে চায় লেভি-ফাঁকিদার জোতদারদের বিরুদ্ধে কি সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কারণ, রাজ্যে এতটা খাদ্য ঘাটতি নেই! অতি মুনাফার জন্য এই মুনাফাশিকারীরা রাজ্যের ভেতরে ধানচাল লুকিয়ে রেখেছে, বাইরে পাচার করেছে তাদের এখনই সায়েস্তা করতে না পারলে রাজ্যের ভবিষ্যৎ খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযানও ব্যর্থ হবে। মজুত উদ্ধার অভিযান রাজ্যে নতুন মানসিকতার জন্ম দিচ্ছে এটাও একটা লাভ।

সংগে সংগে বৃহত্তর কলকাতা, শহর ও আংশিক বরাদ্দ এলাকায় ভুয়ো রেশন কার্ড উদ্ধারের জন্য সক্রিয় অভিযানও দরকার। কারণ, একটা হিসাবে দেখা যায় বৃহত্তর কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে প্রায় ১৫ লাখ এবং আংশিক এলাকায় প্রায় ২০ লাখ ভুয়া কার্ড আছে। এই কার্ড পরীক্ষা ও উদ্ধারের জন্য বার বার যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাতে নিষ্ঠা ও সৎসাহসের অভাব ছিল। তাই কিছুই হয়নি। আমদানী করা চাল, গম পাচারের একটি রাস্তা হল রেশনিং ব্যবস্থা। কাজেই এই ভুয়ো কার্ড উদ্ধার করেও বহু খাদ্য দরিদ্র মানুষকে সরবরাহ করা চলে। জীবনযাত্রার ব্যয়ের ক্ষমতার ভিত্তিতে দুই তিন রকম দর তৈরীও চলে। রেশনের খাদ্যদ্রব্য ওয়াগন গুদাম ভেঙে ও ট্রান্সপোর্ট ক্যারিয়ার এবং দোকান থেকে পাচার হয়। যার ফলে বছরে তিনশত কোটি টাকার খাদ্যসামগ্রী লোপাট হয়। কাজেই মজুত উদ্ধার অভিযান এবং ভুয়ো রেশন কার্ড উদ্ধার অভিযান একসংগে হওয়া দরকার।

অনাহারে অপুষ্টিজনিত রোগে কত লোক মরেছে বা এখন ধুঁকছে তা নিয়ে বিতর্ক আছে, কিন্তু এর ব্যাপকতা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। রিলিফ ও লংগরখানা ব্যাপক হারে খোলা হচ্ছে মূলত ৮টি জেলায়। পুরুলিয়া, ন[illegible], কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা[illegible] খরা এবং বন্যা, দ্রব্যমূল্য ও ব্যাপক দারিদ্র্য এই ভয়াবহ দুঃখকষ্ট পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। সরকারী ও বেসরকারী সব সেবাকার্যে সমন্বয় একান্ত দরকার। কারণ রিলিফের দ্রব্য নিয়ে অতীতের মতো এবার যাতে কোন ব্যক্তি বা দল, বা সংস্থা মুনাফা লুটতে না পারে তার দিকেও নজর অত্যাবশ্যক।

খাদ্যাভাব বেকারী ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সংকটে পশ্চিমবাংলা যখন ধুঁকছে তখন দেখছি রাজ্যে বিস্ফোরণ ঘটানর জন্য বামপন্থীরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। দুঃস্থ মানুষের সেবায় এরা নেই, কিন্তু দুঃস্থতার সুযোগ নিয়ে ব্যাপক আন্দোলনের কথা তারা বলছে। সি পি এম পুজোর আগে সবকিছু অচল করে দেবে বলে হুমকী দিয়েছে। কিন্তু কোন হুমকীতে ক্ষুধা মিটবে না। মানুষকে বিপদে রক্ষা করাই যখন প্রথম কর্তব্য তখন খাদ্য নিয়ে রাজনীতির কথা বলা কি সমীচীন?

—ভাষ্যকার

সিকিম-প্রসঙ্গ

গত এক দেড় বছর ধরে সিকিমের খবর স্থান পাচ্ছে ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায়। গত জুন-জুলাই থেকে সিকিম এখন দৈনিক খবরের পর্যায়ে পড়েছে। এতদিন সবাই জানতেন, সিকিম হচ্ছে হিমালয়ের কোলে একটি নিদ্রিত সামন্ত রাজ্য। সিকিম রাজ্য বা সিকিমবাসীদের কতখানি আগ্রহ বা তাদের মতামতের কোনো গুরুত্ব না দিয়েই কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্র সিকিমকে নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। এদের মধ্যে অন্যতম হল নেপাল চীন পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সিকিম কেন ভারতের অন্য রাজ্যের মতন সাংবিধানিক ক্ষমতা পেল এই নিয়ে মাথা ব্যথা দেখা দিয়েছে নেপালের চীনের পাকিস্তানের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। গত কয়েক বছর ধরে এই কটি রাষ্ট্র ভারতের সব ব্যাপারেই বিরোধিতা করে আসছে। ভারতের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করা এখন এদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। অবশ্য এর জন্য দায়ী ভারত সরকারের দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন নীতি। সিকিমের সামন্ততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের অবসান হওয়া উচিত ছিল ১৯৪৮-৪৯ সালে। বৃটিশ আমলে ও স্বাধীনতার পরে ভারতে যেমন বহু সামন্ত রাজ্য ছিল তেমনি ছিল সিকিম। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যখন সামন্ত রাজ্যগুলোকে ভারতীয় সংবিধানের আওতায় আনেন তখনই উচিত ছিল সিকিমকে আনা।

১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীন হল তখন সিকিম কংগ্রেস দল আন্দোলন সুরু করে যাতে সামন্ততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। তারই ফল দেখা দিল ১৯৭৪ সালে অর্থাৎ ২৭ বছর পরে। সিকিমের জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে বিধানসভা কায়েম করেছেন। সেই বিধানসভার প্রতিনিধিরা নির্বাচন করেছেন মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী। তাঁরাই চেয়েছেন ভারতীয় সংবিধানের আওতায় আসতে অর্থাৎ ভারতের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করতে। সিকিমের মহারাজা, যিনি এই কয়েক বছর আগে চোগিয়াল নামে পরিচিতি লাভ করেছেন তিনি যেমন ছিলেন তেমনি থাকছেন। তবে তিনি আগের মতন তাঁর দরবারে ১২ জন প্রতিনিধি যা তিনি নিজের পছন্দ মতন বসাতেন তা আর করতে পারবেন না। রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের অবসান হয়ে এখন প্রজাতন্ত্র কায়েম হয়েছে। সেটা পুরোপুরি হজম করতে পারছেন না চোগিয়াল এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা। তারই ধুঁয়ো তুলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন নেপাল ও পাকিস্তান। এদের স্বার্থ কোথায় এবং কেন তা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই।

সিকিমের ইতিহাস ও ভূগোল পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সিকিমের আসল বাসিন্দা হল লেপচারা। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল দক্ষিণে তিস্তা নদীর অববাহিকা, উত্তরে তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা এবং পূর্বে নেপালের মেচি নদী পর্যন্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় ভোটিয়া এসে আক্রমণ চালায়। সেই থেকে ভুটিয়াদের আধিপত্য বাড়ে। বাড়ে সেই সঙ্গে নেপালীদেরও। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিব্বতের সঙ্গে কয়েকবার যুদ্ধও হয়ে যায়। সেই ফাঁকে চীনও খবরদারী করে। সেই দাবীতে আজ চীনও সিকিমের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে। আর যেহেতু নেপালী বসবাস করে সিকিমে সেই হেতু নেপালও চায় সেখানে খবরদারী করতে। নেপাল যে কারণে দার্জিলিং জেলার ওপর খবরদারী করতে চায় ঠিক সেই কারণে আজ সে সিকিমেও করতে চায়। পাকিস্তানের কথা স্বতন্ত্র। ভারত-বিরোধী কোনো কারণ ঘটলেই তার পেছনে থাকে পাকিস্তান। আর তাতে ইন্ধন জোগায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তার কথা পরে আসছে।

সিকিমের মহারাজা বা চোগিয়াল কিন্তু লেপচা নন। তিনি ভুটিয়া। অর্থাৎ সিকিমের আদিবাসী লেপচাদের বাদ দিয়ে ভুটিয়াদের রাজাই হলেন ওখানকার সর্বেসর্বা। এবং তাঁকে নিয়েই যত গন্ডগোল। বছর কয়েক আগে যখন বর্তমান সিকিম রাজা আমেরিকান মেয়ে মিস হোপকে বিয়ে করলেন, তার কিছু পরেই সিকিমের রাজপ্রাসাদে বেশ আলোড়ন দেখা দিল। যেহেতু সিকিমের অধীনে বহু শতাব্দী আগে ছিল দার্জিলিং জেলা ও নেপালের কিছু অংশ তাই সিকিম রাজকে বোঝান হল যে তার পুরোনো সাম্রাজ্য এলাকাকে নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র করলে কেমন হয়। স্বপ্ন ও বাস্তব তো এক জিনিস নয়। এটা মিস হোপ ভুলে গেলেন। তাঁকে বোঝালেন মার্কিন পরামর্শদাতারা। চোগিয়াল বা সিকিমের মহারাজা সেই ভাবেই কাজে এগুলেন।

আমেরিকানদের হঠাৎ সিকিম নিয়ে মাথা ঘামাবার কেন এত ব্যস্ততা? সেই ইতিহাসের খানিকটা তাহলে বলতে হয়। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সিকিম ছিল সত্যিকারের ঘুমন্ত একটি সামন্ত রাজ্য। চীনা আক্রমণের পর দেখা গেল তিব্বত থেকে ভারতে আসতে গেলে ওখানে অনেক পথ, ওখান থেকে সহজ পথে তিব্বতে যাওয়া যায়।

চীনের সঙ্গে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যত গলাগলি ভাব, তা শুধু ওপরে ওপরে। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে চাপে রাখার জন্যেই চীনকে এত তোয়াজ করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু চীনের বাড়াবাড়ি কোনো দিন সহ্য করেনি বা করে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তিব্বতের প্রতি নজর রাখার জন্যে তার প্রয়োজন ছিল সিকিমের ওপর প্রভাব বিস্তার করা। সেই কারণে সিকিমকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চেয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তার জন্যে মদত দিচ্ছিল এতদিন মিস হোপ ও চোগিয়ালকে। '৭৩-এর গ্রীষ্মকালে ঘটল অঘটন সিকিমে। সিকিম কংগ্রেসের নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন সুরু হল সামন্ততন্ত্র ও চোগিয়ালের বিরুদ্ধে। সেই আন্দোলনের কাছে মাথা নোয়ালেন সিকিম রাজ। অসন্তোষ দমন করবার জন্যে চোগিয়াল ভারত সরকারের সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। ভারত সরকারের হস্তক্ষেপে সিকিমের অশান্তি দূর হল। বৃটিশ আমলে ১৮৬৯ এবং স্বাধীন ভারতে ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর চুক্তি অনুযায়ী সিকিমের অনুরোধ অনুযায়ী ভারত সরকার সেখানে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার সব ব্যবস্থা করেছে। জনগণের ইচ্ছাতেই সেখানে সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন হল। এবং জুলাই মাসে নব-নির্বাচিত সিকিম বিধানসভা ভারতের অঙ্গ রাজ্য রূপে যোগ দেয়। এই নিয়ে অনেক অর্ধসত্য খবর রটনা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছে যে সিকিমে গণভোট কেন নেওয়া হল না ইত্যাদি। চোগিয়ালকে নিয়েও অনেক প্রশ্নের ঝড় ওঠে। ভারত-বিদ্বেষী কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্র এই প্রশ্নটিকে ফেনিয়ে জাতি সংঘে তুলবে বলেও শাসিয়েছে। শোনা যায় প্রথম দিকে চোগিয়াল জানান, বিধানসভার প্রস্তাবটি দেখে তার পর সম্মতি দেবেন। পরে নাকি তিনি সম্মতি দিতে চাননি। যাই হোক শেষ পর্যন্ত তিনি সম্মতি দিয়েছেন। সুতরাং সব ব্যাপার এখানেই মিটে গেছে। ব্যাপারটা সহজ হলেও কিছু বিদেশী রাষ্ট্র এই নিয়ে নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে, তারা এটিকে আন্তর্জাতিক সমস্যা বলে মনে করছে। যদিও এটা ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

দিন কয়েক আগে মার্কিন সিনেটর মিঃ পার্সি এসেছিলেন কলকাতায়। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সিকিম সম্বন্ধে। উত্তরে তিনি বলেছেন, এটা সম্পূর্ণ ভারতীয় ব্যাপার। তিনি পরে গিয়েছিলেন ভুটান পরিদর্শনে। কিন্তু কেন ভুটান পরিদর্শন সেটা এখনও রহস্যাবৃত।

যে যাই বলুন এবং যে যাই ভাবুন না কেন, সিকিম এখন ভারতের একটি সহযোগী রাজ্য। সিকিমের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার গত দুই দশকে কৃষি উন্নয়নে প্রায় বিশ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। সিকিমের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৬৬—৭১) তার কৃষি, রাস্তা-যানবাহন ও সমাজ-সেবায় ভারত সরকার নয় কোটি টাকা ব্যয় করেছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত সরকার ব্যয় করবে তার দ্বিগুণ অংক। প্রায় তিনশ জন সিকিম ছাত্র এখন ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া শিখছে। তার ব্যয়ভার বহন করছে ভারত সরকার।

দিলীপ মালাকার

দেশে বিদেশে

খাদ্য চিন্তা!

দেশের নানাদিক থেকে যখন অন্নাভাব ও অনাবৃষ্টির সংবাদ আসছে সে সময়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা নয়াদিল্লীতে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে দেশের খাদ্য-পরিস্থিতির একটা হিসাব নিয়েছেন। কথা ছিল এবারকার খরিফ মরশুমে কি পরিমাণ ফসল কিভাবে কি দামে সংগ্রহ করা হবে সেসব বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীরা সিদ্ধান্ত করবেন। কিন্তু এসব বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দেওয়ায় তাঁরা কোন সিদ্ধান্তেই আসতে পারেন নি।

ফসল সংগ্রহের পরিমাণ সম্পর্কে অনিশ্চয়তার একটি কারণ হল, বন্যায় ও অনাবৃষ্টিতে এবার ফসলের ঠিক কতখানি ক্ষতি শেষ পর্যন্ত হবে তা এখনও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। কৃষিপণ্য মূল্য কমিশন ৫০ লক্ষ টন চাল ও ১৫ লক্ষ টন মোটা দানার শস্য সংগ্রহ করার যে সুপারিশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীরা সেই সুপারিশ 'অবাস্তব' বলে মনে করেন। কিন্তু ঠিক কি পরিমাণ ফসল সংগ্রহ করা হবে সে বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট অঙ্ক স্থির করার আগে মুখ্যমন্ত্রীরা আর দু' সপ্তাহখানেক অপেক্ষা করে ফসলের পরিমাণ সম্পর্কে একটা ভাল আন্দাজ পেতে চান।

ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্বেগজনক সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার মানবাজার থেকে পাঁচ মাইল দূরে ইন্দ্রুদি গ্রামের বীরসিং কর্মকার নামে ৪০ বৎসর বয়স্ক এক কর্মকারের মৃত্যুর সংবাদ সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে বীরসিং তার শেষ যন্ত্রটি এক টাকায় বিক্রি করে সেই টাকা নিয়ে মডিফায়েড রেশনিং-এর দোকানে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। কিন্তু সে পৌঁছতে পৌঁছতে দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হতাশ হয়ে সে ফিরে আসে। পরের দিন শূন্য কুটিরে বীরসিংহের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুরুলিয়ার শস্যভাণ্ডার বলে পরিচিত মানবাজারের ক্ষেতগুলি তখন জলের অভাবে খাঁ খাঁ করছে ধানের চারাগুলি শুকিয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণমন্ত্রী সন্তোষ রায় বলেছেন, রাজ্যের প্রায় দেড় কোটি মানুষ অনাহার ও অর্ধাহারের চরম দুর্গতির মধ্যে রয়েছে। তাদের মধ্যে ভূমিহীন খেতমজুরদের দুর্দশাই সবচেয়ে বেশি। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতেই দুর্দশা সবচেয়ে বেশি। সাতটি জেলায় মোট সওয়া ছয় লাখ মানুষকে দেড়মাস বিনাপয়সায় অথবা সস্তায় খাওয়াবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন এবং অস্থায়ী রাজ্যপাল শঙ্করপ্রসাদ মিত্র দুর্গত মানুষদের ত্রাণের জন্য বেসরকারি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। যে পাঞ্জাব বলতে গেলে সারা দেশকে খাইয়ে রাখে সেখানকার খবরও এবার ভাল নয়। রাজ্যের খরিফ ফসল শুকিয়ে গেছে এবং এখন সেচ দিয়েও ঐ ফসল আর পাওয়া যাবে না বলে জানা যাচ্ছে। ওড়িশার খবর হচ্ছে, সেখানে শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ খরা হয়েছে। একমাত্র মধ্য ওড়িশার কিছু অঞ্চলে অতিবৃষ্টি ও বন্যা হয়েছে, তাছাড়া রাজ্যের আর সব অঞ্চলেই ফসলের খেত জ্বলে হলদে হয়ে গেছে। এই অনাবৃষ্টির ফলে বিদ্যুতেরও সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। পাঞ্জাবের গোবিন্দসাগর লেকে জলের স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় জলবিদ্যুতের উৎপাদন কমে গেছে এবং নাঙ্গল সার কারখানা কয়েকদিনের জন্য বন্ধ রেখে ঐ কারখানায় ব্যবহৃত বিদ্যুৎ সেচের জলের পাম্প চালাবার কাজে ব্যবহার করার কথা হয়েছে।

●

খরিফ ফসলের সংগ্রহমূল্য কি হবে সে প্রশ্নে নয়াদিল্লির বৈঠকে তীব্র মতভেদ দেখা দেওয়ায় প্রশ্নটির মীমাংসার ভার কেন্দ্রের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কৃষিপণ্য মূল্য কমিশন এবার ধানের সংগ্রহমূল্য কুইন্টাল প্রতি ৭৪ টাকা ধার্য করার সুপারিশ করেছেন। অর্থাৎ সংগ্রহমূল্য গত বছরের তুলনায় ৪ টাকা বাড়াবার প্রস্তাব করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী এই দাম বাড়াবার জন্য বিশেষ চাপ দিয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশ,

পাঞ্জাব ও হরিয়ানার প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে বলেছেন চাষের খরচ যেভাবে বাড়ছে তাতে ফসলের উৎপাদন বাড়াবার দিকে লক্ষ্য রেখে সংগ্রহমূল্যে যদি অন্তত কুইণ্টাল প্রতি ১০০ টাকা ধার্য না করলে সেটা একান্তই অবাস্তব হবে। অপরপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীরা সংগ্রহমূল্যে বাড়াবার বিরুদ্ধে জোরালো মত প্রকাশ করেছেন। কৃষিপণ্য মূল্যে কমিশনও এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে ধানের সংগ্রহমূল্য ৭৪ টাকার বদলে ১০০ টাকা করার দাবি মেনে নিলে তাতে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতাই বাড়বে।

ভারত-পাকিস্তান সম্মেলন

ইসলামাবাদে ভারত ও পাকিস্তানের সরাসরি অফিসার পর্যায়ে সম্মেলনে স্থির হয়েছে যে, ডাক, তার ও অন্যান্য যোগাযোগের ব্যবস্থা ও যাতায়াতের ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা হবে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর থেকে এই সব ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। এই উদ্দেশ্যে দুই দেশের মধ্যে তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এই তিনটি চুক্তি সম্পাদন করে সিমলা চুক্তি রূপায়ণের পথে আর একটি পদক্ষেপ করা হল।

সম্মেলন থেকে ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী কেবল সিং বলেছেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সম্মেলন করা হয়েছিল সেটা সীমাবদ্ধ হলেও গুরুত্বপূর্ণ। ঐ উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয়েছে চুক্তিগুলি তার প্রমাণ, তিনি আশা করেন যে, দুই দেশের মধ্যে অধিকতর স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠার পথে এখন আরও অগ্রসর হওয়া যাবে।

•

আফ্রিকায় যুদ্ধের হাওয়া

ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসীর গদীচ্যুতি ও পশ্চিম আফ্রিকার উপনিবেশ থেকে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাদপসরণ —একই সপ্তাহের এই দুটি সংবাদ আফ্রিকায় যুগের হাওয়া বওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সিংহাসনের অধিকারী ও প্রবীণতম নৃপতি ৮২ বৎসর বয়স্ক সম্রাট হাইলে সেলাসী ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন তাঁর সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী অধিনায়কদের দ্বারা। কিছু দিন যাবতই সেখানে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছিল। সেদেশে খরায় ও দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে। অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বিক্ষুব্ধ সেনাবাহিনী এই অবস্থায় প্রতিকার চাইছিল, তারা শাসন সংস্কার ও দুর্নীতির অবসান দাবী করছিল, মন্ত্রিসভার সদস্যরাও গ্রেপ্তার হচ্ছিলেন। এটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছিল যে, ইথিওপিয়ার জনগণের দৃষ্টিতে সম্রাট হাইলে সেলাসীর যে দেবতুল্য স্থান রয়েছে সেখানে তাঁর আসনকে এই বিক্ষোভের ঢেউয়ের আঘাত থেকে বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না। কিছুকাল আগে যখন ছাত্র বিক্ষোভকারীরা অনাহারে মৃত কঙ্কালসার মানুষদের পাশাপাশি রাজপ্রাসাদের কুকুরদের অপর্যাপ্ত আহারের ছবি নিয়ে আদ্দিস আবাবা শহরে মিছিল করেছিল তখন ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে রাণী আঁতোয়ানেতের মতই আদ্দিস আবাবার রাজপ্রাসাদ থেকে মূর্খের মত প্রশ্ন করা হয়েছিল 'কেন কুকুরকে খাওয়ান কি অন্যায়?' সম্রাট হাইলে সেলাসীর শেষ প্রহর ঘনিয়ে এল যখন তিনি সেনাবাহিনীর দাবী অনুযায়ী বিদেশে সঞ্চিত তাঁর প্রায় দুই হাজার কোটি ডলার দেশে ফিরিয়ে আনতে রাজী হলেন না।

সম্রাট হাইলে সেলাসী ক্ষমতাচ্যুত হলেও ইথিওপিয়ার রাজতন্ত্রের অবশ্য অবসান হয় নি। সেনাবাহিনী তাঁর পুত্রকে রাজা হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন

পশ্চিম আফ্রিকার গিনি-বিসাউ থেকে ৩৪৩ বছরের পুরান পর্তুগীজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে পর্তুগাল সেখানকার ৬ লক্ষ অধিবাসীকে স্বাধীনতা দেওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছে গত ১০ সেপ্টেম্বর। আফ্রিকার বুক থেকে শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্নটুকুর অবলুপ্তির এই সূত্রপাতে আতঙ্কিত হয়ে ও প্রতিবেশী রোডেশিয়ার ইয়ান স্মিথের শ্বেতাঙ্গী অনুগামীদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে মোজাম্বিকের শ্বেতাঙ্গরা সেখানে রোডেশিয়ার মত একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার একটা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পর্তুগালের নতুন নেতা জেনারেল স্পিনোলার দৃঢ়তার ফলে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে এবং মোজাম্বিকের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগঠন 'ফ্রেলিমো'র হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে আর একটি খবরে প্রকাশ যে পর্তুগাল ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। গোয়ার মুক্তির পর থেকে এই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে রয়েছে।

১৪-৯-৭৪ —পুণ্ডরীক

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

গৌরচন্দ্রিকা

আমার স্মৃতিচারণ সম্বন্ধে 'স্মৃতির শেষপাতায়'-এর ভূমিকায় একটি নাতিদীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়েছি কীভাবে আমার স্মৃতিকথা সাজালে সুষ্ঠু হবে। 'স্মৃতির শেষপাতায়' নামটি ঠিক হয়নি কেননা তার পরে আরো তিনটি পর্ব আছে—পণ্ডিচেরিতে যোগদীক্ষা পর্ব, তারপর পণ্ডিচেরির আশ্রম থেকে বেরিয়ে বিশ্বভ্রমণ পর্ব—এটুকু লেখা হয়েছে 'দেশে দেশে চলি উড়ে'-তে—তারপরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে কিভাবে পুনায় 'ডানলাপিন কটেজ'-এ প্রাক্‌মন্দির পর্বে প্রবেশ করল তার কাহিনী যা লিখেছি আমার 'স্মৃতিজোয়ারে দুকূল ছেয়ে'-তে যেটি গ্রন্থাকারে একটি বিশিষ্ট পর্ব হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে যথাকালে। কিন্তু মাঝখানে পণ্ডিচেরিতে আমার যেসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা উপলব্ধি হয়েছিল সে সবের কোনো যথাযথ বিবৃতি বাংলায় লেখা হয়নি—কতকটা লেখা হয়েছে ইংরাজীতে

Sri Aurobindo Came To Me, Among The Great ও Yogi Sri Krishnaprem

এই তিনটি বইয়ে। এ-বই তিনটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা মানবেন এরাও মূলত স্মৃতিচারণই বটে—যদিও যথাপর্যায়ে সাজানো হয়নি, ফলে শুধু যে নানা স্থানে পুনরুক্তি ঘটেছে তাই নয়—পরের কথা অনেক সময় আগেই এসে গেছে। একথা খাটে 'তীর্থঙ্কর' ও 'ভূস্বর্গ-চঞ্চল' সম্বন্ধেও—যদি আমার জীবনের পণ্ডিচেরি পর্বকে ধরি মোটামুটি ২২-১১-১৯২৮ থেকে ১৯৫৩ সালের শেষপর্যন্ত। এতক্ষণ ব্যাখ্যা করছি একটি বিশেষ কারণে। সেটি এই যে, আমার অনেক দরদী বন্ধু-বান্ধবী—যাঁরা আমার স্মৃতিচারণে রস পেয়েছেন—আমাকে বার বার অনুরোধ করেছেন যে এতই যখন লিখলাম তখন বাংলায় স্মৃতিচারণ গ্রন্থাকারটি পূর্ণাঙ্গ করলে তবেই আমার স্মৃতিকথা কতকটা সমাপ্ত হবে। (কতকটা বলছি এইজন্যে যে এর অন্তিম পর্ব হবে আমাদের 'হরিকৃষ্ণমন্দির পর্ব'—যার পত্তনের কথা 'স্মৃতিজোয়ারে দুকূল ছেয়ে'-র শেষে উল্লেখ করেই ইতি করেছি।) তাই ভাবলাম আমার দরদী পাঠকদের মনস্তুষ্টি করলে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে : তাঁদের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করাও হবে : আমার স্মৃতিচারণের বৃত্ত কতকটা সম্পূর্ণও হবে। যদি তাঁরা বলেন সম্পূর্ণ হবে কেমন করে—হরিকৃষ্ণ মন্দির পর্বকে যখন আমার জীবনের স্বর্গারোহণ পর্ব নাম দেওয়া চলে? তাহলে বলব আমতা আমতা করে : 'আচ্ছা, যদি পারি তো হরিকৃষ্ণ মন্দিরের কাহিনীও লিখব যদি না হঠাৎ খুলে যায় ঠাকুরের চরণবৈকুণ্ঠের দুয়ার।'

না, এ নিছক পরিহাস নয়। মানুষ জীবনে কত কী করবে ভাবে। সংকল্প করে, মতলব আঁটে ভবিষ্যতের নানা গর্ভাঙ্কের ছক কাটে, কিন্তু যা করবে ভাবে করতে পারে কি পুরোপুরি? কিছুটা পারে, আর তারই নাম কর্মযোগের কৃতি। বাকিটুকু আর করা হয় না—যাকে বলে পাদপূরণ। সেই অকৃত কর্মের কিছুটা পরে বন্ধুরা হয়ত লেখেন স্মৃতি-তর্পণে—যদি অবশ্য সত্যি লেখবার মতন কিছু থাকে। জীবনের রঙ্গমঞ্চে উড়োতর্ক বা দাপাদাপিটা তো আর সত্যিকার কর্ম নয়, গীতার পরিভাষায় বিকর্ম। সত্যিকার কর্ম হল সেই কৃতি প্রচেষ্টা সাধনা যাদের লক্ষ্য তিনি যিনি গীতায় ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে বলেছিলেন : 'কর্মেই আমাদের অধিকার কর্মফলে নয় নয় নয়।' অপিচ, এমন সব বিকর্ম না লেখাই বাঞ্ছনীয় নয় কি যার বিবৃতি শ্রোতার মনপ্রাণকে উদ্দীপ্ত করে না, তুলে ধরে না অন্ধকার থেকে আলোর পানে? অর্থাৎ যদি হরিকৃষ্ণমন্দিরে আমি এই জাতীয় শুভকর্ম বা শুভবুদ্ধির বিবৃতি লিখে যেতে পারি তবেই লিখব, নৈলে নয়। মানে শুধু আর্টের জন্যে নয়, মানুষের মনকে ভগবৎমুখী করে যেসব কাহিনী, তারই রেকর্ড রেখে যেতে—যদি অবশ্য তার আগে ঠাকুর হাতছানি দিয়ে না ডাকেন তাঁর চরণমূলে ফিরে যেতে জাগতিক দেনা-পাওনার হিসাব নিকাশের শেষে।

।। এক ।।

আমার 'স্মৃতিচারণ' পড়ে এক 'নিরপেক্ষ' ক্রিটিক ভ্রূকুটি করেছিলেন এই বলে যে আমি বড় বেশি আমি আমি করেছি। কিন্তু আত্মজীবনী বর্গীয় লেখায় আমি-কে বাদ দিয়ে বিচিত্র বিশ্বের বর্ণনা করব কেমন করে আমি ভেবে পাইনি। স্মৃতিচারণের উপজীব্য বিচিত্র বিশ্ব বটে, কিন্তু সে-বিশ্ব ফুটে উঠেছে একটি মানুষের মাধ্যমে যার সর্বনাম 'আমি'। নিবন্ধ বা নানা রম্যরচনায় আমিকে কতকটা পাশ কাটানো চলে কিন্তু স্মৃতিচারণের মূল রস বয় 'আমিই' নানা শাখাপ্রবালে। অবশ্য একথা মানি যে, এ-শাখাপল্লবের মর্মরে কেবল আমিই বেজে উঠলে রসভঙ্গ হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মানতেই হবে যে এ-মর্মর জাগে একটি সংঘাতে—আমি ও ন-আমির। বাতাসের উপমাটি সুপ্রযুক্ত কারণ যদিও মর্মরধ্বনির রসে লতাবল্লরীর দান অনস্বীকার্য তবু সঙ্গে সঙ্গে এও সমান অনস্বীকার্য যে বাতাস উস্কে না দিলে মর্মরধ্বনি জাগতেই পারে না। অন্ততঃ আমি তো এইভাবেই এঁকে এসেছি নানা ছবি আমার 'মনের মাধুরী মিশায়ে'। অবশ্য যদি আমার মনের কোনো মাধুরীই না থাকে তবে সে-ছবিকে মাধুরীর রসে রসিয়ে তোলা সম্ভব নয়। যে-মানুষ নিজে অরসিক তার আত্মকথা সরস হবে কেমন করে? মিষ্টি না দিয়ে শুধু দুধ ঘন করলে কি পায়েস রাঁধা যেতে পারে?

এইসব ভেবেই আমি প্রথম থেকেই আমার আমি-কে রাশ ছেড়ে দিয়েছি—লৌকিক বিনয়কে মেনে 'আমি' না বলে 'বর্তমান লেখক' বসাই নি। আমার মনে হয় এভাবে আমি সর্বনামটিকে "moi haissable" নামাঙ্কিত করে বাদ দিলে আত্মকথা আড়ষ্ট হয়—সাবলীল হতে পারে না—আরো এই জন্যে যে, একজনের আমি-র [illegible]

টিপে ধরলে থতিয়ে বেসুরেই বেজে ওঠে, সুরেলা কখন নয়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা বলতে চাই সবিনয়েই : যে, আমি সাত-সতেরো ভেবেচিন্তে স্মৃতিচারণ লেখা শুরু না করলেও লেখার পরে দেখি : ও মা! আমি পদে পদেই আমির স্মৃতিপটে এঁকে এসেছি নানা বন্ধু বান্ধবী উপদেষ্টা শিল্পী রসিক ও দার্শনিককে—আর তাঁদের ছবি আঁকার সময়ে আমার আমি এগিয়ে আসে নি কতকটা আড়াল থেকেই আলো ধরেছে তাঁদের মুখের উপর। আজ জীবনের সান্ধ্য-লগ্নে আমার মনে হয় যে আমার নানা অহঙ্কার সত্ত্বেও আমি আসলে দাম্ভিক নই। আমার স্মৃতিচারণ রসোত্তীর্ণ হয়েছে অন্তত তাঁদের কাছে যাঁদের মন আমার এ-অঙ্গীকারকে মঞ্জুর করেন যে আমি আন্তরিক বিশ্বাস করি স্বামীজির এই মহোক্তিতে যে আমি বড়র কাছে মাথা নত করে সত্যিই আনন্দ পাই যে-আনন্দের কাছে আমার আমির দুরভিমান ফিকে হয়ে এসেছে সরল উচ্ছ্বাসেই বলব।

আমার প্রতি বিরূপ অনেক ক্রিটিক আমাকে 'উচ্ছ্বাসী' দুর্নাম দিয়ে আমার লেখার মানহানি করে থাকেন। কিন্তু তাঁরা যদি একটু শান্ত হয়ে ভেবে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে এই উচ্ছ্বাসই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে—বিশেষ করে গুরুবাদী যোগপথে যেখানে আমার 'আমি' গুরুর নিরাসনায় অভিভূত হয়েছিল বলেই প্রতিষ্ঠা পায়নি। বাস্তবিক যাঁর ডাকে আমি সাংসারিক তথা শৈল্পিক জীবন ছেড়ে ছুটেছিলাম অজানা অচেনা আশ্রমে, তাঁর মহিমা আমাকে মাতিয়ে তুলেছিল বলেই আমি তাঁর সঙ্গে নিরন্তর তর্কাতর্কি করা সত্ত্বেও সাড়ে পনেরো আনা ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশই মেনে চলতে পেরেছিলাম আত্মাভিমানের বিদ্রোহকে দাবিয়ে। তাঁর মহিমা আমি যে শতমুখে বলেও তৃপ্তি পাই নি, বারবারই মনে হয়েছিল আরো ফলিয়ে বলা উচিত ছিল—এই উচ্ছ্বাসই আমার নানা আত্মাভিমানকে বাতিল করার শক্তি দিয়েছিল—আর একবার নয় অগুন্তিবার। মহাজনের মহত্ত্ব আমার মনকে এমন সহজে রাঙিয়ে রাঙিয়ে দুলিয়ে চালাত যে, আমি ঠাকুরকে বার বার প্রণাম করেছি এই বলে যে আমাকে তিনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন এই প্রণাম করার আবেগ জাগিয়ে—দেখিয়ে দিয়ে যে, বড়কে বড় বলে চললে নিজের গর্ব মাথা তুলতে পারে না কারণ প্রণামবৃত্তি বলে : 'আমাকে দেখো না—দেখ মহিমময়কে যাঁকে প্রণাম করে বাঁচি মুক্তিপথের দিশা পেয়েছি প্রীতি দেই।' জানি এ-ধরনের পূজাবৃত্তিকে এ-যুগের বুদ্ধিবাদীরা নাম দেন—hero-worship: এ-কথাটির বাংলা নেই, তবে এর কটাক্ষ কী জানে সবাই—। 'আপনাতে মন আপনি থেকো, যেও না কো কারো ঘরে।' কিন্তু এ-উক্তিটির সত্য [illegible] হলেও এর কদর্থটি আধুনিকেরা বেশি বরণ করেন : অর্থাৎ আত্মম্ভরিতা : কি না আমি যা বুঝি তাই প্রামাণ্য কাজেই অপরের উপদেশে চলতে আমি নারাজ।

এ-আত্মসর্বস্বতার রসদ জোগায় হাজারো উড়ো ঝড়—তর্কপ্রবৃত্তি আত্মাদর বশ না মেনে উদ্দাম ছোটার সনাতন ঝোঁক, কারুর কাছে নত হতে কুণ্ঠাকে মান দিয়ে যারা নত হয় তাদের স্তাবক বলে রেগে দেওয়ার সস্তা সুখ—আরো কত কী। পণ্ডিচেরিতে পৌঁছবার আগেই এ-সত্যটি আমি আবিষ্কার করেছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি কথা মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে : যে উঁচু জমিতে ফসল ফলে না নিচু জমিই উর্বর হয় সেখানে জল সহজে জমে বলে। তাছাড়া চৈতন্যদেবেরও আমি ভক্ত হয়েছিলাম 'মন্দ্র' বাবো পিতৃদেবের চৈতন্য-তর্পণে সাড়া দিয়ে। চৈতন্যদেব উঠতে বসতে শিষ্যদের বলতেন :

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।
তৃণের চেয়েও নিচু হয়ে, নিত্য সয়ে
তরুর মতন
মান দেয় যে নম্রতাকে ধন্য তারি
ভজন পূজন।

কিন্তু মুখে শ্লোক আওড়ালে হবে কি যদি অন্তরে আত্মাভিমান বেঁচে বর্তে থাকে? শ্রীঅরবিন্দের যোগাশ্রমে বার বার দেখতাম মুখে যা বলছি কাজে তা করতে পারছি না। বারবার ঠেকে একবার বেঁধেছিলাম একটি গান

যা কিছু বলি না বলি সাধি না সাধি
করি না করি—
সবার মাঝে অহঙ্কার নিতুই ওঠে
শিহরি।

তাইতো আমি আরো চাইতাম গুরুদাস হতে যাতে হরির নামকীর্তনে ঠিক সুরটি আমার মুখে ফুটে ওঠে। উঠত যখন সত্যি নত হতাম গুরুর পায়ে, কিন্তু যেই তাঁর সঙ্গে তর্কাতর্কি করতাম সেই দেখতাম প্রণতিসুন্দর দীনভাব মন থেকে উবে গেছে অজান্তে আর তার জায়গা জুড়ে বসেছে 'আগে জানি তবে মানব' এই ঔদ্ধত্য, অহঙ্কার। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলতেন 'আগে জানব তবে মানব' এ-জিগির এসেছে বিদেশ থেকে, ভারতাত্মা চিরদিনই বলে এসেছে—আগে মহাজনের মহাবাক্য মেনে চললে তবেই জানবে মত জানা যায়। কিন্তু আমি প্রসঙ্গান্তরে এসে পড়েছি—যার নাম যোগাশ্রমে নানা পরীক্ষার পড়া। তাই ফিরে গিয়ে হারানো খেই ধরি—বলি অন্তরের পূজাবৃত্তির কথা যে ধারণ করে গুরুবাদের বিনতিকে।

আমার একটা মস্ত সুবিধা হয়েছিল আবাল্য পিতৃদেবের গুণী জ্ঞানী মানীদের শ্রদ্ধা করতে দেখে। আমাকে তিনি পদে পদে শেখাতেন প্রণাম করতে শুধু গুরুজনকে নয় তাঁর নানা গুণবান প্রতিভাধর বন্ধুকে-আমাকে আগে পরিচয় দিয়ে—তাঁরা কোন কোন গুণে গুণবান, কিসের আলোয় ফুটে উঠেছেন প্রতিভার দীপ্তিতে। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমীর নাম আমি কৈশোরে পড়েছিলাম রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণের এক পাদটীকায়। মহাপণ্ডিত বেদজ্ঞ সদাচারী নানা বৈদিক গ্রন্থের অনুবাদক। সব মনে নেই তবে মনে আছে তিনি যেদিন প্রথম আমাদের 'সুরধাম'-এ আসেন পিতৃদেবের আমন্ত্রণে। পিতৃদেব তাঁকে দেখিয়ে বললেন : 'প্রণাম কর এ মহাপণ্ডিতকে যাঁর কথা তুই বলছিলি সেদিন।' আমি সানন্দেই প্রণাম করতে তিনি সবিস্ময়ে বললেন : 'এ কী ব্যাপার দ্বিজেন্দ্রবাবু, আমার কথা এ-শিশু আপনার কাছে বলল কী সূত্রে?' আমি নতমুখে বললাম রাজকৃষ্ণ রায়ের কথা। তিনি খুশী হয়ে বললেন : 'বেঁচে থাকো বাবা।' অমনি আমার সে কী আনন্দ। সাক্ষাৎ সত্যব্রত সামশ্রমীর স্নেহাশিস—আমাকে আর পায় কে?

এইভাবে আমি মহাজনের প্রতি শ্রদ্ধার আবহে গড়ে উঠেছিলাম—যার পরম পরিণতি গুরুবাক্যে প্রশ্নহীন বিশ্বাস না হোক, নির্ভেজাল শ্রদ্ধা। আজকের যুগ মূলত অশ্রদ্ধার যুগ, আকাশে বাতাসে হুঙ্কার-ধ্বনি শুনি পার্সনালিটি কাল্ট নাকি আমাদের অধঃপাতের গোড়া—কাউকে না মেনে শুধু নিজের কুবুদ্ধিকে সুবুদ্ধি প্রমাণ করে যে কায়েক ছেলে বনে কেবল তারই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, যে জ্ঞানী ধ্যানী মুনি ঋষির গুণগানে দোয়ার দেয় তার অবস্থা সঙ্গীন। বহুদিন পরে মনীষী অলডাস হাক্সলির একটি লেখায় পড়েছিলাম যে আমাদের সভ্যতার প্রগতির মূলে আছেন যে কতিপয় মনীষী তাঁরা না জন্মালে আমরা আজও বর্বরতার জঙ্গলেই গোচারণ করে চলতাম, আমাদের মনের মাটিতে মহাজনদের দীপ্তি-বীজ বুনলে তবেই আমরা মানুষ হয়ে উঠি, কিন্তু এ-বীজ তাঁরা না বপন করলে আমরা আজও থাকতাম যে-তিমিরে সেই তিমিরে। বইটি হাতের কাছে নেই তবে মনে হয় এক গাণিতিক প্রতিভাধর বালক Young Archimedes এর গল্পের প্রস্তাবনায় অলডাস পেশ করেছিলেন সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁর এ-নিশানাটি। একথা যে সত্য তা একটু ভেবে দেখলেই মনে হয় বৈকি, কিন্তু সচরাচর মানুষ চলে গতানুগতিকতার পথেই দিনগত পাপক্ষয় করে—ভেবে দেখে অচিন পথে পদক্ষেপ করেন যাঁরা তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

সাধুসন্তের প্রতি শ্রদ্ধার বীজে আমাদের মনের মাটিতে সোনার ফসল ফলে এ একটি ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু আমাদের আত্মপ্রসন্ন অহমিকার ঠুলিকে আমরা দূরবীন বলে ভুল করি বলেই এ-প্রত্যক্ষ সত্যটিকেও দেখতে পাই না। পেলে কি ভাবতে পারতাম যে গুরুকে মানলে স্বাধীন চিন্তার অপমৃত্যু না হয়েই পারে না? আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে সনাক্ত করেছি অনেকগুলি কারণে : একটি কারণ—বলেছি—আমি—

মহাপ্রাণ মহাত্মাদের কাছে নত হবার দীক্ষা পেয়েছিলাম আমার মহানুভব পিতৃদেবের কাছে শৈশবেই। শ্রীঅরবিন্দকে ১৯২৪ সালে যখন প্রথম দেখি তখন আমার যুবক মন যে সানন্দ বিস্ময়ে আত্মহারা হয়েছিল তার মূলে ছিল এই দীক্ষার ফলশ্রুতি—কোনো মামুলিয়ানার সেকেন্দে উদগার নয়। অর্থাৎ আমার বালক মন শ্রদ্ধার বাতাবরণে ফুলের মতন সহজে তার নানা আনন্দদল মেলেছিল বলেই আমি বরণ করতে পেরেছিলাম বরণীয়দের কমলচরণ—যাদের মধ্যে আমার কাছে গুরুর মান পেয়েছিলেন প্রধানত দুজন লোকোত্তর মহাভাগ: শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমি চর্মচক্ষে দেখিনি, কিন্তু তিনি আমার মনের মন্দির আলো করে বসেছিলেন কৈশোরেই। যৌবনে তাঁর উপ্ত বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল আমার দ্বিতীয় গুরু শ্রীঅরবিন্দের অপার অচিন্ত্য স্নেহাশিসে। আমাকে তিনি আমার যোগদীক্ষার আশিপর্বে একটি সংশয়ের সঙ্কটলগ্নে লিখেছিলেন (২-১-১৯৩০):

> "You need not imagine that we shall ever lose patience or give you up—that will never happen. Our patience you will find is tireless because it is based upon unbounded sympathy and love. Human love may give up, but divine love is stable and does not falter. We know that the aspiration of your psychic being is sincere. It is because the sincere aspiration is there that we have no right to disbelieve in your *adhikar* for the Yoga".

('ভাবার্থ: ভুলেও ভেবো না যে, আমরা অসহিষ্ণু হয়ে তোমাকে বাতিল করতে পারি। পারি না, কারণ আমাদের ধৈর্যের ভিত হল অপার দরদ ও প্রেম। মানবিক প্রেম হার মানতে পারে কিন্তু ঐশ প্রেম অচলপ্রতিষ্ঠ। আমরা যখন জানি যে তোমার অন্তরাত্মার অভীপ্সা অকৃত্রিম তখন আগে তোমার অধিকারকে নামঞ্জুর করব কেমন করে?')

কিন্তু আমার সংশয়গ্রন্থি ছিন্ন করতে তিনি এর আগেও আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন। এবার সাধ্যমত যথাপর্যায়ে লিখতে চেষ্টা করব—কী ভাবে তিনি আমাকে নির্দেশের দিশা দিয়ে আমার হৃদয় জুড়ে বসেছিলেন প্রথম থেকেই।

(২)

আমি অন্যত্র লিখেছি কীভাবে আমার জীবনের নিশুতি রাতে ঠাকুরের উষার আলো এসে আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল গুরুচরণে শরণ নিতে। শরণ আমি নিয়েছিলামও ভক্তির উচ্ছ্বাসে। কিন্তু সেপরম সুলগ্ন বারবারই নিরাশার দুর্যোগে ঢেকে গিয়েছিল, আর বারবারই ফের ভরসার নবারুণ আমাকে মুক্ত করেছিল নানা অহমিকা সংশয় ও দুর্মতির কবল থেকে। এরকম নানা দুর্দিনে আমি শ্রীমা-র কাছেও বারবারই উৎসাহের পাথেয় পেয়েছিলাম—যার কথা বোধহয় লিখেছি ইতিপূর্বে। কিন্তু যখন মনে পড়ছে না তখন লিখি সংক্ষেপে—পুনরুক্তি হবে নিরুপায়। যে-স্মৃতিচারণের কালপরিধি ১৯২৮ থেকে ১৯৫৩ সাল—প্রায় পঁচিশ বৎসর—সে-পরিধির মধ্যে সব খুঁটিনাটি মনে রাখা অসম্ভব। তাই নানা কথাই একাধিকবার বলেছি যার জন্যে ক্রিটিকেরা আমার প্রতি ভ্রূকুটি করেছেন। কিন্তু তাঁরা যদি বার্ধক্যের উপান্তে এসে মনে করতে চেষ্টা করতেন কবে কী ঘটেছিল যা উল্লেখযোগ্য তাহলে হয়ত পুনরুক্তির জন্যে আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে তাঁদের একটু বাধত। এইটুকু সাফাই গেয়েই শুরু করি আমার যোগজীবনের প্রথম অধ্যায়।

১৯২৪ সালে আমার ভাগ্যতারকা প্রথম মেঘমুক্ত হয়ে আমাকে হাতছানি দিয়েছিল—আমার চিত্তাকাশে উদয় হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের আশ্চর্য নয়নতারা। সাধে কি রবীন্দ্রনাথ ১৮২৮ সালে পাণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দকে দেখে লিখেছিলেন মডার্ন রিভিউয়ে যে এক আন্তর আলোয় তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত—

> His face was radiant with an inner realisation!

তারপরে কত কী ঘটে গেল আমার জীবনমঞ্চে—কত আশা নিরাশার দ্বৈতলীলা, স্ববিরোধী অনুভূতির হানাহানি অঙ্গীকার-অস্বীকারের দুঃসহ সংঘর্ষ; সংসার ভালো লাগে না অথচ তার মায়া কাটাতে না পারা; আলোকে আলো বলে চিনেও অন্ধকারের সঙ্গে ঘনকন্না করতে রাজী হওয়া; একবার নয় বারবার ঠেকেও শিখতে না চাওয়া: গুরুর হৃদয়াবেগের সঙ্গে বিজ্ঞ সাবধানতার অশ্রান্ত প্রতিযোগিতা; এ-ও তা বিলাসের মধ্যে শান্তি চাওয়ার সঙ্গে নির্মল বৈরাগ্যের সহাবস্থান—সে কত কাণ্ডকারখানা! সময় সময় হতাশা আমাকে পেয়ে বসত, কোনো দিন কি পার হতে পারব এ-দুর্বিষহ অন্তর্দ্বন্দ্বের গণ্ডী? যারা বস্তুলাভ করেছেন তাঁদের স্বভাব নিশ্চয়ই একান্তী সুস্থ শান্ত, আমার মতন চঞ্চল বিক্ষিপ্ত ও উদভ্রান্ত নয়—এইসব অন্তহীন বিষম প্রশ্ন—কিন্তু থাক এ-দীনতা, বলি রাত পোহালো কীভাবে—যদিও বলা সহজ নয়—অনেক কথা বলতে বাধে বলেও বটে। তবু নাচতে নেমে ঘোমটা দিলে চলবে কেন? তাই বলি যতটা বলা চলে।

১৯২৪ সালে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে শেষ কথা যা বলেছিলেন তা এই যে, আমাকে এখনো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে যদি আমি তাঁর যোগে সত্যিই দীক্ষা চাই। তারপরে গিয়েছিলাম স্বামী অভেদানন্দের কাছে আসন ও প্রাণায়ামে দীক্ষার জন্যে। তিনি কৃপা করে দীক্ষা দিতে রাজীও হয়েছিলেন, কিন্তু বলিষ্ঠ যোগী শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার বাধ সাধলেন, আমার সঙ্গে (বোধহয় ১৯২৬ সালে) ধ্যান করে বললেন যে শ্রীঅরবিন্দই আমার গুরু, একথা তিনি বরদাবাবুকে বলেছেন নিজে এসে। এসব কথা আমার 'স্মৃতিচারণ' দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছি, তাই পুনরুক্তি করলাম না। শুধু বলি যে আমি শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের কাছে ১৯২৮ সালে ৫ই নভেম্বর গিয়ে আমার সমস্যার কথা জানাতে তিনি বলেছিলেন যে, বরদাবাবু আমাকে ভুল বলেন নি, শ্রীঅরবিন্দই আমার গুরু—এখন চাই শুধু পথ চেয়ে থাকা কখন ডাক আসবে—'ন ত্বরমাণেন লভ্যঃ' হাঁকুপাঁকু করা ভুল ইত্যাদি। এসব কথাও লিখেছি আগে ফলিয়েই। তাই এবার বলি—কিভাবে আমার ডাক এসেছিল জীবনের এক অবিস্মরণীয় সন্ধিলগ্নে।

৫ই নভেম্বর শ্রীগোপীনাথ আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন একটু নিরালা থাকতে যাতে গুরুশক্তি আমার মধ্যে সহজে সক্রিয় হতে পারে। আমি স্থির করলাম লখনৌয়ে আমার পিতৃবন্ধু কবি অতুলপ্রসাদের কাছে থাকব লোকজনের সঙ্গে বেশি না মিশে।

কিন্তু মানুষ যা করবে ভাবে করতে পারে কি? অতুলপ্রসাদের আরাম-নিলয়ে কেবল গান আর গান আর গান। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন সাবিত্রীতে:

> The conscious doll is pushed a hundred ways,
> It feels the push but not the hand that drives.
>
> (কী জানে জীবনে জীব, নিয়তির খেলার পুতুল?
> জানে সে কেবল—এক করাঘাতে ধায় দিকে দিকে
> জানে না কার সে-কর কোথা তাকে শুধাও কোথায়।)

লখনৌয়ে গানের আবর্তে অস্থির হয়ে একদিন মনে বিষম অনুতাপ হল। এর নাম কি—নিরালা থাকা? বিষন্ন হয়ে একলা ভজন গেয়ে সকালে সবে ধ্যানে বসেছি ২৫-১১-২৮ তারিখে, এমন সময়ে আমার অন্তরে কী যে ওলটপালট হয়ে গেল আবার তার ছদিশ দেওয়া সম্ভব নয়। ধ্যান থেকে ব্যুত্থিত হয়ে আমি শ্রীঅরবিন্দকে তার করে ছুটলাম পণ্ডিচেরি। কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ধরলাম ট্রেন—সব অনিশ্চয়তার অবসান হয়ে গেল যেন চক্ষের নিমেষে। অঘটন যে আজো ঘটে তার পরিচয় পেলাম আবার যেন নতুন করে। তারপর শুধু আনন্দ আর আনন্দ তারকতীর্থ-যাত্রায়।

(কীভাবে এ-অভাবনীয় অঘটনটি ঘটেছিল আমি আমার 'স্মৃতিচারণ' দ্বিতীয় ভাগে লিখেছি, অন্যত্রও বর্ণনা করেছি ফলিয়ে।)

(ক্রমশঃ)

উপন্যাস

সেই সব মানুষ

মনোজ বসু

সোনাখড়ি গ্রামের ভবনাথ ঘোষ আর দেবনাথ ঘোষ দুই ভাই। ভবনাথ বড়ো। অল্পবয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর জ্ঞাতিদের চক্রান্তকে উপেক্ষা করে ভবনাথ সংসারের হাল টেনেছেন, ভাইকে মানুষ করেছেন। কলকাতা যাবেন দেবনাথ ছোট আদালতে উকিল হওয়ার পরীক্ষা দিতে। সব ঠিকঠাক। যাওয়া হোল না। পরে নায়েবীর চাকরী নিলেন বিদেশে এক জমিদারী সেরেস্তায়। পরে কর্মদক্ষতায় হলেন ম্যানেজার। সেই কৃতি ভাই দেবনাথ আট বেহারার পালকিতে সোনাখড়ি ফিরল।

বৌদি উমাসুন্দরী খুব খুশি। জাকে বললো সরষে কুটতে, কাসুন্দি হবে। হরেক রকমের। এদিকে নতুন বাড়ির মিত্র ঠাকুরুণ দেবনাথের দুজন বরকন্দাজকে ব্রাহ্মণ ঠাউরে নিমন্ত্রণ করতে এল। দেবনাথ বললেন, কী জাত [illegible] করব..।

।।তিন।।

পাদপগায় তরুরাজি কৈলাস-শিখরে।
সদা শোভে মনোহর রতন-নিকরে।।
সিদ্ধ চারণাদি কত সুখেতে বিহরে।
আমোদে অপ্সরাকুল নৃত্য করি ফিরে।।
বেদধ্বনি উঠে সদা ব্রহ্ম ঋষি মুখে।
নিবাস করেন শিবা-শিব অতি সুখে।।

ভিতর দিক থেকে আসছে। দেবনাথের চমক লাগে গলাটা মিতের না? বিনো পুকুর-ঘাট গিয়েছিল, ভরা কলসি নিয়ে উঠি কি পড়ি বাড়িমুখো দৌড়চ্ছে।

দেবনাথ বললেন, সুর করেছে কে রে বিনা? দেখেন না?

বিনা বলে, তিনিই! হাঁটু অবধি কাপড় তুলে বিল ভেঙে বাদামতলায় এসে উঠলেন, ঘাট থেকে দেখতে পেলাম। ছোটমেয়ের কাছে বিলপার মির্জা নগরে ছিলেন, মনে হচ্ছে।

দেবনাথ হঠাৎ ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললেন--আমার কাছে না এসে মিতে সরাসরি ভিতরে ঢুকে গেল?

কৈফিয়ৎ যেন বিনোরই দেবার কথা। সে বলে, আপনি বাড়ি এসেছেন কি করে জানবে? বিষ্ণুপুরে গিয়ে ফটিক ত পায়নি সেদিন। আমি গিয়ে বলছি আপনার কথা।

দেবেন্দ্র চক্রবর্তী বাড়ি যাচ্ছেন বাঁকা-বড়শি গাঁয়ে। পথের মাঝে সোনাখড়িতে একটু বসেছেন। দেবনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দরুণ সোনাখড়ি এলে পুব বাড়িতে একবার বসবেনই। মেয়েমহলে বেশি পসার--কোথাও গেলে পুরুষদের এড়িয়ে সোজা ভিতরে চলে যান। সেকালে দৈবজ্ঞগিরি পেশা ছিল—তজ্জন্য উপর আলকাতরায় সাইনবোর্ড লিখে বাড়ির সামনের সুপারি গাছে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন: হাত-দেখা বর্ষফল-গণনা গ্রহ শান্তি স্বস্ত্যয়ন কোষ্ঠি-ঠিকুজি-বিচার যোটক বিচার ইত্যাদি করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পাঁচ মেয়ে পাত্রস্থ হবার পর অবস্থা বদলে গেল। 'দশ পুত্র সমকন্যা যদি পড়ে পাত্রে'—চক্রবর্তীর কপালে তাই ঘটেছে। ব্রাহ্মণী গত হয়েছেন, কিন্তু মেয়েরা সাতিশয় ভক্তিমতী। তবে আর কোন দুঃখে দৈবজ্ঞ-গিরি করে বেড়াবেন। পেশা বরঞ্চ বলা যায়, পঞ্চ কন্যাকে পালাক্রমে পিতৃসেবার পুণ্য বিতরণ।

তখন নিয়ম ছিল, বৈশাখের গোড়ার দিকে বাড়ি বাড়ি বর্ষফল শোনানো—সিকিটা আধুলিটা মিলতো। পেশা ছেড়েছেন কিন্তু নেশা যাবে কোথায়। আগেকার মতোই পাঁজি সব সময় সঙ্গে থাকে। পাঁজির ভিতরে সর্ব শাস্ত্র, পাঁজি যার নখদর্পণে চক্রবর্তীর মতে সে ব্যক্তি সর্ববিদ্যায় পারঙ্গম। এখনো যেহেতু বৈশাখ মাস চলছে, মেয়েরা সব তাঁর কাছে বর্ষফল শুনতে চায়। চক্রবর্তীও মহানন্দে লেগে গেলেন:

হর প্রতি প্রিয়ভাষে কন হৈমবতী।
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি।।
কোন গ্রহ হৈল রাজা, কেবা মন্ত্রীবর।
প্রকাশ করিয়া কহ, শুনি দিগম্বর।।
ভব কন ভবানীকে, কহি বিবরণ।
বৎসরের ফলাফল করহ শ্রবণ।।

ভূমিকা চলছে, আর চক্রবর্তী দ্রুত পাঁজির পাতা উল্টে যাচ্ছে। রাজা-মন্ত্রীর পাতা বেরিয়ে গেল—গুরু রাজা, রবি মন্ত্রী। পাতার আধাআধি জুড়ে ছবি। মুকুট-পরা রাজা রাজ সিংহাসনে আসন-পিঁড়ি হয়ে আছেন। আঁটো জামা গায়ে, ভারী গোঁফ। মাথার উপর ছাতা—ছাতা বোধ হয় সিংহাসনের সঙ্গে সাঁটা। অথবা ছাতা ধরে কেউ পিছনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে আছে। রাজার বাঁদিকে প্রকাণ্ড পাখা হাতে পাখা-বরদার, তলোয়ার কাঁধে চাপড়াশআঁটা সৈন্য কয়েকটা। মন্ত্রীমহাশয় ডানদিকে—তাঁরও উঁচু আসন, কিন্তু আয়তন ছোট। মাথায় পেখম দেওয়া মুকুট নয়, পাগড়ির মতন জিনিস। চোখ বুলিয়ে দেখে দেবেন্দ্র চক্রবর্তী বললেন, এবারের রাজাটি ভাল। মেঘ যথাকালে বৃষ্টিদান করবে। ধরিত্রী শস্যপূর্ণা, প্রজারা নিঃশঙ্ক। মন্ত্রীটি কিন্তু সুবিধের নন। শস্যহানি, প্রজাদের নানা নিগ্রহ-ভোগ, শোকভয়।

হিরু কলকেয় তামাক সেজে আগুনের জন্য রান্নাঘরে যাচ্ছিল। দাঁড়িয়ে পড়ে টিপ্পনী কাটে: রাজায় মন্ত্রীতে লেগে যাবে খাঁটাখাঁটি। ইনি শস্য ঢালবেন, উনি ভরা ক্ষেত খরায় পুড়িয়ে বেড়াবেন।

জলাধিপতি শস্যাধিপতি মেঘ-নায়ক নাগনায়ক পবনাধীশ গজপতি সমুদ্রপতি পর্বতপতি ইত্যাদির সকল বর্ণনা একে একে আসছে। শস্যাধিপতির নামে চক্রবর্তী শিউরে উঠলেন—সর্বনেশে

ঠাকুর, শনি। ফলং শস্যহীন অগ্নিভীতি দুর্ভিক্ষ মড়ক।

কল্কেয় ফুঁ দিতে দিতে হিরু এসে পড়ল। পাঁজি রেখে চক্রবর্তী নিজ হুঁকোয় কল্কে বসিয়ে নিলেন।

কমল উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল গুরু-রাজা রবি-মন্ত্রীর ছবি দেখবার জন্য। পাতাটা খোলাই আছে। বর্ষফল একটু থামিয়ে দিয়ে দেবেন দ্রুত কয়েক টান টেনে নিচ্ছেন। রাজা-মন্ত্রী কমল খুব মনোযোগ করে দেখছে। খুব পুরোনো পাঁজিগুলোয় যেমন আছে, এবারও হুবহু তাই। বছর বছর রাজা-মন্ত্রী বদলাচ্ছে, চেহারা তো বদলায় না। অবশেষে সমাধান একটা ভেবে নিল, আগে চেহারা যেমনই থাকুক রাজা-মন্ত্রী হলেই সব এক রকমের হয়ে যায়।

হপ্তাখানেক পরে একদিন হুলুস্থূল কাণ্ড। শয়তানি সেরে গেছে কারা। সকালবেলা বাবলাডালের একটা দাঁতন ভাঙছেন বসে দেবনাথ দক্ষিণের দোর খুলে বেরিয়েছেন। সামনে দাওয়ার উপর ঠাকুর-প্রতিমা। সদ্য গড়া প্রতিমা রাতের অন্ধকারে চুপিসারে রেখে গেছে।

ও দাদা, উঠে এসো। দেখ কী করে গেছে—

হাঁক পাড়ছেন দেবনাথ। ভবনাথ মশারি তুলে দিয়ে শয্যার উপর উবু হয়ে বসে হুঁকো টানছেন। এই বিলাসটুকু বহু দিনের। হুঁকো ফেলে ছুটতে ছুটতে এলেন। চেঁচামেচিতে বাড়িশুদ্ধ সব এসে পড়েছে।

দেবনাথ বললেন, প্রতিমা রেখে গেছে, ফেলে তো দেওয়া যাবে না।

জিভ কেটে উমাসুন্দরী বলেন, সর্বনাশ। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর—অমন কথা মুখেও আনে না। তোমাদের যেমন সাধ্য, করবে: নমো-নমো করে হলেও করতে হবে।

শরিকদের বাড়ির দিকে চোখ পাকিয়ে ভবনাথ গর্জন করে উঠলেন: জগদীশ্বর ঘোষের কারসাজি, দেখতে হবে না। দেওয়ানি মামলা করেছে ফৌজদারি করেছে, কিছুতে কায়দা করতে পারে না—উল্টে নিজেই নাকানি-চোবানি খেয়ে আসে। এবারে এই চালাকি খেলল। খরচান্ত করে পুববাড়ি কাবু হয়ে পড়লে ওদের ভাল।

কৃষ্ণময় ঘাড় নেড়ে বলল, আমার কিন্তু তেমন মনে হয় না বাবা। জগদীশ্বরকাকা নয়, ফক্কোড় ছোঁড়াদের কাজ। গাঁয়েরই হোক, কিম্বা বাইরের হোক। নতুন বাড়ি—ও বছর করে বন্ধ করে দিল, তারপর থেকে পুজোর সময় এত বড় গ্রামে ঢাকের কাঠিটা পড়ে না। অথচ সামান্য দূর রাজীবপুরে হুলুস্থূল পুজো। কথা উঠেছিল, চাঁদা তুলে গাঁওটি পুজো করা যাক। মতলব করে তারপর আমাদের একলার ঘাড়ে সম্পূর্ণটা চাপিয়ে দিল।

কথার মাঝে উমাসুন্দরী না-না করে ওঠেন। কেউ চাপায় নি বাবা— প্রতিমা কারো রেখে-যাওয়া নয়। আমাদের ভাগ্যে জগন্মাতা নিজে এসে উঠেছেন।

কৃষ্ণময় আপন কথার জের ধরে বলে যাচ্ছে: নতুন বাড়ি অষ্টপ্রহরী আড্ডা। মতলব ওখান থেকেও উঠতে পারে। হিরুকে একবার ভাল মতন জেরা করে দেখুন বাবা।

উৎস আবিষ্কারে দেবনাথের আগ্রহ নেই। এতবড় দায়ে কাঁধে চাপল, তিনি আরও হি-হি করে হাসেন। বললেন, বড়লোক হয়েছ যে দাদা। ভাইয়ের পা রুপোয় বাঁধানো—হাঁটা-চলা নিষেধ, নাগরগোপ থেকেও পালকি হাঁকিয়ে আসতে হয়, বেহারারা ও-হো এ-হে হাঁকডাক করে তল্লাটের কানে তালা ধরিয়ে দেয়। পুব-বাড়ি-রা সাংঘাতিক রকমের ধনী, সকলে জেনেছে। যে জিনিস তুমি চেয়েছিলে দাদা। সবশেয়াল ছেড়ে দিয়ে ন্যাজ-মোটাকে ধর—গল্পে আছে না, এবারে সামলাও ঠেলা। গাঁওটি বাতিল করে একলা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। চেষ্টা করে ন্যাজ মোটা করেছ, এর তার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কি হবে। পুজো কেমন করে ওতরায়, তাই দেখ এখন।

চাউর হয়ে গেল পুববাড়ির ঠাকুর ফেলেছে, প্যাঁচে পড়ে গেছে ওরা—পুজো না করে উপায় নেই। নতুন বাড়িতে আগে পুজো হত। শরিক অনেক, সকলের অবস্থা সমান নয়, খরচ করা ও ঝঞ্ঝাট পোহানোর অভিরুচিও থাকে না সকলের। মাদার ঘোষের বাপ চণ্ডী ঘোষ তখন বর্তমান। জজের পেশকার তিনি, সিকিতে আধুলিতে নিত্য দিন বিস্তর পকেটে পড়ে, হিসাব করলে উপরি-রোজগার মাসান্তে জজসাহেবের মাইনের দুনো-তেদুনো দাঁড়ায়। অতএব, শরিকদের যে যতটা পারে দিল, [illegible] পূরণের বাবদে আছেন চণ্ডী ঘোষ। তিনি মারা যাবার পরে মাদার একটা বছর কায়ক্লেশে চালিয়েছিলেন, কিন্তু বাপের দিল-দরিয়া মেজাজখানা থাকলেও সে রোজগার কোথায়? পুজো বন্ধ হল। এতদিন পরে এবারের আশ্বিনে আবার ঢাকের কাঠি পড়বে।

দলে দলে লোক এসে প্রতিমা দেখছে। ছোটখাট এক মেলা লেগেছে যেন। খবর বাইরেও ছড়িয়েছে, বার গাঁয়ের লোকও আসছে। মাথা সমেত একেবারে ষোল আনা প্রতিমা—শুধু রং পড়েনি এবং সাজসজ্জা নেই। শতকণ্ঠে সবাই তারিফ করছে। ঠাকুর গড়ানোর পটুয়া বিলেত থেকে আসে নি নিশ্চয়। গড়া হয়েছে এই গাঁয়ের কুমোর-পাড়ার ভিতরেই, আর নয় তো রাজিবপুরে। কোথায় রেখে গড়া হল, কারা গড়ল ঘুণাক্ষরে প্রকাশ নেই। নিখুঁত মন্ত্রগুপ্তি।

বিকালবেলা গাঁয়ের মুরুব্বিদের নিয়ে ভবনাথ দেবনাথ শলা পরামর্শে বসলেন। ভবনাথ দুঃখ করছেন: জোড়া মেয়ের বিয়ে দিয়ে তার উপর পুকুর কাটিয়ে হাত একেবারে শূন্য। জ্যৈষ্ঠমাসের আম-কাঁঠাল খেয়ে যাবে বলে ভাইকে বাড়ি নিয়ে এলাম, তখন এই শত্রুতা সেধে গেল। আপনাদের নিয়ে বসেছি—কী ভাবে কি করা যায়। ফেলেছেও ঠাকুর দেখুন দিকি—কালী নন লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক নন দশভুজা দুর্গা। সেকালে শোনা আছে, জব্দ করার জন্য শত্রু-পক্ষ এমনি ফেলত—তখন সস্তাগণ্ডার দিন, টাকা পয়সার মধ্যে খাস একখানা দুর্গোৎ-

সব নেমে যেত। এখন নমো-নমো করেও কি লাগবে হিসেব করে দেখুন।

বরদা আগের প্রসঙ্গে একটু বলে নিচ্ছেন : শত্রুতা করে গেছে তোমাদের সঙ্গে এমন কথা মনেও জায়গা দিও না ভবনাথ। রাজিবপুরে ছ-সাতখানা দুর্গা তোলে আর এ গাঁয়ে তখন একটা ঢাকে কাঠি পড়ে না। বেটাছেলেরা রাজিবপুর অবধি গিয়ে পুজো দেখে আসে, কিন্তু মেয়েলোক পারে না—বুড়োরা ছেলেপুলেরাও না। ঘরে বসে মন আনচান করে, বুঝে দেখ তাদের অবস্থা। তাছাড়া আমাদের সোনাখড়ি গাঁয়ের অপমানও বটে। তোমার রাজা ভাই দেবনাথ-মহামায়ার ইচ্ছাতেই সে কৃতীপুরুষ হয়েছে। মায়ের বাঞ্ছা হয়েছে, তোমাদের হাতেই পুজো নেবেন তিনি। যারা প্রতিমা ফেলেছে, মহামায়াই তাদের হাত দিয়ে করাচ্ছেন, কোন সন্দেহ নেই।

উত্তরবাড়ির যজ্ঞেশ্বর জুড়ে দিলেন : আরও দেখ, সবে বোশেখ মাস, পাকা ছ-মাস হাতে দিয়ে নোটিশ ঝেড়েছে—সেদিক দিয়ে বলবার কিছু নয়। যোগাড়যন্তরে এখন থেকে লেগে যাও। গাঁয়ের ছোঁড়ারা রয়েছে, ওরা ডাঙ্গা ভেঙ্গে ডহর করে। আর এর মধ্যে একটা পাল্লাপাল্লির ব্যাপারও আছে রাজিবপুরের সঙ্গে। ভাবনাচিন্তা কোরো না, নির্বিঘ্নে কাজ উঠে যাবে, ছোঁড়ারাই কোমর বেঁধে লাগবে।

পাল্লাপাল্লির কথায় হারু সরকার বলল, পুজো যখন হচ্ছে, থিয়েটারও হবে। অতি-অবশ্য ওটা। রাজিবপুরের ওরা তো থিয়েটারেই মাত করে দেয়। গেলবছর কলকাতার অ্যাকটর নিয়ে এসেছিল।

অক্ষয় বলে, মন্ডপে আর কটা লোক মন্ডপের সামনে স্টেজের মাঠে লোকে-লোকারণ্য। কলকাতার অ্যাকটর এবারও হয়তো আনবে। থিয়েটার বিনে শুধো দুর্গোৎসবে গাঁয়ের লোক কিন্তু ধরে রাখা যাবে না—রাত্রে মন্ডপ পাহারার কটা জোয়ান পুরুষ জোটানোই মুশকিল হবে। তাছাড়া পুজো সোনাখড়িতেও হচ্ছে, আর সোনাখড়ির যত মানুষ রাজিবপুর গিয়ে জুটেছে, আমাদের পক্ষে অপমানও বটে। বলুন তাই কিনা।

বরদাকান্ত বাধা দিয়ে ওঠেন : না হে, আর চাপিও না তোমরা। পুকুরকাটা মেয়ের বিয়ে-দেওয়া—মোটা মোটা খরচ করে উঠেছে, তার উপরে আবার দুর্গা ঘাড়ে এসে পড়লেন। যেমন তেমন পুজো নয়—দুর্গোৎসব। অন্য দেবদেবীরা আছেন, শুধু পুজো তাঁদের—সরস্বতী পুজো লক্ষ্মীপুজো বাস্তু পুজো শীতলা পুজো, উৎসব বলতে হয় না। দুর্গার বেলাতেই কেবল দুর্গোৎসব।

হারু সায় দিয়ে বলল, ঠিক বলেছেন কাকা। থিয়েটার গাঁওটি—পুববাড়ির কিছু নয়, গ্রামসুদ্ধ চাঁদা তোলা হবে ঐ বাবদে। থিয়েটার সমেত গোটা পুজোই গাঁওটি হবে। আগে তো সেইরকম কথা হচ্ছিল—অর্ধেক তবু ছাড় হয়ে গেল। থিয়েটার সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার—পেরজেরও তোফা জায়গা রয়েছে, নতুন বাড়ির বৈঠকখানা।

অক্ষয় রসান দিয়ে বলে, থিয়েটার তো অহোরাত্রই ওখানে যায় যেমন খুশি করে যায়। এবারে মুশকিল পার্ট-কার পরে কোন জন হিসেব করে চলন-বলন। এইমাত্র তফাত।

হারু সরকার বলল, এদিককার একপয়সা খরচার জন্যেও বলব না নিজেরা ব্যবস্থা করে নেবো। শুধু প্লের দিনে পুজোর উঠোনটার উপর সামিয়ানা খাটিয়ে নিচে কয়েকটা মাদুর ফেলে দেবেন, ব্যস। স্টেজ আমাদের খরচায় আমরাই বেঁধে নেবো, হ্যাজাক ভাড়া আমরা করব। তামাক কেরাসিন তেল আর যে ক'কাপ চা লাগবে সেইটি শুধু গৃহস্থের। নেহাৎ মাকে পালাটা শোনাতে চাই, নয়তো উঠোনও চাইতাম না।

হিমচাঁদ মাঝবয়সী রসিক মানুষ। বললেন, ভাল বুদ্ধি করছ হে। প্লে শুনে লোকজন উঠে যেতে পারে, তবু আসর ফাঁকা হতে পারবে না। মা-জননীকে থাকতেই হবে, শেষ অবধি না শুনে গত্যন্তর নেই। একলা তিনি নন—দুই ছেলে কার্তিক-গণেশ, দুই মেয়ে লক্ষ্মী-সরস্বতী সমেত। অন্য কেউ না থাকলেও এই পাঁচন তো পাকা রইলেন। অসুর আর সিংহ ধরলে সাত।

বরদাকান্ত বললেন, গণেশের কলাবউকে বার দিচ্ছ যে, শোনার লোক আরও যে একজন বাড়তি আছেন।

কথাবার্তা শেষ করে হাসিখুশীতে যে যার বাড়ি চলে গেল। ভুবনাথ বললেন, মানা-পুকুর-পাড়ের বেলগাছটা কেটে ফেলতে হবে। পাট ঐ গাছে। দেরি আছে অবিশ্যি।

মূল পূজার দায় যাঁদের কাঁধে, ইচ্ছে হয়তো তাঁরা দেরি করুন গে। আমাদের এক্ষুনি লেগে পড়তে হবে—কোমর বেঁধে—এক্ষুনি, এক্ষুনি। দলের কর্তাকর্তা পয়সা দশ্বারি পান্ডা হারু সরকার নতুন বাড়ির আড্ডায় ঘোষণা করল।

গানবাজনা যাত্রা-থিয়েটারের নামে হারু পাগল। যাত্রা শুনতে মাঘের রাতে তুরতুর করে কাঁপতে কাঁপতে তিন-চার ক্রোশ দূরে অবধি চলে যায়। এবারে গাঁয়ের মধ্যে সেই জিনিস। যাত্রা নয়, থিয়েটার—যাত্রার পিতামহস্বরূপ। বখেড়ার মোটা অংশ পুরো-বাড়ির কর্তারা নিয়ে নিয়োজন—পুজো-আচ্চার ভাবনা আমাদের ভাবতে হবে না। একটা-কিছু বললে নিশ্চয় গোলমাল করবে। কিন্তু দায়িত্বটা ওঁদের। থিয়েটারের ব্যাপারে আমরাই কিন্তু সর্বেসর্বা- হর্তা-কর্তা- অর্থাৎ ষোলআনা আমাদের উপর বর্তাবে।

সোনাখড়ি গ্রাম নিয়ে হারুর বড় দেমাক। আয়তনে একফোঁটা, লোকজন মুসলমান—তাহলেও রাজিবপুরের মতো গঞ্জগ্রামের সঙ্গে টক্কর দিয়ে চলবার মত ক্ষমতা রাখি আমরা। সোনাখড়ি খাটো কিসে? মোনছেফ (মুন্সেফ) আছে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার আছে উকিল আছে মোকতার আছে কলকাতার ডাক্তার আছে কলেজের পড়ুয়া আছে। অধিকন্তু রায়-সাহেব আছে একটি—এ বাবদে রাজিবপুর গো-হারান হেরে রয়েছে। আশ্বিনের দুর্গোৎসবও ছিল নতুনবাড়ির মাদার ঘোষের পিতা চণ্ডী ঘোষ জাঁকিয়ে পুজো করতেন। তাঁর মৃত্যুর পরে শরিকি গণ্ডগোলে পুজো বন্ধ হয়ে গেছে। থিয়েটার কোনদিনই নেই। সেই কলংক মোচন হয়ে যাচ্ছে এবারে।

হুড়মুড় কাজ। দত্তবাড়ির কালিদাস কলকাতার হ্যারিসন রোডের মেসে থাকে, চাকরি করে। কলকাতার বন্দোবস্ত তার উপর চাপিয়ে হারু জরুরি চিঠি দিল : পত্রপাঠমাত্র নাটক পছন্দ করে পাঠাও। পৌরাণিক অতি-অবশ্য—যাতে সাজপোশাক গোঁফদাড়ি অগ্নি-যুদ্ধ ও নৃত্যগীতাদি আছে। চরিত্র যত বেশি হয় ততই ভাল—বেশি লোক কাজে পাওয়া যাবে। কিন্তু স্ত্রী-চরিত্র তিন-চারটির বেশি নয়—গোঁফ কামিয়ে স্ত্রীলোক সাজতে ছেলেরা বড় নারাজ। নাটক ঠিক করে তার মধ্যে তোমার কোন পার্ট হবে, জানিও। আর অমুক অমুক অমুকের (তিন-চারটে নাম—গাঁয়ের ছেলে তারাও, কলকাতায় থাকে) কি পছন্দ তা-ও জিজ্ঞাসা করে নিও। এ ছাড়াও খাস-কলকাতার প্লেয়ার গোটা দুই-তিন আনার বন্দোবস্ত করবে। কলকাতার প্লেয়ার না হলে মানুষ টেনে রাখা মুসকিল হবে। আমাদের আসর খাঁ-খাঁ করছে, সব মানুষ গিয়ে রাজিবপুরে জুটেছে—এমনি অবস্থা ঘটলে গ্রামসুদ্ধ আত্মঘাতী ছাড়া উপায় নেই।

কালিদাস ঘোষ থিয়েটার-পাগলা, হপ্তার মধ্যে থিয়েটারে একদিন নিদেনপক্ষে যাবেই। মানুষ বুঝেই হারু মাতব্বর কেড়েছে। মোন-ছেফ ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি ইত্যাদির কাছেও মচ্ছবের খবর জানিয়ে চিঠি চলে গেছে। সোনাখড়িতে আসেন না তাঁরা বড়—এমনও আছেন তিন-চার পুরুষ আগে পিতামহ প্রপিতামহের আমলে চাকরি সূত্রে প্রবাসে গিয়ে তথাকার পাকাপাকি বাসিন্দা, সোনাখড়ি নামটাই শোনা আছে কি নেই—গ্রামবাসী হিসাবে তাঁরাও হারুর লিস্টভুক্ত, পাল্লা-পাল্লির মুখে জাঁক করে সে তাঁদের নিয়ে। চিঠি চলে গেছে ওঁদের নামে, পুজোর সময় আসতেই হবে সপরিবারে। আর চাঁদার প্রার্থনাও জানিয়েছে গ্রামের ইতরভদ্র সর্বজনার পক্ষ থেকে।

বিচার-বিবেচনা ও অনেক শলাপরামর্শ অন্তে কালিদাস পালা পছন্দ করে পাঠাল কর্ণার্জুন। জোরদার অ্যাকটিং আছে সাজ-পোশাক নাচগান আছে, ইচ্ছামতন লড়াইয়ের সিনও ঢোকানো যেতে পারবে : এ জিনিস না জমে যাবে কোথায়! সৈন্যসামন্ত রয়েছে, অতএব কথা মুখে ফুটুক আর না-ই ফুটুক যে চাইবে তাকেই পার্ট দিয়ে খুশী করা যাবে। এসব ছাড়াও সোনাখড়ির এক বিশেষ গুণ রয়েছে—নরেন পাল। নাচে গানে চৌখস—রাজিবপুর থিয়েটারে সখি সেজে এসেছে বরাবর। নামডাক এতদূর বেড়েছে, গেল-বছর সদর থেকে ডাক এসেছিল তার—জজ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আলিবাবা পালায় মর্জিনা সেজে আসর মাত করে এসেছে। গ্রামেই থিয়েটার যখন, এবারে কোনখানে যাবে না—সে এখানে ড্যান্সিং-মাস্টার। পালার গান তো আছেই উপরি কিছু বাইরের গানও জুড়ে দেবে। মর্জিনার গান গোটা দুই জুড়ে দেবে বলছে নরেন।

অপরাহ্ণ বেলা নতুন বাড়ির রোয়াকের এ-মুড়ো ওমুড়ো ঘরে ঘরে হারু সরকার ঢং-ঢং করে কাঁসর বাজায়, লোকজন ডাকছে। থিয়েটার নামানো চাট্টিখানি কথা নয়—নানান রকম কাজ, বিস্তর খাটনি। গাঁ তোলপাড়—মানুষ সব চলেছে। যাদের পার্ট আছে তারা যাচ্ছে, যাদের নেই তারাও যাচ্ছে রিহার্সাল দেখার কৌতূহলে। তিন-চারজনে অহো-রাত্রি পার্ট লিখছে—লিখে লিখে দিয়ে দিচ্ছে। আধ মুখস্থ হয়ে গেলে তখন রিহার্শাল। মন কষাকষি, ঝগড়া—আমার পার্ট ছোট হয়ে গেল অমুকের পার্ট বড়। হারু বলে, ছোট হোক বড় হোক এবারের মতন নামিয়ে দাও। ভাল হলে আয়েন্দা সন প্রামোশন। কখন বা বিরক্ত হয়ে বলে, সামনের বছর খুঁজে পেতে এমন নাটক আনব ঠিকঠিক একশ নম্বর করে পার্ট যাতে। মেয়ে পুরুষ দূত সৈনিক সবাই একশ দফা করে বলতে পাবে—একশর কম নয়, বেশিও নয়। তা নইলে দেখছি তোমাদের খুশী করা যাবে না থিয়েটার পার্টি ভেঙে যাবে।

দিনরাত্রি এখন এই এক উপসর্গ হয়েছে, উচ্চৈঃস্বরে পার্ট মুখস্থ করছে ছোঁড়ারা। প্রবীণও দু-পাঁচটি জুটে গেছেন তার মধ্যে। টানা মুখস্থ চাই, প্রম্পটারের উপর নির্ভর করলে হবে না—ম্যানেজার হারু সরকারের আদেশ। নরেন পালের বুড়ো বাপ হৃদয়নাথ পাল মশায় বলেন, ইস্কুলে-পাঠশালে পড়ার সময় এই মনোযোগ কোথায় ছিল বাপসকল? তাহলে তো কেল্ট-বিল্টু যা হোক একটা হতিস, গাঁয়ে পড়ে ভেরেন্ডা ভাজতে হত না।

(ক্রমশ)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সাহিত্য-সংস্থা সুপর্ণার জাতীয় সংহতির সঙ্কল্প

গত কয়েক মাস ধরে সাহিত্য-সংস্থা সুপর্ণা প্রতি মাসে সাহিত্য সম্মেলন-এর আয়োজন করে আসছেন। সম্প্রতি তামিল লেখক সংঘের আমন্ত্রণে সংস্থার অষ্টম মাসিক কাব্যপাঠ সভা ভারতী তামিল সংগম সভাগারে অনুষ্ঠিত হয়। সুপর্ণার অধ্যক্ষ কে সি গুপ্ত সংস্থার আদর্শ ব্যক্ত করে বলেন যে প্রত্যেকটি ভারতীয় ভাষাকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়ে আমরা জাতীয় সংহতির সংকল্প পূর্ণ করতে পারবো। তামিল লেখক সংঘের অধ্যক্ষ পি এন ত্যাগরাজন আমন্ত্রিত কবিদের স্বাগত জানিয়ে জাতীয় সংহতি এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সুপর্ণার এই উদ্যমের প্রশংসা করেন। ওড়িষার প্রখ্যাত সাহিত্যিক কিশোরী-চরণ দাস আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের একটি বিবরণ দেন। তারপর সভায় বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় স্বরচিত কাব্য পাঠ করেন অমরেশ পট্টনায়ক (ওড়িয়া), সুশীল রায় ও চিত্ত ঘোষ (বাংলা), হৃদয়েশ পাণ্ডে ও কুশেশ্বর (হিন্দি) এবং হাবিব হাশমী ও হাশমুর রমজান (উর্দু)।

সংস্কৃত ভাষার উন্নতিকল্পে কেন্দ্রীয় উদ্যোগ :

কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণ দপ্তরের উপমন্ত্রী ডি পি যাদব সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চম যোজনায় সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও উন্নতিকল্পে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ের এক প্রস্তাব বিবেচনা করছেন। সংস্কৃত ভাষাতে কেবল একটা নির্দিষ্ট পণ্ডিত সমাজের চর্চার বিষয় হয়ে না থাকে যাতে এ-ভাষা সাধারণের আদরের বস্তু হয়ে উঠতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে।

লণ্ডনের প্রবাসী বাংলা সাহিত্য সম্মেলন-এর কার্যকরী সমিতি :

লণ্ডনে সদ্য-সমাপ্ত প্রথম প্রবাসী বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের সাফল্য দেখে আগামী বছর যাতে এই সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন আরো সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা যায়, সেই উদ্দেশ্যে বর্তমান সম্মেলনেই একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে। যুগ্ম-সভাপতি : শ্রীমতী আশালতা ভট্টাচার্য ও এ আর মতিনউদ্দীন সাধারণ সম্পাদক : কমল বসু, প্রচার : সিরাজুল রহমান, সাহিত্য : বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সাংস্কৃতিক : ডাঃ শিশির রায়, খেলা ও সংগঠন : এ সুলতান, কোষাধ্যক্ষ : অমিয় বসু। ২১নং ক্যাথারিণ স্ট্রীট লণ্ডন, ডবলু সি—২-তে কমিটির দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন-এর আগরতলা অধিবেশন :

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তের আমন্ত্রণে এ-বছর ২৫ ডিসেম্বর থেকে আগরতলায় নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন-এর অধিবেশন-এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই অধিবেশনটিকে সর্বদিক থেকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবার জন্য সম্প্রতি দক্ষিণারঞ্জন বসুর সভাপতিত্বে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হয়েছে। ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা এই সমিতির সভাপতি এবং ডঃ এইচ এস রায়-চৌধুরী এর সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন। রাজ্যপাল এল পি সিংহ ও মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত যথাক্রমে প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও পৃষ্ঠপোষক হয়েছেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি সম্পর্কে কমিটির সুপারিশ :

দু' বছর আগে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির কাজকর্ম পর্যালোচনা করবার জন্য একটি কমিটির উপর ভার দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি এই কমিটির সুপারিশগুলি যা জানা গেছে তা নিম্নরূপ : সোসাইটির প্রতি বৎসর ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ঘাটতি হয়ে থাকে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে এ-ঘাটতি পূরণ করে যেতে হবে। এই ঘাটতির মধ্যে পাণ্ডুলিপি উপযুক্তভাবে সংরক্ষণের জন্য পনেরো হাজার টাকা এবং সোসাইটির বাড়িটি মেরামতের জন্য ১০,০০০ টাকাও ধরা হয়েছে। এছাড়া দুই সরকারকে একত্রে অন্ততঃ ৩০,০০০ টাকা খয়রাতি হিসেবেও দিতে হবে। তবে কমিটি এ-কথাও বলেছেন যে এযাবৎকাল যা ঘাটতি হয়ে আছে তা সোসাইটিকে নিজের তহবিল থেকেই মেটাতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তর বর্তমানে সুপারিশগুলি বিবেচনা করে দেখছেন। এ-ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করছেন বলে জানা গেল। ১৯৭২ সালে দুই সরকার সোসাইটিকে মোট ১,৪৩,০০০ টাকা দিয়েছেন এবং গত বছর দিয়েছেন মোট ৮১,৫০০ টাকা।

—অলংকার

আরো বই

পত্র-পত্রিকা

স্মৃতি সান্ত্বনা ও অভীপ্ট সংলাপ (কাব্য-সংখ্যা) শান্তি রায় ও শিবদাস চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—অজিতকুমার বসু, কোতুলপুর, বাঁকুড়া। দুই টাকা।

শান্তি রায়ের 'তির্যক সান্ত্বনা' ও শিবদাস চট্টোপাধ্যায়ের 'অভীপ্ট সংলাপ' —এই দুই ভিন্ন গন্থ ভিন্ন ব্যক্তিদের উৎসর্গীকৃত হয়ে, ভিন্ন ভূমিকায় বক্তব্য জানিয়ে একত্র সংকলিত হয়েছে। এভাবে একটি গ্রন্থে সংকলিত করার কোন যৌক্তিকতা বোঝা গেল না। তবু দুই কবির কবিতা আমাদের কিছু কিছু ভাল লেগেছে। শান্তি রায়ের তুলনায় শিবদাস চট্টোপাধ্যায়কে কোন কোন কবিতায় বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন কবি বলে মনে হল। শান্তি রায়ের ছন্দজ্ঞান পরিচ্ছন্ন। কিছু মিলের কবিতা তিনি লিখেছেন। শিবদাস চট্টোপাধ্যায়ের গদ্য-কবিতাও মন্দ নয়। দুই কবিই প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন।

শ্রীভৃগু সংহিতা। (১ম খণ্ড) শ্রীভৃগু। রুপ পুস্তকালয়, ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

প্রাচীনতম আর্য সভ্যতার একটি মূল্যবান গ্রন্থ হল শ্রীশ্রীভৃগু সংহিতা। সেই সময় থেকেই জ্যোতিষ শাস্ত্র ভারতে উচ্চস্থান লাভ করে ও পরে মধ্যপ্রাচ্যে ও সারা ইউরোপে এর প্রচার ঘটে। এই প্রাচীন ভৃগুসংহিতার অনুসরণে শ্রীভৃগু ছদ্মনামে আলোচ্য 'ভৃগু-সংহিতা'-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। লেখক স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়ে বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রত্যেকটি গ্রহে ভাবিবিচার রাশিতে গ্রহ-সঞ্চারের স্বরূপ গ্রহগণের ক্ষমতার পরিমাণ গ্রহগুলির দোষ শান্তি, উচ্চ-নীচ বিচার এবং আদ্যন্তর বারফল, মাসফল তিথিফল, নক্ষত্র ফল লগ্ন দোষশান্তি ইত্যাদির সচিত্র ও ছকসহ আলোচনা করেছেন। জন্মমাস অনুযায়ী ভাগ্য গুণাগুণ প্রভৃতি বিচারের অধ্যায়টি বাস্তবিক অর্থে বৈজ্ঞানিক পন্থায় সুলিখিত। গ্রন্থটির ভবিষ্যবাণী সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যথেষ্ট কাজে লাগবে বলে মনে হয়।

যাদুসম্রাজ্ঞীর অভিজ্ঞতা। উমা দাশগুপ্ত। গ্রন্থ-প্রচার, কলকাতা-১২। চার টাকা।

পশ্চিমবাংলায় যাদুবিদ্যা চর্চায় অনেকে যশস্বী হয়েছেন। কিন্তু একে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো মহিলার এগিয়ে আসার নজির খুব আছে বলে মনে পড়ে না। উমা দাশগুপ্ত শুধু যাদুবিদ্যায় পটিয়সী নন। নিজের অভিজ্ঞতাকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করার দক্ষতা তাঁর আছে। তাঁর রচনায় শুধু যাদু-প্রদর্শনীর কথাই নয়, দেশে-বিদেশে মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও তাঁদের জীবনকে জানার মানবিক প্রয়াস চোখে পড়ে। গ্রন্থটি উৎসাহী জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে আশা করি।

শাখা প্রশাখা শেকড়গুচ্ছ (কাব্য সংকলন)—রণজিৎ দেব। ত্রিবৃত্ত প্রকাশন, ১ ত্রিবৃত্ত সরণী, কুচবিহার। তিন টাকা।

রণজিৎ দেব প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবি। তাঁর কবিতায় আধুনিক জীবনভাবনা, প্রেম, ব্যক্তিক অনুভূতির গূঢ় কম্পনাময়তা, সর্বোপরি সমকাল সম্পর্কে জ্বালা-যন্ত্রণা—সবই আছে শৈল্পিক সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে। 'বাংলাদেশ'-এর জন্ম মুহূর্তে কবি তাকে সানুনয়ে জানিয়েছেন, 'শুদ্ধিস্নান সেরে নে মা, ও আমার বাংলাদেশ'। এই জাতীয় বাক্য প্রয়োগের পর কবি অত্যাচারিত বাংলাদেশের যে ছবি এঁকেছেন, তা সার্থক ও কবিত্বপূর্ণ। সংশয়, দ্বিধা, যন্ত্রণা কবির বিভিন্ন কবিতায় সুস্পষ্ট। যেমন—'চারদিকে পিপাসার রোদ/আমি কিভাবে দাঁড়াবো সারাদিন/আমি কেমন করে দাঁড়াবো!'

অশ্রুতে শিশির (কাব্য সংকলন)—চন্দন মজুমদার। দরবারী প্রকাশনী, ৩০, লেনিন সরণী, কলকাতা-১২। তিন টাকা।

উনিশটি কবিতা নিয়ে 'অশ্রুতে শিশির' গ্রন্থ। চন্দন মজুমদার স্মৃতি-অনুষঙ্গকে গুরুত্ব দিয়েছেন কোন কোন কবিতায়—'ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে ডাকছে স্মৃতি', কিন্তু স্মৃতি নিয়ে অর্থাৎ অতীতকে একমাত্র সত্য করে বসে নেই কবি, বর্তমানও কবিকে সচেতন করেছে—'দুন্দুভির মত বেজে উঠছে এখন/অনবদ্য জীবন/বেলুনের মত ফুলে উঠে ফেটে পড়ছে।' কবির প্রেম, প্রেমিকা ধারণা, ভিয়েৎনামের অমানবিক পরিবেশ ভাবনা, সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ইত্যাদি চমৎকার কাব্যরূপ পেয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। 'অশ্রুতে শিশির' কাব্যগ্রন্থ কবিতাপাঠকদের নতুন যুগোপযোগী রসের আশ্বাস দেবে।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান (৭ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা ১৩৮১) সম্পাদক : রমাপ্রসাদ সরকার ও রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ, সোদপুর, ২৪ পরগণা। এক টাকা।

সাহিত্য ও বিজ্ঞানসম্পর্কীয় আলোচনার সমৃদ্ধ ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি সিরিয়াস পাঠকদের ভাল লাগবে। এ-সংখ্যার সবচেয়ে উল্লেখ্য রচনা হল আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সেই স্মরণীয় গবেষণা-পত্র—মূলে জার্মান থেকে অনুবাদ করেছেন : ডঃ রমাপ্রসাদ সরকার। এছাড়া আছে তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ সুলিখিত কটি নিবন্ধ : দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসঙ্গে (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), হাফিজের বাংলা কবিতা (শুদ্ধসত্ত্ব বসু) যে ঐতিহাসিক সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন—থিওডর মমসেন (দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়), আকস্মিকতা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার (গৌরগোপাল বসাক) কয়েকজন সাম্প্রতিক ইংরেজ নাট্যকার ও তাঁদের কয়েকটি নাটক (পল্লব সেনগুপ্ত) এবং পরলোকগত সৈয়দ মুজতবা আলী ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত দুটি চিঠি একগুচ্ছ কবিতা ও একটি গল্প।

নবাঙ্কুর : (নববর্ষ সংকলন ১৩৮১) সম্পাদক : বিকাশচন্দ্র দাস। কলকাতা ৫০। এক টাকা।

লিখেছেন : জ্যোতির্ময়ী দেবী, পরমানন্দ সরস্বতী, কৃষ্ণ ধর, নচিকেতা ভরদ্বাজ প্রমুখ।

ছন্দিতা। গৌরগোপাল দাশ এবং হেনা চৌধুরী সম্পাদিত। বি-৫১ রবীন্দ্রনগর। কোলকাতা-১৮। দাম দেড় টাকা।

ছন্দিতা পত্রিকার নেতাজী শ্রদ্ধাঞ্জলি সংখ্যা এবং বিশেষ নববর্ষ সংখ্যা একই সঙ্গে হাতে এলো। নেতাজী শ্রদ্ধাঞ্জলি সংখ্যায় প্রকাশিত সুভাষচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠি নিঃসন্দেহে পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। এছাড়াও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত একাধিক প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথায় পত্রিকাটি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

যুবক যুবতী

পরীক্ষা ব্যবস্থা

সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে শিক্ষা-সংকট তীব্রতা লাভ করায় বিশেষজ্ঞদের তা নিয়ে গবেষণা করতে হচ্ছে। এই সংকট আসছে নানা দিক থেকে। বলা বাহুল্য, শুধু আমাদের দেশেই নয়, পশ্চিমের বিভিন্ন দেশ এই সমস্যায় আক্রান্ত এবং তার ফলেই দেশে দেশে ছাত্রবিক্ষোভ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই বলেন, শিক্ষা-ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এর আমূল সংস্কার চাই। আর এ-কথাটি তো হামেশাই শোনা যায় যে, যে পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় তা শিক্ষা-সংকটকে প্রকট করে তুলছে। আমি তাই কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে কলকাতা ও উপকণ্ঠের কয়েকজন তরুণ শিক্ষাব্রতী ও ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলি।

স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনা করতে করতে সম্প্রতি ব্যাংকে চাকরি নিয়ে চলে এসেছেন অর্থনীতির এম-এ মনোজ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কাছে জানতে চাইলাম 'বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থার কি কোন ত্রুটি আছে? থাকলে তা কী?'

'বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থার সব থেকে বড় ত্রুটি হল এটা শিক্ষা-ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়, শিক্ষার সঙ্গে সবরকম সম্পর্কবিহীন একটা উটকো ঝামেলাবিশেষ।' বললেন মনোজ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বললেন, 'পরীক্ষা-ব্যবস্থাই বলুন আর শিক্ষা-ব্যবস্থাই বলুন এ সবকিছুই উপরি কাঠামো। মূল বা বনিয়াদটা হল গিয়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই বনিয়াদটাই ধীরে ধীরে ধসে পড়ছে। সেক্ষেত্রে উপরি কাঠামোটাকে আর ধরে রাখবেন কিভাবে?' প্রসঙ্গক্রমে গণ-টোকাটুকির কথা এনে চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'এক কথায় বলা যায় গণ-টোকাটুকি হল পরীক্ষা-ব্যবস্থার তথা শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি সামগ্রিক সংকটেরই প্রতিচ্ছবি, [illegible] অবক্ষয় পতনমুখ অর্থনৈতিক-[illegible] পরিণতি।'

[illegible] আগেও তো এ-[illegible] ছিল। তখনকার তুলনায় এখন, [illegible] কেন?'

বললেন 'একটা সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া যদি এসব প্রশ্নের সদুত্তর পাবার চেষ্টা করেন, তাহলে আমি বলব আপনাকে হতাশ হতেই হবে। অর্থনৈতিক সংকট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বহিরাবরণ শিক্ষা, সংস্কৃতি এসব কিছুতেই সংকট বাড়ছে।'

'শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে পরীক্ষা-ব্যবস্থার সম্পর্ক কি?'

'পরীক্ষা হল শিক্ষার পরিমাপের একটি যন্ত্রবিশেষ। যথাযথভাবে প্রযুক্ত হলে এই যন্ত্রের সাহায্যে শিক্ষার ব্যাপ্তি ও গভীরতা পরিমাপ করা যায়।'

মনোজ চট্টোপাধ্যায়ের এই প্রশ্নেরই খেই ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টাদশী ছাত্রী গীতাঞ্জলি দাসের কাছে জানতে চাইলাম, 'শিক্ষার পরিমাপে পরীক্ষা কি একটি যন্ত্রবিশেষ?'

গীতাঞ্জলি বললেন, 'তাই তো হওয়ার কথা। কিন্তু দুঃখের কথা হয়েছে ঝামেলাবিশেষ। যন্ত্রটায় জং ধরে গেছে—এখন এটাকে ত্যাগ করে নতুন যন্ত্র আনতে হবে।'

কান্তু চ্যাটার্জি

গীতাঞ্জলি দাস

বললাম, 'একটু বুঝিয়ে বলুন।'

'অর্থাৎ পরীক্ষা-ব্যবস্থাকে পাল্টে ফেলতে হবে।'

'কিরকম?'

'পরীক্ষা যিনি গ্রহণ করেন অর্থাৎ পরীক্ষক এবং যিনি পরীক্ষায় বসেন অর্থাৎ পরীক্ষার্থী দুই পক্ষকেই সমগ্রকতা সম্পর্কে যথেষ্ট বোধ নিয়ে সজাগ থাকতে হবে। এক পক্ষের সঙ্গে আর এক পক্ষের রিলেশন যদি সদা মারমুখী হয় তাহলে যেটুকু হওয়ার কথা তা-ও ভেস্তে যাবে।'

'সামগ্রিকতা বলতে কি বোঝাচ্ছেন?'

'অ্যাটমোশফেয়ার, আরগনমেন্ট সবই।'

সুবীর দাশগুপ্ত (মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, বি-এ) বললেন, 'পরীক্ষা-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ অবশ্যই চাই। যে শিক্ষক-অধ্যাপক ছাত্রদের পড়ান, পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের ওপরই বেশির ভাগ দায়িত্ব দেওয়া উচিত। বার্ষিক পরীক্ষায় তাঁরা যদি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তবে স্কুল লিভিং এবং কলেজ লিভিং-এর পরীক্ষায় অধিকাংশ দায়িত্ব তাঁদের কেন দেওয়া হবে না? এই সঙ্গে সামাজিক পরিবেশ অর্থাৎ অভিভাবক এবং দেশের সরকারী প্রশাসন উভয়কেই শিক্ষকদের যথাযথ শ্রদ্ধা বা সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শিক্ষক হয়ে উঠবেন ছাত্রের কাছে আদর্শ ব্যক্তি।'

অর্চনা চ্যাটার্জি বললেন, 'একেবারে ক্লাশ ওয়ান থেকে ছাত্রদের মাথায় এই কথাটা ঢোকাতে হবে যে সে যা শিখছে বা জানছে তার একটা ফেয়ার টেস্ট হল পরীক্ষা। সেটি তার কাছে তপস্যাবিশেষ। কিন্তু শেখাবে কে? শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেরাই আছেন শিক্ষার বাইরে নানা ঝামেলায়। তাই দেখি, আস্তে আস্তে সমস্যা পাকতে পাকতে বড় পরীক্ষায় টেবিল-চেয়ার চূর্ণবিচূর্ণ হয়। অসহায় শিক্ষক লাঞ্ছিত হন।'

'শিক্ষার বাইরে নানা ঝামেলা যাবে?'

'আমি অর্থনৈতিক দুর্দশার কথা বলছি।'

'পরীক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?'

'শুরু থেকে ভাবতে হবে। তা তো বললামই।'

বিপুল বিশ্বাস—'বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থায় যেসব ত্রুটি রয়েছে, তার মধ্যে প্রধান মনে হয় বছর শেষে মূল লিখিত পরীক্ষা নেওয়া। আমার মতে বছরে অন্তত তিন মাস পর পর মৌখিক পরীক্ষার ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। ওই মৌখিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লিখিত পরীক্ষা নিয়ে বছর শেষে ছাত্রের উপস্থিতিকেও সঙ্গে ধরে সামগ্রিক ফল ঘোষণা করা উচিত।'

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসন্তু চ্যাটার্জি বললেন 'পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব বা নীতি স্থির করবার দায়িত্ব যাঁদের ওপর ন্যস্ত তাঁরা ধরে নিয়েছেন আমাদের শিক্ষা-দানের ব্যাপারটা তেমন কোন মৌল ব্যাপার নয়। ওই ধারণা থেকে এসেছে শৈথিল্য ধা না ভেবে কোনমতে একটা অবৈজ্ঞানিক প্রবণতা। এর থেকে মুক্তি পাওয়া আমার মনে হয় আপাতত খুব কঠিন। কেননা, পরীক্ষার হলে গণ-টোকাটুকি আর সিনেমার লাইনে মারামারি বা খেলার মাঠে ঝামেলা—এগুলোকে আমি আলাদা করে দেখি না। যে-স্রোত ধরে এগুলো আসছে সেদিকে নজর না দিয়ে ওপর ওপর কিছু করা সম্ভব নয়।'

—কৃষ্ণা সেনগুপ্ত

এঁরাও পিছিয়ে নেই

দুই বন্ধুর ছাপাখানা

লেক গার্ডেন্সের কমিউনিকেশন ম্যানেজমেন্টের ছাপাখানায় যখন ঢুকলাম, তখন বেলা দশটা পুরোদমে মেশিন চলছে কম্পোজিটাররা দ্রুত লয়ে হরফের পর হরফ সাজিয়ে চলেছে। কমিউনিকেশন ম্যানেজমেন্টের অন্যতম কর্তাব্যক্তি ২৪ বছরের তরুণ শ্রীসৌরজিৎ ঘোষ হাত বাড়িয়ে বললেন, —এই আমাদের ছাপাখানা—বহু সাধ আর স্বপ্নের বাস্তব রূপ। এর প্রতিটা টাইপ আর মেশিনের পেছনে রয়েছে আমাদের দিবারাত্রির সংগ্রামের ইতিহাস।

এই ছাপাখানাটি তৈরী করেছেন দুই বন্ধু—শ্রীসৌরজিৎ ঘোষ এবং শ্রীঅভিজিৎ ব্যানার্জি। এঁরা দুজনেই যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র—লাইসেনসিয়েট ইন প্রিন্টিং অ্যান্ড গ্রাফিক আর্ট। বিজ্ঞানে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে যাদবপুরে ভর্তি হন। '৭১-এ কৃতিত্বের সঙ্গে প্রিন্টিং এর লাইসেনসিয়েট কোর্সে উত্তীর্ণ হন।

অভিজিৎ ব্যানার্জি এবং তাদের ছাপাখানা

ইউনিভার্সিটি থেকে বার হবার পর সেই সনাতন সমস্যাটা দেখা দিল—চাকরির সমস্যা। চাকরির জন্যে চলল ধর্ণা। সৌরজিৎবাবু বলতে লাগলেন—আমাদের দেশে প্রিন্টিং সম্পর্কে অনেকেরই পরিষ্কার ধারণা নেই। ছাপাখানা বলতে সাধারণে বোঝে একটা ট্রেডল মেশিন আর কয়েকজন অর্ধশিক্ষিত কম্পোজিটার। অথচ এটা এমন একটা জিনিস যেখানে সায়েন্স এবং আর্টিস্টিক ন্যাক দুটোই দরকার। মুদ্রণ সম্পর্কে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে হয় তা অনেকেই স্বীকার করতে চায় না।

সৌরজিৎবাবু বলতে লাগলেন—আত্মীয়স্বজন, পরিচিত ব্যক্তি, সকলের কাছেই গেলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরি-বাকরি জুটল না। কেউ কেউ আবার উপ-দেশও দিলেন—প্রিন্টিং-এর চাইতে পাস-কোর্সে বি-এ পাশ করলেও এল ডি সি-র চাকরি হয়তো জুটিয়ে দিতাম।

অনুরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা অভিজিৎ ব্যানার্জিরও। অগত্যা চাকরির আশা ছেড়ে দিলেন দুজনই। তারপর গ্রীষ্মের এক তাপদগ্ধ মধ্যাহ্নে একটি রেস্তোরাঁয় চায়ের কাপে তুফান তুলে ওঁরা দুজনে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শপথ নিলেন—চাকরি নাই বা পেলাম দুঃখ নেই। কিন্তু প্রেস আমরা করবই।

ওঁরা দুতিনটে প্রেসের সঙ্গে কথা বলে কমিশনে কাজ করতে লাগলেন। ওঁরা অর্ডার আনেন—বিনিময়ে কমিশন পান। এভাবে বছর তিনেক কাজ করে মূলধন সংগ্রহ করলেন—ছাপাখানার পত্তন করালেন গত মে মাসে। কাজের অর্ডার সামগ্রিক পরিকল্পনা সবকিছু যাচাই করে ব্যাঙ্ক এঁদের দিয়েছে এক লক্ষ টাকা ঋণ। ওঁরা কিনেছেন দুটি ফ্ল্যাট বেড, দুটি ট্রেডল ও একটি কাটিং মেশিন।

—কর্মচারীর সংখ্যা কত? আমার প্রশ্ন

—পাঁচজন, তবে আমাদের দুজনকে ধরলে সাত। সৌরজিৎবাবু মৃদু হেসে বল্লেন—কম্পোজিটার না এলে আমরাও হাত লাগাই, মেশিন চালাই।

—শিখলেন কবে?

—কেন? আমরা ক্লাসেই শিখেছি। এছাড়া পাশ করার পর বছর-খানেক ট্রেনিং-এও থাকতে হয়েছে।

—কেমন লাগছে?

—নাইস। অর্ডার ভালই পাচ্ছি। তবে লোড শেডিং-এর জন্য মাঝখানে বিজনেসে মন্দা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু এখন আর তা নেই। ব্যাঙ্কের কিস্তি শোধ এবং কর্ম-চারীদের বেতন দিতে মাসে হাজার-পাঁচেক টাকা ইনকাম তো করতেই হয়, নইলে চলবে কি করে।

—বিয়ে করেছেন?

—না—সৌরজিৎবাবু হাসতে হাসতে বললেন।

—প্রেম করেছেন?

—না মশাই, প্রেম করবার সময় কোথায় বলুন। চব্বিশ ঘণ্টাই মাথায় ঘুরছে—কি করে 'কমিউনিকেশন ম্যানেজমেন্ট'কে বড় করা যায়। অর্ডার আনা, কাজের সুপার-ভিশন, বিলের [illegible] করতে দিনগুলো [illegible] তা নিজেই বুঝতে পারি না। একটা [illegible] মেশিনের গায়ে সস্নেহে [illegible] হাসতে হাসতে বল্লেন—বেশ আছি মশাই।

—[illegible] মজুমদার

চিঠিপত্র

'কমদামে সর্বশ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক'

অমৃতের একজন পাঠক হিসাবে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই অমৃতের প্রচ্ছদ ক্রমশ সুন্দর হওয়ার জন্য। সত্যি কথা স্বীকার করতে কোন বাধা নেই যে অমৃতের প্রচ্ছদ এখন অনেক সাপ্তাহিক পত্রিকার চেয়ে সুন্দর হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে পর পর কতকগুলো সংখ্যার প্রচ্ছদ ভোলবার মত নয়। নিতাই ঘোষ ইন্দ্রাণী চৌধুরী মনোজ বিশ্বাসের প্রচ্ছদ অংকন অতুলনীয়। আশা করি আগামী সংখ্যাগুলোতে আরও ভালো প্রচ্ছদ দেখাতে পারেন।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে প্রায় চার বছর ধরে অমৃতের দাম ৫০ পয়সা রাখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন পত্রিকার দাম ক্রমশ বেড়ে গেছে, কিন্তু অমৃতের দাম সেই দামেই থেকে গেছে। এখন আপনি একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাত্র ১৫ পয়সা দাম বাড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। এর জন্য আশা করি অমৃতের পাঠক পাঠিকাদের দুঃখ বা ক্ষোভ নেই—আমার তো নেই। কারণ অমৃতের একজন পাঠক হিসাবে আমি এখনও স্বীকার করবো অমৃত এখনও সবচেয়ে কম দামের বহুগুণসম্পন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক পত্রিকা।

মিঠু মুখোপাধ্যায়,
বিষড়া, হুগলী।

'বিষয় বৈচিত্র্যে অতুলনীয়'

বহু বছর ধরে সাপ্তাহিক অমৃত আমাদের মত হাজার হাজার সাহিত্যানুরাগীদের যেভাবে সাহিত্যের অমৃত পরিবেশন করে আসছে তাতে আজ আমরা গর্বিত। কিছুদিন যাবত অমৃতে বিষয়-বৈচিত্র্য অতুলনীয় হয়ে উঠেছে। চলচ্চিত্র সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি খেলাধূলো বিভাগ আজ পত্রিকার প্রধান অলংকার স্বীকার করছি। তা সত্ত্বেও এই বিভাগগুলি সম্বন্ধে কিছু না লিখে পারছি না। প্রথমত খেলার বিভাগে আরো নতুন নতুন মুখরোচক (তবে অশ্লীল নয়) তথ্য পরিবেশন করা উচিত বাংলার বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত যাত্রাগান কবিগান এসব বিষয়ে লেখা প্রকাশ করলে ভালো হয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগে আরো নতুন নতুন সাহিত্য পত্র-পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ছাপান। এতে অনেক পত্রিকা নতুনভাবে প্রেরণা পাবে। খেলাধূলো বিভাগে খেলোয়াড় পরিচিতি আরো বাড়ান। খেলোয়াড়দের প্রেরণা দেবার জন্য এটুকু করতেই হবে। নতুন নতুন লেখকদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ক্রীড়া রচনা প্রকাশ করুন। ছবিতে গোয়েন্দা গল্প ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হলে পত্রিকার চাহিদা বাড়বে বই কমবে না। সবশেষে জানাই—এবার থেকে অমৃতের দাম বেড়ে ৬৫ পয়সা হচ্ছে শুনে খুশি হলাম। ভেবে আশ্চর্য হই এই দুর্মূল্যের বাজারে এত কম দামে অমৃত ছাপা হচ্ছিল কিভাবে! পত্রিকার দাম বেড়েছে খুব ভালো কথা, তবে এই সাথে পত্রিকায় যাতে আরো নতুন নতুন বিভাগ খুলে পত্রিকার মান আরো বাড়ানো হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি।

অমল ত্রিবেদী, সম্পাদক : খেলাধূলো
পোঃ আদ্রা, পুরুলিয়া।

(পত্রলেখকের সহযোগিতামূলক পরামর্শ আমরা নিশ্চয়ই মনে রাখব। অঃ সঃ)

যুবক-যুবতী

লিব

সাপ্তাহিক অমৃতে (১৩-৯-৭৪) হৃদয়গ্রাহী যুবক-যুবতী বিভাগে বহুবিতর্কিত 'লিব' প্রসঙ্গটির সময়োপযোগী আলোচনায় যুবক-যুবতীরা উপকৃত হবে। কিন্তু সাক্ষাৎকারে স্বচ্ছ আলোচনা না হওয়ায় 'লিব' সম্পর্কে কিছু সংশয় থেকে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু নিবন্ধ বক্তব্য রাখলাম।

'লিব' লিবার্টি'র সাংকেতিক রূপ। এক-কথায় 'লিব' বললে উইমেনস-লিব-আন্দোলনকেই বোঝায় যদিও লিবার্টি'র আক্ষরিক অর্থ—মুক্তি, তবুও এক্ষেত্রে মুক্তির পরিবর্তে 'আত্মনিয়ন্ত্রণ' বললে 'লিব'-এর প্রকৃতিগত অর্থ পরিষ্কার হয়। পুরুষদের টেক্কা দেওয়া বা পুরুষের প্রতিহিংসায় কিংবা পুরুষদের হাত থেকে কেবল অধিকার ছিনিয়ে আনার উদ্দেশ্য 'লিব' আন্দোলনের উদ্ভব নয়।

সাক্ষাৎকারে শ্রদ্ধেয় বীণা দত্তের খেদোক্তি—বিয়ের পর নতুন মানুষটা অনেক বড় বড় কথা বলেন। তারপর যথাসময়েই যে একটি সন্তান উপহার দেন তারপর ভদ্রলোকের কিছু যায় আসে না, শুধু আমরাই বন্দী হয়ে যাই চার দেওয়ালে। এ জীবন-সংলগ্ন বন্দীত্বের মুক্তি 'লিব' আন্দোলন কেন—কোন ব্যাপক আন্দোলনেও সম্ভব নয়। কেবলমাত্র নরনারীর পারস্পরিক মধুর সমঝোতাতেই স্থায়ী মীমাংসা সম্ভব।

প্রশ্নকার প্রশ্ন রেখেছেন—'স্বামী হিসেবে আপনার স্ত্রীকে আপনি যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে রাজী আছেন?' প্রশ্নকার এখানে কোন ধরণের স্বাধীনতা কথা বলেছেন তা স্পষ্ট নয়। ক্লাবে-বারে, পথে-ঘাটে যথেচ্ছ চলাফেরার স্বাধীনতার কথা বলেছেন কি? তা যদি বলে থাকেন, তাহলে ঐ ধরণের স্বাধীনতা লাভে লিব আন্দোলন সার্থক হওয়া অসম্ভব। প্রশ্নকারের লিব আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিতে সংযম কথাটা একেবারে অমূলক।

আলতলা মিনতি দাসগুপ্তের জেহাদ—আমার বিয়ের পর কোনমতেই স্বামী দেবতার দাসী হয়ে থাকব না। আসলে তিনি বোধ করি আমাদের দেশের প্রচলিত শাস্ত্রগুলির অন্যায়ের বশবর্তীকেই মেয়েদের ক্ষেত্রে স্ত্রী হিসাবে। দাসীবৃত্তি মনে করেছেন। একথা ঠিক আমাদের দেশে পুরুষেরা নিজেদের সুবিধার্থে বিবাহের পরবর্তী জীবনে মেয়েদের একটি সংকীর্ণ পরিবেশে আবদ্ধ করে রাখে। আমার মনে হয় এই সংকীর্ণ পরিমণ্ডলের ভিতরেই মেয়েদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে নিজেদের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

ফ্রয়েডের একথাও ঠিক—নারীর শরীরই তার নিয়তি প্রকৃতিগত দৈহিক বা মানসিক উভয় তাগিদেই নারীরা অনিবার্যভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল। তবুও পর-নির্ভরতা অস্বীকার করে নারীরা কর্মক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় উদ্ধত, উগ্র ও হৃদয়হীন হয়ে পড়েছে। ফলে নারীর এই চেষ্টাকৃত পুরুষালী স্বভাব জীবনের আসল কাম্য—শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে, পশ্চিমের উন্নত দেশগুলির নারীদের কাছে এর সত্যতা পরীক্ষিত। ভারতবর্ষের মতো দেশে লিব আন্দোলনের লক্ষ্য হওয়া উচিত যুগ যুগ অনুসৃত অন্ধ-কুসংস্কার থেকে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা ও নারী-পুরুষের কর্মস্পৃহার প্রতি সমাজের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন করা।

বাল্মীকি ঘোষ

হিপি

আপনার পত্রিকার যুবক-যুবতী ফিচারটি ক্রমশ সকলের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। ৩০শে আগস্ট তারিখের সংখ্যায় 'হিপি মনোভাব' সম্পর্কে কয়েকটি সাক্ষাৎকার পড়লাম। বেশ কয়েক বছর ধরেই আমেরিকা থেকে আবিষ্কৃত হিপিতন্ত্রের প্রভাবে বর্তমান পৃথিবীর যুব-সমাজ উচ্ছৃঙ্খলতায় ভুগছে। বর্তমান ফিচারের সাক্ষাৎকারীদের এই উৎকট মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে কটি কথা বলতে চাই।

কিম্ভূতকিমাকার পোশাকে বিকট চেহারা তৈরি করা হিপিদের একটা বৈশিষ্ট্য। তারা নাকি ঐশ্বর্যের রাজত্ব থেকে পালিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে মুক্তি খোঁজেন। কিন্তু এটা অবশ্যই স্বীকার্য যে তাদের সংগে সংগেই এসেছে গাঁজা আফিং এল এস ডি কোকেন মারিজুয়ানা প্রভৃতি নেশার দ্রব্য আর প্রচণ্ড উচ্ছৃঙ্খলময় কামনার জীবন।

থেরাপিদের জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হিপি-আদর্শকে গ্রহণ করার নাম মুক্তি নয় বা নতুন পথে চলা নয়। ওটা নেহাতই বিকৃত মনোভাবের পরিচয়। সব্যসাচী ঘোষের ফেথার্কীহুড ইন্ডাস্‌ব ক্যাইয়ের নস্ত কি লম্বা চুল সেপারেট কথাবার্তা আর বে-ঢপ সাজ-পোশাক? এই কি গোষ্ঠীভুক্তের লক্ষণ? আজকাল প্রায়ই রাস্তাঘাটে জ্যালজেলে এক-টুকরো কাপড়ে (ন্যাকড়া বলাই বাঞ্ছনীয়) উদগ্র যৌবনকে প্রকাশ করে অনেক মেয়েকে পথ চলতে দেখা যায়। এর নাম কি যান্ত্রিক সভ্যতা থেকে মুক্তি?

মিহির মণ্ডল এবং ঘোষজায়া মন্তব্য-গুলি প্রকাশ করেন—বকে পুজাৰ্ভান করে একদলগুলি ছেলেদের মাঝখানে গাঁজা টেনে বাড়ীর জিনিসপত্র ভেঙে চিন্তাহীন জীবন কাটিয়ে। এটা কি ওঁদের আত্মতৃপ্তি না মানসিক বিকৃতি?

সব দেখেশুনে মনে হয় যে সংস্কৃতি ধ্বংসের পরিকল্পনা আজ সার্থক হয়েছে। অপসংস্কৃতি এবং অবক্ষয়ের বিষাক্ত গ্যাসে সমগ্র যুবকচিত্ত আজ প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলায় দিশেহারা। কিন্তু এই কি আমাদের সব? জ্বালা-যন্ত্রণা আছে ঠিকই, কিন্তু এই মানসিক অস্থিরতার জন্য হিপি মনোভাবই কি একান্ত আদর্শ? না, তা কখনই হতে পারে না। এই জ্বালা-যন্ত্রণা উপশমের জন্য দরকার একটি বলিষ্ঠ মতবাদ আর চাই মনের জোর এবং সাহস।

অনিল ঘোষ, বসিরহাট।

'যুবক-যুবতী'

শ্রদ্ধেয় মহাশয় আমি 'অমৃত'র একজন গুণমুগ্ধ পাঠক। আপনার পত্রিকার নিত্যনতুন কিছু ফিচার সংযোজন করার যে সুনাম আছে গত ১৩ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত 'যুবক যুবতী' ফিচারটি তারই অঙ্গ। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করছি যে লেখিকা কেবলমাত্র শহরাঞ্চলের যুবক যুবতীদেরই মতামত প্রকাশ করছেন। গ্রামাঞ্চলের যুবক যুবতীরা কি যৌনশিক্ষা, ফিল্ম, প্রেম প্রভৃতি সম্বন্ধে সচেতন নন? না আমাদের দেশের বৃহত্তর অংশের ছেলে-মেয়েদের ঐ সমস্ত ব্যাপারের ভাবনা চিন্তার কোন মূল্য নেই? এবার থেকে গ্রামাঞ্চলের যুবক যুবতীরাও যাতে তাদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারে তার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।

গোপাল দে,
ধনিয়াখালী হুগলী।

(গ্রামাঞ্চলের যুবক যুবতীদের মতামত পেলে অবশ্যই তা প্রকাশিত হবে। আঃ সঃ)

রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবী : একটি জিজ্ঞাসা

শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা' গ্রন্থে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের যখন সাত (৭) বছর কাদম্বরী দেবীর তখন ন' (৯) বছর। সেই সময় কাদম্বরী দেবীর বিবাহ হয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী দেবীর থেকে দু' বছরের ছোট। শ্রীচৌধুরী লিখেছেন কাদম্বরী দেবী পঁচিশ (২৫) বছরে মারা যান অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের তখন তেইশ (২৩) বছর। উনি একথাও লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের বিয়ের দু বছর পর কাদম্বরী দেবী মারা যান। দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় নামী প্রবীণ প্রাবন্ধিক শ্রীপ্রমথনাথ লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ২৩।২৪ বছরে মৃণালিনী দেবীকে বিয়ে করেন, মৃণালিনী দেবীর তখন ১৩।১৪ বছর বয়স। মোটামুটি দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ যদি ২৩ বছরে বিয়ে করে থাকেন তাহলে তো অমিতাভবাবুর হিসাব মতোই কাদম্বরী দেবী ২৭ (সাতাশ) বছরে মারা যান, অথচ উনি লিখছেন ২৫ বছরে। এ বিষয়ে সঠিক জানার জন্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠি দিয়েছিলাম। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ব্যক্তিগত চিঠিতে ঐ প্রসঙ্গে যা লিখেছেন, তা হুবহু এখানে তুলে দিচ্ছি :

'রবীন্দ্রনাথের মৃণালিনী দেবীর সহিত বিবাহ হয় ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হয় ১৯শে এপ্রিল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং মৃত্যু ঘটে বিবাহের চার মাস পরে। বিবাহের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স বাইশ বছর সাত মাস। কাদম্বরী দেবীর তখন বয়স কত সঠিক বলা যায় না। তবে কিছু তথ্যের উপর নির্ভর করে খানিকটা অনুমান করা যায়। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ রচিত 'পুষ্পাঞ্জলি' নামে এক অপ্রকাশিত রচনায় উল্লেখ আছে বিবাহের পর তাঁর বৌঠাকুরাণী ১৭ বছর জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁর বিবাহ হয় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছয় বছর। রবীন্দ্র-নাথের এক কবিতায় তাঁকে বিবাহের পর প্রথম দেখার অভিজ্ঞতা এইভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে :

উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ গলায় পলার হারখানি।
চেয়েছি অবাক আমি
তার পানে।
বড় বড় কাজল নয়ানে
অসংকোচে ছিল চেয়ে
নব কৈশোরের মেয়ে।

নব কৈশোরের বয়স বারো ধরলে অযৌক্তিক হবে না। কাজেই বিবাহের সময় কাদম্বরী দেবীর বয়স সম্ভবত বারো ছিল এবং তাহলে তিনি রবীন্দ্রনাথের থেকে সম্ভবত ৫।৬ বছরের বড় ছিলেন।'

তিনজন জ্ঞানী লেখক—শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী শ্রীপ্রমথনাথ এবং শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় একই ঘটনা বা বিষয়ের তিন রকম বিবরণ দিচ্ছেন। এঁদের কে ঠিক, না—সকলেই বেঠিক? সঠিক বিস্তারিতভাবে জানার নিদারুণ ইচ্ছা। নিশ্চিত জানতে পারবো অধীর আগ্রহে এই প্রতীক্ষায় রইলাম।

প্রবীর ঘোষ
সম্পাদক—'বর্ণালী', [illegible]

ইমদাদুল হক মিলনের গল্প

মহাশয়, ইমদাদুল হক মিলনের 'জোয়ারের দিন' গল্পটা পড়লাম। এমন ভিন্ন স্বাদের গল্প ইদানীংকালে বড় একটা পড়েছি বলে মনে পড়ে না। বাংলা ছোট গল্প যে কত সার্থকভাবে এখনো লেখা যেতে পারে এই গল্পটিই তার প্রমাণ।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে লেখকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। জানি, উনি বাংলাদেশের নাগরিক। অমৃত পত্রিকায় ইতিপূর্বেও ওঁর দুটি একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের এই ধরনের কিছু কিছু তরুণ শক্তিমান লেখকের লেখা 'অমৃত' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হলে আমরা এখানকার লেখক এবং পাঠকরা বিশেষভাবে উপকৃত হই। নিঃসন্দেহে চিন্তার জগতে এই যোগাযোগের দায়িত্ব এখানকার পত্র-পত্রিকারাই নিতে পারে। এই হিসেবে 'অমৃত' পত্রিকাকে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। ইতি

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা-৩৩।

ভেবো নাকো প্রবঞ্চনা ॥

কার্তিক মিত্র

তোমার দু'ঠোঁটে সাধ, ডুবব চুম্বনে,—
হারাবে পৃথিবী
চন্দ্র কিংবা সূর্য ঠিক একই হবে মনে।
ভেঙে যাবে রাত কিংবা দিনের সীমানা,
ভুলে যাব, মৃত্যু বলে কিছু আছে.....
আমাদের শরীর বলেও কিছু নেই,
স্নায়ুতে জড়ান শুধু স্বচ্ছ সলিলস্রোতা
যোগাবেগ, দু'জনের বোধির ভেতর।

তোমার দু'ঠোঁটে, সাধ, ডুবব চুম্বনে

তবু কেন কটি দেশে লোভী হাত রেখে
আলিঙ্গন করার সময় মনে পড়ে,
বাজারে চালের দাম আজ কত বাড়ে।

তোমার দু'ঠোঁটি থেকে সরালেই আঁখি,
কোন্ প্রহসনে চাকরীতে পদোন্নতি!

ভেবোনাকো তপ্তকতা হৃদয় প্রাঙ্গণে,
প্রবঞ্চনা সংগোপনের এ আলিঙ্গনে।

মায়-সত্ত্বেও তো নিষ্পাপ শিশুর
হাত-পা হৃদয় বুদ্ধি সব একসাথে বাড়ে।

কেউ কেউ কবি ॥

কবিরুল ইসলাম

একটিও কবিতা না লিখে সে লেখা ছেড়ে দিলো
কেননা সে বুঝেছিলো
দুধের দাঁতের মতো
শব্দ কামড়া-কামড়ি করে কোনো লাভ নেই

জেনে ফেলে ছিলো
প্রশস্তি ও প্রতীক্ষার একজনকে
পারমিটধারী
অন্ধের যষ্টির চেয়ে বেশি নয়

আর সম্পূর্ণ অজ্ঞানে থেকে
অন্ধ ফলে স্বর্ণ মুখশ্রী
বৃষ্টির দাঁতের সম্মোহনও ভাঙা ভাঙা
যে রকম ভাঙা প্রাত্যহিক

আরও জেনে ছিলো
শব্দ বড় বিশ্বাসঘাতক
তার স্বয়ং শাস্ত্রে কোনো পরিবেশ নেই
বেশি নাড়াচাড়া হলে
কার্তিকেরা
ভোঁতা হয়ে যায়

তাই
একটিও কবিতা না লিখে সে লেখা ছেড়ে দিলো।।

আশ্চর্য মানুষ পথ চলে ॥

করুণা বসু

দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর ছায়া পিছে ফেলে
আশ্চর্য মানুষ পথ চলে।।
নিত্য বাস বুকের কিনারে তবু তার
দেখা মেলা ভার, জয়ন্তীর মাঘের কুয়াশা
অদৃশ্য প্রাচীর গড়ে। সন্ধানী চোখের ছুরি দিয়ে
স্তর ভেদ করে খোঁজা জলে বহুদূর চলে যাওয়া যায়
হঠাৎ রোদ্দুর ওঠে, দুয়ো দেয়
বলে যেখানকার যে থাক সেইখানে।।

আশ্চর্য মানুষ পথ চলে।

অফুরন্ত সম্পদে ফাটো ফাটো সত্তার ভোরঙ্গ,
তরাইয়ের অরণ্যে ইচ্ছে করে চাবি নিরুদ্দেশ—
বিন্দুমাত্র বিতরণে পৃথিবীর যত কান্না নয় কোনদিন,
পৌষের হিম আর চৈত্রের খড়কুটো গায়ে রেখে
যেন এক উদাসীন পথ পরিক্রমা।।

সময় হরিণী বড় ঘনঘন লাফ দেয়
দ্রুত ধুয়ে চকমকি জেবলে পুরাতন
আঁধার পোড়ায়, দ্রুত বদলায় পট
স্নেহ-উপহার সব চুরি করে নিয়ে
আমরা পলাতক। গভীর চোখের
নিচে প্রচ্ছন্ন মহিমা, আজো তুমি সেই
আশ্চর্য মানুষ এক—অনন্ত বিস্ময়।।

অলৌকিক জলযান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পালে বাতাস লেগেছে। ছোটবাবু শেষ-ব্যরের মতো দূরে থেকে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে হেঁকে উঠল গুডবাই ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস, গুডবাই। আর সে তখনই দেখতে পেল এলবা উড়ে আসছে সাঁ-সাঁ করে। সোজা বোটের মাথায় বসে গেল। সে ফের তখন চিৎকার করে বলছে, চাচা, আপনি আমার জন্য ভাববেন না। ঠিক আমরা পৌঁছে যাব। এলবা বোধহয় আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

ছোটবাবু দেখল বনি তখন দু হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে দিয়েছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ছোটবাবু ডাকল, বনি প্লিজ—কি হচ্ছে বনি! পালে বাতাস লেগেছে এলবা বোটের চারপাশে উড়ছে—এবং সে আকাশের ওপরে উঠে যাচ্ছে কখনও আবার নিচে নেমে এসে ঝুপ করে বসে পড়ছে বোটের মাথায়, বোট দুলে উঠছে—অসংখ্য সব মাছ ছোট ছোট, ঝাঁকে ঝাঁকে গোল-মাছের বাক্সার মতো কতসব বিচিত্র মাছ, এবং তার নিচে কোনো বড় মাছের ঝাঁক এই পাঁচ-সাত ফুট লম্বা এবং চারপাশে জলের নিচে এক ডিজনি-ল্যান্ডের মতো ব্যাপার। এত স্বচ্ছ যে একটু নিচে তাকালেই যেন সমুদ্রের অতল দেখা যায়, গুচ্ছ গুচ্ছ কখনও সবুজ স্যাওলা—আর হয়তো অতিকায় কোনো প্রাণী ভেসে উঠলে জলের নিচে তার কালো ছায়া প্রথম ভেসে আসছে—ছোটবাবু সমুদ্রের বিশালতায় কি এক আশ্চর্য রোমাঞ্চ বোধ করতে থাকল। মৃত্যু যতই অনিবার্যতার শামিল হোক—সে কেমন সাহস পেয়ে যাচ্ছে—জাহাজ যত চোখের ওপর থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, যত সে বনিকে নিয়ে অকূল সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে তত সে এক আশ্চর্য পৃথিবীর খবর পেতে প্রবল হয়ে উঠছে। সে হাল হুকের সঙ্গে বেঁধে ফেলল। বনির কান্না থামছে না। সে ওর পাশে হাঁটু মুড়ে বসল। নানাভাবে বুঝিয়ে সে কিছু করতে পারছে না। বনি বুঝতে পেরেছে সব। এবং বনির কান্না ছোটবাবু একদম সহ্য করতে পারে না। সে শেষে ওর মুখ তুলে বলল, এই, আমি বুঝি, তোমার কেউ না!

বনি যেন কতকাল পর, কতদিন পর এক সাম্রাজ্য জয়ের অধিকারে ছোটবাবুর বুকে মুখ লুকিয়ে ফেলল। আর কি নরম সাবলীলতা রয়েছে সেই বলিষ্ঠ বাহুতে। যত ছোটবাবু সেই সমুদ্রে পাটাতনের ওপর আকাশের নিচে বনিকে বুকে টেনে নিচ্ছে যত ওকে আদর করছে, তত বনি ওর শরীরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, তত লতাপাতার মতো সে শরীরে জড়িয়ে যাচ্ছে এবং মসৃণ স্বপ্নের বর্ণমালায় ছোটবাবু ক্রমশ ডুবে যাচ্ছিল। বনি কি যে করছে। বনি তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বুঝি কাঁদছে—অথবা যুবতী হবার

মুখে তার উল্টোকার অতি বাকি ফুলে ফুটে যাচ্ছে—সেই যাতনা ফুলের, ফলে কেটার যাতনা। বনির মনে আবার উচ্চের কুসুমে কুসুমে লও। পালে তেমনি বাতাস। সমুদ্রের জল কেটে বোট প্রায় উড়ে যাচ্ছে। আর ওদের মাথার ওপর এলবা থাকছে। হঠাৎ বনি ওপরে এলবাকে দেখে পা পাটিয়ে ফেলল এই এলবাটা দেখছে। এস ভিতরে এস। বনি ছোটবাবুকে নিয়ে ছই-এর ভেতরে ঢুকে গেল।

এভাবে এক অধীর প্রাণপ্রবাহ সামান্য এই বোটে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। নিশীথে যখন নক্ষত্রমালা বিরাজমান আকাশে এবং খোলাজলে ওরা বোটের নিচে শুয়ে নিজেদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছিল—পাখিটা তখন বোটের মাথায় পাখায় ঠোঁট গুঁজে রেখেছে। ওরা যখন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নায় সমুদ্রের অন্তহীন রহস্য খুঁজে বেড়াচ্ছে পাখিটা তখন বাতাসে ডাঙার গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে। ওরা যখন বোটের ভেতর রেশমের মতো নরম উলের বল নিয়ে খেলা করছে—আকাশের নক্ষত্রমালা তখন সব নিচে নেমে এসেছিল। চুরি করে দেখছে ওরা কি যে এক অতীব সুন্দর বল ছুঁড়ে দিচ্ছে কখনও মনে হয় সেই নরম উলের বল বাতাসে উড়ে গিয়ে আকাশের দুপাশে দুটো নক্ষত্র হয়ে যাবে। বনি বলেছিল ছোটবাবু, আমার পৃথিবীতে আর কিছু লাগে না।

ছোটবাবু বলেছিল আমারও না।

ছোটবাবু বলেছিল, বনি ক্রসটা সমুদ্রে ভাসিয়ে দিচ্ছি। বোট হাল্কা হলে তাড়াতাড়ি ডাঙায় পৌঁছাতে পারব।

বনি বলেছিল, দাও। ওটা আমাদের কোনো কাজে লাগবে না।

ছোটবাবু ক্রসটা নামিয়ে দেবার সময় কি ভেবে বলল, থাক। আছে যখন থাক। আগুন জ্বালানো যাবে।

বনি এবং ছোটবাবু এভাবে মৃত্যু এবং বিধাতাকে যখন অস্বীকার করে পৃথিবীতে ফিরতে চেয়েছিল—তখন স্যালি হিগিনস জাহাজে চুপচাপ শুয়ে আছেন। সারেঙ পাশে দাঁড়িয়ে বলছে, সাব খাবার খান।

হিগিনসের চোখেমুখে শুধু বনি, বনির সেই অবোধ মুখ। যত দিন যাচ্ছে কেবল সমুদ্রের ভেতর থেকে তার আর্ত কান্না শুনতে পাচ্ছেন—বাবা তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না কেন, বাবা! তুমি আমাকে বোটে নামিয়ে দিচ্ছ কেন।

হিগিনস বললেন, তুমি খেয়েছ!

সারেঙ-সাব বললেন খেয়েছি। আসলে কিছুই আর সারেঙসাব খাচ্ছেন না। আহার এবং পানীয় বলতে যা কিছু সব নিঃশেষ। এবং এই বোধহয় শেষ খাবার। সারেঙ চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি শীর্ণকায় এবং অতীব দুর্বল হয়ে পড়েছেন। স্যালি হিগিনস বিছানায় চুপচাপ শুয়ে আছেন। জাহাজটা মনে হচ্ছে নিশীথে ছুটে যাচ্ছে কোথাও। ক্রসটা আর দেখা যাচ্ছে না। সারেঙ-সাব টেবিলে শেষ জল এবং খাবার রেখে প্রায় হাঁটু মুড়ে নিচে বসে পড়লেন চোখে কিছুই আর দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি কিছুতেই বুঝতে দিচ্ছেন না তিনি ক্রমশ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলছেন। এবং বোধহয় বুঝতে পারছিলেন এই শেষবার এ-ঘরে আসা। তিনি অন্ধকারে বাইরে বের হয়ে ডেকের ওপর বসে দু-হাত বিধাতার কাছে প্রার্থনার মতো বিছিয়ে রাখলেন। মনে হচ্ছিল চারপাশে শুধু সীমাহীন অন্ধকার, এক অন্ধকার জগতে তিনি এখন বিরাজমান—এবং মাঝে দুটো একটা আয়াত তার মনে আসছিল—কেয়ামতের দিন তিনি কি জবাব দেবেন তাঁকে এ-সবই বার বার মনে আসছিল। এবং তখন জাহাজটাকে ভাবাই যায় না আর সাধারণ জাহাজ, কেমন নিশীথে সে বেশ ছুটে চলেছে। এই অন্ধকার আকাশ, নক্ষত্রমালা আর সমুদ্র অতিক্রম করে তার কোথাও যেন এক অলৌকিক যাত্রা শুরু হয়েছে। তিনি বুঝতে পারছিলেন, সমুদ্র প্রলয়ঙ্কর ঝড় নিয়ে ছুটে আসছে। তিনি স্থির এবং অবিচল। জলোচ্ছ্বাসে তিনি ভেসে যাবেন হয়তো, কোনো দুঃখ থাকছে না—তাঁর কাছে এখন এই জাহাজ, সমুদ্র জলোচ্ছ্বাস সব সমান। তাঁর কাছে এখন বিশ্বস্ত থাকার চেয়ে বড় কিছু নেই। তাঁর শেষ আহার ভোজ্যদ্রব্য যা কিছু তিনি স্যালি হিগিনসের টেবিলে রেখে এসেছেন। কেয়ামতের দিন বিধাতার কাছে এটাই একমাত্র জবাব—বিশ্বস্ততা। শুধু এই সম্বল নিয়ে তিনি ঈশ্বরের করুণা প্রত্যক্ষ করছেন এখন। এবং সেই জলোচ্ছ্বাসে নিঃশ্বাস ক্রমে বন্ধ হয়ে এলে কেমন নীল বিন্দু বিন্দু বেলুনের মতো উজ্জ্বল আলোর মালার ভেতরে তিনি যাত্রা করেছেন। তারপর তারা একে একে সবাই নিভে যেতে থাকল।

স্যালি হিগিনস ক্ষীণকণ্ঠে ডাকলেন, সারেঙ।

কোনো জবাব নেই। আবার ডাকলেন সারেঙ।

হিস হিস সমুদ্রের তরঙ্গমালার শব্দ। জাহাজটা এবার যেন আরও গতি পেয়ে গেছে। কোনো আলো নেই। আকাশে কোনো জ্যোৎস্না নেই। কোথায় কবে তিনি কোন জাহাজে উঠে এসেছিলেন মনে করতে পারছেন না—কেবল ঝড়ো বাতাসে জাহাজ দুলছে। আর বোধহয় সব তরঙ্গমালা জাহাজ

ডেক ভাসিয়ে নিচ্ছে। ঝড়ের ভেতর তিনি বের হয়ে ডাকলেন—সারেঙ তুমি কোথায়। তুমি খাবে না?

শুধু অন্ধকারে চারপাশে। নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার। আর আশ্চর্য তিনি আকাশের নক্ষত্রমালা দেখতে পাচ্ছেন না। আকাশে তবে এখন প্রলয়ঙ্কর কান্ড ঘটে যাচ্ছে। যত জোরে সম্ভব দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন হাত-পা কাঁপছে। শরীর মনে হচ্ছে শক্ত হয়ে গেছে। গলা কাঠ। শেষ জল এবং আহার সারেঙ রেখে চলে গেছে। সারেং বনির কেবিনে থাকত। সব ফাঁকা। কিছু নেই।

তারপর তিনি ফের শুয়ে পড়লেন এসে। তিনি বুঝতে পারছিলেন, জাহাজে এখন একা তিনি। জাহাজটা বোধহয় এই চেয়ে-ছিল। জাহাজটা যা চেয়েছে পেয়ে গেল। সে তার বিশ্বস্ত আরোহীকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তাঁর আর কোন দুঃখ থাকল না। তিনি জাহাজটার জন্য ভীষণ মায়া বোধ করলেন। জাহাজটা এখন নিশিদিন সমুদ্রে ভেসে বেড়াবে। তিনি এবং সে। সমুদ্রে তিনি এবং সে। এক অলৌকিক জলযানে তিনি সমুদ্রে ভেসে যেতে থাকলেন। এবং ক্রমে এভাবে দিন যায়। রাতে তিনি পোর্ট-হোলে আকাশে নক্ষত্র দেখতে পান, চাঁদের আলো এসে পড়ে—সমুদ্র নিথর নীরব, বর্ণহীন গন্ধহীন। তিনি সাদা বিছানায় সাদা পোশাকে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। শেষ খাবার আর জল টেবিলে। হাত তুলে খেতে পর্যন্ত পারছেন না।

হাত পা ক্রমে এ-ভাবে ঠান্ডা হয়ে আসছে। যেন অসাড় চোখ স্থির বায়ুমন্ডলে ভারি অক্সিজেনের অভাব। দু-হাতে তিনি সমস্ত বায়ুপ্রবাহ গিলে খেতে চাইছেন। পারছেন না। কঠিন যন্ত্রণায় চোখ ঠেলে বের হয়ে আসছে। পাশে এখন কত সব মিছিলের মতো ছায়া এসে জড় হচ্ছে। এবং বার বার সেইসব শৈশবের মুখ, বাবা মা ছোট্ট বোন, আর তারপর যৌবনে সেই প্রেমিকারা। কেউ কেউ ভারি অস্পষ্ট। তাদের তিনি চিনতে পারছেন না। কেবল তিনি দেখতে পেলেন এলিস পোর্ট-হলে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং দরজায় লুকেনার। আর আর কে আছেন, বনি ছোটবাবু তোমরা কোথায়—বনি বনি এবং বুঝতে পারছেন তিনি তাঁর অলৌকিক জলযানে এবার সত্যি আবার বের হয়ে পড়েছেন—কেউ তাঁর কথায় সাড়া দিচ্ছে না।

এত কষ্ট এত যাতনা এবং স্থবির শরীর থেকে যেন শেষ বায়ুপ্রবাহ বের হয়ে যাবার আগে, সমস্ত ভূমণ্ডল জুড়ে প্রকম্পন। সব কিছু লন্ডভন্ড হয়ে যাচ্ছে। উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে লাভা। শিলাস্তর ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে গ্রহ নক্ষত্রের। আহা ক্রমে সব আবার শিথিল স্থবির হয়ে আসছে—শান্তি পরম শান্তির বাণী তার কানে বাজছিল—কেউ যেন পাশে দাঁড়িয়ে ডাকছেন—তার হাতে সবুজ লন্ঠন, লন্ঠনের আলোয় সেই পরম করুণাময় আশ্চর্য সুধাপারাবারের খবর পৌঁছে দিচ্ছেন তার কাছে। তিনি বলছেন, ডোন্ট বি এফরেড—আই এ্যাম দ্য ফার্স্ট এ্যান্ড আই দ্য লাস্ট। আজানু তাঁর সোনালী আলখাল্লায় ঢাকা। মাথায় বড় বড় সোনালী চুল। বড় বড় সব লাল নীল হলুদ অথবা ক্রিমসন কালারের আলোময় সৌরজগতের ভেতর দিয়ে তিনি হেঁটে যাচ্ছেন। এবং বার বার সেই অমোঘ বাণী, সব গ্রহ নক্ষত্র থেকে যেন ভেসে আসছে। যত তিনি সেই অলৌকিক জলযানে ভেসে যাচ্ছেন সেই অমোঘ বাণী সব গ্রহনক্ষত্রের ভেতর গীর্জার ঘন্টার মতো গমগম করে বাজছিল—ডোন্ট বি এফ্রেড আই এ্যাম দ্য ফার্স্ট এ্যান্ড আই এ্যাম দ্য লাস্ট।

সিউল-ব্যাংক জাহাজ নীল আকাশের নিচে ঘুরে ঘুরে কখনও অন্ধকারে, অথবা সাদা জ্যোৎস্নায় অজানা সমুদ্রে এভাবে ভেসে যাচ্ছিল। তার প্রিয় ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস ভেতরে শুয়ে আছেন। সাদা চাদরে ওঁর শরীর ঢাকা। পোর্ট-হোলে তেমনি সূর্যের আলো, কখনও সমুদ্রের জল, কখনও সব নক্ষত্রমালার ছবি।

সমুদ্রে সিউল-ব্যাংক এখন একটা ভাসমান কফিনের মতো। নীল আকাশের নিচে নীল অন্ধকারে সাদা জাহাজটা এখন শুধু একজন ক্যাপ্টেনের কফিন। আর কিছু না। ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস যেন ভেতরে শুয়ে আছেন। ঘুমিয়ে আছেন। ভেসে যাচ্ছেন।

— শেষ —

চাঁদের যে এলাকাকে বলা হয় প্রশান্ত সাগর তার একটি গহ্বরের নাম দেওয়া হয়েছে ডঃ বিক্রম এ সারাভাই। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন সম্প্রতি একটি সভায় স্থির করেছেন চাঁদের গহ্বরগুলোর নতুন করে নাম দেওয়া হবে—মানুষের জ্ঞান ও সংস্কৃতি বাড়িয়ে তুলতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন এমন সব বিজ্ঞানী, লেখক শিল্পী ও সংগীতচর্চাকারীদের নামে। ভারতে মহাকাশ-গবেষণার সূচনা হয়েছিল প্রয়াত ডঃ বিক্রম সারাভাইর হাতে, অতএব যোগ্য ব্যক্তিই সম্মানিত হলেন। ছবিতে তীরচিহ্ন দিয়ে বিক্রম সারাভাই গহ্বরটি দেখানো হয়েছে।

Mare Tranquillitatis

Oceanus Procellarum

Fra Mauro

বিজ্ঞানের কথা

*পৃথিবীর আকার

*মানসিক নির্যাতন

পৃথিবীর আকার

বহুকাল ধরে ধারণা ছিল আমাদের এই পৃথিবীর আকার একটি গোলকের মতো। একেবারে নিটোল গোলক নয়, উত্তরমেরুতে ও দক্ষিণমেরুতে খানিকটা চাপা—অর্থাৎ কমলালেবুর মতো। তারপর ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে স্পুৎনিক ১ পৃথিবীর আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় ও মানুষের তৈরী প্রথম উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে পাক খেতে শুরু করে। তখন থেকেই কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথের বাঁকচুরের মাপজোক নিয়ে আমাদের এই গ্রহের আকার সম্পর্কে অনেক কিছু জানা সম্ভব হয়েছে। এখন ধারণা করা হচ্ছে, পৃথিবীর আকার [illegible] একটা নাসপাতির মতো। ব্রিটিশ সায়েন্স নিউজ 'স্পেকট্রাম'এ প্রকাশিত এডওয়ার্ড ফিলিপস-এর প্রবন্ধ অনুসরণে বিষয়টি সম্পর্কে কিছু আলোচনা তুলতে চাই।

পৃথিবীর আকার নির্ধারণ করার চেষ্টা প্রাচীনতম কাল থেকেই হয়ে আসছে। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গ্রীক বিজ্ঞানী পিথাগোরাস এ-বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এই ভাবনাচিন্তার শেষ হয়নি, বিজ্ঞানীরা এখনো এই পৃথিবীকে আরো ভালোভাবে জানার চেষ্টায় নিয়োজিত।

পৃথিবীর একটা ভালোমতন মাপ নিতে পারার কৃতিত্ব সাধারণত দেওয়া হয়ে থাকে গ্রীক গণিতজ্ঞ এরাস্টোথেনিসকে। খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে তিনি পৃথিবীর ব্যাস নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁর উপায়টা ছিল এই রকম : পরস্পর থেকে দূরে অবস্থিত মিশরের দুই স্থানে সূর্য দিগন্ত থেকে কত ডিগ্রী উঁচুতে উঠেছে তার মাপ নেওয়া এবং এই দুই মাপের ভিন্নতা থেকে অঙ্ক কষে পৃথিবীর ব্যাস নির্ধারণ করা। তারপর থেকে উনিশ-শো বছর এক্ষেত্রে বড়ো-রকমের কোনো অগ্রগতি হয়নি।

অতঃপর খৃষ্টাব্দ সতেরো শতক। এই সময়ে অদ্ভুত একটা আবিষ্কার ঘটে গেল : মাধ্যাকর্ষণের শক্তি ফরাসী গিনীতে ও প্যারিসে সমান মাপের নয়। মাধ্যাকর্ষণের খোদ আবিষ্কর্তা নিউটন এ-ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করলেন এই বলে যে গলিত অবস্থায় থাকার সময়ে পৃথিবী যখন লাটুর মতো পাক খাচ্ছিল তখন স্বাভাবিক নিয়মেই পৃথিবীর এই গোলকটি ওপরে-নিচে চাপা হয়ে গিয়েছে ও পেট-বরাবর স্ফীত। ফলে মাধ্যাকর্ষণের মাপ নির্ভর করছে ভূপৃষ্ঠের কোন্ অক্ষাংশে মাপ নেওয়া হচ্ছে তার ওপরে। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত এই যে আমাদের এই পৃথিবী নিখুঁত নিটোল গোলক নয়।

পৃথিবীর আকার সম্পর্কে এই জ্ঞান নিয়ে অতঃপর আরো তিনশো বছর কাটে। এই সময়ে বিশদভাবে জানার চেষ্টা হয় শুধু পৃথিবীর বিষুবীয় স্ফীতি সম্পর্কে। পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মতো--এই ধারণাই প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। তারপরে উনিশ-শো পঞ্চাশের দশকে এসে বিজ্ঞানীরা তাঁদের নানা মাপজোক থেকে বলতে পারলেন—পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বিষুব-রেখার কোনো বিন্দুর দূরত্ব যতোখানি তার চেয়ে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উত্তরমেরুর ও পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দক্ষিণমেরুর দূরত্ব প্রায় ২১-৪৭ কিলোমিটার কম।

অতঃপর ১৯৫৮ সাল, প্রথম স্পুৎনিক উৎক্ষিপ্ত হবার পরে কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষ-পথের মাপজোকের সাহায্যে পৃথিবীর আকার নির্ধারণের চেষ্টা। সাধারণত যা হয়ে থাকে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে জ্ঞান থেকে অগ্রসর হয়ে ধারণা করা হয় কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথের চেহারাটি কেমন দাঁড়াবে। কিন্তু হিসেবটি যদি উল্টোদিকে থেকে করা হয়? প্রথমে দেখা যাক কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথের চেহারাটি কেমন, তা থেকে হিসেব করা যাক পৃথিবীর আকারটি কেমন হওয়া উচিত। বিজ্ঞানীরা সাধারণত এই সমস্ত মাপজোক ও হিসেব করে থাকেন বিশেষ বিশেষ ক্যামেরায় তোলা আলোকচিত্রের সাহায্যে।

এক্ষেত্রে প্রথম সাফল্যলাভ সোভিয়েত কৃত্রিম উপগ্রহ দু-নম্বর স্পুৎনিকের কক্ষপথ বিশ্লেষণে। বিজ্ঞানীদের একটা ধারণা ছিল এই উপগ্রহের কক্ষপথের চেহারাটি কেমন দাঁড়াবে, কিন্তু বাস্তবে যা দাঁড়াল তা পূর্ব-ধারণা থেকে যথেষ্ট ভিন্ন। বিজ্ঞানীরা তখন হিসেব করতে বসলেন, কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথের চেহারাটি যদি এই হয় তাহলে পৃথিবীর আকারটি কী হওয়া উচিত। হিসেব করে বললেন, পৃথিবীর দুই মেরু চাপা হওয়ার যে মাত্রার কথা বলা হয়েছে তা বাড়িয়ে বলা। আসলে মেরু থেকে মেরু পর্যন্ত পৃথিবীর ব্যাসের মাপ তার বিষুবীয় ব্যাসের মাপের চেয়ে ৪২-৭৭

কিলোমিটার কম—৪৭·৯৪ কিলোমিটার (যা আগে বলা হত) নয়।

একই বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এমন কিছু বিশ্লেষণ পাওয়া গেল যা কিছুটা বিভ্রান্তিকর। এই বিশ্লেষণ আমেরিকান উপগ্রহ এক নম্বর ভ্যানগার্ডের কক্ষপথের বিশ্লেষণ থেকে। দেখা গেল, এই উপগ্রহের কক্ষপথের চেহারা এমন একটা কিছুর দ্বারা নাড়া খাচ্ছে যা পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মতো ধরে নিলে কিছুতেই ব্যাখ্যা করা চলে না। ধরে নিতে হয় যে বিষুবরেখা ভূ-গোলককে যে দুটি গোলার্ধে ভাগ করছে—উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণ গোলার্ধ—তা হুবহু অনুরূপ নয়। দুয়ের মধ্যে অমিল থেকে যাচ্ছে, যা অসামঞ্জস্য। এই অসামঞ্জস্য থাকার দরুনই উপগ্রহের কক্ষপথ পূর্বধারণাকৃত চেহারা থেকে সরে সরে যায়।

এই বিশ্লেষণ থেকে সিদ্ধান্ত করতে হল, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দক্ষিণমেরুর দূরত্ব পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উত্তরমেরুর দূরত্বের চেয়ে আরো প্রায় ৪০ মিটার কম। অর্থাৎ দক্ষিণমেরু উত্তরমেরুর চেয়ে কেন্দ্রের আর প্রায় ৪০ মিটার বেশি কাছে। এ থেকেই কথাটা দাঁড়ায়, পৃথিবীর দুই মেরু খানিকটা চাপা ঠিকই সেই সঙ্গে পৃথিবীর গোটা আকার খানিকটা নাসপাতির মতোও বটে।

পরবর্তী কালে দুজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী আরো সাতাশটি উপগ্রহ পর্যবেক্ষণের ফলাফল থেকে আরো সুনিশ্চিতভাবে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে হিসেব উপস্থিত করেছেন। তাঁদের মতে পৃথিবীর আকার নাসপাতির মতো—খানিকটা মাত্র নয়, বেশ কিছুটা। তাঁদের হিসেবে, দক্ষিণমেরুর চাপা হওয়ার মাত্রা আগে যা নির্ধারিত ছিল তার চেয়েও ২৫·৮ মিটার নিচে। আর উত্তর-মেরুতে স্পষ্টতই একটি "বোঁটা" উঠেছে, চাপা হওয়ার মাত্রার চেয়ে তা ১৮·৯ মিটার উঁচুতে। এ থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয়, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উত্তরমেরুর দূরত্বের চেয়ে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দক্ষিণমেরুর দূরত্ব আরো—৪০ মিটার নয়—৪৪·৭ মিটার কম।

এখানে একটি কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার। কৃত্রিম উপগ্রহের সমস্ত মাপ-জোকেই ধরে নেওয়া হয় গোটা ভূপৃষ্ঠই যেন সমুদ্র-সমতলে রয়েছে, সেখানে পৃথিবীর জমির অংশও জমির নিচের এমন একটি তল ধরা হচ্ছে যেটি সমুদ্রের সমতল। মেরুদেশের বেলাতেও একই কথা। তাহলে বলা চলে, সমুদ্রের এই সমতলটি পৃথিবীর উত্তরমেরুতে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যতোটা দূরে তা পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দক্ষিণমেরুর দূরত্বের চেয়ে আরো ৪৪-৭ মিটার অধিক।

পৃথিবীর বিষুবরেখার দুই দিকের দুই গোলার্ধ হুবহু অনুরূপ না হওয়া—এই যে অমিল—তা ধরা পড়ে উপগ্রহের কক্ষপথের অনুভূ-র (ভূপৃষ্ঠ থেকে সবচেয়ে কাছের বিন্দুর) অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে। অমিল যদি থাকে তাহলে কক্ষপথের অনুভু

যার ঠিক আগে আজও কী দাদা বৌদির ঠোঁট পানের লালে পদ্ম করে দিয়ে যায়? ঈশ্বর একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

দড়াম করে দরজার শব্দ হওয়ার পর ঈশ্বর বুঝতে পারল—দাদা বেরিয়ে গেছে। দাদা সেই ধম্ম রাতে কুঁজো হয়ে বাড়ি ফিরবে। চুপ করে খাবে। দু-হাঁটু বুকের কাছে ভাঁজ করে চুপ করে ঘুমিয়ে পড়বে। দাদা এরকম ছিল না। কি রকম ছিল ঘুমের ভিতরও স্বপ্ন দেখে না। কিছু দেখার নেই? ঈশ্বর দেখল দাদার শরীর ক্রমশ ছোট হতে হতে ভীড়ে মিশে গেল।

আরো মিনিট দশেক পর 'কী গো?' বলে বৌদি দরজায় হাত রেখে দাঁড়াল। ঈশ্বর চমকে উঠেছিল। তারপর বৌদির ঢোলহীন শরীরে কিশোরীর মত দাঁড়ানোর ভঙ্গী—আর চোখের দিকে তাকিয়ে ক-মুহূর্ত অন্যমনস্কভাবে থেকে ঈশ্বর হেসে বলল, 'বুঝলে সকাল হল? এমন সব সে বুঝলে' ঈশ্বর কী বলতে গিয়ে না মনে পড়ায় আবার বলল—'এক কাপ চা দেবে? দুধ দেবে দু-চামচ, চিনি দেবে দেড় চামচ, বুঝলে?' বলেই ঈশ্বর ভাবল কেন সে একথা বলতে গেল!

ঈশ্বর ভেবেছিল, বৌদি মোটেই রাগ করবে না। আশ্চর্য! করলও না। যাওয়ার সময় বলল, 'সাতা বাপু, তোমার কিসসু হবে না।'

বৌদি চলে যাওয়ার পর ঈশ্বর দেখল অনেকটা সকাল হয়ে গেছে। এখন রোদ নেই। আর একটু পরে আকাশের পেট থেকে রোদ শব্দ না করে বেরিয়ে আসবে। যারে রোদ জমে যাবে। ততক্ষণে এককাপ চা আর একটা সিগারেট শেষ করে ফেলতে পারবে। তারপর স্নান সেরে অফিসে যাবে। ঈশ্বর ভাবল আগে অফিসে না—কি—রাণুর কাছে যাবে? রাণুর কাছে বেশ ক-দিন যাওয়া হয়নি। যাবে যাবে করে—রাণুর দরজার প্রায় কাছে গিয়েও শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কিছুদিন আগে জগদীশ রাণুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। ঈশ্বরের মুখে কী ছিল কে জানে! রাণুর সম্পর্কে জানতে গিয়েও শেষ মোমেন্টে জানতে চায়নি। শুধু বলেছিল, 'কিছু দরকার হলে বলিস।' এই রহস্যহীন কথাটা প্রায় সবসময় ভাবছে ঈশ্বর। তা হল, রাণুর সম্পর্কে কৌতূহল শেষ মুহূর্তে কেন জগদীশের ফিকে হয়ে গেল! ব্যাপারটা আশ্চর্য নয়। জগদীশ কী ভেবেছিল—কিছু বলার অথবা শোনার নেই। জগদীশের এই অভাবনীয় নিস্পৃহতার কাছে ঈশ্বর কৃতজ্ঞ। একদিন রাণুর সঙ্গে জগদীশের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। জগদীশের স্বাস্থ্য ভালো।

বৌদির বহু পুরোন একটা অ্যালবাম আছে। সেই অ্যালবামটাই একমাত্র সম্বল। মাঝে মাঝে বৌদি সেটা খুলে বসে। ছেলেবেলায় স্বপন-মাখা ছবি দেখে। দেখতে দেখতে কখনও বা চোখ শ্রাবণ হয়ে যায়। আবার কখনওবা মেঘভাঙ্গা রোদের ঐশ্বর্য অন্ধকার চুলে মোড়া মুখে ভেসে ওঠে। তবে আশ্চর্য—বাড়িতে যখন কেউ থাকে না তখন বা পূর্ণ রাত্রিবেলা এ্যালবামের নানান ছবিভর্তি জগতে চলে যায়। কেউ দেখতে পায় না। তখন বৌদিকে কেউ চিনতে পারে না। বৌদি একদিন ঠাট্টা করে ঈশ্বরকে বলেছিল, 'আমি মরে গেলে অ্যালবামটা আমার বুকের উপর রেখে দিও, মনে থাকবে?' বেরোবার মুখে বৌদি জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আজ একটু সকাল সকাল ফিরো। আজ তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো'—বলে বৌদি সেই সকালের মত করে হাসল। সত্যি কী বৌদি এ-জীবনে কিছু দেখাতে পারবে! পারবে? বৌদির যদি একটা রুগ্ন সন্তানও হতো—তবে কী বৌদি এভাবে কাছে এসে দাঁড়াত! এভাবে হাসত! রোদের একটা কোয়া বৌদির চুলে প্রজাপতির মত এসে পড়েছে। নাকে ঘামের রেণু রুপোর মত জ্বলছে—বোধহয় প্রতিমার মুখ মনে পড়ে যায়। বৌদির পেটে বোধনহীন জীবন। ঈশ্বর কথা দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল।

বৃষ্টি-ধোয়া আকাশের কাঁচা রোদ আর নির্বিকল্প শান্ত ভীড়ের ভিতর দিয়ে ঈশ্বর হাঁটতে লাগল। চারপাশে বিচিত্র বিজ্ঞাপন সময়ের চালচিত্র ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ শেষ দৃশ্য কোথাও নেই। মনে হল—বহুদিন এমন রোদে, এমনভাবে হাঁটেনি। ঈশ্বরের মনে হল বৃষ্টি প্রকৃত সুসময় এনে দেয়। সে কথা ভেবেই ঈশ্বর একবার আকাশে মুখ তুলে তাকানো মাত্রই ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। শরীরের সমস্ত রক্তের স্রোত মুহূর্তের জন্য হিম হয়ে গেল। মনে হল—তার নাম ধরে পিছন থেকে কে যেন ডাকল 'এই যে ঈশ্বর'। ঈশ্বর সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে তাকাল। না কেউ পাশে নেই। সব দূরে। আশ্চর্য ব্যাপার। ঘুমের মধ্যে পিছন থেকে কেউ কী এভাবে ডাকে! স্মৃতিহীন জীবন। ঈশ্বর ভুল শুনেছে? না। সত্যি হোক বা নাই হোক এরকম মাঝে মাঝে মনে হয়—মনে হয় কে যেন অলক্ষ্যে ডাকে 'এই যে ঈশ্বর'। ঈশ্বর ভাবল তার মাথা এখনো ঠিক আছে তো! ঈশ্বর তার সেই ছেলেবেলা, গুরুপুকুরের পাড়, ছেলেবেলার জীবন—সেইসব স্বর্গীয় দৃশ্য মনে করার চেষ্টা করে। মনে পড়ে না। মাথার ভিতর হাসপাতাল ঢুকে যায়। মুক্তি নেই! হাঃ......

অফিসে ঢুকতে গিয়েই ঈশ্বর বেশ দূর থেকে দেখতে পেল—কিছু লোক অদ্ভুত অবস্থায় জট পাকিয়ে মনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দূর থেকে দেখলে মনে হবে একটা লোকই দাঁড়িয়ে আছে। যার অনেকগুলো মাথা, অনেকগুলো হাত, পা। ঈশ্বর আশ্চর্য হয়ে গেল—এমন দৃশ্য সে দেখেনি, এইখানে। ঈশ্বর কোন লোককে ডেকে কিছু বলতে সাহস পেল না। দু-পাশে চূর্ণ মুখের বিজ্ঞাপন ফেলে ঈশ্বর ঢুকে গেল। অফিসে ঢুকতেই একটা মেয়ে অফিসের বড়বাবুর শিকার হল। বেশ কিছুদিন ছুটিতে থেকে ক-দিন হল অফিসে জয়েন করেছে। ঈশ্বরকে দেখামাত্রই সতীলক্ষ্মীর মত হেসে ব্লাউজের ভিতর থেকে রুমালটা নিমেষে বার করে ঈশ্বরের নাকের কাছে উড়িয়ে 'সুপ্রভাত' বলে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

পাশে চর্যাপদবাবু ফাইলে ঘাড় গুঁজে কাজ করে যাচ্ছিলেন। হিসেবে ভুল হতেই জিরাফের মত গলা তুলে ফোকলা দাঁতে ফকফক করে বললেন—'জানেন না অ্যাঁ! আজ থেকে ওরা ছাঁটাই।' চর্যাপদবাবু এমন রাগ এবং গলায় কথাকটা ছুঁড়ে দিলেন যে—মনে হল ঈশ্বর ছাঁটাই-এর খবর না রেখে মহাপাতক করেছে। সহকর্মী হিসেবে অন্তত সামান্য সম্মান আশা করেছিল। অবশ্য সামান্য পরে চর্যাপদবাবু একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় চর্যাপদবাবু বললেন—'কিছু মনে করবেন না মশাই, বুড়ো হয়েছি তো, মাথার ঠিক ছিল না। জানেন, আমার ছেলেও আজ ছাঁটাই হয়ে গেল।' বলে চর্যাপদবাবু হাসলেন। আশ্চর্য! ঈশ্বর ভাবে—কেন চর্যাপদবাবু হাসলেন? হাসলেও চর্যাপদবাবু কী জানেন যে তিনি হাসলেন!

কিছুই করার নেই ভেবে—ঈশ্বর নিজের টেবিলে এসে বসল। মাথার উপর মরচে-ধরা তিরিশ বছরের ফ্যান ঘুরছে। টেবিলে একটা টেবিল-ল্যাম্প ক্ষীণভাবে জ্বলছে। ফাইলের ঝিমি মালভূমি—ধুলো ফাঁকে ফাঁকে কিকে ছায়ার জলা। হঠাৎ ঈশ্বর দেখল ফাইলের ফাঁকে একটা ঝকঝকে খাম। পোস্ট অফিসের স্ট্যাম্প আছে—অথচ গোটা ঠিকানাটা লেখা নেই। আশ্চর্য! শুধু খামের উপর তার নাম টাইপ করা—'শ্রী ঈশ্বর গুপ্ত'। ঈশ্বর খামের মুখ ছিঁড়ে ফেলল।

নাম	বয়স	সংখ্যা
আরতী দাস	২৩	৬
কাজলা বসু	৩২	৫
সাথী চৌধুরী	১৯	৩
মহুয়া বসু	৪০	৭
সেন	২৯	২
কস্তুরী রায়	৩০	২
অতসী হাজরা	৩৩	৫
মালতী	১৬	৪
আলো রায়	১৮	৯
ক্লান্ত	২২	৮
১০	—	৪৯

ঈশ্বর প্রচণ্ডভাবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল তার জীবনে সমস্ত কিছু হুবহু মিলে গেছে। তার জীবনের গোপন বিরামহীন বৃত্তান্ত আলেখ্য নিজে ছাড়া এত পৃথিবীর আর কোন দ্বিতীয় প্রাণী জানে না। ঈশ্বর কাঁপতে কাঁপতে ঘামাতে লাগল। কে জানল? কে? এই গোপন রিপোর্ট নিজের কাছে না এসে—অন্য কোন লোকের হাতে পড়তে পারত। তা হলে তো ঈশ্বর চিন্তাহীনভাবে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারত। যন্ত্রণায় ঈশ্বরের শরীরের সমস্ত রক্ত শুকিয়ে যেতে লাগল। হাড় ভেঙে যেতে লাগল। ঈশ্বরের সমস্ত শক্তি বোধ চিন্তা পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগল। ঈশ্বরের মনে হল সে বুঝি এই মুহূর্তে জন্মান্ধ হয়ে যাবে। ঈশ্বর সেই ক্ষীণ বোধে তার চারপাশের মানুষ-গুলোর মুখ দেখল—না কেউ তাকে দেখছে না। আপাতত এই মুহূর্তে নিশ্চিন্ত হলেও ঈশ্বর জানে এই বিষাক্ত রক্তাক্ত অন্ধকার থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তার নতুন খাট আসার সময় হয়ে এসেছে।

অফিস থেকে বেরিয়ে ঈশ্বর কোন দিকে যাবে বুঝতে পারল না। অথচ কত মানুষ কত নিশ্চিন্ত হয়ে সামনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। কল্পনা করা যায় না। বাইরে যত শব্দ, তার থেকে ভিতরে আরো অনেক বেশী হিম নিঃশব্দ নিয়ে পাশাপাশি অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে হেঁটে যাচ্ছে। যাচ্ছে! সবাই! ভাবা যায় না! আশ্চর্য ভাবাটাই ঈশ্বরের প্রায় অভ্যাসের মত এসে দাঁড়িয়েছে। রোগ! ঈশ্বর দেখল—কুমির মত গাদা ভীড়ের পাশ কাটিয়ে একটা একা লোক এগিয়ে আসছে। ছ-ফুটের মত লম্বা। হাড়ের মত অকল্পনীয় রোগা। গলার কণ্ঠা থেকে গোড়ালি অবধি বিবর্ণ একটা ঝুলন্ত কোট শরীরে সাইন-বোর্ডের মত ঝুলে আছে। সমস্ত মুখে এত অস্বাভাবিক দাড়ি যে—দূর থেকে হঠাৎ করে দেখলে মনে হবে, লোকটার মুখ নেই। কোন আদিম জন্তুর মুখ লোকটার গলার উপর অপারেশন করে লাগান। হাত দুটো কোটের পকেটে। লোকটা ঈশ্বরের একেবারে ঠিক একেবারে মুখের কাছে মুখ এনেই—প্রায় চিৎকার করে উঠল—'বল হরি হরি বল' এমন অকল্পনীয় কথা, আর লোকটার পাগলের মাথার দিকে তাকিয়ে—ঈশ্বরের এমন কান্না আর হাসি পেয়ে গেল যে সে নির্বোধ হয়ে গেল। লোকটা লজ্জিত হয়ে বিপন্ন ভঙ্গীতে ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে মুখোমুখি বলল—'আমাকে দেখে ঠিক বুঝতে পারছেন না-না? আমার বয়স কত হল? অবশ্য হ্যাঁ—আমিও ঠিক আমার বয়সের ব্যাপারটা ঠাওর করতে পারি না। হিসেব কষতে গেলেই সব গণ্ডোগোল হয়ে যায়। আমার কী মনে হয় জানেন, আমাদের সবার বয়স বলে যেমন একটা ব্যাপার আছে তেমনি জীবনের এক-একটা সময়ের সন্ধি-ক্ষণ আসে—আরো ভাল করে বলতে গেলে বলতে হয়' বলে, এক মিনিট আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার বলল—'হ্যাঁ ঠিক তাই আমাদের জীবনের সন্ধিক্ষণে এমন এমন একটা কথা থাকে বা শব্দ আসে, মনে হয় যে কথাটা আশ্রয় করে আমরা বাঁচতে চাই। মনে হয় সেই কথাটাই শেষ কথা। আর কোন কথা নেই। থাকতে পারে না। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম—মানুষের জীবনে 'বল হরি হরি বল' ছাড়া আর কোন কথা থাকতে পারে না। বলুন হ্যাঁ—ঠিক কিনা?' বলে লোকটা অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে তাকালেন। 'হ্যাঁ' এবং 'না' কোনটাই বলতে না পারায় ঈশ্বর ... সে ঝুঁকিয়ে তাকিয়ে থাকেন। ঈশ্বর ... বুঝতে পেরেছে, বিশ্বাস করে আমাদের ভাগ্য যেমন অবিশ্বাস্য সত্যি, তেমনি আমাদের কারও সাথে এমন কী নিজের আত্মার সাথেও মৃত্যুর শেষ মুহূর্তেও পরিচয় হয় না। পৃথিবীটা যদি গোল হয় আবার এইভাবে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে—কেমন। 'গুডবাই' ভালোবাসার মত ভঙ্গীতে মাথা নীচু করে বলে—আর এক মুহূর্ত দেরি না করে লোকটা চলে গেল। লোকটা কী জানে সে চলে গেল! পাগল!

হাঁটতে হাঁটতে ঈশ্বর শ্যামবাজারের 'স্বর্গ কেবিন'-এ এসে ঢুকল। বেশ ভিড়। ধূসর ধোঁয়াটে আলোয় প্রত্যেক টেবিলে সিগারেটের ফিল্টার এবং রমণীরা শরীর ঢেলে দিয়ে পুরুষদের সঙ্গে যৌন চিন্তার মত অলক্ষে গল্পের ফাঁদ পেতে বসেছে। টুংটাং শব্দ, নেশাগ্রস্ত গন্ধ আর বিচিত্র মৃদু কথার জোয়ার-ভাঁটার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। ঘুরছে। কোণের টেবিলে জগদীশ একটা মেয়ের সঙ্গে আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে মুখো-মুখি বসে গল্প করছিল। ঈশ্বরকে দেখা মাত্রই জগদীশ শিশুর মত 'ইয়া ঈশ্বর' বলে চেঁচিয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্যে সমগ্র 'স্বর্গ কেবিন'-এর চিত্র কেঁপে গেল। মেয়েটার পাশে একটা সিট আশ্চর্য অবস্থায় শূন্য পড়েছিল। সেখানে জগদীশ প্রায় জোর করে বসাল। মেয়েটাও গলা খুলে দিয়ে বলল—'বসুন না। কী হবে আর?' ঈশ্বর মেয়েটার কাপড়ের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বসল। ছেঁড়া ছেঁড়া কথা বলতে বলতে জগদীশ চা-এর কথা বলে—দেশলাই-এর কাঠি ধরানোর মত ফস করে 'এর নাম শিউলী। একেবারে ভোরবেলার আনকোরা এডিশন। ভালো করে চেয়ে দ্যাখ। সামনের মাসে একে বিয়ে করছি।' বলে জগদীশ পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছতে গিয়ে সিগারেট ধরিয়ে ফেলল।

বলা মাত্রই ঈশ্বর মেয়েটার মুখ দেখতে পাবে? না দেখা উচিত? আর তার থেকে বড় কথা—এমন একটা কথা শোনার জন্যে ঈশ্বর কী প্রস্তুত ছিল? জগদীশরা বড়-লোক। কলকাতার এক বড় কোম্পানীতে শেয়ার আছে। তিন-চারটে বাড়ি আছে। জগদীশ গদীর বিছানায় শোয়। রোজ দুধ ফল খায়। তার পক্ষে খেয়ালে কোন কিছু করা অসম্ভব নয়। ঈশ্বর জগদীশের মুখের দিকে তাকাল—জগদীশ তুই বিষ খেতে যাচ্ছিস। তুই কখনও দীপাকে ভুলতে পারবি না। একজনকে ভোলার জন্যে আরেক জনকে বিয়ে করা যায় না। তুই যদি বাঁচতে

চাস—এভাবে বিয়ে করিস না। দু-দিন খুব ঝলমলে থাকবি। তারপরে দেখবি গোল খেয়ে গেছিস।

জগদীশ আবার সিগারেট ধরিয়ে হেসে বলল—'কদিন তোর কথাই ভাবছিলাম। অতীন দেবেশ বিদ্যুৎ—এদের সঙ্গে আজকাল আর দেখা হয় না। মাইরি তুই কেমন আছিস—বলে জগদীশ তীক্ষ্ণভাবে ঈশ্বরের মুখ তদন্ত করতে লাগল। আবার হাসি চালিয়ে দিয়ে জগদীশ শিউলীর দিকে তাকিয়ে বলল—'এই তুমি ঈশ্বরের হাতে তোমার হাত দাও।' ঈশ্বর চমকে উঠল। শিউলী ঘাবড়ে গিয়ে বলল—'তুমি কী বলছ?' জগদীশ আগের স্বরে ফিরে এসে আবার বলল—'দাও না দাও।'

ঈশ্বর—'কী দেবে?'

শিউলী—'কী দেবো? তুমি কী বলছ?'

জগদীশ—'আমি বলছি দাও। তোমার হাত ঈশ্বরের হাতে দাও।'

ঈশ্বর—'তুই কি পাগল হলি। আমি কী নেবো? দু'দিন পর ও তোর বউ হবে। ওর হাতে কী আছে?'

জগদীশ দরাজ গলায় হেসে বলল—'আমি এমনি একটা জোক করলাম মাইরি। তুই একেবারে চুপসে গেছিস বলে।' তারপর যেটুকু সময় জগদীশ ছিল—সিগারেট উড়িয়ে আর হাসতে হাসতে দিব্যি সময় কাটিয়ে দিল। সেই সময়টুকু ঈশ্বর কিছুই বুঝতে পারল না। ঈশ্বরের মনে পড়ল গত বছর কালী পুজোর দিন জগদীশ সারারাত ধরে তার ঘরে মদ খেয়েছিল। শেষরাতে মেসে বমি করে যেমন চলতে টলতে চলে গিয়েছিল—ঠিক তেমনি ভাবে জগদীশ মেয়েটার কোমর জড়িয়ে টলতে টলতে শ্যামবাজারের ফুটপাথে নেমে গেল। এবং ওরা যাওয়ার পর ঈশ্বরের মনে পড়ল—মেয়েটাকে সে চেনে। কোথায় যেন দেখেছে—অথচ মনে পড়ল না।

ঈশ্বর আরো কিছুক্ষণ বসে থাকবে কিনা ভাবতে লাগল। বস্তুত ভেবেও তো কোন লাভ নেই। ঈশ্বর তো জন্মের পর থেকে ভেবে আর চুপচাপ থেকেই কাটিয়ে দিল দিচ্ছে। ঈশ্বর খোলা জানলা দিয়ে দেখল—নরনারীর ছলছলানি ভিড়ের স্রোত। ট্রাম বাস রিকসা পোস্টারময় ফুটপাথের অনর্গল ভ্রাম্যমাণ ছায়াছবি। দূরে নিয়ন আলো জ্বলছে নিভছে। এক ভিখারী ভিক্ষে চাইতে চাইতে যাচ্ছে। এমন ভিড়ে আর চিত্রের জটিলতায় অথবা চিত্রহীনতায় নিঃসঙ্গতায় বুকের ভিতর চিতার মত জ্বলে ওঠে।—এই যে জগদীশ আর মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আরো আশ্চর্য জগদীশ তাকে চিনতে পেরেছে। তাই যদি না হবে তা হলে কেন ঈশ্বর জগদীশের মত সহজ স্বাভাবিক হতে পারল না। আবার এইভাবে জগদীশের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে। আবার হঠাৎ হবে। এইভাবে হঠাৎ হতে হতে আর দেখা হবে না।

'কেমন আছো বাবা? হ্যাঁ, অন্ধকার—দেখে উঠো' বলে রাণুর মা ভাঙা কাঁসরের গলায় চেঁচিয়ে উঠল—'কে এসেছে, দ্যাখ-দ্যাখ।' অন্ধ ভিখারী হোক বা কুকুরই হোক—সামনে যাকে পাবে, কোন শব্দ হলেই বুড়ি একথা বলে চেঁচিয়ে উঠবে। বুড়ির চোখ নেই। দেখতে পায় না। চোখে ছানি পড়েছে।

ঈশ্বর একবার এদিক ওদিক ভাল করে তাকিয়ে রাণুর কথা জিজ্ঞেস করার আগেই রাণু কোথায় ছিল! ছুটে এসে থমকে—বুকের কাপড় সামলে বলল—'ও মা! আপনি? কি ভাগ্যি।' ততক্ষণে ঈশ্বর দেখে নিয়েছে দরজায় কোন পুরুষের চটি নেই। সুখী হয়ে ঈশ্বর পকেট থেকে রুমাল বার করে কবার মুখ মুছে নিল। রাণুর মা সেই কথা বলার পর আর কোন কথা না বলে ভাঙা কাঠের সিঁড়ির মুখে বসে থাকল। এঁদো গলিতে চোখ রেখে। 'এই সে এল।' ঈশ্বর একবার রাণুর মার হাড় বার করা পিঠ দেখে চটি খুলে ঘরে ঢুকে পড়ল।

'ওরে বাবা ওঠ। দ্যাখ বাবু এসেছে। ওঠ সোনা আমার।' বলে রাণু তার পাঁচ বছরের ছেলেকে জোর করে তুলে ঈশ্বরকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিল। ছেলেটার চোখে-মুখে ঘুমের আঠা লেগে আছে। ঈশ্বরকে দেখল কী দেখল না। ছেলেটা বিছানা থেকে নেমে এক ছুটে বেরিয়ে গেল। বসার কথা মনে পড়তেই ঈশ্বর বসে পড়ল। এবং বসার পর ঈশ্বর খুব সামান্য ভাবে টের পেল মাথায় ঘিলুর ভিতর আবছা ঘুম ক্রমশ জেগে উঠছে।

'ইস কতদিন পর এলেন। আপনার মাথায় এত চুল কেন? সন্ন্যাসী হলেন, নাকি বিয়ে করেছেন?' বলে রাণু হাসি দুলিয়ে ঠোঁটের কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর আচমকা কী মনে পড়ায় খোলা দরজা বন্ধ করে—'আজ থাকবেন তো?' বলে রাণু এমনভাবে তাকাল—যেন সদ্য বিয়ে করা বউ। ঈশ্বরের হাসি পেয়ে গেল। রাণু নিশ্চিন্ত হয়ে বাঁ-হাতে সিঁদুরের কৌটো আর ডান হাতে খাটের তল থেকে একটা ফাঁকা মদের বোতল নিয়ে মৌসুমী হাওয়ার মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাণুর মা রাণুর ছেলেকে কোলে নিয়ে বাইরে কনকনে শীতের ভিতর ভাঙা সিঁড়ির মুখে বসে আছে। এইভাবে বুড়ি এক যুগ ধরে বসে আছে। ঈশ্বর জানলার বস্তার পর্দা সরিয়ে দিতেই ভিজে বাতাস কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকে পড়ল। প্রাচীন যন্ত্রের কোন কাফনের মত গোটা শহরটা নীল অন্ধকারের তলায় পড়ে আছে। ভিজাবিলিটি নীল। দূরে—বহু দূরে গীর্জার চূড়ায় যীশুর মাথায় কাঁটায় রক্তহীন চাঁদ ঝুলে আছে। কুয়াশার মালভূমির ভিতর দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্যভাবে ঈশ্বর টের পেল বিপুল নীল ঘুমে সে ক্রমশ আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। এমন কি হাড়ের মধ্যে নিয়তির মত ঘুম ঢুকে যাচ্ছে। সেই ঘুমের ফাঁকে বিস্মৃতির মত মনে পড়ল ঈশ্বরের জন্মের আগে আত্মার প্রথম সবুজ স্বাধীনতা দিবস;—ধানের গন্ধের মত অঘ্রানের এক ঘুম—দুপুরে সে 'বনলতা সেনের' মত মুখ তুলে ঈশ্বরকে জন্মান্তরের গান শুনিয়ে ছিলো—'আমি ভেবে দেখেছি—তোমার কাছে না গিয়ে আমার উপায় নেই। তুমি আমার কাছে এসো। ইচ্ছে হলে আমার কাছে এসো।' ঈশ্বর ঘোলা চোখ খুলল—দেখল, রাণুর ভিজে দেয়ালে মা-কালীর ফটো—ফটোর কাছে ধূপ জ্বলছে—সমস্ত ঘরময় ভিজে কুয়াশা আর ধূপের ধোঁয়া—মাঝে মাঝে রাস্তার নিঃসঙ্গ শব্দ ভেসে আসছে—আবার চলে যাচ্ছে—আর...? ঈশ্বর একবার রোগা হাতের আঙ্গুল বুকে রাখল (এইভাবে আর কেউ কী রেখেছিলো) তার পর গলায়—আবার বুকে—কোন রকম শব্দ অনুভব নেই। নেই? সেই কথা ভাবতে গিয়ে শুকনো রক্তহীন ঠোঁটে ঈশ্বর অস্পষ্টভাবে মন্ত্রের মত উচ্চারণ করল—হাঃ ঈশ্বর।

অঙ্গনা

এখনও লেডিজ সীটের লড়াই

[illegible] বহুদিন বেশ খানকয় ট্রাম ধাওয়াবাজারে ট্রাম ডিপোতে আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে গেল। এ খবর কার কাছে কতটা মর্মান্তিক না জানিনা, প্রত্যহও আমরা জীবনধারণের সংগ্রামে যারা দশটা-পাঁচটা করি তাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে। কলকাতাবাসীদের কাছে রেশনের চাল, চিনি বাড়ন্তের মত এ বড় দুঃসংবাদ নয়? অবশ্য এ দুঃসংবাদ নিয়ে শোক করে কালোদিন কাটিয়ে দেবার অবকাশও নেই। বছর শেষে কমবেশি সকলেরই ক্যাজুয়েল লীভের ভাণ্ডার প্রায় ফাঁকা।

প্রায় ফাঁকা ভাণ্ডারকে আরও শূন্য না করার প্রয়াসে জনৈক অফিসযাত্রী খানিক পায় হেঁটে বাসে ট্রামের সঙ্গে বহু ধস্তাধস্তি সহ্য করে বাসের দরজা পেরিয়ে মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালেন। সেখানে সবাই বাঁদিক কিংবা ডানদিক অথবা সামনে বা পেছন ফিরে যে যেমন দাঁড়িয়ে আছেন গন্তব্যস্থল পর্যন্ত তাঁকে সেভাবেই দাঁড়িয়ে যেতে হবে সামান্য নড়চড়ের উপায় নেই। তাহলে কেউ কারো পায়ে মাড়িয়ে দিতে পারেন তাই নিয়ে ছোটখাটো কুরুক্ষেত্রও বেঁধে যেতে পারে কারণ ভাদ্রের গরমে কারো মেজাজই শীতল নয়। নিজের পকেট ভেবে অন্যের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। এ ঘটনা নিত্যদিনের। কিন্তু অংশগুলো পোড়া ট্রামের ভীড় সামলাতে হচ্ছে অন্য ট্রাম-বাসগুলিকে। পরবর্তী জনৈক ভদ্রলোক বাসের মাঝামাঝি এসে এক হাতে কোনরকমে হাতল অন্য হাতে চোখ রগড়াতে লাগলেন আর মাঝে মাঝে চোখ মেলে বহু কষ্টে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে দেখছেন। পাশের ভদ্রলোককে বললেন 'দেখুন ভীড় বাসে উঠতে গিয়ে আমি অন্ধ হয়ে গেলাম। চশমা ভেঙে গেছে।' শ্রোতা ভদ্রলোককেও কম ধকল সয়ে বাসে একটু জায়গা করতে হয় নি। অত ভীড়েও তিনি রসবোধ হারান নি। ঘাম মুছে হাসতে হাসতে বললেন 'আজ চশমা ভেঙেছে, কাল ভাঙবে বুকের পাঁজর।' সামনাসামনি জনাকয়েকের হাসির একটা মৃদু গুঞ্জন উঠলো।

মিনিট কয় বোধহয় একটা নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল বাসে। হঠাৎ খেয়াল করলাম আমার সামনের সীটে বসে এক ভদ্রলোক তাঁর পাশের ভদ্রলোককে বেশ উত্তেজিত-ভাবে বোঝাচ্ছেন 'দেখুন এত ভীড় অথচ লেডিস সীটগুলি কিন্তু একটাও মহিলা-শূন্য নেই। এত ভীড়েও যে মহিলারা কি করে বাসে ওঠেন ভাবলে অবাক লাগে।' আশ্চর্য যিনি উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন, তিনিই কিন্তু একটি দু' আসনের লেডিস সীটে জাঁকিয়ে বসেছেন। আমি অবশ্য বুঝতে পারলাম না শ্রোতা ভদ্রলোকও লেডিস সীট-এ বসে সে কথাটা বিস্মৃত হয়েছেন কিনা। তিনি কিন্তু নীরব, মনে হয় বিন্দুমাত্র আগ্রহ তাঁর সেই কথাতে নেই। তবুও তিনি শুনছেন।

বক্তা কিন্তু সমানেই বলে চলেছেন পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে লেডিস সীট বলে কোন কথার অস্তিত্ব নেই। সেখানে সুযোগ পেলে যে কোন সীটে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই বসতে পারেন। অথচ আমাদের দেশে মেয়েরা চাকরী-বাকরী সবক্ষেত্রে সমানাধিকার দাবী করবে আবার বাসে-ট্রামে উঠে ঠিকমতো নিজেদের সীটটা আদায় করে নেবে।

বুঝলাম ভদ্রলোক অতিশয় বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। অথচ বুঝলাম না, তিনি তো জানলার পাশে লেডিস সীটেই আরামে বসেছেন। ভবিষ্যতে অত ভীড় বাসে কোন মহিলা উঠে তাঁকে আসনচ্যুত করবেন সে সম্ভাবনা নেই। তবুও তাঁর অত বিরক্তি কেন?

তাঁর কথাবার্তা, আকার-আলোচনা থেকে এক সময় আমি তাঁর বিরক্তির কারণ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তিনি ক্রমাগত বলে চলেছেন 'কোন ভদ্রলোক যদি লেডিজ সীট-এ বসেন লেডিজ দেখলে তাঁকে উঠতেই হবে। তিনি উঠে হয়তো সে স্থান থেকে সরতে সরতে বেশ খানিকটা তফাতে চলে গেলেন। ভদ্রমহিলা হয়তো দুটো স্টপেজ পরেই নামলেন সেখানে তখন দখলদার হলেন অন্য আর একজন। দেখুন তো কি অন্যায় যিনি আসনের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমার একটু আশ্চর্য লাগলো লেডিজ সীট বলে আসনটা যদি শূন্য থাকতো তাহলে ক্ষোভের একটা কারণ হতো কিন্তু সেখানে যখন কেউ না কেউ বসে যাচ্ছেন তখন তিনি মহিলা আসনের জন্য অত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন!

মহিলা আসনের সপক্ষে-বিপক্ষে বহু আলোচনা ইতিমধ্যে অনেকেই করেছেন। তবুও ট্রামে-বাসে এমনকি ট্রেনে পর্যন্ত মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট [illegible]

মহিলাদের জন্য নির্দিষ্টভাবে পৃথক কিছু আসন রাখার একটা প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। ভীড় ট্রামে-বাসে মহিলা বা পুরুষ সকলেরই উঠতে যথেষ্ট কষ্ট হয় তবুও দৈহিক শক্তিতে পুরুষেরা মহিলাদের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী সে কারণে কষ্ট উভয়পক্ষের হলেও পুরুষদের নিশ্চয়ই কম। তদুপরি ট্রাম-বাসের দরজায় জমায়েত থাকেন পুরুষেরা—সে ভীড় ঠেলে উঠতে পুরুষের যত সুবিধে মেয়েদের তত অসুবিধে। তাছাড়া ট্রাম-বাসের স্বল্প-পরিসরে কিছু অসুস্থ লোক আছেন যাঁদের কাছাকাছি দাঁড়াতে বাধ্য হয়ে মেয়েরা অল্পসময়েও নাজেহাল হন। এর বিরুদ্ধে মহিলারা কোন প্রতিবাদ করলে অনেক সময়েই যাত্রীদের সমর্থনের পরিবর্তে টিকা-টিপ্পনী হজম করতে হয়।

মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষিত আছে বলেই তাঁরা বাসে-ট্রামে বসার সুযোগ পান নাহলে প্রয়োজনেও মহিলারা বসার এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতেন কারণ বাসে-ট্রামে পুরুষযাত্রীদের সংখ্যা মহিলাদের থেকে অধিকাংশ সময়ই বেশী থাকে। মহিলা আসনের সামনে মহিলারা যত স্বচ্ছন্দে ভীড় করে দাঁড়াতে পারেন তেমনি পুরুষদের সঙ্গে দাঁড়ানো সহজ নয়।

সামান্য ভীড়েও মহিলারা বাসে উঠলে পুরুষযাত্রীদের কারো কারো মুখে শোনা যায়, 'আবার জেনানা, কনডাক্টর ঘণ্টিটা মারো। ঠেলে বাস বেরিয়ে চলো। তিল ধারণের জায়গা নেই আবার লেডিজ।' কথাগুলো যিনি বলেন তিনি এটা সবসময় অন্তর থেকে বলেন কিনা জানিনা তবুও এর কথা শুনলে সে সময় যে কোন মহিলাযাত্রীরই ক্ষোভ হয়। মাঝে মাঝে তাঁরা উত্তরও দিয়ে দেন—'ভাবছেন কি আমরা অফিসটাইমে ভীড় ঠেলে বেড়াতে যাচ্ছি। আমাদেরও কাজ আছে, আমরা কাজেই যাচ্ছি। পুরুষবক্তা যদি ব্যাপারটার জের আরও বেশ টানতে চান তাহলে হয়তো বলবেন 'রাগছেন কেন, ভীড়ে উঠতে আপনাদেরই কষ্ট।' মহিলাযাত্রী বলবেন, আপনারা আমাদের কষ্টের কথা ভেবে কাতর হয়ে যাচ্ছেন।' ক্রমাগত কথায় কথা বাড়ে। তারপর অফিস-আদালতে গিয়ে পুরুষ ও মহিলাযাত্রী দুজনেই দুজনের অভদ্রতা ও বিতণ্ডার সংবাদ পরিবেশন করেন।

আমার মনে হয় যে পুরুষযাত্রী বাসে অন্য কারো জন্য বাসে কষ্ট করতে রাজী নন তাঁর সহনশীলতা নিশ্চয়ই কম এবং অন্যের প্রয়োজনের প্রতি তার বক্রমন্তব্য থাকবে কেন! আবার এমনও হতে পারে ট্রাম-বাসের ভীড় দেখে এটা তাঁর একটা বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিত্য যাঁরা ট্রামে-বাসে যাতায়াত করেন তাঁরা লক্ষ্য করলে দেখবেন নিত্যদিনের যাত্রীদের মধ্যে একজন ব্যক্তিই রোজ নানা মন্তব্য করেন যা ভীড়ের জন্য বেশী বিরক্তি প্রকাশ করেন।

অর্থনৈতিক কারণে অনেক অনিচ্ছুক মেয়েও কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাছাড়া মেয়েদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন না থাকলেও তারা আজ চাকরী-বাকরীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছেন। সুতরাং পুরুষদের সঙ্গেও তাদের ট্রামে-বাসে ভীড় ঠেলে উঠতে হবে। যাত্রীহিসেবে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের একটা স্বাভাবিক সহানুভূতি, হৃদ্যতা কাম্য। বিদেশ বিভুঁয়ে একজন যখন আর একজন নিজের দেশের মানুষের সাক্ষাৎ পান তখন তাদের মধ্যে একটা গভীর আন্তরিকতা গড়ে ওঠে।

মানুষের সহনশীলতা কমে যাবার কারণ অনেক আছে। দিনের পর দিন জীবন-ধারণের জন্য সংগ্রাম করতে করতে আমরা সকলেই প্রায় ক্লান্ত। এই ক্লান্তির মধ্যখানে আমরা সকলেই অল্পে উষ্ণ হয়ে উঠে বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাবটাকে হারিয়ে ফেলি। পুরুষ আর মহিলার আজ কোন দ্বন্দ্ব চলে না, সংসারজীবনে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে প্রতিটি কাজে এগিয়ে যাচ্ছে। অনুভূতি সকলেরই আছে। কারো হয়তো সেই অনুভূতিতে লেগেছে শুষ্কতা। জীবনের প্রতিকাজেই সামান্যে এসেছে বিরক্তি। তবুও অনেকে আছেন পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিই তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে যখন আমরা স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে একত্রে এগিয়ে চলেছি তখন লেডিজ সীটের মতো সামান্য ব্যাপার নিয়ে দিনের পর দিন উত্তেজিত আলোচনা করে সময় নষ্ট করার সময় আর নেই।

—অঞ্জলি চৌধুরী

রূপসীর খাতা

গ্রীষ্মের পরেই আসে বর্ষা। স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শ দিয়ে তাপদগ্ধ ধরিত্রীকে স্নিগ্ধ মধুর করে। আকাশে আর পৃথিবীর বুকে নীল ধূসর আর সবুজের রং মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। সেই রং পোশাকে ছায়া ফেলে। ম্লান সে ছায়া। তাই বর্ষার রং একটু জেল্লালো একটু চড়া না হলে প্রকৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করবে কি করে?

গাঢ় নীল, সবুজ আকাশ নীল, জংলা ছাপা ইত্যাদি রংগুলি সবচেয়ে মানানসই হবে। তবে শাড়ীর আয়ু রক্ষার্থে এমন শাড়ি যা সহজে ধোয়া যায় আর মাড় দরকার হয় না, যেমন নাইলন টেরিলিন ইত্যাদি শাড়ী পরাই ভালো। দামী টাঙ্গাইল, ঢাকাই বা এই জাতীয় শৌখিন সুতী শাড়ী না পরাই ভাল। তার প্রধান কারণ বৃষ্টির জলে ওসব শাড়ীর ক্ষতি হয়। তাছাড়া মাড়ের বিচ্ছিরী পচা গন্ধও হয়।

কিন্তু শীতকালই সাজের আসল সময়। এই ঋতু সবচেয়ে অল্প সময়ের জন্য থাকে, কিন্তু এই সময়টুকু সত্যই উপভোগ করার মতন। মনে যতো রং আছে, প্রকৃতিতে যতো সৌন্দর্য আছে সব নিয়ে সাজ-পোশাক করা যায়।

যাঁদের রংয়ের উপর ঝোঁক আছে তাঁরা আশ মিটিয়ে রং পরতে পারেন। এই সময় গাঢ় রঙ লাল, নীল, কালো ইত্যাদি পরা যায়। তবে হ্যাঁ, সময় ও চেহারা সম্বন্ধে একটু সচেতন হওয়া দরকার। ধরুন গায়ের কালো রঙ হলে সাধারণত ধারণা হয় যে গাঢ় রঙ লাল ইত্যাদি পরা চলে না। কিন্তু এ ধারণা নিতান্ত ভুল। দেখা গেছে আলো বা শ্যামলা মেয়েদের অঙ্গে কতকগুলি বিশেষ গাঢ় রঙ খুব বেশী মানায়। বিশেষ করে লাল কালচে লাল, কালচে নীল। কালো ও লালের মিশ্রণ ইত্যাদি রঙ কালো মহিলাদের রীতিমতন ভাল দেখায়। কিন্তু অনেকের ভুল ধারণা যে, কালোদের হাল্কা রঙ পরা উচিত। সেই কারণে খুব হাল্কা গোলাপী, হলুদ ইত্যাদি পরতে চান। কিন্তু দেখা গেছে কালো রঙের সঙ্গে এই সব রঙ মানায় না। অবশ্য এর মধ্যে আরো কতকগুলি বিষয়ে ভাবা উচিত। যেমন যিনি পরছেন তাঁর শরীরের গঠন ও চেহারা কেমন? খুব ফর্সাদের কিন্তু হাল্কা, ফিকে রঙ ভাল লাগে। ফর্সা শরীরে হাল্কা গোলাপী রঙ একটা অদ্ভুত সুন্দর আভা ছড়ায়। হাল্কা বাদামী রঙ যাদের গায়ের রঙ কালো তাঁদের ভাল চলে, কিন্তু চকোলেট অথবা বাদামীর গাঢ় রঙগুলি কালোদের একদম পরা উচিত না। হাল্কা সবুজ কমলা, আগুন রঙ, কালোদের গায়ের রঙকে উজ্জ্বল করে থাকে।

তবুও সকালের দিকে বা দুপুরের দিকে খুব বেশী গাঢ় রঙ না পরাই ভাল। শীতকালে গরম জামা পরা হয়। উলের জামা গরম চাদর ইত্যাদি গায়ে দেওয়া হয়। যদিও সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারে বেশী রকমের গরম পোশাক থাকে না তবুও যত-দূর সম্ভব পোশাকে ও রঙে সামঞ্জস্য রাখা ভাল। তাই দুই-একটা সাধারণ রঙ যেমন কালো, শাদা, কালচে নীল লাল ইত্যাদি রঙের গরম পোশাক রাখলে সেগুলি মোটা-মুটি অন্যান্য রঙের সঙ্গে মানিয়ে যায়। শীতকালে বড় বড় নকসার নানা রঙে ছাপা শাড়ী পরলে ভাল দেখায়।

> সকালের সংগীতগুণী পর্যায়ের রচনা আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

তবে শাড়ী ও ব্লাউজ সম্বন্ধে একটা বিষয়ে নজর রাখা কর্তব্য, তাহল শাড়ীর রঙের সঙ্গে সমতা রেখে ব্লাউজ পরা, কিম্বা শাড়ীর রঙের বিপরীত রং পরে একটা সৌন্দর্য রক্ষা করা যায়। যেমন শাড়ীর ভেতরের প্রধান রঙ নীল, হলুদ, লাল খয়েরী হলে সেই সঙ্গে ব্লাউজও সেই রঙের হওয়া ভালো। আবার শাড়ীর ভেতরের রঙের সঙ্গে সমতা না রেখে পাড়ের সঙ্গে মিলিয়ে অথবা বিপরীত রঙ পরা। যেমন ধরুন শাড়ীর রঙ কালো, পাড়ের রঙ লাল কিম্বা হলুদ, তাহলে কালো রঙের ব্লাউজ পরাই ভাল। তাহলে পাড়ের রঙ ফোটে বেশী ও উজ্জ্বল দেখায়। আবার ছাপা শাড়ী হলে খুঁজে নিতে হয় কোন রঙ তার মধ্যে সবচেয়ে কম অথবা ফিকে। সেই রঙের ব্লাউজ পরাই ভাল। ঠিক তেমনি করে ছাপা ব্লাউজ পরা যায়। যার সঙ্গে এক রঙে শাড়ী পরাই সবচেয়ে ভাল।

এক কথায় শাড়ীর রঙ যদি খুব উজ্জ্বল ও চড়া হয় তাহলে ব্লাউজ একটু নরম রঙের ও এক রঙের হওয়া উচিত। কারণ একটা কথা আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, সাজ এমন হওয়া উচিত যা অন্যের চোখকে পীড়া দেবে না। বেশী রঙ ও চড়া ভারী কাজ সব সময় পোশাকের সৌন্দর্য না বাড়িয়ে সৌন্দর্য হ্রাসও করে থাকে।

শীতকালে বিয়ে বাড়ী বা কোন নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে ভারী শাড়ী, যেমন বেনারসী কাতান, আসল ভারী মাদ্রাজী টেম্পল ইত্যাদি পরা যায়। কারণ শীতের ঠাণ্ডা ধূসর রাত্রের ম্লানতা এই সব গাঢ় পোশাকেই দূর করতে পারে।

পোশাকের সঙ্গে মানানসই করে রূপ-চর্চা করা উচিত ও গহনা পরা উচিত। সধারণত মহিলারা বিয়ে বাড়ী ইত্যাদি নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে প্রায় সব রকম গহনাই গায়ে চাপিয়ে একটা দোকানের শো-কেসের মতন উপস্থিত হন। তাতে কত গহনা আছে এ বিষয়ে প্রচার হয় ঠিকই, কিন্তু রুচির প্রশংসা হয় না। যদি সম্ভব হয় তাহলে গহনা সম্বন্ধে একটু সচেতন হওয়া ভাল। অনেকে ভারী ও দামী পোশাকের সঙ্গে ততধিক ভারী ও দামী গহনা সাধারণত পরে থাকেন কিন্তু তা ভাল দেখায় না। একটু হাল্কা পরলে বোধ হয় বেশী ভাল দেখায়। [illegible] একটা বিষয় লক্ষ্য রাখা ভাল। যেমন রূপোলী জরীর কাজ করা শাড়ীর সঙ্গে সোনার গহনা একেবারে বেমানান। মুক্তার গহনা কিম্বা রূপোর গহনা পরলে অনেক রুচিসম্মত দেখায়। তেমনি জরীর (সোনালি) কাজ করা ভারী শাড়ীর সঙ্গে সোনার গহনা পরাই সবচেয়ে ভাল। এছাড়া কতকগুলি রঙ আছে যেমন কালো, গাঢ় নীল, হলুদ, বেগুনী ইত্যাদি তার সঙ্গে সরু মুক্তার গহনা খুব বেশী মানায়। লালের সঙ্গে সাধারণত সোনার গহনাই ভাল লাগে।

এইভাবে প্রতিটি বিষয়ে সামান্য একটু যত্ন ও লক্ষ্য রাখলে সাজ অপূর্ব হয়। আমরা ভুলভাবে মনে করি যে এতে বুঝি বেশি অর্থের প্রয়োজন। ঠিক তা নয়। অর্থ থাকলে ভাল, তবে এর জন্য প্রয়োজন একটু বুদ্ধি আর সূক্ষ্ম দৃষ্টি। এইটুকু বিচার-বুদ্ধি থাকলেই যে-কোন মহিলা নিজেকে সুন্দর ও অপরূপ করতে পারেন। সুন্দর দেখানোর মধ্যে কোন দোষ নেই। এতে শুধুমাত্র নিজেদের মানসিক শান্তিই নয় না, চারিপাশে যাঁরা থাকেন তাঁদেরও ভাল লাগে।

—[illegible]

উপন্যাস

প্রভাত দেবসরকার

রাজার রাজা

[উপার্জনক্ষম ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করেন অবনীবাবু। আর সে পাত্রী হল বিকাশের অফিসেরই বড়বাবুর মেয়ে। এ সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বিকাশ।

একদিন অফিস থেকে ফিরে অবনীবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার বলেছেন হার্টের কমপ্লেন। বিকাশ চিন্তিত। অসুস্থ বাবাকে বিকাশ কথা দিল, অবাধ্য হব না। অবনীবাবু মারা গেলেন। বিকাশ নিজেকে অপরাধী ভাবল। সংসারের দায়িত্ব পড়ল বিকাশের ওপর। ছোট ভাই নন্তুর দায় নেই। এদিকে অফিস ইউনিয়ন স্ট্রাইক নোটিশ দিয়েছে। কমিটি মিটিং হবে...]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ওরা চলে যেতে নিজেকে বিকাশের ...িজন মনে হল। এই কদিন আগের কথা, ...পিসের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে ... উৎসাহই না সে বোধ করেছে মনে হতো ...ত যেন সব এক এক মন, এক মত ...কায়, কাউকে গ্রাহ্য করে না, ভয় করে —

...মন মনে বিকাশ বেশ ক্ষুব্ধ হয়। তার ...র্তমান মানসিক অবস্থার কথা সহকর্মী ...রা বুঝছে না। তার বাবা মারা গেছেন ...দ কেউ তাকে সমবেদনা জানাচ্ছে না সে ... কত অসহায় আর অশক্ত হয়ে পড়েছে ...ও ওরা বুঝবে না। কেবল নিজের কথা ...য়ই ব্যস্ত। আপিসের ব্যাপারে থেকে ...। কি লাভ? সে কেন ওদের সঙ্গে মিলে ...জর ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে? এখন যদি ...হু হয় কে তাকে দেখবে?

একলা-একলা বসে বিকাশের যেন ...া পেল। কেবল মনে হতে লাগল বড় ...হায়, অনাথ হয়ে গেছে সে। তার কেউ ...!

সে-দিক থেকে অনন্তবাবুকে [illegible] ...ত হয়। তিনি যতদূর সম্ভব বিকাশকে ...র্ম কম দিয়েছেন. কাছে ডেকে বাড়ীর ...ল জিজ্ঞেস করেছেন, দরকার হলে ...াতাড়ি বাড়ী চলে যেতেও বলেছেন. ...ট-ছাটার প্রয়োজন হলে জানাতে ...ছেন। কে জানে ভদ্রলোকের সম্বন্ধে ...শের ধারণা বদলাচ্ছে কিনা। কিছুদিন ... ভদ্রলোকের প্রতি যে ঔদ্ধত্য আর ...জন্য প্রকাশ করেছিল তার জন্যে ...ন মনে মনে ক্ষমা চেয়ে নেয়। এই আপিসের ইউনিয়নের ব্যাপার! পিতৃহীন হয়ে বিকাশের আজ কেবল ধারণা হয় এই ইউনিয়ন তার ব্যক্তিগত সুখদুঃখের ধার ধারে না, তাকে এতটুকু সহানুভূতি দেখালে না, তার ঘাড় ধরে কাজ করিয়ে নেবে নিজের সুবিধার জন্যে। কেবল দলগত ক্ষমতা লাভের ব্যাপার!

না, ইউনিয়নের মধ্যে সে আর থাকবে না। ওই দূর থেকে যা হয় করবে। আপিসের গোলমালের মধ্যেও যাবে না। দিবেন্দুকে বলবে, দেখ ভাই আমাকে তোমরা রেহাই দাও, আমি তোমাদের কমিটির মধ্যে নেই আমাকে নিয়ে টানাটানি করো না—ও পলিটিকস-মলিটিকস আমি বুঝি না, তোমরা যা পার কর! আমি অপারগ. অসহায় পিতৃহীন—

আজকাল 'পিতৃহীন' কথাটা বারবার বিকাশের মনে হয়. আর নিজেকে অসহায়ের একশেষ মনে করে। বাবা-না-থাকার অবস্থাটা কিছুতে যেন ভাবা যায় না। অথচ এই বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন একদিনও তাঁর অস্তিত্বের কথা মনে হয়নি। বুকটাও কোনদিন এমন হু-হু করে শূন্য মনে হয়নি। বিশেষ করে এখন মার দিকে চাওয়া যায় না; মাসখানেকের মধ্যে মা যেন প্রাণপিণ্ডের মত হয়ে গেছেন বেঁচে থাকতে তাঁর যেন এখন খুবই কষ্ট. একেবারে নীরব নিশ্চুপ. পাথর যেন। সংসার ঠিকই চলছে খাওয়া-পরা শোওয়া-বসা আগের নিয়মেই হচ্ছে, তবু যেন কি নেই, কোথায় একটা রিক্ততা, ভিত্তিভূমির মধ্যেই মস্ত বড় একটা ফাঁক বোধ করা যায়। উঠতে বসতে এখন বিকাশের বাবার অপার স্নেহের কথা তাঁদের দু-ভায়ের জন্যে অহরহ তাঁর উদ্বেগের কথা, সংসারের জন্যে তাঁর উদয়-অস্ত পরিশ্রম এবং স্বার্থত্যাগের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে হয়। বেঁচে থেকে বাবা তাঁদের জন্যে যা করেছেন তার যেন তুলনা সংসারে নেই। আরো মনে হয়, জীবিতকালে এই স্বার্থত্যাগী স্নেহশীল ব্যক্তিটির যোগ্য সমাদর তারা করেনি। আজ বাবার জন্যে তাই আকুল হয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে বিকাশের, পিতৃহীন হয়ে সব যেন কেমন বিস্বাদ লাগে। কিছুতে আর জোর পাওয়া যায় না।

সেদিক থেকে নন্তু বেশ আছে, বাবা ছিল কি নেই তার কিছু যায় আসেনি। বরং আরো যেন তার সুবিধে হয়েছে। কখনো সখনো বাড়ী আসে, একদিন দুদিন থেকে আবার কোথায় চলে যায়। কিছুদিন কোন পাত্তা থাকে না। জিজ্ঞেস করলে কোন জবাবই দেয় না। মায়ের জন্যে বিকাশ ভাইকে কিছু বলতে পারে না। তবে বেশ ভয়ে ভয়ে থাকে কখন কি করে বসে তার ঠিক কি!

...আপিসের ছুটি হয়ে যেতে অনন্ত-বাবু বিকাশকে বললেন, তুমি একটু অপেক্ষা কর, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বিকাশ ভাবলে কথা আর কি এবার হয়তো বিয়ের কথা পাড়বেন। অবনীবাবু কথা দিয়েছিলেন, সেইসব কথা তুলবেন!

বিকাশ বেশ বিরক্ত হল। আজকাল ছুটির পর আর এক মিনিটও সে আপিসে থাকে না। সোজা বাড়ী চলে যায়। এখন মাকে সব সময় আগলান তার কাজ হয়েছে। মার শরীরও ভাল নয়, কখন কি হয় বলা যায় না।

বিকাশ জিজ্ঞেস করলে, কত দেরী হবে? আমার কাজ আছে—

না বেশি নয়—এই যে—বলে অনন্ত-বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এলেন, কাগজপত্র গুছিয়ে ড্রয়ারে চাবি লাগিয়ে আলমারীর ডালা টেনে দেখে বললেন, এই যে—এস এবার।

বড়বাবুর এতটা আজ্ঞাবহ বা বিনীত হতে বিকাশের কেমন যেন লাগল, উনি [illegible] ওঁর দরকার বলে

কেন সে আপিসের পর অপেক্ষা করবে, কেন শুনবে ওঁদের কথা। বিকাশ গুম হয়ে খানিক নিজের সিটে বসে রইল যেন বলতে চায় দরকার থাকে আপনিই আসবেন এগিয়ে। এ আপিসের ডিসপোজাল নয় যে--

ছুটির পর আপিস ফাঁকা হয়ে গেছে আশপাশে কোন সিটে কেউ নেই, কেমন অদ্ভুত একটা নিস্তব্ধতা ঘরটার মধ্যে বিরাজ করছে, যেন গত সাতঘণ্টার সমস্ত কলতান ফাইলপত্র, র‍্যাক-আলমারীর মধ্যে বেঁধে-ছেঁদে মূক করে রাখা হয়েছে! কাফন খুলে মৃতদেহ পুনরুত্থানের মত আবার কাল সেইসব শব্দ, ঐ র‍্যাক-আলমারী ফাইল থেকে বেরিয়ে পড়বে! আপিস গম্-গম্ করবে। অনন্তবাবু মাঝে মাঝে বিরক্তির সঙ্গে হুঙ্কার দেবেন আঃ আস্তে। সাইলেন্স। এটা আপিস না কি?

সরকারী আপিস নয় যেন মাছের বাজার কি রেলওয়ে প্ল্যাটফরম!

কিন্তু কে কার কথা শোনে, যত না আপিস সংক্রান্ত ততোধিক ব্যক্তিগত সমীক্ষা রাজ্য পরিচালন রাজা-উজীর মারা ইত্যাদি নিয়ে!

যেন মৃতের ভূমি মাড়িয়ে অনন্তবাবু বিকাশের পাশে এসে বসলেন ধীর স্থির কণ্ঠে বললেন, দেখ তোমার ভালর জন্যে বলছি আপিসে যা চলছে তা মোটেই ভাল নয়—ফল খুব খারাপ।

বিকাশ চুপ করে রইল এই কি ওঁর দরকারী জরুরী কথা তার সঙ্গে? নতুনত্ব কি আছে। ফল ভাল কি মন্দ ওঁর মাথা ঘামাবার দরকার কি? বিকাশ কি এতই ছেলেমানুষ যে কিছুই বোঝে না! মনে মনে বেশ রাগ হয় অনন্তবাবুর কথা শুনে।

অনন্তবাবু বললেন, শুনছি বড় সাহেব খুব ড্রাসটিক স্টেপ নেবেন হেড আপিসে চিঠি গেছে তোমাকে তাই বলছি—ওদের সঙ্গে তুমি আর মিশো না!

বিরক্তিটা যেন বিকাশের শিরগুলি চড়ে উঠলো। ইচ্ছে করল ভদ্রলোকের মুখের ওপর যা তা বলে।

অনন্তবাবু ছোট ছেলেকে বোঝানোর মত বললেন, তোমার এখন এসব করা উচিত নয়! সংসারের দায়িত্ব এখন তোমার ঘাড়ে—মা, ভাই—মাথার ওপর কেউ নেই বলতে গেলে।

উপদেশ নয় যেন বিদ্রূপ, বিকাশের গা জ্বালা করতে লাগল। ইচ্ছে করলো বলে কেন আপনি আছেন

অনন্তবাবু যেন একটা অনুতপ্ত যুবককে বোঝাচ্ছেন, মনে করেছেন তাঁর কথায় কাজ হয়েছে। উৎসাহ সহকারে

লতে লাগলেন, বড় সাহেব ভীষণ রেগে াছেন, ইউনিয়নের কাজকর্ম লক্ষ্য করছেন ামাদের মধ্যেই কত চর আছে—সব কথা ায়ে তাঁর কানে তুলছে। লোকটা একদিকে ্যাল, অবাঙালী হলে কি হবে বাঙালীদের ওপর খুব শ্রদ্ধা ভালবাসা আছে। দত্ত-াহেব বলছিলেন—

বলতে বলতে অনন্তবাবুর মনে হল ্ভাবে কথাগুলো বলে বিষয়টার গুরুত্ব বং তার অশুভ ফল সম্বন্ধে বিকাশকে চেতন করবেন ভেবেছিলেন তা যেন ঠিক চ্ছে না। হঠাৎ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অনন্ত-াবু বললেন, অবনীবাবুকে কথা দিয়ে-ছলুম—আমি যদ্দিন আছি তদ্দিন াপনার ছেলের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে ারেন! সেই জন্যে তোমাকে বলছি ওইসব াকের সঙ্গ ছাড় আমি সব ঠিক করে দেব -দত্তসাহেবকে বলেছি তোমার নামটা ন—

হঠাৎ ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে বিকাশ ালে, কেন আপনি বলতে গেলেন কে াপনাকে বলতে বলেছিল? কি ভেবেছেন াপনি?

বিকাশের কথা বলার ধরন আর অগ্নি-র্তি দেখে অনন্তবাবু অবাক হয়ে লেন। কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

বিকাশ তেমনি উত্তেজিত স্বরে বললে, পনাকে একদিন বলেছি, আবার বলছি, দ নিজের মান রাখতে চান তা হলে ামাদের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। াপনি যতই আত্মীয় সাজতে চেষ্টা করুন মরা জানি আপনি কি! বিকাশ আর ালে না।

মুখের ওপর চড় খাওয়ার মত অনন্ত-াবু স্তব্ধ হয়ে খানিক বসে রইলেন। জকালকার ছেলেগুলো কি বুঝতে রেন না। নিজের ভালটাও বোঝে না, তাকাঙ্ক্ষীদের চেনে না, আশ্চর্য!

মরুক গে! অনন্তবাবু গুটি গুটি াপিসের সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় নেমে লেন। বিকাশের ওপর তাঁর ঠিক রাগ ছে না ভাবছেন ছেলেটার মাথা এভাবে াপ হলো কি করে! তেজ থাকা ভাল, তু এ তো তেজ নয়—পাখা গজান, ায় পালক! সরকারী আপিসে স্ট্রাইক বে! দেখাই যাক বাবুদের মুরোদ, কাল ন—

না, তিনি আর বাঁচাতে পারবেন না। নীবাবু বেঁচে থাকলে না হয় আর বার চেষ্টা করে দেখতেন।

...আজো রাস্তায় মিছিল আপিস-াটার হঠাৎ নর্দমার মুখ বুজে যাওয়ার অবস্থা। এতটুকু ফাঁক নেই, ঝাণ্ডা ত চীৎকার আর শ্লোগান দিতে দিতে লে আসছে সাঁড়াশী আক্রমণের মত।

বিকাশ রাস্তা পেরবার জন্যে ফুটের ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অনন্ত-র কথাগুলো মনের মধ্যে ফুটতে ে। এক সময় নিজের মনে সে হাসলে, লোকটা তাকে ভাবে কি, এখনো জামাই করবার মতলব আছে নাকি?

বিকাশ অস্ফুটে বললে, শালা!

হঠাৎ বিকাশের চোখ দুটো উৎসুখ আর উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। সামনের মিছিলে মালবিকা না? হ্যাঁ মালবিকাই তো।

নতুন বেশে নতুন পরিবেশে, ফেস্টুন হাতে আজ নতুন দেখাচ্ছে মালবিকাকে। এতদিন যেভাবে এবং যেখানে দেখেছে তার সঙ্গে একেবারে মিল নেই। 'প্রহরণধারিণী'—

কাছে বলেও মালবিকার মুখের কথা কিছু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু মুখ-চোখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর কিছু সে বলছে, যার অনুরণন ইঁটপাথরের গায়ে লেগে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে: কেবল আমাদের দাবী নয়, আরো অনেক অনেক লোকের দাবী—শুধু বিপ্লব নয় আরো ভয়ঙ্কর কিছুরই!

মালবিকাকে কোনদিন এ মূর্তিতে দেখবে বিকাশ কল্পনা করেনি। আজকের দিনের সাধারণ মেয়ের চেয়ে কিছু স্বতন্ত্র করে তাকে ভাবলেও কোনদিন এমন সংগ্রামী বলে ভাবেনি। মাঠে-ঘাটে আজকাল অনেক মেয়েকে দেখা যায়, তাদের চালচলনে বোঝা যায় চেনা যায় যৎসামান্য অর্থে তাদের দেহ কেনা যায়, আসঙ্গ লাভ হয়। মালবিকা তাদের দলে নয় ভিন্ন—অভাব-গ্রস্তা হলেও আত্মমর্যাদাসম্পন্না। স্বাবলম্বিনী হবার চেষ্টা তার মধ্যে প্রবল। কিন্তু—এই রাজনীতির আবর্তে পড়ে একেবারে উদ্ধতফণা ভুজঙ্গিনী মূর্তি!

বিকাশ ঘাড়টা তুলে ভিড়ের মধ্যে থেকে জয়দ্রথের মত মুখ বাড়িয়ে দিলে। মালবিকার সঙ্গে চোখাচোখি হল। মালবিকা বোধ হয় হাসলে।

নির্দিষ্ট স্থানে বিকাশ এসে অপেক্ষা করলে। মিছিল শেষ হয়ে রাজভবনের অবরোধ তুলে নিলে পর ট্রাম বাস আবার চলতে লাগল। বিদ্যুৎবাহিত ট্রামের তারে নীলমণিরা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মনুমেণ্টের মাথার ওপর তারাটা পশ্চিম আকাশে অনেকটা নিচে নেমে এল।

বিকাশ বললে, আজ তোমাকে নতুন দেখলুম!

মালবিকা বললে, নতুন আবার কি?

কৌতুক কণ্ঠে বিকাশ বললে মিছিল করছিলে।

তাই বুঝি হাঁ করে দেখছিলে? মেয়েদের মিছিল দেখতে খুব ভাল লাগে, না?

সব মেয়েদের নয়? যারা গাঁ থেকে ছেলে-কোলে করে কি, পোঁটলাপুঁটলী নিয়ে আসে তাদের নয়?

বুর্জোয়া মেনটালিটী!

মালবিকার মুখে কথাটা আজ নতুন শুনলে বিকাশ কেমন যেন অবাক হয়ে মালবিকার মুখের দিকে চাইলে। মালবিকা হাসছে ঠিকই, কিন্তু সে-হাসিটা যেন

বিদ্রূপের মত। মানে বুর্জোয়া কথা বোঝ না কেমন সংগ্রামী তুমি?

বিকাশ ভেবেছিল অফিসের কথা মালবিকাকে বলবে কিন্তু কি ভেবে চেপে গেল। দরকার নেই। বরং জিজ্ঞেস করবে আজ মালবিকার মিছিলে যোগ দেওয়ার মানে কি, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উদ্দেশ্য কি।

গম্ভীর হয়ে বিকাশ বললে, বুর্জোয়া কেন? কি দেখলে?

গরীব বেচারাদের দেখতে পারেন না! সেজেগুজে না বেরলে মনে ধরে না! মালবিকা যেন কৌতুক করলে।

অধিকতর গাম্ভীর্য নিয়ে বিকাশ জিজ্ঞেস করলে, বুর্জোয়া কাকে বলে জানেন? কথাটার মানে কি?

হেসে মালবিকা বললে মানে আমি কি বড়লোক গরীব লোকদের যারা ঘেন্না করে।

আমাকে কি খুব বড়লোক বলে মনে হয়? গাড়ী বাড়ি চাকর-বাকর—

মালবিকা উত্তর দিলে না স্মিত মুখে বিকাশের আপাত গাম্ভীর্য অনুসন্ধান করতে লাগল।

বিকাশ বললে, বড়লোক হলেই বুর্জোয়া হয় না। বুর্জোয়ার সংজ্ঞা অত সহজ নয়। গরীবদের শুধু দেখতে না পারা কি, পছন্দ না-করা বুর্জোয়াদের কাজ নয়। কথাটা আজকাল যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন ব্যবহার হচ্ছে।

মালবিকা হেসে উঠলো, বাবারে বাবা আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি! আর কোনদিন বলবো না!

বিকাশ তবু বলতে লাগল, বুর্জোয়া হচ্ছে তারা যারা সংসারের বা আশপাশের সব ব্যাপারে উদাসীন নিজের নিয়েই মত্ত! আমাকে দেখে কি তাই মনে হয়?

বললুম তো, আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি! আপনি বুর্জোয়া নন, আপনি প্রলেটারিয়েট! এবার হলো তো? মালবিকা হেসে চীনাবাদামের ঠোঙাটা এগিয়ে দিলে, নিন খান আমিই সব খেয়ে ফেললুম!

মনের মধ্যে বিকাশের কেমন খটকা লাগল। এই কমাসে মালবিকাকে দেখে, আলাপ করে তার সম্বন্ধে যা ভেবেছিল তা ঠিক নয়। খুব সাধারণ মেয়ে ও নয়।

হঠাৎ বিকাশ জিজ্ঞেস করলে, আপনি কি পলিটিক্স করেন? মানে কোন পার্টি-টার্টিতে—?

মালবিকা এবার একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বললে কেন বলুন তো, আমাকে দেখে কি পার্টির মেয়ে বলে মনে হয়?

এতদিন মনে হয় নি, আজ মনে হচ্ছে। তারপর মিছিলে যেভাবে যাচ্ছিলেন—

মালবিকা তেমনি গম্ভীর হয়ে বললে ও। কিন্তু মিছিলে থাকলে যে কোন পার্টির লোক হতে হবে তার কি কোন নিয়ম আছে? এই যে রোজ হাজার হাজার লোক মিছিল করছে তারা কি সব পার্টির লোক? তা হলে তো পার্টির বরাত ফিরে যেত, সব দুঃখ ঘুচে যেত!

বিকাশ বললে, তা হলেও একটা মতে বিশ্বাস না করলে মানুষ কি করে এতখানি কষ্ট স্বীকার করতে পারে, রোদ-জল-বৃষ্টি?

হেসে মালবিকা বললে হুজুক!

বিকাশ আর প্রশ্ন করলে না। চুপ করে গেল। বলতে পারলে না আজ তা হলে তুমিও হুজুকে মেতেছ? তার মনে হল মালবিকা তার রাজনীতিক কোন বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করতে চায় না।

চীনাবাদামের ভাঙ্গা খোলাগুলো এক-দিকে জড় করতে করতে মালবিকা নিজের মনে বললে আপনি বিশ্বাস করলেন না তো—এ সব হুজুক? আমার বয়সে কত হাজার মিছিল দেখলুম, কিন্তু কি হলো? সে-ই যারা শাসন করবার তারাই শাসন করছে, গরীব যারা তারা গরীব আছে—সাধারণ লোকের কি ভাল হয়েছে বলুন? রেশনের চাল বাড়ে নি, জমির ধান বাড়ে নি, বেকারের চাকরি মেলে নি—ঐ নামে মিছিল প্রতিবাদ—

মালবিকা কথাগুলো কেমন কৌতুক করে বললে। কথাগুলো সে সিরিয়াসলি বলছে না ব্যঙ্গ করছে রাজনীতিক দলের সঙ্গে নিজের যোগাযোগকে ঢাকতে।

কিন্তু মিছিলের আর এক নাম শোভা যাত্রা, জলুস! শহর জীবনের সঙ্গে বেশ মানিয়ে যায়! যেমন গাড়ি-ঘোড়া!

কে জানে এই বলে মালবিকা নিজের রাজনীতিক বিশ্বাসকে আচ্ছন্ন করতে চায় কিনা বিকাশকে বোকা বানাতে চায় হয়তো।

বিকাশ গম্ভীর হয়ে বললে, নামে যদি, তা হলে রোজ এত মেয়ে-পুরুষ কি সুখে দল বেঁধে রাস্তায় নেমে পড়ে? তোমারই বা দরকার কি?

মুখ টিপে মালবিকা বিকাশের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বিকাশ বলতে লাগল, শাসন যারা করছে তাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। আমরা বিশ-বাইশ বছর স্বাধীন হয়েছি তুমি কি মনে কর এই বিশ-বাইশ বছর আমাদের অবস্থা এক আছে? এসব প্রতিবাদের কোন দাম নেই?

মালবিকা সে-কথা বলে নি। তাদের সবার অবস্থা ভাল কি মন্দ বোঝবার যথেষ্ট তার বয়েস হয়েছে। দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন তারা খুবই ছোট ছিল কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে দেশের যে অবস্থা হলো তা তো হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে। মা বাবা একে একে গেছেন এখন তাদের পালা, দাদার একটা চাকরি ছিল তাও কবে ঘুচে গেছে—আর সে তো পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

দু হাতে মালবিকা মুখ ঢাকলে, উত্তর দিলেই যেন ধরা পড়ে যাবে। সে কি বিশ্বাস করে আর কি বিশ্বাস করে না এই উন্মুক্ত মাঠের মাঝখানে যুবক বন্ধুর সান্নিধ্যে জানিয়ে লাভ কি? তার কেমন সঙ্কোচ বোধ হল, বিকাশের সঙ্গে এক মত হয়ে বলে, দাম নিশ্চয়ই আছে, তা না হলে তারা রাস্তায় নামে কেন—ডাক দিয়ে শাসন-কর্তাদের বলে কেন, দেখ, আমাদের দেখ, তোমরা আমাদের কি অব[illegible] করেছ! চলবে না, আর চলবে না!

মালবিকার ভাব [illegible] বিকাশ অবাক হয়ে যায়। এ আবার [illegible]? সে অন্যায় কিছু কি বলেছে, যার জন্য মালবিকা অমন করে মুখ ঢেকে আছে?

বিকাশ ব[illegible]লে, এসব কথা তোমার হয়তো ভাল লাগছে না! কিন্তু আমি বলছি এ সত্যি—শতকরা নিরানব্বুইজন লোকের ওই কথা—ওদের দিন শেষ হয়ে এসেছে—মরণ পণ করে আঘাত হানতে হবে!

হঠাৎ মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে মালবিকা বিকাশের মুখের দিকে পরম আগ্রহে চাইলে। ঔৎসুক্যে চোখ দুটো স্নিগ্ধ দীপ শিখার মত জ্বলতে লাগল। সে-চাহনি মাঠের উপর সান্ধ্য আকাশের প্রথম তারাটির মত উজ্জ্বল।

বিকাশ হাত বাড়িয়ে মালবিকার চিবুক স্পর্শ করে বললে তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর না মালবিকা?

মুখ নামিয়ে মালবিকা বললে, বিশ্বাস করি, শুধু কথা নয় তোমাকেও বিকাশ, কিন্তু আমরা যে—

কথাটা সে সম্পূর্ণ করতে পারলে না, বিকাশের কাঁধে মাথা রাখল। তারপর কতক্ষণ পরে মাঠ থেকে উঠে যেতে যেতে মালবিকা বললে, তোমার যদি চাকরি [illegible] বিকাশ?

FORTIFIES YOU FOR THE DAY
RELAXES YOU FOR THE NIGHT

ASP/JIL-V-5/74-Ben

ভিভা

অনেক স্বাস্থ্যবান পরিবারই যে ভিভার ওপর ভরসা রাখেন–তার কারণ কি।

অনেক বেশী পুষ্টিকর :
একমাত্র ভিভাতেই আছে ননীযুক্ত খাঁটি দুধ আর বার্লিমল্টের পুরো পুষ্টিগুণ। আর এছাড়াও আছে অনেক বেশী পুষ্টিগুণে ভরা হুইট মল্ট। এ হোল-প্রাকৃতিক যে-সব উপকরণের অন্যতম—যা থেকে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়—প্রোটিন, ভিটামিন, কার্বোহাইড্রেট আর খনিজ পদার্থ।

অনেক সহজে হজম হয় :
কারণ এতে আছে হুইট মল্ট। এ হোল সবচেয়ে সহজে হজম হয় এরকম আকারে—গমের পুষ্টিসাধক উপাদান। এর সঙ্গে দুধ, বার্লিমল্ট, প্রাকৃতিক দুধ-শর্করা আর খনিজ-পদার্থ মিশিয়ে—এমন এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় ভিভা তৈরী করা হয় যা'র ফলে এটি সহজে হজম হয়, শরীর চটপট আরাম ক'রে নেয় আর ক্লান্ত শরীরের কাজেও লাগে।

মেশানো সহজ :
বিশেষ প্রণালীতে তৈরী হয় ব'লে আর ভ্যাকুয়াম-ড্রাইং-এর দরুন ভিভা অনেক সহজে গ'লে যায়। ঘেঁটে ক'রে নেবার দরকার হয় না। জলে বা দুধে ভিভা খুব সহজে মিশে যায় ব'লে খাওয়ার জন্য কয়েক সেকেণ্ডেই তৈরী ক'রে নেওয়া যায়।

স্বাদও অনেক ভাল :
ভিভার দুটি প্রধান উপকরণ মল্ট আর দুধ একত্রে এটিকে অপূর্ব্ব এক স্বাদে ভরিয়ে তুলেছে। এর নিজস্ব বিশেষ স্বাদ পরিবারের সবাই পছন্দ করেন।

আধুনিক প্রয়োগ বিজ্ঞান :
ভিভা অত্যন্ত আধুনিক খাদ্য-প্রয়োগ বিজ্ঞান অনুযায়ী তৈরী এক চমৎকার খাদ্য পানীয়। এর গুণমানের দিকেও সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।

ভারতে তৈরী করছেন:
জগজিৎ ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

ভিভা-ই খান
ভিভা
মূল্য যোগায় অনেক বেশী

খেলার জগতে মেয়ে

অফস্পিন বোলার বনশ্রী দাস

সব সময় সোজা ব্যাটে খেললে কোনরকম বিপদের আশঙ্কা থাকে না।' বেশ দার্শনিক ভঙ্গীতে বনশ্রী দাস তার সুচিন্তিত অভিমত দিল। বাংলার মেয়েদের ক্রিকেট দলের একমাত্র খাঁটি অফস্পিন বোলার বনশ্রী দাস ক্রিকেট খেলায় যোগ দেবার জন্য অনেকদিন থেকেই তৈরী হচ্ছিল।

—পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বেশ সিরিয়াসলি প্র্যাকটিশ করতুম। উপায় কি বলুন, এতদিন তো মেয়েদের ক্রিকেট খেলা শেখবার বা অনুশীলন করবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। অনকাদি'রা যখন মেয়েদের ক্রিকেট দল গড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন তাঁদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।

বনশ্রীর দাদা মেরিন ইঞ্জিনীয়ার। ওর আর ভাইবোন নেই। বাবা স্বর্গত। সেন্ট অ্যান্ড্রুজ থেকে বি-এস-সি পাশ করে বসে আছে। পাড়ায় ক্রিকেট খেলা ছাড়াও বড় বড় ক্রিকেট খেলোয়াড়ের জীবনী ও তাদের রচনা পড়াই বনশ্রীর প্রধান ঝোঁক। নিজের ইচ্ছে আরও বড় বড় খেলায় যোগ দেবার।

—বড় বড় আসরে খেলার সুযোগ না পেলে নিজের খেলার কুশলতা বাড়বে কি করে? যত বেশী খেলতে পাব, অভিজ্ঞতাও ততই বাড়বে। শুধু ক্রিকেটই নয়, নানারকম খেলার ওপরই বনশ্রীর ঝোঁক আছে। কিন্তু অভাব সুযোগের।

—আমাদের দেশে মেয়েদের নানারকম খেলায় যোগদানের ঢালাও সুযোগ সুবিধা কবে হবে বলতে পারেন? এখনো তো বহু জায়গায় লোকে আমাদের খেলাকে 'তামাসা' বলে মনে করে। অথচ দেখুন বেশীমাত্রায় খেলাধুলোর সুযোগ না থাকার জন্যই আন্তর্জাতিক আসরে কোন খেলাতেই আমরা স্বদেশের মান রাখতে পারছি না। এবার ইংলন্ডে আমাদের দেশের দল কি শোচনীয় ফলাফলই না করলো? হ্যাঁ আমি ওয়াদেকারের ক্রিকেট দলের কথাই বলছি। আমাদের রনজি ট্রফির হিরো সব ব্যাটসম্যানেরা একে একে গেল আর বলে খোঁচা মেরে বিপক্ষ ফিল্ডারদের হাতে ক্যাচ জমা দিয়ে ফিরে এল!'—বনশ্রী বলে চলে,—রেডিওতে

একজনের আউট হওয়ার বর্ণনা শুনে
ই দুঃখ হচ্ছিল। মাত্র ৪২ রানে ইনিংস
? ব্যাপারটা সত্যি বলে মেনে নিতে
ছিলাম না। পরদিন তাই আবার কাগজ
ভাল করে দেখলাম।'

—এতো গেল ভারতীয় দলের কথা,
তোমার নিজের খেলার কথা কিছু
তো।

—ব্যাট করার চেয়ে বোলিংয়ের দিকেই
আগ্রহ বেশী। তবে, আসল কথা
না নিশ্চয়। অলকাদি'দের উদ্যোগে
আমাদের অনুশীলনের ব্যবস্থা হল,
নেটে এসে বল করতে লাগলাম।
বাদল চন্দ আর সুনীল দাস
প্রথম আমায় জানালেন যে আমার
স্বাভাবিক অফ স্পিন আছে। ঠিকমত
নিশানা রাখতে পারলে আমার বলে
কাজ হবে।

—বল করার সময় প্রতিপক্ষ ব্যাটস-
কে (নাকি ব্যাটস উওম্যান?) দেখে
কি মনে হয়?

—প্রথমে তার দিকে কয়েকটা বল ফেলে
চেষ্টা করি ওর ব্যাট জোরে চলে
বা এগিয়ে এসে মারবার ঝোঁক আছে
। সেই বুঝে তার সামনে কখনও জোরে
আস্তে বল ফেলতে থাকি। এবং একটা
একটু উঁচু ফ্লাইটেও দিই। আমার মনে
ব্যাটসম্যানকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে
। তাহলেই সে ভুল ব্যাট চালিয়ে হয়
না হয় বোল্ড আউট হবে। বারানসীতে
খণ্ড দলের বিরুদ্ধে এইভাবে আমি
ওভারেই তিন তিনজনকে বিদায় করি।
দের দলের একটা খুব সুবিধে কি
? আমাদের মধ্যে কয়েকজন বেশ ভাল
র আছে। চট করে কেউ ক্যাচ
না। তাইতো দলের রান কম হলেও
কদেরও কম রানে আউট করতে
।

বোম্বাই বা কর্নাটকের বিরুদ্ধে
বিশেষ বল করতে হয়নি। কারণ
চক্রবর্তীর বাঁ হাতের স্পিন বলেই
হয়েছে। ছোট্ট মেয়ে শর্মিলার বোলিং
র খুব প্রশংসা করে বনশ্রী।

দিকে আগ্রহ বেশী থাকলেও
ব্যাটিংকেই বিশেষ গুরুত্ব দেয়।
তোমার আর কি ভাল লাগে?
গান গাওয়া আর গীটার বাজানো।
বাড়ীতে এখন ঐ দুটির চর্চা করছি।

তিক মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে
আমাদের মেয়েরা খেলাধুলায় প্রতি
সিরিয়াস। সাক্ষাৎকার শেষে ফিরে
সময় তাই তারই কথার পুনরাবৃত্তি
এলুম—সব সময় সোজা ব্যাটেই
তাহলেই সাফল্য সুনিশ্চিত।

ন্যাটা স্পিনবোলার শর্মিলা চক্রবর্তী

—টালীগঞ্জে পাড়ার ছেলেদের দলে
ক্রিকেট তো খেলতুমই, ফুটবল খেলতেও
নামতুম। বললে ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে শর্মিলা
চক্রবর্তী। বাবা জীবনগোপাল চক্রবর্তী
মেয়ের খেলায় ঝোঁক দেখে তাকে কোন ভাল
মেয়ে ক্রিকেট দলে ভর্তি করে দেবার কথা
চিন্তা করতেন। —কিন্তু বাড়ীতে সবচেয়ে
বেশী বকুনি খেতুম ঠাকুমার কাছে। উনি
ছেলেদের সঙ্গে আমার খেলা কিছুতেই
বরদাস্ত করতেন না।

বাংলার মহিলা ক্রিকেট দলের কুশলী
ন্যাটা স্পিনবোলার শর্মিলা তার ক্রিকেট
খেলা আরম্ভের কথা [illegible]
মাঠে। [illegible]
—ফুলপ্যান্ট [illegible]

এসেছে বাংলাদলের অনুশীলন নেটে প্র্যাক-টিশ করতে।

—তুমি বাঁ হাতে এ রকম স্পিন বোলিং শিখলে কি করে?

—আমার এক জ্ঞাতি দাদা অতুল দেব বর্মণের কাছ থেকে। তিনিই পাড়ায় ছেলে-দের সংগে খেলায় আমায় বাঁহাতে বল করতে দেখে কি করে বল ঘোরাতে হয় তা শিখিয়ে দেন। আমার ঐ দাদা পোর্ট কমিশনার দলে খেলেন।

শর্মিলা বর্তমানে টালীগঞ্জের নৃপেন্দ্রনাথ গার্লস হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। বাংলাদলের কেয়া রায় নবম শ্রেণীর ছাত্রী। সেদিক থেকে দলের কনিষ্ঠা খেলোয়াড় হবার কৃতিত্ব শর্মিলার। বারানসীতে সর্ব ভারতীয় আসরে খেলার সুযোগ পেয়ে শর্মিলা খুব খুশী।

—জানেন, আমি বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে অল্পের জন্য হ্যাটট্রিক না পেলেও ফাইনালে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে কিন্তু হ্যাটট্রিক উইকেট পেয়েছি। আর প্রায় সব ম্যাচেই প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের বোল্ড আউটও করেছি। তাছাড়া আমাদের দলের ফিল্ডিং খুব ভাল হওয়ায় আমার বলে ক্যাচ আউটের সংখ্যাও কম নয়।

প্রসংগতঃ সে বলল, ছেলেরা আমাদের খেলাকে আমাদের বোলিংকে বড্ড তাচ্ছিল্য করে। কিন্তু অনুশীলন করতে পেলে আমরা পারবো না কেন?

ওর কথা শুনে বিশেষ করে রাউন্ড-হ্যান্ড বোলিংয়ের সূচনার ইতিহাস মনে পড়লো। গত শতাব্দীতেই ইংলণ্ডে এ ঘটনা ঘটেছিল। একটি মেয়ের বোলিং থেকেই ক্রিকেটে বোলিংএর পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক পরিবর্তন এসেছে। সে কাহিনী হয়ত এখন অনেকের কাছেই বিস্মৃত। তখন ক্রিকেটে আন্ডারহ্যান্ড বোলিং চলতো। জন উইলিস নামে এক ক্রিকেট খেলোয়াড় তাঁর বাড়ীর সংলগ্ন প্রাঙ্গণে ভাইবোনদের নিয়ে ক্রিকেট খেলতেন। ভিকটোরীয় যুগের বড় ফোলানো গাউন পরে জনের বোন কুমারী উইলিসের আন্ডারহ্যান্ড বল করতে অসুবিধা হত। তাই সে হাত ঘুরিয়ে কাঁধের ওপর থেকে বোলিং করতো। জন দেখলেন এই ধরনে বোলিং করলে ব্যাটসম্যানদের সহজেই খুব বেকায়দায় ফেলা যায়। তাই তিনিও নিজের ক্লাব ম্যাচে ঐ পদ্ধতিতে বল করে উইকেট দখল করতে থাকেন। কিন্তু প্রতিপক্ষের তীব্র প্রতিবাদ আর নিজ দলের বিরোধিতার ফলে তাঁকে খেলার মাঠ ছাড়তে হয়। অথচ কয়েক বছর পরে ঐ পদ্ধতি অর্থাৎ 'রাউন্ড হ্যান্ড' বোলিংই ইংলণ্ডে প্রসার লাভ করে এবং ক্রমে বিধিবদ্ধ হয়। বর্তমানে সর্বত্র রাউন্ড হ্যান্ড বোলিংয়েরই চল।

সুতরাং মেয়েদের ক্রিকেট খেলায় পুরুষদের বিরোধিতার বা সমালোচনার কারণ নেই। হয়ত আমাদের মেয়েরাও ক্রিকেটে কোন নতুন অবদান যোগাতে পারবে। যাই হোক শর্মিলার কথায় ফিরে যাই।

শর্মিলা বলে আমার প্রশিক্ষকরা শিখি-য়েছেন যে, যার বিপক্ষে বল করবে তাকে নানাভাবে অস্বস্তিতে ফেলতে হবে। তাই কখনও তার ব্যাটের কাছে, কখনও বা কিছু দূরে বল ফেলে বলটা ঘোরাবার চেষ্টা করি। মাঝে মাঝে জোরে বল দিই। এক এক সময় তাতে আমাদের উইকেটরক্ষক ইলাদির কিছু অসুবিধা হয়েছে, জানি। কিন্তু বারাণসীতে এইভাবে বল করে বেশ কাজ হয়েছে।

হাসতে হাসতে বলে, দেখুন না ক্রমে 'চায়নাম্যান'টাও রপ্ত করবো। হ্যাঁ, শর্মিলা ক্রিকেটের পরিভাষাতেও রপ্ত হয়েছে।

ক্রিকেট দলে যখন ডাক পড়ল, তখন আমার যে কি আনন্দ, তা আর কি বলব, বাবাও খুব খুশী। আর এখন তো বাড়ীর সবাই মায় ঠাকুমা পর্যন্ত আমাকে খেলায় উৎসাহ দেন।

—বারাণসীর মাঠে কিভাবে বল করলে? প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানকে (ব্যাটস-উওম্যান) দেখে তোমার কি মনে হত?

ও পক্ষের খেলোয়াড়রা যাতে আমার বলের ঘোরা বুঝতে না পারে সে চেষ্টা করেছি। প্রথমেই চেষ্টা করতুম প্রতিপক্ষ এগিয়ে মারার চেষ্টা করবে কিনা। সেই অনুসারে তার সামনে বা পাশে বল ফেলেছি। আমি যে বাঁ হাতে স্পিন করাচ্ছি তা বুঝতে না দেবার জন্য মাঝে মাঝে সোজা জোর বলও ফেলেছি। তাতে ফল মন্দ হয়নি।

—এখন কি কেবল ক্রিকেটই খেলবে—না ফুটবলও ধরবে?

সে রকম টিম যদি তৈরী হয় তাহলে ফুটবলও খেলব। তবে আমার খুব ইচ্ছে ভবিষ্যতে কলেজ ক্রিকেট দলে খেলি। বাংলার মেয়েদের ক্রিকেট দল প্রথম আবির্ভাবেই সর্বভারতীয় আসরে জয়মুকুট লাভ করায় মেয়ে খেলোয়াড়দের মহলে বেশ সাড়া পড়ে গেছে। এরিমধ্যে মেয়েদের কয়েকটি ক্রিকেট ক্লাব তৈরীও হয়ে গেছে।

তাই আশা হয়, হয়ত শর্মিলার আকাঙ্ক্ষা সফল হবে। কলকাতা তথা পশ্চিম বাংলার স্কুল ও কলেজের কর্তৃপক্ষ এদিকে নজর দেবেন। তখন আন্তঃ কলেজ ও আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আসরে শর্মিলা তার 'চায়না-ম্যান' দিয়ে ব্যাটসম্যান (উওম্যান?)দের ধোকায় ফেলে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করবে। আশা করতে ক্ষতি কি যে একদিন মেয়ে ন্যাটা বোলারদের মধ্যেও বিষেণ বেদীর অনুরূপ কুশলী বোলারের দেখা মিলবে।

—অময়

গোয়েন্দা ধাঁধা—সমাধান

খানসামা বন্ধ ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল নকল চাবি হাতে। তিনি দেখেছিলেন সিলেসটিন প্রথমবার তুলো আনতে গেল নিজের ঘরে। ড্রয়ার থেকে গয়নার বাকস বের করল হোটেল ঝি। খিল খুলে চলল করিডর পাশের ঘরে। ফিরে এল সিলেসটিন। আবার গেল কাঁচি আনতে। আবার দরজা খুলল হোটেল ঝি। খানসামা ততক্ষণে বাকস খুলে মালা নিয়ে নিয়েছে। খালি বাকসটা নিয়ে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল হোটেল ঝি।

নকল মুক্তোর মালাটা সকাল বেলা বিছানা ঝাড়বার সময়ে সিলেসটিনের গদীর তলায় লুকিয়ে রেখেছিল হোটেল ঝি।

পয়রট দেখল খালি ঘরে ধুলো জমা টেবিলে একটা চৌকো ছাপ। গয়নার বাকসটাও চৌকো এবং একই মাপের। বুঝে ফেলল হোটেল-ঝির সংগে এ ঘরের খানসামা হাত মিলিয়েছে। তাই আগে থেকেই ফ্রেঞ্চ চক মাখিয়ে রাখা হয়েছিল ড্রয়ারে যাতে টানটানিতে আওয়াজ না হয়।

সাদা কার্ডটা বিশেষ মশলা মাখানো আঙুলের ছাপ নেওয়ার কার্ড। ঝি আর খানসামার আঙুলের ছাপ কার্ডের ওপর ধরে নিয়ে পয়রট গেল লন্ডনে। স্কট-ল্যান্ড ইয়ার্ড পুরোনো ফাইল দেখে বললে—হ্যাঁ এরা দুজনেই দাগী হীরে চোর। এখন ফেরারী।

গ্রেপ্তার হল দেবা আর দেবী। খান-সামার পকেটে পাওয়া গেল আসল মুক্তোর মালা।

ফ্রেঞ্চ চক তার ধুলোর ছাপ হেস্টিংসও দেখেছিল—কিন্তু বুদ্ধির খেলায় হেরে গেল পয়রটের কাছে।

[আগামী সংখ্যায় আবার শার্লক হোমস]

তন্ময় দত্ত

মাঠের নায়ক

'দেখ ছোকরা, তোমায় দিয়ে কিসস্যু
না অন্ততঃ ফুটবল তো নয়ই। একটা
করো. বাস্কেটবলে লেগে যাও, ওটা
ও হতে পারে।'

আজ থেকে বছর বারো আগে উয়াড়ীর
জন বিদগ্ধ কোচ আমায় দেখেশুনে ঐ
এবং সেই সঙ্গে মহামূল্য উপদেশ
ছিলেন বাস্কেটবলের কোর্টে যেতে।
তই পাচ্ছেন বাস্কেটবল কোর্টে আমি
ন. ফুটবলই খেলছি। গড়ের মাঠের
কেই আমায় এখন অল্পবিস্তর চেনে?
তন্ময় দত্ত ফুটবলই খেলে।

জল কাদার মাঠে ঘণ্টা দেড়েক একটানা
টিসের পর. চানটান করে, ফ্রেস হয়ে
নর বাটা টেন্টে বসে ছ-ফুট এক ইঞ্চি
স্টপার ব্যাক তন্ময় দত্ত প্রথমে ঐ
শোনালেন। গড়ের মাঠে অনেক ক্লাব
তাঁবু ঘুরে ঘুরে ঢাকার বিক্রমপুরের
াখা ছেলে তন্ময়. হালে বাটায় নতুন
বেঁধেছেন। এক যুগ আগে. উয়াড়ীর
লোক তন্ময়কে নিরুৎসাহী করেছিলেন
কাছে আজকের তন্ময় কিন্তু আন্ত-
রে কৃতজ্ঞ কেননা ঐ আঘাত না পেলে
য়তো জিদ চেপে যেত না। প্রকৃতপক্ষে
ু হবে না' শুনেই বড় হওয়ার
া অংকুরিত হয়েছিল তরুণ তন্ময়ের

ছোটবেলায় যখন পার্ক সার্কাস মডার্ণ
লে পড়তাম. ফুটবলে বলতে গেলে
হাতে খড়ি। দক্ষিণ পূর্ব কলকাতা
সংস্থার সম্পাদক পার্ক ইউনিয়নের
বাবের কাছে। বাবা শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দত্ত
। ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার অবসরপ্রাপ্ত
কর্মী) মা (সুনীতিবালা দত্ত) তিন
র দু বোন সবাই ফুটবলে আমায়
দিয়েছেন. দিচ্ছেনও। সত্যি কথা
ক বাড়ীর এত সহযোগিতা না পেলে
াঠে আমার হয়তো পা রাখাই হোত
া খেললে তো কথাই নেই ভাল না
বাড়ীর লোকদের উৎসাহ দেওয়ায়
ড না। হয়তো সবাই আমায় একটু
ালবাসেন বলে।

: নিজের বাড়ীই নয়, গড়ের মাঠের
স্নেহ ভালবাসার অধিকারী বাটার
স্টপার তন্ময় দত্ত। দেহিত উচ্চতা
[illegible]

এবং পজিসন জ্ঞানে তিনি অসাধারণ। পায়ে সটও যেমন সঠিক তেমন আছে প্রতিপক্ষের ফরওয়ার্ডদের পা থেকে ছোঁ মেরে বল কেড়ে নেওয়ার দক্ষতা। এক কথায় মাঠে যতক্ষণ থাকেন তন্ময়, তন্ময় হয়েই ফুটবল খেলেন। এক লহমার গরমিল গোঁজামিলের অর্থই হচ্ছে বিপর্যয়, এ কথা সম্পর্কে তিনি ষোলআনা সচেতন। তিনি যে স্টপার।

কিন্তু এই স্টপারের জায়গাটিতে কে তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিলেন? কি উদ্দেশ্যে? স্টপারের মত অমন ভাইটাল পজিসনে খাড়া করেছিলেন প্রখ্যাত ফুটবল শিক্ষক শ্রীঅচ্যুত ব্যানার্জি। তন্ময় খেলতেন সাধারণতঃ লেফট উইংয়ে। '৬৪ সালে জর্জ টেলিগ্রাফে লেফট ব্যাকে নামলেন। '৬৫ সালে টেলিগ্রাফের স্টপার ধ্রুব চক্রবর্তী চলে যাওয়ার পর অচ্যুতদা নিজের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ওপর আস্থা রেখে দীর্ঘদেহী তন্ময়কে টেনে আনলেন স্টপারের পজিসনে। ('৬৩ সালে টেলিগ্রাফে গুটি কয়েক শাওয়ার লীগে ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়েছিল)

সেই থেকে ঐ স্টপারেই চলছে, চলবেও বোধ হয়। ৬৫, ৬৬ এই দু বছর জর্জ টেলিগ্রাফ কাটিয়ে ৬৭ সালে তন্ময় দল বদল করে চলে যান খিদিরপুরে (অচ্যুৎ ব্যানার্জি তখন খিদিরপুরের প্রশিক্ষক)। এই খিদিরপুরে খেলার সময়ই (৬৮) জাতীয় ফুটবলের আসরে (ব্যাঙ্গালোরে) বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন সর্বপ্রথম। বাংলা সে বছরের রানার্স আপ। সেবার আই এফ এ [illegible] মরিশাস যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সফর বাতিল হোল। ১৯৬৯ সালে যোগ দিলেন এরিয়ানে। বরাত খারাপ। তৃতীয় খেলাতেই চোট পেয়ে গোটা মরশুমের জন্য বসে থেকে হোল। ১৯৭০ সালে তন্ময় খেলেছে বি এন আর-এর হয়ে (কলিঙ্গ কাপ জয়ী)। তারপরের বছর নাম লিখিয়েছেন বাটায় এবং সেই থেকে বাটাতেই রয়েছেন। ভবিষ্যতে কোথায় যাবেন বা অন্য কোথাও আর যাবেন কিনা, সে সম্পর্কে তিনি অনিশ্চিত। সবই ভাগ্যের ওপর তিনি ছেড়ে দিয়েছেন।

তন্ময় ভাগ্যকে মানেন ভীষণ। ভাগ্য ছাড়া ওঁর মতে কিছু পাওয়াই সম্ভব নয়। কারণ? কারণ কি, তা তন্ময়ের মুখেই শুনুন :

'জন্মেছিলাম ১৯৪৬ সালে ঢাকায়, জোর মারদাঙ্গার সময়। আমাদের অর্থ, সম্মান প্রতিপত্তি, ঢাকায় সবই ছিল কিন্তু দেশ ভাগের পর বলতে গেলে সবই হারিয়ে গেল। ফুটবল এমন স্কুলে খেলতে শুরু করলাম, (মডার্ন হাই), সে স্কুল—স্কুল লীগে আদৌ খেলতোই না। অনেক অনুনয় বিনয় ঘুরে পার্ক সার্কাস হাই স্কুলের ছাত্র হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়ে পূর্বাঞ্চল স্কুল ফুটবলে যদিও বা বাংলার হয়ে চান্স পেলাম, যাওয়া হোল না। যাবো কি করে। আমি যে পার্ক সার্কাস হাই স্কুলের বোনাফাইড স্টুডেন্ট তার সার্টিফিকেট দেবে কে? সুতরাং আমি অগত্যা বাদ পড়ে গেলাম। স্কুলের পর, এমন এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলাম, যাঁরা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ আওতায় পড়ে না (যাদবপুর পলিটেকনিক)। অর্থাৎ স্কুল-টিমের জীবনে যে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের আসরে নামবো, সে পথেও বাধা, আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় খেলার বাসনায় ভর্তি হলাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অনেক আশা নিয়ে কিন্তু জানেন তো নেপাল গেলেও কপাল যায় সঙ্গে সঙ্গে। সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ভর্তি হওয়ার পরই নিয়ম হয়ে গেল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় খেলাধুলায় চাকুরে ছাত্রদের খেলা নিষিদ্ধ। সিলেকসনের তখন আর মাত্র তিনদিন বাকী। বুঝুন অবস্থাটা আমার। বি এন আর-এ ভাল চাকরী পাবো এই আশায় জানপ্রাণ দিয়ে খেললাম একটা সিজন। ওমা, পরে যে চাকরীর অফার দিলো (৭২) সেটি ক্লাস ফোর স্টাফ বৈ কিছু নয়। রাঁচী হেভী ইন্ডাস্ট্রিজে চাকরী হওয়ার যখন সব কাগজপত্র প্রায় তৈরী ঠিক সেই সময় লাগলো পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ। সব এ্যাপয়েন্টমেন্ট বন্ধ। অর্থাৎ ওখানেও তরী তীরে এসে ডুবলো। উপায়ন্তর না দেখে সামনে পেলাম এ জি বেঙ্গল। কপাল ঠুকে ঢুকে পড়লাম। দেখা যাক ভাগ্য আমায় কোথায় টেনে নিয়ে যায়।

বয়স বাড়ছে ফুটবল যে আর বেশীদিন নয়, অন্ততঃ সুনাম বজায় রেখে যে আর খুব বেশীদিন নয় সে সম্পর্কে তন্ময় দত্ত সম্পূর্ণ সচেতন। তাই এই মুহূর্তে একটু থিতু হয়ে বসতে চায়। ভদ্রগোছের একটা চাকরী পেতে চায়। বাবা অবসরপ্রাপ্ত, লবণ হ্রদের অসমাপ্ত বাড়ীটা এ বছরের মধ্যে শেষ না করলে চলবে না কারণ ইঁট, চুন, সুরকি, বালি, সিমেন্ট লোহা এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের দাম যে রেটে হু হু করে বাড়ছে তাতে আর বসে থাকা যুক্তিসংগত নয়। যা হোক, তাড়াতাড়ি একটা কিছু করতেই হবে। না হলে, ফুটবল মাঠের মত সংসারের মাঠেও ভাগ্যের বলটা হয়তো পা ফসকে নিজের গোলেই ঢুকে যাবে।

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশ বিদেশের খেলা

উইম্বলেডন নির্বাসিত রোজওয়াল

সংবাদ শিরোনামে কেন রোজওয়ালের নাম আর স্থান পাবে কিনা এই মুহূর্তে তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত। কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে টেনিস খেলোয়াড়দের জীবনের দ্বিতীয় দশক অর্থাৎ কুড়ি থেকে আটাশ বছর পর্যন্ত সময় হল 'পিক আওয়ারস'। যদিও রোজওয়াল এই অভিমত মিথ্যে প্রতিপন্ন করে দিয়ে চল্লিশ বছর বয়সেও উইম্বলেডন ফাইনালে উঠলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিজয়ীর সম্মান পেলেন না।

কেন রোজওয়াল টেনিস কোর্টের অভিশপ্ত নায়ক। ভাগ্যহত খেলোয়াড়। যিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সব কটি টেনিস খেতাবে সসম্মানে ভূষিত হয়েও উইম্বলেডন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর আখ্যা পেলেন না। অথচ উইম্বেলডন চ্যাম্পিয়ান হওয়া টেনিস খেলোয়াড়দের জীবনের সেরা গৌরব।

এই নিয়ে রোজওয়াল চার চারবার উইম্বলেডন ফাইনালে উঠলেন। কিন্তু

রোজওয়াল

ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে একবারও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেলেন না। উইম্বেলডনে রোজ-ওয়ালের প্রথম আবির্ভাব ১৯৫২ সালে। তখন তার বয়স মাত্র সতের বছর। দু বছর পরে ১৯৫৪ সালে প্রথম ফাইন্যালে ওঠেন। পরাজিত জারোশলাভড্রবনির কাছে। আরও দু বছর পরে ১৯৫৬ সালের ফাইনালে পৌছিয়ে পড়েন স্বদেশীয় লিউ হোডের কাছে। আর ১৯৭০ সালের ফাইন্যালে জোর লড়াই চালিয়েও খ্যাতনামা খেলোয়াড় জন নিউকম্বের কাছে নতি স্বীকার করেন।

দীর্ঘ চার বছর পর চল্লিশ বছরের প্রবীণ কেন রোজওয়ালের উইম্বেলডন ফাই-নালে প্রত্যাবর্তন কিছুটা আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতও বলা চলে। কারণ কোয়ার্টার ফাইনালে তাকে এক নম্বর বাছাই ও তিন-বারের চ্যাম্পিয়ান জন নিউকম্বের প্রতি-দ্বন্দ্বী হতে হয়েছে। সেদিন টেনিস রসিকরা ভবিষ্যতের আশা করে ব্যথিত হয়েছিলেন। রোজওয়াল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি কোয়ার্টার ফাইনালের বাধা বেড়া ডিঙিয়ে সেমিফাইনালে ওঠেন। এবং প্রতিযোগিতার চার নম্বর বাছাই ও ১৯৭২ সালের চ্যাম্পিয়ান স্টান স্মিথকে দীর্ঘ লড়াইয়ে পরাজিত করেন। স্মিথ -৪ ও ৬-২ গেমে প্রথম দুটি সেট ছিনিয়ে নিলে, রোজওয়ালের ব্যর্থতা সম্পর্কে দর্শকেরা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যান। মনের ম দৃঢ়তায় আকস্মিক বিদ্যুতের মত রোজওয়াল যেন সেই মুহূর্তে তার পুরনো ক্রীড়ানৈপুণ্যকে ফিরে পেয়েছিলেন। ম্যাচ পয়েন্টকে বাঁচিয়ে টাইবেকার পদ্ধতিতে -৮ গেমে জিতে তৃতীয় সেটটি নিজের অনুকূলে আনেন। পরের দুটি সেট ঝড়ের বেগে খেলে স্মিথকে স্বচ্ছন্দে পরাজয়ের মুখে ঠেলে দিলেন। দর্শকেরা হর্ষোৎফুল্লচিত্তে রোজওয়ালকে অভিনন্দন জানালেন এই ভেবে যে গত তিন র উইম্বেলডন ফাইনালে হেরে যাবার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে।

কেন রোজওয়াল হয়ত মনে মনে এমনই একটা কিছু কল্পনা করেছিলেন। জন নিউ-কম্ব ও স্টান স্মিথের মত বাঘা বাঘা দু-জনকে পরাজিত করবার পর এমন জবাবটাই দু[illegible]।

কিন্তু কল্পনাই হয়ে রইল। ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হলেন না। প্রবীণ অভিজ্ঞ রোজওয়াল একুশ বছরের মার্কিন তরুণ জিমি কোনরসের কাছে ৬—১, ৬—১, ৬—৪ সরাসরি সেটেই হেরে গেলেন। হেরে গেলেন চার চারবার ভাগ্যের লড়াইয়ে। ভাগ্য ছাড়া আর কি বলব? কয়েকদিন পূর্বে ফরেস্ট হিলসেও ভাগ্যাহত রোজওয়াল দ্বিতীয়বার ফাইনালে কোনরসের কাছে পরাজিত হলেন।

রণে অক্লান্ত ঘোড়ার মত রোজওয়াল এই চল্লিশ বছর বয়সে এসেছিলেন উইম্বেল-ডন প্রতিযোগিতায় তার বিগত দিনের বিফল স্বপ্নকে সাফল্যের রং-এ রাঙিয়ে দিতে। [illegible]—[illegible]মুহূর্তে এক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে রোজওয়াল বলেন—আমি এখানে এসেছি দর্শক হিসেবে নয়, খেলোয়াড় হিসেবে। গত পনের বছরে আমি দিগ্বিজয়ী বীরের মত উল্কাবেগে পঁচিশ হাজার মাইল দৌড়েছি বিভিন্ন টেনিস প্রতিযোগিতার আসরে। একের পর এক জিতেছি। সম্মান পেয়েছি। উজ্জ্বল স্তুতি আর প্রশংসার জোয়ারে অবগাহন করেছি। পৃথিবীর সবকটি টেনিসের খেতাব পেয়েছি। খ্যাতি, অর্থ, পুরস্কার সব, সব পেয়েছি। আমি এখন রীতিমত ধনী। সিডনীর শহরতলীতে সুন্দর হালফ্যাসানের বাড়ী করেছি, তাতে সুইমিং পুল, মনোরম উদ্যান ও মানুষের আরামে বাঁচার জন্যে প্রায় সব রকম আধুনিক সাজসরঞ্জাম রয়েছে। যখন আমি একেলা বাড়ীর সামনে সৌখীন লনে নিঃসঙ্গ অবসরে পায়চারি করি তখন উইম্বেলডন ট্রফিটি বিনষ্ট স্বপ্নের মত যেন চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

বস্তুতঃ এ যেন সব পেয়েও কিছু না পাওয়া। এই বেদনা ও অতৃপ্তিই রোজ-ওয়ালকে আর একবার ভাগ্যের লড়াইয়ে নামতে অনুপ্রাণিত করেছিল। রোজওয়াল কি আবার অদৃষ্টের লড়াইয়ে নামবেন? রোজ-ওয়ালের উত্তর—এ মুহূর্তে কি কিছু বলা যায়! অনেক চিন্তা করে আগামীদিনের কথা ভাবতে হবে।

সদ্য বিজয়ী কোনরস বলেন—রোজওয়া-লের বিরুদ্ধে জয় সম্পর্কে আমার যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। আমি প্রাণপণে ভাল খেলার চেষ্টা করেছি। স্টান স্মিথ ও জন নিউকম্বের দুই বিরাট প্রতিভাকে হারিয়ে রোজওয়ালের শক্তি কমে যায়। আর কেন জানিনা সেদিন কোর্টে আমার প্রতিটি মার এত নিখুঁত যে আমি ভাবতেই পারি না। যা ছুঁয়েছি তাই সোনা হয়েছে। এ পর্যন্ত এই ম্যাচটি আমার জীবনের সেরা ও স্মরণীয় খেলা।

দর্শক আসনে বসে রোজওয়ালের স্ত্রী আর দুই ছেলে সেদিন চোখের জল চেপে রাখতে পারে নি। পারেনি অসংখ্য টেনিস অনুরাগী। সবাই মনে প্রাণে চেয়েছিলেন উইম্বেলডন ফাইনালে তিনবারের বিফল নায়ককে চতুর্থবার সফল দেখতে। কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে। সেই নিয়তির নির্মম পরিহাসে সম্ভবতঃ শাপগ্রস্থ বিরহী যক্ষের মত উইম্বেলডন বিজয়ের গৌরব থেকে হয়ত রোজওয়াল চির নির্বাসিত হয়েই রইলেন।

[illegible]

খেলাধুলা

দর্শক

এশিয়ান গেমস

তেহেরানে সপ্তম এশিয়ান গেমস শেষ হয়েছে। অন্যান্যবারের মত এবারও জাপান চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় বিরাট ব্যবধানে শীর্ষস্থান লাভ করেছে—তাদের মোট পদক ১৭৫ (স্বর্ণ ৭৪, রৌপ্য ৪৯ ও ব্রোঞ্জ ৫২)। ১৯৭০ সালের ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমসে জাপানের পদক ছিল মোট ১৪৪ (স্বর্ণ ৭৪ রৌপ্য ৪৭ ও ব্রোঞ্জ ২৩)। গতবারের থেকে জাপান এবারের আসরে বেশী রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। তাদের স্বর্ণ পদকের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয়নি। গতবারের ৪র্থ স্থান অধিকারী ইরান এবার ২য় স্থান পেয়েছে। আর গতবারের ২য় স্থান অধিকারী দক্ষিণ কোরিয়া এবার ৪র্থ স্থানে নেমে গেছে। ভারত নেমেছে দু'ধাপ—গতবারের ৫ম স্থান থেকে এবার ৭ম স্থান। নবাগত চীন তালিকায় ৩য় স্থান পেয়েছে।

সপ্তম এশিয়ান গেমসের লংজাম্পে স্বর্ণ পদক বিজয়ী ভারতের যোহানন (৬৬), আর ব্রোঞ্জপদক বিজয়ী সতীশ পিল্লাই।

অ্যাথলেটিকসে জাপান, চীন ও ভারত যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছে। জাপানের পদক ৩১ (স্বর্ণ ১০, রৌপ্য ১১ ও ব্রোঞ্জ ১০) চীনের পদক ২১ (স্বর্ণ ৫, রৌপ্য ১০ ও ব্রোঞ্জ ৬) এবং ভারতের পদক ১৫ (স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ৭ ও ব্রোঞ্জ ৪)। ১৯৭০ সালের অ্যাথলেটিকসে জাপান ১ম (স্বর্ণ ১৯ রৌপ্য ৭ ও ব্রোঞ্জ ৬) ও ভারত ২য় (স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ৫ ও ব্রোঞ্জ ৫) স্থান পেয়েছিল।

এবারের অ্যাথলেটিকস আসরে তিনটি স্বর্ণ পদক জয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন ইজরায়েলের ২১ বছরের শ্রীমতী আসথার রট এবং থাইল্যাণ্ডের ২৬ বছরের আর্মি-অফিসার আনাত রত্নপল। শ্রীমতী অ্যাসথার রট মেয়েদের ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড় এবং ১০০ মিটার হার্ডলসে স্বর্ণ পদক জয় করেন। এশিয়ান গেমসের একই বছরের অ্যাথলেটিকস আসরে তিনটি স্বর্ণ পদক জয়ের নজির প্রথম করেন ১৯৫১ সালে জাপানের তোকিয়োশে। তারপর শ্রীমতী রট সেই নজির স্পর্শ করলেন। ২১ বছরের জননী শ্রীমতী রট তাঁর দু'মাসের শিশুসন্তানকে বাড়িতে রেখে তেহেরানের এশিয়ান গেমসের আসরে এসেছিলেন। দু'ঘণ্টার ব্যবধানে তিন ১০০ মিটার হার্ডলস এবং ২০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক পান। এখানে উল্লেখ্য, তিনি মিউনিখ অলিম্পিকের হার্ডলসে ফাইনালে উঠেছিলেন। কিন্তু আরব গেরিলাদের আক্রমণে তাঁর কোচের মৃত্যু হওয়াতে তিনি প্রতিযোগিতা বর্জন করে স্বদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন। থাইল্যাণ্ডের আনাত রত্নপল পুরুষ বিভাগের ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড় এবং ৪×১০০ মিটার রিলেতে স্বর্ণ পদক সংগ্রহ করেন। তাঁর আগে একই বছরের অ্যাথলেটিকস আসরে পুরুষদের ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছেন একমাত্র ভারতের লেভী পিন্টো, ১৯৫১ সালে।

চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকা
(প্রথম সাতটি দেশ)

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
জাপান	৭৪	৪৯	৫২
ইরান	৩৫	২৮	১৭
চীন	৩০	৪৫	২৬
দঃ কোরিয়া	১৬	২২	১৫
উঃ কোরিয়া	১৫	১৪	১৭
ইস্রায়েল	৬	৩	৮
ভারত	৪	১২	১২

হকি প্রতিযোগিতা

হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ৬টি দেশ লীগ প্রথায় খেলেছিল—প্রত্যেকে পাঁচটি করে খেলা। ভারত এবং পাকিস্তান লীগের পাঁচটি খেলায় সমান ৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করে। ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান নির্ধারণের জন্যে তাদের দ্বিতীয়বার খেলতে হয়। ভারত-পাকিস্তানের লীগের খেলাটি ১—১ গোলে ড্র যায়। ভারতের গোলরক্ষক ফার্নাণ্ডেজের দক্ষতাপূর্ণ খেলার দরুনই ভারত লীগের খেলায় পরাজয় থেকে খুব জোর বেঁচে যায়। পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে পাকিস্তানের আখতার এবং ভারতের অজিত্ পাল গোল করেন। লীগের এই খেলায় পাকিস্তান পেয়েছিল ৮টি সর্ট কর্নার এবং ২টি পেনাল্টি স্ট্রোক। অপরদিকে ভারতের ২টি সর্ট কর্নার এবং একটি পেনাল্টি স্ট্রোক। উভয় দেশের দ্বিতীয় খেলায় পাকিস্তান ২—০ গোলে ভারতকে হারিয়ে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার স্বর্ণ পদক জয়ের গৌরব লাভ করে। এই খেলাতেও পাকিস্তান খুব ভাল খেলেছিল। ভারতের হকি ম্যানেজার লেসলি ক্লডিয়াস এবং হকি কোচ বালকিষেণ সিং একবাক্যে স্বীকার করেছেন পাকিস্তান যোগ্যদল হিসাবেই জিতেছে।

এশিয়ান গেমসের তালিকায় হকি প্রতিযোগিতা প্রথম সংযুক্ত হয় ১৯৫৮ সালে। ভারত এপর্যন্ত হকিতে স্বর্ণ পদক পেয়েছে মাত্র একবার—১৯৬৬ সালে। আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারত এবং পাকিস্তান পরস্পর যে ১১ বার খেলেছে তার ফলাফল : পাকিস্তানের জয় ৮ বার এবং ভারতের জয় ৩ বার।

ভারতের স্বর্ণ পদক জয়

ডেকাথলন : ভি এস চৌহান
—৭৩৭৫ পয়েন্ট (নতুন এশিয়ান রেকর্ড)

লং জাম্প : টি সি যোহানন
দূরত্ব : ৮·০৭ মিটার (নতুন এশিয়ান রেকর্ড)

৮০০ মিটার দৌড় : শ্রীরাম সিং
সময় : ১ মিঃ ৪৭·৫৭ সেঃ (নতুন এশিয়ান রেকর্ড)

৫০০০ মিটার দৌড় : শিবনাথ সিং
সময় : ১৪ মিঃ ২০·৫০ সেঃ (নতুন এশিয়ান রেকর্ড)

সপ্তম এশিয়ান গেমসের অ্যাথলেটিকসে ৩টি স্বর্ণপদক বিজয়িনী ইজরায়েলের শ্রীমতী এসথার রট (কুমারী জীবনে এসথার শাখামরেভ)

আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৭৪ সালের আমেরিকান ওপেন লন টেনিস প্রতিযোগিতার পাঁচটি খেতাবের মধ্যে আমেরিকার খেলোয়াড়রা পাঁচটি খেতাবই জয়ী হয়েছেন—এককভাবে চারটি খেতাব এবং অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যুগ্মভাবে মিকসড ডাবলস খেতাব। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে জিমি কোনর্স (আমেরিকা) ৬—১, ৬—০ ও ৬—১ গেমে ৩৯ বছরের প্রবীণ খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার কেন রোজওয়ালকে হারিয়ে দেন। কোনর্সের পক্ষে আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব জয় এই প্রথম। অপরদিকে রোজওয়াল আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন দুবার। এ বছরের উইম্বলেডন সিঙ্গলস খেলার ফাইনালেও কোনর্সের কাছে রোজওয়াল হেরেছিলেন। এ বছরের উইম্বলেডন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান এবং ১নং বাছাই কুমারী ক্রিস এভার্ট (আমেরিকা) মেয়েদের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী খেলোয়াড় কুমারী ইভোন গুলাগংয়ের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে যান। এই পরাজয়ের আগে কুমারী এভার্ট একনাগাড়ে ১০টা প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব নিয়েছিলেন। আলোচ্য প্রতিযোগিতায় ২নং বাছাই শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) দুটি খেতাব পান—মেয়েদের সিঙ্গলস এবং ডাবলস। শ্রীমতী কিং এই নিয়ে চারবার আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব পেলেন।

ভারতের বিজয় অমৃতরাজ

অবাছাই খেলোয়াড় বিজয় অমৃতরাজ ... রাউণ্ডে ৪নং বাছাই সুইডেনের বর্গকে হারিয়ে দারুন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। বর্গ এ বছরের ফ্রেঞ্চ, ইটালীয়ন সুইডিস এবং আমেরিকান ... টেনিস আসরে সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন ... আমেরিকান ওপন টেনিস আসরে ... প্রত্যাশা নিয়ে নেমেছিলেন।

বিজয় অমৃতরাজ গত বছরের মত ... ও আমেরিকান টেনিসে কোয়ার্টার ফাইনালে ৫নং বাছাই কেন রোজওয়ালের কাছে ... যান। এই নিয়ে রোজওয়ালের ... বিজয়ের তৃতীয় হার—আমেরিকার ... কোয়ার্টার ফাইনালে দুবার এবং ১৯৭৪ ... উইম্বলেডন আসরে একবার, ... রাউণ্ডে।

এখানে উল্লেখ্য, এবছর উইম্বলেডন টেনিস খেলার আসরেও আমেরিকা খেতাবের সিংহভাগ পেয়েছিল। পাঁচটি বিভাগেরই ফাইনালে খেলে আমেরিকা ৪টি খেতাব পেয়েছিল—পুরুষ ও মেয়েদের সিঙ্গলস এবং অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের সহযোগিতায় মেয়েদের ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস খেতাব। উইম্বলেডন এবং আমেরিকান টেনিস খেলার আসর ঐতিহ্য, মর্যাদা এবং নগদ পুরস্কারের পরিমাণের দিক থেকে বিশ্বের টেনিস খেলোয়াড়দের তীর্থস্থান এবং এখানের খেতাব জয়ের অর্থ বে-সরকারীভাবে বিশ্ব খেতাব লাভ।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : ১নং বাছাই জিমি কোনর্স (আমেরিকা) ৬—১, ৬—০ ও ৬—১ গেমে ৫নং বাছাই কেন রোজওয়ালকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলস : ২নং বাছাই শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) ৩—৬, ৬—৩ ও ৭—৫ গেমে ইভোন গুলাগংকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : স্ট্যান স্মিথ এবং বব লুজ (আমেরিকা) ৬—৩ ও ৬—৩ গেমে চিলির পি কর্নেজো এবং জে ফিলোলকে পরাজিত করেন।

মিকসড ডাবলস : পি ডেলর্ফ (আমেরিকা) এবং জিওফ মাস্টার্স (অস্ট্রেলিয়া) ৬—১ ও ৭—৬ গেমে কুমারী ক্রিস এভার্ট এবং জিমি কোনর্সকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মেয়েদের ডাবলস : শ্রীমতী বিলি জিন কিং এবং রোজমেরী ক্যাসলস (আমেরিকা) ৭—৬, ৬—৭ ও ৬—৪ গেমে এফ দ্যুর (ফ্রান্স) এবং বেটি স্টোভকে (নেদারল্যাণ্ডস) পরাজিত করেন।

প্রেক্ষাগৃহ

া টুকু কেবল রবীন্দ্রসঙ্গীতই
ত পারে না—গানের তালে তালে
নী নৃত্যেতেও সমান পারদর্শী।
কে আবার নতুন করে ভাবতে হোল
সম্পর্কে সে যেন উচ্চ মধ্যবিত্ত
র সমাজের আশা ও ভরসা।
পারিবারিক অবস্থাটাও ক্রমে ক্রমে
শের চোখে ভেসে উঠলো। টুকুর
র জীবনটা অনেকটা সমুদ্রের তীর-
মতো। অনীশেরও মনে হয় টুকু

পড়ন্ত বিকেলের বুকে একটি ভোরের ফুল কিন্তু ফুলটি তাজা নয় কীটদষ্ট। আর এই কীট হোল আজকের সমাজ-ব্যবস্থা এবং উচ্চবিত্ত পরিবারের ভণ্ডামি। টুকুর যখন নিজেকে বড্ড অসহায় ও একা মনে হয় ছুটে আসে অনীশের বাড়ীতে। অনীশ ওঁর দুঃখে সমব্যথী হয়ে নিয়ে যায় দীঘা ছাড়িয়ে আরো দূরে 'কপালকুণ্ডলার' মন্দির দেখাতে। মন্দিরের পুরোহিত ওঁদের স্বামী ও স্ত্রী মনে করে টুকুর কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেয় টুকুর মনে রোমাঞ্চ জাগে, কিন্তু অঘটন ঘটে যাওয়ার আগে অনীশ নিজেকে সামলে নেয় কিন্তু টুকুর বিহ্বলতা কাটে না, ইচ্ছা থাকলেও অনীশ টুকুকে নিয়ে ঘর বাঁধতে পারে না, কারণ ওঁদের জীবনের ছন্দ মিলবে না। একদিন তুমি তোমার জীবনের আলোর সন্ধান পাবে, এই বলে টুকুকে হাসিমুখে বিদায় দেয় অনীশ টুকু চোখের জল কোনরকমে চেপে রাখে। বিদায় নেবার সময় অনীশ টুকুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখে, দাদার বন্ধুর সঙ্গে নাচছে টুকু—হয়তো আঘাতটা ভোলবার চেষ্টা করছে। অনীশের গাড়ী দীঘার ঝাউবন থেকে—দূরে ক্রমশঃ দূরে মিলিয়ে যায়।

বম্বের চিরতরুণ নায়কদের চেয়েও এ ছবিতে উত্তমকুমারের অভিনয় আরো বিস্ময়কর, এই বয়সেও চলনে বলনে, হাসিতে এবং দুঃখের দৃশ্যে এটাই বুঝিয়ে দিয়েছেন বাংলা ছবিতে তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। 'ছেঁড়া তমসুকে'-এর পর সুমিত্রা মুখার্জী টুকুর চরিত্রে এটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে অভিনয়ের ব্যাপারে ওঁর কোন ত্রুটি নেই। অনীশের সঙ্গ কামনায় এবং বাড়ীর লোকেদের অত্যাচারে অতিষ্ট হবার অন্তর্দ্বন্দ্বকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সুমিত্রা। অন্যান্য ভূমিকায় রবি ঘোষ (চারুচন্দ্র কলেজের শিক্ষক), উৎপল দত্ত (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) তরুণ রায় (টুকুর কাকা) কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় (দাদার বন্ধু) গীতা দে ও বনানী চৌধুরী (মহিলা কলেজের শিক্ষিকা) বেশ ভালো অভিনয় করেছেন। নবাগতা অলকা গাঙ্গুলী মালা দাশ, শর্মিলা দাস তনুশ্রী বসু সোনা মুখার্জী শর্মিলা রায় জয়শ্রী ব্যানার্জী ও নিমু ভৌমিক চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। আবহ সঙ্গীত রচনা ও সুর সংযোজনায় হেমন্ত মুখার্জী তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কলা-কৌশলের বিশেষ করে আলোকচিত্র গ্রহণ শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদকের কাজও উচ্চাঙ্গের। —চিত্রদূত

সুমিত্রা মুখার্জি

বায়োস্কোপিক

আপাত নিরীহ-দর্শন এই মধ্যবয়স্ক মানুষটিকে চিনুন। বায়োস্কোপের জগতের সঙ্গে এই মানুষটির সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের, এর বিচিত্র কার্যকলাপের সঙ্গে অল্প-বিস্তর সকলেরই পরিচয় আছে, অতএব একে আপনাদেরও চেনা প্রয়োজন।

ফিল্মে যখন প্রথম ঢুকি তখন প্রায়ই একে ওকে বলতে শুনতাম, আরে, এর জন্যে চিন্তা কিসের, কল্যাণ পাণ্ডেকে ডেকে অর্ডারটা দিয়ে দাও, সময় মত পেয়ে যাবে। লোকটা প্রায়ই আসত। অফিসের এক কোণায় বা ফ্লোরের সদর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত, যাতায়াতের পথে সবাইকে অকাতরে সেলাম করত, আদায় কাজ ফুরোলেই নিঃশব্দে সরে পড়ত। ওর অনুগত ভঙ্গীটা আমার খুব খারাপ লাগতো না। তারপর আমি হেন এক নবাগত, ফিল্মের শিক্ষানবীশ, ও যখন সেই আমাকেই সেলাম ঠুকতে লাগল, আমি তো অবাক।

আমার মুরুব্বীকে এই কথাটা একদিন বলতে তিনি সহাস্যে বললেন, কল্যাণ পাণ্ডে তো? ওরা ওরকমই। অসম্ভব চালু লোক—

আমি আরও অবাক।

—ওরা কেন? কল্যাণ পাণ্ডে তো একজন মানুষ!

মুরুব্বী আমার এহেন অজ্ঞানতায় হেসে অস্থির হয়ে বললেন—কে তোমায় বলল যে কল্যাণ পাণ্ডে একজন লোকের নাম? ওরা দুজন। একজনের নাম কল্যাণ, বাঙ্গালী মুসলমান, আর একজনের নাম পাণ্ডে, গুজরাটী হিন্দু! ওরা দুজনে মিলেমিশে এই সাপ্লায়ের বিজনেস করে। হাঃ।

সেই থেকে ওরা যে দুটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা, কল্যাণ আর পাণ্ডে, এটা জানলাম মাত্র, কিন্তু মন থেকে কখনো মেনে নিতে পারিনি।

একটা ফিল্ম তৈরী করতে কি কি জিনিস প্রয়োজন পড়তে পারে, তা আপনারা ধারণায় আনতে পারবেন না। ইট, কাঠ, চুণ, সুরকি জীবজন্তু জানো[illegible] মেশিনপত্র—সব কিছুরই যোগান দরকার হয়। আসলে সবটাই হয়ত কেন নিশ্চিতই মেক-বিলিভ, কিন্তু তা চলে যদি কখনও একটা মেলার দৃশ্য স্টুডিও ফ্লোরে তৈরী করতে হয়, নকল কি ভাবে করবেন? আপনাকে একটা মেলা তৈরী করে দেখাতেই হবে। মেলার মানুষজন, দোকান-পশরা, জীবজন্তু—সবই ভাড়া করে আনতে হবে। ফ্লোরের ভেতর সেগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে এমনই একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যে পর্দায় দর্শকরা তা যখন দেখবেন তখন তাদের চোখে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। মেলাটাকে যেন একটা বাস্তব মেলা বলেই মনে হয়। এর জন্য চাই টেকনিক্যালি একসপার্ট মানুষ, যারা এটাকে অর্গানাইজ করবে, মেলা বসাবার রসদ জোগান দেবে, হুজ্জোত এবং হ্যাঙ্গাম পোয়াবে।

কল্যাণ আর পাণ্ডে হচ্ছে সেই ধরনের একসপার্ট সাপ্লায়ার। এদের কো-অপারেশন ছাড়া ছবিতে বিয়ের দৃশ্য, শ্রাদ্ধের দৃশ্য, রাজসভার দৃশ্য, কোর্টরুমের দৃশ্য, হোটেলের ক্যাবারে নৃত্য-দৃশ্য, ভিড়-ভাট্টার দৃশ্য—কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যাবে না।

কল্যাণ পরপারে চলে গেছে, স্মৃতিভারে
রাক্রান্ত পান্ডে রয়ে গেছে। একদিন
ণ্যাণ সম্পর্কে পান্ডেকে একটা প্রশ্ন করে
ার কি ফ্যাসাদ, বন্ধুর অকাল বিয়োগে
বুড়ো বয়েসেও আবেগে পান্ডের চোখ
ছল—স্যার, ও-যে এভাবে টেঁশে যাবে
তে পারিনি। কত আশা ছিল দুজনে
। একটা ছবি করব, চাট্টে পয়সার মুখ
া, কিন্তু কল্যাণ শট করে চলে গেল...

পান্ডের এখন একটি মাত্রই প্রার্থনা—
একটু বিবেচনা করে দেবেন স্যার।
জিনিসপত্রের দাম বড় আক্রা হয়েছে।
একসট্রা সাপ্লাই করে আর পেট
না...

ান্ডের খাতায় দু ধরনের একসট্রার
কানা লেখা থাকে। টকিং আর
ন্ট। শটের মধ্যে ওর দেওয়া যে-সব
কথা কইবে—তাদের একরকম রেট,
ারা নির্বাক—তাদের আর এক রেট।
একটা ছবিতে পান্ডের যোগানের
ল একটি ভিজে বিড়াল। সে ব্যাটা
ধ্যে বার কতক মিঁউ মিঁউ করেছিল,
া গ্রাহ্যও করেনি। হঠাৎ একদিন সে
প্রোডাকশন ম্যানেজার মহা উত্তেজিত।
ঃ দারুণ ধমকাচ্ছে।—তোমার তো বড়
হ! সামান্য একটা বিড়ালের জন্যে
নর টাকার বিল দিয়েছ? তোমার
রে না?

ড তাকে 'আহা' বলে বোঝায়—
টছেন কেন স্যার, টকিং আর্টিস্টের
বরাবরই পনের টাকা। আমি সেই
। করেছি—

জার অবাক। —তার মানে? টকিং

, শটের মধ্যে বিড়ালটা ডাকেনি?
বলুন যে ধর্মত বিড়ালটা ম্যাঁও
নি—

ম্যানেজারের চক্ষুস্থির। —সোক
ল ডেকেছে বলেই ওটা টকিং
য়ে গেল?

বৎ। মানুষ কথা বললে সে টকিং
ন আর বিড়াল বার্তাচিত করলে
কং আর্টিস্ট হবে না?

যুক্তি। অবশ্য প্রোডাকশন ম্যানে-
। পাষণ্ড। বিড়ালের বিল কেটে
য় রফা করিয়ে ছেড়েছিল—হ্যাঃ
া নেবে কেটে পড়। দু টাকাই
এ-থেকে বেড়ালকে তো আর
চ্ছে না—

ান্ডেকে একদিন পরিচালক
' ডেকে বললেন—ওহে পান্ডে,
একটা মিশকালো বিড়াল
পারবে?

া, পান্ডের মত এতবড় গুল-
ম আমার ইহজীবনে আর
নি; যত বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি

পকেটমার / ধর্মেন্দ্র-সায়রাবানু

সব্যসাচী
পরিচালক পীযূষ বসু ও সুপ্রিয়া দেবী। ফটো ঃ অমৃত

গুলোমারা ওর একটা অভ্যাস। একদিন যদি এসে বলে, হাওড়া ব্রীজটা দু ফাঁক হয়ে গেছে দেখে এলাম, একটা ট্রাম সেই ফাঁক দিয়ে গলে গংগায় ঢুকেছে স্যার—বিন্দুমাত্র অবাক হব না আমরা।

গুলগপ্প ধরা পড়লেও পাণ্ডে বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ বোধ করে না—রাগ করবেন না স্যার, চোখে আজকাল সব ভাল দেখতে পাই না, কি করব বলুন!

সেদিন মঙ্গল চক্রবর্তীর অর্ডার শুনে পাণ্ডে যেন কতই চিন্তা করছে এরকম একটা ভংগী করে অবশেষে নিবেদন করল—মিশকালো চাইছেন স্যার? আছে একটা। তবে খরচাটা বেশী পড়বে—

—কত?

—দেড়শোর মত?

—ভাট্—মঙ্গল চক্রবর্তী চটে গিয়ে বললেন—দেড়শো টাকায় কালো ভেড়ার গুষ্ঠিসমেত কেনা যায় সে খবর রাখো?

—উঁহু, আমার ভাবতে এই একটাই নিখুঁত বিড়াল আছে স্যার, আসানসোলের এক সাহেব বাড়ীতে। যদি বলেন তো চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—একদম কালো বিড়াল?

—কুচকুচে কালো স্যার। পাছে কয়লা ভেবে কেউ উনুনে গুঁজে দেয় এই ভয়ে তো স্যার মেমসাহেব ওটাকে একদম কাছ ছাড়া করে না।

—বটে! মঙ্গল চক্রবর্তী ব্যাপারটা উপভোগ করতে করতে বললেন—বেশ, নিয়ে এসো। এক ফোঁটা অন্য রং হলে কিন্তু তোমার জরিমানা হবে—

পাণ্ডে চলে গেল সেলাম বাজিয়ে।

তারপর নির্ধারিত দিনে ফ্লোরে এসে বলল—মাল এনেছি স্যার।

—কই দেখাও।

একটা বাক্সের ডালা খুলে পাণ্ডে দেখাল, বাস্তবিক মিশকালো একটা মাঝারি সাইজের বিড়াল, আতংকে জুল জুল চোখে তাকিয়ে ল্যাজ গুটিয়ে সেঁটে বসে আছে। ম্যাও করার ক্ষমতাও যেন তার লোপ পেয়েছে।

পাণ্ডে বলল—বড় হুজ্জোৎ করে তবে আনতে হয়েছে স্যার। মেমসাহেব কিছুতেই ছাড়ছিল না, নগদ কিছু ছাড়তে তবে দিয়েছে। সাহেববাড়ীর মাল, আরামে থাকে, গরমে কেমন যেন ঘেবড়ে গেছে।

পরিচালকের নির্দেশিত জায়গায় বিড়ালটিকে বসিয়ে দিয়ে পাণ্ডে সবাইকে অনুরোধ করল, এটার গায়ে কেউ হাত দেবেন না। আমায় বলবেন, যা করবার আমিই করব—

বলে পাণ্ডে কিছুদূরে একটা বেঞ্চিতে উবু হয়ে বসে রইল। বিড়ালের ধারে-কাছে কাউকে ঘেঁষতে দেয় না।

এখন হয়েছে কি, সব স্টুডিওতেই কিছু কিছু বেওয়ারিশ নেড়ি কুত্তা থাকে, তাদেরই একটা গন্ধে গন্ধে ফ্লোরে এসে হাজির। পাণ্ডে তখন সম্ভবতঃ অন্যামনস্ক ছিল, কুকুরটি বিনা নোটিশে ন্যাজ নাড়তে নাড়তে এসেই বিড়ালটিকে বিরাট এক ধাঁক—আর যায় কোথা, বিড়ালটি আতংকে দিশেহারা হয়ে দে এক লাফ—সটান এক ভদ্রলোকের কোলে। সে ভদ্রলোক গিলে করা পাঞ্জাবি-ধুতি পরে এসেছিলেন শুটিং দেখবেন বলে, হঠাৎ বিড়ালটি তার কোলে অমন হুমড়ি খেয়ে ল্যাণ্ড করবে এটা তিনিও ভাবতে পারেননি। ফলে তিনিও তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই—এঃ হে, গোটা পাঞ্জাবি-ধুতি ভুষো কালিতে মাখামাখি যে—কি ব্যাপার দাদা?

মাল তৎক্ষণে পুরোদস্তুর কাচ। আসলে বিটকেল রং-এর এক বিড়ালকে ভুষো কালিতে চুবিয়ে ব্ল্যাক ক্যাট করা হয়েছে, পাণ্ডেরই কীর্তি, ভাগ্যিস শটের আগে ধরা পড়ে গেছে, মঙ্গল চক্রবর্তী রেগে আগুন হয়ে বললেন, ডাকো তো পাণ্ডেকে—

কিন্তু পাণ্ডে কি আর তখন রঙ্গভূমিতে থাকে? বিপদ বুঝে সে বহু আগেই কেটে গেছে কালো বিড়ালের দরুন প্রাপ্য টাকার মায়া ত্যাগ করেই।

এই গেল, আর একবার ভোলানাথ শিবঠাকুরকে নিয়ে একটা ছবি উঠছে, পরিচালক পাণ্ডেকে ডেকে বললেন—পাণ্ডে একটা আসল ময়াল সাপ দিতে পারবে? শিবঠাকুরের গলায় বেড় দিয়ে ঝুলবে—

পাণ্ডের কখনও না বলে কোন কথা নেই, তৎক্ষণাৎ বলল, নিশ্চয় পাবেন, এতো খুব সামান্য রিকুইজিশান, তবে একটু বেশী খর্চা পড়বে—

পরিচালক বললেন—পাবে।

পাণ্ডে সেলাম করে গেল গড়িয়ার দিকে। ওদিকে নাকি বেদেপাড়া আছে।

দুপুর নাগাদ বিরাট আওয়াজ করতে করতে একটা টেম্পো ঢুকলো স্টুডিওতে। সংগে পাণ্ডে। সবাই খবর পেয়ে ভীড় করল।

প্রথমে টেম্পো থেকে নামল বিরাট একটা বাকস। সেটা খুলতেই একটা ময়ালের দর্শন পাওয়া গেল, জিলিপির মত প্যাঁচ এঁটে পড়ে আছে।

পাণ্ডে হেসে বলল—এক নম্বর জিনিস স্যার, পাহাড়ী ময়াল—

শিব ঠাকুরের ভূমিকাভিনেতা স্বয়ং এসেছিলেন ব্যাপারটা দেখতে। ময়াল দেখে ওঃ তার কি উৎসাহ—হ্যাঁ, এই রকম একটা জন্তুর গলায় না ঝুললে কি অ্যাকটিং করে মজা পাওয়া যায়! বাঃ, খাশা হয়েছে—

বলে শিবঠাকুর মেকআপ রুমের দিকে গেলেন মেকআপ টাচ করতে, ব্যাস, তিনি বেপাত্তা। শটের সময় তাঁর খোঁজ পড়তে জানা গেল তিনি নেই। তিনি পোষাক বদলে স্টুডিওর পেছনের দেওয়াল টপকে কেটে পড়েছেন, রেখে গেছেন একটা ছোট্ট চিঠি—

মহাশয়,

অতঃপর এই ছবিতে আমি পার্ট করিতে অক্ষম। একটি জ্যান্ত ময়াল সর্প গলায় ঝুলাইয়া আমি কিছুতেই অভিনয় করিতে পারিব না কারণ তাহাতে আমার পত্নীর নিষেধ আছে...!

পরিচালক যেন দায়ে পড়লেন—ধ্যাঃ এখন কি উপায়?

পাণ্ডে সিচুয়েশন বুঝে বলল—ভাল কমিশন যদি দেন তো আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—অর্থাৎ?

—আমি শিববাবুকে ফেরৎ নিয়ে আসতে পারি।

—বটে! বেশ, সত্যিই যদি পারো তো একশো টাকা নগদ পাবে—

পাণ্ডে তৎক্ষণাৎ শিবঠাকুরের ঠিকানা লিখে নিয়ে ছুটল। ঘণ্টা দুই বাদে বাস্তবিকই শিবঠাকুরকে নিয়ে সে ট্যাক্সি থেকে নামল স্টুডিওতে। হাসি হাসি মুখ।

সোমা দে / ফটো ঃ অমৃত

...দকে ত্যাকাস থেকে নেমে শিবঠাকুরের
ক চনমনে ভাব। উৎফুল্ল কন্ঠে তাকে
ত শোনা গেল কই, আনুন দেখি কোথায়
নাজের সেই ময়াল না গোখরো সাপ,
র ওজনটা কত একবার দেখি—

কি অবাক কান্ড, শিবঠাকুর গভীর
চল্যের সংগে সেই অর্ধমৃত ময়ালটিকে
। ঝুলিয়ে অতঃপর পরের পর শট
ন কোথাও কোন গন্ডগোল হল না।
শেষ করে তবে তিনি বাড়ী গেলেন।

শুটিং প্যাক আপ হবার পর সবাই
কে তারিফ করে বলল—নাঃ, তুমি
বাস্তবিক মিরাকল কান্ড করলে।
শিবঠাকুরকে কি করে রাজী করালে?

পান্ডে প্রথমত বললতেই চায় না শেষে
র বিশেষ পীড়াপীড়িতে সলজ্জ
ত বলল—রাজী আমি করাইনি
মিথ্যে কেন বলব রাজী করিয়েছে
। এক পাঁট বেঙ্গল পেটে পড়তেই
ম করে রাজী হয়ে গেলেন। এবার
র আমার ন্যায্য কমিশনটা...

টা ছবিতে ক্যাবারে ড্যান্সের সেট
। কিছু নিগ্রো সেলার চাই।
অর্ডার দিতে সেদিন বিকালেই সে
রের জাহাজঘাটা থেকে হাফ ডজন
। এনে হাজির স্টুডিওতে।

ন স্যার বেছে নিন যে কটা চাই
ব।

লকের সহকারী বলল—ওদের
ও ডিরেকটার এখন শুটিং করতে
ক আপের পর ওঁকে একবার
ব। পান্ডে পাঁচজন অসুর নিয়ে
ঢুকল আবার ইঙ্গিতে ওদের
থানে মুখে ছিপি এঁটে একটু
এক্ষুনি আসছি।

বাইরে এসে চায়ের কাপটা হাতে
র হঠাৎ একটা আর্তনাদ, কি
ফ্লোরের মধ্যে হিরোইন হঠাৎ ভয়ে
র হয়ে গেলেন। সবাই পান্ডেকে

তড়িৎগতিতে ফ্লোরে ঢুকতে
মিলে বিরাট তম্বি;—তুমি কেমন
হ ফ্লোরের মধ্যে ছ'ছটা যমদূতে
। মজা দেখছিলে নাকি?

অবাক। —আমার তো কোন
স্যার—

আপ। হিরোইন অজ্ঞান হচ্ছে
কোন কসুর নেই?

না গেল দোষটা নিগ্রোদের।
দুটি উঠে গিয়েছিল নায়িকার
দেখবার জন্যে। হিরোইন
তাঁর দিকে ছটি মিশকালো
আসছে ব্যাস চীৎকার পতন
৭ৎ!

শুধ পান্ডে গেল নিগ্রোদের
পটিয়ে বিদেয় করাতে কিন্তু
তেই যেতে রাজী নয় ওরা

আরও শুটিং-এর মজা দেখতে চায়।
পান্ডে চোখ পাকাতেই ছজন নিগ্রো এক-
যোগে গিলিগিলি সহকারে এট্টু হেড হান্টিং
ড্যান্স দেখিয়ে দিল। তাতে পান্ডেরও
অবস্থা কাহিল। শেষে পুলিশকে ফোন
করতে তারা এসে অবস্থা আয়ত্বে আনল

উঃ! সে ছবির ক্যাবারে নেত্য শেষ অবধি
নিগ্রো সেলারদের বাদ দিয়েই পিকচারাইজ
করা হয়েছিল। আর কোন নিগ্রো রিকস
নেওয়া হয়নি।

পান্ডের ম্যাকসিমাম যে কীর্তি সেটা
এবার বলিঃ

একবার রাত্রে একটি বাংলা ছবির শুটিং
চলছে ট্রাম ডিপোর লাগোয়া ইন্দ্রপুরী
স্টুডিওতে। পান্ডে দুনিয়ার সব কাজ শেষ
করে বাড়ী ফেরার পথে একবার ফ্লোরে এসে-
ছে এটা জানতে যে কোন এক্সট্রার
দরকার আছে কিনা। সহকারী পরিচালক
পান্ডেকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে

[illegible] হ্যাঁ [illegible] আমি এতক্ষণ তোমার খোঁজ করছিলাম—

—বলুন স্যার।

সহকারী পরিচালক তার [illegible] দিল। —দুজন ষণ্ডাগণ্ডা চেহারার পুলিশ চাই হে পাণ্ডে। দিতে পারবে এক্ষুনি?

—[illegible] পারব। তবে রাত [illegible] জন্য ডবল চার্জ।

—তাই পাবে।

—[illegible] না [illegible]

—[illegible]।

[illegible] পাণ্ডে তৎক্ষণাৎ ছুটল [illegible]। দুজন কণ্ডাক্টর [illegible] করছিল। পাণ্ডে ছুটে গিয়ে তাদের হাতের [illegible] স্টুডিওতে। কস্টিউমম্যান কার্তিককে পাণ্ডে বলল—এদের দাদা একটু সাজিয়ে দাও, [illegible] পুলিশ।

কার্তিক [illegible] সাজিয়ে দিল।

মেকআপম্যান বিনা বাধাবাধায় [illegible] বসিয়ে দিল একটা [illegible] গোঁফ। দেখে পাণ্ডের কি তারিফ। [illegible] মানিয়েছে ভেইয়া। একেবারে আসল পুলিশ [illegible] দিচ্ছে—

দুজনের অমনি মোচে তা পড়ল। [illegible] পড়বে।

অমানুষ / শর্মিলা ঠাকুর ও উত্তমকুমার। ফটো : অজন্ত

[illegible] যেতে সহকারী বলল—এখন নয় বাইরে বেঞ্চিতে বসতে বল আমি সময় মত ভেতরে ডেকে নেব। এখনও মার্ডার সিন শেষ হয়নি—

পাণ্ডে তখন ওদের বলল— তোমরা ভেইয়া এই এখানে একটু বসো আমি চট করে একটু ফাঁড়ির মোড় থেকে ঘুরে আসছি।

ওরা বশংবদের মত ঘাড় নাড়ল।

পাণ্ডে সাবধান করল—কোথাও সটকে যেও না ভাই। তাহলে কিন্তু কেলেঙ্কারী। রাত কাবার হলেই নগদ পাঁচ টাকা মনে থাকে যেন।

বলে পাণ্ডে নিশ্চিন্ত মনে বেঞ্চাল টানতে গেল রাত তখন সবে এগারোটা। আর ফিরল যখন তখন পাণ্ডে রীতিমত টেনে। একটু আদি রসাত্মক গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে রাত দুপুরে ফিরতে ফিরতে হঠাৎ মস্তকে যেন বজ্রাঘাত। একি: [illegible] পেঁ পেঁ করে বলে এলাম স্টুডিওর বসে থাকতে আর কিনা এখানে এই ট্রাম ডিপোর চাতালে এসে চেঁশে ঘুম মারা হচ্ছে?

নির্জন ফাঁকা রাস্তা।

পাণ্ডে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ছুটে গিয়ে কনেস্টবল দুটির শার্টের কলার ধরে এক হ্যাঁচকায় টেনে তুলে ফেলল—তু লোককো শরম নেই যে এহি নিন্দে যাচ্ছে? চল—

আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ওদিকে কনেস্টবল দুটিরও খুব খারাপ অবস্থা। ওরা বিরাট বিরাট আপত্তি করতে লাগল কিন্তু তাদের কথা গ্রাহ্য করার সময় কোথায় পাণ্ডের। মুখ দিয়ে তখন খিস্তির খেউড় ফাটছে—চল চল পৈসা মুফৎ সে মিলি? অ্যাঁ? ফিরছিলি বাড়ী ধরে নিয়ে এসে পাঁচ টাকার কাজ ধরিয়ে দিলাম একটা কোন পরিশ্রম নয় কিছু নয় অথচ দেখ কি রকম ঢোঁটিয়া লোক এরা চল স্টুডিওতে ফাঁকি দিয়ে ঘুম দেওয়া আজ বের করছি—

ওরা দুটিতে যত আপত্তি করে পাণ্ডে ততই চটে। এই করতে করতে পাণ্ডে ওদের সজোরে কলার ধরে টানতে টানতে একদম স্টুডিওতে এসে হাজির। [illegible] ঢুকেই তার চক্ষু ছানাবড়া। দেখে [illegible] পুলিশ দুটো যথাপূর্ব সেই বেঞ্চিতেই বসে ঢুলছে। পাণ্ডে বুঝল কেলেঙ্কারী ঘটতে আর বাকী কিছু নেই। ভুল করে সে আসল দুজন পুলিশ কনেস্টবল ধরে এনে ফেলেছে। এবার যে ওর ছাল চামড়া উঠবে। কি করা? আসল কনেস্টবল দুটি তখনও সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেনি। ব্যাস পাণ্ডে আর কোন কথা নয়। 'হুপ' শব্দে বিরাট এক লাফ মেরে টেনে হাওয়া। পুলিশ দুটি চোখ ফেরাবার আগেই পগার পার।

নকল কনেস্টবল দুটিও অবাক। একি আরও দুজন লোক ছবিতে নামবে নাকি? আসল কনেস্টবল দুটির রাগের ঝাল তখন যে ওদের দুজনের ওপরই বর্তেছে তা বুঝতে পারেনি। পারল যখন কেসটা আরম্ভ হল।

পাণ্ডে এরপর দীর্ঘদিন টালিগঞ্জ মুখো হয়নি।

—[illegible]

ওঁরা বলেন

রবি ঘোষ

ম হাসির শুরু কবে থেকে, কে-ই বা
া কমেডিয়ান?

। খুব জটিল প্রশ্ন। তবে শিল্পের
; হয়—যবে থেকে মানুষ মিমিক্রী
রম্ভ করে। অর্থাৎ শিকার করে পশু
 আনত খাবার জন্য এবং সন্ধ্যা-
া সবার সামনে সেই শিকারের
টা বলত। এই বলার ভঙ্গিমাটা
ই অভিনয়-শিল্পের শুরু হয়।
য়ই হাসিও সেই সময় থেকেই
াগতভাবে আসছে ধরা যেতে পারে।
কমেডিয়ান কে মনুষ্য সমাজে, তা
র পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে
' মুনিকে যদি প্রথম দার্শনিক
য়ান বলি তবে কি ভুল হবে?
 হাস্যরসের প্রয়োজন কতটুকু
করে বাংলা ছবিতে?

াতটুকু পরিচালক মনে করেন। যদি
পুরোপুরি হাস্যরসকেই ঘিরে
হলে সর্বক্ষণই দরকার। তবে
মতে হাসি ব্যাপারটা লিমিটেড
াদের মধ্যে যারা ইকোনমিক্যালি
া। আমাদের দেশে কান্নাটাই বেশী
। কারণ কান্নাটা এখানে একটা
হিসেবে চলে আসছে। আমরা
গও পেয়েছি কেঁদে-কেঁদে,—
।

অর্থ আপনার কাছে কি? এবং
অর্থে আপনি নিজে কি
ন?

—কমেডী একটা ফর্ম। এই ফর্মটা থিয়োরীর দিক থেকে যদি ফলো করা যায় তাহলে আপনি চ্যাপলিন হতে পারেন। আর যদি কমেডি মানে বোঝেন একটু লোককে হাসানই তাহলে বম্বের রাস্তায় যেতে হবে। শ'-এর একটা কথা আছে হাস্যরস সম্পর্কে—

"Any fool can make an audience laugh—but see how many of them are in a melting mood."

শেষের অর্থে আমি নিশ্চয়ই একজন কমেডিয়ান।

: কোন হাসি-কান্না হয় কোন কান্না হাসি এবং কখন?

—এটা কিন্তু খুব ধোঁয়াটে প্রশ্ন। তবুও যখন জিজ্ঞাসা করা হোল তখন বলি। যখন আমাদের দেশের নেতারা হাসতে হাসতে বলেন যে—ভারতবর্ষে কারও কোন অভাব নেই,—বা আমরা প্রায় গরীব হটিয়ে ফেলেছি,—তখন আমি প্রায় কেঁদে ফেলি। যদি কোন ধনীর ছেলে দুপাত্র মদ্য পান করার পর তার দুঃখের কথা বলতে সুরু করেন কেঁদে কেঁদে তখন আমার খুব হাসি পায়। প্রথমেই বলেছি যে হাসি বা কান্না এই দুটোই ফর্ম। এখন যে যেটাতে বিশ্বাস করে।

: আজকের দিনে সবচাইতে হাসির ব্যাপারটা কি?

—আমার মতে বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকতে হলে যে সারাজীবন ধরে কত রকম কা[illegible] কি করতে হয় সেটা ভাবলে আমার সব-চাইতে বেশী হাসি পায়। যেমন ধরুন, আমি যদি বলি ভারতবর্ষ একটা সত্যিকার গণতান্ত্রিক দেশ—তাহলে আপনার খুব হাসি পাবে না। বা ধরুন যদি কেউ বলে ভারতবর্ষে সবাই খেয়ে পরে বেঁচে আছে,—তাহলে আপনার হাসি পাবে না।

: চারদিকে অভাব, ভেজাল আন্দোলন—হৈ-চৈ, বলুন তো এ অবস্থায় কোন কোন হাসি বৈধ?

—যে অবস্থার কথা বললেন সেখানে হাসি আদৌ আসা উচিত নয়। কেননা হাসিতে মানুষকে আনন্দ দেওয়ার চাইতে অন্য উদ্দেশ্য এখানে প্রবল থাকে। চতুর্দিকে যখন এত ভেজাল তখন আমি হাসাতে হাসাতে একটা কথাই বলতে পারি,—"Come revolt."

: হাসির অভিনয় করতে গিয়ে চোখে জল এসেছে কখনো?

—এগুলো খুব মনস্তাত্ত্বিক চিন্তার কথা। হাসাতে গিয়ে কাঁদব কোন দুঃখে। তবে মাঝে মাঝে এমন জঘন্য অভিনয় করতে হয় যে তখন প্রায় চোখ দিয়ে জল [illegible] যায়। আমাদের [illegible] একটি [illegible] হয়েছে ফিল্ম জগতে,—কমার্শিয়াল ছবির

সময়। সবাই বলছে কমার্শিয়াল ছবি বানাও। কেউ বলছে না—ভাল ছবি করো।'

ঃ ইন্দিরা ব্যক্তের? জরুরী অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য কি?

—এ প্রশ্নটার জবাব আমি দিলাম না। এগুলো সম্পূর্ণ একান্তভাবে নিজস্ব ব্যাপার। সুতরাং আলোচনা করলাম না।

ঃ সম্প্রতি নারী কল্যাণ পরিষদ দাবী করেছেন বিবাহিত মহিলাদের মত বিবাহিত পুরুষদেরও কোনো সাংকেতিক চিহ্ন বাধ্যত হবে?' এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

—মহিলাদের ব্যাপারে আমার কি কোন কথা বলা উচিত? এখন মহিলাদের যুগ চলেছে। তাঁরা যা বলবেন তাই আমাদের শুনতে হবে। যদি বিবাহিত পুরুষদের একটা চিহ্ন থাকলে মহিলাদের কোন সুবিধা হয় তাহলে হোক না। তবে আমার একটাই প্রশ্ন,—চিহ্নের জন্য কি কিছু আটকাবে?'

ঃ আজকের ভারতবর্ষের অবস্থা কতখানি হাস্যকর?

—আমার মনে হয় এ প্রশ্নের জবাব আগেই দিয়ে দিয়েছি। তবে ভারতবর্ষের পুরো ব্যাপারটাই হাস্যকর বর্তমানে। এই যুগটাকে বলা যেতে পারে—'মাস্তান যুগ।' 'মাস্তান যুগে' কোন সীরিয়াস কাজ হওয়া ত সম্ভব নয়।

ঃ তেহরানে ভারতীয় খেলোয়াড়রা যে ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখালেন তা হাসির খোরাক না দুঃখের?

—আবার খেলাধূলার সম্বন্ধে আমায় বলতে বলছেন কেন? তবে আমরা slow and steady wins the rates এ বিশ্বাস করি। তাই তাড়াহুড়োর ব্যাপার হলেই আমরা কাৎ। তেহেরাণে কেন,—কোন 'ঘ্রাণেই' আমরা নেই। আমরা বর্তমানে রাণ আউট।

ঃ কৌতুক চরিত্রে অভিনয়ের শুরু আপনার কবে থেকে?

—আমার অভিনয় শুরু এল টি জি অর্থাৎ লিটল- থিয়েটার গ্রুপ যেদিন থেকে শুরু হয়। আমি প্রথম অভিনয় করি 'সাংবাদিক' নাটকে। আমার অভিনয়ের সময় ছিল মাত্র এক মিনিট স্টেজে। একজন হকারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। প্রখ্যাত পরিচালক মৃণাল সেন তখন সাংবাদিক। তিনি আমার ঐ সামান্যতম অভিনয়ের জন্য কাগজে অনেকখানি লিখেছিলেন এবং আমার মতে ঐটাই আমার প্রথম স্টেজে কমেডি অভিনয়।

ঃ বাংলায় কি যথার্থ কমেডি ছবি হয়েছে এপর্যন্ত? নাম বলুন। না হলে কারণটা কি?

—নিশ্চয়ই হয়েছে। প্রথম নাম করা যেতে পারে—গুজত-জয়ন্তী। দ্বিতীয় বরযাত্রী। তৃতীয়—পরশ পাথর। তারপরে একটু বাড়াবাড়ি হলেও বলতে হবে আমার ছবি—সধু যুধিষ্ঠিরের করচা'। হয়ত হাসির ছবি অনেকই হয়েছে,—কিন্তু সেগুলো নিছকই হাসাবার জন্য। ছবির মধ্যে যদি কতকগুলো টেকনিক্যাল গুণাগুণ দেখতে না পাওয়া যায় তাহলে সেগুলো ঠিক আলোচনার মধ্যে পড়ে না। আমাদের একটা ধারণা আছে যে হাসির ছবি মানেই হচ্ছে একটা এলেবেলে ব্যাপার। কিন্তু সত্যজিৎবাবুর মতে একটা পরিচ্ছন্ন হাসির ছবি করা সবচেয়ে শক্ত। বিলি ওইল্ডারের মত পরিচালক বলেন,

—"To make a comedy film is more challenging."

ঃ হাস্যরসকেও বাস্তব সমস্যা প্রকাশের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যায় এটা কি সত্যি? সেরকম কোনো চেষ্টা বাংলা ছবিতে হয়েছে কি?

—প্রায় একশ ভাগ সত্যি। চার্লস চ্যাপলিন সমস্ত বুর্জোয়া সমাজটাকে ব্যঙ্গ করে গেছেন হাস্যরসের ভেতর দিয়ে। ব্যঙ্গ করতে গেলেই আপনাকে হাসির আশ্রয় নিতে হবে। তখন সেটা হয়ে যাবে ব্যঙ্গরস। থিয়েটারে বর্তমানে দেখুন না—উৎপল দত্ত কী কান্ড করছেন। শ্রেফ হাসির মাধ্যে দিয়ে একটা দেশের বা সমাজের বিকৃত চেহারাটা তুলে ধরেছেন। হাস্যরসের মাধ্যমে বলা যায় না এমন কোন ঘটনাই নেই। তবে প্রশ্ন হোল আপনাকে কতদূর বলতে দেওয়া হবে। বাংলা চিত্রজগতে আমার মতে একমাত্র 'পরশ পাথরে' সমাজের খানিকটা চেহারা দেখতে পেয়েছিলাম।

ঃ পৃথিবীর সর্বকালের সেরা কমেডিয়ানের নাম করতে পারেন?

—নিশ্চয়ই। চার্লস চ্যাপলিন যিনি শুধু কমেডিয়ান নন,—একজন মহান দার্শনিকও বটে। চ্যাপলিন হচ্ছেন একটা ট্র্যাডিশান — চ্যাপলিন একটা ইনস্টিটিউশন —চ্যাপলিন হচ্ছে একটা ফর্ম— চ্যাপলিন হচ্ছে একটা কনটেন্ট।

ঃ অভিনয়ের ক্ষেত্রে আপনার কোনো গুরু আছে কি? কে তিনি?

—গুরু হোল যাঁকে আমি মনে মনে স্মরণ করি। সেটা যে কে তা আমি নিজেই জানি না। তবে অভিনয় শিক্ষা সুরু হয় আমার এল টি জি-তে শ্রীউৎপল দত্তের নির্দেশনায়। অভিনয় শিক্ষাগুরু বলতে উৎপলদাই আমার গুরু।

ঃ ছবিতে কৌতুক চরিত্র সবসময় রিলিফ চরিত্র হিসাবে, একথা আপনি মানেন?

—গতানুগতিক ছবিতে কৌতুক ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর। একটা কথা আমাদের ছবিতে খুব চালু আছে, সেটা হোল একটা রিলিফ চরিত্র। কমেডি সাধারণভাবে আমাদের ছবিতে একটা সংযোগকারী চরিত্র হিসেবে ব্যবহার হয়। সবাই মনে করেন তিনি একটা খুব গুরু-গম্ভীর ছবি করবেন। তারপরই দেখতে পান সে গুরু ভাবটা আর বজায় রাখা যাচ্ছে না —এবং তখনই দরকার হয় রিলিফের। কমেডির ব্যবহার ব্যাপারে অর্থে এই রকমই আমাদের বেশ ভাগ ছবিতে। যদি কখনও কোন পরিচালক বলেন যে ক্যারেকটার কমেডি রোল বানাতে পারেন না,—তিনি হয় বুঝতে পারেন না, অথবা এড়িয়ে যান। এই জঘন্য চিন্তাধারাটা এসেছে আমাদের ফিউডাল হ্যাংওভার থেকে। এখনও আমরা জমিদারদের রুচি কাটিয়ে উঠতে পারি নি।

ঃ তানসেন নাকি গান গেয়ে বৃষ্টি এনেছিলেন আপনি হাসিয়ে কি আনতে পারেন?,

—এ প্রশ্নের কোন উত্তর হয় না।

ঃ আপনার মনমত চরিত্র পাচ্ছেন? না পেলে নিচ্ছেন কেন?

—সব সময় পাই না নিশ্চয়ই। অবশ্য কথা বলতে পাইও কদাচিৎ। তবুও অ্যাকটিং করতে হয় এই কারণে যে অন্য কিছু আর করার নেই বলে।

ঃ রবি মানে তেজ, আপনার তেজের গোপন কথা কি?

—রবি মানে যে তেজ বোঝেন সে তেজ আমার নিশ্চয়ই নেই। যদি থাকত তাহলে এখানে পড়ে থাকতাম না। থাকলেও এখানে ঝড় তুলে ফেলতাম। আমি যে রবি

সে রুচি লোককে সামান্য আনন্দ দিতে পারে,—ভেঙে চুরমার করতে পারে না। করতে পারলে আনন্দ পেতাম।

পরলোকগতা স্ত্রীর কথা নিশ্চয়ই মনে পড়ে আপনার অনেক সময়—তখন কি করেন আপনি?

এই প্রশ্নের জবাব আমি কোথায়ও কখনও দি না। মানুষের মন খুবই বচিত্র। মনটা যে কখন কোথায় কিভাবে চাজ করছে সেটা যদি বুঝতে পারতাম তাহলে আমি একজন মহাপুরুষ হয়ে যেতাম। আমার জীবনে প্রায় সব প্রিয়-নই আজ পরলোকে। সুতরাং তাদের ধা মনে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক। স্ত্রীব থাটা কখন কি ভাবে মনে পড়ে সেটা বলাই ভাল। তবে সে যদি আজ কাছে কত তাহলে মনের জোরটা অনেক শী হোতো। কাউকে শুধুমাত্র স্মরণ া ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই।

নেমা ও থিয়েটার শিল্প মাধ্যম াবে কোনটা বেশী শক্তিশালী—এবং ানি, কোনটায় কাজ করে বেশী ন্দ পান?

া আলাদা মিডিয়াম। কোনটার সংগে টাকে মিলিয়ে দেওয়া যায় না। তবে হয়:—

–"Actor is the king on the ge"— এবং —"Film is essenti- a Director's media."

াং অভিনেতার আনন্দ অনেক বেশী । সোজাসুজি দর্শকের প্রতিক্রিয়া াটা ভীষণ জিনিস। ফিল্মে যদি ্টর অভিনেতাকে ব্যবহার না করেন । তার কিছুই করার নেই; কিন্তু অভিনেতা একবার অ্যাপিয়ার পারলে সবটাই তখন তার মুঠোয়। দুটো মিডিয়ামই ভাল লাগে। দুই তই অভিনয় করে আমি আনন্দ আসলে অভিনেতাকে তার ামটাকে প্রথমে বুঝতে হবে। না য কোন কাজ করাটাই মুর্খামি,,—
?

অভিনয় ও কৌতুকাভিনয়ের র্থক্য আছে কি এবং কোথায়?

পার্থক্য আছে। সেটা বিশদ-াতে গেলে এখানকার জায়গায় া। তবে একটা কথা বলছি সেটা । কোন ভাল অভিনেতার মান য় তার কমেডি অ্যাকটিং দেখে। অ্যাকটিংয়ে প্রচন্ড টাইমিং-এর লা আছে। এই সময়জ্ঞানটা া থাকলে কিছুই দাঁড়াবে না। রনের কমেডি অ্যাকটিং আমাদের ানো হয় সেটা খুবই বাজে। কমেডি অ্যাকটিং বলতে ট্র্যাডিশনটা ধরেই বলছি।

—নির্মল ধর

অপর্ণা সেন, রবি ঘোষ, অনুপকুমার, চিন্ময় রায়, রঞ্জিত মল্লিক।

ছুটিটুকু থাক/জয়শ্রী রায়
পরিকল্পনা : রঞ্জন মজুমদার
ফটো : অমৃত

ঠোকর

অবাস্তব কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত কাহিনীর—উপভোগ্য চিত্রেপ!

প্রযোজনা : মুভি টেমপল

দিলীপ বসু বোম্বাইয়ের হিন্দী ছবির অনুকরণে কলকাতায় স্যার ম্যাডামের ছবি করেছেন কিন্তু বম্বে গিয়ে 'তাসের ঘর' এবং বৌদি ছবির সংস্করণের মাধ্যমে হয়তো বাংলা ছবির সরেজে ধরতে চেয়েছেন কিন্তু এই ছবিতে যে উদ্ভট কাহিনীকে কেন্দ্র করে ছবির পরিচালনা করেছেন সে জাতীয় মেলোড্রামা বম্বের ছবিতে হামেশাই দেখা যায়।

গ্রামের মধ্যে সৎ ও সাহসী ছেলে হোল শামু, আচমকা তার কাছে খবর এল গ্রামের এক কুচক্রী ব্যক্তি গংগু নিষ্পাপ কিশোরীর উপর অত্যাচার করায় সে আত্মহত্যা করে অব্যাহতি পেয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গংগু ও শামুর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এই বিরোধে গঙ্গুকে আহত করার জন্যে শামুর জেল হয়। জেল থেকে ফিরে এসে গ্রামের নানা উন্নতিমূলক কাজের মধ্যে আত্মনিয়োগ করে। গ্রামেরই যৌবনময়ী তরুণী শামুকে মনে-প্রাণে ভালবাসে কিন্তু শামুর সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। তার নিজের বোন রাধা এখন যুবতী, তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, কিন্তু এক অন্ধ তরুণীকে কে বিবাহ করবে?

ার শহরের প্রখ্যাত চক্ষুবিশারদ
ক গ্রামে এলে শামু তাকে রাধার
পরীক্ষা করতে বলে, পরীক্ষা করে
যায় যদি শহরে গিয়ে রাধার
র অপারেশনটা করা যায় তাহলে
চোখ ভালো হয়ে যাবে। এর জন্যে
পড়বে পাঁচ হাজার টাকা। অনেক
রাধ উপরোধ ও ধার চেয়েও কারো
থেকে পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ
পারলো না শামু। তখন চাকুরীর
। শহরে কাকা (ব্যান্ড মাস্টার)
ালের কাছে গিয়ে জানতে পারলে
শ্যামলাল স্মাগলিং করে প্রচুর
। অধিকারী, পুলিশের কাছে
ধরিয়ে দিয়ে ৫০০০ টাকা
চর পায় শামু। এই টাকা দিয়ে
। চিকিৎসার জন্যে বোনকে
অশোকের চেম্বারে নিয়ে এলো
ও তার দলবল সেই ৫০০০
ই করে নিয়ে যায়। অশোক বিনা
চোখের চিকিৎসা করে চোখের
ফিরিয়ে দিল রাধার। শামু
ন্যে ডাক্তার অশোককে বললে—
বিন সে কৃতজ্ঞ থাকবে বিনা অর্থে
বোনের চিকিৎসা করে চোখের
ফিরিয়ে দেবার জন্যে। সে
া করলে প্রয়োজন হলে অশোকের
আত্মত্যাগ করতে দ্বিধা বোধ
না। অশোক উচ্চশিক্ষার জন্যে
বিদেশ যায়। সেই সুযোগে তার প্রণয়ী (সীমার) র মা অসৎ শার্দুলালের সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক করে ফেলে। অসৎ শার্দুলালের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সীমা শামুদের গ্রামে এসে গঙ্গুর খপ্পরে পড়লো। শামু এবারও ঝাঁপিয়ে পড়ে সীমাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো। কিন্তু নিজেই ওঁকে ভালবেসে ফেলে। বিদেশ থেকে ফিরে এসে অশোক জানতে পারলে শামু তার প্রণয়ী সীমাকে বিবাহ করতে চলেছে। কিন্তু সময় উপস্থিত হলে শামু অশোকের জন্যে আত্মত্যাগ করবে—সুতরাং অশোকের সঙ্গে সীমার, বিজলীর সঙ্গে শামুর বিবাহ হয়ে গেল অর্থাৎ মধুরেণ সমাপয়েৎ। আর গঙ্গুও তখন থেকে ভদ্র হওয়ার চেষ্টা করতে থাকে।

অভিনয়ে শামু (বলদেব খোসা), গঙ্গু (যোগীন্দর), সীমা (অলকা) রাধা (সুরেখা), বিজলী (পুনম বিদ্যা) ডক্তার অশোক (শিবকুমার) চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় ব্রহ্মচারী জুনিয়ার মেহমুদ ললিতা চ্যাটার্জী, জেব রহমান, রাজন হস্কর যথাযথ। সংগীতাংশে শ্যামজী ঘন-শ্যামজী তেমন উল্লেখ্য সুর সৃষ্টি করেননি। পরিচালনা বম্বের রুটিন ছবির মতো কলাকৌশলের কাজ পরিচ্ছন্ন।

চিত্রদূত

সেলাম মেমসাহেব প্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায় ও দীপংকর দে
ফটো : অমৃত

করছে। সেই অনুযায়ী তিনি এই ; যে স্টাইল অফ ট্রিটমেন্ট লাইন ন য্য গল্পের মেজাজকে করবে ়। অর্থ-পরম্পরায় সারা ছবির বক্তব্য ন হয়ে উঠবে। আশা হয়, এটুকুই পারি। কারণ ছবি তো কারখানায় হয় না। একটা ছবি কোন কোন নিশ্বাস-প্রশ্বাসে প্রাণময় ও জীবন্ত ঠবে আগে-ভাগে নির্দিষ্ট করে বলা । কী ঘটবে জানি না, কিন্তু কিছু তা জানি। এই প্রকার বোধের তাড়না : পৃথিবীর সৃষ্টিশীল পরিচালকেরা একটি বিশেষ শিল্পের সীমাবন্ধ-অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছেন...।

থম পর্যায়ের শুটিং এগিয়ে চলেছে। 'র ভূমিকায় রূপদান করছেন সন্ধ্যা মন্যান্য ভূমিকায় আছেন : উৎপল গথর চট্টোপাধ্যায়, সন্তু মুখোপাধ্যায়, ভ চট্টোপাধ্যায় সুলতা চৌধুরী, বিশ্বাস, কালী ব্যানার্জি প্রভৃতি। গ করছেন : কে এ রেজা। শিল্প-নায় আছেন : রবি চট্টোপাধ্যায়। পরিচালক: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ীন পিকচার্সের পতাকাতলে নির্মিত ।ই ছবি।

ত শীতে ডুয়ার্সের চা বাগানে ছোট ম্ব ড্রাইভার কেষ্টচরণ বটব্যালকে ‌‍ গোল বেঁধেছিল, তার নিষ্পত্তি হয় নি। এই পর্যায়ে হল না। হবে পর্যায়ে, অকটোবর মাসে। চলতি ; ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর ফ্লোরে যা হচ্ছে এই—অফিসের বড়বাবু বড় পড়েছেন। বড়সাহেবের কড়া হুকুম ই হোক ছোটসাহেব এবং তার না ড্রাইভার কেষ্টচরণকে এক সঙ্গে হাজির করতে হবে। নচেৎ কুড়ি বছরের চাকরী কলমের এক খোঁচায় শেষ করে দেওয়া হবে। ওদিকে ছোটসাহেব এই বলে শাসিয়েছেন যে যদি কোনক্রমে হাটে হাঁড়ি ভাঙে তাহলে আর রক্ষে থাকবে না। জান নিয়ে টানাটানি হয়ে যাবে। মাঝখানে পড়ে বড়বাবু চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক লোকটির প্রাণ যায়-যায়। রাজায় রাজায় ঝামেলা, মাঝে প্রজার যা অবস্থা আর কি...

মনীশ দাশগুপ্তের ক্যামেরা তখন করিডোরে বড়বাবু প্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায় এবং ড্রাইভার কেষ্টচরণের বেশভূষায় ছোটসাহেব দীপঙ্কর দে—দুজনকে ফ্রেমে ধরে রেখেছে। আলো জ্বলছে, লাইটস বার্নিং। অতএব এই মুহূর্তে স্টার্ট সাউন্ড...ক্যামেরা... অ্যাকশন। ঠিক তাই হল। প্রবীণ কুশলী পরিচালক মৃণাল গুহঠাকুরতার নির্দেশমত ওরা সংলাপ উচ্চারণ করলেন শিনাকা ফিল্মসের 'সেলাম মেমসাহেব' ছবির জন্য।

সর্বপ্রথম এ ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে একটানা পনেরো দিন উত্তর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে। ডুয়ার্সের আইভিল টি গার্ডেন্সে, কালীঝোরায় ও ভুটান সীমান্তে। হাল্কা রসের গল্প। লেখক : বিমল সাধু। কেষ্টচরণ বটব্যাল এবং ছোটসাহেব বলা বাহুল্য একই ব্যক্তি, একে নিয়েই যত গণ্ডগোল। কত মজার মজার ঘটনা। চরিত্রের দুটি সত্তাতেই নতুন নায়ক দীপঙ্কর দে অসাধারণ। তার উজ্জ্বল প্রকৃতির বন্ধুর ভূমিকায় শমিত ভঞ্জ একটি বিশেষ ভূমিকায়, একেবারে ডিফারেন্ট রোল। নায়িকা : সোমা দে। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পী : উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, পবিত্র-কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পনির্দেশনায় আছেন : সঞ্জিত সেন।

সম্পাদনা করবেন : রমেশ যোশী। এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালক : অভিজিৎ বন্দ্যো-পাধ্যায়। আশা ভোঁসলের গাওয়া গান পিকচারাইজও করা হয়েছে। প্রধান সহকারী পরিচালক : মিঠু চট্টোপাধ্যায়। ব্যবস্থা-পক : দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়। দীনেশ চিত্রম ছবিখানির পরিবেশন সত্ত্ব গ্রহণ করেছেন।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

ইতিমধ্যে সঞ্জীবকুমারের ক্রেডিটে পঞ্চাশটি ছবি। এই সংখ্যা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর সেক্রেটারী প্রযোজকদের কাছ থেকে একটা একটা করে পঞ্চাশটি স্থির চিত্র সংগ্রহ করেছেন। অনেকেই ধারণা করছেন সঞ্জীব অটো বায়োগ্রাফী লিখছেন। পুস্তকাকারে বের করবেন শীঘ্রই। সেক্রে-টারী জানিয়েছেন—এত তাড়াতাড়ি নয়। সঞ্জীব ভীষণ কিপ্টে। এখন বের করলে আবার একশোটা ছবির সময় বের করতে হবে, তাই ও ঠিক করেছে একবারেই বের করবে।

বিয়ের পর মুমু বম্বে ছেড়ে স্বামীর ঘর করতে বিদেশে চলে গেছে। অনেক অসমাপ্ত ছবির প্রযোজককে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে। সেদিন একজন প্রযোজক জীতেন্দ্রর কাছে দুঃখ করে বৃত্তান্ত বল-ছিলেন। সব শুনে জীতু মৃদু হাসলে, বললে : তখন কত বার করে বললাম মুমুর সঙ্গে আমার বিয়েটা পাকাপাকি করে দিন। পাবলিসিটি স্টান্ট তো অনেক সময় সত্য হয়ে যায়। হলে কত ভাল হত বলুন তো। তাহলে মুমুকে আপনারা এখনও পেতেন।

সিমি বিয়ে করার পর এবং বিদেশে পাড়ি দেবার পর অন্ততপক্ষে কয়েক জনের হৃদয় ভেঙে চুর চুর হয়েছে। কয়েক জনের মধ্যে কনরাড রুকস এবং শশী কাপুরের নাম উল্লেখযোগ্য। কনরাড 'সিদ্ধার্থ' ছবির পরিচালক, শশী, নায়ক। খবর শুনে শশী তো বিশ্বাসই করতে পারে নি। বলেছে : হতেই পারে না। তাও আবার কমলজিতের সঙ্গে, ইমপসিবল। কমল 'সিদ্ধার্থ' দেখেছে। এই ছবি দেখার পর সিমিকে কোনো পুরুষ বিয়ে করতে পারে আমার মনে হয় না। তারবার্তায় রুকসও জানতে পেরে বিস্মিত। সেও মন্তব্য করেছে : হতেই পারে না। এও নিশ্চয়ই পাবলিসিটি স্টান্ট। সিমি যদি বিয়ে করে তাহলে আমাকেই করবে।

সুলক্ষণা পণ্ডিত ওর বাবার সঙ্গে বম্বেতে থাকত। রক্ষণশীল পরিবার। তাই তিনি তার মেয়েকে সব সময়ই আগলে রাখতেন। এখানে যাবে না ওখানে যাবে না। এটা করবে না, ওটা করবে না। সুলক্ষণা মুখে কিছু বলতে পারত না।

ছুটির ঘণ্টা:
মাধবী ও জহর

ক্রমশ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। সে সব বুঝেছিল বম্বে থেকে বাবাকে হাটাতে না পারলে ফিল্মে হিরোইন হবার কোন চান্স নেই। তাই নানা রকমভাবে পলিটিকস করে সুলক্ষণা ওর বাবাকে বম্বে থেকে তাড়িয়েছে। বর্তমানে তিনি কলকাতায় থাকেন। মেয়ে ঠিক তার পর থেকেই বম্বেতে জাঁকিয়ে বসেছে। আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে আছে। কিছু চামচাও হয়েছে। রাজেশ খান্নার অপজিটে কাজ করছে, চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। প্রায়ই সে ফ্ল্যাটে পার্টি থ্রো করছে। অথবা প্রয়োজনে প্রযোজকদের সঙ্গে একান্তে দেখা করছে। প্রসঙ্গত, সুলক্ষণা বলে : আমি গিভ অ্যান্ড টেক পলিসিতে বিশ্বাস করি। এ পৃথিবীতে কিছু না দিলে কিছু পাওয়া যায় না।

কিশোরকুমার, বম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির শ্রেষ্ঠ পাগল। সে অনেক কাজ করে ফেলে যার নাম পাগলামি। যেমন 'বড়তি কা নাম দাড়ি' নামে সে একটা ছবি বানিয়েছে। এই ছবিতে সে একটা নতুন মেয়েকে হিরোইন করেছে, নাম তার শীতল। শীতলকে উষ্ণ করে ছেড়েছে কিশোর। কথা দিয়েছিল ছবি শেষ হলেই বিয়ে করবে। এখন কথা রাখতে পারছে না ফলে শীতল তো উষ্ণ হবেই।

—অভিজিত

স্টুডিও সংবাদ

এবার পুজোয় বেশ কয়েকটি বাংলা ছবি মুক্তি পাচ্ছে। যে ছবিগুলো মুক্তি পাবে তার কাজকর্ম দ্রুত এগিয়ে চলেছে। যেমন 'সুজাতা'—সম্প্রতি এর ডাবিং এবং রিরেকর্ডিং শুরু হয়েছে। মা চণ্ডী চিত্রমের ব্যানারে পিনাকী মুখার্জির পরিচালনায় নির্মিত হয়েছে এ ছবি। সুবোধ ঘোষের বহুপঠিত রচনা। এছাড়া একবার চলচ্চিত্রে রূপায়িত। বিমল রায় পরিচালনা করেছিলেন। হিন্দিতে। এই ছবির নামভূমিকায় মর্মস্পর্শী অভিনয় করেছিলেন নূতন। ওর প্রেমিকার ভূমিকায় ছিলেন সুনীল দত্ত। বাবার রোলটি করেছিলেন তরুণ বোস। এই প্রধান তিনটি ভূমিকা বাংলায় করছেন যথাক্রমে অপর্ণা সেন, দীপংকর দে এবং অনিল চট্টোপাধ্যায়। শশীকলা যে চরিত্রটি করেছিলেন সেটি করছেন সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। এছাড়া আছেন সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় এবং ছায়া দেবী। চিত্র গ্রহণ করেছেন কৃষ্ণ চক্রবর্তী। সম্পাদনা করেছেন : রবীন দাস। পুজোয় রাধা-পূর্ণ-প্রাচী প্রেক্ষাগৃহের আকর্ষণ।

শ্রী ইন্দিরা প্রেক্ষাগৃহে সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে মুক্তি পাবে অগ্রগামী গোষ্ঠীর শ্রদ্ধা নিবেদিত 'সে যেখানে দাঁড়িয়ে'। এখনো ফাইনাল এডিটিং চলছে। রমাপদ চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে তৈরী এই ছবির প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন : কাবেরী বসু, দীপংকর দে, কেয়া চক্রবর্তী, এন বিশ্বনাথন, নবাগত ভাস্কর সেন এবং মহুয়া রায়চৌধুরী। চিত্রগ্রহণ, শিল্প নির্দেশনা, রূপসজ্জা এবং সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে বিশু চক্রবর্তী, সুনীতি মিত্র, অনন্ত দাশ এবং দুলাল দত্ত। চিত্রদীপ ফিল্মসের ব্যানারে প্রযোজনা করেছেন বিমল দে। এ ছবির সংগীত পরিচালক ওস্তাদ বাহাদুর খান। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন : সাগর সেন এবং অরুন্ধতী হোম চৌধুরী।

শক্তি সামন্তের 'অমানুষ'এর বাংলা ভার্সান আসছে পুজোয়। উত্তরা-পূরবী-উজ্জ্বলা চেন-এ। শক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনীতে স্বরচিত চিত্রনাট্যে ছবিখানা পরিচালনা করেছেন প্রযোজক শ্রীসামন্ত স্বয়ং। ব্যানার শক্তি ফিল্মস। ইস্টম্যান কলার ছবি, প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন উত্তমকুমার। অন্যান্য চরিত্রে শিল্পী : অনিল চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, তরুণ ঘোষ, সুব্রত সেনশর্মা, মানিক দত্ত, শম্ভু ভট্টাচার্য, প্রেমা নারায়ণ এবং শর্মিলা ঠাকুর। সুন্দরবনের বিভিন্ন লোকেশনে তোলা এই ছবির আলোকচিত্রশিল্পী অলোক দাশগুপ্ত। সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্র। সর্বসাকুল্যে পাঁচখানা গান থাকছে। গেয়েছেন: কিশোরকুমার এবং আশা ভোঁসলে।

জয়দেব চক্রবর্তী ও মধু বসু প্রযোজিত চলচ্চিত্র সংস্থার রহস্যঘন ছবি 'ছায়াঘেরা রাত'-এর নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায় বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হচ্ছে। শ্রীমতী গীতা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে স্বরচিত চিত্রনাট্যে পরিচালনা করছেন প্রবীণ কুশলী কানু রায়। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত গানগুলিতে সুরারোপ করেছেন শ্যামল মিত্র। গেয়েছেন : মান্না দে, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় হৈমন্তী শুক্লা এবং সুরকার স্বয়ং। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে কমল নায়েক (পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউট) এবং অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়। চরিত্র চিত্রণে আছেন : বসন্ত চৌধুরী, দীপংকর দে, কৃষ্ণা বসু, সত্য ব্যানার্জী, ... মৃদুলা ও মধুমিতা।

বিদেশী ছবি

গত সম্প্রতি এলিট সিনেমা হলে 'জ্যাক ফ্রস্ট' নামে একটি ছবি দেখানো হোল, যা এক কথায় অপূর্ব। এমন উপভোগ্য শিশুচিত্র সচরাচর এদেশে দেখা যায় না। বর্ণাঢ্য, স্নিগ্ধ রঙগীন রূপকথার কাহিনী-চিত্রটি দেখতে দেখতে শুধু শিশু বা কিশোর-কিশোরীরাই নয়, তাদের অভিভাবকরাও যেন এক কল্পলোকে চলে গিয়েছিল কিছু সময়ের জন্য।

সিন্ডারেলার সেই কাহিনী যা পড়তে পড়তে ছেলেমেয়েরা চলে যায় সেই রূপকথার দেশে যেখানে উৎকণ্ঠা আবেগ পেরিয়ে দেখা মেলে ইচ্ছাপূরণের সেই স্বপ্নময় কাহিনী আগেও যেমন সত্য ছিল, এখনও তেমনি সত্য।

শুধু বিদেশী কেন, এদেশেও এমন অহংকার সব গাথা, উপকথা কিংবা রূপকথার গল্প আছে যা এক কথায় অপূর্ব এবং পৃথিবীর সাহিত্যে বিরল। ভারত যেমন বহু ভাষাভাষীর দেশ, তেমনি তার ভাষায়ই মন কেড়ে-নেওয়া রূপকথা আছে। রূপকথা ভৌতিক কাহিনী, লৌকিক কাহিনী আঞ্চলিক উপকথা সব এদেশের অধিবাসীদেরও মধ্যে চলিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের অন্যান্য দিকে উল্লেখযোগ্য অবদান থাকলেও, শিশুদের জন্য বোধ করি এমন কোন মহৎ কর্মের চিহ্ন নেই যা নিয়ে আমরা ভারতের বাইরে কেন, ভারতের মধ্যেও গৌরব করতে পারি। যেসব ছবির নামে দু'-একবার প্রচেষ্টা হয়েছে, সেগুলি হয় স্থূল অথবা হাস্যকর চেষ্টা (প্রচেষ্টা বশাই নয়)।

শুধু শিশুদের মনোজগতের পরিধি বিস্তারের ক্ষেত্রেই নয় (রূপকথা, হিতোপদেশ বা বিক্রমাদিত্যের গল্প কিংবা আঞ্চলিক উপকথা বা সেই আবাল বৃদ্ধের মন কেড়ে-নেওয়া রাজপুত্র, রাজকন্যা ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প — এই সব অমূল্য সম্পদ যার অংগীভূত) বিজ্ঞানভিত্তিক কৌতূহলোদ্দীপক অথচ রোমাঞ্চকর অভিযান বা নির্মল আনন্দদায়ক ছবিও ভারতে খুব বেশি একটা তৈরি হয়েছে কিনা তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এমনকি 'ফ্যামিলি পিকচার' যা দেখে ছেলেমেয়েরা আনন্দে উদ্বুদ্ধ হতে পারে তেমন ছবিও হয়নি। ওয়াল্ট ডিজনী, চার্লি চ্যাপলিন বা লরেল হার্ডির মত প্রচেষ্টার কথা ছেড়েই দিলাম। সে-জাতের ছবি তৈরির মানুষ বোধহয় এখনও আসেইনি এদেশে। একথা রূঢ় হলেও বাস্তব সত্য।

যেমন আসেনি এদেশে এ্যানিমেশন ছবি তৈরি করার লোক। যা করে সমস্ত পৃথিবীর তাবৎ শিশু-কিশোরদের মনোজগতে আনন্দ, কল্পনা ও রূপকথার ম্যাজিকের ঝড় তুলে গেছেন অমর স্রষ্টা ওয়াল্ট ডিজনি। যার তুলনা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নেই।

এদেশে এখনও এ্যানিমেশন ফিল্ম তৈরির পরিধিটা বিজ্ঞাপনের জগৎ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাসির ছবি (যদিও ঠিক অর্থে এদেশে হাসির ছবি কটা তৈরি হয়েছে সন্দেহ রয়েছে) বা মিলনান্ত ছবির টাইটেলে ব্যবহারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

অবশ্য, এদেশে যে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য এ্যানিমেশন ফিল্ম একদম তৈরি হয়নি তা বলবো না। অন্তত বাংলাদেশে (পঃ বঙ্গ) তেমন প্রচেষ্টা অন্ততঃ দু'-তিনজন করেছেন (অন্যান্য প্রদেশের কথা আমার জানা নেই।) যেমন এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে মন্দার মল্লিক এবং রঘুনাথ গোস্বামীর কথা। (রঘুনাথ গোস্বামী অবশ্য আমায় বিস্মিত করেছেন তাঁর পুতুলনাচ বা পাপেট ফিল্ম মারফৎ। এমন প্রতিভাকে আমরা কাজে লাগাতে পারলুম না বলে আমি যুগপৎ লজ্জা এবং দুঃখ প্রকাশ করছি।) তৃতীয় আর একটি বিস্ময়কর প্রতিভা, যিনি দীর্ঘকাল যাবৎই অন্তরালে থেকে এ্যানিমেশন ছবি করার পরিকল্পনা, সাধনা এবং প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর নাম প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট শ্রীচণ্ডী বা চণ্ডী লাহিড়ী (এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রতিভার কথা মনে পড়ছে যাঁর নাম রেবতীভূষণ)।

অথচ আমরা আর একটু সচেষ্ট হলেই এ'দের কাজে লাগাতে পারি বা বলা যায়, এ'দের প্রচেষ্টায় শিশুদের জন্য উৎকৃষ্ট ছবি তৈরি করতে পারি।

এ্যানিমিশন ফিল্ম তৈরির মূল ভিত্তিই হোল জীব (জন্তুসহ) জগৎ ও মানুষকে কিছুটা বক্রদৃষ্টিতে দেখা এবং যার প্রায় সবারই মূলে প্রতিপাদ্য হোল উপদেশাত্মক এবং কৌতূহলপ্রশমন।

এই এ্যানিমেশন ফিল্ম পৃথিবীর প্রায় সমস্ত চলচ্চিত্রশিল্পে অগ্রণী দেশগুলিরই গর্ব এবং তাদের এজন্য আলাদা স্টুডিও-ও আছে।

বৃটেন আমেরিকা ছাড়া চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মান (উভয়) হাঙ্গেরী বুলগেরিয়া, জাপান ইত্যাদি বহু দেশেই এ্যানিমেশন ছবি দেশের বিশেষ সম্পদ। চেকোশ্লোভাকিয়া ও জার্মান পাপেটের বুঝি তুলনা নেই।

ভাবতে কষ্ট হয় এসব দেশের মত আমরা কেন আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু করছি না।

যা বলছিলাম। এই সেদিন হাঙ্গেরীতে তো এ্যানিমেশন ফিল্ম তৈরির ক্ষেত্রে একটা রেকর্ড সৃষ্টি করল। প্রখ্যাত রূপকথাকার স্যান্ডর পিটোফি-র সৃষ্টি 'চাইল্ড জন'-এর ফিল্মে ভার্সান করে তারই ১৫০তম জন্ম-বার্ষিকীর অঙ্গ হিসেবে।

'চাইল্ড জন' হাঙ্গেরীতে রূপকথার গল্প হিসেবে একটি অমর সৃষ্টি। সেই গল্পকে হাঙ্গেরীয় জীবনের বাস্তবতার রেখায় আধারে তৈরি করা হয়েছে এক অনবদ্য সৃষ্টি। যে-ছবিতে রূপকথার গল্প এবং বাস্তবতা পাশাপাশি রয়েছে। ছবির গল্পটি আগামীতে পরিবেশনের ইচ্ছে রইল।

এমন কাহিনী বা রূপকথার গল্প কি আমাদের সাহিত্যেই নেই বিশেষ করে বাংলায়? বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ অবন ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (সত্যজিৎ রায় যাঁর 'গুপী গায়েন বাঘা বাইন' ছবিতে অনবদ্যভাবে উপস্থাপিত করেছেন) সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, এছাড়া তাল-বেতালের গল্প (সংস্কৃত সাহিত্যে তেমন তো অনেক আছেই) থেকে কত অজস্র গল্প ছড়িয়ে আছে বাংলা সাহিত্য ও গ্রাম-বাংলার আঞ্চলিক উপকথায়। যা সংগ্রহ ও পরিবেশন করতে পারলে বিদেশী প্রচেষ্টার সঙ্গে আমরাও পাল্লা দিয়ে চলতে পারি।

ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্প এখন অনেক উন্নত। তাই তাঁদের কাছে এটা আশা করা নিশ্চয় অন্যায় হবে না। অন্তত ভবিষ্যতের এবং ভারতীয় শিশুদের মুখ চেয়ে। কারণ ওরাই দেশের ভবিষ্যৎ মেরুদণ্ড।

—শা. র. চ

বাংলাদেশের ছবি

খান আতার ত্রি-রত্ন

আতা সাহেব মানে প্রবীণ চিত্রপরিচালক খান আতাউর রহমান জানালেন, ছবির স্যুটিং শেষ। এখন সম্পাদনা চলছে।

উল্লেখ্য, আতা সাহেবের কুইক প্রোডাকশন থেকে 'ত্রি-রত্ন' নামে একটি ছবি মুক্তির জন্য তৈরী হচ্ছে।

'ত্রি-রত্নের' কাহিনী নেয়া হয়েছে প্রখ্যাত নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা' থেকে। ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রমোদ কর। মাত্র ক'দিনে ছবিটি নির্মাণ করে খান আতা 'কুইক প্রোডাকশনের নজীর রাখতে আগ্রহী।

সাইফুল আজমের বিয়ে

'অন্তরালে' ছবির পরিচালক সাইফুল আজম কাশেম গোপনে সম্প্রতি বিয়ে করেছেন বলে জানা গেছে।

জানা গেছে অভিনেত্রী সুফিয়ার বোন হীরাকে তিনি বিয়ে করেছেন।

আরো জানা গেছে, জনাব সাইফুল আজম অভিনেত্রী সুফিয়ার বাসায় পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকছিলেন।

পান্নার বিয়ে

নায়িকা সুচরিতার খালা পান্না ছোটখাটো চরিত্রে ইতিমধ্যে অভিনয় করেছেন।

'বাসররাত' ছবির পরিচালক শেখ আলাউদ্দীন সম্প্রতি নাকি পান্নাকে বিয়ে করেছেন।

ইকবালের চোখে নারী

জাফর ইকবালের কথা বলছি।

চিত্রনায়ক জাফর ইকবাল সম্প্রতি মেয়েদের উপর ভীষণ চটে আছেন।

তিনি 'মেয়েদের' মানে বিশেষ কোন মেয়ের উপর চটেছেন কিনা, জানা যায়নি।

তবে তাঁর মতে, একটি সাপ্তাহিককে তাঁর ভাষ্যে মেয়েরা হলো—'মেয়েরা আমার চোখে একটা ফুলের বাগান। যখন বসন্তের সমাগম হয়, ফুলে ফুলে বর্ণে বর্ণে বাগান বর্ণাঢ্য হয়, তখন বাগানটিকে মনে হয় উদ্ভিন্নযৌবনা নারীর মত। আবার বসন্তের বিদায়ের বাঁশী যখন বাজে আস্তে আস্তে বাগানের ফুল শুকিয়ে যায়। পাতা ঝরে পড়ে। বাগান তখন প্রতীক্ষা করে আবার কবে নতুন বসন্ত আসবে। আবার নতুন করে ফুল ফুটবে। কিন্তু সে ভুলে যায় গতকালের বসন্তের কথা। যে বসন্ত তাকে উজাড় করে দিয়েছিল বর্ণাঢ্যের ডালি। মেয়েরাও ঠিক একই রকম। তারা খুব তাড়াতাড়ি অনেক কিছু ভুলে যায়। অতীতকে পুরানো বলে দূরে সরিয়ে দেয়াটা তাদের ধর্ম।'

কল্পনা ও শর্বরী

নৃত্যশিল্পী শর্বরীকে ও তার নায়িকা বোন কল্পনাকে বাংলাদেশের যে কোন চলচ্চিত্র দর্শক খুব ভাল করেই চেনেন। এঁরা দু' বোন এবার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় অংশ নিলেন।

শর্বরীকে ক'দিন আগে 'জীবন সাথী' সেটে এক নাম্বার ফ্লোরে দেখলাম। ছবির পরিচালক নরেন্দ্র হক বাচ্চু বার-রেস্টুরেন্টের সেট ফেলেছেন।

সেখানে ক্লাব ড্যান্সার শর্বরী প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় (পরণে মিনি। পা থেকে উরু পর্যন্ত বস্ত্রশূন্য) বিশেষ এক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

নরেন্দ্র হক জানালেন আগামী মাসে ছবিটি মুক্তির জন্য তৈরী হবে। এর পরে সেন্সর, হল ইত্যাদির 'গ্যাঞ্জাম' পেরিয়ে ছবি দর্শকদের সামনে হাজির হবে।

উল্লেখ্য, এ ছবির নায়ক নায়িকা যথাক্রমে ওয়াসীম ও [illegible]। অন্যান্য চরিত্রে আছেন জসীম, আলতাফ, শর্বরী প্রমুখ।

মঞ্চাভিনয়

শাহী-সংবাদ

নাটক : কেয়া চক্রবর্তী। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। গীতি রচনা ও নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর : রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। আলো : তাপস সেন। মঞ্চ : রাধারমণ তপাদার। রূপসজ্জা : শক্তি সেন। শব্দ : হিমাংশু পাল। অভিনয়ে : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় — ফররুখশিয়ার। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত — মীরজুমলা। পরিমল মুখোপাধ্যায় — লোকটি। পশুপতি বসু — বড়া সৈয়দ। পাহাড়ী ভট্টাচার্য — ছোট সৈয়দ। রণজিৎ ঘোষ — রতনচাঁদ। পল্লব মুখার্জি — দারাগত। সুমৌলীন্দ্র আচার্য — ইতিকাদ খাঁ। কেয়া চক্রবর্তী — সবেরা বানু। বীণা মুখোপাধ্যায় — যোধপুরী বেগম। তাছাড়া সীমা ঘোষ, দীপালী চক্রবর্তী, শিপ্রা সাহা, রাধারমণ তপাদার, দেবব্রত বিশ্বাস, নিরঞ্জন পাল প্রভৃতি আরো অনেকেই আছেন।

বিগত শনিবার, ২৪ আগস্ট 'রঙ্গনা' নাট্যগৃহে নাটকটি আমরা দেখে আসি।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ক্ষয়িষ্ণু ও বিচ্ছিন্ন মোগল সাম্রাজ্যের এক অধ্যায় নিয়ে নান্দীকর গোষ্ঠীর বর্তমান নাটক শাহী সংবাদ রচিত।

১৭১২-১৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ফররুখশিয়ারের রাজত্বকালের মধ্যেই নাটকটি সীমিত। ইতিহাসে ফররুখশিয়ারকে অপদার্থ, ভীরু, অস্থিরমস্তিষ্ক ও অকৃতজ্ঞ সুলতান হিসেবে অঙ্কিত করা হয়েছে। আবদুল্লা ও হোসেন আলী এই দুই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহযোগিতায় সিংহাসনারোহণ করে সৈয়দবিরোধী বন্ধু ও রাজকর্মচারী মীরজুমলার পরামর্শেই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের [illegible] বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত [illegible] পড়লে তাদেরই চক্রান্তে সিংহাসনচ্যুত হয়ে নৃশংসভাবে নিহত হন। এবং সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ফররুখশিয়ারের পর রফিউদ্দ [illegible] সুলতানের পদে অভিষিক্ত করে নিজেরাই প্রকৃতপক্ষে শাসনভার পরিচালনা করতে থাকেন।

ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত ঘটনার সূত্র ধরে ভারতের আড়াইশত বছর পূর্বেকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে নিষ্পেষিত জনসাধারণের শোচনীয়তার সঙ্গে বর্তমানের শোচনীয়তার যে কোন পার্থক্য নেই শাহী সংবাদে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

স্বদেশী যুগে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইতিহাসের বহু চরিত্রকে মহীয়ান করে তুলে ধরা হতো নাটকের মধ্য দিয়ে। ইতিহাসের সিরাজদ্দৌলা-প্রতাপাদিত্য আর নাটকের সিরাজদ্দৌলা-প্রতাপাদিত্য এক নয়। 'জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সংশ্লিষ্ট নাট্যকারেরা হুবহু ইতিহাসকে অনুসরণ না করাতে আমরা তাদের অপরাধী বলে ভাবতে পারিনি—অভিনন্দনের উচ্ছ্বসিত ধারায় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। 'ব্যক্তিস্বার্থ-সর্বস্ব সৈয়দবংশীয়েরা ১৫০ বছর বাদে আজও দেশের

ক থেকে বিলুপ্ত হয়নি। এইটেই হল টকের বক্তব্য।

ফকার শিয়ারের চরিত্রে শক্তিমান অভিনেতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন রূপে দেখা দিয়েছেন। ইতিহাসের অপদার্থ সুলতানকে নাটকে কেবলমাত্র ব্যক্তিত্বহীন চরিত্ররূপেই আঁকা হয়েছে। কৃতঘ্ন করা হয়নি। অপরদিকে প্রেমিক ও দরদীও করা হয়েছে। অজিতেশবাবুর অভিনয়ে প্রতিটি দিক সুন্দরভাবে প্রকটিত। ল চরিত্রের খল নায়ক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই শক্তিমত্তায় নিশ্চয়ই দর্শকরা বিস্মিত হবেন।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তথা জাতীয় স্বার্থবিরোধীদের কবল থেকে সুলতান তথা শাসন-ক্ষমতাকে মুক্ত করে জাতীয় স্বার্থে প্রয়োগ করার সংগ্রামে মীরজুমলার কার্যকলাপ খাপছাড়া তরোয়ালের মত তীক্ষ্ণ ও ... রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের অভিনয়ও ... অনুরূপ।

... রাজনীতিসম্পন্ন বড় সৈয়দের চরিত্রে পশুপতি বসু এবং জংগী ছোট সৈয়দ চরিত্রে পাহাড়ী ভট্টাচার্য সমান দক্ষতায় চরিত্র দুটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

জোকার্টি চরিত্রে পরিমল মুখোপাধ্যায়ের ক্ষমতাও উল্লেখযোগ্য। সূত্রধার বা ... মতই এই চরিত্রটির সৃষ্টি। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সামঞ্জস্য দেখাতে ... মুখে দিয়ে বর্তমানকে টেনে না নিলেই বোধ হয় ভাল হতো। কারণ সচেতন দর্শক অতি সহজেই অভিনয়ের মধ্য দিয়েই অতীত আর বর্তমানকে উপলব্ধি করতে পারেন।

স্ত্রী চরিত্রগুলির অভিনয়ের সুযোগ বর্তমান নাটকে খুবই কম। তবে সবেরা বানু চরিত্রে কেয়া চক্রবর্তীর অভিনয় প্রশংসা করবো। অন্যান্যরাও প্রশংসনীয়। সমগ্র অভিনয় মান বা গোষ্ঠী-অভিনয়ের মর্যাদা রক্ষায় প্রতিজন শিল্পী সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই কৃতিত্ব পরিচালকের। কৃতিত্ব প্রতিজন সভ্যের। একটি দৃশ্যপটে বিভিন্ন প্রতীকের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দৃশ্যান্তরকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দৃশ্যশিল্পী তাঁর কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মোগল আমলের অংকন-পদ্ধতি এবং স্থাপত্য শিল্পকেই অনুসরণ করেছেন তিনি। আর্থিক দিকটির কথাও এক্ষেত্রে শিল্পী অবহেলা করতে পারেননি। কিন্তু সাধারণ দর্শকদের কথা চিন্তা করে এ বিষয়ে ভবিষ্যতে ভিন্নধর্মী দৃশ্যপট সৃষ্টির প্রয়োজনের কথা চিন্তা করা উচিত। তাপস সেন বর্তমান নাটকে আলোর ক্ষেত্রে নতুন করে চিন্তা করেছেন। ভেলকীবাজী এড়িয়ে নাটককে অনুসরণ করেই আলোক নিয়ন্ত্রিত। নব নাট্যান্দোলনের ক্ষেত্রে নান্দীকার অন্যতম পুরোধা। এ নাটকে ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেল।

—শীলভদ্র

অনজানে মেহমান / সুখেন দাস

শতবর্ষের স্মরণীয়

বেঙ্গল থিয়েটার

বিগত ১৪ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় বেঙ্গল থিয়েটার প্রসঙ্গে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইতিবৃত্ত নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এই সময় বেঙ্গল থিয়েটারের সংস্কার সাধন করা হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটার ত্যাগ করে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে যোগদান করেন। গিরিশচন্দ্রের ন্যাশনাল থিয়েটারে বিনোদিনীর যোগদান বিষয়ে দুটি মতান্তর আছে। অনেকে বলেন, গিরিশচন্দ্রের অনুরোধেই শরৎচন্দ্র ঘোষ এ বিষয়ে বিনোদিনীকে ছেড়ে দেন। গিরিশচন্দ্রের মত প্রতিভার সংস্পর্শে বিনোদিনী উন্নতি লাভ করবে—এইটেই ছিল শরৎচন্দ্রের আশা। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র একথা অস্বীকার করেন। এবিষয়ে তিনি শরৎচন্দ্রকে কোনসময়ই অনুরোধ করেন নি বলে মন্তব্য করেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে নাট্যগৃহটির সংস্কার সাধনের জন্য বেঙ্গল থিয়েটারে কোন উল্লেখযোগ্য অভিনয় হতে পারেনা।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ জানুয়ারী বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয় দেখতে তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড লীটন এবং তদীয় পত্নী লেডী লীটন—তাছাড়া বাংলার ছোটলাট স্যার ... টেম্পলও উপস্থিত থাকেন। এদিন শকুন্তলা নাটক অভিনীত হয়। এই প্রথম ভাইসরয় দেশীয় নাট্যশালায় অভিনয় দেখতে উপস্থিত থাকেন। তাই ঘটনাটি অসম্ভব আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইংলিশম্যান পত্রিকার ২১ জানুয়ারীর সংখ্যায় এবিষয়ে মন্তব্য পাওয়া যায়।

দুষ্মন্তের রথটি কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ধর্মদাস সুর নির্মাণ করেন। অতিথিরা এক ঘণ্টা অভিনয় দেখেন। অভিনয়ের মান, মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যপট ঐকতানবাদ্য প্রভৃতির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের শুরু হয়েছিল—ধীরে ধীরে তা স্তিমিত হয়ে আসে। থিয়েটারের প্রধান দুই স্তম্ভ ছিলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ আর বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। উভয়েরই বয়স হচ্ছিল। যৌবনের প্রতিভা অস্তাচলে ঢলে পড়ছিল। অপর দিকে গিরিশচন্দ্রের বিকাশ বেঙ্গল থিয়েটারের ভবিষ্যতকে আরো অনিশ্চিত করে দিল। শিল্পী সম্প্রদায়ের মধ্যেও তেমন শক্তিশালী কেউ ছিলেন না। দূরদর্শী বিহারীলাল প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন নাট্যশালাকে সচল রাখতে হলে নাটকের প্রয়োজন। তাই নিজে বহু নাটক উপহার দিলেন। কিন্তু এদিক থেকেও বেঙ্গল থিয়েটার উল্লেখযোগ্য নাট্যাপহারেও দর্শকদের আকৃষ্ট করতে পারলো না। সর্বোপরি বেঙ্গল থিয়েটারকে ঘিরে রেখেছিল

পরোন আভিজাত্য—যা বিহারীলাল নিজেও সবসময় সমর্থন করতে পারতেন না। শকুন্তলার অভিনয়ের পর ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ মার্চ বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরে বিহারীলাল নামভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করলেন। প্রতাপ চরিত্রে হরিদাস দাস আর ফষ্টার চরিত্রে অভিনয় করেন শরৎচন্দ্র ঘোষ। বনবিহারিণী দলনী চরিত্রে স্বীয় অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে গোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'পাষাণপ্রতিমা' [illegible] নাটকে ভীমচাঁদ চরিত্রে শরৎচন্দ্র আর রণজিৎ সিংহ চরিত্রে হরিদাস দাস অভিনয় করেন। হরিদাসবাবু ছিলেন পরম বৈষ্ণব। হরি বৈষ্ণবরূপে তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনিও একজন দক্ষ অভিনেতা ছিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারের উল্লেখযোগ্য নাটক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অশ্রুমতি। নাটকটি মঞ্চস্থ হবার পূর্বেই বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য অভিনেতা শরৎচন্দ্র ঘোষ মারা যান। অশ্রুমতি তাঁর স্মৃতি পূজায় ১১ ডিসেম্বর, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে বিহারীলাল প্রতাপ সিংহ, হরিবৈষ্টম—সেলিম, সুকুমারী—মলিনা এবং অশ্রুমতি চরিত্রে ছিলেন বনবিহারিণী।

[illegible] নাটক নিয়েই বেঙ্গল থিয়েটারকে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলতে হয়। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও [illegible] ক্ষেপেও বিহারীলালের মন ভেঙ্গে পড়ে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে রাজা ও রাণী মঞ্চস্থ হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর [illegible] জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মঞ্চস্থ [illegible] নাটকের অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটার নতুন করে সাড়া জাগায়। হরিনামের গানে পাষাণ গলে যায় [illegible] সকলের মুখে মুখে গীত হতো। প্রহ্লাদ চরিত্রে শ্রীমতী কুসুম আর [illegible] চরিত্রে [illegible] অসম্ভব খ্যাতি অর্জন করেন। এই অভিনয় থেকে কুসুম প্রহ্লাদ-কুসুম নামে পরিচিতা হয়ে ওঠেন।

প্রহ্লাদ নাটকের অভিনয়ের পর বেঙ্গল থিয়েটারে রাজকৃষ্ণ রায়ের আরো কয়েকখানা নাটক অভিনীত হয়।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বিহারীলালের দুর্বাসার পারণের পর ১১ ডিসেম্বর রাজকৃষ্ণ রায়ের দশরথের মৃগয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভীষ্মের শরশয্যা ও সিন্ধুবধ নাটকের অভিনয় সংবাদ অন্যান্য নাটকের মধ্যে রাজসূয় যজ্ঞ বামন ভিক্ষা, স্বাধীন জানানা, সুরুচির ধ্বজা, দুই সতীনের কোন্দলও উল্লেখযোগ্য।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বিহারীলালের পান্ডব [illegible] কণ্ঠ এবং প্রভাসমিলন অভিনীত হয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বেঙ্গল থিয়েটারে মঞ্চস্থ অন্যান্য নাটকগুলি [illegible] সীতার স্বয়ম্বর, গোবর গণেশ গণযুদ্ধ ও বসন্তসেনা। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। সপ্তম এডওয়ার্ডের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টর ভারতে আসেন এবং বেঙ্গল থিয়েটার নাট্যাভিনয় দর্শন করেন। এর পর থেকে বেঙ্গল থিয়েটার 'রয়াল বেঙ্গল থিয়েটার' নাম গ্রহণ করে। নাম গ্রহণ করেও ১৮৯১ থেকে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বেঙ্গল থিয়েটার (রয়াল বেঙ্গল) খুব [illegible] এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কিছুটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। প্রখ্যাত অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু এখানে যোগদান করেন। তাছাড়া পরবর্তী কালের [illegible] অভিনেতা শরৎচন্দ্র ঘোষের ভ্রাতু- [illegible] থিয়েটার পরিত্যাগ করে রয়েল বেঙ্গলে যোগ [illegible] পরে, নরক, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি পুরোন নাটক- [illegible] বেঙ্গলে পুনারায় [illegible] যায়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বিষবৃক্ষ নাটকের অভিনয়াংশে মহেন্দ্র বসু নগেন্দ্রনাথ মথুর চ্যাটার্জি [illegible] সুকুমারী সূর্যমুখী হরি বৈষ্ণব শ্রীশ [illegible] কমলমণি এবং কুন্দনন্দিনী চরিত্রে [illegible] ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারী বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় নাট্যরূপায়িত রজনীতে সুকুমারী দত্ত নামভূমিকায় অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হয় [illegible]চন্দ্রের রাজসিংহ। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে দেবী চৌধুরাণী ও কৃষ্ণকান্তের উইলও রয়েল বেঙ্গলের সুনাম বৃদ্ধি করে। কিন্তু এই সময়ই কলকাতায় ভীষণাকারে প্লেগ দেখা দেয়।

পরশুরাম নাটকটিও জনপ্রিয়তার্জন করে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথম চারজন অভিনেত্রীর অন্যতমা শ্রীমতী এলোকেশী পরলোক গমন করেন। তিনি তখন স্টার থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রমোদরঞ্জন' নাটকও রয়েল বেঙ্গলে জনপ্রিয়তার্জন করে। নৃপেন বসু চঞ্চলকুমারের চরিত্রে দর্শকদের মাতিয়ে দেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ময়না, নীহার দাওয়াই প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ হয়।

কিন্তু রয়েল বেঙ্গল বা বেঙ্গল থিয়েটারকে এবার চারিদিক থেকে দুর্ভাগ্য গ্রাস করে ফেলে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল নাটসম্রাট বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর বিহারীলাল রয়েল বেঙ্গলের আলোকমালাকে প্রোজ্জ্বল রেখেছিলেন আপন মহিমায়। এবার তাঁর মৃত্যুতে যে ধাক্কা এলো রয়েল বেঙ্গলের পক্ষে সে ধাক্কা সামলানো সম্ভব হলো না।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ৯ই [illegible] বিডন স্ট্রীটে [illegible] বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল বাংলার প্রথম স্থায়ী পেশাদার নাট্যশালা বেঙ্গল থিয়েটার। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রয়েল বেঙ্গল নাম গ্রহণ করে একই পরিচালনাধীনে বেঙ্গল থিয়েটার দীর্ঘ আঠার বছর স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রেখে বাংলার নাট্য ঐতিহ্যকে নানাদিক দিয়ে সমৃদ্ধতর করে তোলে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বিহারীলালের মৃত্যুর পর মূলে স্বত্বাধিকারীদের পক্ষে থিয়েটার পরিচালন করা সম্ভব হয় না। এর পর বিভিন্ন [illegible] থিয়েটার মঞ্চ ভাড়া নিয়ে অভিনয় করতে থাকেন। এদের মধ্যে অরোরা ১৯০১-১৯০২ ইউনিক থিয়েটার (১৯০৩-৪) ন্যাশনাল (১৯০৪-১০) অমর দত্তের গ্রেট ন্যাশনাল (১৯১১) চুনিলাল দেব (১৯১১-১৪) ফ্রেড মিত্রের থেসপিয়ান টেম্পল (১৯১৫-১৬) প্রেসিডেন্সী থিয়েটার (১৯১৭-১৮) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এরপর বেঙ্গল বা রয়েল বেঙ্গল মঞ্চ ধূলিসাৎ হয় এবং ওখানেই বর্তমানে বিডন স্ট্রীট ডাকঘরটি অবস্থিত। বেঙ্গল থিয়েটার নানাকারণে নাট্যশালার ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

[illegible] প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১৪ বর্ষ

অমৃত

সংখ্যা ২২

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday 4th October, 1974 — শুক্রবার, ১৭ আশ্বিন, ১৩৮১

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীনিতাই ঘোষ

স

সম্পাদকীয়

ক্ষুধার্তের ত্রাণ ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গ আজ এক ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন। অন্তত দেড় কোটি লোক অন্নাভাবে বিপন্ন। সরকার একে দুর্ভিক্ষ বলে ঘোষণা না করলেও, দুর্ভিক্ষের ছায়া যে রাজ্যের একটা বৃহৎ অংশকে গ্রাস করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দুঃখের বিষয় এত বড় একটা বিপদে যেভাবে সরকারকে সর্বাত্মকভাবে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় ব্যবস্থাপনার ত্রুটির জন্য তা না দেখে সকলেই হতাশ এবং উদ্বিগ্ন। অন্নাভাবে মৃত্যুর খবরও পাওয়া যাচ্ছে। সরকারী মতে এই মৃত্যু অনাহার কি অপুষ্টির কারণে তা নিয়ে চুলচেরা বিতর্ক চললেও, একথা সত্য যে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে বিরাট সংখ্যক মানুষের ঘরে খাবার নেই, খাবারখাবার কেনার মতো সামর্থ্য নেই, এমন কি অনশনক্লিষ্ট এই মানুষদের টেস্ট রিলিফের কাজ করার মতো ক্ষমতাও নেই।

এত বড় একটা বিপদে দলমতনির্বিশেষে সকলের এখন ক্ষুধার্তদের পাশে সাহায্যের ভাণ্ডার নিয়ে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত। কয়েক বৎসর আগে বিহারে যখন প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল তখন জয়প্রকাশ নারায়ণ বেসরকারীভাবে ব্যাপক সেবাকার্য চালিয়ে বহু মানুষের প্রাণরক্ষা করেছিলেন। দেশ-বিদেশ থেকে সেদিন সাহায্য গিয়ে পৌঁছেছিল বিহারে। দলে দলে স্বেচ্ছাব্রতীরা সেই মহান সেবাকার্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে তার বিপরীত চিত্রই আমরা দেখতে পাচ্ছি। সরকার বিভিন্ন জেলায় লঙ্গরখানা খুলেছেন। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকের অভাবে ত্রাণকার্য ঠিকমত চলছে না বলে সরকার হা-হুতাশ করছেন। এটা খুবই দুঃখের কথা। দেশের মানুষের প্রতি সতিকারের দরদ কি কারো মনে নেই? পশ্চিমবাংলা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান তো কম নয়? এই বিপদের দিনে তাঁরা এগিয়ে আসছেন না কেন? সরকারই বা তাঁদের ডেকে এনে দায়িত্বভার তাঁদের ওপর তুলে দিচ্ছেন না কেন? তা ছাড়া যুব সম্প্রদায়কে তো এখনই তাঁদের সেবাধর্ম ও শক্তির পরিচয় দিতে হবে? শুধু ভাঙার কাজে নয় শুধু চটকদার শ্লোগানে নয়, শুধু দলাদলিতে নয়, যুব সম্প্রদায় যে আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে জানে তখনই তার পরিচয় দেবার প্রকৃষ্ট সময়। স্বেচ্ছাসেবকের অভাবে যদি ত্রাণকার্য ব্যাহত হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে তা হবে গভীর লজ্জা ও দুঃখের বিষয়।

টেস্ট রিলিফের জন্য সরকার ব্যাপক কার্যসূচী গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তার আগে মানুষগুলোকে কর্মক্ষম করে তুলতে হবে। কারণ দীর্ঘদিন অনাহারে থেকে অখাদ্য, কুখাদ্য খেয়ে তাদের জীবনীশক্তি হ্রাস পেয়ে গেছে। গোড়া থেকেই টেস্ট রিলিফের কাজ আরম্ভ করলে মানুষগুলো খেয়ে বাঁচত। আজকের মতো লঙ্গরখানার সামনে ভিড় করত না। এখন এদের কজনের পক্ষে মাটিকাটা বা রাস্তা বানানোর মতো দৈহিক পরিশ্রমের কাজ করা সম্ভব তা সরকারকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

আসলে সমস্যাটা এত ব্যাপক এবং জরুরী যে সরকারের পক্ষে আর টাল-বাহানা করা মোটেই উচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের উৎপাদন কম হয়নি। তা সত্ত্বেও মানুষ খাদ্যাভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটিতে তার কোনো প্রতিকার করা যাবে না, এটা মেনে নেওয়া কঠিন। জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে আজ সকলকে নিয়ে রিলিফ কমিটি গঠন করার সময় এসেছে। এতে রাজনীতির কোনো স্থান নেই। দেশের এই দুর্দিনে নিরন্নের অন্নদান সেবায় দলমতনির্বিশেষে সকলে যদি আজ এগিয়ে না আসেন তা হলে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মহারাষ্ট্র, গুজরাটে খরার সময় বিভিন্ন দলের মানুষ একসঙ্গে কাজ করেছে। কলেজের ছাত্ররা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে সেবাকার্য করেছে। পশ্চিমবাংলাতেই বা তা আমরা করতে পারব না কেন? দলাদলি, পারস্পরিক দোষারোপ করার সময় এখন নয়। এই বিপদে বাংলার মানুষ দেখতে চায়, এখনও আর্ত মানবতার ডাকে দলমত ভুলে সকলে মিলে একসঙ্গে কাজ করার মনোভাব নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। সরকারকেও আরও কঠোর হয়ে গ্রামাঞ্চলে মজুতদারদের হাত থেকে খাদ্য উদ্ধার করে তা ন্যায্যমূল্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব নয়।

অলিভার

নিরঞ্জন সিংহ

(এক)

চিঠিখানা পেয়ে একটু বিরক্ত হলেন সজল মিত্র। আবার কোন ইনফরমেশান চেয়ে পাঠিয়েছে নিশ্চয়। গত এক বছর ধরে কত-বার কতরকম খবরই যে দিতে হল এই কম-পিউটার কোম্পানীকে তার ঠিক নেই। অফিসের খবর থেকে সুরু করে ব্যক্তিগত—সব খবরই ওরা সংগ্রহ করে চলেছে। অবশ্য সব খবর গোপন রাখা হবে বলে কোম্পানী প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। চিঠিখানা খুলে পড়তে সুরু করতেই অবশ্য বিরক্তি কেটে গেল। খুশী হলেন সজল মিত্র। বেশ কিছুদিন থেকে এই চিঠিখানা আশা করছিলেন তিনি। গত এক বছর আগে অর্থাৎ ২০১৮ সালের গোড়ায় নাম রেজেস্ট্রি করিয়েছিলেন। সর-কারী মহলে যথেষ্ট চেনাশুনা থাকা সত্ত্বেও অনুমতি পত্র জোগাড় করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল সজল মিত্রকে। তখন সবেমাত্র যোগ দিয়েছেন এই ওষুধ কোম্পানীতে প্ল্যানিং ডিরেকটার হিসেবে। আজ অবশ্য উনি ম্যানেজিং ডিরেকটর। তখন যা ছিল খানিকটা শখ আজ তা একান্ত প্রয়োজনীয়। একটা সিগরেট ধরিয়ে খানিকটা সহজ হয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন সজল মিত্র। বেশ খানিকটা মানসিক বোঝা এবার হাল্কা হয়ে যাবে অলিভারটা পেলে।

টেবিলের সঙ্গে লাগানো মাইক্রোফোনটা অন করে চিঠিটার ছোট্ট একটা জবাব বলে গেলেন।

প্রিয় মহাশয়,

আপনার চিঠির জন্য আন্তরিক ধন্য-বাদ। 'অলিভারটি' এ সপ্তাহে ডেলিভারী দেবেন জেনে খুশী হলাম। সঙ্গে অবশ্যই লিফ-লেট ও একজন ভাল ডেমনেস্ট্রেটর পাঠাবেন যে আমাকে জিনিসটা ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে পারবে। প্রোফর্মা ইনভয়েস অনুযায়ী ক্রেডিট স্লিপ চিঠির সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

ডিকটেশান শেষ হতেই সুইচটা অফ করে দিলেন। উত্তরটা আপনা-আপনি টাইপ হয়ে ডেসপ্যাচে চলে যাবে।

পুরোনো ঘটনাটা মনে পড়ল সজল মিত্রর। এই কোম্পানীতে যোগ দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যে বোর্ড অব ডিরেকটরের একটা মিটিং ছিল। যথাসময়ে বোর্ডরুমে ঢুকে সজল মিত্র দেখলেন মস্তবড় টেবিলের একপাশের চেয়ার দখল করে বসে আছেন টেকনিক্যাল ডিরেকটর মিঃ সাহানী, মার্কেটিং ডিরেকটর মিঃ পারেখ, ফিনান্স ডিরেকটর মিঃ নায়ার আর ম্যানেজিং ডিরেকটর মিঃ নাগের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারে বসানো রয়েছে একটা যন্ত্র। ব্যাপারটা প্রথমে কিছু বুঝতে পারেন নি উনি। কৌতূহল হলেও কিছু না বলে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। সেদিনের মিটিংএ-র এ্যাজেন্ডা ছিল একটা ভিটামিন প্রডাক্টের সেল কমে যাচ্ছে কেন তার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা ও সেল কিভাবে বাড়ানো যায় তার ব্যবস্থা নেওয়া। মিটিং সুরু হল। মিঃ নাগের চেয়ারের যন্ত্র মিঃ পারেখের কাছে জানতে চাইলেন মার্কেট রিসার্চের ফলাফল। মিঃ পারেখ জানালেন প্রোডাক্টের প্যাকিং-এর সাইজ ও রং কাস্টমাররা পছন্দ করছে না। কিছুদিন আগে এই প্রোডাক্টের পুরোনো প্যাকিং বদল করে নতুন প্যাকিং চালু করা হয়েছিল।

—সাইজ ও রঙ সম্বন্ধে তখন তো মার্কেট রিসার্চের ডাটা প্রসেস করেই ডিসি-সান নেওয়া হয়েছিল তাই না মিঃ পারেখ? বলল মিঃ নাগের চেয়ারের যন্ত্র।

—হ্যাঁ মিঃ নাগ। কিন্তু সে তো আট মাস আগে। মানুষের টেস্ট পাল্টাচ্ছে দ্রুত-গতিতে। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশের মার্কেট এখন এগোয় যাচ্ছে সুপার ইন্ডা-স্ট্রিয়ালাইজেশানের দিকে। এ ধরনের মার্কেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সব কাস্ট-মারকে একভাবে বিচার না করে তাদের

চাহিদার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ছোট ছোট দলে ভাগ করে নিয়ে তাদের চাহিদার পূরণ করা।

—কথাটা ঠিক। বললেন মিঃ সাহানী।

—তাহলে আমাদেরকেও সেইভাবে এগুতে হবে। এ-বিষয়ে আপনারা দয়া করে কিছু তথ্য দিন।

আপনি যদি ইন্টারেস্টেড হন আমি এখুনি কিছু তথ্য দিতে পারি। বললেন মিঃ পারেখ।

—নিশ্চয়!

—আমি মার্কেট রিসার্চের ডাটা প্রসেস করে যে রেজাল্ট পেয়েছি তাতে এখুনি এই ভিটামিন প্রডাকটের আরো দুটো সাইজ বাড়াতে হবে আর বিভিন্ন সাইজে কম করে চারটে কালার-স্কীমে প্যাক করতে হবে, তাহলে আমরা কাস্টমারদের স্যাটিসফাই করতে পারব।

—আমাদের প্যাকিং মেটিরিয়াল সাপ্লাই-য়ারদের কোন অসুবিধে নেই তো? মিঃ নাগ অর্থাৎ মিঃ নাগের চেয়ারের যন্ত্র প্রশ্ন করল।

—না সে সম্বন্ধে আমার ডিপার্টমেন্ট অলরেডি কথাবার্তা বলেছে। অসুবিধে শুধু যে স্টক আছে সেটা সম্পূর্ণ নষ্ট হবে। জবাব দিলেন টেকনিক্যাল ডিরেকটর মিঃ সাহানী।

—মিঃ নায়ার প্যাকিং মেটিরিয়ালের যে স্টক আছে তার কস্ট কি?

মিঃ নায়ার জবাব দিলেন প্রায় ১২ হাজার টাকার মত।

—হু। মিঃ নায়ার আপনি একটা ব্রেক-ইভন কোয়ান্টিটি মিঃ পারেখকে দেবেন। মিঃ পারেখ যদি মনে করেন প্যাকিং আর কালার-স্কীম চেঞ্জ করে আমরা ব্রেক-ইভন পয়েন্টের উপরে যেতে পারব আর ওই ডেড স্টকের কস্ট কভার করেও কিছু কন্ট্রিবিউ-শান পাব তাহলে আমরা এ প্রডাকট্ চালাব। তা না হলে আমাদের অন্য প্রডাকট্ সম্বন্ধে ভাবতে হবে।

পরে সজল মিত্র জানতে পেরেছিলেন সেদিনের মিটিংএ ম্যানেজিং ডিরেকটর মিঃ নাগ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকতে পারেননি বলে তিনি তাঁর অলিভারকে পাঠিয়েছিলেন। অলিভার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছিলেন সজল মিত্র কিন্তু সেদিনের মিটিংএ মিঃ নাগের বদলে তাঁর অলিভার যেভাবে আলো-চনা করেছিল ও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল—মিঃ নাগ নিজে উপস্থিত থাকলে তার বেশী কিছু করতে পারতেন বলে কখনো মনে হয়নি সজল মিত্রের।

এরপর থেকেই অলিভার সম্বন্ধে ভীষণ কৌতূহলী হয়ে পড়েন সজল মিত্র। কিন্তু একটা অলিভার জোগাড় করা খুব সহজ কাজ নয়। প্রথমতঃ সরকারী অনুমতিপত্র জোগাড় করতে হবে। কারণ অলিভারের ডিস্ট্রিবিউসান সম্পূর্ণ সরকার নিয়ন্ত্রিত। সরকার যতক্ষণ না কনভিন্সড হবেন যে আবেদনকারীর পক্ষে একটা অলিভার অত্যন্ত প্রয়োজন ততক্ষণ অনুমতিপত্র দেবেন না। দ্বিতীয়তঃ অলিভারের উৎপাদন খুবই সীমিত। তাই সরকারী অনুমতিপত্র পেলেও দীর্ঘদিন অপেক্ষা করা ছাড়া কোন পথ নেই। সজল মিত্র অনুমতিপত্র পাওয়ার পর এই নতুন কোম্পানীর কাছে নাম রেজেস্ট্রি করেন।

(দুই)

তিনদিন বাদে কোম্পানীর ডেমনেস্ট্রেটর অলিভার নিয়ে সজল মিত্রের ফ্ল্যাটে হাজির হল। সজল মিত্রের স্ত্রী গায়ত্রী তখন ভিতরের ঘরে টেলিভিশান দেখতে ব্যস্ত। সজল মিত্র খুব খুশী হলেন কিন্তু অবাক হলেন যখন অলিভারের প্যাকিং খোলা হল। অলিভারটাকে দেখতে হুবহু সজল মিত্রের মত। এমনকি পরনের স্যুটের কাপড়টাও সজল মিত্রের একটি প্রিয় স্যুটের মত। মুখ-খানা এত জীবন্ত যে খুব কাছে থেকে দেখলেও কেউ বুঝতে পারবে না যে ও একটি যন্ত্রমানব-কম্পিউটার।

—শুধু দেখতে নয় স্যার। বলল ডেমনে-স্ট্রেটর—ওকে এমনভাবে প্রোগ্রামড্ করা আছে যে মানসিক দিক থেকে ও আপনারই মত। এতদিন যত ইনফরমেশান আমরা আপনার কাছ থেকে জোগাড় করেছি সব ওর মেমারী টেপএ জমা আছে। আপনি যা ভালবাসেন ও-ও তাই ভালবাসে। আপনি যা পছন্দ করেন না ও তা পছন্দ করে না। তাছাড়া ও টাইপ করতে পারে। আপনার হাতের লেখার মতই লিখে যেতে পারে যা দেখে আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন না কে লিখেছে, ও না আপনি। আপনার ব্যক্তি-গত জীবনের স্মরণীয় সব ঘটনা ও জানে। যেমন আপনার ম্যারেজ এ্যানিভার্সারির তারিখ ওর জানা। আপনি যদি কাজের চাপে ভুলেও যান, কোন ক্ষতি নেই। আপ-নার পছন্দমত উপহার ও নিজেই দোকানে ফোনে অর্ডার দিয়ে দেবে। আপনার অফিস কলিগ, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের নাম ধাম ও তাদের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক খবর রাখে।

সজল মিত্র অবাক হয়ে ডেমনেস্ট্রেটর ভদ্রলোকের কথা শুনছিলেন। এরকম একটা অলিভার পাবেন তা উনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। উত্তেজনায় ওঁর বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল।

—ওগুলো তো গেল সাধারণ কাজের হিসেব। এবার ওর আসল কাজের কথায় আসছি। আপনার যে কোন সমস্যার সমাধান করাই হচ্ছে ওর আসল কাজ। তবে আমরা অফিস-সংক্রান্ত সমস্যার উপরই বেশী জোর দিয়ে থাকি। এই যে টুপীটা দেখছেন এই টুপীটা মাথায় পরে এই প্লাগটা ওর গায়ের এই জায়গা লাগিয়ে দিয়ে আপনার সমস্যার কথাটা মনে মনে ভাববেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনার মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ থেকে জমা হবে ওর প্রোগ্রাম টেপে। মুহূর্তে সমাধান করে দেবে সমস্যার। ফলাফল জানিয়ে দেবে ও টাইপ করে। ওর জন্য একটা পোর্টেবল ইলেকট্রিক টাইপরাইটারও আমরাই দিয়ে যাচ্ছি। শুধু সমাধান জানানোই নয়। প্রয়োজন হলে ও নিজেও অনেক কিছু করে দেবে আপনার হয়ে। তবে স্যার হঠাৎ গলাটা একটু নামিয়ে কানে কানে বলার মত করে বলল ডেমনেস্ট্রেটর—যখন এই টুপীটা মাথায় লাগাবেন তখন একান্ত ব্যক্তিগত অনু-ভূতি বা আবেগসম্পন্ন কোন সমস্যা নিয়ে চিন্তা করবেন না—কারণ এই অলিভার

গুলো খুবই সফিস্টিকেটেড—মানে ভীষণ অনুভূতিসম্পন্ন—। আমার কোম্পানী অবশ্য যথেষ্ট সেফটি ডিভাইস অলিভারের সারকিটে জুড়ে দিয়েছে—তবু একটু খেয়াল রাখবেন কারণ আমার কোম্পানীর তৈরী এটাই প্রথম অলিভার যা আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি।

—ঠিক আছে। বললেন সজল মিত্র।

—তাহলে চলি স্যার। কোন অসুবিধা হলেই জানাবেন।

—নিশ্চয়ই জানাবো। অনেক ধন্যবাদ সব ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য।

ডেমনেস্ট্রেটর ভদ্রলোক চলে যেতেই সজল মিত্র স্ত্রীকে ডাকলেন—গায়ত্রী একবার এ-ঘরে এসো তো। ভিতরের ঘর থেকে গায়ত্রী সাড়া দিল—আসছি। হঠাৎ একটা অদ্ভুত চিন্তা খেলে গেল সজল মিত্রের মাথার মধ্যে। মনে মনে হেসে ফেললেন। অলিভারের সুইচটা অন করে দিয়ে বই-এর শেলফের পাশে লুকিয়ে পড়লেন।

গায়ত্রী ঘরে ঢুকে বলল—কি ব্যাপার কোথাও বেরুচ্ছো নাকি আবার?

সজল মিত্র শেলফের আড়াল থেকে লক্ষ্য করলেন—গায়ত্রীর কথা শুনে অলিভার একটু হেসে বলল—না।

—তবে জামাকাপড় পরে বসে আছো যে?

—এমনিই। বলল অলিভার।

—একটু আগে যে বললে আজ কোথাও বেরুবে না। কি জানি বাপু! কখন যে কি তোমার মনে আসে তা তুমিই জান। যাক আমাকে ডাকছিলে কেন?

—আমাকে দেখতে।

গায়ত্রী এবার সত্যি অবাক হয়ে অলিভারের মুখের দিকে তাকালো। তারপর একটু ভ্রূ কুঁচকে বলল—তোমাকে দেখতে? অবাক করলে।

—হ্যাঁ। আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বলো তো?

—ব্যাপার কি? এতক্ষণ এ ঘরে বসে বসে কি ড্রিংক করছিলে? বলে গায়ত্রী নাক টেনে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করল।

সজল মিত্র আর হাসি চাপতে পারলেন না। গায়ত্রী অলিভারকে চিনতে না পারায় ভীষণ মজা পেয়েছেন উনি। শেলফের পাশ থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন। আর গায়ত্রী ভূত দেখার মতো চমকে উঠল আসল সজল মিত্রকে দেখে। অবস্থাটা বুঝতে পেরে হাসি থামিয়ে সজল মিত্র তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—ভয় নেই গায়ত্রী—ও হচ্ছে অলিভার। এই কিছুক্ষণ আগে কোম্পানীর লোক ওকে দিয়ে গেল। ওকে দেখাবার জন্যই তোমাকে ডেকেছিলাম।

গায়ত্রী ফ্যাল ফ্যাল করে একবার অলিভারের মুখের দিকে আর একবার সজল মিত্রের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। ও যেন বিশ্বাস কতে পারছিল না একটা যন্ত্র কি করে হুবহু একটা মানুষের মত দেখতে হয়। অলিভারকে সজল মিত্র মনে করে এতক্ষণ কথাবার্তা চালিয়েছে বলে যেন একটু লজ্জিত হল। তারপর সামনের সোফার উপর অসহায় ভাবে বসে পড়ল। নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় লাগল গায়ত্রীর। তারপর একটু ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল ওর মুখে। সজল মিত্র যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন—বাব্বাঃ একটু মজা করতে গিয়ে দেখছি বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। আমাকে রীতিমত চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে।

গায়ত্রী মুখ তুলে অলিভারের দিকে তাকাল। অলিভার অল্প অল্প হাসছে যেমন সজল মিত্র মাঝে মাঝে হাসেন। একটুও তফাৎ নেই। কি আশ্চর্য! ভাবল গায়ত্রী। অলিভারটা যেন সজল মিত্রের প্রতিবিম্ব।

—ও কি এখানে থাকবে? ফিস ফিস করে গায়ত্রী জানতে চাইল সজল মিত্রের কাছে।

—নিশ্চয়ই! আমার অনুপস্থিতিতে তুমি ওর সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাতে পারবে। মার্কেটিং বা নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ওকে সঙ্গে নিতে পারবে। এখন থেকে আমার অনুপস্থিতি তুমি বুঝতেই পারবে না।

—ইয়েস ম্যাডাম। আপনার মত সুন্দরী মহিলার কোন কাজে লাগতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। বলল অলিভার। আর ওর কথা শুনে লজ্জায় গায়ত্রীর মুখ লাল হয়ে উঠল। সজল মিত্র হো-হো করে হেসে উঠলেন। যাক যন্ত্র হলেও অলিভার বেশ রসিক।

(তিন)

কয়েকদিনের মধ্যে অলিভার সজল মিত্র ও গায়ত্রীর জীবনের সঙ্গে যেন মিশে গেল। গায়ত্রীর আর কোন ক্ষোভ নেই। ইচ্ছে করলে ও ঘন্টার পর ঘন্টা অলিভারের সঙ্গে গল্প করতে পারে। ওর মনেও হয় না, স্বামীর ব্যক্তিগত কমপিউটারের সঙ্গে ও গল্প করছে, ওর মনে হয়, ও যেন আসল সজল মিত্রের সঙ্গেই কথা বলছে। মাঝে মাঝে এও মনে হয় অলিভার যেন আসল সজল মিত্রের থেকেও বেশী প্রাণবন্ত, বেশী কোমল ও বেশী সহানুভূতিসম্পন্ন। যন্ত্র যেন মানুষের থেকেও ভাল! কথায় কথায় গায়ত্রী একদিন সজল মিত্রকে বলেছিল—দেখ, তোমার থেকে তোমার অলিভার আমাকে বেশী ভালবাসে।

—সত্যি নাকি। সজল মিত্র সকৌতুকে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন—কিন্তু তুমি আমার থেকে অলিভারকে বেশী ভালোবেসো না তাহলে হয়ত আবার অলিভারকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করতে হবে। বলে হেসে উঠলেন সজল মিত্র।

—আমি তো দেখছি অলিভারকে তুমিই বরং বেশী ভালবাসছ।

সজল মিত্র জবাব দিলেন না। কথাটা খুব সত্যি। অলিভার ছাড়া আজকাল সজল মিত্র যেন একদম চলতে পারছেন না। অফিস থেকে বাড়ী ফিরেই অলিভারকে ডাকেন। মাথায় টুপীটা পরে নিয়ে প্লাগটা লাগিয়ে দেন অলিভারের গায়ে। তারপর অফিসের সমস্যা নিয়ে ভাবতে সুরু করেন। অলিভার তখন সজল মিত্রের সামনের সোফায় চুপচাপ বসে থাকে। সজল মিত্রের মগজের চিন্তার বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধীরে ধীরে জমা হতে থাকে অলিভারের প্রোগ্রাম টেপে। এরপর অলিভারের ভিতরের মিনি কমপিউটার মগজ

হয়ে যায়—সজাগ হয়ে ওঠে আমারী ক্লনসোল। সমস্যা যত জটিলই হোক সমাধান হয়ে যায় দ্রুত গতিতে। কিছুক্ষণের মধ্যে সজল মিত্র হাতে পেয়ে যান টাইপ করা সমাধান। সজল মিত্র হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। রেহাই পেয়েছেন দুশ্চিন্তার হাত থেকে। দৈনন্দিন কাজের চাপ হয়ে গেছে হাল্কা। ইতিমধ্যে অলিভার যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে তাতে কোম্পানীর যথেষ্ট লাভ হয়েছে। গত সপ্তাহের লেবার প্রবলেমটা অলিভারের দেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ট্যাকল করে অদ্ভুত সাফল্য লাভ করেছেন সজল মিত্র, তা না হলে হয়ত ফ্যাক্টরী একটা বড় রকমের স্ট্রাইকের সম্মুখীন হত। প্রোডাক্টিভিটি রেশিও হু-হু করে নেমে যেত।

সেদিন অফিস থেকে ফিরেই অলিভারকে নিয়ে বসলেন সজল মিত্র। একটা একসপোর্ট অর্ডার নিয়ে ঝামেলা দেখা দিয়েছে। দ্রুত সিদ্ধান্ত না নিতে পারলে কয়েক কোটি টাকা লোকসান হবার ভয় আছে। সবাই ম্যানেজিং ডিরেকটরের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছে। খুব আস্তে আস্তে ভাবতে সুরু করলেন সজল মিত্র। যাতে কোন মূল্যবান পয়েন্ট ভুলে না যান। সম্পূর্ণ সমস্যাটা অলিভারের প্রোগ্রাম টেপে পাঠিয়ে একটু যেন হাল্কা হলেন। অফিসের পোশাক ছেড়ে বাথরুমে ঢুকলেন।

স্নান সেরে ঘরে ঢুকতেই দেখলেন টেবিলের উপর টাইপ করা কাগজগুলো রয়েছে। দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন সজল মিত্র। খুশী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফোনে খবর দিয়ে দিলেন অন্যান্য ডিরেকটরদের। টেলেক্স চলে গেল বিদেশের কাস্টমারের কাছে।

ডাইনিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন সজল মিত্র। টেবিলে খাবার সাজানো কিন্তু গায়ত্রী নেই। গায়ত্রী সাধারণত এ সময় টেবিলে থাকে—টুকিটাকী কথাবার্তা হয়। গায়ত্রীকে দেখতে না পেয়ে সজল মিত্র ডাকলেন—গায়ত্রী! গায়ত্রী নিজের ঘর থেকে সাড়া দিল—আসছি। একটু পরেই গায়ত্রী বেরিয়ে এলো। অপূর্ব সেজেছে গায়ত্রী। একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সজল মিত্র—কোথায় বেরুবে নাকি?

—হ্যাঁ, মিঃ নারলিকারের বাড়ীতে পার্টি আছে।

—কিন্তু...সজল মিত্র কথাটা শেষ করার আগেই গায়ত্রী বলল,—না-না, তুমি খেয়ে বিশ্রাম করো, তোমাকে আর কষ্ট দিতে চাই না—আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি।

মুখ নীচু করে খেতে সুরু করলেন সজল মিত্র। গায়ত্রী পট থেকে কফি ঢেলে কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলল—যাচ্ছি।

—আচ্ছা। সজল মিত্র কফির কাপটা এগিয়ে নিয়ে চুমুক দিলেন। সজল মিত্রের খুশী হওয়া উচিত ছিল কিন্তু কেন উনি যেন খুশী হতে পারলেন না। একটা সূক্ষ্ম কষ্ট অনুভব করলেন। কফি খেতে খেতে বুঝতে পারলেন ওরা বেরিয়ে গেল। গায়ত্রীর হাসির শব্দ ভেসে এলো সজল মিত্রের কানে। নিজেকে যেন বোঝালেন—গায়ত্রী তো অন্যায় কিছু করেনি। সারাদিন অফিসের কাজের পর আর পার্টির হৈ-হট্টগোল ও'র ভাল লাগে না। গায়ত্রী যে ও'কে বিরক্ত করেনি, তার জন্য ওকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ছিল সজল মিত্রের।

মনটা হাল্কা হয়ে গেল। খুশী মনে একটা চুরুট ধরিয়ে রিল্যাকস চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন সজল মিত্র। মনে মনে ভাবলেন সত্যি অলিভার মানুষের এক আশ্চর্য সৃষ্টি। সজল মিত্র এখন নিজের ঘরে রিল্যাকস চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছেন অথচ এই মুহূর্তে আর এক সজল মিত্র মিঃ নারলিকারের পার্টিতে হৈচৈ করে বেড়াচ্ছে। বলে না দিলে কেউ জানতেও পারবে না যে আসল সজল মিত্র তখন পার্টি থেকে অনেক দূরে। হয়ত এমন দিন আসবে যখন একই সঙ্গে দশটা কি তারো বেশী সজল মিত্র দশ কি তারো বেশী জায়গায় একই সঙ্গে উপস্থিত থাকতে পারবে। আসল সজল মিত্রকে ঘর ছেড়ে বেরুবার দরকারই হবে না। ভাবতেও কেমন অদ্ভুত লাগে। অথচ বিজ্ঞান এও সম্ভব করতে পারে। অফুরন্ত এর ঐশ্বর্য। মানুষ কতটুকুই বা আহরণ করতে পেরেছে।

(চার)

একসপোর্ট অর্ডার সম্বন্ধে ম্যানেজিং ডিরেকটর সজল মিত্র যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার জন্য কোম্পানী কয়েক কোটি টাকা লোকসানের হাত থেকে বেঁচে গেছে! অন্যান্য ডিরকটররা সজল মিত্রকে অভিনন্দন জানালেন। সজল মিত্র খুব খুশী হলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল এ অভিনন্দন তো পাওয়া উচিত অলিভারের। সিদ্ধান্ত তো নিয়েছে অলিভার। নিজেকে হঠাৎ যেন ছোট মনে হল অলিভারের কাছে। মানুষের তৈরী যন্ত্র মানুষের থেকেও নিখুঁত। আবার ভাবলেন এসব কি তিনি ভাবছেন আবোল তাবোল। যন্ত্র-যুগে মানুষ যন্ত্রকে তো কাজে লাগাবেই। যন্ত্রকে কাজে লাগাতে পারছে বলেই তো মানুষের সভ্যতা এগিয়ে চলেছে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে: একটা ক্রেন তো একটা মানুষের থেকেও যথেষ্ট শক্তিশালী। প্রচন্ড ভারী জিনিস অনায়াসে শূন্যে তুলে ফেলছে, তবে কি ক্রেনের কাছে মানুষ নিজেকে ছোট ভাবে? মানুষের পেশীর শক্তি যেমন বহুগুণ বেড়ে গেছে যন্ত্রের সাহায্যে তেমনি মগজের শক্তিও বেড়ে যাচ্ছে যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে। এটাই তো যন্ত্রযুগের সাধারণ নিয়ম। না, মাঝে মাঝে পুরোনো দিনের মানসিকতা যেন ও'কে পেয়ে বসে। নতুন যুগে নতুন মূল্যবোধের জন্ম হচ্ছে। পুরোনো মূল্যবোধকে আঁকড়ে পড়ে থাকার অর্থ হচ্ছে নিজেকে যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যর্থ হওয়া। তার ফল ভাল হতে পারে না। অবশ্য পুরোনো ধ্যান-ধারণা মূল্যবোধকে হটিয়ে দেওয়াও সহজ নয়। সেগুলো মানুষের মজ্জায় মিশে থাকে—মিশে থাকে সংস্কারে আর তাই বাধে সংঘাত।

সজল মিত্র অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন। এমন সময় কোন দিনই অফিস থেকে বেরোন না। তাই ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়ে যেন একটু দিশেহারা হয়ে পড়লেন। কোথায় যাবেন এখন? নিজের অজ্ঞানতেই কখন গঙ্গার ধারের দিকে এগিয়ে চলেছেন বুঝতে পারেন নি। অনেক দিন আসেন নি এদিকে। বড্ড হট্টগোল। ওই দূরে দ্বিতীয় হাওড়া ব্রীজ। ভাবলেন গাড়ী থেকে নেমে একটু পায়চারী করবেন। কিন্তু হট্টগোলের জন্য ভাল লাগল না। মনে হল বরং বাসায় ফিরে গায়ত্রীকে একটু চমকে দেওয়া যাবে। গাড়ী ঘুরিয়ে বাসায় পৌঁছুলেন। দরজার সামনে দাঁড়াতেই দরজা আপনা থেকে খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে উনি আস্তে আস্তে গায়ত্রীর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ইচ্ছে ছিল গায়ত্রীকে একটু চমকে দেবেন। কিন্তু দরজার পর্দার ফাঁক দিয়ে যে দৃশ্য তার নজরে পড়ল তাতে তিনি নিজেকে যেন সামলাতে পারলেন না। সমস্ত রক্তস্রোত যেন তীব্রগতিতে মাথার মধ্যে এসে আছড়ে পড়ল। দেখলেন গায়ত্রী নিজের বিছানায় শুয়ে আছে আর তার প্রায় নগ্ন দেহে অলিভার আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এলেন। না, না এভাবে চলতে পারে না। পুরোনো সংস্কারকে কিছুতেই হটাতে পারলেন না সজল মিত্র। কিন্তু...কিন্তু অলিভারকে ছাড়াও তো ওর এক মুহূর্ত চলবে না। এই যে উত্তরোত্তর খ্যাতি বেড়ে চলেছে, এই যে একচেটিয়া প্রভুত্ব করার ক্ষমতা পেয়েছেন তা তো অলিভারকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। একটা তীব্র দোটানার মধ্যে পড়লেন সজল মিত্র। গায়ত্রীকে সাবধান করতে হবে। অবশেষে সেইদিন সন্ধ্যায় গায়ত্রীর কাছে পাড়লেন কথাটা।

—গায়ত্রী।

—বল। গায়ত্রী হাসিমুখে জবাব দিল ডাইনিং টেবিলে বসে। একটু ইতস্তত করলেন সজল মিত্র। কিভাবে কথাটা আরম্ভ করবেন তা যেন ঠিক করে উঠতে পারছেন না।

—কি হল? চুপ করে গেলে কেন? গায়ত্রী একটু হেসে বলল।

—তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। তবে কিভাবে আরম্ভ করব তাই বুঝতে পারছি না।

—কি এমন কথা?

—কথাটা অলিভারকে নিয়ে। ওকে নিয়ে তুমি বোধহয় একটু বেশী বাড়াবাড়ি করছ। কোন রকম কথাটা যেন শেষ করলেন সজল মিত্র।

সজল মিত্রের কথা শেষ হতেই গায়ত্রী ও'র মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তারপর একটু হেসে বলল—তুমি কি আজ সকাল সকাল বাসায় ফিরেছো?

—হ্যাঁ—আর সেই জন্যই কথাটা বলতে হল। আশা করি বুঝতে পেরেছো। সজল মিত্রের কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

গায়ত্রী এবার খিল খিল করে হেসে উঠল।

—হাসছো যে? একটু বিরক্ত হলেন সজল মিত্র।

—হাসির কথা বললে হাসবো না?

—এটা তোমার কাছে হাসির কথা হল?

—হাসির কথা না? তুমি আর অলিভার কি আলাদা?

—তাও কি তোমায় বুঝিয়ে দিতে হবে? একটা যন্ত্র আর মানুষ কি এক হতে পারে?

—কিন্তু তুমিই তো আমাকে বলেছিলে অলিভার তোমারই পরিবর্তিত সত্তা। তা কি অস্বীকার করো?

—না অস্বীকার করি না—তবে একথা সত্যি যে ওই অলিভারটা কখনই সজল মিত্র নয়।

—তুমি যদি তাই মনে করো তাহলে ওকে সেইভাবে ইনস্ট্রাকশান দিয়ে দাও—সব ঝামেলা চুকে যাবে। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? নাও খাও—বলে গায়ত্রী সজল মিত্রের ডিশে খাবার তুলে দিল। গায়ত্রী যেন কোন গুরুত্বই দিল না ব্যাপারটায়। সজল মিত্র মনে মনে যেন অপমানিত বোধ করলেন। কোন রকমে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লেন টেবিল থেকে।

ড্রইংরুমের সোফায় বসে অলিভার চোখদুটো আধবোজা অর্থাৎ বিশ্রাম নিচ্ছে। সজল মিত্র মাথায় টুপিটা পরে নিয়ে প্লাগ লাগিয়ে দিলেন। অলিভার চোখ খুলে সজল মিত্রের মুখের দিকে তাকালো। সজল মিত্রও ওর মুখের দিকে তাকালেন। অলিভারের দুই ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসির রেখা। হাসিটা যেন অবজ্ঞার—যেন বিদ্রূপ করছে সজল মিত্রকে। নিজেকে সামলাতে পারলেন না সজল মিত্র। মাথার মধ্যে যেন আগুন ধরে গেল। মনে হল সম্ভব হলে এখুনি অলিভারকে টুকরো টুকরো করে ফেলতেন। অসহ্য রাগে মাথার টুপিটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ইচ্ছে করে ঘরের আলো জ্বালালেন না। আলো যেন অসহ্য লাগছে। হুইস্কির বোতলটা খুলে ঢক ঢক করে খানকটা গলায় ঢেলে দিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়লেন। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে মাথার মধ্যে। মনে হচ্ছে মাথাটা বুঝি ফেটে যাবে। নরম বালিশটা মাথার উপরে চেপে ধরলেন জোর করে।...বন্ধ চোখের পাতা ভেদ করেও যেন অলিভারের মুখটা চোখের সামনে ভাসছে সজল মিত্রের। সে মুখ আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে...উঃ কি ভয়ানক—যেন আঁতকে উঠলেন সজল মিত্র। শুধু মুখ নয়, আস্তে আস্তে বাড়ছে ওর দেহ। আর সেই দেহের বিরাট অন্ধকার ছায়া যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করছে সজল মিত্রকে—তার চারপাশের পরিমণ্ডলকে। এর হাত থেকে বোধ হয় মুক্তি নেই সজল মিত্রের। ভয়ে ঘেমে উঠলেন—মনে হল যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে ওঁর। গভীর অন্ধকার, একটু বাতাসও বুঝি নেই সেই অন্ধকারে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সজল মিত্রের। একটা ভারী কিছু যেন বুকের উপরে চেপে বসেছে। চোখ চাইলেন কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখতে পেলেন না। গলাটার উপর কে যেন চাপ দিচ্ছে। ক্রমেই সে চাপ বেড়ে চলেছে। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন সজল মিত্র কিন্তু গলা দিয়ে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ ছাড়া আর কিছু বের হল না। অন্ধকারে একটু চোখটা সয়ে যেতে আবছা যাকে দেখলেন তাতে ও'র শরীরের রক্ত হিম হয়ে এলো। থরথর করে কেঁপে উঠল সারা দেহ। প্রাণপণ শক্তিতে অলিভারকে বুকের উপর থেকে ঠেলে ফেলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সফল হলেন না। ও শক্ত পাথরের মত বুকের উপর চেপে আছে।

—কেন? কেন? আমাকে খুন করছ? অতি কষ্টে শেষবারের মত যেন জানতে চাইলেন সজল মিত্র। অন্ধকারে অলিভারের মুখ দেখতে পেলেন না, শুনতে পেলেন এক বিকৃত কণ্ঠস্বর—আমি তোমাকে খুন করার কে? তুমি নিজেই তো তোমাকে খুন করতে চেয়েছিলে কিছুক্ষণ আগে।

হঠাৎ সেই শেষ মুহূর্তে সজল মিত্র যেন বুঝতে পারলেন, কি ভুল তিনি করেছেন, কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। অলিভারের যান্ত্রিক হাতের নীচে সজল মিত্রের মাথাটা ঢলে পড়ল। দেহটা নিস্পন্দ হয়ে গেল, আর মুখের দুকষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা তাজা রক্ত। সেই সঙ্গে শক্ত মেঝেতে একটা ধাতব কিছু গড়িয়ে পড়ার শব্দ রাতের নিস্তব্ধতাকে সজোরে আঘাত করল।

গোয়েন্দাধাঁধা

ধোঁকা-বাজ শার্লক হোমস্‌-স্যার আর্থার কোনান ডয়াল

ওয়াটসনের তখন সবে বিয়ে হয়েছে। আইবুড়ো শার্লক হোমসকে বেকার স্ট্রীটের বাসায় ফেলে আলাদা সংসার পেতেছে। বউ পুষতে গিয়ে নতুন করে ডাক্তারিও শুরু করেছে। কোকেন-আসক্ত ডিটেকটিভ বন্ধুকে মনেও নেই। বউ এমনি জিনিস।

রুগী দেখে একদিন বেকার স্ট্রীট দিয়ে ফিরছিল ওয়াটসন। সবে সন্ধ্যা হয়েছে। পুরোনো বাসার সামনে এসে দেখল, দোতলার ঘরে উত্তেজিতভাবে পায়চারী করছে শার্লক হোমস।

বউয়ের কথা তখনকার মত ভুলে গেল ওয়াটসন। তরতর করে উঠে গেল ওপরে। বন্ধুকে দেখে খুশী হলেও যথারীতি বাইরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না হোমস।

বলল—'বাঃ বিয়ে করে বেশ গায়ে-গতরে সেরেছো দেখছি। ওজন সাড়ে সাত পাউণ্ড বেড়েছে। ঠিক?'

'সাত পাউণ্ড।'

'আধ পাউণ্ড বাড়িয়েছি মাত্র। আবার ডাক্তারি শুরু করেছো বললাম তো?'

'তুমি জানলে কি করে?'

'তোমাকে দেখে। তুমি যে সম্প্রতি বৃষ্টিতে বেড়াল-ভেজা ভিজেছো আর তোমার কপালে একটা আনাড়ি ঝি জুটেছে, তাও কিন্তু বলেনি।'

লাফিয়ে উঠল ওয়াটসন—'হোমস বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। সেকাল হলে নির্ঘাৎ তোমাকে পুড়িয়ে মারা হত ডাইনী সন্দেহে। বেস্পতিবারে সত্যিই ভিজে চুপসে পাড়াগাঁয়ে রুগী দেখতে গিয়েছিলাম। বেআক্কেলে ঝি-কে জবাব দিয়েছে গিন্নী এই সেদিন। কিন্তু তুমি কি গণৎকার?'

হেসে উঠল হোমস—'তোমার বাঁ পায়ের জুতোর তলার দিকে দুটো সমান্তরাল আঁচড়ের দাগ রয়েছে। বুঝলাম, অসাবধানী ঝি জুতো পরিষ্কার করতে গিয়ে ঐ কাণ্ড করেছে। নিশ্চয় জলকাদায় রাস্তায় বেরিয়ে জুতোয় কাদা লাগিয়ে এনেছিলে। তোমার ডাক্তারির কথা জানলাম আরো সহজে। গায়ে আয়োডোফর্মের গন্ধ, ডানহাতের বুড়ো আঙুলে সিলভার নাইট্রেটের কালচে দাগ আর স্টেথোসকোপ লুকিয়ে রাখার ফলে উঁচু টুপী দেখেই ধরেছি ফের রুগী মারতে রাস্তায় বেরিয়েছো। আসলে কি জানো ওয়াটসন, তুমি চোখ দিয়ে দেখো— মন দিয়ে নয়। যেমন ধরো, এই বাড়ীর সিঁড়িতে বহুবার ওঠানামা করেছো। কটা ধাপ আছে বলো তো? পারলে না তো। আমি কিন্তু জানি সতেরোটা। আচ্ছা, এই নাও একটা চিঠি। কাগজ দেখে কি মনে হচ্ছে বলো তো।'

টেবিলের ওপর থেকে একটা গোলাপী চিঠি এগিয়ে দিল হোমস। দামী কাগজ। পত্রলেখক বিত্তবান। এর বেশী কিছু বলতে পারল না ওয়াটসন।

হোমস কিন্তু অনেক কথাই বলে ফেললে। কাগজটার জলছাপ দেখে বলে দিলে পত্রলেখক জার্মান এবং বাড়ী বোহেমিয়ায়। কারণ এ কাগজ সেখানেই তৈরী হয়। আর, চিঠির ভাষা আড়ষ্ট বলেই বোঝা যায় জার্মান হাতের ইংরেজী।

এই কথা বলতে না বলতেই এসে হাজির পত্রলেখক। মুখের ওপরে মুখোশ। মুখের তলার দিকে প্রখর ব্যক্তিত্ব, কড়া মেজাজ আর একগুঁয়েমির ছাপ।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই প্রথমে শপথ করিয়ে নিলেন, দু বছরের মধ্যে এসব কথা কাউকে বলা যাবে না। বললে ইউরোপের ইতিহাসে প্রভাব দেখা দেবে। তিনি এসেছেন বোহেমিয়ার এক রাজবংশের প্রতিনিধি হয়ে।

নীরস কণ্ঠে হোমস বললে—'বোহেমিয়ার রাজামশাই নিজেই যখন এসেছেন, তখন সব কথা খুলে বললেই হয়।'

ধরা পড়ে গিয়ে মুখোশ টেনে ফেলে দিলেন বোহেমিয়ার রাজা, ঘরময় ছটফট করে ঘুরতে ঘুরতে বললেন—'আমি বাধ্য হয়ে আত্মগোপন করেছিলাম। পাঁচ বছর আগে অভিনেত্রী আইরিন অ্যাডল্যারের সঙ্গে আমার ভালোবাসাবাসি হয়েছিল। একসঙ্গে ছবিও তুলেছিলাম। তারপর, সব চুকেবুকে গেছে। কিন্তু ছবিটা আইরিন রেখে দিয়েছে। শাসাচ্ছে যেদিন আমার বিয়ের তারিখ ঘোষণা করা হবে, সেই দিনই হাটে হাঁড়ি ভাঙবে সে। তার মানে আর মাত্র তিন দিন হাতে আছে। তার মধ্যেই ছবিটা চাই।'

'কার সঙ্গে বিয়ে?' হোমসের প্রশ্ন?

'স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রাজকন্যের সঙ্গে।'

'এত দিন ছবি খোঁজেন নি কেন?'

'পাঁচ-পাঁচবার চেষ্টা করেছি। দুবার দাগী চোর লেলিয়ে, দুবার রাস্তায় ওৎ পেতে থেকে, একবার আইরিনের দেশ-ভ্রমণের সময়ে সারা বাড়ী তোলপাড় করে। ছবি পাই নি। ছবি না পেলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে মিস্টার হোমস। এই নিন হাজার পাউণ্ড। আপনার পারিশ্রমিক। কিন্তু ছবিটা এনে দিন।'

'দেব। তিন দিনের মধ্যে।'

আশ্বস্ত হয়ে বুহাম গাড়ী হাঁকিয়ে বিদেয় হলেন বোহেমিয়ার রাজা। হোমস ওয়াটসনকে বললে—'কাল বিকেল তিনটের সময়ে এলে আরো মজা দেখবে।'

পরের দিন ঘড়ি ধরে তিনটের সময়ে হাজির হল ওয়াটসন। হোমস ফিরে এল নোংরা পোশাক-পরা সহিসের ছদ্মবেশে। হাসতে হাসতে বললে তার সারা দিনের অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী। আইরীন অ্যাডলারের বাড়ীর পাশে আস্তাবল থেকে অনেক খবর এসেছে সে। আইরীন অ্যাডলার ডাকসাইটে সুন্দরী। মনটা দরাজ। ইদানীং একজন সুপুরুষ বন্ধু জুটেছে। নাম গডফ্রে নর্টন। এগারোটার একটু পরেই হঠাৎ নর্টন এল গাড়ী চেপে। আধ ঘন্টা পরে সেই গাড়ীতেই ঝড়ের মত গেল সেন্ট মনিকা গির্জেতে। তারপরেই ল্যাণ্ডো হাঁকিয়ে আইরিনও গেল সেই একই গির্জেতে। পেছন পেছন হোমসও হাজির হল সেখানে। তারপরেই ভ্যাবাচাকা খেয়ে খেয়ে গেল পাদরীর আহবানে। আইরিনের সঙ্গে নর্টনের বিয়ে। আর সময় নেই। সাক্ষী চাই। গির্জে ফাঁকা। সুতরাং সহিস-

বেলা। [illegible] হয়ে গেল দুজনের।

তারপর? হোমস বললে — 'এক্ষুনি আইরিনের বাড়ী যেতে হবে। এখন পাঁচটা। সাতটার আগে আইরিন বাড়ী ফিরবে না। চলো হে ওয়াটসন, তোমারও কাজ আছে।'

'কি কাজ?'

একটা ধোঁয়া-বোমা ওয়াটসনের হাতে ধরিয়ে দিল হোমস। বলল—'এই কাজ। আমি হাত ইসারা করলেই আইরিনের ঘরে ছুঁড়ে দেবে।'

বলে নতুন ছদ্মবেশ ধরল হোমস। এবার সৌম্যমূর্তি পাদরী সাহেবের'। দেখে চমৎকৃত হল ওয়াটসন। ভাবল। হোমস অপরাধ বিশেষজ্ঞ হওয়ায় বিজ্ঞানজগৎ একজন বৈজ্ঞানিককে হারিয়েছে, মঞ্চজগৎ হারিয়েছে একজন অভিনেতাকে।

আইরিন বাড়ী ফিরতেই দোর গোড়ায় সামনে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হল। ছিন-তাইয়ের দৃশ্য। আইরিনকে বাঁচাতে ছুটে গেল পাদরীবেশী হোমস। লুটিয়ে পড়ল রক্তাক্ত মুখে। ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হল বৈঠকখানায়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওয়াট-সন যেই দেখল হাত তুলেছে হোমস— ছুঁড়ে দিল ধোঁয়া-বোমা জানলা গলিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ করে উঠল রাস্তার লোকেরা।

কিছুক্ষণ পরে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল হোমস। দুই বন্ধু গল্প করতে করতে ফিরে এল বেকার স্ট্রীটে। ছবিখানা? এখনো পাওয়া যায় নি। তবে কোথায় আছে জানা গেছে।

বাড়ীতে ঢুকতে যাচ্ছে হোমস এমন সময়ে শুনল পেছন থেকে কে বলছে— 'গুড নাইট, মিস্টার শার্লক হোমস।'

হকচকিয়ে পেছন ফিরল হোমস। গলাটা চেনা। কিন্তু অলস্টারধারী ঐ যে পাতলা ছোকরাটা চলে গেল, তার গলা তো ও রকম নয়?

পরের দিন সকালে বোহেমিয়ার রাজাকে নিয়ে আইরিনের বাড়ী হাজির হল দুই বন্ধু। গিয়ে বোকা বনে গেল।

ভোরবেলা নতুন স্বামীকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চম্পট দিয়েছে আইরিন। চাকর-বাকরকে বলে গেছে, শার্লক হোমস বলে এক ভদ্রলোক এলে যেন বসতে বলা হয়।

ঘর-দোর তছনছ অবস্থা। খুব দ্রুত জিনিসপত্র গুছোতে হয়েছে আইরিনকে। হোমস লাফ দিয়ে ঘন্টার দড়ির পেছনে একটা প্যানেল [illegible] হাত ঢুকিয়ে দিল। টেনে আনল [illegible] আর একটা ছবি শুধু আইরিনের।

আইরিন [illegible] হোমসকে, তার অনুরোধ সে পালাচ্ছে। পাদরী হোমসকে তার সন্দেহ হয়েছিল। তাই ছোকরার ছদ্মবেশে বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল কাল রাত্রে। মহা-রাজার ভয় নেই। যুগল ছবিটা সঙ্গে রাখছে সে আত্মরক্ষার জন্যে কখখনো প্রকাশ পাবে না।

রাজা তো মহাখুশী—আইরিন বড় ভালো মেয়ে। ওর মুখের কথার কথনো নড়চড় হয় না। মিস্টার হোমস, আর কি নেবেন? আমার হাতের এই মরকত আংটিটা চলবে?

'না,' বলল হোমস। আইরিনের ছবিটা শুধু দিন। আর কিছু না।'

খুশী হল সবাই। কিন্তু আমরা পাঠক-পাঠিকারা তো খুশী হতে পারছি না। ছবির হদিশ জানল কি করে শার্লক হোমস?

—অদ্রীশ বর্ধন

(সমাধান ৪৮নং পাতায়)

এই বাংলার খবর

দুর্গত মানুষের ত্রাণ

এই বাংলার মানুষের এক বিরাট অংশের দুর্গতি ঢেকে রাখার আর কোনো উপায় নেই, দায়িত্বসম্পন্ন কেউ সে চেষ্টাও করছেন না। দিল্লীতে খাদ্যশস্যের জন্যে দরবার করে ফিরে এসে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলেছেন, আগামী দু'মাস এই রাজ্যের পক্ষে খুবই দুঃসময়। তবে সেই সঙ্গে এই সংকল্পও তিনি ঘোষণা করেছেন যে, সরকার অনাহারে কাউকে মরতে দেবেন না। এখনও অবশ্য অনাহারে অথবা অপুষ্টিতে মৃত্যু, এই নিয়ে যে কোনো কোনো মহলে চুলচেরা বিচার চলছে না, তা নয়। কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মৈত্রও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অনাহার আর নানা রোগে মৃত্যুর সংখ্যা অন্তত এক হাজার। জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস সভাপতির দেওয়া হিসেব যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে শুধু ঐ জেলাতেই অনাহারে মারা গেছে ৪০০ নরনারী। এদিকে কাকদ্বীপ থেকে নির্বাচিত বিধানসভার সদস্য জানাচ্ছেন যে, তাঁর কেন্দ্রে অনাহারে ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে। গোটা সুন্দরবন এলাকা জুড়েই খাদ্যাভাব চরম। বর্ধমানের মতো উদ্বৃত্ত জেলাতেও অনেক গ্রামে চাল-গম মিলছে না। বীরভূমও উদ্বৃত্ত জেলা। তবু সেখানেও কোনো কোনো এলাকায় খাদ্যাভাব তীব্র—বিশেষত ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে। বিদ্যুৎ দপ্তরের উপমন্ত্রী সুনীতি চট্টরাজ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন তাতে তিনি এই কথাই লিখেছেন।

সুনীতিবাবুর পদত্যাগপত্র পেশ ত্রাণের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সংকটকে স্পষ্ট করে তুলেছে। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের ন'টি জেলায় ত্রাণের ব্যবস্থা হয়েছে, অথচ বীরভূমে হয়নি। ত্রাণের জন্যে দাবিদার প্রায় সব জেলা, অথচ সরকারের সঙ্গতি রীতিমতো সীমিত। আপাতত ঠিক হয়েছে ন'টি জেলায় সাড়ে চৌদ্দ লাখ লোককে ত্রাণের আওতায় আনা হবে। খয়রাতি সাহায্য হিসেবে মাথা পিছু গম বা আটা দেওয়া হবে দু' কিলো প্রতি সপ্তাহে। টেস্ট রিলিফ কাজের জন্যে দেওয়া হবে দৈনিক ৭৫০ গ্রাম গম আর নগদে পাঁচ সিকে। ইতিমধ্যে ত্রাণের কর্মসূচিতে একটা বড় রকমের বদলও ঘটেছে। লঙ্গরখানা আর চীপ ক্যান্টিনের মারফৎ ছ'লাখ লোককে রান্না-করা খাবার যোগানোর ব্যবস্থা বেশ কিছুটা ছাঁটাই হয়েছে। এ-পর্যন্ত দেড় লাখ লোক ঐ ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। আর এ-ব্যবস্থা বাড়ানো হবে না, কারণ রান্না-করা খাবার পরিবেশনে অসুবিধে অনেক। তার মধ্যে একটা হলো, যথেষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীর অভাব।

বামপন্থীরা আন্দোলনে নামছেন

শেষ পর্যন্ত এই রাজ্যের বামপন্থী দলগুলো আন্দোলনে নামছে। এজন্যে তারা একটা পাকা কর্মসূচীও তৈরি করে ফেলেছে। স্বভাবতই তাদের আন্দোলনের উপলক্ষ রাজ্যব্যাপী অন্নাভাব আর মানুষের দুর্দশা। এটাও স্বাভাবিক যে, রাজ্যে খাদ্যাভাব আছে বামপন্থীরা তা স্বীকার করতে চাইছেন না মোটেই। তাঁদের হিসেব অনুযায়ী এ-বছর এই রাজ্যে ফসল হয়েছে বেশ ভালোই—৬০ লাখ টনের মতো। কিন্তু, তাঁদের অভিযোগ, সরকারি অপদার্থতার জন্যেই ধান-চাল যথেষ্ট সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এখনও অনেক চাল মজুত আছে জোতদার আর মজুতদারের ঘরে। বামপন্থীরা আন্দোলনের যে কর্মসূচী তৈরি করেছেন তা হলো মোটামুটি এই : অক্টোবরের পয়লা থেকে সাত তারিখ পর্যন্ত ব্লক, থানা আর মহকুমা সদর ঘেরাও ও অবস্থান। তারপর আট থেকে পনের তারিখ পর্যন্ত জেলা সদর ঘেরাও। আর সতের তারিখে কলকাতায় রাজভবনের দিকে বিরাট মিছিল। দাবি সর্বত্রই এক—গোটা পশ্চিম বাংলাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করতে হবে এবং এখনই সব ক্ষুধার্ত মানুষকে খাওয়াবার দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে। এরপর পুজোর সময়েও বন্ধ থাকবে না আন্দোলন।

সম্প্রতি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির রাজ্য কমিটির যে-বৈঠক হয়ে গেল সেখানেও রাজ্যের শোচনীয় অবস্থার জন্যে সরকারের জনবিরোধী ও মজুতদার-তোষণ নীতিকে দায়ী করা হয়েছে। দলের নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তের হিসেব অনুযায়ী এ-পর্যন্ত এই রাজ্যের আটটি জেলায় অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা ৫০২। গোটা রাজ্যে এই সংখ্যা এক হাজার হবে। এই অবস্থায় এক-আধ দিন বাংলা বন্ধ না-করে সি পি এম বড় রকমের আন্দোলন করার পক্ষপাতী। সি পি এমের এই ডাকের পর ন' পার্টির বৈঠক বসে আর সেখানেই নেওয়া হয় অক্টোবরে আন্দোলনের কর্মসূচী। এদিকে সি পি আই এই সঙ্কটের সময় বিধানসভার বৈঠক ডাকার প্রস্তাব করেছে। এ-বিষয়ে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় একটা চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে। উল্লেখযোগ্য যে, বিধানসভার কিছু কংগ্রেসী সদস্যও এখনই বিধানসভার বৈঠক ডাকার পক্ষপাতী। কিন্তু রাজ্য সরকার নভেম্বরের আগে বিধান-সভা ডাকতে চান না।

তদন্ত কমিশনে নতুন আগ্রহ

অনেক ঢাক-ঢোল পেটানোর পর পাঁচজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের জন্যে যে কমিশন বসেছে, প্রথম-প্রথম তার শুনানী চলছিল বলতে গেলে ফাঁকা ঘরে। অভিযুক্ত মন্ত্রী, অভিযোগকারী অথবা দু পক্ষের কৌসুলি আর সাংবাদিকেরা অবশ্যই হাজির থাকেন, কিন্তু যাদের বলা হয় সাধারণ মানুষ তাঁরা এটাকে একটা মামুলি ব্যাপারের চেয়ে বেশি কিছু ভাবছেন

... কৈলাসনাথ ওয়াঞ্চু বিধানসভার সংলগ্ন ভবনে কাজ সুরু করলেন সেদিন ভিড় সামলাবার তোলাও ব্যবস্থা করেছিল পুলিশ—কিন্তু দেখা গেল তার দরকার ছিল না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের শুনানীও হচ্ছিল এই অবস্থাতেই। হঠাৎ অবস্থাটা গেল বদলে। কমিশনের শুনানী শুনতে যাকে বলে একেবারে লোকারণ্য। দুর্নীতির তদন্ত নিয়ে এই নতুন আগ্রহের মূলে ত্রাণমন্ত্রী সন্তোষ রায়ের বোন গায়ত্রী রায়ের চাকরির ব্যাপারে নতুন তথ্য।

সন্তোষবাবুর বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ নিয়ে তদন্ত হচ্ছে তা হলো, তিনি গায়ত্রীকে সমাজ কল্যাণ পর্ষদে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন। এই স্বজনপোষণের অভিযোগ জটিল হয়ে উঠলো যখন গায়ত্রী কমিশনের সমনের উত্তরে জানালেন যে, তিনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়েই নিজেকে গ্র্যাজুয়েট বলে পরিচয় দিয়েছেন। এই কথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজ কল্যাণ পর্ষদের মুখ্যসেবিকার পদে ইস্তফাও দিলেন। তদন্ত কমিশনের কাছে নতুন করে হলফনামা পেশ করতে হলো সন্তোষবাবুকে। কারণ ইতিপূর্বে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর বোন গ্র্যাজুয়েট। এখন তিনি জানালেন, গায়ত্রী যে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি, সে-কথা সন্তোষবাবু জানতেন না।

সমাজ কল্যাণ পর্ষদের মুখ্যসেবিকা (এবং আরো কয়েকটি) পদের প্রার্থী বাছাইয়ের জন্যে সরকার যে-কমিটি নিয়োগ করেন তার সভানেত্রী ছিলেন সবিতা দেবী। তিনি একজন শিক্ষিকা। সবিতা দেবী তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন, মুখ্যসেবিকা পদে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্যে গায়ত্রীকে কোনো চিঠি পাঠানো হয়নি। সমাজ কল্যাণ পর্ষদের আঞ্চলিক সদস্যা প্রতিমা দাশগুপ্তের সুপারিশেই তাঁকে ইন্টারভিউয়ে ডাকা হয়। ইন্টারভিউয়ে সবিতা দেবী গায়ত্রীকে পঁচিশের মধ্যে দেন মাত্র তিন নম্বর। তবু যে গায়ত্রী কীভাবে চাকরি পেলেন তা তিনি বুঝতে পারলেন না। তবে তিনি আরো জানান যে, মুখ্যসেবিকার পদে যে গায়ত্রীকে নিয়োগ করা হবে এটা তিনি আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন, কারণ সমাজ কল্যাণ পর্ষদের অধ্যক্ষা প্রতিমা বসু তাঁকে জানান যে গায়ত্রী এই পদে নিযুক্ত হোক এটাই সন্তোষবাবুর ইচ্ছে। অবশ্য আঞ্চলিক সদস্যা প্রতিমা দাশগুপ্তা তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন, অন্যান্য প্রার্থীর মতো গায়ত্রীও মুখ্যসেবিকার পদের জন্যে আবেদন করেছিলেন, তাঁকে ইন্টারভিউয়েও ডাকা হয়েছিল এবং ইন্টারভিউয়ের পর তাঁকে নম্বরও দেওয়া হয়েছিল। এদিকে সবিতা দেবী বিচারপতি ওয়াঞ্চুকে জানিয়েছেন যে, তাঁকে ও তাঁর পরিবারের লোকজনকে ভয় দেখানো হচ্ছে।

হলদিয়ায় জাহাজ কারখানা

এই বাংলায় একটা জাহাজ কারখানা হোক, এই দাবি অনেক দিনের। তার জন্যে একটা সুবিধেমতো জায়গার কথাও বলা হয়েছে—হলদিয়া। শুধু নিজের কোলে ঝোল টানার চিরাচরিত ইচ্ছে অনুযায়ীই যে পশ্চিম বাংলা এই দাবি জানাচ্ছে তা অবশ্য নয়। হলদিয়ায় একটা পুরোদস্তুর জাহাজ কারখানা গড়ে তোলার মতো সব সুযোগও রয়েছে। এ জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যোগানোর উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প আর কোন্ রাজ্যেই বা আছে? এই রাজ্যে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মীরও অভাব নেই। কলকাতা এত বড় একটা বন্দর, এর কাছাকাছি একটা জাহাজ কারখানা থাকাও দরকার।

কেন্দ্রীয় সরকার যে রাজ্য সরকারের দাবি সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন, তা নয়। তবে দাবিদার তো আরো অনেক রাজ্য আছে, যেমন ওড়িশা, গুজরাট অথবা গোয়া। কোন্ রাজ্যে এবং কোথায় জাহাজ কারখানা গড়ে তুললে সব দিক থেকে সুবিধে হয়, তা বিবেচনার ভার কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন এক বিদেশী বিশেষজ্ঞ দলের হাতে। যুগোশ্লাভিয়া থেকে সেই বিশেষজ্ঞের দল সেদিন এসে হলদিয়া দেখে গেলেন। সরেজমিনে সব কিছু দেখার পর তাঁদের রায়—হলদিয়ায় জাহাজ কারখানা হওয়ায় কোনো অসুবিধে নেই। রাজ্য সরকার হলদিয়ায় দুটি উপযুক্ত জায়গা সুপারিশ করেছিলেন—বাদুড় আর গ্যাংরা। তার মধ্যে বাদুড়েই বিশেষজ্ঞেরা মতে বেশি উপযুক্ত। তবে বিশেষজ্ঞেরা আরো কয়েকটি রাজ্য ঘুরবেন, প্রস্তাবিত জায়গা দেখবেন, তারপর চূড়ান্ত রায় দেবেন। তা ছাড়া নরওয়ে আর বৃটেন থেকে আসবেন আরো দুটি বিশেষজ্ঞ দল। সব বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট পাওয়ার পর তবেই কেন্দ্রীয় সরকার একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন।

বিনা বিচারে বন্দী কতো?

সম্প্রতি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নামে এক বিলিতি সংস্থা এই বলে অভিযোগ করে যে, পশ্চিম বাংলায় পনের থেকে বিশ হাজার রাজনৈতিক বন্দীকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে। তা ছাড়া জেলের মধ্যে তাঁদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হচ্ছে না। বন্দীতে ঠাসা সেলগুলোর অবস্থাও ভয়াবহ। কয়েক দিন আগে দুনিয়ার বেশ কিছু সুপরিচিত বুদ্ধিজীবীও পশ্চিম বাংলার বিনা বিচারে আটক ব্যক্তিদের সম্পর্কে এক বিবৃতি দেন। প্রথমে ভারত সরকার এর প্রতিবাদ করেন। এখন রাজ্য সরকার এক বিবৃতিতে জানাচ্ছেন, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিনা বিচারে আটকের যে-সংখ্যা দিয়েছে তা রীতিমতো অতিরঞ্জিত। এ-রাজ্যে নকসাল বন্দীর সংখ্যা ১৬০৯ জন। তার মধ্যে ৫৯২ জনকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে। বাকি সকলের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অপরাধের অভিযোগ আছে। জেলের মধ্যে কোনো রকম অত্যাচারের কথাও রাজ্য সরকার অস্বীকার করেছেন। তা ছাড়া এই সব বন্দীকে রাজনৈতিক বন্দী বলাতেও রাজ্য সরকারের আপত্তি আছে। কারণ শুধু রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্যে কাউকেই জেলে পোরা হয়নি।

২৩।৯।৭৪

—দেবব্রত

পটভূমি

কি আর রেখেছো বাকি ?

সাপ্তাহিক পত্র পত্রিকায় পশ্চিমবাংলার বর্তমান রাজনীতি পর্যালোচনা করা এক দুরূহ কাজ। শুধু তাই নয় অত্যন্ত বেদনাদায়কও, কলম ভেঙে যায়। সব পার্টিরই কাজ কর্মে না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু। নেতারা এ বেলায় যা বলেন সেবেলা না হতেই তাঁদের মুখ দিয়ে অন্য কথা বেরিয়ে আসে। এর ফলে রাজনৈতিক ভাষ্য দেওয়া যে কি কষ্টসাধ্য কাজ তা সকলেই নিশ্চয় বুঝবেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে শাসক পার্টি কংগ্রেসের মধ্যে কয়েক মাস আগেও বেশ থমথমে ভাব ছিল। ব্যাপারটা কি! মুখ্যমন্ত্রী নাকি তখন মন্ত্রিসভাকে একটু স্ট্রীম লাইন করার জন্য কয়েকজনকে বাদ দেবেন বলে স্থির করে ফেলেছেন। আবার কয়েকজনকে নতুন মন্ত্রী করতে হবে। চীফ নাকি বুঝতে পেরেছেন ইন্দিরাজীর মত শক্ত না হতে পারলে উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করা যাবে না। অথচ জনসাধারণের কাছে পার্টি 'কমিটেড'। তাই কাজ তাঁরা করবেনই। এই সময় একজন নেতা পরিহাসছলে মন্তব্য করেছিলেন : আরে বাদ দিন। সিদ্ধার্থবাবুর এই সাহস হবে না। তবু অনেকেই ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তাই সর্বত্র থমথমে ভাব ছিল। পরে অবশ্য দেখা গেলো ঐ নেতার কথাটুকুর মধ্যে সার বস্তু ছিল। সিদ্ধার্থবাবু মন্ত্রিসভার রদবদল করেননি। তবে তাঁর কিন্তু খুব ইচ্ছে ছিল।

মন্ত্রিসভার একদম যে কিছু রদবদল করা হয়নি তা বলা চলে না। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী সোজাপথে মন্ত্রিসভার রদবদল করেন নি। তিনি ঘোরপথের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেউ কেউ অবশ্য এর একটা বিশ্লেষণ খুঁজে পেয়েছেন। ইন্দিরাজীর প্রশাসনের ওপর জোরালো কন্ট্রোল থাকায় তিনি সোজাপথেই তাঁর প্রয়োজনানুসারে মন্ত্রিসভার রদবদল করেছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের বোধ হয় প্রশাসনের ওপর এত কন্ট্রোল নেই। তাই তাঁকে ভিন্ন পথের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে।

এখন আবার নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে; এবার মুখ্যমন্ত্রী আর মন্ত্রিসভার রদবদল করতে চাইছেন না। এখন মন্ত্রীরা পদত্যাগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন। আর মুখ্যমন্ত্রী বলছেন থামুন থামুন এখন না।

হ্যাঁ যে কথাটা বলছিলাম মুখ্যমন্ত্রী ঘুরপথে মন্ত্রিসভার কিছুটা রদবদল করেছেন। যেমন ধরুন তিনি চেয়েছিলেন পুলিশ ও প্রশাসন দপ্তর থেকে সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে সরিয়ে দিতে। কাশীকান্ত মৈত্র যে মুহূর্তে পদত্যাগ করলেন অমনি তার সুযোগ এসে গেলো। তিনি সুব্রতবাবুকে পৌরসভার দায়িত্ব দিয়ে ঐ দুটো দপ্তর নিয়ে নিলেন। পরে তাঁর আবার মনে হলো কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ভোলা সেনের হাতে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ তা হলে কাজের সুবিধে হবে। তাই এই দপ্তরও সুব্রতবাবুর নিকট থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের দায়িত্ব সরকারীভাবে আবু বরকৎ গণি খান চৌধুরীর হাতে থাকলেও আসলে সব কিছু দেখাশুনো করছেন ডাঃ গোপালদাস নাগ। মুখ্যমন্ত্রীরও নাকি তাই ইচ্ছে।

এবার শাসক পার্টিকে বাদ দিয়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কথায় আসুন। তাঁদেরও কাজকর্মের কোন মাথা মুণ্ডু নেই। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার আর এক প্রভাবশালী দল কম্যুনিস্ট পার্টি অনেক মারপ্যাঁচ করে মোর্চা ভেঙে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দু' দল চীৎকার করে ঘোষণা করলেন : তাঁরা দুজনে আর কোনদিন একত্রে আন্দোলন করবেন না। এ অবস্থা মাত্র কয়েক দিন চললো। আবার দেখা যাচ্ছে এই দুই দলের যুব সংগঠন একসঙ্গে আন্দোলন করার জন্য কর্মসূচী তৈরী করে ফেলেছেন। কোন রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ থেকে কিছুই বোঝা যায় না। এই সি পি আই আবার একথাও বলছেন যাঁরা আন্দোলন করবেন তা সি পি এম হোক বা কংগ্রেসই হোক তাঁরা তাঁদের সঙ্গে আছেন। অদ্ভুত পরিস্থিতি।

অন্য দিকে দেখুন সোস্যালিস্ট পার্টি জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে বিহারে যে আন্দোলন হচ্ছে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়। তারা এই রাজ্যে নয় বাম পার্টি যাতে ঐ ধরনের আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে তার জন্য চাপও সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। কারণ সি পি এম বিহারের আন্দোলনের পেছনে গিয়ে দাঁড়ান নি। অথচ তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে সোস্যালিস্ট পার্টির সাথে একসঙ্গে লড়াই করতে এগিয়ে চলেছেন।

তাই সব দেখেই একথা বলতে হচ্ছে পশ্চিম বাংলার রাজনীতির গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা এক কঠিন কাজ। নেতারা কম বেশী সবাই বিভ্রান্ত। তাঁদের অনেকের কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য নেই। ফলে এর বিশ্লেষণ করা যে কত অসুবিধের তা বলার নয়।

—কৌটীল্য

দেশে বিদেশে

জয়প্রকাশের দিল্লী অভিযান

সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ দিল্লি চলো আহ্বান দিয়েছেন। তিনি তাঁর আন্দোলনকে ব্যাপকতর করে এখন খাস রাজধানী দিল্লিতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আগামী ২ অকটোবর গান্ধীজীর জন্মদিনে তিনি রাজঘাটে সারা ভারতের এক বিরাট জমায়েতের প্রস্তুতি করছেন। রাজ্যগুলি থেকে এসে এই জমায়েতে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি তাঁর অনুগামীদের আহ্বান জানিয়েছেন। এই উপলক্ষে তিনি বিবৃতিতে বলেছেন, বিহারের সংগ্রাম একটা সর্বভারতীয় গুরুত্ব লাভ করেছে এবং সারা দেশের ভাগ্য এই সংগ্রামের সাফল্য বা ব্যর্থতার সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন, বিহারের মন্ত্রিসভা দুর্নীতিগ্রস্ত, অযোগ্য ও অত্যাচারী এবং সেখানকার বিধানসভা অপ্রয়োজনীয় দুর্বহ ও ব্যয়ব[illegible] পরিণত হয়েছে। এই মন্ত্রিসভা ও [illegible]র জন্য জনসাধারণের দাবি [illegible] এই মন্ত্রিসভা ও বিধানসভা যে টিকিয়ে রাখা হয়েছে তার কারণ হল, কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী এটাকে একটা মর্যাদার প্রশ্ন হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

আচার্য কৃপালনীও আগামী ২ অকটোবর তারিখে দিল্লিতে [illegible] বিক্ষোভ সমাবেশের আহ্বান জানিয়েছেন।

চোরাচালানদারদের বিরুদ্ধে

চোরাচালানদের গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইনে সরকারকে ক্ষমতা দিয়ে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে জাল বিস্তার করে সুপরিচিত চোরাচালানদের গ্রেপ্তার করছে। প্রথম দিনই যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে আছে হাজী মাস্তান ও সুকুর-নারায়ণ বাখিয়া। হাজী মাস্তানকে বাঙ্গালোরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর বাখিয়ার উপর গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারির সময় সে বোম্বাইয়ের একটি প্রাইভেট নার্সিং হোমে ছিল। কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কিছুকাল আগে সংসদে যে তিনজন 'চোরাচালানদের সর্দার' বলে অভিহিত করেছিলেন, হাজী মাস্তান ও বাখিয়া তাদের অন্যতম। ৪৫ বছর বয়স্ক হাজী মাস্তান একজন অনাথ ডক-ইয়ার্ডের কুলি হিসাবে জীবন আরম্ভ করে এখন সে একজন লক্ষপতি হয়ে উঠেছে। একটি বড় ব্যবসায়ের সে অংশীদার, বহু বাড়ি ও ফ্ল্যাটের মালিক। মাস্তান বলেছে, 'জীবনে আমার সাফল্যে যারা ঈর্ষান্বিত' তারাই তাকে চোরাচালানদার বলে অপবাদ দিচ্ছে।

চোরাচালান থেকে বাখিয়া কোটি কোটি টাকা আয় করেছে বলে প্রকাশ। দমন শহরে তার বিরাট প্রাসাদতুল্য বাসভবন। সে অনেকগুলি যন্ত্রচালিত মোটর-বোটের মালিক। তারই উদ্যোগে গোটা দমন শহরই বলতে গেলে চোরাচালানদারদের শহরে পরিণত হয়েছিল।

বাখিয়াও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

চোরাচালানদারদের বিরুদ্ধে 'মিসা' প্রয়োগের জন্য অর্ডিন্যান্স জারি করে সরকার আইন কমিশনের সুপারিশ মেনে নিয়েছেন। কমিশন এই ধরনের অর্থনৈতিক অপরাধ দমনের জন্য নিবারণমূলক আটক আইন প্রয়োগের প্রস্তাব করেছিলেন ও এই সব অপরাধ বিচার করার জন্য বিশেষ আদালত গঠন করতে বলেছিলেন।

এই ধরনের অপরাধীরা যে সামাজিক মর্যাদা ভোগ করে থাকে তার উল্লেখ করে আইন কমিশন তাঁদের রিপোর্টে বলে-

ছিলেন এই সব উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা এদের ব্যবসার বৈশিষ্ট্য হল, এই ধরনের অধিকাংশ অপরাধই করে থাকে সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা। এই শ্রেণীর লোকেরা চোরাকারবার, কিছু মনে করবে না, কিন্তু সমাজের ক্ষতি হলে নিশ্চয়ই তাদের গায়ে লাগবে।

১৯৭১ সালে বল কমিটি তাঁদের রিপোর্টে যে হিসাব দিয়েছিলেন তাতে দেখা গিয়েছিল চোরাচালানের ফলে ভারত বছরে ২৬০ কোটি থেকে ২৭০ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা হারায়। কমিটির এই হিসাবে চোরাচালানের ব্যাপকতাকে খুব কম করেই ধরা হয়েছিল বলে এখন অনুমান করা হয়।

●

শেখ আব্দুল্লা ও তাঁর প্রতিনিধি গণভোট ফ্রন্টের নেতা মির্জা আফজল বেগ দিল্লিতে এসে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে যেসব আলাপ-আলোচনা করে গেছেন তার কোন ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি। শেখ ও মির্জা দেখা করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর প্রতিনিধি জি পার্থসারথির সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁদের মধ্যে কি বিষয় কথা হয়েছে অথবা এই আলোচনার ফলে মীমাংসার সম্ভাবনা কতখানি এগোল তার বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ করা হয়নি। তবে শেখ আব্দুল্লার যেসব বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি থেকে অনুমান হয় যে, ১৯৫৩ সালের পূর্বাবস্থায়, অর্থাৎ শেখকে যখন ক্ষমতাচ্যুত করা হয় তার আগেকার অবস্থায় ফিরে যাওয়ার দাবি [illegible] শেখ ঐ দাবির যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন [illegible] মীমাংসার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে [illegible]। শেখ দাবি করছেন বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন করতে হবে, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার মেনে নিতে হবে। কাশ্মীরকে নির্বাচন কমিশনের ও অডিটার জেনারেলের এক্তিয়ারের বাইরে রাখতে হবে ইত্যাদি। শেখের আরও প্রস্তাব হল এই যে, কংগ্রেস ও অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলি এক জোট হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং সেই উদ্দেশ্যে 'জাতীয় সম্মেলন' দলটি পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ কংগ্রেস যা দাঁড়াচ্ছে তা হল কাশ্মীর কংগ্রেস তুলে দিয়ে শেখ আবদুল্লার ভূতপূর্ব দল 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' বা জাতীয় সম্মেলনকেই আবার চাঙ্গা করে তুলতে হবে, যাতে তিনি ঐ দলের নামেই ক্ষমতা অধিকার করতে পারেন।

●

রাষ্ট্রসংঘে বাংলাদেশ

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনের প্রথম দিনে বাংলাদেশ রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ লাভ করেছে। ঐদিন আফ্রিকার গিনি-বিসাউ ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের গ্রেনাডাও রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হিসাবে গৃহীত হওয়ায় এই বিশ্বসংস্থার সদস্যসংখ্যা দাঁড়াল ১৩৮। ৩০ বছর পূর্বে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠার সময় তার সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৫২।

বাংলাদেশকে সদস্য করে রাষ্ট্রসংঘ অবশেষে আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটা বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে নিল। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা সংস্থা অনেক দিন আগে থেকে বাংলাদেশকে সভ্য করে নিলেও এতদিন প্রধানত চীনের ভিটোর জন্য বাংলাদেশকে রাষ্ট্রসংঘে গ্রহণ করা যাচ্ছিল না।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ যখন রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরূপে গৃহীত হল তখন সে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের যে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করল তাতে কিন্তু পাকিস্তান ও চীন যোগ দেয় নি। যে ২০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়েছে তাদের মধ্যে ভারতও ছিল। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং এই প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন আশ্বাস দিয়েছেন যে তাঁর দেশ শুধু উপমহাদেশই নয় আমাদের সমগ্র অঞ্চলে ও সারা পৃথিবীতে শান্তির অঙ্গীকারে সম্পূর্ণ আবদ্ধ থাকবে।

চীন বাংলাদেশকে রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশ করতে দিতে যদিও আপত্তি করে নি তাহলেও সে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নি।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হওয়ার পর এখন চীন তাকে স্বীকৃতি দিতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে তার আগে সে ভারত-পাকিস্তান ও পাকিস্তান-বাংলাদেশ কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময়ের জন্য অপেক্ষা করবে বলে মনে হয়।

ওয়াটার গেটের জের

আমেরিকার ওয়াটারগেটের জের যেন মিটতেই চাইছে না। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নিকসনকে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত মামলা সম্পূর্ণ মার্জনা করে প্রেসিডেন্ট ফোর্ড মৌচাকে আবার ঢিল মেরেছেন। কোন কোন মহল থেকে এই সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে যে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি চাপা দেওয়ার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ফোর্ডও হয়ত একজন অংশীদার। নিকসনকে তিনি ক্ষমা করবেন এই শর্তেই হয়ত নিকসন পদত্যাগ করে তাঁকে ক্ষমতায় বসিয়ে গেছেন। যাঁরা এমন সন্দেহ করছেন তাঁরা প্রেসিডেন্ট ফোর্ডকে ইম্পিচ করার কথাও ভাবছেন বলে প্রকাশ।

চিলিতে সি-আই-এ'র কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে সেটাও একাধিক অর্থে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারিরই জের। প্রথমত, ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি নিকসন প্রশাসনের অন্যান্য প্রায় সব কর্তাব্যক্তিকে স্পর্শ করলেও ডঃ হেনরি কিসিঞ্জারকে কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়ান যায় নি। কিন্তু এখন চিলিতে সি-আই-এ ও অন্য মার্কিন সংস্থার যে গোপন কার্যকলাপের খবর বেরিয়ে পড়েছে ডঃ কিসিঞ্জার সেগুলির সঙ্গে বেশ ভালভাবেই জড়িয়ে পড়ছেন। দ্বিতীয়ত নিকসন প্রশাসনের [illegible] কার্যকলাপের কথা কংগ্রেসকে [illegible] জানান হয়নি উপরন্তু কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটিতে এবিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করা হলে এ ব্যাপারে আমেরিকার সংস্রবের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে যাওয়া হয়েছে। নিকসন প্রশাসন ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির কথা গোপন করে সেদেশের আইন ও সংবিধানের কাছে যে অপরাধে অপরাধী চিলিতে গোপন কার্যকলাপের কথা চেপে দিয়েও তাঁরা সেই একই অপরাধ করেছেন। গোপন নীতিহীন কার্যকলাপের দ্বারা যেনতেনপ্রকারেণ কার্যসিদ্ধি করার চক্রান্তমূলক মনোভাবই যদি ওয়াটারগেট নামক ব্যাধির মূলে হয়ে থাকে তাহলে সেই একই মনোবৃত্তি বিভিন্ন দেশে সি-আই-এর গোপন কার্যকলাপের মধ্য দিয়েও প্রকাশ পাচ্ছে। সুতরাং এটা প্রায় অনিবার্য ছিল যে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি যে ধাক্কা দিয়েছে সেই ধাক্কায় নিকসন প্রশাসনের বৈদেশিক কার্যকলাপেরও কিছু আবরণ খসে যাবে।

ভারতস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ময়নিহানের একটি তারবার্তায় বিবরণ মার্কিন সংবাদপত্রে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ওয়াটারগেট পরবর্তী এই ধরনের একটি [illegible] প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কিছুকাল আগে চিলিতে মার্কিন [illegible] প্রেসিডেন্ট আলেন্দের পতন ঘটান হয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন ও সেই প্রসঙ্গে ভারতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেকথা উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন সংবাদপত্রে সংবাদ ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর শ্রীমতী গান্ধীর কথারই সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে। রাষ্ট্রদূত ময়নিহান মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে পাঠান তারবার্তায় বলেছেন এরপর শ্রীমতী গান্ধীকে তাঁর সরকারের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সদভিপ্রায় সম্পর্কে আশ্বস্ত করা কঠিন হবে।

মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডঃ কিসিঞ্জারের আসন্ন ভারত সফরের প্রাক্কালে ময়নিহানের তারবার্তা প্রকাশ পাওয়ায় কিছুটা বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ কিসিঞ্জারকে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন ভারতে কোন আমেরিকান নাগরিকের আপত্তিকর কার্যকলাপ সম্পর্কে নয়াদিল্লি অভিযোগ করলে আমেরিকা তাঁকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সরিয়ে আনবে।

২৩-৯-৭৪

—পুণ্ডরীক

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

[সোনাখড়ি গ্রামের ভবনাথ ঘোষ আর দেবনাথ ঘোষ দুই ভাই। ভবনাথ বড়ো। অল্পবয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর ভবনাথ সংসারের হাল টেনেছেন, ভাইকে মানুষ করেছেন। কলকাতা যাবেন দেবনাথ ছোট আদালতে উকিল হওয়ার পরীক্ষা দিতে। যাওয়া হোল না। তিনি বিদেশে পরে জমিদারী সেরেস্তার ম্যানেজার হয়েছিলেন। সেই কৃতি ভাই দেবনাথ আট বেহারার পালকিতে সোনাখড়ি ফিরল।

বৌদি উমাসুন্দরী খুব খুশি। এদিকে নতুন বাড়ির মেজ ঠাকরুন দেবনাথের দুজন বরকন্দাজকে ব্রাহ্মণ ঠাউরে নিমন্ত্রণ করতে এল। দেবনাথ বললেন, কী জাত জিগ্যেস করব।

একদিন সকালে দেবনাথ দেখলেন সামনের দাওয়ায় ঠাকুর প্রতিমা। দশভুজা দুর্গা। গাঁয়ের লোকজন ভবনাথকে বললেন, মায়ের ইচ্ছা তোমাদের হাতেই পুজো নেবেন তিনি। পুজোর তোড়জোড় চলতে লাগল। যাত্রা নয় থিয়েটারও হবে। ম্যানেজার হারু সরকারের তদারকিতে চলতে লাগল থিয়েটারের মহড়া...]

ভবনাথ ও দেবনাথের মাঝে ভগ্নী আছেন মুক্তকেশী। শ্বশুরবাড়ি কুশডাঙ্গায় আছেন তিনি—সোনাখড়ি থেকে ক্রোশ পাঁচেক দূরে।

উমাসুন্দরী বললেন—গাড়ি পাঠিয়ে দাও ঠাকুরঝি চলে আসুন। তিন ভাই বোন একসঙ্গে হবে অনেক দিনের পর।

ভবনাথ ঘাড় নাড়লেনঃ মুক্তোর গ্রাম-জোড়া সংসার—গুছিয়ে আসবে তো। গাড়ি পাঠালে গাড়ি ফেরত আসবে। তার চেয়ে ফটিক চলে যাক—আসার হলে ওখান থেকে গাড়ি করে আসবে।

ফটিক মোড়ল চাকরান খায় রুপতানগিরি করে। অর্থাৎ এখানে যাওয়া সেখানে যাওয়া—হাঁটাহাঁটির যাবতীয় দায় তার উপর। মুক্তোঠাকরুনের বাড়ি হামেসাই যেতে হয় তাকে। পাকা ইমারত ভেঙেচুরে এক কুঠুরিতে এসে ঠেকেছে। বেশি আর লাগেই বা কিসে! ছাতে জল মানায় না বলে উপরে খোড়ো চাল ভাঙাচোরা দেয়ালে গোবরমাটি-লেপা। আর আছে চালাঘর দুটো—রান্নাঘর ও গোয়াল। বিশাল কম্পাউন্ড জুড়ে রকমারি তরকারির ক্ষেত। বড় ফটকটা কিন্তু প্রায় অভগ্ন। ফটকের বাইরে পাঁচ শরিকের এজমালি পুকুর। পুকুর সেকেলে হলেও ঘাসবন কিছু নেই জল টলটল করছে। এই বাড়িতে একলা মুক্তকেশী দ্বিতীয় প্রাণী নেই। পড়শিদের কতজনে প্রস্তাব করেছে বাড়ির মেয়েছেলে একজন একজন কেউ গিয়ে রাতেরবেলা শুয়ে থাকবে দিনকাল খারাপ—একলা পড়ে থাকা ঠিক নয়। মুক্তোঠাকরুন উড়িয়ে দেনঃ এদিকে ফণীরা ও ওদিকে ভূপতিরা—একলা কিসে হলাম। ডাক দিলে ছুটে এসে পড়বে। দরকারই হবে না—অ্যাদ্দিন তো আছি দিয়েছি কখনো ডাক?

ফণী ও ভূপতি দুই শরিক—এবাড়ির লাগোয়া উত্তরদিকে ও পশ্চিমদিকে তাদের বাড়ি। ফণী সম্পর্কে দেওর ভূপতি ভাসুরপো। বউঠান বলতে ফণী পাগল ভূপতিরও তেমনি জেঠাইমা বলতে মুখে জল আসে। কেউই বা নয় এমন। গ্রামসুদ্ধ তাঁর নামে তটস্থ তাঁর কোন কাজে লাগতে পারলে বর্তে যায়। মুক্তকেশীর গ্রামজোড়া সংসার ভবনাথ বললেন—সে কিছু বাড়িয়ে বলা নয়।

ফটিক এসে বলল—ছোট বাবুমশায় এসে গেছেন ঠাকরুন। যেতে হবে।

মুক্তকেশী বললেন—বললেই কি আর হুট করে যাওয়া যায় রে বাবা—আমার কি এক রকমের ঝঞ্চাট। সে হবে এখন—হেঁটেহুটে এলি হাত-পা ধুয়ে ঠান্ডা হয়ে বোস দিকি এখন তুই।

এতকালের আসা-যাওয়া—ঠান্ডা হয়ে বসার অর্থ ফটিক কি আর বোঝে না? ঘাট থেকে হাত-পা ধুয়ে এসেই দেখবে পিতলের জামবাটি ভরতি চিঁড়া ভিজানো তার সংগে দুধ আম কাঁঠাল কলা পাটালি আরও কোন কোন বস্তু—সঠিক আন্দাজে আসছে না। এই দেড় পহর বেলায় চেটেপুছে সব শেষ করতে হবে। অনতিপরে দুপুরে আবার দুটো ডুব সেরে আসতে না আসতেই এক পাথর ভাত বেড়ে এনে সামনে ধরবেন—খাওয়ানোর ব্যাপারে ঠাকরুন অতিশয় নির্দয় দয়াধর্ম নেই কোন রকম।

পা ধুতে ফটিক পুকুরে গেছে আর এদিকে হন্তদন্ত হয়ে ভূপতি এসে উপস্থিত। কথাবার্তা এক্ষুনি তো হল। এবং দুটি মানুষের মধ্যে—দুই ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না সেখানে। জিনিসটা এরই মধ্যে ভূপতি পর্যন্ত কেমন করে চাউর হয়ে গেল কে তাকে খবর দিল? পোষা বিড়ালগুলো এবাড়ি-ওবাড়ি করে তারা গিয়ে বলেছে নাকি? কিম্বা পাতিকাকটা জিওন-গাছের ডালে যে বসেছিল। অন্য কিছু তো ভেবে পাওয়া যাচ্ছে না।

ভূপতি উত্তেজিত কন্ঠে বলে—তোমার এখন নাকি বাপের বাড়ি যাওয়া লাগল জেঠাইমা? স্বচ্ছন্দে চলে যাও। আমিও এক-মুখো বেরুই। বিয়ে বন্ধ।

মুক্তোঠাকরুন প্রবোধ দিচ্ছেনঃ দেবনাথ বাড়ি এসেছে না গেলে হবে না। তা বলে কি এখনই! আক্কেল-বিবেচনা নেই বুঝি আমার? বিয়ের কাজ-কর্ম মিটিয়ে কনে রওনা করে দিয়ে তারপরে যাবো।

ফটিক ঘাট থেকে ফিরেছে। জলখাবার দিতে দিতে মুক্তকেশী বললেন—[illegible] শুনে যাচ্ছিস—গিয়ে সব বলবি। [illegible] তারিখে ভূপতির মেয়ের বিয়ে। তার [illegible] যেতে দেবে না বলছে। [illegible] করে উঠে যদি তো [illegible]।

দাবরাব এমনি। আবার পদ্মবালার বর এসেছে শুনে সেই মানুষ ছুটতে ছুটতে গিয়ে হাজির। দেখেশুনে বলছেন নাত-জামাই বড় রূপবান রে। আমি ছাড়ব না এ বর পাবিনে তুই পদ্ম আমি নিয়ে নিলাম। থানকাপড়ের ঘোমটা টেনে বউ হয়ে ঝুপ করে বরের পাশে বসে পড়লেন। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে পদ্ম হাসে আর ঘাড়টা অনেক অনেকখানি কাত করে দেয়। অর্থাৎ নাওগে বর খুশী মনে দিয়ে দিচ্ছি ঠাকুমা......

শুধু মানুষ কেন পশুপক্ষীরাও ঠাকরুনের সংসারের বাইরে নয়। নীলির সঙ্গে কাকেদের বোধহয় ঝগড়া। বাটিতে চাট্টি মুড়াকি দিয়ে বসিয়ে বোন জল আনতে গেছে ঠিক টের পেয়েছে কাকেরা একটি-দুটি করে দাওয়ায় এসে বসছে এগিয়ে আসে কাছাকাছি। নীলি ছোট হাত দুখানিতে বাটি ঢেকে ধরেছে তো কাকে গায়ে ঠোক্কর মারবে। কেঁদে পড়ে নীলি পালাতে গিয়ে হাতের বাটি ছিটকে পড়ে। কাকেদের মচ্ছব পড়ে গেল খুব মুড়াকি খাচ্ছে। মুক্তোঠাকরুন এমনি সময় উঠানে পা দিলেন।

এইও ভয় দেখিয়ে বাচ্চার মুড়কি খাওয়া হচ্ছে?

নীলিকে ডাকছেন: আয়রে কিছু করবে না। কাঁদিস নে আবার মুড়াকি দিচ্ছি। ভয় কিসের তোকে খেপাচ্ছে।

এখনো তো কত দূরে মুক্তোঠাকরুন—কিন্তু মুড়াকি ফেলে কাকগুলো দূরে চলে গেছে। নিপাট ভালমানুষ—মাথা কাত করে ঠোঁটে গা খোঁচাচ্ছে দেখতেই পাচ্ছে না এদিকে যেন।

তাতে ছাড়াছাড়ি নেই মুক্তোঠাকরুন সমানে বকুনি দিয়ে যাচ্ছেন: হুস হুস—ভারি বজ্জাত হয়েছে সব। সাত সকালে এক পেট মুড়ি গিলে এসে আবার এখানে বাচ্চার মুড়াকিতে ভাগ বসাতে এসেছ।

সকালবেলা রান্নাঘরের পাশে জিওলতলায় দাঁড়িয়ে ডাক দেবেন: আয় আয় আয়। ডাক চেনে কাকেরা নানান দিক থেকে উড়ে এসে পড়ে। মুড়ি ছড়িয়ে দেন ঠাকরুন। কাকেরা রা মানে না—নিজের খাচ্ছে আবার অন্যের দিকে ঠোক্কর মারছে। ঠাকরুন তাড়না করছেন: এইও সরে যা বলছি। সরে যা বলছি। সরে যা মারব কিন্তু—

ঠিক এরাই কিনা বলা যায় না—কিন্তু মুক্তোঠাকরুনের ধারণা সকালের সেই দলের কয়েকটি অন্তত এর মধ্যে আছে। একটার দিকে আঙুল দেখান: এই পাজিটা বড্ড শয়তান। নিজেরটা খাবে আবার অন্যের দিকে ঠোক মারবে। নিত্যি সকালে দেখে দেখে চিনেছি।

শিবা ভোজন করিয়ে থাকেন ঠাকরুন। সন্ধ্যাবেলা পুকুর-পাড়ের জঙ্গলে ঢুকে যান। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জোড় হাত করে বলেন, মহারাজেরা আছ তো সব? আজ রাত্রে পঞ্চজন তোমাদের সেবা—কোন পাঁচজন ঠিক করে নাও। সামনের শনিবার আবার পাঁচটিকে ডাকব। ঝগড়াঝাঁটি কাড়াকাড়ি যদি করো, তা হলে ইতি পড়ে যাবে কিন্তু।

সেবারে ঠিক তাই হয়েছিল। হেসে-হেসে ঠাকরুন বৃত্তান্ত বলেন। রেগেমেগে শিবা ভোজন বন্ধ করলেন কান্নাকাটি পড়ে গেল কিছুদিন পরে। উঠোনে ঘুরত, রান্নাঘরের কানাচে ধন্না দিত রাত্রিবেলা। পুকুরপাড়ে দলবদ্ধ হয়ে এসে হুক্কা-হুয়া করত। কাণ্ড দেখে মুক্তোঠাকরুন হাসতেন খলখল করে। শেষটা মাপ করে দিলেন: আর করবিনে কখনো বজ্জাতি মনে থাকে যেন।

জঙ্গলের ধারে ডুমুরতলায় পাতা পড়তে লাগল আবার। লাইনবন্দী পাঁচখানা কলাপাতা—পরিপাটি করে ভাত বাড়া ডাল পায়স। মালসায় জল পাশে পাশে—গেলাসে মুখ ঢুকবে না শিয়াল-নিমন্ত্রিতদের। সকালবেলা গিয়ে তীক্ষ্ণ নজরে দেখেন ভদ্রভাবে খেয়ে গেছে কিনা। মুক্তকেশী ছাড়া অন্য কেউ বুঝবে না। দেখে প্রসন্ন

যুবক যুবতী

শিপ্রা বসু

বিয়ের পরে বন্ধুত্ব

বিবাহের মতো বন্ধুত্বও তেমন জোরালো না হলেও অপেক্ষাকৃত শিথিল কোন বন্ধন কিনা এ প্রশ্ন দু-একজনের কাছে জিজ্ঞেস করেও তেমন যথার্থ বা সঠিক কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। এই থেকেই আমার মনে হয়েছে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় রদ-বদল যতখানিই হোক না কেন প্রগতি এখনও এমন একটা স্তর অতিক্রম করতে পারেনি যেখানে দাঁড়িয়ে বলা যেতে পারে হ্যাঁ বন্ধুত্বের বন্ধন স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনের চেয়ে কম কিছু নয়। আমি অবশ্যই বলছি একজন যুবকের সঙ্গে আর এক যুবতীর বন্ধুত্বের কথা। ধরা যাক মিনতি আর রবি কলেজ-জীবনে বা প্রাক-বিবাহ পর্বে ছিল হরিহর আত্মা। দুই অকৃত্রিম বন্ধু। সেই বন্ধুত্ব উভয়ের বা যে কোন একজনের বিবাহের পর কি আগের মতোই থাকবে?

দেখা যায় অতীব উচ্ছলা তরুণী (মেয়েদের ক্ষেত্রেই একথা অধিকতর প্রযোজ্য) যেই না বিয়েতে বসল তারপর থেকেই বন্ধু বা বান্ধবীদের ভুলে যেতে থাকে। আস্তে আস্তে এমন একটা অবস্থা দাঁড়িয়ে যায় যখন বিয়ের আগেকার হৈ-চৈ হুল্লা এবং তাকে ঘিরে বন্ধুজনেরা স্মৃতির অতলে ডুবে যায়।

তবে কি আমাদের দেশে 'বিবাহ' ঘটনাটিরই এমন কোন গভীর রহস্য আছে যা এমন করে ভুলিয়ে দিতে পারে উচ্ছল দিনগুলোকে? হয়তো অধিকতর উজ্জ্বল তার আলোকে আপ্লুত হওয়াই এর কারণ।

এ প্রশ্নেরও বলা বাহুল্য তেমন মনের মতো জবাব মেলেনি।

অনেক সময় দেখা যায় বিয়ের পরে কন্যা স্বামীর কর্মস্থলে দূরে চলে যায়। এরকম ক্ষেত্রে সময় বা সুযোগ বন্ধুত্ব রাখতে সহায়ক হয় না।

আজকাল লাভ-ম্যারেজ যে সমস্ত ক্ষেত্রে নেগোসিয়েশন ম্যারেজ হয়ে উঠতে পারে না তার অধিকাংশ স্থলেই রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়ে ঘটানোর সহায়ক হয় বন্ধু-বান্ধবরা। এমন বিয়ে যা অনেকটাই বন্ধুদের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয় নিশ্চয়ই বিয়ের আগের বন্ধুজনকে ভুলিয়ে দেয় না।

এই সব নানা প্রশ্ন নিয়ে সাক্ষাৎ করলাম কয়েকজনের সঙ্গে। সিঁথির অপর্ণা সেন বললেন - 'বিয়ের আগে কলেজে আমার অনেক বয়-ফ্রেণ্ড ছিল চুটিয়ে আড্ডাও দিতাম তাদের সঙ্গে। তবে এখন কি তা সম্ভব?'

সন্দীপ বসু

'কেন সম্ভব নয়?' প্রশ্ন করি।

'সময়ের অভাব। তাছাড়া মানসিকতাও বদলেছে।'

'কি রকম?'

'আমার স্বামীর এসব হয়তো ভালো নাও লাগতে পারে।'

'আপনার স্বামী কি ওঁর গার্ল-ফ্রেণ্ডদের প্রতি এখন আপনার মতোই আচরণ করেন?'

'তা তাকে করতেই হয়। কেননা আমরা দুজনে সুখে আর আনন্দে থাকতে চাই।'

এরপর কোন প্রশ্ন করা অশোভন। তবে বোঝা গেল স্বামী-স্ত্রীর একান্ত সুখ আর আনন্দে আগের মতো বন্ধুত্ব চালিয়ে যাওয়া বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

অলোক দত্ত মজুমদার (বারাসত কলেজ) বললেন, 'এখন যে মেয়েরা আমার বন্ধু বিয়ের পরেও আমার হয়তো তাদের সঙ্গে একই রকম থাকবে। কেননা আমার শিক্ষা যে কোন হীনমন্যতা বা সংস্কার থেকে আমাকে মুক্ত রেখেছে।'

'এ ব্যাপারে আপনার স্ত্রীর যদি আপত্তি থাকে?'

'থাকা উচিত নয়। আর থাকলেও আমি তাকে বোঝাতে পারবো বলেই মনে করি।'

শর্মিলা দত্তের বছর দুয়েক হল বিয়ে হয়েছে। ওর আড্ডা, বিশেষ করে পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে আগের মতোই কফি হাউসে এবং অন্যত্র একইরকম আছে। বলল, 'আমি তো কিছু হেরফের বুঝছি না।'

স্বামীর প্রসঙ্গ তুলতেই বললে, 'ও তো প্রায়ই আমার সঙ্গে আড্ডার আসরে উপস্থিত থাকে। আমরা অন্য কিছু কখনো ভাবি-ই না।'

বেদিপাড়ার সদ্য-বিবাহিতা শিপ্রা বসু বললেন, মধ্যবিত্ত সমাজে মেয়েদের কাছে পুরুষ-বন্ধু প্রসঙ্গই অনেক ক্ষেত্রে উঠতে পারে না। তবে শিপ্রার মতে 'ফ্রেণ্ডশিপ যদি নির্ভেজাল হয়, তবে বিবাহের আগের

বন্ধুত্ব পরবর্তী জীবনে টেনে নিয়ে যাওয়ায় অসুবিধে থাকতে পারে না।' শিপ্রা বলেন, 'আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা এখনো অনেকটা অজ্ঞানতা ও সংস্কারে ভরা। 'পরপুরুষের' সঙ্গে মেলামেশা এ-সমাজের নিচের তলায় এখনও নিন্দিত। তবে এই অজ্ঞানতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। আমার নিজের কথাই ধরুন রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হয়েও আমার স্বামী আমি নিজে বেছে নিয়েছি, স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গেও আমি নিঃসঙ্কোচে মেলামেশা করি। এ-ব্যাপারে আমার স্বামী আমার সঙ্গে সর্বদা একমত।'

সন্দীপ বসু বলেন 'আসল গন্ডগোল অন্য জায়গায়। তা হল আমরা কি 'বন্ধু'র প্রকৃত সংজ্ঞার অনুসারী? যদি তাই হই, তাহলে মেয়ের পুরুষবন্ধু থাকা বা পুরুষের মেয়েবন্ধু থাকা নিয়ে কোন সমস্যার কথাই উঠতে পারে না। 'বয় ফ্রেন্ড' বা 'গার্ল ফ্রেন্ড' এই দুটি বিদেশী শব্দের সংজ্ঞা সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। অর্ধ-শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা বহু সময় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে আর চটপট প্রেম নিবেদন করে বসে। নারী-পুরুষের 'প্রেম' ছাড়াও যে নারী-পুরুষে বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব এই মূল বিষয়টিকে ধরতে পারলে সমস্যা অনেক ছোট হয়ে যেতে বাধ্য।

আমি আমার বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে মিশি, তাই কোন সমস্যা বোধ করে বিব্রত হই না।'

—কৃষ্ণা সেনগুপ্ত

এঁরাও পিছিয়ে নেই

বাংগালীর ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান

ভেষজ শিল্পেও তরুণ বাঙালীরা আজ আর পিছিয়ে নেই। ওষুধ তৈরীর ব্যবসায়ে এখন তরুণরা এগিয়ে আসছেন। সংখ্যায় হয়তো খুব একটা বেশি নয়, কিন্তু তবুও যে ওঁরা এ ব্যাপারে ঝুঁকি নিতে পিছিয়ে যান নি, সেটাই আমার কথা।

ব্রজগোপাল দাশগুপ্ত

টালিগঞ্জের 'ট্রোপজন ফার্মা-কেম প্রাইভেট লিমিটেডের কথাই ধরা যাক। সেদিন ওঁদের অফিসে কথা হচ্ছিল। ঐ সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পূর্ণসময়ের পরিচালক শ্রীব্রজগোপাল দাশগুপ্ত বল্লেন—'৬৫ সালে ট্রোপজন-এর যাত্রা শুরু হয়। যৌথ মালিকানাধীন এ সংস্থার মালিকের সংখ্যা তিন। প্রায় দশ বছর আগে আমরা তিনজনে কুড়ি হাজার টাকা সম্বল করে ব্যবসায়ে নামি। আমাদের হাতে যেসব যন্ত্রপাতি ছিল তার দাম ছিল আনুমানিক হাজার বারো টাকা। দুজন কেমিস্ট আর তিনজন শ্রমিক নিয়ে আমরা সেদিন ব্যবসা শুরু করি।

এ বছর দশেকে ট্রোপজন অনেক বড় হয়েছে। এখন 'অথরাইজড ক্যাপিটালে'র পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক লাখ টাকা। এগারো জন কর্মী ঘরে-বাইরে দিনরাত কাজ করে চলেছেন। ট্রোপজনের ওষুধ শুধু পশ্চিমবাংলা নয় আসাম ও ত্রিপুরার বাজারেও বিক্রী হচ্ছে।

—এ পর্যন্ত কটি ওষুধ আপনারা বাজারে ছেড়েছেন?

—নটি পেটেন্ট। আমার প্রশ্নের উত্তরে ব্রজবাবু বল্লেন—আমরা এমনভাবে ওষুধের দাম বেঁধে দিই যাতে সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরীব ঘরের লোকেরাও আমাদের ওষুধ কিনতে পারে।

—এত ব্যবসা থাকতে এ লাইনেই বা নামলেন কেন?

—আমার ছেলেবেলার স্বপ্নই ছিল—আমি কেমিস্ট হব। ৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এস-সি পাশ করার পর নোয়াখালির একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানে কেমিস্ট হিসেবেও কাজও করি। তারপর কলকাতায় এসে ট্রোপজনের সঙ্গে গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়ে গেলাম সেই ৬৫ সালে।

—বিজনেস কেমন চলছে?

—মন্দ নয়, তবে যা আশা করেছিলাম তা পূরণ হচ্ছে না। আমার প্রশ্নের উত্তরে ব্রজবাবু ভেষজ শিল্পের নানা সমস্যা তুলে ধরলেন—কাঁচামালের অভাবের জন্য আমরা ভয়ানক অসুবিধায় পড়েছি। এমন কয়েকটি জিনিস আছে যা দ্বিগুণ দাম দিয়েও সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃমিনাশক ওষুধের জন্য দরকার 'পাইপারাজাইন সাইট্রেট'— কিন্তু ও জিনিসটা এখন বাজার থেকে অদৃশ্যই বলতে পারেন। আর স্পিরিটের কথা নাই বা তুললাম। তবে.....

—তবে কি?

—বড় বড় হাউজগুলোর কাছে অবশ্য কোনও সমস্যাই সমস্যা নয়। ওঁরা সব কিছুই ম্যানেজ করতে পারেন ওদের সোর্স এবং রিসোর্স আমাদের চাইতে অনেক বেশি। আমি কিন্তু এখনও হাল ছাড়ি নি। জীবনের সবচেয়ে ভাল দিনগুলো লড়াই করতেই কেটে গেল—'স্ট্রাগল ফর এক্‌জিসটেন্স'। তবে লেগেপড়ে থাকলে একদিন সাকসেস আসবেই।

—বিয়ে করেছেন?

—না, ব্রজবাবু তাঁর ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আলোকচিত্রের দিকে চেয়ে বল্লেন—বিজনেসের কথা ভাবতে গিয়ে নিজের কথা ভাববার সময় পাই নি। কি করে যে ৩৬টা বছর চলে গেল নিজেই বুঝতে পারিনি।

—কনক মজুমদার

যুবক-যুবতী

ফিল্ম

অমৃতে প্রকাশিত 'যুবক-যুবতী' ফিচারটির জন্য লেখিকাকে ধন্যবাদ। সমীক্ষাটির বিষয়বস্তু হিসেবে লেখিকা যে ধরণের সমস্যা বেছে নিয়েছেন, সন্দেহ নেই বর্তমান পাঠকমহলে তা যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করবে। গত (৩০শে শ্রাবণ) সংখ্যায় প্রকাশিত চলচ্চিত্র বিষয়ে যে সমীক্ষাটি হয়েছে তার ওপর আমার কিছু বক্তব্য আছে।

প্রথমে বলি— আলোচনা যথেষ্ট প্রশ্ন কেন্দ্রিক হয় নি। সমীক্ষাটির বিষয় ছিল 'ফিল্ম কেমন হওয়া উচিত?' কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ উত্তরেই এই মূল প্রশ্ন থেকে সরে গিয়েছে।

আলোচনা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। আর এই সংক্ষিপ্ত পরিসর থেকে চলচ্চিত্রের মান সম্পর্কে বর্তমান যুবসমাজের মানসিকতার সঠিক চিত্রটি ধরা পড়েনি।

এ ছাড়াও কয়েকটি সাক্ষাৎকারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারছি না। 'অধিকাংশ বাংলা ছবি না পারে আনন্দ দিতে না পারে সিরিয়াস কথা বলতে।' এবং কোন ছবি আনন্দ দিতে পারে? উত্তর— 'ববি, প্রেমনগর ইত্যাদি'— অর্থাৎ হিন্দী ছবি। আজকের বাঙালি সমাজে হিন্দী ছবির যে সার্বজনীন সমাদর, তাতে এ ধরণের উক্তি খুবই স্বাভাবিক। তবু স্বাভাবিক বলে ছেড়ে দিলেই বোধহয় শেষ কথা বলা হয় না।

ধরে নিচ্ছি অধিকাংশ বাংলা ছবি আনন্দ দিতে পারে না। এবং ঠিক বিপরীতে, অধিকাংশ হিন্দী ছবি আনন্দ দিতে পারে। এখন শ্রীঅভিজিৎ এবং তার মত আরও অনেকের কাছে আমার প্রশ্ন—অধিকাংশ হিন্দী ছবি ঠিক কি ধরণের আনন্দ দেয় তা ভেবে দেখেছেন কখনো? নিশ্চয়ই খুব ইনটেলেকচুয়াল আনন্দ নয়? তবে কি খুব অনাবিল স্বর্গীয় আনন্দ আমার মনে হয় তাও নয়। বরং বলা যায় এ ধরনের বিকৃত আনন্দ অনেকটা শ্রীমতী মধুমিতা যাকে বলেছেন 'পারভারশন'। দর্শকের স্নায়ুকে এক বিকৃত আনন্দে উত্তেজিত করে তার বিবেক বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখা। কিন্তু আমাদের শারীরিক মানসিক সুস্থতার জন্য এ ধরণের উত্তেজনা কি সত্যিই কাম্য?

বলা হয়েছে, বাংলা ছবি সিরিয়াস কথাও বলতে পারে না। কিন্তু একেবারেই পারে না স্বীকার করতে পারছি না। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, পূর্ণেন্দু পত্রী তাঁদের ছবিতে যে কথা বলতে চান তা সবই বাজে একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করব না। এছাড়া আরও অনেকের বাংলা ছবিতে অনেক সিরিয়াস কথা বলা হয়। আসলে কোনো সিরিয়াস কথা শোনার মত ধৈর্য বা মানসিকতা আজ আমাদের নেই। থাকলে বাংলাদেশের তরুণ সমাজের কাছে 'ববি'র জনপ্রিয়তা ও 'অশনি সংকেত'র জনপ্রিয়তা একই রকম হত। কিন্তু তা হয়নি।

হিন্দী ছবির চোখ ধাঁধানো রঙের ছটা আর মন ভোলানো সেক্সসীয়লজির তোড়ে বাংলা ছবির সমস্ত দানই ভেসে যাচ্ছে। শুনতে পাই বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ আজ প্রচণ্ড আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। আর এই সংকটই যে কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক ছবির বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাংলা ছবির এই আর্থিক সংকটের পেছনে বাংলার দর্শকদের 'অবদান' কিন্তু অনেকখানি। কেননা আমরা বম্বের ফিল্মের প্রতি একটু বেশী সহানুভূতিশীল। বাংলা দেশেরই যে একটি বড় শিল্পনগরীতে আমি থাকি সেখানে বাংলা ছবি দেখার জন্য প্রবাসী [illegible] পাত্রের মত আমাকেও দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়। বাংলা ছবি তার নিজের দেশেও পরবাসী হয়ে আছে।

আমাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। আজ যে পোশাকে পরিচ্ছদে কথাবার্তায় ও আচার ব্যবহারে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি তার অধিকাংশই বঙ্গ সংস্কৃতির আওতায় পড়ে না। শ্রীঅভিজিতের বক্তব্য মতো এ ব্যাপারটা যে শুধু তরুণ সমাজের তাই নয়। ওপর মহলের অনেক তথাকথিত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিরও। সামাজিক কৌলিন্য বজায় রাখতে হিন্দী ছবির প্রতি ততটা আসক্ত না হলেও ইংরেজী বা বিদেশী ছবির প্রতিই তাঁরা নুয়ে। বাংলা ছবি তাঁদের কাছেও অসার। কিন্তু তাকে সারগর্ভ করে তোলার কি কোনো দায়িত্ব তাঁদেরও নেই? একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়
বার্ণপুর

চিঠিপত্র

"লিব" প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক 'অমৃত'-এর যুবক-যুবতী বিভাগটি বেশ আগ্রহ জাগায়। প্রতি সপ্তাহে যুব-সমস্যা নিয়ে তরুণ-তরুণীদের অভিমত জানতে পেরে ভাল লাগে। তবে, আমার মনে হয়, কোন একটা বিষয়ের আলোচনা একটামাত্র সংখ্যায় (পত্রিকা) না ছেপে অন্তত দু'টি সংখ্যায় প্রকাশ করলে বিষয়টি আরও ভালভাবে পরিস্ফুট হবে।

বর্তমান সপ্তাহের (১৩-৯-৭৪) 'লিব' পড়লাম। এ-প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য রাখছি।—

'আশ্চর্য বোধ করছি বীণা দত্ত'র মতামত পড়ে। তিনি নাকি আপনভাগ্য জয় করবার অধিকার পাচ্ছেন না। বিয়ের পর, 'মা' হওয়ার পর নারী পড়েন আরও মুশকিলে। তাতে নাকি লিবার্টির নামগন্ধও থাকে না।

কালনার মিনতি দাশগুপ্তর অভিমত তো আমার কাছে দারুণ রকমের ভয়ংকর বলেই মনে হল। তাঁর মতে পুরুষ নাকি মেয়েদের 'লিবার্টি' অর্জনে দারুণ বাধা দিচ্ছে। তবে, তিনি সে-বাধাকে বাধাই বলেন না। এমনকি বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতান্তর (স্ত্রীর লিবার্টি-র ব্যাপারে) যদি মনান্তরে দাঁড়ায়, তাও তিনি পরোয়া করেন না।

এই সমস্ত শুনে মনে হচ্ছে, বর্তমান কালের যুবতীরা চান তাঁদের সংসারের, সমাজের চলা নিয়মকানুন ভেঙে ছুটে বেরিয়ে পড়তে। কিন্তু তাঁরা কি ভেবে দেখেছেন এই চলতি দুনিয়ায় চলতি সংসারের বাইরের জগৎটা (যেটার জন্য তাঁরা [illegible]) তাদের কী দেবে? 'লিবার্টি' নিয়ে নিউজিল্যান্ডে নারী-সম্মেলন হতে পারে। কিন্তু ওই বীণা ঘোষরায়, ওই মিনতি দাশগুপ্ত একবারও কি ভেবে দেখেছেন নিউজিল্যান্ড-এর তালে তাল দেওয়া আমাদের বাঙালী তথা ভারতীয় মহিলাদের দ্বারা সম্ভব নয়? না, আমি হীনমন্যতায় ভুগছি না, তবুও বলব হাতীর দেখাদেখি পিঁপড়ের পা বাড়ানো পোষায় না।

ওঁদের কেউ 'লিবার্টি' কথাটার অর্থ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। পলিটিক্যাল লীডার হয়ে দেশ-বিদেশে চেনা-অচেনার ভীড়ে সময় কাটানো, [illegible] ওপরে [illegible] মানুষের [illegible] টী-হাউস, সিনেমা-

হাউস করে বেড়ানো— এগুলোই কি 'লিবার্টি'র একমাত্র লক্ষণ?

আমার মনে হয়, মেয়েদের পক্ষে ও-সমস্ত করে বেড়ানোতে যে-একটা কষ্টকর বা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তা জেনেও বীণা ঘোষ, মিনতি নাগ-পুরে, ইচ্ছা করেই, অসবের কষ্টটা মনে মনে স্বীকার করতে চাইছেন না। এটা তাঁদের গতানুগতিক সামাজিক সংস্কারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রসঙ্গত, বেথুন কলেজের ছাত্রী প্রিয়া মণ্ডল বলেছেন, '...লিবার্টির নামে পথে নামতে দিলে (মেয়েদের) বারোটা বেজে যাবে'। সত্যিই তো, মেয়েদের শরীর ও মনে একটা বিশেষ মাধুর্য আছে— যেটা পুরুষ-দের নেই। নারী সদাই পুরুষের বিপরীত। নারী বা পুরুষ কেউই নিজে সম্পূর্ণ হতে পারে না। তার জন্য পরস্পরের প্রয়োজন পরস্পরকে। তাছাড়া বিধাতার নিয়মে নারী-শরীর কখনোই পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে না। নারীশরীর পুরুষের মত অতটা চোট সহ্য করতেও পারবে বলে মনে হয় না।

সুতরাং আমার মতে সব মেয়েদেরই উচিত নিজের সংসারের মধ্যেই, মানিয়ে গুছিয়ে, সবাইকে নিয়ে হেসেখেলে জীবন কাটানো। প্রয়োজনবোধে স্ত্রীকে চাকুরী করতে বাইরে বেরোতে হতে পারে অনেকক্ষেত্রে, কিন্তু তাই বলে 'লিবার্টি' নামের এক অন্দোলনে ছুটে যাওয়া কোন নারীরই সাজে না। 'লিবার্টি' মানেই ইন্দিরা-সিরিমাভোর জীবন-যাত্রা নয়। তাই, 'লিবার্টি' কথার অর্থ অন্যভাবে ঘুরিয়ে, নিজেদের তৈরী সংসারেই আর পাঁচজনকে নিয়ে নিজেদের সুখ যদি নিজেরাই তৈরী করে নিই, তবে দেখতে পাবো সেখানেও লিবার্টির অভাব নেই।

স্বাতী পাঠক (শিক্ষিকা)।
পাত্রসায়ের। বাঁকুড়া।

হিপি মনোভাব

৩০-৮-৭৪ তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় যুবক-যুবতী ফিচারে 'হিপি মনোভাব' পড়ে খুব আনন্দ লাভ করলাম। যুবক-যুবতীদের সম্বন্ধে এই ধারাবাহিক আলোচনার জন্য প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

হাওড়ার একটি নামকরা গার্লস স্কুলের একাদশ শ্রেনীর ছাত্রীর সঙ্গে আমি কিন্তু একমত হতে পারলাম না। তিনি বলেছেন 'ঘেরাটোপে থেকে থেকে আমাদের মনগুলো প্যাঁচোয়া হয়ে যাচ্ছে।' তাঁর কথা শুনে মনে হচ্ছে তিনি বর্তমান কুসংস্কারযুক্ত সমাজকে সহ্য করতে পারছেন না। সেই জন্য তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করছেন, সেই সঙ্গে তিনি তাঁর মনকে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে দেবার জন্য হিপি মনোভাবকে সমর্থন করছেন।

কিন্তু আমার মতে সমাজকে সংস্কারমুক্ত করতে হিপি না হলেও চলে। জীবনকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবার জন্য আরো অনেক পথই খোলা আছে। পোশাক-পরিচ্ছদ আচার-আচরণে পুরাণো রীতিনীতি ত্যাগ করতে হবে, তার কোন অর্থই হয় না। এতে শুধু নিজেদের উগ্রতাই প্রকাশ পায় কেবল। সমাজকে আধুনিক রূপ দেবার ইচ্ছে ভালো। কিন্তু হিপি না হয়ে, আমাদের যা সাধারণ রীতিনীতির মধ্যে থেকেই আমরা কু-সংস্কার-মুক্ত সমাজ গঠন করতে পারি। কিম্ভূতকিমাকার বর্তমান হিপিদের পোশাক। পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে আমাদের সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতাই প্রকট হয়ে উঠবে, এতে সমাজ-সংস্কার মুক্ত না হয়ে সমাজকে আরো অবনতির দিকেই ঠেলে নিয়ে যাবে।

গোবিন্দচন্দ্র ধর,
সোনারপুর, ২৪ পরগণা।

মহিলারা এখনও সেই তিমিরে

'অমৃত' ৩০ আগস্ট সংখ্যায় অঞ্জলি চৌধুরীর 'মহিলারা এখনও সেই তিমিরে' পড়লুম। মনে হল লেখিকা এখনও মান্ধাতার আমলের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আজকের সমাজ-সংস্কারকে দেখছেন।

আজকের দিনে সুযোগ থাকলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চাকরী করেন এটা খুবই সাধারণ ঘটনা। উভয়ে চাকরী করেন সাংসারিক দায়-দায়িত্ব উভয়েই গ্রহণ থাকেন। লেখিকা লিখেছেন, 'কোন ঘরে যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চাকরী-জীবী হন, তাহলে মহিলাটির শারীরিক ও মানসিক দায়িত্বের বোঝা কতখানি সেই পরিবারের সকলে, এমনকি স্বামী ভদ্রলোকটিও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন'

লেখিকাকে একথা কে বললেন কি তাঁর কল্পনাপ্রসূত না নিজে দেখেছেন? আজকের দিনে প্রায় প্রত্যেক স্বামী চাকুরীজীবী স্ত্রী সম্পর্কে সহানুভূতিশীল।

চাকুরীজীবী স্ত্রী ঘর-সংসার সামলান রান্নাবান্না করেন, ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা করেন, দশটা—পাঁচটা চাকরী করেন আর স্বামী ভদ্রলোক ইজিচেয়ারে পা তুলে আরামে বসে থাকেন—এমনটা কি আজকাল হয়?

ছবিটা বরং উল্টো। যেহেতু মহিলারা পুরুষদের থেকে কম পরিশ্রম করতে পারেন, সেজন্যে পুরুষরাই এগিয়ে আসেন চাকুরীজীবী স্ত্রীদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতে, এমনকি রান্নাবান্নার জোগান দিতেও।

লেখিকা আরও লিখেছেন, 'স্বামী ভদ্রলোক ছেলেমেয়েদের অকৃতকার্যতা অসংযত আচরণ সবের জন্যেই দায়ী করেন স্ত্রীকে। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না যিনি ঘর-বার দুটো করেন, তাঁর পক্ষে সব ব্যাপারেই সব দায়িত্ব বহন করা সম্ভব নয়।'

সব দায়িত্ব বহন করা যে সম্ভব নয় সেটা সবাই জানেন। সত্যিই কি সব দায়িত্ব স্ত্রীকে বহন করতে হয়? চাকুরীজীবী স্ত্রী অর্জন করে যাবতীয় দায়িত্ব ঘাড়ে নেওয়ার মত সময় করতে পারেন? মানে বাস্তবে সেটা সম্ভব? সবাই জানেন সম্ভব নয়। ফলে দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই নিতে হয়, নিতে হচ্ছে।

'একান্নবর্তী পরিবারকে খুশী করে এখনও ভারতীয় মহিলারা মিষ্টি হাসি দিয়ে সকলের মন জয় করে থাকেন।' লেখিকা হয়ত জানেন না, একান্নবর্তী পরি-বারকে টিকিয়ে রাখতে স্বামীর ভূমিকাও কম নয়। একা স্ত্রীর পক্ষে সকলের মনো-রঞ্জন করা সম্ভব হয় না স্বামী যদি প্রতিকূল হন। অপরপক্ষে এটাও দেখা গেছে মুখ্যত স্ত্রীর ম্যাল অ্যাডজাস্ট-মেন্টের জন্যেই বহু একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যায়। কারণ, খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে অনর্থ ঘটানো বেশ কিছু মহিলার স্বভাবগত।

শ্রীমতী চৌধুরী পুরুষদের ওপর আগাগোড়া দোষের বোঝা চাপিয়ে মহিলা-দের অসহায় অবস্থা জাহির করতে চেয়েছেন। এটা বোধহয় ঠিক নয়।

সুকুমার চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-৬

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বর্ধমানে নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের শাখার উদ্বোধন ও অমৃত-সম্পাদক তুষার-কান্তি ঘোষের সম্বর্ধনা ঃ

গত ১৫ সেপ্টেম্বর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাহিত্যানুরাগী নাগরিকগণের উপস্থিতিতে বর্ধমান শহরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের একটি শাখার উদ্বোধন করা হয়। এই শাখার উদ্বোধন করেন সম্মেলনের সভাপতি সাহিত্যিক সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ জীবেন্দ্রমোহন সিংহরায়। যুগান্তরের বার্তা-সম্পাদক ও বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন 'ভারতের সমস্ত রাজ্যে এমন কি বিদেশেও বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি এখন গভীর ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়েছে। শিগগিরই ভারতের সমস্ত রাজ্যে এবং বৃটেন অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশেও সম্মেলনের শাখা খোলা হবে।' শ্রীঘোষ বর্ধমান জেলার লেখক ও সাহিত্যিকদের এই সম্মেলনের সদস্য হবার জন্য এবং বাংলা সাহিত্যের প্রসারে যৌথ প্রচেষ্টা চালাবার জন্য অনুরোধ জানান। ডঃ সিংহরায় উপস্থিত সুধীবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে বর্ধমানে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের শাখা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন যে, উদীয়মান লেখকদের জন্য একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রতিষ্ঠিত লেখক ও সাহিত্যিকদের জন্য একটা উপযুক্ত সংস্থা গঠনের উদ্দেশ্যেই এই শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে শ্রীকমল ঘোষ যুগ্ম-উপসভাপতি ডঃ গোপেশ দত্তও ভাষণ দেন। সম্মেলনের যুগ্ম-সভাপতি শ্রীমতী দীপ্তি মৈত্র শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে মানপত্র প্রদান করেন তাঁকে এক জোড়া ধুতিও দেওয়া হয়। জেলা স্কুল বোর্ড হলে এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়।

দু বছর পূর্বে বর্ধমান শহরের পশ্চিমাঞ্চল আলমগঞ্জে খনন কার্য চালাবার [illegible] টন ওজনের একটি বিশালকায় শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে স্থানটি একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও তাঁর সহযাত্রীরা বর্ধমানেশ্বর নামে জনপ্রিয় এই বিগ্রহে পূজা দেন। আলমগঞ্জ পূজা কমিটি শ্রীঘোষকে মানপত্র দেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্ধমান শাখার পক্ষ থেকেও শ্রীঘোষকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শ্যামসাগরের দক্ষিণে পরিষদের কার্যালয়ে আয়োজিত এই সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীজহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিষদ-প্রদত্ত মানপত্রটি পাঠ করেন শ্রীসুধীরচন্দ্র দাঁ।

তারপর শ্রীঘোষ ও শ্রীবসু বর্ধমান শহর থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা 'সংস্কৃতি' ও পাক্ষিক 'খোলা কথার' কার্যালয় পরিদর্শনে আসেন। সেখানে পত্রিকা দুটির সম্পাদক শ্রীসদানন্দ দাস তাঁদের সম্বর্ধনা জানান। শ্রীঘোষ পল্লী অঞ্চলে এই ধরনের পত্রিকা দেখে আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি সাংবাদিকদের রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে ও সঠিক ও সংক্ষিপ্তভাবে সংবাদ পরিবেশনের পরামর্শ দেন। বর্ধমান সমবায় ব্যাংক হলে বর্ধমান জেলা স্থানীয় পত্রিকা সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীঘোষ ও তাঁর সহযাত্রীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। দৈনিক ও পাক্ষিক 'দামোদর' সম্পাদক শ্রীদাশরথি তা এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠান শেষে শ্রীঘোষ দামোদর পত্রিকার অফিসটি পরিদর্শনে যান।

মনীষী রজনীকান্ত গুপ্ত স্মরণে ঃ

বাংলা ভাষায় প্রথম যথার্থ পরিণত ইতিহাস-লেখকের সম্মান বোধ করি মনীষী রজনীকান্ত গুপ্তেরই প্রাপ্য। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। সে সময়কার সাহেব এবং সাহেবদের পদাঙ্ক অনুসারী দেশীয় ঐতিহাসিকগণ সিপাহী পরিচালিত যুদ্ধটাকে নিছক একটা বিদ্রোহ বলে আখ্যা দিয়ে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করতেন। ঠিক সেই সময়েই মনীষী রজনীকান্ত তাকে যুদ্ধ বলে সঠিক ঐতিহাসিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সাহেবী ঐতিহাসিকদের প্রভাব যে কি ব্যাপক ছিল, (প্রধানত সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার জন্য) তা বোঝা যায় এই দেখে যে, এমন কি আজকের দিনেও সাধারণত ঐ যুদ্ধটাকে মিউটিনি অর্থাৎ বিদ্রোহ মাত্র বলেই আমরা অনেকেই নিজেদের মত ব্যক্ত করে থাকি।

এ যুগের শুরুটা সিপাহীদের দ্বারা হয়েছিল বটে এবং কয়েক বৎসরব্যাপী এ-যুদ্ধের নেতৃত্বও প্রধানত সেনানীদের করায়ত্ত ছিল, তাও ঠিক কিন্তু গোটা দেশে এ-যুদ্ধের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ প্রায় গোটা দেশবাসীই এর সামিল হয়েছিলেন তাই এটা যথার্থই ভারতীয় জনগণের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের গৌরব দাবী করতে পারে। এ-সত্য অবশ্য আধুনিক যুগের বহু ইতিহাসকার খোলা মনেই স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে

মনীষী রজনীকান্ত গুপ্তই সর্বপ্রথম কঠিন পরিশ্রম করে নানা তথ্য উপস্থাপন করে গিয়েছেন। আমরা জেনে আনন্দিত হলাম যে, ৫ খণ্ডে প্রকাশিত রজনীকান্তের অমর কীর্তি সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস এক খণ্ডে পুনঃ মুদ্রিত হয়ে বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

রজনীকান্ত অবশ্য কেবল একজন ইতিহাসকারই ছিলেন না। নানা ধরনের নিবন্ধ জীবনী ও নাটক রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর আর্যকীর্তি প্রতিভা জয়দেব ও চরিতমালা এ-কথার সাক্ষ্য দেবে। তা ছাড়া বাঙালী সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পরিষদের মুখপত্রের প্রথম দু বৎসরের সম্পাদকও ছিলেন তিনিই। কাজেই তাঁর নিকট বাঙালী জাতির ঋণ যে কত গভীর তা সহজেই অনুমেয়। প্রাচীন পুঁথিপত্র সংরক্ষণের জন্য বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার কথা অন্তত আমাদের দেশে তিনিই প্রথম ভেবেছিলেন। বাংলায় বিজ্ঞানের একটি পরিভাষা সৃষ্টির জন্যও তিনিই প্রথম প্রয়াস পেয়েছিলেন। রজনীকান্তর সমস্ত সৃষ্টি রচনাবলীর আকারে প্রকাশের চেষ্টা করা হচ্ছে জেনে আমরা আনন্দিত। তাঁর জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি উৎসবটি দেশ বিভাগোত্তর নানা সমস্যার মধ্যে যথাযথভাবে উদযাপন করা সম্ভব হয় নি। তাই তাঁর জন্মের ১২৫তম বর্ষ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে প্রতিপালনের জন্য আয়োজন করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে গঠিত একটি কমিটি রজনীকান্ত সম্পর্কে একখানি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের আয়োজনও করেছেন। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হলে তথা কলকাতার জাতীয় পাঠাগারে রজনীকান্ত সম্পর্কে যে প্রদর্শনী ও বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়েছিল তার ফলে এই অনন্যসাধারণ বাঙালী মনীষী ও ঐতিহাসিক সম্পর্কে নতুন করে সাধারণের মধ্যে আগ্রহ দেখা দেবে নিশ্চয়ই। আমরা এই প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁর ১২৫তম জন্মতিথি পালনের জন্য যাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন তাঁদের প্রচেষ্টায় সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি ও তাঁদের সাধুবাদ জানাই।

অন্তরঙ্গ-এর বার্ষিক অনুষ্ঠানে বনফুল-এর সম্বর্ধনা :

উত্তর কলকাতার জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক সংস্থা অন্তরঙ্গ-এর দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি মহাজাতি সদনে সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সাংবাদিক দিলীপ মালাকার। এদিনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধান বিচারপতি শংকরপ্রসাদ মিত্র। এদিন স্বনামধন্য সাহিত্যস্রষ্টা বনফুলকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ অমিয় মুখোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। নৃত্য, গীত, নাট্যাভিনয় ব্যতীত ঋষি শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে বিশেষ অনুষ্ঠান 'শ্রীঅরবিন্দ প্রণাম' সকলকে আনন্দ দেয়।

বাংলার বাইরে বাঙালী ও বাংলা ভাষা :

বাংলার বাইরে স্থায়ীভাবে যে-সমস্ত বাঙালী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বসবাস করেন, নানা অসুবিধার জন্য মাতৃভাষার প্রতি কর্তব্য তাঁরা সঠিকভাবে পালন করতে পারেন না। এ সম্পর্কে নানা অসুবিধার মধ্যে সর্বপ্রধান হলো অল্প বয়স থেকে বিদ্যালয়সমূহে মাতৃভাষায় পঠন-পাঠনের অসুবিধা। অন্যান্য রাজ্যের স্কুলসমূহে বাংলা শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে দেখা যায় বাংলার বাইরে অন্যান্য রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বাঙালীরা বাংলা ভাষা হয় একেবারেই ভুলে বসেছেন আর না হয়ত বাংলা নামে যে-ভাষা বলেন তা শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের পক্ষে একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ তা না বাংলা, না অন্য কোনো ভাষা। এই অবস্থাটা নজরে আসায় নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক শশাংকমোহন কর সম্মেলনের বহির্বঙ্গের সদস্যদের উদ্দেশে একটি আবেদন প্রচার করেছেন। এই আবেদনে অনুরোধ জানান হয়েছে : (১) পুত্র-কন্যাদের শৈশবে বাংলা শেখান, (২) তাদের মাতৃভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ ও সংবাদপত্র পাঠ করতে দিন।

কবি সুকান্ত জন্মজয়ন্তী :

সম্প্রতি নবদ্বীপ রাধাবাজারে প্রগতি পরিষদের পাঠাগারে বিপ্লবী কবি স্বর্গত সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মজয়ন্তী প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তাতে নবীন-প্রবীণ বহু সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি যোগদান করেছিলেন। বিভিন্ন বক্তা বিপ্লবী কবির জীবন তাঁর স্বল্প-পরিসর জীবনে রচিত কাব্যের মৌলিকতা ও পরবর্তী যুগের কাব্যে তাঁর লক্ষণীয় প্রভাব প্রভৃতি নানা বিষয় সম্পর্কে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন।

জরৎকার,

জীবন্মুক্তির তপস্যা মাহাত্ম্যের ভাষ্যকার - - -

"তোমার প্রতিভা আমি স্বীকার করি। তার স্বকীয়তা আছে—অজস্রতা আছে—আত্মশক্তির প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা রেখে প্রশস্ত পটভূমিকার উপরে নানা চরিত্র ও বিচিত্র ঘটনা নিয়ে যে বৃহৎ চিত্র তুমি এঁকেছ তাতে তোমার লেখনীর আশ্চর্য বলশালীতা প্রকাশ পেয়েছে।"

একালের সমকালীনদের প্রথম বৈপ্লবিক চেতনা যাঁরা বহন করেছিলেন সেই 'প্রচণ্ড' কাল্লোল গোষ্ঠীর প্রধান পুরোধা অচিন্ত্যকুমারকেই উপরের চিঠিখানি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বলাবাহুল্য বিশ্বকবির স্বীকৃতিই অচিন্ত্যকুমারের স্পষ্ট পরিচয়।

সম্প্রতি 'দেউটি' সাহিত্য পত্রিকা 'কল্লোল পুরোধা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বিশেষ সংখ্যা নামে চলতি সংখ্যাটিকে চিহ্নিত করেছে। এই সংখ্যায় অচিন্ত্যকুমারকে লেখা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চিঠি ছাড়াও জীবনানন্দ, হেমচন্দ্র বাগচী প্রভৃতির চিঠি এবং অচিন্ত্যকুমার সম্পর্কে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রমথনাথ বিশীর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে অমর কথাসাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশিষ্ট মূল্য রয়েছে। অচিন্ত্যকুমার প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু মনোজ বসু নরেন্দ্র মিত্র মণীন্দ্র রায় দক্ষিণারঞ্জন বসু এবং সুশীল রায়ের লেখাগুলির উল্লেখ করার মতো। প্রেমেন্দ্র মিত্রের চিঠিতেও শ্রীসেনগুপ্ত সম্পর্কে কিছু মূল্যবান উক্তি রয়েছে। অচিন্ত্যকুমারের গ্রন্থপঞ্জীটি পত্রিকায় সংযোজিত হওয়ায় পত্রিকার মর্যাদা বেড়েছে। ছাপা এবং প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। 'দেউটি' পত্রিকাকে তাঁদের এই মহৎ প্রয়াসের জন্য অভিনন্দন জানাই। দেউটি। (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বিশেষ সংখ্যা। সম্পাদনা বিপ্লব চন্দ্র হিজলপুকুর। হাবড়া। ২৪ পরগণা। দাম আড়াই টাকা।

নতুন বই

টলস্টয় গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড)। অনুবাদক—গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। জ্যোতি প্রকাশন, ২এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯। কুড়ি টাকা।

মাত্র কয়েক দিন হল টলস্টয় গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থাবলীটির বিভিন্ন খণ্ডের অনুবাদক তালিকায় একাধিক খ্যাতনামা অনুবাদকের নাম উল্লিখিত হলেও বর্তমান খণ্ডে শ্রীগৌরীশংকর ভট্টাচার্যের 'ওয়ার এণ্ড পীস' (১ম খণ্ড) এবং 'কশাকস' গ্রন্থদুটির অনুবাদ দিয়েই প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে। 'বিশ্বসাহিত্য বাঙালী পাঠক টলস্টয়' এই শিরোনামায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্রের দীর্ঘ বত্রিশ পৃষ্ঠার ভূমিকাটি এই খণ্ডের একটি মূল্যবান সংযোজন। এই ভূমিকা অংশে লেখক টলস্টয়ের সমস্ত গ্রন্থের একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিয়েছেন। ভূমিকাটি মননঋদ্ধ উপযুক্ত তথ্যসমৃদ্ধ এবং একজন কবি-প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিতে এক বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিকের

শিল্পীমনের যথার্থ স্বরূপ উন্মোচন। বাঙালী টলস্টয় পাঠকের এই জাতীয় গ্রন্থাবলী পাঠের পূর্বে এই মূল্যবান ভূমিকাটি অন্দরমহলে প্রবেশের মূল চাবিকাঠি বিশেষ।

টলস্টয়ের সার্থক অনুবাদক হিসেবে শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ইতিপূর্বেই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। আলোচ্য গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডটি তা যথার্থ অর্থে প্রমাণ করে। মনে পড়ে টলস্টয়ের সাহিত্যভাবনায় ঋষিত্বের উচ্চ আসনের কথা চিন্তা করেই স্ট্রাকভ স্পষ্টতই টলস্টয়কে 'পবিত্রতার উপাসক' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এহেন টলস্টয়ের দুখানি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'ওয়ার এণ্ড পীস' এবং 'কশাকস' আলোচ্য সঙ্কলনে গ্রথিত। এখন 'ওয়ার এণ্ড পীস' বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে ধ্রুপদী মর্যাদার অধিকারী হয়ে ইতিহাস রসাশ্রিত উপন্যাসের উজ্জ্বল স্থান পেয়েছে। এই উপন্যাসেই টলস্টয় ইতিহাস ও ব্যক্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে সুচিন্তিত মন্তব্য করে গেছেন। টলস্টয় দেখিয়েছেন—মানুষের জীবনভাগ্য এবং জীবন-সামগ্র্য [illegible] সম্পর্কে চিহ্নিত। টলস্টয় তাঁর এই গ্রন্থে আরও বলতে চেয়েছেন—মানুষের স্বাধীন সত্তা যত সামাজিক জীবনমুখী ও জীবন-নিষ্ঠ হয়, ততই তার ইতিহাসের নিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ অবধারিত হয়ে ওঠে। এই নিয়ম থেকে ছিটকে সরে আসা উজ্জ্বল-তম চরিত্র সম্ভবত ওয়ার এণ্ড পীসের প্লেটো ক্যারাটিয়েভ—যার সঙ্গে বন্দীযাত্রার কালে নায়ক পিয়েরের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এক জাতির উত্থান-পতনের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনের অভ্যুদয় জড়িত হয় কেমন করে—ওয়ার এণ্ড পীস তা বোঝায়। এই বিপুল গ্রন্থটিকে অনুবাদক তাঁর ভাষায় যথার্থতা দিতে পেরেছেন। 'কশাকস' উপন্যাসেও অনুবাদকের সে কৃতিত্ব বর্তমান। অ্যাডভেঞ্চার এবং স্বভাবী—দুই ধারার পাঠকই বর্তমান গ্রন্থাবলীর অনুবাদ পাঠ করে মূলের রস উপলব্ধি করতে পারবেন বলেই আমাদের স্থির বিশ্বাস। গ্রন্থটি দামী রেক্সিনে বাঁধা, অবশ্যই রুচি-সম্মত এবং উপহারোপযোগ্য।

[illegible] অরবিন্দ ভট্টাচার্য। বকুল গুর্নাল, ৫৪।৮, কলেজ স্ট্রীট কলকাতা-১২। তিন টাকা।

'তারও পর আশুমালী সাজাবে আবার আমারই ঘাসের ফুলে অন্য কোন সবুজ প্রস্তর/হে স্মৃতি প্রত্যাশা রেখো সেখানে থাকবার। —প্রথম কবিতাতেই কবি অরবিন্দ ভট্টাচার্য আগামী সতেজ জীবনের আকাশবাণী শুনিয়ে স্মৃতিসূত্রে তাঁর রোমান্টিক অনুভাবনার মৃদুস্বাদী বেদনার আভাস দিয়েছেন সম্প্রতি প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থ প্রাণবন্ত সত্তার তাগিদের মধ্যে। কবি আশাভঙ্গ কেরাণী বধূর সহমর্মী চিত্রণ বর্ণনায় অনেক মাটির কাছাকাছি আসতে পেরেছেন। গভীর ভালবাসার জন্য আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ হতাশা, আর্তি প্রকাশে কবি যে সব চিত্রকল্প ছন্দ ও শব্দ ব্যবহার করেছেন, ততে কবিকে অবলীলায় স্বভাবী পাঠকদের কাছাকাছি আসতে দেখা যায়।

বই আর বই পত্রপত্রিকা

ধূপের ধোঁয়ায়। কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্যোতি প্রকাশক, ২এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯। আট টাকা।

শ্রীকৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্প্রতি প্রকাশিত 'ধূপের ধোঁয়ায়' গ্রন্থে তাঁর ক্ষমতার পরিচয় সুস্পষ্ট। একের পর এক কাহিনী বলতে বলতে লেখক সর্বস্তরের পাঠকদের সঙ্গে বিবিধ বিচিত্র সব চরিত্রের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সেই রকম সব চরিত্র চন্দনা - সোমনাথ - বিকাশ - পলা, সুরক্ত-মণিকা-শশাঙ্কমোহন, সুদীপ - জয়ন্ত-কল্যাণ দেবাশীস ইত্যাদি। শুধু চরিত্র নয় কাহিনী ও ঘটনাবলীকে কখনো প্রেম, কখনো বা প্রেমহীনতায়, কখনো ঈর্ষা কখনো বা পরম স্নিগ্ধ হার্দ্য প্রশান্তির কেন্দ্রে স্থির করে স্বভাবী পাঠকদের বিস্ময়ে আপ্লুত করেছেন। শ্রীকৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় কৃতিত্ব বোধহয় নিপুণ-ভাবে গল্প বলার ক্ষমতায়। 'ধূপের ধোঁয়ায়' গ্রন্থে লেখক যথেষ্ট আন্তরিক এবং গভীর মমত্ববোধ দিয়ে চার পাশের চরিত্র-চিত্র পর্যবেক্ষণ করেছেন।

বাতায়ন (বর্ষা সংখ্যা) — সম্পাদক ঃ কার্তিক ঘোষ। এল বি বিল্ডিং। বসির-হাট। চব্বিশ পরগণা। এক টাকা।

বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন জগদীশ-চন্দ্র দাস, শ্রীমুন্সী, কার্তিক ঘোষ, তরুণ-কুমার ঘোষ পান্নালাল মল্লিক অনিল ঘোষ কাজী মুর্শিদুল আরেফিন শঙ্কর সরকার, প্রসাদ নাথ, অমিত নাগ, পলাতক, নারায়ণ-চন্দ্র নাথ এবং পবিত্র জানা রায়। সম্পাদনায় আরও নজর দেওয়া দরকার।

সাহিত্য রশ্মি। সম্পাদক পীযূষ বসু। মছলন্দপুর। ২৪ পরগণা। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

কবিতা

যখন আমি ॥ তরুণ সান্যাল

এক সময় আমি আর দাঁড়িয়ে থাকবোনা
হাঁটুর গাঁটে জমবে শ্যাওলা
অথচ আমার সামনেই হেঁটে যাবে বুক চিতিয়ে মিছিল
ততোদিন আমাকে যেন বাঁচতে না হয়

একেক দিন মনে হয় বুকের মধ্যে কেমন এক টান
সমস্ত নদীর নাড়ি যেমন টনটন করে ওঠে জোয়ার বেলায়
দেখেছিলাম ফাঁকা মাঠে সর্ষেক্ষেতের নকশি কাঁথা, গা ঘেঁষে তার
হয়ে ছুটেছে দূরপাল্লার বাস
সমুদ্রের গা ঘেঁষে দৌড়চ্ছে ট্রেন
আত্মকালের গোপনে দম ক্ষীরের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠা
শক্ত বীজের গায়ে জমে ওঠে সব
এমনিভাবে সব দুপুর
আর এমনি করে হঠাৎ হঠাৎ জেগে ওঠা মধ্যরাত
উড়োজাহাজের সুদূর গম্ভীর বিষাদময় শব্দ

চোখ বন্ধ করে দেখতে পাই
বিশাল নদীর বুকে এপার ওপার মিলিয়ে দেওয়া
ঝুলন্ত ব্রীজ
দৌড়ে পার হয়ে যাচ্ছে
অসহায় শুঁয়োপোকার মতো ট্রেন
টানেলের মধ্যে অন্ধকারে ধক্ ধক্ চলছে এঞ্জিনের হৃৎপিণ্ড
চলেছে অচেনা গ্রামের দোপায়ায় হাঁটা পা
আলের বাঁকে কোমল ধুলোর গুঁড়োয়
লাল আলোর ঝোলানো লণ্ঠনে
গোরুর গাড়ি

যখন আমি দু পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবোনা
আমাকে যেন বাঁচতে না হয়।।

সম্রাট ॥ পরিমল চক্রবর্তী

বরং সাম্রাজ্য গড়ো আকাঙ্ক্ষার আর্ত পৃথিবীকে
জয় করে, হে আমার যৌবনের অনন্য সম্রাট;
দেখো, তাতে শান্তি পাবে; চৈতন্যের বিশাল কপাট
খুলে গিয়ে অদ্বিতীয় কোনো সান্দ্র প্রাণের ছোঁয়ায়,
দেখবে প্রার্থিত আলো তোমাকে রাঙাবে; দিকে দিকে
কাঁপবে বাসনা আর বেদনায় মগ্ন ধ্রুবতায়।

দেখো, তুমি তৃপ্ত হবে অতুলন স্বপ্নের বিভায়
দুঃখমগ্ন তিমিরেও; সব জ্বালা, সব তীব্র দাহ
মুছে গিয়ে বেদনার আনন্দের ম্লান শুভ্রতায়
প্রাণের অনন্তদূরে বয়ে যাবে স্বপ্নের প্রবাহ।।

প্রার্থনা রেখোনা কিছু ॥

জয়ন্তী রায়

প্রার্থনা রেখোনা কিছু
অনেকান্ত ধ্বংস হয়ে গেলে
নতুন নির্মাণে হবে
বাউলের শেষ সুর সাধা।
আমের মুকুল থেকে শুরু,
তারপর পাকা ফল সুগন্ধী মধুর,
অবশেষে পচে যায় দূষিত হাওয়ায়;
খোসা আঁশ জমা হয় পথে ডাস্টবিনে।
ধুলো ঘেঁটে দূরে যেতে হলে
নষ্ট প্রাণ, বিনষ্ট শরীর
ক্রমশঃ স্থবির হয়;
তার চেয়ে তপ্ত রোদে মাটির ফাটল হয়ে
জেগে থাকা ভাল—
একদা বর্ষণে হবে নতুন অংকুর।
প্রার্থনা রেখোনা কিছু,
লুব্ধতার মুখোমুখি দাঁড়িওনা ভিড়ে,
পরোনা স্মৃতির ফুলে মুখ রেখে
কেঁদো না অঝোরে।
তার চেয়ে মাঝ রাতে শান্ত ছায়াপথে
নির্বিকল্পে মেলে দাও
অবিকল্প বোধ।

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

(তিন)

লখনৌ থেকে শ্রীঅরবিন্দকে তার করেছিলাম: 'আমার ডাক এসেছে অবশেষে। এখন দীক্ষা দেবেন তো?' বম্বেতে বন্ধুবর শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেনের ওখানে উঠে গুরুদেবের তার পেলাম: এসো। কিন্তু বন্ধুরে কাছে বলি নি: বাউল ঝাঁপ দিয়েছে (শ্রীমৎ অনির্বাণের ভাষায়)। শুধু বললাম, শ্রীঅরবিন্দ ২৪এ নভেম্বর দর্শন দেবেন তাই বাংগালোর হয়ে পণ্ডিচেরি প্রয়াণ। বন্ধুবর শ্রীঅরবিন্দকে মহাকবি বলে ভক্তি করতেন তাই খুশী হলেন।

হরি তো হ. সেইদিন রাত্রেই তার এক মিত্রের নিলয়ে খ্যাতনামা আবদুল করিমের গান। কিন্তু এ কি? তাঁর গানে কই আর তো তেমন গভীর তৃপ্তি পেলাম না! যে-পরমানন্দ আমি আকণ্ঠ পান করেছিলাম তার পাশে আর সব আনন্দকেই আলুনি লাগত এ অত্যুক্তি নয়—যদিও জানি আমার মতন গানপাগলের মুখে এহেন কথা শুনে বিচক্ষণেরা মাথা নাড়বেন: "The old old story" বলে। কিন্তু আমার বৈরাগ্যের মূল তখন আর জীবনবিতৃষ্ণা ছিল না। পটপরিবর্তন হয়েছিল—এক অচিন আলোর আনন্দে মনপ্রাণ উদ্ভাসিত—যাকে সাহেবপুরাণে বলে walking on air! একথার মর্ম কেবল সেই জানে যার চোখের ঠুলি খসে গেছে দৈব জ্যোতির অভ্যুদয়ে। তাই এ-আশ্চর্য আনন্দের উল্লেখ করেই আমি বলি—কী হল তার পরে। সেও এক অভাবনীয় অঘটন।

পণ্ডিচেরিতে শ্রীমার দর্শন আমি পেয়েছিলাম প্রথম ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে—যখন আমি উঠেছিলাম আলসাসিয়া হোটেলে। শ্রীমা আমাকে সাদরে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন যোগ সম্বন্ধে নানা কথা। শুনে ভালো লেগেছিল বৈ কি—কিন্তু আরো ভালো লেগেছিল তাঁর রূপ, বিশেষ করে তাঁর দৃষ্টি ও হাসি।

শ্রীমা সুন্দরী—তার যৌবনের ছবিতে মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর সুষমায়। পণ্ডিচেরিতে যখন তাঁকে প্রথম দেখি তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ হবে। যৌবনশ্রী ছিল না, কিন্তু এমন মধুর মাতৃমূর্তি ফুটে উঠেছিল তাঁর রূপশ্রীতে যে, আমি সত্যিই অভিভূত হয়েছিলাম—আরো এই জন্যে যে, বিদেশিনীর কান্তিতে ভারতীয় মাতৃরূপ দেখব এ আমি সত্যিই ভাবতে পারিনি। তাই হয়ত (চমকে ওঠার দরুনই) অভিভূত হয়েছিলাম। তাঁর সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানতাম না শুধু দু-তিনটি সাধকের মুখে শুনেছিলাম তাঁর নানা দৈবী বিভূতির কথা। কিন্তু আমার মন টেনেছিলেন তিনি তাঁর মাতৃমূর্তির অপরূপ প্রসাদে—কোনো বিভূতির গুণে নয়। তাঁকে প্রণাম করেছিলাম সানন্দেই—কিন্তু দেবী বলে নয়, মা বলে সানন্দে স্বীকার করে। এ আমি পারব ভাবি নি কিন্তু পেরেছিলাম যে প্রথমেই এতে আমার অনেক সংশয়ই নিরস্ত হয়েছিল। শ্রীমা-র একটি কথা আজও কানে বাজে: 'আমি চাই সবাই আমাকে সহজে বরণ করবে আপনজন বলে।' আরো অনেক চমৎকার কথা বলেছিলেন যা ভুলে গেছি। কেবল এই আত্মপ্রকাশটুকুই মনে গেঁথে গেছে।

তারপর কলকাতায় ফিরে ফের পড়লাম নানা আবর্তে—বিশেষ করে সংশয়ের। কিন্তু সেসব কথা নানা সূত্রেই লিখেছি, তাই টপকে বলি ১৯২৮ সালের কথা যখন প্রথম শ্রীমার সঙ্গে সম্পূর্ণ খোলাখুলি কথাবার্তা হয়। আশ্রমে দীক্ষা পাবার পরে দ্বিতীয়বার তাঁকে দেখে মনের আরো একটি পর্দা সরে যায়, যখন শ্রীমা আমাকে বলেন যে লখনৌয়ে ১৫-১১-২৮ তারিখে সকালে আমার চৈত্যপুরুষের (psychic being) উদ্বোধন হয়েছিল বলেই আমি সংসারের দেহলি ডিঙিয়ে এক কথায় যোগমন্দিরের তোরণে পৌঁছতে পেরেছিলাম।

তারপর মাঝে মাঝেই শ্রীমা ডেকে পাঠাতেন আমার নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে। মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর নানা আশ্চর্য ভাষ্যে, ভরসা পেয়েছিলাম বিশেষ করে শ্রীঅরবিন্দের সাধনা সম্বন্ধে তাঁর নানা অভয় আশ্বাসে। সেসব মনে নেই, কেবল মনে আছে যে তিনি শুধু বারবারই আমার নানা সংশয়ের জট খুলে দিতেন, এবং আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করার সঙ্গে সঙ্গে এক বিচিত্র শান্তিপ্রবাহ বইয়ে দিতেন। মনে আছে কতবারই তাঁর কাছে গিয়ে বসতেই তাঁর অপরূপ হাসি ও চাহনিতে মেঘলা মনের ঘনঘটা কেটে ফুটে উঠতো তাঁর নয়নতারা।

DIVINE, SYNTHESIS OF YOGA, SECRET OF THE VEDAS, PSYCHOLOGY OF SOCIAL DEVELOPMENT (পরে গ্রন্থাকারে এটি ছাপা হয় HUMAN CYCLE শিরোনামায়) DEFENCE OF INDIAN CULTURE, IS INDIA CIVILISED, (এগুলি পরে একখণ্ডে ছাপা হয় FOUNDATIONS OF INDIAN CULTURE শিরোনামায়) বিবিধ দার্শনিক তথা চিন্তা সম্বন্ধে রচনা এই মাসিকটিতেই ছাপা হয়। কিন্তু এসম্বন্ধে আর বেশি লেখার প্রয়োজন দেখি না যেহেতু নানা লেখকের নানা লেখায়ই এসব ঐতিহাসিক তথ্য মিলবে। আমি যথাসাধ্য সেই সব কথাই লিখব যা ব্যক্তিগত—স্মৃতিচারণের উপজীব্য তো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ, উপলব্ধি, অভিজ্ঞতাই বটে। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে কত কী দিয়েছেন নানা পত্রে তথা কথালাপে যার ফলে আমার জীবন ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে সেই কথাই আমি বলতে চাই পরমানন্দে। জগতের নানা যশস্বীর সম্বন্ধে বেশি বলতে গেলে অত্যুক্তি হতে পারে বটে কিন্তু মস্ত বাঁচোয়া এই যে এ-মহাপুরুষের গুণগান যতই করি না কেন অত্যুক্তি হবে না—অর্থাৎ Understatement-ই হবে overerstatement নয়। আমি তাঁর সম্বন্ধে আমার একটি গানে লিখেছিলাম:

এমনি স্মরণে জাগালে পরাণ ভুলালে
যা কিছু ছিল স্মরণে:
কী পেয়েছি তার কী গাইব গান,
দিয়েছ হায় কহি কেমনে?
না চাহিতে যে গো সকলি মিলিল
অহেতুক প্রেমে দিলে গগনে—
অতীতের দিশাচিহ্ন মুছিলে
নবীন-দিশারি-ছবি বরণে।
ছিল না যাহার কোনো দাবি-দাওয়া
তারে দিলে তব চিরন্তনে,
যা কিছু পেয়েছি সবি প্রিয়,
পাওয়া তব চরণের অনুশরণে।

দিশারি কথাটি বড় সুন্দর। জীবনে প্রতিপদেই তো নানা ডাক আসে, এ টানে এদিকে ও—ওদিকে। এ আদর্শ-সংঘর্ষে কেবল একটি দীপঙ্করের আলোয় তীর্থ-পথের নির্দেশ মেলে—যার নাম দিশারি। উপদেষ্টা মেলে অনেক কিন্তু দিশারি হতে পারেন শুধু জীবনদেবতা যাঁর প্রতিনিধি হয়ে আসেন গুরু পথিকৃৎ। আমার কৈশোরে এসেছিলেন এমনি দিশারি প্রথম—শ্রীরামকৃষ্ণ, তারপর—শ্রীঅরবিন্দ। একজন বীজ বুনে আড়াল থেকে আশীর্বাদ করতেন আর এক-জন এগিয়ে এসে পথে বাতি ধরতেন নানা সংকটের দুর্লগ্নে, অন্ধকারের নিরাশায়। ভাবে পথচলার পাথেয় হয়ে। তাঁকে পাওয়ার পরে আর কোনো দাতার কাছেই যে কিছু পাইনি এমন কথা বলব না। পেয়েছি অনেক কবি মনীষী দ্রষ্টা সাধু সন্তের কাছেই। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন কাউকেই দেখতে পাই নি যাঁকে বসাতে পারি আমার হৃদয়-মন্দিরের শেষ আসনে। এমন কথা বলি না যে. শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে সব সময়েই অটল আশ্বাস পেয়েছিলাম। আমাদের মন চঞ্চল, দোলায়মান, কখনো কখনো তাঁর অন্তরালবিকাসে ক্ষুব্ধ হয়েছি বৈকি। বার-বার শান্তির ঘূর্ণিপাকে হাঁপিয়ে উঠে চেয়েছি তাঁকে ছেড়ে আর কোথাও যেতে। কিন্তু কখনো এমন মনে হয়নি যে, আর কাউকে আমার গুরু বলে বরণ করে বলতে পারি: ত্বমেকো গতিমে ত্বমেকো গতিঃ—শুধু তুমিই আমার গতি অগতির গতি আর কেউ নয়। আমার সব আশা আকাঙ্ক্ষা তৃষা অভীপ্সা জল্পনা কল্পনা তাঁকে কেন্দ্র করেই প্রদক্ষিণ করত, যেমন পজারী গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। বারবার সংশয় এসে আমাকে অশান্ত করেছে, উদভ্রান্ত করেছে, বারবারই মনে করে যিনি সংকটলগ্নেও আড়ালে থাকেন—কাছে এসে বলেন না: 'অয়মহং ভোঃ'—এই যে আমি! আমার মনে হয়নি কোনো-দিনই যে, আদর্শ গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ এভাবে গড়ে উঠতে পারে। আমার কৈশোরে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজির আদানপ্রদানের অপরূপ দৃশ্যে। চেয়েছিলাম এমনি গুরুই বটে। কিন্তু মানুষ যা চায় তার ষোলো আনা পেলে যে সে তীর্থপথের নির্দেশ পেয়ে প্রাণসাধনায় কৃতকৃত্য হতে পারে না একথা আর মনে ঠাঁই পায় নি যখন দিনের পর দিন শ্রীঅরবিন্দের কাছে পেতাম যা চেয়েছিলাম সর্বান্তঃকরণে —কখনো তাঁর নানা লেখায়, কখনো তাঁর চিঠিতে কখনো তাঁর কথালাপে।* কিন্তু পণ্ডিচেরিতে তাঁকে যেভাবে অন্তরে পেয়ে-

---

* কথালাপ তাঁর সঙ্গে আমার হয়েছিল তিনবার—তীর্থঙ্কর ও Among the Great দ্রষ্টব্য। কিন্তু এছাড়া একবার তাঁর সামনে বসে তাঁকে গান শুনিয়ে যেতে উঠে-ছিলাম—আর একবার যখন তিনি আমার অর্ঘ্য নিয়ে আমাকে এসে আশীর্বাদ করে-ছিলেন গভীর স্নেহে।

আর্থিক প্রসঙ্গ

যৌনশিক্ষার অর্থনীতি—(১)

গুরু বলে এতদিনে সব জানা গেল।
এই হেতু বৎগণ দুর্বল হইল।।'
ছেলেবেলায় পড়া উপমন্যুর কাহিনী, রণ না মহাভারত কিংবা কোন পুরাণ উদ্ধৃত মনে নেই। তবে সূত্রের প্রসঙ্গ তর। কাহিনীটাই আসল। উপমন্যুর ন্তিকতা পরীক্ষা করবার জন্যে শিক্ষ- তাঁকে প্রত্যহই অভুক্ত অবস্থায় গরু ার ভার দিতেন। কিছুদিন পরে গুরু করলেন উপমন্যু দিন দিন কৃশকায় াম পরিবর্তে হৃষ্টপুষ্টই হচ্ছে। াসা করলেন : কি ব্যাপার? উপমন্যু দিলেন :

'গাভীর দোহনান্তে পিয়ে বৎসগণ।
পশ্চাতে আমি যে ভুঞ্জি করিয়া দোহন।।'

অর্থাৎ আশ্রমের জন্যে দুধ-দোয়া র পর বাছুরগুলোকে পান করতে া হয়। তাদের উদরপূর্তি হয়ে গেলেও ষ্ট দুধ অবশিষ্ট থাকে। আমি তখনই ার দোহন করে পান করি।

শুনে গুরু কপট কোপনতার সঙ্গে লেন : বটে বটে! এতদিনে বুঝতে পার- দিন দিন গো-বৎসগুলো দুর্বল হচ্ছে।

গুরু উপমন্যুর ক্ষেত্রে ঐ ধরণের কোন টা পদ্ধতি অনুমান করে থাকবেন। তরাং জ্ঞানোদয়ের ফলে তিনি মোটেই সন্ত হন নি। আমার বেলায় আমি কিন্তু াছিলাম। সেই আখ্যানেরই অবতারণা ছি।

গৌরচন্দ্রিকা :

এমন অনেক সময় হয় না কি যে অন্ধ- র হাতড়ে বেড়াচ্ছি অথচ বাইরে অনেক লো—শুধু জানালাটা খোলার অপেক্ষা। রপর সবকিছুই স্পষ্ট প্রতীয়মান—জানা- জানার মধ্যে আর কোন ব্যবধান নেই। নেছি অতীন্দ্রিয়বাদীদের বেলায় নাকি এই মই ঘটে—সৃষ্টির দুর্জ্ঞের রহস্যের দ্বার ক মুহূর্তেই নাকি খুলে যায়। আমারও ই হয়েছিল। পটভূমি দিয়েই বিবরণ শুরু রি।

পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার র্তমান (১৯৭৪ সাল থেকে প্রবর্তিত) পাঠ্য- ম জীববিজ্ঞান বা লাইফ সায়েন্স আবশ্যিক করা হয়েছে। কারণটা ঠিক না বোঝার জন্যে ব্যবস্থাটি মোটেই আমার মনঃপূত হয় নি। এ যুগের মানুষ হলেও বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব বলেই হোক অন্য কোন কারণেই হোক, সব রকমের পরিবর্তনকে আমি সহজে মেনে নিতে পারি না। মোটকথা, সাধারণ মাপ- কাঠিতে আমি বোধহয় একটু রক্ষণশীল বা সেকেলে। তাই পূর্বতন উচ্চ মাধ্যমিক বা একাদশ-শ্রেণীর শিক্ষা-ব্যবস্থার বেলাতেও স্কুলে জীববিজ্ঞান পড়ানো আমি ঠিক যুক্তি- যুক্ত বলে মনে করিনি। তখন অবশ্য স্কুলে জীববিজ্ঞান ছিল ঐচ্ছিক—বিজ্ঞানে ধারার ছাত্রছাত্রীদের জন্যেও ঐচ্ছিক। এর ওপর বর্ত- মানের প্রকারভেদবিহীন মাধ্যমিক শিক্ষা- ব্যবস্থায় জীববিজ্ঞানকে যখন আবশ্যিক করা হল তখন এই নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তকদের মতিগতি ঠিক না বুঝতে পেরে অন্তত কিছুটা অস্বস্তি যে ভোগ করেছিলাম তাতে কোন সন্দেহই নেই। মতিগতি বোঝবার পর অস্বস্তির স্থলাভিষিক্ত হয়েছে সন্দেহ। আজকের সমীক্ষার তারই কিছুটা আলোচনা করব।

অনেকেই হয়ত জানেন না—আমারও জানা ছিল না—কলকাতায় জীববিজ্ঞান কেন্দ্র বা 'লাইফ সায়েন্স সেন্টার' বলে একটি সংস্থা আছে। এই সংস্থার পক্ষ থেকে গত মাসে একটি সেমিনার বা সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বিজ্ঞান কলেজ ভবনে। অন্যান্যের মধ্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য জীববিজ্ঞানের ওপর পাঠ্যপুস্তক প্রণেতাদের এবং ঐসব পুস্তকের প্রকাশক দের।

ঐ সেমিনার বা সম্মেলনে আহ্বায়ক- গণের মধ্যে একজনের উদ্বোধনী ভাষণ নাকি ছিল এই ধরনের : ...আপনাদের অনেকেই জীববিজ্ঞানের ওপর পাঠ্য- পুস্তকের লেখক এবং প্রকাশক—যেসব পুস্তক আপনারা মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদে

অনুমোদনের জন্যে জমা দিয়েছেন। ইতি-মধ্যেই ঐসব পাঠ্যপুস্তকের প্রাথমিক বিচার করা হয়েছে। দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, কোন লেখকই জীব-বিজ্ঞানকে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ ঠিক ধরতে পারেননি। এই জন্যে এইখানে উপস্থিত একজন নাকি অসহিষ্ণু হয়ে দাবি করেন: ঐ যে কারণের কথা বললেন, সেটা আগে ব্যাখ্যা করবেন কি?...

ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, তবে কিছুটা পরে এবং ব্যাখ্যাটা ছিল মোটামুটি এই রকমের: ভারতের তথা পৃথিবীর জন-সংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে খাদ্য ও জীবনধারণের অন্যান্য উপকরণে বিশেষ ঘাটতি দেখা দিয়েছে—অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আর বর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। সুতরাং প্রয়োজন জনসংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের। এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে বিদ্যালয়ে যৌন-শিক্ষা নীতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। এবং জীববিজ্ঞানের মাধ্যমেই এই শিক্ষাদান করা হবে।...

এই সময় শ্রোতাদের মধ্যে একজন নাকি বলে ওঠেন: তাহলে জীববিজ্ঞান পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত উদ্দেশ্য হল যাকে বলে ফেমিলি প্ল্যানিং। তা গোড়াতে খুলে বললেই পারতেন, আমরাও অন্যভাবে বই লিখতাম। যা হোক ব্যাপারটা বোঝা গেল।

শুধু বক্তা ভদ্রলোক নয়, অন্যান্যরাও ব্যাপারটা বুঝলেন। আর আমরা যারা পরম্পরায় সেমিনারের বিবরণটি শুনেছিলাম তারাও। বোঝার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে কিন্তু উল্লিখিত সন্দেহের সূত্রপাত হল: বিদ্যালয়ে যৌনশিক্ষা দান কি জনসংখ্যা-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের প্রকৃষ্ট পথ অন্তত আমাদের মত দেশে? পটভূমি একটু বিস্তার করে ব্যাপারটির আলোচনা করা যেতে পারে।

পটভূমি :

বিদ্যালয়ে যৌনশিক্ষাদান ব্যবস্থা অনেক দেশেই প্রবর্তিত হয়েছে। এ-ব্যাপারে কিন্তু অগ্রণী হল সুইডেন সেখানে ৫ বছর বয়স থেকে ছেলেমেয়েদের স্কুলে যৌনশিক্ষা দেওয়া হয় এবং ১৫ বছর বয়সে তারা ঐ শিক্ষা একরকম শেষ করে ফেলে। (অবশ্য শিক্ষার শেষ আছে বলে যদি ধরে নেওয়া যায়)। গর্ভপাত উচিত কিনা, এর পদ্ধতি কি কি এবং কোনটি শ্রেয়, যৌনব্যাধি এড়াবার পথ কি—বয়ঃসন্ধির আগেই এসব ব্যাপারে ঐ দেশের ছেলেমেয়েরা মোটামুটি ওয়াকি-বহাল হয়ে ওঠে। তাছাড়া পথে বেরিয়েই তাদের নজরে পোস্টার পড়ে: 'আজ রাত্রে ৩৭১ নারী গর্ভবতী হতে চলেছেন যাঁদের মধ্যে অন্তত ৭১ জন গর্ভপাত ঘটাতে চাইবেন। অর্থাৎ প্রতি ৫টির মধ্যে একটি গর্ভসঞ্চার সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত। অতএব অকাম্য জন্ম রোধ করুন। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের ব্যঞ্জন-বর্ণের 'র' শেখানো হয় রসোগোল্লা বা ঐ ধরনের কিছুর উল্লেখ করে, সুইডেনে ব্যঞ্জনবর্ণ 'আর' হোল 'রিপ্রোডাকসনে' শব্দের বাহক। 'কনডোম' 'পিল' 'সেফ পিরিয়ড' ইত্যাদি শব্দ বা শব্দসমষ্টির বাছবিচারহীন ব্যবহারে সুইডিসদের কোন আপত্তি নেই—ছেলেমেয়েদের সামনে বাপ-মায়ের বা বাপ-মায়ের সামনে ছেলে-মেয়েদেরও নয়। বরং এ-ব্যাপারে ছেলে-মেয়েরাই বেশী এগিয়ে গেছে।

এই রকম পূর্ণাঙ্গ যৌনশিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে সুইডেনে জনসংখ্যা গত ১৪ বছরে (১৯৬০—৭৪) বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৮ শতাংশ। তুলনায় আমাদের জন-বহুল দেশে পূর্ববর্তী দশকে (১৯৬১—৭১) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২৪-৮ শতাংশ। সুইডেনে অবশ্য যৌন-শিক্ষাদান-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য আরও ব্যাপকতর—যৌন-জীবন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা বিস্তারের মাধ্যমে জাতির গুণগত মান—কোয়ালিটি অব দি নেশান—উন্নয়ন। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দম্পতিকে সন্তান-সন্ততির সংখ্যা নির্দিষ্ট করা ছাড়াও তাদের মধ্যে পর্যাপ্ত ব্যবধান বা স্পেইসিং বজায় রাখতে শিক্ষা দেওয়া হয়। কোন দম্পতির সন্তান-সন্ততি 'প্রপারলি স্পেইসড' হলে তা অভি-নন্দনের যোগ্য বিবেচিত হয়। বিদ্যালয় থেকে বালক-বালিকাদের মাথায় এই ধারণাটি ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা যৌন-শিক্ষার পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এই ঢেউ গিয়ে পৌঁছেছে। সেখানে সকল রাজ্যে (স্টেটস) বিদ্যালয়ে যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা এখনও করা হয়নি সত্য কিন্তু এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বে-সরকারী সংঘ গড়ে উঠেছে। আটলান্টায় কোন পরিবারের সন্তান-সন্ততি সংখ্যা পাঁচ অতিক্রম করলেই পরবর্তী সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ দম্পতি ভৌতিক টেলিফোন কলে অকাম্য ভাষায় তিরস্কারের আশঙ্কা করে থাকেন। ম্যানহাটানে একটি যুব সংঘ গড়ে উঠেছে—যার কাজ হলো বছরের মধ্যে যাঁরা জনক-জননী না হন (নন-পেনরেন্টস অফ দ্য ইয়ার) তাঁদের সম্মানিত করা। অষ্টম সন্তানের জননী হওয়ার পর স্যাক্রিমনের এক ভদ্রমহিলাকে ফোনে এক-জন বিদ্বেষ প্রকাশ করে: আপনার ব্যাপারটা কি? আপনার ছেলেমেয়েরা কত জায়গা জুড়ে আছে আর কতটা অক্সি-জেন শেষ করছে তা ভেবে দেখছেন কি? যা হোক যারা এসে গেছে তাদের ভাল করে শিক্ষার ব্যবস্থা করুন—শেখান তারা যেন আবার প্রত্যেকে এক ডজন করে ছেলেমেয়ে এনে না ফেলে। এমনেই ত' বায়ু দূষিত হচ্ছে, কাঁচামাল কমে যাচ্ছে...

এই অবস্থায় ভদ্রমহিলা রিসিভারটি রেখে দিয়েছিলেন।

সিঙ্গাপুরেও নাকি বিদ্যালয়ে যৌন-শিক্ষা শুরু হয়ে গেছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আছে অন্যান্য ব্যবস্থা। সে-আলোচনায় আসছি পরে।

ব্যাপারটা হল যে আন্তর্জাতিক পরি-কল্পিত পিতৃমাতৃত্ব সংঘের (ইন্টার-ন্যাশনাল প্ল্যান্ড পেরেন্টহুড ফেডারেশান বা সংক্ষেপে আই পি পি এফ) মতে, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াং-শেরও জন্মনিরোধ পদ্ধতি বা কনট্রাসেপ-শান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা নেই, অথচ যারা জন্মনিরোধের পক্ষপাতী যা প্রয়োজন-মত ঐ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ফল দাঁড়িয়েছে যে গড়ে এক-তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে গর্ভপাতের পন্থা অব-লম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। বিদ্যালয়ে যৌনশিক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তা নাকি মূলতঃ এইখানেই। অবশ্য অর্থনীতির প্রশ্নও আছে, বিশেষ করে আমাদের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে যেখানে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার ২-৫ শতাংশের মত আর সম্প্রসারণ-হার সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। কারণ, বৃষ্টি-পাতের মত দৈব এবং তেলের দাম ইত্যাদি আন্তর্জাতিক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল বলে।

আমাদের অবস্থা :

আমাদের দেশে বছরে ১ কোটি ২০ লক্ষের মত লোক প্রতি বছরে জনসংখ্যার সঙ্গে যোগ হচ্ছে—যা সমগ্র অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার সমান। অথচ আমরা গোড়া থেকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনায় কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। এই অবস্থায় নতুন কিছু জোরালো কিছু অবশ্যই করা দরকার। কিন্তু বিদ্যালয়ে যৌনশিক্ষাই কি নতুন—জোরালো ব্যবস্থা? এই প্রসঙ্গেরই আলোচনা করব পরবর্তী সংখ্যায়, বর্তমানে উপক্রমণিকা সমাপ্ত করে রাখলাম মাত্র।

১৯-৯-৭৪

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

বনবাস । সুনির্মল ঘোষ

বাস থেকে নামতেই শবরীর চোখে পড়ল এক মানুষ, বেশ একটু লম্বা, হাওয়ায় উড়ছে মাথার চুল, অবিকল হেঁটে যাচ্ছে বুলনের মত।

বুলনের কথা মনে পড়তেই বুকের ভেতর কেমন এক নিষিদ্ধ ঘুঙুর ফেটে পড়ল ঝনঝন করে, আস্তে আস্তে মানুষটার পিছন পিছন হাঁটতে লাগল শবরী, ঘোর লাগা মানুষের মত কার্জন পার্কের ধার দিয়ে হাঁটতে লাগল সে। মানুষটা দাঁড়াল, পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে ধরাল। তারপর সোজা রাস্তা পার হয়ে ইডেনের দিকে চলতে শুরু করল, শবরীও হঠাৎ শবরীর কলকাতাকে ভীষণ ভাল লাগল, এই কলকাতা বহু দিনের স্মৃতিকে আবার দেখিয়ে দিতে পারে। শবরী চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল, নীল আকাশে শুধু সূর্যের আলো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। শৈশবের গল্পের মত নিঃসঙ্গ আকাশ। আর একটু পরে সন্ধ্যে হলেই সূর্য ডুবে যাবে। শবরীর হাঁটতে ভীষণ ভাল লাগছে। সে মনে করে দেখল এই ভাবে হাঁটলে আজ হয়ত তার আর মেট্রোর লাভ প্যারেডের টিকিট কেনা হবে না। না হোক, সে বুলনকে দেখেছে। তার স্বপ্ন, তার স্মৃতি চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে অবিকল বুলনের মত। এইভাবে সে অনন্তকাল হাঁটতে পারে পৃথিবীর বুকে। হাঁটতে হাঁটতেই শবরীর চোখের সামনে ফুটে উঠল এক আশ্চর্য আলো, আলোর চারপাশ জুড়ে গাছপালা, গাছপালার মধ্যে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে বুলন, অনায়াসে সেই ভঙ্গিতে।

বুলন আপন মনে ডেকে উঠল শবরী। তারপর ফিস-ফিসিয়ে বলল সে, তুমি এখনও এইভাবে ছুটতে পার? এই আশ্চর্য-ভাবে। বুলন, এখন তো আমি আর আগের মত ছুটতে পারি না, এই দেখো আমার পেটের তলার চামড়া কেমন ভারী হয়ে গেছে, আমি কেমন স্মৃতিময় হয়ে গেছি। কেমন স্পন্দহীন রূঢ় বাস্তবের মধ্যে বেঁচে আছি অনায়াসে!

মানুষটা মাঝে মাঝে সিগ্রেট টানছে, আর সোজা হেঁটে যাচ্ছে গঙ্গার দিকে। কি সুন্দর লাগছে বুলনকে। শেষ বিকেলের আলো বড় মোহময় করে তোলে মানুষকে।

শবরীর মনে হল বুলন ছুটে যাচ্ছে। তাকে সে ছুঁয়ে দেয়, ছুঁলেই বুলন ছুটবে অসম্ভব জোরে গাছপালা আর জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে। ছুটবে শবরীও, এক সময়ে ক্লান্ত হয়ে গেলে সে বুলনকে ডাকবে, তার গলার স্বর শুনতে পাবে না বুলন। শুধু জ্যোৎস্নার মধ্যে গড়াগড়ি খেয়ে শবরীর গলার স্বর ছুটে যাবে গাছ-গাছালির এ-প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।

মানুষটার পিছন পিছন হাঁটতে হাঁটতে শবরীর সারা শরীর জুড়ে একটা ঝড়ো হাওয়ার মতো উত্তেজনা জাগল। বেশ ঘাম হয়েছে তার শরীরে। শবরী রুমাল দিয়ে ঘাড় গলা মুছে নিল।

এদিকটায় কেউ নেই, বেশ ফাঁকা। নির্জন। শবরী দেখল আকাশে ফুরিয়ে যাচ্ছে শেষ বিকেলের আলো। একটু পরেই সন্ধ্যে নামবে। ঝলমলে কলকাতায় হাজার হাজার আলোর ঝিলিক উঠবে। শুধু এখানটায় থাকবে আলো আঁধারীর নির্জন ছায়া। ইচ্ছে করলে এখানে বসে সে গঙ্গার উপরের তারা ভরা আকাশও দেখতে পাবে। চারপাশের নিবিড় নিঝুমতা শবরীর শরীর জুড়ে হাতছানি দিয়ে উঠল, গা ছম ছম করল তার। তবু কি যে আকর্ষণ।

মানুষটা একটা বেঞ্চির উপর বসে পড়ল। অস্বস্তি লাগল শবরীর। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে শবরী ভাবতে লাগল। কি করে সে বুঝবে এই তার বুলন। এই মানুষ যদি বুলন না হয়। না-না বুলনকে তার ভুল হতে পারে না। বুলনকেই তো সে তার স্বপ্ন করে রেখেছে। মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লে সে তো স্মৃতি থেকে বুলনকেই কাছে ডাকে।

শবরী ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটুও চিনতে ভুল হয় নি শবরীর। প্রথমে তার পাটা একটু টলে গেল। গলার ভিতর যেন বহুকালের ব্যর্থতার কান্না, তবু সে শৈশবের মত চেঁচিয়ে উঠল বুলন-দা।

ভদ্রলোক মাথা তুলে তাকালেন, শবরীকে দেখতে পেলেন তিনি। ফুল হাতা চিকনের সাদা ব্লাউজ টুকটুকে তুঁতে নীল শাড়ি। কপালে পাঁচমেশালী টিপ, রেয়াল কালার লিপস্টিক ঠোঁটে। সমস্ত মাথাটা তার টলে গেল। আকীর্ণ স্মৃতির ভিতর খুঁজতে থাকল এই মুখ। সে ভাল করে শবরীকে দেখতে চেষ্টা করল। গভীর এই চোখ তার যেন পরিচিত। অস্পষ্ট ছায়াছবির মত দ্রুত সরে যাচ্ছিল অনেক স্মৃতি। পাগলের মত মুখ ডুবিয়ে দেখতে থাকল সে।

শবরী হাসল। চিনতে পারছ না বুলন-দা। তোমরা পুরুষ মানুষেরা ভীষণ ভুলে যাও।

তার মাথার ভিতর বিদ্যুতের মত খেলে গেল। এলোমেলো সাজানো এই দাঁত কোথায় যেন সে দেখেছে। স্মৃতিগুলো তার কাছে এসেও ছিলো বলে লম্বা হিজলের সারির মধ্যে ছুটে চলে যাচ্ছে যেন, কি করবে সে এখন। তার শরীরে না পাওয়ার বেদনাটা আবার শিরশির করে উঠল। ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে নানুঠাকুমার টিনের ঘরে বসে যাকে চুমু খেয়েছিল, সে কি এই? না সে তো ভাস্বতী। তার দাঁতগুলি একটু বড় ছিল। চোখটাও একটু বড়। তবে—তবে কি সেই যাকে রঙীন মাছ ধরে দেবে বলে সারাদিন জলে ডুবিয়েছিল। তারপর সাত দিন জ্বরে ভুগেছিল, এ কি সেই? না তার নাম তো কবরী।

শবরী দেখল বুলনদার সেই অবিকল করুণ চোখ। মুখের উপর গোঁফটা এখন বেশ পুরু। মুখের উপর কয়েক দিনের না কামানো দাড়ি। এখনও অবিকল সেই ছোটবেলাকার বুলনদা।

—এই বুলনদা।

—উম্।

—চিনতে পারছ না?

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল বুলন। না তোমায় চিনতে পারছি না।

—আমি কবরী।

শবরী দেখল বুলনদার দৃষ্টির মধ্যে হারিয়ে গেল শেষ বিকেল। সারা মুখ জুড়ে নেমে এল সন্ধ্যার নিঝুমতা।

—তুমি কবরী! ভালভাবে দেখতে চেষ্টা করল বুলন কি যেন একটু ভাবল সে তারপর আবার বলল, তুমি কবরী তা তোমার সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন?

মাথা নীচু করে শবরী বলল সে অনেক কথা।

মনে মনে ভয় পেল শবরী। কেমন এক সাংঘাতিক মিথ্যে বলল সে নিজেকেও কেমন গোপন করে নিল, কিন্তু [illegible]? বুলনদার একটু সুখের জন্য। [illegible]র নাম শুনলে বুলনদা কি সত্যিই [illegible]শী হবে: বরং পুরোনো স্মৃতি [illegible] আহত করবে তাকে। হয়ত ঘৃণায় তার সাথে কথা না বলে চলে যেতেও পারে।

বরং সে যদি বলত সে শবরী তাহলে হয়ত বুলনদা অনেক খুশী হত। শবরীর চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই দুরন্ত নদীর মত ছেলেবেলা। বুলনদার হাত ধরে ছুটতে ছুটতে কত দূর এসে পড়েছিল সে। সারা আকাশ জুড়ে তখন মেঘ, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল জারুলের বনে। চারদিক জুড়ে শুধু জারুলের গাছ। মাঝে আঁকা বাঁকা সরু পথ। তাও কোথাও কোথাও থেমে গেছে গাছের শিকড়ে। সমস্ত বন জুড়ে সে আর বুলনদা। দুজনে বৃষ্টির মধ্যে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে লাগল। মা বাবা বাড়ীর কথা এমনকি তার প্রিয় চন্দনা পাখিটার কথাও ভুলে গিয়েছিল শবরী। অস্ফুটে বলেছিল, বুলনদা, যদি পথ হারিয়ে ফেলি?

—তবে এখানেই থেকে যাব চিরকাল। এম্নি করে বনের মধ্যে বনবাসী হয়ে যাব, দুজনে। গভীরভাবে শবরীর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলেছিল বুলন।

—বুলনদা আমার ভয় করছে।

—কিসের ভয়? বুলনের শরীর থেকে যেন উঠে আসছিল বৃষ্টির ঘ্রাণ, কি আপন আর নিজস্ব সে ঘ্রাণ, শবরীর শরীর অবশ হয়ে আসছিল কেমন ঝিমঝিম করছিল।

শবরী বলল, কি জানি, তারপর বুলনের চোখের দিকে তাকাল সে। আস্তে আস্তে বলল, আমার ভয় করছে বুলনদা।

বুলন একভাবে চেয়েছিল শবরীর দিকে। তুমি কবরী, ঠিক বলছ তো? জান কবরী

মনে করতে পারি না।

—তুমি কি কবরীকেও মনে করতে পারছ না বুলনদা?

একটুক্ষণ চুপ করে থাকল বুলন। তার শরীরে কেমন নির্জীবতা। পুরোনো কিছু স্মৃতি কিছু সংসর্গে তার মাথাটায় ঝিম ধরে যাচ্ছে। সে কপালের রগ টিপে নিঃসঙ্গতা অনুভব করতে চাইছিল। সে জানে এখন এসব কিছু ভাবতে গেলেই কেমন সব স্মৃতি-গুলি এ রকম পোষাক পরে আদিগন্ত মাঠে এসে দাঁড়ায়। সে ঠিক তাদের কাউকেই আলাদা করে চিনতে পারে না।

শবরী বুঝল। বুলনদা ঠিক প্রকৃতিস্থ নেই, কোথায় যেন গোলমাল ঘটে গেছে। ভীষণ কষ্ট হল বুলনদার জন্য।

—বুলনদা, শবরী ডাকল।

অদ্ভুত অন্তরঙ্গ স্মৃতিময় দৃষ্টি নিয়ে তাকাল বুলন।

বুলনদা, তোমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে?

পুরোনো দিনে ফিরে যাচ্ছিল বুলন: উদাসীর মত চোখ তুলল। রাস্তায় আলো, গাড়ী মানুষজন ক্রমে কমে আসছে। নিভৃত আকাশের মত ফাঁকা গলায় বলল সে, কবরী, আমার সব মনে পড়ে না। সে তো ছেলেবেলার কথা। তবে একটা কথা ভীষণ মনে পড়ে। সেই যে তিতির পাখি। মনে পড়ছে তোমার।

শবরী ভাষাহীন দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

—তুমি, আমি, শবরী, ভোটন বাবলা, গোবিন শ্রাবণী সেই খালের ধারে বসে খেল-ছিলাম। শেষ হয়ে আসছিল বিকেল। লম্বা জারুলের ছায়া নেমে আসছিল খালের বুকে। পথ জুড়ে লুটিয়ে পড়েছিল সে আলো। হঠাৎ গোবিন আমাকে একটা জারুল গাছে তিতিরের বাসা দেখাল। ওরা সবাই বলল তিতিরের ডিম সাদা। আমি বললাম নীল। বাজি হল। বিশাল গাছ, তাই উঠতে পারলাম না। তারপর ঠিক হলো গুলতি দিয়ে বাসা ভেঙে দেখব। গুলতি ছুঁড়লাম আমি। টিপগুলি লাগল তিতির জননীর বুকে। ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ল। গাছ থেকে রাস্তায় ঘুরে পড়ল তিতির জননী। আর পুরুষ তিতিরটা অনেকক্ষণ উড়ল এধার ওধার। কি ডাক! বনের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠছিল সে ডাক। সবাই বলল তিতিরটা কাঁদছে। তুমি বললে দারুণ টিপ তো তোমার, আর শবরী এসে আমাকে প্রশ্ন করলে, একটা পাখির স্বপ্ন ভাঙার অধিকার তোমাকে কে দিল? বলেই কাঁদতে কাঁদতে জারুলের বনে লাগালো লম্বা ছুট, তারপরে শবরীর জ্বর হল। জ্বর সারল সাতদিন পর। শবরী আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিলো। বিশ্বাস কর কবরী। আমি জারুলের বনে বনে ঘুরে ঘুরে ক্ষমা চেয়েছি। তিতিরকে তো পাইনি। তাই নদীর কাছে ক্ষমা চেয়েছি। নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষে চেয়েছি। বলতে বলতে বুলনের গলার স্বর ক্রমে খাদের দিকে নেমে যাচ্ছিল।

শবরী দেখল বুলনের চোখ জুড়ে জল। ওর ভারি কষ্ট হল। মনে হল সে যেন বুলনদাকে একটা ভীষণ কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তার মনে হল এসব স্মৃতির কথা জিজ্ঞেস না করলেই ভাল হোত।

শবরী তাই কথা ঘোরাতে চেষ্টা করল।

—কতদিন পরে দেখা হোল আমাদের? শবরী জিজ্ঞেস করল।

—কি জানি। একটু থেমে স্মৃতির মত টেনে টেনে বলল, অনেকদিন পরে।

—কোথায় থাক তুমি বুলনদা?

—ঢাকুরিয়ায় ব্রীজের ধারে বিপ্লব-বাবুর মেসে।

শবরী ঢাকুরিয়াই ভাল চেনে না। সে থাকে ইছাপুর নর্থল্যাণ্ডে। মাঝে মাঝে কল-কাতায় আসে। আজ যেমন এসেছিল মেট্রোতে সিনেমার টিকিট কাটতে।

—একদিন তোমার ওখানে নিয়ে যাবে বুলনদা?

—কি হবে। কয়েকটা ছেলে থাকি সেখানে। বুলন মেসের কথা ভেবে দেখল, চারটে ঘর। কেমন হাড়াবাড়ির মত। সামনে ডেকরেটর্সের গুদাম। চারদিক আলোহীন। মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে সে। বাথরুমের জানালায় দাঁড়ালে মাঝে মাঝে একটু আলো দেখতে পায়। বড় ভাল লাগে তখন বুলনের। বাথ-রুমের জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আলো পায় না। প্রায়দিনই পায়খানার প্যানটা জমে থাকে। তার দুর্গন্ধ। এইসব মনে করে তাড়াতাড়ি বলে ফেল বুলন, তুমি এখানে এসো। রোজ আমাকে পাবে। আমি রোজ এখানে অনেক রাত পর্যন্ত থাকি।

শবরী কেমন এক দৃষ্টি নিয়ে বুলনের দিকে তাকাল। বলল, এখানে রোজ আস কেন?

বুলন হাসল। উত্তাপহীন সে হাসি। তারপর পকেট থেকে পেথিডিনের শিশি বার করল। সিরিঞ্জে সূচ পরিয়ে শিশি থেকে বেশ খানিকটা পেথিডেন ভরে নিল। তারপর জামার আস্তিন গুটিয়ে চারদিক দেখতে দেখতে এক সময়ে হাতে বিঁধিয়ে দিল সিরিঞ্জের সূচটা। শবরী দেখল যন্ত্রণায় কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে বুলনের মুখ।

অনেকক্ষণ ঝিম মেরে থাকল বুলন। শবরীও কোন কথা বলতে পারছিল না। এসব সে অন্যের কাছে শুনেছে। গল্প উপন্যাসে পড়েছে, চোখে কখনও দেখেনি। কেমন যেন গা শির শির করে উঠল তার। মাথার ভিতর রক্তের চাপ বাড়তে লাগল। এমন খেলায়

য়গায় গঙ্গার ধারে বসেও তার দমবন্ধ
বন্ধ লাগছিল। ভারী করে শ্বাস টানল
য়েকবার।

বুলন তাকিয়ে দেখল শবরীকে। তারপর
জ্ঞেস করল। কি হল। এমন শ্বাস নিচ্ছ
ন?

—কিছু না। মাথা নাড়ল শবরী।

বুলন পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে
দলাই ঠুকে ধরাল। কয়েকটা টান দিল
পর। শবরীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস
ল, কি ব্যাপার, অত ধারে বসেছ কেন?
ড় যাবে। সরে এস।

শবরী কোন কথা বলল না। একটু সরে
। আকাশে তখন দ্বিতীয়বার চাঁদ।
ঠা মুঠো অজস্র তারা। পায়ের নীচে
নো পথের উপরের কাগজের টুকরো
যাচ্ছে হাওয়ায়।

বুলন ভাবল, মেয়েরা ঠিক নদীর মতো।
র যেমন গতি পাল্টায়, আর যেদিকে চলে
সে, সেদিকেই তার সংসার গড়ে ওঠে।
ফেলে আসা কোন কিছুই যেমন মনে
না, মেয়েরাও ঠিক তেমনি, যখন
কে যায় সেদিকেই মিশে যায়,
কেই তার প্রিয় গাছপালা জন্মে, গাছ-
য় নতুন পাখিদের সমাজ গড়ে ওঠে।

শবরীর ভীষণ কান্না পেল। পৃথিবীর
ীয় ক্রোধ জমা হোল কবরীর জন্য।
মনে ভাবল সারা জীবন কেন সে পরের
খোঁজে, কেন সে বুলনকে কবরীর জন্য
ন করল না। কেন ইচ্ছে হলেও চুরি
ও দেখেনি বুলনদা তার বুলন হলে
লাগে?

শবরীর শরীর জুড়ে নিঃশব্দে কান্নার
াত হচ্ছিল। সে ধরা গলায় বলল,
দা, তুমি এইভাবে নিজেকে শেষ করছ

-কি ভাবে? বুলনের স্বরে কান্না ভিড়
এলো।

-এইসব ছাইপাশ কেন ঢোকাচ্ছ
?

বলবে বুলন। কেন নিচ্ছে সে এসব।
তার সময় কাটাবার উপায়। না
তো তার চারপাশে ভিড় করে আসে
গতা। নিঃসঙ্গতা মৃতের সংগী।
গতা ঘিরে থাকে কবরের চারপাশে।
বরীর দিকে তাকিয়ে ভারী গলায়
বুলন, জীবনটাতে এখন এরকমই
। তারপর পিছনের দিকে তাকিয়ে
বাদাম খাবে কবরী?
না।
কেন?
ভাল লাগছে না। শবরী ভেবে দেখতে
রল ছেলেবেলার সেই বুলনদার
ই বুলনদার কত তফাত। ছোটবেলায়
প্ন দেখতে জানত বুলনদা। কত
াহাড়, নদীর গল্প বলত স্বপ্ন দেখে।
লনদা, তুমি আগের মত স্বপ্ন

বুলন হাসল। শীর্ণ নদীর মত।
তারপর বলল, স্বপ্ন ছাড়া মানুষ কি
বাঁচতে পারে? যারা স্বপ্ন দেখে না তারা
পাগল।

শবরী কোন কথা বলল না। সে
আকাশে দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখছিল। অনেক-
দিন পরে আকাশ দেখছে সে। পিছনে ঘুরে
দেখল, শহীদ মিনারে আলোর মালা।
কিসের যেন উৎসব আছে। গত বছরও
একবার সাজিয়েছিল শহীদ মিনার। আরো
দূরে বিজ্ঞাপনের নানা ঢঙা আলো। কি
ঝলমলানি। বেশ ভাল লাগছিল শবরীর।

শবরীকে কোন কথা বলতে না দেখে
বুলন ভাবল, শবরী হয়ত ভেবেছে সে
এখনও ছোটবেলার মত রঙীন স্বপ্ন দেখে।
তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল সে, আমি কি
স্বপ্ন দেখি জান কবরী।

—কি স্বপ্ন।

—মরুভূমির। কেমন জ্বলে যাচ্ছে চার-
দিক। মাঝে মাঝে রুক্ষ শ্রীহীন কলকাতা
শহরকেও জ্বলে যেতে দেখি।

কোন কথা বলল না শবরী। শবরী
জানে কবরীকে ভীষণ ভালবাসত বুলনদা।
অথচ কবরী ভালবাসতে পারল না। মায়ের
ছোট্ট ধমকে সে দীপংকরকে বিয়ে করল।
দীপংকরকে ঘৃণা করে শবরী। বুলনদা
পাগলের মত ঘোরে শহরময় অথচ কাবেরী
এখন বড় সুখী, তার দুই ছেলেমেয়ের নাম
গাপ্পি আর ডাম্পি। কবরী হেসে
বলেছিল দীপংকরের দেওয়া নাম। কিন্তু
শবরী জানে বুলনদা হলেই এদের নাম
রাখত পরমেশ্বরী কিংবা শ্রাবন্তী। কবরী
এসব চায় নি। সে দীপংকরের মতই স্বামী

চেয়েছিল। তাই সে ভুলে গেছে বুলনদাকে।
আর শবরী যে কবরীর জন্য কোনদিন
বুলনদার হতে পারল না।

একটু চুপ থেকে বুলন আবার বলল,
মাঝে মাঝে স্বপ্নে সেই তিতির-জননীকে
দেখি আর মনে পড়ে শবরীর সেই কথা,
'একদিন তোমার স্বপ্নও ভেঙে যাবে
বুলনদা।"

বুলন হাসল। বলল, কিন্তু আমি তো
এসব চাইনি। আমি চেয়েছিলাম তোমাকে।
তোমাকে পেলে আমি কোথায় চলে
যেতাম। ছোট্ট ঘর, ভাঙা ডিঙ্গার মত, চার-
ধার জুড়ে হিজলের গাছ। হিজল ফুল।
আকাশে মেঘ জমলে ময়ূরের পেখমের মত
পেখম ধরতে তুমি। আকাশে চাঁদ উঠলে
জ্যোৎস্নার বৃষ্টি হয়ে যেত ঘরে।

শবরী বুলনের চোখের দিকে তাকাল।
স্মৃতির মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে বুলন। সিগ্রেট
খেতেও ভুলে গিয়েছে। কোন ফাঁকে সে
সিগেট ধরিয়েছিল, হাতের ফাঁকে পুড়ে
যাচ্ছে জ্বলন্ত সিগ্রেট।

—এসব আমার শরীরে জ্বালা হয়ে
বেঁচে আছে, যন্ত্রণার মত বলে ফেলল
বুলন।

—তাই বুঝি তুমি এসব ছাইপাশ
শরীরে ঢোকাও আর এতে তোমার জ্বালা
কমে বুলনদা।

—জ্বালা না কমলেও কিছু সময়ের
জন্যও ভুলিয়ে দেয়।

—কিছু সময়ের জন্য ভুলে থেকে
লাভ।

—বুলন ভেবে দেখল শবরী কি বোকা।
এইসব কিছু সময়ই তাকে বড় যন্ত্রণা দেয়।

এইগুলিই তার কাছে চিরকাল হয়ে যায়। অফিসে বসে সে এসব ভাববারও সময় পায় না।

শবরী আবার বলল, তুমি বোঝ না এতে তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

—জীবন? শবরীর কথার প্রতিধ্বনি তুলে বুলন হাসল। তারপর বলল, শবরী কেমন আছে?

—ওঃ, এতক্ষণ পড়ে তাকে মনে পড়ল তোমার, শবরী জিজ্ঞেস করল।

বুলন হাসল। একটু ঝুঁকে শবরীর মুখটা দেখল। তারপর বলল, আমি জানি শবরী ভাল আছে। সেই ধবধবে গায়ের রং, একটু এলোমেলো সাজানো দাঁত, থুতনির নীচে শ্রাবণের মেঘের মত কালচে জরুলটা। সব ভাল আছে। আর সেই জরুলে কেউ এখনও ঠোঁট ছোঁয়ায় নি।

—তুমি এসব কি করে জানলে বুলনদা। আমার সাথে তো অনেকদিন দেখা হয় না।

বুলন যেন এসব কিছুই শুনতে পায় নি, এমনভাবে বলল, দেখ নদীর ভিতর জাহাজটা কেমন সুন্দর লাগছে?

শবরী দেখল। তারপর বলল, আচ্ছা ওরা বাইরে আসে না? এই কলকাতা দেখতে?

—কি জানি। আসে বোধহয়। একটু থেমে আবার উদাস গলায় বলল বুলন, বেশ কয়েকদিন পরেই আমি এই জাহাজটাকে দেখছি। কেমন আশ্চর্য ভাই না। এত বড় ভারি জিনিসটা জলের মধ্যে কেমন ভেসে আছে।

শবরী বলল, প্রকৃতির সব কিছুই বড় সুন্দর বুলনদা।

বুলন হাসল। আকাশের দিকে মুখ তুলে চারিদিক ঘুরে ঘুরে কি যেন দেখল বুলনদা। হয়ত তার জীবনের স্বপ্নগুলিকেই বোধহয়। চারিদিক জুড়ে নিঃঝুমতা নেমে আসে। কেমন এক ঔদাসীন্য দোলা খায় তার শরীরে। কবরীকে মনে পড়ে। কবরীকে ভালবাসত সে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবরীর জন্য জমা থাকবে তার ভালবাসা। কবরীও ভালবাসত তাকে। অথচ কি যে হোল, কিছুই সে বুঝতে পারে না। একদিন হঠাৎ দেখল বুলন, কবরীদের বাড়ীতে সানাই বসেছে। কবরীর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে স্যানডোজ কোম্পানীর এক মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভের সাথে। কবরীর বিয়ের দিন ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে জীবনের প্রথম পাপ ঘটিয়েছিল বুলন। একটু একটু করে পুরো এক বোতল মদ খেয়ে বেহুঁশের মত পড়েছিল মাঠে। সকালে জ্ঞান ফিরে দেখেছিল মায়ের থমথমে মুখে অবজ্ঞা আর ঘৃণা। আর সেইদিন প্রথম শুনেছিল সে তার বাবা তাকে খোকন না ডেকে বুলন বলে ডাকল। হু হু করে কান্না পাচ্ছিল তার।

নদীর থেকে উঠে আসছিল জোলো হাওয়া। জাহাজের আলোয় নদীর জলটাকে কোঁচকানো চাদরের মত মনে হচ্ছিল তার। নদীর ওপারে কোনাকুনি বহু দূরে জ্বলছে নিভছে "হাওড়া" বিজ্ঞাপন। হাসি পেল বুলনের। হাতের ঘড়ি দেখল। বেশ রাত হয়েছে।

তারপর শবরীর দিকে ঘুরে বলল। বাড়ী যাবে না? অনেক রাত হয়েছে। তারপর একটু থেমে আবার বলল, তুমি কোথায় থাক এখন?

সে কথার কোন উত্তর দিল না শবরী। একটু ভেবে নিয়ে সে বলল, তোমার সাথে আবার কবে দেখা হবে?

আমি তো রোজই আসি এখানে। যে কোনদিন এলেই দেখা পাবে। একটু ঢোক গিলে সময় নিল বুলন। তারপর আবার বলল, আমি কিন্তু এখানে নেশা করি।

শবরী কোন কথা বলল না। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল সে। বুলনও দাঁড়িয়ে প্যান্টটা ঠিক করে নিল। তারপর দুজনে পাশাপাশি সোজা হাঁটতে লাগল। অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না দুজনে। বুলনের এই নিঃশব্দ সঙ্গ খুব ভাল লাগছিল। মাঝে মাঝে হাঁটতে হাঁটতে তার শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছিল শবরীর দেহে। শবরীর কি হচ্ছিল তা জানে না বুলন। কিন্তু বুলনের শরীর রোমান্টিক হচ্ছিল। যেন অনেকদিন পরে আকাশে মেঘ জমেছে, এমন এক খুশী ছিল বুলনের শরীরে।

গাছ-গাছালিতে ঘেরা ইডেনের পাশ দিয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে এগিয়ে এল বুলন। হঠাৎ সে শবরীকে বলল, ইডেনের ভিতর যে প্যাগোডা আছে, তা দেখেছ কোনদিন।

শবরী ঠিক করতে পারছিল না কি বলবে সে। আসলে সে প্যাগোডা দেখে নি। তবু ঘাড় নেড়ে বলে দিল, হ্যাঁ দেখেছি। তারপর যাতে এ বিষয়ে বুলন আর কথা বাড়াতে না পারে, তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, একটু জোরে হাঁটো বুলনদা।

বুলন তখন দেখছিল দুর্গের মত ইডেন গার্ডেন্স। অন্তত বুলনের এই মুহূর্তে তাই মনে হচ্ছিল। দুর্গের পাশ দিয়ে সে বুক ফুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তার কয়েক বছর আগের স্মৃতি নিয়ে। শবরীকে দেখতেও বেশ সুন্দর। সে আড় চোখে আর একবার দেখল শবরীকে।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকক্ষণ কথা বলেনি তারা। এক সময় বুলন বলল, আমার আর কিছু ভাল লাগে না। আমি ভীষণ একা হয়ে গেছি। শুধু একটা সাধ আছে আমার জীবনে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল বুলন। যেন বুক ঠেলে বেরিয়ে এল সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

—কি বুলনদা! আগ্রহের সুর ফুটে উঠল শবরীর গলায়।

—সেই আমার ঘর, হিজলের গাছ দিয়ে ঘেরা। সামনে ছোট্ট উঠোন। খুব জ্যোৎস্না এক বনে আমি বনবাসী হয়ে যেতে চাই।

বুলনের কণ্ঠস্বর কেমন ভাঙ্গা ভাঙ্গা শোনাল শবরীর কাছে। শবরী দেখল বুলন অন্যমনস্কের মত হাঁটছে তার পাশে পাশে। শবরী দেখল কার্জন পার্কের পাশে তারা। একটু পরেই দুজনে দু দিকে চলে যাবে। তাই সে কিছু বলে নিতে চায়। তাই বলল, আর, আর কিছু চাও না তুমি।

—চাই ক্ষমা।

—কার কাছে?

—সেই শৈশবের তিতির-জননীর কাছে।

—কেন বুলনদা! শবরীর কণ্ঠস্বর কার্জন পার্ক ঘুরে হাঁপাতে হাঁপাতে আবার যেন কাছে ফিরে এল!

—আমার স্বপ্নকে ফিরে পেতে চাই। বুলন বলল, আমার যে বড় সখ সেই হিজলের বনে জ্যোৎস্নার উঠোন। তিতির জননীর অভিশাপে তা হয় না, তাই আমি ক্ষমা পেতে চাই তার কাছে।

শবরীর মনে হল অনেক দুঃখ জমে বুলনের বুকের মধ্যে পাহাড় হয়ে গেছে, তার ধস নেমেছে যেন। যে কোন সময়ে কেঁদে ফেলতে পারে বুলনদা।

সে বলল, আর কিছু চাও না তুমি!

চাই, বুলন বলল।

—কি বুলনদা।

—আর জ্যোৎস্নার উঠোনে বসে তাকে মনে করতে চাই।

—কাকে? শবরীর কণ্ঠস্বর নিশ্বাসের মত মনে হল।

—যার মুখ মনে পড়ে না আমার।

—মুখ মনে পড়লে?

—নতুন করে আবার তার সংগে ভালবাসা শুরু করব। তার ভালবাসা পেলে আমি জানি আমার আর বনবাস থাকবে না। আমি রাজা হয়ে যাবো।

—কে সে? ঘনিষ্ঠ গাঢ় গলায় দ্রুত নিশ্বাসের মত বলল শবরী।

একটু ছুটে চলন্তি বাসে পা রাখল বুলন। তারপর ঝুঁকে বলল, শবরীকে। শবরীকে পেলে আবার নতুন করে ভালবাসা শুরু করতাম।

ক্ষিপ্ত গলায় শবরী চিৎকার করল, বুলনদা!

রাতের বাস তখন একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে এগিয়ে গেছে অনেক দূরে, শবরীর মাথাটা ঘুরে গেল। চোখের সামনে আস্তে আস্তে নিবে গেল কলকাতার সব নিয়ন বাতি। দেখল তার চারপাশে গভীর অরণ্য, কি বিশাল উঁচু উঁচু গাছ! একা বনবাসী হয়ে যাচ্ছে শবরী। সে ভাবল, কেন বলল না সেই শবরী। তাকে চিনতে পেরেছে বুলনদা? কি জানি, তার চোখের সামনে টা টা করে হাসতে হাসতে উড়ে গেল সেই দুঃখী তিতির। বনবাসে একা বনবাসী হয়ে গেল শবরী।

রূপসীর খাতা

আবার আমরা মুখের ত্বকের যত্ন ও মুখের গঠনের সঙ্গে মিল রেখে সাজ-সজ্জার বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করব

এর আগে বলেছি, মুখে খুব তাড়াতাড়ি বয়সের রেখা পড়ে। তার কারণ মুখ সবচেয়ে বেশী আবহাওয়ার নিচে এবং রোদজলের মাঝে খোলা থাকে। দ্বিতীয়তঃ মানুষের মনের প্রতিবিম্ব মুখের পর্দাতেই পড়ে বেশী। তাই দুশ্চিন্তার রেখা, দুশ্চিন্তার কালি চোখের নিচে, গালের ভাঁজে বয়সের ছাপ সবই ধীরে ধীরে মুখের কমনীয়তা নষ্ট করে শুষ্ক কঠিন ছাপ আনে। এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এগুলো আরো বেড়েই চলে। এর ফলে চেহারা খারাপ হয়ে যায়। এমনও দেখা যায় পেটের গোলমাল বা লিভার খারাপ ইত্যাদির কারণেও চোখের নিচে গভীর কালো দাগ দেখা দেয় এবং অনেক সময় মুখের চামড়ার ওপর জলীয় ভাব না থাকায় শুষ্ক ও রুক্ষ দেখায়।

কিভাবে মুখের ত্বকের যত্ন নেওয়া যায়, তার মোটামুটি একটা আলোচনা আমি আগে বলেছি। এবারে আরও কিছু জানার না জানলে ও সেই মত যত্ন করলে খুব সুফল পাওয়া যায়। আমি আগেই জানিয়েছি যে, আমাদের মুখের ত্বক প্রধানতঃ তিন রকমের। ১) শুষ্ক, ২) তেলতেলে ও ৩) সাধারণ। খুব শুকনো চামড়ায় মুখের কমনীয়তা নষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, মুখে নানা রকমের দাগ ও ব্রণ হয়। তবে সাধারণতঃ ব্রণ বা গোটা ইত্যাদি হওয়ার প্রধান কারণ পেটের গোলমাল। দ্বিতীয়তঃ সময় সময় শীত-কালে, বিশেষ করে ময়লা জমে জমে লোমকূপের মুখ বন্ধ হয়ে যায় ফলে দাগ বা গোটা হয়। এছাড়াও আর একটা কারণ হল শরীরের প্রকৃতিগত যে তেল বের হয়, সেই তেল লোমকূপের মুখে জমে যায়—বাইরের আলো হাওয়া ও রোদের স্পর্শে—। ফলে দাগ হয়। এর জন্যে আগে যেমন বলেছি, ঠিক তেমনি করে গরম ভাপ নিতে হবে। তাতে মুখে ঘামের মতন হয়ে জল বেরিয়ে আসে ও তারপর ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলতে হয়। এইভাবে অন্ততঃ সপ্তাহে একবার মুখের যত্ন নেওয়া দরকার। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে মুখের ওপর একটা ঘরে তৈরি প্রলেপ দেওয়া উচিত। এটা লোমকূপগুলিকে খুলে পরিষ্কারও করবে আবার সেই সঙ্গে লোমকূপের মুখ বন্ধ করে মুখকে সজীব ও চকচকে রাখবে। প্রলেপটা এরকম হতে পারে।—শুকনো চামড়া যাঁদের, তাঁরা সপ্তাহে একবার করে (গ্রীষ্মকালে) অলিভ তেলের সঙ্গে ডিমের কুসুম ফেটিয়ে সেটা মুখে অন্ততঃ মিনিট পনেরোর জন্য মাখিয়ে রাখবেন, তারপর ঠাণ্ডা জলে বেশ করে মুখটা ধুয়ে ফেলবেন। এর পর ভাল কোন ক্লিনজিন মিল্ক তুলো দিয়ে বেশ করে মুখের ওপর বুলিয়ে মুখ মুছে ফেলতে হবে। এতে চামড়ার ওপর তৈলাক্ত ভাব আসবে ও চামড়া চকচকে হবে। শীত-কালে ডিমের কুসুমের সঙ্গে কমলালেবুর খোসা বাটা ও অলিভ তেল মিশিয়ে ঠিক এইভাবে করতে হবে।

যাঁদের চামড়া খুব তেলতেলে তাঁরা সপ্তাহে একবার (গ্রীষ্মকালে) লেবুর রসের সঙ্গে অলিভ তেল ফুটিয়ে সেটা ঠাণ্ডা করে মাখবেন। শীতকালে অলিভ তেলের সঙ্গে ডিমের কুসুম, মুসুরীর ডাল-বাটা দিয়ে বেশ করে ফেটিয়ে সেটা মাখবেন। এতে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। তারপর ঠাণ্ডা জলে মুখ ধোয়া ও ক্লিনজিন মিল্ক দিয়ে মুখ মুছে ফেলা আগের মতোই। সাধারণ ত্বক যাঁদের, তাঁদের জন্য একটা জিনিস তৈরি করে রাখা যায়। এটা যাঁদের তেলতেলে ত্বক তাঁরাও ব্যবহার করতে পারেন। মুসুরীর ডালের সঙ্গে ডিমের কুসুম মেখে রোদে শুকিয়ে রাখতে হবে, তারপর ওটা গুঁড়ো করে পাউডারটা রেখে দিতে হবে। সপ্তাহে একবার একটু ওই গুঁড়ো পাউডার, কাঁচা দুধ, লেবুর রস ও দুই ফোঁটা মধু চায়ের চামচের এক চামচ অলিভ তেলের সঙ্গে ফেটিয়ে তা মুখে মেখে রাখতে হবে অন্ততঃ ১৫।২০ মিনিট। তারপর ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে রঙ খুব উজ্জ্বল সুন্দর হয় তাছাড়া চেহারায় যৌবনশ্রী ধরে রাখা যায় বহুকাল।

শুকনো চামড়ায় মুসুর ডাল কখনও দেওয়া উচিত নয়। এছাড়া কাঁচা হলুদ, কমলালেবুর খোসা দুধের সর দিয়ে বেটে

শীতকালে মাখলে চামড়া পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়।

খাঁটি গ্লিসারিনের সঙ্গে ২।৩ ফোঁটা শাদা ভিনিগার ও লেবুর রস হাল্কা হাতে আঙুলের ডগায় মুখে ও গলায় মেখে রাত্রে শুয়ে, তারপর ঘুম থেকে উঠেই সবচেয়ে প্রথমে তা ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেললে রোদে পোড়া কালো দাগ থাকে না। তবে যাঁদের চামড়া শুকনো, তাঁরা কখনও এসব ব্যবহার করবেন না। আর একটা কথা মনে রাখবেন। শীতকালে ভুলেও কখনও ক্রীম ও গ্লিসারিন মেখে রোদে থাকবেন না। তাতে চামড়ার খুব ক্ষতি হয়। মুখে দাগ হয় ও রঙ কালো হয়ে যায়।

কতকগুলি অতি সাধারণ জিনিস—যেমন দুধ, ডিমের কুসুম, অলিভ তেল কাঁচা হলুদ মসুরীর ডাল ইত্যাদি ঠিক-মতন ঠিকভাবে ব্যবহার করলে চামড়া খুব ভাল ও সুন্দর হয়।

শুধু তাই নয় কাঁচা দুধ বা দুধের সর দিয়ে আরো উপকার পাওয়া যায়। জানা গেছে, চোখের পাতার উপর একটু দুধের সর মাখিয়ে রাত্রে শুলে, চোখের পাতা বড় হয় ও ঘন হয়। তারপর সকালে উঠেই চোখে বেশ কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলা দরকার। এছাড়া চোখের পাতাকে ঘুরিয়ে গোল করে তোলার জন্য আঙুলের ডগায় ভেসলিন লাগিয়ে পাতাগুলি উপরের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। এইভাবে নিয়মিত করলে চোখের পাতা সুন্দর ও বড় দেখায়। এছাড়া তো চোখের সৌন্দর্যের জন্য কি কি করতে হবে তা আগেই লিখেছি।

এর পর আর যে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার—তা হল খাদ্যবস্তু। সাধারণত আমরা খাওয়ার বিষয়ে একটুও লক্ষ্য রাখি না বা ভাবি না। কিন্তু সৌন্দর্যের ব্যাপারে খাদ্য যে কতো গুরুত্বপূর্ণ তা ভাবা যায় না। যেমন ভিটামিন 'বি' চামড়ার জন্য প্রয়োজনীয়। মাঝে মাঝে মুখের ওপর খসখসে দাগ দেখা যায় কিম্বা কোনরকমের চর্মরোগ। তখন ভিটামিন 'সি' খুব বেশি প্রয়োজন। যেমন, কমলালেবু, পাতিলেবু, আঙুর ইত্যাদি। ভিটামিন 'ডি' দরকার হয় শীতকালে। আর সবার উপর দরকার সবুজ শাক-সব্জি। এতে পেট পরিষ্কার থাকে; আর পেট পরিষ্কার থাকলে চামড়াও ভাল থাকে। এইভাবে নিয়মিত চামড়ার যত্ন নিলে সৌন্দর্য রক্ষা ও সজীবতা আসে। শুধু নিজের জন্য নয়, সবার জন্যই তা সুন্দর শোভন।

পৃথিবীর সব দেশে সব জাতিই সুন্দরের পূজারী। কাজেই সুন্দর হলে ক্ষতি কি? বাঙালীদের মধ্যে রূপচর্চা কিছুটা লুকিয়ে অন্তরালে করা হয়—কারণ লোকভয় লজ্জা। আজকের দিনে এ-দুর্বলতা মুখ ভাব নামান্তর। বেঁচে থাকা বা বাঁচার মতন করে পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ গ্রহণ করে ও বিলিয়ে। তবেই তো বেঁচে থাকার সার্থকতা।

এবারে আমি একটি চিঠির উত্তর দেবো। শ্রীমতী অসীমা দাশগুপ্তা বারাসত থেকে লিখেছেন। আমার 'রূপসীর খাতা' পড়ে তাঁর ভাল লেগেছে জেনে তাঁকে ধন্যবাদ। মহিলাদের উপকারের জন্যই এই বিভাগ সুতরাং উপকার হচ্ছে জেনে খুশী হলাম। এবারে তাঁর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। প্রথম, প্রতিদিন সকালে মুখ ধোয়ার সময় মুখ ভর্তি করে জল নেবেন—যাতে দুই গাল ফুলে থাকে, ও সেই অবস্থায় গালের ওপর হাত বোলাবেন চক্রাকারে। এইভাবে প্রতিদিন সকালে অন্ততঃ ৫।১০ মিনিট করবেন। এছাড়া একবার বাঁ ও একবার ডান করে গাল ফোলাবেন বার ১০।১২ একবারে রাত্রে বিছানায় শুয়ে। এই রকম করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। আর প্রসাধনের সময় চাপা অংশে একটু লাল আভা দিলে তা উঁচু দেখায়। সামান্য বোরোলীনের সঙ্গে লালচে লিপস্টিক আঙুলের ডগায় মিশিয়ে চাপা অংশে নীচের থেকে ওপরের দিকে গোল করে মাখাতে হবে, তাহলে ওই অংশের দোষ ঢাকা পড়বে ও ভাল দেখাবে। নাকের পাশ থেকে কানের দিকে টানতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হল, দাঁতে কালো ছোপ পড়ার কারণ দুটি বেশী পান খাওয়া, আর ভাল করে পরিষ্কার না করা। পান খয়ের ছাড়া খেলে ছোপ পড়ে না। দাঁত কভাবে পরিষ্কার রাখা উচিত সে আলোচনা আগে করেছি, সেই ভাবে পরিষ্কার রাখা যায়। আমার বিশ্বাস নিম দাঁতন সবচেয়ে ভাল। তবে আরোও একটা খবর দিতে পারি। অবাঙালীদের মুদি দোকান অথবা বড়বাজারের মুদি দোকানে এক ধরণের গাছের ছাল পাওয়া যায়—তা দিয়ে দাঁত ঘষলে দাঁত দুধের মতন পরিষ্কার হয়ে যায়। তবে দুই একদিন ঠোঁটে জিবে হলুদ রঙের ছোপ পড়ে। কাপড় দিয়ে ঠোঁট ঢেকে ঘষলে অবিশ্যি সে ভয়ও থাকে না। সুতরাং এটা করে দেখতে পারেন। তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, কেশুতি পাতার সম্বন্ধে। বাজারে শাক-সব্জির ছোট ছোট ঝাঁকা নিয়ে যারা বসে তাদের কাছে বলে দিলে ওরা নিয়ে আসবে। পাতাগুলি ঈষৎ লম্বাটে ছোট ছোট কালচে সবুজ রঙের। আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে জানাতে পারেন।

পুনশ্চ

খাবার কথা তুলতেই আজ মাথায় হাত দিয়ে বসতে হয়। সারা দেশ জুড়েই প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা। লোকে কচু-ঘেঁচু খেয়েও প্রাণরক্ষা করতে পারছে না। গেঁড়ি-গুগলি, ঘাস ও গাছের পাতা সেদ্ধ প্রভৃতি নানা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়েও, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে পাগলের মত মানুষ দুটি উচ্ছিষ্ট অন্নের জন্য একটু ফ্যানের জন্য, একটুকরো পোড়া রুটির জন্য কাকুতি-মিনতি করে বেড়াচ্ছে দোরে দোরে। জীবন-ধারণের জন্য একমুঠো ভাতের অভাব যে কি ভয়াবহ, তা একমাত্র সেই বোঝে যে ভুক্তভোগী। বিশেষ করে চোখের সামনে শিশু-সন্তানের মুখে অন্ন দিতে না পারার জ্বালায় এই শহরেই টালিগঞ্জ অঞ্চলে কিছুদিন পূর্বে যে-ঘটনা ঘটে গেছে তা ভাবতে আজও সারা শরীরে একটা বিশ্রী শিহরণ, মনে একটা কদর্য বিষণ্ণ অনুভূতি অনুভূত হয়—কেমন যেন একটা উন্মাদ ভাব প্রকাশ পায়, যারা পেটপুরে দুবেলা ভালমন্দ খাচ্ছে, হোটেলে খাচ্ছে তাদের উপর। নিজেও তো এখনো খেতে পাচ্ছি বলে লজ্জিত না হই না।

কিন্তু এদেশে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর খাদ্যের এই নিদারুণ অভাব আর এমন-ভাবে হয়েছে কিনা সন্দেহ! শুধু খাদ্যের অভাবই নয় আকাশ-ছোঁয়া দ্রব্যমূল্যও আজ নিম্নমধ্যবিত্তকে নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত দরিদ্র ভিক্ষুক করে তুলেছে—চরিত্র নষ্ট হচ্ছে, চোর-ডাকাত-খুনে পর্যন্ত করে তুলছে ভদ্রঘরের শিক্ষিত বেকার সন্তান-দের। এ-সত্যকে আর অস্বীকার করার উপায় নেই।

এ যে আজ কি অবস্থায় এসে পৌঁছেছি আমরা তা ভাবলে দিশাহারা হয়ে যেতে হয়। কিন্তু এক সময় প্রাচীন-কালের সাহিত্যে, মঙ্গলকাব্যে, চৈতন্য-চরিতামৃতে গোবিন্দদাসের করচায়, জয়ানন্দ-মঙ্গলকৃত চৈতন্যমঙ্গলে কবিকঙ্কন চণ্ডীর মধ্যে নানিক গাঙ্গুলি রচিত ধর্ম-মঙ্গলে খাদ্যাদির যে বিচিত্র বিভিন্ন বর্ণনা বিবৃত হয়েছে, তা খুবই রসাস্বাদ উপভোগ্য। কিন্তু তার বর্ণনা আজ এমনই বিসদৃশ 'অ্যানাক্রনিজম্' বলে মনে হয় যে, উল্লেখ করতে স্বতঃই নৈরাশ্য জন্মে।

তবুও আশা করি, এই ভয়াবহ খাদ্য-পরিস্থিতির মধ্যেও কিছুটা অন্যমনস্কতা সৃষ্টি ও অন্তর্বেদনা দূরীকরণের জন্য অবিনাশচন্দ্র ঘোষের ধারাবাহিক রচনা 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বাঙালী-জীবনের ছায়াপাত' থেকে গর্ভিণী রমণীর 'দোহদ' বা 'সাধ' ভক্ষণের অংশটুকু ১৩২১ সালের 'মালঞ্চ' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যা থেকে এস্থলে উদ্ধৃত করে দিলাম—

'যাজ্ঞবল্ক্যের সময় হইতে গর্ভিণী রমণীর 'দোহদ' বা 'সাধ' সম্পাদনের ব্যবস্থা এদেশে চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত কাব্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, প্রাচীনকালে তরুলতারও দোহদ সম্পন্ন হইত। প্রাচীন বঙ্গে আসন্নসত্ত্বা মহিলাগণের 'সাধভক্ষণ' সম্বন্ধে আমাদিগের যে কৌতূহল জন্মে কবিকঙ্কন তাহা পূর্ণমাত্রায় চরিতার্থ করিয়াছেন। গর্ভভারাক্রান্তা ব্যাধরমণী নিদয়ার অভিলষিত আহারের তালিকাটি কি সুন্দর ও স্বাভাবিক!

আপনার মত পাই তবে গ্রাস দুই খাই
পোড়া মাছে জামিরের রস।

নিধানি করিয়া খই তাহাতে মাহিষ দই,
কুল করঞ্জা প্রাণ হেন বাসি।

যদি পাই মিঠা ঘোল পাকা চালিতার ঝোল
প্রাণ পাই পাইলে আমসী।

আমার সাধের সীমা হেলঞ্চা কলমী গিমা
বোয়ালি আনিয়া কর পাক।

ঘন কাটি খর জ্বালে সাঁতলিবে কটু তৈলে,
দিবে তাতে পলতার শাক।।

পুঁইডগা, মুখী কচু ফুলবড়ি তাহে কিছু
তাতে দিবে মরিচের ঝাল।

হরিদ্রা রঞ্জিত কাঞ্জি উদর পূরিয়া ভুঞ্জি
প্রাণ পাই পাইলে পাকাল।।

মূণ কিছু দিয়া বাড়া
নকুল গোধিকা পোড়া,

হংসডিমে কিছু তোল বড়া।
কিছু ভাজ রাই খাড়া
চিঙ্গড়ির তোল বড়া,
শজারু করহ শিক-পোড়া।।

সদাই ন্যাকার উঠে দিনে দিনে বল টুটে,
বদনে সদাই উঠে জল।
মধু বাতাকী শীম তাহে দিয়া রান্ধ নীম
আর দাও উড়ুম্বর ফল।।'

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী

বণিক-পত্নী খুল্লনার 'সাধ' ব্যাধ-পত্নীর 'সাধ' ইতে স্বভাবতঃ কিঞ্চিদ্বিভিন্ন।

'আপনার মত পাই তবে গ্রাস চারি খাই
পোড়া মাছে জামিরের রস।।

* * *

যদি পাই মিঠা ঘোল বদর শকুল ঝোল
তবে খাই গ্রাস পাঁচ চারি।।

লতাপাতা বন শাক খরজালে করি পাক
সম্ভজিবে যোয়ানী ফোড়ন দিয়া।

লন্ডাল লবণ তথি দিবে হিং জিরা মেথি
রাঁধন যদি কর দয়া।।

নিধান করিয়া খই তাহাতে মথিয়া দই
আমড়া সংযোগে রাঙ্গাশাক।

যদি পাই কিছু পাপ আসে মসুরীর সূপ
আমসীতে প্রাণ পাই, রাখ।।

আমি যেন পাই সোনা শকুল মাছের পোনা
পোড়া কাসন্দি দিয়া তথি।

হরিদ্রারঞ্জিত কাঞ্জী উদর পূরিয়া ভুঞ্জি
বন শাকে বড়ই পিরীতি।।'

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী

* * *

পুস্তক-বিশেষে খুল্লনার এই একটি অতিরিক্ত সাধ-বিজ্ঞাপক দৃষ্ট হয়,—

শুন দুয়া দাসী বলি তোমারে।
এবে মোর মন কেমন করে।।

কহি নিজ সাধ শুন গো দাসী।
পান্ত ওদন ব্যঞ্জন বাসি।।

বাথুয়া টকটলি তেতুলেতে পাক।
ডাঁগ ডাঁগ ভাজ ছোলার শাক।

মীন চড়চড়ি কুমড়া বড়ি।
সরল সফরী ভাজা চিংগড়ি।।

যদি ভাল পাই মহিষা দই।
ফেলি চিনি কিছু মিশায়ে খই।।

পাকা চাঁপাকলা করিয়া জড়।
খেতে মনে সাধ করেছি বড়।।

কনক-থালেতে ওদন শালি।
কাঁজির সহিত করিয়া মেলি।।
হেন কাঁজি ভুঞ্জি মনেতে ভায়।
কচি কচি মূলা বাগুন তায়।
আমড়া নোয়াড়ি পাকা চালিতা।
আমসি কাসুন্দির কুল করঞ্জা।।
খেড়ে ডুমুড় ইলিচা মাছে।
খাইলে মুখের অরুচি ঘোচে।।
হিয়া ধকধক অন্তরে ডোক।
মুখে নাহি রুচে এ বড় শোক।।
মনে করি সাধ খাইতে পিঠে।
নারিকেল ছাই খাইতে মিঠে।।
বসিতে উঠিতে ফিরয়ে মাথা।
ঘন উঠে হাই এ বড় ব্যথা।।
সখি! সাধে যদি বাড়াই পা।
আলুইয়া পড়ে সকল গা।।
দুগ্ধে তিলের গুঁড়ি মিলাইয়া লাউ।
শালির সহিত খুদের জাউ।
চিঁড়া পাকা কলা দুগ্ধের সার।
কহি দুয়া আর শুন গো আর।।
ঝুনো নারিকেল চিনির গুঁড়া।
করি আপনার সাধের চূড়া।।'

* * *

খুল্লনার সাধ-সংগ্রহ
'শাক তুলিবারে দুয়া ফিরে বাড়ি বাড়ি।
দোহাটি করিয়া পরে বার হাত শাড়ী।।
নটা রাঙ্গা তোলে শাক পালংক নালিতা।
তিক্ত-ফলতার শাক কলতা পলতা।।
সাঁজাত বনতা বন-পুঁই ভদ্রপলা।
তিজলী কলমী শাক জাঙ্গি ভাঁড়িপলা।।
নটিয়া বেথুয়া তোলে ফিরে ক্ষেতে ক্ষেতে।
মহুরী শুলুফা ধন্যা ক্ষীরপাই বেতে।।
বাড়ি বাড়ি ফিরে দুয়া দিয়া বাহু নাড়া।
ডগী ডগী তোলে যত সরিষার আড়া।।

রন্ধন করিতে লহনার হৈল ত্বরা।
ঘটে পুরিয়া এড়ে মাটিয়া পাথরা।।

ঘৃতে জব জব কৈল নালিতার শাক।
কটু তৈলে বেথুয়া করিল দৃঢ় পাক।।

খণ্ডে মুগের সূপ উভারে ডাবরে।
আচ্ছাদন থালাথালি তাহার উপরে।।

কটু তৈলে ভাজে রামা চিতলের কোল।
রোহিত কুমড়া বড়ি আলু দিয়া ঝোল।।

বদরী শকুল মীন রসাল মসুরী।
পণ দুই ভাজে রামা সরল সফরী।।

কতকগুলো তোলে রামা চিংগড়ীর বড়
কচি কচি গোটাকতক ভাজিল কুমড়া।

—কবিকঙ্কণ চ°

* * *

কবিকঙ্কণের পরবর্ত্তী কবিদিগের :
মাণিক গাঙ্গুলি একটি উল্লেখযোগ্য
বর্ণনা রচনা করিয়া গিয়াছেন—

রাণী রঞ্জাবতীর সাধ-নিবেদন
'কহ কহ কি সাধ খাইবে রাজরাণী।
নত হয়ে নিবেদন করে নিতম্বিনী।।

শুসুনির শাক আনি সম্বরিবে তৈলে
শেষে দিবে সর্ষপ বাটনা সিদ্ধ হলে।

অল্প জলে অল্প অল্প আসিবে ফাটি
দৃঢ় করে দিয়া কাটি দিবে তাকে ঘাঁ

গুড়া করে গোটা দশ দিবে তায় বড়ি
অল্প অল্প লবণ দিয়া উলাইবে হাঁ

কটু তৈল কিছু দিয়া সম্বরিয়া পুন
প্রচুর পিঠালি দিবে পাক হয় যেন।।

ঠিক বলি ঠাকুররাণী ইহা যদি পাই।
এক সের চেলেদ্ব অন্ন এক গ্রাসে খাই

আর এক আছে সাধ আনি পুঁই থ
যথোচিত জল দিয়া জ্বাল দিবে

সিদ্ধ হইলে শেষ দিবে শোভাঞ্জলি
কিছু কিছু দিবে তায় কচু কলা মূ

ঝোল রাখি ঝাল দিয়া জ্বাল দিও
সেই ব্যঞ্জনের সার শুনে মুখ সরে।

চিংড়ী চাঁদ কুচানি চাঁপানটে শাকে
অধিক লবণ দিয়া পাক কর তাকে

তায় দিবে গোটা দশ পনসের বীচ
প্রচুর করিয়া দিবে পিঠালি মরিচ।

ঝোলে দিয়া কই মাছ করে চড়চড়
তৈলেতে ভাজিয়া তায় দিও ফুলবড়

নীরস অত্যন্ত হলে তায় দিও ন
কাটী দিয়া কর দ্রব যেন হয় ক্ষীর

আধারে তুলে সব বাছিবে কণ্টক
এই ব্যঞ্জনের চূড়া অরুচি নাশক।

তায় যদি কিছু হয় লবণবিহীন।
খেতে পারি ঢের করে বসে সারা

সফরীর পেট চিরি বার করে পে
পোড়াবে যতনে যেন থাকে গোট

লবণ সর্ষপ তৈল দিবে কিছু ত
শুনে মুখে সরে জল খাবার নাই

ব্রাহ্মণী রঞ্জার বাণী শুনে সেই
শাকাদি ব্যঞ্জন রাঁধি করিল প্রস

—মাণিক গাঙ্গুলি রচিত

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

জানল অতি সহজে। ঘরে আগুন লাগলে মায়েরা কোলের বাচ্চা সামলায়, কুমারীরা গয়না সামলায়। যার কাছে যা প্রিয় ধন। আইরিনের কাছে প্রাণের চেয়েও দামী হল যুগল মূর্ত্তির ছবিখানা। তাই ঘরে আগুন লাগানোর অভিনয় করল হোমস। ধোঁয়া-বোমার আগুন চেঁচানি শুনে আইরিন দৌড়ে গেল কাঠের প্যানেলের আড়ালে লুকোনো ছবিটার দিকে। কিন্তু ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে সে। হঠাৎ সন্দেহ হল পাদরীবেশী হোমস্‌কে। তাই তখনকার মত হোমস ছবিখানা সরাতে পারল না। কিন্তু ভয়ের চোটে দেশ ছেড়ে পালিয়ে [illegible] আইরিন বাক্সো বেচাই দিয়ে।

উপন্যাস

প্রভাত দেব সরকার

রাজার রাজা

ছোট্ট সংসার হলেও, অবনীবাবুকে মোকাবিলা করতে হয় নানান অশান্তি। উপার্জনক্ষম ছেলে বিকাশের বিয়ের সম্বন্ধ করেন অবনীবাবু। আর সে পাত্রী হল বিকাশের অফিসেরই বড়বাবুর মেয়ে। এ সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বিকাশ। অসুস্থ অবনীবাবু মারা গেলেন। বিকাশ নিজেকে অপরাধী ভাবল। সংসারের দায়িত্ব পড়ল বিকাশের ওপর। ছোট ভাই নন্তুর দায় নেই। এদিকে অফিস ইউনিয়ন স্ট্রাইক নোটিশ দিয়েছে। কমিটি মিটিং হবে। বিকাশকে ইউনিয়নের কাজকর্মে যুক্ত করার চাপ দিল নন্দরা। বড়বাবু অনন্তবাবুও বিকাশকে খানিকটা সাবধান করে দিতে চাইলেন। বিকাশ রাস্তায় মিছিলে হঠাৎ দেখে মালবিকাকে। পরে মাঠ থেকে উঠে যেতে যেতে একসময় মালবিকা বলল, তোমার যদি চাকরী যায় বিকাশ ?...

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিকাশ বললে, যায় যাবে! তা বলে চিরকাল মুখ বুজে অন্যায় সহ্য করবো না। চাকরি করি বলে কারো কেনা গোলাম ই! আমরাও দেখে নেব।

মালবিকা বিকাশের হাত ধরে এগোতে গোতে বললে, তোমরা পারবে বিকাশ?

নিশ্চয়ই পারবো! কথাটা বিকাশ এত দারে বললে মনে হল শূন্য মাঠটাও যেন নুরণনে ভরে উঠলো। ঃ পা-র-বো! -র-বো!

মাঠ পেরিয়ে ট্রাম লাইন ছাড়িয়ে, র্জার চূড়োকে পিছন করে এলগিন ড়ের মোড়ে এসে বিকাশ বললে, এবার ম একলাই যেতে পারবে—

মাথা নেড়ে মালবিকা বললে, না।

কিন্তু আজ তো রাস্তায় কোন গোল- ল নেই, দিব্যি লোক-জন চলা-ফেরা ছে। মালবিকার মনোগত ভাবটা বুঝতে পেরে বিকাশ বললে।

মালবিকা গম্ভীর হয়ে বললে, হয়তো াদের পাড়ায় গোলমাল হচ্ছে!

শুধু শুধু গোলমাল হতে যাবে কেন শ ভেবে পেল না। তা ছাড়া আজ ও তেমন কোন উত্তেজনার কারণ ঘটে মিছিল কোনটা একটা ঘটনাই নয়।

মালবিকা ঠিক কি বলতে চায় বিকাশ তে পারে না। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে।

হঠাৎ মোড়ের মাথা থেকে একটি ছেলে মালবিকাকে কাছে ডেকে কি যেন ল। মালবিকা ব্যস্ত হয়ে কি করবে ভাবতে পারলে না, তার মুখ-চোখ ন করতে লাগল।

বিকাশ কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে, কি হ? অমন করছো কেন?

মালবিকা বললে, আমার দাদাকে পুলিশ এ্যারেস্ট করেছে, থানায় নিয়ে গেছে।

কেন? কেন? উত্তেজিত কণ্ঠে বিকাশ জিজ্ঞেস করলে, তারপর মনে হল রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব কথা বলা উচিত নয়। কারণটা মালবিকাই বা জানবে কি করে।

ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে মালবিকা বললে আমি যাচ্ছি, দেখি কি হয়েছে! দ্রুত পায়ে পিছনে এসে বিকাশ বললে, চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই, যদি কিছু সাহায্য করতে পারি।

মালবিকা করুণভাবে বিকাশের মুখের দিকে চেয়ে বললে, সত্যি আপনি আসবেন?

কথাটার মানে যেন বিকাশ বুঝতে পারলে না। এতে সত্যি মিথ্যের কি আছে? মালবিকা কি তাকে বিশ্বাস করছে না? বিপদেই তো মানুষ মানুষের করে!

অনেক রাত পর্যন্ত বিকাশ থানা পুলিশ করলে। মালবিকার দাদাকে পুলিশে ধরার পেছনে নাকি অনেক ব্যাপার আছে। উপস্থিত মার্ডার চার্জ আছে। বন্ধ কার- খানার দু দল শ্রমিকের মধ্যে বিরোধের ফলে একজন খুন হয়েছে। প্রথমে ও-সি তো আমলই দিতে চায় নি কে মশাই আপনি, একজন ক্রিমিনালের হয়ে বলতে এসেছেন?

মালবিকাও সঙ্গে ছিল, তাকে দেখে হয়তো থানা-অফিসারের মেজাজ কিছু নরম হল, বললে, সিরিয়াস চার্জ আছে, আমাদের ক্ষমতার বাইরে! কাল কোর্টে হাজির করা হবে তখন চেষ্টা করবেন।

খুনের কথা শুনে মালবিকা হতভম্ব হয়ে গেল, কিছুতে বিশ্বাস করতে পারলে না, তার দাদা কখনো কোন খুন-জখমের ব্যাপারে থাকতে পারে। কারখানা বন্ধ হবার পর তার দাদা তার ধারে-কাছে যায় নি।

গম্ভীর হয়ে ও-সি বললে, সে আমরা কি জানি, আদালতে তার প্রমাণ হবে— আমরা কমপ্লেন পেয়েছি, আমাদের কাছে নাম ঠিকানা এসেছে আমরা সেই মত কাজ করেছি—

তৎক্ষণে মালবিকা নিজেকে সামলে নিয়েছে বেশ দৃপ্ত কণ্ঠে বললে কেউ কারো নামে বললে আর অমনি আপনারা তাকে ধরে এনে হাজতে পুরলেন! এই কি আপনাদের কাজ? দেখবেন না শুনবেন না? বাঃ বেশ মজা তো!

ও-সি রেগে উঠলো দেখুন বেশি কথা বলবার আমার সময় নেই।

মালবিকা চিৎকার করে বললে ওঁকে আপনারা ছাড়বেন না? বলছি উনি নির্দোষ!

না। কোর্টে প্রমাণ দেবেন। ও-সি তেমনি রাগত এবং নির্বিকার!

মালবিকা বলতে লাগল, আপনারা ওঁকে অন্যায় করে ধরেছেন শুধু শুধু ওঁকে নির্যাতন করছেন, ওঁকে ছেড়ে দিন—

ও-সি বললে, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার পরে হবে। এখন ওঁকে আমরা ছাড়তে পারি না। উনি আসামী!

না, না উনি আসামী নন কোন অপ- রাধই করেন নি, মিথ্যে মিথ্যে ওঁকে ধরে- ছেন, ওঁকে ছেড়ে দিন! বলতে বলতে মালবিকা ভেঙে পড়ল।

বিকাশ মালবিকাকে সামলে নিয়ে থানা অফিসারের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। জানে এখানে কিছু হবে না ওঁরা কর্তব্যের প্রতিমূর্তি! দয়া-মায়া বা বিবেচনা করবার ওঁদের সময় নেই। সামাজিক অন্যায় নিবা- রণের নিমিত্ত ওঁরা সদাজাগ্রত! চোর-ডাকাত ধনী কাউকে ওঁরা খাতির করেন না। বড় কর্তব্যপরায়ণ! স্বাধীন ভারতে ওঁরাই প্রকৃত দেশ-সেবক!

বাড়ী এসে বিকাশ মালবিকাকে অনেক বোঝালে। এখনই এত বিচলিত হলে চলবে না। লোকে বলে বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা! এদেশে পুলিশও তাই! কেস করতে হবে, লড়তে হবে—নিশ্চয়ই একটা চক্রান্ত আছে।

কিন্তু? সে-কথাটা বিকাশ বুঝেছিল মালবিকাকে বললে, তার জন্যে তোমার ভাবনার দরকার নেই আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমার এক উকিল বন্ধু আছে, তাকে দাঁড় করাব। আগে জামিনের ব্যবস্থা করাতে হবে।

মালবিকার দাদার স্ত্রীর যে-সামান্য সোনা গায়ে ছিল তাই দিয়ে স্বামীর মুক্তির জন্যে বিকাশকে অনুরোধ করলে। বিকাশ তাঁকেও বললে, ওটা রেখে দিন, দরকার হলে চেয়ে নেব।

মালবিকার দাদার নাম সুবিমল। মালবিকাকে সঙ্গে নিয়ে বিকাশ কয়েকবার Jail Custody তে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেছে মালবিকাই পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছে, এ বিপদে বিকাশ খুব করছে, আপন জনের মত।

সুবিমল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছে, বিশ্বাস করুন আমি এর বিন্দু বিসর্গ জানি না, আমাদের অফিস লকআউট করে বন্ধ হয়েছে তারপর ওদিক আমি মাড়াই নি মাঝখান থেকে কি মুস্কিলে ফেললে বলুন দিকি। এমনি একবেলা আধবেলা খেয়ে দিন চলছিল, তার ওপর এই মামলা মকদ্দমা! আর বাঁচতে পারবো না, ওর চেয়ে পুলিশ যদি আমাকে গুলি করে মারতো! —বলতে বলতে ভদ্রলোক প্রায় কেঁদে ফেললেন।

বিকাশ আশ্বাস দিয়ে বললে আপনি কিছু চিন্তা করবেন না, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মালিক পক্ষ এইভাবে নিরীহ নিরপরাধ করে শ্রমিক ঐক্য ভেঙ্গে দেবে— মুষড়ে পড়লে ওরা আরো পেয়ে বসবে, আরো নির্যাতন চালাবে। পয়সা দিয়ে সব কলকাঠি ওরা নিজের সুবিধে মত কাজে লাগায়!

সুবিমলবাবুর সঙ্গে কথা বলে বিকাশের মনে হয়েছে ভদ্রলোক খুবই নিরীহ। তুলনায় মালবিকা অনেক শক্ত! বিকাশের সামনে সে দাদাকে অনেকবার ধমক দিয়ে বলেছে তুমি কি করেছো না করেছো তা নিয়ে অত ভাবছো কেন, উকিল দেওয়া হয়েছে তিনি এর ব্যবস্থা করবেন, বিকাশবাবু তো বলছেন ভয় পাবার কিছু নেই খুন বললেই তো আর খুন হয় না প্রমাণ করতে হবে! মগের মুলুক নয়, যা খুশী করলেই অমনি হলো!

কিন্তু—সুবিমলবাবুর মনে সেই কিন্তু সংশয় ঘুরে ফিরে। কতবার নিজের মনে বলেছেন, শেষটা তাকে খুনী আসামী করে ছাড়ল। তিনি কোন কিছুর মধ্যে ছিলেন না, কর্তৃপক্ষের কাউকে পর্যন্ত চেনেন না। একি হলো!

ভদ্রলোকের বিচলিত ভাবের জন্যে বিকাশের মাঝে মাঝে খুব বিরক্ত লেগেছে বুঝিয়ে অনেক বলেছে, তবু যেন ভদ্রলোক বিশ্বাস করছেন না ব্যাপারটা ষড়যন্ত্র দলাদলির কুফল, ইউনিয়নে পাঁচ পার্টির হাতে থাকলে যা হয়!

সে তুলনায় সুবিমলবাবুর স্ত্রী অনেক শক্ত; বরং তাঁরই বিচলিত হওয়া উচিত ছিল। সেই একবার যা সাশ্রুনয়নে হাতের চুড়ি খুলে দিতে গিয়েছিলেন, তারপর বিকাশের সঙ্গে এমনভাবে আলাপ করছেন যেন কতদিন বিকাশকে চেনেন কত আত্মীয়। মালবিকা না থাকলেও বিকাশকে ঘরে বসিয়ে স্বামীর মকদ্দমা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

একদিন তো ভদ্রমহিলা বেশ আইনের কথা বললেন, জেল-হাজতে কি যতদিন খুশী রাখতে পারে?

বিকাশ উকিলের কাছে এসম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে যা জেনেছিল বললে, তা নয়, পুলিশের ইনভেস্টিগেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত—

ভদ্রমহিলা যেন কোথাও একটা আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন, উৎসাহপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, এখনো ওরা খবর নিচ্ছে! তার মানে খবর কিছু নেই, শুধু শুধু একটা লোককে ধরে রেখেছে! তাই না?

বিকাশ সায় দিয়ে বললে, তা ছাড়া আর কি! আজকাল তাই হচ্ছে। কয়েকদিন আসাযাওয়া করে বিকাশ সুবিমলবাবুর স্ত্রীকে বৌদি বলে ডাকতে শুরু করেছে। সম্পর্কটা যেন বড় তাড়াতাড়ি আপন হয়ে উঠেছে। এদের বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে বেশ একটা ঝোঁক চেপে গেছে। অফিস কামাই করে অর্থ সামর্থ্য দিয়ে যতদূর করবার বিকাশ করছে, বলেছে এব্যাপারে মালবিকা কি তার বৌদি যেন কোন সংকোচ না করে। মালবিকা কিছু বললে বলেছে এ বিপদ যদি তার হতো তা হলে কি সে কিছু করতো না না চুপ করে হাত-পা গুটিয়ে থাকতো?

বেশ উত্তেজনার মধ্যে এখন দিন কাটছে, অফিসে গোলমাল, বাড়ীতে নন্তুকে নিয়ে দুর্ভাবনা, মায়ের মৌনাবলম্বন, মালবিকার দাদার কেস! বিকাশ ভেবে দেখেনি বাবা বেঁচে থাকলে কি বলতেন, তার এই সব কার্যকলাপ কি চোখে দেখতেন—ছেলে রোজগেরে বলে কি ছেড়ে কথা কইতেন?

বাবার মৃত্যুর পর এই দু'এক মাসেই বিকাশ যেন অনেক বড় অনেক দায়িত্বশীল অনেক আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। নিজের মধ্যে ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন যেন অনুভব করতে পারে, যেন তার ইচ্ছেয় সংসার চলছে, সে যা করবে তাই হবে—

একদিন কেবল উমাশশী দেবী জিজ্ঞেস করেছিলেন, আজকাল রোজ এত দেরী করিস কেন ফিরতে? আগে তো সকাল সকাল আসতিস্—

বিকাশ বলেছিল, কত কাজ শুধু কি অফিস!

উমাশশী আর কিছু কোন কথা জিজ্ঞেস করেন নি। স্বামী বেঁচে থাকলে কি করতেন বা বলতেন তিনিই জানেন, উমা-শশীর ছেলেদের নিয়ে যেন আর কোন ভাবনাই নেই। ছোট ছেলের ভাবনা তো ছেড়েই দিয়েছেন বড় ছেলেও দিন দিন কেমন যেন হয়ে উঠছে বাইরে থাকার সময় আজকাল অনেক বেড়ে গেছে!

সব থেকে আশ্চর্য অনন্তবাবুর ব্যবহার। সেই দিনের পর আর একটি কথাও বলেন নি। বোধ হয় তিনিও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের আশা ত্যাগ করেছেন। কাজের ব্যাপারেও বিকাশকে কিছু বলেন না। চুপচাপ অফিসে এসে কাজ করে চলে যান। অফিসটাও যেন কদিন ধরে বেশ থমথম করছে। একটা কি হয় কি হয় ভাব ঝড়ের পূর্বলক্ষণ যেন। দিব্যেন্দুরা খুব জোর আন্দোলন চালিয়েছে—এর মধ্যে একদিন কর্মবিরতি, অবস্থান ধর্মঘট হয়ে গেছে, কাল থেকে সব স্ট্রাইকের ব্যাজ পরতে আরম্ভ করেছে, ডিমান্ড সপ্তাহ পালিত হচ্ছে।

আজকাল মালবিকার সঙ্গে দেখা করতে গেলে আর মাঠে গিয়ে অপেক্ষা করতে হয় না। অফিসের পর সোজা তাদের বাড়ীতে এলেই হয়। মালবিকা না থাকলে বিকাশ অপেক্ষা করে—সুবিমলবাবুর স্ত্রী যথোচিত আপ্যায়ন করেন। ছোট ছোট দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে বেচারা খুব কষ্টে পড়েছে। প্রথম প্রথম চা খাওয়াতে চাইলে বিকাশ বেশ সংকোচ বোধ করতো আবার চা কেন মিথ্যে হাঙ্গামা!

কিন্তু ভদ্রমহিলা শুনবেন না ঠিক চা করে সামনে এসে স্মিতমুখে বলবেন, আপনার চা!

চাটা খুব স্বাদু মনে হয় না সব দিন বিকাশ বুঝতে পারে দুচার পয়সা প্যাকেটের মুদির দোকানের চা তবু তার সঙ্গে যে আন্তরিকতা মেশান থাকে তার যেন তুলনা হয় না। বিকাশ বুঝতে পারে না আজকাল কেবল মালবিকার খোঁজে সে

সুবিমলবাবুদের বাড়ি আসে কিনা। আপিসের ঝামেলা, নিজের বাড়ীতে মা-ভাইকে নিয়ে দুর্ভাবনা সংসারের নানা দায়িত্ব, রাজনীতিক অবস্থা, এসবের থেকে স্বস্তি পেতে বিকাশ সুবিমলবাবুদের বাড়ীতে ছুটে ছুটে আসে কিনা তাও বুঝতে পারে না। এদের উপকার করছে বলে নিজেকে জাহির করাও বিকাশের উদ্দেশ্য নয়। তবু কেন আসে, নিজেকে বিকাশ অনেকবার প্রশ্ন করেছে, কতদিন যাব-না, যাব-না করেও ঠিক গিয়ে হাজির হয়েছে।

একদিন গিয়েই ফিরে আসবার চেষ্টা করতেই সুবিমলের স্ত্রী বললেন, কেন, আমরা কি কেউ নই?

মাত্র কয়েক দিনের আলাপে মালবিকার বৌদি যে এমনভাবে কথা বলবে বিকাশ ভাবতে পারেনি। কেমন যেন থতমত আর অপ্রস্তুত বোধ করে। আমতা আমতা করে ...লে না না তা নয়!

বেশ সপ্রতিভ মালবিকার বৌদি, বললে, ...া হলে বসুন, একটু চা খেয়ে যান।

বিকাশ মালবিকাকে তার বৌদির তার ...ঙ্গে আন্তরিক হবার চেষ্টার কথাটা ক'দিন হাসতে হাসতে বলেছে, তোমার ...দি খুব ভাল! তোমাদের বাড়ী গেলে চা খাইয়ে ছাড়েন না!

শুনে মালবিকা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে ...কাশের মুখের দিকে চেয়েছিল—তারপর ...নক পরে বলেছে, আর কিছু নয় তো?

এ প্রশ্নের অর্থ কি? মালবিকার মুখের ...র কিছু অবশ্য বিকাশ বলেনি কিন্তু ...। মনে খটকা থেকে গেছে, তাকে নিয়ে ...বমলের বৌ সম্পর্কে মালবিকার মনে ...ন সন্দেহ জেগেছে কি? আর কি সে-টা?

ইদানিং বিকাশও লক্ষ্য করছে। মালবিকা ...তার ওপর নির্ভরতা অনেকটা কমিয়ে ...ছে। সুবিমলের কেসের ব্যাপারে ...ই ছোটাছুটি করছে। সেদিন টাকা ... গেলে বলেছে, দরকার হলে চেয়ে

...অদ্ভুত ব্যাপার। একথা ঠিক ...মলের বৌকে বিকাশের ভাল লাগে, তার ...রটাও বেশ ঘরোয়া মনে হয়। তা বলে ভাল লাগাটা এমন নয় যে তাতে কোন ...চুরি আছে, যার জন্যে অন্য কেউ ... করতে পারে। ভদ্রমহিলা যদি নিজের ...হত, তা হলে মালবিকা কি বলতো? ...ড়াও কথা আছে—উপকারী বন্ধুকে পেয়ে কে না খাতির করে সম্মান বা ...খায়? মালবিকার গম্ভীর হওয়ায় কি ...করার কোন মানে হয় না। এটা যে ...তরে বিকাশকে অপমান করা তাই বা ...কা ভাবছে না কেন? ঠিক আছে, প্রয়োজন ছাড়া বিকাশও আর ওপথ ...না। কি দরকার?...

বিকাশ আপিসের স্ট্রাইকের ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়ে ফেললে। দাবি আদায়ের জন্যে আপিস কর্তৃপক্ষকে দেখিয়ে দেখিয়ে বক্তৃতা দিতে লাগল, রোজ এক ঘণ্টা করে গেট-মিটিং-এ সবাইকে আসন্ন সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হতে বলল। ইউনিয়নের যারা তার সম্পর্কে বিপরীত ভাবতে আরম্ভ করেছিল তারা স্বীকার করলে, তাদের ভুল হয়েছিল! বিকাশ মনে-প্রাণে সংগ্রামী! লীডার!

অনন্তবাবু আড়ালে ডেকে সাবধান করেছিলেন, কিন্তু ইদানিং বিকাশের 'এ্যাগ্রেসিভ' ভাব দেখে নিজেই ভয় পেয়ে গেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতায় সরকারী আপিসে এধরনের 'ইনডিসিপ্লিন' কখনো দেখেননি—ছেলেগুলো ভেবেছে কি? পথে-ঘাটের অরাজকতা কি আপিসের আপিসের মধ্যে আনবে? দেশে বহু চাকরিহীন বেকার যুবক আছে, ওরা গেলে কি আপিস অচল হয়ে যাবে, না ওদের কাজ-বন্ধে আপিস বন্ধ হয়ে যাবে? অনন্তবাবু বুঝতে পারেন না, এখনো কোন 'স্টেপ নেওয়া হচ্ছে না কেন? ওদের আর বাড়তে দেওয়া কি উচিত হবে?

মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে অনন্তবাবু চোখ চেয়ে দেখেন, সব সিটই খালি! তাঁর মত দু-একজন বুড়ো ছাড়া সেকশন একেবারে শূন্য। মুশকিল, বলে বলে পারেন না, বেশি কথা বলতে গেলে, ছেলের দল মুকিয়ে অপমান করে আসে। বড়-সাহেবের কানে তুলেও কিছু হয় না! সাপের পাঁচ-পা দেখেছে সব! অসহ্য এ আর পারা যায় না!

অনন্তবাবুর আরো ক্ষোভ বিকাশও আজকাল তাঁকে অগ্রাহ্য করতে আরম্ভ করেছে। সেকশনে যতক্ষণ থাকে কাজ তো করেই না, কেবল ইউনিয়ন নিয়ে চেঁচিয়ে আলোচনা করে—যত রাজ্যের ছেলে-ছোকরা এসে রাতদিন কি যে পরামর্শ করে কে জানে। না, আর তাঁর কোন মায়াদয়া নেই, প্রথম চোটেই তিনি ছোকরাকে ঝুলিয়ে দেবেন, বড্ড বাড় হয়েছে!

বিকাশের আপিসে স্ট্রাইক শুরু হবার আগের দিন পাঁচজন ইউনিয়ন কর্মীদের ওপর সাময়িক বরখাস্তের নোটিশ বেরিয়ে গেল। তার মধ্যে বিকাশ একজন। নোটিশটা অনন্তবাবুই ডেকে বিকাশকে দিলেন। কি অপরাধ? ইউনিয়ন করা কি অন্যায়? দাবী আদায়ের জন্যে স্ট্রাইক করা অপরাধ? তা হলে ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেণ্ট কেন? ভদ্রলোক চাকুরিজীবিরা কি বাড়ীর চাকর-বাকর যে, খুশীমত ছাটাই করে দেবে?

অনন্তবাবু বললেন, আমাকে বলা বৃথা। বরখাস্ত তো আমি করিনি!

বিকাশ চীৎকার করে বললে, হ্যাঁ, আপনি করেন নি, করিয়েছেন। আপনি লাগিয়েছেন, এসব আপনার কারসাজি!

অনন্তবাবু চুপ করে ফাইল পড়তে লাগলেন, আর সবাই সিট ছেড়ে উঠে এসে অনন্তবাবুকে ঘিরে দাঁড়াল। ভদ্রলোক ভয়ে চোখ বোজালেন। একটা অপ্রিয় ঘটনা ঘটে, আর কি!

কি ভেবে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে বিকাশ বললে যেতে দাও! এর ফল ওঁরা পাবেন। তারপর নোটিশটা দুমড়ে ওয়েস্ট পেপার বাসকেটে ফেলে দিয়ে ফুৎকার দিয়ে বললে,

"...charged with instigating inciting and abetting loyal workers not to carry out duties and misconduct"!

সঙ্গে সঙ্গে সব সেকশন থেকে লোক বেরিয়ে পড়ে আপিসের গেটে জড় হয়ে ছাটাই বিরোধী স্লোগান দিতে লাগল। সবার অলক্ষ্যে এক সময় বিকাশ আপিস থেকে বেরিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল।...

মাঠে তাদের পরিচিত নির্দিষ্ট স্থানটিতে এসে মালবিকা যে আজ অপেক্ষা করবে বিকাশ ভাবতে পারেনি। দূর থেকে মালবিকাকে দেখে বিকাশের মনটা দুলে উঠলো মনে হল জীবনে এত খুশী সে আর কখনো হয়নি—ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে মালবিকাকে জড়িয়ে ধরে বলে, মালবিকা! মালবিকা তুমি কি করে জানলে এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে আমার একান্ত অভিপ্রেত ছিল। মালবিকা তুমি কি হাত গুনতে পার?

যেন কত লজ্জিত মালবিকা অস্ফুটে বললে, বস!

(ক্রমশঃ)

ভলিবলে
কৃষ্ণা গুহ

খেলার জগতে মেয়ে

—সিনেমায় মেয়েদের ভলিবল খেলার ছবি দেখে এই খেলা শেখার ইচ্ছা হয়। যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। বিজয়ী সংঘের সাধারণ সচিবের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে নিজের অভিপ্রায় জানালুম। তিনিও সানন্দে আমায় ক্লাবের মেয়েদের দলে নিয়ে নিলেন।—

কথাগুলি বলছিল কৃষ্ণা গুহ। লম্বা ছিপছিপে গড়ন। চলনে বলনে বেশ সপ্রতিভ। আদি বাড়ী বাংলাদেশের ফরিদপুরে দেশ ছেড়ে চলে আসার পর ওদের পরিবারের সবাই কলকাতার বাসিন্দা হয়ে যান। ওর জন্ম কলকাতায়। বর্তমানে ওরা থাকে শিয়ালদহের কাছেই সারপেনটাইন লেনে। এবছরই স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ও ছিল ব্যাপটিস্ট মিশনের ছাত্রী।

বিজয়ী সংঘে ভলিবল খেলা সুরু করি ১৯৬৯ সালে। প্রশিক্ষকদের সযত্ন প্রচেষ্টার ফলে ঐ বছরই রাজ্য লীগ প্রতিযোগিতায় দলে স্থান পাই।

প্রশিক্ষকদের মধ্যে আশুদা (অর্থাৎ আশুতোষ রায়চৌধুরী) বিমল গাঙ্গুলী এবং এ জি চবালডু বির অনিল ভট্টাচার্যের প্রশিক্ষণের ফলে কৃষ্ণার খেলায় সবিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায়। সেই সঙ্গে নিজের ঐকান্তিক আগ্রহও ছিল প্রধান মূলধন। বাংলা দলে স্থান পাবার জন্য অনুশীলন করে চলেছি। রাজস্থানে জাতীয় ভলিবলের আসর বসলো ১৯৭০-এ। ঐ বছর বাংলাদলে খেলার সুযোগ পাই প্রথম।

এরপর কৃষ্ণার স্থান বাংলাদলে প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে যায়। ৭১-এ গৌহাটিতে ৭২-এ জামসেদপুরে ৭৩-এ কেরলে এবং ৭৪-এ ব্যাঙ্গালোর ও হায়দরাবাদে জাতীয় ভলিবলের আসরে বাংলা দলে কৃষ্ণার স্থান হয়।

একটা কথা বলা হয়নি। ভলিবলের কোর্টে কৃষ্ণার পরিচয় 'স্ম্যাসার' হিসাবে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভলিবল দল ভারত সফরে এলে কৃষ্ণা সেবার ভারতীয় দলে খেলার সুযোগ পায়।

আমরা তিন ভাই আট বোন। আমার দিদিরাই খেলাধুলোয় আমাকে খুব উৎসাহ যোগায়। তাদের অনুপ্রেরণাতেই নিয়মিত খেলা চালিয়ে যেতে পারছি। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের মেয়ে কৃষ্ণা কিন্তু উৎসাহ আগ্রহ আর প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর।

শুধু ভলিবল নয় কৃষ্ণা এথালেটিকসেও পারদর্শিনী। স্কুলের খেলাধুলোয় যথেষ্ট কুশলতা দেখিয়েছে। ওর ইচ্ছা কলেজে ভর্তি হয়ে খেলাধুলোর আরও বড় বড় আসরে যোগ দেবার সুযোগ নেয়।

কৃষ্ণার বাবা মাও চান মেয়ে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলাতেও দক্ষ হয়ে উঠুক। কৃষ্ণার এখন প্রধান বাসনা—ভারতীয় ভলিবল দলে খেলার সুযোগ পাওয়া। বিভিন্ন জাতীয় প্রতিযোগিতায় খেলার সূত্রে কৃষ্ণা তার অভিজ্ঞতার কথাও বললে।

—সর্বভারতীয় আসরে আমরা মানে—বাংলার মেয়েরা খুব হেলাফেলার নই। প্রথম প্রথম অন্যান্য রাজ্যের লম্বা-চওড়া মেয়েদের খেলাতে দেখে নিজেদের সম্পর্কে কিছুটা দ্বিধা কিছুটা অনিশ্চয়তার ভাব এসেছিল অস্বীকার করি না। কিন্তু কয়েকটা খেলার পরই বুঝলুম আমরাও খুব দুর্বল নই। একটু চেষ্টা অথবা একটানা অনুশীলন আর বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু হলে ভারতের অন্যান্য রাজ্যকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে খুব একটা কঠিন কিছু নয়।

—বিদেশীদের খেলা কেমন মনে হয়?

—দেখুন এক প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়
া বিদেশীদের সঙ্গে খেলার সুযোগ
নি। আর জানেনই তো প্রথম ম্যাচটা
র কাছে হেরে গেলেও পরেরটাতে
রাই (মানে ভারতীয় মেয়েরাই)
তছিলাম। জাপান কোরিয়া প্রভৃতি দলের
র্কে শুনেছি এবং আন্তর্জাতিক আসরে
র কুশলতার খবরও কাগজে পড়েছি।
তু কি জানেন ওদের সঙ্গে না খেললে
র কলাকৌশল বোঝা সম্ভব নয়।
দের দেশের সংগঠকরা যদি ঐ সব
করা আন্তর্জাতিক দলকে এদেশে আনার
থা করেন তাহলে আমরাও প্রত্যক্ষ
জ্ঞতার পুঁজি বাড়াতে পারি।

কিন্তু টেনিস ক্রিকেট ব্যাডমিন্টনের মত
টেবল টেনিসের মত এদেশে বিদেশী
বল দলের সফরের আয়োজন হয় না
কৃষ্ণা দুঃখ প্রকাশ করে।

—এসব ব্যবস্থা না হলে আমাদের
য় মান বাড়বে কি করে?
তেহেরানে এশীয় ক্রীড়ায় ভারতের
বল দল না পাঠাবার কারণ আমাদের
মান উন্নত নয় বলে। অথচ
শী দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে না
ল আমাদের উন্নতি হবে কি করে?

দশের বিভিন্ন রাজ্য দলের মধ্যে কৃষ্ণার
কেরলই সবচেয়ে শক্তিশালী হায়দরা-
চেয়েও।

—ওদের দু দলকেই আমরা বাংলার
া হারিয়ে দিয়েছি। তবু আমরা
বিশেষ স্বীকৃতি পাইনি। সর্ব-
ীয় আসরে জিতে রাজ্যের ক্রিকেট
টবল বা টেবল টেনিসদল কিংবা
রা জিমন্যাস্টরা কত অভিনন্দন
আর আমরা বাংলার ভলিবল দলের
া সে সব থেকে বঞ্চিত।

াজ্য সরকার নানাভাবে খেলাধুলোয়
া করছেন। কিন্তু এখানে একটা
লের ভাল স্টেডিয়াম কেন করছেন
ৃষ্ণা প্রশ্ন করে। বলে—জানেন। এখন
ধ খেলা দেখতে খুব ভিড় হয়। অত
কোর্টের মধ্যে লোক ঢুকে পড়ে।
অসুবিধা হয়। মাঝে মাঝে খেলায়
ঘটে। একটা ছোটখাট ভাল
াম আর রাতে বিদ্যুতালোকে খেলার
র ব্যবস্থা করা কিছুই শক্ত বলে মনে
। সরকার এবং বেসরকারী প্রয়াস
ুক্ত হয় তাহলে আমাদের অনেক
র সমাধান হতে পারে।

া হকি আর ক্রিকেট খেলাতেও
। বিশেষ করে ক্রিকেট। এখন
চা আস্তে আস্তে মেয়েদের ক্রিকেট
ড় উঠছে। দেখি কোন দলে খেলব
পাই কিনা।

ন খেলার দিকে কৃষ্ণার যেরকম আগ্রহ
া তাতে আশা করতে পারি ওর
উজ্জ্বল হবে।

—অময়

দেশ বিদেশের খেলা

সেরা স্বর্ণ-সঞ্চয়ী

এক একটি অলিম্পিক গেমস যেন এক একটি কষ্টিপাথরের মত। যেখানে প্রত্যেকটি দেশের ক্রীড়ামানের মূল্যায়ন হয় নিক্তির বিচারে। কোন দেশ কতটা এগিয়ে গেল বা পিছিয়ে পড়ল তার চুলচেরা হিসেবনিকেশ হয় সারা বিশ্বের প্রতিনিধিদের সামনে।

১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিকের মাপকাঠিতে যে সব নতুন প্রতিভা ধরা দিয়েছে তার মধ্যে সাঁতারু মার্ক স্পিজ অনন্য। শুধু অনন্য বললে বোধ করি সব বলা হয় না।

এক অলিম্পিকেই মার্কিন তরুণ মার্ক স্পিজ একাই সবার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন। একের পর এক চমক। আর স্বর্ণ সঞ্চয়ের নজির। পুরনো সব রেকর্ড-গুলোকে ধূসর করে দিয়ে নতুন ইতিহাস গড়লেন। তামাম দুনিয়ার জলে যেন অকস্মাৎ বান ডাকিয়ে দিলেন।

মার্ক স্পিজ জাতিতে ইহুদী। দেহের ওজন ৭২ কিলোগ্রাম। ৫ ফুট ১১ ইঞ্চ লম্বা। অভিজ্ঞ মহল মিউনিখ অলিম্পিকের প্রাকমুহূর্তে মার্ক স্পিজের ওপর আকাশছোঁয়া আশা করেছিলেন। কারণ অলিম্পিকের বিগত দু বছরে স্পিজ ২২টি আন্তর্জাতিক ও সব কটি স্বদেশীয় খেতাবের অধিকারী। তখন ১০০ মিটার বাটার ফ্লাইতে ৫৫-৭ সেকেণ্ড ও ২০০ মিটার বাটার ফ্লাইতে ২ মিঃ ৫-৭ সেকেণ্ডে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করে মার্ক স্পিজ সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন। স্বদেশীয় সাঁতারে প্রায় সব কটি ইভেন্টেই মার্ক স্পিজ নতুন অধ্যায় রচনা করে ঐ অল্পবয়সেই তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

১৯৫৭ সালে কানাডার উইনিপেগে অনুষ্ঠিত প্যান আমেরিকান গেমসে মার্ক স্পিজ পাঁচটি স্বর্ণপদক গলায় ঝুলিয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন।

মিউনিখ অলিম্পিকে বিস্ময়ের কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না মার্ক স্পিজকে ঘিরে। এক অলিম্পিকে একাই একের পর এক সাতটি স্বর্ণপদক সংগ্রহ করে মার্ক স্পিজ অলিম্পিকের খতিয়ানে তাঁর নাম অবিস্মরণীয় করে রাখলেন। স্বল্প পাল্লার ফ্রি স্টাইল, বাটার ফ্লাই ও অপর দুটি ব্যক্তিগত বিভাগে প্রথম ও নতুন রেকর্ড সৃষ্টিকারী। এবং রিলে সাঁতারের তিনটি প্রতিযোগিতায় পূর্বতন নজীরকে ম্লান করে আমেরিকাকে অনায়াস সাফল্যের দ্বারে পৌঁছে দেন।

মার্ক স্পিজ

মিউনিখ অলিম্পিকের পদকের তালিকায় মার্ক স্পিজের নাম ছিল শীর্ষে। শুধু মিউনিখ কেন অলিম্পিকের দীর্ঘ ইতিহাসে এ এক নজীর। এক অলিম্পিকে সাতটি স্বর্ণপদক জয়ের আস্বাদ লাভ ইতিপূর্বে আর কোন প্রতিযোগীর ভাগ্যে জোটে নি। আর [illegible] মেক্সিকো-অলিম্পিকে মার্কিন তরুণী ডেবি মেয়ারের তিনটি ও তার আগের অলিম্পিকে ঐ দেশেরই ডন শ্লেন্ডারের চারটি স্বর্ণ পদক জয় ছিল সাঁতারে সেরা সাফল্যের দৃষ্টান্ত। অবশ্য বাহান্ন বছর পূর্বে অ্যান্টোয়ার্পে ইতালীয় অসিচালক নেডো নাদির পাঁচটি ব্যক্তিগত বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বই ছিল সেরা স্বীকৃত।

এইভাবেই মার্ক স্পিজ এক অলিম্পিকেই সব অতীত রেকর্ড নস্যাৎ করে নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করে শীর্ষাসনে স্থাপন করলেন। সন্তরণের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করলেন। জলে মাছের মত দ্রুতগতি, নমনীয়, শক্তিশালী সাতপদকজয়ী মার্ক স্পিজের অসাধারণ কীর্তির আলোকে রসিকের স্মৃতি অনেক দিন আলোকিত হয়ে থাকবে।

—প্রশান্ত দাঁ

মাঠের নায়ক

মানস ভট্টাচার্য

ভিনি, ভিডি, ভিসি। এলাম, দেখলা জয় করলাম। ময়দানের মিনি ফুটবল মানস ভট্টাচার্য সম্পর্কেও ঐ রোমান শব কাটি যেন ষোল আনা সত্যি।

বাটানগর থেকে হঠাৎ একদি ময়দানে এসে দাঁড়ালেন, খেললেন এব তারপর মিনি মানস জনমানসে এঁটে ব গেলেন। বাচ্চা মানসকে একদিনেই মা চিনে ফেললেন সবাই। অনেকে বললেন ঠিকমত যত্নআত্তি, পরিচর্যা, প্রশিক্ষ পেলে ছেলেটার ভবিষ্যৎ ভাল। ক্যালকা জিমখানার রাইট আউট মানস ভট্টাচা ১৯৭৩ সালে জীবনের প্রথম কলকাতা সিনিয়ার ডিভিসন ফুটবল লীগ ম্যা খেলতে নেমেই কাগজ-জোড়া পাবলিসি পেয়ে গেলেন। খেলাটি ছিল ভ্রাতৃসংঘে বিরুদ্ধে। ভ্রাতৃর আটোসাটো ডিফেন্স লাই দুমড়ে মুচড়ে গেল মানসের মুন্সিয়ানায় পরের ম্যাচ মোহনবাগানের সঙ্গে। মা লোক থৈ থৈ করছে কারণ মরশুমের প্রথ খেলা মোহনবাগানের। মিনিট কয়ে দাপটে খেলেই মোহনবাগানের ডিফেন্ লাইনের অমন বাঘা বাঘা খেলোয়াড়র ভেঙে পড়লেন। দ্বিতীয়ার্ধে মাঝ মা থেকে সমীরেন্দ্রের একটি শাণিত বিশ্বস্ত মানসের পায়ে পড়তেই—বু ডগা থেকে বুলেট ছিটকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মোহনবাগান বিধ্বস্ত। বল জালে জড়িয়ে গেছে। হীরো মার্কা গোলকিপা ব্যাক এবং হাফ ব্যাকেরা অসহায় পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। ওকে দোষ দিচ্ছেন, কিন্তু কেউই ঐ বাচ্চা ছেলেটার তেজী শটটার তারিফ করছে না। অবশ্য মানসের এজন্য মনোবেদনা কোন কারণ ঘটে। মানসের নৈপুণ্যে অকুণ্ঠে প্রশংসা আর স্বীকৃতি জানিয়ে ছিলেন মোহনবাগানের খাঁটি ক্রীড়ানু রাগীরা।

রীতিমত সোরগোল তুলে যার আবি র্ভাব সেই মানস কিন্তু এখনও মনে-প্রাণে ফুটবলের একজন সামান্য শিক্ষার্থী মাত্র মানস জানেন যে, নৈপুণ্য এবং স্বীকৃতির শিখরে উঠতে গেলে নিজেকে আরও অনেক তৈরী করতে হবে, অনেক শোধ রাতে হবে অনেক বেশী আত্মস্থ হতে হবে আত্মসংযমী হতে হবে। কারণ তার স্পীড বা স্যুটিং থাকলেও উচ্চ মানে পৌঁছাতে যে অসাধারণ স্ট্যামিনার প্রয়োজন তা নেই স্পীড আরও বাড়াতে হবে অবিলম্বে কারণ মাথায় সে বড় ছোট, স্টেপিং তাই ছোট। সুতরাং চেষ্টা করে রানিং এ্যাবি লিটি বাড়াতে না পারলে—দীর্ঘকায় প্রতি-দ্বন্দ্বী ডিফেন্স তাকে অনায়াসে কব্জা করে ফেলবে, স্যুটিং যতই থাক, বল পর্যন্ত পৌঁছনই মানসের পক্ষে সম্ভব হবে না। পরের কথা তো সহজেই অনু-মেয়। মাঠের বাইরে শুধুই অসহায় অস্তিত্ব নিয়ে বসে থাকা।

দুঃখের কথা নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে

মানস এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। বেয়াড়া কোন ইচ্ছে নেই, এ্যালন্যাস্কারের মত অবাস্তব দিবাস্বপ্নও দেখে না। নিজের শক্তি সামর্থ সম্পর্কে দিব্যি ওয়াকিবহাল। মানসের নিজের কথা হোলঃ 'অনেক আশা না করাই ভাল। শেষকালে আশার আলেয়ার পেছনে ছুটে অসময়ে হাত পা গুটিয়ে হতাশ হয়ে সাইড লাইনের পাশে রিজার্ভ লিস্টে নাম লিখিয়ে বসে পড়তে হয়। তাই আমি হীরো হওয়ার স্বপ্ন দেখি না, পাছে জিরো হয়ে যেতে হয় বলে। লোকে মাঠে আমায় খেলতে দেখে আঙ্গুল দেখিয়ে বলবে, ওঃ একদিন ছেলেটা কি ভালই না খেলতো—তার আগেই মাঠ থেকে সরে আসতে চাই'।

হালের ফুটবল খেলা আনা বিজ্ঞান আশ্রিত। একক অস্তিত্ব থেকে দলগত প্রতিষ্ঠাই বড়। সুতরাং ফুটবলের এই প্রথা প্রকরণে ব্যক্তিগত পারিপাট্যের চেয়ে দলগত সংহতির ওপরই নজর এবং গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশী। উইং বা স্ট্রাইকার নামক পজিসন গুলি এগোয়োজন খেলোয়াড়ের মধ্যে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে সত্য কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে, দলের স্বার্থে সব্বাইকেই বিশেষতঃ গোলকীপার ছাড়া দলের বাকী দশজনকেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির (গোল) পথে এগিয়ে আসতে হয় এবং সময়ে সময়ে পিছিয়েও পড়তে হয়। বলা বাহুল্য এই নতুন প্রয়োগ কৌশলে সার্থকভাবে সামিল হওয়ার জন্য একক নৈপুণ্য প্রকাশের পর্যাপ্ত অবকাশও হয়তো ক্ষেত্র বিশেষে ব্যাহত হয়। কিন্তু একথা তো স্বীকার করতেই হবে যে, দলের বাহত্তর স্বার্থেই সব। একক অস্তিত্ব নিতান্ত গৌণ।

মানসের কথাবার্তায়, চিন্তাধারায় ঐ দলগত স্বার্থ চিন্তা, পরিভাষায় যাকে বলে টিম ইন্টারেস্ট বেশ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। তার বিশ্বাস দলের সামগ্রিক কল্যাণ বা লাভ লোকসানের কথা বিবেচনা করে হাল্কে যে ক্রীড়াপদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে সামাদ, গোষ্ঠ পাল, মোনা দত্ত, নূরে মহম্মদ, দুলাল গুহঠাকুরতা, সত্তু চৌধুরী, সালে ভেঙ্কটেশ, মাসুদ ফকরী বা পি, কে, ব্যানার্জির মত আর কৃতী দিকপাল উইংগার বা ফরওয়ার্ড দেখা হয়তো যাবে না। ফুটবলের গতিবিধি হবে প্রায় যান্ত্রিক। ব্যক্তিগত প্রতিভা প্রকাশের পথ সেখানে অবরুদ্ধ।

১৯৫৬ সালের ২৫ এপ্রিল মানসের জন্ম বাটানগরে। বাবা সদাব্রত ভট্টাচার্য বাটার সুপারভাইজার। আদি বাড়ী বাংলাদেশের খুলনার রতনপুর গ্রাম। মানস অবশ্য সে সব কিছুই দেখে নি আজ পর্যন্ত। মা বাবা দু ভাই, তিন বোনকে নিয়ে মোটামুটি স্বচ্ছল সংসার মানসদের। সম্প্রতি বাড়ী হয়েছে বর্তমান আস্তানা নিউল্যান্ডসের কাছেই সুভাষ পল্লীতে। চাকরী করছে এ, ভি ওয়েস্ট বেঙ্গলে (এ্যাডমিনিস্ট্রেসন ২)। বাটা স্কুলে পড়ার সময় ১৯৭১ সালে সুব্রত কাপে (জুনিয়র ডুরাণ্ড) খেলেছে। ঐ খেলার সময়ই বাটার আর এক ফুটবল খেলোয়াড় অমিতাভ ঘোষের চোখে পড়ে যান মানস। গোড়ায় গোড়ায় খালি পায়ে খেললেও ১৯৭২

রাজস্থান ক্লাবের গোলকিপার সন্তোষ বসু

সঙ্গে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় পাশ করার আগে ১৯৭১ থেকে বুট পরে খেলা রপ্ত করেছেন। দ্বিতীয় ডিভিসনে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ (বিজ্ঞান) করার পর কলকাতার আশুতোষ কলেজে ভর্তি হয়ে যান কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে। ফুটবলের নানান ঝামেলায় মানসকে অবশ্য বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত কেমিস্ট্রি অনার্স ছেড়ে দিতে হয়েছে। পাস কোর্সেই তিনি বি, এস-সি পরীক্ষায় বসবেন (পরীক্ষা হলে হয়!) বলে ঠিক করেছেন।

বলা বাহুল্য মানসের ফুটবলের হাতেখড়ি বাটানগরেই। কলকাতার বিচিত্র গড়ের মাঠে ওঁকে নিয়ে আসেন এরিয়ান্সের গোলকীপার স্বপন লাহিড়ী। একদিন হঠাৎ স্বপন ওদের বাড়ী গিয়ে বললেন : 'মানস, বলেছিলি না, কলকাতায় খেলবি, চল তোকে ক্যালকাটা জিমখানার দিলীপদার (দিলীপ ঘোষ) কাছে নিয়ে যাই। ১৯৭৩ সালের সিনিয়ার ডিভিসনে সেই খেলতে আসার কথা মানসের মনে এখনও জ্বল্ জ্বল্ করছে। বাবা, মা, ভাইবোনেরা তো খুব খুশী। কলকাতার মাঠে খেলবে বলে কথা। বাবা অবিশ্যি মোহনবাগানের বিরুদ্ধে গোল করার দিনও খুশী হয়েছিলেন। মিষ্টি খাইয়েছিলেন বাড়ীর সবাইকে।

১৯৭১ সালে মানস বাংলা স্কুল দলে খেলেছেন বাটানগর স্কুলের ছাত্র হিসেবে। খেলা হয়েছিল গুজরাটের গান্ধীনগরে। ১৯৭৩ সালে খেলেছেন জুনিয়ার বাংলা আগরতলায় এবং মূল পর্যায় কৃষ্ণনগরে। ১৯৭৪ সালে পাতিয়ালার জুনিয়ার ইণ্ডিয়ান্স ট্রায়ালেও ডাক পেয়েছিলেন কিন্তু ভারতীয় দলে ঠাঁই হয় নি। কেন? সে প্রশ্নের উত্তর মানস দেন নি। শুধু আঙ্গুল তুলে কপালটা দেখিয়েছেন। —বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলাধূলা

দর্শক

এশিয়ান গেমসে ভারত

তেহেরানে সদ্যসমাপ্ত ৭ম এশিয়ান গেমসে ভারত চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় ৭ম স্থান লাভ করেছে—মোট পদক ২৮ (স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ১২ ও ব্রোঞ্জ ১২)। গত ১৯৭০ সালের ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমসে ভারত পেয়েছিল ৫ম স্থান—স্বর্ণ ৬, রৌপ্য ৯ ও ব্রোঞ্জ ১০। এবারের ৭ম এশিয়ান গেমসের আসরে ভারতের ২৮টি পদকের মধ্যে অ্যাথলীটরা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন ১৫টি পদক—স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ৭ ও ব্রোঞ্জ ৪। ১৯৭০ সালে অ্যাথলেটিকসে পদক ছিল ১৪টি—স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ৫ ও ব্রোঞ্জ ৫। এবার ভারত অ্যাথলেটিকস ছাড়া অন্য কোন বিভাগে স্বর্ণ পদক পায়নি। ভারতের পক্ষে এবার দুটি করে পদক পেয়েছেন তিনজন—অ্যাথলেটিকসে শিবনাথ সিং (স্বর্ণ ১ ও রৌপ্য ১), স্যুটিংয়ে ডাঃ কার্নি সিং (রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ১) এবং কুস্তিতে সুখচেন সিং (ব্রোঞ্জ ২)। গত ১৯৭০ সালের এশিয়ান গেমস আসরে ট্রিপল জাম্পে মহীন্দর সিং গিল এবং ডিসকাসে পরভীন কুমার নতুন এশিয়ান গেমস রেকর্ডে স্বর্ণ জয়ী হয়েছিলেন। এবার তাঁরা রৌপ্য পদক পেয়েছেন।

একনজরে

ভারতের পদক জয়

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
অ্যাথলেটিকস	৪	৭	৪
বক্সিং	০	৩	২
স্যুটিং	০	১	১
হকি	০	১	০
কুস্তি	০	০	৪
ব্যাডমিন্টন	০	০	১
মোট	৪	১২	১২

ভারতের পদক জয়

স্বর্ণ (৪) :

ডেকাথলন : ভি এস চৌহান
পয়েন্ট—৭৩৭৫ (এশিয়ান রেকর্ড)

লং জাম্প : টি সি যোহানন
দূরত্ব—৮·০৭ মিটার (এশিয়ান রেকর্ড)

৮০০ **মিটার দৌড় :** শ্রীরাম সিং
সময়—১ মিঃ ৪৭·৫৭ সেঃ
(এশিয়ান রেকর্ড)

৫০০০ **মিটার দৌড় :** শিবনাথ সিং
সময় ১৪ মিঃ ২০·৫০ সেঃ
(এশিয়ান রেকর্ড)

রৌপ্য (১২) :

অ্যাথলেটিকস (৭)
১০,০০০ মিটার দৌড় : শিবনাথ সিং
হ্যামার : নির্মল সিং
ডিসকাস : পরভীন কুমার
৩,০০০ স্টিপলচেজ : গুরুমেজ সিং
ট্রিপল জাম্প : মহীন্দর সিং গিল
সটপাট : বাহাদুর সিং

৪×৪০০ মিটার রীলে — ভারত
ট্র্যাপ স্যুটিং : কার্ণি সিং
হকি : ভারত

বক্সিং (৩)
লাইট হেভী : মহতব সিং
হেভী : টি বুরা
মিডল : মেজর সিং

ব্রোঞ্জ (১২)

অ্যাথলেটিক্স (৪)
ডেকাথলন : সুরেশ বাবু
লং জাম্প : সতীশ পিল্লাই
৪০০ হার্ডলস : লাম্বার সিং
সটপাট : জগরাজ সিং
স্কীট স্যুটিং : কার্নি সিং
ব্যাডমিন্টন : ভারত (দলগত পুরুষ)

বক্সিং (২)
ফ্লাই : চন্দ্রনারায়ণ
লাইট : মনস্বামী ভেনু

কুস্তি (৪)
হেভী : সুখচেন সিং
ফ্লাই : সতবীর সিং
মিডল : সতপাল সিং
হেভী (গ্রীকো-রোমান) : সুখচেন সিং

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

ফুটবল : স্বর্ণ ইরান রৌপ্য ইজরায়েল এবং ব্রোঞ্জ মালয়েশিয়া। ফাইনালে ইরান ১—০ গোলে ইজরায়েলকে পরাজিত করে এবং মালয়েশিয়া ২—১ গোলে উত্তর কোরিয়াকে পরাজিত করে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হয়।

হকি : স্বর্ণ পাকিস্তান, রৌপ্য ভারত এবং ব্রোঞ্জ মালয়েশিয়া। ফাইনালে পাকিস্তান ২—০ গোলে ভারতকে পরাজিত করে। এবং মালয়েশিয়া ৩—১ গোলে জাপানকে পরাজিত করে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হয়।

৫০০০ মিঃ-এ স্বর্ণ এবং ১০০০০ মিঃ-এ রৌপ্য পদক জয়ী শিবনাথ সিং

ওয়াটার পোলো : স্বর্ণ ইরান, রৌপ্য চীন এবং ব্রোঞ্জ জাপান।
(গতবারের চ্যাম্পিয়ান)

ব্যাডমিন্টন (দলগত) :

পুরুষ বিভাগ : স্বর্ণ চীন, রৌপ্য ইন্দোনেশিয়া এবং ব্রোঞ্জ ভারত। ফাইনালে চীন ৩—২ খেলায় ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত করে এবং ভারত ৩—০ খেলায় পাকিস্তানকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক পায়।

মহিলা বিভাগ : স্বর্ণ চীন, রৌপ্য ইন্দোনেশিয়া এবং ব্রোঞ্জ জাপান। ফাইনালে চীন ৩—২ খেলায় ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত করে এবং জাপান ৩—১ খেলায় দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হয়।

টেবল টেনিস (দলগত) :

পুরুষ বিভাগ : স্বর্ণ চীন, রৌপ্য জাপান এবং ব্রোঞ্জ উত্তর কোরিয়া। ফাইনালে চীন ৫—৪ খেলায় জাপানকে পরাজিত করে এবং উত্তর কোরিয়া ৫—১ খেলায় হংকংকে পরাজিত করে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হয়।

মহিলা বিভাগ : স্বর্ণ চীন রৌপ্য দক্ষিণ কোরিয়া (বর্তমানের বিশ্ব

চ্যাম্পিয়ান) এবং ব্রোঞ্জ জাপান। ফাইনালে চীন ৪—১ খেলায় দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে এবং জাপান ৩—০ খেলায় উত্তর কোরিয়াকে পরাজিত করে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হয়।

ভলিবল :

পুরুষ বিভাগ : স্বর্ণ জাপান, রৌপ্য দক্ষিণ কোরিয়া এবং ব্রোঞ্জ চীন।

মহিলা বিভাগ : স্বর্ণ জাপান, রৌপ্য দক্ষিণ কোরিয়া এবং ব্রোঞ্জ চীন।

টেনিস (দলগত) :

পুরুষ বিভাগ : স্বর্ণ জাপান, রৌপ্য চীন এবং ব্রোঞ্জ পাকিস্তান।

শুটিং : ১৮টি স্বর্ণ পদকের মধ্যে উত্তর কোরিয়া ১০টি স্বর্ণ পদক জয়ী হয়।

বাস্কেটবল :

পুরুষ বিভাগ : স্বর্ণ ইজরায়েল, রৌপ্য দক্ষিণ কোরিয়া এবং ব্রোঞ্জ চীন।

মহিলা বিভাগ : স্বর্ণ জাপান, রৌপ্য দক্ষিণ কোরিয়া এবং ব্রোঞ্জ চীন।

ফুটবল

এশিয়ান গেমসের ফুটবল প্রতিযোগিতায় ১৫টি দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল। খেলা হয়েছিল লীগ এবং নক-আউট প্রথায়। প্রাথমিক লীগ পর্যায়ে ১৫টি দেশ চার ভাগ হয়ে খেলেছিল—এ গ্রুপে ৩টি দেশ এবং বাকি তিনটি গ্রুপের প্রত্যেকটিতে ৪টি করে দেশ। প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দেশ পরবর্তী দ্বিতীয় লীগ পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল। দ্বিতীয় লীগ পর্যায়ে ৮টি দেশ দুভাগে দুটি গ্রুপে খেলেছিল এবং ফাইনাল খেলা হয়েছিল দুই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দেশের মধ্যে।

প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় এ গ্রুপে কোয়ায়েৎ, বি গ্রুপে ইরাক, সি গ্রুপে ইজরায়েল এবং ডি গ্রুপে ইরাণ সমস্ত খেলায় জিতে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। ভারত প্রাথমিক লীগ পর্যায়ে বি গ্রুপে খেলে নিম্ন স্থান পেয়েছিল। লীগের তিনটে খেলাতেই ভারতের হার—চীনের কাছে ...গোলে উত্তর কোরিয়ার কাছে ১—৪ গোলে এবং ইরাকের কাছে ০—৩ গোলে। দ্বিতীয় লীগ পর্যায়ের এ গ্রুপে ইজরায়েল এবং বি গ্রুপে ইরান লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে ফাইনালে উঠেছিল। ফাইনালে ইরাণ ১—০ গোলে ইজরায়েলকে হারিয়ে স্বর্ণপদক জয় করে। অপরদিকে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক পায় যথাক্রমে ইজরায়েল এবং মালয়েশিয়া।

প্রাথমিক লীগ খেলা

এ গ্রুপ : কোয়ায়েৎ (চ্যাম্পিয়ান), দক্ষিণ কোরিয়া (রানার্স-আপ) এবং থাইল্যাণ্ড।

বি গ্রুপ : ইরাক (চ্যাম্পিয়ান), উত্তর কোরিয়া (রানার্স-আপ), চীন এবং ভারত।

সি গ্রুপ : ইজরায়েল (চ্যাম্পিয়ান), মালয়েশিয়া (রানার্স-আপ), জাপান এবং ফিলিপাইনস।

ডি গ্রুপ : ইরাণ (চ্যাম্পিয়ান), ব্রহ্মদেশ (রানার্স-আপ) পাকিস্তান এবং বাহরেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ

এ গ্রুপ : ইজরায়েল (চ্যাম্পিয়ান), উত্তর কোরিয়া, কোয়ায়েৎ এবং ব্রহ্মদেশ।

বি গ্রুপ : ইরাণ (চ্যাম্পিয়ান) মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইরাক।

বক্সিং

বক্সিং প্রতিযোগিতার ১১টি স্বর্ণপদক চারটি দেশ এইভাবে পেয়েছে — দক্ষিণ কোরিয়া ৫, ইরাণ ৩ উত্তর কোরিয়া

রঙ্গজগতের রঙ্গকথা

মতিলাল সুরের 'ন্যাচরাল' অভিনয়

মতিলাল সুরের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট পরিচয় আছে। নীলদর্পণে তোরাপ, কপালকুণ্ডলায় কাপালিক আর বিষাদে মাধব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হয়ে আছে। কিন্তু মতিলাল সুরকে নিয়ে তাঁর বন্ধুবান্ধব বিশেষ করে রসরাজ অমৃতলাল খুব রঙ্গ-তামাসা করতেন। অমৃত মিত্র এবং মহেন্দ্রলাল বসুও রসরাজের সঙ্গে জোট বাঁধতেন। মতিলাল সুর খুব সবল প্রকৃতির লোক ছিলেন। অভিনয় উৎকর্ষের প্রতি খুব সচেতন থাকতেন এবং নিজের অভিনয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে বন্ধুদের মতামত চাইতেন। এই সুযোগে বন্ধুরা তাঁকে নিয়ে খুব মজা করতেন।

ন্যাশনাল থিয়েটারে মেঘনাদ বধ নাটকে মতিলালবাবু বিভীষণ চরিত্রে নির্বাচিত হয়েছেন। রিহার্সেল চলছে। ড্রেস রিহার্সেলও হয়ে গেল। ড্রেস রিহার্সেলের পর নিজের অভিনয় সম্পর্কে ভুনিবাবু অর্থাৎ অমৃতলাল বসুকে স্বীয় অভিনয় সম্পর্কে মতামত জিজ্ঞাসা করলেন।

অমৃতলাল গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন : দ্যাখ অভিনয় তোমার চমৎকার হয়েছে, তবে ন্যাচরাল হয়নি। মতিলালবাবু বললেন, আন-ন্যাচরাল হলে গিরিশবাবু কি কিছু বলতেন না?

অমৃতবাবু আরো গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন : আমিও তাই ভাবছি। গুরুদেব কি খেয়াল করেন নি?

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন : নতুন নাটক নিয়ে চিন্তা-ভাবনা। তাই--

মতিলালবাবু অধৈর্য হয়ে উঠেছেন : তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু পরিষ্কার করে বল।

অমৃতলাল বললেন : দ্যাখ, বিভীষণ ধার্মিক এবং শান্তশিষ্ট। সবাই তা জানে। কিন্তু সে তো রাক্ষস। রাক্ষসের জাতিগত বৈশিষ্ট্য তার থাকবেই। তোমার অভিনয়ে এই বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। কথাবার্তা, চালচলনে রাক্ষসের ভাব ফুটে ওঠা দরকার।

মতিলালবাবু একটু চিন্তা করে বললেন : ঠিক বলেছ। মানুষের চেয়ে দেবতা ও রাক্ষসের কথাবার্তা চালচলনে পৃথক হওয়া দরকার। যাই হক, এ-নিয়ে পাঁচ-কান করো না—অভিনয়ের সময় আমি সব ঠিক করে নেবো। তুমিও আমায় একটু সাহায্য করো।

অমৃতলালকে নিয়ে গোপনে মতিলাল বাবু রাক্ষসের হালচাল ঠিক করে নিলেন। জনাকীর্ণ নাট্যগৃহে 'মেঘনাদ বধ' অভিনীত হচ্ছে। চিত্ররথ ইন্দ্রজিত বধার্থে ইন্দ্রপ্রেরিত অস্ত্রাদি শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়ে গেলেন। রাম ও লক্ষ্মণ অস্ত্রাদি পরীক্ষা করছেন। এমন সময় বিরাট হুংকার ছেড়ে বিভীষণ বেশী মতিলালবাবু রামচন্দ্রের শিবিরে প্রবেশ করলেন। শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ চরিত্রে যথাক্রমে অভিনয় করছেন নটরাজ গিরিশচন্দ্র আর মহেন্দ্রলাল বসু। নাট্যামোদীরা তো দূরের কথা—এরা দুজনেও হতবাক।

বিভীষণ-বেশী মতিবাবু বললেন : হের খড়্গ রঘুমণি, অগ্নিশিখা সম, ধাধিছে নয়ন—এ ঘোর নিশীথে। —বলে একেবারে চক্ষু বিস্ফারিত করে এমন বিকৃত কণ্ঠে সংলাপটি বললেন যে দর্শক মহলে হাসির কোলাহল উত্থিত হলো।

গিরিশচন্দ্র মতিবাবুর এই আকস্মিক অভিনয় ধারার তাৎপর্য খুঁজে না পেয়ে আপাততঃ তাঁকে প্রতিহত করার এক কৌশল অবলম্বন করলেন। মতিলালবাবুর রাক্ষসের ভাবপ্রকাশ যাতে দর্শকরা দেখতে না পারেন, এজন্য সবসময় তাঁকে আড়াল করে কোনরকমে অভিনয় করে যেতে লাগলেন। কোন রকমে দৃশ্যটির অভিনয় শেষ করে গিরিশচন্দ্র মতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন : নেশা-টেসা করে এসেছো নাকি? কি মাতলামিটা করলে? আমি ঢেকে না থাকলে তো আজ কেলেঙ্কারীর শেষ থাকতো না?

মতিলালবাবু কোন রকম দমে না পড়ে বললেন : কেন, কি দোষ হয়েছে বলুন। বিভীষণ তো রাক্ষস। রাক্ষসের জাতিগত ভাবভঙ্গী ফুটিয়েছি—অভিনয়কে ন্যাচরাল করার জন্য।

মতিবাবুর এই নির্ভয় উত্তর এবং নিঃসংকোচে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য গিরিশচন্দ্রের সন্দেহ হলো--নিশ্চয়ই এর অন্তরালে কোন রহস্য আছে। অনুমান করলেন ভুনিবাবুই কোন কারসাজি করেছে। ভুনিবাবুকে ডাকানো হলো। তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না। মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃত মিত্র প্রভৃতিরা বিষয়টি জানতেন। তাই হাসি চেপে রাখতে পারলেন না। সকলকে হাসতে দেখে মতিলালবাবু বুঝলেন তাঁকে নিয়ে মজা করবার জন্যই অমৃতলাল এমনি উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি তখন সব কথা গিরিশচন্দ্রের কাছে খুলে বললেন।

গিরিশচন্দ্র বললেন : তুমি এত বোকা কেন? রাক্ষসের জাতিগত ভাবভঙ্গী যদি ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন হতো তাহলে তো আমিও বলতাম। অমৃত মিত্র তো রাবণ সেজেছে—সেতো হুংকারও ছাড়লো না—রাক্ষসের জাতিগত ভাবভঙ্গীও ফুটিয়ে তোলেনি। ভুনিবাবুর কথা তুমি শুনতে গেলে কেন?

অমৃতলাল বসুর মনোগত ইচ্ছা এবং নিজের বোকামির কথা মনে করে মতিবাবু খুবই লজ্জিত হলেন। সেই থেকে অমৃতলালের অনেক সিরিয়াস কথাও তিনি বিশ্বাস করতেন না। আর বন্ধুবান্ধবের ন্যাচরাল অভিনয়ের কথা উল্লেখ করে অবসর সময়ে বেশ মজা উপভোগ করতেন।

তখনকার ন্যাচরাল। আজকের বাস্তব।

সাহিত্য, শিল্প ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে আজ যেমন 'বাস্তব-বাস্তব' বলে রব উঠেছে তখন 'ন্যাচরাল-ন্যাচরাল' বলে সবাই চীৎকার করতেন। গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক তদানীন্তন প্রখ্যাত শিল্পী অন্নদাপ্রসাদ বাগচী 'সতীদেহ স্কন্ধে মহাদেবের' একখানি চিত্র আঁকেন। এই ছবি শিল্পী জটাজুটধারী মহাদেবকে শ্মশ্রু ও গুম্ফে ভূষিত করেছিলেন। ছবিখানি মুদ্রিত হবার পর মিনার্ভা থিয়েটারের জনৈক চিত্রকর স্বর্গতঃ বাগচীর ছাত্র ছবিটি এনে অর্ধেন্দুশেখরকে দেখিয়ে বললেন : দেখুন আমার গুরুদেব কেমন ন্যাচরাল ছবি এঁকেছেন। এর আগে কেউই মহাদেবের দাড়ি দেখাননি। কী রকম আন-ন্যাচরাল বলুনত! চিত্রকর অনেকক্ষণ ধরে তার গুরুদেবের ন্যাচরালিটি আর অপরদের আন-ন্যাচরালিটি নিয়ে অর্ধেন্দুশেখরের সামনে বক্তৃতা করছিলেন। অর্ধেন্দুশেখর বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন : দ্যাখ বাপু! এই ন্যাচরাল-ন্যাচরাল করেই তোমরা দেশটাকে উচ্ছন্নে দিলে। তোমার গুরুদেব ত দাড়ি দিয়ে মহাদেবের 'ন্যাচরাল' ছবি এঁকেছেন--কিন্তু মহাদেবের বড় বড় নখ দেননি কেন? তাহলেত আরো ন্যাচরাল হতো। বিলেতি ভাবের আর্ট স্কুলের শিক্ষায় তোমাদের এই 'ন্যাচরাল' ভূত পেয়ে বসেছে। আরে আহম্মক! তোমরা কি বুঝবে যে আমাদের দেবতাদের যৌবন চিরকালের। সেই জন্য কোন দেবতার দাড়ি নেই। পুরুষের যৌবন লক্ষণ গোঁফের রেখায় আর মেয়েদের যৌবন লক্ষণ পীনোন্নত স্তনে। কেউ তলিয়েও দেখবে না। বুঝবেও না। কেবল একটা শেখানো বুলি আওড়াও 'ন্যাচরাল-ন্যাচরাল!' চিত্রকর শিল্পীর মুখাবয়ব শেষ পর্যন্ত ন্যাচরাল থেকে আন-ন্যাচরাল হয়ে উঠলো। তিনি কোন কথা না বলে ছবিটি নিয়ে সরে পড়েন।

—[illegible]

নৃপতি চট্টোপাধ্যায়

বায়োস্কোপিক

নিরামিষ্য 'প্রভু' পদে উন্নীত হবার পর বিরাট আশা করা গিয়েছিল, কমেডিয়ান নৃপতি চাটুজ্যে এবার ত্যাগ এবং বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মাত্র লোটা-কম্বল সম্বল করে নিশ্চিতই হিমালয়ের গভীরে গমন করবেন—মথুরা বৃন্দাবন তো ঘরের কাছে! কিন্তু বাস্তবে তা তো হলোই না উল্টে তাঁর ইয়ে অর্থাৎ ভোগাসক্তি ফুলে-ফেঁপে প্রায় দ্বিগুণ আকারে দেখা দেবার উপক্রম হ'লো।

আর এহেন সংবাদে স্বয়ং ছবি বিশ্বাস বড়ই বিচলিত বোধ করলেন। খুবই স্বাভাবিক। কারণ তিনিই 'প্রভু' মেকার! একদিন মুডের মাথায় তিনি নৃপতি চাটুজ্যের সমস্ত আপত্তি রুল আউট করে দিয়ে আচমকা 'প্রভু' টাইটেলটা দিয়ে বসেছিলেন। আর এই ব্যাপটাইজ উপলক্ষে ওখানে বেশ বড় সাইজের একটা সেলিব্রেশান-ও হয়েছিল সেদিন।

কিন্তু অল্পদিন পর ছবি বিশ্বাসের কানে প্রভু সম্পর্কে কিছু উল্টোপাল্টা খবর পৌঁছতে উনি তো মহাবিচলিত। সঙ্গে সঙ্গে প্রভুকে এত্তেলা দিলেন।

প্রভু এলেন। ভঙ্গীটা কিঞ্চিৎ ডেসপারেট।

ছবি বিশ্বাস তাকে এক নজর দেখে নিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডায়লাগ দিলেন—ওহে নেপতি, আমি এত আশা করে তোমায় প্রভু করলাম, ভেক নিলে না কেন হে? তুমি তো দেখছি আচ্ছা পাষণ্ড!

নৃপতি চাটুজ্যে তখন ঘাড় চুলকে যেন কত অপরাধী, পাল্টা ডায়লাগ দিলেন—ছবিদা, তখনই আপনাকে বলেছিলাম টাইটেলটা আমায় দেবেন না। কারণ আমি অক্ষম আমি অপাত্র। তা গরীবের কথা বাসি না হলে তো মিঠে হয় না, এখন ঠ্যালা [illegible]। আপনি তো জানেন আমি এট্টু-আট্টু খেতে ভালবাসি, মুরগীর ঠেংয়ের রোস্ট ও আমের মালসা ভোগ কিছুতেই চালাতে পারব না। সে আপনি যতই ক্রুদ্ধ হ'ন। ওটা আজ পর্যন্ত কোন বাঙাল পারে নি, কোন বাঙাল পারবেও না।

বটে?

নৃপতি দৃঢ়কণ্ঠে ডায়লাগ রাখলেন—নিশ্চয়। আপনি এখন দয়া করে টাইটেলটা ফেরৎ নিন, নিয়ে আমায় মুক্তি দিন সখীদের অত্যাচার থেকে আমায় রেসকিউ করুন ছবিদা, অন্যথায় আমি হয়ত খেষ্টান হয়ে যাব—

আর টাইটেল ফেরৎ নেবার অনুরোধে ছবি বিশ্বাসের সেকি ক্রোধ। —ভালবেসে একটা দিলুম আর তুমি আমায় তা ফেরৎ দিতে এসেছো অকালকুস্মাণ্ড। গেট আউট, গেট আউট ইউ আনগ্রেটফুল—

সেদিন ছবি বিশ্বাসের ক্রোধে মস্টি-কার্লো হোটেলের অর্ধেকের বেশী খরিদ্দার হাওয়া। ফলে হোটেল ম্যানেজারের তো মাথায় হাত। সবে বিক্রী-বাটা শুরু হয়েছে আর তখনই যত হুজ্জুত। তবে ছবি বিশ্বাসের ডায়লগের কাউন্টার কে দেয়? আর কে-ই বা ওঁর রোষানলে রোস্ট হ'তে চ[illegible] সে এক পরিস্থিতি। শেষে নেপোতিক

দেখে নৃপতি চ্যাটুজ্যেই নতি স্বীকার করলেন।—ঠিক আছে ঠিক আছে দাদা, হগ্গোলরে কইয়া দিতা আছি — আইজ থিকা আমি প্রভু তবে দাদা—খাদ্য-খাদকের ব্যাপারটা, আপনিও একটু অ্যামেন্ড করে দিন, নিরামিষ্যি পারুম না, প্রোটিনের ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে।

ছবি বিশ্বাস তখন ক্রোধ সম্বরণ করে নিয়ে প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন—বেশ তাই হবে! তুমি প্রভু, প্রভুর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে সব হবে। যেটা তুমি ভাল মনে করবে সেটা করার স্বাধীনতা রইল তোমার হুজুরা...

প্রভু শেষ পর্যন্ত 'প্রভু' রয়ে গেলেন, এখন তো বায়োস্কোপের লাইনে উনি লিজেন্ডারি ফিগার: প্রভু সর্বত্রই। ওঁকে সবাই চেনে, সবাই মান্য করে। ওঁর অনুচরের সংখ্যাও যথেষ্ট; উনি তাদের সস্নেহে 'সেনাপতি' নাম [illegible] ডাকেন। প্রভু যখন সত্যিকারের মুডে থাকেন তখন ওঁর নানা বিভূতি দেখা যায়। অবশ্য নাস্তিকেরা তা বিশ্বাস করে না। কিন্তু ওঁর ভক্তমণ্ডলীর দৃঢ় বিশ্বাস—প্রভু ইচ্ছা করলে অলৌকিক কাণ্ড যখন তখন ঘটাতে পারেন...

প্রভু এখন থাকেন টালীগঞ্জে এ-রকম কনফার্মড ব্যাচেলার পৃথিবীতে দীর্ঘদিন দেখা যায়নি। কলকাতা থেকে উনি যেদিন রাতে টালীগঞ্জের বাড়িতে ফিরতে মনস্থ করেন, সেদিন গভীর রাত্রে, একেবারে লাস্ট ট্রাম ধরেই ফেরেন। টালীগঞ্জ সেকশানের প্রতিটি ট্রামকর্মী ওঁকে ভাল রকম চেনে। উনি লাস্ট ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে প্রথমেই কণ্ডাকটরকে কাছে ডেকে একে একে সাতখানা টিকিট কিনে ফেলেন এবং বিমূঢ় দু-একজন প্যাসেঞ্জারের চোখের সামনে একটি বেঞ্চিতে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে সটান নিদ্রা যান। অলিখিত শর্তে কণ্ডাক্টর তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করে গাড়িটি গ্যারেজ করবার ঠিক আগের মুহূর্তে।

প্রভু-ই একমাত্র প্যাসেঞ্জার কলকাতায়, যিনি এখনও ধারে বা বাকীতে ট্রামে যাতায়াত করে থাকেন। কোন কারণে যদি ওঁর

জয়া ভাদুড়ী
ফটো: অমৃত

পকেটে পয়সা না-ই থাকে, প্রভু কারও তোয়াক্কা না করেই ট্রামে উঠে বসেন। কন্ডাক্টরকে ইঙ্গিতে যা বোঝাবার বুঝিয়ে দেন। এবং পরদিন অতি প্রত্যুষে ওঁকে আবার ট্রাম ডিপোতে দেখা যায়। উনি এসেছেন আগের রাত্রের দেনা-মুক্ত হতে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিকিট কিনে উনি সে-গুলি তৎক্ষণাৎ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার বাড়িতে চলে যান।

টালীগঞ্জের ফাঁড়ি থেকে ওঁকে মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে রিকসাযোগে বাড়ি ফিরতে হয়। এই সময়টা প্রভুর পক্ষে খুবই ক্রুসিয়াল। ফাঁড়ির প্রত্যেকটি রিকসাচালক ওঁকে ভাল চেনে। প্রভু যেখানে একটিতে উঠে গেলে তখন রিকসাচালকেরই দায়িত্ব বর্তায়—ওঁকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছাবার।

একবার এখানেও হুজ্জুত হয়েছিল।

শীতের রাত। প্রভু রিকসা স্ট্যান্ডে এসে দেখেন, সব ভোঁ-ভো, একটি মাত্র রিকসা দাঁড়িয়ে, চালক বেচারি কম্বল মুড়ি-সুড়ি দিয়ে রিকসার ওপর নিদ্রা যাচ্ছে।

রাজা। অনিল চ্যাটার্জি। দেবরাজ রায়।
পরিচালনাঃ তপন সিংহ। ফটোঃ অমৃত

দেখে প্রভুর বড় মায়া হলো, আহা, এখন ওকে দিয়ে রিকসা চালানোটা অপরাধ।

প্রভু সিদ্ধান্ত নিলেন, নিজেই রিকসা চালিয়ে নিয়ে যাবেন। আর যেমন ভাবা তেমন কর্ম। প্রভু রিকসা চালাতে শুরু করে দিলেন। প্রথম কিছুক্ষণ রিকসাওয়ালা ধড়মড় করে জেগে উঠে দেখে, আরে বাপ, প্রভুজী নিজেই চালাচ্ছেন। সে দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করতে প্রভু কঠিন হাসিতে তাকে বললেন বাছা, আমাকে কোন রকম চেষ্টা করলে আজ তোমায় আর খোঁড়া করব।

— অ্যাঁ! রিকসাওয়ালার আর্তনাদ।
— হাঁ রোজ তুমি আমায় টেনে টেনে নিয়ে যাও, আজ আমি টানব। বেশরম কাঁহিকা।

— লেকিন প্রভুজী, মেরা কসুর?
প্রভুর হুংকার—শাট্ আপ্ ইউ রাস্কেল, চুপ করে বসে থাকো। এখন আরাম করতে থাকো, আমি বড় মানুষের মত চালাচ্ছি।

সেদিন গভীর রাত্রে, টালীগঞ্জের নির্জন রাস্তায় রিকসাওয়ালার প্রাণ যায় আর কি। রামভক্ত হনুমানের মত জোড় হাতে সে বসে, প্রভু কি প্রাণদণ্ড দেবেন, এই রকম ভঙ্গীতেই...

ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওর দারোয়ান বিশ্বেশ্বরী রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে সবে শুয়েছে, হঠাৎ গেটে হট্টগোল শুনে গিয়ে দেখে স্বয়ং প্রভু, অদূরে রিকসাচালক দাঁড়িয়ে।

প্রভু বিশ্বেশ্বরীকে হুকুম দিলেন—এই যে, তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম, এই বেয়াদপ রিকসাওয়ালাকে ওর প্রাপ্য ভাড়াটা মিটিয়ে দাও তো, আমার পকেট গড়ের মাঠ—

বিশ্বেশ্বরী তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করল। এমন হুকুম তাকে প্রায়ই নিতে হয়। রিকসাওয়ালা ভাড়া নিয়ে প্রভুকে দীর্ঘ এক সেলাম ঠুকে সরে পড়ল, তখন প্রভু গেলেন নিজের গৃহে।

একদিন প্রভুর সঙ্গে স্টুডিওর ক্যান্টিনে দেখা।
প্রভু সহাস্যে আহ্বান জানালেন—মধুময়।
এই 'মধুময়' শব্দটি প্রভুর ঠোঁটে যেন অনুক্ষণ লেগে আছে। ভাল-মন্দ যে কোন প্রসঙ্গের শুরু এবং শেষ প্রভুকে এটা বলতে শোনা যায়।

ওঁর সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা হতে হতে এক সময় প্রশ্ন করেছিলাম — আচ্ছা প্রভু, একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?

— মধুময়, নিশ্চয়।
— রাগ করবেন না তো?
— সন্ উনিশশো চল্লিশের ষোলই জানুয়ারী রাত সাড়ে নটার পর ওটা আর করি না। অতএব যা বলার আপনি এখন স্বচ্ছন্দেই বলতে পারেন—
— তা... আচ্ছা প্রভু, আপনি কখনও প্রেম করেছেন?

প্রভু এবার আমার দিকে লম্বা করে তাকালেন। আহা, কি মৃদুমন্দ হাসি! তারপর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললেন, সরি, আমি ওটা একবার ইনডিরেক্ট করেছিলাম—, মধুময়......

— ব্যাপারটা আমরা শুনতে পাই?
— মধুময়! তখন আমার এক পেটোয়া সেনাপতি ছিল, দুর্ধর্ষ, তাকে প্রায়ই দেখতাম মাঝে মাঝে সব ডায়লগ ঝাড়ছে। একদিন ব্যাটাকে কিঞ্চিৎ রগড়াতে সে স্বীকার পেলো যে প্রেমে পড়েই এইসব ডায়লগ নাকি তার মুখস্থ হয়েছে। আমি তাজ্জব। বটে? ব্যাপারটা মন্দ নয় তো! একদিন সেনাপতিটিকে বললাম, অয়, আমি প্রেম করব স্থির করেছি। তুই কি কস্? শুনে সে আহ্লাদে একখণ্ড নৃত্য করে আমায় বলল—ভালোই করছেন প্রভু তা কবে থিকা করবেন সেইটা কিছু স্থির করছেন নাকি?
— যদি কই আইজ থিকা—তুই কি কস্?
— খুব ভালো। তো চলেন, এখনই লাইগা পড়ি। পাত্রী ঠিক কইরা ফালাইছেন তো?

শুনে প্রভু যেন অথৈ জলে। — অয়, পাত্রী তো ঠিক করি নাই।
সেনাপতি এক লহমা চিন্তা করে জানাল, চিন্তার কিছু নেই প্রভু, সামনের ওই পুস্করণীর লগে যে বাড়ি, ওই বাড়িতে পরমা সুন্দরী এক পাত্রী আছে। তবে রঙ্গীন সাবুন লাগবো কিছু—
রঙ্গীন সাবান? সাবান দিয়ে কি হবে?

প্রেম পর্বে রঙ্গীন সাবানের কোন ভূমিকা আছে, এটা প্রভু জানতেন না। তিনি তো অবাক। সেনাপতি তখন এক্সপ্লেন করল, রঙ্গীন সাবান দিয়ে সে জলে ইয়ে খেলবে অর্থাৎ ব্যাঙাচি, এপার থেকে ছুঁড়ে মারলে সাবান ফর্-ফর্ করে ওপারের ঘাটলায় গিয়ে হাজির হবে। পাত্রী যখন ঘাটলায় এসে দাঁড়াবে তখনই শুরু হবে খেলা, আর এই খেলা দেখে সে যখন খুশী হয়ে হাসবে তখনই—
— তখনই কী?
সেনাপতি তখন কান এঁটো করে এক গাল হেসে বলল—প্রেম! হুঃ।

প্রভু সহাস্যে বললেন—তখন ওই রঙ্গীন সাবান এক পয়সায় দুখানি করে পাওয়া যেত। সেনাপতির ব্যবস্থাপত্র মত বেশ কয়েকখানি রঙ্গীন সাবান কেনা হল। তারপর পঞ্জিকা দেখে একটা শুভ দিন স্থির করা হল। এবং নির্ধারিত দিনে, দ্বিপ্রহরে পাত্রী যখন আঁচাতে ঘাটলায় এসে দাঁড়াল—শুরু হল রঙ্গীন সাবানের খেলা। আমি বহুদূরে একটা বাড়ির রকে উদগ্রীব হয়ে বসে। আমার সেনাপতি দাঁড়িয়ে এপারের আঘাটায় পাত্রী পুকুরের জলে রঙ্গীন

সাবানের ফরফরানি দেখে প্রথমে অবাক, পরে সেনাপতির সঙ্গে তার শুভদৃষ্টি হল—আমি ওখান থেকে সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি সেনাপতির মুখে হাসি, বলতে কি কিছুক্ষণের মধ্যে পাত্রীর সলজ্জ মুখে হাসি ঝিলিক দিতে শুরু করল আমি ভাবলাম কেল্লা ফতে, পাত্রীর সঙ্গে আমার প্রেম তবে আর ঠেকায় কে?

—তারপর?

—তারপর গাঢ় প্রেম, ইন্টারভ্যাল, বিবাহ!

—অ।...ইয়ে, আপনি বিয়ে করেন নি বলেই তো শুনেছিলাম—

—ঠিকই শুনেছেন। বিয়ে আমি করি নি, করেছে আমার সেনাপতি। আমি শুধু রঙীন সাবান যোগান-ই দিয়ে গেছি তা প্রায় বছরখানেক—

এই মানুষটিকে চিনে রাখুন। নানা রংগীন তথ্যের তবকে মোড়া এই মানুষটি বড়ই নিঃসঙ্গ, একাকী। জীবনের সুতীব্র বেদনাবোধ থেকেই তো প্রকৃত শিল্পীর জন্ম; নৃপতি চ্যাটার্জি সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবেন কি ভাবে? চলচ্চিত্রে আসার আগে, আমার আর একটা প্রশ্নের জবাবে প্রভু বললেন—মশায়, আমি কিছু করতাম না। থিয়েটার যাত্রা বা চাকরী-বাকরী—কিছুই না। অবশ্য তার কোন প্রয়োজনও ছিল না। ওঁর ছিল শুধু দেশ ভ্রমণের নেশা। সবাইকে হতভম্ব করে উনি হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে পড়তেন, আর ফিরতেন দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে, নানা দেশ-দেশান্তর ঘুরে।

প্রায় অসম্ভবের মধ্যে পড়ে না ব্যাপারটা যে বিগত ছত্রিশ বছর ধরে ক্রমাগত উনি মানুষ হাসাচ্ছেন? আমাদের বোঝা উচিত, এ-যুগের এক জীবন সংগ্রামেই জেরবার মানুষের শুকনো নিস্প্রভ গোমড়া মুখে হাসি ফোটানো কি দারুণ শক্ত কাজ! আর সেই কর্মটি-ই ওঁকে সুচারু রূপে সম্পন্ন করতে হয়—যখনই ডাক আসে—তখনই। কি মুস্কিল, ওঁর সুবিধা-অসুবিধার কথা কেউ বোঝে না বোঝার চেষ্টাও করে না এমন কি নিজের পেটও নয়। কমেডিয়ানের জীবনে এই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডী!

তিরিশের দশকে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের হাতের এক থাপ্পড় খেয়ে যখন প্রবল প্রতাপ বৃটিশ সিংহ খাবি খাচ্ছে, ওদের অস্ত্রাগার বেহাত এই সময় নৃপতি ছিলেন চট্টগ্রামে। অবস্থা সামান্য থিতিয়ে আসতেই চারদিকে পুলিশী সন্ত্রাস শুরু হয়েছিল, নৃপতি চ্যাটার্জির গ্রেপ্তার প্রায় অনিবার্য উনি টুক করে সরে পড়লেন। তারপর পুলিশের নজর এড়িয়ে সটান মহানগরী কলকাতায় চলে এলেন।

থাকেন এক হোটেলে। নানা চিন্তা-ভাবনায় দিন যায় হঠাৎ একদিন এক অন্তরঙ্গ বন্ধু বলল—বায়োস্কোপ করবি?

রাজার বন্ধু ভুতো
অরবিন্দ। আশাচন্দ্র

কিছু না ভেবেই নৃপতি বলেছিলেন—পেলে করি কিন্তু দিচ্ছে কে?

বন্ধু ওঁকে তৎক্ষণাৎ নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন খ্যাতনামা পরিচালক সুশীল মজুমদারের কাছে। আর সেখানে অভিনয় নয়, গীতবাদ্য নয় শিল্পের কোন ভাল-মন্দ আলাপ-আলোচনাও নয়, স্রেফ কিছু কেরিকেচার দেখিয়ে তার আস্ত একখানা সেকচার কেড়ে মুখ বন্ধ করলেন মজুমদার মশায়কে। বিব্রত সুশীলবাবু বললেন ঠিক আছে আর বলতে হবে না আমি সব বুঝতে পেরেছি।

—অ! তাহলে এখন আমি কি করবো?

সুশীলবাবু সহাস্যে বললেন—তাহলে আর কি আপনি লেগে পড়ুন আমার সঙ্গে—

নৃপতির মুখ দিয়ে তখন আর যেন কথা সরে না।—পড়বো?

—বিলক্ষণ!

উনিশ শো সাইত্রিশ সালের কথা, সেই যে উনি বায়োস্কোপে লাগলেন, আজ সন চুয়াত্তরে এখনও সগৌরবে লেগে আছেন। বয়স তো ইতিমধ্যে ষেষট্টি অতিক্রম করেই গেছে। উনি বললেন, এ পর্যন্ত আমি আমার যদ্দূর স্মরণে আছে, সাড়ে চারশোখানা বায়োস্কোপে অভিনয় করেছি। ধরুন—এর মধ্যে টুরেন্সখানি থেকে ইয়াব্বড় রোল আছে। খল নায়ক, চল নায়ক থেকে আরম্ভ করে ভাঁড়ামি অব্দি সব ধরনের চরিত্রেই উনি ইয়ে করেছেন অর্থাৎ অ্যাকটো করেছেন।

নাঃ, জীবনে অভিনয়ের স্বীকৃতি যেটা এখন সরকারী বেসরকারীভাবে সবাই সবাইকে দিয়ে কৃতার্থ হচ্ছে, তেমন কোন পুরস্কার পান নি। তবে সবচেয়ে বড় পুরস্কার যেটা পেয়েছেন তা হচ্ছে দর্শকের হাসিভরা মুখ। বললেন, সবাই কষ্টের মধ্যে থাকে যেটা আমিও থাকি লোকে এই পরিস্থিতিতে হাসবে কি করে? আমি সেই বিষণ্ণ মুখে হাসি ফোটাই, একজন শিল্পীর জীবনে এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে?

—রঞ্জন মজুমদার

লাইট অফ ডার্ক শ্যাণ্ডোজ।লানা পারকার: ডেভিড সেং

বিদেশী ছবি

আমেরিকান ক্লাসিক ছবি

কোলকাতার সিনে সোসাইটি এবং বিভিন্ন সিনে ক্লাবগুলি ছাড়া আর যাঁরা সময়ে সময়ে এবং বলা যায় প্রায় নিয়মিতই নির্দিষ্ট দর্শকদের বাছাই করা বিদেশী ছবি দেখিয়ে থাকেন তাঁদের মধ্যে কোলকাতার ইউ এস ইনফরমেশান সার্ভিস অন্যতম।

নিজস্ব অডিটোরিয়ামে বা ইউনিভার্সিটি সেণ্টারে মাঝে মাঝেই আমেরিকান ক্লাসিক ফিচার ফিল্ম দেখিয়ে থাকেন। এবং তার মধ্যে বেশীর ভাগই পুরনো ছবি।

সেখানে অতি সম্প্রতি যে ছবিখানা দেখানো হোল তার নাম 'টুয়ালভ ও ক্লক হাই'। ছবিটির পটভূমি ইংল্যাণ্ডে সময়কাল ১৯৪২ সাল, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যাহ্ন-সময়। পাত্র আমেরিকান বিমান বাহিনীর বোমারু বাহিনী। স্থান, এমন একটি জায়গা যেখানটা শহর থেকে দূরে হলেও শহরকে যে দুর্গের মত রক্ষা করেছে।

'টুয়ালভ ও ক্লক হাই'-এর গল্প সামান্য, তার বক্তব্যটাই প্রধান। আমেরিকান ফ্লাইং ফোর্টেস বোম্বিং গ্রুপের একজন কমাণ্ডিং অফিসারের অযোগ্যতা এবং ক্ষতিকর ও ভুল নির্দেশ দেবার ফলে বোমারু বিমানচালকরা প্রায়শই তাদের কাজে ভুল করত। এবং তার গাফিলতি ও ঢিলেঢালা পরিচালনব্যবস্থার ফলে একদিকে যেমন বৈমানিকেরা অলস ও কর্মবিমুখ হয়ে পড়ছিল অন্যদিকে তেমনি তার অধীনস্থ অফিসারেরা ও অন্যান্য কর্মীরা তার প্রতি নানা কারণেই আস্থা হারিয়ে ফেলছিল।

শেষ পর্যন্ত এক সময় সেই কমাণ্ডিং অফিসারের বদলে এলো একজন যুবা বয়সী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। সে এসেই সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করে শক্ত হাতে কর্তৃত্ব তুলে নিল এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই কড়া নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলার অনুশাসন চালু করল বাধ্যতামূলকভাবে। ক্রমে এক সময় দেখা গেল আগের অফিসারের আমলে যারা অযোগ্য কুঁড়ে এবং বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ছিল, তারাই আবার নতুন কর্মাধ্যক্ষের কঠিন নিয়মানুবর্তিতার ফলে যোগ্য এবং সক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে উঠল। নতুন অফিসারের 'আয়রন ডিসিপ্লিন' যেন তাদের মধ্যে এনে দিল নতুন উদ্যম। এই অফিসারটি তাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলল স্বাজাত্যবোধ। একজন সৈনিককে সক্ষমতার পরিচয় দিতে হলে সর্বপ্রথম যেটা প্রয়োজন।

অথচ অফিসারটি শক্ত হাতে কম্যাণ্ড করা সত্ত্বেও তার মধ্যে ছিল স্নেহ মমত্ববোধ ও শান্ত মানসিকতা।

শেষ পর্যন্ত সেই সব অধীনস্থ কর্মচারীদের দিয়েই অসাধ্য সাধন করে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশংসা ও সম্মানীয় হোল সে।

গল্প বলা যায় এইটুকুই। আপাতে যা আকর্ষণীয় বলা যায় না। কিন্তু বক্তব্য ছবির ট্রিটমেণ্ট, সংযম এবং গতিশীলতা ও পরিচালনা ও সবশেষে অভিনয়ের গুণে দর্শককে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত তার অগোচরেই টেনে নিয়ে যায়। অথচ ছবিটির প্রদর্শনকালে দু ঘন্টারও বেশী এবং যদিও যুদ্ধ এর বিষয়বস্তু, তবে শেষ দিকে কিছু বোমাবর্ষণের দৃশ্য ছাড়া যুদ্ধের কোন দৃশ্যই এতে নেই।

অভিনয়ে প্রথমেই যার কথা বলতে হয় সে হোল নবীন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল-রূপী গ্রেগরী পেক। আশ্চর্য সংযত অভিনয়। অভিনীত চরিত্রটিকে উনি আশ্চর্য মর্যাদা আরোপ করেছেন। গ্রেগরী পেকের এমনি চরিত্রাভিনয় দেখতে আমরা সচরাচর অভ্যস্ত নই।

ছবির শেষের দিকে যে বোমাবর্ষণের দৃশ্য আছে (প্রায় দশ মিনিটব্যাপী এবং যে স্কোয়াড্রনের সঙ্গে স্বয়ং ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থেকে বোমাবর্ষণকারীদের উৎসাহিত ও সাহায্য করেছেন) তা বাস্তব পটভূমিতেই অর্থাৎ আসল রণক্ষেত্র থে[কে] তোলা একথা ছবির প্রারম্ভেই বলে [দেওয়া] হয়েছে। বোমাবর্ষণের ও তার পরিণ[তির] দৃশ্যগুলি নিষ্পলক বসে দেখতে হয়। [এই] জায়গার ফটোগ্রাফিও এক কথায় দ[ক্ষতাপূর্ণ] কর্ম। এবং বলাই বাহুল্য দুঃসাহসিক।

ছবির গল্পটি ফ্ল্যাশব্যাকে বলা হয়ে[ছে] যখন সেখানে যুদ্ধকালীন এয়ারফ[িল্ডের] রেশ নেই। সব কিছু চিহ্নই প্রায় ম[ুছে] এসেছে, একমাত্র পরিত্যক্ত সিগন[্যাল] টাওয়ারটি এবং ... তে পোঁতা একটি প্র[স্তর] ঢেকে যাওয়া স্মৃতিফলক ছাড়া। [...] চারদিকে তখন শুধুই শূন্য প্রান্তর [...] সবুজের সমারোহ। অর্থাৎ যুদ্ধকা[লের] সব চিহ্নই মুছে গেছে কালের স্রোতে।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন হেন[রী] কিং। কাহিনীসূত্র সিডনি বার্টলে[ট] বেয়ার্ন লে জুনিয়ার রচিত 'টুয়াল[ভ] ও ক্লক হাই' উপন্যাস। প্রযোজ[না] করেছেন ডেরিল এফ জেনুক। এবং পরি[বেশক] টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স।

গ্লোবের সাম্প্রতিক আকর্ষণ টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের 'দি ম্যারেজ অব এ ই[য়ং] স্টকব্রোকার'। উপভোগ্য ছবি।

নিউ এম্পায়ারের ছবি ওয়ার্নার ব্রাদার্সের উইলিয়াম রাইনার অভিনীত 'ক্যাটল ওয়েস্টার্ন' ছবি।

এলিটে চলছে ফরাসী ছবি জিল আয়[ার]ল্যাণ্ড রাইডার অন দি রেন। ভাল লাগ[ার] মত ছবি।

—শা, র, চ

সুব্রতা চ্যাটার্জি

ওঁরা বলেন

ঃ অভিনয় তো আপনি অনেকদিন হোল করছেন ম্যাডাম, আপনার অভিজ্ঞতায় অভিনেত্রী হবার প্রধান যোগ্যতা কি হওয়া দরকার? অভিনয়ের ব্যাপারে ক্ষমতা না গ্ল্যামার নাকি যোগাযোগটাই প্লে করে বেশী?

– অভিনেত্রী হবার প্রধানতম যোগ্যতা অভিনয় নিঃসন্দেহে। আর সৌন্দর্য্যের গ্ল্যামার তাঁকে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। শুধু সুন্দর চেহারা দিয়ে তো আর অভিনয় হতে পারে না। অভিনয় দিয়ে তবু কিছুটা গ্ল্যামার পুষিয়ে নেওয়া যায়। তবে গ্ল্যামার আর অভিনয়ক্ষমতা — দুটো একসঙ্গে মিললে তো কথাই নেই। তাকে কেউই আটকাতে পারে না। যেমন আমাদের দাদা, উত্তমকুমারের কথা আর কি! যোগাযোগ বা সুযোগ যাই বলুন—এ ব্যাপারটা কিন্তু সেকেণ্ডারী। সুযোগ করে দেবার একটা চ্যানেল দরকার মানছি, কিন্তু এই যোগাযোগ কখনই কাউকে বড়ো অভিনেত্রী করে দিতে পারে না।

ঃ সৌন্দর্যের গ্ল্যামারে আপনার কিছুটা ঘাটতি আছে বটে, কিন্তু অভিনয় ক্ষমতা এবং যোগাযোগ—এ দুটো জিনিসে তো আপনার ঘাটতি নেই: তবুও কেন আপনি এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো ভালো হিরোইনের রোল পেলেন না?

– আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটাকে বোধ হয় ভাগ্যই বলা যায়। যোগাযোগের অনেক চ্যানেল আমার আছে ঠিকই কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি দাদা (মানে উত্তমকুমার) বা আমার স্বামী কখনও কারও কাছে আমার জন্য বলেননি। এজন্য আমার কোন অভিযোগ-অনুযোগ নেই। কারণ দাদা বা স্বামী লোককে বলে একটা বা দুটো ছবিতে আমায় সুযোগ করে দিতে পারেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো আমাকেই এগোতে হবে। অনেকে বলেন শুনি অমুক অভিনেতা ঐ মেয়েটাকে তুলে দিচ্ছে। আমি এ ধরনের কথা একেবারে বিশ্বাস করি না। আমার বিশ্বাস কেউ কাউকে তুলতেও পারে না, নামাতেও পারে না। যে যার ভাগ্যে ওঠে নামে। এককালে উত্তমকুমার 'ফ্লপ মাস্টার' ছিলেন, আর এখন দেখুন তাঁর অবস্থা। সুতরাং একে আর ভাগ্য ছাড়া কি বলব?

ঃ ক'দিন আগে একটা গুজব শুনেছিলাম যে তরুণবাবু আর আপনার মধ্যে নাকি মানসিক মিলনের অভাব ঘটেছিল! আপনারা দুজনে আলাদাও ছিলেন কিছুদিন! ঘটনাটায় একটু আলোকপাত যদি করেন।

– (মৃদু হেসে) গুজবটা স্বাভাবিকভাবে আমারও কানে এসেছে। বড়োরও (তরুণকুমার)। আপনি শুধু এটুকু শুনেছেন আমার সঙ্গে কারও কারও নাম জড়িয়ে কিছু শোনেননি?

ঃ হ্যাঁ, তাও শুনেছি। ইচ্ছে করেই নামটা গোপন রেখেছিলাম। শুভেন্দুকে নিয়ে তো?

[illegible] মেয়ে। দীপঙ্কর দে। রাজশ্রী বসু

না। স্বামীর দায়িত্বটা কম কেন হবে? তাহলে তো স্ত্রীর ওপর বেশী চাপ দেওয়া হয়।

: অভিনেত্রী হলে নানা ঝামেলায় সংসারের প্রতি নিশ্চয়ই যথোচিত নজর দেওয়া যায় না—এটা সত্যি কথা। আপনার ক্ষেত্রেও কি এ সত্য প্রযোজ্য?

— আমি যখন অভিনেত্রী, নিশ্চয়ই এ সত্য আমার ক্ষেত্রেও খাটবে। তবে সংসারের প্রতি এই অনিচ্ছাকৃত দায়িত্ব এড়ানোর জন্য মেণ্টালি আমি খুব ডিপ্রেসড হয়ে পড়ি। কিন্তু কি আর করব বলুন। অ্যাডজাস্ট করে নিতেই হয়।

: মজুত উদ্ধার আন্দোলন আজকের খাদ্য ও মূল্যবৃদ্ধি সমস্যার সমাধান কি করতে পারে?

— (একটু বিরক্তিই যেন) সত্যি বলছি ভাই এসব পলিটিকস-ফলিটিকস আমি বুঝি না, বুঝতে চাইও না। তবে মানুষের মুখের খাবারটুকু নিয়ে যে নোংরামি রাজনীতি চলছে এটা বন্ধ হওয়া দরকার। পেট পুরে যদি দুটো খেতেই না পেলাম তবে কিসের এই পলিটিকস। কোন আন্দোলন করলে কি হবে বা কিসে কি হতে পারে আমি বলতে পারব না, জানিও না। এটুকু শুধু বলতে পারি সরকারের এখুনি পজিটিভ কিছু করা উচিত।

: আজকের এই অর্থনৈতিক দুরবস্থায় সংসারের প্রতি আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য কি? আপনি কি সেটুকু করতে পারছেন?

— (বেশ বিজ্ঞের সুরে) আদর্শ স্ত্রী হয়তো আমি নই, তবে সংসারের প্রতি সব স্ত্রীরই সাধারণ কতগুলো কর্তব্য আছে। যেমন সংসার চালানো, আর্থিক আয়ের সঙ্গে সমতা রেখে ব্যয়ের লিস্ট তৈরী করা, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা। সংসারের এতসব দায়িত্বের আমি আর কতটুকুই বা করতে পারি। বাবার সংসারকে একটু দেখতে হয় নিজের এই সংসারেরও দায়িত্ব আছে, মেয়ের এডুকেশন আছে। উপরন্তু স্টার নাকি হয়েছি আমরা, সেই স্টার স্ট্যাটাস মেনটেইন করতেও বাড়তি কিছু পয়সা বেরিয়ে যায়। কিন্তু আয়ের পরিমাণটার তো তেমন হেরফের হয়নি। সুতরাং একেবারে কিছুই ধকল সামলাচ্ছি না বলব না।

: ছবির সংখ্যাও তো আপনার হাতে খুব বেশী নয় এখন, তবুও স্টার থিয়েটার ছাড়লেন কেন?

— এখন শরীরটা আমার একটু খারাপ যাচ্ছে, (কথাটা সত্যিই। কারণ সুব্রতা চ্যাটার্জির সঙ্গে এই লেখার জন্য যেদিন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করতে গিয়েছিলাম সেদিন আমাকে সঙ্গে নিয়েই নার্সিং হোমে গিয়েছিলেন। আমি অবশ্য নার্সিংহোম পর্যন্ত যাইনি। জ্বরও ছিল সেদিন তাঁর গায়ে দুর্বল লাগছিল দেখতে।) বলতে পারেন তাই বিশ্রাম নিচ্ছি। তাছাড়া শিল্পীরও একটু স্মৃতি রোমন্থনের প্রয়োজন হয় কখনও কখনও। তাই করছি এখন। অভিনয় ছাড়িনি, ছাড়বার ইচ্ছেও নেই।

: অনেকে বলেন হিন্দী ছবি দর্শকের রুচি বিকৃত করছে। এ অভিযোগ আপনি মানেন?

— না মানি না। কারণ আমার বিশ্বাস দুটো বাজে নাচ দেখিয়ে বা দৃশ্য দেখিয়ে দর্শকের রুচি খারাপ করা যায় না। আর এখন তো অনেক ভালো ছবিও হচ্ছে হিন্দীতে। দর্শকের রুচি বিকৃতি ঘটছে এটাও সত্যি নয়। বরং ভালো ছবির দর্শক এখন বেড়েছে অনেক। আমাদের ইণ্ডাস্ট্রির লোকরাই হিন্দী ছবি সম্পর্কে এসব মিথ্যে অপবাদ দেয়। নিজেরা ভালো ছবি করতে পারবো না, দোষ দেব অন্যের। এটা অন্যায়। খারাপ ব্যাপারটা নিয়ে চিৎকার না করে ভালো ছবি করার শ্লোগান দেওয়া হোক না।

: ভালো ছবি বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?

— সহজ সরল সুন্দর করে জীবনের কথা যে ছবি বলবে সেটাই ভালো ছবি। ছবি দেখার পর কেন কি হলো কোন্ দৃশ্যের সঙ্গে কার কি বক্তব্য এসব চুল চেঁড়া ভাবনা আমার আসে না। যাঁরা এ ধরনের ছবি করেন তাঁরা প্রতিভাবান নিঃসন্দেহে, কিন্তু আমার কাছে 'অনুভব', 'ফুলেশ্বরী' বা 'সান ফ্লাওয়ার' ছবির অ্যাপীল অনেক বেশী।

: অভিনয় তো অনেক করছেন অনেকদিন, বহু শিল্পীর সঙ্গে কাজ করেছেন, তরুণবাবু ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে হার্দিক সম্পর্ক হয়েছিল আপনার?

— ছোটবেলায় তো অনেক কিছুই হয়, ওগুলো মনে না করাই ভালো। অভিনয় করতে এসে ইমোশনাল অ্যাটাচমেণ্ট একেবারে হয়নি বলাটা মিথ্যে বলা হবে। হয়েছে একাধিক [illegible] হয়েছে। কাইণ্ডলি অমন নাম বলতে অনুরোধ করবেন না [illegible] পারবো না। এসব ঘটনা আমার মতে মনে হয় সব শিল্পীর জীবনেই কম বেশী ঘটে থাকে।

—নির্মল ধর

হাত কী সাফাই

প্রযোজনা :

পুষ্প পিকচার্স

ভাবাবেগ সমৃদ্ধ একটি অতি নাটকীয় কাহিনীর চিত্ররূপ

দুই ভাই শিব ও রাজু কায়ক্লেশে ভিক্ষে করে, চুরি পরিষ্কার করে মাকে কোনরকমে বাঁচিয়ে রেখেছিল, কিন্তু দামী দামী ওষুধ এবং ডাক্তারের ফী দেবার ক্ষমতা না থাকায় মাকে চিরতরে হারাতে হোল। বম্বেতে ওদের এক কাকা থাকেন, তাঁর কাছে যেতে গিয়ে পথে ওরা একে অপর থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলেও, কালক্রমে একই শহরে আজ একজন চোরাচালান দলের সর্দার আর একজন কুখ্যাত পকেটমার। দিনে দিনে দুই ভাইয়ের মধ্যে সংঘাত শুরু হোল—ভাই বা মিত্র হিসাবে নয় এবং একে অপরের শত্রু হিসাবে। এই শত্রুতার মূলে রয়েছে লক্ষপতি ধনী বাপের একই মাত্র কন্যা 'কামিনী'। ওঁকে নিয়েই অর্থাৎ লক্ষপতির কন্যা যখন প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তির মালিক, সুতরাং ওঁকে যেভাবেই হোক হাঁপিস করতে হবে। কুমার সাহেব অবকে শিব বিবাহিত হলেও সুন্দরী তরুণীদের সঙ্গ উপভোগ করতে ভালবাসেন। সুতরাং কিছু বেশী অর্থ দিয়ে 'রাজুর' কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন 'কামিনীকে' এবং ওকে নিজের বিশিষ্ট অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্যে নির্বাচিত করলেন। 'কুমার সাহেবে'র পর 'কামিনীর' কাকা এবং হবু স্বামীর ভূমিকায় এবার আসরে এলেন এক বদমাস ব্যক্তি রণজিত। ওরই অনুরোধে কামিনীকে অনেক অর্থের বিনিময়ে রণজিতের হাতে তুলে দিতে হবে, এর জন্যে শিব-(কুমার সাহেব) প্রচুর টাকা নিলেও, পারিবারিক কারণে শিব কামিনীকে অন্য কারো হাতে না তুলে নিজের বোনের মতোই দেখতে লাগলেন। কারণ ওঁর স্ত্রী ওঁর তরুণী প্রীতি এবং

স্মাগলারের ব্যাপারে বিশেষ কিছুই জানতেন না। তিনি আচমকা এই ঘটনা জেনে, গৃহত্যাগ করেন এবং সে রাত্রে চলন্ত ট্রেনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েও পারেন না। 'রাজুই' শিবের অর্থাৎ 'কুমারসাহেবের' স্ত্রীকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে সেবা ও যত্ন করে এবং নিজের বড় বোনের মতো নজর রাখে তার ওপর। স্মাগলার কিং-এর কাছ থেকে

হেমা মালিনী

বিনোদ খান্না

রণধীর কাপুর

নীকে উদ্ধারের জন্যে ও'র নিজের কাকাও মিথ্যার আশ্রয়
ও তাকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন। অবশেষে
নীর' জন্যে 'রাজুই' পুলিশ ডেকে এনে 'কুমারসাহেবকে'
শের হাতে অর্পণ করে। কিন্তু আসল অপরাধী রণজিং
য় যাবার চেষ্টা করলে শিব ঝাঁপিয়ে পড়ে 'রণজিংকে'
ফলে পুলিশের হাতে অর্পণ করে। কিন্তু এখানেই
র সমাপ্তি নয়। রাজু ও শিব বুঝতে পারে যে ও'রা
র ভাই, একে অপরের বন্ধু। শিব জানতে পারে তাঁর
ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা যায়নি। সুতরাং আবার
মিলন ভাইয়ে ভাইয়ে, স্বামী ও স্ত্রীতে এবং 'রাজু'
মিনীর'।

শিবকুমার তথা কুমারসাহেব এর চরিত্রে অপূর্ব অভিনয় করেছেন বিনোদ খান্না। রাজুর চরিত্রে রনধীর কাপুর এবং কামিনী চরিত্রে হেমা মালিনীও সুন্দর অভিনয় করার চেষ্টা করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় রণজিং, সিমি, সত্যেন্দ্র কাপুর, শপ্রু, রনধীর, রবি মেয়ার্স: রণজিং চিত্রনাট্যের প্রয়োজন মিটিয়েছেন। সংগীত পরিচালক হিসাবে কল্যাণজী আনন্দজী একাধিক জনপ্রিয় গানের সুর দিয়েছেন. লতা, কিশোরের গাওয়া একাধিক গান জনপ্রিয় হবে। আলোক-চিত্রগ্রহণে সুধীন মজুমদার তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ পরিচ্ছন্ন। পরিচালক প্রকাশ মেহরা চরিত্রে নাটকীয় অতিনাটকীয় ঘটনা দিয়ে, কেবল ওই প্রকাশের অংশটুকুকে আরো সুন্দর করে পর্দায় উপস্থাপিত করতে পারতেন

রেশম কা ডোরি :: ধর্মেন্দ্র - সায়রা বান

মাতৃ পিতৃহীন অজিতের একমাত্র স্বপ্ন বোন :
কীভাবে মানুষ করে সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর বিবাহ
কিন্তু গরীবের স্বপ্ন, হয়তো স্বপ্নই থাকে। 'বসন্ত '
মেলা উপলক্ষে গ্রামে যে নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করা :
তাতে অন্যান্য গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে অজিতের বোন
অংশ নেয়। ওখানে উপস্থিত ছিলেন অজিতের মনিব
রজনীর রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে একটি হার উপহা
ব্যর্থ হওয়ার জন্যে, একদিন মিথ্যা অজুহাতে রজনীকে
বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তার ওপর অত্যাচার করতে
হলেন। খবর পেয়ে অজিত বোনকে বাঁচাবার জন্যে
সঙ্গে দ্বৈত যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো, নিজের পিস্তলের '
মনিব নিহত হলেন আর মিথ্যা-সাজানো অপরাধে
সাত বছরের জেল হয়ে গেল। কিন্তু বোনের গ

রেশম কী ডোরী

মর্ডান পিকচার্স

ধর্মেন্দ্রর অপূর্ব অভিনয় সমৃদ্ধ

একটি উপভোগ্য চিত্র

...বর পেয়ে অজিত এক রাত্রে শের সিং-এর সঙ্গে যুক্তি করে ...জল থেকে পালালো। জেল থেকে পালিয়ে পুলিশের হাত ...কে বাঁচতে গিয়ে অজিত একটি চলন্ত ট্রেনে উঠে দেখলো ...কটি 'গুণ্ডা' মহিলা কামরায় উঠে অনুপমা ও তাঁর বন্ধুর ...পর হামলা করছে, সেই গুণ্ডার হাত থেকে দুই তরুণীকে ...দ্ধার করার জন্যে অনুপমা পুরস্কার দিতে চাইলেও অজিত ...ত্যাখ্যান করে পালিয়ে যায়। পরে 'রামনবমীর' দিন ...শহরা উৎসবে রাবনের মূর্তিতে আগুন দেবার পর ...ক্তি চাপা পড়ে আহত হলে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে ...য়। অজিত (বিনোদ ছদ্ম নামে) অসম সাহসের জন্যে ...নকার কাপড়ের কলে চাকুরী পেল। বছরের পর ...র লোকসানের জন্যে মিল-মালিক কারবার বন্ধ করে ...ত চাইলেন। তখন উনি নাতনীর (অনুপমা) অনুরোধে ...কদের একমাস সময় দিলেন, তারা যদি নিজেদের চেষ্টায় ...নর উন্নতি করতে পারে। বাস্তবে ঘটলোও তাই। ...চার মাসের মধ্যে লাভ বেড়ে গেল। কিন্তু কুচক্রী দিনেশ ...তার সাঙ্গপাঙ্গরা 'বিনোদ'কে জব্দ করবার ফিকির ...জ বের করতে গিয়ে 'অনুপমার' সঙ্গে বিনোদের ...র্ক নিয়ে কুপ্রচার চালিয়ে অনুপমার দাদুকে উত্তেজিত ...তোলে। কিছু লাভ না হওয়ায় দিনেশ একরাত্রে ...নাইট দিয়ে মিলে আগুন লাগিয়ে বিনোদ এবং ...রদের নামে সব দোষ দেবার মতলব করে। আগুন নেভায় মিলের মজদুররা, এমনকি অনুপমার দাদুও তাঁর ভুল বুঝতে পেরে ছুটে এলেন ওদের মধ্যে। অজিত (বিনোদ) হারানো বোন 'রজনীকে' পেল। কিন্তু এত ভালো কাজ করেও আগের কৃতকর্মের জন্যে ওকে আদালতে যেতে হোল, আদালত তাকে আগেকার সব অপরাধ থেকে মুক্তি দেয়। এবার আর অনুপমার সঙ্গে অজিতের আর রজনীর সঙ্গে পুলিশ অফিসারের বিবাহে বাধা রইলো না। বম্বের চির তরুণ নায়কদের বাদ দিয়ে যিনি অভিনয়ে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার অভিনয় সত্যিই প্রশংসনীয়। তিনি হচ্ছেন ধর্মেন্দ্র। অনুপমা রূপী সায়রা বানু, রজনী রূপী কুমুদ চুগানি, বিশাল রূপী সজ্জন, মিল মালিক রূপে শপ্রু, দিনেশ রূপে সুজিতকুমার, পুলিশ অফিসার রূপী রমেশ দেও অপূর্ব অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় রাজেন্দ্রনাথ, মীনা টি, জয়শ্রী টি, কুন্দন, ভগবান; শবনম; লীলা মিশ্র ও চাঁদ ওসমানী প্রভৃতি চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। সঙ্গীতাংশে শঙ্কর জয়কিষেন কয়েকটি জনপ্রিয় গান উপহার দেবার চেষ্টা করেছেন। আলোকচিত্রগ্রহণে কে জি প্রভাকর, সংলাপ রচনায় রাজেন্দ্র গৌড় ওঁদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ উচ্চাঙ্গের। পরিচালক আত্মারাম একটি উপভোগ্য ছবি উপহার দিয়েছেন।

—চিত্রদূত

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

। সূর্য/দেবরাজ রায় রাজশ্রী বসু

সমিত ভঞ্জ ও আরতি ভট্টাচার্য 'প্রেমের ফাঁদে'

ফ্লোর থেকে বলছি

—প্রচলিত প্রেম উপাখ্যান বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণির কাহিনী অন্যতম। এই বিষয়বস্তু প্রথম বাংলা পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র—পরিচালনা করেন রুস্তমজী দোতিয়ালা। মুক্তি পায় উনিশশো উনিশ সালের আটই নভেম্বর। তারপর মাঝে 'বিল্বমঙ্গল' আরেকবার চলচ্চিত্রায়িত হয়। দু দুবারই বিষয়বস্তুর পর অবিচার করা হয়েছে উল্লেখ করলেন এবারের প্রযোজক-পরিচালক প্রবীণ কুশলী গোবিন্দ রায়। কথাপ্রসঙ্গে বললেন : আমি এখানে বিল্বমঙ্গল আর চিন্তামণির প্রেমকেই প্রাধান্য দিয়েছি। নানারকম তথ্য সংগ্রহ করেছি কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'ভক্তমাল' থেকে। এছাড়া আরো কয়েকটা বইয়ের সাহায্য নিয়েছি। পিরিয়ড ছবিতে চরিত্রের সাজসজ্জা সেট সেটিং যেমন থাকে ঠিক তেমনই থাকছে। অথচ স্টাইল অফ ট্রিটমেন্ট' লাইন হচ্ছে আধুনিক। এই দেখুন এই ঘর হচ্ছে চিন্তামণির। ঘর না বলে আস্তানা বলাই ভাল। ঘরের ইনটিরিয়র ডেকরেশন (শিল্প-নির্দেশনা : গৌর পোদ্দার) থেকে শুরু করে আর্টিস্টদের মেক-আপ আর কস্টিউম দেখুন। চিন্তামণির সাজপোষাক অবশ্যই খুব সাধারণ। হ্যাঁ খুব সাধারণ। এই ভূমিকায় সোমা দে এখন আমার চোখের সামনে। চোখ দুটিতে এমনিতেই অনেক বেদনা তদুপরি ছলছল করছে। করবেই তো। অদূরে দাঁড়িয়ে বিল্বমঙ্গল, সমিত ভঞ্জ। বিল্বমঙ্গলকে বিদায় দিতে চিন্তামণির মন চাইছে না। তবুও তাকে দিতে হচ্ছে। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির রূপেগুণে মুগ্ধ। সে তাকে চোখের আড়াল হতে দিতে চায় না। প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসে। চিন্তামণি এই ভালবাসা আপন করে নিতে চায়। তাকে বাধা দেয় সমাজ সংস্কার ইত্যাদি। সে প্রকাশ করতে পারে না। বলে : তোমায় মিনতি করে বলছি তুমি যাও আর এস না।

বিল্বমঙ্গল : আসব না? আমি যে তোমাকে ভালবাসি।

চিন্তামণি : ভালবাসি, ভালবাসি। তোমার এমন পাগলকরা ভালবাসা আমার মতো সামান্য নারীকে দিয়ে কেন ছোট করছো।

বিল্বমঙ্গল : ছোট করছি?

চিন্তামণি : হ্যাঁ শোনোনি। তোমাকে সবাই লম্পট বেশ্যাসক্ত বলে। ......চুপ করে আছো কেন? যাও চলে যাও—তোমার কি লজ্জা নেই?

[চিন্তামণির চোখ থেকে অশ্রুবিন্দু নয় যেন এক একটি মুক্তো ঝরে পড়ে।]

বিল্বমঙ্গল : বেশ আমি চলে যাচ্ছি চিন্তামণি......কিন্তু আমার যে কেউ নেই। কোথায় যাবো আমি—

বিল্বমঙ্গল/সোমা দে ফটো :

চিন্তামণি : কেউ কারো আপন যিনি সবচেয়ে বেশী আপন তাঁরই নাও।

বিল্বমঙ্গল : কে সে?

চিন্তামণি : ভাল করে তাকিয়ে।

(সোমা ব্যাক টু ক্যামেরা ছুটে দেওয়ালের দিকে। অনুসরণ করে নাটকীয় দৃশ্য। সোমা দেওয়ালের প একটা কাপড়ের আবরণ সরিয়ে উন্মোচিত হয় কৃষ্ণমূর্তি। এদিকে চো সে সংলাপ বলতে থাকে......)

ভাল করে তাকিয়ে দ্যাখ—যাঁর আপন কেউ নেই—যিনি অসহায়ের রূপ! এ রূপের তুলনা আছে? আছে?

বিল্বমঙ্গল অসহায়ের মতো থাকে।

অনে . কিছু বলা না বলার ম দৃশ্যটি এই মুহূর্তে আমাকে আপনাদেরও নিয়ে যাচ্ছে এক অনুভূতির জগতে। এই যে মোমেন মুহূর্ত সৃষ্টি যা মনে দাগ ক আধুনিক চলচ্চিত্রসৃষ্টির অন্যতম লক্ষণ। চিত্রনাট্যকার-পরিচালক শ্রীর কিছু করার চেষ্টা করছেন। পুরাত বস্তুর আধুনিক চিত্ররূপ—এ এ পরীক্ষা নিশ্চয়ই। পরীক্ষা-নিরী যে প্রেরণা থাকা উচিত অথবা ম —দুটোই আছে তাঁর মধ্যে। শো যদি থেকে যায়, যদি না কম্পে জনা হাত বাড়াতে হয় তাহলে অনিবার্য। তাহলে আরো, আ চিরন্তন কাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্র হ দেবেন নতুন দিনের স্রষ্টারা।

নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর মাঠে ছড়িয়ে বসেছিল মহুয়া—ম চৌধুরী। 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' এ সঙ্গে এই মহুয়ার অনেক তফাৎ। সময় গড়িয়ে গেছে। দিন, মা

লেখক কে.........?
কোন ছবি.........?
পরিচালক কে.........?

শ					

উত্তর ৭৪ পৃষ্ঠায় দেখুন।

সংগীত গ্রহণে গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সংগীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ মান্না দে এবং পরিচালক সলিল দত্ত।
ফটো : অমৃত

চবাহিত। মহুয়া এখন ঠিক কিশোরী যুবতী। সেটা শুধু বাহিরঙ্গে। রঙ্গে একেবারে কিশোরী। চপলতার নেই। দুষ্টুমির হিসেব নেই। মাঝে সে আবার গার্জিয়ানও বটে। বাড়ির খা পোষা বেড়ালের। মহুয়া সতেরো আঠেরো, বকুনি যা খেয়েছে চয়ে বেশী বকেছে বেড়ালদের। মত স্নান না করলে, সময়মত না খেলে ভীষণ রেগে যায়, খুব বকে। বেড়াল-সুড়সুড় করে সামনে চলে যায় নীচু করে। অর্থাৎ শাসন মাথা গ্রহণ করছে ওরা, মহুয়া খুশী। নদের নিয়ে বেড়াতে যায়, এটা ওটা দেয় আদর করে, গান শোনায়, নাচ। হ্যাঁ ভাল কথা মহুয়া খুব ভাল ছবিতে নামার আগে কতবার যে ফাংশান করেছে। নৃত্যপটিয়সী ব বেশ খ্যাতি হয়েছিল। সে সময় একটা নাম নিয়েছিল। ওর স্কুলের আসলে শিপ্রা। ডাক নাম টুনটুন। নেম মহুয়া। আর ছবিতে তো চরিত্রের বিভিন্ন নাম। যখন যে কাজ করে সেই ছবির চরিত্রের নাম াকলে মহুয়া চটপট উত্তর দেয়। ও চরিত্রের মধ্যে থাকে। ঠিক এখনই ওকে একটা নামে ডাকলাম। সলিল 'সেই চোখ' এর নায়িকার নাম। লে তাকাল। হাসল। বলল :
—পরের শটেই আমি আছি।

লাম ফ্লোরের মধ্যে। শুটিং জোনে নামী দামী তারকার মেলা। হয়ে বসে আছেন নায়ক ার। তাঁকে ঘিরে বাসবী নন্দী নারীচরিত্রের শিল্পী), শৈলেন াধ্যায়, তরুণকুমার, শ্রাবণী বসু মার, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অমর-মুখোপাধ্যায় সোমা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো অনেকে। এঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল মহুয়া। বৃহদাকার ঘরের দরজায়। দৃশ্যটা সাজিয়ে ফেললে অন্যতম সহকারী শ্রীকান্ত। ক্যামেরা ছিল ট্রলিতে। আলো করা হতেই পরিচালক সলিল দত্ত নির্দেশ দিলেন 'স্টার্ট সাউন্ড'। সংগে সংগে 'স্টার্ট ক্যামেরা'। ক্যামেরাসহ বিজয় ঘোষ এবং তাঁর সহকারীরা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এগিয়ে গেলেন। প্লে-ব্যাক চলছে। লিপ দিচ্ছেন অনেকে। মহুয়ার পরি-প্রেক্ষিতে। মহুয়া গট গট করে এগিয়ে এলো ক্যামেরার দিকে। অসহ্য, অসহনীয় পরিস্থিতি। তাকে লক্ষ্য করেই এই গান (মান্না দে ও সহশিল্পীদের গাওয়া। নচিকেতা ঘোষের সুরারোপ)। মহুয়ার চোখে জল। হোল্ড। পড়েও পড়ল না। ক্যামেরায় এই মুহূর্তটি ধরে রাখা হল। কাট অথবা ছেদ।

গীতাঞ্জলি পিকচার্সের এই ছবি 'সেই চোখ'। রচনা এবং চিত্রনাট্য পরিচালকের নিজেরই। ছবির শুটিং এক-তৃতীয়াংশ শেষ।

স্টুডিও সংবাদদাতা

স্টুডিও সংবাদ

কলকাতার স্টুডিওতে কাজকর্মের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এই সপ্তাহে প্রায় প্রত্যেকটা স্টুডিও এবং স্কোরিং পর্যন্ত কর্মরত। টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর স্কোরিং ও তরুণ সঙ্গীতপরিচালক আনন্দশংকর দুখানা গান রেকর্ড করলেন—'বারবধূ' ছবির জন্য। গাইলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। 'বারবধূ' মঞ্চে সাফল্যের পর—চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে। চিত্ররূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন বিজয় চট্টোপাধ্যায়। এ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে শিমুলতলায় বহির্দৃশ্য গ্রহণ তথা দৃশ্যগ্রহণের কাজ শুরু হচ্ছে। একটানা পনেরোদিন ধরে শুটিং চলবে। এই পর্যায়ে শিল্পীদের মধ্যে থাকছেন—সমিত ভঞ্জ গীতা ('গরম হাওয়া' খ্যাত, এই প্রথম বাংলা ছবিতে অভিনয়), সোমা দে, উৎপল দত্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায় রবি ঘোষ প্রভৃতি। চিত্রগ্রাহক : শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদনা করবেন গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়। বিস্তারিত বিবরণ বারান্তরে জানানো যাবে।

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে যাত্রিক গোষ্ঠীর পরিচালনায় কোয়ালিটি পিক-চার্সের 'অধিকার' এর শুটিং এগিয়ে চলেছে। মহাশ্বেতা দেবীর 'মোমবাতি' অবলম্বনে উমানাথ ভট্টাচার্যের চিত্রনাট্যে অভিনয় করছেন প্রধান চরিত্রে—উত্তমকুমার। বিশিষ্ট কয়েকটি চরিত্রে শিল্পী : অনিল চট্টোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় এবং নন্দিতা বসু। অনাথ আশ্রমের পটভূমিকায় গল্প শুরু, ছড়িয়ে পড়ছে দুটি পরিবারে। যোগাযোগ করছে একটি চরিত্র যার বয়স সাত কিম্বা আট—অভিনয় করছে নবাগত শিশুশিল্পী অর্ঘ্য বসু। চিত্রগ্রহণ করছেন অনিল গুপ্ত। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করেছেন নচিকেতা ঘোষ।

এ মাসের সাতাশ তারিখ থেকে যাত্রিক গোষ্ঠী আরেকখানা ছবি শুরু করছেন। কৌটিল্য গুপ্তের 'স্নো ফকস ক্যাবারে'। পার্থপ্রতিম চৌধুরী চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। নায়ক : উত্তমকুমার। নায়িকার ভূমিকায় রূপ দেবেন মিঠু মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ করবেন : অনিল গুপ্ত।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে হীরেন নাগের পরিচালনায় 'প্রিয় বান্ধবী' রেচনা

প্রবোধকুমার সান্যাল)-এর শুটিং চলছে। এক সাক্ষাৎকারে শ্রী নাগ জানিয়েছেন, শুটিং প্রায় শেষ হয়ে এলো। এই পর্যায়ে শুটিং করছেন নায়ক উত্তমকুমার ও নায়িকা সুচিত্রা সেন। এ ছবির অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে আছেন : তরুণকুমার, বঙ্কিম ঘোষ, দিলীপ মুখোপাধ্যায় এবং জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। আলোকচিত্রশিল্পী : কানাই দে। শিল্পনির্দেশক : সূর্য চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালক : নচিকেতা ঘোষ।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে প্রবীণ পরিচালক মানু সেন 'মোহনবাগানের মেয়ে' ছবির শুটিং এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। শৈলেশ দে'র লেখা হাসির গল্প সলিল সেন কৃত চিত্রনাট্য। ওয়ান আফটার আনাদার ফানি সিচুয়েশন। দেখলাম উৎপল দত্ত ছেলের বাবা সেজেছেন। মেয়ে দেখতে এসেছেন। তিনি ছেলের বিয়ে দেবেন এমন মেয়ের সঙ্গে যার সাতকুলে কেউ ইস্টবেঙ্গল নেই। চারপাশে আছে শুধু মোহনবাগান। চাই মোহনবাগানের মেয়ে। ছেলে, দীপংকর বেচারা। প্রেম করে বসে আছে এমন মেয়ে, বাসন্তী বসুর সঙ্গে যে ঘোরতর ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক। দাদা, চিন্ময় রায়, ইস্টবেঙ্গলের প্লেয়ার। এত সব ঝগড়াঝাঁটি মেটাবার দায়িত্ব নিয়েছেন রবি ঘোষ। তিনি হাঁটু মালিশ করছেন। মালিশ করতে গিয়ে একটার পর একটা—ঘটনা। ক্যামেরার ধারে রয়েছেন মণীন্দ্র দাশগুপ্ত।

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে পরিচালক পীযূষ বসু 'বাঘ-বন্দী' ছবির শুটিং করছেন। সেটে ঢুকে দেখলাম প্রধান চরিত্রে শিল্পী উত্তমকুমার একটা খড়ের আটচালার মধ্যে বসে আছেন। নিতান্তই কাহিনী এবং চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে। কাহিনীকার প্রফুল্ল রায়। চিত্রনাট্যকার, পরিচালক নিজেই। অসীমা ভট্টাচার্য নিবেদিত এ ছবির অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে আছেন : মহুয়া রায়চৌধুরী, পার্থ মুখোপাধ্যায়, অসিতবরণ, গীতা দে এবং সুপ্রিয়া দেবী। চিত্রগ্রহণ করছেন : গণেশ বসু।

স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এ সুখেন দাশের নিবেদন কলাপ্স হিন্দি ছবি 'অনজানে মেহমান'-এর শুটিং দ্রুত এগিয়ে চলেছে। গোলাপ পিকচার্সের ব্যানারে এ ছবি উঠছে। কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার : সুখেন দাশ। পরিচালক : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। বর্তমান লটে শিল্পীরা যাঁরা কাজ করছেন : সমিত ভঞ্জ, সুখেন দাশ, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সাধনাব্রত দত্ত, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবি ঘোষ। এ ছবির নায়িকা সুস্মিতা সান্যাল। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করছেন : পদ্মা দেবী সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মেনকা দেবী, মাস্টার পার্থ, শ্যামল রায়-চৌধুরী এবং জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ করছেন কে এ রেজা। শিল্প নির্দেশনায় আছেন সূর্য চট্টোপাধ্যায়। কুশেশ্বর এবং যোগেশ রচিত গানগুলিতে সুরারোপ করেছেন অজয় দাশ। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন : মান্না দে, শ্যামল মিত্র এবং হৈমন্তী শুক্লা।

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

এবার কিছু 'ধরম নরম' পরিবেশন কর
যাক। অর্থাৎ ধর্মেন্দ্রর প্রসঙ্গে নরম কিছু
সে এখন আর আশার আশায় নেই। আশ
সচদেব বেশ কিছুদিন ঘুরে ফিরে, নিজে
উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে কেটে পড়েছে
ধর্মেন্দ্রের সঙ্গে শুধু নাম নয় নিজে
নানাভাবে জড়িয়েছিল আশা। উদ্দেশ্য
জলের মতো পরিষ্কার—পাবলিসি
স্টান্ট। এ বিষয়ে দ্বিমত আছে। অনে
বলেন ওদের মধ্যে রোমান্স বেশ
হয়েছিল। প্রতিদিন শুটিং-এর পর দে
যেত ধর্মেন্দ্রর আশার জন্য অপেক্ষা ক
আশা আসে ওকে নিয়ে যায়। এ
ঘনিষ্ঠতায় হঠাৎ ফাটল ধরেছে। আ
আর আসে না। শুটিং-এর পর ধর্মে
একাই চলে যায়। মেজাজ খুব খ
থাকে। আর এমতাবস্থায় যদি আ
সাংবাদিকের মুখোমুখি হতে হয়
কথায় কথায় একটু প্রশ্ন হয়
জোরালো—নায়িকাদের সঙ্গে তোমার
জড়িয়ে যেসব কথা বাজারে চালু অ
তার কতটা সত্যি বলতে পা
: একবর্ণও না। আসলে তোমরাই আম
ক্যাসানোভা বানিয়ে দিয়েছ। রোজ এ
করে নতুন গল্প বানাচ্ছো আর রসিয়ে বি
দিচ্ছো। পড়ে এক একসময় আমার
রাগ হয় আবার হাসিও পায়। কি ব
আমি যদি এত রোমান্সেই করি তো
শুটিং করি কখন। তোমাদের লে
আমার রোমান্সের যা বহর তাতে সব
কোন না কোন নায়িকার সঙ্গে আ
বিছানায় থাকতে হয়। আফটার অল
তো একটা মানুষ। আমি বিবা
আমার স্ত্রী আছে, সন্তান আছে এবং
সংসার আছে। দিনে দু' শিফট
শুটিং করে, এতসব করে, হার্টের রো
করার সময় কোথায়? বিশ্বাস কর
ওসব লাইনে একদম নেই। তোমরা স
লেখ 'গরম ধরম'—এবার থেকে
ক্যাপসানটা একটু বদলে দিও 'ধরম ন

বম্বেতে 'পার্টি' বস্তুটাই
জমজমাট। তারপর আবার যদি সেট
'ফিল্মি'। গত মাসের শেষ দিকে এ
হল সুবিখ্যাত প্রযোজক-পরিচ
অভিনেতা ও, পি রলহনের জন্ম
আউট অ্যান্ড আউট 'ফিল্ম পার্টি'.
হাঙ্গামা। শুরু হতে হতেই
উপস্থিত হলেন সঞ্জীবকুমার। ত
অনেকেই এসে গিয়েছেন। কেউ ম
করছেন, কেউ গান গাইছেন
নৃত্যরত। যাকে কেন্দ্র করে এত কি

দৃশ্য : প্রেমনারায়ণ শর্মিলা ঠাকুর। পরিচালনা : শক্তি সামন্ত

...রা মাল টেনে বুঁদ। সঞ্জীবকে ...লক দেখে উঠে বসবার চেষ্টা করে, ...ন। পারে না। জড়িয়ে জড়িয়ে কথা ...র চেষ্টা করে। উদ্ধার করতে পারলে ...মর্মটি এই দাঁড়ায়—'সঞ্জীব আমি ...মার সঙ্গে আছি। দ্যাখো কে এসেছে। ...তে পারো? সেই অপমানের প্রতিশোধ ...র এই তো সময়, এগিয়ে যাও সঞ্জীব, ...ম তোমার সঙ্গে আছি।' সঞ্জীব তখন ...নক দূরে। বিরাট হলঘরের এক প্রান্তে। ...সেখানে দাঁড়িয়ে নূতন—যার বার চোখ ...ট আড়াল করার চেষ্টা করে। সঞ্জীবের ...খে আগুন। নীরব কয়েকটি মুহূর্ত। ...ণে চুরমার হয়। ব্যাণ্ড আর ট্রাম্পেটের ...দ একাকার হয়। তালে তালে পদ্মা ...া আর রীণা রায়ের চটুল নাচ। কেউ ...উকে খুঁজে পায় না। তখন পরিপূর্ণ ...ঙ্গামা।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন মেহমুদের ...ক বউ আমেরিকান। সম্প্রতি মেহমুদ ...স্ত্রীক শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিল। বেশ ...য়েকদিন থাকার পর টাকাকড়ি যা নিয়ে ...গিয়েছিল সব শেষ। দেশে ফেরার জন্যও ...অবশিষ্ট কিছু নেই। শ্বশুরবাড়িতে ...জানতে পারলে প্রেস্টিজ যাবে। তার চেয়ে ...বরং কাজের কাজ করা যেতে পারে, ভাবল ...মহমুদ। ওদেশে কাজ বিচারের কোনো ...মাপকাঠি নেই। সব কাজই সমান। ...নিশ্চিন্ত কল্পে কাজে লেগে গেল মেহমুদ ...কার ক্লিনার'এর চাকরী। বউকেও কাজে ...লাগিয়ে দিল—শর্ট টার্ম অ্যাসাইনমেন্টস-এ ...স্কুল-টিচার।

অভিজিৎ
২১।৯।৭৪

বিবিধ সংবাদ

স্টুডিও কর্মীদের বিশ্বকর্মা পূজা ও নাট্যাভিনয়

ভূতপূর্ব নিউ থিয়েটার্স ২নং স্টুডিও বর্তমান স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর পশ্চিমবাংলা সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্যে পুনরায় দ্বারোদ্ঘাটন করেছে এবং সেখানে নিয়মিত কাজ হচ্ছে—এ সংবাদ আমরা রাখি। রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং সমবায় মন্ত্রী জয়নাল আবেদীনের আন্তরিকতা পশ্চিমবাংলার চিত্রজগত এ বিষয়ে কোনদিনই ভুলবে না। স্টুডিও কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে বিগত ১৮ সেপ্টেম্বর টিপু সুলতান নাটকাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। অভিনয়ের পূর্বে একটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্টুডিও পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান এবং জনসংযোগ ও তথ্য বিভাগের জয়েন্ট ডাইরেকটর গোপাল ভৌমিক। প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ দেন রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এর পর মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত টিপু সুলতান নাটক অভিনীত হয়। নাটকে স্টুডিওর বিভিন্ন কর্মীরাই মূলত অংশগ্রহণ করেন। পরিচালনা ও নামভূমিকায় অভিনয় করেন সুব্রত সেনশর্মা। হায়দার আলী চরিত্রে অধীর দে মসিয়ে লালী চরিত্রে সন্তোষ গাঙ্গুলী, জ্যোতিষী চরিত্রে গোবিন্দ মুখার্জি অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অন্যান্য অভিনয়াংশে অতুল চট্টোপাধ্যায়, ভোলা ভট্টাচার্য, অসীম রায়, পরিতোষ রায়, প্রমীলা ত্রিবেদী, বন্দনা চক্রবর্তী দুলাল মৈত্র, তরুণ রাহা, হরিপদ হাইত, তুষার জানা প্রভৃতি ছিলেন। মঞ্চসজ্জা ও শব্দ ও আলোয় ছিলেন সূর্য চ্যাটার্জি ও ডাবু গাঙ্গুলী।

সস্ত্রীক সুব্রত মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক গোবিন্দ ঘোষাল অমিয় দত্ত, প্রীতিন ভট্টাচার্য, অসিত চৌধুরী, বিমল দে, তপন সিংহ, অরুন্ধতী দেবী, বিভূতি লাহা সলিল সেন বিষ্ণু চক্রবর্তী কালীশ মুখোপাধ্যায় (অমৃত), বাগীশ্বর ঝা সেবাব্রত গুপ্ত রণধীর সাহিত্যালংকার প্রভৃতি আরো অনেকেই পূজা এবং অভিনয়ে উপস্থিত থেকে স্টুডিও কর্মীদের উৎসাহিত করেন।

জলসা

আসন্ন সদারং সংগীত সম্মেলন

সর্বভারতীয় সদারং সংগীত সম্মেলন আরম্ভ হচ্ছে ৭ অক্টোবর থেকে কলা-মন্দিরে। অন্যান্যবারের মত এবারেও ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা আছেন কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতের অনুষ্ঠান তালিকায়। কণ্ঠ-সংগীতে পণ্ডিত ভীমসেন যোশী সুনন্দা পট্টনায়ক মুনাব্বর খাঁ মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় যন্ত্রসংগীতে ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য কালীজীবন সোম জারিন দারুওয়ালা দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে। তরুণ ধ্রুপদ গায়ক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবার ধ্রুপদ গাইবেন। সংগীতে সব জনপ্রিয় শিল্পীদেরই দেখতে পাওয়া যাবে।

আশা ভোঁসলের রজত-জয়ন্তী উৎসব

বোম্বেতে গ্রামোফোন কোম্পানীর পক্ষ থেকে জনপ্রিয় শিল্পী শ্রীমতী আশা ভোঁসলের—শিল্পী জীবনের রজত-জয়ন্তী বর্ষ সাড়ম্বরে এবং সগৌরবে পালিত হয়েছে কিছুদিন আগে।

প্লে-ব্যাক শিল্পী হিসাবে শ্রীমতী আশা ভোঁসলের জনপ্রিয়তার কারণ অনেক। প্রথমতঃ তাঁর সহজাত কণ্ঠসৌন্দর্য দ্বিতীয়তঃ উচ্চাংগ সংগীত পরিশীলিত কারুকার্য সমৃদ্ধ কণ্ঠ ও তার প্রাণময়তা—তৃতীয়ত নানা ধরনের গান পরিবেশনা-নৈপুণ্যের বহুমুখীনতা (রাগপ্রধান থেকে ও ক্যাবারে অবধি) সর্বোপরি গুজরাটি বাংলা তামিল ওড়িয়া হিন্দী ও অন্যান্য ভাষায়—তিনি যেন গানের ঝর্ণা প্রবাহিত করেছেন। সম্প্রতি গ্রামোফোন কোম্পানী শিল্পীকে অভিনন্দন জানান একটি সিলভার রঙের মলাটের পরিচয়-পুস্তিকা (বহু স্মরণীয় মুহূর্তের ছবি সমেত) প্রকাশিত করে—এবং রুপোলী লেবেলের ডিস্কে শিল্পী পরিবেশিত নানা হিট ছবির সংগীতাংশ যুক্ত করে। উৎসব সভায় যেসব শীর্ষ-স্থানীয় সংগীত পরিচালক ভাষণ দেন তারা হলেন শংকর জয়কিষণ মদনমোহন রবি রাহুল দেববর্মন শচীন দেববর্মন লক্ষ্মীকান্ত পিয়ারীলাল নওসাদ এবং কল্যাণজী আনন্দজী।

শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের যুক্তরাষ্ট্র সফর

বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী— শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। প্রায় মাস দেড়েক সময়ের মধ্যে তিনি টেক্সাস মিশিগান, ওহায়ো, মিনেসোটা, ইলিনয়, ম্যাসাচুসেটস, পেনসিলভেনিয়া, নিউইয়র্ক প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যে প্রায় কয়েক হাজার মাইল ঘুরেছেন। আমেরিকার অধিবাসীদের সহজ ভাব ও অমায়িকতায় তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। ওদেশে গিয়ে তাঁর নিজেকে বিদেশী বলে মনে হয়নি একবারও। ঘরোয়া ও ঘনিষ্ঠ পরিবেশের জন্য তিনি সবত্রই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরে-ছিলেন সহজেই। ওখানে অনেক অনুষ্ঠানেই তিনি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেছেন। কোথাও কোথাও রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে আলোচনাও করেছেন। ভারতীয় সংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে আমেরিকানদের উপলব্ধিরও তিনি প্রশংসা করেন। পিট্স-বার্গে একটি অনুষ্ঠানে তাঁর রবীন্দ্র-সংগীতের সঙ্গে দুটি মার্কিন তরুণ বেহালা ও বাঁশী বাজিয়েছিল। তারা বেশ ভালই বাজিয়েছিল অথচ তারা এর আগে রবীন্দ্রসংগীত শোনেনি। এতে তাঁর খুব আনন্দ হয়েছিল। শ্রীমতী মিত্র কয়েকটি

সুচিত্রা মিত্র

জায়গায় রবীন্দ্রসংগীতের ক্লাসও নিয়েছেন। তাঁর একমাত্র দুঃখ, আরও অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁর যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করারও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্বল্প সময়ের সফরে তাঁর সে-বাসনা পূর্ণ হয়নি।

শাস্ত্রীয় সংগীতানুষ্ঠান : শ্রীশ্রীবিশ্ব-কর্মা পূজা উপলক্ষে বসিরহাট পালপাড়া প্রাঙ্গণে সারারাত্রিব্যাপী একটি শাস্ত্রীয় সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগীতাংশে সংগীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল, শ্রীমতী মানসী রায়চৌধুরী ও সংগীতা-চার্য কালিদাস দে, এবং সংগতে মৃদাংগা-চার্য রাজীবলোচন দে, ভূপাল ভট্টাচার্য ও সমর সাহা প্রমুখ শিল্পীরা আসরটি রীতি-মত জমিয়ে রাখেন।

সাংস্কৃতিক পরিষদের অনুষ্ঠান : সম্প্রতি বোকারো ইস্পাতনগরীর সাংস্কৃতিক পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে এক মনোজ্ঞ রবীন্দ্র-সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বকীয় আবেগমিশ্রিত ঢঙে একক রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন হয় সাংস্কৃতিক পরিষদের সদস্য শ্রীচন্দন ভট্টা-চার্যের সংগীতের মাধ্যমে।

ইস্পাতনগরীর কিছু উৎসাহী তরুণের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে এই সাংস্কৃতিক পরিষদ। কর্মময় একঘেয়ে জীবনের মধ্যে সংস্কৃতির যে একটা বিশেষ স্থান আছে, সেই চেতনাই উৎসাহ যুগিয়ে-ছিল পরিষদ গঠন করবার। সাংস্কৃতিক পরিষদের এই প্রথম প্রয়াস, শ্রীবন্দ্যো-পাধ্যায়ের দরদী কণ্ঠের গুণে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর কাছে বিশেষ উপভোগ্য হয়।

—চিত্রাঙ্গদা

সেকালের সঙ্গীতগুণী

আর একজন সব্যসাচী

মুরারি গুপ্তের ছবিতে মালাটি দোলানো ছিল। সেখান থেকে তুলে নিয়ে গায়কের গায় পরিয়ে দিলেন দুর্লভচন্দ্র। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে আনন্দের উচ্ছ্বাস শোনা গেল। চমৎকার হয়েছে অনুষ্ঠান। এমনি পুরস্কারই শিল্পীর যোগ্য। সকলেই সাধুবাদ দিলেন।

শ্রোতারা এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। এমন আসরের কথা অনেকেই শোনেননি আগে। প্রায় ২৫ বছর ধরে এই সম্মেলন হয়ে এসেছে। এখানেও এমন বিচিত্র প্রতিভা দেখা যায়নি কোনদিন। এমনটি কেউ আশা করতে পারেননি।

সেকালের সেই বিখ্যাত মুরারি সম্মেলন। বাংলায় বার্ষিক সংগীত সম্মিলনী বলতে প্রথম। পাখোয়াজি মুরারি মোহন গুপ্তের স্মৃতিতে ১৯০৫ সালে আরম্ভ হয়েছিল, তাঁর মৃত্যুর এক বছর পরে। তাঁর শিষ্য দুর্লভ ভট্টাচার্য প্রতি বছর এই সম্মেলনের ব্যবস্থা করতেন। বাংলার সব নামী গুণীরাই যোগ দিতেন আসরে। আর পশ্চিমের যে কলাবতরা কলকাতায় থাকতেন, তাঁরাও আসতেন। যেমন সরদী করামতুল্লা খাঁ, ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাও, সেতারী এনায়েৎ খাঁ, সরদী আমীর খাঁ, সারেঙ্গী ছোটে খাঁ লছমী ওস্তাদ ধ্রুপদী শিবসেবক ও পশুপতিসেবক মিশ্র প্রভৃতি। গান বাজনা শোনাতেন তাঁরা। শ্রোতারা উচ্চ মানের সংগীতের আস্বাদ পেতেন। দর্শনী দিতে হত না সেজন্যে। সাধারণত অবাঙালী ওস্তাদরা দক্ষিণা নিতেন। আর বাংলার বেশির ভাগ শ্রেষ্ঠ গুণীরাই ছিলেন অপেশাদার, সর্বভারতীয় নিরিখে প্রথম শ্রেণীর হয়েও। যথা—ধ্রুপদী মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুপদী রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সেতার সুরবাহারী হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল এস্রাজী কালিদাস পাল ধ্রুপদী আশুতোষ রায় পাখোয়াজী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সেই সব দিনের মুরারি সম্মেলনের কথা। ঠনঠনিয়া অঞ্চলে ১৬ শিবনারায়ণ দাস লেনে দুর্লভচন্দ্রের বাড়ি। তার কাছেই দুটি রাস্তা মিলেছে। সেইখানে মণ্ডপ তৈরি করে মুরারি সম্মেলনের জলসা হত মহাসমারোহে। সে আসরে ধ্রুপদের মর্যাদা ছিল সবচেয়ে বেশী। ধ্রুপদীরাই বেশী গান শোনাতেন। আর সমঝদার শ্রোতার অভাব ছিল না। অবারিত দ্বার হলেও। তার কবছর পরে আরম্ভ হয়েছিল 'শংকর উৎসব'। শিবরাত্রিতে রাধানাথ মল্লিক লেনে এই বার্ষিক আসর বসত। শংকর উৎসবেরও উদ্যোক্তা ছিলেন দুই গুণী পাখোয়াজী—দীনু হাজরা ও নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তারও পরে আরম্ভ হয় লালচাঁদ উৎসব—১৯২৮ থেকে ১৯৩১-৩২। এই তিনটি বার্ষিক সম্মেলনের পথ দক্ষিণা দিয়ে সংগীত সম্মেলনের যুগ আরম্ভ হয়। আর তিনটির মধ্যে সবচেয়ে বেশিদিন চলে মুরারি সম্মেলন। দুর্লভচন্দ্র যতদিন জীবিত ছিলেন (১৯৩৮ সালে মৃত্যু) এই বার্ষিক আসর হয়েছে নিয়মিত।

সে বছরটি হল ১৯২৮। শিবনারায়ণ দাস লেনে তেমনি মণ্ডপ বেঁধে সম্মেলন আরম্ভ হয়েছে। আসর বসেছে সন্ধ্যার বেশ খানিক পরে। প্রবীণ থেকে নবীন নানা শিল্পী আসরে উপস্থিত।

পর পর কয়েকজনের গান বাজনা হয়ে গেল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পরিণত-বয়সী ধ্রুপদগুণী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মধুকণ্ঠ ধ্রুপদ গায়ক ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামও বলা যায়। তিনি তখন ৩০ বছরের তরুণ। তাঁর চেয়ে ৭।৮ বছরের জ্যেষ্ঠ যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ধ্রুপদ শুনিয়েছেন। গানের শেষে তাঁরা সকলেই রয়েছেন আসরে।

তাঁদের অনুষ্ঠানের পরে মোহিনীমোহন মিশ্রের নাম ঘোষণা করা হল। এবার গান গাইবেন তিনি।

মোহিনীমোহন যখন আরম্ভ করলেন তখন রাত প্রায় একটা। আগেকার শিল্পীরা উৎকৃষ্ট গেয়ে গেছেন। উচ্চাঙ্গের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে আসরে। রাত্রিও গভীর। মোহিনীমোহনও উপযুক্ত রাগ নির্বাচন করলেন। ধীর গম্ভীর ঐশ্বর্যময় দরবারী-কানাড়া। আলাপচারী করতে লাগলেন সবিস্তারে। সুরেলা কণ্ঠে যথাবিধি রাগ-রূপ দেখালেন। সম্পূর্ণ আলাপের পর ধরলেন গান। সর্ব অলঙ্কারযোগে দরবারী-কানাড়ার গান শোনাতে লাগলেন।

গান শেষ হল রাত আড়াইটার সময়।

গোপালচন্দ্র ও অন্যান্য গায়কেরা, আসরের শ্রোতারা সকলেই গায়কের সুখ্যাতি করলেন। বড় ভাল হয়েছে দরবারী-কানাড়া। মোহিনীমোহন যেন আর একখানি গান শোনান।

গায়ক তখন পাখোয়াজীর জায়গায় কোন তবলচীকে আসতে অনুরোধ জানালেন। এবার সংগত হবে তবলায়।

সেইরকম ব্যবস্থা হল। এবার মোহিনীমোহন আরম্ভ করলেন খেয়াল। রাগ মালকোষ। এখন আর আলাপচারী নেই। একেবারেই গান ধরলেন ত্রিতালের মধ্যলয়ে। কিন্তু তান কর্তবে মালকোষের বহুল বিস্তার করলেন। একঘণ্টা কখন পার হয়ে

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003
AMRITA
Friday 4th October, 1974
Phone 55-5231 (14 lines)

অমৃত
সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /
১১ অক্টোবর ১৯৭৪ ।। মূল্য ৬৫

যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা আর কষ্টের ঝঞ্ঝাটও আসে

জোরালো আর নির্ভরযোগ্য অ্যানাসিন আপনার অসময়ে কাজে আসে

আপনি নিশ্চয়ই কলেজের কোনো উৎসব থেকে বাদ পড়তে চান না! ধরুন কলেজে কোনো ভালো ফিল্ম দেখানো হচ্ছে— আর আপনি কোমরের যন্ত্রণা আর অস্বস্তির দরুণ প্রায় শয্যাশায়ী! এ হেন অসহায় অবস্থায় আপনাকে সাহায্য করবে জোরালো আর নির্ভরযোগ্য অ্যানাসিন!

অ্যানাসিনের গুণ অনেক। এ যে শুধু যন্ত্রণা থেকে আরাম দেয় তাই নয়—যন্ত্রণার দরুণ যে হতাশভাব আসে তাও দূর করে দেয়। আপনাকে চটপট আরাম আর স্বস্তি দিয়ে, অ্যানাসিন আপনার মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে।

এই অসহায় দিনগুলিতে যন্ত্রণা আর অস্বস্তি ভোগ করে পড়ে থাকবেন না। আজ যুগ অনেক এগিয়ে গেছে। জোরালো আর নির্ভরযোগ্য অ্যানাসিন আপনাকে চটপট আরাম দেয়, চাঙ্গা করে তোলে। আপনি অক্লেশে আপনার রোজকার কাজকর্ম করতে পারেন।

মেয়ে হয়ে জন্মানো মাঝে মাঝে ঝঞ্ঝাট বলে মনে হয়। কিন্তু আজ এই অসময়ে আপনি অ্যানাসিনের সাহায্যে সে ঝঞ্ঝাট দূর করে—জীবনের সকল আনন্দ পুরো উপভোগ করতে পারেন। প্রয়োজনের জন্যে হ্যাণ্ডব্যাগে সবসময় অ্যানাসিন রাখুন—মস্ত বড় সুবিধে।

জোরালো অথচ নির্ভরযোগ্য

অ্যানাসিন

জগতে ব্যথা-বেদনার উপশমকারী ওষুধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১৪ বর্ষ

অমৃত

সংখ্যা ২৩

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday 11th October, 1974 শুক্রবার, ২৪ আশ্বিন, ১৩৮১

সূচীপত্র

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীমনোজ বিশ্বাস

স

সম্পাদকীয়

চোরা চালানের বিরুদ্ধে

সরকার চোরা চালান বন্ধের জন্য দেশব্যাপী যে বেড়াজাল ছড়িয়েছেন তাতে অনেক রাঘব বোয়াল ইতিমধ্যেই ধরা পড়েছে। হাজী মাস্তান শুকুরনারায়ণ বাখিয়া কিংবা ইয়ুসুফের মতো শত শত চোরা চালানকারী ছড়িয়ে আছে দেশে। দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবসা চলছে। বিদেশী মাল, সোনা, রূপো প্রভৃতি নানা জিনিস চোরা পথে এরা নিয়ে আসে। দেশে এনে চড়া দামে সেগুলো বিক্রী করে। বছরে প্রায় ছশো কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা উপার্জন থেকে বঞ্চিত হয় সরকার। চোরা চালানের ফল হিসেবে কালো টাকার বাজার ফেঁপে ওঠে। অর্থনীতিকে বানচাল করে দেয় কালো টাকার লেনদেন। সরকার যে এসব জানতেন না তা নয়। কিন্তু কীভাবে এই শক্তিশালী চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করা হবে সেটাই ছিল ভাবনা।

শেষ পর্যন্ত অভিযান শুরু হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইনের প্রয়োগ করে চোরা চালানকারীদের রাজা-বাদশা বলে কথিত বহু লোককে দেশের নানা জায়গায় আটক করা হয়েছে। দেরীতে হলেও সরকার যে সাহস করে এই গুপ্ত জগতের কারবারীদের সাম্রাজ্য খতম করার জন্য এগিয়ে এসেছেন তা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। এখন সরকারকে শেষ পর্যন্ত যেতে হবে। এদের শুধু আটক রাখলেই চলবে না, এরা কীরকম চক্রান্ত করে দেশের অর্থনীতিকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তা প্রমাণের জন্য এদের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করতে হবে। চোরা চালানের সমস্ত ঘাঁটি নির্মূল করতে না পারলে এই সমাজবিরোধীরা জেলের ভিতর থেকেও যে কারবার চালাবার ফন্দীফিকির বার করবে না, এ বিষয়ে আর আশ্চর্য কি' কারণ এই চোরা চালানকারীরা প্রভূত বিত্ত এবং ক্ষমতার অধিকারী। এরা আবার [illegible] পয়সা যথেচ্ছভাবে বিলিয়ে নিজেদের এলাকায় প্রচুর অনুরাগী তৈরি করে রেখে[illegible]. সরকারী আমলা ও পুলিশের মধ্যেও যে এদের প্রতি সহানুভূতিশীল লোক আছে তা সি. বি, আইয়ের রিপোর্টেই প্রকাশ। সুতরাং সরকারকে আটঘাট বেঁধে শক্ত হয়ে কাজ করতে হবে।

সামাজিক দুর্নীতির ব্যাপক প্রসারে চোরা চালানকারীদের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। পুলিশের চোখের সামনেই বড় বড় শহরে কত চোরাই আমদানী করা বিদেশী জিনিস বিক্রী হয়। ভারতের পশ্চিম উপকূলে এই চোরাচালানকারীরা কীভাবে ব্যবসা চালায় কীভাবে তারা আরব দেশগুলো থেকে মহামূল্য বিদেশী জিনিস আমদানী করে তা আইনরক্ষকদের অজানা ছিল না। কিন্তু সরকারী যন্ত্রের দুর্বলতা এবং দ্বিধার ফলে এই সমাজ-বিরোধী ব্যবসা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছিল। এখন আশা করা যায়, সরকারী কঠোরতা চোরা চালানের মেরুদণ্ডে আঘাত করতে সক্ষম হবে। একটা পাপ থেকে উদ্ধার পাবে দেশ।

চোরা চালান যেমন অপরাধ, চোরা চালানের জিনিস কেনাও তেমনি অপরাধ। বিদেশী জিনিসের প্রতি লোভই চোরা চালানকারীদের ব্যবসা এমন ফাঁপিয়ে তুলেছে। নিজের দেশের জিনিসের প্রতি আগ্রহ থাকলে বিদেশী ছাপমারা জিনিস চড়া দামে কেনার ঝোঁক থাকত না। সমাজের বিত্তবানশ্রেণী যদি এ সমস্ত জিনিস কিনতে অসংমত হয় তাহলে এই চোরা চালানকারীদের ব্যবসায় মন্দা দেখা দেবে। সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে অত্যন্ত কঠোরভাবে এই অভিযান চালিয়ে যেতে হবে এবং অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। জেলে আরামে তোয়াজে এদের রেখে সরকার যদি মনে করে থাকেন যে এদের খুব বেকায়দায় ফেলা গেছে তাহলে ভুল হবে। এদের সাকরেদরা সারা দেশে ছড়ানো। প্রমাণপত্র লোপ করার চেষ্টা তারা করবে। সুতরাং সরকার শক্ত হয়ে এই অভিযানকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যান সেখান থেকে এই মাস্তানের দল কিছুতেই ছাড়া পাবে না।

বারান্দা থেকে জীবন

তপন দাশ

সকালের আকাশে রোদ ছিল। ঝকঝকে আয়নার মতো আকাশ। খাপছাড়া এক-আধ টুকরো যাযাবর মেঘের আনাগোনা ছিল।

দৈনিক কাগজের পূর্বাভাষে বিশ্বাস হয়নি। যেমন লেখে—আজ বৃষ্টি হতে পারে। আকাশবাণী, বলেছিল—বজ্রপাতসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। সকালের এমন পরিচ্ছন্ন আকাশের মুখ দেখে কি ভাবা যায় বৃষ্টির সম্ভাবনা?

সকালের গনগনে রোদ জানলার ভেতর দিয়ে ঘরের মোজাইক মেঝেতে সোনার পাতের মতো বিছিয়ে পড়েছিল। বেশ সুন্দর সকাল।

তিন্নি খেলনার মোটরগাড়িটায় ঘুড়ির সুতো বেঁধে টানাটানি করছিল। তিন্নি এই পাঁচ বছর পেরোলো। ডল-পুতুলের মতো তিন্নি রোদের আলোয় ওর রূপোর মতো ফরসা দেহটা নিয়ে একতাল আলোর মতো খেলা করছিল। ওর নাকটা একটু বসা এই যা।

গতকাল অসাবধানে আমি ওর গাড়িটায় পা তুলে দিয়েছিলুম। পাতলা টিনের পাতের খেলনাটা দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছিল। দুর্ঘটনার সময় তিন্নির নজর পড়েনি; ও তখন ঘুমোচ্ছিল। সে সময় দেখলে ও চিৎকার চেঁচামেচিতে সকলকে অস্থির করে তুলতো।

পরে আমি ওর গাড়িটাকে মোটামুটি সোজা করে রেখেছিলুম। কিন্তু তিন্নির নজর এড়ানো সোজা নয়। তিন্নি দেখতে পেলো—ওর গাড়িটা কেমন যেন অস্বাভাবিক থেবড়ানো। সত্যিকার কোন মোটরগাড়ি যদি কোন সত্যিকার দুর্ঘটনায় পড়ে? পড়ে যেমন থেঁতলানো হয়ে যায়—প্রায় সেই রকম মনে হচ্ছিল তিন্নির গাড়িটা।

তিন্নি এই বয়েসেই বেশ গুছিয়ে কথাবার্তা বলতে শিখেছে। কে করেছে? কেমন করে তার গাড়িটার এই হাল হলো?

হাত-পা ছড়িয়ে তিন্নি কাঁদতে বসবার উপক্রম করতে আমি ওকে কোলে নিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করলুম। সঙ্গে সঙ্গে একটা গল্প বানিয়ে বললুম।

তিন্নি। সোনা। কাঁদে না। আমি আবার তোমায় নতুন গাড়ি এনে দোব। তাছাড়া ও-গাড়িটা কাল দুপুরে এ্যাকসিডেন্টে পড়েছিল। হয়েছিল কি জান! একটা বিরাট দৈত্যের মতো অয়েল ট্যাঙ্কার। অয়েল ট্যাঙ্কার বোঝ তো? তেলের গাড়ি। মস্ত পিপে লাগানো যে গাড়িগুলো তেল বয়ে নিয়ে যায়। সেই রকম একটা গাড়ি হঠাৎ তোমার গাড়িটার ওপর আচমকা এসে পড়ায় এই রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। তেলের গাড়ি ধাক্কা মেরেই পালিয়ে গেছে। ড্রাইভার বেচারা কিন্তু খুব জোর বেঁচে গেছে।

আমার গল্প বানানোটা কাজে লাগলো। তিন্নি কান্না থামিয়ে আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। মনে হচ্ছিল তিন্নি যেন আজকাল সবকিছুই বেশ তলিয়ে বুঝতে শিখেছে।

তাহলে সেই দৈত্য গাড়িটাকে পুলিশ ধরলো না কেন? পুলিশ তো সে-জন্যেই রাস্তায় পাহারা দেয়। তিন্নি জানতে চাইলো বিজ্ঞের মতো।

আমি আশ্বাস দিলুম। হ্যাঁ, নম্বর নেয়া হয়েছে। পুলিশ ওটাকে খুঁজে বের

করবে। বলা যায় না হয়তো এতক্ষণ কোথাও আটক করেছে। তিন্নিকে বললুম, তোমার নতুন গাড়ি ইন্সিওরেন্স কোম্পানী দিয়ে দেবে।

তিন্নি বুঝতে পারলো না। তবুও বেশ আশ্বস্ত হলো বোঝা গেল।

সেই থ্যাবড়ানো গাড়িটা নিয়ে খেলবার সময় রোদটা মেঝে থেকে বেশ কিছু ডিগ্রী সরে গেল। ঝাপটা হাওয়ায় দরজার সবুজ রঙের পর্দাটা দুলে উঠলো। হঠাৎই রোদ হারিয়ে গেল। আচমকা ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা। আর ঘরের মধ্যেটা প্রায় সন্ধ্যের মতো আধো-অন্ধকার হয়ে গেল। কোথায় ছিল মেঘ কে জানে। কোন হাওয়ায় উড়ে এলো কেউ জানে না। সমস্ত আকাশটাই তখন স্লেটরঙা। হারিয়ে গেছে ইস্পাতের নীল স্বচ্ছতা। বলতে বলতেই এসে পড়লো বৃষ্টি।

বৃষ্টি! বৃষ্টি! আরম্ভ হয়ে গেল বৃষ্টি।

মা-মণি তিন্নিকে নিচে নিয়ে গেলেন। আমি আর বিজু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। ঝির-ঝির করে বৃষ্টি নামার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ঝড়ো হাওয়াটা থেমে গেল। শুধুই বৃষ্টি পড়তে থাকলো।

রাস্তা, ফুটপাত আর ও-পাশে গলির মোড়। যতোটা আমাদের ঝুলবারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যায়। শুধুই বৃষ্টি আর ছাতার সারি। অনেকের ছাতা নেই। শুধু হাতটা মাথার ওপর তুলে ভিজে সপসপে হয়ে চলছিল আমার কিন্তু ভালো লাগছিল ওদের। যাদের ছাতা নেই, বেশ মজায় ভিজে ভিজে হাঁটছিল ওরা।

যারা যাচ্ছিল তাদের অনেকে আমার চেনা। গুপ্তকাকুর ছেলে ব্রজদা বর্ষাতি চাপিয়ে সাইকেল চড়ে অফিস গেল। খবর-কাগজআলা সুখন মাথায় টুপি পরে আর এক গাদা কাগজের ওপর প্লাস্টিক চাপিয়ে চলে গেল। ওই তো রেখাদি বেরোলেন। নক্সা-কাটা ফলসা রঙের বর্ষাতি। মাথাটা বর্ষাতির ঘোমটায় ঢাকা। রেখাদি গানের স্কুলে যাচ্ছেন।

বিজু রেখাদির নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকলো। রেখাদি শুনতে পেয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আমার প্রতিও হাত নাড়লেন। আমি জিভ বের করে ভ্যাঙালুম। রেখাদি গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়ে বাঁ দিকে মোড় নিলেন।

নিচে থেকে তিন্নির কান্না শোনা যাচ্ছিল। তিন্নি ঠিক এইভাবে সারাদিনে দু-তিনবার কাঁদে। চান করবার সময়। সরষের তেল মাখাবার সময়। খাবার সময় আর ঘুমোবার আগে। নইলে এমনিতে বড়-একটা কাঁদে না তিন্নি।

আমাদের পড়ার তাগাদা নেই আজ। আন্টি আসবে না। আন্টি ছুটি নিয়ে টাটা-নগর গেছেন।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা বৃষ্টি দেখছিলুম। বিজু আমাকে ক্যালেন্ডারের পাতা ছিঁড়ে নৌকো বানিয়ে দিতে বলছিল। চলতি মাসের পাতাটা ও ছিঁড়ে এনেছিল।

আমি বললুম—বৃষ্টি থেমে গেলে যখন নালার জল উপচে হাইড্রান্টের দিকে ছুটবে, তখন নৌকো বানিয়ে দোব। এখন নয়। এখন দারুণ বৃষ্টি পড়ছে। নৌকো ডুবে যাবে।

বিজু তবুও বায়না করছিল।

এক সময় তিন্নিকে মা আবার ঘরের মেঝেতে ছেড়ে দিয়ে গেলেন। তিন্নির গায়ে নতুন জামা। চোখে কাজল। মা-মণি ওর গায়ে পাউডার ছড়িয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তিন্নি সেই থ্যাবড়ানো গাড়িটা নিয়েই আবার খেলছে।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে তেমনি। মাঝে মাঝে আবার দমকা হাওয়াও বইছে। মেঘ ডাকছে। তিন্নি নিজের মনে খেলে যাচ্ছে। মুখ দিয়ে এক রকম বিজু-বিজু শব্দ করছে। বিজু নিজেই নৌকো বানাবার চেষ্টা করছে। ভুল ভাঁজে মুড়ে কিছুতেই পারছে না। হঠাৎ এক ঝলক তীব্র আলোর সঙ্গে সঙ্গেই দারুণ শব্দ করে বাজ পড়লো। বিজু কান চেপে ধরলো হাতের চেটো দিয়ে। কিন্তু তিন্নি নির্বিকার। ভাঙা গাড়িটার জন্যে মন খারাপ লাগছিল। আমার কাছে টাকা থাকলে আমি তিন্নির জন্যে একটা নতুন গাড়ি এখুনি এনে দিতুম।

বেলা বেশি গড়ায়নি। অথচ মেঘলার জন্যে মনে হচ্ছিল যেন বিকেল হয়ে গেছে। বিকেল হয়ে যাবার পর সূর্য একেবারে ডুবে গেলে যেমন হয়। তেমনি।

বৃষ্টির জমা জলে রাস্তাটা একাকার। হাইড্রান্টের ঝাঁঝরির মুখ ময়লায় বুজে যাবার জন্যে প্রায় পায়ের গুলফ অবধি ডুবে যাবার মতো জল জমে গেছে রাস্তায়। বড় রাস্তাতেও জল। ওটা যেন বড় নদী আর গলিটা তারই প্রশাখা খালের মতো। বেশ স্রোত বইছে। বাস অথবা ট্যাক্সি কিম্বা মোটরগাড়ি যাবার সময় ঢেউ তুলে যাচ্ছিল স্টিমারের মতো। ফুটপাতের কানায়। রাস্তার কিনারায় ঢেউ আছড়ে পড়ছিল। দারুণ লাগছিল দৃশ্যটা। কল্পনায় যেন গভীর সমুদ্রে একটা জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে ছিলুম আমি।

আমরা একবার স্টিমারে চেপেছিলুম। সেই কথা মনে পড়ছিল। তিন্নি হয়নি তখন। আমি আর বিজু গিয়েছিলুম বাবার সঙ্গে। বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে। শালুকে আহিরীটোলার ঘাট থেকে ফেরী স্টিমারে বাঁধাঘাট। বাঁধাঘাটের গঙ্গার ধারেই ছিল শুরকি রঙের বাড়িটা। বাবার সেই বন্ধুর নাম গুপীবাবু। একদিন, মাত্র দু-এক ঘন্টার মধ্যেই গুপীকাকু আমাদের আপন করে নিয়েছিলেন। গুপীকাকুরা বড়লোক। শুরকী রঙের বাড়িটা বেশ বড়। লাগোয়া বাগান। বাগানে পুকুর। সেই পুকুরে বাবা আর গুপীকাকু ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসেছিলেন।

আমি আর বিজু সমস্ত বাগান, বাড়ির বারান্দা, দোতলা ছাদে ছুটে ছুটে খেলা করছিলুম। অতো বড়ো বাড়িটা সম্পূর্ণ

ফাঁকা, চাকরবাকর ছাড়া কেউ নেই। কতো কি ভালো ভালো খাবার যার নাম মনে নেই। আমাদের খেতে দেয়া হয়েছিল। বাবা গুপীকাকু পুকুরের ধারে বসেই খেয়ে নিয়েছিলেন।

সারাদিনে বাবার ছিপে মাত্র পো-দেড়েক ওজনের একটা মৃগেল মাছ উঠেছিল আর কতকগুলো ছোট ছোট মাছ। কিন্তু গুপীকাকু ধরেছিলেন অনেকগুলো মাছ। বেশ বড় বড়। সন্ধ্যে হয়ে যাবার অনেক পরে আমরা ফিরেছিলুম ট্যাকাদ করে। মনে কষ্ট হয়েছিল আসার সময় আর স্টিমারে চড়া হয়নি। চার-পাঁচটা মাছ খড় দিয়ে জড়িয়ে দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন গুপীকাকু। অনেক রাত অবধি জেগে মা-মণি সেই মাছগুলো রান্না করেছিলেন।

তারপর গুপীকাকু আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। ক্রমে ওঁর আমাদের বাড়ি আসাটা নিয়মিত হয়ে গেল। গুপীকাকুর মোটরগাড়ি চড়ে আমরা কতো জায়গায় বেড়াতে গিয়েছি। বটানিকস্ চোরবাগানের মল্লিকবাড়ি, লেক, গান্ধীঘাট, বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর—আরো কতো জায়গায়। গুপীকাকু নিজেই গাড়ি চালাতেন। অনেক রকমের কি সব ব্যবসা ছিল গুপীকাকুর। কাজ-কারবার লোকজনরাই দেখাশোনা করতো বলে গুপীকাকুর অঢেল সময় হাতে থাকতো। রোববারে সকাল সকাল আমাদের বাড়ি এসে বাবার সঙ্গে গল্প করতেন। মা-মণিও গল্পে যোগ দিতেন। মা-মণি কতো সব ভালো ভালো রান্না করতেন গুপীকাকুর জন্যে। বিকেলে সিনেমায় যেতেন ওঁরা। কোনদিন থিয়েটারে। আমরা ছোটরা বাড়িতে থাকতুম।

বাবার অসুখ করলো। অফিস থেকে গাড়ি করে বাবাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল। সাত-আটদিন পরে বাবা হাসপাতালে ভর্তি হলেন। বাবা যখন হাসপাতালে, তখন গুপীকাকু আমাদের দেখাশোনা করেছেন। তারপর বাবা হাসপাতাল থেকে আর ফিরলেন না। তিন্নি হবার সময়ও গুপীকাকু মা-মণিকে নিয়ে নার্সিং হোমে গেছেন। গুপীকাকু আমাদের জন্যে অনেক করেছেন। অনেক কিছু দিয়েছেন আমাদের জন্যে। খেলনা ছবির বই দম-দেয়া পুতুল, গাড়ি। তিন্নির জন্যে প্রাম্। বিজুর জন্যে ট্রাই-সাইকেল। বাবা আমাদের এসব কখনো কিনে দেননি। তবুও বাবা আমাদের কতো ভালোবাসতেন। কতো!

বিজু ক্যালেণ্ডারের পাতা ছিঁড়ে এনেছে। চলতি মাসেরই একটা পাতা আমার ছিঁড়েছে ও। মা-মণি দেখতে পেলে রেগে যাবেন। বৃষ্টি বেশ সমান ছন্দে পড়ছে। এরকম বৃষ্টি সহজে থামে না। থামার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আমি মনে মনে চাইছিলুম—এই বৃষ্টি [illegible]

সারাদিন চলুক। সারারাত চললেও কোন আপত্তি নেই। বৃষ্টি আমার দারুণ ভালো লাগে। জল শুধু জল। জল দেখে দেখে আমার চিত্ত সহজে বিকল হবে না। এতক্ষণে আমাদের গলিটা সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। হাইড্রাণ্টের মুখে এসে জল প্রবলভাবে ঘুরছে। জল আমাদের চৌকাঠ ডিঙিয়ে উঠোনে জমে গেছে। আমি বিজুর জন্যে প্রথমে ছোট একটা নৌকো বানালুম। বিজু খুব খুশী। ও আমার নৌকো বানানো দেখছিল। ও বললো—একটা বেশ বড় পাল-তোলা নৌকো বানিয়ে দাও। তারপর আরো বড় একটা যুদ্ধের জাহাজ। যেটায় কামান থাকবে। র্যাডার থাকবে।

যখন নৌকো বানাচ্ছিলুম, তখন নিচে থেকে মা-মণির গলা শোনা গেল—বিজু, নানু—তোমরা নিচে এসে রুটি খেয়ে যাও। তোমাদের খিদে পায়নি?

একটা করে নৌকো শেষ হয়, আর বিজু সেটা নিয়ে দ্রুত নিচে নেমে গিয়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসে। জলের স্বাভাবিক টানে দুলে দুলে সেটা হাইড্রাণ্টের দিকে এগিয়ে যায়। তারপর ওর ভাসানো সবক'টা নৌকো অবধারিত ঘূর্ণির মুখে পড়ে চক্কর খায় বারকতক এবং শেষে তলিয়ে যায়। বিজুর শেষ নৌকোটাও ওইভাবে ডুবে যাবার পর সে হাততালি দিয়ে ওঠে।

মা-মণি হয়তো আরো দু-একবার আমাদের ডাক দিয়েছিলেন নিচে থেকে। আমরা শুনতে পাইনি। এক সময় তিনি নিজেই ওপরে উঠে এসে আমাদের ছেলেখেলা দেখে বেশ রেগে গেলেন। বিজুর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। আমাকে ভর্ৎসনা করলেন—তোমার কি এখনো এই সব ছেলেমানুষি বয়েস আছে নানু! তুমি বড় হচ্ছ না? পড়াশোনা নেই?

মা-মণির বকুনির সময় আমি মাথা নিচু করে থাকলাম। মজা এই—মা-মণি বকাঝকা করলে বা খুব বেশি রেগে গেলেও ওঁকে সেরকম ভয়ঙ্কর দেখায় না। মা-মণির মুখে রাগ মানায় না ঠিক। তবু একটু যেন কঠিন দেখায়। মা-মণি কোনদিন কাউকে মারধোর করেন না। তবু রেগে গেলে মুখটা যখন কঠিন হয়ে ওঠে, তখন কেমন যেন ভয় ভয় করে। বড্ডো মন খারাপ লাগে। খুব রাগ হলে মা-মণির যে ব্যবহারটা বেশি করে চোখে পড়ে সেটা হলো—উনি সে-সময় আমাদের সঙ্গে, মানে বিজু আর আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেন। সে-সময় তিন্নিকে অহেতুক বেশি মাত্রায় আদর করেন।

আগে হতো না। কিন্তু আমি তো বড় হচ্ছি—তাই একটা দুঃখবোধ বুকের মধ্যে টনটন করে ওঠে। বিজু কেমন যেন বিষণ্ণ

চোখে তাকায়। কিন্তু বাবা আমাদের কোন-দিন বকতেন না। রাগ করতেন না। কতো ভালোবাসতেন। কতো—

জল থৈ-থৈ উঠোনে নেমে দাপাদাপি করার ইচ্ছেটা বিজু আমার কানে কানে বলেছিল। কিন্তু মা-মণি খুব রেগে আছেন বলে আমি বিজুকে বললুম—এখন নয়। আজ তো জল থামবে না। বরং সেই চান করবার সময় কলঘরে যেতে হলে তো উঠোন পেরোতে হবে—তখন।

রান্নাঘরে সেনদিদি আমাদের রুটি-দিলে আমরা খেতে শুরু করলুম। মা-মণির মুখটা এখনো খুব থমথমে গম্ভীর। সেনদিদি মানুষটা খুব ভালো। সেনদিদি মা-মণিকে রান্নায় সাহায্য করে, ফাইফরমাস খাটে। হরিণঘাটার দুধ নিয়ে আসে। বাসন তোলে। তিন্নিকে তেল মাখায়। কাপড় কাচে। আমাকে আর বিজুকে দারুণ ভালোবাসে। আমাদের ভুত-পেত্নীর গল্প শোনায়। অনেক বয়স হয়ে গেছে ওর। এখন চোখে বেশ কম দ্যাখে। প্রসঙ্গত একটা কথা মনে পড়তে আমার বেশ কষ্ট হলো—একদিন মা-মণির কাছে ওকে বলতে শুনেছিলুম—আমার জন্যে একটা পরকলা গড়িয়ে দেবে বোমা? সেনদিদি চশমাকে পরকলা বলতো।

সেনদিদির পরকলা এখনো হয়নি। কেন জানি না মা-মণি ওর কথার কোন গুরুত্ব দেননি। আমি জানতুম বাবার একটা পুরোনো চশমা দেরাজের মধ্যে আছে। সোনালি ফ্রেমের চশমা। আমি একদিন সেই চশমাটা বের করে সেনদিদির চোখে লাগিয়ে দিয়ে বলেছিলুম—এবার কেমন দেখছো বলো?

বাঃ বেশ তো পরিষ্কার দেখছি খোকাবাবু!

ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে বুঝতে পারিনি। মা-মণি সেই সময় ছুটে এসে প্রায় ছো মেরে চশমাটা সেনদিদির চোখ থেকে খুলে নিয়ে আমার গালে ঠাস করে এক চড় লাগিয়েছিলেন। বলেছিলেন— কে তোমায় এসব পাকামো করতে বলেছে। আর কোনদিন দেরাজে হাত দেবে না। সেনদিদি ভ্যাবাচাকা খেয়ে বিমূঢ় হয়ে রইলো। সেই প্রথম মা-মণি আমার গায়ে হাত তুলে-ছিলেন। বিজু কেঁদে ফেলেছিল। আমিও সারাদিন কেঁদেছিলুম। সেনদিদি আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল।

সেনদিদিকে বলেছিলুম—আমি বড় হয়ে বাবার মতো হয়ে তোমার জন্যে চশমা গড়িয়ে দোব সেনদিদি।

আ-মরি বাছা আমার! কি মায়া গো! ঠিক বড়বাবুর মতো (বাবাকে সেনদিদি বড়বাবু বলতো)। সেনদিদি আমাকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে নিজেও কেঁদে ফেলেছিল। বিলাপ করেছিল বাবার নাম করে।

কখনো কখনো নিজের কথা বলতো সেনদিদি। ওদেরও অবস্থা ভালো ছিল এক সময়। স্বামী সংসারের মাঝখানে সুখী সেনদিদির নাকছাবি-পরা মুখটা আমি কল্পনা করতুম। গোবরমাটি দিয়ে নিকোনো দাওয়ায় সেনদিদি কুলোয় করে চালের কুঁড়ো বাছছে। সন্ধ্যেয় ঘোমটা টেনে গোয়ালঘর, ধান-মরাইয়ে সন্ধ্যে-প্রদীপ দিচ্ছে। গাল ফুলিয়ে শাঁখ বাজাচ্ছে। এমনি সব। বর্ধমান না বাঁকুড়ার কোন গ্রামে সেন-দিদিদের দেশ। তারপর কেমন করে যেন অবস্থার বিপর্যয়ে সবকিছু ওলোট-পালট হয়ে গেল—সে-গল্প জানি না। তাছাড়া সেনদিদি আমাদের সংসারে কতোদিন আছে, তাও না। আমরা জন্মে থেকেই ওকে দেখে আসছি। সেনদিদির কোলেপিঠে চড়ে, আদরে-সোহাগে বড় হচ্ছি। বাবা মারা যাবার পর সেনদিদি প্রায়ই আজকাল কাঁদে।

আকাশটা গুড়-গুড় শব্দ করলো। বৃষ্টি আরো ঝেঁপে এলো।

ওপর থেকে মা-মণি জানিয়ে দিলেন—আজ আর কেউ চান করবে না। শুধু ভিজে গামছা দিয়ে গা মুছবে।

বিজু আমার মুখের দিকে হতাশভাবে তাকালো। ও বলতে চাইলো—জলে ভিজে দাপাদাপি করার ব্যাপারটা এখানেই ইতি।

আকাশবাণী দুপুরের খবরে বললো—আবহাওয়া এমনই চলবে। বিকেলে বা সন্ধ্যের দিকে অবস্থা আরো খারাপের দিকে যেতে পারে। ঝোড়ো হাওয়া বইবে। দমদম থেকে অনেকগুলো বিমানের যাত্রা বাতিল হয়ে গেছে।

আমি আর বিজু সেই সকালের মতো বাইরের ঝুলবারান্দায় বুক ঝুঁকিয়ে বৃষ্টি দেখছি। তিন্নি ঘুমোচ্ছে। মা-মণি কি একটা পত্রিকা পড়ছিলেন। নিচে রান্না-ঘরে সেনদিদি রাত্রের খাবার করছে। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। বিজু আর আমি ছুটে টেলিফোনের কাছে পেঁছুবার আগেই মা-মণি রিসিভার তুলেছেন।

আমি আর বিজু ফিরে এলুম ঝুল-বারান্দায়। বিজু আমার মুখের দিকে তাকালো। আমি বললুম—টেলিফোনে কথা শুনতে বেশ লাগে। তোর?

বিজু বলো—আমারো।

মেথাদিকে গানের স্কুল থেকে ফিরে আসতে দেখলুম। শাড়ির প্রান্তটা অনেক-খানি তুলেও কোন লাভ হয়নি। ভিজে সপসপে হয়ে গেছে। কলসা রঙের বর্ষাতিটা দেহের সঙ্গে লেপ্টে আছে।

রেখাদি আমাদের ঝুলবারান্দার দিকে চোখ উঁচু করে তাকালেন। হাত নাড়লেন সকালের মতোই। আমরাও।

মা-মণি সে সময় টেলিফোনে হাসাহাসি করছিলেন। দু-একটা টুকরো কথা শোনা গেল—বা বৃষ্টি! এই বৃষ্টিতে? দেখা কখন? আচ্ছা—হুঁ হুঁ। তাই বুঝি!

বিজুকে জিজ্ঞেস করলুম—বলতো—টেলিফোনে কে?

বিজু বললো—বোধহয় কাকু। গুপী-কাকু।

আরো একটু পরে মা-মণি টেলিফোনে কথাবার্তা শেষ করে আমাদের ডাকলেন—এই বিজু—নানু, তোমরা শুতে যাও। মা-মণির কণ্ঠস্বর এখন আশ্চর্য নরম আর মিষ্টি!

আমরা ঘরের মধ্যে গিয়ে মা-মণির বেলো-সান্নিধ্যে দাঁড়াতে মা-মণি বললেন—আমি একটু বেরোবো। তোমরা নিজের নিজের পড়াশোনা করবে। দুষ্টুমি করবে না। জলে ভিজবে না। শরীর খারাপ হবে।

বিজু সেই তালে কাজ গুছোলো—আমার জন্যে টফি আনবে না?

মা-মণি বললেন—আনবো সোনা।

তারপর সেই ডিমের মতো লম্বাটে গোল আয়না লাগানো ড্রেসিং টেবিলটার সামনে বসলেন মা-মণি। ড্রেসিং টেবিলটার মাথার ওপর দেয়ালে লাগানো বাবার সেই বড় ছবিটা! যে ছবিটায় বাবা কেমন হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন। পুরোপুরি বাঙালী পোষাক। পাঞ্জাবি আর রেশমের কাজকরা শাল জড়ানো। ছবিটা বোধহয় শীতকালে তোলা হয়েছিল। চোখে চশমা। যে চশমাটা দেরাজের মধ্যে আছে। ছবিটা এমন—যেদিক থেকে যেমন করেই তাকানো যাক, সেদিকেই বাবার ছবির চোখ ঘুরে যাবে। মনে হবে সরাসরি তার দিকেই তাকিয়ে আছেন। ঠোঁটের ফাঁকে স্মিত হাসি।

মা-মণি টুলে বসে অনেকক্ষণ ধরে পরিপাটি করে চুল আঁচড়ালেন। প্রসাধন করলেন। স্প্রে থেকে সেণ্ট ছড়ালেন। দেরাজ খুলে জলপাই রঙের একখানা শাড়ি পরলেন। কাপড়টার কোন পাড় নেই। মা-মণিকে সুন্দর বলে যে কোন রঙ দারুণ মানিয়ে যায়। চমৎকার গাঢ় নীল রঙের জাপানী ছাতাটা বের করলেন। ওই ছাতাটা মুড়ে ছোট করে হাত-ব্যাগের মধ্যে ভরে রাখা যায়।

সেনদিদিকে ডেকে রাতের বন্দোবস্ত বোঝালেন। আমাদের ওপর নজর রাখতে বললেন। সময়মতো টিন্নিকে দুধ খাওয়ানো আর ঘুম পাড়ানোর কথা বললেন।

নিখুঁত সাজপোষাক ঠিকমতো হয়েছে কিনা আরো একবার দেখে নিলেন মা-মণি। মণিবন্ধে ছোট্ট ঘড়িটা দেখলেন। হাত-ব্যাগটা খুলে কি যেন দেখলেন। এমন সময় বাইরে থেকে মানে বড় রাস্তার মুখ থেকে একটা মোটরগাড়ির হর্ণ শোনা গেল। মা-মণির মুখ খুশিতে ভরে উঠলো। একটু যেন কান পেতে হর্ণের শব্দটা শুনে স্বগতোক্তি করলেন—ঐ এসে গেছে।

যাবার আগে বিজুর থুতনি ধরে আদর করলেন। তোমাদের জন্যে টফি আনবো। তারপর নীল রঙের জাপানী ছাতাটা আর হাত-ব্যাগটা নিয়ে মা-মণি নিচে নেমে গেলেন।

আমরা ছুটে গিয়ে আবার ঝুল-বারান্দায় ঝুঁকে পড়লুম। তখনো আগের মতোই ঝম্-ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। মেঘ ডাকছিল।

জাপানী ছাতাটা খুলে এক হাঁটু জলের মধ্যে মা-মণি রাস্তায় নামলেন। রেখাদির মতো কাপড়ের প্রান্তটা না তুলেই ছপ্-ছপ্ করে জল ভেঙে চললেন। জলপাই রং-এর শাড়ির নিচের অনেকাংশ সম্পূর্ণ ভিজে গেল। মা-মণিকে দেখাচ্ছিল যেন একটি কিশোরী মেয়ের মতো।

ঝুলবারান্দা থেকে আরো বেশি ঝুঁকে দেখতে গিয়ে জলের ছাটে আমাদের মাথা ভিজে গেল।

বড় রাস্তার মুখে দাঁড়ানো গুপী-কাকুর সবুজ মোটরগাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। সামনে কাচের ওপর জল-সরানো ঝাটা চল-ছিল সপ্-সপ্ করে। মা-মণি ঘুরে গিয়ে বাঁদিকের দরজা খুলে গুপীকাকুর পাশে বসলেন।

আমি আর বিজু ঝুল-বারান্দা থেকে বৃষ্টি সমেত ওঁদের চলে যাওয়া দেখলুম।

টিন্নিটা এই সময় কেঁদে উঠলো বেশ জোরে।

সেনদিদি ওকে ভোলাতে লাগলো—না—আ—আ। কাঁদে না—সোনা—আ—আ—

আমি আর বিজু বারান্দা থেকে সরে এসে সেনদিদির কাছে বসলুম। ঠিক কেন এই সময় মন খারাপ লাগছে বলতে পারবো না।

টিন্নি কান্না ভুলে পিট্-পিট্ করে বাবার সেই আশ্চর্য ছবিটার দিকে তাকাচ্ছে। যেটা, যেদিকে চোখ ফেরানো যায়, সেদিকেই চোখ ফেরান বাবা।

বাবা আমাদের কতো ভালোবাসতেন! কতো—

গোয়েন্দা ধাঁধা

বেআক্কেলে আলপিন

ডরোথি সেয়ার্স

স্যার সেপ্টিমাস কোল-কে কুবেরের ভায়রা-ভাই বলা চলে। ব্যাঙ্কে জমা টাকার হিসেবও মনে থাকে না তাঁর।

কিন্তু টাকা থাকলেই আধুনিক হওয়া যায় না। স্যার সেপ্টিমাস-ও মডার্ন নন। সেকেলে। এমনকি সখগুলো পর্যন্ত মান্ধাতা আমলের।

একটা সখ হল বড়দিন পড়লেই দেশের বাড়ীতে যাওয়া। একা না। সঙ্গে বউ-মেয়ে তো থাকবেই—সেই সঙ্গে থাকবে কিছু বন্ধুবান্ধব অতিথি। বাড়ীটা প্রকাণ্ড। গোলকধাঁধা বললেই চলে। সনাতনী কায়দায় ফুল-লতাপাতা দিয়ে মুড়ে দেন ঘরদোর। তারপর শুরু হয় বস্তাপচা সস্তা খেলা। যেমন কানামাছি, লুকোচুরি, চোরপুলিশ ইত্যাদি। একই প্রোগ্রাম চলে আসছে বছরের পর বছর। তাঁর ভালই লাগে। সামনে কেউ কিছু বলেও না।

সেবারও দেশের বাড়ী গেছেন স্যার সেপ্টিমাস। সঙ্গে বউ এবং একমাত্র কন্যা-রত্ন। মারগারিটা। একুশ বছর আগে এই বড়দিনের দিনই সে পৃথিবী আলো করে-ছিল। স্যার সেপ্টিমাস তাই এই দিনটাকে স্মরণ করেন কুবেরের পন্থায়। মানে, সাগর-ছেঁচা দারুণ দামী একটা মুক্তো উপহার দেন মেয়েকে। সে-মুক্তো দেখলে নাকি জাঙ্কেল গুড়ুম হয়ে যায়, এত সুন্দর। ওজন নাকি চুলের মত হাল্কা। সোসাইটির কাগজে মারগারিটার মুক্তোর মালার ছবি বেরিয়েছে বহুবার। দেশশুদ্ধ লোক জেনে গেছে মুক্তোমালার দাম, খ্যাতি আর ইতিহাস।

এবার নিয়ে সবশুদ্ধ একুশটা মুক্তো জমেছে মালায়।

রাতের খাওয়া সবে শেষ হয়েছে। খাওয়ার মত খাওয়া। নড়বার ক্ষমতা নেই কারো। শুতে পারলে বাঁচে। কিন্তু এখুনি শুরু হবে কানামাছি খেলা, লুকোচুরির খেলা এবং আরো অনেক খেলা। মানে, ঘুমের দফা রফা।

জমে উঠল খেলা কিছুক্ষণের মধ্যে। হঠাৎ স্যার সেপ্টিমাস শুধোলেন—মারগা-রিটা, তোর মুক্তোর মালা কোথায়?

এই তো এখানে রেখেছি। খেলতে গিয়ে পাছে ছিঁড়ে যায়। বাক্সটা খুলল মারগা-রিটা। কিন্তু মালা নেই তার মধ্যে। দুষ্টু হেসে বললে—নিশ্চয় লুকিয়ে রেখেছো। দাও বলছি।'

'আমি কেন লুকোতে যাবো?' তেড়ে উঠলেন স্যার সেপ্টিমাস।

খোঁজ খোঁজ পড়ল ঘরে ঘরে। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। সব ঘরে খোঁজার দরকারও ছিল না। ড্রেসিংরুমের কোথাও ফেলে রেখে নিশ্চয় ভুলে গেছে মারগারিটা। কিন্তু জামাকাপড় তছনছ করেও অদৃশ্য রয়ে গেল কণ্ঠহার।

না জানলা দিয়েও পাচার হয়নি। সব জানলাই বন্ধ। দুজন চাকর হাত লাগালে তবেই খোলা যায় এক-একটা জানলা। সুতরাং মালাটা এই ঘরেই কোথাও আছে। কিন্তু কোথায়?

এই সময়ে স্যার সেপ্টিমাসের ভেজালো সেক্রেটারী উইলিয়াম নর্গেট বললে—'খামাকো দেরী করছি। আসুন বডি সার্চ করা যাক প্রত্যেকের।'

আশ্চর্য! কেউ রাগ করল না প্রস্তাবে। তৎক্ষণাৎ মেয়েরা গেল ভেতরের ঘরে। ছেলেরা বাইরের ঘরে। মাঝরাতে জামাকাপড় খুলে আবার পরতে হল সবাইকেই। মুক্তো পাওয়া গেল না বটে, তবে প্রত্যেকেরই পকেট আর হাতব্যাগ থেকে বেরোলো অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিসপত্র।

যেমন, লর্ড পিটার উইমজি-র পকেট থেকে বেরোলো একটা ভাঁজ-করা ফুট-রুল, আতস কাচ আর একটা চিমটে। আশ্চর্য কিছু নয়। মাঝে মাঝে শার্লক হোমস্ হওয়া তাঁর হবি। কিন্তু অন্যান্যদের পকেট থেকে বেরোলো মোম গালার ডেলা, সেফটিপিন, সুতোর গোলা, তুলো, রহস্য-জনক সাদা গুঁড়ো, গোপন খুপরিওয়ালা চাইনীজ সিগারেট বক্স, সবশেষে একটা নকল মুক্তোর মালা!

উৎকণ্ঠা আর সইতে পারল না এক-জন। চেঁচিয়ে বলল—'ডাকুন পুলিশ!'

আঁৎকে উঠে বললেন স্যার সেপ্টিমাস—'পাগল নাকি? মান-সম্মান নেই আমার অতিথিদের? তবে লর্ড পিটার উইমজি যদি মনে করেন—'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়', উঠে দাঁড়ালেন তাল-ঢ্যাঙা লর্ড। 'চলুন ভেতরের ঘরটাই আগে দেখা যাক। আপনারা কিন্তু বাইরে বসে থাকুন। আমার সঙ্গে থাকুন শুধু স্যার সেপ্টিমাস—সাক্ষী হিসেবে।'

শুরু হল তল্লাসী। পায়ের ছাপের আশা বৃথা। কালো কাচ-মোড়া মেঝেতে সিলিংয়ের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। বড় বড় ঝাড়বাতিতে ঝুলছে মিজলটো লতা আর বেরীফলের গুচ্ছ। আসবাবপত্র খুব বেশী নেই বলেই খুঁজতে সুবিধে হল লর্ড উইমজির। মেঝের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে, চোখে আতস কাচ লাগিয়ে ঘরময় ঘুরতে লাগলেন বিরাট শুঁয়ো পোকার মত। সবশেষে একটা প্রকাণ্ড স্টীল আল-মারীর তলায় হাত ঢোকালেন। খাটো পায়া। হাত আটকে গেল। আস্তিন গুটোলেন উইমজি। উপুড় হয়ে শুয়ে শূন্যে লাথি মেরেও কনুই পর্যন্তও ঢোকাতে পারলেন না। অগত্যা ফুট-রুলের ভাঁজ খুলে ঢুকিয়ে দিলেন। অনেক কসরৎ করে টেনে আনলেন—

একটা আলপিন!

স্যার সেপ্টিমাস হাসবেন কি কাঁদবেন ভেবে পেলেন না। আলপিনটা খুব সরু। লম্বায় পৌনে এক ইঞ্চি। মাথাটা ছোট্ট। হাতের তেলোয় আলপিন নিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন উইমজি। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হল চোখ। মেঝের কালো কাচে দেখা গেল তাঁর উচ্ছ্বসিত চোখের প্রোজ্জ্বল প্রতিবিম্ব।

হেসে উঠলেন আপনমনে। বললেন—'মালা তো পাওয়া গেল। কিন্তু নিয়েছে কে, সেটা তো জানলাম না।'

সারা রাত ঘর বন্ধ রইল। সকাল বেলা অতিথিদের নিয়ে হলঘরে ব্রেকফাস্ট খেলেন স্যার সেপ্টিমাস। তারপর আচমকা চেঁচিয়ে বললেন—ছিঁড়ে ফ্যালো, ছিঁড়ে ফ্যালো সব লতা পাতা ফুল-টুল। দরকার নেই সাজ-সজ্জায়। শেষ হোক অলুক্ষুণে উৎসবের।'

খেলার ছলেই শুরু হল ছেঁড়াছেঁড়ি পর্ব। ড্রেসিং রুমের তালা খুলে দেওয়া হয়েছিল অনেক আগেই। খেলতে গিয়ে মুক্তোর মালার শোক পর্যন্ত ভুলে গেল মারগারিটা।

ভুললেন না কেবল পিটার উইমজি। লক্ষ্য রাখলেন, কে আগে ড্রেসিংরুমে ঢোকে। তারই কাঁধে হাত রেখে বলেন—'যাবার সময়ে আপনার এই জিনিসগুলো কিন্তু নিয়ে যাবেন।'

হাতের তেলোয় দেখা গেল বাইশটা আলপিন!

মুক্তোর মালা? আগেই ফিরে গেছে মারগারিটার কাছে।

কিন্তু কিভাবে? কিভাবে?

—অদ্রীশ বর্ধন

(গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান ৬২ পৃষ্ঠায়)

এই বাংলার খবর

দিল্লীর দিকে তাকিয়ে

পশ্চিম বাংলার দুর্গত এলাকায় নিরন্ন মানুষ যখন ত্রাণের জন্যে রাজ্য সরকারের দিকে তাকিয়ে আছে, তখন রাজ্য সরকার এই সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায় তাকিয়ে আছেন দিল্লীর দিকে। কম করেও দেড় কোটি মানুষকে অনাহার থেকে বাঁচানোর মতো আর্থিক সংগতি যে রাজ্য সরকারের নেই তা অনেক আগেই জানা গেছে। ত্রাণ খাতে বরাদ্দ অর্থ অনেক আগেই শেষ। এখন চলছে উন্নয়নের জন্যে বরাদ্দ টাকা ভেঙে ত্রাণের কাজ। ত্রাণের জন্যে রাজ্য সরকার আরো দশ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন, কিন্তু তার ফলে বিদ্যুৎ ছাড়া অন্য সব খাতেই বরাদ্দ অল্পবিস্তর ছাঁটাই করতে হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে যে বরাদ্দ ছাঁটাই করা হয় নি তার কারণ রাজ্যে বর্তমান বিদ্যুৎ সংকট। তবে ত্রাণ খাতে যে টাকা খরচ হবে তা দিয়ে টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট, বাঁধ ইত্যাদি তৈরির চেষ্টা হবে। সেটাও উন্নয়নেরই কাজ। ত্রাণের বাড়তি খরচ মেটাবার জন্য বিশেষ "ত্রাণ লেভি" বসানো যায় কিনা তাও নাকি বিবেচনা করা হচ্ছে।

কিন্তু রাজ্য সরকারের সমস্যা যে শুধু টাকার এ-কথা ভাবলে ভুল হবে। ত্রাণ বাবদ দিল্লী কোনো অর্থ সাহায্য দিচ্ছে না, কিন্তু দিলেও বিশেষ লাভ হবে না। কারণ দুর্গত মানুষকে অনাহার থেকে বাঁচানোর জন্য চাই খাদ্যশস্য, অথচ অভাব সেই খাদ্যশস্যেরই। দুর্গত এলাকায় দেওয়ার জন্যে অন্তত ২৫ হাজার টন গম দরকার। সেকথা জানিয়ে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে জরুরি বার্তা পাঠানো হয় দিল্লীতে। কিন্তু দিল্লী ব্যাপারটাকে খুব জরুরি মনে করছে বলে মনে হয় না, কারণ জরুরি বার্তার জরুরি জবাব আসে নি। কেন্দ্রীয় সরকারের দুজন পদস্থ অফিসার সরেজমিনে অবস্থা দেখার জন্যে এই রাজ্যে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন অস্থায়ী রাজ্যপাল শংকরপ্রসাদ মিত্রের সঙ্গে দুর্গত এলাকাতেও ঘুরেছেন। তাঁদের রিপোর্ট পেয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কী করেন দেখা যাক। এদিকে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কে আর গণেশ কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সঙ্গে আলোচনার সময় এই রকম আভাস দিয়েছেন যে, ত্রাণের জন্যে দিল্লীর কাছ থেকে কিছু বাড়তি সাহায্য মিললেও মিলতে পারে।

খাদ্যনীতি ও খাদ্যমন্ত্রী

বিদেশী চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষের দেহে আরো একবার অস্ত্রোপচারের দরকার হতে পারে—লণ্ডন থেকে এই মর্মে খবর এসে পৌঁছনোর পর কলকাতায় জল্পনা সুরু হয়ে যায় তিনি পদত্যাগ করতে পারেন। গত বছর এক মোটর দুর্ঘটনায় তিনি আহত হন। কিন্তু সেই জখম পুরোপুরি সারে নি বলেই আগস্টের গোড়ায় তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যান। প্রফুল্লকান্তির পদত্যাগের সম্ভাবনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য জানান, তিনি এ-বিষয়ে কোনো খবর পান নি। কিন্তু তাতে জল্পনার অবসান ঘটে না। প্রফুল্লকান্তি পদত্যাগ করবেন কিনা, করলে কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন, অস্থায়ী খাদ্যমন্ত্রী ডঃ গোপালদাস নাগই ঐ পদে স্থায়ী হবেন কিনা, ডঃ নাগ কোন্ শর্তে এই গুরুদায়িত্ব নিতে রাজি হবেন, না হলে শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে কিনা—জল্পনা-কল্পনা চলছিল এই সব বিষয় নিয়েই।

প্রফুল্লকান্তি ফিরে আসার পর অবশ্য এই জল্পনার অবসান ঘটে। বিদেশ থেকে ফিরে তিনি জানান, তিনি পদত্যাগ করেন নি। তাঁর দেহে আর একটি অস্ত্রোপচারের দরকার, তবে চিকিৎসকেরা বলেছেন তা এপ্রিলে করলেও চলবে। এখন অস্ত্রোপচার করলে তাঁকে অন্তত তিন মাস শয্যাশায়ী থাকতে হবে। রাজ্যের বর্তমান অবস্থায় তিনি তা পারেন না। তারপর তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। পরে তিনি জানান যে, তিনি খাদ্য দপ্তরের দায়িত্ব ছাড়ছেন।

খাদ্যনীতির ব্যর্থতা নিয়ে যে কথা উঠেছে সে-প্রসঙ্গে প্রফুল্লকান্তি বলেছেন, বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় সরকার মাথা পিছু সপ্তাহে দু কিলো চাল-গম দিচ্ছেন। আংশিক রেশন এলাকায় 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর কার্ডধারীদের পাঁচ শ গ্রাম গম দেওয়া হচ্ছে। তবে গ্রামের মানুষের যদি ক্রয়ক্ষমতা না-থাকে তবে সে-দোষ খাদ্য দপ্তরের নয়। খরায় অবস্থা খারাপ হতে পারে বলে তিনি গত জুলাই থেকে মন্ত্রিসভাকে সতর্ক করে দিয়েছেন, কিন্তু মজুত ভান্ডার গড়ে তোলার দিকে নজর দেওয়া হয় নি। খাদ্যনীতির ব্যর্থতার জন্যে তাঁকে দায়ী করার যে-চেষ্টা চলছে তা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। খাদ্যনীতি তাঁর ব্যক্তিগত নীতি নয়। এই নীতি রচনার ব্যাপারে সর্বদাই তিনি গোটা মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। ব্যর্থতা যদি এসে থাকে তবে তার দায়িত্ব সকলের। দেশের মানুষ ও দলকে নীতি রূপায়ণের ব্যাপারে জড়িত করাতে পারলে তবেই সেই নীতি সার্থক হতে পারে। মজুত উদ্ধারের যে চেষ্টা হচ্ছে তা ভালোই, কিন্তু এ-ব্যাপারেও চাই জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা।

পাট চাষীর বিপদ

এই বাংলার পাটচাষীর একটা ফাঁড়া আপাতত কাটলো, কিন্তু কাঁচা পাট কেনা বন্ধ করার জন্যে চটকলগুলোর ওপর নির্দেশ জারির প্রশ্নে পাটচাষীদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব আরও একবার বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। চটকলের মালিকেরা সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারকে এই মর্মে অনুরোধ জানান যে, যে-সব কলের মালিকের হাতে বেশি পাট মজুত আছে তাদের যেন আর পাট কিনতে দেওয়া না-হয়। তাঁদের এই অনুরোধের উদ্দেশ্য নাকি ছিল, ছোটখাটো কলের মালিকদের বাঁচানো, কারণ এই লোকেদের হাতে নাকি বিশেষ পাট মজুত নেই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই অনুরোধ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করেছেন বলে খবর রটে যাওয়ার ফলে ছোটখাটো চটকলের উপকার না-হোক, মাথায় হাত পড়লো পাটচাষীর। গত বছরের তুলনায় এবার কাঁচা পাটের দর কিছুটা চড়া, কারণ এবার পাটের ফলন হয়েছে কম। (পাটের দর ভালো মেলে না বলেই অনেক চাষী এবার পাট না বুনে ধান চাষ করেছেন।) কিন্তু চটকলগুলো পাট কেনা বন্ধ করছে শুনে পাটের দর পড়তে সুরু করলো।

এই সবে বাজারে কাঁচা পাট আসতে সুরু করেছে, এই সময় দর পড়তে দেখে রাজ্য সরকারও পড়লেন ভাবনায়। দিল্লীর

কাছে পাঠানো হলো কড়া প্রতিবাদ। তারপর পাট কমিশনার জানালেন যে, চটকলকে কাঁচা পাট কেনা বন্ধ করার নির্দেশ নাকি দেওয়া হয় নি। তিনি এই কথাটা বললেন বটে, কিন্তু খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দপ্তর সত্যি সত্যিই ঐ রকম একটা নির্দেশ পাট কমিশনারের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের প্রতিবাদ আর খবরের কাগজে হৈ-চৈয়ের ফলে নির্দেশটা আর চটকলের মালিকদের কাছে পাঠানো হয় নি। অনেকে সন্দেহ করছেন, চটকল মালিকদের চাপে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব ভারতের পাটচাষীদের বঞ্চিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। পাটচাষীদের প্রতি দিল্লীর ঔদাসীন্য নতুন ব্যাপার নয়; কিন্তু এ-বিষয়ে অনেক প্রতিবাদ সত্ত্বেও যে সে-মনোভাব বদলায় নি, এই ঘটনা তারই প্রমাণ।

বিমান বন্দরের বরাত খুলছে

সেই যবে থেকে একদিকে ব্যবসায়িক মন্দা আর অন্যদিকে শুমোখুনির ধাক্কায় কলকাতার দুর্নাম রটেছে তবে থেকে দমদম বিমানবন্দরেরও কপাল পুড়েছে। বরাতের এমনই ফের যে, একদিকে যখন অনেক টাকা খরচ করে পেল্লায় আন্তর্জাতিক টার্মিনাল বিল্ডিং তৈরি হচ্ছিল তখন আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন-গুলো একে একে দমদম থেকে পাততাড়ি গুটোতে সুরু করে। তাদের বক্তব্য এই যে, যথেষ্ট যাত্রী যখন দমদমে ওঠা-নামা করে না তখন আর এই বিমানবন্দরে বিমান নামিয়ে লাভ কী? এখন যে হিসেবপত্র পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে দমদমের বরাত বোধহয় ফিরছে। ১৯৭১-৭২ সালে দমদম দিয়ে সোয়া সাত লাখের মতো যাত্রী যাতায়াত করেছিলেন। '৭২-৭৩ সালে এই সংখ্যা এক লাফে বেড়ে ন' লাখ ৬৫ হাজার ছাড়িয়ে যায়। এক বছরে এই হারে (শতকরা প্রায় সাড়ে তেত্রিশ ভাগ) যাত্রীসংখ্যা দেশের আর কোনো বিমানবন্দরেই বাড়ে নি। '৭৩-৭৪ সালে অবশ্য এই সংখ্যা কিছুটা কমেছে, কিন্তু তা হলেও তা ন' লাখের বেশ ওপরে। ১৯৬৮ সাল থেকে ধরলে দমদমে বিদেশী যাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে দু'গুণ।

তদন্তের শুনানীতে দেরী

ওয়াঞ্চু কমিশনের কাজকর্ম এখন যে-তালে চলছে তাতে পাঁচজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তের পালা শেষ হতে আরো কয়েক মাস লাগবে বলে মনে হচ্ছে। জুনে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, একজন বিচারপতিকে দিয়ে তিনি মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করাবেন। জুলাই মাসে এ-বিষয়ে সরকারি গেজেটে ঘোষণা প্রচারিত হয়। সেপ্টেম্বরের মধ্যে কমিশনের রিপোর্ট পাওয়া যাবে বলে সরকার আশা করেছিলেন। এখন মনে হচ্ছে, সে-আশা বৃথাই। এমন কি রাজ্য সরকারের নতুন নির্দেশ অনুযায়ী নভেম্বরের মধ্যেও রিপোর্ট পাওয়ার আশা নেই। কারণ তখন পর্যন্ত শুনানিই শেষ হবে না। উপমন্ত্রী সুনীতি চট্টরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগের শুনানি সুরুই হবে ডিসেম্বরের বারো তারিখে। তার আগে ত্রাণমন্ত্রী সন্তোষ রায়ের প্রসঙ্গ আবার উঠবে ঐ মাসের সাত তারিখে এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজার দু তারিখে। বনমন্ত্রী সীতারাম মাহাতোর প্রসঙ্গ উঠছে নভেম্বরের চার তারিখে।

শুনানিতে এই দেরির একটা কারণ, ওয়াঞ্চু কমিশন ব্যাপারটা যেন বেশ "অস্বাস্থ্যকর" হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

৩০।৯।৭৪

—দেবদত্ত

পটভূমি

আজকের রাজনীতির অন্য নাম চরিত্রহনন

এক অভিযোগ, এক ভাষা, এক দাবী, শুধু পরিস্থিতি, কাল এবং প্লাটফর্ম ভিন্ন। আজ মনে করুন, ১৯৬৭ সালের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে খাদ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে ফ্রন্টের বড় শরিক সি পি এম তার নেতা ও কর্মীদের কটূক্তি, আচরণ এবং পদত্যাগ দাবীর ঘটনা। এবার মিলিয়ে নিন '৭৪ সালে কংগ্রেস সরকারের আমলে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষের বিরুদ্ধে শহীদ মিনার মঞ্চ থেকে নিজের দলের একটি যুব ও ছাত্রগোষ্ঠীর নেতাদের অভিযোগ, দাবী ও অশালীন উক্তি।

'৬৭ সালের সেই পুরান ঘটনা আজ মনে উঠত না যদি সেদিন শহীদ মিনারে কংগ্রেসের যুব ও ছাত্রদের এক অংশের তর্জন-গর্জন, উপদেশামৃত বা অভিযোগ ও দাবীগুলো কানে না আসতো। এই চরিত্রহননতা এবং নিজেদের ধোয়া তুলসী প্রমাণের প্রয়াস কেন? রাজ্যব্যাপী হাহাকার, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারী, ক্রয়ক্ষমতাহীনতার অভিশাপে অভিশপ্ত বঙ্গবাসীর দুঃখ মোচনে নিজেদের গাফিলতি ঢাকবার জন্যই কি এই আক্রমণ? না, প্রতিপক্ষ গোষ্ঠীকে অপদস্থ করার রাজনৈতিক কৌশল?

শহীদ মিনারের সভায় যুব কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদের মুখ্য নেতারা সরাসরি তিনজন মন্ত্রীর নাম করে—অর্থাৎ খাদ্য, শিল্প ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বললেন "এঁদের ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব ছাত্র পরিষদ বা যুব কংগ্রেস কেন নেবে?" তাঁরা সাফল্যের ভাগীদার হতে চান, ব্যর্থতার নয়। ভাল কথা। কিন্তু তাঁরা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সাফল্য এনেছেন তাঁদের বশংবদ মন্ত্রীদের সাফল্যের তথ্য কি তা অবশ্য তাঁরা বলেননি। কারণ, হয়তো কিছুই বলার নেই।

১৯৬৭ সালে চালের দর যখন ভীষণ বেড়ে গেল অভাব দেখা দিল, রেশনের বরাদ্দ কমল, কেন্দ্র থেকে সাহায্য আশানুরূপ এলো না তখন সি পি এম তাদের ধোয়াতুলসী প্রমাণের জন্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের ঘাড়ে সব দোষ দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে প্রকাশ্যে খাদ্যমন্ত্রীর সমালোচনা, ঘেরাও এবং পদত্যাগের দাবীতে তারা সোচ্চার হয়ে উঠল। লেজুড় পার্টিগুলো, এমনকি সি পি আই কর্মীরা পর্যন্ত একই পন্থা ধরেছিলেন। চরম পরিণতি ঘটল কাঁথির একটি ঘটনায়। ডাঃ ঘোষ নিরপেক্ষ নীতি নিয়ে চলতেন, তাই হল তাঁর বিপদ।

পারস্পরিক সন্দেহ, দলবাজী এবং একে অপরের উপর টেক্কা দেওয়ার তৎপরতা যুক্তফ্রন্টে সব সময়েই অব্যাহত ছিল। সেদিন কাঁথির ঘটনায় এবং অন্যান্য কএগুলো ঘটনায় ডাঃ ঘোষ রীতিমত অপমানিত, দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জির কাছে পদত্যাগের ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। অজয়বাবুর অনুরোধে প্রথমে ডাঃ ঘোষ পদত্যাগ করতে পারেননি। কিন্তু পরে তাঁকে যেতেই হল। চরিত্রহনন রাজনীতির ফলেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের সেদিন অকাল মৃত্যু ঘটেছিল।

আজকের যে কংগ্রেসী অংশ সি পি এমের সেই পুরান কৌশল নিয়ে চলছেন তাঁরাও আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে খাদ্যমন্ত্রীকে বেছে নিয়েছেন। খাদ্যমন্ত্রী যত বলছেন রেশনে খাদ্য সরবরাহ বরাদ্দ ঠিক আছে। ত্রাণের জন্য অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহই সমস্যা। খাদ্যনীতি যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে তবে তার জন্য সামগ্রিকভাবে মন্ত্রিসভা ও কংগ্রেস দলই দায়ী। ততই বিরুদ্ধগোষ্ঠী হুংকার দিচ্ছেন সব কিছু অচল করে দেবো! এক দলের, এক আদর্শের এক প্রতীক ও পতাকার লোকের মধ্যে এই যুদ্ধং দেহি চেহারা দেখে সবাই উদ্বিগ্ন। ক্ষুধার্তকে অন্ন পৌঁছে দেওয়া যেখানে প্রথম দায়িত্ব, সেখানে একজোট হয়ে সেবার কাজে এগিয়ে না গিয়ে একদল কংগ্রেসী ছিদ্রান্বেষীর ভূমিকা পালনে এতো তৎপর হলেন কেন? এতে কি কংগ্রেসের শক্তি এবং কংগ্রেসের ভাবমূর্তি বজায় থাকবে? গরীব জনসাধারণ বাঁচবে? নিশ্চয় নয়। তবুও এই আত্মহননের পথেই চলতে হবে। কারণ, সি পি আইর তাত্ত্বিকরা এই পথকেই প্রগতিশীলতার পথ বলে বুঝিয়েছেন।

এই হুমকী নাটকের সূচনা ১৯৭২। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষের পদত্যাগের দাবী থেকে এই বিরোধের সূচনা। এর পর ১৯৭৩ সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ কলকাতার রাজনৈতিক সম্মেলন মঞ্চ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীগোষ্ঠী, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চিৎকার এবং পরবর্তী বহু ঘটনায় এই চরিত্রহননের কৌশলকে প্রসারিত করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর দুর্বলতা জোড়াতালির ঐক্যনীতির সুযোগ উভয়পক্ষই কাজে লাগিয়েছেন। সি পি আই যখম যুবক কংগ্রেসে তাদের চিহ্নিত প্রগতিশীল অংশ দুর্বল ও কোণঠাসা, তখন পি ডি এ'র গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করলো। কিন্তু ঝাঁকের কই ঝাঁকে ফিরে গেলো না। তাঁদের কংগ্রেসের ভেতরেই লড়াই চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেওয়া হল। কংগ্রেসের কলহ-যাত্রা বিশেষত ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর লড়াই থামাবার জন্য বার বার মুখ্যমন্ত্রীকে এগিয়ে যেতে হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। কিন্তু মিলন হল না ঝগড়াও থামল না। সেই ঝগড়ার এবং রাগের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া গেল সেদিনের জনসভায়।

সি পি আই আবার ঝোপ বুঝে কোপ মারতে এগিয়ে এসেছে; আবার যৌথ আন্দোলন, মহাকরণ ঘেরাও ইত্যাদির কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেসের বন্ধু অংশকে নিয়ে। এই আন্দোলন কার বিরুদ্ধে? খাদ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে? কিন্তু ত্রাণমন্ত্রী বা পরিবহণ মন্ত্রী বা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে নয় কেন?

গ্রামে গ্রামে হাহাকার। ব্যাপক ত্রাণের ব্যবস্থা নেই। খাদ্যসামগ্রী কি[illegible]ওয়ার ক্ষমতা রাজ্যের তিন কোটি [illegible] মানুষের নেই। রাজ্যে খাদ্য আছে, কিন্তু দাম বেশী। অন্যান্য জিনিসেরও দাম চড়া। পুরো ও আধা রেশনিং-এ সরবরাহ পরিমাণ ঠিকই আছে। আসল সমস্যা হল মূল্য-শাসনে ব্যর্থতা এবং ব্যাপক ত্রাণের সংগঠনে সরকারী অক্ষমতা। কিন্তু সেদিকে কংগ্রেসের "হৈচৈ" গোষ্ঠীর কোন নজর নেই।

খাদ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে বাছাই করে গালমন্দ করায়, পদত্যাগের দাবীতে এঁরা সোচ্চার; কিন্তু যাঁদের অপদার্থতায় রাষ্ট্রীয় পরিবহণ পথে বসেছে, ত্রাণের সামগ্রী ক্ষুধার্তদের কাছে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে না তাঁদের বিরুদ্ধে এঁরা টু শব্দ করছেন না।

এই গোষ্ঠী লড়াইর জোয়ারে ত্রাণ-সামগ্রী কোথায় ভেসে যাচ্ছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। মানুষ বাঁচল কি মরলো তার দিকে তাকাবার সময় নেই। কিন্তু বিরামহীন খেউড় গানে এদের ক্লান্তি নেই। এই হল পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির এক দুর্ভাগ্যজনক চিত্র।

—চাণক্য

দেশে বিদেশে

সুলক্ষণ ?

ইতিমধ্যে একটি সুলক্ষণ এই যে, সেপ্টেম্বরের প্রথম ১৫ দিনে পাইকারি মূল্যের সূচক সংখ্যা কিছুটা কমেছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রথম দামের নিম্ন-গতি লক্ষ্য করা গেল। কলকাতায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিপুটি ডিরেকটর ডঃ আর কে হাজারী বলেছেন চাহিদার চাপ কমায় সুতী কাপড়, কাগজ প্রভৃতির বিক্রিতে মন্দা দেখা দিচ্ছে। বোম্বাই ও আমেদাবাদের মিল মালিকরা কাপড়ের দাম কিছুটা কমিয়েছেন। বাড়ি তৈরিতে কালো টাকার লগ্নি কমে যাওয়ায় ইমারতী মাল-মশলার দাম কিছুটা কমেছে এবং বোম্বাইয়ের ফিল্ম শিল্পে কালো টাকার লগ্নি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় ঐ শিল্পের অধিকর্তারা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। (বোম্বাইয়ের একটি সিনেমা হাউসের লাইসেন্স ইতিমধ্যে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। সিনেমা হাউসটিকে নাকি কয়েকজন নামকরা চোরা-চালানদারের কালো টাকা সাদা করার কাজে লাগান হত।)

•

কালো টাকার বিরুদ্ধে

গত ১৬ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে এগার-টায় বোম্বাই পুলিশের সি-আই-ডি অফিসে ঢুকে ২৮ বছর বয়সের এক সুসজ্জিত যুবক বললেন 'এই যে আমি এসেছি। আমার নাম ইউসুফ প্যাটেল।'

কয়েকদিন আগে সংসদে কেন্দ্রীয় বিত্ত মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী কে আর গণেশ যে তিনজনকে 'পয়লা নম্বর চোরাচালানকারী' বলে অভিহিত করেছিলেন তাদের একজন এই ইউসুফ প্যাটেল। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইন সংশোধন করে অর্ডিনান্স জারির সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুজন— সুকুরনারায়ণ বাখির ও হাজি মাস্তান মির্জা —ধরা পড়েছিল। ইউসুফ প্যাটেলই ফেরার হয়ে ছিল। সে গোয়ায় লুকিয়ে থাকতে পারে অথবা কুওয়াইটে চলে গিয়ে থাকতে পারে বলে খবর রটেছিল। পুলিশ নাকি তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিল। অথচ, আত্মসমর্পণ করার পর জানা গেল, ইউসুফ দিল্লিতে ছিল এবং বোম্বাইয়ে সে খোলা রাস্তা দিয়ে এসে পুলিশের কাছে আত্ম-সমর্পণ করার " আগে পর্যন্ত কেউ নাকি চিনতেই পারে নি।

চোরাচালানদারদের বিরুদ্ধে ও অন্যান্য অর্থনৈতিক অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে এই অভিযান চলছে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে চোরাচালানদারদের গ্রেপ্তারের খবর আসছে। এই অভিযানের তত্ত্বাবধান করতে কলকাতায় এসে রাষ্ট্রমন্ত্রী গণেশ বলেছেন, কালো টাকা ও চোরা-চালানের চক্রকে চূর্ণ করে জাতীয় অর্থনীতিকে বাঁচাতে সরকার কৃতসংকল্প। তিনি জানান, ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে মোট ১২৫ জনকে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে (তাদের মধ্যে একজন ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি বিদেশে পাচার করার বিদ্যায় হাত পাকিয়েছে।) আয়কর ফাঁকিবাজদের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালান হয়েছে তাতে গত আগস্ট মাস পর্যন্ত মোট ৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা গোপন আয় ধরা পড়েছে। আয়কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে সারা দেশে মোট চার হাজার সম্পত্তি দখলের নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

•

হুঞ্জার স্বাতন্ত্র্য লোপ

সিকিমের আইনসভার প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত যখন সিকিমকে সহযোগী রাজ্যের মর্যাদা দেয় তখন পাকিস্তান প্রবল প্রতিবাদ করেছিল। এখন সেই প্রতিবাদের আসল কারণটা বোঝা যাচ্ছে। কাশ্মীরের হুঞ্জা অঞ্চলটিকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যে মতলব আঁটা হচ্ছিল সেটাকে চাপা দেওয়ার জন্যই এই সোরগোল তোলা হয়েছিল। স্থানীয় মীরের শাসনাধীনে হুঞ্জার যে স্বাতন্ত্র্য ছিল তা লুপ্ত করে পাকিস্তান এই অঞ্চলকে গিলগিট বা বালটিস্তানের কমিশনারের শাসনাধীনে আনল। ভারত পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, এর ফলে কাশ্মীরের বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেছে। হুওদা কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত একটি সামন্ত রাজ্য এবং যেহেতু কাশ্মীর ভারতের অংশ সেহেতু হুওদাতে পাকি-স্তানের অবস্থান বড় জোর জবরদখলদার হিসাবে। হুওদা সম্পর্কে কোন একতরফা সিদ্ধান্ত করার অধিকার পাকিস্তানের নেই।

এর আগে হুঞ্জার সীমান্ত নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের চুক্তি হয়েছে। গিলগিটে ইতিমধ্যে চীনের সামরিক উপস্থিতি অনুভব করা যাচ্ছে। আর এই গিলগিটের সংলগ্ন হুঞ্জার যথেষ্ট সামরিক গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, চীন, সোভিয়েট রাশিয়া, আফগানিস্তান ও ভারত সব কয়টি দেশের সীমান্তই হুঞ্জার লাগোয়া।

•

ভারত পর্তুগাল সম্পর্ক

ভারত ও পর্তুগালের মধ্যে ছিন্ন সম্পর্ক জোড়া লাগাবার জন্য দুই দেশের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং ও পর্তুগালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মারিও সোয়েরেসের মধ্যে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

গোয়া, দমন, দিউ, দাদরা ও নগর-হাভেলির উপর ভারতের সার্বভৌম অধিকার মেনে নিয়ে পর্তুগাল এই ছিন্ন সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুত করল। পর্তুগালের নতুন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করার জন্য পর্তুগালের প্রাক্তন ডিরেকটর সালাজারকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, পর্তুগাল যখন তার জঘন্য সাম্রাজ্যবাদী অতীতের ঐতিহ্য কাটিয়ে উঠছে তখন ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপনের এই সিদ্ধান্ত একটি 'সদিচ্ছার প্রতীক'।

এদিকে লিসবনের খবর হচ্ছে, পর্তুগালের ক্ষমতাচ্যুত নেতারা দক্ষিণপন্থী অভ্যুত্থান করে জেনারেল স্পিনোলাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, এই দক্ষিণপন্থী চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

•

তেলের রাজনীতি

বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের রিপোর্টে বিশ্বব্যাপী অর্থ-নৈতিক বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি, শিল্পে মন্দা, আন্তর্জাতিক বিনিময় মুদ্রার লেনদেনে গোলযোগ, তেলের চড়া দাম ইত্যাদি মিলে বিশ্বব্যাপী অর্থ-নৈতিক সঙ্কটের একটা চেহারা যেন ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক এই বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে এই সঙ্কট বিশেষভাবে উন্নতিশীল দেশগুলিকে আঘাত করবে। কারণ, একমাত্র তেল-উৎপাদনকারী দেশগুলি ছাড়া অন্য উন্নতিশীল দেশগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সুযোগ পাবে না অথচ অন্যদিকে উন্নত দেশগুলিও তাদের পর্যাপ্ত সাহায্য দিতে পারবে না।

এদিকে, আসন্ন শীতে তেলের অভাবে কি হবে সেই আশঙ্কায় পাশ্চাত্য দেশ-গুলিতে উদ্বেগ দেখা দিচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফোর্ড ও পররাষ্ট্র সচিব ডঃ হেনরি কিসিঞ্জার তেল-উৎপাদক দেশ-গুলিকে এই বলে শাসিয়েছেন যে, তারা তেলের দাম না কমালে 'বিপজ্জনক পরিণাম' হতে পারে। এই হুমকির জবাবে ইরানের শাহ্ বলেছেন, অন্য সব জিনিসের দাম যখন বাড়ছে তখন তেলের দাম কম রাখার এই হুকুম তেল-উৎপাদনকারী দেশগুলি মেনে নেবে না। অটোয়াতে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলির অর্থমন্ত্রীরা এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে বলেছেন যে, তেল-উৎপাদন-কারী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মোকাবেলা না করে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

৬-১০-৭৪

—পুণ্ডরীক

নেতাজীর অন্তর্ধানের অকথিত কাহিনী

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

১৯৩৭ সাল।

অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুর কার্সিয়াং-এর শৈলবাসে অন্তরীণ সুভাষচন্দ্র মুক্তিলাভ করে আবার চলে গেলেন ইউরোপে।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, ১৯৩৩ সালে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য যখন তিনি ভিয়েনায় গিয়েছিলেন, তদানীন্তন ইংরেজ সরকার সে সময় তাঁর ওপর নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করে কার্যত তাঁকে সুদূর ইউরোপে নির্বাসিতের জীবনযাপন করতে বাধ্য করেছিলো। এই সময়ে তিনি ইউরোপে থেকেই আন্তর্জাতিক পট-পরিবর্তনের ঘটনাবলীকে প্রত্যক্ষভাবে নিরীক্ষণ করেন। ধূর্ত ইংরাজ রাজশক্তি বুঝেছিলো—বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে ভারত-বর্ষের অভ্যন্তরে রাখাটা আদৌ নিরাপদ নয়। কারণ জাতীয়তাবাদী অন্যান্য নেতাদের মত তিনি নিছক নিয়ম-তান্ত্রিকতার পথে বিশ্বাসী ছিলেন না। রাজনীতিতে প্রবেশের সূচনা থেকেই দেশের বিপ্লবী দলগুলির সংগে তাঁর যোগাযোগ ছিল নিবিড়। সুতরাং ১৯২৪ সালে ইংরেজ রাজশক্তি এই বিপ্লবী নেতাকে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন আইনের বেড়াজালে বন্দী করে বর্মা মুলুকের সুদূর মান্দালয় জেলে কারারুদ্ধ করে রাখে। কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে বিপ্লবী তরুণদের নিয়ে সামরিক কায়দায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে তাদের সামনে দেশের মুক্তিসৈন্য হবার আদর্শকে তুলে ধরেন। যার প্রতিফলন দেখা যায় ১৯৩০ সালের ব্যাপক অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের পাশাপাশি বিপ্লবী যুবশক্তির সশস্ত্র অভ্যুত্থান। সামরিক কায়দায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ ও লুণ্ঠন জালালাবাদ পাহাড়ে সেই মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র রাজশক্তির বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ গেরিলা যুদ্ধ।

সশস্ত্র বিপ্লবের অভিযান বাংলা থেকে শুরু করে সুদূর পাঞ্জাব পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রমাদ গুনলো। তারা বুঝলো বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রই দেশের বিপ্লবী যুবশক্তির প্রেরণার উৎস। তাই সুভাষচন্দ্রকে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে রাখাটা বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে নিরাপদ নয়। স্বাস্থ্যোদ্ধারের অজুহাতে ইংরেজ সরকার তাই কারাগার থেকে মুক্ত না করে বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে সুদূর ইউরোপে করলো নির্বাসিত। সুদূর ইউরোপে গিয়ে তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। রোম ও বার্লিনে গেছেন—সেখানকার রাষ্ট্রনায়কদের সংগেও যোগাযোগ করেছেন।

১৯৩৭ সালে দ্বিতীয়বার ইউরোপ সফরের সময় তিনি বুঝতে পারলেন আন্তর্জাতিক আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত। বিশ্বযুদ্ধ সমাসন্ন। যে কোনও মুহূর্তে জার্মানীর সংগে গ্রেটবৃটেনের যুদ্ধ সুরু হয়ে যেতে পারে। এই বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়েই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম শয্যা রচিত হবে। সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস ওঠার আর বিলম্ব নেই। চরম আঘাত হানার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। এই সুযোগকে যেন তেন প্রকারে কাজে লাগাতে হবে।

সুতরাং বিশ্বযুদ্ধ যে সমাসন্ন এবং এই বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম সময় যে ঘনিয়ে আসছে বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র হরিপুরা অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতির অভিভাষণে তার স্পষ্ট আভাস দেন। এবার তাঁর রহস্যপূর্ণ অন্তর্ধানের পূর্বপরি-কল্পনার অধ্যায়ে ফিরে আসা যাক।

১৯৩৮এর শেষের দি[illegible] জাপানের সহকারী বৈদেশিক মন্ত্রী মিস্টার ওহাসি কলকাতায় আসেন। তাঁর আসার আগেই এই সংবাদটি কলিকাতার জাপ ভাইস কন্সাল মিস্টার কাগিয়ামা আমার অগ্রজ (বর্তমানে স্বর্গীয়) ধীরেন বসু ওরফে গণেশকে জানান। আমার অগ্রজের সংগে জার্মান-জাপান ও ইতালিয়ান দূতাবাসের যোগাযোগ ছিল। তাঁর এই যোগাযোগকে প্রয়োজনবোধে আমাদের রাঙাকাকাবাবু বিপ্লবী সুভাষ-চন্দ্র মাঝে মাঝে ব্যবহার করতেন। তাই আমার অগ্রজ তাঁকে এই সংবাদটি দেওয়াতে তিনি তাঁর সংগে সাক্ষাতে আগ্রহী হন এবং তাঁরই নির্দেশে আমি এবং আমার অগ্রজ শ্রীস্নেহাংশু আচার্যের তদানীন্তন বাসভবন সুইনহো স্ট্রীটে ওহাসির সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করে আসি। শ্রীআচার্যকে আমরা বলি, রাঙা-কাকাবাবু আপনার বাড়ীর ড্রয়িংরুমটি ব্যবহার করতে চান—তবে বাড়ীতে সে সময়ে কোন লোকজন থাকবে না—এমন কি আপনিও না। চা ও জলযোগের ব্যবস্থা করে রেখে আপনি চলে যাবেন।' শ্রীআচার্য সানন্দে সম্মতি জানালেন—আর সেইমত ব্যবস্থাও করে রেখে গেলেন। একান্ত নিভৃতে মিস্টার ওহাসি এবং রাঙাকাকা-বাবুর গোপন আলোচনা হল। ওহাসি চলে

গেলেন। তখনই বোঝা যায় যুদ্ধ সমাসন্ন, পুরোদমে তার প্রস্তুতি চলেছে।

এরই কিছুদিন পর ১৯৩৯এ জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে বৃটিশ সরকারকে ছয় মাসের চরমপত্র দানের প্রস্তাব গৃহীত হয় আমার খুল্লতাত শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে। পরবর্তীকালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে ঐ একই প্রস্তাব উত্থাপিত হলে তৎকালীন দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ ওই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন ফলে ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। গান্ধীপন্থীরা আপত্তি তোলেন এই অজুহাত দেখিয়ে যে, দেশ নাকি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত নয়।

কংগ্রেস সংগঠনকে বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র যাতে গণসংগ্রামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারেন তার জন্য দক্ষিণপন্থীরা তৎসহ জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ তথাকথিত সমাজতন্ত্রী নেতারা পন্থ প্রস্তাবটি পাশ করিয়ে নিয়ে সভাপতির ক্ষমতাকে সংকুচিত করে দিলেন। অর্থাৎ কংগ্রেস সভাপতির পদটিকে পুনরায় গান্ধীজীর আজ্ঞাবাহকের পর্যায়ে ফেলা হল।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের সময় থেকেই ওয়ার্কিং কমিটির দিকপাল মহারথীবৃন্দ সভাপতির সঙ্গে অসহযোগিতা করে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে একযোগে সবাই পদত্যাগ করলেন। নির্বাচিত সভাপতির বিরুদ্ধেই অসহযোগের অস্ত্র প্রয়োগ করা হল। বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের প্রভাবকে খর্ব করার চক্রান্ত শুরু হল প্রতিটি পদক্ষেপেই তাঁরা বাধা দিতে লাগলেন। অবশেষে বাধ্য হলেন তিনি সভাপতির পদে ইস্তফা দিতে। কংগ্রেস থেকেও তাঁকে বিতাড়িত করা হল।

এবার তিনি গোপনে ইউরোপ যাবার পরিকল্পনা মনে মনে স্থির করে ফেললেন। সর্দার নিরঞ্জন সিং তালিব তখন কলকাতায়। এই কলকাতাতেই রাজনৈতিক কার্যকলাপ তাঁর যৌবনের সূচনা থেকেই। তালিবজী ছিলেন বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের অনুগামী তদানীন্তনকালের বিশ্বস্ত সহকর্মী। দক্ষিণ কলকাতা থেকে গুরুমুখী ভাষায় প্রকাশিত 'দেশ দর্পণ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক—কলকাতাস্থ পাঞ্জাবী গোষ্ঠীর নেতা এবং ফরওয়ার্ড ব্লকেরও সদস্য। সর্দার তালিবজী মারফৎ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র শিরোমণি গুরুদ্বোয়ারা প্রবন্ধক কমিটির চেয়ারম্যান পাঞ্জাব আকালী দলের নেতা মাস্টার তারা সিং এবং সর্দার বলদেব সিং-এর সঙ্গে ভারতবর্ষের বাইরে গোপনে রাশিয়া যাবার পরিকল্পনা করলেন। এঁদেরই মারফৎ তিনি পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। কিন্তু সংবাদটি ফাঁস হয়ে যায় সর্দার বলদেব সিংয়ের এক অসতর্ক আলাপে। খাদ্য পানাহারের পর একদিন রাত্রে সর্দার বলদেব সিং কলকাতা পৌরসভার প্রধান বাস্তুকার ডাক্তার বি, এন, দে-কে কথাচ্ছলে বেফাঁস বলে ফেলেন—'গোপনে সুভাষবাবুর রাশিয়া যাবার ব্যবস্থা তাঁরা করছেন।' খবরটি শুনেই ডাক্তার দে পরদিন এলগিন রোডের বাড়ীতে ছুটে আসেন এবং সুভাষচন্দ্রকে বলেন—আপনি রাশিয়া যাবার আগে আমায় চিফ একসিকিউটিভ অফিসারের পদে প্রমোশনের ব্যবস্থাটা পাকা করে দিয়ে যান। ডাক্তার দের মুখে হঠাৎ ওই কথাটা শুনেই তিনি চমকে উঠলেন কিন্তু মুখের ভাবের কোনওরূপ পরিবর্তন না করেই তিনি বল্লেন—এসব বাজে গুজব—ওতে কান দেবেন না। এরই কিছুদিন পর কীর্তি কিষাণ দলের অচ্ছর সিং ছিনা, ইকবাল সিং হুন্ডাল, করম সিং মান, সোহন সিং যোশ গ্রেপ্তার হয়ে কারারুদ্ধ হলেন। পাঞ্জাবের এই কীর্তি কিষাণ দলের অনেক সভ্য পরে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করছিলেন। পরবর্তীকালে জনযুদ্ধের শ্লোগান নিয়ে অচ্ছর সিং ছিনা প্রমুখেরা কম্যুনিস্ট দলে যোগ দেন ও জেল থেকে মুক্তি পান।

সুতরাং প্রথম পরিকল্পনাটি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র আবার নতুন কৌশলের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। ইংরাজ শাসকশক্তিকে ধোঁকা দেবার জন্য নতুন কৌশল স্থানীয় সংগ্রাম—লোকাল স্ট্রাগল-এর পরিকল্পনা নিলেন। স্থানীয় সংগ্রামকে এমনই এক কর্মসূচীর ভিত্তিতে করতে হবে—যার মধ্যে দিয়ে দেশের হিন্দু মুশ্লিম ঐক্যের দৃঢ়ভিত্তি গড়ে উঠতে পারে। তাই তিনি বেছে নিলেন —ডালহাউসীর উত্তর পশ্চিম কোণে—ইংরেজ রাজশক্তির আমলাতন্ত্রের শক্ত ঘাঁটি রাইটার্সের কাছে হলওয়েল মনুমেন্টটি যা ভারতীয় জাতীয় চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্কের স্মৃতিস্তম্ভরূপে স্থাপন করেছিল ইংরেজ রাজশক্তি, তার অপসারণের দাবী নিয়ে হিন্দু মুসলীম জনতাকে আন্দোলনে সামিল হবার উদাত্ত আহ্বান জানালেন। প্রমাদ গুনলো ইংরেজ রাজশক্তি—বেকায়দায় পড়লো তৎকালীন বাংলার লীগ মন্ত্রিসভা। আন্দোলন সুরু হবার আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হল, সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন অন্যান্য বিপ্লবী সহকর্মীরাও। গ্রেপ্তারের নির্দেশ এসেছিলো ভাইসরয় ক্যাবিনেট থেকে আর সেটা কার্যকরী করেছিলো বাংলার মুশ্লিম লীগ পরিচালিত সরকার।

এবার তিনি প্রেসিডেন্সী জেলে কারারুদ্ধ অবস্থাতেই দেশের বাইরে যাবার পরিকল্পনার অন্য পন্থা অবলম্বনের বিষয়

চিন্তা করতে লাগলেন। জেলে প্রবেশের সময় থেকেই তিনি গোঁফ রাখতে সুরু করলেন। যেনতেন উপায়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এবং তাঁর নতুন পরিকল্পনাকে কার্যে রূপ দেবার উদ্দেশ্যে তিনি সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলীতে প্রার্থীদের নির্বাচনে মনোনয়নপত্র আমাকে দিয়ে দাখিল করালেন। সূর্য সোমের মৃত্যুতে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ কনস্টিটিউয়েন্সীতে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। এই আসনটিতে প্রার্থী ছিলেন আরও তিনজন, কে সি নিয়োগী অঘোরবন্ধু গুহ ও বসন্ত মজুমদার। শ্রীবসন্ত মজুমদারকে বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের ডামি ক্যান্ডিডেট হিসাবে রাখা হয়েছিল—নির্বাচনপত্রগুলি বৈধ ঘোষণার পর তাই শ্রীবসন্ত মজুমদার মহাশয় সুভাষচন্দ্রের অনুকূলে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিলেন। বাকি প্রার্থী দুজন। প্রেসিডেন্সী জেলে আমি ও আমার অগ্রজ ধীরেন বসু ওরফে গণেশ নিয়মিতই রাঙাকাকার সঙ্গে ইন্টারভিউ-এ যেতাম। এবার ইন্টারভিউ-এ গেলে তিনি আমায় নির্দেশ দিলেন যেমন করে পার ওই দুইজনকে নাম প্রত্যাহার করে নিতে অনুরোধ কর। এ বিষয়ে তিনি আমায় শ্রদ্ধেয় অনিল রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। আমি শ্রদ্ধেয় অনিল রায়ের সহায়তায় ঢাকা গিয়ে দুইজন প্রার্থীর প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াবার সম্মতিপত্র নিয়ে আসি। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুভাষচন্দ্র কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত হলেন—কিন্তু ইংরেজ সরকার তবুও তাঁকে মুক্তি দিল না। শুধু তাই নয় তাঁর প্রার্থীপদের জমানতের ৫০০ টাকা যে টাকাটা তাঁরই নির্দেশে আমি তদানীন্তন পৌর প্রতিনিধি শ্রীজগন্নাথ কোলের কাছ থেকে নিয়ে সরকারী ট্রেজারীতে জমা দিয়েছিলেম সেই টাকাটাও ফেরৎ দিল না। অজুহাত কেন্দ্রীয় আইনসভায় সদস্যপদের শপথ বাক্য পাঠ না করায় টাকাটা বাজেয়াপ্ত করা হল।

আগেই বলেছি প্রেসিডেন্সী জেলে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে আমি নিয়মিত ইন্টারভিউ-এ যেতাম। সঙ্গে থাকতেন আমার খুল্লতাত ভ্রাতা ও ভগ্নীদের সঙ্গে আমার অগ্রজ ধীরেন বসু। আমার অগ্রজকে সঙ্গে নিতাম এই কারণে যে আমার আর রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে যখন কথাবার্তা হোত আমার অগ্রজের কাজই ছিল নানা হাসি মস্করার গল্প ফেঁদে ইন্টারভিউ-এ উপস্থিত ইন্টেলিজেন্স অফিসার ও জেল কর্তৃপক্ষকে অন্যমনস্ক করে দেওয়া। সেই সুযোগে আমি তাঁর নির্দেশগুলি জেনে নিতেম গোপন পত্রেরও আদানপ্রদান হত। জেলে থাকতেই তিনি আমায় যুব সংগঠন গড়ে তোলার নির্দেশ দেন এবং তাঁরই নির্দেশে আমি আমাদের এলগিন রোডের বাড়ীতেই যুব সংগঠন গড়ে তুলি। নাম দিই নিখিল ভারত যুব সংঘ। সংগঠনের উদ্দেশ্য হোল দেশের বিপ্লবী যুবশক্তিকে সংঘবদ্ধ করা এবং সারা ভারতব্যাপী সংগঠনের দ্রুত প্রসার। অর্থাৎ তাঁর পরিকল্পিত অন্তর্ধানের পর তাঁর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডকে দেশের অভ্যন্তরে থেকে কার্যে রূপায়িত করার গোপন প্রস্তুতি পর্ব চালানো।

প্রেসিডেন্সী জেলে সেবার তিনি মহাসমারোহে দুর্গা পূজা করলেন। জেলের সমস্ত কয়েদীদের তিনি ভূরিভোজে আপ্যায়িত করলেন—এর যাবতীয় ব্যবস্থা আমরা ইয়ুথ লীগের পক্ষ থেকে সেদিন করেছিলেম—এবং দশমীর দিন বৈকালে দুর্গাপ্রতিমা প্রেসিডেন্সী জেল থেকে আমরাই নিয়ে এসে শোভাযাত্রা করে সারা শহর প্রদক্ষিণ করি।

এখানে একটা প্রসঙ্গ অনুল্লেখ থেকে গেছে সেটা হল বিদেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সর্বপ্রথম সূত্র। অর্থাৎ ওহাসির সঙ্গে ১৯৩৮ সালে গোপন সাক্ষাতের পর তিনি লালা শংকরলালকে গোপনে জাপান যাত্রার নির্দেশ দেন। দিল্লীর লালা শংকরলালের একটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ছিল ট্রপিক্যাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী। সুভাষচন্দ্রকে লালাজী সেই কোম্পানীর চেয়ারম্যান করেছিলেন, তিনি ছিলেন ম্যানেজিং ডিরেকটর। রাঙাকাকাবাবু আমায় এই কোম্পানীতে কাজে লাগিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে আমি যেন লালাজীর সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রেখে চলি। ১৯৩৯ সালে লালাজী বোম্বাই থেকে নেতাজীর তালিমমাফিক নাম নিয়ে অর্থাৎ নিজের নামটি গোড়ায়, মাঝখানে পিতৃনাম, শেষেরটায় পদবী—গুজরাটী কায়দায় পাশপোর্টের জন্য দরখাস্তের আবেদনে লেখা হোল শংকরলাল হীরালাল গুপ্তা। লালা শংকরলাল জাতিতে ছিলেন আগরওয়াল গোত্রীর বনসাল— পদবী হয়ে গেল গুপ্তা। সে সময়ে বোম্বাই প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা। কে এম মুন্সি ছিলেন হোম একটা ফেল্ট হ্যাট মাথায় পরে কপালের একটা কাটা দাগ ছিল—যাতে তাঁকে চেনা না যায় সুভাষচন্দ্রই তাঁকে নির্দেশ দিলেন একটা ফল্ট হ্যাট মাথায় পরে কপালের কালো দাগটা ঢাকা দিতে যাতে চেনা না যায়। সেইমত পাশপোর্ট ফোটোও তোলা হল। এবং কে এম মুন্সিও ধরতে পারলেন না কে এই ব্যক্তি এস এইচ গুপ্তা। সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে যাবার পর লালাজী কলকাতায় এলেন ১৯৪০এর এপ্রিল-মে নাগাদ। রাঙাকাকাবাবু আমার ওপর ভার দিলেন লালাজীকে খিদিরপুর ডকে অপেক্ষারত জাপানগামী জাহাজে তুলে দিয়ে আসার। আমি সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী লালাজীকে গোপনে জাহাজে তুলে দিয়ে আসি। রওনা হবার আগে এদেশের মাটি যে তিনি ত্যাগ করে যাননি সেটা প্রমাণের জন্য রাঙাকাকাবাবু লালাজীকে দিয়ে তারিখবিহীন একটি আমমোক্তারনামায় পণ্ডিত শান্তিরামের অনুকূলে স্বাক্ষর করিয়ে রাখেন এবং ইংরেজ রাজশক্তির চোখে ধুলো দেবার জন্য সেই আমমোক্তারনামাকে ব্যবহারোপযোগী করার জন্য আমায় পাঠান শিয়ালদহ কোর্টের তৎকালীন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট হেমচন্দ্র নস্করের কাছে—আদালতের শিলমোহরযুক্ত তাঁর স্বাক্ষরের জন্য। এই ঘটনাটা লালাজী জাপানে নিরাপদে পৌঁছোনোর পর সম্পন্ন করা হল। এই অ্যালিবি করার ক্ষেত্রে প্রথমে হেমচন্দ্র নস্কর ইতস্ততঃ করতে থাকেন যেহেতু যিনি আমমোক্তারনামায় স্বাক্ষর করেছেন তাঁর উপস্থিত থাকাটা আইনের দিক থেকে একান্তই দরকার। আমি তাঁকে বললেম, তিনি এলগিন রোডের বাড়ীতেই রাঙাকাকাবাবুর ঘরে বসে আছেন। যদি এখানে স্বাক্ষরে দ্বিধাবোধ করেন তাহলে শিলমোহর সমেত আপনি সেখানেই চলুন। আমার এই কথায় অতঃপর হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয় স্বাক্ষর দিয়ে উক্ত আমমোক্তারনামায় আদালতের শিলমোহরের ছাপ দিয়ে দেন। পরে কলকাতায় জাপান থেকে ফিরে আসার পর ইংরেজ সরকার যে সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করলো এই অ্যালিবি করিয়ে রাখার দরুন প্রমাণ করা গেল না যে লালা শংকরলাল জাপানে গিয়েছিলেন। ইংরেজ সরকার অতঃপর মামলা তুলে নিতে বাধ্য হলেন।

(ক্রমশঃ)

উপন্যাস

সেই সব মানুষ

মনোজ বসু

[সোনাখড়ি গ্রামের ভবনাথ ঘোষ আর দেবনাথ ঘোষ দুই ভাই। ভবনাথ বড়ো। অল্পবয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর ভবনাথ সংসারের হাল টেনেছেন, ভাইকে মানুষ করেছেন। কলকাতা যাবেন দেবনাথ ছোট আদালতে উকিল হওয়ার পরীক্ষা দিতে। যাওয়া হোল না। তিনি বিদেশে পরে জমিদারী সেরেস্তার ম্যানেজার হয়েছিলেন। সেই কৃতি ভাই দেবনাথ আট বেহারার পালকিতে সোনাখড়ি ফিরল।

একদিন সকালে দেবনাথ দেখলেন সামনের দাওয়ায় ঠাকুর প্রতিমা। দশভুজা দুর্গা। গাঁয়ের লোকজন ভবনাথকে বললেন, মায়ের ইচ্ছা তোমাদের হাতেই পুজো নেবেন তিনি। পুজোর তোড়জোড় চলতে লাগল। যাত্রা নয় থিয়েটারও হবে। ম্যানেজার হারু সরকারের তদারকিতে চলতে লাগল থিয়েটারের মহড়া... .

ভবনাথ-দেবনাথের বোন মুক্তকেশী। শ্বশুরবাড়ি কুশডাঙায়। মুক্তকেশীকে আনতে ফটিক মোড়ল গেল। ওদের ওখানে আবার ভূপতির মেয়ের বিয়ে। ভূপতি মুক্তকেশীকে যেতে দিতে নারাজ। মুক্তঠাকরুণ বললে, বিয়ে-টিয়ে সেরে যাব। ফটিক মোড়ল ফিরে এসে বলল উনি আসবেন বোশেখের শেষ বা জৈষ্ঠ্যের গোড়ায়...]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)

গাঁ-গ্রামে ছেলেপুলের কী মজা। ছেলেপুলে আর পাখি-পশুদের। ঝোপে-ঝাপে গাছেগুল্মে এত খাবার জিনিস খুঁজে পেতে নিয়ে নিলেই হল। বৈঁচবনে বৈঁচি পেকে আছে—সামাল হয়ে ঢুকতে হবে বড্ড কাঁটা। ওদের অভ্যাস হয়ে গেছে, কাঁটা বেঁধে না। আর বিঁধলেই বা কী—পাকা ফলে কোঁচড় ভর্তি হয়ে এলো, কাঁটার খোঁচায় এখন আর গায়ে সাড় লাগে না। এক কোঁচড় বৌঁচ নিয়ে পুঁটি মালা গাঁথতে বসেছে। কমল সতৃষ্ণ চোখে দিদির কাজ দেখছে, সদয় হয়ে পুঁটি মাঝেমধ্যে একটা দুটো ফল ছুঁড়ে দিচ্ছে ভাইয়ের দিকে নিজের গালেও ফেলল হয়তো বা। আর সুচসুতো নিয়ে দ্রুতহাতে মালা গেঁথে চলেছে। একজোড়া মালা—একটা পরাল কমলের গলায়, একটা নিজের। খেলে বেড়াও, যা ইচ্ছে করো—খাবার ইচ্ছা হল, মালা থেকে ছিঁড়ে মুখে ফেলে দাও, দেবার ইচ্ছা হল ছিঁড়ে একটা দিয়ে দাও। শেষটা দেখা যাবে শুধু এক-গাছি সুতো ঝুলছে, তাতে একটিও ফল নেই।

আশশ্যাওড়ার ফল পাকে—ছেলেপুলের দেওয়া নাম মধুফল। মুক্তাফলও বলতে পারত। গোলাকার লালচে একটি মুক্ত, রসে টসটস করছে। সবটাই প্রায় বীচি বলে মালা গাঁথা চলবে না, ঝোপ থেকে ছিঁড়ে মুখে ফেলে, শুষে নিয়ে বীচি ছুঁড়ে দেয়। পাথরকুচির পাতা—দেখতে বড় ভাল চাপ দিলে মট করে ভেঙে যায়। পুঁটিদের রান্নাবাড়ার খেলায় পাথরকুচি পাতার মাছ হয়, হেড়াঞ্চি ফলের ডাল, তেলাকুচো ফলের পটোল। কচুর পাতার উপর ধুলোর ভাত বেড়ে নারকেল মালার বাটিতে বাটিতে ডাল ও মাছের ঝোল সাজিয়ে পুঁটি কমলকে ভাত খেতে বসিয়ে দেয়। পাথরকুচি গাছে এখন লম্বা লম্বা ডাঁটা উঠেছে, ডাঁটা ঘিরে নিম্ন-মুখ অজস্র ফুল। কী সুন্দর দেখতে। আর ফুলের মধ্যে মধুকোষ। ছেলেপুলে সন্ধান জানে, ফুল চিরে মধু খায়। খেজুর পাকতে লেগেছে এখন। খেজুর কেউ পাড়তে যায় না, টের পেলে বাড়ির লোকে খেতেও দেবে না খেজুর খেলে নাকি পেট কামড়ায়। গাছে পেকে ঝুরঝুর করে তলায় পড়ে, শিয়ালে খায়। খেজুর-তলায় গিয়ে যে কটি ছিল পুঁটি খুঁটে তুলল। এদিক ওদিক তাকায় আর মুখে ফেলে। পিছু পিছু কমলও দেখি এসে গেছে। আমায় দে পুঁটি, আমায় দে—হাত বাড়িয়ে বলছে। পুঁটি বলে, নাম ধরছিস কেন, 'দিদি' বললে তবে দেবো। এখন কমলকে যা বলবে, খেজুরের লোভে তাতেই সে রাজি। পুঁটি সামাল করে দেয় : খেয়ে বীচি ফেলে দিবি, গলায় না আটকায়। টপ করে খেয়ে ফেল, জেঠিমা দেখলে রক্ষে রাখবে না। মুখে আঙুল ঢুকিয়ে বের করে ফেলে দেবে।

তার কয়েকটা দিন পরে, গাছে গাছে হঠাৎ যেন বান ডেকে গেল। যে গাছের যে ডালে তাকাও পাকা ফল, ডাঁসা ফল। প্রকৃতি দেবী মেজাজে এসেছেন, দু হাতে অকৃপণ ঢালছেন। জামরুল গাছ দুটো ফলের ভারে নির্ঘাৎ এবারে ভেঙে পড়বে। গুঁড়ি ভেদ করেও থোকা থোকা ফল। কত খাবে, খাও না। ছেলেপুলেরা ঘরবাড়ি ভুলেছে, সারাটা দিন এ-গাছ ও-গাছ করে বেড়ায় কাঠ-বিড়ালির মতো। যার গাছে হোক উঠে পড়লেই হল। গৃহস্থ বড়জোর বলবে, এই, জোরে ঝাঁকি দিসনে রে—নরম বোঁটা, কুশি-গুলোও পড়ে যাবে। কিম্বা বলবে এই জোরে দুটো ঝাঁকি দে না। তলায় পড়ুক, ধামা এনে

ঘুড়িয়ে নিই। বলবে এইটুকু—এর অধিক কিছু নয়। খাওয়ার জন্য ভগবান দিয়েছেন। খেয়ে শেষ করা ছাড়া এ ফলে কোনো আর দেয় না। দু দিনে ফুরিয়ে যায় পুরো বছর তারপর গাছের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাবে না।

আরও কত রকম। গাব পেকেছে, সপেটা পাকছে। জামের দেরি আছে—গোলাপজাম পাকতে লেগেছে দুটো-চারটে করে। জল্লাদ মগডালে উঠে পিলপিল করে বেড়ায়। গাছে উঠে ছোঁড়া যেন শোলার মানুষ হয়ে যায়—দেহের ওজন একেবারে শূন্য, এতটুকু ডাল নড়ে না। সপেটার কাঁচা পাকা এমনি দেখে বোঝা যায় না, ডালের মাথায় গিয়ে জল্লাদ টিপে টিপে দেখে নরম হল কিনা। গোলাপজামের বোঁটা শুদ্ধ নাকের কাছে তুলে ধরে সুবাস লোকে।

লিচুতে পাক ধরেছে, এক রাত্রে বাদুড়ে সাটা বলে দিল। পুবেবাড়ির পাঁচটা লিচুগাছ সারবন্দি। পাখায় অন্ধকার দুলিয়ে ঝাঁক বেঁধে বাদুড় ঝপাস-ঝপাস করে গাছের উপর পড়ছে। কিচির-মিচির করে ঝগড়া বোধহয় ভিন্ন দলের সঙ্গে। পুঁটি দাওয়ায় এসে চেঁচিয়ে বাদুড়-জব্দ ছড়া পড়ছে : বাদুড় বড় মিঠে, যা খায় তা তিতে। ছড়ার গুণে লিচু তিতো হয়ে যাবে বাদুড়ের মুখে, থুঃ থুঃ করে পালাবে।

ভবনাথ মাহিন্দারকে বকছেন : চোখ খুলে দেখবিনে তোরা শিশুবর। রাতের মধ্যে সব শেষ করে যাবে। লিচু খেতে হবে না এবার, খাস ঘোড়ার ডিম।

শিশুবর চাটকোলের উপর পা ছড়িয়ে বসে পাটটাকুরে কেষ্টটা ঝাটছে। বলল পাকে

না লিচু দেখতে পাবেন কাল সকালবেলা। বাদুড়ে চালাক হয়ে গেছে, আমাদের বন্দোবস্তের আগে ভাগে ফুলো ডাঁশা যা পায় খেয়ে নিচ্ছে।

বাদুড়দের উপর শাসানি দিচ্ছে : খেয়ে নে যা পারিস। কাল থেকে আর নয়। কত বড় শয়তান হয়েছিস দেখে নেবো।

সকাল হতে শিশুবর সেই ব্যবস্থায় লেগে গেছে। হিরুও এসে যোগ দিল। বলে বাবা বড় মিছে বলেন নি, কত বীচি আর খোসা ছড়িয়ে আছে দেখ। সিকি আন্দাজ নিকেশ করে গেছে একটা রাতের মধ্যে।

বাড়িতে পাশখেওলা জাল আছে—প্রায় সব বাড়িতে থাকে। পুরোনো জাল ছিঁড়ে পচে বাতিল হলে ফেলে দেয় না। এমনি সব কাজে লাগে। গাছের উপরে জাল বিছিয়ে ঢেকে দিচ্ছে। জালের নিচে লিচুফল—বাদুড়ে আর নাগাল পাবে না। কিন্তু মুশকিল হল পাঁচ-পাঁচটা গাছ ঢেকে দেবার মতন এত জাল পাই কোথায়?

পরম সুহৃদ ঝন্টুর কাছে হিরু চলে গেল : ছেঁড়াছুটো জাল কি আছে বের কর—

ঝন্টু ঘাড় নেড়ে দেয় : ইঁদুরে কেটে ফালা ফালা করেছিল, ফেলে দিয়েছি।

আহা, দেখ না কেন চাষির-কুঠুরির ঝুলে। ওর মধ্যে তো গরু হারালে পাওয়া যায়। কোণে-খাজোড়ে থাকলেও থাকতে পারে।

চাবি সংগ্রহ করে খোলা হল। জানালা-হীন অন্ধকার কুঠরি। টর্চ জ্বেলে তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। নেই।

ঝন্টু হাত ঘুরিয়ে দেয় : যাক গেল। ক্যানেস্তারা পেটাব।

হিরু বলে ক্যানেস্তারায় শজারু ভয় পায়, বাদুড়ে আমল দেবে না। বড় শয়তান। যে সময়টা বাজাচ্ছিস, হয়তো বা একটু থেমে থাকল। বাজনা থামলেই ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। রাত জেগে সারাক্ষণ বাজাবেই বা কে?

সারাক্ষণ বাজবে। বন্দোবস্ত করছি দেখ—

ক্যানেস্তারা খুঁটো-পোঁতা মুগুর ও দড়ির বাণ্ডিল নিয়ে ঝন্টু লিচুগাছের মাথায় উঠে পড়ল। সুকৌশলে মুগুর আর ক্যানেস্তারা ঝুলিয়ে দিল। পাঁচ গাছের উপরেই এক ব্যবস্থা। দড়ির মাথাগুলো একত্র করে বেড়ার ভিতর দিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকিয়ে দিল। গাছ থেকে নেমে এসে ঘরের ভিতরের তক্তাপোশ দেখিয়ে হিরুকে বলে, শুয়ে পড়—

হিরু অবাক হয়ে বলে, সাত সকালে শুতে যাব কেন রে এখন?

এতক্ষণ ধরে এত খাটলাম, পরখ হবে না—শুবি তক্তপোশে, চোখ বুজবি দড়ি ধরে টানবি টানাপাখা যেমনধারা টানে।

যেইমাত্র টান দিয়েছে—অদ্ভুত করেছে বটে ঝন্টু, হতভাগা ইঞ্জিনীয়ার কেন যে হয়নি। দড়ি টানার সঙ্গে সঙ্গে উৎকট বাদ্য

লিচুগাছের মাথার উপরে। বাদুড় তো বাদুড়, বাঘ থাকলেও চোঁচা দৌড় দিতে দিশে পাবে না।

ঝন্টু বলল, ছেড়ে দে দড়ি—টান আবার। পালাবে না বাদুড়? বলল।

শতকণ্ঠে হিরু তারিপ করছে : বলিহারী ঝন্টু। বেড়ে বানিয়েছিস—বাহবা বাহবা!

প্রশংসা পরিপাক করে নিয়ে ঝন্টু বলল, শিশুবর দরজার কাছে ঐ-খানটায় তো শোয়। আরো ভালো। ঘুমুবে আর দড়ি টানবে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাতপাখা নাড়ে তো দড়িটা কেন টানতে পারবে না?

অনেক রাত্রে কমলের ঘুম ভেঙে গেল। লিচুগাছে ধুন্দুমার। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে, জানালা দিয়ে চাঁদ দেখা যায়। ভয়-ভয় করছে, মাকে কমল নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল। তরঙ্গিণীও ঘুমের ঘোরে ছেলেকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

আম পাকল। একটা দুটো করতে করতে অনেক। এ গাছ ও-গাছ করতে করতে গাছ আর বড় বাকি রইল না। সিঁদুরে গাছের দিকে চেয়ে চোখ ঝলসে যায়, কাঁচা পাকা সব আমে সিঁদুর মেখে গেছে যেন, টুকটুক করছে। বোঁটা আমেও পাখি ঠোকরায়। তেমনি আবার বর্ণচোরা আম গোপালভোগ, কালো-মেঘা। পেকে তুলতুল করছে, খোসার রং কালো। টের পাবার জো নেই আম পেকে গেছে।

বেলতলি খেজুরতলি নারকেলতলি জামতলি বাদামতলি ডুমুরতলি তেঁতুলতলি জুড়ে জুড়ে গাছের নাম। সাবেক আমলের গাছ এইসব। আঁটির গাছ জুড়ায় বেলগাছ খেজুরগাছ নারকেলগাছ ছিল ঐ ঐ জায়গায় তলার কাছে আমের আঁটি আপনি পড়ে গাছ হয়েছিল কিংবা আঁটি পোঁতা হয়েছিল ঐখানটায়। বেল খেজুর কবে মরে নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেই জায়গায় ডালপালা-মেলানো প্রকাণ্ড আমগাছ এখন। নামে তবু রয়ে গেছে যার ছায়াতলে এই গাছ চারা অবস্থায় আশ্রয় নিয়েছিল। আছে আবার নানারকম। টুরে চাটালে চুষি কালোমেঘা—ফলের চেহারা থেকে গাছের নামকরণ। এর উপরে কলমের চারা নিস্তর এসে গেল এবার—চারাগুলো বড় হলে বাগের মধ্যে রোদ ঢুকবার পথ খুঁজে পাবে না।

পাকা আম টুপটাপ তলায় ঝরছে সারা দিন, সমস্ত রাত্রি। ছেলেপুলে বাড়ি রাখা যায় না তলায় তলায় ঘুরছে। ধরে পেড়ে এই নিয়ে এলে সুড়ুত করে আবার চলে গেছে। অন্য সময় কে আমতলায় যেতে যায়? ডাঁট কালকাসুন্দে কাঁটাঝিটকে বিছুটির ঝোপে ছেয়ে থাকে, শুকনো পাতা পড়ে পড়ে পচে। গুটি পড়ার সময় থেকেই অল্পস্বল্প শুরু—এখন নিত্যিদিন কত পা পড়ছে তার অবধি নেই। পায়ে পায়ে আমতলা সাফসাফাই হয়ে যাবে। শেষে আর ঘাসটুকুও থাকবে না, বাড়ির উঠানের মতন ধবধব করবে।

কমল ছোট্ট মানুষ, বেশি দূর যেতে ভরসা পায় না—তার দৌড় খেজুরতলি অবধি। বাইরের উঠোনের পথেই মহাবৃদ্ধ গাছটি। খেলা করে গাছ বালকের সঙ্গে, কতরকম মজা করে। আম পেকে হলদে হয়ে ডালের উপর ঝুলছে। দুলছে বাতাসে চোখের উপর, লুব্ধ চোখে কমল আকাশ-মুখো তাকিয়ে। বাতাস জোরে উঠল—হাত পেতে রয়েছে সে, বলের মতন লুফে নেবে। পড়ে না আম লোভ বাড়িয়ে পাগল করে দিয়ে থেমে যায় হঠাৎ বাতাস।

কমল খোশামুদি করছে: ও গাছ, লক্ষ্মীসোনা দাও না ফেলে আমটা। পেকে গেছে, পড়ে তো যাবেই। চারি-দিদি ঘোরা-ঘুরি করছে তক্কে তক্কে আছে ওরা—কোন সময় পড়বে, টুক করে নিয়ে নেবে। আমি পাবো না।

গাছ কানে নিচ্ছে না। রোদে ঝিলমিল করে পাতা নড়ছে, রোদের কুচি খেলা করছে কমলের মুখের উপর। বুড়ো আঙুলে নাড়ানোর ভঙ্গিতে গাছ যেন পাতা নেড়ে উপহাস করছে: দেবো না, দেবো না।

পায়ে পড়ছি ও গাছ দাও আমটা দিয়ে দাও।

গাছ উদাসীন। কমল এত করে বলছে তা মোটে কানেই যায় না যেন। ডাল-পাতা নাড়াছিল, তা-ও একেবারে বন্ধ করে দিল রাগে দুঃখে আমতলা ছেড়ে কমল উঠানের দিকে চলল। যে-ই না পিছন ফিরেছে, টুপ-টাপ টুপটাপ করে একটা নয় চার-পাঁচটা আম পড়ল। বউদিদি অলকার কাছে বলেছিল খেজুরতলির বজ্জাতির কথা। অলকা উড়িয়ে দিয়েছিল: গাছ কিছু বোঝে নাকি—গাছ কি মানুষ? বোঝে কি না, চাক্ষুষ দেখে যাও না এইবারে। চলে আসছে, ঠিক সেই মুহূর্তে সশব্দে এতগুলো আম ফেলার মানেটা কি শুনি? আম না কুড়িয়ে রাগে রাগে চলে যাচ্ছ—যাও না দেখি কেমন যেতে পার।

মানে জলাঞ্জলি দিয়ে কমল ফিরে এল গাছতলায়। ঘাসবন মরে ইতিমধ্যেই খানিক খানিক পরিষ্কার হয়ে গেছে, সেদিকটা সে চোখ তুলেও দেখে না। জানা আছে খেজুর-তলি মরে গেলেও পরিষ্কার জায়গায় ফেলবে না—ঝোপঝাপ জঙ্গল দেখে ফেলবে, কষ্ট করে যাতে খুঁজে বার করতে হয়।

কাঁটাঝিটকের ঝোপে পাওয়া গেল একটা। আমটা ছোট্ট, তার জন্যে কাঁটার খোঁচা খেয়ে হাতে রক্ত বেরিয়ে গেল। কতক-গুলো বাদুগাছের মাথায় তেলাকুচা লতা জড়িয়ে আছে, টুকটুকে তেলাকুচা ফল বাদুবন আলো করে ঝুলছে। লতার মধ্যে আম—মাটি অবধি পড়তে পায় নি। বাদু-গাছেই দৈবাত যেন আম ফলেছে একটা। এত জায়গা ছেড়ে এইখানটা আপনা-আপনি পড়েছে, কে বিশ্বাস করবে? খেজুরতলিই খুব সম্ভব গদখালি-পেত্নীর মতন ডালের লম্বা হাত বের করে ঐখানটা আম রেখে ডাল আবার গুটিয়ে নিয়েছে—কমল যখন পিছন ফিরে বাড়ি যাচ্ছে, সেই সময় কাজটা করেছে। খুঁজে বের করতে পারে কিনা, পিটপিট করে দেখছে এখন পাতার আড়াল থেকে। বাদুগাছ ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বিস্তর কষ্টে কমল আম ভুঁয়ে ফেলল।

আরও দেখ। সোঁদাল গাছ একটা আম-তলায়—তিনটে ডাল তিন দিকে বেরিয়ে গেছে, সেই তেডালার ফাঁকেও আম। এর-পরে কে বলবে, ইচ্ছাকৃত নয় এসব। গাছের উপর অভিমান এসে যায় কমলের, অভিমানে চোখ ছলছল করে: তলায় এসেছি একা একা কটা আম কুড়িয়ে পুঁটির কাছে বাহাদুরি নেবো—খেজুরতলির তাতে শতেক রকম বাগড়া। দেখা যাচ্ছে গাছও পুঁটি চারি সুরিদের দলে। ওদের বেলা এমন হয় না আম পাড়ার শব্দে তলায় ছুটে আসে, আম একেবারে সামনের উপর পড়ে আছে, ধামিতে তুলে নিয়ে লহমার মধ্যে ফিরে চলে যায়।

ডিঙিগ মেরে কমল হাত বাড়াল তেডালা অবধি হাত পৌঁছয় না। বাখারির টুকরো পেয়ে খোঁচাচ্ছে—পড়ে না আম, ফাঁকের মধ্যে সেঁটে আছে। ছোট ডাল কয়েকটা নিচের দিকে—একটায় পা রেখে উপরেরটায় অন্য পা তুলে দিল। গাছে ওঠা হয়ে গেল যে-আগে আর কখনো হয়নি। বাড়ির কেউ দেখলে রক্ষে রাখবে না। উঠে যাচ্ছে দিব্যি একের পর এক পা তুলে। পেয়েছে, পেয়েছে—আম নাগালে এসে গেছে। কমলের ভারি উল্লাস। গাছে উঠেছিল, কারো কাছে বলবে না এ খবর। আম নিয়ে যেন রণজয় করে বাড়ি ফিরল।

টুপটাপ আম তলায় করছে। ছেলেপুলে তলায় তলায় ঘোরে, তাদের নামে সবাই বলে। কিন্তু বড়রাই বা কী। নিমি আর অলকা ননদ-ভাজে নতুন পুকুরে চানে যাচ্ছে—চ্যাটালের তলায় পড়ল একটা। কলসি ঘটি রইল পড়ে পথের উপর—গাছতলায় ছুটল। গা-হাত-পা ছড়ে গেল কাঁটায়, বিছুটির বিষে দাগড়া-দাগড়া হয়ে ফুলে উঠল। যতক্ষণ না পেয়ে যাচ্ছে সর্বকর্ম ফেলে আম খোঁজা।

দুপুরবেলা রোদ্দুর ঝাঁ-ঝাঁ করে, আগুনের হল্কা বয়ে যায়। চাষ দিতে দিতে চাষীরা লাঙল গরু নিয়ে বিল ছেড়ে উঠে পড়েছে। গ্রাম নিঃশব্দ। পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে সবাই ঘামে সর্বদেহ ভিজে। তক্তাপোশে নয় মাটির মেজের উপর পড়েছে। মাদুরও নয় খালি মাটি। হাতে তালপাতার পাখা। অভ্যাস এমনি, ঘুমের মধ্যেও হাত নড়ছে—হাতের পাখাও চলছে ঠিক। ঘুম গাঢ় হয়ে এলে পাখা হাত থেকে পড়ে যায়, হাতও পড়ে মাটিতে। ক্ষণপরে গরমটা অসহ্য হয়, সম্বিত পেয়ে পাখা তুলে দ্রুত নাড়ে কয়েক-বার, গতি পুনশ্চ ক্ষীণ হয়ে আসে।

দেবনাথের আলাদা ব্যবস্থা। নতুন পুকুরের উত্তর পাড়ে কয়েকটা বড় বড় আমগাছ জামগাছ কাঁঠালগাছ। রোদ ঢোকে না সেখানটা ঠিক দুপুরেও আবছা অন্ধ-কার। তলার জঙ্গল কেটে পাতা ঝাটপাট দিয়ে শিশুবর মাদুর বালিশ পেতে দিয়েছে সেখানে। এমন কি গড়গড়াটাও নিয়ে এসেছে। হাতপাখা দিয়েছে, পাখার গরজ তেমন নেই এ জায়গায়। খান দুই তিন ক্ষেতের পর থেকে বিলের আরম্ভ, মুক্ত হাওয়া পুকুরের জলের উপর দিয়ে আরও ঠাণ্ডা হয়ে গায়ে এসে লাগছে। পত্রঘন ডাল-

ঘুমিয়ে সন্ধ্যের সময় ওঠা হবে। রাত আড়াই পহর অবধি পায়ে পায়ে ঘুরবি তারপর।

স্ত্রীর গলা শুনে দেবনাথ চোখ মেললেন। ডাকছেন : এসো না, বসে যাও একটু। কেমন ঠান্ডা জায়গা বেছেছি, দেখ এসে।

হেসে তরঙ্গিণী ঘাড় নাড়লেন : ওমা কখন কে এসে পড়বে—

কমলের হাত ধরে নিয়ে চললেন। পুঁটির গর্ভধারিণী-মা হলেও জোর তার উপরে উমাসুন্দরীর বেশি। তবু কর্তব্যের দায়েই যেন বলেন, তুই আসবি নে?
বাতাস করছি না বাবাকে?

গতিক বুঝে ইতিমধ্যেই পুঁটি পাখাটা হাতে তুলে নিয়েছে। অতএব আর কিছু বলা চলে না। তরঙ্গিণী সতর্ক করে দেন : পুকুরঘাটে নামবিনে খবরদার। ঠিক দুপুরে গাছতলায় ঘুরবিনে চুল ছেড়ে দিয়ে শাকচুন্নির মতো—চুলের মুঠো ধরে গাছের উপর তুলে নেবে দেখিস। ঘুমিয়ে পড়লেই বাড়ি চলে আসবি। আর নয়তো শুয়ে পড়বি পাশটিতে।

আচ্ছা—বলে পুঁটি বাতাস করছে বাপকে। ঘোর ভক্তিমতী মেয়ে। মা চলে যেতে চারিদিকে ফালুক-ফুলুক তাকায়। লিচুতলায় ফুনিট দেখা দিল। হাত তোলে পুঁটি তার দিকে অর্থাৎ একটু সবুর কর, বাবার ঘুম এসে গেছে প্রায়। জোরে জোরে বাতাস করছে, বাতাস কামাই দেবে না এখন। কাঁচা ঘুমে বাবা জেগে পড়তে পারেন, তা হলে সমস্ত পন্ড।

কদিন থেকেই মেঘ-মেঘ করছে। বাতাসে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যায়। আজকেও আয়োজন গুরুতর, ঝড়ো কোণ কালো হয়ে গেল। অপরাহ্ণেই মনে হয় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। উড়ে যাবার মেঘ নয় আজ ঝড় এলো বলে।

পুঁটিটাকে নিয়ে সামাল সামাল। লহমার তরে বাড়িতে টিকি দেখবার জো নেই। ছেলেটাকেও নিয়ে বের করেছে। পাড়ার একপাল বাঁদর জুটেছে তলায় তলায় টহল দিয়ে বেড়ায়। অধিকার করে এসেছো তা বলে একফোঁটা ভয়ডর নেই। দেখে আয় তো মা নিমি—

বলতে বলতে গর্জন করে ওঠেন : কোন চুলোয় হারামজাদি দেখে আয়। ছেলেটাকে নিয়ে বের করেছে—দেখতে পেলে চুলের মুঠো ধরে টানতে টানতে আনবি।

হুকুম পেয়ে নিমি সোৎসাহে বেরুচ্ছে। ধরে আনতে বললে বেঁধে আনা স্বভাব তার—চুলের মুঠো ধরে সত্যিই টানবে সে চড়টা চাপড়টাও দেবে না এমনও মনে হয় না। লেগে যাবে দুই বোনে। সভয়ে বড়গিন্নি বললেন চুল-টুল ধরিসনে রে। যোলোই মাসে আমতলায় গেছে তো কি হয়েছে। মাত্তর এই কটা দিন—এর পরে কেউ থুতু ফেলতেও তো ওদিকে যাবে না। সন্ধ্যে হয়ে এলো—গা-হাত-পা ধোবে চুল বাঁধবে এখন। বড়বোন তুই ভালো কথায় বুঝিয়েসুজিয়ে নিয়ে আয়।

বাতাস উঠল। ঝড়-দস্তুরমতো। ঘনঘন ঝিলিক দিচ্ছে জলও ঢালবে এইবার। দেখতে দেখতে ঝড় প্রচন্ড হয়ে উঠল। বাইরের উঠানের একদিকে খেজুরতলি অন্যদিকে বেলতলি। ফলেছেও তেমনি এবার। কিন্তু গাছে আজ একটি আম রেখে যাবে মনে হচ্ছে না। সবে পাক ধরেছে—টবটাব পড়ছে তো পড়ছেই। পাকা ডাসা কাঁচা—ডাল ধরে শেষ করে দিয়ে যাচ্ছে। খই ভাজতে খোলার খই যেমন চিড়বিড় করে চতুর্দিকে ছিটকে গিয়ে পড়ে তেমনি। আম গড়িয়ে উঠান অবধি এসে পড়ছে। সামলে থাকা কঠিন বটে। পুঁটিটা তো ছটফট করছে—রোয়াক থেকে লম্ফ দিয়ে পড়ে আমতলায় চোঁচা-দৌড় দেবে। এইমাত্র বিষম বকুনি খেয়েছে আছে তাই এখনো। শিশুবর খসর-খসর করে গরুর জন্য পোয়াল কাটছিল; পোয়াল-কাটা বঁটি কাত করে রেখে সে বেরুল। দেবনাথ হেন গণ্যমান্য বয়স্ক ব্যক্তিও থাকতে পারলেন না—শিশুর অধম হয়ে খেজুরতলি তলায় চললেন। উমাসুন্দরী চেঁচাচ্ছেন : যেও না ঠাকুরপো গাছগাছালি ভেঙে পড়তে পারে। বতাস থেমে যাক যেতে হয় তার পরে যেও।

দেবনাথ বলেন আম ততক্ষণ তলায় পড়ে থাকবে বুঝি? কুড়াতে এলে কাকে মানা করতে যাবো করবই বা কেন?

হাসতে হাসতে ধামি হাতে নিয়ে ছুটলেন তিনি। উমাসুন্দরী কি করবেন—যে-মানুষ ধমক দিয়ে হাতের ধামি কেড়ে নিতে পারতেন তিনি এখন বাড়ি নেই। হাটবার আজ—কতদিন পড়ে ভাই বাড়ি এসেছে হিরুকে সঙ্গে নিয়ে ভবনাথ নিজে হাট করতে গেছেন। বেছেগুছে দরদাম করে ভাল মাছটা ভাল তরকারিটা নিয়ে আসবেন অন্যকে দিয়ে সে জিনিস হয় না। আর বাপই চললেন তো মেয়ের কি—পরম অনুগত মেয়েটি হয়ে পুঁটি দেবনাথের পিছন ধরেছে। পিছনে তাকিয়ে নির্ভয়ে দেখে এক একবার মায়ের দিকে—বড়-গাছে বাসা বেঁধেছি কাকে আর ডরাই ভাবখানা এইপ্রকার। জানলার ওধারে বড়-ঘরের ভিতর ছোট ভাইটির করুণ অবস্থা দেখতে পাচ্ছে—বাতাস-বৃষ্টি গায়ে না লাগে কমলকে মা জুতো-জামা পরিয়ে ঘরের মধ্যে আটক করে ফেলেছেন।

মড়মড় করে জামরুল গাছের একটা ডাল ভেঙে পড়ল। যা বলেছিলেন উমাসুন্দরী ঠিক ঠিক তাই। চেঁচাচ্ছেন তিনি—প্রচন্ড বাতাস বৃষ্টিও আরম্ভ হয়ে গেল কথা না বেরুতেই উড়িয়ে নিয়ে যায়। কেমন বাবা দেবনাথ জানিনে—বাচ্চা মেয়েটাকে অন্ততঃ ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ি পাঠানো উচিত ছিল। বৃষ্টি টিপটিপ করে হচ্ছিল ঝেঁপে এলো এবার ঝড়ের সঙ্গে। কাঁচা পাতা ছিঁড়ে ঘূর্ণি-বাতাসে পাক খেতে খেতে এসে পড়ছে। গাছপালা মাথা ভাঙাভাঙি করছে সুপারিগছ নুয়ে পড়ছে। ভেঙে পাঁচ-সাতটা ভূমিশায়ী হল। সামনের কলাঝাড়ে সবে মোচা থেকে কাঁদি বেরিয়েছে চোখের উপর গাছটা পড়ে গেল। অলকা-বউ বলে কাল থোড়-মোচা খাওয়া যাবে খুব।

তরঙ্গিণী বললেন তুমি খেও রেঁধে দেবো তোমায়। অন্য কেউ তো মুখে দেবে না।

বিনো হি-হি করে হাসে : তুমি যেন কী বউদি কিছু বোঝ না। কাঁচ-কলার থোড়-মোচা বিষম তেতো খাওয়া যায় না। সবসুদ্ধ কুচি কুচি করে কেটে জাবনায় মেখে দেবে গরুতে খাবে। ওয়োগাছ পড়েছে তার বরঞ্চ মাতি খাওয়া যাবে। ছোটখুড়িমা মাতির ডানলা রেঁধো না কাল। ঘি-গরম-মশলা দিয়ে সেই যে রেঁধেছিলে—তোমার মতন কেউ পারে না।

(ক্রমশঃ)

কবিতা

আকাশচারিণী মেয়ে

জসীম উদ্দীন

আকাশচারিণী মেয়ে।
কোথা হ'তে আসিয়াছ
অঙ্গ তোমার ফুলদলে আছে ছেয়ে।
কোন ফুল আধ মুকুলিত
কোন ফুল মেলি শতদল;
হাসিতে ভাসিতে সদা সুবাসে নেশাতে,
দিগন্ত করিছে টলমল।
কোন ফুল ঈষৎ শাড়ীর আড় হ'তে
সচকিতে একটু চাহিয়া,
রঙিন শরম খানি বৃথাই লুকাতে চায়
টানিয়া আঁচল।

এরূপ কোথায় পেলে মেয়ে?
কোন্ সে অজানা নামহীন গ্রহ ছেয়ে,
স্নেহ আর মায়া আর ভালবাসা হয়ে,
জনম লভিয়াছিলে। দেহ ভরি
এত স্বপন এত মোহ লয়ে,
নভপথে চলিয়াছ দেশ হ'তে দেশে।
গতির তুরঙ্গ যেন রেখাময় হ'য়ে,
কত না মধুর বাণী
কত না সুরেলা ধ্বনি
পোষ মানিতেছে ওই দেহের পিঞ্জরে।

হয়ত বা কোনদিন
কোন এক পূজারীর মন্ত্রমুগ্ধ স্বরে,
তাহারা বাহির হ'য়ে আসি,
অনাহূত অনাশ্রুত নূতন বাণীর পুটভরে;
ফুলের নিশ্বাস অনুকারি মৃদুল বাতাসে ভেসে
বর্ষিবে ওই দু'টি কর্ণকুহরে।

সে ভাষা জানিনে আমি,
তোমাদের যুগ হ'তে বহু বহু দূরে,
আমার বসতি মেয়ে
কি করে ধরিব সেই সুরে!

তবুও সুদূর হ'তে
যতটা আভাষ পেনু তার,
আমার প্রবাস পথপারে,
বাণীর ভ্রমরী হ'য়ে,
আসা যাওয়া করিতেছে তারা
আজি বারে বার।

এ যেন পরাণ-ভরা জীবন-জুড়ান উপহার,
আর ত হবে না দেখা,
না হোক, বাঁশীতে কিছু দিয়ে গেলে সুর,
তারারি মায়ায় আজি
আকাশ বাতাস মোর
লাগিতেছে মধুর মধুর।

যুবক যুবতী

গণ টোকাটুকি

বেশ কিছুকাল যাবত আমাদের দেশে শিক্ষা-সংকট এমন একটা জটিল অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যার দরুন শিক্ষাবিদ এবং সুস্থ নাগরিক মাত্রেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এর সমাধান বা অবসান সম্পর্কে নানা সময়ে নানা কথা উঠেছে কিন্তু অবস্থা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেছে। বরং নানা-ভাবে এর প্রকাশ ঘটছে। ইদানিংকালে বিশ্ব-বিদ্যালয় বা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ যে বিষয়টি সামাল দিতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন তা হল গণ-টোকাটুকি। বোঝাই যায় টোকাটুকি শব্দটির আগে অবস্থা বিপাকে যখন 'গণ' অক্ষর দুটি বসাতে পেরেছে তখন সমস্যা কি আকার ধারণ করেছে।

গণ-টোকাটুকি অর্থাৎ পরীক্ষার্থীদের অসদুপায় অবলম্বন করে পরীক্ষা দান সোজা কথা নকল করে পাশ করার পাইকারী প্রবণতাই গণ-টোকাটুকি নামে ভূষিত হয়েছে। ছোট-বড় সমস্ত পরীক্ষাতেই এক ছবি কোথাও একটু ইতর বিশেষ। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এই রোগ নিবারণে নানা পন্থা নিচ্ছেন এবং নেবেনও হয়তো। কিন্তু বিশেষজ্ঞের মতে বিশেষ ফল তাতে ফলছে না।

এই সমস্যা সম্পর্কে কলকাতার কয়েক-জন যুবক-যুবতীর সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মতামত জানার চেষ্টা করি। দেখা গেছে এই সমস্যার মুখোমুখি হয়েই তাঁরা কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট গাফিলতির উল্লেখ করেছেন। একই সঙ্গে দায়ী করেছেন পরিবেশ এবং কর্তৃপক্ষ দুই অবস্থাকেই। আবার নিজেদের ত্রুটিকেও তাঁরা ঢেকে রাখার কোন চেষ্টা করেন নি।

ঢাকুরিয়ার সুদর্শন তরুণ অশোক মুখার্জি যিনি কখনই কোন পরীক্ষায় নকল করেন নি বলে জোরের সঙ্গে কবুল করলেন তাঁর মতে দেশ জুড়ে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে নানাভাবে। গণ-টোকাটুকি তারই একটা অত্যন্ত খারাপ দিক। জিজ্ঞেস করলাম পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা আগেও ছিল কি?'

'টোকাটুকি আজকেই হচ্ছে না। আগেও ছিল। তবে সেটা এমন সমস্যা হয়ে দেখা দেয় নি। জোর দায় ঠেকলে অনেকেই পাশের ছেলের খাতাটি দেখে টুকে নিতেন সেটা তেমন কোন সমস্যা সৃষ্টি করত না। এখন কিন্তু প্যাটার্ণ বদলেছে।

'কেন এ রকম হচ্ছে?' প্রশ্ন করলাম।

সদ্য-স্নাতক অশোক বললেন 'না পড়ে কম পরিশ্রমে একটা ছাপ জোগাড় করাই আসল লক্ষ্য পড়াশুনোটা একেবারে গৌণ হয়ে গেছে। আসলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বার বার যেভাবে বদলানো হচ্ছে ছাত্রদের যেভাবে পড়াশুনা করানো হচ্ছে তারই ফল এইসব। শিক্ষার প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা উদ্রেক করাতে না পারলে এ সমস্যা মিটবে বলে মনে হয় না।' অশোক নিজে থেকেই আরো একটু যোগ করে বললেন 'অনেক সময় হলে কোন পরীক্ষার্থী আনফেয়ার উপায় অবলম্বন করে ধরা পড়লে বাইরে বেরিয়ে সংশ্লিষ্ট গার্ড বা শিক্ষককে মারধোর করে। আমার মতে ওরা সমাজ-বিরোধী। লেখাপড়ার সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্কই নেই। লেখাপড়া ওরা করতেই চায় না।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (সাহিত্য) শিখা সেনগুপ্তকে জিজ্ঞেস করলাম 'এ যাবত যতগুলো পরীক্ষা দিয়েছেন তাতে গণ-টোকাটুকি সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন?'

'খুবই হতাশাজনক।'

'কি রকম তা একটু বলুন না?'

অশোক মুখার্জি

শিখা সেনগুপ্ত

'আমি দেখেছি মোটামুটি ভালো ছাত্র—সেও একই উপায়ে পরীক্ষা দিচ্ছে।'

'ভালো ছাত্রের এরকম করার দরকার হয় কেন?'

'আমার মনে হয় আশেপাশের দৃশ্য তাকে একটু কনফিউশানে ফেলে। সে ভাবে, আগাগোড়া বই দেখে টুকে ওর চেয়ে অনেক খারাপ ছাত্র অনেক ভালো ফল করতে পারে। অতএব ওই পন্থায় প্রতিযোগিতা করা।'

'ভালো ছাত্রের তো আত্মবিশ্বাস থাকার কথা?'

'অনেক ক্ষেত্রেই তা এখন নেই। সকলে কেমন হতাশায় ভুগছে।'

'এর জন্যে দায়ী কে?'

'টোটাল অ্যারেঞ্জমেণ্ট। ঘরে-বাইরে সর্বত্র বন্ধ্যা দশা। এ-দশা ঘোচাতে না পারলে এ-সমস্যা মিটবে না।'

তরুণ শিক্ষক মলয় দাশগুপ্ত বলেন, 'এই গণ-টোকাটুকির কারণ হল জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যহীনতা। যখন ঔপ-নিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এদেশে চালু হয়েছিল তখন শিক্ষার যে-উদ্দেশ্য ছিল, বর্তমানে সেই মাপের মধ্যে আর তাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। ইংরেজ কিছু রাইটার্স বা কেরাণী সৃষ্টিতেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ রেখেছিল। কিন্তু আজকের দিনে শিক্ষার পরিসর অনেক বেড়েছে। প্রায় নিবিত্ত ছেলেরাও বৃহত্তর জীবনের স্বপ্ন দেখতে পারেন। তাই ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে শিক্ষাকে মেলাবার একটা বাসনা থাকে তাঁদের। অথচ শিক্ষাকে সেই ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারেন না। এছাড়া সামগ্রিকভাবে চারিদিকে মূল্যহীনতা ও নীতিবোধহীনতা শিশুকে প্রথম থেকে ওই সমস্ত দোষগুলি শেখায়। তাছাড়া শিক্ষক-দের একটি বড় অংশের নিশ্চেষ্টতা নির্বিকার ভাব, ভাঙনের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ছাত্রদের চৌর্যবৃত্তির সহায়ক হয় আমার মতে. গত ১০।১৫ বছর ধরে শিক্ষকরাও ধীরে ধীরে এই গণ-

টোকাটুকির পাপের অংশীদার হয়ে পড়েছেন।

'আপনি তো হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করলেন, কিছু মনে করবেন না, নকল করতে হয়েছে কী?'

জিজ্ঞেস করলাম সদ্য স্কুল-ছেড়ে-আসা মায়া রায়কে।

মায়া বলেন, 'মেয়েরা বড় একটা নকল করে না। সামান্য যেটুকু করে তা-ও ছেলেদের তুলনায় কিছুই না।'

'মেয়েদের বাধাটা কোথায়?'

'তারা পড়াশুনাটা মোটামুটি মন দিয়ে করে।'

'আপনি কি মনে করেন পড়াশুনা না করাই গণ-টোকাটুকির একমাত্র কারণ?'

'তা তো একশ'বার।'

অলোক সাহা বললেন, 'আমাদের দেশ থেকে কোচিং ক্লাশগুলোকে আঁচড়ে তুলে দেওয়া উচিত।'

'কেন?'

'ওরাই সর্বনাশটা করছে। ওদের দেওয়া সাজেশন অনুযায়ী প্রশ্নপত্র না এলেই বিপত্তি বাড়ে। শুধু তাই নয়, সংক্ষিপ্ত নোট বই প্রকাশকেও সেন্সার করা উচিত।'

'কে সেন্সর করবে?'

'এর জন্যে আলাদা বিশেষজ্ঞ কমিটি করা দরকার। তাঁরাই এদিকটায় নজর রাখবেন।'

—কৃষ্ণা সেনগুপ্ত

চিঠিপত্র

শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশের জীবন

শ্রীঅজিতকুমার ঘোষের প্রতিবাদটি পড়লাম। অজিতবাবু লিখেছেন 'শরৎচন্দ্র যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন একথা আমি বলিনি।' একথাও আমিও কোথাও বলিনি। আমি বলেছি, অজিতবাবুর লেখা থেকে ঐ কথা দাঁড়াচ্ছে বা বোঝা যাচ্ছে। কারণ, তিনি বলেছেন, 'শরৎচন্দ্র যখন অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে ছিলেন, তখন হইতেই তাঁহার চরিত্র কলুষপঙ্কে নিমগ্ন ছিল। তাঁহার আত্যন্তিক মদ্যাসক্তি ও অসংযমের ফলও ভুগিতে হইল। তিনি ব্রহ্মদেশে পৌঁছিবার কিছুকাল মধ্যেই অসুস্থ হইয়া পড়েন।' এই কথা লেখার পরই অজিতবাবু, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের যে অংশটা উদ্ধৃত করেছেন, তাতে সুরেনবাবু লিখেছেন —'আমার দাদা রেঙ্গুনে গিয়ে লোকের মুখে শুনেছিলেন যে শরৎচন্দ্র পীড়িত হয়ে কোন হাসপাতালে আছেন। তাঁর এমন কোন অসুখ যে সকলের সঙ্গে দেখা করেন না। দাদার তখন ধর্মপ্রমুখ মন তাই তিনি দেখা করার আর চেষ্টাই করেন নি। শরৎ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা মোটেই ভাল হয়নি।'

আত্যন্তিক মদ্যাসক্তি ও অসংযমের ফলও ভুগতে হল এবং অসুস্থ হয়ে পড়লেন এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই এর সমর্থনে সুরেনবাবুর ঐ লেখাটা জুড়ে দিলে কি বোঝায়? যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত বোঝায় না কি? অজিতবাবু না বললেও এইটাই বলতে চেয়েছেন।

অজিতবাবু লিখেছেন—শরৎচন্দ্র মেসো মশাইএর বাড়ীতে এসেই অতিরিক্ত পরিমাণে মদ খেতে এবং লুকিয়ে বেশ্যাবাড়ীতে যেতে কখনই সাহসী হতেন না।' আমার এই উক্তি অজিতবাবুর মতে, ধারণা বা অনুমান মাত্র, কোন তথ্যের দ্বারা সমর্থিত নয়, এবং অন্যান্য জীবনীকারও আমার মতের বিরোধী।

কিন্তু আমি বলছি, আমার ঐ উক্তি তথ্য ও যুক্তির দ্বারাই সমর্থিত। কারণ আমি বলেছি, অঘোরবাবু যে প্রকৃতির তেজস্বী শক্তিশালী রাগী ও অন্যায়ের বিরোধী মানুষ ছিলেন, সেই মানুষের বাড়ীতে এক দূরসম্পর্কের অনাথ, অসহায়, আশ্রয়প্রার্থী যুবক তার সেখানে থাকাকালে কখনই ও রকম হতে পারেন না। আর হলেও, আমি আগে যা বলেছি, আবার বলছি—অঘোরবাবু তাকে শুধু চড়চাপড় বা দূর করে দেওয়াই নয় আছাড় মেরেই শেষ করে দিতেন। এ ছাড়া যে সুরেনবাবুর কথার উপর ভিত্তি করে অজিতবাবু শরৎচন্দ্রকে অঘোরবাবুর বাড়ীতে থাকাকালে অত্যন্ত মদ্যাসক্ত ইত্যাদি বলেছেন, সেই সুরেনবাবুর কথাই যে অসত্য তাও আমি পরিষ্কার করেই দেখিয়ে দিয়েছি। আর আমি আগে কখনই কোথাও একথা লিখিনি যে, শরৎচন্দ্র অঘোরবাবুর বাড়ীতে থাকাকালে অত্যন্ত মদ্যাসক্ত ও অসংযমী ছিলেন। 'অন্যান্য জীবনীকাররা'ও কেউ এ কথা লেখেন নি। কেবল ব্রজেনবাবু লিখেছেন—'অঘোরনাথের পীড়ার সময় তিনি ঘোর পানাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।' ব্রজেনবাবুর এই লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে, তিনি শরৎচন্দ্রকে অন্য কিছু না বলে শুধু পানাসক্তই বলেছেন। তাও বলেছেন—অঘোরবাবুর পীড়ার সময়, অঘোরবাবু সুস্থ থাকার সময় নয়। এবং শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যাওয়ার দু বছর পরে।

এখন কথা হচ্ছে, ব্রজেনবাবুর এই লেখাই যে ঠিক তাই বা কে বললে? প্রথমত অঘোরবাবুর পীড়ার সময় তাঁর অন্য শুশ্রূষাকারী শরৎচন্দ্রের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার এমন কথাও কোথাও বলেন নি। তিনি লিখেছেন—'শরৎচন্দ্র দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাঁহার আত্মীয়ের সেবা করিতেন এবং রাত্রি জাগরণে বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে আমি তাঁহার সাহায্য করিতাম।' এ থেকে কি বোঝায় শরৎচন্দ্র তখন ঘোর পানাসক্ত ছিলেন? দ্বিতীয়ত—যে ব্রজেনবাবু, শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের চাকরি-জীবন, প্রেমের জীবন ইত্যাদি সম্বন্ধে (যেমন মৌলমিন ও পেগু পরস্পর বহু দূরে অবস্থিত দুটি পৃথক জেলা হওয়া সত্ত্বেও ব্রজেনবাবু লিখেছেন—'আমহার্স্ট জেলার অন্তর্গত মৌলমিন, পেগু') সমস্ত ভুল লিখে গেছেন তিনি একথাটাও যে ভুল লেখেন নি, তাই বা কে বললে?

অজিতবাবু লিখেছেন—নরেন দেব, গিরীন সরকার এবং আমিও শরৎচন্দ্রকে 'উচ্ছৃঙ্খল' বলেছি এবং শরৎচন্দ্র মদ খেতেন একথা আমিও লিখেছি।

শরৎচন্দ্র মদ খেতেন এ কথা আমি লিখেছি। এ কথা শরৎচন্দ্র তাঁর রেঙ্গুন থেকে লেখা চিঠিতে নিজেও বলে গেছেন। কিন্তু তাই বলে আমি কি কোথাও লিখেছি বা শরৎচন্দ্র নিজেও বলেছেন, অঘোরবাবুর বাড়ীতে থাকাকালে তাঁর 'আত্যন্তিক মদ্যাসক্তি' ইত্যাদি ছিল। আমরা শরৎচন্দ্রকে 'উচ্ছৃঙ্খল' বললেও কেউই বলিনি যে, শরৎচন্দ্র অঘোরবাবুর জীবিতকালে তাঁর বাড়ীতে থেকে উচ্ছৃঙ্খল হয়েছিলেন। আর উচ্ছৃঙ্খল অর্থে আমরা কেউই বলিনি যে তিনি 'অতিমাত্রায় বেশ্যাসক্ত' ছিলেন।

অজিতবাবু লিখেছেন—'আমি গিরীন্দ্রনাথ সরকারের উক্তি সমর্থন করেছি অথচ গোপালবাবু লিখলেন, আমি সুরেনবাবুর অসত্য কথাটা সত্য বলে ধরে নিয়ে শরৎচন্দ্রকে অযথা অকৃতজ্ঞরূপে চিত্রিত করেছি।'

আমি ত' বলেছি অজিতবাবু গিরীনবাবুর কথাও উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে স্পষ্ট মতামত দিতে পারেন নি। যদি দিতে পারতেন, তাহলে তিনি সুরেনবাবুর অসত্য কথাটাকে নিয়ে কখনই লিখতে পারতেন না,—'শরৎচন্দ্রের উপরের উক্তি হইতে মনে হয় তিনি অঘোরনাথের মৃত্যুর আগেই ঐ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। ...অঘোরনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের উপরের উক্তির মধ্যে যেন একটু শ্রদ্ধার অভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রতি অঘোরনাথের অশেষ উপকারের কথা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্মরণ না করিলে অন্যায় হইবে।' যা আদৌ শরৎচন্দ্রের উক্তি নয় (সেত আমি দেখিয়ে দিয়েছি), সেটাকে শরৎচন্দ্রের উক্তি বলে ধরে নিয়ে এরূপ মন্তব্য করলে শরৎচন্দ্রকে অযথা অকৃতজ্ঞরূপে চিত্রিত করা হয় না কি?

গোপালচন্দ্র রায়,
কলকাতা—১২।

॥ ২ ॥

শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশের জীবন প্রসঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনায় শ্রীগোপালচন্দ্র রায় একটি বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। শরৎচন্দ্রের চারিত্রিক অধঃপতনের বিচার-বিবেচনা ও তাঁর ঔচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রসঙ্গগুলিতে অজিতবাবুর ভাষায় বলা হয়েছে, 'শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যাওয়ার পর থেকেই অতিশয় মদ্যাসক্তি ও অতিমাত্রায় বেশ্যাসক্ত হয়েছিলেন।'

এ-বিষয় শ্রীযুক্ত রায় তৎকালীন কয়েকজন ব্যক্তি যাঁরা শরৎচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের সাক্ষ্য-প্রমাণ তুলে ধরেছেন।

মানুষের ব্যক্তি-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটনে কিছুটা কৌতূহল থাকা অস্বাভাবিক নয়, আবার যারা সমাজের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পারদর্শী তাঁদের সম্বন্ধে আমরা বেশী স্পর্শকাতর। এই স্পর্শকাতরতার মধ্যে ঈর্ষা বা অসূয়া যেমন আছে, তেমনি আছে সত্যভাষণ। শিল্পী চরিত্র-চিত্রণে যে-আদর্শ চরিত্রটি রূপায়িত করেন ব্যক্তিজীবনে তিনি হয়তো সে-আদর্শটি রক্ষা করে চলেন না। এইভাবে শিল্পীসত্তায় দ্বৈত রূপ প্রত্যক্ষ করি। তিনি স্বভাবে যা হয়তো শিল্পী-সত্তার গভীরতর চেতনায় ভিন্ন। কিন্তু এই বলে যদি আমরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের উপর গুরুত্ব আরোপ করি, কিম্বা তাঁর চারিত্রিক পতন ও স্খলন আমাদের দৃষ্টি-সীমাকে আচ্ছন্ন করে, তাহলে শিল্পের জগৎ থেকে অনেক লেখকই বাতিল বলে গণ্য হতেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের দিক-পালরা তো মাতৃগর্ভ থেকেই ও-দুটি বিকার নিয়ে জন্মেছেন। ওঁদের ব্যক্তিগত লাম্পট্য সাহিত্যের মূল্যায়নে কোন বাধার সৃষ্টি করেনি, কিম্বা প্রতিবাদ করে কেউ এ-কথাও প্রমাণ করেননি যে, ওঁরা আদৌ অন্দ-কামাগ্নির দাহিক হননি বা পরদার গমন করেননি।

টলস্টয় তো ঋষি ছিলেন জীবনভর শান্তির বাণী প্রচার করেছেন। অথচ তাঁর জীবনে বাসনা ও দাম্পত্যের স্বেচ্ছাচারী ইতিহাস তো ভুবনবিখ্যাত। হাইনে, বোদলেয়ার, নীটস, মোপাসাঁ, দস্তয়েভস্কি প্রমুখ জগৎজোড়া, আর ওঁদের [illegible] অনেকেরই জানা। নিম্নশ্রেণীর রূপোপজীবিনী কিম্বা [illegible] ইন্দ্রিয় সুখোপভোগ এঁদের একমাত্র কাম্য ছিল। [illegible] মাইকেলের [illegible] এঁদের দেহ-মন [illegible]। তাই বলে কি এঁদের সাহিত্য সেই [illegible] মাহাত্ম্য প্রকাশে কাতর, না উৎসবের আস্বাদনে ধর্ষিত নয়?

রতন দাশগুপ্ত,
ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা।

আধুনিক কবিতার গীতিরূপ

গত ১১ আগস্ট আমার এক কবি-বন্ধুর সহায়তায় বিবেকানন্দ সোসাইটিতে 'কি-সন্তক' আয়োজিত একটি সুন্দর আধুনিক বাংলা কবিতার গীতিরূপ সংগীতানুষ্ঠানে শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল।

আধুনিক কবিতার উৎসাহী পাঠক হিসাবে এই উপলক্ষে সামান্য কিছু বক্তব্য রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। আজকে কবিতার পাঠক-পাঠিকারা এখনও অনেকে আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা, ছন্দ না-থাকা ইত্যাদি অনেক কিছু নিয়ে 'নাসিকা কুঞ্চন' করে থাকেন এবং সেই সঙ্গে আধুনিক কবিদের বহু ক্ষেত্রে উপহাসও করেন। কিন্তু গত সংগীতানুষ্ঠানটিতে তাঁদের মধ্য থেকে যদি কয়েকজনও শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থেকে থাকেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চয় তাঁদের কাছে আধুনিক কবিতা অনেক সহজভাবে মনের দরজায় নাড়া দিতে পেরেছে। অনুষ্ঠান পরিচালক ও মুখ্য কণ্ঠশিল্পী শ্রীঋষিন মিত্র প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এত সুন্দরভাবে কবিতার অন্তর্লীন ভাবটি প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন যা আমার মনে হয় 'আধুনিক কবিতার' একান্ত বিরাগভাজনেরও মনের দুর্বোধ্যতা কাটিয়ে ছন্দ ও সুরটি ধরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

আমার মনে হয় পর্যায়ক্রমে 'আধুনিক কবিতার গীতিরূপ' একটি অপূর্ব পরি-কল্পনা। সাধারণ পাঠক-পাঠিকার কাছে কবিতার দুর্বোধ্যতা ইত্যাদি কেটে যাওয়ার সঙ্গে আধুনিক বাংলা কাব্যগীতির মান উন্নয়নেও সহায়তা করবে।

বিনীত
শ্রীনিখিলকুমার বাগচী
কলকাতা-৪

উগ্র আধুনিকতায় আমাদের সমাজজীবন

অমৃতের (১৮ সংখ্যা) অঙ্গনা ফিচারে অঞ্জলি দেবীর 'উগ্র আধুনিকতায় আমাদের সমাজজীবন' নামক নিবন্ধের লেখাটি পড়লাম। লেখাটি উপভোগ্য হলেও ভূমিকা এবং উপসংহারের বক্তব্য কিছুটা অস্পষ্ট থেকে গেছে। যেমন শেষ তিনটি লাইন— 'সেকেলে প্রাচীনপন্থী হয়ে বসে থাকার কোন গর্ব নেই নিশ্চয়ই, তবুও চরম আধুনিকতায় শান্তি কোথায়?' এ-কথার মধ্যে দিয়ে তিনি কি প্রাচীনপন্থী ও আধুনিকতা, এ-দুটির মধ্যবর্তী পথ অবলম্বনের কথাই বলতে চেয়েছেন? যদি সে-ইচ্ছে থাকে, তাহলে পরিষ্কার করে উল্লেখ করতে বাধা কোথায়।

আমাদের মত মধ্যবিত্তের সংসারে নারী এবং পুরুষের অনেক স্বাধীনতা খর্ব হয়ে যায় যখন তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হন। তাঁরা যতই বাস্তববাদী হোন না কেন, সুস্থির সম্পর্ক বজায় রাখতে উভয়েই কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন। এইটিই সচরাচর আমরা দেখে থাকি। উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন তুলবো না, কেননা সেটা ব্যক্তিগত অভিরুচিসাপেক্ষ। অঞ্জলি দেবী বোধহয় বলতে চেয়েছেন আমাদের ঘরে প্রাচীনপন্থী হয়ে থাকা যেমন বেমানান, তেমনি উগ্র আধুনিকতাও মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ। তাই মধ্যবিত্তের সংসারে মধ্যবর্তী পন্থা অর্থাৎ স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যতটুকু সম্ভব সাংসারিক অবস্থার সঙ্গে মানসিক অবস্থার সহজ ভারসাম্য বজায় রাখাই ভালো। তাই না কি?

ধ্রুব বাগচী
শ্রীরামপুর, হুগলী।

যুবক যুবতীর ফিচারে গ্রামের যুবক

আমি অমৃত পত্রিকার একজন আগ্রহী পাঠক। গত চারটি সংখ্যায় যুবক-যুবতীদের সম্বন্ধে চারটি আলোচনা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। কিন্তু এতে গ্রামকে অব-হেলা করা হয়েছে প্রত্যক্ষ করলাম। লেখিকা যে কয়েকজন যুবক-যুবতীর সঙ্গে আলো-চনা করে তাঁদের বক্তব্য লিখেছেন, তাঁরা সবাই প্রায় শহরের অধিবাসী। কিন্তু শহরের যুবক-যুবতীরা তো [illegible] যুব-সমাজের প্রতিনিধি নন। এতে [illegible] যুব-সমাজের মনোভাব প্রতিফলিত হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। তাই সম্পাদক মহাশয়কে আমার অনুরোধ, পরবর্তী ফিচারগুলিতে যাতে গ্রামের যুব-সমাজ অংশগ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করুন।

গ্রামের যুবক হিসাবে আমি কয়েকটা মন্তব্য লিখছি। গ্রামের যুব-সমাজ হিন্দী বই অপেক্ষা বাংলা সিনেমা দেখতে বেশী পছন্দ করেন। শিপ্রা মল্লিক শাড়ি পরতে ভালবাসেন না এটা গ্রাম্য যুবতীদের কাছে আশ্চর্য বলেই মনে হবে। শাড়ির বদলে বেলবটম পরার কথা চিন্তা করতে পারেন না তাঁরা।

অসিতকুমার [illegible],
গুজরাত।

যৌনশিক্ষা

অমৃতে যৌন শিক্ষা বিষয়ে যুবক-যুবতীদের মধ্যে আলোচনা ও পরে প্রকাশিত গীতা মৌলিক এবং এস দাশগুপ্ত-এর লেখা দুটি পড়লাম।

শ্রীমতী মৌলিকের করুণ পরিণতি বেদনাদায়ক। নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞ-

তার মধ্য দিয়ে তিনি আগামী যুগের বংশধরদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের জন্য যে-চেষ্টা করার কথা উপলব্ধি করছেন সেটা খুবই মূল্যবান। কিন্তু আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থাতে তার গ্যারাণ্টি আছে কি? সংক্ষেপে শুধু একটি কথাই বলা যায় যে, শুধু যৌন সমস্যা নয়, আমাদের চারি-দিকে যে-সকল সমস্যা আছে, সে-সবই 'একসূত্রে বাঁধা'। স্বাধীনতার পূর্বে আমাদের দেশে যে সামাজিক সমস্যা তৈরি হয়েছিল সেই সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে স্বাধীনতার কিছু পরেই মহাত্মা গান্ধী আত্মদান করেছিলেন।

আজ স্বাধীনতার দীর্ঘ সাতাশ বছর পরে আমাদের চারিদিকে যে অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান শুধু শিক্ষা প্রবর্তন করেই হবে না।

এন দাশগুপ্তের চিঠিতে যে ইঙ্গিত রয়েছে সেইভাবে একটি সুন্দর সামাজিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে সুখী ও সুস্থ জীবনের গ্যারাণ্টি সৃষ্টি করা সম্ভব।

সমীর সেনগুপ্ত,
কলকাতা-৩৭

শির

১৩ই সেপ্টেম্বর সংখ্যা অমৃত সাপ্তাহিকীর যুবক যুবতী ফিচারে নারী স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত সম্বলিত রচনাটি খুব ভালো লাগলো। আজকের দিনে এটা একটা বিশেষ চিন্তার বিষয় বৈকি। কিন্তু আমার মনে হয়, স্বাধীনতা বলতে মেয়েরা যে কি চাইছেন তা তাঁরা নিজেরাই বুঝতে পারছেন না। বর্তমান আমাদের দেশের মেয়েরা পরাধীন কোন্ বিষয়ে? শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই পুরুষ এবং নারী সমান তালে পা ফেলে চলেছে। শিল্প-সংস্কৃতি বা সাহিত্যেও মেয়েদের পরিপূর্ণভাবে আত্ম-প্রকাশের সুযোগ রয়েছে। আমার তো মনে হয়, সুস্থ বিবেকবুদ্ধি নিয়ে কোন মেয়ে যদি কোন মহৎ কাজে ব্রতী হন, তবে কোন স্বামী অথবা বাড়ীর অন্য কোন অভিভাবক তার বিরোধিতা করবেন না। একটা কথা সবার আগে ভাবতে হবে, সেটা হলো নারী সমাজ যে স্বাধীনতা পেতে চাইছেন, সেটা যদি মঞ্জুর করতে হয় তাহলে শুধু শিক্ষিতা নারীদের জন্যই তা মঞ্জুর করা যাবে না। দেশের সর্বস্তরের মেয়েরা এই স্বাধীনতা ভোগের দাবী তুলবেন। কিন্তু সমস্যা হলো শিক্ষিতা নারীরা যেভাবে স্বাধীনভাবে চলতে চাইছেন, সেটা হয়তো সমাজের পক্ষে ততোটা ক্ষতিকর হবে না কারণ তাঁরা শিক্ষার গুণেই হয়তো নিজেকে পরিচালিত করবেন, কিন্তু গ্রাম্য মেয়েরা, যাঁরা শিক্ষালাভের সুযোগ পাননি, যাঁদের বেঁচে থাকার জন্য পুরুষের সহায়তা একান্তভাবে প্রয়োজন, তাঁরা কি করবেন? যাঁরা শিক্ষার সুযোগ পাননি অথবা অল্প-শিক্ষিতা তাঁরা কি তথাকথিত স্বাধীনতা-লাভের পথে স্বামীকে অগ্রাহ্য করে ভ্রান্ত পথের শিকার হয়ে যাবেন না?

বড় দুঃখের কথা, আমাদের দেশে শিক্ষার যা অবস্থা তাতে কজন নারীই বা শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছেন? শিক্ষিতাগণ ছাড়া আমার তো মনে হয় দেশের নারী-সমাজের একটা বৃহৎ অংশ উক্ত স্বাধীনতার মূল্যবোধ সম্বন্ধেই সচেতন হতে পারবেন না।

বেথুন কলেজের কলা বিভাগের ছাত্রী প্রিয়া মণ্ডলের সঙ্গে আমি একমত। সত্যি মেয়েদের দেহে এমন একটা কমনীয়তা আছে, যা নারীদেহের মস্ত সম্পদ। আমার মনে হয় মাসান্তে স্ত্রীর উপার্জনের দুশ কি আড়াইশ টাকার বিনিময়ে ঐটুকু হারাতে অনেক স্বামীই চাইবেন না। চাকুরীরতা মেয়েদের চোখে মুখে এমন একটা পেশার কঠোর ছাপ পড়ে, যা দেখলে হয়তো অনেকেরই দুঃখ হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে, গ্রাম্য মেয়েরা বিনা প্রসাধনেও কি সুন্দর দেহ সুষমা এবং সুকোমল কমনীয়তার অধিকারিণী। স্বপন সেন-গুপ্তের উক্তিও যথার্থ বলে মনে হয় আমার কাছে। মেয়েরা এমন একটা শক্তি, যার ফলে পুরুষরা শুধু বেঁচে থাকবার নয়, দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করার উৎসাহ পায়। প্রিয়া মণ্ডলের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে হাই সোসাইটিতে শত সুখস্বাচ্ছন্দ্য থাকতেও স্বামী স্ত্রী আলাদা হয়ে মনের আগুনে জ্বলছেন। অপরপক্ষে মধ্যবিত্ত ঘরের দম্পতিযুগল বা গ্রাম্য চাষীর সংসারে শত অভাব-অভিযোগ সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুমধুর এক সুস্থ প্রেমের ছবি দেখা যায়। সৃষ্টিতে যেমন নারী এবং পুরুষের আকৃতি এবং প্রকৃতি আলাদা, তেমনি ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় নারী এবং পুরুষের কার্যাবলীর মধ্যেও কিছু পার্থক্য রয়েছে। আমার মনে হয় এই পার্থক্যটা শান্ত স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়াই নারী-সমাজের উচিত হবে। যেসব মেয়ে নিজেদের পরাধীন বলে মনে করেন এবং 'স্বাধীনতা' না পাওয়ায় বিক্ষুব্ধ তাঁরা বিষয়টা ভালো করে চিন্তা করে দেখলে হয়তো প্রিয়া মণ্ডলের কথাগুলি উড়িয়ে দিতে পারবেন না।

বিভাসকান্তি সাহা
দক্ষিণদাড়ি রোড, কলিকাতা-৪৮

ফিল্ম

অমৃতের ১০ আগস্ট সংখ্যায় 'ফিল্ম' সম্পর্কে যুবক-যুবতীদের বিভিন্ন মতামত পড়লাম। অনেকে ফিল্মে আনন্দ পান। এজন্যে অনেকে আজকের হিন্দী ফিল্মকেই দায়ী করেছেন। এদের মধ্যে অসীমা চৌধুরীর 'কিছু পত্র-পত্রিকাকেও একটু সামলানো উচিত। ওরাই আজগুবি গল্প বানিয়ে ছাড়ে। তাই দেখে সব পাগল হয়ে হিন্দী ছবির হিরো-হিরোইনদের পেছনে দৌড়ায়।' মতামতটি ভাল লেগেছে। আর সবচেয়ে প্রশংসনীয় উক্তিটি করেছেন প্রেসি-ডেন্সী কলেজের জয়দেব রায়। তিনি বলেছেন, 'যুব সমাজকে গাল দিয়ে লাভ নেই। সামনে তাদের অন্ধকার, তাই তারা দিশেহারা। গোড়ায় গলদ।' আর একই কথা বলেছেন স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রী মধুমিতা ভট্টাচার্য। ফিল্ম কেমন হওয়া উচিত সে-সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'জীবনের সঙ্গে যুক্ত আমাদের দুঃখ-সমস্যা নিয়ে ছবি হোক। এঁদের' তিনজনের মতা-মতকে আমি সমর্থন করি।

হাল আমলের যুব-সমাজ সাহিত্যের চেয়ে ফিল্ম পত্রিকা বেশী সংখ্যায় পড়ে। তার কারণ অবশ্য ধরা যেতে পারে যে, অন্যান্য পত্র-পত্রিকার চেয়ে ফিল্ম পত্রিকার মধ্যে এমন সব ফীচার, প্রবন্ধ ও গল্প থাকে যা যুব-সমাজকে সহজেই আকর্ষণ করে।

অমৃত পত্রিকা একটি আকর্ষণীয় ফীচার 'যুবক-যুবতী' আরম্ভ করেছে, ফলে যুবক-যুবতীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আরও সক্ষম হবে। এর জন্যে সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই। আমার মতে, আজকের যুব-সমাজের কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য বিভিন্ন জায়গার যুবাদের মতামত অমৃত মারফৎ আহ্বান করলে আরও ভাল হয়। আশা করি, যুবক-যুবতী বিভাগে ভবিষ্যতে আজকের যুব-সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবো।

নিশিকান্ত সিন্‌হা
পঃ বঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, রায়গঞ্জ।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রাক-শততম জন্মতিথি উদ্‌যাপন

পশ্চিমবাংলার সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রাক-শততম জন্মতিথি উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

এ-বছরের অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে এখন পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো শিল্পী সংস্থা আয়োজিত তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান। প্রথম দু'দিন এই অনুষ্ঠানের স্থান ছিল 'কলামন্দির' ও তৃতীয় দিন বিশ্বরূপা। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে উদ্বোধনী ভাষণে সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু 'জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র' বিষয়ে ভাষণে শরৎচন্দ্র যেসব জায়গায় বসে তাঁর সাহিত্য রচনা করেছেন, সে-সব জায়গায় শরৎ-শতবার্ষিকীতে যে-সমস্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, তার বিশদ বিবরণ দেন। অমর কথাশিল্পীর সহজ, সরল জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন সাহিত্যিক মনোজ বসু ও সমথ ঘোষ। সভানেত্রীর ভাষণে ডঃ রমা চৌধুরী শরৎচন্দ্রকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী আখ্যা দিয়ে নারী-সমাজের প্রতি তাঁর সহজাত দরদের বিষয় আলোচনা করেন। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ দেন সংসাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ। তিনি শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবকে একটি ক্রান্তিকারী ঘটনা বলে উল্লেখ করেন। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী এম-পি এবং রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় এ-অনুষ্ঠানগুলির বিভিন্ন স্তরে তাঁদের ভাষণ দিয়েছেন। বাংলাদেশের ডেপুটি হাই-কমিশনার জনাব আবদুস শোভান চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। শ্রীদাশমুন্সী তাঁর ভাষণে বলেন যে, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শরৎচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা উচিত। শিল্পী-সংস্থার যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীকেশব মুখোপাধ্যায় শরৎ-শতবার্ষিকী উৎসবের জন্য সংস্থার কার্যসূচীও এই অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন। সংস্থার তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানের (বিশ্বরূপায়) সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র। এ-দিনের অন্যতম বক্তা ছিলেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। এই সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে : 'অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নিতে হবে।' দ্বিতীয় প্রস্তাবে জানানো হয় যে, অন্ততঃ শরৎ-শতবার্ষিকী বৎসরের জন্য শরৎচন্দ্র রচিত কাহিনীর নাট্যাভিনয়ের জন্য সম্মান-দক্ষিণা দেওয়ার রীতি চালু করা হোক। তৃতীয় দিনের এই অনুষ্ঠানে আশাপূর্ণা দেবীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। নিষ্কৃতি ও বামুনের মেয়ে-র মঞ্চাভিনয় এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল।

হুগলীর দেবানন্দপুরে শরৎ-জন্মোৎসব কমিটির ১৩ দিনব্যাপী উৎসবের শুরু হয় ১৮ই সেপ্টেম্বর। এ-অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ দেন শ্রীহরিপদ ভারতী।

সাহিত্য সংস্কৃতি : সংশোধন

আপনার পত্রিকায় জরৎকারু লিখিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগে 'দৈনিক চন্দ্রভাগা'র স্রষ্টা মনোহর সিং লেখা হয়েছে' এবং বোলপুর থেকে প্রকাশিত লেখা হয়েছে। দুটো তথ্যই ভুল। 'দৈনিক চন্দ্রভাগা' সিউড়ি থেকে প্রকাশিত এবং স্রষ্টা বা সম্পাদক বর্তমান পত্রলেখক।

রমানাথ সিংহ
সম্পাদক : দৈনিক চন্দ্রভাগা
সিউড়ি

পরলোকে সৌম্যেন্দ্রনাথ

সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, রাজনীতি, সংগীত—নানা বিষয়ে নিজস্ব ধারার প্রবর্তক, সমার্জিত রুচির পথিকৃৎ বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিস্ময় জাগে একজন মানুষ কতো বহুবিচিত্র শক্তির অধিকারী হতে পারেন তা দেখে, বিস্ময় জাগে একজন মানুষ কতো কিছু করে যেতে পারতেন, অথচ করলেন না তা দেখে। যে-সুবিখ্যাত বংশে সৌম্যেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এ-দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে তার নেতৃত্ব সর্বস্বীকৃত। কিন্তু তাঁদের সকলেই মূলতঃ সমাজের উপরতলার মানুষ ছিলেন। কিন্তু সৌম্যেন্দ্রনাথ পারিবারিক ধ্যানধারণার বাইরে গিয়ে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের শরিক হয়ে উঠেছিলেন। পিতা সুধীন্দ্রনাথ ১৯২৭ সালে তাঁর যুবক পুত্রকে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন দেশের নানা রাজনৈতিক সমস্যার কবল থেকে তাঁকে মুক্ত করবার জন্য। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গিয়েছিল যে, মস্কো, বার্লিন,

প্যারিস গিয়েও তিনি প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের একেবারে প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের পাশে নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। গান্ধীবাদের প্রভাবে যাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু। কিন্তু ভারতীয় বুদ্ধিজীবিগণের মধ্যে সৌম্যেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম হিটলারের বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তাও আবার খাস জার্মানীতে বসে। এজন্য হিটলার তাঁকে কারারুদ্ধও করেছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপের ফলেই সৌম্যেন্দ্রনাথ জার্মান কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন, কিন্তু ততদিনে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ তাঁর সম্পর্কে হুঁশিয়ার হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা তাঁকে একাধিকবার কারারুদ্ধও করেছিলেন। কাজেই দেখা যায় চিন্তাজগতের এই জনসাধারণ ব্যক্তি জীবনের প্রথম ৩৬ বৎসরের অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে প্রচলিত রাজনীতি ও সমাজনীতির বিভিন্ন ধারার তুলনামূলক(?) মধ্যে নিজস্ব একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'দি রিভোলিউশনারী কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া'। ধর্ম-দর্শন-ইতিহাস-রাজনীতি-সংগীত এবং সাহিত্যের প্রায় সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যেকোনও সময়ে মুহূর্তের নোটিশে সৌম্যেন্দ্রনাথ উচ্চ ধারায় অনর্গল বক্তৃতা করে তিনি সর্বদাই শ্রোতৃবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবার শক্তি রাখতেন। বাস্তবিকপক্ষে এই অসাধারণ শক্তির জন্য তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই একটা 'মিথ'-এ পরিণত হয়েছিলেন।

পরলোকে জ্যাকুলিন সুসান

প্রখ্যাত মার্কিন উপন্যাস-লেখিকা সম্প্রতি ৫৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ১৯৬৬ সালে 'ভ্যালী অব দি ডলস' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েন এবং আজ পর্যন্ত বইখানির ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ কপি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'দি লাভ মেসিন এবং তৃতীয় ও শেষ উপন্যাস 'ওয়ানস্ ইজ নট এনাফ'ও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

বীরভূমে 'অমৃত' সম্পাদকের সম্বর্ধনা

বিগত ২০শে সেপ্টেম্বর 'অমৃত' সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও সাংবাদিক-সাহিত্যিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুকে বীরভূম জেলা থেকে প্রকাশিত একমাত্র দৈনিক পত্রিকা—'দৈনিক চন্দ্রভাগা' কার্যালয়ের এক অন্তরঙ্গ ও ঘরোয়া পরিবেশে সম্বর্ধনা জানানো হয়। তারপর রামরঞ্জন পৌরভবনে নাগরিকগণের এক সভায় শ্রীঘোষ ও শ্রীবসুকে সম্বর্ধনা জানান হয়। এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সিউড়ি বিবেকানন্দ পাঠাগার, রামরঞ্জন পৌরভবন, রবীন্দ্র-স্মৃতি সমিতি, গান্ধী স্মারকনিধি, বীরভূম সাহিত্য পরিষদ সিউড়ি নাগরিক সমিতি ও কিশোর পাঠাগার প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেন। সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে শ্রীঘোষ তাঁর সাংবাদিক জীবনের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন ও স্থানীয় সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ ও সঠিক এবং বলিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের আবেদন জানান। শ্রীবসু বীরভূমে জেলাভিত্তিক নিঃ ভাঃ বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন-এর একটি শাখা প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষ্টিবান নাগরিকদের উদ্দেশে আবেদন জানান। জেলা প্রেস ক্লাবের সদস্যরাও শ্রীঘোষ ও শ্রীবসুকে সম্বর্ধনা জানান। ক্লাবের সম্পাদক শ্রীসুর্য চক্রবর্তী মানপত্র পাঠ করেন।

নিঃ ভাঃ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন-এর হাওড়া শাখার উদ্বোধন

গত ২২শে সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে হাওড়া জেলায় নিঃ ভাঃ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন-এর একটি শাখার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সাঁতরাগাছি কেদারনাথ ইন্সটিটিউশন হলে এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির অভিভাষণে সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বলেন : 'দেশের বিভিন্ন যুগের সমাজ-ব্যবস্থার ছবি সমসাময়িক যুগের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। তাই আমাদের দেশের অতীত ঐতিহ্যকে জানতে হলে, সামাজিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি পেতে হলে, পুরনো দিনের সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হতে হবে।' তিনি আরও বলেন : কাগজের অভাবে সংবাদপত্রের পাতায় নতুন সাহিত্যিকদের লেখা প্রকাশের সুযোগ ঘটছে না। তাই সম্মেলন-এর হাওড়া শাখায় নতুন সাহিত্যিকদের রচনা প্রকাশ হওয়া দরকার। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ডঃ শংকরীপ্রসাদ বসু। সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু উত্তরোত্তর এই শাখাটির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে একটি ভাষণ দেন।

—জরৎকারু

নতুন বই

Kavi Nazrul Islam By Gopal Halder
সাহিত্য একাডেমী, রবীন্দ্র সদনের গৌড়িয়াম, ভি বি রোড কলকাতা ২৯। আড়াই টাকা।

কবি নজরুলের জীবন ও তাঁর কাব্য-ভাবনাকে জীবনীকার শ্রীগোপাল হালদার 'কাজী নজরুল ইসলাম' নামের সদ্য প্রকাশিত ইংরাজী গ্রন্থটিতে সাতটি নিবন্ধ-যোগ্য অধ্যায়ে ভাগ করে সাধারণ পাঠকের উপযোগী ও সহজবোধ্য করেছেন। জন্ম ও শৈশবকাল 'যোদ্ধা ও শিল্পী' 'বিদ্রোহী কবি' 'জনগণের কবি' ইত্যাদি স্বতন্ত্র সাতটি নামে সুলিখিত অধ্যায়গুলি চিহ্নিত। প্রত্যেকটি অধ্যায়। যথাযোগ্য তথ্যসম্বদ্ধ, মুক্তনিষ্ঠ ও কবি এবং মানবতাবাদী নজরুলের অন্তর্নিহিত স্বভাব বুঝবার উপযোগী হয়েছে।

নজরুলের আবির্ভাব বাংলা কাব্য সাহিত্যের এমন এক লগ্নে যে সময়টা বেদবিদ-কবি রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ কাব্য-প্রতিভায় দীপিত। নজরুলের সমকাল ও পাককাল রবীন্দ্রপ্রভাবে এমন এক পরিবেশে উদ্ভাসিত, যাকে অস্বীকার করা যায় না। এবং অস্বীকার করতে পারেন নি সত্যেন্দ্রনাথ কুমুদরঞ্জন করুণানিধান ইত্যাদির মত রবীন্দ্রভাবনার কবিরা। সে সময়ের স্বাতন্ত্র্য-দীপ্ত কবি ছিলেন মোহিতলাল যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নজরুল। মোহিতলালের তান্ত্রিক ভোগবাদ যতীন্দ্রনাথের বুদ্ধিশুদ্ধ দুঃখবাদের পাশে নজরুলের বিদ্রোহী কণ্ঠের উচ্চরোল বাংলা কাব্যের নতুন দরজা খুলে দিয়েছিল। শ্রীগোপাল হালদার নজরুলের সৌন্দর্যলিপ্সা, প্রবল আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে কবিকে মানবতাবাদের স্বরূপে তুলে ধরে কবি, বিদ্রোহী নজরুলের জীবনালেখ্য রচনা করেছেন। গ্রন্থটি সর্বস্তরের পাঠকদের কাছে সহজগ্রাহ্য হবে বলে প্রবন্ধকার অভিনন্দনযোগ্য।

ভালবাসায় মহুয়ারী : [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। সুমিত প্রকাশনী, বাবুপাড়া রোড, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা পশ্চিম বাংলা। মূল্য দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে ওঠার পর ওকার প্রবীণ ও নবীন কবিদের লেখার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ এসেছে বিভিন্ন সাহিত্য-গোষ্ঠীর মাধ্যমে। ওপার বাংলার নতুন কবি [illegible] মাত্রায় রোমান্টিক ভাবধারায় অনুসারী। ওপারের বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত কবিতার এই সংকলনে বেশ কিছু ভালো কবিতা পেলাম। গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি দুর্বল কবিতাও আছে যা বাদ দিলে সংকলনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতো। কবি মানসিকতার দিক থেকে এখনো পরিণত না হওয়া সত্ত্বেও [illegible] সব বেশ আবেগের সঙ্গে প্রকাশে সমর্থ হয়েছেন। [illegible] শব্দ-প্রয়োগ। আধুনিকতার দুর্বোধ্যতা বর্জিত এই কবির কাছে পরবর্তীকালে আরো ভালো কবিতা পাব এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় শিল্প বিভাগ পত্রিকা :
সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। বিভাগীয় ছাত্র সংসদ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কল্যাণী।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের চুয়াত্তর সালের শিল্প বিভাগীয় পত্রিকাটি পূর্বে সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বিভাগীয় স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেকটি রচনাই সুনির্বাচিত। ভিন্ন স্বাদের প্রবন্ধ, কবিতা, চিঠি, গল্প পত্রিকাটির একটি স্বতন্ত্র মান ও আদর্শের ক্ষেত্র রচনা করেছে।

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমি শ্রীঅরবিন্দকে কেন ভুল বুঝতাম বারবার মূলে তার দুটি কারণ। একটি—আমি যোগ সম্বন্ধে ছিলাম অজ্ঞান, আর অজ্ঞানরা অজ্ঞান বলেই জানে না যে, তারা অজ্ঞান; দ্বিতীয়—আমি ছিলাম অত্যন্ত ঝোঁকালো মানুষ (impulsive) তার ঝোঁকের পরিণাম মূঢ় রোখ, রোখের পরিণাম মতি-ভ্রম। কিন্তু এ-সূত্রে আমার একটি অমূল্য লাভ হয়েছিল এই যে, আমি তাঁর অগাধ স্নেহ ও অহৈতুকী করুণার মর্মজ্ঞ হতে পেরেছিলাম। পরে আমি এ-উপলব্ধিটির রূপ দিই একটি কবিতায় (মধুমুরলী)ঃ

যদি অপরাধ না করিত পাপী—
কৃপার মহিমা জানিত কি সে?

ব্যথাতসলিলে ডোবে নি যে—
তুমি তারক কেমন জানিত কি সে?

মলিন ধুলায় হয় নি যে—
প্রেমগঙ্গাস্নানে তোমার, প্রভু

অশুচি যে হয় অমল পলে—
এ-উপলব্ধি কি লভিত কভু?

আমার মনে এই একটা দৃঢ় ধারণা গড়ে উঠেছিল যে যোগের প্রগতি হয় নানা দর্শনাদিরই ফলে—যার ইংরাজী নাম vision কিন্তু আমার ধ্যানের বাগানে কোনো দর্শনফুলই ফুটত না বলে আমি বারবার ধ্যানে বসে 'বৃথা বৃথা' বলে ব্যথিত হতাম বিষণ্ণচিত্তে। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বারবার সাবধান করে দিতেন ভুল ভেঙে দিতে চেয়ে, কিন্তু আমি তবু মোক্ষম আঁকড়ে ধরে থাকতাম আমার নানা দৃঢ়মূল ভুল ধারণা। শেষে হল বিস্ফোরণঃ বিদ্রোহ শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন আমাকে যে, আমার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে আমার এক অবোধ গোঁ যে, যোগে দর্শনাদি না হলে সব মাটি। আমি রুখে উঠলাম, বললাম ঃ 'তাহলে গুরুদেব আমাকে বিদায় দিতে আজ্ঞা হয়—আমি পারছি না ধ্যানের শূন্য বালুচরে কল্পনার পরীপ্রাসাদ বানাতে। শ্রীঅর-বিন্দ বোঝালেন ঃ সে কি কথা? যোগে তোমার কবিতার উৎস খুলে গেছে, গানে উন্নতি হয়েছে. অন্তরে নানা সঙ্কটে আশ্চর্য শান্তি নেমেছে—সব ভুলে গেলে? কিন্তু আমার বিমুখ মন সমানে মাথা নাড়েঃ ওঁ হুঁঃ. গুরুদেব আমাকে সুমিষ্ট প্রবোধ দিচ্ছেন যেমন ডাক্তারে দেয় মরণাপন্ন রোগীকে। আজ দেখতে পাই এ-মূঢ়তা কেন আমাকে থেকে থেকে পেয়ে বসত। কিন্তু সে-সময়ে আমি মূলত শুধু তাপের তাড়সে প্রলাপ বকতাম। শেষে তাঁকে দিলাম আলটিমেটামঃ আমি আপনার যোগের অধিকারী নই তাই চলি।

উত্তরে তিনি লিখলেন একটি মর্মস্পর্শী চিঠি—অমনি আমার বিকার কেটে গেল—আমি দেখতে পেলাম আমার গোঁয়ার্তুমির বহর। গুরুদেব লিখলেন (১৬-৫-৩২)ঃ

"You do not belong to yourself—you belong to the Divine and myself and the Mother. I have cherished you like a friend and a son and have poured on you my force to develop your powers — to make an equal development in the yoga. We claim the right to keep you as our own here with us".

(তোমাকে এখন ভগবান স্বয়ং পেয়ে বসেছেন, সেই সঙ্গে আমি ও শ্রীমাও পেয়েছি সে-অধিকার। আমি তোমাকে বরণ করেছি বন্ধু ও দুলাল বলে। তোমার নানা নিহিত শক্তির আমি উদ্বোধন করেছি আমার প্রভাবে—যোগেও তোমার তেমনি প্রগতি হবেই হবে। তাই আমি দাবি করবই করব তোমাকে আমাদের কাছে ধরে রাখতে আপন জন বলে লালন করে।)

পত্তে আমার বিদ্রোহ গলে গিয়েছিল চোখের জলে। যাবে না? সাক্ষাৎ শ্রীঅরবিন্দ—মহামানব যুগর্ষি মহাকবি—যাঁর মহিমা আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল সাংসারিক জীবন থেকে, যাঁর চুম্বকশক্তি আমাকে টানত আমার প্রাক্‌যৌগিক জীবনেও, যাঁর নানা কবিতায় নিবন্ধে ভাবধারায় স্নান করে আমি বারবারই নিজেকে ধন্য মনে করেছি—তিনি আমার মতন ঝাঁঝালো রোখালো অবোধকে মান দিতে পারেন তাঁর 'দুলাল ও বন্ধু' বলে! একেই তো নাম ছায়াস্বপনের জাগরণে কায়া ধরা—— dream come true!

আর শুধু এই চিঠিটিই তো নয়—চিঠির পর চিঠি অশ্রান্ত নির্ঝরে—জানানো স্নেহের অঙ্গীকারে; তোমাকে আমি ছাড়ব না, তোমার প্রাণসাধনার পথে তোমাকে ঠেলে পৌঁছিয়ে দেবই দেব তীর্থলক্ষ্যে যাতে করে তুমি জেগে উঠতে পারো নিশার আঁধার থেকে ঊষার সোনার আলোয়, তোমার প্রাণের নিহিত পূজার দলগুলি মেলে ধরে বরণ করতে পারো সেই নীলমণিকে যাঁর জন্যে আমাদের জন্ম, যাঁর মিলন বিনা অন্য সব প্রাপ্তিই থেকে যায় বিফল বিষণ্ণ। আর কতবারই না মাত্র দু' একটি লাইনে ঝরাতেন তাঁর আদরের ঝর্ণাধারা! একবার লিখেছিলেন (ডিসেম্বর ১৯৩৪) ঃ আমার সামনে যখন রাতে নানা সাধকদের চিঠি জড়ো হয় তখন আমি সব আগে খুঁজি তোমার চিঠি। আমি তোমার দ্বিতীয় 'আর্জেন্ট' চিঠিটার কথা জানতে পেরেছিলাম তোমার তৃতীয় চিঠিটি পাবার পরে—নিশুত রাতে। যদি আগে পেতাম তবে নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতাম। তোমাকে যে সারারাত আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছে এজন্যে আমি দুঃখিত।' আর একটি চিঠিতে ঃ আমার সময় হয় না এমন নয়। এমন দিন যায় না যেদিন আমি তোমার পানে আমার

যোগশক্তিকে না নিয়োগ করি—যাতে তোমার নানা পথের বাধা কাটে।

(Want of time does not come in the way, as there is no day on which I do not devote some time to thinking of you and concentrating on you. May 1933)

পক্ষান্তরে কী চমৎকার প্রত্যুত্তর দিতেন সময়ে সময়ে! একবার আমি তাঁকে লিখেছিলাম হাল্‌কা সুরে যে আমার ভালো লাগে ভগবান যখন মানুষী তনু ধরেন তাঁর সাংঘাতিক কূটস্থ রূপকে বাতিল করে। পিঠ পিঠ তিনি জবাব দেন (১৪-২-৩২) : 'তোমরা সবাই কেবলই আবদার ধরো ভগবান মানুষ হয়ে মানবিক চেতনায় বেঁচে বর্তে থাকুন, কিন্তু মানুষকে আমি ভাগবতী চেতনায় উত্তীর্ণ করতে চাইবামাত্র না না করে শোরগোল তোলো'।

("Again you all insist on the Divine becoming human, remaining in the human consciousness, but protest against any attempt to make the human divine!" 14.2.32)

কখনো বা দু' কথায় বুঝিয়ে দিতেন কোনো সমস্যার আশু সমাধানের দিশা মেলে কোন পথে। একবার আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করি—জ্ঞান জ্ঞান করে এত সোচ্চার হয়ে হবে কী যখন দুঃখশোকের যন্ত্রণা মানুষকে পদে পদে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে? উত্তরে গুরুদেব লিখলেন : জ্ঞান যখন আমাদের কোনো সঙ্কটের মূল আবিষ্কার করে তখন তার মধ্যে সক্রিয় হয় এক আশ্চর্য দুঃখনিবৃত্তির শক্তি। ডুব দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে যেই দুঃখব্যথার নিদানে পৌঁছই, দেখি—দুঃখ উবে গেছে যেন এক ইন্দ্রজালে!'

("For knowledge when it goes to the root of our troubles has in itself a miraculous healing power as it were. As soon as you touch the quick of the trouble, as soon as you, diving down and down, get at what really ails you, the pain disappears as though by a miracle".)

আর একবার কোনো কোনো সাধকের আচরণে ঘা খেয়ে গুরুদেবকে প্রশ্ন করেছিলাম, এ-ধরনের চ্যুতিকে যারা চ্যুতি মনে করে না তাদের নানা স্খলনকে তিনি সয়ে থাকেন কেমন করে? উত্তরে তিনি লিখেছিলেন :

"My experience shows me that human beings are much less deliberate and responsible for their acts than the moralists, novelists and dramatists make them and I look rather to see what forces drove them than what the man himself may have seemed by inference to have intended or proposed — our inferences are often wrong and even when they are right touch only the surface of the matter".

(ভাবার্থ : নীতিবাদী, ঔপন্যাসিক বা নাট্যকারেরা মানুষকে তার কর্মের জন্যে যতটা দায়িক করে থাকেন আসলে তারা ততটা দায়িক নয়। আমি জোর দেই সেই গভীর দৃষ্টির 'পরে যার প্রসাদে দেখতে পাওয়া যায় কী ধরনের তাড়নায় তাদের পদস্খলন হয়। তাদের নানাত্রুটি চ্যুতির সম্বন্ধে যে-সব সিদ্ধান্ত আমরা সচরাচর করে থাকি তারা প্রায়ই বেঠিক, আর ঠিক হলেও খতিয়ে উপরভাসাই বলব)

কখনো কখনো দুকথায় দিতেন নানা স্ববিরোধের সমাধান। একদা আমি তাঁকে লিখি যে ছন্দে নতুন কিছুর প্রবর্তন করতে গেলেই গতানুগতিকদের দল হৈ হৈ করে ওঠেন—এমন কি নবছন্দ রসাল হলেও। উত্তরে গুরুদেব লেখেন : 'তা বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও সমান সত্য যে, আমাদের সব মানবিক প্রচেষ্টারই বিকাশ প্রসার সমৃদ্ধির জন্যে আমাদের মন বা শ্রুতি চায় নূতনত্বের চমক :

Novelty is difficult for the human mind or ear to accept, but novelty is asked for all the same in all human activities for their growth, amplitude, richer life. (২৮-১-৩৩)'

কিন্তু নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে—নিয়তিকে ঠেকাবে কে? তাই তাঁর নিয়ত আশ্বাসের পরেও আমি থেকে থেকে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতাম, মনে হত হয়ত শেষরক্ষা হবে না, আর তখন আমার মতন অযৌগিক আগন্তুক অনাদৃতে হসন্ত হয়ে উঠবেই উঠবে। বলা বাহুল্য, এর মূলেও ছিল আমার সূক্ষ্ম অহমিকা, যে চাইত তাঁর আদর কাড়তে। তিনি নিশ্চয় দেখতে পেতেন এসবই। কিন্তু এমনি ছিল তাঁর অহৈতুকী কৃপা, অমল স্নেহ যে আমাকে বার বার ফিরে ফিরে দিতেন একই ভরসা যে আমার প্রতি তিনি বিরূপ হবেন না হবেন না, হবেন না :

"You need not think that anything can alter our attitude towards you. That which is extended to you is not a vital human love which can be altered by external things : it remains and persistently we shall try to help and lift you up and lead you towards the light where in the union of soul and heart you will recognise the Friend and the Mother".

(তোমাকে আমরা যে-দৃষ্টিতে দেখেছি তার বদল হবে না গো। তোমাকে আমরা যা দিতে চাইছি তা তো কোনো চঞ্চল মানবিক প্রীতি নয়—বাহ্য পরিবেশ বদলালে যার ভোল বদলে যায়। সে অটল, অচল। আমরা নিরন্তরই চাইব তোমার সাধনায় সহায় হয়ে তোমাকে দিব্য জ্যোতির্লোকে উত্তীর্ণ করতে যেখানে তোমার অন্তরাত্মা ও হৃদয় চিনতে পারবে চিরসাথীকে ও মা-কে।)

।। সাত ।।

আমি কিছু ভেবেচিন্তে কোমর বেঁধে অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের মহিমার অশ্রুকণ্ঠী গুণগান করতে চাইনি—অস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগে। শেষের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই যেন নতুন করে শুনি তাঁর স্নেহসুরধুনীর রেশ স্মৃতির শ্রুতি-সৈকতে। দেখতে পাই যেন আরো স্পষ্ট করে তিনি আমাকে কী অজস্র আশা ভরসা জ্ঞান আলো—সর্বোপরি তাঁর অমেয় স্নেহ দিয়ে ধন্য করেছিলেন। একথা বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না যে, তিনি একা আমাকে তাঁর প্রেমপক্ষপুটে টেনে রেখেছিলেন আমার হাজারো কামনাবাসনার টানকে নস্যাৎ করে দিয়ে। আমার প্রকৃতি ছিল বহুমুখী, নিত্য-বিক্ষিপ্ত। কিন্তু তবু তাঁকে আমি বরণ করেছিলাম আমার প্রাণের নায়ক বলে—আর এমন নায়ক যাঁর জন্যে আমি বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন এমন কি আমার আদরের গীতসাধনাও ছাড়তে রাজী হয়েছিলাম। কেমন করে এহেন অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল—বিশেষ যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ লেন-দেন হত না, শুধু পত্রের মাধ্যমেই চলত আদান-প্রদান? এ প্রশ্নের পরিপাটি উত্তর আমি দিতে পারব না? আমরা কি জানি আমাদের স্বরূপ? তাই শুধু এইটুকুই বলেই এ-ভাষার সমাপ্তি টানব যে, আমি তাঁকে ভালোবেসেছিলাম আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে। এক গভীর বেদনার অন্ধকারে অনুযোগ করে লিখেছিলাম একটি কবিতা চল্লিশ বৎসর আগে :

বেসেছি তোমাকে ভালো—যে-তুমি
জেলেছ আলো এ-প্রাণে কৃপায়।

শিশুকাল হতে আমি চেয়েছি দিবসযামী
তোমার চরণ।

অশান্ত বাসনা যবে রুক্ষমুগ্ধ কলরবে
করেছে আমায়

উদ্‌ভ্রান্ত—সে-দুর্দিনেও তোমারেই
জানি প্রেয় করেছি বরণ।

কতদিন মনে মনে করেছি যে সংগোপনে
তোমার অর্চনা,

কুমারী যেমন করে শিবপূজা পতিতরে—
না দেখি তাহারে;

অলক্ষ্য গুরুর শিখা আমাকে পরাক টিকা
করেছি প্রার্থনা,

রজনী যেমন করে প্রার্থনা উষার তরে
বিরহ-আঁধারে।

পঙ্কশ্লানি হতে মুক্তি চাহি নি কি

গুরুভক্তিব্রতে—গেয়ে গান :

"তোমার আশিসে জিনি' তুফানতর্জনে,

চিনি' তোমায় কাণ্ডারী,

চলিব তোমার দিশা বরি'—জপি' প্রেমতৃষা

রজনীবিহান ?"

বহুজন্মপুণ্যফলে সে-তুমি অন্তরতলে

এসেছ, দিশারি।

কোরো ক্ষমা এ-দুর্যোগ—যদি করি'

অনুযোগ কাঁদি অভিমানে :

"যে সুদূর আকাশের বিহঙ্গ সে

এ-মর্ত্যের ব্যথায় কী জানে ?"

আমার 'মধুমুরলী' কাব্যগ্রন্থে এ-কবিতাটির পটভূমিকা (context) দিয়েছি। তাই শুধু সংক্ষেপে এইটুকু বলেই থামব যে, আমার মনে একটি অনপনেয় দুঃখ ছিল তাঁর দেখা সাক্ষাৎ পেতাম না বলে। আমি পণ্ডিচেরি গিয়েছিলাম শুধু তাঁরি টানে। সেখানে আনন্দ পেয়েছিলাম অগাধ—বিশেষ করে প্রেমস্পর্শে। তিনি আমাকে একবার লিখেছিলেন যে, আমাকে তিনি যত চিঠি লিখেছেন তত চিঠি আর কাউকেই লেখেন নি। আরো লিখেছিলেন পরে—যখন তিনি সাধকদের প্রাত্যাহিক চিঠি লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন—যে, আমাকে তিনি চিঠি লিখে চলবেন কেন না আমার কাছে যে তাঁর চিঠি মরুভূমির পথিকের কাছে তৃষ্ণার জলের সামিল তা তিনি জানেন। আমি সাশ্রুনেত্রে তাঁকে লিখেছিলাম; আপনার লিখতে কষ্ট হলে আপনি লিখবেন না—যদিও জানতাম তিনি

লিখবেনই লিখবেন। কিন্তু সে যাক, এ-সম্বন্ধে আমি বলতে চাইছি শুধু এই কথাটি যে, আমি তাঁর অদর্শনের দুঃখের সাধ যে চিঠির যোগে কিছুটাও মেটাতে পেরেছিলাম তার কারণ—তাঁরই স্নেহের দৈবী শক্তি ঘটিয়েছিল এ-অঘটন। আমি পণ্ডিচেরিতে নানা ভুল করলেও তাঁর স্নেহকে কখনো মানবিক বলে ভুল করিনি। সেটা এই জন্যেই যে, তাঁর প্রেম যে মানবিক প্রেম নয় এটুকু আমার অবোধ মনও চোখের জলে শুধু মেনে নয়েছিল। এবং কেবল তাই নয়, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলাম, যেকথা তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন তাঁর একটি পত্রে (এপ্রিল, ১৯৩৪) :

> "It is only divine love which can bear the burden I have to bear, that all have to bear who have sacrificed everything else to the one aim of uplifting earth out of its darkness to the Divine. The Galileo-like 'Je m'en fiche'-ism (I do not care) would not carry me one step".

শ্রীঅরবিন্দ দৈবী প্রেমকে কীভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এ-পত্রে তার ঈষৎ আভাস দিয়েছেন বিশেষ করে, এই মহাসত্যটির পরে জোর দিয়ে যে, যাঁরা ধরণীর দুঃখনিবৃত্তি চান তাঁরা ধরণীকে পাশ কাটিয়ে সমাধির সুখে মগ্ন হয়ে থাকতে পারেন না, চান প্রতিপদেই পার্থিব দুঃখকে বহন করতে দৈবী প্রেমের তাগিদে। কেন না কেবল দৈবী প্রেমই এ-গুরুভার বহন করতে পারে। যাকে মানুষ প্রেম প্রেম বলে ঢাক পিটোয় সে-প্রেম বেশি সইতে হলে নেতিয়ে পড়েই পড়ে। তাই—গেয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ—মহাপ্রাণ যাঁরা তাঁরা বলতেই পারেন না—মানুষের দুঃখে তাঁদের প্রাণ কাঁদে না, বললে তাঁরা প্রেমের দুরভিসারে এক পা-ও এগুতে পারতেন না। এই দীপ্ত বাণীটি তিনি বিশদ করে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সাবিত্রীতে (ষষ্ঠ স্কন্ধে) দেবর্ষি নারদের মুখে :

> The great who come to save this suffering would....
> Must pass beneath the yoke of grief and pain.
> On their shoulders they must beat man's load of fate..
> Exempt and unaffected by earth's fate,
>
> How shall he cure the ills he never felt? He carries the suffering world in his own breast;
>
> Its sins weigh on his thoughts. its grief is his:
>
> Earth's ancient load lies heavy on his soul....
>
> His march is a battle and a pilgrimage.

আসেন মহানুভব যাঁরা এই আর্তা ধরণীরে
করিতে উদ্ধার—হবে তাঁহাদের করিতে বহন
জীবের যন্ত্রণা যত। নিয়তির গুরুভার হতে
যদি তাঁরা পান অব্যাহতি তবে দিবেন কেমনে
মুক্তি বসুধারে তার লক্ষ জ্বালা হতে—যাহাদের
সাথে হয় নাই পরিচয় তাঁহাদের? ধরিত্রীর
পাপ তাপ করে ক্লিষ্ট চিন্তারে তাঁদের, আর্তি তার
করেন ধারণ তাঁরা আপনার বলি'।
পৃথিবীর
সনাতন গুরুভার করেন বহন গূঢ়প্রাণে।
পদযাত্রা তাঁহাদের তীর্থযাত্রা হয় প্রতিপদে
পার্থিব ত্রিতাপ সাথে যোঝিয়া সংগ্রাম ক্লান্তিহীন।

আমি জানি—বস্তুবাদী রিয়ালিস্টরা এ ধরনের কবিত্বকে উচ্ছ্বাস বলে হেসে উড়িয়ে দেবেন — আত্মিক রণঘোষকে 'অবাস্তব' নাম দিয়ে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের কাছে বিশ্বের দুঃখশোক দুর্বিষহ মনে হত বলেই তিনি আত্মিক যোগশক্তির আবাহন করতে চেয়েছিলেন—প্রথম দিকে বিপ্লবীদের নায়ক হয়ে কারাবাস বরণ করে, তারপরে কারাগৃহে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পেয়ে রাজনীতি ছেড়ে দুশ্চর তপস্যায় মগ্ন হয়ে। আমাকে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন যে, তিনি কোনো দিনই নিজের একক মুক্তি-সাধনাকে বরণ করেন নি বিশ্ববিচ্ছিন্ন পরমানন্দের আবেশে মশগুল হয়ে থাকতে। তিনি বিষ্ণুভাস্কর লেলের কাছে যোগদীক্ষা চেয়েছিলেন যোগশক্তিবলে ভারতের রক্তশোষক বিদেশী শাসকদের বিতাড়িত করতেই। তারপর তাঁর চোখের সামনে খুলে যায় এক আদিগন্ত জ্যোতির্লোক যার প্রসাদে তিনি চেয়েছিলেন আমাদের পার্থিব চেতনাকে ঊর্ধ্বায়িত করতে —দেখতে পেয়ে যে, এ-মহা-উত্তরণ শুধু যে সম্ভব তাই নয়, মানবিক চেতনাকে তার মর্ত্য সীমা থেকে মুক্তি দিতে না পারলে কোনো স্থায়ী আনন্দরাজ্যেরই প্রতিষ্ঠা হতে পারে না এ অপলকা মাটির ভিতে। কিন্তু তাই বলে আমাদের মৃন্ময়ী মা-কে তিনি হেনস্থা করতে চাননি, বারবারই ঘোষণা করেছেন যে, এই মর্ত্যলোকে শাশ্বত অমর্ত্য চেতনার আবাহন করে পৃথিবীকে স্বর্গের পদবী দিতেই মানুষকে চাইতে হবে যার ফলে

> The spirit shall look out through Matter's gaze.
> And Matter shall reveal the Spirit's face.

তাঁর বিখ্যাত Life Heavens কবিতাটিতেও তিনি এই মহাবাণীই দিয়েছেন ঝংকৃত প্রস্বনে :

> I, Earth have a deeper
> power than Heaven.
> My lonely sorrow surpasses its rose-joys,
> A red and bitter seed of
> the raptures seven:—
> My dumbness fills with
> echoes of a far voice.

এ-কবিতাটির মনোজ্ঞ অনুবাদ করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দের এক প্রিয় শিষ্য সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (মণি) :

মৃন্ময়ীর দৃষ্টিদীপে জ্বালিবে চাহনি চিন্ময়ীর,
প্রকাশিবে চিন্ময়ীর মুখ মৃন্ময়ীর প্রতি অঙ্গ।
(Savitri Book II)
আমি পৃথ্বী, স্বর্গ হতে গূঢ়তম শক্তি আছে আমার অন্তরে,
আমার নিরালা ব্যথা ওই স্বর্গসুখ হতে বহু ঊর্ধ্বে রাজে,
রক্তরাঙ্গা মধুতিক্ত সপ্ত পুলকের রাজ্য মোর মর্ম ধরে,
মূক মোর এ-আত্মায় দূর এক আহ্বানের প্রতিধ্বনি বাজে।

কথায় কথায় স্মৃতিচারণ থেকে বহুদূরে সরে এসেছি। তাই ফের স্মৃতির খেই ধরি। শ্রীঅরবিন্দ একটি চিঠিতে এ-সম্পর্কে লিখেছিলেন একটি লাখ কথার এক কথা। পটভূমিকাটি এই : কোনো সাধিকা আমার কাছে এসে একদিন খুব কান্নাকাটি করেন। তাঁকে আমি ভরসা দিয়ে বলি ইংরাজীতে :

> "However feeble the day, the flower is in the bud and it will blossom".

(মাটি যতই কেন অসহায় হোক যে-ফুলটি লুকিয়ে ...ছে কুঁড়ির তলায় সে ফুটবেই ফুটবে) শ্রীঅরবিন্দকে সাধিকাটির দুঃখের কথা জানিয়ে লেখাতে তিনি আমাকে লেখেন :

"তুমি তাকে ঠিকই বলেছ, বিশেষ করে তোমার সান্ত্বনাটি
(However feeble....blossom)
একথাটি শুধু প্রতি মানুষের সম্বন্ধেই নয় এ-বিশ্বভুবন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

> Earth is a feeble day for the spiritual planting, but all the same it buds eventually and the bud, once there, will blossom".

(মৃন্ময়ীর মাটিতে অধ্যাত্ম চাষে ফসল ফলানো সহজ নয়, কেন না সে-মাটি ভঙ্গুর, তবু কুঁড়ির নিচে ফুল আছে বলে অন্তিমে সে ফোটেই ফোটে।)

এই ফোটার প্রসঙ্গে আর একটি চিঠিতে তিনি সস্নেহে লিখেছিলেন :

> "You cannot doubt but that we will help you through and watch over you with the greatest love and care. Beyond the storm we must look to a summer beyond".

পদে পদেই তিনি এইভাবে মনে করিয়ে দিতেন তাঁর করুণাসজল, আশিসস্নিগ্ধ সদাসজাগ স্নেহসতর্ক তার কথা। আর কত-শত কাজের মাঝে।

(ক্রমশঃ)

উপন্যাস

প্রভাত দেবসরকার

রাজার রাজা

ছোট্ট সংসার হলেও, অবনীবাবুকে মোকাবিলা করতে হয় নানান অশান্তি। উপার্জনক্ষম ছেলে বিকাশের বিয়ের সম্বন্ধ করেন অবনীবাবু। আর সে পাত্রী হল বিকাশের অফিসেরই বড়বাবুর মেয়ে। এ সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বিকাশ। অসুস্থ অবনীবাবু মারা গেলেন। সংসারের দায়িত্ব পড়ল বিকাশের ওপর। ছোট ভাই নন্তুর দায় নেই। এদিকে অফিস ইউনিয়ন স্ট্রাইক নোটিশ দিয়েছে। ইউনিয়নের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল বিকাশ। বড়বাবু অনন্তবাবুও বিকাশকে খানিকটা সাবধান করে দিতে চাইলেন। বিকাশ রাস্তায় মিছিলে হঠাৎ দেখে মালবিকাকে। মালবিকা বিকাশকে বলল তোমার যদি চাকরী যায় বিকাশ?

বিকাশ বলল, যায় যাবে। এদিকে মালবিকার দাদা সুবিমলকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল। বিকাশ-মালবিকা দুজনেই প্রচুর চেষ্টা করল ছাড়িয়ে আনতে। পারল না। এই সূত্রেই বিকাশ মালবিকাদের বাড়ি যাওয়া শুরু করল। মালবিকার বৌদির সঙ্গে আলাপ হল। মালবিকা তাতে খুশি নয়। অফিস থেকে বরখাস্তের নোটিশ পেল বিকাশ। মাঠে পরিচিত জায়গায় মালবিকার সঙ্গে দেখা...]

বিকাশ যেন নতুন দেখছে, মালবিকাকে [illegible] দেখে বললে, [illegible]?

অনেকক্ষণ!

রোজ আস নাকি? আমি তো—

[illegible] মালবিকা বললে পারতে যদি না আসে মহম্মদকে আসতে হয়। সেদিন মালবিকার বৌদিকে নিয়ে জল বোঝাবুঝির জন্যে বিকাশ কয়েকদিন দেখা সাক্ষাৎ করে নি। রাগও করেছিল বেশ মনে মনে।

পাশে বসে বিকাশ বললে, তারপর খবর কি?

ভাল! দাদা জামিন পেয়েছে। কাল বাড়ী এসেছে—

যাক বাঁচা গেল। তবে মামলা টিকবে না, কেবল হ্যারাসমেন্ট!

দাদা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আমার সঙ্গে দেখা করে কি হবে, আমি কি মুক্তিদাতা?

অত জানি না, দাদা জেলহাজত থেকে বেরিয়েই তোমাকে খুঁজেছে। সে কথা তাকে জিজ্ঞেস করতে পার!

বিকাশ কৌতুক করে বললে, আর কেউ খোঁজে নি?

মালবিকা মুখ টিপে বললে, না!

[illegible] হাত বাড়িয়ে বিকাশ হঠাৎ মালবিকার আনত মুখখানি তুলে ধরলো।

আর কি আশ্চর্য, সে দেখলে মালবিকার চোখে জল! বিকাশ কি কোন অপরাধ করলে?

বিকাশ হাতটা সরিয়ে নিলে, মনে পড়ল আর একদিন মালবিকার চোখে এমনি জল দেখেছিল। সেদিন চোখ মুছে মালবিকা

জিজ্ঞেস করেছিল, বিকাশ তোমার যদি চাকরি যায়? তোমরা কি পারবে সংগ্রাম করতে?

সেদিন মালবিকা ভয় পেয়েছিল বিকাশ দাদার চাকরি যাওয়ার কথা বোধহয় মনে পড়েছিল। আজ চোখের জলটা ছুঁয়ে না আবেগে বিকাশ বুঝতে পারলে না।

কিন্তু মালবিকার চোখে জল কেন? [illegible] তো [illegible] বিকাশ এখনো জানায় নি—সত্যি সত্যি আজ বিকাশের চাকরি গেছে যে!

হঠাৎ মালবিকার যেন কি হল, বিকাশের বুকে মাথা রেখে গদ গদ কন্ঠে বললে, বিকাশ বিকাশ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর—

মালবিকার মাথায় হাত রেখে বিকাশ ভাবলে, এ কি হয়েছে [illegible] পাগলি! বিকাশের মনে হল তার বুকের ভারটা অনেক হালকা হয়ে গেছে। সে যেন আরো বেশি আত্মসচেতন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে—নিজেকে [illegible] নতুন করে এসে সে যেন পরম আনন্দকে পেয়ে গেছে! দুঃখকে জয় করেছে!

[illegible] ভাবে [illegible] তাদের [illegible] আলো [illegible]।

মালবিকাকে স্পর্শ করে ধনসম্মিবিষ্ট হয়ে বসে থাকতে থাকতে কেমন একটা নিষ্ক্রিয়তা বিকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এ অতি সুখ না অতি দুঃখের কারণ বিকাশ বুঝতে পারে না।

মালবিকা ডাকলে, বিকাশ?

উঃ! সামনে চেয়ে বিকাশ সাড়া দিলে—

কি ভাবচো এত? কথা বলচো না যে!

এই তো বলচি—বিকাশ মালবিকার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বললে, চল এবার উঠি!

আর বসবে না? আর একটু—মালবিকা বিকাশের কণ্ঠলগ্ন হতে চাইল।

বিকাশ উঠে দাঁড়াল, বললে না চল ফেরা যাক।

বিকাশের মনোভাবটা মালবিকা বুঝতে পারে না। আজ এই মুহূর্তে সে বিকাশকে অনেক কিছু দিতে চায়, কিন্তু বিকাশ কৈ গ্রহণ করছে না তো! কেন? মনে মনে মালবিকা ক্ষুণ্ণ হয়।

বিকাশ মালবিকাকে চাকরিতে তার সাময়িক বরখাস্তের কথা কিছুতে বলতে পারবে না। সংকোচ নয়, ভয় নয় কেমন যেন তার পৌরুষে লাগে। হোক তারা সংগ্রামী তবু এ যেন প্রণয়িনীকে জানান উচিত নয়। আমায় যেদিন বিজয়ী হবে কেবল সেদিনই বলতে পারবে—

তারপর নিঃশব্দে অনেকটা পথ এসে, ট্রাম স্টপের নিকটবর্তী হয়ে বিকাশ বললে, চল ট্রামে করে যাই।

মালবিকা বললে, হেঁটেই চল না। কতটুকুই বা—

আবার মাঠের রাস্তায় ফিরে এসে বিকাশ বললে, হাঁটতে তোমার ভাল লাগছে?

তা নয়, ট্রামে-বাসে বড় ভিড়—দেখছো না লোকগুলো কেমন করে যাচ্ছে ঝুলে ঝুলে—

ও আর নতুন কি, রোজই তিনশো পঁয়ষট্টি দিন! মনে করতে পার কবে বসে আরাম করে ট্রামে-বাসে গিয়েছ? এই তো জীবন-যুদ্ধ! বিকাশ যেন খুব বড় কথা বলেছে।

শুধু শুধু যুদ্ধের দরকার কি! তাড়া তো নেই কিছু, অবশ্য তোমার যদি—মালবিকা আড় চোখে বিকাশকে দেখে বললে।

বিকাশ বললে, তোমার যখন নেই আমারও নেই—ট্রাম-বাসে যেতে আমারও ভাল লাগে না, উঃ কি ভিড়—ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি, ধস্তাধস্তি! দেখলে মনে হয় কত স্বার্থপর ইতর এই গৃহ-প্রত্যাগত-প্রাণ মানুষগুলো!

উপায় কি বল? এর সুরাহা তো এখনো কিছু হলো না। ভূগর্ভ অন্তরীক্ষ কত রকম রেলের কথা কতবার কাগজে বেরুল! কিছু হলো?

হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বিকাশ বললে, হবে হবে যেদিন সত্যিকারের জনগণের সুখ-সুবিধা দেখার জন্যে সরকার গঠন হবে, ব্যক্তি বা দলের স্বার্থ ভুলে দেশের কথা সবাই ভাববে।

মালবিকা থমকে দাঁড়িয়ে বিকাশের মুখের দিকে চেয়ে বললে, একথা তুমি বিশ্বাস কর সত্যি?

বিশ্বাস না করার কি আছে! দেশের লোকের ভাল না হলে আর দেশ-সেবা হলো কি করে?

আমার তো বিশ্বাস হয় না—মনে হয় কেমন যেন একটা পাপ-চক্রের মধ্যে সবাই পড়ে গেছে! ক্ষমতা পাবার জন্যে সেবা, আদর্শ মত পথ কত কি বড় বড় কথার সৃষ্টি হয়েছে—সব যে স্তোক, ধোঁকা বুঝতে কি কারো আর বাকি আছে!

সহসা বিকাশ মালবিকার ডান হাতটা নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে বললে, মালবিকা! মালবিকা তুমি এত কথা ভাবো? আমায় ক্ষমা কর আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলুম!

লজ্জায় আনন্দে শিহরণে মালবিকা যেন রাস্তার মধ্যেই ভেঙে পড়ে। গদ-গদ কণ্ঠে বললে, না না অমন করে তুমি বোলো না—আমার কোন বোধ নেই, অতি সাধারণ!

সেই প্রথম দিনের একত্রে পাশাপাশি হাঁটার কথা বিকাশের মনে পড়ল। উভয়ের কি ভয় সন্দেহ সংশয়—মধ্যবর্তী নীরবতাটা যেন এখুনি একটা ভয়ংকর কিছু করে বসে! তবু সেদিন সেই দুর্যোগের মধ্যেই যেন আজকের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বীজ উপ্ত হয়েছিল। পিছনে কালো রাত্রি ফেলে যেন নব সূর্যোদয়ের দিকে তারা এগিয়ে চলেছিল।

আজ ভয় নেই, সংশয় নেই অপরিচয়ের সন্দেহও নেই! তবু কেন বিকাশ সহজ হতে পারছে না? মুখরোচিত ব্যবহার করতে পারছে না? আবার কেমন নীরব হয়ে হাঁটতে লাগল।

ক্যাথিড্রাল গির্জার পিছনে এসে মালবিকা জিজ্ঞেস করলে, আজ তোমার কি হয়েছে বলতো কোন কথা বলচো না? কেমন যেন—

হাঁটতে হাঁটতে বিকাশ বললে, কই কিছু তো না!

বিকাশের হাত ধরে মালবিকা বললে, তাহলে আমাকে তুমি আপন মনে কর না, ভালবাস না?

না না তোমাকে যদি ভাল না বাসি, নিজেকেও তাহলে ভালবাসি না। মালবিকা তুমি আমাকে ভালবাসতে শিখিয়েছ, তোমার ভালবাসায় ধন্য আমি!

মালবিকা বিকাশের মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, হয়েছে হয়েছে! আর বলতে হবে না—

বিকাশ বললে আমি কি ভাবছি জান কতদিনে দেশের এই অবস্থার পরিবর্তন হবে—আবার আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে আনন্দে বাস করতে পারবো? শান্তির নামে এই অশান্তি রোজ রোজ ভাল লাগে না!

আমারও না! আমাদের আকাঙ্ক্ষা আমাদের ইচ্ছা এরা আর কতদিন দাবিয়ে রাখবে? এখন নির্বাচন করতে এত ভয় কেন? সাধারণ লোককে কি ওরা এইভাবে অপমান করবে? মালবিকা বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বললে।

গম্ভীর হয়ে বিকাশ বললে, সংখ্যার সাধারণ-এর চেয়ে কোথাও ভাল ব্যবহার পায় না। প্রতিটি সাধারণ যখন ব্যক্তি হবে তখন ওদের চোখ খুলবে, ভদ্র ব্যবহার করবে!

মালবিকা হেসে বললে, সদাশিববাবু গেল, এবার কে আসবে বল তো?

যার মুখে গণতন্ত্রের দই মাখিয়ে পেছন থেকে জনসাধারণকে লাঠিপেটা করা চলবে।

সে তো ওরা এখনিও করতে পারে! শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে হবে না? বললেই হলো—

হঠাৎ খুব কাছাকাছি দুম দুম গুলীর শব্দ হলো। বিকাশ উৎকর্ণ হয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। মালবিকা পিছন পিছন এসে বললে, অমন করে সামনে যেও না। দাঁড়াও।

তেমনি ব্যস্ত হয়ে বিকাশ বললে, গুলী চলছে, তোমাদের ওদিক থেকে যেন শব্দটা এল! কি হলো?

যাই হোক তুমি এগিয়ো না ছোটাছুটি করো না, এক জায়গায় দাঁড়াও—মালবিকা পিছন থেকে বিকাশের জামা ধরে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলে।

পি-জি হাসপাতালের গেটের কাছে এসে দুজনে থমকে দাঁড়াল সামনে রাস্তার মোড়ে লোকের ভিড় জমে উঠেছে, মৌচাকে ঢিল পড়ার মত [illegible] হয়ে আরো লোকজন এধার-ওধার ছিটকে ছড়িয়ে পড়েছে!

পুলিশ এলগিন রোডের মোড়ে গুলী চালিয়েছে, কারণ একদল সশস্ত্র যুবক পুলিশ-ভ্যানের ওপর বোমার আক্রমণ চালিয়েছে, কজন যেন আহত হয়েছে। মরেছে কেউ? এখনো জানা যায় নি, তবে রাস্তার ধুলো অনেক রক্ত শুষে নিয়েছে, যারা দেখেছে তারা বলছে—

বলুক! তুমি এখানে চুপ করে দাঁড়াও আর এক পাও এগিয়ো না! মালবিকা শক্ত করে বিকাশের হাত চেপে ধরলে।

হঠাৎ বিকাশের কি হলো সজোরে মালবিকার হাত ছাড়িয়ে ছুটে সামনে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। আবার কটা গুলীর শব্দ ধারে-কাছে হল, লোকজন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এধার-ওধার পালাচ্ছে। মালবিকা কি করবে যেন বুঝতে পারছে না কেমন যেন হতচেতন হয়ে গেছে। 'পালাও! পালাও!' কেউ চীৎকার করে না বললেও সেই রকম একটা হুঁশিয়ারী শব্দেও যেন শুনতে পাচ্ছে না, মাটির সঙ্গে পা দুটো যেন আটকে গেছে, চলবার ক্ষমতা নেই।

কতক্ষণ এইভাবে কাটল মালবিকার খেয়াল নেই, যখন খেয়াল হল তখন দেখল সামনে পিছনে রাস্তার সব আলোগুলো

নিয়ে গেছে, নির্জনতা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে।

মালবিকার বুকটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠলো। বিকাশ কি তাকে এই বিপদের মধ্যে রেখে পালিয়ে গেল? নাকি সে নিজেই কোন বিপদের মধ্যে পড়ল? বুক দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল—মালবিকা অস্ফুটে বললে, বিকাশ! বিকাশ! তুমি কোথায়?

হঠাৎ আততায়ীর মত পিছন থেকে এসে হাত ধরে বিকাশ বললে, চল দাঁড়িয়ে থেকো না এভাবে?

নিজেকে যেন মালবিকার বিশ্বাস হচ্ছে না, ভুল দেখছে না তো—

বিকাশ তাড়া দিয়ে বললে, আঃ চল চল এখানে দাঁড়ান নিরাপদ নয়, এখনি পুলিশ এসে ধর-পাকড় শুরু করবে! এগোও—

কিন্তু কোথায়? সে-কথা আর মালবিকা জিজ্ঞেস করলে না, যন্ত্রচালিতের মত বিকাশের পিছন পিছন এগিয়ে চলল।

হন হন করে বেশ খানিকটা দক্ষিণ-মুখো এসে একটা মোড়ের মাথায় পেঁছে যেন উভয়ের নিঃশ্বাস পড়ল। বিকাশ সুস্থির হয়ে বললে, কোথায় যাবে?

এতক্ষণে মালবিকাও সুস্থির হয়ে বললে, তোমার যেখানে খুশী—

সে কি? কথাটা মুখ দিয়ে না বেরলেও বিকাশ মনে মনে বিস্ময় বোধ করলে, মালবিকা বলে কি, বাড়ী ফেরার কথা কি ভুলে গেল গোলমালে? ভয় আতঙ্ক কোথায় গেল এখন মন থেকে?

অবশ্য এখন এখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় না পিছনে তারা কোন গোলমাল ফেলে এসেছে, গুলি চলেছে পুলিশ আর নব-বিপ্লবীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে, মানুষ মরেছে পথের ধুলোয় রক্ত মিশেছে!

খানিক নীরবে হেঁটে যদুবাজারের কাছে এসে বিকাশ বললে, চল তোমাদের বাড়ী যাই তোমাকে পেঁছে দিয়ে আসি!

মালবিকা কোন কথা বললে না, নিঃশব্দে বিকাশের পাশে-পাশে চলতে লাগল।

বিকাশ বললে, কি বাড়ী ফিরবে না? কি হলো, বল—?

কিছু না, চল। মালবিকা বিকাশকে ফেলে একটু যেন এগিয়ে গেল।

পার্শ্ববর্তিনীর মনোগত ভাব বা ইচ্ছাটা কি, বিকাশ বুঝতে পারে না। বিপদ যা তা তো তারা পিছনে ফেলে এসেছে ভয়ও কেটে গেছে তাহলে? এখন তো যে-যার আলয়ে ফিরে যাওয়াই উচিত। রাতও অনেক হয়েছে! আর রাস্তায় ঘুরে বেড়ান উচিত নয় এভাবে।

তাহলে সামনের গলি দিয়ে চল, তাড়াতাড়ি হবে। বিকাশ এগিয়ে এসে বললে। কোন কথা না বলে মালবিকা তেমনি সোজা চলতে লাগল। হঠাৎ সে যেন বোবা হয়ে গেছে।

বিকাশ বিরক্ত হয়ে বললে, আচ্ছা মুশকিল! কি হয়েছে বলবে তো, না রাস্তার মধ্যে এমন করবে?

মালবিকা থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে রুদ্ধ কন্ঠে বললে, আপনি আমার সঙ্গে আসবেন না, আমার কথায় থাকবেন না আমার খোঁজ করবেন না আর—

বিকাশ অবাক হয়ে গেল হঠাৎ এ আবার কি ধরনের কথাবার্তা মালবিকার মুখে—মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি মেয়েটার?

মালবিকা দাঁড়াল না, থরথর পা ফেলে এগিয়ে গেল। বিকাশ হতভম্ব হয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল, সে কি করবে যেন ভেবে পেল না। এমন ব্যবহার মালবিকা কখনো তো করে নি! ধরা দিয়ে যুবতী মেয়েরা এমনি করে পালায় নাকি? তাহলে মাঠে বসে এই কিছুক্ষণ আগে মালবিকা যা বললে বা করলে সব অভিনয়? কিন্তু তার কি দরকার ছিল, বিকাশ তো কিছু চায় নি বলে নি?

এ যে বড় অপমান, প্রতারণা! রাগে-ক্ষোভে দুঃখে বিকাশ বুঝি জ্ঞান হারিয়ে ফেলল, ছুটে গিয়ে মালবিকার হাত ধরে হটেনে বললে, তোমাকে বলতে হবে আমি তোমার কি করেছি?

মালবিকা রাগ করল না, হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টাও করলে না, কেবল সজল চোখে বললে তুমি বাড়ী যাও বিকাশ আমার কথা শুনলে তোমার কষ্ট হবে।

না, তোমাকে বলতে হবে আমি কি করেছি? বিকাশ মালবিকার হাত ঝাঁকানি দিয়ে বললে, আমি কিছুতে সহ্য করবো না।

এবার মালবিকা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, আমি যা বলেছি যা করেছি সব ভুলে যান। দোষ আমারই। আমি ভাল না, আমি খারাপ মেয়ে। আপনার অযোগ্য!

আশপাশে দু' চারজন উৎসুক হয়ে উঠেছে, পথচারীর পদচারণা মৃদু হয়ে এসেছে। বিকাশ মুখ নীচু করে সরে এল, বেশ অপ্রস্তুত বোধ করলে। দু-একটা সরস মন্তব্যও কানে এল। তারপর চোখ তুলে চাইবার আগে মালবিকা পাশের গলিপথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

পুনশ্চ

অধুনা বইয়ের বিজ্ঞাপনে অধিক স্থান জুড়ে ভাষার কেরামতি করার উপায় নেই। কারণ যে পরিমাণে বিশিষ্ট কয়েকটি কাগজে বিজ্ঞাপনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে অল্প পরিসরের মধ্যে কোন বিশেষ গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বিজ্ঞাপিত করা সত্যই অসম্ভব। যাঁরা অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক স্থান গ্রহণ করেন, তাঁরা কেবলমাত্র লেখকের নাম, গ্রন্থগুলির নাম ও কোন কোন ক্ষেত্রে কি বিষয়ের গ্রন্থ ব্যতীত ততোধিক আর কিছুই উল্লেখ করতে সমর্থ হন না।

তবুও এই সকল অসুবিধার মধ্যেও, কোন কোন প্রকাশক কপাল ঠুকে নব-প্রকাশিত গ্রন্থগুলি সম্পর্কে, কোথাও বা খ্যাতনামা গ্রন্থকারদের তাগিদে অথবা তাঁদের মনস্তুষ্টির জন্য বা কোপানলের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য, নানা ভাষার অলংকারে, বাকবৈশিষ্ট্যে, সেগুলিকে লোক-চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত করে থাকেন। অবশ্য তাঁরা কিছু মুনাফা লাভের আশাতেই যে তাঁরা সাধ্যাতীত ব্যয়ভার বহন করে থাকেন তাতে আর ভুল নেই।

এই বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে চিরকালই বিজ্ঞাপনদাতারা যথাসম্ভব স্বল্পপরিসরের মধ্যে হলেও তাঁদের যথাসম্ভব বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে থাকেন এবং বিজ্ঞাপন লেখার জন্য অনেকের স্বতন্ত্র লোকও থাকেন। এ ব্যাপারে তাঁরা নানা কৌশল অবলম্বন করে থাকেন বটে, কিন্তু এ যুগের সঙ্গে প্রাচীন বিজ্ঞাপনের হাস্যকর ভাষা-বৈচিত্র্য দেখলে বিস্মিতই হতে হয়। এবং এই ভাষা-বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রাচীন বিজ্ঞাপনদাতারা এমনই বাগাড়ম্বর সৃষ্টি করতেন যে অধুনা আমাদের কাছে তা অশোভন ও নিতান্তই পরিহাসের ব্যাপার বলেও মনে হয়।

প্রধানতঃ অতীতে বইয়ের এই বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' ছিল একেবারে একমেবাদ্বিতীয়ম্। বঙ্গবাসী ও হিতবাদীর প্রকাশন বিভাগ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়, সাধনা লাইব্রেরী, ক্রাউন লাইব্রেরী প্রভৃতি শেষোক্ত বটতলার দোকান-গুলিও যেমন কম যেতেন না, তেমনি এক সময় রবীন্দ্রনাথের বই নিয়ে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসও নানা ধরনের কম বিজ্ঞাপন করেন নি! সবচেয়ে আশ্চর্য হতে হয় তখনকার দামের সঙ্গে বর্তমানকালের বইগুলির তারতম্য দেখে। এবং তখনই বিজ্ঞাপনের মূল্যবৃদ্ধির হার দেখে মনে কিছুটা সান্ত্বনার সম্ভাবনা জাগে।

১৩২৭ সালের (অগ্রহায়ণ) 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকা থেকে 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' ও 'ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস'-এর দুটি প্রাচীন কৌতূহলোদ্দীপক পুস্তক-বিজ্ঞাপনের নমুনা এখানে প্রকাশিত হল। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ। গ্রন্থখানির নাম 'রুসিয়ার প্রলয়'।

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত না প্রলয়ের জীমূত-মন্দ্র গর্জন।

কি এ! আগ্নেয়গিরির লাভাপ্রবাহ না প্রচণ্ড ঝটিকার সহিত প্রলয়োদ্বেলমুখর সমুদ্রের মহাবেগ।

রুসিয়ার প্রলয়

প্রলয়! প্রলয়! মহাপ্রলয়!!

প্রলয়ের অগ্নিস্রোত ছুটিতেছে— রুসিয়ার প্রজার হৃদয়ে যে বিপ্লব-বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইতেছিল, রাজশক্তির প্রবল অত্যাচারের-নৃশংসতার আহুতি প্রাপ্ত হইয়া সেই বহ্নি প্রতিজনপদপল্লীতে প্রলয়াগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল। সেই অগ্নিস্রোতে লাভাপ্রবাহের মত সাম্রাজ্য-শক্তি - শান্তি - ঐশ্বর্য - পদমর্যাদা - আভিজাত্য - ধনগৌরব মুহূর্তে ভস্মসাৎ করিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছে। অতুলপ্রতাপশালী—

রুসসম্রাট সাম্রাজ্ঞীর ছিন্নমুণ্ড সেই জাতীয়-

যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইয়াছে!

কে জানে এ বিপ্লববাদ—বিভীষণ বলশেভিকবাদের প্রজ্বলিত দাবানল কোন যুগে কোথায় নিবৃত্তি - পরিসমাপ্তি - শান্তিলাভ করিবে! এ অধীর উন্মাদনা—সমরক্ষেত্রের উদ্দীপনা সমেরুবৎ অটল উৎসাহ—মানব স্বপ্নাতীত পৈশাচিক তাণ্ডব—কিসের জন্য?

প্রতিশোধ! প্রতিহিংসা! প্রতিবিধিৎসা!!!

রক্তে রক্তে প্রতিশোধ! জ্বালাময়ী অত্যাচারের প্রতিহিংসা!

লক্ষ লক্ষ মৃত্যুর প্রতিবিধিৎসা!

রাজশক্তির প্রবল অত্যাচার প্রজাকে কিরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন পাগল করিতে পারে, দেখিয়া আতঙ্কে সম্ভ্রমে বিকম্পিত হউন। স্তরে স্তরে—সোপানে সোপানে স্বাধীনতা লাভের জন্য জাতীয় শক্তির অভ্যুদয়। রাজশক্তির সহিত বিপুল সংগ্রাম! অত্যাচার-অনাচার - লাঞ্ছনা - নিগ্রহ - নির্যাতন - নির্বাসন - নির্জন কারাদণ্ড - কারাগৃহে জলপ্রবাহে মৃত্যু—জীবন্ত সমাধি—উলঙ্গ বেত্রাঘাত—অনশনে মৃত্যু—বিদ্যুৎসঞ্চারে উৎপীড়ন প্রভৃতি যত [illegible] পর্যায় চড়িয়াছে—ততই রক্তবীজের দলের মত—সোস্যালিস্ট—নিহিলিস্ট—সিনডিকেলিস্ট—এনার্কিস্ট ন্যাশনালিস্ট—মেনশেভিক—বলশেভিক প্রভৃতি বিপ্লবপন্থীদের অভ্যুদয় হইয়া—উদ্ভব হইয়া প্রভাব ও প্রতাপ বিস্তারে অসম সাহসে প্রাণপণ করিয়াছে!

অসংখ্য পুলিশ ও গুপ্ত পুলিশের সহিত

প্রবল সংঘর্ষ

কে পুলিশ কে বিপ্লববাদী স্থির করিবার উপায় নাই! কিন্তু সমগ্র জাতির জাগরণে একপ্রাণতায় বিপুল পুলিশ-বাহিনী—রাজরক্ষী সেনাশ্রেণী যেন ফুৎকারে উড়িয়া গেল—সেনাগণ মহানন্দে বিপ্লবপন্থী দলে যোগদান করিয়া আত্ম-তৃপ্তি লাভ করিল—অত্যাচার—অনাচারের তীব্র জ্বালা রাজরক্তে স্নিগ্ধ করিল!

আর কি বিভীষণ কল্পনাতীত মাতৃর্যাময়ী সর্বলোক ভয়ঙ্করী রুস সম্রাট-মহিষী জেরিনা! বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না—ভাবিতে আতঙ্কে শিহরিতে হয়!

যিনি লক্ষ লক্ষ চক্রান্ত নিয়ন্ত্রের নেত্রী! যাঁহার অঙ্গুলি হেলনে রুসিয়ার শাসন-চক্র বিঘূর্ণিত হইয়াছে—নিরপরাধ প্রজার হৃদপিণ্ড ছিন্ন করিয়াছে! প্রজাশোষণে, প্রজানির্যাতনে—প্রজার রক্তের বন্যাদর্শনে যাঁহার আনন্দ—উৎফুল্লকর! অগণিত মৃত্যুর স্রোতের ভিতরেও যিনি হাস্যলাস্য-ময়ী রুস-সম্রাট [illegible] করতলধৃত পুত্তলিকাবৎ অঙ্গুলি [illegible] নৃত্য করিয়া-ছেন [illegible] আত্মহত্যায় যিনি [illegible] প্রমত্ত হইয়াছিলেন! বড় বড় [illegible] যাঁহার মন্ত্রণার সহায়তা করিয়া ধন্য হইতেন। যাঁহাকে তিনি অনর্থক কার্যের বাধাবিঘ্ন মনে করিয়াছেন, তৎদণ্ডেই তাঁহাকে ইহলোক বা কর্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিতে বিন্দু-মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

বড় বড় খ্যাতনামা গুপ্তচর

যাঁহার নির্দেশে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধীকে কঠোর কারাদণ্ডে — অন্তরীণ নির্বাসনে প্রেরণ করিয়া জীবলীলা সাঙ্গ করা হইয়াছে, কেশমস্ত্র প্রমণ কি রাজসভায়—রাজপ্রাসাদে—রাজপরিবারেও বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—সাম্রাজ্যের প্রতাপ—সৈন্যবল — প্রজাশক্তি ধ্বংসের জন্য যিনি সম্রাটকে সুকৌশলে উদ্দীপিত করিয়া সমর অভিযানে বাধ্য করিয়াছিলেন সেই রুশ সাম্রাজ্যের সর্ব-নাশিনী কাইসার পরিচালিত জার্মান নন্দিনী যাহার ভ্রূভঙ্গে রুস-রাজতন্ত্র সমূহে উচ্ছেদ হইয়াছে—প্রজার রক্তে প্রতিশোধ লইয়াছে। তাঁহার অমোঘ চক্রান্ত—দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ—বিপুল নির্যাতন অভি-যানের কথা স্মরণ কি করিয়া বলিব!

পুরাণে ইতিহাসে ইহার উপমা নাই, তুলনা নাই।

ভাল কাগজে, চমৎকার ছাপা সিল্কের বাঁধাই, মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

এবার 'ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস' থেকে প্রকাশিত অতীতকালে রবীন্দ্রনাথের কিছু বইয়ের বিজ্ঞাপনের নিদর্শন এবং গ্রন্থমূল্য প্রকাশিত হ'ল।

রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থাবলীর শোভন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিলাতী উৎকৃষ্টতম য়্যাণ্টিক পেপারে ১০ খণ্ডে সম্পূর্ণ। স্বর্ণমণ্ডিত, সুদৃঢ় বিলাতী বাঁধাই, মূল্য ৫০ টাকা। বিলাতী ইণ্ডিয়া পেপারে ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ জাপানি ধরণে বাঁধাই মূল্য ৫০ টাকা।

(বাকী অংশ পরের সংখ্যায়)

—কপণক

ভুল হিসেব

প্রদীপ আচার্য

বাসে উঠেই জানলার ধারের সিটটা বেছে নিল বিনতা। ও জানলার ধারের সিটটাই বেশী পছন্দ করে। কেননা কলকাতার রাস্তায় চলাফেরার দিক দিয়ে ও খুব একটা পাকা হয়ে উঠতে পারে নি এখনও। কিন্তু তাই বলে কলকাতায় আজ ও নতুন নয়। রোজ দুবেলাই ওকে বাসে করে কলেজে আসা-যাওয়া করতে হয়। কিন্তু তবুও মাঝে-মধ্যে খেই হারিয়ে ফেলে ও।

বাসের জানলায় বসে বসে রাস্তার দু'ধারের দোকান-পাট, বাড়ী-ঘর, সিনেমা হল, দেয়ালের রাজনৈতিক শ্লোগানগুলো বিনতার চোখে ছবির মতো। ওই দোকান, সিনেমা হল বা দেয়ালের রাজনৈতিক শ্লোগানগুলো দেখে ওর গন্তব্যস্থানটাকে বুঝে নেয় ও। মাঝে মাঝে এসবও কেমন এলোমেলো হয়ে যায় বিনতার।

পঁচিশে ডিসেম্বরের কথাটা ওকে আজও ভীষণভাবে লজ্জা দেয়। ঠিক দুটোতেই এপয়েন্টমেন্ট ছিল কার্জন পার্কে। বেশীর ভাগ দিনেই দুজনে কার্জন পার্কে দেখা করে ওরা। অমিত আবার সময়ের দিক দিয়ে ভীষণ পাংচুয়াল। পাঁচ-দশ মিনিটের বেশী দেরী হলেই ও ভীষণ রেগে যায়। একদিন এরকম দুটোতেই এপয়েন্টমেন্ট ছিল, আর বিনতার পৌঁছতে দুটো কুড়ি হয়ে গিয়েছিল। অমিত তো রেগে মুখ একেবারে লাল করে ফেলল। আর বিনতাকে দেখেই এক গাদা বকাবকি করে দিল। অবশ্য বিনতার এমন বকাবকি ভালই লাগে। কেননা অভিমান করে থাকার সুযোগ পায়। মাঝে মাঝে বিনতা অমিতকে ইচ্ছে করে রাগিয়ে দিয়ে বকাবকি শুনে অভিমান করে বসে থাকে। কখন অমিত আবার ওকে কথা বলার জন্য সাধাসাধি করবে সেই প্রত্যাশায়। বিনতা খুব শিহরিত এতে। কিন্তু তাই বলে কি সব সময় রাগানোটা ঠিক? তাই ঠিক দুটোতেই যাতে পৌঁছতে পারে, তার জন্য পৌনে একটাতেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিল বিনতা। বাসও ঠিক সময় মতোই পেয়ে গেল। অবশ্য ফরটি-ওয়ানটা খুব একটা গণ্ডগোল করে না। কিন্তু জানলার ধারের সিটটা আজ আর ওর জন্য অপেক্ষা করে থাকেনি। বিনতার মনটা বিগড়ে গেল। মনে মনে ভাবল ঠিক মতো নামতে পারবো তো! তার চেয়ে বরং কণ্ডাক্টারকে বলে রাখি। কিন্তু সেটা আবার একটা লজ্জার ব্যাপার। বাস-ভর্তি লোক ভাববে কি সদ্য গ্রাম থেকে এলো নাকি! তার চাইতে ভাল জানলার দিকে লক্ষ্য রাখি, মনে মনে ভাবল বিনতা। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ওর সামনে জানলাটা আড়াল করে এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন, বিনতার রাস্তার দিকে চোখ রাখায় অসুবিধা হয়ে গেল। এই অবস্থার মধ্যেই হঠাৎ ওর যেন মনে হল কার্জন পার্কটা পেরিয়ে গেল। ঝটপট করে সামনের স্টপেজে নেবে পড়ল ও। আর বাসটা ওকে ছেড়ে যেতেই ওর যেন মনে হল ও এতবড় কলকাতায় হঠাৎ হারিয়ে গেল।

একভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল বিনতা। তার পর ওর কেমন যেন মনে হল

রাস্তার সমস্ত লোক ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আসলে এই ব্যস্ত শহরে কে কার খোঁজ রাখে? অবশ্য কোনো আধুনিক যুবক অর্থাৎ হিপ্পী মার্কা যাকে বলে, তাদের কারো নজরে পড়লে একটু হ্যারাস তো ওকে হতেই হবে। উদ্দেশ্যহীন বেশ খানিকটা পথ চলে এসেছে বিনতা। হঠাৎ বাঁ ধারের বিড়লা-প্লানেটেরিয়ামটা চোখে পড়তে একটু সাহস পেল ও। কেননা বাসের জানলা দিয়ে বিড়লা-প্লানেটারিয়ামের সঙ্গে ও বিশেষভাবে পরিচিত। একবার ভাবল কার্জন পার্ক তো এখনও অনেকটা পথ। আবার বাসে উঠলে কেমন হয়। ঘড়ির দিকে তাকায় বিনতা। দুটো বেজে পঁয়ত্রিশ হয়ে গেছে ততক্ষণে। অমিতের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস আর হল না ওর। তাই শেষ পর্যন্ত বাড়ী ফিরে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় দেখল না। অনেক অসুবিধা করে বাড়ী ফিরেছিল সেদিন বিনতা। আর বিনতার জন্যেই অমিতেরও বড়দিনের সমস্ত আনন্দটাই মাটি হয়ে গিয়েছিল।

ঘরে ঢুকতেই আবহাওয়াটা কেমন যেন একটু অন্য রকম মনে হল বিনতার। চট করে ঘরে ঢুকেই ও তাই একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বৌদি আর মার কথাবার্তা হঠাৎই থেমে গেল। —কোথায় গিয়েছিলি বিনু? বিনতা হকচকিয়ে উঠল। এই একটু বেরিয়ে ছিলাম। বিনতার কণ্ঠে এড়িয়ে যাবার সুর। মা বেরিয়ে যেতেই বিনতা কৌতূহলী চোখ দুটোকে মেলে দিল বৌদির দিকে। বৌদি বুঝল ওর দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা। বইয়ের শেলফটা থেকে গ্রীটিংস কার্ডটা বের করে দিল বৌদি বিনতার হাতে। —ও এসেছিল। এটা তোমাকে দিয়ে দিতে বলেছে। আর সেই সঙ্গে তোমার নামে একগাদা অভিযোগও করে গেছে। তোমার এটা মোটেই উচিত হয় নি। বিনতা যেন স্বপ্ন দেখছে। ও বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ এইমাত্র চলে গেল। তুমি যদি আর তিন মিনিট আগেও আসতে।

—আসি নি ভালই হয়েছে। দেখা হলে কি থেকে কি হয়ে যেত। মা কিছু জানতে পারে নি তো?

—আর একটু হলেই বুঝতে পেরে যেতেন। মনে হয় কিছুটা আঁচ করতে পেরেছেন। সেই নিয়েই তো এতক্ষণ কথা কইছিল।

—তুমি আবার কিছু বলে বসো নি তো?

—না গো না এমন ম্যানেজ করে দিয়েছি না, যাই হোক তুমি শীতকালে বেচারীকে ঘোল খাওয়ালে, কি ব্যাপার?

—সে অনেক কথা, পরে বলব।

—তবে যাই বল বিনু, আমাদের পার্টির বেশ প্রণামের ঘটা আছে। মাকে আসতে এক প্রণাম যেতে এক প্রণাম।

—মা জিজ্ঞেস করে নি ও-কে?

—মা তো ওকে মেজ ঠাকুরপোর বন্ধু বলেই জানেন। ভাগ্যিস ঠাকুরপো বাড়ী ছিল না। থাকলে কি বিপদ হতো বল তো?

—ও অত বোকা নয়। সেজদা যে গিরিডি গেছে তা ও ভালভাবেই জানে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে বিনতা অনেকক্ষণ এসব চিন্তা করেই এক সময়ে নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিনেই অমিতের সঙ্গে দেখা করার প্ল্যানটা মনে মনে করে নিয়েছিল ও।

যাই হোক অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে বিনতা পর দিন অমিতের রাগটা দমিয়ে ওদের সম্পর্কটাকে আবার সহজ করে নিয়েছিল। তার পর থেকে ওরা থিয়েটার রোডেই এপয়েন্টমেণ্ট করত। বিনতারও বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয় নি আর।

চিন্তার জাল ছিঁড়ে দিয়ে কণ্ডাক্টারের হাত বাড়াতেই ভাড়াটা মিটিয়ে দিল বিনতা। জানলার দিকে তাকাল ও। এখনো বেশ খানিকটা পথ বাকী আছে। ঘড়িতে দুটো বাজতে এখনো পঁচিশ মিনিট। এর মধ্যে পৌঁছে যাবে ও। পৌনে একটায় বাসে উঠেছে বিনতা। মর্নিং কলেজ সেরে সাড়ে এগারোটা নাগাদ বাড়ী ফিরেছে। আবার পৌনে একটায় বাড়ী থেকে বেরোন স্বভাবতঃই মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। —কোথায় বেরোচ্ছিস বিনু? —মালাদের বাড়ীতে। বলেই আর দেরী করা নেই, এক লাফে রাস্তায়। তার পরেই বাস। মাকে মিথ্যে কথা বলার সময় বিনতা মায়ের মুখটা লক্ষ্য করেছিল। একটা চাপা হাসি, যেটা নাকি প্রচণ্ড গাম্ভীর্য দিয়ে ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা চলছিল। মা বুঝতে পেরেছে। না পারারও কোন কারণ নেই। যা অসভ্য পিওনটা এত দিন বিনতা ওকে জিজ্ঞেস করেছে চিঠির কথা, নেই নেই করেছে। আর আজ ওর কলেজ যাবার সুযোগ নিয়ে একেবারে মায়ের হাতে পৌঁছে দিয়েছে চিঠিটা। অবশ্য বেচারী পিওনাকেই বা দোষ দেয় কি করে। অমিত লিখলে তো চিঠি আসবে। মা-রও স্বভাবটা আবার ভীষণ খারাপ যার-তার চিঠি পড়া। তাই নিয়ে খেতে বসে কত কথা। হাজার রকম প্রশ্ন। বাধ্য হয়ে এসব প্রশ্নকে এড়িয়ে 'আর খেতে ইচ্ছে করছে না' বলে উঠে আসা ছাড়া আর কোন উপায় দেখল না ও। অবশ্য কোথাও যাবার সময় ওর কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। আর আজ তো আনন্দের ঠেলায় এক গাল ভাতও পুরোপুরি খায় নি ও। সেই গিরিডি যাবার পর থেকে দীর্ঘ এক বছর পর আজ অমিতকে দেখবে বিনতা। চিঠি পাবার পর থেকে কৌতূহলী মনটা ছটফট করছে ওর। আর সবচেয়ে আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে অমিতের এই চিঠিটা বৌদির ধারণার স্রোতটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। রোজই পিয়নকে চিঠির কথা জিজ্ঞেস করাতে বৌদি [illegible] ওর ওপর বিশ্বাস রাখ? হ্যাঁ রাখ, জোর গলায় বলল বিনতা।

গিরিডিতে যেদিন অমিতের বাবা বদলী হয়ে গেলেন, তার আগের দিন রাত্রের কথা কোনো দিনই ভুলবে না ও। কোথায় বিনতার কাঁদার কথা, সেখানে শিশুর মতো কেঁদেছিল অমিত। বলেছিল তোমার পার্ট-ওয়ান পরীক্ষাটা হয়ে যাক, ততদিনে আমারও একটা চাকরী হয়ে যাবে। আর আমাদের কেউ আটকে রাখতে পারবে না। যদিও আপাতত বিনতা আর অমিতের জীবনের সীমান্তে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। তবে ওদের দুজনেরই সেদিন একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। গিরিডি গিয়ে ওদের ঠিকানা জানানোর কথা ছিল অমিতের। কিন্তু বিনতার ঠিকানাই ওর জানা ছিল না। অমিত লিখেছে ওখান থেকে চলে আসার পর আমার মনে হল তোমার বাড়ীর পোস্টাল অ্যাড্রেসটা তো আমার জানা নেই। তুমিও তো আমার ঠিকানা জান না। ভাগ্যের অদ্ভুত পরিহাস আমাদের যোগা-যোগকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। ঘটনাচক্রে তোমার দাদার সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেল আমি আর তোমার দাদা একই ডিপার্ট-মেন্টে কাজ করছি। তোমার দাদার কাছ থেকেই আমি তোমাদের ঠিকানা উদ্ধার করেছি। আমার পরিচয় দেওয়াতে তোমার দাদাই আমাকে চিনতে পেরে গেল। তোমার আমার সম্পর্কের কথা তোমার দাদারও অজ্ঞাত নেই দেখলাম। সবই নাকি বৌদি গোপনে জানিয়েছে। তবে তোমার দাদার বিশেষ একটা আপত্তি আছে বলে মনে হয় না। বিনু এতদিন কোনো যোগা-যোগ নেই বলে তুমি হয়তো মনে করেছ তোমার অমিত তোমাকে ভুলে গেছে, তাই তো? আমিও তো মনে করতে পারতাম আমার বিনতা আমাকে ভুলে গিয়ে অন্য কোথাও বিয়ে করে ফেলেছে। মোটেই না, অমিতের জন্য হাজারটা সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিয়েছে বিনতা। যাই হোক অমিত লিখেছে আজই ও আবার গিরিডিতে ফিরে যাবে। কিন্তু অমিত ডাইরেকট বাড়ীতেও তো চলে আসতে পারতো। বিনতাদের বাড়ীটা তো ভালভাবেই চেনে। অবশ্য ও যা লাজুক আর সেণ্টিমেণ্টাল ভেবেছে হয়তো বাড়ীর সবাই জেনে গেছে, কে কি রকম প্রশ্ন করবে কে জানে?

এই যাঃ, বাসটার আবার কি হলো? হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল যে। বিরক্তিতে ভরে গেল বিনতার মন। টায়ার পাল্টাবে? সে তো অনেক সময়ের ব্যাপার। অথচ আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী আছে। বিনতার গন্তব্য-স্থান আসতে আর দেরী নেই। এ যেন সারা রাস্তা হেঁটে এসে বাড়ীর উঠোনে আছাড় খাওয়ার মতো ব্যাপার ঘটে গেল বিনতার জীবনের এই চরম মুহূর্তে। হাতের রুমালটা দিয়ে শীতকালের ঘাম মুছতে মুছতে একবার বাসের সিটে গিয়ে বসছে আবার নিচে নেমে এসে বিরক্তিতে পাঞ্জাবী ড্রাইভার আর কন্ডাক্টার দুটোর টায়ার পাল্টানো দেখছে। ঘড়ির দিকে তাকালো বিনতা দুটো বেজে পনের হয়ে গেছে। অমিত হয়তো ভেবে নিয়েছে বিনতা আসবে না। তাই কি হয় - বিনতা কি এত বড় নিষ্ঠুর হয়ে গেছে যে, চিঠিতে এত করে রিকোয়েস্ট করার পরও আসবে না। আর রিকোয়েস্ট করারই বা দরকার কি? বিনতাই ওকে দেখার জন্য ছটফট করছে আজ পুরো একটা বছর। আর ভাবতে পারছে না ও। দুটো বেজে পঁচিশ হয়ে গেল। অমিত এবারে হয়তো সত্যি সত্যিই ভেবে নিয়েছে, বিনতা আর আসবে না। এক একবার ভেবেছিল বিনতা যে, পেছনের বাসটায় করে পৌঁছে যাবে ও। কিন্তু যা ভীড় বাসে তাতে ওঠার চিন্তা করাই ওর পক্ষে অবাস্তব ব্যাপার। আবার ওই ভীড়ের মধ্যে উঠলেও নির্দিষ্ট জায়গায় যে নামতে পারবে না সেটাও বেশ বুঝতে পারল বিনতা। অগত্যা এই বাসের টায়ার পাল্টানোর অপেক্ষায় সময় গুনতে হল বিনতার। বিনতা ভাবল এটাও হয়তো অদৃশ্য নিয়ন্তার এক নতুন স্বাদের খেলা। টায়ার পাল্টিয়ে বাসটা যখন থিয়েটার রোডে পৌঁছল, তখন ঘড়ির কাঁটাটা তিন ছুঁই-ছুঁই করছে। বিনতার ভাবনার ব্যতিক্রম হল না এতটুকুও। অমিত ঠিক ওর জন্য অপেক্ষা করে করে চলে গেছে। বিনতা হঠাৎ একটা কথা চিন্তা করে তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে রওনা হল। ও হয়তো বিনতার আসার দেরী দেখে সেদিনকার মতো ওদের বাড়ী গিয়ে হাজির হয়েছে। কিন্তু বাড়ীতে ঢুকতেই বৌদির কৌতূহলী জিজ্ঞাসা বিনতার ধারণাকে পাল্টে দিল।

—কি ব্যাপার বিনু দেখা হল? বৌদির কথার উত্তর দেবার মতো কথা খুঁজে পেল না বিনতা। একদৌড়ে বিছানায় গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কতক্ষণ কেঁদেছিল তা সে নিজেই জানে না। তবে অনেক রাত্রে বিনতার জ্বর একশোরও বেশ ওপরে উঠেছিল।

দীর্ঘ এক মাস জ্বরে ভোগার পর বিনতাকে এখন যেন আর চেনাই যায় না। চোখের নীচে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। বৈঠকখানা ঘরে দাদুর আমলের কারুকার্য করা ইজি চেয়ারে বসে আজও একমনে অমিতের কথাই ভেবে চলেছে বিনতা। অমিত কি সেদিন সত্যিই এসেছিল?...... এসেছিল কিনা তার কোনো প্রমাণ হয়তো সেদিন অমিত রেখে যেতে পারেনি। তবে লাইটপোস্টের ঠিক নিচটায় পোড়া সিগারেট-গুলো নিঃসন্দেহে এর সাক্ষ্য দিতে পারে। যেগুলো নাকি অমিত ফেলে দেওয়ার পর বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ঘাসগুলোকে পোড়াচ্ছিল।

রোদটা ঠিক যেন এদিকেই ঝুঁকে পড়েছে। এ সময়টায় শীতকালের রোদটা আবার বেশী কড়া। মনে হয় খুব বেশী গরম করলে কপালে এসে পড়া চুলগুলোর ফাঁক দিয়ে জমে থাকা চিটচিটে ঘাম উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এ রোদটাকে এড়িয়ে কিছুটা দূরে ঐ গাছটার নীচে গিয়ে একটু দাঁড়িয়ে নেবারও উপায় নেই। বিনতা আবার পাছে এসে অমিতকে নির্দিষ্ট লাইট পোস্টটার নীচে না দেখতে পেয়ে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়। অমিতের আবার সেদিকে খুব কড়া দৃষ্টি। ওর জন্য বিনতাকে কোন অস্বস্তি বোধ করতে হোক এটাও একেবারেই চায় না। অগত্যা এই একভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় কি?

গিড়িডিতে যাবার কিছুদিন আগেও বাস থেকে নেমেই জ্বলন্ত সিগারেট হাতে অমিতকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধমকের সুরেই বলেছিল বিনতা 'এই কড়া রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা সিগারেট খেয়েই চলেছে?' 'তোমার অভাবে যখন ভীষণভাবে বিচলিত তখন সান্ত্বনা দেয় এই সিগারেট' একটু রসিকতা করে অমিত। 'থাক বেশী আদিখ্যেতা কোর না। রোদটা ঠিক একেবারে তোমার মুখের উপর।' নীচে চোখ পড়ে বিনতার 'ও-মা এতগুলো সিগারেট খেয়েছ তুমি। সিগারেটের আগুনে ঘাসগুলো পর্যন্ত পুড়েছে। ফ্যালো ফ্যালো বলছি ওটা'। অমিত আর দেরী না করে হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটাকে মিশিয়ে দিলো ওই ঘাসে পড়ে থাকা পোড়া সিগারেটের দলে। বিনতার এই কোমরে হাত রেখে শাসনের ভঙ্গিতে কথা বলা দেখে অমিত ওকে খুব বেশী কাছে পাওয়ার আনন্দটাকে অনুভব করার জন্য অভিমান করে থাকার অভিনয় করে।

'এ্যাই কতক্ষণ এসেছ বললে নাতো?'

'আমার আসার কথা নাই বা জানলে। তোমায় তো অপেক্ষা করতে হয়নি।'

'এ্যাই না তুমি রাগ করেছ। বিশ্বাস কর রোজ ভাবি ঠিক দুটোতে পৌঁছবই। কিন্তু একটা না একটা বাধা ঠিক পড়বেই। আজও দেখ দুটো সতের হয়ে গেছে। ঘড়ি দেখে বিনতা। 'আমি জানি তোমার এই একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হয়। কিন্তু কথা শেষ করতে দেয় না অমিত। প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলে, 'চল একটু বসা যাক।' একটা সিগারেট ধরাতে যায়। বিনতা বাধা দিয়ে বলে, 'উঁহু একদম না।'...

বিনতার বাধা দিয়ে খানিকটা শাসনের ভঙ্গিতে এই কথাগুলো বেশ মনে পড়ে।

অনেকক্ষণ পরে আরও একটা ফরটি ওয়ান এল। নাঃ এটাতেও বিনতা আসেনি। আর আসবেই বা কেন? ও কি এখনও অমিতের মুখ চেয়ে বসে আছে? একমাসেই মেয়েদের মন পরিবর্তন হয়ে যায়, আর এতো দীর্ঘ একটা বছর। ভাগ্যিস অমিত বিনতাদের বাড়ী যায়নি। গেলে হয়তো রীতিমত অপমানিত হতে হোত। কিন্তু একবার অন্তত সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কেমন হয়? নাঃ থাক, জোর করে কিছু করতে যাওয়াটা খারাপ হবে। হাতের সিগারেটটা একেবারে ছোট হয়ে যাওয়াতে আঙুলে অমিতের হতে ছ্যাঁকা লাগাতেই চমকে ওঠে ও।

কিছুটা সামনে পরস্পরের প্রতি ... এমন কিছু ছেলেমেয়ের ভীড় দেখে অমিতের যেন মনে হল, এদের ভীড়েই বিনতাও যেন মিশে গেছে। আর কোনো একটা ছেলের শরীরকে আড়াল করে অমিতকে ঠকানোর আনন্দে নিঃশব্দে হাসছে বিনতা খানিকটা লুকোচুরির মতো করে।

তিনটেয় মিনিট পাঁচেক আগে অমিত বাসে উঠেছে। খুব বেশী রাগ বা অসহ্যতার মধ্যেও অমিত হয়তো একবার হলেও ভেবেছিল বিনতাকেই ও আবার ভুল বুঝছে নাতো? তবে যা সেন্টিমেন্টাল ও ভুল বুঝতেও পারে।

মাঝে মাঝে ভেবেছে বিনতা সেজদার কাছে অমিতের খোঁজ নেবে। কিন্তু লজ্জায় কলম ধরতে পারেনি। এমন কি বৌদিকে পর্যন্ত ও সেজদার কাছে অমিতের খোঁজ নিতে বারণ করেছে।

পিওনের ডাক শুনে দৌড়ে গিয়ে চিঠিটা নিল বিনতা। বেশ বোঝা গেল এত ঝড়ের পরেও অমিতের জন্য ও এখনো বেশ খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছে। কিন্তু নাঃ, এটাতো ওর চিঠি না। এতো সেজদার হাতের লেখা।

চিঠিটাতে অমিত সম্পর্কে সেজদা যা লিখেছে, তা সুধীজনের কাছে শুভ সংবাদ হলেও বিনতার কাছে এর চেয়ে দুঃসংবাদ আর কি আছে? একটা চাপা কান্না ওর বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইল। অমিত শেষ পর্যন্ত বিনতার সম্বন্ধে এত নীচু ধারণাকে প্রশ্রয় দিল? মুহূর্তের মধ্যে চোখ দুটো জলে ভরে গেল বিনতার। উদ্গত কান্না চাপতে ছুটে গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিল।

সেকালের সঙ্গীতগুণী

—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। তাই বৈচিত্র্যের সাধক দেখা যায় প্রসিদ্ধ মনোহর ঘরাণার গুণীদের। কিংবা লক্ষ্মী-নারায়ণ বাবাজীকে। তাঁর ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ঠুংরি গান ও বীণা সেতার পাখোয়াজ তবলা বাজনায় পরিচয় অন্যত্র দেওয়া হয়েছে।*

তেমনি সংগীতের আর একজন সব্যসাচী হয়ে আছেন মোহিনীমোহন মিশ্র। তিনি ধ্রুপদ ধামার খেয়াল টপ্পা ঠুংরি গজল ভজন এবং কীর্তন গাইবারও অধিকারী ছিলেন, আর সুকণ্ঠও। আবার যন্ত্রসংগীতেও তিনি প্রায় কোন যন্ত্রেই হাত দিতে বাকি রাখেননি। সুরের যন্ত্র থেকে প্রতিটি সঙ্গত যন্ত্রে পর্যন্ত। বীণা সুরবাহার ও সুরশৃঙ্গারও বাজাতেন। আবার পাখোয়াজ তবলাও। অন্যান্য সুর-যন্ত্রও প্রায় সবই বাজিয়েছেন—যেমন সেতার এসরাজ সরোদ সারেঙ্গ দিলরুবা রবাব ইত্যাদি। আবার ক্ল্যারিওনেট কর্ণেট বেণু প্রভৃতি সব রকমের বাঁশীও প্রথম জীবনে বাজাতেন। তাছাড়া কটি মিশ্র যন্ত্র বাজাতেও অভ্যস্ত ছিলেন যা বিশেষভাবে ফরমায়েস দিয়ে তৈরি করান কারিগরদের সাহায্যে। যথা—(১) সুরায়ন। কাঠের ফ্রেমে সন্নিবিষ্ট ২২টি তারের যন্ত্র। হার্পের অনুকরণে গঠিত এই যন্ত্রে দুহাতে দুটি শক্ত কাঠি দিয়ে বাজানো হত। (২) সুররঞ্জন। ব্যাঞ্জোর অনুকরণে নির্মিত। খোল ও সাধারণ আকার ব্যাঞ্জোর মতন। কিন্তু যন্ত্রের মাথার অংশ ব্যাঞ্জোর মতন সরু নয়; জোয়ারিও ব্যাঞ্জোর নয়, সেতারের। মাথার অংশ সরু না হয়ে সমান বলে আওয়াজ অনেক বেশি, যদিও সেজন্যে বাজানো অপেক্ষাকৃত কঠিন। (৩) সুরচয়ন। সেতার এস্রাজ ও সরোদের সংমিশ্রণ। মূল অবয়ব সেতারের মতন। নীচের অংশে এসরাজের চর্মের পরিবর্তে কাঠের গঠন। সমগ্র পিছনের অংশ সরোদের অনুকরণে তৈরি। সরোদের মতন কোলে রেখে সরোদেরই মতন জবা দিয়ে বাজানো হত। আওয়াজ সরোদের চেয়ে মিষ্টতর।

এসব ছাড়াও, ঢোল ও হারমোনিয়ামেও মোহিনীমোহনের হাত ছিল। ঢোলে সঙ্গত করেছেন আসরে। তেমনি খেয়াল ইত্যাদি গানের অনুসরণে হারমোনিয়ামও বাজিয়েছেন।

* সংগীতের আসরে—পৃষ্ঠা ৩৪—৩৯।

এই প্রকার যন্ত্রসংগীতের চর্চা করে-ছিলেন তিনি। শুধু যদি যন্ত্রী হয়ে সংগীতজগতে বিচরণ করতেন, তাহলেও স্মরণীয় হতেন। যন্ত্রসংগীতে বিপুল অভিজ্ঞতা থেকে তিনি লাভ করেন অন্ত-দৃষ্টি। সে-পরিচয় তাঁর একটি রচনায় প্রকাশ পায়। 'সংগীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা' পত্রিকায় তিনি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন 'যন্ত্রসঙ্গীত' নামে। ১৩৩৯ সালের মাসের পর মাস সেটি প্রকাশিত হয়। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দুদিকেই যন্ত্রসংগীত বিষয়ে নানা জানবার কথায় রচনাটি পূর্ণ। বিভিন্ন আলোচনা তত্ত্ব নানা যন্ত্র বাদনের (সেতার প্রভৃতি) রীতিনীতি শিক্ষা ইত্যাদি। সে-প্রবন্ধের পাঠকরা হয়ত জানবেন না লেখক কণ্ঠসংগীতেরও কত রীতিতে গুণী।

এই বহুমুখীনতাই ছিল মোহিনী-মোহনের সংগীতজীবনের বৈশিষ্ট্য। সংগীত চর্চায় লঘুচিত্ত নন, বৈচিত্র্যের সাধক তিনি। স্বভাবের প্রেরণাতেই বহুর সাধনা করতেন মূল একের উপলব্ধির জন্যে। আর নানা রীতির সাধনা করলেও নিষ্ঠার অভাব তাঁর ছিল না। বহুবল্লভ হওয়ার জন্য তাঁকে সাধনা ও শ্রম করতে হত অতিরিক্ত। কিন্তু অসাধারণ স্বাস্থ্যসম্পদের জন্যে নিরন্তরেই তিনি ক্লান্ত হতেন না। যেমন ব্যায়ামবলিষ্ঠ সুগঠিত শরীর, তেমনি অন্যদিকে এক অসামান্য বৈচিত্র্য-বিলাসী সংগীত-মানস তাঁর ছিল। তা-ই নানা রূপের লোকে লোকে সুরছন্দের আলোক সন্ধানে উদবুদ্ধ করত তাঁকে।

তবে প্রধানত তিনি ধ্রুপদীই ছিলেন। বেশির ভাগ আসরে, বৃহৎ সম্মেলনে ধ্রুপদ ধামারই গাইতেন সচরাচর। বছরের পর বছর মোহিনীমোহন লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ আগ্রা বারাণসী, দিল্লী সম্মেলনে যোগ দিয়ে বাংলার ধ্রুপদ সাধনার সাক্ষর রেখে-ছিলেন।

রাগসংগীতের ভিত্তিমূলে আছে ধ্রুপদ। তাতেই সুদক্ষ থেকে অন্যান্য অঙ্গের চর্চায় অবাধে তিনি সঞ্চরণ করতেন। রীতিমত সংগীতশিক্ষা করেছিলেন একজন মাত্র গুরুর নির্দেশেই। আর তাঁর কাছে প্রধানত ধ্রুপদই শিখেছিলেন। সে-শিক্ষার আগেও মোহিনীমোহন গাইতেন খেয়াল ও টপ্পা। বাজাতেন পাখোয়াজ, তবলা, ক্ল্যারিওনেট, বাঁশী। কি মেধায় সেসব শিখতে পেরে-ছিলেন, তার বিবরণ পরে দেওয়া হবে। এখন তাঁর ধ্রুপদ-গুরু প্রমথনাথের কথা।

এক দিকপাল গুণী প্রমথনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়। খেয়ালে অভিজ্ঞ হলেও আসলে তিনি ধ্রুপদী। ধ্রুপদাঙ্গে সুরশৃঙ্গারবাদক এবং ধ্রুপদগায়ক।*

* প্রমথনাথের সংগীত-জীবনের পরিচয় 'সংগীতের আসরে' ১৫৭—১৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মোহিনীমোহন শিক্ষার্থী হয়ে এলেন তাঁর কাছে।

প্রমথনাথ বললেন 'ধ্রুপদ না শিখলে খেয়াল গাওয়া যায় না।'

সেকালে সংগীত শিক্ষায় এই পদ্ধতি ও আদর্শই ছিল।

মোহিনীমোহন তাঁর কাছে শিখতে আরম্ভ করলেন ধ্রুপদ। ধ্রুপদ গান, রাগা-লাপ ও কিছু খেয়াল শিখলেন প্রমথনাথের অধীনে। প্রায় চার বছর নিয়মিত। পরেও মাঝে মাঝে যেতেন গুরুর কাছে শিক্ষার্থী হয়ে।

পরিণত বয়সে মোহিনীমোহন বলতেন, 'ওই একজনের কাছেই মাথা হেঁট করেছি। শিখেছি পায়ের কাছে বসে। অন্য কারুর শিক্ষাই জানিয়ে নিতে যাইনি কোনদিন।'

অহঙ্কারের কথা নয়। সত্যি কথাই। আর সবকিছু তিনি শেখেন পরোক্ষে। নানা সাংগীতিক পরিবেশে। বিভিন্ন শিল্পী-কলাবতের গানবাজনা শুনে। সহজাত প্রতিভায়। শ্রুতিধর শক্তিতে। সে-শিক্ষায় সুযোগ বিস্তৃত হয়েছিল তাঁর জন্মস্থান ও প্রথম জীবনের পারিপার্শ্বিকে। সে-কথাও এখানে বলবার মতন।

২৪ পরগণার দুটি সুপরিচিত সংলগ্ন পল্লী: জয়নগর মজিলপুর। বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে নানা দানের জন্যে চিহ্নিত অঞ্চল। তার মধ্যে সঙ্গীত-চর্চাতেও ঐতিহ্য সৃষ্টি করে মজিলপুর। মোহিনীমোহন তারই এক স্মরণীয় সুফল। সে-বিবরণ দেবার আগে তাঁর শিষ্য-প্রসঙ্গ বলে নেওয়া যায়।

মোহিনীমোহনের বৈচিত্র্যময় প্রতিভা তাঁর সংগীত শিক্ষা দেবার বিষয়েও সুপ্রকাশ। তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য হয়েছিলেন পুত্র মুরারিমোহন মিশ্র। তখনকার বাংলার উদীয়মান কলাকার। পিতার শিক্ষা পাঁচ বছর বয়স থেকেই মুরারিমোহন পেতে থাকেন। আর নিতান্ত তরুণ বয়সেই নৈপুণ্য দেখান ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ঠুংরি ভজন ইত্যাদি রীতির গানে। ২০।২১ বছর বয়সের মধ্যেই নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনের এলাহাবাদ কাশী লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি অধিবেশনে যোগ দেন মুরারি-মোহন। গুণীজনের স্বীকৃতি লাভ করেন।

মোহিনীমোহনের আর একজন শিষ্য ছিলেন হর্ষদেব রায়। তিনিও বিভিন্ন প্রকার গান গাইতেন।

সুপরিচিত ক্ল্যারিওনেটশিল্পী গোপাল-দাস লাহিড়ীও (নট-নাট্যকার তুলসীদাস লাহিড়ীর ভ্রাতা) তাঁর এক ছাত্র। গোপাল লাহিড়ীকে মোহিনীমোহন নিজে ক্ল্যারিও-নেট্ যন্ত্রেই শিক্ষা দেন।

সেতারবাদিকা জয়া বসুও প্রথম জীবনে শিখেছিলেন মোহিনীমোহনের কাছে।

আরো কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে তিনি কণ্ঠসংগীত ও কয়েকটি যন্ত্রবাদন শিখিয়ে-ছিলেন। সকলের নাম উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মোহিনীমোহনের জীবনকথা এখানে

দেওয়া হল আর সেই সঙ্গে বর্ধিষ্ণু গ্রাম মজিলপুরের সংগীতপ্রসঙ্গ।

১৮৮৪ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি মজিলপুরে তাঁর জন্ম। মজিলপুরের দক্ষিণপাড়ায় তাঁদের পৈত্রিক নিবাস। পিতা হরিনাথ মিশ্র ছিলেন আইনজীবী। তাঁরা শাণ্ডিল্য গোত্রের ব্রাহ্মণ। মিশ্র তাঁদের পদবী নয়, উপাধি। দামোদর নামে মোহিনীমোহনের কোন পূর্বপুরুষ মুর্শিদাবাদ নবাব-দরবারে দোভাষীর কাজ করতেন। তিনি সহ মিশ্র উপাধি পান বহুভাষাভাষী হয়ে। সেই থেকে এ-বংশে নামের সঙ্গে মিশ্র যুক্ত হয়ে যায়।

পারিবারিক সূত্রেই আরম্ভ হয় মোহিনীমোহনের সংগীতচর্চা। আর শিশুকাল থেকেই। পিতামহ উমাচরণ মিশ্র ভাল তবলাবাদক ছিলেন। অন্যান্য আসরের মধ্যে নবাব ওয়াজেদ আলীর মেটিয়াবুরুজ দরবারেও তিনি বাজিয়েছেন বলে প্রকাশ।

মোহিনীমোহনের পিতা কাজের অবসরে সুরের চর্চা করতেন। এস্রাজ বাজাতেন। মোহিনীমোহনের জননীর ছিল সংগীত-কণ্ঠ। ঘরে গান গাইতেন তিনি। শিশুপুত্র জ্ঞান হবার সময় থেকেই তার পরিচয় পেতেন। মাতৃক্রোড়েই প্রথম শুনতেন সুরধ্বনি। যেন সুরের জগতেই চৈতন্যের উন্মেষ।

(ক্রমশঃ)

রূপসীর খাতা

শরীরের সৌন্দর্য, পোশাকের রুচি, এ-সবের সঙ্গে আর একটা ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী হওয়া দরকার, সেটা হল চলন। সুন্দরভাবে চলার ভঙ্গি শুধু যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শুধু তাই নয় কী করে যেন একটা ব্যক্তিত্বেরও ছাপ এনে দেয়। এই চলনভঙ্গির সুন্দরতা অবিশ্যি জুতো ও পায়ের গঠনের উপরও অনেকটা নির্ভর করে।

সাধারণত প্রতিটি শিশু সুন্দর সুগঠিত পা নিয়ে জন্মায়, কিন্তু দেখা যায় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই পায়ের গঠন অনেক সময় কুৎসিত আকার ধারণ করে। এর ফলে তার চলনভঙ্গি বিশ্রী হয়ে যায়। জন্ম থেকেই এ-বিষয়ে মায়েদের সচেতন হওয়া উচিত। বাচ্চাদের তেল মালিশ করার সময় পায়ের পাতা দুই হাতের তেলো দিয়ে চেপে চেপে দেওয়া উচিত। এছাড়া আঙুলের ভেতর দিয়ে তেল দিয়ে গোল করে মুড়িয়ে মালিশ করা উচিত। তারপর ইংরাজীতে যাকে 'এক্কেল সু' বলে সেই ধরনের ঢাকা নরম চামড়ার জুতো পরানো ভাল। তাতে পায়ের গঠন সুন্দর থাকে ও আঙুলগুলি ফাঁক হয়ে ছেতরে যায় না। এবং আঙুলগুলি পায়ের পাতার সামনের ভাগও সুন্দর, সুগঠিত হয়।

এতো গেল ছোটবেলার কথা। বড় হতে না হতেই আজকাল বিশেষ করে চটি পরার রেওয়াজ বেশী। একেবারে পাতলা চটি দুই স্ট্র্যাপের বা চটির সামনের ভাগ চওড়া পরা ভাল না। এতে পায়ের গঠন আস্তে আস্তে খুবই খারাপ আকার নেয়। দুই স্ট্র্যাপের চটি পরলে, সামনের সব অংশই খোলা থাকে—তাছাড়া বুড়ো আঙুল ও মাঝের আঙুল চেপে চেপে চলতে হয়। এর ফলে পায়ের আঙুলের গঠন খারাপ হয় ও পায়ের শিরাতে টান পড়ে। একেবারে পাতলা চটি পরলে কোমর ও নিতম্বের গঠন খারাপ হয়ে যায়। নিতম্ব নীচের দিকে ভারী হয়ে ঝুলে পড়ে; এছাড়া পায়ের গঠনও খারাপ হয়ে যায়। আবার খুব উঁচু হিলের জুতোও পরা ভাল না— তাতে হাঁটাটা স্বাভাবিক লাগে না। শুধু তাই নয়, নিতম্ব বিচ্ছিরীভাবে উঁচু হয়ে উঠে থাকে, এতেও ভাল দেখায় না। হিলের মাঝারি ধরনের উচ্চতা থাকাই ভাল। তবে যাঁরা চটি পরেন, তাঁদের হঠাৎ উঁচু হিল-ওয়ালা জুতো পরা ঠিক হবে না, এতে পায়ের শিরায় টান পড়ে। ঠিক তেমনি খুব উঁচু হিল থেকে নেমে একেবারে নিচু চটি পরাও ভাল না। এটা সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, পায়ের উপরই সমস্ত শরীরের ওজন থাকে—তাই সেই ওজন বহন করার ব্যাপারে সচেতনতা থাকা দরকার।

খুব বেঁটে মহিলা যাঁরা নিজেদের লম্বা করার জন্য উঁচু হিল পরেন তাঁরা যদি জাপানীদের মতন জুতো পরেন, তাহলে তাঁদের ইচ্ছাই পূর্ণ হয় আবার ক্ষতিও হবে না। জাপানী জুতোর উচ্চতা পুরোটাই চওড়া হয়ে সমানভাবে উঁচু হয়। সামনে ও পেছনের উচ্চতা একই থাকে ও চওড়া হয়। এতে চলনভঙ্গিও খারাপ হয় না। কিন্তু দেখা গেছে, সামনেটা নীচু ও পেছনের হিল খুব সরু ও উঁচু (যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে) পায়ের গঠনের ক্ষতি করে থাকে ও চলনভঙ্গিতে স্বাচ্ছন্দ্য আনে না।

আজকাল দেখা যাচ্ছে, বিদেশে অনেক সময় জুতোর নীচের অংশ তৈরি হয় কাঠ দিয়ে কিম্বা কর্ক দিয়ে। এগুলি পায়ের পেশীর জন্য খুবই ভাল। আজকাল আমাদের দেশেও কিছু কিছু এই জাতীয় জুতো এসেছে। শীতকালে ঢাকা জুতো পরাই বাঞ্ছনীয়। এতে গোড়ালী ফাটে না।

আরো কতকগুলি ব্যাপার আমাদের খেয়াল রাখা দরকার। যেমন পায়ের কড়া, গোড়ালী ফাটা, পায়ের নখে নোংরা জমা। পায়ের কড়াতে ডাক্তারী ওষুধ দেওয়া ভাল। অনেকে কড়া কাটেন সেটা ভাল নয়। তবে একটা টোটকা ওষুধ আছে, যা পরখ করে দেখতে পারেন। অনেকের ক্ষেত্রে এতে ভাল ফল পাওয়া গেছে। সেটা হল সিগারেটের ছেঁকা। হয়ত কথাটা শুনতে অবাক লাগছে —কিন্তু অনেকে বলেন, সত্যি। গোড়ালী ফাটলে তাতে হলুদ ও নুন একটু অলিভ তেলের সঙ্গে ফেটিয়ে লাগালে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া নিয়মিত পা পরিস্কার রাখা বিশেষ দরকার। পা কিভাবে পরিস্কার রাখা উচিত সে-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আগেই করেছি। সুতরাং সেই-ভাবে নিয়মিত পা পরিস্কার রাখা ভাল। এছাড়া কতকগুলি ব্যায়াম পায়ের পাতা ও আঙুলের জন্য দিচ্ছি যেগুলি নিয়মিত করলে ভাল গঠন থাকে। পায়ের পুরো অংশ যদিও শাড়ীর নীচে ঢাকা থাকে, তবুও তার গঠন সুন্দর থাকলে চলন সুন্দর হয় ও শরীরের গঠন ভাল দেখায়।

(১) খালি পায়ে যতোদূর সম্ভব মেঝেতে হাঁটা উচিত। দিনে অন্ততঃ একবার আঙুলের ডগার উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মিনিট খানেক হাঁটা ভাল। হাঁটার সময় নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে টেনে ছাড়া ভাল।

(২) পায়ের আঙুলগুলি একবার খুলে ফাঁক করে ছড়িয়ে দেওয়া ও পরে আবার আঙুলগুলিকে জড়ো করে নেওয়া। এই-ভাবে অন্ততঃ ১৫।২০ বার দিনে করা ভাল।

(৩) পা সোজা রেখে টান হয়ে শুয়ে গোড়ালী মেঝেতে ঠেকিয়ে পায়ের পুরো পাতা বাঁদিকে থেকে ডানদিকে ও ডান থেকে বাঁয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে হবে।

(৪) একটা গোল বল পায়ের নীচে রেখে তাকে একবার সামনে ও একবার পেছনে টেনে আনা। তখন শরীরের অপর অংশ নিতম্বের ওপর সোজা হয়ে বসে থাকতে হবে।

(৫) শরীর চেয়ারের মতন রেখে পায়ের পাতা দুটির গোড়ালী জোড়া রেখে, হাঁটু জোড়া করে একবার ফাঁক করা ও জোড়া করা। এইভাবে পাখার মতন পা নাড়তে হবে। গোড়ালী জোড়া থাকবে কিন্তু পায়ের পাতার সামনের অংশ ফাঁক রাখতে হবে। এইভাবে অন্ততঃ ১০।১৫ বার করতে হবে।

এইসব নিয়ম মোটামুটি করলে পায়ের ও পায়ের পাতার গঠন সুন্দর থাকতে বাধ্য। এছাড়া চলনও সুন্দর হয় এতে। এইসব ছোট ছোট সহজ কতকগুলি উপায় জানা থাকলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি ঘটবেই। আর সৌন্দর্যই তো নারীর ঐশ্বর্য।

—বরবর্ণিনী

খেলার জগতে মেয়ে

ওপেনার সন্ধ্যা মজুমদার

বারানসীর সর্বভারতীয় মহিলা ক্রিকেট আসরের বিজয়ী বাংলাদলের অন্যতম প্রারম্ভিক ব্যাটসম্যান (নাকী ব্যাটস-উওম্যান?) সন্ধ্যা মজুমদার একাধারে এথলীট, হকি খেলোয়াড় এবং হ্যান্ডবল খেলোয়াড়। বারানসীতে কেয়া রায়ের সঙ্গে বাংলা দলের ইনিংসের গোড়াপত্তনের ভার পড়তো সন্ধ্যার ওপর। সন্ধ্যাই প্রথম বিপক্ষ বোলারকে 'ফেস' করতো।

—আমিও দলের অন্য কয়েকজনের মত খিদিরপুরে বডিগার্ড লাইনের মাঠে ছেলেদের সঙ্গে সবরকম খেলা খেলি। বাবা সন্তোষ মজুমদার ক্যালকাটা পুলিশের গেজেটেড অফিসার। তরুণ বয়সে আমার বাবা ঢাকার এথলেটিকের আসরের চ্যাম্পিয়ান এথলীট ছিলেন। বাবাই আমার খেলাধুলোর জন্য বিশেষভাবে উৎসাহী।

বাবার অনুপ্রেরণার জোরেই স্কুলছাত্রী হিসাবে সন্ধ্যা স্বল্প পাল্লার দৌড় (১০০ ও ২০০ মিটার) এবং দীর্ঘলম্ফনে যোগ দেয়। হকি খেলার প্রেরণার উৎসও তার বাবাই। কলকাতায় ৭১-এ আন্তঃস্কুল ক্রীড়ায় খিদিরপুর স্কুলের ছাত্রী সন্ধ্যা ঐ তিনটি বিভাগে সবগুলো অর্জনের সাথে চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করে। এরপর আমেদাবাদে আন্তঃরাজ্য এথলেটিক সন্ধ্যা তার বিভাগে দীর্ঘলম্ফনে রেকর্ড করে। এরপর যোগমায়া কলেজের ছাত্রী হিসাবে ১৯৭৪-এ বারানসীতে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় এথলেটিক প্রতিযোগিতায় একশ দশ ও চারশ মিটার দৌড়ে কলকাতার প্রতিনিধিত্ব করে। বর্তমানে সন্ধ্যা যোগমায়া কলেজে দ্বিতীয় বর্ষ আর্টসের ছাত্রী। সম্প্রতি সেন্ট্রাল এক্সাইজের কাস্টমস অফিসে চাকরীও পেয়েছে। ও কলেজ করে সকালে তাই চাকরীতে সুবিধা। খেলায় কুশলতার জন্যই এই চাকরী পেয়েছে বলে সন্ধ্যা জানায়। কালেকটর এন এন রায়চৌধুরীর নাম করে সন্ধ্যা জানাল, উনি নিজে অতীতের কুশলী স্পোর্টসম্যান। তাই খেলোয়াড়দের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল।

শুধু এথলেটিকেই নয়, হকিতেও সন্ধ্যা সমান কুশলী। এ খেলাও অনুশীলন করেছে ছেলেদের সঙ্গে। হকি খেলায় সন্ধ্যার কুশলতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন হল, ও গত বছরই বাংলা হকি দলে স্থান পায়। পুণায়

জাতীয় মহিলা হকি প্রতিযোগিতায় গত বছর সন্ধ্যা গিয়েছিল। হকিতে আরও উন্নতির আশা থাকলেও এ বছর ও ক্রিকেটের ওপরেই বেশী জোর দিচ্ছে।

স্কুল-কলেজে খেলাধূলোর ব্যবস্থার প্রশ্নে সন্ধ্যা কর্তৃপক্ষের সম্পর্কে খুব আশার কথা শোনাতে পারলো না।

—জানেন, আমাদের কলেজের কলেজ-এথলেটিকে অ্যাফিলিয়েশনই ছিল না। বাবা উদ্যোগী হয়ে অ্যাফিলিয়েশনের ব্যবস্থা করেন তবেই আমার পক্ষে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় এথলেটিকসে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের অধিকাংশ কলেজের ক্রীড়াকর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের খেলাধূলোর ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত এবং নিরাশাবাদী। আমরা এদেশের মেয়েরা যে খেলাধূলোর সুযোগ পেলে কিছু করতে পারি, তা তাঁদের চিন্তাতেই আসে না। অথচ শুনেছি, কলেজে কলেজে মেয়েদের খেলাধূলোর ব্যবস্থা করার নির্দেশ আছে। এ জন্য ছাত্রীদের কাছ থেকে আলাদা করে ফীও নেওয়া হয়।

—তুমি ত বারানসীর ক্রিকেট আসরে দলের ইনিংস আরম্ভ করতে। ব্যাট করতে নেমে তোমার কি রকম মনে হত?

—প্রথম দিকে প্রত্যেক খেলাতেই বেশ খানিকটা ভয় ভয় করতো। কারণ, আমাকে হঠাৎ দলের গোড়াপত্তনের জন্য নিযুক্ত করা হয়।

—তুমি কিভাবে বাংলার নির্বাচকদের নজরে পড়লে?

—প্রথম দিন আমার ফিল্ডিং করা দেখে। দলের কর্তৃপক্ষ, যেমন অলকাদি, আরতিদি, কুমকুমদিরা এবং প্রশিক্ষক বাদল চন্দ ও সুনীল দাসগুপ্ত প্রথমে আমার ফিল্ডিংয়ের যোগ্যতা পরখ করেন। আমি প্রধানতঃ কভার এবং স্কোয়ার লেগেই ফিল্ডিং করি। তবে বোলিংয়ের চেয়ে ব্যাটিংটাই আমি বেছে নিয়েছি। একদিকে মনস্থির রাখাই ভাল কি বলেন?

—তা অবশ্য ভালই। তারপর তোমার ব্যাটিংয়ে ঝোঁক কোনদিকে—মারবার দিকে না, যাকে বলে রক্ষণাত্মক?

—আমি ঠেকিয়ে খেলাই পছন্দ করি। কেয়া একদিক থেকে মেরেছে। আমি অন্যদিকে বল ঠেকিয়ে গেছি। দুজনে এসেই মারতে আরম্ভ করলে বিপদ হতে পারত। তাছাড়া জানেনই তো ক্রিকেট বড় অনিশ্চিত খেলা। তাই আমি দলের প্রয়োজনে প্রায়ই আস্তে আস্তে খেলেছি। বুন্দেলখণ্ডের বিরুদ্ধে আমার সর্বোচ্চ ৪৮ রান উঠেছিল। তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধেও ২১ রান করি, বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে আচমকা রান-আউট হয়ে যাই। আমি বলটা ছেড়ে দিলে বিপক্ষ উইকেট-কীপার তা ধরে সামনের ফিল্ডারের হাতে দেয়। আমি সেই সময় অন্যমনস্ক হয়ে ক্রীজের বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। একদম খেয়াল করিনি যে ফিল্ডারটি বলটা বোলারকে ফেরৎ না দিয়ে আমার স্টাম্পে মেরে দেবে। সেদিন খুব শিক্ষা হয়েছে। এবার থেকে খুব সাবধান হয়ে যাব। তাছাড়া খেলার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেটের নানা বিধি-নিষেধও আস্তে আস্তে শিখে নিচ্ছি। যাতে ভবিষ্যতে আর ওভাবে বোকা বনতে না হয়।

বারানসীতে সব কটি খেলায় সন্ধ্যা দুবার নট-আউট ছিল। মোট সর্বোচ্চ রান ওরই—৮১। অবশ্য কেয়া রায়ের মোট রানও তাই। তবু ক্রীড়াকৃতির বিচারে বিচারকরা সন্ধ্যাকেই আসরে সেরা ব্যাটসম্যানের সম্মান দেন।

সন্ধ্যা বলে, ব্যাট করার সময় বুঝতে চেষ্টা করি, বল ঘুরেছে কিনা। তবে স্পিন বল পীচ দেখে ঠিক করতে হয়। এতে ঝুঁকি কম নয়। চেষ্টা করছি বল আন্দাজ করার। ভাল রকম অনুশীলন করতে পেলে, আর নানা বলে খেলার সুযোগ পেলে বোধহয় সঠিক মারের অভ্যাস হয়ে যাবে।

ক্রিকেট অনুশীলন জোরালো করার জন্যই সন্ধ্যা এবার হকিস্টিক তুলে রেখেছে। শিগগিরই মহিলা-আন্তঃআঞ্চলিক খেলা। তার আগে আছে বিহারের সঙ্গে খেলা জামসেদপুরে। দুটো আসরেই দলভুক্তির জন্য সে জোর অনুশীলন চালাচ্ছে দলের নিরলস প্রশিক্ষক সুনীল দাসগুপ্তের তদারকিতে। নর্দার্ন পার্কের নেটে অনেকেই আসছে। সকলেরই লক্ষ্য এবার আরও ভাল ফল দেখাতে হবে। সন্ধ্যার প্রবল আগ্রহ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টম্যাচে ভারতীয় দলে স্থান পাওয়ার। অস্ট্রেলীয় মহিলা ক্রিকেট দল আসছে আগামী বছর ফেব্রুয়ারী নাগাদ। এরা কলকাতাতে একটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে। বাংলা দলের মেয়েরা সেজন্যে জোর প্রস্তুতি সুরু করে দিয়েছে।

বারানসীর প্রতিযোগিতায় ওভারের সংখ্যা ছিল প্রথম দিকে ২৫ এবং ফাইনালে ৪০। এবার জানুয়ারীতে কলকাতায় আয়োজিত জাতীয় মহিলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ওভারের সংখ্যা বেড়ে হয়ত ৬০ হবে। সীমিত ওভারের খেলায় ফিল্ডিংয়ের গুরুত্ব খুবই বেশী। সন্ধ্যা বললে, যখন কম রান উঠছে তখন তো বটেই, বেশী রান হলেও ফিল্ডিংয়ে আমরা কখনই আলগা দিইনি। এই জন্যেই দু-তিনটে ম্যাচ খেলতে-না-খেলতেই আমাদের মনে একটা আস্থার ভাব এসেছিল যে, বোলিং আর ফিল্ডিং যদি জোর হয়, তাহলে আমরা জিতবই। বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে আমাদের রান কম হলেও ওদেরও আমরা আটকে রেখেছিলাম, রান তুলবার সুযোগ দিইনি।

সন্ধ্যার খুব ইচ্ছা কলেজে মেয়েদের ক্রিকেট টিম হয়।

—কিন্তু কে করবে বলুন? আমাদের সব কলেজ কর্তৃপক্ষের কথা ত বললাম। আন্তঃকলেজ এথলেটিক নামার ব্যবস্থাই হয় না। ওঁদের এখন নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করার যে সময় এসেছে, তা ওঁরা বুঝতে পারছেন না। বুঝতে পারছেন না যে এদেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরা খেলাধূলোর ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় আসরে পিছিয়ে থাকতে নারাজ। আমাদের মেয়েদের খেলার সুযোগ আরও অনেক অনেক বাড়ানো দরকার। শহরে ত বটেই গ্রামাঞ্চলেও। মফঃস্বল শহরের অনেক মেয়ে বলেন, তাদের কলেজে কোনরকম খেলারই ব্যবস্থা নেই, অথচ প্রায় প্রত্যেক কলেজ বিশেষ ফি নেয়।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সন্ধ্যা কেবল হকি বা ক্রিকেট নয় হ্যান্ডবল খেলাতেও সমান দক্ষ। ১৯৭৩—মানে গত বছরই সন্ধ্যা পুনায় অনুষ্ঠিত জাতীয় মহিলা হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় বাংলা দলে স্থান পেয়েছিল। সুযোগ পেলে বোধহয় ফুটবলও খেলবে।

—অময়

মিহির কর

মাঠের নায়ক

গড়ের মাঠে দুখীরামবাবুর খ্যাতি ছিল প্রতিভার সন্ধানী হিসেবে। তাঁর দূরদৃষ্টির ফলে এরিয়ান ক্লাবে অতীতে এবং আজও নতুন প্রতিভা এবং প্রতিশ্রুতির প্রকাশ দেখা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার পরবর্তী পর্বেও এই এরিয়ান ক্লাবেই গড়ের মাঠে অগণিত চাবুক ফুটবলার উপহার দিয়েছে।

সম্প্রতি এরিয়ানের এই প্রশংসনীয় ভূমিকার পাশে গড়ের মাঠে আরও একটি ক্লাব বিশ্বস্ততার সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছে। নাম খিদিরপুর। তরুণ প্রতিভার পরিচর্যার কথা বিবেচনা করলে খিদিরপুরকে আজ রাজ্যে ফুটবলের সেরা নার্সারী বলে অভিহিত করলে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। অশোক ব্যানার্জি, গৌতম সরকার তরুণ বসু, প্রশান্ত মিত্র সলিল দাস, তরুণ বসু মজুমদার, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, শ্যামল ঘোষ, বিনয় পাজা প্রমুখ বহু খেলোয়াড়ই কলকাতা ময়দানের প্রথম ঠিকানা ছিল খিদিরপুরের তাঁবু। সুখ্যাত অচ্যুত ব্যানার্জির সনিষ্ঠ পরিচর্যায় ঐ তরুণেরা আজ রাজ্য তথা সর্বভারতীয় ফুটবলে খ্যাতির শিখরে প্রতিষ্ঠিত।

মিহির কর খিদিরপুরের নবতম আবিষ্কার। মিহির রাইট স্টাইকার। ছোটখাট চেহারা দেখলে মনেই হয় না যে, সে ফুটবল খেলে। লম্বা, চওড়া জোয়ান হলে ফুটবলের অনেক সুবিধে সন্দেহ নেই কিন্তু মিনি মানুষ হলেও যে মাথায় বস্তু থাকলে ভাল ফুটবল খেলা যায় মিহির তার একটি জ্যান্ত প্রমাণ। প্রতিদ্বন্দ্বী রক্ষণভাগের দুর্বলতম গ্রন্থিটির সন্ধান করে সেখানে দুর্বার আঘাত হানা বা নিখুঁতভাবে সুবিধামত জায়গাটি আগলে রাখা পেনাল্টি বক্সের ভেতর পায়ে বল পড়লেই সেটি সপ্রতিভ ভঙ্গীতে গোলের দিকে আগিয়ে দেওয়া সহযোগীদের নিরলস বল যোগান ইত্যাদি সব ব্যাপারেই মিহির সার্থক। কিন্তু মিহিরের সবচেয়ে বড় গুণ বোধহয় তাঁর প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ মেজাজ। জয়ে, পরাজয়ে সংকটে ঐ মেজাজটি শান্ত শীতল। খেলার মাঠে সার্থক হতে হলে মেজাজের রাশটিকে শক্ত হাতে ধরে রাখতে হবে। একথা তরুণ বয়স হলেও মিহির কর বিলক্ষণ উপলব্ধি করেছে। এবং করেছে বলেই মিহির আজ শুধু খিদিরপুরের কেন সারা গড়ের মাঠের ফুটবল অনুরাগীদের এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব।

মিহিরের জন্ম বাংলার বাইরে, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে (১৮ অকটোবর, ১৯৫৩)। অর্থাৎ বয়স এখন একুশ। বাবা

কথা কানে যায় না। পড়াশোনায় একেবারে মন নেই। দিন রাত দাবার চিন্তায় আত্মমগ্ন.

মাত্র চোদ্দ বছর বয়সেই ববি জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দাবা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রথম চ্যাম্পিয়ান ১৯৫৮ সালে। এর পর আরও সাত বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হন। এবং মাত্র পনের বছর বয়সে বিশ্ববিখ্যাত দাবাড়ুদের হারিয়ে গ্র্যান্ডমাস্টার আখ্যায় ভূষিত হয়ে অবিশ্বাস্য নজীর রচনা করেন। ববি দাবার ইতিহাসে কনিষ্ঠতম গ্র্যান্ড মাস্টার। সারা বিশ্বে এদের সংখ্যা সম্ভবতঃ ৭৫ জন। এদের মধ্যে ৩৩ জন রুশ ও ১০ জন আমেরিকান।

পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সে ববি আকস্মিকভাবে দাবার আসর থেকে সরে যান। প্রতিযোগিতা দূরে থাক ববিকে দু' বছর তার প্রিয় বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনও দেখা পায় নি। অনেকের ধারণা ববি দাবা খেলা থেকে অবসর নিয়েছে। ববি কিন্তু ঐ দু' বছর লোকচক্ষুর অন্তরালে চার দেয়ালের মাঝে দাবা অনুশীলনে মগ্ন ছিলেন।

১৯৭০ সালের শেষের দিকে উল্কার মত ববির পুনরায় আবির্ভাব ঘটে। ববি তখন অন্য মানুষ। রক্তে শিরা উপশিরায় যেন দাবার স্রোত বইছে। নিখুঁত চাল ও অতিমানবিক বুদ্ধির নিরিখে ববি পর পর ১৯টি খেলায় জয়লাভ করে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানশিপ দাবা প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে ওঠেন।

সেমিফাইনালে ববির প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ান চৌকশ রুশ দাবাড়ু টাইগ্রান পেট্রোসিয়ান। টাইগ্রান ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত এক নাগাড়ে বিশ্বদাবায় চ্যাম্পিয়ান। এই সময় ববি এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করতেন না। সব সময় দাবার চাল ঘূর্ণি পাকের মত মাথায় মাথায় ঘুরত। খাবার টেবিলে বসে কিম্বা সুইমিং পুলে দাঁড়িয়ে দাবার অনুশীলন করতেন। জলে নেমেও ভাসমান দাবার বোর্ডে ববিকে কসরৎ করতে দেখা গেছে। প্রতিযোগিতার পূর্বে তালিমের সময় বিপক্ষে খেলতেন তার প্রিয় বন্ধু ও প্রখ্যাত প্রবন্ধকার ল্যারি ইভান্স। ববির সাধনা সার্থক হয়েছে। অভিজ্ঞ টাইগ্রান তাঁর লড়াই-এর শেষে ববির অভ্রান্ত চালের কাছে নতি স্বীকার করেছেন। ববি ফাইনালে ওঠেন। ইতিপূর্বে উত্তর আমেরিকায় আর কেউ বিশ্ব-দাবা প্রতিযোগিতার ফাইনালে পৌঁছতে পারেন নি।

আটবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হবার পর এক সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ববি বলেছিলেন—আমি সময়ের অপচয় চাই না। আমার লক্ষ্য বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানশিপ অর্জন। আর একে অত্যন্ত গুরুত্ব দিই আমি।

ববির আশা বিফল হয় নি। চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় তিনি প্রাক্তন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান বরিস স্প্যাসকিকে অতিমানবিক কল্পনা শক্তির জোরে ও জটিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধির চালে পর্যুদস্ত করেন। স্মরণ করা যেতে পারে টাইগ্রান পেট্রোসিয়ানের পর রুশ বিজয় পতাকাকে সাফল্যের সংগে সগর্বে উড্ডীন রেখেছিলেন বরিস স্প্যাসকি। তিনি ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান। ববি ফিশারই প্রথম আমেরিকান যিনি বিশ্বশ্রেষ্ঠ দাবাড়ুর স্বীকৃতিতে ভূষিত। এবং যিনি গত ৩৫ বছরের রুশ আধিপত্যকে স্বকীয় নৈপুণ্যে ধূলিসাৎ করলেন।

দাবাই ববির জগৎ। ধ্যান জ্ঞান সর্বকিছু। স্বল্পবাক ববি কদাচিৎ খেলাধুলো বা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন। তবে দাবা ছাড়া অন্য বিষয়ে কথা বলতে উৎসাহ বোধ করেন না। ইংরেজী ছাড়া চারটি বিদেশী ভাষায় কথা বলতে পারেন। সব সময়ে এক গাদা দাবার পত্র-পত্রিকা নিয়ে পড়াশুনায় মশগুল থাকেন। জানালা বিহীন ঘরে থাকতে পছন্দ করেন। জানালা থাকলে চোখ যায় বাইরে। মন হয় বিক্ষিপ্ত। তাই জানালা নিষিদ্ধ। থাকলেও তার কপাট বন্ধ করে রাখা হয়। বাড়ীর বাইরে বেরুলেও ববির হাতে থাকে দাবা বিষয়ক পত্রিকা। পকেটে সদাসঙ্গী ছোট্ট একটি দাবা বোর্ড। অধিকাংশ অবসর অতিবাহিত করেন নিজের বন্ধ ঘরে নিভৃতে বসে দাবার চিন্তায়।

ববির সম্পর্কে তার মার অভিমত—ববির মাথায় দাবার পোকা ঢুকেছে। সে দেরীতে ঘুমোয়। প্রতি মাসে দাবা বিষয়ক পঞ্চাশটির বেশী বিদেশী দাবা পত্রিকা পড়ে। হাত দেখার চেষ্টা করে। রক এন্ড রোল সংগীত শোনে। আর টেবল টেনিস খেলে ও সাঁতার কেটে মনকে জিরিয়ে নেয়। দাবাই তার ধ্যান জ্ঞান। দাবায় জিততে হবে—এই তার শপথ।

দাবায় চ্যাম্পিয়ান হওয়া যায় কি করে জিজ্ঞেস করলে ববি ফিশার বলেন—বলিষ্ঠ স্মৃতিশক্তি গভীর মনঃসংযোগ কল্পনাশক্তি আর প্রবল ইচ্ছাশক্তি। অঙ্ক কষার সংগে এর বিশেষ সম্পর্ক নেই।

বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান ববি ফিশার নিজেই নিজের কথার দৃষ্টান্ত। তিনি বিশ্ববিখ্যাত হলেও তার পৃথিবীটা খুব ছোট। মন আটকানো আধ মিটার বোর্ডের ওপর আঁকা দাবার ছকে। মন বিচরণ করে হাতীর দাঁতের তৈরী কারুকার্য খচিত ৩২টি মূর্তির গতির সাথে সাথে।

—প্রশান্ত দাশ

ববি ফিশার

খেলাধুলা

দর্শক

ডেভিস কাপ

ইন্টার-জোন সেমিফাইনাল

পুরুষদের দলগত আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে ভারত ৩—১ খেলায় রাশিয়াকে হারিয়ে মূল প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছে। এই নিয়ে ভারত দ্বিতীয়বার ফাইনালে উঠলো। প্রথম উঠেছিল ১৯৬৬ সালে। তখন ফাইনাল খেলার নাম ছিল চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড। ভারত ১৯৬৬ সালের ফাইনালে ১—৪ খেলায় ২৩ বারের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে যায়। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রথম যোগদান ১৯২১ সালে এবং রাশিয়ার ১৯৬২ সালে। রাশিয়া এই প্রথম ইন্টার-জোন পর্যায়ে খেললো। অপরদিকে ভারত ইতিপূর্বে ৬ বার ইন্টার-জোন ফাইনালে খেলে একবার জিতে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ ফাইনালে উঠেছিল। ১৯৭২ সালের আগে এই ইন্টার-জোন ফাইনাল খেলার পরই ছিল চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ মূল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা। এই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলতো ইন্টার-জোন ফাইনাল বিজয়ী দেশ এবং ঠিক আগের বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী দেশ। ১৯৭২ সাল থেকে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে নতুন নিয়মে ডেভিস কাপ বিজয়ী দেশকেও পরবর্তী বছরে প্রাথমিক পর্যায়ের আঞ্চলিক খেলায় অংশ গ্রহণ করতে হচ্ছে। তারা আগের মত আঞ্চলিক খেলায় অংশ না নিয়ে সরাসরি চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ ফাইনালে খেলবার বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে না।

ডেভিস কাপের খেলায় ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার খেলা এই প্রথম। ভারত বনাম রাশিয়ার এই ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনাল খেলার আসর বসেছিল পুনার জিমখানা তৃণাচ্ছাদিত কোর্টে। প্রথম দিনে উভয় দেশই একটি করে সিংগলস খেলায় জয়ী হয়। ফলে খেলার ফলাফল সমান দাঁড়ায়। প্রথম সিংগলস খেলায় ভারতের বিজয় অমৃতরাজ ৬—৪, ১১—৯ ও ৬—৩ গেমে রাশিয়ার তেমুরাজ কাকুলিয়াকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় সিংগলসে রাশিয়ার আলেকজাণ্ডার মেত্রেভেলি ৬—৪, ৯—৭ ও ৬—৩ গেমে আনন্দ অমৃতরাজকে হারিয়ে খেলার ফলাফল সমান (১—১) করেন।

দ্বিতীয় দিনের ডাবলসের খেলা অসমাপ্ত থাকে। দুইভাই বিজয় ও আনন্দ অমৃতরাজ রাশিয়ার মেত্রেভেলি এবং

আমেরিকান সিংগলস চ্যাম্পিয়ান জিমি কোনর্স (আমেরিকা).

আমেরিকান সিংগলস ফাইনালে (১৯৭৪) পরাজিতা কুমারী ইভোন গুলাগং (অস্ট্রেলিয়া)

অ্যান্ডিয়ার বিপক্ষে ১৩—১৫, ৭—৫ ও ১১—১৭ গেমে অগ্রগামী ছিলেন।

তৃতীয়দিনে ভারত পূর্বদিনের অসমাপ্ত ডাবলসের খেলায় জয়ী হয় ১৩—১৫, ৭—৫, ১১—১৭ ও ৬—৩ গেমে। এর পর তৃতীয় সিঙ্গলসে আনন্দ অমৃতরাজ ৬—২, ৮—১০, ৪—৬, ৬—৩ ও ৬—৩ গেমে তেমুরাজ কাকুলিয়াকে হারিয়ে দিলে ভারত ৩—১ খেলায় জয়ী হয়ে ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। বিজয় অমৃতরাজ বনাম আলেকাস মেত্রেভেলীর শেষ চতুর্থ সিঙ্গলস খেলাটি আলোর অভাবে অসমাপ্ত থেকে যায়। তখন স্কোর ছিল ৬—২ ৪—৬ ২—৬ ও ৬—১।

ইন্টার-জোন ফাইনালে ভারত

১৯৭২ সালের আগে ডেভিস কাপের ইন্টার-জোন ফাইনাল খেলার পরই চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ মূল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা হত। ভারত এই ইন্টার-জোন ফাইনালে ৬ বার খেলে একবার (১৯৬৬ সালে) জয় লাভের সূত্রে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ ফাইনালে উঠেছিল। ভারতের ইন্টার-জোন ফাইনাল খেলার ফলাফল দাঁড়ায়ঃ ১৯৫৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১-৪ খেলায় হার, ১৯৬২ সালে মেকসিকোর কাছে ০-৫ খেলায় হার, ১৯৬৩ সালে আমেরিকার কাছে ০-৫ খেলায় হার, ১৯৬৫ সালে স্পেনের কাছে ২-৩ খেলায় হার, ১৯৬৬ সালে ব্রেজিলের বিপক্ষে ৩-২ খেলায় জয় এবং ১৯৬৮ সালে আমেরিকার কাছে ১-৪ খেলায় হার।

আই এফ এ শীল্ড

১৯৭৪ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ১-০ গোলে মোহন-বাগানকে হারিয়ে উপর্যুপরি ৩ বার (১৯৭২-৭৪) আই এফ এ শীল্ড জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য ইস্টবেঙ্গল এই নিয়ে ১৯ বার আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে খেলে শীল্ড জয়ী হল ১৩ বার (এর মধ্যে ১৯৬১ সালে মোহনবাগানের সঙ্গে যুগ্ম-বিজয়ী)। এ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল একই বছরে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং আই এফ এ শীল্ড জয়ের সূত্রে ডাবল খেতাব পেয়েছে ৯ বার (১৯৪৫, ১৯৪৯-৫০, ১৯৬১ ১৯৬৬, ১৯৭০, ১৯৭২-৭৪)। এবং উপর্যুপরি তিন বছর করে আই এফ এ শীল্ড জয়ী হয়েছে দু' বার (১৯৪৯-৫১ এবং ১৯৭২-৭৪)।

ফাইনাল খেলার প্রথমার্ধের ৪০ মিনিটের মাথায় সুভাষ ভৌমিক ইস্ট-বেঙ্গলের জয়সূচক গোলটি দেন। এই গোল ছাড়া ইস্টবেঙ্গল গোল করার একাধিক সহজ সুযোগ নষ্ট করে। তারা যোগ্য দল হিসাবেই খেলায় জয়ী হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ খেলা

আই এফ এ শীল্ডের দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ খেলায় ৬টি দল সমান দু' ভাগ হয়ে খেলেছিল। লীগ চ্যাম্পিয়ান ও রানার্স-আপ হওয়ার সূত্রে এ গ্রুপ থেকে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং এবং বি গ্রুপ থেকে মোহনবাগান ও আবাহনী ক্রীড়া চক্র (বাংলাদেশ) মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে উঠেছিল।

আই এফ এ শীল্ড

ভি এস চৌহান (ভারত); এশিয়ান গেমসের ডেকাথলনে স্বর্ণপদক বিজয়ী

লীগ এবং সেমি-ফাইনাল খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফলঃ

এ গ্রুপের লীগ খেলা

ইস্টবেঙ্গল ২-২ গোলে কালীঘাটের সঙ্গে খেলা ড্র করে এবং ৩-০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত করে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়। অপর দিকে মহমেডান স্পোর্টিং ২-১ গোলে কালীঘাটকে হারিয়ে রানার্স-আপ হয়।

বি গ্রুপের লীগ খেলা

মোহনবাগান ২-০ গোলে প্রিমিয়ার টায়ার্স (কেরালা) এবং ৫-০ গোলে আবাহনী ক্রীড়া চক্রদলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ান হয়। অপর দিকে আবাহনী ক্রীড়া চক্রদল ১—০ গোলে প্রিমিয়ার টায়ার্স দলকে পরাজিত করে রানার্স-আপ হয়।

সেমি-ফাইনাল

প্রথম সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ৩-১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে এবং দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ৭-০ গোলে বাংলাদেশের আবাহনী ক্রীড়া চক্র-দলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

টেবল টেনিস টেস্ট

ভারত সফরকারী জাপানের টেবল টেনিস দলের সঙ্গে ভারতের যে পাঁচটি টেস্ট খেলা হয়েছে তার ফলাফল : পুরুষ বিভাগে ভারত ৩—২ খেলায় 'রাবার' জয়ী হয়েছে। অপরদিকে জাপান মহিলা বিভাগের পাঁচটি টেস্টেই জয়ী হয়ে 'রাবার' পেয়েছে। পুরুষ বিভাগে জাপান ১ম এবং ২য় টেস্টে জয়ী হয়। ভারত জয়ী হয় পরবর্তী তিনটি টেস্টে।

শতবর্ষের স্মরণীয়

শরচ্চন্দ্র ঘোষ

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দেই আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবু) বাড়ীতে অভিনয় অনুষ্ঠিত হবার সংবাদ পাওয়া যায়। কলিকাতার অন্যতম ধনী ছাতুবাবু এবং তার ভাই লাটুবাবুর সম্পর্কে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। বাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কোনদিনই এঁদের অবদানের কথা অস্বীকার করা যাবে না। মাতামহদের অনুপ্রেরণায় বাল্য বয়স থেকেই শরচ্চন্দ্র নাট্যাভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ বিষয়ে আমৃত্যু তার সংগী ছিলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। প্রায় সমবয়সীই ছিলেন উভয়ে। বিহারী-লাল বয়সে কিছু বড়ই ছিলেন। আনু-মানিক ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে শরচ্চন্দ্রের জন্ম।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানপ্রদায়িনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার উদ্যোগে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে নন্দকুমার রায়ের 'শকুন্তলা' নাটকাভিনয়ে শরচ্চন্দ্র 'শকুন্তলা' চরিত্রে অভিনয় করে সকলের প্রশংসার্জন করেন। সমাচার চন্দ্রিকায় শরচ্চন্দ্রের অভিনয় সম্পর্কে বিশেষ ভাবে প্রশংসা করা হয়), এখানেই বাণভট্টের কাদম্বরী থেকে গৃহীত 'মহাশ্বেতা' নাটকে তরলিকা চরিত্রে অভি-নয় করে অনুরূপ খ্যাতি পান। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ও এই অভিনয়ে জড়িত থাকেন। ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হবার পর বিহারীলাল আর শরচ্চন্দ্র সান্যাল ভবনের অভিনয় দেখে এসে স্থায়ী পেশা-দার রংগশালা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন এবং ফলশ্রুতি হিসেবে গড়ে তোলেন বেংগল থিয়েটার। জীবিতকাল পর্যন্ত শরচ্চন্দ্র বেংগল থিয়েটারে অভিনীত প্রতি নাটকে অভিনয় করে অভিনেতা রূপেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মফঃস্বলেও তিনি সম্প্রদায়ের সংগে অভিনয় করতে দ্বিধা-বোধ করতেন না।

শরচ্চন্দ্র ঘোষ অভিনীত চরিত্রগুলির মধ্যে নাম করতে হয় : যযাতি—শর্মিষ্ঠা। জগৎসিংহ—দুর্গেশনন্দিনী। পুরু—পুরুবিক্রম। ফষ্টার—চন্দ্রশেখর। ভীষ্মাচার্য—পাষাণ প্রতিমা। নবকুমার—কপালকুণ্ডলা। আরো বহু নাটকে শরচ্চন্দ্র ঘোষ অভিনয় করে তদানীন্তন রংগশালার প্রথম সারির অভিনেতা রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। দুর্গেশনন্দিনী নাটকে জগৎসিংহ রূপে শরচ্চন্দ্র ঘোষ যখন অশ্বারোহণে প্রবেশ করতেন নাট্যামোদিদের বিস্ময়ের অবধি থাকতো না। অশ্বারোহণে শরৎ-বাবুর দক্ষতা ছিল। অশ্বটি শরৎবাবুর সমস্ত নির্দেশ মেনে চলতো। কথিত আছে। শরচ্চন্দ্রের মাতৃদেবী দ্বিতলে প্রতি-দিন পুজো করতেন। শরৎবাবু প্রতিদিন সকালে ঠাকুর ঘরে গিয়ে পুজোর আশীর্বাদী নিয়ে আসতেন। অশ্বটিও পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে উঠে দোতলার ঠাকুর ঘরের কাছে সামনের দু' পা ভেংগে দাঁড়িয়ে থাকতো। শরৎবাবুর মাতৃদেবী তাকে পুজোর বিল্বপত্র ও অন্যান্য প্রসাদ দিতেন অশ্বটি প্রসাদ গ্রহণ করে আবার নীচে নেমে আসতো।

স্থুলকায়, সুপুরুষ এবং সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন শরৎবাবু। বাবুগিরিতেও আভিজাত্য সকলকে আকৃষ্ট করতো। চওড়া কালো পাড়ের কোঁচানো মিহি তাঁত বা ফরাসডাংগার ধুতি পরতেন। গায়ে থাকতো তখনকার যুগোপযোগী দামী কোট। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে শরচ্চন্দ্রের মৃত্যুতে বেংগল থিয়ে-টারের প্রধান স্তম্ভটি খসে পড়ে। শরৎবাবুর স্মৃতি পূজা উপলক্ষে বেংগল থিয়েটারে অশ্রুমতী নাটক অভিনীত হয়। পরবর্তী-কালে তাঁর বিধবা স্ত্রীর সৌজন্যে বিশেষ অভিনয়েরও আয়োজন করা হয়।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়

জন্ম : ১৮৪০। মৃত্যু : ১৯০৮। বিহারীলাল যখন মাতৃগর্ভে তখনই তাঁর পিতা পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। আবাল্য মাতামহের গৃহে লালিতপালিত। ছাত্রজীবনে খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন তাঁর সহ-পাঠী। জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার লাভ করেন। ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশনে সিনিয়র ক্লাশ অবধি পড়াশুনা করেন। মহাত্মা ডাফ বিহারীলালের সাহিত্যানুরাগ ও সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিশেষ পারতোষিক প্রদান করেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে 'গ্লাডস্টোন উইকলী'র করেসপণ্ডেন্স ক্লার্ক-এর কাজ গ্রহণ করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে সহকারী কেশিয়ারের কাজ করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁর পদোন্নতি হয়। এই সময় তিনি এলাহাবাদে কর্মরত ছিলেন। কর্ম-জীবনে সততার জন্য ছিলেন সুখ্যাত। স্বাধীনভাবে ব্যবসা করেও প্রভূত অর্থোপার্জন করেন।

প্রথম জীবনে জয়রাম বসাকের বাড়ী 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ীতে বেণীসংহার নাটকেও স্ত্রী-চরিত্রে তাঁকে দেখা যায়। কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে অভিনীত নব-নাটকের সুলোচনা, শোভা-বাজার রাজবাড়ীতে কৃষ্ণকুমারী নাটকে ভীমসিংহ চরিত্রে চমৎকৃত করেন সকলকে। পদ্মাবতী নাটকে অভিনয় করেন ইন্দ্রনীল চরিত্রে। ছাতুবাবুর বাড়ীতে শকুন্তলা নাটকেও স্ত্রী-চরিত্রেই অভিনয় করেছিলেন। এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেই শরচ্চন্দ্র ঘোষের সঙ্গে গড়ে তোলেন বেংগল থিয়েটার।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমৃত্যু বেংগল থিয়েটারের হাল ধরেছিলেন। থিয়েটার পরিচালনা অভিনয় ও নাটক রচনা করে বাংলা নাট্য শিল্পকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। বিহারীলাল অভিনীত ভীমসিংহ—মৃণালিনী, শুক্রাচার্য—শর্মিষ্ঠা, অভিরাম স্বামী—দুর্গেশ-নন্দিনী, মাধবাচার্য—মৃণালিনী, প্রতাপ-সিংহ—অশ্রুমতি। রাবণ—রাবণবধ কাপা-লিক—কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি ছিল অতুল-নীয়।

বিহারীলাল রচিত নাটকগুলির মধ্যে মেঘনাদ বধ, অহল্যাহরণ প্রভাসমিলন, নরোত্তম ঠাকুর, যমের ভুল, সুভদ্রাহরণ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ব্যাসকাশী, খণ্ড প্রলয় নবরাহু, জন্মাষ্টমী, বাণযুদ্ধ, রাজসূয় যজ্ঞ, দুর্যোধন বধ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। ৩০ খানা নাটক রচনা করেন বিহারী-লাল। তাছাড়া কাব্যগ্রন্থও আছে। নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিহারীলালের মৃত্যুর পর শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশেষ এক প্রবন্ধ লেখেন।

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

কাহতে হ্যায় মুঝকো রাজা/বিশ্বজিৎ

প্রেক্ষাগৃহ

কাবেরী বসু / ফটো : অমৃত

বায়োস্কোপিক

চলচ্চিত্রে এখন পরিষ্কার একটা জেনারেশন গ্যাপ চলছে। টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ার সাবেক আমলের শিল্পী এবং কলা-কুশলীদের সংগে এসব প্রসঙ্গে আলোচনা করলে বোঝা যায় এই গ্যাপটা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। পৌরাণিক ঐতিহাসিক ও ভক্তিমূলক ছবির যুগ এখন অস্তমিত। সেসব ছবির প্রয়োজনীয়তা কি বাস্তবিক ফুরিয়ে গেছে? এটা একটা বিতর্কিত প্রশ্ন। তবে ইদানিং মাইথোলজিক্যাল ছবি যে হচ্ছে তো দেখতেই পাচ্ছি।

অথচ এদেশে এমন দিন গেছে—চিত্র-নির্মাতারা পৌরাণিক ছবি তৈরীর ওপর বেশী গুরুত্ব দিতেন। আর দর্শকরাও সেসব ছবি বেশ ভক্তিসহকারে দেখতেন। তখন অবশ্য ছায়াছবির টেকনিক্যাল দিকটি এখনকার মত এত শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি। ছবিতে তাই অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেত। এমনও হয়েছে টালিগঞ্জের খালের শট তুলে তাকে মহাসমুদ্র বলে পর্দায় চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর দর্শকরা তা বিনা প্রতিবাদে মেনেও নিয়েছেন। ধরুন বসুদেব কংসের কারাগার থেকে সদ্যোজাত শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করে নিয়ে চলেছেন গোকুলের পথে। পথে পড়েছে এক অকূল নদী। ঝড় প্লাবনের ঘন অন্ধকার রাত্রি। বিদ্যুৎ চমকের আলোর এই তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ নদী কিভাবে পার হবেন বসুদেব? এ আর এমন কি একটা কথা নদী দু-ভাগ হয়ে ওঁকে পথ দেখায়। শেয়ালরূপী নারায়ণ চলেছেন আগে আগে। মাথায় ছাতার মত বিশাল ফণা তুলেছেন স্বয়ং বাসুকী। এই তো ব্যাপার, এখন লক্ষ্য করুন বায়োস্কোপে সেটা কিভাবে করা হয়েছে—ঠা-ঠা রোদ্দুরে খেঁকুড়ে মার্কা বসুদেব কোলে একটা পুতুল নিয়ে ডিং মেরে মেরে টালি খাল পার হচ্ছে। বাসুকী-ফাসুকীর চিহ্ন নেই কোথাও। শেয়াল ধরা অত সোজা কম্মো নয়। অতএব একটি শান্তশিষ্ট নেড়িকুত্তা ধরে তাকে পেন্ট করে শেয়াল বলে চালানো হচ্ছে। পরে ভুল ধরা পড়তে কিন্তু পরিচালক সেই শট আবার রি-টেক করেছেন। তাঁর কটু মন্তব্যে জানা যায় তোমাদের কি আক্কেল হে হিন্দুর ছেলে হয়ে এতবড় এট্টা অধম্মো না হয় করেইছো। তা বলে শ্যালের লেজ কখনও উঁদো হয় দেখেছো? না অমন জিলিপির প্যাঁচ হয়?

শুনে সব্বার মুখ শুকনো, আরে তাই তো এখন উপায়?

পরিচালকই বাতলে দিয়েছিলেন উপায়—লেজে দাও ঝুলিয়ে পাঁচসেরি এক বাটখারা দেখি কেমন উঁদো হয়। স্যালুট করে নেবে পড়তে আর পথ পাবে না।

অথচ লেজে পাঁচসেরি এক বাটখারা ঝুলিয়ে পৃথিবীতে হেন নেড়িকুত্তা কি আছে যে নড়াচড়া করতে রাজী হবে? অতএব ক্যামেরার বাইরে থেকে আধলা ঝেড়ে ঝেড়ে তাকে টালি খালে নামাতেই সবাই গলদ-ঘর্ম, তারও পর বসুদেব রয়েছেন পেছন পেছন কোমর জল পেতেই তিনি কাছা সামলাতে গিয়ে কেষ্টকে জলে ফেলে দিয়ে আর এক কেলেঙ্কারী বাধিয়ে বসলেন। তখন টোটাল ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম—খালের ওপারে শেয়াল উঠে গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াতেই সে কুত্তো হয়ে গেল কারণ তার গায়ে অত যত্ন করে যে রঙ করা হয়েছিল তা গেছে ধুয়ে আর কোথায় বাটখারা? ভেসে বেরিয়ে গেছে নিশ্চিত তাই অবনত লেজ ফের উঁদো হয়ে বনবন চক্কর দিচ্ছে। পরিচালক ভদ্রলোক তখন দুঃখে ক্ষোভে নিজের কপাল চাপড়ে অস্থির। তারও পর বসুদেব যখন ঠেলে উঠলেন—নাঃ সে আর বলা যাবে না। এত কাণ্ড করে তোলা সে-সব ছবি কিন্তু ভাল চলেছে সেযুগে। সুপার হিট হয়েছে। আর প্রত্যেক শো শেষ হবার পর মঞ্চে রাশীকৃত পয়সা পাওয়া গেছে। ভক্ত দর্শকরা পালা ছুঁড়ে পেন্নাম জানিয়ে গাত্রোত্থান করেছেন যে! খোদ কলকাতায় এ ঘটনা আকছার ঘটেছে মফঃস্বলে তো বিলক্ষণ।

এখন ফিল্মের টেকনিক্যাল মাউন্টিং দারুণ শক্তিশালী। এমন একটা ক্যামেরা বেরিয়েছে যার নাম অপটিক্যাল ক্যামেরা অবাস্তব ঘটনাকে ছবিতে এই অপটিক্যাল লেন্সের সাহায্যে এমন নিখুঁত বাস্তবসম্মত করে

আমি সে ও সখা / উত্তমকুমার ও আরতি ভট্টাচার্য। পরিচালনাঃ মৃণাল চক্রবর্তী। ফটোঃ অমৃত

...শট করা যায় যে স্তম্ভিত হতে হয়।

এখন এই ব্যাপারটা যত বাস্তব হচ্ছে তত ফন্দি-ফিকির বের করতে হচ্ছে মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে। ঘোড়া শট-টা না তুলতে পারলে আবার অপটিক্যাল প্রিন্টিং করা যায় না। চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়া, আগুনের মধ্যে ছোটাছুটি করা, প্লেন থেকে ভিলেনের হাতের ঘুষি খেয়ে নায়কের মহাশূন্যে ছিটকে পড়া—এই সব দুঃসাহসিক দৃশ্য-গুলো আজকাল অপটিক্যাল লেন্সের দৌলতে খুব সোজা হয়ে গেছে কিন্তু মূল শটগুলো নিতে গিয়েও নানা ধরনের অ্যাকসিডেন্ট ঘটছে।

ফিল্মে এটা হচ্ছে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস লাইন। একদল পেশাদার মানুষ অহরহ এই কাজে নিযুক্ত। বোম্বেতেই অবশ্য এদের বাড়-বাড়ন্ত। স্টান্টম্যান ডাবলম্যান হিসাবে এরা পরিচিত।

বোম্বের ছবিতে মারপিটের দৃশ্য একটা মাস্ট। এটা না থাকলে ছবি বিক্রী হবে না। ধর্মেন্দ্রকে প্রায় ছবিতে যেসব ভয়ংকর মার-পিটের দৃশ্যে দেখা যায় এটা কি সত্যি সত্যিই ধর্মেন্দ্রজী করেন? একদম নয়। এর জন্যে স্টান্টম্যানকে নিয়োগ করা হয়। মোটামুটি ধর্মেন্দ্রজীর মত দেখতে—এরকম কয়েকজন লোক বোম্বেতে আছে মারপিটের দৃশ্যে আসলে তাদের কেউ একজন ধর্মেন্দ্রজীর কন্টিনিউটি পোশাক পরে লড়ে যায়। সে-ছবিতে ভিলেন যদি হন শত্রুঘ্ন, তাহলে শত্রুঘ্নর ডাবলম্যান মারপিট করবে।

তখন বোম্বেতে আছি। একদিন বিশ্ব-জিতের সংগে দেখা করবার দরকার পড়ল। ফোন করতে ওঁর সেক্রেটারী জানালেন—বিশ্বজিৎ এখন দাদারের রনজিৎ স্টুডিওতে শুটিং করছেন—ওখানে চলে যান।

তাই গেলাম।

গিয়ে দেখি জোরে এলাহি কান্ড-কার-খানা চলছে। ডাবলম্যান আর স্টান্টম্যানদের ভিড়ে জোর গিশ-গিশ করছে। বিশ্বজিৎ আর শত্রুঘ্ন ঘর্মাক্ত দেহে এয়ার সার্কুলে-টারের সামনে দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে। স্টান্ট-ম্যানদের যে নেতা তার নাম শংকর, আমার বংগস্থানীয়। আমায় দেখে একগাল হেসে বললে—আ যা বাঙালী দেখ্ আজ কিংনা তাকৎ উড়তা হ্যায়...

লড়াই হচ্ছে বিশ্বজিৎ আর শত্রুঘ্নর মধ্যে। অর্থাৎ ভিলেন আর হিরো। মাঝখানে একটা মেয়ের প্রবলেম রয়েছে নিশ্চয়। ফটাফট্ রন্দা উড়ছে। জোরে মুল ডিরেক-টার মনমোহন দেশাই কপালের রগ টিপে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এই সব সিকোয়েন্সে ছবির মূল পরিচালকদের কিছু করার থাকে না—যা করবার স্টান্টম্যানদের নেতা যে—সে করে। ক্যামেরা কখন কোথায় বসবে আর্টিস্টরা কি রকম অ্যাকশান করবে—সব বলবে সে। এমনকি শট শুরু এবং শেষ হবে তার-ই নির্দেশে।

বিশ্বজিৎ বললেন—এসো। দেখ কি হাল হচ্ছে আমার। এর নাম ফিল্মের পয়সা। রোজগার করতে রক্ত দিতে হয়।

একটা ক্লোজ শট হল। এখানে ডাবল-ম্যান দেওয়া যায় না। মিড লঙ বা লঙ শটে ডাবলম্যান স্বচ্ছন্দে দেয়া যায়।

শংকর ক্লোজ শট-টা কম্পোজ করে শত্রুঘ্নকে বলল—আপনি এই শটে প্রোফাইল পাবেন বিশ্বজিৎজী ফুল প্রেজেন্স—আপনি ওঁর নাক বরাবর টেনে ঘুষি ঝাড়লে বিশ্ব-জিৎজী আপনাকে তলপেটে লাথি কষিয়ে দেবেন। আপনি 'ওক্' করে উঠলেই আমি শট কাট করে দেব।

বিশ্বজিৎ বললেন—শত্রু তুমি যথা-সম্ভব বাঁচিয়ে ঘুঁসি চালাবে। বিকেলের শিফটে আমার আবার অন্য ছবির শুটিং আছে মেহবুব স্টুডিওতে।

শত্রুঘ্ন হেসে বললেন—কোই ফিকর নেহি বিশুদা ম্যায় করলুঙ্গা বাঁচাকে—

কিন্তু শট শেষ হবার পর পরই বিশ্ব-জিৎকে নাকে বরফ ঘষতে হল। শত্রুঘ্ন অপ্রস্তুত হেসে বোঝাল—একটু জোরে লেগে গেছে ঘুঁসিটা। আম সরি বিশুদা।

বিশ্বজিতের হয়ে বদলা নিল তাঁর ডাবলম্যান। পরের শটে সে শত্রুঘ্নর ডাবল-ম্যানকে স্রেফ তুলোধোনা করে ছেড়ে দিল। শংকর চটে ফায়ার—এসব কি হচ্ছে? বিশ্ব-জিতের ডাবলম্যান দাঁত বের করে যেন সে

প্রিয় বান্ধবী
সুচিত্রা সেন

কতই অপ্রস্তুত—হেসে এমন, একটা ভাণ করল। এটা একটা অদ্ভুত সাইকোলজি। যে যার ডাবলম্যান তার আচার-ব্যবহার কিছুটা সেই অনুযায়ী গড়ে ওঠে। কোন শটে তার মাস্টার একটু বেশী ধোলাই খেলে—ডাবলম্যান হয়ত পরের শটেই সেই ঝাল মিটিয়ে দিতে চেষ্টা করে। সেজন্য সব আর্টিস্ট-ই নিজের নিজের ডাবলম্যানকে প্রাণপণে সামলাবার চেষ্টা করে থাকেন।

সেদিনই তো বিশ্বজিৎ নিজের ডাবলম্যানকে ডেকে খুব কড়কে দিলেন—কেন অকারণ ওকে পিটলে—ও গরীব মানুষ—বিছানায় পড়ে গেলে ওকে কে খাওয়াবে?

—শত্রুঘ্নজী।

—বটে! আর তুমি পড়লে?

—কে আর—আপনিই খাওয়াবেন।

কথাটা মিথ্যে নয়, ডাবলম্যানদের বিপদে এঁরাও মুক্তহস্ত। কারণ বোম্বের ফিল্মে যাঁর যত মারপিটের ইমেজ ভাল, তার তত বক্স অফিস ভাল। সেই ইমেজ এই ডাবলম্যানদের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল।

তারপর একটা ক্যাটেগরিক্যাল শট দেখলাম।

হিরো ভিলেনকে পিটতে পিটতে প্রথমে ঘর থেকে বারান্দায় বের করে নিয়ে আসবে। ফাইট এখানে আরও জোরদার হবে। হতে হতে একসময় হিরোর হাতের একটা প্রচণ্ড ঘুঁসি খেয়ে ভিলেন দোতলার রেলিং ভেঙে দড়াম করে সটান নীচে এসে পড়বে। বাপ্!

শঙ্করকে বলতে সে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল—এ এমন কিছু নয়, শত্রুজীর ডাবলম্যান একবার গায়ে পেট্রল ঢেলে তাতে আগুন জ্বালিয়ে চলন্ত এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে একটা শট দিয়েছিল। গ্যাস ও এখন অল প্রুফ প্রায় অমর হয়ে গেছে।

শেষ মুহূর্তে পরিচালক শট-টা একটু অলটার করতে চাইলেন। একটা কাঁচ ভেঙে দি ও পড়ে তো বেটার হয়। শঙ্কর সামান্য মাথা চুলকে ও-কে করে দিল। গাড়ি ছুটল। ঢাউস একটা কাঁচ এলো। স্টুডিওর কার্পেন্টাররা সেটা তৎক্ষণাৎ লাগিয়ে দিল।

ফ্লোরে একটা নয় দুটো মুভী ক্যামেরা বসানো হলো। এই ধরনের শট কখনও রিটেক হয় না, হওয়া সম্ভবও না।

ডাবলম্যান একটা সামারসল্ট দিয়ে কাঁচ ভেঙে নীচে এসে পড়বে এবং তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শট আউট হয়ে যাবে। কি ভাই, সব ঠিক হ্যায়? বাতাইয়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সেই প্রাণঘাতী শটটা দেখলাম মশাই চোখের সামনে। ঘুঁসিটি খেল, সামারসল্ট দিল, কাঁচ ভেঙে প্রসাইসলী ক্যামেরার সামনে এসে দড়াম করে পড়ল, উঠল, শট আউট হয়ে গেল। ঠিক!

এবার দেখুন ওর কি হাল।

বাঁ হাতের কনুই কাঁচে কেটে ফালা হয়েছে, কেটে গেছে, রক্ত ঝরছে। ডাক্তার রেডি থাকেন। তিনিও নির্বিকার। উঠলেন। স্টিচিং হলো ফটাফট। ব্যান্ডেজ হলো। ডাবলম্যান ওষুধ এবং ব্র্যান্ডি খেয়ে আবার ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এবার আর ও নয়, শত্রুঘ্নর দুনম্বর ডাবলম্যান অ্যাকটিভ হবে, পরের শটগুলো তাকে দিয়ে নিতে হবে। যেন কিছুই না, আমি অবাক! শঙ্করকে একবার বলেছিলাম ভাই এত থাকতে এই ডেঞ্জারাস প্রোফেশান নিলে কেন? যখন-তখন জীবন চলে যেতে পারে—

শঙ্কর হেসেছে। —ইয়ে জিন্দেগী অ্যাসাই গুজারনা হ্যায়। আসলে একটা দারুণ এক্সাইটমেন্ট আছে এতে, যেটা আর কোথাও নেই। হয়ত সেই জন্যেই আমরা করি।...মরতে একদিন না একদিন তো হবে। ...ও ভেবে আর কি লাভ?

সেদিন কাগজ পড়তে গিয়ে হঠাৎ দেখলাম একজন স্টান্টম্যানের শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছে আউটডোর লোকেশানে শট দিতে গিয়ে। এটুকুই খবর। পড়ে মনটা ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এদের অনেককে আমি যে চিনি। পেটের জন্যে মানুষ কত কি করে, এমনকি স্টান্টম্যানের ডেঞ্জারাস লিভিং নিতেও বাধ্য হয়। অথচ মানুষের জীবন মৃত্যুতে তো কোন স্টান্ট নেই। সেটা নিরেট এবং এক অপ্রতিরোধ্য বাস্তব।

ছবিতে কাজ বাগাবার আশায় কিছু লোক দমাদ্দম মিথ্যে কথা বলে যায়। যেমন প্রশ্ন করা হল—আপনি ঘোড়ায় চড়া জানেন?

উত্তর এল। —নিশ্চয়। আমি কলকাতা পুলিশের সার্জেন্ট, আমাদের ঘোড়ায় চড়ার ট্রেনিং নিতে হয়েছে।

—আর আপনি?

দ্বিতীয়জন বললেন—আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে টানা এক বছর ঘোড়ায় চড়ার ট্রেনিং নিয়েছি।

তখন আর একজনকে প্রশ্ন করা হলো—আপনি স্টেনগান চালাতে জানেন?

—বিলক্ষণ। এন, সি, সি-তে আমি স্টেনগানারই ছিলাম।

—ঠিক তো?

—বিশ্বাস করুন—

এবার আসুন আমার সঙ্গে অভিশপ্ত চম্বলে। ছবির শুটিং চলছে শুটিং স্পটে, এর মধ্যে একদিন গোয়ালিয়র থেকে এক ডজন মিলিটারী ঘোড়া লোকেশানে আনা হল। সেদিন আমাদের শিডিউল—শুধু

ঘোড়া সংক্রান্ত ছবিতে যত শট লাগবে, সেগুলোই পরের পর তুলে ফেলা।

একটা দৃশ্য ছিল—ডাকাতরা ঘোড়ায় করে এসে একটা গাছের ডালে তাদের বেঁধে রেখে গ্রামে ডাকাতি করতে ঢুকবে। এবং লুটের মালপত্র সব ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে চম্পট দেবে। খুব সরল ব্যাপার।

এখন এই তেজী তেজী মিলিটারী ঘোড়া দেখে চাঁড়ুয়েদের কোথায় উৎসাহিত হবার কথা, তা নয় কয়েকজন দেখলাম বেশ মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যিনি পুলিশে ট্রেনিং পেয়েছেন, তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ। আমরা তাঁকেই অ্যাটেম্পট করলাম ট্রেনারকে বলা হল—মশাই একটা অর্ডিনারী রিহার্সাল দিয়ে দেখান তো আমাদের।

মিলিটারী ট্রেনার তখন তার মোচে তা দিয়ে বলল—ঠিক হ্যায়, আব্ দেখাইয়ে সওয়ারী কৌন?

আমরা তখন সেই পুলিশ সার্জেন্টকে দেখিয়ে দিতে তিনি মৃদু আর্তনাদ করলেন। তাড়াতাড়ি আমাকে একপাশে ডেকে বললেন—রিহার্সালটা অন্য কাউকে দিয়ে করুন, আমি একেবারে ফাইন্যাল টেকের সময় মাউন্ট করব, প্লীজ—

মাল ক্যাচ্।

তখন ভিকটোরিয়া ফ্রন্টের আর্টিস্টকে ধরা হলো। তার তো মুখ শুকিয়ে একাকার। সে শুধু বিড়বিড় করে বলল—আমি তো বেঁটে ঘোড়ায় ট্রেনিং নিয়েছি এ-যে ঢাউস ঘোড়া। পারব তো?

আমি অভয় দিলাম।—নিশ্চয় পারবেন। উঠে পড়ুন—

এমনিতে উঠতে পারল না। একটু টুল দিতে হলো।

টুলের ওপর দাঁড়িয়ে অনেক পাঁয়তাড়া করে যাহোক উঠলো শেষ পর্যন্ত।

ট্রেনার হেঁকে বললেন—ট্রট!

ঘোড়া ট্রট করতে করতে এগিয়ে চলল। সওয়ারী লাগাম ধরে সিঁটিয়ে বসে আছে দেখলাম, কোনগতিকে। হঠাৎ ট্রেনার চেঁচিয়ে বলেন—ক্যান্টার।

আর যায় কোথা, ঘোড়া তৎক্ষণাৎ যেন লম্বা হয়ে গেল সোঁক দৌড়, বাপস, চোখের নিমেষে ঘোড়া পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল। অদৃশ্য হবার আগে দেখলাম সওয়ারী লাগাম ছেড়ে ঘোড়ার গা দু'হাতে বেড় দিয়ে টান টান শুয়ে পড়েছে।

মিনিট দশেক পরে ঘোড়া যথাস্থানে ফিরে এল। কিন্তু পিঠে তার সওয়ারী নেই। কি ব্যাপার? সে মক্কেল কোথায় গেল? আরও কিছুক্ষণ পর তাকে দেখা গেল, অনেক দূরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনি করুণ মুখে এদিকে আসছেন। তার অভিযোগ, অসভ্য এই ঘোড়াটি পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে তাকে ফেলে দিয়ে পালিয়েছে। এ মশায় আমি চড়তে পারব না।

তারপর ঘোড়ার শট সেদিন যে কিভাবে হয়েছিল তা একমাত্র ঈশ্বর জানেন।

স্টেনগানার হচ্ছে পঙ্কজ। শুটিং করতে করতে তাকে আমি প্রায়ই টুকতাম—অ মশায়, শেষ পর্যন্ত পারবেন তো?

পঙ্কজ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রতিবারই জবাব দিয়েছে—পারব পারব, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। হেঃ, স্টেনগানতো সামান্য জিনিস, এন সি সি-তে আমি কতবার বলে কামান দেগেছি—

লোকেশান প্যাকআপ হবার দু'দিন আগে স্থির হলো পরদিন গুলি গোলার সব শট নিতে হবে। সেইমত সিকিউরিটি ফোর্সের সঙ্গে আমাদের ব্যবস্থা হল। ডিরেকট, লাইফ শট, সত্যিকারের গুলি-গোলা চলবে।

বেহড়ের এক নির্জন উপত্যকায় লোকেশান নির্বাচন করা হল। প্রথমেই স্টেনগানের শট। পঙ্কজের ভাবপ্রতিক আমার কেমন যেন সুবিধে মনে হল না। ততক্ষণে তার হাতে স্টেনগান নিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্টেনগানের ম্যাগাজিন বোঝাই করে বুলেট ভরে দেওয়া, পঙ্কজ যন্তরটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই দেখলাম যেন স্রেফ ফাঁসির আসামী হয়ে গেল। দরদর করে ঘামতেও আরম্ভ করল।

ক্যামেরা ফিকসড্। রামানন্দ সেনগুপ্ত ওকে ওর পজিশনে দাঁড় করিয়ে ক্যামেরায় অ্যাপারচার দিতে বললেন ওঁর সহকারী পিন্টুকে।

পিন্টুকে বললাম—তুমি অ্যাপারচার দিয়ে সোজা কেটে এসো, ধারেকাছে থেকো না, পঙ্কজের গতিক কিন্তু খারাপ—

পরিচালিকা মঞ্জু দে স্টার্ট সাউণ্ড হাঁকবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ক্ষিপ্রগতিতে ক্ল্যাপস্টিক বাজিয়ে দিয়ে দে-দৌড়। ক্যামেরা চলতে লাগল।

—অ্যাকশান!

কামান-দাগা পঙ্কজ এবার ট্রিগারে চাপ দিল। আগ্নেবাস সঙ্গে সঙ্গে বিকট আওয়াজ করে 'মাল' বেরুতে লাগল। তাই দেখে পঙ্কজের চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে দেখলাম। হড়-হড়-হড়-হড় করে জ্বলন্ত বুলেট বেরিয়ে আসছে, সাঁই সাঁই শব্দ হচ্ছে, পঙ্কজ হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে আমাদের দিকে ফিরতে আরম্ভ করল, ওর খেয়াল নেই যে সেই সঙ্গে অগ্নিস্রাবী ব্যারেল-ও আমাদের দিকে ঘুরেছে, ক্যামেরা-ম্যান রামানন্দ সেনগুপ্ত হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন—সব মাটিতে টান টান হয়ে শুয়ে পড়।

সে আর বলতে, আমরা ঝপাঝপ মাটিতে লেটে গেছি ততক্ষণে, মাথার ওপর দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট বেরিয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে প্রবল কনফিউশান হৈচৈ, চীৎকার—ওরে শালা বন্ধ কর, বন্ধ কর—

পঙ্কজের সাধ্য কি তখন বন্ধ করে! আসলে তার অনভ্যস্ত আঙুল তখন ট্রিগারে সেঁটে বসে গেছে, এত নার্ভাস, যে আঙুল সরিয়ে আনতেও পারছে না। শেষ বুলেট বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত এই-ই চলল, তারপর সব চুপ, অখণ্ড নীরবতা, সব ঠাণ্ডা।

আমরা মাটি থেকে উঠে দেখি পঙ্কজ ঠিক স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে, চোখের পলক পড়ছে না ব্যতিক্রম শুধু স্টেনগান ধরা হাতটিতে, সেটি এখনও কেঁপে চলেছে। যাঃ।

—রঞ্জন মজুমদার

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

আলপিন দেখেই লর্ড পিটার বুঝলেন, চোরের মাথাটি অতিশয় সাফ এবং অনেকদিন ধরেই প্ল্যান আঁটা হয়েছে। সে জানে ফি-বছর একই খেলা খেলেন স্যার সেপটিমাস তাঁর দেশের বাড়ীতে। সে খেলার মধ্যে লুকোচুরি খেলা থাকে। লুকোতে হয় ড্রেসিংরুমে। অন্য অভ্যাগতদের নাম নিয়ে নামাবলী খেলা হয় পাশের ঘরে। মিনিট পাঁচেক সময় থাকে হাতে।

পাঁচ মিনিট কম সময় নয়। ওরই মধ্যে মুক্তোর মালার সুতো ছিঁড়ে ঘর গরম করার চুল্লীতে সুতো পুড়িয়ে ফেলেছে চোর মহাশয়। কাঁচের টেবিলে দাঁড়িয়ে একুশটা মুক্তো ঝাড় বাতির মিজ্জলটার মধ্যে গেঁথে দিয়েছে আল-পিন দিয়ে। বেরী ফলের সঙ্গে মিশে গেছে মুক্তোর দানা। বাকী পিনটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে—তার আগেই অবশ্য পায়ের ছাপ মুছে দিয়েছে টেবিল থেকে। ঘর বন্ধ থাকায় রাত্রে মুক্তো সরাতে পারে নি। সকাল বেলা ঘর খোলা পেয়েই সবার আগে ছুটেছিল মুক্তো পাড়তে।

সব শোনবার পরেও স্যার সেপটিমাসের মনের দ্বন্দ্ব মিটল না।

বললেন—আপনি কিন্তু একবারও ওপরে তাকান নি।

নীচে তাকিয়ে বললেন—মুক্তোর মালা পাওয়া গেছে। জানলেন কি করে মাল আছে মাথার ওপরে?

মেঝের প্রতিবিম্ব দেখে বললেন পিটার উইমজি। মেঝেটা যে কালো-কাঁচ দিয়ে বাঁধানো। নীচে তাকালেই ওপর দেখা যায়। বেরী ফলের ছায়া দেখেই ভাবলাম, বারে মুক্তো ফল-গুলোও যে হুবহু ঐ রকম দেখতে। বে-আক্কেলে আলপিনটা হাতে না পড়লে কিন্তু কল্পনাও করতে পারতাম না, মুক্তো ঝুলছে মাথার ওপর—আমরা খুঁজছি বাক্স পেঁটরায়।

সমিত ভঞ্জ

ওঁরা বলেন

আপনজন ও অরণ্যের দিনরাত্রিতে আপনার ম্যানলি চেহারা আমরা দেখেছিলাম তার ইতে এখন আপনার শরীরে একটু বেশীই াট দেখতে পাচ্ছি। চেহারার আকর্ষণটা ই হচ্ছে না?

—ফ্যাট বেশ বেড়েছে পুরোনো ছবির দিকে তাকালেই বুঝতে পারি। কিন্তু কি করি বলুন তো দাদা? সেই অরণ্যের দিনরাত্রির শুটিং করতে গিয়ে যে পা ভাঙলুম আর ব্যায়ামও বন্ধ হোল। অমনি যত রাজ্যের চর্বি এলো গায়ে আর এখনতো ব্যায়াম করতেই পারছি না।

্যাটটা কমান! —নইলে চলবে কি করে?

—কমাচ্ছি তো নিশ্চয়ই। কমাস আগে তো আরও মোটা ছিলাম। এখন রোজ সকালে বেশ কিছুটা হাঁটি সন্ধ্যের পর ব্যাডমিন্টন খেলি রেগুলার আর ডায়েট কন্ট্রোল তো করছিই।

জনরসিক হিসাবে তো শুনেছি আপনার সুনাম আছে। একবারে বসে বেশ কিছু াণ ভাত আর তিন-চার বোতল মদ পারেন। সত্যি নাকি-

—ভোজনরসিক হিসাবে সুনাম-ছিল এক-কালে। এখন আর নেই। আগেই তো বললাম ডায়েটিং চলছে। সুতরাং ভাততো প্রায় বন্ধ। তাছাড়া এখন এই বাজারে হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত খেলে তো আর দেখতে পাবেন না আমাকে। তবে মদ্য পান সম্পর্কে যে পরিমাণটির কথা শুনেছেন সেটা ভুল। মদ আমি খেতাম এখনও মাঝে মধ্যে খাই কিন্তু তিন-চার বোতল কখনই না।

ঃ কোন ফ্যানের সংখ্যা আপনার বেশী মেয়ে না ছেলে? ফ্যানেদের পাল্লায় পড়ে নাজেহাল হয়েছেন কখনো?

—আমিতো ছেলে সুতরাং আমার মেয়ে ফ্যানের সংখ্যাই বেশী হওয়া স্বাভাবিক। ফ্যানদের উপদ্রব সহ্য করেনি এমন অভিনেতা কেউ আছেন নাকি? এইতো কদিন আগে 'প্রেমের ফাঁদে' শুটিং করছিলাম একটা গার্লস স্কুলের সামনে। আমাকে দেখতে পেয়েই কাতারে কাতারে সব মেয়েরা আসতে লাগল। শুটিংতো মাথায় ওঠবার দাখিল। পরে অবশ্য অনেক কষ্টে সবাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করিয়েছিলাম। আর একবার একটা ছবি না কি যেন কিনতে গিয়ে এক দঙ্গল কলেজের মেয়ের পাল্লায় পড়েছিলাম। উঃ সে এক কিম্ভূতকিমাকার অভিজ্ঞতা। বলব আর কত, সব লিখতেও পারবেন না। কলমে আটকে যাবে!

ঃ মেয়ে না ছেলে কাদের সঙ্গ আপনার ভালো লাগে এবং কেনইবা?

—মেয়েদের সংগতো সবারই খুউব ভালো লাগে শুনি সুতরাং আমারও লাগে। ফ্রয়েড তো বলেছেন অপোজিট সেকসের সংগ সব সময়ই আনন্দদায়ক। কাজেই মেয়েদের ভালো না লাগলে চলে?

ঃ আপনি তো প্রেম করে বিয়ে করেছেন—প্রেম করার প্রধান যোগ্যতাটা কি আপনার অভিজ্ঞতায়?

—প্রেমতো দাদা হয় হয়ে যায়। কেউ প্রেম করব বলে কি প্রেম শুরু করে? সুতরাং যোগ্যতার প্রশ্নটা এখানে চলে না। কোথায় কখন কার সংগে কিভাবে প্রেম হয়ে যায় বলতে পারে না। আবার কারও হয় লাভ এ্যাট ফার্স্ট সাইট। অযোগ্য লোকও প্রেমে পড়ে বোকাও পড়ে চালাকও পড়ে। সুতরাং প্রেমের ক্ষেত্রে কোয়ালিফিকেশন নট কিসসু।

ঃ বহু নায়িকার সংগে রোমান্টিক নায়কের রোল করেছেন, এখনও করছেন। রোমান্টিক বহু দৃশ্যে বেশ প্রাণবন্ত অভিনয়ও করেছেন। ক্যামেরার বাইরে গিয়ে নায়িকাদের সংগে কখনও প্রেম করেছেন?

(হাসতে হাসতে) না দাদা তেমন কোনো অভিজ্ঞতা আমার নেই। অভিনয় করলাম প্রেম করলাম ক্যামেরার সামনে যত রোমান্টিক দরকার ততটুকু। তারপরই একেবারে ফিউজ। শুটিং-এর কথা ভাবতে ভাবতে প্রেম করার ব্যাপার সংগে চলে যায় সহকর্মীর সংগে বন্ধুত্বের চাইতে আর বেশী দূরে এগোন যায় না।

ঃ তাহলে কি বলতে চান সব নায়িকাদের সংগেই আপনার সম্পর্ক সহকর্মী বন্ধুর মত?

প্র

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই তাই।

ঃ ঘুষ নেওয়া এবং ঘুষ দেয়া—কোনটা খারাপ?

—ঘুষ নেয়া। কারণ ঘুষ যে দেয় সে বিপাকে পড়েই দেয়, আনন্দে তো দেয় না। আর ঘুষ যে নেয় আনন্দ করেই নেয় জেনে-শুনে নেয়। সুতরাং অপরাধটা আপনিই বলুন কার বেশী?

ঃ শুনেছি আপনার একটা ট্রেন দুর্ঘটনার পর পড়াশুনো আর করতে পারেননি। এখন ফিল্ম লাইনে চলে এসেছেন তাই নইলে এত পয়সা রোজগার করতে পারতেন?

—কেন পারতুম না? আরও বেশী পারতুম। বিজনেসে কম পয়সা নাকি! এখনও যদি কাজ শুরু করি ফিল্মের চাইতে অনেক বেশী আয় করতে পারব।

ঃ ফিল্মের নায়ক হবার ফলে আপনি কি একটু বেশী আয়েসি হয়ে পড়ছেন?

—না না মোটেই তা নয়। আয়েসি কেন হবো? বরং উল্টোটাই হয়েছে। আগে

বেকার ছিলাম কাজ থাকত না। বাপের হোটেলে খেতাম আর ঘুরে বেড়াতাম। এখনতো বেশী কর্মঠ হয়ে পড়েছি। সকাল সন্ধ্যে শুটিং করছি তারপর ফিল্মের হাজার রকম ঝামেলা নিয়ে সবসময়েই ব্যস্ত। আর আয়েস বলতে যদি কমফর্টের কথা বলেন তাহলে বলব বাবার হোটেলে থাকতে যেমন বেলায় ছিলাম এখনও তেমনি আছি। নো ফারাক।

ঃ আগেকার দিনের রাজা আর আজকের যুগের মন্ত্রীর মধ্যে মেজাজে ও চরিত্রে প্রভেদ কতটা?

—আজকালকার মন্ত্রীদের সুনাম থাক বা না থাক প্রভাব প্রতিপত্তি থাকবেই। মেজাজ বা চরিত্র সম্পর্কে নতুন করে কি আর বলব? আমি কোনো রাজাকে দেখিওনি আর আজকালকার মন্ত্রীদের সম্পর্কেও খুব আগ্রহান্বিত নই আমি কারও সঙ্গে মিশিনাও তেমন। সুতরাং...

ঃ আপনার সব ছবি হিট করেনি একাধিক ছবি ফ্লপই করেছে বলতে পারি। ছবিগুলোর এই অসাফল্যের কারণে আপনার দায়িত্ব কতটুকু?

—ফিল্মতো আউট অ্যান্ড আউট একটা পরিচালকের মাধ্যম। ছবি ফ্লপ করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিশ্চয়ই পরিচালকের। শিল্পীদের জন্য কখনও ছবি ফ্লপ করে না। তাহলে তো উত্তমকুমারের সব ছবি সুপার হিট হতে পারতো। কই তাতো হয় না। কেন? উত্তমকুমার কি কোনো ছবিতে খুউব বাজে অভিনয় করেন? পরিচালক যদি দর্শকের ভালো লাগার মত করে ছবি করতে না পারেন তাহলেই ছবি ফ্লপ সেজন্য অভিনেতা অভিনেত্রীরা দায়ী হবেন কেন?

ঃ পাবলিসিটি একজন শিল্পীকে কতটা এগিয়ে দিতে পারে? আপনি কি উপযুক্ত পাবলিসিটি পেয়েছেন?

—নতুন শিল্পীদের পক্ষে পাবলিসিটি অবশ্যই দরকার কারণ প্রথমটায় প্রচার না হলে লোক নামটা জানবে কি করে। কিন্তু পুরোন বা প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের ক্ষেত্রে পাবলিসিটি খুব একটা এফেকটিভ নয়। বিদেশে এমন কি বম্বেতেও কোনো কোনো নতুন শিল্পীর পাবলিসিটি করে একটা বুম ক্রিয়েট করা হয়। এখানে তেমন কোনো ব্যাপার নেই। আসল কথা অভিনেতাকে তার অভিনয় ক্ষমতা নিয়েই এগোতে হবে। আমার ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বলতে পারি পাবলিসিটি আমায় খুব একটা হেলপ করেনি প্রথমটায় তেমন বুমিং পাবলিসিটি পেলুমই বা কোথায়! তবে এখন পাচ্ছি ইতিমধ্যে সাংবাদিক বন্ধুও কিছু পেয়ে গেছি!

ঃ বর্তমানে চারদিকের এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে আপনার নিজের করণীয় কিছু নেই কি?

—এই পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার চাইতে কালেকটিভ প্রচেষ্টায় প্রয়োজন বেশী একা আর কি করতে পারি। সে জন্যেই তো অভিনেতৃ সংঘের মেম্বার হয়েছি। ও'রা দেখলাম নানা ধরনের কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করছেন। আমিও তার শরিক হচ্ছি। এর চাইতে আর বেশী কি করব বলুন?

আপনার অভিনীত কোনো চরিত্র আপনাকে দর্শবান হতে উদ্বুদ্ধ করেছে?

—আদর্শবান ঠিক নয় সামাজিক কতগুলো সমস্যা সম্পর্কে আমাকে ভাবিয়েছে বলতে পারেন। যখনই যে চরিত্র করি না কেন চরিত্রটার ব্যাকগ্রাউন্ড জেনে নিতে হয়। আর তখনই অনেক না জানা সমস্যা আর অভিজ্ঞতার দরজা খুলে যায় চোখের সামনে। যেমন আপনজন অরণ্যের দিন-রাত্রি বা আটাত্তর দিন পরে ছবিগুলো।

ঃ মানুষ কখন পবিত্র হয়ে পড়ে?

—যখন সে ভূমিষ্ঠ হয় মায়ের কোলে থাকে।

ঃ অভিনয় করছেন খুব বেশী দিন না হলেও একেবারে কম সময় নয়। আত্মবিশ্বাস এসেছে আশা করি আপনার?

—হ্যাঁ কিছুটা হয়েছে বলতে পারেন। এখন কাজ করতে করতেই বুঝতে পারি কাজটা কেমন হচ্ছে। ভালো হলে এক ধরনের তৃপ্তি পাওয়া যায় নইলে কেমন যেন লাগে। ভুল হলে বড় খারাপ হয়ে যায় মনটা। এটাকেই আপনি কনফিডেন্স বলতে পারেন।

ঃ কোনো কোনো অভিনেত্রীদের নাম জড়িয়ে আপনার সম্পর্কে বেশ কিছু গুজব শোনা যায় কিন্তু আপনি এ ব্যাপারে কিছু বলবেন?

—গুজবগুলো আমার কানেও আসে বিভিন্ন সোর্স মারফৎ। কিন্তু আপনিই তো বললেন ব্যাপারটা গুজব। সুতরাং গুজবে কান দেবো কেন বলুন? ফিল্ম লাইনে কাজ করলে কারণে অকারণে এমন সব অনেক কিছুই শুনতে হয় তাতে কান দিলে চলে না। আমিও আমল দিই না।

ঃ হোম ফ্রন্টের হেড—আপনার স্ত্রী আপনাকে কখনও ফিল্ম লাইন ছেড়ে দিতে বলেছেন?

—না না কখখোনো না। বরং সে আমাকে কাজে উৎসাহই দেয়।

ঃ যদি কখনও অভিনয় ছেড়ে দিতে হয় কি করবেন তারপর?

—পরিচালক হবো। অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে এই কাজটাও রপ্ত করে নিচ্ছি। তবে কি ধরনের ছবি করব তা বলতে পারি না। ছবি করব—এমন একটা ইচ্ছে আছে।

ঃ বেড়াতে ভালবাসেন?

—খু-উ-ব। জঙ্গলের নাম শুনলে এক পায়ে খাড়া। সারান্ডা আলাপেট্ট জামদুয়া—সব ঘোরা হয়ে গেছে।

ঃ এবার পুজোয় তাহলে কি প্রোগ্রাম?

—ইচ্ছে তো আছে রবিদা (রবি ঘোষ) চিন্ময়কে নিয়ে যাবো হাজারিবাগের জঙ্গলে। দেখি কি হয়।

নির্মল ধর

অধিকার

অনিল চ্যাটার্জি এবং সুব্রতা চ্যাটার্জি। ফটো : অমৃত

ফ্লোর থেকে বলছি

অত রঙ চঙে পোষাক পরিপাটি হেয়ার-ডু মুখে জ্বলন্ত সিগারেট—কে বলবে এই মেয়ে কালীঘাটের সতীশ মুখুজ্যে রোড নিবাসী আর পাঁচটা সাধারণ বাঙ্গালী মেয়ের মতো চুলও বাঁধে, আবার রান্নাও করতে পারে। হ্যাঁ, রাজশ্রী বসু। অনেকে যাকে বলেন জুনিয়র অপর্ণা সেন। অপর্ণার মতো দেখতে। অপর্ণার মতো সফিস্টিকেটেড ইমেজ নাকি আছে ওর মধ্যে—সেটা বিলক্ষণ আছে। ফলে এই মুহূর্তে স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ (দু' নম্বর নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও)-এর ফ্লোরে, পার্টি গার্লস-এর বেশে যথাযথ। দেখা যাচ্ছে রাজশ্রী একটা ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। আশেপাশে অনেক লোকজন। আসামের জনপ্রিয় নায়ক বিজু (এই প্রথম বাংলা ছবিতে), যোগেশ সাধু, ডক্টর ঘোষ প্রভৃতি। [illegible] ক্যামেরার পজিশন। ক্যামেরাম্যান [illegible] সেন পুরো ব্যাপারটা একবার দেখে নিয়ে লাইট রি-অ্যাডজাস্ট করতে ব্যস্ত হলেন। এই ফাঁকে পরিচালক অমিতাভ দাশগুপ্ত সবাইকে দৃশ্যটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষিত করলেন। অনেকটা হিন্দি ছবির মতো ব্যাপার-স্যাপার। এটা হচ্ছে একটা পাপচক্র। এদের রিং-লিডার হচ্ছে বিজু, চরিত্রের নাম অজিত। হোটেলের সংলগ্ন অত্যন্ত গোপন এই ঘরটিতে নানা রকম বিজনেস ট্রানজ্যাকশন চলে। এমন কি মানুষ ধরা পর্যন্ত। মানুষ মানে সাধারণ মানুষ নয় অসাধারণ—পয়সা-ওয়ালা লোক। এই কাজে সম্প্রতি নিয়োগ করা হয়েছে সুপ্রিয়াকে, অর্থাৎ রাজশ্রী বসুকে। তার বেশভূষা, অঙ্গভঙ্গি দেখে মনে হল এই কাজ সে বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই করছে। আজ আর তার লোকলজ্জার ভয় নেই। অজিত যাকে সুপ্রিয়া একদিন মস্ত-বড় অবলম্বন মনে করেছিল সে এতবড় সর্বনাশ করতে পারে, কল্পনাও করেনি সুপ্রিয়া। অজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে আজ তার বড়ো অবাক লাগে। কত সহজে মুখোশটা খসে পড়েছে। অজিতের চোখের এবং মুখের খেলা, চরিত্রের বহিরঙ্গ এবং

বন্দী বিধাতা / সোমা দে

পরিচালনা : প্রভাত মুখার্জি

অন্তরঙ্গ—বাংলা ছবিতে নবাগত বিজু সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিজু হ্যান্ডসাম একই সঙ্গে ম্যানলি—এই মন্তব্য শুধু রাজশ্রীর নয় আমারও। চরিত্রের জন্য যে গেট-আপ দরকার, সেটা বিজু ষোলো আনা পূর্ণ করছেন বললেন প্রযোজক প্রখ্যাত প্রচারবিদ রঞ্জিত মিত্র। বিজু বললেন : দাদা সবই ঠিক আছে। খুব ভালো লাগছে কাজ করতে। আমি তো অসমীয়া ভাষায় কাজ করতে অভ্যস্ত। তাই ইনটোনেশান কতদূর ক্লিয়ার হচ্ছে বুঝতে পারছি না। আপনারা তো শুনছেন, কি রকম লাগছে?

আমার তো খুবই ভালো লাগছে, অকপটে জানালাম। বিজুকে সকলেরই ভালো লাগছে। সে অভিনয় করছে বেশ দাপটের সঙ্গে। নিয়মিত কাজ করে—অসমীয়া ছবিতে। ওখানে এক নম্বর হিরো। দারুণ বক্স-অফিস ডিমান্ড। সেই সুবাদে আশা হয়, বিজু বাংলা ছবির জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

এই ছবি, 'অপরাজিতা'র রোমান্টিক নায়ক হলেন রঞ্জিত মল্লিক। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পী : শিপ্রা মিত্র, তরুণকুমার, রুবী দত্ত, অনিমা বিশ্বাস, অসিতবরণ, মন্মথ মুখোপাধ্যায় এবং উৎপল দত্ত। আর এম প্রোডাকসানের পতাকাতলে নির্মিত হচ্ছে এই ছবি। ছবির শুটিং শেষের দিকে। আরো কয়েকদিন ইনডোর শুটিং ছাড়া একটা আউটডোর স্পেল আছে বোম্বাইতে। এ ছবির গান হবে অন্যতম প্রধান সম্পদ। সুধীন দাশগুপ্তের সুরে গেয়েছেন : মান্না দে আরতি মুখোপাধ্যায় ও বনশ্রী সেনগুপ্ত।

অপরাজিতা রাজশ্রী বসু ও বিজু ফুকান। ফটো: অমৃত

এবার আসুন টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে। এখানে যাত্রিক গোষ্ঠী নতুন ছবি অধিকার-এর শুটিং করছেন। ফ্লোরের বেশীর ভাগ অংশটাই শুটিং জোন। বিরাট শুটিং জোন। ঘর—মোটামুটি সাজানো গোছানো—আধুনিক আসবাবপত্রে এবং বই-পত্রে। এখন এইসব একজন অধ্যাপকের ঘর। অধ্যাপক এবং তাঁর স্ত্রী যথাক্রমে অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। মাঝখানে একটি শিশু—নবাগত শিশুশিল্পী অর্ঘ্য বসু। যাত্রিক গোষ্ঠীর অগ্রভাগে রয়েছেন দিলীপ মুখোপাধ্যায় তিনি একাধারে সুঅভিনেতা এবং সুপরিচালক। তিনি রি-লাক্স করছিলেন। কারণ অতবড় জোন আলো করতে সময় লাগছে। ইতিমধ্যে একটা রিহার্সাল হয়ে যেতে পারে। দিলীপ উঠে দাঁড়ালেন। শিল্পীদের পজিশন নিতে বলা হল। প্রথমেই অর্ঘ্য চটপট দৌড়ে এসে বসে পড়ল সোফায়। বিপরীতে বসলেন সুব্রতা। অনিল চাটুজ্যে তখন ফ্লোরে নেই। নির্দেশ পেলেই আসবেন। দৃশ্যটা হচ্ছে এই—সুব্রতা অর্ঘ্যকে এক গ্লাস দুধ এগিয়ে দেবেন। এমন সময় বেল বেজে ওঠে। ঝি একজন জুনিয়ার আর্টিস্ট এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেবে। অনিল চট্টোপাধ্যায় হাতে একগাদা বই চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবী—একেবারেই

ডাকবাংলো। সিমী ও নিতীন শেঠী

প্রিয় বান্ধবী / উত্তম-সুচিত্রা

...দামাটা বেশ; বেশ করবেন। দু-চারটে সংলাপ বিনিময় হবে। তারপর আবার কেমন যেন নীরবতা। ভয়ানক মেকানিক্যাল জীবন-যাত্রা—এই হবে পরিবেশ। বুকের মধ্যে মেঘ থাকবে, সব কিছুর মধ্যেই একটা আত্ম-কেন্দ্রিক ভাব বজায় রেখে সুরেশ চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করলেন। পরিচালক এরকমই চেয়েছিলেন। তিনি দেখাতে চাইছেন শিশু মনের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কিভাবে প্রতিফলিত হয়। যদিও এই পরিচালক শিশু মনোস্তত্ত্বকে মোটেই প্রাধান্য দিচ্ছেন না। তিনি মোদ্দা গল্পটা বলতে চাইছেন। যেমন মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন। মহাশ্বেতা দেবীর 'মোমবাতি' অবলম্বনেই অধিকার (চিত্রনাট্য উমানাথ ভট্টাচার্য)। অধিকার; একটি শিশুর। অরফ্যানেজ-এ গল্প শুরু হচ্ছে। সেখান থেকে অর্ঘ্যকে আনা হচ্ছে অনিল চাটুজ্যেদের পরিবারে। কেননা এই পরিবারে ওর তখন প্রয়োজন। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ওকে অবহেলা করা হচ্ছে। স্নেহ মায়া মমতা, এবং ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সে। কোন অধিকারে এতসব কিছু নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে! ওর মনে প্রশ্নের ঝড় ওঠে। ঝড় থামে যখন তখন অর্ঘ্য সেখানে নেই। সে আবার চলে এসেছে অরফ্যানেজ-এ।

তাকে দ্বিতীয় পর্বে দেখা যাচ্ছে আরেক পরিবারে। এখানেও প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে আবার সেই অনাদর অবহেলা। স্নেহ মায়া মমতা আর ভালবাসা থেকে আবার সে বঞ্চিত। বড় অসহায় বড় নিঃস্ব মনে করে নিজেকে। এই পৃথিবীতে একটুখানি ঠাঁই একটুখানি আশ্রয় কি মিলবে না যেখানে স্নেহ আর ভালবাসা সময়ের নিক্তি মাপা-মাপি হয় না। কেনাবেচা হয় না।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকদের জন্য এ ছবিতে নাটক থাকবে ঘটনা থাকবে থাকবে চোখের জল—এর সঙ্গে হাসির খোরাকও কিছু থাকবে আশা করি। বিরাট ভূমিকালিপি। উত্তমকুমার দ্বিতীয় পরিবারের কর্তা। দুটি বিশেষ নারী চরিত্রের শিল্পী সুপ্রিয়া দেবী ও নন্দিতা বসু। কোয়ালিটি পিকচার্সের এই ছবির আলোক-চিত্রশিল্পী অনিল গুপ্ত। সংগীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন নচিকেতা ঘোষ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের শুটিং চলছে। তৃতীয় পর্যায়ের শুটিং-এ উত্তমকুমার যোগ দেবেন। ছবির বেশীর ভাগ অংশ গৃহীত হবে স্টুডিও ফ্লোরে।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

স্টুডিও সংবাদ

কলকাতার ছবির জগতে সেপ্টেম্বর মাসটা জন্মদিনের মাস। বিগত তেসরা সেপ্টেম্বর ছিল উত্তমকুমারের জন্মদিন। সাড়ম্বরে জন্মদিন-উৎসব পালিত হয়। সেদিন উত্তমকুমার শুটিং করেননি। সারা-দিন আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন। বিশেষভাবে আয়োজিত এক পার্টিতে উত্তমকুমার বলেন: জনসাধারণ যতদিন চাইবেন ততদিন আমি অভিনয় করব। তবে এখন আর রোমান্টিক রোল করার তেমন ইচ্ছে নেই। বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে চাই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তিনি এখন বেশীর ভাগ ছবিতে 'ক্যারেকটার হিরো' করছেন। যেমন—পীযূষ বসুর 'বাঘবন্দী' ও 'সন্ন্যাসী রাজা'। দুটি ছবিতেই উত্তমকুমার প্রধান চরিত্রের অভিনেতা। 'বাঘবন্দী'-তে অ্যান্টি-হিরো। সন্ন্যাসী রাজায় স্বতন্ত্র ধরনের চরিত্র—আত্মভোলা সর্বত্যাগী রাজা। মঙ্গল চক্রবর্তীর 'আমি সে ও সখা' ছবিতে অভিনয়ের দুটি দিক। কখনও আত্মকেন্দ্রিক কখনও উচ্ছল। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'অগ্নিশ্বর' ছবিতে নামভূমিকায় এক বিশেষ টাইপ। যান্ত্রিক গোষ্ঠীর অহংকার এ প্রচন্ড ব্যক্তিত্বপূর্ণ অথচ অতি সাধারণ চরিত্র।

একুশ সেপ্টেম্বর পার্থ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালিত হল ঘরোয়া পরিবেশে। 'অতিথি' খ্যাত কিশোর অভিনেতা পার্থ বর্তমানে স্বয়ং সম্পূর্ণ নায়ক। অনেক কাট

যে যেখানে দাঁড়িয়ে / কাবেরী বসু

ছবিতে কাজ করছে সে। পঙ্কজ বসুর 'বাদ-কদমীর রোমান্টিক নায়ক; বিপরীতে নায়িকা মহুয়া রায়চৌধুরী। মহুয়ার নায়ক আরো দুখানা ছবিতে—সলিল দত্তের 'সেই চোখ' ও পূর্ণেন্দু বাগচীর 'সৃষ্টিছাড়া'। দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তিন পত্নী ছয় প্রেমিক' ছবিতে পার্থর নায়িকা নবাগতা সোমা মুখোপাধ্যায়। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের অগ্নিশ্বর ছবিতেও পার্থ আছে।

চলতি সপ্তাহ থেকে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে যাত্রিক গোষ্ঠী নতুন ছবি শুরু করছেন—'স্নো ফকস ক্যাবারে'। কোটিলা গুপ্তের কাহিনী থেকে পার্থপ্রতিম চৌধুরীর চিত্রনাট্যে এ ছবি নির্মিত হচ্ছে। এ ছবির প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করছেন মিঠু মুখোপাধ্যায়। বিপরীতে নায়ক উত্তমকুমার। একটি বিশেষ চরিত্রে আছেন শর্মিলা বিশ্বাস। ছবির ব্যানার : চিত্র যুগ।

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

শোনা যাচ্ছে মুমু-ময়ুরের বিবাহিত জীবন দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কারণ ইতিমধ্যেই ময়ুর মাধবানী পরিবার মমতাজের পর চটেছে। মুমু নাকি ওদের বড্ড নিরাশ করেছে। কথা ছিল মুমু তার অভিনেত্রী জীবনের উপার্জন সঙ্গে করে আনবে। তা তো আনেই নি। এখনো সে তার উপার্জন বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে। এ ব্যাপারটা ময়ুরেরও ভাল লাগছে না। বিয়ের আগে মুমু কথা দিয়েছে আর কোনো নতুন কন্ট্রাকট করবে না। পুরোনো কন্ট্রাকটের কাজগুলো শেষ করে দেবে। কিন্তু মুমু এখন আবার নতুন ছবি নেবার তাল করছে। স্টুডিওতে শুটিং থাকলে বাড়িতে ফিরতে দেরী করছে। একদিন একেবারে বেহুঁশ অবস্থায় ফিরেছে। ময়ুর এসব শুধু দেখে যাচ্ছে। জানে জিজ্ঞাসা করলেই মিথ্যে কথা বলবে। মিথ্যে একদম সহ্য করতে পারে না ময়ুর। তার খুব খারাপ লেগেছে বিয়ের কথাবার্তার সময় মুমু বলেছিল ওর বয়স দু বছর বেশী। এখন জানা যাচ্ছে ময়ুরের চেয়ে মুমুর বয়েস কমপক্ষে পাঁচ বছর বেশী। ময়ুরের বাড়ির লোকজন খুব ক্ষেপে গেছে। মুমুর সঙ্গে ভাল করে কথা বলছে না। মুমুর মতে ওরা সকলে আমার সঙ্গে অসহযোগিতা করছে। আমি তো মানিয়ে চলারই চেষ্টা করছি। বয়সের ব্যাপারটা আমি কিছু জানি না মিথ্যে আমার দিদি বলেছে। আর বিয়ের সময় কোরান পাঠ সে তো হবেই। তোমাদেরই কেবল ধর্মকর্ম আছে, আমাদের নেই!

ডিম্পল-এর বোন সিম্পল অনেকদিন থেকে ফিল্মে নামার ধান্দায় ছিল। দিদির সঙ্গে স্টুডিওতে আসতে আসতে বেশ কয়েকজন প্রযোজককে হাত করে নিয়েছিল। ববি-র শুটিং-এর সময় মাঝে মাঝেই সিম্পল কোনো না কোনো প্রযোজকের সঙ্গে উধাও হয়ে যেত। এমন কিছু দেখতে নয় ডিম্পলের ধারে কাছে আসে না সেই মেয়ে সিম্পল সত্যি সত্যি নায়িকা হল। তাও আবার নায়ক যে কেউ নন স্বয়ং জামাইবাবু—রাজেশ খান্না। খবরটা সম্প্রতি বম্বে ছবির জগতে বহুল প্রচারিত। উক্ত ছবির শুটিং শুরু হতেও আর বেশী দেরী নেই।

'কলগার্ল' ছবিতে কাজ করে খ্যাত, নায়ক বিক্রম প্রেমে পড়েছে। প্রেম কি প্রেমের ফাঁদে তা অবশ্য সঠিক বলা যাচ্ছে না। শুধুমাত্র এই বলা যাচ্ছে যে, বিক্রম বাঁর নিয়মে লীনা চন্দ্রভারকারের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনও মেরিন ড্রাইভ, কখনও বা জুহু বীচে। ওদের দুজনকে প্রায়ই একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। লীনা যেসব ছবিতে কাজ করছে সেখানে বিক্রমকে ভেড়াবার তালে আছে।

পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সদ্য ডিপ্লোমা হোল্ডার রীতা ভাদুড়ী শুধুমাত্র কলকাতাতে নয় বম্বেতে নয় মাদ্রাজেও কাজ করছে। উঠতি এই নায়িকা সম্পর্কে সকলেই খুব আশাবাদী। এমনকি অনেকে মনে করছেন ও জয়ার জায়গা নিয়ে নেবে। কিন্তু সাম্প্রতিক একটি খবর বিস্মিত করেছে। ঋষি কাপুরের সঙ্গে একটি ছবিতে কাজ করার ফাইনাল হয়ে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত করছে না বাদ পড়েছে ঐ ছবি থেকে। প্রযোজক ও পরিচালকদের কথা ঋষির চেয়ে রীতার বয়স বেশী লাগছে। এই পয়েন্ট নাকি তুলেছে ঋষি স্বয়ং। রীতার বদলে বর্তমানে এই ছবিতে এসেছে পারভিন ববি। পারভিনের বয়স তাহলে রীতার চেয়ে কম? হতেই পারে না। আসলে অন্য ব্যাপার। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল এ-ছবির প্রযোজক ও পরিচালক ঋষির বন্ধু। ঋষি সুযোগের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করে। রীতার সঙ্গে আলাপ হতেই শহর থেকে খানিকটা দূরে হোটেলের অ্যাপার্টমেন্টে বসে অনেকক্ষণ গল্প-গুজব করার প্রোপোজাল দেয়। রীতা মুখের পর না বলে দেয়।

►অভিজিত

আয়না
মুমতাজ এবং জগদীশ রাজ

হরা

আলিঙ্গন

(প্রযোজনা : জেসমিন ফিল্মস)

অবাস্তব কাহিনীর

আঙ্গিক সমৃদ্ধ

চলচ্চিত্ররূপ

আধুনিকা রীতুর জীবিকা মডেলিং। বাড়ীতে থাকে না। সৎবাপের দৃষ্টি ওর দেহের ওপর। সে হোস্টেলে থাকে, আরো দুজন তরুণীর সঙ্গে। ওরা ওকে নিজের আত্মীয়ের মতোই দেখে। ফটোগ্রাফারের 'লেন্সের' পাকা হাতের ছবি তুলিয়ে [illegible] পরিচয় হল তরুণ ন্যাভাল অফিসার অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে। প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেম। [illegible] জীবনে প্রথম প্রেম। রীতুর জীবনে প্রথম প্রেম। ভেসে গেল ওর মনের সব [illegible]। হঠাৎ অশ্বিনীকুমারকে চলে যেতে হল পাক-ভারত সংঘর্ষে। রীতু মানসিক দুর্বল হয়ে পড়লো। জন্মদিনে অজ্ঞান হয়ে গেল। মা বাড়ীতে নিয়ে এলো। সুযোগ বুঝে ওর সৎবাবা, মাকে নেশায় অচৈতন্য করে সৎ-মেয়ের ওপর ওর অতৃপ্ত কামনা মেটালো। রীতু আবার হোস্টেলে ফিরলো। এবার আর মডেলিং নয়। যাওয়া যায় এমন পথে [illegible] নিজেকে তিল তিল করে এগিয়ে দিল বিপথে। কাগজে জাহাজডুবির খবর বেরোল। সবাই ভাবল অশ্বিনীকুমার মারা গেছে। কিন্তু অশ্বিনীকুমার ফিরে এল। নিজের চোখে দেখল রীতু কী-ভাবে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ঠিক করল ওকে বিয়ে করার। বাগদানের আগের দিন বাড়ীতে দুর্গাপুজো। রীতু নিজেকে নিঃশেষ করার জন্যে ছুটে চলল। অশ্বিনী ছুটে গেল ওকে বাচাতে এবং সৎবাবাকে শায়েস্তা করতে। ধাক্কাধাক্কিতে সৎবাবা মারা গেলো। রীতু-অশ্বিনীকুমার আলিঙ্গনাবদ্ধ হল।

শশীভূষণের [illegible] কাহিনী ও চিত্রনাট্যের জন্যে এবং ছবির শ্লথ গতির জন্যে সম্পাদনার পরিশ্রম বেড়ে গেছে। কাঁচি মাঝে মাঝে আরও নির্মম হতে পারতো ছবির কাহিনীর বিস্তারের জন্যে। অভিনয়ে মডেলিং গার্ল রীতুর ভূমিকায় [illegible] জাহিরার অভিনয় অনবদ্য। 'কলগার্ল' ছবিতে অভিনয়ের পর থেকে। অশ্বিনীকুমারের ভূমিকায় নবাগত রমেশ শর্মার অভিনয় ভাল। রীতুর দুই বান্ধবীর ভূমিকায় অঞ্জনা [illegible] অভিনয়ও উল্লেখ্য। ফটোগ্রাফার [illegible]-এর ভূমিকায় সুরেশ ছাতওয়াল, সৎ-পিতার চরিত্রে নীতিন শেঠী, মা-র ভূমিকায় [illegible] এবং অন্যান্য ভূমিকায় [illegible] শেঠী, পূনম, বিনোদ শর্মা প্রত্যেকেই চিত্রনাট্যের দাবী অনুযায়ী অভিনয় করেছেন। আলোকচিত্র গ্রহণে [illegible] মূর্তির এবং অন্যান্য কলা-কৌশলের কাজ অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। সংগীত পরিচালনা এবং ছবির মূড অনুযায়ী সংগীত সৃষ্টি করা এবং মান্না দে ও মহম্মদ রফীর গানের জন্যে [illegible] সকলেই প্রশংসা পাবেন। পরিচালক সি এল ধীরের পরিচালনা প্রশংসা দাবি করতে পারে।

—চিত্রদূত

বাংলাদেশের ছবি

উত্তরণ

'অজানা' থেকে 'উত্তরণ'।

ছবিটি এখন মুক্তির দিন গুনছে। সাবেক পাকিস্তান-আমলে চিত্রপরিচালক রুহুল হক তাঁর 'অজানা' ছবির কাজ শেষ করেন।

স্বাধীনতার পর, দীর্ঘদিন বাদে কিছু কিছু 'পুনর্বিন্যাস'এর পর 'অজানা' 'উত্তরণে' রূপ নিয়ে চলতি মাসে অথবা আগামী মাসের কোন এক সপ্তাহে দর্শকদের সামনে হাজির হচ্ছে বলে পরিচালক সূত্রে প্রকাশ।

এ ছবিতে সাবেক পাকিস্তান আমলের এ দেশের প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দকে এক সঙ্গে দেখা যাবে। যাঁরা এ ছবিতে আছেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে রহমান, চিত্রা সিনহা, নাসিমা খান, শবনম আনোয়ার রাণী সরকার, আনোয়ারা আজিম মেসবাহ রবিউল প্রমুখ।

অবাক পৃথিবী

মোস্তফা মেহমুদের ছবি 'অবাক পৃথিবী' এখন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। মেহমুদ সাহেবের 'অবাক পৃথিবীর' নায়ক-নায়িকা রাজ্জাক শাবানা এবং কবরী। ছবিটির পরিবেশক চিত্রা ফিল্মস।

কে আসল কে নকল

মোমতাজ আলীর ছবি কে আসল কে নকল ও মুক্তির দিন গুনছে।

ছবির প্রধান তিনটি চরিত্রে যথাক্রমে অভিনয় করেছেন কবিতা, ওয়াসীম, ও মোস্তফা। ছবিটি পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন নেহার এণ্টারপ্রাইজ লিঃ।

অনেক দিন আগে

নবাগত পরিচালক এফ কবীর চৌধুরী ছবি 'অনেক দিন আগে'র কাজ অনেক দিন আগেই শুরু হয়েছিল। ছবিটির কাজ এখন শেষ পর্যায়ে রয়েছে বলে জানা গেছে।

এ ছবিতে সঙ্গীতপরিচালক সুবল দাস। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন নাভেদ, নবাগত কল্পনা ও মতিন প্রমুখ।

ছবিটির পরিবেশক জুপিটার ফিল্মস।

সন্ধিক্ষণ

শাবানা ওয়াসীম খান জয়নাল বেবী বীথী ও মোস্তফা প্রমুখ অভিনীত এবং মীর মোহাম্মদ হালিম পরিচালিত 'সন্ধিক্ষণ'এর কাজ থেমে থেমে এগোচ্ছে।

এ ছবির সংগীতপরিচালক আলাউদ্দীন আলী।

রক্তের ডাক

এইচ আকবরের কাহিনী চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় 'রক্তের ডাক' নামে একটি ছবি লালন ফিল্মস নিবেদিত এখন মুক্তির দিন গুনছে।

এ ছবির সংগীতপরিচালক সত্য সাহা। চিত্রগ্রাহক জাকির হোসেন। ছবিটির প্রযোজক শামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী।

ছবিটির ভূমিকালিপিতে আছেন কবরী, খলীল মিত্র, শওকত আকবর সামিতা, খান জয়নাল, সাইফুদ্দীন, ফরিদ আলী, শর্বরী প্রমুখ।

ছবির খবর আজ এখানেই থাক, অন্য কিছু খবর শোনাই—শুনুন।

বাংলাদেশে বন্যা

সর্বনাশা বন্যায় ভাসছে সমগ্র বাংলাদেশ। বাংলাদেশ আজ প্লাবিত। বাংলাদেশের তিন কোটি মানুষ আজ বন্যা কবলিত। পানি প্রতিদিন ইঞ্চি ইঞ্চি বাড়ছে।

পানিতে ভাসছে রাজধানীর ঢাকার পথঘাট বাড়ী ঘর।

বেঙ্গল স্টুডিওতে পানি

ঢাকার দ্বিতীয় বৃহত্তম ফিল্ম স্টুডিও বেংগল স্টুডিও এখন পানিতে ভাসছে। স্টুডিওর চারধারে পানি। চত্বরে পানি। ফ্লোরে পানি। আর তাই সুটিং বন্ধ।

—আনওয়ার আহমদ

বিদেশী ছবি

ডেথ অফ এ লুম্বেরজ্যাক

জিলেস কার্লে পরিচালিত উপরোক্ত নামের ক্যানাডিয় ছবিটি নানা দিক দিয়েই চাঞ্চল্যকর এবং বিতর্কমূলক। পরিচালক বলেছেন, সমাজের উঁচুতলার সেই সব মানুষদের মুখোস খুলে দেওয়া হয়েছে যারা নানা ছুতোয় যুবতী মেয়েদের হাতের মুঠোর মধ্যে এনে তাদের যথেচ্ছভাবে ব্যবহার ও উপভোগ করে এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাদের ঠেলে দেয় সেই জীবনে, যেখানে মেয়েদের বেঁচে থাকার একমাত্র পথ বেশ্যাবৃত্তি।

পিতার অন্বেষণে বেরিয়ে একটি কুসুমের মত মেয়ের স্বপ্নভ্রষ্ট জীবনের কাহিনী নিয়ে তৈরী এই 'ডেথ অব এ লুম্বেরজ্যাক'।

তার হারিয়ে যাওয়া পিতাকে খুঁজতে খুঁজতে (বিস্ময়ের ব্যাপার যে মেয়েটি এই চরিত্রে অভিনয় করেছে, যার আসল নাম ক্যারেল লরী ব্যক্তিগত জীবনে সেও একদা নিজের হারিয়ে যাওয়া পিতাকে খুঁজতে খুঁজতে মনট্রিলে এসে পৌঁছয়। এখান থেকেই তার চলচ্চিত্র অভিনয় জীবন শুরু।) এসে একজন বুদ্ধিজীবী পত্রিকা সম্পাদকের সঙ্গে পরিচিত হয়। (প্রকাশ, এই বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তার লাইব্রেরীতে তোলা একটি দৃশ্যের সঙ্গে ভারতীয় ছবি 'রবি'র একটি দৃশ্যের আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়) মেয়েটি গান জানত। সে একটা চাকরী চায় তার কাছে।

পরবর্তীকালে সে গায়িকার চাকরীই পায় বটে কিন্তু তা অন্যরূপে। নাইট ক্লাবে টপলেস গায়িকার চাকরী। সেই প্রথম তার জীবনে পরিবর্তন আসে।

সেই বুদ্ধিজীবী একদিন মেয়েটিকে সরিয়ে এনে তাকে মডেলের চাকরী দেয়। এই সময় মেয়েটি ঐ ভদ্রলোকের মনোরঞ্জনের জন্য (উক্ত বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোকটিকে পরিচালক কাগজে সম্রাট বা পেপার কিং বলে ব্যঙ্গ করেছিল। অর্থাৎ এরা অক্ষম হয়েও শক্তিমান বা উপদেষ্টা উপকারী বন্ধুর ভান করে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে থাকেন, এটাই পরিচালক বলতে চেয়েছেন।) তার সামনে বিবস্ত্র হয়েও নেচেছে। আসলে মেয়েটি তখন তার মুঠোর মধ্যে এবং আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট।

শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে তার প্রেমিক প্রতিবেশী এক বামপন্থী মহিলা সাংবাদিক এবং তার পিতার এক পুরনো মিস্ট্রেস ও নাইট ক্লাবের মালিক নিয়ে গেল এক লুম্বেরজ্যাক ক্যাম্পে। সেখানে গিয়ে মেয়েটি দেখল যে তার পিতাকে হত্যা করা হয়েছে।

এই মৃত্যু যেমন তাকে শোকে আকুল করল তেমনি তার জীবনে অন্যভাবে নেমে এলো স্বস্তি, তার সেই অন্বেষণের দিন শেষ হোল বলে।

মেয়েটি তখন তার প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হোল নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়।

ছবিতে ন্যুড দৃশ্য এবং ক্যাট ড্যান্স অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে। যৌনাচারের দৃশ্যও এতে কম নেই। আর একটা দুঃসাহসিক কথা বলেছেন পরিচালক এই ছবির মাধ্যমে, সেটা হোল, ক্যানাডার এক জাতের লোক এই ধরনের বেওয়ারিশ অসহায় মেয়েদের লোভে তাদের ঘর সংসার পর্যন্ত ছেড়ে আসতে পেছ-পা নয়।

সন্দেহ নেই, একটা জাতির পক্ষে এটা এক ধরনের অবক্ষয় এবং বিপর্যয়ের লক্ষণ।

ইসাবেল

জেনেভিভ বুজোল্ড অভিনীত 'ইসাবেল' সম্পূর্ণ অন্য স্বাদের ছবি। পরিচালক পল এ্যালমণ্ড।

নায়িকা ইসাবেল চেয়েছিল তার অতীতকে ভুলে শহরে স্থায়ীভাবে বাস করবে। এবং নতুনভাবে জীবনযাপন করবে। কিন্তু তার সে ইচ্ছার স্বপ্ন ভেঙে যায় মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। তাকে শোকপালনের জন্য যেতে হোল আপন গ্রামের বাড়িতে। সেখানে গিয়েই সে জড়িয়ে পড়ল। নিঃসঙ্গ এক আত্মীয়ার দায়িত্ব নিয়ে সেই বাড়িতেই থেকে যেতে হোল তাকে। এর পর থেকেই তার বাবা এবং [illegible] রহস্যজনক মৃত্যু এবং নির্জন বাড়ির ওপর অদৃশ্য শক্তির ছায়া তাকে বিভ্রান্ত করে তুলল। নিষ্ঠুর কি নিষ্ঠুর পরিহাস, ইসাবেল চেয়েছিল সুখী নিরুপদ্রব শহুরে জীবন, বিনিময়ে তাকে যাপন করতে হোল গ্রামীণ আতঙ্কজনক অসহায় জীবন। সেটা সবচেয়ে বড় [illegible]।

ছবিটি ভয়াল পরিবেশ তৈরি করে একটা সত্যি পরিণতিতে দর্শককে পৌঁছে দিয়েছে। কিছুটা আধিভৌতিক, কিছুটা এক-শ্রেণীর প্রতিহিংসাপরায়ণ গ্রামীণ মানুষের মানসিকতা ছবিতে স্থান পেয়েছে। অসহায় ইসাবেল যার শিকার হয়েছে। (নায়িকার চরিত্র-চিত্রণ ছবিটির সম্পদ।)

ছবিতে এসব ছাড়াও যে কথাটি বড় করে বলা হয়েছে, তা হোল মানুষের ইচ্ছার মূল্য ও ভাগ্য। যেখানে মানুষের কোন হাত নেই। —শা-র-চ

বিবিধ সংবাদ

পক্ষকালব্যাপী যাত্রা উৎসব :

সম্প্রতি মহাজাতি সদনে পনেরো দিন-ব্যাপী এক যাত্রা উৎসব হয়ে গেল। বিভিন্ন দল বিভিন্ন ধরনের পালার অনু-ষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই উৎসব মোট ৪১ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে। জানা গেল যে, এই টাকা দিয়ে কোনও একটি হাস-পাতালে যাত্রা শিল্পীদের জন্য একটি শয্যা সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করা হবে, বাকী টাকাটা আপাতত জমা থাকবে অদূর ভবিষ্যতে একটি স্থায়ী যাত্রামঞ্চ নির্মাণের জন্য। যাত্রা উৎসবের সমাপ্তিতে যুগান্তর-সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও যাত্রা সংসদের সভাপতি শ্রীতিনকড়ি গাঙ্গুলী ভাষণ দেন।

আফগানিস্থানের উৎসবে সুমিত্রা মিত্র :

এই বছরেই সর্বপ্রথম আফগানিস্থান সরকারের পক্ষ থেকে বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক আন্তর্জাতিক উৎসবের আয়োজন করা হয়। এ উৎসবে বাংগালী শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র সুমিত্রা মিত্র আমন্ত্রিত হয়েছিলেন—ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলে-শনের মাধ্যমে। তাঁর কত্থক নৃত্য ওখানের সাংবাদিক রসিক ও গুণীমহলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছে।

জলসা

'পরিশোধে'র আলোয় শ্যামা

আজও কবিগুরুর শ্যামা জনপ্রিয়তার শিখরে। কিন্তু বহু প্রযোজিত বহু পরিবেশিত এবং বহু প্রচারিত হওয়ার ফলে এই নৃত্যনাট্যের উক্ত আবেদন কিছু যেন স্তিমিত। বোধহয় সেই কথা স্মরণ করেই উদয়শংকর গ্রুপের অন্যতম শিল্পী সাধন গুহ শ্যামাকে উপহার দিলেন নতুন রূপে। আঙ্গিকে ও পরিকল্পনায় রবীন্দ্রসদন মঞ্চে। ইন্ডিয়ান কালচারাল গ্রুপের ব্যানারে।

সাধন গুহ গতানুগতিক নৃত্যনাট্যের ধারায় না চলে জোর দিয়েছেন কাব্যনাট্যের প্রতি। কাব্যের ছন্দ লেগেছে বক্তব্যে। তাই প্রতিটি চরিত্র যেন দুলে উঠেছে হাওয়ায় উতল মঞ্জরীর মত। নৃত্য রচনার কৃতিত্ব প্রাপ্য অবশ্যই সাধন গুহের কিন্তু এ পাওনার আর দুটি অনস্বীকার্য অংশীদার হলেন পার্থ ঘোষ ও শ্যামল সেনগুপ্ত, নাট্যরূপ রচনার জন্য।

উত্তীয় কাহিনী উন্মোচনে ফ্ল্যাশব্যাক টেকনিকের ব্যবহারে শুধু নাটকীয়তা নয় শিল্পবোধের ছোঁয়াও লেগেছিলো।

আর এক চিত্তস্পর্শী মুহূর্ত রচিত হয়েছিল যখন বজ্র সেনকে কারাগার থেকে মুক্ত করবার সময় শ্যামাকে তাঁর কৃতজ্ঞতা-সিক্ত **দয়াময়ী** সম্বোধনের উত্তরে আত্মধিক্কৃত কলহাসির সঙ্গে উচ্চারিত আমি **দয়াময়ী?**-তে অনুরণিত শ্যামার হৃদয় চিত্রণে।

সেই হাসির অর্থ সুপরিস্ফুট হোলো নৃত্যনাট্যের শেষাংশে যখন বজ্রসেনের কোন দুঃসাধ্য বলে এ প্রাণ বাঁচালে? প্রশ্নের জবাবে শ্যামা বর্ণনা করে সেই নিদারুণ কাহিনী—শ্যামার ব্যর্থ প্রেমে মত্ত উত্তীয় হয়ে যে নীরবে প্রাণ দিয়েছে।

নৃত্যরচনায় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন সাধন গুহ—কথাকলি মণিপুরীর মাঝে মাঝে লোকনৃত্যের ললিত প্রয়োগে।

কখনও কানাড়া কখনও ভৈরবী কখনও কেদারা কখনও বা পিলুর সুরে কাব্যমধুর পটভূমিকা রচনা করেছেন দীনেশ চন্দ।

শ্যামা ও বজ্রসেনের ভূমিকায় পলি ও ও সাধন গুহ তাঁদের উচ্চমান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কোটালের ভূমিকায় শিবশংকরম অতুলনীয়।

শ্যামার গান বনানী ঘোষের কণ্ঠে সুপরিবেশিত। সমান প্রশংসার দাবীদার বজ্র সেন ও উত্তীয়ের গানে দ্বিজেন মুখার্জি ও শৈলেন মুখার্জি।

চরিত্রগুলিকে সংলাপ সমৃদ্ধ করেছেন গৌরী ঘোষ পার্থ ঘোষ ও সুবীর মিত্র।

কনিষ্ক সেনগুপ্তের আলো কাহিনীকে যথাযোগ্য আলোদান করেছে।

পুজোর রেকর্ড (দ্বিতীয় পর্যায়ে)

দ্বিতীয় পর্যায়ে পুজো রেকর্ডের বিশেষ আকর্ষণ তিনটি সুপার সেভেন ও একটি ই পি ডিস্ক।

সুপার সেভেনের একটি ডিস্কে শোনা গেলো কল্পনা ব্যানার্জির সেই ছড়াগান যা একদিন বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করেছিলো—হাটিমা টিম্ টিম্, ময়না না ময়নামতী ময়নাবতী সরস্বতী ও আলপুরের কাজল মেয়ে।

আলপনার মধুর কণ্ঠের এই গানগুলি চিরন্তন, এই কথাটিই নতুন করে অনুভব করা গেলো। এই সঙ্গে নচিকেতা ঘোষের সংগীত জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়কেও পাওয়া যায়। উপরিপাওনা হিসেবে শুনতে পাওয়া যায় অভিজিত ব্যানার্জির সুরের একটি গান।

* বেগম আখতারের আগের বাংলা ঠুংরী জোছনা করেছে আড়ি—প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো। এবারের গাওয়া চারটি সুপার সেভেন ডিস্কের বাংলা গানগুলি এই ধরনের গানে তাঁর সেই অধিকারকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সুর ও রচনা—রবি গুহমজুমদার।

বাংলা গানের একটি বিশেষ ধারার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে প্রবীণা ও নবীনা দুই শিল্পীর কণ্ঠে ছটি অতুলপ্রসাদের গান ডিস্কবন্ধ করে। ভক্তি ও রোমান্টিক ভাবের এই বিভিন্ন গানগুলি গেয়েছেন শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্তা ও কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়।

আর এক আনন্দের বিস্ময় হলো একটি ই পি ডিস্কে শ্রীমতী রুমা গুহঠাকুরতার পরিচালনায় ক্যালকাটা ইয়থ কয়্যারের চারটি কোর্যাস। এর মধ্যে মধ্যমণির মত ঝলমল করছে রুমা গুহঠাকুরতার কণ্ঠে ও গংগা তুমি বইছ কেন?—যে গানের আবেগব্যাকুল আবেদনে তিনি শুধু সারা ভারত নয়—সাগরপারের দেশের মানুষের চিত্ত জয় করে এসেছেন। ইয়ুথ কয়্যারের নতুন সংযোজনা ট্রেনের গানটিও এতে আছে ট্রেন চলার গতি ও ছন্দে। মুগ্ধকারী অনুষ্ঠান পরিবেশনার ক্ষেত্রে ইয়ুথ কয়্যারের জনপ্রিয়তা শীর্ষস্থানীয়। এই ডিস্কের গানগুলিও অনুরূপ জনপ্রিয়তা অর্জন করবে বলেই মনে হয়।

তরুণ গোষ্ঠীর জন্য আছে একটি বিশেষ উপহার। সুপার সেভেন ডিস্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গীটারে শোনা যাবে অনেকগুলি হিন্দী ছবির গানের সুর। বলা বাহুল্য সব কটিই হিট সং।

যে যে ছবির গান গাওয়া হয়েছে সেগুলি হলো ম… পান্না নয়ন-হারায় আনন্দ আগ্যানে লাগ যা ও মেরা-আপনা।

এস পি রেকর্ডগুচ্ছে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি গান তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিকতায় পরিবেশিত। সুরকার ও গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুধীন দাশগুপ্ত।

নচিকেতা ঘোষ রচিত সুরের মাতন যথাযোগ্যভাবেই প্রতিধ্বনিত হয়েছে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় গীত দুটি গানে। গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

পিন্টু ভট্টাচার্যের এবারের গানেও তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ আছে। গান দুটির রচয়িতা ও সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নির্মলা মিশ্র এবং বনশ্রী সেনগুপ্ত দুজনেই তাদের যথাযথ আকর্ষণীয় ভংগীতেই গেয়েছেন দুটি করে গান। নির্মলা গেয়েছেন নচিকেতা ঘোষের সুরে: বনশ্রী সুধীন দাশগুপ্তের। গানগুলি যথাক্রমে শ্যামল গুপ্ত ও সুধীন দাশগুপ্ত।

—চিত্রাঙ্গদা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 11th October, 19
Phone 55-5231 (14 lines)

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

১৮ অক্টোবর ১৯৭৪ ।। মূল্য ৬৫

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সংগে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১৪ বর্ষ

অমৃত

সংখ্যা ২৪

ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

Friday 18th October, 1974 শুক্রবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৮১

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : ধ্রুব রায়

স

সম্পাদকীয়

সৌহার্দের এলাকা সম্প্রসারণ

ইরাণের শাহানশা এবং শাহবাণুর সাম্প্রতিক দিল্লি সফর আমাদের দুই দেশের মৈত্রী বন্ধনকেই শুধু দৃঢ় করে নি, এশিয়ার এক বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সৌহার্দ সম্প্রসারণে তা সহায়তা করল। ভারতের সঙ্গে ইরাণের সম্পর্ক অদূর অতীতে নানা কারণেই একটু জটিল হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের হামলার সময় ইরাণ ভারতের প্রতি ছিল বিরূপ। ইরাণ ও পাকিস্তান একই সামরিক জোটের শরিক হওয়ায়, ইরাণের ধারণা হয়েছিল যে, বাংলাদেশের অভ্যুত্থানে সমর্থন জানিয়ে ভারত ইচ্ছা করেই পাকিস্তানের অঙ্গহানি ঘটিয়েছে। পাকিস্তানকে ইরাণ অস্ত্রশস্ত্র সাহায্যও দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ইরাণের ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়। আজ এটা খুবই সুখের কথা যে ভারত ও ইরাণ পরস্পরেব খুব কাছাকাছি এসেছে এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়েও দুই দেশের সরকারের মধ্যে গভীর ঐক্য স্থাপিত হয়েছে।

ইরাণের শাহ পরিষ্কার ভাষায় এই আশ্বাস দিয়েছেন যে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্য তিনি দেবেন না। এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি স্থাপনে সর্বপ্রকার সহযোগিতা দিয়েছেন তিনি। আমাদের দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যে বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল তার অবসান হওয়ায় ভারত ও ইরাণের পক্ষে একসঙ্গে এক সমআদর্শের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হবে। পাকিস্তানের অনিষ্ট করা ভারতের নীতি নয়। কিন্তু পাকিস্তানকে বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠি সামরিক জোটে ভিড়িয়ে ভারতকে নাস্তানাবুদ করার অপচেষ্টা করে আসছে এই রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই। কে না জানে ভারতের অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীর রাজ্যের ওপর হানাদার লেলিয়ে দিয়ে তার অর্ধেক কুক্ষিগত কব্জা করে রেখেছে পাকিস্তান। এখনও তার মীমাংসার জন্য কোনোরূপ আগ্রহ নেই পাকিস্তানের। যাই হোক, ইরাণের শাহের আশ্বাস ভারতকে এই স্বস্তি দেবে যে, ইসলামের ধুয়া তুলে কিংবা সামরিক জোটের শরিক বলে সে আর কথায় কথায় ইরাণের কাছে ছুটতে পারবে না ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য।

ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা করার জন্য ভারতের প্রচেষ্টার প্রতি ইরাণের শাহের সমর্থন একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। বৃহৎ শক্তিবর্গের নজর পড়েছে ভারত মহাসাগরের ওপর। দিয়েগো গার্সিয়ায় মার্কিন ঘাঁটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত এই মহাসাগরের জলকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। ভারতবর্ষ বার বার রাষ্ট্রসংঘের কাছে প্রস্তাব রেখেছে ভারত মহাসাগরকে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত শান্তির এলাকা বলে ঘোষণা করা হোক। নিষিদ্ধ করা হোক বৃহৎ শক্তির আনাগোনা এবং নৌঘাঁটি নির্মাণ। শক্তিমদমত্ত রাষ্ট্র আমেরিকা তাতে কান দেয় নি। তার ফলে উপকূলবর্তী দেশগুলোর মনে গভীর আশংকা দেখা দিয়েছে। ইরাণের শাহ ভারতের সঙ্গে একমত হয়ে ঘোষণা করেছেন যে, ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা হিসেবে গণ্য করতে হবে। এই অঞ্চলে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হলে রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুযায়ী তার মীমাংসা করতে হবে বাইরের হস্তক্ষেপ চলবে না। দক্ষিণ এশিয়ায় যাতে স্নায়ুযুদ্ধের প্রসার না ঘটে তার উদ্দেশ্যেই ভারত ও ইরাণের এই যৌথ উদ্যোগ।

কারিগরী ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রেও দুই দেশের মৈত্রী নিবিড়তর হয়েছে। এর দ্বারা আমাদের দুই দেশই লাভবান হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিয়েও ইরাণের সঙ্গে ভারত একমত। মানব কল্যাণের জন্য পারমাণবিক শক্তি নিয়োগ ভারতের লক্ষ্য এবং এর জন্যই ভারতের পরমাণু-বিজ্ঞানীরা কাজ করে যাচ্ছেন। ইরাণের শাহ ভারতের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হয়ে ঘোষণা করেছেন যে শান্তিপূর্ণ কাজে পরমাণু শক্তির ব্যবহার কোনো কোনো রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারে থাকতে পারে না। সবাই এ সম্পর্কে পরীক্ষা চালাবার অধিকারী। আশা করা যায়, ভারত ও ইরাণের এই মৈত্রী ঘোষণা পশ্চিম এশিয়া থেকে শুরু করে গোটা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মৈত্রী ও সৌহার্দের এলাকা সম্প্রসারণে সহায়তা করবে।

সাদা পায়রা

সমীর রক্ষিত

ম্যাজিসিয়ান হাতের তালুতে কষে খৈনী ডলছে। তার পরণে হাতকাটা গেঞ্জি আর নীলচে বিবর্ণ তাঁতের লুংগি। ম্যাজিসিয়ানদের এরকম দেখতে ঠিক স্বাভাবিক লাগে না। বস্তুতঃ ম্যাজিসিয়ান পরিমল একটা গলাবন্ধ লম্বা কোট আর সাদা চুস্ত পরে যখন ম্যাজিক দেখায়, তখন তার মাথায় থাকে রাজকীয় মুকুট, হাতে যাদুদণ্ড; চালচলনে আর কথার তুবড়ি ফোটানোর ভঙ্গিতে সে তখন যথার্থই রাজার মত স্মার্ট কিম্বা তারও চেয়ে বেশী, অনেকটা অবতারের মত। সে তখন যা-খুশী-তাই করতে পারে। তার হাতের তুকে জ্যান্ত পায়রা ডিম হয়ে যায়। এবং ডিমটা সে টেনে বের করে ডেকে-স্টেজে-তোলা কোন বালকের পেট থেকে। পরমুহূর্তেই ডিমটা ফের পায়রা হয়ে ডানা ঝাপটায় দুমুখ-খোলা টিনের ভেতরে। যেন সমস্ত পৃথিবী তখন ম্যাজিসিয়ানের আজ্ঞাধীন।

এমন যার অলৌকিক ক্ষমতা, সে হোটেলের বারান্দায় বসে হব-হব সন্ধ্যায় খৈনী টিপছে।

আর তখনই আরেক পশলা গোঁয়ার বৃষ্টি ঝেঁপে আসে, যেন দূর থেকে ঝাঁক ঝাঁক পঙ্গপাল ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে টিনের চালে। এমনি চলছে দিনকয়েক —ঝরছে থামছে ফের ঝরছে। আকাশের মুখটা হাঁড়িপানা।

বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে তারক বলে—'পরীবাবু, ম্যাজিক দিয়ে বৃষ্টিটা বন্ধ করে দিতে পারেন না?'

প্রথম যেদিন ম্যাজিসিয়ান এল, তারক খুব পেছনে লেগেছিল—'ম্যাজিক; কী ম্যাজিক দেখান আপনি। ভোজবাজি?' 'ভানুমতীর খেল?'

পরিমল পায়ের কাছ থেকে একটা খোয়া তুলে এগিয়ে দিয়ে বলেছিল—'নিন খান, কলকাতার ভীম নাগের সন্দেশ।'

তারক স্পষ্ট দেখল একটা নিটোল লোভনীয় সন্দেশ, তবু হাতে নিয়ে দ্বিধা করছিল।

ম্যাজিসিয়ান তার চোখের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়েছিল—'খান। খেয়ে ফেলুন।'

তারক মোহাবিষ্টের মত খোয়া চিবুতে সুরু করেছিল। পাশে বসে হোটেলমালিক শৈলেন হাততালি দিয়ে উঠেছিল।

ফলে তারক আর তাকে খুব এলে-বেলে ম্যাজিসিয়ান বলে উড়িয়ে দিতে পারে না।

'এই শালা পচাবিষ্টি মাইরি জনালাচ্ছে দিন না বন্ধ করে? কী পরীবাবু?'

খৈনী মুখে পুরে বুঁদ হয়ে বসে আছে ম্যাজিসিয়ান, তারক তার কাঁধে হাত রাখে।

মুখ ফিরিয়ে তাকায় পরিমল, তারক একটু থমকায়। হিপ্নোটাইজ করা চোখ নয়, মাছের চোখের মত লালচে কাঁচের ডেলার মত নির্বোধ দুচোখ।

'কী দাদা, কী হল? মনটন খারাপ নাকি? বৌদির চিঠি এসেছে বুঝি আজ?'

ম্যাজিসিয়ান দেয়ালে মাথা হেলিয়ে দেয়, তার মুখটা হাড়উঁচু, বড়সড়, চুলগুলিতে পাক ধরেছে, গালও ভাঙ্গা কিন্তু চোখ দুটি কোটরগত হলেও টানা টানা বড়—স্বপ্নদেখা চোখের মত বিষণ্ণ।

ম্যাজিসিয়ান চাপা হাসি হেসে বলে—'মনটাকে তারকবাবু তুক করে দিয়েছি, এখন ওটা ঐ ফুলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।' হাত টান করে বারান্দার বাইরে সুপুরী গাছের গোড়ায় লাল কলাবতী ফুল দেখায় সে।

ম্যাজিসিয়ানের ব্যাপার, তারক আধা বিশ্বাসে ফুলের দিকে তাকায় বৃষ্টিতে ভিজছে, টপ টপ করে জল ঝরছে হাওয়া-নাড়া ফুল থেকে, ঠিক জলে ভেজা মানুষের চোখের মত। ফুলটা দেখে তারকের স্থির বিশ্বাস জন্মে যায়—ম্যাজিসিয়ানের আজ মন ভাল নেই।

আজ পরিমলের মনটা যথার্থই খারাপ। মোহিতনগর স্কুলে খেলা দেখাতে গিয়েছিল আজ সে।

হেডমাষ্টার গতকাল তাকে প্রায় হাঁকিয়েই দিয়েছিল—'ছেলেরা না খেয়ে স্কুলে আসে মুখ দেখলে বুঝতে পারি মশাই, ম্যাজিক দেখার পয়সা চাইতে পারব না।'

অনেক বলাকওয়ার পরে দশটা করে পয়সা আনার জন্য ছেলেদেরকে বলেছিল শেষ পর্যন্ত হেডমাষ্টার, কিন্তু দুচারজন ছাড়া কেউ আনেনি। বৃষ্টি ছিল ছাত্রদের বেশীর ভাগ আসেনি। শেষ পর্যন্ত হেড মাষ্টার নিজের পকেট থেকে দশটি টাকা দিয়েছে।

আগে একটা স্কুলে কম করেও চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা হত।

'আপনাদের নর্থ বেঙ্গলের বৃষ্টির মাবাপ নেই মশাই, যখন খুশী তখন নামে।'—পরিমল বৃষ্টির দিকে চোখ রেখে বলে।

'এবারে লেটে নামল, কিন্তু ঝাপটখানা দেখুন তিন দিনেই বন্যা, মণ্ডলঘাট ভেসে গেছে—বার্নেশ ঘাট দোমোহিনীর অবস্থাও খুব খারাপ। আপনাকে বললাম ম্যাজিকের বাণ মারুন—'

উদাস গলায় পরিমল বলে—'আর ম্যাজিক, ম্যাজিক ফ্যাজিকে আর চলছে না মশাই। পুরুলিয়া বাঁকুড়া গেলাম, সেখানে খরা, আর এখানে বন্যা। দেশেগাঁয়ের কী হাল হয়েছে। আগে একেকটা শোতে নাই নাই করেও চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা উঠত, এখন ইস্কুলটিস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়, বলে—ম্যাজিক দেখাতে চাও দেখাও কিন্তু বাপু, পয়সা ফয়সার কথা বলো না।'

পেটে ভাত জোটে না পয়সা দেবেই বা কোত্থেকে বলুন? আপনারা কলকাতার লোক তাও র‍্যাশনটা পান ঠিক ঠিক মত, আমাদের তো না র‍্যাশন, না খোলাবাজার। সাড়ে চার চালের কেজি, আটা আড়াই।' বলে নিভে যাওয়া বিড়ি বৃষ্টির জলে ছুঁড়ে ফেলে তারব।

'সব জেলাতেই এক অবস্থা। আমি তো সারা বাংলা দেশ চষে বেড়াচ্ছি।'—ম্যাজিসিয়ান আনমনে বলে উদাস গলায়।

হোটেলের ভেতর-বারান্দা থেকে পায়রার বকবকম আর ডানা ঝাপটানের শব্দ ওঠে, বৃষ্টি পড়ার পর থেকেই শব্দটা আসছে, অথচ তারক অবাক হয়ে লক্ষ্য করে ম্যাজিসিয়ান কোন গা করছে না।

এতদিন সে দেখেছে পায়রাগুলোর একটু শব্দ হলেই ম্যাজিসিয়ান ছুটে গেছে, বলেছে—

'শালা একটা হুলো পেছনে লেগেছে বুঝলেন?'

তারক বলে—'আপনার পায়রাগুলো বোধহয় ভিজে যাচ্ছে ম্যাজিসিয়ান।'

'ভিজুক, আর ভাল্লাগে না শালা পায়রাবাজি।' ম্যাজিসিয়ানের কথা শুনে শৈলেন হেসে ওঠে।

'কী হল ম্যাজিকবাবু! পায়রার ওপর এত রাগ?'—শৈলেন হোটেলের ভেতর থেকে বোধহয় রাতের রান্নার তদারকি করে ফেরে, ম্যাজিসিয়ানকে বলে—'আপনি ব্যানার্জি সাহেবের মত ম্যাজিক সুরু করুন, দেখবেন খেলা কীরকম জমে।' শৈলেন অর্থপূর্ণ হাসি হাসে।

তারকের দুচোখ ফুলের ওপরে বসা প্রজাপতির মত রঙীন হয়ে ওঠে সে বলে—'সুরু হয়ে গেছে?'

'আমার হোটেলে শালা পুলিশের ফুলিশের হুজ্জুৎ হবে মাইরি, ব্যানার্জি আমাকে সুদ্ধু ডোবাবে। মেয়েটাও তেমনি—ছেনালি সুরু করেছে—শৈলেন পান মুখে দোক্তা ফেলে।

'কাজ বাজ হচ্ছে নাকি রে শৈলেন? একটু দেখে আসব?'—তারক উঠে পড়ে উত্তেজিতভাবে।

পানের রসে ভরা মুখে শৈলেন বলে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলাম মেয়েটা চিৎ হয়ে শুয়ে ছেনালের মত হাসছে আর ব্যানার্জি প্যান্ট ছেড়ে লুঙ্গি পরছে—'

'মাইরি, তার মানে এখন আসল কাজ হবে, আমি যাচ্ছি ভাই—একটু চোখ জুড়িয়ে আসি।'—তারক প্রায় লাফ মারে।

শৈলেন কড়া ধমক দেয়—'রোস ব্যাটা, ব্যানার্জি শালা অত বোকা নাকি? দরজা জানালা বন্ধ করে লাইট নিভিয়ে দেয়।'

তারক মুখ শুকনো করে বসে পড়ে। প্রথমতঃ শৈলেন তার বন্ধু হলেও হোটেলের মালিক, তার অমতে সে গিয়ে আড়ি পাততে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তারক যে চা-বাগানে টাইপিষ্টের কাজ করত, সে বাগানটা পনের দিন আগে বন্ধ হয়ে গেছে। বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে দাদার ঘাড়ে এসে চেপেছে তারক। পারতপক্ষে বাড়ি যায় না। শৈলেনকে তোয়াজ করে সারাদিন, যদি কোন একবেলা খাবারটা জুটে যায় হোটেলে। ফলে সে বসে ফের একটা বিড়ি ধরায়। কিন্তু তার মনটা পড়ে থাকে ব্যানার্জির ঘরে।

'ব্যানার্জির এলেম আছে এটা তোকে মানতেই হবে শৈলেন, মালটা কিন্তু ভাল পটিয়েছে— তারক দু ঠোঁটে বিড়িতে কড়া চাপ দিয়ে ধোঁয়া টানে।

'বিকাশ ডাক্তার যদি টের পায় না ব্যানার্জিকে প্যাঁজাতে পারবে।' উঠে গিয়ে একমুখ লাল থুথু ফেলে শৈলেন বৃষ্টির মধ্যে। শুকনো মুখে বলে—'আমি বুঝি না এত বড় একটা ডাক্তারের মেয়ে হয়ে এরকম চট করে পটে যায় কী করে?'

'কেন?'—তারক সোজা হয়ে বসে, বলে—'কেন ব্যানার্জি ছেলেটা খারাপ কিসে? হিরোর মত ফার্স্ট ক্লাস চেহারা তার ওপর বড় কোম্পানীর রিপ্রেজেনটেটিভ—পকেটভর্তি টাকা। আজকাল আসল জিনিসটা হো অই বাবা, টাকা। টাকা থাকলে তুই যা খুশী তাই করতে পারিস।'

খ্যা খ্যা করে হাসে তারক, ম্যাজিসিয়ানকে আঙ্গুলে খোঁচা দিয়ে বলে—'কী ম্যাজিকদা, ঠিক বলিনি?'

ম্যাজিসিয়ান লাল কলাবতী ফুলে জলপড়া দেখছিল, শুনছিল সব; এবার মুখ ঘোরায় খৈনীর নেশায় বুঁদ চোখে তাকিয়ে বলে—'শুধু টাকা না, মেয়েরা গুণীলোকদের পছন্দ করে।'

'বাজে কথা, মেয়েরা ওসব গুণফুণের ধার ধারে না।'—তারক খেঁকিয়ে ওঠে।

শৈলেনের মুখে ফের লালা জমে উঠছে, সে নীচের ঠোঁট সামনে উঁচিয়ে বলে, 'ম্যাজিসিয়ান খুব বেঠিক কথা বলেনি। তবে কী জানো ম্যাজিসিয়ান, শুধু গুণফুণও কিচ্ছু না, যদি ট্যাঁকে তোমার মাল না থাকে।'

কী যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল ম্যাজিসিয়ান কিন্তু থমকে যায়। কথাটি বলে না। শান্তির কথা মনে পড়ে।

আসলে এতক্ষণ সে শান্তির কথাই ভাবছিল। সেই তরুণী শান্তির কথা—কবেকালের কথা। তবু মনে হয় এই তো গতকাল যেন ঘটে গেছে সব। পঁচিশটা বছর এর মধ্যে কখন হাতের

ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে গেছে টেরই পাওয়া গেল না।

পঁচিশ বছর আগে তখন তার নিজের বয়েস কুড়ি একুশ, ভরা যৌবন শরীরে, আর শান্তি ষোল বছরের তরুণী। সদ্য সদ্য যৌবনের সবুজ জমিতে পা দিয়েছে শান্তি। সারা শরীরে কুঁড়ি ফাটিয়ে পাপড়ি ছড়াবার জৌলুশ, কথায় আর চোখের ধারে যেন সৌরভ ছড়ায়। বিষ্ণুপুরের এক গাঁয়ের হেডমাস্টারের বাড়িতে থেকে ইস্কুলে ইস্কুলে ম্যাজিক দেখাচ্ছে পরিমল। তার হিপ্নোটিজম্-শেখা চোখের দিকে চোখ রেখে পাগল হয়ে গেল সেই সদ্যযুবতী মেয়ে শান্তি।

সে বছর নয়, তার পরের বছর আবার গেল পরিমল খেলা দেখাতে। কিন্তু সব খেলা দেখানো শেষ করার আগেই নিজে এক মারাত্মক খেলায় ডুবে গেল। শান্তি ঘর ছেড়ে চলে এল গভীররাতে তার হাত ধরে।

সেদিন কুয়াশাভরা গভীর শীতের রাতে, ফসলে-উপচেপড়া ক্ষেতের আলপথ ধরে দুজনে হোঁচট খেতে খেতেও মনে হয়েছিল এ-পৃথিবী বড় শান্তিময়—প্রেমের সুঘ্রাণে উত্তেজিত। আকাশময় অজস্র তারার চোখ জ্বলছিল সে রাতে মিটমিট করে।

পরিমলের মনে হয়েছিল পৃথিবী নয়—সে ঘুমের মধ্যে স্বর্গের স্বপ্ন দেখছে। সে যেন সমস্ত পৃথিবীটাকে হিপ্নোটাইজ করে দিয়েছে। পরিমলের বুকজুড়ে তখন শুধু স্বপ্ন, সে আর গ্রাম শহরের ইস্কুলে ইস্কুলে নয় কিম্বা কলকাতার ফুটপাথে নয়, বড় বড় হলে শো দেখাবে, শুধু কলকাতা বম্বে না, যাবে ফ্রান্স ইংলণ্ড আমেরিকা জাপানে। পিন্স-সরকার হবে সে। শান্তি তার খইফোটা ঠোঁটে চারবেলা চুমু খেত।

পঁচিশ বছরে স্বপ্নের সন্দেশ এখন খোয়া হয়ে পায়ের তলায় ফুটছে অহরহ। চোখ বেঁধে ছোঁড়া তীর এখন নিজের ক[illegible] করছে। দিনরাত্রি টুপটাপ করে রক্ত ঝরে যাচ্ছে ফোঁটায় ফোঁটায়, কেউ দেখে না, কেউ জানে না শুধু সে জা[illegible] পরিমলের অন্তরাত্মা জানে শুধু।

টালিগঞ্জের হরিপদ দত্ত লেনের খোলার চালের ঘরে দিনরাত শান্তির সঙ্গে [illegible] অশান্তি হয়। চল্লিশ বছরের নয় যেন ষাট বছরের বুড়ি এখন শান্তি। [illegible] গঞ্জনা দেয়, দাঁতমুখ খিঁচোয়, অভিসম্পাত দেয়।

'কী ম্যাজিক, এমন বেগুনবেচা মুখ কেন?' —শৈলেন কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে—'ব্যানার্জির প্রেমলীলা দেখবে নাকি চলো। কাঠের দেয়ালে ফুটো আছে—যুযুৎসু দেখবে, ওঠ।' —জর্দার ঝাঁঝালো গন্ধ ভুরভুর করে জলো বাতাসে।

খৈনীর নেশাটা আজ [illegible] এসেছে,—মাথার ভেতরে রক্তস্রোত বনবন করে ছুটে বেড়ায়। [illegible]

পাথরের মত ভারী হয়ে ঝুলে থাকে।

দুহাতে নিজের উরু দশ আঙ্গুলে খামচে ধরে তারক বলে চিবিয়ে চিবিয়ে 'গভর্মেণ্ট যদি বাগানটা ন্যাশনালাইজ' করে নেয়, আবার যদি চাকরীটা ফিরে পাই না শৈলেন, দেখিস সালা লাইফটা আবার নতুন করে স্টার্ট দেব, যা পারে হাতের কাছে সারা শরীরে চোখ দেখা।' —বলে নিজের শুকনো দুঠোঁট [illegible] তারক। তার চোখ-মুখ টসটসে। টান টান শিরা পেশী।

মেঘের থেকে বিদ্যুৎ-ঝলকে বজ্র লাফ মারে মাটিতে, মাটি কেঁপে ওঠে। হু-হু শব্দে হাওয়া ছোটে চারিদিকে এলোমেলো রক্তমুখ পিশাচের মত। তোড়ে বৃষ্টি পড়ে গলগলিয়ে যেন আকাশ এখন বুকফাটা।

'অই আনন্দেই থাক, নিয়েছে তোমার বাগান! হাতের মোয়া!'—শৈলেন আবার একখিলি পান ছোট্ট টিনের বাক্স থেকে সোজা মুখে পোরে।

'কেন নেবে না, আমরা কী সাজা বানের জলে ভেসে এসেছি নাকি? চিরকাল বেকার বসে থাকব নুলো হয়ে?' তারক রেগে উঠতে যায় কিন্তু সাহস করে না। তার গলার স্বর ফেঁসে যায়।

'এমনি এমনি নেবে নাকি? আপনারা আন্দোলন-টান্দোলন কিছু করছেন না?'

পরিমল নেশা ভেঙে গাঝাড়া দিয়ে বলে। আড়মোড়া ভাঙে, ভেতরে কলজেটা নড়বড় করে।

তারক বলে—করছে, মজুররা করছে।

'আপনি কী করছেন? ঠুঁটো জগন্নাথ?' —পরিমল হিপ্নোটাইজকরা চোখ দুটো পরিপূর্ণ খুলে তারকের দিকে তাকায়।

সহসা তারক আঁতকে ওঠে। কোন কথা বলতে পারে না। ভয় ভয় মুখটা তার কাঁচুমাচু হয়ে যায়। আর তখন ম্যাজিসিয়ান চোখ সরিয়ে নিয়ে জলে-ভেজা কলাবতী ফুল দেখে। হাওয়ায় বেনাড়া খেয়ে কাত হচ্ছে সোজা হচ্ছে। জল গড়াচ্ছে লালপাপড়ির ওপরে সাদা মুক্তোবিন্দুর মত।

ঠুঁটো জগন্নাথ কথাটা পরিমলের ছেলে তাপসের লব্জকথা। পরিমলকে শুনতে হত হামেশা ছেলের মুখে। কুড়ি বছরের ছেলে, বুকের পাটা চওড়া, সে বয়েসে পরিমলের যেমন স্বপ্ন ছিল, তারও চেয়ে ধারালো স্বপ্ন দেখে ছেলেটা। দেশের সবার ভাবনা যেন ওর মাথায়। সবার খাওয়া-পরা স্বাস্থ্য নিয়ে ওর ভাবনা। কবে সবাই মানুষের মত বাঁচবে। নতুন করে জীবন সুরু করবে। আর ঠিক এজন্যই বনে না বাপের সঙ্গে। খিটিমিটি লাগে, যুদ্ধও বলা যায়। পরিমলের ইচ্ছে ছেলে চাকরী করুক। ছেলে [illegible]—চাকরি আমি একটা না হয় পেলাম, তারপর সারাজীবন নেই নেই

খাই খাই। আর যেখানে লাখ লাখ বেকার, সেখানে একা একটা চাকরি পাওয়া যেন হায়েনার ছাগলছানা শিকারের মত নিষ্ঠুরতা। সে বস্তির হা-ভাতে হা-ঘর লোকজনদের নিয়ে মিছিল করত; দাবী করত; দাবী তুলত। দিনরাত স্বপ্নের ঘোরে ফিরত ছেলে। ডাকাবুকো ছেলেটা নাকি সমাজ পাল্টাবে। এখন সে জেলে। দু বছর।

একদিনও গিয়ে দেখে আসেনি সে ছেলেকে। শান্তি যেতে চেয়েছে। শান্তির সঙ্গে তুমুল খিস্তিখেউর, ঝগড়াঝাটি হয়েছে। পরিমলের জেদ কী নিজের ছেলের চেয়ে একবিন্দু কম? শান্তির চোখের জলে কী পরিমল গলে যাবে? সেদিন আর নেই, যখন একজনের আবদার রক্ষায় জন আরেকজন সব কষ্ট স্বীকার যেত,—সে টান নেই মায়া নেই সে প্রেম নেই; এখন কারো দুঃখে কারো কিছু এসে যায় না, কারো চোখের জলে কারো মন ভেজে না; উল্টে খাঁ খাঁ করে বুক। আগুন জ্বলে রক্তের মধ্যে। মুখের কথা বিষ হয়ে ঝরে পড়ে।

বৃষ্টির ওপর বৃষ্টি ঝাঁপিয়ে পড়ে, হাওয়ার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাওয়া, অন্ধকার গাঢ় হয়ে ওঠে আলকাতরার মত; ঝলসানো আঁকাবাঁকা বিজলী মুখে নিয়ে অন্ধকারের অন্ধকার মেঘ দাপিয়ে বেড়ায় সারা আকাশ।

'একী দুর্যোগ করল রে বাবা!' বলে শৈলেন ডানহাত দিয়ে সুইচ টিপে দেয়, বারান্দায় আলো জ্বলে ওঠে।

চোখে আ[illegible] সুচের মত বেঁধে, ম্যাজিসিয়ান যন্ত্রণায় চোখ বোজে। দূরে কোথাও একটা গরু হাম্বাচ্ছে, কুকুর ডাকছে আকাশে মুখ তুলে।

তারক যেন আপনমনে অনেক দূর থেকে বলে—'এবারও দেখবি শৈলেন সেবারের মত দারুণ বন্যা হবে, লোকজন গরুবাছুর অনেক মরবে। সাংঘাতিক কিছু একটা হবে।'

'রাখ শালা তোর যত ভয়দেখানো কথা!' —শৈলেন ধমকায়, তবুও ভয়-পাওয়া মুখ।

আর ঠিক এসময় ভেতর-বারান্দা থেকে আর্ত বকবকম আর সন্ত্রস্ত ডানা ঝাপটানোর শব্দ ওঠে। ম্যাজিসিয়ান উঠে পড়ে, ভেতরে চলে আসে। যতটা না প্রাণের টানে তারও চেয়ে বেশী অভ্যাসবশে।

দুদিকে তারের জাল আর চারদিক বন্ধ প্যাকিং বাকস বৃষ্টির ছাটে ভিজে যাচ্ছে। তাকে দেখেই জলেভেজা পায়রাগুলো গোল গোল চোখে চায়, গ্রীবা বাঁকায়। নিঃশব্দ ভাঙাগলায় যেন অভিমান ফুটে ওঠে,—'এতক্ষণ থেকে ডাকছি শুনতে পাও না? ভিজে যাচ্ছি আমরা।' যেন এরকম কথা ওরা পরিমলের দিকে চেয়ে বলে। আজ আর পরিমল জালের ভেতর দিয়ে আঙ্গুলে [illegible] না, [illegible]—আঙ্গুলে চুম

খাবার ভঙ্গিতে ঠোঁটে ঠোকরায় না, অন্যদিনের মত পরিমল ওদের বকঝকাও করে না—'কাঁহে একমুহূর্ত আমাকে শান্তিতে কোথাও বসতে দিবি না? বসেছি কী অমনি তোদের ডাকাডাকি সুরু হয়ে যায়? আমি কী তোদের কেনা গোলাম?' সাদা পায়রা দুটো জালের ভেতর দিয়ে ঠোঁট বাইরে বের করে দেয়। যেন বলে—'কই তোমার আঙুল কই?' খাঁচাটাকে আলতো করে ধরে ঘরে আনে পরিমল। ফাঁক পেয়ে সাদা পায়রা দুটো তার গালে ঠোঁট ঘষে। আরো দুটো ছাইরঙের ছিট ছিট পায়রা আছে। ওরা বেশী এগোয় না। সাদা দুটোরও আদর-আবদার বেশী, বেশী ন্যাওটা।

ওদের দিয়েই খেলা শেষ করে পরিমল। কালো চাদর শূন্যে ছড়িয়ে দেয় পরিমল জালফেলার ভঙ্গিতে। কোথাও কিছু নেই, কিন্তু সেই বস্তুহীন শূন্য থেকে চাদর যখন নেমে আসে, তখন তার ভেতর থেকে বের করে আনে ধবধবে দুটি সাদা পায়রা। তারপর দুহাতে দুটিকে ধরে নিজ সন্তানের গালে চুমু খাবার মত করে চুমু খায়—দর্শকের দিক হিপ্নোটাইজ-করা চোখে তাকিয়ে বলে—'শান্তি আর মৈত্রীর দূত, আমাদের ভারত-আত্মার প্রতীক।'

আধো আলো আধো অন্ধকারে মহাশূন্যে দু হাত উৎক্ষিপ্ত করে দেয়, ম্যাজিসিয়ান, প্রথমে কিছুক্ষণ পায়রা অদৃশ্য হয়ে যায়, তারপর শান্তির মন্ত্র উচ্চারণ করে সে, তখন অকস্মাৎ শূন্যে আবির্ভূত হয় শান্তি আর মৈত্রীর দুই দূত সাদা পায়রা, দর্শকদের মাথার ওপরে ব্যালেনৃত্যের ভঙ্গিতে উড়ে যায়। ম্যাজিসিয়ান দুহাত ছড়িয়ে ভারতবর্ষের ম্যাপের আকারে দাঁড়িয়ে থাকে। পায়রা-গুলো এরপর শূন্য থেকে টাল খেয়ে সাঁ করে নেমে আসে, বসে পড়ে ম্যাজি-সিয়ানের দু কাঁধে দু দিকে। নত-মস্তকে দু হাত কপালের কাছে এনে দর্শকদের অভিবাদন করে ম্যাজি-সিয়ান। আর তখন হাততালির উল্লাসের তরঙ্গ বয়ে যায় তার শরীরের ওপর দিয়ে সমুদ্রের মত।

ওরা ঠোঁট দিয়ে জাল কামড়ে ধরে ঝুলে থাকে। আজ ছাতুটাতুও বিকেলে দেয়নি পরিমল। ওদের খিদে টের পায় পরিমল ওদের মুখ দেখে। তর্জনী ঢুকিয়ে দেয় ভেতরে পরিমল—ওরা চুমু খাওয়ার ভঙ্গিতে ঠোঁট ঘষে। পরিমল ধমক দিয়ে বলে— 'ঠুকরে দে, ঠুকরে খা দেখি আঙুলটাকে।' ওরা অবাক হয়ে গ্রীবা বাঁকায়।

শান্তির মুখ মনে পড়ে পরিমলের এসেই টাকা পাঠাবার কথা ছিল। কড়া চিঠি এসেছে আজ। একটা বোকে পোষার মুরোদ নেই, অত ঢং করে তার জীবনটা নিয়ে কেন ম্যাজিক খেলেছিল সে?

গাছ নাড়লে টাকা আসে? যারা দেবার তাদের ট্যাঁক ফাঁকা হলে সে কী করবে; টাকা বাজাবে? নানান ভাবনা ভাবে, কিন্তু সঠিক কিছু ভেবে পায় না পরিমল। তার হোটেল খরচ আর ফিরে যাবার টাকায়ই এখন টান। কিছু যা আছে তাতে কী হবে? দু আঙুল ঢুকিয়ে পায়রার ঠোঁট সাঁড়াশীর মত চেপে ধরে পরিমল। পায়রাটা ডানা ঝাপটায়, অতর্কিতে তীক্ষ্ণ নখে আঁচড়ে দেয় পরিমলের হাত। সাদা আঁচড়ের দাগে কলাবতী ফুলের রঙের রক্তবিন্দু ফোটে। শেষ যেটুকু ছাতু ছিল এনে দেয় পরিমল রক্তাক্ত হাতে। চিনচিন করে জ্বলে যায় বুকের ভেতরটা। কেউ দেখে না, কেউ জানে না—অথচ সেখানে আরো কত রক্ত।

চড়াৎ করে মেঘ থেকে বাজ লাফিয়ে পড়ে মাটিতে, ভিৎসুদ্ধ কাঁপিয়ে দেয়। শরীর ফুঁড়ে যেন বিজলি ছুটে যায় মাটিতে।

মেঝে কাঁপিয়ে ব্যানার্জি দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। লুঙ্গির ওপরে পায়ের ডিম অবধি লম্বা চকচকে নাইট গাউনে তার রক্তমাংসের শরীর ঢাকা।

'শৈলেনবাবু, রাত্রে দু প্লেট মুরগীর মাংস চাই। যা ফাইন ওয়েদার করেছে।' —বারান্দায় ব্যানার্জি দাঁড়ায় ছ ফুটি শরীরে, তার দু চোখ নেশা-চ্ছন্ন।

'মুরগী? এই ঝড় বৃষ্টিতে এখন আমি মুরগী পাব কোত্থেকে?' শৈলেন হেসে অসহায়তা ফোটায় মুখে।

'আমি মশাই ক্যাশ পেমেন্ট করব। দেখুন না কাউকে পাঠিয়ে টাঠিয়ে যদি—

'আমি একবার ঘুরে আসতে পারি শৈলেন'—তারক চকচকে চোখে তাকায়।

'তুই যাবি?' সন্দিগ্ধ চোখে তাকায় শৈলেন—'গিয়ে কী ফয়দা এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে তোর জন্য মুরগীর দোকান খোলা রেখেছে?'

'প্লিজ শৈলেনবাবু। ম্যানেজ ইট সামহাউ। ওয়েদারটা দেখছেন না?'—বলে ব্যানার্জি নাইট গাউনের পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বের করে।

পায়রার চেয়েও লম্বা গলা উঁচিয়ে ঝুঁকে পড়ে ম্যাজিসিয়ান বলে—'আমি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি।' তিন জোড়া চোখ তার ঢাউস মুখে এসে আঠার মত আটকে যায়।

নিজের মুখের থুথু নিজে গিলে ম্যাজিসিয়ান বলে—'আপনি কুড়ি টাকা দিয়ে আমার চারটে পায়রা কিনে নিন, ব্যানার্জি সাহেব, পায়রার মাংস বেশ'—

'পায়রা? বিউটিফুল। খুব টেস্টি!' —ব্যানার্জি দুহাত এগিয়ে দেয় ম্যাজি-সিয়ানের দিকে যেন তার প্রাণ বাঁচিয়েছে সে। দুটো দশ টাকার নোট তুলে নেয় ম্যাজিসিয়ানের রক্তাক্ত হাতে।

শৈলেন তারক প্রায় একসঙ্গে বলে ওঠে—'সে কী ম্যাজিক, তুমি তোমার পায়রা বেচে দিচ্ছ?'

ম্যাজিসিয়ান হাসে দুঠোঁট পায়রার মত লম্বা করে, বলে—'টাকার দরকার। আপনার হোটেলের বিলও তো মেটাতে হবে।'

'তাই বলে।' শৈলেনের গলায় পানের রস আটকে যায়। অন্ধকারে কলাবতী ফুল জলে ভেজে।

শক্ত মুঠোয় টুঁটি চেপে ধরে ঝটাং টানে যখন সাদা পায়রার গলা ছেঁড়া হয়, তখন তাদের সাদা এবং ছাই রঙের পালকে ফিনকি দিয়ে ছড়ানো রক্তে ভিজে যায়। চকচকে জলেভেজা মেঝেয় রক্তের ধারা গড়িয়ে যায়।

অদূরে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ তৃষ্ণার্ত চোখে তাকিয়ে দেখে ম্যাজিসিয়ান। বুকের ভেতরটা চিনচিন করে। শান্তির কথা ফুটকুরি কাটে বুকের মধ্যে। সে ভাবে এবারে ফিরে গিয়ে শান্তিকে নিয়ে সে জেলে ছেলেকে দেখতে যাবে, যেমন করে গভীর এক কুয়াশাময় শীতের রাতে ফসলেভরা ক্ষেতের পাশে আল ভেঙে ভেঙে শান্তিকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে সে হেঁটেছিল, অবিকল তেমনি করে সে শান্তিকে নিয়ে ফাটক-বন্দী ছেলেকে দেখতে যাবে।

এই বাংলার খবর

চাষের উন্নতির জন্য

চাষের ক্ষেতে একটা বড় রকমের পরিবর্তন আনার জন্যে সিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রিসভা একেবারে গোড়ার দিকেই একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার নাম সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প, লোকের মুখে যা সি এ ডি পি নামেই পরিচিত। প্রত্যেক জেলায় দশ হাজার একর জুড়ে এক-একটা এলাকা নির্বাচন করে সেখানে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষবাস আর আনুষঙ্গিক কাজকর্ম চালু করাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। রাজ্য যোজনা পর্ষদ ঠিকই বুঝেছিলেন যে, গ্রামের উন্নতি করতে না-পারলে পশ্চিম বাংলার উন্নতি হবে না, আর গ্রামের উন্নতি করতে হলে এই রকম এলাকা ধরেই চাষবাসের উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু তারপরে কী হলো কে জানে, এমন একটা সুন্দর প্রকল্প সম্পর্কে সরকারি উৎসাহ জুড়িয়ে গেল কিছুদিন পরে। সি এ ডি পি'র নকসা পড়ে রইল হিমঘরে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেই প্রকল্প আবার বের হলো হিমঘর থেকে, বিধানসভায় আইন পাস হলো, রাষ্ট্রপতির সম্মতিও মিলল। এখন রাজ্য সরকার এই প্রকল্প অনুযায়ী কাজ সুরু করার কথাও ভাবছেন: ২৪ পরগনা নদীয়া হুগলি আর বর্ধমানের চারটি নির্বাচিত এলাকায় [illegible] গম চাষের সময়েই এই কাজ শুরু হতে পারে। কিন্তু এমন একটা ভালো কাজ আরম্ভ করতে যে এতটা দেরি হয়ে গেল তাতে একটা বড় অসুবিধা দেখা দিয়েছে। সেটা হলো টাকার সমস্যা। এই প্রকল্প চালু করতে বেশ কিছু টাকা লাগবে। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষের জন্যে নানা উপকরণ দরকার। আগে হিসেব করা হয়েছিল, প্রতিটি এলাকার জন্যে তিন থেকে সাড়ে তিন কোটি টাকার লগ্নী দরকার হবে। এখন দেখা যাচ্ছে, ঐ খরচ দাঁড়াবে পাঁচ কোটি টাকার বেশি। কথা ছিল, এই প্রকল্পের জন্যে টাকা আসবে প্রধানত বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুযায়ী এখন ব্যাংকগুলো ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি চালু করেছে। তা হলে টাকা পাওয়া যাবে কোথায়? বিশ্ব ব্যাংকের একটি দল এখন এই রাজ্যের নানা এলাকায় সফর করছেন। রাজ্য সরকারের কেউ কেউ বলছেন, বিশ্ব ব্যাংককে এই প্রকল্পের জন্যে টাকা যোগাতে অনুরোধ করা হতে পারে।

ভূমিহীন চাষীর দুর্গতি

কৃষি উন্নয়নের এই রকম একটা ব্যাপক পরিকল্পনার যে কতো দরকার তা বোঝা যাবে অস্থায়ী রাজ্যপাল শংকরপ্রসাদ মিত্রের একটি মন্তব্য থেকে। রাজ্যের নানা দুর্গত এলাকায় সফরের সময় তিনি দেখেছেন, দুর্গতি ভূমিহীন চাষীরই সবচেয়ে বেশি। কারণ এই সময় চাষের কাজ থাকে না। এদিকে খাদ্যদ্রব্যের আগুন দাম। তাই কিনে খাওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। কিছু দিন আগে ত্রাণমন্ত্রী সন্তোষ রায় হিসেব দেন যে, ভূমিহীন কৃষক আর তাদের পরিবারবর্গ নিয়ে মোট দেড় কোটি নরনারী শিশুই আজ সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত। যখন এদের কাজ থাকে না সেই সময় যাতে কাজ করে এরা কিছু রোজগার করতে পারে তার জন্যে প্রতি জেলায় স্থানীয় শিল্পগুলোকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে সুপারিশ করেছেন শ্রীমিত্র।

এই ধরনের সমস্যা যে এই প্রথম দেখা দিল তা অবশ্যই নয়, সমাধানের রাস্তাও অনেক দিন ধরে বাতলানো হচ্ছে। সি এ ডি পি চালু হলে এই সমস্যা সমাধানের পথে বেশ কিছুটা এগোনো যাবে। কারণ এই প্রকল্প অনুযায়ী একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল ফলাবার ব্যবস্থা করা হবে। এখনই দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের যে-সব এলাকায় একই জমিতে তিনটে ফসল তোলা যাচ্ছে সেখানে চাষের এবং ফসল কাটার মরশুমে ক্ষেতমজুরের অভাব দেখা দিচ্ছে এবং কাজের জন্যে রাজ্যের বাইরে থেকে ক্ষেতমজুর আনতে হচ্ছে। সুতরাং সি এ ডি পি চালু হলে ক্ষেত-মজুরদের আধা-বেকারির সমস্যার সমাধানের পথ তৈরি হবে। তা ছাড়া ঐ প্রকল্পের অধীনে সরাসরি চাষবাস ছাড়া চাষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সহায়ক অনেক কাজকর্ম চালু করার কথাও আছে। তার ফলেও অনেকে কাজের সুযোগ পাবে। সুতরাং, টাকার অভাবে সি এ ডি পি আটকে যাক, এটা কেউই চাইবেন না।

বারো ঘণ্টার ধর্মঘট

কড়া হতে পারলে যে কাজ হয়, কলকাতা পৌরকর্মীদের ধর্মঘটের মেয়াদ থেকে তা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পৌর কর্মচারীদের দাবিদাওয়া নিয়ে সেই আগস্ট থেকে যে আন্দোলন চলছিল তারই পরিণতিতে অকটোবরের পয়লা থেকে ৩৩ হাজার পৌরকর্মীকে ধর্মঘটে নামার ডাক দেয় সংগ্রাম কমিটি। তাঁরা প্রথমে স্থির করেন, এই ধর্মঘট হবে সর্বাত্মক, আলো-জল-শ্মশান-হাসপাতাল কোনো কিছুকেই রেহাই দেওয়া হবে না। পরে অবশ্য তাঁরা এগুলোকে রেহাই দেন। কিন্তু পৌর কর্তৃপক্ষ হাত গুটিয়ে বসে থাকেন নি। কমিশনার আর পৌরমন্ত্রী দুজনেই অনেক আগে থেকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, সরকার এই ধর্মঘটের মোকাবিলা করবেনই। ধর্মঘট সুরু হওয়ার আগের দিনই টালা আর পলতায় জল সরবরাহের কাজের দায়িত্ব নেন সামরিক বাহিনী আর ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্সের কর্মীরা। কিন্তু পৌর কর্তৃপক্ষ সত্যি করে সকলকে চমকে দেন কেন্দ্রীয় পৌরভবনে লক আউট ঘোষণা করে। পৌরমন্ত্রী অবশ্য অনেক আগেই বলে রেখেছিলেন যে, দরকার হলে তিনি লক আউট ঘোষণা করতেও পিছ-পা হবেন না। কিন্তু সত্যি-সত্যিই সরকার ঐ পথে যাবেন তা বোধ হয় অনেকেই ভাবতে পারেন নি। কারণ পৌরসভার বিচিত্র ইতিহাসেও লক আউট ঘোষণা এই প্রথম।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, স্নায়ুযুদ্ধে সরকার পক্ষই জয়ী হলেন। ধর্মঘট সুরু হওয়ার পর আধবেলা কাটতে-না-কাটতেই সংগ্রাম কমিটি নিঃশর্তে তা প্রত্যাহার করে নিলেন। পৌরকর্মীদের সব দাবি-দাওয়া মীমাংসার ভারও ছেড়ে দেওয়া হলো পৌরমন্ত্রীর ওপর। সংগ্রাম কমিটি অবশ্য এ-কথাও জানালেন যে, ধর্মঘটী কর্মীদের ওপর যেভাবে অত্যাচার করা হয়েছে তাতে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয়। পৌরমন্ত্রী জানান, ধর্মঘট মিটে যাওয়ায় তিনি খুশী। তিনি শ্রমিক-বিরোধী নন কিন্তু পৌরসভায় কোনো রকম বিশৃংখলা তিনি বরদাস্ত করবেন না।

রাস্তার উন্নতি

পৌরসভার তদারকিতে কলকাতার রাস্তার যে কী হাল হয়েছে তা আর বিশদভাবে বলার দরকার করে না। সুতরাং মহানগরীর গোটা ৪৫ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের ভার অতঃপর সি এম ডি এ'র হাতে যাচ্ছে, এটা সুসংবাদ। সি এম ডি এ অবশ্য অনেক রাস্তার দুরবস্থার জন্যে দায়ী, কারণ নানা ধরনের কাজের জন্যে অনেক রাস্তা তারাই খুঁড়ছে। কিন্তু তবু সি এম ডি এ ইতিমধ্যে মহানগরীর কয়েকটা রাস্তার ভোল কিছুটা ফিরিয়েছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাস্তার উন্নয়নের জন্যে দিল্লীর কাছ থেকে দু কোটি টাকা পেয়েছে সি এম ডি এ। সেই টাকাটা খরচ করে পুজোর আগেই রাস্তা মেরামতির কাজে হাত দেওয়া সি এম ডি এ'র ইচ্ছে।

তবে রাস্তা মেরামতি বা চওড়া করা সম্পর্কে ঐ সংস্থার অভিজ্ঞতা সুখবর নয়। কারণ এ পর্যন্ত যে-সব রাস্তা চওড়া করা হয়েছে সেখানে প্রার্থিত সুফল পাওয়া যায় নি। রাস্তা চওড়া হয়েছে, দু দিকের গাড়ি যাতে নির্দিষ্ট জায়গা দিয়ে যায় তার ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু তবু যানবাহন চলাচল ততোটা দ্রুত হয়নি। কারণ এখনও রাস্তা আর ফুটপাথ জুড়ে ফেরিওয়ালার ভিড়। এদিকে সি এম ডি এ আর এক সমস্যায় পড়েছে রাস্তার দুধারে বড় বড় পুরোনো গাছ নিয়ে। রাস্তা চওড়া করতে গেলে অনেক জায়গায় ঐ-সব গাছ কাটা পড়ছে। একেই কলকাতায় গাছ তেমন বেশি নেই, তার ওপর যে কটা আছে সেগুলোও কাটা হোক, এটা কেউই চায় না। তাই সি এম ডি এ এখন ভাবছে, গাছ না কেটে তা শিকড় শুদ্ধ তুলে আবার নতুন জায়গায় বসাতে। দিল্লীতে নাকি কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তর এইভাবে অনেক গাছ বাঁচিয়েছে। সি এম ডি এ এই বিষয়ে তাই ঐ পূর্ত দপ্তরের কাছে পরামর্শ চেয়ে পাঠিয়েছে।

চোরাচালানি গ্রেপ্তার

গোটা দেশ জুড়েই যখন সংশোধিত মিসার জাল ফেলে চোরাচালানিদের আটক করার অভিযান চলছে তখন এই বাংলাতেও তা বাদ পড়তে পারে না। অবশ্য ওয়াকেবহাল মহল বলেন, দেশের পশ্চিম বা দক্ষিণ উপকূলের মতো পূর্ব উপকূল দিয়ে চোরা আমদানি-রপ্তানি সে-রকম একটা হয় না। এখানে একটা বড় সমস্যা বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর চোরা লেন-দেন। কিন্তু এখন তাও অনেকটা নিয়ন্ত্রিত। তবে এই রাজ্যে যে অন্যান্য দেশের সঙ্গে চোরাচালানে লিপ্ত কোনো লোকই নেই, এমন নয়। তাদের চাঁইদের ধরার কাজ কাস্টমস কর্তৃপক্ষ সুরু করে দিয়েছেন। পনের জন চাঁইকে তাঁরা পাকড়াও করার সিদ্ধান্ত করেন। তাদের মধ্যে জন দশেককে আটক করা হয়েছে। এদের মধ্যে চারজন নিজেরাই এসে ধরা দিয়েছে। বাকি কয়েক জনকে ধরার চেষ্টা চলছে। বিদেশী মুদ্রা ফাঁকি দেওয়ার একটি বিরাট ঘটনাও ধরা পড়েছে, কিন্তু যাদের ধরার জন্যে দুর্নীতি দমন বিভাগ ফাঁদ পেতেছিল তাদের ধরা যায় নি। উল্লেখযোগ্য যে, চোরাচালানের অভিযোগে গ্রেপ্তার শুধু কলকাতাতেই হচ্ছে না। ২৪ পরগণা, নদীয়া, শিলিগুড়ি—এমন সব জায়গাতেও অনেকে ধরা পড়েছে।

এদিকে আয়কর বিভাগও কর ফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। গোটা সেপ্টেম্বরে কলকাতায় গোটা পঞ্চাশটা বাড়িতে হানা দিয়ে তারা নগদ তিন লাখ টাকা আর ৩২ লাখ টাকার গহনাপত্র উদ্ধার করেছেন। তাছাড়া পার্ক স্ট্রীট এলাকায় বাড়ি-বাড়ি ঘুরে তাঁরা শ' দুয়েকের বেশি এমন লোকের সন্ধান পেয়েছেন যাদের আয়কর দেওয়া উচিত অথচ দেন না। আয়কর বিভাগ তাঁদের এই সাফল্যে স্বভাবতঃই উৎসাহিত এবং নভেম্বরে এই অভিযান আরো জোরদার করা হবে।

৭।১০।৭৪　　—দেবদত্ত

পটভূমি

সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে জ্যোতিবাবুর খানাপিনা

কট্টর মার্কসবাদী নেতা জ্যোতি বসু রুমেনিয়া যাবার আগে দিল্লীতে থাকাকালীন একদিন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের বাড়ীতে লাঞ্চ-এ মিলিত হয়েছিলেন। সেদিন অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া দাওয়া চলে। অনেক কথা হয়। সিদ্ধার্থবাবু অবশ্য বলেছেন : আরে রামো রামো, ওর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কি কথা বলতে পারি। ওতো গোঁড়া সি পি, এম। তবে জ্যোতি আমার অনেকদিনের পুরনো বন্ধু—বাইরে যাবার আগে তাই একসঙ্গে বসেছিলাম।

জ্যোতিবাবুর সঙ্গে এই খানাপিনার পরে আর দেখা হয়নি। অনেক আগে তাঁর দেশে ফিরে আসবার কথা ছিল। তিনি গত সোমবার পর্যন্ত ফিরে আসেননি। কেন যে তাঁর ফিরতে দেরী হচ্ছে, তা কিন্তু মার্কসবাদী পার্টির সদর দপ্তরখানাও খোঁজ রাখে না। তাঁদের কাছে যদি খবর থাকতো যে, জ্যোতিবাবুর ফিরতে দেরী হবে, তাহলে তাঁরা গত ২৯ সেপ্টেম্বর ময়দানের জনসভার জন্য যে সকল পোস্টার লটকেছিলেন, তাতে বক্তার তালিকায় তাঁর নাম দিয়ে এ ধরনের নাজেহাল হতেন না। সি পি, এম নেতারা জানেন না, জ্যোতিবাবু দিল্লীতে সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে খেয়েছেন। কেন দেরী করে মঙ্গলবার তিনি ফিরে এলেন তার খবরও কেউ রাখে না। কেউ কেউ অবশ্য মনে করছেন, জ্যোতিবাবু হয়তো পোল্যান্ড দেখে এলেন। তবে মার্কসবাদী হলে কি হয়, তিনি পুজোর মধ্যে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। পুজোর ব্যাপারে এই নেতার তেমন আগ্রহ নেই। কিন্তু আনন্দের অংশ তো নিতেই হবে।

যাক সে কথা—যে বিষয় আলোচনা হচ্ছিল। জ্যোতিবাবুর সঙ্গে দেখা হলে অন্তত তাঁর কাছ থেকে জানতে পারবো সিদ্ধার্থবাবুর ভোজসভায় কি কি 'মেনু' ছিল। আর চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করবো, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কি বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল? দ্বিতীয় প্রশ্নের যে কোন উত্তরই পাবো না তা আমি এখন থেকেই বলে দিতে পারি।

এত সময় আবোল তাবোল আলোচনা করলেও এবার আসল কথায় আসতে চাইছি। এবং তা হচ্ছে সিদ্ধার্থবাবু আর জ্যোতিবাবু রাজনীতির দিক থেকে দুই মেরুতে বাস করলেও তাঁরা যদি একত্রে বসতে পারেন, খেতে পারেন, তা হলে কংগ্রেসের ছাত্র ও যুবদের দুই বিবদমান দলের নেতারা কেন এক হয়ে কাজ করার সংকল্প নিতে পাচ্ছেন না? তাঁরা উভয় গোষ্ঠিই মুখে অন্ততঃ বলছেন যে, এটা তাঁদের ব্যক্তি স্বার্থের লড়াই নয়, এ হচ্ছে তাঁদের আদর্শের সংঘাত। কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই আদর্শনামক বস্তুটা কি তা বুঝতে পারছে না। তবে জনগণ দেখতে পাচ্ছেন, কতগুলি তাজা প্রাণের অবসান হচ্ছে। কত মায়ের অশ্রুজলে শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছে। বিবদমান দুই গোষ্টির মধ্যে এক উপদলের নেতা তো সেদিন রাগের মাথায় বলেই ফেললেন : রেখে দিন আপনাদের ঐক্য আলোচনা। গত দু বছর ধরে ওরা আমাদের শান্তিতে দিন কাটাতে দেয়নি। ওদের আমরা শান্তিতে শুতে দেবো না। এর জন্য যা করতে হয় তাই করবো। অপর দলের আর এক নেতার উষ্মার কারণ হচ্ছে : ওরা ছাত্র ও যুব সংগঠনকে নিজেদের পৈত্রিক সম্পত্তি করে রেখেছে। ওদের ইচ্ছে অনুযায়ী অমুকের গলা কাটা যাচ্ছে, অমুককে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, সব কিছুই কংগ্রেস সংগঠনের নামে, ইন্দিরাজীর স্লোগান তুলে করা হচ্ছে। কিন্তু এ অবস্থা আর বেশীদিন কেউ সহ্য করবে না, বা করতে পারে না।

অতএব দেখা যাচ্ছে, ঐক্য আলোচনা বিশ বাঁও জলের তলে। চন্দ্রজিৎ যাদবের অনুরোধে এবং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বা তরুণকান্তি ঘোষের আগ্রহে একাধিক আলোচনা বৈঠক বসেছে এবং ভবিষ্যতেও বসবে। কিন্তু অন্যদিকে যুবক খুন হয়ে চলেছে। এর নামই নাকি বর্তমানকালে কংগ্রেসী যুব সংগ্রাম। ফলে দাঁড়াচ্ছে এক অসহনীয় অবস্থা। মানুষের দৈনন্দিনের জীবনযাপন করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। চাল নেই, ডাল নেই, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম নিয়ে আলোচনা না করাই শ্রেয়। ক্ষুধার্ত মায়ের কোলে না খেতে পেয়ে শিশু মারা যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চল থেকে লোকে কাতারে কাতারে একটু ফ্যানের আশায় শহরে এসে ভীড় করছে। আর কংগ্রেসী ছাত্র যুবরা রাস্তার পর রাস্তা, পাড়ার পর পাড়া 'বন্ধ' করে চলেছেন। অজুহাত হচ্ছে, আন্দোলনে তাঁরা যদি না নামেন তবে বামপন্থীরা এর সুযোগ নিয়ে বাজার মাৎ করবে। আসছে নির্বাচনে কংগ্রেস আবার তলিয়ে যাবে। তাই ভবিষ্যতে কংগ্রেস যাতে তলিয়ে না যায়, তার জন্য বর্তমানে সাধারণের চোখে পার্টির ইমেজ খারাপ হলেও তাঁরা খুনের নেশায় মেতে উঠেছেন।

তাই বলছিলাম, মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি '৬৯ সালের ভ্রান্ত নীতি ত্যাগ করে যখন সংশোধনের পথে এগিয়ে চলেছে, ঠিক সেই সময় কংগ্রেস একের পর এক প্রচন্ড অন্যায় করেছে। তবে পার্থক্য হলো সি, পি, এম কোন ব্যক্তিবিশেষ বা নেতার স্বার্থরক্ষার জন্য ভুল বা অন্যায় করেন নি। কিন্তু কংগ্রেস ও তার প্রত্যেকটি উপদল ব্যক্তিপূজারী হিসেবে তাঁদের নিজস্ব নেতাকে জিইয়ে রাখার জন্য জঘন্য রাজনীতিতে নেমেছেন। নেতাকে বাঁচিয়ে রাখার পেছনে ক্যাডারদের একটা বিশেষ যুক্তি আছে। কারণ তাঁর বা তাঁদের নিজস্ব নেতা বেঁচে থাকলে, তাঁরাও রক্ষা পাবেন, তাঁদের কিছু হবে। তাই খোলা মন নিয়ে জ্যোতিবাবু যখন সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন, তখন কিন্তু প্রদীপবাবুর সঙ্গে প্রিয়বাবুর আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে শত বাধা দেখা দেয়।

কৌটিল্য

গোয়েন্দা ধাঁধা

পুলিশের ঘাড়ে কবিতা ছুঁড়

এডগার ওয়ালেস

ব্যাংকটা লুঠ হবার মত নয়, তবুও লুঠ হয়ে গেল।

ছোট শাখা হলেও ব্যাংকের লেনদেন বড় কম নয়। তিন-তিনটে পেশায় কোম্পানীর টাকা-পয়সা থাকে সেখানে। মাইনে দেওয়ার আগের দিন যথারীতি একলক্ষ পাউণ্ড এনে রাখা হয়েছিল স্ট্রং রুমে। রাত ফর্সা হওয়ার আগেই টাকার কাঁড়িও ফর্সা হয়ে গেল সুরক্ষিত পাতালকুঠরী থেকে।

আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য! স্ট্রং রুমটা ইস্পাত আর কংক্রিট দিয়ে তৈরী। কুঠরীর ছাদে ব্যাংক ম্যানেজারের প্রাইভেট অফিস। সে-ঘরে ঢুকতে হলে বাইরের অফিস দিয়ে আসতে হয়। দরজা একটাই। ইস্পাতের দরজা। এই দরজা পেরোলে তবে ম্যানেজারের অফিস।

সুতরাং দরজাটা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। তাই দরজার মাথায় সারা রাত জ্বলে একটা বিদ্যুৎ বাতি। সেই আলোয় রাস্তা থেকেই দেখা যায় দরজাটা বন্ধ রয়েছে। একজন পুলিশ কনস্টেবল ঠিক চল্লিশ মিনিট অন্তর সামনের রাস্তা দিয়ে যায়।

শুধু পুলিশ আর ইস্পাতের দরজাতেও নিশ্চিন্ত হয় নি ব্যাংকের মালিক। তাই একজন রাতের পাহারাদার মোতায়েন করা হয়েছে প্রাইভেট রুমে। জানলা দিয়ে সে মুখ বাড়িয়ে বলে দেয় রাতের পুলিশকে—সব ঠিক হ্যায়!

সে রাতেও যথারীতি চল্লিশ মিনিট অন্তর ঘুরপাক দিচ্ছে পুলিশ কনস্টেবল বার্নেট। হঠাৎ দেখলে আলোটা নেভানো। পিলে চমকে উঠল বার্নেটের। রাতের পাহারাদারের জন্য দাঁড়িয়ে না থেকে দৌড়ে এল দরজার সামনে। বুক ধড়াশ করে উঠল পাল্লা দু হাট দেখে। ঝড়ের মত ভেতরে ঢুকলে দেখলে একটা অদ্ভুত দৃশ্য!

রাতের পাহারাদার শুয়ে আছে মেঝেতে। হাতে আর পায়ে হাতকড়া। নাকের ওপর তুলোর প্যাড। ইঞ্চি কয়েক ওপরে ঝুলছে একটা ফুটো টিন। টপটপ করে ক্লোরোফর্ম ঝরছে তুলোর প্যাডে। মিষ্টি গন্ধে ঘর ভরপুর।

রাতের পাহারাদারের নাম আর্থার মালিং।

তৎক্ষণাৎ ফোন করা হল পুলিশ-ফাঁড়িতে। ঐ রাস্তাতেই থাকতেন মিস্টার গ্রীণ—ব্যাংক ম্যানেজার। পুলিশ আগে দৌড়োল তাঁর কাছে। গিয়ে কি দেখল?

বাকস বিছানা বেঁধে চম্পট দেওয়ার আয়োজন করছেন মিস্টার গ্রীণ। ভীষণ উত্তেজিত। এত রাতে যাওয়া হচ্ছে কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তরে বললে আমতা আমতা করে, কাজ আছে। মালিককে একটা চিঠি লিখে যাচ্ছেন অবশ্য। চিঠি আর চাবী অফিসঘরের ড্রয়ারে রেখে এসেছেন।

কিন্তু ড্রয়ারে চাবী বা চিঠি কোনোটাই পাওয়া গেল না। স্ট্রং রুমেও পাওয়া গেল না এক লক্ষ পাউণ্ড!

সোজা কেস! দিনের আলোর মত স্পষ্ট! খাঁচায় পোরা হল মিস্টার গ্রীণকে। টাকা? ধোলাই দিলেই বেরিয়ে পড়বে'খন।

পুলিশ কতকগুলো আঁচড়ের রহস্য কিন্তু ধরতে পারল না। আর্থার মালিংয়ের হাতের তেলোয় পাওয়া গিয়েছিল রক্ত রেখাগুলো।

ব্যাংক লুঠের দিনই সকালবেলা চার্জ বুঝে নিতে এলেন মিস্টার রীডার। ইন্সপেক্টর হলফর্ড কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে বললেন—'ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের সেই ভীষণ চুরি আপনিই ধরে দিয়েছিলেন কিন্তু দোহাই আপনার, আজকের চুরি নিয়ে খামোকা মাথা ঘামাতে যাবেন না। মিস্টার গ্রীণ জেলখাটা আসামী। ব্যাংকেরই কেস। নাম ভাঁড়িয়ে ম্যানেজারি করেছে অ্যাদ্দিন।'

'জানি', বিষণ্ণ চোখে বললেন মিস্টার রীডার, 'আমিই ধরে দিয়েছিলাম গ্রীণকে। টাকা ধার দিয়ে ফেঁসে গিয়েছিল। স্বীকার করলেই ল্যাটা চুকে যেত বেচারা!'

ভুরু কুঁচকে বললেন ইন্সপেক্টর হলফর্ড—'গ্রীণের সঙ্গে মোলাকাৎ করার ইচ্ছে আছে নাকি?'

'আছে।'

ফলে, হাজতে হাজির হলেন মিস্টার রীডার। দেখেই চিনতে পারলেন মিস্টার গ্রীণ। হাউ হাউ করে বললেন অনেক কথা। একটা উড়ো চিঠি পেয়েই দেশ ছেড়ে পালাচ্ছিলেন তিনি। চিঠিতে লেখা ছিল, গ্রীণ যে জেলখাটা আসামী, পত্রলেখক তা জানে। পাছে মুখে চুনকালি পড়ে তাই নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন ভাবে জীবন শুরু করবেন ভেবেছিলেন গ্রীণ। এই বয়েসে বিয়ের ইচ্ছেও হয়েছিল। মেয়েটার বয়স যদিও তাঁর চাইতে তিরিশ বছর কম। কিন্তু পোড় খাওয়া মেয়ে তো, এক বদমাসকে বিয়ে করে অনেক জ্বলেছে। সে বিয়ে ভেঙে গেছে। নাম তার মিস ম্যাগডা গ্রেন। থাকে এই পাড়াতেই। পাড়ার কিছু ছেলেছোকরা এর মধ্যেই ঘুরঘুর করতে শুরু করেছে বাড়ীর আশে-পাশে। উদ্দেশ্য, প্রেম করা। এদের মধ্যে পুলিশ কনস্টেবল বার্নেটও আছে। সে আবার কবিতা লিখে লিখে ছুঁড়ে দেয় তার ভাবী বউকে। যাক, এখন আর সে ভাবী নয়। এ মুখও তিনি দেখাতে চান না ম্যাগডাকে।

মাথার মধ্যে চিন্তার বোঝা নিয়ে বাড়ী ফিরলেন মিস্টার রীডার। সারা রাত ঘুমোতে পারলেন না। হাজতে যাওয়ার আগেই কনস্টেবল বার্নেটের রিপোর্টটা তিনি পড়েছিলেন। তাতে লেখা আছে, ব্যাংকের কাছাকাছি আসতেই একটা লোককে দৌড়ে যেতে দেখেছিল সে। ভাল করে দেখবার আগেই হোঁচট খেল একটা লোহার নালে। নীচু হয়ে নালটা দেখে ফের সিধে হয়ে লোকটাকে সে আর দেখতে পায় নি।

সকাল আটটা নাগাদ — পাড়া ঘুরতে বেরোলেন মিস্টার রীডার। দেখলেন ম্যাগডার বাড়ীর সামনে একটা ছোট্ট বাগান। বাগানের মাঝে একটা গোলাপগাছ। শুকোচ্ছে বললেই চলে। বাদামী হয়ে গেছে পাতা।

শহরের মস্ত বাগানের ধারে গিয়ে ফুল-গাছগুলোর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন মিস্টার রীডার। ফিরে এলেন ম্যাগডার বাড়ীতে। ম্যাগডার সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেখলেন, একটা ফুলদানীতে একগুচ্ছ গোলাপ। বাজে অছিলায় পাশের ঘরে পাঠালেন ম্যাগডাকে। গোলাপগুচ্ছ টেনে নিয়ে দেখলেন। বোঁটাগুলো কাঁচি দিয়ে কাটা নয়—টেনে ছেঁড়া। নোট বইয়ের একটা পাতা দিয়ে আগে মোড়া হয়েছে বোঁটাগুলো—তার ওপর জড়ানো সুতো। ভিজে পাতার ওদিকে লাল কালি দিয়ে কি যেন লেখা।

নেমে এলেন মিস্টার রীডার। বাগানে পেলেন একটা লোহার নাল। জানলা থেকে ম্যাগডা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল বাগানে।

গেলেন কনস্টেবল বার্নেটের কাছে। কথায় কথায় জানলেন, লোহার নালে হোঁচট খাওয়ার পরেই রাত দুপুরে কবিতা লেখার ইচ্ছে হয়েছিল বার্নেটের। শহরের বাগানে গিয়ে অনেকগুলো গোলাপ ছিঁড়ে ছিল। নোটবইয়ের পাতায় কবিতা লিখেছিল। সেই কবিতা দিয়েই গোলাপগুলো মুড়ে লোহার নাল দিয়ে ভারী করে ছুঁড়ে দিয়েছিল ম্যাগডার জানলা দিয়ে।

সেইদিনই বিকেলবেলা জানলা থেকে ম্যাগডা দেখলে বিষণ্ণ মুখে সেই লোকটা ফের আসছে। পেছনে একজন পুলিশ ডিটেকটিভ।

নিমেষ মধ্যে বিছানার গদী তুলে ফেলল ম্যাগডা। প্যাডের মত সাজানো ব্যাংক নোটের বাণ্ডিলগুলো তুলে নিয়ে ঠাসল একটা ব্যাগে। পেছনের জানলা খুলে রান্নাঘরের ছাদে ব্যাগটা ফেলে দিয়ে নিজেও লাফ দিয়ে নামল ছাদে। সেখান থেকে বাগানে। বাগান থেকে রাস্তায়। চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে বসল টাকার থলি সমেত। মিশে গেল জনারণ্যে।

—অদ্রীশ বর্ধন

দেশে বিদেশে

পরলোকে কৃষ্ণ মেনন

ভি কে কৃষ্ণ মেননের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যথার্থই বলেছেন, একটা আগ্নেয়গিরি যেন নির্বাপিত হয়ে গেল। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মানুষ নিজের বিশ্বাসের ভূমিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থেকে কারও নিন্দা বা প্রশংসার পরোয়া না করে অবিচলভাবে কাজ করে গেছেন। জওহরলাল নেহরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম কৃষ্ণ মেনন প্রথম জীবনে বিদেশে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বামপন্থী আন্দোলনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নিজের বিশিষ্ট স্থান রচনা করে গেছেন।

ভারত-ইরাণ সম্পর্ক

ভারত ও ইরাণ কিছুকাল যাবৎ পরস্পরের কাছাকাছি আসছে। বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার স্তর পার হয়ে দুই দেশ নিজেদের মধ্যে সীমিত রাজনৈতিক বোঝাপড়ার স্তরে এসে পৌঁছচ্ছে। ইরাণের শাহেনশাহ রেজা পহলবী আর্যমেহেরের তিন দিনব্যাপী ভারত সফরের মধ্য দিয়ে এই ভারত-ইরাণ সম্পর্ক আরও কিছুটা ঘনিষ্ঠতর হল।

শাহেনশাহের সফরের শেষে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে লক্ষণীয় হল, শাহ কিছুকাল যাবৎ যে ভারত মহাসাগরীয় রাষ্ট্রগোষ্ঠী গঠনের কথা বলে আসছেন যুক্ত ইস্তাহারে তার পরোক্ষ উল্লেখ আছে।

যুক্ত ইস্তাহারে বলা হয়েছে ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী দেশগুলির মধ্যে অধিকতর বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা 'এই অঞ্চলে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, অধিকতর আত্মনির্ভরশীলতা এবং খনিজ, প্রাকৃতিক ও জন সম্পদের অধিকতর সদ্ব্যবহার সম্ভব করে তুলবে।'

ভারত মহাসাগরকে উত্তেজনামুক্ত রাখার জন্য বৃহৎ শক্তিগুলির প্রতি আবেদন জানিয়ে যুক্ত ইস্তাহারে বলা হয়েছে 'তাঁরা (শাহেনশাহ ও শ্রীমতী গান্ধী) এবিষয়ে একমত হয়েছেন যে, এই অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব তীরবর্তী দেশগুলির উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

দুই দেশের মধ্যে এই আলোচনা তাদের ভিতর অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রস্তাবকে আরও কিছু দূরে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ভারত থেকে ইরাণ আকরিক লোহা ও এ্যালুমিনিয়াম আমদানি করবে এবং দুই দেশ মিলিতভাবে একটি জাহাজী সংস্থা স্থাপন করবে বলে আগেই স্থির হয়েছিল। ইরাণ কুদ্রেমুখ লোহার খনির উৎপাদন বাড়াবার জন্য ভারতকে সাহায্য দিতে স্বীকৃত হয়েছে। তাছাড়া, কাগজ রেলওয়ে সরঞ্জাম, সিমেন্ট রাসায়নিক পদার্থ কাপড় এক্সরে ফিল্ম চিনি কলের যন্ত্রপাতি প্রভৃতিও ভারত থেকে ইরাণে রপ্তানি করা হবে এবং এইসব শিল্পের উৎপাদন বাড়াবার জন্য ইরাণ সাহায্য করবে বলে স্থির হয়েছে।

* * *

অমৃতের নতুন গৌরব

'অমৃত' এক নতুন গৌরবের অধিকারী হয়েছে। 'অমৃত' পত্রিকার প্রতিনিধি শ্রীপ্রতাপকুমার রায় ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য ইন্ডিয়ান এ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির (আই ই এন এস) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। নাগপুরে টাইমস পত্রিকার শ্রী এ জি শেওরে উপ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন 'মাতৃভূমি' পত্রিকার শ্রী ডি এম নায়ার। 'হিন্দুস্থান টাইমস'-এর জি এন সাহী এবং শ্রী পি সি গান্ধী যথাক্রমে কোষাধ্যক্ষ এবং সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যুগান্তর পত্রিকার মিহিরলাল গাঙ্গুলী এবং নর্দার্ণ ইন্ডিয়া পত্রিকার শ্রীতুহিনকান্তি ঘোষ কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিনিময় বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ তিন মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ঢাকায় বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী খোন্দকার মুস্তাক আহমেদের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

স্থির হয়েছে যে, এই তিন মাস সময়ের মধ্যে বিবেচনা করে দেখা হবে ১৯৭৫ সালের জন্য দুই দেশের মধ্যে অধিকতর বাস্তব বাণিজ্য চুক্তি কিভাবে করা যেতে পারে।

১৯৭৩ সালে দুই দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য চুক্তি করা হয়েছিল তাতে আশা করা হয়েছিল, এক বছরে দুই দেশের মধ্যে মোট ৬০ কোটি টাকা দামের পণ্যের লেনদেন হবে—ভারত থেকে যাবে প্রধানত কয়লা, কাপড় তামাক সিমেন্ট প্রভৃতি আর বাংলাদেশ থেকে আসবে প্রধানত পাট নিউজপ্রিন্ট মাছ। আরও আশা ছিল যে, আমদানি ও রপ্তানির এই দ্বিমুখী বাণিজ্যে উভয় দেশের দেনাপাওনা সমান সমান হয়ে যাবে কারও কোন ঘাটতি থাকবে না। কিন্তু এই দুই আশার কোনটিই পূর্ণ হয় নি। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৪-৫৩ কোটি টাকা অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২৫ শতাংশের কম। এই বাণিজ্যে বাংলাদেশের ঘাটতি হয়েছে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকা।

৬-১০-৭৪

—পুণ্ডরীক

উপন্যাস

শেষ বিচার

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

একটা দিন সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরোতে না পারলে কেমন লাগে। ব্যাস। যেমন কাল। তাঁর মনে হচ্ছিল কি একটা খাঁচার মধ্যে আটকা পড়েছেন। ভীষণ ছটফট করছিলেন।

ছটফট করছিলেন কতক্ষণে ঘর থেকে বেরোবেন। সেটা আর সম্ভব হয়নি। কাল ডুস নিতে হয়েছিল। কাজেই বিছানায় শুয়ে থেকে থেকেই বেলা আটটা বেজে যায়। তারপর বাথরুমে যান। বাথরুম সেরে যখন বেরিয়ে আসেন তখন অমিয়র ঘরের টেবিলের টাইমপিসটায় আটটা কুড়ি বাজতে চলছিল।

তখন আর কি। তখন কি আর বেড়াতে বেরোবার সময়!

হুঁ, বাথরুম থেকে বেরিয়ে ফালি বারান্দাটুকু পার হয়ে নিজের ঘরে ঢোকার সময় ডান হাতে অমিয়র ঘরের দিকে চোখ গিয়েছিল। যে জন্য এক সঙ্গে দুটো জিনিস তাঁর নজরে পড়ে।

নেটের মশারির নিচে অমিয় অকাতরে ঘুমোচ্ছে। আর তার টেবিলের ঘড়িতে আটটা বেজে উনিশ। কুড়িই ধরা যায়।

না, চশমা ছাড়া দূরের জিনিস দেখতে এখনও গোলমাল হয় না। গোলমাল করছে কাছের নজরটা। যেন হাতের কাছের সব কিছুই কদিন ধরে খুব বেশি ঝাপসা দেখছেন। ডাঃ বোসের চেম্বারে গিয়ে এই সেদিনও চোখ দেখিয়ে আবার চশমার পাওয়ার বদলিয়ে এনেছেন।

কিন্তু ঐ যে, যখন ভিতর থেকে আলো নিভতে থাকে তখন বাইরের হাজারটা জোড়াতালি লাগিয়েও সেই জিনিস আর পাওয়া যায় না, সেই চোখ সেই দৃষ্টি এই জীবনে আর ফিরে আসে কখনও! এই বয়সে?

তার জন্য তিনি আফসোস করেন না।

তা হলে অনেক কিছুর জন্য আফসোস করতে হত। সব চুল সাদা হয়ে গেছে। সব কটা দাঁত পড়ে গেল। চামড়া কুঁচকে দলা পাকিয়ে পাকা খেজুরের চেহারা ধরেছে।

কথা হচ্ছে ডুস নেওয়ার দরুন কাল সকালে যেমন বেরোতে পারেন নি তেমনি আজ একেবারে অন্ধকার থাকতে লাঠি হাতে ঠুকঠুক করে নিজের জায়গায় চলে এসেছেন। মুক্ত আকাশ, মুক্ত বায়ু। কিছু শন পাটের ক্ষেতও আছে এদিকটায়। রাস্তাটা কাঁচা। ময়লা জলের নর্দমাটা অর্থাৎ শহরতলীর যেটা বৈশিষ্ট্য, ঠিক এই পর্যন্ত এসে থেমে গেছে। তারপর থেকে আর নর্দমা নেই। এবং দুর্গন্ধও নেই। দু পাশের জমি ও রাস্তা এক হয়ে গেছে। কিছু বাসক কিছু বনতুলসী, খানিকটা খানিকটা আসসেওড়ার ঝোপ। আগুনের মতন লাল দগদগে ফড়িং চোখে পড়ে। সবচেয়ে বেশি দেখা যায় বিশেষ করে এই ভোরের দিকটায়, দুধের রঙের মথ। বনতুলসীর তিনরঙা ফুলের কাছে ঝাঁক বেঁধে সব উড়ছে ঘুরছে, আহা কী দৃশ্য!

এই পর্যন্ত পা চালিয়ে এসে একটু জিরিয়ে নেন তিনি। বসেন না যদিও। বসা হবে আর একটু এগোবার পর। আসশ্যাওড়ার একটা বড় ঝোপের কাছে একটা গর্ত। অনেকটা খাদের মতন। বুনো কচু ও দণ্ডকলস ফুলের গাছে গর্তের উঁচু পাড়টা কেমন নিবিড় সবুজ হয়ে আছে। কচি লম্বা লম্বা ডাঁটের মাথায় অবিকল কলসির চেহারায় অগুনতি সাদা ছোট ছোট ফুল। এইজন্যই ঐ নাম।

দণ্ডকলস। কলসিগুলি কিন্তু খালি নেই। পূর্ণকুম্ভ বলা যায়। মধু বোঝাই হয়ে আছে।

এই জায়গাটায় এসে দাঁড়ালে ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে তাঁর। ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ফুলগুলি দেখেন। দণ্ডকলস ফুল ছিঁড়ে কত না মধু খেয়েছেন।

তখন কারা সঙ্গী সাথী ছিল ভাল মনে নেই। না কি এমন একলাই বেড়াতেন।

বেড়াতেন অর্থ কি! সেদিন লাঠি হাতে ঠুকঠুক করে হাঁটতেন না। বা হাঁটতে গেলে মাথা কাঁপত না পা কাঁপত না। টাট্টু ঘোড়ার মতন ছুটতেন দৌড়োতেন। ছুটতে ছুটতে এক একটা ঝোপের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াতেন। সবুজ বুনো গন্ধ নাকে লাগত। ঝিঁঝি ডাকত। ফড়িং প্রজাপতি উড়ত। বুকের ভিতর কেমন সিরসির করত। অদ্ভুত।

না সেই ভাব এখন আর আসে না। সেই চমক শিহরণ কোথায় হারিয়ে গেছে।

অথচ এখনও ঝোপঝাড় আছে, গাছপালা আছে। দণ্ডকলস ফুল ফোটে। মধুলোভী পতঙ্গের ঝাঁক উড়ে আসে।

আর এদের সঙ্গে আমিও আছি, সেই মানুষ, বঙ্কিম দত্ত।

ভেবে একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলেন তিনি।

এই হয়। যার নাম বয়স অভিজ্ঞতা।

এর মতন কদর্য জিনিস পৃথিবীতে আর কিছু আছে?

অর্থাৎ সব কিছু তোমার দেখা হয়ে গেছে বোঝা হয়ে গেছে। কিছুই আর নতুন নেই অভিনব নেই। তোমার কাছে নেই। দীর্ঘ আয়ু পাওয়ার এই অভিশাপ!

পরশু কী হয়েছিল! অমিয়র ছোট মেয়ে টুটুনের জন্মদিন। অমিয়র স্ত্রী নিজে মার্কেট থেকে সন্দেশ ও ফুল কিনে এনেছিল। এখন ফুলের তোড়া দুটো হাত থেকে নামিয়ে নীহার যখন টেবিলে রাখতে গেছে, টুটুনের চোখে জিনিসটা পড়ে। ব্যাস্—কী চিৎকার নাতনীর! মা মা মা! কি ব্যাপার? বঙ্কিমবাবু বারান্দায় ছিলেন। কাগজ পড়ছিলেন। ছুটে ভিতরে যান। টুটুন হাততালি দিচ্ছিল লাফাচ্ছিল, চোখের মণি দুটো টোপা কুলের মতন গোল হয়ে বড় হয়ে উঠে কপালের নিচে থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসে এমন অবস্থা। অর্থাৎ বঙ্কিমবাবু দেখছিলেন তেরো বছরের কিশোরীর চোখে ভয় বিস্ময় কৌতূহল উল্লাস ঘেন্না। পৃথিবীতে হেন জিনিস নেই যা একটার পর একটা মুহুর্মুহু চলকে চলকে উঠছিল না। অমিয়র স্ত্রীর চোখও বেজায় রকম গোল হয়ে উঠেছিল। একটা গোলাপের ডাঁটের গায়ে এত বড় দুটো

শুঁয়োপোকা কিলবিল করছে। জোড়া বাঁধবার সময় নিশ্চয় দোকানী লক্ষ্য করেনি। আর ঐ পোকাসহ এতবড় তোড়াটা কিনা নীহার দিব্যি বগলে করে মার্কেট থেকে বয়ে এনেছে। বাড়ি ও বাজারের মধ্যে দূরত্বটা তো কম না। অনেকটা রাস্তা।

দেখে বঙ্কিমবাবু হাসছিলেন কি। না। আবার খুব যে একটা গম্ভীর হয়ে ছিলেন তা-ও নয়। তিনি দেখছিলেন মেয়ের মতন মার চোখেও ভয় বিস্ময় কৌতূহল ঘেন্না ইত্যাদি এবং সেই সঙ্গে একটা দারুণ মজার জিনিস আবিষ্কার করার ছেলেমানুষী উল্লাস প্রকট হয়ে উঠেছে।

স্বাভাবিক। বঙ্কিমবাবু তখন চিন্তা করেন এমন টকটকে লাল রং, আর হাতের মুঠোর মতন বড় এক একটা গোলাপ। এমন চোখ জুড়ানো ফুলের ডাঁটের গায়ে ধোঁয়ার রঙের বিদঘুটে চেহারার দুটো ঘৃণ্য কীট কামড় খেয়ে আছে। চমক লাগাবার মতন ভীতি উদ্রেক করার মতন কনট্রাস্ট তো বটেই। আর এই বৈসাদৃশ্য দেখে মজা পেয়ে হাততালি দেবার মতন একটা বয়সও থাকে বৈকি মানুষের। টুটুনের আছে। টুটুনের মা-র আছে।

দুপুরবেলা নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে কথাটা আর একবার চিন্তা করে বঙ্কিমবাবুর বুক ঠেলে একটা ভারি নিশ্বাস উঠে এসেছিল।

অর্থাৎ আশির ঘরে পা দিয়ে কোনো বিস্ময়ই তাঁর চোখে আর এখন বিস্ময় হয়ে থাকে না, কোনো চমকই তাঁকে নাড়া দেয় না। যেন কোনো ভয়ও ভয় বলে মনে হয় না। তেমনি উদ্ভট কিছু দেখে উল্লসিত হবেন, ভিতরে হাসির সুড়সুড়ি জাগবে সেই দৃষ্টি সেই মনই বা কোথায়! সব হারিয়েছেন।

যেমন এখন।

দণ্ডকলসের মধু খেতে এক ঝাঁক নীল মাছির মতন পোকা উড়ে এসেছে। হয়তো এক জাতের মাছিই।

মাছি ফুলের মধু খায়? এই দৃশ্য দেখতে পেলে কেবল তাঁর তেরো বছরের নাতনি কেন নাতনির মা অমিয়র স্ত্রী নীহার কী করত?

ভেবে আর দাঁড়ান না তিনি। লাঠি ঠুকঠুক করে এগোতে থাকেন। কয়েক পা এগোবার পর সামনে প্রকাণ্ড ঝিল। যেন ফিশারীর মতন একটা কিছু। ভোরের আকাশের ছায়া পড়ে আয়নার মতন চকচক করছে।

এবার তিনি জলের গন্ধ পানার গন্ধ টের পান। ভোরাই বাতাসে থেকে থেকে হাঁসের গায়ের গন্ধ শামুক গুগলির গন্ধও ভেসে আসছে।

হুঁ, নিজের জায়গাই বটে। রোজ পায়জামা পাঞ্জাবি পরে লাঠি হাতে ঠিক এই জায়গাটায় চলে না এলে তাঁর মনে হয় প্রাতর্ভ্রমণটা অসম্পূর্ণ থেকে গেল। অমিয়রা মোটেই খুশী না। অমিয় অমিয়র স্ত্রী রোজ চেঁচামেচি করে। অতদূরে একলা যাবেন না। বাড়ির কাছে পার্ক আছে খেলার মাঠ আছে—তা ছাড়া আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটাও তো কম বড় নয়। দুধারে যথেষ্ট গাছপালা।

কিন্তু বঙ্কিমবাবু তা শুনবেন কেন।

রাস্তা যত বড়ই হোক কি যত গাছ-পালাই থাকুক, ট্রাম বাসের শব্দ ও পোড়া পেট্রল ডিজেলের গন্ধ যাবে কোথায়। ফুটপাথ ধরে ক্রমাগত মানুষের মিছিল। সেই সকাল থেকেই রাস্তায় ভিড়। এই বয়সে এসব আর ভাল লাগে! তা না হলে রোজ পয়সা খরচ করে একটু ঘাসের গন্ধ জলের গন্ধ শামুক পানার গন্ধ পাবেন বলে রিকসা করে সেই বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে বণ্ডেলের রেললাইন পার হয়ে, তারপর হাঁটতে হাঁটতে তিনি এতটা রাস্তা ছুটে আসেন!

ঝিলের ওপাড়টা এখনও কেমন ধোঁয়াটে সবুজ হয়ে আছে। গাছপালা বাড়িঘর কিছুই বোঝা যায় না। একটু রোদ উঠলে আর একটু বেলা বাড়লে সব কিছুই পরিষ্কার চোখে পড়বে। চারদিকের ঝাপসা চেহারাটা থাকবে না। থাকে না। কিন্তু ততটা বেলা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেন না। রোদ উঠলে হাঁটতে কষ্ট হয়। মাথাটা ঝিমঝিম করে। সে জন্য ঠাণ্ডা থাকতে থাকতে ফেরার রাস্তা ধরেন। আজ একটু বেশি সকালে চলে এসেছেন। কুয়াশার মতন একটা ধূসর নীলাভ পর্দা এখনও দূরে দূরে ঝুলছে। রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল। হয়তো মেঘের জন্য চারদিকের ঝাপসাটা কাটতে একটু বেশি বেলাই হবে।

রোজকার মতন ঝিলের ধারে ঝাঁকড়া-মাথা শিমুল গাছটা লক্ষ্য করে তিনি হাঁটছিলেন। ওখানে একটা বড় পাথর আছে। পাথর ঠিক নয়। কনক্রিটের একটা চাঁই। ওই প্রকাণ্ড জিনিসটা ওখানে কি করে এল বঙ্কিমবাবু অনেকদিন চিন্তা করেছেন। যাই হোক তাঁর পা ঝুলিয়ে বসবার চমৎকার আসন একটা। আধঘণ্টা বিশ মিনিট ওটার ওপর বসে নিরুপদ্রবে তিনি বিশ্রাম করেন। আসনটা সর্বদা খালি পান। আর তখন টুটুনের মা-র কথা মনে পড়ে তাঁর হাসি পায়। বাড়ির কাছে পার্ক। খুব ভাল কথা। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু সকাল দুপুরে সন্ধ্যে—আজ চল্লিশ বছরের ওপর এ-পাড়ায় আছি, একদিন একটা বেঞ্চ আমি খালি দেখতে পাইনি বৌমা যে বসে দশ মিনিট বিশ্রাম করব জিরিয়ে নেব। আগে আগে বেড়াতে বেরিয়ে বিশ্রাম করার তেমন দরকার পড়ত না। গায়ে জোর ছিল। কিন্তু এখন একনাগাড়ে দশ মিনিট হাঁটলে পা দুটো ধরে যায়, মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে— কাজেই ঝিলের ধারের এই ফাঁকা আসনটির লোভে আমি এদিকে চলে আসি।

আহা, সময় সময় তিনি এ-ও চিন্তা করেন স্ত্রীকে নিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে অমিয় যদি কখনও এদিকে বেড়াতে আসত তো এখানকার এই শান্ত আকাশ মাটি ঘাস কীটপতঙ্গ আর আয়নার মতো চকচকে প্রকাণ্ড ঝিলের ছবিটা দেখে তারা মুগ্ধ হত।

উঁহু, ভুল করলেন তিনি। চিন্তাটা ঠিক হল না। অমিয় তার স্ত্রীকে নিয়ে বা ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোনোদিন বেড়াতে বেরোয় না। অমিয় একা একা বেড়ায়। তেমনি ছেলেমেয়েরা। যেন কারো সঙ্গে কারো যোগ নেই। হয়তো এটাই আজকের দিনের বৈশিষ্ট্য। স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলা। বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা। কারো গায়ের সঙ্গে কেউ লেগে থাকবে না। যার যখন খুশি বেড়াতে বেরোবে কি [illegible] করে ধরে বসে থাকবে, কি খবরে[illegible]জ পড়বে বা নভেল পড়বে বা সেলাই [illegible]বে বা রেডিও শুনবে।

আশ্চর্য এটা যে শুধু এ-বাড়িতে হচ্ছে তা না, বঙ্কিমবাবু আঁচ করতে পারেন, ঘরে ঘরে ঠিক তাই। মা মেয়ে একসঙ্গে বসে রেডিওর খবর শোনে না, এক সঙ্গে বেড়ায় না; বাপ ছেলে একত্র হয়ে কাগজ পড়ে না, দরকারী কথা থাকলেও বলে না। খাবার টেবিলে সকলে গোল হয়ে বসে খাবে গল্প করবে, ক্রমশ এই সমস্ত ভাল ভাল নিয়ম উঠে যাচ্ছে। অথচ সবাই এক হাঁড়ির ভাত খায় একটা ছাদের নিচে শয্যা নেয়, একটা সদর দিয়ে ভিতরে ঢোকে, বাইরে যায়। হলে হবে কি, এক পরিবারের মানুষ বলতে এখন আর পরিবারের সব কটি প্রাণী কিছু সুতোয় গাঁথা মালাটি হয়ে থাকে না যে একটা ফুল টানলে মালার সব কটা ফুল নড়ে উঠবে দুলে উঠবে।

কোনোদিন কি বঙ্কিমবাবু টুটুনকে বলে রাজী করাতে পারবেন, আয় আজ দাদুর সঙ্গে বেড়াবি? বা টুটুনের ভাই খোকনকে? খোকন মানে রঞ্জু। অমিয়র ছোট ছেলে। ষোলয় পা দিয়েছে। সাউথ পার্কের স্কুল থেকে এবার হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিল। বলে কিনা আশি বছরের বুড়ো দাদুর সঙ্গে ওরা বেড়াবে, বাবা মার সঙ্গেই কোনোদিন বেড়ায় না! বাবা মা কেন, দুটি ভাই-বোনকে একত্র হয়ে কোনোদিন বেড়াতে কি

যখন ঘরে থাকে এক সঙ্গে বসে গল্প করতে বা এই বয়সের যেটা ধর্ম লুডো ক্যারাম খেলতেও কোনোদিন দেখা গেল না।

কিন্তু তাঁর ছেলেবেলায় এই জিনিস বঙ্কিমবাবু দেখেন নি। তাঁরা ভাইবোনেরা একসঙ্গে কত খেলাধুলো করেছেন গল্প করেছেন, বাবা মা তাঁদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে, একত্র বসে খেয়েছে হেসেছে কত কথা বলেছে।

যাক গে, কথা হচ্ছে একলা কেউ যে যায় খুশি মতন অমিয় বা তার স্ত্রী কি ছেলে-মেয়েদের কেউ কোনোদিন রেললাইন পার হয়ে শহরতলীর এদিকটায় ভুল করেও পা বাড়াবে না। তাদের দৃষ্টি শহরের আরও ভিতরের দিকে। ঘিঞ্জির দিকে। যেখানে আরও বেশি শব্দ, বেশি ঘরবাড়ি। গাড়ি-ঘোড়ার ছুটোছুটি হৈচৈ, উন্দামতা অস্থিরতা তারা অনেক বেশি পছন্দ করে।

বঙ্কিমবাবুর মতন নালা মাঠ দেখতে আকাশ দেখতে পোকামাকড় পাখি দেখতে তাদের বয়ে গেছে। এটা উত্তেজনার যুগ।

হঠাৎ তাঁর গতি শ্লথ হয়ে এল। ওরা ওখানে কারা দাঁড়িয়ে! তাঁর দিকে এমন করে তাকাচ্ছে কেন। বঙ্কিমবাবুর কপালে রেখা জাগল। তিনি ঠিক বুঝতে পারছিলেন না।

(ক্রমশ)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিতর্ক

কুমারেশ চক্রবর্তী

সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও অ্যাকাদেমিক কাউন্সিলে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানান হয়েছে। পার্লামেন্ট যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আবেদন গ্রহণ করেন, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর বর্তাবে।

বিষয়টি যেমন বিতর্কিত তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষতঃ শিক্ষাবিদ মহল এ ব্যাপারে একমত নন। সেই কারণে সেনেট ও অ্যাকাদেমিক কাউন্সিলে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়নি, ভোটের আশ্রয় নিতে হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী প্রবীণ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী (৮১) সারা ভারত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত সেনেট সদস্যাদ্বয় অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর কাছে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতি করলেও কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁদের বক্তব্য রাখেননি।

ডঃ রমা চৌধুরী

শ্রীমতী চৌধুরী এই প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন—কোন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব জাতীয় গুরুত্বের সমান হলে তবেই তা জাতীয় প্রতিষ্ঠান হতে পারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেই গুণ ও যোগ্যতাসম্পন্ন। তবে আর্থিক সমস্যা সমাধানে এটাই একমাত্র পথ বলে আমি মনে করি না।

প্রঃ—জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বলতে কি আপনি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় মনে করেন?

উঃ—নিশ্চয়ই নয়। অনেক কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বসম্পন্ন নয়। এদের অনেকের মানও জাতীয় স্তরের নীচে।

প্রঃ—এই প্রস্তাব কার্যকর হলে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারে বাধা সৃষ্টি হবে না কি?

উঃ—হওয়া তো উচিত নয়। কারণ এই প্রস্তাব কার্যকর হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অব্যাহত থাকে সে ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই করেছেন।

প্রঃ—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান কি নেমে গেছে? এই প্রস্তাব কার্যকর হলে কি সেই মান উন্নত হবে বলে আপনি মনে করেন?

উঃ—না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজও 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়'। আজও এর শুধু জাতীয় নয় আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। এই প্রস্তাব কার্যকর হলেই যে মান বাড়বে তা নয়।

প্রঃ—আপনি কি চান রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষিত হোক?

উঃ—এটা সকলের কাম্য হওয়া উচিত আমিও চাই। কিন্তু কোনরূপ স্বাধীনতার বিনিময়ে নিশ্চয়ই নয়।

অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী

প্রবীণ অধ্যাপক চক্রবর্তী এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে 'জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান' বলে ঘোষণা করতে হলে সংবিধানের সপ্তম তপশীলের ৬৩ ধারা অনুযায়ী করতে হবে। এর অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়া। এর দ্বারা আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়ত হতে পারে কিন্তু অন্য অনেক সমস্যা দেখা দেবে। যেমন (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন কলেজের প্রায় আড়াই লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর কি হবে? কেন্দ্র তো এদের দায়িত্ব নেবে না। (খ) পাঠ্যসূচী পাঠ্য-পুস্তক পাঠ্য বিষয় প্রভৃতি ঠিক করবে দিল্লী এমন কি শিক্ষক নিয়োগ [illegible] করবে দিল্লী। এর ফল ভয়াবহ। (গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য থাকবে না। (ঘ) আমরা কেন্দ্রের আজ্ঞাবহ হয়ে পড়বো। (ঙ) মাতৃভাষার প্রচার-প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হবে। শুরু হবে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ (চ) বিশেষ করে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয় বড় হয়ে দাঁড়াবে বামপন্থী ব্যক্তিরা সুযোগ পাবেন না। (ছ) এবং সর্বোপরি বাংলার ও বাঙালীর শেষ ও শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এই বিশ্ববিদ্যালয়—যা আমরা ধ্বংস করার জন্য অপরের হাতে দিচ্ছি।

প্রঃ—আপনার আশংকার কারণ কি?

উঃ—তিক্ত অভিজ্ঞতা। চোখের সামনে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী।

প্রঃ—এই প্রস্তাবের অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বলে মনে করেন?

উঃ—ব্যক্তিগতভাবে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রাস করার চক্রান্ত এর আগেও হয়েছে। টাকার প্রলোভন দেখিয়েছিল ফোর্ড ফাউন্ডেশন। আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। তাছাড়া কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতিতে ভরসা রাখা যায়? দ্বি-বার্ষিক কোর্স চালুর সময় যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি কেন্দ্র দিয়েছিল তা রাখেনি শেষে সমস্ত পরিকল্পনাই ব্যর্থ হলো।

প্রঃ—এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সমস্যা সমাধানের পথ কি?

উঃ—এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব জাতীয় গুরুত্বের সমান এর জন্য প্রস্তাব নেবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এই সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে নিঃশর্তভাবে আরও সাহায্য দিতে হবে।

অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আলোচ্য প্রস্তাবকে জোরালোভাবে সমর্থন করে বললেন, শিক্ষাজগতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা। যা আমাদের দেশে বিশেষত এই রাজ্যে সবচেয়ে বেশী অবহেলিত। রাজ্য সরকারের বেশীর ভাগ সময় ও অর্থ উচ্চশিক্ষা ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হয়। ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা ও সময় দেওয়া যায় না। এই প্রস্তাব কার্যকর হলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দায়-দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করবেন। ফলে রাজ্য সরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ধন ও মন দুই-ই দিতে পারবেন। দ্বিতীয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নত করার জন্য এটা প্রয়োজন। তৃতীয়ত এর দ্বারা আর্থিক সমস্যা সমাধান হবে।

প্রঃ—আপনি কি মনে করেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মান নেমে গেছে? যদি গিয়ে থাকে তা হলে এই প্রস্তাবের দ্বারা কিভাবে মান উন্নত হবে?

উঃ—হ্যাঁ আমি মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান অনেক নেমে গেছে। এই প্রস্তাব কার্য-কর হলে আমরা বাইরে থেকে ভালো ভালো শিক্ষক আনতে পারবো। বিভিন্ন রাজ্যের সেরা ছাত্রদের আকর্ষণ করতে পারবো। বর্তমান কাঠামোর মধ্যে এটা সম্ভব নয়। কারণ বাইরের শিক্ষক আনার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বাধা সৃষ্টি করেন। তাছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন কোন জাতীয় গুরুত্ব নেই এটা এখন একটা আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। সেই জন্য বাইরের ভালো শিক্ষকরা আসতে চান না।

প্রঃ—বর্তমানে কি এখানে ভালো শিক্ষক, ছাত্র নেই?

উঃ—ভালো শিক্ষকের সংখ্যা খুবই অল্প ভালো ছাত্র কিছু আছে।

প্রঃ—এই প্রস্তাবের দ্বারা কলকাতা কি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে?

উঃ—না। তবে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হলে আপত্তি নেই। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের যেটা স্বর্ণ যুগ সেটা কেন্দ্রের হাতে থাকাকালে হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণান রমন ভান্ডারকার প্রভৃতি ঐ সময়ে এসেছিলেন।

প্রঃ—এই প্রস্তাবের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য ও অটোনমি নষ্ট হবে না কি?

উঃ—এ ব্যাপারে ভ্রান্ত প্রচার হচ্ছে। এটা বৃটিশ আমল নয়, সুতরাং দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিবর্তন হওয়া দরকার। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনী ব্যাপারগুলো যত কম থাকবে ততই ভালো।

প্রঃ—আচ্ছা এই প্রস্তাব গৃহীত হলে আন্ডার-গ্রাজুয়েট কলেজগুলোর কি হবে?

উঃ—সেটা রাজ্য সরকার ঠিক করবে। তবে আমার পরামর্শ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকবে পোস্ট-গ্রাজুয়েট আর রিসার্চ বিভাগ আর থাকবে ২।৩টে ভালো কলেজ। এখানে ত্রি-বার্ষিক কোর্স চালু থাকবে। অন্য সব কলেজ ইন্টার কলেজ বোর্ডের মতো কোন বোর্ডের অধীনে থাকবে।

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু

অধ্যাপক বসু আলোচ্য প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে বললেন বিশ্বের সর্বত্র যুক্ত রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি রাজ্য সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানেও সেই ব্যবস্থা আছে। তবে ব্যতিক্রমের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু ১৯৫০ সালের সংবিধান প্রবর্তনের পর একটিও রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় হতে চায়নি। এর কারণ কোন ঐতিহ্যসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় স্বেচ্ছায় নিজে-দের স্বাতন্ত্র্য ও অটোনমি বিসর্জন দিতে চায় না। এ অবস্থায় কলকাতা কেন্দ্রের হাতে চলে গেলে কেন্দ্রীয়করণের ঝোঁক তৈরী হবে। দ্বিতীয়ত প্রাথমিক থেকে গবেষণা পর্যন্ত শিক্ষা একটা সুসংহত যুক্ত ব্যবস্থা তাই প্রাথমিক ও মাধ্যমিককে রাজ্যের হাতে রেখে উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রের হাতে দেওয়া শিক্ষাকে এভাবে খণ্ড খণ্ড করা যায় না। তৃতীয়ত রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর জন-মতের যত প্রভাব পড়ে দিল্লীর হাতে থাকলে তা হয় না। তাছাড়া বিধানসভা বিশ্ব-বিদ্যালয় ব্যাপারে যত নজর দিতে পারে বিরাট পার্লামেন্টে তা সম্ভব নয়।

প্রঃ—এই প্রস্তাব কার্যকর হলে আপনি আর কি আশংকা করছেন?

উঃ—স্বাতন্ত্র্য অটোনমি নষ্ট হবে বাংলা ভাষার স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে। তাছাড়া নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে রাজ্যের মেধাবী ছাত্রদের প্রতি বৈষম্য হতে পারে যেমন সর্বত্রই হচ্ছে।

প্রঃ—কেউ কেউ বলেন কেন্দ্রের অধীনে থাকাকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণযুগ, আপনার মত কি?

উঃ—যাঁরা ওকথা বলেন, তাঁরা ভুল বলেন। রাজ্যের হাতে থাকা কালেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বর্ণযুগ হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণান রমন ভান্ডারকার পি সি রায় দীনেশ সেন কয়াজী বিনয় সরকার সত্যেন বোস—সব এই সময়ের প্রতিভা।

প্রঃ—এই প্রস্তাব ছাড়া আর্থিক সমস্যা সমাধানের উপায় কি?

উঃ—প্রথমত ছাত্র সংখ্যার হিসাবে এই বিশ্ববিদ্যালয় অন্য পাঁচটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কম সাহায্য পায়। এই সাহায্যের পরিমাণ বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত রাজ্য সরকারের সামর্থ্যে না কুলালে ফিনান্স কমিশন মারফং এই অতিরিক্ত টাকা আসতে পারে, সংবিধানে এর ব্যবস্থা আছে। তৃতীয়ত ইউ জি সি বর্তমানে ভালো সাহায্য করছে। ইউ জি সির নিয়ম পরিবর্তন করে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন দুই বাবদই সাহায্যের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিক্ষা কমিশনও এই সুপারিশ করেছেন। চতুর্থত কেন্দ্র সরাসরি বিশ্ব-বিদ্যালয়কে সাহায্য করতে পারে না এটা ভুল ধারণা। সংবিধানের ২৮২ ধারা অনুসারে কেন্দ্র সরাসরি সাহায্য করতে পারে এবং

কাও উচিত। কারণ কলকাতা ভারতের বৃহত্তম ও দরিদ্রতম বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং অর্থ-সংকট থেকে মুক্তির পথ আছে। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্রের হাতে দেবার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া কেন্দ্রের হাতে তুলে না দিলে সাহায্য দেব না—পরোক্ষভাবে কেন্দ্রের যদি এই মনোভাব হয় তাহলে সন্দেহ জাগে এর পেছনে মতলব আছে।

প্রঃ—এই প্রস্তাবের পেছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কি?

উঃ—মনে হয় না। অন্তত আমি জানি না।

অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত

অমিয়বাবু প্রস্তাবটির সপক্ষে মত দিয়ে বললেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—ভারতের প্রাচীন ও বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়। এর একটা সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য আছে। প্রাক স্বাধীনতা ও উত্তর-স্বাধীনতা যুগের বহু গণ-আন্দোলনে ও জাতীয় সংকটে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ ভূমিকা ও অবদান আছে। এটা শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। এর সংগে সমগ্র জাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তাই এর দায়-দায়িত্ব চিন্তা-ভাবনা সমগ্র জাতির বহন করা উচিত। প্রধানত এই কারণে আমি এই প্রস্তাবের পক্ষে। দ্বিতীয়ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা—তা আমাদের দেশে বিশেষত পঃ বংগে সবচেয়ে বেশী অবহেলিত ও দুর্দশাগ্রস্ত। রাজ্যের ঘাড় থেকে উচ্চশিক্ষার আর্থিক বোঝা কিছুটা কমে গেলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দেবে। তৃতীয়ত স্থায়ী ও সরাসরি সাহায্য পাওয়া গেলে সুপরিকল্পিত স্থায়ী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় অনিশ্চিত ও মাঝে মধ্যে সাহায্যের দ্বারা যা সম্ভব নয়। চতুর্থত এর বিরাট আর্থিক ঘাটতি ও অন্যান্য যে সব ত্রুটি ও দুর্নীতি আছে সেদিকে সমগ্র জাতি এখনই নজর না দিলে এটা হয়ত একদিন কলকাতা করপোরেশনে পরিণত হবে।

পঃ—আপনি কি মনে করেন এই প্রস্তাব কার্যকরী হলেই সব ত্রুটি দূর হবে?

উঃ—নিশ্চয়ই না। তবে একটা সম্ভাবনা দেখা দেবে। আসলে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন ছাড়া এটা সম্ভব নয়। বিশেষত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পাঠ্যসূচী ও পরীক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন না করলে এবং রিসার্চব্যবস্থার আরও উন্নতি না করলে উন্নতি সম্ভব নয় তা যতই টাকা ঢালুক।

প্রঃ—এই প্রস্তাব কার্যকর হলে কি বর্তমান গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হবে না?

উঃ—এই প্রস্তাবের সব শর্তগুলো আমি জানি না। জাতীয় স্বার্থে এই প্রস্তাব সমর্থন করছি তার মানে এই নয় যে গণতান্ত্রিক অধিকার বিসর্জন দিচ্ছি। তেমন কোন শর্ত থাকলে বিরোধিতা করবো। বরং আমি চাই সম্ভাব্য সকল স্তরে ছাত্র শিক্ষক কর্মচারীদের প্রতিনিধি। অবশ্য আমি মনে করি স্বাতন্ত্র্য অটোনমি গণতান্ত্রিক অধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলো নির্ভর করে সেই প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর।

পঃ—কলকাতা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হলে এর আন্ডার-গ্রাজুয়েট আড়াই লাখ ছাত্রের কি হবে?

উঃ—শুনলাম জাতীয় গুরুত্বের মর্যাদা পাবে শুধু পোস্টগ্রাজুয়েট ও রিসার্চ বিভাগ। যদি তাই হয় তাহলে আমি এর তীব্র বিরোধিতা করবো। কারণ এই দুই স্তর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এদের ভাগ করা সম্ভবও নয় কাম্যও নয়।

ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন

এই প্রস্তাবের মূল উদ্যোক্তা উপাচার্য ডঃ সেন সরাসরি বললেন মূলত আর্থিক কারণেই এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান আর্থিক সংকট যে কি নিদারুণ তা বাইরে থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও অন্যান্য উন্নয়ন কাজ সব এই অর্থের জন্য ব্যাহত হচ্ছে। রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন কেন্দ্র সরাসরি সাহায্য দেবে না। ইউ জি সি যা দিচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি অল্প—এ অবস্থা থেকে মুক্তির এছাড়া পথ নেই। ফিনান্স কমিশনের কথা বলা হচ্ছে। এটা রাজ্য সরকারের ব্যাপার। জানি না ও'রা টাকা নেন কিনা তবে আমরা পাই না।

প্রঃ—সংবিধানের কোন ধারা অনুসারে এই প্রস্তাব গৃহীত হবে?

উঃ—সপ্তম তপশীলের ৬৩ ধারা অনুযায়ী।

প্রঃ—জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বলতে আপনি কি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় মনে করেন?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—এই প্রস্তাব কার্যকর হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান গণতান্ত্রিক বডিগুলো ও স্বাতন্ত্র্য থাকবে কি?

উঃ—নিশ্চয়ই থাকবে। সব যেমন আছে তেমনি থাকবে, শুধু আইন প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাজ্য বিধানসভার পরিবর্তে পার্লামেন্টের হাতে যাবে। রাজ্যের পরিবর্তে সমগ্র দেশের পার্লামেন্টের হাতে গেলে ক্ষতি হয় কি করে? আর এতে স্বাতন্ত্র্য বা অটোনমি নষ্ট হয় কি করে?

প্রঃ—আন্ডারগ্রাজুয়েট কলেজের আড়াই লাখ ছাত্রের কি হবে?

উঃ—তারা যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আছে তেমন থাকবে। তবে আমাদের বিশাল আয়তন সংকোচনের প্রস্তাব আছে।

প্রঃ—আপনি কি মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নেমে গেছে?

উঃ—না। আজও নানা অসুবিধার মধ্যেও আমাদের ভালো ছাত্রদের মান অত্যন্ত উঁচু। তারা ভারত কেন বিশ্বের যে কোন ভালো ছাত্রের সমতুল্য।

প্র—বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাইরে থেকে ভালো শিক্ষক আনায় অসুবিধা আছে কি?

উঃ—কোন অসুবিধা নেই, কোন বাধাও নেই। প্রয়োজন হলেই আনবো। বর্তমানে আমাদের ভালো শিক্ষকের অভাব নেই।

প্রঃ—এই প্রস্তাব কি বাংলার সংস্কৃতিকে আঘাত করবে না?

উঃ—বাংলার সংস্কৃতিকে আঘাত করার মত ক্ষমতা কারো নেই। বাংলার সংস্কৃতি এত দুর্বল নয়। তা ছাড়া আমি নিজেকেও এত দুর্বল মনে করি না। আসলে এ আশংকা যাঁরা করছেন তাঁরা নিজেরাই দুর্বলচেতা।

কবিতা

নিয়মমা[illegible] ॥

শংক[illegible]োপাধ্যায়

দিনগুলোকে গা ধরেই দি ঝাঁকিয়ে
উল্টে রাখি রাস্তাটা ফুটপাতে
নদীগুলোকে ফেরৎ পাঠিয়ে দি মোহানায়
তারপর হাত-পা ছড়িয়ে টানা ঘুম চৌপহর।

কাজগুলো কিন্তু বাকি-ই থেকে যায়
খোলটানা খাতায় হিসেবের ঘর খালি
বুদ্ধিবিবেক জলাঞ্জলি
'বয়সের ঢিবি তবু বাছা আমার বালক কেষ্ট'
মায়ের গলা শুনি উঠোনে, লক্ষ্যটা আমি-ই।

কুকড়ে বসে থাকো মানুষের ছবি আঁকলাম খাতাভর্তি
দিলুম নৌকোটাকে ফুটো করে
এক লাথিতে নিজের ছায়াটাকেই
ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম চৌকাঠে
তারপর গলা খুলে গাইলাম গান যা কিনা প্রলয়ের।

ফিরতি পথে দেখি দিনগুলো দিনের মতই ফিরছে
রাস্তাটাও নিজের মত
আর খাতাভর্তি খুদো মানুষের পালে লেগেছে আগুন
ঝাঁপ খাচ্ছে নদী সমুদ্রে।

বুঝলাম সময় হয়েছে,
সেই কেশর ফোলানো সিংহের মত সময়
যাকে আমি জীবনভোর খুঁজছি
পোষাক এঁটে রান্নাঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে তাই হাঁক পাড়লাম
'বড্ডো খিদে পেয়েছে মা ভাত বাড়ো।'

অধীনতাগুলি ॥

দীপেন রায়

অথচ সে এলো না,
কথা দিয়েছিলো
আমি বাস স্টপ থেকে তাকে
আলো দেখিয়ে নিয়ে যাবো আমার ওখানে।
এখন সমস্ত পথ এক নিরবিচ্ছিন্ন অলসতা নিয়ে
শব্দহীন শুক্লা সপ্তমীর আলোয়
স্থির হয়ে যাবে—
আর সে আসবে না।

অনির্দিষ্ট যে যেখানে যেমনটি দাঁড়িয়ে,
থেকে যাবে,
যতক্ষণ না অপরাপর প্রত্যেকটি ইচ্ছার মনোমত
ভূমির পাদস্পর্শে উঠে আসে আমাদের অধীনতাগুলি।

সরস্বতী দীঘি ॥

দেবারতি মিত্র

সাদা পদ্ম তুমি পাপড়ি কাঁপিয়ে
টুপটাপ ঢেলে দাও অঝোর শিশির
ডুবে যায় দেবীদীঘি—
মীনচিহ্ন, শ্যাওলার মেদুর ঘুমন্ত সিঁড়ি
আস্তে আস্তে ভরে ওঠে
পৃথিবী গভীর স্নিগ্ধ জন্মের ফাটল
উপচে আচ্ছন্ন ছায়া, ঘুম, প্রস্রবণ টেনে আনে
দু'পায়ের পাতা ছুঁয়ে চোখ অবধি কত
আকুলিবিকুলি করে ঠাণ্ডা স্রোত আসে
ঝিরঝির ঢেউ দেয় জল।

সরস্বতীর মুখের মতো টলটলে সাদা পদ্ম
কেন তুমি সারা দিনরাত
টুপটাপ টুপটাপ গান গেয়ে যাও
সাগর ছোঁয়ানি হাওয়া
তবু তার কাছ থেকে
আকাশ এমন গাঢ়
উৎস শিশির খুঁজে পাও?

যুবক যুবতী

আড্ডা—অবসর

কথাটা বোধহয় মিথ্যেও নয় যে পৃথিবীতে দুটি দেশের মানুষ যথা ফরাসী এবং বাঙালী আড্ডার বেলায় বাকি সব দেশগুলিকে টেক্কা দিয়ে চলেছে। ফরাসীদের আড্ডার স্থান শুনতে পাই কাফে, আমাদের দেশে অঞ্চল-বিশেষ এক একরকম। কলকাতায় রেস্তোরাঁ বা চায়ের দোকান একটু অলি-গলি বা না-বড় না-ছোট রাস্তার ধারে বাড়ির রক, পার্ক, কফি হাউস অনেক কিছু। গ্রামে আছে চণ্ডীমণ্ডপ (বয়স্কদের স্থান বলেই চিহ্নিত) আর বটতলা কিংবা আটচালা চায়ের দোকান নয়তো ক্লাবঘর, আড্ডা মানেই আনন্দ। তাই কি? ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলন্ডের ছেলেরা আড্ডা মারতে মারতে কোন একটা বিষয় তর্কাতর্কি করতে করতে হঠাৎ মারপিট লাগিয়ে দিত, এর প্রমাণ আছে শেকস্পিয়রের রচনায়। প্রমাণ আছে আমাদের দেশেও। হঠাৎ হঠাৎ আড্ডার স্থলটি তপ্ত হয়ে ওঠে, এ কথা তো বলাই বাহুল্য। এই আড্ডা বা খোসগপ্প আজকের কলেজ স্ট্রীটের রবরবা বইপাড়ার পশ্চাতে ইতিহাস হয়ে আছে। কে না জানে উনবিংশ শতাব্দীতে শোভাবাজারের বটতলায় যে সাহিত্যের জন্ম, কাল পেরিয়ে তা এখন কলেজ স্ট্রীটে সরে এসেছে। আড্ডা নিয়ে লেখা হয়েছে স্মরণীয় সাহিত্যিকদের কত না রচনা।

আড্ডা দেওয়া আর অবসর যাপন যে সর্বক্ষেত্রে একই বস্তু হবে, এমন কোন মাথার দিব্যি অন্তত এ দেশে দেওয়া নেই। আর থাকলেও সে দিব্যিকে থোড়াই পরোয়া করে এখনাকার লোকেরা। অবসর নেই অথচ ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা চলছে, বাড়িতে গিন্নী অথবা মা নিজে না খেয়ে আড্ডাবাজের ভাত নিয়ে বসে আছেন এমন নজীরের কি অভাব আছে কিছু?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র অসিত সাহাকে জিজ্ঞেস করলাম, অবসর সময় কি করেন?

নো রেস্ট। অবসর বলে কিছু নেই এখন। অসিত বললেন, খুব আড্ডা দি। তবে ওটাকে অবসর না বলে বরং আরো খাটুনি বলাই ভালো।

কেন?

বেশি আড্ডা দিলে চেহারা খারাপ হয়ে যায়। কেবল বকবক করতে হয়। চেঁচাতে হয় খুব।

এত জেনেও আড্ডা দেন কেন?

আড্ডা ছাড়া বাঁচা যায় নাকি? কিছু একটা করতে হলে, ধরুন আইনটা ভালোভাবে পাশ করতে হলেও আড্ডা দেওয়া দরকার।

কেন বলুন তো?

আড্ডা মাথা খুলে দেয়। আউটলুক বাড়ায়। অসিত সাহা অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আড্ডাকেই বেশি পছন্দ করেন। কেননা, তাঁর কথায় ওয়াটারগেট থেকে নিউক্লিয়ার, মাও থেকে গিরি—ক্রিকেট ব্যাডমিন্টন, প্রেম, যুদ্ধ সবই সেখানে বেশ এসে যায়।

বিদ্যাসাগর কলেজের তৃতীয় বর্ষের (কলা) ছাত্রী কৃষ্ণা রায়—, আড্ডা আমি বিশেষ মারি না— বাড়িতে আপত্তি।

আপত্তি না থাকলে কি করতেন?

চুটিয়ে আড্ডা দিতাম।

কোথায়?

রকে-পার্কে যেখানে খুশি। ছেলেমেয়ে সকলের সঙ্গে। ছেলেদের সঙ্গে বসে আড্ডা মারতে আমার ভালো লাগে।

কেন?

অনেকদিন ধরে দেখে শুনে প্রপার সিলেকশানটা করে নেওয়া যায়।

স্পষ্টবাদী কৃষ্ণা রায় এক এক ঋতুতে এক এক রকম কায়দায় সময় কাটান। যেমন গ্রীষ্মের দুপুরে কাঁচা আম মেখে ভাগ করে দিতে প্রায় দুপুরটা কাটান। তারপর আসে বর্ষা। বর্ষাটা যায় একরকম জানলায় নয়তো হিন্দী বাংলা সিনেমা হাউসে। শরৎ কাটে বাদিার অপেক্ষায়। শীতে আছে উল বোনা। দুপুর ছাড়া কৃষ্ণার কোন অবসর নেই।

অসিত সাহা

কৃষ্ণা রায়

সকালে কলেজ, সেখানে আড্ডা হয় সামান্য। দুপুরে অবসর। রাত্রে মায়ের ছুটি। ওকে যেতে হয় রান্নায়।

বাজে আড্ডা মারতে আমার ভালো লাগে না। আমি সময় কাটাই মড় পুড়িয়ে। এই অবাক করে দেওয়া কথাটা বললেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজের দ্বিতীয় বর্ষ (বিজ্ঞান)-এর ছাত্র দিলীপ মুখার্জি।

জিজ্ঞেস করলাম, রোজ মড়া পান?

তা পাই না। তবে এই চব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে শ তিনেক মড়া পুড়িয়েছি। পাড়ার বা আশেপাশে কেউ মরেছে শুনলেই ছুটি। চান্স করে নিতে অসুবিধে হয় না।

'মড়া যখন পাওয়া যায় না তখন?'

চুপচাপ বসে থাকি, কি করা যায় ভাবি।

'আড্ডা কেন [illegible] লাগে না আপনার?'

'ওতে কনস্ট্রাকটিভ কিছু করা যায় না।'

'মড়া পোড়ানোটা কি কনস্ট্রাকটিভ কাজ?'

'নিশ্চয়ই। আবর্জনা সাফ করা কনস্ট্রাকটিভ নয়?'

শেখর দত্ত বারাকপুর কলেজের ছাত্র (কলা) বললেন, 'আড্ডা আর লিজার এক কথা নয়। লিজারে আমি বই পড়ি। আড্ডার বেলায় যা পড়ি তা প্রকাশ করি। তবে পড়ার বই অবশ্য নয়। পড়ার বই পড়া একটা পরিশ্রম।'

আড্ডা ও অবসর প্রশ্নটি নিয়ে যে সমস্ত তরুণ-তরুণীর সঙ্গে কথা বলেছি, প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করেছি অবসর বিষয়টি তাদের ক্ষেত্রে ক্লান্তিকর ঠেকছে। চার বছর আগে হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে বিপ্লব দাস সময় কাটানোর উপায় খুঁজে পান না। বললেন, আর পারি না। এবার একটা চূড়ান্ত কিছু করতে হবে।

জাতীয় গ্রন্থাগারে অবসর যাপন করেন সিটি সাউথ-এর (বাণিজ্য) ছাত্র অশোক ঘোষ। তাঁর মতে, অবসর যাপনের এত ভালো পথ আর দ্বিতীয়টি নেই।

—কৃষ্ণা সেনগুপ্ত

চিঠিপত্র

ভারতীয় শিল্পকলা প্রসঙ্গ

আপনার 'অমৃত' কাগজে শিল্পাচার্য অতুল বসু মহাশয়ের ধারাবাহিক (৯ই শ্রাবণ সংখ্যা হতে) তিনটি প্রবন্ধ দেখে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হলাম। আমি বহুবার তাঁকে এইসব কথা লিখে যাবার জন্য অনুরোধ করেছি, কিন্তু তিনি সব সময়েই বলেছেন যে শাস্ত্রে আছে 'সিদ্ধ রসের' ব্যাঘাত জন্মাতে নেই। অর্থাৎ সকলের মনে যে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে, তার বিপরীত কিছু বলা বা করা উচিত নয়।'

তাঁকে দিয়ে এইটুকুই যে আপনি লিখিয়েছেন তাতে আপনাকে ধন্যবাদ। তবে এই সঙ্গে বোধহয় এটাও বলা উচিত যে তিনি যেভাবে সূত্রাকারে প্রবন্ধ কটি লিখেছেন তাতে স্থানে স্থানে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন মনে হয়। না হলে আমাদের মত দু' চারজন সেকালের লোক ছাড়া ভিতরের কথা কেউই বুঝবে বলে মনে হয় না। ঐ সময়ের শিল্প জগতের কথা বলার একমাত্র অধিকারী হচ্ছেন শ্রীযুক্ত বসু। একথাও মনে রাখতে হবে শ্রীযুক্ত বসুর এই লেখার উপরে নির্ভর করেই ভবিষ্যত বাংলার শিল্পকলার ইতিহাস রচয়িতাদের কাজ করতে হবে। অবনীন্দ্র প্রবর্তিত 'ভারত শিল্প' ছাড়া আরও যে একটি সচল শিল্পপ্রবাহ পাশাপাশি এগিয়ে যাচ্ছিল তার কথা না বললে সে ইতিহাস পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে না। সুতরাং এই তথ্য অতি মূল্যবান।

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
কলকাতা-৯।

পুনশ্চের বক্তব্য

৩০শে আগস্ট ১৯৭৪-এর 'অমৃত'-এ রূপদক্ষ 'পুনশ্চ' বিভাগে হাসির পত্র-পত্রিকা এবং লেখক সম্পর্কে যে উল্লেখ করেছেন সেটি অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। উল্লেখযোগ্য যে দুটি হাস্য ও রঙ্গ-ব্যঙ্গের পত্রিকার নাম তিনি উল্লেখ করেন নি তা হোল 'সচিত্র ভারত' ও 'অচলপত্র'। প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট প্রমথ এবং লেখক দীপেন্দ্র সান্যাল (নীলকণ্ঠ)—এই দুজনের নামও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই ত্রুটি বাদ দিলে মোটামুটি রচনাটি উপভোগ্য।

দ্যুতি রায়চৌধুরী
বোম্বাই-১৪।

বৃটেনে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি

এককালে কেউ বাংলার বাইরে বাস করলেই তাকে প্রবাসী বলা হত। ইতিমধ্যে অনেক রদ-বদল হয়েছে। প্রযুক্তিবিদ্যাকে বিবর্তন ঘটে গেছে। আর বিজ্ঞানের প্রগতি পৃথিবীকে অনেক ছোট করেছে। শুধু তাই নয়, আজ পৃথিবীর অনেক বড় বড় শহরে বাঙালীর সংখ্যা প্রচুর। তাই বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পাখা বিস্তার করেছে। এবং সাগর পারের মত সাহিত্য পত্রিকার পক্ষে বিদেশের বুকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে।

সম্প্রতি লন্ডনে প্রবাসী বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মাননীয় সৈয়দ আবদুস সুলতান বলেছেন, 'বিপুল প্রতিকূলতার মুখেও সাগর পারে বলিষ্ঠতর পদক্ষেপে লক্ষ্য পথে এগিয়ে চলেছে।' একথা তাঁর আন্তরিক সহানুভূতির প্রকাশ।

'অমৃত' পত্রিকায় সম্প্রতি প্রবাসী বাংলা সাহিত্য সম্মেলন সাহিত্য সংস্কৃতি এবং সাগর পারে সম্বন্ধে অনেক খবরা-খবর ছাপা হয়েছে। সে জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

কেবল একটা ভুল সংশোধনের প্রয়োজন মনে করি। সাগর পারের জন্ম ১৯৬৯ সালে নয়, ১৯৭০ সালে। প্রথম সংখ্যা ছাপা হয় রবীন্দ্র জন্মতিথি স্মরণ করে। সেই উপলক্ষ্যে সাগর পারের তরফ থেকে মহাসমারোহে লন্ডনে রবীন্দ্র জয়ন্তীর আয়োজন করা হয়। বিখ্যাত অভিনেত্রী এবং রবীন্দ্র ভক্ত ডেম সিবিল থর্নডাইক সে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আসেন।

আরও একটা মন্তব্য হয়ত অসমীচীন নয়। সাগর পারের সম্পাদকীয় দপ্তর বৃটেনে কিন্তু কানাডা ও আমেরিকায় তার বহুল প্রচার। সেখানকার প্রবাসী বাঙালীর খবরা-খবরও সাগর পারের পাতায় থাকে।

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য
সম্পাদক, সাগর পারে
এসেকস
ইংলণ্ড।

সেকালের সঙ্গীতগুণী

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'সেকালের সংগীতগুণী' শীর্ষক ধারাবাহিক ফিচারটি আমি নিয়মিত পড়ি। লেখকের সংগ্রহ এবং সংগীতরসজ্ঞতা অবশ্যই প্রশংসার্হ।

কিন্তু ১৩ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় একটি মারাত্মক ভুল আছে। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেছেন, কোঁৎ জার্মান, দার্শনিক। আসলে কোঁৎ (কোমটি কোমতে) অর্থাৎ Auguste Comte ফরাসী দার্শনিক। তাঁর রচনাবলী মিল-কংগ্রীভ প্রমুখ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ইংরেজী সাহিত্যে কোঁতের প্রভাব সম্পর্কে Huge Walker-এর English Literature in the Victoria Era বইতে বিশদ আলোচনা আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, প্রফুল্লচন্দ্র, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, যোগেন ঘোষ, দ্বারকানাথ মিত্র কৃষ্ণকমল প্রমুখ ভিক্টোরীয় বাঙালী বুদ্ধিজীবীরাও পজিটিভিস্ট চিন্তাধারায় প্রভাবিত হন। সম্ভবত বংগদর্শনের আগে 'হোপ' পত্রিকায় কোঁৎ সম্পর্কে কৃষ্ণকমলের রচনা প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা।

খেলা

অমৃত পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক। গত কয়েক সপ্তাহে আপনাদের 'যুবক-যুবতী' ফিচার পড়ে সত্যই খুব ভাল লেগেছে। তাছাড়া এবার 'খেলা'র প্রসঙ্গ পেয়ে আরও আনন্দিত হয়েছি। বর্তমানে খেলার মাঠ পাওয়া যে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এটা বাস্তবিক। এখন আমরা ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদির চর্চা করার মত উপযুক্ত মাঠের সন্ধান পাই না। কিন্তু আমি কলকাতার কয়েকটি পার্কে সংঘবদ্ধভাবে কতকগুলি ছেলেকে খেলতে দেখেছি, যেসব খেলায় কোনো রকম খরচের বালাই নেই। ঐসব জায়গায় যেসব ভারতীয় খেলা হয় তা সত্যই আকর্ষণীয়। তাছাড়া এদেশে খেলার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে না বলে শিখাদি যা বলেছেন তা ঠিকই। উচ্ছৃংখলতার পরিবেশে খেলার মাঠকে পরিষ্কার রাখা অসম্ভব ব্যাপার। উচ্ছৃংখলতার আবহাওয়ায় খেলার মাঠ দূষিত হয়ে যাওয়ায় সেখানে সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনা করা যায় না। দক্ষিণ কলকাতা আই টি আই-এর ছাত্র সন্দীপদা বলেছেন, 'একজন প্লেয়ারের সঙ্গে আর একজন প্লেয়ারের সম্পর্ক হয়েছে আর্টিফিসাল। একই টিমের খেলোয়াড় অথচ সমঝোতা নেই। সত্যিই তিনি যা বলেছেন একেবারে খাঁটি সত্য। প্লেয়ারে প্লেয়ারে মারামারি হয়, যা সমঝোতার অভাবই বোঝা যায়। কিন্তু পূর্বোক্ত খেলার দলগুলিতে কোনো বিরোধ দেখতে পাইনি। চেষ্টা করলে আমরাও ভালো পরিবেশ তৈরি করতে পারবো।

কমল রায়,
বীরভূম

নেতাজীর অন্তর্ধানের অকথিত কাহিনী

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লালা শঙ্করলাল জাপান থেকে যখন ফিরে এলেন বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র তখন প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী। লালাজী আমাদের এলগিন রোড বাসভবনে এসেই উঠলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের এবং যে উদ্দেশ্যে জাপানে গিয়েছিলেন—সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে অর্থাৎ জাপ সরকার বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে সর্বতোভাবে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত—এই গোপন বার্তা আমি তাঁকে ইণ্টারভিউএর সময় জানাই। লালাজী ইংরাজ রাজশক্তিকে ধোঁকা দিয়ে বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে জেল থেকে কিভাবে মুক্ত করা যায় তার একটি পরিকল্পনা দিলেন। দিল্লীতে সর্দার শার্দুল সিং কাবিশের মারফৎ তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোকে একটা আপোষ ফর্মুলা দিলেন। ভাবখানা এই যে, ফরওয়ার্ড ব্লক যুদ্ধকালীন ভাইসরয় ক্যাবিনেটে যোগ দিতে চায় এবং ইংরেজের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় দল হিসাবে সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা দেবে সর্ত এই দলের নেতা সুভাষচন্দ্র বসুকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। মুক্তিলাভের পর স্বাধীন নাগরিক হিসাবে ভাইসরয়ের সঙ্গে মীমাংসার সর্ত নিয়ে তিনি আলোচনায় বসবেন।

ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোকে সে সময়ে সবচেয়ে বেশী প্রভাবান্বিত করতে পারতেন পাঞ্জাবের তদানীন্তন আই. সি. এস গভর্ণার স্যার হেনরী ক্রেক। এই স্যার হেনরী ক্রেক এক সময় বাংলার এবং পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টেরও হোম মেম্বার ছিলেন। ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোর একান্ত বিশ্বাসভাজন এই হেনরী ক্রেককে যদি কোনমতে বোঝানো যায়, তাহলে আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রকে জেল থেকে বার করে আনার কাজটা সহজ হবে। স্যার হেনরী ক্রেক ওই প্রস্তাবের কথা শুনে প্রথমে বিশ্বাসই করতে চান নি। সর্দার শার্দুল সিং কবিশেরকে তিনি বললেন : "হি (সুভাষচন্দ্র বোস) ইজ দি অনলি ম্যান ইন ইণ্ডিয়া হুম উই আর অ্যাফ্রেইড অব অ্যান্ড হুম উই নো টু বি দি অনলি ইণ্ডিয়ান হু ক্যান লিড এ ওয়ার এগেস্ট দ্য ব্রিটিশ উইথ এবিলিটি।" সর্দারজী বললেন, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন হলে ট্যাক্স বসিয়ে আমরা অর্থ সংগ্রহ করে দেব, ভাইসরয় ক্যাবিনেটে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি দপ্তর আমাদের দলকে দিতে হবে। হোম, ডিফেন্স ও ফিনান্স।

এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলার লীগ মন্ত্রিসভাতেও ফজলুল হকের সঙ্গে তখন মন কষাকষি চলছে, এই সুযোগে তদানীন্তন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বিরোধী দলের নেতা হিসাবে শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ও বাংলার ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে ফজলুল হকের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রাথমিক আলোচনা চালাচ্ছিলেন।

যাই হোক স্যার হেনরী ক্রেক তৎকালীন ভাইসরয় ক্যাবিনেট সদস্য স্যার রামস্বামী মুদালিয়ারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করার পরামর্শ দিলেন।

প্রকৃতপক্ষে কী উদ্দেশ্যে আমাদের সিমলায় আগমন এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য কী এই কথা জানার ভার পড়েছিল তৎকালীন সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্সএর ডেপুটি ডিরেকটর জেনারেল মিস্টার ইভান জেনকিন্স ও তার সহকারী মিস্টার ওয়েসের ওপর। সর্দার শার্দুল সিং এই তথ্যটি সংগ্রহ করেন।

সর্দার শার্দুল সিংএর সঙ্গে আলোচনার ফলে তিনি মুক্ত হবেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে না পেরে সুভাষচন্দ্র ধরে নিলেন যে ইংরেজ সরকার সহজে তাঁকে ছেড়ে দেবে না। তাই এবার তিনি অন্য পন্থা অবলম্বন করলেন অনশনের সংকল্প। বাংলার গভর্ণারকে তাঁর এই সংকল্পের কথা জানিয়ে চরমপত্র দিলেন ১৯৪০ সালের ২৬শে নভেম্বর। এরপর আমি প্রেসিডেন্সী জেলে তাঁর সঙ্গে ইনটারভিউএ আলোচনার ধারা-বিবরণী জানিয়ে তাঁকে অনশন সংকল্প থেকে বিরত হবার অনুরোধ জানাই। তিনি বললেন, তোমরা শেষ চেষ্টা [illegible] লিয়ে যেতে পার। তবে অনশনের মা[illegible] চাপ সৃষ্টি করতে না পারলে ওরা আমায় মুক্তি দেবে না। তাঁর নির্দেশ পেয়ে আমি এবং সর্দার শার্দুল সিং আবার দিল্লী চলে গেলাম এবং স্যার রামস্বামী মুদালিয়ারের সঙ্গে দেখা করে সুভাষচন্দ্রকে তাড়াতাড়ি মুক্তি দেবার জন্য ভাইসরয়কে অনুরোধ জানাতে বললাম, স্যার রামস্বামী আমাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন বড়-দিনের সময় ভাইসরয় কলকাতায় আসবেন বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভায় ভাষণ দিতে সেই সঙ্গে কলকাতায় অনুষ্ঠিত রেশকোর্সের মাঠে ভাইসরয় কাপের খেলার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা তখনই তিনি করে দেবেন।

ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র অনুমান করে নিলেন হয়তো বা আমাদের মিশন ব্যর্থ হয়েছে—তাই তিনি তাঁর চরমপত্র অনুযায়ী সুরু করলেন অনশন। অনশনের দশদিন পর কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে বাংলার তদানীন্তন গভর্ণার স্যার জন হার্বার্ট সুভাষ-চন্দ্রকে প্যারলে মুক্তি দিলেন।

প্যারলে মুক্তি পেয়েই তিনি বাড়ীতে এসে নিজের শয়নকক্ষেই নিজেকে আবদ্ধ রাখলেন। প্রথম প্রথম বাইরের সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেন। শেষের দিকে গুরুতর অসুস্থ এই অজুহাত দেখিয়ে বাইরের কারও সঙ্গেই বড়একটা

দেখাসাক্ষাৎ করতেন না। অজুহাত ডাক্তারের নিষেধ।

প্রথমেই বলেছি এবার জেলে গিয়েই তিনি গোঁফ রাখতে সুরু করেছিলেন। রাঙা-কাকাবাবুর গোঁফ গজাতে দেরী হোত। তাই জেলে ঢুকেই গোঁফ কামানো তিনি বন্ধ করলেন। প্যারলে মুক্তি পেয়ে দাড়িও আর কামালেন না। ক্রমে মুখমণ্ডলটি দাড়ি ও গোঁফে ভরাট হতে লাগল।

তাঁর শয়নকক্ষের বিছানার দুপাশে থাকতো গীতা আর চণ্ডী। ভাবখানা এই—আধ্যাত্মিক সাধনায় তিনি মগ্ন। এ সময়ে তাঁর ঘরে বাইরের কারও উপস্থিতি তিনি পছন্দ করতেন না। ডাক্তার মণি দের দেওয়া মেডিকেল সার্টিফিকেট আদালতে দাখিল করে মামলার শুনানীর দিন ব্যক্তিগত হাজিরা দেওয়া থেকে অব্যাহতি লাভ করেছিলেন।

জেল থেকে প্যারলে মুক্ত হবার পর সুভাষচন্দ্রের একান্ত সচিবেরা আবার তাঁদের কাজে যোগ দিলেন। কিন্তু বন্দীবিলা সত্যাগ্রহখ্যাত বিনোদ ব্যানার্জী কাজে যোগ না দেওয়ায় তিনি অনুসন্ধান করে জানলেন যে আমিই তার না ফেরার কারণ। অবাক বিস্ময়ে তিনি আমায় কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি তাকে বললেম, অনুসন্ধানে জানতে পেরেছি বিনোদবাবুর সঙ্গে আই, বির যোগাযোগ আছে। এবং তাঁর সন্তোষ বিধানের জন্য প্রমাণাদিও পেশ করি। রাঙা-কাকাবাবু কয়েকদিন পর আমার সঙ্গে এক-মত হন এই ব্যাপারে। আই, বির সঙ্গে যোগাযোগের প্রমাণ পেয়ে বিনোদ ব্যানার্জীকে আমরা ইয়ুথ লীগ থেকেও বিতাড়িত করি।

দ্বিতীয়জন হলেন আমাদের এক নিকট-আত্মীয়—সম্পর্কে কাকা হতেন তিনি। প্যারলে মুক্তি পেয়ে রাঙাকাকাবাবু যখন বাড়ীতে এলেন, হঠাৎ এলগিন রোডের বাড়ীতে তিনিও হলেন আবির্ভূত। তাঁর হাবভাবে বোঝা গেল সহজে তিনি বাড়ী ছেড়ে যাবেন না। তাঁর চালচলনে সর্বদাই যেন একটা অনুসন্ধিৎসু ভাব পরিলক্ষিত হোত। তাঁকে সরানো দরকার, অথচ কী উপায়ে সরানো যায়—এসব নানা চিন্তার পর রাঙাকাকাবাবু স্থির করলেন চাকুরী দেবার অজুহাতে তাঁকে কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাঙ্ককল করালেন জামসেদপুরে ওঁর রাঙামামাবাবু শ্রীবি এন দত্তর কাছে। এই আত্মীয়ের সঙ্গে স্যার আর্দেশীর দালালের নামে একটা চিঠিও লিখে দিলেন। জামসেদপুরের একটা রেল টিকিটও কিনে আনা হল এবং বেশ কায়দা করে তার অজান্তে তিনি যে জামসেদপুর পৌঁছোচ্ছেন সেটা লক্ষ্য রাখার জন্য একজন লোককেও রেলপথে সহযাত্রীরূপে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এঁরা যদি সে সময়ে এলগিন রোডের বাড়ীতে থাকতেন তাহলে তাঁর ভারতের বাইরে চলে যাওয়ার পথ হয়তো আরও জটিল হয়ে উঠতো।

ইতিমধ্যে রাঙাকাকাবাবু পেশোয়ার থেকে মিঞা আকবর শাহকে কলকাতায় আনালেন। মিঞা আকবর শাহ ছিলেন সে সময়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ফরওয়ার্ড ব্লকের সভাপতি। সীমান্তের উপ-জাতীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। রাঙাকাকাবাবু মিঞা আকবর শাহকে বললেন, আমি আর আকালি অথবা কীর্তি কিষাণ কোনও দলের ওপর ভরসা করব না—খবর সব ফাঁস হয়ে যায়। মিঞা আকবর শাহ যেন তাঁর ভারত-ত্যাগের সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করে আসেন। রাঙা-কাকাবাবুর নির্দেশমত আমি মিঞা আকবর শাহের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলি। কলকাতায় তাঁর থাকার ব্যবস্থা আমিই করে দিই। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের উত্তরে অবস্থিত ইন্ডিয়া হোটেলে। মিঞা আকবর শাহ দুবার কলকাতায় এলেন। গভীর রাতে নিভৃতে এলগিন রোডের বাড়ীতে তাঁদের মধ্যে গোপন আলোচনা চলতো। সে

আলোচনাটা একান্তই রাঙাকাকাবাবু ও মিঞা আকবর শাহর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো।

আকবর শাহ চলে গেলেন নওশেরায়। ভগৎরাম তলওয়ারের সঙ্গে সমস্ত কিছু ব্যবস্থা পাকা করে আবার তিনি ফিরে এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁর মাথার মাপ অনুযায়ী কিস্তিনাম্মা টুপী (জিন্না ক্যাপ)। পেশোয়ার থেকে তাঁর শরীরের মাপ অনুযায়ী সালওয়ার কেনাটা তখন আর সম্ভব নয়—হঠাৎ যদি পুলিশের গুপ্তচরের নজরে পড়ে যায়। ইতিমধ্যে বড়দিনে ভাইসরয় কলকাতায় এসেছেন। স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার টেলিফোনে সে সংবাদ আমায় দিলেন। বললেন, ভাইসরয় তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন ক্যাবিনেটে যোগদান সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনার জন্য। সংবাদটি দিলেম আমি রাঙাকাকাবাবুকে। শুনে তিনি বললেন, "আর দেখা করে লাভ কী? আমার কাজ যেনতেন প্রকারে কারা-প্রাচীরের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসা। সে কাজ হাসিল হয়ে গেছে। সুতরাং আর দেখা করে লাভ নেই। তুমি বরং কায়দা করে বলে দাও শরীর আমার অসুস্থ, দেখা করাটা ডাক্তারের নিষেধ। সুস্থ হলে আমি দেখা করব।' আমি তাঁর নির্দেশ মতো স্যার রামস্বামী মুদালিয়ারকে টেলিফোনে জানিয়ে দিলেম।

তাঁর পরিকল্পিত ভারত ত্যাগের কথা অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়কে গোড়াতেই জানিয়েছিলেন। এবার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য শিশির বসুকে ডেকে পাঠালেন তিনি। কারণ বাড়ী ছেড়ে মোটরে রওনা হতে হলে বাইরের কোন ড্রাইভার দ্বারা মোটর চালনা নিরাপদ নয়। এমন একজনকে মনোনীত করতে হবে যে হবে বাড়ীরই বিশ্বস্ত ছেলে, অথচ আই-বি'র নজরে সে নেই। আমি বা অরবিন্দর দ্বারা সেটা সম্ভব নয় যেহেতু আমরা দুজনেই সেদিনের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নিয়েছি, আই-বির নজর আমাদের প্রতি আছে। নিজের গাড়ীটিও তিনি ব্যবহার করতে চান না কারণ ওই গাড়ীটি পুলিশের নজরে মার্কা মারা। তাই তিনি স্থির করলেন অগ্রজ শরৎচন্দ্রের জার্মান কার ওয়ান্ডারার গাড়ীটিই তাঁকে ছদ্মবেশে বাড়ী থেকে নিষ্ক্রমণে সাহায্য করবে—এবং অগ্রজের গাড়ীটি তাঁরই তৃতীয় পুত্র শিশির বসুই ড্রাইভ করে নিয়ে যাবে। শিশির সে সময়ে মেডিকেল ছাত্র। সক্রিয় রাজনীতিতেও কোনও-দিন ছিল না। তাঁর পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণটি তিনি নিখুঁতভাবেই ছকে রেখেছিলেন।

আমাদের বসু পরিবারে রাঙাকাকাবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে আমি আর আমার খুল্লতাত ভ্রাতা শ্রীঅরবিন্দ বসু তৎকালীন রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিয়ে রাঙাকাকাবাবুর নির্দেশেই হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলন চলাকালীন সময় থেকেই নিখিল ভারত যুব সঙ্ঘ গঠন করে গোপনে আমাদেরই এক নিকটআত্মীয় হীরেন সরকার মহাশয়ের (বর্তমানে স্বর্গত) টালিগঞ্জের এক বাড়ীতে থেকে বৈপ্লবিক কর্মসূচী সমন্বিত গোপন ইস্তাহার সাইক্লোস্টাইল মেশিনে ছাপিয়ে সারা শহরে ছড়িয়ে দিতেম। সেই সময় থেকেই এই ইয়ুথ লীগে আমাদের এই গোপন রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাথী ছিলেন আমার এক সমবয়সী মাতুল বর্তমানে স্বর্গত গোপাল মিত্র, শ্রীসুহৃদ মল্লিক চৌধুরী, মদন ধর, স্বর্গীয়া হেমপ্রভা মজুমদারের কনিষ্ঠ পুত্র বর্তমানে স্বর্গত ননী মজুমদার। সর্দার নিরঞ্জন সিং তালিবও সে সময় আমাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। আমার আর এক খুল্লতাত ভগ্নী স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অন্যতম কন্যা ইলা বসু রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ না নিলেও রাঙাকাকাবাবুর গৃহত্যাগের প্রাক্কালে যাবতীয় কাজের সহায়ক ছিলেন। আমাদের পরিবারের মধ্যে আমরা চারজনই গৃহত্যাগের ব্যাপারে তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যকর করে তুলতে গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা করতেম। শিশির বসুকে মোটর ড্রাইভ করে নিরাপদে গোমো স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবার কঠিন দায়িত্ব রাঙাকাকাবাবুই দিয়েছিলেন—আর তাঁরই নির্দেশ পেয়ে শিশির বসু ওয়ান্ডারার গাড়ীটি নিয়ে পথঘাট নিরীক্ষণের জন্য গ্রেন্ড ট্রাঙ্ক রোডের বেশ খানিকটা অংশ চক্কর দিয়ে এল।

এবার টাকা পয়সা জোগাড়ের দিকে মন দিলেন। ডাক্তার দেবেশ মুখার্জীর মারফৎ জোগাড় হল চার অঙ্কের মতো টাকা। আরও দু-একজন দিয়েছিলেন তার মধ্যে ডাক্তার মনমোহন দাস অন্যতম। তিনিও চার অঙ্কের মতো টাকা দিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ডাক্তার দেবেশ মুখার্জীর পরিচয় এখানে দিয়ে রাখি। চীন-জাপান যুদ্ধের সময় একদল ভারতীয় চিকিৎসককে সে সময় কংগ্রেস থেকে পাঠাবার আয়োজন হচ্ছেল ডাক্তার কোটনীজ-এর নেতৃত্বে। সেই মেডিকেল মিশনে বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের মনোনীত সদস্য ছিলেন ডাক্তার দেবেশ মুখার্জী। এই ডাক্তারদের মেডিকেল মিশন যে সময় চীনে রওনা হল, বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের একটি গোপন চিঠিও সঙ্গে নিয়ে যান ডাক্তার দেবেশ মুখার্জি। চিঠিখানি মাও সে তুং-এর উদ্দেশ্যে লেখা। ডাক্তার দেবেশ মুখার্জি চীন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমাদের ইয়ুথ লীগে সক্রিয় সদস্যরূপে যোগদান করেন এবং আমাদের বৈপ্লবিক গুপ্ত কার্যকলাপের উৎসাহী সহায়ক ছিলেন; পরে তিনিও কারারুদ্ধ হন।

এবার বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের যাবার আয়োজন সব প্রস্তুত।

গৃহত্যাগের প্রাক্কালে প্রস্তুত হতে লাগলেন। গভীর রাত বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। শিশির সন্ধ্যাতেই জার্মান মোটর-কার ওয়ান্ডারার নিয়ে এলগিন রোডের বাড়ীতে উপস্থিত হল। বাড়ীর কেউ জেগে আছেন কিনা মাঝে মাঝে আমি লক্ষ্য রাখছি, সতর্কভাবে। একবার আমার তিনতলার শয়ন-কক্ষের দিকে গেলাম জানালা দিয়ে দেখলেম বাইরের রাস্তার অপর প্রান্তের ফুটপাথে প্রহরারত স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ওয়াচাররা নিদ্রা-মগ্ন অবস্থায় ঝিমোচ্ছে। নিচে দোতলায় রাঙাকাকাবাবুর ঘরে ফিরে এলেম। ইলা আমি আর অরবিন্দ তাঁর স্যুটকেশ বিছানা সব গোছগাছ করে দিচ্ছি। হঠাৎ এই সময় খেয়াল হল সালোয়ারের জোগাড় হয় নি। সকালে আমায় রাঙাকাকাবাবু সালোয়ার কেনার জন্য ওয়াছেল মোল্লার দোকানে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু পেছনে ওয়াচার অনুসরণ করায় কেনা সম্ভব হয় নি। আমার দেহাকৃতির সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর দেহাকৃতি একই মাপের তাই উপায় না দেখে আমি আমার নতুন সার্ট ও পায়জামা তাঁকে দিই, তিনি পায়জামা পরিধান করলেন, গায়ে চাপালেন সেরওয়ানী মাথায় কিস্তি-নামা টুপি। পিতামাতৃপ্রদত্ত সোনার গোল রিস্ট ওয়াচটি এবং দেশবন্ধুর উপহার দেওয়া স্মৃতিচিহ্ন ফাউন্টেন পেনটি সঙ্গে নিলেন।

নতুন পোষাকে সজ্জিত হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার কিছু আগে রাঙাকাকাবাবু আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, দেখ তো আমায় চিনতে পারছো কিনা? সার্ট পায়জামা-সেরোয়ানী ও জিন্না ক্যাপ পরিহিত সুভাষচন্দ্রকে চিনতে কষ্ট হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁর চশমাটা অপরিবর্তিত থাকায় মুখটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছিল।

আমি বল্লেম—কালো ফ্রেমের ওই চশমাটা বদলানো দরকার। ভগ্নী ইলা সঙ্গে সঙ্গে লোহার সিন্দুক থেকে একটি সরু ফ্রেমের রোলড্‌গোল্ডের চশমা এনে পরিয়ে দিল। চশমাটা ছিল পুরোনো। কলকাতা পৌরসভার যখন তিনি চীফ একসিকিউটিভ অফিসার ছিলেন এই চশমাটি সেই সময়ের। চশমাটি চোখে পরিয়ে দিতেই তিনি বল্লেন —'ঝাপসা দেখছি।' আমি বল্লেম, তা হোক যেহেতু ওই কালো ফ্রেমের চশমায় আপনাকে চিনে ফেলার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে—তাই কোনরকম ঝুঁকি না নিয়ে আপনার

পুরোনো ওই রোলডগোল্ড-এর সরু ফ্রেমের চশমাটি পরা দরকার।

১৬ই জানুয়ারী ১৯৪১ ঃ ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত সাড়ে বারোটা। সারা শহর যেন ঘুমোচ্ছে। শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন রাত। বাড়ীর পরিবারের অন্যান্য সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। জেগে আছি শুধু আমি, অরবিন্দ আর ভগ্নী ইলা বসু। আগেই বলেছি শিশির ওয়াণ্ডারার গাড়ীটি নিয়ে সন্ধ্যা থেকেই এ বাড়ীতে অপেক্ষা করছে। কয়েকটা দিন রোজই শিশির এই গাড়ীখানা নিয়ে শরৎবাবুর উডবার্ন পার্কের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এই বাড়ীতে আসতো। আসা-যাওয়ার মহড়া দিত যাতে বাড়ীর সামনে প্রহরারত স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ওয়াচারদের মনে এই প্রত্যয় হয়—ওটা যেন দৈনন্দিনের ঘটনা। রান্নাবাড়ীর সিঁড়ি বেয়ে এবার শিশিরের সঙ্গে নিচের তলায় নেমে গেলেন রাঙাকাকাবাবু। অরবিন্দ বেডিং আর সুটকেশ বাড়ীর অভ্যন্তরে রাখা ওয়াণ্ডারার গাড়ীতে তুলে দিয়ে এল। রাঙাকাকাবাবু গাড়ীর মধ্যে গিয়ে বসলেন—শিশির গাড়ী চালালো। বাড়ীর ফটক পার হয়ে ডানদিকে বাঁক নিয়ে আবার ডাইনে এলেনবি রোড হয়ে আবার বাঁয়ে ঘুরে ল্যান্সডাউন রোড (বর্তমানে শরৎচন্দ্র বসু রোড) ধরে সার্কুলার রোড পার হয়ে হ্যারিসন রোড ধরে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে ধানবাদের পথে গভীর রাতে গাড়ী ছুটলো।

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নাগপাশ থেকে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে দৃঢ়সংকল্প নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন পথের সন্ধানে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতির প্রত্যাশা নিয়ে তিনি চলে গেলেন পিতৃস্মৃতিবিজড়িত ৩৮।২ এলগিন রোডের বাড়ী ছেড়ে। ধানবাদের পথে বারারীতে শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীঅশোকনাথ বসুর বাড়ীতে এসে গাড়ী থামলো। এর পরের ইতিহাস সবারই জানা। ইংরেজ রাজশক্তির নাগালের বাইরে ১০ দিনের মধ্যেই তাঁকে পৌঁছোতে হবে। যাত্রাপথের সময় সীমা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী দশ দিন নির্ধারিত হয়েছিল। সেই দশদিনের সময় সীমা অতিক্রমের পর ২৬শে জানুয়ারী আমরা ঘোষণা করলেম ঃ সুভাষচন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—তিনি হঠাৎ গৃহত্যাগ করে গেছেন।

যে কয়দিন তিনি তাঁর শয়নকক্ষে অবস্থান করছিলেন গৃহত্যাগের কদিন আগে থেকেই ঘরের মধ্যেই আরও একটা স্ক্রিনের পর্দার ছোট ঘর তৈরী করা হয়েছিল। ওই পর্দায় ঘেরা ছোট ঘরে তিনি যেন আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন। কারও সঙ্গে আর দেখা করছেন না। ইতিমধ্যে তাঁর একান্ত সচিবকেও ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে—গৃহভৃত্য কর্‌দুলাকেও ও ঘরে আর যেতে দেওয়া হত না। প্রতিদিনকার আহার্য যথারীতি ওই প্রথম পর্দার ভেতরে রেখে দেওয়া হত। আহার্য গ্রহণ করে যেন তিনি শূন্য পাত্রটি পর্দার বাইরে বার করে দিতেন।

আসলে ১৭ তারিখ থেকে আমরা অর্থাৎ আমি আর অরবিন্দ ওই খাবারগুলি খেয়ে নিয়ে পরিকল্পনা মতো পর্দার বাইরে রেখে দিতেম। রাতে তাঁর শোবার সময়ে ঘরের মধ্যে তাঁর গলার অনুকরণ করে গার্গল করতেম তারপর ঘরের বাতিটি নিভিয়ে দিতেম যেন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। এ সবই ছিল বাইরের প্রহরারত স্পেশাল ব্রাঞ্চ ওয়াচারদের চোখে ধুলো দেওয়া।

২৬শে জানুয়ারী আমাদের পরিকল্পনানুযায়ী পর্দা সরিয়ে ঘোষণা করলেম, আহার্যসামগ্রী তিনি স্পর্শ করেননি। নিজের ব্যবহৃত ওই কালো ফ্রেমের চশমাটিও যথাস্থানে পড়ে রয়েছে—পুজোয় ব্যবহৃত গরদের পট্টবস্ত্রও যথাস্থানে ন্যস্ত। তবে তিনি গেলেন কোথায়? রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে হয়তো বা গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস ব্রত নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে চলে গেছেন। পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে পাঠানো হল তারবার্তা। মোটর ছুটলো রামকৃষ্ণ মিশন আর বেলুড় মঠে—শরৎচন্দ্র বসুর রিষড়ার বাগানবাড়ীতেও খোঁজ নেওয়া হল, খোঁজ নেওয়া হল কেওড়াতলা শ্মশানে। তন্নতন্ন তাল্লাসী চালিয়ে কোথাও আর সুভাষচন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

এর পর শুরু হল আমাদের ইয়ুথ লীগের গোপন কার্যকলাপ। গোপন ইস্তাহার মুদ্রণ ও ব্যাপকভাবে বণ্টনের নিখুঁত পরিকল্পনা আমরা নিলেম। বড়বাজারে রাজাকাটরার সামনে ২নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডের বাড়ীর ছাদে ছিল আমাদের অন্যতম সহকর্মী বর্তমানে স্বর্গত সূর্যবংশ সিংহের ছাপাখানা তিলক প্রিন্টিং প্রেস। গোপনে সেখানে ছাপানো হল লাল ইস্তাহার—'রোম-বার্লিন-টোকিও প্যাক্টে—বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বার্লিনে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় ফৌজদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন আজাদ হিন্দ বাহিনী। আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র স্থাপন করে দেশবাসীর উদ্দেশে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতির আহ্বান জানাচ্ছেন। আজাদ হিন্দ রেডিও স্টেশন থেকে তাঁর নির্দেশ শুনুন।'

এক ইস্তাহার মুদ্রিত হল—সারা কলকাতাকে চার ভাগে ভাগ করে প্রতিটি কেন্দ্রে ইস্তাহারের বাণ্ডিলগুলো পৌঁছে দেওয়া হল। নির্দেশ দেওয়া হল ঠিক একই সময়ে ঘড়ির কাঁটা দেখে রাত বারোটার পর রাস্তার দেওয়ালে দেওয়ালে ল্যাম্পপোস্টগুলোর গায়ে ইস্তাহারগুলি সেঁটে দিতে হবে। কার্যসূচী অনুযায়ী হোলও তাই।

এবার পুলিশের তৎপরতা বেড়ে গেল। শহরের রাজপথগুলিতে কৌতূহলী জনতার ভিড়—ওই লাল ইস্তাহার অবাক বিস্ময়ে পড়ছে সবাই। পুলিশের টনক নড়লো। দেখা গেল জলের বালতি ও ছুরি নিয়ে দেওয়ালের ইস্তাহারগুলি পুলিশ আর সার্জেন্টরা জল দিয়ে ধুয়ে ছুরি দিয়ে চেঁছে দিচ্ছে। কোথাও বা মই লাগিয়ে মইয়ে উঠে পোস্টার ছিঁড়ছে ফিল্ড পুলিশ সার্জেন্টের দল।

তিন মাস পর পুলিশ আমায় গ্রেপ্তার করলো। আমার খুল্লতাত ভ্রাতা শ্রীঅরবিন্দ বসু, ইয়ুথ লীগের অন্যান্য সাথী শ্রীনৃপেন্দ্র পালিক চৌধুরী, ডাক্তার দেবেশ মুখার্জি, মদন ধর প্রমুখও ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে কারারুদ্ধ হলেন। শিশির বসু গ্রেপ্তার হলেন অনেক পরে ১৯৪৪ সনে। আমার ওপর বৃটিশ সরকার যে অভিযোগ এনে চার্জসিট দিয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল—

দ্যাট ইউ অয়ার ইন কনট্যাক্ট উইথ দ্য জাপানিজ অ্যান্ড উইথ সুভাষচন্দ্র বোস এ্যান্ড অয়ার এ পারটি টু দ্য প্ল্যানস এ্যান্ড প্রোগ্রামস হুইচ অয়ার প্রিজুডিসিয়াল টু দ্য ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া।

অরবিন্দের ওপর অভিযোগ ছিল—

দ্যাট ইউ অয়ার ইন কনট্যাক্ট উইথ সুভাষচন্দ্র বোস এ্যান্ড অয়ার এ পারটি টু হিজ প্ল্যানস এ্যান্ড প্রোগ্রামস হুইচ অয়ার প্রিজুডিসিয়াল টু দ্য ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া।

তাঁর গৃহত্যাগের, ভারতবর্ষের বাইরে যাবার যে ইতিহাস, যা ছিল এতদিন পর্দার অন্তরালে, সেই অকথিত কাহিনীর স্মৃতিচারণ করে দেশবাসীর উদ্দেশে তুলে ধরা হল আজ। তাঁর রহস্যপূর্ণ অন্তর্ধানের কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে অনেকেই অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা সম্পূর্ণ নয়। অনেকে ইতিহাসকে করেছেন বিকৃত অনেকে আবার কথার কুয়াশা সৃষ্টি করে নিজের আত্মপ্রচারের জয়ঢাক বাজিয়ে সাধারণের মাঝে সস্তায় বাজীমাৎ করতে চেয়েছেন। মহাবিপ্লবী নায়ক সুভাষচন্দ্র বিপদসঙ্কুল দুর্গম পথ অতিক্রম করে ভারতবর্ষের মুক্তিসাধনায় নিজের জীবনকে বিপন্ন করে ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চরম আঘাত হানার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। প্রথম বার্লিনে পরবর্তীকালে জাপানে গিয়ে আর এক বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর সঙ্গে মিলিত হয়ে সশস্ত্র আজাদ হিন্দ বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। গঠন করেছিলেন সর্বপ্রথম স্বাধীন সার্বভৌম আজাদ হিন্দ সরকার। দেশবাসীর সমক্ষে তাঁর রহস্যপূর্ণ অন্তর্ধানের এই অকথিত কাহিনীর কয়েকটি অংশ তাই এখানে তুলে ধরলাম।

জয় হিন্দ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

জীবনে আদর্শের মূল্য :

২৮শে সেপ্টেম্বর হাওড়া হোমাস্-এর ২৯-তম বার্ষিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানের সভাপতি অমৃত সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ তাঁর ভাষণে জীবনে আদর্শের গুরুত্বের কথা বলেন। তিনি বলেন যে আদর্শ ও ধারাবাহিকতা —দুটো জিনিসই ব্যক্তি তথা সংস্থার পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। প্রসংগতঃ অমৃতবাজার পত্রিকা ও হাওড়া হোমসের কথা তিনি উল্লেখ করেন। পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র বলেন : বাস্তব শিক্ষা বিস্তার, শিক্ষাব্যবস্থাকে সুদূরপ্রসারী করার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ পাঠাগার নির্মাণ আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণের দ্বারা ভাবধারার সম্প্রসারণ—দীর্ঘকাল ধরে এ তিনটি লক্ষ্যই হাওড়া হোমস পূর্ণ করে আসছে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাহিত্যিক শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) দেশব্যাপী সংকট ও নিরানন্দের মধ্যে হাওড়া হোমস যেভাবে আনন্দের সংগে আদর্শ অনুসরণ করে চলেছে তার প্রশংসা করেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় হাওড়া হোমসের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন যে, তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল জনসেবা করা। তিনি আরও বলেন যে, বাস্তব শিক্ষার প্রসার ও জনসেবায় বাকী জীবন অতিবাহিত করাই তাঁর একমাত্র স্বপ্ন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্মরণে

২৮ সেপ্টেম্বর টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট আয়োজিত স্মরণ সভায় সংস্কৃতি-স্বাধীনতা ও সাহসের ত্রিবেণী সংগম জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনে ঘটেছিল বলে বিভিন্ন বক্তা মত প্রকাশ করেন। তথ্যকেন্দ্রের এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রমথনাথ বিশী। অধ্যাপক হরিপদ ভারতী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুনীল দাস অমিয়কুমার মজুমদার ও ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রও সভায় বক্তৃতা করেন।

পরলোকে কিরণচন্দ্র সিংহ

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন-এর আজীবন সদস্য এবং ঐ সম্মেলন-এর সংগে ৪৫ বৎসর যাবৎ সক্রিয়ভাবে যুক্ত অধ্যাপক কিরণচন্দ্র সিংহ গত ১৪ই সেপ্টেম্বর এলাহাবাদে পরলোকগমন করেছেন। সম্মেলন-এর পরীক্ষা পরিষদের সচিব হিসেবে বাংলা ভাষা শিক্ষা, তথা প্রচার ও প্রসারকল্পে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান শ্রদ্ধার সংগে স্বীকার করা হয়ে থাকে। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

শৈলবালা ঘোষজায়ার স্মরণসভা

গত ২৯ সেপ্টেম্বর 'সাহিত্যিকা'র উদ্যোগে শৈলবালা ঘোষজায়ার স্মরণে একটি আলোচনা সভার অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। কলকাতা তথ্যকেন্দ্র-এ অনুষ্ঠিত এই স্মরণসভায় শ্রীলীলা মজুমদার ও মহাশ্বেতা দেবী ভাষণ দেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন-এর অধিবেশন

কার্শিয়াং বুসফিল্ড মহকুমা পাঠাগারে ২৮—৩০ সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন-এর ৩৯-তম অধিবেশন হয়ে গেছে। এই সম্মেলন-এর উদ্বোধন করেন সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

আই-এন-এস-এর নতুন সভাপতি

অমৃত-এর শ্রীপি কে রায় ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য ইণ্ডিয়ান এন্ড ইস্টার্ন নিউজপেপার সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। উপ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন নাগপুর টাইমস-এর শ্রী এ জি শেতরে এবং সহ-সভাপতির পদ লাভ করেছেন মাতৃভূমি পত্রিকার শ্রীভি এম নায়ার। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশিত ৩৭টি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিনিধিবর্গকে নিয়ে নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যসমাজের বার্ষিক উৎসব

হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্যসমাজের ৩৭-তম বার্ষিক উৎসব সম্প্রতি সমাজ-ভবনে সুসম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানের সে দিনে প্রাচীন পণ্ডিত আশুতোষ ন্যায়াচার্যকে সম্বর্ধনা জানানো হয় এবং কবি নগেন্দ্রনাথ কুণ্ডুকে কাব্যবিনোদ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। পণ্ডিত নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ ও নির্মল সরকার প্রমুখ সুধীবৃন্দ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

হাওড়ায় শরৎচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী

হাওড়া জেলা কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র জন্মশতবর্ষ পূর্তি উৎসব সমিতির উদ্যোগে শরৎচন্দ্রের ৯৯-তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। হাওড়ার জেলাশাসক পার্থসারথি চৌধুরী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। হাওড়া গার্লস কলেজের নাম পরিবর্তন করে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র গার্লস কলেজ করার একটি প্রস্তাব এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

একটি পৃথক অনুষ্ঠানে শরৎ স্মৃতিরক্ষা সমিতি বাটরা পাবলিক লাইব্রেরী হলে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রাক-শততম জন্মোৎসব পালন করেন।

—শ্রীজরৎকারু

নতুন বই

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি শঙ্কর সেনগুপ্ত ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন ৩ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট কলিকাতা-১ কুড়ি টাকা।

দীর্ঘদিন ধরে শ্রীযুক্ত শঙ্কর সেনগুপ্ত বাঙলার ইতিবৃত্ত সংকলন করছেন। বাংলার জ্ঞানী গুণী ও বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর যেটুকু প্রতিষ্ঠা তা সম্ভব হয়েছে তাঁর একনিষ্ঠ সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে। তাঁর চিন্তা ও কর্মধারার প্রণালী কিছু ভিন্ন। মূলত লোকজীবনকে সম্বল করেই তাঁর প্রকাশ, লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি (তাঁর ভাষায় 'লোকযুক্ত') তাঁর প্রেরণার উৎস। আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীসেনগুপ্ত বাঙলার লোকজীবনের হৃদয়তাপ উত্তাপিত বিবরণ শুধু দেন নি উপস্থিত করেছেন আধুনিক বাংলার মানসলোক ও সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তন অনুষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। সামাজিক পটপরিবর্তনের ধারায় যে ঐতিহ্যবিমুখ নয় এবং জাতীয় সাধনা যে পালাবদলের দিনেও স্থানচ্যুত হয় নি, বরং লৌকিক উপলব্ধিজাত সাধনার সংগে উচ্চ কোটির চিন্তা-চেতনা-ধ্যান-মননের অপূর্ব সম্মেলনে পুষ্ট হয়েছে, তাও শ্রীসেনগুপ্তের বক্তব্যে পরিস্ফুট। শংকরবাবু লোকবৃত্তকে কেন্দ্র করে বাঙালী মানসের সমগ্র রূপের পরিচয় আবিষ্কারে ব্রতী। সুতরাং ঋতু-প্রকৃতি ও নদীর-শাসন পাল-পার্বণ উৎসব-অনুষ্ঠান, গ্রামসমীক্ষা প্রভৃতি তাঁর আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অত্যন্ত সঠিক ভাবেই তিনি বলেছেন যে বাঙালী-জীবন ঋতু-নিয়ন্ত্রিত শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষা। তাকে সমগ্র বাঙালীর জীবন বিবর্তিত হয়, বিবর্তিত হয় আহার পোষাক ও ধর্মাচার পদ্ধতিও। পূর্বসূরী বাঙালী সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজ-ঐতিহাসিকগণের কেউ বাঙালী জীবনের এই প্রয়োজনীয় দিকটির প্রতি এমন নিষ্ঠাভাবে অনুসন্ধিৎসু

করেন নি। আমরা এজন্য শ্রীসেনগুপ্তের কাছে কৃতজ্ঞ।

বাংলা নদীবিধৌত। সমুদ্রের স্বাদ পাওয়া যায় বাংলার নদীতে। জনজীবনেও নদীর প্রভাব গুরুত্বের। রেলগাড়ী প্রবর্তনের পরেও নদীই বাঙালীর যানবাহনে প্রধান অবলম্বন। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জনপদের সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করে এই নদীর উপর। শ্রীসেনগুপ্ত বাঙালী জীবনে নদীর প্রভাবটিকে মুন্সীয়ানার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। নদী ও ঋতুর শাসন কী ভাবে বাঙালীকে হাসায়-কাঁদায় তার একটি ছক পাই শ্রীসেনগুপ্তের রচনায়। শ্রীসেনগুপ্ত যদি পরবর্তীকালে এ বিষয়ে আরও একটু গভীরে যান তবে বাঙালীর সমাজ ইতিহাসের অনেক মূল্যবান তথ্য যে বেরিয়ে আসবেই তা অনুমান সাপেক্ষ। লোক-উৎসব ও মেলা বিষয়ক আলোচনাটি খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে লেখক যেভাবে মেলার টাইপ' ভাগ করেছেন তাতে তাঁর চিন্তার মৌলিকতা ধরা পড়েছে। অবশ্য তিনি কিঞ্চিৎ রুষ্ট হয়ে ভারতীয় জনগণনা দপ্তর প্রকাশিত পূজা-পার্বন ও মেলাকে যেভাবে নস্যাৎ করেছেন তা না করলেই শোভন হত। 'ফোকলোর' বা 'লোকবৃত্ত' সম্পর্কিত আলোচনায় তাঁর চিন্তার সঙ্গে অনেকের ভিন্নমত থাকতে পারে। কিন্তু তাতে তাঁর চিন্তার বক্তব্যকে নস্যাৎ করা যাবে না।

তিনি সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন গ্রন্থ-পরিকল্পনায়। লোক-ক্রীড়ার আলোচনায় এবং গ্রাম সমীক্ষায়। মাঝে মাঝে সমাজ ইতিহাসের ছোট ছোট চিত্র তুলে ধরেছেন পূর্ববর্তী গবেষকদের গবেষণা হজম করে। লোক-ক্রীড়ার ব্যাপারে একমাত্র ডকটর সুকুমার সেনের বাংলার খেলাদোলা (অমৃত-এ প্রকাশিত) প্রবন্ধের পর এত বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র দৃষ্ট হয়নি। শ্রীসেনগুপ্ত নৌকা বাইচ, ঘোড় খেলা, সিঁদুর খেলা, লাঠিখেলা কিং-কিং ছি-ছি, উপেনটি বাইস্কোপ থেকে দাবা, পাশা তাস খেলা নিয়েও আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে এখনও বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। গ্রাম-সমীক্ষা অংশে আমাদের সর্বাধিক ভাল লেগেছে কতগুলি টাইপ চরিত্র যেমন রাঙাপিসী সেনমহাশয় করিম-বসির প্রভৃতিকে। এ চরিত্রগুলো একদিকে জীবন্ত অন্যদিকে উপন্যাসের চরিত্রের মত সরস। আচারআচরণাদির বর্ণনায় শ্রীসেনগুপ্ত যেখানে বিবাহ, চুম্বন, কবচ-তাবিজ ধারণ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন সেখানে তিনি প্রাণখোলা দিলদরিয়া, কিন্তু অনেক স্থানে তিনি কৃপণ। তাঁর কাছে আমরা গ্রাম্য দেবদেবীর আলোচনা আরও ব্যাপক ও তির্যক দৃষ্টি আশা করেছিলাম। প্রাকৃতিক চিকিৎসার আলোচনাটি চমৎকার কিন্তু তিনি যেখানে বিভিন্ন শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেখানে যেন অনেকটাই ফাঁকি দিয়েছেন এবং রচনাকেও অনেক স্থানে কামড়াস করে ফেলেছেন। এ জিনিষটি আমরা লক্ষ্য করছি তাঁর ঋতু-প্রকৃতি আলোচনার প্রথমার্ধেও।

শ্রীসেনগুপ্ত বাঙালী মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যে একজন বিশেষজ্ঞ তা এ গ্রন্থ পাঠে জানতে পারলাম। এ গ্রন্থে বাঙালী মুসলমানদের ব্যাপারে এমন অনেক কথা বলা আছে যা হয়ত অনেক বাঙালী মুসলমানও জানেন না। গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণ কামরুল হাসানের অলঙ্করণ। বস্তুতপক্ষে এই অলঙ্করণ না থাকলে কিছুতেই এ গ্রন্থ এত খোলতাই হতে পারতো না। খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদও প্রশংসনীয়।

গ্রন্থকার বইটির বর্ণনাভঙ্গিতে যে আঙ্গিক-নব রীতি অবলম্বন করেছেন তা একান্তই সত্য। কিন্তু এ জাতীয় গ্রন্থে অনেক পাঠকই তথ্যের প্রামাণিকতার ব্যাপারে উৎসাহী, লেখক তা প্রকাশ না করে অনেককে হতাশ করেছেন। তাছাড়া গ্রন্থের ভাষারও কোথাও আছে স্বাচ্ছন্দ্য কোথাও জড়তা। তথাপি এ গ্রন্থ প্রত্যেকটি শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে করি।

—বদরুদ্দীন ওমর ঢাকা।

আরো বই

Jayadeva by Suniti Kumar Chatterjee
সাহিত্য একাদেমী, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম ব্লক ভি-বি কলকাতা ২৯। দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

'জয়দেব' সংস্কৃতে গীতগোবিন্দ লিখলেও তিনি বাঙালী কিনা, তাঁর কাব্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোন প্রামাণ্য সূত্র মেলে কিনা—এরকম নানাবিধ জিজ্ঞাসা নিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ইতিহাস-কাররা প্রচুর গবেষণার কাজ করেছেন। আলোচ্য 'জয়দেব' নামের ইংরাজী গ্রন্থটিতে প্রখ্যাত অধ্যাপক ও ভাষাবিদ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সেই চিন্তা-ভাবনাকে সংক্ষেপে অথচ যুক্তিনিষ্ঠ তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যগঠনে জয়দেবের অবদানের স্বরূপ আলোচনা করেছেন। জয়দেবকে বাঙালী ওড়িয়া ও মৈথিলীরা প্রত্যেকেই স্বপক্ষে দাবী করেন। ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় সেই দাবীগুলির ব্যাখ্যা করতে বসে ডঃ সুকুমার সেন ইত্যাদির মতকেও আলোচনায় এনেছেন শ্রীধর দাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' গীতগোবিন্দ ছাড়া জয়দেবের আরও যে-সব রচনা আছে সে প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট হদিশ দিয়েছেন প্রবন্ধকার। প্রেমের গীতিকাব্য রচনার ধর্মনিরপেক্ষতা জয়দেবের ভাবপ্রবণতা ও মিস্টিক চেতনার স্বরূপ বিচার ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত নিপুণভাবে সুনীতিবাবু এ গ্রন্থে উপস্থাপিত করেছেন। গীতগোবিন্দর কবির একটি সর্বময় কাব্য-প্রতিভার স্বরূপ এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জয়দেব বাংলা সাহিত্যধারার একপ্রান্তের কবি। সেখান থেকে পরবর্তী কালে গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে, অনেক নিত্যনূতন চিন্তাধারার সংযোগ ঘটেছে। আলোচ্য গ্রন্থে প্রবন্ধকার এই প্রাচীন ভক্ত-কবিকে সেই ধারাবাহিকতায় সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলেছেন।

প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য (প্রবন্ধ) : আশিস সান্যাল। গ্রন্থ সম্পুট ৪৪।১সি বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯। সাত টাকা।

গ্রন্থে মোট বারোটি ছোটবড় প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। রচনাগুলি ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে বুদ্ধিমান পাঠকদের সমাদর পায়। গ্রন্থভুক্ত হওয়ার পর আশিস সান্যালের চিন্তাধারার একটি স্পষ্ট রূপ ধরা পড়ে। গ্রন্থভুক্ত প্রথম দুটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত, বাকি প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথের সমকালের অনুজ কবি-গোষ্ঠী সম্পর্কিত। শেষ তিনটি প্রবন্ধ স্বতন্ত্র রসাস্বাদের। অনুসন্ধিৎসু ও গবেষক পাঠকদের এ বই সংগ্রহযোগ্য। তবে একটা কথা বলার, কয়েকটি প্রবন্ধে ইংরাজী ও বাংলা উদ্ধৃতি নিশ্চয়ই অনেক কমানো যেতো। অতিরিক্ত উদ্ধৃতি প্রমাণ অপেক্ষা প্রবন্ধকে দুর্বল করে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

আলোয় আলোয়। ত্রিশঙ্কু। অনন্যা প্রকাশন ৬৬, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ১২। ছয় টাকা।

কবি শ্রীশরৎ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম 'ত্রিশঙ্কু'। এই ত্রিশঙ্কু নামে কিছু ফিচার জাতীয় রচনা লিখেছিলেন লেখক একটা সাপ্তাহিক পত্রিকায়। সেইগুলিই সম্প্রতি গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে আলোয় আলোয় নাম নিয়ে। গ্রন্থের লেখক জানিয়েছেন তাঁর পূর্ববর্তী কিছু কবিতার এবং অনিশ্চিত পরবর্তীকালের কিছু গদ্য রচনার বীজ সম্ভবত এই রচনাগুলির মধ্যে নিহিত আছে। কবি শরৎ মুখোপাধ্যায় একাধিক কাব্যগ্রন্থের লেখক, আবার সম্প্রতি কিছু উপন্যাসও লিখেছেন। কবিতায় শরৎ মুখোপাধ্যায়ের সূক্ষ্ম কাহিনী, ঘটনা বলার চেষ্টা ছিল, অন্তত তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত কিছু কবিতা ও কাব্য-নাট্য পড়ে বুঝেছি। উপন্যাসের বিস্তৃত কাহিনী ঘটনায় তার পল্লবিত রূপ চোখে পড়ে। 'আলোয় আলোয়' এই দুই মানসিকতার চিত্রল রূপ নিঃসন্দেহে। হাল্কা রম্য মেজাজে কিছু গদ্য চর্চা ও সেই সূত্রে ক্ষণিক কিছু মানসিক অনুভূতিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা লেখকের কাজ। আসলে 'আলোয় আলোয়' গ্রন্থটি আধুনিক শহুরে মানুষের এক ধরনের চিত্রশিল্পীর স্কেচ করার ভঙ্গিতে আঁকা।

সিঁদুরে মেঘ (কাব্য সংকলন): সেখ আমানুল্লা। বন্না প্রগতি সাহিত্য সংসদ. চিংড়ীপোতা, পোঃ পশ্চিম রামেশ্বরপুর. ভায়া বাটানগর, ২৪ পরগণা। দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সেখ আমানুল্লা সম্পাদিত 'সিঁদুরে মেঘ' কাব্য সংকলনের মধ্যে সারা পশ্চিম-বঙ্গের ও কিছু পশ্চিমবঙ্গের বাইরের মফঃস্বল অঞ্চলের নূতন কবির কবিতা স্থান পেয়েছে। কলকাতা, পশ্চিম দিনাজপুর, বর্ধমান, চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, মেদিনীপুর বাঁকুড়া হুগলী ছাড়া মধ্যপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি প্রদেশের কবিরা এতে লিখেছেন। বহু লেখা কাঁচা, তবু আন্তরিকতা আছে। কবিতার ছন্দ, চিত্র, শব্দ সম্পর্কে চর্চা-সাপেক্ষ অভিজ্ঞতা গভীর হলে সংকলনভুক্ত কিছু কবির ভবিষ্যৎ কাব্যচর্চা শিল্পসমন্বিত হবে বলে মনে হয়।

পত্র পত্রিকা

অভিনব। সম্পাদক — শ্যামলেন্দু চট্টোপাধ্যায়। আসানসোল পুস্তকালয়, শাহা লেন, আসানসোল, বর্ধমান। পঞ্চাশ পয়সা।

আলোচ্য বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংকলনের ৮৯র 'অভিনব' পত্রিকার লেখকসূচীতে আছেন কবিরুল ইসলাম পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা চক্রবর্তী অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। রচনাগুলি সুনির্বাচিত। এই পত্রিকাগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র 'সুকান্ত সংকলন'টি কবি সুকান্তের যথার্থ সশ্রদ্ধ স্মৃতি-তর্পণ।

অক্ষর। সম্পাদক সুনীলকুমার। ৬।৩।১ ঘোষপাড়া লেন সালকিয়া হাওড়া। দাম এক টাকা।

আজকের সাহিত্য ও সাহিত্যচিন্তার মুখপাত্র 'অক্ষর'-এর চলতি সংখ্যায় জনতাব লেখক আঁরি বারবুস শীর্ষক প্রবন্ধটি ভালো। আরও কয়েকটি লেখা ভালো লেগেছে।

আবির্ভাব। সম্পাদনা অঞ্জন সান্যাল এবং সুকান্ত। কেরাণীতলা। মেদিনীপুর। দাম উল্লেখ নেই।

শুধুমাত্র কবিতা নিয়ে মেদিনীপুরের কেরাণীতলা থেকে শীর্ণ পত্রিকা জন্ম নিয়েছে। পত্রিকাটির নাম আবির্ভাব। প্রথম আবির্ভাবে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকলেও প্রতিশ্রুতির আভাস যে নেই এমন নয়। কবিতা নির্বাচন এবং মুদ্রণের ব্যাপারে একটু যত্ন নিলে আগামী সংখ্যাটি আকর্ষণীয় হবে মনে হয়।

সারস্বত। সম্পাদনা অশোক ভট্টাচার্য। ২০৬ বিধান সরণী। কোলকাতা ছয়। দাম দু টাকা।

অমলেন্দু বাগচী, শিবচন্দ্র লাহিড়ী এবং দেবজ্যোতি দত্তমজুমদারের নিবন্ধ উল্লেখ করার মতো। অনুবাদ গল্পটিও ভালো লেগেছে।

শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য। সম্পাদনা অমল চন্দ্র ও অশোক চট্টোপাধ্যায় দাম তিরিশ পয়সা।

'বিদ্রোহী ক্রীতদাস'-এ পরেশ মন্ডল কিছু জোরালো কথা বলতে চেয়েছেন। বিষয় না আঙ্গিক এই নিয়ে অতীন্দ্রিয় পাঠকও সাধ্যমত প্রয়োজনীয় আলোচনা করেছেন। এই পুস্তিকার সমস্ত আলোচনাই অবশ্য অনিবার্য বলে মনে হয় নি। প্রচ্ছদ ভাল।

পর্ণপুট। সম্পাদনা সরল দে। বেলুড়। হাওড়া। দাম একটাকা।

উজ্জ্বল মজুমদারের লেখা 'রবীন্দ্রনাথের পড়াশোনা' এবং সন্দীপ সরকারের লেখা 'কলকাতায় শিল্পকলা' নামের নিবন্ধ দুটি ভালো লেগেছে। ভালো লেগেছে বুদ্ধদেব বসু এবং রবার্ট ফ্রস্ট সম্পর্কিত হরপ্রসাদ মিত্র এবং অমিত্র বসুর লেখা নিবন্ধ দটিও। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পটিও পত্রিকার একটি বিশেষ আকর্ষণ।

অনুভব। জয়ন্তকুমার সম্পাদিত। ৩৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। কলকাতা-১২। দাম ষাট পয়সা।

'কবিতা কবির জীবন' প্রসঙ্গে কৃষ্ণ ধরের লেখা 'আমার দুঃখই আমার কবিতা' ভালো লেগেছে। 'যখন তোমাকে পাই' এবং 'মনে পড়ে যায়' নামের কবিতা দুটিও ভালো। এছাড়া গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমোদ মুখোপাধ্যায় এবং সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা ভালো লেগেছে। প্রচ্ছদে সুরুচির ছাপ স্পষ্ট।

খসড়া। সম্পাদনা চন্দনকুমার রায়। ৩১ বি ললিত মিত্র লেন। কলকাতা। দাম বারো আনা।

প্রচুর কবিতা একটি গল্প এবং একটি প্রবন্ধ আছে এই পত্রিকাটিতে। গোটাকয়েক কবিতা ভালো লাগল।

চিরন্তন। সুশোভন দত্ত। লক্ষ্মী সরে। গোবরডাঙা। ২৪-পরগণা।

আনন্দবার্তা। সম্পাদনা পুষ্পলকুমার বসু। দত্তপুকুর সংস্কৃতি পরিষদ। অরবিন্দ পল্লী। দত্তপুকুর। ২৪-পরগণা। দাম এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

'যুগ জিজ্ঞাসায় ভারতীয় সংস্কৃতি' ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীর লেখা এই নিবন্ধটি উল্লেখ করার মতো।

ঈগল। সম্পাদনা অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং পরেশ মন্ডল। ২৮ কিষণলাল বর্মণ রোড। হাওড়া। দাম তিরিশ পয়সা।

পরেশ মন্ডল, অতীন্দ্রিয় পাঠক এবং অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ভালো লেগেছে।

চারুবাক। সম্পাদনা বঙ্কিম দাস। ৪৩ চৌরঙ্গী রোড। কলকাতা-১৬। দাম এক টাকা।

'অফিস পাড়ায় প্রকাশিত একমাত্র সাহিত্য ত্রৈমাসিক' 'চারুবাক'-এর চলতি সংখ্যায় সুধীন ঘোষের প্রবন্ধ, শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা, কৃষ্ণ ধরের কবিতা এবং রজত সেনের গল্প ভালো লেগেছে। প্রচ্ছদটিও ভালো।

নরসিংহ দত্ত কলেজ পত্রিকা। (দিবা বিভাগ)। সম্পাদনা অধ্যাপক বিভূতিভূষণ ঘোষ ও চিত্তরঞ্জন ঘোষ।

লোক সাহিত্যে শিশু সম্পর্কিত ছড়া বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ প্রবন্ধ দুটি উল্লেখ করার মতো। বিজয় সান্যালের কবিতাও ভালো লেগেছে।

স্বগতোক্তি। সম্পাদক স্বরূপ মন্ডল। ১২৬।এ, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম এক টাকা তিরিশ পয়সা।

সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ বিষয়ক ত্রৈমাসিক 'স্বগতোক্তি'-র এই সংখ্যায় কৃষ্ণ ধরের কবিতা, রতন চট্টোপাধ্যায় এবং নন্দদুলাল ঘোষের গল্প ভালো লাগল। কাশীনাথ কংস বণিকের আঁকা পত্রিকার প্রচ্ছদ প্রশংসা পাবে।

দ্যোতনা। সুনীলকুমার জানা। অশোক চক্রবর্তী। অনন্তপুর সুতাহাটা। মেদিনীপুর। দাম এক টাকা।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নারায়ণ মন্ডলের নিবন্ধ এবং শ্যামলকান্তি দাসের গল্প ভালো লাগল। ছাপার বিষয়ে যত্ন নেওয়া দরকার।

অরণ্য। স্বপন রায় সম্পাদিত। ৮।১০৩ বিজয়গড়। যাদবপুর। কলকাতা-৩২। পঞ্চাশ পয়সা।

পরিচ্ছন্ন রুচির এই পত্রিকাটিতে বেশ কিছু ভালো প্রবন্ধ কবিতা এবং গল্প আছে। অসীম রেজ এবং বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ভালো লেগেছে। ভালো লেগেছে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্পও। প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন।

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

[সোনাখড়ি গ্রামের ভবনাথ ঘোষ আর দেবনাথ ঘোষ দুই ভাই। ভবনাথ বড়ো। অল্পবয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর ভবনাথ সংসারের হাল টেনেছেন, ভাইকে মানুষ করেছেন। কলকাতা যাবেন দেবনাথ ছোট আদালতে উকিল হওয়ার পরীক্ষা দিতে। যাওয়া হোল না। তিনি বিদেশে পরে জমিদারী সেরেস্তার ম্যানেজার হয়েছিলেন। সেই কৃতী ভাই দেবনাথ আট বেহারার পালকিতে সোনাখড়ি ফিরল।

একদিন সকালে দেবনাথ দেখলেন সামনের দাওয়ায় দশভুজা দুর্গা। গাঁয়ের লোকজন ভবনাথকে বললেন, মায়ের ইচ্ছে তোমাদের হাতেই পুজো নেবেন তিনি। পুজোর তোড়জোড় চলতে লাগল। যাত্রা নয় থিয়েটারও হবে। ম্যানেজার হারু সরকারের তদারকিতে চলতে লাগল থিয়েটারের মহড়া...

ভবনাথ-দেবনাথের বোন মুক্তকেশী। মুক্তকেশীকে আনতে ফটিক মোড়ল গেল। ওদের ওখানে আবার ভূপতির মেয়ের বিয়ে। মুক্তঠাকরুণ বললে, বিয়ে-টিয়ে সেরে যাব। ফটিক মোড়ল ফিরে এসে বলল উনি আসবেন বোশেখের শেষ বা জ্যৈষ্ঠের গোড়ায়...।

গাছে গাছে হঠাৎ যেন বান ডেকে গেল। সব গাছেই পাকা ফল, ডাঁসা ফল। বেঁচি, লিচু, গোলাপজাম, আব, সপেদা পাকা ফলের ছড়াছড়ি। টুপটাপ পাকা আম পড়ছে তলায়। ছেলেপুলেদের বাড়িতে রাখা দায় তাই এসেছে তাই ভবনাথ আজ নিজে বেরিয়েছেন হাট করতে...]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দেবনাথ ফিরলেন পুঁটিও ফিরেছে বাপের সঙ্গে। কাপড়-চোপড় ভিজে গেছে গা মাথা দিয়ে জল গড়াচ্ছে। ফিরেছেন সে জন্যে নয়। ছোট ধামি ভরে গেছে আমে তলায় এখনো বিস্তর একটা কোন বড় পাত্র চাই। বিনো বলে আমি যাবো ছোটকাকা। নিমি বলে আমি যাবো। আম কুড়ানোর নামে নাচছে সবাই। ভবনাথ হাটে চলে গেছেন-- রাতের বেলা ঝুপঝুপে এই বৃষ্টির মধ্যে আম কুড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ। দেবনাথ অতিশয় দরাজ এ ব্যাপারে—বলতেই ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বসে আছেন। অলকা-বউকে নিজে থেকেই আবার জিজ্ঞাসা করছেন : তুমি যাবে না বউমা?

ইচ্ছা কি আর করে না কিন্তু বউমানুষ যে! অলকা কথা ঠিক বলে না খুড়শ্বশুরের সঙ্গে—নকারে আকারে ইঙ্গিতে বলে। ঈষৎ ঘোমটা টেনে গামছাটা নিয়ে পুঁটির ভিজে চুল মুছতে লাগল সে।

বিনো আর নিমি চলল ঝুঁকি বনে-বাদাড়ে—সভয়ে বড়গিন্নি বলেন সত্যি সত্যি চললি যে তোরা?

দোষ কি বউঠান, আমি তো সঙ্গে থাকব।

দেবনাথ সম্পূর্ণ ওদের পক্ষে। বলছেন ছেলেমেয়ে সবাই কুড়িয়ে বেড়াবে বলেই কর্তারা বাড়ির উপরে বাগ বানিয়ে রেখে গেছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের দিনে আম খেয়ে সুখ বটে, কিন্তু কুড়ানোয় বেশী সুখ।

উমাসুন্দরী বলেন, তা বলে রাত্তিরে কেন? কুড়োতে হয়, সকালবেলা কুড়োবে।

নাগাড়া পড়ায় বিনো ক্যাঁ-কাঁর করে উঠল : সকাল অবধি আম পড়ে থাকবে কিনা! কতজনা এরই মধ্যে উঠে পড়েছে দেখগে।

ঠেকানো যাবে না এ দুটোকে খোদ ছোট কর্তারই যখন আসকারা, বড়গিন্নি একেবারে নিঃসংশয় হয়ে গেছেন। বৃথা বাক্যব্যয় না করে পুঁটির হাত ধরে নিয়ে চললেন তিনি। বকতে বকতে যাচ্ছেন : সেদিন জ্বর থেকে উঠেছিস রাত্তির বেলা নেয়ে এলি আবার। কাঁপিয়ে জ্বর আসবে, মজা টের পাবি তখন। জামাইষষ্ঠীতে কত খাওয়া-দাওয়া আমোদ-আহ্লাদ চন্দনা আসবে জামাই আসবে, তুমি তখন বিছানায় শুয়ে চিঁ-চিঁ কোরো আর বার্লি গিলো—

দক্ষিণের ঘরে তরঙ্গিণীর হেপাজতে কমল। বড়গিন্নি পুঁটিকে সেখানে এনে ছাড়লেন। বাপের সঙ্গে কমল যেতে পারে নি, সেজন্য মুখ আঁধার। বড়গিন্নি আদর করে বললেন, কমল কেমন লক্ষ্মী সোনা, দেখ তো। রাতের বেলা আমতলায় যায় না—

কমল বিজ্ঞজনোচিতভাবে বলল দিন-মানে যেতে হয়—

কমল জলবৃষ্টি লাগায় না।

কমল বলল জল লাগলে অসুখ করে।

শিশুবর ফিরল। নতুন পুকুরের পূবে বাগের ঐ মুড়োয় দূরের দিকে গিয়েছিল সে। ঝুড়ি ভরতি আম হুড়মুড় করে দর-দালানে ঢেলে দিল। বিনো যা বলেছিল —সত্যিই তাই। মাদারতলার দিক দিয়ে বিলের দিক দিয়ে মানুষ এসে উঠেছে, বেপরোয়াভাবে আম কুড়োচ্ছে। হাঁক পাড়লাম ছোটবাবু তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। তাদের নিজেরই যেন জায়গা।

এত বলাবলিতেও দেবনাথ উত্তেজিত করা যায় না। উল্টে তিনি শিশুবরকে দুষছেন : অন্যায় তোমারই তো শিশুবর। কেন তুমি হাঁকাহাঁকি করতে যাও? গাছের তো পাড়ছে না, তলায় দুটো কুড়িয়ে নিচ্ছে। তাতে রাগ করলে হবে কেন?

অলিখিত আইন : গাছের ফল মালিকের। গাছে উঠে আম পাড়াটা বেআইনী—চুরির শামিল। তলার আম যে কুড়িয়ে পাবে তার, মালিকের সেখানে একক অধি-কার নেই।

শিশুবর বলল, লণ্ঠন নিয়ে এসেছিল চেঁচিয়ে উঠতে নিভিয়ে অন্ধকার করে দিল।

তবুও দেবনাথ সে পক্ষের দোষ দেখতে পান না। বললেন, আনবেই তো। তলায় আগাছার জঙ্গল আলো না হলে দেখতে পাবে কেন?

নাও, হয়ে গেল! ওগায়কড়োনোয় দোষ ধরে না—সে জিনিস হল, একটা-দুটো সামনের মাথায় দেখলাম তুলে নিলাম। এমনিভাবে লণ্ঠন ধরে তন্ন তন্ন করে কুড়ানো কখনো হতে পারে না। কিন্তু মীমাংসা ও শাসন-নিবারণ ছোটবাবুকে দিয়ে হবার নয়। অথচ জমিদারের ম্যানেজার নাকি উনি—প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। সেই মানুষ বাড়ি এসে বোম-ভোলানাথ হয়ে গেছেন।

হেনকালে ভবনাথ ফিরলেন। ঝড় থেমে গেছে বৃষ্টি অল্পসল্প টিপটিপ করে পড়ছে। জল-কাদা ভেঙে আম কুড়িয়ে বেড়াবে বলে আধময়লা ছেঁড়া কাপড় কাঁধ বেড় দিয়ে গাছকোমর বেঁধে নিমি ও বিনো তৈরী। হলে হবে কি—আয়োজন পণ্ড, ভবনাথ এসে পড়ছেন। তাঁর কাছে কথা পাড়বেই বা কে, যাবেই বা কেমন করে তাঁর সামনে দিয়ে?

আসল মানুষ পেয়ে শিশুবর নালিশটা আবার গড়গড় করে বলে যায়: এত চেল্লা-চেল্লি তা মোটে কানেই নিল না বড়বাবু। যেন ওদের বাবাতে গাছ। দেদার কুড়োচ্ছে।

ভবনাথ গর্জে উঠলেন: কুড়ানো বের করে দিচ্ছি। চল—

জিরান নেই, তক্ষুনি বেরুচ্ছেন আবার। উমাসুন্দরী বাধা দিয়ে বলেন, ওমা, হাট করে এই এসে দাঁড়ালে। শিশুটা হয়েছে কেমন যেন লহমার সবুর সয় না। উঠোনে পা না ফেলতে আরম্ভ করে দেয়।

ভবনাথ বলেন, হাট অবধি যেতে পারলাম কই? বদন-সার তেল-কেরাসিনের দোকানে এতক্ষণ। দালানের মধ্যে দিব্যি আছ, বাইরে কী কাণ্ড হয়ে গেল টের পেলে না। হাটঘাট কিছু হয় নি, জলঝড়ের মধ্যে হাট মোটে বসতেই পারে নি আজ। ভাইটি আছে, ডাল দেখে মাছ-শাক আনব ভেবে-ছিলাম। নাও, কচু কোট বেগুন কোট—কচু-বেগুনের ডালনা রাঁধো। আর কি হবে।

দেবনাথকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেন বাতাসে দুটো-একটা পড়ে, কুড়িয়ে নিয়ে যায়—সে এক কথা। তা বলে কালবোশেখিতে গাছ মুড়িয়ে দিয়ে গেল—ধামা ধামা তাই নিয়ে হাটে বিক্রী করবে, তা কেমন করে হতে দিই। হিরুটা আসছিল—গেল কোথায় আবার? এলে পাঠিয়ে দিও।

চললেন ভবনাথ বীরদর্পে শিশুবরও চলল পিছু পিছু ঝুড়ি কাঁধে নিয়ে। আলো ধরে আম কুড়োচ্ছে বটে—আলো নড়ছে। অনেকটা দূরে—বাগের একেবারে শেষ প্রান্তে বিলের কাছাকাছি। ভবনাথ জোর পায়ে যাচ্ছেন, শিশুবর তাঁর সঙ্গে হেঁটে পারে না।

একেবারে কাছে চলে গেলেন। দুটো লোক—স্পষ্ট নজরে আসে। ভবনাথ হুঙ্কার দিলেন: কারা ওখানে?

মাহিন্দারের চেঁচামেচি নয়—ভব-নাথের গলা তল্লাটের মধ্যে কে না জানে? লণ্ঠন পিছন দিকে নিয়ে ফুঁ দিয়ে চাকতে নিভিয়ে দিল। মানুষ চেনা গেল না—এক ছুটে তারা বিলের মধ্যে। রাত্রিবেলা বিলে নামা ঠিক হবে না। ভবনাথ সহাস্যে বললেন, আর আসবে না, মনের সুখে কুড়ো এবারে তুই।

মিছে বলেন নি ভবনাথ—সকলে তাঁকে ডরায়। কথা না শুনলে তিনি কোন ফ্যাসাদে ফেলবেন ঠিক কি। একেবারে কাছা-কাছি হাজির হয়ে মানুষগুলোকে চিনে নেবেন—সেই মতলবে আলো আনেন নি, আঁধারে আঁধারে এসেছেন। শিশুবর এবারে বাড়ী থেকে লণ্ঠন নিয়ে এলো। আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে ভবনাথ বলেন উঃ কী ঝড়টা হয়ে গেল! আম কি আর আছে গাছে, আসবে না কেন মানুষ?

নিমি ওদিকে দেবনাথকে ধরেছে: বাবা তো বাগের ঐ মুড়োয়। চলো কাকামশায়, এই তলাগুলোয় আমরা কুড়িয়ে আসি। বাবার আগেই ফিরে আসব টেরও পাবেন না তিনি।

দোনামোনা করছিলেন দেবনাথ—বাড়ীর উপর ভবনাথ সশরীরে হাজির, তার মধ্যে এত বড় দুঃসাহসিক কাজ উচিত হবে কিনা। হিরু এই সময়ে দেখা দিল। জবর খবর নিয়ে এসেছে, প্রত্যক্ষ পরিচয় খালুইতে—দুটো কই মাছ। শূন্য খালুই নিয়ে হাট ফেরতা ভবনাথের পিছু পিছু আসছিল, বাড়ীর হুড়কোর কাছে এসে মাথায় মতলব এলো: এই নতুন বৃষ্টিতে কই মাছ উঠতে পারে, কানা পুকুরটা এক-বার ঘুরে এলে হয়। ভবনাথকে কিছু বলল না। বৃষ্টির মধ্যে জলকাদা ঘাসবনের মধ্যে হা-পিত্যেস বসে থাকা—জলের মধ্যে মাছ খলখল করছে ভেবে সাপ এঁটে ধরাও বিচিত্র নয়, হয়েছিল তাই সেবারে—ভগবান-নাথের হাতে সাপে ঠুকে দিয়েছিল। ভবনাথ টের পেলে যেতে দিতেন না, তাঁর অজান্তে তাই সরে পড়েছিল। জুত হল না। দেখা গেল, একলা তার নয়—অনেক মাথাতেই মতলব এসছে। কানাপুকুরের গর্ভে হোগলাবনের এদিকে-সেদিকে বিস্তর ছায়া-মূর্তি। গণ্ডগোল করে মাটি করল—কারোই তেমন কিছু হল না, হিরণ্ময়ের ভাগ্যে তবু যা হোক দুটো জুটেছে—একেবারে বেকুব হতে হয়নি।

খালুই থেকে ঢেলে মাছ দেখা হল। মনোরম বটে—কালো কুচ, লম্বায় বিগত-খানেক—হাটে বাজারে কালে-ভদ্রে এ জিনিস মেলে। হলে হবে কি, মাত্র দুটো। এত বড় সংসারে দুটো মাছ কার পাতেই বা দেওয়া যাবে!

হিরণ্ময় বলে দিল, একটা তো কাকার। আর একটা কেটে দু খণ্ড করে আধখানা বাড়ির ছোট ছেলে কমলবাবুকে, বাকি আধ-খানা পরের মেয়ে বড়দিদিকে—

অলকার দিকে চেয়ে হাসল সে মুখ-টিপে

দেবনাথ রোখ ধর : চল দিকি?

কোথায়?

কানাপুকুরটা ঘুরে আসি একবার—

হিরু অবাক হয়ে বলে, বৃষ্টি মাথায় করে জল-কাদা-জঙ্গলের মধ্যে হা-পিত্যেশ দাঁড়িয়ে থাকা—বড্ড কষ্ট কাকা, আপনি পারবেন না।

না, পারব না: আমি যেন করি নি কখনো!

নেমে পড়েছেন রোয়াক থেকে। বললেন, খালুইতে হবে না—বস্তা নিয়ে আয় একটা। কানকো ঠেলে মাছ উঠতে থাকে—ধরতে গিয়ে হুঁশ থাকে না তখন, খালুই উল্টে পড়তে পারে। বস্তার মধ্যে ফেলে দিলে নিশ্চিন্ত।

আর এক কালের পুরনো দিন সব মনে পড়ছে। তখন দাদা—ঐ ভবনাথকে সঙ্গে নিয়েই কত হুল্লোড়পনা করেছেন। সঙ্গী ছিলেন সীতানাথ, ইন্দির, জিতে ভেজালে বিপুর—আরও কত, নাম মনে পড়ছে না। বয়স হয়ে ঠাণ্ডা মেরে গেছেন এখন তাঁরা মরেও গেছেন কতজনা।

কাকামশায় উঠানে দাঁড়িয়ে—না গিয়ে উপায় নেই অতএব। তাড়াতাড়ি হিরণ্ময় সরঞ্জাম সংগ্রহ করে আনল। হিংকসের হেরিকেন একটা এবারে কলকাতা থেকে এনেছেন, তল্লাটে নতুন জিনিস। সেটা নিয়ে নিল। ছাতা এনেছে, বস্তা তো আছেই। যেতে যেতে হিরু আবার একবার শুনিয়ে

দেয় ঃ মিছে যাওয়া কাকামশায়। আজ আর হবে না, যা হবার হয়ে গেছে। হবার হলে আমিই কি মাগুর দুটো নিয়ে ফিরতাম?

দেবনাথ অন্য কথা তুললেন ঃ ছাতা-আলো নিয়ে তোরা কই মাছ ধরিস নাকি? তবে একটা পিঁড়ি নিলি নে কেন? পিঁড়ি পেতে বরপাত্তোর হয়ে বসতিস।

ঝোপজংগল খানাখন্দ অন্ধকার, মাথার উপর ফোটা ফোটা জল পড়ছে—আলো ছাতা ছাড়া আপনিই তো পেরে উঠবেন না কাকামশায়।

টুরে-শাখাসংকুল বিশাল মহীরুহ, একেবারে কানাপুকুরের উপরে। ছোট ছোট আম, মধুর মতন মিষ্টি এমন ফলন ফলেছে পাতা দেখার জো নেই। নরম বোঁটা, দিবারাত্রি পড়ছে তো পড়ছেই। আম পড়ে পুকুরের খোলে—এক ফোঁটা জল ছিল না, মাটি ঠনঠন করছিল সারাদিন আজও ছেলেপুলে ছুটোছুটি করে আম কুড়িয়েছে। সেই আমতলায় এখন জল দাঁড়িয়ে গেছে দস্তুরমতো—বৃষ্টির জল, তার উপর বিলের জল রাস্তার পগার দিয়ে এসে পড়ে। কই মাছ হিরু এইখানটায় ধরেছে।

অতএব ছাতা বন্ধ করে নরম মাটিতে ছাতার মাথা পুঁতে দেওয়া হল, হেরিকেনের জোর কমিয়ে নিভু-নিভু করা হল। খুড়ো-ভাইপো জলের উপর হাঁটু গেড়ে বসলেন—বসে অপেক্ষায় আছেন। পগারের জল ঝিরঝির করে পড়ছে এখনো। হঠাৎ কোনো এক সময় উজান কেটে দাম-চাপা দশা থেকে মুক্তি নিয়ে উল্লাসে ডাঙায় উঠতে যাবে মাছ, মাথা চেপে ধরে অমনি বস্তার মধ্যে ফেলবেন। কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়তো হাত, ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। ছাড়া পেয়ে মাছ দামের ভিতর যদি ফিরে যেতে পায়, তাহা সর্বনাশ। বলে দেবে সংগীসাথী ইয়ার-বন্ধুদের, তারপরে একটাও আর বেরুবে না। হাতেনাতে বহুক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা, কইমাছ ধরার কাজে তাই আনাড়ি লোক আনতে নেই। সেই কাণ্ড আজও হয়েছে, দামের তলে চাউর হয়ে গেছে মানুষ ওৎ পেতে রয়েছে ধরবার জন্য। আজকে মাছ আর বেরুবে না।

হিরু বলল, কতক্ষণ আর বসবেন কাকা, উঠে পড়ুন। আর একদিন দেখা যাবে।

এদিক সেদিক আরও কিছু ঘোরাঘুরি করে খুড়ো-ভাইপো বাড়ি ফিরে এলেন। তাহা বেকুব জলে ভেজা আর কাদা মাখাই সার হল শুধু।

আম কুড়িয়ে শিশুবর ধামার পর ধামা এনে দরদালানে ঢালছে। লণ্ঠন হাতে ভবনাথ বাগের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেন। দেবনাথ বললেন, উঃ, কত আম! অর্ধেক মেজে ভরে গেল আর কত আনবি রে। শিশুবর বলে, ত' আছে ছোটবাবু। আজ পয়লা দিনেই গাছ মুড়িয়ে শেষ করে দিয়ে গেছে।

পাকা আম, ডাঁসা আম, একেবারে ফুলো আমও আছে। মেজেয় পাতিয়ে দিচ্ছে বাতাস পেয়ে তাড়াতাড়ি পচে উঠবে না।

হিরুকে দেবনাথ বললেন তুই গিয়ে দাঁড়া একটু। দাদা চলে আসুন। হয়েও এসেছে প্রায়, আর কতক্ষণ!

কালবৈশাখী এই প্রথম এবছর। খাওয়া-দাওয়ার রাত্রে আকাশ পরিষ্কার, বৃষ্টি-বাদলার চিহ্নমাত্র নেই। আকাশে তারা। সোনাখড়ি যেন চান করে উঠেছে বৃষ্টি-ধোওয়া পাতালতা ঝিকঝিক করছে তারার আলোয়। ব্যাঙেরা গ্যাঙর-গ্যাং গ্যাঙর-গ্যাং করে তোলপাড় তুলেছে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, জল পড়ার সামান্য শব্দ এদিকে সেদিকে। রান্নাঘরের দাওয়ায় ঢপাঢপ পিঁড়ি পড়ছে অর্থাৎ খেতে এসো সব এবারে। এদিকে আর ওদিকে কাঠের দেলকোর উপর দুটো টেমি ধরিয়ে দিয়েছে—এসো সব এবারে। বিনো আর অলকা-বউ ভাতের থালা এনে এনে রাখছে।

সুপাকা আম যাকে বলে, তা বড় নেই এই আমের গাদার মধ্যে। ভাল গাছের দুটো পাঁচটা বেছে ছেলেপুলের হাতে দেওয়া হল। মিষ্টি নয় পানসা কিম্বা হাড়ে-টক। সেগুলো একেবারে কাঁচা, বঁটিতে সরু সরু ফালি কেটে পাটির উপর মেলে দেওয়া হল—শুকিয়ে আমসি হবে। কাঁচা আমের আমসি ভাল এ আমে সুবিধে হয় না। কিন্তু উপায় কি; আম ফেলে দেওয়া যাবে না তো। ডাঁসা আম জাক দিয়ে রাখা হল, পাকবে না—শুঁটকো হয়ে নরম হোক, কিছু আমসত্ত্বে মিশাল দেওয়া যাবে, বাকি সমস্ত গরুর জাবনায়।

পরের দিন উমাসুন্দরী আমসত্ত্বের তোড়জোড় করে বসলেন। কাজটা বরাবর তিনিই করে আসছেন, প্রধান কারিগর তিনি, তরঙ্গিণী সাথে সঙ্গে আছেন। অলকা-বউকে তরঙ্গিণী ডাকাডাকি করছেন ঃ ইদিকে এসো বউমা, লেগে পড়ে যাও। হেঁসেলে বিনো থাকুক, আম ছেঁচে দিয়ে আমি যাচ্ছি তারপরে।

অলকার দ্বিধা ঃ আমি কি পেরে উঠব ছোটমা, চাকলা কেটে দিয়ে যাচ্ছি বরং।

চাকলা কাটবে, ছেঁচবে ছেঁকবে, গোলা লেপবে—সমস্ত করবে তুমি। জেদ ধরছেন তরঙ্গিণী ঃ আমিই বরঞ্চ রান্নাঘরে যাবো এখন। বলি শক্তটা কি আছে? দেখে-শুনে শিখে-পড়ে নাও। সংসার তোমাদের —চিরকাল বেঁচেবর্তে থেকে আমরা সব করে দেবো নাকি?

বঁটি পেতে তিন চাকলা করে আম কাটে। চাকলাগুলো ধামার মধ্যে ফেলে মুগুরের মাথা দিয়ে খুব একচোট পিশে নেয়, হামানদিস্তায় পান ছেঁচার মতো। পরিমাণ অত্যধিক হলে ঢেঁকিতেও কোটে। পাতলা কাপড়ে গোলা ছেঁকে নেয় তারপর। নরম হাতে আস্তে আস্তে ছেঁকতে হবে, জোর জবরদস্তিতে কাপড় ছিঁড়ে যাবে, গোলা ভাল উতরাবে না। চিনি একটু মিশালে মিঠা বাড়ে, চুন একটু মিশালে রং খোলে। বড়গিন্নির এতে ঘোরতর আপত্তি—খাঁটি আমসত্ত্বের স্বাদ মিশাল জিনিসে মিলবে না। গোলা তৈরি হল। বারকোশ, পিঁড়ি, খেজুর পাতার পাটি আর আছে পাথুরে ছাঁচ—পাথরের উপর রকমারি খোদাই ঃ মাছ পাখি পরী কলকা ফুল লতাপাতা উল্টো করে লেখা 'জলখাবার' 'আবার খাবো' ইত্যাদি। একগাদা এমনি ছাঁচ সেকালে ভবনাথের মা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন—বাসনের বাকসে দশ রকম বাসনের সঙ্গে থাকে, দরকারে বেরোয়। যেমন এই আমসত্ত্ব দেবার জন্য বেরিয়েছে, আবার জামাইষষ্ঠীর সময় ক্ষীরের ছাঁচ তৈরির কাজে বেরুবে। আমের গোলা নানান পাত্রে লাগিয়ে শুকোতে দিল শুকোলে আবার গোলা লাগাবে তার উপর। ছেলেপুলেরা পাহারায় আছে কাকে না ঠোকর দেয়। আজ হয়ে গেল, গোলা কাল আবার লাগাবে, বারম্বার লাগাবে। সম্পূর্ণ শুকোলে ছুরি দিয়ে কিনারা কেটে আমসত্ত্ব তুলে ফেলবে। ছেলেপুলের মজা তখন, তারা ঘিরে এসে বসল। পাহারা দিয়েছে এইবারে পারিশ্রমিক—ছাঁচের ছোট ছোট কয়েকটা আমসত্ত্ব বিলি হবে। হাত ধাড়িয়ে কমল নাচন দিল ঃ মাছ-খানা আমার। পুঁটি বলে আমার তবে পাখি।

তরঙ্গিণী নিমিকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুই কি নিবি রে?

আমার লাগবে না কাকিমা।

আদিকালের বাদামবুড়ি হয়ে গেছিস, তোর কিছু লাগে না। বড় এই কলকাথানা দিয়ে দিই কেমন?

নিমি বলল, ছাড়বে না তো ছোট দেখে যা-হোক একখানা দিয়ে দাও। আমার পছন্দ-অপছন্দ নেই।

পরে শোনা গেল, সে আমসত্ত্বটুকুও ছিঁড়ে সে কমল পটুর মাঝে ভাগ করে দিয়েছে। এমনিই হয়েছে নিমি আজকাল—সবকর্মে নিস্পৃহ ভাব।

আমসত্ত্ব দেওয়া চলল এখন—শুকিয়ে সযত্নে ভাঁজ করে তোলো—বোকাই সবদালে তুলে রাখবে। আম যতদিন আছে, চলবে আমসত্ত্ব দেওয়ার কাজ। বর্ষায় স্যাঁতসেঁতে হবে, খবর পেলে রোদে মেলে দেবে। আম তো এই কটা দিনের—আমসত্ত্ব বারোমাস দুধের সঙ্গে খাবে, মাঝে মাঝে অম্বল রাঁধবে।

আমে আমে ছয়লাপ, উমাসুন্দরী একটি মুখে দেন না। আম উৎসর্গ না হওয়া অবধি উপায় নেই। ইষ্টদেবতা ও পিতৃপুরুষের নামে আম-দুধ নিবেদন হবে—আগে তাঁদের ভোগ তার পরে নিজের। যে কাজে পুরুত ও দিনক্ষণ লাগবে, নারায়ণ-শিলা আসবেন ভদ্রাকুলবর্তী সেই বড়েঙ্গা গ্রাম থেকে। পুরুত শরৎ চক্রবর্তীর বাড়ি সেখানে।

তরঙ্গিণী ব্যস্ত হয়ে উঠছেন। হিরুকে বলেন, ঠাকুরমশায়ের বাড়ী চলে যাও তুমি। সকলে খাচ্ছে, দিদিই কেবল খাবেন না, এ কেমন কথা।

হিরুর সঙ্গে শরৎঠাকুরের নাকি হাটে দেখা হয়েছিল। কথাটা বলেছিল সে তখন।

শরৎ বললেন, নারায়ণ নিয়ে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এক বাড়ীর সামান্য ঐ কাজটুকুর জন্য অত হাঙ্গামা পোষায় না।

হাঙ্গামা বিস্তর বটে। পাকা তিন ক্রোশ পথ খেয়া-পার আছে তার মধ্যে একটা। নারায়ণ সঙ্গে থাকলে সারাক্ষণ নির্বাক হয়ে যেতে হয়, খুন করে ফেললেও টুঁ-শব্দটি বেরুবে না—কথা বলতে গিয়ে থুতুর কণিকা অজ্ঞাতে ছিটকে পড়তে পারে। পথের কোনখানে নারায়ণ-শিলা নামানোরও জো নেই—অশুচি সংস্পর্শের শঙ্কা। তা তাড়াহুড়ো কিসের, আম তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না এর মধ্যে।

পুরুত বলে দিয়েছেন, অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন দত্তবাড়ী ব্রত প্রতিষ্ঠা আছে, এক সঙ্গে সব কাজ সেরে দিয়ে যাবেন সেইদিন।

(৬)

বৈশাখের বিশে পার হয়ে গেল। ভূপতি ধায়ের মেয়ের বিয়ে চুকে গেছে। মুক্তোঠাকরুন এসে পড়বেন এইবার। কাল নয়তো পরশু। কিম্বা তার পরের দিন—তার ওদিকে কিছুতে নয়। ফটিকের কাছে আন্দাজ সেই রকম বলেছিলেন।

ঠাকরুন আসছেন, সাড়া পড়ে গেছে। পটুটি কমলকে ভয় দেখায়ঃ রাগ হল তো ভূয়ে আছাড় খেয়ে পড়িস তুই। পিসিমা এসে দেখিস কি করেন।

পটুর দিকে বিনো অমনি করকর করে ওঠেঃ তোর কি করবেন পিসিমা সেটা ভাবিস? বাড়ী তো এক জহমা দাঁড়াস নে, পাড়ায় টহল দিয়ে বেড়াস। আর এখন হয়েছে তলায় তলায়—

অলকা-বউকেও বিনো শাসানি দিচ্ছেঃ তোমার মাথার কাপড় ঘন ঘন পড়ে যায় বউদি। বউ নও তুমি যেন, পুববাড়ীর মেয়ে। পিসিমা আসছেন, হুঁশ থাকে যেন। বলছি কি, ঘোমটার কাপড় সেফটিপিন দিয়ে চুলের সঙ্গে সেঁটে রেখো—পড়ে যেতে পারবে না।

তরঙ্গিণী নিমিকে বলছেন, পাগলীর মতন অমন ছন্নছাড়া বেশে ঘুরবিনে তুই। দৃষ্টিকটু লাগে। সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে সিঁদুর ফোঁটা, পায়ে আলতা পরে ভব্যসভ্য হয়ে থাকবি—নয়তো বকুনি খেয়ে মরবি ঠাকুরঝির কাছে।

পাড়ার মধ্যেও মুক্তোঠাকরুনের কথা। ভালোর ভালো তিনি কিন্তু বেচাল দেখলে রক্ষে রাখবেন না। এ হল আপনজন ঐ মানুষটা আমার পর—এসব ঠাকরুনের কাছে নেই।

দেড় প্রহর বেলা। উত্তর-বাড়ির অক্ষয় এসে খবর দিল আসছেন পিসিমা। হাটখোলার দীঘির পাড়ের উপর আতাগাছ কাঁঠাল(?) গরুর-গাড়ি দেখতে পেলাম। ভাবলাম যাই—খবরটা বলে আসিগে।

এত পথ ছুটতে ছুটতে এসেছে হাঁপাচ্ছে সে। দেবনাথ বললেন, রাস্তাপথে গাড়ি তো কতই আসে যায়—

অক্ষয় বলে—পিসিমার গাড়ি দু-রশি দূর থেকে চেনা যায়—চলনই আলাদা। মালপত্রঠাসা—চিকির-চিকির করে আসছে। এত মাল যে গাড়োয়ানের জায়গা হয়নি হেঁটে হেঁটে সে আসছে। পিসিই গাড়োয়ান হয়ে ডায়-ডায় করে গরু তাড়াচ্ছেন। হরিতলার কাছাকাছি এসে পড়লেন এতক্ষণে।

খবর দিয়েই অক্ষয় ছুটল দীঘির পাড়ের গাছ কাটা শেষ করতে। ব্যাটবল খেলায় একটা ব্যাটের প্রয়োজন পড়েছে আতা গাছের গুঁড়িতে ভালো ব্যাট হয়।

বট-অশ্বত্থের জোড়াগাছ— হরিতলা। সেকালে অনেক কাল আগে পথিকের ছায়াদানের জন্য পুণ্যার্থী কেউ তিন রাস্তার মাথায় দুই গাছ একত্র রোপণ করে বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই হরিতলা থেকেই সোনাখড়ির আরম্ভ বলা যায়। বহুদীর্ঘ প্রায় সমান আকৃতির দুই প্রকাণ্ড ডাল দু-দিকে—স্তম্ভের মতো বিশাল দুটো বোঁটা দুই পাশে মাটিতে নেমে গেছে তার উপরে ডালের ভর। নতুন পথিক দেবস্থান বলে যে জানে না সেও থমকে দাঁড়াবে এইখানটা এসে—মহাবক্ষে দীর্ঘ দুই বাহু প্রসারিত মেলে দুটো দিক আগলে করে যেন গ্রাম রক্ষা করছেন। নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন জায়গাটা—চলতে চলতে আচমকা যেন ছাতের নিচে এসে পড়েছি মনে হবে। তাড়া নেই পাক পালকি গরুরগাড়ি পথচারী মানুষ হরিতলায় একটুকু না জিরিয়ে — না মাথা নুইয়ে বিড়বিড় করে হরিঠাকুরকে মনের কথা জানিয়ে যাবে।

দেবনাথ দিদিকে এগিয়ে আনতে চললেন। শহরে থাকার দরুন তল্লাটে একটু বিশেষ খাতির—অতএব গেঞ্জিটা গায়ে চড়িয়ে চটি জোড়া পায়ে ঢুকিয়ে নিতে হল। হরিতলায় এসে পড়লেন—কাকসা পরিবেদনা। ভবনাথ কোন কাজে কোথায় ছিলেন—শুনতে পেয়ে তিনিও চলে এসেছেন। হাটখোলার পথ ধরে চললেন দু-ভাই পাশাপাশি। হ্যাঁ কুশডাঙার গাড়িই বটে অক্ষয় ভুল দেখে নি।

মুক্তকেশী চুক্‌চুক্‌ আওয়াজ করে গরু থামাবার চেষ্টা করছেন। গরু আমল দেয় না। গাড়োয়ানকে ডাক দিলেনঃ এগিয়ে আয় রে নিতাই গাড়ি ধর নামব।

নিতাই এতক্ষণে গাড়ির মাথায় চড়েছে—তিন ভাই-বোনে হেঁটে যাচ্ছেন। পথের উপরই প্রণামাদি। দেবনাথ মুক্তকেশীর পদধূলি নিলেন মুক্তকেশী ভবনাথের। তারপর কে কেমন আছে—নাম ধরে ধরে জিজ্ঞাসা। বাড়ির হয়ে গেল তো পাড়ার সকলের। তারপর গ্রামের। গাড়ির দিকে চেয়ে দেবনাথ একবার অবাক হয়ে বললেন—করেছ কি ও দিদি গোটা কুশডাঙা গাড়ি বোঝাই দিয়ে এনেছ।

(ক্রমশঃ)

পুনশ্চ

নদীয়া জেলার অন্তর্গত (বর্তমানে বর্ধমান) পূর্বস্থলী গ্রামের নিকটবর্তী চুপী গ্রামের দত্তবংশে ১২২৭ সালের শ্রাবণ মাসে প্রসিদ্ধ লেখক এবং বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার পথপ্রদর্শক অক্ষয়কুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খ্যাতিমান কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর পিতামহ ছিলেন। অল্পবয়সেই অক্ষয়কুমার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁরই উদ্যোগে কলকাতায় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হলে অক্ষয়কুমার সেখানে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তাঁর সম্পাদিত প্রভাকর পত্রিকায় অক্ষয়কুমারের সর্বপ্রথম রচনা প্রকাশিত হয়।

১৭৬৫ শকে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশিত হলে তিনি প্রায় বার বৎসর উক্ত পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। সেই সময়েই তাঁর বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হতে থাকে এবং ক্রমশই তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক ও লেখক হিসাবে সর্বত্র সমাদৃত হতে থাকেন।

তাঁর রচিত বিশেষ গ্রন্থসমূহের কথা বিচার করলে, প্রথমেই 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামক দুই খণ্ড মূল্যবান গবেষণা-পূর্ণ গ্রন্থের কথা মনে পড়ে। এতদ্ব্যতীত প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুলের শিক্ষকতা অবস্থায় 'ভূগোল' ও ১৭৭৩ শকের মাঘ মাসে 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ' নামক বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের ১ম ভাগ এবং ঠিক তার এক বৎসর পরে ২য় ভাগ, এবং সেই বৎসরেরই শ্রাবণ মাসে তৎকালীয় তথ্যবহুল শিক্ষাপ্রদ পাঠ্যপুস্তক 'চারুপাঠ' ১ম ভাগের প্রকাশ ঘটে। এই চারুপাঠেরই আরও দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৭৬ শকাব্দে। অক্ষয়কুমারের সহজ ও সরস বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ 'পদার্থবিদ্যা' ১৭৭৮ শকে এবং ১৭৭৯-এর মাঘ মাসে 'ধর্মনীতি' আত্মপ্রকাশ করে। এই 'ধর্মনীতি' গ্রন্থের মধ্যে প্রজ্ঞার পরিচয় বিদ্বজ্জনকে বিমুগ্ধ করলেও, তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থ খণ্ডদ্বয়ের তুলনা হয় না। ১৭৯২ শকে এই গ্রন্থের ১ম ভাগ এবং ১৮০৪ শকের চৈত্র মাসে ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়। ২য় ভাগ যখন রচিত হয়, তখন অক্ষয়কুমারের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। সে কারণ, ২য় খণ্ডের উপক্রমণিকায় তিনি অত্যন্ত দুঃখ করে লিখেছিলেন,—

"কোথায় বা প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞান বিশেষের বিশেষরূপ অনুশীলনপূর্ব্বক তদ্বিষয়ক অভিনব তত্ত্বানুসন্ধান চেষ্টা, কোথায় বা ভূমণ্ডল অথবা তদীয় ভূরি-ভাগ সন্দর্শন-বাসনায় এক একবারে বহুবিধ বর্ব্বর-নিবাস, সুপ্রাচীন যাদবকীর্ত্তি এবং অপূর্ব্ব নৈসর্গিক সামগ্রী ও অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপারাদি-বিশিষ্ট বিস্তৃত-ভূখণ্ড পরিভ্রমণ, কোথায় বা আপনাদের শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকৃতির যুগপৎ সমুন্নতি-সাধন ব্রতেব্রতী স্বদেশীয় সম্প্রদায়-বিশেষ প্রবর্ত্তনের অভিলাষ এবং কোথায় বা বিজ্ঞান, দর্শন ও ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থপ্রণয়ন ও স্বদেশ সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার হিতানুষ্ঠান কামনা রহিল। সকলই বাষ্পীভূত হইয়া গেল। সকল বাসনাই নির্ম্মূল হইল। অচিরেই আঘাত ঘটিল।"

উক্ত ২য় খণ্ড প্রাচীন ষড়দর্শনের সমূহ বিষয় ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে শাক্ত সৌর গাণপত্য, শৈব ও পরিশিষ্ট সহ বিরাট গ্রন্থে এমন সব ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের পরিচয় পাওয়া যায়, যা সচরাচর অন্যত্র কোন গ্রন্থে একত্রে দৃষ্টিগোচর হয় না। এই খণ্ডের 'সম্প্রদায় বিবরণ' অংশ থেকে 'নাগা' সম্বন্ধীয় অংশটি সাধারণের অবগতির জন্য এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম।

।। নাগা ।।

যে সমস্ত সন্ন্যাসী মস্তকের জটাগুলি রজ্জুর ন্যায় পাক দিয়া উষ্ণীষের মত বদ্ধ করিয়া রাখে *, তাহারাই নাগা। নঙ্গা শব্দের অর্থ উলঙ্গ। ইহারা সচরাচর বিবস্ত্র থাকে বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে নাগা বলে। এক্ষণে রাজ-শাসনের ভয়ে সর্ব্বত্র উলঙ্গ থাকিতে পায় না; একরূপ কৌপীন ধারণ ও অন্য অন্য প্রকার বস্ত্র পরিধান করে, ঐ কৌপীনের নাম নাগফণী।

অপরাপর সন্ন্যাসীদের ডোর ও কৌপীন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র; ইহাদের ঐ এক নাগফণীতেই উভয়ের কার্য্য সম্পন্ন হয়।

ইহারা বিভূতির উপাসক। বিভূতি-রাশিকে একত্রীভূত করিয়া জমাইয়া রাখে, এবং গিরিমৃত্তিকায় চিত্রিত ও চন্দনাদি দ্বারা বিলেপিত করিয়া থাকে। এইরূপে প্রস্তুত করা বিভূতি-পুঞ্জকে গোলা বলে। ভিন্ন ভিন্ন আখড়ার ভিন্ন ভিন্ন রূপ গোলা; নিরঞ্জনী আখড়ায় গোলা অর্থাৎ চক্রাকার ও নির্ব্বাণী আখাড়ার চতুষ্কোণ। ইহারা প্রতিদিন পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা উহার অর্চনা করে ও উহার হস্তে লইয়া মঠ-ধারী প্রভৃতির নিকটে ভিক্ষা করিয়া থাকে। যিনি যে কিছু মুদ্রা ভিক্ষা দেন, তাহা ঐ বিভূতি-গোলার উপরেই গ্রহণ করে(১)।

নাগারা নিজে শিষ্য করে না; যাহারা অনত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে আসিয়া ইহাদের দলভুক্ত হয়। এই রূপেই ইহাদের প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। ইহাদিগের দীক্ষাগুরুর আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া নাগা-দল প্রবেশ করিতে হয়, এই নিমিত্ত এই ব্যাপারটিকে গুরু-পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেব-পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকে। ঐ সময়ে ইহারা কতকগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নানাবিধ কঠোর ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। পূর্ব্বকার গুরু-দত্ত কৌপীন পরিত্যাগ করিয়া একেবারে বিবস্ত্র হইয়া থাকে; এমন কি, এক খাই সূতা পর্যন্ত শরীরে ধারণ করিতে পায় না। এই অবস্থায় প্রান্তরে অথবা তাদৃশ আশ্রয়শূন্য স্থানে এক মাস পর্যন্ত অবস্থিতি করে; গৃহ-মধ্যে কদাচ অধিবাস করিতে পারে না। প্রগাঢ় শীতের সময় হইলেও, ইহার অন্যথাচরণ করিবার সম্ভাবনা নাই।

সন্ন্যাসীদিগকে নাগা-দলভুক্ত করিবার সময়ে নাগা মহন্তের বিস্তর ব্যয় হয়, এই নিমিত্ত তিনি একেবারে বহু-সংখ্যক ব্যক্তিকে ঐ দলে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ইহারা অত্যন্ত উগ্র-শীল ও কলহ-প্রিয়। পূর্ব্বে ইহাদের উপদ্রবে লোকে অস্থির হইত; এক্ষণে রাজশাসন দ্বারা তাহার অনেক নিবারণ হইয়াছে। কবীর নিজ গ্রন্থে নাগাদির প্রতি যে সমস্ত পশ্চাল্লিখিত ভর্ৎসনাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতেই ইহাদের দুঃশীলতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

"ভাই হে! আমি এরূপ যোগী কোনকালে দেখি নাই যে, নিজের ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া বৃথা পর্যটন করিয়া বেড়ায়। মুখে বলেন, আমি শিব-ভক্ত ও প্রধান গুরু, কিন্তু হট্ট-ভূমি তাঁহার যোগসাধনের স্থান। মায়া ভণ্ড তপস্বীর দেবতা। কোনকালে দত্তাত্রেয় গৃহ নষ্ট করিয়াছিলেন? কোন্ কালে নারদ মুনি বন্দুক ব্যবহার করিয়াছিলেন? কোন কালেই বা শুকদেব সশস্ত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন? কোন্ কালেই বা ব্যাসদেব তূরী-যন্ত্র বাদন করিয়াছিলেন। যুদ্ধেতে ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়। যিনি ধনুকধারী, তিনি কি প্রকার অতীৎ? (সন্ন্যাসীরা সচরাচর আপনাদিগকে 'অতীৎ' বলিয়া উল্লেখ করে। ইহার অর্থ অতিথি বোধ হয়।) যাঁহার লোভ আছে, তিনি কি প্রকারে বিরক্ত? কি লজ্জার বিষয়! তিনি স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করেন। তিনি অশ্বসকল সংগ্রহ করিয়াছেন, গ্রাম সমুদায় অধিকার করিয়াছেন ও ধনী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। সুন্দরী স্ত্রী কদাচ সনক ও তাঁহার ভ্রাতাদিগের ভূষণ ছিল না। দুগ্ধেতে মসীপাত্র থাকিলে সে মসীতে সহজেই বস্ত্র মলিন হয়। (অর্থাৎ রেমৈনি)

নাগাদের উদ্ধত স্বভাব ও বিশেষতঃ বৈষ্ণবদিগের সহিত ইহাদের বিষম বিসংবাদিতা সুপ্রসিদ্ধ আছে। হরিদ্বারে মধ্যে মধ্যে কুম্ভমেলা নামে একটি মেলা হয়, তাহাতে গঙ্গাস্নান উদ্দেশে বহু

---

* জটা তিন প্রকার। নাগজটা, শম্ভুজটা ও বাবরান জটা। নাগারা যেরূপ রজ্জুর মত পাকান জটা ধারণ করে, তাহার নাম নাগজটা। যে জটা ঐরূপ পাকান নয়, তাহাকে শম্ভুজটা বলে। শম্ভুজটা ছোট হইলে বাবরান্ বলিয়া উল্লিখিত হয়।

১। ইহারা ঐ বিভূতি-গোলার উপর রজত-মুদ্রা ভিন্ন অপর নিকৃষ্টতর মুদ্রা গ্রহণ করে না, এইরূপে ব্যক্ত করিয়া থাকে।

লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে শৈব নাগাদিগের সহিত বৈরাগীদিগের বিবাদ উপস্থিত হইয়া এক এক বারে সহস্র সহস্র মনুষ্য মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। পারসীক ভাষার প্রণীত দাবিস্তান নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত আছে, ১০৫০ এক হাজার পঞ্চাশ হিজরা শকে হরিদ্বারে মুণ্ডিদের (বৈরাগীদের) সহিত সন্ন্যাসিদিগের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতে সন্ন্যাসীরা জয়লাভ করিয়া বহুসংখ্যক মুণ্ডির প্রাণবধ করে। মুণ্ডিরা প্রাণভয়ে তুলসী-মালা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ণফুট যোগীদিগের ন্যায় কর্ণযুগলে কুণ্ডল ধারণ করে। ঐ দাবিস্তানের দ্বিতীয় ভাগের দ্বাদশ অধ্যায় জেলালি ও মদারি নামক দুই মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত সন্ন্যাসীদিগের যুদ্ধ-ঘটনার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতেও সন্ন্যাসীরা জয়প্রাপ্ত হইয়া জলালি ও মদারি-দিগের (২) মধ্যে সাতশত ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট করে ও তাহাদের পুত্রদিগকে শৈব-ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়। ১৭২৯ বা ৩০ শকে হরিদ্বারে ঐরূপ একটি যুদ্ধ হইয়া যায়, তাহাতেও যুদ্ধজয়ী শৈব সন্ন্যাসীরা ১৮০০ বৈরাগীকে রণ-ভূমিতে নিপাত করে।

---

২ মদারিসম্প্রদায়ী লোকে জটা-ধারণ, ভস্মালেপন, অগ্নি-সেবন ও প্রচুর পরিমাণে সিদ্ধিদা পান করিত এবং তন্মধ্যে প্রধান সাধকেরা একেবারে বিবস্ত্র থাকিত। জলালিরাও সেইরূপ অনুষ্ঠান করিত; কেবল জটাধারণ করিত না। কিন্তু এই উভয় সম্প্রদায়েই গোবধে নিবৃত্ত হয় নাই। জেলালি-সম্প্রদায়ী গুরুদের একটি কুৎসিত ব্যবহার ছিল যে, তাহারা শিষ্যদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে কোন কুলস্ত্রীর সহিত সহবাস করিত এবং সময়ে সময়ে নিজ গৃহে আনয়ন করিয়া রাখিত।

১৭১৭ শকে ঐ হরিদ্বারে তীর্থস্নান উপলক্ষে শাক, সন্ন্যাসী ও বৈরাগী এই তিন সম্প্রদায়ে একটি ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতে অশ্বারূঢ় শাক-সম্প্রদায়ীরা অপর দুই দলস্থ সমস্ত শত্রুকে পরাস্ত করিয়া বহু ব্যক্তিকে রণক্ষেত্রে বিনাশ করে, এবং অবশিষ্ট সকলকে বন, পর্ব্বত ও নদীতে তাড়িত করিয়া দেয়।

হিন্দু রাজারা (পূর্ব্বে) ইহাদিগকে এইরূপ উগ্র-শীল ও কলহপ্রিয় দেখিয়া অনেকদিন অবধি সেনা-পদে নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছেন।...

নির্ব্বাণী ও নিরঞ্জনী আখাড়ার নাগাই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিয়াছি, পশ্চিমোত্তর প্রদেশের কোন কোন স্থানে অটল আখড়ার নাগা বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহাদিগের সহিত আমার সাক্ষাৎকার ঘটে নাই।

সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে যেমন উল্লিখিত রূপ বৃত্তি-বিশেষ অবলম্বন করিয়া নাগা নামে খ্যাত হয়, সেইরূপ অন্যে আবার অন্য অন্য বৃত্তি গ্রহণ করিয়া আলেখিয়া দণ্ডলী ঊর্দ্ধবাহু প্রভৃতি বিবিধ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

•

[গত সপ্তাহে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থাবলীর শোভন সংস্করণের অবশিষ্টাংশ]

শোভন সংস্করণ কাব্য-গ্রন্থাবলী।

উপহার দেবার অপূর্ব্ব সামগ্রী—কাব্য-রসিকের লোভনীয় বাসন্তী সম্পদ—

সর্ব্বোপরি বাঙ্গালার গ্রন্থশালার মুকুট-মণি

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত—

উপহারের বই

চয়নিকা ২৲

মনোমোহন বাঁধাই। ইহার মধ্যে কবির শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিই স্থান পাইয়াছে।

গীতাঞ্জলি ১৷৹

ইহার এক একটি কবিতা এক-একটি বহুমূল্য রত্ন-বিশেষ। বহু ভাষায় এই সকল কবিতার অনুবাদ হইয়াছে। কিন্তু অনুবাদে মূল কবিতার রসধারা তেমন হৃদয়গ্রাহিণী হয় নাই। এমন কবিতা বাংলাভাষার নিজস্ব।

গল্পের বই

নৌকাডুবি ১৷৹ চোখের বালি ১৲ গোরা ৩৲ গল্পগুচ্ছ ৫ খণ্ড ১ম ২য় ৩য় ও ৫ম খণ্ডের প্রত্যেকের মূল্য ১৲। চতুর্থ খণ্ডের মূল্য ১৷৹ গল্প সপ্তক ১৲ আটটি গল্প ৸৹ গল্প চারিটি ৷৶৹ রাজর্ষি ৸৹

কথা ও কাহিনী ৸৹

ছন্দে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও কাল্পনিক গল্পের বই। রসে, ছন্দে ভাবে সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়। অননুকরণীয় গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নাটরূপে নির্ব্বাচিত।

গান ৷৹

গানের নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে, ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

গান ও স্বরলিপি

গীতিপঞ্চাশিকা ২৲ কেতকী ১৲ শেফালি (শরৎকালের গানের স্বরলিপির বই) ১৲ কাব্য-গীতি ১৲ গীতবিথীকা ১৲ বৈতালিক ১৲ গীতলেখা ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ প্রত্যেক ১৲

রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম

অরূপরতন ৷৹

বাহির হইয়াছে। সর্ব্বজন প্রশংসিত রাজা নাটকখানি অভিনয়ো যোগী করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণে অনেক নূতন গান সংযোজিত হইয়াছে।'

—ক্ষপণক

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

ঠকে গেলেন। মেয়েটা মোটেই চুন্নী নয়, হত্যাকারীও নয়।

চোর রাতের পাহারাদার নিজেই। হত্যাকারীও সে নিজে। মানে, নিজেই নিজেকে খুন করে ফেলেছে টাকার বাণ্ডিল চুরী করার পরেই। কিন্তু খুন সে হত না। যদি রাতের পুলিশের ঘাড়ে কবিতার ভূত না চাপত!

প্ল্যানটা অনেক দিনের। আর্থার মলিং নিজেও দাগী আসামী। ম্যাগডা তারই মেয়ে।

ষড়যন্ত্র মত ম্যাগডা তালাক-দেওয়া ম্যাগডা গ্রেন সেজে বাড়ী নিয়েছিল ব্যাংক পাড়ায়। তারপর ছেনালী করে পটিয়ে ফেলেছিল গ্রীণকে। মেয়ের মুখেই স্ট্রংরুমের খবরাখবর সংগ্রহ করত আর্থার মলিং।

তারপরেই মণিকাঞ্চন যোগ ঘটল।

উড়ো চিঠি এল গ্রীণের নামে। চম্পট দেওয়ার আয়োজন করলেন গ্রীণ। সেই দিনই এক লাখ পাউণ্ড এসেছে স্ট্রংরুমে।

আর্থার মলিংয়ের কাছে নকল চাবিও ছিল। কিন্তু ড্রয়ারের চাবি দিয়েই স্ট্রংরুম খুলল। টাকার বাণ্ডিল এনে পুঁতে রাখল গোলাপ গাছের তলায়। ফিরে এল অফিসে। যেই দেখলে বার্নেট আসছে। ঝাঁ করে ফিরে গিয়ে হাত-পায়ে হাত-কড়া লাগিয়ে শুয়ে পড়ল ফুটো টিন-ভর্ত্তি ক্লোরোফর্মের তলায়।

জ্ঞান হারালো সঙ্গে সঙ্গে। হিসেব মত তখনি বার্নেটের এসে পড়ার কথা। প্রাণটা তাহলে বেঁচে যেত। কিন্তু তার মাথায় তখন কবিতা ভূত চেপেছে। ফুল ছিঁড়ে, কবিতা পাঠিয়ে ফিরে এল দশ মিনিট পরে। ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে।

কিন্তু ষড়যন্ত্রটা মিস্টার রীভার আঁচ করলেন কি করে?

ম্যাগডার বাড়ীর বাগানে নেতিয়ে-পড়া গোলাপগাছ দেখে। নিজের মনটাও ক্রিমিন্যালের মন তো। তাই তক্ষুনি মনে হয়েছে, মাঝরাতে এক কাঁড়ি টাকা গোলাপগাছের তলায় তাড়াতাড়ি পুঁততে গেলে হাতে কাঁটার আঁচড় তো লাগবেই।

পুলিশ যে রহস্যের সমাধান করতে না পেরে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল, সে

রহস্যের সমাধানও হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ! মৃত আর্থার মলিংয়ের হাতের তেলোর রক্তরেখাগুলো আর কিছুই নয়—গোলাপ কাঁটার রক্ত-সূত্র!

বিজ্ঞানের কথা

রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা ও ভবিষ্যতের নিরোগ পৃথিবী

আজকের দিনে মেডিকেল গবেষণার সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ ক্ষেত্র, সম্ভবত, ইমিউনোলজি—বাংলায় বলা যেতে পারে, অনাক্রম্যভবনবিদ্যা। জীবন্ত প্রাণীর শরীরে এমন একটা ক্ষমতা থাকে যার সাহায্যে সেই জীবন্ত প্রাণী তার শরীরে বাইরের কোনো কিছুর অনুপ্রবেশ থেকে নিজেকে রক্ষা করে। এই রক্ষাব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ অনুসন্ধান ও গবেষণা করার জন্য যে-বিজ্ঞান তারই নাম ইমিউনোলজি বা অনাক্রম্যভবনবিদ্যা।

সকলেই জানেন টীকা দিয়ে কতকগুলো রোগের আক্রমণ ঠেকানো চলে। আসলে কী করা হয়? যে বিশেষ রোগটিকে ঠেকাতে চাওয়া হচ্ছে তারই জীবাণু অতি সামান্য মাত্রায় শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া। তাহলেই সার্থক এক প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এমনিভাবে টীকা দিয়ে কলেরা বসন্ত প্লেগ টাইফয়েড ডিপথিরিয়া পোলিও হাম ইত্যাদি বহু রোগ দূর করা সম্ভব হয়েছে। চিকিৎসকরা উনিশ শতক থেকেই রোগ-প্রতিরোধের এই ব্যবস্থার কথা জানেন এবং কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগও করে আসছেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। অনাক্রম্যভবন ঠিক কি-ভাবে ঘটে এবং অন্যান্য প্রাণঘাতী রোগের বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করা যায় কিনা—এ-বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা এতদিন হয়নি।

কিন্তু এখনকার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। শরীরের অনাক্রম্যভবনের ব্যাপারটি বিজ্ঞানীরা এখন অনেক ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করছেন এবং তার ফলে বহুবিধ রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে তার কার্যকরী প্রয়োগের বিরাট এক সম্ভাবনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভবিষ্যদ্বাণী করাটা অবশ্যই বিপজ্জনক কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ-বক্তারা খুবই আশাবাদী। তাঁদের ধারণা, এই বিজ্ঞানের 'স্বর্ণফসল' অবশ্যই ফলবে, হয়তো সময় লাগতে পারে—এই মাত্র।

বিরাট যে সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে, তার তিনটি দিক—তিন রকমের সমস্যার সমাধান। সাবেকী সেই টীকাদান তো থাকছেই যার সাহায্যে কতকগুলো সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থা। উপরন্তু, (১) টিস্যুর অসংগতি দূর করার ব্যবস্থা (২) বাত কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে অনাক্রম্যভবনের সাহায্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা ও (৩) ক্যানসার রোগের নির্ধারণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা। একের শরীর থেকে অপরের শরীরে কোনো একটি অঙ্গ (যথা হৃৎপিণ্ড কিডনি ইত্যাদি) পুনঃস্থাপনের সাফল্য অনেকখানি এই বিজ্ঞানের ওপরে নির্ভরশীল। এমনিতে একের অঙ্গ অপরের শরীরে পুনঃস্থাপিত হওয়া মাত্রই বর্জিত হওয়া উচিত। অনাক্রম্যভবন শরীরের মধ্যে বাইরের কোনো কিছুর অস্তিত্ব সহ্য করে না। কিন্তু তাও করানো যায় যদি অনাক্রম্যভবনের প্রক্রিয়া কি-ভাবে ক্রিয়াশীল হয় সে-সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান থাকে।

*

অনাক্রম্যভবন নিয়ে অনুসন্ধানে আধুনিক পর্যায়টির শুরু ১৮৯০-এর দশকে। সে-সময়ে দুজনে জার্মান রসায়ন-বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর এবং ইংলণ্ড ফ্রান্স ও জার্মানির জীবাণু-শিকারীদের গোড়ার দিকের কাজ সম্পর্কে আরও গবেষণা চালাচ্ছিলেন। তাঁরা আবিষ্কার করলেন, আক্রমণকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে রাসায়নিক লড়াই যে চালায় তার অবস্থান রক্তেরই মধ্যে—সেটি হচ্ছে একটি প্রোটিন অণু। পরে দুটি নাম দেওয়া হয়েছে। আক্রমণকারী জীবাণুর নাম অ্যান্টিজেন, তার বিরুদ্ধে যে লড়াই চালায় তার নাম অ্যান্টিবডি।

এই দুটি শব্দ ভালো করে মনে রাখা দরকার। অ্যান্টিজেন বা আক্রমণকারী জীবাণু। আর অ্যান্টিবডি—আক্রমণকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে যে লড়াই করে।

মানুষের শরীরে কতরকমের বিভিন্ন অ্যান্টিবডি হতে পারে তার হিসেব এখনো পর্যন্ত কেউ করে উঠতে পারেনি। তবে বিজ্ঞানীরা এ-বিষয়ে নিশ্চিত যে অ্যান্টিবডির সংখ্যা হাজার হাজার বা এমনকি লক্ষ লক্ষ। আর বিশেষ একটি অ্যান্টিবডি বিশেষ একটি অ্যান্টিজেনকে খুঁজে বার করে তার বিরুদ্ধে লড়াই চালায় ও তাকে হত্যা করে। একমাত্র এই বিশেষ অ্যান্টিজেনকেই, একমাত্র তারই বিরুদ্ধে ও একমাত্র তাকে। যেমন ধরা যাক কলেরার জীবাণু শরীরে প্রবেশ করেছে। তখন তার মোকাবিলা করার জন্য বেরিয়ে আসে কলেরার অ্যান্টিবডি অন্য কোনো অ্যান্টি-

যুক্ত নয়। আর একবার মোকাবিলা হয়ে যাবার পরে সেই খবর সারা জীবনের মতো মজুদ থাকে এবং অতঃপর আর কোনো সময়েই এই শত্রুকে চিনতে ভুল হয় না।

অ্যান্টিবডির আণবিক গড়ন এবং কি-ভাবে এই অ্যান্টিবডি বিশেষ একটি জীবাণুর বিরুদ্ধে চালিত হতে পারে—তাই নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ল্যাবরেটরিতে ব্যাপক গবেষণা চলেছে।

ইতিমধ্যে আমেরিকার কয়েকজন ডাক্তার জনকয়েক বিশেষ রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে এবং কয়েকজন বিজ্ঞানী বিশেষ ধরনের মুরগির বাড়বৃদ্ধি ও রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে অনাক্রম্যভবন সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য আবিষ্কার করে বসলেন।

দেখা গেল, শরীরের অনাক্রম্যভবন নিয়ন্ত্রিত হয় দুটি দিক থেকে। একটি দিক হচ্ছে হৃদপিণ্ডের কাছে ছোট একটি গ্ল্যান্ড যার নাম থাইমাস। অপর দিক হচ্ছে হাড়ের মজ্জা। অর্থাৎ, শরীরের মধ্যে অনাক্রম্যভবনের ব্যবস্থা চালু রাখতে হলে সঠিক সক্রিয়তা থাকা চাই যেমন থাইমাসের, তেমনি হাড়ের মজ্জার।

আবার এমন রোগীরও সন্ধান পাওয়া গেল যার রক্তে সেই উপকরণের অভাব যা থেকে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও চর্মসংযোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা সেই রোগীর ছিল।

মুরগির বেলাতেও এমন ধারণা হবার কারণ ঘটল যে মুরগির শরীরে অনাক্রম্যভবনের ব্যবস্থা রয়েছে দুটি। নানাভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করে এই ধারণার স্বপক্ষে বাস্তব প্রমাণও পাওয়া গেল।

এই সমস্ত ফলাফল থেকে অতঃপর উপস্থিত করা হল মানুষের শরীরে অনাক্রম্যভবনের ব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি ছক। তার ভিত্তি হচ্ছে দুই উপাদানবিশিষ্ট একটি ব্যবস্থা। সোজা কথায় তার মানে অনাক্রম্যভবনের কারকরা রয়েছে দুই ধারায়। দুটির উদ্ভব হাড়ের মজ্জার মূলগত কোষের মধ্যে। নানা রূপান্তরের পরে সেগুলো শ্বেতকোষের চেহারা নিয়ে রক্তের ধারায় চালান যায়। এক জাতের শ্বেতকোষকে বলা হয় টি-কোষ কেননা এই বিশেষ শ্বেতকোষগুলো থাইমাসে পরিণতি লাভ করে। অপর জাতের শ্বেতকোষকে বলা হয় বি-কোষ—এগুলো থাইমাসে না গিয়ে সরাসরি বেরিয়ে আসে মজ্জা থেকে।

শরীরের মধ্যে অনাক্রম্যভবনের দুই ব্যবস্থা একই সঙ্গে সক্রিয় থাকে, যদিও তাদের গঠন ভিন্ন ও কর্তব্যপালনের ক্ষেত্রও ভিন্ন। টি-কোষ খুঁজে বেড়ায় ও ধ্বংস করে বড়ো শিকার—যেমন, চর্মসংস্থান, অঙ্গ-স্থাপন, বড়ো আকারের বহিঃবস্তু ও এমনকি ক্যানসার পর্যন্ত। বি-কোষের লড়াই অপেক্ষাকৃত ছোট অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে। টি-কোষের চেহারা সাদামাটা। বলিষ্ঠ মল্লের মতো। বি-কোষ হয়ে থাকে লোমশ ও শুঁড়বিশিষ্ট। টি-কোষকে কখনো কখনো ঘাতক কোষও বলা হয়ে থাকে।

শরীরের মধ্যে বাইরে থেকে কোনো কিছু অনুপ্রবিষ্ট হলেই একধরনের অ্যান্টি-বডি উদ্যত হয়ে ওঠে। তবে হালের পরীক্ষাকার্য থেকে জানা গিয়েছে অনাক্রম্যভবনের ক্রিয়ায় দুই ধরনের কোষই সাড়া দিয়ে থাকে।

১৯৬০-এর দশকের শেষদিকে এসে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, অনাক্রম্যভবনের ক্রিয়া সম্পর্কে জানতে গিয়ে তাঁদের হাতে চিকিৎসার এক নতুন হাতিয়ার এসে গিয়েছে। আর এই হাতিয়ারের যে কতখানি ক্ষমতা তার একটি পরীক্ষাও হাতেনাতে হয়ে গেল।

ফ্লোরিডার একজন চিকিৎসকের কাছে বাচ্চা একটি ছেলেকে আনা হয়েছিল যার শরীরে নানা জটিল রোগ। চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখলেন ছেলেটির শরীরে না আছে থাইমাস, না টি-কোষ। অর্থাৎ, অনাক্রম্যভবনের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটিই অনুপস্থিত।

চিকিৎসক করলেন কি, গর্ভপাতের ফলে প্রাপ্ত একটি ভ্রূণের শরীর থেকে সংগৃহীত থাইমাস অনুপ্রবিষ্ট করালেন ছেলেটির শরীরে। তারপরেই আশ্চর্য ব্যাপার, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ছেলেটির রক্তে টি-কোষ দেখা দিল চার সপ্তাহের মধ্যে চর্মসংযোগ বর্জন করার ক্ষমতা লাভ হল। এখন সাত বছর পরে, ছেলেটির শরীরে অনাক্রম্যভবনের দুই ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

এখন তাই সমস্ত রকমের দুরূহ ও দুরারোগ্য রোগকে অনাক্রম্যভবনের অস্ত্র দিয়ে ঘায়েল করার চেষ্টা চলেছে।

যেমন, কুষ্ঠরোগের কথা ধরা যাক। কুষ্ঠরোগ চিকিৎসায় সারে কিন্তু মারাত্মক হয়ে পড়লে এখনো পর্যন্ত সমস্ত চিকিৎসাই নিষ্ফল। এই রোগ যার হয় তার শরীরে টি-কোষের অভাব থাকে। কিন্তু জরুরি অবস্থায় বি-কোষের সাহায্যেও আক্রমণ চলতে পারে, চলে থাকেও। কিন্তু মুশকিল এই যে, কুষ্ঠের জীবাণু এমন-ভাবে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পারে যে বি-কোষ তার নাগাল পায় না। বিশ্বে আশি লক্ষ থেকে এক কোটি কুষ্ঠরোগী যে এখনো থেকে গিয়েছে তার কারণও এই। তখন একজন চিকিৎসক বিশেষ একটি পরীক্ষাকার্য করে দেখালেন। কয়েকজন কুষ্ঠরোগী বাছাই করে নিয়ে টি-কোষ অনুপ্রবিষ্ট করালেন তাদের শরীরে। তাতে সাফল্য পাওয়া গেল। চিকিৎসার এই পদ্ধতি এখনো পরীক্ষাধীন রয়েছে ব্যাপকভাবে প্রবর্তিত হয়নি।

অপর একটি রোগ বাতজনিত আর্থ্রাইটিস—গাঁটে গাঁটে ফোলা ওঠা ও বেদনা। সব দেশেই লক্ষ লক্ষ মানুষ এই রোগে ভুগে থাকে এবং কোনো চিকিৎসাতেই সম্পূর্ণ উপশম হয় না। অনাক্রম্যভবনের হাতিয়ার দিয়ে এই রোগটিকেও ঘায়েল করার চেষ্টা চলেছে এবং কিছুটা সাফল্য-লাভও হয়েছে।

এমনি আরো নানা রোগ যা এতকাল দুরারোগ্য মনে করা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, অনাক্রম্যভবনের হাতিয়ার দিয়ে পৃথিবীর তাবৎ রোগকে একদিন না এক-দিন নির্মূল করা যাবেই।

এমন কি ক্যানসার রোগকেও।

ক্যানসার নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন তাঁদের ধারণা, অনাক্রম্যভবনের ক্রিয়ায় ঘাটতি হওয়ার দরুন ক্যানসার হয়ে থাকে। হালের কয়েকটি ঘটনা এই ধারণাকে আরো জোরদার করেছে। যেমন, একজন রোগীর পাকস্থলীতে ক্যানসার হয়েছিল। তারপরে সে অন্য একটি অসুখে পড়ে, যার নাম পেরিটোনাইটিস। শেষোক্ত অসুখটি সারাতে গিয়ে দেখা গেল তার ক্যানসারও সেরে গিয়েছে। বুড়োদের মধ্যে ক্যানসার রোগ বেশি, তার কারণ বুড়োদের শরীরে অনাক্রম্যভবনের ক্রিয়া কমজোরী। আবার অনাক্রম্য ভবনের ক্রিয়ায় ঘাটতি আছে এমন যাদের শরীর তারা যদি শিশুও হয় তাহলেও তারা অতি সহজে ক্যানসারের শিকার হতে পারে।

ক্যানসারের চিকিৎসায় অনাক্রম্যভবনের ভূমিকা যে কতখানি তার আরও দৃষ্টান্ত সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। কিডনি পুনঃস্থাপিত হয়েছে এমন একজন রোগীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা চলে। পুনঃস্থাপনের পরে কিডনি যাতে বর্জিত না হয় সেজন্য অনাক্রম্যভবনের ক্রিয়াকে কমজোরী করার প্রয়োজন থাকে, এই অবস্থায় দেখা গেল পুনঃস্থাপিত কিডনিতে একটি টিউমার বড়ো হয়ে উঠেছে। অথচ দাতার শরীরে এই কিডনি যতোদিন ছিল ততোদিন এই টিউমারের কোনো অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়নি। অতঃপর রোগীর শরীরে অনাক্রম্য-ভবনের ক্রিয়াকে আবার স্বাভাবিক করে তুলতেই টিউমার সমেত কিডনিটি বর্জিত হল।

দেখেশুনে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে শরীরের অনাক্রম্যভবনকে এমন একটা অবস্থায় দাঁড় করানো সম্ভব যার বিরুদ্ধে কোনো রোগের জীবাণু টিকে থাকতে পারে না, ক্যানসারও নয়।

তাছাড়া, অনাক্রম্যভবন সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান নিয়ে শল্যচিকিৎসকরাও এমন একটি সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করতে পারবেন যাতে পুনঃস্থাপিত অঙ্গ কোনোক্রমেই বর্জিত না হয়।

মোট কথা, বিজ্ঞানীদের হাতে অনাক্রম্যভবন এমন একটি হাতিয়ার হতে চলেছে যার সাহায্যে মানুষের শরীরে যে-কোনো রোগের বাসা ধ্বংস করা সম্ভব হবে। এই মুহূর্তে নয়, অদূর ভবিষ্যতেও হয়তো নয়, কিন্তু একদিন না একদিন এমন দিন আসবেই। শুধু সময়ের অপেক্ষা। অনাক্রম্যভবনবিদরা যেন বলছেন আমাকে সময় দাও, আমি পৃথিবীর মানুষকে নিরোগ করে তুলব। —জয়ন্তকান্ত

উপন্যাস

প্রভাত দেবসরকার

রাজার রাজা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাড়ী ফিরে বিকাশ আর এক বিমূঢ় অবস্থার মধ্যে পড়ল। দেখল বাড়ীতে কয়েকজন যুবক নন্তুকে নিয়ে কি যেন করছে। উমাশশী ছেঁড়া-নেকড়া গরম জলের পাত্র নিয়ে ছোটাছুটি করছেন। বিকাশকে দেখে ছেলেগুলো সচকিত হয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

কি ব্যাপার? বিকাশ বেশ ভয় পেয়ে গেছে। এ-সব কি হচ্ছে এখানে, এরা কারা নন্তুকে এমন করে ঘিরে আছে কেন? নন্তুর কি হয়েছে?

ছেলেগুলোর একজন বললে ইনজিওয়াড আমরা ওকে তুলে এনেছি! দেখছি—

বিকাশ বললে, হাসপাতালে দেন নি কেন? কি করে এমন হল?

আর কেউ কথা বলে না। বিকাশ এগিয়ে এসে নন্তুর হতচেতন আহত দেহটার ওপর ঝুঁকে পড়ল। এ কি রক্ত যে, এমন বেরুচ্ছে ডান কানের পাশ দিয়ে। এক দিকের মাথাও রক্তাক্ত। মা মতগুলো নেকড়া এনেছিলেন সব ভিজে গেছে।

বিকাশ যেন ডুকরে উঠলো কে এ অবস্থা করলে? কখন হলো? নন্তুর আশেপাশে ছেলেগুলো স্থির নীরব মুখে কারো কথা নেই। ঘরের অনুজ্জ্বল আলোয় মুখগুলো ভয়ংকর দেখাচ্ছে।

রক্তাক্ত আহত অজ্ঞান অচেতনা ভাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিকাশ বললে বিপ্লব! কর বিপ্লব! হয়েছে তো? এখানে মরতে এসেছো কেন? তোমার দাদাদের কাছে যাও।

বলেই বিকাশ নিজেকে সামলে নিলে মনে হল তার মাথার ওপর অনেকগুলো হাত ছোরাশুদ্ধ উদ্যত হয়ে উঠেছে চোখ-গুলো যেন ভাঁটার মত জ্বলছে। নন্তুর মত অবস্থা না করে বসে বিশ্বাস কিছু নেই এইসব নব-বিপ্লবীদের।

ভয় বিহ্বল কণ্ঠে বিকাশ চীৎকার করে বললে, হয়েছে তোমরা যাও যাও—আমি দেখছি।

না নন্তুর সহযাত্রীরা বিকাশকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে আদেশের মত বললে আপনি সরে যান আমরা একে নিয়ে যাচ্ছি!

হতভম্ব বিকাশ কি করবে না করবে ভেবে পেল না, চাপা আক্রোশে বললে গেট আউট। গেট আউট।

মুহূর্তে ঘরটা ফাঁকা হয়ে গেল ওরা নন্তুকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলে গেল। পিছন থেকে মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

বিকাশ ছুটে গিয়ে মার মুখে হাত-চাপা দিয়ে বললে চুপ! কাঁদবার সময় অনেক পাবে দয়া করে চুপ কর! সর্বনাশ হবে।

উমাশশীর বুঝি দম বন্ধ হয়ে যায় এক ঝটকায় বিকাশের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন কেন? কেন? কেন তোরা এমনি করাচিস?

কেন তা বোধহয় বিকাশও জানে না! চোরের মাকে কাঁদতে নেই। নন্তুর জন্যে তো বটে। এইসব সমাজবিরোধীদের কি সাজা মা কি জানেন না—এখনি পুলিশ এসে হামলা করবে বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে নিয়ে টানাটানি করবে!

তবু মার কান্না থামেনি সারারাত ধরে তিনি নন্তুর জন্যে মড়াকান্না কেঁদেছেন, বিকাশের কথা শোনেননি। অন্ধকার ঘরে সে-কান্না মাথা কুটে যেন বলছে কেন আমার কপালে এমন হলো ভগবান! কি অপরাধ করেছি যে আমাকে এমনি করে সাজা দিচ্ছো?

নন্তুকে যে ঘরে আহত অবস্থায় এনে রাখা হয়েছিল বিকাশ ঘর অন্ধকার করে সেখানে চুপটি করে বসে আছে। কেমন যেন উৎকর্ণও সে এই বুঝি পুলিশ এসে তাকে ডেকে বলে পুলিশের গুলি খেয়ে এখানে কেউ এসে লুকিয়েছে? সরে যাও খানাতল্লাসী করবো।

অস্তিত্বের মত অন্ধকারে অশরীরী ছায়ার অনুসরণ করে বিকাশ ঘর-দোর ঘুরে ঘুরে দেখলে—মা সেই বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছেন ওরে আমার কি সর্বনাশ হলো রে!

বিকাশ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বললে সেই কাঁদছো তুমি! কেন?

কেন সে কথা বিকাশকে তিনি কি বোঝাবেন।

বিকাশ বিরক্ত হয়ে বললে চুপ কর!

উমাশশী তেমনি কান্নার সুরে বললেন ওরে দেখ না যে, ছেলেটা বেঁচে আছে না মরে গেছে! ওকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল?

বিকাশ তেমনি বিরক্তির সঙ্গে বললে মরলে বাঁচা যায়! কি ঝামেলা আরম্ভ হল।

উমাশশী চুপ করে গেলেন। তাঁর বুকের মধ্যে কান্নার উৎস বুঝি শুকিয়ে গেছে। বিকাশ ফিরে এসে ঘরের আলো জ্বাললে।

হঠাৎ কখন ঘরটা যেন রক্তে রাঙা হয়ে গেছে, চতুর্দিকে রক্ত চাপ-চাপ ছড়িয়ে আছে। অ্যাঃ এত রক্ত ঝরেছে গুলিবিদ্ধ নন্তুর দেহ থেকে? নন্তু, তুই একি সর্বনাশ করলি ভাই? গরীবের ছেলে তোর একি দুর্মতি হলো—দুটো হাত-বোমা চারটে পাইপগান নিয়ে তোরা কি বিপ্লব করবি? একদিন সন্ত্রাস-বাদীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে এমনি কত লড়াই করেছিল তাতে কি হয়েছিল ইংরেজ কি পালিয়ে গিয়েছিল দেশ স্বাধীন হয়েছিল? সেই ইংরেজ আজও রাজত্ব করছে তোর স্বদেশবাসীর ছদ্মবেশে! তোরা কেন ভুল পথে গেলি ভাই?

বিকাশের চোখ ফেটে জল এল। নন্তু হয়তো এতক্ষণ মারা গেছে, পুলিশের চোখ এড়াতে তার দেহটা নিয়ে ওরা এখান-ওখান করে বেড়াচ্ছে? তাড়িয়ে দেওয়া তার উচিত হয়নি।

নিজেকে বিকাশের অপরাধী মনে হল ভাইকে সে এতবড় বিপদে আশ্রয় দেয়নি তার আহত দেহের ক্ষত মুছিয়ে দেয়নি আপনি সুখে বাঁচবার জন্যে তাড়িয়ে দিয়েছে। ছি ছি!

এখন আসুক পুলিশ বিকাশ সামনা-সামনি মোকাবিলা করবে। মেজের ওপর থেকে রক্তের দাগ মুছতে মুছতে বিকাশ আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল—ভগবান এ তুমি কি করলে এ কি পরীক্ষায় আমাকে ফেললে? নন্তু যেন প্রাণে বেঁচে থাকে হে ভগবান!

সারারাত অভুক্ত থেকে আচ্ছন্ন ঘুম-জাগরণের মধ্যে বিকাশ আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখল—এই পুলিশ তাকে ধরতে আসছে সে প্রাণপণে ছুটছে বোমার আওয়াজে স্বপ্নটা বিক্ষিপ্ত হয়ে মনে হচ্ছে সে যেন কোথায় এসে পড়েছে ধু-ধু প্রান্তর পত্র-হীন গাছগুলো হঠাৎ নুয়ে পড়ে তার দেহে সঙ্গীনের খোঁচা দিচ্ছে উঃ কি অসহ্য যন্ত্রণা! হঠাৎ যেন একটা লোক হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এসে সস্নেহে তার কাঁধে হাত দিয়ে বলছে এস আমার সঙ্গে এস ভয় কি! মুখটা খুব চেনা-চেনা তবু যেন চেনা যায় না।

স্বপ্ন ভেঙে গিয়ে জেগে উঠে বিকাশ দেখলে বন্ধ জানালাটা কখন আধ-ভেজান হয়ে খুলে গেছে আর তার মধ্য দিয়ে রাত-শেষের চাঁদ যেন উঁকি মেরে দেখছে আলোর রশ্মিটা যেখানে নন্তুর বুকের রক্তের দাগ

ছিল সেখানে পড়ে কেমন যেন থরথর করে কাঁপছে—

হঠাৎ বিকাশ চীৎকার করে উঠলো কে? কে? কেন?

চাঁদ বুঝি ডুবে গেল ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।......

সুবিমলবাবু বাড়ী ছিলেন না। বিকাশ অপেক্ষা করবে কিনা ভাবতে ভাবতে সুবিমলবাবুর স্ত্রী ঘরের মধ্যে এসে স্মিত-মুখে বললে বসুন! এখনি চলে যাবেন?

সুবিমলবাবু কখন ফিরবেন? বিকাশ ঘরের বাইরে পা বাড়িয়ে বললে।

সপ্রতিভ অথচ কেমন যেন কৌতুকের সুরে সুবিমলবাবুর স্ত্রী বললে দরকার কি কেবল তাঁর সঙ্গে?

কথাটার মধ্যে কেমন একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে বিকাশ মুখ ফিরিয়ে বললে তাহলে আর কার সঙ্গে?

না তাই জিজ্ঞেস করছি! সুবিমলবাবুর স্ত্রী সামনে এসে বললে বসুন না চা আনছি!

বিকাশের ইচ্ছে করল 'না' বলে সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। কথাটা সুবিমলবাবুর স্ত্রী মিথ্যে বলেনি ইঙ্গিতও অন্যায় করেনি। মালবিকার সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে সুবিমল-বাবুকে খোঁজার অজুহাত করে সে আজ এসেছে। সেদিনের মালবিকার ব্যবহার বিকাশ কিছুতে মানতে পারছে না। হঠাৎ মালবিকার মানসিকতার অমন পরিবর্তন হল কেন কি কারণ? এখনও তো উভয়ের মন স্পর্শ আশ্লেষে মদির গন্ধের মত মনে হয়! সেদিনের দুর্যোগ বড় আকস্মিকভাবে নেমে এসেছিল, মালবিকা তাকে প্রত্যাখ্যান করল, নন্তু পুলিশের গুলিতে মুমূর্ষু হয়ে মরতে বাড়ীতে এল। কিন্তু পূর্বের মত আনন্দ তাকে কত মনোবেদনা দিলে! বিশ্বাসই হয় না কালকের মানষটা আজও আছে কিনা। দেখা হলে সুযোগ পেলে মাল-বিকাকে একটাই প্রশ্ন করে বিকাশ চলে যাবে —তুমি খারাপ তুমি অসৎ মানে কি? সত্যি বলচো, না আমাকে এড়াতে চাইচো?

বিকাশ ঘরের মধ্যে ফিরে এল। মনে হল ইতিপূর্বে সুবিমলবাবুর স্ত্রীকে এত সজীব সুচতুরা কখনো সে দেখেনি। বউটিকে আজ কেমন যেন দেখতে লাগছে। স্বামীর বিপদে কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল বিষাদ-পূর্ণা অবগুণ্ঠিতা! আজ চেনাই যেন যায় না! কেসের কথা জিজ্ঞেস করতে সুবিমল-বাবুর স্ত্রী বললে আপনি ঠিক বলেছিলেন মিথ্যে কেস—প্রমাণ হবে না। কেবল দিন পড়ছে।

বিকাশ বললে, আর খবর কি? মানে সুবিমলবাবুর আপিসের কিছু হল?

না। সেই তালাচাবি দেওয়া আছে! আজ বউটিকে তার জন্যে চিন্তিত বা ক্ষুব্ধ মনে হচ্ছে না। স্বামীর চাকরি নিয়ে যেন ভাবনার কিছু নেই।

বিকাশ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলে চাকরি কিছু পেয়েছেন অন্য কোথায়?

সুবিমলবাবুর স্ত্রী মাথা নাড়লে। তাহলে সংসারে সেই বিপদের ছায়া গেল কোথায়? অবস্থাটা বেশ রহস্যপূর্ণ মনে হয়। স্পষ্ট করে কিছু জিজ্ঞেস করতেও বিকাশ সঙ্কোচ বোধ করে। যে যেমন পারে যেভাবে পারে থাকুক তা নিয়ে বিকাশের ভাবনার দরকার কি? নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন তো এই মেঘ-রোদ্দুর খেলা! এই সুখ এই দুঃখ এই ভাল এই মন্দ এই মরা এই বাঁচা।—মানিয়ে চলা। মনে কত আশা আবার কত হতাশা! কার যে কিভাবে চলে কে জানে!

কিছুক্ষণের জন্য সুবিমলবাবুর স্ত্রী ভিতরে গেল। একলা ঘরে মুহূর্তের জন্যে বিকাশের মনে হল চলে যাই—চা খেয়ে এদের সুখদুঃখের অংশভাগী হয়ে সমবেদনা জানাবার আর দরকার নেই! এখন তাকে কে সমবেদনা জানায় তার নেই ঠিক। কিন্তু কি আশ্চর্য মানুষের অবস্থার কত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হয়। তাকে আর এদের কোন প্রয়োজন নেই? সেই আবার কথাটা মনে আসে, মালবিকারও কি তাকে দরকার নেই, মালবিকার কি হলো? বউটি কিন্তু তার সঙ্গে মালবিকার সম্বন্ধের রমণীয়তা উপ-ভোগ করে কৌতুক করতে চায়—

উঠতে গিয়ে বাধা পেল সুবিমলবাবু ঘরে ঢুকে বললেন, এই যে কতক্ষণ?

বিকাশ মুখে কোন সাড়া করলে না! কেমন যেন বিস্ময় বোধ করে সুবিমলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। আশ্চর্য এঁকেও যে আজ চেনা যায় না! বেশবাসের বেশ পরিবর্তন হয়েছে।

সুবিমলবাবু বললেন, মালবিকা নেই? দেখা হয়েছে?

বিকাশ গম্ভীর হয়ে বললে আমি আপনার খবর নিতে এসেছিলুম কেসের কি হলো? নানা ঝঞ্ঝাটে অনেকদিন আসতে পারিনি!

সুবিমলবাবু হেসে বললেন ও আর কি চলছে!—যেমন ছিল তেমনি আছে কেবল হেরাস্‌মেন্ট!

এরপর বিকাশ কি বলবে ভেবে পেল না। ওরা যদি না ভাবেন তার ভাবনার কি আছে। নিজেকে কেমন উপযাচক মনে হয়।

বিকাশকে চুপ করে থাকতে দেখে সুবিমলবাবু বললেন, দেখি কি হয়।

আপনাদের ফ্যাক্টরি খুলবে না? বলেই মনে হল ওকথা না তুললেই হতো। বিকাশ অপ্রস্তুত বোধ করলে।

সুবিমলবাবু হুংকার দিয়ে বললেন, জাহান্নমে গেছে! মালবিকাকে বলেছি এবার একটা ব্যবস্থা করে নে তোর তো অনেক চেনা-শোনা আছে!

এসব বিকাশ কি শুনছে, মালবিকা নিজের ব্যবস্থা করবে? দাদাটা কি? বোনকে খাটাবে নাকি?

বিকাশ শুনতে না চাইলেও সুবিমল-বাবু বোনের প্রশংসা করতে লাগলেন। সংসারটাকে নাকি সে-ই মাথায় করে রেখেছে। তাঁর চেয়ে মালবিকা যে অনেক বুদ্ধিমতী অনেক কাজের, সে কথা স্বীকার করতে সুবিমলবাবু সঙ্কোচ বোধ করলেন না। আরও বললেন হঠাৎ তাঁদের সংসারে বিপর্যয় না এলে মালবিকা লেখাপড়ায় বিশেষ উন্নতি করতে পারতো ছেলেবেলা থেকে পড়াশোনায় ওর খুব মাথা ছিল!

এখন সুবিমলবাবুর এসব কথা যেন অবাস্তব মনে হয়। একটা পথের মেয়ে পথেই একদিন যার সঙ্গে আলাপ তার বিষয় নতুন করে জানার বিকাশের আর আগ্রহ নেই। কেবল দেখা হলে কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করবে, এই তোমার চরিত্র! অনেক জানাশোনা নাকি তোমার লোকের সঙ্গে? এই জন্যেই কি তুমি আমার সঙ্গে বিচ্ছেদ চেয়েছিলে? বুঝেছি দাদাকে দিয়ে আর প্রশংসাপত্র দাখিল করতে হবে না।

বিকাশ ঘর থেকে বাইরে আসতে পিছন থেকে সুবিমলবাবুর স্ত্রীর সকৌতুক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল আবার আসবেন কিন্তু! মাল-বিকার সঙ্গেই দেখা হলো না!

একবার মনে হল ফিরে গিয়ে মুখের ওপর বলে আপনি [illegible] কে কি ভেবেছেন? ভদ্রলোকের সঙ্গে ? বলতে জানেন না? যতসব সুবিধাবাদ!!

কাগজে খবর সেই যা বেরিয়েছিল এল-গিন রোডের মোড়ে একদল সশস্ত্র যুবক একটি ভ্রাম্যমাণ পুলিশ পার্টির ওপর বোমা ছোরাছুরি নিয়ে আক্রমণ চালায় ফলে পুলিশের কয়েকজন আহত হয়েছে। আক্রমণ-কারী দলের একজন পুলিশের গুলিতে জখম হয়েছে সম্ভবত তাকে তারাই তুলে নিয়ে গেছে। অনেকগুলি বোমা একটি পাইপ-গান পুলিশ আশেপাশে তল্লাসী করে উদ্ধার করেছে, কয়েকজন গ্রেপ্তারও হয়েছে।

যাকে উগ্রপন্থীরা আহত অবস্থায় তুলে নিয়ে গেছে সে আর কেউ নয়, নন্তু! কি ভেবে নন্তুকে মরতে নিজের বাড়ীতে এনে-ছিল তারাই জানে। বিকাশ আশ্রয় দেয়নি। বিপ্লবের রূপ যে এমন ভয়ঙ্কর সে কোনদিন ভাবেনি, পুলিশী হাঙ্গামায় তার বিশেষ ভয়।

নন্তুর সঙ্গে এইখানে তার তফাৎ। নন্তুরা যেন ক্ষেপে গেছে প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থাকে ভেঙেচুরে উল্টে দিতে চায় বলে সশস্ত্র বিপ্লব করবে! তাহলে এমন গোপনে কেন? জনসাধারণকে এমন আতঙ্কগ্রস্ত করে দেশের কি তোরা পরিবর্তন আনবি?

বিকাশ মনে মনে বলে যেন ছেলেবেলার নামতা মুখস্থ করার মত—আমাদের দাবী মানতে হবে!

কিন্তু, কি তাদের দাবী? খেয়ে-পরে বাঁচার? শুধু তারা বাঁচলেই কি দেশ বাঁচবে, আর কারো কথা ভাবতে হবে না? এই বিরাট দেশে অগণিত মানুষের মধ্যে তারা কজন? সেদিন কে যেন একটা হিসেব দিয়েছিল মাথাপিছু ছ আনার মত দৈনিক আয় ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের। সে তুলনায় অফিস কর্মচারীরা তো অনেক অনেক সুখী!

না, এসব কথা বিকাশ ভাববে না তার মত সংগ্রামী জীবনযুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত ব্যক্তির ভাবা উচিত নয়। যে-কাজ সে করে সে-কাজ তাকে জীবনে নিশ্চিন্ত সুখ-শান্তি দিতে পারে না। তারা সহ্য করে বলেই কর্তৃপক্ষ উদাসীন। প্রতিবাদ না করলে কোন ফল হবে না। দেশটা যেমন নেতাদের দেশটা তেমনি তাদেরও! দেশের সম্পদ সুখ-স্বচ্ছন্দ কেবল তারাই ভোগ করবে কেন? তারা কেবল দুঃখ অপমান অনাহার-মৃত্যু সহ্য করবে? না তা হয় না! এ অন্যায় এ পাপ! প্রতিকার চাই। আমাদের দাবী মানতে হবে!

এত কথার মধ্যে মালবিকার কথা বিকাশ ভুলতে পারেনি। যেন তার বিপ্লবচেতনার উদ্বোধনের মূলে মালবিকার কনট্রিবিউশন অনেকখানি। সেই প্রথম যেদিন তাকে মাঠে মাঠে সভা-মিছিলের পাশে পাশে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিল সেইদিন থেকে কেমন একটা সশ্রদ্ধ বিস্ময় বোধ করেছিল মনে হয়েছিল নারীমূর্তি রূপে তাদের বিপ্লব-চেতনা দীপশিখার মত জ্বলছে, তার মত দুর্বলচিত্তদের প্রেরণা যোগাচ্ছে। বড় বিস্ময় আর আনন্দের সঙ্গে বিকাশ মালবিকার সাহচর্য কামনা করেছিল। অফিসের প্রতিবাদ-সভায় যোগ দিয়ে সাময়িক বরখাস্ত হয়ে ছুটে এসে তাই সগর্বে মালবিকাকে বলেছে আমরা জয়ী হবো আমাদের দাবী মানবেই।

ছি ছি সেদিন সে কি ভুল করেছে! কাকে সে প্রেরণার স্থল ভেবেছিল কে সে? মায়াবিনী! আর পাঁচটা মেয়ের মতই ব্যভিচারিণী স্বৈরিণী! বর্তমান ধনগর্বিত সমাজব্যবস্থার ফল গণোরিয়া সিফিলিসের মত যৌনব্যাধির নির্লজ্জ প্রকাশ। এবার দেখা হলে—

কি করবে না করবে বিকাশ ভাবতে পারে না। প্রচণ্ড আঘাত করবে? ছুরি মারবে? এ্যাসিড বাল্ব ছুঁড়ে চোখ-মুখ কানা করে দেবে? না একটা বোমা ঐসব বিপ্লবীদের কাছ থেকে ধার চেয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারবে? বলবে সমাজজীবনে এই নতুন পাপকে তোমরা দেখছো না? এরা সপাই বড়লোকদের চর সত্যসন্ধ নবীন বিপ্লবীদের পথভ্রষ্ট করতে নিয়োজিত! সঙ্গ দিয়ে দেহ দিয়ে মধ্যবিত্তের বুদ্ধিকে বিপথে নিয়ে যায় বিপ্লবকে পিছিয়ে দেয়!

এত নির্বুদ্ধিতার কাজ জীবনে যেন আর কখনো করেনি বিকাশ। ঐ মায়াবিনী, কুলটা মেয়েটি যেন তার সর্বস্ব অপহরণ করে নিয়ে গেছে. তার জীবনের একান্ত গোপন কথাটা জেনে নিয়েছে। তার জীবন-দর্শন পর্যুদস্ত করে তাকে নিঃস্ব করে নিয়েছে। তাকে ছোট করেছে! খুন করবে—

এই মুহূর্তে বিকাশের খুব আপসোস হয় হাতে পেয়ে একটা বড় সুযোগ সে হারিয়েছে—হ্যাঁ, হ্যাঁ ইচ্ছে করলে সে মালবিকার গলা টিপে মারতে পারতো? বড়লোকের দালাল, গুপ্তচর সর্বনাশিনী—

কে জানে আপিসের খবর কি? ধর্মঘট হচ্ছে কি? বরখাস্তের নোটিশ নিয়ে সেই যে চলে এসেছে তারপর আর ওমুখো বিকাশ হয়নি। খবর কিছুও কেউ দেয়নি। তাহলে কি—

বিকাশ কেমন যেন একটা সংশয় বোধ করে কেমন যেন এ ধরনের অশান্তি আর অশান্তি মনে মনে অহরহ বোধ হয়। তারপর ঘরে বাইরে এইসব ঘটনা তাকে দোলাচলচিত্তবৃত্তির সামিল করে। কখনো মনে হয় সে ভুল করেছে, ভুল পথে চলেছে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে। সবাই ঠিক চলছে সে-ই মাথা গরম করে বেড়াচ্ছে। অভাব অভাব চারিদিকে কেবল অভাব!

সংগ্রামী বন্ধুরা কেউ আসে না কেন? বড় অভিমান হয় দিব্যেন্দু প্রশান্ত কি তার বিপদের কথা কিছু জানে না? সে কিভাবে দিন কাটাচ্ছে তাও কিছু জানা তাদের কর্তব্য নয়? স্বার্থপর সব স্বার্থপর! ঐ মালবিকাকে দেখে বিকাশের শিক্ষা হয়েছে, তোমাকে সামনে ঠেলে দিয়ে নিজেরা সরে পড়েছে হয়তো! এই নিয়ম!

না, সে বোকার মত চুপ করে থাকবে না। সবার হয়ে সে একা কেন সংগ্রাম করবে? সংসার অচল হয়ে গেছে আর চলে না—মা নীরব হয়ে গেছেন, ছেলের শোকে মুহ্যমানা। কখন খান কখন শুনা কখন জাগেন কিছু বোঝা যায় না। বিকাশের মনে হয় বাবার মত তিনিও একদিন হঠাৎ চোখ বোজাবেন, পৃথিবীতে তার আপনার বলতে কেউ থাকবে না, একেবারে মাতৃপিতৃহীন অনাথ হয়ে যাবে সে। মা বেঁচে থেকে এখনো যেন সংসারে তার অনেক জোর আছে এখনো সে নিশ্চিন্ত। মা বেঁচে থাকুন, তাহলে সে এইসব দুঃখ অশান্তি মনোবেদনা অকাতরে সহ্য করতে পারে—তার সুখকল্প থেকে কেউ তাকে বিচ্যুত করতে পারবে না। মাকে সে আশ্বাস দেয় নন্টু বেঁচে আছে তার কথা ভেবে তুমি শোক করো না। ভুল পথে গেলেও সে তোমার কুসন্তান নয়। আমি যেমন—

না মাকে সে আপিসের কথা কিছু আজও বলেনি। বেশিরভাগ সময় সে বাইরে থাকে মা যেন না ভাবেন তার চাকরি নেই কি আপিসে কোন গণ্ডগোল হয়েছে।

কিন্তু আর যে চলে না সংসার খরচ চালাবে কি দিয়ে? সাবসিসটেনস্ এ্যালাউন্স হিসেবে এখনো কিছু পায়নি। কবে পাবে তার ঠিক নেই। মাকে বলবে, মৃত্যুকালে বাবা আপিস থেকে যে-কটা টাকা পেয়েছিলেন তার থেকে কিছু এখন তুলে সংসার চালাবে? তারপর—

আজ ক'দিন মা বেশ স্বাভাবিক আছেন। উঠছেন বসছেন সংসারের কাজকর্মও করছেন। বিকাশকে আপিসে বেরুবার জন্যে তাড়াও দিচ্ছেন। মনে মনে বিকাশ প্রমাদ গনে মা যদি সত্যিকারের অবস্থা জানতে পারেন, তাহলে হয়তো আর সহ্যই করতে পারবেন না। যাক—

একদিন নিজে থেকে আপিস বেরুবার উদ্যোগ করতে মা সামনে এসে বললেন কাল তোর একটা চিঠি এসেছে? দেখ দিকি কার চিঠি কে লিখলো?

মুখ-বন্ধ খামের চিঠি না খুললে বোঝবার উপায় নেই কার চিঠি কে লিখলো। তাছাড়া ওপরে ঠিকানা দেখে বোঝা যায় না পরিচিত কারো হস্তাক্ষর কিনা। এমনি সাধারণ চিঠি সাধারণ হাতের লেখা! হঠাৎ বিকাশের বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে মালবিকা লেখেনি তো? নিজের ব্যবহারে লজ্জা পেয়ে অনুশোচনা করে চিঠি লিখেছে? অনেক অনুরোধ করে হয়তো দেখা করবার প্রার্থনা করেছে? কিন্তু—ঠিকানা মালবিকা কোথায় পাবে? কোনদিন তো তাকে বিকাশ আপনার ঠিকানা দেয়নি! যে কিছু মেলামেশা হয়েছে তাতে তার কেমন সহজাত ভয় ছিল যদি কোনদিন মালবিকা হুট্ করে তার বাড়ী এসে পড়ে—মা-বাবা জানতে পারেন?

আবার মালবিকা নিজে থেকে কোনদিন জানতে চায়নি। হয়তো বুঝেছিল ঠিকানা দিয়ে মানুষের পরিচয় নয়! ঠিকানায় কিছু যায় আসে না।

বুকের মধ্যে কেমন একধরনের সংশয় আশা-নিরাশার সঙ্গে আসা-যাওয়া করে। কে জানে কোনদিন হয়তো বিকাশই নিজে থেকে ঠিকানা দিয়েছে খেয়াল করেনি: মালবিকা ঠিকই মনে রেখেছে।

মার সামনে চিঠিটা খুলতে বিকাশ ইতস্তত করে। মা সরে যেতে ঘরে এসে কম্পিত হাতে মুখ ছিঁড়ে ফেলে চিঠিটা বার করে নেয়। খুলতেই শেষটুকু নজরে পড়ে।

অনন্তবাবু চিঠি লিখেছেন। আপিসের খবর দিয়ে বলেছেন বিকাশ যেন অবিলম্বে 'জয়েন' করে, ধর্মঘট সাকশেসফুল হয়নি ইউনিয়নের সঙ্গে একটা চুক্তি হয়ে গেছে বিকাশ এলে জানতে পারবে বরখাস্তের নোটিশ উইথড্র করা হয়েছে। যেন একটু দেলদও করেছেন মাঝখান থেকে বিকাশই ফাঁক পড়লো পান্ডারা কেটে পড়ল! তিনি কথা দিয়েছিলেন যতদিন আপিসে থাকবেন ততদিন বিকাশের ভালমন্দ দেখবেন। কোন লাভ নেই পাচজনকে নিয়ে হৈ-হৈ করে ফল তো হাতে হাতে ফলল ইত্যাদি---

চিঠিটা পড়ে বিকাশের খুব রাগ হলো অনন্তবাবুর এই অযাচিত উপদেশ আর মাতব্বরি তার ভাল লাগল না। কে তাঁকে তার ভালমন্দ দেখতে বলেছে? ভদ্রলোক এখনো কি তাকে —জামাই করবার দুরাশা পোষণ করেন? নাকি এত অপমানে শিক্ষা হয়নি? আজ আবার গিয়ে অপমান করে আসবে, নির্লজ্জ বেহায়া ভদ্রলোক কোথা-কার! নিজের ভালমন্দ বিকাশ নিজেই দেখবে, কারো অভিভাবকত্ব বা মাতব্বরি সে সহ্য করবে না!

কিন্তু তাদের সংগ্রাম? সত্যি তা ব্যর্থ হয়েছে? বিদ্রোহীরা ভেঙ্গে পড়েছে, হার স্বীকার করেছে? না না হয়তো অনন্তবাবুর এ একটা চাল! একরকমের দালালী!

হ্যাঁ—না করে শেষপর্যন্ত বিকাশ আপিসের দোরগোড়ায় এসে হাজির হল! বুকটা কেমন দুলে উঠলো অদ্ভুত একটা শূন্যতা বোধ করল। আশ্চর্য আপিসটা ঠিক আগের মত চলছে—কোথাও কোন বিদ্রোহের চিহ্নমাত্র নেই। তাহলে অনন্তবাবু তো ঠিক খবর দিয়েছেন ধর্মঘটীরা হার স্বীকার করেছে, প্রতিবাদ তুলে নেওয়া হয়েছে। তাই তো কই সেইসব প্রাচীরপত্র, সেইসব প্রতিজ্ঞা আর দাবীদাওয়ার হুঙ্কার? আপিসটা দিব্যি স্বস্তিতে আছে।

কাগজপত্রে সই দিয়ে মাথা নীচু করে বিকাশ বেরিয়ে এল। আপিসের অবতরণ সিঁড়ির মাথায় এসে অনন্তবাবু বললেন, আর আর তোমাকে কাজ করতে হবে না কাজ থেকে এস আমি সব ঠিক করে রাখবো! চিরার আপ মাই বয়!

বিকাশের কান-মাথা ভোঁ ভোঁ করে মনে হল এক ঠেলা দিয়ে ভদ্রলোককে সিঁড়ি দিয়ে একেবারে রাস্তায় ফেলে দেয়। তার বদলে নিজেই সিঁড়ি দিয়ে পড়তে পড়তে রাস্তায় এসে নামল। তারপর সামলে নিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবল এছাড়া তার কি করবার ছিল সবাই তাকে 'বিট্রে' করেছে! আর সে কি করতে পারে! এসব করার যেন কোন মানে হয় না সে একলা কেন নির্যাতন অপমান অনাহার পীড়ন ভোগ করবে? তার পাশে কেউ তো নেই! বোকামি! সে ঠিকই করেছে 'বন্ডে' সই করে অনন্তবাবু প্রকৃতই তার শুভানুধ্যায়ী! কেন জানি না অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা বিকাশের মনে পড়ল 'যে আমারে দেখিবারে পায়, আপন ক্ষমায় ভালমন্দ মিলায়ে সকলি—

তারপর আর মনে পড়ে না। বিকাশ ট্রামে উঠে বাড়ী ফিরতে ফিরতে বললে বেশ করিছি ঠিক করিছি?......

কিন্তু একটা অপরাধবোধ যেন থেকেই যায়। সব সময় খচ খচ করে কাঁটার মত বেঁধে; নন্তুর খবর যে আজও পর্যন্ত কিছু নিতে পারলে না। উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ কিছু সীমিত হলেও তারা যে আদর্শচ্যুত একথা কে বলবে? নন্তু যদি তার মত করে দল থেকে চলে এসে বলে ভুল করেছিল ভুল পথে গিয়েছিল তাহলে? বিকাশ শিউরে ওঠে এই কদিন আগে এই নিয়ে কটা খুন হয়ে গেছে। ছেলেটি চেনা নন্তুর মতই হঠাৎ খুন হয়ে গেল। গলা কেটে রাস্তার মধ্যে ফেলে দিয়ে গেছে! কেন? কেন? সত্যি কারণ কে বলবে। ঐ দলে একদিন ছিল খুব বুদ্ধি-মান ছেলে, জীবনে উন্নতি করতো! ছেলেটির বাবার সঙ্গে এখনো রাস্তাঘাটে দেখা হয় কেমন যেন পাগলের মত হয়ে গেছেন উদভ্রান্তের মত চলাফেরা করেন।

হঠাৎ একটা বোমা-ফাটার শব্দ হল ঝড় ঝড় করে একটা গাড়ি চলে গেল পুলিশের গাড়িও একটা শব্দ করে এসে ব্রেক কসল—ঘ্যাচ-চ-চ:

বিকাশ ভয় পেয়ে একটা বন্ধ বাড়ির জানালার নীচে বৃষ্টিতে ভেজা কাকের মত গুটিশুটি মেরে সরে দাঁড়াল। পুলিশের গাড়ি পিছন ফিরে চলে গেল ঝড় ঝড় শব্দে একটা গাড়ি বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। হঠাৎ বৃষ্টি থেমে যাওয়ার মত পাড়াটা নিস্তব্ধ মনে হল।

বিকাশ অবাক বিস্ময়ে দেখল তারই চোখের সামনে ধোঁয়া-ওঠা রাস্তার একধারে কি একটা গাছে—কচি কচি পাতা ধরেছে ফুরফুরে হাওয়ায় কাঁপছে আর একটু দূরে একটা বাড়ির গায়ে কালি দিয়ে কিসব লেখা আছে—রক্তের বদলে রক্ত কার যেন ধড় থেকে মাথা আলাদা করে দেবার হুঁশিয়ারি!

পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল, বিকাশ ভয়ে যেন আধমরা হয়ে গেল। একলা একলা এতদূরে এসে খুব অন্যায় করেছে, দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে। এসব পাড়ায় আসা নিরাপদ নয়। নন্তু এ তল্লাটে আছে কে তাকে বললে? কার কথায় সে এই ভয়ঙ্কর রাজ্যে মরতে এল? নন্তুর সন্ধান এখানে মিলবে তার ঠিক কি, তার আগেই সে যদি শেষ হয়ে যায়—

হায় হায়, তার এত সাধের চাকরি, যার জন্যে কদিন আগে সে 'বন্ডে' সই করে এসেছে, যার জোরে সে নিজেকে বিশিষ্ট মনে করছে, আর অনন্তবাবুর ওপর সদয় হয়েছে, আর বুঝি জীবনে তা করতে পারবে না!

আবার এত ভয়, এত আতঙ্কের মধ্যে অনন্তবাবুর কন্যাকে বিয়ে করার কথা বিকাশের মনে হল—বাবা পছন্দ করে গিয়েছিলেন, তার অবাধ্যতায় তিনি বুঝি 'শক' পেয়ে হঠাৎ মারা গেছেন! প্রায়শ্চিত্ত করবে।

বিকাশ পিছন ফিরে পাড়াটা থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করতে হঠাৎ একজন যুবক সামনে এসে পথ রোধ করে উদ্ধত কণ্ঠে বললে, কোথায় যাচ্ছিলেন—ফিরলেন যে? কি চাই?

বিকাশ থর থর করে কাঁপছে, বুঝি মাটিতে পড়ে যায় মুখ থুবড়ে। ছেলেটি তেমনি উদ্ধত কণ্ঠে [illegible], এ পাড়ায় কেন এসেছেন? কাকে চা[illegible]

কাউকে নয় এমনি এসে পড়েছি পথ ভুলে! বিকাশ ভাইয়ের নাম বলতে ভুলে গেল। পাশ থেকে আর একটি ছেলে তার কাঁধে হাত দিয়ে বললে, চালাকি পেয়েছো? শালা স্পাই কোথাকার! বিলটু দাঁড়িয়ে আছিস কেন, ফাঁসিয়ে দে! দেখছিস্ না, শালা—চামচে!

মুহূর্ত মাত্র দেরী হল না বিকাশ পড়ে গেল, রক্তে মাটি ভিজে গেল। আততায়ী ছেলে দুটো বীভৎস উল্লাসে চীৎকার করে উঠলো; আশপাশের বাড়ীঘরের বন্ধ জানালায় বিকাশের অন্তিম আর্তনাদ মাথা কোটবার ব্যর্থ চেষ্টা করলে।

এদের কি সাংকেতিক আওয়াজ কে জানে, সঙ্গে সঙ্গে দুম্ দুম্ করে কটা বোমা ফাটল পাড়া কাঁপিয়ে, ধোঁয়া সরে যেতে না যেতে একটি নারী মূর্তি ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এসে বিকাশের মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডুকরে যেন কেঁদে উঠলো, এ কাকে তোরা খুন করলি? কি সর্বনাশ করলি, এ যে—

অপ্রস্তুত দলের একজন ছেলে অপরাধীর কণ্ঠে বললে, একে আপনি চেনেন মালবিকাদি?

মালবিকা কোন সাড়া করলে না, আঁচল ছিঁড়ে বিকাশের দেহটা ঢেকে দিলে।

(শেষ)

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

।। আট ।।

শ্রীঅরবিন্দের কথা যখন ভাবি তখন সব আগে মনে হয় আমার তাঁর অপার স্নেহ-কোমলতার কথা, তারপরে তাঁর তুঙ্গ প্রজ্ঞার, যার জ্যোতি তাঁর অজস্র নিবন্ধে কাব্যে ও পত্রাবলীতে যেন বান ডাকিয়ে চলেছে পদে পদে চমকে দিয়ে। এছাড়া ভাবতেও আবেগে কাগে তাঁর অটল ইচ্ছাশক্তি ও আশ্চর্য ব্যক্তি-রূপের কথা যে-ব্যক্তিরূপে রবীন্দ্রনাথের মতন মহামানবকেও বলিয়েছিল : "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।" আমাকে কবিগুরু বলেছিলেন পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দকে দেখার পর : "তিনি একটি দীপ্তির মধ্যে রয়েছেন দেখলুম।"

ভাষায় এ-দীপ্তির বর্ণনা সম্ভব নয়। আমরা উজিয়ে উঠতে পারি তাঁর মহিমার ও মাধুর্যের কথা বলতে—বলার প্রয়োজনও আছে, পূজনীয়ের স্তবগানে মন আনন্দ ও শক্তির বর পায় বৈকি—কিন্তু দৈবী দীপ্তি প্রজ্ঞা প্রীতি করুণার কথা যতই বলি না কেন মন শেষে বলেই বলে : "মেনেছি হার মেনেছি।" তাই এবার আমি যতটা পারি ভাবোচ্ছ্বাসকে দাবিয়ে বলব আমার আশ্রম-জীবনের কিছু কথা যার মাধ্যমে আমি তাঁর মহিমময় সত্তার সংস্পর্শে এসেছিলাম।

তাঁর পত্রাবলীর অজস্রতার কথা প্রথমেই এসে গেছে। ভেবেছিলাম এ-সম্বন্ধে পরে সাজিয়ে লিখব যথাপর্যায়ে—কারণ তাঁর পত্র-পর্ব আমার আশ্রমজীবনের আদিপর্ব নয়। তাই পেছিয়ে গিয়ে সুরু করি যথাসম্ভব প্রথম থেকে—(২২এ নভেম্বর ১৯২৮)—যেদিন আমি আশ্রমে পৌঁছই।

একটি সাধক এসেছিলেন স্টেশনে—কে, মনে নেই। তবে মনে আছে আমার মন ভরে ওঠার কথা যখন পৌঁছলাম ফরাসী কোষা-গার-ভবনের পাশে আমার আবাসে দোতলার ঘরে। সামনের প্রাঙ্গণে একটি—বোধহয় বকুল গাছ। দোতলায় আমার ঘরের পূর্বদিকে সাগরমুখী বারান্দায় পা দিতেই মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল। অদূরে নীলাঞ্চলা আদিজননী কল্লোর্মিলা। ঘরে চেয়ার টেবিল খাট মশারি তোষক এমন কি একটি আরাম কেদারাও যেন আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করল। কে বলবে—বিদেশে বিভূঁয়ে এসে পড়েছি? মনে পড়ল শ্রীঅরবিন্দের দীপ্ত শিবশান্ত মূর্তি, আর শ্রীমার স্নিগ্ধ মধুর কান্তি। যেন ঘর বেজে উঠল উভয়েরই সম্ভাষণ স্বাগতম্!

তারপর ক্রমশ নানা সাধক-সাধিকার সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে সুরু হল আমার বহুবাঞ্ছিত যোগজীবন? কী আনন্দ! কী চমক—আবেশ- শান্তি!

অতঃপর কর্মসূচী। এর কিছু কিছু বদল হয়েছিল পরে। তাই মনে রাখা চাই যে, আমি এখানে বলছি ১৯২৮,-'২৯,-'৩০ সালের কথা। পত্রপর্বের সুরু হয় ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি। আমার দপ্তরে তাঁর টাইপ করা চিঠি রক্ষিত আছে ১৯৩০ সাল থেকে। কিন্তু সেকথা যথাস্থানে। আগে বলি কী ভাবে আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনযাত্রার রথ চলত সে-সময়।

১। সকালে উঠে প্রথমেই যেতাম আমরা সবাই—শতাধিক সাধক সাধিকা—শ্রীমাকে প্রণাম করতে। তিনি ধ্যান করতেন একটি অনতুচ্চ কাঠাসনে বসে আমাদের ধ্যানে দীক্ষা দিতে। আধঘণ্টা ধ্যানের পরে আমরা একে একে গিয়ে তাঁর পায়ে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করতাম আর তিনি প্রত্যেকের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে একেকটি ফুল দিতেন—রকমারি ফুল—শিউলি জবা গোলাপ স্থলপদ্ম...তুলসী মঞ্জরীও দিতেন। প্রত্যেক ফুলটি ছিল যেন একেকটি আত্মিক প্রতীক, যথা গোলাপ—আত্মসমর্পণের শিউলি—অভীপ্সার (aspiration), তুলসী—ভক্তির...

ফুল পেয়ে শ্রীমার আশীর্বাদ শিরোধার্য করে প্রথম দিকে প্রতিদিনই মন এক অচিন আনন্দের আবেশে ভরপুর হয়ে থাকত—মনে হত যেন শ্রীমা তীর্থপথে প্রতিদিন এক-পা এক-পা করে এগিয়ে দিলেন।

২। ফিরে এসে ফল্কো ওরফে কোকো সেবন—সে সব হাল্কা বর্ণনা থাক। নানা গ্রন্থেই লিখেছেন নানা সাধক।

৩। মা আমাকে কখনো কখনো ডাকতেন পূর্বাহ্নে। আমি গিয়ে তাঁকে নানা প্রশ্ন করতাম তিনি উত্তর দিতেন—যেমন মধুর তেমনি প্রাঞ্জল ফরাসী ভাষায়। প্রতিদিনই তাঁর স্পর্শপ্রসাদ, স্নিগ্ধ হাসি ও গভীর চাহনি আমাকে আবিষ্ট করত। তখনো তো নিজের অহন্তার সঙ্গে সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয় নি, তাই চলতাম কবি নিশিকান্তের ভাষায় : 'এখন শুধু সুখের তালে চলছে তরী ভরা পালে—আপন ভুলে কূল অকূলের মাঝির মুখে আছি চেয়ে।"

৪। তারপর প্রতি সাধকই করে চলত নির্দিষ্ট কাজ—আশ্রমের কাজ, বলাই বাহুল্য। কেবল আমাকে ও মণিকে (সুরেশ-চন্দ্র চক্রবর্তী) আশ্রমের কোনো কাজ দেওয়া হয়নি, আমরা লেখাপড়া ও গানসাধনায় ভুবসাঁতার কাটতাম।

৫। দুপুরে ভোজনালয়ে ভোজন।

৬। সন্ধ্যায় সান্ধ্য আহার।

৭। অতঃপর শ্রীমা-র সঙ্গে ফের ধ্যান সন্ধ্যাবেলা। এ-ধ্যানচক্রে শ্রীমা অল্পক্ষণ ধ্যান করেই প্রত্যেককে আশীর্বাদ করতেন ও "সূপ" পরিবেশন করতেন। সে বর্ণনা ফলিয়ে করার প্রয়োজন দেখি না। শুধু বলে রাখা যে, শ্রীমার দেওয়া সূপ আমাদের কাছে ছিল বড় আদরের।

৮। উৎসব হত বৎসরে তিনটি—যেদিন যেদিন শ্রীঅরবিন্দ দর্শন দিতেন শ্রীমার পাশে বসে। এ বর্ণনাও ফলিয়ে করব না, শুধু বলি :

ক) প্রথম উৎসব ২১-এ ফেব্রুয়ারী—শ্রীমার জন্মদিনে।

খ) দ্বিতীয় উৎসব ১৫ই আগস্ট—শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনে।

গ) তৃতীয় উৎসব ২৪-এ নভেম্বর—শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধির পুণ্যাহে।

এ-উৎসব তিনটির সম্বন্ধে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। আশ্রম পত্রিকায়ও বিবৃতি আছে। তাই কেবল বলি পরে আর একটি উৎসবের দিন ধার্য করা হয়—

ঘ) ২৪-এ এপ্রিলে শ্রীমার পণ্ডিচেরিতে এসে কায়েম হবার দিন। এর পরে আর তিনি পণ্ডিচেরির বাইরে পদার্পণ করেন নি কখনো।

প্রতি দর্শন হত নিঃশব্দে অনবদ্য শৃংখলা ও শান্তির আবহে। আমরা একের পর এক গিয়ে গুরুদেব ও শ্রীমাকে প্রণাম করে তাঁদের আশীর্বাদ বরণ করে প্রত্যাবর্তন করতাম মহানন্দে।

৯) এছাড়া আর একটি স্মরণীয় দিন রাঙিয়ে উঠত প্রতি মাসের পয়লা তারিখে। সাধকেরা যে যা চাইত (কলম কাপড় কাগজ

ফোনালে ইত্যাদি। লিখে পাঠিয়ে দিত শ্রীমা সে সব বিলি করতেন। চমৎকার ব্যবস্থা: কেউই দোকানে গিয়ে কিছু কিনত না।

এর পরে আর একটি স্মরণীয় দিন ধার্য হয় প্রতি রবিবার বিকালে। শ্রীমা আমার ঘরে এসে বসে আমাদের আট-দশজনের রকমারি প্রশ্নের উত্তর দিতেন একের পর এক। একটি মার্কিন মহিলা শর্টহ্যান্ডে টুকে নিয়ে পরদিন টাইপ করে পাঠাতেন আশ্রমে, শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ দেখে দিলে (যাকে বলে পুনর্মার্জনা) সেই রিবাইটির অনেকগুলি কপি করা হত সাইক্লোস্টাইলে ও সাধকদের সবাইকেই এক এক কপি দেওয়া হত। পরে এগুলি Conversations with the mother শিরোনামায় ছাপা হয়েছিল গ্রন্থাকারে।

এ-কথাচক্রে থাকতাম আমরা আট-দশজন মাত্র। কাজেই অধিকাংশই যাঁরা বাদ পড়তেন কিছুটা সান্ত্বনা পেতেন কথালাপের অনুলিপি পড়ে।

পরে শ্রীমা মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে কয়েকজনকে তাঁর মোটরে নিয়ে যেতেন কোনো এক বিজন কুঞ্জে যেখানে ফের কথালাপ হত। কিন্তু মাত্র কয়েক মাস আমরা এ আনন্দ পেয়েছিলাম।

সংক্ষেপে এই-ই ছিল সে-যুগের আশ্রম-জীবনের বাহ্য কর্মপঞ্জী। এর পরে আসে শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলীর পর্ব—আমার কাছে যে-পর্ব বরণীয় হয়েছিল কীভাবে তার কিছু পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু বলা হয় নি এ-পর্বের উদ্ভব ও প্রগতির কথা। বলি।

(নয়)

বলেছি, শ্রীমা মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে পাঠাতেন আমার সঙ্গে কথালাপ করতেও বটে, আমার নানা প্রশ্নের উত্তর দিতেও বটে। আরো অনেক সাধক যেতেন তাঁর কাছে তাঁদের প্রশ্ন বা সমস্যা নিয়ে। কিন্তু তাঁর হাজারো কাজ—শতাধিক লোকের খাওয়াদাওয়া বসবাস খুঁটিনাটি দাবি-দাওয়ার সমাধান—কাজেই সাধকদের মধ্যে অনেকেরই নানা প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। তাই অগত্যা শ্রীঅরবিন্দ ঠিক করলেন সাধকেরা চিঠি লিখে কোনো প্রশ্ন করলে তিনিই জবাব দেবেন পত্রে। বলাই বাহুল্য এদের মধ্যে প্রশ্নাঘাতে অগ্রণী ছিলাম আমিই। এই হল গুরুদেবের পত্রাবলীর উদ্ভব। প্রথমদিকে তিনি প্রত্যহ পাঁচ সাতজনের প্রশ্নের জবাব দিতেন রাতে ঘণ্টাখানেক ধরে। কিন্তু আমি তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত চিঠি পেয়ে সবাইকে দেখাবার ফলে তারাও সোল্লাসে "জয় গুরু" বলে আমার মতন তাঁকে পত্রাঘাত সুরু করল—শ্রীঅরবিন্দ তাদের নিরস্ত করলেন না—লিখে চললেন চিঠির পর চিঠি। যতদূর মনে পড়ে ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি এই পত্রপর্বের সূচনা হয়। কিন্তু দেখতে দেখতে বানের জলের মতন প্রশ্নের ঢেউ ফুলে উঠল—ফলে শ্রীঅরবিন্দ চিঠি পড়তে ও লিখতে রাতের পর রাত দু'তিন ঘণ্টা সময় নিয়োগ করতেন শোবার আগে।

কিন্তু স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ পত্রপাঠক তথা পত্রলেখক—লোকে মেতে উঠল—যার ফল হল দারুণ: তিনি রাত ন-টা থেকে আরম্ভ করে দশটা এগারোটা বারোটা একটা পর্যন্ত সমানে চিঠি লিখতেন—কখনো কখনো দুপাতা তিনপাতা চারপাতা—আমাকে ছ'সাত পাতার চিঠিও লিখতেন অনেক সময়। শেষে এমন হল যে, তিনি শুতে যেতেন শেষ রাতে—অর্থাৎ প্রত্যহ সাত আট ঘণ্টা স্বহস্তে চিঠি লিখে তবে। এ আমার ভক্তোচ্ছ্বাসী অতিরঞ্জন নয়—কেউ সংশয় প্রকাশ করলে সাক্ষী তলব করতে পারি শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তকে যিনি এসব চিঠি বিলি করবার ভার নিতেন দিনের পর দিন।*

এ যদি তাঁর ধৈর্য তথা করুণার চূড়ান্ত প্রমাণ বলে কেউ গণ্য করতে না চান তবে আমি নাচার। কারণ এই নিয়ে আমরা দিনের পর দিন বিস্ময় প্রকাশ করেছি উল্লাসের গমকে তাঁকে কারুণিক মহানুভব ও সহিষ্ণু শিরোপা দিয়ে। ভেবে পাইনি কেমন করে ১৯৩০ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি এইভাবে অশ্রান্ত চিঠি লিখেছিলেন। ১৯৩৮ সালে নভেম্বরে পড়ে গিয়ে তাঁর উরুর হাড় ভেঙে না গেলে পত্রপর্ব কখনই অকস্মাৎ শেষ হত না। এরপরে তিনি আর চিঠি লিখতেন না, তবে আমার কন্যাশিষ্যা গীতরাজ্ঞী উমা বসুর অকালমৃত্যুর পরে আমি ব্যথিত হয়ে তাঁকে এক দীর্ঘ পত্র লেখার পরে তিনি কেবল আমাকে ফের চিঠি লেখা সুরু করেন। তিনি যে-চিঠিটি লেখেন সেটি সুদীর্ঘ-তারিখ, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২। সে-চিঠিটি পেশ করব পরিশিষ্টে—এখানে শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হব যে, তাঁর উরুভঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে আমাকে আবার চিঠি লিখবেন কথা দিয়েছিলেন তাতে আমি শুধু যে সান্ত্বনা পেয়েছিলাম তাই নয় অভিভূত হয়েছিলাম যার ফলে আমার বিষাদের কুয়াশা কেটে গিয়েছিল সত্যিই। প্রতিভা মনকে চমকে দেয়, কিন্তু সব সময়ে প্রাণকে স্পর্শ করতে পারে না যেমন পারে স্নেহ দরদ সমবেদনা প্রীতি—এই অঙ্গীকার যে, দরদী আমার ব্যথার ব্যথী।

এখানে পত্রাধ্যায়ের ভূমিকা শেষ করবার আগে শুধু আর [illegible]টি কথা বলতে চাই। তিনি আমাকে যত চিঠি লিখেছেন তার সংখ্যা ৪০০০ একথা বলেছি—ফটোপ্রিন্টার গুণে আমাকে জানিয়েছেন বলে। আমি এসব চিঠির মধ্যে বোধহয় অর্ধেকেরও বেশি টাইপ করে বাঁধিয়ে রেখেছি চারটি খণ্ডে—একুনে ৯২৫ পৃষ্ঠা। এর মধ্যে আমার নিজের লেখা চিঠি ২৫ পৃষ্ঠার বেশী হবে না। তাই বলা চলে অকুতোভয়ে যে তাঁর চিঠির টাইপ-করা পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯০০-এর কম হবে না। এছাড়া আর সবাইকে যত চিঠি লিখেছেন শুনলে কত দাঁড়াবে বলতে পারি না। তবে সব জড়িয়ে অন্তত হাজার দুই পৃষ্ঠা হবেই হবে!

(ক্রমশঃ)

---

* একদিন রাত তিনটের সময় তিনি চিঠি লিখতে লিখতে থেমে গিয়ে, পরদিন আবার লিখেছিলেন সপরিহাসে:
"The lights went out, the lights went out!" শেষে
"So I have to wait till tomorrow. Pondichery Municipality volente ......" শেষ পুনশ্চ:
"Joy Joy!! Joy!! I have done It—both letters written, done this time" Sri Aurobindo Came to Me আমার দ্রষ্টব্য Chapter, Avowedly Personal.

রূপসীর খাতা

সাজ-সজ্জা ও রূপচর্চা নিয়ে কতকগুলি প্রশ্ন আমার কাছে এসেছে সেগুলিকে একসঙ্গে মোটামুটি সাজিয়ে উত্তর লিখছি—। ঠিক মতন প্রসাধন করতে জানা আজকের দিনে প্রতিটি মহিলারই মনের ইচ্ছা। নিজেকে সুন্দর দেখানর প্রয়াস ছোট-বড় সবারই আছে। কিন্তু প্রসাধনের সময় কতকগুলি সাধারণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন—যাঁরা চশমা পরেন (এবং কারুর কারুর পাওয়ার এতো বেশী যে চোখ দেখতে বেশী গোল ও বড় দেখায় মনে হয় উপর দিকে উঠে আসছে) তাঁদের পক্ষে ঠিক কি রকমের চোখের সাজ হবে এ প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে। এছাড়া যাঁরা 'কনট্যাকট লেন্স' ব্যবহার করেন তাঁরা কিভাবে কি করবেন তারও প্রশ্ন এসেছে। এই সব ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয়ে খেয়াল রেখে চলা উচিত।

প্রথমত যাঁদের চোখে চশমা তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই চোখ আঁকতে পারেন যেমন আগে আলোচনা করেছি। কিন্তু যদি দেখা যায় চশমা বেশি দিন পরার জন্য চোখের আকারের কোন অস্বাভাবিকতা ঘটেছে তাহলে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখে সাজতে হবে। অনেক সময় চোখ গর্তে ঢোকা মনে হয়। সেই ক্ষেত্রে চোখের ওপরের পাতায় মোটা করে লাইনার দিয়ে টেনে নেওয়া ভাল। এছাড়া চোখ আঁকার আগে অন্তত মিনিট ৫।৭ চোখের ওপর ভেজা তুলো দিয়ে চেপে রেখে দেওয়া ভাল। তাতে চোখ ফোলা ফোলা লাগে। আরও একটা কথা, চোখের নিচের পাতা কোন রকমেই কালো করা চলবে না। তবে যাঁদের চশমা পরার জন্য চোখ বাইরের দিকে বেরিয়ে আসছে তাঁরা নিচের পাতায় কালো পাতলা রেখা টানতে পারেন এবং নাকের পাশে অর্থাৎ চোখের শুরু পর্যন্ত কালো রেখে টেনে নিতে পারেন। তাতে চোখ একটু চাপা লাগবে। তবে ওপরে কোন কারণেই লাইনার লাগান যুক্তিযুক্ত হবে না।

যাঁরা কনট্যাকট লেন্স পরেন তাঁদের কতকগুলি বিষয়ে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। প্রথমত সমস্ত মুখের মেক-আপ সেরে তারপর হাত ভাল করে ধুয়ে লেন্স মুছে তা পরে নিতে হবে। এরপর 'লাইনার' ব্যবহার করা চলবে। লাইনার কিন্তু নিচের চোখের পাতায় দেওয়া চলবে না। এর কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত যদি লাইনার চোখের ভেতরে চলে যায় তাহলে লেন্সের ক্ষতি হবে।

দ্বিতীয়ত মেক-আপ নষ্ট হয়ে যাবে কারণ কনট্যাকট লেন্স থাকলে চোখ তুলো দিয়ে মোছা যাবে না। তৃতীয়ত লাইনারগুলি সাধারণত যে সব পদার্থ দিয়ে তৈরী হয় তা কনট্যাকট লেন্সের পক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং এই সব ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধান হয়ে চলা ভাল। এসব ক্ষেত্রে চোখের নিচের পাতায় কালো লাইন দিতে হলে ভাল জাতের চোখের পেনসিল ব্যবহার করা যায়।

রূপের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অঙ্গ হল চোখ। সুতরাং এই চোখ সুন্দর দেখাতে বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার। শুধু তাই নয় এই চোখ ভাল রাখার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা থাকা ভাল। চোখের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমি আগেই করেছি—সেগুলি একটু ভাল করে পড়ে নেবেন। তবে বিশেষ কোন রোগ থাকলে ডাক্তার দেখান ভাল। অনেক সময় চোখের পাতায় এক রকমের পোকা হয় ফলে পাতার চুল পড়ে যায় আর চোখ বিশ্রী দেখায়—। সেসব ক্ষেত্রে ডাক্তার দেখিয়ে সে বিষয়ে সঙ্গে সঙ্গে যত্ন নেওয়া উচিত। তাছাড়া বাড়ীতে নিজেরা যা করা যায় তা হল রোজ সকালে ঠাণ্ডা জল দিয়ে বেশ অনেকক্ষণ চোখ ধোয়া। তারপর এক কাপ গরম জলে ২।৩ ফোঁটা ডেটল দিয়ে সেই জল তুলো দিয়ে চোখের ওপর আস্তে আস্তে মুছে দিতে হবে। সকালে প্রথম রোদের লাল আভার দিকে চেয়ে থাকতে হবে। ভিটামিন 'এ' ও বি নিশ্চয়ই করে খেতে হবে। ওষুধ ও পথ্য দুই ভাবে। রাত্রে শোয়ার আগে চোখের পাতার ওপর দুধের সর লাগিয়ে গুলে নতুন চুলই শুধু হবে না চোখের পাতার পুষ্টি হবে। এই নিয়মগুলি নিয়মিত পালন করলে ফল পাবেনই।

আরও একটা প্রশ্ন এসেছে—চোখের নিচে গোটা গোটা মতন হয় আবার মিলিয়ে যায়। এগুলি সাধারণত যাঁরা চশমা পরেন তাঁদের হয়—গরম ঘাম ও চশমার ফ্রেমের কারণে। একবার ডাক্তার দেখান ভাল। তবে সাধারণভাবে আর একটা কাজ করা যায় যেমন মুখে গরম জলের ভাপ নেওয়া। এতে ঘাম ও চামড়ার ভেতরের তেল জমে যে গোটার সৃষ্টি হয় তা গলে যায় তাছাড়া পর্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা জ দিয়ে মুখের ঐগুলির ওপর তুলো দি মুছে নেওয়া। এতে দেখা গেছে ওগু মিলিয়ে যায়। এই সঙ্গে মাঝে মাঝে চন্দ বেটে রাত্রে শোয়ার আগে লাগিয়ে শোয় তবে চন্দন রোজ দেওয়া ভাল নয়—১৫ দি একবারই যথেষ্ট। মুখে শাদা শাদা ছো দেখা যায় এও একটা মুস্কিল। এই শা ছোপ সাধারণত লিভারের গণ্ডগোল থে হয়। তাই ডাক্তারের পরামর্শই সবচে প্রয়োজন। ওষুধের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি আরও কিছু করা যায়। যেমন অলিভ তে লেবুর রস দিয়ে সেটা গরম করে মু আলতোভাবে লাগিয়ে রাখা। পরিমাণ এ রকম হবে—বড় চামচের দুই চামচ অলি তেল তার সঙ্গে একটা আস্ত পাতিলেব রস। তেল মেখে থাকতে হবে অন্তত ১ ১৫ মিনিট। তারপর গরম জল ও সাবা দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। মুখ ধু শুকনো করে মুছে বোরোলীন মাখতে হবে তবে মনে রাখতে হবে য বোরোলীন মে রোদে যাওয়া চলবে না। আর দুধের সঙ্গে সঙ্গে মধু ১।২ ফোঁটা মিশিয়ে সে দুপুরের দিকে শাদা জায়গাগুলি পেস্টের মতন করে লাগিয়ে রাখতে হবে পরে বিকেলে ঠাণ্ডা জল দিয়ে বেশ ক মুখটা ধুয়ে ফেলতে হবে। এইভা নিয়মিত ১৫।২০ দিন করলেই আমার ম হয় সুফল পাওয়া কঠিন হবে না। সপ্তা ২।৩ দিন এসব যত্ন করলেই সব ভ হয়ে যাবে, তা পরীক্ষা করে দেখা গেছে।

এভাবে আমাদের নিজেদের বাড়ী ছোট ছোট ব্যবস্থা করলে অনেক কিছু সমস্যার হাত থেকেই উদ্ধার পাওয়া যায়।

এমন অনেক ছোট বড় প্রসাধনে অসুবিধাকে আমরা অনায়াসে একা বুদ্ধি ও চেষ্টা দিয়ে ঠিক করে নি পারি কাঁচা দুধ দুধের সর কাঁচা হলুদ মধু মুশুরী ডাল ইত্যাদি কতকগু জিনিস যা প্রতি ঘরে পাওয়া যায়—সেগু ঠিক মতন ঠিক সময়ে ব্যবহার করলে না উপকার পাওয়া যায়। শুধু জানতে হ কিভাবে এগুলি ব্যবহার হয় এবং কে কারণে। আগেকার দিনে মহিলারা রূপচর্চা করতেন। এসব জিনিস দিয়ে আর প্রকৃতি বুকে জন্মানো রং দিয়ে নিজেদের রাঙাতেন তাই দেখা গেছে তাঁদের রং ও রূপ দুই খুব সুন্দর ছিল। বিখ্যাত বিশ্বসুন্দরী যেমন ক্লিওপেট্রা মেরী আনতনিয়ে ইত্যাদিরা গাধার দুধে স্নান করতেন ও ম আঙুরের রস ফলের পাপড়ি ইত্যাদি সাহায্যে প্রসাধন করতেন।

কিন্তু আজকের দিনে আমরা এসবে ব্যবহার প্রায় ভুলেই গেছি। আমার বিশ্ব ওসবের ব্যবহার আবার সুরু করলে র যৌবন বাঁধা পড়ে যাবে সবার জীবনে।

—বরবর্ণিনী

সুলেখার অসুখ

সুনীল গুহ

'আপনার গায়ে জ্বর নাকি?' হাতটা সোজাসুজি ওর গায়ের উপর চলে এলো। নিজের হাতে স্পর্শ নিয়ে জ্বর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে চাইল সুলেখা।

প্রশান্ত সহাস্য বিনীত কণ্ঠে বলল, 'না জ্বর নয়, তবে ভালো লাগছে না, এই আর কি।

একটু চা করে দিই আপনাকে?

না না, তার কোন প্রয়োজন নেই। আপত্তি জানায় ও। সুলেখার উৎসাহটা দমে যায়। বোধ হয় ওকে এখন একটু চা করে দিতে পারলে খুব খুশী হত সে। কিন্তু সরাসরি আপত্তি জানিয়েছে প্রশান্ত, এবং আলাপ পরিচয় তত গভীর নয় বলে—আপনাকে একটু চা খেতেই হবে গোছের কোন কথা বলে যে জেদ ধরবে তা সম্ভব হল না। গায়ে জ্বর কিনা, সেটা দেখতে গিয়ে গায়ে হাত দেবার সময় হাতটা কেঁপে উঠেছিল একবার, এখন আবার সেইরকমের তত্রটা কোন বাড়াবাড়ি করার সাহস হল না। তাই নিজের আবেগকে পুরোপুরি দমন করে রাখতে বাধ্য হল।

ঘরের ভিতরে নৈঃশব্দ। ওদের দুজনেরই বুঝি বলবার মত আর কোন বক্তব্য ছিল না। তাই দুজনেই কথাহীন চুপচাপ। আবার তাও-ও বেশীক্ষণ ভালো লাগল না, নৈঃশব্দটা অস্বস্তিকর। প্রশান্ত জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল, সুলেখার চোখ ঘরের ভেতরেই এদিক ওদিক। দু এক পলক অবশ্য ওর দিকেও। অতঃপর আর বেশী সময় চুপ করে থাকাটা তেমন ভালো নয় বলেই যেন আবার ওর দিকে তাকিয়ে বলল, একটু সাবধানে থাকবেন, এদিকে শুনছি প্রায় বাড়িতেই সর্দিজ্বরের প্রকোপ চলছে।

বাইরে থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে আনবার সময় দেয়ালে টাঙানো আয়নায় নিজের মুখোমুখি হল ও। বেরোবার সময় চুলে চিরুনি দিতে ভুলে গেছে আর তারই ফলে সত্যি একটা জ্বরের রোগীর মত দেখাচ্ছে ওকে। তারপর আয়না থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে বলল, এরই মধ্যে এদিকের সব বাড়ির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে ফেলেছেন নাকি?

না, তা অবশ্য সম্ভব হয়ে ওঠেনি এখনো, আমাদের বাড়িতে যে মেয়েটা কাজ করে—সে কাল রাতে বলছিল এসব কথা।

আবার কথা বন্ধ। আবার সেই নৈঃশব্দ। আবার সেই অস্বস্তি। দুজনেরই যেন ভালো লাগছিল না সেটা। তাই প্রশান্ত আবার বলে আপনার বাবাকে দেখছি না যে, কোথাও গেছেন বুঝি?

হ্যাঁ, বাজারে গেছেন, এখুনি এসে পড়বেন, আপনি বসুন।

বসতে অবশ্য কোন আপত্তি নেই ওর। শুয়ে বসে দিন কাটাবার জন্যই ত এখানে এসেছে। কলকাতায় দিনের পর দিন শুধু কাজ আর কাজ। মাঝে মাঝে এমনি ফাঁক খুঁজে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে এদিক ওদিক। পরশু রাত্রে গাড়িতে এদের সঙ্গে

আলাপ। একই কামরায় পাশাপাশি বসে এসেছে। ভিড় ও ঠেলাঠেলিতে ঘুমোবার কোন সুযোগ ছিল না। সারারাত বসে বসে আলাপ পরিচয় থেকে আরো কত নানান কথাবার্তা। আর তারই ফলে সামান্য কিছু ঘনিষ্ঠতা। ভোরের দিকে একটা স্টেশনে গাড়ি থামতেই সাগ্রহে তিন কাপ চা নিয়েছিল ও। ভবতোষবাবু কুণ্ঠিত হয়েছিলেন। সুলেখার সংকোচটুকুও চোখ এড়ায়নি ওর। চা খেতে খেতেই ভবতোষবাবু বলেছিলেন, ওখানে গিয়ে যেখানেই থাক না কেন রোজ একবার আসবে কিন্তু বেশ গপ্পসপ্প করে সময় কাটানো যাবে।

কাল আর সময় হয়ে ওঠেনি। বলতে গেলে সারাটা দিন প্রায় ঘুমিয়েই কাটিয়েছে, পরশু সারারাত ঘুমোয়নি, তদোপরি গাড়ির পরিশ্রম। তাই কাল দিনের বেলাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেনে ঘুমিয়েছে। কলকাতা থেকেই এখানকার বাসা ঠিক করে এসেছিলেন ভবতোষবাবু। গাড়িতে বসেই ঠিকানা লেখা ছোট্ট চিরকুটটা ওর হাতে দিয়েছিলেন। আজ ভোরের দিক থেকে ঘুমের আর তেমন কোন বেগ ছিল না। তাই ভিতর দিক থেকেই মনটা আজ এখানে আসি আসি করেছে। এখানে আসতেই সুলেখা বলল কাল আর এদিকে এলেন না যে।

শরীরটা ভালো ছিল না, তাই।

এখানকার আশেপাশে প্রায় বাড়িতেই যে সর্দিজ্বরের রোগী আছে বলে শুনেছে সঙ্গে সঙ্গে সেটা মনে পড়ে গেল সুলেখার। বলল শরীর খারাপের নাম শুনলেই আমার ভীষণ ভয় করে।

শুনে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ও তাকালো সুলেখার দিকে। দৃষ্টির মানেটা বুঝতে দেরী হল না সুলেখার। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল,—পুরো একটি মাস জ্বরে ভুগেছি।

ও তাই নাকি?

এবারে সুলেখার দিকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখল ও। মেয়েটা যেন সেদিনকার গাড়ির তুলনায় আজ অনেক স্বাভাবিক। যাকে বলা যায় মন্দ নয়। পরশু সন্ধ্যে থেকে মাঝরাত অবধি ত মেয়েটা কোন কথাই বলেনি, বসে বসে শুধু ওর আর ভবতোষবাবুর কথা শুনেছে। ঠিক শোনাও বলা যায় না তাকে। কেমন এক ধরনের নিস্পৃহভাবে তাকিয়ে ছিল যেন। তারপর এক কথায় দু কথায় ধীরে ধীরে দাঁড়িয়েছে। আজ একেবারে গায়ে হাত দিয়ে জ্বর কিনা, সেটা দেখতে চাওয়ার মধ্যে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছে। আবার একবার তাকালো ও সুলেখার মুখের দিকে। মন্দ নয়। মনের মধ্যে আপনা থেকেই যেন কথাটা ঘুরপাক খেলো একবার। তারপর আবার তাকিয়ে থাকল বাইরের দিকে।

ভবতোষবাবু বাড়ি নেই এখন। যে আছে তার সঙ্গেও পরশু গোটা একটা রাত এবং পরের দিনের খানিকটা সময় গাড়িতে কাটিয়েছে। মিষ্টভাষী এবং সদালাপী বলে ভবতোষবাবুকে খুবই ভালো লেগেছিল ওর। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই সুলেখাকেও।

এই ধরনের সহযাত্রীরা গাড়িতে সময় কাটানোর জন্য খুবই উপকারী বন্ধুর কাজ করে। দীর্ঘদিন জ্বরে ভুগেছে এই মেয়েটি। এক মাস জ্বরে ভুগে ওঠা বড় কথা নয়। তাই ডাক্তারের পরামর্শে ওকে নিয়ে ভবতোষবাবু এখানে এসেছেন হাওয়া বদলের জন্য।

কী আর বলব, সপ্তাহ খানেক ধরে নানান চেষ্টা করে তবে আজ বেরিয়েছি। কথায় কথায় ভবতোষবাবু সেদিন রাত্রে মধ্যবিত্ত পরিবারের নানান ঝামেলার কথা গাড়িতে বসে এক এক করে শুনিয়েছিলেন ওকে। ও শুধু শুনছিল। কিন্তু ভালো লাগছিল না। ঘরের বাইরে এসেও যত সব ঝামেলার কথা। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল একটা হিংস্র পশু যেন ওকে তাড়া করছিল। এসব কথা সম্বন্ধে এমনি ভয় ওর। তাই তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সুলেখার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, যেখানে যাচ্ছেন, স্বাস্থ্য উদ্ধারের পক্ষে সে জায়গাটা কিন্তু মন্দ নয়।

বলতে বলতে সেই প্রথম ও সুলেখার চোখের উপর চোখ রেখেছিল। সুলেখা তখন শুধু একটু স্মিত-হাসির সঙ্গে নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল নীরবে। শুধু ভদ্রতাটুকু লক্ষ্য করেই নয়, ওর বক্তব্যে বুঝি সন্তুষ্টও হয়েছিল সে।

আরে তুমি? ঘরে ঢুকে ওকে দেখে ভবতোষবাবু অবাক। বললেন, কতক্ষণ এসেছ?

এইত একটু আগে।

বেশ, বেশ। বলে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন যাও ত মা বেশ ভালো করে চা নিয়ে এসো ত আগে। সুলেখা উঠে রান্নাঘরের দিকে গেলো। আর ওর যেন আরো অনেকখানি সহজ হবার সুযোগ এলো। এবারে ভবতোষবাবুর দিকে তাকিয়ে ও বলল কেমন লাগছে এখানে?

খুব ভালো, তবে একেবারে নিরিবিলি এই যা একটু অসুবিধে।

মনে মনে হাসল ও, অথচ ওর এখানে আসা শুধু একটু নিরিবিলিতে বিশ্রামের জন্য, আর এই সব ভদ্রলোকেরা চান যেখানেই যাবেন সেখানেই যেন কলকাতার কোলাহলটা সঙ্গে থাকে। কিন্তু ও এখানে এসে [illegible] শুধু খাওয়া আর ঘুম। পয়সা খরচ করে বাইরে আসায় আর কোন কারণ থাকতে পারে বলে ও মনে করে না।

সুলেখা চা নিয়ে এলো। ওর সামনে ধূমায়িত চায়ের কাপটা রাখতে গিয়ে অজান্তেই বুঝি হাতটা কেঁপে উঠল একবার। ভবতোষবাবুর লক্ষ্য এড়ালো না তা' বললেন, কী রে, এতেও তোর সেই চঞ্চলতা? ঝাঁকুনি লেগে ভরা কাপ থেকে একটু পড়ে গিয়েছিল টেবিলে। নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়ে সেটুকু মুছতে মুছতে ওর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল একবার। ও যেন খানিক অস্বস্তি বোধ করল। বলল, আরে কাপড়টা নষ্ট করলেন কেন আমার কোন অসুবিধে হত না।'

—না না ঠিক আছে ভবতোষবাবু সুলেখাকে সমর্থন করলেন। একটু থেমে থেকে আবার বললেন, এই সব চঞ্চলতার জন্য বাড়িতে মা'র কাছে রোজ বকুনি খায়, তবু এত বড় মেয়ে এখনো শুধরে চলার চেষ্টা করে না।

—'তাই নাকি?' হাসি পেলো ওর। তেমনি হাসতে হাসতেই সুলেখার দিকে তাকালো একবার। মনে মনে ভাবল, এত সময় ধরে যে মেয়েটার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল, বা পরশু সারারাত যার সঙ্গে গাড়িতে পাশাপাশি বসে এতদূর এসেছে তার সম্বন্ধে এর আগে কিন্তু এমন কোন ধারণাই ওর মনে আসেনি। অবশ্য ভবতোষবাবু ব্যাপারটায় যত গুরুত্ব দিচ্ছেন ও ততটা দিতে চায় না। এই বয়সে এমন এক আধটুকু চঞ্চলতা হলেও হতে পারে।

সুলেখাদের বাড়ি থেকে ফিরে আসতে আসতে মনে মনে নানান কথা পর্যালোচনা করে দেখতে লাগল ও। পথের পরিচয় শেষ হয়ে মুছে যেতে দুদিনের বেশী সময় লাগবে না। অথচ কথায় কথায় কেমন যেন একটা জড়িয়ে যাওয়ার ভাব। এমনি আসতে যেতে পথে প্রান্তরে এর আগেও নানান দেশের নানান জনের সঙ্গে কত আলাপ পরিচয় হয়েছে, তারা সবাই মন থেকে মুছে যেতে কেউই তেমন বেশী সময় নেয়নি। কিন্তু এ যেন কেমন লাগছে, পথের আলাপ পরিচয় থেকে একেবারে যাতায়াতের পর্ব পর্যন্ত শুরু হয়ে গেল। আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ভদ্রলোক। না গেলেও তেমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না। হয়ত আর কোনদিন দেখা হত না। মুছে

যেত তেমনি মন থেকে। অথচ সকাল থেকে মনের ভিতরে নিজের মনেরই একটা অব্যক্ত টানাটানি, সেই বেগের আবেগকে নিজেও পারেনি রুখতে। তাই গিয়েছিল। কথায় কথায় বেলা হয়ে গিয়েছিল। যাকে বলে বেশ বেলা, অন্যমনস্কতা ভেঙেছিল ভবতোষবাবুর কথায়—'খাওয়াটা আজ এখানেই হোক না।'

—'না না তা হয় না আরেকদিন হবে সেটা।'

সুলেখা একটু জোর দিয়ে বলেছিল, 'না আজই হবে সেটা।'

শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেটা আর হয়নি। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে এড়িয়ে আসতে পেরেছে। ও বেরোবার সময় সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল সুলেখা। দরজায় হাত রেখে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেছিল—'অন্যদিন কিন্তু আর এসব ওজর আপত্তি শুনব না।'

—'আচ্ছা আচ্ছা।' সহাস্যে হাত তুলে বিদায় নিয়ে আসতে পেরেছে। তখন হাসি ছিল সুলেখার মুখে, আর সেই হাসিটুকু যেন এক বিচিত্র আনন্দদায়ক উপকরণের মত বুকের মধ্যে ঝুলে রয়েছে। অবাক লাগছে। এত কিছু মনে করেনি আগে। একজন ভদ্রলোকের সবিনয় আহ্বান, সেই আহ্বানের প্রতি ভদ্রতাবশেই সাড়া দেওয়া। তেমনি কিছু নয়। তবু যেন অনেক কিছু। আর সেই অনেক কিছু যে কী, সেটা যেন এখন আর বুঝতেই পারছে না ও।

বোর্ডিংএ ফিরে দাঁতে ব্রাশ গুঁজে জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল। জানালা দিয়ে দৃশ্যমান বাইরের অদূরে একটা টিলা। সেখানে দৃষ্টি প্রতিহত, তবু সেদিকে তাকিয়ে থাকতেই যেন এখন ভালো লাগছে ওর। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা বিস্মৃত। মেয়েটার রূপ আছে কি নেই এতবড় একটা অসুখ আসলে সেটা জানতে দিতে চায় না তবু যা আছে তারও বুঝি কোন তুলনা নেই। সেই তুলনাহীন রূপের ইশারা এখন ও একটু একটু করে টের পাচ্ছে। চোখ মুখের আদলে, হাত পায়ের গড়নে, দৃষ্টি বিকীরণে, যেন এক গোপন ইঙ্গিত, সবই ঘুমিয়ে আছে শরীরটা একটু ভালো হলেই জেগে উঠবে সব। রূপসী সুলেখাকে আর ইশারার মধ্যে খুঁজতে হবে না, আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে সে।

কিন্তু তাতে ওর কী! তাড়াতাড়ি ব্রাশ ঘষতে লাগল দাঁতে। অনেক বেলা হয়ে গেছে। সম্বিত ফিরে এলো ওর। খেয়েদেয়ে টেনে ঘুমুতে হবে। তারপর বিকেলে সোজাসুজি ওই টিলার পাদদেশে। বসে বসে সময় কাটাবে। নানান চিন্তায় জড়িয়ে পড়ছে এ সব ভালো নয়। কয়েকদিনের অবসর নিশ্চিন্ত আরামে কাটানো দরকার। সুলেখা কে? কোথা থেকে এসেছে, কী হয়েছে তার, দেখতেই বা কেমন, এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কী ওর। না, এসব বাজে চিন্তার কোন দরকার নেই। দাঁত ঘষতে ঘষতে গিয়ে বাথরুমে ঢুকল ও।

ভবতোষবাবু লোকটা মন্দ নয়। বেশ ভদ্রলোক। দুপুরে শুয়ে ভাবল ও। তাড়াতাড়ি আপন করে নেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর। তবে একটু বেশী কথা বলেন আর কি। সকালে হাত কেঁপে গিয়েছিল সুলেখার সেটা কি সত্যি চঞ্চলতা, না আর কিছু, একটা অব্যক্ত সঙ্কোচ থেকেও সেটা হতে পারে। কখনো কখনো যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেও অমন ঘটনা ঘটে যায়। তাই বলে ওর সামনে অমন করে বলাটা ভবতোষবাবুর উচিত হয়নি। নিজের মেয়েকে বলবেন তিনি তাতে অবশ্য ওর বলার কিছু থাকতে পারে না, তবু এটা কি উচিত হয়েছে তাঁর?

আবার যেন সেই একই চিন্তায় জড়িয়ে পড়ছে। পাশ ফিরল ও। একটু ঘুমোনো দরকার চোখ বুজল ও। ঘুম নয় ঘুমের সাধনা। একটু বিশ্রাম। পাশ ফিরে চোখ বুজে পড়ে রইল। বই আছে স্যুটকেসে। পড়ার জন্য এনেছে কিন্তু ইচ্ছে করল না বার করতে। তার চেয়ে ঘুমোনো ভালো। আবার এ-পাশ হলো, দু চারদিন পরেই আবার ফিরতে হবে। এ দু চারদিন একটু এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি আছে। এদিকের দশ বিশ মাইলের মধ্যে যা আছে, তাই একটু দেখতে শুনতে হবে। মনে মনে এ পরিকল্পনা করেই বেরিয়েছে।

—'আমাদের বেরুবার সময় কোথায় মেয়েটার অসুখ তাই মন্দের মধ্যেও সুযোগ হলো।' পরশু রাত্রে গাড়িতে বসে ভবতোষবাবু বলছিলেন। শুনতে ওর কেমন যেন লাগছিল। অবশ্য তাঁর যদি এ সুযোগটা না হত তবে ওরও কি সুযোগ হত এমন একটা প্রীতিকর আলাপ পরিচয়ের। অসুখের নির্যাতনে যে খুবই নির্যাতিতা সুলেখা সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখছিল না। মেয়েটার দিকে বারবার তাকিয়ে সেটা বারবারই বুঝতে পারছিল ও। এখন সেই ছবিটা স্পষ্ট হতে থাকল ওর মনে। একটা প্রবল বন্যা যেন তার প্রচণ্ড বেগের ধাক্কায় ভেঙে নিয়ে গেছে একেবারে। সুলেখার মুখখানা বারবার মনে পড়তে লাগল। চোখ বুজে পড়ে থেকে ও স্পষ্ট দেখতে পেলো সেই মুখখানা।

ঘুম আসছে না। ভারী বিশ্রী লাগছে যা হোক। মাথার মধ্যে নানান চিন্তার কিলবিল। নিজের উপর বিরক্তি বোধ করল ও। এতসব কথা দিয়ে ওর দরকার কী? পথের দাগ পথের ধুলোতেই মুছে যাবে। অনাবশ্যক এত কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার কোন মানে হয় না। আজ সকালে না গেলেও হত। কিন্তু নিজের সঙ্গেই যে পেরে উঠল না ও। যেন ছুটে যাবারই দরকার ছিল।

—'মাঝে মাঝে এদিক ওদিক একটু ঘুরে বেড়াতে আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে।' ও বলেছিল। শুনে ভবতোষবাবু বলেছিলেন—'ঘর সংসারের ঝামেলা থাকলে আর ওটা সম্ভব নয়।'

এ কথাতেই ওর ঘোরতর আপত্তি। এই ঘর সংসারের কথাটাতেই ওর গা কেমন শিউরে ওঠে। একটা যেন শক্ত বাঁধন। সবাই সেই বাঁধনে জড়িয়ে পড়ে যেন বাঁচে। সব ব্যাপারেই সেই এক অজুহাত।

আজ গোটা দুপুরটা আর ঘুমোতে পারল না। মাথার ভিতরের কিলবিলটা যতবার সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে, ততবারই যেন নানান কথা নিয়ে আরো বেশী কিলবিল করে উঠেছে। হাত ঘড়িটায় চোখ বুলিয়ে অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, আজ আর ঘুম হবে না, বেলা শেষ হয়ে গেছে। এমনি বাইরে এলে ওর যেন ঘুমের আকাঙ্ক্ষা বাড়ে।

জামা-কাপড় পরে বাইরে এসে পান-বিড়ির দোকানের সামনে গিয়ে দোকানীকে বলল 'দাও সিগারেট দাও ত একটা।' সব সময় সিগারেট খায় না ও। কখনো-সখনো খায়। এখন ইচ্ছে হল, তাই। সিগারেট ধরিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই টানতে লাগল। মন্দ লাগছে না। মাঝে মাঝে সিগারেটে এরকম আরাম বোধ করে ও। এখন গিয়ে সোজা বসবে সেই টিলার নিচে। অনেক লোকজন আসে ওখানে। কাল বিকেলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখেছে ও। পরিবেশ মনোরম। বইটা নিয়ে এলে হত। বসে বসে অন্তত অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত ত পড়া যেত। যাকগে ভুল হয়ে গেছে যখন, তখন আর দরকার নেই বরং চুপচাপ গিয়ে বসে থাকাই ভালো।

বেশ লাগছিল। নানান দেশের মানুষ। অনেক জায়গা থেকেই এখানে লোকজন বেড়াতে আসে। স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায়ও আসে কেউ কেউ। নিচে সবুজ ঘাসের গালিচা উপরে সুবিস্তৃত আকাশ, আর এদিকে একপাশে টিলার দেয়াল, অন্যপাশে শহরের যাত্রা শুরু। কলকাতার প্রচণ্ড ভিড়ের তুলনায় এটাকে নির্জন জনপদ বললে অত্যুক্তি হয় না।

—'আরে আপনি এখানে?'

সবিস্ময়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, সুলেখা। বলল, 'হ্যাঁ, এখানে এসে বসেছি একটু।'

সঙ্গে ভবতোষবাবু। ওর সামনে এসে তিনি বলেন 'মেয়েটাকে নিয়ে কী বিপদেই পড়েছি, আজ আবার দুপুরের দিকে শরীরটা খারাপ হয়েছে ওর খেতে বসেও খেতে পারেনি।'

ও তাকিয়ে দেখল সুলেখার দিকে। না, তেমন ত কিছু মনে হচ্ছে না। বরং একটা হাসিখুশী ভাব তার চোখমুখকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে।

—'কী হয়েছিল আপনার?'

—'কী জানি আপনি চলে আসার পর থেকেই কেমন যেন লাগছিল।'

কেমন এক প্রচন্ড ধাক্কায় যেন বিচলিত বোধ করল প্রশান্ত। মনে হল নিজের চোখ-মুখ যেন কালো হয়ে যাচ্ছে। যথাসম্ভব নিজেকে সামলে নিয়ে বলল,—'একটু সাবধানে থেকে নিজেকে আগে সুস্থ করে তুলুন।'

—'বলত একটু ভালো করে ও'কে বুঝিয়ে।' ভবতোষবাবু সায় দিলেন ওর কথায়।

মনটা আসলে সারা দুপুর ওর নিজেরও ত ভালো ছিল না। যাকে বলে বিশ্রী একটা ভাব। ঘুমের সাধনা করেও একটু ঘুমুতে পারল না। অথচ আবার যেন সেই ব্যাধিতে এখানে এসে ধরা পড়ল।

সুলেখা এবারে একেবারে ওর মুখোমুখি বসে বলল 'এরকম লাগছিল কেন বলুন ত?'

—'কী জানি হয়ত কোন কোন সময় এরকম লাগে।'

—'তাই বুঝি?'

—'হ্যাঁ তাই।'

ঘাসের নরম গালিচায় ভবতোষবাবু পুরোপুরি শুয়েই পড়েছিলেন। আশ্চর্য, ঘুমিয়েও পড়েছেন। ও সুলেখার দিকে তাকালো। সুলেখা বলল, 'বাবার ওইরকমই একটা অভ্যাস।'

ও হাসল। বলল, 'বাঃ! বেশ ত।'

—'আপনি আমাদের ওখানে খেলেন না, মনে হল আজ দুপুরে বুঝি খাওয়া হয়নি আপনার।' সুলেখা আস্তে আস্তে বলল।

—'না না আমি বেশ খেয়েছি আজ।'

—'তবু আমার এরকম মনে হচ্ছিল কেন বলুন ত?'

—'কেন এরকম মনে হচ্ছিল বলুন ত?' প্রশান্ত অবাক হয়।

—'আপনিই বলুন।'

একটু থেমে, আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত বলল 'হয়ত অসুখের পরে দুর্বলতার জন্য এরকম মনে হয়।'

সুলেখা ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল শুধু। ওদিকে ভবতোষবাবু নির্বিঘ্নে ঘুমুচ্ছেন। কী রকম অবাক লাগল প্রশান্তর। এরকম ঘুমও আবার ঘুমুতে পারে নাকি মানুষ। সুলেখা যেন নিশ্চিন্ত মনে কথা বলতে পারছে।

বলল —'তারপর একদিন ত এখান থেকে চলে যাবেনে।'

—'যেতে ত হবেই।'

—'আর দেখা হবে না।'

—'কী করে বলব আর নাও হতে পারে।'

সুলেখার মুখমন্ডল কালো আকার ধারণ করল। প্রশান্ত নিস্পৃহভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন এসবে ওর মনে কোন রেখাপাত করে না। একথা সেকথায় ক্রমে ক্রমে রাত্রি হল। তারপর একসময় ওরা উঠল। ফেরে যার যার গন্তব্যস্থলে।

আরো দিন চারেক কেটে গেলো এই-ভাবে। সকালে সুলেখাদের ওখানে। বিকেলে এই টিলার নিচে মনোরম ঘাসের বুকে। এড়াতে চেয়ে নিজেই এড়াতে পারেনি ও। রাত্রে যদি শপথ নিয়ে থাকে যে, আর যাবে না। তবে সকালেই ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে হাজির হয়েছে ভবতোষবাবুর ওখানে। এবার ওর কলকাতায় ফিরে যাবার পালা। সুলেখা বলল —'যাবার সময় কিন্তু এখান থেকে খেয়ে যেতে হবে।'

—'আচ্ছা তাই হবে।'

যাওয়ার সময় গাড়ির যথেষ্ট সময় ছিল তবু তাড়াহুড়ো করে সুলেখা ওকে খাইয়ে নিল, তারপর ভবতোষবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল—'চল বাবা ওকে স্টেশনে তুলে দিয়ে আসি।'

ভবতোষবাবু বললেন —'চলো তাই যাই।' বলে পকেট থেকে একটা খাম বার করে বললেন, 'এটা কলকাতায় পেঁৗছেই ডাকে ফেলে দিও একটু তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে বাড়িতে।'

খামটা নিয়ে ও পকেটে রাখল। তখনো হাতে অনেক সময়। গাড়ি ছাড়বে সেই মাঝরাতের কাছাকাছি গিয়ে। তবু ওরা বেরিয়ে পড়ল। ক'টা দিন বেশ কাটলো। মনে মনে এখন ও স্বীকার করল ও এটা।

'আপনি ত চলে যাচ্ছেন আবার যদি আমার শরীর খারাপ হয়?' ও'র কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল সুলেখা।

—'না খারাপ হবে কেন আপনি খুব শীগগিরই সেরে উঠবেন।'

—'আমার কিন্তু ভয় করছে।'

—'না ভয়ের কী আছে আপনার বাবাই ত আছেন।' এই প্রথম সুলেখার সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে গিয়ে কণ্ঠস্বর আড়ষ্ট হল ওর।

—'বাবা ত আছেন কিন্তু আপনি যে চলে যাচ্ছেন।'

কোন কথা বলল না ও। আসতে আসতে দেখা যেতে যেতে ছাড়াছাড়ি, যা স্বাভাবিক, তাই। তবু যেন কোথাকার এক গোপন ব্যথা ভিতর থেকে গুমরে উঠছে। যা ভাষা হয়ে ফুটে বেরোয় না, মূক করে দেয়। তাই কোন কথা আর বেরোয় না ওর মুখ দিয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে সুলেখার দিকে ভবতোষবাবু স্টেশনের এদিক-ওদিক পায়চারি করতে করতে এটা-ওটা দেখছেন।

—'আর কটা দিন থেকে গেলে পারতেন।'

—'সম্ভব নয়। এ-কদিনেরই ছুটি নিয়ে ছিলাম অফিস থেকে।' প্রশান্ত হাসল।

—'বাবা যে খামটা দিয়েছেন ওতে আমাদের ঠিকানা আছে।'

—'ওটা আমি আলাদা কাগজে টুকে নেব।'

অবাক মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে আবার তাকালো সুলেখা ওর দিকে। ক্রমাগত যেন ভিতর থেকে কথা বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। অথচ আরো যেন কথা ছিল সুলেখা যেন ওর দিকে আর তাকাতেও পারছিল না। ইচ্ছে হচ্ছিল এ-গাড়িতেই আবার চলে যেতে। এখানে যেন আর ভালো লাগছে না।

ভবতোষবাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'চিঠিটা কিন্তু কালকেই ডাকে ফেলে দিও।'

—'আমাদের বাড়িতে একদিন আস-বেন।' বাবার সামনেই সুলেখা বলল।

—'হ্যাঁ। নিশ্চয় আসবে কিন্তু।' ভব-তোষবাবু সায় দিলেন।

আবার অস্বস্তিকর নীরবতা। লোকের ভিড়। গাড়ির শব্দ। কুলীদের বেপরোয়া ছুটোছুটি। গাড়ির সময় এগিয়ে আসছে। চারিদিকে গোলমাল যেন চরম মুহূর্তের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সুলেখা বলল —'ক'দিন খুব ভালো কাটল।।' একই কথার পুনরাবৃত্তি।

—'আমারও।' একটু থেমে থেকে প্রশান্ত আবার বলল —'একটু সাবধানে থেকো হয়ত কলকাতা গিয়েও ভাবতে হবে আমাকে!'

সুলেখার ইচ্ছে হচ্ছিল ভালো করে ওর মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু পারল না। বুকের ভিতরটা মোচড়ে উঠছে। ঠোঁট কাঁপছে। কন্ঠনালী শুকিয়ে কাঠ। দূরের দিকে তাকিয়ে নিজের ভেজা চোখদুটো প্রশান্তর দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখতে চাইল। আর কোন কথা নেই। ক্রমে গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে এলো। স্টেশনের উত্তেজনা চরমে। অথচ ওদের মনে হচ্ছে স্টেশনে ওরা ছাড়া যেন আর কেউ নেই। নিজের পকেট থেকে ছোট্ট একটা কাগজ বার করে সুলেখার হাতে দিয়ে প্রশান্ত বলল—'এই ঠিকানায় আমাকে চিঠি দিও রোজ দিও রোজ কেমন থাক জানিয়ে রোজ চিঠি লিখো।'

গাড়ি ছেড়ে দেবার মুহূর্তে ঘোষণা করা হল। ভবতোষবাবু এগিয়ে এলেন। বললেন 'ওটা কিন্তু কালকেই পোস্ট করে দিও। প্রশান্ত ঘাড় কাত করে জানালো, দেবে। তারপর গাড়ির যাত্রা শুরু। গাড়ির জানালা দিয়ে শেষবারের মত আরেকবার সুলেখার দিকে তাকিয়ে দেখল ও।

দেশ বিদেশের খেলা

মার্গারেট কোর্ট

ষাট দশকের বিশ্ব মহিলা লন টেনিসের আসল দ্বন্দ্বমুখর। প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এক বছরের নায়িকা পরের বছরে মুকুটহীনা। ঘন ঘন স্বর্ণসিংহাসনের হাত বদল। তবে পালা বদলের পালা সীমিত ছিল দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী মার্গারেট কোর্ট ও বিলি জিন কিংএর মধ্যে। বস্তুত ষাট দশককে কিং ও কোর্টের দশক বলে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়। তবে উভয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে কোর্ট স্বকীয় ক্রীড়াকীর্তির দীপ্তিতে অনেক বেশী উজ্জ্বল।

কুমারী জীবনে নাম ছিল মার্গারেট স্মিথ। অস্ট্রেলিয়ার শহরতলী অ্যালবেরির এক গাঁয়ের মেয়ে। টেনিস খেলা শুরু করে ছেলেবেলাতে। মাত্র সতের বছরে ১৯৬০ সালে অস্ট্রেলিয়া মহিলা লন টেনিসে চ্যাম্পিয়ান হয়। ১৯৬২ সালে ফ্রেঞ্চ অস্ট্রেলিয়ান, ইটালীয়ান টেনিস প্রতি-যোগিতায় মার্গারেট শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি লাভ করে এবং ঐ বছর উইম্বলেডন প্রতি-যোগিতার প্রথম রাউণ্ডে বিলি জিন কিং-এর কাছে ১-৬, ৬ ৩, ৭ ৫ সেটে হেরে যায়। কিন্তু কোর্ট ছাড়বার পাত্রী নয় সে। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৩ সালের উইম্বলেডন ফাইনালে কিংকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ১৯৬৫ সালে কোর্ট পুনরায় উইম্বলেডন ফাইনালে বিজয়িনী হয়। এবং ছাব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর প্রায় সবকটি টেনিস খেতাবের অধিকারিণী। তবে মার্গারেটের খ্যাতি পরের বছরই নিষ্প্রভ হয়েছে কিং এর কৃতিত্বের পাশে। বিলি জিন কিং ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৬৮ পর পর তিন বছর উইম্বলেডন জয় করে নজীর সৃষ্টি করে।

ষোল মাস সাময়িক অবসর গ্রহণের পর মার্গারেট পুনরায় টেনিস কোর্টে ফিরে আসে এবং তার পুরনো প্রতিপক্ষ কিং এর বিরুদ্ধে অস্ট্রেলীয় ফাইনালে অবতীর্ণ হয়। কিং মাত্র চল্লিশ মিনিটের লড়াইয়ে কোর্টকে ৬—১, ৬—২ সেটে পেছনে ফেলে নিজের খ্যাতি অক্ষুন্ন রাখে। ক্রীড়া সমীক্ষক ফ্র্যাঙ্ক রোদস্টেন মন্তব্য করেন—মেলবোর্ন কোর্টে এই দশকের দুই প্রধানের

উল্কার মত ক্ষণস্থায়ী কিন্তু চির উজ্জ্বল

মধ্যে এই ফাইনাল খেলাকে কোন ম্যাচ হিসেবে গণ্য করা যায় না। বস্তুত ষোল মাসের আগের মার্গারেট কোর্টের যেন আত্মবিলুপ্তি ঘটেছিল। পাঁচ ফুট ন ইঞ্চি লম্বা দীর্ঘাঙ্গী মার্গারেট কোর্টের শারীরিক ক্ষমতা দৈহিক নমনীয়তা মাবের চাতুর্য সব দাপট যেন শেষ হয়ে গেছিল।

পরের বছর কোর্টকে স্বমূর্তিতে ফিরে আসতে দেখি। ১৯৬৯ সালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চারটি প্রতিযোগিতার মধ্যে উইম্বলেডন ছাড়া আর তিনটিতে বিজয়িনী। অস্ট্রেলীয় ফাইনালে বিলি জিন কিংকে সরাসরি পরাজিত করে কোর্ট নিজস্ব দীপ্তিতে পুনরায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

স্বীকৃতির চুলচেরা বিচারে ১৯৭০ সাল কোর্টের টেনিস জীবনে স্মরণীয় বছর। টেনিসের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'গ্র্যান্ড স্লাম' লাভ করে কোর্ট টেনিসের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করে। একই বছরে চারটি প্রথম সারির টেনিস প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করাকেই বলা হয় গ্র্যান্ড স্লাম লাভ। উইম্বলেডন, ফরাসীর অস্ট্রেলীয় এবং ফরেস্ট হিলসে যুক্তরাষ্ট্রীয় টেনিসে সাফল্যের জোরেই গ্র্যান্ড স্লাম লাভ করে কোর্ট অবিস্মরণীয় অধ্যায় সৃষ্টি করে। ইতিপূর্বে একমাত্র মার্কিন মেয়ে 'লিটল মো' বা মরিন কনোলী সতের বছর বয়সে ১৯৫২ সালে গ্র্যান্ড স্লাম লাভ করার গৌরব অর্জন করে। স্মরণ করা যেতে পারে মাদাম সুজেন উইলস মুডি মায় বিল টিলডেন প্রমুখ অতীতকালের টেনিস পটিয়সীরাও কেউ গ্র্যান্ড স্লাম পাননি। মহিলাদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক খেতাব জয়ের বিশ্বরেকর্ড করেন মার্গারেট কোর্ট। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আসরে একাধিকবার ত্রিমুকুট জয়ের সম্মান লাভ করেছেন। একই বছরে সিঙ্গলস ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস খেতাব পেয়েছেন। আমেরিকান টেনিসে তিনি উপর্যুপরি পাঁচ বছর মিক্সড ডাবলস খেতাবে ভূষিতা। এবং বার বার মিক্সড ডাবলস জয় করে রেকর্ড করেন।

আন্তর্জাতিক আসরে শ্রীমতী কোর্টের ৪৭টি প্রথম শ্রেণীর খেতাব জয় মহিলা ও পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর খেতাব জয়ের বিশ্বরেকর্ড আজও অম্লান হয়ে আছে। ছেলেদের মধ্যে এই খ্যাতির অধিকারী ডোনাল্ড বাজ একবার ও রড লেভার দুবার।

১৯৭০-এর মহিলা উইম্বলেডন ফাইনালে মার্গারেট কোর্ট সেন্টার কোর্টে পনের হাজার দর্শকের সামনে তাঁর শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া কৃতির পরিচয় প্রদান করে। চরম উত্তেজনায় সারা বিশ্বের টেনিস-রসিকরা আলাপ আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। কে জিতবে কিং, না কোর্ট? ১৪—১২, ১১—৯ সরাসরি সেটে অতি সহজেই কোর্ট চির প্রতিদ্বন্দ্বী বিলি জিন কিং-কে পরাজিত করলে সব উত্তেজনার পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিশ্ববিশ্রুত টেনিস-তারকা মার্গারেট কোর্ট ফ্রেঞ্চ সিঙ্গলস খেতাব পায় ১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৬৯, ১৯৭০ ১৯৭৩-এ অর্থাৎ মোট পাঁচবার। ১৯৭৩ সালে অস্ট্রেলীয় খেতাব জয় করে। আর সারাজীবনে কোর্টের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ২৩টি। অস্ট্রেলীয় ১১, ফ্রেঞ্চ ৫, উইম্বলেডন ৩ এবং আমেরিকান ৪।

মার্গারেট কোর্ট এখন সন্তানের মা। স্বামী ব্যারী ও সন্তান নিয়ে ঘোর সংসারী। টেনিস কোর্ট থেকে প্রায় সম্পূর্ণ সরে গেছে। কিন্তু নিভে যাবার আগে দীর্ঘ দিনের পর ১৯৭০ সালে কোর্ট যেন হঠাৎ উল্কার মত আকস্মিকভাবে জ্বলে উঠেছিল। এই বছরে অর্জিত দুর্লভ গ্রান্ড-স্লাম লাভ কোর্টকে বিরল কৃতিত্বে চিহ্নিত করেছে। তাই মনে হয় দীর্ঘ নিস্তব্ধতার পর ১৯৭০ সালে কোর্টের শেষ আবির্ভাব অনেকটা যেন ক্ষণস্থায়ী উল্কার মত, কিন্তু চিরউজ্জ্বল।

—প্রশান্ত দাঁ

খেলার জগতে মেয়ে

শ্রেষ্ঠ উইকেটকীপার ইলা রায়চৌধুরী

— হকিতে সেন্টার-ফরওয়ার্ড খেলি, বাস্কেটবলে খেলি রক্ষণভাগে আর ক্রিকেটে আমি উইকেটকিপিং-ই বেছে নিয়েছি।

কথা হচ্ছিল গতবারের বারাণসীতে অনুষ্ঠিত মহিলা ক্রিকেটে ট্রফি বিজয়ী বাংলা দলের উইকেটরক্ষক ইলা রায়-চৌধুরীর সঙ্গে। গত বছরই স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। মহিলা হকিতে খেলে সফি কমার্শিয়ালের দলে। টেবলটেনিসও খেলে।

এত রকম খেলায় যোগ দেবার ফলে ইলার পক্ষে চটপট নড়াচড়া করা খুব সহজ হয়ে উঠেছে। তাই বলের পীচ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও বলের নিশানা সঠিক আন্দাজ করে নিতে পারে। ইলা বলে, উইকেটকিপিং করার সময় সর্বক্ষণ নজর রাখি আমাদের বোলার কোন দিকে বল পীচ করছে। বাস্কেটবল, হকি আর টেবল টেনিস খেলা অভ্যাস থাকার জন্য এই ভারী প্যাড পরে উইকেটের পিছনে বসে থাকলেও আমি চট্ করে বলের দিকে সরে যেতে পারি। জোর বলই হোক আর আস্তে বলই হোক, তাড়াতাড়ি জায়গামত সরে যেতে পারি বলে আমার বল ধরতে অসুবিধা হয় না। আমি অফের দিকে ঝুঁকে থাকি। কারণ জানেন তো অধিকাংশ বলই অফ স্টাম্পের দিকে পড়ে; কারণ প্রায় বোলারের বলই অফের দিকে থাকে।

— ব্যাটসম্যান বলে খোঁচা মারল কিনা কি করে বুঝতে পার?

— কি করে জানি তা ব্যাখ্যা করতে না পারলেও, বলটা যে ব্যাট ছ‍ুঁয়ে এসেছে তা কিছুটা বুঝতে পারি। তাছাড়া আমি এল বি ডবলিউ-ও আন্দাজ করতে পারি। বেশ কয়েকবার এল বি ডবলিউ-র কল দিয়ে সফল হয়েছি।

— তোমার দলের বোলারদের মধ্যে কার বল ধরতে অসুবিধা হয়?

— শর্মিলার বল। ও ন্যাটা হাতে স্পিন বল করে, মাঝে মাঝে বেশ জোরে বল ছাড়ে। সে-সময় উইকেটের কাছ থেকে ওর বল ধরতে একটু অসুবিধা হয়, সে-কথা স্বীকার করতে সঙ্কোচ নেই।

— তুমি এই ক্রিকেট দলে এলে কি করে?

— আমার ক্রিকেট খেলার খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল বহুদিন থেকেই। হকি বা বাস্কেটবল খেলার সুযোগ পেয়েই তা কাজে লাগিয়েছি। যখনই শুনলুম ক্রিকেট দল গঠিত হচ্ছে, তখনই যোগ দেবার ইচ্ছা জাগে। ময়দানে এসে অলকাদি-দের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এ'রা আমাকে উইকেটকীপার হিসাবে টেস্ট করে দলে স্থান দেন।

ইলা ব্যাটেও বেশ রপ্ত। হকির সেন্টার-ফরওয়ার্ডের পক্ষে ক্রিকেটে ব্যাট কব্জা আয়ত্ত করতে খুব অসুবিধা হয় না। ইলারও হয়নি। ওর আশা দলের প্রশিক্ষক সুনীল দাশগুপ্তের অনলস প্রশিক্ষণের কল্যাণে ও দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হতে পারবে। ওর একটা সুবিধা উইকেটের পিছনে থেকে বলের গতির ওপর একটানা চোখ রাখার ফলে ব্যাটিংয়ের সময় বিপক্ষের বল বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না।

— তবে ব্যাট চালানোটা ঠিকমত করার জন্য ভালরকম অনুশীলন দরকার ত বটেই।

বারাণসীর আসরে বুন্দেলখণ্ডের বিরুদ্ধে খেলার দিন ইলা প্রতিপক্ষ ব্যাটস (উও)-ম্যানের বিরুদ্ধে এল বি ডবলিউ-র আবেদন জানিয়ে সফল হয়। মহিলা ক্রিকেটে বোম্বাইয়ের নামডাকের কথাও ও জানত। তাই বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে খেলার সময় মনে ওর কিছুটা অনিশ্চয়তার মেঘ জমেছিল। কিন্তু বোম্বাই দলকে হারাবার পর—

— আমি মহারাষ্ট্র আর ফাইনালে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে খুব আস্থার সঙ্গে খেলেছি। কেন জানি না, আমার কেবলই মনে হয়েছে এ-খেলায় আমরা জিতবই।

ঐ আসরে ইলাই সর্বশ্রেষ্ঠ উইকেট-রক্ষকের সম্মান অর্জন করে। অর্থাৎ বর্তমানে ভারতের মহিলা ক্রিকেটে বাংলার ইলা রায়চৌধুরীই শ্রেষ্ঠ উইকেটকীপার।

— আমি এখন ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যাব। বলে ইলা।

ইলা থাকে সিঁথিতে। বাবা পরলোকগত। মা আছেন। মামার বাড়ী থেকেই পড়াশোনা এবং খেলাধুলো চালিয়ে যাচ্ছে।

ওর খুব ইচ্ছা আগামী বছর ভারত সফরে আগত অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে 'টেস্ট' ম্যাচে ভারতীয় দলে খেলার সুযোগ পায়। সেজন্যে অবশ্য ওর প্রস্তুতিতে কোন ঘাটতি নেই। সিঁথি থেকে যাচ্ছে নর্দার্ণ পার্কে নিয়মিত অনুশীলনের আশায়। এখনকার ট্রাম-বাসের অসুবিধা সম্পূর্ণ তুচ্ছ করে ইলা প্রতিদিন সকালে বা বিকালে অনুশীলন করতে যায়। ওর ঐকান্তিক আগ্রহ সত্যিই উল্লেখ করার মত। বাংলার ক্রিকেট দলে এই ধরনের একনিষ্ঠ খেলোয়াড় থাকলে এ-রাজ্যে মেয়েদের ক্রিকেট খেলার উৎকর্ষ দেখা যাবে নিশ্চয়ই। এই ধরনের নিষ্ঠা অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করবে। অনেকেরই ধারণা, সাধারণ পরিবারের মেয়েরা বাঁধা নিয়মে ছক-বাঁধা জীবনযাপন করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু ইলাদের মত মেয়েরা সেই পুরনো ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে দিতে চলেছে। এই সঙ্গে যদি সরকারী ও বে-সরকারী অফিস বা প্রতিষ্ঠান এদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে, তাহলে বাংলাদেশে নানা খেলায় মেয়েরা অধিক সংখ্যায় যোগ দিতে এগিয়ে আসবে।

সাক্ষাৎকার শেষ করে ফিরে আসার সময় তাই ইলাকে বলে এলুম বিধিমাফিক ঠিক ঠিকভাবে 'হাউজ দ্যাট' করলে তোমার খ্যাতি বাড়বে—অন্যায়ভাবে যেন প্রতিপক্ষকে 'স্টাম্প' কোরো না।

—অময়

মাঠের নায়ক

সমীরেন্দ্র মল্লিক

সমীরেন্দ্র ক্যালকাটা জিমখানার স্ট্রাইকার। ঘরোয়া ফুটবলে ক্যালকাটা জিমখানা কোন প্রথম সারির দল নয় এবং সমীরেন্দ্রও খুব নাম-ডাকওয়ালা ফুটবলার নন। কিন্তু এক ডাকে চেনার মত ফুটবল চরিত্র না হলেও সমীরেন্দ্রের আচরণে উজ্জ্বল সম্ভাবনার সংকেত বিদ্যমান।

সমীরেন্দ্র অর্থাৎ সমীরেন্দ্র মল্লিকদের গোটা পরিবারটিকে স্পোর্টসম্যান ফ্যামিলি বলে চিহ্নিত করলে বোধ হয় কিছু বাড়িয়ে বলা হবে না। কারণ ছ' ভাই এবং তিন বোনের মধ্যে অনেকেই আজ রাজ্যের বিভিন্ন ক্রীড়াঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত। ছ ভাইয়ের মধ্যে একজন ফুটবলে বাঙলা রাজ্য দলকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। দুজন প্রতিনিধিত্ব করেছেন ভলিবলে। একটি বোন রাজ্য স্কুল ভলিবল দলের অন্যতম সদস্যা ছিলেন।

সমীরেন্দ্র স্ট্রাইকার। গড়ের মাঠের অন্যতম তরুণ কৃতী স্ট্রাইকার বলে অভিহিত করলেও হয়তো সমীরেন্দ্র সম্পর্কে অত্যুক্তি করা হবে না। নিশানায় প্রায় নির্ভুল স্যুটিংয়ে সপ্রতিভ, পজিসন জ্ঞান ত্রুটিহীন পরিশ্রমে অকুতোভয় এবং ক্রীড়াবিন্যাসে নিটোল সমীরেন্দ্র সত্যি সত্যিই যেন মাঠের নায়ক। পেনাল্টি সীমানার মধ্যে পায়ে বল পড়লে সমীরেন্দ্র আর গড়িমসি করেন না, 'পত্রপাঠ' গোলে সট নেন। এইটি তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ। সত্যি কথা বলতে কি 'হীরো'-মার্কা খেলোয়াড়রাও তো আজকাল আত্মবিশ্বাসের অভাবে পারতপক্ষে গোলে বল মারেন না।

ফুটবলে প্রথম পাঠ পেয়েছেন সমীরেন্দ্র নৈহাটি অ্যাথলেটিক ক্লাবে। বাবা শ্রীশচন্দ্র মল্লিক (অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সাব-ইন্সপেকটর) এবং মা বরাবরই ফুটবলে উৎসাহ দিতেন। মাথায় ছোট্ট, রোগা ডিগডিগে বাচ্চা ছেলে। মা-বাবা, ভাই-বোন অন্যান্য আত্মীয়স্বজনই শুধু তাঁকে ফুটবলে উৎসাহ দেন নি উৎসাহ দিয়েছেন মন্টু রায়ও। প্রকৃতপক্ষে ঐ মন্টুবাবুই সমীরেন্দ্রকে কলকাতার বহু বিচিত্র বহুখ্যাত কুখ্যাত গড়ের মাঠ চেনালেন! এ ঘটনা ১৯৬৬ সালের, মন্টুবাবু ওঁকে নিয়ে এলেন ইস্টার্ণ রেলওয়েতে। সমীরেন্দ্রের বয়স তখন বড়জোর সতেরো। পড়েন নৈহাটি ঋষি বঙ্কিম কলেজে। সমীরেন্দ্র শুধু ফুটবল নিয়েই মাথা ঘামান না, লেখাপড়ায়ও তিনি রীতিমত সিরিয়াস। তার প্রমাণ সসম্মানে বি এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া (১৯৬৯)। কিন্তু সপ্তাহের সাত দিন ফুটবলের নেশায় মাঠেবাটে কাটিয়ে রাত জেগে পরীক্ষার পড়া তৈরী করে পাশ করে লাভ হোল কতটুকু? মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সমীরেন্দ্রের তো আজ পর্যন্ত একটা ভাল চাকরী জুটলো না।

বর্তমান চাকরী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে। পর্ষদের টিম যাচ্ছে কলকাতার বাইরে অফিসের সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। তাই রোজ প্র্যাকটিসের জন্য ঠেঙিয়ে আসতে হচ্ছে নৈহাটি থেকে শেয়ালদা আর সেখান থেকে সেই দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। প্র্যাকটিসের পর যথারীতি ডায়মন্ডহারবার রোডের অফিসে এবং ছুটির পর ট্রাম-বাসের অসহ্য অসভ্য ভিড় ঠেলে আবার শেয়ালদায়, এবং তারপর ট্রেনে নৈহাটিতে।' কথাটা বলেই সমীরেন্দ্র একটু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। যেন বলতে চাইলেন : কি আরামে আছি দেখুন না! আজ না হয় প্র্যাকটিস অফিসের কিন্তু সাত বছর ধরেই তো আমাকে এহেন দৌড় ঝাঁপ করতে হচ্ছে নৈহাটি থেকে কলকাতায়। রোজই ফার্স্ট ট্রেনের প্যাসেঞ্জার আমি। খাওয়ার ঠিক নেই, ঠিক নেই নাওয়ার, ঘুমোবার। অনিয়ম চলছে তো চলছেই। এভাবে কতদিন চলবে ঈশ্বরই জানেন।

১৯৬৬ সালে সমীরেন্দ্র ইস্টার্ণ রেলের সাইড লাইনের ধারে বসা প্লেয়ারই ছিলেন লীগের খেলায় মাঠে নামতে পারেন নি কেননা অমন বাচ্চা ছেলেকে 'রিস্ক' নিয়ে মাঠে নামাবে কে? ৬৮ সালে চলে গেলেন হালের ফুটবলের অন্যতম নার্সারী উয়াড়ী অ্যাথলেটিক ক্লাবে। পাওয়ার লীগ খেললেন গুটি কয়েক। ৬৮ এবং ৬৯ সাল কাটলো ময়দানের উয়াড়ী ক্লাবেই। উয়াড়ীতে তেমন সুবিধে হোল না দেখে ১৯৭০ সালে অর্থাৎ পরের বছর জার্সির রঙ পাল্টালেন গেলেন বালী প্রতিভায়। পরের বছর ১৯৭১ সালে গেলেন টালিগঞ্জ অগ্রগামীতে এবং ১৯৭২ সালে ক্যালকাটা জিমখানায়। এখন পর্যন্ত ঐ ক্যালকাটা জিমখানা ক্লাবেই রয়েছেন।

ইতিমধ্যে যশোহরের (অধুনা বাংলাদেশ) ছেলে সমীরেন্দ্রের সর্বভারতীয় স্বীকৃতি মিলেছে ১৯৭৩-৭৪ সালে কৃষ্ণনগরে আয়োজিত জাতীয় জুনিয়র ফুটবলে পশ্চিমবঙ্গের হয়ে তিনি খেলেছেন। খেলেছেন বললে বোধ হয় কিছুটা কম বলা হবে কেননা প্রায় প্রত্যেকটি খেলায় সমীরেন্দ্র ছিলেন বাংলা রাজ্য দলের আক্রমণ শক্তির কেন্দ্রবিন্দু।

১৯৬৭ সালে বালী প্রতিভায় থাকার সময় সমীরেন্দ্র জীবনে প্রথম সুযোগ পান কলকাতার সিনিয়ার ডিভিসন ফুটবল লীগ খেলার। জীবনের প্রথম বড় ম্যাচ—টালিগঞ্জ অগ্রগামী বনাম মহামেডান স্পোর্টিং ১৯৭১ সালে। টালিগঞ্জ অগ্রগামীর ভৈরবদা (ভৈরব গাঙগুলী) ও সুশীল ভট্টাচার্য (প্রখ্যাত খেলোয়াড় ও কোচ) খেলার আগে আমায় সস্নেহে কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : 'সমীর পারবি তো? একদম ঘাবড়াবি না বড় ম্যাচ তো কি হয়েছে। ভয় করলেই ভয় বুক ফুলিয়ে লড়ে যা, এগারোজনে এক হয়ে লড়ে যা। আমরা এগারোজনে এক হয়েই সেদিন লড়েছিলাম, খেলা ড্র হয়েছিল।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলাধুলা

দর্শক

ডেভিস কাপ

জোহানেসবার্গে ডেভিস কাপের দ্বিতীয় ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা ৪—১ খেলায় ইতালীকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। এই ফাইনাল খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত। কিন্তু ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা উঠলে ভারত যে তার সঙ্গে খেলবে না তা আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। খেলাধুলোর আসরে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতির প্রতিবাদেই দক্ষিণ আফ্রিকার ডেভিস কাপ দলের বিপক্ষে ভারত খেলছে না। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা ফাইনালে না-খেলেই ডেভিস কাপ পেয়ে যাবে। ফাইনালে না-খেলে ডেভিস কাপ জয়—এরকম ঘটনা ডেভিস কাপের ইতিহাসে কখনও ঘটেনি। দক্ষিণ আফ্রিকা এই প্রথম ডেভিস কাপের ফাইনালে উঠলো। ভারত ফাইনালে উঠলো দুবার, প্রথম উঠেছিল ১৯৬৬ সালে।

ভারতের ডেভিস কাপ জয়ের উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের না-খেলার সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধি মহলে বিশেষভাবে অভিনন্দিত হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক লন টেনিস ফেডারেশনের সভাপতি ওয়াল্টার ই এলকক বলেছেন, ভারত ফাইনালে না খেললে ভারতের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব অথবা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসরে দক্ষিণ আফ্রিকা অনেকবার জল ঘোলা করে শেষ পর্যন্ত গলাধাক্কা খেয়েছে। তবু তার লজ্জা নেই। এই ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার আসরেই ১৯৬৪ সালে পোল্যান্ড, ১৯৬৮ সালে রুমানিয়া এবং ১৯৬৯ সালে পোল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া খেলাধুলোর আসরে বর্ণবৈষম্য নীতির প্রতিবাদ হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলেনি।

এইসব প্রতিবাদের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা কয়েকবছর ডেভিস কাপের খেলায় যোগদান করতে পারেনি। এবছর পুনরায় ডেভিস কাপের খেলায় যোগদান করে আবার প্রতিবাদের ঝড়ের মুখে পড়েছে। ভারতের লন টেনিস ফেডারেশনের সম্পাদক আর কে খান্না পুনরায় ঘোষণা করেছেন, পৃথিবীর কোন দেশের মাটিতেই আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলবো না। আমাদের পূর্ব-সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন হবে না।

অজিত ওয়াদেকার

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার সেপ্টেম্বর ৩০ তারিখের এক সাংবাদিক সম্মেলনে ক্রিকেট খেলা থেকে তাঁর অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করে বলেন, ভারতীয় ক্রিকেটের স্বার্থেই তিনি আজ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর নিচ্ছেন। তাঁর এই অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁর চাকরী এবং পারিবারিক জীবনের স্বার্থও যে জড়িত আছে তিনি তার উল্লেখ করেন।

ওয়াদেকারের বর্তমান বয়স ৩৩। তিনি প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলেন ভারত সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৯৬৬ সালে। ওয়াদেকার ১৯৭১ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হন। এবং তাঁর নেতৃত্বে ভারত উপর্যুপরি তিনটি টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়ী হয়—১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এবং ১৯৭২-৭৩ সালে পুনরায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। এই বিরাট সাফল্যের পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৭৪ সালের টেস্ট সিরিজে ভারত শোচনীয়ভাবে হেরে যায়। ওয়াদেকারের নেতৃত্বে ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে যে ১৬টি টেস্ট ম্যাচ খেলে তার ফলাফল : ভারতের জয় ৪, হার ৪ এবং খেলা ড্র ৮। এখানে উল্লেখ্য, ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে তাঁরই নেতৃত্বে ভারত টেস্ট খেলায় প্রথম জয়ের মুখ দেখেছিল।

টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ওয়াদেকারের পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে : খেলা ৩৭ ইনিংস ৭১, নটআউট ৩ বার, মোট রান ২১১৫, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৪৩ (বিপক্ষে নিউ-জিল্যান্ড ১৯৬৭-৬৮), সেঞ্চুরী ১ এবং গড় ৩১-১০।

টেবিল টেনিস অনুষ্ঠান

জব্বলপুরের ভিক্টর বার্ণ হলে অনুষ্ঠিত আমন্ত্রণী এবং পূর্ব ভারত টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপান তিনটি খেতাব জয়ী হয়েছে—আমন্ত্রণী টুর্ণামেন্টে পুরুষ ও মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব এবং পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়ানশীপে পুরুষদের ডাবলস খেতাব।

আমন্ত্রণী টেবল টেনিস ফাইনাল

পুরুষদের সিংগলস : এম ইসিদা (জাপান) ২১-১৮ ২১-১৮ ও ২১-১৬ পয়েন্টে ভারতের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান মনজিত দুয়াকে পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিংগলস : ফুনিকো ওনো (জাপান) ২২-২০, ২১-১২ ও ২১-১২ পয়েন্টে স্বদেশের কিওমি মিৎসুজোয়াকে পরাজিত করেন।

পূর্ব ভারত টেবল টেনিস ফাইনাল

পুরুষদের সিঙ্গলস : জাতীয় চ্যাম্পিয়ান মনজিত দুয়া ২১-১১, ২১-১৩, ১৯-২১ ও ২১-১৪ পয়েন্টে সুধীর ফাদকেকে পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিংগলস : শৈলজা সালোখে ২৩-২১, ২৩-২৫ ২১-১৩ ও ২১-১২ পয়েন্টে নন্দিনী কুম্ভকারণীকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : টি মিওসী এবং সুগি য়োয়াসাকি (জাপান) ১৪-২১, ২১-১৬ ও ২১-১৪ পয়েন্টে স্বদেশের ইসিদা এবং সেরিকেয়াকে পরাজিত করেন।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সাঁতার

কলকাতার পূর্বাঞ্চলের সুভাষ সরোবরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় কলকাতা ছাত্র বিভাগে এবং গুজরাট ছাত্রী বিভাগে দলগত খেতাব জয়ী হয়েছে। ব্যক্তিগত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন পুণার অশোক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন পুণার অশোক সাহু এবং বোম্বাইয়ের কুমারী স্মিতা দেশাই। অশোক সাহু তাঁর দলের ২৯ পয়েন্টের মধ্যে একাই ২৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে দেন। তিনি এই পাঁচটি বিষয়ে প্রথম স্থান লাভ করেন—১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল ১০০ মিটার বাটারফ্লাই এবং ৪×১০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলী সাঁতার। বোম্বাইয়ের কুমারী স্মিতা দেশাই ১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল এবং ১০০ মিটার বাটারফ্লাই সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন। গতবারও কুমারী দেশাই তিনটি বিষয়ে প্রথম স্থান পেয়েছিলেন।

চূড়ান্ত পয়েন্ট তালিকা

ছাত্র বিভাগ : কলকাতা ৪০, দিল্লী ৩২ পুণা ২৯ বোম্বাই ১২ পিলানী ৮ কেরালা ৭ গুজরাট ৪ এবং হরিয়ানা ৩

ছাত্রী বিভাগ : গুজরাট ৪৩ বোম্বাই ৩২ কলকাতা ১০, পুণা ৮ এবং পাঞ্জাব ৬।

ওয়াটার পোলো : ফাইনালে কলকাতা ৪-৩ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে।

সন্ন্যাসী রাজা : উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী

প্রেক্ষাগৃহ

বায়োস্কোপিক

স্টুডিওতে সেদিন আমাদের লাঞ্চ ব্রেক হয়েছে। আমরা ক্যান্টিনে গিয়ে সবাই খেতে বসেছি। হঠাৎ দেখি, কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি ঢুকছেন। না না, আসল নয়, উনি নকল। স্টুডিওর দু-নম্বর ফ্লোরে সেদিন যে ছবির শুটিং চলছিল, আদালতের একটা জবরদস্ত দৃশ্য। বিচারপতি সেখান-কারই। একটা শটের শেষ এবং আর একটির শুরুর মধ্যে ফ্লোরে লাইট তৈরী করতে যে অবসর, তারই ফাঁকে ভদ্রলোক ধড়াচূড়ো পরে বেরিয়ে পড়েছেন খাবার সন্ধানে। বেঁটে খাটো গোলগাল ভারিক্কী চেহারা, বছর চল্লিশের মধ্যে বয়স। ভদ্রলোক আমাদের পাতের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে প্রশ্ন করলেন—টোস্ট পাওয়া যাবে?

ক্যান্টিনের ছেলেটি অবাক চোখে ভদ্র-লোককে দেখছিল, ঘাড় নেড়ে বলল—যাবে।

—তাহলে কড়া করে দুখানা দাও তো আমায়। গোলমরিচ দিয়ে। আর এক কাপ চা। আর এক গেলাস জল। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে—

বলে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ভদ্রলোক বসলেন। তারপর কি মনে হতে মাথার পরচুল মানে বিচারপতিরা যেমনধারা পরেন, সেটা খুলে রাখলেন টেবিলে। অমনি একটা টাক দেখা গেল, ঘামে চকচক করছে। তারপর ভদ্রলোক পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন। নিশ্চিত ডায়লগ।

ভাবুন, আদালতের একজন বিচক্ষণ জজ সাহেব বসে বসে ডায়লগ মুখস্থ করছেন আর আমরা সশব্দে লাঞ্চ ওড়াচ্ছি। ভদ্রলোক একবার ভ্রূকুটি হেনে আমাদের দিকে তাকা-লেন।

এ-সব দৃশ্য এখন চোখে সয়ে গেছে এখানে কেউ রাজা, কেউ উজির, কেউ ফকির সাজছে, তারপর ক্যামেরার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, শট দিচ্ছে, শুটিং প্যাক আপ হয়ে গেলে মুখের রং মুছে ভাউচারে সই করে টাকা গুনে নিয়ে বাড়ী ফিরছে, এখানে কেউ কারো ধার ধারে না।

এক কালের নায়ক প্রীতি মজুমদারের কথা মনে আছে? ও'র ডাকনাম টুকলু। সেই টুকলুদাকে একবার ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে এই রকমই এক লাঞ্চ ব্রেকের সময় দেখেছিলাম, রামভক্ত হনুমানের রূপসজ্জা নিয়েছেন। এতে একটুও বাড়িয়ে বলছি না, তরণীসেন বধ ছবিটির নাম, আমার পরিষ্কার মনে আছে। হনুমান সেজেছেন বলে ঢাউস একটা ল্যাজ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, ভদ্রলোক সেটাকে সামলাতেই যেন অস্থির। লাঞ্চ খেতে যাবার সময় মানুষে যেমন গড়গড়ার নল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গোল করে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখে ঠিক তেমনিভাবে ল্যাজটাকে গুটিয়ে হাতে ঝুলিয়ে ভদ্রলোক খেতে চলেছেন। দেখুন কী নিষ্ঠুর এই লাইন—হিরো থেকে হনুমান!

সেদিন জয়ন্ত এসে ক্যান্টিনে ঢুকে সেই বিচারক ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে বলল—পালিতদা, কেমন লাগছে?

বিচারকবেশী পালিত বিরস কণ্ঠে বল-লেন—আর ধরে মশায়, আগে জানলে কী

স্বীকারোক্তি : রঞ্জিত মল্লিক, সুমিত্রা মুখার্জি

রাজশ্রী বসু ॥ ফটো : অমৃত

আর জজসাহেব সাজতে রাজী হতাম? এই পার্টে বিস্তর হ্যাপা। দেখুন না তখন চেয়ারে বসে বসে একটুখানি ইয়ে করছিলাম অমনি ডিরেক্টারসাহেব আমায় মানা করলেন—

—কিয়ে করছিলেন?

—ওই যে কান চুলকাচ্ছিলাম। তা জজ বলে কী মানুষ কানও চুলকাবে না, এ্যাঁ? এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ। তারপর ধরুন দিয়েছে এই এক ভয়ংকর ডায়লাগ, কিছুতেই শালা মুখস্থ হচ্ছে না। বড় খটোমটো ইংরিজী—

জয়ন্ত যেন অভয় দিল।—হবে হবে, কিছু আটকাবে না। আরে আপনি হচ্ছেন গিয়ে......, তা আজকে আপনার আসামী কে ডকে?

—কিসে?

—ডকে?

পালিতবাবু রহস্য বুঝলেন না সম্ভবত।

বললেন—ডকে-ফকে বুঝি না ভাই, তবে আসামী তো দেখলাম উত্তমকুমার নিজে। ভয়ংকর এটা মামলা চলছে বলে মনে হলো—

জয়ন্ত চোখ টিপে হেসে বলল—সেকি মশাই, আপনি বিচারপতি অথচ আপনিই জানেন না কী মামলা? আপনাকে পার্ট পড়ায় নি?

পালিতবাবু বললেন—সে পড়িয়েছে। কি সব যেন ধারা-টারাও বলল কিন্তু ও আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি মশাই কখনও কোর্ট-কাছারীতে যাই না। আমার বড্ড ভয় করে—

—সে বললে তো হবে না আপনি পার্ট করবেন জজসাহেবের অথচ জজিয়তির কিছুই বুঝবেন না এটা হতে পারে না। অন্তত বোঝার চেষ্টা করা উচিত ছিল—

আর যায় কোথা, পালিতবাবু এবার যেন খেঁকিয়ে উঠলেন—থামুন তো। ...বুঝতে গিয়েই না ডিরেক্টারের ধমক খেলাম। উনি বললেন থাক, আইন বুঝে আর আপনার পার্ট করাতে হবে না। আপনাকে যা যা বলব তাই তাই চোখ বুজে করে যাবেন, বেশী কেরদানি ফলাতে যাবেন না, হুঃ। বুঝেছেন জয়ন্তবাবু আমায় আর জ্ঞান দেবেন না, সব গুবলেট হয়ে যাবে—

জয়ন্ত অগত্যা চেপে গেল। তারপর নিজের খাবারে মনোনিবেশ করল।

লাঞ্চের পর জয়ন্ত বলল—আরে পালিতবাবুকে তুমি চেনো না? যাচ্ছলে! আমাদের সব ছবিতেই ওঁকে একটু-আধটু পার্ট দিতে হয়। সখের অভিনেতা—

—আসলে করেন কী ভদ্রলোক?

জয়ন্ত মুচকি হেসে বলল—ভদ্রলোক পাচক ঠাকুর!

—যাঃ।

—আরে যা বলছি শোন, ভদ্রলোক বাস্তবিকই একজন হালুইকার। কলকাতার একটা নামজাদা ফাইভ স্টার হোটেলের নাম উল্লেখ করে জয়ন্ত বলল—অবশ্য পাচক বলতে যা বুঝি উনি অবশ্য তা নন, অত-বড় হোটেলের হেডকুক। দেশ-বিদেশের ভাল-মন্দ সব রকম সুখাদ্য রন্ধন করে ওঁকে খদ্দেরের পাতে পরিবেশন করতে হয়। লা গুমে অর্থাৎ খাদ্যতালিকার সমস্ত ব্যাপারটা ওঁর নখদর্পণে কয়েক ডজন অধঃস্তন পাচক নিয়ে ওঁকে রোজ এই কর্মটি বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে হয়। পৃথিবীতে কত রকম যে রান্না আছে—

আমি তো অবাক।

সে কি হে! ভদ্রলোককে সামনা-সামনি দেখে তো অমন তালেবরটি মনে হয় না! তুমি চোখ-টোখ দেখেছো কখনও?

—বিলক্ষণ — জয়ন্ত বলল — একবার পালিতবাবু আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন ওখানে। এলাহি ব্যাপার। খেয়েও-ছিলাম যথেষ্ট—

আজ সেই ভদ্রলোক বিচারপতি, আইনের বিন্দু-বিসর্গ যাঁর জানা নেই, তিনি পর্দায় একজন হোমরা-চোমরা জজসাহেবের চেহারায় আবির্ভূত হবেন—ভাবতেই কি রকম যেন অদ্ভুত লাগে।

ওই ছবিতে উত্তমকুমার দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। একজন গুড উত্তমকুমার আর একজন ব্যাড উত্তমকুমার। উত্তমকুমার তাঁর অভিনয়জীবনে এই রকম অজস্র দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এতে বেশ একটা মজা আছে। শুনলাম, ব্যাড উত্তমকুমার ফেঁসে গেছেন আজ তাঁর ফাঁসির আদেশের দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করা হবে।

পালিতবাবু তাই শুনে তো অস্থির। তাঁকেই সেই প্রাণদণ্ডের আদেশ পাঠ করতে হবে ক্যামেরার সামনে। উত্তমকুমার তাঁর সব চাইতে ফেভারিট আর্টিস্ট, শেষ পর্যন্ত এই অপকর্মটি তাঁকেই করতে হচ্ছে বলে পালিতবাবুর কী দুঃখ—বুঝলেন জয়ন্ত-বাবু এই পার্টটা আমাকে না দিলেই বোধ-হয় ভাল ছিল। আমি মশায় এ-সব পছন্দ করি না—

—কি-সব পছন্দ করেন না?

এই যে প্রাণদণ্ড-টণ্ড। লোকে বড্ড চটে যায়। দেখবেন ছবি বেরুলে আমায় কত হেনস্থা করে। আফটার অল উত্তম-কুমার, পড়ুম করে প্রাণদণ্ডটা দিয়েই দিলে? আমার স্ত্রী-ই হয়ত আমার

ওপর খাপ্পা হবেন। ওরা সবাই উত্তমকুমারকে খুব ভালবাসে কিনা!

অবশ্য ও'কে বোঝায়—আহা, এতো আর সত্যিকারের ব্যাপার নয়, এ তো অভিনয়। অভিনয়ে কত কিছু হয় পালিতবাবু—

কিন্তু পালিতবাবুর সেই এক কথা—সে কথা মশাই আমাদের পাবলিক আজকাল আর বুঝতে চায় না। বিশেষ করে চ্যাংড়ারা: বলবে—কী তুমি গুরুকে লটকে দিয়েছো? এতবড় আস্পর্দা? দাঁড়াও তোমাকেও লটকাচ্ছি। উত্তমকুমার গুডম্যান, ও চিরদিনই গুডম্যান থাকবেন মশাই. আপনারা বায়োস্কোপে ওটা আর বদলাতে পারবেন না। তারপর ধরুন আমার কথা, ইহজন্মে আমি তো কত কাণ্ড করেছি কিন্তু প্রাণদণ্ড-টণ্ড কখনো কাউকে দিইনি, আজ যাবড়ে গিয়ে এটা গণ্ডগোল পাকিয়ে না বসি—

দেখুনে তারপরের ঘটনা:

অস্বাভাবিক উত্তেজনায় চারদিক থমথম করছে। গুরু-গম্ভীর সেশন আদালত। চারিদিকে উকিল ব্যারিস্টার আমলা পুলিশ আর একদল নিষ্কর্মা দর্শকে ঠাসা বিচার গৃহ।

এখানে জলজ্যান্ত এক খুনের আসামীর ট্রায়াল চলছে।

মাত্র কিছুক্ষণ আগে জুরীদের প্যানেল কোর্ট রুমে ফিরে এসে তাঁদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত বিচারপতিকে জানিয়ে দিয়ে তাঁদের নির্ধারিত জায়গায় বসে পড়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁরা তাঁদের জ্ঞানবুদ্ধি বিবেক

পরিচালনা : সলিল সেন
ছুটির ফাঁদে
সৌমিত্র/অপর্ণা

বিবেচনা অনুযায়ী এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—গিল্টী। অতএব মী লর্ড, আপনি এবার দয়া করে আপনার নিরপেক্ষ রায় যদি জানিয়ে দেন তাহলে আমরা কৃতার্থ হই.....

উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক এবং উত্তেজনা।

পালিতবাবুর অবস্থা কাহিল, গরমে তিনি কুলকুল করে ঘামতে আরম্ভ করেছেন। সবাই যেন রুদ্ধশ্বাসে তাঁর দিকে তাকিয়ে।

দশ টাকার একজন একসট্রা, সে সেজেছে একজন উকিল, শামলা পরে বড়ই অস্থির, তার কেবল ভয়—শুটিং আজ আবার না একসটেনশান হয়ে যায়, তাহলে সর্বনাশ, কালকে একটা বড় ছবির আউটডোরে যাবার কথা আছে, ফস্কে যেতে পারে। সে বিড়বিড় করে বলল—হুজুর মেহেরবান, রায়টা তাড়াতাড়ি দিয়ে দিন। শুটিং প্যাকআপ হয়ে যাক, আমরা কেটে পড়ি—

পালিতবাবুর কানে কথাটা যেতে তিনি ক্ষিপ্ত। —ইঃ, রায়টা যেন আমার আস্তিনের মধ্যে গোটানো আছে, বের করলাম আর পড়ে দিলাম। যত্তসব। আজ রাত নটার আগে কেউ ছাড়া পাবে না। ইয়ার্কি না?

দেখুন কেমন সব গুলিয়ে যাচ্ছে—এখানে আসামীও আসামী নয়; আসামী উত্তমকুমার হতে যাবেন কোন্ দুঃখে মশাই? কিন্তু আর্ট ডিরেকটারের কেরামতিতে, রূপ-সজ্জাকরের এলেমে এবং চিত্র-পরিচালকের সূক্ষ্ম বাস্তব বুদ্ধির জন্যে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর এক নম্বর ফ্লোরটা আশ্চর্য ধর্মাধিকরণের চেহারা নিয়েছে। শামলা আর উর্দি গায়ে দ্রুত ব্যস্তসমস্ত পেয়াদা পুলিশের চলাফেরা দেখে কে বলে এটা কোর্টরুম নয়? 'বড়ে ভাই ছেড়ে। এই রকম রিয়ালিস্টিক টাচ দিতে পারলেই তো দর্শকদের কেনা যেতে!

ছবির সেই রিয়ালিস্টিক কোর্টরুমের সেটে একটা লোহার খাঁচায় বিবর্ণ নিষ্প্রভ মুখে আসামী সেজে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বয়ং উত্তমকুমার। খুনের দায়ে ধৃত আসামী, বিচারের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায় যেমন—যথার্থ তেমনি ভাবে।

মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রাতজাগা ঈষৎ রক্তিম চোখ। দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট। দাঁড়াবার ভঙ্গিটা ঈষৎ শ্লথ—পায়ের নিচে থেকে হঠাৎ কখনো মাটি সরে গেলে মানুষ যেমন দাঁড়ায়, অবিকল তাই।

ফ্লোরের অন্ধকার একটি কোণে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন আরও কয়েকজন কৌতূহলী দর্শক। হঠাৎ তাঁদের মধ্যে থেকে কে যেন ইস্ ইস্ করে উঠলেন।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, বেদনার্ত চোখে এক ভদ্রমহিলা উত্তমকুমারের সেই বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। বুঝলাম, ওষুধ ধরেছে। একে মহিলা তায় সুন্দরী—তাঁর স্বপ্নের নায়ক উত্তমকুমার খুনী আসামী সেজে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এ তাঁর কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না। একি সহ্য হয়? ছবির পরিচালককেই এজন্যে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার ইচ্ছে যায়।

ক্রেনে ছিল ক্যামেরা।

ক্যামেরাম্যান দিলীপরঞ্জন পরিচালক পীযূষ বসুর ইঙ্গিতের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সারাটা ফ্লোর নিস্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছিল পরবর্তী অ্যাকশানের জন্যে।

অথচ, এই মাত্র কিছুক্ষণ আগে, উত্তমকুমারকে দেখেছি স্টুডিওর অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে প্রসন্ন হাসিমুখে একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্পগাছা করছিলেন। এবং তারপর দেখছি—সটান লোহার খাঁচাটার মধ্যে।

নির্বাক ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে।

ভয়ঙ্কর একটা কিছুর প্রতীক্ষায়-ই হয়ত-বা।

আদালতের মধ্যে দারুণ অস্বস্তিকর একটা চাপা ভ্যাপসা গুমোট গরম আবহাওয়া। উকিল মোক্তাররা চুপচাপ।

পালিতবাবু মাথা নিচু করে কাগজে কি যেন সব লিখে চলেছেন, দ্রুত হাতে, পরিচালকের কড়া আদেশ। দেয়ালঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, আচ্ছা, এটা তো বাস্তব দৃশ্য নয়, সিনেমার জন্যে নির্ভুল অঙ্কে সাজানো একটা নকল পটভূমি, তা হোক না জবরদস্ত এন্যাক্টমেন্ট—অবাস্তব তো বটেই ওই যে বিচারপতি, পেয়াদা-পুলিশ, উকিল মহুরী পেস্কার, দর্শক আর খুনী আসামী, সবাই তো নকল, তবে কেন এই গা ছমছম ভাব? ব্যাপারটা কী?

—পালিতবাবু, এদিকে তাকান—পীযূষ বসুর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে এ কোন পালিতবাবু ক্যামেরার দিকে তাকালেন? জয়ন্ত তখুনি কনুই দিয়ে আমায় একটা গোত্তা মারল।

গম্ভীর, থমথমে মুখ, বিচক্ষণ এক বিচারপতি তখন সকলের ওপর নজর বুলিয়ে নিয়ে তাঁর রায় পড়বার উদ্যোগ করছেন।

সঙ্গে সঙ্গে লোহার খাঁচায় পোরা বাঘটা হঠাৎ যেন সচকিত হয়ে উঠল। উত্তমকুমারের মুখে নানা প্রতিক্রিয়া অদৃশ্য ইলেকট্রনের মত খেলা করে বেড়াতে লাগল।

জজসাহেবের কণ্ঠস্বরে চুম্বক ছিল বুঝি-বা, যেন লোহা—আমাদের সর্বইন্দ্রিয় সেদিকে আকৃষ্ট হল। উনি পড়তে আরম্ভ করলেন,

—দি মেজারিটি ভার্ডিক্ট অব দি জুরী ইজ গিল্টী উইথ রিগার্ড টু দি চার্জ অফ মার্ডার। আই অ্যাকসেপ্ট ইট অ্যাজ দি ক্রাইম কমিটেড বাই [illegible] বাই ইজ ডায়াবলিক্যাল অ্যান্ড ডাজ নট অ্যাট অল ডিজার্ভ লিনিয়েন্সি। আই সেনটেন্স ইউ টু ডেথ বাই হ্যাংগিং বাই দি নেক অনটিল ইউ শ্যাল বী ডেড!

মৃত্যুদণ্ড! পরিষ্কার মৃত্যুদণ্ড। দেখতে দেখতে আসামীর মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। পালিতবাবুরও।

জীবনের চাইতে সুন্দর নেই, মৃত্যুর চাইতে ভয়ঙ্কর নেই, যদি সে জীবন বাস্তব এবং মৃত্যু অলীক হয়। এমন কি স্টুডিওর নকল পরিমণ্ডলে সেই জীবন নকল নয়, মৃত্যুও নয়।

এই উপসংহারে?

—রঞ্জন মজুমদার

মিস্টার রোমিও

প্রযোজনা : সুবোধ মুখার্জি প্রোডাকসন্স

অবাস্তব কাহিনী, দুর্বল পরিচালনা সত্ত্বেও শশী কাপুরের অভিনয় এ ছবির অন্যতম সম্পদ

সাকসেনা ব্যবসায় ও প্রতিপত্তিতে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ওঁর দুই ছেলে রমেশ ও সুরেশ। রমেশ-এর তিনটি ডিগ্রী। বিশেষ করে ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে তার অধ্যবাসায়ের তুলনা নেই। কিন্তু সে প্রতিদিন বাড়ী ফেরে রাত করে। আবার কখনও কখনও ভোর হয়ে যায়। একাধিক তরুণীর হৃদয় সে অনায়াসে জয় করে নিতে পারে বলেই, বন্ধুরা ওঁকে 'মিস্টার রোমিও' বলে। ছোট সুরেশ-এর বি এ পাশের সাফল্য এবং জন্মদিন উপলক্ষে রমেশ ওঁকে এক পার্টিতে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে সুরেশ কেবল মদ্যপানেই আসক্ত হয় না, ধীরে ধীরে কুসংগে ও 'হাসিসে' আসক্ত হয়ে পড়ে, আর এ জন্যে 'সাকসেনার' বন্ধু পালই দায়ী। আচমকা পোর্ট পুলিশের হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে গুলী চালায় পালের ছেলে, গুলিতে কনেস্টবলটি মারা যায়। 'সাকসেনার' সামনেই ঘটনা ঘটায়, 'পালের' ছেলেকে তিনি থানায় নিয়ে যান। বিচারে তার মৃত্যু অবধারিত জেনে, ছেলেটি 'আত্মহত্যা' করে। 'পালের' একান্ত অনুরোধে সাড়া দিয়ে, সাকসেনা মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে ওঁর ছেলেকে না বাঁচাবার জন্যে, পাল ওঁর ছোট ছেলেকে ধ্বংসের পথে নিয়ে প্রতিশোধ নিতে এবং পরিবারের সুনাম নষ্ট করতে চায়। পাল তার ভাইয়ের ছেলেকে দিয়ে 'সুরেশকে' নরকের পথে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে, 'শালু' নামে এক পতিতা ও নর্তকীকে দিয়ে। যখন ওঁরা জানলো যে—'রমেশ' সবই জেনে ফেলেছে, তখন ওঁরা 'শালুকে' হত্যা করে। ইতিমধ্যে রমেশ এক রোমাঞ্চকর ঘটনার মধ্য দিয়ে

এক উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণী 'শীতলের' সঙ্গে পরিচিত হয় এবং মনে মনে তাঁকে ভালবেসে ফেলে।

'পাল' আর তাঁর দলবল সুরেশের কাছে গিয়ে বললে—তাঁর দাদা রমেশই 'শালু'কে হত্যা করেছে। মৃতদেহের কাছেই ওঁর পার্স পাওয়া গেছে। সুরেশের মনে 'দাদা'র সম্পর্কে পূর্বেকার ধারণা বদলে যায়। রমেশ আগে থেকে গোপনে ওদের আসল উদ্দেশ্য জেনে ফেলে। যখন ওঁর অনুগত এক গুণ্ডা সর্দার 'রণজিতে'র মারফতই জেনে নিল ওরা ওর বান্ধবী 'শীতল'কে অপহরণ করে নিয়ে গেছে, তখনই ওখানে উপস্থিত হয়ে, প্রথমে সুরেশের ভুল ভাঙে, পরে ওদের দলবলের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই সংঘাতের সময় ওরা সাকসেনাকেও ধরে নিয়ে এল, ওঁর চোখের সামনেই পাল তাঁর পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবে দুই ছেলেকে গুলী করে হত্যা করে। কিন্তু গুলী চালাবার আগেই এক অঘটন ঘটে গেল, রণজিতও এসে পড়লো ওদের বাঁচাবার জন্যে। একে একে ওদের পরাজিত করে ফেললো রমেশ, সুরেশ এবং রণজিৎ। রমেশ ফিরে পেল তাঁর শীতলকে, সাকসেনাও তাঁর ভুল বুঝে রমেশ ও সুরেশকে আপন করে নিলেন।

এই জাতীয় কাহিনী হিন্দী ছবিতে নয়, বিশেষ করে অন্যান্য ক্রাইম ছবির নাটকীয়তা এবং অতিনাটকীয়তা ও ছবির শ্লথগতি ছবিকে অবাস্তব ও দুর্বল করে ফেলেছে। পরিচালক সুভাষ মুখার্জী বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। অন্যান্য কিছু পরীক্ষামূলক হিন্দী ছবি ও বিদেশী ছবির অনুপ্রেরণায় উনিও কাটিং, মিকসিং, ফ্রিজ ও নেগেটিভ শটের সাহায্যে কিছু চমক সৃষ্টি করেছেন। আলোকচিত্র গ্রহণে, বিশেষ করে কাশ্মীরের বহির্দৃশ্য গ্রহণে এন ভি শ্রীনিবাস কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শিল্প নির্দেশনায় শান্তি দাস তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সম্পাদকের কাজ আরো উন্নত হতে পারতো। অভিনয়ে (রমেশ) শশী কাপুর ও শীতলের ভূমিকায় রিংকু অসোয়াল অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় অচলা সচদেব (মা), কৃষ্ণকান্ত (শীতলের বাবা), অনিতা গুহ (শীতলের মা), পাল (রাজন হাসকর) ভাইপো (নরেন্দ্রনাথ), গুণ্ডা সর্দার (রণজিৎ), শালু (সবিতা) এবং রানী ডিসুজা, রাজকিশোর, কুন্দন, বিজু খোটে চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। সংগীতে আর ডি বর্মণ তাঁর পুরানো গানের সুরকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। —চিত্রদূত

অমানুষ। শর্মিলা। উত্তম

পরিচালনা : শক্তি সামন্ত

ওঁরা বলেন

মহুয়া রায় চৌধুরী

: শ্রীমান পৃথ্বীরাজ ছবিতে যখন অভিনয় করেন, তখন আপনার বয়স কত?

— ক্লাস সেভেন পড়ি তখন, বয়েস আর কত হবে? আটান্ন সালে জন্ম। (জন্ম-তারিখ জিজ্ঞাসা করায় বাবা বললেন ছাপ্পান্ন সাল, মা বললেন—না না, আটান্ন।) আসলে বয়েস লুকোনো বা বাড়িয়ে বলার কারণ কি জানেন—আমাকে সকলেই খুব বেশী বয়সী বলে ভেবে নেয়। আমার এখন এই সতের চলছে। কালকেই (২৬ সেপ্টেম্বর) জন্মদিন গেল।

: পড়াশুনোর ক্ষতি হচ্ছে না ফিল্মে কাজ করতে এসে?

— অসুবিধে তেমন কিছু হচ্ছে না। কাজের চাপে স্কুল ছেড়ে দিতে হয়েছে, এই যা! বাড়ীতে টিউটরের কাছে নিয়মিত পড়ছি। সেভেন্টি ফাইভে স্কুল ফাইনাল দেবো। স্টুডিওয় যখন কাজ করি, কাজই করি। পড়াশুনোর সময় পড়াশুনোই। অসুবিধে কি হবে?

: শ্রীমান পৃথ্বীরাজের শেষ দৃশ্যে আপনার এবং অয়নের মধ্যে একটা কিসিং সিনের সাজেশন দেখিয়েছেন পরিচালক। ঐ দৃশ্যে অভিনয়ের আগে পরিচালক তরুণবাবু আপনাকে কিভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন?

— তরুণবাবু আমার কাছে সত্যি কথা বলতে কি কিছুই লুকোননি। পায়ের ওপর পা দিয়ে দাঁড়ালে দৃশ্যটার যে কি মিনিং হবে তা আমায় বলেই দিয়েছিলেন, আমারও খুব একটা অসুবিধে হয়নি। কারণ, এটা তো ঠিক, আগেকার দিনের ঐ বয়সের মেয়েদের চাইতে আজকালকার মেয়েরা অনেক বেশী জানে এবং বোঝে। একটু দ্বিধা-লজ্জা নিশ্চয়ই ছিল প্রথমটায়, কিন্তু আনন্দও কম ছিল না।

: বাংলা ছবিতে তাহলে কিসিং আসুক—আপনি চান?

— হ্যাঁ চাইবো না কেন? তবে সুন্দরভাবে আসুক অশ্লীলভাবে নয়। শ্রীমান পৃথ্বীরাজেই যেমন সিম্বল দিয়ে দেখানো হয়েছে, তেমন করেই হোক। ক্ষতি কি? ফেস-টু-ফেস কিসিং দেখাতেই হবে এমন তো কথা নেই! শৈল্পিক ভঙ্গিতে দেখালে কিসিং সিন খারাপ লাগবে না।

: তরুণ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ফিল্ম ইনস্টিটিউট বা ঐ জাতীয় কোনো জায়গা থেকে ফর্মাল ট্রেনিং থাকা কি অবশ্য দরকার?

— না, মোটেই না। আগেকার সব বিখ্যাত শিল্পীরা প্রায় কেউই কোনো ট্রেনিং পাননি। তাঁরা অভিনয় শিখেছেন কি করে? আসলে দরকার অভিনয়-ক্ষমতা। ঐ জিনিসটা থাকলেই চলে। নাহলে সবই ফক্কা। প্রতি বছর তো পুণা ইনস্টিটিউট থেকে এক গুচ্ছের ছেলে-মেয়ে পাশ করছে, বলুন না তাদের মধ্যে সবাই কি দাঁড়াতে পারছে? তবে কিনা একটা তকমা থাকলে চান্স পাওয়া যায় মাঝে-মধ্যে।

: অভিনয় সম্পর্কে থিয়োরেটিকাল বা প্র্যাকটিক্যাল কোনো অভিজ্ঞতারই প্রয়োজন নেই—আপনি একথাই বলতে চান?

— মোটামুটি তাই-ই বলতে চাই। পড়াশুনো করে যেটুকু জানার সেটা না জানলে খুব একটা ক্ষতি আছে কি? বরং অভিনয়ের প্র্যাকটিস্ করতে পারলে কাজ হয়।

: স্কুলে নিশ্চয়ই 'তোমার জীবনের লক্ষ্য' কি বা ঐ জাতীয় কোনো রচনা লিখেছেন। কি লিখেছিলেন তখন?

— ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছি স্কুলে। নাইনে উঠে ছেড়েছি। 'তোমার জীবনের লক্ষ্য' নামে কোনো রচনা সৌভাগ্য-বশতঃ আমায় লিখতে হয়নি। তবে ছোটবেলায় ভয়ানক ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হবার। বেশ থ্রিলিং লাইফ ডাক্তারদের, তাই না?

: ডাক্তার তো হতে পারলেন না আফশোষ হচ্ছে না?

— হচ্ছে তো বটেই কিন্তু এখন তো আর ডাক্তার হতে পারব না। ফিল্ম লাইনে চলে এসেছি। জেনারেল পড়াশুনোই চালাচ্ছি প্রচণ্ড খেটে। তার ওপর আবার ডাক্তারি! হবে না। তবে কি জানেন আমি অঙ্কে আর সায়েন্সে খুব ভালো ছিলুম। অঙ্কে আটের ঘরে আর সায়েন্সে ছ'এর ঘরের নীচে কোনদিন নম্বর পাইনি। কিন্তু কি আর হবে—ভাগ্য সব পাল্টে দিচ্ছে!

: ফিল্মে অভিনয় করার ব্যাপারে বাড়ীর কারো অমত ছিল? বা এখনও আছে কি?

—তেমন জোরালো কোনো অমত কারোরই ছিল না। বলতে গেলে বাবার আপ্রাণ চেষ্টাতেই আজ আমি ফিল্মে চান্স পেয়েছি, পাচ্ছি। প্রথমটায় মা'র একটু অমত ছিল, মৃদু আপত্তিও জানিয়েছিলেন। এখন অল কোয়ায়েট ইন দি হোম ফ্রন্ট বলতে পারেন।

: অভিনয়ের প্রতি আপনার আকর্ষণ এলো কিভাবে বা কার কাছ থেকে?

— ছোটবেলায় পাড়ায় বিভিন্ন ফাংশানে নাচতাম। স্কুলেও নাটক করেছি দু-একটা। বাবা আমার এই নাচের ব্যাপারটাকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে ছিলেন। তিনিই বহু দিন থেকে বহু লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন আমাকে ফিল্মে নামাবার জন্য। তাঁর চেষ্টা আজ সফল হতে চলেছে—এটাই আমার আনন্দের বিষয়।

: যদিও বেশী দিন কাজ করছেন না, তবুও এই অল্প দিনে ফিল্ম লাইনটা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা হয়েছে, যদি অল্প কথায় বলেন?

— ফিল্ম লাইন সম্পর্কে বাইরের লোক হিসাবে খুব একটা পরিষ্কার ধারণা ছিল না আমার। এখনও ধারণাটা যে খুব স্পষ্ট তা বলতে পারছি না। তবে এ লাইনে ভালো লোক যেমন আছেন খারাপ লোকেরও অভাব নেই। সাবধানে চলতে হচ্ছে খুউব। অনেকেই কথা দিয়ে কথা রাখেন না। এটাই খারাপ লাগে। এই তো কিছুদিন আগে একজন পরিচালক তাঁর ছবির জন্য আমায় ঠিক করলেন। ক'দিন রিহার্সালও দিলাম। কিন্তু হঠাৎ কাগজে দেখলুম শিল্পী তালিকায় আমার নাম নেই। তা নিয়ে আমি কোনোদিন অভিযোগ করিনি কারও কাছে। সেই পরিচালককেও কিছু বলিনি। আমার রি-অ্যাকশন তাকে বুঝতেই দিই নি। যা আছে আমার মনেই আছে। বরং একদিন রাস্তায় সেই পরিচালককে ট্যাক্সি খুঁজতে ব্যস্ত দেখে আমার গাড়ীতে লিফট দিয়েছি। উনি সেদিন গাড়ীতে বসে আমাকে বলেছিলেন—মহুয়া, তোমাকে নিলেই বোধহয় ভালো হতো। ছবিটা রিলিজ করে যেতো এদ্দিনে।' এই ধরনের কথা দিয়ে কথা না রাখা ব্যাপারটা বড় খারাপ লাগে।

: ফিল্মের কোনো হিরো আপনাকে প্রেম নিবেদন করেছে এ পর্যন্ত?

— হ্যাঁ, করেছে। কিন্তু নামটা আমি বলতে পারব না, কাইণ্ডলি অনুরোধ করবেন না।

: আপনার রি-অ্যাকশন কি রকম?

— ফিল্ম হিরোদের প্রেম সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। এঁদের বেশীর ভাগেরই চোখে একটা রঙীন চশমা আঁটা থাকে। আজ এই হিরোইনকে ভালো লাগে, কাল আমাকে, পরশু হয়তো বা অন্য কাউকে। এঁদের চাহিদাটা তো একটা জায়গাতেই সীমাবদ্ধ। ফিল্ম হিরোর সম্বন্ধে প্রেম আমি ভাবতেই পারি না।

: তাহলে আপনার প্রেমের লাইফটা ফিল্ম-লাইনের বাইরেই থাকছে?

— হ্যাঁ—তাই।

: ফিল্ম-লাইনের বাইরের লোক কে আপনাকে প্রেম নিবেদন করেছে?

— আপাতত তেমন কেউ নেই। থাকলেও বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা একান্তই ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়। এর চাইতে বেশী কিছু আর বলতে পারব না।

: বাড়ীতে আপনার বাবা-মা কি আপনাকে ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ডিসিশন নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন?

— এপ্রসঙ্গে একটা কথা বলি। আমার বাবা-মা কেউই তেমন অতি-আধুনিক মাইণ্ডেড নন। কিছু সংস্কার তাঁদের মধ্যে আছেই। তবুও আমার জীবনের কোনো ডিসিশন নেবার আমার যেমন অধিকার আছে, বাবা-মা'র মতকেও একেবারে উড়িয়ে দিতে পারব না। কিছু করার আগে ভাবব একটু। তবে কিনা সবকিছুই সময়ের ওপর নির্ভর করে।

: উত্তমকুমার সম্পর্কে আপনার নিশ্চয়ই একটু বেশী ঔৎসুক্যই ছিল। এখন তাঁর সঙ্গে অভিনয় করছেন। ভাবতে কেমন লাগছে?

— সত্যি কথা বলতে কি, উত্তমকুমার বলতে মেয়েরা যেমন পাগল হয়ে যায়, আমি তেমন কোনদিন ছিলাম না। আমাদের পাড়ায় বহু ছবির শুটিং হয়েছে। পাড়াসুদ্ধ ঝেঁটিয়ে সবাই গেছে উত্তমকুমারকে দেখতে। মেয়েদের মধ্যে সেকি উত্তেজনা। আমি কিন্তু তেমন উৎসাহ পেতাম না। এখন তাঁর সঙ্গে অভিনয় করছি। ভাবলে আনন্দ লাগে বইকি! ওঁর সঙ্গে কাজ করে আমি শিখছিও তো অনেক কিছু।

: কথায় কথায় আসল ব্যাপারটি তো জানা হোল না! ফিল্ম-লাইনে আগে থেকে তো আপনার জানাশোনা কেউ ছিল না, তাহলে চান্স পেলেন কিভাবে?

— কোথা থেকে শুরু করব তাই ভাবছি। ঘটনা তো অনেক। 'নয়া মিছিল' ছবির একটা চরিত্রের জন্য মেক-আপ টেস্ট দিতে গিয়েছিলাম। পছন্দ হলো না পীযূষবাবুর। তখন মেক-আপম্যান জামাল সাহেব আমাকে পাঠালেন তরুণ মজুমদারের কাছে। গেলাম। উনি দেখে-টেখে বললেন 'খবর দেব।' এর আগেই অবশ্য গায়িকা বনশ্রী সেনগুপ্ত আমার একখানা ছবি তরুণবাবুকে দিয়েছিলেন। তারপর খবর পেলাম তরুণবাবু আমাকেই সিলেক্ট করেছেন। অবশ্য এতসব যোগাযোগের পেছনে বাবার আপ্রাণ পরিশ্রমটাই কাজ করেছে বেশী।

: আপনার সমসাময়িক নতুন নায়িকাদের সঙ্গে আপনি কোনো প্রতিযোগিতার ভাব বুঝতে পারছেন কি?

— না। তেমন কিছু আমি ফিল করিনি এখনো। আমার বয়স তো খুবই অল্প আর যাঁরা আছেন তাঁদের সঙ্গে এখনও আমার কম্পিটিশনের ব্যাপারটা আসেনি। যে-ধরনের চরিত্র আমি করছি, সেখানে আমার বয়সী শিল্পীই বা কোথায়? অনেকেই আমার চাইতে বয়সে ও অভিজ্ঞতায় বড়।

: আপনার সাফল্য—ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

— ছবিতে কাজ করছি, সবাই ভালোই বলছেন এটাই ভালো লাগছে। তবে নিজে সন্তুষ্ট নই। বেশী আর কি বলতে পারি!

—নির্মল ধর

স্নো ফকস ক্যাবারে
উত্তম/শমিতা ফটো: অমৃত

ফ্লোর থেকে বলছি

ইউ কে এখানে কে কে। বাংলা ছবির জগতে ইউ কে বলতে একম অদ্বিতীয়ম উত্তমকুমার। তিনি হঠাৎ কে কে—কৃষ্ণেন্দু কার্লেকার-এ রূপান্তরিত হয়েছেন। গত সপ্তাহের কথা। টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর ফ্লোরে সেদিন কলকাতা নিবাসী এই মহারাষ্ট্রীয়ান যুবকের সঙ্গে আলাপ হল। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল সে বহুদিন ধরে কলকাতায় আছে। ফলে বাংলা ভাষাটা রপ্ত হয়েছে ভালই।

তা মহাশয়ের কি করা হয়?

: আজ্ঞে—ক্যাবারে সিঙ্গার স্নো ফকস ক্যাবারেতে গান গাই আমি।

বেশ ভাল কথা। কিন্তু এখানে কি মনে করে?

: সুলতার কাছে এসেছি।

এই হচ্ছে সুলতার নিবাস। একটি জীর্ণ কুটির। বেশ কিছুদিন হল তার স্বামী মারা গিয়েছে। একটা ছোট্ট ছেলে আছে। কে কে'র সঙ্গে সুলতার কি রকম যেন একটা প্লেটোনিক ব্যাপার আছে। যখন তার কিছু ভালো লাগে না, যখন সে ক্লান্ত যখন সে বড় একা—চলে আসে সুলতার কাছে। সুলতা কৃষ্ণেন্দুকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। কিন্তু সাত আট বছরের ছেলেটি এ-সব মোটেই পছন্দ করে না।

ধরা-বাঁধা জীবনের মধ্যে আছে কে কে। প্রত্যেক রাতে তাকে গাইতে হয়। গান—শ্রোতাদের পছন্দ করা চটুল গান। কে কে মনে করে এ গান নয়, এ হচ্ছে আর্তনাদ। সে আসলে মস্ত বড় গায়ক হতে চেয়েছিল। ক্লাসিকাল গানের গায়ক। ছোটবেলা থেকে সাধনা করেছে সে। স্বপ্ন দেখেছিল রঙীন স্বপ্ন। আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল অনেক। আজ কে কে'র জীবনের ঘর শূন্য, হয়তো বা জীবিকার ঘর পূর্ণ। অদ্ভুত এক চরিত্র। সুলতাকে তার ভালো লাগে। তাই সে চলে আসে গল্প করে। সময় অতিবাহিত করে। সুলতা কে কে-এর জন্য অনুভব করে। কিন্তু কিছু বলতে পারে না। সুলতা একটা সাধারণ অফিসে চাকরী করে। সে যা পায় তাতে তার কোনো মতে দিন চলে যায়। সুলতার আপনজন বলতে আরেকজন—অফিসের এক বান্ধবী।

এইমাত্র জানা গেল সুলতার বান্ধবী আসছে। তার চাকরী চলে গেছে। এই মানসিক অবস্থায় সে সুলতা ছাড়া আর কার কাছে আসবে। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। তাদেরও সংসার কোনো মতে চলে। বাড়িতে গিয়ে কি বলবে। এই বাজারে চাকরী চলে যাওয়া ঘটনা নয় রীতিমত দুর্ঘটনা। বিস্তারিত শুনেছিল কে কে। সে এই মুহূর্তে কি করতে পারে। বড় জোর মৌখিক সান্ত্বনা দিতে পারে।

এখানেই কে কে'র সঙ্গে মেয়েটির পরিচয়। তার বিপর্যয়ের দিনে কে কে এসে পাশে দাঁড়ায়। মেয়েটির কাছে সে একটা অবলম্বন। এইভাবে ওদের মেলামেশা। ক্রমশঃ ওরা ঘনিষ্ঠ হয়। মেয়েটি কে কে'র জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। কে কে তার জীবনের গতিপথ বদলায়। এক নতুন জীবনের সন্ধান পায় যেখানে শুধু ব্যর্থতা নেই, সাফল্যও আছে। বঞ্চনা নেই ভালবাসা আছে। শুধু জীবিকা নয়, জীবনও আছে।

উত্তমকুমারের বিপরীতে এই ছবির নায়িকা মিঠু মুখোপাধ্যায়। নতুন জুটি। দু দিন শুটিং হয়ে গেল। অন্যান্য শিল্পী-দের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শমিতা বিশ্বাস। তিনি 'সুলতা'র চরিত্র রূপায়িত করছেন। এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার শমিতা সু-অভিনেত্রী হওয়া সত্ত্বেও ভাল কাজ পান না। সে রকম চরিত্র। বিধবার চরিত্রে অভিনয় করতে করতে স্ট্যাম্পড হয়ে গিয়েছেন। 'অতিথি'র ইমেজ আজও নষ্ট হয় নি। বাংলা ছবিতে বিধবার চরিত্র হলেই তাঁর ডাক পড়ে। যেমন এই ছবিতে।

এই ছবি 'স্নো ফকস ক্যাবারে' কৌটিল্য গুপ্তের রচনা থেকে। চিত্রনাট্যকার : পার্থ-প্রতিম চৌধুরী। পরিচালনা করছেন যাত্রিক গোষ্ঠী। একাধিক সফল ছবির পরিচালক।

যাত্রিকের যাত্রারম্ভ হয় 'চাওয়া পাওয়া' ছবি নিয়ে। তারপর একে একে 'স্মৃতিটুকু থাক', 'কাঁচের স্বর্গ' 'পলাতক' 'এখানে পিঞ্জর' 'ছিন্নপত্র' 'যদি জানতেম' প্রভৃতি। বাংলা ছবির জগতে যাত্রিক বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত নাম। শুরুতে ছদ্মনামের আসল রূপকার ছিলেন তরুণ মজুমদার। তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও শচীন মুখোপাধ্যায়। মাঝে যাত্রিক গোষ্ঠী ভেঙে গিয়েছিল। তখন পরিচালক তরুণ মজুমদার স্বনামে পরিচালনা করতে এলেন। দিলীপ মুখোপাধ্যায় অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেন। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠা দীর্ঘস্থায়ী হল না। তাই দিলীপ ফিরে এলেন পরিচালনার কাজে। যাত্রিকের যাত্রা আবার শুরু হল। পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ছবিতে তিনি এখনো অভিনয় করেন। সদ্য সমাপ্ত 'নগর দর্পণে' ছবিতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। আশা করি 'স্নো ফক্স ক্যাবারে'তেও তাঁকে দেখা যাবে। বাংলা ছবিতে নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে এ ছবি হচ্ছে। গানের এক বিশেষ ভূমিকা থাকবে ছবিতে। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন : নচিকেতা ঘোষ। তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন কয়েকখানি গান রেকর্ড করার জন্য।

বাংলা ছবির নায়কের সারিতে উত্তমকুমারের পরেই শমিত ভঞ্জের নাম আসছে আজকাল। শমিতের হাতে অনেকগুলি ছবি। কলকাতা ছাড়াও বম্বেতে আছে: শুটিং চলছে : 'বারবধূ' ছবির—বিহারের শিমুলতলায়। বিজয় চট্টোপাধ্যায় পরিচালনা করছেন। শমিতের বিপরীতে নায়িকা দুজন : সোমা দে ও গীতা ('গরম হাওয়া' খ্যাত)। ওখানে শুটিং করতে করতে শমিত কলকাতায় চলে এসেছেন একটি নতুন ছবির শুটিং শুরু করতে। ছবির নাম 'জীবন মরুর প্রান্তে'। স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এ এ ছবির শুটিং এ ওঁর সঙ্গে দেখা হল। শমিত একটা শট দিয়ে এলেন। শট ছিল এই :

একটি আধুনিক আসবাবপত্রে সুসজ্জিত ঘরে খাটের পর শুয়ে ছিলেন পদ্মা দেবী। পরিচালকের নির্দেশ মত চোখ বুজে পড়ে রইলেন। বিলক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন—এমতাবস্থায় ক্যামেরা ধীরে ধীরে পিছিয়ে এলো; শমিত ক্যামেরার সঙ্গে সঙ্গে সমতা রেখে এগিয়ে এলেন। বিছানার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ক্যামেরা স্থির হ[illegible]ল। শমিত কি যেন বলতে চাইলেন কিন্তু বললেন না শেষ পর্যন্ত। না বলার মধ্য দিয়ে মুহূর্ত সৃষ্টি হল। আবেগ-তাড়িত নায়ক ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলেন। ক্যামেরা এগিয়ে গেল, সোজা পদ্মা দেবীর মুখের দিকে। দৃশ্যটা এখানেই কেটে দেওয়া হল।

মাদার ইন্ডিয়া পিকচার্সের পতাকাতলে এই ছবি উঠছে। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও

রাজা/মহুয়া রায়চৌধুরী

পরিচালনায় আছেন সাধন চৌধুরী। শমিতের বিপরীতে নায়িকা—মহুয়া রায়চৌধুরী। নির্মীয়মান 'জীবনটাই নাটক' ছবিতেও শমিত-মহুয়া জুটি আছেন। শমিতের নির্মীয়মান ছবিগুলির মধ্যে আছে—তপন সিংহের 'রাজা' মৃণাল গুহ-ঠাকুরতার 'সেলাম মেমসাহেব' জ্ঞানেশ মুখার্জী পরিচালিত সুখেন দাস নিবেদিত কালার হিন্দী ছবি 'অনজানে মেহমান' দয়াশংকর সুলতানিয়ার কালার হিন্দি ছবি 'কিতনে দূর কিতনে পাশ' গোবিন্দ রায়ের 'বিল্বমঙ্গল' ইন্দর সেনের 'অর্জুন' অমল রায় ঘটকের 'রং নাম্বার' প্রভৃতি। মুক্তি প্রতীক্ষায় চিত্রদূত গোষ্ঠী পরিচালিত 'প্রেমের ফাঁদে' এবং অজিত লাহিড়ীর 'এক বিন্দু মুখ'।

সমিত ভঞ্জ/বারবধূ

বলতে গেলে 'একস্ট্রা' হিসেবে শমিতের চলচ্চিত্রে যোগদান। বলাই সেন পরিচালিত 'সুরের আগুন' এবং 'কেদার রাজা' ছবিতে—এইভাবে কাজ করেন। ব্রেক তপন সিংহের 'হাটে বাজারে' ছবিতে। হৈ-চৈ ব্যাপার 'আপনজন' ছবিতে। তারপর থেকে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে শমিত ওপরে উঠে চলেছেন। আজও তা অব্যাহত। মাত্র কয়েক বছরের ফিল্ম জীবনে শমিত কাজ করেছেন সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে, অজয় করের ছবিতে, তরুণ মজুমদারের ছবিতে দীনেন গুপ্তর ছবিতে, বম্বেতে হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে......।

ওঁর আগামী ছবির তালিকায় আছে অরুন্ধতী দেবীর 'তলিয়ে যাবার আগে' নীতিশ মুখোপাধ্যায়ের 'কাল মধুমাস' চিন্ময় রায়ের 'তিলোত্তমা কলকাতা' সলিল রায়ের 'এলেম নতুন দেশে' এবং খুব সম্ভবতঃ হরিদাস ভট্টাচার্যের 'দম্পতি'।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

বিদেশী ছবি

পরীক্ষামূলক জার্মান ছবির অনুষ্ঠান

সম্প্রতি ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইন্ডিয়া ও ম্যাক্সমুলার ভবনের উদ্যোগে মিউনিখ-এর অ্যাকাডেমি ফর টেলিভিশন এ্যান্ড ফিল্ম-এর ডিপ্লোমা ফিল্মসের এক অনুষ্ঠান হয়ে গেল ম্যাক্সমুলার প্রেক্ষাগৃহে।

অনুষ্ঠানে মোট ছ'টি শর্ট ফিল্ম এবং দুটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি দেখানো হয়।

ছ'টি শর্ট ফিল্মের মধ্যে যে তিনটি ছবি ভাল লেগেছে তার নাম যথাক্রমে 'দি লিটল সোলজার', 'বোলেরো' এবং 'ক্যাম্প'। অন্য ছবি তিনটির নাম 'ক্যান্সো', 'কনফ্লিক্ট' ও 'ফুচসমুহল'।

'দি লিটল সোলজার' মোপাসাঁর একটি উপন্যাস অবলম্বনে তোলা। দুটি যুবক সৈনিক প্রতি রবিবার বেড়াতে বেরোয়। এমনি এক রবিবার তারা তাদের গ্রামের কাছাকাছি আসতে একটি বর্ধিষ্ণু কৃষিজীবী পরিবারের এক যুবতীর সঙ্গে তাদের উভয়ের আলাপ হোল। সেই আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হতে তারা

একদিন পিকনিক ও নৌকা বিহারে যাওয়া স্থির করে। সেখানে গিয়েই সৈনিক দু'জন অনুভব করলো তারা মেয়েটিকে মনে মনে ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু তাদের একজনের প্রেম দুঃসাহসিক এবং অন্য জনের প্রেম ভীরু।

নৌকা বিহারের সময় সেই ভীরু প্রেমিক এক গুচ্ছ ফুল দিয়ে তার গোপন প্রেম জানিয়েছিল। কিন্তু মেয়েটির কাছে সেটা তখন ছিল নিছকই এক আবেগের প্রকাশ। তাই তার ব্যবহারে মুগ্ধ হওয়ার চেয়ে চাপল্যই ছিল বেশী। নৌকা বিহারের পর পরই সে খুশীর উদ্দামতায় হারিয়ে গিয়েছিল অরণ্য দুঃসাহসী সৈনিকটির সঙ্গে বৃষ্টির মধ্যে। (বৃষ্টির দৃশ্যটি অপূর্ব) ভীরু প্রেমিক সৈনিকটি বৃষ্টির পরে তাদের খুঁজতে খুঁজতে সেই জলাশয়ের কাছে এসে দেখল শূন্য নৌকা। শুধু তার দেওয়া ফুলগুলি জলে ভেসে বেড়াচ্ছে। সে সেই ভাসমান ফুলগুলি তুলে নৌকায় মেয়েটি যেখানে বসে উচ্ছ্বাসে খুশীতে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল সেইখানে রেখে হারিয়ে গেল। এক সময় মেয়েটি তাকে খুঁজতে এসে দৃশ্যটি দেখে সহসা অভিভূত হয়ে পড়ল।

অত্যন্ত সাধারণ এবং সাদামাটা গল্প। কিন্তু পরিবেশনের গুণে ছবিটি যেমন আবেগমণ্ডিত তেমনি হৃদয়স্পর্শী হয়ে ওঠে। সম্পূর্ণ আউটডোরে তোলা ছবিটি রংগীন। পরিচালক উলরিচ এডেল। ১৬ মি মিতে তোলা।

'বোলেরো' ছবির পটভূমি ভিয়েত-নামের যুদ্ধ। যুদ্ধের ভয়াবহতা সাধারণ দরিদ্র মানুষের প্রতি অত্যাচার ও তাদের অসহায়তা অবাক বিস্ময়ে বসে দেখতে হয়। কিছু কিছু নিষ্ঠুর, অমানবিক দৃশ্য আছে। একটু প্রচারধর্মী হলেও ছবিটি মনকে বিষণ্ন করে তোলে। পরিচালক জোহানেস গাল্ডে। ছবিটি ১৬ মি মিএতে তোলা।

'ক্যাচ'-এর বিষয়বস্তু রেসলিং বা মল্লযুদ্ধ। এমন উত্তেজনাপূর্ণ অথচ রমণীয় ছবি বড় একটা দেখা যায় না। ক্যামেরা ও সম্পাদনার কাজ বিস্ময়কর বললেও অত্যুক্তি হয় না। (অথচ এ্যাকাডেমিতে নাকি ক্যামেরা প্রয়োগ ও পরি-চালন শিক্ষা দেওয়া হয় না। এ কথাটি বলেছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভিনেতা, সাংবাদিক ও মিউনিখ এ্যাকাডেমি ফর টেলিভিশন এ্যান্ড ফিল্ম-এর ফিল্ম বিভাগের ডেপুটি হেড ওলফগ্যাং লেম্পাস-মেল্ড তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে।) মল্লযুদ্ধ যে এমন প্রাণবন্ত হতে পারে এ ছবিটি না দেখলে তা বিশ্বাসই হোত না। ছবিটি দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায় তা বোঝাই যায় না।

এছাড়া যে ছবিটি বিষয়-বৈচিত্র্যের উপস্থাপনায় ভাল লেগেছে, তার নাম 'কনরাড'। অতি আদরে মাথা খাওয়া একটি বিকৃত মস্তিষ্কের যুবকের গল্প: যার প্রতিটি ব্যবহারের মধ্যেই নির্বিকার নিষ্ঠুরতা। কথায় কথায় যে অনায়াস ভঙ্গীতে মানুষ খুন করে। খুনের সঙ্গে যৌন বিকৃতি। নতুন স্বাদের ছবি সন্দেহ নেই। ছবিতে গল্পটি কমেডির ঢঙে বলা হয়েছে।

শর্ট ফিল্মের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লেগেছে 'ক্যানোসা'। বলা হয়েছে এ্যাকশান ডিটেক্টিভ স্টোরী। কতকটা চলচ্চিত্র শিল্পের প্রথম যুগে তোলা অপটু হাতে তোলা ওয়েস্টার্ণ ধরনের ছবি। ছবিতে কি বলতে চাওয়া হয়েছে তা বোঝা গেল না।

পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবির মধ্যে 'গার্ডেন অফ ইডেন' মোটামুটি দর্শনীয়। খানিকটা আবেগ প্রধান।

'লীভ মি এ্যালোন' ছবির উদ্দেশ্য, বক্তব্য কিছুই বোঝা গেল না। আদৌ কোন গল্প নেই, বক্তব্য দুর্বোধ্য। সেলুলয়েড সবচেয়ে বড় মিডিয়া বলে এককাল ধারণা ছিল। এক্ষেত্রে মনে হোল সে কথা প্রযোজ্য নয়। ক্লান্তিকর, ঢেলা, নিষ্প্রাণ এমন ছবি কেন যে অনুষ্ঠানে দেখানো হোল তা বোঝা গেল না।

অথচ আশা ছিল টেলিভিশন ও ফিল্ম এ্যাকাডেমির ছবি যখন, তখন নিশ্চয়ই কিছু না কিছু নতুনত্বের আস্বাদন পাওয়া যাবে এখানকার নবীন পরিচালকদের কাজে। ছবিগুলি ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত পরিচালকদের দ্বারা নির্মিত। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মিউনিখ এ্যাকাডেমি থেকে আগত মিঃ লেম্পাসমেল্ড এ্যাকাডেমির প্রকৃতি ও চলচ্চিত্র শিল্পে তার ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রাখেন। ছবি প্রদর্শনের সময় দো-ভাষীর কাজও তিনিই করেন।

ফেয়ারওয়েল ফ্রেন্ড
ওলগা জর্জেস পিকোট

প্রদর্শনীর মাঝে মাঝে ছবি সম্পর্কে সমালোচনারও ব্যবস্থা হয়। তার সূত্রপাত করেন চিত্রপরিচালক চিদানন্দ দাশগুপ্ত।

আমেরিকান চলচ্চিত্রকার জন ফোর্ড স্মরণে

ইউ এস আই এস-এর উদ্যোগে তাঁদের নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে সম্প্রতি আমেরিকার ওয়েস্টার্ণ ছবির জনক জন ফোর্ডের তিরোধান উপলক্ষ্যে এক চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন সত্যজিৎ রায়। অনুষ্ঠানে দু'দিনে মোট তিনটি ছবি দেখানো হয়। ছবিগুলির নাম যথাক্রমে 'স্টেজকোচ', 'জন ফোর্ড : এ বায়োগ্রাফী' এবং 'ড্রামস এলং দি মোহক'। দ্বিতীয়টি জন ফোর্ডের 'ওয়ার্ক'স'-এর ওপর বাকি দুটি ওয়েস্টার্ন ছবি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর ৭৮ বছর বয়সে জন ফোর্ডের মৃত্যু হয়।

—শা. ম.

বাংলাদেশের ছবি

ছুটির ফাঁদে/মুস্তাফা ও আরতি ভট্টাচার্য
পরিচালক: শহীদুল হকখান

সিনেমার দর্শক সংখ্যা কমে গেছে

স্বাধীনতার পর থেকে এ দেশের মানুষের আয় কমেছে। কিন্তু ব্যয় বেড়েছে। ব্যতিক্রম শুধু শতকরা দু'একজন ভাগ্যবানের ক্ষেত্রে। বাকী আটানব্বই নিরানব্বই-জনের ক্ষেত্রে রাতদিনের এক ভাবনা, এক চিন্তা—প্রতিদিনকার বর্ধিত দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সীমিত আয়ে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা।

এমন অবস্থায় সিনেমা দেখবেন কে? আর তাই ছবিঘরের সামনে ভিড় নেই। নেই সিনেমার টিকিটের কালোবাজারীদের উচ্চকন্ঠের চীৎকার 'ডি-সি-ডি-সি' 'রিয়ার স্টল, রিয়ার স্টল।' এবং আরো নেই ছবি-ঘরের সামনে সদর্পে ঝুলন্ত 'হাউস ফুল' সাইনবোর্ড।

সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত নৃত্যগীত ও লোভ-নীয় দেহভংগীসবর্স্ব রমরমা ছবিও এখন আর হাউস ফুল পাচ্ছে না।

এর কারণ ছবির দর্শক কমে গেছে। প্রধানতঃ দুটো কারণে। প্রথমতঃ মানুষের অর্থাৎ যাঁরা ছবি দেখেন, আগেই বলেছি তাঁদের আয় ও ব্যয় কমে গেছে। ফলে যাঁরা মাসে ৪।৫ ছবি দেখতেন তাঁরাও এখন মাসে একটি ছবি দেখার কথা চিন্তাও করতে পারেন না।

এ ছাড়া আগে সিনেমা দেখার অর্থই ছিল সপরিবারে ছবিঘরে যাওয়া। কিন্তু এখন? স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ ছবি দেখতে যাওয়ার কথা বাংলাদেশের দর্শকরা চিন্তা করতেও ভয় পান।

দ্বিতীয়তঃ গত জুলাই মাসের বাজেটের পর থেকে সিনেমায় টিকিটের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ও ছবির দর্শক সংখ্যা ভীষণভাবে কমে গেছে। আগে ডি-সি-তে টিকিটের দাম ছিল পাঁচ টাকা। এখন সাড়ে সাত টাকা। এছাড়া রিয়ার স্টলের টিকিট এখন সাড়ে চার টাকা, মিডল স্টলের টিকিট তিন টাকা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বাজেটে ১৯ পয়সা থেকে এক টাকা পর্যন্ত টিকিটের জন্য শতকরা ১০০ ভাগ, এক টাকা থেকে দু' টাকা পর্যন্ত টিকিটের জন্য শতকরা ১২৫ ভাগ এবং দু'টকার অধিক মূল্যের টিকিটের জন্য শতকরা দেড় শত ভাগ প্রমোদকর ধার্য করা হয়েছে।

ফলাফল, ছবির ব্যবসা আজকাল পড়ে গেছে। এবং চিত্রনির্মাতারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

সেন্সর বোর্ড ও আমাদের চলচ্চিত্র

খবরে প্রকাশ 'সেন্সর বোর্ড' এখন থেকে মাত্র দু'টি ছবি প্রতি মাসে সেন্সর করবেন।

সেন্সর বোর্ডের এ সিদ্ধান্তের ফলে বছরে মাত্র ২৪টি ছবি সেন্সর হবে। (অথচ অতীতে এ দেশে, বছরে ৩০।৩৩টা ছবি মুক্তি পেয়েছে।)

এখন আমাদের চলচ্চিত্রে চিত্রনির্মাতার সংখ্যা (সাবেক পাক আমলের তুলনায়) অনেক বেশী। ফলে বাংলাদেশের চিত্র-নির্মাতাদের মাথায় হাত। নিজেদের বর্তমান ভবিষ্যত সম্পর্কে তারা এখন রীতিমতো নিরাশ হয়ে পড়েছেন।

কারণ, সেন্সর বোর্ডের এই নতুন সিদ্ধান্তের ফলে মোট ২৪টি ছবি বছরে মুক্তি পাবে এবং দেশের ছবির সংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পাবে।

সম্প্রতি এফ-ডি-সি কর্তৃপক্ষ একটি নোটিশ জারী করেছেন। নোটিশ মতে—যে সব ছবির কাজ ইতিমধ্যে পঞ্চাশ ভাগ সমাপ্ত হয়েছে, কেবলমাত্র সেসব ছবি পর-বর্তী সুটিং-এর জন্য এফ ডি সি-র সুযোগ সুবিধা ও ফিল্ম পাবেন।

নোটিশে আরো বলা হয়েছে—এখন থেকে একটি ছবির জন্য মাত্র ৫০ হাজার ফুট নেগেটিভ ও ফাইনাল প্রিন্টের জন্য একশত পঁচিশ রোল ফিল্ম চিত্রনির্মাতারা পাবেন।

সেন্সর সার্টিফিকেট দেখানোর পর উক্ত ১২৫ রোল ফিল্ম তারা পাবেন।

এছাড়া, এখন থেকে বারো হাজার ফুটের বেশী দৈর্ঘ্য ছবি তৈরী হতে পারবে না।

জানা গেছে, সেন্সর বোর্ডের বর্তমান সিদ্ধান্ত ও কাঁচা মালের অভাব ইত্যাদি হেতু প্রায় শতাধিক ছবির কাজ ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। এবং আমাদের চিত্র-নির্মাতাদের মনে হতাশ ও নিরাশার কালো মেঘ বিন্দু বিন্দু করে জমতে শুরু করেছে।

—আনওয়ার আহমেদ

শতবর্ষের স্মরণীয়

গিরিশচন্দ্র । ন্যাশনাল থিয়েটার । প্রতাপ জহুরী

৬, বিডন স্ট্রীট। বর্তমান মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চ যেখানে অবস্থিত। এখানেই গড়ে উঠেছিল বাংলার স্থায়ী দ্বিতীয় নাট্য-বেদী গ্রেট ন্যাশনাল। গ্রেট ন্যাশনালের পর ন্যাশনাল থিয়েটারের ইতিহাসও আমরা আলোচনা করেছি। শেষ পর্যন্ত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ন্যাশনাল থিয়েটার নীলামে ক্রয় করে নিলেন ২৫,০০০ টাকায় প্রতাপ জহুরী।

জহুরী জহর চিনতেন। তাই থিয়েটার ক্রয় করেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—উপযুক্ত লোকের হাতে যদি থিয়েটার পরিচালনভার ন্যস্ত করতে না পারেন, তবে থিয়েটার ব্যবসায় তাকে লোকসান খেতে হবে। এই উপযুক্ত লোক হিসেবে গিরিশ-চন্দ্রের কথাই তার সর্বাগ্রে মনে হলো। গিরিশচন্দ্র তখন পার্কার এ্যান্ড কোম্পানীতে কর্মরত। নাট্যশালার সঙ্গে পেশাগত তাঁর কোন সম্পর্ক তখনও গড়ে ওঠে নি। প্রয়োজনের তাগিদে তিনি নাট্যশালার পুরোভাগেই এসে দাঁড়িয়েছেন। যিনি যতটুকু সাহায্য চেয়েছেন—ততটুকু সহ-যোগিতা নিয়েই জড়িয়ে পড়েছেন। প্রতাপ জহুরী গিরিশচন্দ্রকে যখন আহ্বান জানালেন এক্ষেত্রেও সর্ব সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন তিনি। প্রতাপ জহুরী গিরিশচন্দ্রের এই আশ্বাসেই আশ্বস্ত হতে পারলেন না। তিনি সোজাসুজি বললেন : "বাবু, আমি ব্যবসায়ী লোক ব্যবসা করতে নামবো। আপনার ওই আশ্বাসের ওপর নির্ভর করতে পারবো না। আপনি চাকরী ছেড়ে পুরোপুরি থিয়েটারের দায়িত্ব নেবেন। একশত টাকা মাইনে দেবো এখন তারপর দেখা যাবে।"

পার্কার এ্যান্ড কোম্পানীতে গিরিশচন্দ্র তখন মাইনে পেতেন দেড়শত টাকা। পঞ্চাশ টাকার ঘাটতিটা তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিল না। এ নিয়ে দর কষাকষিও করলেন না। কিন্তু তবু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। সুনিশ্চিত বর্তমান। আশাদীপ্ত ভবিষ্যত। অপরদিকে অনিশ্চিত ভবিষ্যত—বর্তমানও লাভজনক নয়। তবু, তবু অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্য থেকে প্রদীপ্তা হয়ে উঠলেন বাংলার নাট্যলক্ষ্মী। বর্তমানের দীনাহীনা নাট্যলক্ষ্মী যেন কাতর আহ্বানে তাঁকে বিহ্বল করে তুললেন। অন্তরের সুপ্ত বাসনা দিয়ে নাট্যলক্ষ্মীর সর্বালংকায় রূপ ভেসে উঠলো তাঁর কল্পনায়। সর্বস্ব পণ করে তিনি যদি আত্মনিয়োগ করতে না পারেন তবে ধ্যানের প্রতিমা ধ্যানের মধ্যেই আবদ্ধা থাকবেন। লোকচক্ষুর সামনে কখনই পারবেন না তাকে প্রতিষ্ঠা করতে।

সময় চাইলেন কয়েকদিন প্রতাপ জহুরীর কাছে! —একটু ভেবে দেখতে দিন। ঘর সংসার আছে। পরামর্শ করি। তাছাড়া মিঃ পার্কার এত ভালবাসেন। তাঁর মতামত-টাও জেনে নি।

মিঃ পার্কারকে বললেন গিরিশচন্দ্র সমস্ত কথা। মিঃ পার্কার সঙ্গে সঙ্গে নিষেধ করলেন। একজন বিশ্বস্ত কর্মী হারাবার কথাই তাঁর সামনে বড় হয়ে দেখা দিল না। গিরিশচন্দ্রকে অসম্ভব ভাল-বাসতেন। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে তাঁকে ঠেলে দিতে চাইলেন না।

কিন্তু যা ভবিতব্য তা কে খণ্ডাবে? অন্তরের সুপ্ত বাসনা। নাট্যলক্ষ্মীর হাত-ছানি। প্রতাপ জহুরীর অনুরোধ। ভাবী-কালের নটগুরু গিরিশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ালেন নাট্যশালার বেদীমূলে। ভূতপূর্ব ন্যাশনাল থিয়েটারে থাকাকালীন সময়েই 'মহিলা কাব্যের' কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারকে দিয়ে চিতোরের কাহিনী নিয়ে 'হাম্বির' নাটক লিখিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে সুরেনবাবু মারা যান। তাঁর ভ্রাতা দেবেন্দ্র-নাথ মজুমদারের কাছ থেকে নাটকটি সংগ্রহ করে রিহার্সেল শুরু করেন গিরিশচন্দ্র। ধর্মদাস সুরকে নিলেন মঞ্চাধ্যক্ষ রূপে। ম্যানেজারের দায়িত্বও রইল ধর্মদাস-বাবুর ওপর। প্রতাপ জহুরীর স্বত্বাধি-কারীত্বে গিরিশচন্দ্রের পরিচালনায় ন্যাশনাল মঞ্চে সর্বপ্রথম ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী মঞ্চস্থ হলো 'হাম্বির'। নাটকের জন্য কয়েকখানা গান লিখলেন গিরিশচন্দ্র। অভিনয়ে ছিলেন গিরিশচন্দ্র—হাম্বির। মহেন্দ্রলাল বসু—উদয় ভট্ট। অমৃত-লাল বসু—পাল মাহাতো। অমৃতলাল মিত্র—ধীমান দেব। বিনোদিনী—লীলা। কাদম্বিনী কমলা। বনবিহারিণী—পান্না। রামতারণ সান্যাল—চারণ।

'হাম্বির' মাত্র তিন রাত্রি অভিনীত হয়। মোটেই জমলো না। ভাবনায় পড়লেন গিরিশচন্দ্র। নাটকের অভাব সম্পর্কে গিরিশ-চন্দ্র সচেতন ছিলেন। বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয় নাটকের জন্য কিন্তু ভাল নাটক পাওয়া যায় না। চিন্তান্বিত গিরিশচন্দ্র। নিজেই বসলেন নাটক লিখতে। রাতারাতি লিখলেন দোললীলা, শিবের বিবাহ ও মায়াতরু—তিনখানা গীতিনাট্য। প্রথমোক্ত দুখানা মঞ্চস্থ হলো। কিন্তু জমলো না। ২১ জানুয়ারী মঞ্চস্থ হলো মায়াতরু। মায়াতরু সাড়া জাগালো অসম্ভব। মায়াতরু পলাশীর যুদ্ধের সঙ্গে অভিনীত হতো। বিনো-দিনীর কণ্ঠে গিরিশচন্দ্র রচিত "না জানি সাধের প্রাণে" গানখানি সকলের কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হতো। বঙ্কিমচন্দ্র মায়াতরুর ভূয়সী প্রশংসা করেন। রেইস অ্যান্ড রায়তের সম্পাদক শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিগত-ভাবে গিরিশচন্দ্র এবং বিনোদিনীকে অভি-নন্দিত করেন।

১৬ এপ্রিল গিরিশচন্দ্র রচিত মোহিনী প্রতিমার সঙ্গে আলাদীন মঞ্চস্থ হলো। আলাদীনে গিরিশচন্দ্র কুহকী চরিত্রে অভিনয় করেন। দুখানাই জনপ্রিয়তার্জন করে।

এপ্রিলেই গিরিশচন্দ্র নাট্যরূপায়িত রমেশ দত্তের 'মাধবী কঙ্কণে' সাতটি চরিত্রে গিরিশচন্দ্রের অভিনয় বিস্মিত করে নাট্যা-মোদীদের। ২০শে মে মঞ্চস্থ হলো আনন্দ রহো। গিরিশচন্দ্র বেতাল: বিনোদিনী লহনা। আনন্দ রহো জনপ্রিয়তার্জনে সক্ষম হয় না। বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনীতে 'আনন্দ রহো'র জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ভ্রান্ত মন্তব্য করেছেন।

এবার গিরিশচন্দ্র উপহার দিলেন তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক রাবণ বধ।

রাবণ বধ আশাতীত সাড়া জাগালো। অমৃতবাজার পত্রিকা ৪ঠা আগস্ট ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের সংখ্যায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন।

অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র—রাম। বিনোদিনী—সীতা। অমৃত মিত্র—রাবণ। মহেন্দ্র বসু—লক্ষ্মণ। অমৃত মুখোপাধ্যায়—ইন্দ্র। তা ছাড়া ছিলেন কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি। চতুর্দিকে গিরিশচন্দ্র তথা ন্যাশনাল থিয়েটারের জয় ঘোষিত হলো।

১৭ সেপ্টেম্বর মঞ্চস্থ হলো সীতার বনবাস। রাম—গিরিশচন্দ্র। সীতা—কাদম্বিনী। বাল্মীকি—অমৃত মিত্র। লব আর কুশ রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন যথাক্রমে বিনোদিনী আর কুসুম (খোঁড়া)। 'সীতার বনবাস' নাট্যশালাকে নতুন মহিমায় শ্রীমণ্ডিত করলো। জনমদুঃখিনী জনকতনয়া সীতা নতুন রূপে ভা[illegible]ী হয়ে উঠলেন পাদ-প্রদীপের আ[illegible]মালার সামনে।

অমৃতবাজার সাধারণী ভারতী সোম প্রকাশ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা থেকে সাধারণ নাট্যামোদীরা সীতার বনবাস নাটকটিকে অভিনন্দন জানালেন। প্রতাপ জহুরী নিজে গিরিশচন্দ্রকে বলতে লাগলেন : 'বাবু ঐ দুটি ছেলেকে (লব ও কুশ) আপনার সব নাটকেই ছেড়ে দিন এখন থেকে।' গিরিশচন্দ্র হাসেন। সবাই মজা পান।

তিলতর্পণের পর ২৬ নভেম্বর মঞ্চস্থ হলো মহাভারতের কাহিনী নিয়ে রচিত অভিমন্যু বধ। ৩১ ডিসেম্বর এলো লক্ষ্মণ বর্জন।

রামায়ণ মহাভারতের অমৃতধারায় প্লাবিত হয়ে উঠলো ন্যাশনাল থিয়েটার। এই নাট্যরসধারা পান করে নাট্যপিপাসু জনসাধারণ আপ্লুত হয়ে উঠলেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দ সূচনা করলো বাংলা নাট্যশালার নবদিগন্ত। এই নবদিগন্ত নটগুরু গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভায় নব-বর্ণচ্ছটায় রাঙিয়ে নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিল।

(ক্রমশঃ)

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

পরিচালক আদর্শ তাঁর আদর্শ থেকে মোটেই বিচ্যুত হচ্ছেন না। কিছুদিন আগে তিনি 'গুপ্তজ্ঞান' দিয়েছেন সমগ্র দেশবাসীকে। আদর্শবাদী আদর্শ অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন কারণ আমরা সব হুমড়ি খেয়ে পড়ে 'গুপ্তজ্ঞান' আহরণ করেছি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রত্যেকটা প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ সে কথাই প্রমাণ করে। যাই হোক, লেটেস্ট খবর হচ্ছে, আদর্শ আবার জ্ঞান দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তিনি 'গুপ্তজ্ঞান' ছবির পার্ট-টু বানাবেন। এতেও বোধ করি জ্ঞানদান শেষ হবে না। একবার যখন 'পার্ট'-এ পেয়েছে তখন কত নম্বর পর্যন্ত গড়ায় তা এখনই বলা যাচ্ছে না। আপাততঃ এই বলা যাচ্ছে 'গুপ্তজ্ঞান' পার্ট-টুতে বেশ কিছু রগরগে ব্যাপার থাকবে। নর-নারীর যৌন মিলনের দৃশ্য থাকবে। কিভাবে 'আবরশন' হয়—তার বিস্তৃত বিবরণ থাকবে। সেন্সর যদি অ্যালাউ করেন তাহলে তো দেখছি আদর্শ 'গুপ্তজ্ঞান' পার্ট-টু ব্লু-ফিল্ম করে ছাড়বেন। আদর্শ ছবির শুটিং শুরু করেছেন। কোনো স্টুডিওতে হচ্ছে না। হচ্ছে বাড়ি বাড়িতে, বড় বড় নার্সিং হোম-এ।

শক্তি সামন্তের 'অমানুষ' হিন্দি এবং বাংলা ভার্সানে সুর রচনা করে ইতিমধ্যেই বিখ্যাত হয়েছেন কলকাতার শ্যামল মিত্র। হিন্দি গানগুলি বম্বেতে লোকের মুখে মুখে ফিরছে। ফলে সুরকার শ্যামল মিত্রকে নিয়ে বম্বের অনেক প্রযোজক কিম্বা পরিচালক কাজ করতে আগ্রহী। গত সপ্তাহে শ্রীমিত্র এখানে এসেছিলেন। প্রযোজক এন সি সিপ্পী তাঁর আগামী ছবির জন্য শ্রীমিত্রকে চুক্তিবদ্ধ করেছেন। গিরিজা সামন্তর আগামী ছবি বাংলা হিট দেয়া নেয়া'র হিন্দি। রাজেশ খান্না নায়ক হবেন। এ ছবিতেও শ্যামল মিত্র সুর সংযোজনা করবেন। এছাড়া আরো কয়েকটি ছবির জন্য কথা হয়েছে।

জিনত আমন এখন বম্বেতে বহু-আলোচিত নায়িকা। বহুবল্লভাও বলতে পারেন। 'প্রেম শাস্ত্র' ছবির পর জিনতের নাম হয়েছে 'হট গার্ল'। আগেকার ইমেজ নেই, আই মিন ওকে আর কেউ 'দম মারো দম গার্ল' বলছে না। 'হট গার্ল' বলছে এই কারণে জিনত পরিচালকের নির্দেশ পেলেই জামা কাপড় খুলতে শুরু করছে। অতটা সেন্সর রাখছে না। যা রাখছে তার ঠ্যালায় অস্থির কান্ড। একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে জিনত বলেছে—আমি সার বুঝে গিয়েছি। বম্বেতে মাত্র কয়েকজন পরিচালক ছাড়া অভিনয় নিয়ে কেউ মাথা ঘামান না। সকলেই চেষ্টা করেন আমাকে কিভাবে, কতটা একসপোজ করা যায়। তাই আমাকে ওরা কিছু বলার আগেই ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে, বসে অথবা শুয়ে যা যা করার করে ফেলি। আমি তো সকলকে বলেই দিয়েছি সেন্সর যদি অ্যালাউ করে তাহলে বাথরুম সিনেও কাজ করতে রাজী আছি। এ-সব ব্যাপারে আমার কোন সংকোচ নেই। পয়সার জন্য কাজ করতে এসেছি। এমন কাজ যেখানে ঘোমটা টানার কোনো মানে হয় না।

জিনত ইদানীং আবার বহুবল্লভাও। কখনও শত্রুঘ্ন সিনহার সঙ্গে, কখনও রাজেশ খান্নার সঙ্গে, কখনও ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে, কখনও বা শশী কাপুরের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। শত্রুর সঙ্গে বছর খানেক হল প্রেমের জোয়ারে ভেসেছে জিনত। এখন ভাঁটা চলছে। রাজেশ শাদীশুদা আদমী মানে বিবাহিত ও একটু আড়ালে আবডালেই মজা লুটছে। প্রেম নয় জেনেই জিনত ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। ধর্মেন্দ্রর জন্য পাগল হয়েছিল জিনত। ইয়াদো কি বরাত ছবির সময়। পাগলামি একটু কমেছে। কেননা হি ম্যান ধর্মেন্দ্র শী ও-ম্যান জিনতের কাছে ধরা দিয়েছে। শশী কাপুরের সঙ্গে জিনতের সম্পর্ক নাকি ভাই বোনের। অথচ নির্জনে একান্তে শশীর সঙ্গে ওকে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। গুরু হচ্ছেন দেবানন্দ। সব দেখে শুনে মনে মনে হাসছেন। হয়তো বা বলছেন : তোমরা কেউ আমার উপযুক্ত শিষ্য হতে পারলে না।

—অভিজিত

জলসা

ভারত-নেপাল মৈত্রী সংঘের রাখীবন্ধন উৎসব : নিউআলিপুরে নেপাল কনসাল জেনারেল মিঃ থাপার বাসগৃহের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে ভারত-নেপাল মৈত্রী সংঘের পক্ষ থেকে রাখীমিলন উৎসবের এক মনোরম উৎসবসভার আয়োজন করেন সংস্থার সম্পাদক শ্রীপুলিন চট্টোপাধ্যায়, কর্মাধ্যক্ষ শ্রীলোহিয়া ও বকসী। নীল আকাশের নীচে রঙিন সামিয়ানার আলোঝলমল আসরে ভারত ও নেপালের অভ্যাগতদের সংস্থার পক্ষ থেকে রঙিন রাখী পরিয়ে দিয়ে তাঁদের অন্তরে যেন অনুষ্ঠানের মাধুর্য সঞ্চার করে দেওয়া হোলো।

অনুষ্ঠান-আসরের উদ্বোধন করে শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ বলেন, 'বঙ্গ বিভাগের সময় রাখীবন্ধন উৎসবের সূচনা দুই বঙ্গের একাত্মতার প্রতীক উৎসবরূপে। এর প্রধান হোতাদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং কবিগুরু। আমাদের প্রতিবেশী বন্ধুরা অনুভবলোকে সেই পুণ্যক্ষণটির ব্যাপ্তি ও গভীরতাকেই স্মরণ করিয়ে দিলেন আজকের এই আনন্দমেলায় আমাদের আহ্বান জানিয়ে। রাখীবন্ধনের কাব্য-সৌন্দর্য, ভাবগভীরতা ও হৃদয়ছোঁয়া মধুরতা সব মিলিয়ে এই মিলনসভার একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। এই মুহূর্তে নানান সংগ্রামের আঘাতে যখন আমাদের জীবন অস্থির, ক্লান্ত, ঠিক সেই অধ্যায়েই এমন একটি রঙিন মুহূর্তকে তুলে ধরার জন্য উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাই। নেপাল-ভারত মৈত্রী সংঘের মহৎ উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হোক।'

উৎসবের বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করেন যথাক্রমে পুলিনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীলোহিয়া। অভ্যাগতদের স্বাগত জানান প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীথাপা।

এরপর ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উৎসবের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও তার সঙ্গে নৃত্য পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন অপর্ণা চট্টো-

পাধ্যায় ও পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য শিল্পীরা হলেন কেতকী মৈত্র, কেয়া বসু, সৌমেন্দ্র ঘোষ, স্নিগ্ধা গোস্বামী। যন্ত্রসঙ্গতে ছিলেন দীপক মুখোপাধ্যায়।

সুললিত আবৃত্তি দিয়ে গানের ফাঁকগুলি ভরে দিয়েছিলেন রথীন্দ্র সরস্বতী ও সুনন্দা মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন প্রীতি চট্টোপাধ্যায়।

সর্বশেষ অনুষ্ঠান শ্রী এল বি থাপা পরিচালিত টিটারিট। এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন নেপালের শিল্পীরা। নেপালের লোকসংগীত ও নৃত্য দিয়ে শিল্পীরা এক উজ্জ্বল পরিবেশ রচনা করেন।

সাবর্ণিক নিবেদিত 'শাপমোচন':

আকাডেমী অফ ফাইন আর্টসে সাবর্ণিক নিবেদিত 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্য এক পরিচ্ছন্ন সুন্দর প্রযোজনা।

অসুন্দরের বেদনা, অন্ধকারের কান্না আলো-আঁধারের মিলিত সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা—তথা রবীন্দ্রদর্শনের আশ্চর্য গভীরতাবোধ রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছিল নরেশকুমার ও সুমিত্রা নৃত্যে ও অভিব্যক্তিতে। ছন্দপতনের অপরাধে নির্বাসিত সৌরসেনের কাতরতা স্বল্প কয়েক মুহূর্তের নৃত্যে দর্শকচিত্তে পৌঁছে দিয়েছেন নৃত্যকুশলী নরেশকুমার।

কমলিকার চিত্তস্পন্দন বেদনাভরা দীর্ঘ পথ পরিক্রমা পরিশেষে প্রাপ্তির প্রতিটি শোভনসুন্দর পদক্ষেপের ছন্দে—যেন গতির ছবি হয়ে উঠেছে। রাজার সঙ্গে মিলনমুহূর্তে মণিপুরীর প্রথম চালির সঙ্গে কথাকলির রঙ্গপ্রণামের চকিত আভাষের মিলনে সুমিত্রার নৃত্যনিপুণ্য শিল্পবোধের স্মরণীয় সমন্বয় ঘটেছে।

নৃত্যপরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্ব পালনে নিজের খ্যাতি অনাহত রেখেছেন শম্ভু নাগ। অরুণেশ্বরের ভূমিকায় তাঁর চরিত্রোপযোগী রূপদানও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তবে 'না যেও না' গানটির

সুমিত্রা মিত্র

সঙ্গে নৃত্যে একেবারে সটান মঞ্চের ওপর ধরাশায়ী হয়ে পড়ার কোনো প্রয়োজন ছিলো কি?

শিবানী রায় ধূর্জটি সেন সুজাতা মুখোপাধ্যায় জয়ন্তী মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্যরা নৃত্যবৃত্তকে সম্পূর্ণ করেছেন।

সংগীতাংশে কমলিকার গান সুমিত্রা সেন ভালো গাইবেন এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু হৈমন্তী শুক্লা—রবীন্দ্রসংগীত যিনি গান না—তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রসংগীতও শুনতে ভালো লেগেছে এইটে হোলো এ অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য খবর।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীতের এক সুপরিচিত শিল্পী। কিন্তু এই নৃত্যনাট্যে সৌরসেন ও অরুণেশ্বরের ভূমি[কায়] গাওয়া গানগুলিতে তিনি যে অসা[ধারণ] দক্ষতা দেখিয়েছেন—নাট্যরসসৃষ্টি ও সু[র] উভয়ক্ষেত্রেই—তাঁর গানের শ্রোতাদের [illegible] এ অভিজ্ঞতা নতুন বলেই স্মরণীয়। শি[illegible] তাঁর সাধনায় নিরলস এবং সেই কা[illegible] সাফল্যের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন খবর সংগীতরসিকের কাছে নি[illegible] আনন্দের। শিবানী রায় সুন্দর গেয়ে[illegible] মধুশ্রীর গানগুলি।

অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সার্থকতায় আর যাঁদের অবদান স্মরণীয় তাঁরা হ[illegible] প্রদীপ ঘোষ (গ্রন্থনা) ছন্দা সেন (সং[illegible] চিত্তরঞ্জন মুখার্জি ও খোকন সেনগু[illegible] আলোক মঞ্চ ও সজ্জায় ছিলেন সুশীল খোকন লাহিড়ী ননী দাশগুপ্ত।

অমলাশংকরের সাম্প্রতিক সৃষ্টি

রবীন্দ্রসদন মঞ্চে উদয়শংকর কাল[illegible] পক্ষ থেকে পরিবেশিত 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত[illegible] শ্রীমতী শংকরের প্রযোজনার অধ্যায়ে চমকপ্রদ সংযোজন।

চিত্রাঙ্গদা কবিগুরুর এক অ[illegible] দর্শনের কাব্যসুন্দর প্রতিচ্ছবি। অসামান্যা হৃদয়বেদনার দ্বন্দ্বকে ছন্দ[illegible] সংগীতের ভাষায় রূপদান করা সহজ কিন্তু [illegible]তী শংকর এই কঠিন অনায়া[illegible] [illegible]তার সম্পন্নই শুধু করেন সার্থক [illegible]ছেন তাঁর উদয়শংকরের শিক্ষা [illegible] গঠন নৈপুণ্যের [illegible] দক্ষ[illegible]

[illegible]তঃ গতানুগতিক ছাঁচে চিত্রা[illegible] নৃত্যগুলি রচিত হয়নি। শংকর ঘ[illegible] ধারানুসারে প্রত্যেকটি শিল্পীকে স্বাধ[illegible] দেওয়া হয়েছে তাঁদের নিজস্ব ধারণা দক্ষতার অনুরূপ নৃত্যরচনা করবার। [illegible]ভাবে হোলো নৃত্যরচনা তারপর এল শ্রী শংকরের হাতের সংশোধন। ফলশ্রুতি পাওয়া গেল প্রতিটি শিল্পীর ব[illegible] স্বাক্ষরিত এক আত্মপ্রকাশের উজ্জ্বল [illegible] নৃত্য যা স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু ম[illegible]

নায়িকার ভূমিকায় শংকরদ[illegible] প্রতিভাময়ী কন্যা শ্রীমতী মমতাশংকর কৃতিত্বকে যেন নতুন করে মেলে [illegible] নৃত্যদক্ষতার সঙ্গে মিশেছে অভি[illegible] পরিণতি। তাই প্রতিটি পর্যায়ে তিনি উঠেছেন। চিত্রহারা।

অর্জুনরূপী তনশ্রীশংকর অ[illegible] কান্তজের দর্প, মোহ ও মোহ[illegible] পর্যায়গুলি দৃপ্তছন্দের মন্ত্রগতিতে [illegible] করে তুলেছেন।

সুন্দরী চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় আ[illegible] সেনের লজ্জানম্র ভীরুতা সংকোচে [illegible] গদ্য স্বরূপ ব্যক্ত।

—চিত্রা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

২৫ অক্টোবর

১৪ বর্ষ

অমৃত

সংখ্যা ২৫

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ন নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday 25th October, 1974 শুক্রবার, ৭ কার্তিক, ১৩৮১

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষান্মাষিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীমনোজ বিশ্বাস

স

সম্পাদকীয়

উৎসব ও তার পরিবেশ

শারদীয় দুর্গোৎসব তার আনন্দের বার্তা নিয়ে প্রতিবারের ন্যায় এবারেরও আমাদের দুয়ারে উপস্থিত হয়েছে। শরতকাল চিরদিনই বাংলাদেশে আনন্দের বার্তা বহন করে আনে। বর্ষার শেষে আকাশ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে চারিদিকে অজস্র নীল, হালকা শাদা মেঘ আর ফুলের সৌরভ নিয়ে শরতের আগমন। দুর্গোৎসব এই আনন্দেরই অভিব্যক্তি। একই সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পবিত্র ঈদ উৎসব। দুর্গোৎসবে হিন্দু মুসলমান উভয়েই এবার একই সময়ে উৎসবের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। সারা বৎসরের উদ্বেগ, চিন্তাভাবনা ও জীবন সংগ্রামের কঠোরতা বিস্মৃত হয়ে এই উৎসবে সকলে আনন্দে মিলিত হতে চায়। উৎসব প্রতিদিন আসে না। তাই অন্য দিনের চেয়ে উৎসবের দিনগুলো স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট।

শান্তি, মৈত্রী ও কল্যাণের বাণী নিয়ে আসে শারদোৎসব। বিশ্বমানবের কল্যাণে উদ্‌যাপিত হয় পবিত্র ঈদ উৎসব। প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত অসম্পূর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ও দীনতা এই পবিত্র আনন্দোৎসবে নতুন সার্থকতা লাভ করে। পূর্ণতায়, উদারতায় এবং বিশ্বজনীনতায় ঘটে তার নতুন দীক্ষা। এবারের উৎসব এসেছে গভীর দুর্যোগের মধ্যে। বাংলার গ্রামে গ্রামান্তরে নিরন্নের হাহাকার ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত। 'অন্ন চাই, প্রাণ চাই চাই মুক্ত বায়ু' বলে কবির প্রার্থনা যেন আজ আমরা শুনতে পাচ্ছি সারা দেশে। শুধু পশ্চিমবাংলায় নয় অন্যান্য অনেক রাজ্যেও একই হাহাকার ধ্বনি। যেন বা মন্বন্তরের ছায়ায় বাস করছি। এই পরিবেশে উৎসবের আনন্দ হবে ম্লান। সকলের কল্যাণের জন্য যে-উৎসব তার প্রকৃত সার্থকতা হবে ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন দিয়ে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় ও আশ্বাস দিয়ে। অথচ আশ্চর্য এই যে খাদ্যবস্তুর অভাবের চেয়ে ক্রয় ক্ষমতার অভাবই এই দুর্নিমিত্ত ডেকে এনেছে। চড়া দাম দিলে খাদ্য দুর্লভ নয়। খাদ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে জানা যায়, অর্থের অভাবে গ্রামাঞ্চলের মানুষ তাদের রেশন কার্ড বাঁধা দিয়েছে, রেশন তোলার ক্ষমতা তার নেই।

এই পরিস্থিতিতে মানুষকে বাঁচতে হলে তাকে ত্রাণসামগ্রী সাহায্য দিয়ে এই দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করতে হবে। সরকার ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এই কাজ করছেন। কিন্তু আজ সরকারকে সাহায্য করার জন্য প্রতিটি নাগরিককে এগিয়ে আসতে হবে।' মানুষের এই দুঃখ ও দুর্দশা লাঘবের জন্য উৎসবের সময়ে প্রত্যেককে তার সাধ্যমত ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এবার পুজোয় বাজার তেমন জমেনি। বৎসরের এই সময়ে সাধারণ গেরস্ত মানুষ কাপড়চোপড় কেনাকাটা করে, ছেলেমেয়েরা আশা করে থাকে। চরম অর্থনৈতিক সংকটের জন্য এবং জিনিসপত্রের চড়া দামের জন্য সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ দোকানের ধারে কাছে যেতে পারছে না। তার ফলে ব্যবসায়ীদেরও আয়ের পথ বন্ধ। এর প্রতিক্রিয়া সর্বস্তরের মানুষেরই জীবনে দেখা দেবে।

উৎসবের আনন্দও তাই সীমিত হতে বাধ্য। আলোকসজ্জা করে মণ্ডপ সাজিয়ে আড়ম্বর ও জাকজমক দেখিয়ে উৎসব করার সার্থকতা এই দুর্দিনে খুব আছে কি? জোর জবরদস্তি করে চাঁদা আদায় করাও হবে অন্যায়। আপৎকালে একটি জাতি যেমন সংযম ও ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত হয়, আমাদেরও এইবার উৎসবের আতিশয্য বর্জন করে অর্থ বাঁচিয়ে দুর্গতের সেবায় তা দান করাই হবে শ্রেষ্ঠ পুজা। ক্ষুধিতের অন্নদান সেবার চেয়ে মহৎ সেবা আর কিছু নেই। এই সেবার আহ্বান এসেছে আজ। অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছেন বিশ্বের ভার সুখে আছে সর্ব চরাচর—কবির এই স্বপ্ন সফল হোক। অন্নপূর্ণারূপে, দুর্গতিনাশিনীরূপে যাঁর আরাধনা তাঁর আশীর্বাদে নিরন্নের মুখে হাসি ফুটুক। এবারের উৎসবে এটাই সর্বোত্তম প্রার্থনা।

ববি ও তার চার প্রেমিকা

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের কাছে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে মল্লিকা ঘনঘন হাতঘড়ি দেখছিল। প্রায় আধ ঘণ্টার ওপর সে এখানে দাঁড়িয়ে ববির জন্যে অপেক্ষা করছে। বারটার মধ্যে আসবে বলেছিল ববি। প্রতিবার ববি দেরী করে আসে। উল্টো-পাল্টা কথা বলতে ও খুব ওস্তাদ! ববির সবকিছু সুন্দর। ভীষণ, ভীষণ ভাল লাগে ববিকে!

—মলি!

মল্লিকার চোখমুখ হাসিতে ভরে ওঠে। ববি আজ পরেছে লাল রঙের গুরু পাঞ্জাবি আর ডীপ ব্লু রঙের টেরিকটের প্যান্ট। ধবধবে ফরসা চেহারায় যা পরে তাতেই সুন্দর দেখায় ববিকে।

—তাড়াতাড়ি পাঁচটা টাকা দাও, ট্যাকসীর ভাড়াটা দিয়ে আসি।

বটুয়া খুলে পাঁচ টাকার একটি নোট ববির হাতে গুঁজে দেওয়ার সময় মল্লিকা মনে মনে বলে, 'আমার যা কিছু সবই তোমার...তুচ্ছ পাঁচ টাকা!'

একটু পরে ববি আর মল্লিকা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে জলের ধারে একটা বেঞ্চিতে পাশাপাশি ঘন হয়ে বসল। ওদের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরও কিছু যুবক-যুবতী।

মল্লিকা কপট ক্রোধের ভঙ্গীতে বলে, তুমি আজ বড্ড দেরী করেছো। আর পাঁচ মিনিট দেরী হলে আমাকে পেতে না।

—জান মলি, এই শহরে বাস ট্রামের যা অবস্থা...আমার নাকের ডগা দিয়ে যাত্রী বোঝাই হয়ে ছুটে গেছে। আর ট্যাকসী? আজকাল রাজার ছেলে ছাড়া ট্যাকসী চাপার কথা কেউ ভাবে না। উঃ তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কিভাবে যে ছুটে এসেছি... যাকগে, রাগ করনি তো? ইস্ আজ তোমাকে যা মিষ্টি লাগছে...এই মলি ভীষণ ইচ্ছে করছে তোমাকে একটা...।

মল্লিকা দু'হাত দিয়ে ববির মুখ সরিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, আঃ দুষ্টুমী কর না আচ্ছা ববি তুমি এবার একটা চাকরি টাকরী খুঁজে নাও। এম এ ডিগ্রীটা বুকে ঝুলিয়ে দু'বছর ঘুরে বেড়ালে অথচ একটা ভাল চাকরি...।

—চাকরি করবো আমি! ববি আহ চোখমুখে মল্লিকার দিকে তাকায়, আমা একমাত্র দুর্বলতা যে, কোন সুন্দর যুবতীকে রূঢ় কথা বলতে পারি না মলি, তুমি আমার সম্পর্কে আরও একটু উঁচু ধারণা...।

ববির গম্ভীর চেহারা দেখে মল্লিকা দু'চোখ ছলছল করে ওঠে। সে ওর একটা হাত মুঠোয় জড়িয়ে কাঁপা গলায় ব

আমাকে ক্ষমা কর। প্লীজ, এক...
তাকাও!

ববি কথা বলার ফাঁকে এক পলক হাতঘড়ি দেখল। প্রায় দেড়টা বাজে। এবার তাকে উঠতে হবে। মল্লিকার দিকে সে হাসিমুখে তাকায়।

—মলি তুমি জেনে রেখ আমি কোনদিনই চাকরি করবো না।

—তোমায় কিস্সু করতে হবে না। আমি চাকরি করবো। তোমার ভালবাসা ছাড়া আর কিছু চাই না।

—মলি, আর দু'চার বছরের মধ্যে আমাকে তুমি জনপ্রিয় নায়ক হিসেবে দেখতে পাবে।

মল্লিকা হাঁ করে ববির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ববি সামান্য হেসে বলে, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? অলরেডি চার পাঁচটা ছবিতে কাজ পেয়েছি। অবশ্য নায়কের ভূমিকায় নয়, তবে মোটামুটি ভাল রোল। মলি, আমি এবার উঠবো।

—এত তাড়াতাড়ি? মল্লিকা অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে সামান্য সরে বসল।

—প্লীজ, রাগ কর না। ববি নরম গলায় বলল, ঠিক দুটো থেকে আড়াইটের মধ্যে আমাকে স্টুডিয়োতে পৌঁছতেই হবে। দেরী হলে ডিরেকটর রাগ করবেন। মলি, লক্ষ্মী মেয়ে আমার দিকে তাকাও—তুমি নিশ্চয়ই আমার ক্ষতি চাও না!

মল্লিকা ম্লানমুখে আস্তে আস্তে বলে, কোনদিনই তোমাকে বেশীক্ষণ কাছে পাই না। ববি, তোমাকে একটা কথা বলবো, হেসে উড়িয়ে দিয়ো না।

—ইস্ অনেক দেরী হয়ে গেল! ববি হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল, মলি, একটু হাসিমুখে তাকাও। ছিঃ! ওরকম ছলছল চোখে তাকায় নাকি—জাস্ট একটু মিষ্টি হাসি। আর হ্যাঁ, একদম ভুলে গিয়েছিলাম— মানিব্যাগ ফেলে এসেছি বাড়িতে।

বটুয়া খুলে মল্লিকা কয়েকটা টাকা ববির হাতে গুঁজে দিল নিঃশব্দে।

—তোমাকে আমি টেলিফোন করবো।

ববি দ্রুত অগ্রসর হয়। অনেকক্ষণ হাঁটার পর সে একবার পিছনে তাকাল। মল্লিকা ঠিক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে।

বাসে অসম্ভব ভীড়। ঠেলেঠুলে ববি উঠে পড়ল। প্রায় পোনে দুটো। লেডিজ সীটের কাছে দাঁড়ায় সে। একজন মহিলা কটমট করে তাকাতেই ববি মুচকি হেসে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। অন্যের পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়। ববির রসিকতায় বাসের অনেকেই হো হো করে হেসে ওঠে।

কফি হাউসে পৌঁছে দোতলায় ওঠার আগে কিছুক্ষণ দাঁড়ায় ববি। রুমাল বের করে আলতোভাবে মুখের ঘাম মুছল সে। তার পাশ দিয়ে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা হাসি-মুখে কথা বলতে বলতে উঠছে নামছে।

মস্ত বড় হলঘর। ববির দু'চোখ চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে স্থির হয়। দেয়াল ঘেঁষে একটা চেয়ারে শীলা ঘনঘন হাতঘড়ি দেখছে। দৃষ্টি বিনিময় হতে ববি হেসে দ্রুত এগিয়ে যায়। কফি হাউস জুড়ে মৌমাছি গুঞ্জন।

শীলার মুখোমুখি বসে ববি নরম গলায় বলে রাগ কর না শীলু। নাটকের রিহার্সাল থেকে মাঝপথে বেরিয়ে আসা যে কত কঠিন ...যাকগে, তুমি কফি নিয়েছো?

—ববি, আজ আমাকে কিছুতেই এড়াতে পারবে না। শীলা বটুয়া খুলে দুটো সিনেমার টিকিট বের করে বলে মেট্রোয় চলছে—ভীষণ ভীড়, অতিকষ্টে টিকিট জোগাড় করেছি।

—হিন্দী ছবি! ববি তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, ওসব ছবি দেখে কি যে আনন্দ পাও...। শীলু, কি খাবে বল?

শীলা মাথা নাড়াল সবেগে, উহুঁ, আজ সব খরচ আমার। বলে সে মুখ দিয়ে অদ্ভুতভাবে হিস হিস শব্দ করল। সাদা উর্দি পরা বেয়ারা প্রায় ছুটে এল। কফি আর চিকেন কাটলেট। খুব তাড়াতাড়ি।

—তুমি কী নাটকের হিরো? শীলা গভীর দৃষ্টিতে ববিকে দেখতে দেখতে বলে, একটু সাবধানে থেক বাপু। শেষকালে কোন নায়িকার খপ্পরে...না মশাই, মিটমিট করে হেসো না, তোমার যা লালটু চেহারা...।

শীলা একা একা কথা বলে যায় অনর্গল। ববি চুপচাপ শোনে। ধীরে-সুস্থে কফি আর কাটলেট খায়। দেয়ালে লাগানো বড় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠে সে। প্রায় চারটের কাছাকাছি। শীলার কণ্ঠস্বর গাঢ়। দু'চোখে স্বপ্নের আবেশ।

—এই শোন, বাড়িতে আমার বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেছে। শীলার কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক ফুটে উঠে, খুব তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা কর। ওকি, তুমি দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছো কেন?

মুখের ওপর থেকে হাত সরায় ববি। তার সমস্ত মুখ কোঁচকানো।

—উঃ মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা।

—আর এক কাপ কফি খাবে? শীলা টেবিলের তলা দিয়ে ববির একটা হাত মুঠোয় চেপে ধরল।

—উহুঁ! শীলু, আমি আর বসে থাকতে পারছি না।

বিল মি... ববির সঙ্গে শীলা বাইরে এল। ববি ...খ কুঁচকে বলে, কিছু মনে কর না, হঠা... ...থায় এমন যন্ত্রণা...।

শীলা ...ব্দে বটুয়া খুলে সিনেমার টিকিট দুটো কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললো।

—ছিঁড়ে ফেললো! ববি জোর করে হাসার চেষ্টা করল, মিছিমিছি আমার ওপর রাগ করলে তুমি। অঃ, মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে আমার!

শীলা নিজেই তৎপর হয়ে ট্যাকসী ডেকে আনলো।

—আমাকে ক্ষমা কর ববি। ট্যাকসীর হাতল ধরে শীলা ধরাগলায় বলল তুমি থাকবে না সিনেমার টিকিট নিয়ে আমি কি করবো। কবে দেখা হচ্ছে?

—পরশুদিন টেলিফোনে তোমাকে জানাবো।

গঙ্গার ধারে ট্যাকসী থেকে নেমে যায় ববি।

বাঁ দিকে ফোর্ট উইলিয়াম, ডানদিকে বিশাল গঙ্গা। ওয়াটার গেটের উল্টোদিকে বাসস্টপের কাছে ছবি দাঁড়িয়ে। ববি হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রায় ছুটতে সুরু করে। সাড়ে চারটে বেজে গেছে।

ছবি নিঃশব্দে এগিয়ে যায়। কোনদিকে তাকায় না। ববি পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে করুণ চোখমুখে বলে, প্লীজ, রাগ কর না।

—চুপ কর! ছবি হঠাৎ দাঁড়িয়ে কোমরে ডান হাত আর বাঁ হাত ববির মুখের কাছে এনে থমথমে গলায় বলে, কটা বাজে নিজের চোখে দ্যাখো। চুপচাপ একা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা—লোকগুলো হাঁ করে আমাকে

গিলছে।...কী বিচ্ছিরি।

—তোমাকে আজ টপ দেখাচ্ছে—আমারই ইচ্ছে করছে তোমায় গিলে খাই।

—যাঃ! ছবি খিলখিল করে হেসে ওঠে। শেষ বিকেলের আলোয় ওর চোখমুখ উজ্জ্বল দেখায়।

—যাক, হেসেছে যখন, আর কোন ভয় নেই। গাছের নীচে বেঞ্চিতে বসে ছবির কানের কাছে মুখ এনে রবি ফিসফিস করে বলে, কাল রাত্রে তোমাকে আমি স্বপ্নে দেখেছি।

ছবির মুখ লাল হয়ে ওঠে। সে স্থির চোখে রবিকে দেখতে দেখতে বলল, তুমি আজ তাড়াতাড়ি পালাবে না তো?

—চব্বিশ ঘণ্টা তোমাকে আমি কাছে পেতে চাই, ছবিরানী।

—ব্লাফ দিয়ো না! ছবি দু'চোখ কুঁচকে বলে, তুমি আমার সম্পর্কে সিরিয়স নও। রবি খুব শীগগিরই আমাদের রেজেস্ট্রী করা দরকার।

—তুমি কী আমাকে অবিশ্বাস কর? রবি গম্ভীর মুখে সরে বসল।

ছবি সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে রবির গা ঘেঁষে হাসিমুখে বলল, তুমি আজকাল অল্পতেই রেগে ওঠ। এই রবি, আমার দিকে তাকাও। সে ডান হাত দিয়ে রবির মুখ নিজের দিকে ফিরিয়ে মিষ্টি হেসে বলে, তোমাকে অবিশ্বাস করলে বাঁচবো কোন ভরসায়! আমার দিনরাত্রির স্বপ্ন ধ্যান-ধারণা তুমি।

রবি সামান্য হেসে বলে, বিয়ে করলেই কী সব পাওয়া যায়? ছবি, আমি মেটা-ফিজিকাল ভালবাসায় বিশ্বাস করি।

—ধেৎ! ছবি ঠোঁট উলটে বলে, যত অদ্ভুত কথাবার্তা তোমার। দ্যাখ, কী সুন্দর দেখাচ্ছে নদীর জল। যেন রক্তের নদী।

—চল, আমরা দুজনে একসঙ্গে ঝাঁপ দেই ওই রক্তের নদীতে!

ছবি, দু'চোখ বড় বড় করে বলে, খালি ইয়ারকি! শোন রবি, আজ চল না আমাদের বাড়িতে—মা'র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

রবি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, এই মরেছে! ছবিরানী, একদম ভুলে গিয়েছিলাম—আমাকে ছ'টার মধ্যে রাসবিহারীর মোড়ে পৌঁছতেই হবে। ঠিক ওই সময় মিঃ চ্যাটার্জি দেখা করতে বলেছেন।

—মিঃ চ্যাটার্জি... কী ব্যাপার? ছবির হাসিমুখ আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে ওঠে।

—মস্ত বড় অফিসার। ওর অফিসে আমার একটা চাকরি হতে পারে। আটশো টাকা মাইনের চাকরি।

—আটশো টাকা! ছবির দু'চোখ খুশে উজ্জ্বল দেখায় মাত্র আধঘণ্টা বাকী ছুটা

রবির পকেটে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দেয় ছবি।

ট্যাকসীর ভেতর বসে রবি হাসিমুখে ছবির দিকে তাকিয়ে ঘনঘন হাত নেড়ে বিদায় জানায়।

অপেরা সিনেমার কাছে ট্যাকসী ছেড়ে দেয় রবি। ছ'টা বাজতে পনেরো মিনিট বাকী। সে একটা রেস্তোরায় ঢুকে মোগলাই পরোটা আর হাফ প্লেট কষা মাংসের অর্ডার দেয়।

কাঁধে হাত পড়তেই চমকে তন্দ্রা পিছন ফিরে তাকিয়ে রবিকে দেখে অনুযোগের সুরে বলে, উঃ তুমি একটা 'ইয়ে'! একটু আগে আসতে পার না? তাড়াতাড়ি চল, শো বোধহয় সুরু হয়ে গেছে।

অন্ধকার সিনেমা হলে তন্দ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ রবি। খুব মনোযোগ দিয়ে ছবি দেখছে তন্দ্রা। রবির ঘুম পায়। সে দু'চোখ বন্ধ করল।

হাফটাইমে তন্দ্রা ফিসফিস করে বলে, ভীষণ ভাল লাগছে! তুমি অমন ছটফট করছো কেন?

—ছারপোকা।

—বাজে বকো না। তন্দ্রা গাঢ়স্বরে বলে, ছবিটা দেখতে দেখতে বারবার তোমার কথা মনে পড়ছে। ঠিক তোমার আমার গল্প।

রবির কানের কাছে ফিসফিস করে অনেক কথা বলে যায় তন্দ্রা। রবি হাসিমুখে শোনে। মাঝে মাঝে হাই তোলে সে। কখনও তন্দ্রার প্রশ্নে চমকে ওঠে। সিনেমা হলে আলো নিভে যায়।

তন্দ্রা নিবিষ্ট হয়ে ছবি দেখছে। রবি ক্রমশ অধৈর্য। একটা গান সুরু হতেই সে তন্দ্রার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে, বাথরুম থেকে ঘুরে আসছি।

নিচু হয়ে বেরোবার সময় রবি বারবার দর্শকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে। কেউ কেউ বিরক্তি চেপে রাখতে পারে না। উক্ত মন্তব্য ছুঁড়ে দেয় রবির দিকে।

খুব দ্রুত সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে এল রবি। তার বমি পায়। মাথা ঘুরেতে থাকে। তাড়াতাড়ি হাঁটে সে। একটা ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে লাফ দিয়ে ওঠে। ভীড় ঠেলে এগোতে পারে না। কোনরকমে লোহার রড ধরে দাঁড়ায় সে।

ট্রেনে গিজগিজ করছে লোক। ঘামের গন্ধ। দমবন্ধ হয়ে এল রবির। এ ... হাওয়া নেই। ট্রেন ছাড়তে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভীড়ের মধ্যে সে মুখ উঁচু করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ল কয়েকবার।

স্টেশনের বাইরে আলো অন্ধকারের খেলা। রবি ঘুমচোখে হেঁটে বাড়ি পৌঁছায় নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় টানটান ... শুয়ে পড়ল সে। ঘরের এককোণে টিমটি করে হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে। ... টেবিলের ওপর রাত্রের খাবার ঢাকা দেওয়া।

...রবি তাড়া খাওয়া জন্তুর মত ছুটে থাকে। এক গলি থেকে অন্য গলিতে ঢুকতে গিয়ে বাধা পায়। ওরা তাকে অনুমতে ... ফেললো। ওর চায় প্রেমিকা। রবি চিৎ... করে ওঠে। নিস্তব্ধ গলিপথে তার চিৎ... শুনে কেউ জানালা খুলে তাকায় না। ... তার লাল রংয়ের গরম পাঞ্জাবি গেঞ্জী ... ব্লু রংয়ের টেরিকটের প্যান্ট টেনে ছিঁ... খুলে নেয়। তারপর ওরা তার চুলের ... ধরে টানতে টানতে তাকে নোংরা ড্রেনের ... ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়...।

অস্ফুট চিৎকার করে রবি ঘুম ... জেগে ওঠে। প্রায়ান্ধকার ঘরের কোণে টিম... করে হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে। কী বি... স্বপ্ন! বিবর্ণ দেয়ালে লম্বা কালো ... পাশের ঘর থেকে ভেসে এল বাবার খু... কাশির শব্দ। তার মনে পড়ল, কাল ভোরে উঠে চাকরির সন্ধানে তাকে ... জায়গায় যেতে হবে।

গোয়েন্দা ধাঁধা

লাল চুলোর চালাকি ।।
শার্লক হোমস্ ।।

স্যার আর্থার কোনান ডায়াল

লোকটার নাম জ্যাবেজ উইলসন। লাল-চুলো। সম্প্রতি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছে একটা লালচুলো সঙ্ঘে গিয়ে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে সঙ্ঘে গিয়েছিল উইলসন। গিয়ে দেখলে রাস্তা ছেয়ে গেছে লাল মাথায়। লাল আগুন জ্বলছে যেন সারা তল্লাটে। কারণ এ-সঙ্ঘে ঢুকতে পারলে ফি-হপ্তায় চারটে স্বর্ণমুদ্রা মিলবে বিনা আয়াসে। কে এক কোটিপতি লালচুলো নাকি তাঁর সমস্ত টাকা অছির হাতে দিয়ে গেছেন লালচুলোদের সাহায্য করার জন্যে। লাল-চুলের মত লালচুল হলে তাকে বসে রোজ দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত কেবল বিশ্বকোষ কপি করতে হবে। আর কিস্সু নয়।

জ্যাবেজ উইলসন তো হাতে স্বর্গ পেল এমন একটা কাহিনী শুনে। এত সহজে বছরে দশ পাউণ্ড কে না চায়। খবরটা নিয়ে এল অবশ্য তারই কর্মচারী। নাম তার ভিনসেন্ট স্পলডিং। খুব চালাক-চতুর। মাত্র মাস খানেক কাজ নিয়েছে উইলসনের বন্ধকী তেজারতির কারবারে। স্পলডিং-ই টেনে নিয়ে গেল মনিবকে লালচুলো সঙ্ঘের অফিসে। যেতেই তাকে পছন্দ হয়ে গেল ম্যানেজারের। তারও চুল টকটকে লাল। বাদ পড়ে গেল সবাই।

তারপর থেকেই আট সপ্তাহ এই কাজ করে এসেছে উইলসন। কাজ মানে ঘণ্টা, শুধু বিশ্বকোষ কপি করা। দশটা থেকে দুটো। তারপর ছুটি। এমনিতে সে বিপত্নীক। বাচ্চাকাচ্চা নেই। বাড়ীতে থাকে সে নিজে আর ভিনসেন্ট স্পলডিং।

দু মাস পরে একদিন বিশ্বকোষ কপি করতে গিয়ে জ্যাবেজ উইলসনের পিলে চমকে গেল। নোটিশ ঝুলছে সঙ্ঘের দরজায়। লালচুলো সঙ্ঘ নাকি উঠিয়ে দেওয়া হল।

ঘোর সন্দেহ হল উইলসনের। এ আবার কি ধরনের রসিকতা। খোঁজ-খবর নিয়ে জানল, ম্যানেজার লোকটা নাকি নাম ভাঁড়িয়ে দিন কয়েকের জন্যে অফিস খুলে বসেছিল। ও নামে কেউ নেই সারা লণ্ডন শহরে।

তাই শার্লক হোমসের কাছে ছুটে এসেছে জ্যাবেজ উইলসন। ব্যাপারটা কি রকম গোলমেলে মনে হচ্ছে না?

শার্লক হোমস তো হেসেই খুন উইলসনের নাজেহাল বৃত্তান্ত শুনে, বলল—'আজ শনিবার। আজই হেস্তনেস্ত হয়ে [illegible]

বিদায় হল উইলসন। হোমস বললে—'ওহে ওয়াটসন, আমার এখন পর-পর তিন পাইপ তামাক খাওয়া দরকার। নইলে মাথা খুলবে না।'

সহসা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে হোমস বলল—'চলো ভায়া চলো, একটু গান-বাজনা শুনে আসা যাক।'

ওয়াটসন তো হতবাক। বন্ধুর মাথা খারাপ নাকি?

হোমস কিন্তু বাজনা শুনতে যাওয়ার আগে পাতাল ট্রেনে চেপে গেল উইলসনের দোকানের সামনে। গোটা রাস্তাটা এক চক্কর ঘুরে এসে দাঁড়াল দোকানের দরজায়। বাঁধানো রাস্তায় ঠক ঠক করে হাতের ছড়ি ঠুকতেই দরজা খুলে মুখ বাড়ালো এক ছোকরা।

বলল—'ভেতরে আসুন।'

হোমসের মাথায় নিশ্চয় ছিট ছিল। নইলে লোকটার মুখের দিকে না তাকিয়ে শুধু হাঁটুর দিকে তাকিয়ে থাকবে কেন? মুখ না তুলেই বললে—'ভেতরে যাবো না। এখান থেকে স্ট্র্যাণ্ডে যাওয়ার সোজা রাস্তা কোন দিকে?'

রাস্তা বাতলে দিল লোকটা। সরে এসে ওয়াটসন বললে—'এই তাহলে স্পলডিং? উইলসনের কর্মচারী? মুখ-খানা দেখলে?'

'না। হাঁটু দেখলাম।'

'কি দেখলে হাঁটুতে?'

'পরে শুনবে।'

'মেঝেতে খামোকা লাঠি ঠুকলেই বা কেন?'

'ভায়া, এখন কোনো কথা নয়।'

সেখান থেকে বাড়ীর পেছন দিকে গেল হোমস। এদিকের চেহারা আলাদা। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। গাড়ী-ঘোড়া দোকান ব্যাঙ্ক পথচারী।

দেখে-শুনে মহাখুশী হোমস। কফি খেয়ে গেল বাজনা শুনতে। মাথা নেড়ে নেড়ে তন্ময় হয়ে শুনল বাজনা।

বাজনার পর বেরিয়ে এসে হোমস বললে—'ওহে ডাক্তার, কেসটা সিরিয়াস। দারুণ ষড়যন্ত্র। আজ রাত দশটায় আসতে পারবে?'

ওয়াটসন তো এক পায়ে খাড়া। এসে হাজির ঠিক দশটায়—বেকার স্ট্রীটের বাড়ীতে। গিয়ে দেখল, আগে-ভাগেই সেখানে আরো দুজন হাজির। একজন একটা ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান। অপরজন পুলিশ অফিসার।

হোমস পই-পই করে বলে দিয়েছিল ওয়াটসনকে সঙ্গে মিলিটারী রিভলভারটা আনবার জন্যে। সশস্ত্র হয়েই এসেছিল ওয়াটা-সন। চারজনে মিলে গেল উইলসনের বাড়ীর পেছন দিকের রাস্তায়—একটা ব্যাঙ্কের সামনে। ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ভদ্র-লোক সরু লোহার সিঁড়ি দিয়ে সবাইকে নিয়ে নেমে গেলেন পাতাল ঘরে। মজবুত লোহার পাল্লা খুলে ভেতরে ঢুকেই মাটিতে লাঠি ঠুকলেন ভদ্রলোক।

ধাঁ করে রেগে গেল শার্লক হোমস। কড়া গলায় বললে—'আপনার বোকামির জন্যে পণ্ডশ্রম হবে দেখছি। চুপ করে বসে থাকুন ওখানে।'

বলে, আতশ কাঁচ নিয়ে মেঝে পরীক্ষা করতে বসল। উঠে দাঁড়াল খুশী খুশী মুখে। অনুমান যেন মিথ্যে হয় নি।

বলল হৃষ্টকণ্ঠে—'ধরেছি ঠিকই। লণ্ডনের সেরা জোচ্চোর জালিয়াত ডাকাত খুনে জন ক্লে আজ আসছে ভল্ট লুঠ করতে। যদিও ঘণ্টাখানেকের সময় হাতে আছে এখনও।'

ফিস ফিস করে বললেন ব্যাঙ্ক চেয়ার-ম্যান—'এত সোনা এখানে রাখাটাই অন্যায় হয়েছে। ফ্রান্স থেকে আনিয়েছিলাম বাকস ভর্তি সোনা।'

বিরাট বিরাট বাকসগুলোর আড়ালে ওৎ পেতে বসে রইল চারজনে। ঘেরাটোপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল হাতের লণ্ঠন।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ একটা আলোর ছটা চোখে পড়ল মেঝেতে। একটু একটু করে বড় হল আলোর পরিধি। তারপর মেঝের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে এল একটা হাত। তারও খানিক পরে সশব্দে উল্টে পড়ল একটা বড় পাথর। উঁকি দিল একটা মুখ। অবশেষে পর-পর উঠে এল দুটি মূর্তি। দ্বিতীয় জনের চুলের রঙ লাল।

উঠেই চমকে উঠল লোকটা। আঁৎকে উঠে বললে—'লাফাও! লাফাও! সর্বনাশ হয়েছে।' বলেই লাফ দিয়ে পড়ল গর্তে। পুলিশ অফিসার দৌড়ে এসে জামা খামচে ধরল বটে—কিন্তু জামা ছিঁড়ে হাতে রয়ে গেল। লালচুলো উধাও হল সুড়ঙ্গে।

জন ক্লে ওরফে স্পলডিংয়ের হাতের রিভলবার ছিটকে গেল হোমসের চাবুকের ঘায়ে।

ধরা পড়েও ঘাবড়াল না জন ক্লে। ঠাণ্ডা গলায় বলল—'আমার সাগরেদ তো পগাড় পার হল।'

হেসে উঠল হোমস—'সে গুড়েও বালি, বন্ধু। উইলসনের পাতাল কুঠরি ছাড়া পালাবার পথ নেই। সেখানেও পুলিশ দাঁড়িয়ে। জন ক্লে তোমার খেল খতম। চলো শ্রীঘর।

(গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান ৪৫ পৃষ্ঠায়)

—অদ্রীশ বর্ধন

পটভূমি

খাদ্য আছে, কেনবার ক্ষমতা নেই

এখনও গ্রামবাংলার পথেঘাটে, হাটে, গঞ্জে, রেল স্টেশনে ক্ষুধার্ত মানুষের ভীড়, বন্যার্তদের জীবনযন্ত্রণা কর্মহীনের মুমূর্ষু চিত্র। নিরন্নদের হাহাকারে শারদোৎসব কার্যত ম্লান। এই ক্ষুধার্তকে রক্ষার জন্য মানবতার আহ্বান এসেছে, কিন্তু সেদিকে রাজনৈতিক কর্মীদের কোন তৎপরতা নেই। তৎপরতা শুধু ভুখা মিছিলের আয়োজনে বা পথঘাট, মহাকরণ অবরোধ এবং বিক্ষোভ অভিযানে। শাসক দলের একাংশ সি পি আই-র ফাঁদে পা দিয়ে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, পশ্চিমবঙ্গের দুর্গতদের এতো কষ্টের মূলে এই মানবতা বিরোধী রাজনীতিই অন্যতম কারণ।

রাজ্যে খাদ্য আছে; চাল গমের অভাব নেই। তবুও মানুষ খেতে পাচ্ছে না, অনাহারের মারা যাচ্ছে কেন?

এই প্রশ্নের বহু লোক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আসল কথা মুদ্রাস্ফীতি ও অস্বাভাবিক দরবৃদ্ধি। দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত, খেতমজুর, গ্রামবাংলার শতকরা ৯০ জন এবং শহরের শতকরা ২৫ জন মানুষ ক্রয়ক্ষমতার অভাবে এই অসহায় অবস্থায় পড়েছেন। চড়া দামে জিনিস কেনার মতো পয়সা নেই, তাই তাদের দুর্গতি। তার সঙ্গে খরা ও বন্যা—দুটো অভিশাপ রাজ্যের মানুষকে বিপন্ন করেছে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে কেন রাজ্য সরকারের ত্রাণ দপ্তর সময় মতো ব্যাপক ভিত্তিতে ত্রাণ-কার্য সংগঠন করলেন না? সরকারের অর্থাভাব, না দূরদৃষ্টি ও কর্মতৎপরতার অভাব। কার্যত ত্রাণ বিভাগের দুর্নীতি ও ব্যর্থতাই এই দুঃখকে তীব্রতর করে তুলেছে। এই সঙ্গে রয়েছে গ্রামের মজুতদার ও রেশন বন্টনকারীদের চক্রান্ত এবং দুর্নীতি। আংশিক রেশনিং তাঁদের ভাগ্যে জোটে না। তার চেয়ে বড় বিপদ হলো আংশিক রেশনেও চাল-গম কেনার মতো পয়সা অধিকাংশ লোকের নেই। কার্যত আজকের দরে যখন টাকার মূল্য দাঁড়িয়েছে ২৮ পয়সা মাত্র তখন তাদের পক্ষে মাথাপিছু ষোল আউন্স চাল-গম কেনাও দুঃসাধ্য। ১৯৭০-৭১ সালের দরে রাজ্যের শতকরা ৭০ ভাগ গ্রামের লোক মাথাপিছু ৪৪ পয়সার বেশী ব্যয় করতে পারতেন না। "

খাদ্যনীতির অদলবদল করেও এই ক্রয়ক্ষমতাহীনতার অভিশাপ থেকে নরনারীকে উদ্ধার সম্ভব নয় এ কথাটি বুঝবার দিন এসেছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে পাঁচ লক্ষ টন চাল সংগ্রহ করেও তো অভাবী মানুষের অন্ন সংস্থান করা সম্ভবপর হয় নি। যাঁরা কথায় কথায় স্টেট ট্রেডিং-এর কথা বলেন, তাঁরা আসাম ও ওড়িষ্যার দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিলে উপকৃত হবেন। গত বছর ধানচালের পাইকারী কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পর আসামে এতো অন্নকষ্ট, অনাহারজনিত মৃত্যু কেন?

সস্তা দরে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করার জন্য ব্যবস্থা না হলে আজকের এই সংকট দূর হবে না। মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী নিশ্চয়ই রাজ্য সরকার নয়। কেন্দ্রীয় অর্থনীতি, শিল্পনীতি এবং খাদ্যনীতির আগে সংশোধন দরকার। এই সার সত্য উপলব্ধি করেও যখন শাসক দলের একাংশ কলকাতার রাস্তাঘাটে আস্ফালন করেন, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগান তোলেন তখন বুঝতে হবে উদ্দেশ্য ভিন্ন ... কংগ্রেসীদের একাংশ অপর অংশের ... কার জন্যই কি

কেন্দ্র এই রাজ্যকে উপযুক্ত পরিম খাদ্যশস্য সরবরাহ করছে না, ত্রাণের জন প্রয়োজনীয় টাকা দিচ্ছে না—এই দুটো অভিযোগ সম্পর্কে এই বিক্ষুব্ধ যুব ছাত্রগোষ্ঠীর মুখে কথা শুনি না মহারাষ্ট্রে খরার সময় কেন্দ্র গত বছর মহারাষ্ট্রকে ৩৬০ কোটি টাকা সাহা দিয়েছেন; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ যখন খ বন্যা ও মুদ্রাস্ফীতির চাপে দেড় কোটি মানুষ ধুঁকছে তখন কেন্দ্র কেন উদার সাহায্য নিয়ে আসছে না? পাট চাষের রাজ্যে ক্ষতি যখন তণ্ডুলের হিসাবে প্রায় ১৬০ কোটি টাকা তখন কেন্দ্র খাদ্য দিয়ে এই রাজ্যকে সাহায্য ক না? এই সব প্রশ্নে রাজ্যের শাসক দলে নীরবতা সত্যিই দুঃখবহ।

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের দিনে কাজে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাসভা বেঙ্গল রিলিফ কমিটি, রাম মিশন প্রভৃতি সংস্থা ব্যাপক বেসরক রিলিফের আয়োজন করে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষকে রক্ষা করেছিলেন এক ভাগ ত্রাণকার্য আজ দেখছি মানবতার আহ্বানে আজকে আগেকার নেই। আজ দেশ স্বাধীন, যুব ও ছাত্র সচেতন ও সংহত সত্ত্বেও ক্ষুধার্ত মা আজ সেবার অভাবে, সাহায্যের অ পথেঘাটে জীবনবলি দিতে হচ্ছে। অমার্জনীয় অপরাধ ও অপরাধকারী বিরুদ্ধে ছাত্র যুব সমাজের বিবেক হয়ে উঠলেই ক্ষুধার্তদের বাঁচান যাবে বিভেদ ও বিরোধের সময় নয়।

আজ রাজনীতি নয়, মৃত্যুপথযা বাঁচানোর জন্য ত্রাণ সংগঠনই মুখ্য

এই বাংলার খবর

ধান সংগ্রহের উদ্যোগ পর্ব

আমন ধান উঠলে তার একটা অংশ কীভাবে সরকারি ভাঁড়ারে জমা করা যাবে, সেই রণকৌশল এই 'খবর' ছাপা হওয়ার আগেই পাকা হয়ে যাবে। অন্তত হওয়া উচিত। কারণ নভেম্বরের পায়লা থেকে সুরু হবে সংগ্রহের পালা। তার আগে পুজো। খাদ্য সংগ্রহ নীতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা এ-বছর গতবারের চেয়েও ব্যাপক। এই নীতি তৈরির প্রধান দায়িত্ব অবশ্য রাজ্য মন্ত্রিসভার খাদ্য সংক্রান্ত বিশেষ সাব-কমিটির। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এই কমিটির চেয়ারম্যান। শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ যখন বিদেশে ছিলেন তখন অস্থায়ী খাদ্যমন্ত্রী ডঃ গোপালদাস নাগ এ-বিষয়ে একটি 'নোট' তৈরি করেন। আলোচনার ভিত্তি ঐ 'নোট'। গত বছরেও খাদ্যনীতি রচনার আগে কংগ্রেস দলের সংগে সরকার কথাবার্তা বলেছিলেন। এবার সেই কথাবার্তা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে অনুষ্ঠিত প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সভায়।

একবার শোনা গেল, সরকার এ-বছর আট লাখ টন চাল (অর্থাৎ বারো লাখ টন ধান) সংগ্রহের কথা ভাবছেন। পরে জানা গেল, ঐ লক্ষ্য গত বছরের মতো পাঁচ লাখ টনই থাকছে। এ-বছর সরকার ধান ভানা কলের (হাস্কিং মেশিন) ওপর 'লেভি' করে লক্ষ্যের একটা অংশ পূরণ করতে চাইছেন। গত বছর শুধু চালকলের ওপর 'লেভি' বসানো হয়েছিল। এ-বছরও হবে। তা ছাড়া সরকার সরাসরি চাষীদের কাছ থেকেও 'লেভি' করে ধান-চাল আদায় করতে চান। তবে কতো দূর পর্যন্ত চাষীদের রেহাই দেওয়া হবে সে-বিষয়ে নানা জনের নানা মত। মন্ত্রিসভার সাব কমিটি প্রথমে প্রস্তাব করেন সেচ এলাকায় তিন একর আর অ-সেচ এলাকায় পাঁচ একর জমি থাকলেই লেভি দিতে হবে। প্রদেশ কংগ্রেসের সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, ঐ পরিমাণ যথাক্রমে পাঁচ ও সাত একর করা হোক। সর্বশেষ খবর, যথাক্রমে চার আর ছ' একর জমির মালিকদের কাছ থেকে লেভি আদায় সুরু হবে। খাদ্য সংগ্রহ নীতি পাশ করার ব্যাপারে নতুন বাধা হলো, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় খাদ্য দপ্তরের [illegible] বদল। নতুন খাদ্যমন্ত্রী জগজীবন রাম রাজ্যের প্রস্তাবিত সংগ্রহ নীতি খতিয়ে দেখবেন। শোনা যাচ্ছে, নতুন নীতির সব বিষয়ে রাজ্যপাল ডায়াসেরও সম্মতি নেই। শ্রীডায়াস এক সময় কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তরের সচিব ছিলেন। খাদ্য সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন-শোনেন। সরকার তাই তাঁর পরামর্শ নিচ্ছেন।

সরকারি কর্মীদের জন্যে

মাস কয়েক আগে ডাক্তার-এঞ্জিনিয়ারদের লম্বা ধর্মঘট যখন মিটলো তখন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে, টেকনোক্র্যাটদের দাবিদাওয়া বিচার-বিবেচনার জন্যে একটি কমিটি নিয়োগ করা হবে। সেই কমিটি তৈরি হয় শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। যদিও কমিটির রিপোর্ট পাওয়া যায় জুনে, সে-বিষয়ে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো এখন। কমিটির সব সদস্য মিলেমিশে একটা রিপোর্ট দিতে পারেন নি। রাজ্য যোজনা পর্ষদের দুই সদস্য পান্নালাল দাশগুপ্ত আর অমিতাভ ভট্টাচার্য পেশ করেন একটি পৃথক রিপোর্ট। সরকার অধিকাংশ সদস্যের রিপোর্টটিই মেনে নিয়েছেন। এই রিপোর্টের নানা সুপারিশ কার্যকর হবে আগস্টের পয়লা থেকে। এই বাবদ সরকারের বাড়তি খরচ হবে বছরে পাঁচ কোটি টাকা।

টেকনোক্র্যাটদের দাবিদাওয়া ছাড়া অজয় মুখার্জি কমিটির ওপর রাজ্য সরকারের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতনক্রমের মধ্যে নানা অসঙ্গতি, তাঁদের পদোন্নতির সুযোগ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনার ভার দেওয়া হয়েছিল। অধিকাংশ সদস্যের যে-সব সুপারিশ রাজ্য সরকার মেনে নিলেন তার ফলে এখন থেকে সব শ্রেণীর কর্মচারীই তাঁদের কর্মজীবনে অন্তত একটি পদোন্নতির সুযোগ পাবেন। সিলেকসন গ্রেডের বেতনের সুযোগও বাড়বে। ডাক্তার-এঞ্জিনিয়ারদের বিশেষ ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। অন্যান্য স্বাস্থ্য বা এঞ্জিনিয়ারিং কর্মীও বাড়তি ভাতা পাবেন। তবে টেকনোক্র্যাটদের যেটা ছিল মূল দাবি, অর্থাৎ আই এ এস অফিসারদের সমান বেতন বা মর্যাদা, সে-বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত সরকার নেননি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় পড়ে। তিনি আরো বলেছেন, সরকারের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় এর চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। কিন্তু সরকারের সিদ্ধান্তে টেকনোক্র্যাট ছাড়া ব্যুরোক্র্যাটরাও অখুশি। প্রথমোক্তেরা আবার আন্দোলনের পথ ধরতে পারেন, এমন আশঙ্কা রয়েছে। শেষোক্তেরা বলছেন, অজয় মুখার্জি কমিটি তাঁদের প্রতি অবিচার করেছেন।

বন্দর আবার স্বাভাবিক

কলকাতা বন্দরের দিনকাল যে ইদানিং ভালো যাচ্ছে তা নয়। একে তো পলি পড়ে নদীর খাত বুজে [illegible], ফরাক্কার খাল দিয়ে জল আসা এখনও দূরে অস্ত, ফলে বড় জাহাজ এখানে ভিড়তে পারে না। তার ওপর শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘট-আন্দোলন লেগেই আছে। সম্প্রতি খাদ্যবাহী জাহাজ আবার আসতে সুরু করায় এই বন্দরের কাজ বেড়েছে। ঠিকই এই সময়েই ডক শ্রমিকেরা নিয়মমাফিক কাজ সুরু করায় বেশ বড় রকমের বিভ্রাট দেখা দেয়। দেশে যখন খাদ্য সংকট তখন খাদ্যবাহী রকমের বিভ্রাট দেখা দেয়। দেশে যখন খাদ্য সংকট তখন খাদ্যবাহী জাহাজকে আন্দোলনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। কিন্তু বন্দর কর্তৃপক্ষ বলেন, ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্সের কর্মীরা কোনো কোনো খাদ্যবাহী জাহাজ খালাস করেছেন।

শ্রমিকদের আন্দোলনের কারণ, তাঁরা গতবারের হারে (মোট বার্ষিক বেতনের পৌনে বারো শতাংশ) বোনাস চান। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়ে দেন, শতকরা ৮'৩৩ শতাংশের বেশি দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ তা হলে দেশের অন্যান্য বন্দরের ডক শ্রমিকদেরও বাড়তি বোনাস দিতে হয়। কেন্দ্রীয় যানবাহন দপ্তরের মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছু করতে পারেন নি। তখন ভারত রক্ষা বিধি অনুযায়ী কলকাতা বন্দরে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। আন্দোলনকারী শ্রমিকদের গ্রেপ্তার এবং সাময়িক বরখাস্তও সুরু হয়। শেষ পর্যন্ত শ্রমিকরা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন একরকম নিঃশর্তে। তবে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন যে, এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্যে কাউকে সাজা দেওয়া হবে না।

বিশ্বভারতীতে তদন্ত

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তির পালা গেল কিছু দিন ধরে একজন অধ্যাপককে অপসারণের দাবি নিয়ে। তিনি রসায়ন বিভাগের প্রধান ডঃ এ কে দে। তাঁর অপসারণের দাবি জানিয়ে একদল ছাত্র উপাচার্য ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্তকে ঘেরাও করে রাখেন। তাও এক-আধ ঘণ্টা নয়, তিন দিন, চার রাত। ডঃ দে'র বিরুদ্ধে ছাত্রদের অভিযোগ, তিনি তাঁর জনৈক সহকর্মীর প্রতি 'অমানুষিক' আচরণ করেছেন। উপাচার্য জানান যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির সঙ্গে পরামর্শ ছাড়া তিনি এ-বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। কিন্তু ছাত্রেরা তা সত্ত্বেও ঘেরাও তোলেন নি। অবস্থা ক্রমশ থমথমে হয়ে উঠতে থাকে। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। প্রধানমন্ত্রী এর আচার্য। তাঁকে তাই এ-বিষয়ে অবহিত রাখা হয়।

কর্মসমিতির যে বৈঠক পুলিশ পাহাড়ায় কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলো তাতে দেখা গেল ছাত্রদের আংশিক জয় হয়েছে। ডঃ দে সাময়িকভাবে রসায়ন বিভাগের প্রধান পদে ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁর জায়গায় কাজ করবেন ঐ বিভাগের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ডঃ পি কে দাশগুপ্ত। পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারেও আপাতত ডঃ দে জড়িত থাকবেন না। তবে তিনি ক্লাস নেবেন। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি কমিটি তৈরি হবে। ঐ কমিটি বিজ্ঞান বিভাগের বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগেরও তদন্ত করবে। ডঃ দে অবশ্য কর্মসমিতির সভায় বলেছেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

বাইরের ডাক

পুজোর সময় এই বাংলা থেকে 'দেশত্যাগের' একটা হিড়িক পড়ে প্রতি বছর। অবশ্যই সাময়িক 'দেশত্যাগ'। লক্ষ্মীপুজোর মধ্যেই প্রায় সকলে ফিরে আসেন। এবার নানা দুর্গতির মধ্যে এই হিড়িক কেমন? এখন পর্যন্ত যে খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয়, রেলের বুকিং কাউন্টারে আগাম আসন সংরক্ষণের জন্যে ভিড় অন্যান্য বারের চেয়ে বেশ কম। তাই বলে গেলেই যে আসন পাওয়া যাচ্ছে, এমন নয়। বাইরে যেতে ইচ্ছুক এমন লোকের সংখ্যা তুলনায় কম, এই যা। রেল কর্তৃপক্ষ অন্যান্য বারের মতো এবারও পুজোয় বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছেন। সেগুলো এখনই ভর্তি হয়ে গেছে। ভিড় প্রধানত উত্তর ভারত, দার্জিলিং আর পুরীর দিকে। দক্ষিণ ভারত বা কাশ্মীরের মতো দূরে পাড়ি যাত্রায় আগ্রহ কিছুটা কম।

কিন্তু যেহেতু সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা যথেষ্ট নয়, তা এই তুলনামূলক কম ভিড়েও টিকিটের চোরাকারবার ঠিকই চলে বলে অভিযোগ। পূর্ব রেলে দশ দিন আগে আসন সংরক্ষণে নিয়ম, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব রেলে এক বছর আগেও আসন সংরক্ষ করা যায়। তাই সেখানে দুর্নীতির সুযোগ আরো বেশি। কি রেলকর্মীর সঙ্গে টিকিটের চোরাকারবারীরা হাত মিলিয়ে কালে বাজারে টিকিট বেচছে বলে শোনা যাচ্ছে।

১৪।১০।৭৪ —দেবা

দেশে বিদেশে

মন্ত্রিসভায় রদবদল

১৯৭১ সালে মন্ত্রিসভা গঠনের পর থেকে এই পঞ্চমবার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর মন্ত্রিসভায় পুনর্বিন্যাস করলেন। এবারকার রদবদলের বিশেষত্ব হল এই যে, শ্রীমতী গান্ধীর প্রবীণতম সহকর্মীরা প্রায় সকলেই ঘর বদল করেছেন। ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ রাষ্ট্রপতি হয়ে যাওয়ার পর কৃষি ভবনে একজন প্রবীণ মন্ত্রীকে বসাবার প্রয়োজন ছিল। খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের সেচ বিভাগটিকে যুক্ত করে এবং মন্ত্রণালয়ে একটি নতুন গ্রামোন্নয়ন বিভাগ সৃষ্টি করে এই সম্প্রসারিত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শ্রীজগজীবন রামকে. যিনি অতীতেও কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন এবং মন্ত্রিসভায় যাঁর স্থান যখন থাকত প্রধানমন্ত্রীর পরেই। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শ্রীরামকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী সেই সূত্রে আরও কতকগুলি রদবদল করেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং এলেন প্রতিরক্ষা বিভাগে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে শ্রীসিংহের স্থান পূরণ করলেন অর্থমন্ত্রী ওয়াই বি চাবন। অর্থ মন্ত্রণালয়ে শ্রীচ্যবনের স্থান নিলেন শিল্পোন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের মন্ত্রী সি সুব্রহ্মণ্যম। শ্রীসুব্রহ্মণ্যম যে বিভাগগুলি ছেড়ে এলেন সেগুলির দায়িত্ব গেল ভারী শিল্পমন্ত্রী শ্রী টি এ পাইয়ের কাছে। শিল্পোন্নয়ন ও ভারী শিল্প দপ্তর দুটি জুড়ে 'শিল্প' নামে একটি মন্ত্রণালয় গঠিত হল। ঐ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অসামরিক সরবরাহ নামে একটি নতুন বিভাগেও যুক্ত হল। ঐ বিভাগের দায়িত্ব অত্যাবশ্যক পণ্য-দ্রব্যাদির বন্টনের উপর নজর রাখা। এই সব বিষয়ের দেখাশুনা করার গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে শ্রী টি এ পাইয়ের উপর। তাছাড়া তিনি সাময়িকভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের কাজও দেখবেন।

এই রদবদলে বাদ পড়লেন পাঁচজন ও নতুন এলেন আটজন। যাঁরা বাদ পড়লেন তাঁদের মধ্যে দুজন ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রী। শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়া পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন মন্ত্রণালয়ের ভার ত্যাগ করে কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে গেলেন। ১৯৭৬ সালের নির্বাচনের জন্য সংগঠনকে প্রস্তুত করার দায়িত্ব তাঁরই উপর ন্যস্ত হবে বলে [illegible] হচ্ছে শ্রীজোহন পাসোয়ান শাস্ত্রী [illegible] সময়ে বিহারের [illegible] [illegible]

নিয়ে এসে পূর্ত মন্ত্রণালয়ে বসান হয়েছিল তাঁকে এবার মন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।

নতুন যাঁদের মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হল তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মা, যিনি কংগ্রেস সভাপতির পদটি শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়াকে ছেড়ে দিয়ে মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন। মন্ত্রী হিসাবে তিনি যোগাযোগ দপ্তরের ভার গ্রহণ করবেন। এছাড়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রজিৎ যাদব মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন। তিনি রাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন, তবে তিনি একক দায়িত্ব নিয়েই ইস্পাত ও খনি দপ্তরের দেখাশুনা করবেন। আর একজন নতুন মন্ত্রী হলেন কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির ডেপুটি লীডার এ পি শর্মা। তিনিও রাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন। তবে তিনি শিল্প ও অসামরিক দপ্তরে শ্রীটি এ পাইয়ের অধীনে কাজ করবেন।

যাঁদের দপ্তর বদল হল তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডি। তিনি যোগাযোগ দপ্তর থেকে এলেন গুরুত্বপূর্ণ স্বরাষ্ট্র দপ্তরে। শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে বিদায় নিয়ে দপ্তরবিহীন মন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রিসভায় রয়ে গেলেন। দপ্তরবিহীন মন্ত্রী হিসাবে অতীতে কৃষ্ণ মেনন টি টি কৃষ্ণমাচারি ও লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন শ্রীদীক্ষিতও সেই ভূমিকা গ্রহণ করবেন বলে আশা করা যায়।

এবারকার রদবদলের অন্যান্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে একটি হল, নতুন একটি শক্তি মন্ত্রণালয় গঠিত হল। এতদিন সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তর দুটি একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। এখন সেচকে যুক্ত করা হল কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আর বিদ্যুৎ ও কয়লা মিলিয়ে একটি নতুন শক্তি মন্ত্রণালয় গঠিত হল।

বিহারে পাল্টা সরকার

সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ ঘোষণা করেছেন, আগামী ৫ নভেম্বরের মধ্যে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে গফুর মন্ত্রিসভাকে সরিয়ে না দিলে ঐ রাজ্যে জনগণের 'বিধানসভা' ও একটি 'পাল্টা সরকার' গঠিত হবে।

পাটনায় একটি জনসভায় শ্রীনারায়ণ বলেছেন, এই দুটি দাবি মেনে নেওয়া না হলে পঞ্চায়েত ব্লক ও জেলা স্তরে প্রশাসন অচল করে দেওয়া হবে। জনগণ সরকারের প্রতিনিধিদের কাছে ট্যাক্স না দিয়ে ছাত্র সংঘর্ষ সমিতি ও জনসংঘ সমিতির কাছে অথবা তাদের অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের কাছে ট্যাক্স দেবেন।

ইতিমধ্যে নওয়াদা জেলার বরিশালিগঞ্জে একটি 'জনতা সরকার' গঠিত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এই জনতা সরকার। তাঁরা নাকি ইতিমধ্যেই স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে আবেদন গ্রহণ করছেন।

এই প্রকাশ্য বিদ্রোহের আহ্বান সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় সে বিষয়ে বিহার সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে আইন বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করছেন বলে জানা গেছে। তবে যাই করা হোক না কেন, জয়প্রকাশকে গ্রেপ্তার করার প্রশ্নে সরকার কতকটা দ্বিধাগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে। সরকারের উদ্বেগের একটা কারণ হল, পুলিশ সহ সরকারি কর্মচারীদের একটা অংশ জয়প্রকাশের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

বৃটিশ নির্বাচনের ফল

গত ১০ অক্টোবর বৃটেনে যে নির্বাচন হয়ে গেল তার প্রাক্কালে একটা গভীর সন্দেহ দেখা দিয়েছিল, আট মাসের মধ্যে এই দ্বিতীয় নির্বাচন করেও বৃটেনে কোন স্থায়ী সরকার গঠন করা যাবে কিনা এবং পরিণামে বৃটিশ পার্লামেন্টারী শাসন-পদ্ধতিই বিপন্ন হয়ে উঠবে কিনা। টাইম পত্রিকা লিখেছিলেন, 'এটা পার্লামেন্টের শেষ সুযোগ হতে পারে।' যে বৃটেন এতকাল রাজনৈতিক স্থিরতার আদর্শস্থানীয় বলে গণ্য হয়ে এসেছে সেখানে অনাস্থা এতদূর দাঁড়িয়েছিল যে, মধ্যবিত্তের স্বার্থরক্ষার নামে সেখানে একটি বেসরকারী বাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছিল। এমন কি সামরিক অভ্যুত্থানের ভাসা-ভাসা গুজবও শোনা যাচ্ছিল। স্কটিশ স্বাতন্ত্র্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল।

এই নির্বাচনের ফলে লেবার পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় এই অস্থিরতার আশঙ্কা সম্পূর্ণ দূরে না হলেও অনেকটা কমে গেল। গত আট মাস যাবৎ লেবার পার্টি যে অনিশ্চয়তার মধ্যে সংখ্যালঘু সরকার চালিয়ে এসেছেন সেই অনিশ্চয়তা দূর হল। কিন্তু ৬৩৫ জন সদস্যের হাউস অব কমন্সে ৩১৯ জন সদস্য নিয়ে লেবার পার্টি ন্যূনতম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছেন মাত্র।

লেবার পার্টির নেতা হ্যারল্ড উইলসন অবশ্য বলেছেন যে, এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তিন বছরের মেয়াদ সম্পূর্ণ করতে অসুবিধা হবে।

নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে গতবারের তুলনায় এবার লেবার পার্টির ভোট শতকরা ২ ভাগ ও আসন ১৮টি বেড়েছে, অপরপক্ষে কনজারভেটিভ পার্টির ভোট ও আসনসংখ্যা যথাক্রমে ২ শতাংশের বেশী ও ২০টি কমেছে। বৃটিশ ভোটাররা দুটি প্রধান পার্টির মধ্যে প্রায় সমানভাবে বিভক্ত। তৃতীয় পার্টি হিসাবে লিবারেলরা এবার অনেক খানি এগিয়ে আসবেন বলে আগে যে অনুমান করা গিয়েছিল সেটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

রোমাঁ রোলাঁ ও সুভাষচন্দ্র

সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুভাষচন্দ্র

রোমাঁ রোলাঁ

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সভা সেরে কলকাতা ফিরে আসছেন ১৯৩২ খৃঃ ২ জানুয়ারী। পথে কল্যাণ স্টেশনে ইংরেজের পুলিশ তাঁকে ১৮১৮ খৃঃ তিন নম্বর রেগুলেশন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করে। প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলে সেখান থেকে আনা হয় জব্বলপুর জেলে এবং জব্বলপুর থেকে আনা হয় মাদ্রাজ জেলে। এই কারাবাসের আগে ১৯২৪ খৃঃ অকটোবর মাসে যখন তিনি ১৮১৮ খৃঃ রেগুলেশন থ্রি অনুযায়ী গ্রেপ্তার হন এবং বার্মার রেঙ্গুন মান্দালয় ইনসিন প্রভৃতি জেলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে দীর্ঘদিন কারাবাস করেন তখন থেকেই তাঁর শরীর দ্রুত অবনতির দিকে যায়। এর ফলস্বরূপ এইবার সুভাষচন্দ্রের শরীর একদম ভেঙ্গে পড়ে। সরকার ভয় পেয়ে তাঁকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যাওয়ার অনুমতি দিল। সুভাষচন্দ্র ১৯৩৩ খৃঃ ২৩ ফেব্রুয়ারী 'গাঙ্গে' নামক ইটালীয়ান জাহাজে বোম্বাই বন্দর ত্যাগ করেন এবং মার্চ মাসের ৮ তারিখ ভিয়েনা পৌঁছান। ১৯৩৩ খৃঃ থেকে ১৯৩৬ খৃঃ এপ্রিল পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র ভারতের বাইরে ভারতবাসীর রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করেন। (অল্প কিছুদিনের জন্য তাঁকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত বাবাকে দেখতে দেশে যেতে হয়েছিল। কিন্তু বাবাকে দেখা তাঁর কপালে ঘটেনি। বোস বাড়ীতে আসার প্রায় চল্লিশ ঘন্টা আগে জানকীনাথের মৃত্যু হয়। বোস ডিসেম্বরের ৪ তারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার বিকেল ৪-১০ মিঃ দমদমে নামেন। জানকীনাথ ৩ তারিখ মধ্যরাত্রে অর্থাৎ ১২-৩০ মিঃ গত হন।)

জার্মান পণ্ডিত লোথার ফ্রাংক যিনি জার্মানীতে নেতাজীকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন তিনি সুভাষচন্দ্রের জীবনের এই সময়টাকে 'বিদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত' এই নামে অভিহিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময়টায় নেতাজী ভারতের জাতীয় আন্দোলনের জন্য কাজ করেছিলেন। নেতাজী তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির অভিজ্ঞতা থেকে এটা বুঝেছিলেন যে বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব নয়। তিনি তাঁর আন্তর্জাতিক দূরদৃষ্টি থেকে এটাও বুঝেছিলেন যে ইউরোপে যুদ্ধ আসন্ন এবং এই যুদ্ধের সম্পূর্ণ সুযোগ ভারতকে নিতে হবে।

সুতরাং এই সময়টা সুভাষচন্দ্র ইউরোপে পরাধীন ভারতের হয়ে প্রচারকার্য চালিয়ে যান। এই উদ্দেশ্যে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ভারতহিতৈষী বন্ধুগোষ্ঠী গড়ে তুলেছেন। অস্ট্রিয়ান-ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়ান-আইরিশ ইণ্ডিপেনডেন্স লীগ প্রভৃতি সংস্থার মধ্য দিয়ে সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ এবং রাষ্ট্র নেতাদের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হন। এই সময়ই তিনি ভারত-বন্ধু রোঁমা রোঁলা— যিনি খুব নিষ্ঠা এবং উৎসাহের সঙ্গে ভারতের জাতীয় আন্দোলন লক্ষ্য করেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

প্রথম যৌবনে যখন সুভাষচন্দ্রের বয়স ২৩।২৪ বৎসর তখনো রোমাঁ রোঁলা সুভাষচন্দ্রের মনে বিশেষ দাগ কাটেননি— যদিও রাসেলের বড় ভক্ত তিনি ঐ সময়েই হয়ে পড়েছেন। এই প্রসঙ্গে নেতাজীর বন্ধু ও সহপাঠী দিলীপ রায় বলেছেন 'অবশ্য রোমাঁ রোঁলা সম্বন্ধে সুভাষের তখনও পর্যন্ত খুব একটা বড় রকমের শ্রদ্ধা ছিল না তারপর তিনি বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনতত্ত্বের উপর বই লেখায় সুভাষের এই মত বদলেছিল। আর বার্টারণ্ড রাসে সম্বন্ধে সুভাষ শ্রদ্ধাবান ছিল তার গভ চিন্তার স্পষ্ট প্রকাশ তার চোখে প্রশং উজ্জ্বলতা আনতে পারত দেখেছি।

রাসেলের বইয়ের যে তিনি খুব ছিলেন—একথা আমরা ভাল করেই জা রাসেলের বই তিনি জেলখানায় বা পড়েছেন। রাসেলের 'প্রসপেকটস ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সিভিলিজেশন' বই তিনি বহরমপুর জেলে বসে পড়ে রাসেলের বই সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র মান্দ জেল থেকে তাঁর বন্ধু দিলীপ রায়কে একটি চিঠিতে বলেছেন 'রাসেলের বইগ আদর এত বেশী যে একখানা পেলে শীঘ্র ছাড়তে চায় না। সুভাষচন্দ্র মনের কথাই বলেছেন।

রোমাঁ রোঁলা যে সুভাষের পরবর্তী কালে দাগ কেটেছেন এটা স্পষ্ট—কারণ তা না হলে ১৯৩৩ ইউরোপে এসে তিনি রোঁলার দেখা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তে ১৯৩৩ সালে দেখা করা সম্ভব হয়ে সম্ভব হয়ে ওঠেনি ১৯৩৪ সালেও এই সময় চিঠিপত্রের লেনদেন হ রোঁলার সঙ্গে বোসের দেখা হয় সেই সালে।

সুভাষচন্দ্র এই সম্পর্কে ১৯৩৫ সেপ্টেম্বর মাসে মডার্ন রিভিউ-এ প্র রোমাঁ রোঁলা অ্যান্ড গান্ধি' নামক প্রবন্ধে বলেছেন:

"বুধবার ৩রা এপ্রিল ১৯৩৫। তীর্থ করতে চলেছি। দু বছর আগ

মানব এবং চিন্তাবিদ—ভারতের এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বড় বন্ধু মঁসিয় রোমাঁ রোলাঁর সংগে দেখা করার জন্য উৎসুক হয়ে আছি। বিভিন্ন কাজের জন্য ১৯৩৩ সালে দেখা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি—সম্ভব হয়নি ১৯৩৪ সালেও। কিন্তু এবার তৃতীয়বারের চেষ্টা সফল হতে চলেছে।'

রোঁলা ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যদিও এটা প্রথম চাক্ষুষ দেখা চিন্তার জগতে কিন্তু একে অন্যকে ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছেন। সুভাষচন্দ্রও ইতিমধ্যে রোঁলার বই পড়েছেন এবং তাঁর বেশ ভক্তও হয়ে পড়েছেন। রোঁলাও সুভাষচন্দ্রের সেই সাড়া জাগানো বই—যে বই ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশিত হবার সঙ্গে সংগে সমগ্র ইউরোপ খণ্ডে এক বিরাট সাড়া জাগায়—তা পড়ে ফেলেছেন।

এখানে একটু বলা দরকার যে সুভাষচন্দ্র যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত বাবাকে দেখতে দেশে আসছেন এবং ১৯৩৪ সালের ৩ ডিসেম্বর সোমবার রাত ৮-৩০ মিঃ করাচী বিমানবন্দরে নামেন তখনই কাস্টমস বিভাগের অফিসারেরা 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগেল ১৯২০—১৯৩৪' এর একটি টাইপ কপি কেড়ে নেয়। এই বিষয়ে ৪ তারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার অমৃতবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি বেরোয়ঃ

"Subhas arrives to late. Manuscript of Book on India confiscated by Custom Authorities".

তৎ সত্ত্বেও আমরা দেখি যে ইংল্যাণ্ডের উইসার্ট অ্যাণ্ড কোম্পানী বইটি প্রকাশ করে। ১৭ জানুয়ারী (১৯৩৫) বইটির সমালোচনা করেন J. T. Gwynne "Manchester Guardian" নামক বিখ্যাত সংবাদপত্রে। উপরে ক্যাপসান দেন

"A left-wing Indian Leader".

ঐদিন ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে যে কটা বইয়ের সমালোচনা হয় তার মধ্যে সুভাষচন্দ্রের বইয়ের সম্পর্কেই বিস্তারিতভাবে বলা হয়। এমন সুন্দর সমালোচনা সচরাচর দেখা যায় না। সুভাষচন্দ্র যে কত বড় শক্তিশালী লেখক এবং ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যে কত গভীর তা আমরা এই সমালোচনা থেকেই বুঝতে পারি। সমালোচনায় বলা হয়ঃ

'ভারতীয় রাজনীতিবিদগণের লেখা ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যতগুলি বই লেখা হয়েছে তার মধ্যে এই বইখানাই বোধহয় সবচেয়ে কৌতূহলজনক। ভারতীয়দের চিন্তাধারা যে কত দ্রুত রাজনৈতিক পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—তা বুঝতে হলে আমাদেরকে এই বইখানাকে লাজপৎ রাইয়ের যুগে একই বিষয়বস্তুর উপর লেখা লেখকদের বইয়ের সংগে তুলনা করতে হবে।...মিঃ বোসের বিরুদ্ধপন্থীরা তাঁর গুরুত্ব ছোট করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন—কারণ তাঁরা বলেন যে অহংকার এবং অসহিষ্ণুতাবশতঃ মিঃ বোস নিজের ক্ষমতা এবং সামর্থের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বইখানা কিন্তু লেখক সম্পর্কে আমাদের মনে একদম ভিন্ন ধারণা আনে।...অন্য যে কোন লোক অপেক্ষা মিঃ গান্ধীকেই কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়েছে—কিন্তু মিঃ গান্ধীর ভক্তগণও নিশ্চয় একথা স্বীকার করবেন যে এই সমালোচনা ভিত্তিহীন এবং বিদ্বেষপূর্ণ নয়।'......

ভারতবর্ষে কিন্তু এই বই নিষিদ্ধ করা হয়। ভারতে সর্বপ্রথম এই বই প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে।

রোঁলার সংগে দেখা হওয়ার আগে সুভাষ বোস 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগেল ১৯২০—৩৪' লেখেন এবং এই বইতে তিনি রোঁলার উচ্চ প্রশংসা করেন। 'যাহাই হউক তাঁহার (গান্ধীর) সময়ের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশটুকু অতিবাহিত হয় সুইজারল্যাণ্ডে সেই মহান ব্যক্তি ও চিন্তাবিদ ভারত ও ভারতীয় সংস্কৃতির পরম বন্ধু রোঁমা রোঁলার সান্নিধ্যে। ভারতের বাহিরে আজ এই মহান-হৃদয় ব্যক্তিটি অপেক্ষা তাহার আর বড় বন্ধু কেহ নাই এবং সেজন্যই মহাত্মা এই ফরাসী পণ্ডিতের সান্নিধ্যে তাঁহার কিছু সময় কাটাইয়া ভারতের মহদুপকার করিয়াছেন।'

(নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগেলের বাংলা সংস্করণ)।

সুভাষচন্দ্র 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগেলের' এক কপি রোমাঁ রোঁলাকে পাঠিয়ে দেন। নিশ্চয়ই তাঁর জানতে ইচ্ছে হয়েছিল ভারতবন্ধু রোঁলা তাঁর (বোসের) মতামত সম্পর্কে কি বলেন। রোঁলাও সুভাষচন্দ্রের 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগেলের' উচ্চ প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর স্ত্রী এবং বোনের জন্য আরো কপির অর্ডার দিয়েছেন এ তথ্য আমরা পাই বোসকে লেখা রোঁলার একটি চিঠি থেকে। রোঁলার এই চিঠিখানা লেখা হয়েছে ফেব্রুয়ারীর ২২ তারিখ সাল ১৯৩৫। লেখা হয়েছে Villeneuve (Vand), vila olga থেকে। চিঠিটার কিছু অংশ নীচে দেওয়া যেতে পারে।

(অনুবাদ) 'ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস জানার জন্য এ বইখানা অপরিহার্য। এই বইখানাতে আপনি একজন ঐতিহাসিকের শ্রেষ্ঠ গুণ—সুস্পষ্টতা এবং মানসিক ন্যায়নিষ্ঠতা দেখিয়েছেন। আপনার মত একজন সংগ্রামী লোক যেমন দলমত এবং দলনীতি ব্যতীত নিরপেক্ষভাবে বিষয়বস্তু বিচার করেছেন—তেমন বড় একটা দেখা যায় না।'

বুধবারের সকালবেলা সুভাষচন্দ্র চলেছেন রোঁলার সংগে দেখা করতে। মনে খুব আনন্দ কিন্তু মনের মধ্যে উদ্বেগ এবং সংশয়ও এসে হাজির হচ্ছে। তিনি কি সত্য সত্যই রোঁলার দ্বারা উৎসাহিত হবেন না হতাশ হয়ে ফিরে আসবেন? রোঁলা আদর্শবাদী—কল্পনা এবং স্বপ্নের রাজ্যে তাঁর বাস। তিনি কি জীবনের কঠিন সত্যকে

বুঝতে পারবেন—তিনি কি সৈনিকের পথের বাধা বিপত্তিগুলি উপলব্ধি করবেন?

কিন্তু রোঁলার ২২শে ফেব্রুয়ারীর চিঠি সুভাষ বোসকে আশ্বস্ত করেছে। ঐ চিঠির এক জায়গায় রোঁলা লিখেছেন: 'আমাদের মত যাঁদের চিন্তার জগতে বাস তারা প্রত্যেকে ক্লান্তি এবং অনিশ্চয়তার সময় সংগ্রাম ছেড়ে ঐ যে জগৎ—ভগবান আর্ট অথবা আত্মিক শক্তির স্বাধীনতা অথবা দুর্জ্ঞেয় আত্মার সুদূর বাসভূমি—সেখানে ছুটে যাওয়ার প্রলোভনের বিরুদ্ধে অবশ্যই সংগ্রাম করবে। সংগ্রাম আমাদের করতেই হবে কারণ সংসার সমুদ্রের সেই পারেই আমাদের বাস যেখানে মানুষ প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছে।'

ঘণ্টা দুয়েক গাড়ী চলার পর সুভাষচন্দ্র রোমাঁ রোঁলার বাসস্থান 'ভিলা অলগায়' এলেন। বোস বোতাম টিপলেন। শ্রীমতী রোঁলা দরজা খুলে দিলেন। এগিয়ে এলেন তিনি অভ্যর্থনা করতে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাশের দরজা দিয়ে স্বয়ং রোঁলা এসে হাজির হলেন। রোঁলা তাঁর ভারতীয় বন্ধুদের কথা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং তারপরেই আরম্ভ হল সেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যে আলোচনা করার জন্য সুভাষ বোস ১৯৩৩ সাল থেকে দিন গুনেছেন—যে আলোচনা করার জন্য সুভাষচন্দ্র তাঁর অসুস্থ শরীর নিয়েও এতটা পথ এসেছেন। রোঁলা ইংরেজী জানেন না— অথবা বলেন না এবং সুভাষচন্দ্র ফরাসী জানেন না। সেইজন্য শ্রীমতী রোঁলা এবং রোঁলার বোন দোভাষী হলেন। রোঁলার সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল:

> "to discuss with him the latest developments in the Indian Situation and to ascertain his present views on the important problems before the world".

সুভাষচন্দ্র রোঁলাকে গত চোদ্দ বছর (১৯২০—৩৪) গান্ধীর নেতৃত্বে যে বিরাট জাতীয় আন্দোলন চলে—সেই জাতীয় আন্দোলনের প্রধান নীতিগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেন। গান্ধীর আন্দোলনের দুটি মূল নীতি ছিল—(১) সত্যাগ্রহ (২) সম্মিলিত ফ্রন্ট যাতে ভারতের সমস্ত শ্রেণীর লোক রয়েছে।

সুভাষচন্দ্র রোঁলাকে জিজ্ঞাসা করেন 'এই সম্মিলিত ফ্রন্ট যদি ভেঙ্গে যায় এবং গান্ধীর সত্যাগ্রহের পথে না গিয়ে যদি অন্য পথে সংগ্রামের মোড় ফেরে—তবে সে বিষয়ে রোঁলার মনোভাব কি হবে?' এর উত্তরে রোঁলা বলেন যে গান্ধীর সত্যাগ্রহ যদি ভারতের স্বাধীনতা আনতে না পারে তবে তিনি খুব দুঃখিত এবং হতাশ হবেন।

সুভাষচন্দ্র আবার প্রশ্ন করলেন 'যদি সত্যাগ্রহ বিফল হয় তা হলে রোমাঁ রোঁলা কি চান যে অন্য পথে সংগ্রাম চলবে—না তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ব্যাপারে আর কোন উৎসাহ নেবেন না।"

রোঁলা জোরের সঙ্গে বললেন 'যে পথেই হোক না কেন সংগ্রাম চালাতেই হবে।'

কথায় কথায় রোঁলা বলেন তাঁর কাছে কোন দলই বড় না। কোন দল এল আর কোন দল গেল তাতে তিনি উৎসাহিত নন। তাঁর কাছে বড় বিশ্বের শ্রমজীবীর স্বার্থ। নির্যাতিত শ্রমজীবীদের দিকে সব সময়ই তাঁর সমর্থন আছে।

এরপর সুভাষচন্দ্র রোঁলাকে তাঁর জীবনের আদর্শ যার জন্য তিনি সমস্ত জীবন লড়াই করেছেন সে সম্পর্কে একটু বলতে বলেন। উত্তরে রোঁলা তাঁর জীবনের প্রধান চারটি আদর্শের কথা বলেন। (১) আন্তর্জাতীয়তাবাদ (২) শোষিত শ্রমিকগণের জন্য ন্যায় প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ এমন এক সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা যেখান শোষক বা শোষিত শ্রেণী থাকবে না। (৩) পরাধীন জাতিগুলির জন্য স্বাধীনতা এবং (৪) স্ত্রী এবং পুরুষের সমান অধিকার।

রোমাঁ রোঁলা তাঁর সাম্প্রতিক চিন্তা-ধারা (গত পনের বছরের) দুখানি বইতে লিখেছেন—একথা তিনি সুভাষচন্দ্রকে বলেন। প্রথম বইটিতে তিনি তাঁর সামাজিক চিন্তাধারার ক্রম বিবর্তন সম্পর্কে বলেছেন। দ্বিতীয়টিতে তিনি যুদ্ধ শান্তি অহিংসা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। রোমাঁ রোঁলা সুভাষচন্দ্রকে মাস দুই পরে এই বই দুখানা উপহার স্বরূপ পাঠান।

সর্বশেষে ইউরোপের আসন্ন যুদ্ধ—সে যুদ্ধের কথা খুব শোনা যাচ্ছে—সেই সম্পর্কে আলোচনা হয়। সুভাষ বোস স্পষ্টই বলেন যে পরাধীন এবং অত্যাচারিত জাতির কাছে যুদ্ধ অবিমিশ্র অভিশাপ নয়। কিন্তু রোঁলা এর উত্তরে বলেন যুদ্ধ ইউরোপের কাছে বৃহত্তম বিপর্যয় আনবে। এমনও হতে পারে যে এর মধ্য দিয়ে সমস্ত সভ্যতারই ধ্বংস হতে পারে।

রোঁলা ও সুভাষচন্দ্রের এই সাক্ষাৎ এবং আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুভাষচন্দ্র একজন সংগ্রামী সৈনিক। রোঁলা একজন বড় চিন্তাবিদ এবং আদর্শবাদী—ভাবের রাজ্যে তাঁর বাস। এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে আমরা দেখি যে রোঁলা কেবল মাত্র আদর্শবাদী বা কল্পনাবিলাসী নন তিনি বাস্তববাদীও। সংগ্রামকে তিনি ভয় করেন না তা সে যে ধরনেরই হোক না। ভারতের স্বাধীনতা যে পথেই আসুক না কেন রোঁলা তাকে স্বাগত এবং আশীর্বাদ জানাবেনই।

সুভাষচন্দ্র এবং রোঁলার এই আলোচনা এবং সাক্ষাৎ রোঁলা তাঁর প্যারিসে প্রকাশিত ইউরোপ জার্নালে লিপিবদ্ধ করেছেন। রোঁলা বোসকে সিরিয়াস এবং ইনটেলিজেন্ট দেখেছেন। বোসের সংগ্রামের পদ্ধতির ব্যাপারে রোঁলা লিখেছেন:

'তিনি সন্ত্রাসবাদকে সুস্থ নীতি হিসাবে গণ্য করেন না। তিনি সুসংগঠিত সংগ্রামের পক্ষপাতী—হিংসাকে তিনি সংগ্রামের আওতা থেকে বাদ দেননি (এবং নিশ্চয়ই হিংসার সপক্ষে যদি সংগ্রামের জন্য ইহার দরকার হয়) ...ইউরোপীয় যুদ্ধ—যে যুদ্ধে ইংল্যান্ড ব্যস্ত থাকবে এবং ফলে ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হবে— এই আশা তাঁর মনে আছে এবং তিনি এটা গোপন রাখেননি।

সুভাষচন্দ্রের সামাজিক অর্থনৈতিক চিন্তার ব্যাপারে রোঁলা লিখেছেন: 'মনে হয় তিনি সাম্যবাদের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন।' ('এ বেকন অ্যাক্রস এশিয়া'তে উদ্ধৃত হয়েছে) ভারতের জাতীয় আন্দোলনে গান্ধী ছাড়া আর কোন নেতা রোঁলার মনে এতখানি দাগ কাটেননি।

কবিতা

অবগাহনের চিহ্ন ॥

—সিকদার আমিনুল হক

অমরতার জন্যে বাইরে আসিনি। তার জন্যে আলাদা আলাদা
পথ ছিল। অবগাহন আর বিশুদ্ধতায় মণ্ডিত, সবুজ গুহার
দিনগুলির মত এই নিঃশব্দ দিন এবং রাত্রি।...প্রাচীন জাতির
মানুষের মত সতর্কভাবে হেঁটে চলছি রিক্ত মাটির উর্বরতার ওপর

হয়তো তখন ভেবেছিলাম স্তব্ধতায় হাত রাখলে একদিন
তা বাঙময় হয়ে উঠবে। আমার আনন্দের সামনে নারী একগুচ্ছ
ফুল রেখে বলেছিল সৌহার্দ্যের কথা। যখন পাথর কথা বলছে,
ধাতুরা মুখর হয়ে উঠছে, তখন আমি কী করে আর নিশ্চুপ থাকি।

একটি নারীকে বিভক্ত করি যদি, যেমন রাত্রি আর দিন। ছোট্ট
পতঙ্গ আমার মাথার উপরে মুখর ধর্ষণের গান করবে। আর এইভাবে
আমি বিশ্রাম নেব। উত্তাপ ও অবগাহনের সমস্ত চিহ্ন আমার
শরীরে স্পষ্ট ছাপ রাখবে। যেমন জল ও পাথর রেখেছিল।

ভিতরে, বাহিরে ॥

সুবো। আচার্য

ঘুমের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলো নারী
নারী না ফুল! সর্পিণী না ক্রোধ!
প্রতিহিংসা—বুকের মধ্যে তারই
লুকিয়ে প্রেম, রক্ত, প্রতিশোধ;

বাহিরে সব খুব স্বাভাবিক থাকে
বাহিরে সব চুপ প্রকৃতির মতো
বাহিরে সব বাহির ইতস্ততঃ
ভিতরে মেঘ জড়ায় পাকে পাকে—

ঘুমের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা নারী
হাসে এবং ছড়ায় স্বপ্ন, আজো
স্বপ্ন ও প্রেম রক্তময়তারই
আগুন জ্বলে—কল্পনাপ্রতিভার।

যদি তাই হতো ॥

দুলাল ঘোষ

অবিকল যা, অর্থাৎ চোখের সম্মুখে দেখা, দৃশ্য...
তাই যদি হতো একবার
যেমন,
পায়ের তলায় মাটি, উপমাবিহীন—
যদি ভাবা যেত, নিতান্তই সাদামাঠা
তা'হলে অনেক সহজলভ্য হতো ইতিহাস
আমাদের করণীয় যা—
করা যেত
আত্মবিশ্বাসে
ঝড়ের গভীরে রেখে দেহ

অথচ কারুকার্যখচিত পিরিচ, স্বাভাবিক যা
ভিন্ন চোখে আসে
কেউ শূন্যবাদ নিশ্চিত জেনে, চূড়ান্ত মুহূর্তে প্রস্তুত
আর, কারো চোখে
মদিরায় আবর্ত তখনো
ক্লান্তিহীন
রাতের নর্তকী

সমস্ত কিছুই যদি, হাতের স্পর্শে, কিংবা অনুভবে
বোঝা যেত
বিকল্পবিহীন
এই যে আমরা, পরস্পরের শরীরে নিরুদ্বেগ
তা'হলে
ঘুমের খোলস ভেঙে স্বপ্ন, আর—
দুরন্ত পৃথিবী,
কেমন সহজলভ্য হয়ে যেত...।

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মুক্তকেশী বলেন, তাই কারো কুলোবে না দেখিস। কতজনের কত রকম দাবি—

আশ্বিনে এবার বাড়িতে মা-দুর্গা আসছেন ফটিক বলে এসেছে। আয়োজন কতটা কি হল সবিস্তার খবরাখবর নিচ্ছেন। আরও সব রকমারি প্রশ্ন: বউয়ে শাশুড়িতে বনছে কেমন অমুকের বাড়ি? ছেলেমেয়ে কার কি হল? গোয়ালে আমাদের কটা দোওয়া-গাই এখন? পাড়ার মধ্যে নতুন ঘর কে তুলল? লাউ-কুমড়ো কার বাগানে কেমন ফলল এবার?

কথাবার্তায় মধ্যে পথ এগোয় না। গরুর-গাড়ি এগিয়ে পড়েছে এখন বোঝার ভারে ক্যাঁচকোচ আওয়াজ দিচ্ছে। মুক্তো-ঠাকরুন আসছেন আওয়াজ তুলে গাড়ি জেন জানান দিয়ে যাচ্ছে। হরিতলা পার হয়ে গ্রামে ঢুকে গেলেন।

ঠাকুরুন আসছেন সাড়া পড়ে গেছে: হুড়কোরে পাশে দাঁড়িয়ে কেউ বা বলে—শহুরে ছাই বাড়ি এসেছে ঠাকুরঝির তাই বাপের-বাড়ির কথা মনে পড়ল। আমরা গাঁয়ে পড়ে থাকি আমাদের কে খোজ-খবর নিতে যায়?

মুক্তকেশী সকাতরে বলেন—মন ছটফট করে সত্যি মেজ-বউ কিন্তু পায়ে বেড়ি পরিয়ে রেখেছে—আসি কেমন করে? যা করে এবারের আসা! আমার ভিটের ডাঁটা ভালো খাও তুমি নিয়ে এসেছি কগাছা।

যার দেখা পান একটা না একটা বলছেন এমনি।

অকালের আনারস ফলেছে কটা। বলি বুড়োমানুষ ইন্দির-কাকা আছেন—নিয়ে যাই একটা খুশী হবেন। আছে গাড়িতে পাঠিয়ে দেবো।

তোর মেয়েকে নিয়ে যাসরে প্রভা। রথের বাজারের জন্য হাঁড়িবাশি বানাচ্ছে চলে গেলাম কুমোরবাড়ি। আগ ভেঙে দশ-বারোটা আমায় দিতে হবে পালরশায়। কদিন বাদে যাচ্ছি ছেলেপুলের হাতে দেবো কি? তা এনেছি বেশ। বাঁশি ছাড়াও ক্ষুদে ক্ষুদে হাঁড়ি মালসা সরা—রাঁধাবাড়ি খেলবে সব। পুতুল এনেছি পালকি এনেছি—খাসা বানায়। নিয়ে যাস মেয়েকে পছন্দ করে নেবে।

ম্ংতার মাকে ডেকে বলেন, পিঁড়ির উপরে রুটি বেলতে দেখে গিয়েছিলাম গাজনের মেলায় চাকি-বেলন কিনেছি তোমার জন্য। গরুরগাড়ি বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ছইয়ের পিছনে বাঁধা প্রকাণ্ড মান কচুটা দেখিয়ে ফুলিকে বলছেন, এক ফালি নিয়ে এসো দিদি। অতি ভাবিশ্যি। আঁশ মরেনি এখনো তবু খেয়ে দেখো। কাঁচা চিবিয়ে খেলেও গাল ধরবে না।

যাকে দেখছেন এমনি বলতে বলতে আসছেন। ভবনাথ স্নেহকণ্ঠে বললেন, এতও তোর মনে থাকে মুক্তো। কে কি খেতে ভালবাসে কার কোন অভাব দেখে গিয়েছিলি কোন জিনিসটা পেলে কে খুশী হয় সমস্ত তোর নখদর্পণে।

দেবনাথ বলেন বাপের-বাড়ি কবে আসা হবে ছ-মাস আগে থেকে দিদি ঘরের জিনিস বাইরের জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব গোছগাছ করে রাখেন।

গরুর-গাড়ি আগে পৌঁছে গেছে। মাল-পত্র নামিয়ে নিতাই বাইরের রোয়াকে সাজিয়ে রাখছে। হাঁড়ি তোলো কলসি কচু কলা লাউ চই দেলকো বারকোশ চাটু খুন্তি—নেই কোন জিনিস। ছইয়ের খোল থেকে বের করছে তো করছেই। উমাসুন্দরী বাইরে-বাড়ি এসে অপেক্ষায় আছেন চোখ বড় বড় করে তিনি বললেন কত রে বাবা।

হিরু টিপ্পনী কেটে বলে পিশিমা ভাবেন ওঁর বাপের-বাড়ি মরুভূমির উপর এত তাই সাজিয়ে-গুছিয়ে আনলেন।

মুক্তকেশী এসে গেছেন হিরুর কথা কানে গেছে তাঁর। হেসে বললেন, যা গুছিয়েছিলাম তার তো অর্ধেকও আনা হল না। আমার জন্য কি আনলে বলে কতজনে মুখ ভার করবে দেখিস। আনি কেমন করে? গাড়ির ছই করেছে একেবারে পাখির খাঁচা—একটা মানুষ কেশো দুমড়ে সিকিখানা হয়ে কোন রকমে বসে। কদমা বাঁরবাঁন্ড ফেনি বাতাসা আর কিছু গুড়ের সন্দেশ চিনির সন্দেশ চন্দ্রপুলি বানিয়ে আনলাম—দুখানা চারখানা করে বাড়িতে বাড়িতে দেওয়া যাবে।

গ্রামসুদ্ধ ভেঙে এসে পড়েছে। উমা-সুন্দরী বউ-মেয়েদের বলছেন দেখ চেয়ে—একটি মানুষে কত মানুষ আজ চেয়ে দেখ। পিঁড়ি দিয়ে পারেন না লম্বা সপ পেতে সকলকে বসতে দিচ্ছেন।

ধক করে পুরানো কথাটা ভবনাথের মনে চমক দিল। এককালে শ্বশুরের নির্বংশ ভিটা ছেড়ে আসবার জন্য বোনকে বলেছিলেন, একা একা শ্মশান চৌকি দিয়ে কি করবি? সেই মুক্তোর কত আপনমানুষ গুনতিতে আসে না। যেমন এই সোনাখড়িতে, তেমনি কুশডাঙ্গায়।

কালবৈশাখীর বৃষ্টি বাতাস অল্পসল্প প্রায়ই হচ্ছে। একরাত্রে আবার খুব জোর ঢালা ঢালল। বাতাসও তেমনি। সমস্ত রাত চলেছে—সকাল হয়ে গেল, এখনো জের মেটেনি। মুখ পুড়িয়ে আছে আকাশ। টিপ টিপ করে পড়ছে—হঠাৎ জোর এবং এক পশলা। কী কাণ্ড জ্যৈষ্ঠ মাসেই বর্ষাকাল হাজির।

বাইরে-বাড়ি রোয়াকের খুঁটি ঠেসান দিয়ে পুঁটি বাগের দিকে তাকিয়ে আছে। তলায় তলায় কত আম এখনো খুঁজে বের করা যায় কিন্তু বৃষ্টির মাঝে বাইরে বেরুনো বন্ধ। বিশেষ করে মুক্তো-ঠাকুরুন রয়েছেন, বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে বেড়ান তিনি, সে চোখে ফাঁকি চলে না। তাকিয়ে পড়লে বুকের মধ্যে গুরগুর করে ওঠে।

সামনের রাস্তা দিয়ে ছাতার আড়ালে জল ছপছপ করে যাচ্ছে—চলন দেখেই ভব-নাথ চিনেছেন। হাঁক দিয়ে উঠলেন: কে যায়, নন্দা না? বৃষ্টি মাথায় কোথায় চললে? শোন—

নন্দ পরামানিকের কাঁধে ধামি [illegible] চাল। ছাতা ধরেছে মাথায় নয়, ধামির উপরে। নিজে ভিজে ভিজুক, চাল না জল পায়। কিন্তু জল ঠেকানোর অবস্থা ছাতার নেই।

আদি কালো-কাপড়টা নষ্ট হয়ে গেলে ছাতা সাদা কাপড়ে ছেয়ে নিয়েছিল তা-ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। তার উপরে ঝড়বাতাসে দুটো-তিনটে শিক ভেঙে আছে।

রোয়াকে উঠে নন্দ পরামানিক বলল, নিজে ভিজেছি, চালও ভিজেছে। দু-আনা সেরের মাগ্গি চাল—বাদলা দেখেছে রাতারাতি অমনি এক পয়সা দর বাড়িয়ে দিয়েছে। ছাতা-সারারা আসে না—শিক দুটো বদলে নেবো, সে আর হয়ে উঠছে না।

ভবনাথ বললেন, শিক বাঁট ছাউনি আগাপাস্তলা সবই বদলাতে হবে। তার চেয়ে দেশি গোলপাতার ছাতা একটা কিনে নাওগে সস্তা-গণ্ডার মধ্যে হবে, কাপুড়ে-ছাতার চেয়ে অনেক ভাল। বাহার হবে না, কিন্তু বৃষ্টি ঠেকাবে।

চালের ধামি নামিয়ে রেখে নন্দ উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। বলে, এলাম তো কলকে ধরিয়ে নিয়ে যাই। অর্থাৎ তামাক সেজে নিজে টেনে খাবে তারপর কলকেটা ভবনাথের হুঁকোয় বসিয়ে দিয়ে চলে যাবে। নুড়ির আগুনে তামাক খাওয়া—নারকেলের খোসা পাকিয়ে নন্দ নুড়ি বানাচ্ছে। ভবনাথ বললেন, যে জন্য ডাকলাম নন্দ। বিষ্টি-বাদলার মধ্যে ভাল দেখে একটা পাঁঠার জোগাড় দেখ। নয়তো ফুলখাসি। ছোটবাবু বাড়িতে—পারো তো আজকেই লাগিয়ে দাও।

এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে নন্দ পরামানিক ছাগল কিনে আনে দু-একটি সহকারী জুটিয়ে নিয়ে ঘাড়ে কোপ দেয়। নন্দ ছাগল মেরেছে, খবর হয়ে যায়। মাংসের প্রত্যাশীরা নন্দর বাড়ি এসে কেউ বলে চার-আনার ভাগা একটা আমায় দিও, কেউ বলে আট-আনার ভাগ। মোট মূল্যের হিসাবে মাংসের ভাগ, লাভের ব্যাপার নেই তার মধ্যে। কেউ একজন উদ্যোগী না হলে গ্রামবাসীর মাংস খাওয়া হয় না। নন্দ পরামানিক কাজটা করে আসছে বরাবর, মাংস খাবার ইচ্ছে হলে তাকে বলতে হয়।

নন্দ বলল, গাঁয়ের ক্ষেতেল মানুষে আজকাল সেব ত্যাঁদোড় হয়ে গেছে বড়বাবু। গরজ বুঝে চড়া দাম হাঁকে। হাটের দিন গিয়ে কিনতে সুবিধা হয়। ক্ষেতেলরা সেখানে নিজেদের গরজে বেচতে আসে। দশটা মাল দেখেশুনে দরদাম করে কেনা যায়।

ভবনাথ বললেন, সামান্যর জন্য অত হ্যাংগামে কাজ নেই। বৃষ্টি নেমেছে, আর তুমি যাচ্ছ দেখেই কথাটা মনে উঠল। গঞ্জের হাটে গিয়ে কিনতে হবে এর পরে। জামাই-ষষ্ঠীতে জামাই আসবে, আর ছোটবাবু বাড়ি এলে এমনিই তো গাঁয়ের দশজনার বাড়িতে একদিন পাত পড়ে। বেশি মাংস তখন লাগবে।

বাড়ির মেজছেলে কালীময় ফুলবেড়ে শ্বশুর বাড়িতে আছে, সোনাখড়ি থেকে ক্রোশখানেক দূর। দেবনাথ বাড়ি আসার পরে সে-ও এসেছিল, থাকছিলও সোনাখড়িতে। কিন্তু জ্বর এসে গেল। জ্বর কালীময়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কুটুম্বর মতন হয়ে গেছে—মাঝে-মধ্যে আসবেই কালীর অদর্শনে সেন থাকতে পারে না। আসে জ্বর, নাইতে-খেতে সেরে যায়। জ্বর বলে কালীময়েরও কাজকর্ম কিছু আটকে থাকে না। হাতেম আলি নামে ফকির আছেন, ফুলবেড়েয়, রোজ সকালে শতশত রোগী 'ফুল-পানি' অর্থাৎ ফেরোর জলে ফকির মন্ত্রপূত একটা ফুল ফেলে দেন তাই নেবার জন্য থানে এসে ধর্না দেয়। এই ফুল-পানি এবং সেই সঙ্গে নাওয়া ও খাওয়া দস্তুরমতো—জ্বর বাপ-বাপ করে পালায়। বড় সর্বনেশে নাওয়া—সামান্য জ্বরে বিশ ভাঁড় জল মাথায় ঢেলে নাইতে হয়, জ্বরের প্রকোপ যত বেশি ভাঁড়ের সংখ্যা বেড়ে যাবে ততই। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে ডাক্তারবাবুরা রায় দিয়েছেন ডবল নিউমোনিয়া, সেই রোগিকে পুকুরঘাটে নিয়ে একজনে ধরে আছে ও ভাঁড় গুনে যাচ্ছে এবং অপরে ভাঁড় ভরে ভরে মাথায় ঢালছে। অসুখের বাড়াবাড়ি বুঝে ফকির সাড়ে পাঁচ কুড়ি অর্থাৎ একশ দশ ভাঁড় ঢালার ব্যবস্থা দিয়েছেন। ডাক্তারবাবুরা শুনে তো গর্জে ওঠেন : খুনে ফকিরকে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত। নাওয়া এই, আর খাওয়া শুনেও আঁতকে ওঠার কথা। ভাত ডাল মাছ কোন কিছুতেই বাধা নেই। তেঁতুল-গোলা অতি অবশ্য। এবং গরম ভাতের তুলনায় পান্তা ও কড়কড়াই প্রশস্ত। অবাক কাণ্ড—কটা দিন পরেই দেখা গেল, ডবল নিউমোনিয়ার রোগিটি একহাঁটু কাদার মধ্যে লাঙলের মুঠো ধরে হটহট করে চাষ দিচ্ছে, রোগপীড়ার চিহ্নমাত্র নেই।

এক দুপুরে কালীময় ঘরে শুয়ে মৃদু স্বরে গান ধরল। অলকা-বউ কান পেতে শুনে শাশুড়িকে গিয়ে বলল মেজোবাবুর জ্বর আসছে মা। জ্বর আসার লক্ষণ গা শির-শির করা—তেমনি আবার গান ধরা কালীময়ের পক্ষে। এমনি সে গানটান গায় না, শুধু-মাত্র জ্বর আসার মুখে এবং ভুতুড়ে জায়গা অতিক্রম করার সময় গায়। দুপুরবেলা কালীময়ের জ্বর এলো, সন্ধ্যা হতে না হতেই একেবারে হাওয়া। শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে—বউ বীণাপাণিকে তেঁতুলগোলা করতে বলে ভাঁড়ের পর ভাঁড় মাথায় ঢালছে ঘাটের সিঁড়িতে বসে। ফকিরবোলা কালীময়—ফকিরের বিধিমত তার চিকিৎসা। যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়ার চর্চা আছে বলে সোনাখড়ির মানুষজন নাস্তিক, ফকিরের একবিন্দু মান্য নেই। এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ও এক কবিরাজ আছেন গাঁয়ের যাবতীয় রোগী তাঁদের একচেটিয়া। 'ভাত বন্ধ'—এই একটা বুলি বিশেষভাবে তাঁদের শেখা। নাড়ি দেখবার আগেই বার্লি-সাবুর ব্যবস্থা দিয়ে বসে আছেন। এ চিকিৎসায় মধ্যে কালীময় নেই। এমনি দায়ে-দরকারে দশ-বিশ দিন বাড়ি থাকতে বাধা নেই, কিন্তু অসুখ-বিসুখের লক্ষণ মাত্রেই সরাসরি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠবে।

দেবনাথের জরুরি চিঠি নিয়ে শিশুবর কালীময়ের কাছে চলে গেল : আজ না হোক, কাল সকালে অতিঅবশ্য বাড়ি আসবে—কুটুম্ববাড়ি যাবার প্রয়োজন। দেবনাথ না পাঠালেও শিশুবর যেত—মুক্তোঠাকুরুন এসে গেছেন, টুক করে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসত। অসুখ যত বড় সাংঘাতিক হোক, কালীময় ছুটে এসে পড়বে। ঠাকুরুনকে বাঘের মতন ডরায় সে। ক্যাট-ক্যাট করে মুখের উপর তিনি যা-তা বলেন : পুব-বাড়ির কুলাঙ্গার তুই—মাধব মিত্তিরের বউয়ের কাছে দাসখত দিয়ে তার গোমস্তাগিরি করছিস। তোর বাপের ঘরে যেন অন্ন নেই।

ভবনাথকেও ছাড়েন না : ছেলের টোপ ফেলে সম্পত্তি তুলে আনতে গেলে, মাধব মিত্তিরের বউ তেমনি ঘাগি মেয়েমানুষ—টোপই গিলে খেয়ে আছে। তোমরা খাও কলা এখন।

কুটুম্ববাড়ির নামে কালীময় এক-পায়ে খাড়া, খাওয়াটা উপাদেয় ঘটে। তদুপরি মুক্তকেশী এসে পড়েছেন—তাঁর চোখের

উপরে শ্বশুরালয়ে তিলার্ধকাল সে থাকবে না।

দাঁড়া শিশুবর। সকাল-টকাল নয়, এক্ষুনি যাচ্ছি। একটুখানি দাঁড়া—

জামা গায়ে ঢুকিয়ে চাদরটা তার উপর ফেলে জুতো জোড়া হাতে নিয়ে কালীময় বেরিয়ে পড়ল।

দেবনাথ তাকে অন্তরালে নিয়ে বললেন, আজকেই এসে পড়েছ ভাল হয়েছে। রাত থাকতে বেরিয়ে পড়ো। কানাইডাঙা থেকে অনেক হাটুরে নৌকো ছাড়বে, তার একটায় উঠে বোসো। যাচ্ছ গোসাইগঞ্জে, কেউ তো জানবে না দাদা অবধি না। দাদাকে বলেছি, অম্বুজ দাসের কাছে পাঠাচ্ছি তোমায়—হিরুর জন্য বনকরের একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারেন কিনা। দিদি আর আমি পরামর্শ করেছি—দুজন মাত্র আমরা জানি; আর এই তুমি জানলে। দুলালকে যদি এনে ফেলতে পার, জানাজানি তখনই।

কালীময় ঘাড় নাড়ল : আমার যেতে কি কিন্তু থোতা মুখ ভোঁতা করে ফিরতে হবে। গেল-বার এমনি ফটিক গিয়েছিল। এলো না, একগাদা কথা শুনিয়ে দিল। বাবা রেগে টং, নিমিটা মুখ চুন করে ঘোরে। পাড়ার লোকে মজা দেখে : এলো না বুঝি জামাই ?

দেবনাথ বললেন, বাইরের লোক না গিয়ে তুমি যাচ্ছ সেই জন্যে। কাকপক্ষী টের পাবে না। একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি বেয়ানের নামে।

কত সাধ করে একই দিনে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। চঞ্চলার বেলা হয়েছে—বউকে তারা চোখে হারায়। চঞ্চলাও মজে গিয়েছে খুব—মুখে যা-ই বলুক, চিঠিতে যত ধানাই-পানাই করুক বাপের-বাড়ির জন্য সে মোটেই বিচলিত নয়। হোক তাই, ভাল থাকলেই ভাল, বাপ-মা আত্মীয়জনে এই তো চায়।

আর নিমির বেলা ঠিক উল্টো। বিয়ের পর বার তিনেক গোসাইগঞ্জে গিয়েছিল, তারপর থেকে বাপের-বাড়ি পড়ে আছে। বউ নেবার জন্য দুলালের মা গোমস্তাকে পাঠিয়েছিলেন একবার। উঠানে পাল্কি। কানাইডাঙার ঘাট অবধি যাবে। পানসি ভাড়া করা আছে সেখানে। হিরুও যাচ্ছে বোনকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে। জামা-জুতো পরে সে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আসল মানুষ নিমিরই পাত্তা নেই। কোথায় গেল, কোথায় গেল? খুঁজতে খুঁজতে বিনোই শেষটা আবিষ্কার করল নাটাবনের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে সে। যাবে না, কিছুতে যাবে না—জোর করে পাল্কিতে ঢুকিয়ে দেবে তো লাফিয়ে পড়বে পাল্কি থেকে। অথবা মাঝ গাঙে পানসি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। গোসাইগঞ্জে নিয়ে তুলতে পারবে না কেউ, দিব্যিদিশেলা করে বলছে। চুপ, চুপ। বাড়ির লোকে নরম হলেন তখন : ঘরে আয় তুই কেলেঙ্কারী করে লোক হাসাস নে—যেতে হবে না শ্বশুরবাড়ি। পাল্কিসহ গোমস্তমশায় ফেরত চলে গেলেন—হঠাৎ নাকি মেয়ের সাংঘাতিক রকম পেট নামছে, সুস্থ হলে হিরু নিজে গিয়ে রেখে আসবে। গোমস্তাও ঘাস খান না। যা বোঝবার বুঝে গেলেন তিনি। বউ নেবার প্রস্তাব তার পরে আর গোসাইগঞ্জ থেকে আসে নি। চঞ্চলা শ্বশুরবাড়ি চুটিয়ে সংসারধর্ম করছে, নিমি বাপের-বাড়ি পড়ে থাকে। বিষম জেদি—কথা-কথান্তর ঝগড়া-ঝাঁটি হলেই অমনি হাতের চুড়ি ভেঙে সিঁথির সিঁদুর মুছে বিধবা সাজবে, খোশা-মুদি করে তখন নতুন চুড়ি ও সিঁদুর পরাতে হয় আবার।

কানাঘুষো আগেই একটু শোনা গিয়েছিল, অলকা-বউ চাপাচাপি করে আরও কিছু বের করল নিমির মুখ থেকে। বাড়ির সবাই ভবনাথকে দোষে। নিজেই গিয়েছিলেন পাত্র পছন্দ করতে—পাটোয়ারী মানুষ বিষয়-সম্পত্তি দেখে মাথা ঘুরে গেল, অন্য খবরাখবর নেবার ফুরসত হল না। নিজের মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ছুঁড়ে দিয়েছেন তিনি। মারাত্মক কি হয়েছে ভবনাথ অদ্যাবধি কিন্তু বুঝতে পারেন না। বেটা-ছেলের একটু-আধটু বাহিরফটকা দোষ থাকেও যদি, বিয়ের পর শুধরে যায়। বউয়েরই কর্তব্য সেটা, কড়া হাতে রাশ টেনে ধরবে সে। ছেলে বিগড়ে যাচ্ছে বুঝলে বাড়ির কর্তা ডাগরডোগর পাত্রী দেখে তাড়াতাড়ি সেই জন্য বিয়ে দিয়ে ফেলেন। নিমিই তো সৃষ্টিছাড়া—নিজের জিনিস ইঁদুর-বাঁদরে শিয়াল-শকুনে খুবলে খুবলে খেয়ে যাবে, মান করে উনি বাপের-বাড়ি পড়ে থেকে নাকিকান্না কাঁদবেন।

দেবনাথ ঠিক করেছেন ফয়শালা করে যাবেনই এবারে—শ্বশুরে বলে চুপচাপ থাকার মানে হয় না। দুলালের মাসতুত বোন সেই সুহাসিনীটাকে নার্সিং-এর কাজে ঢুকিয়ে দেবেন। জমিদারদের নায়েব, মানবের চেয়ে দেবনাথের বান্ধবই তিনি বেশী এ ব্যাপারে সাহয্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতএব, শহরে চলে যাক মেয়েটা, নিজের পায়ে দাঁড়াক—মাসির বাড়ি কেন চিরকাল পড়ে থাকতে যাবে? এই নিয়েও স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলবেন জামাইয়ের সঙ্গে। জামাইষষ্ঠীর আট দিন বাকী—কালীময়কে তাড়াহুড়ো করে পাঠাচ্ছেন। আগেভাগে দুলালকে নিয়ে আসুক। চঞ্চলা-সুরেশ না আসতেই কথাবার্তা এঁরা চুকিয়ে বসে থাকবেন।

বলেন দেশে-ঘরে থাকিনে বাবাজীকে শুধু চোখের দেখাই দেখেছি, ভাল করে আলাপ-সালাপ হবে এবার—ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখে দিচ্ছি এইসব। তুমি মুখেও বোলো। তা সত্ত্বেও যদি না আসে নিজে চলে যাবো তখন—

কালীময়ের ঘোর আপত্তি : না আপনি যেতে যাবেন কেন? তালুইমশায় মারা গেছেন, চ্যাংড়াটা কর্তা হয়ে বসে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে শুনতে পাই। আমার মান-অপমান নেই কিন্তু আপনার মুখের উপর উল্টোপাল্টা কথা যদি কিছু বলে বসে।

দেবনাথ শান্ত কণ্ঠে বললেন, বন্দুক থাকবে আমার সঙ্গে—তাহলে শেষ করে আসব দুলাল-সুহাসিনী—দুটোকেই। বিধবা হয়েছে নিমি নাকি বলে থাকে। তাই আমি সত্যি সত্যি করে আসব।

।। সাত ।।

গোসাইগঞ্জে কালীময় এই প্রথম। নদী থেকে সামান্য দূরে একতলা পাকা দালান। উঠানে পা দিয়েই দু পাশে গোলা দুটো। হলশা গাছ চতুর্দিকে ঘিরে আছে। নদী ঘরের দুয়ারে বললেই হয় আবার বাড়ির পিছনে বিশাল এক পুকুর। বিষয়ী মানুষ এইসব দেখে মজে যাবেন, সে আর কত বড় কথা। আরও তো তখন দুলালের বাপ বুড়ো কর্তামশাই বর্তমান। দাবরাব প্রচণ্ড ছিল তাঁর। গোটা দুই ভাটা নেমে গিয়ে বাঁধবন্দী প্রকাণ্ড চক। হাজাশুকো নেই ওঁদের জমিতে। ফাল্গুনের গোড়ার দিকে সাতশ নৌকো ধান বোঝাই হয়ে গোসাইগঞ্জের ঘাটে লাগে। জনমজুরে মাঝি-মাল্লারা তখন নৌকো থেকে ধান বয়ে বয়ে উঠানে ঢালতে লেগে যায়। ঢালছে তো ঢালছেই—ছোটখাট পাহাড় হয়ে ওঠে। তারপর চিটে উড়িয়ে [illegible]

সেই ধন গোলায় তুলে ফেলা। কাজকর্ম সারা হতে ককেরটা দিন লেগে যায়। এই মরশুমের মধ্যে ভবনাথ পাকা দেখতে এসে পড়েছিলেন। আশীর্বাদের আংটি দুলালকে পরাবেন, সে এসে দাঁড়িয়ে আছে, ভবনাথ তখনও মুগ্ধ চোখে উঠানে ধানের গাদার দিকে তাকিয়ে। দুলালের বাপ হেসে বললেন এ আর কি দেখছেন বেহাই, খোলাট থেকে সবই তো বেচে দিয়ে এলাম। খোরাকী বাবদ সামান্য-কিছু বাড়ি এনেছি। বাড়ি ফিরে ভবনাথ শতকণ্ঠে নতুন কুটুম্বর ঐশ্বর্যের কথা বলতে লাগলেন।

নৌকোর চলাচলে সময়ের মাথামুণ্ডু থাকে না, কালীময়কে নামিয়ে দিয়ে গেল প্রায় দুপুর তখন। গামছা কাঁধে দুলাল চানে যাচ্ছিল কুটুম্ব দেখে হৈ-হৈ করে উঠল : আসুন, আসুন। রোয়াকের তক্তপোশে নিয়ে বসাল। মাকে ডাকছে : ওমা সোনাখড়ি থেকে মেজবাবু এসেছেন দেখ।

দুলালের মা এসে দাঁড়ালেন। কালীময় পায়ের ধুলো নিয়ে দেবনাথের চিঠি হাতে দিল। চিঠি হাতের মুঠোয় মুড়ে নিয়ে বললেন কুটুম-পাখি ডেকে গেল—বলছিলাম কুটুম্ব আসবে আজ দেখিস। তা ভাল তো সব তোমরা?

কালীময় কলকল করে বলে যাচ্ছে জামাইষষ্ঠী সামনে — আপনি অনুমতি করলে দুলালকে নিয়ে যাই। কাকামশায় বাড়ি এসেছেন তিনি পাঠালেন। সেই বিয়ের সময় সামান্য দেখাশুনো—বললেন নিয়ে আয় জামাইয়ের সঙ্গে সকলে কয়েকটা দিন আমোদআহ্লাদ করি।

দুলালের মা উদাসকণ্ঠে বললেন তবু ভাল। ভেবেছিলাম ভুলেই গেছ তোমরা আমাদের।

দুলালের এক বিধবা বোন টেঁপি তিন ছেলে-মেয়ে নিয়ে থাকে। গাড়ুতে জল ভরে সে জলচৌকির পাশে এনে রাখল গাড়ুর মুখে গামছা। দুলালের মা বললেন পরের কথা পরে। জামা-জুতো খুলে হাত-পা ধুয়ে জিরিয়ে নাও।

মেয়েকে ডেকে বললেন এত বেলায় এখন আর জলখাবারের তালে যাসনে তোরা। দুলালের সঙ্গে পুকুরঘাট থেকে একটা ডুব দিয়ে এসে খেতে বসে যাক।

দুজনে স্নান করতে গেল। ছোট বোনের বর বলে কালীময় তুমি-তুমি করে বলছে : গেল-বার ফাঁকি দিয়েছ—সুরেশ গিয়েছিল ঠিক। কাকামশায় তাই বললেন চিঠিপত্তোর কি আজেবাজে মানুষ পাঠানো নয়। তুমি নিজে চলে যাও আমার কথা বিশেষ করে জানাবে।

দুলাল বলে কাকামশায় কৃতীপুরুষ তাঁর সম্বন্ধে অনেক শুনে থাকি। আমারও খুব ইচ্ছে তাঁর কাছে যাবার—

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে কিছু গম্ভীর হয়ে বলে অনেক কিছু আমার নিয়ে বলাবলি হয় শুনতে পাই। আমারও বলার আছে কাকামশায়ের কাছে যাওয়ার দরকার।

যাবার জন্যে জামাই তো পা বাড়িয়েই আছে—এত সহজে কর্মসিদ্ধি কে ভেবেছে? পুলকে ডগমগ হয়ে কালীময় বলে কালকের জোয়ারে রওনা হওয়া যাক তবে দেরি করে কি হবে। ভাড়ার নৌকো এখানে মিলবে না ডুমুরের বাজার অবধি যেতে হবে এই জন্য?

দুলাল হেসে বলে আসেন নি তো এবাড়ি কখনো—এই প্রথম এলেন। তা যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছেন। মাকে বসে দেখুন না টের পাবেন তখন।

উপস্থিত মতে খাওয়া কুটুম্বর জন্যে নতুন করে রান্নাবান্নার ফুরসত হয়নি। তাই কত রে! ছোট বাটিতে করে ঘি—বাড়ির সর-বাটা ঘি; পাতে খাবার জন্য। কী তার সুবাস! মাছ দু-রকম, নিরামিষ তরকারি তিন-চার পদ ভাজাভুজি আছে। প্রকাণ্ড বাটি ভরতি ঘন-আঁটা দুধ চটের মতন সর—তার সঙ্গে আম-কাঁঠাল বড়সাইজের কদমা। নিত্যিদিনের সাদামাটা খাওয়া এই আর রাত্রিবেলা ধীরেসুস্থে কুটুম্বর জন্য বিশেষ আয়োজন হবে—ব্যাপারটা আন্দাজ করতে গিয়ে কালীময়ের রোমাঞ্চ জাগল। আসা অবধি ছোঁক-ছোঁক করছে সুবাসিনী মেয়েটাকে দর্শনের জন্য। এক-আধ ঝলক হয়েছেও দেখা চকিতের জন্য। খেতে বসে আর ক্ষোভ রইল না। দরদালানে দুলাল আর কালীময় পাশাপাশি বসেছে পরিবেশন করছে সুবাসিনী—রান্নাঘর থেকে উঠান পার হয়ে ভাত-ব্যঞ্জন এনে এনে দিচ্ছে। সম্পর্কে দুলালের মাসতুতো বোন—দুলালেরই সমবয়সী কিম্বা বড়ও হতে পারে। বর নিরুদ্দেশ কোনও চুলোয় কেউ নেই বোধহয় —মেয়েটা এ-বাড়ির আশ্রিত। কালীময় আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বারম্বার। মাজা-মাজা রং দোহারা গড়ন--আহামরি কিছু নয়। কিন্তু ঠসক দস্তুরমতো। হাতে সোনার চুড়ি গঙ্গাযমুনা-পাড় ধবধবে শাড়ি পরণে গায়ে কাঁচুলি সিঁথির সিঁদুরে আছে কিনা মালুম পাওয়া যাচ্ছে না। এদেশ-সেদেশ চিঁ-চিঁ পড়েছে এরা তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে বলে মনে হয় না। কালীময়ের সামনে তাহলে বের হতে যাবে কেন?

সে যাই হোক খাওয়াটা অতি উপাদেয় হল। কালীময়ের বাড়ি ফেরবার তাড়া মিইয়ে গেছে অনেকখানি। নিজে থেকেই বলল কালকেই ছাড়তে চাইছ না—তা বেশ মাঝামাঝি একটা রফা হোক: আটদিন পরে জামাইষষ্ঠী—তার মধ্যে চারটে দিন আমি এখানে থাকছি আর তোমারও অন্তত চারটে দিন আগে গিয়ে পড়তে হবে। সুরেশরা এসে পড়বার আগে। কাকামশায় বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।

বিড়-বিড় করে সঠিক তারিখের হিসাব করে নিয়ে দুলালও সায় দিল : সেই ভাল। ডুমুরের হাটবার ঐদিন। একগাদা খরচা করে নৌকো ভাড়া করার দরকার নেই হাটুরে নৌকোয় হাটে গিয়ে নামব আবার আপনাদের ওদিককার একটা হাটফেরতা নৌকো ওখান থেকে ধরা যাবে। সামান্য খরচার ব্যাপার—নিয়েও যাবে বাতাসের মতন উড়িয়ে।

পরমোৎসাহে বলল, মাকে বলুনগে তাই। আমিও বলব। আপত্তি হবে না জানি। বুধবার হাটের দিন আমরা রওনা হয়ে পড়ব।

এককথায় রাজি। গেল বছর ফটিক ফিরে গেলে বলাবলি হয়েছিল আসবে না তো জানা কথা—কোন লজ্জায় মুখ দেখাবে? কালীময় গিয়ে মাকে এবারে বলতে পারবে এসেছে কিনা দেখ। ফটিককে দিয়ে চিঠি পাঠানোই ভুল। ডাকের চিঠিতে সুরেশ এসে থাকে কিন্তু সকলের পক্ষে এক জিনিস ঘটে না—শ্বশুরবাড়ি বাবদে ঘোরতর মানী দুলালেরা। আমি গিয়ে এই তো টুক করে নিয়ে চলে এলাম। জাঁক করে সে এই সমস্ত বলবে।

বিকালবেলা ভুরিপ্রমাণ জলযোগে বসে কালীময় কথাটা পাড়ল: কাকার চিঠিটা দেখলেন মাউইমা? জামাইষষ্ঠীতে দুলালের না গেলে হবে না।

বেশ তো যাবে—

দুলালের মা গঙ্গাজল একেবারে। বললেন ষষ্ঠীর পর বেশি দিন কিন্তু আটকে রেখো না বাবা। ফিরে এসেই আবাদে যাবে — আমাদের ভাতভিত্তি যেখানে। ভেড়িতে এইবার মাটি দেবার সময়। গোমস্তায় নির্ভর হলে কাজে ফাঁকি দেবে মাটি চুপ্পি করে। নিজে[illegible]র দাঁড়িয়ে থেকে করতে হয়।

কালীময় পরমানন্দে বলে, আপনার অনুমতি পেলে বুধবার রওনা হয়ে যাব।

তাই যাবে—

বলে ঠাকরুন চুপ করে রইলেন মুহূর্তকাল। তারপর গম্ভীর আদেশের সুরে বললেন বউমাকে দুলালের সঙ্গে পাঠিয়ে দিও। অতিঅবশ্য পাঠিও। সেবারে পেট নেমেছিল, মাথাটাতা ধরে না যেন এবার। এখানেও ডাক্তার-কবিরাজ আছে রোগ সত্যি সত্যি হলে তার চিকিচ্ছে-পত্তোর হয়। বলি, শ্বশুরবাড়ি পাঠাতেই নারাজ তো মেয়ের বিয়ে দেওয়া কেন—বীজ রাখলে হত, লাউ-কুমড়োর মাচায় একটা-দুটো যেমন রেখে দেয়।

কণ্ঠস্বর ধাপে ধাপে উঠে প্রচণ্ড হল: বউ বাপের-বাড়ি পড়ে থাকবে বলে ছেলের বিয়ে দিইনি। অজুহাত করে এবারও যদি না পাঠানো হয়, দুলালের আবার বিয়ে দেবো আমি। হ্যাঁ, খোলাখুলি বলে দিচ্ছি—বেয়াই-বেয়ানদের বোলো।

(ক্রমশঃ)

যুবক যুবতী

প্রীতি সাহা

বাজার দর

যাতে হাত দেবেন সব কিছুই আগুন। ধরবার যো নেই। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বলুন, বিলাস দ্রব্য বলুন—পড়াশুনার খাতা কলম বই কিংবা জামা-কাপড় ওষুধপত্র কোন কিছুই বাদ নেই। দিন দিন দাম যা বাড়ছে তাতে আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে সব জিনিস, প্রায় আকাশ ছুঁই ছুঁই অবস্থা। যাঁরা সংসার চালাচ্ছেন সেই মা বাবার মুখে কি হাসি আছে? জীবন সংগ্রামে তাঁরা অস্থির হয়ে পড়েছেন। আমাদের এই বয়সে আমরাই বা কোন্ শখ আহ্লাদ করতে পারছি? পারছি কি মনের মতো একটা শার্ট প্যান্ট পরতে কিংবা একখানা শাড়ী পরতে? পোশাক-পরিচ্ছদ না হয় বাদই দিলাম দুবেলা পেট পুরে খেতে পাচ্ছি? রেশনের আতপ চাল খেতে খেতে পেটে চড়া পরে যাচ্ছে। আজকের ছেলেমেয়েদের কি এই অবস্থা ভাল লাগছে কোন ভাবনা নেই তাঁদের? চলুন একবার ঘুরে আসি তাদের মধ্যে।

বরানগর বাজার থেকে ফিরছিলেন শ্রীপরিতোষকুমার মধু। বিশের কোঠায় বয়স। খুব লম্বা নন। তাই বাজারের থলে খুব ভরতি না হলেও প্রায় রাস্তা ছুঁয়ে যাচ্ছে। আপন মনে বিড় বিড় করে বলে চলেছেন—'সব কিছুর দাম বাড়ছে—আজ এক দাম কাল এক দাম...বাঁচতে দেবে না।' আমি পেছন থেকে ডাকলাম—এই যে দাদা শুনুন। বিরক্তি ভরে একবার পেছনে তাকালেন তিনি। 'নমস্কার আপনার সঙ্গে দু'একটা কথা বলব।' এবার আমার উদ্দেশ্য জানতে পেরে একটু শান্ত হলেন কিন্তু চোখেমুখে এখনো রাগের চিহ্ন।

—আপনি মনে হচ্ছে খুব রেগে আছেন?

—আরে মশাই বাজারে গিয়ে মেজাজ ঠিক রাখা দায়। পনের ষোল টাকার নিচে মাছ নেই আলু দেড় টাকা বেগুন দু'টাকা কাঁচকলা পঞ্চাশ পয়সা জোড়া—কি খেয়ে বাঁচব বলুন তো। ওদিকে সরকার অর্ডি-ন্যান্স করে বাড়তি ভাতার অর্ধেক কেটে রেখেছেন আর এদিকে আমাদের প্রাণান্ত। দাম কমানোর দিকে কারো খেয়াল নেই। যে যা পারছে লুটে নিচ্ছে।

—এ সবের দাম এতো বাড়ছে কেন আপনার কি মনে হয়?

—আমার মনে হয় গ্রামের চাষীদের কাছ থেকে শহরের ব্যবসায়ীরা সব কম দামে কিনে ঠান্ডাঘরে মজুত করছে আর আমাদের কাছে নেই নেই বলে চড়াদামে বিক্রী করে গলা কাটছে।

—জিনিসপত্রের সাপ্লাইয়ের কোন অভাব নেই?

—না মশায় অভাব কিসের? টাকা দিলে জিনিস মিলছে—অভাব হলে তো টাকা দিয়েও মিলতো না। সরকারের দাম নিয়ে কোন মাথাব্যথাই নেই!

—সরকার তো চেষ্টা করছেন—আপনাদের সহযোগিতা না পেলে...

—সহযোগিতা! আমরা কি বড়লোক যেটুকু দরকার সেটুকু কিনি। না খেয়ে কি মরব মশাই? রেশনে যা দেয় তাতে আর ক'দিন চলে। বাইরে চাল পাঁচ টাকা ছুঁই ছুঁই। দোকানে কাপড়ের দাম আগুন। গত সপ্তাহে কলকাতা থেকে একটা ওষুধের ফাইল কিনেছি সাড়ে দশ টাকা দিয়ে আজ এখানে চাইল ষোল টাকা। 'বেশী দামে কিনবেন না' নীতি মানলে আমাদের মতো গরীবদের রোগে ভুগে বিবস্ত্র হয়ে না খেয়ে মরে পচতে হবে। বড়লোকদের অসুবিধে নেই—টাকা ছাড়ছে, দিব্যি মালপত্র ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে।

পি কে মধু

—এর কোন সুরাহা নেই?

—সুরাহা কি করে হবে? দিন দিন সমস্যা বাড়ছে। মাঝে মাঝেই কেরোসিন নিয়ে ঝামেলা। মাঝে মাঝেই আলো বন্ধ পড়াশুনাও বন্ধ। কাগজ কালির দাম ভাবা যায় না। খাব না পড়াশুনা চালাব।

সমীর কর উঠতি যুবক। স্কুলে পড়ে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার কি মনে হয়?

—আর পারছি না লাইন দিতে দিতে জীবন শেষ হয়ে গেল। তেলের লাইন রেশনের লাইন রুটির লাইন সাবানের লাইন পড়াশুনার আর সময় পাই কোথায়?

—এতে পড়াশুনার খুব ক্ষতি হচ্ছে তাই না?

—সে কি বলতে! মন দিয়ে পড়তে পারি না। খালি পেটে তো আর পড়া যায় না—খাবার জোটাতেই হিমসিম খেতে হচ্ছে। স্কুলের মাইনে বাকী পড়েছে অনেকদিনের। সব বই কেনা হয়নি একজন টিউটরের কাছে পড়া দরকার তাও পারছি না।

দেশবন্ধুনগরের আলো দাসের সঙ্গে পরিচয় হল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—'বাজার দর' সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি?

—চেহারাটা দেখুন না। যা খাচ্ছি—দেখলেই বুঝবেন।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। চোখাচোখি হতেই মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম। আলো দেবী বলে চললেন—প্রথমে টিউশনি করে নিজের পড়ার খরচ, কাপড়চোপড় জোগাড় করে নিতাম এখন সম্ভব হচ্ছে না। অভাবের সংসার—বুঝতেই পারছেন সেখানেও মাসে মাসে কিছু দিতে হয়। পরীক্ষা এসে গেল। বইপত্রের দাম—সব বইও কিনতে পারছি নি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্সের ছাত্র ধনপতি দত্তর সংগে কথা বললাম। সংসারে বড় ছেলে। বাবা কিছুই করে না। অনেক লড়াই করে পাঁচ-ছ'জনের সংসার তাকে চালাতে হচ্ছে।

—কি করছ?

—টিউশনি পুরনো কাগজ থেকে ঠোংগা তৈরী। কিছুদিন ধূপকাঠি বিক্রী করেছিলাম। তবু পেরে উঠছি না।

—'বাজার দরের' এ হালের জন্য দায়ী কে?

—দেশে মুদ্রাস্ফীতি চলছে। টাকার মাত্রা বেড়েছে—ব্যাংক ব্যবসায়ীদের অনেক টাকা দিচ্ছে কিন্তু এসবের তুলনায় জিনিসপত্র তত বাড়েনি। টাকার দাম কমে গিয়েছে। জিনিসপত্রের দাম হয়েছে আগুন। আমরা যে কিভাবে বাঁচব।

—দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলাম।

ওদিকে পুজোর বাজারের বিপুল আয়োজন শুরু হয় দোকান-পাটে। পুজো এসে গেল। কিন্তু সোনাপাড়ায় যা বড় বড় কাপড়ের দোকানে আমাদের মতো ঘরের লোকদের ভীড় তেমন বেশী ছিল না। পুজোর আগে কাপড়চোপড় কিনে ফিরছিলেন সোদপুরের প্রীতি সাহা। তাকে জিজ্ঞাসা করি—

—এর মধ্যে পুজোর বাজার হয়ে গেল?

—জিনিসপত্রের যা দাম বাড়ছে এখন না কিনলে পুজো পর্যন্ত আরো আট দশ টাকা বেড়ে যাবে।

—তাই নাকি!

—জামাকাপড়ের দাম অসম্ভব বেড়েছে। সাধারণ পরার একটা কাপড় ত্রিশ টাকার কমে হচ্ছে না।

—তা আপনি তো অনেক কাপড়চোপড় কিনেছেন?

—কই আর এতো কিনলাম। মা বলছেন এতো দাম দিয়ে বেশী কিছু কিনতে হবে না। আমার একটা পছন্দ করা শাড়ী শেষ পর্যন্ত আনা হল না। কেমন যেন একটু বিমর্ষ লাগছিল প্রীতিকে।

জিজ্ঞাসা করলাম—শাড়ীর জন্য মুখ গোমরা?

—না না মায়ের একটা কথা ভাবছি। আমার হয়তো পুজোর শাড়ী হল কিন্তু অনেক মা-বোনের পেটে ভাত নেই। পুজোর সময় হয়তো তারা শতচ্ছিন্ন কাপড় পরে আমাদেরই দোরে আসবে—মাগো একটা বাসি রুটি দেবে। ভাবতে বড্ড কষ্ট হয়। তখন ভাল কাপড়ও পরতে ইচ্ছা করে না।

—অমর দাশ

এঁরাও পিছিয়ে নেই

শিক্ষিত তরুণের ভ্রাম্যমাণ কফি-বার

এসপ্লানেড ট্রাম গুমটি ঘিরে যে বিরাট বাজার গড়ে উঠেছে সেখানে স্থানীয় বাঙালী ব্যবসায়ীদের দেখা পাওয়া ভার। সারি সারি ছিট কাপড় রেডিমেড পোশাক চামড়ার ব্যাগ ইত্যাদি রকমারি জিনিসের দোকান গড়ে উঠলেও বাঙালী দোকানদারের সংখ্যা নেহাৎ নগণ্য বললেই চলে।

তবুও আশার কথা—ওখানে যে তিনটি ভ্রাম্যমান কফি-বার বাজি মাৎ করছে সেই তিনটির মালিক বাঙালী—সনৎ সাহা, নিতাই চাঁদ সাহা এবং গৌরচাঁদ সাহা। সেদিন ভ্রাম্যমান কফি-বারের সামনে দাঁড়িয়ে গৌরবাবুর সংগে কথা হচ্ছিল—ভদ্রলোক বয়সে তরুণ—বছর পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। বছর দেড়েক তিনি এই কফি-বার শুরু করেছেন। ছয় হাজার টাকা সম্বল করে এই ব্যবসায়ে নেমেছিলেন তিনি। এর মধ্যে চার হাজার টাকা লেগেছিল একটি সেকেন্ডহ্যান্ড স্কুটার ভ্যান কিনতে। আর বাকি টাকাটা খরচ হয় কফি তৈরীর যন্ত্র ফোল্ডিং চেয়ার কাপপ্লেট ইত্যাদি কেনা-কাটা করতে। ঐ ছোট স্কুটার ভ্যানে করে গৌরবাবু রোজ ডাক্তার লেন থেকে তাঁর রেস্তোরাঁর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আসেন। নিজেই গাড়ি চালান।

—কেমন লাগছে?

—নাইস। হাজার হোক নিজের জিনিস। এখানে আমিই অল-ইন-অল। এই বলে একটি কফির পেয়ালা এক অবাঙালী তরুণীর হাতে এগিয়ে দিয়ে নমস্কার জানালেন—টেক ইট ম্যাডাম। প্লীজ ট্রাই টু অ্যাপ্রিসিয়েট ইট্স ফ্লেবার।

তারপর আমার দিকে চেয়ে গৌরবাবু বল্লেন—দেখুন সেই কোন ছেলেবেলায় আমার বাবা মারা যান। আত্মীয়স্বজনের কাছেই আমি মানুষ। ম্যাট্রিক পাশ করার পর ইচ্ছা থাকলেও লেখাপড়া করতে পারিনি।

—তা মোবাইল রেস্তোরাঁ করার প্ল্যানটা মাথায় এলো কি করে?

—দেখুন পাশে যে আরও দুটো স্কুটার-ভ্যান-কাম-মোবাইল কফি-বার দেখছেন তার একটি চালান আমার এক আত্মীয় আর একটি চালান আমার দাদা। ও'দের কাছেই আমার প্রথম হাতে খড়ি। ও'দের কাছে কাজ করতে করতে প্ল্যানটা মাথায় আসে।

—টাকা পেলেন কোত্থেকে?

—ধার করেছি তবে ব্যাংকের কাছ থেকে নয়। কয়েকটি ব্যাংকের সংগে কথা বলেছিলাম কিন্তু ও'রা সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ির উপর লোন দিতে রাজী হন নি।

—বিজনেস কেমন চলছে?

—ভালই তিনজনের বিজনেসই পাশাপাশি চলছে—কারও কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। আমাদের তিনজনের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক। ভুল বোঝাবুঝির কোন স্কোপ নেই।

—ডেইলি কি রকম বিক্রী হয়?

—ঝড়বৃষ্টি না থাকলে বিক্রী ভালই হয়। গরমের সময় কম হলেও শীতকালে বেশী বেচাকেনা হয়। শীতকালে সকালের দিকেও বসি। গৌরবাবু আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বললেন—দেখুন এই স্কুটার-ভ্যান আমার লক্ষ্মী। আমাদের স্বামী-স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের মিলে পাঁচ—ছজনের সংসার চলছে এর উপর নির্ভর করে। আমার ছোটো ভাইও আমায় খুব হেল্প করে। ও হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা দেবে। এ ছাড়াও আরও দুজনকে এখানে কাজ দিয়েছি।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত দশটা। গৌরবাবু বললেন—এবার আমি যাই। খুব টায়ারড। ও'র অ্যাসিস্টেন্ট দুজন এর মধ্যে ফোল্ডিং চেয়ার কাপপ্লেট গাড়ির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। গৌরবাবু নমস্কার জানিয়ে স্কুটার ভ্যানে স্টার্ট দিলেন ডাক্তার লেনের উদ্দেশে।

—কনক মজুমদার

চিঠিপত্র

লিব

গত (২৭-৯-৭৪) তারিখে সাপ্তাহিক অমৃতে শ্রীযুক্ত বাল্মীকি ঘোষ 'লিব' প্রসঙ্গটি আলোচনাকালে নারী প্রগতির প্রতি কটাক্ষ করে যে মতামত রেখেছেন, তা বাস্তবিক আপত্তিজনক।

তিনি 'লিব' তথা লিবার্টির প্রকৃতিগত অর্থ করেছেন 'আত্মনিয়ন্ত্রণ'। কিন্তু জিজ্ঞাসা এই আত্মনিয়ন্ত্রণ কথাটি কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? নারী না পুরুষ?

সমগ্র বক্তব্যটির পরিশেষে নারী অগ্রগতি সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করে শ্রীঘোষ বলেছেন 'পরনির্ভরতা অস্বীকার করে নারীরা কর্মক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় উদ্ধত, উগ্র এবং হৃদয়হীন হয়ে পড়েছে।' পর-নির্ভরতা অস্বীকার বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন? একথা স্বীকার করি মেয়েরা দৈহিক দিক দিয়ে (আদৌ মানসিক দিক থেকে নয়) হীনবল। কিন্তু অবিচ্ছিন্নভাবে কায়িক শ্রমক্ষমতা এবং অসীম ধৈর্য নিয়ে আজকের মেয়েরা তাঁদের প্রাপ্য অধিকার এবং প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তথাকথিত এই পর-নির্ভরতাকে কাটিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে চাইছেন। জীবনের সর্বস্তরে পুরুষের সমান স্বাধীনতা, সুযোগ এবং মর্যাদা অর্জনের জন্য যে সংগ্রাম, তাই উইমেনস লিব আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।

সংসারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির আংশিক অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ণ দায়িত্ব মেয়েরা স্বেচ্ছায় হাতে তুলে নিয়েছেন। তাই শহরের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষের দায়িত্ব এবং কাজকর্মের অংশীদার। কিন্তু পুরুষেরা নারীর কর্মভারের কতটুকু অংশ গ্রহণের প্রয়াস পেয়েছেন? কোন ভারতীয় মহিলা কি আশা করতে পারেন কর্মক্লান্ত দিনের শেষে পুরুষের হাতের এক কাপ ধূমায়িত চা। একথা বললে স্বামী মহোদয়রা আতঙ্কে উঠবেন। এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেলে তাঁদের পুরুষত্ব নিদারুণভাবে খর্ব হয়। বাল্মীকি ঘোষের উক্তি 'কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা হৃদয়হীন।' কিন্তু প্রশ্ন—ঘর এবং বাইরের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার এই [illegible] পরিশ্রমে ক্লান্ত পাণ্ডুর [illegible] দিকে তাকিয়ে কজন পুরুষ সহযোগী হাত বাড়িয়ে সহৃদয়তার পরিচয় দেন?

এর পরেও আছে পুরুষদের সেই সর্বকালীন, সর্বব্যাপী অধিকার স্থাপনের অহমিকা। মেয়েদের সমস্ত কর্মপ্রয়াসকে তাঁরা তাঁদের অনুমতিসাপেক্ষ বলে মনে করেন। তাই মেয়েরা যদি কোন ক্ষেত্রে তাঁদের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চান তবে সাংসারিক জীবনে সংঘর্ষ প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এবং অনিবার্যভাবে তার দোষ বর্তায় নারীদের ওপর। এ সবেরই পরিপ্রেক্ষিতে কোন মেয়ে যদি নিজেকে সংসারের দাসীর নামান্তর ভেবে আক্ষেপ করে থাকেন, তবে পুরুষেরা তৎক্ষণাৎ এর সঙ্গত কারণ হিসাবে ভুল ব্যাখ্যা দেন।

এতদসত্ত্বেও মেয়েরা তাঁদের দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে সংসারের শ্রী শান্তিকে বজায় রেখে পুরুষের যথার্থ সহকর্মী এবং সহমর্মী হয়ে জীবন কাটাতে চান। ক্লাবে, বারের উচ্ছ্বাস, অসংযত জীবনের জন্য স্বাধীনতা কোন মেয়েরই একান্ত কাম্য নয়।

তাই গৃহাভ্যন্তরীণ শান্তি এবং সৌষ্ঠবকে উপেক্ষা করে লিব-এর অগ্রগতি

যুবক যুবতী

ঘটছে এবং ঘটবে, এ ধারণা পোষণ করা সম্পূর্ণ অমূলক ও কষ্টকল্পনা মাত্র।

কণিকা রায়,
কলিকাতা-৩২

(২)

সাপ্তাহিক অমৃতে প্রকাশিত যুবক-যুবতী বিভাগে লিবার্টি সম্পর্কে লেখিকার সাক্ষাৎকারগুলো পড়লাম। দত্ত-দম্পতি ব্যতীত প্রায় সব সাক্ষাৎকারগুলো কেমন যেন অস্পষ্ট আবোল তাবোল, বিশেষ করে মিনতি দাসগুপ্তার সাক্ষাৎকারটি যেন লিবার্টি কথাটাকেই চাপা দিয়ে নিজের মনের গোপন বাসনা প্রকাশে উদগ্রীব। লিবার্টির উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে উনি বলেছেন, পুরুষেরা তাঁর কাছে সমস্যাই নয়, কিন্তু আসল কথাটা কি সত্যি তাই? নারী ও পুরুষ এই দুইয়ের পরস্পর সহযোগিতা ভিন্ন কি করে আমরা নারী জগতে লিবার্টি কথাটা ভাবতে পারি? মেয়েদের লিবার্টির ক্ষেত্রে মা, দিদিমা বা তথাকথিত আর কারো চেয়ে সর্বাগ্রে পুরুষের সহযোগিতাটাই কি বড় নয়? একটি মেয়ের স্বাধীনতার পেছনে কোন পুরুষ যদি নিজে সহায়ক না হয় তবে কি করে সে লিবার্টির পথে এগিয়ে আসবে? মিনতি দেবীর বক্তব্য অনুযায়ী তাহলে তো তাঁকে চিরকাল এক ঘরে হয়েই থাকতে হয়। তিনি বলেছেন বিয়ের পর কোন ক্রমেই তিনি স্বামী-দেবতার দাসী হয়ে থাকবেন না। কিন্তু স্বামী যদি সত্যিই দেবতা হয়ে থাকে তবে তিনি নিশ্চয় কোন দিনই তার স্ত্রীকে দাসী করে রাখবেন না। তিনি আবার এ-ও বলেছেন, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি যেমন যাবো না তাকেও এ্যালাউ করবো না আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেতে? তার মানেই তিনি দাম্পত্য (ভবিষ্যত) জীবনে ছেদ ঘটাতে চাইছেন। আমার এই কথাটাকেই বোধহয় সাক্ষাৎকারী লেখিকা একটু ঘুরিয়ে মিনতি দেবীকে প্রশ্ন করেছেন, উত্তরে তিনি বলেছেন 'ছেঁদো কথায় বিশ্বাস করি না...' কিন্তু কথাটা কি সত্যিই ছেঁদো? নাকি উনি নিজেই তাঁর (বক্তব্যে) ভবিষ্যত বিবাহিত জীবনে বিরোধের পথ উন্মুক্ত করছেন। পরিশেষে মিনতি দেবীর বক্তব্যানুযায়ী যে কথাটা বলতে হয়, তা হল যে তিনি নারী জগতে সামগ্রিক লিবার্টির কথা না ভেবে ভাবছেন নিজের ব্যক্তিগত লিবার্টি বা স্বাধীনতার কথা। সোজা ভাষায় তা হল মিনতি দেবীর কোন রকম ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন পুরুষ বা স্বামীর (ভবিষ্যত) কোন কাজই তিনি বরদাস্ত করবেন না।

—মিহিরকুমার রায়
ময়নাগুড়ি।

(৩)

সাপ্তাহিক 'অমৃত'-র যুবক-যুবতী বিভাগে বিভিন্ন সমসাময়িক যুব-সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য জানাই আমার অভিনন্দন।

রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলা'-য় এক জায়গায় লিখেছেন 'মেয়েদের সাহস ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশী লজ্জা অনেক কম।' এক-দিন একথাটা ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি। কিন্তু গত ১৩ই সেপ্টেম্বরের অমৃত-র যুবক-যুবতী বিভাগে প্রকাশিত 'লিব' শীর্ষক আলোচনায় শ্রীমতী বীণা দস্তুরায় ছবি দত্ত ও মিনতি দাশগুপ্ত-র নারী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে মতামত পড়ে মনে হল উপরোক্ত উক্তিটি ঠিক। অন্যথায় নারী স্বাধীনতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁরা এমন সব কথা বলেছেন যা আমাদের নারী জাতির পক্ষে অবমাননাকর। নারী-স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ ওঁদের কাছে বোধহয় অজ্ঞাত। স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। কিন্তু ওঁরা যা করতে চাইছেন তা স্বেচ্ছাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। শ্রীমতী দাশগুপ্ত স্বামী-দেবতার দাসী হয়ে থাকতে রাজী নন। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে তাঁর কাছে স্বামীর কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না। স্বামীর দাসী হয়ে থাকার অর্থ ঠিক বুঝলাম না। আর স্বামী-স্ত্রীকে সর্বদাই বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী ইচ্ছার বোঝাপড়ার মধ্য দিয়েই তো চলতে হয়।

সমাজ বিশেষ করে আমাদের বাঙালী সমাজে মেয়েদের একটা বিশেষ স্থান

রয়েছে। এ ব্যাপারে শ্রীমতী প্রিয়া মণ্ডলের বক্তব্য খুবই বাস্তবসম্মত। মেয়েদের সুষমামণ্ডিত কোমল যে রূপটি রয়েছে তার যে একটা আলাদা মূল্য আছে সেটা আমাদের অর্থাৎ মেয়েদের অনুধাবন করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে যেটা দরকার সেটা হল সংস্কারকে ভেঙে ফেলা। প্রয়োজনে মেয়েদের পুরুষদের মতই চাকরী ইত্যাদি করতে হবে। এ সম্বন্ধে অসীমবাবুর বক্তব্য খুব স্পষ্ট। তাঁর মতো আমারও ব্যক্তিগত ধারণা নারী-স্বাধীনতার ক্ষেত্রটি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনা থেকেই তৈরী হয়ে যাবে। নারী-স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে পুরুষদের সব কাজ মেয়েরা করবে। অনেকে হয়ত বলবেন যে-যুগে মেয়েরা চাঁদে পাড়ি দিচ্ছে সে-যুগে তারা বাড়ীতে বসে পুরুষদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে কেন? কিন্তু নারীসুলভ স্বভাবের মধ্য দিয়ে পুরুষদের পাশে থেকে তাদের সাহায্য করার মধ্য দিয়ে এক রকম আত্মতৃপ্তির স্বাদ পাওয়া যায়—একথা সত্য নয় কি?

আসলে আমরা মেয়েরা আমাদের দুর্বলতা সম্বন্ধে খুব সচেতন। তাই এমন সব কথা আমাদের বলতে হয় যাতে আমরা বোঝাতে পারি যে পুরুষদের সার্বিক নিয়ন্ত্রণের জনাই আমরা সব ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছি। প্রকৃতপক্ষে যেটা প্রয়োজন তা হল বিভিন্ন সংস্কার ভেঙে মেয়েদের যোগ্যতার যথাযথ বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করা। তা না করে আমরা যদি স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠি তাহলে সেটা হবে নারীজাতির পক্ষে এক কলঙ্কস্বরূপ। ইতি।

চন্দ্রাণী ভট্টাচার্য
কলিকাতা-৯।

'চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিণী' প্রসঙ্গে

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিণী' আপাতদৃষ্টিতে একটি 'বিদগ্ধ রচনা'; কিন্তু যাঁরা প্রত্নবিদ্যা নিয়ে সামান্য চর্চাও করেছেন তাঁরা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই ধরতে পারবেন আলোচ্য প্রবন্ধটি আসলে মৌলিকতাবর্জিত একটি দুর্বল প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। তার চাইতেও বড়ো কথা এতে এমন কিছু তথ্যের বিকৃতি, অযথা আক্রমণ, অবিনয় ও প্রমাণ ব্যতিরেকে সিদ্ধান্ত স্থান পেয়েছে যা সত্যি দুঃখজনক।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় কৃত 'চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিণী' প্রবন্ধের প্রথম বাক্য—'সুপ্রাচীন চন্দ্রকেতুগড় আজ আর পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না।' বর্তমান পত্রলেখক ১৩৭৮ সালের 'শারদীয়' পত্রিকার ৪র্থ সংকলনে 'চন্দ্রকেতুগড়ের স্বর্ণমুদ্রা' নামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছিলেন সেই প্রবন্ধেরও আরম্ভ বাক্য ছিলো—সুপ্রাচীন চন্দ্রকেতুগড় আজ আর পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না।' কোনো উদ্ধৃতি চিহ্ন না দিয়ে কিংবা ঋণ স্বীকার না করে অন্য লেখকের রচিত বাক্য হুবহু নিজের লেখায় চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা নিশ্চয়ই মৌলিকতার লক্ষণ নয়।

প্রবন্ধের গোড়াতেই লেখক চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত মন্দিরটি 'তথাকথিত গুপ্তযুগে' নির্মিত বলে কটাক্ষ করেছেন। এই কটাক্ষ সার্থক হতো যদি তিনি প্রমাণ করতে পারতেন যে মন্দিরটি অন্য যুগে নির্মিত। তিনি তা করেন নি। এ থেকে মনে হয় নিছক কটাক্ষ করার জনাই তিনি কটাক্ষ করেছেন।

আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলির কথা বলতে গিয়ে লেখক 'লাঞ্ছনাময় মুদ্রা' ও বিচিত্র বর্ণ ও আকৃতির কৌশল-এর কথা বলেছেন। কথাগুলি হবে 'লাঞ্ছনাময়' ও কৌলাল।

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের একটি রচনা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু বাক্যের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক লিখেছেন : 'মৌর্য ভাস্কর্যের নারীমূর্তির বেশভূষায় যে মর্যাদাবোধ ও সংরক্ষণশীল পারিপাট্য প্রতিফলিত হয়, তা এ সকল সূক্ষ্ম বসনের আবরণে ও মেখলাভাবে উদ্ভাসিত সুরসুন্দরীদের রূপমাধুরীতে অনুপস্থিত'। এই বলে তিনি শ্রীদাশগুপ্তকে এক হাত নিয়েছেন। আসলে, শ্রীদাশগুপ্তকে আক্রমণ নিজের লেখার ওজন বাড়াবার জনাই শ্রীদাশগুপ্তের লেখাকে বিকৃত করে ব্যবহার করেছেন। প্রমাণ হিসেবে শ্রীদাশগুপ্তের প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি : 'সাধারণ নিয়মানুসারে মৌর্যকালে নির্দিষ্ট নারীমূর্তিগুলির বেশভূষায় যে মর্যাদাবোধ ও সংরক্ষণশীল পারিপাট্য প্রতিফলিত হয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ শুঙ্গ ও কুষাণ যুগে ক্রমশই সেই রীতির পরিবর্তন দেখা যায়"।

(অতীতের সমাধি চন্দ্রকেতুগড় : পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, গড়চন্দ্রকেতুর কথা, পৃঃ ৪৩)

শ্রীমুখোপাধ্যায় শ্রীপরেশ দাশগুপ্তের লেখাটিকে কতটা বিকৃত করেছেন তা দেখার জন্য আলোচ্য প্রবন্ধ ও শ্রীদাশগুপ্তের রচনাটি পাশাপাশি রেখে পড়বার জন্য পাঠকদের অনুরোধ জানাচ্ছি। কারো বক্তব্য এরকমভাবে বিকৃত করাকে কোনো রকমেই প্রকৃত প্রত্নচর্চা বা ইতিহাসচর্চা বলা চলে না।

শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বর্তমান পত্রলেখকের একটি প্রবন্ধ (চন্দ্রকেতুগড়ের মিথুন ভাস্কর্য গৌরীশংকর দে : গড়চন্দ্রকেতুর কথা) থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ও পত্রলেখকের মতের বিরোধিতা করে বলেছেন—(চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত যক্ষিণী মূর্তি বা ফলকের) 'সাধারণ লক্ষণ যৌন অকপটতা এমন কথা বোধহয় কোন প্রতিষ্ঠিত যুক্তি বা তথ্যের উপর নির্ভর করে বলা চলে না।' লেখক প্রবন্ধের সঙ্গে যে সব আলোকচিত্র ব্যবহার করেছেন এবং তাতে 'যক্ষিণীদের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদর্শিত হয়েছে তা কিন্তু লেখকের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে লেখকের জ্ঞান কত অগভীর তার সব থেকে বড়ো প্রমাণ 'পঞ্চচূড়' যক্ষিণী নাম দিয়ে যে আলোকচিত্র দুটি তাঁর প্রবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে সেই দুটি আসলে দশচূড়া যক্ষিণী। লেখক লিখেছেন 'যক্ষিণী বা অপ্সরা'। যক্ষিণী এবং অপ্সরা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

লেখক কয়েকটি যক্ষিণীর কবরীবিন্যাসে 'রোমক ও মিশরীয় রীতির প্রভাব' আবিষ্কার করেছেন। লেখক নিজেই নাকি এই ধরনের একটি মূর্তি পেয়েছেন। তাছাড়া 'অনবমুখী' ইত্যাদি ধরনের যক্ষিণীর কথাও তিনি বলেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রমাণ হিসেবে তিনি কোনো আলোকচিত্র ব্যবহার করেন নি। ফলে তাঁর বক্তব্য দুর্বল থেকে গেছে।

চার পাতার একটি প্রবন্ধে লেখক প্রায় ষোলো-সতেরোটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। এতে লেখকের মৌলিকতার অভাবই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যক্ষ-যক্ষিণী সম্পর্কে সব থেকে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আনন্দকুমার স্বামীর 'যক্ষ'। আলোচ্য প্রবন্ধটি পড়ে মনে হলো সেই অপরিহার্য গ্রন্থখানির সঙ্গেই শ্রীমুখোপাধ্যায়ের পরিচয় নেই।

পরিশেষে লেখকের কাছে অনুরোধ অযথা আক্রমণ বক্তব্যের বিকৃতি প্রমাণ ব্যতিরেকে সিদ্ধান্ত অবিনয় বর্জন করে নিজস্ব বক্তব্যে সমৃদ্ধ প্রত্নতত্ত্বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠকদের উপহার দিন।

গৌরীশংকর দে,
বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস,
হাবড়া শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়,
২৪ পরগণা।

রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবী
একটি জিজ্ঞাসা

১০ আশ্বিনের 'অমৃত' পত্রিকায় উপরোক্ত 'জিজ্ঞাসা'র উত্তরে নিম্নলিখিত তথ্যাদি পাঠালাম, অনুগ্রহ করে প্রকাশ করলে বাধিত হব।

কাদম্বরী দেবীর জন্ম—ইং ৪ঠা জুলাই ১৮৫৯ (২১ আষাঢ় ১২৬৬ সাল)

বিবাহ—৫ই জুলাই ১৮৬৮—বয়স ৯ বৎসর ১ দিন।

মৃত্যু—১৯।শ এপ্রিল ১৮৮৪—বয়স—২৪ বৎসর ৯ মাস ১৫ দিন।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম—ইং ৭ই মে ১৮৬১ (ইংরাজি মতে রাত্রি ১২টার পর ৭ তারিখ হইয়াছে।)

কাদম্বরী দেবী অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ ১ বৎসর ১০ মাস ৩ দিনের ছোট।

কাদম্বরী দেবী বিবাহের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ৭ বৎসর ১ মাস ২৮ দিন।

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স ২২ বৎসর ১১ মাস ১২ দিন।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ—৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩।

এই তারিখের ৪ মাস ১০ দিন পরে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হয়।

বিমলাকান্ত রায় চৌধুরী
কলকাতা: ২৫

শোলার শিল্প

—প্রশান্ত দাঁ

১৯৭০ খৃঃ জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শোলার দুর্গা প্রতিমা। শিল্পী ঃ অনন্ত মালাকার

যাত্রাগান, পুতুলনাচ, পটচিত্রের মত জনপ্রিয় লোকশিল্প শোলার কাজ একদা প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছিল। রাজা ও জমিদারী প্রথার বিলোপ, অর্থনৈতিক সংকট, পারিবারিক কলহ প্রভৃতি কারণে বাঙালীর উৎসবমুখর ধর্মীয় জীবন ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে আসছিল। তার ওপর পাশ্চাত্য প্রভাবিত নতুন যুগের নতুন রুচির জোয়ারে সুপ্রাচীন শোলাশিল্প প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল।

শোলাশিল্পের জন্মের সঠিক সন তারিখ হারিয়ে গেছে কুহেলী সমাচ্ছন্ন ইতিহাসের অতীত অধ্যায়ে। তবে শোলার ব্যবহার যে সুপ্রাচীন সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। শোনা যায় মানব সভ্যতার উষালগ্নে আগুনের ব্যবহার শেখার পর আদিম মানুষ সহজে বহনযোগ্য ও সহজদাহ্য কাঠের অনুসন্ধান করতে করতে গভীর অরণ্যের এক ক্ষুদ্র জলাশয়ে কাঠ জাতীয় এক প্রকার খুব হালকা বস্তু খুঁজে পায়। রোদে শুকিয়ে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে। এই প্রথম শোলার ব্যবহার।

শোলা দু রকমের। কাটশোলা ও ফুলশোলা। কাটশোলা বেশ শক্ত। অনেকটা কাঠের মতই। কাঠশোলা থেকে জেলেরা ভেলা তৈরী করে মাছ ধরে। অনেক সময় শক্ত ছিপ তৈরীর কাজেও বোধ হয় কাটশোলাকে ব্যবহার করা হয়।

ফুলশোলা ফুলের মত কোমল না হলেও বেশ নরম। ছুরির সাহায্যে স্বল্পায়াসে পছন্দ অনুযায়ী যে কোন ছন্দে রূপ দেওয়া যায় বলে ফুলশোলা শিল্পজ কাজের মাধ্যম হয়েছে। সাধারণতঃ ধানক্ষেত পাটক্ষেত খাল বিল পচা পুকুর ডোবা এই জাতীয় জলাশয়ের তলদেশে পরগাছার মত শোলা উৎপন্ন হয়। জলের উপরিভাগে কেবলমাত্র শোলাগাছের পাতা ভাসতে থাকে। দেখতে অনেকটা তেঁতুল পাতার মত। তবে আকারে আরও ছোট। শোলাগাছ দৈর্ঘ্যে চার পাঁচ ফুট এবং প্রস্থে আড়াই ইঞ্চির অধিক হয় না। ঝাড় থেকে বাঁশ কাটার মত জলের তলায় গোড়া থেকে শোলা কেটে নিয়ে রোদে শুকানো হয়। তারপর খুব ধারালো মানে ছুরি দিয়ে ওপরের ছাল তুলে ফেলে কোমল হাতে ও যত্নে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভেতরের সাদা মার্বেল পাথরের মত সাদা রং-এর শাঁসকে প্রয়োজন অনুযায়ী কাজে লাগান হয়।

পুরাকালে আমাদের দেশের সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেক জাতির উপজীবিকা সুনির্দিষ্ট ছিল। বিশ্বকর্মার নয় বরপুত্র—কাংশকার কর্মকার শঙ্খকার চিত্রকর স্বর্ণকার, সূত্রধার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, মালাকার—প্রত্যেকের জন্যে এক একটি নির্দিষ্ট পেশা ছিল। পুরুষানুক্রমে মালাকারদের উপজীবিকা হল উৎসবের অনুষ্ঠান অনুযায়ী ফুলের মালা ও শোলার সরঞ্জাম সরবরাহ করা। বিয়েতে বরকনের শোলার টোপর মুকুট ও ফুলের মালা তৈরী করা এবং পুজো উৎসবে চাঁদমালা বানানো ও প্রতিমাকে কুসুমে ও শোলার সাজে সাজিয়ে দেওয়াই মালাকারের কাজ। প্রতিমার এই শোলার সাজ অবিভক্ত বাংলাদেশে ডাকের সাজ নামে পরিচিত। একচালার দুর্গা জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি মৃণ্ময় মূর্তিকে এখনকার মত আধুনিক ধাঁচে সাজানোর রেওয়াজ ছিল না। শোলার সঙ্গে নানা রংয়ের রাংতা, জরি ময়ূরের পালক, পুঁথি দিয়ে তৈরী ছন্দময় আভরণে প্রতিমাকে অপরূপ রূপে অলঙ্কৃত করা হত। সুকৌশলে নির্মিত শোলার সূক্ষ্ম কলকা বা কারুকার্যময় চালচিত্রের দ্বারা মূর্তিকে শিল্পময় ও সুন্দর করে তোলা হত। বিশাল থাকা—মুকুট, দানপাশা, চিক, তাগা, বালা চুড়ি রতন হার, রতন চুড়, চরণ চুড়, বিছা তাগা তাবিজ কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি অঙ্গসজ্জায় প্রতিমার আপাদমস্তক ভরিয়ে দেওয়া হত। চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোয়, নবদ্বীপের রাসপূর্ণিমার কোন কোন মূর্তিতে এবং কোলকাতার অভিজাত বনেদি পরিবারের প্রাচীন পুজোয় এখনও এই ঐতিহ্যবাহী ডাকের সাজ দেখা যায়। ডাকের সাজের জন্ম ও নাম নিয়ে অনেক রকমের ব্যাখ্যান আছে। তবে অধিকাংশের মতে উৎপত্তিস্থল ঢাকা বলে এই শোলার সাজের নাম হয় ঢাকের সাজ। ঢাকার মসলিনের মত জগদ্বিখ্যাত না হলেও ঢাকের সাজ ভারতপ্রসিদ্ধ বটেই। নারায়ণগঞ্জ ও কৃষ্ণনগরের ঢাকের কাজের সুখ্যাতি অনেক কালের।

শোলা থেকে সরু ছুরি দিয়ে পাতলা কাপড়ের মত কেটে বের করা হয়। মালাকারদের ভাষায় একে বলা হয় কাপ। তারপর কুম্ভকারের তৈরী পোড়ামাটির ছাঁচের ওপর কাপ বসিয়ে চাপ দিয়ে নানা ধরনের নানা ডিজাইনের অলঙ্কার, কলকা, ফুল, লতাপাতা, পশু পক্ষী ও নানা রকমের নকশা তৈরী করা হয়। মোঘল আমলে রাজা, রানী, আমীর ওমরাহ ও বাদশাদের পোষাক-পরিচ্ছদে সোনা-রূপার জরির সূক্ষ্ম অলঙ্করণের কাজে গভীর শিল্পরুচির পরিচয় ছিল। যে কাজের জন্যে এখনও মধুবনী, জেনারস লক্ষ্ণৌ সুপরিচিত। ঢাকের সাজেও শোলার ওপর ঐ ধরনের রাংতা জরি সলমার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিল্পরসাকৃত অলংকরণ দেখা

শোলার বিবাহ মণ্ডপ   শিল্পী : নিমাইচন্দ্র পাল

যায়। এই সমস্ত কাজ মালাকারদের শিল্প-সচেতন মনের পরিচয়বাহী।

বৃটিশ রাজত্বের সময় শোলার হ্যাট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল ইংরেজদের কাছে। আগে এ'রা কাগজের তৈরী হ্যাট ব্যবহার করতেন। আঠা দিয়ে কাগজের ওপর কাগজ লাগিয়ে নির্মিত হত বলে খুব ভারী হত। শোলা দিয়ে তৈরী করার ফলে ওজন অনেক হালকা হয় এবং সমাদৃত হয়। পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে নদীয়ার কালীগঞ্জ মালদহ হ্যাট-শিল্পের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। শোনা যায় বর্তমান বেলেঘাটারও নাকি হ্যাট তৈরীর এক বড় কারখানা ছিল। ইংরেজ প্রভুদের প্রয়োজনে বৃটিশ আমলে বিশেষতঃ হ্যাট তৈরীর জন্যে শোলার সমাদর বাড়ে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের যুগে শোলাশিল্প ধ্বংসোন্মুখ অবস্থার মুখোমুখি হয়। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ফলে রাংতা জরি আসা বন্ধ হয়। এগুলি আসত বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মান প্রভৃতি দেশ থেকে। উপাদানের অভাবে হ্যাট তৈরী ছাড়া অন্যান্য শোলার কাজে ভাটা পড়ে।

১৯৭০ সালে শোলা শিল্পের ইতিহাসে এক নতুন দিকের সূচনা করে। শিল্পী অনন্ত মালাকার এই নতুন অধ্যায়ের প্রবর্তক। হ্যাট ঢাকের সাজ, চাঁদমালা, টোপর প্রভৃতি তৈরীর গতানুগতিক স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি শোলাকে রূপ দিলেন এক অভিনব আঙ্গিকে। ১৯৬৬ সালে তিনিই প্রথম সম্পূর্ণ শোলা দিয়ে এক অপূর্ব সরস্বতী-প্রতিমার রূপদান করেন। ১৯৭০ সালে শিল্পীর দু ফুট তিন ইঞ্চি দৈর্ঘ্য শোলার দুর্গাপ্রতিমা জাতীয় পুরস্কারলাভের সম্মান অর্জন করে। শ্রীমালাকারের আর একটি বৃহৎ দুর্গাপ্রতিমা কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। ৭২ এর এশিয়ান ফেয়ারে শিল্পীর শোলার হর-পার্বতী উচ্চপ্রশংসিত হয়। মালাকারের এই কাজগুলি ভাব-বিন্যাসে ও শিল্পমাধুর্যে অপরূপ। শোলাকে যে ইচ্ছানুযায়ী রূপ দেওয়া যায় এবং তাকে যে চরম শিল্প উৎকর্ষে পৌঁছে দেওয়া যায় অনন্ত মালাকারই প্রথম স্বাক্ষর রাখলেন তার অবিস্মরণীয় সুনিপুণ সুডৌল সুন্দর শোলার কাজে। এবং শোলাশিল্পকে সর্বভারতীয় স্তরে এগিয়ে দিলেন। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী পূর্তি বর্ষে ভারতবর্ষে মোট পঁয়ত্রিশ জন হস্তশিল্পীকে সম্মানিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে দুজন হস্ত-শিল্পীকে সম্মানিক করা হয় তাঁদের একজন হলেন শোলার কাজের যাদুকর অনন্ত মালাকার।

শোলা ক্রমশঃ বহুল প্রচলিত হচ্ছে। অধুনা শোলার কাজের দিকে মানুষের প্রবণতা সুস্পষ্ট। বাংলা ঢং-এর প্রতিমার সঙ্গে ঢাকের সাজের রেওয়াজ বেড়েছে এবং বাড়ছে। অনেক সার্বজনীন পুজামণ্ডপেও শোলার ও শোলার সাজের প্রতিমা পুজো হচ্ছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চসজ্জায়, দোকানের শো-কেসে ও অনেক সময় হোটেল রেস্তোঁরা ও ঘরের অঙ্গসজ্জায় স্থান ও চাহিদা অনুযায়ী শোলার রুচিপূর্ণ সাজে সাজান হচ্ছে। পুতুল, মডেল, প্রতিমা হচ্ছে। কিছু কিছু বিদেশে গিয়ে নাম কিনেছে। বিবাহ মণ্ডপ, বাসর ঘর, বর ও কনে বসানোর জায়গাও আজকাল অনেক বাড়ীতে শোলায় কারুকার্যমণ্ডিত করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে কুমারটুলীর শোলাশিল্পী বৈদ্যনাথ কর্মকার ও নিমাইচন্দ্র পাল-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ'রা এই ধরনের শোলার কাজে পটু। এবং এ'দের ডাক আসে প্রায় সারা ভারতবর্ষ থেকে এই দুই শিল্পীর নানান মনোরম [illegible] ও আলপনা-ধর্মী শোলার কাজ দেখে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়।

একদা অর্ধমৃত শোলার কাজ আজ দিনে দিনে বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠে আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে এক গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান গ্রহণ করতে চলেছে। পশ্চিম-বঙ্গেই এই কাজের রবরবা। এখন কৃষ্ণনগর বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া মেদিনীপুর, হাওড়া চব্বিশ পরগণা ও কলকাতায় শোলার কাজ হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক প্রায় সাতশ জন শোলাশিল্পী বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত। এখনও চাহিদা যথেষ্ট নয় বলে এ'দের অধিকাংশই শোলার কাজকে পরিপূর্ণ জীবিকারূপে গ্রহণ করতে পারেন নি। তবে শোলার কাজের প্রতি সাধারণ মানুষের ক্রম-বর্ধমান রুচির কথা স্মরণ করে এবং সর্ব-ভারতীয় হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে তার সমাদর দেখে মনে হয় অনাগত অদূর ভবিষ্যতে এই হস্তশিল্পটি স্বকীয় মাধুর্যে সর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে এক উল্লেখনীয় স্থান গ্রহণ করবে।

উপন্যাস

শেষ বিকেল

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

[বৃদ্ধ বঙ্কিম দত্ত রোজ সকালে এক চক্কর বেড়িয়ে আসতে না পারলে হাঁফিয়ে ওঠেন। লাঠি ঠুকঠুক করে সেই পরিচিত ঝিলের ধারে এসে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। একটু ঘাসের গন্ধ জলের গন্ধ শামুক পানার গন্ধ পাবার লোভে ছটফট করেন বঙ্কিমবাবু। কিন্তু ছেলে অমিয় কি বৌমা কি তার ছেলেমেয়েরা ঠিক উল্টো। তারা শহরের উন্দামত্তা অস্থিরতা পছন্দ করে। ঝিলের ধারের ঝাঁকড়া মাথা শিমুল গাছটা পেরিয়ে বড় পাথরটায় বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া বঙ্কিমবাবুর অভ্যেস। আজও হাঁটতে হাঁটতে বঙ্কিমবাবুর গতি শ্লথ হয়ে এল। কারা দাঁড়িয়ে ওঁর দিকে তাকাচ্ছে...]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই যে দাদু!

বঙ্কিমবাবু থমকে দাঁড়ালেন। আর দু পা অগ্রসর হলেই তাঁর সেই ঝাঁকড়া-মাথা শিমুল গাছ। কনক্রিটের চাঁইটাও দেখা যাচ্ছে। যেন একটা ছাগলছানা বসে আছে পাথরটার কোল ঘেঁষে। তা থাক।

কিন্তু এরা কারা! আর কোনোদিন তো এখানে দেখেননি। তা ছাড়া এই পোশাক এই বয়স। জায়গাটার পক্ষে মানুষ তিনটিকে কেমন যেন বেমানান খাপছাড়া ঠেকছিল। শব্দ না করে বঙ্কিমবাবু পর পর দুটো ঢোক গিললেন।

বেড়াতে এসে যে দু চারটি মানুষ তিনি এখানে দেখতে পান তারা সচরাচর জাল দিয়ে কি পোলো দিয়ে মাছ ধরে বা ক্ষেত খামারে কাজ করে। গ্রাম থেকে শহরের কলকারখানায় কাজ করতে যাচ্ছে এমন দু একজনকেও এই রাস্তা ধরে চলাফেরা করতে দেখা যায়। কিন্তু এরা?

পোনরো ষোল থেকে আঠারো উনিশের মতন বয়স। মাথায় বাবরি চুল। পরনে সার্ট প্যাণ্ট। পায়ে চপ্পল। বেশ চটপটে শহুরে চেহারা।

এরা কি এখানে এত সকালে বেড়াতে এসেছে। এতক্ষণ কোথায় ছিল। এদিকে চোখ রেখেই তো বঙ্কিমবাবু ক্রমাগত হেঁটে আসছিলেন। এতক্ষণ দেখতে পান নি কেন? তবে কি ঐ আকন্দ ঝোপটার আড়ালে ঘাড় গুঁজে বসে অপেক্ষা করছিল। তাঁকে দেখা মাত্র দাঁড়িয়ে পড়ল। উদ্দেশ্য?

—দাদু কথা বলুন। একজন চোখ টিপল। যেন ইয়ার বন্ধুর দেখা পেয়েছে। বঙ্কিমবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল এবং সেভাবে গলার শব্দ করল।

—কি বলব বলো! বঙ্কিমবাবু গম্ভীর হয়ে উত্তর করলেন। হাতের লাঠিটা আস্তে মাটিতে ঠুকলেন।

—এই বল্ না, যা বলার বলে ফেল্। এবার একজন আর একজনের গা টিপল।

—তুই বল্।

—কেন, দাদু কি তোর শ্বশুর যে বলতে লজ্জা পাচ্ছিস।

—ফোট্, শ্বশুর হতে যাবে কেন। এবার মাঝের ছেলেটি যেন এটি সবচেয়ে বেশি চালাক, খিকখিক হাসল। দু পাশের সঙ্গী দুটিকে দুদিক থেকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলল দেখছিস না চুল পেকে দাঁত ফাত পড়ে গিয়ে গায়ের চামড়া দলা পাকিয়ে দাদু একেবারে দাদুদের বাদশা বনে গেছে—অ্যাদ্দিনে মেয়ে ফেয়েরও বিয়ে দিয়ে দিয়েছে ঠিক। এখন আর আমাদের জামাই হওয়া চলবে না।

—তাই নাকি দাদু? দিদি বলছিস কি বিয়ে হয়ে গেছে?

—এই দ্যাখো, দিদি বলছিস কি অজবুক, দাদুর মেয়ে আমাদের পিসি হয় মাসিও হতে পারে—তবে না দাদু-নাতি সম্পর্ক। এবার আর একটি ছেলে খিকখিক হাসল। ঠিক বলিনি দাদু?

বঙ্কিমবাবু অন্যদিকে চোখ দুটো ঘুরিয়ে নিলেন। অত্যন্ত অপ্রস্তুত বিমর্ষ হয়ে চিন্তা করলেন আর এগিয়ে কাজ নেই। এবার ফেরা যাক। ভেবে ঘুরে দাঁড়াবেন। সঙ্গে সঙ্গে বাধা পেলেন। তিনজন আর গলাগলি হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে না। একজন এগিয়ে এসে প্রায় থুতনি ঘেঁষে দাঁড়ায়। বাকি দুটি ডাইনে বাঁয়ে তাঁকে ঘিরে ফেলে।

—তোমাদের উদ্দেশ্যটা কি আমাকে বলতে পার! ভিতরের ক্রোধ ও উত্তেজনা চাপতে গিয়ে রীতিমত কাঁপতে থাকেন বঙ্কিমবাবু। পাকা ভুরু কুঁচকে তিনজনের মুখের দিকে তাকান।

—অহো উদ্দেশ্য বিধেয়! দাদু আমাদের গ্রামার শোনাচ্ছে। সামনের ছেলেটি ঘাড় বেঁকাল।

—দাদুর লাঠিটা চেপে ধর। ডাইনের ছেলেটি বলল। বাঁ-দিকের ছেলেটি ঠিক তাই করল।

—এটা কি বাঁশের লাঠি দাদু! বলে লাঠিটা ধরে সে জোরে নাড়া দিল। ফলে বঙ্কিমবাবুর ক্ষীণ শরীরটাও নড়ে উঠল। হঠাৎ কেমন অসহায় বোধ করলেন তিনি। কি হল দাদু, চুপ করে কেন? এটা কি বাঁশের। বলে ছেলেটা আরও জোরে বঙ্কিমবাবুর হাতের লাঠিটা নাড়তে লাগল।

—উঁহু, বেত হবে। সামনের ছেলেটি ঘাড় নাড়ল। সিঙ্গাপুরী কেন্। তাই না দাদু?

—মোটেই সিঙ্গাপুরী কেন্ নয়। স্রেফ বাঁশ। এবার ডানদিকের ছেলেটি টান মেরে বঙ্কিমবাবুর হাত থেকে লাঠিটা নিজের হাতে তুলে নিল। তারপর যেন খুঁটিয়ে দেখতে চোখের কাছে সেটা তুলে ধরল। এই তো যা বলেছি বাঁশ। ঘুণে খেতে আরম্ভ করেছে। বেতে কখনো ঘুণ ধরে না।

ধোৎ তুই কিস্সু জানিস না আমার হাতে দে দিকিনি। সামনের ছেলেটা লাঠিটা কেড়ে নেয়। চোখের কাছে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। তারপর গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ে। —যা ভেবেছি পুরোনো হয়ে বেতটা শুকোতে আরম্ভ করেছে তাই এমন ফুটফুট দাগ। ভাল করে তেল মাখিয়ে রাখলে [illegible] দাগফাগ মিলিয়ে যাবে। আবার চকচকে হয়ে উঠবে।

—হুঁ, তাই বল্। এবার বাঁদিকের ছেলেটি মাথা ঝাঁকাল। দাদুর লাঠিতে কোনোদিন ঘুণ ধরবে না বরং তার আগে —বলতে বলতে সে হঠাৎ চুপ করে গেল।

—বল্ না বলে ফেল্, থামলি কেন। মাঝের ছেলেটি চোখ টেপে। ডান দিকের ছেলেটি কি ভেবে খুক্ করে হাসল।

—বরং তা আগে, বাঁয়ের ছেলেটি আবার বলতে আরম্ভ করল দাদুর শরীরে ঘুণ ধরবে কিন্তু লাঠি ঠিক থাকবে। দাদুর চেয়ে দাদুর লাঠি ঢের বেশি মজবুত।

শুনে বাকি দুজন খিকখিক হাসে।

—থাক্ গে। মাঝের চালাক ছেলেটি তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। দাদুর লাঠি ফিরিয়ে দে, লাঠি নিয়ে আমরা কী করব। এই যে দাদু—

লাঠি ফেরত পেয়ে বঙ্কিমবাবু কিছুটা স্বস্তি বোধ করেন।

—তোমরা কোথায় থাক? গলার সুরটা নরম করেন তিনি। তোমাদের তো আর কখনো এখানে—

—না, দাদু আমরা আজই এখানে প্রথম এলাম।

—বেড়াতে?

—ঐ আর কি, আমরা কি আর দাদুর মতন পয়সাঅলা মানুষ। বাঁয়ের ছেলেটি মাথটা ঝুঁকিয়ে ফেলল। দাদুর মতন ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়াতে কি আর ইচ্ছে করে না আমাদের খুবই ইচ্ছে করে, তবে কিনা রুজি রোজগারের ধান্ধায় আমাদের ঘুরতে হয় বেশি।

আর, কথা বললেন না বঙ্কিমবাবু। ভুরু কুঁচকে আকাশটা দেখলেন। কিছু চিন্তা করলেন। এবং সেই সঙ্গে কিছু একটা যেন অনুমানও করে নিলেন। যে জন্য সতর্ক হয়ে তিনটি মুখের দিকে চোখ রেখে ঘাড় কাত করে তেমনি নরম গলায় বললেন আচ্ছা, আমি চলি ভাই এখন, বেলা হয়ে যাচ্ছে।

—সে কি! লাঠিটা ভালয় ভালয় ফিরিয়ে দিলুম। আর অমনি আপনি চললেন। মাঝের ছেলেটি, যেন অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়েছে চোখ দুটো বড় করে ফেলল।

—আমাকে কি করতে হবে ভাই বলো? বঙ্কিমবাবু পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ান।

—কিছু ছাড়ুন। সকালবেলা চা-টা পর্যন্ত গেলা হয়নি পয়সার অভাবে। বাঁ এবং ডানদিক থেকে দুটি ছেলে একসঙ্গে বলল।

—অ্যাঁ! চমকে ওঠাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বুদ্ধিমান বিচক্ষণ বঙ্কিমবাবু। সেই সঙ্গে দীর্ঘ পরমায়ু-লাভের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা রয়েছে। একটি বিনীত মানুষের মতন তিনি তৎক্ষণাৎ মিষ্টি করে হাসলেন। আমার সঙ্গে তো অতিরিক্ত পয়সা নেই ভাই। বিকল ভাঙলে একটা আধুলী শুধু। বুড়ো মানুষও অতটা পথ হেঁটেই বাড়ি ফিরতে [illegible]

—এই তো মুস্কিল বাধালেন দাদু! মাঝের ছেলেটি, বঙ্কিমবাবুর মনে হল এটিই এদের চালাক নেতা—গলার স্বরটা অতিরিক্ত গম্ভীর করে ফেলল। সব সময়েই আমাদের অভাব লেগে আছে আপনারা জানেন, পয়সাঅলা মানুষ, রাস্তায় বেরোবার সময় আপনারা যদি অন্তত কিছু টাকাকড়ি সংগে না রাখেন আমাদের খুব অসুবিধে হয়।

এর কি উত্তর দেবেন বঙ্কিমবাবু ভেবে পেলেন না। অথবা যে কোনোরকম একটা উত্তর দেওয়াও এখানে বিপজ্জনক চিন্তা করে ঘাড় বেঁকিয়ে ফ্যালফ্যাল করে আকাশটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—এদিকে তাকান দাদু। দুদিক থেকে দুটি ছেলে একসঙ্গে বঙ্কিমবাবুর দু হাত ধরে আস্তে ঝাঁকুনি দিল। আর্লি-মর্নিং-এর আকাশ সুন্দর আমরা জানি। আমাদেরও আকাশের দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তাতে তো পেট ভরবে না, শুনুন! এদিকে চোখ নামান।

—বলো! এখন বঙ্কিমবাবু বেশ একটু ভয় পেলেন। সুবিধের ছেলে নয় এরা। চারদিকে যেমন সব কাণ্ডকারখানা চলেছে শোনেন। তেতো মতন একটা ঢোক গিললেন তিনি। লাঠিটা মাটিতে ঠেকিয়ে না রেখে কাঁধে ফেললেন।

—আপনার পকেটে কি সত্যি টাকাকড়ি কিছু নেই? দশ টাকা পাঁচ টাকাও নেই? মাঝের ছেলেটি বলল।

—না ভাই। তেমনি অনুনয়ের ভঙ্গি বঙ্কিমবাবুর। আস্তে মাথা নাড়লেন! বলেছি তোমাদের ঐ একটা আধুলী সম্বল করে সকালে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।

তিনজন চুপ থেকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। মাথার ওপর দিয়ে একটা পানকৌড়ি ক্রিকক্রিক শব্দ করে জলের দিকে উড়ে যায়। এদিক ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে জেলে চাষা বা কারখানার কাজে যাচ্ছে এমন একটি মানুষকেও আজ বঙ্কিমবাবু দেখতে পাচ্ছেন না।

—চলি ভাই এবার তাহলে আমি। একটু পরে, যেন অনেকটা দুঃসাহসে ভর করে বঙ্কিমবাবু ছেলে তিনটির দিকে ঘাড় ফেরান। বেলা হয়ে যাচ্ছে।

—আরে ধেৎ মশাই বেলা হয়ে যাচ্ছে! এবার আর 'দাদু' বলল না দলের নেতাটি। ভেংচি কাটল। বেলা হচ্ছে হোক। যা বলছি শুনুন।

—বলো ভাই, বলো। বঙ্কিমবাবু আবার লাঠিটা মাটিতে ঠেকান। আমি তো দাঁড়িয়েই আছি। সত্যি বলছি তোমাদের, টাকা নেই, বিশ্বাস না হয় আমার পকেট সার্চ করে দেখতে পার তোমরা।

আবার তিনজন মুখ চাওয়াচাওয়ি ও সেই সঙ্গে আর এক দফা চোখ টেপাটেপি সেরে নিল।

—ঠিক আছে কারো পকেট-ফকেট আমরা সার্চ করি না। বাঁয়ে ছেলেটি বলল, [illegible] মুখের কথায় আমরা বিশ্বাস করি। টাকাকড়ি যখন সঙ্গে নেই তখন আর করা কি। ঠিক আছে হাতের ঘড়িটা চট করে খুলে দিন।

মাথায় বজ্রাঘাত হল বঙ্কিমবাবুর। তাই তো, তাঁর হাতে ঘড়ি রয়েছে, এতক্ষণ কি কথাটা ভুলে ছিলেন! রিস্টওয়াচ ও স্টিক। এই দুটো জিনিস সঙ্গে না নিয়ে কোথাও তিনি বেরোন নি। কোনোদিন না। তাঁর অনেক দিনের অভ্যেস। বিশেষ করে যখন বেড়াতে বেরোবেন। স্টিক এবং এই ঘড়ি তাঁর চল্লিশ বছরের সংগী।

—কি হল, বেল্টটা খুলুন। না কি আমরা খুলব! হাতটা দিন।

—দেখ ভাই এটা খুব একটা মূল্যবান ঘড়ি না। অতি সাধারণ জিনিস। তা ছাড়া পুরোনোও হয়েছে খুব। ফি মাসেই একবার করে অয়েলিং করাতে হচ্ছে—এটা নিয়ে তোমরা খুব একটা লাভবান হবে বলে আমার মনে হয় না। বঙ্কিমবাবুর গলার স্বরটা সামান্য কেঁপে উঠল। একবার কাশলেন তিনি।

—সে আমরা বুঝব। মূল্যবান ঘড়ি কি সস্তা ঘড়ি আমরা দেখব। হাতটা বাড়িয়ে দিন তো। বাঁ-দিকের ছেলেটি তার হাত ধরবার জন্য নিজের ডান হাতটা বাড়িয়ে দিতে ঘড়িটার বাঁ-হাতটা বঙ্কিম-বাবু কোলের কাছে সরিয়ে আনলেন।

—এসব কি হচ্ছে শুনি? সর্দার ছেলেটি চোখ লাল করল। ভালয় ভালয় ওটা খুলে দেবেন কিনা বলুন!

—ইস্, তোমরা এত অবিবেচক! তালুর সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে বঙ্কিমবাবু একটা আক্ষেপসূচক শব্দ করলেন। পুরোনো ঘড়ি কম দামের ঘড়ি সুতরাং আর্থিক ক্ষতির দিকটা আমি মোটেই চিন্তা করছিনে, তবে কিনা চল্লিশ বছরের ওপর আমি রিস্ট-ওআচটা পরছি, একটা মায়া পড়ে গেছে এটার ওপর--

—রাখুন মায়া! বাঁ-পাশের ছেলেটি জোর করে তাঁর হাতটা টেনে ধরল এবং সর্দার ছেলেটি বেল্ট-এর হুক্ খুলে ঘড়িটা সরিয়ে নিল।

বঙ্কিমবাবু করুণ চোখে তাঁর শূন্য মণিবন্ধের ফ্যাকাশে সাদা দাগটা একবার দেখলেন ও একটা চোরা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। উপায় নেই যে। একা মানুষ। তার ওপর বৃদ্ধ হয়েছেন। এরা তিন তিনটে জোয়ান ছেলে।

—দিন, এবার ডান হাতটা দিন। ঘড়িটা পকেটে পুরে সর্দার ছেলেটি একটা সাফল্যের হাসি হাসল ও বঙ্কিমবাবুর ডান হাত ধরতে হাত বাড়িয়ে দিল।

—আবার ডান হাতে কি? চক্ষু কপালে উঠে গেল বঙ্কিমবাবুর। ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে জোরে মাথা ঝাঁকালেন। তোমরা এসব কী আরম্ভ করেছ আমায় বলতে পার!

—বলার দরকারই বা কি। আমরা যা বলছি শুনুন, হাতটা দিন, আঙটিটা খুলে নেব।

—অ্যাঁ! তারপর বলবে আপনার জামা খুলে নেব জুতো খুলে নেব—তোমাদের এতটা অধঃপতন! কচি বয়স, দেশের ভবিষ্যৎ তোমরা—

—বক্তৃতা করবেন না, জামা জুতোয় আমাদের দরকার নেই। আঙটিটা দিন।

—কী আশ্চর্য! উত্তেজনার দরুন গলার ভিতর একটা ঘড়ঘড় শব্দ হল বঙ্কিমবাবুর। ওরা টের পেল না। কিন্তু তিনি নিজে টের পেলেন। প্রেসারের রুগী। হৃৎপিণ্ডে চাপ পড়ছে। যে জন্য ভয়ে এক মিনিট চুপ করে রইলেন। তারপর, উত্তেজিত হব না, উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে যেন তিনি যতটা সম্ভব ঠান্ডা গলায় বললেন এটা সেসব পাথর নয় ভাই, গোমেদ। এটা নিয়ে তোমরা করবে কী। দোকানে বিক্রি করতে পারবে না। একবার ব্যবহার করা হয়ে গেলে দোকানীরা আর এসব স্টোন নিতে চায় না।

—সেটা আমরা বুঝব, আপনি খুলুন—দিন হাতটা, আমি খুলে নিচ্ছি।

—এটা খুলে ফেললে আমার হেলথ খারাপ হবে। বঙ্কিমবাবু কাকুতির গলায় বললেন স্বাস্থ্যের জন্য আঙটিটা আমাকে ধারণ করতে হয়েছিল।

—আর স্বাস্থ্যের দরকার নেই দাদু। ডান দিকের ছেলেটি ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল। অনেকদিন বাঁচা হয়েছে। এবার টিকিট কাটুন। কিরে, মিছে বললাম?

—ঠিক বলেছিস। বাঁ-পাশের ছেলেটি মাথা নাড়ল। ফি হপ্তায় রেশনের দু কেজি চাল গম বেঁচে যায়।

মাঝের সর্দার ছেলেটি কথা বলে সময় নষ্ট না করে বঙ্কিমবাবুর ডান হাতটা চেপে ধরে আঙটিটা খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অনেকদিনের আঙটি। বুড়ো তর্জনীর শুকনো হাড়-মাংসের সঙ্গে কামড় খেয়ে বসে গেছে।

—আঃ লাগছে লাগছে! বঙ্কিমবাবু যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করলেন। কিন্তু তার চেয়েও বেশি বিকৃত চেহারা করে ছেলেটি আঙটিটা টানছে।

—হাতটা নড়াচ্ছেন কেন? সোজা করে ধরুন। ধমক লাগাল সে।

—আমি পুলিশ ডাকব। বঙ্কিমবাবুর চোখে জল এসে গেল। তোমাদের এতখানি সাহস! একটু একটু ছেলে সব।

—ডাকুন না দেখুন কোথায় পুলিশ আছে! দু পাশ থেকে দুটি ছেলে রীতিমত গর্জন করে উঠল।

—পুলিশের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। সর্দার ছেলেটি যা-হোক তায় আঙটিটা শেষ পর্যন্ত খুলতে পারল। হাতের তেলোয় নিয়ে সম্ভবত রুপোর ওজনটা একবার পরীক্ষা করল। তারপর সেটা পকেটে পুরে বলল, আপনার গোমেদের আঙটি রক্ষা করতে এই বনবাদাড়ে পুলিশ ছুটে আসবে, তবেই হয়েছিল আর কি। বঙ্কিমবাবুর চোখে চোখ রেখে ভেংচি কাটার মতন চেহারা করে ছেলেটি হাসতে থাকে।

—অ্যাঁ, আমি একজন রিটায়ার্ড জজ তোমরা সেই খবর রাখ? যেন অপমানের চূড়ান্ত হয়েছে অথচ করার কিছু নেই, একটা অসহায় ক্রুদ্ধ ভঙ্গি নিয়ে বঙ্কিমবাবু থুতনিটা নাড়তে লাগলেন।

—থাকুন না রিটায়ার্ড জজ। তিনজন একসঙ্গে উত্তর করল। তাতে আমাদের কি। তরতাজা জজ ম্যাজিস্ট্রেটকেই আমরা কত কেয়ার করি কিনা আর আপনার মতন ঘাটের মড়া—হি-হি চল এবার! একজন আর একজনকে ডাকে।

যেন আর তাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। কাজ শেষ হয়েছে। না কি একটা খেলা। খেলায় জিতে ট্রফি নিয়ে হাসতে হাসতে তিনটি বঙ্গসন্তান বাঁ-দিকের মাঠে নেমে গেল। উঁহু চাষার ছেলে না এরা, জেলের ছেলে না। এদের বাপ কাকারা কলকারখানায় কাজ করে একথাও কেউ বলবে না। বরং বলতে পার এদের যাঁরা অন্ন যোগান তাঁরা অফিস-কাছারীতে দশটা পাঁচটা কাজ করেন, স্কুল-কলেজে ছাত্র পড়ান, হয়তো উকিল মোক্তার ডাক্তারও কেউ কেউ থাকবেন। মানে এঁদের নিয়েই একটা বিশেষ শ্রেণী, একটা বিশেষ জাত। আজ এখানে বঙ্কিমবাবু এদের নতুন দেখছেন বটে কিন্তু গড়িয়াহাট মার্কেটের কাছে গোল পার্কের ধারে, হাজরার মোড়ে কালীঘাটের রাস্তায়—যদি উত্তর কলকাতা ধর তো শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে, হাতিবাগানের কোনো না কোনো তেলেভাজা কি চায়ের দোকানের সামনে, গড়পাড়ের রাস্তায়—বা যদি মধ্য কলকাতা ধর তো ওয়েলিংটন বৌবাজারের মাঝামাঝি রকমের কোনো সোডাফাউন্টেনের দরজায় বা তালতলার কোনো চায়ের দোকানে বা সেন্ট্রাল এভিনু্য ফায়ার ব্রিগেড স্টেশনের কাছাকাছি কোনো গাছতলায় কি ওদিকেরই কোনো পার্কের রেলিং-এর গায়ে ঠেস দিয়ে এরা দাঁড়িয়ে থাকে, গল্প করে। সকাল দুপুর বিকেল। এরা অথবা এদের দাদারা। অত্যন্ত পরিচিত চেহারা। এমন লম্বা চুল লম্বা জুলপি। বুক-খোলা হাওয়াই সার্ট। সরু বা পায়ের পাতার দিকে ব্যাঙের ছাতার মতন ফাঁদান পায়জামা প্যান্টজোড় জুতো, সকাল সন্ধ্যা দুপুর। গ্রীষ্মে বর্ষায় শীতে হেমন্তে। বঙ্কিমবাবু অনেক দেখেছেন। রিটায়ার করে বুড়ো হয়ে আজ খুব একটা ঘর থেকে বেরোন না যদিও। নিয়মের একটু মর্নিং-ওয়াক ও সান্ধ্য ভ্রমণ। কিন্তু তা বলে শহরের চেহারাটা কি বেমালুম ভুলে গেছেন। যদি এই মুহূর্তে আর একটি ভদ্রলোক তাঁর সামনে এসে দাঁড়াত বঙ্কিমবাবু তাঁর কানে কানে বলতেন, একটা বিশেষ শ্রেণী বিশেষ জাত বলছি বটে, আসলে তলিয়ে দেখতে গেলে এরাই খাঁটি বাঙ্গালী শহুরে বাঙ্গালী এখনকার মতন কলকাতার বাঙ্গালী। মানে আমার আপনার ঘরের ছেলে। কবে থেকে এরা এমন হল? হয়তো বঙ্কিমবাবুর কথা শুনে সেই ভদ্রলোক প্রশ্ন করতেন, কবে থেকেই বা আপনি এদের দেখছেন?

গম্ভীর হয়ে বঙ্কিমবাবু উত্তর করতেন, যবে থেকে এরা বড় হয়েছে। ওদিকে ছাব্বিশ সাতাশ, এদিকে পনেরো ষোল সতেরো এক একটির বয়েস। এখন হিসেব করে দেখুন।

তবে তো বলা যায় স্বাধীনতার পর—ইন্ডিয়া ইনডিপেনডেন্ট হওয়ার পর থেকে এরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে, পার্কের ধারে চায়ের দোকানে, গাছতলায় বা বালিগঞ্জ রেলস্টেশনের ওভারব্রীজ-এর রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। সকাল দুপুর বিকেল। গ্রীষ্মে বর্ষায় শীতে। তাই না? ভদ্রলোক হাসতেন। তা গল্প করা তেমন কিছু দোষের নয়, আড্ডা দেওয়া যৌবনের ধর্ম, কিন্তু আজ এরা এমন হল কেন? ভদ্রলোক পাল্টা প্রশ্ন করতেন যেমন বলছেন আপনার ঘড়ি ছিনিয়ে নিয়েছে, তিনরতি রুপোর জন্য গোমেদ আংটিটা আঙ্গুল থেকে খুলে নিয়েছে। কে এদের এদিকে ঠেলে দিলে? এর সবটাই কি অভাব, না কি স্বভাব, সঙ্গদোষ?

বলব বলব, বঙ্কিমবাবু তখন আগের চেয়েও বেশি গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়তেন। এখানে দাঁড়িয়ে এত কথা বলা যায় না আপনি আমার ম্যান্ডিভিল গার্ডেনের বাড়িতে একদিন দয়া করে আসুন, সব আপনাকে বুঝিয়ে দেব......

চিন্তাটার এই পর্যন্ত পৌঁছে বঙ্কিমবাবু হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে উঠল। ইতিমধ্যে মেঘলা কেটে গিয়ে চারদিকে রোদ ঝিকমিক করছে। দূরের জিনিস এখন তিনি আরও পরিষ্কার দেখছেন। মাঠে নেমে এরা ওই তালগাছের গুঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল কেন! আর একটি ওখানে কে দাঁড়িয়ে? সব মিলিয়ে চারটি হল। কিন্তু কে ওই ছেলেটি? নীল ডোরাকাটা পায়জামা, টেরিলিনের শার্ট লম্বা চুল। বঙ্কিমবাবুর হাত থেকে ছড়িটা খসে পড়ল, যেন তাঁর পায়ে এক ফোঁটা জোর নেই, ঘাসের ওপর বসে পড়েন তিনি। কী সাংঘাতিক কী ভয়ংকর কথা! ওটা রঞ্জু না! আজকের ছোট ছেলে, বঙ্কিমবাবুর আত্মজ। এ কী করে সম্ভব! ম্যান্ডিভিল গার্ডেনের ঐ ছোট মানুষটি এই সংসর্গে! না কি ও-ই এদের পথ দেখিয়ে এখানে এনেছে। রোজ রোজ এখানে বেড়াতে আসে। হাউ-হাউ করে বঙ্কিমবাবুর কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। মাথার পাকা চুলগুলি টানতে লাগলেন। মৃত্যু-কামনা ছাড়া এই মুহূর্তে তাঁর কিছু করার নেই। দীর্ঘ পরমায়ু, ভাগ্যের অভিশাপ! এই দৃশ্য তাঁকে দেখতে হল!

(ক্রমশঃ)

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

১৯৭৪ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের তালিকায় যাঁরা সম্মানিত তাঁরা হলেন দুজন সুইডিশ ঔপন্যাসিক হ্যারী মার্তিনসন এবং এইভিন্ড জনসন। আমাদের দেশে অবশ্য দুজনই প্রায় অপরিচিত হলেও স্বদেশে বিশ শতকের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য প্রতিভার অধিকারী।

হ্যারী মার্তিনসন

১৯০৪ সালের ৬ই মে সুইডেনের ব্লেকিং-এর দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশে হ্যারী মার্তিনসন জন্মগ্রহণ করেন। ৬ বছর বয়সে তিনি পিতার মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেন। এবং তখনই মা বাস্তুত্যাগীদের ভীড়ে একদিন আমেরিকার পথে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। হ্যারীর দুঃখের জীবন তখন থেকেই সুরু হয়। তারপর দশটি বছর বিভিন্ন কোম্পানীতে নিম্নমানের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই জীবন থেকে তিনি যেন মুক্তির পথ অনুসন্ধান করছিলেন। মাঝে মাঝে সমুদ্র তাকে হাতছানি দিতো। একদিন সাঁত্য সত্যি সুযোগও এসে পড়লো। কোন এক সমুদ্রগামী জাহাজে কেবিনবয়ের চাকরী নিয়ে পালিয়ে গেলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আট। চোখে সমগ্র পৃথিবী দেখার নিবিড় স্বপ্ন। এত দুঃখের মধ্যেও তিনি উৎসাহ বিশ্বাস হারান নি। ব্যর্থতার জ্বালা তাকে বিন্দুমাত্র উত্তেজিত করতে পারেনি। বরং [illegible] তাঁকে প্রাণবন্ত [illegible] রেখেছিলেন। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর উপন্যাসে কাব্যে।

প্রথম জীবনের রচনার মধ্যে ১৯৩৫ সালে রচিত '[illegible]' এবং ১৯৩৬ সালে রচিত 'দি ওয়ে আউট' গ্রন্থে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখময় শৈশবের চমকপ্রদ বর্ণনা এবং আবেগ সঞ্চার করে, মুগ্ধ করে রাখেন। তখন অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'এইক্লেস ট্রাভেলস', 'কেপ ফেয়ারওয়েল' (১৯৩৩), 'স্পুকশিপ' ...(১৯২৯) এবং '[illegible]' (১৯৩১) উল্লেখযোগ্য। [illegible] যেন তাঁর সুদীর্ঘ সাত বছরের সমুদ্র জীবনের ব্যাপ্তি এবং [illegible] [illegible] [illegible] হয়ে [illegible] [illegible]।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ সাড়া না জাগালেও দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নোমাড' প্রকাশিত হবার সংগে সংগে সমালোচক মহলে সাড়া পড়ে এবং তাদের অভিনন্দনে 'নোমাড' গ্রন্থ অলংকৃত হয়। সেই সংগে লক্ষ্য করা যায় এক প্রতিশ্রুতিবান লেখককে।

মার্তিনসন ভ্রমণকাহিনী সদৃশ তিনটি সুবিখ্যাত খণ্ডে 'ড্রীমারস এন্ড ড্যান্ডি-লঙ-লেগস' (১৯৩৭), 'মিড সামার ভ্যালী' (১৯৩৮) এবং 'দি সিম্পল এন্ড দি ডিফি-কাল্ট' (১৯৩৯) পাঠকদের তীব্রভাবে আকর্ষণ করে রাখেন। তাছাড়াও তাঁর দুর্বোধ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'প্যুড উইন্ড' (১৯৪৫) এবং 'সিকাডা' (১৯৫৩)।

১৯৫৬ সালে প্রকাশিত মহাকাব্য সদৃশ গ্রন্থ 'আনিয়ারা' সুইডিশ সাহিত্য জগতে প্রচণ্ড বিস্ময় সঞ্চার করে। যার ফলে 'প্রোলেতারিয়ান লেখক' হ্যারী মার্তিন-সনকে 'এইটিন ইম্পোরটেল' সম্মানে সুইডিশ আকাদমী অলংকৃত করে।

এই মহাকাব্যে হ্যারী মার্তিনসন বর্ণনা করেছেন মানুষের প্রয়োগিক বুদ্ধিবাদী নৈতিক এবং মনোবিদ্যাগত অবস্থা। তিনি যাকে উল্লেখ করেছেন: 'কাল এবং স্থানে মানুষের মূল্য নিরূপণ।' এই কাব্যে সর্ব-মোট ১০৩টি সর্গ। মহাকাশযান আনিয়ারার এখানে চরম নিয়তিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই যানে রয়েছে ৮০০০ লোক কবি এখানে হঠাৎ যান্ত্রিক বিপর্যয় ঘটিয়েছেন পৃথিবীর ওপরে নয়। পরিক্রমায়। বুধ এবং শুক্র গ্রহের যাত্রাপথে। এখানেই কবি বিজ্ঞান-ভিত্তিক কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করেছেন কাব্যকে। যার তুলনা সমগ্র য়ুরোপীয় সাহিত্যে দুর্লভ।

মহাকাশযানে রয়েছে ৪০০০ কক্ষ। ২৩০টি প্রশস্ত ঘর। ১০ হাজার লোকের উপযোগী রয়েছে প্রধান হলঘর। কবি এখানে দেখিয়েছেন আণবিক রশ্মির আতঙ্কে পৃথিবী থেকে বাস্তুত্যাগী মানব নক্ষত্রলোকে আশ্রয় সন্ধানে যাত্রা করেছে। যান্ত্রিক দুর্ঘ-টনার ফলে কোন অজ্ঞাত নক্ষত্র বা অজানা পথে মহাকাশযানের দিক পরিবর্তন করা হয়। বস্তুত জাহাজ তখন লীরার দিকে ক্রমশ ধাবমান। মুহূর্তের মধ্যে যাত্রীদের মধ্যে ভয় এবং উৎকণ্ঠা বিস্তৃত হয়ে পড়ে। তারা অনুভব করে যে, গন্তব্যস্থলে কোন-দিনই তারা পৌঁছাতে পারবে না। বরং তাদের জীবন মহাকাশযানেই কাটবে। তখন যান্ত্রিক দেবী মীমা এদের [illegible] স্বপ্নের মাধ্যমে শান্ত করেন। যাত্রী মীমার কাছ থেকে অনাগত নক্ষত্রলোক এবং অজানা দেশের স্বপ্নময় চিত্রগ্রহণ করে দৃষ্টির সম্মুখে স্থাপন করে। তখন তারা আবার বাড়ী ফেরার কামনায় বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অনেকেই তখন মীমাকে পুজো করে। জাহাজের গতিশীল অবস্থায় মীমা তাদের জানায় যে আণবিক যুদ্ধে পৃথিবী ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়েছে। সেই দৃশ্য সত্যিই যেন আতঙ্কিত এবং বীভৎস। দেবীও নিজে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মৃত্যু ডেকে নিয়ে এসে-ছেন। সময় চলে যায় জাহাজ কোথাও থামে না। চারদিকে ঘন অন্ধকার। সর্বত্র যেন অনুক্ষণ রাত্রি বিরাজ করছে। আলো নেই। কিন্তু তবুও বাস্তুত্যাগীরা সময় হিসেব করে চলেছে। দিন, মাস ঋতু বছর। সেখানে ক্রমে ধর্মসম্প্রদায় স্থাপিত হয়। সেখানে আলোর উপাসনা চলে তারপর পরিণতিতে চব্বিশ ঘন্টা পর যাত্রীরা তাদের চরম নিয়তির সম্মুখীন হয়: 'বাস্তু-ত্যাগীরা অবশেষে মীমার অতি প্রশস্ত কক্ষে মৃত্যুকে দর্শন করে।'

এখানে হ্যারী মার্তিনসন প্রায়োগিক কুশল এবং অগ্রগতি যে মানব সমাজকে আতঙ্ক এবং নিরাপত্তার জগতে বিচলিত করে নির্বাসিত করেছে [illegible] স্পষ্ট করে তুলেছেন।

সুইডিশ কাব্যসাহিত্যে মার্তিনসন বিস্ময়বিহ্বল অনুভূতিপ্রবণতা সঞ্চার করে-ছেন। যার জন্যে তাঁকে অপ্রচলিত শব্দ-চয়ন, চমকপ্রদ প্রতিমা রচনা এবং কবির খেয়ালকে সেখানে প্রতিবিম্বিত করে কাব্যকে শিশির বিন্দু সদৃশ করতে হয়েছে। সেখানে যেন তার অনুভূতি এবং ধারণা বিদ্যুতের মত দ্রুতসঞ্চারী। কল্পনাপ্রবণ রীতিতে তাঁর পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন হলেও কবি হিসেবে তিনি তাঁর কবিতায় সর্বত্র ইন্দ্র-জালের মায়া বিস্তার করে রাখেন।

'দি ওয়ে আউট' উপন্যাসে মার্তিনসন তাঁর কৈশোর জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং দুঃখময় গ্লানিকে রূপায়িত করেছেন। সেই সঙ্গে যুক্ত করেছেন কাব্যিক মেজাজ। তাছাড়া সেখানে যে দর্শন প্রত্যক্ষ করা যায় তা হলো মানুষের মধ্যে সহজ মহানুভবতা—যা শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেও বিরাজমান। যদিও তা সংক্ষিপ্তভাবে 'প্রিমিটিভিজম' হিসেবে বর্ণিত হয়ে ও সেখানে [illegible] উপলব্ধি সহজভাবে ধরা পড়ে। ১৯৫৫ সালে প্রকা-শিত 'দি রোড' মূলত ভবঘুরের উপন্যাস। এক ভবঘুরের জীবনযাত্রার সংবেদনশীল চিত্র যেন। তাছাড়া সেখানে রয়েছে সামাজিক

দিক থেকে আসন্ন বন্যসভ্যতার উদ্ভব এবং মানব সেখানে কদ্রুভাবে নির্বাসিত।

হ্যারী মার্তিনসন শুধুমাত্র কবি এবং ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচিত নন তিনি অন্য দিকে নাট্যকার এবং প্রখ্যাত প্রবন্ধকার হিসেবেও পরিচিত। সম্প্রতি তিনি নাটক রচনায় উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যদিও তিনি স্ট্রীণ্ডবার্গের নাট্যধারার অনুসারী হয়েও আজ তাঁর সংগেই তুলনীয় হয়ে উঠেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিখ্যাত ঔপন্যাসিকা হেলগা মারিয়াকে বিয়ে করেন।

পরিশেষে সমস্ত রচনায় ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর সমগ্র জীবনের চরম অভিজ্ঞতা, দুঃখময় ঘটনাবলী ও পর্যাপ্ত ভ্রমণ। যার ফলে তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় প্রকৃতির প্রতি একান্ত ভালবাসা। সেই সংগে যেন তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে তারুণ্যে আশাবাদ বিষন্নতা এবং যন্ত্রবিজ্ঞান যুগে মানবের নিঃসংগতা।

এইভিন্দ্‌ জনসন

সুইডিশ ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার। ১৯০০ সালের ২৯শে জুলাই সুইডেনের বোডার সার্কেলের সন্নিকটে আপার নোরল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ১৪ বছর বয়সেই তিনি রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হন। ব্যক্তিগতভাবে মোবার্গ মার্তিনসন এবং লো-জোহানসনের মতো একান্ত নিজের প্রচেষ্টায় শিক্ষালাভ করেন। তাঁর মধ্যে তখন থেকেই লক্ষ্য করা যায় বুদ্ধিবাদী সংস্কৃতি এবং সুবিন্যস্ত কল্পনার সমাবেশ। কৈশোরে তাকে জীবিকা নির্বাহের জন্য অতি সামান্য কাজও করতে হয়েছে। তাই তাঁকে কাঠের বাজারে সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করতে দেখা যায়। ১৫ বছর বয়সে মাসের-পর-মাস তিনি ইঁটখোলায় কম মাইনার কাজ করতে থাকেন। তখন তাঁর আর্থিক, শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা চরম সঙ্কটের সম্মুখীন। সেখানে তাঁর চারদিকে রয়েছে নিষ্ঠুর শ্রমিক এবং অসুস্থ পরিবেশ। এবং এই অবস্থায় নিজেকে যুক্ত রেখেও ব্যক্তিগত তাগিদে পড়াশুনার চর্চাকে অব্যাহত রাখেন। ফাঁকে ফাঁকে পড়াশুনা করেন। কখনো বা তাঁর চোখের সম্মুখে লেখক হবার স্বপ্ন এসে ভিড় করে। ১৯ বছর বয়সে তিনি হঠাৎ পালিয়ে স্টকহলমে এসে হাজির হন। কয়েক বছর পর সেখান থেকে চলে আসেন বার্লিনে এবং প্যারিসে। তখন তাঁর একমাত্র ভাবনা ছিলো সাহিত্য। প্রোলেতারিয়ান কমরেডদের সহযোগীতায় তখন তিনি তাঁর ছোট গল্প প্রকাশ করেন ক্ষণস্থায়ী অতি আধুনিক পত্রিকা 'আউয়ার টাইমে।' তৎকালীন দুটো বছরের বিদেশে অবস্থান যেন চরম দুর্যোগের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। এমন কি প্রায় অনাহারে থাকতে হয়েছে। তখনই স্বপ্রচেষ্টায় পড়াশুনার ফলে একাকী মনীষী ফ্রয়েডকে আবিষ্কার করে বসেন।

দ্বিতীয়বার সুইডেন ত্যাগ করার পূর্বে তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশের জন্য নির্বাচিত হয়। স্বদেশবাসীর সাহিত্যসচেতনতার জন্য তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে পর-পর চারখানি উপন্যাস রচনা করেন। যেমন 'সিটি ইন ডার্কনেস, 'সিটি ইন লাইট', 'রিমেমবার্ড' এবং 'কমেন্টারী অন এ ফলিং স্টার।' 'রিমেমবার্ড' গ্রন্থে অনুরূপ দেখা যায় প্রুস্তের ভাবনার প্রতিফলন। সেই সংগে যুক্ত হয় আঁদ্রে জিদের বিদ্রুপাত্মক বুদ্ধিবাদ এবং নৈরাশ্য। 'সিটি ইন লাইটে' হামসুনের বিষয়বস্তু এবং মেজাজ বর্তমান: 'কমেন্টারী অন এ ফলিং স্টার'-এ রয়েছে মানুষের ব্যর্থতা এবং আভ্যন্তরীণ স্বপ্নের স্বচ্ছরূপ।

১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত প্যারিস এবং বার্লিনে অবস্থানকালে রচনা করেন বিখ্যাত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। চারটি খণ্ডে সমাপ্ত। যেমন 'নাউ ইট ওয়াজ' 'হিয়ার য়ু হ্যাভ, ইওর লাইফ', 'ডোন্ট লুক ব্যাক' এবং 'ইওথস ফাইন্যাল।' এই উপন্যাসে ছড়িয়ে রয়েছে জনসনের প্রথম জীবনের অতিনির্মম অথচ দুঃখময় ঘটনাগুলি। বর্ণনার মধ্যে যুক্ত হয়েছে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রতীকী রীতি। যা সুইডিশ সাহিত্যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। তাঁর মানবতাবাদী ও মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রতীকী কাহিনী এবং রূপক এই ত্রয়ী উপন্যাসকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করে রেখেছে। আধুনিক জীবনের সমস্যাকে ওডিসির কাহিনীতে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন 'রিটার্ণ টু ইথাকা।' সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী ডাইনীতন্ত্র প্রভাবিত 'ক্লাউডস ওভার মেটাপন্টিয়ন' এবং প্রাচীন ও আধুনিক গ্রীসের সমন্বয়ে রচিত 'দি ডেজ অব হিজ গ্রেস।' বস্তুত সেখানে যেন শার্লমেনের সাম্রাজ্যের সর্বগ্রাসী শাসনতন্ত্র, ব্যক্তিবাদ নিয়ন্ত্রিত ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। সেই সংগে যুক্ত হয়ে রয়েছে প্রেমের কাহিনী।

এইভিন্দ জনসনের সাম্প্রতিক বিখ্যাত উপন্যাস 'ড্রীভসদাগেন ল্যাণ্ড' ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত। এখানে রয়েছে মহাকালের ধারণা। অষ্টম শতাব্দী থেকে বর্তমান শতক পর্যন্ত তার ব্যাপ্তি। এই উপন্যাসে যে সব চরিত্র রয়েছে তাদের মধ্যে যেমন দোনেতাস ইস্মো লিউপ্রান্দ মঙ্ক ক্লোরক দৌভিল আস্তালদা, গিসেলা, দেবী এবং নান। এই

বেঁচে দুটো [illegible] শতাব্দী অতিক্রম করে অবিরাম নিজেদের অনুসন্ধানে রত। যে অনুসন্ধান তাদের আত্মাকে নিয়ে তাদের নিয়তিকে নিয়ে। সেই সাড়া যেন অন্যদের কাছে প্রায় নৈরাশ্যজনক। তাই কালের মধ্যে তাদের ভ্রমণ। যদি এই ধরনের সমাপ্তির মতো সবকিছুই চিন্তা করা যেতো বা ঘটানো যেত। তাদের কণ্ঠস্বর সহজেই বোধগম্য হয়ে ওঠে এবং কান্না শ্রবণসীমায় পৌঁছয়। তাদের অতিদীর্ঘ রূপান্তরিত কাহিনী একের-পর-এক সবাই পুনরাবৃত্তি করে বলে যায়। তাদের কণ্ঠস্বর কখন জেগে ওঠে আবার নিঃশব্দতায় নিমজ্জিত হয়। যখন নতুন দৃষ্টি নতুন চোখের দিকে আলোকপাত করে তখন যেন তাদের মুখে, ছবিতে তাদের প্রেমে, জীবনে কিসের সন্ধানে তৎপর হয়ে ওঠে।' মানুষের এই ধরনের অবিরাম অনুসন্ধান কখনোই তাদের উৎস কোথায় এবং কিই বা নিয়তি জানতে পারে না। তবুও যেন একের সংগে অন্য সংযুক্ত হয়ে পড়ে।

জনসন কাহিনী বলেছেন দোনেতাস এবং আস্তালদার। আস্তালদা হলো অভিজাত বংশের জারজকন্যা। এবং ইস্মো, দোনেতাস, লিউপ্রান্দ হলো দৌভিলের সন্ন্যাসী। অষ্টম শতাব্দীতে যখন ইস্মো গীর্জায় যোগ দেয় তখন আস্তালদা কনভেন্টে পাঠরতা। তারপর দুজনেই তাদের ভ্রমণ শুরু করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা অতিক্রম করে আসে। এই কাহিনী বর্ণনা করে চলেছে কাহিনীকার তার বন্ধুদের। ঐতিহাসিক কাহিনী যেন।

বস্তুত এই উপন্যাস ঐতিহাসিক নয় বরং এখানে রয়েছে ভ্রাম্যমান আত্মা এবং নিশ্চিন্ততার কাহিনী। জনসন অবশ্য এই উপন্যাস ফণ্টাস ঐতিহ্যে রচনা করেছেন।

পরিশেষে এইভিন্দ জনসনের ওপর যাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাদের মধ্যে মার্সেল প্রুস্ত, জেমস জয়েস, লরেন্স এবং ফকনার। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে প্রচলিত রীতিতে রচনা শুরু করলেও অবিরাম নতুন রীতির অনুশীলনে তিনি মগ্ন। স্বভাবত শিল্পী মেজাজ, ভাবনা নিয়ে সাহিত্যের ক্রমবিকাশকে লক্ষ্য করে চলেছেন যার প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তৃত হয়ে রয়েছে সুইডিশ সাহিত্যের তরুণ লেখকদের ওপর।

বিজয়দেব

নতুন বই

THE STORY OF TEST CRICKET (Vol. I, 1876-1914): BY Ajit Kumar Roy. Published by Rabindra Nath Dutta, 20, Chintamoni Dev Road, Howrah 1. Price Rs. 10.00.

ক্রিকেট ইংরেজদের জাতীয় খেলা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধর্মপ্রচার, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং রাজত্ব করার সূত্রে ইংরেজরা স্বদেশ থেকে ক্রিকেট, ফুটবল, রাগবি টেনিস, বিলিয়ার্ডস প্রভৃতি খেলা সঙ্গে করে নিয়ে যায় এবং কালক্রমে এই খেলাগুলি ইংরেজ অধিকৃত দেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে। আন্তর্জাতিক খেলাধূলার আসরে জনপ্রিয়তার দিক থেকে ক্রিকেট অনেক খেলারই সমকক্ষ নয়। কিন্তু ঐতিহ্য এবং কৌলিন্যে ক্রিকেট অনন্য। তাছাড়া ক্রিকেট খেলায় দলগত এবং ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রকাশের সুযোগ-সুবিধা অন্য সব খেলার থেকে অনেক বেশী। কথায় বলে খেলার রাজা ক্রিকেট। এই ক্রিকেট খেলা নিয়ে হরেক রকমের অজস্র ইংরেজী বই আছে। ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত ক্রিকেট খেলার তথ্যসমৃদ্ধ 'উইসডেন' বর্ষপঞ্জিকা তো ক্রিকেট খেলোয়াড়দের বাইবেল হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। ক্রিকেট খেলার বই অন্য সব খেলাকে টেক্কা দিয়ে চলেছে।

ক্রিকেটের বড় আসর হল আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলা। পৃথিবীর মাটিতে টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসর প্রথম বসে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ মাঠে, ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে। এই প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে নেমেছিল ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া। তারপর আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে একে একে নামে আরও পাঁচটি দেশ—দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান।। মাত্র এই সাতটি দেশ নিয়ে আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসর গড়ে উঠেছে। এই সাতটি দেশ পরস্পরের সঙ্গে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলে থাকে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যতিক্রম। এ পর্যন্ত তারা ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত এবং পাকিস্তানের সঙ্গে কোন টেস্ট ম্যাচ খেলে নি। এই সাতটি দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত টেস্ট ক্রিকেট খেলার সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে সতেরশ'র ওপর। আলোচ্য বইখানি আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলা নিয়ে রচিত। বইখানির এই প্রথম খণ্ডে ১৩৪টি টেস্ট খেলা স্থান পেয়েছে। প্রতিটি টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, উল্লেখযোগ্য ঘটনা, রেকর্ড, স্কোর কার্ড এবং বিবিধ তথ্য সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন একটি বই রচনার ক্ষেত্রে লেখক অজিতকুমার রায় যথেষ্ট শ্রম, অধ্যবসায় এবং নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলা নিয়ে এ ধরনের বই এই প্রথম। আমরা বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

গল্প সংকলন—নন্দিনী শতপথী। পপুলার লাইব্রেরী। ১৯৫।১ বিধান সরণী। কলকাতা-৬। দাম চার টাকা।

মূল ওড়িয়া ভাষা থেকে নন্দিনী শতপথীর এই গল্পগুলি বাংলায় অনুবাদ করেছেন শিবশেখর সরকার। শ্রীমতী শতপথী রাজনৈতিক জীবনে সুপরিচিত হলেও সাহিত্যকার হিসাবেও যে তাঁর স্বীকৃতি কোন অংশে কম নয় বর্তমান সংকলনটিতে তার পরিচয় সুস্পষ্ট। মোট তেরটি গল্পে আধুনিক জীবনযন্ত্রণা শহর ও নগর কেন্দ্রিক জীবন চিত্র, ধনী দরিদ্র সর্বস্তরের মানুষের আলেখ্য আশ্চর্য মুন্সীয়ানার সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে। গল্পগুলির ভাষায় অনুবাদের কোন ছাপ নেই: মনে হবে, মৌলিক বাঙলা রচনা।

শোণিতে কুসুমে ভিয়েৎনাম (কাব্য সংকলন) অনুবাদ : সত্যধন ঘোষাল। মানস প্রকাশনী। ৬৪ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম চার টাকা।

সংগ্রামী ভিয়েৎনামের বেশ কয়েকটি কবিতার অনুবাদ বর্তমান সংকলনে স্থান পেয়েছে। এইসব কবিতার মধ্যে ভিয়েৎনামের আদর্শ, সংগ্রামী ইতিহাস মানুষের জীবনধারা প্রেম-ভালবাসা প্রকৃতি এসেছে স্বাভাবিকভাবে। এবং অপূর্ব শিল্প গুণে সমৃদ্ধ হয়ে। ফরাসি ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কবিরাও যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন কোন কোন কবিতায় তার স্পর্ধিত প্রকাশ অভিভূত করে এবং শিল্প ও শিল্পের দায়িত্ব সম্পর্কেও পাঠককেও সচেতন করে। অনুবাদকও যে একজন সচেতন কবি তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়।

ছোটরা ছোট নয়। নেপাল রায়। অ্যালফা বিটা পাবলিকেশনস লিমিটেড। কোলকাতা। দাম চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ছোটদের জন্য লেখা এ উপন্যাসটিতে লেখক রূপকথার আমেজ মিশিয়ে শিশুমনের মনোজ্ঞ কাহিনী রচনা করেছেন। এবং প্রায় সফলও হয়েছেন। রুম্পা নামের একটি মেয়ের অপার বিস্ময় এবং কৌতূহলকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের কাহিনী অংশ গঠিত। উপন্যাসটি নিশ্চিতভাবেই ছোটদের দাবী মেটাতে পারবে—কেন না ছোটরা তাদের প্রত্যাশিত কল্পনার জগতেরই ছবি দেখতে পাবে এর পাতায়। আর বড়রাও যে বঞ্চিত হবেন এমন না তাঁরাও ছোটদের চিন্তা এবং কল্পনার প্রসারতা দেখে ছোটদের সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে পারবেন। ছাপা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ ভালো।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

চিত্রবীক্ষণ। সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার মুখপত্র। সপ্তম বর্ষ। দশম সংখ্যা (জুলাই ৭৪) ২ চৌরঙ্গী রোড। কোলকাতা-১৩। দাম একটাকা।

চলচ্চিত্রের ঐতিহ্যবাহী এই পত্রিকা মানের বিচারে তার উচ্চাসন যথারীতিই দখলে রেখেছে এ সংখ্যাতেও। সম্পাদকীয় লেখা 'প্রয়োজন প্রতিবাদ প্রয়োজন প্রতিরোধ' সংস্কৃতি প্রতিবাদীকালে এক বলিষ্ঠ রচনা। মৃণাল সেনের 'কোলকাতার চলচ্চিত্র নির্মাতারা' কোলকাতার চলচ্চিত্রের ক্রম পরিণত সংক্ষিপ্ত সমাচার দস্তুর মতো আকর্ষণীয়। 'পত্র পত্রিকা থেকে'—বেশ চিন্তা সমৃদ্ধ বৈপরীত্যে ভরা এছাড়া চলচ্চিত্র সংবাদ নানাভাবে পরিবেশিত। তবে পত্রিকার বিশেষ আকর্ষণ বলা যেতে পারে মার্কো বেলোসিওর 'চায়না ইজ নিয়ার' চিত্রনাট্যের ধারাবাহিক অনুবাদ। প্রচ্ছদে ঋত্বিক ঘটকের ছবি 'যুক্তি তর্ক আর গপ্পো।'

অর্ন্দিন। সম্পাদনা শিশির ভট্টাচার্য। ৩৮।১২৮ লেক গার্ডেনস। কলকাতা-৪৫।

প্রবন্ধ লিখেছেন প[illegible] সিংহ এবং বীরেন মিত্র। প্রেমেন্দু [illegible], মণীন্দ্র রায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রতিমা সেনগুপ্ত গিরিধারী কুণ্ডু কুমারেশ চক্রবর্তীর কবিতা ভালো লাগল।

তিনজন। জীবন সরকার সম্পাদিত। ৪, অরনেট ফার্স্ট লেন। কোলকাতা-১৪। এক টাকা।

'তিনজন পত্রিকায় সাম্প্রতিক সংখ্যাটি সুশীল রায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা। লিখেছেন সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত জীবন সরকার শিশির গুহ কুমারেশ চক্রবর্তী ও আরও কয়েকজন।

গোমতী। সম্পাদনা কৃষ্ণপদ দত্ত। ত্রিপুরা সরকারের জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকার থেকে প্রকাশিত।

'ত্রিপুরার লোক শিল্প' ত্রিপুরার মন্দির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 'ত্রিপুরার লৌকিক দেবদেবী' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি বিশেষ মূল্যবান। পত্রিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

প্রতিভা। সম্পাদনা প্রদীপকুমার বসু মজুমদার। ৩২।ই।১ বাবুরাম ঘোষ রোড। কোলকাতা-৪০। ষাট পয়সা।

সাহিত্য সেতু। শুভেন্দু সেনগুপ্ত সম্পাদিত। বাঁশবেড়িয়া। হুগলী। দাম—পঞ্চাশ পয়সা।

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলী সম্বন্ধে এত কথা খুঁটিয়ে বললাম শুধু তথ্য পরিবেশন করতেই নয়, এ-পত্রাবলীর প্রসঙ্গে তাঁর আশ্চর্য অধ্যবসায় ও সমবেদনার পরে আলোকপাত করতেও বটে। যিনি ধ্যানলোকে পেয়েছিলেন অনাদি অশেষ ভূমানন্দ তিনি ইচ্ছা করলেই সে-আনন্দে মশগুল হয়ে থাকতে পারতেন যেমন ছিলেন তৈলঙ্গ স্বামী প্রমুখ মহাতপস্বিবৃন্দ। তিব্বতে ও হিমালয়ে এখনো এমন তান্ত্রিক সাধু আছেন যাঁরা তুষারপাতের মধ্যেও নগ্নদেহে সমাধি-মগ্ন থাকেন অহোরাত্র যথা—, স্বামী কৃষ্ণাশ্রম। এ আষাঢ়ে গল্প নয়—নানা পরিব্রাজক তীর্থযাত্রী হিমালয়ে নানা গভীর গুহায় দেখা পেয়েছেন এ-শ্রেণীর বিরক্ত বৈরাগীর—যাঁদের মূল বাণী এই যে, যেহেতু "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" সেহেতু কী হবে এ-মায়ার খেলায় বৃথা সময় নষ্ট করে? সাংসারিক বা বৈষয়িক সুখ যে অনিত্য একথার যখন মার নেই তখন এ-ক্ষণসুখের প্রমাদে নিজেকে জড়িয়ে লাভ কী—এই-ই হল লীলাবিমুখ সন্ন্যাসীদের মহাবাক্য। আমাদের শাস্ত্রেও এ-মহাবাক্যের সমর্থন আছে নানা মুনি ঋষি যোগী যতির সমাধি-লব্ধ অনুভূতির এজাহারে। এমন কি, জ্ঞানভক্তিকর্মবাদী গীতায়ও নানা শ্লোকে পাই এ-ধরাবিতৃষ্ণার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি। যথা, "অনিত্যম্ অসুখং লোকং ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্" (এ জগৎ দুঃখের নিলয় তাই এখানে এসে শুধু আমাকে, ভগবানকে, ধরে যত শীঘ্র পারো বেরিয়ে এসো এ-মায়ামোহের গোলকধাঁধা থেকে)। কেন? কারণ এ-জগৎ যখন "দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্" তখন কেন মিথ্যে এখানে বেঁচে থাকার দুর্ভোগ? অবশ্য গীতায় একথাও পাই যে, এ-সংসার অজস্র সুখের আনন্দলোকও হতে পারে, কিন্তু কার কাছে? না, স্থিতপ্রজ্ঞ স্থিতধী মহাজনদের যাঁরা সকলের মধ্যে থেকেও অনপেক্ষ সর্ববিচ্ছিন্ন, অনাসক্ত, উদাসীন, ব্রাহ্মীস্থিতিতে অচলপ্রতিষ্ঠ। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নানা লেখায়ই বার বার বলেছেন যে এ একটা কথাই নয়, যেহেতু ব্রহ্ম সত্য বলেই জগৎ মিথ্যা এ-সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হয় না। সাবিত্রী-তে সাবিত্রী ভগবানকে জোর গলায়ই বলেছেন (অন্তিম স্কন্ধে):

> If earth can look up to the light of heaven
> And hear her answer to her lovely cry
> Not vain their meeting, nor heaven's touch a snare.
> If thou and I are true, the world is true

> ধরা যদি পারে স্বর্গজ্যোতি পানে রহিতে চাহিয়া
> তাহলে ধরার সাথে অধরার আদানপ্রদান
> মিথ্যা মায়া বলিব কেমনে?
> জীব আর শিব যদি
> সত্য হয়—তবে বিশ্বলীলা
> হবে অলীক কেমনে?

অপিচ:

> Heaven's touch fulfils but cancels not our earth

অধরার স্পর্শে ধরা হয় ধন্য, লুপ্ত হয় না সে।

তাঁর প্রখ্যাত HUMAN CYCLE-এ (২৪ অধ্যায়) শ্রীঅরবিন্দ বলছেন:

> "The one thing essential must take precedence, the conversion of the whole life of the human being to the lead of the spirit. The ascent of man into heaven is not the key, but rather His ascent here into the spirit and the descent also of the spirit into his normal humanity and the transformation of the earthly nature"

ভাষ্য এই যে, সর্বাগ্রে মানুষকে চাইতে হবে তার সমগ্র জীবনকে ঢেলে সাজাতে। মানুষ স্বর্গমুখী হয়ে মর্ত্যকে বাতিল করলে চলবে না, কেন না মানুষের আত্মায় ভগবান আরূঢ় হয়েছেন নিখিল বিশ্বে অবতীর্ণ হয়ে তিনি মানুষের স্বভাবের আমূল রূপান্তর সাধন করতে চান বলেই। গীতার মধ্যে মায়াবাদের কিছু কলতান শোনা গেলেও তার মূল বাণী যে বিশ্বরাজকে বিশ্ববন্ধু বলে বরণ করে জ্ঞানভক্তিকর্মযোগের সমন্বয়ে সর্বহিতব্রতী হওয়া একথা জোর করেই বলা যায়। *

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ শুধু গীতার বাণীর প্রতিধ্বনি করেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁর বিশ্বব্রত আরো ঝংকৃত, প্রাণস্পর্শী। তাই সাবিত্রী বিশ্বরাজকে বলছেন (অন্তিম স্কন্ধে):

> Since God made earth, earth must make in her God;
> What hides within her breast she must reveal.
> I claim thee for the world that thou hast made.

> ঈশ্বর যখন বিশ্ব করেছেন সৃষ্টি—বিশ্বকেও
> বিরচিতে হবে বিশ্বাধিপে।
> যিনি বিশ্বের অন্তরে

---

* গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে (২৫ ও ২৯ শ্লোকে) পাই শ্রীকৃষ্ণের এই পরম আত্মপ্রকাশের কথা যে, তিনি সর্ববন্ধু বলেই তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করার পরে জীবন্মুক্ত হওয়ার পরেও মুক্তৈকান্ত ঋষিরা "সর্বভূতহিতে রত" থাকেন। শ্রীঅরবিন্দ এই বিশ্বমুখী বাণীকেই বরণ করেছেন—বিশ্ববিমুখতার বাণীকে বর্জন করে।

রাজেন সুগুপ্ত তাঁকে চাহিবেই
বিশ্ব প্রকাশিতে।
তোমাকে এ-বিশ্বতরে চাই যারে
সাজলে তুমিই।

এ-বহির্মুখী বস্তুবাদী যুগে পৃথ্বীবাদের সমর্থন করা কারুর কারুর কাছে হয়ত বাহুল্য মনে হতে পারে, কেন না আজকের দিনে চিন্তাশীল মানুষ সহজেই সাড়া দেয় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উদাত্ত জীবনদর্শনে : "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" তাছাড়া জীবনের একটা প্রবল টান আছেই আছে, কাজেই মনে হতে পারে অনেকের—কেন শ্রীঅরবিন্দ বারবার বৈরাগ্যবিমুখতার পাঠ দিতে চেয়েছেন তাঁর অজস্র কাব্যে পত্রে নিবন্ধে? এ-প্রশ্নের উত্তরে আমার যা মনে হয়েছিল তাঁর কাছে যোগদীক্ষা নেওয়ার পরে আমি বলতে চাই একটু বিশদ করেই, কেন না সংসারে বিষয়ীরা বৈরাগ্যবিমুখ হলেও যোগের জগতে সাধকেরা প্রায়ই অন্তরে বৈরাগ্যের একটা প্রবল টান অনুভব করেন—বিশেষ করে শংকরাচার্যের মায়াবাদী দর্শনের প্ররোচনায়। কিন্তু জীবনের আর সাধনার পীঠ আলাদা হলেও সংসারের কোনো ক্রমবিকাশই বিশ্ব থেকে প্রত্যাহৃত হয়ে আত্মকেন্দ্রিক হতে পারে না—এর প্রভাব পড়েই পড়ে ওর পরে কমবেশি, কেন না ভগবান যখন বিশ্বের প্রতি অণু ছন্দ রাগ দোলে অনুস্যূত তখন বিষয়ীর মধ্যেও যিনি বৈরাগীর মধ্যেও তাঁর কিছুটা প্রভাব থাকবেই থাকবে এবং ভাইসি ভার্সা। তাই পদে পদেই দেখা যায় যে, যেমন বিলাসীর মনেও বৈরাগী বিরাজ করে তেমনি বৈরাগীর মনেও বিলাসী উঁকি দেয়। এ আমার কথার কথা নয় : আমার নিজের জীবনে এই দুই স্ববিরোধী ভাবধারা প্রায়ই আমাকে অশান্ত করে তুলত : আশ্রমের বাইরে এলে যেমন মন ঝুঁকত সাধনার দিকে, তেমনি আশ্রমে ফিরে গেলে মন বলত—চলো মন, বাইরে গিয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক। মায়াবাদীরা সচরাচর বৈষয়িক সব ভাবধারার ছোঁয়াচ কাটিয়ে বিজনবাসী হতে চান। কিন্তু সংসার আমাদের অস্থিমজ্জায় ঠাঁই পেয়ে এসেছে আশৈশব, সে ছাড়বে কেন? ফলে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব এড়াতে চেয়ে হয় সংসারের দিকে ঝুঁকে বৈরাগ্যকে ভুলতে চায়, নয় বৈরাগ্যকে বরণ করে মোহমুদ্গরী সুরে কেঁদে বলে : "নলিনীদলগত সলিলং তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্"—কি না, এ-জীবন পদ্মপত্রের জলের মতন টলমল টলমল করে বলে এ-বিড়ম্বনা ছেড়ে 'মায়াময়মিদম্ অখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং ত্বং প্রবিশ বিদিত্বা—এই মায়াময় সংসার ছেড়ে ব্রহ্মপদে আশ্রয় নাও।"

একথা ঠিকই যে, সংসারের কোনো কিছুই স্থায়ী হয় না, না সুখ, না তৃপ্তি, না আমোদপ্রমোদ। একথাও অনস্বীকার্য যে, দুঃখসুখের পারে যিনি নিয়তির রাশ কষে আমাদের চালাচ্ছেন তাঁর আশ্রয় পেলে মানুষ কৃতকৃত্য হয়ে শান্তি পেয়ে জীবনের চিরন্তন দোটানা থেকে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু, বলছেন শ্রীঅরবিন্দ তাই বলে একথা সত্যি নয় নয় নয় যে, সংসার ছেড়ে নিঃস্ব বা গুহাবাসী হলেই রাতারাতি জীবনসমস্যার পরম সমাধান মিলবে, বলা চলে না যে, আমরা দলে দলে চোখের জলের নদী কোনোমতে সাঁতরে পার হয়ে সংসার ছেড়ে সর্বহারা বনচারী হব এইই ভগবান চান। তাই গুরুদেব বারবারই আমাকে লিখে বোঝাতেন যে, বিরক্ত বৈরাগী হওয়াই ঘোর জীবনসমস্যার শেষ সমাধান নয়, তিনি গীতার অনাসক্তিকে বরণ করেই নির্মোহ আনন্দলোকের বাসিন্দা হতে চান, সংসারকে বর্জনীয় বলে দেগে দিয়ে নৈমিষারণ্যে গিয়ে ফলমূল খেয়ে মৌনী বাবা বনতে চান না। তাঁর FOUNDATIONS OF INDIAN CULTURE -এ (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) তিনি লিখেছেন যে, সনাতন ভারতের বাণী এ নয় যে মানবজীবন জঘন্য, সত্যের সত্য এই যে, মর্ত্য জীবন বরণীয়—পুরাণেও পাই যে এমন কি দেবতারাও নরলীলাকে বাঞ্ছনীয় মনে করেন।

> ("Human life was in ancient Indian thought no vile and unworthy existence; it is the greatest thing known to us; it is desired, the Purana says, even by the gods in heaven".)

একথা আমার অজানা ছিল না। ভাগবতে যখন প্রথম পড়ি—দেবতারা স্বর্গ থেকে মানুষকে দেখে ঈর্ষা করছেন, বলছেন ধন্য এরা যে, কৃষ্ণের লীলাসাথী হতে পারল * —তখন মন ভরে উঠেছিল বৈকি। মনে হয়েছিল বৈকি—শ্রীঅরবিন্দের মতন ঋষিকল্প মহাগুরুর চরণে যখন আশ্রয় পেয়েছি তখন তাঁর বাণী ছেড়ে শংকরাচার্যের মোহমুদ্গরের সুরে সুর মিলিয়ে বলব কী দুঃখে "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"—নেংটি পরে গুহায় গিয়ে বসলেই চতুর্বর্গ লাভ হবে?

কিন্তু তবু এমনি মানুষের মন যে, সে উল্টোপাল্টা স্রোতে সাড়া না দিয়ে পারে না যার ফলে তার প্রবৃত্তি কখনো ঝোঁকে এদিকে, কখনো ওদিকে। তাই আমি সব বুঝেও সময়ে সময়ে যোগে আরো এগিয়ে গিয়ে রাতারাতি সিদ্ধিলাভ করবার আশায় বায়না ধরতাম আমিও গুরুদেবের মতন চুপচাপ থাকব একলাটি শুধু ধ্যান ধারণা নিয়ে। একবার তাঁকে লিখেছিলাম কবীরের একটি দোহা :

হঁস হঁস কান্ত ন পাইয়া, জিন পায়া
তিন রোয়।
হাঁসী খেলে পিউ মিলৈ তো কৌন
দুহাগিনি হোয়।
(মিলে না কান্তে হেসে খেলে,
তাঁকে কেঁদে কেটে শুধু জিনি,
সাধ করে হত দুঃখী কে মূঢ়
সুখে দে দিলে তিনি?)

লিখে টীকা করল (বিজ্ঞের মত!) "যুগে যুগে দেখি বহু হাহাকারের পরে তবে সাধক কাঁটাবনে ফুলবাগানের পথ খুঁজে পেয়েছে। কাজেই আপনি কেন মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছেন—বুক চাপড়ে কেঁদে হুতুশে না হলেও বস্তুলাভ হতে পারে? সহজিয়া হয় মানুষ বহু সাধনার কান্নাকাটির পরে, আগে নয়। তাই আমি বিজনবাসী হয়ে হাহুতাশ সুরু করব যদি দয়া করে অনুমতি দেন, লক্ষ্মীটি! বেলা বয়ে যায়, গুরুদেব!"

উত্তরে তিনি লিখলেন অশান্তকে শান্ত করতে (২২-১০-৩২) :

> "An ascetic dryness or isolated loneliness cannot be your spiritual destiny since it is not consonant with your **swabhava** which is made for joy, largeness, expansion, a comprehensive movement of the life-force"

(রুক্ষ শুষ্কতা বা একান্ত বিজনবাস তোমার সাধনার অনুকূল হতে পারে না, কেন না তোমার স্বভাব সহজ আনন্দমুখী, প্রাণশক্তির স্বচ্ছন্দ প্রগতিপন্থী।)

কিন্তু আমি স্বভাবে কিছুটা একরোখা বলে সব বুঝেও নিজের ঝোঁকালো মনের

---

* অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে মুকুন্দ-
সেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ।।
শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১৯।২০

একান্তে করতাম প্রায়ই, বলতাম তাঁকে অনুযোগের সুরে : "বেশ, আমি চেষ্টা করব আপনার কথা মেনে চলাতে, কিন্তু আমার মনে হয় যে, চুপচাপ থেকে সাধনায় বেশি ডুবলে অতলের জল পেতে বিলম্ব কম হত।"

কিন্তু হায় রে, এভাবে দোমনা হয়ে চলার নাম তো গুরুবাক্য মেনে চলা নয়। মনের বিমুখতাকে জয় করতে হলে সব আগে চাই গুরুর বাধ্য হওয়া। তাই মহা-সাধকেরা সবাই বলেন বিদ্যা গুরুমুখী না হলে কিছুতেই প্রজ্ঞা হয়ে দাঁড়াতে পারে না—থেকে যায় পুঁথির বুলি মাত্র যার সাহেবি নাম পেডান্ট্রি। শুধু তাই নয়, গুরুর অবাধ্য হলে সে-বিকর্মের ফলও ফলেই ফলে যথাকালে—প্রায় দুই আর দুই-য়ে চারের লজিক। দৃষ্টান্ত আমি নিজেই—দুর্লগ্ন এল ঘনিয়ে—গান্ধীজী সমুদ্র থেকে নুন ছাঁকার পণ নিয়ে চললেন একদল কারাব্রতী সহযাত্রী নিয়ে। দন্ডীমার্চের তারিখ ও জয়-ঘোষণা কাগজে পড়ে আমি ঠিক করলাম—সোজা তাঁর দলে গিয়ে হাজিরি দিয়ে জেলে যাওয়াই শ্রেয়ঃ, * যখন দেখাই যাচ্ছে যে, যোগে আমার কোনো সত্যিকার অধিকার নেই। উত্তরে তিনি লিখলেন এক সুদীর্ঘ চমৎকার চিঠি আমাকে ঠান্ডা করতে। তারিখ—৩০এ মার্চ ১৯৩০। এ-চিঠিটির প্রাঞ্জল ভাষা ও গভীর ভাব আশ্রমের গন্ডীর বাইরেও বহু ভাবুক ও পন্ডিত পড়ে আনন্দ পেয়েছেন, শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলীতেও ছাপা হয়েছে। তাই আমি এখানে তাঁর বক্তব্যের ভাবার্থটুকু সংক্ষেপে পেশ করেই ক্ষান্ত হব।

প্রথমে তিনি ভূমিকা করলেন এই বলে যে, যে-আসুরিক মিথ্যা শক্তিরা চিরদিন দৈবসত্যশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে এসেছে—তারাই দেশপ্রেমের অজুহাতে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে দৈবপ্রভাবের পরিধি থেকে। আর শুধু আমাকে নয়, আরো অনেককেই এরা যোগভ্রষ্ট করাতে চাইছে নানা সঙিন কুযুক্তি দিয়ে।

তারপর গুরুদেব লিখলেন যে, এ-আক্রমণ আসে যখন সাধকের সাধনা মানস বা প্রাণশক্তির স্তর থেকে দৈহিক স্তরে অবতরণ করে। তখন হয় কি—সাধক ভুলে যায় প্রথমদিকে কত কি আনন্দ শক্তি শান্তি নেমেছিল তার অন্তরে। শেষে লিখলেন তাঁর উদ্বোধনী জিজ্ঞাসা : "চেতনার যে-পূর্ণ রূপান্তর আমাদের লক্ষ্য সে-রূপান্তর কঠিন একথা আমি তোমাকে খুলে বলেছি বহুবারই। কিন্তু তুমি কি সত্যি ভগবানের এ-মহান ডাকে সাড়া দিতে নারাজ? আর কিসের জন্যে? এমন একটি ঝোঁকের—যাতে তোমার স্বভাব সাড়া দিতেই পারে না।... এখন সময় এসেছে তোমার চৈত্যপুরুষের (psychic being) এগিয়ে আসার যাতে করে তোমার প্রকৃতির পূর্ণ রূপান্তর হতে পারে। এ-রূপান্তর হলে তোমার সব সংশয় ভঞ্জন হবেই হবে...মন ভাবে, প্রাণ কাঁদে, কিন্তু হৃদয় জানেই জানে জীবনদেবতাকে। *

আমি চাই তুমি তোমার অন্তরাত্মার জ্যোতির অনুগামী হবে, মনে রাখবে যে, শুধু ভগবানের ডাকে সাড়া দিতেই এসেছ তুমি—শুধু সেই ডাকের পথে চলো একান্তী হয়ে—তাহলে তুমি জয়ী হবেই হবে।

*

(দশ)

অধিকাংশ সময়ে তিনি হেলান দিয়ে বসে লিখতেন বলেই হয়ত ছোট ছোট কাগজে লিখতেন। বড় বড় কাগজেও লিখতেন যখন তাঁকে চার পাঁচ ছয় আট দশ পাতার চিঠি লিখতে হত বা অর্ধেক লিখে আমাকে পাঠিয়ে পরদিন লিখতেন উত্তরার্ধ। (একবার লিখেছিলেন এত বড় চিঠি যা টাইপ করে দাঁড়াল ষোলো পৃষ্ঠা!) বলাই বাহুল্য আমার কাছে এ-চিঠিগুলি হয়েছিল শুধু আমার সাধনার সহায় নয়—আমার আশ্রম জীবনের একটি প্রধান আনন্দ গৌরব। তাঁর পর আমি যে প্রতিদিনই পেতাম তা নয় কিন্তু আমার কোনো প্রশ্ন থাকলে তিনি পিঠ পিঠ উত্তর দিতেন বলে আরো আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন দাখিল করতাম। তাঁকে প্রশ্ন করার যত আনন্দ উত্তর পেতে তার দশগুণ আনন্দ। আমার মনের অবস্থা ক্রমশ এমনি দাঁড়িয়েছিল যে, গুরুদেবের চিঠি আমার কাছে হয়ে উঠেছিল ঠিক তেমনি আরাধ্য যেমন চাতকের কাছে মেঘের জল। নলিনীবাবু যখন সকালে তাঁর চিঠি নিয়ে আসতেন খামে ভরে তখন খাম দেখেই আমার বুক উঠত দুলে। আমার এক ফরাসী বন্ধু Villederace একদা আমাকে বলেছিলেন ফ্রান্সে : 'জাপানীদের কথা কি রকম মিষ্টি সে আর কি বলব মঁসিয়ে? সে না শুনলে বোঝানো অসম্ভব। কিন্তু তারপরে যখন শুনলাম জাপানী ললনার মিষ্টভাষায় তখন—ওহ্—' বলে ফরাসীদের স্কন্ধ-দোলন (shrugging) অর্থাৎ এমন বর্ণনাতীত মাধুর্য যার মাত্র একটু কণাস্বাদ দেওয়া যায় অঙ্গভঙ্গিতে।

শ্রীঅরবিন্দের চিঠির খাম হাতে কার সত্যিই আমার বুকের রক্ত উঠত দুলে। তারপর খাম খুলে বসে তাঁর চিঠির প্রথম লাইন পড়তে না পড়তে যে-অসহ পুলক আমাকে উচ্ছল করে তুলত তার বর্ণনা করতে চাই শুধু আমি এইভাবে অঙ্গভঙ্গিতে করেই—ভাষার সীমিত ব্যঞ্জনায় নয়। মনে পড়ে একটি গান লিখেছিলাম এক সন্ন্যাসীর ব্যথে, কৃষ্ণের প্রতি রাধা :

নয়ন পলকে সখা,
　　এসো হে লুকায়ে রাখি :
রসনা নীরব রবে
　　যা কয়ায় কয়ে আঁখি।

তাই আমি ইঙ্গিতে পাঠককে উল্লেখ দিয়েই শুধু এইটুকু পুনশ্চ জুড়ে দিচ্ছি যে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধের মধ্যে যে স্বপ্নাবেশ (romance) বেজে উঠতে পারে এ-প্রত্যক্ষ সত্যকে আমি গদ্যের ভাষায় ফোটাতে অক্ষম, তবে একটু আভাস দিতে পারি ছড়ায় :

কোথা যে তুমি আসীন—
　　জানি না, ওগো অপ্রাপ্ত!
শুধু মন হয় যে রঙিন
　　লিপিকা পেলে তোমার—
একথা বলতে পারি,
　　নয় এ প্রলাপ উচ্ছল,
যে মজে জানে তারি
　　অন্তর নেশায় বিভোল।

কতবারই যে তাঁর চিঠির সুধাপ্রলেপের যাদুতে আমার মনের সব ক্ষোভ জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে—একটি দৃষ্টান্ত দিই। মাঝে মাঝে আমি গাইতাম তিনি উপর থেকে কান পেতে শুনতেন। শ্রীমা শুনতেন সামনে বসে। একদা আমি গানের পর তাঁর কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে অভিমান করে তাঁকে লিখেছিলাম : 'আমার সন্দেহ হচ্ছে—এ-অধমের গান আপনার মনের তারে কোনো অনুরণনই তোলে না। তাই ভবিষ্যতে আশ্রমে গিয়ে গান শুনিয়ে আপনাকে তার বিব্রত করব না ভাবছি। নাস্তিকে খুঁচিয়ে অস্তি করার চেষ্টা বিড়ম্বনা।'

উত্তরে তিনি লিখলেন (২৩-৩-৩৩) :

'তোমার সন্দেহ অমূলক। তোমার গানে আমার ঔৎসুক্য শুধু যে অস্তি তাই নয় এমন অস্তি যে আমি রাতে ঘুমের সময়ে জেগে তোমার 'সরস্বতী' গানটির অনুবাদ সংশোধন করছিলাম।...আমি আর এক

---

* পরে শ্রীঅরবিন্দ একদা বলেছিলেন কাউকে : "অনেকেই জেলে যায় বার বার। কিন্তু তোমরা কি কেউ ভাবতে পারো—বিজয়ী চুপচাপ জেলে বসে আছে?"

"The mind thinks, the vital craves but the soul feels and knows the Divine...... Be faithful and you will conquer"
Sri Aurobindo　　30.3.30.

সাধককে লিখেছি যে, কাল তোমার গান আবেগে ও ব্যঞ্জনায় তোমার আগের সব গানকে ছাড়িয়ে গেছে; লিখেছি—সাধকটি ঠিকই ধরেছেন যে, তোমার সেদিনকার গান হয়েছিল পার্থিব চেতনার আবেদন—ভগবানকে ডাক : তুমি নেমে এসো। উদাত্ত সঙ্গীত সম্বন্ধে যখন কিছু লিখি তখন মনে হয় কথারা পান্ডুর ও প্রাণহীন তাই তারা প্রবেশ করতে অক্ষম—গানে কি ভাব মনে জাগল কেন না মনোজাত কথামালার মধ্যে দিয়ে মনের অতীত ঝঙ্কারকে পরিবেশন করা অসম্ভব। অন্তত আমার এই রকম মনে হয় বলেই তোমার গানের সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে ভেবে পাই না ঠিক কি করে ফুটিয়ে তুলব যা বলতে চাই।'

(Your surmise is without any real cause. Far from being without interest in your music, my interest was so great that I sat up during my time of sleep correcting your song, *Saraswati*, so that it might be in time for the occasion, —as I could not make any time for it in my working hours. And I had already written to some one who asked the question that your song yesterday had even exceeded in feeling and significance anything we had yet had and that he was right in feeling in it the effective invocation of the earth-consciousness for the Divine's descent. Written words are pale and lifeless things when one has to express the feelings raised by superb music and seem hardly to mean anything—not being able to convey what is beyond words and mere mental form—that is, at least, what I have felt and why I always find it a little difficult to write about your songs.....
—23.3.33 Sri Aurobindo)

এ আর এক আশ্চর্য ব্যাপার। পন্ডিচেরীতে যখন আমি এসেছিলাম তখন পণ নিয়েছিলাম গান আর নয়—ধ্যানে চাইব তাঁকে যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন 'গানের ওপরে'। শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য বলেন নি যে, গানকে নামঞ্জুর করতে হবে। কিন্তু আমি তাঁকে ভুল বুঝে ভেবেছিলাম "নিবিড় আঁধারে শুধু চমকে অরূপরাশি তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী।' এর একটা কারণ এই যে, আমার মধ্যে যে-বৈরাগী বাস করত সে ছিল দোমনা, দুমুখী—কখনো চাইত কর্মকে নামঞ্জুর করে কর্মাতীতকে পেতে, আর একটি বাউল ছিল যে গানের মধ্যে দিয়ে বারবারই গানাতীতের চকিত স্পর্শ পেয়ে ভক্তিতে আনন্দে আপ্লুত হয়ে অঙ্গীকার করতে—গানই তার স্বধর্ম—'গানং পরতরং নহি'। তাই শ্রীঅরবিন্দকে কথা দিতে মন বাঁথিয়ে উঠলেও পণ নিয়েছিলাম যে, যদি (শ্রীঅরবিন্দেরই ভাষায়) যোগে দীক্ষা চাইলে যোগেশ্বরের সঙ্গে কোনো রফা করা না চলে—অর্থাৎ যদি তিনি আমাকে বলেন গান ছেড়ে নৈঃশব্দ্যে ডুব দিতে—তবে তাই করব নাক টিপে আসনে বসে। আজ এসব কথা ভাবলে হাসি আসে, কিন্তু তখন সত্যিই যোগের সম্বন্ধে নানা ভুল ধারণাকেই ঠিক মনে করে পড়তাম বিপাকে, যেকথা শ্রীঅরবিন্দ আমাকে পরে দেখিয়ে দিয়ে লিখেছিলেন যে, যোগপন্থীর কাছে গুরুর নির্দেশ অপরিহার্য হয় এই জন্যেই যে গুরুর উপদেশই নয় দীপ্ত ব্যক্তিরূপেও পদে পদে তার নানা ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করে। তবু গান ও ধ্যানের পন্থা ও লক্ষ্য সম্বন্ধে নানান হিজিবিজি ধারণার গোলকধাঁধায় সময়ে সময়ে এমনিই হাঁপিয়ে উঠতাম যে, আমি গুরুদেবের অগাধ স্নেহ ও নিরন্ত ভরসা সত্ত্বেও নিজেকে অনধিকারী মনে করে এ-বিড়ম্বনার হাত থেকে অব্যাহতি চাইতাম। এর একটি কারণ ছিল এই যে, রবীন্দ্রনাথ আমাকে একবার বলেছিলেন : দিলীপ তুমি স্বভাবে শিল্পী, আর যোগীর স্বধর্ম শিল্পীর পরধর্মী।' কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বারবারই বলেছিলেন অটল নৈশ্চিত্যের প্রস্বনে যে, যোগ আমার নিয়তি-নির্দিষ্ট—"your destiny is to be a yogi" *

তাই আমার সব আগে চাই এই দৃঢ় বিশ্বাসে ভর করা (গুরুবাক্য ও সুবুদ্ধি মেনে) যে যদি ভগবান থাকেন ও আমাকে ডাক দিয়ে থাকেন যোগীপন্থী হতে—তাহলে তাঁর দেশনা আছেই আছে সে-ডাকের পিছনে—কাজেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, আমি সব বাধা-বিঘ্ন কাটিয়ে পৌঁছব পরমা সিদ্ধিতে।

(It is this faith you have to develop— a faith which is in accordance with reason and commonsense — that if the Divine exists and has called you to this path, as is evident, then there must be a Divine guidance behind and that through and in spite of all difficulties you will arrive.... 25-6-32).

শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার আমার কাছে উদ্ধৃত করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দের একটি মহাবাক্য : 'যত বাধা তত বিকাশ।' নানা বাধাবিঘ্ন নির্ভরসা যখন আমার সামনে দুর্লঙ্ঘ্য তুষার-প্রাচীরের মতন পথ আগলে দাঁড়াত তখন আমার মনে পড়ত বরদাবাবুর মুখে-শোনা শ্রীঅরবিন্দের এই আশ্বাসটি। ফলে মনে যে কিছুটা আত্মপ্রসাদও পেতাম না তা নয় কিন্তু পেলে হবে কি—বাধারা চড়াও হয়ে আমাকে সময়ে সময়ে এমনিই জখম করে দিত যে, আমি গুরুদেবের কাছে লিখতাম কান্নাকাটি করে : 'আপনি অতিমানস লোকের বাসিন্দা, মহাকায় মহাজন বলেই সাদাসিধে বামন অভাজনের দুঃখদুর্দশা বুঝতে পারেন না। বুঝতেন হাড়ে হাড়ে যদি আপনাকে আমাদের মতন বাধার পর বাধা ডিঙিয়ে সরুপথে চলতে হত মরীচিকার হাতছানিতে'...ইত্যাদি ইত্যাদি।

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন : 'বলো কি তুমি—অবাক কান্ড! —যে, আমি অতিমানস স্বভাব নিয়ে জন্মেছিলাম—তাই দুস্তর বাধাদের কোনো খবরই রাখি না! হা ভগবান! আমাকে যে সারা জীবনই দুঃখের সঙ্গে লড়তে হয়েছে—বিলেতে অনশন অনটন থেকে শুরু করে এখানে প্রবাসে মুখোমুখি হতে হয়েছে একের পর এক কঠিন বাধা ও বিপদের সঙ্গে। আবাল্য আমাকে লড়াই করে চলতে হয়েছে নিয়তির সঙ্গে—এখনো হচ্ছে। আজ আমাকে একটি ঘরে বসে তাদের সঙ্গে যে-যুদ্ধ করতে হচ্ছে সেও রীতিমত যুদ্ধ যদিও আমি লড়ছি এখন আত্মিক আয়ুধ নিয়ে।' (১৯৩৫)

("But what strange ideas again!— that I was born with a supramental temperament.... and that I know nothing of hard realities! Good God! My whole life has been a struggle with hard realities from hardships, starvation in England, and constant dangers and fierce difficulties to the far greater difficulties cropping up continually here in Pondichery external and internal. My life has been a battle from its early years and is still a battle: the fact that I wage it now from a room upstairs and by spiritual means as well as others that are external makes no difference to its character").

তবু যখন থেকে থেকে আমার নিজের অহঙ্কারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠে চলে যেতে চাইতাম 'আর পারছি না' বলে তখন গুরুদেব কি এক জাদুতে দু-চারটি ছত্রেই আমার সব দুঃখ তাপ জল করে দিতেন। একবার যখন আমি খেপে উঠে তাঁকে লিখেছিলাম : এবার সত্যিই যাবার সময় এসেছে—তখন তিনি লিখেছিলেন (২৯-৫-৩৬) :

'ভগবান সবচেয়ে ভালো বোঝেন—তাঁর এই প্রজ্ঞায় আস্থা রাখা চাই...আশা করি তুমি শেষ পর্যন্ত সত্যিই চলে যাবে না। যদি কিছুদিনের জন্যে বাইরে যেতে চাও যেতে পারো কিন্তু আমাদের জানিয়ে তবে—যাতে করে আমাদের শক্তি তোমার রক্ষাকবচ হতে পারে। অন্তত আমাদের স্নেহ তোমাকে সদাসর্বদাই ঘিরে থাকবে এ-কথাটি অবিশ্বাস কোরো না।

(Whatever else you doubt, you should not doubt that our love and affection will always be with you)".

(ক্রমশঃ)

* Your destiny is to be a Yogi and the sooner your vital purusha reconciles itself to the prospect the better for it and all the other personalities in you.

পুনশ্চ

বৈদ্যনাথ ধাম বা দেওঘর আমাদের সন্নিকটে অবস্থিত যেমন একটি পরম পবিত্র তীর্থস্থান, তেমনি একটি স্বাস্থ্যকর স্থানও। কলিকাতা থেকে কিঞ্চিদধিক দশ মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে সাঁওতাল পরগণার মধ্যে এর অবস্থিতি। শারীরিক সুস্থতার জন্য দীর্ঘকাল থেকে পূজো-পার্বণ ছুটিছাটায় বহু বাঙালী প্রতি বৎসর ওখানে গিয়ে থাকেন। বহু বাঙালীর সুরম্য স্বাস্থ্য-নিবাসও আছে ওখানে। তাছাড়া রামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্যাপীঠ ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের আশ্রম, বালানন্দ স্বামীর আশ্রম ও কুষ্ঠাশ্রম প্রভৃতি স্থানীয় গৌরব প্রচারের অন্যতম সহায়ক বিশেষ।

।। বৈদ্যনাথ ।।

'বৈদ্যনাথ 'দেওঘর' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। 'দেও' শব্দ 'দেব'শব্দের অপভ্রংশ এবং 'ঘর' শব্দ 'গৃহ' শব্দের প্রাকৃত। সম্ভবতঃ বৈদ্যনাথ দেবের অধিষ্ঠানই দেওঘর নাম হইবার কারণ। দেওঘর নাম প্রায় দেড়শত বৎসরের (১৩০৮ সাল ধরে) প্রাচীন হইলেও, উভয় নাম সমসাময়িক নহে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তৎপরিবর্ত্তে হার্দ্দপীঠ হরিদ্রাপীঠ রাবণ কানন কেতকীবন হরিতকীবন এবং বৈদ্যনাথ নাম দৃষ্ট হয়। মোসলমান রাজত্বের শেষভাগে বৈদ্যনাথ বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছিল। অধুনা ইহাকে সাঁওতাল পরগণায় সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে।

বৈদ্যনাথ মন্দিরের কিঞ্চিৎ উত্তরে শিবগঙ্গা নামে ৯০০ ফুট দীর্ঘ ও ৬০০ ফুট প্রস্থ একটি দীর্ঘিকা। ইহা অতিশয় গভীর এবং অবতরণোপযোগী প্রস্তরময় সোপানাবলী শোভিত। লঙ্কাধিপতি রাবণ পদাঘাতে ইহার সৃষ্টি করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। পূর্ব্বে শিবগঙ্গা একটি অগভীর জলাভূমির সহিত সংযুক্ত ছিল। সম্রাট আকবর সাহের প্রধান সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ ওড়িশা গমনকালে বৈদ্যনাথে আসিয়া এতদুভয়ের মধ্যে একটি বাঁধ নির্ম্মাণ করেন; এবং স্বীয় নামানুসারে উক্ত জলাভূমির 'মান সরোবর' আখ্যা প্রদান করেন। বৈদ্যনাথের এক মাইল পশ্চিমে 'দারোয়া' নামে স্বল্পসলিলা এক নদী। বর্ষা ঋতু ভিন্ন অন্যসময়ে 'দারোয়া' অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় আকার ধারণ করে। কিন্তু ইহার জল অতিশয় পরিপাক-শক্তিসম্পন্ন। প্রায় পাঁচ মাইল পূর্ব্বে 'তপোবন' নামক একটি পাহাড়। তপোবন প্রকৃতই শান্তি-রসাস্পদ তপোবনের ন্যায় গাম্ভীর্য এবং পবিত্রতাব্যঞ্জক।

বৈদ্যনাথ সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত বলিয়া বৈদ্যনাথবাসীদিগকে সাঁওতাল বলিয়া অনেকের ধারণা জন্মিতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ...এদের প্রচলিত ভাষা 'কায়েতি' ইহা হিন্দি ও বাঙ্গালার সংমিশ্রণ মাত্র। এখানে বহুঘর পান্ডা বসবাস করিতেছেন। ইহারা বহু পূর্ব্বে মিথিলা কনৌকুব্জ এবং বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত। বৈদ্যনাথ দেবের পূজা এবং যাত্রীদের পৌরোহিত্য ব্যতীত ইঁহাদের আর কোন বৃত্তি নাই।...বোধন ওঝা সর্ব্ব-প্রথমে মিথিলা হইতে আসিয়া বৈদ্যনাথ দেবের পূজক হন। 'ওঝা' শব্দ উপাধ্যায় শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। বোধকের পুত্র রঘুনাথ ওঝা গিধোড়াধিপতি পূরণমল্ল সিংহকে বৈদ্যনাথ মন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রার্থনা করেন।

বৈদ্যনাথ মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সদর রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে ছয় ফুট উচ্চ এক প্ল্যাটফরমের উপর তিনটি সমচতুষ্কোণ প্রস্তর দৃষ্ট হয়। ইহাদের দুইটি প্ল্যাটফরমের উপর সোজাভাবে প্রোথিত এবং তৃতীয়টি তদুপরি তোরণাকার স্থাপিত। প্রোথিত প্রস্তরগুলি প্রত্যেকে ১২ ফুট এবং উপরিস্থিত প্রস্তরটি ১৩ ফুট দীর্ঘ ইহার উভয় প্রান্তে মকর মৎস্যের মুখ অঙ্কিত। এই প্রস্তরত্রয় সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ পন্ডিতদিগের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে।...ভিন্ন ভিন্ন মুনির মতের মধ্যে বাবু ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়ের উক্তিই আমরা যথার্থ বলিয়া বিবেচনা করি। তিনি বলেন, দোল পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণকে দোলাইবার জন্য এই প্রস্তরগুলি তোরণাকারে স্থাপিত হইয়াছে। অন্য কোন কারণ থাকিলে মকর মুখের প্রয়োজন ছিল না। অদ্যাপি ঐ স্থানে দোলযাত্রার সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে দোলান হইয়া থাকে।

বৈদ্যনাথ তীর্থের উৎপত্তি শিবপুরাণ এবং পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে। বাহুল্যভয়ে আমরা এস্থলে তাহা উল্লেখ করিলাম না।

এখন বৈদ্যনাথ মন্দিরের কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। প্রাচীর বেষ্টিত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রকান্ড প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে ইহা স্থাপিত। উচ্চতা প্রায় ৭২ ফুট। চতুর্দ্দিকে লক্ষ্মী-নারায়ণ অন্নপূর্ণা পার্ব্বতী কালী-সূর্য্য এবং আনন্দভৈরব প্রভৃতি দেবতার অনেকগুলি মন্দির আছে। কিন্তু তন্মধ্যে বৈদ্যনাথ মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রাচীন। ইহার অভ্যন্তর অন্ধকারময়। দিবসেও ঘৃত-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত থাকে। লিঙ্গ প্রায় চারি ইঞ্চি উচ্চ। উপরিভাগ ভগ্ন ও পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বন্ধুর ছিল। কিন্তু অসংখ্য যাত্রীর হস্তঘর্ষণ এবং অনবরত দুগ্ধ ও বারিধারায় অধুনা তাহা মসৃণ হইয়া গিয়াছে। হিন্দুমতে রাবণের মুষ্ট্যাঘাতে এবং সাঁওতাল মতে বৈজুর যষ্ঠি-প্রহার লিঙ্গ ভঙ্গের কারণ। অঙ্গনে প্রবিষ্ট হইবার তিনটি দ্বার আছে। উত্তর দ্বার দিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই সম্মুখে সুগভীর চন্দ্রকূপ। রক্ষোরাজ রাবণ লিঙ্গের অভিষেক ও অর্চ্চনার জলের জন্য এই কূপ খনন করেন। বৈদ্যনাথ মন্দিরের সম্মুখেই পার্ব্বতীর মন্দির। এই মন্দিরটি জলেতুল, মধ্যস্থলে চতুর্ভূজা গৌরীমূর্ত্তি এবং অষ্টভূজা পার্ব্বতীমূর্ত্তি। দুর্গোৎসবের সময় তাঁহাদের প্রীত্যর্থে বহুসংখ্যক ছাগ ও মহিষ বলি দেওয়া হয়। পশুগুলি বৈদ্যনাথের অপ্রিয়; তজ্জন্য বলি প্রদানের সময় তাঁহার মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করা হয়। হর-পার্ব্বতীর চিরসম্মিলন সূচনার জন্য উভয়ের মন্দিরের চূড়া বস্ত্রদ্বারা সংযোজিত করা হইয়াছে। তারকেশ্বরের ন্যায় বৈদ্যনাথেও 'হত্যা' দেওয়ার প্রথা আছে।

শিবলিঙ্গের অধিষ্ঠান ভিন্ন অন্য একটি কারণেও বৈদ্যনাথ প্রাচীন তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত আছে। দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণে সতী তনুত্যাগ করিলে ভার্য্যা শোকে উন্মত্ত-প্রায় মহাদেব তাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধে স্থাপন করিয়া যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে বিষ্ণুচক্রদ্বারা সেই শব ৫২ ভাগে কর্ত্তিত হইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়। এই স্থানে সতীর উৎকৃষ্টাঙ্গ পতিত হইয়াছিল সুতরাং বৈদ্যনাথ একটি 'মহাপীঠ'স্থান। অদ্যাপি এখানে হৃদয়-পতনস্থানসূচক একটি পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। ইহাকে 'হার্দ্দকুন্ড' বা 'হৃদয়কুন্ড' বলে। পূর্ব্বে এই কুন্ড একটি অপরিস্কৃত দুর্গন্ধময় ডোবা মাত্র ছিল। ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুযাত্রী ব্যতীত অন্য কেহ ইহার জল স্পর্শ করিতেও ইচ্ছা করিত না। তিন বৎসর অতীত হইল (সেই সময় হইতে) রোহিণীর ঘাটওয়ালিনী কস্তুরাকুমারী ইহার পঙ্কোদ্ধার করাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে জল ব্যবহারযোগ্য হইয়াছে।

বৈদ্যনাথ মন্দির ও তৎপার্শ্বস্থ অন্যান্য মন্দিরে কয়েকটি প্রস্তরলিপি লক্ষিত হয়। ...বৈদ্যনাথ মন্দিরের ভিতরের পূর্ব্বদ্বারের উপরে দেবনাগর অক্ষরে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিত আছে।

অচলশশিশায়কোল্লাসিত ভূমি শাকাব্দকে
বলতি রঘুনাথকে হলব পূজ্যকে শ্রদ্ধয়াত্র
বিমলগুণ চেতসা নৃপতি-পূরণে নাচিরং
ত্রিপুরহরমন্দিরং ব্যরচি সর্ব্বকামপ্রদং।
নরপতি কৃত পদ্যমিদং।।

এই শ্লোকে 'বলতি' এবং 'হলব' এই ভাস্করের অসতর্কতা হেতু ঘটিয়া থাকিবেক। দুটি শব্দ অশুদ্ধ। সম্ভবতঃ তাহা তাহা না হইলেও রাজ্যরচনা সমালোচ্য নহে। পন্ডিতের হইলে স্বতন্ত্র কথা ছিল। যাহা হউক উহা পাঠ করিয়া বৈদ্যনাথ মন্দিরের নির্ম্মাণকাল এবং নির্ম্মাতা নির্ণয় করা যাইতে পারে। অচল=৮, শশী=১, শায়ক=৫ এবং ভূমি=১, সুতরাং ১৫১৮ শকাব্দ অথবা ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে রঘুনাথের প্রার্থনায় পূরণমল্লসিংহ ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। রঘুনাথ বৈদ্যনাথের তৎকালীন প্রধান পূজক ছিলেন। বীর বিক্রমসিংহ ১১৬৭ খৃস্টাব্দে গিধোড়ে রাজধানী সংস্থাপন করেন। পূরণমল্ল ইঁহারাই বংশধর।"

—ক্ষপণক

(প্রদীপ ।। আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০৮)

পৃথিবীলোক

ময়ূখ বসু

'স্নেহ নিম্নগামী, জলের মত।'

অর্ধেন্দু এই কথাটা হঠাৎ লিখে ফেললেন। কথাটা নতুন নয়, তিনি কোথায় যেন পড়েছিলেন।

অর্ধেন্দুর বয়স এখন ষাটের ঘরে। কম বয়সে বিয়ে করেছিলেন। চাকরী থেকে অবসর নেবার আগেই তার একমাত্র ছেলে নিরুপম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অর্ধেন্দু সেদিক থেকে রীতিমত ভাগ্যবান। অবসর জীবনে আর কলকাতায় না থেকে তিনি তার পৈতৃক-ভিটেয় আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই থেকে কয়েক বছর তিনি এখানে।

দিনকয়েক হলো নিরুপম তার স্ত্রী, আর বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে এখানে এসেছে। বছর চারেকের বাচ্চা নাতনীকে নিয়ে অর্ধেন্দুর বেশ কাটছে। খুব সকালে তার ওঠা অভ্যেস। বাড়ির সব্জি ক্ষেতে একটু পায়চারি করে তিনি নিজের হাতে ক্ষেতের কাজে লেগে যান। একটু বেলায় তার নাতনী উঠলে তাকে সব্জি ক্ষেতে নিয়ে আসেন। তারপর সারাদিন নাতনীকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। দুপুরবেলা অর্ধেন্দু কখনো ঘুমোন না।

বেলায় আসা খবরের কাগজ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলেন তিনি, তারপর তার চিঠি লেখার প্যাডে আঁকিঝুঁকি কাটতে কাটতে ঐ কথাটা কখন যেন এক সময় লিখে ফেললেন।

নিরুপমকে এতদিন চিঠি লিখে লিখে একবারও এখানে আনতে পারেন নি। অফিসের এ্যানুয়াল লিভে নিরুপম বৌ-মেয়ে বগলদাবা করে হিল্লীদিল্লী পাড়ি দেয়। অথচ কলকাতার এত কাছে তাদের পৈতৃক বাড়িতে দিনকয়েকের জন্যে আসে না। অর্ধেন্দুর এই সংসার...ছেলে...স্ত্রী এই সবকিছু বড় অর্থহীন ঠেকে। বেশ কয়েক বছর আগে তার স্ত্রী গত হয়েছেন। স্ত্রীর সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক ছিল না। ছেলেকে নিয়ে তার স্ত্রী নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। অর্ধেন্দুর কি ছেলের উপর টান ছিল না। সেই যুদ্ধের বাজারে যুবক অর্ধেন্দু শিশুপুত্রের গ্লুকোজের জন্যে অনেকবারই লাইন দিয়েছিলেন। ছেলে হওয়ার পর থেকে তার স্ত্রী নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। যুবক অর্ধেন্দুর দিকে ফিরেও তাকান নি। এর জন্যে অর্ধেন্দুর ছেলের ওপর কি কোন ঈর্ষা ছিলো? অর্ধেন্দু সব কিছু ভুলেছিলেন ছেলের জন্যে। অফিস থেকে প্রথম বাসে চেপে তিনি বাসায় ফিরতেন। ছেলের সামান্য অসুখে তিনি সারারাত স্ত্রীর পাশে জেগেছেন।

অতি শৈশবে প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে যৌবনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ...অর্ধেন্দু এই বয়সে অনেক কিছু দেখেছেন। রোজ সকালে সংবাদপত্রের শিরোনামায় জ্বলজ্বলে কত অক্ষরের সমাবেশ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের ওপর তার সব দাবী তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

অর্ধেন্দু ঘরের সামনে বাঁধানো দাওয়ায় এসে বসলেন। পৈতৃক গ্রাম বালক অর্ধেন্দুর অনেক স্মৃতি বহন করে। এই দাওয়ায় তিনি তার দাদু অবনীমোহনের সঙ্গে অনেক রাত শুয়েছেন। একটা রাতের কথা তার বড় বেশী করে মনে হয়। তখন গ্রীষ্মকাল। ঘরের মধ্যে ভ্যাপসা গরমে টিকতে না পেরে দাদু-নাতিতে

দাওয়ায় এসে শুয়েছেন। বাইরে সমস্ত চরাচর জুড়ে দিনমানের মত জ্যোৎস্না। কাকেরা ভোর হয়ে গেছে ভেবে সেই মাঝরাতেই থেকে থেকে ডেকে উঠেছিল। বালক অর্ধেন্দু দাদুর বুকে মুখ গুঁজে শুয়ে। কে যেন তাকে বলেছিলো, এই রকম ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাতেই তেঁনারা বেড়াতে বের হন। এমন সময় দাদু হাঁক দিয়ে উঠলেন 'কে যায়!' বালক অর্ধেন্দু ভয়ে ভয়ে দাদুর বুক থেকে মুখ তুলে তাকালো। পুকুরের পাড় ঘেঁসে একটা ছায়া-শরীর দুটো ধবধবে গরু নিয়ে চলেছে। দাদু আবার হাঁক দেয়—'কে যায়।'

এবারে উত্তর আসে—'আমি সাতবেড়ের পঞ্চানন গড়াই।'

—'তা এত রাতে কোথায় যাওয়া হয়েছিলো।'

—'পেঁজের হাটে গরু কিনতে।'

অর্ধেন্দু অতি শৈশবে তার বাবা-মাকে হারিয়েছিলেন। এই দাদুই তখন তার সব। বালক অর্ধেন্দু দাদুর কোলে পিঠে ধীরে ধীরে বড় হয়েছেন, লেখাপড়া শেষ করে চাকরীতে ঢুকেছেন; তারপর কলকাতায় যুবক অর্ধেন্দু স্ত্রী-পুত্র নিয়ে জাঁকিয়ে ঘর-সংসার করেছেন। দাদুর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে অর্ধেন্দু ছুটে এসেছিলেন তার গ্রামে। তিনি দাদুর শেষ কাজে ত্রুটি রাখেন নি। শেষের দিকে দাদুর ওপর তার তেমন আকর্ষণ ছিলো না। দাদুর মৃত্যুর পর তার মনে একটা অপরাধবোধ জেগেছিলো। কিন্তু সেই পর্যন্তই! অথচ তার দাদু শেষ দিন পর্যন্ত তাকে স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন।

আজকাল অর্ধেন্দুর মাথায় এই কথাগুলো ঘোরাফেরা করে। তার বারবার মনে হয় এই সংসার, এই বন্ধন বড় অর্থহীন। কিন্তু তিনি কি তাদ ছেড়ে, তার নাতনীর কথা ভুলতে পারেন? একটা প্রবল আকর্ষণবোধ তাদের ঘিরে!

একটা নরম হাত তিনি তার পিঠে অনুভব করলেন। তার নাতনী ঘুম ভেঙে উঠেছে। তিনি তাকে কোলে বসিয়ে দেখলেন নাতনীর গায়ে একটা পাতলা জামা। তিনি ব্যস্ত হয়ে ছেলে-বৌয়ের ঘরের দিকে গেলেন। ছেলে নিরুপম তখনো ঘুমিয়ে। পুত্রবধূ ঘরে নেই, বোধহয় কলতলায়। তিনি আলনা থেকে নাতনীর পুলওভারটা নিয়ে তাকে পরিয়ে দিলেন। এবার তিনি নাতনীর হাত ধরে বেড়াতে বের হলেন। ইস্কুলের সামনের বড় মাঠের একপাশে ছেলেরা ভলিবল খেলছে। এই মাঠে কিশোর অর্ধেন্দু কত ফুটবল খেলেছেন। সে সময় তার খুব নামডাক ছিলো, এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে তাকে খ্যাপ করে খেলতে নিয়ে যেত। পুরোনো ঘরের দেয়ালে তিনি কত মেডেল ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। বহু দিন পর্যন্ত সেই মেডেলগুলো তার কৈশোরের কীর্তিকে বহন করে এসেছে। নাতনী তুতুলের কথায় তিনি যেন কৈশোর থেকে ফিরে এলেন।

—'দাদু ঐ পাখিটা কি পাখি?'

অর্ধেন্দু দেখলেন একটা কাঠঠোকরা পাখি মাঠের ধারের নারকেল গাছের গুঁড়ি ঠোকরাতে ঠোকরাতে উপরে উঠছে। তিনি বললেন—'ওতো কাঠঠোকরা। কেমন ঠোঁট দিয়ে গাছের গায়ে ঠোকরাচ্ছে।'

তুতুল বললো—'কি সুন্দর দেখতে, ঐ পাখিটা আমায় ধরে দেবে।'

নাতনীর আধো আধো কথায় কিসের যেন বন্ধন। শিশু নিরুপম এরকম কথা বলতো। অর্ধেন্দু তার যৌবনে ফিরে গেলেন। নিরুপমের জন্মের সময়। সেবার কলকাতায় ভীষণ গরম পড়েছিলো। শিশু নিরুপম দিনরাত গরমে কষ্ট পেতো। তিনি তার বাসায় প্রথম হাওয়া পাখা আনলেন। সুইচ টিপলেই হাওয়া সারা ঘর জুড়ে।

নাতনী তুতুল আধো আধো সুরে বায়না ধরে—

'দাদু কাঠঠোকরা ধরে দাও না।'

তিনি সস্নেহে বললেন 'কাঠঠোকরা কেউ পোষে না। তোর জন্যে আমি ময়না কিনে দেবো। দেখবি তোর সাথে কেমন কথা বলবে।'

দিনের আলো কমে এসেছে। দূরে স্টেশনের আলো জ্বলে উঠছে। তিনি স্টেশনের পথে দ্রুত পায়ে চলতে শুরু করলেন। স্টেশনের সামনে মনোহারী দোকান, তিনি নাতনীর জন্যে এক মুঠো লজেন্স কিনলেন। নাতনীকে কোলে নিয়ে এতটা পথ দ্রুত হেঁটে অর্ধেন্দু বেশ হাঁপিয়ে গিয়েছেন। এবার তিনি তুতুলকে কোল থেকে নামিয়ে তার হাত ধরে হেঁটে চললেন। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। কুয়াশা গাঢ় হয়েছে চারপাশে। তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে নাতনীর মাথায় ভালো করে বাঁধলেন, পাছে হিম পড়ে নাতনীর ঠাণ্ডা লাগে। তিনি ইস্কুলের খেলার মাঠ পেরিয়ে দত্তপাড়ার মধ্যে দিয়ে আড়াআড়ি পথ ধরলেন।

জীর্ণ দত্তবাড়ি হা হা করছে। দত্তরা কেউ এখানে থাকে না। সবাই কলকাতায়। অর্ধেন্দুর বালক...কৈশোরের স্মৃতি এই বাড়িকে কেন্দ্র করে। তার দাদুর বাল্যবন্ধু রঘু দত্ত জীবনের শেষদিন পর্যন্ত একা একা এখানে কাটিয়েছেন। শেষে ঐ পোড়ো বাড়িতেই তার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল দুদিন পরে। তখন ধান কাটার সময়। সবাই ধান কাটতে মাঠে। অর্ধেন্দু গ্রামে এসেছিলেন ধান সংগ্রহ করতে। দাদুর মৃত্যুর পর তিনি বছরে দুবার গ্রামে আসতেন। একবার চাষের আগে জমিজমা বীজ বন্দোবস্ত করতে আর একবার ধান কাটার সময়। রঘু দত্ত সবার অজ্ঞাতসারে মরে পড়েছিলেন তার পৈতৃক ভিটেতে। যখন মৃতদেহের হদিস হয়েছিলো, তখন রঘু দত্তের সারা শরীরে পচন ধরেছে। সেই দৃশ্য অর্ধেন্দু এখনো যেন চোখের সামনে দেখতে পান। রঘু দত্ত জলচৌকিতে একটা খাটে শুয়ে আছে দুচোখ ঠেলে বেরিয়ে এসে উপরের কড়িকাঠে স্থির। খাটের পায়া বেয়ে সার বেঁধে ডেঁয়ো পিঁপড়ে উঠছে শরীরে।

অর্ধেন্দুর মনে হয় যে হয় তো তিনিও একদিন রঘু দত্তর মত মরে পড়ে থাকবেন: ডেঁয়ো পিঁপড়েরা তার সারা শরীরে চলে-ফিরে বেড়াবে। তার আজকাল নিজেকে বড় একা লাগে। নিরুপমরা এখানে এসেছে তাই দিনগুলো বেশ কাটছে। আবার এখন থেকেই তার বড় একা লাগছে......আজ বাদে কাল ওরা চলে যাবে ভেবে। তিনি যদি আজকালের মধ্যে মরে যেতে পারতেন?

দূরে অর্ধেন্দু বাড়ির আলো দেখতে পেলেন। আজ ফিরতে বেশ সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ওরা হয়তো চিন্তা করছে। ছোট্ট তুতুল আর হাঁটতে পারছে না। অর্ধেন্দু অনেকটা পথ তুতুলকে কোলে নিয়ে হেঁটেছেন। তিনি বেশ ক্লান্তি বোধ করছেন। তবু তিনি তার নাতনীকে কোলে তুলে নিলেন। শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে বিঁধছে। তিনি গায়ের চাদর দিয়ে তুতুলকে ঢেকেঢুকে নিয়ে চললেন। অর্ধেন্দুর আজকাল প্রায়ই তার দাদু অবনীমোহনের কথা মনে পড়ে। তার শৈশবের কথা। বালক অর্ধেন্দু সারাদিন ইস্কুল, খেলার মাঠ, নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। দিনের শেষে তিনি যেন কিসের অভাববোধ করতেন। দাদু অবনীমোহনকে তখন তার বড় প্রয়োজন হতো। অর্ধেন্দু তার যৌবনে যে দাদুকে হারিয়েছিলেন, সেই দাদু আজ জীবনের শেষভাগে তাকে আবার কাছে টানছেন। তার মাথার ওপর কেউ নেই একথা ভাবতে নিজেকে বড় অসহায় লাগে। অথচ তার যৌবনকালে তার জীবনের প্রথম ও শেষ অভিভাবককে হারিয়ে তিনি একটুকু বিচলিত বোধ করেননি।

বাড়ির সামনের দাওয়ায় তার ছেলে-বৌ দাঁড়িয়ে। তাদের চোখেমুখে দুশ্চিন্তার রেখা। অর্ধেন্দু এতটা পথ নাতনী কোলে দ্রুতপায়ে হেঁটে অবসন্ন বোধ করছিলেন। তিনি ঘরে গিয়ে বসে পড়লেন। নিরুপম ঝুঁকে পড়ে তাকে বললো—'বাবা, শরীর খারাপ লাগছে?'

কী নিস্পৃহ গলা। যেন বলতে হয় তাই বলা। অর্ধেন্দু একটু জিরিয়ে সময় নিয়ে বললেন—

'না......শরীর ঠিকই আছে।'

অর্ধেন্দু দারুণ হাঁপিয়ে গেছেন। এই শীতে তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

তুতুলের মুখে লজেন্স। তুতুল নিরুপমকে আধো আধো গলায় বললো—'দাদু আমায় অ্যাত্তো লজেন্স কিনে দিয়েছে।'

তুতুল তখ মুঠো ভর্তি লজেন্স নিরুপমকে দেখাচ্ছে। নিরুপম তুতুলকে কাছে আদর করে একটা লজেন্স চাইছে। তুতুল কিছুতেই দিচ্ছে না।

এখন অর্ধেন্দুর ভীষণ দুর্বল লাগছে, মাথাটা টলছে বুকের বাঁ পাশে তীব্র ব্যথা অনুভব করছেন। চোখের সামনে তারা যেন একটা বড় কালো পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে। তার পাশে কখন যেন তার দাদু অবনীমোহন এসে দাঁড়িয়েছেন। তার মনে হলো তারা তিন পুরুষ এই ঘরে।

অবনীমোহন— অর্ধেন্দু— নিরুপম। তাদের সমবেত [illegible] দৃষ্টি তুতুলের ওপর।

পশ্চিমী সমাজে যৌন চিন্তা

মানুষের শরীরের একটি অঙ্গ এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যৌন চেতনাকে আমরা কোনো রকমেই অবহেলা করতে পারি না। এসম্বন্ধে সম্প্রতি ইউরোপ-আমেরিকায় নতুন ধরনের চিন্তাধারা দেখা যাচ্ছে। রুশ-মার্কিনরা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দুই বিপরীত মেরুতে বসে। সম্প্রতি দুই দেশেই যৌন চিন্তা নিয়ে নানা রকমের গবেষণা হয়েছে। সমাজে বা ব্যক্তিজীবনে এর প্রভাব কোন্ দিকে যাচ্ছে, তারই গবেষণালব্ধ ফলাফলের কথা বলছি।

প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাই বলি। আমেরিকায় এখন চলছে 'উইমেনস্ লিবারেশান মুভমেণ্ট'। অল্প কথায় 'লিব' আন্দোলন। নারী-মুক্তি আন্দোলনের মূল কথা পুরুষের মতন ও-দেশের নারীরা চাইছে সমান অধিকার। মায় যৌন জীবনেও। তাদের বক্তব্য, পুরুষরা যেমন যৌন-স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে, তেমনি করবে নারীরা। কথাটা শুনতে খারাপ হলেও মার্কিন নারীদের লিব আন্দোলনের অধিকর্তারা বলছেন বহু পুরুষ যেমন অশাস্ত্রীয় যৌনজীবন যাপন করেন, আমরা যাকে বলি যৌনবিকার, তেমনি জীবনযাপন করতে চান মার্কিন 'লিব' আন্দোলনের মহিলারা।

মার্কিন 'লিব' আন্দোলনের বহু মহিলা আজকাল মুক্ত যৌন জীবন যাপন করছেন। এঁদের কেউ সমকামী, কেউ উভয়কামী। এই নতুন সামাজিক সমস্যা নিয়ে কিছু মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী বই প্রকাশ করেছেন। এঁদের গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, কেবলমাত্র 'লিব' আন্দোলনকারী নারীদের মধ্যেই সমকামী ও উভয়কামী অথবা দুয়ের সংখ্যা বাড়ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও এই সংক্রামক রোগ ছড়াচ্ছে। তাদের যুক্তি হল হিন্দু, গ্রীক, রোমান পুরাণে সমকামী-উভয়কামীর উল্লেখ আছে। সুতরাং এসব নতুন নয়। জুলিয়াস সিজার নাকি সম ও উভয়কামী দুই-ই ছিলেন। নৃ-বিজ্ঞানীরা বলছেন নিউগিনির কুকুকু আদিবাসী সমাজে সব রকমের যৌন-জীবন চলে। তাদের সমাজে তো বে-আইনী নয়। মার্কিন সমাজ-বিজ্ঞানীরা এখন প্রশ্ন তুলেছেন, আমরা যাকে যৌনবিকার বলি অর্থাৎ সমকাম, উভয় কাম এবং একই সঙ্গে বিপরীত কাম সুস্থ মনের বিকাশ কি না। এই প্রশ্ন নতুন নয়। কয়েক হাজার বছর ধরে যৌনবিকার চলে আসছে। তবে এটি ব্যাপক নয়। কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এবং সেটি সীমাবদ্ধ রাখাই সমীচীন বলে তাঁরা মনে করেন।

রুশ দেশে বহুকাল যৌন আলোচনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত না। আজকাল সরকারী অনুমতি অনুসারে এসম্বন্ধে বেশ কিছু বই সেখানে প্রকাশিত হয়েছে। তবে যৌনবিকারকে সোভিয়েত সরকার প্রশ্রয় দেন না। এসম্বন্ধে তাঁরা খুবই কঠোর।

নারীর যৌন-সমস্যা নিয়ে সম্প্রতি একটি বই প্রকাশিত হয়েছে রাশিয়ায়। বইটি লিখেছেন লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ এম শিবয়াদোশ; এ-ধরনের বই সচরাচর রাশিয়ায় প্রকাশিত হয় না। রুশ মহিলাদের ওপর অনেক সমীক্ষা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার বহু অজ্ঞাত খবর দিয়েছেন অধ্যাপক শিবয়াদোশ্। এই বইটি লেখা হয়েছিল ডাক্তারদের জন্য, কিন্তু বইটি ছাপা হয়ে বাজারে বেরুবার মাত্র কয়েকদিনে এক লাখ কপি বিক্রি হয়ে যায়।

অধ্যাপক শিবয়াদোশ্ বলেছেন যে নর-নারীর মিলন যে-কোনো জায়গায় এবং যে-কোনো সময়ে হতে পারে। তবে দিনে একবার অথবা রাত্রে একবারের বেশী হওয়া উচিত নয়। এবং দেখতে হবে মিলনের পরে যেন বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করা হয়।

এই বইয়ে বলা হয়েছে বৃটিশ বা ফরাসী মহিলাদের তুলনায় রুশ মহিলারা অনেক ভাগ্যবতী। যৌনজীবনে রুশ-মহিলারা যত বেশী তৃপ্তিলাভ করেন তার এক-তৃতীয়াংশ তৃপ্তি পান না বৃটিশ ও ফরাসী মহিলারা।

বইটিতে রুশ যৌনজীবনের অনেক অকথিত বিষয় আলোচিত হয়েছে, কিন্তু নারীদের সমকামিতা একেবারেই অনুল্লিখিত। অন্য যৌনবিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রুশ অধ্যাপক বলেছেন যে, যৌনজীবন মানুষের ব্যক্তিগত মনোবৃত্তি ও তার নীতিগত মনোভাবের ওপর নির্ভর করে। ওটা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। সবাইকে এক পর্যায়ে ফেলা যায় না। যারা বিয়ের আগে যৌন জীবনযাপন করে, তাদের অনেকেই হয় মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে, নয়তো তা ঘটেছে অসুস্থ সামাজিক পরিবেশের ফলে।

যৌন জীবনে যেসব নর-নারী খুবই ঠাণ্ডা প্রকৃতির, তাঁদের জন্যে রুশ অধ্যাপক ডাক্তারী নির্দেশে বলেছেন তাঁরা যেন গরম দেশে বেড়াতে গিয়ে উষ্ণ প্রস্রবণের জলে স্নান করেন এবং কাদা মেখে স্নান করেন। তাহলে ঠাণ্ডাভাব কাটবে।

আমাদের সমস্যা জনসংখ্যা বাড়ছে। যাতে কমে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আমাদের সরকার। কিন্তু জার্মানীতে এই সমস্যা অত প্রকট নয়। তাই তাঁরা যৌন জীবনে যারা ঠাণ্ডা প্রকৃতির, তাদের 'সাধারণ' করে তোলার জন্যে চিকিৎসা-পদ্ধতি বাতলেছেন।

হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজের পত্রিকায় পুরুষের যৌন-ক্ষমতা কতখানি থাকা উচিত সে-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। পরিসংখ্যান থেকে উদ্ধৃতি করে বলা হয়েছে, জার্মানীতে কুড়ি থেকে ত্রিশ বছরের নর-নারী সপ্তাহে যৌন-মিলনে লিপ্ত হয় ২-৫ বার, ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের লোকেরা সপ্তাহে দু-বার চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের বয়সের লোকেরা সপ্তাহে ১-৮ বার এবং পঞ্চাশের ওপরের লোকেরা সপ্তাহে একবার। কিন্তু সরাই সমান নয়। কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে যে হিসেব দেওয়া হয়েছে, তার বাইরে বেশ কিছু লোক ওই হিসেবের চেয়ে বেশী বা কম যৌন-মিলন করে থাকে।

ঠাণ্ডা প্রকৃতি বা কম ক্ষমতাসম্পন্ন সম্বন্ধে এতকাল যেসব ধারণা ছিল, তার সবটাই ঠিক নয়। দেহযন্ত্রের গণ্ডগোলের জন্য যতখানি দায়ী করা হয়, তার চেয়ে বেশী দায়ী হল মন। এখানে মনটাই বড়। সুতরাং মানসিক চিকিৎসায় সে-রোগ সারে।

মানসিক দুর্বলতার দরুন যারা যৌন জীবনে অশান্তি ভোগ করেন, অথবা যারা অক্ষম বলে অনুতপ্ত, ব্যর্থ যৌন জীবনের দরুন যেসব সংসার ভেঙে গেছে তাঁদের ওপর গবেষণা চালিয়েছেন মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাকস্ প্ল্যাঙ্ক ইন্সটিট্যুট অব সাইকিয়াট্রির ডঃ গৎস্ ককোট্। ডঃ ককোট্ বলেছেন যে যৌন জীবনে অক্ষমতার কারণ প্রধানতঃ মানসিক। ভয় এবং অহেতুক আতঙ্কের জন্য বহু নর-নারী যৌন জীবনে অশান্তিতে ভোগেন। এঁদের জন্যে তিনি নানা রকমের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। যদি স্বামী এই রোগের চিকিৎসার জন্য সেখানে যান, তাহলে তাঁর স্ত্রীকেও আনতে বলা হয়।

এই সমীক্ষায় [illegible] হয়েছে যে, অজ্ঞতা এবং অতিরিক্ত সম্ভোগ থেকেও নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে। একালের অতিরিক্ত যৌন-স্বাধীনতা থেকে অনেক রকমের মানসিক রোগ দেখা দিচ্ছে। যৌন অক্ষমতায় যেসব কারণ রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল ভয় ও আতঙ্ক। অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকলে অনেকেই এই ধরনের মানসিক রোগে ভোগেন। তাঁদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের অনেক রকমের চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন মনোবিজ্ঞানীরা। কেমন করে অনুরাগ বাড়াতে হয়, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন করে সহজ করে তোলা যায় তার জন্যে শিক্ষার দরকার। জার্মান ডাক্তাররা তাই নিয়ে গবেষণ করছেন এবং নির্দেশও দিচ্ছেন।

যৌন শিক্ষা এখন আর গোপনীয় নয়। গোপনীয়তার জন্য বহু স্বামী-স্ত্রী অশান্তিতে ভোগেন। তাঁদের মানসিক চিকিৎসার জন্য জার্মান ডাক্তাররা নতুন পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। মানসিক চিকিৎসার পর অনেকেই সহজ জীবন শুরু করেছেন। সংসারের অশান্তিও দূর হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডঃ ককোট্।

—দিলীপ মালাকার

(১) অতি পরিচিত দৃশ্য : জোনাকি ও তার আলো

বিজ্ঞানের কথা

আলোকবিকাশী প্রাণী

আমাদের চোখের দেখার জগতে এবং গভীর সমুদ্রে এমন অনেক প্রাণী আছে যাদের বলা যেতে পারে আলোক-বিকাশী। অর্থাৎ, এই সমস্ত প্রাণীর শরীর থেকে আলো নির্গত হয়। আলোক-বিকাশী প্রাণীর সবচেয়ে পরিচিত দৃষ্টান্ত অবশ্যই জোনাকি। আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামের দিকে, আরো বিশেষ করে ঝোপঝাড়ে ও বাঁশবনে প্রচুর জোনাকি দেখতে পাওয়া যায়। অন্ধকার রাতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একরাশ আলোর অনবরত দপদপ করার দৃশ্য যে-কোনো মানুষকে বিহ্বল করতে পারে। এই বিহ্বলতা নিয়েই প্রত্যেক দেশের মানুষ জোনাকি নিয়ে কত যে গল্প বানিয়েছে, কত যে কল্পনা করেছে। জোনাকির উল্লেখ পাওয়া যায় পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্যে, আমাদের দেশেরও। জোনাকির আলোর সৌন্দর্য নিয়ে কবিরা সেই আদিকাল থেকেই কবিতা লিখে আসছেন।

তবুও বলতে হবে, এই শতকের বিশের দশকের আগে পর্যন্ত মানুষ দেখতে পেয়েছিল অল্প কয়েকটি মাত্র আলোক-বিকাশী প্রাণী। কেননা তখনো পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টির পরিসর বিস্তৃত ছিল মাত্র ভূ-ভাগের এলাকায়—সমুদ্রের গভীরে নয়। এখনকার জ্ঞান নিয়ে বলতে পারা যায় ভূ-ভাগের এলাকায় আলোক-বিকাশী প্রাণীর সংখ্যা সমুদ্রের গভীর তলদেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম—শুধু কম নয়, যৎসামান্য। এই শতক শুরু হবার আগে পর্যন্ত (আরো সঠিকভাবে বলতে হলে বেথিস্ফিয়ার বা সমুদ্রের গভীরে নামার জন্য গোলক-সদৃশ বিশেষ একটি আয়োজন উদ্ভাবিত হওয়ার আগে পর্যন্ত) সমুদ্রের গভীর তলদেশ ছিল মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অজানা। দৃশ্যমান প্রাণিজগৎ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান নিয়ে মানুষ তখন ধারণা করে নিয়েছিল যে সমুদ্রের গভীর তলদেশে কোনোপ্রকার প্রাণী থাকা সম্ভব নয়। ধারণাটি আমূল বদলাতে হল এই শতকের বিশের ও তিরিশের দশকে যখন বেথিস্ফিয়ারের মধ্যে অবস্থান করে সমুদ্র-বিজ্ঞানীরা কয়েকশত মিটার পর্যন্ত সমুদ্রের তলদেশে নামতে পারলেন। সমুদ্রের গভীর তলদেশ সেই প্রথম মানুষের চোখ দিয়ে দেখা। বিজ্ঞানীরা আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করলেন, বেঁচে থাকার পক্ষে দুঃসাধ্য এই জগতেও অজস্র প্রাণী বিদ্যমান। আরো আবিষ্কার করলেন, তিনশো মিটার বা তারও বেশি গভীরে বিদ্যমান প্রায় সকল প্রাণী আলোক-বিকাশী।

সমুদ্রের এই বিপুল গভীরতায় চাপ হয়ে থাকে প্রচণ্ড উত্তাপ হিম-শীতল—সম্ভবত এই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকতে পারে কেবল আলোক-বিকাশী প্রাণীরাই। এই জগতে বিবর্তনের শক্তি আলোক-বিকাশী প্রাণীর পক্ষে। তাই যদি হয় তাহলে একথা স্বীকার্য যে আলোক-বিকাশের ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া এই প্রাণীদের টিঁকে থাকার জন্য জরুরি প্রয়োজন। উপরিতলে বা অগভীর তলেও আলোক-বিকাশী প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায় বটে কিন্তু গভীর সমুদ্রে বিদ্যমান সংখ্যার তুলনায় খুবই কম।

•

বেশির ভাগ আলোক-বিকাশী প্রাণীর শরীরে আলো তৈরি হওয়ার রাসায়নিক প্রকরণটি প্রায় একই রকমের, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে আলোর নিঃসারিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদানও অভিন্ন। এক্ষেত্রে আলো উৎপন্ন হয় অক্সিডেশন বা জারণের ফলে। রাসায়নিক উপাদানটি হচ্ছে একটি জৈব যৌগিক পদার্থ নাম লুসিফেরিন। তার সঙ্গে অক্সিজেনের ক্রিয়া ঘটে লুসিফেরাজ নামে একটি এনজাইমের (এনজাইম হচ্ছে জীবন্ত কোষের মধ্যে উৎপন্ন বৃহৎ একদল প্রোটিন যার ভূমিকা জীবনরক্ষাকারী রাসায়নিক ক্রিয়ায় সহায়কের) উপস্থিতিতে। এমনি-ধারা জারণের ফলস্বরূপ পাওয়া যায় আলো, কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল ও অক্সিলুসিফেরিন।

লুসিফেরিন-এর অক্সিজেন-যোগ হবার ফলে এই যে অক্সিলুসিফেরিন তা থেকেই নিঃসৃত হয় তেজ। অক্সিলুসি-ফেরিন অণুর মধ্যে তা ধৃত থাকে সেকেন্ডের একশো-কোটি ভাগের এক ভাগ সময়কাল মাত্র—এবং এই সময়টুকুতে অক্সিলুসিফেরিনের অবস্থা হয় ইলেক-ট্রনিক দিক থেকে অতিমাত্রায় উত্তেজিত বা অতিমাত্রায় তেজসম্পন্ন। এই তেজ নিঃসৃত হয়ে এমন আলোক সৃষ্টি করে যার অবস্থান বর্ণালীর দৃশ্যমান অংশে। অর্থাৎ সাদা চোখে যা দেখা যায়। আরো একটি আশ্চর্যের বিষয় নিঃসৃত এই তেজের সবটাই—কথাটার ওপরে জোর দিতে চাই—সবটাই পাওয়া যায় আলো হিসেবে, সামান্যতম অংশও উত্তাপ হিসেবে নয়। জোনাকির আলোকে বা আলোক-বিকাশী প্রাণীর আলোকে তাই বলা হয় 'শীতল আলো'।

•

বিষয়টি আশ্চর্যের বইকি। নিঃসারিত তেজের সম্পূর্ণ অংশকে আলো হিসেবে পাওয়ার দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় নেই। যেমন,

আলোক বিকাশী উদ্ভিদ

জোনাকি। তার আলোয় নিঃসরিত তেজের সবটাই আলো হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে—উত্তাপ হিসেবে একেবারেই নয়। 'কুশলতা' শব্দটি যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে বলা যেতে পারে তেজকে আলোয় রূপান্তরিত করার কুশলতা জোনাকির একশোর মধ্যে একশো। সে-জায়গায় একটা বাতির কুশলতা একশোর মধ্যে মাত্র দশ। অর্থাৎ, আলো পাওয়াটাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে বাতির বেলায় নিঃসৃত তেজের একশো ভাগের নব্বই ভাগ খোয়া যাচ্ছে উত্তাপ হিসেবে।

বর্তমানে দুনিয়াজোড়া যে সংকট চলছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে তেজকে আলোয় রূপান্তরণের এই সামগ্রিক ক্ষমতা অবশ্যই বিশেষ অনুশীলনের বিষয়।

মূলে রয়েছে একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া, যে-কথা আগে বলা হয়েছে। সবিশেষভাবে বলতে হলে, অক্সিজেন-যোগের প্রক্রিয়া। অক্সিজেন যুক্ত হচ্ছে লুসিফেরাজ নামে একটি জৈব যোগ পদার্থের সঙ্গে। অতএব লুসিফেরিন ও লুসিফেরাজের জন্য একটি সন্ধানকার্য চালিয়ে দেখার প্রয়োজন ঘটে।

এই দুটি পদার্থের রাসায়নিক গড়ন বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা নয়। কিন্তু সন্ধানকার্য চালাতে গিয়ে দেখা গেল গড়নের দিক থেকেও প্রজাতিতে প্রজাতিতে যথেষ্ট ফারাক। আবার একেবারে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর ক্ষেত্রে বহু ক্ষেত্রে মিলও পুরোপুরি। এ ব্যাপারটি কেন হচ্ছে তাও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণসাপেক্ষ।

এই বিশ্লেষণ থেকেই হয়তো জানা যাবে, কোন কারণে কোনো কোনো উদ্ভিদ, কোনো কোনো জীবাণু, কোনো কোনো ছত্রাক ইত্যাদি হয়ে থাকে আলোক-বিকাশী। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মাছ এই বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন। কারণটি বিশেষভাবে জানা দরকার, কেননা এমনিতে মনে হতে পারে আলোক-বিকাশী হওয়ার পিছনে কোনো নিয়ম বা শৃঙ্খলা নেই, ব্যাপারটি ঘটেছে নিতান্তই খাপছাড়াভাবে। একজন বিজ্ঞানী চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন কতখানি খাপছাড়া। মনে করা যাক, প্রকাণ্ড একটি ব্ল্যাকবোর্ডে জীবন্ত সমস্ত প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রাণীর নাম লেখা হল। তারপরে একমুঠো ভিজে বালি ছোঁড়া হল ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে। এক্ষেত্রে বালির দানা নিতান্ত খাপ-ছাড়াভাবেই কতকগুলো প্রজাতির নামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা। যে-যে প্রজাতি এমনিভাবে বালির দানার দ্বারা চিহ্নিত হচ্ছে সেগুলোই যেন হয়ে উঠছে আলোকবিকাশী। এমনি খাপছাড়াভাবেই যদি না হবে তাহলে এমনটি কেন দেখা যায় যে প্রায় সমভাবাপন্ন দুই প্রজাতির একটি আলোক-বিকাশী, অপরটি নয়?

যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে আলোকের বিকাশ, সেটিকেও গোড়ার দিকে মনে হয়েছিল প্রজাতি থেকে প্রজাতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু সামুদ্রিক প্রাণীদের নিয়ে কাজ হবার পরে এখন জানা গিয়েছে, কথাটা ঠিক নয়। অন্ততপক্ষে সামুদ্রিক প্রাণীদের ক্ষেত্রে আলোক-বিকাশের রাসায়নিক ক্রিয়ায় যথেষ্ট মিল।

*

জাপানের উপকূলে আলপিনের মাথার মতো আকারের একটি প্রাণী প্রচুর পাওয়া যায়, নাম সাইপ্রিডিনা। ক্ষুদে এই প্রাণীটি আলোক-বিকাশী হয়ে থাকে। লুসিফেরিন ও লুসিফেরাজ মজুদ থাকে এই প্রাণীর শরীরে পৃথক পৃথক গ্ল্যান্ডের কোষে। এক ধরনের কোষে ভর্তি থাকে বর্ণহীন দানা, অপর ধরনের কোষে হলদে দানা। ব্যাঘাতের কারণ ঘটলে এই প্রাণীর শরীর থেকে উভয় দানা সমুদ্রের জলে নিঃসৃত হয়, তারপরে মিশে ও গলে যায়। ফলে স্থানিক পরিসরের মধ্যে বেশ ঘনভাবেই তৈরি হয়ে যায় লুসিফেরিন ও লুসিফেরাজ। তা থেকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে নীলাভ দ্যুতির তীব্র একটি মণ্ডল।

সাইপ্রিডিনার লুসিফেরিন গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে তৈরি হয়েছে। এই কৃত্রিম লুসিফেরিনের সঙ্গে সাইপ্রিডিনার শরীর থেকে প্রাপ্ত আসল লুসিফেরাজের মিশ্রণ ঘটিয়ে দেখা গিয়েছে—যেমনটি স্বাভাবিকভাবে হতে দেখা যায় ঠিক তেমনটি হচ্ছে টেস্ট-টিউবের মধ্যেও। তেমনি তীব্র নীলাভ দ্যুতি।

সাইপ্রিডিনার লুসিফেরিনের রাসায়নিক কাঠামো আলোক-বিকাশী জীবাণু ও জোনাকির লুসিফেরিনের কাঠামো থেকে সুস্পষ্টভাবেই পৃথক। ফলে দেখা গেল সাইপ্রিডিনার লুসিফেরিনের সঙ্গে জীবাণু

বা জোনাকির লুসিফেরাজের কোনো ক্রিয়া নেই এবং তা থেকে কোনো আলোও নেই। অর্থাৎ, ধারণা হবার কারণ ঘটল যে লুসিফেরিন ও লুসিফেরাজ প্রজাতিতে প্রজাতিতে এতই ভিন্ন যে একের সংগে অপরের ক্রিয়া ঘটানো সম্ভব নয়।

কিন্তু সম্প্রতি এই ধারণা বদলাতে হয়েছে। জাপানের কাছে অগভীর সমুদ্র থেকে পাওয়া দু-ধরনের মাছের বেলায় দেখা গেল, তাদের লুসিফেরিন ও লুসিফেরাজের সংগে সাইপ্রিডিনার লুসিফেরিন ও লুসিফেরাজের ক্রিয়া ঘটছে। এই ছিল প্রথম দৃষ্টান্ত যা প্রমাণ দিল যে, সামুদ্রিক প্রাণীর বেলায় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতির মধ্যেও লুসিফেরিন ও লুসিফেরাজ হতে পারে সম্পূর্ণ অভিন্ন।

অগভীর সমুদ্র থেকে পাওয়া যে দুটি মাছের কথা বলা হল তারা কিন্তু এমনিতে দেখতে সাধারণ মাছের মতো। এদের আলোক-বিকাশী অংগ রয়েছে শরীরের ভিতরে। আলোক নির্গত হয় আস্বচ্ছ পেশীর টিস্যু থেকে, যার কাজ লেন্স-এর মতো। আলোকের উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই টিস্যুর মধ্যে স্থিত কোষগুলো সংকুচিত বা প্রসারিত হয়।

মেকসিকো উপসাগরে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে পাওয়া যায় আরো একটি আলোক-বিকাশী প্রাণী (টোর্ডফিশ) যার আলোক-বিকাশের অংগ বিশেষ রকমের লক্ষণীয়। এই অংগের অবস্থান শরীরের তলদেশে, সংখ্যায় প্রায় শতাধিক, চোখের দেখায় সারি সারি পেতলের বোতামের মতো। এক সময়ে ধারণা করা হয়েছিল এগুলো বোধহয় প্রাণীটির চোখ, পরে এই ধারণা বদলাতে হয়েছে।

•

আলোক-বিকাশের প্রক্রিয়া আসলে প্রতিপ্রভার প্রক্রিয়ার মতো। শেষোক্ত প্রক্রিয়ায় অণুর মধ্যে ঠাসা হয় আলোকের তেজ, সে ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক তেজ। উভয় ক্ষেত্রেই তৈরি হয়ে থাকে অণুর ইলেকট্রনিক দিক থেকে উত্তেজিত ক্ষণস্থায়ী একটি অবস্থা।

জীববিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন আলোক-বিকাশের অংগের সংগে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে দৃষ্টিপাতের অংগের। আলোক-বিকাশের অংগের বেলায় বহু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গিয়েছে কর্নিয়া-সদৃশ স্তর বা লেন্সের অস্তিত্ব, রেটিনার মতো বিন্যস্ত আলো-উৎপাদনকারী কোষ, প্রতিফলক ও নার্ভ। দুয়ের মধ্যে এতই মিল যে আলো-বিকাশের অংগকে চক্ষু মনে হওয়া কোনো অসম্ভব ব্যাপার ছিল না।

আলোক-বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞান যতোই বাড়ছে ততোই জানা যাচ্ছে তার ব্যবহার কী হতে পারে। সম্ভাব্য প্রয়োগ সম্পর্কে গবেষণা চলছে তিনটি নির্দিষ্ট কারণে ঃ প্রথম, প্রতিপ্রভার বহু উপাদান গবেষণাগারে পৃথকীকৃত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। দ্বিতীয়, আলোক সন্ধানের জন্য উচ্চমাত্রার ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। তৃতীয়, বহুবিধ রাসায়নিকের হদিশ পাবার সুযোগের ক্ষমতাসম্পন্ন সম্ভাবনা হচ্ছে আলোক উৎপাদন।

প্রতিপ্রভার ক্রিয়া হয়ে থাকে অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন, দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য। এ-কারণে বৃহৎ একটি বস্তুপিণ্ডে ক্ষুদ্রতম একটি পদার্থকণার অস্তিত্ব টের পাবার জন্য তার ব্যবহার খুবই মূল্যবান বিবেচিত হয়ে থাকে।

জোনাকিসদৃশ আলোক-ব্যবস্থার সাহায্যে বহু রোগ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ধরা যেতে পারে—বিশেষ করে মূত্রনালীতে বা রক্তপ্রবাহে জীবাণুর আক্রমণঘটিত রোগ।

আলোক-বিকাশের রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা অনেক কিছু জানতে পেরে গিয়েছেন এবং মানব-কল্যাণে তা প্রয়োগও করছেন। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো এটা একটা রহস্য যে আলোক-বিকাশ কেন? বিজ্ঞানীরা এ প্রশ্নের জবাব খুঁজছেন।

(এই প্রবন্ধের তথ্য নেওয়া হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অধ্যাপক মিলটন জে. কর্মিয়ারের একটি প্রবন্ধ থেকে। প্রবন্ধটি 'সায়েন্স টুডে' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত)।

—অয়স্কান্ত

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

কেসটা জলের মত সোজা। উইলসনকে ভাঁওতা মেরে দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত বাড়ীর বাইরে রাখার জন্যেই জন ক্লে ওরফে ভিনসেন্ট স্পলডিং তার লালচুলো দোস্তের সঙ্গে বানিয়েছিল খাসা প্ল্যানটা। ফিল্ম ডেভেলাপ করার নাম করে পাতাল কুঠরিতে ঢুকে সুড়ঙ্গ খুঁড়ত ক্লে। তারপর, তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্যে বাড়ী ফাঁকা করার দরকার হল। বাড়ীর মালিককে ধাপ্পা মেরে টাকার লোভ দেখিয়ে আটকে রাখল লালচুলো সঙ্ঘের আপিসে। নিয়ে গেল নিজেই উদ্যোগী হয়ে। তারপর সুড়ঙ্গ এগিয়ে চলল মাটির তলা দিয়ে বাড়ীর পেছন দিকে ব্যাঙ্ক অভিমুখে। ভল্টের তলায় সুড়ঙ্গ পৌঁছোনোর পর উইলসনকে বাড়ীর বাইরে আটকে রাখার আর দরকার ছিল না।

সেদিনই আবার শনিবার। শার্লক হোমস শুনেই বুঝল, ব্যাঙ্ক লুঠ আজ রাতেই হবে। কেননা, রবিবার ব্যাঙ্ক বন্ধ। চুরি ধরা পড়বে সোমবারে। ততক্ষণে পগাড় পার হবে লুঠেরা-রা। সুড়ঙ্গ খোঁড়া শেষ হয়ে যাবার পর ডাকাতরা নিশ্চয় আর দেরি করবে না। সোনাসুদ্ধ বাকসও তো সরে যেতে পারে ভল্ট থেকে। এই দিনটির জন্যেই তো মাত্র এক মাস আগে উইলসনের চাকরী নিয়েছে স্পলডিং। সুতরাং ব্যাঙ্কে গিয়ে ওৎ পেতে বসে রইল হোমস।

গোড়া থেকেই ওর খটকা লেগেছিল দুটি ব্যাপারে। স্পলডিং ছোকরা মাত্র মাসখানেক হল চাকরীতে ঢুকেছে আর পাতাল কুঠরীতে ঢুকে বসে থাকে যখন-তখন। তাই বাজনা শুনতে যাওয়ার আগে অনুমানটা যাচাই করে নিল দুভাবে।

প্রথমত স্পলডিংয়ের হাঁটু ভীষণ ময়লা। কাদা-মাটির দাগ। ঘন্টার পর ঘন্টা হামাগুড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার স্পষ্ট চিহ্ন।

দ্বিতীয়ত, বাড়ীর সামনে লাঠি ঠুকে দেখল রাস্তা নিরেট। ফাঁপা নয়। তার মানে সুড়ঙ্গটা গেছে বাড়ীর পেছন দিকে—যেখানে রয়েছে ব্যাঙ্ক আর বাকস বাকস সোনা।

পরেরটুকু স্রেফ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের খেলা!

অঙ্গনা

জীবিকার সন্ধানে পোলট্রি, ফেরি

শ্রীমতী আশা সেন-এর সঙ্গে আমার বাসেই আলাপ। বেলা দশটা নাগাদ তাকে মাঝে মাঝে বাসে যেতে দেখতাম। কখনো তাকে দেখে মনে হতো মুখে কেমন তামা-রং-এর ছোপ। কখনো বা খুশীতে চোখের তারা অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। একদিন সুযোগ পেয়ে আলাপ করেছিলাম। সেদিনই কথায় কথায় জেনেছিলাম তিনি হাঁস-মুরগীর খাবার কিনতে কলকাতায় আসেন—তাই মাঝে মাঝে তাকে বাসে আমার সঙ্গিনী হতে হয়।

হাঁস-মুরগীর কথা উঠতেই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনার এই প্রিয় প্রাণীদের সংখ্যা কত?

তিনি আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিলেন, 'ওরা কিন্তু সত্যিই আমার খুব প্রিয়। ওদের আমি আমার ছেলেমেয়েদের থেকে কোন অংশে কম স্নেহ আর যত্ন করি না। এক ছেলে আর এক মেয়ের সঙ্গে পঞ্চাশটি হাঁস ও কুড়িটি মুরগী মিলে আমার ছোট সংসার।

প্রঃ তার মানে আপনি একটা পোলট্রি করেছেন?

উঃ পোলট্রি বলতে পারেন তবে অবশ্য বিরাট কিছু নয়।

আমি মিসেস সেনের পোলট্রি দেখার বাসনা প্রকাশ করতেই তিনি সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন।

চাতাল ঘেরা তিনটি ছোট-বড় ঘর। চাতালের এক পাশে হাঁসের দুটি বড় বড় খাঁচা। অন্য আর একটি খাঁচায় গোটা পাঁচেক মুরগী ঘাড় গুঁজে বসে আছে। গোটাকয়েক এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাঁসের খাঁচা প্রায়ই ফাঁকা।

তিনি আমাকে খিড়কি দরজা খুলে ছোট একটা ডোবার পাশে নিয়ে দাঁড় করালেন। ডোবা হলেও বর্ষায় সেখানে কানায় কানায় জল। মনের আনন্দে সেখানেই হাঁসেরা জলকেলি করছে।

শ্রীমতী সেন বললেন, 'ভোর ছটায় কলকাতা যাবার আগে এদের আমি খাঁচা থেকে বার করে দিয়ে গেছি।'

প্রঃ এদের হারিয়ে যাওয়া বা চুরি যাবার কোন ভয় নেই?

তিনি সহজভাবেই বললেন, 'এদের দেখাশোনা করার জন্য আমি একজন মহিলাকে নিযুক্ত করেছি। তাছাড়া আমার প্রতিবেশীরা আমার কাজে বেশ সহানুভূতিসম্পন্ন। সুতরাং এদের হারিয়ে যাওয়ার কোন আশঙ্কা এখনও আমার মনে আসে না।

প্রঃ আপনি এদের ডিমগুলিকে কিভাবে বিক্রী করার ব্যবস্থা করেছেন?

উঃ বিক্রী করে আমাকে কিছু লাভ করতে হয় নিশ্চয়ই তবুও আমি আমার প্রতিবেশীদের কাছে বাজার থেকে অন্ততঃ কয়েক পয়সা কমে বিক্রী করে থাকি।

প্রঃ আপনি কি প্রতিবেশীদের বাড়ীতে বাড়ীতে নিজে গিয়ে ডিম বিক্রী করে আসেন?

উঃ প্রতিবেশীরা পরিমাণে বেশী হলে ডিমের অর্ডার একদিন আগে থেকেই দিয়ে যান—অল্প স্বল্প হলে আমি সব সময় সরবরাহ করতে পারি, তারা নিজেরা এসেই আমার এখান থেকে ডিম নিয়ে যান।

প্রঃ পাড়ার দোকানে সরবরাহের দায়িত্বও বোধহয় আপনার?

উঃ কিছুটা অবশ্যই। ওদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ডিম সরবরাহ করার পর বাকিগুলি আমি অন্যদের দিই। দোকানের লোক এসে নিয়মিত আমার বাড়ী থেকে তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী ডিম নিয়ে যান।

প্রঃ তাহলে ঘুরে ঘুরে ডিম বিক্রী করার ঝামেলা আপনার নেই? বাড়তি ডিম কিভাবে আপনি রাখছেন?

উঃ বাড়তি বলতে বিশেষ কিছুই থাকছে না। উপরন্তু আমার ছোট পোলট্রির সস্তা ডিমের সন্ধান পেয়ে কিনতে এসে অনেকেই নিরাশ হয়ে ফিরে যান। আমি ভাবছি আরও বড় করবো।

প্রঃ—পোলট্রি খোলার বাসনা আপনার কেন হলো?

শ্রীমতী সেন বললেন হঠাৎ ভাগ্য-বিপর্যয়ে বেশ দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। ছেলে-মেয়েকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবো এমন আশা যখন ক্রমশঃ লুপ্ত হচ্ছিল সে সময় একদিন আমাদের বাড়ীর দরজায় একজন মুসলমান ফেরিওয়ালা খাঁচা ভর্তি অনেকগুলি হাঁস-মুরগীর বাচ্চা বিক্রী করার জন্য নিয়ে এসেছিল। ঐ ছোট ছোট বাচ্চাগুলিকে দেখে মনে হল একবার কষ্ট করে যদি সাহস নিয়ে এগুলিকে বড় করে তুলতে পারি তাহলে পায়ের নীচের মাটিটা ধ্বসে নাও পড়তে পারে। সত্যিই তাই সেদিনের সেই স্বপ্নের ফসল আমার ছেলে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা দেবে, মেয়ে ক্লাস নাইনে উঠেছে তাছাড়া খেয়ে-পরে আরও পাঁচজনের মত বেঁচে আছি। মনে হচ্ছে আর বছর কয়েক বাদে আমি নিজের পরিশ্রম কমিয়ে দেবার জন্য আর দুজন লোককে এদের দেখাশোনা করার জন্য নিয়োগ করতে পারবো।

সব শেষে আশা দেবী বললেন, 'সব কাজেই কিছু না কিছু ঝুঁকি নিতে হয়। এরকম একটা ঝুঁকি বেচা-কেনার দায়-দায়িত্বের জন্য অনেকেই নিতে চান না। আমার মনে হয় মেয়েদের পক্ষে এটা বেশ উপযুক্ত কাজ। বাড়ীতে থেকে তত্ত্বাবধানের সুবিধা মেয়েদের সবচেয়ে বেশী। তাছাড়া আমার প্রতিবেশীদের সস্তায় টাটকা ডিম খাওয়াতে পারছি এটাও কম তৃপ্তির কথা নয়।

আশা দেবী যেমন বাড়ীতে থেকেই তাঁর হাঁস-মুরগীর তত্ত্বাবধান করে সংসার চালিয়ে তার সন্তানদের মানুষ করার ভবিষ্যৎ রঙীন স্বপ্ন দেখেন তেমনি সুশীলা ধর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বাড়ী বাড়ী প্রয়োজনীয় সায়া শাড়ী ব্লাউজ বিক্রী করে নিজের পরিবারের সব দায়িত্ব বহন করছেন। তিনি বললেন, 'আমি একজন মহিলা ফেরিওয়ালা। রাস্তায় রাস্তায় যদিও হাঁক দিয়ে ফিরি না তবুও লোকের দোরে দোরে কড়া নাড়িয়ে নিজের পণ্য-সামগ্রী মেলে ধরি।'

সুশীলা ধরকে আজ দশ বছর ধরে দেখে আসছি। প্রথম প্রথম তিনি সাবান ধূপকাঠি সিঁদুর আলতার মত কম দামের জিনিস বিক্রী করতেন, দিনের পর দিন মাসের পর মাস তাঁর এই ফেরি করার জন্য কয়েকটি বাড়ী তার নির্দিষ্ট খরিদ্দার হয়ে গিয়েছে। মাসকাবারী সাবান সিঁদুর ধূপের চাহিদা অনেক পরিবারেই সুশীলা ধরের

কাছ থেকে মেটাতেন। ক্রমে ক্রমে সাবান সিঁদুর ফেরিওয়ালার সংখ্যা এত বাড়তে লাগলো যে শ্রীমতী ধর তখন বিকল্প কোন জিনিসের ফেরির কথা ভাবতে শুরু করলেন।

মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের চাহিদা কম নয় কিন্তু সেগুলি সংগ্রহ করার জন্য দরকার পর্যাপ্ত অর্থ। সুশীলা ধর সেখানেই বেশী অসহায়া। সংগৃহীত জিনিস বিক্রী করে অর্থ সংগ্রহ করতে যে দিন কয়েক সময় লাগবে সে ক'দিনের ধারে জিনিস দিতে কেউ ইচ্ছুক নন। হালে শ্রীমতী ধর একজন তাঁত ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিছু শাড়ী ধারে এনে বিক্রী করার সুযোগ পেয়েছেন। হয়তো তাঁর এই শাড়ীর ফেরি ভাই-ফোটা পর্যন্ত চলবে। সে সঙ্গে আছে রকমারী ব্লাউজ, সায়া।

শ্রীমতী ধরকে প্রায় বাড়ীতে এসে জল খেয়ে তেষ্টা মেটাতে হয়। এমনি একদিন উত্তর কলিকাতার একটি বাড়ীতে ফেরি করতে এলে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বাইরের দোকানের বাহারী শাড়ী থাকতে আপনার এই তাঁতের শাড়ী আর কত বিক্রী হবে?'

সুশীলা ধর বললেন, যত বাহারী শাড়ীই বাজারে চালু হোক কিছু তো তাঁতের শাড়ীর খরিদ্দার আছেন। তাদের দয়াতেই আমরা বেঁচে আছি। আমাদের পরিশ্রমের মর্যাদা দিতে গিয়েও অনেকে শাড়ী কিনে থাকেন। তাছাড়া দীর্ঘ দশ বছর ধরে ফেরির ফলে আমার কিছু কিছু বাড়ীর সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গতা হয়ে গিয়েছে।'

প্রঃ 'পূজো শেষ হলেই আপনার শাড়ীর ফেরি বন্ধ করবেন কেন?'

উঃ 'তখন তো ক্রেতার সংখ্যা কমে যাবে। তাছাড়া শাড়ীর বোঝা বয়ে বেড়ানো মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

প্রঃ 'এবারের মন্দা বাজারে আপনার বিক্রী কেমন?'

উঃ—'খুব খারাপ বলবো না। মহিলা ফেরিওয়ালা বলে অনেকেরই বেশ দয়ামায়া আছে। পূজোর দামী শাড়ী ছাড়াও আটপৌরে শাড়ীরও কিছু ক্রেতা আছেন। সবচেয়ে বড় সুবিধা আমাদের যে বাড়ীতে যেদিন যাবার কথা থাকে সেখানে গৃহিনীর প্রতিবেশিনী আত্মীয়স্বজনদের সমাগম হয়। এভাবে আমাদের ক্রেতার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।'

প্রঃ 'বিক্রী করতে গিয়ে বাড়ীর গৃহিনীর ব্যবহার কেমন থাকে আপনার ওপর?'

উঃ 'ভাল-মন্দ মিশিয়ে। কোথাও যেমন আন্তরিকতার অভাব নেই আবার দু-চারজন এ-সব উটকো ঝামেলায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন।'

শ্রীমতী ধরের মত মহিলা ফেরিওয়ালার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। উপার্জনের জন্য মানুষ যখন যে কোন কাজ করতেই আজকাল আগ্রহী সেখানে ফেরির মত কাজে মহিলাদের আপত্তি কিছু না থাকলেও শারীরিক দিক দিয়ে অনেকেই এ-কাজে অক্ষম। তবুও গৃহিনীদের সহানুভূতি ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যদি এদের থেকেই নিয়মিত ক্রয় করা হয় তাহলে এদের যেমন পরিশ্রম কিছু লাঘব করা যায় সে সঙ্গে তাদের একটা নির্দিষ্ট আয়েরও হিসেব দেওয়া সম্ভব।

—অঞ্জলি চৌধুরী

মানসিক পুনর্বাসন

আজকের মানুষ এক অস্থির মানসিকতার বলি। একথা নিশ্চয় অবাস্তব নয়। কিন্তু কেন এই অস্থিরতা, বিশেষ মেয়েদের মধ্যে?

মানসিক রোগ সম্বন্ধে সচেতনতা পূর্বের চেয়ে এখন অনেক বেশী স্পষ্ট। যার ফলে মেয়েদের একচেটিয়া ফিট হওয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন নেই বললেই চলে। এ সম্বন্ধে গবেষণার অবকাশও বৃদ্ধি পেয়েছে যথেষ্ট। আগে ভূতে পাওয়া বাণমারা তুক করা ধুলোপড়া ইত্যাদি অসহায় বিশ্বাসের ফলে রোগী বা রোগিণীদের মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের ফলে অমানুষিক অত্যাচারের শিকার হতে হত। গ্রামাঞ্চলে এ ঘটনা আজও ঘটে চলেছে। বর্তমানে চিকিৎসকদের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে এ একরকম রোগ বিশেষ। এমনই এক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সম্প্রতি মানুষের জীবনযাত্রা অতিবাহিত হচ্ছে যে অনেকে এরই ফলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পাগলের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। বেয়াল্লিশের দুর্ভিক্ষ, ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একাত্তরের রাজনীতি অনেক পাগলের সৃষ্টি করেছে আর এখন তো প্রতিটি মুহূর্ত মানুষের বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে কাটছে এতে অত্যন্ত সুস্থ মানুষও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে। দারিদ্র্যজনিত খাদ্যাভাব ও নানা সমস্যা এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছাড়াও জগৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল না থাকায় এবং ভাব-প্রবণতার প্রচণ্ডতায় মানসিক ক্রিয়ায় যে বিস্ফোরণ ঘটায় তার ফলশ্রুতিও এই মানসিক বিপর্যয়। যেখানে দারিদ্র্য নেই এবং দারিদ্র্যজনিত সমস্যা নেই সেখানেও কেন এই সমস্যা? হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যেখানে অভাবজনিত সমস্যা নেই এবং সংসার মাত্র দু-তিনটি প্রাণীকে নিয়ে, সেখানেও এই রোগ ধীরে ধীরে তার পক্ষ বিস্তার করছে। এই ধরনের স্বচ্ছল সংসারেও কোন না কোন মানুষ বিচিত্র কোন কমপ্লেক্সে ভুগছেন। কিছুদিন যাবৎ একটি কথা প্রায়ই শোনা যায় 'হতাশা' বা 'ফ্রাস্ট্রেশান'। মানুষের হতাশার কারণ নিশ্চয়ই অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে এটা যেন ছোঁয়াচে রোগের মত ছড়িয়ে পড়েছে। যারা নিজেদের হতাশ বা 'ফ্রাসট্রেটেড' বলে বিশ্বাস করেন তাঁদের প্রশ্ন করলে হয়তো দেখা যাবে যে তাঁরা জীবন সম্বন্ধে সত্যিই একেবারে হতাশ নন। পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ সম্বন্ধে তাঁরা এখনও যথেষ্ট আগ্রহী। আসলে মানুষের জীবন-যাত্রার এবং বিশ্বাসের এখন ধারাবদল হয়েছে। আগেকার দিনের সংসার-ব্যবস্থা বা সমাজব্যবস্থায় যে পারস্পরিক দেওয়া নেওয়ার প্রশ্ন ছিল এখন সেটা বড় একটা দেখা যায় না। তাই এডজাস্টমেন্টের বাঁধন এখন অনেকখানি শিথিল। অবশ্য এর জন্যও মানুষ আজ অনেকখানি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে যেমন একান্নবর্তী সংসারের দায়দায়িত্ব না থাকায় আত্মকেন্দ্রিকতার সমস্যা দেখা দিয়েছে। যাঁদের খেটে খেতে হয় না তাঁরা কাজ খুঁজে পাচ্ছেন না অথচ অবসর যথেষ্ট। তাঁদের পক্ষে সময়টাকে কাজে লাগানো এক সমস্যা। এমন অনেকের মুখে শোনা যায়—"উঃ দুপুরটা হু হু করে। কি করে সময় কাটাচ্ছি বলুন তো? এক মনের মধ্যেটা এমন ফাঁকা হয়ে যায় তারপর আর কিছু ভাল লাগে না।" এদিকে আবার ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষার সামঞ্জস্য রাখার প্রতি সজাগ দৃষ্টি অবচেতন মনের মধ্যে ঘূর্ণীর সৃষ্টি করছে নিজেরই অজান্তে। এর ওপর নিজের ব্যক্তিত্বের দ্বারা নিজেকে এবং নিজের সংসারকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা যাঁদের কম থাকে তাঁদের অন্তরের ইচ্ছের পথ বেয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ক্রমে বৃহত্তর পৃথিবীর সংস্পর্শে মানুষ তার ন্যায্য অবসরটুকুকে আপন সত্তার আন্তরিকতায় যদি কাজে লাগাতে না পারে তাহলে তার থেকেই সৃষ্টি হয় একরকম অসহায়তা। সেই অসহায়তা ক্রমে মানুষকে উদাসীন করে তোলে সুতরাং আগে চাই মানসিক পুনর্বাসন।

রাষ্ট্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই মানসিক পুনর্বাসনের যথার্থ পরিকল্পনা করার সময় এসেছে। বলতে বাধা নেই অনেক স্বচ্ছল পরিবারে শুচিবায়ুগ্রস্ত শাশুড়ি, সিনেমা পাগল বৌ, খিটখিটে স্বামী এবং বখাছেঁড়া ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিন্নীদের যে অসহায়তার সৃষ্টি হয় এবং এই তুচ্ছ কারণগুলো থেকেই একদিন যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তার খেসারৎ দিতে গিয়ে অনেক মানুষই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। সুতরাং মানসিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার সময় এসেছে।

মীরা দেবী

রূপসীর খাতা

পূজোর আগমনীর সুর বাজছে—তবে বেসুরো কারণ একটানা দীর্ঘশ্বাস আজ বাংলার বুকে। মা আসছেন—তবে উৎসবের আলো নেই—নেই খাদ্য। এতো নেই এবং হাহাকারের মাঝে মা আসছেন। তাই জল-ভরা চোখেও কোথায় যেন একটু আলোর ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। কাপড়ের দাম চড়া, সাজ-সরঞ্জামের অভাব, যা আছে তা অগ্নি-মূল্য—কিন্তু তাই বলে যৌবন যেমন বিকশিত হওয়ার হচ্ছে, ফুল যেমন ফোটার ফুটছে—কিছু তো থেকে থাকছে না? নেই অনেক কিছুই, তবুও তার মধ্যে যেটুকু আছে যতটুকু পাওয়া যায় তাই দিয়ে একটু সুন্দরতা ধরে রাখলে ক্ষতি কি?

খুব সহজে সামান্য বুদ্ধি আর সামান্য ব্যবস্থা থাকলেই সাজগোজ করা যায়। বহু রঙের বহু বাহারের শাড়ী জামা বেরিয়েছে, কিন্তু অগ্নিমূল্য দাম। তাই ঘরে সামান্য ব্যবস্থা করলে সেই শাড়ীই সুন্দর হতে পারে। ছোট ছোট কাট-পিসের রঙিন কাপড়ের টুকরো কিনে তা একরঙের ভয়েলের ওপর অ্যাপ্লিকের কাজ করে বসালে খুব সুন্দর দেখতে হয়। এ ছাড়া রঙ মানিয়ে সুন্দর শাড়ী কিনে যতোদূর সম্ভব কম খরচে কাজ সারা যায়। প্রশ্ন এই, দামী শাড়ী পরলেই কি অপরূপা দেখায়? তা নয় শাড়ী ও ব্লাউজ মানান-সই পরে তার সঙ্গে উপযুক্ত প্রসাধন করলেই ভাল দেখায়। সেইটুকুই ব্যবস্থা মাত্র। বিনুনী কিম্বা খোঁপায় একটা ফুল একটু পাতা আর উজ্জ্বল ত্বকের ওপর সুন্দর মেক-আপ থাকলেই খুব সুন্দর দেখাবে।

চামড়ার যত্ন সম্বন্ধে যে আলোচনা আগে করেছি সেই মতন যত্ন করে যান, ফল ভালো হবেই। এ প্রসঙ্গে অনেক আলোচনাই আগে করেছি, আপনাদের বিশেষ জিজ্ঞাসা কিছু থাকলে পরে আবার না হয় আলোচনা করবো।

আজ যে বিষয়ে লিখবো সেটা একটু লজ্জা হলেও প্রয়োজনীয়। শরীরের গঠন সুন্দর করতে আমরা কিছু ব্যায়াম ও ওঠা-বসার ধরন সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। কিন্তু যে অংগ রমণী শরীরের বিশেষ একটি রূপ সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা এ পর্যন্ত করিনি। তা হল বক্ষ। আজকাল মোটামুটি সকলেই সুন্দর সুন্দর ব্লাউজ পরে থাকেন। বড় চওড়াভাবে কাটা গলা ও লম্বায় খাটো। কিন্তু একটা বিষয়ে আমরা সচেতন হই না যে নিচে যে জামা আমরা পরি সেটা আমাদের মাপ অনুযায়ী কিনা। ঠিক মাপ মতন নিচের জামা পরতে না জানার ফলে পিঠে ও বুকের দিকে কতকগুলি বাজে ভাঁজ পড়ে, আর এতে বেশ খারাপ দেখায়। এছাড়া ছোট মাপের নিচের জামা বেশী শক্ত করে বেঁধে পরাতেও পিঠে বিচ্ছিরী ভাঁজ পড়ে, আর সামনের দিকে গলার কাছে মাংস উঁচু হয়ে থাকে। এর ফলে বেশ খারাপ ও আশালীন দেখায়। নিচের জামা সব সময় এমন মাপের পরা উচিত যাতে জামাটা সহজভাবে শরীরের সঙ্গে বসে যায়, আর চাপ না সৃষ্টি করে। সামনের অংশটা এমন হওয়া উচিত যার ফলে বাড়তি কোন মাংস বেরিয়ে না থাকে। জামাটা যেন ঠিক শরীরের ভাঁজে ভাঁজে বসে যায়। এইভাবে নিচের আবরণী পরলে অবাঞ্ছিত ভাঁজ শরীরে দেখা যায় না। আর যাদের পিঠে গোল হয়ে অর্ধচন্দ্রাকারের মাংস ঝুলে থাকে তাঁদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন কোনো কারণেই ছোট ব্লাউস না পরেন। তাঁরা বড় গলার ব্লাউজ পরতে পারেন কিন্তু ঝুল যেন একটু বাড়িয়ে দেন আর ব্লাউজের নিচের পট্টি একটু চওড়া করে দেন, তাহলে মাংস চেপে বসতে পারে। নিচের জামার পিছনের বাঁধার অংশ ঠিক কনুই থেকে চার আঙুল ওপরে হওয়া উচিত। অনেকের ওই অংশ পিঠের খুব উপরে উঠে যায়—তার কারণ নিচের জামা মাপ মতন হয় নি ও পরা ঠিক হয় নি।

এছাড়া গঠন ঠিক রাখার জন্য কতক-গুলি নিয়ম পালন করা ভাল। (১) প্রতি দিন অন্তত ১০।১২ মিনিট উপুড় হয়ে দুই পা জোড়া করে শুতে হবে। তারপর দুই হাতের পাতা বুকের নীচে রেখে কনুই ওপরে তুলে মাথা সোজা থুতনীর ওপর রাখতে হবে। এর পর আস্তে আস্তে নিশ্বাস টেনে কোমর থেকে মাথা অবধি ওপরের দিকে তুলতে হবে, পরে নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মাথা নামাতে হবে। এইভাবে ১০।১২ বার করতে হবে। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকতে হবে, (২) সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে সামনের দিকে তুলে সোজা করে হাত রাখতে হবে। এভাবে ৫।৬ মিনিট থাকতে হবে।

যাঁরা বিবাহিত ও সন্তানের জননী—তাঁদের করণীয় অনেক কিছু। প্রথমত নতুন মায়েরা সাধারণত আমাদের দেশে বাচ্চা হলেই নিচের জামা পরা (বাড়ীতে) ছেড়ে দেন, সেটা ভাল না। তারপর বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর সময় বিশেষ নজর রাখা ভাল। যেমন বাচ্চাকে কোলে শুইয়ে সোজা বসে খাওয়াতে হয় না, এতে চামড়ায় টান পড়ে ও নিচের দিকে নেমে আসে। সব সময় শুয়ে কাত হয়ে খাওয়াতে হয়।

দ্বিতীয়ত প্রতিদিন স্নানের সময় দুই হাতের তেলো দিয়ে বুকের নিচের অংশকে ঠেলে ওপরে দিকে তুলে দিতে হবে। এভাবে বার দশেক করলেই হবে। এছাড়া উপরের নিয়মগুলিও পালন করা ভাল। এমন করে একটু যত্ন নিলে মহিলারা বহুকাল সুন্দরী ও রমনীয় হয়ে থাকতে পারেন।

রাত্রে শোয়ার সময় ছাড়া শরীর কখনই ঢিলেঢালা করে রাখা ভাল না। এমনও অনেক মহিলা আছেন যাঁদের সামনের অংশ নেই বা শরীরের আয়তন অনুপাতে কম। ত[illegible]দের ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে সে [illegible]ম্বন্ধে ব্যবস্থা করা ভাল। তবে বিশে[illegible] ধরনের ক্রিম ব্যবহার করে ভাল ফল [illegible]তে শোনা গেছে। তাঁরা তাও করে দে[illegible] পারেন।

নিচের আবরণী ও ব্লাউজের ঠিক ছাঁট ও মাপ হলে শরীর ভাল থাকতে বাধ্য ও সুন্দরও দেখাবে। পাতলা ব্লাউজের নিচে অপরিষ্কার বা গুটিয়ে থাকা টেপের নিচের জামা দেখতে খুব অশোভন লাগে। এ বিষয়ে মহিলারা কেন যে একটু সচেতন হন না বুঝতে পারি না। এ ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন থাকা উচিত। যাঁরা মোটা, বা হাতের উপরের ভাগ বেশ মোটা, তাঁরা ছোট আঁট হাতের ব্লাউজ পরলে ভাল দেখাবে। অনেকে ফ্যাশানের স্রোতে ভেসে যান, নিজের শরীর ও চেহারার বিশেষত্ব না দেখেই সেটা ঠিক করেন না। মোটারা যদি হাত লম্বা ব্লাউজ পরেন তাহলে আরও মোটা দেখায়। বা হাতকাটা পরেন তাহলেও বেশী মোটা দেখায়। কিন্তু যদি হাতের ওপর অংশ শক্ত ও থলথলে না হয় তাহলে হাতকাটা ব্লাউজ বেশী মানায়। তাই একটু বিচার ও একটু বুদ্ধি খরচ করলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবেই, এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

—বরবর্ণিনী

সেকালের সঙ্গীতগুণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঘরে সংগীতচর্চার এই পরিবেশ। আর বাড়ির আশেপাশেও তেমনি অনুকূল আবহ। তাঁদের নিকটতম প্রতিবেশী ছিলেন প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্তী। দুটি বাড়ির মাঝখানে একটি সরু গলি। প্রবোধচন্দ্র হলেন বিখ্যাত গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তীর আত্মীয়। এই চক্রবর্তী বাড়িতে অঘোরনাথের গানের আসর বসত। এখানকার কথার আগে মজিলপুর অঞ্চলের সংগীত-পটভূমির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। কারণ শুধু চক্রবর্তী পরিবার নয় আরো সংগীতচর্চার স্থান সে-এলাকায় ছিল। তার নানা সূত্রেই আহরণ করেন মোহিনীমোহন। আর সেই সব নিয়েই বাংলার একটি সংগীতকেন্দ্র হয়েছিল মজিলপুর।

সংস্কৃতির অন্যান্য ধারার সঙ্গে সংগীত-চর্চাতেও মজিলপুর সমৃদ্ধ ছিল। মোহিনীমোহনের বাল্যকালেও বেশ কয়েক-জন সংগীতসেবী থাকতেন এখানে। তার ফলে অঞ্চলটি বিশিষ্ট সংগীতকেন্দ্রে পরিণত হয়। কয়েকটি পরিবারেই চর্চা হত ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ইত্যাদি গানের। আর পাখোয়াজ তবলা, সেতার, বাঁশীর।

গণ্যমান্য দত্ত বংশ সংগীতের বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্মরণ করা যায় এই দত্ত পরিবারের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। তাঁর স্মরণীয় 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথের গৃহবর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র নাকি প্রাসাদোপম দত্ত-ভবনের চিত্র দিয়ে করেছিলেন।

তাঁদের সংগীত-সভায় শুধু আঞ্চলিক গুণীরা নন বাংলায় আগত পশ্চিমী কলাবন্তরাও যোগ দিতেন। কখনো বা তাঁদের আসরে নিযুক্ত দেখা গেছে ভারত-প্রসিদ্ধ শিল্পীদের। যেমন হেমচন্দ্র দত্তের সভা। ধ্রুপদী মুরাদ আলী খেয়ালগায়ক আলী বখস আর টপ্পা-ওস্তাদ রমজান খাঁ-কে একসঙ্গে হেমচন্দ্র নিযুক্ত রেখেছিলেন।

স্বনামধন্য গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তী ছিলেন নিকটস্থ রাজপুরের সন্তান। মজিলপুরেও তিনি যাতায়াত করতেন। তাঁর কোন কোন শিষ্য এবং আত্মীয়দেরও বাস ছিল ওখানে। অঘোরনাথ তাঁদের কাছে এবং দত্ত পরিবারের আসরে বহুদিন গান শুনিয়েছেন। মোহিনীমোহন কিশোর বয়সে উপস্থিত থাকতেন সে-সব অনুষ্ঠানে।

ময়ূরভঞ্জ দরবারের সভাগায়ক যদুনাথ রায়ের গানও তিনি দত্ত-বাড়িতে শোনেন। মুরাদ আলীর সবচেয়ে কৃতী শিষ্য যদুনাথ রায়। যদুনাথ ভাল বীণকারও ছিলেন। তাঁর বীণাবাদনও মোহিনীমোহন একাধিক বার শুনেছিলেন মজিলপুরে। যদুনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র আশুতোষ রায়ের উৎকৃষ্ট ধ্রুপদও তিনি অনেকবারই এখানে শোনেন।

সেই সঙ্গে স্থানীয় অনেক গায়ক বাদকও ছিলেন মোহিনীমোহনের প্রথম জীবনে। তাঁরা মজিলপুরে সংগীতের বেশ ক্ষেত্র রচনা করেছিলেন। এখানকার পাখোয়াজীদের মধ্যে বেশি উল্লেখ্য তিনজন —কেদারনাথ কাঞ্জিলাল, অতুলকৃষ্ণ বসু ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা তিনজনই কলকাতার মৃদঙ্গাচার্য মুরারিমোহন গুপ্তের শিষ্য।

মজিলপুরের ধ্রুপদীদের মধ্যে অপূর্ব-কৃষ্ণ দত্তের নাম করা যায়। তিনি ছিলেন মুরাদ আলী খাঁর শিষ্য।

অঘোরনাথ চক্রবর্তীর আর এক শিষ্যও এখানকার বাসিন্দা—দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়। মোহিনীমোহনের মেসোমশায় চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন দেবেন্দ্র-নাথের কাকা। আগে উল্লেখ-করা পাখোয়াজ-বাদক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা চন্দ্রকান্ত। সুতরাং গায়ক দেবেন্দ্রনাথ আর পাখোয়াজবাদক উপেন্দ্রনাথ দুজনেই মোহিনীমোহনের নিকট আত্মীয়। তাঁদের দুজনের সংগীতচর্চার সময়েই মোহিনী-মোহন সামনে বসে শুনতেন।

তাছাড়া তাঁর পাশের বাড়িতে ছিলেন প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্তী। মাঝখানে একটি মাত্র গলি। প্রবোধচন্দ্র হলেন অঘোরনাথ চক্র-বর্তীর মাতুলপুত্র। অঘোরনাথ সে-বাড়িতে মাঝে মাঝে আসতেন। গান গাইতেন। প্রবোধচন্দ্র নিজেও বাজাতেন পাখোয়াজ তবলা। অন্য গায়করাও সেখানে উপস্থিত হতেন। বাল্যকাল থেকেই মোহিনীমোহন শুনতেন তাঁদের গানবাজনা। কখনো নিজে-দের ঘরে বসে। কখনো প্রবোধচন্দ্রের বাড়িতে। এখানের সংগীতচর্চা থেকে তিনি খুবই উপকৃত হয়েছিলেন। কান ও মন তৈরি হয়ে যায় নিয়মিত গানবাজনা শোনার ফলে।

আর একটি সংগীতচর্চার স্থানও মজিলপুরে ছিল। ভূপেন্দ্রনারায়ণ দত্তের বাগানের শিবমন্দির। সেখানে কেদারনাথ কাঞ্জিলাল পাখোয়াজ বাজাতেন। অন্য গায়ক-বাদকরাও যোগ দিতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কালিচরণ চট্টোপাধ্যায় নামে এক সেতারী। উৎসুক কিশোর মোহিনীমোহন তাঁরও সেতারবাদনের শ্রোতা হতেন। দিনের পর দিন।

ঘরে-বাইরে সংগীতের এই নিরবচ্ছিন্ন পরিবেশ পেয়েছিলেন মোহিনীমোহন। তাইতেই তাঁর সংগীতজীবনের ভিত্তি গড়ে ওঠে। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর সহজাত প্রতিভা। পিতৃপিতামহের ধারায় যা তিনি লাভ করেছিলেন। তাই তাঁর সংগীতচর্চা আরম্ভ হয়ে যায় নিতান্ত বাল্য থেকে। কারুর নির্দিষ্ট শিক্ষা না পেয়েই।

শ্রুতিধর স্বভাব মোহিনীমোহনের। শৈশব থেকেই অপরের শুনে তিনি সংগীতের পাঠ নিতেন। এত অল্প বয়স থেকে তবলা বাজাতে আরম্ভ করেছিলেন যে, পরে আর স্মরণ করতে পারবেন না সে-কথা। জননীর কাছে শোনেন যে, চার বছর পূর্ণ হবার আগেই তবলা আরম্ভ করেন। প্রবোধচন্দ্রের তবলা বাদন শুনে নিজের থেকেই।

তারপর বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই সংগীতচর্চায় অভ্যস্ত হয়েছেন। স্বভাবের প্রেরণায়, পারিপার্শ্বিক দৃষ্টান্তে। গান-বাজনা শুনলেই আকৃষ্ট হতেন। একটির পর একটি বাজনা শিখতে চেয়েছেন আপনা থেকে। দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছেন। আর আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছেন তার বাদন-পদ্ধতি। পরে তা বাজাতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। এমনিভাবে গানও শিখে-ছেন ক্রমান্বয়ে শুনে শুনে। কেউ তাঁকে শেখাননি বা শেখাবার ব্যবস্থাও করে দেন নি। নিজে নিজেই অভ্যাস করেছেন। আর মিলিয়ে নিয়েছেন গায়ক-বাদকদের সঙ্গে। এমনিভাবে প্রবোধ চক্রবর্তীর বাড়ি, চন্দ্রকান্তের বাড়ি, ভূপেন্দ্রনারায়ণের শিব-মন্দিরে কেদারনাথ কাঞ্জিলালের আসর সেতারী কালিচরণের গৃহ আর নিজেরও বাড়ি থেকে তাঁর সংগীত সঞ্চয় হতে থাকে। সেই সঙ্গে শিক্ষাও।

প্রথম যে তবলা বাজানো আরম্ভ করে-ছিলেন সাত বছর বয়স পর্যন্ত তা চলে-ছিল। সেই সঙ্গে পাঁচ-ছ' বছর বয়স থেকে গান গাইতে থাকেন মায়ের মুখে আর

প্রবোধচন্দ্রের ঘরে শুনে। ছেলেবেলা থেকেই মোহিনীমোহনের কণ্ঠ সুমিষ্ট ছিল। আর অনুকরণ করে গাইবার ক্ষমতাও সহজাত।

তারপর ৭।৮ বছর বয়স থেকে বাঁশী বাজানো শিখতে লাগলেন। তাঁর বাঁশীর সুর বড় ভাল লাগত। একদিন পেতলের বাঁশী কিনলেন বাজাবার জন্যে। সুরবোধ আর গানের গলা ছিল। ফুৎকার দিয়ে বাজাবার কায়দা অভ্যাস করতে লাগলেন এবার। ক্রমে বাঁশী থেকে সুর বেরুতে লাগল।

দু বছর সেই বাঁশী চর্চার পর সংগ্রহ করলেন একটি পিকলু। এও একপ্রকার বাঁশি। সেই ৯।১০ বছর বয়স থেকে ১২ বছর পর্যন্ত পিকলু বাজাবার ঝোঁক রইল। তারপর মোহিনীমোহন ক্ল্যারিওনেট আর কর্নেট ধরলেন পরে পরে। এই দুরকম সুর-সমৃদ্ধ বাঁশিতে সুরের চর্চা প্রায় ৬ বছর ধরে চলে। পরেও হয়ত বাজাতেন প্রিয় ক্ল্যারিওনেট। কিন্তু পিতার নিষেধে তখনকার মতন ত্যাগ করেছিলেন। উত্তর-জীবনে ক্ল্যারিওনেট আবার বাজানো আরম্ভ করেন। শিক্ষাও দেন। যেমন, গোপালদাস লাহিড়ীকে। কিন্তু প্রথম জীবনে ক্ল্যারিওনেট বন্ধ করতে হয় পিতার অমতের জন্যে। পুত্রের গান বাজনায় তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু হরিনাথের ভয় বালকের বাঁশি বাজানোতে।

১৬ বছর বয়স থেকে মোহিনীমোহন পাখোয়াজ বাজাতে আরম্ভ করেন। জ্ঞান হবার সময় থেকেই তালের যন্ত্র শুনে এসেছেন প্রবোধচন্দ্রের ঘরে। কিংবা মেসো-মশায় চন্দ্রকান্তের বাড়িতে। তাই পাখোয়াজ শিখতে খুব অসুবিধা হল না। মাসতুত ভাই উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাখোয়াজ বাজাতেন মুরারি গুপ্তের শিক্ষায়। তাঁর রিয়াজের সময় কাছে বসে শুনতেন লক্ষ্য করতেন। সেখান থেকে মুরারি গুপ্তের পাখোয়াজ শিক্ষার বই 'সঙ্গীত প্রবেশিকা' এনে বোল ওঠাতেন বাড়িতে। শুধু প্রবোধ চক্রবর্তী কিংবা উপেন্দ্রনাথের পাখোয়াজ শুনতেন না। শিবমন্দিরে কেদারনাথ কাব্বায়ন আর মজিলপুরের নানা ধ্রুপদের আসরেও পাখোয়াজীদের বাজনা শুনে নিতেন নিবিষ্ট হয়ে।

এমনিভাবে অন্তরের প্রেরণায় আর মজিলপুরের পরিবেশে তাঁর পাখোয়াজ চর্চা হতে থাকে। সেইসব কথার প্রসঙ্গে বৃদ্ধ বয়সে মোহিনীমোহন বলতেন 'কোন গুরুর কাছেই যন্ত্রের তালিম নিইনি।' অর্থাৎ পাখোয়াজ ইত্যাদি যন্ত্রবাদনের চর্চা ওইভাবেই তাঁর হয়েছিল।

সেই যে পাখোয়াজ তখন থেকে বাজাতে থাকেন জীবনে আর কখনো তা ত্যাগ করেননি। ২৪ বছর বয়স থেকে ধ্রুপদ চর্চা আরম্ভ হল তাঁর। তারপর থেকে ধ্রুপদী বলেই সঙ্গীতসমাজে সুপরিচিত হন। আর সঙ্গীতজীবনের সেই পরিণত অবস্থায় তাঁর পাখোয়াজ সাধন থাকে অঙ্গাঙ্গী।

প্রথম পাখোয়াজ চর্চার কিছু পর থেকেই খেয়াল গানও তিনি কিছু কিছু গাইতে থাকেন। তাও মজিলপুরের নানা আসরে শুনে শুনে। তবলা বাদনও তাঁর কোন সময়ে একেবারে বন্ধ ছিল না।

এইভাবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে চলে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন রীতির গান ও যন্ত্রসঙ্গীত। এসবের মধ্যেই কোনরকমে স্কুলের পাঠেরও সমাপ্তি ঘটে। প্রথমে জয়নগর স্কুলে। পরে ডায়মণ্ডহারবার স্কুল থেকে পাশ করেন এনট্রান্স পরীক্ষা।

কিন্তু তারপর আর বিদ্যাশিক্ষা সম্ভব হল না; তাঁর সারা মনপ্রাণ অধিকার করে নিলে—সঙ্গীত।

এদিকে উপার্জন করবারও সময় হয়েছে। কিন্তু সঙ্গীতচর্চাকে জীবনের বৃত্তি হিসেবে নেওয়া হত না সেকালে। অর্থাৎ 'বাঙ্গালী সমাজে। তা হল বিশ শতকের একেবারে গোড়ার কথা। যত কৃতীই হোন কিংবা একান্তভাবে সঙ্গীত-সেবা করতে চান, বাঙ্গালীরা সচরাচর পেশাদার হতেন না। অর্থোপার্জন করতেন অন্য সূত্রে। আর আদর্শবাদী নিষ্ঠায় সঙ্গীত চর্চা করে যেতেন। মোহিনীমোহনও অন্য বৃত্তির চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সে অঞ্চলে কোন কাজেই তাঁর মনে উৎসাহ এল না। পিতার ইচ্ছায় আইনের পথ কিংবা চালের আড়ত বা জমিদারী সেরেস্তার কাজ কিছুতেই রাজি হতে পারলেন না তিনি। মত ও পথ নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধল। ফলে মোহিনীমোহন গৃহত্যাগ করে চলে এলেন কলকাতায়।

তখন তাঁর ২১ বছর বয়স। ভবানী-পুরে একটি বাসাবাড়িতে প্রথমে রইলেন। সন্ধান করে কাজও পেলেন একটি অফিসে। সেই সঙ্গে সঙ্গীতচর্চাও চলতে লাগল।

কলকাতার বৃহত্তর পটে সঙ্গীতশিক্ষার নানা সুযোগ করে নিলেন তিনি। যাদৃশী ভাবনা যস্য। তখন থেকে বিভিন্ন সময়ে কলকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন স্থানে বাস করেছেন। কাজও করেছেন নানা প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু শুধু একটি বিষয়ে অচঞ্চল থাকেন। সঙ্গীতচর্চায়। ধ্রুবতারার মতন এ লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হননি কখনো।

২৪ বছর বয়সে প্রমথনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কাছে শিক্ষার সুযোগ পান। আগেই বলা হয়েছে—তাঁর কাছে বছর চারেক শেখেন ধ্রুপদ গান, রাগের আলাপ পদ্ধতি ও খেয়ালের রীতিনীতি। তার অনেক পরে টপ্পা তিনি শিখেছিলেন। কলকাতায় নয়, শিবপুরে থাকবার সময়ে। সে বিচিত্র কাহিনী শেষে বর্ণনা করা হবে। তার আগে তাঁর জীবনীর সংক্ষিপ্ত পর্ব পর্যন্ত বলে নেওয়া যায়।

পরিণত বয়সে যথেষ্ট যশস্বী হয়ে-ছিলেন মোহিনীমোহন। কিন্তু সম্পূর্ণ সঙ্গীত ব্যবসায়ী হন নি—সম্মেলনে কোন বিশেষ আসরে, বেতার কেন্দ্রে কিংবা কখনো শিক্ষাদানের জন্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করলেও। সেজন্যে চাকুরিজীবনকেই অবলম্বন করেন বরাবর। নানা সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁর কর্মস্থল হয়। সেখান থেকে অবসর নেন ১৯৫৭ সালে। তার অনেক আগেই তিনি দক্ষিণ কলকাতার চেতলায় (১৯২১) নিজের বাড়ি করেছিলেন। সেই ১৩৬ প্যারীমোহন দাস লেনে বাস করেন জীবনের শেষ পর্যন্ত।

সঙ্গীতগুণের জন্যে তিনি কিছু কিছু সম্মান ও স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন। যেমন 'কাশী সঙ্গীত সমাজ' থেকে 'সঙ্গীত রত্ন' উপাধি। ধ্রুপদ-প্রবীণ হরিনারায়ণ মুখো-পাধ্যায়ের আজীবন পরিচালিত বারাণসীর বিখ্যাত 'সানন্দে ধ্রুপদ ক্লাব' প্রদত্ত 'সঙ্গীত নায়ক'। কলকাতায় আগত কোন কোন বিদেশী গুণীও তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। যথা—লন্ডন সিমফনি অর্কেস্ট্রার বেহালাশিল্পী কেনেথ মুর ও তুর্কীর

ফটো : প্রশান্ত মিত্র

লে চেফ ডি অর্কেস্ট্রার পরিচালক এসরেফ এ্যাশ্টিকাজী। তাঁরা মোহিনীমোহনের একাধিক যন্ত্রসংগীত শুনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। আর সেকথা জানিয়েও ছিলেন লিখিতভাবে।

কিন্তু তবু বলা যায় প্রতিভার যোগ্য স্বীকৃতি তিনি পাননি। না সংগীতসমাজে আনুষ্ঠানিকভাবে না সরকারী সূত্রে।

পরিণত বয়সের কাম্য সুখ শান্তিও লাভ করেননি মোহিনীমোহন। অসাধারণ প্রতিভাধর পুত্র মুরারিমোহনের মাত্র ২৫ বছর বয়সে মৃত্যু ঘটল। আর তাও শোচনীয় ঘটনাপরম্পরায়। (তার বিবরণ 'আসরের গল্প' পুস্তকের ২৬২-২৮৮ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে)। অসীম ধৈর্যে সেই শক্তিশেল তিনি সহ্য করেছিলেন। বলশালী দেহ ও তেমনি সুদৃঢ় অন্তর না হলে সেই আঘাতই মারাত্মক হত মোহিনীমোহনের পক্ষে।

সেই সঙ্গে আপনার সাধনক্ষেত্রেও শেষ বয়সে তিনি অসুখী ছিলেন। তাও এক বিয়োগান্ত অধ্যায়।

বয়সে বৃদ্ধ হলেও শরীরে তাঁর বার্ধক্য দেখা দেয়নি। জরাগ্রস্ত কোন বিষয়েই হননি। সতেজ সুরেলা কণ্ঠ। সংগীতনৈপুণ্যও প্রায় অটুট ছিল মৃত্যুর বছর খানেক আগে পর্যন্ত। কিন্তু সংগীতের আসর থেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন। এই শতকের অর্ধাংশ চলে গেছে তখন। পূর্ব যুগের অর্থাৎ মোহিনী-মোহনের অভ্যস্ত যুগের পরিবেশ আর যেন নেই। সংগীতচর্চার সে যুগের ধারা দ্রুত বদল হচ্ছে নতুন রুচির চাহিদায়। তাঁর মনে হয় লঘুর আদর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। যথার্থ গুণের উপযুক্ত সম্মান স্বীকৃতি নেই। আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র রুদ্ধ হয়ে আসছে নিষ্ঠাবান শিল্পীর। মূলত তিনি ধ্রুপদী। তাই ধ্রুপদের হৃতগৌরব অবস্থার জন্যে সংগীতজীবন তাঁর ক্রমেই সংকুচিত হয়ে এল। পূর্ণ শক্তির অধিকারী থেকেও অপসৃত হয়ে যেতে লাগলেন নেপথ্যে। আগেকার শুভার্থী, অনুরাগীরা সব কোথায় হারিয়ে গেলেন। সঙ্গীতক্ষেত্র পরিণত হল হৃদয়হীন ব্যবসাদারিতে।

তখনো অনেক কিছু দেবার ছিল, মনে করতেন। কিন্তু নেবার জন্যে তেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে আসে না ত কেউ! এ এমন বিদ্যা যা দান না করলে সার্থক হয় না। কিন্তু গ্রহীতা কোথায়?

অভিমানী শিল্পী নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন দিন দিন।

তাঁর নিজেরও ব্যবহারের দিকে দোষ-ত্রুটি ছিল। বনিয়ে মানিয়ে চলতে পারতেন না অনেকের সঙ্গে। মাঝে মাঝেই বিবাদ বেধে যেত। সেজন্যে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হতেন বেশি। তবে ত্রুটিহীন মানুষ সংসারে কজন? কিন্তু দোষ বাদ দিয়ে গুণ গ্রহণের, সম্পদ আহরণের জন্যে আগ্রহ ত দেখা যেতে পারত! কত শিল্পী কত রকমের চরিত্র-দোষ নিয়ে সফল হয়েছেন জীবনে। আসলে ভাগ্যলীলাও অনেকখানি কাজ করে। মোহিনীমোহনের জীবনও তার এক উদাহরণ!

শেষ বয়সে দেখতেন, তদ্বির তদারকে কিংবা ডামাডোলে অল্প পুঁজির ব্যক্তিও কেমন পেয়ে যাচ্ছেন বড় বড় স্বীকৃতি। কিন্তু তিনি এত ক্ষমতা নিয়েও একপাশে অনাদরে উপেক্ষায় দিন গুজরান করছেন।

ক্রমেই মন অধিকার করতে থাকে অভিমান। বিক্ষুব্ধ থেকে বিষম অভিমান—সঙ্গীত জগতের ওপর, তার সংগঠকদের ওপর। আত্মীয়স্বজনদের প্রতিও। দুর্জয় অভিমানে শেষ জীবনে কলকাতা থেকে কাশীও চলে যেতেন। শেষ বয়সে আক্রান্ত হয়েছিলেন হৃদরোগে। তখনো গায়নক্ষমতা ছিল। কিন্তু কাল বদলে গেছে তাঁর চেনা-শোনার বাইরে। কোন আসর থেকে আর আমন্ত্রণ আসে না!...

অবশেষে সেই অভিমানী মনেই চিরবিদায় নিয়ে গেলেন। ৭৬ বছর বয়সে কলকাতায়। চেতলায় সেই বাড়িতে।

ঘরের প্রকাণ্ড আলমারিটা শুধু সাক্ষ্য রয়ে গেল। মোহিনীমোহনের সুদীর্ঘ সঙ্গীতজীবনের সুরাঞ্জলি সব—তাঁর প্রাণপ্রিয় যন্ত্রসংগ্রহ। তিন পাল্লার কাচের আবরণীর মধ্যে তাঁর হাতের বীণা, সুরবাহার রবাব সুরচয়ন সুরশৃঙ্গার ক্ল্যারিওনেট পাখোয়াজ তবলা সুরায়ন তানপুরা, বাঁশি......

অসংখ্য সুরমুখর দিনরাতের স্মরণচিহ্ন ওরা। কতকালের সঙ্গীতসাধনায় বাহন মাধ্যম মূক হয়ে আছে। শিল্পীর ভাগ্য পরিণতি দেখে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে বিস্ময়ে!...

মোহিনীমোহনের ভাগ্য অনেক সময়েই বিরূপ ছিল। তার পরিচয় তিনি নিজেও পেয়েছেন জীবনের নানা পর্বে।

সেই টপ্পা শিখতে গিয়েও তাঁকে ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছিল।

টপ্পা তিনি শিখেছিলেন কিভাবে?

সে এক কৌশল বটে। তবে চিরাচরিত সেই লুকিয়ে শেখার পদ্ধতি নয়। প্রকাশ্যে, সামনে বসেই। অথচ অন্যের অজ্ঞাতে।

মোহিনীমোহন তখন শিবপুরে থাকতেন। হাওড়ার একটি ভাল সঙ্গীতচর্চার কেন্দ্র ছিল শিবপুর।

তাঁর চেতলায় বাস আরম্ভ করবার আগেকার কথা।

শিবপুরেই একদিন তিনি জানতে পারলেন—টপ্পার বিখ্যাত ওস্তাদ রমজান খাঁ এখানে আসেন। তালিম দেন ফণীশংকর মুখোপাধ্যায়কে। তাঁর বাসা থেকে বেশি দূরেও নয় সে বাড়ি।

টপ্পা গান আর রমজান খাঁর কথা মোহিনীমোহন আগে থেকেই জানতেন। সেই মজিলপুরে থাকতেই। দত্তবাড়িতে হেমচন্দ্র তাঁর আসরে রমজানকে তখন নিযুক্ত রেখেছিলেন।

মোহিনীমোহনের ভারি ভাল লাগত টপ্পা গানের চাল। তার দানা-দার তানের অলঙ্কার। শুনে শুনে কিছু কিছু টপ্পা গাইতেনও।

এখন গলা বেশ তৈরি হয়েছে। এখন ত শেখা যাবে সহজেই। রমজান যখন এত কাছে আসছেন এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।

শিবপুরে তখন মোহিনীমোহন বেশিদিন আসেননি। গায়ক বলে এখানে তাঁর পরিচয় অজানা। এমন সময় তিনি ফণীশংকরের সংগে আলাপ করে নিলেন। নিজের তবলা বাজাবার কথা জানালেন। তবলায় হাত ত ছিল ছেলেবেলা থেকেই।

ফণীশঙ্কর তাঁর বাজনা শুনে খুশী হলেন। কাজেই যখন রয়েছেন, এসে ঠেকা দেবেন গানের সঙ্গে।

মোহিনীমোহন তাই চাইছিলেন। ওস্তাদ রমজানের এক প্রিয় ছাত্র ফণীশঙ্কর। চমৎকার সুরেলা কণ্ঠ তাঁর। রমজান তাঁকে ভাল ভাল চীজ দিতেন। দীর্ঘজীবন পেলে বাংলার এক নামকরা টপ্পাশিল্পী হতেন ফণীশঙ্কর।

তাঁর সঙ্গে নিয়মিত সঙ্গত করতে আসতেন মোহিনীমোহন। ফণীশঙ্করের রিয়াজের সময়েও বাজাতেন। আবার রমজান যখন তালিম দিতে আসতেন, তখনো তিনি তবলা নিয়ে বসতেন ঠেকা দিতে। ফণীশংকর তাঁকে নিছক তবলাবাদক বলেই জানতেন আর আসতে বলতেন।

দিনের পর দিন তাঁর গানের সঙ্গে সঙ্গত করতেন মোহিনীমোহন। একাগ্র মনে দেখে নিতেন টপ্পার ধরনধারণ। গানের ভাষা মনে করে এসে বাড়িতে লিখে রাখতেন। জমজমাট গিটকিরির চাল গানের কায়দা, তান-লয়ের খুঁটিনাটি সমস্তই এঁকে নিতেন মনের পটে। বাড়িতে নিয়মিত সেইভাবে রিয়াজ করতেন। রমজান যেদিন তালিম দিতে আসতেন, সেদিন আরো লাভ। নতুন নতুন গানের রাগের তালিম মোহিনীমোহনও পেতেন মনে মনে। ওস্তাদজী কিংবা ফণীশংকর কেউই তা কল্পনা করতে পারতেন না।

এমনিভাবে মাসের পর মাস গেল। কাটল ছ'মাস। তারপরই অঘটন ঘটল। একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে। গুণের জন্যেই নিজের জালে জড়িয়ে পড়লেন মোহিনীমোহন।

সেদিনও ফণীশংকর বৈঠকখানায় রিয়াজে বসেছেন। তবলায় ঠেকা দিচ্ছেন মোহিনীমোহন। কিন্তু তালে একটু গোল হচ্ছে। গানে কম পড়ে যাচ্ছে কসরত। এ-গানটি ফণীশংকরকে আগের সপ্তায় রমজান দিয়েছেন। তালিমের সময়েও যথারীতি বাজিয়েছেন মোহিনীমোহন।

এখনো তিনি ঠিক তালে বাজাচ্ছেন। কিন্তু একটি তানের শেষে সমে পড়তে পারছেন না ফণীশংকর। বার বার চেষ্টা করেও তাল কাটছে।

হঠাৎ অনামনস্ক হয়ে মোহিনীমোহন তবলা বন্ধ করলেন। বললেন, এটা খাঁ-সাহেব এইরকম দিয়েছেন।'

বলেই নিজের গলায় তানটা উঠিয়ে সম দেখিয়ে গানের মুখটাও গেয়ে দিলেন।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ফণীশংকর। কিন্তু কয়েক মুহূর্তেই আত্মসংবরণ করে আরো নিশ্চিত হতে চাইলেন।

মোহিনীমোহনের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'ঠিক ঠিক। ওইরকমই হবে। আর একবার দেখান ত!'

মোহিনীমোহন ততক্ষণে নিজের 'নিবুদ্ধিতা' বুঝতে পেরেছেন গান গাইবার সঙ্গেই। ধরা তিনি পড়েছেন। আর পালানোর পথ নেই। আর অস্বীকার করতে পারেন না গান গাইতে।

বাধ্য হয়েই আর একবার শোনালেন।

ফণীশংকর বুঝতে পারলেন—কি সুমিষ্ট কণ্ঠ। তাল-লয়েও নিখুঁত। পরিস্কার তানকারী। সব দিকেই তৈরি।

উত্তেজিত হয়ে মোহিনীমোহনকে জিজ্ঞেস করলেন 'আপনি গান গাইতে পারেন এ-কথা কখনো জানান নি ত!'

নিরুত্তর মোহিনীমোহন।

'আপনি আর কোনদিন এ-বাড়িতে আসবেন না।'

ফণীশংকরের বৈঠকখানা থেকে তিনি চলে গেলেন—একেবারেই!...

তবে টপ্পার সঞ্চয় ও জ্ঞান তখন মন্দ হয়নি......

—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

খেলার জগতে মেয়ে

রেকর্ডকারিণী সাঁতারু ইলা পাল

এবার রাজ্য সাঁতারে শ্রেষ্ঠ সাঁতারু মনোনীত হয়েছে ইলা পাল। কলেজ স্কোয়ারে আয়োজিত এই রাজ্য সাঁতার প্রতিযোগিতা দেখতে গিয়েছিলুম গত সেপ্টেম্বরের শেষ শনিবারে। দু-শ মিটার বুক সাঁতারে পাঁচজন প্রতিযোগিনীর মধ্যে ইন্ডিয়ান লাইফসেভিং সোসাইটির দুই শেলী সাঁতারু শ্রীপর্ণা ব্যানার্জি ও মৌসুমী রায় ছিল, আর ছিল বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির কল্পনা মল্লিক, ক্যালকাটা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের নূপুর গুপ্ত, আর ইলা - ইলা পাল চাতরা সুইমিং ক্লাবের। সমাপ্তির কিছু আগে পর্যন্ত শ্রীপর্ণাই ছিল সর্বাগ্রে। হঠাৎ দেখলুম ৫ নম্বর লেনের মেয়েটি তীব্র বেগে জল কেটে এগিয়ে আসছে। শেষ সীমায় পৌঁছুতে তখন আর মাত্র ৬।৭ মিটার বাকী। সবারই ধারণা শ্রীপর্ণাই এই বিভাগে বিজয়িনী হবে। কিন্তু সমাপ্তি রেখার প্রায় দু-মিটার আগে দেখা গেল ঐ ৫ নম্বর লেনের মেয়ে ইলা পালই সবার আগে সমাপ্তি রেখা স্পর্শ করল। শ্রীপর্ণা হল দ্বিতীয়। শুধু প্রথম হওয়াই নয়। কিছুক্ষণ পরে সময়রক্ষকের হিসাব ঘোষণা করার সময় বলা হল, ইলা পাল এই প্রতিযোগিতায় তিন মিনিট ২৩-৯ সেকেন্ড সময়ে প্রথম স্থান অধিকার করার পথে। গত বছর এই বিভাগে নাফিসা আলীর গড়া ৩ মিনিট ২৫-১ সেকেন্ডের রাজ্য রেকর্ড তো সে ভেঙেইছে, উপরন্তু বিগত ১৯৭১ সালে দীপ্তি দীক্ষিতের গড়া জাতীয় রেকর্ডও ম্লান করে দিয়েছে। দীপ্তি দীক্ষিত তিন মিনিট ২৪-৫ সেকেন্ড সময়ে শীর্ষস্থান দখলের সঙ্গে জাতীয় রেকর্ডের অধিকারিণী হয়েছিল। এখন দু'শ মিটার বুক সাঁতারে জাতীয় রেকর্ডকারিণীরূপে নাম থাকবে চাতরা সুইমিং ক্লাবের কিশোরী ইলা পালের।

পরদিনই প্রশিক্ষক কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলে কলেজ স্কোয়ারের লনে ইলার সঙ্গে দেখা করে প্রথমেই প্রশ্ন করলাম,—গতকাল যখন শুনলে যে তুমি জাতীয় রেকর্ড করেছ তখন কেমন মনে হচ্ছিল?

পল্লী বাংলার সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে ইলা, গঙ্গার জলে তার সাঁতারের হাতে খড়ি। ক্রমে স্কুল সাঁতার ও রাজ্য সাঁতারের আসরে নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়ে জাতীয় জলক্রীড়ার আসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পেয়েছে। বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব করবে এবার ফোর্ট উইলিয়ামে আয়োজিত জাতীয় জলক্রীড়ায়। একটি ছোট্ট মেয়ের পক্ষে এই সুযোগ লাভ বড় কম কথা নয়। একাগ্র সাধনা আর উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। পড়াশোনার চাপ থাকলেও ইলা তার সাঁতার অনুশীলনে কখনও ক্ষান্তি দেয় না, বরং ক্রমেই সাঁতার অনুশীলনের সময় বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু কিশোরী ইলার হাবভাবে বা আচার-আচরণে চাঞ্চল্য বা চাপল্য নেই। সলজ্জ ভঙ্গীতে জানাল—'মনে মনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল।' নানাভাবে প্রশ্ন ও কথাবার্তা চালাতে চালাতে ইলার সংকুচিত ভাব কিছুটা কমল। ও জানাল ওরা শ্রীরামপুরের প্রাচীন অধিবাসী। বাবা কালীপদ পালের মুদীখানার দোকান আছে। ওরা সাত ভাই, দুই বোন। বোনেদের মধ্যে ইলাই ছোট। ওর দাদা নারায়ণ পাল গত বছর রাজ্য দলের হয়ে জাতীয় সাঁতারের আসরে নেমেছিল। এবার মুর্শিদাবাদে গঙ্গা সাঁতার প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে। সুতরাং দাদার কাছ থেকে ইলা উৎসাহ এবং সাহায্য পায়।

ইলা বলে, আমি ১৯৭১ সাল থেকে নিয়মিত ভাবে সাঁতার কাটছি। এ-ব্যাপারে আমায় প্রশিক্ষণ দেন শ্রীকানাই চট্টোপাধ্যায়। তবে গঙ্গার ধারে আমাদের বাড়ী তাই জলে নামছি খুব ছেলেবেলা থেকেই। রাজ্য প্রতিযোগিতায় বার বছরের অনূর্ধ্বদের প্রতিযোগিতায় ৫০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক এবং ফ্রিস্টাইল সাঁতারে নতুন রেকর্ড করে ও জয়ী হয়। ইলা চাতরা ক্লাবের জলাধারে রোজ প্রায় দেড় ঘণ্টা অনুশীলন করে। ও এখন স্থানীয় নন্দদুলাল ইনস্টিটিউশনের ছাত্রী।

৺ বছরই স্কুল সাঁতারে ইলা বুক সাঁতারে দ্বিতীয় হয়। জয়পুরে গতবার জাতীয় আসরে সিনিয়র বিভাগে একশ মিটার বুক সাঁতারে বাংলার প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়।

প্রশ্নের উত্তরে ইলা বলে, প্রায় আট বছর বয়স থেকেই জলে নামছি। জলে আমার মোটেই ভয় করেনি। সাঁতারে আমায় মা বাবা দাদারা এবং দিদি সবাই উৎসাহ দেয়। সাঁতার কাটা এবং প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য অনুশীলনে সময় দিতে হয়, কিন্তু এসব সত্ত্বেও ইলা বলে আমার পড়াশোনায় কোন ক্ষতি হয় না। তবে আমার সাঁতার কাটায় স্কুলের দিদিমণিরা আমার ওপর খুব প্রসন্ন নন। ওঁরা আমার সাঁতার সমর্থন করেন না। তাই আমার প্রতি ওঁদের বিশেষ সহানুভূতি নেই।

স্কুলের অন্যান্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইলা যোগ দেয়। তবে সাঁতারে, বুক সাঁতার, স্কিটাইলে প্রথম স্থান পায়। ইলা বলে আমি সাঁতার চালিয়ে যাব, অন্য কোন খেলায় তেমন আগ্রহ নেই—

প্রশিক্ষক শ্রীচট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে ইলার খুব শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম। চাতরার সাঁতার ক্লাবে ওর সঙ্গে আরও তিনজন মেয়ে সাঁতার অনুশীলন করে, তাছাড়া জনদশেক ছেলেও আছে।

ইলা বলে সাঁতারের আসরে যোগ দিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে প্রতিযোগিতার নিয়ম-কানুনও রপ্ত করছি। কোন প্রতিযোগিতায় নামলে কেমন করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারাব এই চিন্তাই মন জুড়ে থাকে। জয়ী হবার জন্য আমি প্রাণপণ 'লড়ে যাই'। গতদিনের রাজ্য সাঁতারের আসরে দু'শ মিটার বুক সাঁতারে নেমে এই আশঙ্কা বাস্তবায়িত করার জন্যই ইলা শেষপর্বে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীপর্ণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিযোগিতা গড়ে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত রেকর্ড ভাঙা সময়ে বিজয়ী হয়। এই জয়ের মূলধনে ইলা এবার জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় রাজ্য দলে স্থান পেয়েছে। জাতীয় আসরে তার সাফল্যের আশা জানিয়ে কলেজ স্কোয়ার থেকে ফিরে এলাম।

—জয়ন্ত

মাঠের নায়ক

কৃষ্ণ মিত্র

কৃষ্ণনগর থেকে কৃষ্ণ মিত্রকে যিনি কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন তিনি নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নিখুঁত এক কারিগর। মিনিট কয়েক কৃষ্ণকে দেখেছিলেন এবং পাকা জহুরীর মত একেবারে তুলে নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়। কৃষ্ণনগর মাঠের সেই কৃষ্ণ মিত্রই আজ মোহনবাগানের স্ট্রাইকার কেষ্ট।

কষ্ট এবং কসরৎ দুইই তাঁর জীবনে এখন সার্থক কেননা আজ তিনি প্রতিষ্ঠিত, স্বীকৃত, সর্বজন পরিচিত। স্যুটিং, পাশিং, হেডিং এবং স্ট্রাটেজি রচনায় সপ্রতিভ। একাই খেলবো একাই সব করবো মাঠের সবটুকু অস্তিত্ব থাকবে আমাকে ঘিরেই, একথা তিনি এক লহমার জন্য ভাবেন না। কারণ একথা তাঁর জানা যে ফুটবল একক খেলা নয়, ইনডিভিজুয়ালের থেকেও বড় হোল টিম ফুটবল টিম গেম। এবং জানেন বলেই আজ তাঁর এত কদর, এত প্রতিষ্ঠা।

কেষ্ট মিত্রের জন্ম ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে রাণাঘাটে। বাবা শ্রীসুশীলকুমার মিত্রের টিউবওয়েলের ব্যবসা। ব্যবসা অবশ্য এখন তেমন ভাল চলছে না, সুশীলবাবুর দেহটা ভাল যাচ্ছে না বলে। কিন্তু ভাল যাচ্ছে না বললে শুনছে কে? মা-বাবা, তিন ভাই (কেষ্ট মেজ), অবিবাহিত দুটি বোনকে নিয়ে রাণাঘাটের সংসারটি রীতিমত বিরাট, ব্যয় বিপুল। সুতরাং হালের আগুন-বাজারে ঐ সংসারকে ম্যানেজ করাতে, কেষ্টর বলতে গেলে হাড়ির হাল হতে হচ্ছে। তার ওপর আবার বিয়েও করে ফেলেছেন।

কেষ্ট মিত্র ক্লাব ফুটবল খেলছেন ১৯৬৪ সাল থেকে রাণাঘাট স্পোর্টিং এসোসিয়েশনের হয়ে। শ্রীসুধাংশু পালিত ও প্যাটজার সাহায্য ও সহযোগিতায় কলকাতার ফুটবল মাঠের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তার আগের বছর অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে আন্তঃ জেলা স্কুল ফুটবলে নদীয়ার হয়ে খেলেছিলেন তিনি। ১৯৬৬ সালে খেলেছেন আন্তঃ জেলা ফুটবলের আসরে। ১৯৬৬ সালে কলকাতা সিনিয়ার ডিভিসন ফুটবল লীগে প্রথম খেলতে নামেন বালী প্রতিভার সাদা সবুজ জামা গায়ে দিয়ে। প্রথম খেলাতেই কিন্তু কেষ্ট আসর মাৎ করলেন জয়সূচক একমাত্র গোলটি দিয়ে। কার বিরুদ্ধে? হ্যাঁ আজ যেখানে চাকরী করছেন, কাল যেখানে খেলেছেন সেই বি এন আর-এর বিরুদ্ধে। ১৯৬৭ সালে বালী প্রতিভাতেই রইলেন, অভিজ্ঞতা বাড়লো। কাটলো এইভাবে ৬৮ সালেও। ১৯৬৯ সালে এলেন এরিয়ানে। ১৯৭০ সালে চাকরী জুটে গেল বি এন আর-এ। একটানা তিন বছর খেলার পর ১৯৭৪ সালে ডাক এলো মোহনবাগান থেকে। চলে এলেন মোহনবাগানে। বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করে বি এন আর ক্লাবের অন্যতম কর্ণধার মেজর গুপ্ত (সি পি আর ও, সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ে) কেষ্টকে মোহনবাগানে খেলার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বাধা দেন নি। আন্তঃ রেল ফুটবলে সাউথ ইস্টার্ণের হয়ে খেলছেন ১৯৭০ সাল থেকে। জাতীয় ফুটবলের আসরে সর্বভারতীয় রেল দলের হয়ে খেলছেন ১৯৭২ সাল থেকে। ১৯৭২ সালে গোয়ায় আয়োজিত জাতীয় ফুটবলে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা নিতে না পারলেও ১৯৭৩ সালে এর্ণাকুলামে অনুষ্ঠিত গত জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় তাঁর দল রেলওয়েজ রাণার্স আপ হয়েছিল। কেষ্ট মিত্র এবার সিনিয়ার লীগে গোল করেছেন মোট পাঁচটি। মাদ্রাজে আন্তঃ রেল প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে হয়েছিল বলে আই এফ এ শীল্ডে মোহনবাগানের হয়ে শুধু একটি ম্যাচই এবার খেলতে পেরেছেন। শীল্ডে খেলতে পারেন নি বলে তিনি দুঃখিত তবে ঐ দুঃখের মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা রেল ফুটবলে কেষ্টর দল সাউথ ইস্টার্ণ চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছে বলে। ফাইনালে সাউথ ইস্টার্ণ সাদার্ণকে ২—০ গোলে হারিয়েছে। এবং দুটি গোলই কেষ্টর।

—বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলাধুলা

দর্শক

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা

ফোর্ট উইলিয়ামের ইস্টার্ন কম্যাণ্ড সুইমিং পুলে ৩১তম জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। সুদীর্ঘ ১৪ বছর পর কলকাতায় জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতার আসর বসলো। গতবারের মত এবারও পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস এবং মেয়েদের বিভাগে মহারাষ্ট্র দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। চারদিনের এই প্রতিযোগিতায় ৮টি বিষয়ে নতুন জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—পুরুষদের ৭টি এবং মেয়েদের ১টি। দুটি করে নতুন রেকর্ড করেছেন সার্ভিসেস দলের জি এস নায়ার (৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি এবং ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল) এবং বাংলার আশিস দাস ((১০০ ও ২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক)। মেয়েদের ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক সাঁতারের ৩য় হিটে বাংলার স্কুল-ছাত্রী কুমারী শ্রীপর্ণা ব্যানার্জি নতুন জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে শেষ পর্যন্ত ফাইনালে ৩য় স্থান পান। বাংলার কুমারী নাফিসা আলি তিনটি বিষয়ে প্রথম স্থান লাভ করেছেন—১০০ ও ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল এবং ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি সাঁতারে।

নতুন জাতীয় রেকর্ড
পুরুষ বিভাগ

৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি
জি এস নায়ার (সার্ভিসেস)
সময় ঃ ৫ মিঃ ২৭-৭ সেঃ

২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক
আশিস দাস (বাংলা)
সময় ঃ ২ মিঃ ২৮-৮ সেঃ (৩য় হিট)

১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক
মাখন সিং (সার্ভিসেস)
সময় ঃ ১ মিঃ ১৫-৬ সেঃ

২০০ মিটার বাটারফ্লাই
ইয়াং চিন সিন (রেলওয়ে)
সময় ঃ ২ মিঃ ৩০-৬ সেঃ

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক
আশিস দাস (বাংলা)
সময় ঃ ১ মিঃ ৯ সেঃ (৪র্থ হিট)

২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল
মহীন্দর সিং রানা (সার্ভিসেস)
সময় ঃ ২ মিঃ ১১-৫ সেঃ

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল
জি এস নায়ার (সার্ভিসেস)
সময় ঃ ৫৯ সেঃ

মহিলা বিভাগ

২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক
শ্রীপর্ণা ব্যানার্জি
সময় ঃ ৩ মিঃ ২২-২ সেঃ (৩য় হিট)

চূড়ান্ত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ ঃ ১ম সার্ভিসেস (১৪৮ পয়েন্ট), ২য় বাংলা (৭০ পয়েন্ট) ও ৩য় রেলওয়ে (৫৮ পয়েন্ট)

মহিলা বিভাগ ঃ ১ম মহারাষ্ট্র (৭২ পয়েন্ট) ২য় বাংলা (৫৫ পয়েন্ট)

সন্তোষ ট্রফি

জলন্ধরে আগামী ১লা নভেম্বর ৩১তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসছে। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে ২৪টি দল। খেলা হবে তিন প্রথায়—প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ এবং নক-আউট। প্রাথমিক পর্যায়ের লীগ খেলায় ২৪টি দল সমান ৮ ভাগ হয়ে খেলবে (অর্থাৎ প্রতি গ্রুপে ৩টি করে দল)। এই ৮টি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দল দ্বিতীয় লীগ পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করবে। দ্বিতীয় লীগ পর্যায়ে ৮টি দল সমান দুভাগ হয়ে খেলবে—অর্থাৎ প্রতি গ্রুপে ৪টি করে দল নিয়ে খেলা হবে। দ্বিতীয় লীগ পর্যায়ের খেলায় প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দল নিয়ে নক-আউট সেমি-ফাইনাল খেলার তালিকা তৈরী হবে।

খেলার তালিকা
প্রাথমিক লীগ খেলা

এ গ্রুপ ঃ পাঞ্জাব, গুজরাট ও উত্তরপ্রদেশ

বি গ্রুপ ঃ তামিলনাড়ু, দিল্লী ও রাজস্থান

সি গ্রুপ ঃ সার্ভিসেস, জম্মু-কাশ্মীর ও গোয়া

ডি গ্রুপ ঃ মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও ওড়িষ্যা

ই গ্রুপ ঃ বাংলা, ত্রিপুরা ও মধ্যপ্রদেশ

এফ গ্রুপ ঃ কেরালা, হিমাচলপ্রদেশ ও আসাম

জি গ্রুপ ঃ রেলওয়ে, নাগাল্যাণ্ড ও অন্ধ্রপ্রদেশ

এইচ গ্রুপ ঃ কর্ণাটক, বিহার ও মণিপুর

দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ খেলা

১নং গ্রুপ ঃ এ, বি, সি এবং ডি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান

২নং গ্রুপ ঃ ই, এফ, জি এবং এইচ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান

সেমি-ফাইনাল

(১) ১নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান বনাম ২নং গ্রুপ রানার্স-আপ

(২) ২নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান বনাম ১নং গ্রুপ রানার্স-আপ

বিশ্ব হকি কাপ প্রতিযোগিতা

আগামী বছরের মার্চ মাসে (১লা থেকে ১৫ই) কুয়ালালামপুরে তৃতীয় বিশ্ব হকি কাপ প্রতিযোগিতার আসর বসবে। যোগদানকারী বারটি দেশ সমান দুভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে। তারপর দুই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দল নিয়ে সেমি-ফাইনাল খেলা হবে। পাকিস্তান খেলবে এ গ্রুপে এবং ভারতবর্ষ বি গ্রুপে।

খেলার তালিকা

এ গ্রুপ ঃ পাকিস্তান, হল্যাণ্ড নিউজিল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া এবং স্পেন

বি গ্রুপ ঃ ভারতবর্ষ, ইংল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকার একটি দেশ

বিদায় পেলে

সে এক করুণ দৃশ্য। ভিলা বেলমীরো স্টেডিয়ামে সানটোস বনাম পোন্টে প্রেতো ফুটবল দলের একটা সাধারণ লীগ খেলা হচ্ছিল। হঠাৎ খেলার ২১ মিনিটের মাথায় ফুটবল-সম্রাট পেলে মাঠের মধ্যে হাঁটু মুড়ে বসে সাশ্রুনয়নে চারদিকের দর্শকদের উদ্দেশ্যে ফুটবল খেলা থেকে তাঁর বিদায় অভিবাদন জানাতে থাকেন। স্টেডিয়ামের ত্রিশ হাজার দর্শক নিজেদের সংযত রাখতে পারেননি। এই বিদায়-লগ্নে তাঁদেরও চোখ ভিজে যায়।

পেলে ধীরভাবে মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর অতি প্রিয় ১০নং জার্সিটা গা থেকে খুলে বাঁ হাতে নিলেন। তারপর তিনি শেষ স্টেডিয়াম পরিক্রমা করে ক্লাবের ড্রেসিং-রুমে যাওয়ার পথে অদৃশ্য হয়ে যান। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় পেলে আনুষ্ঠানিকভাবে ফুটবল খেলা থেকে চিরবিদায় নিলেন। পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে তিনি সর্বাধিক গোল দিয়েছেন—১২৫৪টি খেলায় ১২১৬ গোল।

তিনবারের বিশ্ব ফুটবল কাপ বিজয়ী ব্রেজিল দলের তিনি হিরো ছিলেন। তাঁর স্মরণে সানটোস ক্লাবের আর কোন খেলোয়াড় ১০নং জার্সি গায়ে দেবেন না, ১০নং জার্সির বদলে ১২নং জার্সি গায়ে দেওয়া হবে।

শতবর্ষের স্মরণীয়

গিরিশচন্দ্র। ন্যাশনাল থিয়েটার। প্রতাপ জহুরী

১৮৮১ খৃষ্টাব্দেই গিরিশচন্দ্রের অধিনায়কত্বে প্রতাপ জহুরীর ন্যাশনাল থিয়েটার সগৌরবে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ালো।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১১ মার্চ আবার এলো রামায়ণের কাহিনী নিয়ে 'সীতার বিবাহ', বিশ্বামিত্র চরিত্রে অভিনয় করলেন গিরিশচন্দ্র। শ্রীরামচন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করলেন কেদবাবু। ১২ এপ্রিল নতুন গীতি-নাট্য ব্রজবিহার অভিনীত হলো মূল নাটকের সঙ্গে।

তখন পূর্ণাঙ্গ নাটকের সঙ্গে পঞ্চরং গীতিনাট্য বা একাংকিকা অভিনীত হতো। ৩।৪ ঘণ্টার নাটকেও নাট্যামোদীরা পরিতৃপ্ত হতেন না।

১৫ এপ্রিল রামের বনবাসে কৈকেয়ী-রূপে বিনোদিনী আর সীতা চরিত্রে আত্ম-প্রকাশ করেন ভূষণকুমারী। বিনোদিনীর মঞ্চজীবনের মূলে যে গঙ্গামণির কথা আমরা পাই তিনি গুহক পত্নী চরিত্রে অভিনয় করেন। মন্থরা চরিত্রে ক্ষেত্রমণি অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেন। মঞ্চে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে 'দূর দূর' শব্দে নাট্যামোদীরা অভিনন্দিত করতেন। পৃষ্ঠ-দেশের 'কুজ'টি হয়েছিল নিখুঁত।

২২ জুলাই সীতাহরণ নাটকে বিনোদিনীকে দেখা গেল সীতা চরিত্রে। এবার শ্রীরামচন্দ্ররূপে অভিনয় করলেন মহেন্দ্রলাল বসু। অমৃত মিত্র হলেন বালি ও রাবণ। একটি বিষয় লক্ষ্য করবার যে, রামায়ণের কাহিনী নিয়ে রচিত বিভিন্ন নাটকের চরিত্র বণ্টনেও গিরিশচন্দ্র সজাগ থাকতেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভোটমঙ্গল ও মলিন মালা ছাড়া রমেশ দত্তের মাধবী কঙ্কণও পুনরায় অভিনীত হয়।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারী মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে গিরিশ-চন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' প্রতাপ জহুরীর ন্যাশনাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের শেষ নাট্যনিবেদন। 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'-এর ছন্দ বিশেষভাবে সাড়া জাগালো। অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন কীচক ও দুর্যোধন—গিরিশচন্দ্র, অর্জুন—মহেন্দ্র বসু। দ্রৌপদীরূপে দেখা দিলেন বিনোদিনী।

পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস মঞ্চস্থ হবার পূর্বে থেকেই প্রতাপ জহুরীর সঙ্গে গিরিশচন্দ্র ও অন্যান্যদের তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল নানা বিষয় নিয়ে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে কোন মঞ্চমালিকই থিয়েটার ব্যবসায় লাভ করতে পারেন নি। প্রতাপ জহুরী থিয়েটার ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করেই গিরিশচন্দ্রের অধিনায়কত্বে প্রথম বছর থেকেই বহু অর্থোপার্জন করতে থাকেন। থিয়েটার ব্যবসা সম্পর্কে নিজে একজন পরম বোদ্ধা এই মনোভাব ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো তার মধ্যে। গিরিশচন্দ্রকেও তিনি উপদেশ দিতে লাগলেন নানাভাবে। সর্বোপরি শিল্পী ও কর্মীদের পারিশ্রমিক এবং অন্যান্য খরচপত্র বিষয়ে অহেতুক বাধার সৃষ্টি করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত প্রতাপ জহুরীর সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের চরম বিরোধ দেখা দিল বিনোদিনীকে নিয়ে। অসুস্থতার জন্য বিনোদিনী একবার ছুটি নিয়ে কাশী যান। ফিরে এলে প্রতাপ জহুরী তার ছুটির মাইনে কেটে নেন। বিনোদিনী প্রতিবাদ জানালেন। গিরিশচন্দ্র অনুরোধ করলেন তাতেও প্রতাপ জহুরীর মনোভাবের পরিবর্তন হলো না। শেষ পর্যন্ত গিরিশ-চন্দ্রের নেতৃত্বে বিনোদিনী, অমৃত মিত্র, অমৃত বসু, নীলমাধব চক্রবর্তী, কাদম্বিনী ক্ষেত্রমণি প্রভৃতিরা প্রতাপ জহুরীর থিয়েটার পরিত্যাগ করলেন।

এবার প্রতাপ জহুরীর থিয়েটারের অধ্যক্ষ হলেন কেদার চৌধুরী। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের তরণীসেন বধ নাটক মঞ্চস্থ হলো। কেদার চৌধুরী নাট্যরূপায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠ দেখা গেল মে মাসে। স্বপ্নময়ী, ছত্রভঙ্গ প্রভৃতি নাটকের কোনটাই জমলো না। শেষ পর্যন্ত প্রতাপ জহুরী ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কিছুদিন থিয়েটার বন্ধ থাকে। তারপর আবার ন্যাশনাল থিয়েটার নাট্যগৃহ [illegible] নামে লীজ নেন ভুবনমোহন নিয়োগী। মাতৃবিয়োগের পর কিছু অর্থপ্রাপ্তিতে স্ত্রী ভুবনময়ী [illegible] নামে থিয়েটার লীজ নিয়ে ভুবনবাবু আবার থিয়েটার ব্যবসায় আত্মনিয়োগ [illegible]। ২৭ আগস্ট ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে '[illegible]রসম্ভব' নাটক বিশেষ জনপ্রিয়তাজর্ন করে। পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য এবং কেদার চৌধুরী ছাড়া বাবু ধর্মদাস সুরও এই সময় জড়িত থাকেন।

রবীন্দ্রনাথের বসন্ত রায়, শ্রীবৎস চিন্তা প্রভৃতি এই সময় মঞ্চস্থ হয়। মঞ্চ-কৌশলের দিক থেকে কুমারসম্ভব এবং শ্রীবৎস চিন্তা নাটকে ধর্মদাস সুর ডায়েরামা এবং মেকানিক্যাল ডায়েরামার সাহায্যে মদন ভস্ম, বসন্তের আবির্ভাব, সমুদ্রের অবলুপ্তির পর গভীর অরণ্যানির পরিবর্তিত দৃশ্য দেখিয়ে চমৎকৃত করেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই আবার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। প্রতাপ জহুরী ভুবনমোহন নিয়োগীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন। শেষ পর্যন্ত ন্যাশনাল থিয়েটার আবার নীলামে বিকিয়ে যায়।

ওদিকে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ জহুরীর থিয়েটার পরিত্যাগ করে সদলবলে গিরিশচন্দ্র নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিলেন না। গুরমুখ রায়ের অর্থে বিনোদিনীর আত্ম-ত্যাগে গড়ে উঠলো বাংলার তৃতীয় নাট্য-দেউল—স্টার থিয়েটার। সংযোজিত হলো নতুন গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

স্টার থিয়েটারের জন্ম এবং গ্রেট ন্যাশনালের অবলুপ্তির পর এমারেল্ড থিয়েটারের অভ্যুদয় নানাদিক দিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ।

—[illegible] মুখোপাধ্যায়

অগ্নীশ্বর
পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়
উত্তমকুমার-সুব্রতা

প্রেক্ষাগৃহ

ওঁরা বলেন

অনিল চ্যাটার্জি

ার্ট ফিল্ম ও কমার্শিয়াল ফিল্মের
া তফাৎ কি?

—আর্ট ও কমার্স দুটো সমার্থক ব্যাপার নয়। একটা শিল্প অন্যটির নাম বাণিজ্য। তবে অনেক ক্ষেত্রে একে অপরের পরিপূরক। যেমনটি চলচ্চিত্র শিল্পমাধ্যমের ক্ষেত্রে। দেখা গেছে বহু আর্ট ফিল্ম প্রভূত সাফল্য লাভ করেছে অর্থাৎ কমার্শিয়াল সাকসেস বলতে যা বোঝায়। আবার বহু কমার্শিয়াল ছবিও ভীষণ সফল হয়েছে। আসলে কিছু ছবি নিশ্চয়ই তৈরী হয় যা কিনা তথাকথিত জোলো সেন্টিমেন্ট, ভাবালুতা বা সস্তা মনোরঞ্জন ব্যতিরেকে। যার মধ্যে প্রথমাবধি একটা উৎকর্ষ আনার চেষ্টা থাকে, তাকেই আর্ট ফিল্ম বলবে। বিপরীতে যে ছবি পুরোপুরি বকস-অফিসের দিকে দৃষ্টি রেখেই নির্মাণ করা হয় অর্থাৎ প্রথম থেকে শেষ অবধি যার সমস্ত প্ল্যানটাই কেবল মনোরঞ্জনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সেটাই কমার্শিয়াল ছবির সংজ্ঞা। কেননা এই ধরনের ছবিতে মহৎ বা উৎকৃষ্ট কোনো শিল্পস্তরে পৌঁছাবার কোনো চেষ্টাই থাকে না।

ায়াছবিতে আঙ্গিক ও বক্তব্যের মধ্যে
টার প্রাধান্য পাওয়া উচিত?

—দেখুন এটা বহু পুরোনো প্রশ্ন, তবু গুরুত্বপূর্ণ। আসলে ফর্ম এবং কনটেন্ট এ দুটো বিষয়ই একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। শুধু বক্তব্য বা আঙ্গিক-চাতুর্যে কোনো শিল্প দাঁড়ায় না। আমার মতে ছায়াছবিতে দুটো বিষয়ের যথাযথ মিলন ঘটা চাই। এমন অনেক ছবি হয়েছে যাতে শুধু আঙ্গিকের চমক অর্থাৎ টেকনিকের বাহুল্য। আবার এমন অনেক ছবি আছে যার মধ্যে কেবল বক্তব্যের গুরুভার অকারণে তার সৌন্দর্য নষ্ট করেছে। বস্তুত সার্থক স্রষ্টা বক্তব্য এবং আঙ্গিক এ দুটো ছবিতে এমনভাবে মিলিয়ে দেবেন যে কোনটার গুরুত্ব বেশী বোঝা যাবে না, সেইখানেই ছবির চূড়ান্ত সিদ্ধি। অর্থাৎ দুয়ে মিলে এক অখন্ড রসসৃষ্টি করবে।

ঃ সার্থক চলচ্চিত্র বলতে আপনি কি বোঝেন?

—সার্থক চলচ্চিত্র বলতে এক কথায় আমি বুঝি গুড ফিল্ম। অর্থাৎ যে ছবি বিষয়বস্তু ও প্রকরণে একই সংগে উত্তীর্ণ। চলচ্চিত্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পমাধ্যম সুতরাং এ মাধ্যমকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যে এর শিল্পত্ব যাতে করে নষ্ট না হয়। যে ছবিতে এই মাধ্যমের প্রকৃত বিন্যাস লক্ষ্য করা যাবে তাকেই এক কথায় সার্থক চলচ্চিত্র বলবো। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ছবির প্রতিপাদ্য বিষয় যেন সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক না হয়। এক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের একটা মহৎ দায়িত্বের প্রশ্ন এসে যায়। মানে সার্থক চলচ্চিত্র তাই-ই যা আমাদের মনকে এই শিল্পমাধ্যমের প্রতি আকৃষ্ট করবে, মনকে আপ্লুত করবে, বিষয়ের গভীরতায় আমাদের ভাবাবে—অর্থাৎ একই সঙ্গে তন্ময় ও মন্ময় জগতের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে।

ঃ শিল্প কি কোনো নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে চলে?

—আমি মনে করি শিল্পে কোনো নীতির স্থান নেই। কারণ শিল্পী তা তিনি পরিচালকই হোন, চিত্রকর হোন, নর্তক হোন অভিনেতা হোন বা গায়ক হোন, নৈয়ায়িকের কঠোর বন্ধনে তিনি আবদ্ধ থাকতে বাধ্য নন। এই শিল্পস্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতেই শিল্পের কোনো নির্দিষ্ট পথ নেই। শিল্পের একটিই উদ্দেশ্য, সত্য অনুভাবনায় বিশ্বজগৎকে নতুন করে দ্রষ্টার দৃষ্টির সামনে মেলে ধরা। তাছাড়া পথ বলতে অনেক কিছু বোঝায়। যেমন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পথ, কলাকৈবল্যবাদের পথ সমাজচেতনার পথ ঐতিহাসিক মূল্যায়ণের পথ। আসলে ব্যাপারটাই খুব সংশয়াতীত।

ঃ ডেডিকেশান আর কমিটমেন্ট-এর প্রভেদ কতোটা? চলচ্চিত্র অভিনয়ে দুয়ের মধ্যে কোনটার বেশী প্রয়োজন?

—ডেডিকেশন এবং কমিটমেন্ট এ দুটো আলাদা ব্যাপার। প্রথমটা এক ধরনের নিষ্ঠা। দ্বিতীয়টা এক ধরনের স্বীকারোক্তি। ব্যাপারটা একটু বিশদ করা যাক। প্রত্যেক রূপের সঙ্গে রূপের চেহারাটা কতকগুলো ইংগিত এবং আকারে আমাদের চোখে পড়ে এবং তখন আমরা বুঝি এটা কি ওটা কি। এটার মানে এই ওটার মানে এই। আমরা যখন সিনেমায় কোনো চরিত্রে রূপদান করি, তখন এইভাবে মূল ব্যাপারটা আমাদের বুঝে নিতে হয়। তারপর সেটাকে প্রকাশের দায়িত্ব নির্ভর করে সম্পূর্ণ আমাদের স্ব স্ব শিল্পক্ষমতার ওপর। কিন্তু সবক্ষেত্রেই শিল্পীর চেষ্টা থাকা উচিত সবচেয়ে ভালো ও সুষ্ঠুভাবে ব্যাপারটাকে দাঁড় করানো আর এটাই হল ডেডিকেশান।

মানে অভিনেতার চূড়ান্ত অভিনয়-ক্ষমতাটা নিষ্ঠাসহকারে চরিত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসারে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাই হল তাঁর ডেডিকেশান এবং সিনেমায় অভিনেতার এই ডেডিকেশানের গুরুত্বই বেশী। অন্য পক্ষে যিনি পরিচালক তিনি তাঁর চরিত্র ও ঘটনা নিয়ে কিভাবে ডিল করবেন কোন তত্ত্বে প্রবেশ করবেন সেটা তাঁর ব্যাপার এবং সেটাই তাঁর কমিটমেন্ট। এখানে তাঁর বিশ্বাস ও মতের সঙ্গে অভিনেতার মতের মিল নাও থাকতে পারে। সুতরাং কমিটমেন্ট ব্যাপারটা অভিনয়ের অংশ অপেক্ষা পরিচালকের মত ও পথের সঙ্গে সম্পর্কিত।

ঃ সৎ ও অসৎ ছবির মধ্যে তফাৎ কোথায়?

—শিল্পকে নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার নিদর্শন আমাদের দেশে প্রচুর। চলচ্চিত্রকে বাহন করে বিজ্ঞাপন-চিত্র তথ্যচিত্র, প্রচার-চিত্রের নজির বহু রয়েছে। আসলে উদ্দেশ্যের বিভিন্নতাই একটা ছবিকে সৎ আর অসতের পর্যায়ে নিয়ে যায়। আমরা যে অবস্থায় আছি তার থেকে মহত্তর পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার ইংগিত যে ছবিতে অকপট ও সাবলীলভাবে প্রকাশিত হবে যার মধ্যে কোনোরূপে ভান নেই, তাই-ই সৎ ছবি। আর যে ছবি কেবল প্রকরণের মিথ্যে মায়াজালে আমাদের ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা তা হল অসৎ ছবি। জোর করে কিছু তৈরী করা আর স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তির সঙ্গে কিছু করার মধ্যেই সৎ আর অসৎ সংজ্ঞাটা লুকিয়ে আছে। দেখা গেছে যে অসুন্দরের মধ্যে একটা ভান থাকে, মিথ্যার আবরণে সে নিজেকে আবৃত করে, তাই সে অসৎ পদবাচ্য। আর সৎ যা তা সুন্দর, অনাবৃত। সত্যের ওপর তার প্রতিষ্ঠা। যে ছবি সৎ, প্রকাশগভীরতায় অন্তর্দর্শীতায় গঠনের সংহতিতে তা সব দিক থেকে উৎকৃষ্ট। যে ছবি শিল্পের যাথার্থ্যকে স্বীকার করে না, তার মৌল বাসনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না তাই-ই অসৎ। এই হ'ল দুয়ের মধ্যে তফাৎ।

ঃ অভিনেতা পরিচালকের হাতে পাপেট এটা মানেন?

—একদম মানি না। যাঁরা একথা বলেন আমি তাঁদের মধ্যে দম্ভের প্রকাশ লক্ষ্য করি। কেননা অভিনেতার যদি স্বকীয় ক্ষমতা নাই-ই থাকে তবে বিশেষ বিশেষ চরিত্রের জন্য পরিচালককে নির্দিষ্ট অভিনেতার সন্ধান কেন করতে হয়? আসলে পরিচালকের প্রথম ও প্রধান কাজ অভিনেতার কাছ থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজটুকু আদায় করে নেওয়া, সেক্ষেত্রে অভিনেতার ক্ষমতার ওপর তাঁকে নির্ভর করতেই হয়। অভিনেতা যদি পুতুলই হবেন তবে একই পরিচালকের হাতে অভিনেতার পরিবর্তনে কোয়ালিটির তারতম্য কেন ঘটে? পরিচালক তো ইচ্ছে করলে যে কোনো অভিনেতাকেই পুতুলের মতো নিজের প্রয়োজনে যেমন-তেমন করে ব্যবহার করে উৎকৃষ্ট ফল পেতে পারেন। কিন্তু আদতে তা হয় না। বিশিষ্ট চরিত্রের জন্য বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন অভিনেতার দরকার পড়ে। অভিনেতার শিল্পক্ষমতার ওপর তাঁকে আস্থা রাখতেই হয়। না হলে পুরো শিল্পসংগঠনটাই গোলমাল হয়ে যাবে।

ঃ অভিনয়ের সঙ্গে সময়-কালের সম্পর্ক কি রকম?

—প্রশ্নটা একটু গোলমেলে। সময়কাল বলতে অনেক কিছু বোঝায়। সমকালীনতা, ঐতিহাসিকতা, বিশেষ সময়ের সামাজিকতা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে অভিনেতার চেয়েও পরিচালকের ক্ষেত্রে সময়-কালের প্রশ্নটা বেশী প্রযোজ্য। কারণ সময়-কালের মাত্রাজ্ঞান ছাড়া কোনো স্রষ্টা প্রকৃত শিল্প গড়তে পারেন না। যে কোনো ছবিই তার নিজের কালকে ধারণ করেই এগোয়। পরিচালকের যথার্থ স্বকালচেতনা ইতিহাসবোধ থাকলে তিনি তাঁর গোটা ছবিটার সঙ্গে দর্শকদের আত্মীয়তা স্থাপন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আলাদা করে অভিনেতার অভিনয়ের সঙ্গে সময়-কালের বিষয়টা স্বতন্ত্র কোনো মূল্যে বিচার্য নয়। শুধু এইটুকুই, অভিনেতার সেখানে চরিত্রটার সমকালীন মূল্যায়ন সম্পর্কে সচেতন থাকা কর্তব্য।

ঃ সময়-কাল বলতে আমি পিরিয়ডে বলছি অনিলবাবু।

—ওহো, আচ্ছা। পুরোনো আবার দেখলে অভিনয়ের কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে এই তো। হ্যাঁ, পড়ে। সব ছবি নয়, কিছু কিছু ছবি দেখে। বর্তনটা হয় কেন জানেন? চরিত্র বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রচিত্রণও বদলায় বলে।

ঃ অভিনয় করতে করতে কোনো ভুল চালনা দেখলে আপনার কি রি-অ্যাকশ এবং কি করেন?

—রি-অ্যাকশন দু রকমের হয়। টেকনিক্যাল ভুল দেখলে কন্টি ত্রুটি হলে। সঙ্গে সঙ্গে আমি সেটা পয়েন্ট আউট করি এবং চালক তখন সেটা ধন্যবাদের সানন্দে মেনে নেন। আর দুই চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে যদি ভুল তাহলে খুব শান্তভাবে পরি বুঝিয়ে বলি, আলোচনা করি। সময়ই নিজের ভুলটা বুঝতে শুধরে নেন ব্যাপারটা। আবার ব্যাপারটাও হয়, পরিচালক নিজে ধরে বসে থাকেন আর আমিও মত কাজ করে যাই।

ঃ বাংলা ছবি এভাবে একের পর এক খাচ্ছে কে ? দায়ী কে?

— ছবি করার মত লোক কম। যাঁরা আছেন তাঁদের কই এই বাণিজ্যিক ব্যবস্থার হয়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করতে শত হলেও এটা তো তাঁর রোজগা একমাত্র উপায়। এ ছাড়াও কারণ আছে। তবে এটা ধ্রুব ভালো ছবির প্রোডাকশন না বা বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বাঁচবেই না।

ঃ বিদেশে লক্ষ্য করেছি এক-একজন চালকের সংগে এক-একজন শিল্পীর ধরনের র‍্যাপোর্ট সৃষ্টি হয়। প্রায় ছবিতেই তিনি কাজ করেন এ ব্যাপ আমাদের দেশে নেই কেন বলুন তো?

—নেই বলতে পারবো না। আমি তো এক সময় একজন পরিচাল সংগে চার-পাঁচখানা ছবি কর আরও দু-একজন অভিনেতা এ করছেন। আমি জানি সেই পরিচা আমাকে নিয়ে কাজ করতে চান। পারছেন না। বেঁচে থাকার জন্য শিল্পী নিয়ে কম্প্রোমাইজ করতে তাঁকে। হবেও। আসল কথা কি জা স্টার সিস্টেমের দৌরাত্ম্যে চলচ্চি ব্যবসার প্যাটার্নটাই গেছে পা সংগে সঙ্গে বদলেছে আরও অ কিছু।

—নির্মল

প্রিয়বান্ধবী। উত্তমকুমার

বায়োস্কোপিক

তখন শীতকাল, আমরা একটা ছবির টডোর শুটিং করতে বাইরে গেছি। া বাঁধের সংলগ্ন পাহাড়ের টিলার একটা বেশ সুন্দর সাজানো গোছানো পেকশান বাংলো, তাতে ছবির সব পীরা উঠেছেন, আর আমরা উঠেছি রী কর্মচারীদের জন্যে তৈরী কয়েকটা ও-পর্যন্ত-খালি কোয়ার্টার্সে। এমনিতেই ধর পূরী পূর্ত বিভাগের কজন অফিসার ফ্যামিলি নিয়ে সেখানে বছর পড়ে থাকেন আমাদের আগমনে খুব খুশী। যাক, এই বৈচিত্র্যহীন ন তাঁদের অন্তত গল্প করার মানুষ-জুটে গেল কয়েকটা দিনের জন্যে।

ওঁরা খুব সাগ্রহে আমাদের অভ্যর্থনা নন, বলে দিলেন—আপনারা সবরকম যাগিতা পাবেন, যখন যেটা আপনাদের র একটু আগেভাগে বলে পাঠাবেন, া সাধ্যমত ব্যবস্থা করে দেব।

দিন দুয়েকের মধ্যে কলকাতা থেকে ট্রেন কিছু ভ্যানগাড়ীতে প্রায় লোকেশানে পেঁছে গেলেন। দেখতে দেখতে জায়গাটা মানুষের কলরবে সরগরম হয়ে উঠল। তাবড় সব শিল্পী সেই ছবিতে অভিনয় করছেন। মাধবী দেবী পদ্মা দেবী, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, জহর রায়। এর মধ্যে অনুপকুমার আর জহর রায় স্টেজের আর্টিস্ট। সপ্তাহে তিনটি দিন এঁদের মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে। তাই ওঁরা কলকাতা থেকে দেড় দুশো মাইলের মধ্যে কোন ছবির শুটিং পড়লে এমন ব্যবস্থা করে নেন যাতে অন্তত স্টেজটা কামাই না হয়। ধরুন বুধবার সারাদিন শুটিং করে ওঁরা লোকেশানে রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে গাড়ীতে উঠে বসলেন। তারপর বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতায় পেঁছে গেলেন। এরপর স্টেজে সন্ধ্যের শো শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষমান গাড়ীতে চেপে বসলেন। এবং সারারাত ড্রাইভ করে পরদিন ভোর-বেলায় লোকেশানে পেঁছে গেলেন। শুক্রবার সারাদিন লোকেশানে কাজ করে রওনা দিলেন। তারপর শনি আর রবিবার স্টেজ শো শেষ করে আবার গাড়ী, আবার লোকেশান। ভাবুন কি ঝঞ্ঝাট। কিন্তু যারা স্টেজ এবং ফিল্ম, এ দুটোই করেন, তাঁরা কিন্তু এই ব্যাপারে খুব অভ্যস্থ। এ আমি নিজের চোখে অনেকদিন ধরে দেখে আসছি।

কি বলব এই তো সেদিনের কথা, হাজারীবাগ ন্যাশনাল পার্কে শুটিং করছিলাম। সে-ছবিতে স্টেজ আর্টিস্ট ছিলেন তিনজন; তরুণকুমার, শেখর চ্যাটার্জি আর বঙ্কিম ঘোষ। কোথায় হাজারীবাগ আর কোথায় কলকাতা! ওঁরা কিন্তু নির্বিকার। যাতায়াত যেন কোন ব্যাপার নয়। ওঁদের কাছে যেন কোন ব্যাপার। নয়। বুড়োদাকে (তরুণকুমার) একদিন প্রশ্ন করেছিলাম—আচ্ছা, এই যে রাত-বিরেতে ঠেঙিয়ে যাতায়াত কর, রাতে ঘুমোও কখন?

—কেন? গাড়ীতেই ঘুমিয়ে নিই। আরে বাবা, ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে নিতে পারলেই তো শরীর ফের যে-কে-সেই তাজা। আর তাছাড়া অনেকদিন ধরে করছি তো এখন আর তেমন কষ্ট হয় না, সয়ে গেছে।

শেখর চাটুজ্যে তো এসব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। বঙ্কিম ঘোষও তাই।

তা আমাদের এই ছবির লোকেশান কলকাতা থেকে তো মাত্র দুশো মাইলের মধ্যে। গাড়ীতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার স্ট্রেট ড্রাইভ। তবে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড বরাবর রাত্রে

মোহনবাগানের মেয়ে। দীপঙ্কর দে রাজশ্রী বসু

রাত্রের দিকেই দুনিয়ার যত হেভি হেভি লরি কনভয় যাতায়াত করে, টেরিফিক স্পীডে। একবার হেড অন কলিশন হলে আর রক্ষা নেই, স্রেফ ছাতু! গ্র্যান্ড ট্রাংক রোডে যাদের রাত্রে গাড়ী চালাবার অভিজ্ঞতা আছে, একমাত্র তাঁরাই আমার এই কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন। বেশী কি, দানবাদের কাছে আমিই একবার প্রায় লড়িয়ে দিচ্ছিলাম, ঈশ্বর নিতান্ত সহায়, সে যাত্রা এক চুলের জন্যে বেঁচে গিয়েছিলাম। আর তারপর থেকে আমি জি টি রোডে রাত্রের বেলায় কখনও হুইল ধরি না। কসম। তারপর ইদানিং হাইওয়ে ডাকাতি হচ্ছে বলে শুনেছি। রোড ব্লক করে গাড়ী আটকে লুটপাট খুন জখম শুরু হয়েছে নাকি! তাই এবার পুজোয় যাঁরা লং রোড রাত্রে ড্রাইভ করবেন তাঁদের প্রতি আমার পরামর্শ, বড় জোর রাত এগারোটা, তার বেশী একদম নয়। সোজা কোন ওয়েসাইড খাটিয়া হোটেলে গাড়ী লাগিয়ে টান টান হয়ে যাবেন কিন্তু বেশী রাত্রে গাড়ী চালাবার রিস্ক একেবারেই নেবেন না। বিশেষ করে সঙ্গে যদি মেয়েরা থাকেন। বায়োস্কোপের লাইনের মানুষ বলে আমার পরামর্শ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়িয়ে দেবেন না, তাতে নিজের বিপদ হয়ত নিজেই ডেকে আনা হবে। বোম্বেটে-দের পাল্লায় পড়লে সোজা ধ্বংসের ট্র্যাক বরাবর হয়ে যেতে পারেন।

কথা না শুনলে দেখুন কি দাঁড়ায়। আমি নাম করব না, আমাদের কলকাতার ফিল্মের একজন টপ হিরোইন একবার লং রোডে বোম্বে যেতে মনস্থ করলেন। উনি তখন ওখানে দু-একখানা হিন্দী ছবিতে অভিনয় করছিলেন। আর তাঁর সেই সিদ্ধান্তের কথা শুনে প্রথমে বন্ধু-বান্ধবরা নিষেধ করলেন—আরে তোমার মাথা খারাপ নাকি? বারশো মাইল ড্রাইভ করে যাবে? কি দরকার, তার চেয়ে যেমন প্লেনে যাতায়াত করছিলে সেই প্লেনেই চলে যাও, অনর্থক কেন স্ট্রেন করবে?

নায়িকা বড়ই জিদ্দি, কোন কিছুতেই তাঁর যেন ভয়-ডর নেই। হেসে বললেন—যাই না একবার। একটা অভিজ্ঞতা তো হবে—

সবাই অবাক। —রাস্তায় কত রকম বিপদ আপদ ঘটতে পারে, দু'এক ঘণ্টার ড্রাইভ তো নয়, পাক্কা আড়াই থেকে তিন দিনের পথ, এতে কত পাহাড় পর্বত, ঘাট সেকশান, ব্রীজ, নদী পড়ছে। তাছাড়া সব জায়গায় ভাল হোটেলও নেই। রাত্রে যদি সেরকম কিছু না পাও থাকবে কোথায়? খাবে কোথায়? আর আর সব সারবে কোথায়?

নায়িকা হেসে সবার কথা উড়িয়ে দিলেন, তিনি যাবেনই।

তখন নায়িকার স্বামী বললেন—ও কে, আমি সঙ্গে যাব।

কলকাতার একজন নামজাদা পরিচালক, যাঁর সঙ্গে এই নায়িকার খুব বন্ধুত্ব, তিনি বললেন—তাহলে আমিও যাব। বোম্বেতে আমায় এমনিই যেতে হত একটা বিশেষ কাজে, তাহলে তোমাদের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়া যাক। হৈহৈ করতে করতে সময় কেটে যাবে, বেশ ভালই হবে—

তখন যাত্রার একটা দিন স্থির হল।

নির্ধারিত দিনে ও'রা তিনজ[illegible] উৎসাহের সঙ্গে কলকাতা ছাড়লেন ট্যাংক ফুল লোড, সঙ্গে অপর্যাপ্ত দাবার।

প্রথম রাত্তির বেশ ভালয় কাটল। আসলে ও'রা রাতের দিকে ড্রাইভ করে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বেরিয়ে পক্ষপাতী ছিলেন। বিশ্রামটা [illegible] দিনের বেলায় যখন মাথার ওপর গনগনে, রাস্তার পীচ গলে প্রায় জ[illegible]

মধ্যপ্রদেশে ঢুকলো গাড়ী।

একটা মাঝারি হোটেলে দিনের বিশ্রাম নিয়ে ও'রা বিকেলে গাড়[illegible] দিলেন। গাড়ী কিছুক্ষণের মধ্যে [illegible] এলাকায় ঢুকে পড়ল। ও'রা রোড দেখে জায়গাটা ঠাহর করেছিলেন, [illegible] যে, সব সময় একটা ডোণ্ট কেয়া[illegible] নায়িকার স্বামী তখন হুইলে এটুখানি খুংখুং করে চেপে গেছে[illegible]

সন্ধ্যা নাগাদ একটা শহর দেখে গাড়ী থামালেন। একটু চা-টা এবার হয়।

একটা হোটেলের সামনে গাড়ী [illegible] ও'রা যখন চা খাচ্ছেন তখন হো[illegible] মালিক কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস [illegible] আপনারা স্যার আসছেন কোত্থেকে?

—কেন?

—না, আপনাদের বিদেশী ব[illegible] হচ্ছে, তাই জিগ্যেস করছি—

—আমরা কলকাতা থেকে আসছি

—ও। তা যাচ্ছেন কোথায়?

—বোম্বে।

—এই গাড়ীতে?

—হ্যাঁ। ...কেন?

হোটেল মালিক ইতস্তত করে [illegible] দেখুন স্যার, আমাদের এই ডিস্ট্রি[illegible] রাত্রে কেউ গাড়ী চালায় না। একমাত্র লাড়া। তাও ওরা দল বেঁধে যাতায়াত

—কেন বল তো? কিসের এত ভ[illegible]

হোটেল মালিক ফিস্‌ফিস্‌ করে —বাগী'র ভয়।

—হোয়াট বাগী?

—বাগী মানে ডাকাত। চ[illegible] ডাকাতের কথা কখনও শোনেন নি? খতরনাক।

নায়িকা তাচ্ছিল্যের হাসি [illegible] লোকটিকে। —দেখ, আমরা কলকাতার [illegible] তোমাদের বাগীরা আমাদের [illegible] আসতেও সাহস পাবে না, তোমার চ[illegible] দাম কত হয়েছে তাই এখন বল—

হোটেলের মালিক তবুও ব[illegible] আপনারা ভুল করছেন। রাত্রে গাড়ী চাল[illegible] না। ওরা মানুষের জান নিতেও দ্বিধা [illegible] না। রূপার নাম শুনেছেন? ছেদ্দা মা[illegible] মোহর সিং? এখন ওদের তল্লাটের [illegible] দিয়ে আপনাদের যেতে হবে—

পরিচালক ভদ্রলোক সব শুনে নার্ভাস হয়ে নায়িকাকে বললেন—এরা [illegible] যখন মানা করছে তখন না যাওয়াই ভ[illegible] আজ রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল [illegible] বরং—

চোখ
মকুমার।সোমা মুখার্জি

কথাও শেষ হল না, তার আগেই কার সেকি হাসি—কি হল ভয় পেয়ে না? এই তোমাদের সাহস?
পরিচালক মহা অপ্রস্তুত। —আরে শোন ফালতু বীরত্ব দেখিয়ে লাভ কী? সত্যি সত্যিই যদি একটা বিপদ হয়
—

—হয় হবে। অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়ে যে হাত-পা গুটিয়ে তো বসে থাকা যায় । কপালে তেমন বিপদ লেখা থাকলে স্য করতে হবে—
স্বামী বেচারি 'হুম' শব্দ করে উঠেই কি কথাটা গিলে ফেললেন।

গাড়ী আবার গর্জন করে উঠল। হেড ইটের উজ্জ্বল আলোয় কালো অজগর াবার দৃশ্যমান হয়ে উঠল। রাস্তার ধারের গাছপালা পিছনে বেরিয়ে যেতে রু করল।
রাত বাড়ছে। গাড়ীও দুর্দান্ত গতিতে গিয়ে চলেছে ভিন্ড জেলার মধ্যে দিয়ে। ছুক্ষণের মধ্যে পড়বে মোরেনা জেলা। ন ফ্রাইং প্যান টু ফায়ার।
রাত দুটো।

দূরে দেখা যাচ্ছিল রাস্তায় এড়োয়েড়ি রে কি যেন একটা পড়ে আছে। নায়িকার ামী স্পীড কমিয়ে দিলেন। পরিচালক ধু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—স্টার্ট বন্ধ রবেন না যেন।

চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, রাস্তার পাশে পাহাড়ের দেয়াল, যতদূর দৃষ্টি যায় াকালয়ের কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না। ছুক্ষণের মধ্যে গাড়ীটা এসে দাঁড়াল, ল বোঝাই একটা বয়েল গাড়ী রাস্তা টকে দাঁড়িয়ে আছে, অদূরে দুটি মোষ স খাচ্ছে। গাড়োয়ানের পাত্তা নেই।

নায়িকার স্বামী জোরে জোরে হর্ন জালেন কয়েকবার। উঁহু কোন সাড়া শব্দ ই। হেডলাইটের তীব্র আলোর দিকে মোষ টি কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে আবার ঘাসে মনোযোগ দিল। তবু গাড়োয়ানের দর্শন পাওয়া গেল না।

পরিচালক বললেন—ধুত্তোরি, দাঁড়ান, দাঁড়ান, নেমে দেখি ব্যাপারটা কি! নইলে হবে না। মনে হয় আশে-পাশে কোথাও—

নায়িকা বললেন—বয়েল গাড়ীটা ঠেলে দিলেই তো রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়।

স্বামী ভদ্রলোক নামতে নামতে বললেন —সেটাই ভাল, চলুন মশায় ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিই—

দুজনে এগিয়ে এসে বয়েল গাড়ীতে হাত দিয়েছেন কি দেব দেব ভাবখানা, হঠাৎ গাড়ীর সামনে থেকে একটা লোককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। মধ্যপ্রদেশের সাধারণ একজন চাষীকে যেমন দেখায়।
লোকটা প্রথমে একটা হুঙ্কার দিল। তারপর গাড়ীর ভেতর থেকে একটা রাইফেল বের করেই তার সেফটি ল্যাচ খুলে ফেলল।

গাড়ীর ইঞ্জিন তখন ধক ধক করে চলছে। পরিচালক ভয়ে আড়ষ্ট। নায়িকার স্বামীরও তথৈবচ অবস্থা। শুধু নায়িকা অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন লোকটির দিকে।

দেখা গেল যেন পাহাড়ের দেয়াল ভেদ করে একে একে লোক বেরিয়ে আসছে। হিংস্র ক্রূর দৃষ্টি, বলিষ্ঠ চেহারা, প্রত্যেকের গায়েই খাকী শার্ট পরনে ধুতি। সকলের কাঁধেই একটা করে থলে ঝুলেছে।

ওরা এসে নিঃশব্দে ঘিরে দাঁড়াল এঁদের। —সঙ্গে যা যা আছে চটপট বের করে দাও—
একে একে সবই দিয়ে দিতে হল। টাকা, পয়সা, ঘড়ি, নায়িকার গায়ের দু একখানা অলংকার বলতে যা ছিল সবটাই, ট্রানজিস্টর রেডিও শাড়ী কাপড়চোপড়ের বড় বড় দুটো চামড়ার সুটকেশ এবং—
—ওটাও চাই, ওটা লুকোচ্ছো কেন? বিরাট এক হুংকার।

পরিচালক ভয়ে ভয়ে বললেন—দুটো বোতল আছে, অন্তত একটা আমাদের যদি দিয়ে যাও—
—কেন, একটা দেব কেন? একটা দিয়ে কি হবে?
—না মানে, আমাদের এখন যা মাভের্র অবস্থা তাতে মানে......
লোকটি হো হো করে হেসে উঠে বলল —ওটা খাবার জন্যে তোমরা বেঁচে থাকবে ভেবেছো? আরে বাহু, বাঙালীদের মাথা বড় সাফ—
তবে এরাই সেই বাগী, এদের আতঙ্কে পুলিশও মুক্তকচ্ছ?
নায়িকা হঠাৎ হেসে উঠলেন খিল খিল করে। আর তা শুনে লোকটির কি চমক— হাসছো কেন?
—হাসছি তোমাদের ব্যাপার দেখে। তুমি দেখছি ভাল অ্যাকটিং করতে পার। সিনেমায় নামবে? চাইলে ব্যবস্থা করে দিতে পারি—

লোকটি ভীষণ অবাক। এই আউরাৎ তো আজীব ধরনের কথা বলে। লোকটি যথা-সম্ভব তার ক্রোধ বজায় রেখেই হঠাৎ বলল— হাসি বেরিয়ে যাবে আমার নাম শুনেছো?
—তোমার নাম? কি, রূপ সিং? ছেন্দা মাখন? মোহর সিং? এই তিনজনের একজন হবে বড়জোর। ও আর শুনে কি হবে? যারা নিরস্ত্র মানুষের যথাসর্বস্ব লুট করে নিয়ে আবার খুনের হুমকি দেয় তাদের নাম জেনে লাভ কি? ও জানা আর না জানা —এক কথা। নায়িকার কণ্ঠে যেন শ্লেষ ঝরে পড়ল।

কি হল হঠাৎ লোকটির কেমন যেন ভাবান্তর হল—নায়িকার ওই কথায়, তার কথা বলার ঢং-এ, হঠাৎ লোকটি বিরাট একটা চীৎকার করে ঠেট হিন্দীতে ওর লোকজনদের কি যেন নির্দেশ দিল আর লোকগুলো নিজের নিজের রাইফেল পিঠে ঝুলিয়ে দৌড়ে গিয়ে বয়েল গাড়ীটাকে রাস্তার একপাশে সরিয়ে রাখল। হেড লাইটের আলো আবার কালো অজগরের পিঠে যেন চমকে উঠল।
পরিচালক দেখলেন, গাড়ীটা সরিয়ে দিয়ে লোকগুলো আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ঠিক যেমন তারা এসেছিল, এরপর আসল লোকটি হাতের দুটো বোতলের একটি আচমকা গাড়ীর সীটে ছুঁড়ে দিয়ে বলল—এই ফেরৎ দিলাম, আমি যাচ্ছি, তোমরা কেটে পড়—

নায়িকার স্বামী আর পরিচালক দৌড়ে গিয়ে গাড়ীতে ঠেলে উঠলেন। লোকটি বলল—শুনে রাখ আমার নাম রূপ সিং, আমি অকারণে মানুষ খতম করি, কারণ তাতে আমি বেশ আনন্দ পাই, কিন্তু কোন সানদার আউরৎকে কখনও মারি না। যাও—
গাড়ী চোখের নিমেষে তিন কিলো-মিটার পথ পাড়ি দিয়েই দিয়েছে ততক্ষণে, উর্ধ্বশ্বাসে......

—রঞ্জন মজুমদার

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

মেপর থেকে বলছি

বিকেলের কনে দেখা আলোর স্নিগ্ধতায় চড়া সূর্যের খরতাপের অস্তিত্ব অনুভব করা গেল সেদিন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে ক্যান্টিনের সামনে—ছন্নছাড়া জীবনের সিঁড় ভাংগা আঁক কষার উক্ততা নিয়ে দাঁড়িয়ে কিছু বলছিলেন ঋত্বিক। ঋত্বিককুমার ঘটক। তিনি যেন তাঁর কথার সংগে সংগে একটা ভিজুয়াল ইমেজ সৃষ্টি করে চলেছেন। আমরা অনেকে তখন নির্বাক দর্শক' ঋত্বিক অন্তরংগে এবং বহিরংগে যে কথা বলে চলেছেন—অনুসরণ করতে হবে। ধরতে হবে ও'র স্টাইল অফ 'ট্রিটমেন্ট লাইন'-কে। একাত্ম হতে হবে ও'র জীবন দর্শনের সংগে। স্মরণ করতে হবে 'অযান্ত্রিক'... যেখানে ঋত্বিক প্রতিভার মহৎ উন্মেষ। এই ছবির শিল্প চিন্তায় সর্বত্রই এক নতুন ভাষা কাজ করেছে যা 'পথের পাঁচালী'র অভাবিত সাফল্যে চিহ্নিত না হয়েও স্বতন্ত্র। এই ছবির ভাষা রোমান্টিক নয় সিনেমাটিক নয় লিরিক্যাল নয় অ্যানালজিক্যাল নয়। এক নতুন ভাষা হয়েও বিশিষ্ট। এই অর্থে বিশিষ্ট ঋত্বিক-এর চিত্রভাষা শিল্প-সচেতন এবং শিল্পোর্ত্তীর্ণ। তার 'ট্রিটমেন্ট লাইন' গভীর সুতীক্ষ্ম এবং শিল্প সন্ধানী। পজিটিভ অথচ অসম্ভব ধারাল। চিন্তাসমৃদ্ধ এবং সংহত। কাহিনী একেবারে নতুন ধরনের কিছুটা অদ্ভুতও। একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে 'অযান্ত্রিক' ছবিতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি গভীর তত্ত্ব স্থান পেয়েছে যা কখনো এত সুস্পষ্টভাবে পর্দায় রূপায়িত হয়নি। জীবন তৃষ্ণা আর জীবন-যন্ত্রণার এমন অনুচ্চারিত নাটক খুব কম ছবিতেই দেখা গেছে। 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে ঋত্বিক তাঁর চিত্রভাষা পরিবর্তন করেছেন—পজিটিভ ভাষা রূপান্তরিত হয় তথাকথিত সিনেমাটিক উচ্চারণে। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'—একটি গ্রাম্য বালকের নাগরিক জীবনে ওতপ্রোতভাবে মিশে যাওয়ার কাহিনী নতুনভাবে দেখানোর চেষ্টা হয়। এই ছবির মাধ্যমে স্পষ্ট হয় তাঁর চরিত্র বোধ তর্কাতীত। এই ছবি অত্যন্ত সহজ এবং সরল। খানিকটা অ্যানালজিক্যাল—শহরে কলকাতার জীবন-ধারার পরিপ্রেক্ষিতে। প্রচলিত সেন্টিমেন্ট একদম বাদ দিয়ে পরিচালক ঋত্বিক পরীক্ষা-ধর্মী চরিত্র বিশেষ বা চরিত্র মিছিল তুলে ধরলেন।...সম-সাময়িক বঙ্গদেশ দেশ বিভাগের দায়ে ক্ষত-বিক্ষত অনিশ্চিত স্বাধীনতায় দ্বন্দ্বসংকুল রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আদর্শ বিনা বিবেচনায় চাপিয়ে দেবার ফলে অবদমিত চিত্ত। আর সেই অবদমনের ফল-স্বরূপ পশ্চিমী সভ্যতার রসে পরিপুষ্ট চিত্ত জাতীয় নেতাদের চিন্তারাজ্যের দেউলেপনা ইত্যাদি ফলশ্রুতিতে দেশের চরম দুর্গতি। ...এই ছবি সেই অধোগমনের মূল্যহীনতার ও আশ্রয়হীনতার অপূর্ব চলচ্চিত্রায়ন। চিত্রভাষা যথেষ্ট আধুনিক—ছবির মেজাজকে করেছে অভিজ্ঞ। এই ছবিতে শ্রীঘটকের শূন্য মুহূর্ত গঠনের চিন্তা এবং প্রতিচিন্তা স্বতঃস্ফূর্ত এবং বলিষ্ঠ। 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে আমরা বুঝতে পেরেছি আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি। স্থির করতে হবে কিভাবে এই সমাজ সুস্থ হয়ে ওঠে, কিভাবে শ্বাসরো সংকীর্ণতার গন্ডী ছাড়িয়ে আমরা হতে পারি। অর্থাৎ দুই বাংলার প্রায় প্রত্যেকটা ছবিতে ঋত্বিক যে ভা দেখাবার চেষ্টা করেছেন তা বিগত নয় ভবিষ্যতের দিকে তার বিবর্তন হ

প্রসংগত তাঁর সর্বাধুনিক ছবি তক্কো আর গপ্পো। সম্ভবত দশ বিরতির পর এখানে এই তাঁর চি জনান্তিকে শোনা এই ছবির চিত্রনাট ছত্রিশ ঘন্টায় লেখা। তাও আবার হারিয়ে গিয়েছে। অথবা ঝেড়ে হয়েছে। যাক গে যাক। ওসব কিসসু আসল কথা হচ্ছে (মাথায় হাত রেখে শালা...।)হঠাৎ ঋত্বিক অদৃশ্য।

কিন্তু তিনি পর্দায় আছেন। এ তাঁর নাম নীলকণ্ঠ বাগচী। একজন বি লোক। বুদ্ধিজীবী। মদ খেতে সর্বস্বান্ত। একদিন বউ ছেলে সবাই চলে গেল। অবশেষে ঘরের সিলিং ফ্যানা তবে কিনা ফ্যানের বিনিময়ে কিছু এ কিছু পয়সা। অতএব আবার কিছু গেলা হল। ঘর-বাড়ি ছেড়ে গলিপথ বেরিয়ে পড়লেন কলকাতার রাজপথে। স একজন তরুণ নচিকেতা। প্রকাশ্য লোকে নীলকণ্ঠের মদ্যপান বাংলা মদ— মাঝে নচিকেতার গার্জিয়ানসুলভ ম ভংগি—[illegible]দান। ইতিমধ্যেই সংগ নি এক যুবতী নাম তার বংগবা গ্রামের মেয়ে হাতে তার এ বোঁচকা। আরেকজন টোলের পা ভূতপূর্ব—গ্রামে মারদাংগা চলছে টোল তাই তিনি শহরে চাকরীর আশায়—তি

সাঁওলী মিত্র

যুক্তিতক্কো আর গপ্পো
ঋত্বিক ঘটক। সাঁওলী মিত্র

কালোবাজার।
লিলিয়ান।ধর্মেন্দ্র

ন এ'দের সঙ্গে। সকলেই চলেছেন চলেছেন যেন অনন্ত পদযাত্রা। শহর গ্রামে। বীরভূমের শালবনের কাছাকাছি ও ওদের যেতে হবে। অনেকটা পথ। লয়ায় এসে বিশ্রাম অপরিহার্য, জলের —ছৌ নাচ আর ভূমিদখলের লড়াই। আশ্রয় মেলে একজন শিল্পীর । শিল্পী—ছৌ-এর মুখোশ তৈরী আতিথেয়তার ত্রুটি রাখে না। তার- াবার পথে। অকস্মাৎ ভাড়াটে কৃষকের র গুলিতে টোলের পন্ডিত প্রাণ । এবার [illegible]। [illegible] পালা।

নীলকন্ঠ সেখানে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে মাত্র। থাকে না। থাকে অনতিদূরে শালবনে। শালবনে আসবার পূর্বমুহূর্তে নীলকন্ঠ তার স্ত্রীকে অনুরোধ করে ছেলের দিকে তাকিয়ে—'হাল ভোরে সত্যকে একবার শালবনে এনো। সূর্য ওঠার আলোয় ওকে একবার দেখতে চাই। যাবার আগে ওটাই তো সম্বল হয়ে থাকবে।' শালবনে একদল সশস্ত্র নকসালদের হাতে। ওরা তিনজনকে ঘিরে নিয়ে যায় গভীরে। প্রশ্ন হয় 'তুমি কে?' নীলকন্ঠের সুরাজর্জরিত কন্ঠস্বর

আলোচনা ধীরে ধীরে তর্ক-এর পর্যায়ে আসে। নীলকন্ঠ এবং একজন ক্রুদ্ধ যুবকের মধ্যে তুমুল তর্ক চলে। মার্কস লেনিন গুয়েভারা স্ট্যালিন মাও সে তুঙ—এরা সবাই তখন এক একটি অকাট্য যুক্তি। গল্পো নয়। তক্কো। কখন যেন বিপ্লবী বুলি খেই হারিয়ে ফেলে। যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ। মাতাল কি করবে? সে কোথাও যাবে না। সে থাকবে সে বুঝবে এবং সে দেখবে। পাশাপাশি নাচিয়েরা আর বঙ্গবালা। মাদলের ভীম ভীম শব্দ।

সম্পর্কের ব্যাপার। দুজনেই থরথর করে কাঁপে কান্নায়। ওরা দুজন মুখ দেখায় না। সময় দ্রুত এগিয়ে চলে। জোরের আলোয় সব শেষ। যুদ্ধশেষ। ভারী বুটের শব্দ গুলির শব্দ বাতাসে মিলিয়ে গেছে। নীলকণ্ঠের শরীরটা অদ্ভুত এক আকৃতিতে বেঁকে পড়ে যায় তার আগে ক্যামেরার লেন্সের ওপর ছরছর করে......বাংলা মদ।

একজন বিবেকবাদী ভণ্ডা বুদ্ধিজীবী নীলকণ্ঠ বাগচীর পারসপেকটিভ-এ ঋত্বিক আজকের এই সময়কে ধরতে চেয়েছেন কিম্বা ধরার চেষ্টা করেছেন। বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন কিম্বা করার চেষ্টা করেছেন। 'পজিটিভ' কিছু বলার চেষ্টা করেছেন কিম্বা বলতে চেয়েছেন। কনক্লুড করেছেন একটা কথাতেই—আমি কনফিউজড আমরা সকলেই কনফিউজড।

নীলকণ্ঠ বাগচী-র ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ঋত্বিক নিজেই। স্ত্রীর ভূমিকায় : তৃপ্তি মিত্র। বংগবালা : শাওলি মিত্র। ছৌ নাচের পটশিল্পী : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। নচিকেতা : সুগত বর্মন। টোলের পণ্ডিত : বিজন ভট্টাচার্য। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রের শিল্পী : অরুণ রায় জহর রায় উৎপল দত্ত পার্থপ্রতিম চৌধুরী প্রণব চট্টোপাধ্যায় এবং অনন্য রায়।

চিত্রগ্রাহক : বেবী ইসলাম ও দীপক দাশ। শিল্প নির্দেশক : রবি চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক : রমেশ যোশী। আবহসংগীত : ওস্তাদ বাহাদুর খান।

রাজা
দেবরাজ রায় মহুয়া রায়চৌধুরী

স্টুডিও সংবাদ

রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' চলচ্চিত্রায়িত হতে চলেছে। কলাবে। কলকাতার স্টুডিওতেই নির্মিত হবে শ্যামল গুহের পরিচালনায়। শ্রীগুহ মূলতঃ একজন সঙ্গীত পরিচালক তিনি এ ছবির সঙ্গীত পরিচালনার ভারও গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে সংগীত পরিচালক রাজেন সরকারের সহকারী ছিলেন। চিত্রপরিচালনায় তিনি একেবারে নবাগত। এটি তাঁর প্রথম এবং স্বাধীন চলচ্চিত্র-প্রয়াস। ছবিটি নির্মাণের জন্য ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন।

পরিচালক দীনেন গুপ্ত 'রাগ অনুরাগ'-এর বহির্দৃশ্য গ্রহণ শেষ করে সম্প্রতি সদলবলে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। বহির্দৃশ্য-গ্রহণ করা হয় দার্জিলিং এবং কালিম্পং শহরে। কয়েকখানি গানও পিকচারাইজ করা হয়। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গানগুলিতে সুরসংযোজনা করেছেন : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এ ছবির জন্য কাহিনী রচনাও করেছেন। চিত্রনাট্য রচয়িতা :

মল্লিক অপর্ণা সেন। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে আছেন অনুপকুমার রবি ঘোষ চিন্ময় রায় কণিকা মজুমদার রত্না ঘোষাল শেখর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। পরিচালক বলা বাহুল্য এ ছবির আলোকচিত্রশিল্পী। শিল্প-নির্দেশক : সূর্য চট্টোপাধ্যায়।

পুজোর পর বিশ্বজিৎ নতুন ছবি নিয়ে ফ্লোরে আসছেন। এই অভিনেতা-পরিচালক বর্তমানে বম্বেতে 'কহতে হ্যায় মুঝকো রাজা'র শেষ পর্যায়ের কাজে ব্যস্ত আছেন। এই হিন্দি ছবিটি কলকাতায় মুক্তি পাবে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস নাগাদ। তার আগেই বিশ্বজিৎ বাংলা ছবির কাজ শুরু করে দেবেন। শ্রীমতী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত হবে 'পাগলাবাবু'। পরিচালক নায়ক। নায়িকা মহুয়া রায়-চৌধুরী। চিত্রগ্রহণ করবেন বিজয় দে। সংগী পরিচালনা করবেন : প্রদীপ রায়চৌধুরী।

চলতি সপ্তাহে প্রযোজক-পরিচালক

করাচ্ছেন টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর স্কো
প্রবীণ সঙ্গীত পরিচালক অনিল ব
তত্ত্বাবধানে ইতিপূর্বে মান্না দে
নির্মলা মিশ্র গান গেয়েছেন।
অনিল বাগচীর তত্ত্বাবধানে ইতিপূর্বে
গাইছেন : আরতি মুখোপাধ্যায়।

কলকাতায় হিন্দি ছবির নি
বিরাট সম্ভাবনার কথা ভেবে আরো ব
জন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত পরিচালক
করছেন। কিন্তু কাজ এগিয়ে নিয়ে চ
সুখেন দাস 'অনজানে মেহমান'
ছবিটি নির্মিত হচ্ছে কালারে। কল
শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়েই এ
পরিচালনা করছেন জ্ঞানেশ মুখোপা
সংগীত পরিচালক : অজয় দাশ। বলা
পারে এটি একটি বিরাট পদক্ষেপ।
ছবির কাজ এগিয়ে চলেছে বলতে গেলে
কারের অনুপ্রেরণাতেই। সরকারী সা
এই ছবি সফল হলে আগামী দিনে কল
থেকে একাধিক হিন্দি ছবি নির্মিত
বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সংকটমোচন তান
করা যাবে। ফিরে আসবে নিউ থিয়েটার্স
সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলি।

স্ট্যান্ডিং অর্ডার ছিল। আকাশ
মেঘে কালো হলেই যে যেখানেই থাকু
কেন সোজা স্টুডিওতে চলে আস
সেইমত গত সপ্তাহের একদিন, স
একে একে জড়ো হলেন নিউ থিয়ে
এক নম্বর স্টুডিওতে। বৃষ্টি শুরু হব
করছে এমন সময় পরিচালক তরুণ মজু
সদলবলে [illegible]রিয়ে পড়লেন। কলক
পথে প[illegible] প্রবল বৃষ্টির মধ্যে 'স
সীমান্তে [illegible]বির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা
প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই বিখ্যাত কাহিনী
নাট্যে রূপ দিয়েছেন পরিচালক নি
ছবিখানি নির্মাণ করছেন সমকা
পিকচার্স। প্রযোজক : সুবীর
পর পর কয়েকটি পর্যায়ে টেকনিসি
এবং এন টিতে অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ
হয়েছে। ছবির প্রধান দুই চরিত্রের শিল্প
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যা রায়। অ
চরিত্রে আছেন : উৎপল দত্ত, কালী ব
পাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, রবি
শমিতা বিশ্বাস অমিতাভ চট্টোপা
আনন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। চিত্র
করছেন : কে এ রেজা। সঙ্গীত প
চালকের দায়িত্ব পালন করছেন : হে
মুখোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে কয়েকটা গান রে
করা হয়ে গিয়েছে। জানা গেল নভেম্বর ম
একটানা পঁচিশ দিন ধরে শুটিং চ
স্টুডিও কম্পাউন্ডে সেট ফেলা হবে।

এ মাসের মাঝামাঝি থেকে 'চুণী' ন
একটি নতুন ছবির দৃশ্যগ্রহণ শুরু হ
ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে। প
চালনা করবেন 'চিত্রসেবী' নামের আড়
আলোকচিত্রশিল্পী শক্তি বন্দ্যোপাধ্যা
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এ
খানা ছবি পরিচালনা করেছেন। 'ছোট্ট নায়ক'
ছবিটি মুক্তির অপেক্ষায়। যথারী
এ ছবিরও চিত্রগ্রহণ করবেন নিজে। স্বরী
কাহিনী ও চিত্রনাট্য। গ্রামের পটভূমিক

...ের বিষয়। **নায়ক: শমিত ভঞ্জ।** নায়িকা: ...ধ্যা রায়। **খুব সম্ভবতঃ একটি বিশেষ** ...রিত্রে রূপদান **করবেন আরতি ভট্টাচার্য।**

নভেম্বর **মাস থেকে বেশ কয়েকটি** ...তুন ছবি শুরু **হচ্ছে। তার মধ্যে আছে** ...রঙ্গী। **বিমল মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে** ...ই ছবি **পরিচালনা করছেন তরুণ** ...শিল্পী শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা। নায়ক-নায়িকা ...রূপে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অপর্ণা ...সেন দ্বৈত চরিত্রে। কয়েকটি বিশিষ্ট ...চরিত্রে রূপ দেবেন: উৎপল দত্ত, ছায়া ...দেবী, তরুণকুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় এবং দিলীপ রায়। চিত্রগ্রহণ করবেন: বিজয় ...ঘোষ। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন মান্না ...দে। ছবির বেশ কিছুটা অংশ বহির্দৃশ্যে তোলা হবে।

বাংলা ছবির অন্যতম মহিলা প্রযোজক ...ঞ্জু পার অচিরেই নতুন ছবি নিয়ে ফ্লোরে ...যাচ্ছেন। নীহাররঞ্জন গুপ্ত 'কলঙ্কিনী ...কঙ্কাবতী' চিত্রায়িত করবেন। নায়কের ভূমিকায় রূপদান করবেন উত্তমকুমার দ্বৈত ভূমিকা। পরিচালনা করবেন শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা।

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

শত্রুঘ্ন সিনহা অনেকদিন থেকেই অপর্ণা সেনের ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টায় আছেন। একবার তিনি কলকাতায় গিয়ে দেখা করার চেষ্টা করেন কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আরেকবার একটা ছবিতে হিরোইন হিসেবে বাংলার অপর্ণা সেনের নাম প্রপোজ করে। প্রযোজক-পক্ষ তেমন উৎসাহী না হওয়ায় সেই পরিকল্পনাও ভেস্তে যায়। এতদিনে সফল হতে পারে। কারণ অন্য একটা পরিকল্পনার মাধ্যমে অপর্ণাকে হিন্দি ছবিতে কাজ করার জন্য অফার দেওয়া হয়েছে। অফার অ্যাকসেপটেড। জানা গিয়েছে শত্রুর বিপরীতে সাইন করেছেন অপর্ণা। ছবিটি পরিচালনা করবেন হৃষিকেশ মুখার্জি। হিন্দি ছবিতে হৃষি মুখার্জির ছবিতে অভিনয়ের অর্থ হচ্ছে বড় ব্রেক। কে ছাড়ে? যাতে না ছাড়াছাড়ি হয় তার জন্যেই তো এত ব্যবস্থা। মোদ্দা ব্যাপার হচ্ছে 'ব' কলমে এ ছবি প্রযোজনা করছেন শত্রু নিজেই। ও'র সেক্রেটারী পবনকুমারের নামে। পবন এখন শব্দের উচিত প্রযোজক। অথচ 'অভিমান' ছবিও ও এই ভাবে প্রযোজনা করেছে। 'ব' কলমে অর্থ নিয়োগ করেছিলেন অমিতাভ বচ্চন আর জয়া ভাদুড়ী। পবন আবার এঁদেরও সেক্রেটারী। যাই হোক শত্রুঘ্ন অপর্ণা সেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্য একটা ছবি বানাতে চলেছেন। ভাগ্যিস তাজমহল বানাবার চেষ্টা করছেন না।

সঞ্জীবকুমার প্রেম করতে গিয়ে প্রথমেই যে ধাক্কা খেয়েছিলেন সেকথা অনেকেরই জানা আছে। কি কেলেংকারীটাই না হয়েছিল। নূতন যে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে সঞ্জীব স্বপ্নেও ভাবেন নি। অপমান আর লাঞ্ছনার গ্লানি নিয়ে সেদিন সঞ্জীব চুপচাপ করে স্টুডিওর বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি কখনও আত্মপক্ষ সমর্থন করেননি অথবা আজ পর্যন্ত কারুর কোনো প্রশ্নের উত্তর দেন নি। বলতে গেলে তারপর থেকে মেয়েদের সম্পর্কে সঞ্জীব তাঁর ধারণা বদলে ফেলেছেন। এখন তাঁর মতে মেয়েরা হচ্ছে নতুন জামাকাপড়ের মতো। যখন যেটা খুশী পরা যায়। সঞ্জীব তাই একের পর এক প্রেমে পড়ছেন আর ত্যাগ করছেন। কখনও লীনা চন্দ্রভারকারের সঙ্গে কখনও মমতাজের সঙ্গে কখনও জীনত আমনের সঙ্গে কখনও শার্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে কখনও বা হেমা মালিনীর সঙ্গে। এঁদের অনেকের সঙ্গে সঞ্জীবের অনেকবার বিয়ে ঠিক হয়েছে এবং ভেঙ্গে গেছে। সঞ্জীব বলেন: তাই তো অনিবার্য।

রাজেশ খান্না বিদায় নেবার পর অঞ্জু মহেন্দ্রুর জীবনে আরেক রাজেশ এসেছে। তার সম্পূর্ণ নাম রাজেশ লহর। সে হচ্ছে পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্র। ছুটিতে বেড়াতে এসে একটা পার্টিতে অঞ্জুর সঙ্গে ওর আলাপ হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে পড়ে। প্রেমে না প্রেমের ফাঁদে?

আই এস জোহরের ছেলে অনিল (জয় বাংলাদেশ ছবিতে যে রাজীব নামে কাজ করেছিল) ধরা পড়েছে। প্রেমের ফাঁদে নয় পুলিশের হাতে। কারণ ড্রাগ স্মাগলিং করা। ছেলের জন্য বাবা জোহর জামিন দেয়নি। বলেছে: ও ড্রাগ স্মাগল না করে ফিল্ম স্মাগল করলে জামিন দেওয়া যেত......

পারভিন বাবি বলে 'আমি অবিবাহিতা। আমার কেউ নেই আমি একা।' কেন ড্যানি? উঁহু ড্যানিরও ড্যানি আছে। আহমেদাবাদে পারভিনের স্বামী এবং সন্তান বর্তমান। তাই মাঝে মাঝেই পারভিনকে আহমেদাবাদে যেতে হয়। এককূলও রাখতে হচ্ছে ওকূলও রাখতে হচ্ছে। জানতে পেরে ড্যানী এতদিনে ড্যানীর মতো কথা বলেছে: আমি জেনেশুনেই বিষ করেছি পান......

—অভিজিত

মণি শ্রীমানী
তরুণকুমার

শজারুর কাঁটা

প্রযোজনা ঃ মঞ্জু দে প্রোডাকসন্স

দুর্বল চিত্রনাট্য, পরিচালনা মন্থর গতির জন্যেই, রহস্য কাহিনী প্রেমের কাহিনীতে পরিণত হয়েছে!

'স্বর্গ হতে বিদায়' এবং 'অভিশপ্ত চম্বল' সাফল্যের পর শ্রীমতী মঞ্জু দের উপর সকলেরই প্রত্যাশা ছিল, যে উনি একটি খাঁটি রহস্যকাহিনী পর্দায় উপস্থিত করবেন। কিন্তু শ্রীমতী দে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাসের চিত্ররূপ দিতে গিয়ে, রহস্যের থেকে প্রেম সংঘাতের উপরই বেশী নির্ভর করেছেন। ফলে রহস্যচ

শারদীয় আকর্ষণ

তিনটি বাংলা এবং ৪টি হিন্দী ছবি

'সুজাতা'

মা চণ্ডী ফিল্মস নিবেদিত 'সুজাতা' ছবিটি ১৮ই অকটোবর থেকে রাধা-পূর্ণ-প্রাচী চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। কাহিনী—সুবোধ ঘোষ। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা পিনাকী মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত—নচিকেতা ঘোষ। ভূমিকায় অপর্ণা সেন, দীপঙ্কর দে, অনিল চাটার্জি, সুব্রতা চাটার্জি সুমিত্রা মুখার্জি ছায়া দেবী প্রভৃতি।

'অমানুষ (রঙীন)

শক্তি সামন্ত প্রযোজিত ও পরিচালিত 'অমানুষ' শারদীয়ার অন্যতম আকর্ষণ হিসাবে উত্তরা-উজ্জ্বলা-পূরবী চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। কাহিনী—শক্তিপদ রাজগুরু, গীতিকার—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সঙ্গীত—শ্যামল মিত্র, অভিনয়ে—উত্তমকুমার, শর্মিলা ঠাকুর, অনিল চাটার্জি, উৎপল দত্ত প্রেমানারায়ণ, অসিত সেন, অভি ভট্টাচার্য।

'যে যেখানে দাঁড়িয়ে'

চিত্রলিপি ফিল্মস নিবেদিত 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' মুক্তি পাচ্ছে শ্রী ও ইন্দিরায়। কাহিনী—রমাপদ চৌধুরী, পরিচালনা—অগ্রগামী, সঙ্গীত—ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ। ভূমিকায়—কাবেরী বসু, দীপংকর দে এন বিশ্বনাথন, মহুয়া রায়চৌধুরী ভাস্কর সেন প্রভৃতি।

'রোটি কাপড়া অওর মাকান'

বিশাল ইন্টারন্যাশনাল নিবেদিত, কাহিনী—শশী গোস্বামী। প্রযোজনা-পরিচালনা - সম্পাদনা—মনোজকুমার, সঙ্গীত—লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলাল, ভূমিকায়—মনোজকুমার, শশী কাপুর, জীনৎ আমন, মৌসুমী চাটার্জি, প্রেমনাথ ও অমিতাভ বচ্চন। মুক্তি পাচ্ছে—ওরিয়েন্ট, ম্যাজেস্টিক, বসুশ্রী, বীণা।

'প্রেমশাস্ত্র'

অমরজিৎ প্রযোজিত বি আর ইশারা পরিচালিত 'প্রেম শাস্ত্র' লোটাস, কৃষ্ণা, জেম, প্রিয়া চিত্রগৃহে শারদীয়ার আকর্ষণ হিসাবে মুক্তি পাচ্ছে। কাহিনী—বি আর ইশারা, সঙ্গীত—লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল, অভিনয়—দেবানন্দ, জীনৎ আমন, বিন্দু, রেহমান, আই এস জোহর, অভি ভট্টাচার্য।

'কসৌটী'

ললিত কলা মন্দির নিবেদিত এবং অরবিন্দ সেন পরিচালিত 'কসৌটী' নিউ এম্পায়ার ও অন্যান্য বহু প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে! সঙ্গীত—কল্যাণজী আনন্দজী। ভূমিকায়—হেমা মালিনী, অমিতাভ বচ্চন ও প্রাণ।

'কালাবাজার'

পাঞ্ছী প্রযোজিত ও পরিচালিত ইণ্টারন্যাশনাল ক্রুক বা কালাবাজার অপেরা ও অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। সংগীত—শঙ্কর জয়কিশান, অভিনয়ে—ধর্মেন্দ্র, সায়রাবানু, ফিরোজ খান, জিলিয়ান, ওমপ্রকাশ।

ট হওয়া উচিত, তেমন হয়নি। বাংলা ভাষায় রহস্য-
ীর অভাব নেই, অভাব শুধু সর্বাঙ্গসুন্দর বা
সম্মত রহস্য-ছবির। শ্রীমতী দে'র কাছ থেকে আমরা
করেছিলেনম খাঁটি রহস্যের ছবি, মামুলী খুনের বা
ছবি নয়।

ীপা' একটি মধ্যবিত্ত ও রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের
মেয়ে। অভিভাবকরা, বিশেষ করে পঙ্গু দাদু এবং
সমান সমান মধ্যবিত্ত পরিবারের কোন সংপাত্রের সঙ্গে
ববাহ দিতে সচেষ্ট। কিন্তু দীপা স্পষ্টই ওঁর দাদুকে
অভিভাবকদের জানিয়ে দেয়, যে সে তার মনোমত
ত্রকেই বিবাহ করতে ইচ্ছুক। এই ঘটনায় বাড়ীতে যেন
স্ফোরণ ঘটে। তারপর থেকে দীপার বাহিরে ঘুরে বেড়ানো
কেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরিবারের ঐতিহ্য বজায়
ার জন্য, তাড়াতাড়ি দীপাকে পাত্রস্থ করার ব্যবস্থা চলে।
র দাদার বন্ধুর সাহায্যে দেবাশিসের মতো একজন
বস্থাপন্ন চাকুরে ছেলের সঙ্গে, বিবাহ দেওয়ার ব্যাপারে সব
ছুই পাকাপাকি করে ফেলে। দিনের পর দিন ফোনে
ীপাকে ওর প্রেমিক নিয়মিত ভয় ও উপদেশ দিতে থাকে।
ঙ্গু দাদুর ও দাদার ভয়ে, বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে
্রেমিকের সঙ্গে, মিলিত হবার কোন উপায় নেই। বাধ্য
য়েই বাড়ীর সকলের ইচ্ছানুযায়ী, দেবাশিসকে বিবাহ করতে
ীপা বাধ্য হয়। বাড়ীতে থেকে দীপারও দেবাশিসের
্রী হয়ে, অভিনয় করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।
ুলশয্যার রাত্রে সে দেবাশিসকে স্পষ্টই জানিয়ে দেয়, য
র প্রেমিক আছে। সুতরাং ওর পক্ষে অন্যান্য বিবাহিত
েয়েদের মতো জীবন নির্বাহ করা সম্ভব হবে না। এর
ন্যে যেন দেবাশিস ওকে ক্ষমা করে। অন্য কোন উপায়
া থাকায়, দেবাশিসও সে চুক্তি অনুযায়ী অর্থাৎ দীপাকে স্ত্রী
িসাবে মেনে নেয়। এই সময়ের মধ্যে শহরে পরপর তিনজন
াধারণ ব্যক্তি খুন হয়। প্রত্যেকেরই পিঠে খঞ্জারের কাঁটা
বিঁধিয়ে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডগুলি অনুষ্ঠিত হয়
শহরের দক্ষিণের লেক অঞ্চলে। পুলিশ এই খুনের কিনারা
করবার জন্যে, প্রখ্যাত সত্যান্বেষী ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ
বকসীর সাহায্য নেয়। ব্যোমকেশবাবু দেবাশিসবাবুর
বন্ধুদের আলাদা আলাদা জবানবন্দী নিয়েও হত্যাকাণ্ডের
কিনারা করতে না পেরে চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

আততায়ীর চক্রান্তে আহত দেবাশিসের কাছ
থেকে সব তথ্য সংগ্রহ করে ব্যোমকেশ বুঝলো,
হত্যাকারী একটি মটোর সাইকেল নিয়েই হত্যা
করে, আর হত্যা করার পর সেই সাইকেলেই তীব্র গর্জন
করে চলে যায়। সত্যান্বেষী ব্যোমকেশবাবুও আক্রান্ত হলেও,
নিজেকে খুনীর হাত থেকে রক্ষা করে। তাঁকে গ্রেপ্তার করে
থানায় পাঠিয়ে দেন। এইভাবে রহস্যের তথা খুনের কিনারা
হয়। খুনী গ্রেপ্তার হবার পর দেবাশিস ও দীপার পুনর্-
মিলনের মধ্যে দিয়েই ছবির সমাপ্তি।

মৌলিক রহস্য কাহিনীকার হিসাবে শরদিন্দু বন্দ্যো-
পাধ্যায়ের নাম স্মরণীয়। চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক মঞ্জু দে
রহস্য, রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর বিশ্লেষণের দিকে না গিয়ে
উনি একটি নিটোল প্রেমের ছবি উপহার দেবার চেষ্টা
করেছেন। অভিনয়ে—বাসবী নন্দীর দীপা, সতীন্দ্র ভট্টা-
চার্যের দেবাশিস, 'পাহাড়ী সান্যালের দাদু, শ্যামল
ঘোষালের ব্যোমকেশ বকসী, সৈকত মুখার্জির 'হত্যাকারী'র
অভিনয় সকলেরই ভালো লাগবে। অন্যান্য চরিত্রে—তরুণ-
কুমার, শোভেন লাহিড়ী, মণ্টু ব্যানার্জী, শম্ভু ভট্টাচার্য
গীতা দে, নীলিমা দাস, সীতা মুখার্জি প্রভৃতি চিত্রনাট্যের
দাবী মিটিয়েছেন। সঙ্গীত পরিচালনায় সুধীন দাশগুপ্ত
তাঁর সুনাম রক্ষা করেছেন। গায়কার গুণে হেমন্তকুমার,
মান্না দে, বাসবী নন্দীর গান সকলেরই ভালো লাগবে।
কলাকৌশলের কাজ পরিচ্ছন্ন।

— চিত্রদূত

ফরাসি ছবি প্রাইভার্ট অন দি ট্রেনের একটি দৃশ্য

বিদেশী ছবি

কলকাতার বিদেশী ছবি প্রদর্শনের
হলগুলি থেকে ক্রমশঃ ইংরেজী বা বিদেশী
ছবির প্রদর্শন কমে যাচ্ছে। সেখানে ক্রমশ
স্থান করে নিচ্ছে হিন্দী ছবি। কদাচিৎ
কখনও বাংলা ছবি। তাও ক্ষণস্থায়ী।

এই সব হলগুলির অবস্থা দেখে মনে
হয়, অদূরে ভবিষ্যতে এসব স্থানগুলি দখল
করে নেবে হিন্দী চিত্রজগৎ।

তাহলে কি আমরা ইংরেজী ছবি দেখা
কালক্রমে ভুলেই যাবো? অবিশ্বাস্য কিছুই
নয়। ভারতে ভারতীয় ছবিই একমাত্র দর্শন-
গ্রাহ্য হবে এ কথা একদিন সামগ্রিকভাবে
সত্য হওয়াও অবিশ্বাস্য নয়।

এখন একমাত্র ভরসা বিদেশী ছবির
উৎসব। যদিও সেটাও নির্ভর করবে
সরকারী নীতির ওপর।

এ ছাড়া আর যেসব সূত্র মারফৎ
বিদেশী ছবি দেখা সম্ভব হতে পারে সেসব
হোল যথাক্রমে বিদেশী দূতাবাসের সৌজন্যে

সময়ে তাদের দেশের ছবির প্রদর্শন এবং স্থানীয় সিনে প্রতিষ্ঠানগুলি।

কিন্তু তাতে কি ইংরেজী ছবির দর্শকদের মন ভরবে, নাকি সেসব ছবি বৃহত্তর দর্শক সমাজ দেখবার সুযোগ পাবে?

এটা শুধু আমরা বিদেশী ছবি ভালবাসি বলেই নয়, এখানে এখনও এমন অনেক বিদেশী বসবাসকারী আছেন, যাঁদের স্বার্থের কথা চিন্তা করেও আমাদের ভাবা দরকার।

অর্থাৎ এদেশে বিদেশী ছবি প্রদর্শনের পেছনে যে একটা সার্বজনীন স্বার্থ আছে এটা আমাদের মনে রাখা কর্তব্য।

উপভোগ্য ছবি চীপার বাই দি ডজেন

গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ইউ এস আই এস-এর তরফ থেকে যে ক্যাসিক ছবিখানি নির্দিষ্ট সংখ্যক দর্শককে তাদের অডিটোরিয়ামে দেখানো হল, তার নাম চীপার বাই দি ডজেন। টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফকসের ছবি। প্রথম উপভোগ্য আকর্ষণীয় এবং গভীরতায় চিহ্নিত ছবি বড় একটা ইদানীং দেখা যায় নি।

উপভোগ্য এবং ব্যঙ্গ মিশ্রিত (:) গল্প। গল্পের পরিবেশনাও সাবলীল। আগাগোড়া কৌতুক মিশ্রিত। কোথাও সেই কৌতুক নির্মল আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিয়েছে যেন। আশ্চর্য প্রাণবন্ত এবং উইটি সংলাপ। সর্বত্রই যেন হৃদয়ের উত্তাপ অনুভূত হয়।

অথচ আপাতে সাধারণ একটি সুখী পরিবারের গল্প। যাঁর কর্ণধারের ১২টি সন্তান। পেশায় যিনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার—যাঁর বিশেষত্ব সময় ও তার গতি-প্রকৃতি অনুধাবনে। এবং বলা যায় নিয়মানুবর্তিতা। এ যেন একটি পরিবার নয়, একটি গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের প্রতীক এই ছবি। একেই বোধহয় বৃহত্তর অর্থে ফ্যামিলি পিকচার বলে। যে ছবিতে ভাষা প্রতিবন্ধক নয়, অথচ আবেদন সার্বজনীন।

একটি চেক রূপকথা প্রিন্স বায়ায়া

মূলত এই শিশু চিত্রটি রূপকথার আঙ্গিকে পরিবেশিত হলেও প্রিন্স বায়ায়া এক দুঃসাহসী, পরোপকারী, আদর্শবাদী রাজকুমারের গল্প। যার বীরত্ব আর সততার কাহিনী শিশুদের মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দের পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। দেখতে দেখতে তারা যেন এক সময় একাত্ম হয়ে যায় ছবির নায়ক-নায়িকার সঙ্গে।

ছবিতে রাজপুত্র আছে, রাজকুমারী আছে, তার পরীর মত সখীবৃন্দ আছে, আর আছে একটা তিনমুখো ড্রাগন।

প্রিন্স বায়ায়া যেন আজকের যুগেরও নায়ক। শারীরিক দিক থেকে সক্ষম, বীর, রণে সুদক্ষ, এক কথায় সব দিক থেকেই শিশুদের অনুকরণীয় আদর্শ পুরুষ—যে অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পায় না, দেশের শত্রুকে নিধন করার মত দুঃসাহস রাখে। মরণপণ লড়াই করে যে ব্ল্যাক প্রিন্সকে (অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতীক) পরাভূত করল, হিংসারূপী তিনমুখো ড্রাগনকে মেরে ফেলল।

তিনমুখো ড্রাগনকে হত্যা করে প্রিন্স বায়ায়া রাজকুমারী স্লাভেনার মনে প্রেমের সঞ্চার করল কিন্তু তার প্রতি বায়ায়ার লোভ নেই, কারণ সে রাজকুমারীকে পাবার জন্য ড্রাগনের সঙ্গে ভয়াবহ লড়াই করে নি, সে লড়াই করেছে অশুভ শক্তির বি[illegible] ড্রাগনের গহ্বর থেকে তাকে পরাস্ত রাজকুমারীকে উদ্ধার করে আনার শিশুরা নিশ্বাস বন্ধ করে দেখবে। মুখো ড্রাগনের আস্ফালন বিদ্যুৎ[illegible] মত তার জিহ্বা আন্দোলন, অ[illegible] ভাটার মত চোখ এবং সর্বাঙ্গ মোচড়[illegible] ঝাপড় মাথার দৃশ্য দেখতে দেখতে ম[illegible] মুহূর্তে শিশুরা ভয়ে শিউরে উঠে[illegible] শেষে রাজপুত্রের জয় (যা শি[illegible] প্রত্যাশিত) শিশু দর্শকদের মধ্যে দেয় জয়ের আনন্দ।

এসব ছবি দেখলে শিশুদের কল্পনার জগতের পরিধি বিস্তৃত তেমনি তাদের মনে দুঃসাহসী এবং সং[illegible] গড়ে ওঠার অনুপ্রেরণা লাভ করে তা[illegible]

দুঃখের বিষয় এমন ছবি এদেশে তৈরী হয় না, তেমনি দেখারও সুযোগ না এদেশের ছেলে-মেয়েরা।

ফেয়ারওয়েল ফ্রেন্ড

লাইট হাউসে সাম্প্রতিক ছবি ফে[illegible] ওয়েল ফ্রেন্ড রুদ্ধশ্বাসে বসে দেখার ছবি। ছবির ঘটনা সামান্য। কিন্তু ট্রিটমেন্ট, সাসপেন্স সৃষ্টি এবং অ[illegible] এক কথায় স্মরণীয়। সাসপেন্স থ্রিলার [illegible] পছন্দ করেন তাঁদের কাছে ছবিটি আকর্ষ[illegible] সন্দেহ নেই।

—শা, র

বাংলাদেশের ছবি

বাচসাস-এর পুরস্কার

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জন্য একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা। সেদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় স্থানীয় হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির '৭২-'৭৩ সালের চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য মন্ত্রী খন্দকার মুস্তাক আহমদ। বাচসাস-এর সভাপতি জনাব এস এম পারভেজ অনুষ্ঠানের শুরুতে সমিতির পক্ষ থেকে চলচ্চিত্র পুরস্কারের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে এদেশের ছবি বিদেশে পাঠিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য সরকারের উদ্দেশ্যের কথা ব্যাখ্যা করেন। বিচারকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান জনাব আজিজ মিছির তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর বিচারকমণ্ডলীর রায় ঘোষণা করেন। চিত্র-কর্মীদের পক্ষ থেকে খান আতাউর রহমান ভাষণ দেন।

যাঁরা পুরস্কার পেলেন

বাচসাস-এর বিচারক মণ্ডলীর রায় অনুযায়ী : '৭২-'৭৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি থেকে (১) শ্রেষ্ঠ গায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্[illegible] (ধীরে বহে মেঘনা), (২) শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকা[illegible] খান আতাউর রহমান (আবার তোরা মানু[illegible] হ); (৩) শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার আমজা[illegible] হোসেন (আবার তোরা মানুষ হ), (৪[illegible] শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক আনোয়ার পারভে[illegible] (জয় বাংলা) (৫) শ্রেষ্ঠ চিত্র সম্পাদ[illegible] বশির হোসেন (লালন ফকির), (৬) শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক বেবী ইসলাম (তিতাস একটি নদীর নাম); (৭) শ্রেষ্ঠ পরিচালক ঋত্বিক ঘটক (তিতাস একটি নদীর নাম), (৮) শ্রেষ্ঠ ছায়াছবি (আবার তোরা মানুষ হ); (৯) শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় ছায়াছবি (লালন ফকির), (১০) শ্রেষ্ঠ দলিল চিত্র জহির রায়হান (স্টপ জেনোসাইড), (১১) শ্রেষ্ঠ অভিনেতা রাজ্জাক (অনির্বাণ), (১২) শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী কবরী (লালন ফকির), (১৩) শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা মোস্তফা (বলাকা মন), (১৪) শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী রওশন জামিল (তিতাস একটি নদীর নাম) (১৫) শ্রেষ্ঠ গায়ক মহম্মদ আবদুল আলীম (লালন ফকির), (১৬) দুটি বিশেষ পুরস্কার (ক) আলমগীর কবীর (ধীরে বহে মেঘনা নির্মাণের জন্য) ও (খ) এ টি এম

জামান (লালন ফকির ও অন্যান্য অভিনয়ের জন্য)।

বিচিত্রানুষ্ঠান

পুরস্কার বিতরণী উৎসব শেষে বিচিত্রা-ন অংশ নেন—সাবিনা ইয়াসমীন, দি আলম, আঞ্জুমান আরা বেগম, রুবেল মাসুদ প্রমুখ। এ ছাড়া ববিতা ও জাফর ইকবাল একটি ববিতা ও জাফর ইকবাল একটি ইংরেজী গান এবং নায়ক রাজ্জাক বাংলা গানে ঠোঁট দিয়েছেন ও একটি গান গেয়েছেন।

সন্ধ্যা ও ঋত্বিক ঘটক

বাচসাস-এর প্রথম পুরস্কার বিতরণ ঠানে কলকাতার সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও কুমার ঘটক অনুপস্থিত ছিলেন। র দুজনার পুরস্কার ভারতীয় দূতা-মাধ্যমে পাঠানো হবে বলে অনুষ্ঠানে আজিজ মিছির ঘোষণা করেন।

এ ছাড়া ঢাকার শিল্পী জনাব এ টি এম জামানও অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ন। এ ব্যাপারে জনাব মিছির বলেন, তাঁর কাছে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো ন। রায়হানের পক্ষে তাঁর পুরস্কার গ্রহণ জহীর রায়হানের দ্বিতীয় স্ত্রী অভি-সুচন্দা রায়হান এবং আবদুল ীরের পক্ষে তার পুরস্কার গ্রহণ করে পুত্র।

বাচসাস-এর পুরস্কার এবং সেয়ানার জন্ম

তিতাস একটি নদীর নাম ছবির জক জনাব হাবিবুর রহমান বাচসাস-এর খে অভিযোগ করেছেন: 'চলচ্চিত্র বাদিকদের কথায় ও কাজে কোন মিল

তিনি অভিযোগ করেন, তিতাস একটি নাম মুক্তি পাবার পর স্থানীয় বাদিকগণ পত্র-পত্রিকায় ছবিটিকে বছরের ছবি ও একটি শ্রেষ্ঠ ছবির সম্মান দেন। তু বাস্তবে চিত্র সাংবাদিকরা আবার টিকে শ্রেষ্ঠ ছবির সম্মান থেকে বঞ্চিত রেন।

তিনি অভিযোগ করেন যে, বাচসাস-এর রস্কার পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট।

জনাব হাবিবুর রহমানের অভিযোগ:—তাস একটি একটি নদীর নাম ছবিটির রচালক ঋত্বিক ঘটককে বাচসাস শ্রেষ্ঠ রচালক হিসেবে পুরস্কার দিয়েছেন। এ বর চিত্রগ্রাহক বেবী ইসলাম শ্রেষ্ঠ চিত্র-কে হিসেবে এবং রওশন জামিল শ্রেষ্ঠ -অভিনেত্রী হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন। থচ শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে বার তোরা মানুষ হ'। তিতাস একটি ীর নাম যখন মুক্তি পায়, তখন দৈনিক র্নং নিউজ লিখেছিল হিউম্যান ডকুমেন্ট, লাদেশ অবজার্ভার লিখেছিল মাস্টার পিস দৈনিক বাংলা লিখেছিল 'একটি বিক দলিল।' যে ছবি মুক্তি পাবার পর নীয় চিত্র সাংবাদিকরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা রেছিলেন, সে ছবি পুরস্কার পেল না।

জনাব হাবিবুর রহমানের অভিযোগ—সাস-এর পুরস্কার ভালো ছবিকে পেট্রো-নাইজ না করে স্টার সিস্টেমকে পেট্রোনাইজ করা হয়েছে। শিল্পীর অভিনয় দক্ষতা বাচসাস বিচার করেননি, বিচার করেছেন শিল্পীর জনপ্রিয়তার মাপকাঠি।

তিনি বলেন তিতাস তৈরী করে আমরা কিছুই পাইনি। না টাকা, না পুরস্কার। আর তাই এবার আর তিতাস নয়, তিতাসের মতো কোন ভালো ছবি নয়। এবার আমরা বাচসাস পুরস্কার ও নগদ অর্থ (বাজার) পেতে পারে এমন একটা বাণিজ্যিক ছবি তৈরী করব। ছবির নাম হবে সেয়ানা।

—আনওয়ার আহমদ

কসৌটী
হেমামালিনী

মঞ্চাভিনয়

মাও-ৎসে-তুং সমালোচনা: যাত্রা নাটক

প্রযোজনা: বীরেন্দ্রনারায়ণ পাল। রচনা ও পরিচালনা: উৎপল দত্ত। সুর—প্রশান্ত ভট্টাচার্য। অভিনয়ে: শান্তিগোপাল, শিব ভট্টাচার্য, পঞ্চানন ব্যানার্জি, অমর ভট্টাচার্য, অজিত দত্ত, বিশ্বনাথ দত্ত প্রফুল্ল গোস্বামী, সুদর্শন সেন, সোনালী গোস্বামী মিতা তালুকদার, মণিমালা বসু প্রভৃতি।

তরুণ অপেরার শান্তিগোপাল নতুন রূপে দেখা দিয়েছেন নতুন চীনের স্রষ্টা মাও-ৎ-সে-তুং রূপে। হিটলার লেনিন নেপোলিয়ন কার্ল মার্কস প্রভৃতি বিদেশীয় ঐতিহাসিক চরিত্র থেকে রামমোহন ও সুভাষচন্দ্রের মত ভারতীয় ইতিহাসের মহান চরিত্রগুলির অভিনয়ে শক্তিমান অভিনেতা শান্তিগোপাল যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে যাত্রাজগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন—মাও-ৎ সে-তুং চরিত্রের অভিনয়েও তার সেই বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বজায় রইলো। শান্তিগোপালের অভিনয় ও অভিব্যক্তিতে মূল চরিত্রের মর্যাদা অক্ষুন্ন রয়েছে পুরোপুরিভাবে। ইতিপূর্বেকার চরিত্রগুলির মত রূপসজ্জাও হয়েছে চরিত্রানুযায়ী।

বর্তমান নাটকে মাও-এর চিন্তাধারা—চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ এবং চীনের সার্বিক উন্নতিতে কম্যুনিস্ট

[illegible] ঃ জ্যোৎস্না ব্যানার্জ/সামন্ত ভঞ্জ

পার্টির ভূমিকা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উৎপল দত্ত ফুটিয়ে তুলেছেন। নাট্যকার পরিচালক উৎপল দত্তের সবচেয়ে কৃতিত্ব, বর্তমান নাটকের মধ্য দিয়ে এই চরিত্রের রূপায়ণে তিনি পুরোপুরি সার্থক হয়েছেন। সহজভাবে সাধারণের কাছে একটি জটিল চরিত্র এবং মতবাদ তুলে ধরার মধ্যে যে মুন্সিয়ানার পরিচয় পেয়েছি তাতে শক্তিমান উৎপল দত্তকে নতুন করে অভিনন্দন জানাই।

কিন্তু চিয়াং কাইশেক চরিত্রটির ক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট বিরোধী চিয়াং কাইশেকের মত নাট্যকারের প্রতি হিংসাপরায়ণ হীন মনোভাবের পরিচয়ে ব্যথিত হয়েছি। সান-ইয়াৎ-সেনের আদর্শ শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে না পারলেও চিয়াং চীনের মুক্তিদাতাদের অন্যতম। চিয়াং এর নৈতিক পতনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা উচিত ছিল। তা না করে তাকে বিকৃত একটি 'বাফুন' চরিত্ররূপে আঁকা হয়েছে। প্রতিপক্ষ হলেও বিকৃতি বা অতিরঞ্জন শিল্পের ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য নয়। চিয়াং কাইশেক চরিত্রে গৌতম সাধুখাঁ অপূর্ব দক্ষতায় নাট্যকারের চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। মাও-সে-তুং চরিত্রটি বাহ্যত স্তব্ধ ও ধীর। শান্তিগোপালের অভিনয়ও হয়েছে তদনুরূপ অপরদিকে চিয়াং কাইশেক চরিত্রটি তার প্রতিক্রিয়াশীলতার বহিঃপ্রকাশে পরিপূর্ণ। গৌতম মুখার্জি এই চরিত্রকে অপরূপ দক্ষতায় রূপ দিয়েছেন। অন্যান্য অভিনয়াংশে শিব ভট্টাচার্য (বৌদ্ধ ভিক্ষুক), অমর ভট্টাচার্য (চং-সুয়ে-লিয়াং) সুদর্শন সেন (কমরেড লি) অজিত দত্ত (ফুং-সোই), হিমাংশু দাস (চেন-তু-সিউ), বিশ্বনাথ দত্ত (চু-এন-লাই), সোনালী গোস্বামী (ইয়াং-কাই-হুই) মণিমালা বসু, মঞ্জু রায়, মিতা তালুকদার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য উল্লেখযোগ্য। সামগ্রিক অভিনয় ও পরিচালনায় তরুণ অপেরার সঙ্গীতের কথা ও সুরের প্রতি আরো দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল। এমনি নাটকের সঙ্গীতাংশের রচনাও উন্মাদনাময়ী হওয়া উচিত।

দিল্লীতে 'গান্ধার'

কলকাতার অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর পুরোভাগে এখন একটি বিশিষ্ট নাম 'গান্ধার'। সম্প্রতি এই গোষ্ঠী এক সাংস্কৃতিক বিনিময় উপলক্ষ্যে দিল্লীতে 'যাযাবর'-এর ব্যবস্থাপনায় আইফ্যাকস হলে তিন দিন ধরে নাটক পরিবেশন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ঠিক এইভাবে কলকাতায় আগামী জানুয়ারী মাসে দিল্লীর লব্ধ প্রতিষ্ঠিত নাট্যগোষ্ঠী 'যাযাবর' নাটক পরিবেশন করবেন 'গান্ধার'-এর ব্যবস্থাপনায়।

এক কথায় গান্ধার' দিল্লীতে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হয়েছেন। প্রথম এবং তৃতীয় দিন অভিনীত হয় জুলিয়াস হে-র 'দি হর্ণ' অবলম্বনে 'ঘোড়া' (অনুবাদ বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়)। কলকাতায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই নাটক দিল্লীর নাট্যরসিকদের মুগ্ধ করে। নাটকের বিষয় বস্তুর মধ্যে প্রবেশ না করে তাঁরা উপভোগ করেন সরস সংলাপ এবং মজার মজার ঘটনা। খেয়ালী রাজা ক্যালিগুলার কান্ড-কারখানা এই চরিত্রে অরিজিৎ গুহর অতি অভিনয় দর্শকরা বেশ পছন্দ করেন। তাঁরা সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন ভ্যালেরিয়ার ভূমিকায় গীতা চক্রবর্তীর সাবলীল অভিনয়। এছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় প্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায় উজ্জ্বল সেনগুপ্ত পবিত্র চট্টোপাধ্যায় পরী বন্দ্যোপাধ্যায় মিতা মজুমদার অচিন্ত্য চক্রবর্তী শ্যামল মুখোপাধ্যায় শ্যামল বসাক মিতা চক্রবর্তী স্মিতা চক্রবর্তী সুশান্তকুমার শীল চৈতালী ভট্টাচার্যের অভিনয় প্র[illegible] করে। ভবরূপ ভট্টাচার্য এবং [illegible] অভিনয় মাঝে মাঝে নাটককে [illegible] করেছে। কারণ এঁরা দুজন কথ[illegible] ঢঙের অভিনয় ধারার সঙ্গে [illegible] খাইয়ে নিতে পারেন নি। নাটকের টিম-ওয়ার্ক অসাধারণ [illegible] রয়েছেন তরুণ নাট্য নির্দেশ[illegible] মুখোপাধ্যায়। এ নাটকে স[illegible] উপস্থিতি অনুভব করা গেছে। [illegible] প্রযোজনা 'ঘোড়া'—অসিতবাবু[illegible] নিরীক্ষা সফল—দিল্লীর নাট্য[illegible] অকপটে স্বীকার করেছেন এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন।

দ্বিতীয় দিন অভিনীত হ[illegible] সেনের অ্যান্টি প্লে 'তারায়[illegible] কলকাতার মঞ্চে যেভাবে সফল হ[illegible] সেইভাবে দিল্লীতে। সংলাপ [illegible] দর্শকদের আবিষ্ট করে রাখতে [illegible] প্রমাণ করলেন নির্দেশক এবং প্র[illegible] অভিনেতা অসিত মুখোপাধ্যায় এবং জীবনের খন্ডিত ছায়া—দ[illegible] মঞ্চের চরিত্রের সঙ্গে বার বার [illegible] ফেলেছেন নিজেদের। ফলে খ[illegible] অসিতবাবু অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে [illegible] করেছেন, সবসময় প্রভাব বিস্তার [illegible] এবং মুগ্ধ করেছেন। তাঁকে [illegible] সাহায্য করেছেন গীতা চক্রবর্তী [illegible] মাধবীর ভূমিকায় বেশ ভাল [illegible] করেছেন। এছাড়া দুটি সুন্দর [illegible] উপহার দিয়েছেন পবিত্র চট্টো[illegible] অচিন্ত্য চক্রবর্তী। বলা দরকার দর্শ[illegible] অর্ধ যেমন উপভোগ করেছেন দ্বি[illegible] ততটা নয়। এর কারণ [illegible] সমস্ত ব্যাপারটাই একটু অগোছা[illegible] পড়ে [illegible] নির্দেশনার কোন ত্রুটি নয় [illegible] বস্তু ভারসাম্য হারায়। এর জন্য [illegible] অভিনয়ের দাপটও কিছুটা কমে। [illegible] অর্ধেই পিন্টু বসুর আলোক নিয়ন্ত্র[illegible] ভূমি তৈরী করে।

রঙ্গজগতের রঙ্গ[illegible]

খোদ দুমুঠো

বেঙ্গল থিয়েটার তখন জ[illegible] সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। টিকেট বিক্র[illegible] বসে থাকতেন স্বয়ং বিহারীলাল [illegible] পাধ্যায়। স্বত্বাধিকারী টাকার দরকার [illegible] খবর নিতেন। তারপর মুঠো ভর্তি [illegible] পকেটে পুরে চলে যেতেন।

সেদিন যথারীতি বিহারীবাবু [illegible] ঘরে রয়েছেন। স্বত্বাধিকারী এসে [illegible] কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বিহার[illegible] বললেন, ভাল। মালিক অমনি ক্যাশ [illegible] দুমুঠো পকেট ভর্তি করে চলে গে[illegible] বিহারীবাবু মনে মনে খুব ক্ষুব্ধ হ[illegible] এর পূর্বে এমনিভাবে যখন মালিক [illegible] নিতেন—বিক্রীর সঙ্গে ক্যাশ না [illegible] বিহারীবাবু কমতি টাকা মালিকের

লিখে ক্যাশ লিখে রাখতেন। কেউ বুঝতো না। কিন্তু বিহারীলালের সব সময় টিকেট ঘরে থাকা সম্ভব না। তাই বিক্রীর টাকা এধার ওধার সম্ভাবনা থাকতো।

একদিন বিহারীবাবু ক্যাশ লিখবার লিখে রাখলেন : মালিক দুমুঠো।' পরের দিন ক্যাশিয়ারবাবু এসে খাতায় খরচ লিখতে গিয়ে অবাক! বিহারী- খোঁজ করলেন কারণ তিনিই আগের ক্যাশ মিলিয়ে লিখে গেছেন : খোদ মুঠো ১৬২॥৵০ আনা।' বিহারীবাবু ও থিয়েটারে আসেন নি। ক্যাশিয়ার- ...কোতে অনেকেই এসে ...লেন। বিহারীবাবুর লেখা দেখে ...। ইতিমধ্যে বিহারীবাবু এসে ...লেন। ক্যাশিয়ারবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা ... পূর্ব রাত্রির এবং আরো কয়েক ... উল্লেখ করে বললেন : তখন ... কি কথা বললেন! টিকেট বিক্রীর ... টাকা মিলিয়ে দেখলাম ১৬২॥৵০ আনা ...। তাই ঐ টাকাটা 'খোদ—দুমুঠো' ... লিখে হিসেব ঠিক রাখলাম।'

ঘটনাটি শুনে সবাই হেসে উঠলেন ... সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারের ভবিষ্যত ...পর্কে আতংকিত হয়ে উঠলেন। এমনি ... কথা শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ...টাকে কেন্দ্র করেও শোনা যেত। ...দের প্রতি শিশিরকুমারের স্নেহ ছিল ...। নাট্য-মন্দির বা শ্রীরঙ্গম যখন ...নাট—ভাদুড়ী ভ্রাতৃবর্গের অনেকেই ...ভাবে মুঠো মুঠো টাকা নিতেন। ...দের বোঝা অনেক সময় স্বর্গত ... ভাদুড়ীকে বইতে হতো। কারণ ...নই মূলত ছিলেন সর্বাধ্যক্ষ।

...প পাবার মোহ

...বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'র নাট্যরূপ দেন ...ণ্ডিত গিরিশচন্দ্র। গ্রেট ন্যাশনাল ...থিয়েটারে মৃণালিনী অভিনীত হয়েও ...প্রিয়তা অর্জন করে। কিরণচন্দ্র বন্দ্যো- পাধ্যায় বেংগল থিয়েটারে যখন যোগদান ...রেন গিরিশচন্দ্র নাট্যরূপায়িত 'মৃণালিনী'র ...কটি নকল সেখানে নিয়ে যান এবং এই ...টারূপের কিছুটা অদল-বদল করে এখানে অভিনীত হতো। গ্রেট ন্যাশনালে পশুপতি ...রিতে গিরিশচন্দ্র অভিনয় করতেন। বেংগল থিয়েটারে অভিনয় করেন কিরণচন্দ্র।

মৃণালিনীর চতুর্থ অংশের শেষ দৃশ্যে ...ইজন মুসলমান সৈন্যসহ মহম্মদ আলী পশুপতিকে বন্দী করে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে হেঁটে যাবে। অদূরে অগ্নিদগ্ধ পশুপতির বাড়ী দেখতে পাওয়া যাবে। ... দৃশ্য দেখে পশুপতি খেদে বলে উঠবে : ও যে আমার গৃহ—মুসলমানেরা আগুন দিয়েছে—মনোরমা গৃহে আছে, ছাড়ো ছাড়ো—' বলে ছুটে যেতে চাইবে। সৈন্যরা তাকে আটকে রাখবে। তাদের হাত ছাড়িয়ে পশুপতি ছুটে পালাবে।

বেঙ্গল থিয়েটারে মৃণালিনীর অভিনয় হচ্ছে। পশুপতিরূপী কিরণচন্দ্র ছাড়ো ছাড়ো' বলে চলে যাবার জন্য যতই চেষ্টা করছে—একজন সৈনিক ততই তাকে ধরে রাখবার জন্য চেষ্টা করছে। কিছুতেই ছেড়ে দেবে না—তার তখন 'ফিলিং' এসে গেছে।

উপায়ান্তর না দেখে কিরণবাবু অধিক বল প্রয়োগ করে নিষ্ক্রান্ত হলেন। সংগে সংগে কিরণবাবুর সবল ধাক্কায় সৈনিকটি নাক থুবড়ে মঞ্চে পড়ে যায়—দর্শকরা এই স্বাভাবিক অভিনয়ে ঘন ঘন করতালি দিয়ে ওঠেন। ড্রপ পড়ে।

কিরণবাবু সৈনিকের চরিত্রাভিনেতাকে ভৎর্সনা করতে গিয়ে দেখেন, তার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে! কিরণবাবু তখন রাগ সম্বরণ করে বললেন : ছিঃ ছিঃ এমন আহাম্মক তুমি! দেখ দেখি, এখনও রক্ত পড়ছে।' সৈনিক করজোড়ে উত্তর দিল : আজ্ঞে, আহাম্মক তো বলছেন, নাক দিয়ে রক্তও পড়ছে—কিন্তু আজকের সিনে কেমন জমিয়ে দিলুম! এরূপ ক্ল্যাপ আর কোনদিন কি পাওয়া গেছে?'

* * *

ক্ল্যাপের মোহ পরবর্তীকালেও বহুবার বহু শিল্পীকে এমনি মোহগ্রস্ত করেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আই-এন-এ সম্পর্কে সংবাদ তখন সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। স্টার থিয়েটারে সিপাহী বিদ্রোহ- সংক্রান্ত নট ও নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত একটি নাটক অভিনীত হচ্ছে (সম্ভবত শতবর্ষ আগে)। এক বৈদেশিক সৈন্যাধ্যক্ষের চরিত্রে স্বর্গত ভূমেন রায় 'জয় হিন্দ' বলে স্যালুট করতেই সমস্ত নাট্যগৃহ করতালি ধ্বনিতে মুখরিত হতো।'

নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত এবং ভূমেন- বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে মহেন্দ্রবাবু বলছেন : আর বলবেন না—কতবার যে বারণ করেছি। দু' একদিন থেমে আবার শুরু করছেন।' ভূমেনবাবু বলতেন : দেখছেন না কত হাততালি পাই।'

উঃ! বড় জবর! (খেজুরে আলাপ।)

রসনাগর অর্ধেন্দু মুস্তফী ব্যক্তি- জীবনেও মানুষকে রহস্যচ্ছলে বিভিন্ন কথায় হাসাতেন আবার খোঁচা দিতেন। একবার মিনার্ভা থিয়েটারেই তেল মেখে তিনি স্নান করতে চৌবাচ্চায় নামতে যাচ্ছেন —এমনি সময় একটি ভদ্রলোক পেছন থেকে এসে খেজুরে আলাপের ভূমিকা করলেন : আজ্ঞে, কেমন আছেন? বাধা পেয়ে ফিরে তাকিয়ে ভদ্রলোকের আপাদ- মস্তক নিরীক্ষণ করে অর্ধেন্দুবাবু গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন : উঃ বড় জবর।'

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললেন : সেকি! হ্যাঁ, স্নান করতে যাচ্ছি—সেত আপনিও স্নান করতে যাচ্ছেন!

অর্ধেন্দুবাবু উত্তর দিলেন : হ্যাঁ, স্নান করতে যাচ্ছি—সেত আপনিও দেখছেন! নিশ্চয়ই ভাল আছি। তাহলে আবার কেমন আছেন বলে খেজুরে আলাপ কেন?

ভদ্রলোক আর কোন কথা না বলে চম্পট দিলেন সেখান থেকে।

ছুঁচোর গোলাম চামচিকে

মতিলাল সুরকে নিয়ে অমৃতলাল নানা- ভাবে নাস্তানাবুদ করতেন। একবার মফঃস্বলে অভিনয় করতে গেছেন। মতিবাবু 'একলু' নামে তাঁর বাড়ীর হিন্দুস্থানী চাকরটাকে সংগে নিয়েছেন। অমৃতলাল বসু বন্ধুদের সংগে পরামর্শ করে একদিন একলুকে ডেকে বললেন : দ্যাখ একলু তোমার কাজে আমরা খুব খুশী। এই নাও একটা টাকা। দরকার হলে তামাক-ঠামাক সেজে দিও। আর একটা কথা। তোমার একলু নামটা বহুত খারাপ। তোমাকে আমরা চামচিকে বলে ডাকবো। ঐ ডাকেই সাড়া দেবে। বকশিস পেয়ে একলু মহা- খুশী। সে অমৃতবাবুরা চামচিকে বলে ডাকার সংগে সংগে 'হুজুর' বলে সাড়া দেয়। মতিলালবাবু লক্ষ্য করলেন। ভাবলেন এরা চামচিকে বলে ডাকে কেন একলুকে? আর ও-ওত সংগে সংগে উত্তর দেয়। ব্যাপারটা কি। তাছাড়া থিয়েটারের চাকর থাকতে তার চাকরকে নিয়েই বা এত টানা- টানি কিসের? আবার নাম রাখা হয়েছে চামচিকে। হঠাৎ তাঁর মনে হলো—লোকে 'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে' বলে। তাহলে তাকে ছুঁচো বলে গালাগাল দেবার জন্যই তার গোলামের নাম চামচিকে রাখা হয়েছে। মতিবাবুর মাথায় রক্ত উঠে গেল। 'দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা' বলে একটা লাঠি হাতে নিয়ে বন্ধুদের তাড়া করলেন। সবাই পড়ি-মরি করে দৌড়।

অনেক কষ্টে অন্যান্যরা তখন মতি- বাবুকে ঠাণ্ডা করেন।

—শ্রী কাঃ

জলসা

'চিত্রাংগদা'—সুচিত্রা মিত্রের এক অভিনব সৃষ্টি

সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে মঞ্চস্থ রবি তীর্থের 'চিত্রাংগদা' রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় শিল্পকৃতির অধ্যায় রচনা করেছে। এই বিস্ময়কর সৃষ্টির সৌন্দর্য উৎস ছিলো কোথায়? নৃত্য-লালিত্যে? সংগীত বৈভবে? না মঞ্চ সজ্জায়? সামগ্রিক সার্থকতায় এই প্রত্যেকটি অবদানেরই একটি বিশিষ্ট ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবু বলব শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র পরিকল্পিত চিত্রাংগদা নৃত্যনাট্যে **নৃত্য নাট্য কাব্য ও সংগীতের অপরূপ মিলন সুষমায়** কবিগুরুর ধ্যানছবির যথার্থ প্রতি-ফলনই চিত্রাংগদার স্মরণীয় সার্থকতার কারণ।

আবহসংগীত-রচয়িতা দীনেশ চন্দ নৃত্যস্রষ্টা রামগোপাল ভট্টাচার্য, সংগীত-পরিচালনায় ও নৃত্য পরিকল্পনায় সুচিত্রা মিত্র ও দ্বিজেন চৌধুরী যেন একাত্ম হয়ে মঞ্চের বুকে সেই সৌন্দর্যলোক রচনা করে-ছিলেন যা কয়েকলহমার জন্য কবির মহিমা কল্পনাকে উদ্ভাসিত করে তোলে। এ যেন ক্ষণিকের বুকে চিরন্তনের ছবি; সীমার মাঝে অসীমের ব্যাপ্তি। এই সৌন্দর্য অ-ধরা তাই আরো আকর্ষণীয়। পলাতক বলেই বুঝি এত আবেশরঞ্জিত।

সুচিত্রা মিত্রের আবেগভরা মুক্তকণ্ঠের গানে প্রতিটি কথার উচ্চারণ সৌন্দর্যে এবং যথাযোগ্যস্থানে প্রবল ও মৃদু সুরের স্পর্শে নাটকীয় সংঘাতগুলিকে মূর্ত করে তোলার অনায়াসদক্ষতায় সুরে সুরে রূপময় হয়ে

সঞ্চিতা বিশ্বাস

উঠেছিলো কবিগুরুর সেই প্রিয় দর্শন—বাসনা-বিহ্বলতা থেকে মুক্তি, প্রবৃত্তির ওপর চারিত্রিক দৃঢ়তার জয়। গানের মাঝে মাঝে ঐ একই কণ্ঠের হৃদয়-ছোঁওয়া সংলাপ শিল্পীর বহুমুখী প্রতিভার সম্বন্ধে নতুন করে আমাদের সচেতন করে তুলেছিলো। সংগীত ও নৃত্যের মাঝের ফাঁকগুলি সুললিত আবৃত্তিতে ভরিয়ে তুলেছেন সুবীর মিত্র প্রদীপ ঘোষ তুষার ভদ্র ও সুমিত্রা রায়।

কুরূপা চিত্রাংগদার ভূমিকায় আরতি মজুমদার তুলনাবিহীন। চিত্রাংগদার শুচিতা চরিত্রগৌরব তেজ শৌর্য রমণীমাধুর্য সবের ওপর উদাসী বিষণ্ণতার ছবিখানি হয়ে উঠে-ছিলেন আরতি শুধু নৃত্যভংগির মনোহর লালিত্যে নয়—ভাবে ও মঞ্চব্যক্তিত্বে।

অর্জুনের ক্ষাত্রতেজের অহংকার চিত্ত-চাঞ্চল্য এবং তার থেকে উত্তরণের প্রতিটি পর্যায়ে শিবশংকরম তাঁর নৃত্য খ্যাতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

শেষ দৃশ্যের যুগ্মমিলনের নৃত্যে চিত্রাংগদা ও অর্জুনের এক একটি করে চারটি হাত মিলে যাবার প্রতিটি ভ কৃতিত্ব কার? শিল্পীদ্বয়ের না পরিকল্পনাকারীণীর?—বল

সুন্দরী চিত্রাংগদার নাচে ও করেছেন জয়শ্রী মুখার্জি ও সু মদন ও বসন্তর উপস্থাপনা অভিনবত্ব শ্রীমতী মিত্রের কল্পনা স্বাক্ষরবাহী। ভূমিকায় ছিলে গুপ্ত ও মধুরিমা বসু। কা (আলো) ননী দাশগুপ্ত (সজ্জা চক্রবর্তী (মঞ্চ) বিশেষ উল্লেখের

ভারতনাট্যমে এক নতুন

হিন্দী হাই স্কুলে কোলকাতার মহলের পরিচয় ঘটে এক নবীন সংগে। শিল্পীর নাম শ্রী বিশ্বাস। ইনি শ্রী ও শ্রীমতী স এবং সবিতা বিশ্বাসের কন্যা। কালচারাল সেণ্টারের তরফ থেকে একটি একক ভারতনাট্যমের অনুষ্ঠ করেন শ্রীমতী অমলা

কিশোরী শিল্পী যথারীতি দিয়েই নৃত্য শুরু করেন। অং অনাহত ছিলো, তবু একটু স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে না আর পঞ্চদশীর প্রথম মঞ্চ জড়তা স্বাভাবিক। কিন্তু প গুলিতে শিল্পীর কুণ্ঠা বিশ্বাস ও শিল্পনৈপুণ্যে প্র যথার্থ রসসৃষ্টি করে এবং মনে করেছে যে ভারতনাট্যমে উদীয়মান; এবং সেই প্রতিষ্ঠানের এই সাংস্কৃতিক

আলারিপুর পর একে এ হয় জা স্বরম, বর্ণম, তিলানা আংগিক মাধ্যমে পাঁচটি আখ্যান এক পাপড়ির মত এক-একটি নৃত্যবস্তুর পরি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর এগিয়ে যাবার কাহিনী।

তিলানা অথবা বর্ণমের বস্তুর আদর্শ রূপায়ণ এত নৃত্যশিল্পীর কাছে আশা করা যায় 'বর্ণম'-এর মঞ্জরিত উচ্ছ্বাস ও ছন্দউচ্ছ্বাস গতিবৈচিত্র্যে সঞ্চিতার সারী মনটিই প্রতিফলিত হয়েছে। উল্লেখের দাবী রাখে তাঁর রূপক, মিশ্রম, চতুস্বর একমের ছন্দে অনায়াস পদসঞ্চালন এবং আদি চকিত গতিতে শিল্পীর পদক্ষেপের রূপান্তরে সেই প্রতিভাই অনুরণিত।

সংগতে ছিলেন গুরু (কণ্ঠসংগীত), নাগরম থিরু এস আর (মৃদংগ) প্রবীন দাস (সরোদ) দে (বাঁশী)।

—চিত্র

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলি-কাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003
AMRITA
Friday 25th October, 1974
Phone 55-5231 (14 lines)

অমৃত

সম্পাদক
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

সংখ্যা] শুক্রবার ৫ বৈশাখ, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ [মূল্য ৫০ পয়

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১৩শ বর্ষ

অমৃত

৪১ সংখ্যা
মূল্য ৫০ পয়সা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday 19 April, 1974 শুক্রবার, ৫ বৈশাখ, ১৩৮১ 50 Paise

সূচীপত্র

সূচীপত্র

চিঠিপত্র

প্রমথ চৌধুরী প্রসঙ্গে

গত ১লা চৈত্রের 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত জ্যোতির্ময় ঘোষের লেখা 'প্রমথ চৌধুরী ও বাংলা গদ্য' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম। লেখক তাঁর এই প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীকে চলতি ভাষায় বাংলা গদ্যের একক ও প্রধানতম প্রবর্তক হিসাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি তাঁর প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীর পূর্ববর্তী 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র রচয়িতা কালীপ্রসন্ন সিংহ, স্বামী বিবেকানন্দ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীদের কেন এই বাংলা গদ্যের প্রবর্তক হিসাবে গণ্য করা হবে না, তার দাবি তুলেছেন এবং এঁদের স্বপক্ষে নিজস্ব মতামতও বিবৃত করেছেন। এখন এ-বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

প্রথমেই বলা দরকার যে, যে-ভাষায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষের কবিতা' লিখেছেন সে-ভাষা বাংলার কোন জেলারই চলতি ভাষা নয়। এ ভাষার জন্মস্থান হোল রবীন্দ্রনাথের মনে। সাধুভাষার চেয়েও এ ভাষা কঠিন। বীরবলী সাহিত্যের 'ভাষা'ও কারও মুখের ভাষা নয়। এই ভাষা মানুষের মুখ থেকে সোজাসুজি কাগজে নেমে আসেনি। এখন কথা হোল, আমরা যে-ভাষায় কথা বলি, সেই মুখের ভাষায় কি সাহিত্য লেখা চলে? যে-ভাষায় আমরা কথা বলি তার শব্দসংখ্যা তো মুষ্টিমেয়। প্রয়োজনের তাড়নায় সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ স্থানে আমাদের প্রতিদিনের চলাফেরা। আকারে ইংগিতে ও পরিচিত কয়েকটি কথার সাহায্যে আমরা আমাদের কর্মব্যস্ত জীবনের ভাব প্রকাশ করি। দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত কয়েকটি কথা নিয়ে সাহিত্য-পদবাচ্য কোন কিছু লেখা অসম্ভব। সাহিত্যে কতকগুলো শব্দ ব্যবহার করে অর্থ প্রকাশ করলেই কাজ মেটে না। অনেক ইংগিত, ব্যঞ্জনা ভাষার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে হয়। আবার বক্তব্য বিষয়টি কেবল প্রকাশ করলেই চলে না সুন্দর করে প্রকাশ করতে হয়, তা সে যে ভাষার আশ্রয়েই লেখা হোক না কেন। কেবল ভাবের সৌন্দর্য নয়, ভাষারও একটা সৌন্দর্য আছে—নিছক আমাদের মুখের কথার ভাষায় সে সৌন্দর্য বজায় থাকে না। সাহিত্যের ভাষা তাই কেবল ভাবের বাহন নয়, সে-ভাষাও একটা শিল্প।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিচার করতে হবে, চলতি ছাঁদে লেখা কার ভাষা মোটামুটিভাবে শিল্পময়। শিল্পগত বিচারে যাঁর ভাষা শ্রেষ্ঠ বলে মনে হবে তাঁকেই আমরা সকলের পুরোভাগে স্থান দেব।

সাহিত্যে চলতি ভাষায় প্রথম শিল্পীর সম্মান স্বামী বিবেকানন্দেরই প্রাপ্য। বিবেকানন্দের ভাষাই চলতি ভাষা হিসাবে শিল্পময় ও সর্বজনগ্রাহ্য। প্রমথ চৌধুরীর পূর্ববর্তী চলতি ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে আমার মনে হয় বিবেকানন্দেরই স্থান হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে আমি ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি—'আলালীভাষা গুরু-চণ্ডালীদোষ-দুষ্ট হুতোমীভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতা-শূন্য, তা কর্কশ, স্ল্যাং-নির্ভর, বে-আব্রু। বিবেকানন্দের চলতি ভাষা হুতোমী ভাষার মতো বে-আব্রু নয় আবার বীরবলী ভাষার মতো কৃত্রিম চতুর বিদগ্ধ মার্জিত ভাষা নয়। বিবেকানন্দের চলিত গদ্যভাষা আটপৌরে, কথ্যভঙ্গিম, জীবনঘনিষ্ঠ। নাগরিক জীবনের ইডিয়ম, বাগবৈশিষ্ট্য, প্রতিদিনের মুখের কথা তাঁর গদ্যভাষার ভিত্তিভূমি। বিবৃতি ও বর্ণনাবলী রচনায়, গুরু বক্তব্য ব্যাখ্যায়, রঙ্গ ব্যঙ্গ রসিকতায় নবভারতের স্বপ্ন রচনায় ভাবাবেগের উপস্থাপনে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর চলতি গদ্যভাষার সার্থক ব্যবহার করেছেন।' (বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস—ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়)

এখন প্রশ্ন হোল, প্রমথ চৌধুরী বাংলা ভাষাকে কি দিয়েছিলেন? এ-বিষয়ে তাঁর অবদান কি? এর উত্তরে ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন,—

"এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর, তিনি বাংলা গদ্যকে জীবনীশক্তি দিয়েছেন, যা কথ্যরীতির অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। তিনি বুঝেছিলেন ভাষা যখন কথ্যরীতির সঙ্গে যোগ হারায় তখন আর তাতে জীবনের স্পন্দন অবশিষ্ট থাকে না। স্বামী বিবেকানন্দও তা বুঝেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী সে কথাই জোরের সঙ্গে বলেছিলেন। গদ্যচর্চা বিবেকানন্দের পরিপূর্ণ মনোযোগ পায় নি প্রমথ চৌধুরী জীবনের সমস্ত শক্তি ও মনোযোগ গদ্যচর্চায় আরোপ করেছিলেন। ফলে বিবেকানন্দে যা ইঙ্গিত মাত্র, বীরবলে তা ফলবান। সেই কারণে তাঁর লেখা পড়লে মনে হয় তিনি যেন আমাদের সঙ্গে ঘরোয়া আলাপ করছেন। লেখকের সঙ্গে পাঠকের দূরত্ব নিশ্চিহ্ন করাই ছিল প্রমথ চৌধুরীর অভিপ্রেত দায়িত্ব। তাই তিনি কথ্যরীতির সার্বত্রিক অনুশীলনে মন দিয়েছিলেন।" (বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস)

বারিদবরণ ঘোষ
চুঁচুড়া।

পুনশ্চ প্রসঙ্গে

এটা স্বীকার্য যে 'সাপ্তাহিক অমৃত' পত্রিকার পৃষ্ঠায় যে কয়টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলির মধ্যে 'পুনশ্চ' সত্যিই অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে আদরণীয়। সুদূর গ্রামাঞ্চলে যাদের বসবাস সেইসব সাহিত্যরসপিপাসু কিংবা সাহিত্যানুসন্ধানী গবেষকদের কাছে এই ধরনের নির্বাচিত লেখা প্রকাশ করা সত্যিই আনন্দের বিষয়। কেননা কোনো কোনো সময় অনেক ঘটনা অনুসন্ধানের পরও না পাওয়া গেলে অনুসন্ধিৎসু রসপিপাসুকে স্বভাবতই মনমরা হয়ে আরব্ধ কাজে ইতি টানতে হয়। কিন্তু সেই ধরনের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি হঠাৎই পেয়ে গেলে আরব্ধ কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় সহায়তা ঘটে। 'অমৃত'-এর এই 'পুনশ্চ' বিভাগে আমি সেইরকমই কটি প্রয়োজনীয় উপাদান পেয়ে লাভবান হয়েছি। এই প্রসঙ্গে, ৪১ সংখ্যার কালিদাস রায়ের লেখাটি বর্তমান সময়ে সত্যিই অনুভববেদ্য এক আলোচ্য বস্তু। লেখকের সেকালীন ভাবনা বর্তমানকালেও যে কী পরিমাপে বাস্তবমুখীন তা আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করব। ৪২ সংখ্যার যাত্রাভিনয় সম্পর্কিত অনাথকৃষ্ণ দেবের 'বঙ্গের কবিতা' গ্রন্থ থেকে যা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে তা আমার কাছে নতুন সংগ্রহ বলে পরিগণিত হয়ে ব্যক্তিগতভাবে উপাদেয় হয়েছে। ক্ষপণক মহাশয়ের কাছে অনুরোধ, তিনি যেন তাঁর সুচিন্তিত সংগ্রহে এই ধরনের উৎকৃষ্ট অথচ বহু পূর্বের বিষয়কে পুনর্মুদ্রিত করে গ্রামাঞ্চলের রসপিপাসুদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এ ছাড়া বিগত দিনের সাহিত্যসেবীদের ব্যক্তিগত বা ঐ জাতীয় কিছু রসঘন রচনা ও চিঠিপত্র যা আমাদের নাগালের বাইরে তার কতক এই বিভাগে পুনর্মুদ্রিত হলে অনেকেই লাভবান হবেন।

রজতকুমার পান্ডে
কলাইকুণ্ডু, মেদিনীপুর

সম্পাদকীয়

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প

দেশভাগের পর বাংলা সিনেমার সংকট শুরু হয়। গত পঁচিশ বছরে সেই সংকট এখন নিদারুণ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে এর প্রধান কারণ, বাংলা সিনেমার বাজার সংকোচন। পূর্ববাংলার বাজার চলে গেছে। বাংলাভাষী এলাকা যা অবশিষ্ট আছে সেখানে ছবি দেখিয়ে প্রযোজকরা কতটা লাভের আশা করতে পারেন? অন্যদিকে হিন্দি সিনেমার প্রতিপত্তি এবং তার জনপ্রিয়তা। তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠা আজকের বাংলা সিনেমার পক্ষে দুঃসাধ্য। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে দক্ষিণ ভারতের ছবি চলছে কি করে? দক্ষিণ ভারতে তামিল, তেলেগু, মালয়ালম ও কানাড়ী ভাষায় সিনেমা তোলা হয়। দক্ষিণীরা মোটামুটি পরস্পরের ভাষা বোঝেন। বিশেষ করে তামিল ভাষার ছবি তো দক্ষিণের সব রাজ্যেই বাজার পায়। হিন্দির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেও তাই তারা টিঁকে আছে, বাংলার মতো দুরবস্থা হয়নি।

অথচ এক সময়ে কলকাতাই ছিল ভারতীয় সিনেমার প্রাণকেন্দ্র। বোম্বে টকিজের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিত নিউ থিয়েটার্স। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে ছবি করতে আগ্রহী ছিলেন। কলকাতায় তখন হিন্দী ছবিও তোলা হত এবং বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও তাতে অভিনয় করে ভারতজোড়া খ্যাতি কুড়িয়েছেন। কলকাতার স্টুডিওগুলো তখন ছিল সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতিতে সমৃদ্ধ। তাই তার আকর্ষণে অনেকেই কলকাতায় ছবি করতে আসতেন। দুর্ভাগ্যের কথা, স্বাধীনতার পর পশ্চিমবাংলার সর্বাঙ্গীণ অবনতির প্রতিক্রিয়া বাংলা সিনেমা ও কলকাতার স্টুডিওগুলোকেও হতমান করে দেয়। বোম্বে হয়ে ওঠে সিনেমার স্বর্গরাজ্য। কলকাতার পরিচালক অভিনেতা ও কলাকুশলীরা বোম্বে পাড়ি দেন। কেউ তো আর উপোস করে জনমনোরঞ্জনের জন্য অনন্তকাল একটা পোড়ো জমিতে পড়ে থাকতে চায় না। বাংলা সিনেমার দুর্দিনেরও শুরু তখন থেকেই। এর ফলে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শত শত কলাকুশলী, যন্ত্রবিদ, অভিনেতা ও অভিনেত্রী আজ সংকটের সম্মুখীন। প্রযোজকরা বাংলা ছবিতে টাকা খাটাতে ভরসা পান না। সামান্য মূলধনে যে সমস্ত বই তোলা হয় সে টাকা উঠে আসতেই অনেক সময় লাগে। হিন্দি ছবির চাহিদা বেশি বলে কলকাতা শহরেও বাংলা ছবি রিলিজ করার মতো হল যাওয়া দুষ্কর।

এই সংকটের মধ্যেও বাংলার পরিচালকরাই বিশ্ববন্দিত সিনেমা করছেন। সর্বভারতীয় পুরস্কারও জিতে আনছেন তাঁরাই। কিন্তু পুরস্কার তো একমাত্র সান্ত্বনা নয়। সাধারণ ছবির ভবিষ্যৎ কি? এমনকি পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি থেকেও কি প্রযোজকরা যথেষ্ট টাকা পান? তাহলে কলাকুশলীরাই বা কী পাবেন, অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরই বা আশা কতটুকু? এই সংকটের প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বাংলা চলচ্চিত্র উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনাও তৈরি। রাজ্য সরকারের অর্থে সত্যজিৎ রায় নতুন ছবিতেও হাত দিয়েছেন। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে চাঙ্গা করে তুলতে হলে বড়ত্তর পরিকল্পনা দরকার। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীইন্দ্রকুমার গুজরাল সংসদে আশ্বাস দিয়েছেন, বাংলা সিনেমা যাতে বাজার পায় তার জন্য সরকার সব রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত। এই সাহায্যের ধরনটা কী হবে তা বিস্তারিতভাবে তিনি বলেননি। তবে আশার কথা এই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। কলকাতায় চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচাবার কয়েকটি পথ আছে। তা হল : (১) বাংলা সিনেমা প্রযোজনায় সরকারী সাহায্য, (২) কলকাতার হলগুলোতে আবশ্যিকভাবে বাংলা ছবি দেখানোর ব্যবস্থা (৩) কলকাতার স্টুডিওতে তোলা বাংলা ছবির হিন্দি ডাবিং করা এবং (৪) কলকাতায় হিন্দি ছবি তোলা।

মাদ্রাজের স্টুডিওতে যদি সার্থক ও জনপ্রিয় হিন্দি ছবি তোলা সম্ভব হয় তাহলে কলকাতায় তা তোলা যাবে না কেন? বাংলা ছবিকে হিন্দিতে ডাবিং করলে তার বাজার বাড়বে এবং কলকাতায় পরিচ্ছন্ন হিন্দি ছবি তুললে এখানকার স্টুডিওগুলো কাজ পাবে। শ্রীগুজরাল বলেছেন, কলকাতায় হিন্দি ও অন্যান্য ভাষায় ছবি করার জন্য প্রযোজকদের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। বাংলায় ভাল ছবি অবশ্যই তুলতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাজ স্টুডিওর মতো হিন্দি বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় কলকাতায় ছবি করা হলে চলচ্চিত্র শিল্পের আর্থিক দুর্দশা লাঘব হতে পারে। বস্তুর অবস্থা স্বীকার করে নিয়েই বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পকে এগোতে হবে। শুধু হা-হুতাশ করে বসে থাকলে কোনো কাজ হবে না। চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এ বিষয়ে চিন্তা করতে আমরা অনুরোধ করি।

ঘটনা প্রবাহ

প্রথমে প্রধানমন্ত্রী ও পরে কংগ্রেস সভাপতি দলের শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। দলের ভিতর থেকে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করছেন এবং দলের আদর্শ ও কর্মপন্থায় অবিশ্বাসী যেসব সুবিধাবাদী দলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হবে বলে দুই নেতাই সতর্ক করে দিয়েছেন।

এই হুঁশিয়ারির কারণ আছে। বহু রাজ্য থেকেই দলের ভিতর উপদলীয় কোন্দলের খবর পাওয়া যাচ্ছে। ত্রিপুরা বিহার মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীদের সরিয়ে দেওয়ার দাবীতে প্রকাশ্য আন্দোলন চালাচ্ছেন তাঁদের নিজেদের দলেরই একাংশ। সম্প্রতি বিধানসভার নির্বাচনে ত্রিপুরা, উড়িষ্যা ও বিহারের কয়েকজন কংগ্রেস এম এল এ স্বদলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে ভিন্ন দলের প্রার্থীদের জিতিয়ে দিয়েছেন বলে সন্দেহ হচ্ছে। অন্ততঃপক্ষে সম্প্রতি যে নির্বাচন হয়ে গেল সেখানেও কংগ্রেসপ্রার্থীর পরাজয়ের জন্য দায়ী নাকি বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীরা।

এইসব সংবাদে কংগ্রেস নেতারা বিচলিত। বিশেষ করে এই সময় যখন বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ ও তীব্র সরকারবিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতি করছে তখন কংগ্রেসের অনেক নেতাদের উদ্বেগের কারণ হয়েছে। নেতা বদলের দাবী তোলার সময় এটা নয়, একথা কংগ্রেস হাইকমাণ্ড রাজ্যগুলোর বিক্ষুব্ধদের জানিয়ে দিয়েছেন। ত্রিপুরার বিক্ষুব্ধদের নিরস্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নিজে আগরতলায় গিয়েছিলেন।

দলের ও দেশের সঙ্কটের মোকাবিলা করার জন্য কংগ্রেস এমপিদের এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ও জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলিকে সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বড় রকমের কিছু রদবদলের কথাও শোনা যাচ্ছে।

•

বেশ কিছুকাল পরে আবার সর্বভারতীয় স্তরে যুক্ত বামপন্থী আন্দোলনের কথা শোনা যাচ্ছে। নয়টি বামপন্থী দল দিল্লীতে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে স্থির করেছে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারী ও অনাহারের প্রতিবাদে তারা একসঙ্গে মিলে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করবে। আন্দোলনের কর্মপন্থা পরে স্থির করা হবে বলে জানান হয়েছে।

এই নয়টি দল হচ্ছে সোস্যালিস্ট পার্টি, সি পি আই, সি পি এম, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস, এস ইউ সি, রিপাবলিকান পার্টি (খোবরাগাড়ে গোষ্ঠী) এবং ওয়ার্কার্স পার্টি। আর সি পি আই জানিয়েছে, তারা এই নয় দলের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত।

সোস্যালিস্ট পার্টির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য হল এই যে, বহু বৎসর পরে এই সম্মেলনেই আবার দুই কম্যুনিস্ট পার্টি যৌথ আন্দোলনের রণমঞ্চের উপর এসে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত করল।

এই সম্মেলনের সূচনাতেই অবশ্য বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও আন্দোলনের কৌশল সম্পর্কে দুই কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে গুরুতর মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। সি পি আইয়ের বক্তব্য ছিল দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তি যাতে জনসাধারণের অসন্তোষের সুযোগ নিতে না পারে সেজন্য কংগ্রেসে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী অংশের সঙ্গে বামপন্থী দলগুলিকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে। সি পি এম এই তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করে বলে যে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে লড়াই করার পথই হল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম করা। কারণ কংগ্রেসই আজ দক্ষিণপন্থীদের রক্ষাকর্তা। দুই কম্যুনিস্ট পার্টির এই মতপার্থক্য সত্ত্বেও তারা যে যুক্ত আন্দোলনে সামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত করেছে, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

•

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী গত ১ এপ্রিল উড়িষ্যার পারাদীপে একটি নতুন সার কারখানার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

এই কারখানায় বছরে ১৫ লক্ষ টন সার তৈরি হওয়ার কথা আছে। প্রধানত অ্যামোনিয়া ও ইউরিয়া সার তৈরি হবে। কারখানার উৎপন্ন সার ৭৫ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনে সাহায্য করবে বলে অনুমান করা হয়েছে। এই কারখানা স্থাপনের জন্য ফ্রান্সের সঙ্গে সহযোগিতার চুক্তি হয়েছে।

ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর কিষেণচাঁদ শর্মা বলেছেন, মাস ছয়েকের মধ্যে পারাদীপ সার কারখানা তৈরির কাজ শুরু হবে এবং সব কিছু ঠিকঠাক চললে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে এই কারখানার উৎপাদন আরম্ভ হবে। পারাদীপ সার কারখানা উড়িষ্যার চতুর্থ সার কারখানা হবে। আগের তিনটি হল রাউরকেলায় হিন্দুস্থান স্টীলের সার কারখানা, রাউরকেলায় বেসরকারী মালিকানার অধীন আর একটি ছোট সার কারখানা এবং তালচেরে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের কারখানা।

•

পারাদীপ তালচের ও অন্যান্য যেসব সার কারখানা এখন নির্মাণাধীন সেগুলি অবশ্য দেশব্যাপী সার সংকটের আশু সুরাহার কোন হদিশ দিতে পারবে না। বরং যতদূর মনে হচ্ছে আগামী বছর সারের সঙ্কট আরও বাড়বে। একটি হিসাবে প্রকাশ যে আগামী বছর মোট ৯ লক্ষ ২০ হাজার টন অর্থাৎ চাহিদার ১৬-০৭ শতাংশ পরিমাণ ঘাটতি হতে পারে। কিন্তু এই হিসাব করা হয়েছে এমন কতগুলি আশার ভিত্তিতে যেগুলি মিথ্যা হয়ে যাওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। এই আশাগুলি হচ্ছে : (১) বিশ্বের বাজারে এখন সারের যে চড়া দর চলছে সেই দর আর বাড়বে না। (২) বিদেশ থেকে সার আমদানীর জন্য যে ২৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে সেই বরাদ্দ আর ছাটাই হবে না। (৩) ১৯৭৩-৭৪ সালের রবি মরশুমে যে পরিমাণ সার ব্যবহার করা হয়েছিল তারই ভিত্তিতে অনুমান করা হয়েছে যে, আগামী বছর মোট ৩৩ লক্ষ ৭ হাজার টন সার দরকার হবে। অথচ গত রবি মরশুমেও সারের চাহিদার প্রায় ৩৬ শতাংশ পূরণ করা যায় নি। (৪) আগামী বছর দেশে সারের উৎপাদন সাড়ে পাঁচ লাখ টন বাড়বে বলে অনুমান করা হয়েছে। ঐ বছর আটটি নতুন সার নির্মাণ প্রকল্প অথবা বর্তমান কারখানার সম্প্রসারণ প্রকল্প চালু হওয়ার কথা আছে। এইসব প্রকল্প ঠিক সময়মত সম্পূর্ণ হবে কিনা সেটা নির্ভর করছে প্রধানত বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর।

এইসব আশা ব্যর্থ হয়ে গেলে সারের ঘাটতির পরিমাণও অনুমিত অঙ্কের চেয়ে বেড়ে যাবে। শেষপর্যন্ত এই ঘাটতি চাহিদার ৫০ শতাংশ বা তারও বেশিতে দাঁড়াতে পারে।

সার সরবরাহ সম্পর্কে এই অনিশ্চয়তার আর একটি কারণ হল পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি থেকে ভারতীয় মুদ্রায় কি পরিমাণ সার পাওয়া যাবে তার কোন আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে না।

সার শেষপর্যন্ত কতখানি পাওয়া যাবে তা বুঝতে না পেরে কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তর আগামী বছরের জন্য খাদ্য উৎপাদনের কোন লক্ষ্যমাত্রাই ধার্য করতে পারছেন না। অথচ ইতিমধ্যে আমরা পঞ্চম যোজনায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করেছি গত ১ এপ্রিল থেকে।

•

এই পরিকল্পনার সূচনা উপলক্ষে পরিকল্পনা মন্ত্রী দুর্গাপ্রসাদ দর বলেছেন যে পরিকল্পনার দলিল চূড়ান্ত করার আগে কিছুদিন সময় নিলে কিছুই ক্ষতি হবে না। তিনি বলেছেন যদিও এই পরিকল্পনা আরম্ভ করার আগে পরিকল্পনার চূড়ান্ত আকার দেওয়া যায় নি তাহলেও এই পরিকল্পনার প্রথম বছর অংশ অর্থাৎ ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য বাৎসরিক পরিকল্পনার কাজ চালু করা হয়েছে।

পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে তার দুটি কারণ শ্রীদর উল্লেখ করেছেন। একটি হল বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট, অপরটি হল, দেশের অভ্যন্তরীন অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ।

শ্রীদর বলেন, 'অতএব মূল্যবৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে পরিকল্পনার চূড়ান্ত আকার দেওয়ার আগে আমাদের কিছুকাল অপেক্ষা করতেই হবে। তবে মূল লক্ষ্য ও রণকৌশলের ব্যাপারে কোন পরিবর্তন সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।'

মিশরের শেষ রাজা ফারুক সিংহাসনচ্যুত হওয়ার আগে বলেছিলেন যে শেষপর্যন্ত পৃথিবীতে মাত্র পাঁচজন রাজা থাকবেন : তাসের চার রং-এর চার রাজা আর গ্রেট বৃটেনের রাজা। আজকের পৃথিবীর প্রাচীনতম রাজতন্ত্র-শাসিত দেশ ইথিওপিয়ায় যেসব কাণ্ডকারখানা চলছে তা দেখে মনে হচ্ছে রাজা ফারুক হয়ত মিথ্যা বলেন নি।

ইথিওপিয়ার রাজা ৮২ বৎসর বয়স্ক হাইলে সেলাসি শুধু যে পৃথিবীর অভিজ্ঞতম রাষ্ট্রপ্রধান তাই নন তিনি বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো রাজবংশের সন্তান। ঐ রাজবংশের তিনি ১২২৫তম রাজা। যীশুখৃষ্টের সময়েরও আগেকার রাজা সোলোমান ও রানী শেবা তাঁর সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ ছিলেন বলে প্রকাশ। সম্রাট হাইলে সেলাসির মত গত চার দশকের বেশি সময় রাষ্ট্রপ্রধানের আসনে বসে আছেন আজকের পৃথিবীতে দ্বিতীয় এমন কেউ নেই। (মাঝখানে কয়েক বছরের জন্য অবশ্য ইথিওপিয়া মুসোলিনির আমলের ইতালির অধিকারে ছিল।) আর রাজাও কি যেমন তেমন। মধ্যযুগের রাজাদের মত দোর্দণ্ড-প্রতাপ সম্রাট হাইলে সেলাসির। কারণ প্রজাদের চোখে তিনি ত মানুষ নন স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁর রাজত্ব প্রজাদের ইচ্ছার দান নয় ঐশ্বরিক অধিকার। এতদিন পর্যন্ত এভাবেই চলছিল। কিন্তু আফ্রিকার এই দেশ থেকে হালে এমন কিছু খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে যাতে মনে হচ্ছে, এহেন একটি কট্টর রাজতন্ত্রের দেশেও বুঝি অবশেষে যুগের হাওয়া খেলছে।

কয়েকদিন আগে হঠাৎ সম্রাট হাইলে সেলাসিকে আদ্দিস আবাবার বাজারে এসে উপস্থিত হতে দেখা গেল। গাড়ির জানলার কাচ খুলে তিনি ভিখিরিদের মুঠো মুঠো টাকা বিলোলেন। রাজা নিজে বাজারে এলেন এটা ত একটা অভাবিত কাণ্ড বটেই কিন্তু তার চেয়েও অভাবিত ঘটনা হল রাজার এই বদান্যতা দেখে আগেকার মত দেশশুদ্ধ লোক ধন্য ধন্য করে উঠল না, বরং একদল লোক বলে উঠল 'সম্রাটের এই সামান্য দয়ার দানের দিন শেষ হয়ে গেছে।'

শুধু সম্রাটের দানের দিনই নয়, স্বয়ং সম্রাটের দিনই যে শেষ হয়ে আসছে সেকথাটা সেদিন সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষারত ইথিওপিয়ান ছাত্ররা মস্কোর ইথিওপিয় দূতাবাসের সামনে গিয়ে জানিয়ে দিয়ে এসেছে।

দিনকাল যে বদলাচ্ছে তার স্বীকৃতি অবশেষে পাওয়া গেছে সম্রাট হাইলে সেলাসির কাছ থেকে। দেশের সংবিধান বদলাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেছেন, "জনগণের ইচ্ছা অনুসারেই এখন থেকে আমরা পরিচালিত হব। এমনকি সম্রাটের অধিকারও জনগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে।"

হাইলে সেলাসি তাঁর এই প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত কতদূর পালন করবেন সেটা ভিন্ন কথা। (সম্প্রতি তিনি বলেছেন, "রাজতন্ত্র থাকবেই।") কিন্তু ইথিওপিয়ার মত দেশে তাঁর এই কথাগুলিই যথেষ্ট

বৈপ্লবিক। আর গত কয়েকমাস ধরে তাঁর দেশে যা ঘটছে তাও ত বিপ্লবেরই সামিল।

আফ্রিকার অন্যান্য অনেক দেশের মতই ইথিওপিয়ারও উপর দিয়ে বয়ে গেছে প্রচণ্ড খরার দোরাত্ম্য। তার উপর এসেছে বিশ্বব্যাপী তেল সংকটের ধাক্কা। ইথিওপিয়ার পশ্চাৎপদ অর্থনীতি টলমল করছে। দেশ জুড়ে অনাহার। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। এদিকে ইথিওপিয়ার মানুষ আর মুখ বুজে এই অবস্থা মেনে নিতে রাজি নয়। একই সময়ে সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, এমন কি গির্জার পুরোহিতরা পর্যন্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে। মিলিটারির জওয়ান অফিসারেরা আসমারা ও আদ্দিস আবাবায় বিদ্রোহ করেছিল। পুলিশরা নিজেদের অফিসারদের ব্যারাকে তালা বন্ধ করে রেখে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ছাত্ররা স্কুল কলেজ বন্ধ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। শ্রমিকরা ধর্মঘট করে চালিয়েছেন সারা দেশকে অচল ও পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। কপটিক খ্রীষ্টান গির্জার পুরোহিতরা পার্লামেন্ট ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন। এসব আন্দোলন শুধু বেতন বৃদ্ধির দাবী বা জিনিসপত্রের দাম কমাবার দাবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি শাসন সংস্কারের দাবীও উঠেছে। সম্রাট হাইলে সেলাসিকে শুধু যে বেতন বাড়াবার দাবী মেনে নিতে হয়েছে তাই নয় শাসন সংস্কারেরও দাবীও একটু একটু করে মানতে হচ্ছে। ছাত্রদের দাবীতেই তিনি পুরোনো মন্ত্রিসভাকে হটিয়ে দিয়ে ৪৬ বছর বয়স্ক কূটনীতিবিদ এণ্ডালকাচেউ মাকোনেনকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেছেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও এটুকু স্বীকার করে নিতে হয়েছে। ১৯৫৫ সালের যে সংবিধানের বলে নামমাত্র একটা পার্লামেন্ট রেখে তিনি অপ্রতিহত রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সংবিধান সংশোধনেরও আশ্বাস দিয়েছেন।

রাজতন্ত্র উচ্ছেদের দাবী অবশ্য এখন পর্যন্ত খুবই ক্ষীণ। কিন্তু সেই দাবীও যে একেবারে শোনা যাচ্ছে না তা নয়। পৃথিবীর এই প্রাচীনতম রাজবংশের বিদায়ের দিনও কি তাহলে সত্যি সত্যি এগিয়ে আসছে?

•

ফ্রান্সের ক্ষমতাসীন গলপন্থীদের নায়ক যদি হন জেনারেল চার্লস দাগল তাহলে তাঁর প্রধান সহকারী ছিলেন জর্জ জাঁ রেমন্ড পঁপিদু। ৬২ বছর বয়সে ক্যানসার রোগের আক্রমণে সেই পঁপিদুর মৃত্যুতে শুধু যে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির আসন শূন্য হল তাই নয় সেদেশে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক শূন্যতারও সৃষ্টি হল।

জেনারেল দাগলের মতই পঁপিদু স্বপ্ন দেখতেন ফ্রান্স আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' জেনারেলের মতই তিনি ফ্রান্সকে আমেরিকার ছত্রছায়া থেকে বের করে এনে নিজের দেশকে নিজের পারমাণবিক শক্তির উপর নির্ভরশীল করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর মন্ত্রগুরুর মত জর্জ পঁপিদুও ফ্রান্সের নেতৃত্বে ইউরোপের অভিন্ন বাজার গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ১৯৫৮ সালে জেনারেল দাগল ক্ষমতায় এলে স্বাভাবিকভাবেই পঁপিদু তাঁর বিশ্বস্ত সহকারীতে পরিণত হন এবং পরের বছর ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৬৬ সালে জেনারেল দাগল দ্বিতীয়বার ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট হলে পঁপিদুও আর একবার প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। দু বছরের মধ্যে তাঁর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট দাগলের মতবিরোধ হয় ও দাগল তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেন। পরের বছর পঁপিদু নিজে প্রেসিডেন্ট হন।

প্রাক্তন শিক্ষক, সাহিত্য সমালোচক ও নাৎসী-বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের যোদ্ধা জর্জ পঁপিদু আধুনিক ফ্রান্সের ইতিহাসে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। অথচ তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে তাঁর পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে শুধু তাঁর নিকটতম আত্মীয়স্বজনকে সাক্ষী রেখে। তাঁর আরও ইচ্ছা, তাঁর সমাধিমূলে কেউ পুষ্পস্তবক দেবে না, তাঁর সমাধিফলকে শুধু নাম এবং জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ ছাড়া আর কিছুই লেখা থাকবে না।

পঁপিদুর মৃত্যুতে এখন প্রশ্ন উঠেছে, দাগলের নেতৃত্বে ফ্রান্সে যে রাজনৈতিক স্থিরতা এসেছিল এবং পঁপিদুর নেতৃত্বে যে দাগলপন্থী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন ছিল তার কি এবার অবসান হবে? এই প্রশ্নের উত্তর কতকটা নির্ভর করছে পঁপিদুর পর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট কে হন তার উপর। ফ্রান্সের বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট সর্বেসর্বা। ঐ সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী সিনেটের প্রেসিডেন্ট আলাঁ পোহের সাময়িকভাবে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন বটে, তবে মাসখানেকের মধ্যে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে হবে। প্রেসিডেন্ট পঁপিদু গত বছরখানেক যাবৎ অসুস্থ ছিলেন এবং তিনি নিজে তাঁর উত্তরাধিকারীকে প্রেসিডেন্টের পদে বসিয়ে দিয়ে যাবেন, অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে মনোনীত করে দিয়ে যাবেন বলে অনেকে অনুমান করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। এখন পঁপিদুর আসনে বসার জন্য তিনজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে মনে হচ্ছে। একজন হলেন জাক শাবান-দেলমাস যিনি বছর দুয়েক আগে একটি ট্যাক্স ফাঁকি সংক্রান্ত কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত হয়ে প্রেসিডেন্ট পঁপিদুর দ্বারা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় আর একজন প্রার্থী হলেন বর্তমান অর্থমন্ত্রী ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেমোক্র্যাট দলের নেতা জিসকার্ড দেস্ত্যাং। আর এই দুজনের মধ্যে যদি ভোট ভাগাভাগি হয় তাহলে তৃতীয় আর একজন প্রার্থীও বেরিয়ে যেতে পারেন। তিনি হলেন সমাজতন্ত্রী নেতা ফ্রাঁসোয়া মিতেরাঁদ।। কমিউনিস্টরা তাঁকে সমর্থন করছেন।

•

ফ্রান্সের এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল কি হয় তার উপর শুধু ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ নয়, গোটা পশ্চিম ইউরোপের এবং আমেরিকার সঙ্গে ইউরোপের সম্পর্কের ভবিষ্যৎও অনেকখানি নির্ভর করছে।

দ্যগলের মত প্রেসিডেন্ট পঁপিদু বৃটেনকে ইউরোপের অভিন্ন বাজারে ঢুকতে বাধা দেন নি। তিনি বাধা দেন নি বলেই আজ বৃটেন অভিন্ন বাজারের সদস্য। কিন্তু বৃটেনের হীথ সরকার যেসব শর্তে এই বাজারের সদস্য হয়েছেন সেগুলি সম্পর্কে নতুন করে আলোচনা করার জন্য উইলসনের নতুন শ্রমিক সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইতিমধ্যে তাঁরা সেই প্রশ্ন তুলেছেন। এদিকে নতুন বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী কালাহান জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমেরিকার সঙ্গে কলহ জিইয়ে রেখে ইউরোপের জোটকে শক্তিশালী করার নীতিও তাঁরা বদলাতে চান। ১৯৭৩ সালকে আমেরিকা "ইউরোপের বছর" বলে ঘোষণা করেছিল এবং ঐ বছর প্রেসিডেন্ট নিকসন ইউরোপ সফরে আসবেন বলেও ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু দুটি কারণে "ইউরোপের বছর" কাগজপত্রেই থেকে গেছে। এক, চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া করে আমেরিকা এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করেছে যে, সে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যেই দুনিয়াটা ভাগাভাগি করে নিতে চাইছে এবং তার কাছে ন্যাটোর দাম শুধু ভবিষ্যতের সম্ভাব্য যুদ্ধকে আমেরিকার দোরগোড়া থেকে যতদূরে সম্ভব রাখার একটা উপায় হিসাবে। ডঃ হেনরি কিসিংগার একটি বক্তৃতায় আমেরিকার 'বিশ্বব্যাপী স্বার্থ" ও ইউরোপের শুধু "আঞ্চলিক স্বার্থ"-এর কথা বলে ইউরোপকে আরও চটিয়ে দিয়েছেন। পশ্চিম এশিয়ার ব্যাপারে ইউরোপকে সম্পূর্ণ হিসাবের বাইরে রেখে দেওয়া হয়েছে, এটাও পশ্চিম ইউরোপের সরকারগুলি ভাল চোখে দেখেন নি। তারপর আমেরিকার পরামর্শ উপেক্ষা করে ইউরোপের দেশগুলি তৈল উৎপাদক দেশগুলির সঙ্গে আলাদা-আলাদা চুক্তি করায় ইউরোপ - আমেরিকা সম্পর্কের আরও অবনতি হয়। মোট ফল হয়েছে এই যে, ১৯৭৩ সালে আমেরিকা ইউরোপে পা রাখার জায়গা পায় নি। বৃটেনে সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থাটা বদলাতে আরম্ভ করেছে। ফ্রান্সে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর সেই পরিবর্তন দ্রুততর হয় কিনা সেটা দেখার বিষয়।

—পুণ্ডরীক

৫-৪-৭৪

আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত গ্রন্থাদির নির্বাচিত তালিকা

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, ভাষা, সাহিত্য ও সমালোচনা

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী : **শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ** ৩২·০০ ॥ পম্পা মজুমদার : **রবীন্দ্র-সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস** ৩২·০০ ॥ ডঃ সত্যব্রত দে : **রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা** ২২·০০ ॥ ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ : **রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্যায়** ৮·০০ ধীরেন্দ্র দেবনাথ : **রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু** ৬·০০ ॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : **রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জি** ৪·০০ ॥ সুনীল সরকার : **রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা** ৬·০০ ॥ গৌরীপ্রসাদ ঘোষ : **রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ** ৭·০০ ॥ হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় : **নৌকাডুবির পরে** ৪·০০ ॥ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় : **ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ** ৪·৭৫ **রবীন্দ্র শিল্পতত্ত্ব** ৮·০০ **দুই মনীষী** ৬·০০ ॥ ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য : **পদাবলীর তত্ত্ব সৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ** ৫·০০ ॥ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : **কাব্য পরিমিত** ৩·০০ ॥ প্রবোধচন্দ্র সেন : **রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি** ৩·০০, **ছন্দ পরিক্রমা** ৪·০০ ॥ ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : **উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা** গীতিকাব্য ১২·০০ ॥ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার : **পাঁচশত বৎসরের পদাবলী** ৭·০০, **শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্** (লীলাশুক বিল্বমঙ্গল) ১২·০০ ॥ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য : **বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন** ১২·৫০ **বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন** ১২·০০ ॥ প্রমথনাথ বিশী : **বাংলা সাহিত্যে নরনারী** ৬·০০ ॥ ডঃ ভবতোষ দত্ত : **কাব্য-বাণী** ১০·০০, চিন্তানায়ক **বঙ্কিমচন্দ্র** ১২·০০, **ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব** (বঙ্কিম) ২০·০০ ॥ ডঃ নরেন্দ্র সেন : **গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর** ১৭·০০ আজহারউদ্দিন খান : **বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ** ৭-৫০ ॥ আজহারউদ্দীন খান ও ডঃ ভবতোষ দত্ত : **মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ** ১·০০ ॥ ডঃ সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় : **বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য** ২০·০০ ॥ ডঃ উমা সেন : **প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ** ১২·০০ ॥ নারায়ণ চৌধুরী : **আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন** ৩·৫০ ॥ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : **গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা** ১০·০০, **গৌরবঙ্গ সংস্কৃতি** ১২·০০ ॥ অশ্রুকুমার সিকদার ও দেবেশ রায় : **বিদ্যাসাগর** ৫·০০ ॥ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য : **শিল্পতত্ত্ব** (ক্রোচে) ১৫·০০ ॥ বেলাবাসিনী গুহ ও অহনা গুহ : **ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র** ২০·০০ ॥ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর : **প্রবন্ধ সংগ্রহ** ৭·৫০।১০·০০ ॥ শিবনাথ শাস্ত্রী : **যুগান্তর** ৮·০০ ॥ ত্রিপুরাশংকর সেন শাস্ত্রী : **রামায়ণের কথা** ৩·০০ ॥ নবশঙ্কর রায়চৌধুরী : **তখন আমি প্যারিসে** ৬·০০ ॥ ডঃ সুকুমার বিশ্বাস : **ভাষাবিজ্ঞান পরিচয়** ৭·৫০ ॥ ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য : **বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা** ১৬·৫০ ॥ দেবেন্দ্র বিশ্বাস : **কিশোর বিজ্ঞানী** ২·৫০ ॥ ডঃ ভূদেব চৌধুরী : **লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ** ৮·০০ ॥ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : **স্বদেশ ও সাহিত্য** ১০·০০ ॥

জীবনী ও ধর্মপ্রসঙ্গ

অজিতকুমার চক্রবর্তী : **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ** ২৫·০০ ॥ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর : **দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী** ৫·৫০ ॥ সুধাকান্ত রায়চৌধুরী : **দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-স্মৃতিকথা** ৬·০০ ॥ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : **পিতৃস্মৃতি** ১৬·০০ ॥ সীতা দেবী : **পুণ্যস্মৃতি** ১০-০০ ॥ ডঃ সুশীল রায় : **জ্যোতিরিন্দ্রনাথ** ১০·০০ ॥ ডঃ পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : **সমসাময়িকের চোখে শ্রীঅরবিন্দ** ১০·০০ ॥ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত : **কান্তকবি রজনীকান্ত** ১০·০০ শশাংকমোহন চৌধুরী : **কাল পরিক্রমা** ৬·০০, **বারবেলার বৈঠক** ৬·০০ ॥ অবন্তী দেবী : **তরুকবি মধুসূদন রাও ও উৎকলে নবযুগ** ৬·০০ ॥ মণি বাগচি : **কেশবচন্দ্র** ৪·৫০, **দেবেন্দ্রনাথ** ৪·৫০, **মাইকেল** ৭·০০, **রমেশচন্দ্র** ৫·০০, **রামমোহন** ৬·০০, **রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ** ৬·০০ **প্রফুল্লচন্দ্র** ৪·৫০ ॥ নমিতা চক্রবর্তী : **বিদ্যাসাগর** ৬·০০ ॥ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : **মনীষী স্মরণে** ১০·০০ ॥ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় : **শৈলজী** ২·৫০ ॥ স্বদেশরঞ্জন দাস : **মানবেন্দ্রনাথ : জীবন ও দর্শন** ২৫·০০, **মানবেন্দ্রনাথ রায়** ২·০০ ॥ অমিয়নাথ সান্যাল : **স্মৃতির অতলে** ৭ ॥ শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় : **মহাত্মা গান্ধী** ১·৫০ ॥ ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য : **গান্ধীজীর জীবনপ্রভাত** ২·০০ ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ : **চৈতন্যচরিতামৃত** ১০·০০ ॥ সুধা সেন : **মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর** ৮·০০, **ভারতাত্মা শ্রীকৃষ্ণ** ১০·০০ ॥ গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী : **শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে** ৫·০০, **ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ** ৬·০০ ॥ মাখন গুপ্ত : **শ্রীরামকৃষ্ণায়ন** ৪·০০ ॥ কুঞ্জবিহারী দাস বাবাজী : **ভক্তিরসপ্রসঙ্গে** ২·৫০ ॥ ত্রিপুরাশংকর সেন শাস্ত্রী : **গীতায় সমাজ দর্শন** ৪·০০, **সম্ভবামি যুগে যুগে** ৪·০০ ॥ সম্ভূতিরঞ্জন বড়ুয়া : **বুদ্ধপথ** ৬·০০ ॥ রামপ্রসাদ সেন অনূদিত : **ধম্মপদ** ৩·০০ ॥ তারিণীচরণ চৌধুরী : **সদ্গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ** ১৮·০০ ॥

সংগীত, কবিতা ও বিবিধ

শুভ গুহঠাকুরতা : **রবীন্দ্র সংগীতের ধারা** ৮-০০ ॥ অমল মুখোপাধ্যায় : **রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা** ৪·০০ ॥ দিলীপকুমার রায় ও প্রফুল্লকুমার দাস : **কান্তগীতাঞ্জলি** ১ম খণ্ড ৫-০০ ॥ বিমল রায় : **ভারতীয় সংগীত প্রসঙ্গ** ৬-০০ ॥ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য : **রাগাংকুর** ১০-০০ ॥ প্রফুল্লকুমার দাস : **রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ** ১ম/২য় ৫-০০/৫-০০, **সংগীতে সুন্দর** ৫·০০ ॥ দীপংকর সেন : **য়ুরোপীয় সংগীতের কাহিনী** ৪-০০ ॥ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও প্রফুল্লকুমার দাস : **হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাস** ২-৫০ ॥ দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় : **সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সংগীতকল্পতরু** ৬-০০ ॥ রাজ্যেশ্বর মিত্র : **বাংলার গীতিকার ও বাংলা গানের নানাদিক** ৮-০০ ॥ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : **স্বপ্নপ্রয়াণ** ৭-০০ ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : **মন্দ্র** ৭·০০, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়-অনূদিত : **মেঘদূত** ৫·০০ ॥ হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়-অনূদিত : **পুষ্পবাণবিলাস** ৪-০০ ॥ পরমানন্দ সরস্বতী : **আহিতাগ্নি** ৩-৫০, **আনন্দজাতক** ৩-০০, **কালমৃগয়া** ৩-০০, **নির্জন প্রহর** ৩-০০, **নির্জন স্বাক্ষর** ৩-৫০, **পঞ্চমুখ** ৩-০০, **বসন্তবাহার** ৩-০০ ॥ নেপালশংকর সরকার-অনূদিত : **ফেরে নাই শুধু একজন** ৫-০০ ॥ মানবেন্দ্রনাথ রায় : **নবমানবতাবাদ** ৪-০০ ॥ অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় : **সমসাময়িক মনোবিজ্ঞান** ৪-০০ ॥ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : **যুক্তিবাদ আধুনিকতা ও আনন্দ মীমাংসা** ৩-৭৫ ॥ মিত্র ও মজুমদার : **বিদ্যাপতির পদাবলী** ২৫-০০ ॥

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের রচনাসম্ভার

ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য ১২·০০, **রামায়ণী কথা** ৪-০০, **সতী** ১-৩০, **বেহুলা** ১-৬০, **ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ** ১-২০, **জড়ভরত** ১-৫০, **ফুল্লরা** ১-৪০, **পৌরাণিকী** ৬-০০, **বাংলার পুরনারী** ৮-০০, **কানুপরিবাদ ও শ্যামলী-খোঁজা** ২-৫০ **মুক্তাচুরি** ২-৫০, **রাগরঙ্গ** ২-৫০, **রাখালের রাজগি** ২·৫০, **সুবলসখার কাণ্ড** ২-৫০ ॥

ENGLISH PUBLICATIONS

Dr. Bhattacharya, Banerji & Kanjilal: SUNITI KUMAR CHATTERJI — THE SCHOLAR AND THE MAN Rs. 20.00. K. K. Banerjee: INDIAN FREEDOM MOVEMENT — REVOLUTIONARIES IN AMERICA Rs. 10.00 Dwarakanath Gangopadhyaya: SLAVERY IN BRITISH DOMINION Rs. 16.00 Prof. B. N. Banerjee: INTRODUCTION TO POLITICS Rs. 6.00. Dr S. C. Sen: THE RED ROCK Rs. 8.00. Balkrishna Menon: INDIAN CLASSICAL DANCES Rs. 25.00. Dr. Prabas Jiban Chowdhury STUDIES IN AESTHETICS Rs. 10.00; TAGORE ON LITERATURE AND AESTHETICS Rs. 8.50. Hiranmay Banerjee: THE HOUSE OF TAGORES Rs 2.00 Dr. Asutosh Bhattacharya: CHHAU DANCE OF PURULIA Rs. 20.00

কলিকাতা ৯ ॥ জিজ্ঞাসা ॥ কলিকাতা ২৯

সেই লোকটি

—কি নাম তোমার?
—রবীন।
—পুরো নাম বল
—রবীন নাথ।
—বাড়ি কোথায়?
—নারকেলডাঙা।
—পেট ভরে খাবি সব?
—পারব।

বাস। সেই এই কটি কথায় আলাপসারা। ছিপছিপে গড়নের রবীন নামে কিশোরটি আমাদের বাড়িতে কাজে লেগে গিয়েছিল। তখন পনের বছর বয়েস ছিল। না জানান দিয়ে গত সনের এক বর্ষার সন্ধ্যায় কোথায় চলে গেল। আর তার মুখদর্শন হয়নি।

আমাদের চোখের ওপরই পলকা শরীরের ঐ কিশোর নওজোয়ান হয়ে উঠেছিল। হয়ে উঠেছিল বাড়িরই একজন। কাজের সময় ওকে হাতের কাছে না পেলে চোখে ত্রিভুবন দেখতাম আমরা। খাটতে পারত মোষের মত। ফলে অনিবার্য ভাবে মাথা-জুড়ে হয়ে উঠেছিল। পরিবারের সবাই। যে সবল, নিরবধি ভূতের মত খাটে তাকে এক মুহূর্ত বিশ্রাম না দেওয়াটাই আদর্শ মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের রীতি।

ন মাসে ছ মাসে কেমন এক হাওয়া এসে ভর করত রবীনকে। ছুতোয় ছুতোয় বাইরে বেরিয়ে যেত। ইচ্ছেমত ফিরত। বাইরের বারান্দায় একটা সাবেক কেদারা পাতা থাকত—সেখানে অনেকক্ষণ গা ছেড়ে বসে থাকতে দেখেছি ওকে। তখন হাজার ডাকেও রা কাড়ত না। ওর পায়ের কাছে ওরই মত মুখ গুঁজে লেজ গুটিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে থাকত পাড়ার সবচেয়ে রুগ্ন বেওয়ারিশ কুকুরটা। রবীন আনমনাভাবে ওর মাথায় ধীরে ধীরে পা বোলাতে থাকত। মাসখানেক এমনি এক ঘোরের মধ্যে থাকত ও। তখন হাজার বকে বুঝিয়েও কোনো ফল হত না। বেশি রাগারাগি করলে খেতো না সমস্ত খাবার-দাবার বাইরে এনে ঐ কুকুরটির মুখের সামনে ছিটিয়ে দিত। একবার আর সইতে না পেরে রবীনকে বেশ দু ঘা কষে দিয়েছিলেন ছোটকাকা। তারপর পাঁচদিন বাড়ি ফেরেনি। ফলে, মানুষ যেভাবে রোদ জল মেনে নেয়, মেনে নেয় দিন-রাত, আমরা সেভাবেই নানা মেজাজের নানা খেয়ালের রবীনকে মেনে নিয়েছিলাম। আসল কারণটা তো বলেইছি—ওকে ছাড়া আমাদের অবস্থা হয়েছিল নাচার অন্ধের মত।

এক পূর্ণিমার রাতে ছাতে উঠে একপাশে দাঁড়িয়েছিলাম। বেশ তন্ময় হয়ে জোৎস্না গিলছিলাম, হঠাৎ পায়ের খস খস শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। রবীন। এককোণে ছিলাম, আমাকে ঠাহর করতে পারেনি। একটু পরেই দেখি, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি সহকারে রবীন ছাদময় ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। আরো ভালো করে লক্ষ্য করার পর বুঝতে পারলাম, লাটাই বিহীন, সুতো-ঘুড়ি বিহীনভাবে ও প্রাণপণে অদৃশ্য ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। শুধু ওর হাতের ভঙ্গিমায় আমাকে বুঝে নিতে হচ্ছিল কখন ও ঘুড়ি বাড়াচ্ছে এন্তার সুতো ছাড়ছে প্যাঁচ খেলছে লাটাই গোটাচ্ছে। এবং একবার ও প্রচণ্ড উত্তেজনায় 'ভো কাট্টা' বলে চীৎকারও করে উঠেছিল। তারপর অনেকক্ষণ করতালি বাজিয়ে মহা আনন্দে নিজের মনে গেয়েছিল 'আসমানে উড়তা যায়ে মেরা লাল দোপাট্টা মলমল......'

ছাদের ওপরে চিলেকোঠায় থাকত রবীন। আমরা ওর ঘরে ঢুকলে ভারী অসন্তুষ্ট হত। বাড়িতে যখনই কোনো পত্র-পত্রিকা আসত তাৎক্ষণিক কখন সেটিকে রবীন ছোঁ মেরে ওর কুঠরিতে নিয়ে যেত। ইংরিজি-বাংলা সিনেমার কি রাজনীতির কাগজ—কিছুই ওর হাত থেকে রেহাই পেত না। প্রথম প্রথম বুঝতে পারতাম না। একদিন একটি আনকোরা এবং উবে যাওয়া দরকারী কাগজ খুঁজতে খুঁজতে ওর ঘরে গিয়ে দেখি জনৈক নামকরা ব্যক্তির ফোটোর গালের ওপর গাল রেখে ও ঘুমিয়ে আছে।

বরানগর-কাশীপুরের শ্রমিক-মহল্লায় বা বি টি রোডের ধারে ধারে এখনো রামলীলা বা যাত্রাগানের আসর বসে। কবে কোথায় সেসব হয় রবীনের তা মুখস্থ ছিল। সে রাতগুলিতে দড়ি দিয়ে বেঁধেও আটকে রাখা যেত না ওকে। এমনকি সত্তর-একাত্তরের কলকাতায় যখন রাজপথে-অলিগলিতে নিদারুণ কাণ্ড চলছে আসফল্টে মোড়া কালো রাস্তা যখন তখন লাল হয়ে উঠছে তখনও নির্ভীক নির্বিঘ্নচিত্তে রবীন যাত্রাগানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে শেষরাতে বাড়ি ফিরত। ও না ফেরা পর্যন্ত এক পরম অমঙ্গলের আশঙ্কায় অপেক্ষা করতে করতে আমাদের পরমায়ু কমে আসত। রাত-বিরেতে টৈ টৈ করে টহল দিতে গিয়ে বার দুয়েক রবীনকে হাজতবাসও করতে হয়েছিল! তাতে ভ্রূক্ষেপ করার পাত্রই ছিল না সে।

ওকে আমার ছোট ছেলে মাঝে মাঝেই প্রশ্ন করত—রবীনদা কত রসগোল্লা এক সঙ্গে খেতে পারো তুমি? ও মৃদু হেসে উত্তর দিত—দিলে একসের না দিলে পাঁচ সের। ওর প্রিয়-কুকুরটিকে একটি লোক একদিন ঢিল ছুঁড়ে মারায় রবীন সরাসরি গিয়ে তাকে ঐ কুকুরটির মতই কামড়ে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে দেহাত থেকে ওর বুড়ো বাপ আসত কিন্তু রবীন কখনোই যেতে চাইত না। ওর মা ভাই বোন কারো সঙ্গেই কোনো সম্পর্ক রাখতে চাইত না।

রবীন চলে গেছে। বাস্তবে যেমন দেখতাম এখনও মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি নির্জন রাস্তায় প্রতিটি ল্যাম্পপোস্টে লাঠি দিয়ে ঠকাং করে আওয়াজ করতে করতে [illegible] মত রবীন হেঁটে যাচ্ছে। ওর পেছন পেছনে একটি বয়স্ক ক্লান্ত বিমর্ষ কুকুর।

—অমিতাভ দাশগুপ্ত

উপমা

ইমদাদুল হক মিলন

কুকুর কেঁদে উঠলো।

কাছে কোথাও কুকুর কেঁদে উঠলো মেয়ে মানুষের মতো মিহিগলায়। রাত্রির গভীরতা কেঁপে উঠলো সেই ডাকে! রংগু একটু থমকে গেলো। আঙ্গুলের ফাঁকে কায়দা করে ধরা গাঁজার কল্কেটা শিথিল হলো একটু। বুকের ভেতর থেকে ধুয়া বেরুলো নাক মুখ দিয়ে। ভারি ভারি গলায় কথা বললো রংগু।

হুনছস বাপু, কুত্তা কাঁদে। ব্যারামডা বুঝি আইবো না ছুইবার। ঘরের ভেতর থেকে শব্দ এলো না কোন। একটু স্থির হলো রংগু। খেয়াল করে শুনলো ঘরের ভেতর ভারি নিশ্বাস পতনের শব্দ। বাসু ঘুমিয়ে পড়েছে। এখনি ঘুম বাপুর। দেখতে দেখতে অনেক গভীরে চলে যায়।

কষে কষে কল্কেতে আবার টান লাগালো রংগু।

তারপর উঠে দাঁড়ালো বুকের ভেতর ধুয়া আটকে রেখে। কল্কেটা ছুঁড়ে ফেললো। রাগে।

যা শালা।

তখন ঘরের ভেতর ছেলেটা কেঁদে উঠলো ঘুমের মধ্যে। রংগু সেসব খেয়াল না করে উঠোনে নেমে গেলো। এবং বুকের ভেতর জমানো গাঁজার ধুয়া ছাড়লো অল্প অল্প করে। হাত দুটো উপরের দিকে তুলে বিশাল শরীরটা মেলে হাই তুললো এক রকম শব্দ করে। চারদিক তাকিয়ে আঁচ করলো রাত এখোন মাঝবয়সী। বস্তির সার সার খুপরী ঘরগুলো নিস্তব্ধ। উঠোনে আবছা আলোআঁধারি ছড়ানো। পুব-দিকের কদবেল গাছের মাথায় বাঁকা চাঁদ স্থির হয়ে আছে। কুয়াশার আবরণ যেনো, ফিনফিনে সাদা শাড়ী। যার ভেতর দিয়ে মেয়েমানুষের শরীরের লোভনীয় গোপন অংশের মতো স্পষ্ট চাঁদ। আলোর চলাচল নেই। তবুও জলের মতো শীতল সবকিছু। শীতটা পড়তে শুরু করেছে মাত্র। কুয়াশা জমছে হালকা ধুয়ার মতো।

কদবেল তলার ঘরের চুনি নামের তরতাজা যুবতী মেয়েটা দুপুর বেলায় মরে গেলো আজ। কলেরাটা জেঁকে বসেছে প্রচণ্ডভাবে। বাড়ছে দ্রুত। বস্তির লোকজন মরছে প্রতিদিনই দু-চারজন করে। রংগুর আজকাল বড় জমজমাট অবস্থা।

হাঁটতে শুরু করলো রংগু।

মোষের মতো জমাট কালো শরীর আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলো। নেশাটা

তাজা জর্মোন। কেমন শীত শীত লাগছে। তাছাড়া বারবার চুমকির কথা মনে হচ্ছে। মাগী ছিনাল। এতো কইরা কইয়াও শাইমে আইলো না। ভদ্দরনোক সাজতে চেয়েছিলি। কিন্তুক কি অইলো? মইরা গেলি। দুনিয়া দেখলি না মাগী। দুনিয়া দেখলি না।'

অন্ধকার কাদামাটির পথে জল জমে-ছিলো এক জায়গায়।

হাঁটতে গিয়ে ছপাত্ছপ পা পড়লো রংগুর। রাগে গরগর করলো সে। কার উদ্দেশ্যে গালাগাল করলো শব্দে।

শলা মামদার পো।

তারপর ভাবনার ভেতর চলে গেলো আবার। 'আরেকটা সাংগা করমু। শলা বাসুটাকে দিয়ে আর চলে না। একটা বাচ্চা দিয়েই নড়বড়ে হয়ে গেলো।' একটুতেই ছটফট করে। হাঁপায়। চুমকিটাও মইরা গেলো। কইলাম সাংগা করমু। বিশ্বাস করলো না। কয় আগে সাংগা করো, তারপর। মাগী ছিনাল।'

রেললাইনে উঠলো রংগু।

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলো দূরে স্টেশানের কপালে আলো জ্বলছে টিমটিম করে। স্টেশানের ফাঁকা ফাঁকা গাছগুলোকে এখান থেকে জমাট মনে হয়। যেন উপবন। সেইসব গাছগাছালির ভেতর চাঁদ নেমে পড়েছে এখোন। গাছের মাথায় ছায়া মন্দিরের চূড়ার মতো উঁচু।

কারো উদ্দেশ্যে আবার গালাগাল দিলো রংগু।

শলা মামদার পো।

তারপর রেললাইনের ঢালু বেয়ে অন্য পাড়ে নেমে গেলো তরতর করে। এপাড়ে গাছগাছালি ঝোপঝাড় ছড়ানো। তার ফাঁকে সাপের মতো বাঁকা পথ। সেই পথের জমাট আঁধারে সাহসী জন্তুর মতো নির্ভয়ে হাঁটতে থাকলো রংগু। বুকের ভেতর চুমকির কথা নড়েচড়ে উঠলো আবার। 'শরীল ছিলো বটে মাগীর। যেনো মাখনের ঢেলা। দুনিয়া দেখলি না মাগী। দুনিয়া দেখলি না।'

গোরস্থানের কাছাকাছি আসতে পরিচিত গন্ধটা নাকে এলো।

এখানটায় এলে আশ্চর্য স্বাদের গন্ধ পায় রংগু। আতর, লোবান, গোলাপপানি ইত্যাদি একত্রে মিশালে যেমন গন্ধ হয়, তেমনি গন্ধ। এ গন্ধে স্নায়ু শক্তিশালী হয়ে উঠে রংগুর। পায়ের কাছ দিয়ে শুরুৎ করে শেয়াল দৌড়ে গেলো এসময়। ক্রুদ্ধস্বরে গালাগাল দিলো রংগু।

শলা মামদার পো। তাজা মানুষ খাইয়া খাইয়া ফুইল্লা গেলি। অতিসার অইবো শলা। অতিসার।

লোহার ভেজানো গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকলো রংগু।

তারপর হাঁটতে লাগলো অনির্দিষ্ট-ভাবে। তার পায়ের শব্দে নিস্তব্ধ রাতে গোরস্থানের শায়িত শবেরা আর্তনাদ করে উঠলো যেন। এখোন, গাঁজার পঙ্গাত্তক নেশাটা আবার ফিরে আসছে রংগুর কাছে। ধরা দিচ্ছে একটু একটু করে। কেমন ক্ষীণ একটা উষ্ণতা ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে রক্তে। যেন একজোড়া কমজোরী ব্যাটারী ফিট করে দিয়েছে কেউ রংগুর ভেতর। এখোন সেই ব্যাটারিতে চার্য দিচ্ছে সেই অলৌকিক মিস্তিরী। গরম হচ্ছে রংগুর শরীর।

মিউনিসিপ্যালিটির কোয়ার্টারের কাছ দিয়ে যেতেই ভেতর থেকে মৌলভি সাহেবের গলা খাঁখ্যার বাজলো। তারপর সুরা, 'ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন'।

রংগু আইলি?

হ হুজুর।

মৌলভি সাহেবের টের পাওয়ায় নিজের উপরই রাগ ধরলো রংগুর। তখোন বদ্ধ কোয়ার্টারের ভেতর থেকে শব্দ এলো আবার। যাওনের বেলা দেহা কইরা যাইছ।

আইচ্ছা।

এবার ক্রুদ্ধ রাগ জমাট বাঁধলো রংগুর ভেতর। মনে মনে গালি আউরালো মৌলভি সাহেবের উদ্দেশ্যে।

শলা মামদার পো। বখরা চায়। রাইতে ঘুমায় না। পাকা ঘুঘু হারামখোর শলা। আমি তোর বাপের চাকর? দেহা কইরা যামু, শলা!'

এতোক্ষণে একটা নূতন কবরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে রংগু।

উত্তরদিকের ঝোপে ফুল ফুটেছে অচেনা কোন। তুলতুলে গন্ধে মন্থর পরিবেশ। ঘোলা ঘোলা কুয়াসার উপর চাঁদের যাই যাই আলোটা বিছিয়ে পড়েছে। আবছা অস্পষ্ট সবকিছু। সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিক তাকালো রংগু। তারপর সেই নতুন কবরের বুকে হাতের কোদাল চালালো কপাকপ। কাঁচা মাটিতে কোদালের কোপে একরকম শব্দ উঠে মিলিয়ে যেতে লাগলো বাতাসে। ঝুরঝুরে করে আলগা মাটি সরে যেতে শুরু করলো দুদিকে। ক্ষীণ একটা ক্লান্তি আসতে লাগলো রংগুর বিশাল শরীরে।

ক্রমে মাটি সরে গিয়ে বাঁশ, চাটাই ইত্যাদি স্পষ্ট হলো।

কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে চাটাইগুলো টেনে তুললো রংগু। তারপর বাঁশ। কবরটা এখোন খোলা। হাঁ-করা ক্ষুধার্ত কোন বোবা জানোয়ারের মুখ ভেতরে জমাট আঁধার আর ভ্যাপসা গন্ধ। সেই গন্ধে স্নায়ুগুলো উত্তেজিত হতে শুরু করলো রংগুর। বুকের ভেতর কতকগুলো ক্ষুধার্ত জন্তু যেন হিংস্র নখরে শানিত হয়ে উঠলো দ্রুত। টুপ করে কবরের ভেতর নেমে গেলো রংগু। পা দুটো একত্রে গিয়ে পড়লো চুমকির মৃতদেহের উপর। দু-হাতে কবরের দু পাড় ধরে কায়দা করে পা দুটোকে চুমকির শরীরের দু-পাশে রাখলো রংগু। ঠোঁটে শব্দ এনে গালি আওড়ালো আবার।

'ছিনাল। ভদ্দরনোক সাজতে চেইছিলি? কি অইলো? জ্যান্তা থাকতে শরীলডা দিলি না।'

তারপর উবু হয়ে ক্ষিপ্রহাতে কাফনের সাদা কাপড়টা টেনে তুললো উপরে। জমানো বাঁশ আর চাটাইয়ের উপর কাপড়টা রাখলো দলা পাকিয়ে। নীচের দিকে মুখ নিয়ে অতিকষ্টে চুমকির অল্প হা-করা ঠোঁট কামড়ে চুমো খেলো। এবং শেয়ালের মতো লাফ দিয়ে উঠে এলো কবরের ভেতর থেকে। কোদালটা কুড়িয়ে নিয়ে চুমকির ন্যাংটো শরীরের উপর জমানো আলগা মাটি টেনে দিলো চাপচাপ।

ফিরতে গিয়ে দেখলো সকাল নামছে আকাশ থেকে। ফর্সা ফর্সা ছোপ ধরেছে জমাট কুয়াসার উপর। কুয়াসারা এখোন

সাদা অস্তিত্বে স্পষ্ট হচ্ছে দ্রুত। যখন বস্তিতে ফিরলো তখন পূর্ণ সকাল এবং রোদ। আজ পয়সাটা পেতে দেরি হয়ে গেলো। মহাজন শূয়রের বাচ্চা নতুন নিয়ম করেছে। রাত-বিরাত জিনিসপত্তর কেনে না। সকাল পর্যন্ত ঠায় বসে থাকতে হয়েছে রংগুকে। মহাজন হারামজাদা এক নম্বরের ঘুঘু। অতগুলো বাঁশ চাটাই আর অতো বড় একটুকরো কাপড়ের দাম কিনা পাঁচ টাকা দশ আনা।

ঘরের কাছাকাছি আসতে বাতাসে কেমন গন্ধ পেলো রংগু। টক মতো গন্ধ। বারান্দায় চড়ে উঁকি মারলো ঘরের ভেতর। দেখলো মেঝেয় বিছানো চিটচিটে কাঁথার উপর সরু সরু নলের মতো হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে ছেলেটা। পাশে যাসু বসে আছে সর্বনাশের মতো।

নীচু হয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো রংগু।

তাকে দেখেই তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো যাসু।

পোলাডারে বাঁচাও গো। পোলাডা মইরা যাইবো আমার।

রংগু নীঃচুপ খেয়াল করলো সবকিছু। ঘরময় টলটলে বমি আর পায়খানা ছড়ানো। উৎকট গন্ধে নাক রাখা যায় না। পোলাডার কলেরা অইলো!

ভেতরে ভেতরে কথা বললো রংগু। এক ফাঁকে পরিবেশ ভুলে লুঙ্গির কোচরে বাঁধা সদ্য পাওয়া খসখসে টাকা আর শীতল পয়সা গুনলো হাতরে দেখলো সুখে।

তখন কেমন একটা কোলাহল উঠলো বস্তিতে।

রংগু বাইরে এসে দেখলো ক্লাবের ছেলে-দের সঙ্গে সরকারী ডাক্তার এসেছে। সার বাঁধা খুপরির ঘরগুলোর ভেতর উঁকি মেরে দেখছে ডাক্তার। আর চকমকা জামা কাপড় পরা মাথায় টেরি বাগানো ক্লাবের আড্ডাবাজ ছোকরাগুলো জোর করে পাকড়াও করে ইনজেকশান দিচ্ছে যাকে কাছে পাচ্ছে। বস্তির বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো ছুটোছুটি করছে 'সুঁই' নেবার ভয়ে।

রংগু টিপটিপ এগিয়ে গেলো ডাক্তারের কাছে।

হাত কচলে বিনীত স্বরে বললো, ডাক্তার আমার পোলাডারে ইটু দেহেন।

খাসা চেহারার একটা ছোকরা মুখ বাঁকিয়ে জানতে চাইলো, কি অইছে তোমার পোলার?

কলেরা। খালি বাহ্য আর বমি অইতাছে।

পুরো দলটাই উঠে এলো রংগুর ঘরে। তাদেরকে ঢুকতে দেখে যাসু উঠে গেলো এককোণে। মুখ অবধি ঘোমটা টেনে জড়সর দাঁড়িয়ে থাকলো। রংগু আমন্ত্রণ জানালো ডাক্তারকে। আহেন ডাক্তারসাবু।

ডাক্তার তখন ইতঃস্তত করছে যেমন। ক্লাবের ছেলেরা নাক-মুখে ঘৃণা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কে একজন ঘৃণা ঘৃণা গলায় অনুপ্রাণিত করলো ডাক্তারকে।

যান সার ইটু দেইখ্যা আইয়া পড়েন।

ডাক্তার এবার ভেতরে এলো। দাঁড়িয়ে থেকেই সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বুক দেখা যন্ত্রে আলতো ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে দেখলো ছেলেটাকে। ইনজেকসান দিতে গেলে ডাক্তারের হাতের কাছে হরহর করে বমি করে ফেললো ছেলেটা। ঘৃণায় বিরক্তিতে নাক-মুখ কুঁচকালো ডাক্তার। তারপর চলে যেতে যেতে বললো,

অবস্থা খারাপ।

রংগু খাঁচায় বন্দী অসহায় হিংস্র জানো-য়ারের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো। ডাক্তার তখন তার দলবল নিয়ে উঠোনে নেমে গেছে।

দুপুরের দিকে লিকলিকে হাত-পা ছড়িয়ে, শরীরটাকে ভেজা কাগজের মতো চুপসে সাদা চোখ দুটোকে পুরো পৃথিবীটা গিলে খাওয়ার মতো খোলা রেখে মরে গেলো ছেলেটা। যাসু সেই বিবর্ণ শরীরটা জড়িয়ে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিলো। বস্তির একজন এসে উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখে গেলো। কেউবা আফসোস করলো 'আহা পোলাডা' ইত্যাদি বলে। রংগু ধ্যানি সন্ন্যাসির মতো বসে থাকলো খোলা বারান্দায়। নড়ার শক্তি নেই। যেন অনাদিকাল থেকে বৃক্ষ হয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে সে।

দেখতে দেখতে দুপুর উঠে গেলো কদবেল গাছের মাথায়। বিকেল ধরা দিলো মোহনীয় রূপে। ক্লাবের সেই ছোকরাগুলো এসে উৎসবের আয়োজনের মতো বিভিন্ন উপকরণ সেরে কাফন ইত্যাদি পরিয়ে রংগুর চোখের উপর দিয়ে তার আত্মজের লিকলিকে টিকটিকির মতো শরীরটা বয়ে নিয়ে গেলো গোরস্থানে। যাসু উঠোনে গড়াগড়ি খেয়ে কাঁদলো। রংগু আগের মতো স্থির বসে থাকলো। আকাশের পানে তাকিয়ে সূক্ষ্ম একটা শূন্যতা বোধ করলো বুকের কোথাও।

রাত হলে গাঁজার নেশা পেলো রংগুর। কৌটো থেকে মাত্রাধিক গাঁজা তুলে নিলো তালুতে। অন্য হাতের বুড়ো আঙগুলে ঘসে ঘসে কল্কেতে পুরলো। আগুন দিয়ে ঘরের জমাট আঁধারে বসে ভূতের মতো টানতে থাকলো। ক্রমে ঝাপসা আচ্ছন্নতা এলো শিরায় শিরায়। এ মুহূর্তে নিজের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ অবচেতনের ভেতর বিলুপ্ত করে দিতে চাইলো রংগু। পারলো না। কান্নার ভেতর বন্দী থেকে যাসু মিনতি করলো,

তোমার আল্লার দোহাই লাগে, পোলাডার কাফন আনতে যাইও না।

চেতনা ফিরে পেয়েও এসব গ্রাহ্য করলো না রংগু। কষে কষে দম দিতে থাকলো কল্কেতে। ক্ষীণ একটা লাল আগুন বিন্দুর মতো জ্বলে উঠতে লাগলো টানে টানে। যাসু আবার প্রলাপের মতো করে পুরোনো প্রসঙ্গ পাড়লো। এবার সিংহের মতো গর্জে উঠলো রংগু।

চুপ কর মাগী।

তারপর কল্কে ছেড়ে কথা বললো নিজের ভেতরে ভেতরে। না যাসু না। পোলাডার কাফন আনতে যামু না আমি।

অথচ গভীর রাতে কুয়াসার চাদর গায়ে কদবেল গাছের ভেতর দিয়ে আকাশে চাঁদ উঠে এলে সে নিমগ্ন সুখে আত্মজের কাফন আনতে গেলো।

কবিতা

জন্মদিন ॥

দিব্যেন্দু পালিত

একা-একা দুই হাত ভরে ওঠে শস্যের কিনারে।
এক জন্ম গত হলো: তুমি কি ফুলের বীজ করেছো বপন
সাজানো উঠোনে শিশু এখনো কি করে খেলা
অলিন্দের ধারে!

তোমাকে ডেকে নাও ঘরে: কাঁদিছে দুধার ঠিক ক্ষণ
এ জন্ম হলো না জানা শস্যের আড়ালো ঝরে বীজ:
মাঙ্গলিকের শব্দে চেয়ে আছে রূপ সম্মোহন—
ভালোবাসা বেজে যায় দূরে বেহালার মতো—
মনসিজ, হায় মনসিজ!

এলেজি ॥

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

তুমি তো সেই গেলে—
ঘনিয়ে এলো আমবাগানের
বিশাল ছায়া ঘরের কোণে,
সূর্যের চোখ ঢাকলে পাখির আর্ত কোলাহলে।
যখন গেলে চলে।

তেমন কিছুই ঘটলো না রে!
কেবল যেন তন্দ্রাঘোরে
পাশ ফিরে যেন নিদ্রা গেল সমস্ত সংসার;
শব্দও তার মিলিয়ে গেল বন্ধ হলে দ্বার।

আর কিছু কেউ বললো নারে।
তেমন ছিলো থাকলো পড়ে।
বলতো কি কেউ অনিকে কোথায় কিসে ধরা?
সকলের নাম রইলো কেবল মন-কেমন-করা।

আমার মাকে ॥

তেজেশ অধিকারী

একদিন তুমি অশ্বত্থগাছের নীচে
গাজনতলার পুকুরে অথবা কুয়োতলায়
একদিন তুমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে
প্রথমা কুমারী।
স্কুলের পথ ধরে যেতে যেতে তোমার অভিজ্ঞতার বয়স
হৈ হৈ করে বেড়ে যেতো
একদিন তুমি হাতে ধরে রাখতে সরলরেখার মতো
নির্ভেজাল প্রাণ
চোখ জুড়ে অন্ধ ভালবাসার সীমানে নিজের কাছেই
নিজস্ব বিস্ময়ে আপ্লুতো।

সেইসব জানুর মুখ সেইসব স্মৃতি হাতে হাতে
এক এক করে কাঁসায় ভিজে দিলো আবরণ—
নাভীমূল থেকে বুক, বুক থেকে মুখ মুখ থেকে
তোমার পায়ের পাতা
সর্বস্ব দিয়েছ তোমার দেবারতি।
একদিন তুমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে
সম্পন্না নারী।

আমি শুধু জানি সরলরেখার মতো দিন
অথবা দেবারতি উৎসবে
তুমি সাবলীল শান্তি পাওনি
এখন ছানিপড়া চোখে মাঝে মাঝেও উথলে ওঠে না
তোমার মায়াঞ্জন হাসি, সোনার পায়ের পাতার অহংকার
নারকেলের মতো গোপন শিকড় ছড়িয়ে ছড়িয়ে
আমাদের জন্য অসীম ধৈর্যে ক্লান্তিহীনা,
বিলিয়ে যাচ্ছ অকৃপণ স্নেহ ও প্রাণ।
মা আমার—
সাবলীল শান্তি তোমায় এখনো দিতে পারিনি।

সেকালের সঙ্গীতগুণী

(৪)

কতবার আসিয়া কত ভালবাসিয়া

মানদাসুন্দরী দাসী

প্রায় সমস্ত আয়োজনই সম্পূর্ণ হয়েছে। কয়েকদিন পরেই মঞ্চস্থ হবে গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটক। এমন সময় বিভ্রাট বাধালেন নরীসুন্দরী। তিনি হঠাৎ স্টার থিয়েটার ত্যাগ করলেন।

যোগেশ—অমৃতলাল মিত্র। রমেশ—অমৃতলাল বসু। ভজহরির প্রথম নট বেলাবাবু এখন পরলোকে, কিন্তু সে ভূমিকারও ব্যবস্থা হয়েছে। তেমনি কাঙালীচরণ জগমণি জ্ঞানদা উমাসুন্দরী মদন ঘোষ প্রফুল্ল—সকলেই প্রস্তুত। এই অবস্থায় জবাব দিয়ে দিলেন গায়িকা-অভিনেত্রী নরীসুন্দরী। তিনি এখন আর থিয়েটারে আসতে পারবেন না। গানের দৃশ্যটিতে পাওয়া যাবে না তাঁকে।

অমৃতলাল মিত্র অমৃতলাল বসু প্রমুখ কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গুনলেন। এই গানের অংশটি নরীসুন্দরী করবেন জেনে নিশ্চিন্ত ছিলেন সবাই। কোকিলকণ্ঠী তরুণী গায়িকা তিনি। একটি মাত্র দৃশ্যের ভূমিকা হলেও তাঁর গানখানি নাটকের একটি আকর্ষণ হত। সেকালে এমন দর্শকদের অভাব ছিল না যাঁরা ওই গানটি শোনবার কথা মনে রেখেও আসতেন 'প্রফুল্ল' দেখতে! এখন উপায়?

স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁরই নাটক নিয়ে স্টার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। নিজে থেকেই সাধ করে জানিয়েছে দ্বন্দ্বের আহ্বান। কোনপ্রকার ত্রুটি থাকলে চলবে না।

ছ বছর আগে (১৮৮৯) 'প্রফুল্ল' প্রথম মঞ্চস্থ হয় এই স্টারেই। গিরিশচন্দ্র তখন এখানে নাট্যাচার্য। তিনি নিজের হাতে প্রফুল্লকে সাজিয়ে দর্শকসমাজে উপস্থিত করেছিলেন। 'যোগেশ' রূপে গড়ে দিয়েছিলেন প্রিয় শিষ্য অমৃতলাল মিত্রকে। বাংলার রংগমঞ্চে প্রফুল্ল একটি বহু জনপ্রিয় নাটক হয়েছিল। তারপর গিরিশচন্দ্রকেই স্টার থেকে বিদায় নিতে হল চক্রান্তের ফলে। ক বছর পরে (১৮৯৩, ২৮ জানুয়ারি) গিরিশচন্দ্রেরই নেতৃত্বে 'ম্যাকবেথ' নিয়ে বিডন স্ট্রীটে নতুন নাট্যমঞ্চ মিনার্ভা থিয়েটারের উদ্বোধন হল। সেই মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রেরই পরিচালনায় এবার (১৮৯৫) মহলা আরম্ভ হয়েছে 'প্রফুল্ল'র।

'ট্র্যাজেডিয়ান' নামে বিখ্যাত নট মহেন্দ্রলাল বসুকে যোগেশের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র প্রস্তুত করছিলেন। এমন সময় স্টারও প্রফুল্ল অভিনয়ের ঘোষণা করলে সাড়ম্বরে।

এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে মিনার্ভা সম্প্রদায় গিরিশচন্দ্রকেই যোগেশ-রূপে অবতীর্ণ হতে অনুরোধ জানালেন। সম্মত হলেন নাট্যাচার্য।

এদিকে স্টারের পক্ষে থিয়েটারপাড়ায় সগর্ব দেওয়াল-লিপি দেখা গেল—'তোমার শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায়'।

গুরু গিরিশচন্দ্রের প্রতিপক্ষে তাঁরই শেখানো যোগেশ-চরিত্রে মঞ্চাবতরণ করবেন শিষ্য অমৃতলাল! নাট্যমোদী সমাজে সাড়া পড়ে গেল।

গিরিশচন্দ্র স্থির করলেন আগে অমৃতলালকে যেমন শিখিয়েছিলেন, তা বদলে দিয়ে নতুন চিত্র দেবেন যোগেশ চরিত্রে। হলও তাই। পুরাতন যোগেশকে আচার্য এবার নতুন ছাঁচে গড়ে তোলার পর থেকেই প্রফুল্ল অভিনয়-রজনীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে।

কিন্তু তার আগে সেই গানের ভূমিকাটির কথা। একটিমাত্র গানের এই অংশ এক নাটকীয় মুহূর্তে নাটকের দিক পরিবর্তন করে দেয়। যোগেশ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছিল। পীতাম্বর একটু অন্তরালে যাবার অবসরে ইতর স্ত্রীলোকটি গান গেয়ে যোগেশকে আকর্ষণ করে পানশালায়। কপর্দকশূন্য যোগেশ পকেটের ঘড়ির বিনিময়ে সুরা নিয়ে মত্ত হয়। পীতাম্বর ফিরে এসে সে দৃশ্য দেখে—বাবু সুস্থ ভদ্র জীবনে ফিরে আসায় জলাঞ্জলি দিয়েছেন।...

স্টারের প্রথম রজনী থেকে সেই স্ত্রী-ভূমিকার গানটি গাইতেন প্রসিদ্ধ গায়িকা বনবিহারিণী (গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা'য় যিনি নিত্যানন্দ বেশে গানে গানে প্রেক্ষাগৃহ মাতিয়ে দিতেন)। ভূমিকাটি ইতর স্ত্রীলোকের বটে কিন্তু গানখানি উচ্চকোটির। ভৈরবী মিশ্র বিলম্বিত লয়ে গঠিত 'মা তোমার এ কোন দেশী বিচার' শিক্ষিত পটু, মার্জিতকণ্ঠ না হলে এ গান গাওয়া অসম্ভব। (সেকালের নটীদের মধ্যে সেই মানের গায়িকাও থাকতেন। নাট্যমঞ্চের সুর-সংযোজকরাও ছিলেন রাগসংগীতে পারদর্শী আচার্যস্থানীয়। দিকপাল গায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর কৃতী শিষ্য রামতারণ সান্যাল এই গানে সুর যোজনা করেছিলেন।)

সে বনবিহারিণী এখন স্টারে নেই। সেজন্যে কর্তৃপক্ষ স্থির করেছিলেন উদীয়মানা গায়িকা নরীসুন্দরী (ক'বছর পরে যিনি চন্দ্রশেখরের দলনী বিল্বমঙ্গলের পাগলিনী ইত্যাদি ভূমিকায় গানে বিপুল খ্যাতি লাভ করেছিলেন) এই ভূমিকায় অবতীর্ণা হবেন।

এখন উপযুক্ত নটী না হলেই নয়। স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। গানটিও বর্জন করা যায় না। কারণ এটি এক গুরুত্বপূর্ণ নাট্যপরিস্থিতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য এবং নাটকের একটি মাত্র গান।

এই অবস্থায় কর্তৃপক্ষের মনে পড়েছে মানদার কথা। এ গান তাঁর পক্ষেই যোগ্যতার সঙ্গে গাওয়া সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তাঁকে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

মধুকণ্ঠী গায়িকা মানদাসুন্দরী।

স্টারেই তাঁকে প্রথম মঞ্চে দেখা গিয়েছিল বছর পাঁচেক আগেকার কথা। গিরিশচন্দ্রেরই কয়েকটি নাটিকায় গানের ভূমিকায় তখনই তিনি নাট্য জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করছিলেন। এমন সময় স্টার ত্যাগ করে যান একটি বড় রকমের সংসারের পরিবর্তনে। অল্প বয়স, কিন্তু পারদর্শিনী গায়িকা এবং সুমিষ্ট কণ্ঠ।

রঙ্গমঞ্চে এমন অবস্থা মাঝে মাঝেই ঘটে। সমস্যার সমাধানও হয়ে যায় অনেক কষ্টে। এ ব্যাপারেও বহু আয়াসে মানদাসুন্দরী সম্মত হলেন। স্টারে পুনরায় এলেন এই একটিমাত্র ভূমিকার জন্যে।

স্টারের প্রফুল্লর পুনরভিনয়ে মিনার্ভার গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে প্রবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। গুরুর তুলনায় অমৃতলালের যোগেশ কিছু নিষ্প্রভ হলেও প্রায় অক্ষুণ্ণ রইল স্টারের মর্যাদা। মানদা এখানে রাত্রের পর রাত্রি মুগ্ধ শ্রোতাদের সেই গানখানি শোনাতে লাগলেন।

গাওয়া কঠিন কিন্তু বারবার শোনবার মতন চমৎকার বন্দেশের সেই গান—

> মা তোমার এ কোন দেশী বিচার,
> খুঁজে বেড়াই পথে পথে
> দেখা দাও মা একটি বার।...

(গানটি পরে মানদা রেকর্ডও করেছিলেন, তার প্রচারও যথেষ্ট হয়েছিল।) এই সাধারণ কটি কথা তাঁর অসাধারণ সুরেলা কণ্ঠে মূর্ত হয়ে উঠত। সেই ভূমিকাই মানদার মঞ্চে শেষ অবতরণ।

কিন্তু তাঁর সেই গানখানি ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল নাট্যজগতে। তার একটি নজির প্রায় ৩৫ বছর পরে স্টার থিয়েটারেই পাওয়া যায়। স্টার মঞ্চে তখন আর্ট থিয়েটারের আমল এবং নাট্য পরিচালক হলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সেসময় একবার এই গানের ভূমিকাটি নটী নীহারবালার অভিনয়ের কথা হয়।

উত্তরে মানদাসুন্দরীর নাম সসম্ভ্রমে উচ্চারণ করেন নীহারবালা—'ও গান আমি গাইব কি? ও যে মানদার গান!'

অথচ নীহারবালা কি সামান্য গায়িকা ছিলেন? কর্ণার্জুন নাটকে তাঁর নিয়তির বেশে সেই গান—'আমি কখন ভাঙি কখন গড়ি নাইকো ঠিকানা' ও 'কালপ্রবাহ চলে ধীরে ধীরে' বিশেষ প্রথমখানি বাংলার রঙ্গমঞ্চে তো চিরস্মরণীয় হয়ে আছে!...

যা হোক মানদা থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করেন সেই ১৮৯৫ সালে। তার বছর পাঁচেক আগে একবার যোগ দিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্যে। তার কিছু বিবরণ এখানে দিয়ে রাখা যায়।

গিরিশচন্দ্রের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'চণ্ড'তে (স্টারে প্রথম অভিনয় ১১ শ্রাবণ ১২৯৭ অর্থাৎ ১৮৯০ সাল) মানদার প্রথম মঞ্চাবতরণ। চণ্ড নাটকটি নানা কারণে স্মরণযোগ্য। এটি গিরিশচন্দ্রের শুধু ঐতিহাসিক বিষয়ে প্রথম নাটক নয়। এই রচনায় তিনি নতুন রীতিতে মধুসূদনের ১৪ অক্ষরের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র এ বিষয়ে বলছেন—"মেঘনাদ পড়—পর পর লিখিয়া যাও। তাহা চোদ্দ অক্ষরে না লিখিয়া আমি যেরূপ লিখি তাহার সহিত কি প্রভেদ? যদি প্রভেদ না থাকে তবে আবদ্ধ হইবার প্রয়োজন কি?......চোদ্দ অক্ষরে লেখা যে কঠিন নয় তাহা দেখাইবার জন্য আমি 'চণ্ড' নাটক লিখিয়াছি। মুকুল মঞ্জরা, কালাপাহাড় নাটকেও আমার চৌদ্দ অক্ষরের রচনা দেখিতে পাইবে।" (গিরিশচন্দ্র পৃঃ ৩৫৮—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়) চণ্ড নাটকেই গিরিশ-পুত্র সুরেন্দ্র—নট দানিবাবু প্রথম নতুন ভূমিকায় (রঘুদেবজী) অবতীর্ণ হন। এর আগে তিনি মঞ্চে দেখা দিতেন নানা পুরনো চরিত্রে। এই নাটকে গায়িকা মানদাসুন্দরী প্রথম পাদপ্রদীপের সামনে এসেছিলেন। সূত্রধারের পরিকল্পনায় দুটি ভূমিকার সাহায্যে নাটকটির সূত্রপাত করেন গিরিশচন্দ্র। 'সূচনা' এবং 'পরিশিষ্ট'। সূচনা-রূপে মঞ্চে আসেন গায়ক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। আর তাঁর সহযোগিতা করেন পরিশিষ্ট-রূপিণী মানদাসুন্দরী। এই অভিনয় সূচনা ও পরিশিষ্টের দ্বন্দ্ব দিয়ে 'চণ্ড' নাটকের উদ্বোধন হয়েছিল।

তার দেড় মাস পরে (২৯ ভাদ্র ১২৯৭) স্টারে মঞ্চস্থ হল গিরিশচন্দ্রের গীতিনাট্য 'মলিনা-বিকাশ'। নৃত্যগীতের জন্যে নাটকটি বেশ জনপ্রিয় হয়। এতে নায়িকা রাজকুমারী মলিনার ভূমিকা অভিনয় করেন মানদাসুন্দরী। নায়িকার বেশে মানদার ছয়খানি গানই ছিল এ নাটিকার প্রধান আকর্ষণ। পূর্ব যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রী-গায়িকা সুকুমারী দত্ত বা গোলাপসুন্দরীও নায়ক বিকাশের বেশে গান শুনিয়েছিলেন। বাংলার মঞ্চে দ্বৈতকণ্ঠে গীত ও নৃত্যের যে বহুল প্রচলন পরে হয়েছিল 'মলিনা-বিকাশ' গীতিনাট্যেই তার সূত্রপাত। সংগীতাচার্য রামতারণ সান্যাল এই নাটিকায়ও সুর-সংযোজনা করেছিলেন। নায়িকা মানদা এই গান কখানি গেয়ে শ্রোতাদের চিত্ত বিনোদন করতেন—'আজ কি পাখি নাই তোমার সে স্বর' (কেদারা আড়াঠেকা) 'দেখলে তারে আপনহারা হই' (হাম্বির কাওয়ালি) 'কেমনে মন নিবারি' (বেহাগড়া কাওয়ালী) বিকাশের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে 'সুধা ঢেলো সুধাকর' (ভৈরবী মং) তরলার সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে 'মনের কথা মন কি জানে সই' (খাম্বাজ মং) ও 'পাখি তোর পেলে মধুর স্বর' (পুরবী, দাদরা)। 'মলিনার সখীদ্বয় সংগীতে এবং বিলাস ও তরলার অপূর্ব দ্বৈত-গীতে দর্শকগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। 'পাখি তোর পেলে মধুর স্বর' 'দেখলে তারে আপনহারা হই'...ইত্যাদি গীতগুলি দর্শকগণের এত ভাল লাগিয়াছিল যে, সে সময়ে ইহা পথে-ঘাটে গীত হইতে আরম্ভ হয়।" (গিরিশচন্দ্র পৃঃ ৩৬১—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)।

তারপর কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে গিরিশচন্দ্র রচিত 'মহাপূজা'র অভিনয় (১০ পৌষ ১২৯৭) হল স্টারে। নাটিকায় বৃটানিকা রূপে অবতীর্ণা হলেন মানদাসুন্দরী। ভারতমাতা— বনবিহারিণী। সরস্বতী—তারাসুন্দরী। ভারত সন্তানগণ—অমৃতলাল মিত্র রামতারণ সান্যাল অঘোরনাথ পাঠক, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি। প্রায় সবই গানের ভূমিকা। সূচনায় বৃটানিকা-বেশিনী মানদাসুন্দরী গিরিশচন্দ্রের একটি দীর্ঘ কবিতায় ভাষণ দেন। সেদিন অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর এক হাজার টাকা পুরস্কার দেন গিরিশচন্দ্রের হাতে। গিরিশচন্দ্র তা অভিনেতৃবর্গকে উপহার দিয়েছিলেন।

মহাপূজা মঞ্চস্থ হবার কিছুদিন পরেই স্টার থেকে কর্মচ্যুত হন গিরিশচন্দ্র। 'নাট্যসম্রাটের প্রতি এরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সম্প্রদায় মধ্যে একটা চক্রান্ত চলিতে থাকে। হঠাৎ একদিন নীলমাধব চক্রবর্তী অঘোরনাথ পাঠক প্রবোধচন্দ্র ঘোষ রাণুবাবু দানিবাবু প্রমদাসুন্দরী মানদাসুন্দরী প্রভৃতি পনের-জন অভিনেতা থিয়েটার পরিত্যাগ করিলেন।' (ঐ গ্রন্থ পৃঃ ৩৬৬)

কবি-নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় মেছুয়া-বাজার স্ট্রীটে যে বীণা থিয়েটার স্থাপন করেছিলেন, ঋণের দায়ে সেটি তখন বন্ধ হয়েছিল। স্টারের ওই দলত্যাগী নট-নটীদের নিয়ে সম্প্রদায় গঠন করে বীণা থিয়েটারে সিটি থিয়েটার নামে অভিনয় আরম্ভ করলেন নীলমাধব চক্রবর্তী। বিল্বমঙ্গল, মলিনা-বিকাশ বুদ্ধদেব প্রভৃতি গিরিশচন্দ্রের নাটক সিটি থিয়েটারে মঞ্চস্থ হতে লাগল। সিটি থিয়েটারের বছর খানেক অস্তিত্বকালে মানদাও অবতীর্ণা হতেন মাঝে মাঝে।

সিটি থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার চার বছর পরে স্টারে প্রফুল্লর সেই পুনরাভিনয়। কিছুদিন সেই গানের ভূমিকায় দেখা দেবার পর মানদা থিয়েটারের সংস্রব একেবারেই ত্যাগ করলেন। ১৮৯৫ সালের পর আর কখনো যোগ দেয়নি নাট্যশালায়।

মঞ্চ তাঁর শিল্পীজীবনের যোগ্য ক্ষেত্র নয়। অভিনেত্রী নন তিনি। সঙ্গীতগুণের জন্যে, হয়ত জননীর আগ্রহে এসেছিলেন মঞ্চ-জীবনে। কিন্তু থিয়েটারের পরিবেশে নিজেকে মানদা মানিয়ে নিতে পারেননি। হয়ত তাঁর নিজস্ব আভিজাত্য বা রুচিবোধ বিমুখ করে-ছিল রঙ্গমঞ্চের ওপর। আসলে তিনি গায়ন-শিল্পী। সঙ্গীতজগতের মানুষ আপন ক্ষেত্রে ফিরে এলেন। সঙ্গীতই তাঁর জীবনের বড় অবলম্বন ও সাধন। আত্মপ্রকাশের ও প্রতিভার বাহন। উদীয়মানা গায়িকা মানদা-সুন্দরীর সামনে অন্য কোন পথ নেই। বিচক্ষণ কলাবত এবং গুণীর গুরু বিশ্বনাথ রাওয়ের সুযোগ্য শিষ্যা হলেন তিনি। একান্তভাবে সঙ্গীতচর্চা করতে লাগলেন।

গায়িকারূপে মানদার বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পায় টপখেয়াল পদ্ধতির গানে। সেকালের বাংলার সঙ্গীতজগতে টপ-খেয়ালের বড়ই আদর ছিল। খেয়াল অংগে তান বিস্তারের সঙ্গে টপ্পার মনোরম মুড়কি অলংকারে সাজানো হত এই রীতির গান। জনপ্রিয় হবার উপযুক্ত ছিল তার সুরের সৌন্দর্য।

এখনকার প্রকাশ্য সঙ্গীতাসরে অবশ্য মানদার গানের সুযোগ ছিল না। সেসব প্রতিষ্ঠিত ঘরোয়া আসরে পুরুষ শিল্পীদের গানই হত। মানদাসুন্দরীর গানের আসর বসত তাঁর আপন গৃহে। তাঁর ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাও কিংবা আশ্রয়দাতা না গায়িকারই সঙ্গে কোন যোগাযোগের সূত্রে তাঁর গান সামনে শোনার সুযোগ হতে পারত। সে হল বিশেষ কথা। মঞ্চজীবনও তাঁর ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। সেখানে তাঁর গান নাট্যশালায় আর শুনতে পায়নি।

কিন্তু শ্রোতৃ-সাধারণের ঘরে ঘরে মানদার গানকে পৌঁছে দিলে গ্রামোফোন রেকর্ড।

তিনি মিনার্ভায় স্টার থিয়েটার ত্যাগ করবার দু'সাত বছরের মধ্যেই গ্রামোফোন রেকর্ডের যুগ আরম্ভ হয়ে গেল। মানদা-সুন্দরীর বয়স তখন তিরিশ বছরের কিছু কমবেশি। গায়িকারূপে পূর্ণ বিকশিত প্রতিভা। তখন থেকে গ্রামোফোন রেকর্ডই হল তাঁর গানের বাহন। তাঁর শিল্পীসত্তার প্রকাশের মাধ্যম।

রেকর্ড সঙ্গীতের গায়কদের মধ্যে তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী লালচাঁদ বড়াল। তাঁর অব্যবহিত পরেই গ্রামোফোন জগতে মানদা-সুন্দরী সমাদৃত হলেন। লালচাঁদের মতন তাঁরও গান কলকাতা থেকে মফস্বলে, বাংলার দূর পল্লীতে পর্যন্ত মুখরিত, প্রচারিত হতে লাগল সমাদরে। মানদাসুন্দরী দাসী—এই নামাঙ্কিত রেকর্ড থেকে চমৎকার এক একখানি গান কত ঘরে বেজে উঠল।

অকালমৃত লালচাঁদের রেকর্ড হয়েছিল ২৮ খানি গান। মানদাসুন্দরীর রেকর্ড সংগীতের সংখ্যা আরো বেশি। সংখ্যাই অবশ্য বড় কথা নয়। গুণও উল্লেখনীয়। সে মূল্যায়ন পরে করা হবে। এখানে বক্তব্য যে চাহিদা ও বিক্রয় জনপ্রিয়তারই লক্ষণ। সংখ্যা তারই পরিচায়ক। আর সেকালে সংগীতের মান ক্ষুণ্ণ করে শিল্পীরা গানকে লোকপ্রিয় করতেন না। সুতরাং রেকর্ডের সংখ্যা অনুপাতে সঙ্গীতগুণের পরিমাপ হতে পারে এসব ক্ষেত্রে।

মানদার ৩৩ খানি রেকর্ড সঙ্গীতের সন্ধান এখনো পাওয়া যায়। আগে তাঁর আরো রেকর্ড ছিল সম্ভবত। কারণ গ্রামো-ফোনের কোন সরকারী তালিকা অপ্রাপ্য। তাঁর যে সব রেকর্ডের কথা জানা গেছে সে গানগুলির প্রথম পঙক্তি ও রাগের নাম এখানে তালিকাভুক্ত করা হল :

(১) যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়া (ভীমপলশ্রী)। (২) আমি তোমার জন্যে কাঁদি (ঝিঁঝিট খাম্বাজ)। (৩) হবে রে মন রাম নাম নিতি (ভৈরবী)। (৪) আর জলে যাওয়া হল না (আমার) (ঝিঁঝিট)। (৫) অঞ্চল ছাড় চঞ্চল শ্যাম ওহে গুণধাম (কাফি সিন্ধু)। (৬) এস রে নয়নে তোমায় লুকায়ে রাখি (ভৈরবী)। (৭) যাতনা দিতে আমারে বাকি কি রেখেছ তুমি (খাম্বাজ)। (৮) যে যাবার সে যাক সই রে (পূরবী)। (৯) রাধা নামে অভিলাষী রাধা নামে সাধা বাঁশী (ভৈরবী)। (১০) বাঁশরী বাজিল যমুনায় (ওগো শ্যামের) (ভীমপলশ্রী)। (১১) মাঝে মাঝে তব দেখা পাই (সিন্ধু)। (১২) এ বিরহী শুনে শুনে বচন হমারি (ইমন)। (১৩) এস এস বঁধু রসিক নেয়ে (কীর্তন)। (১৪) ও আমার সুন্দর না (কীর্তন)। (১৫) কত বার আসিয়া কত ভালবাসিয়া (কেদারা)। (১৬) আর বাঁশী বাজায়ো না শ্যাম (বেহাগ খাম্বাজ)। (১৭) মনের সাধে শিবের হৃদে (ভৈরবী)। (১৮) সাধে কি করুণাময়ী (পূরবী)। (১৯) হরি হে কে জানে তব চরণের গুণে (ভীমপলশ্রী)। (২০) আর কারো কাছে যাব না আমি (মুলতান)। (২১) কলুষ বিনাশিনী কালী ওমা (তোড়ি ভৈরবী)। (২২) আর কবে দেখা দিবি মা হর-রমা (হাম্বির)। (২৩) ওই যে বাজিল বাঁশী যমুনা পুলিনে (সোহিনী)। (২৪) আমায় ভালবাস না বাস (আসাবরী)। (২৫) মা তোমার এ কোন দেশী বিচার (ভৈরোঁ মিশ্র)। (২৬) ওমা দয়াময়ী কোন গুণে তোর দয়াময়ী নাম (ভৈরবী)। (২৭) চির-দিন কি এমনি যাবে (ইমন কল্যাণ)। (২৮) এখনো কি ব্রহ্মময়ী হয় নি মা (সিন্ধু)। (২৯) ওই যে বাঁশরী বাজিল বিপিনে (বেহাগ)। (৩০) লাজে মরে যাই (হাম্বির)। (৩১) তোমারি প্রেমের কথা (সাহানা মিশ্র)। (৩২) প্রাণ পণে প্রাণ সঁপলাম যাঁরে (বাগেশ্রী)। (৩৩) এ প্রেম ছলনা (ইমন)।

এই গীতাবলীর মধ্যে দুটি কীর্তন আছে। সেই কীর্তন দুখানিও এমন সুললিত কণ্ঠে গাওয়া যে, মনে হয় কীর্তন গানেও সিদ্ধা ছিলেন গায়িকা। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, মানদা সত্যই দক্ষতা নিয়ে শ্রাদ্ধবাসরে কীর্তন গেয়েছেন। সেকালে মহিলা কীর্তনীয়াদের গানের চলন ছিল শ্রাদ্ধবাসরে। অথচ সঙ্গীতের অন্য প্রকাশ্য আসরে ওই শ্রেণীর গায়িকাদের স্থান, সামাজিক কারণে, ছিল না। একালে ঠিক বিপরীত।

মানদাসুন্দরীর রেকর্ডগুলির মধ্যে একটি হিন্দী গানও আছে। ইমনে গাওয়া—এ বিরহী শুনে শুনে বচন হমারি। এই গান-খানি ছোট খেয়ালের একটি সুন্দর নিদর্শন। মাত্র তিন মিনিটের গান। সুতরাং তান বিস্তারের তেমন সুযোগ নেই। তবু চমৎকার কটি ছোট ছোট তান দিয়েছেন গায়িকা। গানের ভাষা আরম্ভ করবার আগে ইমনের স্বরবিন্যাসে তার রাগরূপ প্রস্ফুট করেছেন। তারপরই জমিয়ে ধরেছেন—এ বিরহী শুনে শুনে বচন হমারি। বেশ মনো-হারী শোনায়। আর বোঝা যায়, রীতিমত তালিম-পাওয়া অর্থাৎ শিক্ষিত পটু গায়িকা।

অবশিষ্ট ৩০ খানি গানের প্রায় সবই মানদা টপখেয়াল ধরনে গেয়েছেন। কোন কোন গানের কথা অংশ কিছু দীর্ঘ হওয়ায় তানের সুযোগ পান নি। যেমন 'কত বার আসিয়া কত ভালবাসিয়া' কিম্বা 'আর কবে দেখা দিবি মা [illegible]' কিন্তু অন্যান্য গানগুলি টপখেয়ালের বেশ ভাল দৃষ্টান্ত। সে সব গানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন অল্প অল্প তান দিয়ে। গানের ভাব আরো সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে কথার তানের জন্যে। মোলায়েম দোলা তানে গানের আবেদন আরো গভীর হয়ে ফুটেছে। এই রেকর্ড-গুলি থেকেও বোঝা যায় মানদাসুন্দরীর গান বাংলার সঙ্গীত [illegible] বিশেষ টপখেয়াল গান বাংলার সাংগীতিক ইতিহাসে [illegible]

[illegible] একবার বলেছিলেন, উত্তম উত্তম টপ-খেয়াল [illegible] এঁদের মধ্যে মানদা [illegible] শীর্ষস্থানীয়া [illegible] (বেতার জগৎ ভলুম ৩৩, নং ১৩, পৃষ্ঠা ৫২১)।

যথার্থ কথা। [illegible] মানদার রেকর্ডের গান। বাংলা ভাষায় রাগসঙ্গীতের উৎকৃষ্ট [illegible] চলন ছিল, [illegible] গানও রাগে গঠন করা। সেজন্যে গানের বন্দেশ বা বাঁধুনি এত ভাল হত। রাগের ভিত্তির জন্যে সব কত ঐশ্বর্যময় হতে পারে এই সমস্ত গান তার প্রমাণ।

মানদাসুন্দরীর কলাবতী রূপগুণের সঙ্গে শিল্পী-সত্তার সুসামঞ্জস্য লক্ষ্য করবার মতন। তাঁর গানগুলি যেন রাগ-সঙ্গীত ও কাব্যসঙ্গীতের মনোহর সমাহার। রাগ রূপে পরিবেশিত হয়েও বাংলা গানে কি সুন্দর রসসৃষ্টি; গায়িকার অতি সুরেলা, সুমিষ্ট কণ্ঠ—অথচ তৈয়ারি। মার্জিত পরিশীলিত নিটোল স্বরে পরিচ্ছন্ন উচ্চারণ ও গায়নভঙ্গিমায় দরদী, মর্মস্পর্শী মানদার এক একটি গান। গানের কাব্য ও ভাব শিল্পীর অন্তরের আবেগে, অনুভবে যেন প্রাণবন্ত। খেয়াল ও টপ্পার ছোট ছোট তান—কথার তান—বাংলা গানে মানিয়ে গেছে, কারণ গায়িকার

পরিমিতি বোধ ছিল। আর সাঙ্গীতিক রুচি ছিল শিল্পীজনোচিত। কোন কোন গানে অবলীলায় সুর বিস্তার দেখা যায়—যেমন 'আর কারো কাছে যাব না আমি' (মুলতান) কিংবা 'যে যাবার সে যাক সইরে' (পূরবী) বা 'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে' (ভীমপলশ্রী)। ভাব ও গান রস ও রাগের যুগল মিলন তাঁর অনেক গানেই ঘটেছে। গায়িকার কন্ঠ এমন অটুট যে তারা গ্রামের পঞ্চম ধৈবতেও নেই কোন স্বরবিকৃতি (falsets)। কাব্যসঙ্গীতের হৃদয়বত্তা এবং রাগসঙ্গীতের গভীরতা তাঁর নানা গানে গঙ্গা যমুনার ধারায় মিশে গেছে। রাগের কারুকর্ম তিনি প্রকটিত করেছেন সাবলীলভাবে। একটি ভৈরবীতে (ওমা দয়াময়ী কোন্ গুণে তোর) মুন্সিয়ানার সঙ্গে দুই মধ্যম প্রয়োগ করেছেন। সব গানেই অনায়াস সুরপ্রবাহ। কোথাও শ্রম বা চেষ্টার লক্ষণ নেই—যা প্রতিভার সঙ্গে অক্লান্ত সাধনার যুগ্ম ফল। কি প্রেমসঙ্গীত, কি ভক্তিভাবের গান—সকলই আন্তরিকতাময়। গায়িকার সঙ্গীতের আবেদন শ্রোতার হৃদয়তটে উচ্ছ্বসিত হয়ে সার্থকতা লাভ করেছে।

কেদারা রাগের এই গানটি প্রাণে কি গভীর স্পন্দন জাগায়—

কতবার আসিয়া কত ভালবাসিয়া,
গিয়াছি ফিরিয়া কত কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

এত শুধু কেদারায় সা নি নি সা মা মা মা, মাগা মাগা পামাপা, ইত্যাদি ছকে গেয়ে যাওয়া নয়। মিড় দিয়ে দিয়ে কি মিষ্টি করে কথার পরে কথা সুরের পর সুরের তরঙ্গিণীতে মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়া। এক স্বর অঙ্গাঙ্গী লীন হয়ে যায় স্বরান্তরে। আর হৃদয়ের অনুভব গানের আকৃতিতে দোলা দেয়। 'বার', 'আসিয়া' 'বাসিয়া', 'গিয়াছি', কাঁদিয়া'র মধুর মিড়।

ও মোচড় হিল্লোল তোলে মর্মস্থলে: কেদারার কোমল-করুণ বিন্যাসের সঙ্গে বিরহিণীর মথিত অন্তর অভিমানিনী সুরে হাহাকার করে—

কত নিশি জেগেছি কতই বা কেঁদেছি,
তবু সাড়া পাইনা সাধিয়া সাধিয়া।।

কি প্রতপ্ত আবেগ উত্তাল হয়ে ওঠে তারা গ্রামে—

হে নাথ কোথা তুমি দেখা দাও
দেখা দাও।
আমি যে তোমারি, কোলে তুলে
নাও নাও।।

দরদী কন্ঠের সুর আকুল আর্তিতে ধ্বনিত হয় 'দেখা দাও দেখা দাও, আমি যে তোমারি, কোলে তুলে নাও নাও' এই নিবেদনে! আর দীর্ণ মর্মের যন্ত্রণা শেষ চরণের দোলায়িত ছন্দে ঝংকৃত হতে থাকে—

সহেনা সহেনা আর আসা যাওয়া
বার বার,
নিয়ে আসে নিয়ে যায় মাতিয়া
মাতিয়া।।...

তেমনি মুলতানের আবেশে মূর্ত হয়েছে আর একটি একান্ত প্রাণের উৎসার—

আর কারো কাছে যাব না আমি,
তোমারি কাছে রব হে।
আর কারো সনে কব না কথা,
তোমারি সনে কব হে।।...

কিংবা মিশ্র সাহানায় সেই মরমী গানখানি। অল্প তানের সঙ্গে সুসমঞ্জস ভাবের প্রকাশে কাব্যসঙ্গীতের রসসৃষ্টি এখানে সম্ভব হয়েছে—

তোমা প্রেমের কথা হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা।
নিশিদিন জাগে মনে সোহাগের তব কথা।।
কত কথা ছিল মনে
কত আশা ছিল প্রাণে।
সে আশাদল শুখায়েছে,
সে ভুল ভেঙে গেছে,
এত প্রাণ সয়েছে, কাহাতে প্রাণে ব্যথা।।

আশাবরীর গানটিতে গায়িকা রীতিমত তান করেছেন কাব্য অংশের মাধুর্য অক্ষুন্ন রেখে—

আমায় ভালবাস না বাস,
আমি ত কখনো
তোমার ছাড়িব না আশ।।
যথায় তথায় থাকি
তোমা ছাড়া হইনে সুখী,
মারিলে মারিতে পারো
রাখিলে তোমার পাশ।।

হাম্বিরে 'লাজে মরে যাই' গানে টপ্পার কি চমৎকার দানা-দার তান দিয়েছেন, আবার শেষে যোগ করেছেন তেলেনা। 'প্রাণপণে প্রাণ সঁপিলাম যারে' বাগেশ্রীতে মনোরম খটকার প্রয়োগ করেছেন। রাগের সঙ্গে ভাবের মধুর মিলন ঘটিয়েছেন; একটি রীতিমত ছোট খেয়াল অথচ উপভোগ্য কাব্যসঙ্গীত—যে যাবার সে যাক সইরে আমি ত যাব না জলে, ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়ন সলিলে—এ গানের পূরবীর সকরুণ রেশ শ্রোতার অন্তরেও অনুরণন জাগায়। 'যাতনা দিতে আমারে'—খাম্বাজে একটি চমৎকার গান দরদ দিয়ে গাওয়া। কোন কোন গান আরম্ভ করবার আগে তান দিয়ে রাগের চেহারাটি দেখিয়েছেন। যেমন—বেহাগে 'ওই যে বাজিল বাঁশরি বিপিনে', সিন্ধুতে 'এখনও কি ব্রহ্মময়ী' (নাটোর-রাজ রামকৃষ্ণের রচনা), ইমনে 'এ প্রেম ছলনা', ভৈরবীতে 'মনের সাধে শিবের হৃদে', ইমন কল্যাণে 'চিরদিন কি এমনি যাবে', সোহিনীতে 'ওই যে বাজিল বাঁশরি যমুনা পুলিনে', মিশ্র ভৈরোঁতে 'মা তোমার এ কোন দেশী বিচার', ইমনে 'এ বিরহী শুনে শুনে বচন তুমারি' ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাইনা' গানখানিও মানদা রেকর্ড করেছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতরূপে এ গানের সুর কীর্তনাঙ্গ। গায়িকা কিন্তু সিন্ধুতে সম্পূর্ণ টপ্পা অঙ্গের তানযোগে নিজস্ব ধরনে গেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সুরের কথা মনে না রাখলে এটিকে সেকাল-প্রচলিত বাংলা টপ্পারূপে উপভোগে কোন বাধা থাকে না। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়, কৃষ্ণভামিনী, গহরজান, পূর্ণকুমারী, পিয়ারা সাহেব, রজেন্দ্র গাঙ্গুলী, কে মল্লিক প্রভৃতি অনেক গায়ক-গায়িকা রবীন্দ্রনাথের নানা গান গেয়েছেন আপন আপন সুরে। রেকর্ড পর্যন্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের তখন মধ্য বয়স। কিন্তু তিনি কেন যে আপত্তি করেন নি, তার কারণ জানা যায় না।...

যাই হোক, মানদাসুন্দরীর ভক্তি ও পূজা ভাবের গানগুলিতেও সুর ও গায়নভঙ্গী উপযোগীরূপে দেখা যায়। 'সাধে কি করুণাময়ী করি মা তোর উপাসনাতে' পূরবী যেমন সার্থক হয়েছে, তেমনি গানের ভাব প্রকাশে সহায়তা করেছে বিলম্বিত লয়ের ছন্দ। আর অধিক দৃষ্টান্ত না দিয়ে মন্তব্য করা যায় যে সঙ্গীতরূপে রসসৃষ্টির ধারণা গায়িকার ছিল। তিনি যে প্রকৃত গীতশিল্পী ছিলেন, সমগ্রভাবে তাঁর

আমার কর্ণ আমার দুর্যোধন

শৈলেন রায়

(উপন্যাস)

ছেলেবেলা থেকেই খুব মহাভারত শুনতাম। মা পড়ে শোনাতো। বিশেষ বিশেষ পর্ব, যেখানে যুদ্ধ মারামারি বেশী সেই সব পর্বগুলো বারংবার শুনতাম। শুনে শুনে সেই বয়সেই যুদ্ধের নেশা মনের মধ্যে উদ্গম হয়ে উঠেছিল। শ্রোতাদের মধ্যে থাকতাম আমি আর ছোড়দা, যে বয়সে আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড় ছিল। শুধু বয়সে না। সব বিষয়েই ও আমার চেয়ে বড় ছিল। লম্বা ছিপছিপে শরীর, অসম্ভব গায়ের জোর, বুদ্ধিও ছিল প্রখর। আর আমি রোগা-রোগা মতন। একটু [illegible] বুদ্ধি। কিন্তু সেই যে কথা, যুদ্ধের নেশা বড়ো দেয় দোল, তাই হলো কাল।

মাঝে মাঝে আমরা দুজনে যুদ্ধে মেতে উঠতাম। কোনদিন আমি সাজতাম ভীম, ছোড়দা দুর্যোধন। কোনদিন বা আমি অর্জুন ও কর্ণ। মোট কথা, ছোড়দা বলতো যা বোঝাতো আমি তাই সাজতাম। কিন্তু সত্যি চাইলেই কি সাজা যায়! এলোমেলো বাঁশের সাজানো দশাপট্টে কেমন যেন তুচ্ছ-নিচ হয়ে গেল। যা হওয়া উচিত ছিল বা যা হলে শোভন হতো তেমনি কিছুতেই হতে চাইতো না। এর জন্যে অবিশ্যি দায়ী ছিল ছোড়দাই।

একদিনের কথা। তখন আমরা [illegible] বলে একটা ছোট শহরে থাকতাম। বাবা [illegible] কাজ করতেন। আমরা দু ভাই স্কুলে পড়তাম। বাড়ির সামনে বিরাট একটা মাঠ। মাঠের পারে দোতলা কাঠের বাড়ি। সেটা আমাদের স্কুল।

কয়েক দিন হলো একটু ঠান্ডা মতন পড়েছে। মাঝে মাঝে দু-এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে যাচ্ছে। আমাদের স্কুল সকালে বসতো। বাড়ির বাইরে এসে মনে হলো এখনও ভাল করে ভোর হয় নি। মেঘলা দিনে এরকম মনে হওয়া বিচিত্র নয় অবশ্য।

বই-পত্তর নিয়ে চলেছি দুজনে। জায়গায় জায়গায় ছেলেদের জটলা। ওরা সবাই আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে এবং নীচু স্বরে নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করছে। ওদের চোখে মুখে কৌতুক আর চাপা উল্লাস। চেনা ছেলের দেখে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল ছোড়দা। স্কুলে না গিয়ে সবাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেছে কেন, ছোড়দার এই প্রশ্নের উত্তর কেউ-ই দিল না। ওরা শুধু নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল। ওদের এই আচরণ রীতিমত বিরক্তিকর। ছোড়দা বদ রাগী মানুষ। এ নিয়ে হয়তো কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলবে। ওর হাত ধরে টান দিয়ে বললাম, 'তাড়াতাড়ি চলো। ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে নিশ্চয়।' ছোড়দা আমার কথা শুনল। অযথা কথা না বাড়িয়ে মাঠে নেমে পড়ল।

যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। স্কুলের পাত্তাই নেই। অথচ বাড়িটা দোতলা, মাঠে এমন কিছু গাছপালা নেই যে অত বড় বাড়িটা গাছ আড়ালে ঢাকা পড়ে যাবে। মাঠের মাঝে এখানে-ওখানে ঝোপ-ঝাড় রয়েছে যদিও, কিন্তু তারা নিতান্তই ছোট, বাড়ি ঢেকে দেওয়ার মত না। সন্দিগ্ধভাবে আমরা এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। কিন্তু সমস্যার সমাধান করা গেল না।

আরও কিছুটা পথ এগিয়ে যাওয়ার পর দুজনে এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দিকভ্রম হয় নি তো! পিছন ফিরে তাকালাম। ঐ তো আমাদের বাড়ি। লাল টিনের চাল। ঝকঝকে নজরে পড়ছে। [illegible]। ফাঁক পেরিয়ে বারান্দায় দৃষ্টি গেল। আগের দিন রাতে মা একটা শাড়ি শুকোতে দিয়েছিল, শাড়িটা এখনও ঝুলছে।

ছোড়দা অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার রে?'

প্রশ্নটা আমারও। কূলকিনারা না পেয়ে বিস্ময়ের মত চারদিকে তাকাতে লাগলাম। একবার ভাবলাম, বাড়িতে উঠে গিয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করে রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করি। তার আগেই হাতে টান দিয়ে ছোড়দা বলল, 'তাড়াতাড়ি চল। কিছু একটা হয়েছে নির্ঘাৎ।'

আমি তখন মনে ভয় পেতে শুরু করেছি রীতিমত। বললাম, 'চলো বাড়ি ফিরে যাই।'

ছোড়দা হাতের বাঁধন দৃঢ় করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। বলল, 'আয়।'

কিছুটা যেতেই রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে গেল।

অনেক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে এক জায়গায়। কয়েকটা ঝোপ ওদের আড়াল করে রেখেছিল এতক্ষণ। কাছে গিয়ে দেখলাম, স্তূপীকৃত পোড়া কাঠ পড়ে রয়েছে, সেখান থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে। বুঝলাম আমাদের স্কুল আগুনে পুড়ে গিয়েছে। কাল রাতে নাকি কি করে আগুন লেগে গিয়েছিল। ছোড়দা ঠোঁট চেপে বলল, 'আগুন হঠাৎ লাগে না, কেউ লাগিয়েছে নিশ্চয়।' ছোড়দার এই এক বড় দোষ। কোথাও কিছু দেখলে তার মধ্যে রহস্যের সন্ধান করবেই। কাঠের বাড়ি, হঠাৎ আগুন লেগে যেতে পারে না?

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। শুধু শুধু স্কুলটা পুড়ে গেল। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কী উত্তর দেব? কি উত্তর দিতে পারি আমি? বলব, স্কুল পুড়ে গেছে। না না সে যে বড় লজ্জা।

পাশাপাশি দুজনে হাঁটছি। কিছুক্ষণ আগে এই পথ দিয়ে হেঁটেছি, তখন উত্তেজনা ছিল, চলার বেগে চলেছি। এখন পা আর চলছে না। মনে হচ্ছে একটু বসি, বিশ্রাম নিই। ছোড়দা তাগাদা দিচ্ছে ক্রমাগত, 'তাড়াতাড়ি চল। ইস, বড্ড দেরী হয়ে গেল।'

অফুরন্ত অবসর আমার। কাল সকাল থেকে আর স্কুলে যাওয়ার তোড়জোড় থাকবে না। হাত পুড়িয়ে গরম ভাতে সব বাটা কি মাখতে হবে না মাকে। অমরদাকে আর সাত তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধতে হবে না। ধীর মন্থর গতিতে দিন গড়াতে থাকবে। সেই সঙ্গে আমিও।

মন অসম্ভব ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমি এক বিশাল শূন্যতার মাঝে ভেসে বেড়াচ্ছি।

ছোড়দা হঠাৎ বলে উঠল, 'আয় বড় রকমের একটা যুদ্ধ খেলি আজ।'

কী বললে, ওর কথায় যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেলাম। এই নিস্প্রভ বিষণ্ণ মুহূর্তে আমার মন এরকম কোন উত্তেজনা খুঁজে বেড়াচ্ছিল বুঝি। এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম।

আমাকে লোভ দেখিয়ে ছোড়দা বলল, 'আমি সাজবো কর্ণ, তুই অর্জুন। শেষ পর্যন্ত তুই-ই তো জিতবি। এবারের খেলাটা কিন্তু একটু অন্যরকম হবে। আসল ধনুক বাণ দিয়ে খেলবো।' এতদিন পর্যন্ত ধনুক বাণ বলতে যা বোঝায় সে সব কিছুই থাকত না। হাতে দিয়ে শুধু শুধু কাঠি ছুঁড়ে মারা হতো। গায়ে লাগলেও ব্যথা লাগতো না।

বাখারি দিয়ে দুটো মস্ত ধনুক তৈরী হলো। গোটা কয়েক সুচালো তীরও। বেশ শক্ত ধরনের। হাত দিয়ে মুখের ধার পরীক্ষা করে ছোড়দা বলল, '[illegible] পরে নে।'

লেগেটেগে গেলে তো আবার কাঁদতে বসবি। যা ছিঁচকাঁদুনে তুই।'

মুখে যদিও বললাম, 'যুদ্ধ করতে গেলে একটু-আধটু কেটে-ফেটে যেতে পারে, তা নিয়ে ভয় পেলে চলে না' মনে মনে কিন্তু ভয় পেয়ে গেলাম। ছুটে গিয়ে অলেস্টারটা পরে এলাম। মাথায় বাঁদুরে টুপিও। সেই টুপির দৌলতে মুখের বড় অংশটাই ঢাকা পড়ে গেল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ছোড়দা তারপর হেসে ফেলল। 'সত্যিকারের অর্জুন যদি তোকে দেখতো জীবনে আর যুদ্ধ করতো না। একটা কলা হাতে নিয়ে গাছের ডালে গিয়ে উঠে বোস দলনে মানাবে।' ওর বিদ্রূপ গায়ে মাখলাম না। যুদ্ধের উত্তেজনা তখন শরীরে, মনে।

প্রথমে কল্পনার রথে চড়ে দুজনে সারা মাঠ বন বন করে ঘুরলাম। ঘুরতে ঘুরতে যুদ্ধের নেশা আরও জোরদার হয়ে উঠল। এক সময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ছোড়দা। এক পা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। ওকে সত্যিকারের একজন যোদ্ধা বলে ভ্রম হচ্ছিল, যদিও ওর পরনে ছিল নীল রংয়ের একটা হাফ-প্যান্ট এবং পুরো হাতা সোয়েটার।

'তোমাকে ঠিক জাম্বুবানের মত লাগছে।' আমি বললাম।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই ছোড়দা হুংকার ছাড়ল 'সাবধান অর্জুন' কর্ণ অগ্নিবাণ ছাড়ছে। ও মুহুর্মুহু ধনুকে টংকার দিতে লাগল।

আমি প্রস্তুত ছিলাম। ধনুকের ছিলা কান পর্যন্ত টেনে নিয়ে বাণ ছাড়লাম। 'বরুণ আগুন নিভিয়ে দিল।'

'এইবার সামলাও সর্প বাণ যাচ্ছে।' বলতে বলতে সাঁই করে একটা বাণ কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। আর একটু হলে চোখে মারত। মুহূর্তের অবসর না দিয়ে বাণ ছুঁড়ছে ছোড়দা। আমি—অর্জুন বিভ্রান্তভাবে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম।

দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে চিৎকার করতে লাগলাম, 'এবার তোমার রথের চাকা মাটিতে গাঁথবে। আগেই গাঁথা উচিত ছিল।'

কে কার কথা শোনে। উন্মত্তের মত ছোড়দা আমার দিকে ছুটে আসছে আর বীভৎস সুরে চেঁচাচ্ছে 'শয়তানী করে জেতা যাব কর্ণকে। রথের চাকা গাঁথার আগেই তোকে খতম করবো অর্জুন।'

ও যে সত্যি সত্যি আমাকে খতম করতে উঠে-পড়ে লেগে যাবে বুঝতে পারি নি। বাণ বৃষ্টি যাকে বলে তাই শুরু হয়ে গেল। আমার দু কানে শুধু বাতাস কাটার সন সন শব্দ। তীব্র বেগে তীর ছুটে আসছে। যে কোন একটা গায়ে এসে বিঁধতে পারে। ফলাগুলো যে কী অসম্ভব রকমের ধারালো, তা তো আমি জানি। ভাবতে ভাবতে একটা তীর এসে লাগল বুকের বাঁ ধারে; বুকটা যেন ছিঁড়ে গেল। পড়ে রইল যুদ্ধ, পড়ে রইল ধনুক বাণ।

আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটে চললাম। মুখে 'মা মা' ধ্বনি।

ছোড়দাও আমার পিছন পিছন ছুটে আসছে। 'এই মানু দাঁড়া। এবার রথের চাকা গাঁথবে, যত ইচ্ছে মারতে পারবি আমাকে। 'দাঁড়া।'

কে কার কথা শোনে। আমি সমানে চিৎকার করছি আর ছুটছি।

মা রান্নাঘরে ছিল, বাইরে বেরিয়ে এল। আমি গিয়ে মার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। দু হাত দিয়ে আমাকে বুকে চেপে ধরে মা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলতে লাগল, 'কি হয়েছে রে? ওর কি হয়েছে তপু?' মার বুকে মুখ চেপে রেখে বুঝতে পারলাম আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ছোড়দা।

হাঁপাতে হাঁপাতে ছোড়দা বলল, কর্ণ-বধ খেলছিলাম মা।'

কান্নায় আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে তখন। বিকৃত স্বরে চিৎকার করে উঠলাম, 'অথচ অর্জুন-বধ হয়ে গেল।'

অলেস্টার খুলতেই বুকে এক বিন্দু রক্তের আভাষ পেলাম। আমার কান্না আরও বেড়ে গেল।

মা আমার পিঠে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলল, 'কতবার বারণ করেছি এখেলা না খেলতে। মার কথা না শুনলে শাস্তি পেতেই হয়।' আমার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনে মা আবার গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল।

কান্না আপনা-আপনি থেমে গেল। বিস্মিত দৃষ্টিতে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। পৃথিবীটা সহসা বাসের অযোগ্য বলে মনে হতে লাগল। আমার কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে ছোড়দা। ও অবহেলা-ভরে আমার বুকের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার, তারপর অন্য দিকে চলে গেল। বাবা এখন বাড়ি নেই। থাকলে নিশ্চয় তিনি এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন। কর্ণর কান মলে নিশ্চয় বলতেন 'অর্জুন বীর অর্জুন যোদ্ধা। তাকে কখনও এভাবে মারা যেতে পারে না।'

জীবনে এই প্রথম, আমার এই চোদ্দ বছর বয়সে উপলব্ধি করলাম বিশ্ব-সংসারে বাবা ছাড়া আমার আপনার জন আর কেউ নেই।

এই ঘটনার পর চার-পাঁচ দিন ছোড়দার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ ছিল। ইচ্ছে করেই ওকে এড়িয়ে চলতাম। মার সঙ্গেও বিশেষ কথাবার্তা বলতাম না। দুপুরবেলায় মহাভারত পড়ার ফাঁকে ফাঁকে মা যে চোখ দিয়ে আমাকে খুঁজে বেড়ায় বুঝতে পারি। পারি বলেই অন্য ঘরে ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকি। ছোড়দা গিয়ে মার পাশে শোয়। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে মার কাছ থেকে পানের ছিবড়া চায়, সবই শুনতে পাই। শুনতে পাই না কেবল অতি পরিচিত এক কণ্ঠস্বর। মা আর সুর করে মহাভারত পড়ে না। বুকের ওপর মোটা বইটা খুলে রাখে। হয়তো মনে মনে পড়ে। নাকি পড়েই না, শুধুই তাকিয়ে থাকে। এক সময় মা ঘুমিয়ে পড়ে। ছোড়দা ধীরে ধীরে বই সরিয়ে নেয়। মুখোমুখি দুটো দরজা। আমার খাট থেকে ও ঘরের প্রতিটি দৃশ্য দেখা যায়। প্রতিটি শব্দ কানে আসে। আমার ঘুম আসে না। কান গরম হয়ে ওঠে। চোখে জ্বালা ধরে। শুয়ে শুয়ে ছটফট করি। অথচ সামনের ঘরে দুটি মানুষ কত নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। সেই দৃশ্য আমার মনে তুফান তোলে।

শেষ পর্যন্ত একটা ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছোড়দার সঙ্গে আবার ভাব হয়ে গেল।

সকালে দেরী করে ঘুম থেকে ওঠা আমার অভ্যেস। সেদিন হট্টগোলে ঘুমটা আগেই ভেঙে গেল। আমি আর ছোড়দা এক ঘরে আলাদা আলাদা খাটে শুই। তাকিয়ে দেখলাম, ছোড়দার খাট শূন্য। উঠে সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। উঠোনে জনা দশ-বারো লোক। তার মধ্যে ছোড়দাও রয়েছে। মা ছোড়দাকে ডাকছে, ওপরে উঠে আসতে বলছে। কিন্তু ছোড়দা মার ডাক শুনেও শুনছে না। আমাকে দেখতে পেয়ে মা বলল, 'ওকে ডেকে আন, তখন থেকে সাপ সাপ করছে।'

মার কথা শুনে বুকটা ধড়াস করে উঠল। সাপকে আমার বেজায় ভয়। সভয়ে প্রশ্ন করলাম 'কোথায় সাপ মা?'

মা শঙ্কিত দৃষ্টিতে উঠোনের দিকে তাকিয়ে ছিল সেভাবেই বলল 'কী জানি বলছে তো গর্তের মধ্যে।'

মার কথা শেষ হতে না হতেই ছোড়দার কণ্ঠস্বর কানে এল, 'ঐ যে মুখটা বার করেই আবার ঢুকিয়ে নিল।'

কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল আমি দুপ-দাপ করে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এসে ছোড়দার হাত ধরে টান দিয়ে বললাম, 'মা ডাকছে, শুনতে পাও না।'

ছোড়দা বাধ্য ছেলের মত আমার সঙ্গে চলে এল। মা নিশ্চিন্ত মনে ভেতরে চলে গেল। ছোড়দা আমার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছিল। প্রশ্ন করলাম 'হাসছো যে?'

'সেঁদো কোথাকার! সেধে সেধে ভাব করলি!'

লোকগুলো এক সঙ্গে হৈ-হৈ করে উঠল। গর্ত ছেড়ে সাপটা বেরিয়ে এসে পালিয়ে গেল। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল ছোড়দা, 'ভীতুর দল, ভয়েই মরল। আমি থাকলে—'

নদী চলে স্রোতের টানে। পাড়ে জমে ওঠে পলি মাটি। তার নীচে চাপা পড়ে যায় গত দিনের রাগ, বিরাগ, অভিমান। মন পুরনো খাতে বইতে শুরু করে, নতুন খেলা শুরু হয় আবার। ছোড়দা বলে, চল। প্রশ্ন নেই, কোথায় যাব, কেন যাব। দে ছুট। তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে ইরাবতীর ফটিক—স্বচ্ছ জলে ছায়া ফেলে শুধু ছোটা। গন্তব্যহীন, উদ্দেশ্যবিহীন। তবু তো ছোটার বিরাম নেই। ছুটে ছুটে ক্লান্ত

হয়ে পড়ি। পা ভেঙে ভেঙে আসে। দাঁড়িয়ে পড়ি এক সময়। নরম চোখে তাকায় ছোড়দা, বলে, 'আয় তোকে সাপের ডিম দেখাই।'

দু পা পিছিয়ে আসি। না না দেখতে চাই না। কিন্তু কে কার কথা শোনে। বালির মধ্যে হাত ডুবিয়ে কী খুঁজে বেড়ায় ও। এক সময় হাত মেলে ধরে, 'এই দ্যাখ।'

সত্যিই তো, গোটা কয়েক ডিম হাতে। উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়ে ছোড়দা। বলে, 'কি বুদ্ধুরে তুই। সাপ কখনও বালিতে থাকে! পাখির ডিম। ঐ যে শাদা শাদা পাখিগুলো উড়ছে, ওদের।'

নীল আকাশের গায়ে গোটা কয়েক পাখি সারিবদ্ধভাবে উড়ছে। ওরা মনের আনন্দে উড়ছে। কে কোথায় তাদের সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে গেল, সেদিকে তিলমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। সযত্নে ডিমগুলো বালির মধ্যে পুঁতে দিতে দিতে ছোড়দা বলে, 'এই যে ডিমগুলো অন্য জায়গায় পুঁতে দিলাম ওরা কিন্তু ঠিক খুঁজে বার করবে।'

'কি করে?'

'আমি যেমন করে ওদের পেয়েছিলাম, গন্ধ শুঁকে শুঁকে, সেইভাবে।'

'ডিমের কি গন্ধ থাকে?'

আমার বিস্ময়ভরা দৃষ্টি দেখে ছোড়দা হেসে ফেলল। শুধু সে ওর কথা তো না, [illegible] বিশ্বাস করে ফেললাম। কিন্তু যদি বিশ্বাস না করতাম তাহলেই হয়তো ভাল হতো।

কাশীবিশ্বেশ্বরবাবু সন্ধ্যার সময় বেড়াতে এলেন। তিনি এখানকার পোস্টমাস্টার। সঙ্গে স্ত্রী এবং মেয়ে ইন্দুমতীও এসেছে। ইন্দুমতী আমারই বয়সী হবে। দেখতে শুনতে মন্দ না। লম্বা ধরনের গড়ন। রং ফর্সা না কিন্তু ইন্দুমতীকে আমার হঠাৎ ভালই মনে হয়। একরাশ [illegible], বেশ মানিয়ে [illegible] ফর্সা না হলেও [illegible] দেখায় ইন্দুমতীর রং সেইরকম। ইন্দুমতীর চোখ বড়, দৃষ্টি শান্ত। কিন্তু এক এক সময় এই শান্ত দৃষ্টি আমাকে [illegible] করে তোলে। কী জানি কেন, ইন্দুমতী যখন স্থির শান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হয়, বার বার [illegible] দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি, [illegible] পর সঙ্গেই কী এক আকর্ষণে [illegible] তাকিয়ে থাকি। জানি না। ইন্দু [illegible] কী আছে, যেন বার বার সেই [illegible] আকর্ষণ করে। কিছু নেই, [illegible] নিজেকে সংযত [illegible] চেষ্টা করি। কিন্তু মন মানে না।

কী আছে তোমার চোখে ইন্দুমতী?

তখন আমি আর ছোড়দা পড়তে বসেছি। এই বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী কেউ এলে সেখানে আমাদের উঠে যাবার কথা না। কিন্তু অন্যদিন [illegible] যখন ওদের আসার কথা শুনলাম এবং বৈঠকখানা থেকে টুকরো টুকরো কথা হাসি কানে আসছিল, আমি ক্রমে [illegible] উন্মনা হয়ে পড়ছিলাম। ছোড়দা আমার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে বলল, 'মন দিয়ে পড়।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর ঠোঁট যে ঈষৎ বেঁকে গেল আমি দেখতে পেলাম। কিন্তু না-দেখার ভান করে বললাম, 'কি হবে পড়ে? স্কুল নেই, পরীক্ষা নেই, শুধু শুধু পড়ে কেউ?'

কথাটা ছোড়দার মনে ধরল। বই বন্ধ করে বলল, 'যুদ্ধ খেলবি?'

কিছুদিন আগেই কর্ণবধের প্রহসন হয়ে গেছে। নিরুৎসাহভাবে বললাম, 'কি যুদ্ধ? কর্ণ বধ?' স্নেহের হাসি হেসে বলল ছোড়দা, 'নারে। কর্ণবধ তো ঘরে বসে খেলা যায় না। মাঠ চাই তীর ধনুক চাই। মাঠ না হলে চাকা গাঁথবে কীসে। আজ কুরুরাজের উরুভঙ্গ হোক।'

ওর নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে কোনরকম সন্দেহ হোল না। রাজী হয়ে গেলাম। 'যুদ্ধ কিন্তু বেশীক্ষণ চলবে না। মা জানতে পারলে মারবে।' আমি বললাম।

ছোড়দা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'তাছাড়া বাইরের লোকজন রয়েছে জানতে পারলে তারাই বা কী ভাববে। তুই কিন্তু চেঁচামেচি করিস না। দুই এক ঘা খেলে চুপ করে পড়ে থাকবি বুঝলি।'

ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানিয়ে বললাম, 'সেদিনের মত রক্তারক্তি আর না হয় যেন।'

'[illegible]' ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলল ছোড়দা, 'যুদ্ধে রক্তপাত হয় কখনও!'

দুটো খাট জোড়া লাগিয়ে রণাঙ্গন তৈরী হলো। বাবার বিছানায় মোটা মোটা দুটো কোলবালিশ থাকে। সে দুটোকে নিয়ে আসা হলো। গদা বানিয়ে একটা হাতে তুলে নিলাম দুজনে।

ছোড়দা বলল, 'ভীম রেডি?'

কায়দা করে বললাম, 'ইয়েস মিস্টার দুর্যোধন।' বলার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর বালিশটাকে বারচারেক ঘুরিয়ে নিয়ে আচমকা ছোড়দার পায়ে সেটাকে দিলাম বসিয়ে। অতর্কিত এই আক্রমণে ছোড়দা টাল সামলাতে না পেরে খাটের কোণায় গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আর একটু হলে মেঝেয় পড়ে যেত। কিছুক্ষণ ঐভাবে পড়ে রইল ছোড়দা। ঘাড় কাৎ করে আমাকে দেখতে লাগল। হাত তালি দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'লোকে দেখে বলে, দুই উরু ভেঙে ভূমে পড়ে দুর্যোধন।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ছোড়দা। আমার মুখের ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে চাপা স্বরে বলতে লাগল, 'বার বার ডিজঅনেস্টি করেছিস তোরা। এবার তেজ বার করছি।'

ভীত সন্ত্রস্তভাবে বললাম, 'এলোপাথাড়ি মারলে কিন্তু বাবাকে ডাকবো।' সেদিন বাবা বাড়িতে ছিলেন না, [illegible] আছেন।

কথা শেষ হতে না হতেই দুম করে নিরেট বালিশটা এসে লাগল মাথায়। মাথাটা ঘুরে গেল। কোনরকমে টাল সামলে নিতে না নিতেই আবার এসে পড়ল মুখে। সর্দি-কাশির ধাত আমার। নাকটা বেশ সুড়সুড় করছে। হাঁচি দিই দিই, এমন সময় আবার আঘাত। উদ্গত হাঁচি চাপা পড়ে যাওয়ায় অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই পর পর অনেকগুলো আঘাত এসে পড়েছে মাথায়, নাকে মুখে পিঠে। ইতিমধ্যে প্রচণ্ড আঘাতে বালিশ ফেটে গিয়েছে। রাশি রাশি তুলায় দশ দিক অন্ধকার। সেই অন্ধকার ভেদ করে

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

পরলোকে সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা ১৩৮০ সালের শেষ তিনটে মাসের কথা বহুকাল মনে থাকবে। মনে হয় আর কখনো এতো অল্প সময়ের মধ্যে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এতো প্রতিভাবান ব্যক্তির জীবনাবসান হয় নি। শিল্পী ও শিল্প-সমালোচক অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ওস্তাদ আমীর খাঁ সঙ্গীতাচার্য অনাদিকুমার দস্তিদার পাহাড়ী সান্যাল সৈয়দ মুজতবা আলী কবি বিজয়লাল কবি-সাহিত্যিক বুদ্ধদেব-এর পরে সাহিত্যিক ও সাহিত্যিকসুহৃদ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমাদের এবং সকলের পবিত্রদা বাংলা সাহিত্যের আসরে এক অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন বলা চলে। সারা জীবন তিনি নিজে লিখেছেন প্রচুর এবং অপরের লেখায় উৎসাহ জুগিয়েছেন তার চেয়েও বেশী। বোধ করি এই শেষোক্ত কারণের জন্যই পবিত্রদার জীবনাবসান বাংলাদেশের অনেক কবি সাহিত্যিক শিল্পী ও নাট্যকারের পক্ষে ব্যক্তিগত শোকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মনে পড়ে দশ বারো বছর আগের একটি ঘটনা। একটি কবিতা-ত্রৈমাসিকের বিশেষ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন পবিত্রদা। সম্পাদক এবং কর্মীদের দিকে মুখ তুলে স্মিত হেসে তিনি প্রথমেই বলেছিলেন : এতদিনেও তোদের কাগজটা বন্ধ হয়ে গেল না, এতো বড়ো অবাক কাণ্ড।' তারপরেই সরাসরি আলিঙ্গন করেছিলেন সম্পাদককে। তারপরে ভাষণ যা দিয়েছিলেন তার মধ্যে সাহিত্যতত্ত্ব অপেক্ষা সহজ সরল দরদ এবং উৎসাহের কথাই ছিল বেশী। এ বিষয়ে মনে হয় পবিত্রদার জুড়ি আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে খুব বেশী দেখা যায় নি কোনো যুগেই নয়। লেখার জন্য উৎসাহ ভালো লেখার জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে প্রশংসা করা, পত্রিকা আরম্ভ করা, তা প্রকাশ ও প্রচারের পক্ষে সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে অগ্রাহ্য করার মনোবল জোগানো—এ সমস্ত বিষয়ে পবিত্রদার সংস্পর্শে আসেন নি বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে এ-রকম লেখক খুব কমই আছেন। ৭ এপ্রিল অপরাহ্নে পবিত্রদা ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে কল্লোল যুগের অন্যতম অগ্রদূত হিসেবে গণ্য করা হয়। কাজী নজরুল ইসলাম মুজাফফর আহমেদ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় মন্মথ রায় ও শৈলজানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ সাহিত্যসেবীগণের সাহিত্য-প্রচেষ্টায় পবিত্রদা অনেক সময়েই সহযোগীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। আবার প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'সবুজপত্রে' তিনি স্বয়ং চৌধুরী মহাশয়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। সংক্ষেপে বলা চলে যে প্রথম যৌবনে কলকাতায় এসে বাসা বাঁধবার পরে দীর্ঘ ষাট-বাষট্টি বৎসর ধরে বাংলাদেশের সাহিত্যাকাশে অনেক নক্ষত্রের উদয় ও অস্তের উদার সাক্ষ্য তিনি আপন হৃদয়ে অন্তরঙ্গভাবে বহন করেছেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'চলমান জীবন'-এর কয়েকটি খণ্ডে অর্ধ-শতাব্দীকালেরও অধিক এই বিচিত্র ইতিহাস লিখে।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম হয়েছিল ঢাকার বিক্রমপুরে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২। ঈর্ষা দ্বেষ হিংসা-বিবর্জিত মানবতাবাদী এই সাহিত্যিক ও সাহিত্যিক সুহৃদের স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

এবারের সাহিত্য পুরস্কার

অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর ও মৌচাক-এর পক্ষ থেকে বিগত ১৯৫৮ সাল থেকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাকারদের প্রতি বৎসর বিভিন্ন পুরস্কার দানে সম্মানিত করা হয়। যোগ্য বিচারকমণ্ডলী প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও (১৩৮০) পুরস্কৃত সাহিত্য-স্রষ্টাদের নাম ঘোষণা করেছেন।

এ বৎসরের 'শিশিরকুমার পুরস্কার' লাভ করেছেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায়। তাঁর সমগ্র সাহিত্যকীর্তির জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হল। এ পুরস্কারের সম্মান-মূল্য এক হাজার টাকা। গল্প ও উপন্যাস রচনায় শ্রেষ্ঠত্বের জন্য 'মতিলাল পুরস্কার' দেওয়া হয়েছে প্রখ্যাত সাহিত্যিক চারুচন্দ্র চক্রবর্তীকে (জরাসন্ধ)। এ পুরস্কারের সম্মান-মূল্যও এক হাজার টাকা। জনপ্রিয় শিশু ও কিশোর সাহিত্য পত্রিকা মাসিক 'মৌচাক'-এর পক্ষ থেকে শিশু-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য দেওয়া হয় সুধীরচন্দ্র সরকার পুরস্কার। এ বৎসর এ পুরস্কার লাভ করেছেন 'অমৃত' ও অমৃতবাজার পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক জনপ্রিয় শিশু-সাহিত্যিক তুষারকান্তি ঘোষ। 'বিচিত্র কাহিনী' এবং 'আরও বিচিত্র কাহিনী' নামে শ্রীঘোষের রচিত যে পুস্তক দুখানির জন্য তাঁকে এ-পুরস্কার দেওয়া হল ইতো-মধ্যেই তার কয়েকটি সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছে। এ পুরস্কারটির সম্মানমূল্য পাঁচ শত টাকা। পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যস্রষ্টাগণকে আমরা শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই।

রামচরিত মানস-এর চার শত বর্ষ পূর্তি

ভারতীয় সাহিত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে একক ভাবে রামায়ণ-এর অবদান অনস্বীকার্য। মূল বাল্মীকি রামায়ণ-এর অনুসরণে ও অনুপ্রেরণায় একেবারে প্রাচীন যুগ থেকেই বিরাট ভারত ভূখণ্ডের নানা অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় ও বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় রামচন্দ্রের গুণকীর্তন করে কাব্য ও মহাকাব্য রচিত হয়েছে। হিন্দী ভাষায় রচিত 'রামচরিত মানস' এই রকমই একখানা মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের চার শত বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে এই গ্রন্থটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ এন রায়। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে : 'রামায়ণ দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিরাট স্তম্ভস্বরূপ। এই মহাকাব্য দেশের মানুষকে প্রেম ভালবাসা ও সৌন্দর্য-বোধে অনুপ্রাণিত করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ করণ সিং এই অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণে বলেন যে : রামচন্দ্র ছিলেন একজন মহান বিপ্লবী। দেশও আজ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চলছে। তবে প্রাচীন সকল নীতি ও আদর্শকে অস্বীকার করে এ বিপ্লব সংঘটিত হবে কিনা।

এই উপলক্ষ্যে একখানি তুলনামূলক প্রবন্ধের বইও প্রকাশ করা হয়েছে। রামায়ণ যে-রকম সর্বভারতে আদৃত গ্রন্থ এই প্রবন্ধের বইখানারও একটি সর্বভারতীয় রূপ দেবার জন্য নেপালী সহ মোট পনেরটি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন-এর দিল্লী শাখা

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দিল্লীর সদস্যগণ সম্প্রতি একটি অধিবেশনে বর্তমান বৎসরের জন্য সম্মেলনের দিল্লী শাখার কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করেছেন। সভাপতি মনোনীত হয়েছেন ডক্টর নিরঞ্জন চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি—মদনলাল মুখোপাধ্যায় কর্মসচিব—প্রাণকুমার মুখোপাধ্যায়, আশীষ দে, আশুতোষ বসু ও মানিক সেনগুপ্ত সভ্য মনোনীত হয়েছেন। এই নতুন কার্যনির্বাহক সমিতির কর্মকর্তাগণ ও সভ্যগণকে আমরা অভিনন্দন জানাই। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সেবায় আত্মনিয়োগ করে আছেন বাংলার বাইরে

এরকম অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানই রয়েছেন, এঁদের মধ্যে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের গুরুত্ব বোধকরি সর্বাধিক। সম্মেলনের বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার প্রসার ও তার সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের জন্য রাজধানীর নতুন কার্যনির্বাহক সমিতি সচেষ্ট হবেন, আমরা এই আশাই করবো।

হরিয়ানায় প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন

হরিয়ানা রাজ্যের নৃ-তাত্ত্বিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে হিসার জেলায় যে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চলছে তার ফলে এর মধ্যেই প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এর ফলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন যে, প্রাবস্তী অঞ্চলেই এই সভ্যতার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল। চারশত বর্গমিটার খননের ফলে দশ মিটার উঁচু যে টিলা আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে নগর-স্থাপত্যের এক নতুন নিদর্শন দেখা যাচ্ছে। সুবিন্যস্ত পথঘাট, মাটির ইঁট নানা ধাঁচের উনুন প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তা ছাড়া মাটির তৈরী পশুপাখী ও নানা খেলনা, তামার ক্ষুর, টেরাকোটা ও তীরের ফলক, বেশ উন্নত-মানের শিল্পবোধের পরিচয় বহন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে হরপ্পায় প্রাপ্ত নানা দ্রব্যের সঙ্গে এই খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়।

সংবাদপত্র প্রকাশের উপযোগী কাগজের সংকট

বৎসরাধিক কাল ধরে আমাদের দেশে নিউজপ্রিন্টের যে সংকট দেখা দিয়েছে তার প্রকৃত চিত্রটি তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের ৭৩-৭৪ সালের জন্য প্রকাশিত বার্ষিক রিপোর্টে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। এ সমস্যা সমাধানের আশু কোন সম্ভাবনা ত নেই, উপরন্তু বোঝা যাচ্ছে নিউজপ্রিন্টের ভবিষ্যৎ সরবরাহ রীতিমত নৈরাশ্যজনক। বছরে আমাদের প্রয়োজন ২ লক্ষ ৪০ হাজার টন নিউজপ্রিন্ট। এর মধ্যে অন্তত ২ লক্ষ টন বিদেশ থেকে আমদানী করা প্রয়োজন, কিন্তু সরকারী হিসাবে দেখা যায় মাত্র ২৬ হাজার ৭ শত টনের জন্য বিদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করা সম্ভব হয়েছে। বাকী প্রয়োজনীয় নিউজপ্রিন্ট আমদানী করবার জন্য সরকার যে কি বন্দোবস্ত করবেন, তার কোন আভাস বর্তমান রিপোর্টে নেই। অথচ এদিকে দেশের মজুতে নিউজপ্রিন্টের ভাণ্ডার নিঃশেষিতপ্রায়। ৭২-৭৩ সালের যে পরিসংখ্যান এই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় ডিসেম্বরের মধ্যে বিদেশ থেকে ৭১ হাজার টন নিউজপ্রিন্ট আসবার কথা ছিল, কিন্তু সেখানে এসেছিল মাত্র ৫৩ হাজার টন। কাজেই চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি যে নিউজপ্রিন্ট ঠিক মতো সরবরাহ করতে পারবেন তারও কোনই নিশ্চয়তা নেই।

মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়মের শোচনীয় অবস্থা

সম্প্রতি স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে প্রাক-স্বাধীনতা যুগের বহু শ্রদ্ধেয় দেশ-সেবকের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত কমার্শিয়াল মিউজিয়মের যে চিত্রটি প্রকাশ হয়ে পড়েছে তা এককথায় বলতে গেলে শোচনীয়। মধ্য কলকাতায় কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের উত্তরে ১৯৩২ সালে কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত এই মিউজিয়মের নাম পরিবর্তন করা হয় স্বাধীনতার পরের যুগে — মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়ম। নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন সেই সময় তাঁর পরামর্শে এবং স্বর্গত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে গড়ে-ওঠা কমার্শিয়াল মিউজিয়ম এক সময় দেশসেবক ও সমাজ-সেবকগণের একটি মিলনস্থল ছিল। স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং নানা গঠনমূলক কাজের জন্য বহু পরিকল্পনা এক সময় দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ এখানে বসেই নিয়েছেন। অথচ বর্তমানে আর্থিক সংকট এবং উদ্যোগী-পরিচালকের অভাবে এ প্রতিষ্ঠানটি একটা মর্মান্তিক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। যে কেউ একবার এই মিউজিয়মটি ঘুরে এলেই এর বর্তমান জরাজীর্ণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। আজকের দিনে দেশব্যাপী কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুলবার জন্য যে ব্যাপক উদ্যম দেখা যাচ্ছে, তিন-চার দশক পূর্বে এই মিউজিয়ম থেকে তার জন্য প্রথম প্রেরণা জোগানো হতো। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজসেবা সম্পর্কে এক সময় এই মিউজিয়মের পাঠাগারটিতে উল্লেখযোগ্য পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার সংগ্রহ দেখা যেত। আজকের দিনে সে-সবের খুব সামান্য আয়োজনই দেখা যায়। সরকার এবং কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠানটির পুনরুজ্জীবনের জন্য তৎপর হবেন কি?

আসামে কবি-সম্মেলন

সম্প্রতি গঙ্গোত্রী আয়োজিত আসামের পাণ্ডু মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাঙ্গণে পাঁচ ভাষার কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনে বহু কবি স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন। আসাম-বাঙলা মৈত্রীর ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

অরুণ দাশগুপ্ত শ্রোতাদের উদ্দেশে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেওয়ার পর অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করা 'আন্তোনিও জাসান্তো' আবৃত্তি করেন কাজল বিশ্বাস।

বিভিন্ন ভাষার কবিরা যাঁরা এই অনুষ্ঠানে কবিতা পড়েন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুধীরঞ্জন চক্রবর্তী শিব ভট্টাচার্য অখিল দত্ত রবীন্দ্র সরকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (বাংলা) গোপালবাহাদুর এস বি সিং স্নেহী এন বি সাব কোটা (নেপালী হিন্দী) কবি পরমেশ মল্ল বরুয়া দিনেশ গোস্বামী রবীন্দ্র বরা মিক সিং রাজপুত (অসমীয়া)।

কবি সম্মেলনের সমাপ্তি হয় অসমীয়া ভাষার পরিচিত কবি হীরেন ভট্টাচার্যের কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে।

—অরংকার

নতুন বই

জয়ন্তী-উৎসব—স্মারকগ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৬। মূল্য ১৫ টাকা।

পরিষদের ৭৫ বৎসর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী ও সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর তখনই একখানি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশেরও সংকল্প গৃহীত হয়েছিল। নানা-রূপ বাধা-বিঘ্নের ফলে প্রকাশে বিলম্ব ঘটল। ১৩৭৫ সালের পরিবর্তে বই বেরুল ১৩৮০-তে। তাও সম্ভব হল বর্তমান সম্পাদক এবং কর্মকর্তাদের বিশেষ উদ্যোগের ফলে।

যে পরিষৎ রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ মনীষীদের সাধনায় সমৃদ্ধ, যার বর্তমান কর্ণধার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার তার সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের সঙ্গে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যসেবী মাত্রেরই পরিচয় আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ গ্রন্থ তাঁদের সেই পরিচয়কে ঘনিষ্ঠতর করবে।

পরিষদের বিচিত্র কর্মে ছাত্রবৃন্দকে আহ্বান করে রবীন্দ্রনাথ একসময়ে বলে-ছিলেন—'সাহিত্য পরিষদে আমরা দেশকে জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি।...মাতৃসেবক-দের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হও...বিনা পুরস্কারে খ্যাতিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো।'

যাঁরা দেশকে জানবার এবং জানাবার ব্রত পালন করে এসেছেন তাঁদের চিন্তার ও প্রচেষ্টার কিছু নিদর্শন এ গ্রন্থে আছে। এর প্রথম দুটি প্রবন্ধ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে রচিত। টেরাকোটা বা মৃৎশিল্প সম্বন্ধে লিখেছেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এবং শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুরোনো পরিষৎ পত্রিকা থেকে সংকলিত প্রবন্ধের সংখ্যা তেইশটি। তন্মধ্যে যদুনাথ সরকার মহাশয়ের রামমোহনের বিলাতযাত্রা' রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর গ্রাম দেবতা, যোগেশ-চন্দ্র রায়ের 'দোলযাত্রার উৎপত্তি', নির্মলকুমার বসুর 'রেখ মন্দিরের বিবর্তন', আবদুল করিমের প্রাচীন মুসলমান কবিগণ আবদুল গফুর সিদ্দিকীর 'জঙ্গনামা' বহু অজ্ঞাতপূর্ব তথ্যে সমৃদ্ধ এবং কৌতূহলোদ্দীপক। পরিষৎ যে বিশেষরূপে গবেষণায় উৎসাহী প্রত্যেক রচনায় তার প্রমাণ বর্তমান।

ছাপা বাঁধাই পরিচ্ছন্ন এবং শোভন। বর্তমান বাজারের পক্ষে ১৫ দাম সস্তাই মনে হয়। আশা করি, বঙ্গভাষানুরাগিগণ এ গ্রন্থ সংগ্রহ করে নিজেরা উপকৃত হবেন এবং পরিষদের কার্যে সহায়তা করবেন।

—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পটভূমি কার্শিয়াং (উপন্যাস) : অমিয় রায়চৌধুরী। সরকার প্রকাশন, বি-৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

বর্তমান উপন্যাসের নামেই স্পষ্ট যে লেখক শ্রীঅমিয় রায়চৌধুরী প্রধানত কার্শিয়াংকেই পটভূমি করে একটি নতুন উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু লেখক শুধুমাত্র পটভূমির মোহ ও মায়ায় সহৃদয় পাঠকদের ধরে রাখতে চাননি, চেয়েছেন সুন্দর পটপ্রেক্ষায় বিচরণ করছে যে নেপালী পুরুষ-রমণী তাদের চাকুরী, কুলি-মজুরি চাষ-আবাদ বা দোকান-দানি সব মিলিয়ে মিশিয়ে—সেই সব মানুষের বিশ্বাস-ভালবাসা-সারল্য বিশুদ্ধ রোমান্টিকতার অন্তরালের জটিল জীবনের প্রতিচ্ছবি। 'পটভূমি কার্শিয়াং' উপন্যাসটি তাই পাহাড়-তলির বাসিন্দাদের প্রেম-প্রেমহীনতা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পাওয়া-না-পাওয়ার প্রত্যক্ষ বাস্তব এক জীবন্ত কাহিনী হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের নায়ক অতনু তার বাবার সঙ্গে তার মাসির অবৈধ সম্পর্ক মেনে নিতে না পেরে তার মাস্টারমশাই প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে কার্শিয়াং চলে আসে। তার জীবনে দেখা দেয় নতুন অভিজ্ঞতা, মাস্টারমশাই প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে মঞ্জুলার প্রেমের বার্থতা ও পরে নেপালী মেয়ে জয়ার সঙ্গে প্রেম ও বিবাহ এবং শেষে জয়ার হিমানি বৌদি নাম গ্রহণের ইতিহাস অতনু শোনে। অন্য দিকে অতনুর সঙ্গে কাঞ্চা সরস্বতী নামে তার এক নেপালীর প্রেম ও শেষে মিলন ঘটে নানান দুর্যোগের পর। সরস্বতীর দুই ভাই রতিলাল ও মতিলাল, মা সাবিত্রী। সাবিত্রীর সঙ্গে বাঙালী মুখার্জীবাবুর রোমাঞ্চকর কাহিনী সংযোজিত করে লেখক উপন্যাসকে রুদ্ধশ্বাস করেছেন। উপন্যাসটিতে কার্শিয়াং এর প্রাকৃতিক দৃশ্য, নেপালী জীবন পদ্ধতি এমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বর্ণনা করেছেন লেখক যার জন্য গ্রন্থটি পাঠকদের নিঃসন্দেহে নতুন স্বাদের উপন্যাস পাঠের রস যোগাবে।

অখণ্ড জীবন-দর্শন (প্রবন্ধ)। শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস। সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, এস-পি (বিহার)। নয় টাকা।

'সৎসঙ্গ' প্রতিষ্ঠানের সমগ্র ভাবধারা নিয়ে রচিত গ্রন্থ 'অখণ্ড জীবন-দর্শন'। শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস ব্যক্তিক ও ব্যবহারিক জীবন এবং সমাজের অভ্যন্তরে সর্বমানবের মানসিক ও আত্মিক জীবনভাবনা-ধারণার রূপ ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বস্তু এবং আত্মিক জগতের মূলীভূত অস্তিত্ব ও লক্ষ্য যে অন্বরশক্তি—তারই সহজ সরল বিশ্বাস্য এবং অচিরণীয় ব্যাখ্যা দান করেছেন এই গ্রন্থে। লীলাবাদীরা বলে গেছেন—'লীলাধর্ম কল্পিতম দ্বৈতম অদ্বৈতাদপি সুন্দরম।' কিন্তু এই চিরকালের লীলাবাদীদের ধ্যান-ধারণার পাশে সৎসঙ্গের মূল কথাপ্রসঙ্গে এসে প্রবন্ধকার জানিয়েছেন—'অপরিবর্তনশীল সৎকে বাদ দিয়ে পরিবর্তনশীল জগতকে এবং অসীমকে বাদ দিয়ে সসীমকে আমরা যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে, বুঝতে ও জানতে পারি না।' (সৃষ্টির মূলতত্ত্ব)।

বস্তুত প্রবন্ধকার সৎসঙ্গের মূল লক্ষ্য ও ব্যাখ্যাকে আশ্রয় করেই মানুষের গড়া আবহমান কালের সংসার তার যাবতীয় বাস্তব জীবন, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভাল-মন্দের চমৎকার যুক্তিগ্রাহ্য বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। 'সাহিত্য শিল্পকলা ও বিজ্ঞান' 'রাষ্ট্র ও রাজনীতি' 'শিক্ষা' 'অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ' প্রতিলোম বিবাহ' পারিবারিক জীবন' 'সমাজ জীবন' ইত্যাদি অধ্যায় সুচিন্তিত মন্তব্যে ও সহজ, সরল ভাষায় লিখিত হওয়ায় গ্রন্থমধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য অংশ বলে বিবেচিত হবে। সংসারের মধ্যে থেকেও মানুষ কিভাবে সুস্থ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে পারে সামাজিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় সাহিত্য ও রাজনীতি, সর্বোপরি দর্শন ও আধ্যাত্ম-চিন্তার দৈনন্দিনক জীবনভাবনাকে সম্মিলিত করতে পারে, 'অখণ্ড জীবন-দর্শনে'র লেখক তার নির্দেশ দিয়েছেন নিখুঁতভাবে।

গ্রন্থটির সবচেয়ে বড় গুণ এর ভাষা, এবং দুরূহ তত্ত্ব ও দর্শনচিন্তাকে সহজ করে সাধারণ মানুষের জন্য বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা, সৎসঙ্গের পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রমের যাঁরা ঘনিষ্ঠ তাঁরা ছাড়াও যাঁরা বাইরে আছেন তাঁরাও এই গ্রন্থপাঠে সৎসঙ্গের বিরাট ধর্মীয় কর্মযজ্ঞের ও ভাবযজ্ঞের সঙ্গে একাত্ম হতে পারবেন। সাধারণ সংসার-দীক্ষিত মানুষ আলোচ্য গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন সহজেই—এই বিশ্বাস গ্রন্থপাঠান্তে জন্মেছে বলেই গ্রন্থ ও গ্রন্থের লেখক অভিনন্দনযোগ্য। বস্তুত গ্রন্থটি সর্বস্তরের মানুষের সংগ্রহযোগ্য।

—বীরেন্দ্র দত্ত

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

রোদ জল ঝড়ের সময় (কাব্য সংকলন)। হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যকণ্ঠ প্রকাশনী, ১০।১ ইব্রাহিমপুর রোড, কলকাতা—৩২। তিন টাকা।

যন্ত্রণায় বিদ্ধ আত্মচিন্তায় বিপর্যস্ত ভালবাসার ভিখারী হয়তবা সমস্ত কিছু থেকে মুক্তি পাওয়ার বাসনায় অত্যুৎসাহী কবি হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রোদ জল ঝড়ের সময়' কাব্যগ্রন্থে কিছু আধুনিক মন ও মনন নিয়ে তাঁর কাব্যভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বিশ শতকের এই বিক্ষুব্ধ দশকে স্বাভাবিক কারণেই একজন সচেতন কবির মর্মযন্ত্রণা তীব্র হতে পারে, চেতনায়, অনুভূতিতে ভূকম্পনও দুর্লক্ষ্য নয়। আলোচ্য কবি সেই আধুনিক যন্ত্রণায় তাড়িত। ভালবাসা তাঁর অভিষ্ট কাঙ্খিত ভোগ্য এবং সেই সঙ্গে সমস্ত শূন্যতার দিকে ঠেলে দেওয়ার কোন শক্তিও হয়ত। এই সব অনুচিন্তার তরুণ কবি হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কিছু ভাল পংক্তি চিত্র শব্দগুচ্ছ আবেগ আমাদের উপহার দিয়েছেন। 'আমি বার বার ছিঁড়েছি গোলাপ। উৎসবের শেষে কিছু পাপ/রক্তের আখরে আঁকা থাকে।' ব্যবহারিক জীবন, ভালবাসার জীবন ও কবিতার জীবন—এই তিন প্রধান বিষয়কে শিল্পিত করে কবিতায় প্রশ্ন, সংশয়ের মধ্যে এনে কবি হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় সাতাশের লিরিক্যাল ও রোমান্টিক হতে পেরেছেন তাঁর 'রোদ জল ঝড়ের সময়' গ্রন্থে।

বিদ্রোহী শিল্পী কবি জিবরাণ খলিল জিবরাণ

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জিবরাণ খলিল জিবরাণ বর্তমান যুগের আরবী ভাষার এক অমর কবি, খ্যাতিমান শিল্পী, মহান চিন্তানায়ক ও লেবাননের সত্যদ্রষ্টা ঋষি। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে লেবানন রাজ্যের বিখ্যাত সারের সহরে জন্মগ্রহণ করেন। লেবানন রাজ্য বর্তমান সিরিয়া রাজ্যের পশ্চিমে ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত। এই রাজ্যের রাজধানী হল বেইরুট। কিম্বদন্তী আছে সারেরের বিখ্যাত অরণ্য থেকে সীডার বৃক্ষের কাষ্ঠ আহরণ করে রাজা সলোমন জেরুজালেম নগরীতে মন্দির নির্মাণ করান। জিবরাণ খলিল জিবরাণের পিতা খলিল জিবরাণ ও গর্ভধারিণী মাতা কামিলা। জননী কামিলা হলেন ম্যারোনাইট ক্যাথোলিক গির্জার যাজক ফাদার ইস্তিফান রাহমীর কন্যা। যদিও লেবানন রাজ্য আরব অঞ্চলের অন্তর্গত কিন্তু এখানকার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক খৃষ্টান। শিশুজন্মের পর পিতামাতা তাঁদের নবজাতককে ম্যারোনাইট গির্জায় ব্যাপটাইজ করান। লেবাননের সুচলিত পদ্ধতি অনুসারী পিতা খলিল জিবরাণ পিতামহের নামানুযায়ী জিবরাণ রাখেন। অর্থাৎ পিতামহের নাম থেকে প্রথম জিবরাণ ও পিতার নাম থেকে খলিল জিবরাণ তখন শিশুর সম্পূর্ণ নাম হল জিবরাণ খলিল জিবরাণ। এই নামেই উত্তরকালে আরবী রচনার লেখক হিসাবে তিনি জিবরাণ খলিল জিবরাণ নাম সই করতেন। কিন্তু ইংরাজিতে কিছু সংক্ষেপ করে খলিল জিবরাণ নামেই ইংরাজি পাঠকের কাছে পরিচিত।

স্থানীয় বিদ্যালয়ে আরবী ও সিরিয়াক ভাষা নিয়ে শৈশবের শিক্ষা সুরু। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে যখন জিবরাণের বয়স মাত্র বারো মাতা কামিলা দুই শিশুপুত্র খলিল জিবরান ও পিটার ও দুই কন্যা, মিরিয়ানা ও সুলতানা সমভিব্যাহারে আতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছান। এবং নিউইংল্যাণ্ড অঞ্চলের বস্টন মহানগরীতে বসবাস সুরু করেন।

বস্টনের 'ইটন' ও 'ডায়োর' মত বস্টনের বিখ্যাত পাবলিক স্কুলে আড়াই বছর পড়ার পর জিবরাণ স্থানীয় নৈশ বিদ্যালয়ে অল্পকালে প্রবেশ করেন ও এক বছর সাধারণ শিক্ষা লাভ করেন। জিবরাণের অনুরোধে হিকমৎ মাদ্রাশায় পড়াশুনার জন্য দেশে পাঠিয়ে দেন। এই বিদ্যালয়টি ম্যারোনাইট বিশপ খ্যাতিমান জোসেফ ডেবস বেরুট নগরীতে স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্তের পর জিবরাণ সারা লেবানন ও সিরিয়ার প্রাচীন ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক স্থানগুলি পরিদর্শন করেন ও স্থানীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের ও সভ্যতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন। এই অভিজ্ঞতার প্রভাব উত্তরকালে তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধের মধ্যে নানাভাবে প্রকাশিত।

১৯০২ খৃঃ খলিল জিবরাণ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে চিরদিনের জন্য মাতৃভূমি ত্যাগ করেন। ১৯৩১ খৃঃ মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি মুখ্যতঃ বস্টন ও নিউইয়র্ক প্রভৃতি স্থানে বসবাস করেন।

শিশুকাল থেকেই জিবরাণের অংকনবিদ্যার প্রতি আকর্ষণ ও বিশেষ পারদর্শিতা দেখা যায়। দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য তরুণ জিবরাণ ছিলেন লাজুক স্বভাবের, শান্ত প্রকৃতির। ফলে সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশার অভাবে কিছুটা অসামাজিক হয়ে ওঠেন। আপন ভাই-ভগিনী ছাড়া তার শৈশবে ও কিশোরকালে বন্ধু বা খেলার সাথী বলতে তেমন কেউ ছিল না। বয়সের পার্থক্যের জন্য ভাই-ভগিনীর সঙ্গে গভীরভাবে মেলামেশার সম্ভব ছিল না। জিবরাণের অধিকাংশ সময় পড়ায়, আঁকায় ও লেখায় কেটে যেতো, আর কাটতো ভূমার নিদিধ্যাসনে, নিরালার গভীর অনুভূতিতে। যদি কোন সহপাঠী তার সঙ্গে আলাপ করতে এল তখন জিবরাণ তাদের সঙ্গে অবোধ্য বিষয়ের অদ্ভুত কাহিনী দুর্বোধ্য ভাষায় বলতো যে তারা তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতো না। ফলে বন্ধুত্ব দানা বেঁধে উঠতো না। তারা ভাবতো এ এক কিম্ভূত-কিমাকার জীব কি যে বলে, তার কিছুই বোঝা যায় না। নিশ্চয়ই মাথা খারাপ।

জিবরাণের কবিতার মধ্যে যে এক বেদনার করুণ সুর স্বতঃই ধ্বনিত তার কারণ উদ্ঘাটনে দেখা যাবে যে তার যৌবনের প্রারম্ভে তরুণ মনে বিরহের—প্রিয়জন হারাবার গভীর বেদনা রেখাপাত করেছিল। ১৯০২ খৃঃ এপ্রিল মাসে সহোদরা মরিয়ানার দেহাবসান ঘটে। ১৯০৩ খৃঃ ফেব্রুয়ারি বছরই মে মাসে পুত্র ও কন্যাশোকাতুরা জননী কামিলা জিবরাণ ও সুলতানাকে রেখে ভবলীলা সম্বরণ করেন। ক্রমান্বয়ে প্রিয়জন হারাবার বেদনা তরুণ জিবরাণকে অতিব্যথাতুর ও শোকার্ত করে তোলে। এ বেদনা যে কত গভীর তা তার স্নেহময়ী মাতা সম্বন্ধে তার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় তার নিম্নলিখিত রচনা থেকে পাই।

'মানুষের অধরে সবচেয়ে সুন্দর কথা হল 'মা'। আর সবচেয়ে মধুর ডাক হল 'মা' বলে ডাকা। এই একাক্ষরী মন্ত্রে রয়েছে যুগপৎ আশা ও ভালবাসা, আর সেই মধুর ও সুন্দর ধ্বনি যা অন্তরের গভীরতম তল থেকে উঠে আসে। মা হলেন সবকিছু—তিনি হলেন বেদনায় সান্ত্বনা, দুঃখের মধ্যে আশা, দুর্বলতার মধ্যে শক্তি। তিনিই তো প্রেম, করুণা, ক্ষমা ও সহানুভূতির উৎস। যে তার মাকে চিরতরে হারায়, সে-যে কত বড় অভাগা! সে যে এক পবিত্র আত্মাকে হারায়—যিনি সর্বদা সন্তানের মঙ্গলের জন্য আশীর্বাদ করেন, বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

'পৃথিবীর সবকিছুই মায়ের কথাই বলে। সূর্য হল পৃথিবীর মাতা, উত্তাপ দিয়ে শক্তি সঞ্চারিত করেন এবং যতক্ষণ না পৃথিবীকে সাগরের কল্লোলে বিহঙ্গের কূজনে ত্রিভুবনীর নিক্কণে নিদ্রার দেশে প্রেরণ করেন। আবার পৃথিবী হল বৃক্ষ ও কুসুমের মাতা—এই ধরণীর মাটি থেকেই তাদের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু। এই বৃক্ষ হল আবার ফল ও বীজের মাতা। এই মা-ই হল সৃষ্টির আদি কারণ। তিনি হলেন স্বর্গীয় শক্তিরূপা, সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতিমূর্তি। মানবজীবনে তিনি অসামান্যা। যে তাঁকে হারায় সে-যে কত ভাগ্যহীন, সেই জানে।

খলিল জিবরাণের সাহিত্য জীবন :

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত আরবী পত্রিকার সম্পাদক আমীন গরীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ জিবরাণের জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা। যা তার সাহিত্য সাধনার দিগন্ত উন্মোচিত করে। তখন ১৯০৩ খৃঃ মে মাস। জিবরাণের বয়স তখন কুড়ি। নিউইয়র্কের দৈনিক আরবী সংবাদপত্র আল মুহাজার পত্রিকার সম্পাদক আমীন গরীব নিউইয়র্ক থেকে বস্টনে আসেন। এক সভায় সাক্ষাৎ

জের বাড়ীতে আনেন। জিবরান তাঁকে যৌবনসুলভ চপলতায় নিজের হাতে আঁকা ছবি ও বহু আরবী ভাষায় বিবিধ বিষয়ে রচনার খাতা আমীন গরীবের দিকে এগিয়ে দেন। চিত্র ও প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা দেখে সম্পাদক বিস্মিত হয়ে যান। তিনি ভাবতেই পারেন নি যে বিদেশে বিভূঁয়ে এমন এক প্রতিভার আবিষ্কার করতে পারবেন। বস্টন থেকে নিউইয়র্কে ফেরার সময় আমীন গরীব জিবরাণকে 'আল মুহাজার' পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত করে যান। তাঁর লেখা খাতার কিছু অংশ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যও নিয়ে যান। এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমীন গরীব পাঠকবর্গের উদ্দেশে বলেন— 'আমাদের সংবাদপত্র বিশেষ গৌরবান্বিত যে আমরা আরব ভাষাভাষী জনগণের কাছে এক তরুণের রচনা প্রকাশ করছি যাঁর চিত্রাবলী মার্কিণ সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। তিনি হলেন লেবাননের বীরপ্রসূতা 'সাররে'র খলিল জিবরাণ খলিল জিবরাণ'। 'অশ্রু ও হাসি' শিরোনামায় তাঁর রচনা প্রকাশ করা হল ও ভবিষ্যতেও হবে। এখন আমাদের সহৃদয় পাঠকবর্গ নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী এঁর রচনার মূল্যায়ণ ও বিচার করুন।'

এই হল ছাপার হরফে জিবরাণের প্রথম লেখা; নিউইয়র্কে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রিয়-বান্ধবী 'মে জিয়াদা'কে ১৯১৯ সালের এক পত্রে জিবরান জানান যে অশ্রু ও হাসি পুস্তকাকারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে প্রকাশিত হয়। সেই সময় তোমায় আমি একখণ্ড পুস্তক পাঠাই কিন্তু কোন সংবাদ পাইনি তুমি তা পেলে কি পেলে না। 'অশ্রু ও হাসির' ধারাবাহিক রচনা আল মুহাজারে প্রকাশিত হয় ষোল বছর আগে। বন্ধু নাসিব আরিদা এই প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করে ও আরও দুটি প্যারিস থেকে লেখা প্রবন্ধ সংগ্রহ করে পুস্তক প্রকাশিত করেন। আমার শৈশবে ও যৌবনের উন্মেষে বহু গদ্য ও পদ্য লিখে-ছিলাম বা কয়েক খণ্ড পুস্তক হয়ে প্রকাশিত হতে পারে। আমি তো প্রকাশ করার এমন পাতক আর করব না।

রবীন্দ্রনাথকেও উত্তরকালে কৈশোর ও যৌবনের আদি পর্বের রচনা সম্বন্ধে অনু-রূপ উক্তি করতে দেখা যায়। যখন জিবরাণ 'বিদ্রোহী আত্মা' নামক পুস্তক রচনা করেন যাতে 'রোজ এল হানির' কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে সেই আরবী পুস্তকের ভূমিকা বন্ধুবর ও আল মুহাজার সম্পাদক আমীন গরীব লিখে দেন। এই সমাজ বিদ্রোহী রচনার জন্য জিবারণকে আপন ধর্ম সম্প্রদায় থেকে ও লেবানন রাজ্য থেকে নির্বাসিত হতে হয়।

জিবরাণের সাহিত্যসাধনা অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকে। এদিকে চিত্রকলায় পারদর্শিতা লাভের জন্য প্যারিসে যাবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে জাগ্রত ছিল। শুধু সুযোগের অপেক্ষায় জিবরাণ কালাতিপাত করছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্র-নাথ, ভ্রাতুষ্পুত্র শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত চিত্রশালায় কত না অমূল্য রত্ন সযত্নে সংগৃহীত আছে তা দেখার জন্য বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আত্মনির্ভর হয়ে বিদেশ গমনের ভীতি তাঁকে ভারত-বর্ষের বাইরে নিয়ে যেতে পারেনি। অবনীন্দ্র-নাথের শিল্পসাধনা শুধু ভারতবর্ষে বসেই।

মিশর থেকে প্রকাশিত 'আল হিলাল' অর্থাৎ 'বাঁকা চাঁদ' নামক বহুল প্রচারিত ও এমিল জেয়দান সম্পাদিত পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ, কবিতা ও ছবি প্রকাশিত করে জিবরান খ্যাতির শিখরে ওঠেন। এই পত্রিকায় বান্ধবী 'মে জিয়াদা' জিবরাণ লিখিত দুটী পুস্তকের সমালোচনা করেন। রচনার শুধু তিনি প্রশংসা করেন নি, যেখানে ত্রুটি তাও 'কুমারী মে' দেখিয়ে দিয়েছেন। জিবরাণ সম্বন্ধে বহু রচনা এই বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ও তিনি কবি, শিল্পী ও দার্শনিক খ্যাতি লাভ করেন।

জিবরাণের 'ঝড়' প্রথম আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৯২০ খৃঃ। বন্ধু মিখেল নেয়ামী এক প্রবন্ধে পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তার উত্তরে জিবরাণ বিনয়নম্র বচনে লেখেন 'তুমি আমার রচনা অতি যত্ন করে প্রতিফলিত করেছ। এই কাজ তোমার করায় আমায় বড়ই লজ্জা দিয়েছ।'

ঐ সময় নিউইয়র্কে কয়েকজন সভ্য নিয়ে এক আরবী সাহিত্যচক্র গড়ে ওঠে। এর নাম রাখা হয় 'আররাবিতা' সভাপতি হলেন খলিল জিবরাণ ও সম্পাদক হলেন মিখায়েল নেয়ামী। এই সাহিত্যচক্রের সভ্য হলেন— নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত আরবী 'আস সাইয়া' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক আবদুল মাসী, ঐ নিউইয়র্ক থেকেই প্রকাশিত আর একটি আরবী মাসিক 'আল আখলাক' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক কবি নাসীব আরিদা, চিন্তাশীল লেখক উইলিয়াম কাটজেফ্লিস, আরনে, ডাওয়াই রিহানী, আবমোদ, নাদরা, আবকারিয়া হাদ্দাদ আব্দাল্লা। এঁরা প্রত্যেকেই হয় লেবানন নয় সিরিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। এঁদের অধিকাংশই আজ নরজগতের পরপারে চলে গেছেন। এই সাহিত্য সংস্থা ও কৃতী সভ্যদের রচনা ও শিল্পসম্ভারের উপর বহু প্রবন্ধ লেখা হয়েছে ও অদূর ভবিষ্যতে হবে। খলিল জিবরাণ 'আস সাইয়া'র বহু প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশ করেন। রসিদ আয়ূবের বাড়ীতে আররা-বিতার এক সভা হয়। সেখানে স্থির হয় যে আররাবিতার এক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হবে। তাতে থাকবে আররাবিতার স্থাপনের ইতিহাস ও সভ্যদের রচিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা রসরচনা প্রভৃতি। কিন্তু যখনই লেখা দিতে বলা হল তখনই কেউ আগামী দুদিন কেউ বা সপ্তাহের শেষে বা পরের সপ্তাহে দেবে কথা দিলেন। কেউ লেখা দিলেন না।

মিশরের আরবী পত্রিকা আল হিলালে তিনি 'হারানো জন' নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য পাঠান ১৯২১ সালের জুন মাসে। বেরুট থেকে প্রকাশিত (বোশারা এলকৌরি সম্পাদিত) 'আল বার্ক' বা 'বিদ্যুৎ পত্রিকায় জিবরাণের বহু রচনা প্রকাশিত হয় এবং সম্পাদক মহাশয় জিবরাণের উপরও বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

প্যারিসে চিত্রাঙ্কণ শিক্ষা

প্যারিসে চিত্রাঙ্কণ শিক্ষালাভের সুযোগ আসার আনন্দে কত নব নব পরি-কল্পনা তরুণ জিবরাণের মনে এসেছিল তার এক উচ্ছ্বসিত প্রকাশ ১৯০৮ খৃঃ ২৮ মার্চ তারিখের বস্টন থেকে আমীন গরীবকে লেখা পত্রে পাই: আমি এক বছর জ্ঞান ও চারুশিল্পের নগরী প্যারিসে থাকবো। পরের বছর যাব ইটালিতে সেখানে বিখ্যাত অমর শিল্পীদের চিত্রের প্রদর্শনশালায় ও প্রাচীন নগরীর ভগ্নাবশেষ দেখে ঘুরে বেড়াব। আমি যাব ভিনিসে ফ্লোরেন্সে রোমে জেনোয়ায়। আমি শেষে আমেরিকা যাবার জাহাজ ধরতে নেপল্‌সে চলে আসব। এই ভ্রমণ এক অতীতের স্মরণ সেখানে জিবরাণের সুখময় অতীতের সাথে আনন্দময় ভবিষ্যৎ এক সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত হবে। প্যারিসে আমরা বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের অপরূপ সৃষ্টির

প্রকাশ করেছেন। জিবরাণ পৃথিবীতে তার সমকালীনদের জন্য জীবনের বাণী নিয়ে এসেছিলেন। সে-বাণী তার চিন্তাশীল রচনা 'চিন্তা ও অনুভূতি' 'অবতার' 'গুরুদেবের বাণী'র মধ্যে সমুদ্ভাসিত।

কবি জিবরাণ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। মহান আত্মা আবার পরজন্মে ফিরে আসে ও মহান ব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তার অলৌকিক জ্যোতি।

আত্মপরিচিতি প্রকাশ করে জিবরাণ তার সম্পর্কে তাই নখলী জিবরাণকে এক পত্র লেখেন—'আমি দুর্বল কাঠামোর মানুষ কিন্তু আমার স্বাস্থ্য বেশ ভাল কেননা আমি এ সম্বন্ধে চিন্তাই করি না ও এই নিয়ে আমার ভাবনারও সময় নেই। আমি ধূমপান করতে ও কফি খেতে ভালবাসি। যদি এখন তুমি আমায় এই ঘরে দেখতে আস আমায় দেখবে সিগারেটের ধোঁয়ার অন্তরালে যার সংগে ইয়ামাইট কফির সুগন্ধ মিশেছে।

আমি কাজ করতে ভালবাসি তাই এক মুহূর্তও বিনা কাজে কাটাই না। আবার কোন কোন দিন যখন কাজে স্পৃহা থাকে না ও ভাবের উদ্দীপনার অভাব ঘটে তখন আমার মন কুইনাইনের তিক্ততায় ভরে যায় আর এক নেকড়ে বাঘের দাঁতের মত সাংঘাতিকভাবে আমার বিবেককে দংশন করে। আমি আমার জীবন সাহিত্যসাধনায় ও চিত্রাঙ্কনে উৎসর্গ করেছি। এতে যেমন আনন্দ পাই অন্য কিছুতে তেমন পাই না। অন্তরের যে-আগুন যা আমার হৃদয়কে নিত্য প্রীতিতে ভরিয়ে দিতে চায় তাকে আমি কালি ও কাগজে ঢেকে দিতে চাই। আমি জানি না আমার আরবী ভাষাভাষীরা গত তিন বছর তাঁরা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন ভবিষ্যতে তার কতটা সৌহার্দ্য রাখবেন আমি জানি না। এর কারণ হল শত্রুতা সুরু হয়ে গেছে। সিরিয়ার লোকেরা আমায় বলছে হেরেটিক আর মিশরের লোকেরা বলছে এ হল প্রচলিত রীতির সংসার বন্ধনের ও প্রাচীন সংস্কারের এক ঘোর বিদ্রোহী। তারা হয়তো সত্য কথাই বলছে। কেননা আমি তো মানুষের তৈরি প্রচলিত আইনের ধারক নই; আমার পূর্বপুরুষেরা যে কুসংস্কার রেখে গেছেন তার পক্ষপাতীও নই। তাদের এই ঈর্ষা ও অসূয়া আমার স্বর্গীয় প্রেমের ও আধ্যাত্মিক চেতনার ফলশ্রুতি। করুণাই তো ভগবানের ছায়া যা মানুষের উপর পড়ে। আমি জানি আমার রচনার ও আমার সৃষ্টির যে আদর্শের উপর ভিত্তি তা হল মহান ব্যক্তিসত্তার আদর্শের প্রতিধ্বনি মাত্র। কারণ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা প্রতি মানুষেরই কাম্য যেমন দেহের প্রয়োজন প্রাণে। জানি না। আমার বাণী আরব জগৎ কখনো কি গ্রহণ করতে পারবে? না চিরন্তরে ছায়ার মতই অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

জিবরান কি কোনদিন মানুষের চোখ অগ্নি ও কন্টক থেকে আলো ও সত্যের দিকে প্রসারিত করে দিতে পারবে? না জিবরাণ বহু মহান ব্যক্তির মত পৃথিবী থেকে চিরতরে লোপ হতে যাবে যাঁরা এই পৃথিবীতে কোন কীর্তি রেখে যেতে পারেন নি? আমি জানি না তবে একথা অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব করি যে এক বিরাট শক্তি আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যন্ত্রণায় অস্থির ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে একদিন ভগবৎ কৃপায় বেরিয়ে আসবেই আসবে।

১৯১৮ খৃঃ থেকে প্রকাশিত রচনা পাগল (১৯১৮) অগ্রদূত (১৯২০)এর পর প্রকাশিত হয় 'অবতার'। এই গ্রন্থের সমালোচনায় জর্জ রাসেল বলেন—আমি জানি না বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি প্রকাশের পর এত মধুর ও উদাত্ত কণ্ঠে আর কোন প্রাচ্যের মনীষি এমন করে জীবনের বাণী প্রকাশ করতে পেরেছেন যেমন জিবরাণ তাঁর 'অবতার' গ্রন্থে বলেছেন। তিনি একাধারে শিল্পী ও কবি। বহুদিন আমার চোখে পড়েনি এমন সুন্দর চিন্তাশীল রচনা। যখন আমি এই পুস্তকখানি পড়ি তখন আরও ভাল করে বুঝতে পারি সুবিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের বাণী। তাঁর ব্যানকোয়েটে এ ভাবের যে অপরূপ সৌন্দর্যের কথা বলেছেন তা যে দৈহিক রূপের মাদকতা ও মোহের চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর তা আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করি। আমি প্রতি পাতা থেকেই কয়েক ছত্র মুখস্থ বলতে পারি এবং প্রতি পাতা থেকে কিছু না কিছু স্মরণীয় সুন্দর ও স্বাধীন চিন্তার বাণীর উদ্ধৃতি দিতে পারি।'

'ভগ্নপক্ষ' উপন্যাসে জিবরাণ এক বেইরুটের ধনীর অসামান্যা সুন্দরী সেলমা'র নিষ্ফল প্রেমের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। এই অপরূপ মধুর কাহিনী অতি দরদ ও সরলতার বাতাবরণে লেখা যা মানুষের জীবনের সুখ ও আনন্দের ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যায়। সেখানে ব্যক্তিগত দুঃখ ও প্রেম অতি নগণ্য। এখানে সমাজের নিষ্ঠুর নিয়মের নিপীড়নে জীবনের ফুল শুকিয়ে গেছে হৃদয়ের শান্তি, কঠিন আঘাতে অবলুপ্ত হয়েছে উন্মেষের চেতনাকে কঠোর হস্তে নিষ্পেষিত করেছে। এই নিয়তিসংঘটিত নরনারীর কাহিনী অসামান্য মমতা ও সহানুভূতির প্রলেপে আচ্ছাদিত করেছেন জিবরাণ। তাতে গল্পের সংগে মাধুর্যময় ও বেদনাবিধুর জীবনের কাব্য সৃষ্টি হয়েছে।

খলিল জিবরাণের অনবদ্য রচনা গুরুদেবের বাণী চিন্তাশীল রচনা সংকলনে জিবরাণ দুঃখের উপর বিশ্বাসের একাকীত্বের উপর প্রেমের বৈজয়ন্তী পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন। এত সহজ ও মধুরভাবে এই বাণী কবি-শিল্পী জিবরাণ বিচিত্রিত করেছেন যাতে তাঁকে বিংশ শতাব্দীর দান্তে বলা হয়। তাঁর বিবাহ মানবের দেশত্ব মুক্তি ও জ্ঞান প্রেম ও সাম্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সুযৌক্তিক বিশ্লেষণ চিরাচরিত চিন্তাধারার প্রতিকূল বিধায় তাঁকে সাধারণ গতানুগতিক মানুষের কাছে অপ্রিয় করেছিল। কিন্তু চিন্তাশীল মানুষ এইসব নৈর্ব্যক্তিক প্রবন্ধের মাঝখানে চিন্তার প্রচুর খোরাক পাবেন। মানুষের জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হলে উত্তর পাওয়া যাবে এই গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীর মধ্যে।

তাঁর জীবনের বাণী ও কাব্য মাধুরীর মানসমূর্তি তাঁর অমর ধ্যান ও ধারণার উপলব্ধিতে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাঁর জীবননাটকের অন্তিমপর্বে তাঁর সৃষ্টি লেবাননে তাঁর শিশু ও কিশোরকাল যাপনের ও যৌবনের ফেলে-আসা দিনগুলির স্মৃতির রোমন্থনে সমাচ্ছন্ন থাকতো। প্রাচ্যের দর্শনের ও পশ্চিমের দ্রুতচলমান বস্তুতান্ত্রিক জীবনের সংঘাতে রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি এক অপরূপ মহিমায় বিকশিত হয়ে উঠেছে।

আর্থিক প্রসঙ্গ

মূল্যস্ফীতির শেষ কোথায় ?

তুলনাহীন মাঠে শিবু ও নেতাকালীর [illegible] পরবর্তী পর্যায়ের পরিণতি নিয়ে [illegible] সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল, গল্পকার পরশুরাম নিজে তার সমাধান করতে পারেন নি। শুধু শিবু আর নেতাকালী নয়, শিবুর পর পর তিন-জন্মের স্ত্রী এবং নেতাকালীর পর পর তিনজন্মের স্বামী—[illegible] পরলোকের পটভূমিকায় [illegible] মিলনের এই হর্ষের সমস্যায় কোন কিছু বা বড় সাহিত্যিক আগে এবং [illegible] পড়েন নি। নিজে অপারগ পরশুরাম [illegible] থেকে শুরু করে [illegible] সব বিখ্যাত বড় সাহিত্যিককেই আহ্বান জানিয়েছিলেন : আপনারা এবার [illegible] আসুন একটা কিছু বিহিত করুন। [illegible] প্রত্যেক রাষ্ট্রনেতাই [illegible] এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে না পেরে [illegible] রাষ্ট্রনেতা নয়—অর্থনীতিবিদদের অনুরোধ করছেন : মূল্যস্ফীতির [illegible] নতুন কিছু নির্দেশ দিন—[illegible] কিছু মোটামুটি সিদ্ধান্তে [illegible] কোন ব্যবস্থার নির্দেশ [illegible] সমর্থ হননি। সেই পরশুরাম [illegible] নতুন কোন ব্যবস্থার নির্দেশ না পেয়ে রাষ্ট্রনেতারা [illegible] সমস্যাটির মোকাবিলার প্রচেষ্টা [illegible] ঘোষণা করেছেন। কিন্তু [illegible] উদাসীন [illegible] অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে [illegible] অর্থনৈতিক অবস্থার মিল নেই [illegible] মনে হচ্ছে। [illegible] থাকে জোর প্রত্যাশা।

সমস্যার প্রকৃতি :

মূল্যস্ফীতির সমস্যা আদৌ অভূতপূর্ব নয়, বিশ্বজনীনও [illegible] [illegible]

মুদ্রা-ব্যবস্থা ভেঙেও পড়েছিল, কিন্তু মূল্যস্ফীতি ঠিক সমগ্র বিশ্বে সংক্রামিত হয়নি। বর্তমানে কিন্তু মূল্যস্ফীতি বিশ্বের মড়ক হিসেবে দেখা দিয়েছে—এর প্রকোপ থেকে অনুন্নত উন্নত স্বল্পোন্নত কোন দেশই রক্ষা পায়নি। এমনকি বলা হয় যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোও মূল্যস্ফীতির কবলে পড়েছে। অবশ্য এইসব দেশের মুখপাত্রদের মতে, মূল্যস্ফীতি ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক পশ্চিমী দেশগুলোকে প্রপীড়িত করলেও পূর্ব ইয়োরোপ এই মহামারীকে সম্পূর্ণ ঠেকিয়ে রেখেছে। এই সব দেশে বৎসরিক মূল্যস্তর বৃদ্ধির হার হলো ১—২ শতাংশ মাত্র। পশ্চিমী বিরুদ্ধবাদীরা কিন্তু বলেন এই ধরনের পরিসংখ্যা আসল চিত্র অধিকাংশই প্রকাশ করে না, সমগ্র বিশ্বে যখন কাঁচামালের ও কলাকৌশলের দাম বাড়ছে তখন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বর্ধিত উৎপাদন-ব্যয় দ্রব্যমূল্যে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। এইসব দেশে কিন্তু সরাসরি দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ঘোষণা করা হচ্ছে না, দেখানো হচ্ছে যেন দ্রব্যের গুণগত উন্নয়ন ঘটছে। উদাহরণ দিয়ে একজন পশ্চিমী বিশেষজ্ঞ বলেছেন : দাম বেড়ে গেলে ধরুন একটা শার্ট বছর [illegible] থেকে সরকারী নীতির কারখানায় [illegible] [illegible] এবং তারপর [illegible] একটি নতুন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই শার্টই [illegible] [illegible] বেশী দামে বাজারে ছাড়া হল। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে [illegible] কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য ভরতুকির ব্যবস্থা আছে।

এই অভিযোগ কতটা সত্য তা নিয়ে আলোচনা না করেও বলা যায় যে মূল্যস্ফীতির মহামারী থেকে বিশ্বের কোন দেশই বাদ যায়নি, তবে প্রকোপ কোথাও বেশী এবং কোথাও কম।

যেহেতু সমস্যা বিশ্বজনীন প্রকৃতির সেইহেতু এককভাবে এর মোকাবিলা করতে কোন দেশই সমর্থ নয়। কেনিয়ার অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী হতাশা প্রকাশ করে বলেছেন : "কেনিয়ার মত ছোট দেশের পক্ষে মূল্যস্ফীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।" শুধু ছোট ছোট দেশের নয়, বড় বড় [illegible] রাষ্ট্রনেতাদের ঘোষণাতেও ঐ একই [illegible] উঠেছে। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট প্রণয়নের প্রধান রয় আসের ভাষায় জাতীয় পটভূমিকায় মূল্যস্ফীতির মোকাবিলা করার দিন শেষ হয়ে গেছে।' তবুও কিন্তু প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র গড়ে উঠছে না। এখানেই রয়েছে আগামী ভবিষ্যতে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক সংকটের উৎস। ইতিমধ্যেই বহু দেশ এই সংকটে পতিত হয়েছে, অন্য বাকি দেশের সামনে সংকটের ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পাটীগাণিতিক হিসাব :

পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে অবশ্য বিভিন্ন দেশে মূল্যস্ফীতির পরিমাণভেদ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ১৯৭৩ সালে জাপানে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল ২০ শতাংশ, বৃটেনে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১২ শতাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯.৮ শতাংশ, অস্ট্রেলিয়ায় ১৩ শতাংশ, আমাদের দেশে ২৬ শতাংশ [illegible]। সরকারী বিবৃতি অনুসারে ভারতে ১৯৭৩ সালে পাইকারী মূল্যসূচক ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও সমগ্রিক মূল্যসূচকের বৃদ্ধি ঘটেছিল ২০ শতাংশের মত। এ ছাড়া অবশ্য এক বছরে ৫০ শতাংশ, ৬০ শতাংশ, ৭০ শতাংশ বৃদ্ধির দৃষ্টান্তও আছে। সুতরাং অবস্থা যে সংঘাতিক সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। আরও আশংকার কারণ হল যে বৃদ্ধির হার ক্রমবর্ধমান—এ বছর যদি মূল্যস্তরে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, তবে পরবর্তী বছরে বৃদ্ধি পায় ১৫ শতাংশ। যেমন, আমাদের দেশে ১৯৭২ সালে মূল্যস্তরবৃদ্ধির হার ছিল ১৪ শতাংশ, এবং পরবর্তী বছর বা ১৯৭৩ সালে তা দাঁড়ায় ২৬ শতাংশে (সরকারী হিসাব মেনে নিলেও ২০ শতাংশের কাছাকাছি)। সুতরাং প্রশ্ন হলো : এর শেষ কোথায়?

কারণ :

মূল্যস্ফীতি নামক বিশ্বজনীন মহামারীর কারণ বিশেষ জটিল। তবুও কিছু তিনটি প্রধান কারণ নির্দেশ করা হয়েছে : (ক) সহসা বিশ্বব্যাপী পণ্যমূল্যবৃদ্ধি, যার মূলে শক্তিসংকট ছাড়াও আছে কাঁচামালের ঘাটতি, প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য সম্বন্ধে সচেতনতা, জনবিস্ফোরণ, বন্যা ইত্যাদি। (খ) ধনী ও দরিদ্র সকল দেশের জনগণের মধ্যেই উন্নয়নপ্রচেষ্টার

পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত বিশ্বাস যে তারা উৎপাদনবৃদ্ধির চেয়েও বেশী পরিমাণ দ্রব্যাদি ভোগ করতে সমর্থ এবং এই পদ্ধতিতে যে মূল্যস্ফীতির সৃষ্টি হবে তাও তারা সহ্য করতে প্রস্তুত। (গ) সমাজসেবায় তথাকথিত বিভিন্ন কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের অকল্পিত ব্যয়বৃদ্ধি।

কারণ তিনটির সামান্য বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যে সব অর্থনীতিবিদ সম্প্রসারণের সীমা বা লিমিটস টু গ্রোথ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন তাঁদের মতে, যেদিন পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ সব শেষ হয়ে যাবে সেদিন সম্প্রসারণে শুধু ভাটাই পড়বে না, সমৃদ্ধিও হয়ে যাবে অতীতের ঘটনা। তখন উড়োজাহাজ আর উড়বে না, কয়লা ও তেলের অভাবে কলকারখানা আর চলবে না, রাস্তায় মোটরগাড়ী ও বাসের দেখা পাওয়া যাবে না, গ্যাস ও বিদ্যুতের কথা ইতিহাসেই লেখা থাকবে, ইত্যাদি। এই সব প্রাকৃতিক সম্পদ ঠিক নিঃশেষ হবার আশংকা দেখা না দিলেও প্রত্যেক দেশই তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের সঞ্চয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া রাজনৈতিকভাবে শুধু হলেও এই সতর্কতার মধ্যে অনেক দেশই আন্তর্জাতিক দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক লাভের সন্ধান পেয়েছে। এক বছরের মধ্যেই তেল-উৎপাদনকারী দেশগুলোর আয়ের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনেক দেশ বর্ধিত তেলের দাম তাদের রপ্তানী-পণ্য দিয়ে পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। যেমন, থাইল্যাণ্ডের চালের দাম এক বছরের মধ্যে দ্বিগুণ হয়েছে। সব দেশেরই যে সুবিধা হয়েছে তা নয়। যেমন, আমাদের ভারত ও বাংলাদেশের পাট ও চায়ের আন্তর্জাতিক দাম তেমন বাড়ে নি। ফলে তেলের দামবৃদ্ধিতে এই দুই দেশ সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে কি করে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য আমদানি করা হবে এবং কি করেই বা উন্নয়ন-পরিকল্পনার কাজ চালানো হবে, তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারত ও বাংলাদেশের সমস্যা। যাই হোক কয়েকটি নির্বাচিত নীতিমালা এবং অর্থনৈতিক ভোগাপণ্যের আমদানিতে প্রতিযোগিতা বিশ্বজনীন মূল্যস্ফীতির পেছনকার কারণ হয়েছে এবং এই সব কারণগুলোর মধ্যে কারও নেই বলে মনে হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ককে উপেক্ষা করে ক্রমাগত উৎপাদনবৃদ্ধির যে আশা করা হয়েছে তা ভুল বলেই অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অনেক দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণও ঘটছে। এতদসত্ত্বেও ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, উন্নয়ন-প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনগণের জন্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে উন্নততর জীবনযাত্রার মানের ব্যবস্থা করা সম্ভব। এই ধারণা নিশ্চয়ভাবে অনুমানসাপেক্ষ এবং অনুমানটি হল প্রকৃতির বদান্যতা সীমাহীন। এই অনুমানটি ভ্রান্ত প্রমাণিত হওয়া হল মূল্যস্ফীতির উক্ত দ্বিতীয় কারণ।

কারণটি ম্যালথুসীয় তত্ত্বকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতাই অবশ্য বর্তমান মূল্যস্ফীতির প্রকৃত কারণ নয়, কারণ হলো ঐ সম্পদ আহরণে অপারগতা। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উল্লেখ করা যেতে পারে। বলা হয়, আমাদের দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা একরূপ সীমাহীন। তাই যদি হয় তবে ৩০ বছর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পরে দেশে এই শক্তি বিদ্যুৎ সংকট কেন? এইভাবে যুক্তিটিকে ভ্রান্ত প্রমাণ করলেই অবশ্য সমস্যাটি সরল হয়ে দাঁড়ায় না। বিশ্বব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব প্রধান অর্থনীতিবিদ মরিস ফ্রিডম্যানের ভাষায় 'সমগ্র বিশ্বই আজ ঘাটতি এবং বর্ধমান ভোগাপণ্যের চাহিদায় ভুগছে। এ অবস্থায় আশা করা অন্যায় হবে না যে অন্য কোন দেশ আমাদের সহায়তায় খাদ্য দেবে, তেল দেবে, মূলধন দেবে বা আর কিছু দেবে। পৃথিবীর কোথাও সস্তা বলে আর কিছু নেই।' ভোগাপণ্যের এই বর্ধমান চাহিদার কারণ ব্যাখ্যা করে ফ্রিডম্যান বলেছেন: 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই এই ধারণা প্রচার করে আসা হচ্ছে নিয়ত উন্নততর জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করা সম্ভব এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা বা উন্নয়ন-প্রচেষ্টা হল এর চাবিকাঠি।'

তৃতীয় কারণটি হল উন্নয়ন প্রচেষ্টায় দ্রব্য উৎপাদনের চেয়ে সেবাকার্য সম্প্রসারণের দিকে বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ফলে সেবামূলক শিল্প বা সার্ভিস ইণ্ডাস্ট্রি সম্প্রসারিত হয়ে যে পরিমাণ আর্থিক আয়ের সৃষ্টি করেছে পণ্যপ্রবাহ তখনই তার সঙ্গে তাল রাখতে পারে নি, এবং এর দরুন দ্রব্যমূল্য ক্রমাগতই ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগামী হলে সেবামূলক কাজের দামও বাড়তে বাধ্য। সুতরাং মোট মূল্যস্তরও ক্রমাগত ওপরে উঠেছে।

এ ছাড়া অধ্যাপক জন কেনেথ গলব্রেথের মতে, মন্দা ও বেকারত্বের ভয়ে অনেক দেশের সরকারই বিচারবিবেচনাহীনভাবে অনুৎপাদনশীল ব্যয় নির্বাহ করে গেছে। এর শেষ পরিণতি হয়েছে মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্ব—উভয়েরই পরিমাণ বৃদ্ধি। সুতরাং মূল্যস্ফীতির আর্থিক কারণ (মনেটারী রীজনও) আছে।

পর্যালোচনা :

গত থেকে বর্তমান বা ১৯৮০ সালের জন্যেও ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে। এই

পূর্বাভাষ অনুসারে কয়েকটি দেশে মূল্য-স্ফীতির হার কমবে, কয়েকটি দেশে হার মোটামুটি একই থাকবে এবং কয়েকটি দেশে আরও বাড়বে। এর মধ্যে আমাদের দেশে হার একই থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। সুতরাং মুদ্রামূল্যের স্থায়িত্বের—বর্তমান ক্রয়শক্তিতেও স্থায়িত্বের সম্ভাবনা নেই, গত বছরের তুলনায় বেশী হারে বাড়বে না—এই হলো সান্ত্বনার কথা। তবে বলা হয়েছে যে এর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, আর যদি দ্রব্যমূল্যের গতির মোড় ঘোরাতে হয় তবে রাজনীতি ও অর্থ-নীতি উভয়েরই প্রকাণ্ড পরিবর্তন করতে হবে—পুরোনো সমাধান, পুরোনো পন্থা আর চলবে না। এ সম্বন্ধেই আলোচনা করব পরবর্তী সংখ্যায়।

সোনার দাম :

ভারতকে বলা হত মূল্যবান ধাতুর গহ্বর—দা সিংক অফ প্রেসাস মেটালস্। এখানে সোনা-রূপো ঢুকলে আর বেরুতে চাইত না। মাত্র বিগত তিন দশকের বিশ্ব-ব্যাপী মন্দাবাজারের সময় কিছু সোনা বেরিয়ে গিয়েছিল।। সোনা-রূপোর, বিশেষ করে সোনার প্রতি তীব্র আকর্ষণের জন্যে সোনার আন্তর্জাতিক দাম এবং এদেশে বাজার দামের মধ্যে ছিল বিশেষ ফারাক। তাই গোপনে সোনা আমদানি বিরাট লাভ-জনক কারবারে পরিণত হয়েছিল। প্রায়ই সংবাদপত্রে পড়া যেত : তল্লাসীর ফলে অমুক মালবাহী জাহাজ থেকে এত সোনা উদ্ধার সোনা নিয়ে আসার জন্যে সান্তাক্রুজে অমুক দেশের এক যাত্রী গ্রেপ্তার, ইত্যাদি। বর্তমানের গতি কিন্তু ঠিক বিপরীত দিকে সোনা আমদানির পরি-বর্তে রপ্তানিই করা হচ্ছে, এবং এই রপ্তানিই হল এদেশে সোনার অভূতপূর্ব ও অকল্পিত দামবৃদ্ধির প্রধান কারণ—সোনার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি নয়।

রপ্তানি করা হচ্ছে বিভিন্ন দেশে সোনার প্রতি আকর্ষণ আপেক্ষিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে এবং এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আরব-রাষ্ট্রগুলোই হল অগ্রণী। কারণ : মার্কিন ডলারের মূল্যের স্থায়িত্বে মার্কিন নাগরিক এবং আরব রাষ্ট্রগুলো—কারোরই আস্থা নেই। অর্থ বা টাকাকড়ির মূল্যে উল্লেখযোগ্য অবচয় (ডেপ্রিসিয়েশান) ঘটলে লোকে সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে সোনা-রূপোর দিকেই ঝোঁকে। সুতরাং সোনার চাহিদা যে বৃদ্ধি পাবে তাতে আর আশ্চর্য কি। সোনার দাম বাড়লে স্বভাবত রূপোও অনুগামী হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো : ডলারের অবচয়ের দরুন আরব রাষ্ট্রগুলোয় সোনার চাহিদা বৃদ্ধি পাবার কারণ কি? কারণ মোটামুটি সকলেরই জানা। এতদিন পর্যন্ত তেলউৎপাদনকারী আরব রাষ্ট্রগুলো মার্কিন ডলারেই সঞ্চয় করে এসেছে, এবং এখন ঐ মুদ্রার নিয়মিত অবচয়ের ফলে সোনার দিকে ঝুঁকেছে। তেলের দাম প্রায় তিনগুণ হওয়ায় এই সব দেশের রেভিনিউ বা তেল থেকে বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরি-মাণও মোটামুটি তিনগুণ হয়েছে। সুতরাং টাকাকড়ির অঙ্কে সঞ্চয়ের পরিমাণও আনু-পাতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই চাপ অনেকাংশে এসে পড়েছে সোনার ওপর। ফল : সোনার অকল্পিত দামবৃদ্ধি এবং আমাদের মত দুর্ভাগা দেশ থেকে সোনা রপ্তানি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকার সোনা আম-দানী ব্যাপারে কোন উৎসাহ না দেখালেও ব্যক্তিগতভাবে অনেক নাগরিকই স্বর্ণ-মৃগয়ায় ব্যাপৃত হয়ে পড়েছেন। ঐ দেশে স্বর্ণপিণ্ডের সঞ্চয় বেআইনী, কিন্তু স্বর্ণ-মুদ্রার সঞ্চয় সম্পূর্ণ বিহিত পদ্ধতি। এই মার্চ মাসেরই প্রথম সপ্তাহে যখন সোনার দাম আউন্স-প্রতি ১৮০ ডলারে গিয়ে পৌঁছোয় তখন অনেকেই নিরাপত্তা ও লাভের প্রত্যাশায় বিভিন্ন দেশের পুরোনো স্বর্ণমুদ্রা কিনতে শুরু করে। এই রকম একটি মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র ঘোষণা করেন যে, এক মাসে তাঁরা যে পরিমাণ ব্যবসা করেছেন তা সারা ১৯৭৩ সালেও সম্ভব হয় নি। স্বর্ণমুদ্রা ক্রয়ের এই হিড়িকের ফলে দাম ক্রমশ আকাশ-ছোঁয়া হচ্ছে। ১৪।১৫ মাস আগে মার্কিন স্বর্ণমুদ্রা যুগল ঈগলের (ডাবল ঈগল) বাজার দাম ছিল ৯০ ডলার, বিগত ৭ই মার্চ তা হয় ৩৬৫ ডলার। এক দোকানের মালিককে প্রশ্ন করা হয়েছিল : এর শেষ কোথায়? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : শেষ বা সীমা নেই—দ্য স্কাই ইজ দ্য লিমিট। মূল্যস্ফীতি প্রশমিত হবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ এলোমেলো হয়ে গেছে। এক বছর আগে আমরা মনে করতাম যে, সোনার আউন্স-প্রতি ৪০০ ডলারের সীমায় পৌঁছোন অসম্ভব। এখন মনে হচ্ছে তা খুবই সম্ভব।

শুধু ঐ দোকানের মালিকের নয় অনেক সাধারণ মার্কিন নাগরিকের তাই ধারণা। নিউইয়র্কের এক গৃহকর্ত্রী তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় ৩০০০ ডলারের বিনিময়ে ৫০টি মেক্সিকান স্বর্ণমুদ্রা (পেসো) ক্রয় করেন। মাত্র এক বছর আগে ঐ ৫০টি স্বর্ণমুদ্রা ৮২৫ ডলারে পাওয়া যেত। কেন তিনি এত দাম দিয়ে স্বর্ণমুদ্রা কিনলেন—এই প্রশ্ন করা হলে ভদ্রমহিলা উত্তর দিয়ে-ছিলেন : ডলার ডুবছে, এবং আমি মনে করি যে এই অবস্থায় সোনাই একমাত্র ভরসা। সুতরাং বাঁচবার জন্যে সোনাই কিনেছি।

সোনায় সোহাগা :

স্ফুতগতিসম্পন্ন সোনার দামের ফলে অন্তত একটা দেশ বিশেষ লাভবান হয়েছে : দক্ষিণ আফ্রিকা—অর্থনীতির ক্ষেত্রে তার এখন বৃহস্পতির দশা। তথাকথিত উন্মুক্ত জগতের ৮০ শতাংশ সোনা উৎপাদন করে এই দেশ। হঠাৎ যে সৌভাগ্যলক্ষ্মী এই-ভাবে আবির্ভূত হবেন তা দক্ষিণ আফ্রিকা ভাবতেও পারে নি। তেলের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে আরবরা বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকাকে উচিত শিক্ষা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তার তৈলনীতির ফলেই সোনার দাম আজ এই-ভাবে ঊর্ধ্বমুখী। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকার সোনা ত ছিলই এখন হয়েছে সোনায় সোহাগা। একজন অর্থনীতিবিদের ভাষায় : বিগত ২ হাজার বছরে অনেক মুদ্রা-ব্যবস্থারই উত্থান-পতন ঘটেছে, সোনা কিন্তু সব সময়েই বেঁচে গেছে। সুতরাং বিশ্ব-জনীন মুদ্রাসঙ্কটের দিনে যার সোনা আছে সে যে মজা লুটবে তাতে আর আশ্চর্য কি

২০-৩-৭৪ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

মনের খবর

মানসিক রোগ (৩০)

অপরিচিতাতঙ্ক বা অচেনাতঙ্ক : অজানা জায়গায় যেতে হলে অনেকেই কিছু অস্বস্তি বোধ করে থাকেন। কোথায় কি আছে কোথায় খাবো কোথায় থাকবো কি ব্যবস্থা সেখানে আছে ইত্যাদি খবর জেনে নেবার ইচ্ছা নতুন কোথাও যাবার আগে সকলের মনেই উঠতে পারে। যেখানের কোনও সঠিক খবর ভালভাবে পাবার সম্ভাবনা নেই, সে সব স্থানে যাবার উৎসাহও অভিযাত্রীদের কম নয়। মেরু অঞ্চলে যাত্রা, এভারেস্ট-এর চূড়ায় ওঠা নদীর উৎস নিরূপিত করা, সমুদ্রের তলদেশের তথ্য সংগ্রহ করার নানা অভিযানের কথা আমাদের জানা আছে। তাদের দুঃসাহসিকতা আমাদের বিস্ময় জাগায়। দৈহিক সক্ষমতা থাকলেও ঐসব অভিযানে যোগ দেবার মত মনোবল আমাদের অনেকেরই নেই। কোথায় কি ঘটবে সেই ভয়েই আমরা আগে থেকে পিছিয়ে পড়ি। এই অজানার ভয়ের সঙ্গে অজানা মানুষ সম্বন্ধেও আমাদের কিছু অস্বস্তি মনে জাগতে পারে। বিশেষ করে মনে করুন যদি এমন কোনও আদিবাসীদের দেশে যেতে হয়, যাদের কথা কিছু জানা নেই, তবে মনে নানা রকম শঙ্কা জাগতে পারে। সেই রকম যে মানুষ অপরিচিত তার সম্বন্ধেও ভয় কারও কারও মনে জাগে। বিশেষ করে যে যিনি মানে বড় প্রতিষ্ঠায় বড় বা যোগ্যতায় বড় বলে জানা আছে, তেমন লোক যদি অচেনা বা অপরিচিত হন তবে তার সঙ্গে দেখা করবার সম্ভাবনায় মনে ভয়-ভয় ভাব জাগতে পারে, বুক দুরদুর করে, বুক কাঁপে ইত্যাদি নানা রকম লক্ষণ দেখা দিতে পারে। চাকুরী সংক্রান্ত বিষয়ে, পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রভৃতি নানা অবস্থার সাক্ষাৎকারের সময় অনেকেরই গলা শুকিয়ে যায়, কথা বেরতে চায় না, হাত-পা কাঁপে, কে কি বলছে বা প্রশ্নকারী কি জিজ্ঞাসা করছেন, তাও ভাল করে শোনবার, বোঝবার ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়। এই রকম অভিজ্ঞতা অনেকেরই ব্যক্তিগত জীবনে আছে। নিজের তেমন না হয়ে থাকলেও জানাশোনা অনেকেরই এই দশা যে হয়েছে তার খবর নিশ্চয়ই জানা আছে। এসব খবরই সাধারণ ঘটনা, প্রায়ই তা ঘটে থাকে। কিন্তু অপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা করতে বা কথা বলতে গেলে যদি সে ভয়ের মাত্রা এমন হয় যে সে সব সম্ভাব্য ক্ষেত্রকেই এড়িয়ে চলতে হয় তবে তাকে আর স্বাভাবিক অবস্থা বলা যাবে না। এজন্য যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাও সে মেনে নেবে কিন্তু কিছুতেই অমন ক্ষেত্রে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কখনই দেখা করবে না।

এই শ্রেণীর আতঙ্কগ্রস্তদের মধ্যে দুই রকমের রোগী দেখতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর রোগী যে কোনও অপরিচিত লোকের সম্বন্ধেই ভয় পায়। ফলে পথে ঘাটে, বাজারে চলাফেরা করতে পারে না। সর্বদা সঙ্গে একজন লোক নিয়ে চলাফেরা করে। আরেক শ্রেণীর রোগীদের মধ্যে এরকম ভীতি দেখা না দিলেও, বিশেষ করে কারও সঙ্গে দেখা করতে বা কথা বলতে হলে আতঙ্ক বোধ করতে থাকে। এরা পথে চলতে পারে কিন্তু কারও সঙ্গে কথা বলতে চায় না। ট্রামে বাসে টিকেট চাইলে পয়সা দিয়ে কেবল গন্তব্যস্থানের নামমাত্র বলেই চুপ করে থাকে। অন্য যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে সাহস পায় না। দোকানে গিয়ে জিনিস চাইতে দরদস্তুর করতে ভয় পায়। তবু বিশেষ দরকার হলে তাও কিছু কিছু করতে পারে, কিন্তু বিশেষ কোনও লোকের সঙ্গে কথা বলতে অত্যন্ত ভয় পায়। বাড়িতে কেউ এলে নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে পারে না, অন্য একজনকে কথা বলতে, বা কে এলো দেখবার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে নিজে আড়ালে লুকিয়ে থাকে। এদের জীবনে যে কত অযথা ক্ষতি ঘটে যেতে পারে তা অনুমান করা সহজ। কিন্তু কিসের এত ভয়—তা জিজ্ঞেস করলে কোনও সঙ্গত উত্তর এদের কাছে পাওয়া যায় না। অস্পষ্ট কোনও অস্বস্তিকর সম্ভাবনায় যেন এরা পীড়িত হতে থাকে। কোনো কোনো সময় এমনও হয় যে সেই অপরিচিত ব্যক্তি রোগীর কোনও বিশেষ কিছু ক্ষতি করবে এরকম আতঙ্কও দেখা দেয়। বলতে শুনেছি সে লোক যদি হঠাৎ ডাকে দেয়! যদি হঠাৎ ধমক দিয়ে ওঠে! যদি [illegible] কিছু করে না ফেলে যায়! কিংবা কেন যে অপরিচিত কোনও [illegible] বিনা কারণে তাকে [illegible] ইত্যাদি [illegible] তার ওপর রেগে যাবে তার কোনও কারণ সে বলতে পারে না। তবু তার মনে হতে থাকে কিছু একটা ঐ রকম ঘটবেই। বেশ বোঝা যায় এরা অপরের সম্বন্ধে আদৌ বিশ্বাস রাখতে পারে না। এদের মনে অপরের আক্রমবৃত্তির যথেচ্ছ প্রকাশ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা খুব জোরালো থাকে। কিন্তু কথা হচ্ছে সেই অপরিচিত ব্যক্তি বাড়ির অন্য একজনের কোনও ক্ষতি করছে না, মারছে না, বকছে না কিছুই করছে না, বা করবে না মনে করেও নিজের বেলায় সে বিশ্বাস রাখতে পারে না কেন? খুব সংক্ষেপে বলা যায় শৈশবের কোনও ঐ জাতীয় ভয় রোগীর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে এই সমস্যার সৃষ্টি করে। মনে রাখতে হবে সেই শৈশবকালে যা ঘটেছিল সে ঘটনা বাস্তবিক পক্ষে ততটা গুরুতর ছিল কিনা সেটা বড় কথা নয়, ঘটনা ঘটবার সময় শিশুর এই ভয়ের প্রক্ষোভ কতখানি প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল, শিশু তখন কতটা ভয় পেয়েছিল আর সেই ভয় পেয়ে সে কী পরিমাণ আতঙ্কিত হয়ে কী প্রতি-ক্রিয়া তার দেখা দিয়েছিল সেই সবই হল বড় কথা। সাধারণ ঘটনাও শিশুর বিশেষ মানসিক অবস্থায় ঘটবার ফলে তার প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। এই ভয়ের ছাপ বা স্মৃতি শিশুর মনে এমন ভাবে গাঁথা হয়ে যেতে পারে যে পরবর্তী জীবনে অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখীন হতে গেলেই তার সেই পুরোনো ভয়ের স্মৃতির প্রভাবে সে কাতর হয়ে পড়ে। অতীতের সে ঘটনার স্মৃতি শিশুর মনে থাকে না, পরবর্তী জীবনে তাই চেষ্টা করলেও তার কাছে থেকে তার আতঙ্কের কোনও যোগ্য কারণ পাওয়া যায় না। মনঃসমীক্ষণ করবার সময় এইসব অতীত স্মৃতি আবার ফিরে আসে। ঘটনা যে ঠিক ঠিক মনে পড়ে যাবেই তা জোর করে বলা যায় না। কিন্তু যে কোনও কাল্পনিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়েও তার শৈশবের সেই আতঙ্ক আবার নতুন করে মনে জাগে। তখন রোগীর প্রক্ষোভ এত তীব্র হয়ে দেখা যায় যে সে নিজে বড় [illegible] চিকিৎসার সময় সেসব কথা বলতে গিয়ে [illegible] ছটফট করতে থাকে বা আতঙ্কে একেবারে জড়সড় হয়ে পড়ে। [illegible]—

মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমন কি এক এক সময় রোগী ঘেমে নেয়ে ওঠে বা কাঁপতে থাকে, তাও হয়। অতি ক্রোধযুক্ত শাসন, অতি তীব্র শাসন ইত্যাদি থেকেও এই জাতীয় আতঙ্কের সৃষ্টি হতে পারে। শিশুর ভবিষ্যতে কল্যাণের জন্য তাই ঐ ধরনের শাসন অবশ্য বর্জনীয়। কিন্তু একথা বলা যত সহজ কাজে তা পালন করা মোটেই সহজ নয়। এর প্রধান কারণ পিতা-মাতা বা বড়দের নিজেদের মেজাজের উপর তাদের দখল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বেশ কম থাকে। নিজেদের ইচ্ছা সন্তানের উপর জবরদস্তিতে চাপানো, নিজেদের ভাল মন্দ বিচার দিয়ে শিশুকে শাসন করা, নিজেদের অসহনশীলতার জন্য শিশুকে অতিমাত্রায় শাসন করা, এতো হামেশাই ঘটছে। তার প্রতিক্রিয়া সন্তানদের মধ্যে কম বেশী দেখা দেবে তাইতো স্বাভাবিক। ভাল মা বাবা হওয়া বড় কঠিন কাজ। কৃত্রিমতা মিথ্যাচার ইত্যাদি দোষ ত্রুটি শিশু বড়দের মধ্যে খুব সহজে ধরতে পারে। আমাদের সাধারণ ধারণা—শিশুরা শিশু বলেই তারা কিছু বোঝে না, তাই তাদের যেমন তেমন করে ভোলানো যায়। এ ধারণা প্রথমাবস্থায় আংশিক সত্য হলেও তা প্রকৃত সত্য নয়। আমরা বড়রা শিশুদের যত বোকা বা অবুঝ মনে করি শিশু ঠিক তত বোকা বা অবুঝ নয়। তারাও নিজেদের মত করে বড়দের বুঝে নেয়। সে বোঝা যে সবটুকুই ভুল তা মোটেই নয়। বিশেষ করে প্রক্ষোভের প্রকাশ শিশু যেমন সহজে বুঝতে পারে আমরা তা পারি কিনা অনেক সময় সন্দেহ হয়। শিশুর বুদ্ধি বড়দের চেয়ে কম হতে পারে কিন্তু আবেগ প্রক্ষোভ ইত্যাদি বোঝবার ক্ষমতা তাদের বেশ প্রবল থাকে। পশু-পক্ষীদের মধ্যেও এই বোঝবার ক্ষমতা বেশ দেখতে পাওয়া যায়। কে ভালবাসে, কে ভয় পায়, কে বা ঘেন্না করে, কে পছন্দ করে না, বিশ্বাস করে না—এসব সহজে বোঝবার ক্ষমতা পশুপাখীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। যাঁরা পশুপক্ষী পোষেন তাঁদের এ অভিজ্ঞতা আছে। মানব শিশুদেরও সে ক্ষমতা মোটামুটি আছে। অবশ্য সব শিশুর এ ক্ষমতা সমান থাকে না। কোনও শিশুর হয়ত বিশেষ কোনও প্রক্ষোভ বা ভাবের আবেগের প্রকাশ বোঝবার অন্য প্রক্ষোভে বা আবেগ বোঝবার ক্ষমতার চেয়ে বেশী থাকে। এইসব নানা জটিল কারণে একই ঘটনা দুটি শিশুকে ঠিক সমভাবে উদ্দীপিত করে না। তাই তাদের প্রতিক্রিয়াও ঠিক এক রকম বা সমপরিমাণের হয় না। অনেক অজানা বিষয়ও এর মধ্যে থেকে যায়, যার সঠিক পরিচয় আজও আমাদের জানা নেই। তাই কোন ঘটনা কাকে কি ভাবে নাড়া দেবে, কার মনে কতখানি আন্দোলন সৃষ্টি করবে আর তার আঘাত কতখানি গভীর রেখাপাত করবে তা ঠিক ঠিক বলা আজও সম্ভব নয়। তবুও মোটামুটি কিছু কিছু বলা সম্ভব। যতটুকু জানা গিয়েছে তার আলোকে যদি শিশু পালন করা সম্ভব হয় তবে শিশুর প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।

একদিকের কথা বলা হল। এছাড় শিশুর নিজস্ব মানস গঠনের উপরও এই আতঙ্ক বোধ করা না করা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সে আলোচনা জটিল বলে ভবিষ্যতের জন্য থাকুক। এখানে সে বিষয় বলতে গেলে সব মিলেমিশে জোট পাকিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। নানা কথা শুনতে শুনতে মনটা আরেকটু প্রস্তুত হলে পরে সে আলোচনা করা যাবে। এখন দু-একটা উদাহরণ দিয়ে এই অপরিচিতাতঙ্ক বিষয়ে আলোচনা শেষ করব।

একটি যুবতী মেয়ের কথা মনে পড়ছে। বয়স ১৮।১৯ বছর হবে। লেখাপড়া কিছু-দূর করেছে, কিন্তু ইস্কুলের সীমা পার হতে পারে নি। এই না পারা তার বুদ্ধিবিদ্যার অভাবের জন্য নয়। আর বেশী সম্ভব হয় নি তার ঐ আতঙ্কের জন্য। ছোট বেলাতেও সে নূতন লোকদের কাছে যেতে চাইতো না। মায়ের বা অন্য পরিচিতদের কোলে কোলে থাকতো। একটু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ বোঝা যেতে লাগলো মেয়েটি 'ভীতু'। নূতন কোনও ছেলে মেয়ে তার সঙ্গে খেলতে এলেও সে সহজে তাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতে পারতো না। বাড়ির আঙিনা থেকে বাইরে যেতে চাইতো না। গ্রামে থাকতো। বাড়ির আঙিনা মোটামুটি ভালই ছিল। সেইখানেই তার খেলাধূলা। কেউ বাড়িতে এলে সে ছুটে বাড়ির ভেতরে চলে যেতো। নবাগত তাকে ডাকলেও সে আর বেরিয়ে আসতো না। প্রথম প্রথম বাড়ির লোকেরা তাকে 'ভীতু' বলতো। যত বড় হতে লাগলো তত তার এই ভয়কে অন্যেরা লজ্জা বলে মনে করতে লাগলো। তখন তাকে বলতো 'লাজুক'। এই লাজুক মেয়েটিকে এক সময় শহরে আসতে হয়। ইস্কুলেও যেতে হয়। তাতে কিছু সহজ হলেও মূলে কিন্তু সে একই রয়ে গেল। বড় হতে লাগলো কিন্তু ক্লাশের মেয়েদের মধ্যে দু-একজনের সঙ্গে ছাড়া আর অন্যদের সঙ্গে সে বিশেষ কথা বলতো না, মিশতো না। অন্য মেয়েরাও তার এই স্বভাবের জন্য তার সঙ্গে মিশতে চাইতো না। বয়স যখন আরও বাড়লো—তখন বড় ইস্কুলে ভর্তি করা হল। সেখানে এসে তার সমস্যা দেখা দিতে লাগল। কারও সঙ্গে ভাল করে মিশতে পারে না। শিক্ষিকাদের সঙ্গেও কথা বলতে পারে না। প্রশ্ন করলে জানা উত্তরও ভুল হয়ে যায়। কি প্রশ্ন করা হল তাও যেন ভাল করে শুনতে পারে না। অন্যেরা বলতে আরও করলো নার্ভাস। ক্রমে এমন হল যে ক্লাশে শিক্ষিকা আসবার সময় হলেই তার আতঙ্ক দেখা দিত। গলা শুকিয়ে যেতো, চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো। একদিন কি কারণে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তাদের ক্লাশে আসেন। তাঁকে সে আগে কোনো দিন দেখেনি। তাঁকে দেখে সবাই দাঁড়িয়েছে। সেও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াতে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাবার মত হয়ে বসে পড়লো। প্রধানা কিছু বলে ক্লাশ থেকে চলে গেলে পরে অন্য মেয়েরা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল 'কিরে ভূত দেখেছিলি নাকি?' তার অবস্থা সত্যি ভূত দেখার মতই হয়েছিল। সেদিন আর কোনো ক্লাশেই সে তার মত স্বাভাবিক হয়েও থাকতে পারে নি। সেদিন বাড়ি ফিরে গিয়ে সে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারপর থেকে আর সে ইস্কুলে আসেনি। বাড়িতে থেকেই যা কিছু লেখাপড়া করেছে। এই ১৮।১৯ বছর বয়সেও তার অপরিচিত লোকের সামনে বেরুনো সম্ভব হয় না। কিসের যে অসম্ভব আতঙ্ক তাকে পেয়ে বসে তা সে বুঝতে পারে না, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সে নিজেকে সামলে নিয়ে অপরিচিতের সামনে বেরুতে পারে না। বিয়ে দিয়ে দিলে সব সেরে যাবে মনে করে অভিভাবক তার বিয়ের চেষ্টা করেন। মেয়ে দেখতে কয়েকবার পাত্র পক্ষের লোক এসে মেয়ের অবস্থা দেখে আর সম্বন্ধ করতে এগোয় নি। তাদের সামনে সে কিছুতেই আসতে চায় না। জোর করে নিয়ে আসার ফলে তার এমন অবস্থা হল যে সে নিজের নাম পর্যন্ত ভুলে গেল। নাম জিজ্ঞেস করলে সে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর নিজেদের লোকের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি সে ঘর ছেড়ে চলে যেতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। পাত্রপক্ষ মাথার গোল-মাল আছে বলে ফিরে যায়। কয়েকবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে পরে এটাকে রোগ মনে করে চিকিৎসা করাতে আনেন। চিকিৎসা আজও চলছে। অবস্থা এখন অনেক ভাল। সে এখন অনেকের সঙ্গে হেসে গল্প করতে পারে। কিন্তু আজও রোগের মূল তার রয়ে গেছে। সেরে যাবে আশা আছে।

এই ধরনের মানসিক রোগীর বিষয় কম-বেশী অনেকের জানা আছে, তাই আর বেশী উদাহরণের প্রয়োজন হবে না।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

চিরবাসায় সেদিন

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

আমার কাছে নতুন জায়গা মানেই নতুন মানুষ। চিরবাসা মানে সে জায়গার পাথর পাহাড় বা অরণ্যই শুধু নয় মানুষও বটে বিশেষ করে 'নতুন মানুষ' রামরতন সিনহা।

ভুল বললুম। নতুন বললে সামান্যই বলা হয়। 'অদ্ভুত' বলা-ই বোধ করি ঠিক। কেননা অদ্ভুত না হলে কেউ কি অমন চিঠি লেখে? এবং বিশেষ করে নতুন আলাপ-পরিচয়ের পর?

এই সেদিন আলাপ রামরতন সিনহার সঙ্গে। অথচ এরই মধ্যে হঠাৎ তার পত্রাঘাত। লিখেছেন আগাগোড়া ভুল ইংরেজীতে যা লিখেছেন তা বাংলা করলে এই রকম দাঁড়ায়—

মনে পড়ে? হতভাগ্য রামরতন সিনহাকে? গোমুখী পথে চিরবাসায় যেতে যেতে আলাপ? তারপর ঐ চিরবাসায় বসেই গল্প? কত গল্প! কত কথা! মনে পড়ে? আমি কিন্তু ভুলি নি। মনে রেখেছি। সব। তাই তো দেখুন না লিখতে বসলুম নিজের কথা কিছু বলে মনটাকে আবার একটু হালকা করতে চাই। কী জানেন সেই ঝামেলা শুরু হয়েছে আবার। রাত হলেই আবার সেই বিদঘুটে কাণ্ড। ঘুমুতে পারি না। এমন কি দিনেও দুঃস্বপ্ন দেখি। বলতে পারেন কবে এর শেষ? এ থেকে মুক্তি? আপনাকে সব কথা একদিন খুলে বলেছিলাম। ধৈর্য ধরে সবকিছু শুনেছিলেন আপনি। ভরসা দিয়েছিলেন—ভয় নেই। সব একদিন ঠিক হয়ে যাবেই।... কিন্তু কই হল? সব যে আজও ঠিক তেমনি চলছে। ঠিক সেই ঝামেলা! সেই বিদঘুটে কাণ্ড!.....

চিঠিটা বন্ধ করে ভাবতে বসি। কিছুদিন আগেকার কতকগুলো ঘটনা মনে পড়ে। হ্যাঁ রামরতন সিনহা সব কথা খুলে বলেছিলেন বটে। আমিও ভরসা দিয়েছিলাম ভয় নেই। সব একদিন ঠিক হয়ে যাবে।

রামরতন সিনহার সঙ্গে আলাপ এই সেদিন গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখী যাবার পথে। পথ দুর্গম ভয়ংকর। খাড়া পাহাড়ের গা কেটে অনেক কষ্টে গড়া। কোথাও আবার পথ বলতে আদৌ কিছু নেই। 'বোল্ডার' বা এবড়ো-খেবড়ো পাথর ডিঙিয়ে খুব সাবধানে যেতে হয়। এছাড়া জায়গায় জায়গায় ধস। সরু বিপজ্জনক পথও নিশ্চিহ্ন। অতি সন্তর্পণে ধসকে পাশ কাটিয়ে অথবা ধসের উপর দিয়েই পথ-চলা।

পথ মানে সরু এক ফালি ফিতে যেন পাহাড়ের উপর বিছিয়ে রাখা। তারই উপর কোনো রকমে পা ফেলে যেতে হবে। একটু অসতর্ক হলে আর রক্ষা নেই। সোজা একেবারে হাজার খানেক ফুট নীচে গঙ্গাগর্ভে।

খুব সন্তর্পণে চলি। বেশ ধীরে ধীরে। হাতে পাহাড়ে চলার লাঠি; জংলী বাঁশের তৈরী। তলায় লাগানো লোহার 'স্পাইক'।

এ-জিনিস আমাদের 'বেস-ক্যাম্প' হরিদ্বার থেকে কেনা। এছাড়া আসবার সময় পথে আরও অনেক জিনিস কিনেছি। অর্থাৎ সব এগিয়েছি গোমুখী-অভিযানের সাজ-সরঞ্জামও তুচ্ছ বেড়েছে। যেমন হরিদ্বার থেকে পনের মাইল দূরে ঋষিকেশ। সেখান থেকে কিনলাম পাহাড়ে ওঠার জুতো। ঋষিকেশে এক রাত্রি থেকে উত্তরকাশী যাত্রা। বাস ধরা গেল পরদিন সকালবেলা। দিনভর বাসে চলে উত্তরকাশী যখন পৌঁছুলাম, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। গঙ্গার তীরে পাহাড়িয়া শহরটা

তখন ঝায়াপন্থী। ঠান্ডা হিমে হাওয়া ধারে-কাছের অরণ্য থেকে ভেসে-আসা মর্মর-ধ্বনি এবং একেবারে কানের কাছেই গংগার কল্লোল মন-প্রাণ জুড়িয়ে দিল। এই উত্তর-কাশী থেকে কেনা হল 'লুকোজ'। গোমুখীর পথে এ-জিনিসটিও নাকি খুব দরকার।

কিন্তু দরকারের যদি শেষ থাকতো! উত্তরকাশীতে রাত্রিবাস করে পরদিন ভোর-বেলা আবার বাস ধরি। পাঁচ-ছ ঘন্টার পাহাড়ী পথ পেরিয়ে পৌঁছুই লংকা চটি। জায়গাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ন' হাজার ফুট উঁচুতে। বেগলোর বাস সার্ভিস' এখানে এসেই শেষ। এই লংকা চটিতেও দরকারী জিনিস কিছু কিনলাম। বাড়তি দাম দিয়ে এখান থেকে কেনা হল আপেল। গংগোত্রী বা গোমুখী অঞ্চলে এ-জিনিস নাকি দুষ্প্রাপ্য।

ভাবি তা হবে। অনেক উঁচুতে ওরা। অত উঁচুতে আপেল হয় না। এদিকে লংকা চটিতে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে ধরি ভৈরবঘাটির হাঁটা-পথ। মাত্র তিন মাইল পথ। অথচ এ পেরিয়ে ভৈরবঘাটি পৌঁছুতেই যেন দম বেরিয়ে যায়।

ভৈরবঘাটি পৌঁছে দেখি ওখানে আর এক দরকারী জিনিস আমাদের অপেক্ষায়। জিনিসটি হল কমলালেবু।

ভৈরবঘাটি থেকে গংগোত্রী মাইল ছয়েকের পথ। এ-পথে শাটল বাস চলে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে দশ হাজার ফুট উঁচু গংগোত্রী অবধি আসে।

এমন কি গংগোত্রী পৌঁছেও আমাদের দরকারী জিনিস সংগ্রহের বিরাম নেই। সহযাত্রীদের একজন লেপ ভাড়া নিলেন। আর একজন নলেন 'স্লীপিং ব্যাগ'।

গংগোত্রী থেকে গোমুখী বারো মাইল পথ। এ-পথে শ্রীচরণই একমাত্র ভরসা। এমন কি ডান্ডি কান্ডি বা ঘোড়া-ও এখানে অচল। তাই সেই সাত-সকালে গংগোত্রী থেকে বেরিয়ে অবধি সবাই আমরা হাঁটছি।

খুব সাবধানে হাঁটছি ডান-পাশে খাদ আর বাঁ-পাশে পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য রেখে। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ছি এক এক সময়। ছায়া-ঢাকা চওড়া একটু জায়গা দেখলেই জিরোচ্ছি। ঘাম বেরোচ্ছে দেহ থেকে। গরম লাগছে।

ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হবে। কারণ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এগারো হাজার ফুট উঁচুতে আমরা। চারিদিকে আমাদের বরফে ঢাকা পাহাড়। এমন কি পায়ের তলাতেও জায়গায় জায়গায় জমাট বরফ। এহেন জায়গায় শীতে কুঁকড়ে যাবার কথা। অথচ শীতের বদলে গরম লাগছে। এমন কি বেশির ভাগ গরম জামা-কাপড় খুলে ফেলেও সোয়াস্তি মিলছে না।

আসলে এ হল পথ-চলার ক্লান্তি। একে চড়াই পথ তায় আবার বিপদ-সঙ্কুল। সব মিলিয়ে তাই চলার ক্লান্তিটাও বেশি।

কিন্তু ঠিক ক্লান্তিই বা কী করে বলি। দু-চার মিনিট বসতে না বসতেই চাঙ্গা হয়ে উঠি আবার। এগোবার উদ্যোগ করি।

লক্ষ্য করেছি উঁচু হিমালয় অঞ্চলের এ এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। সেখানে মানুষের ক্লান্ত হতে যেমন ক্লান্তি ভুলতেও তেমন সময় লাগে না।

মনে পড়ে সেদিন ক্লান্তি ভুলবার মুহূর্তেই রামরতন সিনহার সংগে প্রথম আলাপ। ছায়া-ঢাকা এক জায়গায় পাথরের উপর বসে আছি। সহযাত্রীরাও ধারে-কাছেই। হঠাৎ দেখি মাঝবয়সী দোহারা চেহারার এক ভদ্রলোক। আমাদের কাছাকাছি পথের উপরেই ধপ্ করে বসে পড়লেন।

লোকটিকে দেখে মনে হল অবাঙালী। পথের ধকলে ক্লান্ত অবসন্ন। তাড়াতাড়ি ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে শুধালাম—কষ্ট হচ্ছে?

পরিষ্কার হিন্দীতে উনি জবাব দিলেন—তা হচ্ছে। কিন্তু হলেই বা উপায় কী বলুন? জেনেশুনেই তো এ-পথে আসা।

জানতে চাইলাম—কোত্থেকে আসছেন?

—ধানবাদ! বিহারের ধানবাদ থেকে। কিন্তু কেন বলুন তো? —ভদ্রলোক আমার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকান।

এদিকে আমিও সন্দিগ্ধ। কারণ দিব্যি নাদুস-নুদুস এবং সুখী চেহারার ঠিক এই রকম একজন লোককে গোমুখীর পথে দেখবো এ আমি আদৌ আশা করি নি। তবু নিজের বিস্ময়কে যথাসম্ভব চাপা দেবার চেষ্টা করে বললাম—কী জানেন। আমরা বাঙালী। কলকাতার লোক। বাইরে বেরিয়ে অভিযাত্রী বা পর্যটক গোছের কাউকে দেখলেই জানতে ইচ্ছে করে একই গোত্রের কিনা। বাঙালীরা বিশেষ করে কলকাতার ওরা ভ্রমণে আবার একটু বেশি উৎসাহী হে!

—ওঃ! এই কথা! —ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন। কিন্তু আমার মনে হল হাসিটা যেন ওর ধর্ম, নতুন কোনো প্রশ্নকে ঠেকাবার আছিলায়। তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আর কিছু জিজ্ঞাসা করা গেল না। গাইড এবং কুলিকে সংগে নিয়ে উনি উঠে পড়লেন। আমরাও এগোলাম।

আমাদের গন্তব্যস্থল চিরবাসা গংগোত্রী থেকে সাত মাইল দূরের এক বিশ্রাম-কুঞ্জ। না একদিনে এর বেশি যাওয়া আমাদের সাধ্যাতীত। কারণ হাঁটছি ধীর লয়ে; দেখে দেখে চোখে চোখে জিরিয়ে জিরিয়ে। এই রকমভাবে হাঁটলে এবং বিশেষ করে এ-ধরনের দুর্গম পথে—একদিনে সাত মাইল পথ চলাই ভাগ্যের কথা।

কিন্তু ভাগ্য যেন প্রতিকূলে ঠেকছে! আকাশের চেহারা ভালো নয়। তার জায়গায় জায়গায় ছিটে-ফোঁটা মেঘ। ক্রমেই তা আয়তনে বাড়ছে। অদূরে শিবলিঙ্গ আর ভাগীরথী পর্বত। দিব্যি চোখে পড়ছিল এতক্ষণ—তুষারধবল গম্ভীর রহস্যময়। হঠাৎ ওরা মেঘে ঢেকে গেল। যেন ধুনুচির ধোঁয়া। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ধুনুচি। হাতে নিয়ে হঠাৎ কেউ যেন ভুবন-জোড়া আরতি শুরু করল।

বৃষ্টি হবে? না কি তুষারপাত? ভাবনায় পড়ি। এমন জায়গায় বৃষ্টি হলে জানোয়ারের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজা ছাড়া উপায় নেই। কারণ ছাতা নেই কারও। প্ল্যাস্টিকের সস্তা দামের বর্ষাতি গায়ে। দমকা হাওয়ার দাপটে এরই মধ্যে তা শতছিন্ন। এদিকে ধারে-কাছে ঘর-বাড়ি তো দূরের কথা গাছ-পালা পর্যন্ত নেই। অতএব এহেন জায়গায় বৃষ্টি বা তুষারপাত মানে সাক্ষাৎ সর্বনাশ।

দুশ্চিন্তায় আতঙ্কে বুক কেঁপে ওঠে যাত্রীদের। পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়াই। এ ওর মুখের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করি। গাইড কৃপাল সিং অবিশ্যি ভরসা দেয়—ডরো মৎ বাবুজী! মৎ ঘাবড়াও! চিরবাসা থোড়ি দূর হি্‌য়াসে।

ভাবি তা হবে। তবে উল্টোটা হওয়াও বিচিত্র নয়। কারণ বহুবার লক্ষ্য করেছি পাহাড়ীয়ারা দূরত্বকে অনেক সময় কমিয়ে বলে। প্রধানতঃ দুটো কারণ থাকে এর পেছনে। এক—অজ্ঞতা দুই—ক্লান্ত যাত্রীকে চাংগা রাখা।

এখানে শেষের কারণটাই কার্যকরী মনে হল। কারণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দিব্যি আমরা টের পাচ্ছি যে সবাই শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন।

সবচেয়ে শোচনীয় রামরতন সিনহার অবস্থা। তিনি রীতিমত টলছেন। থেকে থেকে দাঁড়াচ্ছেন লাঠি ভর দিয়ে। ধুঁকছেন।

যাত্রীরা সবাই এখন একজোট। রামরতন সিনহা এখন আমাদের দলে। আকাশে দুর্যোগের গন্ধ পেয়ে কখন যে সবাই আমরা একসংগে চলতে শুরু করেছি তা টেরই পাই নি।

কিন্তু সিনহার মনে হল কৃপাল সিং-এর কথা ঠিক বিশ্বাস করছেন না। তাই কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভেবে নিয়ে কৃপাল-এর কথার প্রতিবাদ করেন—থোড়ি দূর চিরবাসা? নেহি। কভি নেহি। ঝুটমুট ভরোসা মৎ দেনা।

বললুম—দেখুন ভরসা যদি দিয়েও থাকে তো ওর চেয়ে আমাদেরই লাভ বেশি। কারণ ও নয় আমরাই ক্লান্ত।

রামরতন সিনহা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন,—তা বটে। তা বটে। তবে কী জানেন, খানিক আগে যেন একটা মাইল-স্টোন দেখলুম। ওতে লেখা, চিরবাসা ২ কিলোমিটার।

বললুম, — মাইল-স্টোন-এর কথা ছেড়ে দিন। কলকাতা বা দিল্লীর বাস-স্টপকে যেমন, এ-কেও ঠিক তেমনি বিশ্বাস করা যায় না। সেক্ষেত্রে বাস পেতে পেতে দশ মিনিটের জায়গায় এক ঘন্টা দশ মিনিট লাগতে পারে। আর এক্ষেত্রে, দু' কিলোমিটারের মানে হতে পারে বারো কিলোমিটার। দু'-এর পাশে এক-টা কবে কোন মান্ধাতার আমলে হয়তো উঠে গেছে। অথবা রাস্তা বার বার ধসে গিয়ে পথ বদল হয়ে হয়ে দূরত্ব এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে ঐ দুয়ের পাশে এক থাকলেই মানায় ভালো।

রামরতন সিন্‌হা হেসে উঠলেন,—বাঃ! চমৎকার! খাসা বলেছেন। কী জানেন, মাইল-স্টোন-এর হেরফের আর কী করে জানবো! তবে বাস-যাত্রীদের অসুবিধের কথা শুনেছি বটে।

বলতে যাচ্ছিলুম,—কেন। চাক্ষুষ করেননি? নিজে ভোগ করেননি অসুবিধে? কিন্তু বলা আর হল না। তার আগেই চোখ পড়ল আকাশের দিকে। গলা এক মুহূর্তে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

আকাশের অবস্থা ভয়ঙ্কর। চারিদিক মেঘে ঢাকা। যেন ধূসর এক চাঁদোয়া টাঙানো। শীত বেড়ে গেছে এরই মধ্যে। ঝড়ো হাওয়া অবিরাম যেন চাবুক মারছে।

দেখতে দেখতে হওয়ার দাপট বেড়ে চলল। চারিদিক থেকে শন-শন, শোঁ-শোঁ, হিস-হিস—অদ্ভুত কত কী আওয়াজ ভেসে এল। কতবার মনে হল, হঠাৎ কোনো মন্ত্রবলে গাছপালাহীন রুক্ষ পাথরগুলো প্রাণ পেয়েছে। ওরা কথা কইছে।

কৃপাল সিং কি ওদের ভাষা বুঝতো? না কি বুঝতে চাইত? একবার মনে হল, কান পেতে ও যেন কী শুনছে।

এদিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। না থেমে, না দাঁড়িয়ে, এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে। যেমন করে হোক আজই চিরবাসায় পৌঁছুতে হবে। এ-পথে, ঠিক এইরকম পরিবেশে অপেক্ষা করা মানে, মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ; কেননা, যা অবস্থা, তাতে যে-কোনো মুহূর্তে তুষার-ঝড় শুরু হতে পারে। যেন অদ্ভুত এক রঙ্গমঞ্চ। সব সেখানে তৈরী। আসল অভিনেতা মূর্তিমান কোনো ধ্বংস ও সর্বনাশের আসবার আসবার অপেক্ষা শুধু।

কিন্তু না, শেষ অবধি সে এলো না। তার পার্শ্বচররাই আসর মাতিয়ে রাখল। তুষারপাত শুরু হল খানিক বাদে।

এ এক মজার দৃশ্য। যেন গুঁড়ি গুঁড়ি পেঁজা তুলো। ফুটো আকাশ ভেদ করে স্বর্গ থেকে মর্তে্য গড়িয়ে পড়ছে।

না, ভুল হল বোধ করি। মর্ত্য বলতে আলাদা কোনো জায়গার অস্তিত্ব তখনও কি ছিল? স্বর্গ-মর্ত্য সব কি একাকার হয়ে যায়নি?

খানিক বাদেই দেখি, হ্যাঁ, সব একাকার। সাদা কোমল বরফের আবরণ চারিদিকে। আর পড়ন্ত তুষারকণাগুলো যেন সাদা ফুলের পাপড়ি। অমরাবতীর দেশে পুষ্প-বৃষ্টির মতো অহরহ ঝরছে তো ঝরছেই।

আমাদেরও এখন আর চেনবার জো নেই। সারা গায়ে তুষারকণা। যেন দেবদূত কয়েকটি। লক্ষ কোটি সাদা ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে স্বর্গাভিসারে চলেছি।

রামরতন সিন্‌হা এ-দৃশ্য দেখে খুব খুশী। যেন অযাচিতভাবে অরূপ-রতন হাতে পেয়েছেন, ঠিক এমনি একটা ভাব দেখিয়ে বললেন,—আশ্চর্য! অদ্ভুত। এ-জিনিস নিজের চোখে কোনোদিন দেখবো, স্বপ্নেও ভাবিনি।

আমাদের দু' নম্বর গাইড দ্বিজেন্দ্র সিং এ-উচ্ছ্বাসকে মোটে পাত্তাই দেয় না। যাত্রীদের নতুন করে সাবধান করে দিয়ে বলে,—বরফ গিরতা হুজুর। পর্বত কা হালৎ আচ্ছা নেহি। সামাল্‌কে চলো। অর্থাৎ, বরফ পড়ছে। পাহাড়ের অবস্থা ভালো নয়। দেখেশুনে চলো।

দ্বিজেন্দ্রর উক্তি মূল্যবান, সন্দেহ নেই। কারণ, বরফ পড়ে চারিদিক ভয়ানক রকম পিছল। সাবধানে না চললে পা হড়কে পাতালে যাবার সম্ভাবনা।

পাতাল? — বিশেষত্ববর্জিত কিম্ভূত-কিমাকার ঐ জায়গাটার নাম মনে আসতেই আঁৎকে উঠি। নীচের দিকে তাকাই। অনেক দূরে, অনেকখানি নীচে চোখে পড়ে কয়েকটা গাছ। যেন সাদা কম্বল মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে।

দ্বিজেন্দ্র বুঝিয়ে দেয়,—ওই হল চির-বাসা। বরফ পড়েছে। তাই অমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে জায়গাটা।

ভাবি, হ্যাঁ; অদ্ভুতই বটে। চিরবাসা পুরোদস্তুর অদ্ভুত। গাছপালাহীন রুক্ষ পাহাড়ের মাঝখানে এক ফালি সমতল জায়গা। অরণ্যের জমাট আসর সেখানে।

অনেকটা উঁচু থেকে দেখছি। চির-বাসার বৈশিষ্ট্য তাই পুরো চোখে পড়ছে। দিব্যি দেখতে পাচ্ছি এখন, চারিদিকে পাহাড়-প্রাচীরের মাঝখানে সে নিঃসঙ্গ, রহস্যময় ও অপরূপ।

ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামি। যেন একটা বাটি। তার গা বেয়ে নামি একদল পিঁপড়ে। বাটির তলদেশে ঠিক মাঝামাঝি জায়গাটায় যেতে হবে। চিরবাসা সেখানেই।

যাচ্ছি খুব সাবধানে। উৎরাই পথ। তুষার জমে জমে তা হয়ে উঠেছে বিপজ্জনক। তবে নতুন তুষারপাত এখন আর নেই। বেশ খানিকক্ষণ তা বন্ধ।

এদিকে আশ্চর্য! তুষারপাত নেই, অথচ শীত এরই মধ্যে হঠাৎ যেন বেড়ে গেল। চির-অরণ্যে ঢুকে রামরতন সিন্‌হা রীতিমত কাঁপছিল। তুষারের উপরেই হঠাৎ বসে পড়লেন।

গাইড কৃপাল আর দ্বিজেন্দ্র সিং-এর অসীম ক্ষমতা। আমাদের অপেক্ষা করতে বলে কোথেকে কিছু বড়ো গাছপালা নিয়ে এল, এবং তারপর, মুহূর্তের মধ্যে আগুন জ্বালাল।

আশ্চর্য! সে-আগুনে দু-চার মিনিটের মধ্যেই আমরা চাঙ্গা। রামরতন সিন্‌হাও নতুন মানুষ যেন।

এরপর আবার পথ-চলা। চির-অরণ্য ধরে এগোন।

চির মানে বিশেষ এক জাতের পাইন। পর্বতের খুব উঁচু মহলের বাসিন্দা। এখানে জমজমাট ওদের আসর। যেন এ ওর হাত-ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে।

এদিকে হাত ধরে আছেন রামরতন সিন্‌হাও। গাইড কৃপাল সিং-এর হাত। চাঙ্গা হয়ে উঠলেও তিনি টলছেন।

অবশ্য বেশিক্ষণ কাউকেই কষ্ট করতে হল না। চির-অরণ্য ধরে খানিক দূর এগোতেই আমাদের বিশ্রামকুঞ্জ, রেস্ট-হাউস।

সাধারণতঃ রেস্ট-হাউস বলতে সুদৃশ্য বা সৌখিন যেসব কুটির বোঝায়, এ ঠিক তা নয়। এ হল গিয়ে কোনোরকম কাজ-চলা গোছের, দো-চালা টিনের ঘর। স্রেফ প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে এ তৈরী। গোমুখী-যাত্রীরা দরকার হলে এখানে রাত্রি-বাস করতে পারেন।

আমাদের বেলায় দরকার-অদরকারের প্রশ্ন নেই। চিরবাসায় আমরা থাকবো, এ আগে থাকতেই ঠিক। অতএব তাড়াতাড়ি বিশ্রামের উদ্যোগ-আয়োজন শুরু হল। রামরতন সিন্‌হা সন্ধ্যে হতে না হতেই এলিয়ে পড়লেন। আমরাও তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম।

ছোট্ট এক টুকরো ঘর। দরজা-জানলা সব বন্ধ। গাদাগাদি করে কয়েকজন শুয়ে আছি। রামরতন সিন্‌হা আমার পাশেই।

তখনও ঘুমোননি, উসখুস করছেন। ভাবলাম, ডাকি একবার। ভদ্রলোকের কষ্ট হচ্ছে কিনা, শুধোই। কিন্তু তা আর হল না। নিজেই তার আগে ঘুমিয়ে পড়লাম।

।। দুই ।।

কিছু কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম, খেয়াল নেই। হঠাৎ। ঘুম ভাঙল খসখস শব্দে। চোখ মেলে তাকাতেই দেখি, ঘরে ছিটেফোঁটা চাঁদের আলো, আধো-আলো আধো-অন্ধকার পরিবেশ। আর রামরতন সিনহা জেগে বসে। হাতে একটা বোতল, কী যেন করছেন।

সন্দেহ হল, কী করছেন তিনি? এই হিমশীতল স্তব্ধ শর্বরীতে একা জেগে থেকে? ঠাণ্ডায় ঘুম কি কাবু হলেন ভদ্রলোক? মদ খেয়ে শরীরকে চাঙ্গা করছেন, ভাবলেন?

খানিক বাদেই দেখি, আমার সন্দেহটা অমূলক নয়। বোতল খুললেন তিনি। ঢক-ঢক করে কী যেন গিললেন।

কিছু বলতে গিয়েও বললাম না। নীরবে সবকিছু দেখতে লাগলাম। হঠাৎ রামরতন সিনহা বোতলটা এক পাশে সরিয়ে রেখে শুয়ে পড়লেন।

ভাবলাম, যাক, নিশ্চিন্ত। এবার ঘুম ছুটবে ভদ্রলোকের। আমিও ঘুমোতে পারবো। কিন্তু বরাত খারাপ। এবারও ঘুম ভাঙলো খানিক বাদে।

জাগতেই দেখি, ভদ্রলোক ভুল বকছেন। ঘুমের ঘোরে দারুণভাবে ছটফট করছেন যেন।

চীৎকার করে ডাকলাম,—ও মশাই, হল কী? কী হল?

রামরতন সিনহা আমার ডাক শুনে হুড়মুড় করে উঠে বসলেন। সংক্ষেপে জবাব দিলেন,—সেই ঝামেলা শুরু হয়েছে আবার। আবার সেই বিদঘুটে কাণ্ড! ঘুমোতে পারি না।

শুধোলাম,—কেন পারেন না? কী এমন হল?

রামরতন সিনহা আমার প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না। চুপচাপ শুয়ে রইলেন। এদিকে আমাদের ডাক-চীৎকার শুনে সহযাত্রীদের কারও কারও ঘুম ভাঙবার উপক্রম। কিন্তু তবু কেউ উঠে ঠিক জাগলেন না তার কারণ বোধ করি এই যে, আমার মতো পাতলা ঘুম ওদের নয়।

এদিকে রামরতন সিনহা বিড় বিড় করে বকছেন আবার। ভুল বকছেন। নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর দিচ্ছেন কী যেন।

বিরক্ত হলাম এবার। রীতিমত বিরক্ত। ভাবলাম, আচ্ছা পাল্লায় পড়েছি যা হোক। মাতালের-ঘুমের দেখছি, দফা রফা।

উঠে বসলাম অগত্যা। টর্চ জেলে ঘড়ি দেখলাম। না, রাত বেশি হয়নি। দশটা মোটে।

—আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়, —নিজের মনে মনেই জল্পনা করি একবার, —বাইরে থেকে একটু যদি ঘুরে আসি!

মন সাড়া দেয়,—বেশ হয় তবে। চমৎকার হয়। নিশীথের চিরবাসা তবে প্রিয়তমের কাছে প্রেয়সীর মতোই একান্তে ধরা দেয়।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। জামাকাপড় পরে প্রস্তুত হয়ে বেরোতে যাবো, এমন সময় রামরতন সিনহা পিছু ডাকেন,—কোথায় চললেন? একা একা?

বললুম,—বাইরে।

—যাবেন না,—বাধা আসে অপর দিক থেকে,—দারুণ ঠাণ্ডা। বরফ পড়ছে। তাছাড়া এখানে ভল্লুকের উপদ্রব।

বললুম,—ভল্লুকে তো আমাদের মনের মধ্যে। থাবা উঁচিয়ে বসে আছে। সুযোগ পেলেই মারবে, একে ওকে তাকে, যাকেই বাগে পায়। কেমন? তাই না?

—ঠিক তাই!—বলতে বলতে রামরতন সিনহা উঠে বসেন। হঠাৎ এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেন,—ঠিক কথা বলেছেন। বড় দামী কথা। আমাদের মনের মধ্যেই হাজার ভল্লুকের বাস।

বললুম,—তাহলে? বাধা দিচ্ছিলেন যে বড়? ভয় দেখাচ্ছিলেন?

রামরতন সিনহা আমার গ্লাভসপরা হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বললেন,—না না, ভয় আমি দেখাই নি। আসলে ভয় পেয়ে নিজের কাছ থেকে নিজেই আমি পালিয়ে বেড়াই।

অবাক হয়ে বললুম,—তার মানে?

রামরতন সিনহা বললেন,—মানে বুঝতে হলে আমার জীবনের কিছু ঘটনা ধৈর্য ধরে শুনতে হবে আপনাকে।

বললুম, এখন? এই অসময়ে?

রামরতন সিনহা বললেন,—কোথায় অসময়! এই তো সময়! দাঁড়ান, জামা-কাপড়গুলো গায়ে দি। প্রস্তুত হয়ে নি। বারান্দায় বসে সব বলা যাবে।

অস্বস্তিতে পড়লুম। কারণ, এইরকম একটা পরিবেশে সত্যি বলতে কী কারও ব্যক্তিগত কথা শোনার মতো ধৈর্য আমার ছিল না। আর তাছাড়া, অমন বরফ-পড়া ঠাণ্ডায় কেউ কি বারান্দায় বসে গল্প করে? কিন্তু রামরতন সিনহা দেখলুম নাছোড়-বান্দা। মিনিট খানেকের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এলেন। হাতে একটা কম্বল। বারান্দার একপ্রান্তে সেটা বিছিয়ে দিয়ে বললেন,—আসুন। বসা যাক।

বসলুম। দুজনে পাশাপাশি। খানিক-ক্ষণ চুপচাপ আমরা, কারও মুখে কোনো কথা নেই।

আমি স্তব্ধ, হতবাক। মুগ্ধ বিস্ময়ে রাতের চিরবাসাকে দেখি।

আমার সামনেই কয়েকটা চির গাছ। তুষারে ঢাকা ওদের দেহগুলো কেমন যেন অপ্রাকৃত ঠেকছে। গাছের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে চিরবাসা উপত্যকা। অদূরে আকাশ-উঁচু পাহাড়। ধবধবে সাদা। জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোকে সব কিছু মায়াময়। মনে হচ্ছে, অপ্সরী বলে আদৌ যদি কিছু থাকে তো এইরকম পরিবেশেই ওরা নেমে আসে। নাচে, হাসে, গান করে। ভুবন জুড়ে আনন্দের ঢেউ ছড়িয়ে দেয়। মর্ত্য-পৃথিবী হঠাৎ কারও কারও চোখে তখন স্বর্গপুরী হয়ে ওঠে।

—বাবুজী!—রামরতন সিনহার ডাক শুনে হঠাৎ চমক ভাঙে। ওর দিকে ফিরে তাকাই।

—বাবুজী, শুনেছেন আমার কথা?—উনি আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই শুরু করেন,—আমি রামরতন সিনহা। কয়লা-খনির মালিক। ধানবাদে থাকি। অবশ্য খনি এখন আর আমার নয়, সরকারের। কয়লা-খনি জাতীয়করণ হয়েছে, শুনেছেন নিশ্চয়?

বললুম—হ্যাঁ শুনেছি।

—শুনলেও খনির মালিকদের কথা তো শুরু করলুন—আমি রামরতন সিনহা থেমে থেমে শুরু করেন,—ঐ যে বলা হল ভল্লুক, ঐ ভল্লুক বুকের ভেতর। ধরুন না কেন আমার কথা। দিব্যি ছিলাম। সুখে-স্বচ্ছন্দে। গৃহিণী, দুই ছেলে, এক মেয়ে আর বুড়ো মা নিয়ে সংসার। অভাব-অভিযোগ তো দূরের কথা, অশান্তিও তেমন কিছু ছিল না। খনির ব্যাপারে যা কিছু ঝুট-ঝামেলা, ম্যানেজার মিঃ মজুমদারই তা মেটাতেন। আমাকে ও নিয়ে কোনোদিনই বিশেষ ভাবতে হয় নি। তাই হাতে সময় ছিল প্রচুর। যাকে বলে অখণ্ড অবসর। আমার একমাত্র চিন্তা ছিল, সম্পদকে বাড়ানো নয়, সম্পদ যা গড়ে তুলেছি, তা কী করে রক্ষা করা যায়। হঠাৎ একদিন, এই সম্পদ-রক্ষার ভাবনাই আমাকে পেয়ে বসল। শুনলুম, এদিকে খুব নাকি চুরি-ডাকাতি হচ্ছে। সমাজবিরোধীরা সকলের অলক্ষ্যে বাড়ি ঢোকে। যথাসর্বস্ব নিয়ে উধাও হয়। মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র থাকে ওদের হাতে। কেউ বাধা দেবার চেষ্টা করলে ওরা খুন-খারাপি পর্যন্ত করে। পর পর কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটল। ধানবাদ এবং তার আশপাশের অঞ্চলেই। লক্ষ্য করলুম, বেছে বেছে পয়সাওলা লোকের বাড়িতেই হামলা হচ্ছে। সাধারণ কোনো গৃহস্থ-বাড়ির দিকে চোর-ডাকাতদের নজর নেই। অতএব, বুঝতেই পারছেন, ভয় পেলুম। কারণ, এ-অঞ্চলে পয়সাওলা লোক মানে ব্যবসায়ী; বিশেষ করে কয়লা-খনির মালিক। এদিকে আমার ভয়টা আরও বেড়ে গেল যখন শুনলুম, পর পর দুদিন দুজন খনি মালিকের বাড়িতে চুরি হয়েছে। ঠিক চুরি

নয়, ডাকাতি। এক বাড়িতে দারোয়ান জখম, দুর্বৃত্তদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে পুরোদস্তুর আহত। অন্য বাড়িতে বাড়ির কর্তা অল্পের জন্যে বেঁচে গেছেন। দুর্বৃত্তদের মধ্যে কে যেন শাবল ছুঁড়ে মেরেছিল। লাগে নি, ইঞ্চি-কয়েকের মাত্র ফারাক ছিল, তাই রক্ষে। কী জানেন, চোর-ডাকাতের ভয় আমার চিরকালের। চিরকাল আমি সাবধানী। কিন্তু এসব খবর কানে আসতেই ভয় যেন আরও বেড়ে গেল। নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হল। ভাবলুম, ম্যানেজার মিঃ মজুমদার-এর সঙ্গে একবার পরামর্শ করি। কিন্তু ম্যানেজার দেখলুম, সাবধানের ব্যাপারে আমার চেয়েও তার এক কাঠি সরেস। বললেন, এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে একটি মাছিও না বাড়ির ভেতর গলতে পারে। বিশ্বাস করুন, তাই করলুম। দশ ফুট উঁচু পাঁচিল। তার উপর ছিল ভাঙা কাচ। সেই কাচের উপর লোহার রড বসিয়ে কাঁটাতার দিয়ে চারিদিক ঘিরে দিলুম। এছাড়া, বাড়ির প্রতিটি জানালায় লাগল পুরু লোহার জাল। দরজায় গডরেজ-এর তালা আগে থাকতেই ছিল। এবার শুধু তালার সংখ্যা বাড়ল। এছাড়া, ছিটকিনি এবং খিলও বাড়ল আর এক প্রস্থ করে। এখানেই শেষ নয়। কয়েক হাজার টাকার 'কলাপসিবল গেট' আনলুম। সিঁড়ির সামনে এবং বাথরুম-এর পেছনে তা নতুন করে লাগালুম। মেন গেট-এ দু'সারি 'কলাপসিবল গেট' এবং তিন সেট তালার ব্যবস্থা হল। কিন্তু এত করেও নিশ্চিন্ত হতে পারি নে। দারোয়ানের নালিশ, আরও আলো চাই। না-হলে অন্ধকারে বাড়ির চারিদিক ঠিক চোখে পড়ে না। বললুম বেশ। আলো হবে। অল্পের জন্যে আর ত্রুটি থাকে কেন। সেদিনই ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে ডাকিয়ে স্পেশ্যাল ওয়্যারিং'-এর ব্যবস্থা করলুম। দেখতে দেখতে বাড়ির চারিদিকে রোশনাই হল। কিন্তু মনের ভয় আর কাটে না। ঘুমোতে গেলেই রাজ্যের দুশ্চিন্তা এসে মাথায় ভিড় করে। কখনও মনে হয়, আমার খাটের তলায় চোর—কাট বারগ্লার; ঘাপ পেতে বসে আছে। সুযোগ পেলেই বেরোবে। সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বসি। আলো জ্বালি। খাটের তলা আলমারির কোণ ড্রেসিং টেবল-এর পেছন তন্ন তন্ন করে খুঁজি। কিন্তু মাকড়সা, আরশোলা এবং টিকটিকি ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর সন্ধান পাই না। তাই আলো নেভাই আবার; শুয়ে পড়ি। ঘুমোবার আশায়। কিন্তু ঘুম আর আসে না। হঠাৎ মনে হয়, বন্ধ জানালা নড়ে উঠল। কে যেন ঠেলে দিল। পরক্ষণেই ভাবি দূর ছাই! দোতলা বাড়ি গ্রীল এবং লোহার জাল ভেদ করে জানালা ঠেলবে কে? আসলে এ হল হাওয়ার কারসাজি। দমকা হাওয়ায় জানালা কাঁপছে। কিন্তু না, কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারি না। শেষ অবধি উঠে গিয়ে জানালাটা খুলি। বেশ ভালো করে চারিদিক একবার দেখে আসি। শেষকালে চোরের ভয় আমাকে এক অসহনীয় অবস্থায় ঠেলে দিল। রাত্তিরে ঘুম হয় না। এমনকি নিজের ছায়া দেখলেও ভাবি, চোর। ঠিক করলুম, এ চলে না; এমন করে না ঘুমিয়ে। এর একটা বিহিত করতেই হবে। শেষটায় অনেক চিন্তার পর ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে ডাকা হল। সেদিনই। মিস্ত্রির কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললুম—নতুন ধরনের 'ওয়্যারিং' চাই। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। বাড়ির আনাচে-কানাচে 'ওয়্যার' থাকবে। 'নেকেড ইলেকট্রিক ওয়্যার'; সলসুলেটেড বা ঢাকা নয়। এমনভাবে ওয়্যারগুলো থাকবে যাতে বাড়ির বাইরে থেকে কেউ আসতে গেলে ওদের গায়ে হাত লাগাতেই হয়। ওরা হবে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। 'সুইচ অন' করলেই ওদের মধ্যে দিয়ে এ-সি কারেন্ট যাবে এবং কারও এতটুকু ছোঁয়া পেলেই ওরা তাকে বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়ে ধরবে। চুম্বক যেমন করে লোহাকে ধরে, ঠিক তেমনি। ইলেকট্রিকের মিস্ত্রী আমার কথা শুনে বললে—বেশ; তাই হবে। তবে দেখবেন শেঠজী, ভুল করে নিজেদেরই না ওখানে হাত পড়ে। আর একটা কথা, কাজটা কিন্তু বে-আইনী। ধরা না পড়ি। বললুম,—না; সে-ভয় নেই। আইন পয়সার বশ। আর এছাড়া সুইচটা থাকবে আমার বেড-রুম-এ; শুতে যাবার আগে আমি নিজের হাতে তো অন করবো।

ব্যস। যেমন কথা ঠিক তেমনি কাজ। ইলেকট্রিক মিস্ত্রী 'ওয়্যারিং' করে দিল। আর আমি শোবার আগে সুইচ অন করে দিব্যি নিশ্চিন্ত হতে লাগলুম। এইবার নিজের উপর বিশ্বাস আমার বেড়ে গেল। ভাবলুম, অনেক মাথা খাটিয়ে এই যে কল করেছি তাতে ধনবাদ অপ্রকে তার কি জুড়ি আছে?

কিন্তু কল করেই বা শান্তি কোথায়! ওতে শিকার পড়া চাই। হ্যাঁ, শিকারের চিন্তা ক্রমেই আমাকে পেয়ে বসল। প্রতিদিন আমার মনে হতে লাগল, এতগুলো টাকা খরচ করে এই যে ফাঁদ পাতলুম, এ কি বৃথা যাবে? একদিনের জন্যেও ভুল করে কেউ ফাঁদে পা দেবে না? দেখতে দেখতে দারুণ এক জিঘাংসা আমাকে পেয়ে বসল। বার বার মনে হল শিকার আমার চাই-ই। যেমন করে হোক চাই। অবশেষে একদিন—নিজের বোকামি আমি নিজেই ধরলুম। ছিঃ! ছিঃ! এ কি করেছি আমি? ফটকে বন্দুকধারী পুলিশ আর বাড়ির চারিদিকে রোশনাই। এ-হেন পরিবেশে আমি কিনা আশা করছি, ফাঁদে শিকার পড়বে! দেখুন তো কাণ্ড, পড়ে কখনও? যে-জলে বড়শি ফেলে আপনারা মানে বাঙ্গালীবাবুরা মাছ ধরেন, সেখানটা যদি অনবরত নাড়াচাড়া হয় তো মাছ কি টোপ খায়? ইঁদুর ধরার সামনেই বেড়াল যদি ওৎ পেতে থাকে তো ইঁদুর কোন্ দুঃখে আসবে মশাই? নিজের ভুলটা টের পাওয়া মাত্রই দারোয়ানকে কিছুদিনের ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম। বাড়ির চারিদিকে সারা রাত আলো জ্বলত। সব আলো নিভিয়ে দিলুম। কিন্তু শিকারের আর দেখা নেই। আমার মনের ভেতরকার জল্লাদটা ওদিকে থাবা উঁচিয়ে বসে আছে। শিকার মিলছে না বলে কী ভীষণ তার যন্ত্রণা! পারলে নিজেকেই যেন সে ছিঁড়ে খুঁড়ে খায়। ওদিকে আবার নতুন বিপদ। কারখানায় গণ্ডগোল। সন্তোষচাঁদ নামে এক কুলি ম্যানেজার মিঃ মজুমদার-এর গায়ে হাত তুলেছে। কী এক ব্যাপারে ওদের মধ্যে নাকি কথা-কাটাকাটি। সন্তোষচাঁদ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ম্যানেজারকে চড় মারে।

ব্যাপারটা শুনে কী বলবো মশাই, আমার হচ্ছে দুঃখ, সজ্জনকে ব্যাংক পাঠিয়ে ফোন। কিন্তু খুঁজে পেলাম, ম্যানেজার চাকরী থেকে ওকে বরখাস্ত করেছেন এবং ও হঠাৎ কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে তখন আমার দিক থেকে কিছুই আর করার ছিল না। এদিকে স্পষ্টই লক্ষ্য করছি, মনের ভেতরকার আক্রোশটা দিন দিন বাড়ছে। কোনো দিক দিয়েই কাউকে শায়েস্তা করতে পারছি না; ফলে নিজের কাছেই যেন মিছে অপরাধী হচ্ছি। কিন্তু কী করবো? এত করেও আমার আসল ফাঁদ যদি শূন্যই থাকে তো দোষ আমার নয়, ফাঁদেরও নয় দোষ আমার বরাতের। হ্যাঁ, বরাত যে খারাপ তা বিশেষ দিকের ভাবগতিক দেখে স্পষ্টই মালুম হচ্ছে। কারণ, এর মধ্যে আবার চুরি বন্ধ হল। বামবাম এলাকায় শান্তি এলো। কী বলবো, এ-কথা জেনে অন্য সময় হলে যে কোনো স্বাভাবিক লোকের মতো আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতুম। কিন্তু হায়! আমি তো তখন স্বাভাবিক ছিলুম না। তাই চুরি বন্ধ শুনে ভাবলুম, আমার ফাঁদের কেরামতি দেখাবার সুযোগও বন্ধ। শিকার-ধরা বন্ধ। হায়! আমার এতগুলো টাকা জলে গেল? 'নেকেড ওয়্যারিং' বৃথা! একটা শয়তানকেও শায়েস্তা করতে পারলুম না?—ভাবতে ভাবতে অদ্ভুত এক ফন্দী এলো মাথায়। —আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়! 'গ্রাউণ্ড ফ্লোর'-এর বারান্দায় একগাদা দামী জামাকাপড় আর কয়েকটা সুটকেস যদি ছড়িয়ে রাখি! যদি বারান্দার 'কোলাপসিবল গেট'-টা খোলা থাকে। বাইরে থেকে সব নজরে পড়বে তো? হ্যাঁ, পড়বে। ওখানে বারোমাসই 'জিরো পাওয়ার'-এর একটা নীল আলো জ্বলে। রাস্তা থেকে বারান্দাটা দেখাও যায় স্পষ্ট। ওটা 'মেন গেট' বরাবর।...বাস, যেমন ভাবনা ঠিক সেই মতই কাজ। গৃহিণী অবিশ্যি বাধা দেন। আমার কাণ্ডকীর্তি দেখে তিরস্কার করেন, —ছিঃ! ছিঃ! পাগল হলে?

তাকে বুঝিয়ে বললুম—দ্যাখো বুদ্ধিই সব। বুদ্ধির জোরে পয়সা করেছি। আবার বুদ্ধির জোরেই পয়সা যে লুটছে আমি তাকে জব্দ করবো।

বড় ছেলেটার নাম শিউরতন। বছর পনের বয়স। সে অবশ্য আমার ব্যবস্থায় খুব খুশী। বললে—বাঃ! বেশ মজার ব্যাপার তো! চোর ব্যাটা এবার ধরা পড়বেই পড়বে।

লক্ষ্য করলুম কথা বলার সময় ওর চোখ দুটো জ্বলছে। যেন ওর মধ্যেও আছে একটা। থাবা উঁচিয়ে বসে আছে। শিকারকে নাগালে পাওয়া মাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কী বলবো গর্বে বুক ভরে সেদিন ছেলেটা আমার কাছে ওঠে। ছেলের মধ্যে আমি নিজেকেই যেন খুঁজে পাই। আমি—বাপ। ব্যাটা আমার জবরদস্ত লোক হবে। দুনিয়ায় নাম রাখবে।

কিন্তু নসিব খারাপ মশাই। বিলকুল খারাপ। ব্যাপার যা ঘটল তাতে বাপ-ব্যাটা দুজনেরই মান যাবার দাখিল।

খুলেটা খুলেই বলি। আসল কিছু না লুকিয়ে।

সেদিন। পৌষের সন্ধ্যে। শীত একটু বেশিই ছিল। তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে সবাই শুয়ে পড়লাম। ফাঁদ-পাতার ব্যাপারটা বলতে গেলে ভুলেই গেছি। কারণ প্রায় দিন পনেরো ধরে তা চালু। জিনিসটা প্রায় গা-সহা হয়ে গেছে।

পরদিন। ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। হ্যাঁ রোজই আমি ভোরে উঠি। উঠে অভ্যেস-মাফিক নীচে নামি। পায়চারি করি বাগানে।

সেদিন নীচে নেমে বারান্দা পেরিয়ে সবে বাগানে পা দিয়েছি হঠাৎ যেন গেট-এর দিকে চোখ পড়তেই আমি স্তম্ভিত। দেখি কে যেন গেট-এ হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে।

—কে? কে ওখানে? —চীৎকার করে ডাকলুম।

কিন্তু না কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। এদিকে বাড়ির সবাই তখনও ঘুমে। সামনের পথও খালি। কোই অন্য কারও সাহায্যও মিলল না।

অগত্যা একাই এগিয়ে গেলুম। কিন্তু হায় ঈশ্বর! কয়েক পা-ও এগোই নি। কী দেখলুম আমি? দেখলুম সজ্জনচাঁদ গেট-এ দাঁড়িয়ে। ঠিক স্ট্যাচুর মতো।

প্রথমে ব্যাপারটা আমিও ঠিক ঠাওর করতে পারি নি। ভাবলুম যে সজ্জনচাঁদ অনুতপ্ত। আমার কাছে এসেছে। ক্ষমা চাইছে। কিন্তু যখন ওর খুব কাছে এগিয়ে গেলুম বার বার ডাকলুম 'সজ্জন সজ্জন' বলে কিন্তু কোনো জবাব পেলুম না তখন আসল ব্যাপারটা স্পষ্ট মালুম হল। বুঝলুম ওকে আমি মেরে ফেলেছি। নেকেড ইলেকট্রিক ওয়্যার-এ হাত দিয়েছিল ও। তারপর হাত আর তুলতে পারে নি।

সর্বনাশ! সজ্জন মরে গেছে? ইলেকট্রিক শক ওর মৃত্যুর কারণ? আমি ওকে মেরে ফেললাম? কী হবে? —মুহূর্তের মধ্যে এই একগুলো প্রশ্ন আমার গায়ে যেন চারিদিক থেকে এসে তীরের মতো বিঁধল।

পরক্ষণেই মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলি আবার। ভাবি ও চুরি করতে এসেছিল। ধরা পড়েছে। ভয় কী!

—ভয় নেই? —যেন বুকের ভেতর থেকে বিচারকের দণ্ডাদেশ শুনতে পাই—কে বললো ভয় নেই? ও তো ধরা পড়ে নি মারা পড়েছে। ওকে তুমি মেরে ফেলেছ। তুমি খুনী। অতএব—

আর ভাবতে পারি না। চীৎকার করে উঠি—শিউরতন! শিউরতন।

আমার চীৎকার কি বড্ড বেশি জোরে হয়েছিল? ভয় পেয়ে আমি কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম?

তাই হবে। কেননা আমার চীৎকার শুনে অল্পক্ষণের মধ্যেই বাড়ির সবাই উঠল। পথেও লোক জড়ো হল।

না আসতে বাকী ছিল না কারও। ডাক্তার পুলিশ খানি ম্যানেজার মিঃ মজুমদার—সবাই এসেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য! চোর ধরেছি বলে কেউ আমায় তারিফ করলেন না; আবার নিন্দাও করলেন না। সবাই ধীর মন্থরগতিতে এলেন আবার চলেও গেলেন। শুধমাত্র পুলিশ অফিসার বলে-ছিলেন—ভয় নেই। এ কেস অব বারগলারি। অতএব আপনি নিশ্চিন্ত।

নিশ্চিন্ত! —কথাটা মনে হলে আজও আমার হাসি পায়। আজব এই দুনিয়ায় কে কাকে নিশ্চিন্ত করে মশাই? মানুষের শক্তি কতটুকু?

দু একদিনের মধ্যেই টের পেলুম আদৌ আমি নিশ্চিন্ত নই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত সবে শুরু। এমনকি ছেলে শিউরতন পর্যন্ত আমাকে নীচু নজরে দেখছে।

একবার। সে তো বলেই ফেললো— কাজটা ঠিক হয় নি। লোকটাকে আমরাই মেরে ফেললুম বাবা। 'ওয়্যারিং' অমন করে না করলেই ভাল হত।

ছোট ছেলে রূপরতন। মাত্র তেরো বছর বয়স। এই ঘটনার পর থেকে কেমন যেন হয়ে গেল। ডাকলেও সাড়া দেয় না। কাছে আসে না। মাঝে মাঝে এমনভাবে আমার দিকে তাকায় যে সন্দেহ হয় বাপের উপর বিশ্বাস হারিয়েছে ও।

কিন্তু আমি তখন আর কী করতে পারি। আইনের ভয়ে 'নেকেড ইলেকট্রিক ওয়্যারিং' তুলে নিয়েছি। দারোয়ানকে ডেকে এনে বাড়ির চারিদিকে আলো জ্বালিয়ে আবার সেই আগের অবস্থাই বহাল করেছি। কিন্তু তবু বাইরের লোকের তো দূরের কথা বাড়ির ওদের পর্যন্ত মন পাচ্ছি নে। সকলেই যেন নীরবে আমাকে নিন্দা করছে।

মেয়ে দুর্গারানী। ক্লাশ সিক্স-এ পড়ে। স্কুল থেকে ফিরে এসে একদিন নালিশ করলে—বাবা তুমি নাকি খুনী?

বললুম—সে কী রে! কে বলেছে?

দুর্গারানী চটপট জবাব দিলে—ক্লাশের মেয়েরা। বললে কি জানো তুমি নাকি মানুষ মারতে খুব ভালোবাসো। আচ্ছা বাবা আমাকেও তুমি মেরে ফেলবে না তো?

মেয়ের কথা শুনে আমি স্তম্ভিত। হাসবো কি কাঁদবো ঠিক করতে পারি না। কোনো জবাবও দিতে পারি না। তবে স্পষ্ট অনুভব করি মেয়ে আমার দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। না না সে দৃষ্টিতে স্নেহ-ভালোবাসার কোনো চিহ্ন নেই। আছে ঘৃণা বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস।

ভাবলুম এ তো ঠিক নয়! বাপ সম্বন্ধে এ-ধারণা যেমন করে হোক দূর করা দরকার। ভেবেচিন্তে গিন্নীর কাছে গেলুম পরামর্শ করতে।

গিন্নী এ-সব কথায় মোটে আমলই দিলেন না। বরং এমন একটা ভাব দেখালেন যার মানে দাঁড়ায়—এ তো জানাই ছিল; অঘটন ঘটবে সর্বনাশও হবে। অতএব নাও এখন। ভোগ।

ভুগব? কিছুতেই ভেবে পেলাম না কোন্ দুঃখে আমি একা ভুগব। যা করেছি তা কি সকলের কথা ভেবেই করি নি? পরিবারের সকলেই কি আমার কাজে কমবেশি সম্মতি দেয় নি?

হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়েছিল। এখন সবাই তা ভুলে গেছে। এমন কি বুড়ো মা পর্যন্ত ভুল বুঝছেন আমায়।

মা তো একদিন বলেই বসলেন [illegible] নতুন কোনো ফন্দিফিকির যেন না করিস [illegible]। চোর ধরতে গিয়ে শেষকালে নিজেই হাতকড়া পড়বে।

কী জানেন ঐ হাতকড়াই ভালো ছিল। বিচার হলে—বিচারে ফাঁসি হলে তিলে তিলে যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেতাম।

ওফ! কী যন্ত্রণা! কয়লা খনির চত্বরে যেতে পারি না। সবাই আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়। বাইরে যেতে পারি না। সবাই যেন আমাকে ঘৃণা করে। এমন কি ম্যানেজার মিঃ মজুমদার পর্যন্ত সামনে এলেই কেমন যেন জবুথবু হয়ে যান।

অগত্যা ঘরে বসে দিন কাটাই। চুপচাপ থাকি আর ভাবি—মানুষ এত খেয়ালী কেন? এত কেন নড়বড়ে তার চিন্তা? যারা আমাকে চোর-ধরার ব্যাপারে উৎসাহ দিল তারাই আজ কেন আমাকে বিদ্রূপ করছে? তবে কি মানুষ চরম দণ্ড কাউকেই দিতে চায় না? অতি বড় শত্রুও পৃথিবী থেকে সরে যাক মানুষ তা চায় না? মানুষের [illegible] প্রকৃত ইচ্ছে তা নয়? তা হতে পারে [illegible] মানুষ আসলে ক্ষমাশীল? [illegible] চরম দন্ড দিতে তার হৃদয়-মন্দিরের দেবতা তাকে নিষেধ করেন?

কিন্তু তা-ই বা কী [illegible]। এই নিষেধ মানুষ শুনলে তো পৃথিবী [illegible] শান্তির জায়গা হত। খুনোখুনি মারামারি কাটাকাটি কিছুই আর থাকত না।

কিন্তু আমি যে খুন [illegible]? আমার যে ঠিক ঠিক বিচার পর্যন্ত হল না? যা হল তা বিচারের নামে প্রহসন।

হ্যাঁ হ্যাঁ প্রহসন। আলবৎ প্রহসন। টাকার জোরে আর প্রতিষ্ঠার ফিকিরে দিব্যি আমি আইনের ফাঁক দিয়ে গলে এলাম।

। তিন ।

প্রথমে সমস্ত ব্যাপারটাই ধামাচাপা দেবার চেষ্টা হল। সজ্জন চুরি করতে এসেছে এসে নিজের বিপদ নিজে ডেকে এনেছে অতএব আমার মানে রামরতন সিন্‌হার কোনো দোষ নেই আমার বিরুদ্ধে কেস্‌-এর কোনো প্রশ্নই ওঠে না—এই ব্যাখ্যা দিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করতে চাইলেন পুলিশ অফিসার।

আমি বললুম—তা কী হয়! সজ্জন যে আমার কয়লা খনির কুলি। মালিকের সঙ্গে ও দেখা করতে এসেছিল এমন ব্যাখ্যাও তো হতে পারে।

খনি-ম্যানেজার মিঃ মজুমদার বললেন—না তা পারে না। কারণ সজ্জন যখন এসেছিল তখন ও আর কুলি নেই। চাকরী থেকে ছাঁটাই হয়েছে। এছাড়া আপনি ওকে দেখেছেন ভোরবেলা। মানে শেষ রাত্রেরই বলা যায়। এমন সময় কেউ এবং বিশেষ করে কোনো ছাঁটাই কুলি কি খনি-মালিকের সঙ্গে দেখা করতে আসে?

স্বীকার করলুম—না আসে না।

মিঃ মজুমদার বললেন—তাহলে? কী দাঁড়াল? প্রতিশোধ নেবে বলে সজ্জনচাঁদ [চড়া?] আপনাকে খুন-জখম করতে আসে। আর না হয় আসে নেহাৎ-ই চুরি করবে বলে।

বললুম—শেষের কারণটাই সঙ্গত মনে হয়। কারণ চাকরী নেই অভাব অভিযোগ; এই হঠাৎ ওর বেপরোয়া হয়ে পড়াটা অস্বাভাবিক নয়।

মিঃ মজুমদার বললেন—আইন কিন্তু প্রথম কারণটাকেই গুরুত্ব দেবে। অর্থাৎ কিনা আপনাকে মারতে এসেছিল ও। পকেটে ওর ছোরা ছিল। অ্যাটেমপ্‌ট টু মার্ডার।

বললুম—মার্ডার! ছোরা! কী বলছেন? কই ছোরা-টোরা কিছু তো ওর সঙ্গে ছিল না।

মিঃ মজুমদার বিজ্ঞের মতো হেসে বললেন—ছিল না। আবার ছিলও। আসলে হয়েছিল কী ল-ইয়ার-এর সঙ্গে পরামর্শ করে ওর পকেটে একটা ছোরা গুঁজে রাখি। [ল-ইয়ার?] বলেছিলেন এ ভালো। সাবধানের মার নেই।

চমকে উঠলুম বলে কী! বেশি সাবধান হতে গিয়েই তো এই সর্বনাশ। এর উপরেও আবার! কোথায় যাচ্ছি? কোন জাহান্নামে?

কিন্তু না শেষ অবধি জাহান্নামে যেতে হল না। বেঁচে গেলাম। সজ্জন-এর বৌ লছমী আমার বিরুদ্ধে কেস্‌ করেছিল বটে। খুনের মামলাও দায়ের করেছিল। কিন্তু কিছুই হয় নি। সজ্জন-এর কোমরে ছোরা থাকায় [illegible] গোটা মামলাটা ভেস্তে গেল। জজ সাহেব রায় দিতে গিয়ে মন্তব্য করলেন—ফরিয়াদী লছমী দেবীর অভিযোগ অন্যায় এবং অযৌক্তিক। সজ্জনকে রামরতন সিন্‌হা খুন করতে চেয়েছিলেন এমন কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ আদৌ নেই। সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করলে এর উল্টোটাই বরং মনে হয়। অর্থাৎ সন্দেহ জাগে সজ্জনচাঁদই রামরতন সিন্‌হাকে খুন করতে এসেছিল। কারণ সজ্জন-এর চাকরী নেই রামরতন সিন্‌হা ওকে মারধোর করবেন বলে শাসিয়েছিলেন। এছাড়া সজ্জন জানতো তার ভূতপূর্ব মনিবের বাড়ি অরক্ষিত। দরোয়ান বাড়ি গেছে গেট-এ তালা নেই এবং সবচেয়ে বড় কথা মনিব যে খুব ভোরে উঠে বাগানে পায়চারি করেন আর ঐ ভোরবেলাতেই যে কাজ হাসিল করা সুবিধেজনক এমন ধারণা পোষণ করাও তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। অতএব সব দিক বিবেচনা করে ফরিয়াদীর সমস্ত অভিযোগ থেকে রামরতন সিন্‌হাকে আমি মুক্তি দিচ্ছি। তবে মিঃ সিন্‌হাকে অনুরোধ বাড়ির ওয়্যারিং তিনি ঠিক রাখেন। কেননা আমাদের মনে রাখা উচিত ওয়্যারিং-এ লিকেজ থাকলে অনেক সময় নির্দোষীকেও শাস্তি হতে পারে।

—নির্দোষীর শাস্তি? —বলতে বলতে রামরতন সিন্‌হা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন জজ সাহেবের রায়ের এই শেষ অংশটাই আমাকে অস্থির করে তুলল। কারণ আমি তো জানি তাই হয়েছে। সজ্জন-এর দোষ আর কতটুকু! বড় জোর সে চুরি করতে এসেছিল। তাও অভাবের তাড়নায়। সজ্জন-এর বৌ লছমীর মতে অবিশ্যি চুরির নয়। সজ্জন এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। ম্যানেজার মিঃ মজুমদার ওর বিরুদ্ধে তার অভিযোগের কথা আমাকে জানাতে।

—কী জানেন, একটু থেমে রামরতন সিন্‌হা আবার শুরু করেন—আমার কিন্তু মনে হয়, লছমীর কথাই ঠিক। খনি-ইউনিয়নের সেক্রেটারীও বারবার বলেছে, সজ্জন আমার সঙ্গে দেখা করবে, এই ঠিক ছিল। এবং জেনেশুনেই ভোরবেলা আসে ও, বাগানে নিরিবিলিতে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে, এই আশায়। কিন্তু ওয়্যারিং-এ লিকেজ? ভগবান জানেন, এর চেয়ে মিথ্যে আর কিছু নেই। আসলে হয়েছিল কী লিকেজ ওয়্যারিং-এর গোটা ব্যাপারটাই ধামাচাপা পড়ে। অ্যাক্সিডেন্ট-এর সঙ্গে সঙ্গেই সব তার সরিয়ে ফেলা হয়। মেন গেট-এর কাছ বরাবর নতুন ওয়্যারিং করি। এমনভাবে করি যাতে 'ওয়্যারিং'-এ লিকেজ আছে, একথা প্রমাণ করা যায়। কেননা সবাই আমরা ভালো-ভাবেই জানতুম, বসত বাড়িতে 'নেকেড ইলেকট্রিক ওয়্যার' রাখা আইনের চোখে অমার্জনীয় অপরাধ। এবং এই 'স্পেশ্যাল ওয়্যারিং'-এর ব্যাপারটা কোনোমতে ফাঁস হলে আমার আর বাঁচবার পথ থাকবে না।

কিন্তু সত্যি কি আমি বাঁচলুম? যে অবস্থায় এসে আজ দাঁড়িয়েছি তাকে কি বাঁচা বলে? তা কি মৃত্যুর চাইতেও ভীষণ নয়? খেতে পারি নে ঘুমোতে পারি নে দিনরাত্রি শুধু একই দৃশ্য দেখি,—যেন সজ্জনচাঁদ দাঁড়িয়ে আছে। সেই সর্বনাশা ইলেকট্রিক ওয়্যার-এ হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। তার চোখে পলক পড়ছে না; মুখটা নীল, ফ্যাকাসে, ভয়ঙ্কর। যেন সে বলে

হল। মুহূর্তের মধ্যে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা। কখনও আবার ধান ছড়াতুম চড়াই আসবে আশায়। আসতও। কিন্তু ফিরত না অনেকেই। কারণ, গুলতিতে আমার হাত ছিল পাকা। খানিকটা বড় হতেই ফাঁদ-পাতায় ভিন্ন এক নেশা আমাকে পেয়ে বসল। পথের উপর একটা আধুলি ফেলে রাখতুম। এবং তারপর দলবল নিয়ে নিজে বসতুম খানিকটা দূরে। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য রাখা, যেতে যেতে কে ওটা তুলছে। তুলতো। অনেকেই তুলতো। আর আমরা চীৎকার করে উঠতুম।

বুঝুন কাণ্ড। দুর্বুদ্ধি আর কাকে বলে, ভাবুন একবার। তবু এইখানেই যদি শেষ হত! কী জানেন, স্ত্রীকেও ছাড়িনি। ফাঁদ পেতে পরীক্ষা করেছি।

একবার। পয়লা এপ্রিল। এক বন্ধুকে বললুম,—কাজ করবে? কাজের মতো কাজ?

বন্ধু অবাক। জানতে চাইল,—কী?

বললুম,—দ্যাখ, আমার স্ত্রীর সঙ্গে খুব তো দোস্তি তোমার। ঠাট্টা-ইয়ার্কিও চলে? কেমন?

বন্ধু স্বীকার করল,—হ্যাঁ, তা চলে।

বললুম,—আজকের তারিখটা মনে আছে?

বন্ধুর প্রথমে মনে ছিল না। একটু বাদেই মনে পড়ল। মাথাটা একটু ভেবে নিয়ে ও বললে, ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আজ পয়লা এপ্রিল।

বললুম,—বেশ। এখন এই মিনিট দশেক মিনিটের ভেতর তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তুমি একটা ফোন করবে আমার বাড়িতে। আমার স্ত্রীর কাছে। ফোনে ইনিয়ে-বিনিয়ে একটু প্রেম নিবেদন করবে।

বন্ধু আমার প্রস্তাব শুনে থ। বললো, —তুমি কি পাগল হলে?

প্রতিবাদ করি,—তা কেন। আজ পয়লা এপ্রিল। আর তাছাড়া, তোমাদের ঠাট্টা-ইয়ার্কির সম্পর্ক। একটু মজা করতে দোষ কী।

বন্ধু শেষ অবধি রাজী হল। হাজার হোক আমারই বন্ধু তো। রাজী না হয়ে যায়।

যথাসময়ে ফোন এল। আমার স্ত্রী রিসিভার তুলে কথা বলতে লাগলেন। আমি তখন কাছেই কী একটা জিনিস খোঁজার ছিলিতে ঘুর-ঘুর করছি। অর্থাৎ কিনা, সতর্ক লক্ষ্য রাখছি স্ত্রীর উপর। কী করেন তিনি, কী বলেন, দেখছি। বুঝতেই পারছেন তখন একটাই উদ্দেশ্য আমার—স্ত্রীকে এই সুযোগে একটু পরখ করা। বন্ধুর সঙ্গে সত্যিই তার পরকীয়ার সম্পর্ক কিনা, দেখে নেয়া। কিন্তু কী দেখলুম?

স্ত্রী কথা বলতে গিয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলেন। তার মুখচোখ মুহূর্তের মধ্যে লাল হয়ে উঠল। রাগে উত্তেজনায় রিসিভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি শয্যা-শায়ী হলেন। কাঁদতে লাগলেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

কত বোঝাবার চেষ্টা করলুম,—এ কিছু নয়। তামাসা। আজ পয়লা এপ্রিল, মনে নেই? বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যুক্তি করে এসব করেছি।

স্ত্রী বললেন,—থাক, আর বুঝিয়ে কাজ নেই। ঢের হয়েছে। এই সুযোগে নতুন এক কায়দায় ফাঁদ পেতেছিলে, বুঝি না?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। বুঝে ফেললেন। আমার সমস্ত জারিজুরি ধরে ফেললেন। এর পর থেকে আর তিনি আমায় বিশ্বাস করেননি। আমার সমস্ত কাজের পেছনে 'ফাঁদ' খুঁজে বেরিয়েছেন।

অতএব দাঁড়াল কী? যে স্ত্রী আগে থাকতেই আমাকে সন্দেহের চোখে দেখেন, সজ্জনচাঁদ খুন হবার পর তা আরও বাড়ল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অন্যায়রকম সন্দেহ করতে লাগলেন উনি, মুখে কিছু বললেন না। আর ঐ না বলাটাই হয়ে দাঁড়াল বেশি মর্মান্তিক।

ইদানীং চুপচাপ আছি। হাতে কোনো কাজ নেই। কাজের ইচ্ছেও নেই। নিরিবিলিতে বসে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি। হঠাৎ উনি ঘরে ঢুকলেন। দুম করে কোনো ধর্মগ্রন্থ ফেললেন আমার সামনে। এবং ফেলেই উধাও। যেন দারুণ সন্দেহ আমাকে। যেন বসে বসে আমি শুধু ফাঁদই পাতছি। কিন্তু উনি তা পাততে দেবেন না। যেমন করে হোক আমাকে সুপথে আনবেন।

এদিকে পথের সন্ধান তখন পেয়ে গেছি। সে পথ গোমুখীর পথ। ভাবছি, হ্যাঁ, আমাকে ঐ দুর্গম ও কঠিন পথ মাড়েই যেতে হবে। সজ্জনচাঁদের অস্থি থাকবে আমার হাতে। সে-অস্থি আমি গোমুখীতে বিসর্জন দেবো। এই কঠিন কাজে সফল হলে আমার নিজের শান্তি; যারা আমার এই কাজের কথা শুনবে তাদেরও শান্তি। এর পর থেকে আমাকে তারা হয়তো নতুন চোখে দেখবে, আর আমিও আত্ম-বিশ্বাস খুঁজে পাবো।

শেষ অবধি বেরিয়ে পড়লুম। তবে গ্রীষ্মে নয়, শরতে। হঠাৎ 'ব্লাড-প্রেসার' বেড়ে যাওয়ায় বেরোতে কিছুদিন দেরী হল।

কিন্তু দেখুন, কী শাস্তি! বেরিয়েও শান্তি নেই। এখানে—এই চিরবাসাতেও দুঃস্বপ্ন। ঘুম আসছে না। চোখ বুজলেই কী সব দেখছি!

—দেখবো না?—একটু থেমে যেন দম নেন রামরতন সিনহা। ধীরে ধীরে শুরু করেন,—পাপ যে অনেক। এত সহজে কি প্রায়শ্চিত্ত হয় তার?

বললুম,—হ্যাঁ, হয়। আমার তো মনে হয় প্রায়শ্চিত্ত এরই মধ্যে হয়ে গেছে। অনুশোচনার আগুনে পুড়ে পুড়ে আপনি এখন নিখাদ সোনা।

—কী বললেন? সোনা? তাও আবার নিখাদ?—রামরতন সিনহা আমার কথাগুলো আমাকেই ফিরিয়ে দিয়ে শুরু করেন,—এ-প্রশংসায় হাসবো কী কাঁদবো জানি নে। তবে এটুকু বেশ বুঝছি, পথে একজন বন্ধু পেলুম। আর স্বজনদের মতো তিনি আমায় খুনী ভাবেন না।

বললুম,—তা কেন ভাববো? খুনটাই তো আপনি তা নন।

—নই?—বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রামরতন সিনহা বলেন—বাঁচালেন। আপনি তবু বাঁচিয়ে দিলেন আমায়। কিন্তু মা এত সহজে ছাড়ছি নে। আপনার নাম-ঠিকানা আমার চাই। 'নিখাদ সোনা' মাঝে মাঝে আপনাকে জ্বালাতন করবে।

বললুম,—বেশ, করবেন জ্বালাতন। কিন্তু ঠিকানা? এই অন্ধকারে? লিখবেন কী করে?

রামরতন সিনহা কোনো জবাব না দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বেরিয়ে এলেন কাগজ-পেন্সিল আর টর্চ নিয়ে। বাঁ হাতে টর্চের বোতামটা চেপে অন্য হাতে উনি যখন ঠিকানা লিখছিলেন চিরবাসায় তখন নতুন করে তুষার পড়ছে। এমনকি দুধারের আগুনেও তুষারকণা তখন।

না, আর বসা চলে না। বাধ্য হয়ে তাই ঘরে ঢুকি। দুজনেই।

পরদিন। খুব ভোরে। রামরতন সিনহা বেরিয়ে গেলেন। আমাদের জন্যে অপেক্ষা না করেই।

বাধা দিতে যাই। বলি,—দাঁড়ান। একই সঙ্গে যাবো। তাড়াতাড়ি কী!

রামরতন সিনহা কৈফিয়ত দেন,—আমার আবার ভারী শরীর, ধীরে ধীরে চলি। তাই আগে যাচ্ছি।

বললুম,—বেশ। যান তাহলে। আমরা পেছনে আসছি।

কিন্তু না, বেরোতে দেরী হয়। বেশ দেরী। মাঝখানে একবার এসে বাইরে দাঁড়াই; রেস্ট-হাউস-এর উঠোনে। দেখি এরই মধ্যে রামরতন সিনহা অনেকটা উঠে গেছেন। গোমুখীর পথ ধরে ছন্দে তিনি এগোচ্ছেন।

হঠাৎ সমস্ত মনপ্রাণ অদ্ভুতভাবে মোচড় দিয়ে ওঠে। ভাবি, এই যে তার এগোনো, এ কি শুধু গোমুখীর পথে? অন্যায় থেকে ন্যায়, অসত্য থেকে সত্য এবং অন্ধকার থেকে আলোর পথেও কি নয়?

মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে যায়। গোমুখীর পথটাকে অদ্ভুত এক প্রতীক বলে মনে হয়। অন্যায় থেকে ন্যায় এবং অসত্য থেকে সত্যের পথে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায় চিরযুগ ধরে মানুষের যে অভিযান তারই প্রতীক। যেন নিখিল বিশ্বজগৎ এই একটি পথ ধরে চলেছে। সব এসে এইখানে মিলেছে।

রামরতন সিনহার চিঠিটা বন্ধ করে আকাশ-পাতাল ভাবি। বার বার মনে হয়, অসংখ্য তা অগণিত মানুষের মিছিল—তারই কেবল রামরতন সিনহা; দুঃখ-যাত্রার সাধনায় নিমগ্ন। কারোই পথ-চলা শেষ হয়নি এখনও। চলছে!

শিল্পী : সুবীর চৌধুরী

প্রদর্শনী পরিক্রমা

ক্যানভাস গোষ্ঠির প্রদর্শনী

বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট গ্যালারীতে 'ক্যানভাস' শিল্পীচক্রের সদস্যদের একটি যৌথ প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনীতে অলোক ভট্টাচার্য নারায়ণ চক্রবর্তী শক্তি চক্রবর্তী ত্রিদিব চন্দ্র সুবীর চৌধুরী স্বপ্নেশ চৌধুরী বিষ্ণু দাস পরিমল দত্তরায় বলাই কর্মকার-এর প্রত্যেকের দুটি করে মোট কুড়িটি ছবি এবং সুধীর ধর-এর চারটি এবং মানিক তালুকদারের ছটি ভাস্কর্য নিদর্শন দেখা গেল। 'ক্যানভাস' শিল্পীচক্রের শিল্পীরা শিল্পক্ষেত্রে নবাগত নন এবং যৌথভাবে অনেক প্রদর্শনী করার অভিজ্ঞতা এঁদের আছে। সুতরাং প্রদর্শনী উপস্থাপনে আরও অনেকটা বেশী যত্ন আশা করা গিয়েছিল।

অলোক ভট্টাচার্য ত্রিদিব চন্দ্র সুবীর চৌধুরী এবং বিষ্ণু দাস তাঁদের ছবিতে শোষিত বঞ্চিত খেটে-খাওয়া বলশালী মানুষদের ভাগ্য সম্বন্ধে কিছু বলতে চান। বেশীভাগ সময়েই বক্তব্যটা অবয়বিক ভঙ্গীর নাটকীয়তা এবং পরিবেশ বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রকটভাবে প্রকাশিত। এবং রূপায়ণ পদ্ধতিতে ইউরোপীয় বারোক এবং রোমান্টিক শিল্পীদের দৃষ্টি-প্রকরণ নাটকীয়ভাবে অনুসৃত। এরই মধ্যে দক্ষতাগুণে অলোক ভট্টাচার্যের দুটি এবং ত্রিদিব চন্দ্রর একটি ছবি উপভোগ্য।

শক্তি চক্রবর্তী স্বপ্নেশ চৌধুরী বলাই কর্মকার বা মানিক তালুকদার যতটা শিল্পভাবনায় ভাবিত ততটা 'সমাজ সচেতন' নন। শক্তি চক্রবর্তী নিঃসন্দেহে দলের সবচেয়ে শক্তিমান চিত্রকর এবং মানিক শক্তিমান ভাস্কর। দুজনেই প্রাতিস্বিক রূপকে অবলম্বন করে তাকে বিশদহীন করে তাঁদের প্রায়-বিমূর্ত রচনা নির্মাণ করেন। বর্ণচয়ন বিস্তরণ এবং প্রয়োগে শক্তির দক্ষতা অনস্বীকার্য। শক্তি একাধারে একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক দৃশ্যকে বিশদহীন করে রঙের পঞ্জের সুসম সমাহারে নির্মিত নকশা গড়ে তোলেন এবং অন্যধারে ঐ বিমূর্ত নকশার সাহায্যে একটি নির্জন কিন্তু মানুষের স্পর্শহীন নয় এমন একটি রৌদ্রস্নাত নির্বিশেষ সূর্যের ব্যঞ্জনা তৈরী করেন। মানিক তালুকদার অবশ্য আরও একটু বিশুদ্ধ শিল্পবাদী। তিনি প্রাতিস্বিক রূপকে বিশদহীন করে তাকে মসৃণ ঘনপুঞ্জে পরিণত করেন। তবে তাঁর প্রবণতা মূলত 'যৌগিক' না মূলত 'বিয়োজক' বোঝা গেল না। মনে হয় বিয়োজক রচনাতেই তাঁর দক্ষতা বেশী প্রকাশ পায়।

পরিমল দত্তরায় ও সুবীর চৌধুরীর ছবি

'ক্যানভাস' শিল্পীচক্রের উদ্যোগে বিড়লা অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে শ্রীপরিমল দত্তরায় এবং শ্রীসুবীর চৌধুরীর ছবির একটি যৌথ প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনীতে দুজনেরই আটটি করে ছবি প্রদর্শিত হয়। ছবিগুলি ড্রইং বলে বর্ণিত হয়। দুজনের ছবিই ড্রইং-প্রধান। অর্থাৎ চিত্রস্থ রূপবন্ধগুলি রেখার সাহায্যে শরীর পেয়েছে এবং ছবিতে এই রূপবন্ধগুলিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। তবু ছবিগুলিকে পুরোপুরি ড্রইং বলে মেনে নিতে বাধা হয়। কারণ ড্রইং-এর স্বতঃস্ফূর্তি ও অসম্পূর্ণতা এগুলিতে অনুপস্থিত। শিল্পীয়ত রূপবন্ধ যতই রেখার বেধে ধরা পড়ুক না কেন, তাতে ঘনত্ব আরোপের জন্য আলোছায়ার তারতম্যবোধক টোনাল গ্রেডেশন করা হয়—তবে ড্রইং-এর রেখার বিশুদ্ধতা স্বতঃস্ফূর্তি এবং অসম্পূর্ণতা ক্ষুণ্ণ হয়।

সুবীরবাবু এবং পরিমলবাবুর ছবিতে অনেক নির্বাস সুদেহী মানুষ এবং ঘোড়া দেখা যায়। ছবির মানুষ এবং ঘোড়াদের চেহারা প্রাতিস্বিক। অর্থাৎ এঁদের দুজনের কেউই রূপায়ণ-পদ্ধতি মারফৎ বক্তব্য উপস্থাপন করার চেষ্টা প্রাথমিকভাবে করেননি। বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন মোটামুটিভাবে অবয়বিক ভঙ্গির সাহায্যে ঘটনা বর্ণনার সাহায্যে। ছবিগুলি একান্তভাবে ঘটনা বর্ণনামূলক এবং সেইসব ঘটনার প্রতিফলন ঘটনাস্থিত পাত্রপাত্রীদের ঘটছে তা তাদের অবয়বিক ভঙ্গির সাহায্যে বোঝান হয়েছে। অর্থাৎ এ ছবিগুলি দেখার অভিজ্ঞতা অনেকটা নাটকের ফ্রিজ-অ্যাকশন দেখার অভিজ্ঞতার মতন। যেসব অবয়বিক ভঙ্গী যথা উত্তোলিত বাহু, আর্তচিৎকাররত মুখমণ্ডল ইত্যাদি ঘুরে ফিরে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো বহুব্যবহার জীর্ণ। সমস্ত ছবির রূপায়ণ পদ্ধতির মধ্যে যা খানিকটা নান্দনিক তৃপ্তি দিতে পারে তা হল—অনেক ক্ষেত্রে দৃশ্যকে দেখার জন্য যে দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক সময় এই দৃষ্টিকোণের ব্যবহার প্রেক্ষিতকে বদলে দিয়ে দৃশ্যকে একটি নতুন অর্থময়তা দিতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু তাওতো দাভিদ আলফারো সিকুয়েরস-এর কাছ থেকে সরাসরি নেওয়া।

শিল্পের যদি মনস্তত্ত্ব যৌনতা ঈশ্বর ধর্ম নিয়ে বক্তব্য থাকতে পারে তবে অতি অবশ্যই রাজনীতি সমাজনীতি নিয়ে বক্তব্য থাকতে পারে। কিন্তু সে বক্তব্য শিল্পের নিজস্ব ভাষাতেই রূপ পাওয়া চাই। নাটক প্যান্টোমাইম ইত্যাদি অন্য শিল্পের ভাষায় নয় বা বহুব্যবহৃত ধার-করা ভাষায় নয়। সমাজ-সচেতন শিল্পীদের শৈল্পিক দুর্বলতা তথাকথিত বিশুদ্ধাচারী শিল্পীদের সমাজ-সচেতনতার বিরুদ্ধে জেহাদকে জোরদার করে। অতএব সমাজসচেতন শিল্পীদের শিল্পের প্রতি দায়িত্ব সম্বন্ধে অনেক বেশী সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

—প্রণবরঞ্জন রায়

—আচ্ছা ওয়াকা ম্যাণ্ডেলার মার সব সময় অসুখ-বিসুখ লেগে থাকে তাই না?

—সারি জ্বর হতে দেখেছি। একদিন খুব কাশছিল।

—ঠিক ঠিক।

সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তখন বললে—এই আমরা খেলব না।

ওয়াকা বলল—না তোমরা বাড়ি যাও। রাত হলে তোমাদের মা-বাবারা বকবে।

বসন্তনিবাস বলল ওরা থাকে না। ওখানে কোনো গণ্ডগোল [illegible] না।

ওয়াকা হাত ছড়িয়ে [illegible] ওদের মা বাবাকে তো তুমি জান না [illegible] বাকে।

হয়তো এখন পাহাড়ের ওপারে [illegible] বাড়িতে কোনো জানালায় টুনি [illegible] দেখছে। ওয়াকা টের পেলেই বলছে এই টুনি [illegible] তোর মা [illegible]। তাড়াতাড়ি যা।

তখন হয়তো অন্য পাহাড়ের ছাদে দাঁড়িয়ে ডাকছে টুপু। টুপু কোথায় রে।

—যাই বাবা। ছোট্ট এইসব মাটির ছেলেমেয়েরা কেমন চারপাশে দাঁড়িয়ে [illegible] সব দুঃখ [illegible] পারে। ম্যাণ্ডেলার [illegible] [illegible] বেশি [illegible]। [illegible] [illegible] ছেড়ে না তবে তোমার [illegible] থাকবে না।

টিম ম্যাণ্ডেলা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] আছে। যেন বর্তাদিনের কথাই [illegible]। বসন্তনিবাস একটা বাচ্চা টিমি পুষেছিল। এর চেয়ে বড় খবর ওয়াকা পৃথিবীতে কি আছে জানে না।

টুপু, টুনি এবং অন্য সবাই দাঁড়িয়ে আছে। কেউ যাচ্ছে না। ওয়াকা খুব বিরক্ত হচ্ছে। —এই তোরা যা। আমরা এখন উঠব।

টিম বলল—আচ্ছা ওয়াকা ম্যাণ্ডেলার মাকে কখনও হাসতে দেখেছ?

ওয়াকা মাথা চুলকাল। বলল—মনে করে দেখি। তোরা এখনও দাঁড়িয়ে। আর নেই। আবার যখন আসবে নিয়ে আসবে। তারপর কি ভেবে বলল—হ্যাঁ হাসতে দেখেছি।

—কবে?

—এই তো সেদিন।

—যাঃ হতেই পারে না। জাহাজডুবির পর হাসতে দেখেছ?

—জাহাজডুবি! ও হো, আমাদের মনেই নেই। ম্যাণ্ডেলার বাবা জাহাজডুবিতে নিখোঁজ হয়েছে! জাহাজডুবির পরও হাসতে দেখেছি?

—মিথ্যা কথা। টিম চেঁচিয়ে উঠল। রাগে ওর হাত-পা কাঁপছে। —ওয়াকা তুমি মিথ্যে কথা বলছ।

—তা হবে। তুমি যাচ্ছ!

—জাহাজে ফিরছি।

—[illegible] হাঁটছি।

ওরা [illegible] [illegible] নেমে এল। পাহাড় জোড়া সব রাস্তা। এখন চার-পাশের সব বাড়ি-ঘরগুলোতে আলো জ্বলছে। কোথাও আলো জ্বেলে মেয়েরা টেনিস খেলছে। মসৃণ সবুজ ঘাসের ভেতর ওরা যখন দৌড়ায়—ওদের সুন্দর পা-হাত মুখ এবং সাদা পোশাক দেখতে দেখতে টিম কেমন তন্ময় হয়ে যায়। তখন ওয়াকা হঠাৎ ডেকে ওঠে এই বসন্তনিবাস তুমি জাহাজে যাবে না।

টিম মনে করতে পারে জাহাজে তার কাজ [illegible] একেবারে কেউ নয়। ওয়াকা তার কেউ নয়। এই বাচ্চা শিশুরা ওর কেউ নয়। সে আপন মনে চুপচাপ হাঁটে। তারপর আবার সহসা অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে হেসে সত্যি বলছ [illegible]।

—আমার তো তাই মনে হয়। নামতে গিয়ে ওয়াকার মাথা থেকে টুপি পড়ে গেছিল। সে টুপিটা তুলে নিল, দুবার ঝেড়ে ওটা আবার মাথায় পরে বলল—আমি দেখেছি। ওকে অনেকবার হাসতে দেখেছি।

—অনেকবার! টিম কেমন মুখগোমড়া করে [illegible]। [illegible] [illegible] ঠিক মিলছে না। সে বলল—আচ্ছা ওয়াকা, তা হলে যাচ্ছি। আসলে ওয়াকা ঠিক বুঝতে পারে না। ছেলেমানুষ না বোঝারই কথা। ম্যাণ্ডেলার মা হাসতেই পারে না। বরং টিমের ইচ্ছে হল একবার বলে জানো ওয়াকা আমি গত-দিন জানি তিনি লম্বা একটা মেহগনি খাটে কেবল শুয়ে থাকেন। সারা শরীর নরম সাদা সিল্কের চাদর ঢাকা। মুখের রং দুঃখে নীল। কেবল চোখ দুটো জাগা।

ভীষণ তাজা আর মাঝে মাঝে সেই ছোট্ট ক্যাঙগারুর বাচ্চাটা বিদেশী লোক দেখলেই কুঁই কুঁই করে ওঠে।

ওয়াকা বলল—ওদিকে কোথায় যাচ্ছ! ওদিকে কোন রাস্তা নেই। শুধু বন। গভীর বনের ভেতর ঢুকে গেলে আর বের হতে পারবে না বসন্তনিবাস।

মৈত্র তখনই একটা ভীষণ ঠাণ্ডা গলার স্বর শুনতে পেল। সে ভীষণ ভয় পায়। সেই ছোটবাবু আর ডেভিড। হাতে তাদের টর্চ। ছোটবাবু বলছে, এদিকে এস ওয়াকা, তুমি ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে। সারাদিন তুমি ওর সঙ্গে ছিলে?

—কোথাও না স্যার।

ডেভিড মৈত্রকে নিয়ে আগে আগে যাচ্ছে। ছোটবাবু ওয়াকার সঙ্গে।

ওয়াকা তখন বলছিল—বসন্তনিবাসতো বিকেলের দিকে কুইনস পার্কে গেছে। তার আগে ওকে আমরা দেখিনি। সারাদিন আমি ওর সঙ্গে থাকব কি করে!

ছোটবাবু ভেবে পেল না সারাটা সকাল দুপুর মৈত্রদা কোথায় ছিল! জাহাজে এসে সে নানারকম ঝামেলায় ক্রমে জড়িয়ে যাচ্ছে। ক্যাথারিন এসে এক রবিবারে ফিরে গেছে। বন্ধু অনিমেষ এক রবিবারে সবার হয়ে গেছে। ছোটবাবু যেতে পারছে না। সেই যে সে জেনে ফেলেছিল বনিকে আর তখন থেকে সে একেবারে অন্য মানুষ। কেমন সে দায়িত্বশীল মানুষ, অথবা কখনও উইনচের নিচে বনি এসে যখন ওর এটা ওটা এগিয়ে দেয় সে ভেবে পায় না বনিকে কি বলবে! বনি সহজেই অজস্র কথা বলতে পারে, বনির সঙ্গে সারারাত বোট ডেকে বসে গল্প করতে করতে রাত কাবার করে দেয়া যায় এবং বনিকে নিয়ে সে ঘুরেও আসতে পারে যেন—বনি ভীষণ বুদ্ধিমতী সঙ্গে ডেভিডকে নিতে ভালবাসে আর তারপর বনি ডেভিডকে কোন পারে বসিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দেয়—কথা থাকে ফেরার সময় তুলে নেবে ডেভিডকে। ছোটবাবু চুপচাপ থাকে। বনির চুল বড় হয়ে যাচ্ছে। বনির চুল বাতাসে উড়তে থাকে। বনির ভারি খারাপ স্বভাব—সে কথা বলার সময় অথবা হেসে ছোট-বাবুকে ঠেলে দেয় সামান্য। ছোটবাবু তখন না বলে পারে না এই পড়ে যাব কিন্তু। পড়ে গেলে মরে যাব।

আসলে ছোটবাবু ওয়াকাকে বলতে চাইল ওঁকে বেশি দূরে নিয়ে যাবে না! আমাদের জাহাজ শিগগির ছেড়ে দেবে। আমরা সামোয়াতে যাব। ওঁকে নিয়ে আমরা খুব চিন্তায় পড়ে গেছি ওয়াকা! এমন হাসিখুশি মানুষটা হঠাৎ কি যে হয়ে গেলেন!

ওয়াকা বলল—যাচ্ছি স্যার।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে সি-ম্যান মিশনের কাছে এসে গেছে। ছোটবাবু ওয়াকাকে বলতে পারত তোমরা ওকে বেশি দূরে নিয়ে যাবে না। ওর মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। জাহাজে এটা হয়। বড় একঘেয়েমি জাহাজে। তুমি তো জানো না ওয়াকা—মৈত্রদার দেশে স্ত্রী আছে। মানুষটা তার বৌকে ভীষণ ভালবাসে ওর ছেলে হবে। ছেলে হলে একদিন ভোজ দেবার পর্যন্ত কথা ছিল। এখন সেসব আর ভাবে না।

তারপর যেন বলতে পারত তোমাদের কি কিছু বলে মৈত্রদা? এই যেমন তার বৌর কথা বাচ্চার কথা। চিঠির কথা। চিঠি একটাও কেবিনে পাওয়া যাচ্ছে না। স্যালি হিগিনস চিফ-মেট সবাই দুঃসম্বাদে ওর ফোকসালে নেমে দেখেছিল চুপচাপ মৈত্রদা বসে রয়েছে। চোখ খোলা। কাজে বের হয়নি। এবং সারেঙকে সারারাত অথবা খিস্তিখেউড় করেছে। সারারাত সব চিঠিতে আগুন জ্বালিয়ে পাত-পা সেঁকেছে।

ওয়াকা চলে যাচ্ছিল। ছোটবাবু বলল—তোমার সঙ্গে ফের দেখা হলে আমাদের খবর দেবে।

—আচ্ছা। সে এবার সত্যি চলে যাচ্ছিল।

ছোটবাবু বলল—তুমি কোথায় থাকো?

সে একটা পাহাড়ের টিলা দেখিয়ে বলল—ঠিক তার নিচে। রাস্তার নাম সাইমন স্ট্রীট। সে যে বাড়ির আউট-হাউসে রাতে শুয়ে থাকে তার ঠিকানা পর্যন্ত দিয়ে দিল।

ওয়াকা বুঝতে পারছিল না এমন ভালো মানুষটাকে তাঁরা খুঁজে নিয়ে যাচ্ছে কেন। বসন্তনিবাসতো জাহাজেই ফিরছিল। বেশি রাতও হয়নি এর চেয়ে কত বেশি রাত করে জাহাজিরা বন্দরে ফেরে। আর সে দেখেছে বসন্তনিবাসের মতো সমুদ্রের গল্প কেউ বলতে পারে না। ওরা দুজনে অনেক-দিন গল্প করতে করতে সারাটা দিন কাটিয়ে দিয়েছে। বসন্তনিবাস ওয়াকাকে ভাল ভাল খাবার খাইয়েছে দোকান থেকে। যেন বসন্ত-নিবাসের এর চেয়ে বড় কাজ পৃথিবীতে আর নেই।

বনি গ্যাংওয়েতে দাঁড়িয়েছিল। সে ছোটবাবুকে উঠে আসতে দেখে বলল—পেলে?

—পেয়েছি। আসছে।

বনি দেখল মানুষটা অন্ধকার থেকে উঠে আসছে। কালো পোশাক শরীরে। সাদা রঙের রাংতা আঁটা। সেফটিপিনে সব লাল নীল ফিতে ঝলুস প্রজাপতি। বড়দিনের উৎসবে যেমন সবাই লম্বা টুপি পরে হৈ-চৈ

করে বেড়ায় বড়টিন্ডালের মাথায় তেমনি লম্বা টুপি। টুপিতে সব হলুদ দাগ কুল। বোধহয় ওয়াকা বলে ছেলেটা বড়-টিন্ডালকে ফুল দিয়ে এভাবে সাজিয়ে দেয়।

জাহাজে মৈত্রদা কারো সঙ্গে কথা বলছে না। কাজের সময় ঠিক কাজ করে যাচ্ছে। ছুটির দিনে সে সকালেই বের হয়ে পড়ে। কোনো কোনোদিন রাতে ফেরে না। একদিন ওয়াকা এসেই খবর দিয়েছিল সমুদ্রের ধারে বালিয়াড়িতে শুয়ে আছে বসন্তনিবাস।

ওয়াকা কিছুতেই জাহাজঘাটায় নিয়ে আসতে পারছে না।

এসব দিনেও ছোটবাবু বন্ধু অথবা আনিমেষকে নিয়ে খুঁজতে বের হয়। কোনো-দিন ডেভিড থাকে সঙ্গে। অমিয় কেমন স্বার্থপরের মতো ব্যবহার করছে। মাঝে মাঝে তার হাতে থাকে লম্বা একটা থলে। থলের মুখ ঢাকা। দু দিন গ্যাংওয়েতে কোয়ার্টার-মাস্টার ধরেছিল। সে ব্যাগ খুলে দেখালে কোয়ার্টার মাস্টার অবাক। এসব ছাইপাঁশ সে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে! অমিয় একটা কথাও বলেনি। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় মাথা বোধ হয় কারো ঠিক নেই। আরো এক বছর থাকতে হবে জাহাজে দেশে ফেরা যাচ্ছে না এই সব শুনেই হয়তো ভয়ে বড় টিন্ডাল পাগল হয়ে গেল। এবং সে নিজেও ভাল নেই। জাহাজের এই হাল তবিয়ত—কখন কি হয় অথচ মুখ ফুটে বলার কারো সাহস নেই। কোয়ার্টার-মাস্টার তারপর অমিয়কে একটা প্রশ্নও করেনি।

একদিন ছোটবাবু অমিয়কে ডেকে খুব কথা শুনিয়েছিল। —তুই কিরে! মৈত্রদার কোন খোঁজ-খবর নিস না। কোথায় থাকিস.

অমিয় বলেছিল ছোটবাবু জাহাজের অবস্থা ভাল না তোমাকে বলে দিলাম। মৈত্রদা সেয়ানা লোক। পাগলামি করলেই ভেবেছে দেশে পাঠিয়ে দেবে। ও-সব আমরা বুঝি।

—তুই কি বলছিস যা তা।

—সত্যি কথা বলছি। তুমি তো আর জাহাজিদের খবর রাখো না। মন কারো ভালো নেই। এই যে এক বছরের জন্য কাপ্তান সাউথ-সিতে ভেসে বেড়াবে সেটা কেন তুমি জান?

—ফসফেট টানবে জাহাজ।

—ধুস, তুমি একটা আহাম্মক ছোটবাবু। ওটাতো একটা অজুহাত। জাহাজ এখন কোম্পানীর কর্তারা ডুবিয়ে দিতে পারলে বাঁচে। ওটা ওপরের দিকে উঠতে থাকলেই বাবুদের জ্বর আসতে থাকে।

ছোটবাবু একটা কথা বলতে পারল না। বেশ কানাঘুষা তবে জাহাজে যেই হোক প্রচার ভালই চালিয়ে যাচ্ছে।

ছোটবাবু বলল আমার এসব বিশ্বাস হয় না।

—তুমি নতুন ছোটবাবু। তোমার কেউ নেই। তোমার মা-বাবা ভাই বোনের খোঁজ-খবর রাখ না। তুমি কি করে বুঝবে আমাদের দুঃখ!

ছোটবাবু কেবিনে পায়চারি করছিল। অমিয় বসে রয়েছে। ছোটবাবু ভেবেছিল, কি করে এমন একটা গুজব থেকে জাহাজটাকে রক্ষা করা যায়! ডেভিড মাঝে মাঝে ক্ষেপে গেলে এমনই বলত। তার তখন বিশ্বাস করতে ভাল লাগত। ডেভিড কি এখন সবাইকে একই কথা বলে বেড়াচ্ছে! কতবার জাহাজ পথ হারিয়েছিল কিউ টি জি কতবার সঠিক পায়নি, কম্পাস রিডিং ঠিক না দিলে যা হয় যতই মেরামত করা হোক অথবা নতুন কম্পাস জাহাজে উঠলেই সব কেমন গণ্ডগোলে পড়ে যায় আসলে সবই গুজব সে বলতে পারত ক'বার ক'জন কাপ্তান পাগল হয়ে নেমে গেছে জাহাজ থেকে তার একটা লিস্ট যেন এখুনি টানিয়ে দিতে পারে অমিয় এবং ছোটবাবু এটা বুঝতে পেরেছে ফোকসালে সবার চোখে মুখে ভীষণ অসন্তোষ। সুযোগ পেলেই সারেঙকে যা তা বলছে সুতরাং অমিয় তাকে তো স্বার্থপর ভাববেই।

ছোটবাবু বলল—মৈত্রদা তোকে কিছু বলেছে?

—কী বলবে?

ছোটবাবু বলল—এসব গণ্ডগোল হবার আগে এমন কিছু কথা যা থেকে আমরা ধরতে পারি—অর্থাৎ কোনো ক্লু যদি আবিষ্কার করা যায়।

—তুমিও যেমন ছোটবাবু! মৈত্র কাঁচা ছেলে! সে আগে যদি কিছু বলতই তবে তোমরাতো সব ধরেই ফেলত।

—আমার তো মনে হয় বাড়ি থেকে কিছু খারাপ খবর-টবর এসেছে।

—তুমি সেই ভেবে থাকো। আমি এখন উঠব। জাহাজ এবার ছাড়ছে। তুমিও সাবধানে থেকো। যা সব শুনেছি ওতে কারো নিস্তার নেই। কাপ্তান আস্ত একটা শয়তান। কাপ্তান মানুষ হলে এমন ভাঙ্গা জাহাজ নিয়ে দরিয়ায় ভাসতে কখনও সাহস পেত না।

ছোটবাবুর মনটা কেমন দমে গেল। এ জাহাজে বনি আছে এবং কাপ্তান জেনে-শুনে এত বড় দায়িত্বের ভেতর কেন যাচ্ছেন। ছোটবাবু কি ভেবে বলল—আচ্ছা ঠিক আছে তুই যা।

অমিয় যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ছোটবাবু তখনও পায়চারি করছে। বড়-মিস্ত্রি নেমে যাওয়া বিষাক্ত পাখিদের উড়ে আসা আর্চির ক্রুদ্ধ মুখ বনিকে জাহাজে নতুনভাবে আবিষ্কার মৈত্রদার সহসা পাগল হয়ে যাওয়া তাকে ভীষণভাবে চিন্তিত করে তুলেছে। এবং এ জাহাজে কাপ্তান নিজেও কি-সব দেখতে পান। একজন মেয়ে সব সময় সোনালী গাউনের ভেতর জ্যোৎস্না-রাতে জাহাজ-ডেকে পায়চারি করে বেড়ায়। এসব মনে হতেই সে সোজা মৈত্রদার ফোকসালে চলে গেল। শেফালীবৌদি সম্পর্কে কিছু বললে একটা কথা বলে না। আজ অন্যভাবে কথা আরম্ভ করবে ভাবল। গতকাল থেকে ওকে আটকে রাখা হয়েছে। কোথায় নেমে যাবে কে জানে! সারেঙের সঙ্গে পরামর্শ করে ছোটবাবু একাজ়া আর কোনো পথ খুঁজে পায়নি। জাহাজ ছেড়ে দিলে যদি আবার সব ঠিকঠাক হয়ে যায়!

ছোটকে দেখেই কেমন ছেলেমানুষের মতো বলল—তুই এলি!

ছোটবাবু বলল—আচ্ছা মৈত্রদা তোমাকে যদি দেশে পাঠিয়ে দেয়া যায় কেমন হবে?

—আমাকে! দেশে! কি হবে!

—তবে তুমি এমন করছ কেন?

—কী করছি! তোরাই তো আমাকে বা তা করছিস। কাল আমাকে জাহাজ থেকে নামতে দিসনি। কোয়ার্টার-মাস্টার আমাকে নামতে দেয়নি। তোরা কি ভেবেছিস!

—আমরা কিছু ভাবিনি। তুমি যদি দেশে যেতে চাও সবাই মিলে আমরা কাপ্তানকে ধরব। সবাই বললে তিনি আমাদের কথা ফেলতে পারবেন না।

—তুই মাঝে মাঝে খুব সরল হয়ে যাস ছোট। আমার দেশে যাবার কী হল। এত-গুলো লোক জাহাজে কাজ করতে পারছে আমি পারব না।

—সমুদ্রের বালিয়াড়িতে শুয়ে থাকো কেন! জাহাজে ফিরে আসো না কেন!

—সকাল হলেই চলে আসতাম। জাহাজে না ফিরলে আমার কাজ কে করবে! তোদের নিজেদের মাথা ঠিক নেই। কি সব গুজব জাহাজে ছড়ানো হচ্ছে খবর রাখিস!

ছোটবাবু বলল—জাহাজটাতো সত্যি ভাল না। সবাইতো বলছে ভুতুড়ে জাহাজ। কত কাপ্তান জাহাজটার পাগলামীতে নিজেরা পাগল হয়ে গেছে। আমরাতো ভাবলাম এ সফরে তোমাকে দিয়ে বোধহয় এটা আরম্ভ হল।

মৈত্র খুব সরলভাবে হাসল।—তুই খুব ভয় পেয়ে গেছিস!

—ভয় পাব না বল! তুমিই তো বলেছিলে ছোট, আমরা আছি ভয় কি! এখন যদি তোমরা এমন করতে থাকো তবে আমি কি করি বলত!

দু একজন জাহাজি দরজায় উঁকি দিয়ে-ছিল। ছোটবাবু ওদের চলে যেতে বলায় কেউ ভিড় করে নি। সারেঙসাব সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সব শুনছেন। ছোটবাবু মৈত্রমশাইকে নানা-ভাবে বোঝাচ্ছে।

ছোটবাবু বের হবার মুখে হঠাৎ ছুটে গেল মৈত্র। —এই শোন। ছোটবাবু ঘুরে দাঁড়ালে বলল আমি কিন্তু কাল কিনারায় যাব একবার। কোয়ার্টার-মাস্টারকে বলে দিস যেন আমাকে ছেড়ে দেয়।

ছোটবাবু বলল আচ্ছা বলে দেব। ওপরে উঠে সারেঙসাবকে বলল কাল যেতে দিন। আমি কাল ওর সঙ্গে থাকব। জাহাজতো এবার ছেড়েই দিচ্ছে।

পরদিন শেষ সালফার গাড়িতে বোঝাই হচ্ছিল। টংলিং টংলিং করে সব মালগাড়ি একে একে চলে যাচ্ছে। ক্রেনগুলো এবার সরিয়ে নেওয়া হবে। ডেরিকগুলো সব নামিয়ে দেওয়া হবে। জল মারা হবে সর্বত্র। সব সালফার গুঁড়ো এখন ধুয়েমুছে একে-বারে খালি জাহাজ এবং গ্যাংওয়েতে দাঁড়ালেই বোঝা যায় জাহাজ কত খালি, জাহাজের সিঁড়ি একেবারে সোজা হয়ে গেছে।

বিকেলে নেমে গেল মৈত্রদা। সেই জম-কালো পোশাকে। মৈত্রদা সারাদিন কাজ করেছে। যেভাবে ছোটবাবু দেখে থাকত বয়লার-রুমে আজও তেমনি দেখেছে। কাজকাম কম বলে সকাল সকাল ছুটি মৈত্রদা নেমে গেল। পেছনে পেছনে যেন মৈত্রদা বুঝতে না পারে সে নেমে গেল। এবং বনি আবার তার পেছনে পেছনে নেমে গেল। তার পেছনে পেছনে নেমে গেল আর্চি। আর্চি নেমে যেতে না যেতেই একদল বাচ্চা এসে ঘিরে দাঁড়াল আর্চিকে। বাদের মতো মানুষটাকে ওরা এমন ক্ষেপিয়ে তুলল যে আর্চি আর বেশিদূর যেতে সাহস পেল না। সে উঠে এসে সারাক্ষণ পায়চারি করল বোট ডেকে। সে এখন কি করবে স্থির করতে পারছে না। যতদূরে জ্যাক চলে যাচ্ছে ততদূরে সে তাকিয়ে আছে। কাপ্তান চার্টরুমে ভীষণ ব্যস্ত। তিনি, ডেবিড, চিফ-মেট শেষ বারের মতো জাহাজের কোর্স-লে ঠিক আছে কিনা দেখে নিচ্ছেন। ক্রমে স্যালি হিগিনস ভীষণ সতর্ক চারপাশে বাতাসে গন্ধ শুঁকে ভয়ঙ্কর ঝড়ের আশংকাতে আতঙ্কিত। অথচ চোখমুখ দেখে বোঝাই যাবে না, বরং তিনি আগের চেয়ে বেশি হাসিঠাট্টায় মজে আছেন। সরল সহজভাবে কথা বলছেন সবার সঙ্গে। একজন সফল কাপ্তানের মতো সবসময় চলা-ফেরা। শেষ সফরে তিনি তো ভেঙে পড়তে পারেন না। তিনি তো বলতে পারেন না সিউল-ব্যাঙ্ক সত্যি অচল জাহাজ ওকে যেন্ন এতদিন সমুদ্রে একনাগাড়ে কিছুতেই চালানো যাবে না।

আবার হয়তো কখনো কখনো মনে হয় সিউল-ব্যাঙ্ক এতদিন সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে নিজের ভেতরেই সে সৃষ্টি করেছে এক ঐশী শক্তি। এর সামনে সব সমুদ্রঝড়, সাইক্লোন, টাইফুন অথবা বিষাক্ত পাখিদের আক্রমণ—অর্থহীন। ভাবি বিধ্বস্ত জাহাজ। মানুষের চেয়ে অনেক বেশি শ্রী এলিসের চেয়ে আরও বেশি, তিনি সব কিছুর ওপর বিশ্বাস হারালেও সিউল-ব্যাংকের ওপর বিশ্বাস হারাতে পারেন না। তাই তখন সাহস বাড়ে। তিনি তখন অনায়াসে মাথায় টুপি টেনে চঞ্চল বালকের মতো মাঠের শেষ গোলপোস্টে দাঁড়িয়ে যেতে পারেন। দুহাত তুলে প্রায় ঈশ্বরের সামিল সাহস এবং প্রতিযোগিতা, এই প্রতিযোগিতায় তিনি তো জীবনে কখনও হেরে যান নি। কর্তৃপক্ষের আস্থাভাজন মানুষ। শেষ সফরে হঠকারী কিছু করে ফেলতে পারেন না।

তখন বনি হাত তুলে ডাকল ছোটবাবু, দাঁড়াও। আমি আসছি।

ছোটবাবু পেছনে তাকিয়ে দেখল, বনি আসছে। বনির পুরুষের পোশাক বেশ মনোরম। এবং বনির ওপরে ওর খুশি হবার কথা। কিন্তু এখন সে ভীষণ রেগে যাচ্ছে। কি দরকার আসার! ওর ফিরতে ফিরতে কত রাত হবে কে জানে? আর মৈত্রদা কোথায় কতদূরে যাবে সেতো জানে না। কেবল আড়ালে আড়ালে লক্ষ্য রাখা। সন্ধ্যা হলেই বলতে হবে, এবারে চল। ওয়াকা এবং সে মৈত্রদাকে জাহাজে নিয়ে আসবে। আর তখন কিনা বনি! সে বলল কী তুমি আবার কেন!

—কিছু হবে না। বাবাকে বলে এসেছি।

আর তখন ছোটবাবু দেখল, মৈত্রদা কোথাও নেই। সে যেই না অন্যমনস্ক হয়েছে পেছনে তাকিয়েছে, কথা বলেছে বনির সঙ্গে, তখনই মৈত্রদা ভ্যানিস! সে বলল, আরে মৈত্রদা কোথায়! (ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

*হার্টের অসুখ

*হৃদযন্ত্র পুনঃস্থাপন

হার্টের অসুখ

আমেরিকার মতো নয় কিন্তু আমাদের দেশেও আজকাল বহু লোক হার্টের অসুখে মরছে বা যে-যে কারণে হার্টের অসুখ হয়ে থাকে তেমন কোনো কারণ ঘটার ফলে। এবং অকালে মরছে। পঁচানব্বই বছর বয়সে যদি কোনো মানুষ হার্টের অসুখে মরে তাহলে সেটা বরং কাম্য অন্য কোনো রোগে ভুগে ভুগে মরার চেয়ে অনেক ভালোও। কিন্তু ধরুন পঁয়ষট্টি বছর বয়সে (যখন এমন কি আমাদের দেশেও আজকাল অনেক মানুষই থাকে সৃজনশীল কর্মতৎপরতার শিখরে) কোনো মানুষের হার্টের অসুখে মৃত্যু হওয়াটা খুবই দুঃখের এবং কোনো রমেই হওয়া উচিত নয়। বিশেষজ্ঞ গবেষক ও চিকিৎসকদের অভিমত সম্ভবত এই দশকের শেষ দিকেই হার্টের অসুখে অকালমৃত্যু হওয়া বন্ধ হবে।

হার্টের অসুখ নানা রকমের। হার্টের মাংসপেশী বিকল হয়ে যেতে পারে। হার্টের ভাল্ভ ফুটো হয়ে যেতে পারে বা ঠিক সময়ে বন্ধ না হতে পারে। হার্টের স্পন্দন হয়ে যেতে পারে মারাত্মক রকমের ধীর বা দ্রুত।

তিনটিই হার্ট নামক যন্ত্রটির কোনো না কোনো গোলযোগ। বলা যেতে পারে যান্ত্রিক গোলযোগ। উপযুক্ত মেরামতী চালাতে পারলে অবশ্যই এই গোলযোগ সারে।

কিন্তু যাকে আমরা বলি হার্টের অসুখ বা হার্ট অ্যাটাক সেটি ঘটে যে কারণে উদ্ভূত হবার ফলে তার নাম অ্যাথেরোসক্লেরোসিস। এটি রক্তনালীর পীড়া সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস।

এই পীড়ার কারণ কি? এখনো পর্যন্ত জানা যায় নি। তার লক্ষণগুলো এই রকম। শিশু যখন মায়ের দুধ ছেড়ে গরুর দুধ ধরে তখন তাদের শরীরের ধমনীতে ভিতরের দিকের গায়ে সরু সরু মেদাক্ত দাগ পড়তে দেখা যায়। অল্প বয়সের এই দাগগুলো বিপজ্জনক নয় বয়স হলে মিলিয়ে যায়। কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। কখনো কখনো এই দাগগুলোর ওপরে কোলেস্টেরল জাতীয় মেদবহুল পদার্থ জমতে শুরু করে। জমতে জমতে এমন অবস্থা হয় যে পরবর্তী জীবনে তার ফলে ধমনীর ভিতরের গা হয়ে পড়ে পুরু বা এবড়োখেবড়ো। এই অবস্থায় ধমনীর ভিতর দিয়ে রক্তের প্রবাহ ব্যাহত হয়।

এই হচ্ছে পীড়ার শুরু। অতঃপর দুটি ব্যাপার ঘটতে পারে। ভিতরের গা এবড়োখেবড়ো হওয়ার জায়গায় ধমনী ছিঁড়ে যেতে পারে। কিংবা সেই একই জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে রক্তের প্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

যে-কোনো ধমনীতে এই অবস্থা ঘটতে পারে তবে সাধারণত ঘটে থাকে বৃহৎ ও মাঝারি আকারের ধমনীতে—মস্তিষ্কে কিডনিতে হৃদপিণ্ড থেকে নিঃসৃত মহাধমনীতে পায়ে।

রক্তের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া বা মস্তিষ্কের ধমনী ছিঁড়ে যাওয়ার অবস্থাকে বলা হয় 'স্ট্রোক'। হৃদপিণ্ডের মহাধমনী যখন এই স্ট্রোকের কবলে পড়ে তখন পার পাওয়া খুবই শক্ত।

আগে ধারণা ছিল ধমনীর ভিতরে রক্তের প্রবাহ ব্যাহত হবার অবস্থাটি বুঝি বা কেবল বুড়ো বয়সেরই লক্ষণ। এখন জানা গিয়েছে এমন কি কিশোর বয়সের ধমনীতেও এই অবস্থাটি ঘটতে পারে।

লক্ষ করা গিয়েছে বিশ্বের যে-দেশ যতো ধনী সেখানে হার্টের অসুখের প্রাবল্যও ততো বেশি। এমনকি বিশেষ একটি দেশের মধ্যেও দেখা যায় অপেক্ষাকৃত ধনীরা অপেক্ষাকৃত বেশি হারে এই রোগের শিকার।

তাহলে ধরে নিতে হয় আলোকপ্রাপ্ত স্বচ্ছল জীবনযাত্রার মধ্যে এমন কিছু অভ্যাসও আয়ত্ত হয় যা থেকে হার্টের অসুখের উদ্ভব বা যে অবস্থা থেকে হার্টের অসুখ তার উদ্ভব।

কী এই অভ্যাস? যদি নির্দিষ্ট করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে যে হার্টের অসুখ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে এই এই বিষয় পরিত্যাজ্য। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ চলেছে। নির্দিষ্ট একটি এলাকার তাবৎ অধিবাসী নিয়ে প্রায় আড়াই দশকব্যাপী গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গিয়েছে যে হার্টের অসুখে আক্রান্ত হয়—

স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষ অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যায় ও অল্প বয়সে।

যাদের রক্তে কোলেস্টেরল বেশি

যাদের রক্তচাপ বেশি

যাদের ডায়াবেটিস আছে

যাদের ইলেকট্রোকার্ডিও গ্রাম অস্বাভাবিক

যাদের ফুসফুস কমজোরী

যারা সিগারেট টানে

যাদের বাপ-মা বা ঠাকুর্দা-ঠাকুমার হার্টের ব্যামো ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের গ্রুট শুর হাসপাতালের এই সেই অপারেশন থিয়েটার যেখানে ১৯৬৭ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখ প্রথম একজন মানুষের হৃদযন্ত্র অপর একজন মানুষের শরীরে পুনঃস্থাপিত হয়েছিল। ফটোটি পরের দিনের।

একই ভূমিকা, ঘনীভূত চর্বি'র বা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় জমাট অবস্থায় থাকে এমন সমস্ত চর্বির। যেমন মাখন পনীর মাংস (মুরগি বাদে) চকোলেট ইত্যাদি। খাদ্যে যত বেশি ঘনীভূত চর্বি রক্তে ততো বেশি কোলেস্টেরল। কিন্তু অ-ঘনীভূত চর্বি এই মাত্রা কমায়। অ-ঘনীভূত চর্বি সাধারণত স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় থাকে যেমন—ভেষজ তৈল ইত্যাদি (নারিকেল তৈল বাদে যদিও স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল কিন্তু নারিকেল তেল হচ্ছে একটি সবচেয়ে ঘনীভূত চর্বি)। এই দুটি ছাড়াও আছে তৃতীয় আরেক ধরনের চর্বি যার কোনো ভূমিকা নেই—না বাড়ায় না কমায়।

পর্যবেক্ষক ও গবেষকরা এখন মোটামুটি এই মত পোষণ করেন যে হার্টের অসুখে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কমে যদি রক্তের কোলেস্টেরল কমানো যায়। এবং রক্তের কোলেস্টেরল সহজেই কমানো যেতে পারে খাদ্যে প্রয়োজনীয় অদলবদল ঘটিয়ে। সঙ্গে ওষুধ খেলে আরো সহজে।

তাহলে আমার যে প্রশ্নটি ওঠে তা এই : হার্টের অসুখে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কি সম্পূর্ণ দূর করা যায়? না, যায় না তার দরকারও নেই। একথা তো ঠিক যে মৃত্যুকে কিছুতেই ঠেকানো যাবে না। অতএব শুধু দেখা দরকার, হার্টের অসুখে অকালে যেন জীবন হারাতে না হয়। পঁচাশি বছর বয়সে পৌঁছে হার্টের অসুখ হোক না কেন।

অকালে হার্টের অসুখের আক্রমণ রোধ করার জন্যে কী কী করা দরকার তাও খুব স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। যেমন,

(১) বছরে একবার শরীরের অবস্থা পরীক্ষা করা—বিশেষ করে রক্তচাপের, রক্তে শর্করার ও কোলেস্টেরলের মাত্রার। যদি কোনো একটিও উচ্চমাত্রার হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যে প্রয়োজনীয় অদলবদল ঘটিয়ে বা ওষুধ খেয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে তা কমিয়ে আনা।

(২) শরীরের ওজনটি ঠিক রাখা, খুব বেশি বাড়তে বা কমতে না দেওয়া।

(৩) সিগারেট না টানা।

(৪) নিয়মিত ব্যায়াম করা।

(৫) অত্যধিক পরিশ্রম ও উৎকণ্ঠার কাজ না করা। যদি করতেই হয় তো শরীরকে ক্লান্ত না করে তা করা।

খুবই সহজ ও সরল পাঁচটি নিয়ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষকে দিয়ে মানানো শক্ত। যেমন, হার্টের অসুখে আক্রান্ত হতে চলেছে এমন কোনো রোগীকে বলা হল ওজনের দিকে নজর রাখতে, সামান্য চর্বির খাদ্য খেতে, সিগারেট খাওয়া ছাড়তে। শুনে রোগী জবাব, এসব হিতোপদেশ তো আমার জিভটাও দিতে পারে, তবে আর ডাক্তারের কাছে এসেছি কেন! ডাক্তার আমাকে পিল দিক, তাই খেয়ে আমার অসুখ সারুক।

ডাক্তার শুধু এটুকুই বলতে পারে যে এমনি একটি পিল এখনো পর্যন্ত কল্পনায় থেকে গিয়েছে। তবে বাস্তবে রূপ পেতে হয়তো খুব বেশি দেরি নেই। তখন শুধু পিল খাইয়েই রোগীর রক্তের কোলেস্টেরল কমানো যাবে, অন্যথা সে যা খুশি করে চলুক। অন্য একদল গবেষক বলেন রক্ত কেন জমাট বাঁধে তার প্রকৃত কারণ যদি জানা যায়, তাহলেই হার্টের অসুখের রোগীকে বাঁচানো যেতে পারে এবং সম্ভবত একটি পিলের সাহায্যেই।

হৃদযন্ত্র পুনঃস্থাপন

হার্টের অসুখে এমন অবস্থা দেখা দিতে পারে যে খোদ হৃদযন্ত্রটির মেরামতি প্রয়োজন। শল্যচিকিৎসা এখন এতই উন্নত যে হৃদযন্ত্রের অতি জটিল মেরামতীও সুসম্পন্ন হচ্ছে। কিন্তু অবস্থা যদি এর চেয়েও খারাপ হয়, এত খারাপ যে মেরামতের অযোগ্য তখনই তখন সম্ভব হলে এই হৃদযন্ত্রটি বাতিল করে অন্য একটি বসিয়ে দিতে হয়।

এখন কথাটি এই যে, মানুষ এখনো পর্যন্ত এমন কোনো কারখানা বানাতে পারেনি যেখানে কৃত্রিম হৃদযন্ত্র উৎপন্ন হতে পারে। অতএব হৃদযন্ত্র যদি বদলাতেই হয় তাহলে অন্য কোনো মানুষের শরীর থেকে একটি সচল হৃদযন্ত্র উৎপাটিত করে আনা দরকার। বলা বাহুল্য, এই উৎপাটন কোনো জীবিত মানুষের শরীর থেকে করা হতে পারে না, হতে পারে একমাত্র কোনো সদ্যমৃত মানুষের শরীর থেকে। [illegible] উৎপাটিত হৃদযন্ত্র [illegible] মানুষের মৃত্যু হচ্ছে [illegible]। [illegible] [illegible] হৃদযন্ত্র [illegible] [illegible] শরীর থেকে [illegible] হৃদযন্ত্রটি উৎপাটিত করে [illegible] শরীরে তা পুনঃস্থাপন করা হচ্ছে।

কথাটি বলা সহজ কিন্তু কাজটি খুবই জটিল ও দুরূহ। [illegible] এক জায়গা থেকে তুলে এনে অন্য জায়গায় [illegible] [illegible] বিশ্বের হৃদযন্ত্র বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য একজন [illegible] [illegible] হয় না।

একজন মানুষের শরীর থেকে হৃদযন্ত্র তুলে এনে অন্য একজন মানুষের শরীরে তা পুনঃস্থাপন করার ঘটনা ইতিহাসে প্রথম ঘটেছে ১৯৬৭ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে। তারপরে ১৯৭৫ সালের ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত নতুন হৃদযন্ত্র প্রাপকদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট ২২৭। হৃদযন্ত্র পুনঃস্থাপনের অপারেশন সম্পন্ন করেছেন ২১টি দেশের ৬২টি শল্যচিকিৎসকের দল। নতুন হৃদযন্ত্র-প্রাপক এই ২২৭ জন রোগীর মধ্যে ১৯৭৫ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে বেঁচে ছিলেন মাত্র ৩৭ জন। তাঁদের মধ্যে দু-বছর বা তারও বেশি কাল বেঁচেছেন এমন প্রাপকের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫ জন।

নতুন হৃদযন্ত্র নিয়ে পাঁচ বছরেরও বেশি কাল বেঁচে আছেন এমন মানুষ সারা পৃথিবীতে এখন মাত্র একজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এই মানুষটির নাম লুইস বি রাসেল, বয়স ৪৮, পেশায় শিক্ষক। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এই নামটি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯৭৩ সালের ২৫শে আগস্ট তারিখে তিনি ছিলেন বিশ্বের প্রথম মানুষ যিনি তাঁর বক্ষপঞ্জরে অপর একজনের হৃদযন্ত্র নিয়ে পাঁচ বছরেরও অধিক কাল জীবিত।

হার্টের অসুখে রাসেল প্রায় মরতে বসেছিলেন। তখন ভার্জিনিয়া মেডিকেল কলেজের একদল শল্যচিকিৎসক তাঁর শরীরে অন্য একজন মানুষের হৃদযন্ত্র পুনঃস্থাপন করেন। এই অন্য মানুষটি ছিল দুর্ঘটনায় নিহত সতেরো বছরের এক বালক।

তারিখটি ১৯৬৮ সালের ২৪শে আগস্ট। [illegible] পর্যন্ত বিশ্বের মাত্র ৩৫ জন মানুষের শরীরে এমনি ধরনের শল্যচিকিৎসা হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ তাঁদের শরীরে অন্য মানুষের হৃদযন্ত্র পুনঃস্থাপিত। কিন্তু এই ৩৫ জনের মধ্যে ৩১ জনই ছ' মাসের মধ্যে মারা গিয়েছেন এবং অধিকাংশই শল্যচিকিৎসার পরে হাসপাতালেই আবদ্ধ ছিলেন। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে [illegible] কয়েকটা দিন বা [illegible] জন্যে [illegible] স্বাভাবিক জীবন [illegible] করতে পেরেছিলেন মাত্র দু-[illegible]।

[illegible] রাসেল-ই ব্যতিক্রম। পাঁচ [illegible] উপর তিনি বেঁচে আছেন [illegible] [illegible] সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

[illegible] তিনি স্কুলে করেন সম্পূর্ণ [illegible]। [illegible] [illegible] পাঁচ থেকে [illegible] ক্লাশ নিতে পারেন। [illegible] [illegible] [illegible] যোগ দেন। সুখী ও [illegible] নাগরিক তিনি।

[illegible] দেখে বিশ্বের মানুষ হৃদযন্ত্র পুনঃস্থাপনের শল্যচিকিৎসায় আস্থা ফিরে পেয়েছে।

১৯৬৭ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথম যখন [illegible] মানুষের হৃদযন্ত্র অপর একজন [illegible] শরীরে পুনঃস্থাপিত হয়, সারা বিশ্ব জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছিল। এমন মন্তব্যও শোনা গিয়েছিল যে [illegible] আশ্চর্য এক নতুন যুগের শুরু হল বুঝি

হৃদযন্ত্র পুনঃস্থাপনের প্রথম বছরটি ছিল ১৯৬৮। সে বছরে ১০১ জন মানুষের শরীরে হৃদযন্ত্র পুনঃস্থাপনের শল্য-

চিকিৎসা চলে। অনেকের মতে ১৯৬৮ সাল হৃদযন্ত্র পুনঃস্থাপনের বছর'।

কেউ কেউ এতটা উল্লসিত হননি। তাঁরা বলতেন, হৃদযন্ত্র পুনঃস্থাপন করতে গিয়ে এই গুরুতর রকমের পীড়িত রোগী-দের যন্ত্রণা ও কষ্ট আরো বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে মাত্র। এ-ধরনের শল্যচিকিৎসায় রোগীরা আবার সার্থক জীবনে ফিরে যেতে পারবে এমন আশা দুরাশা মাত্র।

হৃদযন্ত্র পুনঃস্থাপনের শল্যচিকিৎসার পরে অধিকাংশ রোগী বেঁচে থেকেছেন অতি স্বল্পকাল এবং সেই সময়টুকুতে ভোগ করেছেন নিদারুণ যন্ত্রণা ও অস্বাচ্ছন্দ্য। অন্যদিকে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের দিন কেটেছে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার মধ্যে। তদুপরি বিপুল পরিমাণ খরচ। প্রতিটি রোগীর শল্যচিকিৎসার জন্য খরচ পড়ে প্রায় এক লক্ষ ডলার (সাড়ে সাত লক্ষ টাকা)।

ফলে, ১৯৬৯ সালে হৃদযন্ত্র পুনঃস্থাপনের শল্যচিকিৎসা সম্পন্ন হয়েছে মাত্র ৪৮টি, ১৯৭০ সালে ১৬টি ১৯৭১ সালে ১৯টি, ১৯৭২ সালে ১৭টি।

১৯৭৩ সালে গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হৃদযন্ত্র পুনঃস্থাপনের শল্যচিকিৎসায় বড় দল ছিলেন মাত্র একটিই। তাঁরা হৃদযন্ত্র বদল করছিলেন প্রতি মাসে একটি নি-দুটি করে। এই দলেরই নেতা স্বনামখ্যাত ডঃ নরম্যান শামওয়ে।

হৃদযন্ত্র পুনঃস্থাপনের ক্ষেত্রে ডঃ শামওয়েকে বলা চলে পথিকৃৎ। ষাটের দশকে তিনিই প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে প্রাণীদেহের ওপর এই শল্যচিকিৎসা চালান। তাঁর পরীক্ষাকার্য থেকেই মানুষের শরীরে হৃদযন্ত্র পুনঃস্থাপনের শল্যচিকিৎসা শুরু।

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী ডঃ ক্রিশ্চিয়ান বার্নার্ড ছিলেন তাঁরই ছাত্র। কেপটাউনে ফিরে গিয়ে তিনিই প্রথম মানুষের শরীরে হৃদযন্ত্র পুনঃস্থাপন করেন।

১৯৬৭ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে ঐতিহাসিক শল্যচিকিৎসার মাত্র ১৮ দিন পরে—ডঃ বার্নার্ডের রোগী মারা যায়।

তাঁর দ্বিতীয় রোগী ছিলেন ডঃ ফিলিপ ব্লাইবার্গ (দন্তচিকিৎসক)। ১৯৬৮ সালের ২রা জানুয়ারী তাঁদের শল্যচিকিৎসা সম্পন্ন হয় ও তারপরেও বেঁচে ছিলেন ৫৯৩ দিন। সেই সময়ে নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন পরিবারের সঙ্গে বসবাস করেছিলেন ও নিজের জীবনী প্রকাশ করেছিলেন। ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন ডঃ বার্নার্ডকে তাঁর জীবনের পরমায়ুতে অনেকগুলো আনন্দপূর্ণ দিন যোগ করার জন্য।

উভয় রোগী মারা যান যখন তাঁদের নিজেদের শরীরের মধ্যেই এই নতুন হৃদ-যন্ত্র বাতিল হয়ে যায়। মানুষের শরীরে এমন একটি ব্যবস্থা আছে যার ফলে বাইরের অনুপ্রবেশকারী শরীরে প্রবিষ্ট হলে ধরা পড়ে যায় ও বর্জিত হয়। হৃদযন্ত্র পুনঃস্থাপনের ক্ষেত্রেও এই বর্জনের ক্রিয়াটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রচণ্ড বাধা। নতুন হৃদযন্ত্র নিয়ে রোগী যে বেঁচে থাকতে পারছে না তার প্রধান কারণও এই।

জোরালো ওষুধ প্রয়োগ করে শরীরের এই বর্জনক্রিয়া ইচ্ছে করলে চেপে দেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রটি বাতিল হয় না বটে কিন্তু অন্য আরো মারাত্মক অসুবিধে দেখা দেয়। রোগের জীবাণুর আক্রমণ ঘটলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার কোনো আয়োজন তখন আর শরীরের মধ্যে থাকে না এবং রোগী অনায়াসেই অন্য যে-কোনো রোগের শিকার হয়ে পড়ে।

এখন গবেষণা চলছে এমন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করার জন্য যাতে শরীরের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ আয়োজনটি অটুট রেখেও নতুন হৃদযন্ত্র বজায় রাখা চলে। গবেষকরা আশা করছেন সত্তরের দশকের মধ্যেই তাঁরা পূর্ণ সাফল্য অর্জন করবেন।

অত্যধিক কফি-পানের সঙ্গে হার্টের অসুখের কোনো সম্পর্ক নেই

এক সময়ে ধারণা ছিল যাঁরা দিনে ছ'কাপ বা তার বেশি কফি পান করেন হার্টের অসুখে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা তাঁদের খুবই বেশি; কিন্তু সম্প্রতিকালের গবেষণায় এই ধারণা বাতিল হয়ে গেছে।

গবেষণাটি চলেছিল ইংল্যান্ডের একটি মেডিকেল কেন্দ্রে। গবেষণার পাত্র ছিল এক-দল সাধারণ সুস্থ মানুষ। তাঁদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক ছিলেন যাঁদের স্বাস্থ্য ১৯৬৪-৭০ সালের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে যাঁরা হার্টের অসুখে আক্রান্ত। তাঁদের যেসব প্রশ্ন করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল এই ধরনের: আপনি কি দিনে ছ'কাপ বা তারও বেশি কফি পান করেছেন? তারপরে এই হার্টের অসুখের আক্রান্তদের বিচার করা হয়েছিল সমপ্রকারের আরো দুজন মানুষের সঙ্গে তুলনা করে—একটি তুলনা বয়স স্ত্রী-পুরুষের বিচার বংশ স্বাস্থ্য পরীক্ষার তারিখের দিক থেকে; অপর একটি তুলনা বয়স স্ত্রী-পুরুষ বিচার বংশ সিগারেটের ধূমপান রক্তচাপ রক্তের শর্করা রক্তের কোলেস্টেরল ও ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রামের দিক থেকে। প্রায় ২০ শতাংশের কাছ থেকে জবাব পাওয়া গিয়েছিল যে তাঁরা দিনে ছ'কাপেরও বেশি কফি পান করেন।

গবেষণায় এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে হার্টের অসুখে আক্রান্ত হবার কারণ কফি-পান নয় অন্য কিছু। আরও দেখা গিয়েছে হার্টের অসুখে আক্রান্তদের প্রায় অর্ধসংখ্যক সিগারেটের ধূমপান করেন।

হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদ ও 'লোকবিজ্ঞান'

হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদের পরিচালনায় বিজ্ঞান-বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে নাম 'লোকবিজ্ঞান'। আটপেজী ডবলক্রাউন সাইজের ছ' থেকে আট পৃষ্ঠার এই পত্রিকাটি সাজসজ্জায় আড়ম্বর-হীন মধ্যসামান্য (মাত্র কুড়ি পয়সা) কিন্তু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে ও নানা জ্ঞাতব্য সংবাদে প্রশংসনীয় রকমের সমৃদ্ধ। প্রতি সংখ্যায় অন্ততঃ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। লেখকরা স্ব-বিষয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন এবং সবচেয়ে প্রশংসার কথা পরিচ্ছন্ন বাংলাভাষায় নির্ভুল প্রবন্ধ লেখার ক্ষমতার অধিকারী। প্রবন্ধের সঙ্গে কিছু ছবি থাকলে আরো ভালো হত।

হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদ গত দু-বছরে বহু কর্মতৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রদর্শনী বিতর্কসভা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা বক্তৃতামালা ও আলোচনা-সভা ইত্যাদি।

আমরা বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রচারে উদ্যোগী এই সংগঠন ও পত্রিকার আরো উন্নতি ও ব্যাপক তৎপরতা কামনা করি।

—অয়স্কান্ত

প্রতিভা বললো, আমি এ্যাভারেজ মেয়ে কিন্তু ও সত্যিই ট্যালেনটেড।

কেপ রোকা, কেপ সেন্ট ভিনসেন্ট পিছনে ফেলে জাহাজ আস্তে আস্তে দেশ ট্রাফা-আল-গার্ব প্রবেশ করল। তারপর ঐতিহাসিক ইবন বতুয়ার জন্মস্থান তাঞ্জিয়ার। জাহাজ থামে না। এগিয়ে চলে। দেখতে দেখতে আফ্রিকা পিছনে পড়ে। দূরে থেকে দেখা যায় জিব্রাল্টার।

মিঃ আর মিসেস সেন আগেই বলে-ছিলেন ওরা নামবেন না কিন্তু পার্সারকে বলে ওদের তিনজনের জিব্রাল্টার দেখার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সময় খুব কম। বড় জোর ঘন্টাখানেক শহরে ঘোরাঘুরি করা যাবে। ওয়েস্ট পোর্ট থেকে বেড়িয়েই ওরা খুশী। মিঃ চৌধুরী কয়েক প্যাকেট টোবাকো কিনে আনলেন শহর থেকে।

জাহাজে ফিরে এসে মিঃ চৌধুরী প্রমীলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলতে পার মিলা, জিব্রাল্টার নাম হলো কিভাবে?

'আমি তো ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। দিদি গ্র্যাজুয়েট। দিদিকে জিজ্ঞাসা করুন।'

'কি প্রতিভা, তুমি জান?'

'আমি বি-এ পাশ করেছি, আই-সি-এস পাশ করি নি।'

প্রমীলা সঙ্গে সঙ্গে বললো, দেখেছেন দিদিও জানে না! মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললো, আমার মনে হচ্ছে আপনিও জানেন না।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভা শাসন করল, এই মিলা! কি হচ্ছে!

'আই-সি-এস পাশ করেছেন বলে তুই অত খাতির করছিস কেন? আমার বাবা ব্যারিস্টার, আমার স্বামীও ব্যারিস্টার হবে। আমি তোর মত আই-সি-এসকে খাতির করব না।'

ওর কথায় ওরা দুজনেই হাসেন।

হাসি থামলে মিঃ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার দিদির বিয়ে হোক, তারপর তুমি নিজের বিয়ের কথা ভেবে দেখো।

'দিদির বিয়েতে কোন ঝামেলা হবে না। আপনার মত একটা আই-সি-এস জুটিয়ে নিচ্ছেই দিদির ....'

প্রতিভা বাধা দেয়, কি আজেবাজে বকছিস মিলা। প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য মিঃ চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, জিব্রাল্টার নাম হলো কেন তা তো বললেন না।

'সেভেন হানড্রেড ইলেভেন এ তারিক ইবন জারার এই জায়গাটা দখল করেন। সাধারণভাবে সবাই ওকে জব-আল-তারিক বলতেন এবং সেই থেকেই জিব্রাল্টার।'

প্রমীলা বললো, তাহলে মনে হচ্ছে আপনি বেশ পড়াশুনা করেছেন।

প্রতিভা বললো, ব্রিলিয়ান্ট না হলে কেউ আই-সি-এস হতে পারে?

মনে মনে খুশী হলেও মিঃ চৌধুরী বললেন-না না আমি ব্রিলিয়ান্ট কিছু না।

প্রমীলা বললো, দেখুন দিদি আমার মত টকেটিভ না। ও যখন আপনাকে ব্রিলিয়ান্ট বলেছে আপনি নিশ্চয়ই ব্রিলিয়ান্ট।

মার্সেলিস, মাল্টা পার হয়। জাহাজ আসে পোর্ট সৈয়দে। মানুষের চেহারা পোষাক, ভাষা বদলে যায়। বেশ বোঝা যায় ভারতবর্ষ খুব দূরে নয়। এডেনে এসে মনে হলো ভারতবর্ষের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

জান তো এই এডেন আগে আমাদের বোম্বে প্রেসিডেন্সীর আন্ডারে ছিল?......

দু' বোনেই এক সঙ্গে প্রশ্ন করে, তাই নাকি?

'মাত্র থার্টিটুতে এডেন একটা সেপারেট প্রভিন্স হলো বাট ইট ইজ স্টিল আন্ডার গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া।'

সে রাত্রে জাহাজের কেউ ঘুমোল না। ড্রিঙ্ক আর ডান্স চললো রাত ভোর। যারা নাচেন না তারাও টেবিল ছেড়ে যান নি। ড্রিঙ্ক করতে করতে গল্প করছেন সহযাত্রী বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে। সবার মনেই একটা বিচ্ছেদ বেদনা। মিঃ সেন বললেন, চৌধুরী, তুমি পারমিশন দিলে একটা কথা বলতাম।

'ইউ আর অ্যাট লিবার্টি টু সে এনিথিং ইউ লাইক।'

'গুড! ভেরী গুড!' হুইস্কীর গেলাসটা পাশে সরিয়ে রেখে বললেন, মিসেস সেনের খুব ইচ্ছা তোমার সঙ্গে প্রতিভার বিয়ে হয়। আই মীন আমাদের সবারই ইচ্ছা।

মিঃ চৌধুরী হাসতে হাসতে বললেন, আপনাদের মত হলেও মিলার নিশ্চয়ই সমর্থন নেই।

মিসেস সেন বললেন, আসলে মিলাই আমাদের বললো।

ওর কথায় সবাই হাসেন।

প্রমীলা বললো, আপনি আই সি এস না হয়ে ব্যারিস্টার হলে তো আমিই আপনাকে বিয়ে করতাম। দিদি আর চান্স পেতো না।

ওর কথায় সবাই হাসেন।

ঐ হাসির মধ্যে মিঃ চৌধুরী প্রতিভাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ডু ইউ এগ্রি উইথ ইওর পেরেন্টস?

'আই অ্যাম নট ওভার-এ্যাম্বিশাস লাইক মিলা।'

মিঃ সেন বললেন, ইউ বেটার টেক টু ইট আদার প্রাইভেটলি।

ওরা তিনজনে টেবিল ছেড়ে উঠলেন। প্রমীলা মিঃ চৌধুরীর কানে কানে বললো, ইউ ক্যান কিস মাই দিদি টু-নাইট বাট নাথিং মোর ফর দ্য প্রেজেন্ট।

ওরা তিনজনে চলে যেতেই প্রতিভা জিজ্ঞাসা করল, মিলা কানে কানে কি বললো?

'শুনতে চাও?'

'আপনার আপত্তি......

'আপনি না, তুমি।'

'হঠাৎ চট করে ...

'এতদিন এক সঙ্গে জাহাজে কাটাবার পর আর হঠাৎ হয় না।'

প্রতিভা একটু হাসল। তারপর আস্তে আস্তে বললো, তোমার আপত্তি না থাকলে শুনতাম।

'মিলা বললো আই ক্যান কিস ইউ টু-নাইট বাট নাথিং মোর ফর দা প্রেজেন্ট।'

প্রতিভা লজ্জায় দৃষ্টি গুটিয়ে নিল।

'প্রতিভা! ইউ আর ভেরী সুইট অ্যান্ড পারফেক্ট।'

মুখ নীচু করেই বললো, ইউ আর অলসো ভেরী চার্মিং।

'আগে তো কখনও বলো নি আমি চার্মিং!'

'আপনিও তো কখনও......

'আবার আপনি?'

'তুমিও তো কখনও বলো নি আমি......

'আমি ঠিক করেছিলাম আজ রাত্রেই তোমাকে বলব......

'কি বলবে ভেবেছিলে?'

'তুমি আমাকে বিয়ে করবে কিনা?'

'সত্যি জিজ্ঞাসা করছ?'

'সত্যি।'

বোম্বেতে জাহাজ পৌঁছবার এক মাসের মধ্যেই কলকাতায় ওদের বিয়ে হলো।

বিজয়া হাসল, বললো, বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই ওরাই আমার বাবা-মা।

আমি মাথা নাড়লাম।

'আমার তিনটি ভাইবোন হয়েই মারা যায়। তারপর আমি হলাম। সবাই ভেবে-ছিলেন আমিও বাঁচব না। এক বছর পর্যন্ত আমার কোন নাম দেওয়া হলো না। শেষ পর্যন্ত যখন সত্যি বেঁচে রইলাম তখন আমার মাসী আমার নাম দিলেন বিজয়া।...

'তাই নাকি?'

মাসী বলতেন আমি যখন মৃত্যুকে হারিয়েছি তখন আর কারুর কাছেই হার মানব না।'

আমি হাসি। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার মাসী এখন কোথায়?

'মাসী নেই।'

'নেই?'

'না। উনি সুইসাইড করেন।'

আমি চমকে উঠলাম। বেশ উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? স্বামীর সঙ্গে কিছু......

বিজয়া একটু শুকনো হাসি হাসল। খুব আস্তে আস্তে বললো, না, না, উনি বিয়েই করেন নি।...

'তবে ?'

'আমার বাবার জন্যই উনি সুইসাইড করেন।'

'সে কি ?'

'হ্যাঁ রুণু, আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলছি না। আরো বিশেষ করে বাবা-মা মা-মাসীদের মিথ্যা কুৎসা ছড়াবার মত মেয়ে আমি না।'

'কিন্তু কি হয়েছিল ?'

খুব জোরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বিজয়া বললো, আমার বাবা এক নম্বরের ডিবচ ছিলেন। আই-সি-এস অফিসার হিসেবে তাঁর যত সুনাম ছিল, ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে তাঁর তত বেশী দুর্নাম ছিল।

আমি আর প্রশ্ন করতে পারি না।

বিজয়া আপন মনে বলে যায়, পর পর দুটি ভাইবোন মারা যাবার পরই মার শরীর ভেঙ্গে যায়। সব সময় চুপচাপ নিজের ঘরে বসে থাকতেন অথবা বাংলোর লনে পায়চারী করতেন। তারপর আরো একবার যখন ঐ দুঃখ পেলেন তখন মার শরীর আরো খারাপ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে দাদু মারা যাওয়ায় দিদিমার শরীরও খুব ভেঙ্গে যায়। কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি ছুটে এলেন মাসী।......

'তখন তোমার বাবা জলপাইগুড়ি থাকতেন ?'

'হ্যাঁ। উনি তখন ওখানকার ডিভিশন্যাল কমিশনার ছিলেন।'

'তারপর ?'

মাসী আমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও মাঝে মাঝে বাবার অনুরোধে ওর সঙ্গে এখানে-ওখানে যেতেন। মাসখানেক পরে মাসী কলকাতা ফিরে গেলেও মাঝে মাঝেই আসা-যাওয়া করতেন। বছর দুই পরে আমি হলাম। মাসীও এলেন কিন্তু মা একটি মুহূর্তের জন্যও আমাকে কারুর কাছে দিতেন না। বোধহয় এই সময়ই মাসীর সঙ্গে বাবার সম্পর্কটা খুব ঘনিষ্ঠ হয়।...

'মাই গড !'

বিজয়া হাসল। 'এখনই ভগবানকে স্মরণ করো না। একটু ধৈর্য ধর। যত দিন যেতে লাগল বাবা তত বেশী মাসীকে নিয়ে ট্যুরে যেতে শুরু করলেন। প্রায়ই কোন ফরেষ্ট বাংলোতে রাত কাটানও আরম্ভ হলো।...

'সে কি ?'

মাসী আমাকে ও মাকে ভালবাসলেও বাবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কমাতে পারলেন না অথবা চেষ্টা করেও পারেন নি। আমার যখন দু'বছর বয়স তখন মাসী সুইসাইড করলেন।'

'হঠাৎ সুইসাইড করলেন কেন ?'

'পরে শুনেছি সী ওয়াজ প্রেগন্যান্ট কিন্তু মাসী খুব ইন্টারেষ্টিং মহিলা ছিলেন। সী ওয়াজ এ ব্রিলিয়ান্ট ষ্টুডেন্ট, সী ওয়াজ কাইন্ড অ্যান্ড স্পোর্টিং এ্যাজ ওয়েল।'

প্রমীলা সেনের হাসি-খেলার সুযোগের অপব্যবহার হবার পর যখন হুঁস হলো, যখন নিজের দেহের মধ্যে আরেকটা প্রাণের অস্তিত্ব উপলব্ধি করলেন, তখন সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করেন নি। ব্যারিষ্টার পরশুরাম সেনের অবিবাহিতা কন্যার ভাগে যে বিরাট সম্পত্তি ছিল দিয়ে গেলেন 'টু মাই ইটার-ন্যাল ডার্লিং সুইট গার্ল' বিজয়াকে। মিঃ চৌধুরীকে তিনি জানতেন, জানতেন তাঁর দিদির রুগ্ন স্বাস্থ্যের কথা। তাইতো উইলে স্পষ্ট করে লিখে গেলেন প্রাপ্তবয়স্কা বিজয়া ছাড়া কেউ এই ঘরবাড়ী বা ব্যাঙ্কের টাকায় হাত দিতে পারবে না।

বিজয়া যখন ছ'বছরের তখন ওর মা মারা গেলেন।

'আমি মৃত্যুকে হারিয়ে বেঁচে থাকলেও সেইদিন থেকে আমার পরাজয় শুরু হলো।' কথাগুলো বলতে বলতে ওর বড় বড় সুন্দর দুটো চোখ জলে ভরে গেল।

'দুঃখ করো না বিজয়া। মা তো কারুর চিরকাল বেঁচে থাকেন না ভাই।'

'তা জানি রুণু কিন্তু আমার মা কত ভাল ছিলেন তা তুমি ভাবতে পারবে না। বিরাট ধনীর মেয়ে, আই-সি-এস-এর স্ত্রী হয়েও অর্থকে তিনি ঘৃণা করতে পারতেন। মা আমার সন্ন্যাসিনী ছিলেন।'

(ক্রমশঃ)

পুনশ্চ

সেকালে—সেকালেই বলি, মহিলাদের দ্বারা প্রকাশিত মাসিক পত্রিকার মধ্যে 'ভারত-মহিলা'র একটি বিশেষ স্থান ছিল। সুখ্যাত মহিলার দ্বারা সম্পাদিত ও পরিচালিত পত্রিকা হলেও, এতে রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, জগদানন্দ রায় প্রভৃতি পুরুষরাও নিয়মিত লিখতেন। আর তৎকালীন নামকরা মহিলা লেখিকাদের মধ্যে ছিলেন প্রিয়ম্বদা দেবী, হেমলতা, সরোজকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কুমুদিনী মিত্র, মানকুমারী বসু, নিস্তারিণী দেবী প্রভৃতিরা। পত্রিকাটিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নারীজাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিষয়ক নিবন্ধ প্রবন্ধের সঙ্গে গল্প-কবিতাও প্রকাশিত হত।

এক সময়ে 'প্রবাসী' এই পত্রিকাটি সম্পর্কে লেখেন, 'এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রখানি বঙ্গনারীগণের জন্য প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে বেশ ভাল লেখা থাকে। সম্পাদন কার্য্যও বেশ হইতেছে।' 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা লেখেন, 'বঙ্গদেশে মহিলা সম্পাদিত একাধিক পত্রিকা যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে—ইহা বাঙ্গালীর গৌরবের কথা। 'ভারত-মহিলা' পাঁচ মাস হইল প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি এই পত্রিকার দ্বারা বাঙ্গালীর সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। 'ভারত-মহিলা' নারী জাতীর কল্যাণকল্পে পরিচালিত। ধর্ম্ম সাহিত্য ও স্বদেশ সেবায় পুরুষশক্তির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবার জন্য 'ভারত-মহিলা'র জন্ম। আমরা আশা করি বঙ্গদেশে এইরূপ পত্রিকার জন্ম বিফল হইবে না।'

এই পত্রিকাখানির প্রথম সংখ্যা ১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে, হেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক ভারত-মহিলা কার্যালয়, ১১নং পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা করেন সরযূবালা দত্ত।

প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় হিসাবে যে অবতরণিকাটি প্রকাশিত হয়, সেটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তার মধ্যেই পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ও আদর্শ অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেই অবতরণিকাটি হচ্ছে—

'মঙ্গল-বিধাতা পরমেশ্বরের শ্রীচরণে প্রণিপাত করিয়া আমরা অদ্য 'ভারত-মহিলা'কে বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে আজ ইহাকে অভিনন্দন করিতে অনেকেই সংকুচিত হইবেন, আমরা তাহা জানি। বহু আড়ম্বর ও প্রচুর সমারোহ করিয়া, নানা আভরণে সুসজ্জিত হইয়া, প্রবল বাদ্যে আপনার অভ্যুদয় ঘোষণা করিয়া এক-একখানি পত্রিকা বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতেছে, আর কিছুদিন অতীত না হইতেই সাগরে জলবুদ্বুদের ন্যায় কালগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জাতীয় জীবনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ও অস্থিমজ্জায় যে নিরুৎসাহ ও নিরাশা প্রবেশ করিয়াছে, সাহিত্যক্ষেত্রেও তাহার অবসাদকর প্রবল প্রভাব অবশ্যম্ভাবীরূপে বিস্তৃত হইয়াছে। এক-একখানি পত্রের আবির্ভাব ও তিরোধান সেই অবসাদ আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছে। নীরবে, একটি দুর্ব্বল দেহ নারীকে আশ্রয় করিয়া যে ক্ষুদ্র পত্রিকা আজ জন্মগ্রহণ করিল, তাহার সুস্থ, সবল দীর্ঘজীবন সম্বন্ধে কেহ যদি প্রথমেই নিরাশ হন, তবে সে বিষয়ে আমাদের কিছু বলিবার নাই। আমাদের ধারণা এই, যাহার অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে, ভগবান সংসারে তাহার স্থান করিয়া দেন। এ দেশের নারী জাতির কল্যাণকল্পে সুপরিচালিত একখানি মাসিকপত্রের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন। রাজনীতিই হউক, আর শিল্প-বিজ্ঞানই হউক, পুরুষের পার্শ্বে নারী দণ্ডায়মান না হইলে, পুরুষ-শক্তি কখনও সম্যক বিকশিত হইতে পারে না। ভগবান তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ে পুরুষের সহিত নারীকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। পুরুষ সে বন্ধন অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু বিধাতার বিধান ব্যর্থ করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। তাই ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গিনীর সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত বিহঙ্গের ন্যায়, এদেশের পুরুষেরাও সম্মুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-প্রযত্ন হইতেছেন। নারীকে উন্নত করিয়া, নারীকে সঙ্গে লইয়া পুরুষদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। এই মহৎ দুষ্কর কর্ম্মে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবার জন্য ভারত মহিলার জন্ম। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারত-মহিলা এ দেশে ও বিদেশের চিন্তাশীল পুরুষ ও রমণীগণের উন্নতি বিধায়ক চিন্তার ফল বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত করিবে। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানের উন্নতিসাধক অন্যান্য বিষয়ও ইহাতে আলোচিত হইবে। গুরু কর্ত্তব্যভার মস্তকে ধারণ করিয়া আমরা আজ দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায় করুণাময় ভগবানের কৃপাভিক্ষা করিতেছি এবং স্বর্গগত ও জীবিত সাহিত্য-গুরুগণের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।'

উক্ত 'ভারত-মহিলা' পত্রিকাটির ১ম বর্ষের (১৩১২) ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত একটি রচনা এখানে আমরা প্রকাশ করছি। এতদ্দ্বারা উক্ত পত্রিকার মান কিছুটা উপলব্ধ হবে। রচনাটি অযোধ্যাপতি দশরথের অন্যতমা ভার্য্যা সুমিত্রা সম্বন্ধে, নিস্তারিণী দেবী রচিত।

এই লেখিকা নিস্তারিণী দেবী সম্পর্কে এখানে সংক্ষিপ্ত একটু পরিচয় দেওয়া সমীচীন মনে করি। নিস্তারিণী দেবী প্রবাসী বঙ্গমহিলা। এঁদের আদি নিবাস রাজসাহীর পুঁটিয়া গ্রামে। প্রধানতঃ তিনি কবি হিসাবে খ্যাত হলেও, এবং একদা তিনি তাঁর 'অনোকবা' নামক কাব্যগ্রন্থের জন্য (প্রকাশকাল ১৩১১) বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ কর্তৃক বিশেষভাবে সম্মাননা-লাভ করলেও তাঁর কৃতিত্ব বহুলাংশে

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর 'বঙ্গের মহিলা কবি' গ্রন্থের মধ্যেও সে পরিচয় বিশদভাবে ব্যক্ত করে গিয়েছেন।

নিস্তারিণী দেবী রচিত রাজা দশরথের তৃতীয়া পত্নী এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের গর্ভধারিণী সুমিত্রা সম্বন্ধে নিবন্ধটি নিম্নরূপ :

।। সুমিত্রা ।।

মহারাজা দশরথের অন্তঃপুরে নানা বিকচ কুসুমে পরিশোভিত ছিল। ধর্ম্মিষ্ঠা মহারাণী কৌশল্যা দেবী সেই রমণীয় উদ্যানের শ্রেষ্ঠ ও পরম মনোহর কমল পুষ্পস্বরূপিণী ও অসীম লাবণ্যবতী কৈকেয়ী কণ্টকাবৃত্ত গোলাপ-তুল্যা, তাঁহার তেজোময় সৌন্দর্য্যে দশরথ বৃদ্ধকালে মোহান্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। আর একটি ক্ষুদ্র সৌরভময়ী যূথিকাসাদৃশী শুদ্ধচরিত্রা কামিনী তাঁহার অন্তঃপুরে বিরাজিতা ছিলেন। তাঁহার মৃদু-মধুর সুবাস অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে অযোধ্যা রাজ্য সুবাসিত করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি অসাধারণ গুণবতী মহিষী সুমিত্রা। মহর্ষি বাল্মীকি ইঁহার চরিত্র একাধারে স্ত্রীজনোচিত নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত চিত্রে অঙ্কিত করিয়া মানবচক্ষে প্রকাশিত করিয়াছেন।

রামায়ণের প্রথম দুই কান্ড অর্থাৎ আদি ও অযোধ্যা, সুমিত্রা দেবীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। তাঁহার পবিত্র চরিত্রে ধর্ম্মপরায়ণতা ও কর্ত্তব্যানুরাগ যেমন অখন্ডভাবে লক্ষিত হয়, তদ্রূপ সুশীলতা ও বিনয় উক্ত অলঙ্কারস্বরূপ যেন মণি-কাঞ্চন যোগ হইয়াছিল।

সুমিত্রা দেবী রাজা দশরথের তৃতীয়া পত্নী ও লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের গুণবতী জননী। রমণী-জীবনে সকল সুখ-সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা স্বামীর প্রেম। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, সংসারে যাহা পরম বাঞ্ছনীয় তাহাই বিরল। সুচরিত, পরম পন্ডিত, দৃঢ়ব্রত, প্রজাপ্রিয়, সুন্দর, সৌম্যমূর্ত্তি এবং অতুল ঐশ্বর্য্যশালী স্বামীর অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াও সুমিত্রা পতিপ্রেমে অপূর্ণা ছিলেন। কৌশল্যা দেবীরও সেই মনস্তাপে সংসারে অনাসক্তি জন্মিয়াছিল, এবং তজ্জন্য তিনি অধ্যাত্মব্রতধারিণী হইয়া বাস করিতেছিলেন।

কিন্তু নির্ম্মলচিত্তা সুমিত্রা তাহাতেও নিরপেক্ষ থাকিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে পরম ব্রতবতী ছিলেন। স্বামীর তাঁহার প্রতি ঔদাসিন্যভাব সত্ত্বেও তিনি তৎপ্রতি প্রগাঢ় প্রণয়বতী ছিলেন। সপত্নী-বিদ্বেষ বহ্নিতে অযোধ্যাপুরী দগ্ধ হইয়া রাম বনবাসের সৃষ্টি হইলে, সেই ঘোর বিষাদ-ময় বিদায়কালীন দৃশ্যে রাজাসহ অসহ্য করুণ ক্রন্দনরোল উত্থিত হইয়াছিল; সেই সময়েও ধৈর্য্যবতী, শান্তা, শ্রীমতী কহিলেন, 'পুত্র! তুমি রামের অত্যন্ত অনুরক্ত, অতএব আমি তোমাকে বনবাসার্থ অনুমতি দান করিলাম। হে নিষ্পাপ! তুমি ঐ বনগামী ভ্রাতার সেবায় অমনোযোগী হইও না, কেন না ইহলোকে জ্যেষ্ঠের অনুবর্ত্তী হওয়াই পরম ধর্ম্ম, ইহা সাধুগণ কহিয়াছেন। ভ্রাতা সমৃদ্ধশালী হউন অথবা বিপদগ্রস্ত হউন, উনিই তোমার গতি। এই ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের দান, যজ্ঞ, দীক্ষা-গ্রহণ ও যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন, এ সমস্ত বংশপরম্পরাগত অবশ্যকর্ত্তব্য চিরন্তন সমাচার, তুমি তদনুবর্ত্তী হইতে যত্নবান হও। পুত্র! রামকে দশরথ-তুল্য, জনক-দুহিতা সীতাকে আমার তুল্য এবং অরণ্যকে অযোধ্যা-তুল্য জ্ঞান করিবে।' আহা, সন্তানের প্রতি মাতার কি সুন্দর শিক্ষা! উর্ব্বরা ভূমির বক্ষে বসুন্ধরা শস্য-শালিনী, আর জ্ঞানবতী বিদুষী জননীর গুণে বীর, ধার্ম্মিক পুত্রের জন্ম। কবি ঐ এক চিত্রে সফল বং ফলাইয়াছেন। যেন বর্ষাসিক্ত নভোমন্ডলে সূর্য্য-কিরণ বিভাসিত রামধনু।

মহাহর্ষময়ী অযোধ্যানগরী যখন রামা-ভিষেক-উৎসবে ফুল্ল কুসুমবৎ হাসিতেছিল, একবার সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার বিভিন্ন মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। একজন পতিপ্রেমে গর্ব্বিতা হইয়া সপত্নী-পুত্রের সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র করিতেছেন, আর ঠিক সেই সময়েই সুমিত্রা, পরমানন্দ ভরে সোদর-তুল্য কৌশল্যা-ভবনে রামচন্দ্রের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছেন। রাম রাজা হইবেন, আর তাঁহার পুত্র সেবক সহচর হইয়া জ্যেষ্ঠের পরিচর্য্যা করিবেন, ইহাই তাঁহার অন্তরের সুখ। অকপটে, অবিষাদে, সপত্নী-সুখে সুখী হইবার এমন দৃষ্টান্ত আর নাই। কি স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত চিত্র! এই সকল অসামান্য গুণ প্রাচীন-কালের নারীগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই তাঁহারা দেবী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

সুমিত্রা নিজ পুত্র সমর্পণ করিয়া ছিলেন। রামচন্দ্র স্বীয় মাতা ও লক্ষ্মণ-জননীকে সমভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন।

রক্ত শত্রুঘ্ন তদনুরূপ ভরতভক্ত ছিলেন। তাঁহারা নিজত্ব ভুলিয়া ভালবাসিতে জানি-তেন। ইহাই নিষ্কাম ধর্ম্মের লক্ষণ।

রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বনে নির্ব্বাসিত হইলেন—পিতৃসত্য পালনার্থ; আর লক্ষ্মণের মাতা নিজের প্রাণধন সুযোগ্য পুত্রকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া ভীষণ অরণ্যে প্রেরণ করিলেন এবং নিজে পরম ধৈর্য্যবতী হইয়া, আপন মনস্তাপ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় মর্ম্মের তলে ঢাকিয়া, মুমূর্ষুপ্রাণ রাজা দশরথ ও শিশুতমাহিষী কৌশল্যা দেবীকে পরম হিতজনক বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সুমিত্রা কহিলেন 'সূর্য্য হইতে সূর্য্য, অগ্নি হইতে অগ্নি, প্রভু হইতে প্রভু, শ্রী হইতে শ্রী, কীর্ত্তি হইতে কীর্ত্তি, পৃথিবী হইতে পৃথিবী, দেবতা হইতে দেবতা, প্রাণী হইতে প্রাণী শ্রেষ্ঠ হইতে পারে কিন্তু নগরেই হউক আর বনেই হউক, রাম হইতে কেহ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।' এইপ্রকার নানা শান্তিপূর্ণ আশ্বাসবাক্যে কৌশল্যার কাতর হৃদয়ের শোকাবেগ প্রশমিত করিলেন।

তিনি সর্ব্বত্র স্বীয় কর্ত্তব্যের দ্বারা পরিচালিত হইতেন, সুখ বা দুঃখে উত্তেজিত হইতেন না। তাঁহার অচল-অটল জ্ঞান যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে সমভাবে তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছে।

সুমিত্রা সপত্নীগণের প্রতি চির সৌহার্দ্দময়ী ছিলেন। তিনিই স্থায়ী শিষ্টাচার ও আনুগত্য দ্বারা উভয় সতীনের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন।

সংকালে মহারাজ দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞান্তে মহিষীগণের মধ্যে পায়স বিতরণ করেন, তৎকালে কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে দুই অংশ দিয়া অপর দুই অংশ স্বেচ্ছাক্রমে অকুণ্ঠিতভাবে সুমিত্রাকে প্রদান করিয়া-ছিলেন।

সুমিত্রা-চরিত্র আদর্শভাবে আমাদের হৃদয়ে ধারণ করিয়া তদনুসরণ করিলে আর বিদেশীয় উদাহরণ অন্বেষণ করিতে হইবে না। আমাদের ভারতবর্ষের গভীর ভান্ডারে বিপুল মহামূল্য রত্ন নিহিত আছে।

—[illegible]

শেষ উর্বশী

মানসী মুখোপাধ্যায়

সেই লাল হাবেলী!

এ হাবেলী তৈরি হয়েছিল নবাব সাদাত্ আলি খান-এর আমলে যার রসদ জোগাড় হয়েছিল নবাব আসফউদ্দৌলার সময়ে—ঐ যে নবাব সম্বন্ধে কিংবদন্তী—'জিসকো ন দেয় মৌলা (ভগবান), উসকো দেয় আসফউদ্দৌলা।'

এই বিরাট হাবেলী আর কী অপূর্ব এই হল ঘর বা নাচঘর, কান পাতলে এখানে এখনো কি শোনা যাবে সেই অতীত কালের নূপুর-নিক্কন? রূপে ও নৃত্যে দ্বিতীয় উর্বশী, নবাব আসফউদ্দৌলার দরবারের বিখ্যাত বাইজী—বেদা-র লাবণী চরণের পুরুষচিত্তহরা ছন্দময় পদক্ষেপ?

দয়াবান আসফউদ্দৌলা। তাঁর রাজত্বে দুর্ভিক্ষ একবার ভয়াল মূর্তিতে জনজীবনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নবাব তাঁর রাজ ভাণ্ডার প্রজাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, কিন্তু ভিক্ষারূপে নয়! নবাব হুকুম দিয়েছিলেন, ইমারৎ তৈরি হোক। ইতিমধ্যে তিনি বেলীগার্ড বিবিয়াপুর প্রসাদ দৌলৎখানা তৈরি করিয়েছেন। বড় ইমামবাড়া এবার তৈরি শুরু হল। প্রজারা তাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে উদার পারিশ্রমিক পেয়ে খুশী। শোনা যায় যে, বড় ইমামবাড়া প্রতিদিন যতটা তৈরি হত নবাবের হুকুমে প্রতি রাতে তা ভেঙে ফেলা হত, অর্থাৎ প্রজাদের পাওনার পথ দীর্ঘস্থায়ী করা হত যাতে দুর্ভিক্ষের সময়ে তারা অভাবের মধ্যে পড়ে কষ্ট না পায়।

রাজধানী লখনৌ নানা সৌধমালায় যেমন সুশোভিত হয়ে উঠল তেমনি গোষ্ঠী সেনের টাকায় অনেকে সামান্য অবস্থা থেকে বহু ধনে ধনপতি হয়ে উঠলেন। এইসব সুবিধাভোগী ধনবানদের মধ্যে একজন ছিলেন লালা জগন্নাথ।

লালা জগন্নাথ নবাব আসফউদ্দৌলার দরবারে হাজারো ঝাড় লণ্ঠনের একটি ছোট্ট মোমবাতি ছিলেন বললেই হয়। চতুর্থ শ্রেণীর এক কর্মচারী। সুযোগ মত বহু টাকা সরিয়ে আসফউদ্দৌলার মৃত্যুর সময়ে দেখা যায় তিনি একজন কেণ্টবিষ্টু গোছের ধনবান।

উদার নবাব আসফউদ্দৌলা তাঁর জীবিতকালে কোনদিন খোঁজ করতে যান নি তাঁর একজাতীয় প্রজারা প্রায় রাতারাতি কী করে কুবেরপত্র হয়ে উঠল।

তিনি মারা যাবার পর নতুন নবাব সাদাত্ আলি খান গদীতে বসলেন। তিনি ধূর্ত,

হিসেবী ও ন্যায়বান। হুকুম করলেন যে, কে অন্যায় পথ ধরে কিছু ব্যক্তি হঠাৎ ধনী হয়ে উঠল তার খোঁজ কর।

কাজীর লোক ছোটাছুটি করে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ধনপতিদের রাতারাতি ধরে নবাবের সামনে হাজির করল। ক্রুদ্ধ নবাবের হুকুমে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে লালা জগন্নাথও অন্ধকার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন।

মণিমুক্তা খচিত ও আতর-গোলাপে সুবাসিত হাজারো ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় উদ্ভাসিত ইন্দ্রসভাতুল্য নবাব সাদাত আলি খান-এর দরবারে তিলোত্তমা-নিন্দিত ও রূপসী রাজনর্তকী বেদা-র চরণ-জড়িত নূপুর ধ্বনির ছন্দপতন ঘটল।

লালা এখন অন্ধকার কারাগারে! নর্তকীর মাথার মুকুট লালা জগন্নাথ। চাঁদ যখন মেঘের সিঁড়ি বেয়ে ঠিক আসমানের বুকে পৌঁছয় তখন নিজেকে নিবিড় অন্ধকারে ঢেকে নিঃশব্দ চরণে বেদা লালার বুকে একটি রক্ত গোলাপের মত শোভা পায়। আজ সে কার বুকে নিজেকে বিলিয়ে দেবে?

কিন্তু রাজনর্তকীর হৃদয়-রাজ্যে যত ঝড় তুফান থাক বাইরে সে ভিন্ন প্রকৃতির। নবাব মদির পানীয়ের আস্বাদ নিতে নিতে লক্ষ্য করলেন তাঁর নর্তকী আজ যত না নৃত্যচঞ্চল তার চেয়ে বেশি স্বভাবে উজ্জ্বল; আজ যেন সে বিচিত্র রূপিণী। সেই নবাব আসফউদ্দৌলার সময় থেকে তিনি নর্তকী বেদা-র নাচ দেখছেন কিন্তু এমন মনোহারিণী তাকে কোনদিনই মনে হয় নি। আজ তার তুলে দেওয়া পানপাত্র স্বাদে যেন আরো মধুর, আরো মদির। তৃষার্ত নবাব তাই বেহিসেবীর মত অতিরিক্ত পান করে মসনদের ওপর ঢলে পড়লেন। আমীর-অমাত্যের অবস্থাও শোচনীয়।

নর্তকী বেদা তার কমনীয় দৃষ্টি, যা এতক্ষণ আধ-ফোটা ফুলের মত আধ খোলা রেখেছিল এবার সহজ করল ও সতর্ক হয়ে চারিদিক লক্ষ্য করল। নাঃ আর কোন দ্বিধার কারণ নেই। সে তার পায়ের ঘুঙুর খুলে ফেলে চলল কারাগারের দিকে। পথে যাকে সামনে পেল তাকেই বিলোল কটাক্ষে ও দুর্লভ হাসিতে ধরাশায়ী করল। তারপর একেবারে কারাগারে প্রিয়তম লালা জগন্নাথের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। স্থান পরিবর্তন হল বটে, কিন্তু তাদের নৈশ অভিসারের ছন্দ পতন হল না।

না, দুই কোকিলের এখন নিভৃতে কূজন নয়; বেদার রক্তিম অধরের মদির পানীয় এখন তোলা থাক; চাঁদনিরাত শেষ হতে এখনো বাকি আছে। এখন শুধু মুক্তির চিন্তা।

লাস্যময়ী বেদা, অভিসারিণী বেদা, লালার মানসী বেদা, এখন যেন হিসাবরক্ষক। তাই বিপদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দু কথায় লালাকে বুঝিয়ে দিল কি করে দুয়ে দুয়ে চার হয়, লালা কি করে মুক্তি পেতে পারেন।

ও'কে প্রথমে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে, বেদা-র পাণিগ্রহণ করতে হবে। তারপর বেদা নবাবকে বলে লালাকে মৃত্যুময় কারাগার থেকে আনন্দের জগতে পৌঁছে দিতে পারে। লালা কি বলেন?

কৃতজ্ঞতায় গদগদ লালা বেদার কোমল করপুট নিজের দু হাতের মধ্যে নিয়ে জানালেন, তিনি সব সর্তেই রাজি।

সেই রাত্রিতেই কয়েদখানায় মৌলভী এলেন। লালা জগন্নাথ হয়ে গেলেন 'সরাফুদ্দৌলা'। বেদা ও সরাফুদ্দৌলা এর পর পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন।

পরের দিন জমিনের বুকে বেহেস্ত — নবাব সাদাত আলি খান-এর নাচের দরবারে বেদা হুরী পরীর মত সেজে যেন পাগল হয়ে নাচতে লাগল। নৃত্যরতা বেদার ছায়া পড়ল প্রতিটি ঝাড় লণ্ঠনের প্রতিটি কাঁচের পাত্রে, মুগ্ধ দর্শকের মনের দর্পণে এবং বিমোহিত নবাবের চোখের তারায়। নবাব তারিফের স্বীকৃতিস্বরূপ এক মুঠো মোহর তুলে ধরলেন। ঠিক তখনই—একবার নয়, দু দু'বার বেদা-র লীলায়িত চরণ ভঙ্গির ছন্দ পতন হয়ে গেল।

ক্রুদ্ধ নবাব তাঁর রক্তচক্ষু তুলে তাকালেন নর্তকীর দিকে। আনন্দ-চঞ্চল দরবার ভয়ে নিঃশব্দ। কিন্তু বেদা নির্ভয়। বিনয়ে ভেঙে পড়ে নবাবকে বার বার কুর্নিশ করে তার ভুল স্বীকার করল, কিন্তু এ তার অপরাধ নয়। তার প্রিয়তম যখন নবাবের কারাগারে বন্দী তখন নর্তকী কী করে স্থিরচিত্ত হয়ে নির্ভুলভাবে নাচতে পারে।

—কে তোমার প্রিয়তম? নবাবের দু চোখে এক রাশ বিস্ময়।

—সরাফুদ্দৌলা।

তখুনি রাজাদেশ হল, এখনি বন্দীকে মুক্ত করে দাও।

নর্তকীর বুদ্ধিকে তারিফ করে নবাব তার পুরস্কারস্বরূপ সরাফুদ্দৌলাকে রাজ কোষাগারের প্রধান কোষাধ্যক্ষর পদে নিয়োগ করলেন।

সরাফুদ্দৌলা আনন্দে ভাসতে ভাসতে তাঁর বিবি, নর্তকী বেদাকে নিয়ে এই লাল হাবেলীতে গৃহপ্রবেশ করলেন।

এখন বেদা আর নিজে নাচে না। নাচ-ঘরে ভাড়াকরা নর্তকীরা আসে, ঘন করে সুর্মা আঁকা চোখে যেন সাপখেলা দেখাতে দেখাতে নাচে, গায়, সুরা পান করে করে হা হা করে হাসতে থাকে। সরাফুদ্দৌলা তাঁর ইয়ারবক্সীদের নিয়ে কাঁচের পাত্রে রঙিন পানীয়ের আস্বাদ নিতে নিতে দেখেন।

কুলবধূ বেদা চিকন-কাজ করা রেশমি চিকের আড়ালে বসে নাচ দেখে গান শোনে। ওদের নাচের তালে তালে তার পা দুটি কে যেন সুড়সুড়ি দেয়, গলার মধ্যে যেন সাতটা কোকিল এক সঙ্গে কলরব করে উঠতে চায়। অজান্তে হাতে নানা রকম মুদ্রার ভঙ্গি করে। মন তখন তার কত্থক নৃত্যের পাখায় উড়ে চলে যায়।

সে অতি সামান্য ঘরের মেয়ে। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচতে হয়েছে। নাচ গানের তালিমের পেছনে রয়েছে তার অলিখিত দুঃখ ও কষ্টসাধ্য সাধনার ইতিহাস। নবাবের দরবারে রাজনর্তকী ছেড়ে শুধু নর্তকী পদ লাভ তখন দূর অস্ত্। নবাবের কৃপাদৃষ্টি ও তার আনুকূল্যে রাজনর্তকী হয়ে দরবারে আসা একটা দেশ জয় করার চেয়েও কঠিন ব্যাপার। রাজ-দরবার মানেই ঈর্ষা, ষড়যন্ত্র ক্ষমতা লাভের নির্লজ্জ প্রচেষ্টার মহোৎসব। নবাবের মুগ্ধ দৃষ্টি যেদিন তার মুখের ওপর নিবদ্ধ হয় সেদিন অনেকে তাকে ঘিরে গুঞ্জন করেছে, অনেক কিছু দিতে চেয়েছে ও অনেক লোভনীয় স্বপ্ন দেখিয়েছে। কিন্তু বেদা শুধু একটি জিনিস চিনেছিল এবং সর্বান্তকরণে তাকেই ধরে ছিল—সে হল তার প্রতিভা, তার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধনা, তার স্বপ্ন। বেদা সেই প্রতিভার গুণে রাজনর্তকী হয়েছিল।

বেদা এখন ভেবে পায় না এ কদিন কী করে সে নিজেকে এই বিচিত্র গড়নের লাল হাবেলীতে ধরে রেখেছে! নাচঘর থাকা সত্ত্বেও সে তার নাচ-গান বন্ধ রেখেছে। কিন্তু কেন? কেন সে তার এত বড় সাধনা, এত গভীর নিষ্ঠাকে অপমান করে ভুলে থাকল! অপরাধিনীর মত নতমুখে ভাবে বেদা, এই নিরাপদ নিশ্চিন্ত জীবনের চেয়ে নিজের প্রতিভাকে প্রকাশ করার আনন্দ অনেক, অনেক বেশি নয় কি?......

ঝুন ঝুন করে নূপুরের শব্দ! সত্যিই কি কোথাও কেউ নাচছে, কোথায়? দেখতে যাব বলে উঠে বসতেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি অমনি মাটির জগতে, সম্পূর্ণ বাস্তবে নেমে এলাম। মনে পড়ল আমি লখনৌয়ে বেড়াতে এসে বন্ধুর বাড়ি উঠেছি। এ সেই লাল হাবেলী যা একদিন নর্তকী বেদার ছিল; সেই নাচঘরেই আমায় শয্যা পেতে শুতে দিয়েছে। এখনো সেই নাচ-ঘরে বিছানার ওপর বসে আছি আর ভাবছি, বেদা শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?

সাতদিনের শুভাশুভ

প্রশ্নের উত্তর

দীপক মজুমদার (কলি) ঃ ৩০ বছর বয়সে কর্মলাভের সম্ভাবনা।

দেবব্রত মজুমদার (কলি) ঃ চাকুরী করা ভাল। কারণ ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

মানসী মুখোপাধ্যায় (কলি) ঃ অশ্বিনী-নক্ষত্র, মেষরাশি, দেবগণ, মিথুনলগ্ন।

অসিতকুমার মিত্র (কলি) ঃ ইঞ্জি-নীয়ারিং পড়ায় প্রবল বিঘ্ন আছে। ২৭-২৮ বছর বয়সে বিদেশ ভ্রমণের যোগ আছে।

জয়দেব ব্যানার্জি (হাওড়া) ঃ ১৩৮১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে কর্মলাভের সম্ভাবনা আছে।

তরুণকুমার (কলি) ঃ অনুরাধানক্ষত্র, বৃশ্চিকরাশি, দেবগণ, মিথুনলগ্ন।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ (গিরিডি) ঃ ১৯৭৪ সালের জুনের মধ্যে কর্মলাভের সম্ভাবনা।

অলকনাথ দত্ত (কলি) ঃ তোমার মকর-রাশি। বিদ্যাজীবনে ২।১ বার বিঘ্ন ঘটলেও গ্রাজুয়েট হতে পারবে। অর্থকষ্টের যোগ নেই।

অনল মজুমদার (কলি) ঃ ১৯৭৪ সালে কর্মস্থল পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। বিবাহে বিঘ্ন আছে। গোমেদরত্ন ধারণীয়। ৩৯ বছর বয়সে হতে পারে।

শাহনেয়াজ খান (ঢাকা) ঃ প্রণয়ঘটিত বিবাহে প্রবল বাধা আছে। কাজেই ও পথ ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন।

দিলীপকুমার নাথ (কলি) ঃ ১৩৮১ সাল থেকে মানসিক শান্তি পাবে। পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার যোগ আছে। ২৭ বছর বয়সে কর্মারম্ভ।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (কানপুর) ঃ চিকিৎসা ব্যবসায়ে অর্থার্জন হবে এবং সুনাম পাবেন।

শ্যামলকান্তি বসাক (কলি) ঃ শতভিষা-নক্ষত্র, কুম্ভরাশি, দেবারিগণ, বৃষলগ্ন।

অপরাজিতা বসাক (বেলঘরিয়া) ঃ ১৩৮১ সালেই বিবাহের যোগ প্রবল। গোমেদরত্ন ধারণ কর্তব্য।

ব, না, বি (চাকদহ) ঃ ৪১ বছর বয়স থেকে আর্থিক উন্নতি হবে। উচ্চশিক্ষার যোগ আছে।

সুধীর ঘোষ (চণ্ডীগড়) ঃ প্রতিকূল গ্রহ সন্নিবেশ থাকায় বর্তমানে কৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা কম।

দীপিকা বসু (কলি) ঃ আপনার সন্তানস্থান শুভ হওয়ায় পুত্র শিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন।

শৈলেন বসু (কলি) ঃ ৬৯—৭১ বছর বয়স পর্যন্ত আয়ু পাওয়া যায়। শেষ জীবনে অর্থকষ্টের যোগ নেই।

আভা সেনগুপ্তা (কলি) ঃ লগ্নে নীচস্থ শনি ও কেতু এবং সপ্তমে রাহু। বিবাহে বিলম্ব ও বিঘ্ন আছে। ইন্দ্রনীলা ও গোমেদরত্ন ধারণ কর্তব্য। ৩৫-৩৬ বছর বয়সে বিবাহ হতে পারে।

নির্মলকুমার চক্রবর্তী (যাদবপুর) ঃ ৩৮-৪০ বছর বয়সের মধ্যে গৃহাদি কর-বার যোগ আছে।

অরুণকুমার মিত্র (বারাকপুর) ঃ দাম্পত্য জীবন শুরু হয়েছে। ১৯৭৪ সালে বিদেশ ভ্রমণের যোগ আছে। ৩৫ বছর বয়স থেকে প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হবে। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে কিছু কিছু অশান্তির যোগ আছে।

এম, রায়চৌধুরী (দমদম) ঃ শনি এবং রাহু বিবাহের পক্ষে প্রবল বাধাদায়ক। ঐ দুটি গ্রহের প্রতিকার প্রয়োজন।

এস রায়চৌধুরী (দমদম) ঃ পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল হবে কিনা সন্দেহ।

শ্যামলী দত্ত (ধানবাদ) ঃ ২৪ বছর বয়সে বিবাহের সম্ভাবনা। শিক্ষকতা কর-বার যোগ আছে।

শিবপ্রসাদ মজুমদার (ধানবাদ) ঃ ৩৬ বছর বয়স থেকে সময় ভাল আরম্ভ হবে। বর্তমানে পরীক্ষা না দেওয়াই ভাল। গোমেদরত্ন ধারণ করলে ভাল হয়।

দেবব্রত মজুমদার (ধানবাদ) ঃ তোমার উচ্চশিক্ষা লাভের যোগ আছে। ২৫-২৭ বছর বয়সে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে বিদেশ ভ্রমণ হতে পারে। প্রবালরত্ন ধারণ করলে ভাল হয়।

অরূপকুমার সাহা (কলি) ঃ পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল না হলেও কৃতকার্য হতে পারবে।

ফাল্গুনী বসু (কলি) ঃ ৩০ বছর বয়সে কর্মলাভের সম্ভাবনা আছে।

মোহনকুমার কুণ্ডু (বর্ধমান) ঃ বৃষ-রাশি, নরগণ, কন্যালগ্ন, ২৮ বছর বয়সে কর্মলাভের যোগ। গোমেদরত্ন ধারণ করা দরকার।

মৌ চক্রবর্তী (রাণাঘাট) ঃ বৃষরাশি, জন্ম সময় না থাকায় লগ্ন নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

রীতা গাঙ্গুলী (গোড়িয়া) ঃ মিথুন-রাশি, দেবগণ, বৃষলগ্ন, পুনর্বসুনক্ষত্র। পাশ করিবার যোগ আছে।

বঙ্কুবিহারী রায় (কলি) ঃ গ্রাজুয়েট হতে পারবে। ১৯৭৫ সালে চাকুরী লাভের সম্ভাবনা।

ডালিয়া মুখার্জি (কলি) ঃ জন্ম সন না দেওয়ায় উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

তপন মুখার্জি (কলি) ঃ জন্ম সন না দেওয়ায় উত্তর দেওয়া গেল না।

সীমা সরকার (কটক) ঃ ২৫ বছর বয়সেই বিবাহের প্রবল যোগ রয়েছে।

মৃদুলকান্তি বিশ্বাস (বেলঘরিয়া) ঃ পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না।

স্বপন মুখার্জি (কলি) ঃ তোমার জন্ম সন না দেওয়ায় প্রশ্নোত্তর সম্ভব নয়।

শৈবাল মুখার্জি (কলি) ঃ তোমার উত্তর পেতে হলে জন্ম সন পাঠাতে হবে।

শ্রীমতী ঘোষাল (বারাসত) ঃ যথেষ্ট ঝামেলা হলে বটে, তবে প্রেমঘটিত বিবাহের যোগই বেশী।

প্রেক্ষাগৃহ

সাংবাদিক সম্মেলনে ই আই এম পি এ-সভাপতি

বিগত ২০শে মার্চ বিকেল ৫টা 'ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশন'-এর সভাপতি শ্রীএস এল জালান এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। ই আই এম পি এ আয়োজিত পূর্বাঞ্চলীয় ভাষাভাষী চলচ্চিত্রের উৎসব সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই সভাপতি শ্রী এস এল জালান সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

স্মরণ থাকতে পারে, বিগত ২৯শে মার্চ থেকে আসামের গৌহাটি কেন্দ্রে এই উৎসব শুরু হয়েছে। ১১ই এপ্রিল উড়িষ্যার কটকে এবং এপ্রিলের শেষভাগ থেকে উৎসব শুরু হবে পশ্চিম বাংলার কলকাতায়। দুখানা করে বাংলা, অসমিয়া ও উড়িয়া এবং এক-খানা করে ভোজপুরী ও মণিপুরী ছবি এই উৎসবের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। পূর্বাঞ্চলীয় ভাষাভাষী ছবির প্রদর্শন ক্ষেত্রের প্রসার, সংরক্ষণ ও উন্নতিই বর্তমান উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। এই মহৎ উদ্দেশ্যাবলীর শুভ-কামনা জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীত্রয় বাণী পাঠিয়েছেন।

পশ্চিমবাংলা, উড়িষ্যা ও আসামের চলচ্চিত্র শিল্পের শোচনীয়তা সর্বজনবিদিত। এই শোচনীয়তার মূলে সীমাবদ্ধ প্রদর্শন-ক্ষেত্র, এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের জন-সাধারণের প্রতিকূল মনোভাবের কথাও ই আই এম পি এর সভাপতি অস্বীকার করতে পারেন নি। সর্বোপরি স্ব স্ব অঞ্চলেও আঞ্চলিক ছবির প্রদর্শন-ক্ষেত্রের সংকোচন-সমস্যাও শ্রীজালান অস্বীকার করতে পারেন নি।

আঞ্চলিক ভাষাভাষী চলচ্চিত্রের সমস্যা এমনি উৎসবের মধ্য দিয়ে সমাধান করা যাবে বলে শ্রীজালান মনে করেন। এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে তিনি যেসব যুক্তি দেখিয়েছেন তাতে বেশ সুন্দর সুন্দর কথা আছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে যেমন নেতাদের মুখে সর্বভারতীয় 'মিঠে-বুলি' শুনতে আমরা অভ্যস্ত, তেমনি মিঠে-বুলি তিনি শুনিয়েছেন।

জাতীয়তা উদ্বুদ্ধতায় চলচ্চিত্রের অসীম শক্তি থেকে চলচ্চিত্রের সামাজিক দায়িত্ব—পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলবাসীদের পার-স্পরিক ভাব বিনিময় ও সহনশীলতা বাড়াতে এই উৎসব কার্যকরী হবে বলে শ্রীজালান মনে করেন। সর্বোপরি ভাষার বিভিন্নতাকে উপেক্ষা করে এমনি উৎসব সাংস্কৃতিক ঐক্যের বন্ধনকে দৃঢ়তর করে তুলবে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ভাষার প্রাচীর ভেঙে দিয়ে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ভাষা-ভাষী চিত্রের প্রদর্শন ক্ষেত্রকে বর্তমান

আপ কি কসম/মমতাজ

অংশের অসামাজিক কার্যকলাপ চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে আমাদের চলচ্চিত্রকারেরা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি-গুলোকে উদ্ঘাটন করে সমাজের যে সর্বনাশ ডেকে আনছেন, সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে তার সোচ্চার প্রতিবাদ করার সময় এসেছে।

সদ্যমুক্ত রোদন ভরা বসন্ত বাংলা ছবি-খানিতে মায়ের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে জড়িত পুরুষের কামনাকে কন্যার দেহকে কেন্দ্র করে লকলকিয়ে উঠতে দেখলাম বীভৎসভাবে। কন্যার চরিত্রাভিনেত্রী বাসবী নন্দীর উপর অভিনেতা দিলীপ রায়ের বলপ্রয়োগের দৃশ্যটির মধ্য দিয়ে পরিচালক কোন্ শিল্পরস পরিবেশন করতে চেয়েছেন—তা দর্শকদের অজানা নয়। এই একই মেয়েকে সোমনাথরূপী উত্তমকুমারকে শয্যাসঙ্গিনী করিয়ে স্ত্রীর মর্যাদায় অভিষিক্তা করার দুঃসাহস প্রচেষ্টা বিকৃত হয়ে উঠেছে নাকি? শেষপর্যন্ত তাকে বহুজনভোগ্যা করে তুলে কোন নাটক সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তিনি? নারীর স্বৈরাচারিণীর রূপ ছাড়া অন্য কোন রূপ কী এই সব পরিচালকদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না? যত অশ্রু এদেরই কেন্দ্র করে শুধু ঝড়ে পড়ে?

জননী-জায়া-ভগ্নী ও কন্যারূপে যাঁরা ভাস্বতী, তাঁদের জীবনে আছে বহু লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ইতিহাস। আছে দুঃখ-বেদনার জমাট-বাঁধা অন্ধকার। এদের কোন ব্যথা নিয়ে চিত্রকারেরা ছবি করেন না কেন? নারীর ঘৃণিত বা স্বৈরাচারিণীর রূপ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে আমাদের চলচ্চিত্রকারেরা নিজেদের মনোবিকারেরই শুধু পরিচয় দিচ্ছেন না, সমগ্র নারী-সমাজকেই ঘৃণ্য ও হেয় প্রতিপন্ন করছেন। অথচ জাগ্রত নারী সমাজ থেকে এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ নেই। রোদন ভরা বসন্ত ছবিতে পরিচালক একটি মেয়ের মারফত বহু মেয়ের ঘৃণ্য জীবনের কথা এমনভাবে বলেছেন, যাতে এই বলা সমাজজীবনকে সংক্রামিত করে তুললেও আশ্চর্য হবো না। এমনিভাবে সমাজের নর্দমা যাঁরা শিল্প-সৃষ্টির অজুহাত দেখিয়ে গুলিয়ে তোলেন মিস মেও-র মতই শিল্পজগতে তাঁদের চিহ্নিত করে রাখা উচিত। আশ্চর্য, চিত্র-খানির প্রযোজিকা একজন মহিলা। আজ-কাল একদল বিকারগ্রস্ত মানুষ নাটকে, সাহিত্যে এবং চলচ্চিত্রে শিল্প সৃষ্টির নামে পতিতা বা ঘৃণ্য নারীদের নিয়ে যে অপ-সৃষ্টি করছেন, তার প্রতিরোধ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মানব-চরিত্রের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে এঁরা অবহিত নন বলেই ভ্রান্ত পথে ঘুরে মরছেন। মানুষের জীবনে মৃত্যু অবধারিত। প্রকৃতির এই নিয়মকে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান বা অন্য কোন বিজ্ঞানের সাহায্যে রোধ করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র অকালমৃত্যুকেই রোধ করা সম্ভব। যেসব নারী-পুরুষের মধ্যে আদিম প্রবৃত্তি বা পশুত্বের বীজ মাথা উঁচিয়ে ওঠার জন্য কিলবিল করে বা উচ্ছৃঙ্খলতার বীজ সহজাত দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধির মত দুর্বার, কিছুতেই তাদের সুস্থ, সবল মানুষে রূপান্তরিত করা যায় না। আকস্মিক ঘটনা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা-চক্রে নিষ্পেষিত হয়েও যাদের মন মুক্তির জন্য আর্তনাদ করতে থাকে, কেবলমাত্র তাদেরই পরিবর্তন করা সম্ভব। অন্যদের নয়। ভদ্র-অভদ্র যে-কোন বংশেই তারা জন্ম গ্রহণ করুক না কেন। বর্তমান চিত্রের নায়িকাকে মুক্ত-মনের অধিকারিণী রূপে আঁকতে পারেননি পরিচালক।

এম্পার ফিল্মস-এর কাহিনী বিভাগের যেসব উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বর্তমান চিত্র-কাহিনীটি নির্মিত হয়েছে, তাদের উর্বরতাকেও মেনে নিতে না পারার জন্য দুঃখিত। এই কাহিনীর চিত্ররূপ পরি-চালনায় সুশীল মুখোপাধ্যায় যেসব ঘটনা ও চরিত্রকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তাতে তিনি তাঁর পরিচালক-জীবনকে গৌরবা-ন্বিত করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

শেফালী দাশের ক্যাবারে নৃত্য আজ এক শ্রেণীর স্থূল দর্শকদের কাছে বিরাট ভোজের উপকরণ হিসেবে পরিগণিত হলেও, শিল্পীর ভবিষ্যৎ শিল্পজীবনকে বিরাট এক জিজ্ঞাসার মধ্যে টেনে নেবে।

বনপলাশীর পদাবলী চিত্রে অভিনয় করে শ্রীমতী বাসবী নন্দী বি এফ জে-এর সম্মানে ভূষিতা হয়েছেন। বর্তমান ছবির অভিনয়ে সেই সম্মানকে বিপন্ন দেখে চিন্তাশীল কোন ব্যক্তি যদি দুঃখিত হন, আশ্চর্য হবো না।

উৎপল দত্ত, কালী ব্যানার্জি, সুনীলেশ, পারিজাত বসু, সাধনা রায়চৌধুরী, তরুণ-কুমার এন বিশ্বনাথন এবং পাহাড়ী সান্যাল অভিনয়ে প্রশংসনীয়। এমন অস্বাভাবিক চরিত্রে উত্তমকুমারের আত্ম-প্রকাশ একেবারেই নতুন।

—শীলভদ্র

সুজাতা/সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় এবং অনিল চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা : পিনাকী মুখোপাধ্যায়।
—ফটো : অমৃত

স্টুডিও সংবাদ

যেন একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়ে গেলো। তারপর যা হবার তাই হলো। আমি অপলক তাকিয়ে রইলাম মুখের দিকে—ওর স্থির চাউনি, ওর চোখের ভাষা ওর ছন্দময় শরীরটা আমাকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেলল। কদিন পরে কোনো অজ্ঞাত কারণেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো। কলকাতায় এসে তার কথা খুব মনে পড়ছে। নিশ্চয়ই এমন হয় কোনো মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে কলকাতার জনারণ্যে চলে এলে। ম্যাসাঞ্জোর থেকে ঘুরে এসে সম্প্রতি এরকমই মনে হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি ম্যাসাঞ্জোরের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম আমরা সকলে। আহা! কি বলব আপনাদের—চমৎকার জায়গা। সাঁওতাল পরগণার মধ্যে ছোট্ট একটি জায়গা। চারদিকে পাহাড়ের পাঁচিল। মাঝখানে বয়ে চলেছে ময়ূরাক্ষী নদী তারই ওপর গড়ে উঠেছে একটি বাঁধ। সামনেই পাহাড়ের গায়ে সুন্দর সাজানো গোছানো সরকারী রেস্ট হাউস ময়ূরাক্ষী ভবন। অদূরে বিহার বাংলো। এই সমস্ত লোকে-শনেই পরিচালক গুরু বাগচী তাঁর ইউনিটের লোকজন নিয়ে একনাগাড়ে একুশ দিন শুটিং করলেন। এখন শুনুন 'সৃষ্টিছাড়া'র কথা অর্থাৎ এই যে ছবির আউটডোর শুটিং উপলক্ষ্যে এখানে আসা তারই বৃত্তান্ত।

আলো আঁধারে । আরতি ভট্টাচার্য

মেক-আপ করছেন এমেন মনোতোষ রায় ও তাঁর সহকারী পাচু দাস। [illegible] বাপী [illegible] সহায়তায় শ্যুটিং-এর সাজ সরঞ্জাম উঠছে ভ্যানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকেশনে এসে আলো লাগাতে শুরু করলেন সহকারী আলোকচিত্র-শিল্পী শক্তি দত্ত। ক্যামেরা চেক করল বরুণ আর স্বপন। তৎপর সাউন্ড রেকর্ডিস্ট হরদীপ সেনগুপ্ত মাইক কোথায় ধরতে হবে দেখে নিলেন। সেইমত তাঁর সহকারী দুলাল [illegible] নিয়োগ করলেন। আর্টিস্ট পজিশনে দাঁড়াবার পর ক্যামেরা পজিশন নিলেন প্রধান সহকারী পরিচালক বলাই পালিত। রিহার্সালের পর ফাইনাল টেক। ক্ল্যাপস্টিক নিলেন রবীন্দ্রজিৎ। শট শেষ হতেই আর্টিস্টরা যে যার পজিশন ছেড়ে [illegible] করলেন [illegible] দেখে মনে পরিচালক গুরু বাগচী।

এইভাবেই দিনের পর দিন শ্যুটিং চলছে। [illegible] এবং [illegible] জন্য মাঝে মাঝে ব্যাহত হয়েছে ঠিকই তবে কাজটা একেবারে থেমে যায়নি। এই লোকেশনের [illegible] কথা কেউ [illegible] কাউকে। একেবারে সেই কলেজেই চলছে। এই অঞ্চলে বাস করেন হার্ডলি শ' পাঁচেক লোক। তাঁরা শ্যুটিং দেখতে তেমন আগ্রহী নন। ফলে কোনোরকম ডিসটারবেন্স ফেস করতে হয়নি; কোনোরকম ডিফিকাল্টি অ্যাটাক্ট করেনি; তখন যেমনভাবে প্রয়োজন সাহায্য করেছেন ময়ূরাক্ষী ভবনের কেয়ার-টেকার সুনীল দাশগুপ্ত।

এই লোকেশনে কাজ করে পরিচালক শ্রীবাগচী অত্যন্ত খুশী। ওয়েদারের সঙ্গে একটু-আধটু কম্প্রমাইজ করলেও তিনি তাঁর ছবির শ্যুটিং যেভাবে করতে চেয়েছেন সেইভাবেই করতে পেরেছেন। বলা বাহুল্য ছবির প্রায় সেন্ট পার্সেন্ট শ্যুটিং এখানেই হয়েছে।

সমসাময়িক সমস্যার ওপর ভিত্তি করে এ ছবির গল্প। গল্পকার হলেন দুর্গা লাহিড়ী। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক নিজেই। এই প্রথম তিনি এরকম একটি বোল্ড সাবজেক্ট নিয়ে ডিল করছেন। তিনি বলতে চান : আজকের যুবসমাজ, অনেকের ভাষায় 'বয়ে যাচ্ছে' 'বিভ্রান্ত'। অনেক সময় আমরা তাদের বলি 'সৃষ্টিছাড়া'। কিন্তু কেন? তাদের ভুলছাড়া জীবনের জন্য কি তারা শুধু নিজেরাই দায়ী? এই প্রশ্নটা আমি তুলে ধরতে চাই, বিশ্লেষণ করে দেখাতে চাই এর মূলে রয়েছে পরিবেশ, বাবা-মার আদর্শ। পাশা-পাশি এই অস্থির সময়টাকে ধরে রাখতে চাই।

...কী ঘটবে জানি না। চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এ এক অনিবার্য এবং অনতিক্রম্য সত্য। তারপরে কী ঘটবে না জেনেই পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক সৃষ্টিশীল পরিচালককই, তাঁর বুকের মধ্যে এখনি যে তীব্র উত্তেজনা ও দুর্বার বাসনা অবিরাম ঘণ্টাধ্বনির মত বেজে চলেছে, তাতেই নিমগ্ন হন।...চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি পদ-ক্ষেপেই কী ঘটবে জানি না'র হাতছানি। প্রতি মুহূর্তে অনিশ্চয়তা...কাল যেখানে ফুলের গাছ, আজ সেখানে বেড়া। ডিঙিয়ে যেতে হবে।

লোড শেডিং-এর ঠ্যালায় কলকাতার স্টুডিওগুলি বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এইভাবেই চলছে। অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটা ছবির শ্যুটিং হয়েছে। এর মধ্যে একটা বড় বাজেটের ছবির কাজ ভীষণভাবে ব্যাহত হয়েছে। ফলে উত্তমকুমারকে অগ্রভাগে রেখে স্টুডিওর কর্মকর্তারা, কলাকুশলীরা রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রীর সঙ্গে ঘন ঘন যোগাযোগ করছেন। স্টুডিওগুলির পক্ষ থেকে প্রস্তাব রাখা হয়েছে—সপ্তাহে ছ'দিন অন্তত সাতঘণ্টা করে যাতে কাজ করা যায়...। বিদ্যুৎমন্ত্রী বিশদ ভেবে দেখেছেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন অচিরেই ভালো কিছু হবে। ■

আগামী পয়লা বৈশাখ অনেকগুলি নতুন ছবির শুভ সূচনা হচ্ছে। পরিচালক তরুণ মজুমদার প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাগর সীমান্তে শুরু করছেন। এই সেনসেশনাল গল্পটিকে চলচ্চিত্রায়িত করার কথা অনেকেই ভেবেছেন। ভেবেছিলেন ঋত্বিক ঘটক। ভেবে-ছিলেন রাজেন তরফদার। ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন এই গল্পের জন্য লোন স্যাংশন করেছিলেন। রাজেনবাবু সেইমত পরি-কল্পনাও করেছিলেন। জানি না কোন অজ্ঞাত কারণে এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। এখন আশার কথা এই গল্পটি এসেছে একজন কৃতী পরিচালকের হাতেই। গল্প তো অনেকেই জানেন। নায়ক চোর। নায়িকা বেশ্যা। শোনা যাচ্ছে নায়ক চরিত্রে রূপদান করবেন সমিত ভঞ্জ নায়িকা সন্ধ্যা রায়।

পরিচালক সলিল দত্ত এবার একটি হাসির ছবি করবেন। নিজেরই লেখা গল্প এবং চিত্রনাট্য। ছবির নাম ভেবেছেন : সেই চোখ। একজন পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তির চোখে শহর কলকাতার বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন উত্তমকুমার। ভূমিকা-লিপিতে আর কে কে থাকবেন তা এখনো জানা যায়নি। তবে নায়িকা চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পরিচালক নতুন মুখ খুঁজছেন।

পরিচালক পীযূষ বসু পর পর দুখানি ছবি শুরু করার পরিকল্পনা করেছেন। প্রথমে শুরু করছেন সন্ন্যাসী রাজা। ভাওয়াল রাজার কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে এ ছবির চিত্রনাট্য। এ ছবিতে বাবা ও ছেলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন উত্তম-কুমার অর্থাৎ দ্বৈত ভূমিকায়। ছবিটি প্রযোজনা করছেন অসীম সরকার। অসীমা ভট্টাচার্যের প্রযোজনায় এই পরিচালকের পরের ছবি প্রথম তারার আলো। প্রফুল্ল রায়ের কাহিনী। রোমান্টিক রোলে পার্থ মুখোপাধ্যায় ও মহুয়া রায়চৌধুরীর কথা ভাবা হচ্ছে।

বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর প্রতিভা পিকচার্সের অগ্নিশ্বর-এর শ্যুটিং আবার

শুরু হচ্ছে এপ্রিল মাস থেকে জানালেন পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় নিজেই। ইতিমধ্যে এ ছবির ভূমিকালিপিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। কৃষ্ণা বসুর স্থানে এসেছেন সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। নামভূমিকায় আছেন উত্তমকুমার। একটি গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্রে রূপদান করছেন মাধবী দেবী। এছাড়া কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে তরুণকুমার জহর রায় এবং পার্থ মুখোপাধ্যায়কে দেখা যাবে। বনফুল রচিত কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে এ ছবির চিত্রনাট্য। ছবিটি প্রযোজনা করছেন উদয় সামন্ত।

কিতনে পাস কিতনে দূর মানে কত কাছে কত দূরে। পাশাপাশি দুটি গল্প। দুটি গল্পের বক্তব্য মোটামুটি একই রকম। অসদুপায়ে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করলে জীবনে শান্তি বিঘ্নিত হয় সুখী হওয়া যায় না। এই সব টাকা পয়সা আমাদের কত কাছেই না ছড়িয়ে থাকতে পারে। অসদুপায়ে কত সহজেই প্রথম গল্পটি ক্রাইম-সাসপেন্স ঢঙে সাজিয়েছেন কাহিনীকার পরিচালক দয়াশংকর সুলতানিয়া। তিনি এছবির প্রযোজকও বটে। সম্ভবত ইনি এখন একমাত্র যিনি কলকাতায় কলার হিন্দী ছবি নির্মাণ করার সাহস রাখেন। এটি তাঁর দ্বিতীয় চেষ্টা। তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা বহুজন অভিনন্দিত পরিবর্তন।

বর্তমানে শ্রীসুলতানিয়া পার্ক হোটেলের একটি ঘরে শুটিং করছেন। অংশ নিচ্ছেন সমিত ভঞ্জ এবং মীনা কোসর যথাক্রমে অর্থলোভী মিঃ কাপুর এবং তাঁর পার্টনার লিলির ভূমিকায়। এই গল্পে সুব্রত চট্টোপাধ্যায় রবি ঘোষ এবং চিন্ময় রায় তিনটি বিশেষ চরিত্র রূপায়িত করবেন।

শুটিং-এর ফাঁকে দয়াশংকরের সঙ্গে কথা হল। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন আমি পর পর কয়েকটি ছবি করব। আপনি তো নিশ্চয়ই শুনেছেন আমি ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিও নিয়েছি। রিনোভেশনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এখানেই আমার রেগুলার প্রোডাকশন চলবে। এছাড়া বাইরের পার্টিও কাজ করতে পারবেন। মাস ছয়েকের মধ্যে সব রেডি হয়ে যাবে। এয়ার কন্ডিশনড মেক-আপ রুম ক্লোরিং এবং প্রজেকশন রুম তৈরী হচ্ছে। কসার জেনরেটরও তৈরী হবে এক বছরের মধ্যে।

পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওর উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে একটি সেট নির্মাণ করে (শিল্প নির্দেশক রবি চট্টোপাধ্যায়) যুক্তি তর্ক ও গল্প-এর শুটিং পুনরায় শুরু করেছেন। শ্রীঘটক আশাবাদী: আমিও আশাবাদী। আমার স্থির বিশ্বাস এই স্থগিত ছবির কাজ অচিরেই শেষ হবে।

এই পর্যায়ে শিল্পীরা যাঁরা অংশ গ্রহণ করছেন তাঁরা হলেন: শাওলি মিত্র তৃপ্তি মিত্র সৌমেন্দ্রনাথ এবং শ্রীঘটক। আরতি মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া একটি গান পিকচারাইজ করা হল। জানা গেল অন্তর্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শেষ হলেই পরিচালক সদলবলে তাঁর ইউনিট নিয়ে সাঁইথিয়া অভিমুখে যাত্রা করবেন। সেখানে বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হবে।

যুক্তিতর্ক ও গল্প সম্পর্কটাই উনিশশো সত্তর সাল থেকে বাহাত্তর সালের গোড়া পর্যন্ত গ্রামে গঞ্জে দিনরাত্রি বাস করে যে জীবন প্রবাহ শ্রীঘটক দেখেছেন তার ওপর ভিত্তি করে। তিনি বলেন: একটা সুতীব্র আক্রমণ এ ছবির লক্ষ্য। এ ছবিতে আমি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছি। প্রতিবাদ করা শিল্পীর প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব। শিল্প ফাজলামি নয়। যারা প্রতিবাদ করছে না তারা অন্যায় করছে। শিল্প দায়িত্ব। আমার অধিকার নেই সে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার যুক্তি তর্ক কি পলিটিক্যাল ছবি?

সম্পূর্ণভাবে। পলিটিক্যাল ছবি করা আসলে মেরুদণ্ডের প্রশ্ন।

অনেকদিন পর পরিচালক হীরেন নাগ কলকাতায় ছবি করছেন। সম্ভবত আপনারা আগেই জেনেছেন শ্রীনাগ প্রবোধকুমার সান্যালের প্রিয় বান্ধবী রি-মেক করছেন। নবা কলকাতার একটি অফিসে বহির্দৃশ্য গ্রহণের মাধ্যমে এছবির শুটিং শুরু হয়েছে। প্রথম শটেই ক্যামেরা ফেস করেছেন কানাই দে ও সূর্য চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন নচিকেতা ঘোষ। এ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে নিয়মিত দৃশ্যগ্রহণ চলবে জানালেন পরিচালক স্বয়ং। তিনি আরো জানালেন আসলে এ ছবির শুটিং হওয়া উচিত কলকাতার রাস্তাঘাটে অলিতে-গলিতে। মোটামুটি আমার এই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এখন দেখছি সেভাবে শুটিং করা অসম্ভব। কারণ বিগ স্টার কাস্ট। অনেক লোকেশন ঘুরে দেখলাম আর যাই হোক উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেনকে নিয়ে রাস্তাঘাটে অলিতে গলিতে শুটিং করা সম্ভব নয়। ফলে আমাকে নানাভাবে কম্প্রোমাইজ করে কাজ করতে হচ্ছে।

কদিন আগে বম্বে থেকে পরিচালক শক্তি সামন্ত তাঁর ইউনিটসহ বাংলায় এসেছিলেন চরিত্রহীন-এর আউটডোর শুটিং করতে। বলা বাহুল্য এটি একটি হিন্দী ছবি। বাংলার সফল কলঙ্কিত নায়ক অবলম্বনে গড়ে উঠেছে এছবির চিত্রনাট্য। নায়ক সঞ্জীবকুমার। নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর। ওরা দুজনেই শুটিং করলেন গ্র্যান্ড হোটেলের মধ্যে কখনও বাইরে। এই শিল্পীদ্বয়ের সঙ্গে কলকাতার তরুণকুমার কাজ করেন। তিনি এছবির একটি বিশেষ চরিত্র রূপায়িত করছেন।

শুটিং-এর অবসরে শর্মিলার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় জিগ্যেস করলাম: নতুন কোনো বাংলা ছবিতে কাজ করছেন না কি?

—অনেক অফার আছে। অরুন্ধতী দেবীর আগামী ছবি ছুটিতে যাবার আগে-র গল্প আমার ভালো লেগেছে। ছবিটা হিন্দীতেও হতে পারে। এখনো ফাইনাল হয়নি। তবে আমি এছবিতে কাজ করতে পারি এবং এ-ছবিতে কাজ করতে হলে আমাকে কলকাতায় এসে কাজ করতে হবে।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

মঞ্চাভিনয়

'আসামী হাজির': ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ভবানীপুর শাখা। কর্মীরা সম্প্রতি এ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে তাঁদের দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীবিমল

ছবির কাজের মহরতে সঙ্গীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ ও আরতি মুখোপাধ্যায়।

অর্জুনের শুটিং—স্বরূপ দত্ত, রাজশ্রী বসু, পরিচালক ইন্দর সেন, শক্রো কানুনগো এবং কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়।

মিত্রের 'আসামী হাজির' নাটকটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করলেন। এই নাটকের নেপথ্যে মেহনতী মানুষের বলিষ্ঠ শ্রেণী-চেতনা ও আদর্শের চিত্রায়ণ-প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেল। নাটকের 'আসামী' প্রতীকী—সে হোচ্ছে আজকের সংগ্রামী মানুষের প্রতিভূ। কাঠগড়ায় সে অভিযুক্ত। আপন দোষ সে স্বীকার করে 'হ্যাঁ আমি নিজের কথা চিন্তা করতে চেয়েছি' এই বলে।

নাটকের মূল আদর্শ নাট্যকারেরই স্বীকৃতি অনুযায়ী বিদেশী কোনও রচনা ; কিন্তু দর্শকেরা এর মধ্যে বিদেশী গন্ধ পান না এবং এটা প্রশংসার্হ। বিভিন্ন চরিত্রাভিনয়ে যাঁরা সৌখীন মেজাজ অথচ সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় অরুণ ঘোষ সুব্রত শীল প্রদীপ সেনগুপ্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায় রথীন দেব বিজয় ভট্টাচার্য জয়ন্ত ভট্টাচার্য শক্তি চ্যাটার্জি নারায়ণ মজুমদার ও প্রণব ব্যানার্জির নাম। পরিচালক অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষতার ছাপ ছোট নাটকটির মধ্যে প্রায় সর্বত্রই দেখা দিয়েছে। হাল্কা মেজাজের এই নাটকটি বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বিষণ্ণ ও গম্ভীর কয়েকটি দিক হাস্যরসের মাধ্যমে দর্শকদের মনকে স্পর্শ করতে পেরেছে বলে মনে হয়।

আবাদ : নিসিম বেনজামিন ইলিয়াস মেমোরিয়াল ক্লাবের শিল্পী সদস্যরা সম্প্রতি তাদের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক সম্মিলনী উপলক্ষে 'আবাদ' নাটকটি পরিবেশন করলেন 'বিশ্বরূপা'র মঞ্চে। নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন শ্রীসত্য ব্যানার্জি। কয়েকটি দৃশ্য পরিকল্পনায় শৈথিল্য ও দু-একজন চরিত্রাভিনেতার অনুভূতির গভীরতার অভাব সামগ্রিক ভাবে নাটকটির গতিবেগকে ব্যাহত করেছে বলে মনে হয়।

যাঁদের অভিনয় মোটামুটিভাবে সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে তাঁরা হোলেন লালু গাঙ্গুলী (সুধন্য), মায়া ঘোষ (নয়নতারা), হিরন্ময় চৌধুরী (বিশ্বেশ্বর,) ইন্দ্রাণী লাহিড়ী (গঙ্গা)।

নাটকটির অন্যান্য চরিত্রে রূপ দেন আশীষ চৌধুরী সুকুমার মজুমদার দিলীপ রায়চৌধুরী বিষ্ণুপদ চৌধুরী সুজন শ্রীমানী গোরাচাঁদ চৌধুরী শিবু ভট্টাচার্য সত্য ভৌমিক, বিষ্ণু চৌধুরী, মানিক রায়, বিশ্বনাথ বসু সুজিত ব্যানার্জি মন্টু সাহা অজিত ঘোষ।

উল্কা : কয়েকদিন আগে 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' নাটকটি বেশ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হোল প্রযোজনা করেন পূর্ব রেলের হিন্দুর গুড

অফিসের কমার্শিয়াল রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা।

বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন হিরণ্য চ্যাটার্জি বলরাম রায়, নারায়ণ গাঙ্গুলী নির্মল চক্রবর্তী সুহাস ভট্টাচার্য, হারাশংকর চক্রবর্তী দেবব্রত মুখার্জি, শৈলেন মজুমদার, অমর পাল দেবু সান্যাল মাখন দত্তচৌধুরী বীরেন চক্রবর্তী দেবদাস দত্ত, অধীর কর সরোজ পোদ্দার, মৃত্যুঞ্জয় গুপ্ত, রবি রায় অনিল দত্ত, মন্টু সাউ ইরা চক্রবর্তী সুপর্ণা চ্যাটার্জি সুমিতা চ্যাটার্জি ও বীথি গাঙ্গুলী।

সকালের জন্য : নদীয়ার অনামী গোষ্ঠী সম্প্রতি রতনকুমার ঘোষের 'সকালের জন্য' নাটকটি বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গে অভিনয় করলেন। নির্দেশনার দায়িত্ব নেন পূর্ণিমা বিশ্বাস। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন অভয় মোদক অজিত বিশ্বাস, রতন পাল অজিত পাল গৌতম গাঙ্গুলী, শান্তি বসুমল্লিক দুলাল ভৌমিক রঞ্জন মন্ডল বিধান গাঙ্গুলী মঞ্জু নাথ, আশিস চৌধুরী অসিত বরণ ঘোষ, হরিদাস রায় সুনীল ঘোষ পূর্ণিমা বিশ্বাস।

ক্ষুধা : ই আই-সি-আর সি'র সদস্যরা সম্প্রতি 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা' নাটকটি পরিবেশন করলেন। সামগ্রিক প্রযোজনাটি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সফলতার জন্য যাঁর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য তিনি হোলেন নাট্যনির্দেশক সুব্রত সান্যাল।

অভিনয়ের দিক থেকে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন শুভেন্দু রায়চৌধুরী (সদা) স্বপ্না মুখার্জি (মলিনা) বিনয় ব্যানার্জি (রমা) সমর মুখার্জি (বন্ধু) যদুনাথ ব্যানার্জি (রাজা)।

দুটি একাঙ্কিকা : বিলাসপুরের নতুন নাট্যগোষ্ঠী 'দর্পণ' স্থানীয় রেলওয়ে ইনস্টি-টিউট মঞ্চে দুটি একাঙ্কিকার অভিনয় পরিবেশন করে নাট্যানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নাটক দুটি ছিল অমল রায়ের 'কেননা মানুষ' ও রাধারমণ ঘোষের 'শতাব্দীর পদাবলী'। নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন ফাল্গুনী মুখার্জি। নাটক দুটিতে সু-অভিনয় করেন জ্যোতির্ময় নন্দী অজয় মজুমদার ফাল্গুনী মুখার্জি কৌশিক মিত্র অশোক রায় মানিক চক্রবর্তী বিকাশরঞ্জন রায়। বাদল রায়ের আলোকসম্পাত দুটি নাটকেরই গতিবেগকে সমৃদ্ধ করেছে।

নাট্য-প্রতিযোগিতা

* দমদম সরকারী আবাসিক সংস্থার সাংস্কৃতিক উপ-সমিতির পরিচালনায় বাংলা একাংকিকার অভিনয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। আবেদন করার শেষ তারিখ ২০শে এপ্রিল। ঠিকানা : ৫৯ দমদম রোড ব্লক-কে ৬ কলকাতা-২৮।

* আগামী জুলাই মাসে থিয়েটার সেন্টার হলে সর্বভারতীয় ভাষার একাংক

শনিবারের চিঠি/কবিতা

[illegible]

[illegible]

কার্টুন থিয়েটারের ক্ষুধিত পাষাণ নাটকে বসন্ত ঘোষদস্তিদার (মেহের আলী) ও উজ্জ্বল সেনগুপ্ত (নায়ক)।

নাটকের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। যোগাযোগের ঠিকানা : ১ কালী-ঘোষ লেন, কলকাতা-২২।

* শিলিগুড়ির মিট সম্মিলনী আয়োজিত একাঙ্কিকা অভিনয় প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে আগামী ২০শে এপ্রিল থেকে। যোগাযোগের ঠিকানা : হিলকার্ট রোড শিলিগুড়ি দার্জিলিং।

বিশাখাপত্তমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

কয়েকদিন আগে অন্ধ্রের বিশাখাপত্তমে নবগঠিত সাংস্কৃতিক সমন্বয় সংস্থা 'মিলনী'র প্রযোজনায় শ্রীশুভঙ্কর চক্রবর্তীর 'ঠিকানা' ও সবুজ্জামানের রচিত 'যুবকেরা

*

শতবর্ষের স্মরণীয় : ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলার সাধারণ নাট্যশালা। সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করে ভবিষ্যতের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। যাঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষা জড়িয়ে রয়েছে আমাদের নাট্যঐতিহ্যের সঙ্গে—তাঁদের স্মরণ করে নাট্যইতিহাসের বিশেষ বিশেষ ঘটনা পাঠকসাধারণের সামনে তুলে ধরবেন শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়।

*

ডাকু মনসুরে/ফতেহ্ লোহানী ও জসীম

এখন এই নাটক দুটি স্থানীয় রেলওয়ে রঙ্গমঞ্চে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে শ্রীমিনু মুখোপাধ্যায়-এর পরিচালনায় অভিনীত হয়। দলগত অভিনয়-এর মাঝে এই অনুষ্ঠান এই শহরে এক অনন্যসাধারণ মান নির্ণয়ের সহায়ক হয়। শ্রীনন্দলাল ভৌমিক রতীন ব্যানার্জী অতীন পালিত ও শ্রীদীপেন সেন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিবিধ সংবাদ

রবিতীর্থের সমাবর্তন : গত ৩১ মার্চ রবীন্দ্রসরোবর মঞ্চে রবিতীর্থের সমাবর্তন ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞানপত্র ও পুরস্কার বিতরণ করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন রাজেশ্বর মিত্র। মোট ৩৭ জন ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন রূপা মিত্র। বেদগান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। একক ও সমবেত সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন লোপামুদ্রা দাশগুপ্ত লক্ষ্মী গুপ্ত ও রবিতীর্থের শিশু শিল্পিবৃন্দ। দ্বিজেন চৌধুরী কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

ন্যাশনাল অ্যাটলাস অরগানাইজেশন এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের ৭ম বার্ষিক সম্মিলনী : গত ১৮ মার্চ '৭৪ সন্ধ্যায় ন্যাশনাল এটলাস্ অরগাইজেশন এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সপ্তম বার্ষিক সম্মিলনী উপলক্ষে বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন হলে অনিলবরণ দত্ত রচিত 'লৌহপ্রাচীর' নাটকটি সংস্থার কর্মিবৃন্দ কর্তৃক শ্যাম ভট্টাচার্যের বলিষ্ঠ নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। বিশেষতঃ শেষ দৃশ্যে 'টিল অ্যাকশন' অভিনবত্বে সকলকে বিশেষ মুগ্ধ করে চরিত্রাভিনয়ে উল্লেখযোগ্য প্রশংসার দাবীদার রূপরূপের চরিত্রে মণি সেনগুপ্ত ও কেয়া চরিত্রে নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় সুধাংশু বিশ্বাস, জীবন সেন, হরিহর দে, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনেন্দু ভট্টাচার্য ইন্দ্রসিং ক্ষেত্রী ও রণজিৎ বোস-এর অভিনয়ে বিশেষ সমৃদ্ধ হয়েছে। আলোর সম্পাত ও মঞ্চ-নির্দেশনাও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দাবী রাখে।

বাংলাদেশের ছবি

বাংলাদেশ তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় সম্প্রতি পাঁচটি ভারতীয় ছবির প্রদর্শনীর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছেন। ছবি পাঁচটির নাম যথাক্রমে "দীপ জেলে যাই,' 'কাবুলিওয়ালা,' 'পৃথিবী আমারে চায়,' 'অপুর সংসার', 'সাধারণ মেয়ে'।

উল্লেখ থাকে যে সাবেক পাকিস্তান সরকার '৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পরে এইসব ভারতীয় ছবির প্রদর্শন সার্টিফিকেট বাতিল করেছিলেন।

সুভাষ দত্তের ছবি 'আকাঙ্ক্ষা'

পরিচালক সুভাষ দত্ত অনেকদিন পর আবার ছবি তৈরীর কাজে হাত দিচ্ছেন বলে জানা গেছে। ছবির নাম আকাঙ্ক্ষা।

দত্তবাবু এ-ছবিতে একজন নতুন নায়িকা উপহার দেবেন বলে জানিয়েছেন। নায়ক চরিত্রে রাজ্জাক থাকবেন বলেও তিনি জানিয়েছেন। তবে অন্যান্য চরিত্রের জন্য তিনি নতুন মুখ খুঁজছেন।

শাবানা বিপাকে পড়েছেন

বাংলাদেশের অন্যতমা একজন নায়িকা শাবানা সম্প্রতি বেশ বিপাকে পড়েছেন। কাজী জহীর প্রযোজিত ও বাবুল চৌধুরী পরিচালিত নির্মিতব্য ছবি 'চাষীর মেয়ে'র 'সিডিউল' ও ছবির 'পোশাক' নিয়ে ছবির নায়িকা শাবানা, পরিচালক বাবুল চৌধুরী ও প্রযোজক কাজী জহীরের মধ্যে সম্প্রতি এক বিবাদের সূচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, গত ডিসেম্বরে শাবানা চাষীর মেয়ে ছবিতে অভিনয় করার জন্য নাকি পঁচিশ হাজার টাকাও অগ্রিম নেন এবং চুক্তিবদ্ধ হন যে, প্রতি মাসে তিনি 'চাষীর মেয়ে'র স্যুটিংএর জন্য সাতদিন করে পুর্ণ শিফট সময় দেবেন। কিন্তু এখন অত্যধিক ছবি হাতে থাকায় শাবানা নাকি অনুরূপ ডেট দিতে পারছেন না। ফলে বিরোধ।

দ্বিতীয় কারণ, ছবির পোশাক। ছবিটির নায়িকা যেহেতু শাবানা, সেহেতু শাবানাকে চাষীর মেয়েদের মত ব্লাউজ ছাড়াই অভিনয় করতে হবে।

পরিচালকের বক্তব্য, গ্রামের মেয়েরা বাড়ীতে সর্বক্ষণ ব্লাউজ পরে থাকে না। আর এ কারণেই নায়িকা শাবানাকে যেহেতু চাষীর মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করতে হবে, সেহেতু ব্লাউজ ছাড়াই তাকে অভিনয় করতে হবে।

কিন্তু শাবানা এ যুক্তি মানতে রাজী নন। তিনি কিছুতেই ব্লাউজ ছাড়া ছবিতে অভিনয় করবেন না। ফলে প্রযোজক, পরিচালক ও নায়িকা শাবানার মাঝে সৃষ্টি হয়েছে বাদানুবাদ।

শেষ পর্যন্ত শাবানা নাকি জানিয়েছেন, তিনি এ ছবিতে অভিনয় করবেন না এবং তিনি অগ্রিম নেয়া পঁচিশ হাজার টাকাও ফেরত দেবেন।

কিন্তু বাবুল চৌধুরী ও কাজী জহীর ছাড়বার পাত্র নন। তাদের বক্তব্য, 'শাবানাকে এ ছবিতে অভিনয় করতেই হবে।'

নায়ক বিয়ে করছেন

বাংলাদেশের একজন তরুণ নায়ক বিয়ে করছেন।

কারণ তিনি আর এমনি একা-একা নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে পারছেন না।

আর তাই তিনি কারো সঙ্গে 'গাটছড়া' বাঁধবেন।

—কিন্তু কাকে বিয়ে করছেন? চিত্র-পুরীর কাউকে কি?

—না।

—তবে?

—চিত্রপুরীর বাইরের কাউকে।

—কে সে?

—এখনও ঠিক হয় নি।

—তবু ও?

—খুঁজছি। খুঁজতে খুঁজতে একদিন নিশ্চয় মনের মত কাউকে পেয়ে যাব।

—কিন্তু কবে?

—চুয়াত্তরে নয়, পঁচাত্তরে। হ্যাঁ পঁচাত্তরের মধ্যেই সব কিছু ফাইনাল করে ফেলব।

জানালেন, বাংলাদেশের একজন ব্যস্ত তরুণ নায়ক উজ্জ্বল।

উল্লেখ্য, তিনি এখন এদেশে রাজ্জাকের পরই ব্যস্ত নায়ক।

অবশ্য, মাঝে কিছুদিন তার বেশ দুর্দিন চলছিল।

কিন্তু 'অপবাদ' ছবিতে তিনি তার পূর্ব সুনাম ফিরে পেলেন এবং সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রথম দীর্ঘতম ছবির নায়ক উজ্জ্বল। উজ্জ্বল এখন নির্মীয়মাণ অনেকগুলো ছবিরই ব্যস্ত নায়ক।

জি আর উজ্জ্বল

বাংলাদেশের চিত্রজগতে আরো একজন উজ্জ্বল আছেন।

তিনি স্থির-চিত্রগ্রাহক জি আর উজ্জ্বল।

খুব শীঘ্রই তিনি চিত্রপরিচালকদের তালিকায় নিজের নাম লেখাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

ছবির নাম 'নরক থেকে বলছি।' ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন 'আমি মুজিব বলছি' নাটকের লেখক ও পরিচালক তরুণ রায়।

সংসপ্ত চৌধুরী

বাংলাদেশের উপজাতিদের নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন ছবি তৈরী হয় নি।

সম্প্রতি মিঃ সংসপ্ত চৌধুরী পার্বত্য-চট্টগ্রাম এলাকার উপজাতিদের জীবনকে ভিত্তি করে একটি ছবি নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছেন।

তিনি নিজেই ছবির চিত্রনাট্য রচনা করছেন এবং ছবির জন্য বর্তমানে শিল্পী নির্বাচনে ব্যস্ত রয়েছেন।

উল্লেখ থাকে যে, সাবেক আয়ুব আমলে তিনি একজন মন্ত্রী ছিলেন।

একটি প্রেমের জন্য

নিহত ছবির রায়হানের ছোট ভাই জাকারিয়া হাবিব 'একটি প্রেমের জন্য' নামে একটি ছবি পরিচালনার কথা জানিয়েছেন।

ছবির নায়িকা থাকবেন ববিতা। নায়ক হিসেবে সম্ভবতঃ রাজ্জাক, অথবা উজ্জ্বল কিংবা নবাগত কেউ একজন থাকবেন।

নায়িকা 'সুচন্দা'র ছোট বোন ও প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক জহীর রায়হানের শ্যালিকা চিত্রনায়িকা ববিতা। কৃতী নায়িকা ববিতা। ববিতার আবার ডাক এসেছে পশ্চিম বাংলা থেকে।

একদা ববিতার ডাক এসেছিল প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে—তার 'অশনি সঙ্কেত' ছবিতে অভিনয়ের জন্য। সেটা গত বছরের কথা।

'অশনি সঙ্কেতে' অভিনয় করে, ববিতা 'আন্তর্জাতিক নায়িকার' ও 'শ্রেষ্ঠ নায়িকার' সম্মান অর্জন করেছেন। এখন ববিতার আবারও ডাক এসেছে, পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত চিত্রনির্মাতা গোষ্ঠী অগ্রদূতের পক্ষ থেকে।

এবার ববিতাকে সৌমিত্র নয়, ভারতের মহানায়ক 'উত্তমকুমারের' মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। ববিতাকে উত্তমকুমারের বিপরীতে অভিনয় করার জন্য অগ্রদূত আহ্বান জানিয়েছেন।

অগ্রদূত সম্প্রতি এক চিঠিতে ববিতার কাছে জানতে চেয়েছেন, উত্তমকুমারের বিপরীতে অভিনয় করতে ববিতার আপত্তি আছে কিনা এবং ববিতা কখন সময় দিতে পারবেন ইত্যাদি।

ববিতা কি রাজী হবেন?

নিশ্চয়।

আর তেমন আভাষও পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে।

কোলকাতার নায়িকা আরতি ভট্টাচার্য বর্তমানে ঢাকায় একটি ছবির নায়িকা চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন। ছবির নায়ক উজ্জ্বল। ছবির নাম 'ছুটির ফাঁদে'। ছবির কাহিনীকার পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসু। ছবির পরিচালক শাহীদুল হক খান।

ছবির কাজ বর্তমানে দ্রুত এগিয়ে চলেছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ থাকে, ইতিমধ্যে পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত নায়ক বিশ্বজিৎ মোমতাজ আলী পরিচালিত 'রক্তাক্ত বাংলা'য় অভিনয় করেছেন।

প্রখ্যাত নায়িকা সন্ধ্যা রায় রাজেন তরফদার পরিচালিত "পালঙ্কে" অভিনয় করছেন। এবং মাধবী চক্রবর্তী ও নির্মীয়মাণ একটি ছবি 'হারানো সুরে' অভিনয় করছেন।

বিনিময়ে ববিতা ও সুমিতা নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেছেন ও করছেন কোলকাতার ছবিতে।

সম্প্রতি আরো জানা গেছে, কোলকাতার কিছু কিছু পরিচালক নাকি বাংলাদেশের নায়িকা শাবানা ও অলিভিয়াকে নিয়ে ছবি তৈরীর কথা ভাবছেন।

এসব লক্ষণ মিলিয়ে আমরা আশা করতে পারি, খুব শীঘ্রই ঢাকা কোলকাতার এবং কোলকাতা-ঢাকার শিল্পীরা দুই বাংলার ছবিতে অভিনয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন এবং যতো তাড়াতাড়ি তা হবে, দু'বাংলার শিল্প ও দর্শকদের জন্য তা ততোই মঙ্গল বয়ে আনবে।

কিন্তু প্রশ্ন, শুধু ববিতা ও সুমিতা কেন? সুমিতা ও ববিতা একটি কেন, দশটি ছবিতে অভিনয় করুন, কারো কোন আপত্তি নেই। বরং সেটা আমাদের গর্ব।

কিন্তু আর সবাই কেন সুযোগ পাচ্ছেন না?

ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত তিতাস একটি নদীর নাম যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করবেন, আমাদের আরো দু'জন নায়িকা উক্ত ছবিতে সুন্দর ও এককথায় চমৎকার অভিনয় করেছেন।

এঁরা হলেন নায়িকা রোজী ও নায়িকা কবরী।

কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় সুযোগ ও দক্ষ-পরিচালকের অভাবে এঁরা তাঁদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও প্রস্ফুটন ঘটাতে পারছেন না।

এছাড়াও শনিবারের চিঠির নায়িকা শাহানার কথাও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে।

চিত্রজগতে এঁরা অনেকদিন কাটালেন। অথচ প্রতিভা বিকাশের ও প্রদর্শনের ঠিক যথাযথ সুযোগ আজও এঁরা পেলেন না।

বাংলাদেশের নায়করাজ রাজ্জাক ছাড়াও বেশ ক'জন সত্যিকারের চরিত্রাভিনেতারও একই অবস্থা। সবই আছে। নেই শুধু দক্ষ-পরিচালক এবং অভিনয়ের সুযোগ।

এঁরা হলেন মোস্তফা, হারুণ, আনোয়ার হোসেন, নারায়ণ চক্রবর্তী প্রমুখ বেশ কয়েকজন।

পরিচালক খান আতা পরিচালিত আগামী ছবির নাম 'সুজন সখী।' ছবির কাহিনী ও সংলাপ লিখেছেন আমজাদ হোসেন। এটা হবে একটা প্রেমের গল্প ভিত্তিক ছবি।

বজলুর রহমান পরিচালিত ও প্রযোজিত ছবি 'গোপাল ভাঁড়' এখন মুক্তির দিন গুনছে।

এ ছবির নায়ক আলতাফ, নায়িকা সুচন্দা।

তরুণ নায়ক জাফর ইকবালের অতি-সাম্প্রতিক ইচ্ছে—তিনি 'সংগীত পরিচালক' হবেন। পরিচালক এস এম শফী সম্প্রতি জাফরের এ ইচ্ছা পূরণের সুযোগ দিতে আগ্রহী হয়েছেন বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য জাফরের বড় ভাই আনোয়ার পারভেজ একজন প্রতিষ্ঠিত সুরকার এবং বোন শাহনাজ বেগম বাংলাদেশের একজন অন্যতম কণ্ঠশিল্পী। নায়ক হবার আগে জাফর ছিলেন একজন গীটারবাদক।

শেষ পর্যন্ত ব্লাউজ-যুদ্ধে শাবানা জয়ী হলেন। 'চাষীর মেয়ে' ছবিতে শাবানাকে ব্লাউজহীন অভিনয়ের জন্য পরিচালক বাবুল চৌধুরী-ও প্রযোজক কাজী জহীর চাপ সৃষ্টি করছিলেন। কিন্তু শাবানা রাজী হচ্ছিলেন না। শাবানার বক্তব্য ছিল—'না কিছুতেই ব্লাউজ ছাড়া আমি ছবিতে অভিনয় করব না।' এখন শেষ সংবাদে জানা গেছে, ছবির প্রযোজক ও পরিচালক নায়িকা শাবানার দাবী মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

কণ্ঠশিল্পী শাহনাজ বেগম সম্প্রতি মা হয়েছেন। গত ১২ মার্চে তিনি একটি কন্যা সন্তানের মা হয়েছেন। কন্যার নাম রেখেছেন 'রিঙ্কু।' মা ও সন্তান উভয়েই সুস্থ আছেন।

'দুই পর্ব' ছবিটি মুক্তি পাই পাই করেও অজ্ঞাত কারণে আজও মুক্তি পায় নি। এ ছবির পরিচালক খসরু নোমান। ছবির নায়ক নায়িকা রাজ্জাক ও কবরী। অন্যান্য চরিত্রে আছেন সুমিতা, রাজু আহমদ শিউলী আহমদ, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

শাহজাহান চৌধুরী পরিচালিত 'পিঞ্জর'-এর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এ ছবির নায়ক নায়িকা উজ্জ্বল ও কবিতা। অন্যান্য চরিত্রে আছেন মোস্তফা, শওকত আকবর, রাণী সরকার, সুভাষ দত্ত, হাসমত, খান জয়নুল প্রমুখ। সংগীত পরিচালক খোন্দকার নূরুল আলম। প্রযোজক ডাঃ এম আর বারী।

আজিজুর রহমান পরিচালিত 'পরিচয়'-এর নায়ক - নায়িকা রাজ্জাক - কবরী। অন্যান্যরা হলেন রোজী, সামাদ, আনোয়ার হোসেন, হাসান ইমাম, শওকত আকবর প্রমুখ।

ইবনে মিজান এক সঙ্গে "ডাকু মনসুর" ছাড়াও আরো দুটি ছবি পরিচালনায় ব্যস্ত রয়েছেন। ছবি দুটি হলো যথাক্রমে 'জিঘাংসা' ও 'রাজকুমার'।

রাজকুমার ছবির নায়ক নায়িকা ওয়াসীম ও শাবানা। অন্যান্যরা হলেন রোজী মোস্তফা, সবিতা, হাসমত, জাভেদ রহী প্রমুখ। 'জিঘাংসা'র নায়ক নায়িকা রাজ্জাক ও জবা চৌধুরী। অন্যান্যরা হলে আনোয়ার হোসেন, জসীম, সুচরিত প্রমুখ।

নূরুল হক বাচ্চু অনেকদিন পর ছ পরিচালনায় আবার হাত দিয়েছেন। ছবি নাম "জীবনসাথী"। ছবির নায়ক নায়ি ওয়াসীম ও শাবানা। অন্যান্যরা হলে নাজনীন, আলতাফ, মঞ্জু দত্ত, জাভে রহীম, রমী জালাল প্রমুখ। সঙ্গীত পা চালক সত্য সাহা। রূপসা পিকচাসে ব্যানারে ছবিটি তৈরী হচ্ছে। ছবির ক দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

রহীম নেওয়াজও বহুদিন পর আ ছবি পরিচালনায় হাত দিয়েছেন। ছবির 'ভাই ভাই।'

—আনওয়ার আহ

রাজ্য ক্রীড়াদপ্তর গ্রামের দিকে নজর দিয়েছে

রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ এই জন্য যে, শত সমস্যার মধ্যেও তাঁরা খেলাধূলোর সামগ্রিক কল্যাণের কথাটি বিস্মৃত হননি। বিস্মৃত হননি গ্রাম-বাংলাকে।

পশ্চিমবাংলার ক্রীড়াখাতে ১৯৭৪-৭৫ সালের ব্যয়-বরাদ্দের দিকে নজর দিলেই রাজ্য সরকারের দরদী মনোভাবটির পরিচয় মিলবে। রাজ্যের ক্রীড়াখাতে ১৯৭৪-৭৫ সালে ৫০ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে জেলাস্তরে খেলাধূলোর সাজ-সরঞ্জাম এবং খেলার মাঠ তৈরীর জন্য ১৫ লাখেরও কিছু বেশী টাকা মঞ্জুর করা হবে। রাজ্য সরকার জেলা ও গ্রামীণ খেলাধূলোর ওপর বিশেষ করে দৃষ্টি দিতে চান বলেই ১৫টি জেলায় ক্রীড়া উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি জেলাকে গড়ে এক লক্ষ টাকা সাহায্য দিতেও প্রস্তুত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত বছর ব্লক-ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়ার উন্নয়নে প্রতিযোগিতা, প্রশিক্ষণ এবং ক্রীড়াঙ্গণ নির্মাণে রাজ্য সরকার প্রায় লাখ চারেক টাকা ব্যয় করেছেন। সর্বভারতীয় গ্রামীণ ক্রীড়ায় পশ্চিমবঙ্গের এবারের সাফল্য সরকারের সহযোগিতা ও সহানুভূতি ছাড়া সম্ভব হোত কিনা সন্দেহ।

ক্রীড়াদপ্তর কলকাতার ফুটবল স্টেডিয়াম ও সুইমিং পুলের অভাব সম্পর্কেও সচেতন। ক্রীড়ামন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের প্রতিশ্রুতি পুনরুচ্চারণ করে বলেছেন যে, লবণ হ্রদে স্টেডিয়াম এবং রবীন্দ্র সরোবরে আধুনিক সুইমিং পুল হবেই হবে। অবশ্য তার আগে কলকাতায় আয়োজিত বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার জন্য দশ লাখ টাকা খরচ করে ইডেনে ইনডোর স্টেডিয়াম গড়া হবে। অর্থ ইতিমধ্যেই মঞ্জুর হয়ে গেছে। কলকাতায় আগামী বছরের গোড়ার দিকে আয়োজিত বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রায় ষাটটি দেশের আনুমানিক ছশো খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করবেন।

ক্রীড়া বাজেট প্রসঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রী আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘোষণা করেছেন। স্থির হয়েছে যে, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে অচিরেই একটি খেলোয়াড় কল্যাণ তহবিল প্রতিষ্ঠা হবে। আর সি টি সি, সি এ বি এই তহবিলে যথাক্রমে এক লাখ ও পঞ্চাশ হাজার টাকা দিচ্ছেন। ঐ অর্থের সঙ্গে অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয় ঘটিয়ে মোট দশলাখ টাকার মূল তহবিল গড়ার ইচ্ছা সরকারের।

খেলাধূলোর কল্যাণকল্পে রাজ্য ক্রীড়ামন্ত্রীর উৎসাহ, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু তাঁর এতো প্রয়াস সত্বেও বহু ক্ষেত্রে সরকারী প্রকল্প ও প্রতিশ্রুতিগুলি ব্যাহত হতে দেখা যাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর জন্য দায়ী সরকারী আমলারা। ব্লক থেকে জেলা, জেলা থেকে মহাকরণে ফাইল চলে শম্বুক গতিতে। মহাকরণ ঘুরে ফাইল যখন আবার জেলায় ও ব্লকে পৌঁছায়, ততক্ষণে দেখা যায়, লাল ফিতের শক্ত বাঁধনে উদ্দেশ্যের অপমৃত্যু ঘটেছে। এমন খবরও আছে যে, গ্রামাঞ্চলে ভলিবল বা বাস্কেটবল খেলার প্রসারকল্পে সরকার-প্রদত্ত বল পৌঁছেছে নেট পৌঁছানোর তিন মাস পরে!

অব্যবস্থার এ একটি সামান্য নজীর মাত্র। ক্রীড়ামন্ত্রীকে এই অব্যবস্থা সম্পর্কে আরও সচেতন হতে হবে। আমলাদের তৎপর করে তুলতে হবে। তা না হলে নিষ্ঠা, সদিচ্ছা ও অনুভূতি ক্রীড়ামন্ত্রীর যতই গভীর হোক না কেন, তাঁর সব স্বপ্নই মাঠে মারা যাবে।

খেলাধুলা

যুব ফুটবলে ভারত

এ-মাসের ১৪ তারিখ থেকে ব্যাংককে এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে। অভিজ্ঞতা যত তিক্তই হোক না কেন, একথা বলাই বাহুল্য যে, ভারত ব্যাংককের আসরে এবারও যোগ দেবে। পাতিয়ালার ক্রীড়া শিক্ষায়তনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের খেলোয়াড়দের একত্রিত করে মাস মাসখানেক তালিম দেওয়ার পর গত ২রা এপ্রিল সরকারীভাবে ভারতীয় যুব দলের প্রতিনিধিদের নাম ঘোষিত হয়েছে।

ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করবেন মহারাষ্ট্রের সাবির আলি। সহ-অধিনায়ক পশ্চিমবঙ্গের প্রসূন ব্যানার্জী। দলের অন্যান্য খেলোয়াড়রা হচ্ছেন :—

গোলে : পি মিত্র (বাংলা), চক্রবর্তী (বাংলা); ব্যাক : জেকব (কেরল), ঘাবেটো (মহারাষ্ট্র), দাশগুপ্ত (মহারাষ্ট্র), দিলীপ পালিত (বাংলা), দেবানন্দ (কেরালা), চিন্ময় চ্যাটার্জী (বাংলা); হাফ ব্যাক : দেবরাজ (কর্ণাটক), কুমার (তামিলনাড়ু), তপন বসু (বাংলা); ফরওয়ার্ড : শ্যামসুন্দর মিত্র (বাংলা), শিশির গুহমজুমদার (বাংলা), হারজিন্দার সিং (পাঞ্জাব), গোবিন্দ দাস (বাংলা) ও মহঃ ইয়াকুব (কর্ণাটক)।

টেবল টেনিসে ভারতের হার

ইয়োকোহামায় আয়োজিত দ্বিতীয় এশীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী দিনে, গত ৩রা এপ্রিল প্রারম্ভিক পর্বের খেলায় ভারত পুরুষ ও মহিলা বিভাগে বিজয়ী হলেও, দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ৪ঠা এপ্রিল পুরুষদের দলগত বিভাগের চূড়ান্ত পর্যায়ের আসরে চীনের কাছে পরিষ্কার ৫—০ ম্যাচে হেরে গেছে।

প্রথম দিনে পুরুষদের পঞ্চম গ্রুপের খেলায় ভারত থাইল্যান্ডকে ৫—০ ম্যাচে পরাজিত করে। মহিলা দল হারায় ৩—০ ম্যাচে প্যালেস্টাইনকে। মহিলা বিভাগে গোপা ব্যানার্জি ২১।৬, ২১।৯ পয়েন্টে দাহেরকে, লতা গর্গ ২১।১৪, ২১।১০ পয়েন্টে জেনেস কোডিসকে এবং রূপা ও

কে সরস্বতী ২১।১৮ ও ২১।৭ পয়েন্টে দাস্তের ও কৌড়সকে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিনে ভারত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

পুরুষ বিভাগে চীনের লি চেন সিন ২১।৫ ও ২১।১০ পয়েন্টে মনজিৎ দুয়াকে, তাইওয়ানের উয়ান নীরজ বাজাজকে ২১।১২ ও ২১।১৮ পয়েন্টে, সু সাও ফা ২১।১০, ২১।১০ পয়েন্টে কে জয়ন্তকে, লি চেন সিন ২১।১৮, ২১।১৬ পয়েন্টে নীরজ বাজাজকে এবং সু সাও ফা ২১।১৪ ও ২২।২০ পয়েন্টে মনজিৎ দুয়াকে হারান।

বিশ্ব টেবল টেনিস কলকাতায়

ভারতীয় টেবিল টেনিস সংস্থা তাঁদের কর্মকরী সমিতির সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিশ্ব টেবিল টেনিস কোলকাতাতেই হবে। প্রতিযোগিতার সময় নির্ধারিত হয়েছে ১৯৭৫ সালের ১ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারী। দিল্লী, কোলকাতা, না বাঙ্গালোর কোথায় বিশ্ব টেবিলটেনিসের মজলিস বসবে তা নিয়ে চিন্তা ভাবনার আর শেষ ছিল না। কোলকাতায় এই মজলিস বসার সিদ্ধান্ত পাকা হওয়ায় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ইডেনের উদ্যানে পাকা স্টেডিয়াম করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে, স্টেডিয়ামে ২০টি টেবিল বসাবার ব্যবস্থা থাকবে এবং আঠারো হাজার দর্শক যাতে ধরে সেই মতো জায়গার ব্যবস্থা হবে।

শেষ টেস্টে ইংলণ্ড জয়ী

টনি গ্রেগ

'পোর্ট অব স্পেন'এ পঞ্চম তথা সর্বশেষ টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচে ইংলণ্ড নাটকীয়ভাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে মাত্র ২৬ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছে। আগের চারটি টেস্টের একটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জেতে এবং বাকী তিনটি শেষ হয় অমীমাংসিতভাবে। পঞ্চম টেস্টে ইংলণ্ডের জয়ের ফলে রাবার জয়ের প্রশ্নটি অমীমাংসিতই রয়ে গেল।

পঞ্চম টেস্ট ম্যাচে ইংলণ্ডের এই সাফল্যের পথে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিলেন বোলার টনি গ্রেগ। গ্রেগ প্রথম ইনিংসে ৮৬ রানে ৮টি উইকেট নিলে খেলায় চাঞ্চল্যকর মোড় নেয়। মাত্র দশটি বল দেওয়ার ফাঁকে তিনি লয়েড কানহাই সোবার্স প্রমুখকে প্যাভেলিয়নে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে গ্রেগ পেয়েছেন সত্তর রানে পাঁচটি উইকেট, ঐ উইকেট পাঁচটি হোল, কালীচরণ, লয়েড, কানহাই, মারে ও আর্নিল।

ব্যাটিংয়ে পঞ্চম টেস্টে ইংলণ্ডের এই সাফল্যের মূলে জিওফ বয়কটের ভূমিকাও স্মরণীয়। বয়কট প্রথম ইনিংসে দুর্ভাগ্যবশতঃ মাত্র এক রানের জন্য সেঞ্চুরী করতে পারেননি। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এবার তিনি করেন ১১২।

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এবারের টেস্ট পর্যায়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের উদীয়মান ব্যাটসম্যান লরেন্স রো তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৩০২ রান করে ক্রিকেট দুনিয়ায় সাড়া জাগিয়েছিলেন। চতুর্থ টেস্টেও তিনি সেঞ্চুরী করেন। পঞ্চম তথা শেষ টেস্টের প্রথম ইনিংসেও লরেন্স রো সেঞ্চুরী করেছেন। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, সাম্প্রতিক বিশ্ব ক্রিকেট অঙ্গনে লরেন্স রো সবচেয়ে সমাদৃত ও কৃতী ব্যাটসম্যান। কিন্তু সারা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দৃষ্টি এবার যার ওপর ছিল সেই কালীচরণ কিন্তু ক্রীড়ানুরাগীদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন নি। ছ'দিনব্যাপী পঞ্চম টেস্টের দুটি ইনিংসেই তাঁকে শূন্য রানে ফিরে আসতে হয়েছে।

পঞ্চম টেস্টের শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক কানহাই স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং খুবই খারাপ করেছেন। ইংলণ্ডের অধিনায়ক মাইক ডেনেস বলেছেন : অন্তিম পর্বে জয়ের জন্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আর মাত্র ২৯ রান বাকী, তখন আমি শেষ 'চাল' হিসেবে নতুন বল নিলাম। আশা ছিল, নতুন বলে শেষ জুটি ভাঙতে পারবো। হোলও তাই। টনি গ্রেগ নিল ইনসানকে এবং আর্নল্ড নিল ল্যান্স গিবসকে। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোল।'

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ইংলণ্ড ২৬৭ (বয়কট ৯৯) ও ২৬৩ (বয়কট ১১২), ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৩০৫ (রো ১২৩, গ্রেগ ৮৬ রানে ৮) ও ১৯৯ (গ্রেগ ৭০ রানে ৫)।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

কী সুন্দর
মধুর হাসি

SADHANA DASAN
PURE AYURVEDIC TOOTH POWDER
SADHANA AUSADHALAYA
DACCA . CALCUTTA

SADHANA DASAN
SADHANA AUSADHALAYA
DACCA

Sadhana
TOOTH PASTE

প্রতিদিন নিয়মিত সাধনা দশন ব্যবহার করার ফলেই তাঁর দাঁতগুলি হয়েছে অত সুন্দর। আর তাই তাঁর হাসিও আজ অত মধুর। সাধনা দশন অতি উৎকৃষ্ট দাঁতের মাজন। এর অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য বহুদিন ধরে দেশের সর্বত্র সমাদৃত।

সাধনা দশন | সাধনা টুথপেষ্ট

SD.6/70

সাধনা টুথ পেষ্টও বহুগুণ-বিশিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ ও উপকারী। যাঁরা পেষ্ট পছন্দ করেন তাঁদের অনুরোধেই প্রস্তুত করা হয়েছে।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস, (লণ্ডন) এম.সি.এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

কে সরস্বতী ২১।১৮ ও ২১।৭ পয়েন্টে দান্‌হর ও কোভিসকে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিনে ভারত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

পুরুষ বিভাগে চীনের লি চেন সিন ২১।৫ ও ২১।১০ পয়েন্টে মনজিৎ দুয়াকে, তাইওয়েন উয়ান নীরজ বাজাজকে ২১।১২ ও ২১।১৮ পয়েন্টে, সু সাও ফা ২১।১০, ২১।১০ পয়েন্টে জয়ন্তকে, লি চেন সিন ২১।১৮, ২১।১৬ পয়েন্টে নীরজ বাজাজকে এবং সু সাও ফা ২১।১৪ ও ২২।২০ পয়েন্টে মনজিৎ দুয়াকে হারান।

বিশ্ব টেবল টেনিস কলকাতায়

ভারতীয় টেবিল টেনিস সংস্থা তাঁদের কর্মকরী সমিতির সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিশ্ব টেবিল টেনিস কোলকাতাতেই হবে। প্রতিযোগিতার সময় নির্ধারিত হয়েছে ১৯৭৫ সালের ১ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারী। দিল্লী, কোলকাতা, না বাঙ্গালোর কোথায় বিশ্ব টেবিল টেনিসের মজলিশ বসবে তা নিয়ে চিন্তা ভাবনার আর শেষ ছিল না। কোলকাতায় এই মজলিশ বসার সিদ্ধান্ত পাকা হওয়ায় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ইডেনের ইনডোরে পাকা স্টেডিয়াম করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে, স্টেডিয়ামে ২০টি টেবিল বসাবার ব্যবস্থা থাকবে এবং আরো হাজার দশেক যাতে ধরে সেই মতো জায়গার ব্যবস্থা হবে।

*

শেষ টেস্টে ইংলণ্ড জয়ী

*

টনি গ্রেগ

পোর্ট অব স্পেনে পঞ্চম তথা সর্বশেষ টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচে ইংলণ্ড নাটকীয়ভাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে মাত্র ২৬ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছে। আগের চারটি টেস্টের একটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জেতে এবং বাকী তিনটি শেষ হয় অমীমাংসিতভাবে। পঞ্চম টেস্টে ইংলণ্ডের জয়ের ফলে রাবার জয়ের প্রশ্নটি অমীমাংসিতই রয়ে গেল।

পঞ্চম টেস্ট ম্যাচে ইংলণ্ডের এই সাফল্যের পথে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিলেন বোলার টনি গ্রেগ। গ্রেগ প্রথম ইনিংসে ৮৬ রানে ৮টি উইকেট নিলে খেলায় চাঞ্চল্যকর মোড় নেয়। মাত্র দশটি বল দেওয়ার ফাঁকে তিনি লয়েড কানহাই সোবার্স প্রমুখকে প্যাভেলিয়নে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে গ্রেগ পেয়েছেন সত্তর রানে পাঁচটি উইকেট, ঐ উইকেট পাঁচটি হোল, কালীচরণ, লয়েড, কানহাই, মারে ও আলির।

ব্যাটিংয়ে পঞ্চম টেস্টে ইংলণ্ডের এই সাফল্যের মূলে জিওফ বয়কটের ভূমিকাও স্মরণীয়। বয়কট প্রথম ইনিংসে দুর্ভাগ্যবশতঃ মাত্র এক রানের জন্য সেঞ্চুরী করতে পারেননি। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এবার তিনি করেন ১১২।

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এবারের টেস্ট পর্যায়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের উদীয়মান ব্যাটসম্যান লরেন্স রো তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৩০২ রান করে ক্রিকেট দুনিয়ায় সাড়া জাগিয়েছিলেন। চতুর্থ টেস্টেও তিনি সেঞ্চুরী করেন। পঞ্চম তথা শেষ টেস্টের প্রথম ইনিংসেও লরেন্স রো সেঞ্চুরী করেছেন। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, সাম্প্রতিক বিশ্ব ক্রিকেট অঙ্গনে লরেন্স রো সবচেয়ে সমাদৃত ও কৃতী ব্যাটসম্যান। কিন্তু সারা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দৃষ্টি এবার যার ওপর ছিল সেই কালীচরণ কিন্তু ক্রীড়ামোদীদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। ছ'দিনব্যাপী পঞ্চম টেস্টের দুটি ইনিংসেই তাঁকে শূন্য রানে ফিরে আসতে হয়েছে।

পঞ্চম টেস্টের শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক কানহাই স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং খুবই খারাপ করেছেন। ইংলণ্ডের অধিনায়ক মাইক ডেনেস বলেছেন: 'অন্তিম পর্বে জয়ের জন্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আর মাত্র ২৯ রান বাকী, তখন আমি শেষ 'চাল' হিসেবে নতুন বল নিলাম। আশা ছিল, নতুন বলে শেষ জুটি ভাঙতে পারবো। হোলও তাই। টনি গ্রেগ নিল ইনসানকে এবং আণ্ডারউড নিল ল্যান্স গিবসকে। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোল।'

সংক্ষিপ্ত স্কোর: ইংলণ্ড ২৬৭ (বয়কট ৯৯) ও ২৬৩ (বয়কট ১১২), ওয়েস্ট ইণ্ডিজ: ৩০৫ (রো ১২৩, গ্রেগ ৮৬ রানে ৮) ও ১৯৯ (গ্রেগ ৭০ রানে ৫)।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday, 19th April, 1974
Phone : 55-5281 (14 Lines)

এক নতুন
অনুপম পাউডার!

সুপার
৭৭৭

new
SUPER
777
wash at a lower cost

সোনালী রঙের একমাত্র
কাপড় ধোয়ার ডিটারজেণ্ট পাউডার

সুপার ৭৭৭ করে
"সুন্দর সাদা!"

* অন্যান্য দামী ডিটারজেণ্ট কাপড় ধোয়ার পাউডারের থেকে দাম অনেক কম।
* জল যে রকমই হোক— কাপড় ধোয়া হয় চমৎকার।
* সাদা করার জন্যে নীল বা অন্য কিছু মেশাবার প্রয়োজন নেই।

**পয়সা বাঁচান,
বেশী সাদা করুন**

Shilpi-DM 10/74 BEN

১৪ বর্ষ

অমৃত

৩০ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Fridap, 6th December, 1974 শুক্রবার, ২০ অগ্রহায়ণ, ১৩৮১

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপাচুগোপাল দে

সম্পাদকীয়

ভাষার জন্য রক্তপাত

গত সপ্তাহে আসামের কয়েকটি জায়গায় ভাষার দাবীতে আবার রক্তপাত হয়েছে। বোড়ো উপজাতির লোকদের বিক্ষোভ থামাতে গিয়ে গোয়ালপাড়া জেলায় সি আর পি'র গুলীতে ছ'জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু এক শোকাবহ ঘটনা। বিক্ষোভকারীদের আক্রমণে দু'জন সি আর পি'র মৃত্যুও এই ঘটনার গুরুত্বের এবং তার বিপজ্জনক সম্ভাব্য পরিণতির ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। আসামে এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম ঘটল না। অতীতের ঘটনা স্মরণ করেই আমরা আতঙ্কিত হচ্ছি এই ভেবে যে, বহুভাষী আসামের শান্তি ও সংহতি এতে না আবার বিপন্ন হয়ে পড়ে। আসামের বহু উপজাতির মধ্যে অন্যতম হল বোড়ো। এরা সমতলের অধিবাসী। বোড়ো সাহিত্যসভার পক্ষ থেকে আসাম সরকারের কাছে দাবী জানান হয়েছিল, অসমীয়া লিপির বদলে রোমান লিপিতে বোড়ো ভাষার স্কুলে লেখাপড়ার সুযোগ দিতে হবে। এই দাবী এমন কোনো মারাত্মক দাবী নয়। এর যৌক্তিকতা আছে কি নেই তা ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকদের সঙ্গে আলোচনা করেই সমাধান করা যায়। এর জন্য বন্দুকের নলের কেনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমরা মনে করি না। এবং সে কারণেই আসামের সাম্প্রতিক ঘটনায় আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

আসাম একটি বহুভাষী রাজ্য। অসমীয়ার পাশাপাশি অ... ভাষাভাষী অধিবাসীরাও সেখানে বাস করেন। আসামের ভাষানীতির গোঁড়ামী এই রাজ্যকে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন করেছে। তা সত্ত্বেও শাসকগোষ্ঠী একটি সুস্থ ও সর্বসম্মত ভাষানীতি অনুসরণ করতে পারছেন না। বাংলাভাষীরা বার বার আসামে এই ভ্রান্ত নীতির শিকার হয়েছেন। বহু ক্ষতি স্বীকার করেও তাঁরা আসামের মাটিতেই আছেন। কারণ আসামকেই তাঁরা আপন বলে জানেন। নাগা ও খাসিয়া আগে আসামেরই অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। তাদের বিচ্ছিন্নতার মূলে সরকারী ভাষানীতির অবদান কতটুকু তা খতিয়ে দেখলে শাসকগোষ্ঠী নিজেদের আত্মসমালোচনার সুযোগ পাবেন। বোড়ো উপজাতির দাবী কিভাবে ধীরে ধীরে এতটা প্রবল হয়ে উঠল তা আমরা জানি না। প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নাকি বোড়ো সাহিত্যসভায় প্রতিনিধিদের অসমীয়া ও রোমান দুই লিপিই ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। আসাম সরকার অবশ্য এ সম্পর্কে মনীষীদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করেছেন বলে জানা যায় না। তাঁরা ব্যাপারটাকে মর্যাদার প্রশ্নরূপে দেখছেন এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বন্দুকবাজীতে নেমেছেন। এভাবে উপজাতীয়দের সাময়িক-ভাবে দমন করা গেলে এ পথে কি এই সমস্যার সমাধান হবে বলে তাঁরা মনে করেন? বন্দুক দিয়ে সংখ্যালঘুর ভাষা দমন করতে যাওয়ার অর্থ হল রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন করা। ভাষা বা লিপির প্রশ্ন বিচার করতে হবে সামাজিক ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বাস্তব প্রয়োজনের নিরিখে। উপজাতীয় লোকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার আসামের নিজের স্বার্থেই প্রয়োজন। তারা কোন্ লিপিতে পড়বে বা শিক্ষালাভ করবে তা সুস্থিরভাবে আলোচনার মাধ্যমেই মীমাংসা করতে হবে। তা না করে সরকার হঠাৎ এমন মারমুখী হয়ে উঠলেন কোন যুক্তিতে? আসামে বহুবার সংখ্যালঘু-ভাষাভাষীদের ওপর অত্যাচার হয়েছে এবং ভাষার জন্য সেখানে রক্তপাত হয়েছে। আমরা আশঙ্কা করছি সরকার যদি এ সম্পর্কে সতর্ক না হন এবং উপজাতীয়দের দাবী মীমাংসায় গণতান্ত্রিক পন্থা অনুসরণ না করেন তাহলে এর জটিলতা বাড়বে। প্রত্যেকেরই নিজের ভাষা রক্ষার অধিকার আছে। সমাজের দুর্বলতম অংশ হিসেবে উপ-জাতীয়দেরও অধিকার রক্ষা করা তো সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের পবিত্র কর্তব্য।

সিন্দুক

নির্মল সরকার

চাবির গোছাটা আঁচল থেকে খুলে নিলেন রেখা দেবী। তারপর ঠিক চাবিটা বেছে নিয়ে তালাটা খুললেন সিন্দুকের। কাঠের সিন্দুক। এর মধ্যে বাসন আছে। কাঁসারই বেশি, পেতলের কম। তবে রুপোর বাসনের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। সিন্দুকের ডালাটা বেশ ভারী, রেখা দেবী সেটা নিজেই তুলে ফেললেন। এসব কাজে তিনি অন্যের সাহায্য বড় একটা নেন না। রুপোর বাসনগুলো ওপরেই রাখা ছিল। চোখ বুলিয়ে একবার সেগুলো দেখে নিলেন রেখা দেবী। কত রকমের বাটি—প্লেন, পলতোলা, ধুতরো ফুল, খুরো দেওয়া ছ'কোণা আট-কোণা। ক্ষীর-মাছেরই বা বাহার কত। বাবু বাটি ক্ষীর-মণ্ডাকির বাটি। গোছা গোছা রুপোর বাসন তুলে নিজের পাশে রাখলেন তিনি। সরপোস দেওয়া একটা গেলাস নজরে পড়ল।

ছোট মাসির বিয়েতে নতুন জামাইকে এই গেলাসে জল খেতে দেওয়া হয়েছিল। কি কি রান্না হয়েছিল তাও মনে আছে তাঁর। মাংসের প্যাটিস, চিংড়ির কাবাব, ফিস কাটলেট, বিরিয়ানী—মিষ্টিই হয়েছিল দশ রকমের। সরের নাড়ু, রসের চার রকম—সন্দেশ চার ধরনের ছানার পায়েস—তাছাড়া ক্ষীর রাবড়ির তো ছড়াছড়ি। বগী থালাটার বেড়ই ছিল প্রায় এক হাত। এসব এ-বাড়ির লোক কোন দিন চোখে দেখেছে না শুনেছে। খায় কিসে?—না কাচের প্লেটে আর কাঁসার গেলাসে। মরে যাই, কি সভ্যতারে! দিশী আর শান্তিপুরে কাপড়ের তফাৎ বুঝত না। বেনারসী যে ক্রেপের ওপর হয়, কাতানের ওপর হয় তাও শোনে নি কোন দিন। পলকি হীরে, কমল হীরে কাকে বলে তাও জানে না। দিশী কাটের হীরেকে কাচ বলে ভুল করে। আনাড়ি নয়—সাতজন্মে এসব দেখেনি তো বলবে কি? আসল কথা সামাজিকতা, লৌকিকতার ধারে কাছে যায় না এরা। ছিলেন তো অধ্যাপক—ও শুনতেই ভাল। মাইনে পেতেন তো মোটে চারশো টাকা। টিউশানী করে আরো না হয় শ' দুয়েক হোত। তাতে কি হবে? দেশে আমাদের জমিদারী দেখাশুনো করত যে নায়েব ব্রজদুলাল তার ঘরে দোল-দুর্গোৎসবের আয়োজন তো ইনি নিজের চোখেই দেখে এসেছিলেন। হুঃ—চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল। বছরে তিন চারটির বেশি শাড়ি দিতে পেরেছেন কোন দিন? ছিল সেই প্রতিভা বোস তাই রক্ষে। দেখে শুনে মা-জামাই করেছিল বটে—বাবা দেশকর্মী আর ছেলে অধ্যাপক আর কলকাতায় আড়াই কাঠার ওপর বাড়ি। বাড়িরই বা কি ছিরি! আমাদের দেশের গোয়ালঘর ওর চেয়ে অনেক বড় আর পরিষ্কার।

—বিনোদের মা, ও বিনোদের মা—কানের মাথা খেয়েছ? চীৎকার করলেন রেখা দেবী। একটু পরেই বিনোদের মা এসে দাঁড়াল।

—কি বলছেন মা?

—বলছি আমার মাথা, কাপড় কেচেছ না সেই বাসি কাপড়ে সারা সংসার নরক-গুলজার করছ।

—না মা আমি সেই কোন ভোরে উঠে চান করেছি, প্রতিবাদের সুরে বলে ওঠে বিনোদের মা।

—চান না হয় আগে করেছিলে, মা চান করে সেই নোংরা ছাপা কাপড় পরেই ম্যাড় ম্যাড় করে ঘুরছ ফিরছ?

—আগে চান না হয় করে চান করতে গেছি মা, জোর দিয়ে বলে বিনোদের মা।

—তবু ভাল, আজ আমার মাসতুতো ভাই আর বৌ খাবে, নতুন বিয়ের পর তো আসাই হয়নি। নাও ধর—এই বাসনগুলো রেখে দাও।

—এত রুপোর বাসন? বিস্ময় প্রকাশ করল বিনোদের মা।

—এই দেখেই অবাক হলে বাছা, তাহলে মায়ের বাসন দেখে কি বলবে। এগুলো ছিল আমার বিয়ের বাসন। তবু তো কাঁসার বাসন প্রায় অর্ধেক দিয়ে দিতে হয়েছে এ'দেরই সব বিয়েতে। তিন ভাসুরঝির বিয়েতে দিলুম তিনবার তারপর ও'র ভাগ্নীর বিয়েতে সেও দিয়েছি এক প্রস্থ—তাছাড়া কাপড় গয়না সবই দিতে হয়েছে।

—আর ওই ছোট রুপোর বাসনগুলো, বিনোদের মায়ের কৌতূহল হয় সব জানতে।

—ওগুলো? হুঃ ওগুলো তোমাদের ওই দিদিমণির ভাতের সময় আমারই মা দিয়েছিল। আমার শাশুড়ী নাতনিকে কি দিয়েছিল জান? স্রেফ একটা জার্মান সিলভারের গেলাস। ভাগ্যিস মা দই, মিষ্টি, মাছ, আনাজপত্তর সর্বস্ব দিয়ে তত্ত্ব করেছিল তাই লোকগুলো খেতে পেয়েছিল তা না হলে—এই খেতে হোত। রেখা দেবী বুড়ো আঙ্গুল দুটো আন্দোলিত করলেন কয়েকবার। দেখো বাসনগুলো যেন গায়ের জোরে ঘস ঘস করে ছাস দিয়ে মেজ না! তাহলেই দফা গয়া। মায়ের রুপোর বাসন মিহি খড়িগুঁড়ো আর ঘুঁটের ছাই দিয়ে মাজা হয়। সে যাক, সে হতভাগাটা আবার কোথায় গেল চুলোয়?

রামেশ্বর ওপরের ঘর মুছছে বলল বিনোদের মা।

—এর মধ্যে ঘর মুছছে, বুঝেছি সারা দিন ঘুড়ি লাটাই নিয়ে ছাতে দৌড়োদৌড়ি করে বাবুর দিদিমণির ভারী সো হয়েছেন। ডাক তাকে, হুকুম দিলেন রেখা দেবী জোরগলায়।

রেখা দেবী এবার থালাগুলো তুললেন সিন্দুকের মধ্যে। বগী থালা, কাঞ্চন থালা, রাজভোগী থালা বাবু থালা—কত নাম। সেবার ভাশুরের নতুন জামাই আসতে কাঞ্চন থালার সেটটি নিয়ে গিয়েছিল। থালাটা আর একবার ঘুরিয়ে দেখে নিলেন তিনি।

নতুন জামাইয়ের কথা মনে হতে তাঁর নিজের বিয়ের কথা মনে পড়ল। বিয়ের পর যখন নতুন জামাই হিসেবে উনি গিয়েছিলেন তখন ওপরের বৈঠকখানা দেখেই তো ও'র ভিরমি খাওয়ার মত অবস্থা। প্রকান্ড হলঘর জুড়ে ফরাস তার ওপর কাশ্মিরী জাজিম পাতা। লাল ভেলভেটের তাকিয়া, দেয়ালে মানুষ সমান পলতোলা ভিনিসিয়ান আরশি। তার তলায় দেয়ালে আঁটা শ্বেতপাথরের অর্ধগোলাকার টেবিল। ফরাসের একধারে পার্শিয়ান কার্পেট। তার ওপর ল্যাজারেসের বাড়ির সোফা কোচ। সিলিং থেকে ঝুলছে চার কোণে চারটে ঝাড়।

খেতেই জানতেন নাকি। খাবার সময় কান্ড দেখে হেসে মরি আমরা।

—মা আমায় ডাকছেন, রামেশ্বর এসে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে সে সিঁটিয়ে আছে। ছেলেটার বয়েস প্রায় বছর দশেকের। রেখা দেবীর কল্পনার স্রোতে বাধা পড়ল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—

—এই হারামজাদা তোকে আমি ঘর মুছতে বলেছি, কি চুপ করে আছিস কেন?

—আমি তো রোজই এই সময়ে ঘর মুছি মা, আস্তে বলল রামেশ্বর।

—তোকে বড় ঘরে ঢুকতে কে বলেছে রে কুকুর। জানিস না আমি এ ঘরে শুই। চান করে তারপর ও ঘরে ঢুকবি। এই শেষবারের মত বলে দিলুম। এরপর কোন দিন যদি দেখি তাহলে বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব! এই শুয়ার দেওয়ালে ঠেসান দিচ্ছিস কেন, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারিস না। রামেশ্বর চলে গেলে রেখা দেবী বাসনগুলো সব তুলে ফেললেন সিন্দুকে। পাশেই তাঁর শাশুড়ীর দরুন আর একটা ছোট কাঠের সিন্দুক রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটা ডেও-ঢাকনা আছে—এ তিনি কোন দিন তাকিয়েও দেখেন নি, ছোঁয়া তো দূরের কথা।

—বিনোদের মা, ও বিনোদের মা, আবার চীৎকার করলেন তিনি।

—যাই মা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াল বিনোদের মা।

—দেখ আজ তো প্যাজ রসুনের ছড়াছড়ি হবে, আমি আর কিছু খাব না আজ।

—সে কি মা, আপনি তো নিরমিষ্যি খান, ঠাকুর আলাদা উনুন আলাদা তবে—

—তুমি আর বাজে বক-বক কর না বাপ!—ছোঁয়াছুঁয়ি হবে না? অন্য জাতের বিধবারা মাছ-টাছ খায়, আমার ওসব ছোঁয়াও চলবে না। তাছাড়া মা যদি শোনে তাহলে তো আমার হাতে জলই খাবে না।

—তাহলে খাবেন কি? ব্যস্ত হয় বিনোদের মা।

—খাব তোমার মাথা। চান করে তুমি না হয় আমার জন্যে খই আর বাতাসা এনে দিও।

—আমি তো এই চান করলুম মা, বিনোদের মা একটু অবাক হয়।

—হ্যাঁ তা করেছ, বললেন রেখা দেবী, কিন্তু এখুনি প্যাজবাটা শিল ছুঁলে না? থাক না তোমায় আর চান করতে হবে না। দু একদিন না খেলে আমার কোন ক্ষতি হবে না। তা সে যাক, সে মহারাণী ফিরেছেন কলেজ থেকে?

—না মা, দিদিমণি এখনও ফেরেন নি কলেজ থেকে।

—তাহলে আমি অন্য কাজগুলো সেরে নেই ততক্ষণ। তুমি গুদাম ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দাও। কথাটা বলে রেখা দেবী ওপরে উঠে গেলেন।

বিজল্পিতা ঠিক সেই সময়ে কলেজ থেকে ফিরল। এবার পার্টটু দেবে সে।

—ওমা দিদিমণি এসে গেছেন? বিনোদের মা বিজল্পিতাকে স্নেহ করে।

—কি করছ ওখানে? জিজ্ঞেস করল বিজল্পিতা।

—মা রুপোর বাসন বার করলেন তাই আজ যা বাড়িতে খাওয়া দাওয়া, জানায় বিনোদের মা।

—তাই নাকি। এ জিনিস নতুন নয়। কিছু একটা উপলক্ষ করে মা প্রায়ই এ ধরনের উৎসব করে থাকে। ও বিষয়ে তার নিজের কোন উৎসাহ নেই। তবে অতিথিরা এলে তাদের সঙ্গে সে দেখা সাক্ষাৎ করে, কিছুটা সময় গল্প করে কাটায়—এছাড়া অন্য কিছু নয়। অবশ্য তার করারও কিছু থাকে না। মা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যেভাবে চীৎকার করতে থাকে তাতে তার বিরক্তি আরও বেড়ে যায়। এমনিতেই চার-পাঁচজন ঝি চাকর নিয়ে রেখা দেবী প্রত্যহ সংসারের ওপর যে ঝড় বইয়ে দেন তার ঝাপটায় অনেক দিন আগে থেকেই সে ক্লান্ত।

বিজল্পিতা তার ঘরে ঢুকল। রেখা দেবীর বড় ঘরটা, তার পাশেই বারান্দা, সেটা ছাড়িয়ে গেলেই বিজল্পিতার ঘর। ঘরটি ছোট কিন্তু পরিষ্কার আর ছিমছাম ভাবে সাজান। টেবিলে বই খাতা রেখে সে ফ্যান খুলে দিল। সুইচের আওয়াজ হল খুট করে কিন্তু পাখা [illegible]লা। লোড-শেডিং চলছে। বাসে ধা[illegible]ক্কি করে রোজ তাকে কলেজ যাতায়াত করতে হয়। সে এক অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ। কিন্তু এছাড়া উপায় কি। সহ্য তাকে করতেই হবে। বাবা যখন কলেজে যেত তাকে স্কুলে পৌঁছে দিত তখন কিন্তু ট্রামবাসের এ অবস্থা ছিল না।

পাশের জানালাটা খুলে দিয়ে বিজল্পিতা শুয়ে পড়ল। বেশ পিপাসা পেয়েছে তার, কিন্তু জল পাবে কোথায় বিনোদের মাকে জল দিতে বললে ছোঁয়া ছুঁয়ির ব্যাপার নিয়ে নানা হাঙ্গামা বাধবে। নিজে গিয়ে জল আনলে অবশ্য ঠিক ও ভাবের প্রত্যক্ষ কিছু ঘটবে না, তবে বাঁকা হাসির সঙ্গে ব্যঙ্গাত্মক কিছু শোনা যেতে পারে। বিজল্পিতা ওসব গ্রাহ্য করে না। বাবার মত দুর্বল চিত্তের মানুষ সে নয়।

আশ্চর্য মানুষ ছিলেন প্রফেসর হরপ্রসাদ রায়। ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। প্রয়োজন তাঁর খুবই সামান্য ছিল। বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়ে পড়তেন কলেজে তারপর টিউসানি শেষ করে ফিরতেন রাত প্রায় দশটা। বিপদ হোত পুজো আর গ্রীষ্মের ছুটির সময়। রেখা দেবীর বাক্যযন্ত্রণায় আর উৎপীড়নে তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন।

বিজলিপতার এখনও সব মনে আছে। বাবার ধৈর্য আর সহ্যগুণ দেখে সে বিরক্ত হোত। ভদ্রলোক প্রতিবাদও করতেন না প্রথম দিকে। পরে অবশ্য সহ্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল! কিন্তু সে অনেক পরের কথা। বিজলিপতা সেলফের দিকে তাকাল। বাবার বইগুলো সে নিজে সাজিয়ে রেখেছে। খোলা জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে। শরতের হালকা মেঘ ভেসে যাচ্ছে কত-দূরে। ...

—রেখা আমার ম্যাগাজিনগুলো কোথায় ? অনেক কষ্টে আর বহু পরি-শ্রম করে হরপ্রসাদ এগুলো সংগ্রহ করেছেন।

—সেই ছেঁড়া বইগুলো ?

—হ্যাঁ, সেইগুলো কোথায় রেখেছ ? ব্যস্ত হয়ে পড়েন হরপ্রসাদ।

—সেগুলো শিশি বোতলওলার কাছে বিক্রি করে দিয়েছি।

—সেকি! তাহলে আমি থিথিস লিখব কি করে ?

—থাক আর থিসিস লিখে কাজ নেই। তাতে আর ক'টাকা মাইনে বাড়বে ?

—তুমি জাননা তুমি আমার কি সর্ব-নাশ করলে, হরপ্রসাদের চোখ জলে ভরে এল।

—সর্বনাশ তুমি আমার করেছ, চীৎকার করে ওঠেন রেখা দেবী। আমার আত্মীয়-স্বজনের কাছে আমি ছোট হয়ে গেছি, মাথা হেঁট হয়ে গেছে।

—কেন হীরের গয়না দিতে পারিনি বলে।

—হীরের গয়না দেবে তুমি ? সোনার গয়নাই বা কটা দিয়েছ তোমার মুরোদ কত জানতে বাকি নেই।

—তাহলে কষ্ট করে এখানে পড়ে আছ কেন, তোমার মায়ের কাছে গিয়েই থাকলে পার।

—কেন থাকব, গলার স্বরটা আরও তীক্ষ্ন হল রেখা দেবীর, হাজার হাজার টাকা খরচ করে মা বিয়ে দিয়েছে অমনি ? কলকাতা শহরে কে তোমাদের চেনে? তোমার চোদ্দপুরুষের ভাগ্য যে তোমার এই ভাগাড়ে আমি পা দিয়েছি।

—বাপি, মা চলে যাবার পর বিজলিপতা বাবার কাছে এসেছে।

—উঁ, হরপ্রসাদ কোনরকমে সাড়া দিলেন।

—তুমি কাঁদছ কেন বাপি।

—কৈ না তো, অন্যদিকে মুখ ফেরান হরপ্রসাদ।

—কলেজে যাবে না বিজলিপতা বাবার কপালে ছোট হাত রাখে।

—আমার শরীরটা ভাল নয় বিজু।

—তা হোক বাপি, তুমি কলেজ যাও। তুমি বাড়ি থাকলে মা আরও গালাগাল দেবে, ঝগড়া করবে। সেদিনের মত তোমার সামনে আমায় মারবে। মনে নেই, সেদিন দেয়ালে আমার মাথা ঠুকে দিয়েছিল। হরপ্রসাদ কলেজে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।......

—দিদিমণি ডাকল বিনোদের মা।

—কে? চমকে উঠেছে বিজলিপতা।

—আমি বিনোদের মা, এটা খেয়ে নিন।

—কি এটা? উঠে বসল বিজলিপতা।

—ইলিসের ডিম ভাজা, এই নিন দুধ।

—তিনি কোথায় ?

—বাথরুমে, হাসল বিনোদের মা।

—তাই তোমার এত সাহস বেড়েছে বিজলিপতাও হাসল একটু।

এবার সে উঠে পড়ল। আজ বাড়িতে উৎসবের আয়োজন। বিনোদের মা ভাঁড়ার ঘরে খুব ব্যস্ত। এক টুকরো মাছের ডিম আর দুধ খেয়ে তার একটু ভাল লাগছে। খিদে পেলে সে বুঝতেই পারে না। সে সময় তার রাগ হয় দুঃখের অনুভূতিটাও প্রখর হয়ে ওঠে।

বারান্দার ধারে কয়েকটা টবে সিলিফুল ফুটেছে। এক সময়ে এগুলো বাবার ঘরের সামনেই থাকত।

—বিজু, বাবা ডাকতেন।

—কি বাপি, বিজলিপতা তখন হয়ত স্কুলে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। । ফ্রক জুতো মোজা পরে সে নিজেই চুলটা করে নেয়।

—তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে; বাবার গলা শুনতে পায় সে। বিজলিপতা খাবার টেবিলে বসে—ভাত, আলু ভাতে আর মাছ ভাজা। বিনোদের মা-ই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

—এই তোমার টিফিনের বাকস, হর-প্রসাদ বাকসটা রাখলেন, তুমি আপেল খাওনা কেন ?

—ভাল লাগেনা, মুখে ভাত তোলে বিজলিপতা।

—কি ভাল লাগে ? মেয়ের দিকে তাকান হরপ্রসাদ।

—চানাচুর, বিজলিপতা হাসে, এবার সে বাপিকে ঠকিয়েছে।

—আজ তোমার টিফিনে তাই দিয়েছি। সন্দেশ আর আলুমরিচও খাবে কেমন?

—আচ্ছা, খুব খুশি সে।

—ওকি মাছ খাচ্ছনা কেন ? ব্যস্ত হয়ে বলেন হরপ্রসাদ।

—অনেক কাঁটা রয়েছে—

—কাঁটাও আমি বেছে দিচ্ছি। কাঁটা বেছে থালার এক পাশে রাখেন হরপ্রসাদ। আজও বিজলিপ্তা মাছ খেতে আপত্তি করে না।

খাবার ঘরে ঢুকল বিজলিপ্তা। পাশের ঘরে রুপোর বাসন সাজান রয়েছে। অতিথিদের এসব দেখিয়ে নিজের আভিজাত্য প্রকাশ করতে চান মা। ভদ্রমহিলা এখনও সেইকালেই রয়ে গেলেন। রুপের ছাওয়ায় ঝাপটায় যখন তিনি একটু কাতর হয়ে পড়েন তখনই ফোন মারফত মায়ের উপদেশের জোরে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ পেল বিজলিপ্তা। তাড়াতাড়ি সে নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

স্নান করার পর রেখা দেবী দরজাগুলো ভিজে কাপড় দিয়ে নিজে হাতে মোছেন। এটি সম্পন্ন না হলে তিনি জলস্পর্শ করবেন না। বিজলিপ্তার এ-ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগে। অনেক আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি সে যাতায়াত করেছে কিন্তু তাদের মধ্যে তার মায়ের মত একজনও তার চোখে পড়েনি। বিধবা হলে কেউ কেউ শুচিবায়ুগ্রস্থ হয়ে পড়েন—এটা তার জানা আছে। বাবার মৃত্যুর পর এটা হলে তার একটা মানে খুঁজে পেত বিজলিপ্তা, কিন্তু তার মা চিরকালই একরকম। বাবার মুখে সে শুনেছে এককালে শোবার ঘরে মা স্নান করত। বাবা কি করে সহ্য করত কে জানে ?

তার বন্ধ দরজাটার ওপার এবার মা ভিজে কাপড় ঘষছে। শব্দটা তার স্নায়ু বিকল করে দিচ্ছে পীড়িত করছে অসহ্যভাবে। কেন সে এত তাড়াতাড়ি কলেজ থেকে ফিরল আর একটু দেরী করলে তাকে আর এই মর্মান্তিক শব্দটা শুনতে হোত না।

মাঝে মাঝে তার সহ্যের বাঁধন ছিঁড়ে যায়। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে অসভ্যের মত। তখন তার জ্ঞান থাকে না। সেদিন মায়ের হাত থেকে ভিজে কাপড়ের টুকরোটা কেড়ে নিয়ে নর্দমাতে ফেলে দিয়েছিল। ড্রয়িংরুমের সাইড টেবিল থেকে হাত ধোয়ার মগ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল উঠোনে। না, একাজগুলো করতে তার ভাল লাগেনা। ক্রোধের পরই আসে অবসন্নতা—তখন সে রীতিমত অসুস্থবোধ করে। বাবা পরিত্রাণ পায় নি, তার কি হবে?

—ওগো বিনোদের মা তোমাদের কুটনো হল ? সে ছোঁড়াটাই বা গেল কোথায়। তাকে দিয়ে চায়ের বাসনগুলো আবার ধুইয়ে নাও, নোংরা লেগে আছে, রেখা দেবী আবার মুখ খুললেন, জল নেই ? যা রাস্তার টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে আয়। কি বললি ? পারবিনা ? এত বড় আসপর্ধা! যা দূর হয়ে যা বাড়ি থেকে। ভাত ছড়ালে কাগের অভাব হবে না, বুঝলি।

রামেশ্বর যখন বারান্দা পার হয়ে বিজলিপ্তার জানলা ঘেঁসে যাচ্ছিল তখন বিজলিপ্তা ডাকল ঃ

—রামেশ্বর !

—দিদিমণি মা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে রইল সে।

—তোর ঘুড়ি নেই ?

—ঘুড়ি ? অবাক হয় রামেশ্বর কথাটা শুনে।

—হ্যাঁ, এই নে পয়সা, আজ বিকেলে ঘুড়ি ওড়াবি।

—মা বকবে না, উৎসাহ পেলেও ভয় পায় রামেশ্বর।

—আর অনেক লোক আসবে, মা ব্যস্ত থাকবে তাদের নিয়ে।

—চায়ের বাসন ধোব ? জিজ্ঞেস করে রামেশ্বর।

—টিউবওয়েল থেকে এক বালতি জল এনে ধুয়ে দে। পয়সা নিয়ে রামেশ্বর হাসিমুখে চলে যায়।

—বিজলিপ্তার এসব ভাল লাগেনা তবু করতে হয়। রামেশ্বরকে সে স্নেহ করে। ওর পীড়নে বিজলিপ্তা দুঃখ পায়। এনিয়ে মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে ঝগড়াও হয়।

এবার তাকে তৈরি হতে হবে, অতিথিদের আসার সময় হল। বিজলিপ্তা শাড়ি পালটে সামান্য প্রসাধন সেরে নিল। একটা গাড়ি দাঁড়াল।

—ওমা, সমু আয় ভাই, এস রীনা থাক আর প্রণাম করতে হবে না, রেখা দেবী পিছিয়ে গেলেন না দাঁড়িয়েই রইলেন।

—বিজু কোথায়, জিজ্ঞেস করল সমু।

—এইতো কলেজ থেকে ফিরল। অন্যদিকে মন নেই শুধু বাপের মত পড়া আর পড়া। এই দেখ সমু, বিজু এবার কলেজে প্রথম হয়ে এইসব প্রাইজ পেয়েছে। টেবিলে রাখা একরাশ বই এর দিকে ইঙ্গিত করলেন রেখা দেবী।

—একটা ভাল সম্বন্ধ আছে দিদি, ছেলে সমুর চেনা ইঞ্জিনীয়ার, কলকাতায় বাড়ি, নন্দের ঝামেলা নেই।

—ওমা, বিজুর বয়েস তো সবে উনিশ বছর এর মধ্যে বিয়ে কি, রেখা দেবী হেসে উঠলেন তার ওপর আদুরে মেয়ে। এক দণ্ড কাছ ছাড়া হয় ? শুধু ঘুর ঘুর করছে আমার পাশে পাশে।

সমু মামা, ঘরে ঢুকল বিজলিপ্তা, ওমা মামীমা, কি সুন্দর চুল হয়েছে তোমার।

—তোরা গল্প কর ভাই আমি একটু ওদিকে দেখি, রেখা দেবী নিষ্ক্রান্ত হলেন।

—এই, তুই অমন রোগা হয়ে গেছিস কেমনে ? প্রশ্ন করে সমু।

—শিলম হচ্ছি, মোটা চিপসি কলে ভাল হয় বুঝি ?

—না তা নয় সমু একবার সবুজধুরে দিকে আড় চোখে দেখে নিল, তারপর বলল, আরে দরজা থেকে জল ঝরছে কেন ? দিদির শুচিবাই হল নাকি ?

—না, না, আপত্তি জানায় বিজলিপ্তা, আমাদের যে ছোকরা চাকরটা আছে দরজার ওপর তিনি ছবি এঁকেছিলেন তাই—

—ও তাই বুঝি, হাসতে লাগল সমু।

—কি সিনেমা দেখলে মামীমা জিজ্ঞেস করল বিজলিপ্তা, বাংলা ইংরেজি না হিন্দী ?

—আর বলিস কেন, স্ত্রীর হয়ে সমু উত্তর দেয়, শালাশালীদের পাল্লায় পড়ে দো চাট্টি না ফাইভ দুষমন কি যেন দেখলাম। মাঝ থেকে এক [illegible] টাকা নষ্ট সময় বরবাদ। তুই কি দে[illegible] ?

আমি ? কি আর দেখব বল দেখবার মত বই কোথায়। বাংলা বই হাসির হলে কাঁদতে হয়, হিন্দী ছবির সেই একই ফরমুলা আর ইংলিজ তো আসছেই না। চল মা ডাকছে, খাবার দেওয়া হয়েছে।

খাওয়া এবং বিশ্রামের পর ওরা যখন যাচ্ছে তখন বিজলিপ্তা কাগজের একটা প্যাকেট দিল মামীমার হাতে। কাপড়টা তার নিজের।

—ওটা আবার কি, জিজ্ঞেস করল সমু।

—ও কিছু নয় মামীমা আবার এসো। একটু পরেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

—ওটা কি হল ? রেখা দেবীর মুখটা লাল হয়ে গিয়েছে।

—বাড়িতে নতুন বৌ এলে কাপড় দেওয়া আমাদের বংশের নিয়ম, কথাটা বলে বিজলিপ্তা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন রেখা দেবী তারপর সম্বিত ফিরতে চীৎকার করে বললেন, বিনোদের মা, খই আর বাতাসা নর্দমায় ফেলে দাও। সশব্দে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন তিনি।

বিজলিপ্তার হঠাৎ হাসি পেল। মায়ের কথা ভেবে নয়, নিজের সুন্দোম বাসের সিন্দুকে মরচের কথা তার মনে পড়ে গেল।

পটভূমি

স্টান্টের পথে নয় কাজের পথে যান

চলবে না, চলবে না চিৎকার শুনে শুনে পশ্চিম বাংলার মানুষের কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। সবাই এখন বুঝতে পারছে যত তীক্ষ্ণ ভাষায় চলবে না বলা হচ্ছে, ঠিক তত জোরের সংগে তা চলছে। আবার সেই সুরেই মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়কে কথা বলতে শুনতে পাওয়া গেলো। সেদিন বিধানসভায় সিদ্ধার্থবাবু গলা চড়িয়ে বললেন : জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন পশ্চিম বাংলায় কোনদিন মাথা তুলতে পারবে না। এ রাজ্যে এ চলবে না।

এখন কথা হচ্ছে, চলবে না বলে চিৎকার করে লাভ কি? যুক্তিতর্কের দিক থেকে এটা সত্য হতে পারে, এই রাজ্যে জয়প্রকাশজীর পন্থা অনুসরণ করে যাঁরা আন্দোলন করতে চাইছেন তাঁদের হয়তো শক্তি বা ক্ষমতা নেই। তাই বোধহয় শাসক পার্টি আশা রাখেন, ঐ আন্দোলন দানা বাঁধবে না। কিন্তু সিদ্ধার্থবাবু বা জয়নাল সাহেব ভুলে গেছেন, তাঁদের অন্যায়, দুর্নীতি তো ঐ ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলার ভিত রচনা করতে সাহায্য করছে। ৭২ সালে যে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় এসেছিল তাদের সে সময়ে যে ইমেজ ছিল আজও কি তাঁদের সেই সম্মান রয়েছে? এ প্রশ্নের একটা মাত্র উত্তর এবং ৭৪ সালের নভেম্বরে দাঁড়িয়ে রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা সে উত্তর দিতে কোন রকমেই দ্বিধাগ্রস্ত নয়। তাঁরা এ সরকারকে অপদার্থ দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার বলে মনে করে। তাই জয়প্রকাশ নারায়ণের নামে কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বেঁধে না উঠলেও এ কথা জোরের সংগে বলা যায়, সামনে ঝড় আসছে। এই ঝড়ের মুখে যে পড়বে, তার বিপদ অনিবার্য।

অদ্ভুত লাগে, রাজ্যের রাজনীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে। কথায় আছে চোরের মায়ের বড় গলা। ধরুন মন্ত্রীদের মধ্যে যে সবচেয়ে নিষ্কর্মা, যে সবচেয়ে বেশী ফন্দি করে চলতে পারেন, খবরের কাগজ খুললেই বড় বড় অক্ষরে তাঁর বক্তব্য ছাপা হয়। কি তাঁর বা তাঁদের বৈপ্লবিক বাণী। কিছু নাম করতে চাই না, তবে আজ প্রায় সব লোকই কিছু না কিছু তাঁদের সম্পর্কে জেনে গেছে। এই সব নেতার সমস্ত দেহে দুর্নীতির ঘা দকদক করছে। অথচ তাঁরাই দুর্নীতির কবল থেকে জাতিকে রক্ষা করার মহান কর্তব্য পালনের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান দিয়ে থাকেন।

রাজ্যের কংগ্রেসী নেতারা কিন্তু এই দুর্নামের জন্য ঘাবড়ে পড়েন নি। তাঁদের অনেকেরই কথা রাজনীতিতে নামলে কখন ফুলের মালা কখন নিন্দা শুনতে হবেই। এ নিয়ে মড়াকান্না করে লাভ নেই। ইন্দিরাজীর যে ইমেজ আগে ছিল এখন কি তাই আছে? তাঁরা পাল্টা প্রশ্ন করেন। পাঁচ বছরের মেয়াদের এই সরকার এখন মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছেচে। তাই এখন একটু নিন্দা তাঁদের শুনতেই হবে। কিন্তু নির্বাচন এগিয়ে এলে কাজ করে যেতে হবে, তারপরেই দেখা যাবে জনসাধারণ তাঁদের সংগেই আছে। অর্থাৎ তাঁরা বলতে চাইছেন, নির্বাচনের মুখোমুখি তাঁরা স্টান্ট দিয়ে কেল্লা মাত করে ফেলবেন।

কিন্তু এখন কথা হচ্ছে ব্যাপারটা কি এতই সহজ। রাইটার্স বিল্ডিং-এর করিডরে কান পাতা যায় না। লাইসেন্স, পারমিট নিয়ে বেআইনীভাবে লেনদেন চলেছে। আজ সাধারণ নাগরিক সামান্যতম একটা প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য কংগ্রেসী ছাত্র যুবকের সাহায্য নেয়। তারা মাথা উঁচু করে তাদের দাদাদের দিয়ে কাগজে সই করিয়ে সব সমস্যার সমাধান করে দেয়। তবে এ কথাও সত্য, সবাই যে দুর্নীতিগ্রস্ত তা নয়। কিন্তু বর্তমানের আবহাওয়ায় কেউ সৎ থাকতে পারছে না। যে বা যাঁরা সৎ থাকার একটু প্রয়াস দেখিয়েছেন, অমনি তাঁদের একঘরে করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হয়েছে। অদ্ভুত এক পরিস্থিতি।

এই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হবার কথা যে কেউ চিন্তা করছেন না, তাও ঠিক নয়। সিদ্ধার্থবাবু বার বার ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে যাবার হুংকার দিয়েছেন। কিন্তু যান নি। ওয়াংচু কমিশন বসিয়েছেন। আবার চাপের কাছে মাথা নুইয়ে অনেক অন্যায়কে বরদাস্ত করেছেন। আই এ এস অফিসার পুলিশের উচ্চ পর্যায়ের কর্মীদের শাস্তি দিয়েছেন; কাউকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, কেউ আবার বরখাস্ত হয়েছেন। কিন্তু মন্ত্রিসভায় দুর্নীতির সংগে জড়িয়ে আছে, যে সব মহারথী তাঁদের বিরুদ্ধে তো মুখ্যমন্ত্রী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। তিনি অবশ্য বলবেন তাঁর এ সব জানা নেই। কিন্তু এ কথা কেউ স্বীকার করে নেবে না। তা হলে কি ধরে নিতে হবে পলিটিক্যাল কারণে তিনি কিছু করছেন না। না আগামী নির্বাচনের কথা ভেবে ভাগ্যবানদের ভাগ্য ঘাটাতে চাইছেন না। তা যাই হোক সাধারণ মানুষ কিন্তু সব না হলেও কিছুটা বোঝেন। যদি কেউ মনে করে থাকেন, সাধারণ মানুষ মাটির তাল তাকে যেমনভাবে ইচ্ছে তেমনিভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে এই চিন্তায়ও আবার মারাত্মক ভুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ৭৪ সালের মানুষ ভিন্ন প্রকৃতির।

তাই বলতে হয়, সংগঠন কংগ্রেস পরিত্যক্ত হয়েছে জ্যোতিবাবু নিপাত্তা গেছে অথবা জয়প্রকাশজীর আন্দোলন পশ্চিম বাংলায় দানা বাঁধবে না বলে চিৎকার করলে আয়ুরেই ক্ষয় হবে। এখন কিছু কাজ করতে হবে। দ্বিতীয় সেতু হচ্ছে কি হচ্ছে না, যা কবে শেষ হবে, খবরের কাগজ পড়ে দেশবাসী কি তা বুঝতে পারছে? মোটেই না। বরং তারা বলছে এ তো প্রবঞ্চনা। আসলে জয়প্রকাশজীর আন্দোলনকে রুখতে হলে প্রশাসন ও পার্টি থেকে সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতি দূর করতে হবে। দেশবাসীর জন্য কল্যাণকর পরিকল্পনার কাজগুলিকে আরো দ্রুতভাবে সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শহরবাসী মোটেই জানতে চায় না, রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি অরুণ মৈত্র থাকছেন, না জয়নাল সাহেব যাচ্ছেন? আসলে দুর্নীতি যদি দূর করা যায় তা হলে দেখা যাবে জয়প্রকাশজীর আন্দোলনের ভিত্তি নষ্ট হয়ে গেছে তার আর সম্ভাবনাই থাকছে না। কেননা তিনি দুর্নীতি দূর করার জন্যই ডাক দিয়েছেন।

কৌটিল্য

এই বাংলার খবর

বাস-ট্রেনে রাহাজানি

এই বাংলার নানা অঞ্চলে বাস-ট্রেনে রাহাজানির ঘটনা ইদানিং এমন ঘন ঘন ঘটছে যে বিধানসভার বেশ কয়েকজন সদস্য সেদিন এ-ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ না-করে পারলেন না। আর তাঁরা সকলেই কংগ্রেস সদস্য। একজন সদস্য তো নিজেই দুর্বৃত্তদের পাল্লায় পড়েছিলেন। উত্তর বাংলা স্টেট ট্রান্সপোর্টের একটা বাসে তিনি আসছিলেন রায়গঞ্জ থেকে কলকাতা। পাইপগান আর ছোরা হাতে একদল যুবক সেই বাসে উঠে তাঁর সর্বস্ব লুঠপাট করে নেয়। রানাঘাটের কাছে এই ঘটনা ঘটে। দূরপাল্লার বাসে এই ধরনের ঘটনা যে আজকাল প্রায়ই ঘটছে, একথা মনে করিয়ে দেন আর একজন কংগ্রেস সদস্য। উত্তর বাংলার নানা এলাকাতেই এইসব দৌরাত্ম্য বেশি।

উদ্বিগ্ন সদস্যরা জানতে চান, এ-ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র দপ্তর কী করছেন? তাঁরা অনেক অভিযোগ এনেছেন, কিন্তু পুলিশ ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে। রাজ্যে কি আইনের শাসন বলে কিছু আছে? একজন সদস্য তো স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে খোঁটা দিয়ে বললেন, বিধানসভার সদস্যরা কে কী করছেন সেদিকে নজর রাখার জন্য গোয়েন্দা ব্যবস্থা তো বেশ পাকা, কিন্তু যে-সব দুর্বৃত্ত দিনের পর দিন যাত্রীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তাদের ধরার ব্যাপারে তেমন উদ্যোগ চোখে পড়ে না। দূরপাল্লার প্রতিটি বাসে অন্তত দুজন করে সশস্ত্র প্রহরী দেওয়ার জন্যে প্রস্তাব করেন আর একজন সদস্য। ইদানিং ট্রেনে চালের চোরাচালানকারীদের সঙ্গে যাত্রীদের সংঘর্ষের কথাও ওঠে। সরকার বারবার ঘোষণা করছেন যে, কোনো এলাকায় চালের চোরাচালান বন্ধ করা হবে। কিন্তু এই চোরাচালানীরা যখন দল বেঁধে লোকাল ট্রেনে চাল নিয়ে আসে তখন পুলিশের লোকজন তা শুধু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখে।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ ফজলে হক আশ্বাস দেন, যাত্রীদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ-ব্যাপারে পুলিশের কোনো গাফিলতি ধরা পড়লে তার জন্যেও শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। ট্রেন-বাসে এই ধরনের দৌরাত্ম্য বন্ধ করার জন্য সরকারী ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন স্পীকার নিজেও।

সেচ কর বাড়ছে

পশ্চিম বাংলায় সেচ করের হার বাড়ছে। বাড়ছে বেশ চড়া হারেই। ময়ূরাক্ষী আর কংসাবতী প্রকল্পের জল নিতে গেলে এতদিন দিতে হতো একর প্রতি দশ টাকা। আর মেদিনীপুর খালের জলের জন্যে দিতে হতো চার টাকা। এখন এই হার দাঁড়াচ্ছে খরিফ মরশুমে ৩২ টাকা, রবি মরশুমে ৪৮ টাকা এবং গ্রীষ্মকালে ১৬০ টাকা।

জলকরের হার বাড়াবার জন্যে সেচমন্ত্রী এ বি গণি খান-চৌধুরী যখন বিধানসভায় একটি বিল পেশ করলেন তখন কিন্তু তাঁকে সদস্যদের কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হতে হলো। বিরোধী পক্ষের কম্যুনিস্ট পার্টি এবং আর এস পি সদস্যরা তো এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করেনই, কংগ্রেসের অনেক সদস্যকেও সেচ কর বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে শোনা যায়। তাঁদের বক্তব্য ছিল, এইভাবে সেচ কর বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে চাষীরা বিপদে পড়বেন বিশেষত ছোট চাষীরা। তাই একজন প্রস্তাব করেন, তিন একর পর্যন্ত জমির মালিকদের এই সেচ করের হার থেকে রেহাই দেওয়া হোক। চাষের নানা খরচ এখন বেড়ে গেছে। তার ওপর এত চড়া হারে সেচ কর দিতে হলে গরীব চাষীরা একেবারে ভিখারি হয়ে যাবে।

সেচমন্ত্রী জানান যে, আরো বেশি এলাকায় সেচের ব্যবস্থা করা, ভূমিক্ষয় বন্ধ করা আর বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে রাজ্য সরকারের টাকা দরকার। সেচ করের হার বাড়ানো হলে সরকারের বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা হবে। এখন এই রাজ্যে চাষযোগ্য জমির শতকরা ৩০ ভাগ এলাকায় সেচের ব্যবস্থা আছে। সরকার এই পরিমাণকে বাড়িয়ে শতকরা ৫০ ভাগ করতে চান। খাদ্যশস্যের ব্যাপারে পশ্চিম বাংলা স্বনির্ভর হয়ে উঠুক, এটাই রাজ্য সরকারের ইচ্ছা।

দমকল সম্পর্কে আইন

পশ্চিম বাংলার দমকল কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। সরকারের আগাম অনুমতি না-পেলে দমকল কর্মীরা এখন থেকে কোনো ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা অথবা কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারবেন না। রাজ্য বিধানসভায় এই মর্মে একটি বিল গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় বিলটি তুলতে গিয়ে রীতিমতো বাধা পান। বাধা আসে প্রধানত কংগ্রেস সদস্যদের কাছ থেকেই। বিলটি সুব্রতবাবু পেশ করার আগেই বৈধতার প্রশ্ন তোলেন কাশীকান্ত মৈত্র। দমকল কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এইভাবে নিয়ন্ত্রিত করলে সংবিধান-স্বীকৃত মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে বলে তাঁর আশঙ্কা। শ্রমিক শ্রেণী এই আইনের ভুল ব্যাখ্যা করবে এবং আইনটি নিয়ে আদালতে মামলাও হতে পারে। তাই এ-বিষয়ে আরো এগোবার আগে অ্যাডভোকেট-জেনারেলের মতামত নেওয়া হোক। সরকারের তরফ থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা বলেন যে কোনো-কোনো অধিকার নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ সংবিধানেই দেওয়া আছে। তাছাড়া কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে দমকল কর্মীরা শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হতে পারবেন। সুব্রতবাবু অ্যাডভোকেট-জেনারেলের পরামর্শ নিতে রাজী হননি। তিনি বলেন, তিনি আইনের খুঁটিনাটির কথা জানেন না, তবে এটুকু বলতে পারেন যে এই আইনের মধ্যে বর্তমান সামাজিক মতাদর্শই প্রকাশ পাচ্ছে। শেষপর্যন্ত ডেপুটি স্পীকার সুব্রতবাবুকে বিলটি পেশ করার অনুমতি দেন।

বিলটি নিয়ে আলোচনার সময়েও কংগ্রেস সদস্যরা সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। একজন বলেন এটি কালা কানুন। এই আইন ফ্যাসিস্টদের হাত শক্ত করবে। কোনো কোনো কংগ্রেস সদস্য অবশ্য এই অভিমত প্রকাশ করেন, দায়িত্বজ্ঞানহীন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এখন একটা লাভজনক ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অত্যাবশ্যক সংস্থায় ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিয়ন্ত্রণে কোনো অন্যায় নেই।

সংস্কৃতি কেন্দ্রে গোলযোগ

দক্ষিণ কলকাতার গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট একটি নামকরা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এখানে ভারতীয় সংস্কৃতির নানা দিক নিয়ে গবেষণা হয়, দেশবিদেশ থেকে জ্ঞানীগুণীরা এসে

থাকেন। তাছাড়া নিয়মিত নানাধরণের আলোচনা, সভা ইত্যাদিও হয়। কিন্তু ইদানিং এই প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মচারীদের অসন্তোষকে কেন্দ্র করে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যাতে এখানকার কাজকর্ম একরকম বন্ধ হতে বসেছে। বিদেশীরা অনেকে এই কেন্দ্র ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। কারণ, কেন্দ্রটির ওপর হামলা চলছে, ইঁট-পাটকেল পড়ছে। প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন কর্মীর বরখাস্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভকারীরা একদিন আট ঘন্টারও বেশি প্রতিষ্ঠানটিকে ঘেরাও করে রাখে। এই বিক্ষোভের সময় পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারী-দের সংঘর্ষ ঘটে বলে প্রকাশ। পুলিশ ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন বিধানসভার সদস্য পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়। পঙ্কজবাবুকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পরদিন টালিগঞ্জে বন্ধ পালিত হয়। বিধানসভাতেও ওঠে এই প্রসঙ্গ। বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ হামলা করেছে, এই অভিযোগের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এ-বিষয়ে তদন্ত করা হবে।

গোলযোগের সূত্রপাত সেই ১৯৬৭ সালে। ঐ সময়ই যুক্তফ্রন্টের এক শরিক এই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করান। কর্তৃপক্ষ জানান, সেই থেকে তাঁরা নানা অজুহাতে একটার পর একটা আন্দোলন করে চলেছেন। এমনকি বোনাস দেওয়ার দাবীও তাঁরা তুলেছেন। তাছাড়া, প্রতিষ্ঠানের অনেক নিয়মকানুনও তাঁরা মানছেন না। এক শ্রেণীর কর্মীর এই ধরনের আচরণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইতিমধ্যে তিনজন সন্ন্যাসী এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দিয়েছেন। কিছুদিন আগে কয়েকজন কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তাঁদের পুনর্বহালের দাবীতেই সবশেষ আন্দোলন।

পাট চাষীর দুর্দিন

এই বাংলায় পাটের দর যেভাবে পড়ে যাচ্ছে তাতে রাজ্য সরকার রীতিমতো উদ্বিগ্ন। পাট বাজারে যথেষ্ট আসছে, অনেক সমবায় সমিতির গুদামেও পাটের পাহাড় জমে উঠেছে, কিন্তু সরকারী পাট কর্পোরেশন এই পাট নিচ্ছেন না। কারণ তাঁদের নাকি টাকার অভাব। পাট কর্পোরেশনকে যাতে এখনই টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয় সেজন্যে রাজ্য সরকার দিল্লীতে এক জরুরী বার্তা পাঠিয়েছেন।

কিছুদিন আগে এইরকম একটা খবর রটে যে, কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বড় বড় চটকলকে পাটকেনা স্থগিত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। পরে অবশ্য জানা যায় যে, সেইরকম নির্দেশ দেওয়া হয়নি। যাই হোক, সেই সময় থেকেই পাটের দর পড়তে শুরু করে। এখন আবার পাট কর্পোরেশন হাত গুটিয়ে থাকায় চাষীরা আরো বিপদে পড়েছেন। সরকারের ঠিক-করে-দেওয়া সর্বনিম্ন দরের চেয়ে কম দরে তাঁরা বেসরকারী ব্যবসায়ীদের কাছে পাট বেচে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। সেদিন কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ কৃষক কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত এক বিরাট সভায় এইভাবে পাট চাষীদের শোষণের তীব্র নিন্দা করা হয়। ঐ সভায় বক্তারা অভিযোগ করেন যে, পাটচাষীদের সর্বনাশ করে কেন্দ্রীয় সরকার চটকল মালিকদের তোষণে ব্যস্ত।

২৫।১১।৭৪

২৫।১১।৭৪		—দেবদত্ত

দেশে বিদেশে

রাজনৈতিক সমালোচনা

বিহারে জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যে ধাক্কা দিয়েছে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ক্রমেই ছড়াচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক দুটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, শ্রীনারায়ণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি নির্বাচন ফ্রন্ট গঠন করার উদ্দেশ্যে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করেছেন এবং রাষ্ট্রীকরা কিছু কংগ্রেস নেতা উত্তরপ্রদেশের নারোরা শহরে একটি গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে দেশের সমগ্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটি গভীর পর্যালোচনা আরম্ভ করেছেন।

দিল্লীতে আলোচনা আরম্ভ করার আগে পাটনায় এক জনসভায় শ্রীনারায়ণ বলেছেন, নির্বাচনে জনগণের রায় গ্রহণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁকে যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন সেই চ্যালেঞ্জ তিনি গ্রহণ করছেন। বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করে প্রধানমন্ত্রীই তাঁদের আন্দোলনকে নির্বাচনের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন এ কথার উল্লেখ করে শ্রীনারায়ণ বলেন, আমি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি। আমার, আমার ছেলেদের অথবা জনগণের কারোরই তাড়াহুড়ো কিছু নেই। জনগণের রায় জানার জন্য আমরা পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

বিরোধী দলগুলির একটি ফ্রন্ট গঠন করা হবে, একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করে সর্বোদয় নেতা বলেন যে এই নির্বাচনে দুটি পক্ষ থাকবেন। যাঁরা বিহারের আন্দোলন সমর্থন করছেন তাঁরা এক পক্ষ, আর যাঁরা এর বিরোধিতা করেছেন তাঁরা অন্য পক্ষ। আন্দোলনের সমর্থকদের মধ্যে জয়প্রকাশ জনসংঘ, সংগঠন কংগ্রেস, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি ও সি পি এমের নাম করেন। আর আন্দোলনের বিরোধী হিসাবে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আইয়েরও নাম করেন।

নারায়ণ জানিয়ে দেন যে, তিনি যদিও নির্বাচনে বিরোধী দলগুলিকে নেতৃত্ব ও পরামর্শ দেবেন তাহলেও তিনি নিজে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না।

এদিকে উত্তরপ্রদেশের নারোরা শহরে কংগ্রেসকর্মীদের তিনদিনব্যাপী যে শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে সেখানে বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতিগণ সমেত কিছু সংখ্যক কংগ্রেস নেতা একটি গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয়সূচী যদিও সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে তাহলেও অনুমান করা হচ্ছে যে দেশের সমগ্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এই নেতারা দলের নীতি ও কর্মকৌশলের কোন রকম পরিবর্তন করার দরকার আছে কিনা সেটা গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখবেন। এই প্রসঙ্গে জয়প্রকাশের আন্দোলন থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি যে কংগ্রেস নেতাদের আলোচনায় অনেকখানি স্থান জুড়ে থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লোকসভা ভেঙে দিয়ে আর একবার মধ্যবর্তী নির্বাচন করা হবে কিনা তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও এই বৈঠকে স্থির করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ব্যর্থ আলোচনা

আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থায় পাকিস্তান ভারতের নামে যে নালিশ দায়ের করেছে সেটা ভুলে নিয়ে ভারতের প্রস্তাব অনুযায়ী এবং সিমলা চুক্তির সর্ত অনুযায়ী পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার দ্বারা বিরোধের মীমাংসা করতে রাজি হল না। তার ফল হল এই যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিমান চলাচল শুরু করা ও এক দেশের উপর দিয়ে অন্য দেশের বিমানকে যাতায়াত করার অধিকার দেওয়া সম্পর্কে দুই দেশের সরকারী অফিসারদের মধ্যে পাঁচ দিনব্যাপী আলোচনা নিষ্ফল হয়ে গেল।

রাওয়ালপিণ্ডিতে এই আলোচনার শেষে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে তাতে শুধু এইটুকু বাণী শোনান হয়েছে যে, আলোচনার ফলে দুই দেশের প্রতিনিধিরা পরস্পরের অভিমত আরও ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং দিল্লীতে সম্ভবত আগামী ডিসেম্বর মাসে দুই দেশের মধ্যে এ বিষয়ে আর এক দফা আলোচনা হবে।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় পাক-ভারত বিমান সংযোগ বন্ধ হয়ে যায়। তাসখন্দ চুক্তির পর এক দেশের আকাশ-প্রাঙ্গণ দিয়ে অন্য দেশের বিমান চালাবার অধিকার আবার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের একটি ফকার ফ্রেণ্ডশিপ বিমান ছিনতাই করে দুজন বিমানদস্যু লাহোরে নিয়ে যাওয়ায় এবং পরে বিমানটি পাকিস্তানী পুলিশের প্রহরাধীনে থাকা অবস্থায় পুড়িয়ে দেওয়ায় ভারত তার আকাশের উপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমানের চলাচল বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তানও পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

এই ব্যাপারেই পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থায় ভারতের বিরুদ্ধে নালিশ করেছে। পাকিস্তানের দাবী—ভারতের একতরফা ব্যবস্থার ফলে পাকিস্তান ইণ্টারন্যাশনাল এয়ার ওয়েজের বিমানকে যে ঘুরপথে চালাতে হচ্ছে সেজন্য তাদের আড়াই কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে এবং ভারতকে তার সেই ক্ষতির খেসারত দিতে হবে। ভারতের পাল্টা দাবী—পাকিস্তানী পুলিশের হেফাজতে যে ভারতীয় বিমান নষ্ট করা হয়েছে তার দরুণ পাকিস্তানের কাছে ভারতের ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ক্ষতি-পূরণ পাওনা হয়েছে।

পাকিস্তান যে সিমলা চুক্তি অনুসারে এই বিষয়ে আলোচনা করতে উদ্যোগী হয়েছে তাতে ভারত আশা করেছিল যে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থা থেকে মামলা তুলে ইসলামাবাদ দ্বিপাক্ষিক আলোচনার দ্বারা বিষয়টি মীমাংসা করতে সম্মত হবে। কিন্তু রাওয়ালপিণ্ডিতে ভারতের সেই আশা পূর্ণ হয় নি।

ভারত মহাসাগরে উত্তেজনা

রাওয়ালপিণ্ডির এই বৈঠকের প্রাককালেই জানা যায় ভারত মহাসাগরে এ যাবৎ বৃহত্তম যে নৌ মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে পাকিস্তান তাতে যোগ দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান এই নৌমহড়ায় যোগদানকারী দেশগুলির রণতরী বহরকে আতিথ্যও দিচ্ছে।

এই মহড়ার উদ্যোক্তা সেণ্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন বা সেণ্টো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ইরাণ তুরস্ক ও পাকিস্তান এই মহড়ায় যোগ দিচ্ছে। 'মিডলিঙ্ক ১৯৭৪' এই সাংকেতিক নামে অভিহিত ঐ অভূতপূর্ব নৌমহড়ায় বিরাট নৌ-বহর প্রেরণ করা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদিও সেণ্টোর পূর্ণ সদস্য নয় তাহলেও সে সপ্তম নৌবহরের বিমানবাহী জাহাজ কনস্টেলেশন ও দুটি ডেস্ট্রয়ার নিয়ে এই মহড়ায় যোগ দিচ্ছে। বৃটেন নামছে ১১ খানা রণতরী নিয়ে। এতে পুরোপুরি একটি নৌযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরী করে সেণ্টো জোটের সদস্যরা তাদের নৌশক্তির পরিমাপ করবে।

এই নৌমহড়ার প্রস্তুতির খবর প্রথমে ফাঁস করে দেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্বর্ণ সিং। তিনি এর সমালোচনা করে বলেছেন যে, এর ফলে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে অস্থিরতা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে পাকিস্তানের এই মহড়ায় যোগ দেওয়ায় বিস্ময় ও আক্ষেপ প্রকাশ করে শ্রী সিং লোকসভায় বলেছেন যে পাকিস্তান ১৯৬৫ সাল থেকে এই ধরনের কোন নৌমহড়ায় যোগ দেয় নি। বরং সেণ্টো জোটের সঙ্গে তার যোগ কমিয়ে পাকিস্তান ক্রমে ক্রমে জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করছিল। এখন অকস্মাৎ এভাবে পুনরুজ্জীবিত সেণ্টো জোটকে চাঙ্গা করা ও তাতে পাকিস্তানের পুরোপুরি যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত বিশ্ব রাজনীতিতে একটি লক্ষ্য করার মত ঘটনা।

—পুণ্ডরীক

গোয়েন্দা ধাঁধা

পাঁচটি কমলার বিচি।। শার্লক হোমস্।।
স্যার আর্থার কোনান ডয়াল

ঝড় উঠেছে। সেই সঙ্গে বৃষ্টি। লণ্ডন শহর কুঁকড়ে রয়েছে ঝড়বৃষ্টির নীচে।

ওয়াটসন বৌ-কে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে এসেছে ব্যাচেলর বন্ধুর বিবরে। দিনকয়েক বেকার স্ট্রীটেই থাকবে। শার্লক হোমসের বকুনি শুনবে। রোমাঞ্চের স্রোতে গা ভাসাবে। যুক্তিনিষ্ঠ গোয়েন্দাশাস্ত্র সম্বন্ধে লম্বা লম্বা লেকচারও হজম করবে।

লোকটা এল সেই রাতেই। মরবার পালক উঠেছিল বলেই এল। ঝড়বৃষ্টি মাথায় করেও ছুটে এল হোমসের আস্তানায়—বাঁচবার আশায়। নিয়তি তখন মুখ টিপে হাসলেন ওপরে বসে।

ছোকরার বয়স বেশী নয়, বড় জোর বাইশ। খানদানী চেহারা। কিন্তু চোখমুখ ফ্যাকাশে। নিদারুণ উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় মুখটা যেন দড়ির মত শুকিয়ে পাকিয়ে আমসি হয়ে গিয়েছে।

শার্লক হোমস প্রথমেই পর্যবেক্ষণ শক্তির নমুনা ছাড়ল ছোকরার জুতোর দিকে তাকিয়ে। জুতোয় খড় আর মাটি লেগে আছে দেখেই বলে দিল কোনদিক থেকে এসেছে আগন্তুক।

আগুনের সামনে পা সেঁকতে সেঁকতে লোমহর্ষক কাহিনীটা বলল যুবকটি।

নাম তার জন ওপেন-শ। বাবার নাম জোসেফ। কাকার নাম এলিয়াস। কাকা ছোকরা বয়েসেই আমেরিকা যান। প্রচুর টাকাপয়সা করেন। কিন্তু তিন-চার বছর নিগ্রোদের পরেই ইউরোপে ফিরে আসেন। নিগ্রোদের ওপর হাড়ে চটা বলেই গৃহযুদ্ধের পর আমেরিকায় আর থাকতে পারেন নি উনি। হর্সহ্যামের কাছে নিরিবিলিতে জায়গা জমি নিয়ে থেকে গেলেন। কিন্তু একদিনের জন্যেও শহরের দিকে গেলেন না। ফাঁকা মাঠে ঘুরে বেড়াতেন, কারো সঙ্গে মিশতেন না, মদ খেতেন, বদমেজাজী ছিলেন—এমন কি নিজের ভাইকেও এড়িয়ে চলতেন।

একজনকে কিন্তু কাছে এনে রেখে-ছিলেন এলিয়াস। ভাইপো ওপেন-শ'কে নইলে তাঁর চলতও না। চাকরবাকর থেকে আরম্ভ করে বাইরের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগের প্রতিনিধি বলতে গেলে এই ভাইপো। বাড়ীর সর্বত্র তার অবাধ গতি—চিলেকোঠার একটি ঘর ছাড়া। অথচ রাজ্যের বাজে জিনিস জড়ো করা থাকত সে-ঘরে। তবুও চাবিটা ভাইপোকে দিতেন না এলিয়াস।

ইউরোপ থেকে ফেরার বছর তেরোর পরের ঘটনা। এলিয়াসের নামে একটা খাম এল ইন্ডিয়া থেকে। খামের ওপর পন্ডি-চেরীর ডাকঘরের ছাপ। ভুরু কুঁচকে খামটা খুললেন এলিয়াস। অমনি ভেতর থেকে ঝরঝর করে ঝরে পড়ল পাঁচটা কমলালেবুর বিচি—আর কিছু না!

হো-হো করে হেসে উঠল ভাইপো। কিন্তু মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেল কাকার। মড়ার মত বিবর্ণ চোখে শুকনো বিচি কটার দিকে চেয়ে রইলেন দুর্দান্ত দুর্মুখ দুর্দর্ষ এলিয়াস। আতঙ্কাকণ্ঠে শুধু বললেন—কে-কে-কে। ধরে ফেলল এতদূরেও?'

সেদিন সারাদিন ধরে চিলেকোঠার নির্জন ঘর থেকে কাগজপত্র এনে পোড়ালেন এলিয়াস। সন্ধ্যেবেলা উঁকি মারলেন। ভাইপো ঘরে ঢুকে দেখল, অজস্র কাগজপোড়া ছাই। তার পাশে একটা পেতলের বাক্স। বাক্সের ডালায় লেখা—কে। সকালে পাওয়া খামের ভেতরেও কে কে কে অক্ষর তিনটে দেখেছিল সে।

উইল করলেন এলিয়াস। তাঁর মৃত্যু হলে বিষয়সম্পত্তি পাবে ভাই জোসেফ। তারপর পাবে ভাইপো ওপেন-শ। কিন্তু অভিশাপে সম্পত্তি ভোগ করতে গিয়ে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠার লক্ষণ দেখা গেলে পরম শত্রুকে যেন সব দানখয়রাৎ করে দেওয়া হয়।

অদ্ভুত উইলটা লেখবার পর কিরকম যেন হয়ে গেলেন এলিয়াস। দিনরাত যেন শূন্যের সঙ্গে লড়তে লাগলেন। দরজা বন্ধ করে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। তারপরেই একদিন ডোবার ধারে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেল। গায়ে আঘাতের কোন চিহ্ন কিন্তু দেখা গেল না। বিচি পাওয়ার সাত সপ্তাহ পরে সব জ্বালা জুড়োলো তাঁর।

উইল অনুসারে সম্পত্তির মালিক হয়ে বসল জোসেফ- ওপেন-শ'র বাবা। কিন্তু তাঁর নামেও একদিন এল একটা খাম। ওপরে ডান্ডির ডাকঘরের ছাপ। ভেতরে লেখা তিনটে অক্ষর কে-কে-কে আর পাঁচটা কমলার বিচি। সেই সঙ্গে একটা চিরকুট। তাতে লেখা—কাগজপত্র সূর্যঘড়ির ওপর রেখে দাও।

জোসেফ দারুণ একরোখা লোক। চিঠির মাথা মুণ্ডু না বুঝে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। কিন্তু ঠিক তিনদিন পরে মারা গেলেন পাহাড় থেকে পড়ে।

ওপেন-শ মালিক হল সম্পত্তির। দুবছর আট মাস ভালই কাটল। কিন্তু পরশুদিন

[illegible] এসেছে পাঁচটা কমলার বিচি [illegible]-কে লেখা খামে। চিঠি ডাকে ফেলা [illegible] ইস্ট লণ্ডনের বন্দর থেকে। ভেতরে [illegible]কুটে লেখা ছোট্ট হুকুম—কাগজপত্র [illegible]ঘড়ির ওপর রেখে দাও।

ওপেন-শ তাই ছুটে এসেছে শার্লক হোমসের কাছে। সঙ্গে এনেছে একটা পোড়া কাগজ। নীলরঙের। কাকার পোড়া কাগজ-পত্রের মধ্যে পেয়েছে সে। তাতে লেখা এই ক'টি কথা :

৪ঠা। হাডসন এসেছিল। সে-ও এক-কথাই বলছে।

৭ই। বিচি পাঠানো হল ম্যাকাউলি, প্যারামোর আর সোয়েনকে।

৯ই। ম্যাকাউলি খতম।

১০ই। সোয়েন খতম।

১৩ই। প্যারামোরকে দেখে এলাম। সব ঠিক আছে।

সব শোনার পর অস্থির হয়ে উঠল হোমস। খেঁকিয়ে উঠল ওপেন-শ-কে—"চিঠি তো পেয়েছেন দুদিন আগে। নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন নাকি?

"আজ্ঞে না। পুলিশকে বলেছিলাম। তারা হেসে উঠল।"

"যত্তো সব। আপনি রাস্তায় লোক থাকতে থাকতেই বাড়ী ফিরে যান। কাকার পেতলের বাকসটা সূর্যঘড়ির ওপর রেখে দিন। ভেতরে এই আধপোড়া নীল কাগজটা রাখবেন। আর একটা চিরকুটে লিখে রাখবেন—বাদবাকী কাগজ কাকা পুড়িয়ে ফেলেছেন।"

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বিদেয় হল ওপেন-শ। পরদিন সকালে খবরের কাগজে তার মৃত্যু সংবাদ বেরোলো। নদীর জলে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে বোধহয় ঝড়-জলের রাতে ব্রীজ থেকে পড়ে গিয়েছিল।

শার্লক হোমস একেবারেই ভেঙে পড়ল খবরটা পড়ে।

বলল ওয়াটসনকে—"ভায়া, এলিয়াস, জোসেফ আর ওপেন-শ'র হত্যাকারীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সাগরে—একটা পালতোলা জাহাজে। আমি চললুম সেই জাহাজের ঠিকানা বের করতে।"

বলে, সেই যে বেরিয়ে গেল হোমস, ফিরল রাত্রে। একটা খামের ভেতরে পাঁচটা শুকনো কমলার বিচি পুরে ওপরে ঠিকানা লিখল : ক্যাপ্টেন জেম্স্ কালহাউন, 'লোনস্টার' জাহাজ, স্যাভানা, জর্জিয়া।

যুদ্ধজয়ের হাসি হেসে বলল ওয়াটসনকে—স্যাভানায় পৌঁছে এই খাম হাতে পেলেই ক্যাপ্টেন কালহাউন বুঝবে তাদের চাইতেও ধুরন্ধর লোক এ-পৃথিবীতে অন্ততঃ একজনও আছে। পুলিশ হাতে দড়ি দেবে তার পরেই।

শুনে আবার মিটমিটি হাসলেন নিয়তি। জাহাজ আর স্যাভানায় পৌঁছোলো না। তিনিই ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে 'লোনস্টার' জাহাজকে ডুবিয়ে দিলেন—ইঁদুরের মত চুবিয়ে মারলেন হত্যাকারী ক্যাপ্টেন আর তার খুনে সাগরেদদের।

কিন্তু শার্লক হোম্স্ জানল কি করে যে পালতোলা জাহাজে সাগরে ঘুরে বেড়াচ্ছে হত্যাকারীরা?

অদ্রীশ বর্ধণ

(গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান ২৬ পৃষ্ঠায়)

উপন্যাস

সেই সব মানুষ

মনোজ বসু

[সোনাখড়ি গ্রামের ভবনাথ ঘোষ আর দেবনাথ ঘোষ দু ভাই। ভবনাথ বড়। অল্পবয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর ভবনাথ সংসারের হাল টেনেছেন, ভাইকে মানুষ করেছেন। কলকাতার ছোট আদালতে ওকালতী পরীক্ষা দেওয়া দেবনাথের হল না। পরে বিদেশে জমিদারী সেরেস্তার ম্যানেজার হয়েছিলেন। সেই কৃতী ভাই দেবনাথ আট বেহারার পালকিতে সোনাখড়ি ফিরেছেন।

একদিন সকালে দেবনাথ দেখলেন সামনের দাওয়ায় দশভূজা দুর্গা। মায়ের পুজো করতেই হবে। পুজোর তোড়জোড় চলতে লাগল। থিয়েটার হবে, মহড়া চলতে লাগল।

আষাঢ় মাস। এবারে রথের সঙ্গে ঈদও রবিবার জুড়ে গিয়ে কাছারি তিনদিন বন্ধ। মাদার ঘোষ হারু, খণ্টু এবং হিমচাঁদ গড়মণ্ডলে চললো রথের মেলা দেখতে। হারুর মতলব অবশ্য শুধু রথ দেখা নয়, থিয়েটারের সিন আঁকার কতদূর কী হল তাও একবার সরেজমিনে দেখে আসা।

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

হিমচাঁদের সঙ্গে নিশিকান্তর কি-রকমের মামা-ভাগনে সম্পর্ক—ঠিকঠাক বুঝতে গেলে কাগজ-কলম লাগবে, এমনি এমনি হবে না। কিস্তির মুখে সোনাখড়িতে যখন আদায়তহশিলে যান, হিমচাঁদের বাইরের ঘরে অস্থায়ী কাছারি বসে। সেই অবস্থায় চণ্ডমূর্তি—এমনি কিন্তু মানুষটি সামাজিক খুব। খেতে ও খাওয়াতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

হঠাৎ এসে গাড়ির মুখোমুখি হয়ে নিশিকান্ত জোয়াল এঁটে ধরলেন। বলেন, আড়ঙে যাচ্ছ—এখন কি তার? সে তো বিকেলবেলা। খেয়েদেয়ে নাক ডেকে ঘুমোও পড়ে পড়ে। ঠিক সময়ে আমি রওনা করে দেবো। আমাদের বরকন্দাজ আর যতীন মুহুরিও যাবে বলছিল, দল বেঁধে সব যেতে পারবে।

মাদার আপত্তি করে বলে, আড়ঙে যাওয়া আসল নয়। শুনেছেন বোধহয়, এবারের আশ্বিনে পুজো থিয়েটার দুইরকম হচ্ছে আমাদের সোনাখড়িতে। থিয়েটারের সিন আঁকছে ওখানে। কেমন হল, দেখতে যাচ্ছি।

ওখানে বসে গড়মণ্ডলে তোমাদের সিন আঁকছে? সবিস্ময়ে নিশি জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করলেন।

আজ্ঞে হাঁ। আর্টিস্ট জটাধর সামন্ত আঁকছেন।

হিমচাঁদ বলল [illegible] আর্টিস্ট, এদের দেখে [illegible] ইস্কুল [illegible] মেনেছে।

খণ্টু জুড়ে দেয়: হাতে সময় নিয়ে বেরিয়েছি সেই জন্যে। ডাল-ভাত চাট্টি ওখানেই খেয়ে নেওয়া যাবে।

যেতে দিলে তবে তো।

শেষের কথাগুলো নিশি আমলেই নিলেন না, বিড়বিড় করে আর্টিস্ট জটাধর মানুষটির হদিস খুঁজছেন। চিনেও ফেললেন। অবাক হয়ে বলেন, বলো কি হে, এত গুণের মানুষ। হাটে হাটে তবে পান বেচে বেড়ায় কেন?

মাদার একটু মুসড়ে গেলেন: পান বেচে নাকি?

হারু সামলে দেবার চেষ্টা করে বলে, পানের খদ্দের যে না সেই সিনের খদ্দের ক'টা আছে বলুন মামা।

তা বটে, তা বটে।

নিশি প্রণিধান করলেন। এবং মাদারও। ইতিমধ্যে জোয়াল থেকে গরু খুলে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় বেঁধে দিয়েছে। গোয়ালঘরটা দেখিয়ে গাড়োয়ানকে নিশি বললেন, চাট্টি চাট্টি জোয়াল এনে গরুর মুখে দাও। আর গাছে উঠে কাঁদি দুই-তিন ডাব পেড়ে ফেল। ভাতের দেরি আছে, শাঁসে-জলে পেটে ভর দিয়ে নাও খানিক।

তুমুল হৈ চৈ লাগালেন তিনি। মুহুরির যতীনকে বললেন ঘাটে ভাত কুঁড়োর চার দিয়ে খেপলা জাল ফেল দিকি। বড় রুইটা যদি বেড়ে ফেলানো যায়।

মাদার বলে বেলা হয়ে গেছে—এখন আর ওসব ঝঞ্ঝাটে যাবেন না নায়েবমশায়। উপস্থিত মতন যা আছে, তাতেই হয়ে যাবে।

নিশি ঘাড় নাড়লেন: তাই কখনো হয়! হিমে-মামার কথা না [illegible]— আপনাদের [illegible] আর [illegible] পাচ্ছি বলুন।

বরকন্দাজ ডাকাডাকি লাগিয়েছেন: কাঁহা গিয়া হরি সিং—হরি সিং গেলো কোথ? কুটুম্বলোক আয়া—কুটুম্বরা সব এসেছেন। পাড়ায় এখন সব গাই দুইছে, কলসি লেকে বেরিয়ে পড়ো। চাল সের পাঁচ সের যদ্দূর পাও, নিয়ে এসো।

খাওয়াদাওয়ার অল্প পরেই রওনা। সিনের জন্য উদগ্রীব—তাড়াতাড়ি গিয়ে পড়া দরকার। ঘোর হয়ে গেলে কিম্বা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে, রঙের জেল্লা ঠিকমতো ধরা যাবে না। পথে ভিড় আরম্ভ চলেছে সব—বুড়ো যুবা বাচ্চা নানান বয়সের। হাতে বাঁশের লাঠি, লাল গামছা কোমরে বাঁধা, নিতান্ত বাচ্চাগুলোকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। শৌখিন কারো বা এক-হাতে ছাতা, এক হাতে বার্নিশ-চটি, অঙ্গে ফুল-কাটা কামিজ। বাহারে টেড়ি কেটেছে তেল-জবজবে চুলের মাঝামাঝি চিরে।

মেয়েরাও সঙ্গে। পাছাপেড়ে শাড়ি পরনে হাতে রুপোর বালা একগোছা বেলোয়ারি চুড়ি, কোমরে গোট, কানে ইয়ারিং বা ইহুদি-মাকড়ি, নাকে নথ, গলায় দানা কপালে টিপ, চোখে কাজল, কপালে এ্যাব্বড়ো সিঁদুর ফোটা— বয়সকেলে যারা, মোটামুটি এমনিতরো সাজগোজ তাদের।

চড়চড়ে রোদ, মেঠো রাস্তা। থোলো থোলো কালো জাম পেকে আছে। তেন্টা মেটাতে গাছে উঠে পড়েছে ক-জন, তলায় ঘিরে দাঁড়িয়ে কাকুতি মিনতি করছে কেউ কেউ। জাম ফেলছে না গাছের মানুষ, খেয়ে আঁঠি ছুঁড়ে মারছে।

আড়ঙে অনেকে গরুর-গাড়িতেও যাচ্ছে, হারুদের আগে পিছে আট-দশখানা হয়ে গেল। পাল্লাপাল্লি চলেছে কে আগে গিয়ে উঠতে পারে, গরু ঘোড়ার কান মলে দিচ্ছে দৌড়ানোর বাবদে। মাঠ ছাড়িয়ে কয়েকটা বাঁশবন ও ধবধবির খাল পার হয়ে গড়মণ্ডল। এবং অনতি পরেই রথতলা— আড়ঙ যেখানে বসেছে:

কত দূর-দূরান্তর থেকে লোক আসছে। দোকানদারই বা কত-জংগল সাফসাফাই করে সারি সারি ছাপড়া বেঁধে নিয়েছে। দোকানের মালপত্র গরুর-গাড়ি বোঝাই হয়ে এসেছে, হরিহরের উপর দিয়ে জলপথেও এসেছে। কাপড়ের দোকান, লোহার দোকান, কাঠের দোকান পিতল-কাঁসার দোকান, পাথরের দোকান—দোকানের অবধি নেই।

মেলার মধ্যে গাড়ি ঢোকে না, গাঙ-কিনারে উলুবনে নিয়ে রাখছে। গা ভূতে গাড়িতে জায়গা ভাগ হয়ে গেল। সামান্য দূরে কীর্তিমান যদুপতি সরকারের অট্টালিকার অবশেষ। রাস্তার সামনে ছিল ঠাকুরদালান

তারই গায়ে দেউড়ির চিহ্ন ভিতর দিকে এগিয়ে যাও—দু-পাশে কুঠরি আত্মীয়-কুটুম্ব ও বাইরের লোকের জন্য। কয়েকটার আচ্ছাদন আছে, মেলা উপলক্ষে সাফসাফাই হয়েছে সেগুলো। ছাতে বারোমাস চামচিকে ঝোলে, চামচিকে তাড়ানো হলেও একটা উৎকট গন্ধ কিছুতে ছাড়ায় না। তাহলেও মোটামুটি বাসযোগ্য হয়েছে—বৃষ্টিবাদলা হলে মানুষজন আশ্রয় নিতে পারবে রাঁধাবাড়া করে খেতেও পারবে।

গরুর-গাড়ি ছেড়ে মাদার ঘোষের দল মেলার রাস্তায় এগিয়ে চলল।

মিঠাইয়ের দোকানে তেলেভাজা জিলিপি এক পয়সায় চারখানা। মুড়ি পাহাড়ের চূড়োর আকৃতিতে ডালির উপর উঁচু হয়ে রয়েছে। যত মুড়ি দেখা যায়, আসলে কিন্তু তার সিকির সিকিও নয়। উপুড়-করা পালির উপরে মুড়ি ঢেলে রেখেছে, অত উঁচু দেখাচ্ছে তাই। মুড়ি আর চিনির-রথ দু আনার মতো কিনে চার জন চিবোতে চিবোতে চলল।

নগরকীর্তন বেরিয়েছে। হেলতে দুলতে অতি মন্থর যাচ্ছে। বর্ষীয়সীরা ঢিবঢিব করে পায়ে পড়ে পদধূলি নিচ্ছেন। ইচ্ছে হলেও ভিড় ঠেলে তাড়াতাড়ি এগোবার জো নেই। কুমোরের দোকান—মাটির খেলনা, কত চাই। হাঁড়িবাঁশি—ছোট্ট হাঁড়ি দাগচোক আঁকা একদিকে নল, নলে ফুঁ দিলে মিষ্টি সুর বেরোয়। মাটির জাঁতা-হাঁড়ি-কলসি তাওয়া-শিলনোড়া। নাড়ুগোপাল নীল-পুতুল হামাগুড়ি দিয়ে আছে, ডান হাতে বলের মতন বস্তু মাখনের তেলা বলে ধরে নিতে হবে। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, কলসি মাথায় রমণী, হাতির শুঁড়ওয়ালা গণেশ।

রকমারি শোলার জিনিস এসেছে : দাঁড়ে টিয়াপাখি, পালকিতে বর, দড়ির টানে হনুমান কলাগাছে ওঠে আর নামে। সাপ ছোবল মারে, আবার ঘাড় নুইয়ে পড়ে। কামারের জিনিস : ছুরি বঁটি কোরন কাটারি—

থাক, কেনাকাটা পরে হবে ফিরতি বেলা। বরঞ্চ পান খেয়ে নেওয়া যাক।

নাগরদোলায় কাঠের ঘোড়া বনবন করে পাক খাচ্ছে। অল্প দূরে বাঁশে-ঘেরা মাল লড়াবার জায়গা। ঢোল বাজছে। এ তল্লাটের বিখ্যাত মাল কেতুঢালি এসেছে—দৈত্যসম চেহারা, গায়ের জোর ছাড়াও গুণজ্ঞান বিস্তর। ধুলো পড়ে গায়ে ঘষে নেয়, তারপর দা দিয়ে কোপালেও গায়ে বসবে না। বেশি কোপাকোপি করলে দায়েরই ধার পড়ে যাবে, কেতুর কিছু হবে না। কিন্তু কেতু নিজে এখন নামছে না, যোগ্য প্রতিপক্ষের অপেক্ষায় আছে। কৌতুক-দৃষ্টি মেলে হালের ছোকরাদের কাজকর্ম দেখছে।

পানের দোকানে, সরবত লেমনেট নয়, রাঙিন জল বোতলে ভরে মিছামিছি সাজিয়ে দিয়েছে। দোকানের বাহার। ডবল খিলি সেজে দিচ্ছে, তাকিয়ে তাকিয়ে চতুর্দিকে দেখছে এরা। মেলার মালিক সরকারমশায়রা বেরিয়ে পড়েছেন, মুটে সঙ্গে নিয়ে তোলা তুলছেন। জিজ্ঞাসাবাদ নেই ধামায় ডালায় হাত ঢুকিয়ে মুঠো করে তুলে নিয়ে মুটের মাথায় ঝুড়ির মধ্যে ফেলছেন। নিও না, অত নিলে বাঁচব না কত্তা—বলছে দোকানি, কাকুতি মিনতি করছে। দয়া হল তো মুঠো থেকে কিছু পরিমাণ রাখলেন আবার ডালায়।

জয় জগন্নাথ, হরিবোল, হরি-হরিবোল—তুমুল রোল ওদিকে। রথ বেরিয়েছে। কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে, ঢোল-কাঁসিও আছে একজোড়া। চারিদিক থেকে পানের-খিড়ে সুপারি পাকাকলা বাতাসা পয়সাকড়ি পড়ছে রথের উপর। যদুপতি সরকারের রথ একদিন চলত এখানে—এই রাস্তার উপর দিয়ে, মহাবুদ্ধ ঐ চ্যাটালে আমগাছের বড় ডালখানা ছুঁয়ে যেত। আর এখনকার এই রথ এক-মানুষের সমান বড় জোর। আয়তন যা-ই হোক, বিষম হুল্লোড় ভক্তজনেরা পাগল হয়ে উঠছে—রথের উপরের ঠাকুর দেখবে রথের রশি একটুকু ছোঁবে। মেয়েরা এক দিকে গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়েছে, রথ কাছাকাছি হলে গলায় আঁচল দিয়ে যত্ন করে প্রণাম করছে, উলু দিয়ে উঠছে কলকল করে।......

আড়ং ছাড়িয়ে আরও পোয়াটাক গিয়ে আর্টিস্ট জটাধরের বাড়ি। সাতচালা ঘর একখানা—এ পাশের কামরায় পানের আড়ত ওপাশের কামরায় স্টুডিও, মাঝের বড় ঘরে বউ-ছেলেপুলেরা থাকে। মুহুরি সুরেন বিশ্বাসকে দিয়ে মাদার চিঠি লিখিয়ে দিয়েছেন, রথের সময় গিয়ে সিনের কাজকর্ম দেখবেন। জটাধরও তৈরি—ধোপদুরস্ত কামিজ গায়ে দিয়ে চুলে টেড়ি বাগিয়ে দুপুর থেকে ঘর-বার করছে। একখানা সিন পুরোপুরি শেষ করে ফেলেছে ইতিমধ্যে হাত লাগালে গুণিজনের ক'দিন লাগে। সিন শেষ করে তলতা বাঁশে পরিপাটি করে জড়িয়ে রেখেছে।

গড়মণ্ডলের মানুষ গোড়ায় বিশ্বাস করেনি জটাধর ধাপ্পা দিয়ে খাতির বাড়াচ্ছে ভেবেছিল। কিন্তু সোনাখড়ির চার মাতব্বর গরুর গাড়ি করে কাজ দেখতে এসেছেন, এর পরে মানুষটাকে হেলাফেলা করা যায় না। গাঁয়ের মানুষও এক পাল জুটে গেছে—কাজ তারাও দেখবে, রথের মেলা ফেলে সঙ্গে সঙ্গে চলল।

সিন বের করে জটাধর উঠানে নিয়ে এলো। উজ্জ্বল আলো উঠানে, দিব্যি খুঁটিয়ে দেখা চলবে। দুই ছোকরা বাঁশের দুই মুড়ো ধরে আছে, আর্টিস্ট নিজে অতি সন্তর্পণে গুটানো সিন খুলে দিচ্ছে। একটু একটু করে খুলে আসছে—আশ্চর্য এক রহস্যের উন্মোচন যেন—আর জটাধর তাকাচ্ছে ঘন ঘন মাদার ঘোষের দিকে।

চোখ বড় হয়ে গেছে মাদারের। সগর্বে জটাধর গ্রামবাসীদের দিকে তাকায়। কী হে, বড় যে আমায় হেনস্থা করতে—ভাবখানা এই প্রকার। হারু সরকারের কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না। এমনিধারা চোখ বড় বড় করা দেখা আছে ইতিপূর্বে। মাদার ঘোষের অনেক গুণ, কিন্তু বিষম বদরাগি। রেগে গেলে স্থান-কাল বিস্মরণ হয়ে যায়। সিঁধের মুখে একবার চোর ধরা পড়েছিল। মাদার থেঁক দিয়ে বললেন, সে তো ছেলেবেলায় ধোওয়া-তুলসীপাতা তুই, কিন্তু ফুলবেড়ের মানুষ হয়ে সোনাখড়ির দত্ত-বাড়ি কেমন করে এসে পড়লি খুঁজিয়ে সে তো শুনি। চোরের কৈফিয়ত : মাঠ ভেঙে বেচারি কুটুম্ববাড়ি যাচ্ছিল, আচমকা একটা খারাপ বাতাস উঠে এখানে উড়িয়ে এনে ফেলেছে (খারাপ বাতাস মানে অপদেবতা)। সেই বাতাসই বুঝি সিঁধকাঠি হাতে গুঁজে দিয়ে গেছে? মাদার ঘোষ প্রশ্ন করলেন। আর পাশে-দাঁড়ানো হারু সরকার সেই সময় ঠাহর করেছিল, মাদার ঘোষ চোরের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়েছিলেন অবিকল এই আজকের মতন। আর্টিস্ট দু-পাটি দাঁত মেলে হেসে হেসে পড়শিদের কাছে বাহাদুরি নিচ্ছে, কিন্তু বহুদর্শী হারুর মুখ শুকাল। গ্রামের উপর যেমন খুশি চোর পেটানো যায়, এখানে ভিন্ন এলাকায় মেজাজ না সামলালে চোরের মার নিজেদেরই খেয়ে যেতে হবে।

তা মাদার ঘোষ বুঝেছেন বোধহয় সেটা। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে আর্টিস্টের সঙ্গে আলাপন চালাচ্ছেন : অরণ্যের সিন বুঝি?

অবোধের মতন কথা শুনে জটাধর একগাল হেসে বলল, রাজপ্রাসাদ—

ঝণ্টু বলে, এদিক-সেদিক মস্ত মস্ত গাছ—প্রাসাদের ভিতর এত গাছ গজাল কেমন করে?

জটাধর বুঝিয়ে দিল : প্রাসাদের থাম্বা গুলো—

হিমচাঁদ বলল, থামে মেলা কাঁঠাল ফলে আছে—

কাঁঠাল নয়, ঝাড়লণ্ঠন।

বুঝেছি।

ধমক দিয়ে মাদার আর্টিস্টকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, গাঙের ঘাটে চলো আমার সঙ্গে।

এইরে : ধরে গাঙে চুবানোর বোধহয় মতলব। বিচিত্র নয় ঐ রাগি মানুষের পক্ষে। পা বাড়ালেন নিজে গাঙের দিকে, আদেশ করলেন : চলে এসো।

ছোকরাদের উদ্দেশ করে বললেন, বাঁশ খুলে ফেললে সিনটাও আনো।

হতভম্ব হয়ে জটাধর প্রশ্ন করে : গাঙে কি?

আর্টিস্ট বলে ভাঁওতা দিয়েছিলে। রং মেখে এতটা কাপড় নষ্ট করেছ, রং ধুয়ে সাফসাফাই করে দিতে হবে—

জোর দিয়ে মাদার আবার বলেন, তুমি মেখেছ, নিজের হাতে তোমাকেই ধুতে হবে।

হারুকে বললেন, সদর থেকে সিন ভাড়া করে আনব আগে যা কথা হয়েছিল। তাছাড়া উপায় নেই। সিনের নামে থান কাপড় কেনা হয়েছে, সেলাই করে সামিয়ানা বানাব। সামিয়ানারও তো দরকার।

জেদি মানুষ মাদার ঘোষ, যা বলেছেন তাই করিয়ে তবে ছাড়লেন। আতঙ্ক বুঝে জটাধরও প্রতিবাদের সাহস পেল না। গাঙের এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে সিন কাচছে। গাঁয়ের ছোকরাগুলো ফ্যা-ফ্যা করে হাসছিল, তারপর আড়ঙে চলে গেল।

ভিজে থানের জল নিংড়াতে নিংড়াতে জটাধর উঠে এসে বলে, আমার বিশটা দিনের খাটান, তার কিছু পাওনা হবে না?

হিমচাঁদ হারুকে ফিস-ফিস করে বলে, এই মরেছে, পাওনার কথা বলছে যে, মাদার-দা এবারে তো পাওনা শোধে লেগে যাবে—আমি চললাম। ছোট মেয়েটার জন্য একপ্রস্থ কুমোর-সজ্জা কিনতে হবে। কেনাকাটা করে আমি গরুর গাড়ির কাছে থাকব, এসো তোমরা।

বলে হন-হন করে মুহূর্তে সে নিষ্ক্রান্ত হল।

মাদার জিজ্ঞাসা করলেন, পাওনা চাচ্ছ?

সবিনয়ে ঘাড় কাত করে জটাধর বলল, আজ্ঞে—

পাওনাগণ্ডা এই হল যে রঙের দামটা তোমার কাছ থেকে আদায় করলাম না। তোমার ভগ্নিপতি সরেন আমার মুহুরির সেই খাতিরে ওটা আমি নিজের পকেট থেকে দিয়ে দেবো।

যাবতীয় কাপড় এবং রং-তুলি যা বাড়তি ছিল, গরুর-গাড়িতে তুলে নিয়ে সন্ধ্যার মুখে সকলে সোনাখড়ি ফেরত চললেন।

সোনাখড়িতেও রথের দিনে আজ ছোটখাট মচ্ছব পুরবাড়ির সদাসমাপ্ত খোড়ো চণ্ডীমণ্ডপে। নতুন ঘর বাঁধতে ভবনাথের জুড়ি নেই। বাঁশঝাড় বিস্তর আছে এবং উলুখড়ের জমিও অনেক। ইচ্ছে হলেই চট করে ঘর তুলতে পারেন। তোলেনও তাই। বাড়ির এদিকে সেদিকে বাঁশের খুঁটি কাঁচানির বেড়া খোড়ো-চালের কত যে ঘর হিসাবে আনা মুশকিল। লোকে বলে জনমজুরের টাকাটা নগদ যদি গুনতে না হত, পুরবাড়ির বড়কর্তা নিত্যদিন একটা করে ঘর তুলতেন।

প্রতিমার কাঠাম দেওয়া হয় এই রথের দিন থেকে। বেলগাছ চিরে পাট বানিয়েছি—পাটাতন, প্রতিমা যার উপরে দাঁড়াবেন। রাজিবপুরের পাল কারিগর মলয়দের জন্য দুই আজ এসেছেন, মণ্ডপের উত্তরের বেড়া ঘেঁসে পাট বসিয়েছে। ঢাকে কাঠি পড়ে এইবার। ছেলেপুলে ছুটে এসে পড়ল হুড়বাও আছে কিছু কিছু। হরির লুঠ-মা দুর্গার প্রীতে হরি হরি বলো—। লুঠের বাতাসা কাড়াকাড়ি করে সকলে কুড়ায়। বাঁশ-বাখারি খড়-দড়ি নিয়ে কারিগর কাজ ধরলেন। প্রতিমার কাঠামো আকৃতিগুলোর

হবে। আরম্ভটা করে দিয়েই এক্ষুনি ওঁরা অন্যত্র ছুটবেন, সেখানেও আজ আরম্ভ। ভাদ্র মাসের আগেই কাঠামোর কাজ শেষ করে ফেলতে হবে, মূর্তি উঠবে জন্মাষ্টমীর দিন। খড়ের কাঠামোর গায়ে মাটি লেপা। পুজো-পুজো ভাব সেই দিন থেকে। এক-মেটে চলল কদিন ধরে। সেটা হয়ে গেল তো দিন দশেক কামাই শুকোনোর জন্য। তারপর দোমেটে। দোমেটের পরে দিন পাঁচেক বন্ধ রাখলেই যথেষ্ট। দোমেটের পর খড়ি দেওয়া, তারপরে রং-তুলির কাজ। এখনতো দিব্যি গতর এলিয়ে কাজকর্ম—শেষ মুখে তখন কারিগরদের আহার-নিদ্রা লোপ পেয়ে যাবে।

দোচালা বাংলা ঘর, মন্তার মা'র বাড়ি। বিধবা মেয়ে মন্তা আর তিনি—দুটি প্রাণী থাকেন। প্রহরখানেক রাত, মেজ ভাজ জ্যোৎস্না। মন্তার মা লাঠি ঠুক ঠুক করে উঠানের এদিক-সেদিক চক্কোর মারেন, খানিক আবার দাওয়ায় এসে বসেন। মানুষ দেখতে পেয়ে হাঁক পাড়েন : কে রে, কে ওখানে?

আমি—

নতুন বাড়ির রাখাল। থাকে নতুন বাড়ি, বাড়ি বিল পাড়ের মনোহরপুর গাঁয়ে। মেজ-ঠাকরুণ বিরজাবালার কনিষ্ঠ ভাই। ভাইকে তিনি চোখে হারান—লোকে বলে, কাজের গরজে। হাটঘাট করে রাখাল, গাইটা দেখে, রান্নার কাঠকুটোর জোগাড় দেয়। গাঁয়ের মানুষেরও করে, পারতপক্ষে কোন কাজে না বলে না, সকলের সঙ্গে ভাবসাব। সোনা-খুড়তেই পড়ে থাকে সে, বাড়ি কালেভদ্রে কদাচিৎ যায়। সেই যাওয়াটুকুও মেজঠাকরুণ বন্ধ করবার তালে আছেন। নতুন বাড়ির চন্ডীমন্ডপে পাঠ-শালা—বিদ্যের আবার বয়স আছে নাকি? —ভাইকে ঠাকরুণ পাঠশালার জন্তে দিতে চান। রাখালের মা-ভাইদেরও সেই ইচ্ছা : ঘষতে ঘষতে পাথর ক্ষয়। বাংলা হস্তাক্ষর যদি খানিকটা রপ্ত করতে পারে, জমিদারী সেরেস্তায় অথবা উকিলের সেরেস্তায় মুহুরীগিরি একটা ঠেকায় কে?

রাখাল বলল, হাটবেসাতি দিতে এসেছি মাউইমা।

এক পয়সার পান আর দু-পয়সার মতিহারী তামাক, এই হল মোটমাট বেসাতি। হাটের আগে মন্তার মা তিনটে পয়সা দিয়ে এসেছিলেন। যেহেতু মেজ-ঠাকরুণের শাশুড়ী সম্পর্কীয়, মন্তার মাকে রাখাল মাউইমা বলে। বলছে, ছেঁচাপান একটু মুখে না পড়লে মাউইমার ঘুম হবে না জানি। সাত তাড়াতাড়ি তাই দিতে এলাম। ঠিক তাই। এতক্ষণে তোমার তো এক ঘুম কাবার হবার কথা—আজকে জেগে বসে আছ।

পানের জন্যে বুঝি? সারা রাত আজ এইভাবে কাটবে, শোওয়াশুয়ি নেই।

রাখাল একেবারে ভিজে বেরালটি। বলে, কেন, কেন?

চোরের পাহারায় আছি। মাচায় মিঠে কুমড়ো ফলে আছে, ঘরের চালে শশা। শুতে গেলে সমস্ত ছিঁড়েখুঁড়ে নিয়ে যাবে।

এতক্ষণে যেন রাখালের খেয়াল এল। বলে, ও, নষ্টচন্দোর বুঝি আজ? তা চোর বলছে কে মাউইমা? থানায় চুরি বলে এজাহার দিতে যাও, নেবে না। নষ্টচন্দ্রে চুরি হয় না।

ভাদ্রের শুক্লা চতুর্থীর রাতে নষ্টচন্দ্র। শাস্ত্রীয় পরব, পাঁজিতে রয়েছে। আকাশের চাঁদ ঐ দিনে নষ্ট হয়ে যায়, দর্শন নিষেধ। দেখে যদি ফেলি, তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত আছে—বড্ড মজার প্রায়শ্চিত্ত। চুরি করতে হবে। ঘরের জিনিস কিছু নয়—বাইরের জিনিস, ফলটা পাকড়টা, যা-সমস্ত ক্ষেতে ফলেছে। কাঁকুড় শশা ফুটি বাতাবী লেবু কুমড়ো আখ ডাব ইত্যাদি। রাতের মধ্যেই খাওয়া সেরে ফেলবে যে গৃহস্থের জিনিস তাকেও ভাগ দেবে। আর অজান্তে তাকে যদি একটু খাইয়ে দিতে পার, সব পাপ কেটে গিয়ে উপরি আরও পুণ্যার্জন।

রাখাল মন্তাকে ডাকছে : ওঠো মন্তা-দিদি, মাউইমার পান ছেঁচে দাও।

ঘুমকাতুরে মন্তাকে দুটো পাঁচটা ডাকে তোলা যায় না। হামানদিস্তা নিয়ে রাখাল নিজেই তখন ছেঁচাতে লেগে গেল।

মন্তার মা প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন, তুই আবার কেন রে?

করি না। হাত তাতে খয়ে যাবে না আমার—

প্রশ্ন করে : এ বাড়ির কর্তা চাঁদুবাবুর নামে তো সিন্নি পড়ত শুনেছি। তিনি নাকি বড় ছাড়া ছোট জিনিস রাখতেন না। হামানদিস্তে তবে ছোট কেন এমন?

মন্তার মা বলেন, তাঁর আমলের নাকি? সাড়ে-তিন কুড়ি বছর বয়স কাটিয়ে চলে গেলেন একটা দাঁত পড়ে নি। ছোলা-ভাজা মটর-ভাজা কটর-মটর করে চিবিয়ে খেতেন। হামানদিস্তে ও-বছর দেলের বাজারে আমি তো কিনলাম। তিনি হলে, ওরে বাবা—

স্বর্গীয় কর্তার কথা একবার ধরিয়ে দিলে আর রক্ষা নেই—মন্তার মা'র মুখ একের স্থলে একশখানা হলেও বলে তিনি কূল পেতেন না। বলেন, হামানদিস্তে তাঁর হলে সে জিনিসে শুধু পান ছেঁচা নয়, মানুষের আস্ত মুন্ডু ছেঁচা যেত। ছোটখাট জিনিস ছিল দু চক্ষের বিষ। ফরমাস দিয়ে গাড়ু বানিয়ে ছিলেন—যে গাড়ুতে জল ভরে বয়ে নিয়ে যাওয়া নিজের ক্ষমতায় কুলাত না। মতি ছিল ভিটেবাড়ির প্রজা—'মতি' 'মতি' করে চেঁচাতেন, গাড়ু সে নিয়ে বাঁশ-বাগানে রেখে আসত।

গল্পের পর গল্প। মন্তার মা একাই চালিয়ে যাবেন, মাঝেমাঝে একটু হুঁ-হাঁ দিয়ে গেলেই হল। হাঁই এর মধ্যে পিপাসা পেয়ে গেল রাখালের। বলে, জল খাব মাউইমা। তোমার মেটে কলসির জলে কেমন এক মিষ্টি স্বাদ। আর ঠান্ডাও তেমনি। কত দিন ভেবেছি, যাই—মাউইমার কাছে গিয়ে এক ফোঁটা জল খেয়ে আসি।

প্রীত হয়ে মন্তার মা বলেন, তা এলেই তো হয়। আসিস নে কেন?

সেই মেটে কলসি সন্ধ্যাচারে মাচার নীচে রাখা, মেয়ে মন্তারও ছোঁবার জো নেই। জল আনতে মন্তার মা ঘরের মধ্যে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে মই কোঁচড়ে শশা জল্লাদের আবির্ভাব।

রাখাল লাফ দিয়ে উঠানে পড়ল, দুটো শশা দাওয়ার উপর রেখে দুজনেই হাওয়া। সুঁড়ি পথের উপর মাথন পাটনী যণ্ডা-মা একখানা দেখিয়ে এলো জল্লাদ। ঠিক মাথার উপর পচা চালে দাঁড়িয়ে শশা ছিঁড়ছে, চাল মচাৎ-মচাৎ-মচাৎ করে।

এই রে :—আমার গা কাঁপছে। কিন্তু বুড়োকর্তার কথায় মাতোয়ারা বুড়ির কানেই পৌঁছল না।

আরম্ভ হয়ে গেল ওদিকে। আঙুল মটকে মটকে মস্তার মা রাখাল ও দলবলের চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করছে। যত চেষ্টার বুড়ি, এরা বগল বাজায়। এবং নৃত্য করে।

রাখালের হাত ধরে জল্লাদ জোর টান দিল : এক বাড়িতেই হয়ে গেল? আরও সব রয়েছে না?

বড় দুর্যোগ। বৃষ্টির পর বৃষ্টি—থামে না মোটে। রাতের পর দিন হচ্ছে, সকাল দুপুর-সন্ধ্যা ঘুরে আবার রাত্রি। সূর্য মুখ লুকিয়ে আছে পুরো তিনটে দিন আজ। বৃষ্টি কখনো ঝির ঝিরানি, কখনো ধারাবর্ষণ। আর জোর বাতাস। ডোবা-পুকুর সমস্ত ভেসে গেছে। নয়ানজুলি ছাপিয়ে জল রাস্তার উপরে উঠেছে। হেড়াঞ্চি বন জল-তলে উপর দিয়ে স্রোত বয়ে যাচ্ছে—যে ডালটুকু জেগে আছে, গাঁড়ি পিঁপড়ে থিক-থিক করছে তার মাথায়। ধানক্ষেত ছিল ঘন সবুজ, জল চকচক করছে সেখানটা এখন। লোকে তিতিবিরক্ত, আকাশের পানে চেয়ে বলছে : দেবতা ক্ষমা দাও এবার, সৃষ্টি-সংসার রসাতলে যাবার দাখিল। ছেলেপুলেরা বলছে লেবুর পাতায় করমচা, যা বিষ্টি ধরে যা।

জল্লাদ, উত্তর বাড়ির যজ্ঞেশ্বরের মেজ ছেলে, ঘোর থাকতে এসে দালানের দরজায় ঘা পাড়ছে, আর জেঠিমা জেঠিমা করে ডাকছে। ধড়মড় করে উমাসুন্দরী উঠে পড়লেন : জল্লাদ নাকি রে? কি হয়েছে ও জল্লাদ?

বেরিয়ে দেখ জেঠিমা। ঠাকুর ধুয়ে গিয়ে খড় বেরিয়ে পড়ছেন। ঘুমিয়েও

ঘুমিয়েও সোয়াস্তি নেই তোর জল্লাদ, মণ্ডপের মধ্যে মন পড়ে থাকে।

বৃষ্টি একটু বন্ধ হয়েছে। বড়গিন্নি মণ্ডপে চললেন। পুঁটি জেগে পড়ছে, চোখ মুছতে মুছতে সে-ও জেঠাইমার পিছন ধরল। তারপরে নিমু এবং খোদ বড়কর্তা ভবনাথ। [illegible] সারা হয়ে বিরাম চলছে অল্প কদিন, তারই মধ্যে দুর্যোগ। ভিতরে যাওয়া হল না—আগল বেঁধে ভিতরের পথ বন্ধ, শিয়াল-কুকুর না ঢুকে পড়তে পারে। জল্লাদ ঠিক বলেছে, বৃষ্টির ছাটে প্রতিমার খানিক খানিক ধুয়ে গেছে। আজই পালমশায়দের খবর পাঠাতে হবে দাগরাজি করে দেবার জন্য। আর জলের ছাট না আসতে পারে—পূব দিকটা বিশেষ ভাবে ছ্যাচা-বাঁশের বেড়ায় ঘিরে দিতে হবে।

বড়গিন্নি বললেন রাত থাকতে বেরিয়ে পড়েছিস জল্লাদ, পুজো-পুজো করে ক্ষেপে উঠলি যে একেবারে।

সকৌতুকে তাকিয়ে পড়ে জল্লাদ বলে, [illegible]

উঠতে দেরী করলে যে, ভাদ্দুরে কিল খেয়ে মরতে হবে।

তা বটে। ভাদ্র মাসের শেষ দিন আজ। ছোঁড়ার সর্ববিষয়ে হুঁশ আছে কেবল লেখা-পড়াটা ছাড়া। আজ যার সকালবেলা শুয়ে গড়াবে, ভাদ্র মাস যাবার মুখে বেদম কিলিয়ে সর্বাঙ্গ তাদের ব্যথা ব্যথা করে দিয়ে যাবে। কমলের কথা পুঁটির মনে পড়ে যায়। আহা ভাইটি ঘুমুচ্ছে, খবর রাখে না ভাদ্রসংক্রান্তি আজ। বিভোর হয়ে ঘুমোচ্ছে. ঘুম ভেঙে গায়ের ব্যথায় তখন আর উঠতে পারবে না।

দক্ষিণের ঘরে পুঁটি ছুটল : ওঠ রে কমল. ভাদুরে কিল না খেতে চাস তো উঠে পড়।

উঠতে চায় না তো টেনে তুলে ধরল। ঘুম ঘোরে কমল খিমচি কাটছে, কিল-চড় মারছে দিদিকে। পুঁটি বলে, মারিস কেন রে? তোর ভালোর জন্যেই তো তুলে দিলাম। মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

মার খেয়েও হাসে পুঁটি। জল্লাদ উঠানে আছে, চোখ ইসারায় তাকে ডেকে বাইরের দিকে চলে গেল। হঠাৎ আজ যে বড় সদয় পুঁটির উপর। নিভৃতে গিয়ে বলে, তাল কুড়িয়ে আনি গে, চল যাই।

পুঁটি বলে, তাল তো ফুরিয়ে গেল। এক-আধটা দৈবে-সৈবে পড়েও যদি, সে কি এতক্ষণ তলায় রয়েছে?

আছে রে আছে—

রহস্যময় হাসি হাসে জল্লাদ : গায়ে থাকিস তেরা, কোথায়-কি আছে তাকিয়েও দেখিস নে। সে যা জায়গা একজনে হবে না, দুজন লাগে। সেই জন্যে ডাকছি। ফাঁকি দেবো না, অর্ধেক ভাগ তোর দশটা পেলে পাঁচটা তোর, পাঁচটা আমার। না যাস, লোকের অভাব কি অন্য কাউকে ডেকে নেবো।

এক সঙ্গে দুজনে গেলে বাড়ির লোকে সন্দেহ করবে, জল্লাদ একলা বেরিয়ে গেল। [illegible] শেষ প্রান্তে বলাবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। নীচে সামান্য দূরে ডোঙা। তড়াক করে ডোঙায় লাফ দিয়ে পড়ল। পুঁটিকে ডাকে : আয়।

হাত ধরে তাকে ডোঙায় তুলে নিল। ধুঁজি মেরে চলেছে। পুঁটিরও শাড়ির আঁচ ফেরতা দিয়ে কোমরে বাঁধা। ধানখেত ভেসে গেছে, অবাধে তার উপর দিয়ে ডোঙা বাইছে। বেশ খানিকটা গিয়ে উঁচু চটের জমি—ছোটখাট এক দ্বীপের মতন।

(ক্রমশঃ)

কবিতা

রামধনুরঙ্ মৈশুর ॥

হরপ্রসাদ মিত্র

মনকে দিলুম হিরণবরণ, সবুজ, বেগুনি গয়না,
কতো উচ্ছল ঢেউয়ের ঝাপ্‌টা—
কী জানি সয় কি সয়না।

ফুলে-জলে-রঙ ডুবেছি দুলেছি,
হেঁটেছি কী হিম সন্ধ্যায়
সিঁড়িতে সিঁড়িতে উঠেছি নেমেছি
রাঙা ফুল-তোলা রাস্তায়,
জলতরঙ্গ শাড়িতে সবুজ রোদ্দুরে—
আহা, জলে জলে কী শোভা, আবেশ
কাবেরী প্রতিমা কৃষ্ণা!
মনকে দিলুম অন্তত সেই রামধনুরঙ্ মৈশুর।

তারপরে জেনো।
মনে আছে মন, তোমাতে-আমাতে সংলাপ?
বাঁয়ে চাঁদ ছিল কৃষ্ণাতৃতীয়া সন্ধ্যায়,
নিচে উদাসিনী জলা কাবেরীর শব্দ।
কী হলুদ ভাঙা চাঁদের থালাটা
গাছের শিয়রে একলা,
আহা, বিজড়িত মাধুরী-জাগানো
সময় কখন কি কয় না—
জানি না, জানি না কিসে কী হয় বা হয় না,
তবু এসেছিল—মন মায়াবিনী,
সেও চিরকাল রয় না।
মনকে দিলুম অন্তত সেই রামধনুরঙ মৈশুর।

দোসর ॥

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

সকলে সত্যিই একা পৃথিবীতে?
যতই থাকুক ভিড়, পথে-ঘাটে,
ট্রেনে-ট্রামে, হাটে বা বাজারে—
দূরে থেকে দেখা হাজার নক্ষত্র যেন
অন্ধকার আকাশে সাজানো—
অথচ নিঃসঙ্গ, নির্জন কতো।
বাসে যত ঠেলাঠেলি,
হাতল সম্বল করে ঝোলা—
তবু কত নিঃসঙ্গ একাকী :
একাই চলেছি আমরা যে যার সড়কে
শুধু এক প্রেম ছাড়া
সঙ্গী নিয়ে পৃথিবীতে কেউ কি চলেছে?

প্রেম দেখি কখনো একাকী নয়,
কখনো সে সঙ্গীহারা হয়ে আসে না অন্তরে,
যন্ত্রণা দোসর তার; সর্বদা সে
উপস্থিত—সঙ্গে নিয়ে অমৃত-যন্ত্রণা!

প্রেম ছাড়া সবাই একক,
নির্জন নিঃসঙ্গ হয়ে আমরা চলেছি।

অসম্ভব সম্ভব হয়না !!

শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়

রোমান সীজার ক্যালিগুলা
আকাশের চাঁদ চেয়েছিল,
পারেনি—
অসম্ভব সম্ভব হ'ল না।

রোজ জ্বলে যায়
নীরবে নির্জনে, নীরোর গিটার
সুরের শিহরণ তোলে,
দুঃখের তীব্র আর্তনাদ
আচ্ছাদিত করে
নীরোর বাঁশির মূর্ছনা।

মানুষের দুঃখ বোঝা করা
পুঞ্জীভূত কালো মেঘ
ভেসে যায় আকাশে,
ঈশ্বরের পৃথিবীতে
সকলেই বিধ্বস্ত, মানুষও।
কেউ সুখী নয়,
অসম্ভব সম্ভব হয় না।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মানুষের দুঃখ, বেদনা, সমস্যা ও লেখকগণের কর্তব্য

আজকের দিনে বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবন নানা সমস্যা ও দুঃখ-বেদনায় জর্জর। কবি ও লেখকগণের কর্তব্য হলো তাঁদের রচনায় এই সমস্ত সমস্যার কথা তুলে ধরা ও তার সমাধানের জন্য পথ-নির্দেশ করা। উপরোক্ত মর্মে 'অমৃত' সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সম্প্রতি রাউরকেলায় একটি ভাষণ দেন। শ্রীঘোষ রাউরকেলায় নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের একটি শাখার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ-প্রসঙ্গে তাঁর এই বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানে সম্মেলনের আনুপূর্বিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু বাংলা ও ওড়িশার লেখক ও কবিদের মধ্যে দীর্ঘকালের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের কথা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাউরকেলা বাঙালী সমিতির সভাপতি শ্রীমনোরঞ্জন গাঙ্গুলী।

পরিবেশ ও মানব প্রকৃতি

'বিয়ন্ড ফ্রিডম এন্ড ডিগনিটি' গ্রন্থের রচয়িতা প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডঃ বি এফ স্কিনার, তাঁর একটি সাম্প্রতিক রচনায় (অ্যাবাউট বিহেবিয়রিজম) বলেছেন যে, আজকের পৃথিবীতে পরিবেশ আর মানব প্রকৃতির মধ্যে যে সংঘাত চলছে, তার কবল থেকে মানবসমাজকে রক্ষার এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তির পথ খুঁজে পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো দ্রুত 'পরিবেশ'-এর পরিবর্তন ঘটানো। মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটানো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আজকের সমস্যা-জর্জর সমাজ কোন কিছুর জন্যই অধিক কালক্ষেপ করতে পারে না, কাজেই পরিবেশের পরিবর্তন ঘটানোই হল আশু কর্তব্য।

বেঙ্গল থিওজফিক্যাল ফেডারেশনের শতবার্ষিকী উৎসব

হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ইসলাম জৈন শিখ পারসিক প্রভৃতি নানা ধর্ম, তথা আন্তর্জাতিক প্রার্থনার মধ্য দিয়ে গত ১৭ নভেম্বর কলকাতায় বেঙ্গল থিওজফিক্যাল ফেডারেশনের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ থিওজফিক্যাল ভাবধারার প্রবর্তক প্রখ্যাত রুশ পরলোকতত্ত্ববিদ মাদাম ব্লাভাট্স্কি ও মার্কিন প্রেততত্ত্ববিদ কর্নেল অলকটের সঙ্গে তাঁর পিতা মহাত্মা শিশিরকুমার ও অন্যান্যদের যোগাযোগের কথার উল্লেখ করে বলেন যে 'সকল ধর্মের লক্ষ্যই এক। সে কারণে বিভিন্ন ধর্মের বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে পারলে পৃথিবীতে অশান্তি থাকবে না।' ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক নারায়ণদাস বসু বলেন : 'বর্তমানের ধর্ম আচরণ মানব সমাজের সমস্যা দূর করতে পারে নি। বরং মানুষের মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হিংসা ছড়িয়েছে'। এই অনুষ্ঠানে ফাদার ফালো ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ সি এস চারি ও বিচারপতি রমেন্দ্র দত্ত প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌গণও ভাষণ দেন।

ভারতীয় রাশিবিজ্ঞান সম্মেলনের সভাপতির পদে বাঙালী

নিখিল ভারত রাশিবিজ্ঞান সম্মেলনের ৩৭ বৎসরের ইতিহাসে এবারই প্রথম একজন বাঙালী অধ্যাপক সম্মেলনের সেক্রেটারীর পদে বৃত হয়েছেন। সম্প্রতি চন্ডীগড়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনের ৩৪তম অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই বিশিষ্ট মর্যাদালাভ করেছেন অধ্যাপক নির্মল বসু।

নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কলকাতা ও ২৪ পরগণা শাখার বিজয়া সম্মিলনী

গত ৯ নভেম্বর ত্রিপুরা হিতসাধিনী ভবনে নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কলকাতা শাখার বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। শাখা সম্পাদক শঙ্কর বসু, কোষাধ্যক্ষ অনিল চক্রবর্তী এবং শাখার সভাপতি দক্ষিণারঞ্জন বসু উপস্থিত সদস্যগণকে শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজা বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। শাখার সভাপতি দক্ষিণাবাবু সম্মেলনের আসন্ন আগরতলা অধিবেশনের গুরুত্বের কথা সকলকে বিস্তারিতভাবে বলেন।

সম্মেলনের ২৪ পরগণা শাখার বিজয়া সম্মিলনীও ডাঃ শ্যামসুন্দর বসাকের সভাপতিত্বে ঐ একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়।

পাখী সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থ

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় পাখী বিশেষজ্ঞ শ্রীসালিম আলি ও পাখী রক্ষার আন্তর্জাতিক পরিষদের সভাপতি ডঃ এস ডিলোন রিপলে কর্তৃক যৌথভাবে রচিত 'হ্যান্ডবুক অব বার্ডস অব ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান' নামে একখানি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের পাখীদের সম্পর্কে গ্রন্থখানি সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

রাউরকেলায় শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সম্বর্ধনা

গত ১৫ই নভেম্বর রাউরকেলায় বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'অমৃত' সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে সম্বর্ধনা জানান হয়। শ্রীঘোষ নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন-এর সভাপতি হিসেবে ইস্পাতনগরীতে কয়েকদিন পূর্বে এসেছিলেন সেখানে সম্মেলনের একটি শাখার উদ্বোধনের

জন্য। শ্রীঘোষ সম্বর্ধনার উত্তরে তাঁর ভাষণে বলেন যে, স্থানীয় বাঙ্গালীরা যেন ভ্রাতৃজ্ঞানে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সর্ব বিষয়ে একযোগে কাজ করে ওড়িশাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়াসের ফলে মানুষের মন থেকে ভেদবুদ্ধি লোপ পায়। তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট আবেদন জানান যে, তাঁরা যেন বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত অধিবাসী—যাঁরা এখানে বসবাস করেন, তাঁদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন। এ সবের ফলে আমাদের জাতীয় সংহতি দৃঢ়তর হয়ে উঠবে বলে তিনি আশা পোষণ করেন। এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু তাঁর ভাষণে বলেন যে, বাংলা ও ওড়িশার লেখকগণ মিলিতভাবে দুই প্রদেশের জনগণের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছেন। জাতি গঠনের প্রয়াসে তিনি সকলকে একত্রিত হতে আহ্বান জানান।

স্বর্গত মেননের পুঁথিপত্র ত্রিমূর্তি ভবনে রক্ষিত হবে

স্বর্গত নেতা কৃষ্ণমেনন তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ও মূল্যবান চিঠিপত্রের সমগ্র সংগ্রহ জাতির উদ্দেশ্যে দান করে গেছেন। সে-সব যাতে যথাযথভাবে সংরক্ষিত থাকে, সেই জন্য ভারত সরকার সমগ্র সংগ্রহটি ত্রিমূর্তি ভবনে রাখার বন্দোবস্ত করেছেন।

—জরৎকার,

নতুন বই

বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ (প্রথম খন্ড)। ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। আশা প্রকাশনী ৭৫ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা—৯। কুড়ি টাকা।

একদা এক নৎসী দার্শনিক বলেছিলেন মানুষ হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্যাসিলাস। এক ফরাসী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক জানিয়েছেন তিনি নাকি মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিন্তু মানুষকে ভালবাসতে পারেন না। বড় বড় পন্ডিতদের চুলচেরা বিচারে ও পান্ডিত্যের অভিযান প্রমাণে এরকম সব বিকৃত ব্যাখ্যা অন্তত মানুষ সম্পর্কিত হতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে মানুষকে দূরে সরিয়ে রেখে এই সব ভয়াবহ আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা আজ সারা পৃথিবীকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

মহাভারতে যদুবংশ ধ্বংসের আগে কথিত আছে একটা কালো ছায়া—কালপুরুষের মত-ইতস্তত ঘুরে বেড়াত। বস্তুত প্রতীকী ব্যাখ্যায় তা নিশ্চয়ই যাদবদের চরম নিয়তিরই প্রতিরূপ ছিল। বর্তমান পৃথিবীর ওপর দিয়ে এই সব সভ্য মানুষেরই সামনে দুটি বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে—তার পরের অবস্থা গভীর গোপন বিষ প্রয়োগের মত মানুষের একক সত্তায় একজাতীয় বিচ্ছিন্নতাবোধ জাগছে বলে কোন কোন দার্শনিক মনস্তাত্ত্বিক মনে করেন। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ সত্যই সম্ভব কিনা তা নিশ্চয়ই পরীক্ষামূলকভাবে বিচার্য কিন্তু সম্প্রতি শোনা এই 'বিচ্ছিন্নতা' নিয়ে বাংলায় একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—'বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ' লেখক বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা ও উৎসাহের উপান্তে এসে লেখক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'বিচ্ছিন্নতা' নামক শব্দ তার ব্যাপক অস্তিত্ব ও প্রয়োগের একটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা এবং বাস্তব জীবনে এর ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আলোচনাটি যেমন বিশ্লেষণে অত্যন্ত গভীরে নেমেছে সেই সঙ্গে এইজাতীয় বোধের আদি উৎসর বিকাশ ও বিভিন্ন পন্ডিত মনীষী এর যে সব ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন বিভিন্ন আলোচনায় আলোচ্য লেখক তার সুনিপুণ প্রয়োগ করে আপন সুস্থ জিজ্ঞাসার স্বাক্ষর রেখেছেন।

গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন। ভূমিকাটি নিশ্চয়ই বর্তমান গ্রন্থ পাঠের অন্যতম চাবিকাঠি। ভূমিকা অংশে লেখক স্পষ্টত জানিয়েছেন সর্বাঙ্গীণ ও সর্বজনীন মানববিকাশ তো ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতর অভ্যুদয়ের আয়োজন সে তো সমূহের নিকট আত্মবলি নয় নিশ্চয়ই সমগ্রের দিকটা বিচিত্র মানবসত্তার বিলুপ্তি নয়। বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস প্রসঙ্গে বলেছেন 'একদিকে তা সুপ্রাচীন--কিন্তু মানুষ আরও সুপ্রাচীন।' মানুষকে ভালবেসেই মূল লেখক শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় বিচ্ছিন্নতার ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ'-এ।

লেখক ডাঃ গঙ্গোপাধ্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ভাগ করে বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ স্বতন্ত্র আলোচনা আধুনিক মনস্তত্ত্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার সমস্যার যোগ মার্কস-এর বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্ব পশ্চিমী সমাজতত্ত্ব—সমাজচেতনা ও বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গ রবীন্দ্রমানস বিশ্লেষণ মার্কস ফ্রয়েড প্রসঙ্গ ছাত্র বিক্ষোভ আক্রমকের মন ও সমাজের কথা এমন কি অটোমেশন প্রসঙ্গকেও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। লেখক তাঁর প্রাক কথায় স্পষ্টত জানিয়েছেন—বিচ্ছিন্নতার বিমূর্ত ধারণায় আমার ঔৎসুক্য নেই। বিচ্ছিন্ন মানুষের বেদনা যন্ত্রণা ও তাদের সংযুক্তির আকুতির সঙ্গে আমি পরিচিত বিচ্ছিন্নতার মূর্তরূপে আমার অনুসন্ধিৎসা।'

লেখককে ধন্যবাদ তিনি বিচ্ছিন্নতার শূন্যতায় এসে তাঁর বক্তব্য শেষ করেননি বা তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত টানেননি। বাস্তবিক অর্থে বিচ্ছিন্নতা থাকতে পারে কিনা—তাতেই সংশয় থাকে। মানুষ যে জন্মমুহূর্ত থেকেই এই পৃথিবীর প্রকৃতি আলো বাতাস গাছপালা সব কিছুর সঙ্গেই একটা সমগ্রতার অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে! এটাই তো তার মানবতার একমাত্র সত্য—এক অর্থে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সমতুল্য। তাই বিচ্ছিন্নতার স্বীকৃতি সম্ভবই নয় জীবনে সমাজে ধর্মে দর্শনে মানবাত্মা--কোথাও।

গয়টে প্রমুখ ঠিক বলেছেন 'মানুষ শুধু ব্যক্তিসত্তা নয় সমগ্র প্রজাতিসত্তা নিজের মধ্যে বহন করে। লেখক তার বক্তব্যের যুক্তি তর্কে প্রমাণের সূত্রে ইয়ুং কাফকা কামু কিয়েকের্গার্ড সার্ত্রে অ্যালডুস হাক্সলি ইত্যাদির মতের বিস্তৃত পরিচয় রেখেছেন। গ্রন্থটি কিন্তু আদৌ কথার ও মতবাদের তালিকা হয়নি সমস্ত মতকে সম্মিলিত করে অদ্ভুত সহজ সরল বুদ্ধিদীপ্ত ভাষায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় যে বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ গ্রন্থটি রচনা করেছেন তা বাংলা ভাষায় একটি মূল্যবান দলিল বিশেষ এবং সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীদের অবশ্য সংগ্রহযোগ্য।

পাপ (গল্প সংকলন)। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। জ্যোতি প্রকাশন ২-এ নবীন কুণ্ডু লেন কলকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সাম্প্রতিককালের বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শক্তিমান কথাকার। তিনি সমকালের তরুণ লেখকদের থেকে স্বতন্ত্র বিষয় মানসিকতা ও ভাষায় তাঁর গল্প-উপন্যাস লিখতে অভ্যস্ত। শুধু তাই নয় মানুষের জীবনের গভীরতম অস্তিত্বের মূল্যায়ন ভাবনা তাঁর প্রতি রচনায় তাঁকে

মহৎ কোন তাৎপর্য অনুসন্ধানে আড়ষ্ট করতে দেখি।

পাপ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সম্প্রতি প্রকাশিত গল্প সংকলন। এই গ্রন্থে মোট চারটি গল্প—পাপ দুঃখরোগ ভাগের অংশ উত্তরের ব্যালকনি—সংকলিত হয়েছে। পাপ গল্পটি বড় আকারের। পাপ গল্পে এক বিবাহিত যুবক-যুবতী — হিরণ্ময়-উমার আত্মদর্শনের গল্প। স্ত্রী উমা এক সকালে ওদের রান্নাঘরে এক অবৈধ শিশু পড়ে থাকতে দেখে। কে এই অবৈধ শিশু কার পাপে এমনভাবে এক শিশু অবহেলিত? শিশুকে পেয়ে উমা উল্লসিত ও শঙ্কিত হলেও হিরণ্ময় ক্রমশ নিজের ভিতর থেকে এক গভীর পাপবোধের যন্ত্রণায় বেশ্যা রেণুর কথা উমাকে বলে। উমা-হিরণ্ময়ের পরবর্তী সম্পর্ক—পুলিশ পরিত্যক্ত শিশুটিকে নিয়ে যাবার পরেও অদ্ভুত এক জীবনকথায় শেষ করেছেন লেখক। দুঃখ-রোগ গল্পে বাদলের নিজ অস্তিত্ব-উপলব্ধি ভাগের অংশে নায়ক দীপ্তিময় নায়িকা স্ত্রী রমার চরিত্র নিহেত বৈপরীত্য উত্তরের ব্যালকনি গল্পে স্বামী-স্ত্রী তুষার কল্যাণীর মধ্যে পাগল অরুণ—যে একদা কল্যাণীর প্রেমিক ছিল এবং সব হারানোর আঘাতে আজ পাগল হয়ে গেছে—তার অসম্ভাব ও ত্রিকোণ সম্পর্কের সিদ্ধান্ত তরুণ প্রতিষ্ঠিত লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় অদ্ভুত জীবন-ব্যাখ্যায় শেষ করেছেন। পাপ গ্রন্থটি লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের একটি উল্লেখ্য স্থান নির্দিষ্ট করে।

অজান্তে (উপন্যাস)। মনাম্নী। শিপ্রা-মুদ্রা প্রেস, ১৬ জি টি রোড বালী হাওড়া। পাঁচ টাকা।

নায়কের নাম কানু। তারই জবানীতে লেখা উপন্যাস অজান্তে। লেখক মনাম্নী। দূর সম্পর্কের ছোড়দির সঙ্গে কৈশোরকাল থেকেই প্রেম। একান্নবর্তী পরিবারে পিতৃ-মাতৃহীন কানু মানুষ হয়েছে। ছোড়দির আকর্ষণ তাই অমোঘ। বিয়ের পরেও ছোড়দির সঙ্গে কানুর দেখা। এদিকে আর এক মাসীমা যে সংসারে তিক্ত-বিরক্ত, তার সঙ্গেও কানুর সম্পর্ক। এই সব অতি পরিচিত ঘরোয়া পরিবেশে, নায়কের কৈশোরের গ্রাম-স্মৃতি ও অন্যান্য সূত্রে লেখক যে কাহিনী বলেছেন তা গতানু-গতিক, এক ঘেয়ে।

প্রেম অমৃত (উপন্যাস)। করুণাসিন্ধু পালিত। নাথ ব্রাদার্স, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। সাত টাকা।

এক বিদেশিনী—ডরোথি যার নাম তার সঙ্গে এক বাঙালী যুবক গৌতম—উভয়ের প্রেম কাহিনী। দুজনেই রূপ-সৌন্দর্যের আকর বিশেষ। গৌতম জমিদার তনয়, ডরোথির পিতামহরা ব্যবসার সূত্রে এদেশে আছে। গৌতমরাও ব্যবসা করে। নিছক প্রেম তা-ও গতানুগতিক। লেখকের উপ-ন্যাসের ভাষাজ্ঞান আদৌ নেই। প্রেমের আবেগের ভাষাও হাস্যকর। এ কাহিনী আজ থেকে একশ বছর আগে চলত হয়তো।

শারদ সাহিত্য

সমাচার—অনিল ভট্টাচার্য। ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বর্তমান সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ। সুনির্বাচিত গল্প কবিতা ছাড়াও শিশুদের বিভাগের রচনাগুলি পত্রিকাটির অন্যতম সম্পদ। লিখেছেন জ্যোতি-র্ময় গাঙ্গুলী নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ দত্ত, সুবিমল রায় প্রলয় সেন, কার্তিক লাহিড়ী, বিমল চৌধুরী গোপাল দে, রঞ্জিত সেন এবং আরো অনেকে। পত্রিকাটি সংগ্রহযোগ্য।

সাহিত্যিকা। পুরুলিয়া কবি সম্মেলন স্মারক ১৯৭৪। সম্পাদক—শান্ত সিংহ।

গঙ্গোত্রী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত কবি সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত শোভন এই স্মারক সংকলনটি নানা কারণেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে কলকাতা ও গ্রাম-বাংলার বিভিন্ন কবির সুনির্বাচিত কবিতা ছাড়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন —দিনেশ দাস মণীন্দ্র রায় নীরেন্দ্রনাথ চক্র-বর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টো-পাধ্যায় ও আনন্দ বাগচী প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন যথাক্রমে—অমিতাভ দাশগুপ্ত, শান্তনু দাস, প্রত্নল দত্ত, রূপাই সামন্ত রবি গঙ্গোপাধ্যায়। সাম্প্রতিক কবি ও কবিতা সম্পর্কিত ব্রহ্মচারী অমিতাভ'র আলোচনাটি আকর্ষণীয়। পত্রিকাটির আঙ্গিক, সম্পাদনায় শান্ত সিংহের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

আধুনিক কবিতা। সম্পাদনা রেখা দত্ত। ৩২ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট। কোলকাতা—৯। দাম—দেড় টাকা।

এই সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, নির্মলেন্দু মজুমদার তুলসী মুখোপাধ্যায় এবং পরেশ-নাথ মুখোপাধ্যায়। ছাপা পরিচ্ছন্ন। প্রচ্ছদ ও ভালো।

সীমান্ত—সম্পাদক : গণেশ বসু ও দীপেন রায়। ৬সি স্কট লেন। কলকাতা-৯। দাম দু টাকা

কবিতা ও কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ-পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটিতে বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রায় সকল কবিরই রচনা স্থান পেয়েছে। জর্জ টমসনের 'মার্কসবাদ ও কবিতা' নামক গ্রন্থের অনুবাদ বেরোচ্ছে ধারাবাহিকভাবে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সমালোচনা উল্লেখযোগ্য। ছোট হলেও পত্রিকাটি ভাল।

গল্পমাল্য। সম্পাদনা সচ্চিৎ সুন্দর দাশ। ২৯ রাজেন্দ্রনগর। জামসেদপুর ৮৩১০০১।

শুধুমাত্র ছোট গল্প নিয়েই 'গল্পমাল্য' পত্রিকার পরিচ্ছন্ন এই শারদ সংকলনটি আত্মপ্রকাশ করেছে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রণব বসু এবং আলোক ভট্টাচার্যের গল্প ভালো লাগল। খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদ উচ্চমানের।

নবকাল। সম্পাদনা ইরা দত্ত। ফ্ল্যাট নং জি-৪, হাউজিং এস্টেট। এল আই জি ৩৭ বেলগাছিয়া রোড। কলকাতা ৩৭। দাম—এক টাকা।

মোটামুটি পরিচ্ছন্ন এই পত্রিকাটিতে বেশ কিছু কবিতা গল্প এবং ফিচার ছাপা হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং কৃষ্ণ ধরের কবিতা ভালো লাগল কয়েকটি ভালো গল্প লিখেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু এবং বোম্বানা বিশ্বনাথম। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখো-পাধ্যায়ের স্মৃতিচারণটি পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের 'মানুষ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' লেখাটিও ভালো।

বার্তিকা। সম্পাদক মনীশ ঘটক। বহরমপুর। মুর্শিদাবাদ। দাম—এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

'ক্ষুধিত উপন্যাসের মিঃ সুজাকর এবং প্যাপলা গল্প উপন্যাসে গ্রাম কোথায়?' জ্যোতি রায় এবং কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা দুটি উল্লেখ করার মতো।

অনুভূতি। সম্পাদক সুশান্ত দত্ত। ইছাপুর। গোবরডাঙ্গা। ২৪ পরগনা। পঞ্চাশ পয়সা।

লিখেছেন, কৃষ্ণ ধর সুশীল মহান্তি কার্তিক দত্ত অমল মন্ডল তপন দাস এবং আরও কয়েকজন।

ল্যাম্পপোস্ট। সুশীলকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত। মহিষাদল। মেদিনীপুর। দাম দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কিছু বিশেষ ধরনের ছড়া ছড়ানো ছিটোনো রয়েছে পত্রিকার সর্বাঙ্গে। প্রথম গুচ্ছের কবিতার মধ্যে গোটাকয়েক কবিতা ভালো লেগেছে। ভালো গল্প লিখেছেন শান্তিকুমার দত্ত এবং বেণীমাধব ভট্টাচার্য। প্রভুরাম খাটুয়ার নিবন্ধটিও ভালো। উপন্যাস লিখেছেন সম্পাদক স্বয়ং। হরিদাস সরকারের লেখা উল্লেখযোগ্য।

প্রতিবিম্ব। সম্পাদক সাধন ধুমিয়া। বাঙ্গালী পাড়া। সাবকাশ্চা বিলাসপুর। মধ্যপ্রদেশ। দাম—দু টাকা।

'বিলাসপুর তথা ছত্তিসগড়ের ইতিহাস' 'বিলাসপুরে বাঙ্গলা সাহিত্য চর্চা' 'বিলাসপুরে সেকালের এবং একালের বাঙ্গলা নাটকে এবং নাট্য প্রয়াস' শীর্ষক লেখাগুলি উল্লেখ করার মতো।' 'বিলাসপুরে ভাস্রযোগ' লেখাটিও পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। ইদানীংকালের এক জটিল সমস্যা—কাগজ সংকট নিয়ে সময়োপযোগী আলোচনা করেছেন অমৃতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়।

এপার বাংলা। সম্পাদনা সরোজ মিত্র। ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম—চার টাকা।

পরিচ্ছন্ন রুচির এই পত্রিকাটিতে বেশ কিছু ভালো প্রবন্ধ, একটি উপন্যাসের মতো ভ্রমণ কাহিনী একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস একটি বড়ো গল্প গোটা কয়েক ছোট গল্প এবং অসংখ্য কবিতা রয়েছে। এছাড়া চিত্রকলা এবং চলচ্চিত্র বিষয়েও আলোচনা আছে। তরুণ সান্যালের কবিতা পত্রিকার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প উল্লেখ করার মতো। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটিও ভালো লেগেছে। বনফুলের দিনলিপিটি পত্রিকার একটি অন্যতম আকর্ষণ। আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং সরোজমোহন মিত্রের প্রবন্ধ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। ছাপা এবং প্রচ্ছদ ভালো।

কলম। সম্পাদনা তাপসকুমার মজুমদার। ৩৬ ডি, কে পি লেন। কলকাতা-২৬।

শারদীয় কলমে গল্প লেখকদের তালিকায় রয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র বনফুল বিশ্বনাথ রায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং পৃথ্বীরাজ। দুটি উপন্যাস লিখেছেন অজিত পুততুন্ডা এবং এস আমিতাভ। অজিতবাবুর উপন্যাসটিতে শক্তির পরিচয় আছে। ছাপা পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত ছিল।

সাহানা। গোপেন লাহিড়ী সম্পাদিত। ২৫।১ চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলকাতা—২৫। দাম—সাড়ে চার টাকা।

লেখক তালিকায় রয়েছেন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গৌরাঙ্গ ভৌমিক শংকর চট্টোপাধ্যায় শরৎ মুখোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় শঙ্খ ঘোষ অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

নবজাতক। সম্পাদনা মৈত্রেয়ী দেবী। ১৩।১ পাম এভিনিউ। কলকাতা—১৯। দাম—আড়াই টাকা।

গল্প লিখেছেন আশাপূর্ণা দেবী, সুশীল রায় বারীন্দ্রনাথ দাশ পরেশ সাহা জীবন সরকার বোম্বনা বিশ্বনাথম এবং আরও কয়েকজন। জীবন সরকারের গল্প ভালো লেগেছে। ভালো লেগেছে কবিরুল ইসলাম প্রভাকর মাঝি এবং নচিকেতা ভরদ্বাজের কবিতা। নারায়ণ চৌধুরী দীপঙ্কর সেন এবং গিরীন্দ্রনাথ দাশের প্রবন্ধগুলির কথা উল্লেখ করতেই হয়। ছাপা পরিচ্ছন্ন।

ঝংকার। সম্পাদক কল্লোল সরকার। হিমাচল সংঘ। খোলাপোতা। ২৪-পরগণা। দাম এক টাকা।

বীণা। হীরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং অমিয়কুমার দাস সম্পাদিত। বাঙালী সংঘের বাজার। বাওয়ালী। ২৪-পরগণা।

সাহিত্য চিন্তা। সম্পাদক কিরণশংকর সেনগুপ্ত। ৩১১ গাঙ্গুলী বাগান। কলকাতা-৪৭। দাম দেড় টাকা।

দরবারী—সম্পাদক কল্যাণ চক্রবর্তী। ৩০, লেনিন সরণী, কলকাতা—১৩। দু' টাকা।

দরবারী সাহিত্য শারদ সংখ্যা কল্যাণ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। লেখকসূচীতে আছেন সর্বশ্রী মণীন্দ্র রায়, বিমল কর, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, সুধাংশু ঘোষ, দিব্যেন্দু পালিত অমিতাভ দাশগুপ্ত ইত্যাদি। পত্রিকাটি রুচিসম্মত সাহিত্য পত্রিকা।

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

তিনটে চিঠিই পোস্ট করা হয়েছে সমুদ্রের ধার থেকে, মানে বন্দর থেকে। প্রথমটি পন্ডিচেরী, দ্বিতীয়টি ডান্ডি, তৃতীয়টি ইস্ট লন্ডন থেকে। অর্থাৎ পত্রলেখক জাহাজে বসে আছে।

কিন্তু প্রথম চিঠি এসে পৌঁছোনোর সাত সপ্তাহ পরে হত্যাকারী এল এলিয়াসকে খুন করতে। কেন? না, চিঠি এসেছে কলের জাহাজে। হত্যাকারী এসেছে পালের জাহাজে। দ্বিতীয় চিঠির বেলা কিন্তু তিনদিনের বেশী সময় লাগল না। কেননা, ডান্ডি থেকে হর্সহ্যাম বেশীদূর নয়। তৃতীয় চিঠি পোস্ট করা হল খাস লন্ডন শহর থেকেই।

হোমস সারাদিন জাহাজঘাটায় বসে পুরোনো রেকর্ড ঘেঁটে বার করে ফেলল কোন পাল তোলা জাহাজটা অমুক-অমুক সময়ে পন্ডিচেরী, ডান্ডি আর ইস্ট লন্ডনে ভিড়েছিল। 'লোন-স্টার' নামটাও মার্কিনি নাম—আর কোনো সন্দেহও রইল না।

কে-কে-কে একটা গুপ্ত সংস্থার নাম। নিগ্রোহত্যার জন্যে কুখ্যাত। খুন করার আগে পাঠানো হত ওক গাছের পাতা। কখনো তরমুজের বিচি, নয়তো কমলার বিচি। মৃত্যু আসত তারপরেই। এলিয়াস বিশ্বাসঘাতকতা করে কে-কে-কে সংঘকে ভেঙে দিয়ে টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়ে এসেছিল ইউরোপে।

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

।। সতেরো ।।

শ্রীঅরবিন্দ আমাকে অনেকগুলি চমৎকার পত্র লিখেছিলেন মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের সম্বন্ধে। সে সব চিঠি আমার YOGI SRI KRISHNAPREM -এ মুদ্রিত হয়েছে, প্রকাশক—বম্বের ভারতীয় বিদ্যাভবন। তবু সে চিঠিগুলির মধ্যে কয়েকটি চিঠি আর সেই সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমেরও দু-একটি চিঠি অনুবাদ করে এখানে পেশ করতে চাই বলে কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতেই হবে, আরো এই জন্যে যে এক, সে ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম; দুই, তার কাছে আমি গুরুভক্তি তথা কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে অনেক কিছুই পেয়েছিলাম ও শিখেছিলাম যা স্মরণীয়, বরণীয় মহনীয়। তার সম্বন্ধে আমি প্রথম লিখে ইংরাজীতে প্রকাশ করি আমার AMONG THE GREAT -এ। (বাংলায়ও কিছু লিখেছিলাম আমার 'আবার ভ্রাম্যমাণ' ভ্রমণকাহিনীতে বোধহয় ১৯২৩ সালে, কিন্তু সে-বইটি এখন পাওয়া যায় না।)

রোনাল্ড নিকসন বোধহয় ১৯২০ সালে এসে লখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হন। আমার সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম পরিচয় হয়—১৯২৩ সালে—তখন সে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অতিথি হয়ে। তাঁর স্ত্রী মণিকা দেবীকে নিকসন মা বলে ডাকত—তিনি তাকে গোপাল বলে সম্বোধন করতেন। অতঃপর সে মণিকা দেবীর কাছে দীক্ষা নেয় কৃষ্ণমন্ত্রে—তিনি তাকে নাম দেন কৃষ্ণপ্রেম যখন সে মণিকা দেবীর সঙ্গে কাশীতে যায় অধ্যাপক হয়ে। তার দু-তিন বৎসর পরে মণিকাদেবী যশোদা মা নাম নিয়ে মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে প্রয়াণ করেন আলমোরা থেকে ষোল মাইল দূরে মিরতোলা গ্রামে এক কৃষ্ণমন্দির প্রতিষ্ঠা করে- গভীর অরণ্যে, মঞ্জুল পরিবেশে। আশ্রমের নাম হয় উত্তর বৃন্দাবন। আমি সেখানে গিয়ে কয়েক দিন ছিলাম পরমানন্দে—বোধহয় ১৯৩৩ সালে—কিন্তু সে পরের কথা পরে বলব।

আমাকে কৃষ্ণপ্রেম ১৯২৩ সালে লখনৌয়ে বলে শ্রীঅরবিন্দের ESSAYS ON THE GITA পড়তে। শ্রীঅরবিন্দের নানা তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি ও গভীরতর সে এত প্রশংসা করে যে আমি বইটি পড়ি। অতঃপর কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে আমার বহু পত্রালাপ হয়েছিল—সে-আশ্চর্য পত্রাবলীর কয়েকটি আমি আমার AMONG THE GREAT এ ছাপাই পরে YOGI SRI KRISHNAPREM এ আরো অনেকগুলি পত্র ছাপিয়ে প্রকাশ করি ১৯৬৫ সালে তার দেহান্তের পরে। সে কলকাতায় আমার অতিথি হয়ে ছিল কিছুদিন ১৯২৯ সনে। প্রয়াগে তার সঙ্গে পরে দেখা হয়। মণিকা দেবী আমার গান ভালোবাসতেন তাই তাঁকে ও কৃষ্ণপ্রেমকে আমি প্রায়ই আমার নানা কৃষ্ণকীর্তন শোনাতাম। মণিকা দেবী—যশোদা মা' বলাই ভালো—আমাকে পরে আশীর্বাদ করেছিলেন : ঠাকুর আমাকে আজ দেখিয়ে দিয়েছেন, গানের মধ্যে দিয়েই তোমার কৃষ্ণদর্শন হবে বাবা—ধ্যানের জন্যে বেশী ব্যস্ত হোয়ো না।

এ ভবিষ্যদ্বাণী করেন তিনি একটি বিশেষ অতীন্দ্রিয় দর্শনের পরে। সেটি এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৯৪৩ সালে যখন আমি উত্তর বৃন্দাবনে গিয়ে যশোদা মা'র অতিথি ছিলাম তখন রোজই তাঁর মন্দিরে গাইতাম নানা ভজন, বিশেষ করে কৃষ্ণকীর্তন। এখানে মন্দিরটির একটু বর্ণনা দিতে হবে।

আমার ঘরটি ছিল যশোদা মা'র ঘরের পাশেই। তার পরে কৃষ্ণপ্রেমের ঘর। পাশে একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি করিডোর—শেষ হয়েছে মন্দিরের ওপাশে—যশোদা মা'র ঘর মন্দিরের এপাশে ; মাঝে একটা চৌকাঠ, সেখানে বসত কৃষ্ণপ্রেমের শিষ্যা মোতিরাণী হাসিখুশী সরলা বালা—যশোদা মার ছোট মেয়ে। ওদিকে একটি কুটিরে থাকত হরিদাস—যার সন্ন্যাসের পূর্বাশ্রমের নাম আলেকজান্ডার। সে লখনৌয়ে হাসপাতালের সার্জন ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে এসেছিল পরম বন্ধু কৃষ্ণপ্রেমের টানে। একটি ডিস্পেনসারী খুলে সে পাহাড়ীদের দাওয়াই দিত। সে গ্রামে মন্দিরে কোন গণ্ডগোলই ছিল না।

কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে রোজ সৎকথা হত। যশোদা মা-ও তাতে যোগ দিতেন—শরীর তাঁর খুব খারাপ হওয়া সত্ত্বেও। কৃষ্ণপ্রেমের নানা উজ্জ্বল উক্তি আমি আমার ডায়রিতে টুকে রাখতাম—পরে আমার YOGI SRI KRISHNAPREM -এ প্রকাশ করি। কৃষ্ণপ্রেম আদৌ চাইত না তার

[illegible] আমি কিছু লিখি। কিন্তু আমি [illegible] সোজাসুজি লিখতাম বাংলায় [illegible]তে—সেজন্যে সে সময়ে সময়ে [illegible] করত, বলত বিজ্ঞপ্তিতে তার [illegible] বর্তিত হয়। আমার সাফাই ছিল এই [illegible], মহাজনদের কথা প্রকাশ হওয়া [illegible]—দুর্জনদের দাপাদাপির প্রতিষেধক হতে পারে কেবল সাধুদের জ্ঞানবাণী ও ধর্মজীবন। কিন্তু এখানে তার কথা সংক্ষেপেই বলতে হবে—অন্যত্র তার সম্বন্ধে ফলাওই লিখেছি বলে। তবু তার কথা বলতে হচ্ছে কারণ সে আমাকে তার বলিষ্ঠ সমর্থন দিত যখন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে কৃষ্ণপূজার জন্যে আমার অনেক গুরুভাই আমার পরে অপ্রসন্ন হয়ে বলতেন যে, যেহেতু কৃষ্ণ Overmental এর প্রবর্তক সেহেতু তাঁকে বরণ করা শ্রীঅরবিন্দের Supramental যোগে দূষ্য, কেন না শ্রীঅরবিন্দ সুপ্রামেন্টাল অবতার। ফলে মাঝে মাঝে আমি যখন বিপন্ন হয়ে কৃষ্ণপ্রেমকে লিখতাম তখন সে জোরালো সুরেই বলত যে, কৃষ্ণ যখন আমার ইষ্ট তখন তাঁকে চাইলে আমার কোনো অপরাধ হতেই পারে না। কিন্তু এসম্বন্ধে পরে লিখেছি, তাই এখানে থেমে বলি উত্তর বৃন্দাবনে অপূর্ব অঘটনের কাহিনী (যদিও একথা লিখেছি আমার YOGI SRI KRISHNAPREM তথা "ছায়াপথের পথিক"-এ)।

সেদিন মন্দিরে আমরা ভজন করতে বসেছি কৃষ্ণপ্রেম মাঝে—তার ডান পাশে আমি আসীন, বাঁ পাশে মোতিরাণী—চৌকাঠের কাছে আসন পেতে—চৌকাঠের ওদিকে যশোদামার ঘর। কৃষ্ণপ্রেমের আরতির শেষে আমি ধরলাম তার সবচেয়ে প্রিয় গান আমার "বৃন্দাবনের লীলা"—গ্রামোফোনে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল—অনেকের মতে এই গানটিই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তন—কৃষ্ণের লীলা-বর্ণনা। গাইতে গাইতে আমার বুকের তার বেজে উঠল। কৃষ্ণপ্রেমের ভাবাবস্থা, মোতিরাণীর চোখের জলে নদী বয়ে গেল। গানের শেষে মন্দিরে থমথমে ভাব। আমরা সবাই নিশ্চুপ। এমন সময় হরিদাস এগিয়ে এসে (সে বসত আমাদের ঠিক পিছনে) কৃষ্ণপ্রেমকে বলল :

"জানো, মা বাইরের খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে দিলীপের গান শুনছিলেন।"

কৃষ্ণপ্রেম (চমকে উঠে) : সে কি? মা? খোলা বারান্দায়?

মোতিরাণী (শিউরে উঠে) : মা-র বুকে সর্দি বসেছে যে।

হরিদাস (সায় দিয়ে) : বটেই তো—এই ঠাণ্ডায়—

কৃষ্ণপ্রেম : তাহলে মা নিশ্চয়ই ওদিক দিয়ে ঘুরে এসেছিলেন গান শুনতে। কারণ এদিকের চৌকাঠের কাছে মোতিরাণী বসে ছিল—চলো তো।

আমরা সবাই পরপর চৌকাঠ পেরিয়ে [illegible] যশোদা মা-র ঘরে। দেখলাম—মা জলভরা চোখে খাটের উপর বসে—ঠায় [illegible] দেয়ালের দিকে চেয়ে।

কৃষ্ণপ্রেম : মা! তুমি কী বলে—

মোতিরাণী : শ্—শ্! দেখছ না, মা ভাবসমাধিতে!

আমরা সবাই হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

* * *

কিছুক্ষণ পরে সাড় ফিরে আসতেই যশোদা মা আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে ডাকলেন হাতছানি দিয়ে। আমি আসতেই ধরা গলায় বললেন : "বোসো বাবা—না, মাটিতে নয়—আমার খাটে—কাছে সরে এসো—আরো কাছে।"

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বসলাম খাটে মা-র পায়ের কাছে—ওরা তিনজন রোজকার মতন মাটিতেই বসল সতরঞ্চের উপর।

মা (গাঢ় কণ্ঠে) : কিছু দেখতে পেলে না, বাবা?

আমি (আশ্চর্য হয়ে) : দেখতে? কী মা?

মা (অশ্রুল কণ্ঠে) : ঠা...ঠাকুর।

আমার দেহের মধ্যে শিহরণ জেগে উঠল, বললাম : 'ঠাকুর? মানে কৃষ্ণ?"

মা : ঠাকুর আর কে বাবা? (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ জোর করে পরিষ্কার করে) তুমি যখন...শেষের দিকে...মানে, আখর দিচ্ছিলে না চোখের জলে?—ঠিক সেই সময়ে...হ্যাঁ, ঠাকুর এসেছিলেন...হ্যাঁ বাবা, প্রথমে আমার ঘরে। তারপর ঐ চৌকাঠ পেরিয়ে...মন্দিরে। আমি তো চৌকাঠ পেরিয়ে যেতে পারতাম না—মোতিরাণী বসে ছিল না?...কাজেই আমাকে...ওদিক দিয়ে ঘুরে যেতে হল...ঠাকুরের ডাক...না গিয়ে পারি?...তিনি তোমার পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে চুপ করে গান শুনছিলেন...হ্যাঁ বাবা...আমি দেখেছি খোলা চোখেই...কিন্তু তুমি দেখতে পাও নি?

আমি (বিহ্বল হয়ে) : মা মা...তবে...মানে...

মা (প্রেমে হেসে গদগদ কণ্ঠে) : হ্যাঁ বাবা...ঠাকুর নিজে এসেছিলেন...আর ছিলেন শেষ পর্যন্ত। [illegible] আমার দিকে চেয়ে. ঠোঁটের কোণে অপরূপ হা...হাসি। ও ঠা...ঠাকুর ঠাকুর ঠাকুর'

আমি মায়ের পায়ে মাথা রাখলাম...চোখের জল আর বাধা মানল না।

* * *

আমার দর্শন হত না—বলেছি। তাই মনে আমার আনন্দের আলো ছড়িয়ে পড়ার পরেই ফের ক্ষোভ জেগে উঠল। তবে মনে পড়ল—পরে মা আরো একটি কথার পুনরুক্তি করেছিলেন, তাতে কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছিলাম—যে, তিনি দেখতে পেয়েছেন—গানের মধ্যে দিয়েই আমার বস্তুলাভ হবে ধ্যান না করলেও। এর পরেও ধ্যান করেছি প্রায় রোজই (না করে পারি?) কিন্তু ধ্যানের পরে বিষাদ আর আমাকে ছেয়ে ধরত না, যশোদা মা-র আশ্বাস মনে পড়ত বলে।

কিন্তু এখানে একটু পিছিয়ে যেতে হবে। কারণ অনেকে হয়ত আমাকে ভুল বুঝবেন, ভাববেন ধ্যানে আমি কখনোই কিছু পাই নি। যা চেয়েছিলাম—মানে ইষ্টদর্শন—তা পাই নি বটে, কিন্তু এমন অনেক উপলব্ধি হয়েছিল যার ফলে আমার পথ চলা একটু একটু করে সহজ হয়ে আসছিল—এমন কি, আমি কর্মকেও যোগ বলে বরণ করতে আর তেমন বেগ পেতাম না। তাই আমার ধ্যানে পাওয়া কয়েকটি উপলব্ধির কথা এখানে বলব—যদিও PILGRIMS OF THE STARS এ কিছু কিঞ্চিৎ বিবৃতি দিয়েছি।

* * *

ধ্যানে বসে অনেক সময়ে আমার মাথার ঠিক উপরে—ব্রহ্মরন্ধ্রে—এ[illegible] চাপ অনুভব করতাম—যার ফলে [illegible]র মানসিক চঞ্চলতা গলে এক শ[illegible] নৈঃশব্দ্য গাঢ় হয়ে উঠত—কখনো কখনো শান্তিতে ছেয়ে যেত দেহ-মন—ফলে আমার মানস চেতনার গণ্ডী থেকে যেন কিছুক্ষণের জন্যে মুক্তি পেয়ে স্নিগ্ধ বোধ করতাম। শ্রীঅরবিন্দকে সব বর্ণনা করে একবার লিখেছিলাম :

> "On occassions I felt a heave in my heart — or shall I say, an ascent of my I-ness till it became very rarefied and faint".

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন (১৩-১০-১৯৩০) * :

এটি যোগের একটি মূল উপলব্ধি (fundamental experience) —চেতনার আরোহণ ভাগবত চেতনার সঙ্গে [illegible]

---

* এ-চিঠিগুলি অনুবাদ করা প্রায় অসম্ভব। তাই আমি সংক্ষেপে ভাবার্থটুকু পেশ করেছি। যাঁরা জিজ্ঞাসু তাঁরা PILGRIMS OF THE STARS -এ ষোড়শ অধ্যায়ে মূল পত্রগুলি পড়তে পারেন। যাঁরা যৌগিক অভিজ্ঞতা উপলব্ধি সম্বন্ধে তেমন উৎসুক নন তাঁরা এ-সংক্ষিপ্ত বিবৃতি থেকে কিছু খবর অন্তত পাবেন—যোগে কী ধরনের অনুভূতি আমার হয়েছিল তথা আরো অনেক সাধকের হয়। আমি এ-অনুভূতিগুলির উদ্ধৃতি দিচ্ছি—শ্রীঅরবিন্দের চিঠিগুলির খবর দিতে।

হতে...এরই ফলে তুমি শান্তি পাও। তোমার এ-সময়ে দেহ নিথর হয় নৈঃশব্দ্যের অভ্যুদয়।...এইই হল অধ্যাত্ম অনুভূতির ভিত—যার বিকাশ হবে চেতনার মুক্তিতে।"

আমার আর একটি উপলব্ধি হয়েছিল বড় বিচিত্র। ধ্যান করতে বসতেই অনায়াসে ধীর স্থির এক অবস্থা—যার মধ্যে শান্তির অখণ্ড রাজত্ব। আমি সচেতন অথচ যেন অর্ধ তন্দ্রাচ্ছন্ন— half-sleep.

শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য করলেন (জুন ২, ৩১) ঃ 'অর্ধ তন্দ্রা নয়, সিকি তন্দ্রাও নয়, সিকির সিকি তন্দ্রাও নয়। হয়েছিল কি, তোমার চেতনা অন্তর্মুখী হতেই বাইরের কিছু আর ঢুকতে পারল না...এ হল সমাধির সুরু (নির্বিকল্প নয় অবশ্য)। আমাদের চেতনা বড় বেশি বহির্মুখী বলে তাকে অন্তর্মুখী না করলে সে আন্তর লোকে বিচরণ করতে পারে না। কিন্তু অভ্যাস করলে মানুষ বাহ্য চেতনা বজায় রেখেও আন্তর চেতনায় স্থিতধী হতে পারে।...তখন দিব্য নৈঃশব্দ্যের অনুভূতি-লোকেও জাগ্রত অবস্থায়ই হবে এক মহত্তর ও শুদ্ধতর চেতনার অবতরণ।"

যোগীরা সবাই বলেন যোগে দীক্ষা পাবার পরে গুরুশক্তির ক্রিয়া সুরু হয় স্বপ্নেও। আমার নানা উপলব্ধি হত স্বপ্নে। একদা দেখলাম এক বিষধর জ্বলন্ত সাপ (গোখরো) আমার কাছে সরে এসে ধীরে ধীরে আমার মাথায়—ব্রহ্মরন্ধ্রে—ছোবল দিল। আমার মনে আতঙ্ক আসা তো দূরের কথা, আমার সমস্ত দেহে এক অবর্ণনীয় আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল। আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, আমি অর্ধসচেতন ছিলাম যদিও আমার দেহ ছিল ঘুমে অচল। শ্রীঅরবিন্দকে একথা লিখতে তিনি আমাকে উত্তর দিলেন (১-১১-৩২ PILGRIMS ১৬২ পৃঃ) ঃ

'তোমার স্বপ্ন সুন্দর ও সব সত্য যদি প্রতীক বলে তাকে চিনতে পারো। প্রসঙ্গতঃ, এ স্বপ্ন নয়—সংহৃত বহির্মুখী চেতনালব্ধ উপলব্ধি—তুমি জেগেই ছিলে কিন্তু ঠিক বাস্তব জাগরণের স্তরে নয়, আর এক স্তরে।

'সাপের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে এ-স্বপ্নটি তোমার কাছে এসেছিল ভগবানের উত্তর। তুমি প্রায়ই বলতে যে, ভগবান তাঁর ঠিক লীলা প্রকট করতে চান না—যদি তোমাকে জানিয়ে দিতেন যে, বাধারা তোমাকে ইষ্টমিলনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে তাহলে তোমার মন স্বস্তি পেত। এ-স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে তিনি তোমাকে জানিয়ে দিলেন যে, তুমি তাঁর সঙ্গে খেলার ঠিক ছন্দটি জানলে তিনিও তোমার সঙ্গে খেলতে রাজী। সাপের ছোবল তোমাকে দেখিয়ে দিল যে, বেদনা বা বিপদও তোমাকে আনন্দ এনে দিতে পারে, পারে ভাগবত আবির্ভাবের দিশা দিতে।...

আমি এ-সূত্রে তোমাকে আবার বলতে চাই—যদিও তোমার বাস্তব মন এখনো পুরো বিশ্বাস করতে পারে না—যে, তুমি অন্তরে যোগীই বটে—যে পারে ধ্যান আনন্দ ভক্তির নাগাল পেতে...যদিও বাইরে তুমি ঠিক এর উল্টো—আধুনিক, বহির্মুখী, প্রাণোচ্ছল যে যোগ বা আন্তর জগতের খবর রাখে না। এ-সত্যটি তোমাকে দেখবামাত্র আমার চোখে পড়েছিল—তোমার এর আগে নানা উপলব্ধিও যে এই সত্যেরই আভাষ দেয় একথা যে-কোনো যোগজ্ঞই বলবেন। যার মধ্যে এই আন্তর যোগী বিদ্যমান তাকে যোগপন্থী হতেই হবে...অন্তিমে যার যোগসিদ্ধি অবধারিত।'

৪-৯-৩১ তারিখে তিনি আমার কোনো একটি আকস্মিক উপলব্ধির ভাষ্য দিয়েছিলেন এক সুদীর্ঘ চিঠি লিখে। উপলব্ধিটি কুলকুণ্ডলিনীর সম্বন্ধে। এ-পত্রটির অনুবাদ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই শুধু এখানে সারমর্মটি দিই ঃ

'এ-উপলব্ধিটি হল তোমার বাহ্য চেতনা ও আন্তর স্বরূপের মধ্যে যে-পর্দা আছে তাকে ভেদ করা। এটি আসলে যোগের একটি প্রধান প্রগতির সূচনা। মূলে এ হল চেতনার গভীর জাগরণের ফলশ্রুতি—অন্তর্মুখী তথা ঊর্ধ্বগতি। ...এটিকে বলা যেতে পারে কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণের সগোত্র...যে-শক্তি মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে ষটচক্রভেদ করে সহস্রারে পৌঁছয় ভগবৎমিলনমুখে।

I have said already that your experience was, in essence, the piercing of the veil between the outer consciousness and the inner being. This is one of the crucial movements in Yoga. For Yoga means union with the Divine, but it also means awakening first to your inner self and then to your higher self — a movement inward and a movement upward. In your former experiences the inner being had come to the front and for the time being impressed its own normal motions on the outer consciousness to which they are unusual and abnormal. But in this meditation what you did was — for the first time, I believe — to draw back from the outer consciousness, to go inside into the inner planes, enter the world of your inner self and wake in the hidden parts of your being. That which you were then was not this outer man, but the inner Dilip, the Yogin, the bhakta. When that plunge has once been taken, you are marked for the Yogic, the spiritual life, and nothing can efface the seal that has been put upon you. All is there in your description of this complex experience — combining all the signs of this first plunge . . It is a movement analogous to that on which so much stress is laid in the Tantrik process, the awakening of the Kundalini the Energy coiled up and latent in the body, and its mounting through the spinal cord and the centers (chakras) and the Brahmarandra to meet the Divine above. — —

গুরুদেবের জীবদ্দশায় আমার আরো কয়েকটি আন্তর উপলব্ধি হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি থাক, বাকি দুটির কথা—যদিও আমায় এ ধরনের আত্মিক অনুভূতির কথা লেখার পরে মন প্রশ্ন করে ঃ "যা অনির্বচনীয় তাকে কথার রেখা রঙে আঁকতে যাওয়া কি বিড়ম্বনা নয়?"

এক এক সময়ে মনে হয় যে, মনের কুণ্ঠাকে মেনে চলাই ভালো—বিশেষ করে দর্শনের কথা গোপন রাখা সম্বন্ধে। কিন্তু তার পরই মনে হয়—জিজ্ঞাসুরা সম্ভবতঃ একটু আশ্বস্ত হবেন ভেবে যে, আমার মতন সংশয়ীরও যখন দর্শন হয় তখন তাঁরা বিশ্বাস করলে হয়ত শেষপর্যন্ত ঠকবেন না। ভাগবতে দুরকম বিধানই পাই—এক মন্ত্রগুপ্তির, অদিতিকে বলছেন কাশ্যপ মুনি—"সর্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্" : "দেব কাহিনী প্রকাশ না করলেই পুরোপুরি সক্রিয় হয়।" আবার দেখি নানা ভক্তের দর্শনের মনোহর বর্ণনাও আছে যা পড়ে ভক্তি জাগে। দ্বিবিধ বিধানই যখন আছে আর যখন দর্শনের কথা বলতে ভালো লাগে তখন বললে কি ঠাকুর সত্যি সাজা দেবেন তুর্ণ প্রস্থান করে? একথা বলছি, কারণ নানা সাধক ভয় দেখান যে, দর্শনের কথা বললে আর দর্শন হয় না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীসন্তদাস, শ্রীরামদাস কোঙকনী, যশোদা মা, কৃষ্ণপ্রেমের ইন্দিরার মুখেও শুনেছি দর্শনবার্তায় নানা উপলব্ধির কথা। তাই ভেবেচিন্তে বলেই ফেলি দুর্গা বলে।

প্রথমটি স্বপ্ন-অনুভূতি—এর বিবৃতি আমার "অনামিকা সূর্যমুখী"তে লিখেছি কবিতায়। (২৮৩-৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

পণ্ডিচেরিতে আমার ভাগ্যে কৃষ্ণদর্শন ঘটে নি স্বপ্নেও না। ১৯৫৯-এ হরিকৃষ্ণ মন্দিরে এসে ভজনপূজন সুরু করার পরে সর্বপ্রথম ১৯৬৩ সালে আমি হঠাৎ পর পর দুবার ঠাকুরের দর্শন পাই—কিন্তু অস্পষ্ট, ছায়াময়। প্রথমবার দর্শনের সঙ্গে সুগন্ধ পাই। কৃষ্ণপ্রেমকে খুলে লিখতে সে আল-মোরা থেকে ১লা অক্টোবরে একটি বড় চিঠি লিখেছিল এ-সম্বন্ধে। কিন্তু সে-চিঠিটি আমার YOGI SRI KRISHNAPREM -এর ২৩০-১ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে বলে বলি এর পরের দর্শনের কথা। ৩১-১-৬৯ তারিখে, নিশুত রাতের কথা মনে হল—স্বপ্নের মধ্যে—যেন মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে শক্তি উঠছে—কুলকুণ্ডলিনীই হবে হয়ত। তার পরেই আকাশে গর্জন—বজ্রনাদ ও বজ্রপাত। আমার মনে ভয় আসে নি একটুও, আমি ঠাকুরের নাম জপ করে চলি।

বাজ পড়ল—তারপর আমি একটু ফলিয়েই লিখে রেখেছি দর্শনের রেকর্ড—রাখতে সাধ হয়েছিল বলে। প্রথমে ভেবেছিলাম প্রকাশ করব না এ-স্বপ্নদর্শন। তারপরে মনে হল—আমার নিজের স্বভাব ও বিবেক মেনে চলাই ভালো—মিথ্যা কথা যখন বলছি না তখন এ-বর্ণনা প্রকাশ করলে প্রত্যবায়ের প্রশ্ন উঠবে কেমন করে? তাই আমার অনামিকা-সূর্যমুখী থেকে উদ্ধৃতি দিই :

গর্জে ওঠে কালান্তরের বজ্র নীলাকাশে :
পৌরাণিকী কৃষ্ণগাথা রঙিন মায়াছবি।

ভক্ত! পাতিস কার কাছে হাত
কল্পনা-উচ্ছ্বাসে?
উচ্ছ্বাসে?
কোন্ নাস্তির জয়ধ্বনি করিস
মূঢ় কবি?...

'খুশখেয়ালে আমি গড়ে এ-বিশ্ব খান্ খান
করি তাকে পরে আবার।
নেই কোথাও আমার
প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো দয়াল তারক শক্তিমান,
জ্বালিয়ে জ্যোতিষ্কদের তাদের
ছাই করি আবার।

আমারি তেজ সূর্যচন্দ্র
নীহারিকায় জ্বলে
চমকশিখা দীপালিকায়।
আমারি আজ্ঞায়
অচিন্ত্য এক নিয়ম মেনে
বৃন্দ তারা চলে
লক্ষ্যহীন অনন্ত ব্যোমে
অশান্ত জ্বালায়।...'

ভক্ত হেসে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" জপ করে
একমনে,
বজ্রনাদে জাগে শুধু অন্তরে প্রার্থনা :
"ভয় নেই আমার মরণকে নাথ, যদি
শ্রীচরণে
দাও তুমি ঠাঁই ওগো আমার চির
আরাধনা!"...

বজ্রপাতে ঝলকে ওঠে বহ্নি লেলিহান,
নীরন্ধ্র তমসায় কিছুই যায় না দেখা,
ও কি?
কে সে আমায় ধরে আছে দয়াল,
মহীয়ান্?
গেয়ে ওঠে 'মা ভৈঃ মা ভৈঃ"
কন্যাশিষ্যাসখী!
আর কেউই নেই কোথাও—শুধু
বাহুমূলের পরে
কোমল পরশ কার? কে টেনে আনে
মহাবল?
দুটি চরণ...মরি মরি!...দেখি নয়ন ভরে।
'এ কি শ্যামল, সত্যি তোমার
চরণ-শতদল—
যার ধ্যান আমি করেছি নাথ,
বাদলে কিরণে
কল্পনার অসাধ্য রাগে মধুর
স্বপন ধরি—
যার গান গায় মুনি ঋষি
ভক্তির কীর্তনে
এ কি তোমার মরণহরণ
সেই শ্রীচরণ, হরি!'

প্রশ্নের দেয় সাড়া পুলক
অঝোর বন্যাধারে,
জিজ্ঞাসা তার থাকে কি আর
যে পায় চিরাশ্রয়
শান্তিঝরা দুঃখহরা তোমার
চরণপারে?

এ-জীবনের সব জ্বালা তার হয়
পলকে লয়।

স্বপ্ন ভেঙে যায়, কিন্তু সে-অপরূপ শ্রীচরণের মধুর স্মৃতিরেশ ছেয়ে থাকে দেহে মনে। মনে পড়ল গুরুদেবের একটি কথা : যে, অনেক সময় আন্তরচেতনা স্বপ্নে প্রকট হয় স্বপ্নের অবচেতন স্তরকে দাবিয়ে। এ-অমূল্য উপলব্ধিটির পরে কেবল দুটি খেদ আমাকে বিষণ্ণ করেছিল : এক, শ্রীঅরবিন্দ ও কৃষ্ণপ্রেমের কাছে আমি বলতে পারলাম না আমার উচ্ছ্বাসের কথা; দুই, জাগ্রত ধ্যানে ঠাকুরের চরণদর্শন হল না। তবে সান্ত্বনা ছিল এই যে, স্বপ্নেও যখন আন্তরচেতনা সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে তখন তার সত্যদীপ্তি হয়ত ধ্যানলব্ধ উপলব্ধির মহিমার জুড়ি হতে পারে।

এ দর্শনটির মধ্যে কিন্তু তবু একটি অতৃপ্তির কাঁটা আমাকে খচখচ করে বাজত : যে, ঠাকুরের [illegible] দর্শন করবার সৌভাগ্য আমার হলেও তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করতে পারি নি নয়ন ভরে—কারণ আমি দেখেছিলাম তাঁর মুখের একধার মাত্র—profile —আর তাও আবছা। হোক তবু এ-দর্শন আমার জীবনে একটি অমূল্য দর্শনই বলব—তাঁর চরণদর্শন কি সোজা কথা? পুরাণে ভাগবতে বার বার পাই কী সব অপূর্ব উচ্ছ্বাস ঠাকুরের চরণকমল নিয়ে।

প্রসঙ্গতঃ, আরো দুটি কথা বলার আছে : এক, যখন আকাশ থেকে বজ্রপাতে সব লুপ্ত হয়ে গেল তখন শুধু ইন্দিরা ছাড়া আর কেউ কোথাও ছিল না; দুই, ঠাকুর হঠাৎ আমার দেহকে উৎক্ষিপ্ত করে রাখলেন তাঁর পিঠের উপর, যেমন মা অনেক সময়ে রাখে শিশুকে। ভাবতে আজো আনন্দ হয় যে, এর মানে ঠাকুর আমার ভার নিলেন পুরোপুরি—আমার পার্থিব দেহকে বহন করতে রাজী হয়ে। করুণা আর কার নাম?

যে-তনু ক্লিন্ন, গুরুভার, মৃন্ময়;
পরশে তোমার হয় নাথ চিন্ময়।
ধূলিও তখন উচ্ছ্বাসে গায় গান :
"আমাকেও পাখা দিতে পারে
ভগবান!"

(ক্রমশঃ)

যুবক যুবতী

পার্ণী দাস

গ্রামের যুবক-যুবতীদের সমস্যা

বাংলা মায়ের আসলরূপে চাক্ষুষ করতে হলে আমাদের গ্রামে যেতে হবে। কবির ভাষায় 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।'—বাংলামায়ের এরূপে একদিন গ্রাম বাংলারই ছিল। কিন্তু গ্রামবাংলার সেই বরণীয় রূপ আর নেই। প্রতি ঘরে ঘরে দারিদ্র্য। অনেক এলাকায় সেচের অভাবে জমিতে তেমন ফসল হচ্ছে না। কোথাওবা বানের সমস্যা। গ্রামের যুবক-যুবতীরা কাজ পাচ্ছে না—বৃথা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে তাদের জীবন শুকিয়ে যাচ্ছে। যৌবনের শখ-আহ্লাদ-উদ্দামতা কিছুই মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। পল্লীতে পড়াশোনার ব্যবস্থাও তেমন সুলভ নয়। খেলাধূলোর ব্যবস্থাও নামমাত্র। অথচ সেখানের যুবক-যুবতীরাও রক্তে মাংসে গড়া মানুষ, যৌবনের উচ্ছলতায় ভরপুর। শহরকেন্দ্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে তাদের তীব্র ক্ষোভ। এই সাক্ষাৎকারে আমরা তারই প্রতিফলন লক্ষ্য করব।

ত্রিবেণীর অপরপারে হুগলী নদীর ধারে চরগঙ্গামনোহরপুর গ্রামের ছেলে শ্রীমান নিখিল ঘোষ। হাট থেকে নৌকো করে ঘরে ফিরছিলেন। নৌকোর মধ্যেই আলাপ। গ্রামের সুখদুঃখের নানা গল্প শুনছিলাম তাঁর মুখে। জিজ্ঞাসা করলাম—এখন আপনি কি করছেন? —কি আর করব বলুন, বৃথা বসে না থেকে কলেজে ভর্তি হয়েছি। এখান থেকে এত মুস্কিল ঠেঙিয়ে পড়তে যেতে হয় নৈহাটী ঋষি বঙ্কিম কলেজে।

—কাছাকাছি কোন কলেজ নেই, জিজ্ঞাসা করি।

—গঙ্গার ওপারে মগরাতে একটা কলেজ আছে, সেটা আবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাছাড়া বর্ষাকালে প্রচণ্ড জলকাদা হয়—এত মুস্কিল সাঁতরিয়ে বইপত্র নিয়ে কলেজ করা সম্ভব নয়। সবচেয়ে বেশী কষ্ট হয় এ অঞ্চলের মেয়েদের। বাড়ীর কাছে ভালো স্কুল পর্যন্ত নেই। হয় গঙ্গা পেরিয়ে যেতে হবে আর না হয় মাইল দেড়েক হেঁটে অন্য স্কুলে যেতে হবে। বর্ষাকালে জল বেশী হলে স্কুলে যাওয়া বন্ধ। এসব স্কুলে আবার পড়াশুনোও ভালো হয় না। শিক্ষক কম, মাইনে না পাওয়ায় ভালো শিক্ষক গ্রামে আসতে চান না।

—পড়াশোনার আর কোন অসুবিধা নেই?

—সে কথা আর বলতে! গত পরীক্ষার সময় কেরোসিন তেলের অভাবে রাতে একদম পড়তে পারিনি। তাই রেজাল্টও ভাল হয়নি। কাগজপত্রের দাম অসম্ভব বেশী। গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা তাই সিকেয় ওঠার উপক্রম।

—আপনাদের গ্রামে ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোর ব্যবস্থা নেই?

—নিজেরা চাঁদা পত্র দিয়ে ফুটবল মরশুমে বল খেলি, প্রতিবেশী গ্রামের সঙ্গে ম্যাচ খেলি, কাবাডি প্রতিযোগিতায় অংশ নেই।

—ক্রিকেট খেলা হয় না?

—ওটা বড়লোকদের খেলা, এত পয়সা কই যে সরঞ্জাম কিনে রপ্ত করব।

—মেয়েদের খেলাধুলোর কি ব্যবস্থা আছে?

—বলতে গেলে কিছুই নয়। গতবার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে 'ন্যাশনাল একসটেনশান সার্ভিস' স্কীমে আশপাশের ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্পোর্টস হয়েছে। এতে আমরা সবাই অনেক উৎসাহ পেয়েছি।

আপনাদের গ্রামের যুবক-যুবতীদের অন্যান্য সমস্যার কথা দু একটু বলুন না।

—সবচেয়ে প্রথম কথা প্রতি ঘরে অভাব অনটন। ফলে সবার পক্ষে পড়াশোনা করা সম্ভব নয়। জমিজমা সবার নেই যে চাষবাস করবে। অনেকেই দিনমজুর খাটে, যখন সেটাও পায় না রিকসা চালায়। যারা একটু শিক্ষিত আগে তারা এধরনের কাজ করতে লজ্জা পেত। তবে এখন যা অবস্থা যে কোন কাজ করতে কারো সংকোচ নেই।

—অন্য কোন ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা নেই?

—কল্যাণীতে আই টি আই আছে। তবে সেখানে সুযোগ পাওয়া অথবা সেখান থেকে পাশ করে চাকরী পাওয়া দুটোই ভাগ্যের ব্যাপার।—মুখে তার শুকনো হাসি।

চাকদহে রবীন শিকদারের সঙ্গে কথা হল। অনেকদিন বি-এ পাশ করে বসে আছেন। ইদানীং গ্রামে নিজেরাই একটা প্রাইমারি স্কুল খুলে ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছেন।

জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা, রবীনবাবু, এই যে স্কুল চালাচ্ছেন এর জন্য সরকারের বেতন পাচ্ছেন না?

—বেতন পাওয়ার আশাতেই তো স্কুল চালাচ্ছি। এমনিতে তো আর চাকরীবাকরী জুটবে না যদি এভাবে একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যায়।

প্রশ্ন করি—আপনি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখাননি, সেখানে কোন সুফল হচ্ছে না?

—আর বলবেন না! গ্রাম অঞ্চলে তেমন অফিসকাছারী বা ইন্ডাস্ট্রী নেই। ফলে

গৌরাঙ্গ মণ্ডল

নিয়োগ সম্ভাবনা কম। তারপর শহরে অঞ্চলের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি বেশীরভাগ সময়ে আমরা জানতেই পারি না। কল্যাণী এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ থেকে একবার একটা কল পেয়েছিলাম সেটাও একটা ভোকেশনাল ট্রেনিং-এর জন্য।

—গ্রাম অঞ্চলের বেকারত্ব দূর করার জন্য আপনি কি প্রস্তাব করেন?

—আমরা গ্রামের ছেলেরা চিরদিনই অবহেলিত। আমাদের মামা-কাকা নেই তাই কলকাতায় বা অন্য কোথাও সরকারী চাকরী বা ব্যাঙ্কে চাকরী পাচ্ছি না। সরকারের উচিত গ্রামের ছেলেদের আরো সুযোগ দেওয়া। স্বনির্ভর প্রকল্পে আরো সুযোগ বাড়ানো দরকার। যে সব ছেলেমেয়ে ভোকেশনাল ট্রেনিং বা বি টি ইত্যাদি ট্রেনিং নিয়ে বসে আছেন তাদের নিয়োগের ব্যবস্থাও সরকারকেই করতে হবে। সবচেয়ে বেশী দরকার একটা অর্গানাইজড ইকোনমিক স্ট্রাকচার। গ্রাম অঞ্চলে সমবায় প্রথায় মাছ চাষ, পোলট্রী, হর্টিকালচার, খামার প্রভৃতি করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। অথচ উদ্যোগের অভাব—সরকারী সহায়তার অভাব।

কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি অঞ্চলের শ্রীমতী রেবা বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি জানালেন কৃষ্ণনগরের মাটির কাজ জগদ্বিখ্যাত। অথচ শিল্পী পরিবার দারিদ্র্য কবলিত। এই শিল্পের প্রতি সরকার আরো দৃষ্টি দিলে অনেক যুবক-যুবতী নিজেরাই করে খেতে পারে। কাঁচরাপাড়া অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা শহুরে জীবন থেকে অনেক দূরে। মেয়েদেরও একই অবস্থা। সরকার থেকে স্কুলে স্কুলে সেলাইকল দিলে মেয়েদের সেলাই শিখিয়ে তাদেরও জীবিকার সামান্য ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে।

এছাড়াও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অনেক গ্রামে ঘুরেছি। যুবক-যুবতীদের সঙ্গে মিশেছি। শুনেছি তাদের নানা সমস্যার কথা। হেটো গ্রামের হরিদাস সরকারের সঙ্গে কথা হল। গ্রামের নানা অসুবিধার কথা জানালেন তিনি। তাঁর মুখেই শুনতে পেলাম—হেটোর ভালো স্কুল নেই। সেজন্য ছুটতে হয় বারুইপুরে। মেয়েদের অবস্থা আরো সঙ্গীন।

যদিও মেয়েদের একটা স্কুল আছে তবে সেখানে ইলেকটিভ বিষয় নিয়ে পড়ার ব্যবস্থা নেই। নানা ঝক্কি পুইয়ে যেতে হয় বারুইপুরে।

—এখানে পাড়ার ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোর কি ব্যবস্থা আছে?

—কোন সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান নেই। পাড়ার ছেলেদের একটা ক্লাব আছে, ফুটবল খেলা হয়।

—মেয়েদের?

মেয়েদের নাম করতেই হেসে ফেললেন তিনি। 'পল্লী সমাজ'——আমাদের এখানের মেয়েরা ঘরকন্না, সেলাই, বাড়ীর কাজ করতেই অভ্যস্ত। ঘরে লুডো খেলা বা বাড়ীর উঠোনে ছুটোছুটি খেলা এর বেশী কল্পনা করা যায় না।

তিনি আরো জানালেন গ্রামের বেকার সমস্যা প্রকট। এক ফসলী চাষের জন্য বেশীরভাগ সময় পুরুষ একটা বিশেষ সময়ে বেকার হয়ে পড়েন। তখন তাঁদের নির্ভর করতে হয় আশপাশের শহর অঞ্চলের ওপর। কেউবা সেখানে দিনমজুর খাটেন কেউ রাজমিস্ত্রীর জোগালের কাজ করেন।

—শিক্ষিত বেকারদের অবস্থা......? জিজ্ঞাসা করি।

—অনেক ছেলেই পাশ করে বসে আছে। আমাদের এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ বলতে সেই কলকাতার কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট নয়তো খিদিরপুরে। যাতায়াতের অসুবিধা, সময় সব মিলিয়ে নিত্য যোগাযোগ রাখা হয়ে ওঠে না। বুঝতেই পারছেন এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জের চাকরীর বরাত আমাদের ভালো নয়।

—অটো রিকসা বা মিনিবাসের সুযোগ এখানের বেকার ভাইরা পাননি?

—আমাদের অঞ্চলের কেউ নয়।

একটা অদ্ভুত কথা শোনালেন আর এক যুবক শ্রীগৌরাঙ্গ মন্ডল। তিনি জানালেন 'গ্রাম্য রাজনীতির জন্য ছেলেদের মধ্যে দলাদলি আছে তবে তার বহিঃ প্রকাশ কখনো হিংসার রূপ নেয় না। ভোটের সময় অনেকে বিভিন্ন দলের হয়ে কাজ করে তবে নিজেদের মধ্যে হৃদ্যতা কমে না।' কলকাতার ছেলে আমরা। নিত্যনতুন খুনখারাবি, মারামারির রাজ্যে বাস করি—একথা তাই অদ্ভুত লাগলো। জিজ্ঞাসা করলাম—শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যুবকেরা নিজেরা হতাশ হয়ে অপরাধমূলক কাজের দিকে ঝুঁকছে না?

—না না, আমরা এতদূর এগোইনি। বরঞ্চ স্টেশনে এ...ঘাড়ে চুরি, ছিনতাই না হয় সেজন্য আমরা সব সময় সতর্ক থাকি। ট্রেনে যাতে এসব কমানো যায়—সেসব নিয়েও ভাবছি।

গৌরাঙ্গবাবু তার সুন্দরবন অঞ্চলের অভিজ্ঞতার কথাও জানালেন। সুন্দরবন অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা নানা অসুবিধার মধ্যে আছে। চিকিৎসার জন্য সুব্যবস্থা নেই, স্কুল কলেজ নেই, খেলাধুলো আমোদ-প্রমোদের তেমন ব্যবস্থা নেই। এসবের স্বাদ পেতে হলে তাদেরকে ছুটতে হবে ক্যানিং অথবা কলকাতায়। সবশেষে হরিদাসবাবু জানালেন, আমরা গ্রামের ছেলেরা তাই বলে শুকিয়ে যাইনি। আমরাও সুখে হাসি, ভালবাসি। প্রেম করে বিয়েও হয় গ্রাম অঞ্চলে। হেটোরের মেয়ে ঊর্মিলা সরকার, শেফালি সরকার প্রভৃতির সঙ্গে কথা বললাম। তারাও জানালেন নানা অসুবিধার কথা। কত কষ্ট করে তাদের কলকাতার কলেজে পড়তে যেতে হয়। যেটুকু আনন্দ মজা করি সেই কলেজে মেয়েদের সঙ্গে। বাড়ীতে এসে আবার সেই ঘরে বসে থাকা। বাড়ীর কাজ করা। জবাব পেলাম ঊর্মিলা দেবীর কাছ থেকে। শেফালী দেবী দেখলাম নিশ্চিন্তে উল বুনছেন। পাশে দুচারজন মেয়েকে গোল্লাছুট খেলতে দেখলাম। আমাকে দেখেই লজ্জায় ঘরে ঢুকলো।

ফেরার পথে কল্যাণপুরের ভানুলাল নস্করের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি জানালেন —'আমাদের খেলাধুলোর কে ব্যবস্থা নেই। নিজেরা পয়সার অভাবে ...টা ক্লাবও পরিচালনা করতে পারছি না। আমাদের চাকরীর সুযোগ কোথায়?'

সরিষা কুমারপাড়ের প্রণবকান্তি ঘোষ কিন্তু উল্টো কথা বললেন। তাঁদের অঞ্চলে মোটামুটি সব সুযোগ রয়েছে। সেখানের ছেলে-মেয়েরাও কলকাতার চেয়ে কম যায় না—' জানালেন তিনি।

—তার মানে?

—পোশাকে আশাকে সবকিছুতেই কলকাতার হাওয়া।

বারুইপুর থেকে বাসে করে গোবিন্দপুরে গেলাম। পথে যেতে যেতে লাঙলবেড়িয়ার শ্রীসমীর ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ হল। গ্রামে ছেলেমেয়েদের অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করলাম তাকে। হেসে জবাব দিলো—আমি তো এখনো স্কুলে পড়ি তাই দাদা দিদিদের মতো চাকরীর চিন্তা আসেনি তবে একটা খুব দুঃখ খেলাধুলোর একদম সুযোগ নেই। স্কুলে পর্যন্ত তেমন ব্যবস্থা নেই। নিজে পয়সা খরচ করে বল কিনে তবে খেলা।

গোবিন্দপুর বাজার ছেড়ে আরো কিছু-দূর এগিয়ে গেলাম দক্ষিণ গোবিন্দপুরে। সেখানে আলাপ হল শ্রীপর্ণা দাসের সঙ্গে। আমার উদ্দেশ্য জানালাম তাকে। খুশীমনে তাদের বাড়ী নিয়ে গেলেন তিনি। সুন্দর পরিবেশ। নিরিবিলি। কলকাতার গ্রামবাসের অহরহ ঘেরঘেরানি নেই। গ্রামের কাঁচা রাস্তার জায়গায় হয়েছে পাকা পীচের রাস্তা। বিদ্যুৎ এখনো পৌঁছয়নি। হোটেলের শুষ্কতার চেয়ে এখানে কিছু প্রাণ পাওয়া গেল। পর্ণা দেবীর বাড়ীতে বৈঠকখানায় বসলাম। বেশ ছিমছাম—পরিচ্ছন্ন রুচি চোখে পড়ল।

—অচ্ছা পর্ণা দেবী, আপনি তো গ্রামে থাকেন, শহর কলকাতায়ও নিত্য যাতায়াত আছে এই দুইয়ের পরিবেশের যুবতীদের মধ্যে কি ফারাক আপনার-নজরে পড়ে বলতে পারেন।

—কলকাতার মেয়েদের মতো আমরা সব সুযোগ-সুবিধা পাই না আবার আমরা যা পাই কলকাতার ওরা তা পায় না।

—কি রকম?

—যেমন ধরুন—খোলা মাঠ, মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু....

—তা নিশ্চয়ই, তবে আপনাদের অসুবিধাও রয়েছে এটাও স্বীকার করতে হবে।

—সে সত্যি কথা। এখানে যে স্কুল আছে সেখানে সব স্ট্রীম নিয়ে পড়ার ব্যবস্থা নেই। বাড়ীর কাছে কলেজ নেই। আমার কথাই ধরুন না—বাড়ী থেকে হেঁটে বাস লাইন, বাসে বারুইপুর স্টেশন তারপর কলকাতা কলেজ। যাতায়াত করতেই বেশী সময় কেটে যায়।

—মেয়েদের মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সমস্যা কি রকম?

—ইদানীং অনেক দিদিরা পাশ করে বসে আছেন, এছাড়া অশিক্ষিতা বা স্বল্পশিক্ষিতা যাঁরা আছেন তাঁরা চাকরীর দিকে তত ঝুঁকেছেন না বা তেমন সুযোগও নেই।

—তাদের সেলাই বা অন্য কোন ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা কাছাকাছি কোথাও নেই?

—বারুইপুরে 'বয়স্ক শিক্ষার্জ্জন' কেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু সরকার নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন শিক্ষার্থীদের কমপক্ষে স্কুল ফাইনাল পাশ হতে হবে। ফলে গ্রামের অল্পশিক্ষিতা মেয়েরা বা ঘরের বৌয়েরা এ সুযোগ পাচ্ছেন না। অথচ এ-জিনিস শিখলে তারা ঘরে বসেও কিছু আয় করতে পারতেন।

—এখানে মেয়েদের কোন সংস্কৃতি কেন্দ্র নেই?

—কিছু নেই। নাচ, গান শেখার কোন ব্যবস্থা নেই।

পাশের ঘরে বসে ছিল তারই কাকার মেয়ে রীতা দাস। সে জানালো—দেখুন না, আমার গান শেখার খুব ইচ্ছা। রেডিও শুনে শুনে নিজে অনেকটা শিখেছি। ভালো মাস্টার পাচ্ছি না। পাড়ার এক দাদা যতটুকু জানেন আমাকে শেখাচ্ছেন।

—তোমরা এখানে কেন ফংশন কর না?

—হ্যাঁ, ২৫শে বৈশাখ উদযাপন করি। গান গাই। তাছাড়া গ্রামের অনেক সমালোচনার মুখে আমরা কাকীমাকে নিয়ে 'রক্তকরবী' নাটক অভিনয় করেছি।

অচ্ছা পর্ণা দেবী—এখানের মেয়েরা রাজনীতি করে না,—জিজ্ঞাসা করি।

—না ঠিক শহরের মেয়েদের মতো এরা তত উৎসাহী বা সাহসী নয়। এছাড়া গ্রামের সমাজে লোকনিন্দার ভয় রয়েছে।

দক্ষিণ গোবিন্দপুর থেকে ফিরছি। দেখলাম একদল ছেলে রাস্তার পাশে বসে আড্ডা করছে, নিজের পরিচয় দিয়ে তাদের দলে মিশে গেলাম। সৌমেন বিশ্বাস প্রণব কর, অমর ঘোষ, রঞ্জিত বিশ্বাস, অলোক দেব সবাই জানালেন তাদের বিক্ষোভের কথা—গ্রামের ছেলেদের প্রতি সরকারের অনীহার কথা। 'আমরা সবাই খেলায় উৎসাহী। গরীব ক্লাব তাই সব ব্যবস্থা করে উঠতে পারি না। তাছাড়া ভালো শেখানোর লোক না থাকলে শিখবই বা কি করে?'

স্থানীয় চাকরীর কোন সুবিধা আপনারা পান না?

—স্থানীয় চাকরী আর কোথায়? ভোকেশনাল ট্রেনিং নিতে হলে সেই যেতে হবে বালিগঞ্জে। তার সুযোগ পাওয়া কঠিন। স্বনিযুক্তি প্রকল্পের কোন সংযোগও আমাদের ভাগ্যে জুটছে না। জানালেন সৌমেন বিশ্বাস।

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম—বেকারত্বজনিত হতাশায় আপনারা......

—না, এখনো বিপথগামী হইনি। নৈতিক মূল্যবোধ এখনো টিকিয়ে রেখেছি। তবে কতদিন থাকবে সেটাই আসলকথা। বললেন প্রণব কর।

অলোক দেব জানালেন—তবু আমরা সব ভূলে হেসে খেলে বাঁচতে চেষ্টা করছি, প্রয়োজনে গ্রামের রাস্তাঘাট উন্নয়ন করছি। তবে গ্রাম বাস পোড়াই না বলে কি আমরা চিরকাল সরকারের নজরের বাইরে থেকে যাব?

গ্রামের মেয়ে অপর্ণা বোস জানালেন—বি-এ পাশ করে বসে আছি। চাকরী পাচ্ছি না। সময়কাটানোর একমাত্র সম্বল পাড়ার লাইব্রেরীর বই। মেলামেশা করা, আড্ডামারা কল্পনাও করা যায় না।

নানা গ্রাম ঘুরে পল্লী যুবক-যুবতীদের বিক্ষোভের এক ছবি নিয়ে শহরে ফিরে তোলা চাকরী, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের সমান এলাম। তাদের চাপা অভিমান—চাপা বিক্ষোভ। শ্যামলা বাংলার গ্রামের ছেলে-মেয়েরা কেন পিছিয়ে থাকবে? কেন সুযোগ পাবে না? গ্রামের মেয়ে অধুনা বেহালাবাসী শ্রীমতী বীণা বসাক জানালেন—আজকাল চুপচাপ ঘরে বসে থাকলে কেউ পাত্তা দেয় না। গ্রামের সব ছেলেমেয়েকে সোচ্চার হয়ে তাদের দাবী আদায় করে নিতে হবে। কবির 'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর' নিয়ে আমরা কাড়াকাড়ি করি কিন্তু তার মর্যাদা দিই না। তবে ভুললে চলবে না গ্রাম না বাঁচলে শহর বাঁচবে না। বাড়ী ফিরে যখন লেখা শেষ করছি তখনো শ্রীমতী বসাকের হুঁশিয়ারি মনে পড়ে যাচ্ছে—গ্রাম না বাঁচলে শহরও বাঁচবে না।

—অমর দাস

দে মহাশয়ের শব্দার্থজ্ঞান ভাষাতত্ত্বে এক বিস্ময়াত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। 'যক্ষিণী বা অপ্সরা' বলতে যক্ষিণীরই অন্য নাম অপ্সরা বুঝায় না। যেমন 'হলুদ বা সবুজ' বললে দুটি পৃথক রঙয়ের যে কোন একটিকে বুঝায়। কোন মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ-প্রধানকে 'বা' শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগার্থ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য শিশুবোধ বাংলা ব্যাকরণ-এর আশ্রয় গ্রহণ করার মত ধৃষ্টতা অবশ্যই মার্জনা করবেন। আশ্চর্যের বিষয় শব্দার্থ-জ্ঞান বর্জিত হয়েও দে মহাশয় প্রত্নচর্চা বা ইতিহাসচর্চার সংজ্ঞা ব্যাখ্যার ঔদ্ধত্য প্রকাশে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

পত্রের অন্যত্র দে মহাশয় বলেছেন, আলোচ্য প্রবন্ধটি পড়ে তাঁর মনে হয়েছে যক্ষ-যক্ষিণী আলোচনা সম্পর্কে অপরিহার্য গ্রন্থ কুমারস্বামী কৃত যক্ষ-এর সঙ্গে প্রবন্ধকারের পরিচয় নেই। তিনি হয় 'চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিণী' প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেননি অথবা কুমার স্বামীর পুস্তকের প্রচ্ছদপটের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় নেই। 'চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিণী' প্রবন্ধটির একস্থানে (৪৩ পৃঃ ১ম কলম) আলোচিত হয়েছে— 'ভারতীয় দেব-দেবী মূর্তি কল্পনার বিবর্তনে যক্ষ-যক্ষিণী প্রভৃতি কাল্টের' মূল্যবান ভূমিকার কথা নির্দেশ প্রসঙ্গে আনন্দকুমার স্বামী মনে করেন যে গণেশ কার্তিকেয়, সরস্বতী, ইন্দ্রাণী, প্রভৃতি বিগ্রহ যক্ষ-যক্ষিণী উপাসনা হতে আহরিত হয়েছিল। কুমার স্বামীর এই উল্লেখযোগ্য মন্তব্যটুকু প্রকৃত পক্ষে আলোচ্য গ্রন্থ (যক্ষস্—প্রকাশকাল ১৯৭১—পৃঃ ৩৭) হতে আহরিত হয়েছে। দে মহাশয় কুমার স্বামীর পুস্তকটির নাম 'যক্ষ' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বলতে কুণ্ঠাবোধ হয় গ্রন্থটির প্রকৃত নাম যক্ষস্'ই অমৃত-পাঠক সমাজ বিচক্ষণ। তাই এ-বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

পত্রলেখক লিখেছেন—'চার পাতার একটি প্রবন্ধে লেখক প্রায় ষোল-সতেরোটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। এতে লেখকের মৌলিকতার অভাবই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।' প্রবন্ধটি চার পাতার নয় চার পৃষ্ঠার। পাতা ও পৃষ্ঠার ফারাকটুকুও সমালোচকের জানা নেই! তাছাড়া উপযুক্ত উদ্ধৃতির ব্যবহার লেখকের রচনার মৌলিকতাকে যুক্তিপূর্ণ তথ্যনিষ্ঠ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। পত্রলেখকের মতে উপযুক্ত আলোকচিত্রের অভাবে লেখাটি দুর্বল হয়ে পড়েছে। প্রবন্ধে ব্যবহৃত আলোকচিত্রগুলো ছাড়াও, লেখক আরও ২।১টি আলোকচিত্র মুদ্রণের জন্য দিয়েছিলেন। স্থানাভাববশত হয়ত সেগুলির মুদ্রণ সম্ভবপর হয়নি।

দে মহাশয় প্রবন্ধকারের অবিনয়-এর উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় কাল্টচেতনার বিকৃত উপলব্ধি ও যক্ষিণী নামধেয়ী মাতৃকা মূর্তির ভাব প্রতিফলনের আঙ্গিক প্রকাশকে 'যৌন অকপটতা' বলে দূষিত করা প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার কিছু বলিষ্ঠ ও তথ্যপূর্ণ যুক্তি ও বিশেষজ্ঞদের অভিমত প্রদর্শন করেছেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে তথ্য ও যুক্তির অভাবে দে মহাশয় সাধারণ সৌজন্য বোধটুকুও বিসর্জন দিয়েছেন। এমন কি, পত্রের প্রথম কয়েকটি পর্বে তিনি প্রবন্ধকারের নামের পূর্বে 'শ্রী' শব্দটি ব্যবহারেও কার্পণ্য প্রদর্শনে দ্বিধা বোধ করেননি। পৃথিবীর সকল সভ্যসমাজে শ্রী, জনাব, মিস্টার, মঁসিয়ে প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যক্তি বিশেষের নামের পূর্বে ব্যবহারের সর্বজনস্বীকৃত রীতি প্রচলিত আছে। দে মহাশয় প্রবন্ধটিকে একটি দুর্বল প্রয়াস বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই দুর্বল প্রয়াসটি হার্কিউলিসের মত শক্তিধর হয়ে পত্রলেখকের সকল নিদ্রা-সুপ্তির দীর্ঘশ্বাস সৃষ্টি করেছে। আলোচিত পত্রে লেখক সম্পর্কে আরও দু-একটি অপরিণত বুদ্ধিপ্রসূত কটাক্ষ রয়েছে। সেগুলির আলোচনা করে অমৃত-এর মত শীর্ষস্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রের (বিশেষত এই কাগজ সংকটের দিনে) পরিসর নষ্ট করার প্রবৃত্তি অমৃত দরদী লেখকের নেই।

পরিশেষে, দে মহাশয়ের মত সমালোচকদের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা সুষ্ঠু ও গঠনধর্মী সমালোচনা করে লেখকদের উৎসাহিত ও কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করুন। অন্যথা ব্যক্তিগত আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে লেখক-চরিত্র হননের ব্যর্থ প্রয়াস নাই বা করলেন।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
ফেলো, রয়েল সোসাইটি অফ আর্টস (লণ্ডন)

ও

প্রধান অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ হেরম্বচন্দ্র কলেজ, কলিকাতা।

(২)

অমৃতের ৩ আশ্বিন ১৩৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত অধ্যাপক নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিণী' সমীক্ষাটি পড়লাম। এর আগেও নিম্ন গাঙ্গেয় বঙ্গের প্রত্নস্থলগুলি সম্পর্কে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমীক্ষাগুলি অমৃতের পাঠকদের আনন্দ দিয়েছে।

'চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিণী' নিঃসন্দেহে ইতিহাস ও প্রাচীন কলাবিদ্যা অনুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এবং শুধু তাই নয়, যক্ষিণী সম্পর্কিত অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনাটিতে নতুন কিছু জানবার এবং আলোচনারও অবকাশ রয়েছে। 'চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিণী' আসলে কী? নিঃসন্দেহেই 'বিলাসিনী নাগরিকা' নয়—প্রজননের দেবীই যক্ষিণী। ট্রাইব্যাল সমাজে নিশ্চিতভাবেই সমকালীন মাগধীয় রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে, দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকরী প্রতিরোধ সংগঠনে বিপুল জনসংখ্যার প্রয়োজন ছিল।

চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে তৎকালীন মাগধীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থায় অপসংস্কৃতির প্রচারে রাষ্ট্রের কর্মধারা সম্বন্ধে নিকৃষ্ট বর্ণনা নাই। ট্রাইব্যাল সমাজে 'বিলাসিনী নাগরিকা'দের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে ছিল না। নিম্ন গাঙ্গেয় বঙ্গে তাই এ প্রশ্ন অবান্তর।

যক্ষিণীর দেহ-সৌন্দর্যের কারণ প্রাণ-প্রাচুর্য আর প্রকৃতির স্বাভাবিক শারীর বিকাশ বর্তমানের চোখ দিয়ে আমরা বেশির ভাগ সময়ে প্রাচীন কলার সমালোচনা করে থাকি, তাই ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। চব্বিশ পরগণার প্রত্নতত্ত্ব নামে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ প্রবন্ধ চব্বিশ পরগণা জেলা সাহিত্য সম্মেলন সংকলন গ্রন্থ ১৩৮০-তে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ গ্রন্থে ১৮ পৃষ্ঠায় পাই নিম্ন গাঙ্গেয় বঙ্গের মিথুন মূর্তি শোভিত শীলমোহরগুলি সুস্থ জীবনযাপন নির্দেশ করে।

মৌর্য শিল্পকলার প্রভাব এই অঞ্চলের পোড়া মাটির মূর্তিগুলিকে প্রভাবিত করেছে। এই মিথুন ফলকগুলির মধ্যে শিক্ষাদানগত ভূমিকা নিশ্চয়ই ছিল না। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত যে, মিথুন ফলকের মূল উদ্দেশ্য ছিল কামভাব সৃষ্টি করা। কিন্তু মিথুন ফলক সম্পর্কে এই পত্রলেখকের ধারণা—এগুলি মৌর্য অপসংস্কৃতির প্রভাব। ট্রাইব্যাল সমাজ-ব্যবস্থার যৌন ব্যভিচার প্রচারে এগুলি ব্যবহৃত হত।

প্রণব চট্টোপাধ্যায়
শোভাপুর এভিনিউ
দুর্গাপুর

প্রাকৃতিক সম্পদ ও আমরা

গত ৩০শে আগস্ট শ্রীঈশ্বরকান্তের 'আমাদের কি খনিজ আকরিক লোহা রপ্তানী করা উচিত?' শীর্ষক তথ্যবহুল ও তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনার জন্য ধন্যবাদ। সাধারণভাবে আলোচনাটিতে কিছু চিন্তার খোরাক আছে—তাই এ ব্যাপারে কিছু বলতে উৎসাহিত বোধ করছি।

প্রাকৃতিক সম্পদকে কিভাবে সবচেয়ে উপযোগীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে এবং প্রকৃতির নানা কাঁচামাল (কৃষি বা শিল্পের জন্য) জোগানোর ক্ষমতার সীমার পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলো কিভাবে সংরক্ষণ

[illegible] উচিত এ নিয়ে নানা পত্র-পত্রিকায় ও আন্তর্জাতিক সভায় আলোচনা চলছে।

সম্প্রতি পশ্চিমের উন্নত রাষ্ট্রগুলি উপলব্ধি করেছেন যে, তাঁরা যে হারে বিশ্বের সম্পদ ব্যবহার করে চলেছেন (বিশ্বের জনসংখ্যার শতকরা ২২ ভাগ শতকরা ৮০ ভাগ সম্পদ উপভোগ করেন এবং তা প্রায় বছরে শতকরা ১২ ভাগ হারে বাড়ছে) তাতে আগামী ৩০।৪০ বছরের মধ্যেই প্রধান সম্পদ ও কাঁচা মালগুলিতে টান পড়বে। ইতিমধ্যে অন্য কিছু বিকল্পও ব্যবসায়িকভাবে প্রয়োগ করার সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল নয়। এতে বেশী শঙ্কিত হয়ে পড়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলো, যারা প্রায় বিশ্বের মোট কাঁচামালের মোট প্রায় শতকরা ৬০—৭০ ভাগ উৎপাদন ও সরবরাহ করেন। তাদের শঙ্কা আরও বেশী কারণ এগুলো ফুরোলে তাঁদের রপ্তানী অনেকাংশে কমে যাবে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটি সমগ্র অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করতে হবে। প্রথমত উন্নত রাষ্ট্রগুলি আজ যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে আরও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা উন্নতি ছাড়াও তাঁদের পক্ষে উচ্চ জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা সম্ভব। ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে যে, ভোগপণ্য ব্যবহারের বৃদ্ধির হার কমানোর দিকে সে সব দেশে। শুধুমাত্র কেবলমাত্র 'Sectoral and fiscal adjustment' তাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের উন্নয়নশীল দেশগুলির অবস্থা তা নয়। আমাদের ভোগপণ্য ব্যবহারের হার বাড়াতেই হবে আর তার মৌলিক উপাদানগুলি আসবে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে। তাছাড়া উন্নত দেশগুলি যখন নতুন ও উন্নত প্রযুক্তি-বিদ্যার সুযোগ নিতে ও প্রয়োগ করতে পারে, নানা কারণে আমাদের পক্ষে তা পুরোপুরি আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ 'conventional Technology' উপর আমাদের অনেকাংশে নির্ভর করতে হবে। তার জন্য প্রাকৃতিক কাঁচা মাল ব্যবহার বাড়তে বাধ্য। তাই সংরক্ষণের থেকে আমাদের কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ তাদের 'Economic and optimum exploration and use'. অনুন্নত টেকনোলজির জন্য আমরা কাঁচামালগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারি না। যথা ১ টন ইস্পাত তৈরী করতে আমাদের লাগে ১-৯ টন আকরিক লোহা ও ১-৩ টন কোকিং কোল। পক্ষান্তরে জাপানের ক্ষেত্রে এগুলো যথাক্রমে ১-৩ ও -৭৬৭ টন। বিশেষ কিছু উন্নত নয় সাধারণ টেকনোলজির দ্বারাই এ অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব আমাদের দেশে। দ্বিতীয়ত এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে এখনো পর্যন্ত আমরা কি সম্পদের অধিকারী তার প্রকৃত পরিমাণ আমরাই জানি না। সমুদ্রগুলি এক বিশাল সম্পদের অধিকারী। এ ছাড়া মাটির নীচে সব সম্পদের পরিমাণ এখনো করা যায় নি। আর এতদিন যেগুলোকে আন-ইকনোমিক বলে ব্যবহার করা হয় নি ইদানীং মূল্যবৃদ্ধির দরুন সেগুলো সম্বন্ধে আবার নতুন করে অনুসন্ধান করা হচ্ছে। উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতের মোট জমির মাত্র শতকরা ৪৩ ভাগ অনুসন্ধান করা হয়েছে এবং কেবলমাত্র খনিজ তেলের সম্প্রতি সন্ধান পাওয়া গেছে মোট ৪০০ মিলিয়ন টনের (সমুদ্রগর্ভের কথা বাদ দিয়ে) কিছুদিন আগে এটি ছিল ১৩০ মিঃ টন। অর্থাৎ প্রতিদিন নতুন নতুন উৎসের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এই ত সেদিন উড়িষ্যায় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বকসাইট স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। সুতরাং যতটা শঙ্কার কারণ আছে বলে মনে হচ্ছে অবস্থা হয়ত ততটা খারাপ নয়, তবে ব্যবহার কমানোর সুযোগ ও প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। সম্প্রতি সি এম এ-এর চেয়ারম্যান এই কথাই বলেছেন যে আগে সম্পদের পরিমাণ না জেনে তার সংরক্ষণের ওপর বেশী জোর দেওয়া আমাদেরই স্বার্থের পরি-পন্থী। তবে এগুলো আরও ভালভাবে কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তা নিশ্চয়ই ভাবতে হবে। সম্পদ যা আছে তা রেসাইক্লিং পরিকল্প শক্তির উৎস সন্ধান করে আরও অনেকদিন (অন্তত আমরা যা ভাবছি তার ঢের বেশী দিন) চালানো নিশ্চয়ই যাবে।

এখন মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ১৯৭৩—৭৪ সালে আমরা ২৩'৮ মিঃ টন আকরিক লোহা রপ্তানী করে ১৬০ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেছিলাম। ৭৪—৭৫ ২৬ মিঃ টনের বদলে প্রায় ২০০ কোটি লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে। সম্প্রতি আকরিক লোহা রপ্তানীকারক দেশগুলির প্রাথমিক বৈঠক ভিয়েনাতে শেষ হয়েছে। এর ফলে আকরিক লোহার দাম বাড়লেও অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশগুলো বাধা দেওয়ায় একটা সম্মিলিত কর্মসূচী গ্রহণ করা যাচ্ছে না এ ব্যাপারে। সম্প্রতি জাপান ভারত থেকে আমদানী করা আকরিক লোহার দাম শতকরা ৫০ বাড়াতে রাজী হলেও আমদানী কমাবে শতকরা ৩০। আগামী দশ বছরে বিভিন্ন দেশগুলো তাদের আকরিক লোহা আমদানী যা বাড়াবে তার শতকরা ৬০ আসবে অস্ট্রেলিয়া ও ব্রাজিল। ফলে মতানৈক্যের জন্য হয়ত ভারত প্রমুখ দেশগুলো আকরিক লোহার জন্য দাম খুব বেশী পাবে না। ইতিমধ্যে কানাডা, অস্ট্রিয়া, [illegible] প্রভৃতি [illegible] স্টীল রপ্তানীকারক দেশগুলো একযোগে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা তাদের রপ্তানী-যোগ্য লোহার উৎপাদন কমাবে এবং দাম বাড়াবে। ফলে আকরিক লোহার যত না দাম বাড়বে তার [illegible]কে ঢের বেশী দাম বাড়বে তৈরী ইস্পাতের। ঠিক এরকমটিই ঘটেছে অন্যান্য ধাতু যথা তামা, টিন, দস্তা ইত্যাদির বেলায়। এতে উন্নয়নশীল দেশ-গুলোরই বেশী ক্ষতি হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের বাজারে এক টন ইস্পাত রপ্তানী করে যে টাকা পাওয়া যায় তাতে এক টন ক্ষমতার ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা চলে। কিন্তু কম উৎপাদনের দরুন আমরা এই সুযোগ পুরোপুরি নিতে পারছি না। গোয়াতে একটা পেলেটাইজেশনের ফ্যাক্টরীর স্থাপন করা হচ্ছে মূলতঃ রপ্তানীর জন্য। আশা করা যায় আগামী পাঁচ বছরের মধ্য আমরা এই রকম পেলেটাইজড আকরিক বিক্রী করে বেশ কিছু বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে পারব। ইতিমধ্যে আকরিক লোহা রপ্তানী করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে কিছু বার্টার ডীল করে যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণ আকরিক লোহার বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ ইস্পাত আমদানী করে আমরা কিছুটা ইস্পাতের অভাব মেটাতে পারি। যেমন তুর্কী ও জাপানের মধ্যে চুক্তি হয়েছে যে তুর্কীর বছরে দশ লক্ষ টন আকরিক লোহার বদলে জাপান বছরে ৫০০০ টন ক্রোম স্টীল সরবরাহ করবে। এর জন্য চাই আরও উচ্চমানের কমার্শিয়াল ডিপ্লোমেসি। ইতিমধ্যে আমাদের দেশে উচ্চমানের আকরিক লোহার মজুত পরিমাণ অনুমিত হয়েছে প্রায় ২২৫০ কোটি টন। এ ছাড়া নিম্নমানের পরিমাণ আরও চার গুণ। সুতরাং আকরিক লোহার অভাবের শঙ্কার কোনো কারণ নেই। এরকম তামা, দস্তা, সীসা প্রভৃতির ক্ষেত্রে স্ব-নির্ভরতার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ মজুত আকরিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। সুতরাং রপ্তানী সম্বন্ধে বেশী শঙ্কিত হবার কারণ নেই, তবে বিশ্বের বাজারে ম্যানুফ্যাকচারড ও ফিনিসড গুডস-এর চাহিদার সুযোগ নিতে হবে।

প্রকৃতির সম্পদ সীমিত। কিন্তু মানুষের দক্ষতা, বুদ্ধির ত সীমা নেই। সমস্যা সমাধানে সেই বুদ্ধির সুষ্ঠু প্রয়োগ হবে এই আশা ও বিশ্বাস রইল। আমরা ত পরিচয় দিয়েইছি যে প্রাকৃতিক সম্পদের সমস্যা নিয়ে আমরা সচেতন। সমাধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

দেবাদিত্য চক্রবর্তী।
পদার্থবিদ্যা বিভাগ,
আই আই টি
খড়্গপুর—২।

উপন্যাস

শেষ বিচার

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

[বৃদ্ধ বঙ্কিম দত্ত রোজ সকালে এক চক্কর বেড়িয়ে আসতে না পারলে হাঁফিয়ে ওঠেন। লাঠি ঠুকঠুক করে সেই পরিচিত ঝিলের ধারে এসে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। একটু ঘাসের গন্ধ জলের গন্ধ শামুক পানার গন্ধ পাবার লোভে ছটফট করেন বঙ্কিমবাবু। কিন্তু ছেলে অমিয় কি বৌমা কি তার ছেলেমেয়েরা ঠিক উল্টো। তারা শহরের উদ্দামতা অস্থিরতা পছন্দ করে। ঝিলের ধারের ঝাঁকড়া মাথা শিমুল গাছটা পেরিয়ে বড় পাথরটায় বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া বঙ্কিমবাবুর অভ্যেস। আজও হাঁটতে হাঁটতে বঙ্কিমবাবুর গতি শ্লথ হয়ে এল।

তিনটে ছেলে বঙ্কিমবাবুর কাছে এগিয়ে এল। চড়াও হয়ে ঘড়ি আংটি খুলে নিল। বঙ্কিমবাবু অসহায় ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলেন। ওরা তিনজন মাঠে নেমে তালগাছের কাছে দাঁড়াল। ওখানে আর একটি ছেলে। বঙ্কিমবাবু অবাক হয়ে দেখলেন অমিয়র ছোট ছেলে রঞ্জু। তাহলে রঞ্জুই কি ওদের পথ দেখিয়ে এনেছে ?

প্রাতঃভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরে বঙ্কিমবাবুর কিছুই ভাল লাগছিল না. আজ সব কিছুই কেমন যেন নিষ্প্রভ। ছেলে মেয়ে নাতি-নাতনি সকলকে নিয়ে বঙ্কিমবাবু নিজেকে বেশ সুখী ভেবে আসছিলেন কিন্তু আজ সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

অমিয়র কথা মনে এল। খামখেয়ালী অমিয়র মনটা সরল, শিক্ষাবোধা। ফুলের গাছ, পাখি, মাছধরা নিয়ে মেতে ওঠে মাঝে মাঝে। কয়েকদিনেই শখ মিটে যায়। কোন কিছু নিয়ে লেগে-পড়ে থাকা ওর স্বভাব নয়। বইপড়া চিরকালের অভ্যেস। ইংরেজীতে দখলও আছে। নির্লোভ নিরাসক্ত। বঙ্কিমবাবুর ভালই লাগে।

নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে চোখে পড়ল খোকন-টুটুলকে। ফুলের মত বাচ্চাদুটিকে দেখে মনটা স্নেহার্দ্র হয়ে উঠল। নিজের দু' ছেলেকে যেভাবে মানুষ করেছেন, এদেরও সেইভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব তাঁর। আর তা নিয়ে তাঁর গর্বের ও অন্ত নেই।

। সাত ।

—উঁহু, কথাটা হেসে উড়িয়ে দিও না অমিয়। তুমি আবার দমদম মাছ ধরতে যাচ্ছ, তার মানে আবার সতীশের ছেলের সঙ্গে তোমার দেখা হবে—আবার ঐ লোক এখানে এসে উপস্থিত হবে। আমার যে সেদিন কী খারাপ লাগছিল ওকে দেখে!

অমিয় তথাপি হা—হা করে হাসে।

—আশ্চর্য, এখনো হাসছ! অধৈর্য হয়ে পড়েন বঙ্কিমবাবু। কৈ, দাও দিকিনি। টেলিফোনটা আমার হাতে দাও। আমি কেশবকে ডেকে বলে দিচ্ছি, অমিয় তোমাদের ওখানে যাচ্ছে না। আমার একেবারেই ইচ্ছে নেই তোমাদের দমদম গিয়ে সে মাছ ধরে।

—আমার মনে হয়—যেন রিসিভারটা তখনও হাতে ধরে রেখেছে অমিয়। আর সেই অবস্থায় এদিকে মুখ ঘুরিয়ে বুড়োর সঙ্গে কথা বলছে। —আমার মনে হয় সতীশ কাকার ছেলেকে দেখে এখনো তুমি ভয় পাও। পেল্লায় শরীর ছিল এক সময়. কিন্তু সুরেন্দ্র কি আর সেই সুরেন্দ্র.

আছে। দেখছিলে তো সেদিন, আমাদের বারান্দায় যখন এসে দাঁড়াল, একেবারে অন্য মানুষ, অন্য চেহারা। শুকিয়ে প্যাকাটি হয়ে গেছে।

—ভয় পাবার কথা হচ্ছে না। বঙ্কিমবাবু চটে যান। গলার স্বর আর এক ডিগ্রী চড়িয়ে দেন তিনি। সতীশ বা তার ছেলেকে আমি কোনোদিন পছন্দ করতাম না তুমি জান। এখনো করি না। তবু কেন সুরেন্দ্র এ বাড়ি আসবে। এতকাল তো আসেনি। তুমি সেদিন দমদম মাছ ধরতে গেছ আর সেখানে অমনি তার সঙ্গে দেখা। ব্যস্, তোমার ঠিকানা জেনে নিয়ে পরদিন মূর্তিমান সশু এবাড়ি এসে হাজির, কেন, কি দরকার ছিল তাকে আমাদের ঠিকানা দেবার। দেখে আমার এমন রাগ পাচ্ছিল—

—আহা, সশু বলছ কি। এর সঙ্গে আমরা ছেলেবেলায় খেলাধুলো করেছি এক সঙ্গে বড় হয়েছি, বাল্যবন্ধু, একই স্কুলে পড়তাম—

—রাখ রাখ! ধমক দিয়ে বঙ্কিমবাবু ছেলেকে থামিয়ে দেন। বাল্যবন্ধু! এক স্কুলে পড়তাম! পড়াশুনো তো ওর ঐ ম্যাট্রিক অবধি, তারপর দলে ভিড়ে গেল। যেন বড় করে ভেংচি কাটেন বঙ্কিমবাবু কথাটা বলার সময়। এমন লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব কি!

বাইরে বারান্দায় বসে নীহার শুনছিল। টুটুনও শুনেছে। খুব খারাপ লাগছিল তার। দাদুর সঙ্গে বাবা তর্ক করছে।

—ইস, বাবা যেন কী! ফিসফিসে গলায় টুটুন এক সময় মাকে বলল, তুমি গিয়ে বাবাকে একবার বারণ কর না। দাদু যখন চাইছে না দমদম মাছ ধরতে যেতে।

—আমার কথা কি শুনবে। নিজের খেয়াল-খুশি নিয়ে চলে। কেমন সৃষ্টিছাড়া মানুষ তোমার বাবা দেখছ তো—বলতে বলতে নীহার থেমে যায়। আবার কান পেতে থাকে।

—দেখি, আমার হাতে টেলিফোনটা দাও। কথার অবাধ্য হয়ো না অমিয়। যেন বাবা ছেলে কাড়াকাড়ি করে টেলিফোনের রিসিভার নিয়ে।

—আর তুমিও যেমন। অমিয় তেমনি হাসছে। সেদিন রুদ্রেন্দুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলে আজও যে আবার দেখা হবে একথা তোমাকে কে বললে!

—হবে, দেখা হবে, আমি বলছি। উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর নিয়ে বঙ্কিমবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন। কেশবের বাড়ির পাশেই যখন ওরা থাকে। তুমিই তো সেদিন এসে বললে। আমি কি সেখানে গেছি!

—হুঁ, অমিয় মাথা নাড়ল। কেশব সেন প্রায় এক বিঘা জমি নিয়ে বাড়ি করেছে। প্রকাণ্ড বিল্ডিং তুলেছে। সামনে ফুল ফলের বাগান। বাড়ির পেছনেই পুকুরটা। বেশ বড় পুকুর। আঃ কী জল! আয়নার মতন। এমন পুকুরে মাছ ধরেও আরাম।

—হুঁ, তারপর! পুকুরের ওপারেই তো সতীশের জমি বলছিলে।

—হ্যাঁ, জমি মানে মাদারের বেড়া দেওয়া আড়াই কাঠার মতন একফালি জায়গা। দুখানা টিনের ঘর তুলেছে। একটাতে সতীশ কাকা থাকেন। অন্য একটায় ছেলে-পুলে নিয়ে রুদ্রেন্দু থাকে।

—কটা ছেলেমেয়ে রুদ্রেন্দুর?

—সে মন্দ না। চার পাঁচটি তো বটেই। এইজন্যই তো অভাবে অনটনে একেবারে লেপালেপি।

—অভাব তো ওদের চিরকালই। যেন কথাটা বলতে গিয়ে বঙ্কিমবাবু নাক সিঁটকান। কোর্ট কাছারি ছেড়ে দিয়ে সতীশ বাড়িতে চরকা ঘোরাতে বসে গেল। ইংরেজের আদালতে আর প্র্যাকটিস করবে না। নন কো-অপারেশন। সুতো কেটে ভারত স্বাধীন করবে। কী মূর্খ কী মূর্খ! তা বাবা যা করল—বাপকে টেক্কা দিয়ে ছেলে আর এক কাঠি ওপরে গেল। সতীশের স্ত্রী জীবিত আছে?

—না। অনেকদিন হয় মারা গেছে শুনলাম। সতীশ কাকা অন্ধ হয়ে গেছে। চলাফেরাও করতে পারে না দেখলাম। দিনরাত ঘরে শুয়ে থাকে।

—রুদ্রেন্দুর এক আধটা ছেলে কি বড়টড় হল? কাজকর্ম করে কিছু?

—কোথায়! অমিয় হাসল। সব এইটুকুন এইটুকুন। আবার লেট ম্যারেজ। মনে হয় আমারও ঢের পরে রুদ্রেন্দু বিয়ে করেছিল। মেয়েটাই বড়। দেখে মনে হল পনেরো ষোলর বেশি বয়স হবে না। আমাদের রঞ্জুর সমান।

—উজবুকটা এতকাল পর বিয়ে করতেই বা গিয়েছিল কেন।

—আহা, উজবুক বলছ কেন। গালি-গালাজ করার দরকার কি। অমিয় আর হাসল না। —বিয়ে একসময় সবাই করে। আমিও তো আগে আগে 'না' করতাম। আর বিয়ে করলে এক সময় ছেলেপুলে হবেই। তা বলে আমাদের খেতে পরতে আসছে না সে। সাহায্য চাইতেও আসছে না।

—চাইবে, আসবে। একবার যখন আস্কারা দিয়েছ, বাড়িও চিনে গেছে, সুতরাং আবার আসবে। ঐ তো শরীরের হাল দেখলাম সেদিন যেন কয়েকবেলা উপোস আছে, তেমনি জামাকাপড়ের অবস্থা, তাকান যাচ্ছিল না।

—হুঁ, তা যাচ্ছিল না, কিন্তু মনে হয় পারতপক্ষে সে আর আসবে না এ-বাড়ি। সেদিন খুব একটা ভাল ব্যবহার তো পায়নি আমাদের কাছে। অমিয় 'আমাদের' করেই কথাটা বলল। রুদ্রেন্দুকে দেখে বঙ্কিমবাবু কী পরিমাণ যে বিরক্ত হয়েছিলেন সেদিন। যেন মানুষটা সম্পর্কে একটা অকথ্যরকম ঘৃণা ঘেন্না পুষছিলেন তিনি। আজও পুষছেন। না কি সতীশ বাড়ুয্যের ছেলেকে দেখে এখনও তাঁর ভয় কাটছে না। নিচে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেদিন নীহারও জিনিসটা লক্ষ্য করেছিল। টুটুন লক্ষ্য করেছিল। দাদুর সেদিনের বিরক্তি, রুক্ষ কথাবার্তা ও রূঢ় ব্যবহার তার পরিষ্কার মনে আছে।

—আর আসবে না, বুঝলে বাবা। অমিয় বাবাকে বোঝাল। —আসলে মানুষটা খুব সরল তো। হার্টটা চিরকালই দরাজ। কতকাল পর আমাকে দেখল সেদিন। দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দুহাতে জড়িয়ে ধরল। তারপর বাড়ি টেনে নিয়ে গেল।

অমিয়র মুখে গল্পটা শুনেছে নীহার। কেশবদার পুকুরে ছিপ ফেলে সে মাছ ধরতে বসেছিল। আর তখন বাড়ির কার ওষুধের জন্য পুকুরপাড়ে থেতপাপড়া না কি যেন একটা গাছগাছড়া খুঁজতে আসে রুদ্রেন্দু। এতকাল পর দেখা হলেও অমিয়কে চিনতে তার এক সেকেণ্ডও লাগেনি। অথচ অমিয় চিনতে পারছিল না। না পারার কারণও ছিল। এই জোয়ান চেহারা। শুকিয়ে পাটখড়ি হয়ে গিয়েছিল রুদ্রেন্দুর। নামটা বলতে অমিয় পরে চিনতে পারে।

—হুঁ, বাড়ি টেনে নিয়ে গেল। বঙ্কিম-বাবুর উত্তেজনা এতটুকু কমছিল না। আমি ভেবে পাই না, যে-মানুষ আমার বাড়ির ত্রি-সীমানায় একদিন ঘেঁষতে পারত না, আমি দিতাম না ঘেঁষতে, হঠাৎ আজ সেই মানুষের বাড়ি ঢুকে তার ঘরে বসে কি করে যে তুমি চা মুড়ি খেয়ে এলে।

দমদম থেকে ফিরে এসে অমিয় সেদিন এই গল্পও করেছিল। খুব খাতির-যত্ন করেছিল রুদ্রেন্দুর স্ত্রী তাকে।

—অ্যাঁ, বঙ্কিমবাবু থামছিলেন না। আজ আবার দমদম যাচ্ছ মাছ ধরতে। তার মানে আবার রুদ্রেন্দুর সঙ্গে দেখা হবে। আবার সে তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে তার ঘরে। তার স্ত্রী তোমাকে চা-মুড়ি খেতে দেবে—তাই বলি, দিন দিন তোমার বয়স বাড়ছে, আর কেমন যেন ক্যাবলাকান্ত ভ্যাবারাম হয়ে যাচ্ছ। যেন বসুধার সবাইকে কুটুম্ব করতে পারলে তুমি এখন খুশী—

—উঁহু, আজ আর দেখা হবে না। রোজ কি আর থেতপাপড়া খুঁজতে পুকুরপাড়ে আসবে রুদ্রেন্দু—অমিয় আবার হাসছিল।

—আশ্চর্য! তবু তুমি তর্ক করছ বার বার এক কথা! যে জিনিস আমি লাইক করি না। দেখা হবে না অর্থ কি! বঙ্কিম-বাবুর গলা আগের মতন আবার চড়ে যায়। কেশবের পুকুরের ওপাশটায় সতীশের বাড়ি বলছ। দেখা না হয়ে উপায় কি।

অমিয় চুপ করে থাকে।

—কি হল কথা বলছ না কেন। বঙ্কিমবাবুর গলায় ঝাঁজ কমছিল না।

—ঠিক আছে, যাব না। এতই যখন তোমার আপত্তি। এতক্ষণ পর অমিয়র রাগ প্রকাশ পেল। ঘটাং করে রিসিভারটা হাত থেকে নামিয়ে রাখল। বারান্দায় বসে নীহার সবটা শুনল। টুটুন শুনল।

এবার বঙ্কিমবাবুর গলার স্বর নরম শোনায়। অতিরিক্ত ভালবাসেন তো তিনি বড় ছেলেকে। —বেশ তো, মাছ ধরতে যেতে চাইছ, তোমার ঐ যে, পানিহাটির এক বন্ধু বসন্তবাবু না কে—এটর্নি, একবার তো গিয়েছিলে তাঁর পুকুরে মাছ ধরতে, কতবড় একটা কাতলা ধরে নিয়ে এসেছিলে—সেখানে যেতে পার। বেহালায় সুপ্রিয়র মামাশ্বশুরের পুকুরে যেতে পার। ভদ্রলোক কদিনই তোমাকে নেমন্তন্ন করেছেন তাঁর ওখানে মাছ ধরতে যেতে—বা উলুবেড়েয় আমার ভায়রা কুমুদশঙ্করের দীঘিতে—

—তুমি চুপ কর। আমি কোথাও মাছ ধরতে যাচ্ছি না। রাগে গজগজ করতে করতে অমিয় ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পিছনে বঙ্কিমবাবু। বঙ্কিমবাবু তাঁর চেয়ারে এসে বসেন। অমিয় রেলিঙের ধারে তার ফুলের টবের কাছে চলে যায়। কিন্তু আগের মতন ফুলগাছের ওপর ঝুঁকে দাঁড়ায় না। ঘাড় সোজা রেখে রেলিঙ-এর বাইরে আকাশ দেখে। তারপর, যেন সে নিজের সঙ্গে কথা বলে—আমি ভেবে অবাক হই, রুদ্রেন্দুকে দেখে আজও তোমার জুজুর ভয়। আমার পঞ্চান্ন। রুদ্রেন্দুর ছাপ্পান্ন। আমার এক বছরের বড় সে। রুদ্রেন্দুর সঙ্গে মেলামেশা করলে আমি গোল্লায় যাব। যেন আমি এখনো স্কুলের ছাত্র। আমার বয়েস পনেরো থেকে ষোল।

—তোমার বয়েস পনেরো থেকে ষোলর কথা হচ্ছে না। পাকা ভুরু কুঁচকে বঙ্কিমবাবু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন। তোমার ছেলের বয়স পনেরো ষোল, তোমার মেয়ে বড় হয়ে উঠছে। রুদ্রেন্দুর সঙ্গে মেলামেশায় তোমার ক্ষতি হবে না। ক্ষতি হবে এদের, তোমার সন্তানদের।

—কেন! অমিয় ঘুরে দাঁড়াল।

—রুদ্রেন্দু একটা ব্যাড এগজাম্পল। ব্যর্থ মানুষ সে, সবদিক থেকে। গম্ভীর গলায় বঙ্কিমবাবু বললেন, তোমার এমন এক বন্ধু যদি এবাড়ি আসা-যাওয়া করে—ছেলেমেয়েদের কাছে তুমি তার কি পরিচয় দেবে শুনি! নিশ্চয় তারা কোনো না কোনো সময় জানতে চাইবে লোকটা কে, কি করত, এখনই বা কি করছে? উত্তরে তুমি তোমার ছেলেকে মেয়েকে কি বোঝাবে বলো!

যেন সত্যি কিছু বোঝাবার নেই। হঠাৎ বিব্রতবোধ করে অমিয়। চুপ করে থাকে। ফ্যালফ্যাল করে অসহায়ের মতন বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—আছে কি কিছু বলার। বঙ্কিমবাবু এবার খুশী হয়ে ঘাড় নাড়েন। তাঁর যুক্তি যে এখানে অকাট্য, অমিয় এর বিরুদ্ধে আর একটা কথাও বলতে পারছে না, লক্ষ্য করে নিজের সম্পর্কে তিনি একটু গর্ববোধ করেন। উল্লাসবোধ করেন। অর্থাৎ তিনি জয়ী হয়েছেন। কাজেই মুখে হাসি ফুটিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ আবার বলতে থাকেন—বাড়ির যেটা ডিসিপ্লিন তা তোমাকে মেনে চলতেই হবে। ছোটবেলায় যেমন মেনেছ। নিজের ভালর দিকে তাকিয়ে আমার কথার একদিনও অবাধ্য হওনি। তেমনি আজ তোমার সন্তানদের ভালর দিক চিন্তা করে বুড়োর একটা দুটো বাধানিষেধ তোমাকে মেনে চলতেই হবে। এমনটা নিশ্চয়ই তোমার কাছ থেকে আমি আশা করব, নয় কি?

হুঁ, হ্যাঁ কোনোরকম শব্দ করল না অমিয়। আগের মতন ঘাড় ফিরিয়ে এক মিনিট আকাশটা দেখল। তারপর ঘাড় গুঁজে আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

এবার বঙ্কিমবাবু পুত্রবধূর দিকে চোখ ফেরান। মেয়েকে পাশে নিয়ে তেমনি আড়ষ্ট নতমুখী হয়ে বসে নীহার।

—বুঝেছ বৌমা, সামান্য কেশে গলাটা পরিষ্কার করে বঙ্কিমবাবু স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করেন। এতটা সময় একটা অস্বাভাবিক অস্থিরতার মধ্যে তাঁর কাটছিল। এখন তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন। —বুঝেছ বৌমা, দরাজ গলায় তিনি বলতে থাকেন, সেদিন ঐ মানুষটা যখন গেট দিয়ে ঢুকে নিচে বাগানে এসে দাঁড়াল, তোমাকে বোঝাতে পারব না আমার মনের অবস্থা তখন কি দাঁড়িয়েছিল। আমি বাগানে ছিলাম। আমার যেন মনে হচ্ছিল লোকটা বাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির আবহাওয়াটাই কেমন বিষণ্ণ থমথমে হয়ে গেল। অম্বুজানিলয়ের এতদিনের আরাম উদ্বেগহীনতা শান্তি শৃঙ্খলা পরিচ্ছন্নতা, সব যেন কর্পূরের মতো বাতাসে মিলিয়ে গেল। দম বন্ধ হয়ে আসছিল আমার। লোকটার মুখের দিকে তাকাতে কষ্ট হচ্ছিল। কেবল ভাবছি কতক্ষণে এ-বাড়ি থেকে সে বিদেয় হবে।

—থাক এই নিয়ে আপনি আর দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনার শরীর খারাপ করবে। নীহার শ্বশুরকে বোঝাল, আর সে আসবে না, আপনার ছেলে যখন বলেছে। তা ছাড়া শ্বশুরের বাবা যদি আর দমদম মাছ ধরতে না যায়, যোগাযোগটা আপনা থেকেই নষ্ট হয়ে যাবে। দশটা বাজে। এখন আপনার দুধ এনে দেই!

—হ্যাঁ, দাও।

বেলা দশটায় বঙ্কিমবাবু এক কাপ দুধ খান। নীহার দুধ আনতে উঠে পড়ল।

নীহারের খুব খারাপ লাগছিল কথাটা চিন্তা করে। এতকাল অমিয় দমদম যায়নি। যাবার কারণ ঘটেনি। কাজেই তাদের দেশের সতীশ উকিলের ছেলে রুদ্রেন্দুর সঙ্গেও অমিয়র দেখা হয়নি। যোগাযোগও ছিল না ওদের মধ্যে। হঠাৎ কিনা নীহারের জেঠতুতো দাদা দমদম এসে বাড়ি করলেন। এক বিঘার ওপর জমি নিয়ে বাগান পুকুর সমেত মস্ত বাড়ি। সারাজীবন ভদ্রলোক লখনৌ থেকে চাকরি করেছেন। রিটায়ার

কার এখন দেখো স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলার ইচ্ছে। ভাল কথা। জেঠতুতো দাদা কেশব সেনের সঙ্গে নীহারের কোনোদিনই তেমন একটা যোগাযোগ ছিল না। তাঁর দমদম বাড়িতে যাতায়াত করার খবরও কেউ রাখত না। সেদিন কেশববাবু, নিজের থেকে কেন জানি হঠাৎ ম্যান্ডেভিল গার্ডেনস-এ এসে নীহারের সঙ্গে দেখা করলেন। চা মিষ্টি খেলেন। তারপর কথায় কথায় তাঁর দমদমের বাড়ি বাগান পুকুরের কথা বললেন। বিশেষ করে নতুন কাটা পুকুরটার কথাই বললেন। অনেক মাছ ছেড়েছেন। বাস্ এবার মনসা তার ধুনোর গন্ধ। পুকুরের নাম শুনে অমিয় নেচে উঠল। পরদিনই ছিপ নিয়ে দমদম মাছ ধরতে ছুটল।

কাজেই সেদিন দমদম মাছ ধরতে যাওয়া, সেখানে বাগানবাড়ি, সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয়র দেখা হওয়া, তারপর সুরেনবাবু নামের রোগা শুকনো ছেঁড়া জামা ছেঁড়া জুতো পরা টাকপড়া একটা মানুষের হঠাৎ একদিন গুটি গুটি এ বাড়ি চলে আসা, শুধু এই নিয়ে শ্বশুরমশায়ের অসন্তোষ উত্তেজনা ক্রোধ বিরক্তি এবং আজ আবার ঠিক ঐ এক জিনিস নিয়ে বাপ ও ছেলের মধ্যে তিক্ততা কথাকাটাকাটি—এর সব কিছুর মূলে নীহারের মনে হল তার জেঠতুতো দাদা কেশব সেন। আর এই জন্য নীহারই ষোল আনা দায়ী। কেননা তার সঙ্গে দেখা করতেই তো ভদ্রলোক এ বাড়ি ছুটে এসেছিলেন। এসে ফলাও করে তাঁর দমদমের ঘরবাড়ি ও পুকুরের খবরটা দিয়েছিলেন।

চিন্তা করে নীহারের মনের ভার কমছিল না। কেমন অপরাধী মনে হচ্ছিল নিজেকে। শ্বশুরের দুধ নিয়ে ফিরে এসে দেখল নাতনী ও দাদু গল্প করছে।

—রাস্তার পাশে গাছতলায় একটা কুষ্ঠরোগী বসে আছে দেখলে তোমার কেমন লাগে দিদিভাই!

—খুব খারাপ লাগে। টুটুন উত্তর করে।

—একটা আতুর, বিকলাঙ্গ মানুষকে দেখলে তোমার কেমন লাগে? বঙ্কিমবাবু দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন।

—চোখ ফিরিয়ে নিই। আমি সেদিকে মোটে তাকাই না। টুটুন লম্বা করে শ্বাস ফেলে।

—একটা ভিখিরি মেয়েছেলে। গায়ে জামাকাপড় নেই। ভাত দাও ভাত দাও বলে অনবরত চিৎকার করছে—কেমন লাগে দেখতে?

একটু চিন্তা করে টুটুন বলল,—একটা দুটো পয়সা থাকলে ছুঁড়ে দিই। তারপর সেখানে আর দাঁড়াই না। তাড়াতাড়ি সরে আসি।

—তার মানে কি? চোখের তারা তীক্ষ্ণ করে বঙ্কিমবাবু নাতনীকে বোঝান। এদের দেখলে হতাশায় বিষাদে মন ভরে যায়। মনে হয় গোটা পৃথিবীর চেহারাটাই বুঝি এমন। আশা নেই আলো নেই আনন্দ নেই। জীবনের সব গান ছন্দ সৌন্দর্য বুঝি নষ্ট হয়ে গেছে। কেবল অন্ধকার আর ব্যর্থতা—তাই না?

টুটুন মাথা নাড়ল।

—কাজেই এসব জিনিস বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে নেই। আমি দেখি না, ঐ যে বললে, তুমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে আস। আমিও তাই করি। তা না হলে নিজের কর্মশক্তি নিজের দৈহিক সুস্থতা মানসিক শান্তি এবং আমার ওপর যদি বা ভগবানের আরো কিছুটা আশীর্বাদ থেকে থাকে—সব ভুলে যাই। নিজের সম্পর্কে তখন ঘোর সন্দেহ জাগে। মনে হয় আমিও যেন অভিশপ্তদের দলে।

টুটুন চুপ করে থাকে...

এত সব ভারী ভারী কথা বড় বড় জিনিস তেরো বছরের মেয়ে বুঝতে পারে? যেমন চোখ বড় করে দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলি গিলছে দেখে অবাক হয় নীহার। দুধের কাপটা টেবিলে শ্বশুরের সামনে আস্তে নামিয়ে রাখল।

—বৌমা!

—বলুন।

—চুল কেটে তোমার ছেলে ফিরল?

—না।

—এতটা দেরী হবার তো কথা নয়। বঙ্কিমবাবুর মুখে চিন্তার ছাপ পড়ল। দুধের কাপটা টেনে নিয়ে চুমুক দেন। চোখ বুজে কিছু চিন্তা করেন। হয়তো এখন খুব ভিড় সব কটা হেয়ার ড্রেসিং সেলুনে। বিড় বিড় করে বললেন তিনি। এই জন্যই নিষেধ করেছিলাম। প্রিয়নাথকে ডাকিয়ে নীচে বারান্দায় বসে আরাম করে চুলটা কেটে ফেল না।—কথা শুনল না। বঙ্কিমবাবু পুত্রবধূর মুখের দিকে তাকান। তুমি এক কাজ কর বৌমা—চাকরটাকে একবার বাইরে পাঠাও, দেখে আসুক।

—রতন দোকানে গেছে। ফিরে আসুক, বলব। নীহার আর দাঁড়াল না। ওদিকে রান্নাবান্না দেখতে হচ্ছে। আর এক চুমুক দুধ গিলে বঙ্কিমবাবু নাতনীর দিকে চোখ ঘুরিয়ে অসমাপ্ত গল্পটা আবার শুরু করেন।

—সেই রকম মনে হচ্ছিল সেদিন সতীশের ছেলের দিকে তাকিয়ে। একটা ব্যর্থ মানুষ। নৈরাশ্যের প্রতিমূর্তি। বুঝলে দিদিভাই, কেবল ভাবছিলাম কতক্ষণে সে আমার চোখের সামনে থেকে দূর হবে।

—আর আসবে না। মা-র মতন টুটুন দাদুকে বোঝাল। বাবা দমদম মাছ ধরতে ধরতে যাচ্ছে না যখন, ওই লোকের সঙ্গে আর দেখা হবার চান্স নেই।

—হুঁ, কোনোদিন আর দেখা না হোক আমিও চাইছি। বঙ্কিমবাবু অনেকটা নিশ্চিন্ত হন ও কাপের বাকী দুধটা এক চুমুকে শেষ করেন।

(ক্রমশঃ)

রান্না করে দেখুন

মুখ-রুচি

হিন্দীতে একটা কথা আছে—'আপরুচি খানা, পররুচি পহ্‌রনা'—অর্থাৎ খাওয়াটা নিজের রুচি অনুসারে আর জামাকাপড় অন্যের রুচি অনুসারে। আমরা বাঙ্গালীরা তৃপ্তি পাই মাছ ভাত শুক্তো ঘণ্টতে। আমাদের পাশের রাজ্যে বিহারীদের রোজকার খাবার হল সেতুপ বা ছাতু—অবশ্য আমি শুধু শ্রমিক শ্রেণীর কথাই বলছি। ওপাশে উত্তর প্রদেশে গেলে দেখা যাবে সেই জায়গাটা দখল করে আছে দাল রোটি আচার আর ওপাশের রাজ্য পাঞ্জাবে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে ওখানকার লোকেরা তন্দুরী রোটি ছোলে (ছোলার ঘুগনি) পেলেই খুশি। তামিলনাড়ুর অধিকাংশ লোকের খাবার হল ভাত সম্বর রসম—ইডলি ধোসার স্বাদ তো আপনারা অনেকেই পেয়ে গেছেন। কিন্তু তার আগে আমাদের জানা দরকার পুরাতন মূল্যবোধ সব কিছুরই যেমন আজ বদলে গেছে সেই রকমই বদলে গেছে খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে আগেকার প্রচলিত ধারণা।

বর্তমান যুগে আমাদের দেশের এমনই দুরবস্থা যে ভেজালহীন পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য বলতে গেলে কিছুই পাওয়া যায় না—যাও বা কিছু পাওয়া যায় তার আকাশ-ছোঁওয়া দাম—সাধারণের নাগালের বাইরে। তবুও একথা অস্বীকার করা চলে না যে খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের মনে কতগুলো ভ্রান্ত ধারণা আছে—যেগুলো আমরা ছোট বেলা মা-ঠাকুমার কাছ থেকে পেয়ে এসেছি এবং এগুলোকেই বেদবাক্যের মতো সত্য ও অভ্রান্ত বলে মেনে এসেছি। যেমন ডিমের কথাই ধরা যাক না কেন। আগে সকলের ধারণা ছিল শক্তভাবে সেদ্ধ-করা ডিম হজমের পক্ষে ভাল নয়। কিন্তু এখনকার বৈজ্ঞানিকদের অভিমত হল পুরো সেদ্ধ ডিমই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। যারা কাঁচা ডিম খেতে অভ্যস্ত, তাদের প্রতি বৈজ্ঞানিকেরা সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন এই বলে যে, কাঁচা ডিম বেশী পরিমাণে খেলে চর্মরোগ ও নানারকম এলার্জি দেখা দিতে পারে পারে। মাংসকে আগে খুবই গুরুপাক বলে মনে করা হতো। পেটের অসুখ ও আমাশায় মাংসকে মনে করা হতো বিষ। এখন কিন্তু চিকিৎসকেরা আমাশায় মাংস সেদ্ধ করে খাওয়ার উপদেশ দিয়ে থাকেন। অনেকেই বিলাপ করেন খাঁটি ঘী নামক জিনিসটা এদেশ থেকে উধাও হয়ে গেল চিরদিনের মতো। তাঁদের অভিমত আমাদের মা-ঠাকুমারা ওই ঘী খেতেন বলেই তাঁদের স্বাস্থ্য অত ভাল ছিল। কিন্তু আজকালকার বৈজ্ঞানিকদের অভিমত, আমরা যাকে বনস্পতি বলি এবং বিদেশে যাকে মার্গারিণ বলা হয় তা খাঁটি ঘী-এর চেয়ে অনেকাংশে ভাল—বিশেষত বয়স্কদের পক্ষে—অবশ্য তাও তো আর বাজারে পাওয়া যায় না—তার বিকল্প হিসেবে বাদাম তেল চলতে পারে। বিশুদ্ধ ঘী তাদেরই খাওয়া চলে যারা প্রচুর কায়িক পরিশ্রম করে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সাধারণত উল্টোটাই ঘটে থাকে। যারা গদি-তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসে থাকেন, তাঁরাই বেশীর ভাগ গব্য ঘৃত সেবন করেন। যাঁরা দৈহিক পরিশ্রম বেশী করেন না, তাঁদের পক্ষে খাঁটি ঘী খুব কম খাওয়াই ভাল—কারণ তা শুধু থ্রম্বোসিসের আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে। খাঁটি ঘী-এর পরিবর্তে গরম ভাত, ডালে সম্বরা, রুটিতে আলতো ভাবে মাখানো পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।

অধিকাংশ ভারতীয় রান্নাতেই কার্বোহাইড্রেড ও চর্বি-জাতীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকলেও প্রোটিন ও ভিটামিনের পরিমাণ খুব কম। মাংস মাছ, ডিম, দুধ, দই, বীন, মটরশুঁটি, ফল, শাকসব্জী এবং ডালেতেও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন আছে। চীনাবাদামেও প্রোটিনের পরিমাণ প্রচুর। যারা নিরামিষাসী তাদের প্রত্যহ ডাল খাওয়া উচিত যদিও ডালে প্রোটিনের পরিমাণ মাংসের প্রায় অর্দ্ধেক। ডাল মাংসের সঙ্গে প্রোটিনের প্রতিযোগিতার সমান আসন গ্রহণ করতে না পারলেও সোয়াবীনের সে ক্ষমতা আছে। এছাড়া সোয়াবীনে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিনও আছে এবং দামেও সোয়াবীন সস্তা। এই জন্যেই সোয়াবীনকে গরীবদের ব্যবহারোপযোগী মাংস বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সোয়াবীনের বাংলা নাম ভাটকলাই—যে কোন বড় মুদীর দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। সোয়াবীনকে প্রত্যহ আপনার খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করুন। গম ভাঙানোর মেশিনে সোয়াবীনকে আটার মতো করে নিতে উৎসাহিত হবে?'

পিষিয়ে নিন। আটার সঙ্গে মিশিয়ে রুটি তৈরী করুন। সোয়াবীন দিয়ে আরও অনেক পদ সহজে রান্না করা যেতে পারে যেমন—বেগুনি হালুয়া, মুচমুচে ভাজা ইত্যাদি অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ সপ্তাহে অন্তত দুদিন আহার্য তালিকায় রাখুন। দু তিনদিন ওগুলো অগভীর পাত্রে ভিজিয়ে রেখে প্রত্যহ জল বদলালেই ছোলা, মটর মুগ অঙ্কুরিত হবে। এগুলি নুন, গোলমরিচ, লেবুর রস ও আলু সেদ্ধ সহযোগে কাঁচাই খান। তাতে একটু পেঁয়াজের কুচিও মিশিয়ে নিতে পারেন—খেয়ে দেখবেন কি চমৎকার স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের দিক থেকেও এটি ভিটামিনে সমৃদ্ধ।

কাঁচা স্যালাডও স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী। রান্না করারও কোন ঝামেলা নেই। লেটুস পাতা কচি বাঁধা কপির পাতা, গাজর, শশা, টমেটো, এরিকিড়, মুলো, বীট পেঁয়াজ ইত্যাদি সুন্দর ভাবে পাতলা পাতলা চাকা চাকা করে কুটে লেবুর রস ও নুন গোলমরিচ দিয়ে খাবার কিছুক্ষণ আগে মেখে রাখুন এবং ভাত রুটির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে খান। রুচি অনুযায়ী সালাড যে কোন তরকারী সেদ্ধ করেও এ রকম ভাবে স্যালাড তৈরী করা যেতে পারে। এতে সেদ্ধ আলু ও ডিম চাকা চাকা করে কেটে মেশাতে পারেন। রাশিয়ান স্যালাডে আলু, মটরশুঁটি, বীন, গাজর, শালগম, ডিম সবই সেদ্ধ করে ছোট চাকা করে কেটে টমেটো ও লেটুসের কাঁচা পাতা মিশিয়ে মেয়োনিজ সস্ মাখানো হয়। মেয়োনিজ সস্ কেনা ব্যয়-সাপেক্ষ—তার বদলে একটু কাঁচা বাদাম বা সর্ষের তেল লেবুর রস ও নুন গোলমরিচ দিয়ে ফেটিয়ে নিয়ে ওই সেদ্ধ তরকারীতে মাখিয়ে নেওয়া যেতে পারে। একটা কাঁচের বড় ডিশে অক্ষত লেটুস পাতাগুলো রেখে তার ওপর সেদ্ধ সব্জীগুলো সাজিয়ে রাখলে সুন্দর দেখাবে।

শেষ একটা কথা সব সময় মনে রাখা উচিত সকালের খাওয়ার পাল্লাটা সবচেয়ে ভারী এবং রাতের খাওয়ার পাল্লাটা সবচেয়ে হালকা রাখা উচিত। সকালে প্রাতঃরাশই ছানা বা ডাল, রুটি খান তাতে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিনের সমাবেশ ঘটাবেন। রাতে না বেশী মশলাযুক্ত খাবার সব সময় না খেয়েই নিদ্রিয়ে ফেলুন। রাতে সব সময়েই লঘু ও সহজপাচ্য খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করবেন।

—সাধনা মুখোপাধ্যায়

রূপসীর খাতা

আজ থেকে আমি নতুন করে রূপ চর্চা সম্বন্ধে কতকগুলি আলোচনা করবো—যা খুব উপকারে আসবে বলে বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য থেকে ও সেই খাদ্যসামগ্রীকে সামান্য রান্না করে কিম্বা ফোটিয়ে বা মিশিয়ে আমরা আমাদের ত্বক শরীর ও মুখের বিভিন্ন অংশে লাগাতে পারি ও তার সাহায্য এতো সুন্দর হওয়া যায় যা ভাবা যায় না। স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত সৌন্দর্যই বর্তমান যুগের রূপচর্চার প্রধান মন্ত্র। দেশী বিদেশী নানা প্রসাধন সামগ্রী দিয়ে অল্প সময়ের জন্য যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায় সে কথাও সত্যি কিন্তু—চিরকালের জন্য স্বাভাবিক সৌন্দর্য রাখতে হলে দরকার সাধারণ ও সহজ পদ্ধতিতে ঘরে তৈরি সামগ্রী। বহু বিদেশী ও দেশী খ্যাতিসম্পন্ন সুন্দরীরা স্বীকার করেছেন এবং গবেষণা করেও দেখা গেছে যে খাদ্যদ্রব্য ফল মূল দুধ শাক্‌জ ইত্যাদি থেকে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে ঘরে অনেক ভাল ও উঁচু দরের সৌন্দর্যসামগ্রী তৈরী করা যায়। শুধু জানতে হবে—কিভাবে সেগুলি তৈরী করা যায়—ও কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। আমি আশাকরি আপনাদের ঠিক মত সাহায্য করতে পারবো—ও আপনারা বাড়ীতে অনেক সহজ এবং সস্তায় নিজেদের বাড়ীতে বসে রূপচর্চা করতে পারবেন। তাছাড়া আজকাল বিদেশী ভাল জিনিস পাওয়াও যায় না আর যেটুকুও বা পাওয়া যায় তাও অগ্নিমূল্য। এসব কারণে আজ থেকে আমি ঘরে তৈরী জিনিস সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করবো ও সেই সংগে আপনাদের চিঠিরও উত্তর দেবো।

প্রথমে আসা যাক দুধ সম্বন্ধে। দুধ আমাদের প্রায় প্রতিটি সৌন্দর্য সামগ্রীতে লাগে। দুধের মতন এতো উপকারী জিনিস খুব কম আছে। মাথার চুল থেকে সুরু করে মুখের ত্বক চোখ চোখের পাতা চোখের নীচের অংশ সব কিছুতে দুধের প্রয়োজন।

চুলে স্যাম্পু করার পর দুধ ব্যবহার করা হয় চুলের গোড়ায় পুষ্টি দিতে ও চুলকে আয়ত্তে আনতে। আপনারা জানেন স্যাম্পু করার পর চুল উড়ু উড়ু শুকনো হয়ে যায়—তখন তাকে ঠিক মতন বসান বা আয়ত্তে এনে বাঁধা মুস্কিল হয়। বিদেশে [illegible] নামের একটি লোশ্যান পাওয়া যায় যা ওরা স্যাম্পু করার পর চুলে সামান্য লাগিয়ে আঁচড়িয়ে নেয়। ফলে চুলে সামান্য [illegible] পিঠে ছড়িয়ে [illegible] অবস্থায় থাকে না। আমরা [illegible], দুধ দিয়ে করতে পারি। তোয়ালে দিয়ে চুল শুকনো করে মুছে নিতে হবে, মেশিন দিয়ে নয়। তারপর সামান্য গরম দুধে চিরুনি ভিজিয়ে তা দিয়ে গোড়ায় থেকে সুরু করে টেনে টেনে চুল আঁচড়াতে হবে। সেই দুধে ২।১ ফোটা কোন পারফিউম বা সুগন্ধ কিছু মিশিয়ে দিতে পারেন তাতে চুলে সুগন্ধ হবে। এভাবে দুধ ব্যবহার করার ফলে চুলের ওপরে সিল্কের মত উজ্জ্বলতাও আসবে। চকচকে ফুরফুরে চুল অথচ আয়ত্তে রাখা যায় এমন সুন্দর চুল কে না ভালবাসে।

দুধের দ্বিতীয় উপকারের কথা বলি এবার চোখের তলায় কালি পড়ে সেটা যদি লিভারের দোষ হয় তাহলে ডাক্তার দেখাতে হবে—কিন্তু যদি ত্বকের কোন গোলমালে হয় তাহলে—তুলো গোল করে নিয়ে ঠান্ডা দুধে ভিজিয়ে তা চোখের নিচে চেপে রাখতে হবে মিনিট ২।৩ তারপর তুলো সরিয়ে ত্বক শুকিয়ে গেলে আবার দিতে হবে। এভাবে অন্তত ১০।১২ বার করলে চোখের তলার কালো গোল দাগ ও চোখের নীচে ফোলা জল ভরা পুটলি মত থাকলে তাও কমে যাবে। তবে এরকম করার সময় বিছানায় শুয়ে অলস ভংগীতে থাকাই ভালো।

তৃতীয় উপকার। রাত্রে শোয়ার সময় চোখের পাতার ওপর দুধের সর লাগিয়ে রেখে দিলে চোখের পাতা বড় হয় ও ঘুরে গিয়ে সুন্দর দেখায়।

শেষ উপকার হচ্ছে। দুধের সরের সংগে কাঁচা হলুদ বাটা বা কমলা লেবুর খোসা বাটা মিশিয়ে তাই দিয়ে মুখের ওপর মেখে রাখা। পরে আঙুলের ডগা দিয়ে আস্তে আস্তে ওগুলো উঠিয়ে দিলে দেখা যাবে ময়লা (যা সূক্ষ্ম চোখে ধরা পড়ে না) উঠে আসছে। আর যাদের ত্বক বেশী তেলতেলে তাঁরা এর মধ্যে সামান্য পাতি লেবুর রস মিশিয়ে নিলে ভালো। যাঁদের ত্বক সাধারণ তাঁরা মাসে ২।৩ বার লেবুর রস ব্যবহার করতে পারেন। এরপর সামান্য গরম জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে এবং পরে আবার ঠান্ডা জলে ধুতে হবে। তারপর আলতোভাবে থুপে থুপে নরম তোয়ালে দিয়ে বা পুরানো নরম কাপড় দিয়ে মুখ মুছে ফেলতে হবে।

তাহলেই দেখুন দুধ আমাদের কতো উপকারে আসতে পারে। এর পরের দিন আমি ডিম সম্বন্ধে আলোচনা করবো। জানাবো কি কি উপায়ে ও কিভাবে ডিম রূপচর্চার জন্য ব্যবহার করা যায়। এইভাবে এক একটা শাকজ ও খাদ্য বস্তু নিয়ে আলোচনা করার পর সবগুলি দিয়ে এক-সংগে কিভাবে রূপচর্চা করা যায় তার বিশদ আলোচনা সবিস্তারে করবো।

এবারে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দেবো। রিহাবাড়ী গৌহাটি আসাম থেকে একজন জানতে চেয়েছেন খুস্কী দূর করতে হলে কি করা উচিত। এবং তাঁর চুলও পড়ে যাচ্ছে। যাহোক খুস্কী দূর করার জন্য কতকগুলি বিশেষ নিয়ম পালন করা উচিত। সবচেয়ে প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে যে চিরুনি পরিষ্কার আছে কিনা চিরুনি নিয়মিত সার্ফ জলে (গরম) ধুতে হবে ও ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। পরে ডেটল জলেও চিরুনি অন্তত মাসে দুইবার ধুয়ে রাখতে হবে। আর নিজের চিরুনি কখনও কাউকে দেওয়া উচিত নয়। খুস্কী খুব সংক্রামক।

আপনার মাথার যা অবস্থা বর্ণনা করেছেন তাতে আমার মনে হয় নিম্নলিখিত-ভাবে যত্ন করা উচিত। রাত্রে শোয়ার সময় খাঁটি নারকেল তেল সামান্য গরম করে তা চুলের গোড়ায় লাগিয়ে চিরুনি দিয়ে ভাল করে আঁচড়িয়ে শুতে হবে। সকালে ইতালিয়ান অলিভ তেলে (টিনে পাওয়া যায় কিম্বা বোতলে দেশী যে অলিভ তেল পাওয়া যায়—তাই নিয়ে নেবেন) একটা পুরো পাতি লেবুর রস দিয়ে গরম করে নেবেন। ধরুন খাওয়ার বড় চামচের তিন চামচ তেলে একটা ছোট লেবুর রস। সেটা চুলের গোড়ায় ও মাথার চামড়ায় বেশ করে ঘষে ঘষে দিতে হবে। এরপর ভালো এগ স্যাম্পু, বা কাঁচা ডিম দুইটি তাতে কয়েক ফোঁটা ক্যাস্টর অয়েল ও দুই বড় চামচ অ্যালকোহল বা ব্রান্ডি মিশিয়ে ফেটিয়ে নেবেন। সেটা শুকনো চুলে বেশ করে ঘষে ঘষে দেবেন পরে সামান্য গরম জল মাথায় দিয়ে চু[illegible] ঘষতে হবে। এতে ফেনা হবে ও চুল একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে। শুধু তাই নয় এ[illegible] ফলে চুলের গোড়া সতেজ হয় ও চুলে নরম সিল্কের উজ্জ্বলতা আসে। এরকম সপ্তাহে একদিন করলেই যথেষ্ট। এছাড়া খুস্কী তাড়ানোর এক মহৌষধ হল ভিনিগার খাওয়ার ভিনিগার দুই চামচ এক কা[illegible] ঠান্ডা জলে মিশিয়ে আঙুলের ডগায় ক[illegible] তা মাথায় চুলের গোড়ার ও মাথ[illegible] চামড়ায় বেশ ধৈর্য ধরে মাখ[illegible] হবে। তারপরই স্যাম্পু করে ধু[illegible] ফেলতে হবে। এর ফলে খুস্কী না হতে বাধ্য। এই ভাবে প্রথমে অন্তত সা[illegible] দিন রোজ করুন পরে খুস্কী কমলে মা[illegible] দুইবার এবং সবশেষে মাসে একবা[illegible] যথেষ্ট। ডিম দিয়ে স্যাম্পু করাটাও মা[illegible] একবার হলেই চলে। তবে সাধারণভা[illegible] সপ্তাহে অন্তত একবার নিয়মিত স্যাম্[illegible] করাটা দরকার। এবং নিয়মিত রাত্রে শো[illegible] সময় সামান্য অলিভ তেল গরম করে কি[illegible] খাঁটি নারকেল তেল গরম করে চু[illegible] গোড়ায় লাগান ভাল। এছাড়া মা[illegible] একবার অন্তত ডেটল জল দিয়ে মাথা ধ[illegible] ভাল। এতে মাথা চুলকানীও বন্ধ হ[illegible] যাবে। দিনে যতোবার সম্ভব চুল ব্রাশ [illegible] বা চিরুনী দিয়ে আঁচড়ান ভাল। এতে চু[illegible] গোড়ার ব্যায়াম হয় ও চুল শক্ত থা[illegible] ডেটল দিলে চুল পাকে না।

—[illegible]

সুজনের শেষ প্রেম

সত্যানন্দ গুহ

অনেক অনেক টাকা চাই বিজু, অনেক টাকা।

কেন স্যার? আপনার তো অনেক টাকা আছে। অনেক টিউশনি করছেন, আর টাকা দিয়ে কি হবে?

সুজন জানে তার বেশ টাকা জমেছে, ব্যাঙ্কে পোস্ট-অফিসের ফিক্সড ডিপোজিট, কিউমুলেটিভ এবং লাইফ ইন্সিওরের সুদসমেত মোটা টাকাই তার হাতে আসবে। তবুও তার টাকা চাই।

বিজয়ার কথায় কি উত্তর দেবে? ঐটুকু মেয়ে হায়ার সেকেন্ডারী দেবে। ওকে কি আর বোঝানো যায়? সুজন সাত বছর স্কুলে অঙ্ক পড়াচ্ছে। প্রাইভেট পড়ে অনেকেই। ছেলে এবং মেয়ে সবাই। তাই সহকর্মীরা ব্যঙ্গ করে বলেন—সুজনবাবু বেশ লক্ষ্মী-পুজো চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের সরস্বতী, আর লক্ষ্মীর দুয়ার পর্যন্ত যায় না। ঐ এক কথা। সুজন ক্ষাপা হয়ে উঠে। মুখে উত্তর করার মত অনেক কথা এসে জমা হয়। নানা কারণে চেপে যায়। ওরা যেন মাস্টারী পেয়েই ধন্য হয়ে গেছে। অন্য কাজ কল্পনাই করতে পারে না। অথচ এই বিদ্যা দিয়েই কত লোক জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে, বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে, কত দায়িত্বশীল কাজ পরিচালনা করছে। অর্থাৎ সোজা কোথায় মোটা টাকা রোজগার করছে। কিছু ছাত্র আর সাধারণ কিছু লোক কৃত্রিম সম্মান দেখায়। তাতেই ওরা ধন্য হয়ে যায়। অথচ সমাজের কুলীনমহলে মাস্টারদের যে স্থান নেই তা ভাবে না। ওরা বলেন মাস্টারী হল অনেস্ট জব। কোন ঝুট-ঝামেলা নেই। বসের চোখ-রাঙানি নেই। সারা বছরে কত ছুটি

সুজনের গলা ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছা করে—অনেস্ট না হাতী বাজে বই পাঠ্য করা হেড মাস্টারকে তেল দিয়ে চলা, ছাত্রদের নানান ঝামেলার মুখোমুখি হওয়া। লেট হলে হেডমাস্টারের খ্যাচ খ্যাচ কথা শোনা। কি নেই? সবই আছে। আর ছুটি? কাদের ছুটি? আর্নড লীভ, ক্যাজুয়াল লীভ, মেডি-

ক্যাল লীভ কেপপাল লীভ মিলিয়ে প্রায় সমানই। স্কুল-মাস্টাররা কি ইচ্ছে মত ছুটি নিতে পারে? বিয়ে বা শ্রাদ্ধতে ছুটি মেলে? লম্বা ছুটিগুলিতে কয়েকশ খাতা না দেখে পারে? সহকর্মীদের সঙ্গে তর্ক জমে না। ওদের চালচলন হাবভাব দেখে। ওরা শান্তিতে নেই। সুখে নেই। দুঃখের কথাও আলোচনা করে। তবুও জীবনে অন্য কিছু করার যোগ্যতা নেই দেখে ভুয়ো শান্তির ভান দেখায়।

কি স্যার আমাকে পড়াবেন না? শুধু টাকার চিন্তা। পাগল হয়ে যাবেন একদিন। বিজয়ার কথায় সুজন সম্বিত ফিরে পায়। সুজন বিজয়ার দিকে তাকায়। কি সুন্দর উঠতি যৌবন। চোখে মুখে বুকে অফুরন্ত যৌবনের বিজ্ঞাপন। প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর। স্কুলে স্পোর্টস ও সহপাঠক্রমিক কাজকর্মে সুনাম আছে। গৃহ-কাজেও নিপুণা। ওকে কি সুজন মনের কথা বোঝাতে পারে? বয়সে ছোট, তার উপর ছাত্রী।

টাকা, টাকাই তো সব। টাকার জন্যই প্রেম ভেস্তে গেল। প্রথম প্রেম টুটুর সঙ্গে। টুটু সুজনকে সঙ্গ দিয়েছে। যৌবনের স্পর্শ দিয়েছে। কখনও উপোষ থাকতে দেয়নি। বহুবার হাত ময়লা করেছে। কিন্তু বিয়ের বেলা স্কুলমাস্টার বিয়ে করব না। টুটু বলেছিল—দেখ সুজন, তুমি অন্য যা খুশী কর। মাস্টারী করো না। সমাজে ওদের কৌলিন্য নেই। আর যা বেতন আমার প্রায়ই উপোষ থাকতে হবে। শাড়ী-গয়না তো দূরের কথা, তার উপর আবার নমাসে ছমাসে মেলে।

টুটু সুজনকে বিয়ে করেনি। এক ইঞ্জি-নীয়ারের সাথে মালা বদল হয়েছে। তার-পরই সুজন স্পষ্ট বুঝে গেল স্কুলমাস্টার-দের যতই চরিত্র থাক, যতই গুণ থাক, আসলে মেয়েরা তা পছন্দ করে না। আদর্শবাদী সুকেন্দ্রিক ছেলের চেয়ে নিষ্ঠা-হীন রোজগারী ছেলেই বেশী পছন্দ। ব্যতিক্রম থাকলেও এই তো চিত্র। সুজন বুঝল—চরিত্র, ব্রহ্মচর্য বা 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ' সবই কেতাবী কথা। বাস্তব জীবনে এরা দূরে থাকে; নয়ত জীবনটা এমন হল কেন?

সুজনের দ্বিতীয় প্রেম নীলিমাকে ঘিরে। নীলিমা 'নীলু' হয়েছিল। লতার মত ঘিরে ছিল। একদিন দেখা না পেলে স্বস্তি পেত না। টুটুকে স্মরণে রেখেই সুজন নীলিমাকে সঙ্গ দিয়েছিল। খুব সতর্কতা নিয়ে। সঙ্গোপনে। ক্রমশঃ উত্তাপে সুজন গলে গেল এবং বিট্টেয়ার টুটুর কথা ভুলে গেল। গভীর ভালবাসা। বিশ্বাস জন্মেছিল টুটু স্বর্ণলতা হয়ে থাকবেই।

নীলিমা কোনদিন মাস্টারদের নিন্দা করেনি। বেশ মনে সয়ে নিয়েছিল। হঠাৎ একদিন তুমি আমার বন্ধু। চিরকাল তাই থাকবে। তোমায় আমি ভুলতে পারব না। আমাদের বিয়ে হলে হয়তো এ মধুর সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে না। তাই মা-বাবার কথা মেনে নিচ্ছি।

সুজন একদিন শুনল নীলিমার ঘটা করে বিয়ে হয়ে গেছে। এক অফিসারের জীবন ধন্য করতে গেছে। আসল কথা সুজনকে হাতে রেখেছিল। ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। মাজা-ঘষা রং। কুলীন মহলে অচল হতে পারে। বার্নার্ড শ' ওদের হাড়ে হাড়ে চিনতেন। নয়ত নারীরা পুরুষধরা কল, লাইফ সিকিউরিটি চায়, ভাল সুযোগ পেলে কেটে পড়ে। এসব কথা লিখলেন কেন? আসল কথা সুজন বুঝেছে আর্থিক যোগ্যতা, সামাজিক স্বীকৃতি নেই বলে স্বামী বলে পরিচয় দিতে মাস্টারদের ওরা চায় না। পত্রিকায় একটা সমীক্ষা বের হয়েছিল। লিখেছিল পাত্র হিসাবে শিক্ষকদের স্থান কেরানীদেরও নীচে। অর্থাৎ একেবারে লাস্ট টার্গেট।

সুজনের তৃতীয় প্রেম জয়ার সঙ্গে, ঠিক প্রেম নয়। অভিনয় সহজেই যোগাযোগ হয়ে গেছে। সুদর্শন, সুবক্তা, বুদ্ধিমান সুজন সহজেই মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ বা মন জয় করতে পারত। জয়াকে আর জয় করতে হয়নি। ও নিজেই জড়াতে চেয়েছিল। মেয়েদের সঙ্গে মেশা, আড্ডামারা নিয়ে তার কোন মানসিক দ্বন্দ্ব বা খুঁতখুঁতে ভাব ছিল না। আধুনিক যুগ, পরিবর্তনশীল সমাজ, রাষ্ট্র রাজনীতি সবাইকে গোল্লায় নিয়ে যাচ্ছে। ছাত্ররা আধুনিক হয়েছে। শিক্ষকরা শুধু কট্টর আদর্শ নিয়ে থাকবে? তা হয় না, হতে পারে না। আধুনিক শিক্ষকরা তো ওদের মধ্যে বেড়ে উঠছে, তাই সে ফিল্মি মিশতো। একসঙ্গে খেলা-ধুলাও করত। কো-এডুকেশন স্কুল। না মিশলে টিউশানী মিলবে কেন? সহকর্মীরা পেছনে যা-তা বলতো।

জয়া প্রাইভেট পড়তে আসত। দীর্ঘাঙ্গী, ফর্সা পদ্মিনী টাইপের মেয়ে। ওর নাকি ছেলে চরানো স্বভাব। একটা মেয়ে একই সঙ্গে এত সহজ সরল সুন্দর আবার ব্যভিচারী নোংরা হতে পারে তা না মিশলে বোঝা যায় না। পড়তে এসে ও শুধু বাজে বকতো। নোংরা কথা আমদানি করত। সিনেমা সেকসটক নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে মশগুল থাকত। হাতকাটা পেটকাটা স্বচ্ছ জামা পরত। ব্রাসিয়ারের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ সুস্পষ্ট হত। সুজন দেখত কিছু বলতে সাহস পেত না। সঙ্গীরা মুখ চেপে হাসাহাসি করত। ওরা বুঝত জয়া সুজনের সঙ্গে লাইন ফিট করছে। স্যার, আপনার বায়োলজি ছিল? মানুষের জন্মবৃত্তান্ত একটু বুঝিয়ে দিন। বই পড়ে ঠিক বুঝতে পারছি না।

সুজন আকাশ থেকে পড়ল। ব্যাপারটা আঁচ করে শক্ত হলো। ওর প্রেমে পা দিলো না। [illegible] অর্থ শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস মমতা হারিয়ে ফেলল। জয়াকে কঠোর কথা বলল। একপক্ষপ্রেম টিকল না।

তবু সুজন মেয়েদের পড়ায়। মাস শেষ হলে হাতে হাতে নগদ টাকা পাওয়া যায়। ওদের পড়াতে পরিশ্রম কম। শান্ত, কথা শোনে। সামান্য হাসাহাসিই যা করে। পড়া না বুঝলেও বোঝার ভান করে। এমনি বছর বছর কত ছেলেমেয়ে পড়তে আসে, পাশ করে, চলে যায়। রমা শ্যামা কণিকা ছন্দা শিপ্রা চিত্রা কত মেয়ে এল আর গেল। প্রেমের হাত-পা গুটিয়ে সুজন তার নিত্য-কর্ম করে যাচ্ছে। বিয়েতে বা নতুন প্রেমে উৎসাহ জাগে না। মা-বাবা বিয়ের কথা বললে বলে—এত কম রোজগারে বিয়ে করা যায় না। বৌ পুষতে গেলে আরও রোজগার চাই, আরও অনেক কিছু চাই। বন্ধু-বান্ধবরাও বিয়েতে রাজী করাতে পারেনি। বিয়ে করবো না—তার ভীষণ প্রতিজ্ঞা। স্যার স্কুলের সময় হয়ে গেল। একটাও অংক হয়নি। আজ তাহলে আর স্কুলে যাব না। বিজয়া আবদারের সুরে কথাগুলি বলল। সুজন চিন্তার সমুদ্র হতে পাড়ে এল। বলল—না, এই করে দিচ্ছি। কলমটা হাতে নিয়ে খাতার উপর ধরল।

আজ থাক স্যার, আপনাকে আজ কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। টাকার কথা ভাববেন না। টাকা আপনার আরও হবে।

না-না একটা কাজের কথা ভাবছিলাম। মিথ্যা বলল সুজন। মুখে না বললেও ভিতরে তার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। প্রেম ভালবাসা বিয়ে সংসার চায়। জীবনধর্ম হতে সে চ্যুত হতে চায় না। বিবাগী বা বৈরাগী হয়ে মানুষ ঠিকঠাক বেঁচে থাকতে পারে না সারা জীবন মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে হয়।

বিজয়ার কাছে মন খুলে কিছু বলতে চায় না। সপ্তাহে তিন দিন পড়াতে আসে। দেখলে মন-প্রাণ জুড়োয়। কামনা-বাসনা মনের কোণে জেগে ওঠে। শান্ত গভীর দৃষ্টি ধীর স্থির চলন। আকর্ষণীয় রূপ। দেখলেই পুরুষচিত্ত জেগে ওঠে। শরীরের রক্ত নেচে ওঠে। প্রেম জেগে ওঠে। তবু সে বাইরে নিরুত্তাপ, নিরুত্তেজ। ঘর-পোড় গরুর মত ভয়। বিজু আজ অংকগুলি থাক, আজ নিয়মটা শুধু বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমার ভয় নেই। আমি সব সাবজেক্টের শর্ট সাজেশন করে দেব। কমন পেয়ে ঠিক পাশ করে যাবে।

বিজয়া জানে স্যারের কথা ঠিক। তা জেনে সে পড়ে। টিউশানীর বাজারে সুজনের বেশ নাম আছে। সবাই তার কাছে পড়ে পাশ করে যায়। সুজন টাকা বেশী নেয় ঘাড় ধরে পড়ায়। কেউ কিছু মনে করে না সকালে সাতটা-আটটা, আটটা-নটা, নট দশটা এই তিন গ্রুপে। দুপুরে এগারো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত স্কুলে। তারপর ছট সাতটা, সাতটা-আটটা, আটটা-নটা নয়-দশ-এই চার গ্রুপে পড়ায়। সপ্তাহকে সোম বুধ-শুক্র এবং মঙ্গল—বৃহস্পতি-শনিবার ভাগ করে নিয়েছে। রবিবার দিন লাইব

ফটো : শ্রীশম্ভু মুখোপাধ্যায়

নসিওরের এজেন্টের কাজ করে। তাতেও কেটে কিছু আসে।

কদিন সহকর্মী রবিনবাবু টিপ্পনী কেটে লেন—আরে মশাই, এত টাকা রোজগার রলে সরকার ট্যাকস বসাবে। ছোট সংসার। হবে এত টাকা দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে সহকারী প্রধান শিক্ষক মিয়বাবু বলে ওঠেন—আপনি অকালে ড়ো হয়ে যাবেন। আপনার কোন লাইফ ই। সাধে কি তার বারো বছর মাস্টারী রলে গাধা হয়ে যায়।

রবিনবাবু তর্ক ছুঁড়ে দেন। বলেন—ানবাবুর মত জ্ঞান দিচ্ছেন যে। নিজের শ-বারো বিঘে জমিতে কম টাকার ফসল য়? শ্যালো বসিয়ে বছরে চারবার ইনকাম রছেন।

ামিয়বাবু অমনি রেগে ওঠেন। কি পাগল-ার মত বকছেন? সার বীজ জন ও লাঙল রচ দিয়ে কত টাকা আর ওঠে। জনদের ঙ্গে রোদবৃষ্টিতে থাকতে হয়। আর কৃতি বিরূপ হলে ফসল তো মাঠেই মারা য়। কত ঝামেলা কত রিস্ক। আর টিউশানী? বিনা মূলধনে স্রেফ ঘরে বসে রোজগার। সলিড ইনকাম। রামবাবু, পাইক-বাবু নকুলবাবু বিষ্ণুবাবু ইত্যাদি সহকর্মী াদের টিউশানী নেই বা জোটে না তারা পক্ষে বিপক্ষে নানা যুক্তি খাঁড়া করে তর্ক মিয়ে তোলেন। সুজন ওদের দেখে মনে নে হাসে। কিছু বলে না। বোঝে ওদের তে পুওর নলেজ। মাস্টারী ছাড়া ওদের অন্য কোন গতি ছিল না। হতোও না অন্য াজ। অবশ্য অমিয়বাবুর আউট নলেজ অনেক। বেশ সহজ সরল লোক। সাহিত্যিক াহিত্যিক চেহারা জোরালো গলা দোষের ধ্যে বড় বেশী অপ্রিয় সত্য কথা বলেন। ঢ়ভাষী হন।

কজন বলে ওঠেন—উনি ভালোই আছেন। কান ভাবনা নেই। সকালে বাজারে যেতে য় না। ছেলেপুলের জন্য ডাক্তারখানায় যেতে য় না, যদ্দিন একা থাকবেন ভালোই াকবেন।

সুজন এদের কি বোঝাবে? কি লাভ? সে সে বসে ভাবে—সল্ট লেকে ইনস্টলমেন্টে মি রেখেছি। আধুনিক প্যাটার্নে বাড়ী রে ভাড়া খাটাবো। রিটায়ার না করা পর্যন্ত ুলের কোয়ার্টারে থাকবো। ডাক্তার ইঞ্জি-নীয়ার বড় অফিসার বন্ধুদের দেখিয়ে বো সুজন মরে যায়নি। সমাজে মাথা উঁচু করে সেও বাঁচতে জানে। ভাগ্য এক-িকে মেরেছে। কিন্তু অন্যদিকে ফেরার রেছে। মাসে হাজার টাকা রোজগার।

সুজন ভালো ছাত্র। বি-এস-সিতে অঙ্কের ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। সংসারের অনটনে এম-এস-সি পড়া হয়নি। বাবা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। হার্টের রোগী। ঐ আয়ে সংসার অচল। ছোট ভাই ডাক্তারী পড়ার সুযোগ পেয়েছে। তাই স্কুলে মাস্টারী নিতে বাধ্য হল সে। মাস্টারীতে ঢুকেই আটকে গেছে। আর কোথাও যেতে পারেনি। সামান্য কার এ্যাপ্রেন্টিস নেয়নি। তাই ওকে টাকায় পেয়ে বসলো। স্কুলের কাজ, টিউশানী, এবং স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেন্ডারীর খাতা দেখে পাঁচশো-সাতশো বছরে বারোশ টাকা একসঙ্গে রোজগার। তার উপর সেভেন এইটের অঙ্ক বই লিখে প্রথম সংস্করণে কিছু টাকা পেয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণে মোটা টাকাই ঘরে আসবে। বইটিও যথার্থ ভাল। তাই বহু স্কুলে পাঠ্য হয়েছে। আসলে তুঙ্গে বৃহস্পতি। নয়ত খারাপ ছেলেদের বা যারা প্রাইভেট পড়ে না তাদের অঙ্কে ভাল করে তুলতে পারেনি। পাশ করানোর তুক জানে মাত্র।

একদিন অমিয়বাবু জিগ্যেস করেন—ও সুজনবাবু, আপনার ছাত্রীরা কেমন পড়া-শুনা করছে? বিজয়া বড়লোকের মেয়ে। মোটা টাকাই দিচ্ছে মনে হয়!

সুজন নীরব। কিছু বললে পাঁচ কান হয়ে যাবে। এমনিতেই দিদিমণিদের নিয়ে ব্যঙ্গ করে। বিদ্রূপ করে। দু-একজনকে নিয়ে ঘটকালি করেন। অমিয়বাবু স্থানীয় লোক। অনেক কাজই তার পক্ষে চলে। কিন্তু সুজন দিদিমণিদের এড়িয়ে করে চলে। পথে চলতে বা এই সেন্টারে গার্ড দিতে এলে যা দেখা সাক্ষাৎ হয়। শুধু দেখাই, কথা হয় না। মাঝে মাঝে ভাবে মন্দ নয়। দ্বিগুণ রোজগার। আবার ভাবে ধ্যাৎ যা সব ছিরি। বিয়ে করলে বিয়ের মত বিয়ে করতে হয়। বিজয়া কেমন পড়াশুনা করে সুজন তা জানে না। পাশ করার টেকনিকে পড়িয়ে যায়। ব্যস, এত খোঁজ নিয়ে কাজ কি? পাশ করানোই তার একমাত্র দায়িত্ব। সবাই তার ঘরে এসেই পড়ে। বারান্দায় টেবিল-বেঞ্চ ব্ল্যাকবোর্ড ঠিক করে রেখেছে। শুধু মাত্র বিজয়াকে বাড়ী গিয়ে পড়াতে হয়। ওর বাবা বিশ্ববন্ধুবাবু ধনী লোক। যতই টাকা লাগুক মেয়েকে বাড়ী গিয়ে পড়াতে হবে। তাই সুজন টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে ওকে বাড়ী গিয়ে পড়ায়। সপ্তাহে তিনদিন। মাসের শেষে নগদ পঁচাত্তর টাকা। হাতে

ছাত্রে। পড়ানোর এক ফাঁকে চা এবং টা জোটে। সুজন আপত্তি করে না। যা পাওয়া যায় তাই লাভ তার কাছে।
বিজয়া খাওয়াতে আনন্দ পায়। জন্মদিনে, পুজোপার্বনে বা কোনো অকেশানে স্যারকে বলা চাই। সুজনের শান্ত গম্ভীর চোখে, মিষ্টি হাসিতে ও কথায় কি যেন খুঁজে বেড়ায়। সুজন যতক্ষণ পড়াবে ততক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে। একদিন কথায় কথায়—স্যার, আপনি একটা মেশিন, সুইচ টিপলেই চলতে শুরু করে। কত যে বকতে পারেন। কোন ক্লান্তি নেই। নিষেধ নেই। দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর একইভাবে একই জিনিস বকে যাচ্ছেন। একটু ভারী গলায় স্যার, আর কোথাও পড়াবেন না। বাবাকে বলে টাকা বাড়িয়ে নেব। বলেই উঠে গেল।
সুজনের চমক লাগল। ব্যাহ্যিক প্রকাশ হল না। ছাত্রীর কথা হেসে উড়িয়ে দিল। অথচ বুকের মধ্যে গোপন ব্যথা মোচড় দিয়ে ওঠে। বলে—কি বাজে বকছো বিজু। পড়ো পড়ো সুজনের ফাঁকা মনের খবর কতটুকু রাখে বিজু? এখনও নাবালিকা। জীবন সমুদ্রে কত সমস্যা, কত দ্বন্দ্ব, কত ঝড় তা কি সে জানে না? ধনীর একমাত্র দুলালী, আদরিণী, খায়দায় স্ফূর্তি করে। দুঃখ কি তো বোঝেই না।

দু-তিন বছর পর প্রধান শিক্ষক মহাশয় রিটায়ার করবেন। অমিয়বাবু সে চেয়ারে যাবেন। যোগ্যতা ও সিনিয়ারিটি দিয়ে সুজনই অমিয়বাবুর চেয়ার পেতে পারে। অবশ্য সামান্য বাধা আসবে বিশ্বনাথবাবুর কাছ থেকে। সুজনের বিশ্বাস বিশ্বনাথবাবু রাজনীতি নিয়েই থাকবেন। অমিয়বাবুর চেয়ারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন না। তবুও বলা যায় না। তাই সে সর্বদা প্রধান শিক্ষক ও অমিয়বাবুর মন জুগিয়ে চলে।

সুজন মাঝে মাঝে ভাবে পোস্ট অফিসে কিউমুলেটিভ, ফিকসড্ ডিপোজিট, লাইফ ইন্সিওয়র প্রাইভেট ফান্ড টিচার্স বেনিফিট ফান্ড ও পেনশন মিলিয়ে কয়েক হাজার টাকা হাতে আসবে। তাছাড়া বই-এর টাকা। টিউশানীর টাকা, কো-অপারেটিভ দোকানের টাকা ও বাড়ী ভাড়ার টাকা নিয়ে কত টাকা যে হবে তা সে অংকের শিক্ষক হয়েও ঠিক করতে পারছে না। কিন্তু ভবিষ্যতে এত টাকা কে ভোগ করবে? উত্তরাধিকার কোথায়? নিজের কষ্টার্জিত অর্থ কোথাও দান করতে পারবে না। একজন জীবনসংগীর প্রয়োজন। টাকার বিনিময়ে আরও টাকা বাড়াতে হবে। ছোট ভাই, মা-বাবা এবং উত্তরাধিকারীরা যেন অভাব বলে কিছু বুঝতে না পারে।

স্যার, চা ঠান্ডা হয়ে গেল। সুজন এতক্ষণ খেয়াল করেনি। ওর মা এক ফাঁকে চা পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওমলেটটা বিজয়ার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল—তুমি খাও ... আমার ইচ্ছে করছে না। একটা ... চা ... করে চ্যাপ্টারটা ... শেষ ... ।

অমিয়বাবু রসিক ব্যক্তি। জীবনে প্রেম করেননি। কিন্তু প্রেম ভালবাসার কথা উঠলে কথাসাহিত্য হতে নানা কোটেশন দিয়ে জমিয়ে তুলতেন। একদিন কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করেন—সুজনবাবু, প্রাইভেট টিউটর ও ছাত্রীদের নিয়ে বাজারে কত গল্প উপন্যাস বের হয়েছে। কত রসিকতা লোকমুখে চলছে। আপনার কেমন চলছে? বিজয়াকে কি জয় করে ফেলেছেন?

সুজন গম্ভীর হয়ে যায়। এসব সস্তা রসিকতা তার ভালো লাগে না। ওসব গল্প-উপন্যাসেই চলে। রাবিশ গল্প বাদ দিয়ে অন্য কথা বলুন। পড়াশুনো, শিক্ষার সমস্যা বা অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা করুন। এই জন্যই তো শিক্ষকদের সম্মান নেই।
ঐ সব প্রশ্ন শুনলেই সুজনের মন বিজয়ার ঘরে চলে যায়। সুন্দর সাজানো ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে 'আসুন স্যার' বলে ভেতরে বসায়। যত্ন করে চা-টা দেয়, নানা ছুতো-নাতায় শরীর ছুঁয়ে দেয়। কত বয়স? ষোল, সতেরো, না-হয় বড় জোর আঠারো। আর সুজনের? একুশ বছর বয়সে স্কুলে ঢুকেছে আর সাত বছর সার্ভিস হয়ে গেল। সুজন ওকে ছেলেমানুষ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। কিন্তু ওর হাবভাব ও অন্যান্য ব্যাপার দেখে সুজনের স্পন্দন লাগে। সময় সময় তার বুদ্ধিকেও সীমা ছাড়িয়ে যায়। সুজন বাড়ী এসে নির্জন ঘরে বসে বসে ভাবে।
সুজনের উত্তর না পেয়ে অমিয়বাবু অন্য প্রসঙ্গে পা দিয়ে বলেন—এত টাকা রোজগার করেন অথচ স্ফূর্তি করেন না। সিনেমা দেখেন না। ভাল ড্রেসও পরেন না। একেবারে নীরস ব্যক্তি মশাই। মনে মনে ভাবেন ভাল খায় না- দায়নাও বোধ হয়।
সুজন মনে মনে রেগে যায়। তবুও ভাল মানুষের ভান করে। সময় কোথায়? আর আজকাল সাহিত্য সিনেমায় কি আছে? বস্তাপচা গল্প আর চলতি কেচ্ছা। ঐ করেই তো বাঙ্গালী জাত শেষ হয়ে গেল। পি সি রায় সাধে কি অভিমান করেছেন?

আপনি মনের দিকে বুড়ো হয়ে গেছেন। জীবনের অন্য দিকে একটু তাকান।

সুজন অমিয়বাবুর কথায় প্রচণ্ড রাগতে পারত। রাগে না, সবাই তাকে ভাল শিক্ষক বলে খাতির দেখায়। সম্মান দেখায়। ছেলেরাও ভালোবাসে। অমিয়বাবুও খাতির করেন। নানা কাজে সহযোগিতার জন্য ডাকেন। ঐ চেয়ারে বসবে বলে সুজন সবই হাসিমুখে সহ্য করে। চুপচাপ একধারে বসে আপন মনে কাজ করে। হাল্কা রসিকতা করে না। অফ পিরিয়ড পেলেই কিছু কিছু লিখতে বসে। আর একটা বই বের করবে। ফাঁকা কথাবার্তায় কি পয়সা জোটে? ফাঁকা গল্প করেই এরা মরল। রাজনীতি, খেলা-ধুলা সিনেমা নিয়ে কত অসার গল্প করে। কত অলস সময় কাটায়।

সুজনবাবু আপনি ভাগ্যবান। প্রথম এ লাইনে এসে আশি টাকা বেতন পেতাম। তাও দু-এক টাকা করে নিতে হত। দু-একটা টিউশানী করতাম। আজকাল তো তিন-চার গুণ বেড়ে গেছে। বাংলায় এম-এ। কয়জন আর প্রাইভেট পড়ে? ইংরাজী জানি, তবু স্কুলে বাংলা পড়াই বলে কেউ পড়তে আসে না। আমি মিতা বলে একটা মেয়েকে পড়াতাম। আমার বাড়ী এসেই পড়ত। আমার স্ত্রী একদিন বলল—মিতা ফিতাকে পড়াতে হবে না। আমি কষ্ট করেই থাকব। ওকে পড়তে আসতে বারণ করে দাও। কি ভয়ংকর ভাবুন। তাই বিয়ের আগে যা পারেন পড়িয়ে নিন।

আচ্ছা স্যার, আপনি এম-এস-সিটা দিচ্ছেন না কেন? আজকাল পরীক্ষায় বসলেই তো পাশ। আপনাকে স্কুলে ঠিক মানায় না।
বিজয়ার কথায় সুজনের মনের কোণে ব্যথা জাগে। সত্যি কথাই তো। এ সব কিছু ছেড়ে পড়াশুনা সম্ভব না। আবার ভাবে, কি লাভ? এর থেকে বেশী রোজগার তো হবে না? কিন্তু বিজয়ার এতটা ইন্টারেস্ট কেন? অল্প বয়সের ছেলেমানুষি তো নয় এর গূঢ় অর্থ আছে। তাছাড়া ও বহু ব্যক্তিগত প্রশ্নও করে। যেমন—বাড়িতে কে-কে থাকেন? কি কি খেতে ভালবাসেন? বিয়ে করছেন না কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।
সুজন পাশ কাটিয়ে যায়। সে ভাবে ওকে বিজয়া না ডেকে বিজু ডাকাও ঠিক ছেলেমানুষি নয়। ওকে কি বলবে?

পূর্বের ব্যর্থ প্রেমের কথা কি বলা যায়? ব্যক্তিগত কথাও কি এভাবে বলা যায়। স্যার, আমাকে পরশু দিন 'সমবায়িকায় নিয়ে যেতে ...। বাবা অফিসের কাজে বাইরে যাবেন। মার শরীর ভাল নেই আমার জন্মদিনের জন্য কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে। আমাকে একা ছাড়বেন না আপনি সঙ্গে থাকলে আপত্তি করবেন না আমি মাকে বলেও রেখেছি।

ছাত্রীর আবদার, যেতে হল অগত্যা সুজনের কি লজ্জা, এদিক-ওদিক তাকা তাকাতে যায়, চোরের মত হাঁটে। পাছে কে ছাত্র দেখে ফেলে। কত ছাত্র চলাফে করছে। বিজয়া পাশাপাশি হাঁটছে। ... লাগছে কিন্তু। পথে ওকে সুন্দর দেখ সুজন গর্ব অনুভব করে।

ঘরে ফিরে এসে সেদিন সুজন খেয়ে-দে শুয়ে পড়ে। তার আর কোন কাজ ... লাগে না। মনটা খুশীর জোয়ারে ... বেড়াচ্ছে। ওকে ঘিরেই ভাবনা চিন্তা দোলা খাচ্ছে। বিজয়া পথে ওকে ... পরিবারের বহু গোপন কথা বলেছে। বা ... তার মা-বাবার বিয়ের কথাও। তার আবার প্রেম ভালবাসা জেগে উঠল। সব তো খারাপ নয়। বিয়ের বাসনা তীব্র সে কি বিজয়ার প্রতি...... :
অন্য চিন্তা ভাবনাগুলো বাকসবন্দী রাখে। আজ শুধু বিজয়ার কথা, কি ক বিজয়া বলেছিল—আমার মাকে বাবা আগে প্রাইভেট পড়াতেন, এবং......

বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতায় (মস্কোয়) স্প্যাসকি লড়ছেন পেট্রোসিয়ানের সঙ্গে।

দেশ বিদেশের খেলা

দাবা ছেড়ে সাংবাদিকতা!

অবিচ্ছিন্ন জয়ের ইতিহাসে শেষ নায়কের চরিত্র নাটকীয়। ব্যর্থতা ও সাফল্যের শিহরণে রোমাঞ্চকর। অনমনীয় অধ্যবসায়ের প্রতীক এই উজ্জ্বল দাবা নায়কের নাম বরিশ স্পাসকি।

শিশুকাল থেকেই স্পাসকির জীবন বিচিত্র রস-সম্ভারে পরিপুষ্ট। এ্যাথলেট হিসেবে দক্ষ। বিশেষত হাইজাম্পে বিশেষ পারদর্শী। টেনিস খেলায় নিপুণ কারিগর। একজন কৃতী ফুটবল খেলোয়াড়। অবসন্ন ক্লান্ত মুহূর্তে কাটান দাবা খেলে। তখন পার্থিব পৃথিবীর সব হারিয়ে যায় দাবার ছকে। আত্মকেন্দ্রিক স্পাসকি আত্মমগ্ন হন দাবার চালে। আবার পর মুহূর্তেই মন পাড়ি দেয় বিষয়ান্তরে। সব কিছুকেই পরম আগ্রহ-ভরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেন। কিন্তু কোন কিছুর মধ্যেই দীর্ঘ সময় নিজেকে একান্ত করে ধরে রাখতে পারেন না। এই জন্যেই বলছিলাম স্পাসকির চরিত্র নাটকীয়।

বিশ্বদাবার স্বর্ণসিংহাসনে রাশিয়ার একচ্ছত্র আধিপত্য তিন যুগের ওপর। ১৯৩৭ সালে নেদারল্যাণ্ডের ডঃ মাকস ইউভকে পরাজিত করে রাশিয়ার আলেকজাণ্ডার এ আলেকসহাইন দাবার জগতে স্বদেশের নামকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর তার উত্তরসূরীরা সেই বিজয় পতাকাকে সগর্বে একটানা উড্ডীন রেখেছিলেন ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। ঐতিহাসিক পরিসংখ্যানটি নীচে বিধৃত করছি।

সাল	বিজয়ীর নাম
১৮৯৪—১৯২১	এমানুয়েল লাস্কার (জার্মানী)
১৯২১—১৯২৭	জোস আর কাপাব্লানকা (কিউবা)
১৯২৭—১৯৩৫	আলেকজাণ্ডার এ আলেকসহাইন (রাশিয়া)
১৯৩৫—১৯৩৭	ডঃ মাক্স ইউভ (নেদারল্যাণ্ড)
১৯৩৭—১৯৪৬	আলেকজাণ্ডার এ আলেকসহাইন (রাশিয়া)
১৯৪৮—১৯৫৭	মিখাইল বটভিনিখ (রাশিয়া)
১৯৫৭—১৯৫৮	ভাসিলি স্মিসলভ (রাশিয়া)
১৯৫৮—১৯৬০	মিখাইল বটভিনিখ (রাশিয়া)
১৯৬০—১৯৬১	মিখাইল টাল (রাশিয়া)
১৯৬১—১৯৬৩	মিখাইল বটভিনিখ (রাশিয়া)
১৯৬৩—১৯৬৮	টাইগ্রান পেট্রোসিয়ান (রাশিয়া)
১৯৬৯—১৯৭১	বরিশ স্পাসকি (রাশিয়া)

দাবায় রাশিয়ার অবিচ্ছেদ্য দীর্ঘ জয়ের ইতিহাসে স্পাসকি শেষ নায়ক। ১৯৭২ সাল-এর দাবা যুদ্ধে তিনি হারলেন আমেরিকার সদ্য বিকশিত প্রতিভা ববি ফিশারের কাছে। ববি ফিশার প্রথম আমেরিকান যিনি বিশ্ব সেরা দাবাড়ুর খেতাবে ভূষিত। এবং সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের দৃঢ় রুশ আধিপত্যকে এক ধাক্কায় ভেঙে দিয়ে নতুন যুগের প্রবর্তন করেন। প্রাক চূড়ান্ত পর্বের খেলায় ফিশার হারিয়েছেন সোভিয়েট রাশিয়ার আর এক শক্তিশালী খেলোয়াড় টাইগ্রান পেট্রোসিয়ানকে। ১৯৭২-এর পূর্বে

স্পাসকি ফিশার মোট পাঁচবার পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছেন। দুটি খেলার ফলাফল অমীমাংসিত ও তিনটি খেলায় স্পাসকি জয়ী।

চল্লিশ দশকের শেষে সোভিয়েট রাশিয়ায় দাবা বোর্ডে স্পাসকির প্রথম আবির্ভাব। তখন তার বয়স মাত্র দশ। প্রখ্যাত রুশ দাবা প্রশিক্ষক ভ্লাদিমির জ্যাক এই তরুণ প্রতিভাকে আবিষ্কার করেন। তালিম দেন। প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে উৎসাহ দান করেন। বাড়তি অনুপ্রেরণা এসেছিল বোন ইরাইদার কাছ থেকে। কারণ তখন সে রাশিয়ার মহিলা চেকারস চ্যাম্পিয়ান। সে-কারণেই হয়তো অন্যান্য খেলার চেয়ে দাবার প্রতি শিশু স্পাসকির গভীর অনুরাগ জন্মায়। জ্যাকের প্রশিক্ষণে ও স্বীয় ক্রীড়া-দক্ষতার নিভুল চালে স্পাসকি মাত্র ষোল বছর বয়সে 'মাস্টারস টাইটেল' জয়ের গৌরব অর্জন করেন। ১৯৫৫ সালে জুনিয়ার ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ান। এক মাস পরে সুইডেনের গোটেবোর্গে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে দাবা খেলার 'গ্র্যান্ড মাস্টার' খেতাবে ভূষিত হন। কিন্তু পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে আমস্টারডাম ও হল্যান্ডে আয়োজিত 'চ্যালেঞ্জের টুর্নামেন্টে' স্পাসকি বিফল হলেও তার ক্রীড়াকীর্তি সর্বজন স্বীকৃত হয়। স্পাসকি ব্যতীত ইতিপূর্বে এত অল্প বয়সে আর কোন দাবাড়ু এই সব খেতাব নিজের নামের পাশে জুড়ে দিতে পারেন নি। পরে অবশ্য আমেরিকার ববি ফিশার স্পাসকির এই নয়া নজীর ম্লান করে দেন।

দশ বছর পর পুনরাবির্ভাবে স্পাসকি উপর্যুপরি দুবার ভাল খেলেও পরাজিত হন। জীবনের প্রথম পর্বে পরপর কয়েকটি জয়ের পর বার বার ব্যর্থ হয়েও দমে যাবার পাত্র স্পাসকি নন। 'ফেলিওর আর দি পিলারস অফ সাকসেস'—ইংরেজী প্রবাদ বাক্যের যেন এক চরম দৃষ্টান্ত তিনি নিজে। বিন্দুমাত্র নিরাশ না হয়ে ধীর স্থির শান্ত সংযত ও অসাধারণ অধ্যবসায় নিয়ে অনুশীলন শুরু করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি বাঘা বাঘা দাবা বিশারদদের পেছনে ফেলে চূড়ান্ত খেলায় তদানীন্তন চেস কিং স্বদেশীয় টাইগ্রাম পেট্রোসিয়ানের বিরুদ্ধে অল্পের জন্য পরাজিত হন। ১৯৬৯ সালের বিশ্বদাবা প্রতিযোগিতার ফাইনালে স্পাসকি অতিমানবিক দাবার চালে পেট্রোসিয়ানকে অনায়াসে সিংহাসনচ্যুত করে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। কিন্তু পরের বছর ববি ফিশারের কাছে হেরে যাওয়ায় তিন যুগের ওপর অধিকৃত রাশিয়ান দাবা সাম্রাজ্য বেহাত হয়ে যায়।

বরিশ স্পাসকির জীবনের অন্য একটা দিক সাংবাদিকতার রসে আচ্ছন্ন। ছেলেবেলা থেকেই সাংবাদিক হওয়ার মহান স্বপ্ন দেখেন স্পাসকি। লেখার হাত আছে। স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে ভর্তি হন সাংবাদিকতা শিক্ষায়। ১৯৫৫ সালে লেলিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অফ জার্নালিসম' থেকে সাংবাদিকতায় উত্তীর্ণ হন। দাবা ছেড়ে জীবনের বাকী দিনগুলো তিনি সাংবাদিকতার পেশায় আত্মনিয়োগে অভিলাষী।

স্পাসকি প্রকৃত প্রেমিক। নীল আকাশ, বরফে ঢাকা পাহাড় ও তুষারাবৃত বৃক্ষের ছায়া পড়ে তার মনের গহনে। এখন স্পাসকি সব ছেড়ে খোঁজেন সুখী গৃহ-কোণ। দ্বিতীয় স্ত্রী ল্যারিসা ও পুত্র ভ্যাসিলিকে নিয়ে প্রকৃতির কোলে রচনা করেছেন শান্তির নীড়। সুরু করেছেন সাংবাদিকজীবন। সুখী মানুষ। কিন্তু সুখের মধ্যে অসুখ। কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে মনে পড়ে যায় প্রথম স্ত্রীর একমাত্র কন্যা তানিয়ার কথা। চার বছরের ফুটফুটে মেয়ের সঙ্গে দাবা খেলার সুখ-[illegible]লো বিষাদের তুলি দিয়ে আঁকা ছ[illegible] ভেসে ওঠে।

—প্রশান্ত দাঁ

খেলার জগতে মেয়ে

কিশোরী সাঁতারু মৌসুমী রায়

নাফিসা আলী এবং শ্রীপর্ণা ব্যানার্জির মত মৌসুমী রায়ও লেকের ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সদস্যা। ওখানেই প্রশিক্ষক অনিল দাসগুপ্তের তত্ত্বাবধানে মৌসুমী সাঁতারের তালিম নিচ্ছে। ডায়োসেসনের অষ্টম শ্রেণীর এই ছাত্রী ১৯৭০ থেকে সাঁতার অনুশীলন শুরু করে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। '৭৪-এ রাজ্য স্কুল সাঁতারে যোগদানের সুযোগ পেয়ে ১১—১২ বয়ঃসীমা গ্রুপে ইলা পালের সঙ্গে মৌসুমীও একশ ও দুশ মিটার বুক সাঁতারে জাতীয় রেকর্ড ম্লান করার কৃতিত্ব প্রকাশ করে।

এবার আগ্রায় জাতীয় শরৎকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাংলার মেয়েরা সাঁতারে শীর্ষস্থান পেয়েছে। মৌসুমী এই দলে ছিল। '৭০ সাল থেকে সাঁতার শুরু করলেও এই বছরই ও প্রথম বড় আসরে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পায়। ক্লাবের প্রতিযোগিতায় জুনিয়ার বিভাগে একশ ও দুশ মিটার বুক সাঁতার, একশ মিটার ফ্রিস্টাইল, চিৎসাঁতার এবং রিলে সাঁতারে (ফ্রিস্টাইল) মৌসুমী সাফল্য অর্জন করে। মৌসুমী বলে, অনিলদা আমার অনুশীলনের প্রগতি দেখে প্রতিযোগিতায় নামার জন্য বেছে নেন।

মৌসুমীদের আদি বাড়ী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। বাবা পবিত্রকুমার রয় ছিলেন সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনীয়ার। চাকরীর সূত্রে তিনি যখন সপরিবারে ব্রহ্মদেশে ছিলেন, মৌসুমীর জন্ম সেদেশেই। বর্তমানে শ্রীরায় মেটাল বকসের অফিসার। মৌসুমীরা দুই ভাইবোন। দাদা এখন বারাণসীর আই আই টি-র ছাত্র। বাবা ব্রহ্মদেশে থাকার সময় নিয়মিত ফুটবল ও টেনিস খেলতেন। ফুটবলে ওদেশে বেশ নাম করেছিলেন, বলল মৌসুমীর দাদা। এঁদের বর্তমান আবাস দক্ষিণ কলকাতার কাঁকুলিয়া রোডে।

মৌসুমী লেকে রোজ প্রায় দেড়-দুই ঘণ্টা অনুশীলন করে। অনিলদাই (অনিল দাসগুপ্ত) স্ট্রোক দেখিয়ে দেন। জলাধারের মাপ ৩৩ মিটার হওয়ায় সাঁতারের গতি স্থির করতে বা সময় রাখতে বেশ অসুবিধা হয় বলে মৌসুমী জানাল। শক্ত-সমর্থ মজবুত দেহের অধিকারিণী এই কিশোরী মেয়েটি বেশ সপ্রতিভতার সঙ্গেই জানাল সাঁতারে যথাসম্ভব উন্নতি করার জন্য অনলসভাবে চেষ্টা করে যাবার ইচ্ছা তার। গত মাসে ঐকান্তিকভাবে অনুশীলন চালিয়ে বুক সাঁতারে অনেকখানি সময় কমিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। মৌসুমী আশা করে কয়েক বছরের মধ্যেই জাতীয় সাঁতারে যোগ দেবার কুশলতা অর্জন করতে পারবে। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল করার দিকে মৌসুমীর দৃঢ়সংকল্প অনুভব করে মনে মনে আশ্বস্ত অনুভব করা যায়। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সাঁতারে এখনও অনেক পিছিয়ে। বিশ্বমানের কথা দূরে থাক এশীয় আসরেও আমরা জাপান,

ফিলিপাইন বা ইরাণের থেকেও পিছিয়ে রয়েছে। অথচ ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ। নদী, পুকুর দীঘিতে গাঁথা গ্রামীণ ভারতে যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাঁতার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয় তাহলে নিশ্চয়ই অনেক অজানা প্রতিভার দেখা পাওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গেই নানা অঞ্চলে বহু সাঁতারু আছে, যারা সুষ্ঠু সংগঠন ব্যবস্থার অভাবে বড় বড় আসরে আসার সুযোগই পায় না। বড় দেশের উপযোগী ক্রীড়া সংগঠনের অভাব আমাদের আজ পূরণ হচ্ছে না। সরকারী আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে যদি জাতীয়-চিন্তাভাবাপন্ন বেসরকারী সংস্থা নিঃস্বার্থ লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে এসে দেশের ছেলেমেয়েদের সামনে সুযোগ এগিয়ে দেয়, তাহলে এদেশেও অন্যান্য খেলার সঙ্গে সাঁতারেরও প্রভূত উন্নতি হতে পারে। মৌসুমীর কথাতেই বলি—'কলকাতায় ভাল জলাধার নেই বলে আমাদের প্রশিক্ষক এবং সাঁতারুরা অভিযোগ করেন। সরকারী চেষ্টায় নির্মিত সুভাষ সরোবর আমাদের বাড়ী থেকে অনেক দূরে। ঐ জলাধারটিই অনুশীলনের পক্ষে খুব ভাল। কিন্তু বাড়ী থেকে দূরে হওয়ায় আর শহরের পরিবহণ ব্যবস্থা সমস্যাসঙ্কুল হওয়ায় অত দূরে গিয়ে রোজ অনুশীলন করা আমাদের মত দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দাদের পক্ষে একরকম অসম্ভব। তাছাড়া আমাদের পড়াশোনার চাপও কম নয়। লেখাপড়ায় মন না দিলেও চলবে না। ভবানীপুরে পদ্মপুকুরে জল হাল্কা কিন্তু জল এত ময়লা যে তাতে অনুশীলন করলে শরীর অসুস্থ হবার আশঙ্কা।

সাঁতার মরশুমও এ রাজ্যে বড্ড কম সময় থাকে, বললে মৌসুমী। এঁরা যদি তাপ-নিয়ন্ত্রিত জলাধার তৈরী করেন, তাহলে বোম্বাই বা পাঞ্জাবের মত সারা বছর সাঁতার অভ্যাস করা যায়। কিন্তু সংগঠনকরা সে সব দিকে মাথা ঘামান না কেন? এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে? গুজরাট ও বোম্বাইয়ের ছেলেমেয়েরা পূর্বাঞ্চলের সাঁতারুদের তুলনায় অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা পায়। একথা অনেকের মুখ থেকেই শোনা যায়।

যাইহোক, তর্কের দিকে না গিয়ে মৌসুমীকে জিজ্ঞাসা করি সাঁতার মরশুম শেষ হলে কি কর?—সাইক্লিং করি আর ব্যাডমিণ্টন খেলি। তাছাড়া গল্পের বই পড়ে থাকি। ভাবছি সাঁতার কাটার পর্ব শেষ হলে মন দিয়ে ব্যাডমিণ্টন আর ক্রিকেট খেলব। ক্রিকেটটা এখন পাড়ায় একটু একটু খেলি। কাগজে দেখছি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের বেশ শক্তিশালী ক্রিকেট দল তৈরী হয়েছে। বেশ কয়েকটি নতুন ক্লাবও গড়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত মৌসুমী বলে, জানেন খবরের কাগজে সাঁতারের কথা পড়েই আমি সাঁতার শেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠি। এ ব্যাপারে দাদা আর বাবা আমায় খুব উৎসাহ দেন। মা অবশ্য আমার পড়াশোনার ওপরই বেশী জোর দেন।

স্কুলে এথলেটিকেও মৌসুমী দৌড়, হাইজাম্প ও ব্রড-জাম্পে সাফল্য অর্জন করেছে। তাছাড়া টেনিকোয়েটও ভালই খেলে। বলে, জানেন আমি ঘুড়িও উড়াতে পারি। মৌসুমীর দাদা বললে, ও ব্যাডমিণ্টনটা ভালই খেলে। মৌসুমীর হবি—স্ট্যাম্প আর গ্রীটিংস কার্ড জমান। একদিকে বাবা মায়ের সমর্থন, আর অন্যদিকে নিজের একাগ্রতার সঙ্গে সস্নেহ প্রশিক্ষণের গুণে মৌসুমীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়।

অময়

মাঠের নায়ক

পলাশ নন্দী

'পদ্মপলাশ নয়, পলাশ লোচনও নয়, আমার নাম স্রেফ পলাশ নন্দী। ক্রিকেটার এখনও হই নি, কবে হতে পারবো তাও জানি না। ওদিকে মেঘে মেঘে বেলাও তো অনেক হোতে চললো। বাইশটি বসন্ত ইতিমধ্যেই বিদায় নিয়েছে'।

কথা হচ্ছিল পলাশের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে বসে। তারিখ—২৩শে নভেম্বর, শনিবার। একটু আগেই সি এ বি লীগের প্রথম ম্যাচটি জিতে এসেছেন গোপাল, প্রকাশ, পলাশরা দশ উইকেটে। প্রতিপক্ষ ইয়ংবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ভারত খ্যাত গোপাল বসু ৬৩ করে অপরাজিত, পলাশের সংগ্রহ ৬৫, তবে আউট। লীগের প্রথম দিনেই ৬৫, তাই মেজাজটা বেজায় ভালো তবে আত্মতুষ্টি বা আত্মম্ভরিতার ছোঁয়াচ নেই এতটুকু পক্ষান্তরে পলাশ বিনয়ে বিনম্র প্রচারে-বিমুখ। ক্রিকেটের মাঠে পলাশের প্রতিষ্ঠা মুখ্যতঃ ব্যাটসম্যান হিসেবে। কালে ভদ্রে বল করেন বটে কিন্তু তা শুধু দায়ে পড়লেই।

শুধু কলকাতার মাঠ ময়দানেই নয়, গোটা পূর্বাঞ্চলে পলাশ আজ এক প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ক্রিকেট খেলোয়াড়। পরিণত-ব্যাটসম্যান। বছরখানেক আগেও পলাশের যে দুর্বলতাটি লক্ষ্য করা যেত—আস্তে আস্তে সেই দুর্বলতাটি মুছে যাচ্ছে। স্ট্রোক নেওয়ার সময় ব্যাট আর দেহের মধ্যে আগে যে 'গ্যাপ' থাকতো, এখন আর তা থাকছে না। পা আর ব্যাট এখন কেতাবী ধরনেই থাকছে এবং এর ফলে ব্যাটসম্যান হিসেবে সাফল্যও দিন দিন বাড়ছে। ভুলত্রুটি শুধরে চলেছেন একান্ত নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের বিনিময়ে।

[আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে ফুটবল যে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। খেলার সামগ্রিক মান যাই হোক না কেন, ঐ ফুটবলকে কেন্দ্র করেই বছরের প্রায় অর্ধেকটা সময় অনুরাগী মহল বলতে গেলে বিভোর হয়ে থাকেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হকি আমাদের একদা বিপুল সম্মান, প্রতিষ্ঠা এবং স্বীকৃতি দিলেও ঠিক এই মুহূর্তে অবিশ্বাস্যভাবে এক অবক্ষয়ের পথে পা বাড়িয়েছি। কথাটা নিষ্ঠুর হলেও, নিঃসন্দেহে বাস্তব। হকির এই বিবর্ণ মূর্তির কারণ সম্পর্কে আলোচনা আজকের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। হকি যখন প্রায় উপেক্ষিত, তখন দেখা যাচ্ছে, শহর কলকাতা তো বটেই—জেলার মাঠে, গ্রামে গঞ্জে ক্রিকেটের আসর। ক্রমবর্ধমান এই জন-প্রিয়তার দিকে নজর রেখে অমৃত নিবেদন করছে—ফুটবলের পর ক্রিকেটে 'মাঠের নায়ক'।]

কিন্তু শুধু ব্যাট চালাতে জানলেই পরিপূর্ণ ক্রিকেট খেলোয়াড় হওয়া যায় না, একথা পলাশ ভালভাবেই জানেন। এবং জানেন বলেই ফিল্ডিং ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ; অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। ফিল্ড করেন স্লিপে। চেষ্টা আর নিরন্তর অনুশীলনের সূত্রে তিনি এখন কৃতী ফিল্ডার, প্রতি-স্পর্দ্ধী ব্যাটধারীর সন্ত্রাসের কারণ।

'ব্যাট করতে গিয়ে সব সময়ই সফল হবো এমন কথা দুনিয়ার কোন খেলোয়াড়ই বুক ফুলিয়ে বলতে পারেন না কেননা ব্যাপারটা নিতান্ত অনিশ্চিত। সেক্ষেত্রে ভাল ফিল্ডার হলে দু-একটা ভাল বা শক্ত ক্যাচ বিশ্বস্ত হাতে লুফতে পারলে দলের অনেক সাহায্য হয়। আর কথাই তো আছে—ক্যাচ ধরো, ম্যাচ জেতো'। পলাশ নিজের ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং সম্পর্কে ঐ কথাই আমায় বললেন।

পলাশ নন্দীর জন্ম ১৯৫২ সালের ১৭ই জুলাই, উত্তর কলকাতার পাইকপাড়ায়

বর্তমান আস্তানা দেশবন্ধু পার্ক লাগোয়া ৮এ শ্যামলাল স্ট্রীটে)। বাবা শ্রীভূপতি নন্দী খেলাধুলোয় উৎসাহ দিতেন পলাশকে কিন্তু ছেলে যে সিরিয়াসলি ক্রিকেট খেলবে এ কথা তিনি গোড়ায় ভাবতেই পারেন নি। হয়তো ভেবেছিলেন যে পলাশ একটু আধটু ফুটবল খেলবে। কারণ ছেলেবেলায় ফুটবলের প্রতি পলাশের বেশ ঝোঁক ছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পলাশকে ফুটবল ছাড়তে হোল। মনোনিবেশ করতে হোল ক্রিকেটে। ফুটবল থেকে ক্রিকেটের বিচিত্র আসরে নিয়ে এলেন মূলত শ্রীকল্যাণ বিশ্বাস। শ্রীবিশ্বাসের নাম বাংলার ক্রিকেটে মাঠেই অপরিচিত নয়। গ্রীষ্মকালীন স্কুল ক্রিকেট লীগ খেলার সময় পলাশ কল্যাণবাবুর নজরে পড়ে যান ইডেন উদ্যানে। পলাশ তখন পার্ক ইন্সটিট্যুটের হয়ে খেলছেন। ১৯৬৬ সালে তিনি আন্তঃ স্কুল, পূর্বাঞ্চল স্কুল ক্রিকেটের আসরে নামার সুযোগ পান। স্কুল-উত্তর ছাত্রজীবনে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট অঙ্গনে পলাশের প্রথম আবির্ভাব ১৯৭০ সালে কলকাতার অন্যতম প্রতিনিধি রূপে। ঐ বছর পূর্বাঞ্চল রণজি ট্রফিতেও বাংলার হয়ে প্রথমবার খেলেছেন বটে কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা নিতে পারেন নি। বছর দুই বাদে অবশ্য পলাশের ভাগ্য ফেরে। ১৯৭৩ সালে পূর্বাঞ্চল রণজি ট্রফির খেলায় তিনি ওড়িশার বিরুদ্ধে ৫৮, বিহারের বিরুদ্ধে ৬৮ এবং মূল আসরে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ৪৯ রান করেছিলেন।

১৯৭৩-৭৪ সাল পলাশের সারা জীবন ধরে মনে রাখার মত। কারণ ঐ বছর রণজি ট্রফিতে বিহারের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে তিনি রান করেছিলেন ১৬৬। শুধু তাই নয়, ওপেনিং জুটি হিসেবে গোপাল বসু এবং পলাশের সংগ্রহ (৩২৫ রান) বাংলার পূর্বতন রেকর্ডকে (পঙ্কজ রায়, শিবাজী বসু ২৭৯ রান) ছাপিয়ে যায়। রণজি ট্রফিতে সেরা রেকর্ড (চেতন চৌহান ও মধু গুপ্তের ৪০৫ রান) অবশ্য এখনও কেউ ছুঁতে পারেন নি। চেতন চৌহান ও মধু গুপ্তে ঐ রেকর্ডটি করেছিলেন বিদর্ভের বিরুদ্ধে।

দলীপ ট্রফির খেলায় পলাশ প্রথম খেলেছেন ১৯৭৪ সালে। পরিসংখ্যান অবশ্য জাঁক করে বলবার মত কিছু নয়। ঘরোয়া লীগ ক্রিকেটে প্রথম খেলেন দ্বিতীয় ডিভিসনে সত্যসন্ধি ক্লাবের হয়ে। সত্যসন্ধি পলাশের বলতে গেলে পাড়ার ক্লাব। সত্যসন্ধি থেকে প্রথম ডিভিসনে টাউনে, টাউনের পর এরিয়ান্সে, তারপর দু'বছর এরিয়ান্সে শ্রীকমল ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে। এরিয়ান্স থেকে ইস্টার্ন রেলে দু'বছর খেলার পর কালীঘাট এবং সর্বশেষ কালীঘাট থেকে গোপাল বসুর হাত ধরে একেবারে ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

বেদী প্রসঙ্গ

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বাঙ্গালোরের প্রথম টেস্ট খেলায় ভারতীয় টেস্ট দলে প্রখ্যাত স্পিন বোলার বিষেণ সিং বেদীকে বাদ দেওয়াতে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তীব্র বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। বেদী সম্পর্কিত অভিযোগ বিচারের জন্যে এক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। সম্প্রতি এই তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি শ্রীপি এম রুংতা এক বিবৃতি দিয়ে বলেছেন বেদী লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং তদন্ত কমিটি বিষয়টির সবদিক বিচার বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে উভয় পক্ষের আপোষরফায় ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হয়ে গেল। তিনি আরও বলেছেন বেদীর টেস্ট ম্যাচ খেলার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা তুলে নেওয়া হল এবং পরবর্তী টেস্ট খেলায় দল গঠনের সময় নির্বাচকমন্ডলী বেদীর দলভুক্তির বিষয় বিবেচনা করবেন।

ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট দল নির্বাচকমণ্ডলীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীবিজয় মার্চেন্ট এবং রাজ্যসভায় নির্দলীয় সদস্য শ্রীবাবুভাই চিনাই যেভাবে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সম্পর্কে কড়া সমালোচনা করেছেন আশা করি বোর্ডের কর্তারা তা থেকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাবধান হবেন।

খেলাধুলা

দর্শক

সন্তোষ ট্রফি

জলন্ধরের গুরু নানক স্টেডিয়ামে ৩১তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাঞ্জাব ৬—০ গোলে বাংলাকে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দ্বিতীয়বার সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়েছে। তারা প্রথম জয়ী হয় এই আসরেই ১৯৭০ সালে। বাংলা এই নিয়ে ২৩ বার ফাইনালে খেলে ৯ বার রানার্স-আপ হল। সন্তোষ ট্রফির ৩১ বছরের ইতিহাসে বাংলার এই দুটি উল্লেখযোগ্য রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে—সর্বাধিক বার (২৩ বার) ফাইনালে খেলা এবং সর্বাধিক বার (১৪ বার) সন্তোষ ট্রফি জয়। সন্তোষ ট্রফির কোন খেলাতেই বাংলা আগে কখনও ৬ গোল খায়নি। সুতরাং বাংলার পক্ষে এটা একটা কলঙ্কজনক রেকর্ড হল। এবারের বাংলা দল পুরো শক্তি নিয়ে গঠন করা হয়নি। দল গঠনের সময় নির্বাচকমন্ডলী শিক্ষা-শিবিরে অনুপস্থিত খেলোয়াড়দের বাদ দিয়েছিলেন। ফলে গত বছরের অধিনায়ক সুভাষ ভৌমিক, হাবিব, সমরেশ চৌধুরী, সুধীর কর্মকার গৌতম সরকার, কাজল ঢালি প্রভৃতি নামকরা খেলোয়াড়রা বাদ পড়েন। বেশীর ভাগ জুনিয়র খেলোয়াড় দিয়ে তৈরী এবারের বাংলা দল কিন্তু সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত ভালই খেলেছিল এবং ফাইনালে পাঞ্জাবের কাছে তাদের এরকম শোচনীয় হারের কথা কেউ কল্পনা করেননি।

ফাইনাল খেলার প্রথমার্ধের তিন মিনিটের মাথায় ইন্দর সিং গোল করেন। খেলার ৩০ মিনিটের মাথায় বল রুখতে গিয়ে বাংলার অধিনায়ক অশোক ব্যানার্জি আত্মঘাতী গোল করেন। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার সাত মিনিট আগে ইন্দর সিং

পেনাল্টি কিক থেকে দলের তৃতীয় গোলটি দেন। দ্বিতীয়ার্ধের তিনটি গোল দেন যথাক্রমে সুখবিন্দর সিং, মনজিৎ সিং এবং ইন্দর সিং।

ফাইনালে বিজয়ী পাঞ্জাব দলের ৬টি গোলের মধ্যে অধিনায়ক ইন্দর সিং একাই তিনটি গোল করেন। এখানে উল্লেখ্য, এবারের প্রতিযোগিতায় তিনিই সর্বাধিক গোল দিয়েছেন—৭টি খেলায় ২৩টি গোল (২টি হ্যাটট্রিক সমেত)।

কোয়ার্টার ফাইনাল লীগ

কোয়ার্টার ফাইনাল লীগের খেলায় চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ হওয়ার সূত্রে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল 'এ' গ্রুপ থেকে পাঞ্জাব (৫ পয়েণ্ট) ও গোয়া (৫ পয়েণ্ট) এবং 'বি' গ্রুপ থেকে বাংলা (৬ পয়েণ্ট) ও কর্ণাটক (৫ পয়েণ্ট)। কোয়ার্টার ফাইনাল লীগের খেলায় একমাত্র গোয়া কোন গোল খায়নি এবং লীগের তিনটে খেলায় জিতে পুরো ৬ পয়েণ্ট সংগ্রহ করেছিল একমাত্র বাংলা।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

'এ' গ্রুপ :

পাঞ্জাব	৭	:	রাজস্থান	২
পাঞ্জাব	৪	:	মহারাষ্ট্র	০
পাঞ্জাব	০	:	গোয়া	০
গোয়া	৪	:	রাজস্থান	০
গোয়া	১	:	মহারাষ্ট্র	০
মহারাষ্ট্র	৪	:	রাজস্থান	১

'বি' গ্রুপ :

বাংলা	২	:	কর্ণাটক	১
বাংলা	৪	:	আসাম	০
বাংলা	৪	:	নাগাল্যাণ্ড	০
কর্ণাটক	২	:	আসাম	০
কর্ণাটক	৪	:	নাগাল্যাণ্ড	১
আসাম	২	:	নাগাল্যাণ্ড	০

চূড়ান্ত লীগ তালিকা

'এ' গ্রুপ :

	খে	জঃ	ড্র	পরা	পঃ	বিঃ	পঃ
পাঞ্জাব	৩	২	১	০	১১	২	৫
গোয়া	৩	২	১	০	৫	০	৫
মহারাষ্ট্র	৩	১	০	২	৪	৬	২
রাজস্থান	৩	০	০	৩	৩	১৫	০

'বি' গ্রুপ :

	খে	জঃ	ড্র	পরা	পঃ	বিঃ	পঃ
বাংলা	৩	৩	০	০	১০	১	৬
কর্ণাটক	৩	২	০	১	৭	৩	৪
আসাম	৩	১	০	২	২	৬	২
নাগাল্যাণ্ড	৩	০	০	৩	১	১০	০

সেমি-ফাইনাল

বাংলা ২—১ ও ৩—০ গোলে গোয়াকে পরাজিত করে এবং পাঞ্জাব ২—০ ও ৫—১ গোলে কর্ণাটককে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

হ্যাটট্রিক

এবারের প্রতিযোগিতায় তিনজন খেলোয়াড় মোট ৪টি হ্যাটট্রিক করেন—পাঞ্জাবের ইন্দর সিং ২টি (বিপক্ষে রাজস্থান ও কর্ণাটক), রাজস্থানের মোন সিং (বিপক্ষে তামিলনাড়ু) এবং কর্ণাটকের কুমার (বিপক্ষে নাগাল্যাণ্ড)।

লুডমিলা তুরিশেভা (রাশিয়া) ১৯৭৪ সালের বিশ্ব জিমন্যাস্টিক্সে মেয়েদের ব্যক্তিগত খেলার বিজয়িনী।

ভারত সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল

হায়দরাবাদের লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্টেডিয়ামে ভারত সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট দল ৯ উইকেটে এ বছরের দলীপ ট্রফি এবং ইরাণী ট্রফি বিজয়ী দক্ষিণাঞ্চল দলকে পরাজিত করে। ভারত সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট দলের এটা প্রথম জয়।

প্রথম দিনের খেলায় দক্ষিণাঞ্চল ৫ উইকেট খুইয়ে ৩১৩ রান সংগ্রহ করেছিল। দলের ১০৩ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়ে গেলে ৫ম উইকেটের জুটিতে বিশ্বনাথ এবং ব্রিজেশ প্যাটেল প্রাণহীন পিচে ১৯৫ মিনিটে ২১০ রান তুলে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। বিশ্বনাথের ১১৪ রানে ১১টা বাউণ্ডারী ছিল। তিনি ৩০৪ মিনিট খেলেছিলেন। অপরদিকে ব্রিজেশ প্যাটেলের নট আউট ১০৬ রানে ছিল ১৬টা বাউণ্ডারী।

দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণাঞ্চল আর ব্যাট করেনি। পূর্বদিনের ৩১৩ রানের মাথায় (৫ উইকেটে) তারা প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান দল দ্বিতীয় দিনের খেলায় মাত্র একটা উইকেট খুইয়ে ৩৩৭ রান সংগ্রহ করেছিল। কালিচরণ এবং বেচান নির্ভীকভাবে ভারতীয় স্পিন বোলিং পিটিয়ে খেলে দলকে ৩৩৭ রান তুলতে সাহায্য করেছিলেন। কালিচরণ এবং বেচানের জুটিতে ১৮০ মিনিটে ২১৭ রান উঠেছিল। গ্রিনিজ ৫৫ রান করে আহত হয়ে অবসর নেন। কালিচরণ ১৭৯ মিনিট খেলে তাঁর ১৫১ রানে ১৯টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার-বাউণ্ডারী করেছিলেন। বেচান তাঁর নট আউট ১১৪ রানে ১১টা বাউণ্ডারী করেছিলেন।

তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান দল আগের দিনের ৩৩৭ রানের মাথায় (এক উইকেটে) প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে দেয়। তারা দক্ষিণাঞ্চলের প্রথম ইনিংসের ৩১৩ রানের থেকে ২৪ রানে এগিয়ে ছিল।

দক্ষিণাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনা খুবই খারাপ হয়েছিল। ২২ রানের মাথায় তাদের ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়। দলের এই সংকট সময়ে ৫ম উইকেটের জুটিতে জয়ন্তীলাল এবং কিরমানি ৪৪ রান তুলেন এবং ৮ম উইকেটের জুটিতে ভেঙ্কটরাঘবন এবং ব্রিজেশ প্যাটেল ৪৩ মিনিটে ৬৫ রান তুলেছিলেন। চা-পানের ১০ মিনিট আগে দক্ষিণাঞ্চল তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৮৬ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। দক্ষিণাঞ্চলের অধিনায়ক ভেবেছিলে খেলার বাকি ৯০ মিনিটে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান দলের পক্ষে জয়-লাভের প্রয়োজনীয় ১৬৩ রান সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান দলের অধিনায়ক লয়েড এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নিজেই গ্রিনিজের সঙ্গে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান দল খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ২৫ মিনিট আগে একটা উইকেট খুইয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৬৩ রান তুলে ৯ উইকেটে জিতে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দক্ষিণাঞ্চল : ৩১৩ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেঃ। বিজয়কুমার ৫০ বিশ্বনাথ ১১৪ এবং ব্রিজেশ নটআউট ১০৬ রান। রবার্টস ৭৭ রানে ২ এবং বয়েস ৪৪ রানে ২ উইকেট)

ও ১৮৬ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। জয়ন্তীলাল ৪২ এবং ব্রিজেশ প্যাটেল ৪২ রান। রবার্টস ৩৫ রানে ৩ এবং ব্যারেট ৫৫ রানে ৩ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান্স : ৩৩৭ রান (১ উইকেটে ডিক্লেঃ। কালিচরণ ১৫১ বেচান নটআউট ১১৪ এবং গ্রিনিজ ৫৫ রানে আহত অবস্থায় অবসৃত)

ও ১৬৩ রান (১ উইকেটে। লয়েড নটআউট ৭৯ এবং কালিচরণ নট আউট ৮৪)

বায়োস্কোপিক

প্রেক্ষাগৃহ

আমি যাঁর কথা লিখছি তিনি বাংলা ছায়াছবির জগতের একজন প্রবীণ খ্যাতনামা অভিনেতা। আজকাল আর তাঁকে ছবিতে দেখা যায় না। শরীরের গতিক ভাল নয় দেখে তিনি বেশ কিছুকাল আগে ফিল্ম এবং স্টেজ থেকে বিদায় নিয়ে এখন বাড়িতেই থাকেন। সেই ভদ্রলোক একদিন সকালে উঠে খবরের কাগজ খুলে দেখেন তিনি আর ইহলোকে নেই, গত রাত্রেই পরলোকগমন করেছেন। আর সেই শোক সংবাদটি বেশ ফলাও করেই কাগজে ছাপা হয়েছে। এটা পড়ে ভদ্রলোকের আক্কেল গুড়ুম, আরে, এটা কি ব্যাপার? তিনি জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছেন অথচ তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয়ে গেল? তিনি হাসবেন না কাঁদবেন—কিছুক্ষণ স্থির করতেই পারলেন না।

অথচ সেই সংবাদ রটে গেল ক্রমে, চারিদিকে হুলুস্থুল কান্ড। হয়েছে কি ওঁর সেই অসুস্থতা সাময়িক কিছু বাড়াবাড়ি হতে ওঁকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তোলার জন্য হাসপাতালে দেওয়া হয়েছিল। সংবাদপত্রের রিপোর্টার আগের দিন রাত্রে টেলিফোনে ওঁর অবস্থার খবর নিতে গিয়ে নাকি শুনতে পান, অমুক? অমুক তো মরে গেছেন। ব্যস সংগে সংগে ওবিচুয়ারি রিপোর্ট কম্পোজ হয়ে গেল—প্রবীণ অভিনেতার পরলোকগমন। অথ পরদিন সকালে হাসপাতালের কেবিনে শুয়ে সেই সংবাদ পড়ে অভিনেতা ভদ্রলোকের কি রিঅ্যাকশান! নিজের গায়ে চিমটি কেটে তবে তাঁকে সেদিন বুঝতে হয়েছিল—সংবাদপত্র তাঁকে মারলেও আসলে তিনি কিন্তু মরেননি......

যাক, ভুল ধরা পড়তে পরদিন সেই একই কাগজে ভ্রম সংশোধন ছাপা হয়ে বেরুলো—না না, উনি বেঁচে আছেন, সুস্থ আছেন, আমরা দুঃখিত। কিন্তু দেখুন তার আগে ড্যামেজ যা হবার তা পুরোদস্তুর হয়ে গেছে। রাশী রাশী শোকবার্তা টেলিগ্রাম পিয়ন বিলি করে গেল। সাদা ফুলের মালা গুচ্ছের এসে গেল। শোকাভিভূত অনেকের চোখে মানুষটির স্মৃতি স্মরণে জল এসে গেল। গুণমুগ্ধরা আর দেরী না করে সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় ধড়াধড় কয়েকটা শোকসভা করে বসলেন। আবার সে-সব সভার রিপোর্ট যখন কাগজের অফিসে পৌঁছল তখন উদ্যোক্তারা টের পেলেন, যেলোকটার উনি জলজ্যান্ত বেঁচে আছেন। আরে ছিঃ।

এই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, অভিনেতা ভদ্রলোক বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন হঠাৎ একদিন ভোর বেলায় আমাদের ফিল্মের সলীল রায় চৌধুরী (সলুদা) গুপী দের কাছ থেকে একটা ফোন পেলেন। সনুদা ফোন তুলে সাড়া দিতে গুপী কাতর কণ্ঠে বলল—দাদা, উনি চলে গেলেন—বলে অভিনেতা ভদ্রলোকের নাম উল্লেখ করল।

সনুদা স্তম্ভিত। — কিরে গুপে, খবরটা ঠিক পেয়েছিস তো?

গুপী জোর গলায় ঘোষণা করল—তা নয়তো সকালে তোমায় গুল মারছি? পাক্কা খবর।

সনুদা অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে গুপীকে বুঝিয়ে বললেন—না না মানে বুঝতেই তো পারছিস...গতবার ওঁকে নিয়ে ওই-রকম একটা কান্ড হয়ে গেছে, তাই বল-ছিলাম আর কি! তোকে খবরটা কে দিল?

গুপী তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম উল্লেখ করে বলল—আজ সক্কালে আমায় ফোন করেছিল। ওঁর বাড়ির কাছেই থাকে আমার বন্ধু। সে বললে ও বাড়িতে মড়াকান্না উঠেছে।

—বটে বটে!

গুপী তখন বলল—সনুদা, এইটুকু শুনে বুকের মধ্যেটায় কেমন যেন মোচর দিয়ে উঠল, ওনাকে কতটা রেসপেক্ট করতাম, বুঝতেই তো পারছেন—

সনুদা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন—তারপর তুই ওঁদের বাড়িতে ফোন করেছিলি তো?

গুপী বলল—ওঁর বাড়িতে ফোন নেই তো। তবে বন্ধুটাকে বললাম তুই একবার ভাল করে কান পেতে শোন তো, বন্ধুটি বলল, হ্যাঁ রে হ্যাঁ, ভাল করে শুনেই তবে তোকে ফোন করছি, ডেথ্ নিউজ নিয়ে তো ঠাট্টা করা যায় না। ব্যস্, এই পর্যন্ত। এখন বল, কিংকর্তব্যং?

সনুদা আমতা আমতা করে বললেন—দাঁড়া দাঁড়া, হুট করে একটা ডিসিশান নিলেই তো হবে না তুই বরং এক কাজ কর, তুই এখন লাইনটা ছেড়ে দে, আমি কর্তাদের সঙ্গে একটু পরামর্শ করে তোকে রিং ব্যাক করছি।

গুপী বলল—সেই ভাল, আমি ফোনের কাছেই বসে রইলাম—

বলে সে ফোন ছেড়ে দেবার উদ্যোগ করতেই সনুদা তাড়াতাড়ি যেন লাস্ট মিনিট চেক-আপ বললেন—হ্যাঁরে তুই বলছিস—দাদা নেই?

—বলছি।

—কখন গেলেন?

—কান্না যখন শেষরাত্রে উঠেছে তখন মনে হয় শেষ রাতেই—

—অ।

—তুমি চিন্তা করো না। খবরটা কনফার্মড। তুমি নিশ্চিন্ত মনে কর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ-টর্শ করতে পার। গুপী কখনও ফালতু খবর নিয়ে মাথা ঘামায় না......

স্বীকারোক্তি
সুমিত্রা মুখার্জি
পরিচালনা : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

লাইন কেটে গেল।

দাদা শেষ পর্যন্ত চলেই গেলেন! বুকভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সনুদার। সনুদা বয়সে ছোট হলেও দীর্ঘদিন এই ফিল্মে একসঙ্গে কাজকর্ম করেছেন। সুখ-দুঃখের মধ্যে একত্রে ওঁদের অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, বেদনায় বুকটা টন টন করে উঠল, আহা বড্ড ভালবাসতেন আমাকে, একবার শেষের দেখাটাও হলো না। একটা অপরাধবোধ মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করতে লাগল। কল-কাতার শহরতলীতে ওঁর বাড়ি। কতদিন ভেবেছেন একটু অবসর করে দেখা করতে যাবেন, কিন্তু তা আর শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল না।

সনুদা সম্বিত ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি ফোন তুললেন ডায়াল করলেন উত্তম-কুমারকে—খবর শুনেছো? দাদা কাল রাত্রে চলে গেলেন—

—সেকি?

—হ্যাঁ। এইমাত্র খবর পেলাম ফোনে—

—সংবাদটা ঠিক তো? মানে গতবার...

—ঠিক খবর। গুপে ফোন করে এই-মাত্র জানাল, পাকা খবর—

—ইস!...

উত্তমকুমার দুঃখ করে বললেন—সনুদা, একজন খাঁটি মানুষ চলে গেলেন। ...যাই হোক, তোমরা যাচ্ছ ওঁর বাড়িতে?

—হ্যাঁ যাচ্ছি—

—সনুদা আমার তরফ থেকে একটা রীদ্ (শোকজ্ঞাপক সাদা ফুলের মালা) দিয়ে দিও। উত্তমকুমার শোকার্ত কণ্ঠে বললেন।

—দেব।

উত্তমকুমার বললেন—আর হ্যাঁ, যদি সম্ভব হয় তো একবার শ্মশানে যাব। তুমি ওখানে পৌঁছে যদি সম্ভব হয় তো আমাকে ফোনে একবার খবর দিও। আমি বাড়িতেই রইলাম—

—ঠিক আছে।

বলে লাইন কেটে দিয়ে সনুদা একের পর এক ফোন করে দাদার মৃত্যু সংবাদ জায়গায় জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। স্টুডিওতে ফোন করে কোন লাভ নেই। কারণ দিনটা রবিবার। সব স্টুডিও এমনিতেই বন্ধ। এখন শুধু স্টেজগুলো বন্ধ করা দরকার। ধীরে ধীরে সে-সব জায়গাতেও খবর দেওয়া হল। ইতিমধ্যে গুপীর ফোন এলো—কী ব্যাপার। সেই তখন থেকে হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে রয়েছি, ফোন করবে বলেছিলে অথচ তা-ও

[illegible]
দেবিকা মুখার্জি
পরিচালনা : পার্থপ্রতিম চৌধুরী

করলে না, এখন কী করব? কি সিদ্ধান্ত হলো তোমাদের? যাচ্ছ কি যাচ্ছ না?

সনন্দা বললেন—যাচ্ছি। তবে গনুপে তুই একটা কাজ কর তো, তুই কলেজ স্ট্রীট মার্কেট থেকে গোটা পাঁচেক রীদ-এর অর্ডার দিয়ে করিয়ে রাখ, অনেকেই যেতে পারছেন না। অতএব তাঁদের বাঁ-হাতে আমাদেরই নিয়ে যেতে হবে! টাকা আছে?

—এ্যাঁ?

—বলি তোর সঙ্গে টাকা আছে? রীদ কেনার?

—না তো—

সনন্দা বললেন—ঠিক আছে তাহলে শুধু তৈরী করিয়ে রাখ, আমি গিয়ে পেমেন্ট করব, তারপর সবাই একসঙ্গে মিলে যাওয়া যাবে।

সনন্দা তৈরী হয়ে বেরুতে বেরুতে হঠাৎ ও'র খেয়াল হল—যাঃ, আজ যে একটা টেকিং আছে! কী হবে? সনন্দা কোন প্রাপ্তিযোগকে খাটো করে বলেন—টেকিং। সুতাজা ছবির বাবদ আজ সে ছবির প্রোডিউস্যার বিশ্বনাথ নান সবাইকে একটা টোকেন মানি দিয়ে সই-সাবুদ করাবেন স্থির ছিল। তাছাড়া সনন্দার নিজের পকেটের অবস্থাও তখন বিশেষ ভাল নয়। এতগুলো রীদের টাকা সেটা অবশ্য মারা যাবে না, সবাই পরে দিয়ে দেবে, কিন্তু ট্যাকসি খরচা? অন্যান্য রাহা খরচা?

ভাবলেন যাই তবে ধর্মতলাটা হয়েই যাই বরং। ও'দের খবরটাও দেওয়া হবে আর সেই সঙ্গে অ্যামাউন্টের টেকিং-টাও হয়ে যাবে। ভালই হবে। পকেটে রেস্ত না থাকলে আবার শোক-টোকগুলো ভাল আসে না।

ধর্মতলায় গিয়ে প্রথমে ভাবলেন না। দুঃসংবাদটা দিলে হয়ত বিশ্বনাথ নান বেঁকে বসবে। বলবে এই রকম একটা শুভ সূচনায় যখন ব্যাগড়া পড়ল তাহলে আজ আর কাউকে পেমেন্ট করব না, আর একটা শুভদিন দেখেই বরং......। না, না, সনন্দা বহুত দূর তক পৌঁছা হুয়া আদমী, ও লাইনেই হাঁটলেন না। যাক, ভালয় ভালয় টেকিং পর্বটা হয়ে গেল। ফাউ হিসাবে বড়কা সাইজের দু-পিস সন্দেশও জুটে গেল। সনন্দা জল-টল খেয়ে তারপর খবরটা ভাঙালেন। শুনে সবাই থ।

পিণাকী মুখার্জি-ই আঘাত পেলেন সবচেয়ে বেশী। মুহূর্তে তাঁর চোখে জল এসে গেল। কিছুক্ষণ কথা বলতেই পারলেন না।

সনন্দা বললেন—চলু পানু, শেষ দেখাটা দেখে আসি, অন্ততঃ শোকের প্রণামটা আমাকে আজ গিয়ে দিতেই হবে।

কাট্-টু কলেজ স্ট্রীট।

গনুপী উদ্বিগ্ন মুখে ঘন ঘন সিগ্রেট টানছে আর প্রতিটি ট্যাকসি দেখছে। আর তার ওপর নজর রাখছে ফুলওলা। সে ভাবছে, মাল তৈরী করে আবার কেটে না যায় আর গনুপী ভাবছে ইস্ বড্ড জোর ফেঁসে গেলাম তো। এখন যদি সনন্দা না আসে? যা খামখেয়ালী মানুষ। হয়ত অন্য পথে কারও সঙ্গে চলে গেছে দাদার ওখানে। তাহলে? ফুলওলা কি সহজে ছাড়বে? চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার মাল, পকেটে পয়সা বলতে নেই, এখন কি উপায়?

দুঃশ্চিন্তায় গনুপী হঠাৎ ঘামতে শুরু করল। একি সাংঘাতিক প্যাঁচে পড়লাম।

এমন সময় সনন্দা এসে হাজির। সঙ্গে পিণাকী মুখার্জি! দেখে গনুপী আশ্বস্ত হলো। বাপরে, না এলে ফুলওলা যে ওকে আজ প্যাঁদাতো এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। না প্যাঁদাক, অপমান তো বিলক্ষণ করত। আর সেটাই বা কি এমন আহ্লাদের কথা!

—হয়েছে রীদ—

গনুপীর তখন কি হেক্কড়—দাও তুলে দাও মাল হ্যাঁ হ্যাঁ ট্যাকসিতে, ক-টাকা হয়েছে যেন তোমার? পয়তাল্লিশ? পাবে না পাবে না। বাসী ফুল চালিয়ে আর পয়তাল্লিশ পেতে হয় না। সনন্দা ওকে চাল্লিশটে টাকা দিয়ে দাও তো, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওতেই রফা হয়ে যাবে......

ট্যাকসিতে বড় একটা কথা হল না। গাড়ী সটান গিয়ে বাড়ীর সামনের গলিটায় দাঁড়াল। সনন্দাই দাঁড় করিয়ে দিলেন।—বুঝলি না হুট্ করে রীদ নিয়ে গিয়ে হাজির হওয়াটা ঠিক হবে না। তোরা গাড়ীতে বস, আমি ঢুক করে গিয়ে হাওয়াটা বুঝে আসি—

বলে সনন্দা গলিতে অদৃশ্য হলেন। সেখানেই দাদার বড় কন্যার সঙ্গে দেখা। বেচারি কাঁদতে কাঁদতে তাঁর স্বামীর সঙ্গে কোথায় যেন চলেছে। ব্যাস সনন্দা তৎক্ষণাৎ শ্যোর দ্যাট কনফার্মড। সঙ্গে সঙ্গে থমথমে আষাঢ়ের আকাশ হয়ে গেল ও'র মুখ। আর সনন্দাকে আসতে দেখে মেয়েরও কি কান্না, স্বভাবতই, সনন্দার কান্না এসে গেল। অতিকষ্টে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—কোথায় যাচ্ছিস?

—শ্মশানে সনুকাকু।

—চলে গেছে—

—হ্যাঁ, এই তো, কিছুক্ষণ আগে—

সনন্দা দৌড়ে ফিরে এলেন ট্যাকসিতে। পিণাকী মুখার্জিকে বললেন—হাঁ করে

বলো [illegible]

মিনু রহমান

পরিচালনা : নূর উল আলম

দেখছ কি? বাঁদগুলো বার করো। শ্মশানে যেতে হবে—

পিণাকী মুখার্জি ট্যাক্সির বুট থেকে বাঁদগুলো বের করতে তৎপর হলেন। গুপীর কাঁদো কাঁদো চেহারা চোখ ছলছল।

মেয়েকে সান্ত্বনা দিলেন সুনন্দা—কাঁদিসনে মা কাঁদিসনে। এখন মনটা শক্ত কর, শেষকৃত্যগুলো এখন তো সব তোকেই করতে হবে।

হঠাৎ জামাই বললে—মা যে হঠাৎ এইভাবে চলে যাবেন আমরা কেউ ভাবতেই পারি নি—

সুনন্দার মাথায় কেউ যেন হাতুড়ির বাড়ি মারল—মা? মা মানে?

জামাই বললে—হ্যাঁ, মা যে যাচ্ছেন এটা বুঝতেই দিলেন না কাউকে?

সুনন্দা ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকটা তাকিয়ে থেকে বললেন—তাহলে দাদা?

মেয়ে বলল—বাবা উপরের ঘরে রয়েছেন, ওখানে অন্য সবাই রয়েছে সুনুকাকু—

বলে ওরা চলে গেল। আর সুনন্দা খানিকটা গুম মেরে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ হুঙ্কার দিলেন—গুপে, অ্যাই গুপে—

গুপী ততক্ষণে আমসী। ভয়ে ভয়ে আমতা আমতা করতে করতে বলল—আ-আ-আ-আমি কি করে বুঝব যে—

—শাট আপ তোর জন্যে আজ আমার ...উঃ পাণু আর ঢং করে বাঁদ বের করতে হবে না। দাদা নয়, বৌদি। এই রাস্কেলটা আজ আমায় স্রেফ ডুবিয়েছে। এখন আমি আর অন্য সবাইকে কি করে যে ফেস করব—এক ভগবানই জানেন। উঃ--

পিনাকী মুখার্জি তখন কাঁচুমাচু হয়ে বলেন সুনন্দা, কেলেঙ্কারী যা হবার হয়েই গেছে, এখন চল বাঁদগুলো শ্মশানে পৌঁছে দেওয়া যাক—

সুনন্দা বোমার মত ফেটে পড়লেন—আমি যাব? ওই রাস্কেলটা যাবে। গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আবার দয়া করে কার্ডগুলো সমেত দিয়ে না আসে, পানু তুমি কার্ডগুলো এক্ষুনি ছিঁড়ে করে দাও অর্থাৎ ডেস্ট্রয় নইলে কেলেঙ্কারী আজ চূড়ান্ত উঠবে। উঃ! আজ [illegible] মুখ দেখেই যে শয্যাত্যাগ [illegible]। হায় হায়।

গুপী ততক্ষণ যেন [illegible] হয়ে গেছে। অনুগত [illegible] ওই [illegible] বাঁদগুলো কাঁধে [illegible] দুজনের শ্মশানের পথে [illegible]। [illegible] মনে বৃদ্ধটির [illegible]। হাতের কাছে [illegible] কিচক [illegible]

তারপর ও'রা গেলেন দাদার সঙ্গে দেখা করতে। কী আর কথা, দাদা চালাক মানুষ, উনি দেখলেই বুঝবেন যে, আবার একটা গন্ডগোল হয়েছে। একে সদ্যমৃত স্ত্রীর শোক, তার ওপর এই মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং। সুনন্দার ইচ্ছে করছিল গুপেটাকে খুন করে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে।

ওরা গিয়ে দাদার বিছানার পাশে দাঁড়াতেই দাদা হাউ হাউ করে কেঁদে বললেন—সুনু, এসেছিস। আয় আয়। তোর বৌদি চলে গেল। আয় পানু আয়। খবরটা কে দিল তোদের?

—ওই ইয়ে মানে ওই রাস্কেলটা, গুপে—বলেই সুনন্দা তৎক্ষণাৎ সামলে নিলেন নিজেকে। কেলেঙ্কারী, প্রায় ফাঁস হয়ে গিয়েছিল আর কি!

কিছুক্ষণ পর ফেরার পালা।

গুপী শ্মশান থেকে ফিরে এসে গুম মেরে দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সিতে ঠেশ দিয়ে। পাঞ্জাবী ড্রাইভাররা আবার সিগ্রেট খায় না, নইলে একটা চেয়ে নেয়া যেত। পকেট [illegible] মঠ।

সুনন্দারা ফিরে এলেন। দুজনেরই [illegible] থমথম করছে। ট্যাক্সি আবার [illegible] দিকে ফিরে চলল।

সুনন্দা ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন—পানু, আমি ভিখারী হয়ে গেলাম। ট্যাক্সির মিটার যা দেখলাম তাতে মনে হচ্ছে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছাতে ষাট টাকার মত লাগবে। [illegible]দের টাকাগুলো গেল। ও আর ফেরৎ পাওয়া যাবে না। আজকের স্মল লৌকিংটা একবারে ধুয়ে নিয়ে গেল এই রাস্কেলটা, গুপেটা—

গুপে সামান্য নড়েচড়ে বসল মাত্র। কিছু বলল না।

—ভেবেছিলাম টৌকিং-এর পর তোকে নিয়ে আজ একটু ভালমন্দ চাইনীজ খাব, কতদিন খাওয়া হয়নি, তা কপালে নেই—

হঠাৎ ভয়ে ভয়ে গুপী বলল—সুনুদাদা একটু চা খাওয়াবে। তেষ্টায় গলাটা কাঠ হয়ে গেছে—

সুনন্দা এমন বিকট একটা আওয়াজ দিলেন যে মায় পাঞ্জাবী ড্রাইভার, সেও তাড়াতাড়ি ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। সুনন্দা দু হাত মাথার ওপর তুলে তখন চেঁচাচ্ছেন—স্কাউন্ড্রেল, চা খেতে চাইতে তোর লজ্জা করল না তুই একাই আজ একটা জলজ্যান্ত মানুষকে মেরে ফেলবার তালে ছিলি, তুই আবার কথা বলছিস? চা খেতে চাইছিস? আমার এতগুলো টাকার পিন্ডি চটকালি তোর চা খেতে চাইতে ঘেন্না করছে না?...

—[illegible] মজুমদার

স্টেপস থেকে বলছি

টালিগঞ্জের স্টুডিও ফ্লোর ছেড়ে কলকাতা ছেড়ে, অতঃপর পশ্চিমবাংলা ছেড়ে পালাচ্ছে। ওরা জীবেন আর শ্যাম। অসামাজিক। ক্রিমিনাল। পুলিশের কাছে রীতিমত সমস্যা। হরদম চোখে ধুলো দেয়। এইতো খানিক আগে—সারা রাত ধরে ট্রেনে ডাকাতি হল। তৎপর জীবেন আর শ্যাম যথারীতি, সিউড়ি স্টেশনে নেমে উধাও। পুলিশের লোকজনের নাকের ডগার ওপর দিয়ে এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল। নকলে তো হাঁ। পরিচালক জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটলেন। অভিনেতা সুখেন দাশ তারস্বরে চিৎকার করতে ‌লাগলেন। ক্যামেরার মুখে কালো কাপড় ঝুলিয়ে টান টান হয়ে দাঁড়ালেন কে এ রজা। বেশ সুন্দর সকাল। কিন্তু অবস্থা ‌ব শোচনীয়। আগের দিন সকাল থেকে ‌টিং শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে বিরতি, ‌াবার শুটিং। বলতে গেলে একনাগাড়ে ‌টিং চলছে। এখন আর চলছে না। এখান ‌কে মূল লোকেসান পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ‌স্তা। গাড়ি যেভাবে খারাপ হয়েছে তাতে ‌র এই 'অনজানে মেহমান' ইউনিট ‌াসোজোর গিয়ে পৌঁছবে কয়েকশো ‌য়তাল্লিশ মিনিট পরে। তা কি করে হবে। ‌নীত বিলম্বে পৌঁছতে হবে। সারা দিন ‌টিং করে অভিনেতা দিলীপ রায়কে ‌ড়ে দিতে হবে। স্টেজ পারফরমেন্স আছে ‌। বেগতিক দেখে দিলীপ রায় চিন্তায় ‌ড়লেন। চিন্তার কিসসু নেই। মুস্কিল ‌সান হল। একটা গাড়ি ব্যবস্থা করা গেল। ‌তে যেমন করে হোক প্রয়োজনীয় লোক- ‌রওনা দিলেন। ম্যাসানজোড় আসতে ‌য় লাগল এক ঘণ্টারও বেশী। একে ওভারলোড, তাছাড়া গাড়ির অবস্থাও ‌বধের ছিল না। কিছুদূরে যেতে না যেতে ‌ড়র জলতেষ্টা পাচ্ছিল। এ হেন অবস্থায় ‌্যকটি কলাকুশলী এবং শিল্পী অত্যন্ত ‌তারিকতার সঙ্গে সহযোগিতার হাত ‌ড়িয়ে দিয়েছেন। তা না হলে সাত দিনের ‌দৃশ্য গ্রহণ পনেরো দিনে এসে ঠেকতো। ‌ভাবে ছবির কথা ভেবে কষ্ট করে ‌নকার প্রত্যেকটি কলাকুশলী এবং ‌ী কাজ করেন। একান্তভাবে শিল্পের ‌দে। একথা সকলেই স্বীকার করবেন। ‌াপ পিকচার্সের পক্ষ থেকে সুখেন এবং পরিচালক জ্ঞানেশ মুখার্জি শিবগণে উৎসাহিত করলেন। বলা বাহুল্য দেখলাম, একটা গোটা ইউনিট বিরাট কর্ম-যজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আরো কয়েকটা গাড়ির ব্যবস্থা করা গেল। এক মাইল দূরে লোকেশানে যাতায়াত আরম্ভ করল। আরম্ভ হল ঠাকুর সিং-এর পর্ব। ঠাকুর সিং-এর পরিচয় আবশ্যক। ইনি হচ্ছেন এই এলাকার লোক। প্রচুর পয়সার মালিক। অনেক জমি-জমা আছে। টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসা করেন মানে সুদের ব্যবসা। সুদের টাকা না পেলে ঠাকুর সিং বিনিময়ে মা-বোনের ইজ্জৎ নিয়ে টানাটানি করেন। তাছাড়া সুন্দরী স্ত্রীলোক-দের প্রতি তাঁর দুর্বলতা অনস্বীকার্য। এই ঠাকুর সিং দুঃখনাকে কিছু টাকা দিয়েছিল। সময় মত টাকা শোধ দিতে পারে নি। দুঃখনার ডাগর বৌটির প্রতি নজর দেয় ঠাকুর সিং। দুঃখনা খবর পাবার আগেই তার বৌ ইজ্জৎ দিয়ে বসেছে। এই নিয়ে তুমুল কাণ্ড। দুঃখনা মারতে যায় ঠাকুর সিংকে। উল্টো হয়। তারপর আর দুঃখনার কোনো খবর পাওয়া যায় না। এইভাবে দিনের পর দিন একটা লোক অন্যায় কাজ করবে আর তাই মুখ বুজে সহ্য করতে হবে, তা হয় না। এভাবে চলতে পারে না। জীবেন মনস্থির করে ফেলে। শ্যামের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়। বদলা নিতেই হবে। শালা মাস্টারজীর লেড়কীর দিকে নজর দিয়েছে...।

কে এই মাস্টারজী? একজন আদর্শ-বাদী শিক্ষক। ছেলেমেয়ে নিয়ে এই পাণ্ডব বর্জিত জায়গায় পড়ে আছেন। নিজে হাতে গড়েছেন স্কুল। জমি দিয়ে সাহায্য করেছেন ঠাকুর সিং। এই সুবাদেই ঠাকুর সিং নিজের আধিপত্য ফলাতে আসে। জানে না তার মুখোমুখি দাঁড়াবার কেউ জন্মেছে এই দেশে। জীবেন সেই মুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু শ্যাম বাধা দেয়। এখনো সময় হয়নি। হঠাৎ জীবেন ও শ্যাম এখানে কেন? গল্পের কয়েক পৃষ্ঠা আগে আসতে হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে জীবেন আর শ্যাম প্রাণ বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করে। সামনেই একটা জীর্ণ বাড়ি। ঢুকেই অর্গল তুলে

অনজানে মেহমান/সুখেন দাস ও অমিত ভঞ্জ। পরিচালনা : জ্ঞানেশ মুখার্জি। ফটো : অমৃত

নন্দিতা বসু/ফটো : অমৃত

দেয়। মাস্টারজী অবাক। বিস্ময়ে হতচকিত। দুজনের হাতেই পিস্তল। মাস্টারজী ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে সবকিছু মেনে নিতে থাকেন। এছাড়া তিনি অনন্যোপায়। ততক্ষণে এই বাড়ি পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। সেন্ট্রাল আর্মড ফোর্স। স্থানীয়। এ ব্যাপারে সাহায্য করেছেন সিউড়ির এস পি মিঃ রশিদ খান, অ্যাডিশনাল এস পি এবং স্থানীয় থানার অফিসাররা। যখন তখন সাহায্য করেছেন ময়ূরাক্ষী ভবনের সুনীল দাশগুপ্ত। মুক্তকণ্ঠে সবিস্তারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন পরিচালক এবং নিবেদক।

সাকুল্যে একশো জন। থাকার বন্দোবস্ত ছিল ইউথ হোস্টেলে। অবশিষ্ট কয়েকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আহারের বন্দোবস্ত করেছিলেন স্থানীয় লোকজনেরা। কন্ট্রাক্ট নিয়েছিল একটি দোকান। প্রত্যহ সকালে উঠে ইউনিট বেরিয়ে পড়েছে। ফিরেছে রাতে—লাঞ্চ অন দ্য স্পট। মিঃ জরদার কোনো ভাবেই বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি। যেমনটি দরকার, ঠিক তেমনটি পাওয়া গিয়েছে।

এ ছবির কলাকুশলীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিল্প নির্দেশক : সুর্য চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক : রমেশ যোশী। ব্যবস্থাপক : সুখেন চক্রবর্তী। সহকারী পরিচালক : দুর্গা ভট্টাচার্য সুধীর চট্টোপাধ্যায় তেওয়ারী এবং তপন। শিল্পীরা যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন : সুখেন দাশ (খ্যাপা) সুমিত্রা স্যান্যাল (মাস্টারজীর মেয়ে) জ্ঞানেশ মুখার্জী (মাস্টারজী) দিলীপ রায় (দুখনা) মিস পলিন (দুখনার স্ত্রী) মাস্টার পার্থ (মাস্টারজীর ছেলে) সতীন্দ্র ভট্টাচার্য (পুলিশ অফিসার) শান্তিব্রত দত্ত (চৌধুরী) অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঠাকুর সিং) এবং সমিত ভঞ্জ (জীবেন)।

সাত দিন ধরে একটানা শুটিং চলেছে। ক্যাম্প থেকে লোকেশান ছিল এক মাইলের মধ্যে। এই সাত দিনে ঘটনা বলতে এমন কিছু ঘটে নি। পাড়ার কিছু যুবক অসহযোগিতা করে। শেষ দিনে ইউনিটের সকলেই অভুক্ত অবস্থায় কাজ করেছেন। কারণ খাবার সাপ্লাই করতে দেওয়া হয়নি। বর্তমানে এই রকম ঘটনা ঘটছে। আউটডোরে শুটিং করতে গেলে ইউনিটের লোকজনদের ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে। বড় রকমের চাঁদা না দিলে নির্বিঘ্নে শুটিং করা যাচ্ছে না। এই সমস্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে বাংলা ছবি স্টুডিওর চার দেওয়ালের মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকবে। প্রয়োজনমত লোকেশান শুটিং না করতে পারলে ছবির কোয়ালিটি নিঃসন্দেহে মন্দ হবে। তদুপরি লো-বাজেট ছবির পক্ষে আউটডোর শুটিংই শ্রেয়। এমতাবস্থায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

এই ছবি 'অনজানে মেহমান' সম্পূর্ণ কালারে তোলা হচ্ছে। নিউ থিয়েটার্স যুগের অনুসরণে এই প্রথম শুধুমাত্র কলকাতার শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে পরিকল্পনা। [illegible]

প্রয়াস যদি সাফল্য লাভ করে তবে কলকাতার স্টুডিও থেকে পর পর হিন্দি ছবি হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট উৎসাহ পাওয়া গিয়েছে। কলকাতা থেকে হিন্দি ছবি নির্মাণের প্রস্তাবটি নতুন নয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক সাহায্য ছাড়াই প্রথম এ ধরনের সাহসী পদক্ষেপ অনজানে মেহমান। ছবির শুটিং বর্তমানে প্রায় শেষ।

পাশাপাশি কলকাতার স্টুডিওতে আরো একটি হিন্দি ছবি কিতনে দূর কিতনে পাস (প্রযোজনা - পরিচালনা : দয়াশঙ্কর সুলতানিয়া) এর শুটিং এগিয়ে চলেছে। এ ছবিও যথারীতি কালারে নির্মিত হচ্ছে। গল্প দু ভাগে ভাগ করা। অতএব দুই পর্বে দুটি ছবি। এক পর্বে আছেন সমিত ভঞ্জ মিতা কৌশিক রবি ঘোষ চিন্ময় রায় অনুপকুমার সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। অন্য পর্বে কাজ করবে পুলো প্রত্যাগত জনৈক অশোককুমার এবং প্রাণ। নায়িকা খুব সম্ভব হিমাদ্রি জোস। চিত্রগ্রহণ করছেন : সত্য রায়। শিল্প নির্দেশক : বিজয় বসু। কলাকুশলী নব বম্বে-বাংলার শিল্পী সমন্বয়ে কলকাতার স্টুডিও থেকে নির্মিত হচ্ছে এই হিন্দী ছবি।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

স্টুডিও সংবাদ

[illegible]

শীতটা আসতে না আসতে বাংলা ছবি স্টুডিওর চার দেওয়াল ছাড়িয়ে বাইরে ভিন্ন ভিন্ন লোকেশানে চলেছে। পরিচালক সলিল দত্ত যাচ্ছেন বিহারের কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় 'সেই চোখ' ছবির একটানা কয়েকদিন শুটিং করতে। স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্যে এই ছবি পরিচালনা করছেন শ্রীদত্ত। নায়ক : উত্তমকুমার। নায়িকা : মহুয়া রায়চৌধুরী। একটি বিশেষ নারী চরিত্রে রূপদান করছেন বাসবী নন্দী। আজকের এই সময়ের কাহিনী। হাই সোসাইটির লোকজনদের ব্যঙ্গ করে লেখা। বরং বলা ভাল যারা হঠাৎ নিজেদের হাই-সোসাইটির লোক বলে মনে করেন। গান এ ছবির অন্যতম সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। সংগীত পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন নচিকেতা ঘোষ।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পরিচালক ইন্দর সেনের আগামী ছবির শুভ

সূচনা হচ্ছে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর স্কোরিং-এ গান রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে। বিমল করের বহুপঠিত উপন্যাস 'অসময়' চিত্রায়িত করতে উদ্যোগী হয়েছেন শ্রীসেন। বলা বাহুল্য স্বরচিত চিত্রনাট্যে। ছবির প্রধান নারী চরিত্র রূপায়িত করবেন অপর্ণা সেন। বিশিষ্ট চরিত্রে স্বরূপ দত্ত পার্থ মুখোপাধ্যায় এবং মহুয়া রায়চৌধুরী অংশ গ্রহণ করছেন। চিত্রগ্রহণ করবেন শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালক আনন্দশংকর।

পরিচালক দীনেন গুপ্ত 'রাগ-অনুরাগ' রচনা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়)-এর শুটিং শেষ করে এনেছেন। সিরিও-কমিক গল্প। [illegible]খর চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য। রূপদান করছেন রঞ্জিত মল্লিক অপর্ণা সেন অনুপকুমার [illegible]বি ঘোষ চিন্ময় রায় কণিকা মজুমদার [illegible]খর চট্টোপাধ্যায় রত্না ঘোষাল এবং [illegible]মিত্রা মুখোপাধ্যায়। সংগীতবহুল ছবি—[illegible]টখানি গান থাকছে—সুর সংযোজনা [illegible]রেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গেয়েছেন [illegible]রতি মুখোপাধ্যায় এবং সুরকার স্বয়ং।

পরিচালক দীনেন গুপ্ত ইতিমধ্যে [illegible]ন ছবির পরিকল্পনা করছেন। বিশ্বস্ত-[illegible]ত্রে জানা গেল তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ-কান্তের উইল' চলচ্চিত্রায়িত করবেন। [illegible]হিণী এবং ভ্রমরের ভূমিকায় যথাক্রমে [illegible]চত্রা সেন এবং অপর্ণা সেন থাকতে [illegible]রন। বিস্তারিত আর কিছু জানা যায়নি।

[illegible]বম্বের কৌতুকাভিনেতা অসিত সেন [illegible]মানে কলকাতায়—ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে [illegible]ংসন্ধা' ছবিতে একটি বিশেষ চরিত্রে [illegible]নয় করছেন। সুশীল মুখোপাধ্যায়ের [illegible]চালনায় নির্মীয়মান এই ছবির নায়ক [illegible] মল্লিক। নায়িকা ঃ মিঠু মুখো-[illegible]য়। খলনায়ক ঃ অভিজিৎ সেন। [illegible]রা আছেন উৎপল দত্ত কালী বন্দ্যো-[illegible]য়। রসরাজ চক্রবর্তী গুরুদাস চিন্ময় প্রভৃতি আরো অনেকে। সংগীত পরি-[illegible] নচিকেতা ঘোষ। ব্যানার ঃ চিত্রাঞ্জলি।

[illegible]গত সপ্তাহে প্রবীণ পরিচালক মঙ্গল[illegible]ী 'আমি সে ও সখা' ছবির কয়েকটি [illegible]পূর্ণ দৃশ্যগ্রহণ করলেন। অচিরেই [illegible]তী তাঁর সম্পূর্ণ ইউনিটসহ আউট-[illegible]শুটিং করতে বেরিয়ে পড়বেন। লোকে-[illegible]নব সম্ভবতঃ পুরী কোনারক প্রভৃতি [illegible] শ্যামল মিত্র ও দীপেন ভট্টাচার্য [illegible]ত এ ছবির প্রধান তিনটি চরিত্রের ঃ উত্তমকুমার কাবেরী বসু এবং [illegible] চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে আছেন [illegible] নন্দী তরুণকুমার বনানী চৌধুরী ও [illegible] ভট্টাচার্য।

[illegible]নেকদিন পর লীলা চিটনীশ আবার [illegible] ফিরে এলেন। যুক্তরাষ্ট্রে এতদিন তিনি বসবাস করেছেন। ফিরে যাবার বাসনা নেই। বরং পুনরায় ছবিতে অভিনয় করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে 'হীরা' ছবি খ্যাত পরিচালক সুলতান আহমেদ লীলা চিটনীশকে তাঁর পরবর্তী ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ করেছেন। ছবির নাম গঙ্গা কি সৌগন্ধ। এ ছবিতে নায়ক অমিতাভ বচ্চন।

আনজানে মেহমানের আউট ডোরে অজিতেশ ব্যানার্জি এবং সুস্মিতা সান্যাল।

ফটো ঃ অমৃত

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

রাজেশ খান্না এবং ডিম্পলের বিবাহিত জীবন বেশ সুখেই কাটছে। বাজারে কোনো-রকম গুজব নেই যে রাজেশ কিম্বা ডিম্পল অসুখী—ওরা অচিরেই ডিভোর্স করবে। ডিম্পলের প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও রাজেশ ওকে ছবিতে কাজ করতে দিচ্ছে না। [illegible] নিয়ে ডিম্পলের মোটেই ক্ষোভ নেই। সে বলে—ঘরসংসার করতেই আমার ভালো লাগে। ওসব অভিনয়-টভিনয় পার্টি-পার্টি আমার মোটেই পছন্দ নয়। রাজেশের বাড়ির নাম 'সমুদ্র মহল', ঠিক সমুদ্রের ধারে। বেশীরভাগ সময় ডিম্পল সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসে থাকে। এ নিয়ে অনেকের অনেকরকম আলোচনা। পাড়াপড়শীরা বলে [illegible] ওদের ঝগড়া হয়। তাই ডিম্পল একা একা বসে থাকে। ডিম্পল বলে— আসলে ওর এখন শুটিং থাকে, কিংবা অন্য কাজে বাইরে থাকে। এসব নিয়ে লোকে কেন [illegible] এত মাথা ঘামায় কে জানে। আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক ফিল্মের অন্য কোনো নায়ক-নায়িকার চেয়ে অনেক ভাল এটা আমি জোর গলায় বলতে পারি।

রাজেশ আগে যে বাড়িটায় থাকত তার নাম আশীর্বাদ। আসলে ওই বাড়িটা ছিল রাজেন্দ্রকুমারের। পরপর ছবি হিট করার সময় রাজেন্দ্র ওর মেয়ে ডিম্পলের নামে ওই বাড়িটা কিনেছিল এবং বাড়ির নামও রেখে-ছিল ডিম্পল। কিন্তু কিছুদিন পর ছবি ফ্লাপ করতে শুরু করলে রাজেন্দ্র বাড়িটা বেচে দেয় রাজেশের কাছে। এই বাড়িতে আসবার পর যথারীতি রাজেশের পরপর ছবি হিট। কিছুদিন যেতে না যেতে ফ্লাপ করতে শুরু করলে বাড়িটা বিক্রি করে দেয় রাজেশ। তাহলে দেখা যাচ্ছে কিছুদিনের জন্য এই বাড়িটা বেশ ভাল।

রেখার সঙ্গে বিনোদ মেহরার সম্পর্ক অনেকদিন ধরে খারাপ। একটা খবর চালু আছে ওরা নাকি কলকাতায় গিয়ে বিয়ে করেছিল এবং একটা ঘরোয়া পার্টি থ্রো করে-ছিল সেখানে—হোটেল হিন্দুস্থান ইন্টার-ন্যাশনালে। কয়েকদিন আগে দুম করে রেখা কলকাতা গিয়েছিল মোহন সায়গলের সঙ্গে ও ম্যায় নেহী ছবির মুক্তি উপলক্ষ্যে। সেই সময় সে একজন সলিসিটরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। কিভাবে এই বিবাহের ছেদ হতে পারে। একান্ত ঘনিষ্ঠ মহলের কথা হল রেখা বিনোদের ওপর চটেছে কারণ ও নাকি সবসময় সন্দেহ করে। বিশেষ করে [illegible]কে।

—অভিজিত

হাজী মস্তান—মীনা সংবাদ

বম্বের অভিজাত এলাকায় মীনা ব হাজী মস্তানের অন্যতম ফ্ল্যাটে এক সন্ধ্যায় যখন পেৌঁছালাম মীনার বক্তব্য জানার জন্য, ওর ছোট্ট ভুটানী কালো রঙের কুকুর 'ব্ল্যাকী', সাদর অভ্যর্থনা জানাল। মীনার মতে ব্ল্যাকীর যদি অনুমোদন না থাকে, তবে ওই ফ্ল্যাটে কার সাধ্য কেউ ঢোকে। কাউকে পছন্দ না হলে সে নাকি তুলকালাম কাণ্ড করে।

মীনা খুব সপ্রতিভ বা হিন্দী চলচ্চিত্রের ভাষায় বলা চলে রীতিমত চালু মেয়ে, সে জীবনকে নানাভাবে চেখে দেখেছে। হাজী মস্তানের জীবন যেমন 'র‍্যাগস টু রিচেস' কাহিনী—মীনারও কিছুটা তাই। মস্তানের দৌলতে।

মীনার ফ্ল্যাটে বম্বের আজকালকার খুব কাভবান পেশা ইনটিরিয়র ডেকরেটর-এর নানারকম স্থূল, জটিল সাজসজ্জা ও কারু-কার্য দেখে বুঝলাম, যে এরা ভালই পয়সা পিটচ্ছে এই কাজে। বিচিত্র প্রবেশদ্বার থেকে সুরু করে বৃহৎ ড্রয়িং রুমে বা বসার ঘরে এই সব বায়বহুল সাজসজ্জার স্থূল-বাহুল্য।

মীনা হল যুক্তপ্রদেশ-এর বেরিলীর মেয়ে। দিল্লী হয়ে বম্বেতে অভিযানে আসে চলচ্চিত্রে ঢোকার আশায়। চোস্ত উর্দু বলে, হিন্দীতেও চোকস। চলচ্চিত্রে নাম রেখেছে 'মীনা শর্মা' হিন্দু ধরণের নাম। কিন্তু কথাবার্তায় মনে হয় সে আসলে মুসলমানী।

বম্বেতে হিন্দী চলচ্চিত্রে ঢোকা অত সহজ না। জটিল সে জগৎ। মীনাকে রীতিমত সেখানে স্ট্রাগল করতে হয় কয়েক বছর। এর মধ্যে গোপীকৃষ্ণর নিকট নৃত্য শিক্ষাও করে। কিন্তু বেশী দূর আর শেখা হয়নি।

বম্বের ওয়ার্লি হিল-এ 'হোটেল হিলটপ' বলে এক হোটেল আছে, যার অন্যতম মালিক আমাদের বিখ্যাত প্রযোজক ও পরি-চালক শ্রীশক্তি সামন্ত। শহরের কর্মব্যস্ত এলাকা থেকে একটু বিচ্ছিন্ন এই নিরিবিলি এলাকার হোটেলটি এক ধরণের লোকেদের কাছে নানাকারণে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। এদের ক্যাবারে নাচ, নৈশ আমোদ-প্রমোদ, আজকালকার 'পপ' সঙ্গীত ও নৃত্য খুবই জমজমাট।

এই হোটেলেই মীনার সঙ্গে হাজী মস্তানের পরিচয় করিয়ে দেয়—মীনার পরিচিত কাঞ্চন মাসী। এই হোটেলেই কাঞ্চনের নাচ অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মীনা সুন্দরী, কিন্তু আর্টিস্টিক্যালি কিনা বলা শক্ত। তবু হাজী [illegible] চলচ্চিত্রে অভিনেত্রী রূপে নামার ইচ্ছা মস্তান যখন জানতে পারে, তখন সে ইচ্ছা পূরণের জন্য এককালের ডকের কুলি, এখন-কার অসীম প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন কোটি-পতি মস্তান আগ্রহ প্রকাশ করে। মীনার কষ্টের দিন কেটে যায়।

মীনাকে নিয়ে আসে তার একটি ফ্ল্যাটে। মীনার নামে চলচ্চিত্র প্রযোজনার জন্য 'মীনা মুভীজ' প্রতিষ্ঠা করেন। সুরু হয় ছবি তোলা—যার নাম 'দিল ঔর পাথর'—বিখ্যাত উর্দু কবি ও লেখক কায়ফী আজমীর গল্প, পরিচালক মিত্র হিরো সঞ্জীবকুমার। ছবি তোলা এর মধ্যে প্রায় শেষ। কিন্তু হায়, ছবি প্রদর্শন-এর আগেই মস্তান সাহেব মিসাতে আটক।

তারপরে পত্র-পত্রিকায় গুজব রটেছে এই নিয়ে নানান রোমাঞ্চকর।

মীনা মস্তান-এর প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। সে বলে—মস্তান শুধু আমার জন্য নয় নানা-জনের জন্য কত কি করেছে—সে হচ্ছে দিলদার আদমী। আমাকেও উনি তেমনি সাহায্য করেছেন নিঃস্বার্থভাবে। আমাদের [illegible] এটা [illegible] আমি বিশ্বাস করিনি। নিঃস্বার্থ কিছুই নয় দুজনেই দুজনের কাছে এসেছে বলা চলে।

মীনা আরও বল্ল—'মস্তান আমার গড্‌-ফাদার। আমি বাগদত্তা মেয়ে, আমার ভাবী এখন বিদেশে বসবাসী, আমাদের আর্মির ভূতপূর্ব ক্যাপ্টেন। চলচ্চিত্রে আমি প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করছি। যদি হতে পারি ভালই। তা না হলে দু-চার বছরের মধ্যেই আমার ফিয়াঁসেকে আমি বিয়ে করব। তার সঙ্গে আমার এই বোঝাপড়া এবং সে আমার জন্য অপেক্ষা করতে রাজী।

মীনা আমাকে এই ভূতপূর্ব আর্মি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে রোমান্স ও তার বিষয় আরও অনেক কিছু বলল।

মীনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'দিল ঔর পাথর' ছবিতে তোমার অভিনয় দেখে অন্য প্রযোজক বা পরিচালকরা কি তোমাকে নিতে উৎসাহিত হবে?

'কি জানি—ছবিতে আমার অভিনয়ের তেমন খুব একটা সুযোগ ছিল না। অন্য কোন কাজ না পেলে সাদী করে স্বামীর সঙ্গে বিদেশে বসবাস করব।' সীমার উত্তর

—[illegible]

ওঁরা বলেন

দিলীপ রায়

ক হিসাবে আপনি খুব অল্পই চান্স
নে—এবং তার বেশীর ভাগই তেমন
সফল নয়, কেন?

কারণ যে কি সেটা সঠিক আমি
নি না। তবে আমার প্রথম নায়ক
র যে ছবিতে (হাঁসুলি বাঁকের
কথা) সেটা কিন্তু ফ্লপ করেনি।
মার 'শান্তি' যখন রিলিজ হয় তখন
ক্ষণ অ্যান্টি সংরক্ষণ ব্যাপার নিয়ে
মলা চলছিল তো জানেন। ঐ ডামা-
লে ছবিটা বকস পেলো না। আমার
াই বলতে পারেন। অবশ্য আমার
ছবি 'আলো ছায়া' সম্পর্কে
ার নিজেরও সন্দেহ ছিল।

থাকলে ছবিটা নিলেন কেন?

। সময় যে ইচ্ছে করেই নিই এমন
নানা ধরণের ব্যাপার থাকে। তার
বছরে তো এক-দুখানা ছবি পাই।
হবার ইচ্ছে আছে বলেই
টা ছাড়তে পারি না।

হবার ইচ্ছে যখন এত কিভাবে
চেষ্টা করছেন?

া আর কিভাবে করব বলুন।
উসার অফার নিয়ে এলে এবং
অফার যদি পছন্দ হয় নেব। আর কি
করব—

: এখন তো শুধু কারেকটর অ্যাক্টিংই
করছেন। এতেই সন্তুষ্ট আপনি?

—অসন্তুষ্ট হবার কি আছে! ভালো
চরিত্র পেলে কারেকটর অ্যাকটিং তো
খারাপ নয়। আর যদি বলেন ক্ষোভ
আছে কিনা তাহলে বলবো—না তাও
নেই। আজকালকার বেশীর ভাগ বাংলা
ছবিতে যে ধরনের নায়ক চরিত্র দেখা
যায় সেগুলো না করতে পারলে দুঃখ
কিসের! ভালো কাজ করতে না পারলে
লাভ কি নায়ক সেজে?

: চলতি ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ভারত টেস্টের
ফলাফল কি হবে বলতে পারেন?

—ক্রিকেট অত্যন্ত আনসার্টেইনিটির
ব্যাপার। কি করে কি বলব বলুন তো!
তবে নিরাশ হচ্ছি না।

: পতৌদির অধিনায়ক নির্বাচন সম্পর্কে
আপনার কি মত?

—আমার তো মনে হয় ঠিকই হয়েছে।
দলের মধ্যে যা নোংরা দলাদলি তার
থেকে পতৌদি ভালো। ও'র ক্যাপটেন-
শিপ সম্পর্কেও খুব সন্দেহ নেই
কারও। তবে একটা কথা কি
রকম উনি খেলবেন সেটা বলতে পারব
না। নেতৃত্বের ব্যাপারে এখনও উনি
সেরা এটা বলতে পারি।

: আপনার বাড়ীর লোকজন আপনার
অভিনয় সম্পর্কে কি ধরনের আলোচনা
করেন?

—ভাইপো-ভাইঝিরাই আমার কাজ
নিয়ে আলোচনা করে বেশী। 'রোদন ভরা
বসন্ত' ছবির ভিলেন চরিত্রটা অবশ্য
ওদের তেমন পছন্দ হয়নি। আমার

কাজ কিন্তু তারা সেজন্য নিন্দে করে না।

ঃ বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির উন্নতির জন্য রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অনেক। কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ছে কি আপনার?

—হ্যাঁ—প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন অনেক ঠিকই কিন্তু কাজ হচ্ছে কই! একমাত্র বাৎসরিক একটা পুরস্কার দেয়া ছাড়া। প্রচার শুনছি খুব দেখি কাজ হবে হয়!

ঃ একাধিক্রমে অনেকগুলো বাংলা ছবি ফ্লপের পর আপনার 'রোদন ভরা বসন্ত' সম্প্রতি 'অমানুষ' হিট করেছে। সুতরাং আপনি কি মনে করেন বাংলা ছবিকে এখন সস্তা প্রমোদের দিকে ঝুঁকতে হবে?

—না তা কখনোই করি না। বাংলা ছবি বাংলা ছবির মতই হবে। তবে ছবিতে একটু গতি আনা দরকার। বিশ্বাসযোগ্য গল্প নিয়ে বাস্তব পটভূমিকায় একটু দ্রুতগতিসম্পন্ন ছবি করতে পারলে আমার বিশ্বাস বাংলা ছবি চলতে পারে। আরেকটা শ্লোগান আমরা প্রায়ই শুনি কলকাতা থেকে হিন্দী ছবি না করতে পারলে নাকি বাংলা ছবি বাঁচবে না। কথাটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। এখান থেকে হিন্দী ছবি তৈরী হলে বাংলা ছবি বাঁচবে কি করে? বাংলা ইন্ডাস্ট্রি বাঁচতে পারে।

ঃ দেখতে দেখতে তো বেলা হলো। বিয়ে-টিয়ে করবেন না নাকি?

—না আপাততঃ তেমন কিছু ইচ্ছে নেই।

ঃ কারণ।

—কতগুলো অসুবিধে আছে। নিতান্তই ব্যক্তিগত পারিবারিক। নানা কারণে অনেক ঝামেলা ইত্যাদি ইত্যাদি বলতে পারেন।

ঃ যখন আর অভিনয় করতে পারবেন না লাইন ছেড়ে দিতে হবে তখন চলবে কি করে কিইবা করবেন ভেবেছেন কিছু?

—না তেমন করে ভবিষ্যতের ভাবনা এখনও ভাবিনি। ভাবা উচিত জানি কিন্তু ভেবেইবা করবটা কি! কিছুদিন আগে একটা ওষুধের দোকান করে-ছিলাম। ভদ্র বিজনেস ভেবেছিলাম মন্দ হবে না। কপাল মন্দ যখন আর হবেটা কি! কর্মচারী 'ভদ্রলোক' একদিন বুঝলাম সব ঝেড়েঝুড়ে ফাঁক করে দিচ্ছে! দিলাম তুলে দোকান। আসলে কি জানেন—বিজনেস ব্যাপার নিজে না দেখলে চলে না। দেখি এখন আবার নতুন কি করা যায়! ভবিষ্যতের কথা তো ভাবতেই হবে।

—নির্মল ধর

শতবর্ষের স্মরণীয়

। স্টার থিয়েটার ।

চৈতন্যলীলা দেখার পর গাড়ীতে ভক্তরা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ কেমন দেখলেন?

তখনও ভাবাবেগে ছিলেন পরমহংসদেব। উত্তর দিলেন ঃ আহা! আসল নকল এক দেখলাম গো!

সেন্টজেভিয়ার্স কলেজের পাদ্রত অধ্যাপক ফাদার লাঁফো বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রকে নিয়োগ করেন। চৈতন্যলীলা দেখে ফাদার লাঁফো মুগ্ধ অভিমত রেখে যান। তিনি যেদিন চৈতন্যলীলা দেখতে উপস্থিত হন সেদিন বিনোদিনী অভিনয় করতে করতে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। ফাদার লাঁফো গ্রীনরুমে গিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত স্বীয় হস্ত-চালনা করে বিনোদিনীকে সুস্থ করে তোলেন।

কর্ণেল ওলকট চৈতন্যলীলা দেখার পর রেইস এ্যান্ড রায়ত পত্রিকায় উচ্ছ্বসিত অভিমত ব্যক্ত করেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী চৈতন্যলীলা দেখে 'হরিবোল হরিবোল' বলে নৃত্য করেছিলেন। পন্ডিত মথুরানাথ ন্যায়রত্ন অভিভূত হয়ে গিরিশচন্দ্রকে আশীর্বাদ জানান।

পরমহংসদেব দ্বিতীয়বার চৈতন্যলীলা দেখেছিলেন। চৈতন্যলীলার পর ২২ নভেম্বর ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে মঞ্চস্থ হলো গিরিশচন্দ্রের প্রহ্লাদ চরিত্র। এই সঙ্গে অমৃতলালের বিবাহ বিভ্রাটও অভিনীত হয়। ১৪ ডিসেম্বর রামকৃষ্ণদেব প্রহ্লাদ চরিত্রের অভিনয় দেখেন। কিন্তু বিবাহ বিভ্রাট দেখেননি।

১৮৮৫ খৃস্টাব্দের ১০ জানুয়ারী মঞ্চস্থ হলো নিমাই সন্ন্যাস। বিনোদিনী নিমাই চরিত্রে অভিনয় করেন।

১৮৮৫ খৃস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারী বৃষকেতুর পুনরাভিনয়েও শ্রীরামকৃষ্ণ উপ-স্থিত থাকেন। মে মাসে প্রভাস যজ্ঞ মঞ্চস্থ হবার পর ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে এলো গিরিশচন্দ্রের বুদ্ধদেব।

বুদ্ধদেব—অমৃত মিত্র, গোপা—বিনোদিনী ছন্দক—বেলবাবু, শিষ্য ও গণক—অমৃতলাল বসু, পুত্রহারা রমণী—ক্ষেত্রমণি, গোতমী—গঙ্গামণি, সুজাতা—প্রমোদাসুন্দরী প্রভৃতি নেমেছিলেন অভিনাংশে। লাইট অফ এশিয়ার লেখক এডুইন আর্নল্ড বুদ্ধদেব দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন। অমৃতবাজার, হিন্দু পেট্রিয়ট সবাই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। বুদ্ধদেবের একটি গান স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্যদের খুবই প্রিয় ছিল।

'জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই।
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।'

১৮৮৬ খৃস্টাব্দের ১১ জুন এলো গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল। চৈতন্যলীলার মত আবার স্টার থিয়েটারে প্রেম-ভক্তি রসের প্লাবন বইলো।

পাগলিনীরূপে গঙ্গামণির কন্ঠের সংগীতলহরীতে নাট্যামোদিরা বিমোহিত হয়ে উঠতেন।

'আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে,
যেখানে যাই, সেথায় পাছে,
আমায় বলতে হয় না জোর করে,
মুখখানি সে যত্নে মুছায়, আমার মুখের
পানে চায়—
আমি হাসলে হাসে, কাঁদলে কাঁদে
কত রাখে আদরে
আমি জানতে এলেম তাই, কে বলেরে
আপন রতন নাই,
সত্যি মিছে দেখনা কাছে,
কচ্ছে কথা সোহাগ ঝুঁকার

বিল্বমঙ্গল নাটকখানি পড়ে বিবেকা-নন্দ অভিমত দেন, 'নাটকটি প্রায় ৫০ বার পড়েছি তবু প্রতিবারই নতুন বলে মনে হয়েছে।' ভগ্নী নিবেদিতা ইংরেজীতে বিল্বমঙ্গল অনুবাদ করেছিলেন।

বিল্বমঙ্গল মঞ্চস্থ হবার একমাস বাদে রবিবার, ৩২ শ্রাবণ, ১২৯০ সালে পরম-পুরুষ পরমহংসদেব দেহত্যাগ করেন। ২৫ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয় বেল্লিক বাজার। বেল্লিক বাজারে বিনোদিনী রঙ্গিণী চরিত্রে অভিনয়

করেন। স্টার থিয়েটারে রঙ্গিনী বিনোদিনীর শেষ আত্মপ্রকাশ।

বিনোদিনীর আনুমানিক জন্ম ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর সর্বপ্রথম মঞ্চাবতরণ বেণী সংহার নাটকে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মঞ্চজগত থেকে যখন বিনোদিনী বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স ২৩। বিনোদিনীর মঞ্চজীবন মাত্র ৮ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ৭৮ বৎসর বয়সে বিনোদিনীর মৃত্যু হয়। জীবিত থাকাকালীন সময়ে দুবার তাঁর গৃহে বিনোদিনীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। মৃত্যুর পরও বিনোদিনীর বংশধরদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়নি। বিনোদিনীকে নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। কিন্তু এইসব আলোচনায় বহু ভ্রান্তি দেখা যায়। বিনোদিনী সংক্রান্ত পৃথক আলোচনায় এইসব ভ্রান্তির নিরসন করা হবে।

বিনোদিনীর মঞ্চত্যাগের মূলে কয়েকটি কারণ এখানে উল্লেখ করছি। অনেকের ধারণা পরমহংসদেবের সংস্পর্শে এসে বৈরাগ্য মনোভাব থেকেই বিনোদিনী মঞ্চ ত্যাগ করেন। মূলে তা নয়, বিনোদিনী বরাবরই ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন—পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে তার মনে গৌরাঙ্গভাব সঞ্চারিত করেছিলেন মহাত্মা শিশিরকুমার। পরমহংসদেবের পাদস্পর্শে এলো তাঁর মধ্যে ভক্তির মন্দাকিনী ধারা। নিজের নামে স্টার থিয়েটার নামাংকিত না হবার জন্য যথেষ্ট মনোবেদনা ছিল বিনোদিনীর। তারপর গুরুমুখ বিদায় নেবার পর বলতে গেলে যেখানে ছিলেন তিনি সাম্রাজ্ঞী, সেখানে বেতনভুক শিল্পী ছাড়া তাঁর আর কোন পরিচয় ছিল না। নতুন স্বত্বাধিকারী গিরিশ শিষ্যদের ব্যবহারও বিনোদিনীর ওপর কৃতজ্ঞতাসূচক ছিল না। বিনোদিনীর একমাত্র সান্ত্বনার স্থল ছিলেন গিরিশচন্দ্র—আর অভিনয়। গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট নিত্যনতুন চরিত্রের অভিনয় করে খ্যাতির উত্তুঙ্গ শিখরে উঠেছিলেন বিনোদিনী। এই খ্যাতি নিয়েই সব বেদনা ভুলেছিলেন বিনোদিনী। কিন্তু সেই সান্ত্বনার স্থলটুকুও আর রইল না। বিল্বমঙ্গল নাটকে গঙ্গামণির পাগলিনী বিনোদিনীকে ম্লান করে দিল। অভিমান হলো গিরিশচন্দ্রের ওপর। ঠিক এমনি সময়ে বিনোদিনীর ব্যক্তিজীবনের আর একটি ঘটনাও বিনোদিনীর মঞ্চত্যাগের মূলে প্রভাব বিস্তার করে। গুরমুখ রায়ের পর বিনোদিনী ব্যক্তিজীবনে জড়িয়ে পড়েন শরৎচন্দ্র [illegible] সঙ্গে। শরৎচন্দ্র স্ত্রীর অনুরূপ [illegible]দায় অভিষিক্তা করেছিলেন বিনোদিনীকে। [illegible]দিন থেকেই শরৎচন্দ্র বিনোদিনীকে মঞ্চত্যাগের পরামর্শ দিচ্ছিলেন। বিনোদিনী এতদিন তাতে কর্ণপাত করেননি। বিল্বমঙ্গলে গঙ্গামণির খ্যাতিতে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন তিনি। এমন কি পরবর্তী রূপসনাতন নাটকে বিশাখা চরিত্রে নির্বাচিতা হয়েও মঞ্চস্থ হবার পূর্বেই অনিচ্ছা জানান। বিনোদিনীর মনোভাব সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র সচেতন ছিলেন। তিনি রাতারাতি কিরণবালাকে বিশাখা চরিত্রের উপযোগী শিক্ষা দিয়ে নিলেন। বিনোদিনী অভিনীত অন্যান্য চরিত্রগুলির উপযোগী তৈরী করলেন কিরণবালাকে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২১ জুন মঞ্চস্থ হলো গিরিশচন্দ্রের নতুন নাটক রূপসনাতন। ৩০ জুলাই বুদ্ধদেব আর বেল্লিক বাজার অভিনয় করেই স্টার সম্প্রদায়কে স্টার নাট্যগৃহ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়। বিনোদিনীর দীর্ঘশ্বাস এত অল্পসময়ের মধ্যে স্টার সম্প্রদায়কে স্থানচ্যুত করবে—এটা কারোর কল্পনায়ও ছিল না। অবশ্য বাস্তবের দৃষ্টিতে অন্য কারণ ছিল বৈকি।

কলকাতার অন্যতম ধনী বাবু গোপাললাল শীল স্টার থিয়েটারের জমি কিনে নিয়ে গড়ে তোলেন এমারেল্ড থিয়েটার। সম্প্রদায়ের স্বত্বাধিকারী রূপেই রইলেন গিরিশ-শিষ্যরা। মতিলাল শীলের পৌত্র ছিলেন গোপাললাল শীল। দেখতে ছিলেন কদাকার। মোটা এবং কালো। প্রায়ই স্টার থিয়েটারে নাটক দেখতে আসতেন মোসাহেবদের নিয়ে। জনৈকা অভিনেত্রীর প্রতি গোপাললাল শীলের দুর্বলতা ছিল। গোপাললাল শীলের চেহারা নিয়ে গ্রীনরুমে এবং পরিচালকেরা অনেক সময় বক্রোক্তি করতেন। মনে মনে গোপাললাল শীল ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন এবং

রাগ অনুরাগ
রবি ঘোষ, রঞ্জিত মল্লিক, অপর্ণা সেন

কর্তৃপক্ষকে বক্রোক্তির যথাযথ উত্তর দেবার সুযোগে ছিলেন। সুযোগ এলো। ৩০ লক্ষ টাকার পৈতৃক সম্পত্তির মালিক হলেন তিনি। কীর্তি মিত্রের মৃত্যুর পর তার ছেলে মালিক হলেন। গোপাললাল শীলের সঙ্গে ছিল তাঁর বন্ধুত্ব। ৬৪০০০ টাকায় স্টার নাট্যগৃহ এবং জমি কিনে নিলেন গোপাললাল শীল। কীর্তি মিত্রের স্ত্রীও তখন জীবিতা ছিলেন। তিনিও অন্যতম অংশীদারিণী। হাইকোর্টে মামলা রুজু করলেন ছেলের বিরুদ্ধে। শিষ্যদের পক্ষ থেকে গিরিশচন্দ্র কীর্তি মিত্রের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন। মঞ্চগৃহের মূল্য ত্রিশ হাজার টাকা ধার্য করা হলো—, বাকী জমির মূল্য। গিরিশশিষ্যদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হলো না—তারা স্টার থিয়েটারের গুড উইলটুকু নিয়েই বিদায় নিলেন।

গোপাললাল শীল তাঁর প্রতিহিংসা পূর্ণ করে থিয়েটারের মালিক হলেন এবং গিরিশচন্দ্রকেই অনুরোধ করলেন ম্যানেজার হতে। গিরিশচন্দ্র জানালেন, তুমি ওদের উৎখাত করলে এরপর আমাকেও যদি আটকে রাখো—ওরা দাঁড়াবে কি করে?

গিরিশচন্দ্র শিষ্যদের সঙ্গে রইলেন। গোপাললাল শীল কেদার চৌধুরীকে ম্যানেজার করে ৬৮ বিডন স্ট্রীটে স্টার থিয়েটারের ওপরে এমারেল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করলেন।

স্টার থিয়েটারের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিণতির পরিসমাপ্তি ঘটলো। গিরিশশিষ্যরা ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে হাতিবাগানে গড়ে তুললেন নতুন স্টার গৃহ। (ক্রমশঃ)

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

উঁহু ম্যায় নেহী

প্রযোজনা : উমা সিনে ফিল্মস প্রাঃ লিমিটেড
দুর্বল চিত্রনাট্য পরিচালনা অভিনয়
একটি বিনষ্ট হাসির ছবি

মারাঠি ছবি যেমন বাস্তবসম্মত হয়, মারাঠি নাটক বা উপন্যাস বাস্তব হবে এটাই ভাবা স্বাভাবিক। কিন্তু মোহন সায়গলের সাম্প্রতিক ছবি দেখতে গিয়ে মনে হোল, এরকম উদ্ভট কাহিনী বা নাটকও মারাঠী ভাষায় লেখা হয়? এমন অতিরঞ্জিত কাহিনীও মনে হয় 'টার্জন দি এপম্যান' ছবির আধুনিক সংস্করণ দেখছি। কখনও মনে হয় 'ক্যাসানোভা'র ভারতীয় সংস্করণ দেখছি কারণ ইতালীর প্রাচীন কাহিনীতে আছে, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে 'ক্যাসানোভা' একের পর এক নারীকে ভালবেসেছেন। কিন্তু কারো কাছে ধরা দেননি বা সহজে কারোর প্রেমের ফাঁদে পা দেননি। সকলের সংগেই প্রেমের অভিনয় করেছেন। এ ছবির নায়ক একের পর এক পাঁচজন তরুণীকে বিবাহের নামে মিথ্যা অভিনয় করেছেন। কিন্তু দোষ মারাঠী লেখকের নয়, চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক সম্ভবত বক্স অফিসের কথা বা দর্শকদের কথা চিন্তা করে কাহিনীকে 'টার্জন' এবং 'ক্যাসানোভা'তে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করেছেন। মূল কাহিনীটি যেটি কেবল মারাঠী ভাষায় রচিত হয়নি, পরে গুজরাটীতেও অনূদিত হয়েছে। সেটির মূল কাহিনীতে বিদেশী কাহিনীর কোন অনুপ্রেরণা নেবার চেষ্টা করা হয়নি। বরং সম্পূর্ণ ভারতীয় ধারায় রচিত ও হাসির খোরাকে ভর্তি, এর লেখক আচার্য আত্রে।

ছবির শুরুতে দেখা যায় নায়িকা 'রেখাকে' এক গভীর জঙ্গলে বন্যজন্তুদের সঙ্গে যুদ্ধরত, সাপ, হাতী ও অন্যান্য হিংস্র শ্বাপদ ওকে আক্রমণ করতে উদ্যত। এমন সময় নায়ক 'নবীনের' সেখানে প্রবেশ শিকারী হিসাবে। যথারীতি ফিল্মি কায়দায় হিংস্র জন্তুদের পরাজিত করে নায়িকার জীবন রক্ষা। এরপর প্রথানুযায়ী নায়ক-নায়িকার প্রেম ও প্রণয়পর্ব শুরু। কিন্তু নায়িকার বাবা চান টাকা—যখন উনি জানতে পারেন নায়ক একজন লেখক এবং প্রকাশকের মাধ্যমে বইও ছাপাবার মতো অর্থ আছে। প্রকাশকের কাছে নবীনের প্রশংসা শুনে উনি বুঝলেন অর্থের কোন অভাব নেই ওদের পরিবারে। এসব জানার পর তিনি 'রেখাকে' নবীনের হাতে সমর্পণ করতে রাজী হলেন। খুব তাড়াতাড়ি করেই অন্তঃসত্ত্বা নায়িকার বিবাহের ব্যবস্থা করা হোল। এমন সময় সেখানে পুলিশের আবির্ভাব, আচমকা। কারণ 'নবীন' বিবাহিত, আর উনি কেবল বিবাহ করেন, টাকার জন্যেই। নায়িকার পিতা এ ব্যাপারে খুব বেশী চিন্তিত হলেন না। কারণ 'নবীন'ও সচ্ছল টাকার অভাব তাঁর নেই। তবে সে টাকার জন্যেই কী বিবাহে রাজী হয়? 'রেখা'ও জানে, 'নবীন' কেবল তাকেই ভালবাসে। তাদের ভালোবাসার পরিণতি সে নিজের দেহের মধ্যে অনুভব করছে প্রতি মুহূর্তে। পুলিশের বক্তব্য, যে (নবীন) এইভাবে ইতিপূর্বে চারজন তরুণীকে বিবাহ করেছেন। উনি (রেখা) হচ্ছেন ও'র পঞ্চম পত্নী। অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে প্রেম করে বিভিন্ন তরুণীর সঙ্গে। নিজেকে তাদের স্বামী হিসাবে প্রতিপন্ন করেছে

নবীন নিশ্চল/রেখা/ আশা সচদেব

প্রচুর টাকার বিনিময়ে। কিন্তু এবার আর পুলিশ 'নবীনকে' ছাড়তে রাজী নয়, একেবারে কোর্টে নিয়ে হাজির। সেখানে নবীনকে অন্য চার তরুণী তাদের স্বামী হিসাবে সনাক্ত করে। কেবল অনেক অর্থ পাওয়ার জন্যে 'নবীন' একের পর এক বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সেজে বিভিন্ন তরুণীকে 'বিবাহের' নামে যূপকাষ্ঠে বলী দিয়ে তাদের কাছ থেকে অর্থ রোজগার করেছে। পাঁচজন তরুণীই ওকে কোর্টে, তাদের স্বামী হিসারে দাবী করলো। নবীন নিশ্চল এ ছবিতে একাই একশো—রমণীদের মন জয় করা, নৃত্য-গীতে ভুলিয়ে বিবাহের অভিনয় করা থেকে প্রেম করা, মারপিট, সব কিছুতেই এমন কী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ছদ্মবেশে নবীন নিশ্চল প্রমাণ করলেন উনি কেবল নায়ক নন, একজন শিল্পীও। পঞ্চম কন্যার ভূমিকার শিল্পীরা চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন—টীনএজ ধনীর দুলালী রেখা, কিংবা অর্ধশিক্ষিতা কল্পনা পঞ্জিনী কপিলা, হায়দ্রাবাদের মুসলমান তরুণীরূপী মীনা রাই, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মোহময়ী নারীরূপী আশা সচদেব এবং সাধুর নর্মসঙ্গিনী হিসাবে মাজনীন। অন্যান্য ভূমিকায় ইফতিকার, রাকেশ পাণ্ডে, নরেন্দ্রনাথ, সৌকত আজমী, সুজাতা, নাদিরা, কৃষ্ণ ধাওয়ান, ধুমল, জাগীরদার, মনোহর দেশাই, সাধনা খোটে, সোফিয়া প্রভৃতির অভিনয় রুটিন মাফিক। সঙ্গীত পরিচালনা এবং সুরসংযোজনায় সোনিক ওমি বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি এ ছবিতে। আলোকচিত্রগ্রহণে এম, এন, মলহোত্রা এবং সম্পাদনায় প্রতাপ দাভের কাজ প্রশংসনীয়। অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ পরিচ্ছন্ন। পরিশেষে প্রযোজক ও পরিচালক মোহন সায়গল, ইচ্ছে করলেই মারাঠী কাহিনীকে নিয়ে একটি সুন্দর হাসির ছবি করতে পারতেন।

শুভদিন

প্রযোজনা : দেবর ফিল্মস

কাহিনী ও পরিচালনার দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও, সমস্ত পরিবারের জন্যে একটি আনন্দদায়ক চিত্র

কথায় বলে—বিশ্বাস থাকলে পর্বতকেও হেলান যায়, আর তর্ক করে সেই শক্তিকে ফিরিয়ে আনা যায় না। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। চিনাপ্পা দেবর তাঁর প্রথম ছবি 'হাতী মেরা সাথী' ও দ্বিতীয় ছবি 'জানোয়ার অউর ইনসান' এবং তৃতীয় ছবি 'শুভদিনের' মাধ্যমে এবারে নিজেকে পরিচালনার মধ্যে না রেখে, কেবল চিত্রনাট্য ও কাহিনী রচনায় সীমাবদ্ধ রেখেছেন নিজেকে। শুভদিন ছবির পরিচালক হিন্দী ছবির জগতে নবাগত আর ত্যাগরাজন।

'গৌরী' দাদুর কাছেই গ্রাম্য পরিবেশে মানুষ। এখনও 'নাগ পঞ্চমী'কে অন্যান্য রমণীদের মতো 'নাগপুজো' করে, মনোস্কামনা সিদ্ধির জন্যে। একদিন গৌরী দুধ নিয়ে নাগ-দেবতার পুজোর ব্যবস্থা করে। গৌরীর অন্তরের ভক্তির জন্যেই সে বারবার 'নাগদেবতার' দর্শনের জন্যে উপস্থিত হয়। এবার দেখা গেল 'নাগরাজ' স্বয়ং এসে বাটী থেকে দুধ গ্রহণ করছে। এর থেকে গৌরীর ধারণা হোল 'নাগরাজ' তাকে স্নেহ করে বলেই, তার দেওয়া আহার্যবস্তুই কেবল সে গ্রহণ করেনি, তাকে স্বয়ং দর্শনও দিয়েছে। ওখানকার স্টেটের একমাত্র ওয়ারিস রাজন এলে গৌরীর দাদুই তাকে সমাদর করে গ্রামের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। আচমকা এক দুর্ঘটনার মধ্যে গৌরী ও রাজেশের পরিচয় আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে, ওরা সারারাত একটি ঘরে বন্ধ থাকে। অনেক চেষ্টা করে, সকালবেলায় ওরা গৌরীর দাদুর কাছে উপস্থিত হয়। কালকের সব ঘটনার কথা খুলে বলবার জন্যে। দাদুর ধারণা ছিল, বিলাত ফেরৎ রাজন মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি অসহায় মেয়েকে পেয়ে, নিশ্চয়ই তাকে উপভোগ করার জন্যে কোন বাড়ীতে নিয়ে গেছে। কিন্তু রাজন যখন গৌরীকে বিবাহ করতে চাইল। তখন দাদু তার ভুল বুঝে 'রাজনকে' বুকে জড়িয়ে ধরে পড়েছেন। মহাধুমধামের সঙ্গে গৌরীর বিবাহ হোল রাজেনের সঙ্গে। আর বিয়ের রাত্রেই হোল যত অনাসৃষ্টি কাণ্ড। 'রাজনের' মার মৃত্যু হয় সর্পাঘাতে, সেজন্যে রাজন সাপকে একেবারে সহ্য করতে পারে না। গৌরীর বিয়েতে এক সাপকে গাছের মাথা থেকে গৌরীকে আশীর্বাদ করতে দেখে, রাজন উন্মাদ হয়ে সাপটিকে হত্যা করতে চায়। এমনকি সাপ আছে মনে করে আউটহাউসে আগুন ধরিয়ে দেয়। ভয়ে এবং সাপের মৃত্যু হতে পারে এই চিন্তায় গৌরী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। অনেক রাতে রাজন যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সাপটি গৌরীর কাছে এসে তাকে স্নেহ চুম্বন করে সুস্থ করে তোলে। 'রাজন' ঘুম থেকে ওঠার আগেই আবার পালিয়ে যায়। কিন্তু এই 'নাগরাজ'ই একবার গৌরীকে গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচায়, এমনকি গৌরীর যেখানে বিপদের কোন সম্ভাবনা আছে, সেখানে গিয়ে ওকে-পাহারা দিতে ভোলে না 'সর্পরাজ'। রাজন একবার গৌরীকে বাড়ীতে দুধ দিয়ে 'নাগদেবতা'কে পুজো দিতে দেখে ভর্ৎসনা করে। রাগে দুঃখে বাড়ী ছেড়ে চলে যায় রাজন, যেখানে তাঁর বন্ধু ও প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং ওঁর সৎ দাদা আছে, সেই বাড়ীতে।

ওঁর সেক্রেটারী অশোক, তার বোন এবং বোনের প্রণয়ী (সৎদাদা) তিনজন রাজনকে নানাভাবে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করে। একবার দুধে বিষ মিশিয়ে হত্যা পর্যন্ত করার চেষ্টা করে অশোক। সেবারেও আগের মতো 'নাগরাজ' বাঁচিয়ে দেয় রাজনকে। কিন্তু রাজনের বন্ধু অশোক তার বোন এবং রাজনের সৎদাদাকে সহজে ছাড়ে না 'নাগরাজ'। নানাভাবে হয়রানি করে। তাদের একে একে মেরে ফেলে ভয় দেখিয়ে। এবার 'রাজন' বুঝতে পারে তার সৎদাদা অন্য এক বিষধর সাপ এনে তার মাকে মেরে ফেলেছিল। 'নাগরাজ' বা 'বাস্তুসাপ' কোন ক্ষতি করেনি। রাজন তাঁর নিজের ভুল সংশোধন করার জন্যে ছুটে যায় গৌরীর কাছে। 'নাগদেবতা'র আশীর্বাদ নিয়ে শুভদিনে তাঁদের সুখের সংসার শুরু করে।

প্রযোজক, কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার চিনাপ্পা দেবরের কাহিনীতে চমক আছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে দু' একজন ছাড়া এ জাতীয় অলৌকিক ঘটনাকে কে বিশ্বাস করবে? তবুও গৌরীর ভূমিকায় মধুছন্দার অপূর্ব অভিনয়ের জন্যে ছবিটি বেশ উপভোগ্য বলে মনে হয়। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—রাজন (রাজেশ লহর), অশোক (শশী কিরণ), অশোকের বোন (মধু মালিনী), রাজনের সৎদাদা (গুলেসন অরোরা) এবং রাজনের বন্ধুর অভিনয় করেছেন কৌতুকাভিনেতা পেণ্টাল ও দাদুর ভূমিকায় ওমপ্রকাশ, চিত্রনাট্যের দাবী অনুযায়ী অভিনয় করার চেষ্টা করেছেন। শিল্পীদের বাহিরে 'নাগরাজের' ভূমিকায় সাপটি ক্যামেরার সামনে অপূর্ব অভিনয় করেছেন। 'দেবর' খুব বিশ্বস্তভাবে সাপ ও নেউলের যুদ্ধটি দেখিয়েছেন। আলোকচিত্রগ্রহণে ভি. রাজামূর্তির আঙ্গিক কৌশলের কাজ প্রশংসনীয়। অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ পরিচ্ছন্ন হলেও, সম্পাদকের কাঁচির দুর্বলতার জন্যে ছবির একাধিক দৃশ্য খণ্ডভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। সঙ্গীত ছবির অন্যতম সম্পদ। সুরসংযোজনা এবং নেপথ্যসঙ্গীত পরিবেশনায় 'কল্যাণজী আনন্দজী' তাঁদের সুনাম রক্ষা করেছেন। পরিচালক আর, ত্যাগরাজনের কাজ গতানুগতিক।

মধুছন্দা

—চিত্রদূত

নাটমঞ্চ

চিত্র: অমিয় তরফদার

বাংলাদেশে নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখন আর নতুন কিছু নয়। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্তও নেই। একই নাটক বা তার বক্তব্য সময়ের ব্যবধানে ভিন্ন রূপ নেয়, একথা যেমন সত্য, তেমনি আধুনিক নাটকে একই প্রচেষ্টার পৌনঃপুনিকতা থাকলেও কালের ব্যবধানে তার প্রয়োগরীতি বা ফর্মের ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছুটা আধুনিক মানসিকতাসিক্ত ও যুগোপযোগী হবেই।

ইদানীং কয়েকটি অ-ব্যবসায়িক নাটক দেখে এই ধারণা জন্মেছে। এ-সংখ্যায় এপ্রসঙ্গে দুটি নাটক বেছে নেওয়া হল। যাঁরা নাটকে ভেঞ্চার করেন, এমন সংস্থাগুলির সহযোগিতা পেলে ভবিষ্যতে সবার সম্পর্কেই এই বিভাগে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাবে। আশা করি নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলির সহৃদয় আহ্বান মিলবে। আমাদের ইচ্ছা, আধুনিককালে নাটক, রচনা ও তা পরিবেশনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি বিষয়ে যুগপৎ উৎসাহ জোগানো এবং সেই সব নাটকের ভাবনা সম্পর্কে দর্শক তৈরী করা।

গত দশকেও নাটক বলতে যা অনুমান করতাম আমরা, এখন তার থেকে নাটক—কি তার বক্তব্যে, কি ফ্রেমিং-য়ে, কি পরিবেশনে—অনেক পরিবর্তিত আকার ধারণ করেছে। নাটক আর এখন শুধু নাটকই নয়—আরও কিছু এমন একটা সহজাত ধারণা এখন দর্শকদের মনে বিশ্বাসযোগ্যভাবে স্থায়ী হয়েছে।

আর সেই স্থানটা পূরণ করেছে এ-কালের যাত্রা। বলতে কি, যাত্রার ভূমিকা এ-ব্যাপারে দুঃসাহসিক বললেও অত্যুক্তি হবে না বোধকরি।

তবে তৎকালীন সামাজিক নাটক অথবা ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটক দেখার আগ্রহ বা আকর্ষণ কি কমে গেছে আমাদের? মোটেও তা নয়। এক শ্রেণীর দর্শক এদেশে চিরকালই ঐসব নাটক সম্পর্কে সমান উৎসাহী। কারণ তাতে আমোদ-প্রমোদ, চেনা-জানা মানুষ এবং দেব-দেবী সম্পর্কিত এমন এক কল্পলোকের অর্থাৎ বিস্ময় ও কৌতূহলমিশ্রিত কল্পনার জগৎ থাকে, যা আমাদের আজও সমান আকর্ষণ করে। আর সে-দর্শককে কোনদিনই ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। এটা বাঙালী দর্শকদের কাছে ট্র্যাডিশনাল। বিশেষ আলোচনা না করে সেই সব নাটকের কুশীলবদের ভূমিকাভিনয়ের আলোচনা, তাদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে উৎসাহব্যঞ্জক মন্তব্য থাকবে। যা প্রীত করবে দর্শককে। কারণ সেই সব বহুল অভিনীত নাটক আমাদের আপামর দর্শকদের কাছে ইচ্ছাপূরণের মতই।

এরিণা

ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটারের 'এরিণা' বস্তুত নতুন নাটক নয়। আগে অনিয়মিত হলেও হালে মাসে চারটে করে শো করছেন এঁরা। 'এরিণা' বিতর্কিত নাটক নয়, ফর্মের দিক থেকেও ঠিক আধুনিক রীতির নাটক নয়। তবু বলতে বাধা নেই, এঁদের বিষয়বস্তু নির্বাচন যেমন জীবনধর্মী, তেমনি মানবিকতায় চিহ্নিত। সামগ্রিক জীবনবোধ তার সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা অনিচ্ছা বেঁচে থাকার যন্ত্রণা এবং তার বিপরীত দিকে আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ—একটা সার্কাস পার্টির কতিপয় কুশীলবের মাধ্যমে সার্থক ভাবে দেখানো হয়েছে।

কাহিনীর কোন ঘনঘটা নেই। বরং বলা যায় সাধারণ আটপৌরে কাহিনী। বিচ্ছিন্ন ভাবে সকলের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা এবং তার পরিণতির কথা বলা হয়েছে এখানে। সার্কাস দলটাকে প্রতীকী ধরে নিলেও জীবনের রঙ্গমঞ্চ বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে।

অভিনয়ে টিম ওয়ার্কই হোল নাটকের সম্পদ। বলতে বাধা নেই, সেই যুথবদ্ধতা এরিণা'য় লক্ষ্য করা গেছে। একটার পর একটা দৃশ্য এরা অনায়াস ভঙ্গীতে সম্মিলিত ভাবে পরিবেশন করে গেছেন। তবে কোন কোন দৃশ্যে কিছুটা বিক্ষিপ্ততা ও অতি নাটকীয়তার প্রকাশ ঘটেছে। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা সোচ্চার বলেও মনে হয়েছে। এদিকে একটু নজর দিলে দর্শককে আরও বেশী করে নাটকের অভিনীত চরিত্র ও গল্পাংশের আবেগের প্রতি আকর্ষণ করা যেত বলে বিশ্বাস। অর্থাৎ আর একটু সময় নিয়ে এবং কিঞ্চিৎ ধৈর্য সহকারে নাটকের সংলাপ পরিবেশন এবং মুভমেন্ট কন্ট্রোল করলে নাটকের ভাবের সঙ্গে দর্শক একাত্ম হতে পারতেন বলেই মনে হয়েছে।

নাটকের সুর রচনা সুখদায়ক হয়েও সুষ্ঠুভাবে পরিবেশনের অভাবে কিছুটা দুর্বল। আবহ সঙ্গীত আরও এফেকটিভ হলে ভাল হয়। আলো ও শব্দযোজনা মোটামুটি।

অভিনয়ে যে কয়জন আনন্দ দিয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে মোহনবাবু (কীর্তিশ গুহরায়), নটবর (পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়—এরিণার নাট্যকার ও পরিচালক শম্ভু রায়চৌধুরী (রামাইয়া) নয়নতারা (দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়) ও রীণাদি (সীতা

রূপা (মীনা মুখার্জি), কানাই (শঙ্কর মুখার্জি) এবং রসকান্ত (পূর্ণেন্দু রায়) কয়েকটি দৃশ্যে ভাল অভিনয় করেছেন। সেই অনুপাতে মাস্টার (গুরুপ্রসাদ মুখার্জি) অতি নাটকীয় মনে হয়েছে।

এছাড়া হিমানী ব্যানার্জি, নীলিমা মুখার্জি, নমিতা দাস, তৃপ্তি দাস এবং অরুণ চ্যাটার্জি বিশ্বনাথ হরিদাস চ্যাটার্জি সুদীপ্ত সেনগুপ্ত এবং কমবেশী সকলেই নাটকের উপযোগী অভিনয় করেছেন।

সবশেষে একটি কথা উল্লেখ করছি। সেটা হোল, নাটকের গল্পাংশ এবং তার ঘটনা ও সংলাপ যেমন আবেগপূর্ণ, সেই অনুপাতে তা পরিবেশিত হলে এই নাটক দর্শকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

পার্থবাবু শক্তিমান পরিচালক বলেই এই কথাটা লিখতে আগ্রহী হলাম।

যাদুদণ্ড

নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'যাদু-দণ্ড' ('নিষাদ' নাটকের নামান্তর) থিয়েটার লাভার্স গ্রুপের প্রথম প্রযোজনা। নাটক পরি-বেশনা ও অভিনয় সম্পর্কে বলার পূর্বে নাটক ও তার সংলাপ সম্পর্কেও একটি কথা বলা বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

লেখক নিজেই তাঁর কথায় বলেছেন, 'নিষাদ' কিংবা বর্তমান 'যাদুদণ্ড' একটি আধুনিক রূপকথা। অশুভ চক্রান্তে মানুষের পতন এবং ক্রমান্বয় এই পতন থেকে উত্থারের কাহিনী এই নাটক।

নাট্যকারের এই স্বীকারোক্তি তাঁর নাটকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। নাটকের কুশীলবদের সংলাপ আশ্চর্য কাব্যমণ্ডিত, ধারালো এবং বুদ্ধিদীপ্ত। কখনো কখনো যেন অতলান্তে হারিয়ে যেতে হয় নিজেরই অজানিতে। বাস্তবতার পাশাপাশি রূপকথার আমেজ তৈরী করার মত সংলাপ রচনা নিঃসন্দেহে মুন্সিয়ানার পরিচায়ক। ক্ষেত্রবিশেষে রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ-এর অংশবিশেষ প্রয়োগ সমগ্র পরিবেশ ও বক্তব্যকে তাৎপর্যময় এবং সার্থক প্রতীকী-ময় করে তুলেছে।

নাটকের অন্তর্নিহিত বক্তব্য, তার লক্ষ্যে পৌঁছনো সেদিক থেকে সার্থক।

নাটকে কোথাও কোন গল্প বলা হয়নি। যা বলা হয়েছে, তা হোল এমন একটা বক্তব্য—যা প্রতীকীতে চিহ্নিত। এ্যাবস্ট্রাক্ট নাটক হিসেবে 'যাদুদণ্ড' সার্থক সন্দেহ নেই।

কিন্তু এমন নাটকের দর্শক-সংখ্যা সীমিত, এ-কথাটা আমাদের সব সময়ই মনে রাখতে হবে। (নচেৎ দর্শককে যাদু করার মত ট্রিটমেণ্ট এবং নাটকীয়তা অবশ্যই প্রয়োজন।)

এসব কথা জানা সত্ত্বেও থিয়েটার লাভার্স গ্রুপ এ-নাটক করতে দুঃসাহসী হয়েছেন। এটি তাদের প্রথম প্রয়াস বলেই তাঁদের নাটক পরিবেশন ও অভিনয় প্রচেষ্টা সম্পর্কে দু-একটি কথা নিবেদন করছি।

নাটকের টোটাল এফেক্‌ট আকর্ষণীয়। তিনটি অংশে বিভক্ত নাটকের পারম্পর্যও যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে।

কিন্তু সেই অনুপাতে অভিনয় কিঞ্চিৎ দুর্বল বা বলা যায় অ্যামেচার-ঘেঁসা। ফলে কিছুটা ফাঁকও থেকে গেছে। যার ওপরে নাটকের পরিণতি সম্পূর্ণই নির্ভর করছে।

তবু তার মধ্যে দিবাকর (পঙ্কজ মুন্সী—নাটকের পরিচালক), দ্বিতীয় সাংবাদিক (দুর্জয় মিত্র) ও যাদুকর (গৌর কর) ভূমিকাভিনেতাদের ভাল লেগেছে। সেই অনুপাতে প্রথম সাংবাদিক (দিলীপ ভট্টা-চার্য) ও লতা (রীণা মুখোপাধ্যায়) ভাল অভিনয় করেও কিঞ্চিৎ ম্লান তাদের আড়ষ্টতার জন্য। তপন চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা দুটি আর একটু সহজ হলে দর্শক মনে দাগ কাটত।

অন্যান্য চরিত্রাভিনেতাদের আরও একটু সহজ গতিবিধি ঘটলে নাটকের পক্ষে তা সহায়ক হোত।

আবহসংগীত সংযোজনা রুচিসম্মত। তবে কখনো কখনো নাটকের সংলাপকে ব্যাহত করেছে। এদিকে একটু দৃষ্টিদান বাঞ্ছনীয়। কারণ এ-জাতের নাটকে আলোর পরেই আবহসংগীতের ভূমিকা আবহসংগীত সংযোজনা—অজিতকুমার দানা।

সবচেয়ে বিস্মিত করেছে আলোক-সম্পাত। কয়েকটি দৃশ্য ছাড়া, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই (বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে) আলো আশ্চর্য কথা বলেছে। নাটকের টোটাল এফেক্‌টের ক্ষেত্রে যা প্রায় অপরিহার্য। (আলোকসম্পাত তপন দাস ও দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়)।

এছাড়া যাঁরা নিয়মিত নাটক পরিবেশন করেন (অব্যবসায়িক ভিত্তিতে), তাঁদের প্রতিও আমাদের আকর্ষণ অসীম। যেমন চেতনা (মারীচ সংবাদ। নতুন নাটক—'স্পার্টাকাস') সি পি এ টি (কোলকাতার হ্যামলেট—নতুন নাটক—১৭৯৯) এক্ষণ (কবি সুকান্তর কবিতা থেকে 'অথ ধনপতি কথা'), চারণদল (এই দশকের অভিমন্যু), থিয়েটার কমিউন ('নিষাদ), শৌভনিক (এক দুই তিন—নতুন নাটক), ইংগিত, চতুরঙ্গ, মাঙ্গলিক, থিয়েটার গিল্ড ইত্যাদি একাধিক সংস্থা। তাঁদের প্রত্যেকের সম্পর্কেই আমরা সমান আগ্রহী।

—মঞ্চ সমালোচক

বিদেশী ছবি

কলিকাতায় ইটালিয়ান ছবির উৎসব

প্রথমেই একটি কথা জানিয়ে রাখা ভাল যে, কলকাতার দর্শকরা এবার ইটালিয়ান ছবি দেখে খুবই নিরাশ হয়েছেন। ইটালিয়ান ছবিতে যে সব উত্তেজক দৃশ্যাদি এতকাল দেখে কিংবা অনুমান করে আমাদের দেশের দর্শকরা অভ্যস্ত, তার কিছুই নেই এবারকার চলচ্চিত্র উৎসবের ছবিতে।

এবারকার উৎসবে যে সব ছবি দেখানো হয় তার নাম যথাক্রমে ইউরোপা ফিফটি ওয়ান (১৯৫২ সালে তোলা) পইসা (১৯৪৬ সালে তোলা) দি নাইট লা ব্যাট্রাগলিয়া ডি আলজেরি বা দি ব্যাটেল অফ আলজিয়ার্স (১৯৬৬ সালে তোলা) ইল গ্রিডো বা দি ক্রাই (১৯৫৬—৫৭ সালে তোলা) এল ওরো ডি রোমা বা দি গোল্ড অফ রোম (১৯৬৬ সালে তোলা) মিরাকল ইন মিলান এবং একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি লা আমোর বা লাভ (১৯৪৭—৪৮ সালে তোলা)।

এর মধ্যে দু-তিনটি ছবি ইতিপূর্বে এখানকার দর্শকদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। তার মধ্যে মিরাকল ইন মিলান অন্যতম।

উৎসবের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পরিচালক ছিলেন ভিট্টোরিও ডি সিকা। যিনি মাত্র গত ১৩ নভেম্বর প্যারিসে তাঁর সর্বশেষ ছবি দি ভয়েজ ছবিটির এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যান। তবে তাঁর মিরাকল ইন মিলান ছাড়া অন্য কোন ছবিও দেখানো হবে দর্শকদের এমন একটা প্রত্যাশা ছিল।

দ্বিতীয় আকর্ষণীয় পরিচালক যথাক্রমে মাইকেলাঞ্জেলো আন্তোনিওনি ও রবার্টো রোসেলিনি।

আন্তোনিওনির দুখানা ছবি দি নাইট ও দি ক্রাই এবং রোসেলিনির তিনখানা ছবি পইসা ইউরোপা ফিফটি ওয়ান এবং স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি লাভ দেখানো হয়।

উৎসবের ছবিগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে তার প্রত্যেকটি ছবির কাহিনীর সারাংশ জানা থাকলে পাঠকের পক্ষে আলোচনার ফলপ্রসূ সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করা সুবিধে হতে পারবে ভেবে সেটা প্রথমেই নিবেদন করছি।

পইসা ছবির গল্প জার্মান অনুশাসনের হাত থেকে ইটালিকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টা

ইসক ইসক ইসক । শাবানা আজমী/দেবানন্দ

সময় ১৯৪৩। ছবিটিকে নিও রিয়ালিস্টিক সিনেমার অন্যতম একটি ক্লাসিক বলে অভিহিত করা হয়েছে। পাঁচটি অধ্যায়ে ছবির কাহিনী বিস্তৃত।

ইউরোপা ফিফটি ওয়ান-এর কাহিনীর সারাংশ হোল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা কাটিয়ে ইউরোপ মাত্র পঞ্চাশের দশকে পদার্পণ করেছে, তার বিলাস ব্যসন, পূর্বতন ব্যস্ত ও কৃত্রিম জীবনকে আবার সে ফিরে পেতে উৎসুক (অবশ্যই ওপরতলার মানুষেরা)। এরই এক মর্মান্তিক পরিণতি দেখানো হয়েছে এই ছবিতে।

দি নাইট এক বিগত যৌবন দম্পতির ক্লান্তিকর জীবনের এক রাত্রের আত্মোপলব্ধির কাহিনী।

দি ক্রাই ছবিতে এক শ্রমিকের ব্যক্তিগত জীবনের ট্র্যাজেডি দেখানো হয়েছে।

দি গোল্ড অফ রোম (পরিচালক কার্লো লিজানি)-এর গল্পাংশ ১৯৪৪ সালের রোম। জার্মানরা ইটালি অধিকার করে আছে। এরই পটভূমিতে রোমস্থিত জু সম্প্রদায়ের সংকটজনক মুহূর্তের কথা বলা হয়েছে।

ব্যাটেল অফ আলজিয়ার্স ফরাসী অনুশাসনের বিরুদ্ধে আলজিরিয়ার জনগণের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ছোটখাটো একটি দলিলচিত্র বলা যেতে পারে। যেখানে একদা এই সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল ছবিটি সেই স্থানেই তোলা হয়েছে। এ ছবির পরিচালক গিলো পন্টেকর্ভো।

মিরাকল ইন মিলান সেই সব সর্বহারাদের কাহিনী যারা ইচ্ছা পূরণের দেশে বাঁচতে চেয়েছিল। সমস্ত ছবিটিই ডি সিকা রূপকথার আমেজ মিশিয়ে তৈরী করেছেন। এ ছবি সর্বকালের সেরা ছবির তালিকাভুক্ত। ডি সিকার 'বাইসাইকেল থিভস ও এই ছবিটি এক সময় বিশ্বের চলচ্চিত্র জগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল আজো তার তুলনা বিরল। ভারতীয় দর্শকদের কাছেও এ দুটি ছবি নতুন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। অতএব ছবি সম্পর্কে কিছু নতুন করে বলার আছে বলে মনে করি না।

লাভ রোসেলিনির পরীক্ষামূলক ছবি। একটা ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কুশীলব একটি টেলিফোন ও একজন মহিলা। যাকে ইংরেজীতে বলে ওয়ান অ্যাক্ট ড্রামা।

সমস্ত ঘটনাটাই টেলিফোনের মাধ্যমে ঘটেছে। নায়িকার পূর্বতন প্রণয়ী যে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে তার সঙ্গে নায়িকার টেলিফোনের মাধ্যমে শেষ সংলাপ। নায়িকার অভিনয় দুর্দান্ত। তার বিভিন্ন অভিব্যক্তি দর্শককে বিস্ময়াবিষ্ট করে রাখে।

উৎসবের কোন ছবিই আমাদের মন ভরায়নি। তবু তার মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে আমার ইউরোপা ফিফটি ওয়ান ও দি নাইট ভাল লেগেছে। ইউরোপায় ইনগ্রিড বার্গম্যানের অভিনয় আমার দীর্ঘকাল মনে থাকবে। আর নাইট-এ মাস্ত্রওয়ানির নির্বিকার লেখকের ভূমিকাভিনয়।

ইউরোপা ফিফটি ওয়ান-এর গল্পাংশের বাস্তবতা আমাকে আকর্ষণ করেছে বেশী। যুদ্ধোত্তর ইটালির (রোমের) একটি উচ্চবিত্ত পরিবারের গল্প। স্ত্রী আমেরিকান স্বামী ইটালিয় ব্যবসায়ী। যুদ্ধের ভয়াবহতা কেটে যেতেই যারা ফিরে পেতে চেয়েছে তাদের পুরনো ফ্যাসন-দুরস্ত কৃত্রিম বাঁধা-জীবন। ফলে নিজের সন্তান পর্যন্ত তার মার স্নেহ এবং সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়। সাম্প্রতিক ফেলে সেই সন্তানের আকস্মিক মৃত্যুতে। তখন সে বাঁচতে চাইল অন্য জীবনে। কমিউনিজমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রমিকদের সেবা বৃহত্তর সাধারণ জীবনের প্রতি মমত্ববোধ— কিন্তু কোন জীবনেই সে শান্তি খুঁজে পেল না। শেষ পর্যন্ত সমাজ তাকে মনোবিকারের শিকার বলে সাব্যস্ত করল। গল্পের শেষটা তাই অনিবার্যভাবেই ট্র্যাজিক। পরিচালক তাঁর ছবিতে উচ্চবিত্তের হৃদয়হীনতার প্রতি তাঁর ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

দি নাইট-এর নায়ক লেখক স্বামী একটা বয়সের পর শূন্যতায় ভুগছেন। যৌবন বিগত। কারুর প্রতি কারুর যেন আর আকর্ষণ নেই। নায়িকার খেদ তার দেহ আর আকর্ষণ করছে না স্বামীকে। স্বামীও যেন নিজের অজান্তেই ঝুঁকে পড়ছে যুবতী নারীর প্রতি।

শেষ পর্যন্ত এক রাতে এক নাইট ক্লাবে উভয়েই সারারাত যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে শেষে

আত্মোপলব্ধি করল তারা আবার নিজেদের ফিরে পেল নিজেদের ভুল বুঝতে পারলো।

গল্পের শেষটি অপূর্ব। যেন কাব্য-মণ্ডিত। বস্তুত গোটা ছবিটাই যেন নিবিষ্ট করে রাখে দর্শককে।

এ গল্প ভাষার প্রতিবন্ধক মানেনি। দি রাই লাভ বা ব্যাটেল অফ আলজিয়ার্স'ও নয়। কিন্তু সাব টাইটেল বা ডাব করা না থাকায় অন্যান্য ছবিগুলি সাধারণ দর্শক কতখানি বুঝতে পেরেছেন তাতে সন্দেহ আছে। কারণ ছবির ঘটনা ছাড়াও সংলাপ গল্প বোঝা বা অনুধাবনের পক্ষে সহায়ক।

ভবিষ্যতে এ জাতীয় উৎসবের পূর্বে উদ্যোক্তাদের কথাটা ভেবে দেখতে বলি।

পোলিশ ছবির উৎসব

২৯ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর কলকাতায় পোলিশ ছবির উৎসব হচ্ছে। এতে ইলিমিনেশন এ স্লিপ আপ ন্যাটারক্লাইজ দি ডল পার্ল ইন সি ক্রাখন হুবাল এবং কোপারনিকাস এই সাতটি ছবি দেখানো হচ্ছে।

শা-র-চ

সত্যজিৎ রায়ের সীমাবদ্ধ ছবি

মার্কিণ চলচ্চিত্র সমালোচকের প্রশংসা

নিউইয়র্ক ডেলী নিউজ পত্রিকার চলচ্চিত্র পর্যালোচনায় বলা হয়েছে : শ্রীসত্যজিৎ রায়ের 'সীমাবদ্ধ' ছবিটিতে একাধারে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রস্রষ্টা ও শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর প্রতিভার সম্মিলন ঘটেছে।

সমালোচনাটি লিখেছেন জেরী অস্টার। গত সপ্তাহের শেষ দিকে ছবিটি নিউ ইয়র্কে মুক্তি পেয়েছে।

অস্টার তাঁর সমালোচনায় লিখেছেন : 'একজন শিক্ষিত ভারতীয় তরুণ কেমন করে উন্নতি করে কল তার একটি ব্রিটিশ যৌথ প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে আসীন হলেন, সত্যজিৎ রায়ের 'সীমাবদ্ধ' ছবিটি তারই একটি বলিষ্ঠ পর্যালোচনা।'

শ্রীরায় এই তরুণের মধ্যে এমন একজন মানুষের চিত্র এঁকেছেন যার কাছে কিছুই অন্যায় বা নীতিবিরুদ্ধ নয়। চোখের দৃষ্টি, মুখের হাবভাব, ঘরের মধ্যে আলোক, সংগীতের ঝঙ্কার শাড়ীর কাপড়ের বুনট—এইসব হল শ্রীরায়ের চলচ্চিত্রের ভাষা।

উচ্চপদাভিষিক্ত তরুণের ভূমিকায় শ্রীবরুণ চন্দ্র বিস্ময়কর অভিনয় করেছেন, তবে তার শ্যালিকার ভূমিকায় শর্মিলা ঠাকুর দর্শকদের সমস্ত সহানুভূতি আদায় করে নিয়েছেন। সে তার দিদি ও ভগ্নীপতির বাড়িতে বেড়াতে এসে গ্রাম্যমেয়ের সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই ভগ্নীপতির ধর্মাধর্মজ্ঞানহীন অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিল।

জেরী অস্টার লিখেছেন : 'আমার মতে মিস ঠাকুর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। তাঁর সৌন্দর্য ও লাবণ্য অতুলনীয় এবং এমন কোনও মনের ভাব নেই যা তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। হাসি ও ভ্রূকুটির আড়ালে তিনি বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ করেন।'

বিবিধ সংবাদ

দেবানন্দের 'ইস্ক ইস্ক ইস্ক' (রঙীন) : দেবানন্দ প্রযোজিত পরিচালিত এবং লিখিত 'ইস্ক ইস্ক ইস্ক' ছবিতে মেট্রো গ্রেস দর্পণা ছায়া মেনকা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করেছে ২৯শে নভেম্বর। প্রধান দুটি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দেবানন্দ জীনৎ আমন। অন্যান্য ভূমিকায় শাবানা আজমী নীলাম মেহরা কোমল কোমিল্লা রিকনা দরা এ কে হাঙ্গল গৌতম সেরীন কুলজিৎ প্রভৃতি।

হিমালয়ের পাদদেশে সম্পূর্ণভাবে গৃহীত ছবির আলোচিত্র গ্রহণ করেছেন ফালি মিস্ত্রী। সংগীত পরিচালনা : আর ডি বর্মন।

বাঙালী সঙ্ঘের নাটক : অম্বরনাথ (বোম্বে) বাঙালী সংঘ আয়োজিত একত্রিশ বার্ষিক দুর্গা পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নাটকের মধ্যে বাদল সরকারের বড় পিসিমা নাটকটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ নাটকে পরিচালক ও তরুণ শিল্পী চন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দক্ষতার পরিচয় দেন। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন শীলা ঘোষ স্বপ্না ব্যানার্জি বন্দনা ঘোষাল সুনন্দা গঙ্গোপাধ্যায় কুমারী পিঙ্কু অরূপ ঘোষ রাধাকান্ত সাধুখাঁ হরিপদ সাহা সুমিত্র ব্যানার্জি অচিন্ত্যকুমার বঙ্গ অসীমকুমার বকসী অমিত ব্যানার্জি দিলীপ ব্যানার্জি দীনেশ চ্যাটার্জি অমরেশ মুখার্জি মৃণালেন্দু সাহা এবং চন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বীরেশ মুখোপাধ্যায় স্মরণে : গত ২৩শে নভেম্বর সন্ধ্যায় মহাবোধি সোসাইটি হলে 'অভিনয়' পত্রিকা আয়োজিত বীরেশ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রয়াত শিল্পী-নির্দেশক ও নাট্য সংগঠকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সর্বশ্রী শেখর চট্টোপাধ্যায় বীরু মুখোপাধ্যায় সাধনা রায়-চৌধুরী সুব্রত সেনশর্মা সুধী প্রধান দেবনারায়ণ গুপ্ত জ্যোছন দস্তিদার কিরণ মৈত্র জয়ন্ত ভট্টাচার্য সুনীল দত্ত কাঞ্চন দাশগুপ্ত শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায় নির্মল সাহা দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সভাশেষে নাট্যক্ষেত্রে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের অসামান্য অবদান এবং 'মুক্ত অঙ্গন' প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতিস্বরূপ উক্ত মঞ্চের নাম 'বীরেশ মঞ্চ' করার প্র[illegible] সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পরলোকে অভিনেতা বিভূতি দাস : বিগত দিনের অভিনেতা বিভূতি দাস (৬৩) ১৭-১১-৭৪ ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটস্থ নিজ বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন তিনি অহীন্দ্র চৌধুরী নরেশ মিত্র সন্তোষ সিংহ প্রমুখ অভিনেতাদের সংগে দীর্ঘকাল মিনার্ভা থিয়েটারে যুক্ত ছিলেন। আত্মদর্শন জীবনটাই নাটক কিন্নরী বিক্রমাদিত্য তুষারকণা বামন অবতার সাজাহান প্রভৃতি বিভূতিবাবু অভিনীত শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম। কঙ্কাল নদ ও নদী দুই বোন বৌঠাকুরানীর হাট রূপকথা সাগর সংগমে প্রভৃতি আরও বহু ছায়াচিত্রে তিনি অভিনয় করেন। তিনি ছদ্মবেশী নাট্যসংস্থার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

যোগেশ দত্তের মূকাভিনয় : গত ১৭ই নভেম্বর প্রখ্যাত মূকাভিনেতা শ্রীযোগেশ দত্ত স্টার রঙ্গমঞ্চে তার একক মূকাভিনয় পরিবেশন করেন। শ্রীদত্ত এবারেও কয়েকটি নতুন ফীচার উপহার দেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ। এটি আমাদের জীবনের তিনটি অধ্যায়কে মনে করিয়ে দেয়। অপর তনটি ফীচার : আমিও একদিন ছিলাম এবং দুষ্টু ছেলে ও মজদুর

সুদারঙ্ সঙ্গীত সম্মেলনে (ডান দিক থেকে) কালীদাস সান্যাল তুষারকান্তি ঘোষ এবং কানন দেবী।

এই কয়টি ফীচার জীবন্ত হয়ে ওঠে। সব মিলিয়ে শ্রীদত্তের মূকাভিনয় আরও উন্নত পর্যায়ে পৌঁছায়।

সবসমেত দশটি ফীচার তিনি দর্শকদের উপহার দেন।

বাংলা পুরস্কার সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিকী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান : কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে অর্থ-বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীশংকর ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির ভাষণ দেবার কথা ছিল জন-সংযোগ ও তথ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়ের। তাঁর অনুপস্থিতি ভাষণ দেন সভাপতি শ্রীমতী রমা চৌধুরী (রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য)। অনুষ্ঠানে সহ-সভাপতি শ্রীসেবাব্রত গুপ্ত এবং বি এফ জে-এর সম্পাদক বি, ঝা ভাষণ দেন, পুরস্কার বিতরণ করেন সেকালের অভিনেত্রী শ্রীমতী যমুনা বড়ুয়া। মধ্যে একে একে পুরস্কার নিতে আসেন বিনোদ কাপুর (শ্রীমান পৃথিরাজ) উত্তমকুমার (বনপলাশীর পদাবলী) সন্ধ্যা রায় (অশনি সংকেত) মহুয়া রায়চৌধুরী (শ্রীমান পৃথিরাজ), অনিল চ্যাটার্জী (বনপলাশীর পদাবলী). রবি ঘোষ (বসন্ত বিলাপ) সুধীন দাশগুপ্ত (নিশিকন্যা) দীনেন গুপ্ত (মর্জিনা আব-দাল্লা), শেফালী (এপার ওপার) গৌরী-প্রসন্ন মজুমদার (শ্রীমান পৃথিরাজ), শ্যামল মিত্র (বনপলাশীর পদাবলী), প্রসাদ মিত্র (চিঠি), জে. ডি, ইরানী (অশনি সংকেত), বিজয় চক্রবর্তী (শ্রীমান পৃথিরাজ) প্রভৃতি। এর পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুবীর সেন, সাগর সেন, চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, সিন্ধা দাস ও সবিতা মল্লিক। নৃত্যে শেফালী ও সম্প্রদায় ও রূপশঙ্কর এবং আবৃত্তিতে শ্রীমতী [illegible]।

পুনশ্চ

অতীতে প্রবাসীতে বেতালের বৈঠক, 'বিবিধ প্রসঙ্গ ব্যঙ্গচিত্র পঞ্চশস্য দেশের কথা আলোচনা ও কষ্টিপাথর নামক কয়েকটি মূল্যবান ও উপভোগ্য বিভাগ ছিল। 'কষ্টি-পাথর'-এর মধ্যে প্রধানতঃ সমসাময়িক পত্রিকা থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, বিচিত্র রচনাদি অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে পুনর্বার প্রকাশিত হত। আমাদের 'অমৃত' পত্রিকার 'পুনশ্চ' বিভাগটি তারই রকমফের মাত্র। তবে কষ্টি-পাথরের মধ্যে যেক্ষেত্রে তৎকালীন সম-সাময়িক পত্রিকাদি থেকে রচনাগুলি আহৃত হত, সেক্ষেত্রে 'পুনশ্চ'র মধ্যে আমরা অধুনা-লুপ্ত পুরাতন পত্রিকা ও পুস্তকাদি থেকে আকর্ষক বিষয়গুলি নির্বাচন করি। অধুনা [illegible] দীর্ঘ কোন বিষয় মুদ্রিত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না বলে আমরা দুঃখিত।

উক্ত প্রবাসীর (১৩২৭ অগ্রহায়ণ) 'কষ্টিপাথর' থেকে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা আমাদের পত্রিকার 'পুনশ্চ' বিভাগে অংশত [illegible]। এই [illegible] মোহন দাসের বিখ্যাত গ্রন্থ 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী'র কোন সম্পর্ক নেই।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

প্রাচীনকালেও যে বাঙ্গালী স্বীয় দেশ হইতে বহুদূরে কীর্ত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন, প্রাচীন শিলালিপি সম্যক আলোচনা করিলে সম্ভবতঃ তাহার প্রমাণ আবিষ্কৃত হইতে পারে। সম্প্রতি তিনখানি শিলালিপিতে আমি এইরূপ বিবরণ পাঠ করিয়াছি।

১। বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্য। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর কাকতীয় বংশের রাজগণ উড়িষ্যার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। এই বংশের গণপতি-রাজ ৬২ বৎসরের অধিককাল রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, রুদ্রদেবী অথবা রুদ্রাম্বা নাম্নী তাঁহার কন্যা রুদ্রদেব-মহারাজ এই পুরুষ-নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহারই রাজত্বকালে ১২৬১ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের গন্টুর জিলার অন্তর্গত গন্টুর তালুকের

অধীনস্থ মালকাপুরম নামক স্থানে স্তম্ভ-গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে, বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্যের বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

লিপিতে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্য গৌড়দেশের অন্তর্গত রাঢ়া প্রদেশের পূর্ব্বগ্রাম নামক স্থানের অধিবাসী, সুতরাং তিনি যে বাঙ্গালী তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইনি ধর্ম্মশম্ভু নামক শৈবগুরুর নিকট দীক্ষালাভ করিয়া বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কাকতীয়-রাজ, মালব-রাজ, কলচুরি-রাজ ও চোল-রাজ এবং অন্যান্য রাজগণ তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কাকতীয়-রাজ গণপতি নিজেকে ইঁহার পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিশ্বেশ্বরের বিশেষ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল এবং বাঙ্গালা দেশের বহু শৈবাচার্য ও কবি-কাকতীয়-রাজ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। লিপিখানিতে উক্ত হইয়াছে যে, আলম্বিত কর্ণভূষণ, কণ্ঠহার ও হেমকান্তি জটাধারী প্রতিভা-দীপ্ত মুখমণ্ডল বিশ্বেশ্বর-শম্ভু যখন গণপতি রাজার প্রাসাদে বিদ্যা-মণ্ডপে উপবিষ্ট হইতেন, তখন তিনি একটি বিশেষ দর্শনীয় বস্তু বলিয়া গণ্য হইতেন। ১১৮৩ শকাব্দে (১২৬১ খৃষ্টাব্দে), রাণী রুদ্রদেবী আচার্য্য বিশ্বেশ্বর-শম্ভুকে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ মন্দির ও অন্যান্য কয়েকখানি গ্রাম ও কিঞ্চিৎ ভূমি দান করেন। মন্দম নামক গ্রামে আচার্য্য কর্ত্তৃক একটি শিবমন্দির, মঠ ও অন্নসত্র স্থাপিত হয়। তিনি ঐ গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ-পরিবার প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহাকে 'বিশ্বেশ্বর গোলকী' নাম প্রদান করেন। কাকতীয় রাণীর নিকট হইতে তিনি যে ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ ষাটটি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে বিতরণ করেন। অবশিষ্ট সমান তিন ভাগ করিয়া, প্রথম ভাগ শিবমন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ, দ্বিতীয় ভাগ শুদ্ধ শৈবগণের মঠ ও ছাত্রগণের ভরণপোষণের নিমিত্ত এবং তৃতীয় ভাগ একটি মাতৃমন্দির, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটি অন্নসত্রের ব্যয় বহন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া যান। ঋক, যজু, সাম বেদ পড়াইবার নিমিত্ত তিনজন এবং ন্যায়, সাহিত্য ও আগমের নিমিত্ত পাঁচজন অধ্যাপক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত এক-একজন সুদক্ষ চিকিৎসক ও একজন হিসাব-নবীশও নিযুক্ত হইয়াছিল। ইঁহাদের প্রত্যেকের জন্য দুই পুট্টি ভূমি বরাদ্দ ছিল। মন্দিরে দশজন নর্ত্তকী ও আটজন বাদ্যকার ছিল। মঠ ও অন্নসত্রে একজন কাশ্মীর-দেশীয় গায়ক চৌদ্দজন গায়িকা ছয়জন নর্ত্তকী দুজন পাচক ব্রাহ্মণ, চারিজন ভৃত্য, ছয়জন ব্রাহ্মণ ভৃত্য ও দশজন বীরভদ্র ছিল। এই বীরভদ্রগণ গ্রামের পাহারায় নিযুক্ত থাকিত এবং গ্রামের রক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক হইলে উদর, জিহ্বা ও মস্তক কর্ত্তন করিত। এতদ্ব্যতীত বিশজন বীরমুষ্টি ভৃত্য ছিল। ইহারা শিবপন্থী, এবং স্বর্ণকার, তাম্রকার কর্ম্মকার রাজমিস্ত্রী কুম্ভকার স্থপতি সূত্রধর, নাপিত ও শিল্পীর কার্য্য করিত।......

অন্নসত্রে যাহাতে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নির্ব্বিশেষে সকলেই সকল সময়ে আহারাদি পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা ছিল। মন্দির, অন্নসত্র, মঠ ও গ্রাম—এই সমুদয়ের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য একশত নিষ্ক বেতনে সর্ব্বোপরি একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই অধ্যক্ষ তাঁহার কার্য্যে অবহেলা করিলে অথবা অন্য কোন কুব্যবহার করিলে স্থানীয় শৈব সম্প্রদায় একযোগে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া অন্য অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল।...

প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার এই কর্ম্মবীর সুদূরে দাক্ষিণাত্যে গৌরবময় রাজগুরু পদে অভিষিক্ত থাকিয়া এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পাদনকরতঃ বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

২। ঈশান শিব। প্রাচীন পাঞ্চাল দেশের অন্তর্গত, যুক্তপ্রদেশস্থ বদাউন নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপিতে আর একজন বাঙ্গালী শৈব-সাধকের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পঞ্চাল দেশে রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। ঈশান শিব নামক গৌড়দেশীয় একজন শৈব-সাধক এই বংশের দশম রাজা অমৃতপালের গুরু এবং একটি মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বৎসভার্গব গোত্রীয় এবং ভার্গব চ্যবন আপনুবান ঔর্ব ও জমদগ্নি এই পঞ্চ প্রবর যুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। সবসকদলীদণ্ডবৎ অসার সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি পরমাত্মার ধ্যানে নিযুক্ত হন। কালক্রমে তিনি রাজগুরু ও মঠাধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত হইয়া একটি শিব-মন্দির নির্ম্মাণ করেন।...

বিশ্বেশ্বর আচার্য ও ঈশান শিবের জীবনী আলোচনা করিলে ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলায় শৈবধর্ম্মের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালী ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন।

৩। গদাধর। আগ্রা জিলার অন্তর্গত বটেশ্বর নামক স্থানে প্রাপ্ত এবং চান্দেল্ল-রাজ পরমর্দ্দিদেবের রাজত্বকালে ১২৫২ সংবতে (১১৯৫ খৃঃ অঃ) উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপির কয়েকটি শ্লোকে আগ্রা প্রদেশ-স্থিত একটি বাঙ্গালী পরিবারের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে গৌড়দেশীয় লক্ষ্মীধরের গদাধর নামক এক পুত্র ছিল। ইনি কবি ও বিদ্বান বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং চন্দেল্লরাজ পরমর্দ্দিদেবের সান্ধি-বিগ্রাহিক এই নামধেয় সম্মানিত ও ক্ষমতাযুক্ত প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র দেবধরও একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন এবং পূর্ব্বোল্লিখিত লিপিখানি তাঁহারই রচনা।

যে সময় বাঙ্গালা দেশ উপযুক্ত রাজনীতিজ্ঞের অভাবে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হইয়া যবনগণের পদানত হইতেছিল ঠিক সেই সময়েই একজন বাঙ্গালী সুদূর আগ্রা প্রদেশে সান্ধিবিগ্রাহিক নামক উচ্চ অমাত্যপদে অভিষিক্ত ছিলেন.

—ক্ষপণক

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003
AMRITA
Friday 6th December,
Phone 55-5231 (14 lines)

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

১০ জানুয়ারী ১৯৭৫ ॥

মূল্য ৬৫ পয়সা

১৪ বর্ষ

অমৃত

৩৫ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 10th January, 1975 শুক্রবার ২৫ পৌষ, ১৩৮১

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পাতায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : অমলানন্দ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

ত্রিপুরায় সাহিত্য সম্মেলন

ত্রিপুরার অন্যতম গৌরব বাংলাভাষার প্রতি তার প্রাক্তন নৃপতিবর্গের আন্তরিক অনুরাগ। বাংলাই ছিল তার সরকারী ভাষা, দরবারে স্বীকৃত বাণী। সে-সময়ে বাংলার স্বীকৃতি ছিল না বৃটিশ ভারতে। ত্রিপুরাধিপতিদের কাছে সে কারণে বাংলাভাষীদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। প্রাচীন বাংলা গদ্যের নিদর্শনও পাওয়া যায় ত্রিপুরা রাজদরবারের বিভিন্ন দলিলপত্রে। এই ত্রিপুরায় নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনায়। ত্রিপুরার আতিথ্য গ্রহণ করেছিল সারা ভারতে ছড়ানো বাংলাভাষীদের প্রতিনিধিরা।

সাহিত্যের সম্মেলন সংস্কৃতি চর্চার অঙ্গ। তার চেয়েও বেশী এর দ্বারা জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা। বাংলাভাষা তার যোগ্য সমাদর এখনও পায় নি। পশ্চিম বাংলায় এখনও বাংলা সরকারী ভাষার স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত। ত্রিপুরা অবশ্য বাংলাকে সরকারীভাষারূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে আমাদের প্রতি-বেশী বাংলাদেশে বাংলাভাষার যে নিরংকুশ প্রতিষ্ঠা ও গরিমা আমরা ভারতবর্ষের বাংলাভাষীরা সে মর্যাদা উপার্জন করে এনে দিতে পারি নি আমাদের মাতৃভাষাকে। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিষ্ঠালগ্নে তার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাংলার বাইরে অন্য ভাষাভাষীদের সামনে বাংলাভাষার পরিচয় তুলে ধরা। আজকের ভারতে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে পারস্পরিক মিলন ও ভাবগত ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। কেননা অত্যন্ত দুঃখের হলেও একথা সত্য যে ভাষাগত বিরোধ ভারতের বুক থেকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় নি। প্রায়ই তার দুঃখজনক দৃষ্টান্ত আমাদের হতাশার কারণ হয়ে ওঠে। ভারতের বাংলাভাষীরা সংখ্যার দিক থেকে হিন্দীর পরেই। দুটি রাজ্যের প্রধান ভাষা বাংলা—একটি পশ্চিমবঙ্গ এবং দ্বিতীয় হল ত্রিপুরা। এ ছাড়াও আসামে এবং সুদূরে আন্দামানে বাংলাভাষীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। সুতরাং ভাষা হিসাবে বাংলার প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব নিতে হবে বাংলা ও বাংলার বাইরের বাংলাভাষীমাত্রেই। ত্রিপুরার স্থান তর মধ্যে অগ্রগণ্য।

সাহিত্যের উৎকর্ষ এবং তার উদ্দেশ্য নিয়ে সম্মেলনে চিত্তাকর্ষক আলোচনা হয়েছে। কবি ও সাহিত্যিকরা ভাষাকে সুন্দর করেন, তাকে জনপ্রিয় করে তোলেন নতুন বাকভঙ্গিতে, স্মরণীয় উপমায় গদ্যের ঋজুতায়। কিন্তু সাহিত্য ছাড়াও ভাষার অন্য প্রয়োজন আছে যা ব্যবহারিক। সাহিত্য শাখার সভাপতি শংকর এই দিকটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ইংরেজি আজ পৃথিবীর সব-চেয়ে গ্রহণযোগ্য ভাষারূপে স্বীকৃতি পেয়েছে শুধু তার কবিতা বা কথাসাহিত্যের জন্য নয়, এই ভাষার প্রকাশক্ষমতা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের সার্থকতাও তার জন-প্রিয়তার কারণ। বাংলাকেও আজ ভাষা হিসাবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করতে হলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রতিদিনের প্রয়োজন অনুযায়ী তার শব্দব্যবহারকে বোধগম্য ও গ্রহণীয় করে তুলতে হবে। সরকারী কাজে ইংরেজির ব্যবহার এখনও বেশ পাকাপোক্তভাবেই রয়েছে ভারতে। ইংরেজির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন করা হয়তো ঠিক হবে না। কিন্তু বাংলাকে তার পাশাপাশি প্রতিদিনের কাজে, সরকারী দলিলপত্রে বিজ্ঞপ্তিতে, আদালতে অবশ্যই স্থান দিতে হবে। নইলে বাংলা যে একটি আধুনিক শক্তিশালী এবং প্রকাশক্ষম ভাষা তার প্রমাণ হবে কি করে?

সাহিত্য সম্মেলন পাঠক ও লেখকদের মধ্যে সংযোগস্থাপনের সুযোগ এনে দেয়। সাহিত্যের মূল আদর্শ সর্বমানবিকতা, সর্বজনীনতা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব। বাংলা সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এই চিরন্তন আদর্শ বিশ্বের সমক্ষে তুলে ধরে গেছেন। এই আদর্শ একালের সাহিত্যিকদেরও লক্ষ্য হওয়া উচিত। বহু ভাষাভাষীর দেশ আমাদের। পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা এবং দ্রাবিড় উৎকল-বঙ্গ আমাদের দেশের ভাষা বৈচিত্র্যের পরিচয় তাদের নামের মধ্যেই বহন করে নিয়ে চলেছে। ভাষাগত সংহতি এবং ভাবগত ঐক্যই হল তার আদর্শ। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন সেই আদর্শেরই প্রতীক। বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে এভাবেই সর্ব ভারতীয় ঐক্যের ও ভাবগত সংহতির বাণী প্রচারিত হোক।

সর্পদংশন

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

পিতলতুলসী গ্রামের সনাতন ঘোড়ুই-এর ছোট ছেলে ভজন ঘোড়ুইকে সাপে কাটল।

কথা হচ্ছিল অনিবার্যভাবেই দেশের হালচাল নিয়ে। দিনকাল এমনই পড়েছে যে ইদানীং এ-ছাড়া আর কোনো কথা নেই। বয়স এবং অবস্থা নির্বিশেষে যে কোনো আড্ডাতেই যে কোনো বিষয়ে কথা সুরু হয়ে কথার টানে টানে শেষ পর্যন্ত ঐ এক হা-হুতাশের কোরাস। আর পারা যাচ্ছে না। এর শেষ কোথায়—। মূল্যবৃদ্ধি নামক সেই বিকট এবং বিরাট দৈত্যটা দিনে দিনে ক্রমেই বিরাটতর আকৃতি ধারণ করছে, এবং তার বিস্তীর্ণ করতলের মধ্যে সাধারণ অসাধারণ সব মানুষ, মন্ত্রী উপমন্ত্রী কোর্ট কাছারি পুলিশ মিলিটারী আইন-কানুন শাসন ব্যবস্থা—সব কিছুই যেন কতিপয় খেলনা। কোনো কিছুতেই তার কোনো মাথা-ব্যথা নেই, যখন খুশী যেমন খুশী সে খেলে যাচ্ছে আপন খেয়ালে—।

এর ওপর আছে আর এক উপসর্গ। বর্ধিত মূল্যেও কোনো জিনিস খোলা বাজারে পাওয়ার উপায় নেই। দুধ ঘি মাখন দালদা [illegible] সুজি পাঁউরুটি বিস্কুট কেরোসিন এমন কি সাবান টুথপেস্ট দাড়ি [illegible] ব্লেড [illegible] সিগারেট পর্যন্ত চলে গেছে দুর্নীতির আড়ালে। [illegible] আছে ঘন ঘন লোড শেডিং। আলো নেই পাখা নেই—। জীবনযাপন যে এমন এক দুর্বিসহ নরক যন্ত্রণা, তা বোধহয় এর আগে কোনোদিন মানুষ এমন হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে নি।

আমাদের মধ্যে ছিলেন প্রথম থেকেই চুপচাপ ছিল। কথায় কথায় আমরা যতই ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে উঠছিলাম, মুখ দিয়ে ছুটছিল কথার ফোয়ারা—প্রায়শই যা [illegible] ও [illegible] করে যাচ্ছিল, তাতে [illegible] মুখচোরা, ততই যেন ছিলেন আরো নির্বিকার ও উদাসীন হয়ে উঠছিল। না, তাও নয়—। তার দুই ঠোঁটে এমন একটা আপন হাসি-[illegible] ফুটছিল, তার দু

চোখের তারায় অশ্রান্ত কৌতুক—। আমাদের অনির্দিষ্ট লক্ষ্য রাগটা একটা লক্ষ্যস্থল খুঁজে পাচ্ছিল যেন। এ-সব কথায় হিতেনের এত মজা পাওয়ার কি আছে!

আমাদের মধ্যে প্রণবেশ হঠাৎ বলে উঠল, 'তা হিতেন একেবারে চুপচাপ কেন? না গেঁয়ো সরল বোকা চাষীদের মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ হচ্ছে দু' পয়সা। তাই আর এ-সব বিষয় ভাল লাগছে না—'

প্রণবেশের কথায় আমরা প্রত্যেকেই যেন প্রতিশোধ নেওয়ার সুখ অনুভব করলাম এবং ঠা ঠা করে হেসে উঠলাম সশব্দে।

হিতেন আমাদের বন্ধু। কিন্তু বন্ধু-হলেও আমাদের আড্ডার নিয়মিত অংশীদার নয়। সে রাজ্য সরকারের দপ্তরে চাকরী করে। মফঃস্বলে মফঃস্বলেই তার কাজ। এখন আছে বাঁকুড়া না বর্ধমান জেলার কোথায় বি-ডি-ও হিসেবে। ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার—বেশ গালভরা ডেজিগনেশন। ছুটি-ছাটায় বাড়ি ফিরলে আমাদের আড্ডায় আসে মাঝে মধ্যে। বলার চেয়ে শোনেই বেশী। মধ্যে মধ্যে কর্মসূত্রে লব্ধ অভিজ্ঞতার গল্প-টল্প শোনায়।

প্রণবেশের কথায় হিতেনের ঠোঁট থেকে সেই আলগা হাসিটুকু কে যেন ন্যাতা বুলিয়ে মুছে নিল। নিভে গেল চোখের তারার সেই কৌতুকের ঝিলিকটুকুও। আমাদের সেই সমস্বর ঠা ঠা করা হাসি মিলিয়ে যেতে যেতেই দেখলাম ওকে কেমন যেন অসহায় আর নিরাবলম্বের মত দেখাচ্ছে। সে জুলে জুলে আমাদের মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর বলতে চাইছে কি যেন।

হাসি থামলেও হাসির রেশ মিলোতে একটু সময় নিল। ততক্ষণ মুখ চুন করে রইল হিতেন তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'না ভাই সে সব কিছু নয়। তোদের কথা শুনতে খারাপও লাগছে না। তবে আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াই, গ্রামের মানুষের দুঃখ দুর্দশা চাক্ষুষ দেখতে পাই—'

বাধা দিয়ে সুকুমার বলল, 'তাই বলে আমাদের দুঃখ কষ্টের কথা শুনে তুই হাসবি?'

'না, না—। হাসি নি ঠিক—' তাড়াতাড়ি বলল হিতেন, 'গ্রামের ঐ মানুষগুলো যে কি নিদারুণ কষ্টের মধ্যে আছে তা ভাবাই যায় না। সেই তুলনায় তোদের ঐ ঘি দুধ মাছ মাংস না পাওয়ার দুঃখ, আলো না জ্বলা বা ফ্যান না ঘোরার কষ্ট এত সামান্য আর ইনসিগনিফিক্যান্ট যে—মানে—আমার কাছে কথাগুলো খুব হাস্যকর লাগছিল! এক মুঠো ভাত বা এক ফালি ন্যাকড়ার জন্য মানুষ যে কি করতে পারে আর পারে না, সে সব কথা শুনলে তোদের ঐ নিজেদের দুঃখ টুঃখগুলোকে নিছক বিলাসিতা বলে মনে হবে।'

হিতেনের কথার সুরে এক ধরনের বিষণ্ণতা ছিল অনুক্তির তীক্ষ্ণতা ছিল যা আমাদের অন্তরকেও স্পর্শ করল।

হিতেনকে আমরা বরাবরই খুব নরম মনের ছেলে বলে জানি। দেখলাম এখনও সে একটুও পাল্টায় নি। ক্ষণেক নীরবতার পর আমাদের মধ্যেই কে যেন বলল, 'বল না। গ্রামের ঐসব মানুষগুলোর দুঃখ কষ্টের কথা কিছু বল না। শুনি—'

'শুনবি?—' চকচকে চোখে তাকাল হিতেন। তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তাহলে তিলতুলসী গ্রামের সনাতন ঘোড়ুই-এর ছোট ছেলে ভজন ঘোড়ুই-এর কথাই বলি। শোন—'

হিতেন বলতে আরম্ভ করল।

তিলতুলসী গ্রামের সনাতন ঘোড়ুই-এর ছোট ছেলে ভজন ঘোড়ুইকে সাপে কাটল। তখন রাত পুইয়ে এসেছে, পোয়াতি তারা জ্বলজ্বল করছে আকাশে। অন্ধকারের ঘোর কাটে নি, কিন্তু ঠান্ডা বাতাসে এক রকমের ভিজে ভিজে ভোর ভোর গন্ধ। ভজন ঘুম চোখে দরজার আগল খুলে বাইরের দাওয়ায় বেরুল। গ্রামে দিন সুরু হয়ে যায় শহরের ঢের আগে। পুরোপুরি আলো ফোটার আগেই গ্রামের মানুষদের দিনের কাজে অনেকটা এগিয়ে যায়।

দাওয়ায় দাঁড়িয়ে হাত-পা টান টান করে আড়মোড়া ভাঙল ভজন, তখনও দু চোখের দৃষ্টি পাতলা ঘুমের পর্দায় আচ্ছন্ন। তারপর ডান-পাখানা বাড়িয়ে দাওয়া থেকে উঠোনে ফেলতেই ভজনের সারা শরীরের ভেতর দিয়ে একটা ঠান্ডা শিরশিরানি যেন স্রোতের মত বয়ে গেল। কি যেন পড়েছে পায়ের তলায়, ভিজে ভিজে ঠান্ডা পিছল—। যেন সহজাত প্রবৃত্তির বশেই চকিতে পাখানা টেনে তুলে নিল সে, তারপর সদ্য ঘুমের ঘোর কাটা চোখে তাকিয়ে দেখতে চাইল বস্তুটা কি। তৎক্ষণে ঠিক মাথার ওপরেই যেন একটা প্রবল হিস-হিস শব্দ আক্রোশে ফেটে পড়তে চাইছে। দু চোখ তুলে সেই আবছা অন্ধকারে ভজন তাকিয়ে দেখল লেজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে এক কালনাগিনী, দুলছে হিল হিল করে সামনে পেছনে। দশাসই পুরুষের হাতের পাঞ্জার মত বিশাল চক্র হিম ঠান্ডা বরফের কুচির মত নিষ্পলক দুটো চোখ, দু' চোখের মাঝখানে খড়ম চিহ্ন—সব সেই ভোর রাতের তারার আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেল ভজন। যেন সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল সে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল দুলুনি থামিয়ে একেবারে স্থির হয়ে গেল সেই যমের দোসর। ভজন চকিতে চেতনা ফিরে পেল। বুঝল ছোবল দেয়ার আগে তার কপাল লক্ষ্য করে তাক করছে সাপটা। আত্মরক্ষার তাগিদেই ভজন পেছন দিকে লাফ দিল একটা, সেই সঙ্গে তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা চিৎকার—বিকট এবং মর্মান্তিক। আর সঙ্গে সঙ্গেই সপাং করে একখানা চাবুকের মত নেমে এল সাপটা। ভজন অনেকটা পেছিয়ে যাওয়ার দরুন ছোবলটা পড়ল তার বাঁ পায়ের পাতায়—

ভজনের সেই অমানুষিক চিৎকারে বাড়ির সকলেরই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হুড়মুড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সবাই। ভজনের বাপ সনাতন, ওপরের দুই দাদা—পবন আর বৃন্দাবন বউ ঝিরা, মা মোক্ষদা। সবাই ছুটে এসে দেখল ভজন এলিয়ে পড়েছে দাওয়ার ওপর, আর সাপটা যেন চরম প্রতিহিংসা আর আক্রোশের বশে তখনও তার পায়ের পাতা কামড়ে ধরে আছে আর মাথাটা অল্প কাত করে ভজনের শরীরে ঢেলে দিচ্ছে তার ভান্ডারে সঞ্চিত প্রাণঘাতী বিষের শেষ বিন্দুটুকুও। হৈ হৈ করে উঠল সকলে। সকলেই অপ্রস্তুত ছিল। ভজনের দুই দাদা লাঠি আন শড়কি আন বলে হাঁকাহাঁকি করতে লাগল, কিন্তু কে যে আনবে কেউ কোনো দিশা পেল না। ইতিমধ্যে বাড়ির মেয়েরা হাউ মাউ করে মরাকান্না জুড়ে দিয়েছিল। তখন সেই অতি ভয়ংকর আর সুন্দর সাপটা যেন বিরক্ত হয়েই ভজনের পায়ের পাতা ছেড়ে দিয়ে সর সর করে মসৃণ গতিতে এঁকেবেঁকে কাছাকাছি একটা ঝোপের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। ততক্ষণে ভজনের মুখ থেকে গ্যাঁজলা ভাঙা সুরু হয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভজনের শরীরে মৃত্যুর চিহ্নগুলো খুব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠল। এর মধ্যেই সারা তিলতুলসী গ্রামে খবর চাউড় হয়ে গিয়েছিল। ফলে সনাতন ঘোড়ুইএর উঠানে থই থই করছে মানুষ। বৃন্দাবন আর পবন মেয়েদের শাড়ির পাড়গুলো ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে ভজনের বাঁ পায়ের গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ফেরতার পর ফেরতা বাঁধন দিয়েছিল খুব কষে, জনকয়েক চলে গেছে দুখানা গ্রাম পরে যে বাজুবন্ধ গ্রাম, সেখান থেকে সাপের বিষ ঝাড়াতে ওস্তাদ নামকরা অঘোর গুণীনকে ডেকে আনতে। কিন্তু সবাই জানে অঘোর গুণীন আসা পর্যন্ত টিঁকবে না ভজন। এর মধ্যেই দাওয়ায় শোয়ান ভজনকে দেখাচ্ছে যেন এইমাত্র একটা নীলকালির পুকুরে ডুব দিয়ে উঠে এল সে। কপাল থেকে পায়ের বুড়ো আঙুল পর্যন্ত ঘন নীল হয়ে গেছে শরীরটা, ঠোঁটে আর গালে ফেকো শুকিয়ে উঠেছে, দুই চোখ ওল্টানো। ভজনের মা মোক্ষদা ডাক ছেড়ে কাঁদছে, বউ বাসনালতা ফিট হয়ে গিয়েছিল প্রথমেই—এখনও জ্ঞান ফেরে নি—কারা যেন ওর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফেরানর চেষ্টা করছে, জলের স্রোতে ভাসছে তার আলুথালু চুল। দুই দাদা ঘন ঘন চোখ মুছছে কোঁচার খুঁটে। উপস্থিত কেউই চোখের জল চেপে রাখতে পারছে না। আজকের সকালটা কি মারাত্মক হয়েই না দেখা দিল ঘোড়ুই পরিবারে। অমন জলজ্যান্ত জোয়ান মদ্দ মানুষটা দেখ দেখ করে কাঠ হয়ে গেল।

অঘোর গুণীন যখন এসে পৌঁছল তখন দিনের প্রথম রোদের ছোঁয়ায় মাঠঘাট সোনালী। সে এসেছে গরুর গাড়িতে যারা ডাকতে গিয়েছিল তাদেরই সঙ্গে। অঘোর গুণীন

গরুর গাড়ি থেকে নেমে সরাসরি অকুস্থলে এসে হাজির হল। তার গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, চেহারাটা দড়ির মত পাকান আর লম্বা, একরাশ কালোজিরের মত চুলের ঢল উঁচু করে ফোলান ফাঁপান, নিয়ম মতই সে গাঁজায় দম দিয়ে বেরিয়েছে এই সাত-সকালেই—যতটা না নেশার তাগিদে তার চেয়ে বেশী আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। ফলে অঘোর গুণীনের ভাঁটার মত গোল চোখ দুটো টকটকে লাল। তাকে দেখলে তার ক্ষমতার ওপর একটা ভয় মেশান আস্থা জন্মে।

অঘোর গুণীন দাওয়ায় শোয়ান ভজনের কাছে এসে দুটো লাল টকটকে চোখ পাকিয়ে তাকাল তার দিকে, তারপর কোমর ভাঁজ করে ঝুঁকে পড়ে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখল। অবশেষে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে মুখ বিকৃত করে বলল, 'বড় জবর লাগে কেটেছে গো। সাক্ষাৎ মাতা বিষহরির আপনকার কণ্ঠের অলঙ্কার—সেই কালনাগিনী বিষ ঢেলেছে। সে বিষের কাটান দেয় এমন গুণীন কোথা—'

ভজনের বুড়ি মা মোক্ষদা সমানে চিল চিৎকার করে মড়াকান্না কেঁদেছে এতক্ষণ। কেঁদে কেঁদে হেদিয়ে গিয়ে সদ্য সে একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। এখন সে হঠাৎ আবার একটা বুকফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠে পাগলের মত ছুটে এসে অঘোর গুণীনের দু পা একসঙ্গে জড়িয়ে ধরল, 'দে বাবা দে। আমার ব্যাটার পরানডা ফিরায়ে দে—'

তাড়াতাড়ি পা ছাড়িয়ে নিতে নিতে অঘোর গুণীন বলল, 'দাঁড়াও মা জননী। নেড়ে চেড়ে বিষের রকম ডে এট্টু দেখে নি—'

সে উবু হয়ে ভজনের পাশে বসল। ভজনের অসাড় হাত পা ভাঁজ করল খুলল, এর মধ্যেই শক্ত হয়ে উঠেছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। চোখের পাতা টেনে খুলে দেখল, মণি দুটো মার্বেল গুলির মত কঠিন নিশ্চল। এক গোছা চুল ধরে সামান্য টানতেই গোছাশুদ্ধ উপড়ে এল হাতের মধ্যে। মুখ ভিরকুটি করে অঘোর গুণীন বলল, মাতা বিষহরির আপনকার হাতে ঢেলে দেয়া বিষ তালুতে গিয়ে ঠেকেছেন। আমার তেমন ক্ষ্যামতা নেই গো মাতা বিষহরির আপনকার অভিলাষ খণ্ডন করি—'

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল অঘোর গুণীন, চারপাশে তাকাল ভাঁটার মত চোখ ঘুরিয়ে, তারপর গরুর গাড়ির দিকে পা বাড়াল।

ভজনের বড় ভাই পদ্ম ছুটে এসে পথ-রোধ করে দাঁড়াল, 'তাহলে কোনো আশাই নাই গুণীন!'

'আশার কথা কি গো কত্তা—' অঘোর গুণীন ওর মধ্যেই ফুলফেঁটে দাঁত বার করে হাসল, 'মাতা বিষহরি আপনকার অঙ্গকে যারে টেনে নেন তারে কুবার কার বাপের সাধ্যি—'

অঘোর গুণীন জবাব দিয়ে চলে যেতেই আবার রোল উঠল কান্নার। এবারে শুধু বাড়ির লোকেরাই নয়। কাঁদলো আরো অনেকে। প্রতিবেশীরা, ভজনের বন্ধু-বান্ধব—অনেকেরই চোখের জল আর বাগ মানল না। হাউমাউ করে কাঁদতে সুরু করল অনেকে. আর যেহেতু কান্না অতি ছোঁয়াচে রোগ, কারো চোখই আর শুকনো রইল না। ওরই মধ্যে মুখে মুখে ভজনের প্রশংসা—কত ভাল ছেলে ছিল ভজন, কেমন মান্য করত বয়স্ক-দের, কত উদার ছিল তার মন। ভাল মানুষদের ভগবান বেশীদিন থাকতে দেয় না পৃথিবীতে, টেনে নেয় নিজের কাছে।

সাপে কাটা মড়া পোড়াতে নেই। নদীতে ভাসিয়ে দিতে হয় কলার মান্দাসায় করে। উদ্দেশ্য—যদি তেমন ওস্তাদ গুণীনের হাতে পড়ে হয়ত মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হতে পারে। আসলে সাপে কাটা রোগী নাকি প্রকৃতপক্ষে মরে না, দেহযন্ত্রের কলকব্জাগুলো বন্ধ হয়ে যায় মাত্র। বিষের ক্রিয়া কাটিয়ে দিতে পারলেই আবার চালু হয়ে যায় সব। এছাড়া লক্ষ্মীন্দর বেহুলার উপাখ্যানও এব্যাপারে একটা নজীর হয়ে আছে। সুতরাং ভজনের দাদারা এবং বন্ধু-বান্ধব চোখ মুছতে মুছতেই কলার মান্দাসা তৈরীর কাজে হাত দিল। জনা দুই বাগান থেকে কেটে এনে গোটা কয়েক কলাগাছের ধড় ফেলল উঠোনে। থিতিয়ে পড়া কান্নার রোল আবার প্রবল হয়ে উঠল। লোচুইদের উঠোনে এখন অনেক মানুষ। ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ী—পুরো তিলতুলসী গ্রামখানাই যেন এসে জড়ো হয়েছে সেখানে। কারো বাড়িতে আজ হাঁড়ি চড়ে নি, বাসি চুলোর গোবরের পোঁছ পড়ে নি দাওয়া নিকোনো হয় নি। ঘরে ঘরে আজ অরন্ধনের পালা। শোকের কালোছায়া।

ঠিক এই সময় একজন সন্ন্যাসীকে লোচুই বাড়ির উঠোনে দেখা গেল—

হঠাৎ আমাদের ভেতর থেকে রাজীব অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করল, 'দূর। শুনতে চাইলাম গ্রামের মানুষের অভাব অনটন দুঃখ কষ্টের কথা, আর হিতেন কিনা ফেঁদে বসল কি এক সাপে কাটার কেচ্ছা—'

যদিও হিতেনের বর্ণনার গুণে শুনতে খারাপ লাগছিল না, বস্তুতঃ গ্রামবাংলার একখানা জীবন্ত চিত্রই যেন ফুটে উঠছিল চোখের সামনে, তবু ভেতরে ভেতরে হিতেনের গল্পের অপ্রাসঙ্গিকতা আমাদের প্রত্যেককেই পীড়া দিচ্ছিল। ধান ভানার কথা বলতে গিয়ে হিতেন এ কি শিবের গাজন গাইতে সুরু করল। এখন রাজীবের এই অসহিষ্ণুতার সমর্থনে আমাদের মধ্যে অনেকেই বলে উঠল, 'ঠিক ঠিক। গ্রামের মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা বলবি বলে তুই এ কি এক সাপখোপের গল্প সুরু করলি হিতেন। আর যদি বলিস সাপ বাঘ বা কুমীরের মুখে প্রাণ দেওয়াটাও একরকমের দুঃখ, তাহলে বলব সে ত বরাবরের দুঃখ, সকলেরই জানা, তোর মুখ থেকে আর নতুন কি শুনছি—'

যতক্ষণ আমরা কথা বললাম হিতেন চুপ করে সব শুনল আর জনে জনে আমাদের মুখের দিকে তাকাল। ওর দুই ঠোঁটে সেই পুরোনো হাসিটাই আবার ফিরে এসেছে—মৃদু স্মিত সহিষ্ণু অথচ কোথায় যেন একটু ব্যঙ্গের মিশেল। আমাদের বলা শেষ হলে সে আস্তে আর সংক্ষেপে বলল, 'সবটা শোন, তারপর যা বলার আছে বলিস।'

অপারক ভঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাজীব বলল, 'বেশ। তবে বল।' হিতেন আবার সুরু করল।

কখন যে সেই সন্ন্যাসী ঘোড়ুই বাড়ির উঠোনে এসে ঢুকেছে লক্ষ্য করে নি কেউ। আসলে সেখানে এখন মেলার মত ভিড়, আশপাশ গাঁ থেকেও এসে জুটেছে কিছু মানুষজন, তার ওপর এই রকম একটা শোকাবহ দুর্ঘটনা—কে আর কাকে লক্ষ্য করে। সন্ন্যাসীর চেহারাটা বেশ মানানসই। অনেকটা লম্বা, ধুলো ময়লা সত্ত্বেও গায়ের রঙ টকটকে ফর্সা, টানা টানা চোখের দৃষ্টি যেন কাছের সব কিছু ছাড়িয়ে চলে গেছে কোথায় দূরে, খাড়া নাক, পরনে গেরুয়া, মাথায় জটাজুট, কাঁধে ঝোলা। আর সকলের থেকে মাথায় অনেকটা উঁচু সন্ন্যাসী দু'একজনকে প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে এখানে? ভিড় কিসের? কাঁদছে কেন সকলে?'

কেউ কেউ জবাব দিয়েছে, 'সর্প দংশন গো ঠাকুর, সর্প দংশন। অঘোর গুণীন জবাব দে গেছে। বাঁচার আশা নাই—'

শুনে সন্ন্যাসী অস্থিরভাবে ভিড় ঠেলে এসে পৌঁছেছে দাওয়ার কাছে যেখানে তখনও ভজনের নিষ্প্রাণ দেহ শোয়ান, 'আমাকে একটু দেখতে দাও—'

ততক্ষণে সকলেরই নজর কেড়ে নিয়েছে সন্ন্যাসী। সকলেই সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিয়েছে তাকে। সন্ন্যাসী ভজনের কাছে এসে খুব নজর করে দেখল তাকে অনেকক্ষণ, তারপর চারপাশে তাকিয়ে বলল, 'এর অভিভাবক কে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই।'

ভজনের দুই দাদা পবন আর বৃন্দাবন হাত জোড় করে সামনে এগিয়ে এল।

সন্ন্যাসী বলল, 'আমি এর চিকিৎসা করব। আমার কাছে সাপে কাটার ওষুধ আছে। একটু কাটা ছেঁড়া করতে হবে। আপত্তি নেই ত আপনাদের?'

বৃন্দাবন জোড় হাতেই বলল, 'আপনার যেমন খুশী করেন ঠাকুর, শুধু আমার ভায়ের পরানডা ফিরায়ে এনে দেন—'

স্মিত মধুর হাসল সন্ন্যাসী, 'প্রাণ ফেরা না ফেরা তাঁর ইচ্ছে আমি শুধু আমার কাজ করে যাব।'

সন্ন্যাসী আসন পিঁড়ি হয়ে বসল দাওয়ায় ভজনের পাশে। কাছেই নামিয়ে রাখল ঝোলা। ঝোলার ভেতর থেকে অনেক কিছু বার করল। হামানদিস্তে অজানা কোনো গাছের মোটা শিকড় খানিকটা, একখানা ঝিনুক, ধারাল ঝকঝকে ছুরি। ছুরি দিয়ে শিকড়ের বেশ খানিকটা কেটে নিয়ে হামান-দিস্তের মধ্যে ফেলে থেঁতো করল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। তারপর সেই থেঁতো করা শিকড় থেকে রসটুকু নিংড়ে নিল ঝিনুকে। এইসব হয়ে গেলে শুরু হল অপারেশন। ছুরি দিয়ে বেশ খানিকটা চিরল শরীরের কয়েকটা জায়গা। দু'পায়ে দুই ডিমে, উরুতে, হাতের আঙুলের ডগাগুলো, কুচকির কাছে। তারপর একটা ড্রপার দিয়ে ঝিনুকের সেই রস ফোঁটা ফোঁটা চালান করে দিল শরীরের মধ্যে ঐ সব চেরা জায়গাগুলো দিয়ে। খানিকটা থ্যাতলান শিকড় হাঁ করিয়ে জিভে ঘষে দেওয়া হল ভজনের। মন্ত্র নয় তন্ত্র নয়, কোনো অলৌকিক ক্ষমতার ভান নয়—সন্ন্যাসী একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার ও সার্জনের মত পরপর সব কাজগুলো করে গেল।

এরপর শুরু হল অপেক্ষা। ইতিমধ্যেই খবর চাউড় হয়ে গিয়েছিল স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে এক দেবদূত সন্ন্যাসীর বেশে ভজনকে পুনর্জীবন দিতে। মুখ থেকে মুখে পল্লবিত হয়ে হয়ে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল। হাঁটলে নাকি মাটিতে ছায়া পড়ে না সন্ন্যাসীর, হঠাৎ দেখলে আগুনের শিখা বলে ভ্রম হয়, প্রতি প্রশ্বাসে তার মৃগনাভির সুগন্ধ। কে নাকি সন্ন্যাসীর জটা থেকে খসে যাওয়া এক গাছা চুল কুড়িয়ে পেয়েছে, চুলে দেখে সোনার তার। মুখে মুখেই একটা কিংবদন্তীর সৃষ্টি হতে চলেছে। এখন আশেপাশের সব গ্রাম থেকেও মানুষ স্রোতের মত চলে আসছে তিলতুলসী গ্রামের ঘোড়ুই বাড়ির উঠোনে। উদ্দেশ্য, কোনোভাবে ঐ অলৌকিক সন্ন্যাসীর কৃপাভাজন হওয়া। নানা জনের নানা রকম প্রার্থনা। কোনো বন্ধ্যা নারী চায় সন্তান হওয়ার ওষুধ, কোনো পুরুষের কামনা বিরূপা রমণীকে বশ করার মন্ত্র। ওর মধ্যেই লাঠি হাতে ঝুঁকে ঝুঁকে চলেছে কোমর ভাঙা এক বুড়ি, ক্ষীরো নাপতেনী। তোমার আবার কি চাই গো ঠাকমা—এ প্রশ্নের উত্তরে খরখরে ঝগড়াটে গলায় সে বলল, 'আতি যাচ্ছি ভগমানের খোঁজে। খোঁজ পেলে একবার সে বেটাকে শুধিয়ে দেখব তার আক্কেলটা কি। তারপর মুয়ে মারব মুড়ো ঝ্যাটার বাড়ি পাঁচ কুড়ি পাঁচবার—'

ঘোড়ুই বাড়ির উঠোনে অত মানুষের ভিড়, কিন্তু কোনো গোলমাল নেই। সন্ন্যাসী ঠোঁটের ওপর তর্জনী রেখে সবাইকে নির্দেশ দিয়েছে চুপ করে থাকতে, আর সব মানুষ যেন মন্ত্রমুগ্ধভাবে নিথর নিস্পন্দ হয়ে আছে। দাওয়ায় শোয়ান রয়েছে প্রাণহীন ভজনের কালিবর্ণ দেহ, পাশে আসন পিঁড়ি ভাবে টান টান হয়ে বসে আছে সন্যাসী—আগুনের মত তার গায়ের রঙ। সন্ন্যাসীর চোখের একাগ্র দৃষ্টি ভজনের মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে, একটু দূরেই উবু হয়ে জোড় করে গরুড় পক্ষীর ভঙ্গীতে বসে আছে ভজনের দুই দাদা পবন আর বৃন্দাবন, আরো খানিকটা দূরে থেকে ঘের দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের দঙ্গল। সকলের চোখেই উৎকণ্ঠা কৌতূহল। সত্যিই কি ভজন বাঁচবে? সত্যিই কি পারবে সন্ন্যাসী মৃত-দেহে প্রাণসঞ্চারের মত অসাধ্য সাধন করতে? সত্যিই কি সন্ন্যাসী স্বর্গ থেকে নেমে আসা এক ছদ্মবেশী দেবদূত? না আর এক ভণ্ড জুয়াচোর বুজরুক—

প্রায় ঘন্টাখানেক অপেক্ষার পর প্রথম শুভ লক্ষণ দেখা গেল। ভজনের শরীরের সেই ঘোর কালিমা যেন ফিকে হয়ে এল একটু, তার নিস্তব্ধ বুকে দেখা দিল ক্ষীণ স্পন্দন। অতি ক্ষীণ, বোঝা যায় না প্রায়, তবু কারো কারো চোখে পড়ল, আর ফিসফিস কানাকানি করে সেই কথা ছড়িয়ে পড়ল সকলের মধ্যেই। কেউ বিশ্বাস করল কেউ করল না, তবু রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল সবাই। মনে মনে সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস এতদিনে চোখের সামনে একটা অতিপ্রাকৃত ঘটনা দেখা যাবে, দেখা যাবে এমন কিছু যা সচরাচর ঘটে না, যে ঘটনা সাধারণ মানুষের

আয়ত্তের বাইরে, দৈব ঘটনায় যত যা অস্বাভাবিক অসাধারণ অভিনব—

প্রথম প্রাণের স্পন্দন দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ন্যাসী নিজের হাতের মধ্যে ভজনের শিথিল কবজিটা তুলে নিয়েছিল, তার চোখ মুখ যেন চকচক করে উঠেছিল আসন্ন সাফল্যের আনন্দ আর উত্তেজনায়। নিজের হাতের মধ্যে ভজনের হাতখানা ধরে ঠায় বসে রইল সে। তবে এতক্ষণের বসে থাকা আর এখনকার বসে থাকার মধ্যে তফাৎ আছে। এতক্ষণ সে বসেছিল পাষাণের মত, নিশ্চল, যেন ধৈর্য সহিষ্ণুতা আর তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি, তার মুখে কোনো ভাবের বিকাশ ছিল না, নির্বিকার নিরাসক্ত নিরুত্তাপ। আর এখন সে তাকিয়ে আছে নিমীলিত নয়ন ভজনের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে, চোখ দুটো জ্বলছে দু' টুকরো অঙ্গারের মত, হাতের মধ্যে ধরা ভজনের কবজিতে সে শুনতে পাচ্ছে ফিরে আসা প্রাণের অস্ফুট পায়ের শব্দে। বিপুল উত্তেজনায় একটু সামনে ঝুঁকে পড়েছে সন্ন্যাসী, তার হাবভাবে ফুটে উঠেছে তীর পরান ধনুকের টান টান ভঙ্গী। এখন দৃষ্টিগোচরভাবেই ভজনের সর্বাঙ্গের সেই কালিমা অনেকটা কেটে গেছে, বাকিটাও কেটে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি—প্রবল ঝড়ে আকাশ থেকে যেমন উড়ে যায় কালো মেঘ। চোখ মুখ অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, এবং তাকিয়ে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ভজনের বুক নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ধীরে ধীরে উঠছে নামছে উঠছে নামছে, উঠছে—

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভজন প্রথম চোখ খুলল। অস্ফুটে উচ্চারণ করল, 'মা'—

জঙ্গলের আগুনের মত কথাটা ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। চোখ মেলেছে। ভজন। কথা বলেছে। মরামানুষ প্রাণ ফিরে পেয়েছে তিলতুলসী গ্রামে। সাক্ষাৎ ভগবান নীচে নেমে এসে নিজের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে ভজনের প্রাণ। স্রোতের মত লোক ছুটল আশেপাশের গাঁ থেকে তিলতুলসী গ্রামের উদ্দেশ্য। ঘোড়ুই বাড়ির উঠোনে জড়ো হওয়া মানুষগুলো অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠল সন্ন্যাসীর চরম স্পর্শ করার আকাঙ্ক্ষায়, আপন আপন দুঃখ কষ্টের কথা বলে নিদান নেয়ার জন্য। তাদের বুঝি ঠেকিয়ে রাখা যায় না আর।

শান্তভাবে সন্ন্যাসী বলল, 'এবারে একে ঘরের ভেতরে নিয়ে চল।'

ভজনের দুই দাদা আর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব মিলে ধরাধরি করে ভজনকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। পেছন পেছন গেল সন্ন্যাসীও। নিজের হাতে ঘরের দরজা বন্ধ করে লাগিয়ে দিল আগল। বিছানায় ভজনকে শোয়ান হলে সন্ন্যাসী অল্প গলা খাঁকারি দিয়ে এই প্রথম একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলল, 'দেখ বাপু, তোমাদের একটা ভুল ধারণা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছি। তোমরা সকলেই ভাবছ আমি বুঝি কোনো মন্ত্র তন্ত্রের জোরে সাপে কাটা মড়াকে বাঁচিয়ে তুলেছি। সত্যি কথা শোন—মন্ত্রতন্ত্র বলে কিছু নেই। সব বুজরুকি আর ধাপ্পা। ওকে বাঁচিয়েছে দ্রব্যগুণ। আমার ঝোলায় যে শিকড় ছিল, যার রস ওর শরীরে ঢুকিয়ে দিয়েছি, তাই ওকে ফিরিয়ে এনেছে যমের মুখ থেকে।' একটু থামল সন্ন্যাসী, তারপর ভরাট গম্ভীর গলায় বলল, 'তবে এ ওষুধের কার্যকারিতা বড় জোর ঘণ্টা চার পাঁচ। চার পাঁচ ঘন্টা পরে আবার ও আস্তে আস্তে ঢলে পড়বে। তার আগেই ওকে বড় জাম বাটির তিন চার বাটি পান্তাভাত কচলানো জল খেতে দেবে। তাহলে আর ভয় নেই। ঐ পান্তাভাতের জলই ওর শরীরের বাকি বিষটুকু ধুয়ে বার করে নিয়ে আসবে বাইরে। বুঝেছ। জল দেয়া ভাত হলে চলবে না। সত্যিকারের বাসি পান্তা ভাত হওয়া চাই।

উপস্থিত সকলেই ঘন ঘন ঘাড় নাড়ল। ভজন এতক্ষণে পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। সে সঠিক বুঝতে পারছে না কিছু, শুধু জুল জুল করে তাকিয়ে আছে সন্ন্যাসীর দিকে। সন্ন্যাসী বলল 'এবারে আমি যাব। কিন্তু সোজা পথে ত যাওয়া যাবে না। লুকিয়ে পালাবার ব্যবস্থা করে দাও—'

ভজনের দুই দাদা চতুর হাসি হাসল। নিজেদের মধ্যে ফিসফাস পরামর্শ করে সন্ন্যাসীকে বলল, 'এ'জ্ঞে একটু অপেক্ষা করেন আপুনি; পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবেন।'

ভজনের দুই বন্ধু পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে। তারপর সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো নেয়ার ধুম লেগে গেল। সবাই নীচু হয়ে বার বার চরণ স্পর্শ করতে লাগল সন্ন্যাসীর। তখনও ভজনের উঠে বসার মত ক্ষমতা হয়নি। তা সত্ত্বেও বৃন্দাবন সন্ন্যাসীকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল তার বিছানার পাশে। ভজন অক্ষম দুর্বল হাত বাড়িয়ে কোনো রকমে সন্ন্যাসীর পা ছুঁয়ে সেই হাত নিজের কপালে ঠেকাল।

মিনিট দশেক পরে সন্ন্যাসী সকলের সঙ্গে পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ছাঁচতলায় ছই-দেয়া পর্দা লাগান গরুর গাড়ি অপেক্ষা করছিল। এদিকে সব চুপচাপ নিথর। নিঃসাড়ে সন্ন্যাসী গাড়ির ছই-এর মধ্যে ঢুকে গেলে পর্দা ফেলে দেয়া হল। ভজনের এক বন্ধু গাড়োয়ান। জিভ আর টাগরায় আলতোভাবে শব্দ তুলে আর দুটো গরুর পেটে হালকা লাথি মেরে মেরে সে খিড়কির দোর পেরিয়ে গাড়ি এনে ফেলল বাইরের খোলা মাঠের রোদ্দুরে। তারপর ছোটাল দুদ্দাড়।

হিতেন থামতেই রাজীব চটাস চটাস শব্দে হাততালি দিয়ে উঠল, 'বাঃ ভাই বাঃ! দারুন রূপকথা শোনালি একখানা।'

আমরা কেউ সরবে কেউ নীরবে সমর্থনসূচক হাসি হাসলাম।

স্মিত হাসি হেসে হিতেন বলল, 'গল্পটা তোদের রূপকথা বলে মনে হচ্ছে?'

'রূপকথা নয়! সাপে-কাটা মড়া সন্ন্যাসীর কৃপায় পুনর্জীবন পেয়ে আবার সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল। এর চেয়ে ভাল রূপকথা আর কি হয় আধুনিক কালে?'

একটু চুপ করে রইল হিতেন। চকিতে যেন একখানা চলন্ত মেঘের ছায়া পড়ল তার সদা হাসি-খুশী মুখখানার উপর, যেন একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে হিতেন বলল, 'ভজন কিন্তু বাঁচেনি—'

হঠাৎ যেন একটা নিঃশব্দ বিস্ফোরণ ঘটে গেল ঘরের মধ্যে আমরা সব চুপ। বেলুনের মত ফেঁপে ওঠা হালকা মেজাজ আমাদের যেন আলপিনের খোঁচা খেয়ে চুপসে গেল। কে যেন বলল অস্ফুটে, 'বাঁচেনি? সেকি? কেন?—'

হিতেন বলল, 'বাঁচবে কি করে। পান্তা ভাত পাওয়া গেল না যে।'

আবার আমরা চুপচাপ। সবশেষে সমীর অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠল, 'দূর! তা হয় নাকি কখনও। গাঁ-দেশে বলে প্রত্যেক বাড়িতেই পান্তা ভাত থাকে—'

এক নজর সমীরকে দেখল হিতেন। একটু ম্লান হাসল 'সন্ন্যাসীরও সেই রকম ধারণা ছিল। তাই অতি সহজে বিধান দিয়েছিল পান্তা ভাত-কচলান জল খাওয়ার। কিন্তু রাতের উদ্বৃত্ত ভাতে জল ঢেলে দিলেই ত তবে সকালে পাওয়া যায় পান্তা ভাত। তিল তুলসী আর আশেপাশের দশ-বিশখানা গ্রামের প্রায় সব মানুষই ভাতের মুখ দেখেনি গত দেড়-দু' মাসের মধ্যে। পান্তা করার মত বাড়তি ভাতের ত প্রশ্নই ওঠে না কোনো—'

চকিতে হিতেনের গল্পের সমগ্র তাৎপর্যটা আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। এক দীনা-হীনা রমণী পরিধানে ছিন্নবাস রুক্ষ কেশপাশ জটাজর্জর নয়নে শোকাশ্রু ওষ্ঠে বিলাপ—কোলে তার সর্পদষ্ট শিশুসন্তান আততায়ীর বিষের প্রকোপে প্রগাঢ় নীল। বন্দ আমার জননী আমার—।

এই বাংলার খবর

টিকিট নিয়ে খেলা

ক্রিকেট টেস্ট খেলার টিকিট নিয়ে খেলা কলকাতায় প্রতিবারই জমে, দেশের অন্যান্য প্রান্তেও জমে। তবে এ-বছর কলকাতায় যেমন জমেছে তেমন আর কোথাও বা কখনও জমে নি বলে অনেকেই মনে করছেন। ইডেনের সীমিতসংখ্যক আসনের টিকিট সকলের হাতে পৌঁছতে পারে না, তাই হাহাকার প্রতিবারই দেখা দেয়। কিন্তু এবার ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের টিকিট বণ্টনের ব্যাপারটা একটা কেলেঙ্কারির পর্যায়ে পৌঁচেছে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রথম অভিযোগ, টিকিটের বণ্টন ঠিক মতো হয় নি। ক্লাবগুলো তাদের 'কোটা' অনুযায়ী টিকিট পায় নি, বিধানসভার সদস্য বা মন্ত্রীরাও সকলে হিসেব অনুযায়ী টিকিট পান নি। দ্বিতীয় অভিযোগ জালিয়াতির। দৈনিক টিকিট বিক্রি কয়েক বছর যাবৎ বন্ধ। তাই রাজ্য সরকার সাধারণ দর্শকদের জন্যে লটারি করে কিছু টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা করেন। সেই উদ্দেশ্যে প্রথমে রাজ্য জুড়ে বিক্রি করা হয় কুপন। অভিযোগ উঠেছে, সেই কুপন অনেক জায়গায় জাল হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটি কুপনে দেখা গেছে একই নম্বর। তার ওপর লটারি-বিজয়ী শ' পাঁচেক লোক প্রথমে টিকিট পান নি। অভিযোগ, লটারি-বিজয়ীদের মধ্যে অন্তত শ' পাঁচেক লোক টিকিট নিতে আসবেন না, এই আশায় কুশলী কর্মকর্তারা এই টিকিট সরিয়ে ফেলেন। পরে অবশ্য তাঁদের জন্যে বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করা হয়।

জালিয়াতির অভিযোগ টিকিট নিয়েও। খেলা শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকেই জাল টিকিট ধরা পড়তে শুরু করে। প্রথম তিন দিনে মোট চারশ'রও বেশি জাল টিকিট ধরা পড়ে। যারা এইভাবে জাল টিকিট নিয়ে মাঠে ঢুকেছিল তাদের সকলকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তা ছাড়া মাঠের আশপাশে কালোবাজারে টিকিট বিক্রির অভিযোগেও গ্রেপ্তার হয়েছে কিছু লোক। কলকাতা পুলিশের ধারণা, টিকিট নিয়ে এই জালিয়াতির সঙ্গে একাধিক গোষ্ঠী জড়িয়ে আছে। জাল টিকিট এবং জাল কুপন নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। টিকিট বণ্টনের গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে খোঁজখবর করার জন্যেও রাজ্য সরকার স্বরাষ্ট্র সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন। টিকিট বিলি সম্পর্কে নানা অভিযোগ কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো বা সি বি আইয়ের কাছেও পৌঁচেছে বলে প্রকাশ। তারাও এ-বিষয়ে খোঁজখবর করছে।

ধান ভানা কল

চলতি বছর ধান-চাল সংগ্রহের অভিযান সফল করতে রাজ্য সরকার যে নতুন পথ ধরার চেষ্টা করেছিলেন সেটা আপাতত রুদ্ধ হয়ে গেছে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে। ঠিক হয়েছিল ধান ভানা কলগুলোর ওপর লেভি বসিয়ে দেড় লাখ টনের মতো চাল সংগ্রহ করা হবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে চাল কল আইন সংশোধন করে প্রথমে অর্ডিন্যান্স জারি করা হয় এবং পরে বিধানসভায় বিল পাস করিয়ে ওটি যথারীতি আইনেও পরিণত করা হয়। আদালত প্রথমে নির্দেশ দেন নতুন আইন প্রয়োগ স্থগিত রাখতে এবং শেষ পর্যন্ত তা অবৈধ বলে ঘোষণা করেন।

হাইকোর্টের এই রায় রাজ্য সরকারকে ফেলেছে এক সঙ্কটে। ধান-চাল সংগ্রহের অভিযান এমনিতেই যথেষ্ট জোরদার নয়, তার ওপর সংগ্রহ-নীতির একটা খুঁটি এইভাবে ধসে পড়েছে। খাদ্য-মন্ত্রী অবশ্য বলেছেন যে, তাঁরা এর ফলে খুব একটা উদ্বিগ্ন নন। বিভিন্ন চাল কল আর চাষীরা যদি ঠিকমতো লেভি দেন তবে সংগ্রহের লক্ষ্য (পাঁচ লাখ টন) পূরণ করতে বিশেষ অসুবিধে হবে না। কিন্তু তা হলেও ধান ভানা কলগুলো নিয়ে কী করা যায় সে বিষয়ে সরকার ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে দেন নি। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও পরামর্শ করা হচ্ছে। অর্ডিন্যান্স জারির আগেও কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি নেওয়া হয়েছিল।

প্রথমে শোনা গিয়েছিল, রাজ্য সরকার গোটা রাজ্যের সব ধান ভানা কল নিজের হাতে নিয়ে নেবেন। এই প্রস্তাব নিয়ে সলা-পরামর্শ চলছে, কিন্তু কোনো পাকা সিদ্ধান্ত হয় নি। ইতিমধ্যে ধান ভানা কল সম্পর্কে রাজ্য সরকার কঠোর মনোভাব গ্রহণ করবেন বলে স্থির করেছেন। যে-সব ধান ভানা কলের লাইসেন্স নেই সেগুলো আটক করে 'সীল' করে দেওয়া হবে। আর কোনো নতুন ধান ভানা কলকে লাইসেন্সও দেওয়া হবে না। তা ছাড়া রাজ্য সরকার আরো ঠিক করেছেন, ধান ভানা কলগুলোকে বাজার থেকে ধান কিনতে দেওয়া হবে না। কারণ তারা যদি ধান কিনতে বাজারে নামে তবে ধানের দর চড়ে যাবে, ফলে সংগ্রহের কাজে অসুবিধে হবে।

রাজ্যের যোজনা

পশ্চিমবাংলা সরকারের ইচ্ছে, ১৯৭৫-৭৬ সালে অর্থাৎ পঞ্চম যোজনার দ্বিতীয় বছরে যোজনার জন্যে বরাদ্দ আগের বছরের তুলনায় কিছুটা বাড়ানো হোক। এই রাজ্যের সামনে নানা সমস্যা, তাই উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্যে আরো বেশি অর্থলগ্নী করা খুবই জরুরি। চতুর্থ যোজনার শেষ বছরে এই খাতে লগ্নীর পরিমাণ ছিল ৯০ কোটি টাকা। পঞ্চম যোজনার প্রথম বছরে ঐ অঙ্ক বাড়িয়ে করা হয় ১৫০ কোটি টাকা। রাজ্য সরকার অবশ্য চেয়েছিলেন পঞ্চম যোজনায় আরো বেশি টাকা লগ্নী করতে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সায় মেলে নি। তাই পাঁচ বছরে মোট ৭৫০ কোটি টাকা লগ্নীর প্রস্তাব নিয়েই রাজ্য সরকারকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এই হিসেব অনুপাতেই প্রথম বছরের জন্যে বরাদ্দ হয় ১৫০ কোটি টাকা।

কিন্তু আগামী আর্থিক বছরে এই বরাদ্দ বাড়বে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। যদি বরাদ্দ বাড়াতে হয় তবে দিল্লীর কাছ থেকে যোজনা খাতে আরো বেশি সাহায্য পাওয়া দরকার। কিন্তু যোজনা কমিশন প্রথম বছরের তুলনায় সাহায্যের পরিমাণ বাড়াতে তেমন উৎসাহী নন। এ-ব্যাপারে দিল্লীর কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের কথাবার্তা চলছে। কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ যদি না-বাড়ে তবে যোজনার আকার বাড়াতে গেলে রাজ্য সরকারকে নিজস্ব সূত্রে আরো টাকাকড়ি জোগাড় করতে হবে। গত ক' বছরে কর আদায়ের ব্যবস্থার উন্নতি করে আর নতুন কর বসিয়ে সরকার বেশ কিছু আয় বাড়িয়েছেন। ১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেটে নতুন কর বসানো হয় ২৪ কোটি টাকার মতো। বিক্রয়কর বাবদ বাড়তি আদায় হয় ১৩ কোটি টাকা। স্বল্প সঞ্চয় বাবদ আয়ও বেশ বেড়েছে। এর পর রাজ্য সরকারের পক্ষে নিজস্ব সূত্রে আরো বেশি

টাকা সংগ্রহ করা হবে সহজ নয়। তাই রাজ্য যোজনার আবার বাড়বে কিনা তা নির্ভর করবে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণের ওপর।

১৯৭৪-৭৫ সালের যোজনায় রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান চাষবাসের ওপর। আগামী বছরেই যাতে পশ্চিমবাংলা খাদ্যের ব্যাপারে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে তার জন্যে রাজ্য সরকার সচেষ্ট। বছরে ৯৫ লাখ টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের একটা কর্মসূচী যোজনা কমিশনের কাছে পেশ করা হয়েছে। এই কর্মসূচী রূপায়ণে খরচ হবে সাড়ে ষোল কোটি টাকা।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি

বিদ্যুতের যোগান বাড়াতে না-পারলে যে বিদ্যুৎ সঙ্কটের কোনো সমাধান নেই, এই কথাটা রাজ্য সরকার ক্রমশ বুঝতে পারছেন বলে মনে হচ্ছে। বিদ্যুৎ রেশন ব্যবস্থায় এখন শীতকালে কাজ চলছে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝেই তা বানচাল হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। যেমন সেদিন ব্যাণ্ডেলে উৎপাদন কেন্দ্রে একটি ইউনিট বিকল হওয়ায় কলকাতায় আবার দিন কয়েক লোডশেডিংয়ের পালা চললো। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ব্যাণ্ডেল আর সাঁওতালডিহিতে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করছে। তা ছাড়া কোলাঘাটে তৈরি হচ্ছে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এইসব উদ্যোগের সংগে তাল রেখেই কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের লাইসেন্সের মেয়াদ ২০০০ সাল পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। এই মেয়াদ ১৯৮০ সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল।

সি ই এস সি যাতে নিজস্ব উৎপাদন বাড়িয়ে বৃহত্তর কলকাতার বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে পারে সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান এখন দৈনিক ২৫০ মেগাওয়াট মাত্র বিদ্যুৎ তৈরি করে। পঞ্চম যোজনার শেষে যাতে এই পরিমাণ ৬০০ মেগাওয়াট দাঁড়ায় তার জন্যে রাজ্য সরকার অনুমতি দেবেন। অবশ্য এই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে বিদেশ থেকে বয়লার আর টারবাইন আমদানি করতে হবে। সি ই এস সি'র উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রসঙ্গ পঞ্চম যোজনার হিসেবে ঠাঁই পায় নি। তাই এখন এজন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পৃথক-ভাবে অনুমতি নিতে হবে। সি ই এস সি এখন যে-সব বয়লার বা টারবাইনের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে তার অনেকগুলোই পুরোনো হয়ে গেছে। তাই নতুন যন্ত্রপাতি আমদানির জন্যে এই প্রতিষ্ঠান বেশ কিছুদিন ধরেই চেষ্টা করছিল। এখন লাইসেন্সের মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে সেই কাজ সহজ হবে, কারণ প্রয়োজনীয় টাকাকড়ি যোগাড় করা যাবে সহজে।

লঞ্চ ডুবি

চন্দননগরের কাছে গঙ্গায় লঞ্চডুবির ফলে অন্তত শ' দেড়েক লোক প্রাণ হারিয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। লঞ্চটির নাম '[illegible]'। ২৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ লঞ্চটি চন্দননগরের রানীঘাট থেকে ভদ্রেশ্বরের তেলিনীপাড়া যাত্রা করে। লঞ্চটির [illegible] যাত্রী ধরে। কিন্তু সেদিন অনেক বেশি প্রায় আড়াইশো জন যাত্রী উঠেছিলেন বলে অভিযোগ। এইসব যাত্রী ছাড়াও ছিলেন লঞ্চের চালক এবং অন্যান্য কর্মী। মাঝগঙ্গায় লঞ্চে জল ঢুকতে থাকে এবং তারপরেই ডুবে যায়। কিছু যাত্রী জলে ঝাঁপ দিয়ে পাড়ে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হন। তাঁদের অনেককে পরে উদ্ধার করে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় বেশি নন। অন্তত ১৫০ জন যাত্রী জলে ডুবে প্রাণ হারিয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার পর প্রথম রাতে দমকল বাহিনী আর পুলিশের সহযোগিতায় মোটা বিশ মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ফেরির ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঠিকাদারের লাইসেন্সও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। লঞ্চটিকে জল থেকে টেনে ডাঙায় তোলা হয়েছে।

৩০।১২।৭৪ —দেবদত্ত

পটভূমি

লোকসভার নির্বাচন আসন্ন

লোকসভার নির্বাচন আসছে। কয়েকটি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনও আসছে। সম্ভবত ১৯৭৫ সালের এপ্রিলেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভোটার তালিকা সংশোধন ও নির্বাচন কেন্দ্রের পুনর্বিন্যাসের কাজ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে শেষ করার জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সকল রাজ্যেই এসে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী ক্ষেত্রে ভোটারদের খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারীর মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। এর মধ্যে বাড়ী বাড়ী ঘুরে কে ভোটার আছেন এবং এবং ইতিমধ্যে কেউ নতুন ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করছেন কিনা বা কারও নাম বাদ পড়েছে কিনা তাও কর্মীরা দেখবেন এবং নতুন নাম তালিকাভুক্ত করবেন।

ভোটার তালিকা সংশোধনের দ্রুততা দেখে নিশ্চয়ই মনে হওয়া স্বাভাবিক নির্বাচন খুব কাছে। কিন্তু প্রতি দশ বছর অন্তর নতুন লোকগণনার ভিত্তিতে কেন্দ্রের সীমানার পুনর্বিন্যাস আসন সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির প্রশ্নের আইনানুগ ব্যবস্থা কি দ্রুত নেওয়া সম্ভব হবে? নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ মনে করছেন তাও ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সম্ভব হবে। জানুয়ারীর ১৫ তারিখের পর সীমানা পুনর্নির্ণয়ক কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গে আসছেন। শুনছি, পশ্চিমবঙ্গের লোকসভায় আসন সংখ্যা বাড়ছে—৪০ থেকে ৪২ হবে এবং বিধানসভার আসন ১২ বা ১৪টি বাড়বে। অর্থাৎ ২৮০ থেকে মোট আসন ২৯৪ হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার নির্বাচন যদি এপ্রিলেই হয় তার জন্য কংগ্রেস দ্রুত প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু বিরোধী পক্ষ বিভ্রান্ত, বিচলিত এবং অনৈক্যের রোগে দ্বিধাগ্রস্ত। রাজ্যের বড় বামপন্থী দল সি পি এম সরকারীভাবে বলছেন ১৯৭৫ সালে নির্বাচন হলে তাঁরা নির্বাচন বয়কট করবেন। কিন্তু ১৯৭৬ সালে কি করবেন? তা এখনও অজ্ঞাত।

কিন্তু এই বয়কটের প্রশ্নে সি পি এম নেতৃত্ব ও রাজ্যের অনুগামী মহল দ্বিধাবিভক্ত। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত সি পি এম এবং ২০ জন লোকসভা সদস্যের বেশীর ভাগ জ্যোতির্ময় বসুর নেতৃত্বে সি পি এমের নেতাদের এই নির্বাচন বর্জন নীতি পরিত্যাগের জন্য চাপ দিচ্ছেন।

কর্মী মহল মনে করছেন যে নির্বাচনকে যদি রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে এতোদিন পার্টি বিবেচনা করে থাকে তবে এখন কেন রিগিং-এর ভয়ে পার্টি পার্লামেন্টারী লাইন থেকে সরে যাবে? বরং নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে নির্বাচনী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা এবং কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অসারতা জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়ার সুযোগ আসবে।

সি পি এম পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার নির্বাচন বয়কটের কথা ভাবলেও অন্য রাজ্যে নির্বাচনে অংশ নেবে। রিগিং বা কংগ্রেসীদের নির্বাচনী জুলুম-এর ভয় কি শুধু পশ্চিমবঙ্গেই আছে? অন্য রাজ্যে কি নির্বাচন ও অবাধ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে? এই প্রশ্নের জবাব পার্টির নেতারা দিচ্ছেন না।

বামপন্থী ছোট ছোট দলগুলো অবশ্য সি পি এমের এই নির্বাচন বয়কট নীতিতে বিশ্বাসী নন। তারা নির্বাচনে অংশ নেবে।

সি পি আই কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্রতা আরও বৃদ্ধি করবে। নির্বাচনে আসন ভিত্তিক বোঝাপড়া হবে। সি পি আইর হাতে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি লোকসভার আসন আছে। এটা এবার কংগ্রেসের সহযোগিতায় বাড়িয়ে ১২।১৩টি করার জন্য সি পি আইর গভীর আশা। কিন্তু সি পি আইকে এতোগুলো আসন কংগ্রেস ছাড়বে কি?

১৯৭১ সালে লোকসভা নির্বাচনের সময় কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে ১৩ জন নির্বাচিত হন। পরে বাংলা কংগ্রেসের দুইজন কংগ্রেসে যোগ দেন। বাকী আসনগুলোর মধ্যে সি পি এম পেয়েছিল ২০টি, আর এস পি একটি, সোস্যাল পার্টি একটি এবং সি পি আই তিনটি।

কংগ্রেসের নবীন ও প্রবীণরা ১৯ সালের বিধানসভায় অভূতপূর্ব নির্বাচন সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই রাজে লোকসভার ভবিষ্যৎ নির্বাচনে খোলা মা গোল দেওয়ার আশায় উৎফুল্ল। তা শুনছি কয়েকজন মন্ত্রীসহ অন্তত দ ডজন এম এল এ এবং ছাত্র পরিষদ, য কংগ্রেসের উভয় গোষ্ঠীর প্রথম সারির কয়েকজন নেতা লোকসভার নির্বাচ দাঁড়াতে আগ্রহী।

শুনছি, দুইজন বর্তমান এম-পি এ লোকসভার টিকিট পাচ্ছেন না। দুইজন রাজ্যসভার সদস্য যাঁরা এখন কেন্দ্রে রাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁরা লোকসভায় দাঁড়াচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গের জনৈতিক পরিবে পরিস্থিতি এবং ধী দলগুলোর অনৈ ও সাংগঠনিক র্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন নির্বাচন নিশ্চয় কংগ্রেসের অনুকূলে।

কিন্তু গ্রামবাংলার মানুষের মানসিক কি পরিচয় দেবে? খাদ্যাভাব, জিনিসপত্রে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, চোরাকারবার দুর্নীতি এবং বেকার সঙ্কট গ্রামবাংলার মানুষকে যে বিক্ষোভের লক্ষণ আছে তা প্রতিকারে কংগ্রেস ও সরকারকে কিছু ভাবতে হবে, কাজও করতে হবে। গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে পাওয়ার আর না পাওয়ার যে ঝগড়া ও রেষারেষি কংগ্রেসীদে মধ্যে আছে তা দূর করার দাওয়াই কংগ্রেসকে স্থির করতে হবে। যারা গত দ বছরে কিছু পেয়েছে সেও তাতে সন্তুষ্ট নয় সে আরও পেতে চায়। আর যারা কিছুই পায় নি তারা সামান্য কিছু পাওয়ার আশায় লাইন লাগিয়ে বসে আছে এই লোভ ও প্রত্যাশার মধ্যেই কংগ্রেসের ঝগড়ার বীজ নিহিত।

কাজেই কংগ্রেসকেও সময় থাকতে নিজের সংগঠনকে জোরদার করা ও ভ্রষ্টাচারীদের দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য শক্ত হাতে ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে জ নিশ্চিত হবে।

—চাণক্য

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

আগরতলা অধিবেশন

সম্প্রীতি ও সংহতির সেতুবন্ধনে যে অনুভূতি প্রোজ্জ্বল তাইতো বিভিন্ন ভাষার প্রাচীর ডিঙিয়ে সব মানুষের চিত্তলোকে ঢেউ তোলে। সাহিত্যের সবুজ পাতায় যে জীবন স্বপ্নের আভাস তাকে নিয়ে তো আলপনা আঁকে প্রতিটি পিয়াসী মন। বাংলা মাটির স্পন্দন তাই নিখিল ভারতের শিল্প-সম্পদ। বাংলা ভাষা প্রসার ও বিকাশের উদ্দীপ্ত প্রেরণা থেকে জন্ম হোলেও নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন কিন্তু এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে সমগ্র জাতির প্রাণ-সত্তা চিরন্তন সত্যের দীপ্তিতে ভাস্বর। এই বিহ্বলতাতেই তো মানুষ খন্ড দেশ কালের বাইরে আপন চিত্তের অধিকারকে উপলব্ধি করেছে।

ঐতিহ্যমন্ডিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৪৭তম অধিবেশন সম্প্রতি বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ত্রিপুরার ঐতিহাসিক রাজধানী শহর আগরতলায়। তিনদিনব্যাপী এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন উপলক্ষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পূজারী ও অনুরাগী-বৃন্দের যেন একটি প্রাণচঞ্চল সমাবেশ হয়েছিল। সেই মুহূর্তগুলোতে আগরতলা রূপ নিয়েছিল একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

ভারতের বিভিন্ন স্থানেই নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন তার বার্ষিক অনুষ্ঠানের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেছে। এবারে যে ত্রিপুরায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এর একটা বিশেষ মাহাত্ম্য এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিশ্চয়ই আছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের গভীরে যাঁরা ডুব দিতে পেরেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন যে ত্রিপুরা বাংলা ভাষার একটি অন্যতম তীর্থ। এই রাজ্যের পবিত্র ভূমিতেই বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ত্রিপুরার সঙ্গে এই সম্মেলনের যোগ অতি অন্তরের। তাই 'ত্রিপুরায় সে অতিথি হয়ে আসেনি। এ তার নিজের ঘরেই ফিরে আসা।'

এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের ৪৭তম অধিবেশন উদ্বোধন করতে গিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ত্রিপুরার অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন বাংলা সাহিত্য ও ভাষার প্রতি সুগভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধে উদ্দীপিত হয়েই ত্রিপুরা বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের এই অধিবেশন এখানে আহ্বান করেছেন। তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁদের যেসব সাহিত্য-সেবীরা ত্রিপুরার ডাকে সাড়া দিয়ে এখানে এসে সমবেত হয়েছেন। শ্রীসেনগুপ্ত আশা করেন ত্রিপুরাবাসীর অনেক দুঃখ যন্ত্রণা এইসব সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে ভাষা পাবে এবং তাতে যোগসূত্রটি হবে আরো দৃঢ়তর।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ তাঁর ভাষণে সাম্প্রতিক সাহিত্যের সঙ্কটের কথা উল্লেখ করেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন এই সংস্থার লক্ষ্য হবে নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি এবং অন্যদিকে প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারের চেষ্টা। ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্কের কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন 'ত্রিপুরার কাছে বাংলা ভাষার অশেষ ঋণ। ত্রিপুরার প্রাক্তন নৃপতিরা এই একটি মাত্র রাজ্যে সুদূর অতীত কাল থেকেই বাংলা ভাষাকে দরবারের ভাষারূপে মর্যাদা দিয়ে এসেছেন। বৃটিশ আমলে বাংলা ভাষার কোন সরকারী স্বীকৃতি ছিল না দুয়োরানীর মতো রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে জীর্ণ পাতার কুটিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিল তার বাস। ইংরেজির সেই একচ্ছত্র আধিপত্যের দিনেও ত্রিপুরার রাজভাষা ছিল জনগণেরই ভাষা। সরকারী কাজে যে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা যায় এবং তা সহজবোধ্য ত্রিপুরা সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে। বাংলা ভাষার যেখানে এই মহৎ সম্মান সেখানে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠান পরম গৌরবের। এ গৌরব আমাদের বাংলা ভাষার।'

যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁর প্রোজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে বিংশ শতাব্দীর জীবন-চেতনায় বিস্তৃতি লাভ করেছে তাকে সেই দীপ্তিতেই ভাস্বর করে রাখতে হবে সাহিত্যিক শিল্পীদের। বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য যে চিরন্তন রূপটি পেয়েছে তাকেই অটুট রাখার দায়িত্ব সাহিত্যিকদের। এই সত্যটি যেন কোনরকমে বিস্মৃত না হয়। শ্রীতুষার-কান্তি ঘোষ এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন—'আমি শুধু একথাই সাহিত্যিক

শিল্পীদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই যে, আমাদের সাহিত্যের মানবিকতার মহান উত্তরাধিকার যেটা তারা বহন করে চলেন। পাশ্চাত্যের কোন কোন মহলের উদ্ভট চিন্তা ও রীতিনীতির ব্যর্থ অনুকরণ করে এদেশে সাহিত্য সৃষ্টি করলে তা জনসাধারণ প্রত্যাখ্যান করবে। দেশের মানুষের সমস্যা তার আশা আকাঙ্ক্ষা এবং জীবনের সার্থক প্রতিফলন চাই সাহিত্যে। ধার করা চিন্তা বা আইডিয়া স্থায়ী সাহিত্যের উপাদান হোতে পারে না। শুধুমাত্র চমক সৃষ্টি কিম্বা সস্তা মনোরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য না রেখে আমাদের সাহিত্যিকরা জীবনের গভীর সত্য উদ্ঘাটন করুন তাঁদের রচনায়। সে সত্য যদি কঠিন হয় তবু তা সত্যই। যেন আমরা তা পড়ে বলতে পারি—সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম সে কখনো করে না বঞ্চনা।'

অধিবেশনের মূল সভাপতি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ৫১ বছরের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন গোটা ভারতবর্ষের চিন্তায় বাঙালী যে মগ্ন ও ভিতের তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের' নাম পরিবর্তন করে বর্তমান নাম গ্রহণের মধ্যেই।

আজকের বিভ্রান্তি ও সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন 'আমাদের যুগে যা দেখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী শোচনীয় সততার দৈন্য। নতুন কাল আমাদের কাছে প্রাচুর্যের আশ্বাস যেমন এনেছে তেমনি এনেছে সত্যভ্রষ্টতার প্রলোভন। আত্মবিক্রয়ের এমন সুযোগ কলম বেচার এমন চড়া দামের বাজার এদেশেআগে কোনদিন ছিল না; কলম কিনে যারা পুষে রাখে তেমন সব বড় বড় মহাজন পয়সার প্রতিপত্তি থেকে আরো অনেক কিছুর টোপ ছড়িয়ে বসে আছে। সাহিত্য সংস্কৃতির আবহাওয়া তার জন্যে যে যথেষ্ট দূষিত একথা অস্বীকার না করেও কিন্তু হতাশাকে প্রশ্রয় দিতে যেন আমরা প্রস্তুত না হই।

প্রেমেন্দ্র মিত্র আশা পোষণ করেছেন—'তবু আজকের দিনের সামাজিক রাজনৈতিক বিশৃংখলা ও আলোড়নের মধ্যে ন্যায় ও কল্যাণের অভিমুখে যেসব স্রোত বইছে একদিন তারা জয়যুক্ত হবে বলেই আশা করি।... শুধু দেহের প্রয়োজন আর ক্ষুধার দাসত্বে অধিকাংশ মানুষের আবদ্ধ থাকার কলঙ্ক সেদিন মানুষের জীবনে ও সমাজে থাকবে না।......ক্ষোভ ও অভিযোগ যে সাহিত্যের প্রাণ সে সাহিত্য সেদিন আপনা থেকে স্তব্ধ হয়ে যাবে নিশ্চয়ই 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো। তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ তুমি কি বেসেছ ভালো?' এ অর্থ প্রশ্ন সেদিন হবে নিরর্থক কিন্তু 'এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়'—কি 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভরভসে ঘন গৌরবে নবযৌবন বরষা।'—কিম্বা, 'তন্বী শ্যামা শিখরীদশনা পক্ব বিম্বাধরোষ্ঠি'-এর আবেদন নষ্ট হয়ে যাবে মানুষের মন ও প্রকৃতির এমন মৌলিক পরিবর্তন হোতে পারে বলে তো মনে হয় না। সেই উজ্জ্বল ভাবীকালের স্বপ্ন আমাদের বর্তমান দুর্যোগের অমানিশা অতিক্রম করবার সাহস দিক।'

প্রধান অতিথি অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার বর্তমান বাংলা সাহিত্যের বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক শংকর বাংলাকে আরো বাস্তবধর্মী ভাষা হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তার ধারণা আজকের এই বিভ্রান্তিকর যুগে শুধুমাত্র গল্প কবিতা উপন্যাস নাটকে ভাষাকে আটকে রাখলে তাকে অটুট রাখা মুস্কিল হয়ে উঠবে।

শ্রীশংকর তাই আবেগদীপ্ত কণ্ঠে আহবান জানান, 'আসুন আমরা বাংলাকে শুধু সাহিত্যের ভাষা নয় সাধারণ মানুষের শিক্ষা রুজি রোজগার আনন্দ ও মুক্তির ভাষা হিসেবে গড়ে তুলি। এই ব্যাপারে সরকারের দ্বারস্থ হয়ে কোন লাভ নেই। তাদের এসব ব্যাপারে তেমন আগ্রহ নেই বিশেষ কিছু করবার ক্ষমতাও নেই। যা কিছু করবার তা দেশের শিক্ষক শিল্পী সাহিত্যিক চলচ্চিত্রকার সাংবাদিক নাট্যকার গায়ক বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ী এবং ভাষাপ্রেমিকদের করতে হবে। ভারতের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষার আত্মরক্ষার এই একমাত্র পথ এবং বাংলার লেখকরা এ বিষয়ে সমস্ত ভারতকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

এ দিনের প্রধান অতিথি শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ত্রিপুরার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের কথা গভীরতার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, 'ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বঙ্গভাষাভাষী রাজ্য ত্রিপুরা পশ্চিম বাংলার সহোদরা স্থানীয়ামাত্র নয়, সর্বতোভাবেই তার যমজভগিনীস্বরূপা। সঙ্গীত কলা কৃষ্টি সাহিত্য ও জীবনচর্যার উভয়ের মধ্যে তার একসূত্রে বাঁধা। একই সুখ-দুঃখ আশা-উদ্দীপনা সুপ্রাচীন কাল থেকে উভয়কে একান্ত আপনে বেঁধে রেখেছে।'

সমাপ্তিতে শ্রীসেনগুপ্ত বলেন—জীবনের স্বপ্ন কোনদিন স্তব্ধ হবে না; কল্পনার মহাকাশও কোনদিন ফুরাবে না আলো। বিজ্ঞান তাতে দেবে সমীক্ষার দীপ্ত দর্শন যোগাবে ভাবের দ্যোতনা ইতিহা আনবে সজাগ বস্তুবোধ। এই ত্রিশ মিলিত প্রভাবে যে নতুন সাহিত্য আত্মপ্রক করবে তা হবে সত্যিকার জাতীয় ঐশ্বর্য এ বঙ্গভারতী আবার বরণীয় হবেন ত গৌরবে।

সম্মেলনের কাব্যশাখার প্রধান অতি শ্রীমণীন্দ্র রায় বলেন আজকের এই কঠি জীবন সংগ্রামের দিনে কবিতার ভূমিকাটা কি হোতে পারে তা সত্যি ভাববার কথ আজকের কবিদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন-'কেবল যা আছে তাই নয় যা হোতে পা হওয়া উচিত তার কথাও তাঁরা বলবেন মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাস কবি কাছে এই উত্তরাধিকার রেখে গেছে। আজকে কবিকেও সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে চলে না।'

সম্মেলনের শেষ দিনে ইতিহাস শাখ অধিবেশন হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্র করেন বাংলাদেশের হাই-কমিশনের শিক্ষা সংস্কৃতি দপ্তরের কাউন্সিলের অধ্যাপ ডাঃ সিরাজুল ইসলাম। ডাঃ ইসলাম বাংল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্রিপুরার অ দানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বাঙালীর ইতিহাস মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্প চেয়েও পুরনো।

সভাপতি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ড দীনেশচন্দ্র সরকার তাঁর ভাষণে ত্রিপুর ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সঙ্গীত শাখার অধিবেশনে সভাপতি করেন শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল। শ্রীরাজেশ্ব মিত্র ছিলেন প্রধান অতিথি।

সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশ চারটি পুরস্কার ঘোষণা করেন শ্রীদক্ষি রঞ্জন বসু এবং সংস্থার সভাপতি শ্রীতুষা কান্তি ঘোষ পুরস্কার প্রদান করে পুরস্কার পেয়েছেন ঃ যুগান্তর পুরস্কার ডাঃ রণেন্দ্রনাথ দেব; অমৃত পুরস্কার শ্রীক্ষীরোদ দেববর্মা; বিশ্বরূপা পুরস্কার শ্রীনিখিল ভট্টাচার্য; শেফালী নন্দী স্বর্ণ পদক ঃ শ্রীমতী করবী দেববর্মন।

নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে ১৯৭৪-৭৫ সালের নব-নির্বাচিত পরিচাল সমিতি। সম্মেলন সভাপতি ঃ শ্রীতুষারকা ঘোষ। সহ-সভাপতি ঃ শ্রীবসন্তকু বন্দ্যোপাধ্যায় (পাটনা) শ্রীদ্বিজেন্দ্র সান্যাল (লখনৌ) শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখে পাধ্যায় (নয়াদিল্লী) শ্রীইন্দ্রকুমার র (ত্রিপুরা)। সাধারণ কর্মসচিব ঃ শ্রীরবি ঘোষ (নয়াদিল্লী)। কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রীভ মজুমদার (নয়াদিল্লী)। সম্মিলনী সম্পাদ শ্রীসুনীলময় ঘোষ (কলকাতা), পরি পত্রীকারক ঃ শ্রীশশাংকমোহন কর (এলাহ বাদ)। এছাড়া আরো ৪৭জন সদস্য বিভি স্থান থেকে পরিচালক সমিতির সদস্য নির চিত হয়েছেন।

দিলীপ মৌলিক

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

[সোনাখড়ি গ্রামের ভবনাথ ঘোষ আর দেবনাথ ঘোষ দুই ভাই। ভবনাথ বড়। অল্পবয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর ভবনাথ সংসারের হাল টেনেছেন, ভাইকে মানুষ করেছেন। কলকাতার ছোট আদালতে ওকালতী পরীক্ষা দেওয়া দেবনাথের হল না। পরে বিদেশে জমিদারী সেরেস্তার ম্যানেজার হয়েছিলেন। সেই কৃতী ভাই দেবনাথ আট বেহারার পালকিতে সোনাখড়ি ফিরেছেন।

আষাঢ় মাস। এবারে রথের সঙ্গে ঈদ ও রবিবার জুড়ে গিয়ে কাছারি তিন দিন বন্ধ। মাদার ঘোষ হারু ঝন্টু এবং হিমচাঁদ গড়মন্ডলে চললো রথের মেলা দেখতে। হারুর মতলব আবার শুধু রথ দেখা নয় থিয়েটারের সিন আঁকার কত দূর কী হল তাও একবার সরেজমিনে দেখে আসা।

এদিকে পুজো প্রায় আসি আসি। হারু সরকার বাড়ি বাড়ি ঘুরে রিহার্শালের লোক ডেকে বেড়াচ্ছে। ছোট কর্তা বরদাকান্ত জলচৌকিতে বসে ফর্দের ছাড়হুট ধরিয়ে দিচ্ছেন। দেবনাথ বাড়ি এলেন।

পুজোর আনন্দে গ্রাম গুলজার। সব বাড়িতেই আত্মীয় পরিজনের ভিড়। এর মধ্যেই খুচরো পরব এক ধরনের পুজোই—ধান বনকে সাধ খাওয়ানো। আর এক পরব গারসিও এই সময়েই। সধবা-বিধবা ছেলে-বুড়ো সবাই মেতে উঠলো। ওদিকে ভোর হতেই আহ্লাদ বৈরাগীর গলায় আগমনী সুর বেজে উঠল।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

হিরু বলে, জল্লাদকে বলো মা। পাইতক্কের কোথায় কি, সমস্ত তার জানা। মিষ্টি-মুখে বললে জান কবুল করবে, তেমনটি আর কাউকে দিয়ে হবে না।

সে কথা সত্যি, তবু উমাসুন্দরী ঈষৎ ইতস্তত করেন ঃ দায়িত্বের কাজ। যতই হোক, এক ফোঁটা বালক ছাড়া কিছু নয়।

হিরন্ময় নিজেই জল্লাদকে ডাকিয়ে বলে, ভোরবেলা ফুল তুলে আনতে হবে। বুঝলি জল্লাদ, ভারটা তুই নে।

জল্লাদ বিনা প্রশ্নে ঘাড় নেড়ে দিল ঃ আচ্ছা—

বড় দায়িত্বের কাজ রে। গ্রাম সুদ্ধ মানুষ পুষ্পাঞ্জলি দেবে, আর পুজোও এক নাগাড় চার দিন ধরে। ফুল বিস্তর লাগবে।

বুক চিতিয়ে জল্লাদ বলল, লাগুক না—

তোর দলবল সব রয়েছে—বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে আসুক, কাউকে ফুল তুলতে না দেয়। একটা মুকুলও নষ্ট না হয় যেন। তোর উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছি তা হলে।

[illegible] দিল।

প্রহর রাত হতে চলল, নতুন বাড়িতে মগ্ন হয়ে তবু সে বসে বসে থিয়েটারের মহলা দেখছে। কলকাতার প্লেয়ারমশায়রা এসে গেছেন—তাজ্জব ব্যাপার। মন্ডপের প্রতিমার চেয়ে এ'রাই আপাতত বড় আকর্ষণ।

কমলও আছে। বছরের এই ক'দিন বাধাবন্ধ নেই, এই রাত্রি অবধি বাড়ির বাইরে আছে তাই। অনভ্যাসে অস্বস্তি লাগছে, চুপিচুপি একবার সে বলল, উঠবে না জল্লাদ-দা?

আজকেও পড়বি নাকি?

ক্ষুরধার ব্যঙ্গের হাসি জল্লাদের মুখে। বলে, যা যা আছিস কেন এতক্ষণ? ভাল ছেলে তুই, বাড়ি গিয়ে বই নিয়ে বোস্‌গে। একলা যেতে পারবি নে বুঝি, পদা গিয়ে পথ দেখিয়ে আসছে।

কমল মরমে মরে যায়। ভাল ছেলে বলে রব উঠে গেছে, এর চেয়ে লজ্জার কান্ড সংসারে আর হতে পারে না। তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে বলে, বাড়ি যেতে কে চাচ্ছে? ফুল নষ্ট না হয়, পাড়ায় ঘুরে বলে আসতে হবে না? গড়ভাঙা মাদারডাঙাতেও তো যেতে হবে।

জল্লাদ বলল, আমি ভার নিয়েছি, পুজোর আগে ফুল ঠিক পেঁছে যাবে। তা বলে ফকির-বোষ্টমের মতন বাড়ি বাড়ি ফুল কুড়োতে যাচ্ছি নে।

মাথায় কোনো মতলব নিয়েছে ঠিক, খুলে বলছে না। নিত্যসঙ্গী পদা মনে করিয়ে দিল ঃ ফুলের তো অনেক দরকার—

অনেকই আসবে।

নিঃসংশয় জবাব দিয়ে একটুখানি ভেবে জল্লাদ বলল, হরিবোল দিয়ে কচ্ছপ জড় করব না। বেশি লোকের গরজ নেই। তুই যাবি, আমি তো আছিই। আর আংটুা-মারা মরদ একটা-দুটো, ভাল ধরাজ মারতে পারবে যারা। ঝড়ুকে তো দেখছি নে। ঝড়ু গেল কোন চুলোয়?

ঝড়ু বসে ছিল না, কলাপাতা-কাটার দলের মধ্যে সে। লগির মাথায় কাস্তে বেঁধে সারা দিনমান তারা পাতা কেটে বেড়িয়েছে। হাত-পা ধুয়ে খানিকটা ভদ্র হয়ে এবারে নতুন বাড়ি বিহাশালের জায়গায় যাচ্ছে। পথে দেখা। জল্লাদ বলে, পাতা কাটছিস বেশ করছিস। ফুল তোলার কাজেও দুটো-তিনটে দিন আয় দিকি। তোর পাতারও অনেকখানি তাতে আসান হয়ে যাবে। পোহাতি তারা উঠলে তে-মাথার ডুমুরতলায় এসে দাঁড়াবি, পদা ডেকে-ডুকে এনে হাজির করবে। ওখান থেকে এক সঙ্গে সব বেরিয়ে পড়ব।

ঝড়ু ইতস্তত করে বলে, দিনমানে খোঁজ পড়ে না—রাত্রে বেরুনো বড় মুশকিল। আক্রামণায় এক লহমা ঘুমোয় না। আওয়াজ একটু পেয়েছে কি, হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠবে।

পদা বলল, বেরুতে কোনো মশায় দিতে চায় না। তবু বেরই। দুয়োর খুলেই চোঁচা দৌড়—তখন আর কে পাত্তা পাচ্ছে? ফিরে এসে গণ্ডগোল—

জল্লাদ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে, গণ্ডগোল আবার কি? দুটো কথার বকাবকি খুব বেশি তো দু-ঘা ঠেঙানি।

ঝড়ু বলে, মোটে দু-ঘা? তেমনি পাল্লোরই বটে!

না হয় দশ ঘাই হল। মেরে ফেলবে না তো? পেল্লাদ মাস্টার মশাইর হাতে-পায়ে নিত্যি দু-বেলা খাচ্ছি—ঘরের মারই বা ভয় করতে যাবে কেন?

জল্লাদ তা করে না বটে। মুখের মিছা বাগাড়ম্বর নয়, এ বাবদে তার ভূরি প্রমাণ অভিজ্ঞতা। পাঠশালায় ও ঘরে উঠতে পেটায় তাকে, বসতে পেটায়, সে দৃকপাত করে না।

ঝড়ু দেখেছে সে জিনিস। প্রসঙ্গ যখন উঠে গেল, অন্তরঙ্গ সুরে সে বলে গায়ে তোমার যেন সাড় লাগে না জল্লাদ-দা। দেখেছি, দেখে অবাক হয়ে যাই।

নেই বলে সাপের বিষ থাকে না যে মনে করলেই হল লাগছে না। আরও এক কায়দা আছে শোঁ-ও-ও করে নিশ্বাস টেনে বুকের মধ্যে বাতাস ভরে নিবি। মারতে আসছে—না-হক ছুটোছুটি করে হাঁপিয়ে পড়ে অনেকে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শান্ত ভাবে ততক্ষণ নিশ্বাস টেনে যাবি তুই। ভিতরে বাতাস ঢুকে গেলে ব্যথা লাগে না। ফুটবলে, দেখিস নে এত লাথি মারছে ভিতরে বাতাস বলে লাথি গায়ে বসতে পারে না।

নিজের বেলা জল্লাদ এই কৌশলই নিয়ে থাকে, সকলে চাক্ষুষ দেখে। মার-গুতোন খাবার সময় একেবারে চুপচাপ থাকে—চেঁচায় না, কাঁদে না, পালাতে যায় না। প্রহারকর্তা ক্লান্ত হয়ে এক সময় মার বন্ধ করে, জল্লাদও নিশ্চিন্তে পূর্বকর্মে লেগে যায় তখন।

বরাবর এই রকম হয়ে আসছে। ছোঁড়াটাকে মেরে শাসন করা যাবে না, আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলে বুঝে ফেলেছে। তা সত্ত্বেও মারে—মেরে বেশ হাতের সুখ পাওয়া যায়। খাসা একখানা ক্ষেত্র পাওয়া গেছে, যত খুশি সেখানে নির্বিবাদে মার চালান যায়—হেলাফেলায় তেমন জিনিস ফেলে রাখতে যাবে কেন?

ভাল ছেলে ইত্যাদি গালি খাওয়ার পরেও কমল এ তাবত সঙ্গ ছাড়ে নি, পিছু পিছু চলেছে। অধ্যবসায়ে প্রীত হয়ে জল্লাদ হঠাৎ সদয় কণ্ঠে বলল, যাবি তুই সত্যি সত্যি?

ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছিল, সেই জল্লাদই আবার এখন ভরসা দিচ্ছে : ভাল ছেলে তো কি হয়েছে, ভাল বলে বুঝি ঠুঁটো-জগন্নাথ হয়ে থাকতে হবে। ভাবিস নে তুই—এই বেড়াল বনে গিয়ে বনবেড়াল হয়। তেমাথার ডুমুরতলায় চলে যাবি, আমরা সব থাকব।

নিজেই আবার খেয়াল করে বলছে, একলা যেতে ভয় করবে তোর—অভ্যেস তো নেই। বাড়ি থেকে নিয়ে আসব। ঘরের তলায় দাঁড়িয়ে শেয়াল ডাকব, টিপি-টিপি বেরিয়ে আসিস।

ভাল ছেলে হলেই অপদার্থ হয় না, কায়দা পেয়েছে তো কমলও সেটা প্রমাণ করে ছাড়বে। তরঙ্গিনীকে বলে রাখল, পুজোর ফুল তুলতে যাবে সে। পুজোর নামে মা কিছু বলবেন না, জানে। জল্লাদের নামগন্ধও করল না। ঘরে মেয়েলোক ঠাসা, মেজেয় ঢালা-বিছানা পড়েছে। মেয়েরা থাকলেই কুচোকাচা কিছু থাকবেই, শেষরাত্রি থেকে ট্যাঁ-ভ্যা লেগে যায়। এসো-জন বসো-জন আত্মীয় কুটুম্বে পুজো বাড়ি গিজ-গিজ করছে। বাইরে বাড়ি পুরুষেরা যে যেখানে পারে মাদুর বিছিয়ে গড়িয়ে পড়ে, মেয়েরা ভিতর বাড়িতে। পোহাতি তারার সঙ্গে তরঙ্গিনী উঠে পড়েন, বারো-মেসে অভ্যাস। পুজোর উদ্যোগে এখন তো চোখের ঘুম একেবারে উড়ে গেছে। উঠে তরঙ্গিনী দরজা খুলে বাইরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে কমলও উঠে বসে শেয়াল-ডাকের প্রতীক্ষা করছে।

(তেরো)

আকাশে তারা, রাত্রি আছে এখনো। পাখপাখালি ডাকছে। ডুমুরতলার আঁধারে আরও চারজন—কাঁধে ধামা, হাতে ঝুড়ি। ঝুড়ি ভরে ফুল নিয়ে আসবে। জল্লাদ ও কমল এসে যোগ দিল। জল্লাদ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছে—হেঁসো দা, কাস্তে।

গ্রাম পথে বেরিয়েছে সকলে মিলে। রাতের বেলা বেরুনো কমলের এই প্রথম—পুজোর নামে এতদূর হতে পারল। পড়তে শিখেছে এখন কমল, পড়ার বড় ঝোঁক। হাতের কাছে যা পায়, পড়ার চেষ্টা করে। শব্দ করে না, চোখ দিয়ে পড়ে যায়। নিতান্তই যদি না বোঝে, মনে মনে কষ্ট

পায়—ভান্ডারে কত কি জিনিস, তাকে যেন ধরতে ছুঁতে দিচ্ছে না। গল্প একটা পড়ে ফেলে নিজেকে সেই গল্পের মধ্যে দাঁড় করায়। এই যেমন মনে হচ্ছে আমুন্ডসেনের মতো মেরু বিজয়ে চলেছে। অথবা শিবাজীর মতন দুর্গ-আক্রমণে। ডান দিকে বাঁ-দিকে ক্ষেতের বেড়া,—বেড়ার জিওল ও ভেরেন্ডার কচাগুলো সৈন্যদলের মতন সেলাম ঠুকে সারিবন্দি অ্যাটেনসনে দাঁড়িয়ে আছে যেন। নতুন বাড়ি ছাড়িয়ে গিয়ে সমুন্দুর-পুকুরের পাড় (সমুদ্র নয়, সুমুখ-দুয়ার থেকে সমুন্দুর হয়েছে। প্রহ্লাদ মাষ্টারমশায় একদিন বলছিলেন)। পুকুর-পাড় ধরে যাচ্ছে তারা। হাওয়া দিচ্ছে মাঝে মাঝে—গাছের পাতা নড়ছে, পুকুরের জল কাঁপছে। পথ সংক্ষেপ হবে বলে এর উঠান ওর কানাচ ধরে যাচ্ছে এক এক সময়। মানুষজন বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে, ঘর-বাড়িও। পাখিরাই কেবল জেগেছে—উড়ছে না তেমন, কিচিমিচি করছে। আম-কাঁঠালের বাগান, তরিতরকারির ক্ষেত, খেজুর বাগান একটা ঝড়বন আড়াআড়ি পার হয়ে সুঁড়ি পথে পড়ল। আশশ্যাওড়া, ভাঁট, কাল-কাসুন্দে আর যাদুর জঙ্গল দুধার দিয়ে এঁটে ধরেছে। বিশাল বাঁশ বাগান একটা, অন্ধকার বাঁশতলা দিয়ে পথ। বাঁশের পাতায় আওয়াজ তুলে শিয়াল চলে গেল রাস্তার এধার থেকে ওধারে। হেই, হেইও কেডা তুমি? কনে যাবা? —জল্লাদ অকারণ হাঁক পাড়ছে। জন্তু-জানোয়ার সাপখোপ যা থাকে, মানুষের গলা পেয়ে সরে যাবে। ঝড়ু এর মাঝে গান ধরল হঠাৎ। গানে ভয় কাটে। নাথ, রাম কি বস্তু সাধারণ, ভূভার হরিতে অবনীতে অবতীর্ণ সে ভবতারণ—গানের ভিতরে রামের নাম। রাম নামের বিশেষ সুবিধা, ভূতও ত্রিসীমানায় থাকবে না। এবং ফাঁকতালে খানিকটা পুণ্যার্জনও হয়ে যাচ্ছে।

ঝড়ু একবার বলে উঠল, এখনো রাত পোহানোর নাম নেই, কত রাত থাকতে আনলি রে পদা?

পদা কিছু বলল না, জবাবটা জল্লাদই দিল : রাত যেমন আছে, রাতের কাজও রয়েছে। পা চালিয়ে চল্।

আগে আগে জল্লাদই জোর পায়ে চলল। মতলবটা পদাও পুরোপুরি জানে না, প্রশ্ন করে : যাচ্ছি কোথায় রে?

চৈতন মোড়লের বাড়ি।

যেতে যেতে জল্লাদ বিশদ করে বলে, মোড়ল বাড়ির নিচে ডোঙা রেখেছে। আনকোরা নতুন ডোঙা, এই বছরের বানানো। ঘাস কেটে এনে টেমি ধরে ধুলো অনেকক্ষণ ধরে। চাইলে তো দেবে না, না চেয়ে নিয়ে বেরুব।

নতুন বাড়ির রিহার্শাল থেকে বেরিয়ে যে যার ঘরে চলে গেল তারপরেও জল্লাদ একাকী গ্রাম চক্কোর দিয়েছে। চৈতনের ডোঙাটা পছন্দ করেছে সেই সময়, ঐ ডোঙা কাজে নেবে। বিল-কিনারায় চৈতনের বাড়ি, বিলের মাটি তুলে বাড়ির জমি উঁচু করেছে, চতুর্দিকে বেশ একটা পরিখার মতন হয়েছে। ডোঙা সেখানে।

ঝড়ু বলল, এতজনে আমরা উঠলে ডোঙা তো ডুবে যাবে।

জল্লাদ বিরক্ত হয়ে বলে, বসতে কে বলছে। ডোঙায় চড়ে নবাবি করবি, সেই জন্যে বুঝি এসেছিস? ডাঙায় তোল ডোঙা, উপুড় করে মাথায় নিয়ে নে। এতজনে সেই জন্যে আমরা।

মাথার দিকটা ভারী বলে জল্লাদ নিজে সেই দিকে মাথা ঢুকিয়েছে, পিছনে অন্যেরা। পদা সকৌতুকে বলল, মানুষে ডোঙায় চড়ে যায়, সেই ডোঙা আমাদের উপর চড়ে চলেছে।

সকলের আগে জল্লাদ—ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে বাঁক নিচ্ছে, যেতে হবে সকলকে।

অধীর কণ্ঠে ঝড়ু বলে, নিয়ে চললি কোথা বল দিকি?

রহস্য ভাঙে না জল্লাদ। সংক্ষেপে বলে, চল্ না—

নিঃশব্দ পথ। সোনাখড়ি ছেড়ে মাদার-ডাঙায় ঢুকছে। ঢিবির উঁচুতে উঠল, নেমে গিয়ে এক্তার-বক্তারের দীঘি। রাতও শেষ হয়ে এসেছে, ফিকে অন্ধকার। তারারা নিভে আসছে, ঝিরঝিরে শীতল হাওয়া। দীঘির কিছু নেই, নামেই শুধু দীঘি। কারা এক্তার-বক্তার কেউ জানে না। নলখাগড়া, হোগলা, চেঁচো, ঘন সতেজ সবুজ কচুরি-পানা আর মালি ঘাস। হঠাৎ মনে হবে উর্বর ফসলের ক্ষেত একটা। নজর দূরে ফেললে পদ্মবন চোখে পড়বে। বড় বড় পদ্মপাতা জলের খানিকটা উপরে উল্টানো ছাতার মতন, জায়গাটা ঢেকে দিয়েছে একেবারে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে পদ্ম এখনো পাঁপড়ি বন্ধ, রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শতদল হয়ে ফুটবে।

(ক্রমশঃ)

দেশে বিদেশে

আচমকা নির্বাচনের জল্পনা

দিল্লিতে একটি টেলিভিসন সাক্ষাৎকারে ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার টি স্বামীনাথন যে প্রামাণ্য অভিমত দিয়েছেন তাতে এটা পরিষ্কার যে, লোকসভা ভেঙে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচন ডাকার পথে সংবিধানের দুরতিক্রম্য বাধা আছে। শ্রীস্বামীনাথন বলেছেন যে ১৯৭১ সালের জনগণনার হিসাব অনুযায়ী নির্বাচন কেন্দ্রগুলির পুনর্বিন্যাসের কাজ এপ্রিলের আগে শেষ করা যাবে না। এখনই নির্বাচন করতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। সংবিধানের সংশোধন এমনভাবে করতে হবে যাতে যে ১৬টি রাজ্যে ইতিমধ্যে নির্বাচন কেন্দ্রের পুনর্বিন্যাস হয়ে গেছে সে সব রাজ্যে নতুন নির্বাচন কেন্দ্রের ভিত্তিতে এবং যেসব রাজ্যে পুনর্বিন্যাসের কাজ বাকি থাকবে সে সে রাজ্যে পুরান নির্বাচন কেন্দ্রে ভিত্তিতে ভোট নেওয়া যায়।

কিন্তু এভাবে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভিত্তিতে নির্বাচন করাও সংবিধানসম্মত হবে কিনা সে প্রশ্ন তুলেছেন সংগঠন কংগ্রেসের নেতা এস এন মিশ্র। মোরারজী দেশাই মনে করেন, আচমকা নির্বাচন করা আদৌ সম্ভবপর হবে না। সি-পি-এম নেতা জ্যোতির্ময় বসু বলেছেন যে, পরে দেশের অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে মনে করে প্রধানমন্ত্রী আচমকা নির্বাচন ডাকতে পারেন। শ্রীবসু রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেছেন তিনি যেন প্রধানমন্ত্রীকে আচমকা নির্বাচন ডাকার অনুমতি না দেন। অপরপক্ষে, ভারতীয় লোকদল নেতা চরণ সিং ও রাজনারায়ণ বলেছেন যে, অবিলম্বে লোকসভা ভেঙে দিয়ে নির্বাচন করা উচিত এবং ইতিমধ্যে কেন্দ্রে একটি নির্দলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করা উচিত কেননা তাঁরা মনে করেন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে অবাধ ও ন্যায্য নির্বাচন হবে না। জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেছেন, আচমকা নির্বাচনের জন্য তিনি তৈরি আছেন।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের হাইকমাণ্ডের সূত্রে থেকে জানান হয়েছে ক্ষেত্রবিশেষে বাছবিচার করে কংগ্রেস সি-পি-আই-এর সহযোগিতা গ্রহণ করে যাবে এবং আগামী নির্বাচনেও এই নীতি চালু থাকবে। সম্প্রতি কংগ্রেস দলের ভিতরে এবিষয়ে জোরালো প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন গুজরাটের প্রাক্তন পি-এস-পি নেতা ও বর্তমানে কংগ্রেসের সদস্য ডাঃ অমল দেশাই। কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া সম্প্রতি যখন গুজরাট সফরে গিয়েছিলেন তখন গুজরাটের সি-পি-আই নেতা সুবোধ মেহতা কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে একই মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। এটা কি করে সম্ভব হল সেই প্রশ্ন তুলে ডঃ দেশাই কংগ্রেসের সঙ্গে সি-পি-আই-এর সম্পর্কের বিষয়টি বিচার করার জন্য এ-আই-সি-সির অধিবেশন ডাকার প্রস্তাব করেছেন। আর একজন কংগ্রেস এম-পি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সি-পি-আই-এর প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনি যে দুটি প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন সেগুলি ছাপিয়ে কংগ্রেস এম-পিদের মধ্যে বিলি করেছেন। কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির সভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন যে কংগ্রেসের ঘোষিত নীতির ভিত্তিতে তার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য সি-পি-আই যদি প্রস্তাব দেয় তাহলে সে প্রস্তাব গ্রহণে আপত্তি থাকতে পারে না।

চুয়াত্তরের চ্যালেঞ্জ

১৯৭৪ সাল শেষ হওয়ার প্রাক্‌কালে বোম্বাইয়ে ব্যবসায়ীদের এক সভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, এটা ছিল একটা কঠিন চ্যালেঞ্জের বছর। সরকার যে অন্যায় রাজনৈতিক দাবি ও চাপ ঠেকাতে সক্ষম এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য তাঁরা যে এমনকি অপ্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও ইচ্ছুক বিদায়ী বছরে তাঁরা সে প্রমাণ রেখেছেন। ১৯৭৪-এর ব্যালান্স শীট উপস্থিত করে তিনি জমার অঙ্কে এইসব সাফল্যের উল্লেখ করেন: প্রশাসনিক ব্যয় কমান হয়েছে, মুদ্রাস্ফীতি আটকান গেছে, ঘাটতি ব্যয় নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে এবং অত্যাবশ্যক জিনিসের সরবরাহ বাড়ান গেছে।

এইসব সাফল্য সত্ত্বেও চুয়াত্তরের চ্যালেঞ্জের বেশ কিছু জের যে ১৯৭৫ সালের জন্য তোলা থাকবে বছরের শেষে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের জন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলির ফলে মূলধনের বাজারে টান পড়ার ও উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। চাহিদার অভাবে মন্দার লক্ষণও খানিকটা প্রকট হয়ে উঠছে।

বছরের শেষে অর্থনীতির আকাশে আর একটি বিপদের মেঘ জমে উঠছিল। বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৭৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির চারটি কিস্তি পাওনা হয়েছে। সরকারের ঘাটতি আয়ত্তে রেখে এই বাড়তি মহার্ঘ ভাতা কর্মচারীদের কিভাবে দেওয়া যাবে কেন্দ্রীয় সরকার সেটা ভেবে ঠিক করতে পারছেন না। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা তাঁদের প্রাপ্য আদায়ের জন্য লড়াইয়ের প্রস্তুত করছেন।

বাংলাদেশে জরুরী অবস্থা

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদুল্লাহ সে-দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে এ সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি বাতিল করে একটি আদেশ জারি করেছেন।

ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, 'পাকিস্তানী ফৌজের সহযোগী, চরমপন্থী ও বিদেশী শক্তিসমূহের বেতনভুক শত্রুর চরদের' সঙ্গে মিলিত হয়ে বাংলাদেশের বৈরী শক্তিগুলি যে কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করেছে তাতে এই ঘোষণা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এই ঘোষণার প্রসঙ্গে ঢাকায় সরকারিভাবে বিশেষ করে সেদেশে যে হিংসাত্মক ও অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালান হচ্ছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে যে এযাবৎ পাঁচজন পার্লামেন্ট সদস্য সহ হাজার পাঁচেক আওয়ামী লীগ কর্মীকে খুন করা হয়েছে।

ভারত-পর্তুগাল সম্পর্ক

পর্তুগীজ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ মারিও সোরেসের ভারত সফরের মধ্য দিয়ে এই দুই দেশের ভিতর একটা নতুন সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস সূচিত হল। পর্তুগালের পুরান সরকারকে উৎখাত করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ঔপনিবেশিক নীতিকেও বিসর্জন দিয়ে সেদেশের নতুন সরকার ভারতের সঙ্গে একটা নতুন ও স্বাভাবিক সম্পর্কের অধ্যায়ে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। গোয়া, দমন ও দিউ-এর উপর পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য বজায় রাখার জেদ ধরে ডাঃ সালাজার একতরফাভাবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। সে-দেশের নতুন সরকার অবশেষে গোয়া, দমন ও দিউয়ের উপর ভারতের অধিকারের বাস্তব সত্যটা স্বীকার করে নিয়েছেন। গত ১৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্রসচিব স্বরণ সিংহের সঙ্গে পর্তুগীজ পররাষ্ট্রসচিব ডঃ মারিও সোরেসের আলোচনায় স্থির হয়েছিল, দুই দেশের মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি করে গোয়ার ভারতভুক্তিকে মেনে নেওয়া হবে।

ডাঃ সোরেসের এই ভারত সফরের প্রাক্‌কালে পর্তুগীজ সরকার রাষ্ট্রসঙ্ঘে তাঁদের ১৩ বছরের পুরান অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। গোয়া সম্পর্কেই লিসবন ভারতের বিরুদ্ধে ঐ অভিযোগ দায়ের করেছিল। পুরান ঐ অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়ে আজকের লিসবন সরকার ভারতের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পথ আরও সুগম করলেন। ডাঃ সোরেস তাঁর এই সফরকে 'শান্তি ও আপোষের যাত্রা' বলে অভিহিত করেছেন।

—পুণ্ডরীক

২৯-১২-৭৪

গোয়েন্দা ধাঁধা

বউ উধাও ॥ শার্লক হোম্‌স্‌ ॥

স্যার আর্থার কোনান ডয়াল

গোয়েন্দা হওয়ার ঝকমারি অনেক। বিশেষ করে আইবুড়ো গোয়েন্দার। বউ হারালেও বউকে খুঁজে আনতে হয়—মন্ত্রের মর্যাদা না বুঝেও।

বেচারা শার্লক হোমস-কেও এই জোয়াল কাঁধে বইতে হয়েছে বেশ কয়েকবার। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কেলেংকারীর কথা কে না জানে। আরেকবার প্রায় একই ঘটনা-ঘটল লর্ড সাইমনের বিয়ের পর।

কি বিশ্রী ব্যাপার! ঢিঢি পড়ে গেল সারা লন্ডন শহরে। তারপরেই অবশ্য দরনে হৃক উথলে উঠল যখন লেডী সাইমনের জামাকাপড় পাওয়া গেল একটা লেকে। আহারে! বিয়ের পরেই বিপত্নীক!

ঘটনাটা গোড়া থেকে না বললে জমবে না। লর্ড সাইমন ইংল্যান্ডের সেইসব জমিদার-তনয় যাদের বংশের নামের ডাকেই গেন ফাটে, কিন্তু তালপুকুরে ঘটি ডোবে না। মাঝখানে খুব হিড়িক উঠেছিল আমেরিকার টাকাওলা মেয়েদের পটিয়ে বিয়ে করে ফেলা এবং মোটা বরপণ নিয়ে নতুন করে কাপ্তেনি করা।

লর্ড সাইমন তার ব্যতিক্রম নন। লন্ডনের কাগজে কাগজে এই নিয়ে ঝালমশলা মুড়ি-তে জিভে জল ঝরানো খবর ছাপা হল অনেকবার। কনের বাবার নাকি টাকা গুণে শেষ করা যায় না—খনির মালিক তো। মেয়েরও কেবল ডানা দুটো নেই—বাদবাকী বিলকুল পরীর মতই। কিন্তু এইসব দেখে কোনক্রমে ভোলা উচিত হয়নি লর্ড সাইমনের ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফালতু কথায় কান না দিয়ে ঝটপট বিয়েটা সেরে ফেললেন লর্ড মহাশয়। বয়স তাঁর কম। হুকুম করার জন্যেই জন্মেছেন—হুকুমমাফিক কাজ করিয়ে নিতেও জানেন। বিয়েটাও একটা হুকুম। সুতরাং বউ-বচারীকেও আশা করেছিলেন সেবাদাসীর মত খাটাবেন—দরকার মত মোচড় মেরে টাকাও বার করে নেবেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! বিয়ে সেরে বাড়ী পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই বাতাসে মিলিয়ে গেল বউ! লর্ড সাইমন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। ঘরভর্তি লোক তখন একপেট খিদে নিয়ে বসে আছে খাবার টেবিলে—কনেবউ এসে বসলেই মুরগীর ঠ্যাং চিবোবে—এমন সময়ে খবর এল কনে উধাও!

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে গেল। পুলিশ মানে ইন্সপেকটর লেসট্রেড। যার চেহারা খর্বকায় নেউলের মত। বেজায় চটপটে। বেজায় ধুরন্ধর। বেজায় প্র্যাকটিক্যাল। অনুমান-টনুমানের ধার ধারে না। সে এসে দেখলে ফ্লোরা মিলার বলে একটা নাচুনে মেয়ে এসে বাড়ীতে হামলা জুড়েছিল। লর্ড সাইমনকে নাকি এত সহজে সে হাতছাড়া করতে রাজী নয়। ফুর্তি করার সময়ে মনে ছিল না? ফ্লোরাকে নাকি ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া হয় বাড়ী থেকে। তারপর সেই ফ্লোরার সঙ্গেই নাকি লেডী সাইমনকে বাগানে পাশাপাশি হাঁটতে দেখা গেছে। সুতরাং কেসটা জলবৎ তরলম। অর্থাৎ ফ্লোরাই গায়েব করেছে লেডী সাইমনকে। মেয়েরা ভারী হিংসুটে হয়। হবুবর পালালে বাঘিনী হতেও আপত্তি নেই। সুতরাং পাকড়াও ফ্লোরা মিলারকে।

প্রমাণ? লেসট্রেড অত কাঁচা ছেলে নয়। তাও জুটিয়ে ফেলল সার্পেন্টাইন লেকের জল থেকে। লেডী সাইমনের পরিত্যক্ত জামা-কাপড় পাওয়া গেলেও অবশ্য লাশটা পাওয়া গেল না। তাই বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেবার জন্যে প্রতিবারের মত এবারও সখের গোয়েন্দার পায়ে তেল দেওয়ার জন্যে বেকার স্ট্রীটের আইবুড়ো মন্দিরে হাজির হল সরকারী গোয়েন্দা।

শার্লক হোম্‌স্‌ তখন সবে বিদেয় করেছে লর্ড সাইমনকে। কেসটা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শুনে নিয়ে মনে মনে সাজিয়েও ফেলেছে। সামান্য দু-চারটে প্রশ্ন অবশ্য করেছিল। লর্ড সাইমন তার জবাবে বলেছেন, ফ্লোরা মানে তাঁর সদ্য উধাও বউটোর মাথাটা বিয়ের আগে থেকেই একটু বেসামাল ছিল বলে মনে হয়। নইলে ফ্লোরার ভয়ে এ-ভাবে কেউ পালায়? ফ্লোরার সঙ্গে সাঁটঘাট ছিল কিনা? তা হ্যাঁ, একটু আধটু ছিল বইকি। বিয়ের আগে কার না থাকে? তাই বলে বাড়ী বয়ে বিয়ে ভণ্ডুল করতে আসবে? এত বড় স্পর্ধা! ফ্লোরাকেও বলিহারি যাই। বিয়ে করতে গেল হাসতে হাসতে। বরকে নিয়ে ফিরে এল মুখখানা তোলাহাঁড়ির মত করে। গির্জের মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাওয়ার সময়ে হাতের ফুলের তোড়াটা পড়ে গেল মেঝেতে। এক-

জন গেঁইয়া টাইপের লোক তুলে দিলে হাতে। তারপরেই বাড়ী ফিরে এসে ওর বাপের বাড়ীর ঝি-কে ডেকে কি যে বলল ভগবান জানেন। একটা কথা শুধু কানে এসেছিল। কথাটা আমেরিকার চাষাড়ে লোকদের মধ্যেই চালু। কথাটার সাদা মানে হল, আগের জিনিসের ওপর দাবী নিয়ে তা দখল করা।

ঝি-য়ের সঙ্গে গজর গজর করার পরেই হাওয়া হয়ে গেল কনে। ব্যাপারটা সিরিয়াস। লর্ড সাইমনের ইজ্জৎ বলে একটা কথা আছে!

সব শুনে নিয়ে লর্ডকে বাড়ী ফেরৎ পাঠাল হোমস। তারপরেই ধূর্ত হাসি হেসে ঘরে ঢুকল লেসট্রেড।

সোল্লাসে বলল হোমস্—'আসা হোক! আসা হোক! কিন্তু কোটের হাতা ভিজে কেন বৎস?'

'সার্পেন্টাইনে জাল ফেলছিলাম যে।'

'জাল! সার্পেন্টাইনে। কেন?' চোখ কপালে উঠে গেল হোমসের।

'লেডী সাইমনের লাশ তোলার জন্যে।' হোমসের অজ্ঞতা দেখে অনুকম্পার সঙ্গেই বলল লেসট্রেড। সেই সঙ্গে বললে লেডীর জামাকাপড় পাওয়ার বৃত্তান্ত। এমন কি ফ্লোরা মিলার যে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত, তার প্রমাণ পর্যন্ত নাকি পাওয়া গেছে লেডীর পোশাকের পকেটে।

অতি তুচ্ছ প্রমাণ। একটুকরো ছেঁড়া কাগজ। তার ওপর পেন্সিল দিয়ে লেখাঃ 'একটু সামলে নিয়ে দেখা করো আমার সঙ্গে।

—এফ, এইচ এম।''

মোক্ষম প্রমাণ। ফ্লোরা মিলারকে ঘানি ঘুরিয়ে ছাড়বে লেসট্রেড এই একটা প্রমাণের জোরে।

ভীষণ উৎসুক হয়ে কাগজটা হাত পেতে নিল হোমস্। দেখতে দেখতে চোখে মুখে ফুটে উঠল প্রচণ্ড কৌতুক। অট্টহাসি হেসে বললে—'সাবাস!'

'কিন্তু একী! আপনি উল্টো দিকে দেখছেন কেন?' আঁৎকে উঠল লেসট্রেড।

'উল্টো কোথায়? ঐটাই তো সোজা দিক হে! হোটেলের বিলের ছেঁড়া টুকরো তো! পেছনের হিসেবটাই আসল।'

'ও হিসেব আমিও দেখেছি। চৌঠা অগাস্টের তারিখ আর ঘরভাড়ার জন্যে ৮ শিলিং দেওয়া হয়েছে জেনে আমার লাভ? রেটটা যদিও চড়া—'

আরেক দফা অট্টহাসি হেসে হোমস বললে—'বৎস লেসট্রেড, শুধু একটা কথাই শুনে যাও। লেডী সাইমন বলে কেউ নেই, কোনোকালেই ছিল না।'

বিমূঢ় লেসট্রেড বিদেয় হতেই সুট করে বেরিয়ে পড়ল শার্লক হোমস। ওয়াটসন বেচারী বসে রইল একা একা। কিছুক্ষণ পরেই হোটেল থেকে লোকজন এসে পাঁচ-জনের খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল টেবিলে। ওয়াটসন বুঝল না কেন এই রাজসিক আয়োজন। তারও অনেকক্ষণ পরে হোমস্ ফিরে এসে বললে—'যাক, খাবার এসে গেছে। তাঁরাও এলেন বলে।'

'কারা?'

'লর্ড সাইমন এবং আরো দুজন।'

বলতে না বলতেই ঘরে ঢুকলেন লর্ড সাইমন। চোখ মুখ লাল। ভীষণ উত্তেজিত, বিচলিত এবং হতচকিত।

'কি বলছেন মশায়?' টেবিল চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন লর্ড। 'আপনি ঠিক জেনে বলছেন তো?'

'ঠিকই বলছি।'

'কিন্তু এ সে সাংঘাতিক অপমান', ঠকাঠক ঠকাঠক শব্দে টেবিলে আঙুল বাজাতে লাগলেন লর্ড। পরক্ষণেই তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে কটমট করে চেয়ে রইলেন দরজার দিকে।

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন একজন ডানাকাটা পরী। পাশে একজন ছোটখাট চেহারার চটপটে লোক।

পরিচয় করিয়ে দিল শার্লক হোমস্—'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ফ্রান্সিস হে মুলটন!'

'ফ্রারা! বজ্রকণ্ঠে হুংকার ছাড়লেন লর্ড।

ডানাকাটা পরীটি এগিয়ে এসে মিষ্টি হেসে বললে—রবার্ট, খামোকা রাগ করো না। ফ্রান্সিসের সঙ্গে অনেক আগেই গোপনে বিয়ে হয়ে গেছিল আমার। বাবা জানতেন না। ফ্রান্সিস গরীব ছিল বলে জানাইনি। কিন্তু ও পণ করেছিল আরো বড় খনির মালিক হয়ে এসে তবে আমাকে ঘরে নিয়ে যাবে। কিন্তু বছর খানেক পরেই খবরের কাগজে ওর নাম দেখলাম—খনি দুর্ঘটনায় মারা গেছে। তারপরেও অনেকদিন বসে থাকার পরেও যখন ও এল না, [illegible]বার জেনে আমার দেহটা তোমাকে দেব ঠিক করলাম—মনটা নয়। তুমি বলো আমি ঠিক করেছি না বেঠিক করেছি?'

'আমি চললাম।' কাঠের পুতুলের মত পা বাড়ালেন লর্ড।

'কোথায় যাবেন? খেয়েদেয়ে তারপর যাবেন।' বলল হোমস্।

'এর পরেও খাওয়া নামবে গলা দিয়ে?' বলে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে উধাও হলেন লর্ড সাইমন।

বেচারা! নাকের ডগা দিয়ে ফস্কে গেল রাজকন্যা এবং আধখানা রাজত্ব। কিন্তু রহস্য সমাধানের সূত্রগুলো এখনো আপনার সামনে থেকে পালাতে পারেনি। সামনেই আছে। বলুন দিকি কী?

—অদ্রীশ বর্ধন

(গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান ৫২ পৃষ্ঠায়)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সপ্তম জাতীয় গ্রন্থমেলা

সপ্তম জাতীয় গ্রন্থমেলার আয়োজন করা হয়েছে হায়দরাবাদ নগরীতে। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ৭-১৬ তারিখ পর্যন্ত সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে এই গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য বারের মতো এবারও এই উপলক্ষ্যে ইংরেজী ও ভারতের সমস্ত ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। ১৯৭৩ ও '৭৪ সালে প্রকাশিত গ্রন্থগুলিই কেবল এই প্রদর্শনীতে স্থান পাবে। গ্রন্থমেলায় প্রদর্শিত গ্রন্থগুলি পরে আবার আঞ্চলিক গ্রন্থ প্রদর্শনীতে স্থান পাবে, কাজেই এসব গ্রন্থ ফেরং দেওয়া হবে না। এই গ্রন্থমেলায় 'স্টল' নিতে ইচ্ছুক প্রকাশকগণ ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, এ-৫, গ্রীণ পার্ক, নিউদিল্লী।

উদ্ভিদের সুরপ্রীতি

এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আচার্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ-জগৎ সম্পর্কে যে যুগান্তকারী তথ্য নিজেরই উদ্ভাবিত যন্ত্র-সমূহের সাহায্যে সংগ্রহ করেছিলেন, তা যথার্থই বিস্ময়কর। তারপর থেকে দেশ-বিদেশের বহু বিজ্ঞানী তথা চিন্তাবিদ এসম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন এবং তার ফলে অনেক নতুন নতুন তথ্যও জানা গিয়েছে। সম্প্রতি পিটার টম্পকিনস এবং ক্রিস্টোফার বার্ড 'দি সিক্রেট লাইফ অব প্ল্যান্টস' নামে যে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছেন, তা ইয়োরোপ-আমেরিকাতে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই লেখকদ্বয়ের মতে উদ্ভিদ-জগতের নিকট সুর ও সংগীত অত্যন্ত প্রিয়। কেবল তাই নয়, আচার্য জগদীশচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁরা আরও বলছেন যে, উদ্ভিদ-জগৎ ভাব 'বিনিময়েও' সক্ষম। উদ্ভিদের স্মৃতি আছে ও সূক্ষ্ম অনুভবের শক্তিও আছে। মানুষ সংগীতপ্রিয়, তাই মানুষের প্রতি উদ্ভিদের একটা বিশেষ ধরনের 'ব্যবহার' লেখকদ্বয় লক্ষ্য করেছেন। উদ্ভিদের জন্য যাদের হৃদয়ে সহানুভূতির অভাব আছে, বা সাধারণত উদ্ভিদের অনিষ্ট করে থাকে, অন্য পাঁচজন মানুষের মধ্য থেকে সে-রকম ব্যক্তিকে উদ্ভিদ 'চিহ্নিত' করতে সক্ষম। এজন্য তাঁরা একটি যন্ত্রও উদ্ভাবন করেছেন।

পরলোকে নাট্যকার হরিমদন গুরুং

নেপালী ভাষার প্রখ্যাত নাট্যকার হরি-মদন গুরুং সম্প্রতি দার্জিলিং-এ পরলোক-গমন করেছেন। তিনি ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের অধীনে নাটক ও সংগীত বিভাগের কর্মকর্তা হিসেবে বিশেষ কর্ম-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি আধুনিক নেপালী ভাষার জনপ্রিয় লেখক-গণের অন্যতম ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনীষীদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন

ডিসেম্বর মাসে (৯ই) এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় উপমহাদেশের আটজন জীবিত ও মৃত কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, শিল্পী ও শিক্ষাব্রতীকে সম্মানসূচক ডক্টরেট দান করেছেন। এ'দের মধ্যে আছেন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী স্বর্গত অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, স্বনামধন্য ভাষাতত্ত্ববিদ ও সাহিত্য-সমালোচক স্বর্গত ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ, বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, ডঃ মহম্মদ কুদরৎ-ই

শুদ্দা, ডঃ হীরেন্দ্রলাল দে, অধ্যাপক আবদুল ফজল এবং কাজি মোতাহার হোসেন।

পরলোকে ওয়াল্টার লিপম্যান

স্বনামধন্য আমেরিকান সাংবাদিক ও লেখক ওয়াল্টার লিপম্যান গত ১১ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বৎসর। সাকুল্যে তিনি উনিশখানা বই লিখে গেছেন। তার মধ্যে তাঁর রচিত প্রথম বই 'এ প্রিফেস টু পলিটিক্স' বিগত অর্ধশতাব্দী কাল ধরেই একখানা জনপ্রিয় বই হিসেবে স্বীকৃত। 'টুডে অ্যান্ড টুমরো' নামে তাঁর কলামগুলি এক সময়ে আমেরিকার সমস্ত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক পত্রে নিয়মিত প্রকাশিত হতো। সমসাময়িক রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর এইগুলিতে যে বলিষ্ঠ অভিমত প্রকাশিত হতো, তার দ্বারা অনেক সময় বিশ্ব-রাজনীতি পর্যন্ত প্রভাবিত হতো। তিনি ভারতের একজন অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন।

রুমানিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির আসর

কিছুদিন আগে রুমানিয়ার সরকারের আমন্ত্রণে একটি ভারতীয় শিল্পিগোষ্ঠী রুমানিয়া গিয়েছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে এই গোষ্ঠীতে ছিলেন প্রখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী, মাদ্রাজের ভারত নাট্যম শিল্পী শ্রীমতী কনক এবং ওড়িশার কথককাশিল্পী শ্রীমতী রাণী করণ। এই শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রেস কনফারেন্সে রুমানীয় বিদগ্ধজনের যে আলোচনাদি হয়, তা পরে বুখারেস্ট রেডিও থেকেও প্রচার করা হয়। একটি অনুষ্ঠানে অন্যান্য কবিদের রচনার সঙ্গে কাজি নজরুল ইসলামের 'ছাত্রদল' কবিতা থেকেও কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করা হয়।

—জরৎকার,

নতুন বই

সাগর দেখা। বিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত। প্রাপ্তিস্থান বুকফ্রেন্ড। ৮।১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কোলকাতা-১২। দাম সাত টাকা।

কোলকাতা মাঠের দুই প্রধানের মধ্যে অন্যতম প্রধান হোল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। শুধু কোলকাতা নয়, ভারতবর্ষের ক্রীড়া ইতিহাসে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এক গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কোলকাতায় সিনিয়র ডিভিসন লীগ থেকে শুরু করে দিল্লী বোম্বাইয়ের ডুরান্ড, রোভার্স পর্যন্ত এর সাফল্যের ক্ষেত্র প্রসারিত।

বিনয়ভূষণ সেনগুপ্তের 'সাগর দেখা' গল্প বলার ভঙ্গিতে লেখা বহু গৌরবের অধিকারী ইস্টবেঙ্গল দলের ইতিহাস। লেখক বেশ সরসভাবেই ইস্টবেঙ্গল দলের জয়-পরাজয়ের সুখ-দুঃখের কথা আকর্ষণীয় করে উপস্থাপিত করেছেন। 'সাগর দেখা'-র সবচেয়ে যা প্রয়োজনীয় অংশ তা হোল ১৯২০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল দলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এক নজরে ইস্টবেঙ্গল দলের দীর্ঘদিনের ইতিহাস এই অংশে সহজেই দেখে নেওয়া যায়। দলের সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য—যেমন ১৯৫৩ সালে রাশিয়ায় কিয়েভ ডাইনামোর কাছে ১—১৩ গোলে পরাজিত হওয়া (সর্বকালের সবচেয়ে বড় পরাজয় হিসেবে লেখক চিহ্নিত করতে চেয়েছেন) 'ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে বিপক্ষ দলের আত্মঘাতী গোল' 'বিদেশী দলের সঙ্গে খেলার বিবরণ' 'দলে কোন্ খেলোয়াড় সবচেয়ে বেশী দিন খেলেছেন', 'দলের সবচেয়ে বেশী গোল দিয়েছেন' এমনি সব মূল্যবান তথ্যে বইখানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। ক্রীড়ারসিক পাঠকমাত্রেরই এটি সংগ্রহে রাখা দরকার। তবে একটা কথা বলার আছে, এই ধরনের খেলাধুলো সম্পর্কিত বইতে ছবির একটা অনিবার্য প্রয়োজন থাকে। বইখানিতে একখানিও ছবি নেই। ছবি থাকলে এবং প্রচ্ছদটিকে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করলে ভালো হোত। ছাপা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন।

জন্মান্তরবাদ। হৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য। মহেশ লাইব্রেরী ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দু টাকা।

মানুষের জন্মান্তর নিয়ে অনেক দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হয়েছে। প্রত্যেকটি ধর্ম তাঁদের নিজ নিজ চিন্তানুযায়ী জন্মান্তর রহস্য উন্মোচনে সচেষ্ট হয়েছেন। শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য গীতা, হিন্দু শাস্ত্রাদি থেকে নানান বিষয় উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন, জন্মান্তরবাদের অন্তর্নিহিত সত্য। বস্তুত ধর্মীয় ভিত্তিতে 'জন্মান্তরবাদ'-এর পরিচয়দানই এ-গ্রন্থের অন্যতম লক্ষ্য। তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে আত্মার জীবনস্বরূপ, কর্মফল, পুনর্জন্ম, আত্মার ক্রমোন্নতি, বিশ্ববিখ্যাত মিডিয়াম ম্যাডাম ডি এসপ্যারান্সের উক্তি উদ্ধৃত করে মানুষের জন্মান্তর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা যোগ করেছেন। গ্রন্থটি ধর্মজিজ্ঞাসু, দার্শনিক, অধ্যাত্মপ্রাণ ও সাধারণ পাঠকদের সার্বিক ঔৎসুক্য জাগাতে সক্ষম।

সূর্যমুখী সকাল চাই (কাব্য সংকলন)। তপন বিশ্বাস। সুবোধ বুক স্টল, ৭১।২, বিধান সরণি, কলকাতা-৬। চার টাকা।

শ্রীতপন বিশ্বাস বয়সে তরুণ, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাবও বেশী দিনের নয়। 'সূর্যমুখী সকাল চাই' গ্রন্থটি কবির প্রথম কাব্য সংকলন। কবি বস্তু-জগতকে কবিতা থেকে বাদ দেননি, আবার শুধুমাত্র বাস্তব জগতের নীরস চিত্র রচনা করেই কাব্য বক্তব্য শেষ করেননি। কয়েকটি কবিতায় কবির কবি-ক্ষমতার পরিচয় আছে। কোন কোন কবিতায় আবেগ-উচ্ছ্বাস তীব্র হওয়ায় এবং সংযম না থাকায় ছন্দে, চিত্রকল্পে ও কাব্যের ভাষায় কিছু গতানুগতিকতা, ক্লান্তি, মন্থরতা, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ঘটে গেছে। ছন্দ-ভাবনা সব কবিতায় নির্ভুল নয়। তবু প্রথম কাব্যগ্রন্থে কবির কিছু ক্ষমতার স্বাক্ষর আছে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কণ্ঠস্বর। সত্যরঞ্জন বিশ্বাস সম্পাদিত। ১১।২, টেমার লেন কোলকাতা-৯। দাম তিন টাকা।

পত্রিকার চরিত্রে চমক সৃষ্টির প্রয়াস রয়েছে। সাফল্যের ব্যাপারটা বিতর্কিত। লিখেছেন—অমিতাভ চক্রবর্তী অমিতাভ চৌধুরী দিলীপ গুপ্ত এবং আরও কয়েকজন।

প্রগতি। মৃণাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৩৯বি, ডেন্টমিশন [illegible]। কোলকাতা-২৩। দাম তিন টাকা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র কৃষ্ণ ধর গৌরাঙ্গ ভৌমিকের কবিতা নরেন্দ্রনাথ মিত্র সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ দক্ষিণারঞ্জন বসুর গল্প এবং হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সুখরঞ্জন চক্রবর্তী ভবতোষ দত্ত এবং দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখ করার মতো।

আড্ডা। সম্পাদক রেখা চট্টোপাধ্যায়: ৭৩, শরৎ বোস রোড, কোলকাতা-২৬। দাম চার টাকা।

লিখেছেন রমা চৌধুরী শঙ্করপ্রসাদ মিত্র তপতী মুখোপাধ্যায় (রায়) ভোলানাথ শীল আশাপূর্ণা দেবী এবং আরও অনেকে। সাক্ষাৎকারগুলি উল্লেখ করার মতো।

পল্লীরূপা। নিখিলরঞ্জন মাইতি সম্পাদিত। ময়না, মেদিনীপুর। দাম দু' টাকা।

একক। শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্পাদিত। ১০-৩সি নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীট কোলকাতা-২৬। দাম দেড় টাকা।

লিখেছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র সুশান্ত বসু অশোককুমার দত্ত অংকুর সাহা কৃষ্ণসাধন নন্দী চন্দন দাশগুপ্ত সাগর বসু এবং আরও অনেকে।

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গুরুদেবের এ-পত্রটি পড়ে আমার মন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বিশেষ করে তাঁর শেষ ছত্রটির প্রসাদে। কারণ আমি বরাবরই কৃষ্ণকে পূর্ণাবতার মনে করতাম বলে বলতাম প্রায়ই তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও বিভূতি স্মরণ করে যে, যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আছেন সেখানে শেষরক্ষা হবেই হবে প্রেমের দিগ্বিজয়ে ধ্রুব নীতির প্রবর্তনে। ভরসাটি দিয়েছিলেন সঞ্জয় গীতার শেষে পুলকিত হয়ে—গেয়ে 'হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ'। আমার চিরদিনই মনে হয়েছে—কৃষ্ণের ভাগবত মহিমায় যারা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে অক্ষম তারা আজীবন একটি মহানন্দ থেকে বঞ্চিত থেকে যায় দেখতে না পেয়ে যে, একবার অন্তত ভগবান প্রত্যক্ষ মানুষী তনু ধরে পৃথিবীতে নেমেছিলেন, পেরেছিলেন শুধু নিজের পূর্ণিমা প্রকাশকে সম্ভব করে দিব্য পরা প্রকৃতিকে অবতীর্ণ করতেই নয়—তাঁর অপরূপ রূপৈশ্বর্যের মাধ্যমে প্রেম জাগিয়ে আমাদের বিষম ধরাধামে নিখুঁৎ আনন্দ-বৈকুন্ঠের স্বর্ণদ্বার উদঘাটন করতে—

নেচে গেয়ে হৃদয় ছেয়ে
ফুল ফুটিয়ে কাঁটাবনে
অতুল হাসির অকূলবাঁশির
ঘরছাড়া প্রেম-উন্মাদনে।

বাইশ

আমি কৃষ্ণ ও গঙ্গা সম্বন্ধে লিখেছি যে, ছেলেবেলায়ই আমার মনে বিশ্বাস এসেছিল তেমনি সহজে 'নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে।' *এ উদ্ধৃতিটি পুরোপুরি সুপ্রযুক্ত হয়েছে কেবল কৃষ্ণের ক্ষেত্রে। কারণ আমার মনে নাস্তিক বুদ্ধির জটলা মেঘের মতন আস্তিক্যের আলোকে ঢেকে দিয়েছিল প্রথম দিকে (যেকথা আমার 'স্মৃতিচারণ'-এ বলেছি)। সে-আঁধারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃতই উষার আলোর মতন নেমে এসেছিল কৃপারূপে, যে-আলো মাঝে মাঝে সংশয়ের বাদলে ম্লান হলেও মরিয়া-না-মরে-রামের মতনই ফের জেগে উঠত। কিন্তু গঙ্গার ক্ষেত্রে সংশয় আসে নি কোনোদিনই। পুরাণে আছে সতী দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করার পর জন্ম নিয়েছিলেন হিমালয়ের ঘরণী মেনকার গর্ভে যুগল কন্যারূপে—উমা ও গঙ্গা—উভয়েই শিবের ঘরণী। ভেবে পার পেতাম না কৈশোরে। কিন্তু গঙ্গা শিবজায়া কি না এ-বিষয়ে ধাঁধায় পড়লেও তিনি যে দেবী এ-সম্বন্ধে মনে একবারও সংশয় আসে নি। পিতৃদেব ভক্তির গান বেঁধেছিলেন—কৃষ্ণ, শিব কালী গঙ্গা শ্রীচৈতন্য ও জন্মভূমি দেবিকাকে অর্ঘ দিয়ে। তাঁর মুখে এসব দেব দেবীর গানে আনন্দে বিভোর হয়ে তাঁর সঙ্গে দোয়ার দিতে দিতে অজান্তেই হয়ে উঠেছিলাম প্রতিমাপূজারী—যার ফলে প্রতিমা দেখলেই প্রণাম করতে আনন্দ পেতাম। কিন্তু সব প্রতিমাকেই প্রণম্য বলে বরণ করলেও সবচেয়ে গভীর আনন্দ পেতাম কৃষ্ণ বিগ্রহকে গড় করে। বলেছি. শ্রীঅরবিন্দ ঠিকই ধরেছিলেন যে, কৃষ্ণ সংস্কার যার মজ্জাগত তার কাছে সুপ্রামেন্টালের অত্যধিক গুণগান করা নিষ্ফল। কিন্তু আশ্চর্য সহিষ্ণু হওয়া সত্ত্বেও তিনি অবশেষে আমাকে তিরস্কার করতে বাধ্য হয়েছিলেন আমি দেখেও দেখতে চাইনি বলে যে সুপ্রামেন্টাল কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী নন—পরিপূরক। একথা আমি খুশী মনেই মেনে নিয়েছিলাম সুপ্রামেন্টাল সম্বন্ধে তাঁর উদ্দীপক চিঠিটি পড়ে। কিন্তু বিদেহ সুপ্রামেন্টালকে আমার কৃষ্ণপূজারী মনে সশ্রদ্ধে ঠাঁই দিলেও ভালোবাসতে পারিনি যেমন পেরেছিলাম কৃষ্ণ ও গঙ্গাকে। এ-প্রত্যয়টির পুনরুক্তি করছি এই জন্যে যে পন্ডিচেরি আশ্রমের আবহে কৃষ্ণ সুপ্রামেন্টালের নিচে স্থান পাওয়ার জন্যে আমি মনে সত্যিই গভীর বেদনা বোধ করতাম যার ফলে থেকে থেকে রুখে উঠে বলতাম : 'সুপ্রামেন্টাল আমার মাথায় থাকুন, কেবল কৃষ্ণ যেন থাকেন আমার হৃদয়ে।' পন্ডিচেরি আশ্রমে শুনতাম প্রায়ই যে মানুষের চেতনার যতই বিকাশ হয় ততই সে অতীতের দিকে ফিরতে না চেয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগুতে চায়। শ্রীঅরবিন্দের বিখ্যাত

> "We do not belong to the past dawns but to the noon of the future"

মন্ত্রটি আমি থিওরিতে সাদরেই বরণ করে নিয়েছিলাম। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখতাম যে, কৃষ্ণই বার বার যেন উঁকি মেরে আমার দিকে চেয়ে হাতছানি দিতেন বিগত উষার অস্তাচল থেকে চিরন্তন নবারুণের মতন। মাঝে মাঝে নিজেকে নিশুনা করেই চুপি চুপি হাসতাম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি রসাল কথিকা স্মরণ করে : এক কালীভক্ত ব্রাহ্মণকে এক পালোয়ান মোল্লা জোর করে কলমা পরিয়ে মুসেলমান করে বলে : 'এখন থেকে বল্ আল্লা, আল্লা—কালী বললেই তোর মুন্ডপাত করব।' বেচারী কী করে? বিমনা হয়ে জপ করে : 'আল্লা আল্লা আল্লা...... জগদম্বা...... আল্লা, হো আল্লা...জগদম্বা।' মোল্লা রেগে তাকে কাটতে যেতে সে করজোড়ে বলে : শেখজী, অপরাধ নেবেন না—আমি অপ্রাণ চেষ্টা করছি আল্লামন্ত্র জপ করতে, কিন্তু মা জগদম্বা আমার বুক জুড়ে আছেন, তিনি থেকে থেকে আল্লাকে ঠেলে বেরিয়ে পড়ছেন।' সুপ্রামেন্টাল আমার কাছে হয়ে উঠেছিল আল্লার মতন বিধর্মী এমন ইঙ্গিত করছি না, তবে কৃষ্ণ যে ঐ ব্রাহ্মণ বেচারীর মতন আমার বুক জুড়ে ছিলেন একথা বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না।

কিন্তু তা বলে আমি সুপ্রামেন্টালের প্রতি অপ্রসন্ন একথা বললে আমার বুদ্ধিকে অযথা অপদস্থ করা হবে। সুপ্রামেন্টাল সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের উচ্ছ্বাসে থিওরিতে আমি সত্যিই সাড়া দিয়েছিলাম। তাই বিশ্বাস করেছিলাম যে তিনি নিশ্চয় অবতীর্ণ করাবেন এ [illegible] নরদেবকে যাঁর আবির্ভাবে এ-ধূলিধামে মানুষের নবজন্ম না হোক চেতনার নববিকাশের পথ খুলে যাবে। তাছাড়া যে-নবারুণের স্বর্ণপ্রভায় মানুষ তার সুদুর্লভ ইষ্টের সঙ্গে কথালাপ করতে পারবে সে-উদয়কে কোন্ মূঢ় না বরেণ্য বলে মেনে বরণ করতে চাইবে? আর শুধু কথালাপই তো নয়—মানুষের রোগমুক্তি হবে, দুঃখশোকের নিরসন হবে—বারবার ওঠার পরে পড়তে হবে না আমরা অভীপ্সার পাখা মেলে উড়ে চলব মেঘলোকে

---

* চরণ ধরে আছি পড়ে একবার চেয়ে
দেখিস না মা।
মত্ত আছিস আপন খেলায়, আপন
ভাবে বিভোর বামা ; ..
আয় মা এখন তারারূপে স্মিত মুখে
শুভ্রবাসে
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা
যেমন নেমে আসে।
(দ্বিজেন্দ্রলাল)

উত্তীর্ণ হয়ে তারালোকে—এমন-যে জাদুকর বরদাতা তাকে না চাইবে কোন্ অর্বাচীন? কেবল মুস্কিল এই যে আমাদের মনতরুর নানা শাখায় নানা রঙের নানা মেজাজের পাখী নীড় বাঁধে—যেকথা শুধু শ্রীঅরবিন্দ না মহামনীষী গেটেও বলতেন উঠতে বসতে। (গেটে তাঁর ZUR MORPHOLOGY-তে লিখেছিলেন :

> "Every living being is not a unity but a plurality. Even when it appears as an individual, it is the reunion of beings living and existing in themselves"

অর্থাৎ কোনো মানুষই একলা নয়—অনেকগুলি মানুষের সমষ্টি—যদিও বাইরে থেকে দেখতে একলা মনে হয়।) ফলে কখনো এ-পাখীর গানের আস্থায়ীকে ও-পাখীর অন্তরা ঢেকে দিত—কখনো ও-পাখী এ-পাখীকে থামিয়ে গান শুরু করত। আমি তাই বারবার নিজেকে ধমকিয়েও শুধু যে সুপ্রামেন্টালের পায়ে গড় করতে পারতাম না তাই নয়, তাঁর কাছে হাতজোড় করতেও বাধত—মনে হত আগুনের ছবিকে কেমন করে আগুনের মান দিই? কৃষ্ণের সম্বন্ধে বেশি কিছু না জানলেও অন্তরে তাঁর বাঁশি শুনেছি শ্রদ্ধেয় ভক্তদের আত্মকথায় তাঁর নূপুরধ্বনি—কিন্তু সুপ্রামেন্টালের ছায়াপথের একটুকরো রশ্মিও যে আমার চলার পথে কখনো আলো ধরে নি, এমনকি চকিত আভাসও পাইনি আমার কল্পনার গুঞ্জনে বা বুদ্ধির অনুধ্যানে।

একদা এই ধরনেরই একটি মন্তব্য করেছিল আমার এক প্রিয় গুরুভাই জে এ চ্যাডউইক ওরফে আর্জব বলেছিল : 'তুমি জানো দিলীপ শ্রীঅরবিন্দকে আমি কী গভীর শ্রদ্ধা করি, কিন্তু চমকে উঠতে হয় অতিমানস আলোর অবতরণ সম্বন্ধে তাঁর বাণী শুনে। সত্যিই কি এ-অলোক আবির্ভাব হবে আমাদের ম্লান পৃথিবীতে?

> ("Sri Aurobindo takes one's breath away, Dilip, but will the Supramental really take birth in this our dismal earth?")

চ্যাডউইকের কথা বলি এবার সংক্ষেপে। তার অসামান্য বুদ্ধি প্রতিভা—সর্বোপরি, আন্তরিকতা—আমাকে শুধু যে সাধনায় উৎসাহ দিত তাই নয়, যোগাত মনের খাদ্য কবিতার প্রেরণা, স্বাধীন চিন্তার উদ্দীপনা। সে প্রায় দেড় বৎসর ছিল আমার পাশের ঘরে স্মরণীয় কালনীয় সতীর্থ হয়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সে (কৃষ্ণপ্রেমের মতনই) য়ুরোপীয় সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে এসেছিল ভারতবর্ষে আত্মিক পথের দিশা খুঁজতে। যুদ্ধে আহত হয়ে সে দুর্বল ও ঈষৎ পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। আমাকে আরো বলেছিল যে, সে বেশিদিন বাঁচবে না বাঁচতে চায়ও না—কিন্তু এখানে থেমে একটু পিছিয়ে গিয়ে বলি—সে কীভাবে পণ্ডিচেরিতে এসেছিল যার ফলে তার জীবনে বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল—সে দীক্ষা নিয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের যোগে। ছবিটা আঁকবার মত।

তেইশ

জে এ চ্যাডউইক আমার কাছে এসেছিল লখ্নৌ থেকে আমার বন্ধু শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি চিঠি নিয়ে। ধূর্জটি সে সময়ে ছিল লখনৌয়ের অধ্যাপক। চ্যাডউইকও তাই, কাজেই ধূর্জটির সতীর্থ। ধূর্জটি লিখেছিল তার সম্বন্ধে যে, সে ভারতবর্ষে এসেছে জিজ্ঞাসু হয়ে—গীতার জিজ্ঞাসু যে ভগবানকে জানে না কিন্তু জানতে চায় ভগবত্তত্ত্ব অসামান্য বুদ্ধি......ইত্যাদি।

চ্যাডউইক আমাকে বেশি কিছু খুলে বলেনি, কেবল বলেছিল যে সে অধ্যাত্ম সত্যের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিল—কিন্তু সে-সত্যের কোনো দিশা পায় নি। আমি জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল—শ্রীঅরবিন্দের নাম শুনে কয়েকটি বই কিনেছে কিন্তু পড়ে নি দেশে—ইংলন্ডে ফিরে পড়বে। আমি চ্যাডউইককে বলি শ্রীঅরবিন্দ ধর্ম সম্বন্ধে অনেককেই শুধু দিশা নয় পথের পাথেয় দিয়েছেন কিন্তু তাঁর পূর্ণযোগ সহজ নয়। চ্যাডউইক বলেছিল—সে জানে হাড়ে হাড়ে যে, কোনো বড় প্রাপ্তির পথই সহজ নয়। কিন্তু তখনো পর্যন্ত এমন কোনো পথের নির্দেশ পায়নি যে-পথে পদযাত্রা করা তার পক্ষে সম্ভবপর। কাজেই সে একটু নিরাশ হয়েই স্বদেশে ফিরে যাচ্ছে। শুনে আমি দুঃখিত হয়ে বলেছিলাম যে ভারতে এসে কোনো ধর্মজিজ্ঞাসু নিরাশ হয়েছে শুনলে আমার মন ব্যথিয়ে ওঠে তবে আমি জানি সময় না হলে ডাক এলেও শোনা যায় না। 'ডাক' বলতে কী বোঝায় জিজ্ঞাসা করাতে তাকে আমি শুধু বলেছিলাম যে, কোনো তীর্থপথে পদযাত্রা করতে যখন মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে তখনই বলা চলে যে যাত্রী ডাক শুনেছে সে-অচিন পথের পথিক হবার। বলে তাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম সে শ্রীমার কথা শুনেছে কিনা। সে 'না' বলে জানতে চাইল তাঁর কথা। উত্তরে আমি তাকে শ্রীমা সম্বন্ধে যা জানি বলে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সে রাজী আছে কিনা। সে পাল্টা প্রশ্ন করল : 'কিন্তু তিনি কি আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হবেন?' আমি বললাম : 'আমি তাঁকে বলে দেখতে পারি।' এ-সম্বন্ধে আমি অন্যত্র লিখেছি ফলিয়েই * তাই এখানে সেসব কথার পুনরুক্তি করব না—সংক্ষেপেই বলব যা বলার আছে।

চ্যাডউইক চলে গেলে শ্রীমাকে জানাতে তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হলেন—, আশ্রমের লাইব্রেরিতে। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কথালাপ বেশিক্ষণ হয়নি—বড়জোর আধ ঘণ্টা। কিন্তু চ্যাডউইক মুগ্ধ হয়ে পরে আমাকে বলল : 'আমি অভিভূত হয়েছি।'

* * *

কয়েকমাস বাদে সে বিলেত থেকে আমাকে লিখল যে, সে যোগার্থী হয়ে আসতে চায় পণ্ডিচেরির। শ্রীমা রাজী হয়ে তাকে লিখতে বললেন সে আসতে পারে। আমার ফ্ল্যাটে দুটি বড় ঘর ছিল, আমার পাশের ঘরেই সে থাকবে স্থির হল।

ফলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল দেখতে দেখতে। সে স্বভাবে কৃষ্ণপ্রেমের মতন মিশুক ছিল না, কিন্তু যেমন নম্র তেমনি স্নেহশীল। আমাকে সে ইংরাজী ছন্দ সম্বন্ধে অনেক সাহায্য করেছিল যখন সে চমৎকার কবি হয়ে ফুটে উঠল। তার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ প্রথম দিকে দীর্ঘ পত্রালাপ করতেন য়ুরোপীয় দর্শন নিয়ে—পরে ইংরাজী ছন্দের নানা খুঁটিনাটি নিয়ে। তার কবিতা আমার বিশেষ ভালো লাগত যদিও তার সব কবিতা আমার কাছে সুবোধ্য মনে হত না। তাই সে আমাকে তার নানা কবিতার মর্ম বুঝিয়ে দিত—শেষে আমাকে বলেছিল যে ইংরাজী ছন্দে আমার কৃতিত্বে সে বিশেষ খুশী হয়েছে।

আমার সবচেয়ে ভালো লাগত যেসব কবিতা সে লিখেছিল শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমা ও Lallia (লিলিয়া) নাম্নী এক ললিতার সম্বন্ধে। এসব কবিতা তার দেহান্তের পরে বিলেতে ছাপা হয়েছিল ১৯৪০ সালে। শ্রীঅরবিন্দ তার লিলিয়ার উদ্দেশে লেখা কবিতাগুলির মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতেন। আমিও বারবার পড়তাম বিশেষ [illegible] তার পদলালিত্যে তথা ছন্দোমাধুর্যে [illegible]। তার অন্য নানা কবিতাকেও শ্রীঅরবিন্দ exquisite, exceedingly beautiful, very original ... ...
ইত্যাদি বিশেষণের শিরোপা দিয়েছিলেন, কিন্তু সেসব কবিতা উদ্ধৃত করা এ-তর্পণে অবান্তর হবে বলে শুধু তিনটি কবিতার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত হলঃ

RED LOTUS

(SRI AUROBINDO'S CONSCIOUSNESS)

O puissant heart amidst whose raptured shrining
A nameless Love is garbed in Name's disguise!

হে মহিমময় প্রাণ—যার মহানন্দের মন্দিরে
উজ্জ্বলে নামের ছদ্মবেশে এক নামাতীত প্রেম!

That living Lotus petal by petal unfolding,
which through the mists of this AVIDYA looms.

সে-প্রাণ-উজ্জ্বল পদ্ম পর পর মেলে দল যার,
অবিদ্যামেঘের মধ্যে অস্ফুট রূপশ্রী তার ভায়।

(ক্রমশ)

---

* SRI AUROBINDO CAME TO ME ১ম সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

চিঠিপত্র

অমৃত প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকার মধ্যে 'অমৃত' যে অতুলনীয় একথা অনস্বীকার্য। শ্রেষ্ঠত্বের দাবী অবশ্য পাঠক-পাঠিকা গোষ্ঠীর বিবেচনাধীন। সর্বশেষ সংযোজনের দিক থেকে 'যুবক-যুবতী' বিভাগটি সকলেরই প্রশংসা কুড়িয়েছে, বিশেষ করে সুদূর পল্লীগ্রামের তরুণ তরুণীদের কাছ থেকে। বিষয় বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে 'অমৃত' যেন বহুল প্রচারিত হয়ে গ্রামে গঞ্জের প্রতিটি মানুষের কাছে একটি সর্বাংগসুন্দর, সর্বজনপ্রিয় সার্থক সাহিত্য পত্রিকা হয়ে উঠুক—এই আশাতেই কিছু সংযোজনের আলোকপাত করছি।

পাঠক মাত্রই চান নতুন কিছু জানতে, শিখতে, দেখতে। আবার এই পাঠকদের মধ্যেই রয়েছে শ্রেণীভেদ। কেউ ভালবাসেন খেলাধুলো, কেউ হয়ত সিনেমা আবার কেউ কেউ রাজনৈতিক সমালোচনা। অনেকের মধ্যে তেমনি হয়ত কেউ ভালবাসেন বিজ্ঞানের কথা। বিজ্ঞান বলতে আমি শুধু গবেষণা বা গবেষক অথবা নতুন কিছু উদ্ভাবনের কথা বলতে চাইছি না। এই গবেষণাগুলি কোথায় হয় এবং গবেষণা কেন্দ্রগুলি কোথায় অবস্থিত (মেলে কেন্দ্রের বহির্দৃশ্য চিত্রসহ) তার সামান্য পরিচিতি সকলেরই (বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীদের জানতে ইচ্ছে করে। 'বিজ্ঞানের কথা' নামক একটি বিভাগ যদিও অমৃতে রয়েছে। শহর কলকাতাবাসীদের কয়েকজনকে বাদ দিয়ে বাকী সবাই এবং গ্রাম বাংলার তরুণ ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীদের একটা নিদারুণ ইচ্ছে হয় এগুলি সম্পর্কে কিছু জানতে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আই আই ই এম, আই এ সি এস, দি রিজিওন্যাল ইন্সটিট্যুট অফ প্রিন্টিং টেকনলজি গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক রিসার্চ ইন্সটিট্যুট, বোস ইন্সটিটিউট, সাহা ইনস্টিট্যুট স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবং পশ্চিমবাংলার বাইরের অন্যান্য কেন্দ্রসমূহ। আশা করছি, বিভাগটি চালু হলে নিয়মিতভাবে প্রতিষ্ঠানসমূহে সংযুক্ত ছাত্র, শিক্ষক, কর্মী কেউ কেউ যা কেউ এগিয়ে আসবেন তাদের প্রতিষ্ঠানকে সকলের চোখে তুলে ধরতে। একজন অনুরাগী পাঠক হিসাবে মাননীয় সম্পাদক মহাশয়কে এদিকটা চিন্তা করতে অনুরোধ রাখছি।

লোকনাথ ঘোষ,
পি জি হল
যাদবপুর, কলি-৭০০০৩২

গণটোকাটুকি

আমরা অমৃত পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। বেশ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ অমৃত পত্রিকায় যুবক যুবতীদের বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তাধারা কিরূপ সেটা জানবার যে প্রচেষ্টা আপনারা চালাচ্ছেন সেজন্য ধন্যবাদ জানাই।

গত ১১ই অকটোবরের সংখ্যায় 'গণটোকাটুকি' এই শিরোনামে যে বিভিন্ন মতামতগুলি প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে কোন ছাত্র, ছাত্রী বা শিক্ষকই ছাত্রসমাজকে দায়ী করেননি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমান এই গণ-টোকাটুকির জন্য কারা দায়ী বা এর উৎস কোথায়? এ বিষয়ে শিক্ষক মলয় দাশগুপ্তের উক্তিটি বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য কেননা 'এই গণটোকাটুকির কারণ হল জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যহীনতা।' আর এই উদ্দেশ্যহীনতা আসছে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব থেকে। যার সংগে লেজুড় হিসেবে কাজ করছে শিক্ষা-ব্যবস্থার বার বার পরিবর্তন। এই দুইয়ের মিলিত ফল শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অশ্রদ্ধা, পরিশেষে প্রমাণিত।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যই যে অসদুপায়ের পথকে প্রশস্ত করেছে সে কথা বলাই বাহুল্য। আর যারা (ছাত্ররা) বিনা পরিশ্রমে সাফল্যে বিশ্বাসী (নকলের মাধ্যমে) তারা সমাজের আবর্জনা বিশেষ। কিন্তু এইসব ছাত্র যারা নকলের মাধ্যমে পরীক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী তারা শিক্ষাক্ষেত্রের একটা সামান্য অংশ জুড়েই রয়েছে। সেই জন্য তাদের নিয়ে যতটা ভয় তার চেয়েও ভয় বেশী, শিক্ষাকর্তৃপক্ষ ও আমাদের সরকারকে নিয়ে। এঁরা পুরানো ব্যাধিকে প্রশ্রয় দিয়ে দুরারোগ্য করবার চেষ্টায় আছেন। পুরানো এই কারণে যে নকলের আসল জন্ম বেশীদিন নয় (পূর্বে অল্প 'নকল' ছিল কিন্তু তা বর্তমানের মত এত বিস্তার লাভ করেনি।) যা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় অন্যান্যদের সঙ্গে একটা 'কমন' ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সনৎ মজুমদার
অমিতাভ ঘোষ
হালিসহর

(২)

গত ১৮ বর্ষ ২৩ সংখ্যা 'অমৃতে' যুবক যুবতী বিভাগে কৃষ্ণা সেনগুপ্ত 'গণটোকাটুকি' শীর্ষক আলোচনায় যে সমস্ত প্রশ্ন রেখেছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বক্তব্য রাখছি হরিপাল বিবেকানন্দ কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র হিসাবে। কৃষ্ণা সেনগুপ্ত প্রশ্ন রেখেছেন কেন এ রকম হচ্ছে? প্রথমেই বলে নিই বিগত দিনের যে 'শিক্ষাব্যবস্থা' চালু আছে তা বর্তমান সমস্যাবহুল জীবনের সংগে সম্পর্কহীন অর্থাৎ অকেজো। বাস্তব বা জীবনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন পরীক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন, নতুন পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র তৈরী, পরীক্ষা-সংস্কার, বৎসরে স্কুল থেকে কলেজ স্তর পর্যন্ত তিন চারিটি পরীক্ষা গ্রহণ করা (কর্তৃপক্ষ আন্তরিকতার সংগে গ্রহণ করবে।) কোর্স অনুযায়ী পঠনপাঠন যথাসময়ে শেষ করা। যতদিন এগুলির ব্যবস্থা না হচ্ছে ততদিন এই গণটোকাটুকি বন্ধ করা একটা সমস্যা। টোকাটুকি করে পাশ করার প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় পড়াশুনার নেশাও অন্তর্হিত হচ্ছে। কম পড়াশুনা করে টোকাটুকির জন্যই ছাত্ররা প্রস্তুত হচ্ছে। আসলে পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুতি নয়। বাৎসরিক বা টেস্ট পরীক্ষাগুলি বিভিন্ন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয় আর অধিকাংশ জায়গায় পরীক্ষাই হয় না, কর্তৃপক্ষ অধ্যাপকগণ ঝামেলা, অপমান প্রভৃতির ভয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যান। 'যা হচ্ছে হোক, যা ইচ্ছে করুক' এই মনোভাব নিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। তাই জাতির প্রয়োজনে এই টোকাটুকি বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অথবা পরীক্ষা গ্রহণে নতুন পদ্ধতি অবলম্বন প্রয়োজন. কর্মমুখী শিক্ষা এখন একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

চঞ্চল সিংহরায়
আড়িয়া, হুগলী।

"যৌনশিক্ষার অর্থনীতি"

১৩ ডিসেম্বরের 'অমৃত' পত্রিকায় উপ-রোক্ত নিবন্ধে শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়ের লেখার উপর নির্ভর করে শ্রীসমর ঘোষ যে বক্তব্য রেখেছেন একজন সাধারণ পাঠক হিসাবে আমি সে সম্পর্কে দু-একটি কথা বলছি।

'জীববিজ্ঞান' ও 'জীবন বিজ্ঞান'—এই দুয়ের মধ্যে অর্থের তফাৎ কেমন কম, মূল-গত তাৎপর্যের প্রভেদও খুব একটা বেশী নয়, (শ্রীঘোষ মহাশয় স্কুলের ছেলেদের নিশ্চয়ই ব্যুৎপত্তিগত মানে বোঝাতে ব্যস্ত হবেন না।) এই কথাই শ্রীঘোষ মহাশয় স্বীকার করেছেন তার বক্তব্যের সমর্থনে প্রদত্ত বিবৃতির তৃতীয় অনুচ্ছেদে। অথচ তিনিই শান্তিলালবাবুর লেখাতে এই ভুল দেখাতে এবং বিকৃত তথ্য অবলোকন করে ঠিকই করেছেন। বিকৃত হাতে বোধ হয় কলম ধরেছেন এবং শান্তিলালবাবুর উপর যে মন্তব্য করেছেন তা দুর্ভাগ্যজনক।

এই কথাটা তো কেউ বোধ হয় ভুলে যান নি যদি আমরা কিছু দিন পিছনে ফিরে তাকাই—আমাদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর বক্তব্য। 'দেশে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে এবং আনু-সঙ্গিক যে সকল সমস্যা দেখা দিচ্ছে তাতে এখনকার ছেলেমেয়েদের এই বিষয়ে অব-হিত করানোর জন্য স্কুলেই যৌনশিক্ষা দেয়া হবে। তবে সেটা জীবন বিজ্ঞান এই বিষয়ের নামেই শিক্ষা দেয়া হবে।' 'মোটামুটি মানে এই দাঁড়ায়, ঠিক সেই সময়েই চারিদিকে কত হই-চই। কাগজে পত্র-পত্রিকায় কতো লেখা-লেখি—এই অমৃতেও বোধ হয় লেখা হয়ে-ছিল। তখন শ্রীসমর ঘোষ মহাশয় সেই সময় কোথায় ছিলেন, কেন প্রতিবাদ করেন নি, বুঝতে পারলাম না।

তাই দেখা যাচ্ছে, আলোচনার খাতিরে শ্রীঘোষ মহাশয় শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়কে যেভাবে আক্রমণ করেছেন, সেটা নিরাশাব্যঞ্জক কারণ প্রথম তিনি ভুল ধরেছেন, পরে আবার নিজেও একই কথা বলছেন এবং পুরো দোষটা শ্রীমুখোপাধ্যায়ের ঘাড়ে চাপিয়েছেন—এটা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়।

শ্রীসমর ঘোষ মহাশয়দের কথা ধার করেই আমি শেষ করছি, 'বিদ্যা বিনয় দান করে।'

অমৃতাংশু পাল
কলকাতা

অমানুষ প্রসঙ্গে

অমৃতের ১৪ বর্ষ ৩২ সংখ্যা ২০শে ডিসেম্বর ১৯৭৪-এ বরাহনগর থেকে শ্রীমতী মিতালী ভট্টাচার্য লিখেছেন কেন 'অমানুষ' ছবির আলোচনায় 'অঘোর দারোগার' ভূমিকা-ভিনেতা অনিল চ্যাটার্জির নাম উল্লেখ করেন নি। শিল্পীর প্রতি চলচ্চিত্র পর্যা-লোচকের কোন বিদ্বেষ নেই। এটি একটি অসাবধানতার ঘটনা।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে 'বাংলা ছবির যে সংকট' চলছে তার থেকে বাংলা ছবিকে বাঁচাতে হলে আধুনিক সমালোচনা নয় বরং লেখার মাধ্যমে অনুপ্রেরণা দেওয়া দরকার। সুতরাং বিগত ছয় মাস ধরে 'অমৃত'র চলচ্চিত্র পর্যালোচক সব বাংলা ছবির মূল বক্তব্য এবং ছবির সঙ্গে জড়িত প্রায় প্রত্যেককেই তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। ওদের কাজের ভালো অংশের পাশে কেবল দুর্বল-তার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে বা আধুনিকভাবে প্রত্যেকটি দৃশ্য সামনে রেখে হিন্দী বা বিদেশী ছবির পর্যালোচনা করা সম্ভব। সংকটের দিনে বাংলা ছবিকে উৎসাহ দান করাই 'অমৃত'র একমাত্র উদ্দেশ্য। বিনীত

চিত্রদূত

অহীন্দ্র চৌধুরী প্রসঙ্গে

(লেখকের উত্তর)

বিগত ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৪ তারিখের অমৃত পত্রিকায় জনৈক পত্রলেখক বিগত ১৫ নভেম্বর ও ১১ অকটোবর অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত আমার নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কিত রচনা প্রসঙ্গে যে পত্রাঘাত করেছেন তার উত্তরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি সুধী পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১। আমার রচনায় প্রকাশিত নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যু দিবস 'রবিবার রাত ২-৩০টা, ৩রা নভেম্বর ১৯৭৪'—এই তথ্য অভ্রান্ত। ইংরেজী মতে রাত ১২টার পরবর্তী সময়ে গৃহীত হলেও বাংলা মতে সূর্যো-দয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময় পূর্ব-বর্তী তারিখেরই অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য 'রাত ২-৩০টা' বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৬ কার্তিক বাংলা তারিখটিও উল্লেখ করা উচিত ছিল।

'বাংলা নাট্যবিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র' পুস্তকের নামের 'বাংলা' কথাটির সঙ্গে 'র' কথাটি মুদ্রিত হওয়া কি তথ্যগত ভুল না মুদ্রণ-ভ্রান্তি? তথ্যগত ভ্রান্তি আর মুদ্রণভ্রান্তির পার্থক্য অনুধাবন করার ক্ষমতা যারা অর্জন করেছেন—তারা কোন সময়ই বর্তমান পত্র-লেখকের মত এমনি পত্রাঘাত করবেন না।

অমৃত পত্রিকায় 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' পুস্তকটির প্রকাশ তথ্যই আমি তুলে ধরে-ছিলাম। অন্য পত্রিকায় কবে কোন অংশ কখন প্রকাশিত হয়েছিল তা তুলে ধরতে চাইনি। এক্ষেত্রে যে ভুল হয়েছে পত্রলেখক সে ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হননি। অমৃত পত্রিকায় ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে রচনাটি প্রকাশিত হয়নি—হয়েছিল ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে।

২। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের পিতার নাম 'ঝাপ্পালাল'-এর স্থানে মুদ্রণ-ভ্রান্তির জন্যই পান্নালাল প্রকাশিত হয়েছে। 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের স্থলে 'নবনাটক' মুদ্রণ আমার নিজের অসাবধানতাবশতঃও মুদ্রিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এবং 'সুলোচনা' চরিত্রের নাম যেখানে উল্লেখ আছে—নাট্য-সাহিত্য নিয়ে যাঁরা বিন্দুমাত্র ঘাটাঘাটি করেন তাঁরা যে এই ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হবেন না—তাঁদের সম্পর্কে এতটা খারাপ ধারণা আমার নেই।

১১ অকটোবরের বিহারীলাল লেখাটির তৃতীয় কলমে পরিষ্কার মুদ্রিত হয়েছে, 'শোভাবাজার রাজবাড়ীতে কৃষ্ণকুমারী নাটকে ভীমসিংহ চরিত্রে চমৎকৃত করেন সকলকে—' এবং বিহারীলাল অভিনীত নাটক ও চরিত্র-গুলির ক্ষেত্রেও 'মাধবাচার্য - মৃণালিনী'র পরিষ্কারভাবে মুদ্রিত হয়েছে। দ্বিতীয়বার 'ভীমসিংহ - কৃষ্ণকুমারী'র স্থানে 'মৃণালিনী কৃষ্ণকুমারী' মুদ্রিত হওয়া যে আমার অজ্ঞতা-প্রসূত নয়—মুদ্রণভ্রান্তি একথা পত্রলেখকের বক্তব্য আর আলোচ্য মুদ্রিত অংশ মিলিয়েই পাঠকসাধারণ অনুধাবন করতে পারবেন।

বিহারীলালসম্পর্কে আমার ইতিপূর্বে-কার গবেষণামূলক প্রবন্ধ যদি পত্রলেখক না পড়ে থাকেন, তবে আমার লেখা 'বাংলা নাট্য-শালার ইতিহাস' পুস্তকটির ২৯৩ পৃষ্ঠা পড়তে অনুরোধ করবো। সেখানে নির্ভুল এবং আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন। তাছাড়া বিহারীলালকে বিস্মৃতির পৃষ্ঠা থেকে 'আমিই' সর্বপ্রথম নতুন করে উদ্ধার করি একথা বাংলাদেশের প্রত্যেক বিদগ্ধজনই জানেন। পত্রলেখক তাঁর অভিযোগে বিহারীলাল সম্পর্কে যে তথ্যগত ভ্রান্তির কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বিহারীলাল পিতামহের মৃত্যুর পর মাতুলা-লয়েই আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই এ সম্পর্কে

...ার পূর্বেকার মন্তব্য বজায় রেখেই ...ছিঃ বিহারীলালের পিতা ঝাম্পালাল চট্টো-...ায় যখন মারা যান বিহারীলাল তখন মাতৃ-...র্ভে ছিলেন। পিতামহ হরলাল চট্টোপাধ্যায় ...রীলালকে প্রতিপালন করেন। মহাত্মা ...শবচন্দ্র সেন তাঁর বন্ধু ও সহপাঠী ...লেন। সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষার ...তুত হবার সময় কেশবচন্দ্র সেনদের কলু-...স্থিত বাড়ীতে গিয়ে অনেকসময় পড়া-...না করতেন। এই সময়ই পিতামহ হরলাল ...ট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। পিতামহের মৃত্যুর ... মাতুলালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় ...হারীলালকে। মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও ... ১৬ বছর বয়সে পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়ে ...গ্লাডস্টোন উইলীর অফিসে কিঠনবীশের ...জ গ্রহণ করতে হয়। বিহারীলাল সম্পর্কিত ...বিশচন্দ্র কিরণচন্দ্র দত্ত অবিনাশচন্দ্র ...গঙ্গুলীর তথ্যমূলক প্রবন্ধগুলি যদি পত্র-...লেখক পড়তেন তবে আমার উক্তির বিরূপ ...তব্য করতেন না।

ঝাম্পালাল স্থলে পান্নালাল ভুলক্রমে ...মুদ্রিত হবার কথা এবং এমনি মুদ্রণ-ভ্রান্তির ...ন্য আমার বা অন্যান্য লেখকদের অসহায়-...ার কথা নিয়ে আলোচনা সত্ত্বেও তাঁর ...কাঘাতের অন্তরালে যে হাসিটি আমার ...াছে প্রকটিত তাতেই বেদনাবোধ করছি।

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

একটি আবেদন

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন সম্বন্ধে আমি একখানা গবেষণামূলক গ্রন্থরচনায় হাত দিয়েছি। আচার্য সেনের মৃত্যুর পর বহু সাহিত্যপত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে লেখা বেরোয়। তারপর তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা বের করে। এই সমস্ত উপাদান বাংলাদেশে সংগ্রহ করা কঠিন। এই পত্রিকার সাহিত্যরসিক বিদগ্ধ পাঠকদের অনেকেই আচার্য সেন সম্বন্ধে উপাদানের খোঁজ রাখেন এ বিশ্বাস আমার আছে। সহৃদয় পাঠকদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি কারও কাছে কোন উপাদানের খোঁজ থাকে অথবা হাতের কাছে উপাদান থাকে তবে দয়া করে আমাকে নিম্ন-ঠিকানায় জানালে অথবা পাঠিয়ে দিলে বাধিত ও উপকৃত হব।

হরলাল রায়
প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহাবিদ্যালয়
বাংলাদেশ

বেতার সংক্রান্ত প্রসঙ্গে

অমৃত পত্রিকার আমি নিয়মিত পাঠক। আপনার পত্রিকাটি বিপুলভাবে সর্বস্তরের মানুষের প্রতিই বিশেষভাবে সাড়া জাগিয়েছে এবং প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করছে তার ইঙ্গিত নিশ্চয়ই আপনারা পাচ্ছেন। ক্রীড়া-মোদী, চলচ্চিত্রামোদী সাহিত্যামোদী প্রভৃতি নানা জনের মনের মত নানা বিষয়ক মনের খোরাক অদ্ভুতভাবে জুগিয়ে ধরছে। প্রতিটি মানুষের কাছেই 'অমৃত' অতুলনীয় এবং অদ্বিতীয়।

এ ধরনের এত সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকা এ-যাবৎ প্রকাশ হয়নি। আরও বিশেষ করে বিক্ষুব্ধ বিভ্রান্ত বঞ্চিত যুব সম্প্রদায়ের মোড় ফেরাবার এক নতুন রাস্তা এনে দিচ্ছে। কিন্তু একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং বিষয়টির ব্যাপারে চিন্তা করতে বিশেষ অনুরোধ করছি—সেটী হলো 'বেতার জগৎ বিষয়ক'। বেতার সংক্রান্ত অর্থাৎ শিল্পীদের সমালোচনা কিংবা তাদের নিজস্ব অভিমত যেমন (ছায়াছবিতে ওঁরা বলেন) এই ধরনের কোন রকম কিছু থাকলে খুব ভাল হয়। অমৃতের ব্যাপক প্রসার ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

অমৃত বিশ্বাস
হাওড়া

রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর বয়স

প্রবীরকুমার ঘোষের চিঠির পরি-প্রেক্ষিতে গত ২০-১২-৭৪ সংখ্যায় 'চিঠিপত্র' বিভাগে প্রকাশিত কাজী মুর্শিদুল আরেফিনের লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর বয়স' শীর্ষক চিঠিখানির উপর আমি কিছু বক্তব্য রাখছি।

তথ্য অনুযায়ী কাজী মুর্শিদুল আরেফিন লিখেছেন, বিয়ের পরে কাদম্বরী দেবী মাত্র পনেরো বছর নয় মাসের মতো বেঁচেছিলেন। অথচ জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্র-নাথ কাদম্বরী দেবী সম্বন্ধে বলেছেন, 'আমাকে কত প্রভাতে কত দ্বিপ্রহরে কত সন্ধ্যাবেলায় সে দেখিয়াছে। কত বসন্তে কত বর্ষায় কত শরতে আমি তাহার কাছে ছিলাম! সে আমাকে কত স্নেহ করিয়াছে, আমার সঙ্গে কত খেলা করিয়াছে, আমাকে কত শতসহস্র বিশেষ ঘটনার মধ্যে খুব কাছে থাকিয়া দেখিয়াছে। যে আমাকে সে জানিত সে সেই সতেরো বৎসরের খেলাধুলো, সতেরো বৎসরের সুখ-দুঃখ, সতেরো বৎসরের বসন্ত বর্ষা। সে আমাকে যখন ডাকিত তখন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অধিকাংশই আমার এই সতেরো বৎসর তাহার সমস্ত খেলাধুলো লইয়া তাহাকে সাড়া দিত। ইহাকে সে ছাড়া আর কেহ জানিত না জানে না!......'

(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ১৯৫ পৃষ্ঠায়) বিয়ের পরে যদি কাদম্বরী দেবী পনেরো বছর নয় মাসের মতো বেঁচে থাকেন (গত ২০-১২-৭৪ সংখ্যায় পত্রলেখকের তথ্য অনুযায়ী লিখিত মতে) তাহলে রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী দেবীর সাথে সতেরো বছর কেমন করে মেলামেশা করেছিলেন? আরও তথ্যসমৃদ্ধ বিস্তারিতভাবে জানার ইচ্ছা রইল। বিশেষতঃ মৈত্রেয়ী দেবী যদি এ বিষয়ে একটু আলোক-পাত করেন তাহলে ভাল হয়। কারণ তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। রবীন্দ্রনাথ অনেক কথা তাঁকে বলতেন। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত অনেক-কিছু তাঁর বেশ ভালভাবে জানা আছে।'

কার্তিক দত্ত
সম্পাদক : 'বিশালাক্ষী'
খোলাপোতা, ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞানের কথা

২২ নভেম্বরের অমৃতে বিজ্ঞানের কথা প্রসঙ্গে 'মহাশূন্যে ঘরবাড়ী' বিষয়ক নিবন্ধে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তাতে বেশ কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে। লেখক দয়া করে আলোক-পাত করুন।

লেখক বলছেন, 'চন্দ্রের কক্ষে এমন দুটি স্থান আছে যেখানে পৃথিবী ও চন্দ্রের মিলিত মাধ্যাকর্ষণ স্থিরতা বজায় রাখে। অর্থাৎ কৃত্রিম কোন উপকরণ যদি এই নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত হলে (?) তারা এই স্থিরতার দরুণ আঁটোসাঁটো হয়েই থাকে—কখনো আলগা হয়ে খসে পড়ে না। এই দুটি নির্দিষ্ট স্থানের অবস্থান চন্দ্রের ১২০ ডিগ্রী আগে ও পিছে।'

চন্দ্রের কক্ষের উপরে কোন উপকরণ স্থাপিত হলে মাসিক পরিক্রমাকালে চন্দ্র তার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাবে। তাহলে সে আঁটো-সাঁটো হয়ে থাকবে কি করে?

চন্দ্রের ১২০ ডিগ্রী আগে ও পিছে কথাটি অর্থহীন। কারণ চন্দ্র আকাশে সঞ্চর-মান জ্যোতিষ্ক। আবার কোন নির্ণয়ের জন্য কোনও স্থির রেখার সাপেক্ষে নির্দেশ থাকা দরকার। কোন বিন্দুর থেকে ১২০ ডিগ্রী আগে ও পিছে বললে কিছুই বোঝা যায় না।

জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বহরমপুর (পশ্চিমবঙ্গ)

কবিতা

আজ ভোরে ॥ মৃগাঙ্ক রায়

কে তুমি এনেছ
ভোর
সোনার থালায়,
সুগন্ধে ভরেছ চারিদিক; আকাশের
গাঢ় নীল ফুলদানী
সাজিয়েছ
সদ্য ফোটা শাদা মেঘে।
কে তুমি
সিঁথিতে পরেছ সিঁদুর
আজ ভোরে।

তুমি কি জান না
আমি মূঢ় যুধিষ্ঠির
পাশায় হেরেছি সব—
ধনরত্ন রাজ্যপাট—
এবং নিজেকে। শুধু বাকি
বিদ্যুল্লতা দ্রৌপদী।
আর কুরুক্ষেত্র।

কুরুক্ষেত্র শেষ হলে
আবার সাজিয়ে এনো
ভোর
সোনার থালায়।

সোনার শেকড় তুললে হাতে ॥

রণজিৎ দেব

হাঁটিতে গেলে সম্মুখ পথে পথের বাঁধায় বিষম দুঃখ
নিংড়োলো প্রেম রঙিন আঁচল বাইরে উড়ে ভেতর রুক্ষ
সোনার শেকড় তুলতুলে গা অশ্রুপাতে ঝর্ণা নামে
ভুলের প্রাচীর ক্রমেই গড়ে শান্তি কোথায় নিত্য ধামে।

যতই বলি রাজার কুমার রাজ্য আমার হাতের মুঠে
রাণী সেজে যে ঘুরছে পাশে তারই জন্যে রাবণ জুটে
মানুষ যখন আত্মমগন হৃদয় পলাশ ফোটে কি তখন
কিংবা যখন গভীর কীট খুঁড়ছে বসে হৃদয়-কথন
রাঙাধুলো উড়ে কি তখন এ মর জগৎ বিশ্ব-ধামে?

ঘর ছেড়ে আজ পরের ঘরে বসত বাড়ি নিজেই গাঁড়
বাল্যকালের স্মৃতি-ছোঁয়ায় দারুণ ক্ষয়ে ধ্বংস করি
মৌন মিছিল চলছে হোঁচট পথের বাধায় চোখের জল
ভেতর কাঁপে ভূমিকম্পে বাইরে দানব সদল বল।

সোনার শেকড় তুললে হাতে অশ্রুপাতে ঝর্ণা নামে
ভুলের প্রাচীর ক্রমেই গড়ে শান্তি কোথায় নিত্যধামে?

যেদিকে, দুচোখ যায় ॥ দেবী রায়

ভেবেছি এতো যে ভালোবাসা
এতো যে মাংসল-যৌবন
বিবশ ঘন্টা পথে পথে ঘোরে;
দু পায়ে, মাড়িয়ে পথ, ভ্রূক্ষেপহীন
অনাবশ্যক হয়তো বা—
মজলিস্তুর করে, হকার্স-কর্ণারে।

নিঃস্ব চোখে চেয়ে আছি
তার চোখে যেন মৌমাছি
ইনি কি ভালোবাসেন ওঁকে
উনি কি ভালোবাসেন এঁকে...

শুধু কি আমার পড়ে-মরতে
জায়গা নেই, কোথাও?
বুকে আক্ষেপ বয়ে নিয়ে যেতে চাই
যেদিকে দু চোখ যায়
ইঙ্গিতে ইশারায়, সে জানায়:
'আমি-ই ভবিষ্যৎ, যেদিকেই যাও!'

উপন্যাস

শেষ বিচার

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

[বৃদ্ধ বঙ্কিম দত্ত রোজ সকালে এক চক্কর বেড়িয়ে আসতে না পারলে হাঁফিয়ে ওঠেন। লাঠি ঠকঠুক করে সেই পরিচিত ঝিলের ধারে এসে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। একটু ঘাসের গন্ধ জলের গন্ধ শামুক পানার গন্ধ পাবার লোভে ছটফট করেন বঙ্কিমবাবু। কিন্তু ছেলে অমিয় কি বৌমা কি তার ছেলেমেয়েরা ঠিক উল্টো। তারা শহরের উদ্দামতা অস্থিরতা পছন্দ করে।

অমিয়কে নিজের হাতে করে মনের মত গড়েছেন। কিন্তু এক এক সময় তাঁর মনে হয় সেই অমিয়ও যেন কেমন পাল্টে যাচ্ছে। তার কথার প্রতিবাদ করে নিজের মতকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করে। যেন মনে হয় অমিয় তাকেই অস্বীকার করবার চেষ্টা করছে ইদানীং। অমিয় তার স্ত্রী নীহার সবাবাই যেন কেমন এড়িয়ে চলতে চাইছে। সংসারের ওপর কর্তৃত্ব হারাচ্ছেন যেন তিনি। তবু একসময় নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে অমিয় বা তার স্ত্রী নীহার নয়, তাদের বংশধরদের আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চান বঙ্কিম দত্ত।

নাতি রঞ্জুকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখেন। তাকে নিজের মত করে গড়তে চান।

কিন্তু সেই রঞ্জুই দাদুর ব্যবহারে বিস্মিত। বাবা অমিয়র এক গরীব পুরনো বন্ধু তাদের বাড়িতে আসায় দাদুর অবহেলা এবং ঈর্ষা প্রকাশ দেখে তার খুব খারাপ লাগল। না হয় দাদু সারা জীবন জাঁকজমক করেছে আর তার বাবা বার-এ্যাট-ল। আর ঐ লোকটা ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া মানুষ। রঞ্জুর এটা ভালো লাগে নি।

(এগারো)

বেলার সঙ্গে বেলা বাড়ছে।

এই সময় চায়ের দোকানটা বন্ধ হয়ে যায়।

বন্ধ হয়ে গেলেও তাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। ভাঁড়ে করে চা খাওয়া। দোকানের সামনে একটা রাধাচূড়া ফুলের গাছ। গাছতলায় কেরোসিন কাঠের দুটো প্যাকিং বাকস পাশাপাশি বিছান। বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়েই চা খায় বেশির ভাগ মানুষ। তবে যারা বসে খেতে চায়, তাদের জন্য কাঠের বাকস দুটো। দোকানের ভিতরে বসে চা খাবার ব্যবস্থা নেই। জায়গাও নেই। এইটুকুন একটা খুপরী।

যাক গে, দোকানী ঝাঁপ বন্ধ করে দিতে জায়গাটা আরও বেশি ফাঁকা হয়ে গেল। কেমন নিরিবিলি মনে হচ্ছিল।

না, রঞ্জু চা খাচ্ছিল না।

খাচ্ছে তার বাবার বন্ধু। যাঁর নাম মনুরেন্দু। আশ্বিনের দুপুরের মধ্যে এক একদিন এমন শুকনো খটখটে হাওয়া ছাড়ে। ধুলো ওড়ে এলোপাতাড়ি। গাছের পাতা ঝরে ঝরঝরে। হলদে হয়ে আসা বা প্রায় শুকিয়ে যাওয়া মড়মড়ে রাধাচূড়ার পাতা রঞ্জুর কোলে মাথায় এবং মনুরেন্দুর কোলে মাথায় অফুরান ঝরে ঝরে পড়ছিল।

উঁহু, নিজের মাথায় বা গায়ে পাতা ঝরে পড়ছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু বাবার বন্ধুর। যেন ওতে কিছু যায় আসে না। পড়ে পড়ুক। গাছের পাতা তো। তেমন কিছু খারাপ জিনিস না।

তাঁর নজর ছিল কেবল রঞ্জুর মাথার দিকে, কোলের দিকে পিঠের দিকে।

যতবার পাতা ঝরে পড়ছে ততবার রঞ্জুর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে মনুরেন্দু সব ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে তার কোলে পিঠেও একটা পাতা পড়ে থাকতে দিচ্ছিল না। চোখ আড় করে করে রঞ্জু দেখছিল। মনুরেন্দুর ডান দিকে বসেছে সে। বাঁ হাতে ধরা মাটির ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে মনুরেন্দু একটু একটু করে চা খায়, তার সঙ্গে কথা বলে আর যেই না একটা দুটো কি এক সঙ্গে একমুঠো শুকনো পাতা রঞ্জুর গায়ে পড়ে অমনি ডান হাত বাড়িয়ে মেটে রংয়ের শুকনো হাড় বের হওয়া দুটো আঙুল সাঁড়াশীর মতন একত্র করে বেঁকিয়ে পাতাগুলি তুলে ফেলে দেয়।

দৃশ্যটা কেমন অদ্ভুত ঠেকে রঞ্জুর কাছে।

মানুষটাই তো অদ্ভুত। ভাবছিল সে।

ওপর থেকে, বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝা যায়? একটুও না।

যতবার রঞ্জুর গায়ে কি মাথায় ওই মেটে রংয়ের হাড়সার শুকনো আঙুল দুটো ঠেকছিল, রঞ্জু শিউরে উঠছিল। সে টের পাচ্ছিল তার শিরদাঁড়া বেয়ে ইলেকট্রিক শক-এর মতন কিছু একটা যেন নেমে যাচ্ছে।

তবে জিনিসটা যে আস্তে আস্তে কমে আসছে তা-ও সে টের পাচ্ছিল।

এইতো এইমাত্র মনুরেন্দুর হাতটা তার হাঁটুর ওপর দু মিনিটের বেশি সময় বিছান ছিল। শিরদাঁড়া শিরশির করা ভাবটা আর হয়নি তখন রঞ্জুর এবং আগের মতন সে শিউরেও উঠল না।

চা খাওয়া শেষ হতে মনুরেন্দু মাটির ভাঁড়টা একদিকে ছুঁড়ে দিতে ফুটপাথের সিমেন্টে বাড়ি খেয়ে ফটাস্ শব্দ করে সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

—হি-হি বুড়ো বয়সে একটা বোমা ফাটালাম। বাবার বন্ধু ঘাড়টা অল্প কাত করে তার দিকে চেয়ে হাসে। মানে একটু রসিকতা করে। টের পেয়ে রঞ্জুও অল্প করে হাসে।

এত ভাল লাগছিল তার মানুষটাকে।

এই যে বেলার সঙ্গে বেলা বাড়ছে রঞ্জুর প্রায় খেয়ালই নেই। মনুরেন্দুর পাশে বসে সারাদিন গল্প শুনলেও যেন তার আশ মিটবে না।

এইজন্যই সে বেশি অবাক হচ্ছিল অদ্ভুত লাগছিল বাবার ছেলেবেলার বন্ধুটিকে।

রঞ্জু ভাবল পৃথিবীতে তা হলে এখনও এমন একজন দুজন মানুষ আছে যাদের কাছে সারাদিন বসে থাকতে ভাল লাগে, আর কান পেতে তাঁদের গল্প কেবল শুনে যেতেই ইচ্ছে করে।

—এখন বাড়ি যাবে? রুদ্রেন্দু হঠাৎ প্রশ্ন করল।

—হুঁ। রঞ্জু মাথা নাড়ল।

—কিন্তু তোমার যে চুল কাটা হল না।

—থাক গে, কাল কাটব। রঞ্জু ঘাড় বেঁকায়।

কি ভেবে রুদ্রেন্দু হঠাৎ চুপ করে থাকে। তারপর পকেট থেকে বিড়ি বার করে। কিন্তু সেটা মুখে গুঁজতে গিয়ে থমকে যায়। দু আঙুলের ফাঁকে বিড়িটা ধরে রেখে এদিক ওদিক থাকায়। এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম রঞ্জু তাঁকে পকেট থেকে বিড়ি বার করতে দেখল। কিন্তু বিড়িটা ধরাচ্ছে না। সঙ্গে নিশ্চয় দেশলাই নেই, চারদিকে তাকিয়ে আগুন খুঁজছে অনুমান করতে রঞ্জুর এক সেকেন্ড দেরি হয় না। কাঁচের বাকসটা ছেড়ে চট করে সে উঠে দাঁড়ায়।

—কি হল, উঠলে?

—না। রঞ্জু মাথা নাড়ে। যাচ্ছি যাচ্ছিনে।

—চুল কাটতে?

—উঁহু।

—তবে কোথায় চললে?

—দেশলাই এনে দিচ্ছি আপনাকে।

—আরে কী পাগল, দেশলাই পাবে কোথায় বোসো বোসো।

—ঐ তো ওদিকে একটা দোকান আছে। রঞ্জু আঙুল দিয়ে দেখায়। তারপর ছুটতে থাকে।

—আরে শোন শোন! দেশলাই আনবে পয়সা নিয়ে যাও। রুদ্রেন্দু পিছন থেকে ডাকে।

—আমার কাছে আছে পয়সা। রঞ্জু ঘাড় ফেরায় না। ছুটতে থাকে।

অবাক লাগছিল মানুষটাকে আরও একটা কারণে। ছেলেবেলায় এই মানুষের সঙ্গে তার বাবা খেলাধুলো করত, সেই দেশের বাড়িতে। মফঃস্বলের একটা শহরের স্কুলে দুজন এক সঙ্গে পড়ত। ভেবে মনে মনে যেমন সে উত্তেজিত হচ্ছিল, গর্ববোধ করছিল তেমনি হুহু ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটার মতন আর একটা কথা মনে পড়ে রঞ্জুর সব উত্তেজনা উৎসাহ আর সেই সঙ্গে গর্বের ভাবটা নিভে গিয়ে একেবারে জল হয়ে যাচ্ছিল।

এর মূলে রয়েছে বুড়োটা। তার দাদু। এককালে বন্ধু ছিল। তাই নিয়ে এখনও অহংকারের শেষ নেই।

কিন্তু ভীষণ ছোটলোক বুড়ো। নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল সে। হ্যাঁ ছোট-লোক। তার বাবার বাবা যদিও। কিন্তু তা হলেও জোর গলায় সে বলতে পারে অত্যন্ত বাজে চরিত্রের মানুষ এই বঙ্কিম দত্ত। এতকাল সে বুঝতে পারেনি। আজ বুঝল। আজ চেনা হয়ে গেল। বাজে, একেবারে বাজে লোক এই দাদুটা, মনটা ছোট, দৃষ্টিটা একপেশে। তার মানে কি—আত্মসুখী। সেলফিস টু দি বোন। কেবল নিজের স্বার্থ নিজের সুখ, নিজের পরিবার ছেলেমেয়ে ব্যস, এ ছাড়া জগতের আর কিছু চিন্তা করতে বুড়োর বয়ে গেছে।

এরাই তো দেশের শত্রু। আসল শত্রু। এনিমি অব দা নেশন বলতে এদেরই বলা হয় না?

মাথাটা ঝিমঝিম করছিল রঞ্জুর।

সিগারেটটা পকেট থেকে বের করে ছুঁড়ে ফেলে দেবার সুযোগ পেল সে এখন। এবার মনটা হালকা লাগল। পেভমেন্ট ছেড়ে সে রাস্তায় নামল। এলোমেলো হাওয়ায় মাথার লম্বা চুলগুলি উড়ছে। তার সার্টের কলারটাও কাঁপছিল। এই মানুষটা সাধারণ নয়, দেখতেই এমন, কালো রোগা না-খাওয়া চেহারা আর তেমনি জামা-কাপড়ের দশা। কিন্তু এসব তাঁর আসল পরিচয় নয়। রঞ্জু মনে মনে বলল।

সেদিন তাদের বাড়িতে যখন গিয়েছিল একফোঁটা চিনতে পারেনি সে তাঁকে আশ্চর্য! যে জন্য এখন নিজেকে বোকা বোকা মনে হতে লাগল তার। বাবার ছেলেবেলাকার বন্ধু—ব্যস্ এই পর্যন্ত। এর বেশি কিছু চিন্তাই করেনি সে। কেন করেনি? নিজের ওপর রাগ পেতে লাগল তার কম না।

এমন কি ট্রাইয়্যাংগুলার পার্কের বেঞ্চে বসে যখন তিনি ভুট্টা খাচ্ছিলেন তখনও সে শুধু এই ধরে নিয়েছিল। বাবার এককালের বন্ধু। আলতো ফালতো এমন কত বন্ধুই তো থাকে লোকের।

কিন্তু একটু পরে বস্তির ছেলেটা দোলনা থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লাগতে তিনি যখন তাকে কোলে তুলে নেন তখন তাঁকে আর তেমন একটা আলতো ফালতো মানুষ বলে ভাবতে পারেনি রঞ্জু।

গরীব হতে পারেন হয়তো চাকরি বাকরি নেই, বুঝি বেকার হয়ে পড়েছেন—কিন্তু তাঁর মনটা ভাল হার্টটা নরম, রঞ্জু চিন্তা করল।

তখন থেকেই একটু একটু করে মানুষটাকে তার ভাল লাগছিল।

ডাক্তারখানায় মোটে ভিড় ছিল না। তারা ভিতরে ঢুকতেই ফাঁকা। ছিপছিপে একজন কম্পাউন্ডার ছেলেটার মাথার একটুখানি জায়গা ছড়ে গেছে দেখে তক্ষনি তুলোয় করে ডেটল নিয়ে কাটা জায়গাটায় লাগিয়ে দেয় ও সেখানটায় এক টুকরা এডহেসিব এঁটে দেয়। তারপর ছেলেটার পিঠে আস্তে করে একটা থাপড় দিয়ে বলে যা বাড়ি পালা, কিচ্ছু হয়নি, আর দুষ্টুমি করবিনে। যেন মনে হল কম্পাউন্ডার ছেলেটাকে চেনে। অসম্ভব কিছু না রঞ্জু ভাবল। ধারেকাছের বস্তিতে থাকে ছোঁড়া। আর ডাক্তারখানাও যখন এপাড়ারই।

পপুলার ফার্মেসী থেকে বেরিয়ে তারা রাস্তায় নামল!

ছেলেট এতক্ষণ তাঁর কোলে চড়ে ছিল। এবার তিনি কোল থেকে নামিয়ে দিলেন। —যা, বাড়ি যা। কম্পাউন্ডাররের মতন তিনিও অল্প একটু হেসে তার পিঠে আস্তে একটা চাপড় দেন। আর দুষ্টুমি করবিনে, ঐ করতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলি, আজ একটুখানি কেটেছে, আর একদিন এমন বাঁদরামো করতে গেলে হয়তো মাথা ফেটে গিয়ে খুনটুন হয়ে যাবি। কি বল হে রঞ্জু! ঘাড় কাত করে রঞ্জু অল্প অল্প হাসছিল। ততক্ষণে তিনি রঞ্জুর নাম জেনে গেছেন এবং সে কোন্ ক্লাসে পড়ে তা-ও জিজ্ঞেস করেছেন।

যাই হোক কোল থেকে নেমে ছেলেটা কিন্তু নড়ছিল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

—কি হল, বাড়ি যা। রাস্তা চিনে যেতে পারবি? আবার তিনি তার পিঠে হাত রাখলেন।

ছেলেটা ঘাড় কাত করল, বোঝা গেল বাড়ির রাস্তা চেনে। কিন্তু নড়বার নাম ছিল না। একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ঘাড় গুঁজে হাতের নখ খুঁটছে।

—এই ছোঁড়া! এবার রঞ্জু রেগে যায়। এতক্ষণ ভুগিয়েছিস, মাথায় ওষুধটষুধ লাগান হল এখন আবার দাঁড়িয়ে আছিস কেন!

যেন রঞ্জুর ধমক খেয়ে একটু ভয় পেল ছোঁড়া, ঘাড় তুলে ড্যাবড্যাব করে তাকাল।। আর তাকাল তো তাকিয়েই থাকল। বোবা। যেন কথা বলতে পারে না।

—কি হয়েছে বলবি তো। রঞ্জু আরও জোরে ধমক লাগায়।

ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাঁ করে ছেলের কান্না।

এবার তিনিও বিরক্ত হন। বাবার বন্ধুর মুখ দেখে রঞ্জু বুঝল।

—এই আমার দিকে তাকাও। কি হয়েছে তোমার? বাড়ি যাবে না! বিরক্ত হলেও গলার স্বরটা তাঁর কিন্তু কঠিন ছিল না শক্ত ছিল না। বরং যেন আদুরে আদুরে শোনাচ্ছিল। যে জন্য ভিতরে ভিতরে রঞ্জু আরও একটু চটে যায়।

—ছেড়ে দিন তো। দাঁড়িয়ে থাকে থাকুক। চলুন আমরা এগোই। রঞ্জু প্রায় ঘুরে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু তিনি নড়তে পারছিলেন না। ঠিক দাঁড়িয়ে আছেন। রঞ্জু দেখল, এবার তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে ছেলেটার মুখের কাছে কানটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। কান্নার অস্পষ্ট হিজিবিজি গলায় ছেলেটা কিছু যেন বলল।

—কি হয়েছে কি বলছে! রঞ্জুর খানিকটা কৌতূহল হল।

—বলছে খিদে পেয়েছে। ঘাড় সোজা করে বাবার বন্ধু রঞ্জুর দিকে তাকাল।

—খিদে পেয়েছে বাড়ি গিয়ে খাক, আমরা কি করব। চলে আসুন আপনি। রঞ্জু ডাকল।

—এই, বাড়ি যা। বলে তিনি চলে আসছিলেন। ছেলেটা আবার কাঁদতে থাকে। তিনি আবার দাঁড়িয়ে পড়েন, কি চাইছিস পরিষ্কার করে বল না। এবার তিনি রেগে ওঠেন।

—দশটা নয়া দিন মুড়ি কিনে খাব।

কথাটা রঞ্জুও শুনল। ঘুরে গিয়ে ছেলেটাকে ভীষণ বড় করে একটা ধমক লাগায় সে। এক চাঁটি মারব মাথায়। পয়সা। এখনি ভিক্ষে করতে শিখে গেছে। যা ভাগ পয়সা নেই।

—আমার মনে হয় খিদে পেয়েছে ঠিকই। রঞ্জুর চোখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন না হলে কি এভাবে কাঁদে।

—কেন, বাড়ি চলে গেলেই পারে। রঞ্জু উত্তর করল।

—হয়তো বাড়ি গিয়ে দেখবে রান্না চাপেনি, রেশন আসেনি, বাজার-সওদা কিছু করা হয়নি। মিটমিট করে তিনি হাসছিলেন অথচ এমন সুরে কথাটা বলছিলেন, রঞ্জু স্তব্ধ হয়ে গেল। যেন আর কিছু প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না তার।

— এবার আর রঞ্জুর দিকে কিন্তু তিনি তাকান না। ছেলেটার দিকে সম্পূর্ণ মুখ করে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে পয়সা বার করে গুণতে আরম্ভ করলেন। তারপর আস্তে আস্তে মাথাটা নাড়েন। যেন হিসেব করার পর অনেকটা নিজের মনে বলেন, উঁহু, হবে না। দশ নয়া দিয়ে দিলে আমাকে ট্রেনে বাড়ি ফিরতে হবে। বাসের পয়সায় কুলোবে না। ট্রেনে গেলে আমাকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে নামতে হবে। তার মানে তারপর পাক্কা সওয়া তিন মাইলের হাঁটা রাস্তা।

ছেলেটা ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে ছিল।

বাঁ-হাতের খুচরো পয়সাগুলো ডান হাতের তেলোয় নিয়ে আবার তিনি হিসেব করতে আরম্ভ করেন।

—উঁহু, যা ভেবেছি দশ নয়া হয় না। আচ্ছা ঠিক আছে, পাঁচটা নয়া তুই নে। ঘাড় তুলে তিনি ছেলেটার মুখের দিকে তাকান। তারপর কি ভেবে থমকে যান। মাথাটা আস্তে নাড়েন।

—উঁহু, পাঁচ নয়া দিয়েই বা তুই কি করবি—দোকানে পাঁচ নয়া পয়সার মুড়ি দেয় না আমি জানি। যেমন আগুন-লাগা দাম হয়েছে না চিঁড়েমুড়ির!

—আপনাকে পয়সা দিতে হবে না। এতটা সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে রঞ্জু শুনছিল। পকেট থেকে চট করে একটা দশ নয়া তুলে ছেলেটার হাতে দিল সে। যা পালা মুড়ি কিনে খা-গে।

আর দাঁড়ায় না ছেলেটা। হাতে পয়সা পেয়ে পা-পা করে হাঁটে। যেন একটা মুড়ির দোকানের দিকেই এগোতে থাকে।

বাবার বন্ধু খুশি হয়। ঘাড় নামিয়ে রঞ্জুকে দেখে। —এসো, এইবেলা আমরা এগোই।

তখনও কি রঞ্জু চুল কাটার কথা ভাবছিল!—কোন্ দিকে যাবেন আপনি? হঠাৎ করে সে প্রশ্ন করল।

—একটু চা খাবার ইচ্ছে হচ্ছে। ধারে-কাছে দোকান আছে?

—আছে বৈকি। ঐ গলির মুখেই একটা দোকান। রঞ্জু আঙুল দিয়ে দেখায়।

তিনি সেদিকে একবার তাকান। তারপর মাথা ঝাঁকান।—নাঃ থাক। পয়সা শর্ট আছে। ভুলে গেছলাম। একটা ক্লান্ত হাসি নিয়ে তিনি আবার রঞ্জুকে দেখেন।

—তাতে কি! আমি পয়সা দেব। চলুন।

—না দরকার নেই। লজ্জায় পড়লেন তিনি। তুমি চুল কাটার পয়সা এনেছ।

—আজ আমি চুল কাটছিনে। কাল কাটব। আসুন। ঐ তো কাছেই দোকান।

আর আপত্তি করেন না। রঞ্জুর সঙ্গে তিনি হাঁটেন।

—আমি কিন্তু ঐ ছোঁড়াকে পয়সা দিতাম না। রঞ্জু এবার না বলে পারল না।

—কেন দিতে না। ওর যে খিদে পেয়েছিল।

—তা থাক। রঞ্জু মাথা ঝাঁকাল। অর্থাৎ তখনও সে তার স্বার্থপর আত্মসুখী দাদু বঙ্কিম দত্তের মতই কথা বলছিল। তখনও সে জানত না কার সঙ্গে সে হাঁটছে, কাকে কি বোঝাচ্ছে। বঙ্কিম দত্তের শেখান বুলি গড়গড় করে আউড়ে গেল সে। ভিক্ষে দিলে এরা আস্কারা পেয়ে যায়। যত বেশি ভিক্ষে দেওয়া হবে, তত দেশে ভিখারির সংখ্যা বাড়বে। ভিক্ষে পেলে ওরা কোনো কাজ-কর্ম করতে চায় না পরিশ্রম করতে চায় না। স্রেফ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে। এভাবে ভিক্ষে দিয়ে দিয়ে গোটা দেশটাকে আমরা পঙ্গু বানিয়ে তুলছি।

—ইস, এই বয়সেই তুমি যে অনেক কিছু জেনে ফেলেছ হে। হাঁটিতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়েন তিনি। মিটিমিটি হাসেন এবং এমন চোখ করে তার দিকে তাকান, রঞ্জু চমকে ওঠে। তার হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে ওঠে। না তখনও সে বুঝতে পারেনি ওই চোখ দুটোর মধ্যে কী। তবে একটা কিছু যে ছিল ক্রমেই সে সেটা বেশ করে টের পাচ্ছিল। চুপ করে থাকল সে।

—হুঁ, হাঁটতে হাঁটতে তিনি বলেন, তোমার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না কিছুটা সত্য আছে, তবে কিনা একেবারে বাচ্চা তো, বছর তিন-চার বয়স ওর—ওই ছেলে আর কি কাজ করবে বলো। খিদে পেয়েছে শুনে বুকটা কেমন করে উঠল।

বুকটা কেমন করে উঠল। শুনে রঞ্জু সেদিন মাথাটা একটু হেলাল। বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখটা আর একবার সে দেখল। তবে তার কথাও একেবারে মিথ্যা নয়, তিনি স্বীকার করছেন। ফলে রঞ্জু একটু উৎসাহবোধ করল।

—হাঁ ওটা বাচ্চা ছেলে, কাজ করার বয়েস হয়নি আমি স্বীকার করি। কিন্তু আপনি দেখুন রাস্তায় বেরোলেই কেবল ভিখিরি চোখে পড়ে। ভিখিরিতে ভিখিরিতে কলকাতা শহরটা কিলবিল করছে।

—হুঁ-হুঁ, এবার গলা ছেড়ে তিনি হাসলেন, বলেছ ভাল, মাছির মতন উঁহু, বেজুটির মতন, উঁহু, উপমাটা ঠিক হল না হে বরং বলা যায় পচা ঘায়ের পোকার মতন কলকাতার পথেঘাটে ভিখিরি কিলবিল করছে। করবেই। গাঁয়ে কি আর ভিক্ষে জোটে। এখানে রাতদিন দামী দামী গাড়ি ছুটছে, চোখ মেলে তাকালেই বড় বড়

বাড়ি কত খাবার দোকান হোটেল-রেস্তোরাঁ বায়োস্কোপ থিয়েটার আমোদ ফূর্তি—এখানে এখনও কিছু কিছু মানুষে অঢেল সুখে আছে কেন দলে দলে ভিকিরিরা এসে জুটেছে। তার ওপর শহুরে ভিকিরিরা তো আছেই। ঐ দুয়ে মিলিয়ে এই কিলবিলে চেহারা।

—দিন দিনই দেখছি ভিক্ষুক আর হা-ভাতের গুষ্টি বাড়ছে। মিনমিনে গলায় রঞ্জু বলল, কারণটা বুঝতে পাচ্ছি না। বাবার বন্ধুকে শুনিয়ে কতকটা নিজের মনে সে বলল। অর্থাৎ রুদ্রেন্দুর মতামতটা জানতে তার ভারি ইচ্ছে হল। ভিক্ষে দিকে ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়ার ব্যাপারটা তিনি এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলেন কিনা।

—হুঁ কারণ আছে বৈকি। রুদ্রেন্দু এবার আরও বড় করে হাসলেন। অবশ্য আকাশের দিকে মুখ করে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর যুগল হাতের মুঠো দুটো কেমন যেন ঐ সময় শক্ত হয়ে উঠতে দেখল রঞ্জু। এবং আকাশের দিক থেকে মুখটা নামিয়ে তিনি যখন রঞ্জুর দিকে তাকান, রঞ্জু ঐ চোখের মধ্যে এক সেকেণ্ডের জন্য একটা বিদ্যুৎ-ঝলক খেলা করে উঠতে দেখল। আগুনটা নিভে যেতেই আবার টেনে টেনে হাসছিলেন যদিও তিনি। হুঁ, এত ভিক্ষুক কেন চারদিকে—খুব ভাল প্রশ্ন করেছ রঞ্জুবাবু—তা ভিক্ষুক তো বাড়বেই, আমরা যে স্বাধীন হয়েছি, সাতাশ বছরের স্বাধীনতা, ইয়ারকি! কাজেই আমরা সাবালক হয়েছি, আমাদের কর্মক্ষমতাও আগের তুলনায় ঢের বেড়ে গেছে, আমরা ক'বছরে কত কাজ করে ফেলেছি তার একটা রেকর্ড রাখার দরকার তো—রেকর্ড হল এরা। ভিক্ষুক আর হাভাতে—ঐ যে বললাম, ফুটপাথের ধারে ধারে লোকের দরজায় দরজায় এবং সেসব জায়গায়ও যখন কিছু না জুটছে, তখন ডাস্টবিনের আশেপাশে গুয়ের পোকার মতন এসে কিলবিল করছে।

রঞ্জু স্তব্ধ হয়ে গেল। তার মুখটা শুকিয়ে গেল। তিনি কি ঠাট্টা করছেন। কেমন খটকা লাগল মনে

হুঁ তখন তার মনে হয়েছিল ঠাট্টা। কিন্তু তারপর চায়ের দোকানের সামনে রাধাচূড়া গাছের নিচে কেরোসিন কাঠের বাকসটার ওপর বসে চা খেতে খেতে রুদ্রেন্দু অনেক কথা বললেন। রঞ্জু কান পেতে শুনল। চোখের পলক পড়ছিল না তার।

একটা মাছি বার বার নাকের কাছে উড়ে এসে জ্বালাতন করছিল। সেটাকে পর্যন্ত হাত দিয়ে তাড়াবার সময় ছিল না তার। এত মগ্ন হয়ে সে শুনছে।

ভিক্ষুকের প্রসঙ্গটা আর একবার ঘুরে এসেছিল। তখন রুদ্রেন্দুর চা খাওয়া প্রায় শেষ। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে লোকটা দুপুরের ভাত খেতে বাড়ি চলে গেছে। মাথার ওপর গাছের ডালে দুটো শালিক অনেকক্ষণ ধরে কিচকিচ করছে। ঘটাং ঘটাং আওয়াজ করে পিছনে বড় রাস্তায় একটা ট্রাম চলে যাবার পর ঝাঁঝাঁ রোদ্দুর ছাড়া আর কিছু ছিল না চারদিকে।

সেই নিরিবিলি শূন্যতার মুহূর্তে রঞ্জুর চোখের দিকে চোখ রেখে ঠাট্টার গলায় আর একবার হা-হা করে তিনি হাসছিলেন।

—হুঁ স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার জন্য বিনয় বাদল দীনেশ রক্ত দিয়েছিল, মাস্টারদা রক্ত দিয়েছিল, ক্ষুদিরাম কানাইলাল রক্ত দিয়েছিল। আজ যদি তারা ফিরে আসে আমাদের স্বাধীনতার চেহারাটা দেখতে চায়, আর কিছু না পারি ভিকিরি বেকার দিনের পর দিন উপোস থাকে, গাছতলায় রাত কাটায় এমন লাখ লাখ হতভাগ্য মানুষকে আমরা স্বচ্ছন্দে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারব। তাঁরা খুশি হবে—কি বলো?

রঞ্জুর মুখে শব্দ ছিল না। রুদ্ধশ্বাস হয়ে কথাগুলি শুনছে।

(ক্রমশঃ)

সংশয়

শান্তিনাথ মুখোপাধ্যায়

স্নায়ুগুলোর ওপর যেন একটা কাঁকড়া বিছে হেঁটে বেড়াচ্ছে! শেষে যদি সব ভেস্তে যায়? কথা বলতে বলতে রেখার মুখের ওপর চোখ রাখল দিবাকর।

'অত উতলা হলে চলবে না। আমার মন বলছে লেগে যাবে। পরপর তিন দিন চার শালিখ দেখেছি। সবাই বলে চার শালিখ দেখলে চিঠি আসে।' দিবাকরের কথার উত্তর দিল রেখা।

ইডেনের বড় গেটটার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল রেখা আর দিবাকর। সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। একটি অপরাহ্ন এক সঙ্গে কাটিয়ে এখন যে যার গন্তব্যে পা বাড়াবার পূর্ব মুহূর্তে শেষ-নাহি-যার সেই না-বলা কিছু কথা সেরে নিচ্ছিল দুজনে।

একখানা সেভেনটি নাইন-বি রুটের বাস এসে দাঁড়াল। রেখা উঠে বসল। বাইরে জানালার ধারে দিবাকর দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর গাড়িটা এক সময়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে দিবাকরের মনে হল, পৃথিবীতে এত ঘন ঘন রাত্রি হয় কেন? মাত্র বারো ঘণ্টা দিনের আলোতে পাহাড়ের মত জমে ওঠা জরুরী কথাগুলো শেষ করা যায় নাকি?

কাকজ্যোৎস্নায় আকাশ পৃথিবী ভাসছিল। গঙ্গার দিকে দৃষ্টি গেল দিবাকরের। নদীর ওপর একটি বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। থার্টি-সি বাসগুলো এত দেরী করে আসে যে মানুষের ধৈর্য হারিয়ে যায়।

আধ ঘণ্টা এধার ওধার পায়চারি করেও গাড়ির পাত্তা পাওয়া গেল না। রেখার সঙ্গে সেও যেতে পারতো বাটগাছির মোড় পর্যন্ত। কিন্তু রেক-জার্নির জন্যে বাড়তি পাঁচটা পয়সা খরচা সে কি কম কথা! যখন তার মানসিক অবস্থা পঞ্চমে তখনই পরপর একসঙ্গে তিনখানা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। দিবাকর ধীরে-সুস্থে একটা গাড়িতে উঠে বসল।

'সবাই বলে চার শালিখ দেখলে চিঠি আসে'—রেখা কিছু আগেই কথাগুলো বলে গেছে তাকে, দিবাকরের মনে পড়ল। সেটাই কি শুধু একটা সংস্কার না কথাটা সত্যি!

শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই চিঠি এসেছে। আর চাকরীটাও হয়ে গেছে দিবাকরের। অফিস থেকে জি পি ওর বড় ঘড়িটার নিচে এসে দাঁড়াল দিবাকর। আশ্বিনের অপরাহ্ন আস্তে আস্তে মিলিয়ে আসছিল। শনিবারের ডালহৌসী পাড়া তায় আবার অনেক অফিসে কিসের যেন ছুটি। চাকরীর ফরম আর সাদা খাম বিক্রি করা ছেলেগুলোও উঠে গেছে।

এদিক ওদিক দেখতে দেখতে একটা সিগারেট ধরালো দিবাকর। তারপর ঘাড় উঁচু করে বড় ঘড়িটার দিকে তাকালো। লালদীঘির ধার দিয়ে একটা দুটো ট্রাম আসা-যাওয়া করছিল। চোখে কালো চশমা-পরা একটি মেয়েকে হঠাৎ দেখতে পেল সে। মেয়েটি ওরই পাশে বড় থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হাতঘড়ির দিকে আবার তাকালো দিবাকর। এখনও কুড়ি পঁচিশ মিনিট দেরী আছে। সে ভাবছিল, সামনে কোথাও গিয়ে একটু চা খেয়ে আসবে কিনা। হিসাব করছিল, যেতে আসতে পাঁচ মিনিট, চায়ের দোকানে ঢুকে অর্ডার দিয়ে চা খেয়ে দাম মেটাতে মেটাতে কম করেও দশ মিনিট। তাহলে মোট দাঁড়াল পনেরো মিনিট। তারপরও হাতে থাকছে পাঁচ থেকে দশ মিনিট সময়।

কিন্তু এত ভাবনা আর অংক কষতে কষতেই তার পাঁচ মিনিট সময় নষ্ট হল। আর এখন এত 'ন্যারো মারজিনে' তার যাবার ইচ্ছে হল না। যদি দেরী হয়ে যায় আর তাকে দেখতে না পেয়ে রেখা ফিরে যায়? দিবাকর থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার কথা ভাবছিল।

সময় দেখা অথবা রাস্তা আর গাড়ি-ঘোড়া দেখার মাঝে মাঝে দু-একবার চোখাচোখিও হয়ে গেল মেয়েটির সঙ্গে দিবাকরের। কিন্তু কালো চশমার কাচ ভেদ করে তার দৃষ্টি কোথায় দিবাকর বুঝতে পারছিল না। তার মনে হল, মেয়েটাও নিশ্চয়ই ওর মতন কারোর জন্যে অপেক্ষা করছে।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেটাকে পা দিয়ে পিষে আবার একবার ঘড়ি দেখল দিবাকর। আর মিনিট পাঁচেক বাকি। এমন সময়ে সেই মেয়েটি থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দিবাকরকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি দিবাকর রায়!

মেয়েটির কথায় দিবাকর আশ্চর্য বোধ করল না। সে বলল, হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলুন তো? মেয়েটি বলল, আমার নাম সোহিনী। রেখা দত্ত আমার বন্ধু। আজকে আপনার সঙ্গে এখানে দেখা করার কথা ছিল তার? দিবাকর বলল, হ্যাঁ। সোহিনী বলল রেখার হঠাৎ শরীর খারাপ হয়েছে। আমাকে খবরটা পৌঁছে দিতে বলেছিল আপনার কাছে হয় টেলিফোনে না হলে এখানে সাক্ষাতে! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে পড়বেন ভাবিনি!

এবারে দিবাকরের আশ্চর্য হবার পালা। সে বলল, সেই তখন থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কিছু বলেন নি কেন? আশ্চর্য মানুষ তো আপনি! সোহিনী হাসল। তারপর বলল, বুঝতেই তো পারেন, কাকে বলতে কাকে বলব, লজ্জা লাগে না! দিবাকর সায় দিল, তা অবশ্য ঠিকই। চলুন তাহলে আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে। তার থেকে আপনাকে বাসে তুলে দিয়ে আমিও ফিরে যাই।

ডালহৌসীর ফাঁকা ফাঁকা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সোহিনী বলল, আপনার চাকরীটা হওয়াতে রেখার খুশী যেন আর ধরে না। দিবাকর এবার আলতো করে সোহিনীকে দেখল। সোহিনী তখন তার চোখ থেকে কালো চশমাটাকে খুলে ফেলেছে। দিবাকরের ভাল লাগল সোহিনীকে!

কথার জের টেনে দিবাকর বলল, কিন্তু আপনি তো খুশী নন! সোহিনী বলল, যাঃ কি যে বলেন না! আজকের দিনে একজনের চাকরী হলে আর একজন কখনও অসুখী হয়? দিবাকর বলল, সত্যি বলছেন? সোহিনী উত্তর দিল, মিথ্যে বললে কিছু পাবো কি! দিবাকর হাসতে হাসতে বলল, আমার কিছু দেবার আছে তাহলে! সোহিনী আনমনে উত্তর দিল, জানি না।

কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটের নির্জনতা শেষ হয়ে পথ এখন প্রশস্ত। চতুর্মুখী। দিবাকর সোহিনীকে জিজ্ঞাসা করল, রেখার হঠাৎ শরীর খারাপ হল কেন? কি হয়েছে ওর? সোহিনী অনমনে চলতে চলতে উত্তর দিল, ও কিছু নয়। তিন চার দিন পরেই ঠিক হয়ে যাবে। রেড-ওয়ে ক্রসিং-এর কাছটায় এসে দিবাকর দাঁড়িয়ে পড়ল।

সোহিনী বলল, সন্ধ্যাটা সুন্দর। মনে হচ্ছে এই রাস্তাটা ধরে শুধু এগিয়ে চলতে! ট্রাফিক সিগন্যালটা দেখে নিয়ে দিবাকর বলল, গঙ্গার ধার পর্যন্ত আমরা হেঁটেই যাচ্ছি। বেশ কিছুটা পথ হাঁটা হয়ে যাবে আপনার। সোহিনী দিবাকরের মুখের ওপর তাকালো। রাস্তায় আলো থাকার জন্যে অন্ধকার জমাট ছিল না পরিচ্ছন্ন আভরণে ভদ্র একটি যুবাপুরুষকে তার ভাল লাগলো। অথচ একজন পরপুরুষ সম্বন্ধে কিছু ভাবতে তার লজ্জা হচ্ছিল। তাছাড়া মানুষটা যে তার বান্ধবীর!

পাশাপাশি পথ চলছিল সোহিনী আর দিবাকর। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার জন্যে মনের মধ্যে এক রকমের অস্বস্তি বোধ করছিল দিবাকর। এমন সময় স্টেডিয়ামের পাশ থেকে একটা লোক হাঁটছিল 'চা-আ' 'চা-আ' আওয়াজ তুলে। দিবাকর তাকে

ডাকতে যেতেই সোহিনী বলল, এখানে কেন? আর একটু এগিয়ে কোথাও বসে খেলেই তো ভাল!

সহসা এমন একটা প্রস্তাবে নিজের কাছে নিজেই যেন কৈফিয়ৎ চাইছিল দিবাকর। তার মনে হল, অথচ এই কথাটা শোনার জন্যেই তাকে কি এতখানি পথ পায়ে ঠেলে আসতে হয়েছে? দিবাকর বলল, তাহলে নদীর ধারে কেন। আমরা যদি উজানে বয়ে যাই কিছুক্ষণের জন্যে! বাড়ি ফিরতে দেরী হবে না তো আপনার?

সোহিনী বলল, কি দরকার। থাক না আজ। তার থেকে গঙ্গার ধারে কোথাও—সোহিনীর শেষ না করা কথার শেষটুকু ধরে দিবাকর বলল, নদীর ধারের দোকানগুলো বড় অপরিষ্কার। নোংরা। সোহিনী খিলখিল করে হেসে উঠলো। দিবাকর লজ্জা পেল সে ভাবল, তার প্রস্তাবে সোজন্য মাখানো সন্ধানী কোন ইঙ্গিত ছিল নাকি?

সোহিনী কিন্তু দিবাকরকে আবার বলল, তাহলে চলুন। কিন্তু দিবাকরের মনে হল, সোহিনীর কথায় কোথাও যেন একটা প্রচ্ছন্ন অনিচ্ছার ভাব তার বাবহারের মাধুর্যে মিশে রয়েছে। সে বলল, ঠিক আছে। এতখানি পথ যখন এসেই গেছি তখন আবার উল্টো হেঁটে কি লাভ? নদীর ধারই ভালো।

নদীর প্রবাহে জীবনেরও একটা সঙ্গীত খুঁজে পাওয়া যায় বোধ হয়। অপরিচয়ের প্রাথমিক পর্ব শেষে সোহিনী এখন উচ্ছল! দিবাকর তার হাতঘড়িটার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করার চেষ্টা করল। সোহিনী তার হাত দিয়ে ঘড়িটাকে ঢাকা দিল।

সোহিনী এখন সম্পর্কের নিবিড়তায় দিবাকরের আরো কাছে। এখন রেখার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের ফাঁকে ফাঁকে সোহিনীর সঙ্গেও দিবাকরের নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে। সোহিনী আর রেখা প্রিয়বান্ধবী হয়েও ভিন্ন জীবন দর্শনে একে অপরের কাছ থেকে বহু দূরে সরে থাকে। চাকরীতে পাকাপাকিভাবে বহাল হওয়াতে দিবাকরও এখন আপন জীবন দর্শনে প্রতিষ্ঠিত এক পুরুষ। তার কাছে দুই নারীর সান্নিধ্য আর ভালবাসা আপাত পৃথক হলেও কোথায় যেন একই সুরে বাঁধা।

কিন্তু তবুও দিবাকর যেন একটা সমস্যার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। তার মনে হয়, এর থেকে কোন দিনও যদি সোহিনীর সঙ্গে তার দেখা না হতো। মোটামুটি স্বচ্ছল সংসার রেখাদের। কিন্তু সোহিনীর? তার অভাব নিত্যসাথী। সে চাকরী করে। রেখা পড়ে। ওরা প্রতিবেশী। দিবাকরের সঙ্গে রেখার পরিচয় আকস্মিকভাবে। এক প্রেক্ষাগৃহে। আজ সেই পরিচয় অনেক পরিক্রমার পর পরিণতির শেষ প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ-এ কফি হাউসের পাশে সোহিনীর সঙ্গে দেখা করে দিবাকর এগিয়ে চলে ধর্মতলায় একমে ফার্নিচাসের দোকানের কাছে। সেখানে রেখা তার জন্যে অপেক্ষা করছে। অথবা অন্যদিন অন্য কোথাও। যেন আঁকাবাঁকা পথে নদীর মতন সাগরসঙ্গমে।

অবশেষে সোহিনী একদিন নিজেকে সংশয় থেকে মুক্ত করে বলল, তুমি রেখাকে নিয়ে সংসারী হও। সুখী হও দিবাকর। দিবাকর মৃদু হেসে উত্তর দিল, আমি তো সবার চেয়ে সুখী। ম্লান হাসিতে মুখর হয়ে সোহিনী বলল, থাক, আর বলতে হবে না। সুখীর সকল চিহ্নই তোমাতে প্রকট দেখতে পাচ্ছি।

কিছু সময় স্তব্ধ থেকে দিবাকর ধীরে ধীরে বলল, সংসারী হতে পারলাম না বলে তোমার পাশে আমি তো অসুখী নই! এই সংসার আমাদের জন্যে হয়ত নির্দিষ্ট ছিল না। যা ছিল না, এখনও নেই, অথবা কোন দিনও থাকবে না। তাকে নিয়ে মনে মনে গুমরে মরার থেকে আমাদের এই পাশাপাশি আর কাছাকাছি থাকাটুকুই থাকুক না সুখের ভাবে। তুমি কি অসুখী হবে সোহিনী? যেন ওরা নীল আকাশের মতন উদার চোখ মেলে দিবাকরকে দেখতে গিয়ে বুকের জমে থাকা কিছু বাষ্প হৃদয়ের উত্তাপে অশ্রু হয়ে সোহিনীর দু চোখ ভরিয়ে দিল।

সেই একই কথার প্রতিধ্বনি রেখার মুখেও। দিবাকর তুমি সোহিনীকে নিয়ে ঘর বাঁধ, ও তোমাকে ভালবাসে। মুগ্ধ চোখে দিবাকর তাকিয়েছে রেখার মুখের ওপর। তারপর বলেছে, আর তুমি আমাকে ঘৃণা কর, রেখা? দিবাকরের বুকে মুখ লুকিয়ে অঝোরে কেঁদেছে রেখা। হয়ত ওই কান্নাটুকুই এই জীবনে তার পরম পাওয়া। অথবা এই কান্নাই জীবনে না-পাওয়ার যত গ্লানি ধুয়ে মুছে মিথ্যা যত দ্বিধা আর সংশয় থেকে তাকে মুক্তি দিতে চাইছিল।

অথচ রেখার ভালবাসা সোহিনীর নির্দয়তায় পিষ্ট নয়, অথবা সোহিনীর ভালবাসাও রেখার অনুগ্রহ পুষ্ট নয়। এই পৃথিবীর ভালবাসা থেকে সত্য সুন্দর একটি চিরায়ত পাঠের মতনই দিবাকর প্রত্যহের আশা-বেদনার আলোছায়া থেকে গ্রহণ করে নিতে পেরেছে, সংশয়ের আবরণে ঢাকা জীবন, জগৎ আর সংসারে নিঃসংশয়ে সেও কোন ভুল করেনি। কিন্তু দিনগুলো চলতে চলতে কবে কখন হঠাৎ যেন সভ্যতার অজস্র-নগর ছাড়িয়ে তেপান্তরের মাঠের মধ্যে অপরাহ্নের প্রলম্বিত নিঃসঙ্গ ছায়া হয়ে ঘিরে ধরল তিনটি প্রাণীকে।

আসলে তিনটি ভীরু মন যেন ভুল করেছে ঈশ্বরের কাছে একটি প্রার্থনায়, তুমি না সেই। আর সেই ভুল, সেই সংশয় তাকে অভিশাপ হয়ে তিনটি নর-নারীর জীবনে সাজিয়ে দিয়েছে শূন্যতার ডালি। কফি হাউসের পাশে অথবা একমে ফার্নিচাসের দোকানের কাছে এখন দিবাকর, রেখা আর সোহিনীকে দেখা যায় না, জীবনের আলো-আঁধারিতে ওরা আজ পরিণতহীন সংশয়াতুর তিনটি নরনারী।

পুনশ্চ

বঙ্গদেশের রত্নস্বরূপ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি. আই. ই অন্যতম। তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় বিরাট গ্রন্থ রচনা করেও প্রদান করা সম্ভব নয়। এবংবিধ ভাষণ যে অতিশয়োক্তি নয় তা বর্তমানের প্রকৃত বিদগ্ধজন মাত্রেই উপলব্ধি করবেন।

এই ডিসেম্বর মাসের ৬ই তারিখে ১৮৫৩ সালে, ২৪ পরগণার নৈহাটীতে হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। শাস্ত্রী তাঁর উপাধি। এককালে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং অবিভক্ত বাংলার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ছিলেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি ডি-লিট উপাধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন। ইংরেজী, সংস্কৃত, জার্মান, পালি ও তিব্বতীয় প্রভৃতি বহুবিধ ভাষায় তাঁর অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। নানা বিষয়ের রচনায় বঙ্গ-সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য নিবন্ধরাজি ও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কাঞ্চনমালা, ভারত মহিলা, মেঘদূত, বেণের মেয়ে বাল্মীকির জয়, বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি গ্রন্থগুলির মধ্যে তাঁর অসামান্য সাহিত্য-মাধুর্যের পরিচয় বিদ্যমান। তাঁর তিরোধান ঘটে ১৯৩১ সালের ১৭ই নভেম্বর।

১২৮৫ সালের চৈত্র মাসে প্রকাশিত ৫ম বর্ষের 'বঙ্গদর্শন' থেকে 'তৈলদান' নামক হালকা ধরনের একটি সরস অথচ তির্যক ভঙ্গীসম্পন্ন নিবন্ধ, যা সর্বকালের মানুষের উপযোগী, তা এখানে আমরা আমাদের পাঠক পাঠিকাদের উপহার দিলাম।

: তৈলদান :

তৈল যে কি পদার্থ, তাহা সংস্কৃত কবিরা কতক বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে তৈলের অপর নাম স্নেহ। বাস্তবিক স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ। আমি তোমায় স্নেহ করি তুমি আমায় স্নেহ কর অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া থাকি। স্নেহ কি? যাহা স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা করে, তাহার নাম স্নেহ। তৈলের ন্যায় ঠাণ্ডা করিতে আর কিসে পারে?

সংস্কৃত কবিরা ঠিক বুঝিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহারা সকল মনুষ্যকেই সমানরূপ স্নেহ করিতে বা তৈল প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বাস্তবিকই তৈল সর্বশক্তিমান; যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যে সর্বশক্তিময় তৈল ব্যবহার করিতে জানে, সে সর্বশক্তিমান। তাহার কাছে জগতের সকল কাজই সোজা। তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না—উকীলিতে পসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না, বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না। কোন কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না।

যে তৈল দিতে পারিবে, তাহার বিদ্যা না থাকিলেও সে প্রফেসার হইতে পারে আহাম্মক হইলেও ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্লভরাম হইয়াও উড়িষ্যার গবর্ণর হইতে পারে।

তৈলের মহিমা অতি অপরূপ। তৈল নহিলে জগতের কোন কার্য সিদ্ধ হয় না। তৈল নাহিলে কল চলে না, প্রদীপ জ্বলে না, ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, চেহারা খোলে না; হাজার গুণ থাকুক, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না, তৈল থাকিলে তাহার কিছুরই অভাব থাকে না।

সর্বশক্তিময় তৈল নানারূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তৈলের যে মূর্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম ভক্তি; যাহাতে গৃহিণীকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম প্রণয়; যাহাতে প্রতিবেশীকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম মৈত্রী; যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম শিষ্টাচার ও সৌজন্য 'ফিলনথ্রপি'। যাহা দ্বারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম লয়েলটি; যাহা দ্বারা বড়লোককে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম নম্রতা বা মডেষ্টি। চাকর-বাকর প্রভৃতিকেও আমরা তৈল দিয়া থাকি তাহার পরিবর্তে ভক্তি বা যত্ন পাই। অনেকের নিকট তৈল দিয়া তৈল বাহির করি।

পরস্পর ঘর্ষিত হইলে সকল বস্তুতেই অগ্ন্যুদ্গম হয়। সেই অগ্ন্যুদ্গম নিবারণের একমাত্র উপায় তৈল। এই জন্যই রেলের চাকায় তৈলের অনুকল্প চর্বি দিয়া থাকে। এই জন্যই যখন দুই জনে ঘোরতর বিবাদে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তখন রফা নামক তৈল আসিয়া উভয়কে ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। তৈলের যদি অগ্নি নিবারণী শক্তি না থাকিত, তবে গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে পিতা-পুত্রে স্বামী-স্ত্রীতে রাজায়-প্রজায় বিবাদ-বিসম্বাদে নিরন্তর অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত।

পূর্বেই বলা গিয়াছে যে তৈল দিতে পারে, সে সর্বশক্তিমান, কিন্তু তৈল দিলেই হয় না। দিবার পাত্র আছে, সময় আছে, কৌশল আছে। তৈল দ্বারা অগ্নি পর্যন্ত বশতাপন্ন হয়। অগ্নিতে অল্প তৈল দিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে আবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু সে তৈল মূর্তিমান।

কে যে তৈল দিবার পাত্র নয়, তাহা বলা যায় না। পুঁটে তেলি হইতে লাট সাহেব পর্যন্ত তৈল দিবার পাত্র। তৈল এমন জিনিষ নয় যে, নষ্ট হয়। একবার দিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই কোন না কোন ফল ফলিবে। কিন্তু তথাপি যাহার নিকট উপস্থিত কাজ আদায় করিতে হইবে, সেই তৈলনিষেকের প্রধান পাত্র। সময়—যে সময়ই হউক, তৈল দিয়া রাখিলেই কাজ হইবে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে অল্প তৈলে অধিক কাজ হয়।

কৌশল—পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যেরূপেই হউক তৈল দিলে কিছু না কিছু উপকার হইবে। যেহেতু তৈল নষ্ট হয় না তথাপি দিবার কৌশল আছে। তাহার প্রমাণ ভট্টাচার্য্যেরা সমস্ত দিন বকিয়াও যাহার নিকট ১।০ পাঁচ সিকা বৈ আদায় করিতে পারিল না, একজন ইংরাজীওয়ালা তাহার নিকট অনায়াসে ৫০৲ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া একবিন্দু দিলে যত কার্য্য হয়, বিনা কৌশলে কলস কলস ঢালিলেও তত হয় না।

ব্যক্তিবিশেষে তৈলের গুণ-তারতম্য অনেক আছে। নিষ্কৃত্রিম তৈল পাওয়া অতি দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমনি একটি আশ্চর্য্য সম্মিলনীশক্তি আছে যে উহা অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে, তাহার তৈল আমার তৈল হইতে মূল্যবান। বিদ্যার উপর যাহার বুদ্ধি আছে, তাহার আরও মূল্যবান। তাহার উপর যদি ধন থাকে তবে তাহার প্রতি বিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা। কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক, কেহই টের পায় না।

তৈল দানের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এ প্রবৃত্তি সকলেরই আছে এবং সুবিধামতে আপন গৃহে ও আপন দলে সকলেই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে কিন্তু অনেকে এত অধিক স্বার্থপর, বাহিরের লোককে তৈল দিতে পারে না। তৈলদান-প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও উহাতে কৃতকার্য হওয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ।

আজকাল বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে। যাহাতে বঙ্গের লোক প্রাকটিকল অর্থাৎ কাজের লোক হইতে পারে তজ্জন্য সকলেই সচেষ্ট, কিন্তু কাজের লোক হইতে হইলে তৈলদান সকলের আগে দরকার। অতএব তৈলদানের একটি স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আমরা প্রস্তাব করি, বাছিয়া বাছিয়া কোন রায়বাহাদুর অথবা খাঁ বাহাদুরকে প্রিন্সিপাল করিয়া শীঘ্র একটি স্নেহ-নিষেকের কলেজ খোলা হয়।...

বাঙ্গালীর বল নাই বিক্রম নাই, বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙ্গালীর একমাত্র ভরসা তৈল—বাঙ্গালীর যে কেহ কিছু করিয়াছেন, সকলই তৈলের জোরে বাঙ্গালীদিগের তৈলের মূল্য অধিক নয়; এবং কি কৌশলে সেই তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেবা হয়, তাহাও অতি অল্প লোক জানে। যাঁহারা জানেন তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিই। তাঁহারাই আমাদের দেশের বড় লোক, তাঁহারাই আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।...

শেষে মনে রাখা উচিত, এক তৈলে চাকাও ঘোরে আর তৈলে মনও ফেরে।

—[illegible]

প্রদর্শনী

সলিল ভট্টাচার্যর ছবির প্রদর্শনী

কয়েক সপ্তাহ আগে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস গ্যালারীতে সলিল ভট্টাচার্যের তেল-রং ছবির একটি একক প্রদর্শনী হয়ে গেল। সলিলবাবু বহুদিন ধরে ছবি আঁকছেন এবং কলকাতা শহরে তার প্রদর্শনী করছেন। সুতরাং তাঁর ছবিতে নানতম কারিগরী দক্ষতার একটা পরিচয় যে পাওয়াই যাবে এতো স্বাভাবিক। তিনি প্রায় সহজাত দক্ষতায় বর্ণলেপন করেন, বর্ণান্তর ঘটান ও বর্ণের ঔজ্জ্বল্যকে তুলে ধরেন। সাবলীল হাতে রেখাংকন করেন। সলিলবাবু অবশ্য কারিগরী ক্ষমতার চেয়েও বেশী সৃজনীকৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর বর্ণচয়ন ও বর্ণ বিতরণ পদ্ধতি তাঁর সেই সৃজনীক্ষমতার পরিচয় দেয়। বর্ণান্তরধর্মী কিন্তু মূলতঃ দ্বিমাত্রিক বর্ণক্ষেত্রের উপর একান্ত রেখামাত্রিক রূপবন্ধের প্রক্ষেপ ঘটিয়ে তিনি সুন্দর নকশা সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁর সে নকশা তৈরীর ক্ষমতাও তাঁর সৃজনীশক্তির পরিচয় দেয়।

কিন্তু চিত্রকলা তো একটি চারুশিল্প এক একটি ছবি তো একটি ভুয়োদর্শনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ। সেই রূপ সৃজনের জন্য কারিগরী দক্ষতার প্রয়োজন অবশ্যই আছে কিন্তু সে দক্ষতাই তো সব নয়। ছবি শুধুমাত্র নকশা নয় কোন গূঢ় উদ্দেশ্য দর্শনীয় করে তোলার নকশা।

সলিলবাবু নর-নারী ফুল ইত্যাদি বস্তুর প্রাতিস্বিক রূপকে যেভাবে ঋজু জ্যামিতিক বোধ রেখার সাহায্যে চিত্রায়িত করেছেন, যেভাবে তাদের শারীরসংস্থানকে দ্বি-মাত্রিক ক্ষেত্রে জ্যামিতিক আয়তক্ষেত্রের সমাহার হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন, তাতে স্বতঃই আমাদের বিশ্লেষণী কিউবিজম-এর কথা মনে পড়ে। কিন্তু কিউবিস্টরা রংকে কখনও আলো-আঁধারির প্রকাশের কাজে ব্যবহার করেননি; রং তাঁদের কাছে বিশুদ্ধ রং—কখনও উজ্জ্বল কখনও ঘোর কখনও উষ্ণ কখনও বা শীতল। সলিলবাবু রংকে আলো-আঁধারি প্রকাশের কাজে ব্যবহার করেছেন এবং এমনভাবে করেছেন যাতে বর্ণ-প্রেক্ষিত বা colompupective তৈরী হয়ে ছবির জমিতে একটা ত্রি-মাত্রিকতা এনে দিয়েছে। ওঁর বর্ণান্তর সংস্থানও সেই ত্রি-মাত্রিকতাকেই জোরদার করে। কিউবিস্টরা কিন্তু চিত্রক্ষেত্রের এই মায়াবী ত্রি-মাত্রিকতাকে এড়াবার জন্যই রং-এর আলো-আঁধারী ধর্ম ও বর্ণান্তরকে তাদের অভিধান থেকে বাদ দিয়েছেন। এখন শিল্পী বলতে পারেন যে তাঁর ও কিউবিস্টদের অন্বিষ্ট এক নয়: যে দাবী করতে পারতেন লাইয়োনেল ফাইনিনগার এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতন শিল্পীরা। ফাইনিনগার এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি আপাতঃদৃষ্টে কিউবিস্টদের সমগোত্রীয় হলেও এঁদের দুজনের কেউই কিউবিস্ট নন। ইঁট পাথর লোহায় তৈরী নাগরিক স্থাপত্যের বিপরীত দিক থেকে নানাভাবে আলো পড়ে বস্তুতে - আলোতে - অন্ধকারে মিশে যে আলো-আঁধারি নকশা তৈরী হয় তার সাহায্যে মানুষ এবং প্রকৃতির রহস্যময় সম্পর্ক সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্যই তাঁরা এমন একটি রীতির উদ্ভাবন করেছিলেন যা আপাতঃদর্শনে কিউবিস্টদের মতন। হয়তো বা তাঁরা কিউবিস্টদের কাজ থেকে প্রেরণাও পেয়েছিলেন। কিন্তু বহুধা বিভক্ত প্রাতিস্বিক রূপের একটা চিত্রসম্মত ধ্রুব রূপের সন্ধানে প্রাতিস্বিক রূপকে ভাঙেননি যা কিউবিস্টরা করেছেন। যে মুহূর্তে সলিলবাবু পুরুষ নারী ফুল ইত্যাদির প্রাতিস্বিক রূপকে কিউবিস্ট কায়দায় চিত্রায়িত করেন সে মুহূর্তে কিউবিজমের দায়-দায়িত্ব তাঁর উপরে বর্তায়। নরনারীর পারস্পরিক অবস্থানের বিবরণের মধ্য দিয়ে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গি দিয়ে গল্প-বলার চেষ্টায় সলিলবাবু সে দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন। এবং অন্য কোন দায়িত্ব নেননি।

আমাদের দেশের আধুনিক শিল্পকলার অন্যতম দুর্বলতা এই যে আমরা হাতের কাছে পাওয়া ইউরোপীয় বা মার্কিণী শিল্পরীতির অনুকৃতি করি সেই রীতির পিছনে থাকা ভুয়োদর্শনের পরিচয় গ্রহণ না করেই।

শানু লাহিড়ীর ছবির প্রদর্শনী

কলকাতার চিত্ররসিকদের কাছে শানু লাহিড়ীর পরিচয় দেওয়া নিরর্থক। তিনি বহুদিন ধরে ছবি আঁকছেন এবং নিয়মিতভাবে সে সব ছবির প্রদর্শনী করে আসছেন। তেল-রংয়ের ছবিতে শ্রীমতী লাহিড়ীর দক্ষতা তর্কাতীত।

শানু লাহিড়ীর ছবির পৃথিবী একান্তভাবে নারীজগৎ। তাঁর ছবির পূর্ণযৌবন-ভারনম্রা নারীরা কখন একাকী কখনও বা একাধিক একাকী বিলাসী-বিষাদে মগ্ন, কখনও বা কর্মহীন ক্লান্তিতে মদালসা বিশ্রামরত কখনও বা বিকলাচালকের পৃষ্ঠারূঢ়া। এঁদের যদিবা কোন সমস্যা থাকে সে সমস্যা কদাপি জাগতিক; এঁদের সমস্যাদি একান্তভাবে মনোজাগতিক। এঁদের যৌবন এঁদের আত্মসচেতন করে না। এঁদের যৌবন সৌন্দর্যের সমার্থক দূরে থেকে উপভোগ করবার জন্য।

শ্রীমতী লাহিড়ীর রচনাশৈলী তাঁর নারীজীবন বিষয়ক ভুয়োদর্শনকে আশাতীত সাফল্যের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলে। সেদিক থেকে বিচার করলে শ্রীমতী লাহিড়ী সার্থক শিল্পী।

শ্রীমতী লাহিড়ী মোটা দাগের সহজ নহতা ইলিপটিক্যাল বোধ রেখার সাহায্যে তাঁর ছবির রূপবন্ধগুলিকে চেহারা দেন এবং বর্ণান্তর মাত্রিক রংয়ের পুঞ্জের সাহায্যে চিত্রক্ষেত্র ভরাট করেন। মুক্তছন্দে তুলি চালনা করে বর্ণলেপন করেন। মুক্তঅন্ত নহতা রেখা এবং বর্ণান্তরধর্মী রংয়ের মুক্তছন্দ বিন্যাসের গুণে ছবিতে এক ধরনের সুক্রিয়া বিলাসিতা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। রূপবন্ধের অভিব্যক্তিকে এই বিলাসিতা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলে। শ্রীমতী লাহিড়ীর বর্ণচয়ন এবং বর্ণবিতরণ পদ্ধতিও ছবির ইন্টিগ্রেশনে সাহায্য করে। উনি সাধারণতঃ স্পন্দমূলক উষ্ণ ও ঘোর বর্ণ ব্যবহার করেন না। উজ্জ্বল ও শীতল বর্ণই ওঁর ছবির প্রধান সম্বল। এবং উজ্জ্বল ও শীতল বর্ণকেও উনি সাধারণত মধ্যবর্তী বর্ণান্তরের ব্যবহারে পরস্পরের পরিপূরক করে নেন।

অনেকে ওঁর ছবির ফিগার ড্রইংয়ে ইলিপটিক্যাল বোধ রেখার ব্যবহারের ফলে গড়ে ওঠা মনুষ্যরূপের মধ্যে পটচিত্রের প্রভাব আবিষ্কার করেন। পটচিত্রে বিপরীতমুখী রেখার ব্যবহারে ঘনত্ব প্রকাশ করার যে রীতি দেখা যায় ওঁর ছবিতেও সেটা আছে। তবে উনি ইউরোপীয় কায়দায় বর্ণান্তরকেই ঘনত্ব প্রকাশের কাজে প্রধানতঃ ব্যবহার করেন। তাছাড়া শ্রীমতী লাহিড়ীর ছবির রেখার সঙ্গে পটচিত্রের রেখার চরিত্রের মিল কমই। পটচিত্রের রেখা কমনীয়বরী অভঙ্গ এবং সযত্ন। শ্রীমতী লাহিড়ীর রেখা স্বচ্ছন্দ এবং তার কমনীয় ভঙ্গি ও পটচিত্রের মতন অত সযত্ন নয়, অর্থাৎ অনেক মুক্ত। শ্রীমতী লাহিড়ীর বর্ণক্ষেপণ পদ্ধতি এবং রেখাঙ্কন যদি অন্য কোন ঐতিহ্যকে স্মরণ করায় তা হল আর্ট নুভো-র ঐতিহ্য। বস্তুত শ্রীমতী লাহিড়ী মাতিসের চৌহদ্দির বাইরে এক পা-ও বেরোননি।

-প্রণবরঞ্জন রায়

যামিনী কৃষ্ণমূর্তি

সন্ধ্যা সেন

যামিনী কৃষ্ণমূর্তি, যাঁকে ডঃ রাধাকৃষ্ণান দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে পৃথিবীর নানাদেশের রাষ্ট্রনেতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিভূদের কাছে পরিচিত করে দেবার সময় (বিশেষ অতিথিরূপে ছিলেন রাণী এলিজাবেথ) বলেছিলেন 'কুমারী যামিনী কৃষ্ণমূর্তি ইজ অ্যান আর্টিস্ট অফ গ্রেট ট্যালেন্টস হুজ সার্ভিসেস টু দি ক্ল্যাসিক্যাল ডান্স হ্যাভ বিন নোটেবল—'

এই নৃত্যশিল্পীর নৃত্যে মুগ্ধ হয়ে লণ্ডনের বিখ্যাত এক সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন—'সি গিভস দিস এ্যানসিয়েন্ট এ্যান্ড হাইরেটিক আর্ট এ্যান ইমিডিয়েসি এ্যান্ড এ বিউটি দ্যাট আর রেডিলি পারসেপটেবল'—সারা পৃথিবী তাঁর সৃষ্টির প্রশংসায় মুখর। ভারতের নানা অঞ্চল ও অন্যান্য মহাদেশের মন্তব্য পেশ করতে গেলে যামিনী কৃষ্ণমূর্তি সম্বন্ধে কিছু বলার অবকাশ পাওয়া যাবে না। শুধু দুটি মন্তব্যই উল্লেখ করলাম (একটি দার্শনিকের অপরটি বিদেশী সমালোচকের)—এই জন্য যে নিছক দেহসৌন্দর্যে অথবা ছন্দসুষমার বহিরংগ আকর্ষণে এঁদের আবেগ অবস্তুনির্ভর ভাবালুতায় হারাবার আশংকা নেই বলে।

রাধাকৃষ্ণান যামিনী কৃষ্ণমূর্তিকে শুধু প্রতিভাময়ীই বলেননি বলেছেন ক্লাসিক্যাল নৃত্যে তাঁর অবদান উল্লেখের যোগ্য।

নৃত্যশিল্পী আছেন অসংখ্য। লয়, তাল, মানে যাঁদের সাধনালব্ধ দক্ষতা মানুষকে বিস্মিত করবার মতই। কিন্তু নৃত্যের অন্তঃপুরের বার্তাটি 'সহৃদয়-হৃদয় সঞ্চারী' করে দিতে পারেন কোটিতে গোটিক শিল্পী যাঁরা বিধাতার দেওয়া সনন্দ নিয়ে এসেছেন। যামিনী কৃষ্ণমূর্তি সেই যুগচিহ্নিত শিল্পীদেরই একজন।— ভারত নাট্যমে তাঁর নিজস্ব অবদান কি, কোথায় কুচিপুরীর রংবাহারী মনোহারীতে তিনি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে নতুন কি রূপ দিয়েছেন সেই কথাটি জানবার

জন্য কান পেতেছি তাঁর নূপুরগুঞ্জিত ধ্বনিলোকে, ভাস্কর্য-সৌন্দর্যের নিশ্চল গতিরেখায়, দৃষ্টির ব্যঞ্জনায়।

যা পেয়েছিলাম আভাসে—তা স্পষ্ট হোলো শিল্পীর নিজের মুখের ভাষায়—'ভারতনাট্যম ইজ লিটারাজিক্যাল এ্যান্ড ডিভোশ্যানাল; কুচিপুড়ী ইজ রোম্যান্টিক এ্যান্ড ওড়িসী ডান্স ইজ লিরিক্যাল এ্যান্ড ডেকরেটিভ।' ভারত নাট্যম পূজো পাঠের ভক্তিনত নৃত্য; কুচিপুরী প্রণয়বিহ্বল অভিসার আর ওড়িষী নৃত্য যেন অলংকৃত গীতিকাব্য।

শৈশব থেকে যে নৃত্য ছিলো স্বপ্নের মত মায়াময়ী যৌবনের মধ্যাহ্নে সেই নৃত্যের ধ্যান পৌঁছেছে আজ ধারনার সম্পূর্ণতায়। সেই পূর্ণতার প্রতিধ্বনিই যেন শোনা গেলো যামিনী কৃষ্ণমূর্তির ভাবগভীর কটি কথায়।

'আমার জন্ম মাদ্রাজে। আর সারা শৈশব কেটেছে চিদাম্বরম মন্দিরের একরকম প্রাঙ্গনেই। নৃত্য ও সংগীত ছিলো আমার রক্তে। হয়ত সেইজন্যই ভাল করে চেতনা জাগবার আগেই মন্দিরের গায়ে খোদাই করা ভাস্কর্যমূর্তি আমায় টানত। মূর্তিগুলি সুন্দর বলেই নয়, প্রতিটি মূর্তিই অনন্য। ভাবে, ভাবনায় আর অনুভবেও। আমাদের দক্ষিণ দেশে পূজো হয় স্তোত্র গান দিয়েই। জানোত? পূজোর সময় গানের সংগে সংগে যখন আরতিদীপের শিখাগুলি থরথর করে কাঁপত সেই কম্পিত আলোয় মনে হোতো মূর্তিগুলি যেন নাচছে আর তার সংগে নেচে উঠছে মন্দিরের গায়ের অন্য মূর্তিরাও। মনে হোতো যেন দেবসভায় পৌঁছে গেছি, সেখানে শুধু নাচ আর নাচ। সারা শরীরে রোমাঞ্চ জাগত। আরতি থেমে যেতো কিন্তু থামত না আমার দেহের কাঁপন। আমার বাবা দার্শনিক মানুষ। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন আমার মনের গতি। খুব আদর করে বলতেন—'তুমি সংসারের ঘরণী হবে না, তোমায় হতে হবে মহাদেবের নৃত্য-সহচরী'—কথাগুলি আমার মর্মমূলে নাড়া দিয়েছিলো। আমি নাচের প্রেমেই পড়ে গেছি আর নটরাজের চরণে নিজেকে নিবেদন করে ফেলেছি চেতনার সেই উন্মেষলগ্নেই।

আমার খেলা ছিলো নাচ, চিন্তা ছিলো নাচ। ঘুমে-জাগরণে নাচই আমায় আচ্ছন্ন করে রাখত। সারা দিনের অধিকাংশ সময়ই কাটত মন্দির-গাত্রের সেই নৃত্যসভায়। দেখতাম হাসি হতে পারে কত রকমের। নানান দেবমূর্তি। তাঁদের মুখে হাসি। কারো হাসি স্মিতসংহত। কারো হাসিতে রভসলীলায় হারিয়ে যাবার বিস্মৃতি। আবার কারো হাসিতে দেখতাম ধ্যানলীনতার প্রসন্নতা। কি হাসি? চাউনী? ভংগি? এসবের বৈচিত্র্যও বুঝি অন্তহীন। এইসব চাউনী, ভংগি ভাবের অনুকরণ করতে করতে অজান্তেই যেন এইসব মূর্তিগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতাম।

আমার ভাবগতিক দেখে বাবা আর কালবিলম্ব না করে রুক্মিণী দেবীর কলাক্ষেত্রে আমায় ভর্তি করে দিলেন। ওখানের মেয়াদ শেষ করে গুরু এলাপ্পিল্লাই-এর কাছেও কোরিওগ্রাফির দীক্ষা নিয়েছি। ইনি বালাসরস্বতীর নৃত্যধারার শিল্পী।'

'একটা শুধু প্রশ্ন—ভারত নাট্যমে বালা সরস্বতী ও রুক্মিণী দেবী দুই ভিন্ন ধর্মী ব্যক্তিত্ব। দুজনের প্রকাশভংগী নৃত্যচিন্তার ধর্ম আলাদা। একটা স্টাইলের শিক্ষায় অভ্যস্ত হওয়ার পর অন্যটিতে পদক্ষেপ অনুভব অথবা নৃত্যভংগির জগতে কোনো স্বন্দের সৃষ্টি করেনি?'

'ধরেছ। স্বন্দের সৃষ্টি যে একেবারেই করেনি এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। তবে এ স্বন্দনকে কাটিয়ে উঠতে দেরী হয়নি; দুজনেই ভারত নাট্যমের সিদ্ধ-শিল্পী। তবে বালাসরস্বতী দেবদাসী বংশের। এ নৃত্যের ছন্দ শুধু তাঁর রক্তে নয়—মজ্জায়। আর রুক্মিনী দেবীর এ্যাপ্রোচ খুব স্কলারলি। একজনের নাচ সাগরের ঢেউ-এর স্বতঃস্ফূর্ত কল্লোল—ভাবের আবর্তন ঘটে দ্বীপান্তরের মত। আর একজন নৃত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন সাধিকার দৃষ্টিতে, কান পেতে শুনতে চান তার ঐতিহ্যের স্পন্দন। আনন্দ ও জ্ঞান অনুভব ও প্রজ্ঞা খতিয়ে দেখতে গেলে এরা ত পরস্পরাবিরোধী নয়। বরং পরস্পরের পরিপূরক। শিল্পীসত্তা গড়ে তোলায় এ দুয়েরই দাক্ষিণ্যর প্রয়োজন আছে।'

'সুন্দর বলেছেন। শিল্পীর যোগ্য কথা। এবার বলুন যা বলছিলেন—'

'চার বছরে কলাক্ষেত্রের শিক্ষা সমাপ্ত। ইতিমধ্যে নানা জায়গায় নৃত্যানুষ্ঠান করে চারদিকে একটু একটু নামডাকও হচ্ছিলো। কলেজের শিক্ষাও সমাপ্ত করে নিলাম। কারণ প্রতিটি রক্তকণায় তখন বাজছে মৃদংগের বোল। এমন সময় এলো যখন মনে হোলো আর সময় নেই। শুনতে পেলাম নটরাজের ভেরী, আর আমারও হোলোনা দেরী।'

'আর একবার কথায় বাধা দেবার জন্য মাপ চাইছি।—শিক্ষাজীবনের সংগে সংগে মঞ্চজীবন সুরু করার ইতিহাসও জানতে ইচ্ছে করছে।'

'ও! সিওর। প্রথম প্রথম স্কুলের নৃত্যনাট্যগুলিতে অংশ নিয়ে স্কুলে এবং বাইরেও বেশ কিছুটা নাম ও প্রতিষ্ঠা হোলো। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে কুমারসম্ভবের কথা। ১৯৫৭ থেকে ৫৬ অব্দে মাদ্রাজের নানা সভায় অনুষ্ঠান করে যশের পরিধি বেড়ে গেলো। ১৯৫৮তে স্মরণীয় নৃত্যানুষ্ঠান রাষ্ট্রপতি ভবনে যার অন্য নাম ইণ্ডিয়ার হোয়াইট হাউস।'

'যে অনুষ্ঠানে অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কদের সংগে রাণী এলিজাবেথও উপস্থিত ছিলেন?'

'হ্যাঁ—সেই আমার নৃত্যজীবনে স্মরণীয় পটপরিবর্তন। স্বপ্ন যেন জীবনে এলো সত্য হয়ে। অনেক বিদগ্ধজন চিনলেন যামিনী কৃষ্ণমূর্তি ও তাঁর ভারতনাট্যমকে। তারপর নেচেছি কোলকাতায় ত্যাগরাজ হলে রসিকরঞ্জনী সভার অনুষ্ঠানে। সমালোচক ও রসিকসমাজের প্রশংসা এখানে পেলাম। তবে দর্শকদের বেশীর ভাগই দক্ষিণ-ভারতীয়। ব্যাপকভাবে সারা কোলকাতায় এবং ভারতেও শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত হলাম ১৯৬২তে যখন জগদীশ চ্যাটার্জি (রবিশংকরজীর একাধারে কাজিন ব্রাদার ও সেক্রেটারী) আমায় একক নৃত্যে উপস্থিত করলেন সারা কোলকাতার রসিকসমাজে। এ ঋণ ভোলার নয়। তারপর ত কতবারই এসেছি কোলকাতায়। তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে, বালিগঞ্জ মিউজিক বনফ্ রেন্সে সনাতনবাবুর কনফারেন্সে।'

'হ্যাঁ আমারও মনে পড়ছে তোমার নাচ প্রথম দেখেছি বালিগঞ্জ কনফারেন্সেই। কিন্তু ভারতনাট্যমের সঙ্গে কুচিপুরী দেখেছিলাম এ্যান্ড ইফ আই অ্যাম নট মিসটেকেন—ওরিষী নাচও।'

'রাইট আর ইউ। দিল্লীর অনুষ্ঠানের পর আমি কুচিপুর গেলাম কুচিপুরী নাচ শিখতে। এ নাচ আমায় আকৃষ্ট করেছিলো এর রোমান্টিক আইডিয়ার জন্য। কুচিপুরী নৃত্যের আর এক আকর্ষণ এর বিদ্যুৎগতির আবেদন। এ যেন আলোর মত সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। মনোহর অভিব্যক্তি, পেলব মধুর দেহভঙ্গী, পদক্ষেপ সব মিলিয়ে যেন আমায় পাগল করে দিলো। আর ভারতনাট্যম শেখা ছিলো বলেই কুচিপুরী নৃত্য তুলে নিতে আমার দেরী হয়নি।'

'কুচিপুরী নৃত্যকে ত আপনিই গ্রাম থেকে মঞ্চে এনেছেন—যেমন ইন্দ্রাণী রহমান রসিকসমাজকে পরিচিত করেছেন ওড়িষী নৃত্যের আশ্চর্য রূপের সঙ্গে?'

'ঠিক তাই। তারপর যা বলছিলাম। কুচিপুরী নৃত্যের একাধারে শিল্পী গুরু ও অথরিটি ছিলেন বেদান্তম লক্ষ্মীনারায়ণ শর্মা। আমি শিখেছিলাম গুরু লক্ষণ শাস্ত্রীর কাছে। তাল, লয়, ঐতিহ্য-গীতি-কাব্যিক সৌন্দর্য সব মিলিয়ে সঙ্গীত কুচিপুরী পুরোপুরিই ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্য। এই নৃত্যকে আয়ত্ত করে যেদিন আমার নিজের নৃত্যভাষায় এর রূপান্তর ঘটালাম, সকলের দৃষ্টিপথে আনলাম এই নৃত্যের অন্তহীন সম্ভাবনা, নৃত্যশিল্পীর পক্ষে আপনাকে প্রকাশ করবার মত বিরাট ব্যাপ্তি—তখন মনে হোলো আমি সার্থক। অচেনা লোকের দ্বীপান্তরে যে শিল্প নির্বাসিত ছিলো বন্দিনী সীতার মত তার বন্ধনদশা মোচন করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়ে আমি শিল্পীর কর্তব্য কিছুটা পালন করতে পেরেছি ত।

ওড়িষী নৃত্য শিখেছি পঙ্কজ দাসের কাছে। ওড়িষী নৃত্যের ভাস্কর্য সৌন্দর্যের সঙ্গে গীতগোবিন্দের কান্তকোমল পদলালিত্য মিশে নৃত্যে এমন এক আবেগ সৃষ্টি করেছে যে যে-কোনো দেশের মানুষ মুগ্ধ হয়। না হয়ে পারে না বলে।

তবে কুচিপুরী ওড়িষী ভারতনাট্যম সকল নৃত্যেরই জাতি এক তফাৎ শুধু প্রকাশভঙ্গীর। বিষয়বস্তু একই। সেই কৃষ্ণ ও রাধার চিরন্তন প্রেম, বিরহ ও মিলন।'

'এবার বলুন ভারতনাট্যম কুচিপুরী অথবা ওড়িষী নৃত্যে আপনার নিজস্ব সৃষ্টি কি? কোন দিকটিতে আপনি জোর দিয়েছেন বেশী।'

'দেখ সাধক গীতিকারদের সঙ্গীত রচনার মধ্যেই যেন আমি এই বিরাট শিল্পকে দেখতে পেলাম। আমার সৃষ্টি কি? আমার নিজের নানান ধ্যান, ধারণা, কল্পনাকে আমি ভারতনাট্যমের আঙ্গিকেই রূপ দিয়েছি এ নৃত্যের ট্রেডিশনকে অক্ষুণ্ণ রেখে। অন্যভাবে বলা যায় চলমান চিন্তার ধারাকে প্রকাশ করেছি চিরন্তনের মর্যাদামণ্ডিত আধারে। এর আঙ্গিকের নকসা তথা ডাইমেনশ্যানাল ঐশ্বর্যকে নৃত্য, সঙ্গীত ও ছন্দের রেখায় ও সুরে উজ্জ্বল করে তুলতে চেয়েছি। যেমন ধর আমি দেখাই রামায়ণ। এখানে আমি একাই একাধারে রাম রাবণ সীতা লক্ষ্মণ, আরো অসংখ্য চরিত্রের বিভিন্ন এক্সপ্রেশনকে রূপ দিই।'

যামিনী কৃষ্ণমূর্তি পদ্মশ্রী পেয়েছেন কয়েক বছর আগে। তারও আগে ইনি অর্জন করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি। বহু আন্তর্জাতিক উৎসবে ভারতীয় নৃত্যশিল্পের প্রতিনিধিরূপে ইনি ভারতীয় নৃত্যের উন্নতমানের মর্যাদা রেখেছেন। ১৯৬৫তে ফার্স্ট কমনওয়েলথ আর্টস ফেস্টিভেলে যোগ দিতে গেছেন ইউনাইটেড কিংডাম। গেছেন নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া, বার্মা, ইউরোপের নানা দেশ এবং ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ। লন্ডনে 'দি সানডে টাইমস' যামিনী কৃষ্ণমূর্তিকে অকৃপণভাবে অভিনন্দিত করেছেন। 'সিডাকটিভ এ্যান্ড গড লাইক যামিনী ইজ এ ওয়ান্ডারফুল ডান্সার স্ট্রং, সাটল সিনুয়াস'। এ ছাড়া কানাডা (১৯৬৭) মস্কো, জার্মান, ফ্রান্সও জয় করে এসেছেন।

'ওদেশের নাচের ফর্ম ও শিল্পচিন্তার বৈশিষ্ট্য কি?'

ফ্রান্সের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পচিন্তার অনেক মিল আছে। ওরা স্পর্শকাতর সেন্সিটিভ, এস্থেটিক এবং সূক্ষ্ম শিল্পবোধসম্পন্ন।

জার্মানরা বেশী জোর দিয়ে থাকেন আঙ্গিকের উৎকর্ষ ও পাণ্ডিত্যের প্রতি।

লন্ডনের ব্যালে উন্নতমানের। মুভমেন্টসের ভারসাম্য, কঠিন ধাঁচের ভঙ্গিমা টেকনিকের দৃঢ়বদ্ধতা। নৃত্যশিল্পীরা জীবনের সব ছেড়ে শুধু নাচে আত্মনিয়োগ না করলে এটা সম্ভব হয় না। এবং এ বিষয়ে সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।'

'আপনি তো প্রায় সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। সকল দেশের বিদগ্ধ-সমাজ আপনার সৃষ্টির বন্দনায় মুখর। কিন্তু আপনি কোথায় নেচে আনন্দ পেয়েছেন?'

'অফ কোর্স ইন্ডিয়া। কারণ এখানের দর্শকবৃন্দ ভারতনাট্যম অথবা যে কোনো নৃত্যের ফিলসফির সঙ্গে পরিচিত। তাই নাচ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করতে পারি দর্শকদের উপলব্ধি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। অন্যান্য দেশে কি হয় জান? ভারতীয় নৃত্যের নানা দিক আছে ত? বহিরঙ্গ রূপসজ্জা নানা রাগ ও তালের গান-সঙ্গত, জমকালো সাজসজ্জা, মুভমেন্টসের বৈচিত্র্য—তথা এনটারটেনমেন্টসের দিকটি দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। ভাবের গুরুত্ব বোঝেন না কি? বোঝেন। তবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন। অন্য সবাই চাউনীর গভীরতা অভিব্যক্তির রকমারী প্রকাশ দেখে বোঝেন যে একটা কিছু চলছে। কিন্তু সেটা কি অত ডিটেলসএ বোঝেন না। তবে কি জান? ভারতীয় নৃত্যের এমন একটা বস্তু আছে যাকে বলা যায় সোলফুলিং—এ বস্তু আত্মাকে পূর্ণতার অভিসারী করে। প্রতিটি নৃত্যে লাস্য, কৌতুক, বেদনা সবই আছে কিন্তু মানবিক অনুভবের সীমা পেরিয়ে এটা পৌঁছচ্ছে অনন্তের চরণে। আমাদের মান-অভিমান হাসি-কান্না সবই ত দেবতার সঙ্গে। শিল্পীর দেহের খাঁচায় বন্দী আত্মা পাখির মত ডানা ঝাপটাচ্ছে মুক্তি পাবার জন্য। এই মুক্তিত্বার আনন্দ বেদনার চরম প্রকাশ আমাদেরই শিল্পে। এই কথাটির আভাস ওরা পায় আমাদের নাচে, গানে। আর এই অন্তরমুখীন শিল্পের ডাকে অজান্তেই ওদের চিত্ত দুলে ওঠে।

'এই অনামা ডাকাকেই দিলীপ রায় তাঁর অননুকরণীয় অভিব্যক্তিতে রূপ দিয়েছেন

একটি গানে। তার একটি চরণ হোলো **'না জেনেও জানে সে আঁধারে ঊষাও নিশার অভিসারী, দিশাও তৃষার অভিসারী**, সুধাও ক্ষুধার অভিসারী।'

ওয়ান্ডারফুল। ভারতীয় সাধক ছাড়া এভাবে কেউ চিন্তা করতে পারেন? ভারতের শিল্প ও সাধনা যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

বালা সারস্বতী আমার এত প্রিয় কেন জান? এই স্পিরিচুয়ালিটি ওঁর নাচে যেমন-ভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে এমন আর কারো নাচে নয়। আমি যখন স্টেজে এলাম রুক্মিণী দেবী তখন রিটায়ার করছেন। কিন্তু ওঁর কম্পোজিশন বড় সুন্দর আর খুব হারমোনাইজড।

আর উদয়শঙ্কর? কাগজে দেখেছি কানন দেবী উদয়শঙ্কর সম্বর্ধনায় বলে-ছিলেন, **'উদয়শঙ্কর হলেন নৃত্যের ভগবান'**—এ কথায় আমার মনও খুব সায় দেয়। উদয়শঙ্কর নৃত্যলোকে একমেবাদ্বিতীয়ম ব্যক্তিত্ব। ভারতীয় নৃত্যকে শিল্পমর্যাদায় তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যে কোনো নৃত্যশিল্পীর কাছে উনি ভগবান। নৃত্যের এমন অনন্ত বিস্তার প্রতিদিনের জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা থেকে আত্মার ঊর্ধ্বমুখী তৃষাকে নৃত্যের বিষয়বস্তু করা যায়, এ সত্য সম্বন্ধে তিনিই আমাদের সচেতন করেছেন। এমন ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট ভারতে ত নেই-ই সারা পৃথিবীতে কটা আছে সন্দেহ।'

'আপনার এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি কি নৃত্য থেকেই পাওয়া?'

'নিশ্চয়ই। তবে নৃত্যের মধ্যে ফিলসফিকে খুঁজে নেবার দীক্ষা পেয়েছি আমার বাবা জে. কৃষ্ণমূর্তির কাছে। তিনি মস্তবড় দার্শনিক ও পণ্ডিত।'

আপনার নাচের আগে তাঁর ইনট্রো-ডাকশনেই একথা বোঝা যায়। আর একটা কথা, শিল্পকে জীবনের ব্রত করতে পারেন কারা? যাঁরা অসংসারী কারণ শিল্পলক্ষ্মী ঈর্ষাপরায়ণ কারো সঙ্গে ভাগাভাগিতে রাজী নন। বললাম—প্রশ্নের ভঙ্গীতেই।

রাইট।

'কিন্তু অর্থসমস্যাও একটা বড় জিনিস নয় কি?'

'অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা একটা বড় ফ্যাক্টর নিশ্চয়ই। বাট ইট ডিপেন্ডস অলসো অন দি পার্সন—হাউ মাচ হি অর সি ক্যান স্ট্যান্ড। তবে আবার বলছি বাংলাদেশের অডিয়েন্সই সবচেয়ে এনলাইটেন্ড—কারণ কসমোপলিটান সিটি হলেও খাঁটি ভারতীয় মনোভাব বাংলাদেশের তথা কোলকাতার শিল্পরসিকদের মধ্যেই বিদ্য-মান। অবশ্য এর জন্য উদয়শঙ্করের অবদানের কাছেই আমরা ঋণী।' এই অবধি হোলো যামিনী কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে ১৯৬৯ সালের ইন্টারভ্যুর বিবরণ।

সম্প্রতি তিনি কোলকাতায় আসতে অনেকক্ষণ আলোচনা হোলো। দেখলাম অনেক বিষয়ে তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটেছে।

বর্তমান নৃত্য ও সঙ্গীতের ধারা প্রসঙ্গে শ্রীমতী কৃষ্ণমূর্তির মত হোলো গ্রামে তবু নৃত্যের ধারা অন্তত নিজস্ব মৌলিকতা বজায় রেখেছে। কিন্তু (কোলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে) শহরের নাচে ফিল্মের হাল্কা নাচের ছোঁয়া লেগে এর মর্যাদা ও গাম্ভীর্য অনেকটাই কম হয়েছে। প্রতিভাসমৃদ্ধ নৃত্যদক্ষ শিল্পীর সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু তাঁরা কেউই গ্রেট পারসোনালিটি হয়ে উঠতে পারছেন না। কারণ একটু শিখেই মঞ্চে নেমে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হোলো কোনো ফিল্মে নামা অথবা ফিল্মে নৃত্যের পরিচালক হওয়া। যা শিখেছেন চর্চার অভাবে তার ক্ল্যাসিক্যাল ক্যারেকটার ডিগ্রেড করছে আর কল্পনা রিক্ততার কারণে এসব নাচ দর্শকচিত্তে দীর্ঘস্থায়ী কোনো ইমেজ সৃষ্টি করতে পারছে না। আবার বলছি সৃষ্টিশীল শিল্পীরূপে আজও আমার আদর্শ **উদয়শঙ্কর, বালা সরস্বতী ও শান্তা রাও।'**

'আপনার শিল্পীজীবন নিয়ে আপনি সুখী ত? প্রশ্ন করি।

'হ্যাপিনেস ইজ এ বিগ টার্ম। ইট ডিপেনডস আপন দি মেন্টাল অ্যাটিচিউড অফ এ পার্সন। দেখ সুখ একটা মস্তবড় কথা। এটা নির্ভর করে শিল্পীর মানসিকতার ওপর'—গম্ভীরভাবে বললেন শ্রীমতী ভদ্রে! এটা কি এড়িয়ে যাওয়া কথা নয়? আপনার মানসিকতাটা কোন দিকে সেইটেই যে জানতে চাইছি'—চেপে ধরলাম।

এবার হেসে ফেললেন যামিনী—আর সে হাসিতে অজানা যামিনীও আলোকিত হোলো। 'আমার মত সামান্য একটা মানুষ গতানুগতিক পথের বিপ্লবী হয়ে অচেনার অভিসারে যাত্রা করেছে—একথা বললে কি ছোট মুখে বড় কথা বলা হয় না? সবাই বলেন, আমি বিবাহ করিনি। জীবনের একটা দিক অসম্পূর্ণ ইত্যাদি।'

'আপনার মনের গাঁটছড়া ত নটরাজের সঙ্গেই বাঁধা হয়ে গেছে জ্ঞান হবার আগেই। তাঁর সঙ্গে ঘর করতে করতেই আপনি পূর্ণ থেকে পূর্ণতরর দিকে এগোচ্ছেন।'

'থ্যাংক ইউ। তোমার মনটা বড় আর্টিস্টিক। তাই শিল্পীর মনটি তুমি উপলব্ধি করতে পার। আর সেইজন্যই ত বারবার তোমার সঙ্গে আলোচনায় বসতে এত ভালো লাগে। মনে হয় এ যেন নিজের মনটাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা। আমার বেদনা জাগে কখন জান? যখন দেখি ভারতীয় নৃত্যে ফিলসফির দিকটিই অবহেলিত হচ্ছে। সামথিং মোর ইজ ওয়ান্টিং—বিকজ ইট ইজ বিকামিং শ্যালো। যামিনী হাসলেন—বিষণ্ণ হাসি।

যামিনীর নৃত্য প্রথম দেখেছিলাম ১৯৬৪তে, তারপর ১৯৭০এ-৭৩এ এবং কমাস আগে কলাসংগমে।

প্রথমের দিকে বিভিন্ন তালে ছন্দময় পদক্ষেপ, দেহসৌন্দর্যের কাব্যময়তা, আবেগ-নিবিড় রোমান্স প্রেমবেদনার উচ্ছল কল্পনা শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও পরিশীলিত শিল্প-বোধের সঙ্গে মিলে যেন এক আশ্চর্য সৃষ্টি হয়ে উঠেছিলো। সে ছন্দময়ীর এর চেয়ে সার্থক পরিণতি ভাবা যায় না।

এখন দেখলাম পদম-এ নটরাজের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের লীলা। একই অঙ্গে যেন লক্ষ লক্ষ ভাব ও রূপের অবিরাম আবর্তন ঘটছে। আগের তুলনায় এখন কিছু বিলম্বিত। কিন্তু ভাবনায় ভারী হয়ে আসা স্থির ভঙ্গি, ঊর্ধ্বদৃষ্টি নিমীলিত ধ্যান নেত্র মনে করিয়ে দিলো যামিনী কৃষ্ণমূর্তি শুধু গ্রোয়িংই নন। ডাইনামিক পার্সোনালিটিও।

সেকালের সঙ্গীতগুণী

বুলবুল না অর্ধনারীশ্বর?

সেই চন্দননগরের জলসা থেকেই আরম্ভ করা যায়।

অনাথবাবুর সংগীতজীবনের প্রথম দিকের কথা। একই সঙ্গে তখন চলেছে তাঁর গান আর তবলার চর্চা। লক্ষ্মী ওস্তাদের কাছে দুয়েরই তালিম নিচ্ছেন। গান, তবলা দুয়েরই আসর করছেন কলকাতায়। নামকরা ওস্তাদদের সঙ্গে বাজাচ্ছেন। তাঁর তবলা সঙ্গতে সকলেই সন্তুষ্ট। সরোদী আমীর খাঁ ত তাঁকেই আসরে পেতে চান বেশি। তাঁর মধ্য লয়ের জমাট বন্দিশের সঙ্গে অনাথবাবুর বাজনা তাঁর ভারি পছন্দ।

সেই সময়কার কথা। অনাথবাবু তখনো রায়গড় দরবারে যোগ দেননি। বয়স হবে ২৪।২৫ বছর। অর্থাৎ এখন থেকে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি। ১৯২১।২২ সালের কথা।

চন্দননগরের পালপাড়া। সেখানকার শীল পরিবার ছিলেন ধনী এবং সংগীতের শখদার। মুজরো দিয়ে ভাল ভাল কলাবৎদের চন্দননগরের বাড়িতে নিয়ে যেতেন। আসর বসাতেন তাঁদের সাজানো বিরাট হলঘরে। তাছাড়া এ-বাড়ির বীরেন্দ্রনাথ যন্ত্রসংগীতের চর্চা করতেন। বীরেন্দ্রনাথের পিতা গানবাজনা ভালবাসতেন। একেনো ঘরোয়া হলেও বেশ ভাল আসর হত এখানে।

সেবারও এমনি একটি জলসার আয়োজন হয়েছিল। কলকাতা থেকে শীলবাড়িতে গিয়েছিলেন কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পী। সরোদী আমীর খাঁ, সেতারী এনায়েৎ খাঁ, সারেঙ্গী ছোটে খাঁ। সেতার-সুরবাহারী হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল—এই কজন যন্ত্রী। আর গায়কদের মধ্যে শুধু অনাথনাথ বসু। স্বৈতকণ্ঠের গানের জন্যে তখনই তাঁর বেশ নামডাক হয়েছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। তাঁরা সকলে বসেছেন জলসাঘরে। স্থানীয় দু-একজন গায়ক-বাদকও এসেছেন। হল শ্রোতায় পূর্ণ। আসর আরম্ভ করলেই হয় এখন।

কিন্তু একটা বাধা পড়েছে। শিল্পীদের মধ্যে বিশিষ্ট একজনই অনুপস্থিত। প্রধান তবলাবাদক এখনো এসে পৌঁছননি। তাঁর জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন গৃহকর্তা, বীরেন্দ্রনাথের পিতা। সব শিল্পীরাও অপেক্ষা করছেন। আর শ্রোতারা অধৈর্য হয়ে উঠছেন। কিন্তু এখনো দেখা নেই তাঁর।

এমনি ভাবে কাটল আরো কিছুক্ষণ। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে? বেশ রাত হয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত লজ্জিত, অপ্রস্তুত বোধ করছেন বীরেন্দ্রনাথের পিতা। অথচ নিরুপায়।

তখন অনাথবাবু তাঁকে আলাদা ডেকে বললেন, 'আপনি মন খারাপ করবেন না একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

গৃহস্বামী তখনো ভরসা পাচ্ছিলেন না। 'কি হবে? আমি ত কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না। এত দেরী হয়ে গেছে যখন আর তাঁকে পাওয়া যাবে না। সন্ধ্যার আগেই তাঁর আসবার কথা ছিল।'

অনাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন 'এখানকার কোন তবলচী পাওয়া যাবে না?'

'তা পাওয়া যাবে না কেন? তবলা বাজিয়ে ত এই আসরেই রয়েছে, চন্দননগরের লোক। কিন্তু সে এত বড় ওস্তাদদের সঙ্গে বাজাতে সাহস করবে না। আর পারবেও না। এঁরা সবাই যন্ত্রী। এঁদের সঙ্গে বাজাবার মতন কেউ আমাদের জানা নেই।'

অনাথ বসু

'আচ্ছা আমার গানের সঙ্গে বাজাতে কাউকে পাওয়া যাবে এখানে? শুধু ঠেকা দিতে পারলেই হবে।'

'তা হতে পারে।' বলে একজনকে অনাথবাবুর সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন।

'তাহলে আমি আগে একটু গেয়ে নিই।'

বলে অনাথবাবু আসর পত্তন করলেন।

প্রথমে ধরলেন একটি খেয়াল। তারপর সেই মিহি কণ্ঠে শোনালেন ঠুংরি। প্রথম গান থেকেই আসর জমে গেল। আর তাঁর স্বৈতকণ্ঠের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হল শ্রোতাদের।

গানের আসরের পর কিছুক্ষণের বিরতি। তারপর আবার আসর আরম্ভ হল।

অনাথবাবু এবার তবলা নিয়ে বসলেন। এবার শুধুই যন্ত্রসংগীত। রাত তখন দশটা বেজে গেছে।

আসরে এসেছেন তখনকার ক'জন শ্রেষ্ঠ বাদক। পাশাপাশি তাঁদের বাজনা শোনা যাবে—এ বড় কম সুযোগ নয়। এতক্ষণ যাঁদের জন্যে সবাই অপেক্ষা করে বসেছিলেন, এবার তাঁরা আশা পূরণ করলেন। শ্রোতাদের

এ এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

এনায়েৎ খাঁর সেতার। আমীর খাঁর সরোদ। হরেন্দ্রকৃষ্ণের সেতার। ছোটে খাঁর সারঙ্গ। পরম আনন্দে শুনতে লাগলেন শ্রোতারা।

পর পর চার গুণীর বাজনায় সারারাত চলে গেল। তাঁদের সঙ্গে একদমে সঙ্গত করে গেলেন অনাথনাথ। তাঁরা একেকজন বাজাবার পর বিশ্রাম করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি অবিশ্রান্ত অক্লান্ত। আর নিছক ঠেকা দেয়া নয়। সেকালের ক'জন শ্রেষ্ঠ কলাকারের যোগ্য তবলাবাদন।

প্রত্যেক যন্ত্রীই খুসী হলেন তাঁর সঙ্গতে। তাঁরা সকলেই ত তাঁকে তবলাবাদক বলে জানতেন। তাঁর সঙ্গে বাজিয়েছেনও কলকাতার আসরে। সেজন্যে কোন অসুবিধাই তাঁদের হয়নি এখানে। বেশ মেজাজেই তাঁরা বাজিয়ে গেলেন।

আসর শেষ হল সকাল সাতটায়।

ওস্তাদদের তারিফ, শ্রোতাদের প্রশংসা আর গৃহস্বামীদের কৃতজ্ঞতায় সার্থক হলেন অনাথবাবু।

সেসব কি গৌরবের দিনই তাঁর গেছে। শুধু একেকটি এমন নাটকীয় আসর নয়, নিয়মিত, প্রথম শ্রেণীর কত আসরে বাজনা।

তখনকার কলকাতার দুটি বার্ষিক সম্মেলন—শঙ্কর উৎসব ও মুরারি সম্মেলন। সেসব বিরাট আসরেও তিনি তবলা সঙ্গত করেছেন নানা ওস্তাদদের গানবাজনায়। আসরে আসরে আর সেই দুটি সম্মেলনে যাঁদের সংগে বাজিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন—সরোদী করামতুল্লা খাঁ, সেতারী এনায়েৎ খাঁ নানারীতির গায়ক (বাদকও) পশুপতিসেবক মিশ্র ও শিবসেবক মিশ্র, সরোদী আমীর খাঁ সারঙ্গী ছোটে খাঁ, সারঙ্গী গৌরীশঙ্কর মিশ্র, খেয়াল ঠুংরি দাদরা গায়ক জমিরুদ্দিন খাঁ—তখনকার এমনি শ্রেষ্ঠ গুণীরা।

আমীর খাঁ ও ছোটে খাঁর যে গ্রামোফোন রেকর্ড আছে সেখানেও সঙ্গত করেছেন অনাথনাথ।

সেসময় কলকাতায় তাঁর গানের চেয়ে তবলায় নাম কিছু কম ছিল না। আর গানের

সঙ্গে তবলার রিয়াজও করতেন সমানে। বছরের পর বছর সেই চর্চা তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে বজায় রাখেন। গানের সঙ্গে তবলা-সঙ্গত মিলিয়ে অতি পরিপূর্ণ, ঐকান্তিক ছিল তাঁর সেকালের সঙ্গীতজীবন। প্রথম দিকে কখনো কখনো তবলার জন্যেই আসরে তাঁর ডাক বেশি আসত। গায়ক বাদকদের আস্থা ছিল এই তরুণ সঙ্গতীয়ার ওপরে।

তারও মূলে ছিল তাঁর রীতিমত তালিম। কয়েকজন কলাবতের কাছে তবলায় শিক্ষা তিনি অনেকদিন ধরে পেয়েছিলেন। সব্যসাচী ওস্তাদ লছমীপ্রসাদ মিশ্রের কাছে শিখেছিলেন সাত বছর। গানের সঙ্গে তবলা শিক্ষাও তাঁর কাছে তখন চলেছিল। তা ছাড়াও তবলায় তাঁর ছিলেন আরো তিনজন ওস্তাদ। দিল্লীর নূরে মহম্মদ, মীরাটের মহম্মদ সাফি এবং বারাণসীর বদ্রিদ মিশ্র। এঁরা তিনজনই তখন কলকাতায় থাকতেন। এখানেই তাঁদের কাছে শিক্ষার সুযোগ পান তিনি।

প্রথম জীবনের তবলায় সেই চর্চা ও খ্যাতি পরে তাঁর কমে যায় গানের তুলনায়। তার কারণ উত্তরজীবনে রায়গড় দরবার ও পশ্চিমের আসরে মজলিশে খুব বেশি যোগ দিতে যেতেন। গায়ক বলেই মুজরো করতেন। সেজন্য তবলার আসর তাঁর ক্রমেই কমে এসেছিল।

তাহলেও তবলার চর্চা তিনি কখনোই ত্যাগ করেননি। পরে যখন নিজের শিক্ষক জীবন আরম্ভ হয় তখনো নানা ছাত্রকে শেখান তবলা। এখনকার বাংলার সুপরিচিত তবলাশিল্পী শ্যামল বসু তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তবলায় তাঁর সুযোগ্য উত্তরসাধক। তাঁর অন্য দুই পুত্র কমল (গায়কও একাধারে) এবং গোবিন্দ বসুও কৃতী তবলাবাদক। তিন ভ্রাতার তবলা-শিক্ষা প্রথমে পিতার কাছেই সম্পন্ন হয়...।

তবলা এবং খেয়াল ঠুংরির কলাকার, দৈবতকণ্ঠের অদ্বিতীয় শিল্পী অনাথনাথ সংগীতজগতে একজন দিকপাল। আকৈশোর সঙ্গীতই তাঁর জীবনের প্রধান আকর্ষণ ও সাধন বস্তু হয়েছে। পথ দেখিয়েছে তাঁকে। সিদ্ধিলাভ এইভাবেই করেছেন জীবনে। সঙ্গীত ভিন্ন অন্য কোন সত্তা যেন তাঁর নেই। সুদীর্ঘ ৬০ বছরে বিস্তারিত তাঁর সঙ্গীত-জীবন। আর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কণ্ঠ-সঙ্গীতের জন্যেই তাঁর সম্মানের আসন। সে প্রতিষ্ঠার জন্যে যেমন তাঁর সহজাত প্রতিভা তেমনি কি একনিষ্ঠ প্রস্তুতিই ছিল।

অতি বর্ণাঢ্য উদ্ভাসিত সেই সঙ্গীত-জীবনেরই উপযুক্ত তাঁর বিচিত্র ও বহুমুখী শিক্ষাধারা, কত কলাকারের বিদ্যায় সমৃদ্ধ, গঠিত তাঁর শিল্পী-সত্তা। এত ব্যাপকভাবে শিক্ষা, সংগ্রহ বাংলায় এ যুগে আর কজন করেছেন? কিংবা পেয়েছেন এত গুণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ?

১৬।১৭ বছর বয়স থেকেই অনাথনাথের নানা আচার্যের কাছে শিক্ষা আরম্ভ হয়ে যায়, সহজাত শক্তি ত ছিলই। কিন্তু সেই সঙ্গে গ্রহণ ও আত্মস্থ করে নেবার কি অদম্য আগ্রহ। আর তন্নিষ্ঠ ভাবনা অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম। কি দুর্বার প্রেরণায় সঙ্গীতকে তিনি বরণ করেছিলেন, শিল্পী হবার জন্যে সব কিছু করতে, সর্বত্যাগী হতে কিভাবেই প্রস্তুত হয়েছিলেন। সে বৃত্তান্ত দেওয়া হয়েছে তাঁর জীবনকথায়। এখন শুধু তাঁর ওস্তাদদের কাছে শিক্ষার অধ্যায়টি উল্লেখ করা যাক।

তবলার কথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে শুধু গান শিক্ষার প্রসঙ্গ।

তাঁর প্রথম ওস্তাদ কাশীর বিখ্যাত ছোটে রামদাস। টপ্পার এক শ্রেষ্ঠ কলাবৎ রামদাসজীর কাছে তিনি ছ' মাস শিক্ষার্থী ছিলেন। তবে যত শেখবার আশা করে ছিলেন তা পূরণ হয়নি।

তারপর তিনি আসেন হাওড়া শিবপুরে। ধ্রুপদ ও টপ্পা গায়ক নিকুঞ্জবিহারী দত্তের কাছে শিখতে থাকেন। দুবছর চার-পাঁচ মাস তাঁর শিক্ষা চলে এখানে।

তাঁর তৃতীয় শিক্ষাগুরু হলেন লছমীপ্রসাদ মিশ্র। বহুমুখী কলাবৎ লছমীজীর কাছে তিনি দীর্ঘ সাত বছর একাদিক্রমে শেখেন। এই শিক্ষাপর্বই সব চেয়ে ফলপ্রসূ হয় তাঁর সংগীতজীবনে। খেয়ালের মূল ভৌলটি তাঁর এখানেই গড়ে ওঠে। খেয়ালগায়ক রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ হয় মিশ্রজীর তালিমেই। রাগাবদ্ধায় এবং খেয়াল টপ্-খেয়াল ইত্যাদি নানা রীতির গানে তিনি এই সাত বছরে অভিজ্ঞ হয়েছিলেন।

সমান্তরাল মৌজুদ্দিনের কাছে অনাথবাবু শিখেছিলেন কয়েক মাস। তাঁর কাছে বিশেষ করে ঠুংরি দাদরা শেখেন। সেকালের বিখ্যাত গায়িকা মালকা জানের (আগ্রাওয়ালী) বাড়িতে তিনি শিখতেন মৌজুদ্দিনের কাছে। মালকা জানের অনুরোধেই অনাথবাবু মৌজুদ্দিনের শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। 'পিয়ায় মোরে আঁখিয়া, রাজা হামসে না বোলো' (খাম্বাজ দাদরা), 'সাঁচি কহো মোসে বতিয়া' (খাম্বাজ, ঠুংরি) 'সজন কাহে কো নেহা লাগাও' (মিশ্র শংকরা—খাম্বাজ ঠুংরি) 'নাব মঝি মোরা জিয়ারা কেইসে যাদু ডারা' (পিলু মিশ্র, দাদরা)'—এইসব গান তিনি শিখেছিলেন মৌজুদ্দিনের কাছে। আগ্রাওয়ালী মালকা জানকে তাঁর ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটের বাড়িতে খাঁ সাহেব তালিম দিতে আসতেন। সেসময় সেখানেই তাঁর কাছে শিখতেন অনাথবাবু মালকা জানের কথায়,—'খাঁ সা'ব, এই ছেলেটিকে একটু শেখাবেন। বড় ভাল গাইছে। আর শেখবারও ওর ভারি ইচ্ছে।'

তখন মালকার বাড়িতে মৌজুদ্দিনের গান অনাথবাবু অনেক শোনেন। আর দুলিচাঁদের দমদমার বাড়ির আসরেও শুনতেন খাঁ সাহেবের গান। তাঁর কাছে এইসব দিনের শেখা আর আসরে শোনার ফলে অনাথবাবুর অনেক কাজ হয়েছিল। ঠুংরির দাদরার চাল কেমন চিত্তাকর্ষক হতে পারে, সঙ্গীতে রসসৃষ্টি কিরকম হয়, গানে মাধুর্যের স্থান কতখানি—এসব বিষয়ে উপকৃত হন মৌজুদ্দিনের গান শুনে।

তবে ছোটে খাঁর কাছে অনাথবাবু মৌজুদ্দিনের চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছিলেন।

সারঙ্গী ছোটে খাঁর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় তারাপ্রসাদ শেঠের বাড়িতে। অনাথবাবু তখন তবলা বাদক। আর গানও দস্তুরমত শিখছেন লছমী ওস্তাদের কাছে। আসরে গাইছেনও। তখন থেকে প্রায় ২০ বছর ছোটে খাঁর সঙ্গে যোগাযোগ থাকে। খাঁ সাহেবের সঙ্গে অনেক আসরে তিনি তবলা সঙ্গত করতেন। তেমনি ছোটে খাঁও তাঁর গানের সঙ্গে সারঙ্গী বাজাতেন নানা আসরে। ছোটে খাঁর ঠুংরি দাদরা গানের বিপুল সঞ্চয় ছিল। তার অনেক গান তিনি দিতেন অনাথবাবুকে। শুধু গান নয় গাইবার রীতিনীতিও। ওই যে 'পিয়ায় মোরি আঁখিয়া রাজা হামসে না বোলো' গানখানি অনাথবাবু শিখেছিলেন মৌজুদ্দিনের কাছে। ওই গানে ছোটে খাঁ এত শোর তাঁকে দেন যে গানখানির এক অপূর্ব চাল দাঁড়িয়ে যায়। যেন পূর্ণতা পায় গানটি। এই গানে তারপর থেকে অনাথবাবু কত আসরই মাৎ করে দিতেন। প্রত্যেক শিল্পীর এক একটি গান থাকে সাড়া-জাগানো। তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ পরিচয়। শ্রোতারা বিশেষ করে শুনতে চান তাঁর 'সেই গানটি'। 'পিয়ায় মোরি আঁখিয়াও অনাথবাবুর তেমনি চিহ্নিত হয়ে ওঠে। মৈজুদ্দিন খাঁও পরে কতবার তাঁকে ফরমায়েস করেছেন 'উও গানাঠো শুনাও।' ছোটে খাঁর দেওয়া শোর ইত্যাদির জন্যেই এ গানটি অনাথবাবুর এত উৎরে যায়। এমনি নানাভাবে ছোটে খাঁ গানের বিষয়ে হদিস দিতেন তাঁকে। তা ছাড়া, নিজে অত বড় একক সারঙ্গী-বাদক ছোটে খাঁ, রাগ বিদ্যায়ও ছিলেন রীতিমত অভিজ্ঞ। দীর্ঘকালের পরিচয়ে খাঁ সাহেব তাঁকে অনেক রাগের রাস্তাও বাতলিয়ে দিতেন। এসবই অনাথবাবুর শিক্ষা সংগ্রহের অঙ্গ।

তেমনি উপকৃত তিনি গৌরীশঙ্কর মিশ্রের কাছে। ওস্তাদ গৌরীশঙ্কর ছিলেন মহা গুণী সারঙ্গী। শ্রেষ্ঠা গায়িকা গহরজান, কৃষ্ণভামিনী, ইন্দুবালা, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ছন্নুলাল মিশ্রের প্রমুখদের তালিম দিয়ে কলকাতার সঙ্গীতসমাজে একজন আচার্য হয়েছিলেন। শ্রেষ্ঠা বাঈজী গহর জানের প্রধান সারঙ্গীও তিনি। তাঁরও গানের সঞ্চয় ছিল বিপুল। অনাথবাবু বহুদিনের সঙ্গ লাভে গৌরীশংকরের কাছেও অনেক পেয়েছেন। নানা রাগের রাস্তা, গানের চলন ইত্যাদি। ওস্তাদ গৌরীশংকরের একক সারঙ্গবাদনের সঙ্গে তিনি কতদিন তবলা সঙ্গতও করেছেন। আবার কত আসরে মিশ্রজী তাঁর গানের

সঙ্গে বাজিয়েছেন সারঙ্গ। অনাথবাবু তাঁরও একজন শিষ্য স্থানীয়।

গহর জানের সঙ্গেও এক সময়ে অনাথবাবুর সাঙ্গীতিক যোগাযোগ ছিল। বাঈ সাহেবার কাছে তিনি শেখেন নি বটে। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কয়েকটি গান সংগ্রহ করেছিলেন। তার মধ্যে একটি গান গহর জানের নিজেরই রচনা। একথা অনেকেরই জানা নেই যে, গহর জানের সঙ্গীত রচনার শক্তিও ছিল। তাঁর কাছে এই খাম্বাজের ঠুংরিটি পেয়েছিলেন অনাথনাথ—

তন্ মন কি সুধা বিসর গেয়ি
কেইসি বজায়ি রে বাঁশরিয়া।
যব সে ভানকো শুনি কানন-মে য়ে
তব সে নিদ নাহি মেরা নয়নন্ মে।
কহে গহর পিয়াঁর মন তুন্ লিজিয়ো
মুরলি কি ধুন শুনি বাওরিয়া।।......

ওস্তাদ সরদী আমীর খাঁর কাছেও অনেক পেয়েছেন অনাথবাবু। দশ বছর খাঁ সাহেবের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর সরদের আসরে কতদিন তবলাসঙ্গত করেছেন তিনি আমীর খাঁর (এবং তাঁর বিবি, লক্ষ্ণৌর ঠুংরি-গুণী ছোটে ছুন্নি খাঁর কন্যা-র) ঠুংরির সংগ্রহ অনেক ছিল। সেজন্যে বেশ কিছু গান অনাথবাবু পান আমীর খাঁর কাছে। তা ছাড়া, নানা রাগের পথনির্দেশও পেয়েছেন দীর্ঘকালের সংস্রবে। আমীর খাঁ তাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। বিভিন্ন গানের বন্দিশ আর রাগের চলন ইত্যাদি যেমন তাঁর দরকার হত, উদারভাবে তাঁকে দিয়েছেন খাঁ সাহেব। আমীর খাঁ তাঁর চেয়ে ২১।২২ বছরের জ্যেষ্ঠ। আসরে তিনি তবলাবাদক হিসেবে খাঁ সাহেবের সহযোগী থাকতেন বটে। তবে নিজেকে মনে করতেন তাঁর শিষ্যস্থানীয়।

ফৈয়াজ খাঁর কাছেও অনাথনাথ গায়ক জীবনে ঋণী। ফৈয়াজের কাছে তিনি কখনো শেখেননি যদিও খাঁ সাহেব তাঁকে ছাত্র করতে চেয়েছিলেন। তবে পশ্চিমের বহু আসরে যোগ দিয়েছেন ফৈয়াজের সঙ্গে। গেয়েছেন তাঁর সামনে। খাঁ সাহেবের গানও ঘনিষ্ঠভাবে শুনেছেন। সম্মেলনে, দরবারে, ঘরোয়া আসরে। ফৈয়াজের গান তাঁর ভাল লেগেছে। প্রভাবিতও করেছে তাঁকে। লছমী ওস্তাদ ভিন্ন একমাত্র ফৈয়াজ খাঁর খেয়াল গানই অনাথবাবুর একটি আদর্শ হয়েছে। খাঁ সাহেবের খেয়ালের কোন কোন বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করেছেন তিনি। তাঁর নিজেরই মতে, ফৈয়াজের খেয়ালের স-দাপট চাল, তাঁর বোলতান, লয়কারী ইত্যাদি অনেক সময় নিয়েছেন তিনি। খাঁ সাহেবের সঙ্গে শিল্পীরূপে বহু বছরের হৃদ্য সম্পর্ক ছিল। মেজাজী ফৈয়াজের প্রতি বরাবর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে এসেছেন অনাথবাবু। শিষ্য না হয়েও তাঁর কাছে পরোক্ষে লাভ করেছেন। (আর ফৈয়াজ খাঁর ওপরেও যে মোজুদ্দিনের প্রভাব ছিল, তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে মোজুদ্দিনের অধ্যায়ে)।

রায়গড়ের জীবনেও উপকৃত হয়েছেন অনাথনাথ। সুদীর্ঘ ২২ বছর তিনি রায়গড় দরবারের সভাগায়ক থেকেছেন। সেসময় ঘনিষ্ঠ সঙ্গ করেছেন কত মহা গুণীর। রায়গড় দরবারে গণেশ চতুর্থীর উৎসব সঙ্গীত জগতের এক স্মরণীয় অধ্যায় ছিল। একমাস-ব্যাপী তখন আসর বসত প্রতিদিন দুটি তিনটি করে। একই দিনে বিভিন্ন রাজবাড়ীতে জলসা। মূল দরবারে, কোন রানী মহলে কিংবা রাজবাড়ির অন্য আসরে। একই দিনে এত আসরের কারণ—সমাগত গায়ক-গায়িকা যন্ত্রী নৃত্যশিল্পীদের সংখ্যাধিক্য। সারা ভারতের নানা বিখ্যাত গুণীরা আমন্ত্রিত হয়ে রায়গড়ে আসতেন। গুণপনার পরিচয় দিতেন। মহারাজের প্রিয়পাত্র অনাথনাথের একটি বিশিষ্ট আসন ছিল তাঁদের মধ্যে। তাঁদের সঙ্গে একাসরে গাইতেন তিনি। সঙ্গে করতেন। উৎসবের কলাকার ভিন্ন দরবারে নিযুক্ত থাকতেন নৃত্য গীত যন্ত্রসঙ্গীতের অন্যান্য শিল্পী। সেই সভা-গায়ক সভা-বাদক সভা-নর্তকদের অন্যতম হলেন অনাথনাথ। দরবারের অন্য কলাবৎদের মধ্যে তিনজনের নাম করা যায় যাঁদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতা ছিল। জয়লাল মহম্মদ খাঁ ও পণ্ডিত ভূষণ। জয়লাল এক দুর্লভ, বহুমুখী প্রতিভার আধার। এত বিচিত্র পথে সঙ্গীতগুণের প্রকাশ বিশেষ দেখা যায় না। তিনি একজন দিকপাল নৃত্যশিল্পী। দরবারী সঙ্গীতজগতে সেইটিই তাঁর প্রধান পরিচয় বটে। কিন্তু অনাথবাবুর মতন নিকটজনেরা জানতেন জয়লালের আরো কৃতিত্বের কথা। তিনি উচ্চ কোটির খেয়াল ঠুংরি গায়ক, তবলা বাদক এবং হারমোনিয়ম বাদকও। জয়পুর ঘরানা নৃত্য ধারার সে যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তিনি। সুপরিচিতা নর্তকী জয়কুমারী যে জয়লালের কন্যা-শিষ্যা, একথাও প্রসঙ্গত বলা যায়। রায়গড়ের মহম্মদ খাঁ ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পার এক দিকপাল গুণী। তাঁর কাছে রাগ বিদ্যায় অনাথবাবু উপদেশ নির্দেশ পেতেন। তাঁর দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন মহম্মদ খাঁ। রায়গড়ে তিনি তখন আছেন, সঙ্গীতচর্চা করছেন প্রায় পাঁচ বছর। সে সময় মহম্মদ খাঁ একদিন তাঁকে বলেন বাস এবার তোমার গলায় জোয়ারি এসেছে। সুর বসেছে। এখন ঠিক রাস্তায় এসে পড়েছ। এবার জোর কদমে এগিয়ে যাবে।' তাঁর বয়স তখন ২৬।২৭ বছর। দরবারের তৃতীয় গুণী হলেন সভাপণ্ডিত। তাঁর নামও পণ্ডিত ভূষণ। তিনি নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন এবং অনেক গ্রন্থের লেখক এবং উচ্চ মার্গের বিদ্বান ছিলেন। কাব্যসাহিত্যে যেমন তাঁর অধিকার তেমনি সঙ্গীতেরও তিনি তত্ত্বজ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞ। পণ্ডিত ভূষণের সঙ্গে অনাথনাথ সঙ্গীত বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় যোগ দিতেন।

এমনিভাবে রায়গড় দরবারেও তিনি রাগবিদ্যা লাভ করেন নানাভাবে। তাঁর শিক্ষার্থী জীবনের প্রসার রায়গড় পর্যন্তও ধরা যায়।

কীর্তি-সমুজ্জ্বল সফল তাঁর সুদীর্ঘ কালের সঙ্গীতজীবন। তারই উপযুক্ত হয়েছিল সেই শিক্ষা পর্বের বিস্তার। উত্তর ভারতব্যাপী যেমন সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্র, তেমনি তাঁর সঞ্চয় সংগ্রহের ব্যাপকতা। ঐকান্তিক সাধনার সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতার মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছিল। আর জেগেছিল সঙ্গীতে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি। তারই প্রকাশ তাঁর সঙ্গীতের রস সৃষ্টিতে, তাঁর নিজস্ব গায়ন ভঙ্গিমায়। এত ওস্তাদের কাছে শিক্ষা সংগ্রহ করেছিলেন বটে। কিন্তু খেয়াল ও ঠুংরি দুই রীতিতেই নিজস্ব একটি চাল তিনি গড়ে নেন। তাই লছমী ওস্তাদের তালিমের ওপর ফৈয়াজ খাঁর কিছু ছায়াপাত হলেও অনাথবাবুর খেয়াল গান তাঁর আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। তেমনি তাঁর ঠুংরিও। আসলে তা বোল্ বানানা চালের। তবু বেনারসী আর লক্ষ্ণৌ ঠুংরির ঢঙ মিশ্রণে তিনি নিজস্ব ধরনে পরিবেশন করে এসেছেন। তাঁর প্রতিভার এই একটি স্বচ্ছন্দ নিদর্শন।

শিল্পী হিসেবে অনাথনাথের কি ঘটনা বহুল জীবন। এত বিভিন্ন আসরে যোগ দিয়েছেন, পশ্চিমের এত অঞ্চলে আর সঙ্গীতকেন্দ্রে গান গেয়েছেন দ্বৈতকণ্ঠে যার বেশি উদাহরণ বাংলায় দেখা যায় না। আর সবই অল্প বয়স থেকে। দেশের সব রকম সংগীত সংস্থার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সম্মেলন ইত্যাদি থেকে বেতার প্রতিষ্ঠানেও তিনি প্রথম যুগ থেকে যুক্ত হয়েছেন। সে বোধহয় ১৯২৮ সালের কথা। টেম্পল চেম্বারের ওপরতলায় তখন ছিল বেতার কেন্দ্র। তখন থেকেই অনাথবাবু কলকাতায় বেতার শ্রোতাদের গান শুনিয়েছেন। চমক সৃষ্টি করেছেন সেই পুরুষকণ্ঠে খেয়াল ও 'নারী' কণ্ঠে ঠুংরি গানে। সেকাল থেকে আজো পর্যন্ত তিনি বেতারশিল্পী হয়ে আছেন। বেতারে তাঁর তুল্য সেই আদি পর্বের শিল্পী এখন আর কোথায়?......

গ্রামোফোন রেকর্ডও তাঁর ছখানি হয়েছিল। প্রায় সবই ঠুংরি দাদরা গান। তবে বাংলা গানও ছিল তার মধ্যে। যেমন, গীতিকার-নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর রচনা সেই গানখানি : 'মনে পড়ে আজ কত কথা, কহিবার সাথী নেইকো আজ।' অনাথবাবুর (প্রথমা) পত্নীর মৃত্যু স্মরণে তুলসী লাহিড়ী গানটি রচনা করে দেন। ভীমপলশ্রী রাগে এখানি মর্মস্পর্শীভাবে গেয়েছেন গায়ক। রাগে গঠিত হয়েও কাব্য-সঙ্গীতের হৃদয়াবেদন গানটিকে সার্থক করেছে।

(ক্রমশ)

—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

খেলার জগতে মেয়ে

স্কুলের সাঁতারু লোপামুদ্রা রায়

—তুমি ঠিক কবে থেকে সাঁতার কাটতে সুরু করলে।

—চার বছর আগে—১৯৭১ সালে। সেই বছরই বহুবাজার ব্যায়াম সমিতির প্রতিযোগিতামূলক আসরে যোগ দেয় লোপামুদ্রা। ঐ আসরে আর এক কিশোরী সাঁতারু অরুন্ধতী গাঙ্গুলী প্রথম হয়। লোপামুদ্রা সাঁতারু মহলের নজর কাড়ে ১৯৭২-এ ক্যালকাটা স্পোর্টসের আয়োজিত এক মাইল সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করার সূত্রে। এর আগেও পরে শহরের নানা কেন্দ্রে আয়োজিত ক্লাব-সাঁতার প্রতিযোগিতার আসরে ছোটদের বিভাগে ফ্রি স্টাইল সাঁতারে এই ছোট্ট সপ্রতিভ মেয়েটি বেশ কিছু পদক সংগ্রহ করে আস্তে আস্তে দূর সাঁতারে প্রতিনিধিত্ব করার কুশলতা আয়ত্ত করে।

লোপার আর এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল—এবছর রাজ্যের বাছাই নির্বাচনের প্রতিযোগিতায় সিনিয়ার বিভাগে একশ দু'শ এবং চারশ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে রাজ্যের সর্বভারতীয় কৃতি সাঁতারু নাফিসা আলীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে শেষ দু'টি বিভাগে দ্বিতীয় ও প্রথমটিতে (অর্থাৎ একশ মিটারে) তৃতীয় স্থান লাভ করে। বলা বাহুল্য, নাফিসাই তিনটি বিভাগে বিজয়িনী হয়। এ থেকেই বোঝা যায় যে, লোপা তুলনায় খুব কম সময়ে সাঁতারে রপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রশ্নের উত্তরে ও বলে, আমার প্রশিক্ষক বেণীমাধব তালুকদার এবং নারায়ণ কুণ্ডুর সস্নেহ তত্ত্বাবধানে আমি উৎসাহ পাই। প্রধানতঃ বেণী তালুকদারের দ্বারাই লোপা সাঁতারে অনুপ্রাণিত হয়েছে। একথা ও স্বীকারও করে শ্রদ্ধার সঙ্গে। এই

জন্যে আছে ওর মার সস্নেহ লালন আর বাবার উৎসাহ। সে কথা পরে। আগে লোপার উন্নতির পর্যায় বলে নিই। ১৯৭৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সুইমিং সেন্টারে অর্থাৎ সুভাষ সরোবর জলাধারে আয়োজিত রাজ্য সাঁতার প্রতিযোগিতায় চোদ্দ বছরের অনূর্ধ বিভাগে এই কিশোরী একশ ও দুশ মিটার ফ্রি স্টাইলে রাজ্য রেকর্ড ম্লান করে। ঐ বছর ঐ বয়ঃসীমা বিভাগে লোপা ক্লাব পর্যায়ের আসরে একশ মিটার ফ্রি স্টাইলে ১৯৬৯ সালে অনন্যা সেনের গড়া রেকর্ডও ম্লান করে। জয়পুরে আয়োজিত জাতীয় সাঁতারের আসরে ও একশ মিটার (১৪ বছরের অনূর্ধ বিভাগে) ফ্রি স্টাইলে তৃতীয় স্থান পেলেও একশ মিটার রিলে সাঁতারে বাংলা দলের শীর্ষস্থান লাভে লোপার ভূমিকা স্বীকার করতেই হয়। '৭৩-এ ইন্দোরে আয়োজিত স্কুল ক্রীড়ার আসরেও লোপা বাংলা দলে স্থান পেয়েছিল, কিন্তু জয়পুরে অসুস্থ হয়ে পড়ায় দুর্ভাগ্যক্রমে লোপাকে ইন্দোরে অনুপস্থিত থাকতে হয়।

১৯৭৪-এ অর্থাৎ এবছর রাজ্য প্রতিযোগিতায় চোদ্দ বছরের অনূর্ধ বিভাগে লোপা একশ, দুশ ও চারশ মিটার ফ্রি স্টাইলে শীর্ষস্থান দখল করে। এ বছর বাংলা স্কুল সাঁতারেও লোপা দুশ মিটার ফ্রি স্টাইলে রেকর্ড করে আর একশ মিটারে হয় দ্বিতীয়। এর আগে জেলা এবং আঞ্চলিক স্কুলের আসরেও প্রথম স্থান অধিকার করে লোপাই। এবার আগ্রায় আয়োজিত সর্বভারতীয় স্কুল ক্রীড়ায় বাংলার সাঁতারু দলে রুমা দে (অধিঃ) অবন্তী গাংগুলী, মৌসুমী রায় যূথিকা পাল এবং কেকা ঘোষের সঙ্গে লোপাও স্বাভাবিক কারণেই স্থান পায়। বাংলার মেয়ে সাঁতারুরাই এবার দলগত বিজয়ীর আখ্যা অর্জন করেছে। এই আসরেও বাংলার রিলে দল 4×4 একশ কিঃ মিঃ ফ্রি স্টাইল বিজয়ী হয়। লোপাও রিলেতে ছিল।

লোপামুদ্রা শিয়ালদহের লোরেটো ডে স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষা পাচ্ছে। ওর মা জানালেন, প্রায় প্রতি বছরই ক্লাসে প্রথম-দ্বিতীয় হয়, ওর পড়াশোনার ব্যাপারে আমাদের বিশেষ চিন্তা নেই। নিজেই পড়াশোনা সময়মত সেরে রাখে। তবে পড়াশোনার চাপ তো কম নয়। তারওপর সাঁতারের জন্যে বাইরেও যেতে হয়—স্কুল কামাই হয়—তাই চিন্তা হয়। লোপা বলে স্কুলের টীচাররা কিন্তু আমাকে সাঁতারের জন্য খুব উৎসাহ দেন। লোপার বাবা—সুভাষ সরোবরের সহকারী ইঞ্জিনীয়ার—রমেন রায় বলেন, দেখছেন তো সাঁতারের জলাধার আমার বাড়ীর গায়েই। সুতরাং ওর পক্ষে নিয়মিত অনুশীলনের সমস্যা নেই। আর এই শহরে একমাত্র ফোর্ট উইলিয়ামের জলাধার বাদ দিলে এই সুভাষ সরোবর ছাড়া অন্য কোথাও আন্তর্জাতিক মাপের ৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের জলাধার নেই। উপরন্তু এর জলও পরিশ্রুত। এখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সুইমিং সেন্টারের পরিচালনায় সাঁতার প্রশিক্ষণ চলে। মেয়েকে ভাল সাঁতারু করার আকাঙ্ক্ষা আমারি কি কম। তবে ওর মা-ই মেয়ের সব কিছু সুখসুবিধার ওপর নজর রাখে।

শ্রীরায়ের আদিবাড়ী ঢাকা। সেখানকার মানুষ জলকে ভালবাসবে এ আর বেশী কথা কি?

লোপা বলে, এখানকার পুলে অনুশীলনের অভ্যাস করার ফলে অন্য পুলে সাঁতার কাটতে অসুবিধা হয়—ওসব জায়গার জল ভারী, আর বড্ড নোংরা, শ্যাওলাও খুব।

আগ্রার এবার স্কুল সাঁতারের আসর হয়েছিল ২৫ মিটার পুলে। সত্যিই অবাক কাণ্ড। বারবার সাঁতার কেটে ঘুরবার সময় মাথাই ঘুরে যাচ্ছিল। স্কুল সাঁতারের জন্য কি আর একটু যত্নশীল হওয়া যায় না? ওখানে সাঁতার দিতে আমাদের দলের সবারই খুব অসুবিধে হয়েছে।

—এবার স্কুল সাঁতারে যা দেখলাম তাতে মনে হয় বাংলার ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে মেয়েরা আরও নিষ্ঠার সঙ্গে মানোন্নয়নের চেষ্টা না করলে ভবিষ্যতে বাংলার শীর্ষস্থান হয়ত ত্রিপুরা কেড়ে নিতে পারে।

লোপা বলে, সাঁতার মরশুম শেষ হলে সাইক্লিং করি। এই সুভাষ সরোবর চককর দিই। তাছাড়া স্কুলে বাস্কেটবলও খেলি। এতে ব্যায়ামও হয় স্ফূর্তিও বাড়ে। লোপার হবি ছবি আঁকা আর টিকিট জমান। নানা জায়গা থেকে পাথর সংগ্রহ করেছে অদ্ভুত ধরনের। লোপা ভারতীয় এবং বিদেশী নাচও শিখছে। এছাড়া গল্পের বই পড়াও তার নেশা। সবচেয়ে প্রিয় লেখিকা হচ্ছেন আগাথা ক্রিস্টি। গোয়েন্দা কাহিনী খুব ভাল লাগে।

আসার সময় জিজ্ঞাসা করি তোমার সাঁতারের লক্ষ্য কি?

উত্তর—এশীয় ক্রীড়ায় ভারতীয় দলের সদস্যরূপে স্বর্ণ জয়।

—অময়

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

হাসতে হাসতে বিয়ে করতে গেল ক্লারা। ফিরে এল মুখখানা বাংলা পাঁচ করে। কি ঘটেছিল মাঝখানে? না, হাত থেকে ফুলের তোড়া পড়ে গিয়েছিল গির্জের সিঁড়িতে—তুলে দিয়েছিল একজন গেঁইয়া চেহারার লোক। তারপরেই গেঁইয়া ভাষায় ঝি-কে বললে ক্লারা—আগের জিনিসের দাবী নিয়ে তা দখল করতে হবে। কি সেই জিনিস? না, একটা চিরকুট পাওয়া গেল ক্লারার পরিত্যক্ত পকেটে—তাতে অমুক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে ক্লারাকে। চিরকুটটা ক্লারার পকেটে এল কখন? গির্জের মধ্যে ফুলের তোড়া হাতে তুলে দেওয়ার সময়ে নয় তো? গেঁইয়া চেহারার সেই লোকটার নামের আদ্যাক্ষর এফ এইচ এম? সে চৌঠা অগাস্ট লন্ডনের একটা দামী হোটেলে উঠেছিল যেখানকার ঘরভাড়া দৈনিক ৮ শিলিং? পুরো ব্যাপারটাতেই পূর্ব প্রণয়ীর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না?

খোঁজ...খোঁজ...খোঁজ! লণ্ডনে এমন খানদানী হোটেল বলতে তো মাত্র আটটা। তার একটিতে এক ভদ্রলোক উঠেছিলেন চৌঠা অগাস্ট—নামের আদ্যাক্ষর এফ এইচ এম—অর্থাৎ ফ্রান্সিস হে মুলটন!

পরিষ্কার হয়ে গেল হেঁয়ালী! ক্লারা-র ঝি ক্লারার বিয়ের জামাকাপড় পুঁটলী পাকিয়ে ফেলে দিয়ে এসেছিল সার্পেন্টাইনে—পুলিশকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে—ক্লারাকে অন্য পোশাকে পাচার [illegible]

খেলাধুলা

দর্শক

ভারত সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল

নাগপুরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম মধ্যাঞ্চল দলের তিনদিনব্যাপী ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ এক ইনিংস এবং ৯৬ রানে জয়ী হয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ সালের ভারত সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের এটা চতুর্থ জয়।

প্রথম দিনে চা-পানের কিছু পরেই মধ্যাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ২৫৪ রানের মাথায় শেষ হয়। মধ্যাঞ্চলের ওপনিং ব্যাটসম্যান মূর্তি রাজন ২০৫ মিনিট খেলে ১০৪ রান করেন। তাঁর ১০৪ রানে ছিল ১৪টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার-বাউন্ডারী। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পাডমোর ৮৯ রানে ৬টা উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দেন। প্রথম দিনের খেলার বাকি সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ৫৯ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে চা-পানের ২০ মিনিট পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের প্রথম ইনিংসের ৪৩৫ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে ১৮১ রানে এগিয়ে

অ্যান্ডি রবার্টস
টেস্টের প্রথম দিনের প্রথম বলে উইকেট (সুধীর নায়েক) পান

রয় ফ্রেডেরিকস
সেঞ্চুরী (১০০ রান) করেন

যায়। ফ্রেডেরিকস সেঞ্চুরী করেন (১২০ রান)। বর্তমান সফরে তাঁর এটা দ্বিতীয় সেঞ্চুরী। দলের অধিনায়ক লয়েড ৬৭ মিনিটে ৮২ রান করে নটআউট থেকে যান। তিনি ৯টা বাউন্ডারী এবং দুটো ওভার-বাউন্ডারী করেছিলেন। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় মধ্যাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংসের তিনটে উইকেট খুইয়ে মাত্র ২৭ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে খেলা শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের ২৭০ মিনিট আগে মধ্যাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৮৫ রানের মাথায় শেষ হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এক ইনিংস ও ৯৬ রানে জিতে যায়। অফ স্পিনার পাডমোর ৪০ রানে ৪টে উইকেট পান। এই খেলায় তিনি মোট ১০টা উইকেট পান ১২৯ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে রবার্টসের ২০ রানে ৪টে উইকেটও উল্লেখযোগ্য।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

মধ্যাঞ্চল : ২৫৪ রান (মূর্তি রাজন ১০৪ রান; পাডমোর ৮৯ রানে ৬ উইকেট)

ও ৮৫ রান (বেঞ্জামিন ১৮, হনুমন্ত ১৫ এবং দুরানী ১৫ রান। পাডমোর ৪০ রানে ৪ এবং রবার্টস ২০ রানে ৪ উইকেট)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ৪৩৫ রান (৮ উইকেটে ডিক্লে: ফ্রেডেরিকস ১২০, কালিচরণ ৫৬ এবং লয়েড নটআউট ৮২ রান। দুরানী ১১৭ রানে ২ এবং ওগিরাল ১৮৬ রানে ৫ উইকেট।

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ

তৃতীয় টেস্ট খেলা

কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলা ২৭শে ডিসেম্বর শুরু হয়েছে। খেলা এখনও শেষ হয়নি। বরাদ্দ পাঁচ দিনের খেলার প্রথম তিন দিনের খেলা হয়েছে। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অনুকূলেই খেলার গতি ঘুরে গেছে। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের ৬টা উইকেট পড়ে ২০৬ রান উঠেছে। এখনো দুদিনের খেলা বাকি। ভারতের প্রথম ইনিংসের ২৩৩ রানের উত্তরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের প্রথম ইনিংসে ২৪০ রান করে ৭ রানে এগিয়ে যায়।

ভারতের প্রথম ইনিংসের সূচনা মোটেই শুভ হয়নি। রবার্টসের প্রথম বলেই ভারতের ওপনিং ব্যাটসম্যান সুধীর নায়েক আউট হয়ে যান। টেস্ট ক্রিকেট খেলার সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে এইভাবে টেস্ট খেলার প্রথম দিনের প্রথম বলেই উইকেট পড়েছে ইতিপূর্বে মাত্র তিনবার। সুতরাং এটা একটা বিরল ঘটনা।

প্রথম দিনেই ভারতের প্রথম ইনিংস ২৩৩ রানের মাথায় শেষ হয় এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ১৪ রান করেছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কড়া বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের দরুন ভারতীয় খেলোয়াড়রা এই মুস্কিলে পড়েছিলেন। ভারতীয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ

জি আর বিশ্বনাথ
প্রথম ইনিংসে ৫২ এবং অসমাপ্ত দ্বিতীয় ইনিংসে নট আউট ৭৫ রান

৫২ রান করেছিলেন বিশ্বনাথ। নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় অংশুমান গাইকোয়াড় ৩৬ রান এবং মদনলাল ৪৮ রান করে ভারতের মুখ তবু কিছুটা রেখেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস ২৪০ রানের মাথায় শেষ হলে তারা মাত্র ৭ রানে অগ্রগামী হয়। খেলার বাকি ২৫ মিনিট সময়ে ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ৮ রান করেছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে ফ্রেডেরিকস সেঞ্চুরী (১০০ রান) করেন। তিনি ছাড়া আর কোন খেলোয়াড় সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেন নি। ফ্রেডেরিকসের ১০০ রানের পরই মারের ২৪ রান উল্লেখযোগ্য। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ব্যাটিংয়ে কি শোচনীয় ব্যর্থতা। দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস ২৪০ রানে শেষ হলে খেলার হাওয়া ভারতের দিকে ঘুরে যায়।

তৃতীয় দিনে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে রান দাঁড়ায় ২০৬ (৬ উইকেটে)। বিশ্বনাথ ৭৫ রান করে নটআউট আছেন। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় পরিত্রাতার ভূমিকা নেন ফারুক ইঞ্জিনীয়ার এবং বিশ্বনাথ। ইঞ্জিনীয়ার ৬১ রান করে আউট হন।

তৃতীয় টেস্ট খেলার গতি উপস্থিত ওয়েস্ট ইন্ডিজের অনুকূলে বইছে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
তিনদিনের খেলা

ভারত : ২৩৩ রান (বিশ্বনাথ ৫২, মদনলাল ৪৮, মনসুর আলী ৩৬ এবং অংশুমান গাইকোয়াড় ৩৬ রান। রবার্টস ৫০ রানে ৫ এবং হোল্ডার ৪৮ রানে ২ উইকেট)

ও ২০৬ রান (৬ উইকেটে। ইঞ্জিনীয়ার ৬১ এবং বিশ্বনাথ নটআউট ৭৫ রান। রবার্টস ৬০ রানে ২, উইকেট ৩০ রানে ২ এবং গিবস ৫৫ রানে ১ উইকেট)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২৪০ রান (ফ্রেডেরিকস ১০০ এবং মারে ২৪ রান। মদনলাল ২২ রানে ৪, বেদী ৬৮ রানে ২, চন্দ্রশেখর ৮০ রানে ১ এবং ঘাউড় ২৮ রানে ১ উইকেট)

টেস্টের প্রথম বলে উইকেট লাভ

কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের অ্যান্ডি রবার্টস প্রথম দিনের (ডিসেম্বর, ২৭) প্রথম বলে সুধীর নায়েককে আউট করে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন টেস্ট খেলায়। এরকমের ঘটনা খুবই বিরল। রবার্টসকে নিয়ে এপর্যন্ত মাত্র চারজন বোলার টেস্ট খেলার প্রথম দিনের প্রথম বলে উইকেট পাওয়ার নজির গড়েছেন। রবার্টসের আগে ১৯২৬ সালে ইংল্যাণ্ডের মরিস টেট ১৯৩৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার ই এল ম্যাককরমিক এবং ১৯৭১ সালে ভারতের সৈয়দ আবিদ আলী টেস্ট খেলার প্রথম দিনের প্রথম বলে উইকেট পাওয়ার দুর্লভ গৌরব লাভ করেন।

কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের রয় ফ্রেডেরিকস প্রথম ইনিংসে ১০০ রান পূর্ণ করে মদনলালের বলে বিশ্বনাথের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হয়েছেন।

সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার প্রথম দিনের প্রথম বলে উইকেট পাওয়ার ঘটনা এবং সেই সংগে খেলার ফলাফল দেওয়া হল :

(১) ৩য় টেস্ট, লিডস জুলাই ১০, ১৯২৬, বার্ডস্‌লে (অস্ট্রেলিয়া) কট সাটক্লিফ ব মরিস টেট (ইংল্যাণ্ড) ০
খেলার ফলাফল অমীমাংসিত

(২) ১ম টেস্ট, ব্রিসবেন, ডিসেম্বর ৪, ১৯৩৬ ওয়ার্দিংটন (ইংল্যাণ্ড) কট ওল্ডফিল্ড ব, ম্যাককরমিক (অস্ট্রেলিয়া) ০
খেলার **ফলাফল** : ইংল্যাণ্ড ৩২২ রানে জয়ী

(৩) ২য় টেস্ট, ত্রিনিদাদ মার্চ ৬, ১৯৭১ ফ্রেডেরিকস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) বোল্ড আবিদ আলি (ভারত) ০
খেলার **ফলাফল** : ভারত ৭ উইকেটে জয়ী

(৪) ৩য় টেস্ট, **কলকাতা** ডিসেম্বর ২৭ ১৯৭৪, **সুধীর নায়েক** (ভারত) কট মারে ব **রবার্টস** (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) ০
খেলার ফলাফল : ?

জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

১৯৭৪ সালের জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস, মহিলা বিভাগে পশ্চিমবাংলা এবং বালক বিভাগে মহারাষ্ট্র চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

ফাইনাল খেলা

পুরুষ বিভাগ : সার্ভিসেস ৬৫—৬০ পয়েন্টে রেল দলকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ : পশ্চিমবাংলা ৭২—৬১ পয়েন্টে কর্ণাটককে পরাজিত করে।

বালক বিভাগ : মহারাষ্ট্র ৭৫—৬৯ পয়েন্টে কর্ণাটককে পরাজিত করে।

আন্তঃ রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৭৪ সালের ৩৬তম আন্তঃ রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় দিল্লী পুরুষ বিভাগে, মহারাষ্ট্র (বি) মহিলা বিভাগে, তামিলনাড়ু বালক বিভাগে এবং মধ্যপ্রদেশ বালিকা বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

রজনীগন্ধা

অমল পালেকর এবং বিদ্যা সিনহা

বায়োস্কোপিত

পার্থপ্রতিম চৌধুরী তরুণ দত্ত (এখন বোম্বেতে), সুশীল মুখার্জি, সুনীল ব্যানার্জি আর আমি ভবানীপুরে ইন্দিরা সিনেমা হলের দোতলার লবিতে বসে আড্ডা দিচ্ছি কিছুক্ষণ আগে ছায়াসূর্য ছবির ইভনিং শো আরম্ভ হয়েছে, ছবির রিপোর্ট সন্তোষজনক। ফলে আমরা সবাই খুব হাসিখুশী। শর্মিলা তখন আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিত। পার্থর সঙ্গে কি-যেন ব্যাপারে শর্মিলা একটা বাজি হেরেছে. আর সেই বাজির শর্তানুযায়ী শর্মিলা আমাদের চাইনীজ খাওয়াবে বলে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ। আমরা হাউসে বসে আছি শর্মিলা ঠাকুরের অপেক্ষায়। ও এলে আমরা সবাই মিলে পার্ক স্ট্রীটে যাব এমন সময় মিঠু [illegible] [illegible] এসে [illegible]— পার্থদা, এই মাত্তর একটা কাবুলি (কাবুলীওলা) টিকিট কেটে ছবি দেখতে ঢুকল।

শুনে আমাদের সবার চক্ষুস্থির।

--সেকি রে

বিস্ময়ে পার্থর চোয়াল ঝুলে যাবার দাখিল। —যাঃ, কাবলি আমার ছবি দেখবে কোন দুঃখে! তুই ভুল দেখেছিস—

মিঠু চ্যাটার্জি সশব্দে প্রতিবাদ করল।

—না পার্থদা তুমি বিশ্বাস করো, আমি হলের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম হঠাৎ দেখি একটা কাবুলি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে প্রথমে এদিক-ওদিক কি-যেন দেখল, তারপর একটা টিকিট কিনে বোঁ করে হলের মধ্যে ঢুকে পড়ল অনেস্ট।

বোঝা গেল, মিঠু গুল দিচ্ছে না। কিন্তু তা-বলে এটাও বিশ্বাস করা শক্ত যে [illegible] [illegible] সিংহের 'কাবুলীওয়ালা' ছবি হলেও সেটা খানিকটা বিশ্বাসযোগ্য হত। বা কোন সেকসসাইটিং হিন্দী ছবি হলেও। ছায়াসূর্য তো সে-ধরনের বায়োস্কোপ নয়।

আমরা অবাক বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলাম। তরুণ দত্ত ফস্ করে বলল—হ্যাঁরে পার্থ, ব্যাপারটা কিছু আন্দাজ করতে পারছিস!

পার্থ বিব্রত ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল।

--উঁহু একদম না।

সুশীল মুখার্জি বলল—পার্থ, মনে হচ্ছে তোর ছবি লেগে গেছে। নইলে কাবুলে ছবি দেখে?

আমি বললাম—উল্টোও হতে পারে।

পার্থ ঘাবড়ে গিয়ে বলল—একবার খবর নেয়া যাক কাউন্টারে, বুকিং ক্লার্ক বলতে পারবে—

সবাই তখুনি দুদ্দাড় নিচে নামা হলো।

বুকিং ক্লার্ক তখন টাকা গুনছিলেন। আমাদের প্রশ্নে চোখ বড় করে তাকিয়ে বললেন—কা-বু-লে? বলেন কি মশায়?

তরুণ বলল—কেন আপনি দেখেননি? আপনার কাছ থেকেই তো শুনলাম টিকিট [illegible]—

[illegible]— ক্লার্ক গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন—[illegible]

টিকিট কেনে আমি শুধু তাদের হাত দেখি ফোকরটা ছোট্ট কিনা, মুখ দেখি না, বুঝেছেন?

তরুণ নির্বিবাদে ঘাড় নেড়ে বোঝাল পরিষ্কার।

তরুণ বুঝেছে দেখে বুকিং ক্লার্ক কথাটা টেনে ধরে বললেন—আর খাঁটি কথা যদি শুনতে চান তাহলে আরও খোলসা করে বলি: একবার এক পরমা সুন্দরী ভদ্রমহিলা টিকিট কিনতে এসেছিলেন। আমি কি তখন ছাই জানতুম যে পেছনে পরমা সুন্দরীর পতি পরম গুরু দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি মশাই এট্টুসখানি দেখেছি ভদ্রমহিলাকে গোপাল ফুল দেখতে কার না ভাল লাগে বলুন তারপর টিকিট বেচে দিয়ে দীর্ঘোশ্বাস ফেলে অন্য কাজে মন দিয়েছি তারপর সে মশাই কি কেলেঙ্কারী, আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। সেই পতি পরম গুরু এসে আমায় ধরে কি যাচ্ছেতাই হেনস্থা। বলে কি যে আমি নাকি ও'য়ার পরিবারের দিকে কু-দৃষ্টি দিয়েচি। আরে মশাই ঘরে আমার এয়োস্ত্রিরি রয়েচে, পুত্র রয়েচে, কন্যে রয়েছে—তাদের ছেড়ে আমি অন্য এয়োস্ত্রিরির পানে তাকাব? ছিঃ। তা সে লোকটা মশাই আমার কথা আমলই দেয় না, ব্যাটা বলে আমি নাকি ড্যাব ড্যাব করে ও'য়ার দিকে চেয়েছিলুম। ঝাঁটা মার ঝাঁটা মার, আমার চরিত্তির অত খারাপ নয়। আর অতই যদি সন্দ-বাতিক তো পাঠাচ্ছিলে কেন পরিবারকে টিকিট কাটতে? এই নিয়ে বিরাট গন্ডগোল, হৈ-চৈ। তারপর সব্বাই মাঝে পড়ে ব্যাপারটা সামলে দিল। আর আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম যেন। তারপর শুনুন কি কান্ড। ক্যাশ মেলাতে গিয়ে দেখি হেভি শর্ট। দেখে মাথায় রক্ত উঠে গেল। হয়েছে কি ওই মহিলা একশো টাকার নোট দিয়েছিল। তালে-গোলে বেশী দিয়ে ফেলেছি। ও আর পাওয়া গেল না। ব্যাটা যেরকম তড়পে গেছে আর আগ বাড়িয়ে গিয়ে ঘাঁটাতে সাহস হলো না। শেষে ঘর থেকে এনে ভর্তুকি দিয়ে ক্যাশ মেলাতে হল। মশাই সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি, ইহজন্মে আর কারো মুখের পানে তাকাব না হাত দেখব, ক্যাশ দেখব, টিকিট দেব ব্যস।...তা হ্যাঁ, বলছেন একজন কাবুলে ঢুকেচে? মাথায় নির্ঘাৎ পোকা নড়েচে। নইলে এই বায়োস্কোপ দেখতে ঢোকে?

বলেই তার স্মরণ হলো ছবির পরিচালক স্বয়ং সমুখে দাঁড়িয়ে। জিভ কেটে তৎক্ষণাৎ—তাবলে ভাববেন না আমি ছবির নিন্দে করছি। বড় ভাল বায়োস্কোপ করেছেন। কাবুলি-রা বুঝতে পারবে না, তাই বলছি।

গেট-কীপার বলল—হ্যাঁ এট্টা কাবুলে ঢুকেছে বটে। আমি ভেতরে বসিয়ে দিয়েছি ব্যস। কেন? গণ্ডগোল আছে নাকি?

তরুণ তাড়াতাড়ি বলল—না, গণ্ডগোল কিছু নেই। আমরা শুনলাম তাই জিগ্যেস করছিলাম আরকি—

প্রেমের ফাঁদে/আরতি, শমিত

বলাইদাকে বায়োস্কোপের লাইনে সবাই চেনে। একবার ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে দেখি বলাইদা গোটা আষ্টেক কাবুলির সঙ্গে খুব জোর শলা-পরামর্শ করছে। কাবুলিরা খুব মনোযোগ দিয়ে বলাইদার কথা শুনছে।

বুঝলাম, একটা ভাল রকম কেস হচ্ছে। পরে বলাইদার সঙ্গে অন্য একদিন দেখা হতে প্রশ্ন করলাম—হ্যাঁ বলাইদা স্টুডিওতে কাবুলি কেন?

বলাইদা মুখ বিরক্তির ভ্রূ-ভঙ্গি করে বলল—সে কথা শুনে আর কাজ নেই। ওসব সব থার্ডকেলাস ব্যাপার।

শুনে কাজ নেই বললে তো এ-বান্দা ছাড়বার পাত্র নয়, শুনতে আমায় হবেই। স্টুডিওতে নানা দেশের নানা মত এবং ধর্মের লোক হরদম দেখা যায়, কিন্তু কাবুলিদের কখনও দেখা যায় না। ওরা এদিকটা পানে বড় একটা মাড়ায় না। সেকি ছোট হয়ে যাবার ভয়ে? কি জানি আমি এর সাইকোটা ঠিক বুঝতে পারি না। অথচ খোদ স্টুডিও পাড়াতেই ওদের একটা ডেরা আছে। প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড ধরে দু-নম্বর নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর দিকে এগিয়ে গেলে বাঁ-হাতে কাবুলিদের বিরাট একটা আস্তানা চোখে পড়ে। ওদের পাশে থাকে একজন ওস্তাদ। ইয়াব্বড় একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে তার। লোকটা নল চালায়। কোথাও চুরি-চামারি হলে পুলিশের কাছে গিয়ে হয়রান না হয়ে এই ওস্তাদকে নিয়ে গেলে নাকি তৎক্ষণাৎ মুস্কিল আসান হতে পারে। মন্ত্রপূত চাল খাইয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে নাকি মালের সন্ধান স্রেফ টেলি-যোগে মক্কেলের হাতে পৌঁছে যাবে। তারপর আসামীকে ঘা-কতক দিতে পারলে মাল বেরিয়ে পড়তে কতক্ষণ? এছাড়া এই ওস্তাদ এবং তার পরিবার এমনও মন্তর জানে যে বুড়ো আঙুলের নখে হারানো ছেলের ছবি দেখিয়ে দিতে পারে।

[illegible]

একজন বলল, তার নাম মোশাই বথ-দর্পণ। কী খুব সাবজন্ত। একবার পরখ করে দেখতে পারেন।

কাবুলিদের জেরাটা সেই ওস্তাদের ঘরের পাশে বলে আমার মনে হয় এটা সে-রকম কোন আকস্মিক ঘটনা নয় রীতিমত তাৎপর্যপূর্ণ একটা ব্যাপার। তাবৎ কাবুলিরা নিঃসন্দেহে-ই শক্ত মানুষ। নইলে ধরুন কাঁহা কাঁহা মুলুককে ওরা দেশার সুদে টাকা খাটায়; সময় মত সুদ আদায় করা সে তো বড় চাট্টি খানি কথা নয়! মশাই এমনও দেনদার এই পৃথিবীতে আছে যে তারা পাওনাদারের কাল ঘাম ছুটিয়ে দেবার অলৌকিক সব ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ কাবুলিদের তেরটা বাজিয়ে যে ব্যাটা আসলী টাকা, সুদের টাকা হাপিস করবার ক্ষমতা রাখে, সে তো মহাপুরুষ। আব সে-রকম বিপদ হলে কাবুলিরা নির্ঘাৎ ওই ওস্তাদের শরণাপন্ন হয়। নল-ফল চালিয়ে কাবুলিরা টাকা ঠিকই উদ্ধার করে নেয়। তাই মনে হয় ওস্তাদকে কাবুলিরাই ওখানে বসিয়েছে শুধু ওই জন্যেই।

আমি নাম করতে চাই না, একজন বিখ্যাত অভিনেতাকে আমি বহু দিন দেখেছি, তিনি চলেছেন আর তাঁর "ডান-বাঁয়ে দুজন কাবুলিও চলেছে। ভদ্রলোক প্রাণ পণে ওদের বোঝাচ্ছেন। ওরা বুঝবেও। এবং পরক্ষণেই বলছে—সুদ দো সুদ। বলুন তো কি-কাণ্ড! উনি একদিন ক্যাল-কাটা মুভিটোন স্টুডিওতে একটা ছবির শুটিং করতে এসেছেন। ওরা গন্ধে গন্ধে ঠিক চলে এসেছে। এসে সেটে বসে আছে। প্যাক-আপ হলে উনি পেমেন্ট পাবেন এবং সর্বস্ব দিয়ে শুধু ট্যাক্সি ভাড়া নিয়েই হয়ত ওঁকে বাড়ি ফিরতে হবে।

স্টুডিওর দ্বারোয়ান তখন আমাদের সেই বৃদ্ধ চাচাজী, এখন রিটায়ার করে দেশে চলে গেছে ওফ, একটা ক্যারেকটার ছিল লোকটা। আর ছিল অদ্ভুত 'সেন্স অব হিউমার। চাচাজী থেকে থেকে এমন সব কাণ্ড করত যে হয় আমাদের পিলে চমকে যেত, অন্যথায় হাসতে হাসতে ভুঁয়ে লুটোপুটি খেতে হত। কাবুলি প্রসঙ্গে আসছি, তার আগে চাচাজীর ক্যারেকটারটা কি-রকম ছিল এটু আভাস দিয়ে রাখি এই বেলা।

স্টুডিওর গেটে প্রায়ই উমেদারদের ভিড় হয়। সবাই-ই ছবিতে পার্ট করতে চায়। সব ছেলে চায় উত্তমকুমার হতে। আর সব মেয়েই চায় সুচিত্রা সেন হতে। আর এই আগন্তুকদের সমস্ত ঝক্কি এই চাচাজীকে-ই বরাবর পোয়াতে হয়। অর্থাৎ নানা রকম বোলচাল দিয়ে হটাতে হয়।

একদিন দুপুরে চাচাজী গেটের পাশে তার টুলে বসে বসে ঝিমোচ্ছে। ভেতরে ছবির শুটিং হচ্ছে, হঠাৎ একটি ছোকরা এসে উপস্থিত। বলা বাহুল্য, ছবিতে হিরো হবার বাসনা নিয়েই সে অকুস্থলে হাজির।

চাচাজী তাকে দেখে ক্ষেপে লাল।

—তুহারকে কিন আসতে মানা করলাম উ রোজ ফির আসল? তুহার শরম নৈ খে?

ছোকরাটি তার চৌড়ে সামলাতে সামলাতে জবাব দিল—শরম নিশ্চয় আছে। তবে সেটা বন্ধুমহলে, এখানে ছবিতে নামার ব্যাপারে তার কোন শরম-ফরম নেই। ছবিতে তাকে যে-কোন উপায়েই হোক নামতে হবে। নইলে বন্ধুদের কাছে তার মাথা কাটা যাবে—

চাচাজী অতএব আপ্তবাক্য দিল—তু অব মর। তুহার অব মরননাই চাহিয়ে।

ছোকরা দাঁত বের করে হেসে বলল—চাচাজী, তুমি বলেছিলে ছবিতে হিরো হতে গেলে টাকা লাগে? আমি সেই টাকা এনেছি। কড়কড়ে ক্রো ৪ নোট পনেরো হাজার টাকা—

—এ্যাঁ?!?

বিস্ময়ে চাচাজী তার টুল উল্টে পড়ে আর কি। —সে কিরে তুই টাকা নিয়ে এসেছিস? হিরো সাজবি বলে? তা টাকা পেলি কোত্থেকে?

টাকা সে পেলো কোত্থেকে—সে কথা ভেঙে বলার ব্যাপারে ছোকরার কোন উৎসাহ দেখা গেল না শুধু কৌতুকের ভঙ্গিতে চোখের ভুরু নাচাল বারকতক, তারপর বেশ রহস্য করে বলল—শুধু ক্যাশ নয় চাচাজী সঙ্গে আরও মাল আছে—

বলে সে হাতের রেশন-ব্যাগটা দেখিয়ে দিল। থলেটা যে বেশ ভারী তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। দেখে চাচাজীর চক্ষু ছানাবড়া। কিছুক্ষণ সে ছোকরার দিকে তাকিয়ে রইল, ফ্যালফ্যাল করে।

—ব্যাগে কি?

—গয়না।

—এ্যা! তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল চাচাজী।

ছোকরা তখন নির্বিকার ভঙ্গি করে বলল—ক্যাশ আর গয়না মিলিয়ে বিশ হাজার টাকা এনেচি চাচাজী। এবার বল এতে হবে আমার ছবি?

চাচাজী ততক্ষণে যেন ধাতস্থ হয়েছে। বললে—তুই বোস, এই এখানে আমার এই টুলে।

ছোকরা আট্টহেসে বলল—ঘেবড়ে গেলে বুঝি?

চাচাজী প্রশ্ন করল—এসব গয়না পেলি কোথায়?

—কেন, মা-র আর ঠাম্মার মাল—

—সব ঝেড়ে আনলি বুঝি?

ছোকরা এবার এটু সলজ্জ ভঙ্গি করল।

চাচাজীর টেনশান তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে।—শালা তোকে তো এবার পুলিশ ধরবে। তুই দেখছি আমারও কোমরে দড়ি ফেলবি—

—কেন আমার বাপের মায়ের আর ঠাম্মার জিনিস আমি এনেছি, পুলিশ ধরবে কেন?

চাচাজী বলল—তখন মায়ের পাবি যখন ধরবে। বেশরম বাড়ি যা, এক্ষুনি বাড়ি চলে যা যদি বাঁচতে চাস। খবরদার কাউকে আর বলবি না যে তোর সঙ্গে এত মাল আছে। বললে—

—বললে কি হবে? কেড়ে নেবে?

চাচাজী ছোকরাকে তখন জ্ঞান-বাক্য দিল—না কেড়ে নেবে না, তোকে ঠিক এই-ভাবে মধুর মত চেটে নেবে—বলে মধুর চাটার ভঙ্গি করে দেখাল চাচাজী—শালা পালিয়ে যা, নইলে আমিই পুলিশে খবর দেব, দিয়ে তোকে হাজতে ঢোকাব—

ছোকরা শেষ পর্যন্ত বামাল সমেত বাড়ি ফিরেছিল চাচাজীর অন্তত সেই রকমই রিপোর্ট।

সাত-সকালে ক'জন কাবুলিকে হঠাৎ স্টুডিওর গেটে ঘোরাঘুরি করতে দেখে চাচাজী তো অবাক।—ক্যা খবর খান সাহাব?

খান সাহেবরা আসল রহস্য কখনও উদ্ঘাটন করে না, কারণ তাতে পাখী উড়ে যাবার ভয় থাকে। হেসে জানাল—বেড়াতে এসেছে।

অথচ চাচাজী জানে শুধু-মুধু এরা বেড়াবার পাত্তর নয়, অভিসন্ধি নিশ্চয় জোর একটা কিছু আছে। —বৈঠ বৈঠ—

খাতির করে বসিয়ে এটা-সেটা চাপ দিতে শেষ পর্যন্ত কাবুলিরা কবুল করল—সুদের তরে এয়েছি চাচাজী। বাবুটা আমাদের কলজে হাল্কা করে দিচ্ছে।

—কোন বাবু?

কাবুলিরা নাম বলল। শুনে চাচাজী শুধু বলল—সর্বনাশ!

কাবুলির দল গেটের মুখে ঠায় বসে রইল। ওরা জানত এক সময় না এক সময় সেই ভদ্রলোককে এই গেট পার হতেই হবে। তখন ওরা চেপে ধরবে। টাকা হাওলাৎ করবার সময় মনে ছিল না যে একদিন সুদ-সমেত সে-টাকা শোধ করতে হবে?

ঠিক যেন হাওয়ায় সে-খবর যথাসময়ে পেয়ে গেলেন আমাদের এই অভিনেতা ভদ্রলোক।

খবর শুনে তিনি শুধু হাসলেন মুচকি মুচকি। ওরা আন্দর আঁদর সাহস করে এয়েছে? বটে!

(দ্বিতীয় কিস্তি পরে)

—রঞ্জন মজুমদার

গাধা নাটকের দৃশ্য

নাট্যমঞ্চ

পপ থিয়েটারের গাধা

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পপ থিয়েটার প্রযোজিত নাটক 'গাধা' বলা যায় একেবারে হাল আমলের আমাদের সমাজ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি' গাধা এখানে একটি চরিত্র। যাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে বাস্তব অবস্থার দাস বহু অস্থির চরিত্র।

নাটকের গোটা গল্পটাই বলা হয়েছে রূপকের আঙ্গিকে। সব কটি চরিত্রই তাই আমাদের আশে-পাশের হলেও আমরা তাদের চিনে নিতে পারি, তাদের নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করতে পারি।

তবে সংলাপ প্রধান নাটকের একটা অসুবিধা হোল সেখানে কুশীলব যত না প্রাধান্য পায়, তার চেয়ে বেশী প্রাধান্য পায় তার বক্তব্য। কিন্তু লক্ষণীয়, 'গাধা' নাটক সেদিক থেকে আশ্চর্য উতরে গেছে। গাধা তাই এখানে আধুনিক কালের চরিত্র হয়েই ধরা দিয়েছে।

গাধাকে নাটকের কেন্দ্রবিন্দু করে আজকের সমাজ ব্যবস্থার মানুষের নীতি-বোধ, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা, তার কণ্ঠরতা ও হঠকারিতার কথা যা বলা হয়েছে তাতে কতটা প্রকৃত বাস্তবতা আছে জানি না তবে সমকালের অস্থিরতা স্বার্থ-বোধ চতুর মানুষের ভূমিকা এবং সব শেষে মানবিকতার প্রতি যে একটা স্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দেশ আছে একথা সত্য।

'গাধা' তাই আপাতে ব্যঙ্গ নাটক হলেও গভীর মত নাটক সন্দেহ নেই।

সংলাপ মাঝে মাঝে বিশ্লিষ্ট করেছে। অন্য দিকে তা যেমন অর্থবহ, তেমনি তীক্ষ্ণ ঝকঝকে। এ ব্যাপারে নাট্যকারের (মধুময় রায়) মুন্সীয়ানা অনস্বীকার্য।

তবে একটা কথা। কোন কোন ক্ষেত্রে সেই সংলাপ যেন বড় বেশী ডাইরেক্ট এবং অহেতুক বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে। এটুকু পরিহার অর্থাৎ সেটা সংক্ষিপ্তকরণ করলে বোধকরি নাটকের বক্তব্য আরও ইঙ্গিতবহ হোত।

গাধা নাটকের বড় সম্পদ এর টিম ওয়ার্ক বা সমষ্টিগত অভিনয়। যার ফলে সমগ্র নাটকটাই উপভোগ্য হয়েছে।

গভীর কথা হাল্কা চালে বলা যেমন সহজ নয়, তেমনি তাদের রূপদান তার চেয়েও দুরূহ। বলতে বাধা নেই সে ব্যাপারে নাটকের কুশীলবরা বহুলাংশেই সার্থক।

রাষ্ট্র সমাজ রাজনৈতিক চিন্তার চরিত্রকে নিয়ে শ্লেষাত্মক নাটক এখন আর নতুন কিছু নয়, তার ফলে বৈপ্লবিক কোন চেতনার সঞ্চার হয়েছে কিনা জানা নেই, তবে এমন নাটকের অবশ্যই প্রয়োজন আছে—একথা স্বীকার করতে বাধা নেই। অবশ্য এটাও ঠিক ব্যঙ্গ ব্যঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা শোভন।

আর একটা কথা। সমাজ জীবনকে সচেতন করার প্রয়াস এক, আর মতের বিরুদ্ধে কোন কিছুকে অস্থিরতা দিয়ে বধ করার চেষ্টা অন্য। নাটকে বক্তব্য অবশ্যই থাকবে, কিন্তু সেটাই চূড়ান্ত নয় এটাও নাট্যকারের মনে রাখা দরকার।

নাটকের প্রারম্ভ দৃশ্য, যেখানে নেতাকে ঘিরে গড়ে ওঠা দুটি দলের মধ্যে সংঘর্ষ—সুপ্রযুক্ত। শেষ দৃশ্যটিও—যেখানে সে গুপ্ত রিপুর শিকার হোল—মতভেদ থাকা সত্ত্বেও সুপ্রযুক্ত। দুটি দৃশ্যই নাটকের টোটাল এফেকটের সহায়ক হয়েছে।

অভিনয়ে প্রথমেই যে দুজনের নাম করতে হয় তাঁরা হলেন যথাক্রমে গাধা ও রাষ্ট্রপ্রধানের চরিত্রাভিনেতা (প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকান্ত মুখার্জি)।

অন্যান্য ভূমিকায় প্রবীর ভট্টাচার্য, কান্তি চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য দেবাঞ্জন সুর, দিলীপ বিশ্বাস অরুণ বসাক, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণব মুখার্জি গৌতম সাহা, নির্মল ভট্টাচার্য [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ রায় সুদিত সংকার, দলিব রায় (গাধার বিবেক), সুজিত সরকার এবং উর্বশী চরিত্রে মিতা মুখোপাধ্যায় সুন্দর।

মুরারী রায়চৌধুরী ও গণেশ মুখোপাধ্যায়ের নেপথ্য কণ্ঠসংগীত নাটকের গতিকে বেগবান করেছে।

অঙ্গিরার বিদ্রোহী 'সংবাদ'

অঙ্গিরা নাট্য সংস্থার নাটক 'বিদ্রোহী সংবাদের' পাত্রপাত্রী সর্বমোট তিনজন। ইন্দ্রাণী অতীন ও অসীম। ইন্দ্রাণী অভি-নেত্রী, বেঁচে থাকার জন্যে সে এই পেশাকেই আঁকড়ে ধরে আছে। অথচ তার মনের গভীরে বেদনা আছে, স্বপ্ন আছে যন্ত্রণা আছে। যাকে সে ওপর থেকে হাসি দিয়ে আড়াল করে রাখতে চায়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে পুড়ে মরে। অসীমের প্রতি তার দুর্বার আকর্ষণ সত্ত্বেও সে তাকে কাছে পায় না নিজের মত করে। আবার তার বিদ্রোহী মনেও সে নিজেকে সম্পূর্ণ দীক্ষিত করতে পারে না। অতীন সাংবাদিক। [illegible], নিশ্চিন্ত জীবনের অভি-কাষী। কিন্তু সত্যিই কি তাই? সত্য কথা বলার তার সাহস নেই। বেঁচে থাকার জন্যে সে তাই কমপ্রোমাইজ করেছে চাকরীর শর্তের সঙ্গে।

আর অসীম! সে স্পষ্টবাদী ভঙ্গুর সমাজের সব কিছু মিথ্যার সে মুখোশ খুলে দিতে চায়। তথাকথিত নিয়ম সে মানে না, রাজনৈতিক বিদ্রোহকেও তার মনে হয় চালাকি। যে কোন বন্ধনকে নীতি-বাক্যকে সে বলে মেকি ব্যাপার। তার কাছে জীবনের আসল অর্থ অন্য। সেই সমাজ, সেই চেতনা, সেই জীবনই তার কাম্য যেটা নিজস্ব জগৎ। আজীবন যার স্বপ্ন দেখে এসেছে সে।

আনিসুল মোহম্মদ । সতীন্দ্র ভট্টাচার্য । অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মোটামুটি তিনটে চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার, নির্দেশক ও অসীম চরিত্রের অভিনেতা (আশীষ দাশগুপ্ত) এই বক্তব্যই রাখতে চেয়েছেন।

সম্পূর্ণ নাটকটিই সংলাপনির্ভর। ফলে স্বভাবতই বিদ্রোহের কথা এবং সাধারণ জীবনের হাসি কান্নার সঙ্গে দর্শনও এসে পড়েছে। যা অনেক সময় রিপিটেশনের জন্য ক্লান্তিকরও মনে হতে পারে দর্শকদের কাছে।

কিন্তু গোটা নাটকটার মধ্যে এমন একটা টান রয়ে গেছে আগাগোড়া যে বসে দেখতে হয়। এটা বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। বিশেষ করে তিনটি মাত্র চরিত্র নিয়ে অভিনীত নাটকের ক্ষেত্রে।

এমনও হতে পারে, সেটা অভিনয়ের জনাই সম্ভব হয়েছে, আবার এও হতে পারে যে সু-গ্রন্থনার জন্যেই সেটা সম্ভব হয়েছে। চলতি দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের মত ফ্লাশ ব্যাকে গল্পের অতীত অংশ জুড়ে দেওয়া ভাল লেগেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সব দৃশ্যগুলি দর্শক মনে কোন চমক সৃষ্টি করে না। এমন কি কংকাল থেকে অসীমে রূপান্তরিত হওয়ার দৃশ্যটিও নয়। এ বিষয়ে আর একটু যত্ন নেওয়া আবশ্যক।

অসীমের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর প্রথম পরিচয়ের দৃশ্যটি ফ্ল্যাট অভিনয়ের জন্য স-প্রাণ মনে হয়নি। অথচ হবার মত প্রচুর অবকাশ এবং সম্ভাবনা ছিল। তার চেয়ে এক হাতে কেরোসিনের টিন, অন্য হাতে হ্যারিকেন নিয়ে নায়কের পার্কে আসা এবং নায়িকার সঙ্গে বসে অন্তরংগ কথা বলার দৃশ্যটি ভাল লেগেছে। সেখানে যেন কিছুটা কাব্যের ছোঁয়া পাওয়া যায়।

চিঠি নিয়ে, চিঠির রহস্য নিয়ে এবং একটা সুখবর দিতে আসা নিয়ে নায়িকা ও সাংবাদিকের মধ্যে সংলাপ বিনিময় কোন কোন ক্ষেত্রে ক্লান্তিকর মনে হয়েছে যদিও নায়িকার অভিনয়ের গুণে তা চাপা পড়ে গিয়েছে। তবু ঐ অংশের কিছু সংলাপ রি-এডিট করলে বোধহয় দৃশ্যগুলি আরো কমপ্যাকট হোত।

নায়কের অস্তিত্ব নাটকের সর্বত্রই সাধারণ ভাবনার পরিপন্থী। যে সমস্ত ক্ষেত্রেই নিজের উপস্থিতি এবং বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেবার জন্য বদ্ধপরিকর—তার উপস্থাপনা সর্বত্র সমান মর্যাদা বা সমতা রক্ষার সহায়ক না হলেও চরিত্রটি নিষ্ঠার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন আশীষবাবু। তবে তাঁর বিপ্লবব্যঞ্জক সংলাপ আরো উদ্দীপক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অতীনের চরিত্রে বাবলু দাশগুপ্ত প্রথম দিকে একটু আড়ষ্ট মনে হলেও শেষের দিকে তিনি তা অভিনয় দিয়ে ঢেকে দিতে পেরেছেন। বিশেষ করে তাঁর কোর্টের দৃশ্যটি (প্রতীক) দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। তাঁর একটা বড় গুণ, তিনি যে অভিনয় করছেন না—তার চরিত্রটা লিভিং এটা তিনি আগাগোড়া মনে রাখার চেষ্টা করেছেন।

তবে তার সংলাপ অনেকাংশেই সাংবাদিকতা পেশার ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল নয়, অনেক ক্ষেত্রে নাট্যকারের স্ব-কল্পিত—এ কথাটি সবিনয়ে জানিয়ে রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করছি।

ইন্দ্রাণীর চরিত্রে মায়া ঘোষ যেমন সাবলীল, তেমনি মুখর। তাঁর মাঝে মাঝে চরিত্র পাল্টে অন্য চরিত্রের রূপ দান বিস্মিত এবং মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয়। বিশেষ করে সেই ঝি চরিত্রটি। তিনি যে দক্ষ অভিনেত্রী তা এমনি কয়েকটি দৃশ্যেই স্ব-প্রমাণিত—অতি নাটকীয়তার ঝোঁক সত্ত্বেও।

কিন্তু অসীম সম্পর্কে তাঁর অতি-শয়োক্তি (সংলাপ মারফৎ) কোন কোন ক্ষেত্রে পুনঃপৌনিকতার দোষে দুষ্ট মনে হয়েছে। এমনি অনেক সংলাপকে ছেদন করলে নাটক পরিবেশনের সময় হয়তো সংক্ষিপ্ত হয়, তেমনি অন্যদিকে নাটকের বাঁধুনিও দৃঢ় হয়।

নাটকের বক্তব্য স্পষ্ট নয়—এ কথা ঠিক নয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গেছে। এমন অনেক সংলাপ আছে নাটকে স্থানবিশেষে আবার তাকেই অস্বীকার করা বা খণ্ডন করা হয়েছে। শেষ দৃশ্যে একটা পরিণতির ব্যাপার বোঝা যায়। কিন্তু সেটা কোন মত। মুষ্টিবদ্ধ জেহাদের না সামাজিক বিদ্রোহের। একথা নাটকে স্পষ্ট করে বলা হলে, এ নাটক বৈপ্লবিক বলে আখ্যায়িত হওয়া আদৌ বিস্ময়ের নয়। নাটকের কোথায় যেন একটা বাণী প্রচ্ছন্ন ভাবে লুকিয়ে আছে। যাকে আরো একটু স্পষ্ট করে দর্শকদের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে সাহসিকতার সঙ্গে।

তাপস সেনের আলো সন্তুষ্ট করেনি। ট্রেনের দৃশ্যটি সেতু নাটকের সেই সাড়া জাগানো দৃশ্যটির কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

এ নাটকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বোধকরি তিমিরবরণের আবহসঙ্গীত। নাটকে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করার মত সুর রচনা ও প্রয়োগ ইদানিংকালে নজরে পড়েনি, যা এ নাটকের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে। এমন এফেকটিভ মিউজিক একমাত্র বোধহয় তিমিরবরণের দ্বারাই সম্ভব।

মেটাল বকস অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাট্যাভিনয়

অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরাও নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টা থাকলে এবং অনুশীলনে যত্নবান হলে পেশাদারী পর্যায়ের অভিনয়ের দক্ষতা প্রদর্শনে যে সক্ষম তার স্বাক্ষর রাখলেন মেটাল বকস অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যেরা গত ৪ঠা ডিসেম্বর রবীন্দ্র-সদনে 'রাহুকেতু' নাটকের মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমে। অভিনয়ে প্রশংসার দাবী রাখেন মধু গাঙ্গুলী বিশ্বনাথ বোস, সুনির্মল মুখার্জি, সুনীল ভট্টাচার্য, সুকুমার চ্যাটার্জি নির্মাল্য রায়, মঞ্জুলা মিত্র ও মায়া ঘোষ। অন্যান্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন কৃষ্ণ দত্ত, প্রলয় সান্যাল, প্রকাশ চ্যাটার্জি রমেন দত্ত, নীরোদ সাহা, বিশ্বনাথ পাল, প্রবোধ ব্যানার্জি, প্রফুল্ল ভৌমিক প্রশান্ত সান্যাল সমরেন্দ্র গোস্বামী, চিত্তরঞ্জন তালুকদার, সত্য ব্যানার্জি, দুলাল ভট্টাচার্য আরতি ঘোষ ও দেবী ঘোষ। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীভোলা দত্ত এবং ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শ্রীসন্তোষ লাহিড়ী ও শ্রীপ্রাণেন সেন।

—নাট্য সমালোচক

সোনার কেল্লা

প্রযোজনা : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেতার ও তথ্য বিভাগ

চিত্রনাট্য, পরিচালনা, অভিনয়ে ও আঙ্গিকে অনবদ্য ! ১৯৭৪-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি।

ছয় বছরের ছেলে মুকুল জাতিস্মর। ওর ধারণা তার শৈশব কেটেছে 'সোনার কেল্লা'র দেশে অর্থাৎ রাজস্থানে। সেখানে সে কেবল উট আর ময়ূর দেখেনি, বালির মধ্যে যুদ্ধ দেখেছে। মুকুলের বাবা ও মা ওর জন্যে চিন্তিত হয়ে, ডাক্তার হেমাঙ্গ হাজরার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওকে পরীক্ষা করে সন্দেহ করেন, পূর্বজন্মে মুকুল পশ্চিম রাজস্থানের বাসিন্দা হওয়ায়, সেখানকার কথা ওর মনে পড়ছে। ডাঃ হাজরা অবশেষে যোধপুর যাওয়া স্থির করলেন। ওখানে পৌঁছে শুরু করবেন মুকুলের সঙ্গে 'সোনার কেল্লা'র সন্ধান। রাজস্থানে রওনা হবার আগে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে, মুকুল জানায় পূর্বজন্মে তাদের বাড়ীতে অনেক মূল্যবান হীরা জহরত এবং মণিমুক্তা দেখেছে। আসলে ওর পিতা ছিলেন একজন মণিকার। সময়ে অসময়ে বাড়ীতে বসে মূল্যবান পাথরের বিলাস-দ্রব্য তৈয়ারী করতেন।

সাংবাদিকের ধারণা যে মুকুল 'গুপ্তধনের' কথা বলছে, সুতরাং পরদিন 'দৈনিক পত্রিকায়' রাজস্থানের মুকুলদের বাড়ীর গুপ্তধনের কথা প্রকাশিত হয়।

পাড়ার একটি ছেলেকে 'মুকুল' ভেবে দুই কুচক্রীর দ্বারা অপহৃত হয়, 'সোনার কেল্লা'র তথ্য অনুসন্ধানের জন্যে। পরে তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং অজ্ঞান অবস্থায় ওকে বাড়ীর কাছে ফেলে রেখে যায়। এজন্যে ছেলের বিপদের আশঙ্কা করে মুকুলের বাবা শখের গোয়েন্দা ফেলু মিত্তিরের শরণাপন্ন হন। উনি কাজের গুরুত্ব বুঝে খুড়তুতো ভাই তপসেকে নিয়ে যোধপুর রওনা হন। ইতিপূর্বে 'কাগজে' গুপ্তধনের সন্ধান করবার জন্যে মন্দার বোস ও অমিয়নাথ বর্মণ যোধপুরে রওনা হয়ে যান।

পথে বোস আর বর্মণ ডাক্তার হাজরার সঙ্গে দেখা করে মুকুলের সঙ্গে ভাব করে সোনার কেল্লা দেখানোর নাম করে মুকুলকে নিয়ে যাবার পথে ডাঃ হাজরাকে ধাক্কা মেরে এক কুচক্রী পাহাড় থেকে ফেলে দেয় এবং মুকুলকে নিয়ে সোনার কেল্লার পথে ট্রেন ধরে। যোধপুরে এসে ফেলু মিত্তির সার্কিট হাউসে ওঠে। সেখানেই মুকুলকে নিয়ে ডক্টর হাজরার নামে দুই কুচক্রী বাস করছিল। ওরা বুঝলেন ফেলু মিত্তিরকে না মেরে ফেললে, তাদের আসল কার্য সিদ্ধি হবে না। দুই চক্রী হিপটোনাইস করে মুকুলের কাছ থেকে জেনে নেয়, জসলমীরে 'সোনার কেল্লা'র অবস্থিতি, কিন্তু ফেলু মিত্তির কম নন, জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলীর সহযোগিতায় মন্দার বোসকে জব্দ করেন ট্রেনে। যখন উনি 'ফেলু মিত্তির'কে হত্যা করতে উদ্যত হয়ে ডক্টর হাজরার কামরায় গিয়ে আত্মরক্ষা ভয় পেয়ে, ট্রেন থেকে পড়ে নিহত হন উনি। জসলমীর এসে ওরা দেখে, বর্মণ সাহেব মূল্যবান মণি-মুক্তোর খোঁজে মুকুলের পূর্বজন্মের বাড়ীর খোঁজ করছে। কিন্তু বেশী কিছু করবার আগে ওকে ধরা পড়তে হোল সখের ডিটেকটিভ ফেলু মিত্তিরের কাছে। এরপর সোনার কেল্লা আবিষ্কার করে ফেলুদা মুকুল ও তপসেকে নিয়ে কলকাতায় রওনা হন।

সত্যজিৎ রায় ইতিপূর্বে নিজের লেখা কাহিনী নিয়ে কোন ছবি পরিচালনা করেন নি। 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' ছবিটি ওর প্রথম শিশুচিত্র পরিচালনা আর সোনার কেল্লা হোল দ্বিতীয়। প্রথমটিতে উনি কাহিনীর সঙ্গে অনেক চমক সৃষ্টি করেছিলেন। চলচ্চিত্রের আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার অবকাশ নেই, এই কিশোরদের ছবিতে। তবুও উনি একটি সাধারণ অ্যাডভেনচারের অপূর্ব চলচ্চিত্রায়ন করেছেন। কাহিনীটির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে উনি এবার খুব বেশী সিম্বল বা প্রতীকও ব্যবহার করেন নি। সারা ছবি জুড়েই পরিচালকের মাধুর্য ঘিরে আছে। প্রতি মুহূর্তেই চমক জাগে, পরবর্তী ঘটনা জানবার জন্যে। বিশেষ করে তিনটি দৃশ্যকেই সহজে মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। যখন বর্মণ ট্রেনে মুকুলকে নিয়ে জসলমীর চলেছে সোনার কেল্লা দেখবার জন্যে, তখন ফেলু মিত্তিরের উঠে চড়ে ওদের পেছনে ধাওয়া, রাজস্থানের মরু-ভূমিতে সূর্য অস্ত যাওয়ার দৃশ্য। গভীর রাতে ট্রেনে সকলে ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে নীল আলো জেলে শোবার উদ্যোগ করতে, কুচক্রী মন্দার বোস ভোজালী হাতে ফেলু মিত্তিরকে হত্যা করার চেষ্টা প্রভৃতি, বিভিন্ন শট কম্পো-জিসানে পরিচালকের অসাধারণ জ্ঞানের কথাই, স্মরণ করিয়ে দেয়। চলচ্চিত্রের প্রতিটি বিভাগের কাজেই ও'র প্রতিভার পরিচয় বহন করে। ছবিটির দৈর্ঘ্য কম হলে ভালো হোত।

অভিনয়ে মুকুল (কুশল চক্রবর্তী), তপসে (সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়), ফেলু মিত্তির (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়), জটায়ু (সন্তোষ দেব), মন্দার ঘোষ (কামু মুখোপাধ্যায়); বর্মণ (অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়), ডাক্তার হাজরা (শৈলেন মুখোপাধ্যায়), গোয়েন্দা কাহিনীর চরিত্রারোপে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। অন্যান্য চরিত্রে হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, হারীণ চট্টোপাধ্যায়, কেয়া চাটার্জি, শিউলি মুখার্জি, নিমাই ঘোষ প্রভৃতি চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন।

আলোকচিত্র গ্রহণে—সৌমেন্দু রায়, সম্পাদনায়—দুলাল দত্ত, শব্দ ধারণে—জে ডি ইরাণী, শিল্প নির্দেশনায়—অশোক বোস, তাঁদের প্রত্যেকের কাজই উচ্চাঙ্গের। পরিশেষে সত্যজিৎ রায়কে এ-জাতীয় শিশু-চিত্রের জন্যে ধন্যবাদ।

অংকুর

প্রযোজনা : ব্লেজ ফিল্ম এণ্টারপ্রাইজ প্রাঃ লিঃ
কাহিনী, পরিচালনা, অভিনয় ও আংগিকে ১৯৭৪এর শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ করার পর বি এ পড়ার আগেই অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে সূর্যকে কলেজ ছেড়ে বাবার ইচ্ছায় বিয়ে করে তার বালিকা বধূ সুরোকে ছেড়ে তাকে গ্রামে চলে যেতে হোল জমিদারীর কাজ তদারকির জন্য। ঠিক হোল সুরো প্রাপ্তবয়স্ক হলে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকবে।

কিছুদিন পরেই সেখানে সূর্য নিজেকে নিঃসংগ বোধ করে কাজ এবং সংগীর অভাবে। বোধ হয় সেই জন্যই এবং নিজের অজানিতেই ক্রমে লক্ষ্মী নামে যে সদ্য বিবাহিতা সুন্দরী মেয়েটি তাদের বাড়িতে কাজ করে, তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে সে। প্রথমটা লক্ষ্মী অপ্রস্তুত হলেও সে সূর্যকে এড়াতে পারে না।

লক্ষ্মীর স্বামী বোবা ও কালা, এবং বেশ কিছুকাল ধরেই বেকার বলে, লক্ষ্মীর অনুরোধে সূর্য তাকে চালাকি করে দূরে সরিয়ে দেবার জন্যে গরুর গাড়ি চালাবার কাজ দিল। লক্ষ্মীর স্বামী দিনের শেষে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরত, এসেই স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করত। একদিন হঠাৎ সে এক চুরির দায়ে ধরা পড়ে শাস্তি পাওয়ার লজ্জায় গ্রাম থেকে উধাও হয়ে গেল।

ফলে লক্ষ্মী অসহায় হয়ে পড়ায় সূর্য তাকে ভরসা দেয়। এবং বলে, প্রয়োজন হলে সে চিরদিনের দায়িত্ব নিতেও রাজী লক্ষ্মীর। কিন্তু লক্ষ্মী তাতে প্রমাদ গণে। কারণ, তার স্বামী ফিরে এলে? অথবা সূর্যর বাবা বা স্ত্রী যদি সহসা এখানে এসে উপস্থিত হয়?

কিন্তু সূর্য সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল। সে তখন লক্ষ্মীর প্রতি অন্ধ প্রেমে আসক্ত। ব্যাপারটা নিয়ে এক সময় গ্রামে কানাকানি শুরু হোল। কিন্তু সূর্য নির্বিকার। দেওয়ালীর রাত্রে মাত্রাতিরিক্ত দেশী মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়া সূর্যকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে সেবা করার কথাও গ্রামের লোকের অজানা রইল না। কালক্রমে সেই কথা সূর্যর বাবা ও যুবতী স্ত্রীর কানে পেঁাছতেও দেরী হয় না।

সুরো গ্রামের বাড়ীতে পা দিয়েই লক্ষ্মীকে বিতাড়নের জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল। বাধ্য হয়ে তাই একদিন ফিরে যেতে হোল লক্ষ্মীকে তার পর্ণ কুটীরে।

সেখানে সহসা একদিন লক্ষ্মী আবিষ্কার করল যে সে মা হতে চলেছে। অথচ তার স্বামী দেশছাড়া। এ নিয়ে কানাকানি হলে সকলে সূর্যকেই সন্দেহ করবে।

কথাটা শুনে সূর্যও প্রমাদ গণে। সে লক্ষ্মীকে অনবরত অনুরোধ করে অঙ্কুরেই পেটের সন্তানকে নষ্ট করে ফেলতে। নইলে সে মুখ দেখাতে পারবে না লোকের কাছে। কিন্তু লক্ষ্মী তাতে রাজী হয় না।

হঠাৎ এক রাত্রে ওর স্বামী ফিরে আসতেই লক্ষ্মী প্রথমটা ভয় পেয়ে যায়। পরে মরিয়া হয়েই তাকে বলে যে, তার গর্ভে যে সন্তান বাড়ছে সে অবৈধ।

কিন্তু তার স্বামী সেকথা কানেই তোলে না। বরং সে খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কারণ, তারা আর এখন মাত্র দুজন নয়, তাদের মাঝে আরো একজন আসছে।

আর সেই সুখবর সূর্যর কাছে পেঁাছে দিতে যেতেই সূর্য তাকে ভুল বোঝে এবং রাগে ফেটে পড়ে চাবুক দিয়ে তাকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে তোলে।

সেই অমানুষিক দৃশ্য দেখে সহ্য করতে পারে না লক্ষ্মী। তার নিরপরাধ স্বামীকে মারার জন্য সে সূর্যকে ধিক্কার দিয়ে স্বামীকে নিয়ে ফিরে যায় তার নিজের ঘরে।

এমন একটি গল্পকে কাব্যমণ্ডিত করে সেলুলয়েডে উপস্থাপিত করে আমাদের অবাক করে দিয়েছেন পরিচালক শ্যাম বেনেগাল। বলতে কি এমন বলিষ্ঠ পরিচালনা হিন্দী চিত্রজগতে বড় একটা দেখা যায় না। পরিচালক এ ছবিতে কোন গিমিক সৃষ্টি করেন নি, ফ্লিজ, স্টীল, মন্তাজ ইত্যাদিও ব্যবহার করেন নি, সহজ সরলভাবে গল্পটা বলে গেছেন মাত্র।

লক্ষ্মীর ভূমিকায় আশ্চর্য অভিনয় করেছেন সাবানা আজমী। সূর্যর চরিত্রের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বকে মূর্ত করে তুলেছেন নবাগত অনন্ত নাগ। লক্ষ্মীর স্বামীর চরিত্রে সাধু মেহের বিস্মিত করার মত অভিনয় করেছেন।

বনরাজ ভাটিয়ার আবহ সংগীত ছবিকে প্রাণ দিয়েছে। সম্পাদনা, আলোক চিত্রগ্রহণ ও অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ উচ্চাংগের।

বিদাই

প্রযোজনা : প্রসাদ প্রোডাকসন্স

বক্স অফিসের দিকে চেয়ে তোলা ছবি

একে একে সকলেই পার্বতীকে ছেড়ে চলে গেল। শোকে দঃখে স্বামী যখন মারা যান তখন ছেলে দুটি নাবালক, একমাত্র মেয়েটি (বোবা) ও খুবই ছোট।

তবু সব শোক ভুলে পার্বতী এক সময় দুঃখে-কষ্টে ছেলে-মেয়েদের যখন বড় করল, তখনও দেখলো কেউ যেন তার আপন নয়।

বড় ছেলে বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে শহরে চলে গেল আত্মসুখের আশায়। মেয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলো পরিবারের সুনাম রক্ষার জন্য। আর ছোট ছেলে শহরে থেকে কলেজে পড়তে গিয়ে এক বড়লোকের মেয়েকে প্রেম করে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এলো। কিন্তু সেখানে বেশী দিন তারা থাকতে পারল না। বড়লোকের মেয়ে কষ্ট সহ্য করতে অভ্যস্ত নয় বলে। একদিন মেয়ের বাবা তাকে নিয়ে এলো নিজের কাছে। সঙ্গে নিয়ে এলো মেয়ের স্বামীকেও, তাকে ছেড়ে মেয়ের থাকতে কষ্ট হবে বলে। নিঃস্ব রিক্ত পার্বতীর দুঃখ কেউ বুঝল না।

ক্রমে একদিন পুত্রবধূ পদ্মা মা হলো। কিন্তু মাতৃভক্ত সুধাকর মার অস্তিত্ব বোঝাবার জন্য সেই সন্তানকে পদ্মার কাছে না রেখে নার্সের হাতে তুলে দিল দেখাশোনার জন্য। কারণ পদ্মাও একদিন তাকে মার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছিল।

বিদাই। জীতেন্দ্র এবং লীনা চন্দ্রভারকর

কিন্তু পদ্মা যখন মার মর্মবেদনার কথা হৃদয় দিয়ে অনুভব করলো, তখন সুধাকরের মার অবস্থাও শোচনীয়।

এদিকে বড়ছেলেও একদিন সর্বস্ব খুইয়ে যখন পথের ভিখারী, তখন তার মাকে মনে পড়ল।

কিন্তু সেই মার কাছে যখন দুই ভাই-ই ফিরে এলো তখন সব শেষ। মা মৃত্যুশয্যায়।

মোটামুটি এই গল্প। কিছুটা চটুল কিছুটা আবেগপ্রধান। এক শ্রেণীর দর্শকের ভালই লাগবে।

জীতেন্দ্র (সুধাকর), সত্যেন্দ্র কাপুর (মধুকর) দুর্গা খোটে (পার্বতী), লীনা চন্দ্রভারকর (পদ্মা) মোটামুটি ভালই অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় মদনপুরী, এ কে হাঙ্গাল, অপর্ণা চৌধুরী জয়শ্রী টী আনোয়ার হুসেন ইত্যাদি চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন বলা চলে।

প্রবীণ পরিচালক এল ভি প্রসাদ ভাবাবেগপূর্ণ কাহিনীটি পর্দায় রূপায়িত করার চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি।

লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালের সুর মনোরঞ্জক। সুধেন্দু রায়ের শিল্প নির্দেশনা প্রশংসনীয়।

—চিত্রদূত

কহতে হ্যায় মুঝকো রাজা : বিশ্বজিৎ। রেখা। [illegible]

ফ্লোর থেকে বলছি

ছবির নাম 'ফুলশয্যা'। কিন্তু ফ্লোরে সেদিন ফুলও ছিল না শয্যাও ছিল না। আর এটা আদৌ বাড়ির শয়নকক্ষ নয়। বৈঠকখানা বলা যেতে পারে। এখানে এখন বেশ কিছু লোকজন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে কাজ করছেন। ঘরের একদিকে ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ঘরের একটা বেশ বড় অংশ আলো করা যাচ্ছে। লাউডন স্ট্রীটের এই বাড়ির সাজানো গোছানো ড্রইংরুমটি রীতিমত 'ফ্লোর'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। শুটিং হচ্ছে। আর্টিস্টরা রিহার্স করছেন। এই মুহূর্তে আর্টিস্ট বলতে ছবির নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং অলকা গাঙ্গুলী। 'সারথি' নামের আড়ালে বেশ কয়েকজন তরুণ কলাকুশলী এবং শিল্পী এই ছবি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দেখলাম আর্টিস্টদের দৃশ্যটি বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছেন পরিচালক গোষ্ঠীর অন্যতম দুই কর্ণধার সবেন্দ্র এবং কাজল মজুমদার। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য সবেন্দ্র এই ছবির নায়ক। সে যাই হোক আপাতত..... সাইলেন্স......সাইলেন্স...। চারিপাশে 'সাইলেন্স' ঘোষিত হল। আর্টিস্টরা যে যার পজিশনে এলেন। পরিচালক গোষ্ঠী ফাইনাল মনিটর অর্থাৎ ফাইনাল রিহার্সাল দেখে নিতে চান। বেশ ভাল কথা। ক্যামেরাম্যান বিজয় দে ওরফে গুপীদা তৎক্ষণাৎ হাঁক ছাড়লেন 'অল লাইটস'। সঙ্গে সঙ্গে শুটিং জোন একেবারে আলোয় আলোয় ভরে গেল। ডে সিকোয়েন্স। ক্যামেরা তার প্রয়োজনমত মুখ এদিক ওদিক ঘোরাল। বলতে কি সুচন্দ্রা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন। এসে দেখেন ধীরা অলকা গাঙ্গুলী বই পড়ছেন। বই বন্ধ করে ধীরা মুখ তুলল। সুচন্দ্রা জিজ্ঞাসা করলে : বাবা কোথায়?

ধীরা : ও মা তুমি বুঝি জান না, বাবা তো আজ সকালেই একটা জরুরী মামলা নিয়ে দিল্লী চলে গেছেন।

সুচন্দ্রা আশ্চর্য : দিল্লী চলে গেছেন?

ধীরা : তুমি সব সময় অন্য কাজে ব্যস্ত থাকো। তা বাবাকে আজ প্রয়োজন হল কেন বলো ত।

সুচন্দ্রা : সব খবরই তুমি রাখ। কলকাতার আমার কেন প্রয়োজন সেটা তুমি জান না?

ধীরা : তুমি কি বলতে চাইছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

সুচন্দ্রা : না বোঝার ভান করলে কোনো কিছু বোঝা যায় না।

ধীরা : মানে?

সুচন্দ্রা : মানেটা তোমার শ্বশুর যাবার আগে তোমায় বলে যায়নি।

এত কথাবার্তা যে বলা হল আমিও কি ছাই অতশত মানে বুঝলাম। বুঝেও না বোঝার ভান করতে হচ্ছে। কেননা পরিচালক গোষ্ঠী ছবির গল্পটি ডিসক্লোজ করতে চাইছেন না। কারণ গল্পের বাঁকে বাঁকে আছে চমক। চমকটা আগেভাগে বলে দিলে ছবি দেখতে বসে মজাটা পাওয়া যাবে না। এটা বোধকরি স্থিরসিদ্ধান্ত। তাই আপনারা শুধু এই জানবেন যে গল্প প্রধানত পাঁচজন যুবক এবং একজন যুবতীকে ঘিরে। পাঁচজন যুবক—পঞ্চ পাণ্ডব উল্লেখ করা হল। এই পঞ্চপাণ্ডব যথাক্রমে : সবেন্দ্র অনুপকুমার অসীমকুমার নির্মলকুমার এবং সতীন্দ্র ভট্টাচার্য। বিপরীতে একজন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করছেন : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ছায়া দেবী দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায় অমরনাথ মুখোপাধ্যায় মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় বাবলু সমাদ্দার প্রভৃতি। দুটি বিশেষ চরিত্র রূপায়িত করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং অনিল চট্টোপাধ্যায়। তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী, চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক গোষ্ঠী। সংগীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন অসীমা ভট্টাচার্য। ইতিমধ্যে প্রথম পর্যায়ের সংগীত গ্রহণ সুসম্পন্ন হয়েছে। নেপথ্যে কণ্ঠদান করছেন মান্না দে ও হৈমন্তী শুক্লা।

জুপিটার প্রোডাকসন্সের পতাকাতলে নির্মীয়মান এই ছবির শিল্পনির্দেশক

[illegible]। রাজশ্রী বসু

সুনীতি মিত্র। সম্পাদক : অমিয় মুখোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপক প্রশান্ত পাত্রাদার।

সেদিন নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে এলাহি ব্যাপার। দুদিক থেকে দুটি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। স্টুডিওর একটি ফ্লোরের পাশে খানিকটা নীচু জমি আগে এখানে পুকুর ছিল এখন শুকিয়ে কাঠ—আলো করা হচ্ছে। বিরাট শুটিং জোন। চারিদিক দেখতে দেখতে দেখা হল পরিচালক শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতার সঙ্গে। শ্রীকান্ত বললেন, আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা কাজ শুরু করব।

বেশ ঠান্ডা পড়েছে। চারিদিক উন্মুক্ত সন্ধ্যে পার হয়ে এসেছে। ক্রমশঃ অন্ধকার হচ্ছে। শীতের রাত। স্টুডিওর লোকজন ছাড়া বাইরের লোকজন খুবই কম। ঠিক বিপরীতে মুক্ত আকাশের নীচে সেট ফেলে পরিচালক তরুণ মজুমদার 'সংসার সীমান্তে'র কাজ করছিলেন। হয়তো কিছু-সময় বিরতি ছিল। তাই তিনি ঘুরতে ঘুরতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সকলেই ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। কেননা আলো করা হয়ে গিয়েছে। ক্যামেরাম্যান বিজয় ঘোষ গ্রীন সিগন্যাল পাবার অপেক্ষায় বসে আছেন। সমস্ত কলাকুশলীরাই অপেক্ষা করছেন।

দৃশ্যটা কি—এখানে দেখানো হবে নায়িকা বাসবী নন্দী বাংলাদেশের আগেকার পূর্ব পাকিস্থানের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছেন। দেশের ভিটেমাটি ছেড়ে পালাতে হচ্ছে। রাজাকাররা নায়িকাকে তাড়া করছে। নায়িকা দৌড়তে দৌড়তে এই এখান থেকে গড়াতে শুরু করবে।...শুনে তো আমার চক্ষুস্থির। বলে কি! ফিল্মের নায়িকারা ওপর থেকে এভাবে গড়াতে গড়াতে নীচে পড়বে—অসম্ভব! তাও আবার এতটা দূরত্ব। এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ডামি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শ্রীকান্ত বললেন—সেসব ঠিকই। কিন্তু বাসবী নন্দী ডামি ব্যবহার করতে চান না। সরেজমিন তদন্ত করে তিনি নিজেই এরকম একটি দুরূহ শট দিতে সম্মত হয়েছেন। সকাল থেকে শুটিং করে একটুও ক্লান্ত নন। বরং উজ্জীবিত। নতুন করে মেক-আপ নিচ্ছেন। একেবারে অন্য সিকোয়েন্স তো। নায়িকার জীবনের অতীত ভাগ।... বলতে বলতে বাসবী এসে উপস্থিত হলেন। দেখা হলে কুশল প্রশ্ন-উত্তর বিনিময় হল। তিনি কথা বললেন, হাসলেন কিন্তু স্পষ্ট হল তাঁর মন পড়ে আছে সিকোয়েন্সে। হ্যাঁ খানিকটা অন্যমনস্কভাবেই তিনি এগিয়ে গেলেন নিজের জায়গায় নো রিহার্সাল। একেবারেই শটটি টেক করা হবে। সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল। দৃশ্যটি আরেকবার বুঝে নিলেন বাসবী। চোখে মুখে অসহনীয় অবস্থা ফুটিয়ে তুলে ছুটলেন। সামান্য কয়েক হাত দূরেই রাজাকাররা। বাসবী ছুটছেন প্রাণ ছুটছে। এইভাবে একটুখানি জায়গা অতিক্রম করতে না করতে বাসবী পড়লেন। ঠিক যা চেয়েছিলেন পরিচালক। গড়াতে গড়াতে নীচে। 'কাট' ঘোষণার পরও বাসবী উঠছেন না। কি হল? সকলে পড়ি কি মরি করে এগিয়ে গেলেন। বাসবী মাথায় হাত দিয়ে তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। রক্ত ঝরছে। মাথায় সামান্য আঘাত পেয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি উঠে বসলেন। ফার্স্ট এড করা হল। রক্ত ঝরে পড়ুক শটটা কেমন হয়েছে জানতে চাইলেন বাসবী প্রথমেই। শ্রীকান্ত কি বলবেন—আবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল। তবুও তিনি বললেন : এ শটের দাম লাখ টাকা।...

ছবির নাম 'পরস্ত্রী'। জুবিলী ফিল্মসের পতাকাতলে নন্দিতা দাশগুপ্তের প্রযোজনায় তৈরী হচ্ছে। বিমল মিত্রের কাহিনী। সলিল দত্তের চিত্রনাট্য। নায়ক : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এ ছবির সংগীত পরিচালক : মান্না দে। —স্টুডিও সংবাদদাতা

সূর্যকন্যা। জয়শ্রী রায়

স্টুডিও সংবাদ

'রাজা'র শুটিং শেষ করে পরিচালক তপন সিংহ নতুন ছবির পরিকল্পনা করেছেন। ইতিমধ্যে প্রাথমিক কাজকর্ম সুসম্পন্ন। ছবির নাম 'হারমোনিয়াম'। বিষয়বস্তু, সিরিও কমিক। কাহিনীকার চিত্রনাট্যকার সংগীত-পরিচালক শ্রীসিংহ নিজেই। এ ছবিতে সংগীতের ভূমিকা অসামান্য; অনেকগুলি গানও থাকছে। গান রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে শুভ সূচনা নির্ধারিত হয়েছে জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে। শ্রীসিংহের তত্ত্বাবধানে কণ্ঠ দেবেন : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মান্না দে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ ঘোষাল হৈমন্তী শুক্লা তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পিন্টু ভট্টাচার্য। প্রতাপ আগরওয়াল ও আর এ জালান যথাক্রমে দার্জিলিং ও উড়িষ্যার দুই খ্যাতনামা ব্যবসায়ীর প্রযোজনায় এ ছবি নির্মিত হতে চলেছে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন নামী অনামী অনেক শিল্পী। এখন পর্যন্ত যাঁদের নাম পাওয়া গিয়েছে তাঁরা হলেন : কালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেমাংশু বসু সন্তোষ দত্ত অরুণ মুখোপাধ্যায় ভীষ্ম গুহঠাকুরতা এবং সমিত ভঞ্জ। শোনা যাচ্ছে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও অনীতা ভট্টাচার্য দুটি বিশেষ চরিত্র রূপায়িত করবেন। চিত্র-

বন্দীবিধাতা। রুহী

গ্রহণ করবেন ঃ বিমল মুখোপাধ্যায়। শিল্প-নির্দেশনায় আছেন ঃ সুনীতি মিত্র। সম্পাদনা করবেন ঃ সুবোধ রায়।

প্রবীণ পরিচালক চিত্ত বসু অনেকদিন পর ছবি করবেন স্থির করেছেন। সমস্ত ব্যবস্থা পাকা। জানুয়ারী মাস থেকে শুটিং শুরু হবে। মণি বর্মার কাহিনী ও চিত্রনাট্য। ছবির নাম এখনো স্থির হয়নি। সামাজিক কাহিনী। প্রধান তিনটি চরিত্রের শিল্পী ঃ অনিল চট্টোপাধ্যায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং দিলীপ রায়। আসলে এ ছবির নায়ক-নায়িকা—বারো।চৌদ্দ বছরের ছেলে-মেয়ে, নতুন মুখের সন্ধান মিলবে। ইকনমিক পিকচার্সের পতাকাতলে নির্মিত হবে। ছবির শুটিং প্রোগ্রাম চক-আউট করে ফেলা হয়েছে। জানুয়ারী মাসে টানা শুটিং।—আউটডোরে। প্রথম উস্রী ফলস-এ সেখান থেকে ঘাটশিলা হয়ে মান্দার হিলস-এ। ছবির বেশীর ভাগ অংশ তোলা হবে আউটডোরে। চিত্রগ্রাহক ঃ বিভূতি চক্রবর্তী

'বালক শরৎচন্দ্র' নামে একখানি ছবির কয়েকদিন শুটিং হল টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে। ক্যাপ্টেন ঘোষের প্রযোজনায় এই ছবি নির্মিত হচ্ছে। রাজকুমার রায়চৌধুরীর চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন জয়ন্ত সাহা। বিভিন্ন চরিত্রের শিল্পী ঃ অনন্ত রায়চৌধুরী সুব্রতা ব্যানার্জি মেনু মুখার্জি বিউটি ব্যানার্জি মল্লিকা মজুমদার স্বাতী বিশ্বাস রাজলক্ষ্মী দেবী (ছোট) প্রদীপ কুণ্ডু বরুণ দাশগুপ্ত বিদ্যুৎ গোস্বামী অনিমেষ চক্রবর্তী অমর সেনগুপ্ত বীরেন ভট্টাচার্য ভারতী

দেবী জ্ঞানেশ মুখার্জি সন্ধ্যা মুখার্জি এবং সমীর লাহিড়ী। এ ছবির সংগীত পরিচালক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েকখানা গান রেকর্ড করা হয়েছে। কন্ঠদান করেছেন ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হৈমন্তী শুক্লা। আলোকচিত্রশিল্পী ঃ শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

পিথুন পিকচার্সের ব্যানারে পরিচালক সলিল রায় (যিনি 'জীবনরহস্য' নামে একখানি ছবি করেছেন) নতুন ছবি শুরু করবেন 'এলেম নতুন দেশে'। সম্ভবতঃ জ্যোতির্ময় রায়ের কাহিনী অবলম্বনে জ্ঞানেশ মুখার্জির চিত্রনাট্যে এই ছবি তৈরী হবে। নায়ক চরিত্র রূপায়িত করবেন সৌমিত্র ভঞ্জ। নায়িকা চরিত্র রূপায়িত করতে বম্বে থেকে যোগিতা বালী আসতে পারেন। ইতিমধ্যে এ ছবির গান রেকর্ড করা হয়েছে। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে গেয়েছেন ঃ আরতি মুখোপাধ্যায়।

—স্টুডিও-সংবাদদাতা

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

ডিম্পলের বোন সিম্পল রাজেশের বিপরীতে নায়িকা হয়েছেন এটা এখন বম্বের জোর খবর। সিম্পল যে এত সিম্পাল নায়িকা হবে এটা বম্বের ছবির জগতের কেউই স্বপ্নেও ভাবেননি। যাই হোক যেহেতু ডিম্পলের বোন—মাতামাতি চলছে। রাজেশ প্রেসের লোকজনকে বাড়িতে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। ছবি তোলাচ্ছে। শ্যালিকার জন্য জামাইবাবু লড়ে যাচ্ছেন। পাবলিসিটি অ্যাকাউন্টে জামাইবাবু ইতিমধ্যে কয়েক হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছেন। ফলে কাগজে সিম্পলের ছবি আর ইন্টারভিউ বেরোচ্ছে। পাঠক পাঠিকারা পড়ে ধন্য হচ্ছেন।

কিম্মি নামে একটি নতুন মেয়ে এসেছে বম্বের ছবির জগতে। এসেই টুপিস পরে ছবি টবি তুলে বিখ্যাত হবার চেষ্টা করছে। জানা গেল কিম্মী নৃত্য-পটিয়সী। কতজনকে নাচাবে কে জানে!। গোপীকৃষ্ণের ছাত্রী। লন্ডনে জন্মকর্ম। মাত্র তিন মাস আগে ভারতে এসেছে। এসেই নাচ শিখতে শুরু করেছে। (নাচাতে শুরু করেনি ভাগ্যি!) সান-এন-স্যান্ড হোটেল থেকে কিম্মিকে আবিষ্কার করেছেন কয়েকজন তরুণ অভিনেতা। যেমন ড্যানি রমেশ শর্মা ঋষি কাপুর...। স্বাস্থ্যবতী নায়িকা হবার যোগ্যতা আছে কিনা প্রমাণিত হয়নি তবে যৌবন আছে। একটা ছবিতে কাজ করছে। সঞ্জীব খানের বিপরীতে—আওয়ারা জিন্দেগী। অনেকের মতে কিম্মি শেষ বিস্মৃত—সন্দেহ নেই।

একদা রাজেশের প্রেমিকা অঞ্জু মহেন্দ্রু আর প্রেমে পড়তে চান না। অঞ্জুর মতে—প্রেমের ফাঁদে পড়তে চাই না। এই পৃথিবীতে সত্যিকারের প্রেম বলতে কিছু নেই। সত্যিকারের প্রেমের বদনাম করেন অনেকে। আমরা বড় দ্রুত এগিয়ে চলেছি। জীবন চলেছে দ্রুত ভাবে। উই আর অল রানিং সো ফাস্ট উই হ্যাভ নো টাইম ফর এনিথিং ইন লাইফ।

শর্মিলা রাজশ্রী বসু

অভ্যেসই বলুন আর যাই বলুন সায়রা মাঝে মাঝে গায়েব হয়ে যান। সে কি মশাই! এতবড় মেয়ে বলা নেই কওয়া নেই পালিয়ে যায়। আবার ফিরে আসে কোন্ মুখে। যে মুখ দেখে রাজেন্দ্র মজেছিল, শাম্মী দিওয়ানা হয়েছিল, ধর্মেন্দ্র মরিয়া হয়ে উঠেছিল, দিলীপ প্রথম দেখাতেই প্রেম নিবেদন করে বসেছিল এবং অবশেষে শহীদ হয়েছিলো। এই বিউটি কুইনকে ঘিরে বম্বের ছবির জগতে চাঞ্চল্য এখনো শেষ হয় নি। কেননা সায়রা তাঁর রূপযৌবনের পসরা নিয়ে আবার বাজার গরম করে দিয়েছেন। মাঝে অসুস্থ থাকার জন্য অনেক কিছু হাতছাড়া হয়েছে। সায়রা সেসব ফিরে পেতে চাইছেন। এমনকি, পুরোনো অ্যাসোসিয়েশান। কিন্তু তা কি করে সম্ভব। রাজেন্দ্র'র আর সেই দিনকাল নেই। সে এখন টপ হিরো নয়, রীতিমত পড়তি অবস্থা। ও'র সঙ্গে প্রেম করে লাভ কি। করতে চাইলেও রাজেন্দ্রর সময় নেই। সে এখন নানারকম ব্যবসাপত্তর নিয়ে খুব খুব ব্যস্ত। ধর্মেন্দ্র'র হাতে এখন অনেক নায়িকা—অনেক গার্ল ফ্রেন্ড। হেমা'র সঙ্গে নীরব প্রেম, আশার সঙ্গে অর্থাৎ আশা সচদেবের সঙ্গে উদ্দাম প্রেম, শর্মিলার সঙ্গে প্রেম শুধু প্রেম নয় ইত্যাদি নিয়ে সে আছে। বেশ আছে। সেখানে শুধু শুধু নাক গলিয়ে লাভ নেই। সায়রা সাত পাঁচ ভাবছিলেন ঠিক এমন সময় ঘটনার গতি একদম ঘুরে গেল। মিসেস বিমল রায়ের 'চৈতালী' ছবির অফার। শর্মিলার বদলে সায়রা। নায়ক ধর্মেন্দ্র। সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো প্রেম নতুনভাবে সাড়া দিল। 'কতদিন পরে তোমার সঙ্গে কাজ করছি' বলো ত দুজনের মুখে ঘুরে ফিরে একইকথা। এই কথাটা বোধকরি বাতাসে ভর করে পৌঁছে গিয়েছিল দিলীপের কানে। তা না হলে দিলীপ হঠাৎ 'চৈতালী'র শুটিংএ আসবেন কেন? এই নিয়ে গৃহযুদ্ধ। তারপর থেকে সায়রার ধারণা দিলীপ ও'কে সন্দেহ করে। অথচ সে নাকি তার পতিকে দেবতার মতো পুজো করে। প্রত্যহ দু'বেলা।

অমিতাভ'র সঙ্গে জয়ার এখন অনেকটা ফারাক। আগে ঠিক উল্টো ছিল। এখন অমিতাভ'র হাতে অনেক ছবি। জয়ার হাতে ছবির সংখ্যা খুব সামান্যই। কেউ কি এরকম ধারণা করতে পেরেছিলেন? মোটেই না। সকলে এই ধারণা করেছিলেন বউ'র পয়সায় বসে খেতে হবে, অমিতাভকে। সেসময় অমিতাভ'র সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল না। অনেকেই মনে করেছিলেন 'লম্বু হাওয়া' হয়ে যাবে- জয়ার জয়াকার চলছে, চলবে। চলল না। কারণ অহঙ্কারই পতনের মূল। জয়ার লম্বা-চওড়া লেকচার লম্বুজী পছন্দ করলেও বম্বের ছবির জগতের আর পাঁচজন পছন্দ করলেন না। আস্তে আস্তে জয়া হারিয়ে যাচ্ছেন। অমিতাভ, অমিতবিক্রমে এগিয়ে চলেছে। খুবই স্বাভাবিক এতে ও'দের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ঠিক থাকতে পারে না। এ'দের দুজনের মাঝখানে একটাই মুখ, ইদানীং স্পষ্ট—সে মুখটি হলো সঞ্জীবকুমারের।

বিখ্যাত পরিচালক বি আর ইশারা—রেহানা সুলতান, বি আর ইশারা রীণ কেচ্ছা ইতি হয়েছে। এখন বাজারে গুজব ইশারার প্রেমে পড়েছেন জীনত আমন। জীনি বেবী, এই নামেই ইশারা, জিনতকে ডাকাডাকি করেন। যখন তখন ও'র বাড়িতে আসেন। জিনত-এর শুটিং না থাকলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে গল্প করেন। তাহলে 'প্রেমশাস্ত্র' আবার হবে নাকি?

রাজ কাপুর তাঁর আগামী ছবির জন্য নায়িকা খুঁজছেন। পরপর ছবিতে নতুন নায়িকা—যেমন ছেড়েছেন ডিম্পলকে। রাজের বিরাট পরিকল্পনা। বছরে দু'খানা ছবি করবেন। একটাতে হিরো ডাব্বু, আরেকটাতে চিন্টু যথাক্রমে রণধীর এবং ঋষি। একই নায়িকাকে দুটো ছবিতে নেবেন না। তাহলে ভাই ভাই সম্পর্ক থাকবে না। ভাই ভাই ঠাঁই হবে।

এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার বলরাজ সাহানীর পুত্র অজয় সাহানী'র মতো একজন নিপুণ অভিনেতা বম্বেতে স্থান করে নিতে পারছেন না। অজয়ের মধ্যে অনেক কিছুর অভাব আছে। 'ছবিতে কাজ দিন' মুখ ফুটে বলতে পারে না। তৈলাসিঞ্চন করতে পারে না। গুল ঝাড়তে পারে না। সার বুঝে অজয় অন্য ধান্দা করছে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার চেষ্টা করছে।

—অভিজিত

বিদেশী ছবি

ইনহেরিট দি উইন্ড

সম্প্রতি ইউ. এস ইনফর্মেশন সার্ভিস যে ছবিটি নির্দিষ্টসংখ্যক দর্শককে উপহার দিলেন তার নাম 'ইনহেরিট দি উইন্ড'। পরিচালক প্রখ্যাত স্টানলি ক্র্যামার। ছবিটি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য।

বর্ণবৈষম্যের মত ধর্মান্ধতা এবং অন্ধ সংস্কার আজও পৃথিবীর অনেক স্থানেই রয়ে গেছে এ কথা যেমন সত্য, তেমনি মানুষ যে এখনও অনেক কিছু সংস্কার থেকেই মুক্ত হতে পারেনি এ কথাও সমান সত্য।

বরং বলা যায়, একদিকে যেমন মানুষ সভ্যতার আলোয় নিজেদের নতুন করে দেখতে শিখছে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটছে, তেমনি আবার অন্যদিকে ধর্মান্ধতা, অন্ধ সংস্কার গোঁড়ামী এবং নিষ্ঠুরতা ক্রমশ প্রকট হচ্ছে।

বৃহত্তর কোন যুদ্ধ বা সম্মিলিত ঐক্য প্রচেষ্টাও ঐসব জাতের মানুষকে শুভ-বুদ্ধির দিকে মুখ ফিরিয়ে আনতে পারেনি।

যার ফলে মানুষের ভিতরে সেই আগের মতই হানাহানি, তারতম্যবোধ, আদিমতা রয়েই গেছে।

'ইনহেরিট দি উইন্ড' মানুষের অন্ধ বিশ্বাস এবং প্রাচীন সংস্কারের ওপর একটি প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। ছবিটি সেইদিক থেকেই উল্লেখযোগ্য।

ভগবানের নামে অন্ধ বিশ্বাসী এমন একটি সম্প্রদায়-অধ্যুষিত এক অঞ্চলের স্কুলে যে মাস্টারটি এলো যে প্রথমেই ছাত্র-ছাত্রীদের ম্যাপ এবং বইয়ের সাহায্যে বোঝাতে চাইল, আমরা ঈশ্বরবিশ্বাসী হই আর নাই হই না কেন, আসলে আমাদের পূর্বপুরুষ যে বাঁদর ছিলেন, অর্থাৎ আমরা যে সেই যুগ থেকে ধাপে ধাপে মানুষে রূপান্তরিত এবং ক্রমে সুসভ্য হয়েছি, ডারউইন সাহেব তা নানা তথ্য দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন।

তবে সমাজের কাছে এ কথাটা বিস্ময়ের এবং কৌতূহলজনক হলেও প্রাচীন মতে বিশ্বাসী ধর্মভীরু মানুষের তা মনঃপূত হোল না। তারা বললেন, এ ধর্মবিশ্বাসের ওপর আঘাত করা। এমন শিক্ষা পেলে আমাদের ছেলেমেয়েরা বিভ্রান্ত এবং ধর্ম-বিদ্বেষী হয়ে উঠবে।

সেটা ক্রমে আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত আদালত পর্যন্ত গড়াল।

বস্তুত ছবিটিকে বিস্ময়াত্মক বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। কোর্টে দু'পক্ষের উকিলের কুসংস্কার ধর্মান্ধতা, অন্ধ সংস্কার এবং বিপরীত মত নিয়ে যুক্তি-তর্কের অবতারণা—যেখানে শেষ পর্যন্ত এসে পড়ে (অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ও বাইবেলে এতকাল পর্যন্ত যে ভুল ব্যাখ্যা হয়ে আসছিল তাকে খণ্ডন করা)—এই অংশের ধারালো এবং সাহিত্যরসপুষ্ট সংলাপ, প্রতিটি কথা দর্শককে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

মানুষের ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার আজকের বিজ্ঞানের যুগে তার মূল্যায়ন যেন ছবিটিকে আলাদা একটি পর্যায়ে তুলে দিয়েছে।

এ ছবি ভারতীয়দের আরো ভালো লাগার কারণ, ধর্মান্ধতা এদেশ থেকে অনেকটা সরে গেলেও সংস্কারের শিকল এখনও আমাদের পায়ে পায়ে ঝংকার তোলে।

ডারউইন সাহেবের থিওরী আমরা অনেককাল আগেই স্বীকার করে নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু সেই অনুপাতে আজও কি আমরা সংস্কারমুক্ত হতে পেরেছি?

ছবির শেষটুকু যেমন উত্তেজক তেমনি বিষণ্ণতায় ভরা। শিক্ষিত অথচ গোঁড়া সংস্কারাচ্ছন্ন উকিল যুক্তিতে হেরে গিয়েও যেন সত্যের কাছে মাথা নোয়াতে পারছেন না—এ বড় মর্মান্তিক।

সেই মানসিক দ্বন্দ্ব, পরাজয়ের গ্লানি আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে ফ্রেডারিক মার্চের অবিস্মরণীয় অভিনয়ের মাধ্যমে।

স্পেন্সার ট্রেসী অভিনয় করেছেন যুক্তিবাদে বিশ্বাসী উকিলের ভূমিকায়। তাঁর সে অভিনয় না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

মুগাজানের কবীর। মাধবী চক্রবর্তী

বস্তুত বিষয়বস্তু ও তার বক্তব্য ছাড়া, এই দুজনের অভিনয়ই ছবিটির প্রধান সম্পদ।

গোর্কী সদনে চলচ্চিত্র উৎসব

গত ২৩শে ডিসেম্বর কোলকাতার গোর্কী সদনে সোভিয়েট কনসুলেট-এর কোলকাতা শাখার সাংস্কৃতিক বিভাগ ও সোভেকসপোর্ট ফিল্মের যুগ্ম উদ্যোগে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির এক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হয়।

অনুষ্ঠানে ডঃ জে হেডারিচ, জি ডি আর কনসুলেট. ডঃ এফ কুরকা, চেক কনসুলেট মিঃ হেনরিক সজুকোওয়াস্কি পোলিশ কনসুলেট, মিঃ এল গুরোভ বুলগেরিয়ার ট্রেড কমিশনার মিঃ পজগাই. হাঙ্গেরীর ট্রেড কমিশনার এবং মিঃ এস কুজমেঙ্কো, কলিকাতাস্থ সোভেকসপোর্ট ফিল্মের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন করেন কলিকাতাস্থ ইউ এস এস আর-এর কনসুলেট জেনারেল মিঃ ভি. এ ডিউলিন।

অমৃতবাজার পত্রিকার চলচ্চিত্র সম্পাদক ও বি এফ জে এ'র সভাপতি শ্রীনির্মল-কুমার ঘোষ (এন কে জি) অনুষ্ঠানে তার বক্তৃতায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি এবং ভারতীয় দর্শন ও মানসিকতার সঙ্গে সাদৃশ্যের উল্লেখ করেন এবং এই ধরনের চলচ্চিত্র উৎসবের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষভাবে জোর দেন। তিনি বলেন, এতে উভয় দেশের মধ্য আত্মিক যোগ আরো সুদৃঢ় হবে এবং উভয়কে উভয়ের ঘনিষ্ঠভাবে চেনার সুবিধে হবে।

উৎসবের বিভিন্ন দিনে গণতান্ত্রিক জার্মান, চেকোশ্লোভাক পোলিশ, বুলগেরিয়া এবং হাঙ্গেরীর ছবি প্রদর্শিত হয়।

২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের অন্য আকর্ষণীয় অঙ্গ ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের শিল্প এবং চলচ্চিত্রে অগ্রগতি সম্পর্কিত এক ছবির প্রদর্শনী।

—শাঃ রঃ চ

বাংলাদেশের ছবি

আপনারা যাঁরা আমার বাংলাদেশের ছবির খবরের পাঠক (দর্শক নন)—তাঁরা নিশ্চয় জানতে চান, এখন বাংলাদেশে মানে ঢাকায় সর্বমোট কটি ছবির কাজ চলছে।

কিন্তু নির্মাণাধীন ছবির মোট সংখ্যা আমি কেন যাঁরা ছবি নির্মাণ করেন তাঁরাও চট করে ঠিক ঠিক বলতে পারবেন না। তবুও আপনাদের সামনে মোটামুটি কিছু ছবির খবর তুলে ধরছি।

ধন্যি মেয়ে একটি ছবির নাম। এ ছবির পরিচালক দুজন—বাবুল চৌধুরী ও হাসমত।

ছবির সঙ্গীত-পরিচালক সত্য সাহা এবং চিত্রগ্রহণে আছেন অরুণ রায়। ধন্যি মেয়েতে যাঁরা অংশ নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন যথাক্রমে—কবিতা উজ্জল, সুমিতা, জরিনা, জাবেদ রহিম হাসমত প্রমুখ। ছবির কাজ—বিজ্ঞাপনের ভাষায় দ্রুত সমাপ্তির পথে। এ ছবির প্রযোজক ও পরিবেশক সঙ্গীতা ফিল্মস মধুমিতা মুভিজ।

শ্রীমতী চারশ বিশ : সিরাজুল ইসলাম ভুইয়া পরিচালিত ও নির্মীয়মান একটি ছবির নাম। এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালক আনোয়ার কবীর। চিত্রগ্রহণ আমির হোসেন ও সংলাপ রচয়িতা মাহফুজ সিদ্দিকী।

শ্রীমতী চারশ বিশ ছবিতে যে সব শিল্পী অংশ নিয়েছেন, তাঁরা হলেন অলিভিয়া আলমগীর চন্দনা ফতেহ-লোহানী রাজা মীপারা জামান রবিউল সাইফুদ্দিন ও রোজী সামাদসহ আরো অনেকে। এ ছবির প্রযোজনা ও পরিবেশক নিশান ফিল্মস।

এক এ বেগ **আকাশ কুসুম** নামের একটি ছবির পরিচালনা করছেন। এ ছবির প্রযোজক আমীর আলী। ছবির নায়ক-নায়িকা ওয়াসীন ও নবাগতা সাগরিকা

তাল-বেতাল : একটি ছবির নাম। এ ছবির পরিচালক আজিজুর রহমান। সঙ্গীত-পরিচালক সত্য সাহা। এ ছবিতে আছেন সুচরিতা, শবনম দে রোজী প্রমুখ।

ইবনে-মিজান তার নিজস্ব পদ্ধতিতে এবার জীঘাংসা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। এ ছবিতে মানে জীঘাংসায় আছেন জবা চৌধুরী ওয়াসিম সুচরিতা আনোয়ার হোসেন ফতেহ লোহানী খলিল ও জসীম প্রমুখ।

উল্লেখ্য সম্প্রতি ইবনে-মিজান পরিচালিত একটি বস্তা পচা এবং অতিস্যাঁৎসেঁতে ছবি তাজ মহল মুক্তি পেয়েছে।

কামাল আহমেদ বহুদিন পরে একটি করে ছবি তৈরী করেন। এবার তিনি উপহার তৈরীতে মনোযোগী হয়েছেন। এ ছবির কাহিনীকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার।

উপহারে যাঁরা অর্থাৎ যে সব শিল্পী অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে রাজ্জাক কবরী মোস্তাফা সুলতানা হাসমত রানা সিকো ও টেলী সামাদ প্রমুখ।

ছবির সঙ্গীত-পরিচালক সুবল দাস এবং চিত্রগ্রহণে আছেন আবদুল লতিফ বাচ্চু। এ ছাড়া প্রযোজনা ও পরিবেশনায় আছেন সিকো ফিল্মস।

আকবর কবীর দীর্ঘদিন থেকে মামা-ভাগ্নে নামে একটি ছবি পরিচালনা করছেন। এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালক সুবল দাস. চিত্রগ্রহণ রেজা লতিফ প্রযোজনা বজল আহমেদ ও আনোয়ার মতিন।

বিজ্ঞাপনের ভাষায় মুক্তির মিছিলে বহুল আলোচিত ছবি। মামা-ভাগ্নেতে অভিনয়ে আছেন ববিতা জাফর ইকবাল সুপ্রিয়া ওয়াহিদা টেলি সামাদ রবিউল রেজাউল করিম রীটা নারায়ণ চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।

নায়িকা কবরীর ব্যক্তিগত অর্থে, অভিনয়ে ও পরিবেশনায় (শ্রীমতী পিক-চার্স) যে ছবিটি এখন নির্মাণাধীন রয়েছে সে ছবির নাম গুন্ডা। গুন্ডার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন আলমগীর কুমকুম। ছবির সঙ্গীত-পরিচালক আলম খান চিত্র-গ্রাহক আবদুল লতিফ বাচ্চু।

কবরী ছায়াছবি নিবেদিত গুন্ডা ছবিতে অভিনয় করবেন যথাক্রমে রাজ্জাক কবরী খলিল সুমিতা আশীষ রবিউল ফরিদ আলী ও লুৎফর প্রমুখ

উল্লেখ্য গুন্ডা ছবির নায়ক রাজ্জাকের নিজস্ব প্রযত্নে (রাজলক্ষ্মী প্রোডাকসন্স) এ ছবি দ্রুত সমাপ্তির পথে রয়েছে।

সীমারেখা : মামুন ফিল্মস-এর একটি ছবি। এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালক মনসুর আহমেদ।

নুরুল-হক বাচ্চু বহুদিন পর অর্থাৎ স্বাধীনতার পর এই প্রথম একটি ছবি পরিচালনা করছেন। ছবির নাম **জীবন-সাথী**।

এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালক সত্য সাহা। চিত্রগ্রাহক খান আরিফুর রহমান। ছবির গীত ও সংলাপ লিখেছেন গাজী মাজহারুল আনোয়ার।

জীবন সাথীতে যে সব শিল্পী অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন, তাঁরা হলেন যথা-ক্রমে শাবানা ওয়াসীম আলতাফ মাজদীন শাকিলা মঞ্জু দত্ত শর্বরী মায়া হাজারিকা খান জয়নুল প্রমুখ। ছবিটি রূপসা পিকচার্স প্রযোজিত ও পরিবেশিত।

আজিম ঢাকার জেল থেকে সম্প্রতি বেশ নগদ দুটো পয়সা আয় করেছেন। অবশ্যই

সেটা সম্পূর্ণ আজিমের কৃতিত্ব নয় বরং বোম্বের ছবি 'বেনারসী বাবু'রই কৃপায়। এখন আজিম 'প্রতিনিধি' বানাচ্ছেন। অবশ্য এখনও জানা যায়নি, আজিমের প্রতিনিধি ঢাকায় কার মানে কোন বিদেশী ছবির প্রতি-নিধিত্ব করছে।

আজিম দাবী করেছেন তার এ ছবি হবে বাংলাদেশের প্রথম রঙীন ছবি। কিন্তু আজিম হয়ত ভুলে বসে আছেন নিখোঁজ পরিচালক জহীর রায়হান দীর্ঘদিন আগেই রঙীন ছবি 'সংগম' তৈরী করেছেন। অতএব আজিমের পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত 'বাংলাদেশের প্রথম রঙীন ছবি'র দাবী হাস্যকর।

যাই হোক আজিমের এ ছবিতে অভি-নয়ে অংশ নিচ্ছেন আজিমের অভিনেত্রী-স্ত্রী নায়িকা সুজাতা রাজ্জাক রোজী খলিল জসীম নারায়ণ চক্রবর্তী, চিত্রগ্রহণে আছেন রেজা লতিফ। সংগীতে সত্য সাহা।

অমর প্রেম : সুজনী কথা চিত্রের ছবি। পরিচালক ইমদাদ আলি। অভিনয়ে আছেন রাজ্জাক ও শাবানা। সংগীত পরিচালক সত্য সাহা।

নূর-উল-আলম **চলো ঘর বাঁধি** তৈরী করছেন। কবরী মেহফুজ শওকত আকবর ...বনী মীনু রহমান প্রমুখ এ ছবির শিল্পী।

আলমগীর কুমকুম **মমতা** তৈরী করছেন। ছবির সংগীত পরিচালক সত্য সাহা। অভি-নয় করছেন কবরী আলমগীর মোস্তফা প্রমুখ।

রক্তের ডাক তৈরী করছেন এইচ আকবর। কবরী প্রবীর মিত্র শওকত আকবর সুমিতা প্রমুখ এ ছবির শিল্পী।

ইবনে মিজানের আরো একটি ছবি (জিঘাংসা ছাড়া) রাজকুমার। ছবির নায়ক নায়িকা ওয়াসীম ও শাবানা। সঙ্গীত মনসুর আহমেদ।

কালীদাসও পরিচালক হলেন। তার ছবি '**জানোয়ার**'। জানোয়ারে যারা রয়েছেন : ওয়াসীম সুচরিতা মিনু রহমান প্রমুখ।

রুমী কিসমু পরিচালিত ছবি **আঁধার পেরিয়ে**। এ ছবির সংগীত পরিচালক আলম খান। অভিনয়ে রয়েছেন শাবানা রাজ্জাক ফারুক সুচরিতা খলিল প্রমুখ।

শিবলী সাদিক ...'**জীবন নিয়ে জুয়া**' খেলছেন। আবদুল্লাহ - আল - মামুন সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখেছেন। আবদুল লতিফ বাচ্চু ক্যামেরা চালাচ্ছেন এবং ববিতাকে নিয়ে 'বুলবুল আহমদ' জুয়ার প্রধান অংশীদার হচ্ছেন।

আরো যারা জীবন নিয়ে জুয়া খেলছেন তারা হলেন যথাক্রমে মিনু রহমান খলিল বেবী জামান এহসান নারায়ণ চক্রবর্তী প্রমুখ। ছবির প্রযোজক ও পরিবেশক বনলতা চলচ্চিত্র।

দুর্বৃত্তের পর একটি ছবির নাম। পরি-চালক ফজলুর রহমান রবি। অভিনয়ে আছেন রানী সরকার অনিস প্রমুখ।

পিঞ্জর শাহজাহান চৌধুরী পরিচালিত। উজ্জ্বল কবিতা আনোয়ারা মুস্তফা আনোয়ার হোসেন সুভাষ দত্ত হাসমত টেলী সামাদ রানী সরকার এ ছবিতে অভিনয়ে অংশ নিচ্ছেন। সংগীতে খন্দকার নুরুল আলম।

মীর মোহাম্মদ হালিম পরিচালিত **সন্ধিক্ষণের** শাবানা ও ওয়াসীম এবং খান জয়নুল ও মোস্তফা অভিনয় করছেন।

মোঃ সাঈদ পরিচালিত **সাধু শয়তান**। নায়ক-নায়িকা রাজ্জাক ও শাবানা। অন্যান্য চরিত্রে আছেন মোস্তফা খলিল মঞ্জুশ্রী খান জয়নুল প্রমুখ।

বিরহ—খান আতাউর রহমান পরি-চালিত। বিধায়ক ভট্টাচার্যের কাহিনী অব-লম্বনে চিত্রে আছেন রাজ্জাক কবরী রোজী খান আতা খান জয়নাল প্রমুখ।

বিচার আজিজ মেহের পরিচালিত। ভূমিকালিপিতে আছেন সুচন্দা শাবানা ও জাফর ইকবাল প্রমুখ। সংগীত আনোয়ার পারভেজ।

ম্যাগলার : পরিচালক শেখ আতাউর রহমান। সংগীত পরিচালক খোন্দকার নুরুল আলম। ভূমিকালিপিতে আছেন রাজ্জাক সুচরিতা সবিতা হাসান ইমাম প্রমুখ।

আনন্দ সংবাদ

কলকাতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারত ৮৫ রানে জয়ী হয়েছে।

(বিস্তৃত খবর আগামী সংখ্যায়)

কেন এমন হয় : পরিচালক অমলকুমার বোস। সংগীত পরিচালক কমল দাসগুপ্ত। চিত্রগ্রহণে সিরাজুল ইসলাম। রূপায়ণে ববিতা উজ্জ্বল প্রবীর মিত্র মোস্তফা প্রমুখ।

পরিণতি : পরিচালক এম ইয়াসিন। সংগীত সত্য সাহা। চিত্রগ্রহণে এম এইচ খান। রূপায়ণে ববিতা জাফর ইকবাল প্রবীর মিত্র শওকত আকবর হাসমত অলিপ সুচন্দা প্রমুখ।

বেলা শেষের গান : পরিচালক জীবন চৌধুরী। ববিতা উজ্জ্বল সুচন্দা আনোয়ার রোজী আনোয়ার হোসেন অভিনীত।

নকল মানুষ : হাসমত পরিচালিত। সংগীত সুবল দাস। রূপায়ণে কবিতা খসরু শওকত আকবর হাসান ইমাম আনোয়ারা খলিল হাসমত প্রমুখ।

অনেক দিন আগে : পরিচালক এম কবীর চৌধুরী। ভূমিকায় ফারুক নবাগতা কল্পনা মাতিন প্রমুখ। সঙ্গীত পরিচালক সুবল দাস।

ডাক পিওন : পরিচালক নাজমুল হুদা মিন্টু। সঙ্গীত পরিচালক সুবল দাস। রূপায়ণে রাজ্জাক কবরী খান জয়নুল সুমিতা মেজবাহ দারাশিকো প্রমুখ।

উত্তরণ : পরিচালক ফজলুল হক। ভূমিকালিপিতে আছেন রহমান চিত্রা নাসিমা শবনম আনোয়ারা আনোয়ার প্রমুখ। সংগীতে খান আতাউর রহমান, কাহিনী ওবায়েদ উল হক।

নীড়হারা : পরিচালক বাদল। রূপায়ণে মোস্তফা কবিতা ওয়াসীম ইনাম আহমেদ ফরিদ আলী প্রমুখ।

মা ও মেয়ে : পরিচালনা : গোলাম নবী। রূপায়ণে : আনোয়ারা মিনু রহমান শওকত ওসমান কাসেম প্রমুখ।

শেষ বিকেলের আশায় : পরিচালক সুজন। রূপায়ণে নার্গিস আনোয়ারা কারজানা প্রমুখ।

আলকা বানু : পরিচালনা ফরোজ চৌধুরী। রূপায়ণে শাবানা জাভেদ আফজাল প্রমুখ।

যখন বসন্ত এলো : পরিচালক এম এ শরিফ। বিজ্ঞাপনের ভাষায় 'বাংলাদেশের প্রথম রঙীন ছবি'। অভিনয়ে আছেন ওয়াসীম অলিভিয়া রোজী প্রমুখ।

আলো তুমি আলেয়া : পরিচালক দিলীপ সোম। সংগীত সুবল দাস। ভূমিকা-লিপিতে আছেন রাজ্জাক ববিতা ফতেহ লোহানী ... হাসমত প্রমুখ।

আজিজুর রহমান পরিচালিত **অপরাধ** ছবির সংগীত পরিচালক সত্য সাহা।

বিবিধ সংবাদ

সুলতানা জামানের প্রত্যাবর্তন :

দীর্ঘ দু'বছর স্বেচ্ছা নির্বাসনের পর নায়িকা সুলতানা জামান আবার চিত্রজগতে ফিরে আসছেন বলে খবরে প্রকাশ।

এ-ব্যাপারে সুলতানা জামানের বক্তব্য হলো, 'বিদায় নিতে চাইলেই কি আর বিদায় নেয়া যায়? চিত্রজগতের গন্ডীর বাইরে পুরোপুরি চলে যেতে পারছি না। তাই আবার ফিরে আসতে চাচ্ছি।'

শেষ পর্যন্ত সুভাষ দত্ত :

অভিনেতা-পরিচালক সুভাষ দত্ত বেশ কিছুদিন ধরেই বেকার জীবনযাপন করছেন। আর সম্ভবতঃ তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপে তিনি তার পুরাতন পেশায় অর্থাৎ (ছবি আঁকায়) ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, ছবির জগতে আসার আগে তিনি একজন কমার্শিয়াল শিল্পী হিসেবে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আরো উল্লেখ্য, সুভাষ দত্ত পরিচালিত শেষ ছবিটির নাম 'পালঙ্ক মন'। ছবিটি কিন্তু বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

অলংগা সমাচার

নায়িকা অলিভিয়ার ছোট বোন অলংগা চিত্রজগতে আসছেন। এ-ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য সম্প্রতি জানা গেছে—

'যখন বৃষ্টি এলো' আমার প্রথম ও শেষ ছবি হিসেবে চিহ্নিত হবে।'—বলেছেন অলংগা।

অলংগা আরো বলেছেন, 'নায়িকা হবার ইচ্ছে আমার মোটেও নেই। শুধু দুলাভাই (অলিভিয়ার স্বামী পরিচালক এস এম শফী)-এর একান্ত অনুরোধে মাত্র একটি ছবিতে (যখন বৃষ্টি এলো) অভিনয় করতে রাজী হয়েছি।'

উল্লেখ্য, অলংগা একটি ফার্মে চাকুরী করেন।

জানা গেছে, অল্পদিনের মধ্যেই 'যখন বৃষ্টি এলো'র কাজ শুরু হবে।

—আনওয়ার আহম্মদ

মিনার্ভা থিয়েটারের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের সূচনা

নাটমঞ্চের ইতিহাসে শতবর্ষ অতিক্রান্ত হওয়া যেমন অভূতপূর্ব, তেমনি পরম গৌরবের। মিনার্ভা থিয়েটার সর্বপ্রথম সেই গৌরবের অধিকারী হোল। সমগ্র ভারতবর্ষে আর কোন নাটমঞ্চ এত দীর্ঘকাল ধরে সংস্কৃতির ধারক, বাহক হবার সৌভাগ্য অর্জনে সমর্থ হয়নি অদ্যাবধি।

গত ৩০শে ডিসেম্বর '৭৪ সেই উৎসবের শুভ সূচনা হোল জর্জর দন্ড পূজা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মিনার্ভা থিয়েটার প্রাঙ্গণে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅরুণ মৈত্র এবং উদ্বোধনী ভাষণ দেন বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র।

এছাড়া অনুষ্ঠানে শতবর্ষ উৎসবের সাফল্য কামনা করে ভাষণ দেন রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদীপ ভট্টাচার্য, নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূ দেবী, কালীশ মুখোপাধ্যায়, ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত, ডঃ অজিত ঘোষ এবং আরো কয়েকজন।

মিনার্ভা থিয়েটার কর্মী সংসদের পক্ষ থেকে প্রখ্যাত নট কালী ব্যানার্জী অন্যান্য অতিথিদের সংগে বিগত যুগের দুই খ্যাতনামা অভিনেত্রী রেণুবালা (সুখী) ও সন্তোষকুমারী দেবীকে মাল্যদান করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উৎসব কমিটির সভাপতি শ্রীঅরুণ মৈত্র মিনার্ভা থিয়েটারের বর্তমান পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে ও আসন্ন উৎসবের কর্মসূচী সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রাখেন। কমিটির কার্যবিবরণী পাঠ করেন শ্রীপান্নালাল দাস। ধন্যবাদ দেন অনিমা ব্যানার্জী। উৎসব অনুষ্ঠানে সকলে বক্তাই কোলকাতায় একটি জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ ও সরকারের কাছে সহায়তার জন্য আবেদন জানান। অনুষ্ঠানে শ্রীঅনন্ত ভারতী, তাপস সেন প্রমুখও উপস্থিত ছিলেন।

মূল উৎসব আগামী ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ শুরু হয়ে বলে উদ্যোক্তারা স্থির করেছেন। উক্ত উৎসবের বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর নাটক পরিবেশন ছাড়াও বাংলার নাট্য আন্দোলন নাট্য সাহিত্য নাটকের একাল ও সেকাল সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে কথা আছে।

—সুখী রাজপুত্র—

শিশু রংমহলের (সি এল টি) আমন্ত্রণে সজীব ট্রেনিং কোর, ঢাকুরিয়ার শিশুশিল্পীরা আগামী ১০ জানুয়ারী '৭৫ সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় 'অবন মহলে' অস্কার ওয়াইল্ডের 'হ্যাপী প্রিন্স' অবলম্বনে সমীর ঘোষ রচিত 'সুখী রাজপুত্র' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করবেন। নৃত্য পরিচালনা করবেন তপতী ঘোষাল।

বিচিত্রানুষ্ঠান : স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কলকাতা মেন ব্রাঞ্চ-এর কমার্সিয়াল কারেন্ট একাউন্ট কালচারাল ক্লাব সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ রমা চৌধুরী। পুরস্কার বিতরণের পর মঞ্চস্থ হয় ভোলা দত্তের পরিচালনায় একাঙ্ক নাটক অলীকবাবু। সাধন গুহের পরিচালনায় নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নেন সাধন গুহ ও পলি গুহ। অর্ঘ সেন ও বনানী ঘোষের সংগীত এবং পার্থ ঘোষ ও গৌরী দে-র গ্রন্থনায় রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে।

এছাড়া মান্না দে-র কণ্ঠসংগীত ও জহর রায়ের হাস্যকৌতুক উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

রবীন্দ্র - নজরুল - সুকান্ত সন্ধ্যা : পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লায়ন্স রেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যদের দ্বারা আয়োজিত রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত সন্ধ্যা একটি সুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় গত শনিবার ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ শাখা ভবনে।

অনুষ্ঠানে সাবলীল ভাষায় আলোচনা করেন নির্মালা বসু ও নীরেন সরকার কবিদের জীবনের বিশেষ কয়েকটি দিক নিয়ে।

সংগীত পরিবেশনে বিশেষ উল্লেখ-এর দাবী রাখেন নজরুলগীতিতে গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (শক্তি ঘোষের সুষ্ঠু তবলা সঙ্গত)। অন্যান্যদের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতে পরেশ ভট্টাচার্য, শ্যামলী রায়চৌধুরী, নজরুলগীতিতে রীতা চক্রবর্তী, অতীন চ্যাটার্জি, সুকান্তগীতিতে স্বপন দাস বাঁশীতে স্বপন দে ও তবলা সঙ্গতে সুশান্ত চক্রবর্তী, প্রদীপ রায় ও পীযূষ ব্যানার্জি উল্লেখযোগ্য।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

Regd. No. WB/NC-13 AMRITA Friday 10th January, 1975
Gram : AMRITA Calcutta-700003 Phone 55-5231 (14 lines)

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

১৭ জানুয়ারী ১৯৭৫ ॥ মূল্য ৬০

১৪ বর্ষ

অমৃত

৩৬ সংখ্যা

'ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ন নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য'

Friday, 17th January, 1975 শুক্রবার, ৩ মাঘ, ১৩৮১

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
২২	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		শ্রী দি মো
২৪	যুবক-যুবতী		শ্রীঅমর দাস
২৬	চিঠিপত্র		
২৯	শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে		শ্রীদিলীপকুমার রায়
৩১	অঙ্গনা		শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৩৩	রূপসীর খাতা		শ্রীবরবর্ণিনী
৩৪	রান্না করে দেখুন		শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৩৫	রূপচর্চা		শ্রীস্বপনকুমার ঘোষ
৩৯	শেষ বিচার	(উপন্যাস)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৪৩	পুনশ্চ		শ্রীক্ষপণক
৪৪	বিজ্ঞানের কথা		শ্রীঅয়স্কান্ত
৪৬	ফেরেস্তা	(গল্প)	সৈয়দ ইকবাল
৪৮	সেকালের সঙ্গীতগুণী		শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
৫১	খেলার জগতে মেয়ে		শ্রীঅময়
৫২	নবজন্মের রাণী		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৫৩	গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান		
৫৪	খেলাধুলা		শ্রীদর্শক
৫৬	মাঠের নায়ক		শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৮	বায়োস্কোপিক		শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৬৩	ফ্লোর থেকে বলছি		সংবাদদাতা
৬৫	নাট্যমঞ্চ		নাট্য সমালোচক
৬৭	স্যার চার্লি চ্যাপলিন		
৬৮	চিত্র সমালোচনা		শ্রীচিত্রদূত
৭০	গিরিশযুগের শেষ শিখা নীরদাসুন্দরী		শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
৭১	জলসা		শ্রীচিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ : শ্রীনিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয়

আছে বঞ্চিতের বেদনা

প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আইন সমিতির অধিবেশনে। এই বিশ্বে যারা বঞ্চিত তাদের জন্য আন্তর্জাতিক আইনের পরিধি কতটুকু? যারা দরিদ্র, অভুক্ত, অপুষ্টিজনিত রোগে মুমূর্ষু তাদের জন্য বিশ্বের সচ্ছল, সন্তুষ্ট, ভোগী রাষ্ট্রগুলো কী করছে? এই প্রশ্ন করার সময় আজ এসেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির বৃত্তান্ত সব সময়েই আমাদের শোনানো হচ্ছে। মানুষ চাঁদে যাচ্ছে। তার হাতে তৈরি যন্ত্র দূরে অন্তরীক্ষে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে হয়তো বা এই সৌরমণ্ডল ছেড়ে অনির্দেশ্য অনন্তে পাড়ি জমাচ্ছে। কিন্তু এই পৃথিবীতে মানুষের চরিত্র কি বদল হচ্ছে? এখনো কি এখানে ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলো টাকার জোরে এবং অস্ত্রের জোরে নিজের দাপট দেখাচ্ছে না? আন্তর্জাতিক আইন তো তাদের খুশিমত ব্যবহার করা হয়। ছোট ও গরিব রাষ্ট্রের কথা কে শোনে?

একথা ঠিক যে স্নায়ুযুদ্ধের প্রবলতা এখন কমেছে। কিন্তু তা বলে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়াবার মানসিকতা দূর হয়ে যায়নি। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারব, তাদের মধ্যে কি সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা চলছে। অস্ত্রের পাহাড় তৈরি করে রাখছে তারা। নিত্য নতুন মারণাস্ত্র নির্মিত হচ্ছে এবং একাজে বিজ্ঞানকে রাষ্ট্রনায়কদের দাসবৃত্তি করতে বাধ্য করা হচ্ছে। নতুন এলাকায় সামরিক চাপ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। আমাদের প্রতিবেশী এলাকায় তা আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গেই লক্ষ্য করছি। এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তির জন্য যত চেষ্টাই আমরা করি না কেন, শক্তিমান রাষ্ট্রগুলোর মনোমত না হলে তা করতে তারা দেবে না। আজকের দুনিয়ায় বিপদ হল এই ক্ষমতাবান এবং অঢেল বিত্তের অধিকারী এই রাষ্ট্রগুলোর অপরিসীম লোভ এবং মাতব্বরি দেখাবার প্রবণতা। আন্তর্জাতিক আইন তারাই নিজেদের খুশিমত পরিবর্তন করে, অন্যদের তা মানতে বাধ্য করে। যদি সত্যি সত্যিই সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব মনেপ্রাণে তারা মেনে নিত, তাহলে আজ রাষ্ট্রসংঘের এই অথর্ব অবস্থা হত না। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো স্বাধীন হয়ে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে নিজেদের বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতে শুরু করায় পশ্চিমের বড়লোক ও ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলোর মন রাষ্ট্রসংঘের ওপর বিরূপ হয়ে উঠেছে। আমেরিকা তো স্পষ্টই বলে দিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ মারফত কোনো দেশকে সাহায্য দিতে সে নারাজ। যদি দিতে হয় সে নিজে বাছাই করে দেবে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে। এ হল ক্ষমতাবানের দম্ভ। আন্তর্জাতিক চিন্তা মানসিকতা থেকে তা অনেক দূরে। পুরনো কালে অত্যাচারী জমিদাররা প্রজাদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলোর হাবভাবও সে রকম। পৃথিবীর বিপদ তারাই ডেকে আনে। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যুদ্ধ বাধাতেও দ্বিধা করে না তারা। এই শতাব্দীতে দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছে এ কারণেই। এখানে ওখানে আঞ্চলিক যুদ্ধের পিছনেও একই ষড়যন্ত্র।

গরীব ও বঞ্চিত দেশগুলোর বেদনা তাই অসঙ্গত নয়। যাদের স্বাধীনতা ছিল না, নিজের দেশের সম্পদের ওপর ছিল না অধিকার, তারা আজ একে একে স্বাধীনতা লাভ করছে। তারা নিজেদের স্বাধীনতাকে সযত্নে ও সগৌরবে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, ব্যাধির বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে পৃথিবীর সুখী ও সমৃদ্ধ দেশগুলোর নিঃশর্ত সহায়তা কি তারা প্রত্যাশা করতে পারে না? এদের বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ ছিল ঔপনিবেশিক শাসন। সেই শাসন অপসারিত হলেও অর্থনৈতিক পরবশ্যতার জালে তাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধেই প্রধানমন্ত্রী গান্ধী প্রতিবাদ জানিয়েছেন। পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক চিন্তাধারার ন্যায্যতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে প্রতিটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের নিরঙ্কুশ স্বীকৃতি চাই। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে চাই সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা এবং সংঘর্ষ-হীন পৃথিবী প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি।

বকাসুর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নাম দেখে ভড়কাবার কিছু নেই। পৌরাণিক কি আজগুবী ভুতুড়ে গল্প নয়। গল্প একটি ঘড়ির এবং ত্রিকোণ একটি প্রেমের নাটকে তার সামান্য একটু ভূমিকার।

ঘড়িটা এখনো আছে। বাদামতলার আগেকার সেই ঘড়িটা।

বাদামতলার নাম অবশ্য পালটেছে। যে রাস্তা দুটো সেখানে এসে মিলেছে তাদেরও নাম আর চেহারা। শুধু ঘড়িটাই সেই ভুলে-যাওয়া সেকালের সাক্ষী হয়ে এখনো নাজিরবাড়ির দেয়ালের কোণ থেকে দুদিকের দুই মুখের কাঁটা নেড়ে চলেছে। ঘড়িটার দিকে কেউ কি এখন চেয়ে দেখে? যে মানুষের স্রোত এখন সেখান দিয়ে বয়ে যায় তাদের সময়ই নেই বোধহয় ও ঘড়িতে সময় দেখবার। সারা দিন সেখানে ত মানুষ আর যানবাহনের অস্থির ঘূর্ণি পাক খাচ্ছে।

রাস্তা দুটোর নামই ত শুধু নয় চেহারা চরিত্র একেবারে আলাদা হয়ে গেছে। নাম ছিল যার গোয়ালপাড়া রোড গোছের কিছু, রাজনীতির ওলট-পালটের পালায় এক অঙ্কের এক মন্ত্রীর জমকালো নামে সে এখন সম্ভ্রান্ত। তার বুকে এখন ট্রাম লাইন পাতা। আর পাঁচু দর্জির গলি এখন শুধু সভ্যভব্য নামই নেয় নি বহরেও রীতিমত বেড়ে গলি থেকে সদর রাস্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখান দিয়ে পায়ে হেঁটে বা গাড়িতে যারা এখন আসে-যায় তাদের সবারই প্রায় হাতে হাতঘড়ি আছে। মোড়ের বকাসুরকে দেখে নিজেদের ঘড়ি মিলিয়ে নেবার তাদের দরকার হয় না।

বকাসুর নামটাই তাদের কারুর জানা আছে কিনা সন্দেহ। ঘড়ির নাম বকাসুর একেবারে নেহাৎ আজগুবি অর্থহীন কিন্তু নয়। সে যুগে ও নামটা একেবারে অকারণে চালু হয় নি।

বাড়ি বদলে ও তামাটে একটি দাড়িই তখন নাম করবার মত। বেশীর ভাগ

খাপরার আর টিনের চাল কি বড় জোর একতলা দুখিনী চেহারায় নোনাধরা পাকা বাড়ির জটলার মধ্যে নাজিরবাড়িই দু রাস্তার জোড়ের মুখে চারতলা বাহারে মাথা তুলে থাকত দাঁড়িয়ে। সেই বাড়ির রাস্তার দিকের দুই ধারের কোণ থেকে যে দেয়াল-ঘড়িটা মুখ বাড়িয়ে থাকত সামনের দিকের একটু কারিকুরির জন্যে, ধারালো দুটো ঠোঁট সমেত সেটাকে সবশুদ্ধ বিকট একটা পাখির মাথার মত দেখাত। ঘড়ির দু দিকের দুটো ডালা যেন সেই বিদঘুটে মাথার দুই চোখ।

বকাসুর নামটা ওই থেকেই কারুর মাথায় এসেছিল নিশ্চয়। তারপর কিছুদিন চলেছিল মুখে মুখে।

সামনের ঠোঁটের দিকটা ভেঙে যাওয়ার দরুণ এখন অবশ্য ঘড়ির চেহারাটাই বদলে গেছে।। বকাসুর নামটাই খাপ খায় না। কাউকে নামটা বললে তাই তার সঙ্গে ইতিহাসটাও বলে বোঝাতে হয়।

অমরকে অবশ্য ইতিহাস বলতে হয় নি।

নামটা বলবার পর কয়েক সেকেন্ড মাত্র ভুরু কুঁচকে বিমূঢ় হয়ে থেকে নিভা গম্ভীরভাবেই বলেছিল, নাজিরবাড়ির ঘড়িটার কথা বলছ ঃ ঠিক ওর তলায় দাঁড়াবো ? ঠিক দুটোর সময় ?

হ্যাঁ ঠিক দুটোর সময়। অস্থিরতাটা চাপবার চেষ্টা সত্ত্বেও গলাটা একটু কেঁপেছিল অমরের—দেরী করো না লক্ষ্মীটি। দুটো বাজবার পর বড় জোর আর পাঁচ মিনিটের বেশী অপেক্ষা করবার আমার উপায় নেই। ওর মধ্যে যদি না এসো...

অমর ওইটুকু বলেই থেমেছিল।

তাহলে আর দেখা হবে না। —অমরের থেমে যাওয়া কথাটা পূরণ করেছিল নিভা। তারপর যেন মুখস্থ পড়ার মত বলেছিল, ঠিক দুটো থেকে দুটো বেজে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত নাজিরবাড়ির ঘড়িটার তলায়। তার আগে গিয়েও লাভ নেই, তার পরেও না।

কাকে ফোন করছ? —দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে প্যাকেটটা খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করেছিল রমানাথ।

কাকে বুঝতে পারছ না? —ফোনটা কানে ধরে রেখেই বলেছিল নিভা।

তা পেরেছি। —জ্যাকেটটা হ্যাঙ্গারে টাঙিয়ে টাইটা আলগা করতে করতে বলেছিল রমানাথ,—তবে আমায় দেখে ফোনটা নামিয়ে রাখবে ভেবেছিলাম।

নামাতে চাইলে তোমায় দেখার আগেই ত পারতাম। একটু হেসে বলেছিল নিভা,—রাস্তায় তোমার গাড়ি থামা, বাইরের দরজায় তোমার ঢোকা এসব আওয়াজই ত পেয়েছি।

পেয়েও লুকোচুরির চেষ্টা করো নি। বাঃ চমৎকার চমৎকার! একটা সোফায় বসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বলেছিল রমানাথ।—কিন্তু অমরের তোমার মত সৎসাহস নেই কেন বলো ত? সে ত অনায়াসে যখন ইচ্ছে এখানেই আসতে পারে। আমি ত মানা করি নি।

তা করো নি। নিভা এবার ফোনটা নামিয়ে রেখে রমানাথের কাছের সোফাটাতেই গিয়ে বসে বলেছিল। কিন্তু তোমার এ উদারতাটা সে বিশ্বাস করে না মনে হচ্ছে, মানেটাও বুঝতে পারে না বোধহয়!

মানেটাও বুঝতে পারে না! জুতোর পর মোজা জোড়াও খুলতে খুলতে বলেছিল রমানাথ,—না বোঝবার ত কিছু নেই। আমাদের জটটা ছাড়াবার জন্যে আমি সোজা তাকে তোমার সঙ্গে প্রেম করবার সুযোগ দিচ্ছি।

তাতেই জট ছাড়বে? —নিভার গলাটা একটু যেন তীক্ষ্ম শুনিয়েছিল।

অমরের সাহস থাকলেই ছাড়বে।—মোজা দুটো জুতোর মধ্যে রেখে সোফার পাশেই রাখা স্লীপার দুটোয় পা গলাতে-গলাতে বলেছিল রমানাথ,—অমরের সাহসই নেই বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। থাকলে এতদিনে তোমায় নিয়ে তার পালাবার চেষ্টা করা উচিত ছিল না?

এবার উঠে দাঁড়িয়ে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে রমানাথ আবার বলেছিল,—শুধু ফোনে গুজ গুজ করে কি হবে? এখনো ত সে তোমায় নিয়ে পালাতে পারে।

তাই এবার পালাবে! গলার স্বর চেষ্টা করেও নিভা আর হাল্কা রাখতে পারে নি,—কিন্তু আমার কাছ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে এত প্যাঁচালো প্ল্যানের কি দরকার আছে! সোজা আমায় ডাইভোর্স করলেই ত পারো। যা আমার বিরুদ্ধে বলবে আমি তার কোনোটায় প্রতিবাদ করব না।

ভুল! ভুল! নিভা এখনো তোমার ভুল ভাঙল না। —বাথরুমের দরজায় ফিরে দাঁড়িয়ে যেন করুণাভরে বলেছিল রমানাথ,—তোমায় কেন পালাতে দিতে চাই এখনো তুমি বুঝলে না? পালাতে দিতে চাই, গিয়েও তোমায় ফিরে আসতে হবে বলে। আমি জানি অমরের কবিতার প্রেমের ফাঁকি গদ্যে ফেললেই ধরা পড়ে যাবে।

তাই যদি যায়,—নিভার গলার স্বর এবার স্পষ্ট একটু কৌতুকের—তাহলে আমি তোমার কাছেই ফিরে আসব মনে করো!

কেন আসবে না!—রমানাথও এবার হেসেছিল—তাই আসাই ত স্বাভাবিক সংগত আর মধুর।

হ্যাঁ তোমার কাছে মধুরে নিশ্চয়,—নিভার গলায় এখনো তিক্ততা যেন নেই,—হার-মানা এক হতভাগীকে সারা জীবন ঘৃণা আর দয়া করবার সুবিধের জন্যে।

না না নিভা! ও ত নেহাৎ সস্তা নীচ নাটকে মনের কথা ভাবছ। ফিরে এলে আমার কাছে তুমি হারানো দুর্লভের দাম নিয়ে আসবে। — একটু থেমে গলায় যেন ঠাট্টার সুর মিশিয়ে রমানাথ বলেছিল,—আমাকেও নতুন চোখে দেখতে পাবে হয়ত।

তা পাবার আশা নেই কারণ ফিরে আমি আসব না।—বলে ড্র[illegible]র থেকে নিভা বেরিয়ে গিয়েছিল।

* * *

ফিরেই কিন্তু এসেছিল নিভা।

না, সময় সম্বন্ধে কোনো ভুল-ত্রুটির জন্যে নয়। প্রায় কাঁটায় কাঁটায় দুটো বেজে এক মিনিট হতে না হতে পাঁচু দর্জির গলি দিয়ে হেঁটেই এসে বকাসুরের নীচে দুটো পাঁচ নয়, তার পরও দুটো দশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল নিভা। ফিরে গিয়েছিল অমরের দেখা না পেয়ে।

অমর কি তাহলে আসেই নি!

না, সেও ঠিকই এসেছিল গোয়ালাপাড়ার দিক থেকে ট্যাক্সিতে। দুটো থেকে দুটো পাঁচ পর্যন্ত ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে চলে গিয়েছিল তারপর।

কি মীমাংসা এ রহস্যের?

মীমাংসা অসম্ভব অলৌকিক কিছু নয়।

বকাসুরের দু দিকের ছোট-বড় কাঁটার নির্দেশে প্রায় আট মিনিটের তফাৎ। ডানদিকের ডালায় যখন দুটো, বাঁদিকে তখন দুটো বেজে আট।

কবিতার প্রেমের মানুষ অমর গদ্যের এ সত্যটুকু জানত কি না সেইটেই আসল রহস্য।

রোজ নামচা

ফাদার দ্যতিয়েন

বাংলাদেশ ঘুরে এলাম। হ্যাঁ, ওদেরই বাংলাদেশ, বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলা। সোনার বাংলা। সোনার বলতে জিনিসের দাম : কমলালেবু দশ টাকা হালি; আপেল, কিশমিশ, আঙুরের দর যথাক্রমে বত্রিশ, সত্তর আর একশো টাকা সের (কেজি ওরা বোঝে না); দাম শুনলেই খিদে মিটে যায়...। তবে আছে কলা, মুন্সিগঞ্জের লম্বা মোটা কলা : স্বাদও ভালো, গন্ধও বেশ।

বাংলাদেশে তাহলে পা দিলাম, চব্বিশ বছরের এক স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে। সহজ হয় নি। শিয়ালদার গার্ড বলেছিল, বনগাঁ-র ট্রেন ছাড়বে না, তামার চোর নাকি দত্তপুকুরে কোথাও লাইনের তার কেটে দিয়েছে...আর হ্যাঁ বাসও অচল : চালকেরা কি-যেন লাভের আশায় ধর্মঘট করে বসেছে।

ট্রেন তবু ছাড়ল—সুদীর্ঘ দেরিতে। সঙ্গে সঙ্গে উঠল লেনদেনকারীর ফৌজ-বাহিনী : আপ ট্রেনে একশো সত্তর টাকা দিয়ে একশো রুপেয়া কিনে ওরা আবার ডাউন ট্রেনে একশো টাকা খরিদ করবে পঞ্চাশ রুপেয়ার দামে। টাকায়—সত্যই—টাকা আনে।

বঙ্গীয়েরা দাবি করে, ওদের—বিদেশে মুদ্রিত—একশো, দশ, পাঁচ আর এক টাকার নোট ভারতীয় নোটের চেয়ে অনে—ক সুন্দর।...তা হবে হয়তো!

না, আর যা-ই ভোগান্তি হোক না কেন তৈলসংকটে ভুগতে হয় নি : বনগাঁ-র স্টেশন থেকে বর্ডার-অভিমুখী একমাত্র যান : সাইকেল-রিকসা। ভাড়া : ছ-টাকা, ইউনিয়নের নাকি নির্ধারিত দাম। চালক তবু নালিশ করে : 'জানেন সাহেব, আপনারা ছিলেন যখন, ভালোই ছিল!... আহা! আমরা কোন্ জন্মে ছিলাম, বল তোমাদের ধনধান্যপুষ্পে ভরা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিতে?

...এখানে, ঐ ক্ষেতের ওপারে বহুদিনের অব্যবহারে মরচে-ধরা রেললাইনের ধারে ছিল উদ্বাস্তুর শিবির। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তথাকথিত উন্নতিশীল ভারত কত হাজার বাস্তুহারার তত্ত্বাবধান করেছিল—সারা দুনিয়াকে আশ্চর্য করে। এখনও কানে বাজে সেই ফরাসি সাংবাদিকের প্রশংসাপূর্ণ মন্তব্য : 'লিমা-র ভূমিকম্পে বিদেশাগত সাহায্যের যে অপচয় দেখেছি এখানে তার দশভাগের একভাগও দেখি নি!'

বর্ডার পার হওয়ার টেকনিক সহজ, যদিও জটিল (হ্যাঁ, জটিল আর কঠিন এক নয়!) আর সময়সাপেক্ষ : এক থামুন, পাসপোর্ট দেখান চলুন; দুই, থামুন, পাসপোর্টে ছাপ মারতে দিন, চলুন; তিন থামুন, মাল খুলে দেখান (আর ঐ তিনটি পাটের শাড়ির কৈফিয়ৎ দিতে ভুলবেন না যেন : 'মায়ের জন্য একটা, বোনের জন্য একটা, বৌদির জন্য একটা!' আইনী জবানিতে কথা বলবেন না, হৃদয়ের ভাষায় বলুন : কাস্টমসের লোকগুলিও মানুষ, মা-বোন-বৌদি ওদেরও আছে।) তারপর বোঁচকা বন্ধ করে চলুন : আপনি ভারত ছেড়েছেন বটে, শুধু বাংলাদেশে পৌঁছানো বাকি। টেকনিক এবার উল্টো : মাল খুলে দেখান, ছাপ মারতে দিন পাসপোর্ট দেখান।.....নিরপেক্ষ বিচারে স্বীকার করতে আমি বাধ্য হই : ভারতীয় ছাপের চেয়ে বঙ্গীয় ছাপ অনেক বেশি স্পষ্ট অনেক বেশি নতুনও বটে : ওর বয়স মাত্র দু বছর। ছাপ ওরা একবারই মারবে; পাসপোর্ট ও মাল কিন্তু, সীমার অতিক্রম করার আগেই দেখবেন চার চারবার ওরা চেক করেছে।

বাংলাদেশে আমার এই প্রথম ভ্রমণ বটে; তবে একদিন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে, এই বর্ডারেই আমি পার হয়েছিলাম, ভারতীয় অফিসারের সস্মিত নীরব সম্মতিতে...যুদ্ধগ্রস্ত সেই বীরদেশে পদার্পণের আনন্দের লোভে—আর একটা ফুল তুলতে...আমার এক আরোগ্যাতীত পঞ্চদশবর্ষীয়া প্রতিবেশিনী বান্ধবীর জন্য পুষ্পোপহার; সে তো নিজে গিয়ে দৈশিক আদিবাসের স্বাধীনতার সৌরভ আঘ্রাণ করতে পারবে না।......ফুলটা ছিল একটা

কলাফুল আর মেয়েটির নাম ছায়া ছায়ারাণী।

বর্ডারের ওপারেও (বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত) রিকসাওয়ালাদের একচেটে কারবার। মজা কিন্তু এই যে, রিকসা না চাপলেও চলবে! ট্যাকসিতেই চাপুন, তবে কিনা রিকসাওয়ালার ট্যাকসোটা আগে মিটিয়ে নিয়ে!...রূপসী ট্যাকসি, বিদেশিনী ওরকম জমকালো গাড়ি রাজ্যপাল ভবনের বাইরে আর দেখেছেন কটি? কোথায় আমাদের অ্যাম্বাসাডার, আমাদের ফিয়াট আমাদের স্ট্যান্ডার্ড?...শ্রমশিল্পে যে-দেশ যত কম উন্নত, তত বেশি উৎকৃষ্ট—আমদানি করা বলেই—তার যাবতীয় সামগ্রী।

আমার ডান পাশে ড্রাইভার মিয়া (অঘনশ্মশ্রুমণ্ডিত তার থুতনী মস্তকা-বরণে আচ্ছাদিত তার কেশ!) আর বাঁ পাশে আরেক যাত্রী—সেই যিনি মায়ের জন্য, বোনের জন্য, বৌদির জন্য পাটের সাড়ি নিয়ে চলেছেন। রাস্তার দুধারে সারিবন্দী বনস্পতির ছায়ায় সরিষাক্ষেত্রের পীতবর্ণ পুষ্পের বাহার। বাঁ পাশের লোকটি বললেন 'শিরীষ গাছ!' পিছন থেকে নিঃসংকোচ নারীকণ্ঠ সংশোধন করে বলল, 'শিশু!' অর্থাৎ শিংসপা। তা-ই হবে। মেয়েটি কলেজের ছাত্রী, বিজ্ঞানের ছাত্রী বাবার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে সপ্তাহব্যাপী তীর্থ সেরে ফিরছে; মৃণালিনী তার নাম। দেখেছে কালীঘাট ও চিড়িয়াখানা, বেলুড় ও যাদুঘর...দেখেনি 'অশনি-সংকেত'; ববিতাই নায়িকা জানলে দেখতে ভুলত না।

'এবার দেবদারু...' দেবদারুর প্রতি আমার কৌতূহল আছে : বাইবেলের অনুবাদে লেবাননের 'সিডার-কে' আমি দেবদারু বলেছি উদ্ভিদবিদ্যাগত কারণে নয়, শব্দার্থসংগত কারণে : বৃহৎ বৃক্ষের উল্লেখ করতে হলে হিব্রুরা বলত 'ঈশ্বরের বৃক্ষ'।

যশোরের ফাতিমা-হাসপাতাল সকলেই জানে, ড্রাইভার মিয়া ভুল করল না। ঐ ফাতিমা কিন্তু হজরত আলির ভার্যা খাদীজা-সুতার নাম নয়; ফাতিমা হল পর্তুগালস্থিত এক তীর্থস্থান যেখানে নাকি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টজননী তিনজন নাবালক রাখালকে দর্শন দিয়ে-ছিলেন।

দু সপ্তাহ আগে প্রেরিত আমার চিঠি ওরা পায় নি : কলকাতার দূতাবাসে তাঁরা তবে এপারের সঠিক খবরই দিয়েছিলেন : 'দুদিন লাগতে পারে, আটদিন লাগতে পারে নাও পৌঁছোতে পারে!' কি আর করি? অভুক্ত অবস্থায় বাংলাদেশ-বিমানের অফিস অভিমুখে পা বাড়ালাম। মিথ্যা কথা বলব না : পেট চনচন করছিল! মনে হচ্ছিল, প্রতিটি বাড়ি থেকে আসছে গরম গরম পিঁয়াজির গন্ধ (একেই কি বলে 'মিরাজ' মৃগতৃষ্ণিকা, ঘ্রাণভ্রম...'): লোভ হচ্ছিল, যে-কোনো গেরস্তের দৌলতখানায়—অখণ্ড বঙ্গের চিরন্তনী প্রথামতো—প্রবেশ করে বলি : 'মাসিমা (অর্থাৎ কিনা খালা-আম্মা) খাব!'

কোনো দরকার পড়ল না : ফাতিমা হাসপাতাল থেকে আসছি যখন, আমি অবশ্যই ব্রাদার বুকারির কুটুম...আর কিছু বলতে হল না : এয়ার অফিসেই এল ওমলেট, এল টোস্ট এল ত [illegible] ও অকৃত্রিম আদর : ব্রাদার [illegible] কে কিংবা ওঁর দূরতম সম্পর্কের কু[illegible] ক খাওয়ানোর মধ্যেই যে অনেক অনেক সোয়াব আছে। ব্রাদার দেবতুল্য মানুষ (মানে ফেরেস্তাতুল্য জীব!), কত মুমিনের কত বাচ্চা ভূমিষ্ঠ করেছেন তিনি কত অসুস্থকে সুস্থ করে তুলেছেন, একমাত্র আল্লাতালা তাঁর উচ্চতম জান্নাতে তার ইয়ত্তা রাখেন।

দেওয়ালের সঙ্গে কব্জির টাইম মেলাতে গিয়ে দেখি : ও মা, আধঘণ্টা স্লো!...ঘানি মিয়া সকৌতুকে বললেন : 'ভারত যা-ই করুক না কেন যতই পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্ভাবন করুক না কেন, এক ক্ষেত্রে কিন্তু চিরকালের মতো সে পিছিয়েই থাকবে : ঐ হারিয়ে-যাওয়া আধঘণ্টা সে কোনো দিনই মেক আপ করতে পারবে না।' তারপর কি যেন ভেবে ইতস্তত করে ঘানি মিয়া জিগ্যেস করলেন : 'আচ্ছা সাহেব একটা প্রশ্ন করব? আপনি কাদের ভালোবাসেন বেশি, হিন্দুদের না মুসল-মানদের?'... প্রশ্নটার জন্য আমি পুরোপুরি অপ্রস্তুত ছিলাম না, উত্তরটিও অজানা ছিল না : 'আচ্ছা ঘানি মিয়া কোনটা ভালো বলুন দেখি : বাপের বাড়ি না শ্বশুরবাড়ি?'

ঘানি মিয়া দুপাটি পান-রঞ্জিত দাঁত দেখিয়ে হেসে বললেন : 'সাহেবের মাথায় ঘিলু আছে!'

(ক্রমশঃ)

পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হলো গত ৩০ জানুয়ারী নয়াদিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এবার নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া গেছে। চিরাচরিত প্রথায় মন্ত্রীদের খুব একটা দেখা যায়নি ডায়াসে। পরিবর্তে অভিনেত্রী (যিনি এখন বিবাহসূত্রে দিল্লী-বাসী) সিমি শুভ মহরত অনুষ্ঠানের অনুকরণে মঞ্চের সামনে রাখা একটি ক্যামেরায় সিঁদুর লাগিয়ে মালা পরিয়ে উদ্বোধন করলেন। সেই সঙ্গে ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ফুটে উঠেছিল সামনের পর্দায়। 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' থেকে শুরু করে 'অঙ্কুর' পর্যন্ত বহু ছবির অংশ বিশেষ বা স্থির চিত্রের মাধ্যমে। এই সুন্দর অনুষ্ঠানটির সাফল্যের পেছনে ছিলেন এন কৃষ্ণস্বামী। (এ পর্যায়ে কিন্তু বাংলার বড়ুয়া সাহেব, ঋত্বিক ঘটক মৃণাল সেন অনুপস্থিত। কেন বুঝলাম না।)

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্যামেরার সামনে আরতি করছেন সিমি

নয়াদিল্লীর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

এর পরেই ডায়াসে এলেন বম্বের প্রবীণ অভিনেতা ডেভিড আব্রাহাম। তিনি একে একে জুরীদের সঙ্গে পরিচয় করালেন দর্শকদের। যাঁদের মধ্যে ছিলেন সত্যজিৎ রায়, অপর্ণা সেন, বার্ট হানস্ট্রন ফ্র্যাঙ্ক কাপরা, শাদি আবদেল সালাম ও-ডাবোকভ, ক্রিস্তফ জানুসি ফ্লোরেন্স ভার্লিন নার্গাস ও সমা প্রমুখ। ভারতীয় শিল্পীদের মঞ্চে ডাকা হলে একে একে সব দল বেঁধে হাজির হন বিনোদ খান্না, বিনোদ মেহরা, শত্রুঘ্ন সিনহা, যোগিতাবলী, জিনত আমান, রেহানা সুলতান, রাধা সালুজা প্রেম নারায়ণ মনোজকুমার, আই এস জোহর, প্রেমনাথ, কামিনী কৌশল, রাজ কাপুর, ঋষি কাপুর ডাব্বু, শিবাজী গনেশন, যমুনা, ববিতা (বাংলাদেশ), কলকাতার উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী (অনিল চ্যাটার্জি সামনেই বসে ছিলেন মঞ্চে উঠলেন না কেন জানি না)। বিদেশীদের মধ্যে এসেছিলেন জিনা লোলোব্রিজিদা, প্রফেসর ব্রোজিল, এ ব্রিস ওয়ক্টার চিকডার, রিনকার্ড হাফ (জার্মানী) গোপ সামতানি, আমির নাদেরি হাসান ঘোবরানি, মাইকেল র‍্যালফ, চার্লস কুপার ডেনিস পাওয়েল, মারী সিটন কনরাড রুকস, করিম সামার, নাতালিয়া বন্দরচুক নিকোলাস পাপাতাভে, করিমা মোখতার প্রমুখ। তারকার উপস্থিতির বিচারে এবারের উৎসব অনেক বেশী গ্ল্যামারাস মনে হতে পারে। কারণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে অশোকা হোটেলে যে নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন ইমপা তাকে এক বিরাট মেলার সঙ্গে তুলনা করা চলে। প্রায় এক হাজার নিমন্ত্রিত ছিলেন সেই রাত্রে। নৈশভোজের সঙ্গে কনভেনশন হলে নৃত্যগীতানুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। আমরা যখন পানাহার সেরে ফিরেছি তখন রাত প্রায় দেড়টা। তখনও জোর চলছে পুরোদমে।

মূল অনুষ্ঠানের সঙ্গে মার্কেটিং বিভাগের কাজও জোর কদমে চলছে দেখলাম। আমাদের কলকাতা থেকে এই বিভাগে দেখাবার জন্য আনা হয়েছে ছ'খানা ছবি। অন্যান্য ভাষায় আছে প্রায় তিরিশ খানা ছবি। বিদেশের একাধিক সংস্থা এই বিভাগে অংশ নিচ্ছেন। ফ্রান্স, পোল্যান্ড, রাশিয়া চেকোশ্লাভাকিয়া প্রভৃতি দেশের বহু প্রতিনিধি এসেছেন এই বিভাগে অংশ নিতে। চারদিকের আবহাওয়া দেখে মনে হচ্ছে এবারের উৎসবে ব্যবসায়ী মনোভাবটাই কাজ করছে বেশী।

•

উৎসব শুরু হবার পাঁচঘণ্টা আগেও ঠিক ছিল না উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমরা কলকাতার সাংবাদিকরা উপস্থিত থাকতে পারবো কিনা। শুধু আমরা নই বিদেশী বহু ডেলিগেটরাও বিকেল পর্যন্ত তাঁদের নিমন্ত্রণপত্র হাতে পাননি! শুনতে পেলাম কেউ কেউ আবার ওয়াকআউট করবেন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

কলকাতার শিল্পী দলের অন্যতম প্রতিনিধি অনিল চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা হতে বললেন 'আমাদের কার্ড নাকি কারা নিয়ে গেছে। এইতো একসপ্তা কার্ড দিয়ে গেল কিছুক্ষণ আগে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য পরিচালক হাসান ইমামের হাতে দেখলাম ফেস্টিভাল ডাইরেকটর জগৎ মুরারীর কার্ডখানা। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিপর্ব থেকে শুরু করে প্রতিটি পদক্ষেপে অব্যবস্থার চূড়ান্ত আর কি! নয়াদিল্লীর পি-আই-বির এমনতরো কর্মকুশলতা এর আগের উৎসবেও দেখা যায়নি। কানাঘুষোয় শুনতে পাচ্ছি এই অব্যবস্থার পেছনেও নাকি স্বার্থান্বেষী কিছু আমলাদের যোগসাজস রয়েছে।

উৎসব সম্পর্কে কিছু লেখার আগে একটা আশ্চর্য ঘটনার কথা বলে নিই। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সাংবাদিকদের জন্য যত বেশী সম্ভব ছবির বিশেষ প্রদর্শনী করার বন্দোবস্ত করা হয়। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব দেখার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেসব সাংবাদিক। উৎসবে কেউ যান তাদের প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য থাকে বিদেশের ছবি দেখা। বিশেষ করে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এটা সম্পূর্ণ সত্য। সারা বছরে ভালো ছবি আমাদের দেশে কটাই বা তৈরী হয়, কটাই বা বিদেশ থেকে আসে। সুতরাং এই ধরণের উৎসব সাংবাদিক ও সমালোচকদের একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয় বিদেশী চলচ্চিত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার।

উৎসবের আগে কলকাতায় উৎসব পরিচালক জগৎ মুরারী বলেছিলেন প্রতিযোগিতা ইনফরমেশন রেট্রোসপেকটিভ ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগে যত ছবি আসবে সাংবাদিকদের সেই সব ছবিগুলো দেখানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। ছবি এসেছেও কম নয়, প্রতিযোগিতা বিভাগে আছে পঁচিশ-খানা ছবি। ইনফরমেশন ও রেট্রোসপেকটিভ বিভাগে অনেক (পঞ্চাশের বেশী)। ছবির মধ্যে আছে রেড সাম (হাঙ্গেরী), আমার-কর্ড (ইতালী), এলভিরা মেডিগান, সুইডিশ লাভ স্টোরি, হ্যান্ডফুল অফ লাভ অফিস পার্টি, দি ম্যান হু গেভ আপ স্মোকিং (সবগুলিই সুইডেনের), হায়ারলিং (ইউ-কে), চ্যাপলিনের নখানা ছবি গড ফাদার, মার্ডার ইন সেন্ট একসপ্রেস (ইউ এস এ) ডায়রী অফ এ সিনকুজ, থিফ. ক্লক ওয়ার্ক অরেঞ্জ (ইউ এস এ) ইত্যাদির মত কিছু বিখ্যাত বহু আলোচিত ছবি। মজার এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এইসব ছবি-গুলো আগত সাংবাদিকদের দেখাবার কোনো বন্দোবস্ত হয়নি। সাংবাদিকরা শুধুমাত্র প্রতিযোগিতার ছবিগুলোই দেখতে পাবেন এটাই সিদ্ধান্ত। বহু বাকবিতণ্ডা অনুরোধ-উপরোধের পর মাঝে মধ্যে দু-একটা ছবি

বার্ট হানস্ট্রার সাংবাদিক সম্মেলন উৎসব পরিচালক জগৎ মুরারী ও বার্ট হানস্ট্রা

দেখাবার বন্দোবস্ত যদি কৃপা করে করেন তাহলে হয়তো বা সুযোগ হবে কিছু ছবি দেখার। নইলে প্রতিযোগিতার চব্বিশখানা ছবিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

দিল্লীর আর্টটি পাবলিক থিয়েটারে উৎসবের বিভিন্ন ছবি দেখানোর বন্দোবস্ত হয়েছে। উৎসবের মূল কেন্দ্র বিজ্ঞান ভবন। মাভলংকার হলের প্রদর্শনীর অনেকটাই ফিল্ম সোসাইটি সদস্যদের জন্য নির্ধারিত। অথচ এই দুটি হলের জন্যও সাধারণের কাছে টিকিট বিক্রি করা হয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিজ্ঞান ভবনে দেখানো হচ্ছে ইনফরমেশন বিভাগের ছবিগুলো। এই প্রদর্শনীতে যাবার প্রবেশাধিকারও সাংবাদিকদের নেই। প্রতিযোগিতার ছবিগুলো দেখার জন্য সকাল নটা ও এগারটায় বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সারাটা দিন তাই প্রায় নিষ্কর্মার মতো বসে থাকা। অথচ কলকাতা থেকে প্রায় হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে দিল্লী এসেছিলাম ভালো কিছু ছবি দেখার জন্য।

সাতাশ তারিখ বিকালে পৌঁছেই একজন বন্ধুর কাছে যখন শুনলাম সাংবাদিকদের প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোনো বিভাগের ছবি দেখানো হবে না তখন এই প্রায় হাজার মাইল দৌড়ে আসা কেন—এমন প্রশ্ন এসেছিল মনে। আজ দুদিনে চারখানা ছবি দেখেছি। কোনোটাই তেমন ভালো লাগেনি। তবে সুইডেনের 'দি ম্যান হু গেভ আপস্মোকিং (টোগ ড্যানিয়েলশন) ও বেলজিয়ামের 'উইল অফ দি উইসপ' (ফ্রান্স বায়েন্স) ছবি দুটোতে বক্তব্য ও প্রকাশ ভঙ্গিমায় কিছু নতুনত্বের ছাপ পাওয়া যায়। প্রথম ছবিটি কমেডি ধাঁচে গড়া।

ছোটবেলা থেকেই বাবা ছেলেকে সিগারেট খাওয়া শিখিয়েছে নিজের হাতে। অথচ সেই মৃত্যুর সময় ছেলেকে বিশাল সম্পত্তি দেবার সময় উইল করে যায় যে চোদ্দ দিনের মধ্যে যদি ছেলে ধূমপান বন্ধ করতে না পারে তাহলে সে সম্পত্তি পাবে না। ছেলে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলে। সিগারেটের নেশার বদলে মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করতে চায় বা অন্যকিছু, কিন্তু কিছুতেই সিগারেট সে ছাড়তে পারে না। নিজের পেছনেই নিজে গোয়েন্দা লাগিয়ে দেয় এক সময়। শেষ মুহূর্তে সে সক্ষম হয় নেশা ছাড়তে। কিন্তু লোভী কাকা ভাইপোকে আবার সিগারেট খাওয়াবার জন্য নানা মতলব আঁটতে শুরু করে। কিন্তু সফল হন না তিনি। নায়কের পাশে তখন প্রেমিকাও হাজির। নাড়ে কলোনীতে প্রেমের নেশায় তখন তারা মশগুল।

সরস ভঙ্গিতে পরিচালক ঘটনা ও দৃশ্যবিন্যাস করেছেন। কৌতুকের মেজাজ সারা ছবি জুড়ে। তবে নগ্ন দৃশ্যের আধিক্য চোখে লাগে। এবং বেশ কিছু দৃশ্য অতি সহজেই বাদ দেওয়া যেতো। অভিনয়ে প্রধান শিল্পী গুনার স্ভিনসন দারুন কাজ করেছেন।

বেলজিয়ামের 'উইল অফ দি উইসপ'-য়েও নগ্নদৃশ্যের বাড়াবাড়ি কম নেই। বেশীর ভাগই অহেতুক। নায়িকা ইভা কাস্তকে একটিবারও সম্পূর্ণ পোশাক পড়া অবস্থায় দেখা গেল না। ছবির এই দিকটা বাদ দিলে এ ছবিটাকে ভালো লাগে প্রয়োগ কৌশলের আধুনিকতায়। দ্রুত কাটিং, বর্তমান-অতীতের ইন্টারলেগ কল্পনা আর বাস্তবের গরমিল সুন্দরভাবে বলেছেন পরিচালক বায়েন্স। তিনজন আফগান নাবিক আন্টোয়ার্প বন্দরে নেমে একটি মেয়ের খোঁজ করে, যার সঙ্গে একদিন তারা মিলিত হয়েছিল। সারা শহর জুড়ে অপর একজন ভদ্রলোকের সহায়তায় সেই মেয়েটিকে খোঁজার কাহিনীই ছবির গল্প। সাজানো গল্প নয়। কাটা কাটা দৃশ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছেলেগুলোর চিন্তা আর অতীত নিয়ে তৈরী যেন। যে মেয়েটিকে খুঁজছে তারা পথপ্রদর্শক ভদ্রলোকের প্রেমিক সে। সুতরাং তারা মেয়েটিকে আর খুঁজে পেল না। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে গেল বন্দরে। পরিচালক বায়েন্স অত্যন্ত সুন্দর ভঙ্গিতে ঘটনা ও কল্পনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রতিযোগিতার অপর দুটো ছবি রুমানিয়ার 'দি প্রোডিগাল ফাদার' (আদ্রিয়ান পেত্রিঙ্গেন্ড) ও যুগোশ্লাভিয়ার 'পার্তিসান' (স্তোল জানকোভিক) চিরাচরিত সমাজতান্ত্রিক দেশের কাঠামোয় তৈরী, বক্তব্যে ও উপস্থাপনায় দেশপ্রেমের জয়জয়কার।

আজ (১লা জানুয়ারী) আরও দুটো প্রতিযোগিতা বিভাগের ছবি দেখা হোল। ইন্দোনেশিয়ার 'হেয়ার আর ইওর মাদার' (হাস মানন) ছবিটাকে পাঁচমিশেলি বাংলা ছবির একটা সংস্করণ বলা যেতে পারে। সস্তা নাটক আর ঘটনার ঘনঘটায় ভারাক্রান্ত এ ছবি কোনো উৎসবের উপযোগী কিনা ভাববার বিষয়। ব্রাজিলের নব্যরীতির পরিচালক নেলসন পেরিয়েরা দস্ সান্তোস এর 'হাউ টেস্টি ওয়াজ মাই লিটল ফ্রেঞ্চম্যান' ষোড়শ শতাব্দীর পটভূমিকায় তৈরী। ব্রাজিলের এক ধরনের আদিবাসীদের জীবনযাত্রা, হিংসা-প্রেম-প্রতিহিংসা পর্তুগীজদের [illegible] তাদের আক্রোশ ইত্যাদি ঘটনা নিয়ে কাহিনীর বিস্তার। একজন ফরাসীকে পর্তুগীজ সন্দেহে গ্রেপ্তার করে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে কেটে সবাই মিলে খায়। উপজাতীয় একধরনের ড্রামের শব্দ ব্যবহার করেছেন পরিচালক ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে—যা খুবই অর্থবহ। ছবির সকল চরিত্রই সম্পূর্ণ নগ্ন। সভ্যতার আলো তখনও সেখানে পৌঁছয়নি। দৃশ্যবিন্যাস ও ঘটনার বিশ্লেষণে পরিচালকের মুন্সিয়ানার ছাপ আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এ ছবি ইতিপূর্বে কান চলচ্চিত্র উৎসবের কর্তৃপক্ষ নাকি সব চরিত্রই নগ্ন—এই অজুহাতে প্রত্যাখান করেছিলো।

প্রতিযোগিতার বাইরে ইনফরমেশন বিভাগের কিছু ছবি ইতিমধ্যে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। যার মধ্যে আছে ফেলিনির 'অ্যামারকর্ড' জোসেফ স্টিকের 'জেনিস' ব্রুরিকর 'ক্লক ওয়ার্ক অরেঞ্জ' হানস্ট্রার 'এপ এন্ড সুপার এপ।' ইতিমধ্যে ভালো ছবি দেখালেও সাংবাদিকদের সকল সুযোগ সুবিধা দেবার ব্যাপার নিয়ে প্রায় সমস্ত সাংবাদিকের পক্ষ থেকে একটা দাবীপত্র পাঠানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে। দেখা যাক কি হয়।

—নির্মল ধর

পটভূমি

আদর্শ, না নেতাদের অহমিকা সরকারকে চালায় ?

গত কয়েক দশকের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সভ্য সমাজের ঘোষিত নীতি বা আদর্শ অনুসরণ করে কোন দেশেরই কোন সরকার পরিচালিত হয় না। বরং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসক শ্রেণীর যাঁরা নেতৃত্বে থাকেন, তাঁদের লিপ্সা হিংসা বা অহমিকা সরকার পরিচালনার ব্যাপারে প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মুখে সমাজবাদ, সাম্যবাদ বা ফ্যাসিবাদের ধ্বনি সরকারগুলি তুললেও বাস্তবে দেখা গেছে, সে দেশের কর্ণধারের সম্মানে বা অহমিকায় আঘাত লাগায় তিনি বা তাঁরা সারা দেশটাকে এক জরুরী পরিস্থিতির মধ্যে টেনে নিয়ে গেছেন। ফল হয়েছে সাংঘাতিক। লক্ষ লোকের জীবনহানি; কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস। তবে এই ঘটনা নতুন কিছু নয়; আদিমকাল থেকে এ ঘটে চলেছে। প্রাচীন সভ্য দেশ মিশরের এটা হচ্ছে ইতিহাস।

যাক গে, আসল কথায় আসা যাক। মহাভারত আলোচনায় অযথা আয়ু ক্ষয় করে লাভ নেই। সম্প্রতি ভারতের মাটিতে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। পর্তুগালের বর্তমানের বৈপ্লবিক সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এসেছিলেন। পানাজিম থেকে কয়েক মাইল দূরে পুরনো গোয়াতে সেন্ট জেভিয়ার্সের নশ্বর দেহ স্পর্শ করে তিনি ঘোষণা করে গেলেন, ভারত ও পর্তুগাল দুই বন্ধু রাষ্ট্র। সে সময়টা ছিল ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাস। কিন্তু একবার চিন্তা করে দেখুন ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা। তখনও যে পর্তুগাল এবং এই ভারত ছিল, এখনও তাই আছে। সেদিন পর্তুগাল সরকারের ক্ষমতায় ছিল সালাজার নামের এক ফ্যাসিস্ত। তার অহমিকায় আঘাত লেগেছিল। তাই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিতজীর শত অনুরোধ বিনা দ্বিধায় উপেক্ষা করে ঔপনিবেশিকতার অছিলায় গোয়া, দমন, দিউকে আটকে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। পরিণামে যা ঘটল, তা এই যে, ভারত ও পর্তুগালের মত দুই প্রাচীন দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব যায় ছিন্ন হয়ে। পর্তুগীজরা বা ভারতীয়রা কিন্তু তা চায়নি। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায়নি, সালাজার যা চেয়েছিল, সেইটেই হয়ে দাঁড়াল বড় কথা। আজ সেই সালাজার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেই, নেই তার অহমিকাও। তাই নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পেরেছে আনন্দ ও উৎসাহের ভেতর দিয়ে। বর্তমান সরকার স্বীকার করে নিয়েছে, গোয়া দমন দিউ-এর ওপর ভারতের সার্বভৌম অধিকার। তাঁরা বলেছেন, অ্যাঙ্গোলাকেও তাঁরা স্বাধীনতা দেবেন অতি সত্বর।

এবার অ্যাঙ্গোলা বা লিসবন ছেড়ে দেশে ফিরে আসি। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত দুবার অর্থাৎ ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট প্রভাবান্বিত যুক্তফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছিলেন। কম্যুনিস্ট ও অকম্যুনিস্ট বামপন্থী পার্টিগুলির সমন্বয়ে যে সরকার গঠিত হলো, তাঁদের নীতি বা আদর্শ কি হতে পারে, সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সম্যক ধারণা ছিল। কিন্তু পার্টির নেতৃবৃন্দের মনে হয়েছিল, সাধারণ মানুষ বোধহয় তাঁদের নীতি ঠিকভাবে বুঝতে পারছেন না। বত্রিশ দফা কর্মসূচী কার্যকরী করার শপথ নিয়ে তাঁরা সরকার গঠন করেন। কিন্তু এই বত্রিশ দফার মধ্যে কোথাও দলে দলে হানাহানি, হত্যা বা মিল-মালিককে ঘেরাও করে তাকে চুম্বন ঘণ্টা জল না খেতে দেবার কথা ছিল না। অথচ যাঁরা ক্ষমতায় এলেন, তাঁদের মধ্যে কারোর কারোর ভেতর অহমিকা দেখা দিলো। তাঁরা এর সমর্থন জানালেন। ফল হলো, যে-সরকার জনসাধারণের কিছু উপকার করতে পারতো, অচিরেই সে-সরকারের পরিসমাপ্তি ঘটলো। তারপর সিদ্ধার্থবাবুর মন্ত্রিসভার দিকে তাকিয়ে দেখুন। সতেরো দফা কার্যসূচীর কথা ঘোষণা করে কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে একত্রে তাঁরা সরকার গঠন করেছিলেন। কিন্তু সেখানে ছাত্র-যুবদের মধ্যে লড়ায়ের কথা ছিল না। কিন্তু তাঁরা লড়ে চলেছেন। ইউনিয়ন দখলের নামে কর্মচারী-শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। কে কার কথা শোনে। অথচ নেতৃত্বে যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের এসবের ব্যাপারে সমর্থন রয়েছে। কারণ তা না হলে নেতৃত্বে থাকা যায় না। কিন্তু ফল দাঁড়িয়েছে কী? সরকার কি তাঁর ঘোষিত নীতি নিয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছে? আসলে এখন কংগ্রেসের যে সকল নেতা ক্ষমতায় আছেন, তাঁরা তাঁদের নেতৃত্বের অহমিকা বা ব্যক্তিগত ঈর্ষাবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নীতি বা আদর্শের নাম করে সরকারকে পরিচালনা করে চলেছেন। এরই ফলে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে অশুভ শক্তি। এরই জন্য গণতন্ত্র আজ বিপন্ন। তবে নেতৃবৃন্দকে সতর্ক করে দিয়ে বলতে হয়, উনবিংশ শতাব্দীর জনসাধারণ ও আজকের সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক তফাত। তাঁরা সব বোঝেন। যেদিন তাঁরা সবাক ও সক্রিয় হয়ে উঠবেন, সেদিন কি ঘটবে, সে-কথা কি কেউ চিন্তা করতেই পারছেন না? তবে কেন এই উদাসীন সময়-ক্ষেপণ!

কৌটিল্য

এই বাংলার খবর

চটকল ধর্মঘট

পশ্চিমবাংলার ৬২টি চটকলে প্রায় আড়াই লাখ শ্রমিকের ধর্মঘট যাতে না হয় তার জন্যে রাজ্য সরকারের সব চেষ্টা বিফল হলো। জানুয়ারীর ৬ তারিখ থেকে তাই আগের নোটিশ মতো ধর্মঘট শুরু হয়ে গেছে। এই ধর্মঘটের ব্যাপারে চটকল শ্রমিকদের সব ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাই এক কাট্টা। সিটু, এ আই টি ইউ সি, ইউ টি ইউ সি'র দুই গোষ্ঠী হিন্দ মজদুর সভা প্রভৃতি তো শ্রমিকদের দাবির প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে বটেই, সেই সঙ্গে আছে আই এন টি ইউ সি। বরং এই শেষোক্ত সংস্থা যেন কোনো রকম আপোসের বেশি বিরোধী। প্রকাশ, প্রস্তাবিত ধর্মঘট মার্চ অবধি পিছিয়ে দেওয়ার কথা তুলেছিল সিটু; কিন্তু আই এন টি ইউ সি সে-কথায় কান দিতে রাজি নয়।

চটকল মালিক আর শ্রমিকদের মধ্যে দাবিদাওয়া নিয়ে বিরোধ মীমাংসার জন্যে শ্রমমন্ত্রী ডঃ গোপালদাস নাগ অনেক চেষ্টা করেন। দফায় দফায় বৈঠক করেন দু' পক্ষের সঙ্গে। কিন্তু কোনো ফল হয় নি। ধর্মঘট শুরু হওয়ার আগে চার তারিখ পর্যন্ত চলে এইসব আলাপ-আলোচনার পালা। শেষ মুহূর্তেও মীমাংসার একটা সূত্র পাওয়া যাবে, এই ছিল আশা; কিন্তু পাওয়া যায় নি। শ্রমিকেরা দশ-দফা দাবি আদায়ের ভিত্তিতে ধর্মঘটে নেমেছেন। তার মধ্যে প্রধান হলো দুটি—বোনাস এবং জীবন-যাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি বাবদ দেয় ক্ষতিপূরণের হার। ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলো বার্ষিক বোনাস চেয়েছে শতকরা বিশ ভাগ। জীবন-যাত্রার ব্যয়ের সূচকের হিসেবে একটা গোলমাল আছে, এ অভিযোগ শ্রমিকদের বহুদিনের। এই অভিযোগের ব্যাপারে খোঁজখবর করার জন্যে রাজ্য সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটি সুপারিশ করেন সূচক সংখ্যার হিসেব সংশোধনের। কিন্তু সেই সংশোধিত হিসেবের ভিত্তিতে শ্রমিকদের পাওনা কত হয় তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। চটকল শ্রমিকদের দাবি তাঁদের প্রত্যেকের মাসিক বাড়তি পাওনা ৫০ টাকা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের লেবার ব্যুরোর (সিমলা) হিসেব অনুযায়ী ঐ পাওনা ১৬ টাকার বেশি দাঁড়ায় না। চটকল মালিকেরাও তাই ১৬ টাকার বেশি দিতে চান না। তাঁরা শতকরা বিশ ভাগ বোনাস দিতেও রাজি নন। ওদিকে শ্রমমন্ত্রী জানিয়েছেন, সিমলা ব্যুরোর রায় নিয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে অনিচ্ছুক।

কৃষি বিদ্যালয়

আগেকার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিভাগটিকে পৃথক করে নিয়ে তৈরি হয়েছে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। হরিণঘাটায় সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং পাঠাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদ। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িঘর তৈরি করতে সব মিলিয়ে খরচ পড়বে ১৫ কোটি টাকা। পঞ্চম পাঁচসালা যোজনায় এ বাবদ রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছেন তিন কোটি টাকা। আশা করা হচ্ছে, বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে। গবেষণার ব্যাপারে সাহায্য করবেন ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ। মোট তিনশ একর জমি [illegible] নতুন বিশ্ববি[illegible] এলাকা; তা ছাড়া আরো সাতশ' একর মতো জমি সরকার তুলে দেবেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে। বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজও হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ। বাড়িঘর তৈরি হলেই কলকাতার বেলগাছিয়া থেকে কলেজটি চলে আসবে হরিণঘাটায়। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে থাকবে পশুচিকিৎসা ও পশুবিজ্ঞানের একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ফ্যাকাল্টি।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বললেন, পশ্চিমবাংলায় কৃষির উন্নয়নে এই বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবে বলে তিনি আশা করেন। তা যদি না হয় তবে গবেষণা অথবা কৃষি সম্প্রসারণের কাজ ঠিকমতো এগোতে পারবে না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে এই ধরনের সহযোগিতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে জেনে তিনি খুশি। সব বিশ্ববিদ্যালয়েরই উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান অন্বেষণ। কিন্তু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো একটা ভূমিকা রয়েছে—তাকে হতে হবে চাষবাস আর গ্রামের উন্নয়নের হাতিয়ার। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাজ্যপাল ডায়াস বললেন, গ্রামের উন্নয়নই হলো রাজ্যের সমৃদ্ধির মূল কথা। পশ্চিমবাংলার মাটির নিচে অনেক জল রয়েছে। সেই জলকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে এই রাজ্যে চাষের ক্ষেতে সোনা ফলবে। তা হলে পশ্চিম-বাংলা শুধু নিজের প্রয়োজনই মেটাতে পারবে না, অন্যান্য রাজ্যের ঘাটতিও পূরণ করতে পারবে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে

রাজ্য কংগ্রেসের যুব ও ছাত্রকর্মীদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ মিটে গেলেও শাসক দলের সকলেই যে এক [illegible] কথা বলছেন তা নয়। একদল কংগ্রেসকর্মী পৃথক সভা করে কংগ্রেস এবং সরকারের মধ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এইসব কংগ্রেসকর্মীর পুরোভাগে রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রবীণ নেতা বিজয়সিংহ নাহার। জানুয়ারির ৫ তারিখে কলকাতায় এই গোষ্ঠীর কর্মীদের সভা হলো কুমার-সিংহ হলে। রাজ্যের নানা এলাকা থেকে প্রায় চারশ' কর্মী এই সম্মেলনে যোগ দেন।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দিয়ে বিজয়বাবু বলেন, দুর্নীতিপরায়ণ কোনো মানুষের কংগ্রেসে ঠাঁই নেই। মন্ত্রী নেতা বা সরকারি কর্মচারী যার বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হোক না কেন তাঁকে সামাজিক দিক থেকে 'একঘরে' করা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে পড়লে দেখা যাবে ভয়ের কিছু নেই। কারণ সৎ কংগ্রেসীরা জনসাধারণের সমর্থন পাবে। এই আন্দোলনের যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র হবে বিজয়বাবুর বাড়ি। নিজ নিজ এলাকায় অফিস খুলে ফেলার জন্যে বিজয়বাবু কর্মীদের আহ্বান জানান। যুব কংগ্রেস বা কংগ্রেস নামধারী কেউ সাধারণ মানুষের ওপর জুলুম করলে সে বিষয়ে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা রাখতে হবে ঐসব অফিসে।

এই গোষ্ঠীর আহ্বায়ক হয়েছেন বিধানসভার সদস্য কৃষ্ণকুমার শুক্লা। এ-ছাড়া বিধানসভার আরো যে-সব সদস্য কুমার সিংহ [illegible]দের সভায় ভাষণ দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাশীকান্ত মৈত্র এবং [illegible]। শ্রীনাহার ও শ্রীশুক্লা এই আন্দোলনের কর্মসূচী [illegible] জন্য উত্তরবাংলা সফরে বেরুচ্ছেন। তবে তাঁদের এই

আন্দোলনের সঙ্গে জয়প্রকাশের আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই বলে জানানো হয়েছে।

শুনানী শেষ

অবশেষে পাঁচজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগের শুনানী শেষ হলো। বিচারপতি কৈলাসনাথ ওয়াঞ্চু সব নথিপত্র বাকসবন্দী করে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি ফিরে গেলেন। সব কিছু বিবেচনা করে দেখে তিনি রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাবেন জানুয়ারির শেষে। এই তদন্ত কমিশন গঠনের কথা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন সেই জুন মাসে। তারপর কমিশন গঠিত হয়ে প্রথম বৈঠক সুরু হয় জুলাইয়ে, শুনানী সুরু হতে-হতে সেপ্টেম্বর এসে যায়। তারপর আবার লম্বা ছুটি। ডিসেম্বরে অবশ্য একটানা বৈঠক করে শুনানীর পালা শেষ করে দেওয়া হলো। পাঁচ মন্ত্রীর মধ্যে গোবিন্দ নস্কর আর অজিত পাঁজার প্রসঙ্গ শেষ হয়েছিল আগেই। এই পর্বে শুনানী হলো সন্তোষ রায়, সুনীতি চট্টরাজ আর সীতারাম মাহাতোর বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে।

সন্তোষবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি তাঁর বোন গায়ত্রীকে নিজের প্রভাব খাটিয়ে সমাজকল্যাণ পরিষদে মুখ্য সেবিকার চাকরি পাইয়ে দেন। হলফনামায় সন্তোষবাবু জানিয়েছিলেন যে গায়ত্রী বি-এ পাস। পরে নতুন হলফনামা পেশ করে তিনি জানান যে, গায়ত্রী গ্র্যাজুয়েট নন। এইবার শুনানীর সময় সন্তোষবাবু বললেন, তাঁর ভুল হয়েছিল, তিনি ত্রুটি স্বীকার করছেন। গায়ত্রী বি-এ পাস করেছেন কিনা সে-বিষয়ে আগে তিনি বিশেষ খোঁজখবর করেন নি। তবে তাঁর পক্ষের কৌঁসুলি বলেন, গায়ত্রীর নিয়োগ অসঙ্গত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সেজন্যে সন্তোষবাবু কোনো প্রভাব খাটান নি। এ সবই লোকের চোখে মন্ত্রী মশায়কে অপদস্থ করার চক্রান্ত।

সুনীতি চট্টরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি তাঁর দাদা প্রবোধ চট্টরাজকে ব্যবসায়ের জন্যে সরকারি ঋণ পাইয়ে দিয়েছেন নিজের প্রভাব খাটিয়ে। এই অভিযোগ সম্পর্কে শুনানী সুরু হওয়ার প্রথম দিনেই অভিযোগকারী সুরেন শেঠের কৌঁসুলি জানালেন যে, আগের দিন রাত্রে তাঁকে টেলিফোনে হুমকি দেওয়া হয়েছে যে তাঁকে হত্যা করা হবে। সুরেনবাবুও বললেন যে, তিনি প্রাণভয়ে সাক্ষ্য দিতে ভীত। কমিশনের তরফ থেকে তাঁদের অভয় দেওয়ার পর শুনানী সুরু হয়। অভিযোগকারীর কৌঁসুলি সুনীতিবাবুর স্ত্রী বাণুকে জেরা করেন। বাণু জানান, প্রবোধের আইরিনা ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানিতে তাঁর শেয়ার আছে তা তিনি এতদিন জানতেন না। সুনীতিবাবুও সেই কথা বলেন। তাঁর পক্ষের কৌঁসুলি অবশ্য প্রভাব খাটিয়ে প্রবোধকে টাকা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি প্রশ্ন করেন, সুনীতিবাবু কি চিঠি দেন যে তিনি এইভাবে টাকা পাইয়ে দেবেন? বনমন্ত্রী সীতারাম মাহাতো তাঁর ভাইপো [illegible] মাহাতোকে বন দপ্তরে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন, এই অভিযোগ সম্পর্কে সীতারামবাবুর কৌঁসুলি বলেন, অনন্তলালকে নিয়ম পালন করে চাকরি দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি।

—দেবদত্ত

দেশে বিদেশে

রাজনৈতিক হত্যা

এল এন মিশ্র

বিহারের সমস্তিপুরে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত ললিতনারায়ণ মিশ্র তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রায় সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় সব সময়েই একজন বিতর্কিত মানুষ ছিলেন। পার্টির জন্য টাকা তোলার ব্যাপারে পটু বলে পরিচিত ললিতনারায়ণকে ঘিরে একটার পর একটা বিতর্ক উঠেছে। কিন্তু তিনি সেসব বিতর্কের ঝড় কাটিয়ে উঠে ক্রমে ক্রমে রাজনীতির পিছনের সারি থেকে একেবারে সামনের সারিতে চলে এসেছিলেন। ধাপে ধাপে তিনি এমন একটা পর্যায়ে উঠেছিলেন, যেখানে তিনি বিহারের রাজনীতির একজন মুখ্য নেতা ও জাতীয় স্তরে প্রধানমন্ত্রীর নিকটতম আস্থাভাজনদের অন্যতম হয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালে উপমন্ত্রী হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীতে প্রথম প্রবেশ করে তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কাজ করে তাঁর কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে ন্যাশনাল বিল্ডিং কনস্ট্রাকসন কর্পোরেশনের (তিনি কিছুকাল এই কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন) ও ভারত সেবক সমাজের টাকা অপব্যবহার করার অভিযোগ এসেছে। কিন্তু ললিতনারায়ণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর সমালোচকদের সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। লাইসেন্স কেলেঙ্কারির ব্যাপারে সম্প্রতি সি পি আই ছাড়া অন্য বিরোধী দলগুলি তাঁর বিরুদ্ধে যে জেহাদ আরম্ভ করেছে, সেটিও যদি তিনি তাঁর অনুরূপভাবে কাটিয়ে উঠতে পারতেন, তাহলে ৫১ বছর বয়স্ক এই নেতার সামনে যে উজ্জ্বলতর সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিহারের সমস্তিপুরে একটি নতুন রেল-লাইনের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আততায়ীর বোমা সেই সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করে দিল।

বোমায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মিশ্র ও বিহার বিধান পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য সূর্যনারায়ণ ঝা-সহ তিনজন মারা গেছেন এবং ললিতনারায়ণের ভাই বিহারের কৃষিমন্ত্রী ডাঃ জগন্নাথ মিশ্র, বিহার বিধান পরিষদের সদস্য ও প্রাক্তন মন্ত্রী বালেশ্বর রাম, সংসদ সদস্য রামভগবৎ পাশোয়ান, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার ও পুলিশের একজন ডি আই জি-সহ প্রায় ৩০ জন আহত হয়েছেন।

স্বভাবতই ঘটনাটিকে ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে, বিহারের সরকার-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে এবং বিশেষ করে ললিতনারায়ণের বিরুদ্ধে সংসদের ভিতরে ও বাইরে যেসব সমালোচনা হচ্ছিল, সে-সবের সঙ্গে এই ঘটনার সম্পর্ক কতখানি।

বিহার সরকারের অনুরোধে সি বি আই এই নিদারুণ ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করছে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি পাটনায় গিয়ে এই আশ্বাস দিয়ে এসেছেন যে, ঘটনাটি সম্পর্কে 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিস্তারিত তদন্ত' করান হবে। অনুসন্ধানকারীরা ইতিমধ্যে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে—সেদিন সমস্তিপুরের ঘটনাস্থলে একটি নয়, দুটি বোমা ফেটেছিল। সভামঞ্চের উপর যে বোমায় ললিতনারায়ণ ও আরও দুজন মারা গেছেন, সেটি ছাড়াও দ্বিতীয় আর একটি বোমা ফেটেছিল সভাস্থলের কাছেই উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসারের এই বাড়ির সামনে। এই দ্বিতীয় বোমাটির সূত্রে এবং ঐ অফিসারের স্ত্রী ও পুত্রের পরস্পরবিরোধী বিবৃতির ফলে তদন্তকারী অফিসারদের সন্দেহ রেলওয়ে কর্মীদের উপর গিয়ে পড়েছে। পাঁচজন রেলওয়ে কর্মীকে এই ঘটনা সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কিন্তু এই অনুসন্ধানের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করেই বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল ঘটনাটি নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, সম্প্রতি যেসব শক্তি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছে, তারা ঘৃণার আবহাওয়া সৃষ্টি করছে এবং হিংসায় ইন্ধন যোগাচ্ছে। ঐ দূষিত আবহাওয়াই এই জঘন্য অপরাধকে ডেকে এনেছে। কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া তাঁর শোকবার্তায় বলেছেন, যে ফ্যাসিস্ট শক্তি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে, তারই প্রথম বলি হলেন শ্রীমিশ্র। সি পি আই নেতা আরও খোলাখুলিভাবে বলেছেন, জয়প্রকাশ নারায়ণ ও তাঁর সহযোগীরা যে হিংসার রাজনীতি চালু করেছেন, ললিতনারায়ণের হত্যা তারই অনিবার্য পরিণতি। শ্রীডাঙ্গে বলেন যে, ললিতনারায়ণকে তাঁরা 'নিষ্পাপ' মানুষ বলে মনে না করলেও লাইসেন্স কেলেঙ্কারির সঙ্গে তাঁর সংস্রব আছে বলে তাঁরা মনে করেন না।

অপরদিকে, জয়প্রকাশ নারায়ণ ললিতনারায়ণের শোকাবহ মৃত্যুর পিছনে ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটনের জন্য 'গভীরতর তদন্তের' দাবি তুলেছেন। সীমান্ত রক্ষীবাহিনী, সি আর পি ও স্থানীয় পুলিশসহ বিপুল পুলিশী ব্যবস্থার মধ্যেও সভামঞ্চের নিচে কেউ কি করে বোমা রেখে যাতে পারে তা তিনি বুঝতে পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে জয়প্রকাশ এই ধরনের হিংসাত্মক কাজের নিন্দা করে বলেছেন এতে কোন সমস্যারই সমাধান হবে না। অন্যান্য যেসব বিরোধী নেতা তদন্তের দাবি তুলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, বিরোধী দলগুলিকে শায়েস্তা করার জন্য ঘটনাটিকে ব্যবহার করা হতে পারে তাঁদের মধ্যে আছেন জনসঙ্ঘের এল কে আদভানি ও অটলবিহারী বাজপেয়ী, সি-পি-এম-এর ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, ভারতীয় লোক দলের রবি রায় প্রভৃতি।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, কংগ্রেসের উপরতলার নেতাদের মধ্যে একমাত্র যিনি এই তদন্তের দাবিতে সায় দিয়েছেন তিনি হলেন জগজীবন রাম।

—পুণ্ডরীক

গোয়েন্দা ধাঁধা

হিরোইন যখন পেত্নী হয়

ইন্দ্রনাথ রুদ্র

মেয়েছেলে জাতটা ভারি খারাপ। পুরুষগুলোর হাড় খাবে, মাস খাবে, চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবে। মরবার পরেও নামতে চায়না ঘাড় থেকে। যেমন আমাদের শাওলী সেন।

শাওলী কিন্তু হেঁজিপেজি মেয়ে নয়। দস্তুরমত হিরোইন। উঠতি হিরোইন। ফলে চটকটা আরো বেশী ছিল। রসে টসটসে কালো আঙুরের মতই উঠতি হিরোইনদের মতই জীবনদর্শন চাঁচাছোলা, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। মানে, দেহটাকে খাটিয়ে নাও, যখন তখন, কিন্তু উচ্চাশাকে রেখো উচ্চে।

এ-হেন রসবতী - জ্ঞানবতী - রূপবতী শাওলীই পার্ক স্ট্রীটের পার্টি থেকে বেরিয়ে হাওড়া পোলের ওপর থেকে ঝাঁপ দিল গঙ্গার জলে।

আত্মহত্যা নাকি? ভারী গোলমালে পড়ল অবনীবাবু—জাঁদরেল পুলিশ অফিসার—কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে প্রগাঢ় ভক্তি থাকার ফলে ঈষৎ কমেডীয়ান। তিনি দেখলেন যে মেয়ে পার্টির সমস্ত পুরুষকে নাচিয়েছে হেসেছে নিজেও নেচেছে; এমনকি পার্টির পর পাছে মদমত্ত পুরুষগুলো কামড়াকামড়ি করে তাকে নিয়ে, এই ভয়ে আধবুড়ো বেতো লেখক হেমাঙ্গ বোসকে নিয়ে ট্যাক্সির সন্ধানে বেরিয়েছে—সেই মেয়ে হঠাৎ জীবনের ওপর এত বীতরাগ হল কেন?

রহস্য জমে উঠল শাওলীর আস্তানায় গিয়ে। হোস্টেলে উঠেছিল মেয়েটা। কিন্তু পুলিশ পৌঁছোনোর আগেই কে যেন সেখানে পৌঁছেছিল। বাকস পেঁটরার লেবেল, অ্যালবাম বইয়ের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। মানে, যেখানে যেখানে শাওলীর পূর্বপরিচয় থাকা সম্ভব—সেসব সঙ্গে নিয়ে গেছে।

এ-আবার কিরে বাবা! মহাধাঁধায় পড়লেন অবনীবাবু। হত্যা-হত্যা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না? কে এই শাওলী? নামটা নির্ঘাৎ সিনেমার নাম—বাপ মায়ের দেওয়া নয়।

স্টুডিওতে গেলেন সেই খোঁজেই। ইন্দ্রনাথও যাচ্ছিল স্টুডিওতে একটা গোয়েন্দা কাহিনী সম্পর্কে জ্ঞান দিতে। কাহিনীটা ওরই এক কীর্তি নিয়ে লেখা—'মোমের হাত'। রাস্তার মাঝেই অবনীবাবু পাকড়াও করলেন তাকে।

স্টুডিও গিয়ে বিস্তর খোঁজখবর। আসল খবরটা কিছুই জানা গেল না। শাওলী যেন হাওয়া থেকে আবির্ভূত হয়েছিল। এককালে যাত্রা করত—এইটুকুই শুধু জানা আছে। তারপর ফিল্মে এসে ওর বিউটিফুল বডিটা নিয়ে ভেল্কী দেখাতেই চড়চড় করে উঠতে লাগল ওপরে। 'মোমের হাত' ছবিতে হিরোইনের অফার পর্যন্ত পেয়ে গেল। কনট্রাক্ট সইও সাঙ্গ হল।

কিন্তু কোপদৃষ্টিতে পড়ল ইন্দুবালার। স্টুডিওর হর্তাকর্তাবিধাতা। তারও ইচ্ছে ছিল ঐ 'রোলটা' নেওয়ার। তাতে বিশেষ এক অ্যাকটরের সঙ্গে চুমু খাওয়াখায়ির ইচ্ছেটা মিটিয়ে নেওয়া যেত অভিনয়ের নাম করে।

ইন্দুবালাকে না জানিয়েই রোলটা দেওয়া হয়েছিল শাওলীকে। দিয়েছিল ইন্দুর ভাই শ্যামলাল। ওর আরও দুই ভাই হীরালাল আর মতিলালও স্টুডিওর মাতব্বর বিশেষ।

তবে কি কনট্রাকটটাই যত নষ্টের মূলে? স্ক্রিপ্ট কনফারেন্সে বসে ইন্দ্রনাথ রুদ্র যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পেলে খুন হবে আরো তিনটে। শাওলীর কোনো প্রিয়জন প্রতিশোধ নেবে শাওলীর অকালমৃত্যুর। পাছে তার পরিচয় জানাজানি হয়ে যায় তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে মুছে ফেলেছে সঙ্গে তার নামের যাবতীয় সম্পর্ক।

কে সে? ভাবতে না ভাবতেই টলতে টলতে পড়ে গেল শ্যামলাল। তার কোলিবিল ওষুধের মধ্যে পাওয়া গেল মারাত্মক সুরঞ্জন জাতীয় বিষ—যা হাকিমরা প্রয়োগ করে বাত সারাতে।

ইন্দ্রনাথের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্যে মরতে মরতে বেঁচে গেল হীরালাল। তারও কোলিবিল ওষুধে পাওয়া গেল সেই একই বিষ।

হীরালালের গাড়ীর স্টীয়ারিং হুইল ভেঙ্গে রেখে গেল রহস্যজনক এক আততায়ী। ঐ গাড়ী নিয়ে হীরালাল রাস্তায় বেরোলে নির্ঘাৎ মারা যেত রোড অ্যাকসিডেন্টে।।

কিন্তু হত্যাকারী যেন হাওয়ায় মিশে ছুটছে মৃত্যুর জন্যে চিহ্নিত মানুষগুলোর দিকে। ইন্দুবালার লেখা একটা চিঠিতে

ফাঁস হয়ে গিয়েছে তিন ভাইবোনের নীচ চক্রান্ত। ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে ইন্দুবালা হুকুম করেছিল ছোটভাইদের—কনট্রাকট যেন ক্যানসেল করা হয়। দিদির কথা রেখেছিল ভাইরা। মিথ্যে করে প্যাঁচে ফেলেছিল শাঁওলীকে; দেশ দিয়েও তাই উচ্চাশাকে উঁচে রাখতে পারেনি শাঁওলী। পার্টি শেষ হওয়ার পরেই শ্যামলালের মুখে সব জানতে পারার পর মন ভেঙে যায়—গঙ্গার বুকে জ্বালা জুড়োয়।

অবনীবাবু জীপ নিয়ে ছুটলেন ব্যান্ডেলে হীরালালের বাড়ীতে। বাড়ী পর্যন্ত আর যেতে হল না। মাঝপথেই তুমুল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে তাড়া করলেন একজন পলাতক নকশালীকে। হঠাৎ শুনতে পেলেন কে যেন অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—'একী! আপনি এখানে? তাই বলুন, আপনিই তাহলে—'

কথার শেষ ঐখানেই। ছুটে গিয়ে হীরালালের লাশ পেলেন অবনীবাবু। বুকে ছুরি। ধাবমান পদশব্দ ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গঙ্গার জলে। তার আগে অবশ্য মাথার ওপর ডান্ডার ঘা খেয়ে সর্ষেফুল দেখতে দেখতে জ্ঞান হারালেন অবনীবাবু।

হত্যাকারীর শ্রীমুখ কিন্তু দেখতে পেলেন না! সেই রাত্রেই খবর এল তিন চক্রান্তকারীর তৃতীয়জনও সুরিঞ্জন তালক মিশোনো জিন খেয়ে পরলোক যাত্রা করেছে—ইন্দুবালাও আর বেঁচে নেই।

ঝটিকাবেগে হত্যা করে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল হত্যাকারী। কিন্তু ইন্দ্রনাথ রুদ্রও কম দুঁদে নয়। অবনীবাবু যখন মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে মুখে চাবি এঁটে বাঁজা বউয়ের মুখনাড়া খাচ্ছে খাটে শুয়ে শুয়ে—ঠিক তখনি ইন্দ্রনাথ এসে কানে কানে বলল হত্যাকারীর নাম আর ঠিকানা।

ভীষণ চমকে উঠলেন অবনীবাবু। অমনি টেলিফোন এল পলাতক সেই নকশালীর কাছ থেকে। হত্যাকারীর পেছন পেছন সে ছুটেছিল রিভলভারটা হাতানোর জন্যে। পকেট থেকে একটা কার্ড পেয়ে আস্তানা পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। সেখানে এলেই মিলবে শাঁওলী-রহস্যের সমাধান। হত্যাকারী কোথায়? এই মুহূর্তে গঙ্গার তলায় অথবা কোনো আঘাটায়।

ইন্দ্রনাথ গিয়ে নিয়ে এল হত্যাকারীর ডাইরীটা। মর্মন্তুদ কাহিনী লেখা পাতায় পাতায়। ঢাকায় বাড়ী তার। বিয়ে করেছিল বড়লোকের ঘরের এক ডানাকাটা পরীকে। পরীটির একটি বিয়ের লাইসেন্স দরকার ছিল বলেই হাড়হাবাতে লোকটাকে ঘরজামাই করে রেখেছিল নিজের বাড়ীতে। শাঁওলী ওরফে শ্যামলী বোস তাদেরই মেয়ে?

দিবারাত্র পৌরুষহীন স্বামীকে যন্ত্রণা দিয়েও মন ভরত না বড়লোকের পরীর—তাই মেয়েটাকে দাঁতে পিষতো যখনতখন: সহ্য করতে পারল না ভদ্রলোক। পালিয়ে এল কলকাতায়। কিছুদিন মাথা খারাপ থাকার পর সুস্থ হয়ে প্রবেশ করল লেখার জগতে।

বেশ ছিল লোকটা। এমন সময়ে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হল শাঁওলী। পার্টিতে দেখেই দুজনেই দুজনকে চিনতে পারল। কিন্তু কেউ কাউকে ধরা দিল না। পার্টির ঠিক পরেই শ্যামলালের মুখে শাঁওলী শুনল তার কপালভাঙার কাহিনী। রাস্তায় নেমে বাপকে বলল তার শোচনীয় ইতিহাস। মা মারা গেছে অনেকদিন। এবার হিরোইন হবার সাধও মিটল। তার পরেই গঙ্গায় গিয়ে এই নোংরা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল মেয়েটা।

পাগল হয়ে গেল তার বাপ। পণ করল তিন শয়তানকে যমের দুয়োর দেখিয়ে ছাড়বে। আগে গেল শাঁওলীর আস্তানায় প্রমাণগুলো নিশ্চিহ্ন করে এল নিজের হোটেলে। বাতের জন্যে সুরিঞ্জন তালক-স্নেহ গুঁড়ো সঞ্চয় করা ছিল হোটেলের ঘরে। সেই গুঁড়োই মিশিয়ে দিয়ে এল শ্যামলাল, হীরালালের ওষুধে আর ইন্দুবালার জিন-এ। হীরালালের গাড়ীও জখম করেছিল সে-ই। তাতেও যখন মারা গেল না, তখন ছুরি নিয়ে ওৎ পেতেছিল ব্যান্ডেলের রাস্তায়।

কাজ তার শেষ। কিন্তু মাথার মধ্যে কাঁকড়া বিছের কামড়গুলো আবার শুরু হয়েছে। এ-জীবনে যে সব পেয়েও বারবার হারিয়ে ফেলল—সেকি আবার পাগল হয়ে যাচ্ছে? শাঁওলী কি তাকে ডাকছে?

ডাইরী শেষ ঐখানেই। ইন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিলে অবনীবাবুকে কিভাবে হত্যাকারীর হদিশ আবিষ্কার করেছিল সে।

ঠিক সেই সময়ে পাশে দাঁড়িয়ে বুঝি নীরবে হেসে উঠল হেমাঙ্গ বোস আর শ্যামলী বোসের প্রেতাত্মা।

হে বুদ্ধিমান পাঠক, বুদ্ধিমতী পাঠিকা। বলুন দিকি ইন্দ্রনাথ কোন সূত্রবলে জানল হত্যাকারী কে?

অদ্রীশ বর্ধন

(সমাধান ৫৩ পৃঃ)

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

[সোনাখড়ি গ্রামের ভবনাথ ঘোষ আর দেবনাথ ঘোষ দু ভাই। ভবনাথ বড়। অল্পবয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর ভবনাথ সংসারের হাল টেনেছেন, ভাইকে মানুষ করেছেন। কলকাতার ছোট আদালতে ওকালতী পরীক্ষা দেওয়া দেবনাথের হল না। পরে বিদেশে জমিদারী সেরেস্তার ম্যানেজার হয়েছিলেন। সেই কৃতী ভাই দেবনাথ আট বেহারার পালকিতে সোনাখড়ি ফিরেছেন।

এদিকে পুজো প্রায় আসি আসি। হারু সরকার বাড়ি বাড়ি ঘুরে শিহার্শালের লোক ডেকে বেড়াচ্ছে। ছোট কর্তা বরদাকান্ত জলচৌকিতে বসে ফর্দের ছাড়ছুট ধরিয়ে দিচ্ছেন। দেবনাথ বাড়ি এলেন।

পুজোর আনন্দে গ্রাম গুলজার। সব বাড়িতেই আত্মীয় পরিজনের ভিড়। এর মধ্যেই খুচরো পরব এক ধরনের পুজোই—ধান বনকে সাধ খাওয়ানো। আর এক পরব গারসিও এই সময়েই। সধবা-বিধবা ছেলে-বুড়ো সবাই মেতে উঠলো। ওদিকে ভোর হতেই আহ্লাদ বৈরাগীর গলায় আগমনী সুর বেজে উঠল।

আর ছেলে ছোকরাদের আনন্দ দেখে কে। গ্রাম সুদ্ধ মানুষ পুষ্পাঞ্জলি দেবে। অতএব বিস্তর ফুল চাই। আর ফুল জোগাড় করতে হলে ভোররাতে দল বেঁধে বেরুতে হবে।

সেই কথা ভেবেই কত আনন্দ। সেই দলের পান্ডা জল্লাদ। কমলকেও সে সঙ্গে নিল। তারপর ভোর ভোর রাত্রে একদল গ্রামের ছেলে পথে বেরিয়ে পড়ল।

জল্লাদ দেমাক করে বলে, এক জায়গা থেকেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে।

সঙ্গীরা শিউরে ওঠে : পদ্ম তুলবে নাকি এই দীঘির ?

জল্লাদ বলে দীঘি আর কোথা শুধুই তো পদ্মবন। যতখুশি তুলে নাও। ফকিরের ভিক্ষের মতন এর কানাচে ওর চাঁচতলায় ফুল তুলে তুলে ঘুরব কেন রে ? একখানে ঝুড়ি বোঝাই। শুধু ফুল কেন, পাতাও নেবো। বৃহৎকর্মে পদ্মপাতেও লোকে খেতে পারবে। গোড়া থেকেই আমি ভেবে রেখেছি ঘাবড়ে যাবি তোরা সেই জন্য বলিনি। আর বাবার কানে গিয়ে পড়লে তো আমাকে একচোট পিটুনি দিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে আটকাত।

ফ্যা-ফ্যা করে হেসে নিল খানিক। হাত তুলে জায়গা দেখিয়ে দেয় : উই যে চেঁচো বন, ঐখানে ডোঙা ফেলব। গরু ঘোড়া নেমে নেমে ঘাস খায় ধাপের মধ্যে দিব্যি শয়ালের মতন হয়েছে। কাল আমি হেঁটে দেখে গেছি ধনজি মেরে ডোঙা বেশ চালানো যাবে।

যথাস্থানে নিয়ে মাথার ডোঙা ফেলল। বর্ষার জল যত সামান্য আছে গাদই বেশি। জল্লাদ বলে পয়লা ক্ষেপে তিনজন। আর সব দাঁড়িয়ে থাক পরের ক্ষেপে যাবি। ভার বেশি হয়ে গেলে পাঁকে কামড়ে ধরবে, ঠেলে কুল পাওয়া যাবে না। আমি যাচ্ছি, বড়ু আসুক আর কে আসবি রে ? ঝন্টু তুই বরঞ্চ আয়।

পদা বলল সাপটাপ আছে, নজর ফেলে সামাল হয়ে এগোবি।

একুার-বক্সারের দীঘির সাপের কথা সবাই জানে, বলে দিতে হয় না। শরবনের ধারে ভাঙা শামুকের গাদা-শামুক ভাঙা। কেউটে মশায়রা আহারাদি সেরে উচ্ছিষ্ট ফেলে গেছেন। গরু ঘোড়া ঘাস খেতে নেমে প্রতি বছরই দুটো পাঁচটা কাটিঘায়ে ঘায়েল হয়।

জল্লাদ বলল সুভালাভালি ফিরে মা-মনসার দুধ-কলা দেবো, মানত করেছি। মনে তোরাও সকলে 'আস্তিকস্য' পড়ে নে, সাপে কিছু করতে পারবে না।

হেঁসো দা হাতে জল্লাদ ডোঙায় ঠিক মাথার উপরে হাঁটু গেড়ে বসেছে, ডাইনে বাঁয়ে হেঁসো চালিয়ে জঙ্গল ও দাম কেটে পথ করে দিচ্ছে। সাপ পড়লেও হেঁসোর মুখে কচাত করে দু-খন্ড হয়ে যাবে। দু-পাশে দুজন, বড়ু আর ঝন্টু ধনজি মেরে প্রাণপণ বলে এগুচ্ছে। একটু গিয়েই হুঁশ হল জল্লাদের : রাখ রাখ, আরও একজন চাই। পদ্মবনে গিয়ে ফুল তুলবার মানুষ কই ? ধনজি ফেলে তোরা পারবি নে হেঁসো ছেড়ে আমিও না।

ঝড়ু বলল তিন মানুষের বোঝা এমনিই বেশি এর উপর আবার তো পদ্ম-ফুল পদ্মপাতার চাপান পড়বে।

জল্লাদ ডাঙায় তাকিয়ে দেখছিল। বলল, কমলটা আসুক এক ফোঁটা মানুষ—ওর আর ওজনটা কি। ওদের বাড়ির পুজো—ভালই হবে, নিজের হাতে ফুল তুলবে।

কাস্তে দিল কমলের হাতে : টুক-টুক করে কেটে যাবি কেটে সঙ্গে সঙ্গে ডোঙায় তুলে ফেলবি।

কী মজা কমলের। না কেটে ফুল-পাতা উপড়ে তোলাও যায়—উঁহু, উপড়াতে গিয়ে সরু হালকা ডোঙা কাত হয়ে ডুবে যেতে পারে। ডুববে জলে নয়, গাদের ভিতর। এক-মানুষ সমান গাদ এখানটা। জলে ডুবলে জেলে ডেকে জালাজ করে দেহটা অন্তত পাওয়া যায়—এখানে সেটুকুও নয় পাকাপাকি কবর। সেই এক

যুগে এস্তার-বস্তারের আমলে নিষ্কুটি জল ছিল নিশ্চয়—লোকে স্নান করত সাঁতার কাটত, কলসি কলসি জল নিয়ে যেত বউ-ঝিরা, ছেলেপুলেরা জল কাঁপাত। তারপরে ক্রমশ দীঘি মজে-হেজে গিয়ে জঙ্গল ডেকে উঠল সাপের ভয়ে কেউ আর এ-মুখো হত না। বিশাল পদ্মবন গ্রীষ্মে শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, বর্ষায় জল পড়লে পাতা গজিয়ে ওঠে। ভাদ্রে কলি ফুটতে শুরু হয়, পরিত্যক্ত দীঘি তারপর পদ্মে পদ্মে আলো হয়ে থাকে সারা দিনমান দূরে থেকে পথিকজন দেখে যায়। আজকেই প্রথম পুজো উপলক্ষ্য করে দুঃসাহসী কয়েকটা গ্রামবালক পদ্মবনে ঢুকে লগি ঠেলছে, ফুল তুলছে।

আর ক্ষণে ক্ষণে জল্লাদ সামাল দিচ্ছে কমলকে : ভাল ছেলে তুই, তা খাসা তো বোঁটা কাটছিস। ডুবে না মরিস সেই খেয়ালটা যেন থাকে। মুখ কাচুমাচু করতে লাগলি, মায়া হল, তাই নিয়ে এলাম। সুভালাভালি ডাঙায় ফেরৎ নিয়ে তুলতে পারলে যে হয়।

কাল ষষ্ঠীর বোধন হয়ে গেছে। চারটে ঢাক ছিল তার উপর হাঁসাডাঙা থেকে এইমাত্র ঢোল-শানাই এসে পৌঁছল। মণ্ডপ জমজমাট। ছেলেপুলের ছুটোছুটি কলরবে তোলপাড় পড়ে গেছে। বড় বউ উমাসুন্দরী নেয়েধুয়ে মাথার চুল চূড়াকরে সামনের দিকে বেঁধে হেসে হেসে আদর-আপ্যায়ন করছেন সকলকে। নতুন পুকুরে কলাবউকে স্নান করিয়ে আনল। উমাসুন্দরী বলেন, সার্থক পুকুর কাটা, সার্থক পুকুর-প্রতিষ্ঠা।

ভিতর-বাড়িতেও ছুটোছুটি হাঁকডাক! তরঙ্গিণী ওদিকে। রান্নাঘরের সামনের উঠোনটুকু তকতকে গোবর-নিকোনো, সিঁদুর পড়লে প্রতিটি কণিকা তুলে নেওয়া যায়। আলু পটোল মিঠে কুমড়ো কাঁচকলা এনে ঢালল সেখানে, খান পাঁচেক বঁটি এনে ফেলল। মেয়েলোক বিস্তর জমেছে তাদেরই কতক বঁটি পেতে বসল। তরকারি কোটা ও গল্পগাছা চলছে। কুটনো কুটে বড় বড় ঝুড়ি-চাঙারিতে রাখছে ধুয়ে আনছে সে সব পুকুরঘাট থেকে। আর একদিকে কেঠো বারকোশ চাকি-বেলুন হাতা-ঝাঁঝরি কড়াই-গামলা মেজে-ঘষে সাফ-সাফাই করে গাদা দিয়ে রাখছে। জল ঝরে গেলে ঘরে তুলে নেবে এর পর।

এ দিকের ব্যবস্থা সেরে তরঙ্গিণী রান্নার দিকে ছুটলেন। অনেক মানুষ খাবে, ছেলেপুলে বিস্তর তার মধ্যে। বাজনা খানিকটা নরম হলে খাই-খাই রোল উঠে যাবে, তখন আর দিশা করতে দেবে না। বাঁশে খাড়ে ঘর তুলতে ভবনাথের আলস্য নেই—রান্নাঘরের গায়েই এক চালাঘর উঠে গেছে ইতিমধ্যে—অস্থায়ী রান্নাঘর। চার উনুন সেখানে—রাবণের চুল্লি, এ কদিন দিনে ও রাত্রে কোন না কোন উনুন জ্বলছে। কখনো বা চার উনুন একসঙ্গে। গাঁয়ের ঝি-বউ একটিও বোধ হয় বাড়িতে নেই —কাপড়-চোপড় গয়নাগাটি পরে পুজো দেখতে এসেছে। বাড়ি থাকার গরজও নেই—খাওয়া সবশুদ্ধ আজ এখানে।

ঝড়ুর মা কি কাজে এদিকে একবার এসেছেন, চেয়ে চেয়ে তরঙ্গিণীর ছুটোছুটি দেখছেন। বললেন, পুজোর এত সোরগোল, ছোট বউ সেই রাঁধাবাড়া নিয়ে রান্নাঘরে পড়ে আছে।

তরঙ্গিণী বললেন কলাবউ নিয়ে যাচ্ছে তখন একবার গড় করে এসেছি। অঞ্জলির সময় আবার গিয়ে বসব। কি করব দিদি, এদিকে না থাকলেও তো চলে না।

ঝড়ুর মা খোশামুদি সুরে বলেন, তোমারই সার্থক পুজো ছোট বউ, মা জগদম্বা হাত পেতে তোমার অঞ্জলি নেবেন। যেমন মন, তেমনি ধন। এই মনের গুণেই ছোট ঠাকুরপোর এতখানি সংসার-পশার।

কাজের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তরঙ্গিণীর বুকের ভিতরে টনটন করে ওঠে, কাজ ফেলে মুহূর্তকাল পাঁচিলের দরজায় গিয়ে দাঁড়ান। পঞ্চমী ষষ্ঠী গিয়ে মহাসপ্তমী এসে গেল, মা দুর্গা ছেলেমেয়ে এপাশে ওপাশে নিয়ে মণ্ডপ আলো করে আছেন, তাঁর মেয়ে এলো না বোধ হয় আর। চঞ্চলা, সুরেশ এলো না—আর কবে আসবে? শাশুড়ির চক্রান্ত, সে আর বলে দিতে হবে না। বউকে চোখে হারান—বাড়ির বার হতে দিতে বুক চড়-চড় করে। স্বার্থপর, নিজেরটাই দেখেন শুধু, অন্যদের কেমন হচ্ছে সেটা একবার ভাবেন না। দিয়ে দেবেন শেষে একটা অজুহাত বাসের সিট পাওয়া গেল না। বলে দিলেই হল, বিয়ে দেওয়ার পর চঞ্চলা তো ওঁদের হয়ে গেছে—'পাঠাব না' স্পষ্টাস্পষ্টি না বলে ঘুরিয়ে বলে দেওয়া। লোকজনের ভিড় আর কাজকর্মের চাপে একদণ্ড নিরিবিলি হতে পারছেন না, দেবনাথকেও একটু কাছাকাছি পাচ্ছেন না যে মেয়ের কথা বলে মন কিছু হাল্কা করবেন।

চড়া রোদ। মণ্ডপে বেলোয়ারি-ঝাড় ঝুলোনো ঝাড়ের গায়ে রোদ ঠিকরে পড়ছে। ঠাকুরমশায় গম্ভীর সুরে চণ্ডীপাঠ করছেন—সেদিকে লোক নেই, বুড়ো-বুড়ি গোনাগোনতি কয়েকজন। বলির বাজনা বেজে উঠতে সকলে রে-রে করে ছুটল। মণ্ডপের ভিতরে-বাইরে উঠানে সামিয়ানার নিচে লোকে লোকারণ্য। সন্ধিপুজোয় পাঁচ কুড়ি-পাঁচ পদ্ম লাগে—জোটানোর ভাবনা হয়েছিল, আর এখন দেখ পদ্মের পাহাড়, অঞ্জলি দিচ্ছে আস্ত এক এক পদ্ম নিয়ে। নিমন্ত্রিত অভ্যাগত গ্রামবাসী সকলে প্রসাদ পাবেন পুরোদস্তুর পাতা পেতে খাওয়ানো—লুচি তরকারি মিষ্টি মিঠাই। মণ্ডপের সামনে সামিয়ানার নিচে পুরুষরা, মেয়েরা ভিতর-বাড়ি। সোনাখড়ি গাঁয়ের মধ্যে আজ উনুন জ্বলবে না, মুক্তো-ঠাকরুন বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে এসেছেন।

সন্ধ্যা হতে না হতেই আলো। চতুর্দিকে আলো, আলোয় আলোয় দিনমান করে ফেলেছে। প্রতিমার দুপাশে বাতিদানে চারটে করে বাতি, মাথার উপর কাচের হাঁড়িতে বাতি জ্বলছে। হ্যাঙ্গিং-লণ্ঠন ও হেরিকেন ঝুলিয়ে দিয়েছে এখানে ওখানে। কারবাইডের আলো। আর আছে সরার আলো—কলার তেউড়ের মাথায় সরা বসিয়ে তাতে কেরোসিনে ধরিয়ে দিয়েছে দাউদাউ করে জ্বলছে। দিনমান কোথায় লাগে। আরতির সময় চার চারটে ঢাকে তোলপাড়। মানুষজন ভেঙে এসে পড়েছে। ঢাক থামলে ঢোল আর মিষ্টি-মধুর শানাই। কাঁসর বাজছে ঢং-ঢঙাঢং ঢং-ঢঙাঢং। ধূপের ধোঁয়ায় মন্দির আচ্ছন্ন। এক হাতে পুরুত পঞ্চপ্রদীপ ঘোরাচ্ছেন আর হাতে ঘন্টা নাড়ছেন......

কলকাতার প্লেয়ার দুটি কর্ণ ও শকুনি মহালয়ার দিনে নয়—তার পরের দিনে পৌঁছে গেছে। কালিদাস নিয়ে এসেছে। এসে আর দেরি নয় ফুল রিহার্শাল সেই দিন থেকে। এবং সপ্তমীতে চুল-দাড়ি-গোঁফ পরে না নামা পর্যন্ত প্রতিদিন চলবে। বলে, সড়গড় করে নিই সকলের সঙ্গে—সকলকে বাজিয়ে দেখব, দূত-সৈনিকও বাদ থাকবে না। অতদূর থেকে কষ্ট করে এসে ধাষ্টামো হতে দিচ্ছি নে।

মাদার ঘোষ হারু সরকারকে বলে, কি বলছে শুনেছ?

হারু বড়াই করে : ডরাইনে, হবে তাই। চার মাস একনাগাড় ঘোড়ার ঘাস কাটিনি আমরা।

(ক্রমশঃ)

তোমার সম্বন্ধ বিনা কাল নাহি যায়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কালাকাল কী বা দেবে ভবিষ্য-অধুনা
জানা আছে সব কিছু স্বাদের নমুনা।
তুমি যা বা দিতে পারো যা বা তুমি দেবে
আদ্যোপান্ত কুলোবে না কোনোই হিসেবে।
যখন যা করো তুমি তোমাতেই সাজে
অনুমানে আসে না তো বুদ্ধির আন্দাজে।
গণিতে প্রণীত নও তুমি অগণন
অনন্তের মাপে লাগে অনন্ত ওজন।
মস্তিষ্কের চলে না তো কোনো কারসাজি
বিজ্ঞানের তোপ দাগা হাউইয়ের বাজি।
তোমারই সর্বশক্তি দুর্ঘটঘটনী
শক্তিশেল দিয়ে আনো বিশল্যকরণী।
অভাজনে অকিঞ্চনে করো রাজ্যপাল
রাজ্যভ্রষ্ট ক'রে করো শ্মশানচণ্ডাল।
গিরি-মরু ক'রে তোলো সমুদ্র উদ্বেল
দুঃখের তো শেষ আছে, কৃপাই অঢেল।
নিরাশায় প্রার্থনায় আর যন্ত্রণায়
তোমার সম্বন্ধ বিনা কাল নাহি যায়।।

তুমি বন্ধু, অহেতুক হৃদয়রঞ্জন
সমতায় প্রবাহিত, আবার কখন
দস্তানায় গুপ্ত রাখো প্রখর নখর
বন্ধু তুমি শত্রুর চেয়েও ভয়ংকর।
সর্বক্ষণ হননেচ্ছু করো অপমান
শেষে দেখি ধূলিতেই একত্র শয়ান।
দিবস উদ্‌ভ্রান্ত ক্লান্ত রজনী বধির
নিষ্ঠুর আঘাত দাও নিদ্রা যে গভীর।
যত হানো তত আনো অমৃতক্ষরণ
শূন্য ক'রে দিয়ে করো ন্যূনতা-পূরণ।
যত আনো পদে-পদে বিপদের দায়
তত দেখি পায়ে-পায়ে রেখেছ উপায়।
রাখো ক'রে হৃতধন দরিদ্রের মত
তোমার চিন্তনে থাকি তন্ময় সতত।
অশরণ আমরণ স্মরণ-আবেশ
শাস্তির তো শেষ আছে, ক্ষমাই অশেষ।
ব্যর্থতায় উপেক্ষায় আর অপেক্ষায়
তোমার সম্বন্ধ বিনা কাল নাহি যায়।।

সাহিত্যে ও সংস্কৃতি

কবি সুকান্ত-মূল্যায়ন সম্পর্কে অনুষ্ঠান

গত ২১ ও ২২ ডিসেম্বর পঃ বঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে কবি সুকান্তকে নিয়ে সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রয়াসে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়। তিনি সুকান্তর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন সুকান্তকে স্মরণ করে আমরাই ধন্য হচ্ছি।

সুকান্তর কবিতা এবং তার সংগে ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন শ্রীযুক্তা সরলা দেবী রাখাল ভট্টাচার্য অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য মোহিত আইচ অরুণাচল বসু ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। এঁরা সবাই সুকান্তর জীবনের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাই এঁদের স্মৃতিচারণে সুকান্তর জীবনের বিভিন্ন দিকের শিক্ষাপ্রদ ও বেশ কিছু অলিখিত তথ্য প্রকাশ পায় এবং তাঁরা প্রচলিত কিছু ভ্রান্তিকর তথ্যও খণ্ডন করেন। এই স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ-গুলি ভবিষ্যতে সুকান্ত-মূল্যায়ন বিষয়ে সহায়ক হবে।

সুকান্তের কবিতা প্রসঙ্গে প্রবন্ধ মারফৎ আলোচনা করেন অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য শ্রীঅরুণ মিত্র ডঃ সীতাংশু মৈত্র মণীন্দ্র রায় রাম বসু তরুণ সান্যাল' এঁদের প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতায় কবি সুকান্তের স্থান তাঁর কবিতায় বাস্তবতার নতুনত্ব যুগের প্রভাব আধুনিক কবিতায় সুকান্তের প্রভাব তাঁর ভাষা ছন্দ চিত্রকলা ইত্যাদি বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ মূল্যবান আলোচনা হয়। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র যথাক্রমে তিনটি অধি-বেশনে সভাপতিত্ব করেন। শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় সমাপ্তি অধিবেশনে ভাষণ দেন।

কোন কোন মহলে সুকান্তকে অস্বীকার করবার আয়োজন চলেছে তার কোন কোন মহল তাঁকে সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাইছেন। এই দুই প্রবণতার বিরুদ্ধে এ অনুষ্ঠানের সমগ্র কর্মসূচী সোচ্চার ছিল।

মূল্যবান আলোচনা ছাড়াও সুকান্ত কবিতার আবৃত্তি ও গান পরিবেশন নৃত্য প্রদর্শন হয়। তাতে শ্রীহেমন্তকুমার মুখো-পাধ্যায় শ্রীঅজিত পাণ্ডে শ্রীসুবীর সেন শ্রীসনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরমেন ঘোষ অক্ষয় দাস নতুন সংস্কৃতি আনন শম্ভু ভট্টাচার্য প্রেমব্রত মুখোপাধ্যায় দেবদুলাল বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রদীপ ঘোষ মৃণালকান্তি ভট্টাচার্য নীলাদ্রিশেখর বসু প্রমুখ অংশ গ্রহণ করেন।

—দিঃ মৌঃ

নতুন বই

Calcutta and Its Neighbourhood : (History of people and local from 1690 to 1857) by Reverend Father Janus Long. Indian Publications. 3 British Indian St. Calcutta-1. Price Rs. 32.

শহর কলকাতার পত্তন ঘটেছিল কিভাবে এবং কখন তা নিয়ে আজ আর কাউকে বিব্রত হতে দেখা যায় না। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন বন-জঙ্গলঘেরা এই প্রকৃতিতে মানুষের শত্রু ছিল হিংস্র বন্য-চারী প্রাণী। ডাকাত আর দস্যুর ভয়ে সমস্ত অঞ্চল ছিল আতঙ্ক ও বিপদের প্রাণকেন্দ্র। তারপর একদিন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আসে ইংরেজ বণিক। উপযুক্ত বিবেচনা করে এখানে তারা গড়ে তোলে শহর, কলকাতা-সুতানুটি ও গোবিন্দপুর তিনখানি গ্রামকে কেন্দ্র করে। নির্মাণ করে ফোর্ট উইলিয়ম। সিরাজকে পলাশীর যুদ্ধে হারিয়ে ইংরেজ এদেশের শাসক হয়ে ওঠে। সে হল দু'শ বছরেরও বেশী সময়ের আগেকার ঘটনা।

তারপর কলকাতা এগিয়েছে কখনও দ্রুত লয়ে কখনও মন্থরভাবে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের প্রাণবিন্দু কলকাতা ভারতের সমস্ত শহরকে ম্লান করে গড়ে উঠেছিল বিদেশী ব্যবসায়ীদের স্বার্থে।

পুরোন কলকাতার বহু বিবরণ ছড়িয়ে আছে নানাভাবে, নানা স্থানে। সম্প্রতি শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত সেকালের বিশিষ্ট কলকাতাবাসী রেভারেন্ড লঙের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি মূল্য-বান প্রবন্ধ সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছেন। এই জাতীয় আরও কয়েকখানি গ্রন্থ বেরিয়েছিল, কিন্তু অধুনা তা দুষ্প্রাপ্য।

রেভারেন্ড লঙ কেবলমাত্র ধর্মপ্রচারকই ছিলেন না, কর্মব্যপদেশে তাঁকে সেকালের বহু সমাজউন্নয়নমূলক কাজের সংগে জড়িত হতে হয়েছিল। এই কারণে সে সময়কার বিশিষ্ট বাঙালীদের সংস্পর্শে এসে বাঙালী সমাজকে জেনেছিলেন সামগ্রিকভাবে। কলকাতাকে তিনি যেভাবে দেখেছিলেন এবং জেনেছিলেন তারই সঠিক চিত্রণ ঘটেছে তাঁর প্রবন্ধগুলিতে। কলকাতার মানুষ তার উন্নয়ন এবং শ্রীবৃদ্ধিকে রেভারেন্ড লঙ তুলে ধরেছেন পরিবেশ ভূপ্রকৃতি এবং সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে।

এই অসামান্য গ্রন্থখানি প্রকাশ করে সম্পাদক মূল্যবান কর্তব্য পালন করেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ ভূমিকায় প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কলকাতার ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনি সুধীজনের প্রশংসা পাবেন। সমকালীন কলকাতার ছবি পেলে একালের পাঠক উপকৃত হতেন।

সিদ্ধসাধক তারাক্ষ্যাপা — ডাক্তার অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়। নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৩৫+১০। মূল্য—ছয় টাকা।

এই ভারতভূমিতে যুগে যুগে বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে জাতির কল্যাণ-কামনায় আত্মোৎসর্গ করেছেন। অধিকাংশ সিদ্ধসাধক দেশমাতৃকার কথা মনে রাখেন নি। তাঁদের ধ্যানধারণা নিখিলভুবনের আপামর সাধারণকে নিয়ে। এই গতানুগতিক নিয়মের আশ্চর্য ব্যতিক্রম ঘটেছে সিদ্ধ-সাধক শ্রীমৎ তারানাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের (তারাক্ষ্যাপা) জীবনে। তিনি বলতেন মাটি হলো মা। পরাধীন ভারতের শৃঙ্খল-মুক্ত করবার জন্যে আজন্ম ব্রহ্মচারী, শ্রীবামদেবের একমাত্র সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য ও তৎস্থলাভিষিক্ত পীঠাধীশ এবং তাঁর সাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক ব্রহ্মচারী তারানাথ ছিলেন প্রকৃতই মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষিত। তাঁর গোপন কার্যকলাপে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল দুর্ধর্ষ ইংরেজ সরকার। অধ্যাত্ম সাধনার শিখরে আরোহণ করেও যে দেশের পরাধীনতার জন্যে প্রাণ কাঁদতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তারা-

ক্ষ্যাপা। বাঘা যতীন থেকে শুরু করে নেতাজী সুভাষ পর্যন্ত সকলেই তারা-ক্ষ্যাপার সঙ্গে গভীর আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। এই মহাপুরুষ ছিলেন একান্ত অন্তর্মুখ। তাই তাঁর জীবনকথা এ পর্যন্ত আমাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। এই অভাব পূরণ করেছেন ডাক্তার অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়। ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় তারাক্ষ্যাপার ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে ছিলেন সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর।

'সিদ্ধসাধক তারাক্ষ্যাপা' গ্রন্থ ডাক্তার চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। মহাযোগী ও সিদ্ধসাধকদের অধ্যাত্ম জীবন এবং সাধনতত্ত্বের ভাবরাশি সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। তাছাড়া তারাক্ষ্যাপা ছিলেন প্রকৃতই তারামায়ের পাগল ছেলে। তাঁর জীবনকাহিনী সুগ্রথিত করে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য কর্ম। এই মহৎ কর্ম অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে সমাধা করে গ্রন্থকার আংশিক ভাবে পরিশোধ করেছেন তাঁর ঋষিঋণ।

গ্রন্থটিতে মোট উনত্রিশটি অধ্যায় আছে। এর মধ্যে পঁচিশটি অধ্যায়ে মহান সাধকের জীবনকাহিনী উপস্থাপিত করা হয়েছে। ভাষার লালিত্যে ভাবের গাম্ভীর্যে ঘটনা পরিবেশনার পারিপাট্যে সমগ্র গ্রন্থটি সুখপাঠ্য হয়েছে নিটোল গল্পের মতো। পাদটীকা অংশে সুপণ্ডিত এবং সাধক গ্রন্থকার অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বিশেষতঃ তন্ত্র-সাধনার বহু বিষয় প্রাঞ্জল করে বর্ণনা করেছেন। এই বিশাল পরিচ্ছেদটি গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। 'পঞ্চাগ্নি বিদ্যা' অধ্যায়ে গ্রন্থকার পরলোক ও জন্ম-মৃত্যু প্রবাহের স্বরূপ সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন জিজ্ঞাসু পাঠকের সামনে। 'তারানাথ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র' অংশে লেখক নেতাজী সুভাষের জীবনের এক অজ্ঞাত কাহিনী গবেষকদের সামনে এনে দিয়েছেন। ক্ষ্যাপাজী বলতেন 'জিহ্বা সংযত রাখিয়া মৌনী অর্থাৎ মুনি হতে হয়।' ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় এই আপ্তবাক্য স্মরণ রেখে গ্রন্থ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন। যদি তিনি তা না করতেন তাহলে এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জীবনের আরো অজ্ঞাত কাহিনীর আস্বাদনে আমরা পরিতৃপ্ত হতে পারতাম। ক্ষ্যাপাজীর সাংকেতিক ভাষায় পত্রগুলির মর্মব্যাখ্যা থাকলে রসগ্রহণে সুবিধা হতো। যে গবেষণাগ্রন্থ তিনি রচনা করে গেলেন তার জন্যে দেশবাসী কৃতজ্ঞ থাকবে। সুন্দর ছাপা, সুন্দর বাঁধাই ও আকর্ষণীয় চিত্রসমূহের সংযোজনে এ গ্রন্থ সকলেরই সংগ্রহ করা উচিত।

—অমিয়কুমার মজুমদার

আরো বই

লালের ডালি (কাব্য সংকলন)। মুকুল ভট্টাচার্য। বুলবুল প্রকাশনী, ২, ওয়ালিউল্লা লেন, কলকাতা-১৬। তিন টাকা।

'লালের ডালি' গ্রন্থের কবি এখনো পরিণত ভাব, ভাবনা ও প্রকাশরীতির দক্ষতা নিয়ে আসতে পারলেন না, গ্রন্থ পড়ে বোঝা গেল। কিছু আবেগ-উচ্ছ্বাস, অনেক অবান্তর কথার জন্ম দিয়েছে এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে। ছন্দ সম্পর্কে এখনো ভাল জ্ঞান তৈরী হয়নি। আরও কিছুকাল লেখার পর, ছন্দ আধুনিক কবিভাবনা সম্পর্কে কিছুটা দক্ষতা অর্জনের পর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে উৎসুক হলে ভাল করতেন।

স্তব্ধ কৃতজ্ঞতা (কাব্য সংকলন)। সুকুমার দাশ। প্রকাশকামি ১৮৯ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-১। দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

প্রায় সবই গদ্য-কবিতার ঢঙে লেখা সুকুমার দাশ রচিত 'স্তব্ধ কৃতজ্ঞতা' গ্রন্থের কবিতাগুলি। গ্রন্থের নাম কবিতা নিয়ে মোট তেত্রিশটি ছোট-বড় কবিতা আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। কবির আন্তরিকতা, বাস্তব সমাজদৃষ্টি, জীবন-ভাবনা ও সমকালচেতনা কবিতাগুলিতে ওতপ্রোত। কয়েকটি কবিতা— যেমন, আমি, পুরস্কার, স্তব্ধ কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি ভাল লাগল। কিছু কবিতা কাঁচা। সংকলন-ভুক্ত না হলেই ভাল হত।

পরলোকের প্রাঙ্গণে। হৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। তিন টাকা।

পরলোকতত্ত্বটিকে লেখক শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য সহজ সরল ও সরস ভাষায় তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ 'পরলোকের প্রাঙ্গণে'র মধ্যে ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থটির দুটি অধ্যায়—প্রথম অধ্যায়ে পরলোক ও পরলোকবাসীদের পরিচয় স্বভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইহলোকের সঙ্গে পরলোকের যোগ, পরলোকগমনে উপকার, পাশ্চাত্য দেশের অশরীরী কাহিনী, বিষয়-বাসনার আকর্ষণে বিদেহীর আবির্ভাব ইত্যাদি প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'মৃত্যু'-র প্রকৃত অর্থ, সূক্ষ্মদেহী মানুষ ইত্যাদি প্রসঙ্গ সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে। নেতাজী, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি মহামানবের ইহলোকবাস ও পর-লোক জীবন সম্পর্কিত বেশ কিছু সংবাদ এতে আছে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায়, বাস্তব-অলৌকিকের ভাবনায় ইহলোক-পরলোকের বিষয় যাঁদের চিন্তিত করে, আলোচ্য গ্রন্থ তাঁদের বিষয়-ভাবনায় কিছু নতুন উপকরণ জোগাবে বলে মনে হয়।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

ত্রিবৃত্ত (জীবন সরকার সংখ্যা)। রণজিৎ দেব সম্পাদিত। ১ ত্রিবৃত্ত সরণী। কোচবিহার ৭৩৬১০১। দাম এক টাকা।

তরুণ কবি এবং গল্পকার জীবন সরকারের সাহিত্যকৃতি নিয়ে কোচবিহারের 'ত্রিবৃত্ত' পত্রিকার শারদ সংকলনটি প্রকাশ পেয়েছে। তরুণ এই লেখকটিকে নিয়ে বহু নামী লেখকই কিছু ঘনিষ্ঠ পরিচিতি রেখে-ছেন এই পত্রিকার পাতায়। লেখক তালিকায় রয়েছেন—কৃষ্ণ ধর গৌরী আইয়ুব মৈত্রেয়ী দেবী সুশীল রায় সমীর রক্ষিত পরেশ সাহা শিশির ভট্টাচার্য কার্তিক লাহিড়ী অখিল দত্ত এবং আশিস লাহা। একটি তরুণ প্রতিভাকে তুলে ধরার প্রচেষ্টায় 'ত্রিবৃত্ত' পত্রিকার প্রয়াস অনিবার্যভাবেই স্বীকৃতি পাবে।

কিন্নর কণ্ঠ (শারদ সংকলন)। সম্পাদক অভিজিৎ সেনগুপ্ত। বামুড়িয়া। বারাসাত। ২৪ পরগণা। দাম এক টাকা।

পরিচ্ছন্ন রুচির এই পত্রিকাটিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তরুণ কবিদের বেশ কিছু কবিতা স্থান পেয়েছে। তরুণ সান্যালের কবিতাটি বিশেষভাবেই উল্লেখ করার মতো। আরও কয়েকটি ভালো কবিতা লিখেছেন—রাম বসু গৌরাঙ্গ ভৌমিক দীপেন রায় এবং সত্য গুহ।

নৈবেদ্য। সম্পাদনা সুধীরকুমার দে এবং শ্রীমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৮৭, রাজবল্লভ-সাহা লেন রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া। দাম এক টাকা।

শিশিরকুমার মাইতি এবং গৌতম ভট্টাচার্যের নিবন্ধ, বোম্বানা বিশ্বনাথম এবং মুরারি মণ্ডলের গল্প এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। ছাপা পরিচ্ছন্ন। প্রচ্ছদে একটা গ্রামীণ আমেজ আছে।

সেতুটি। সম্পাদনা অশোক চন্দ। হিজল-পুকুর। হাবড়া, ২৪ পরগণা। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

পরিচ্ছন্ন রুচির এই পত্রিকাটির শারদ-সংকলনে লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্ত বিকাশচন্দ্র দাস শুদ্ধসত্ত্ব বসু কালী-কুমার চক্রবর্তী অমিতাভ দাশগুপ্ত হর-প্রসাদ মিত্র সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যোগব্রত চক্রবর্তী বিপ্লব চন্দ এবং আরও অনেকে। বিকাশচন্দ্র দাশের প্রবন্ধটি ভালো লাগল। ছাপা ভালো। প্রচ্ছদে আরও যত্ন নেওয়া দরকার।

সাতপুরা—সম্পাদক : শ্যামল মুখোপাধ্যায়। ৩২১, পূর্ব ঘামাপুর। জব্বলপুর। মধ্যপ্রদেশ। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। মধ্যপ্রদেশের একমাত্র নিয়মিত সাহিত্য। ত্রৈমাসিক। বর্তমান সংখ্যাটি সুসম্পাদিত এবং আকর্ষণীয় রচনায় সমৃদ্ধ।

বহ্নিশিখা—সম্পাদক : তপনকুমার দাস এবং রামপ্রসাদ সরকার। মল্লিকপুর। গোবরডাঙ্গা। ২৪ পরগণা।

যুবক যুবতী

বিমল দত্ত

বাংলা নাটক ও সাহিত্য প্রসঙ্গে

বাংলা নাটক ও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যুবসমাজ অনেক বেশী উৎসাহী। কলকাতা মফস্বলে শহরতলীতে এমনকি পাড়াগাঁয়ে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী নাটকের মহড়া দিচ্ছে। বাংলা নাটককে তারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, ভালো নাটকের জন্যে তাদের চেষ্টার বিরাম নেই। প্রতিনিয়ত চলছে পরীক্ষানিরীক্ষা। অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে ক্রমেই। শারদ উৎসবে একই সঙ্গে একশ দেড়শ উপন্যাস কয়েকশ ছোট বড় গল্প এবং কবিতার সৃষ্টি সারা পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের তুলনায় এক বিস্ময়কর ঘটনা। কোন জাতির জীবনে সাহিত্য ও নাটকের অবদান অনস্বীকার্য। নাটক ও সাহিত্য তো সমাজেরই দর্পণ। জনগণের ধ্যানধারণা, জনজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-বেদনার কাহিনী মূর্ত হয়ে ওঠে নাটক ও সাহিত্যে। তাই আজকের নাটক ও সাহিত্য প্রসঙ্গে যুবকযুবতীদের চিন্তাভাবনাও এড়িয়ে যাবার নয়। এই আলোচনায় আমরা এবিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারব।

শনিবারের বিকেল। ভবঘুরের মতো ময়দানের হাওয়া খেয়ে ঘুরছি। বিকেলের ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগান সত্যি আকর্ষণীয়! সারাদিনের কাজের চাপে হাঁপিয়ে ওঠা মানবমানবীরা চান একটু খোলামাঠে বসে মনের দুটো কথা বলে বোধশক্তির সীমার মধ্যে অসীমের আনন্দ পেতে। তরুণতরুণীদের ভিড় প্রচণ্ড। কোথাও দল বেঁধে আড্ডা হাসিঠাট্টা চলছে আবার কোথাও জোড়া জোড়া কপোতকপোতী রঙিন স্বপ্নের জাল বুনে আগামীদিনের নীড় বাঁধার স্বপ্ন দেখছে। আমি একা। চারদিকে জোড় দেখেও কিন্তু খারাপ লাগছে না। মজার কথা এসব আড্ডা মজলিসে শুধু সস্তা প্রেম আর গভীর প্রেমের গল্পই হয় না; অনেককিছু সিরিয়াস আলোচনাও হয়। এমন একটা আসরে চলছে নাট্য আলোচনা। পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম কথাগুলো। বড় সুন্দর লাগছিল। একসময়ে তাদের পাশে বসেই পড়লাম।

শ্রীবিমল দত্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম-এ। হিন্দুস্থান স্টীলের হেড অফিসের কর্মী। বাংলা নাটক সম্পর্কে অত্যুৎসাহী। দীর্ঘদেহ ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স। সুপুরুষ চোখেমুখে তাঁর দৃঢ়তার ছাপ। তাঁদের আলোচনার জের টেনে জিজ্ঞাসা করলাম আজকাল নাটকে যে সেক্স-প্রবণতা দেখছি এবিষয়ে আপনার মত কি?

বিমলবাবু স্বভাববশে বিনয়প্রকাশ করে জানালেন নাটক নিয়ে সামান্য পড়াশুনা করেছি আমার বক্তব্য কতদূর ঠিক হবে জানি না। বেশ কিছুদিন হল সিনেমা বা থিয়েটারে সেক্স-এর প্রয়োগ অতিরিক্তভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন নাটক যখন সমাজের দর্পণ আর সমাজে যখন সেক্স রয়েছে তখন এর প্রয়োগ কি শিল্পে কি সাহিত্যে চলতে পারে। আবার অনেকে বলছেন সেক্স অপসংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সুতরাং এটা চলবে না।

—আপনি কোন্ দলে? জিজ্ঞাসা করি।

—আমার মতে অশ্লীল শিল্প বা সাহিত্য যা মানুষের সুপ্ত কামনা বাসনাকে জাগিয়ে তুলে মানুষের চরিত্র হনন করে তা নিশ্চয়ই কাম্য নয়। বর্তমানে আমরা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব পর্যন্ত হারিয়ে বসতে চলেছি। আমরা যেন যৌনচিত্রগুলির বা মঞ্চে নগ্ন দৃশ্যগুলির শিকার হয়ে পড়ছি। আজকাল প্রায়ই দেখা যায় বিজ্ঞাপনে (কি পত্রিকায় কি পোস্টারে) নুড্যে মিস্—। এখানে নাটকের বিষয়বস্তু বা অভিনয় মুখ্য নয় কে নুড্যে অংশগ্রহণ করবে সেটাই যেন মুখ্য।

—যুবমানসে এর প্রভাব কতখানি আপনার মনে হয়?

—আমাদের বয়সটাই এখন একটু...। তাই এসব যৌন আবেদন আদিম প্রবৃত্তির সুড়সুড়ি মনকে সহজেই কেড়ে নেয়। অথচ নগ্নতা হচ্ছে ব্যবসায়ীদের ব্যবসার একটা পণ্য। এই নগ্নদৃশ্যগুলিকে মূলধন করে প্রত্যেক ব্যবসায়ী কৃতকার্য হচ্ছেন যার ফলস্বরূপ 'এ' মার্কা ছবিগুলোর সামনে টিকিটের হুড়োহুড়ি। অবশ্য এ বালবৃদ্ধবণিতা কারো টিকিট পেতে কোন বাধা হয় না। নিয়মমাফিক 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' কথাটা থাকলেই হল।

আচ্ছা বিমলবাবু যাঁরা ভালো নাটক করছেন তাঁরা এইসব নাটকের জনপ্রিয়তা দেখে কি নিজেদের অসহায় বোধ করছেন?

—ভাল নাটক করে মানুষের মনে উন্নত রুচিবোধ জাগ্রত করার প্রাণপণ চেষ্টা অনেকেই করছেন। ভাল নাটকে ভিড় যে হচ্ছে না তাও নয়। কিন্তু সেক্সপ্রধান নাটকে অল্পআয়াসেই যে ব্যবসায়িক সাফল্য আসে সে তুলনায় অনেক নাট্যগোষ্ঠীর অনেক ভালো নাটক মার খাচ্ছে। তাঁরা স্বভাবতই যেন অসহায় বোধ করছেন।

—তাহলে এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? জিজ্ঞাসা করি।

এবার আমাদের আলোচনার নীরব শ্রোতা শ্রীগোপালমোহন মজুমদার মুখ খুললেন। 'রুচিসম্পন্ন শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। সাধারণ মানুষের জীবনের সুখদুঃখের কথাকে ভাষা দিতে হবে এমনভাবে যাতে জনজীবনের সঙ্গে বাংলা নাটকের যোগসূত্র নিবিড় হয়। তখন সুস্থ নীতিবোধ গড়ে তুলতে অশ্লীল শিল্প ও সাহিত্য অন্তরায় হবে না। মানুষের জীবনের ঘটনাগুলোকে শিল্পমণ্ডিত করে প্রকাশ করতে পারলেই দর্শকের অভাব হবে না।'

অঞ্জু ব্যানার্জী

—আপনি মঞ্চে বা চিত্রে অশ্লীলতা বলতে কি বোঝেন?

—দেখুন মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' বা 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকেও আপাতঃ-দৃষ্টিতে কিছু অশ্লীল ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। তবে কিন্তু ঐসব নাটক সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। এসব নাটকের উদ্দেশ্য ভিন্ন।

—একটু বুঝিয়ে বলুন না, অনুরোধ করি।

বিমলবাবু এতক্ষণ শুনছিলেন। এবার তিনি শুরু করলেন—ধরা যাক, ইদানিংকালে কোন নাটকে একটি অত্যাচারের দৃশ্য। সেখানে অত্যাচারী শোষিতশ্রেণীকে অতি নগ্ন কায়দায় অত্যাচার করছে। সেই দৃশ্য দেখে কিন্তু কোন যুবকের কামোন্মাদনা বৃদ্ধি পাবে না বরং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা প্রকাশ পাবে। এসব নাটকের উদ্দেশ্য সমাজের নগ্ন দিকটা উন্মোচিত করে তার বিরুদ্ধে যুবমানসকে সোচ্চার করা। অন্যদিকে তথাকথিত নৃত্যপ্রধান নাটকের উদ্দেশ্য পয়সা রোজগার করা।

বিমলবাবুর মুখেই জানতে পারলাম গ্রাম অঞ্চলে মফস্বলে নাট্যগোষ্ঠীর নানা সমস্যার কথা। তাঁরা ভালো নাটক করলেও প্রচারের অভাবে তেমন দর্শক পাচ্ছেন না। টাকার অভাব। কলকাতার হলে বই করা সম্ভব হচ্ছে না অন্যদিকে শহরতলীতে নাট্যপ্রদর্শনের তেমন ব্যবস্থা নেই। অথচ অনেক নাট্যগোষ্ঠী সম্ভাবনাময় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে। তিনি জানালেন, সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে সরকারের উচিত এইসব গ্রামীণ ছোট ছোট নাট্যগোষ্ঠীকে সুযোগ দেওয়া, সাহায্য করা।

অফিসে পাড়ায় আজকাল অনেক যুবক-যুবতীই ক্লাব পরিচালনা করছেন। নাটক করছেন লাইব্রেরী চালাচ্ছেন। অফিস রিক্রিয়েশেন ক্লাব লাইব্রেরী এবং শহরতলীর বিভিন্ন লাইব্রেরীতে তাই পাঠকের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। বাংলা সাহিত্যে যুব-সমাজের আগ্রহ লক্ষ্য করবার মতো। বিজয়পুরের শ্রীজীজা গোস্বামীর সঙ্গে আলাপ হল। বিশের কোঠায় বয়স। বি-এড পাশ করে বসে আছেন কয়েক বছর। এখন একমাত্র সঙ্গী বাংলা বই। নাটক, উপন্যাস, গল্প—সবই পড়েন তিনি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা জীজা দেবী আজকের বাংলা সাহিত্যের প্রবণতা কোনদিকে? আপনার কি মনে হয়।

একটু গম্ভীর হয়ে জীজা দেবী জানালেন—এ আলোচনা অনেক সময়নির্ভর। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সমাজের সত্যিকার দর্পণ হিসাবে বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। বাংলা নাটকে, উপন্যাসে, গল্পে, কবিতায় আজকের মানুষের প্রেম, বিরহ, সুখদুঃখ নাগরিক জীবনের সমস্যা, যান্ত্রিকসভ্যতার কৃত্রিমতা—সব দিক নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। পল্লীবাংলার সমস্যা নিয়েও বই হচ্ছে।

—এসবের মধ্যে যুবমানসের প্রতিফলন লক্ষ্য করছেন?

—নিশ্চয়ই অনেক উপন্যাস বা গল্পের নায়ক কোন বেকার যুবক কিংবা শিক্ষিত যুবক-যুবতী। সমস্যাসংকুল জীবনে দিশে-হারা তারা। কেউ পথের নির্দেশ পাচ্ছে আবার কেউ স্রোতে গা ভাসিয়ে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন পরিবেশে মানসিক দ্বন্দ্ব সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক চিত্র, তার মধ্যে জীবনসংগ্রাম সবই থাকছে।

—ইদানীং সাহিত্যে 'সেকস'এর যে প্রবণতা লক্ষ্য করছি এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

—সেকস থাকাটাই খারাপ নয়, তার প্রকাশ শিল্পসম্মত হওয়া চাই। ব্যক্তিগত-ভাবে আমি অশ্লীল সাহিত্যের বিরুদ্ধে।

—অশ্লীল সাহিত্য বলতে আপনি কি বোঝেন?

—আমি মনে করি সাহিত্য জনজীবনের অংশীদার। যে সাহিত্য জনগণকে বিপথ-গামী করে সে সাহিত্য সমাজের সঠিক দর্পণ নয়। মানুষের জীবনের ভাণ্ডার অফুরন্ত। সে ভাণ্ডার থেকে চয়ন করে শিল্পমণ্ডিত সাহিত্য রচনা কখনো অসম্ভব নয়। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, কিছু সাহিত্যিক সাহিত্য নিয়ে সস্তা ব্যবসা শুরু করে দিয়েছেন। তাঁরা জীবনের অন্ধকার দিকটার প্রকাশ এমনভাবে করছেন যে আমরা যেন 'সেকস'-এর ক্রীতদাস। জীবনে যেন আমরা 'সেকস' ছাড়া অন্য কিছু জানি না। তাঁদের সাহিত্য পড়ে রুচিবোধ গড়ে উঠছে না, বরঞ্চ আমরা অপসংস্কৃতির শিকারে পরিণত হচ্ছি।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গোবিন্দপুর গ্রামের সাধনা বোস কিন্তু এ মতের বিরোধী। তিনি জানালেন সাহিত্য হবে যুগোপযোগী। সমাজের তথাকথিত ভদ্রতার আবরু ভেদ করে সেই অন্ধকার দিকে আলোকপাত করা অশ্লীলতা নয়। বরঞ্চ এসব সাহিত্যিক অনেক ভালো কাজ করছেন। তাঁদের এই কীর্তি বিপ্লবাত্মক।

—বিপ্লবাত্মক? তার মানে?

—গতানুগতিক সাহিত্যের বেড়া ডিঙিয়ে এটা স্বতন্ত্র পথে চলছে, তাই এটা বিপ্লবাত্মক। সমাজের একশ্রেণীর লোক এসব কাজ করতে পারবেন, আর যখনই সাহিত্যে এর প্রকাশ হবে তখনই রব তুলবেন সাহিত্যে অশ্লীলতা চলবে না এটা অন্যায়।

—এ ধরনের সাহিত্য দিয়ে কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে আপনার মনে হয়?

—যুবসমাজ সমাজের এসব অন্ধকার দিকের প্রতি আরো সজাগ হবে। তথাকথিত 'ভদ্র' সমাজের প্রতি তাদের চরম ঘৃণাবোধ জন্মাবে। নিজেদের জীবনকে ঠিক পথে চালিত করতে পারবে।

বেলেঘাটার অমূল্য দাস জানালেন, বাস্তবে ঠিক হচ্ছে তার উল্টো। সাহিত্যে নাটকে এসবের প্রকাশ দেখে তারা নিজেরাই এক্সপেরিমেণ্ট চালাচ্ছে। জীবনকে যথেচ্ছ-ভাবে ভোগ করার প্রবণতা বাড়ছে। সাহিত্যে নোংরা সেকস আমদানি করে যুবমানসকে সৃজনাত্মক চিন্তা থেকে সরিয়ে এনে বিপথে চালনা করা হচ্ছে।

নদীয়া জেলার সরাটী অঞ্চলের শ্রীইন্দ্র বিশ্বাস শিক্ষক মানুষ। গল্প, কবিতা লেখেন। তাঁর বিক্ষোভ সাহিত্যে আজ স্টার সিস্টেম চলছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা ইত্যাদিতে গ্রামের ছেলেদের লেখার সুযোগ নেই।

—সাহিত্যে স্টার সিস্টেম বলতে আপনি কি বলতে চাইছেন?

—অর্থাৎ নামকরা পরিচিত মহলের লেখক ছাড়া অন্যরা লেখার সুযোগ পাচ্ছে না। অনেক পত্রিকা অফিসে পাণ্ডুলিপি না পড়েই 'অমনোনীত' ফাইলে রাখা হয়। অথচ মুখে তাদের নবীন লেখকদের উৎসাহ দেওয়ার বুলি—!

আমি প্রশ্ন করি, সব পত্রিকা কি আর একরকম? অনেক পত্রিকায় নবীন অচেনা মুখের লেখা তো বেরোয়?

—সেটা নেহাৎ ভাগ্য। আমরা বুঝতে পারি না, স্টার সিস্টেম না ভাঙলে নতুন স্টার আসবে কোত্থেকে?

দুর্গাপুরের পরিতোষ হাজরা পল্লী-বাংলা এবং মফস্বলের ছোট পত্রিকার সমস্যার কথা জানালেন। তাঁর অভিযোগ সরকারী ঔদাসীন্যে কাগজগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অথচ সে সব জায়গায় যুবক-যুবতীদের মনের কথা ছোট পত্রিকাতেই প্রকাশ পায়। আমার মনে হয় কলকাতার বড় পত্রিকাগুলো এবং সরকার যৌথভাবে চেষ্টা করে এদের বাঁচিয়ে রাখতে পারেন।

উত্তরপাড়ার সদ্যবিবাহিতা গৃহবধূ শ্রীমতী অঞ্জু ব্যানার্জি জানালেন এবার পুজো সংখ্যাগুলো ভালোই লেগেছে। তবে অনেক নামকরা সাহিত্যিকের রচনা পড়তে না পেয়ে খারাপ লেগেছে। ভালো নাটক, প্রবন্ধও পড়তে পারিনি। উপন্যাসেরই ছড়াছড়ি।

—আপনার সবচেয়ে ভালো লাগে কি পড়তে?

—উপন্যাস, আর আধুনিক কবিতা।

—কেন বলুন তো?

—উপন্যাস আর আধুনিক কবিতা গতিশীল—নতুন নতুন পথ পরিক্রমা চলছে প্রতিনিয়ত। নতুন স্বাদ নতুন কথা নতুন-ভাবে বলা—কার ভাল না লাগে বলুন?

—প্রেমের কবিতা প্রেমের গল্প? হেসে জিজ্ঞাসা করি।

—সবারই ভাল লাগে, বিশেষ করে জীবনের এ সময়ে আপনারও ভাল লাগবে। বলে মুচকি হেসে বিদায় নিলেন।

—অমর দাশ

যুবক যুবতী

চিঠিপত্র

গ্রাম বনাম শহর

গত ২০-১২-৭৪এর 'অমৃত' সাপ্তাহিকে চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীকল্লোল সরকার 'ঝংকার' সম্পাদকের চিঠিখানি পড়লাম। চিঠিখানির মধ্যে শহরের অধিবাসীদের উপর যেন বিষোদ্গার করেছেন শ্রীসরকার। তিনি অনেক প্রশ্ন করেছেন অনেক দোষ দেখিয়েছেন অনেক কিছু বলেছেন। তার সব কিছুর উত্তর লিখতে হলে এই পত্র খুবই দীর্ঘ হয়ে পড়বে। কয়েকটি কথা না বলে অবশ্য পারা গেল না।

শ্রীসরকার যদি একটু চিন্তা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমাদের দেশটি শাসন করছেন গ্রামের অধিবাসীরা। শহরের অধিবাসীরা সেই সব শাসনকর্তাদের কৃপার পাত্র। লোকসভায় এবং রাজ্যের বিধানসভায় যাঁরা সভ্য আছেন তাঁদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরাই সংখ্যায় গরিষ্ঠ। গ্রাম থেকেই বেশী সভ্য আসন দখল করে আছেন। অতএব তাঁরা যদি গ্রামের দিকে নজর না দেন তার ব্যবস্থা গ্রামবাসীরাই করতে পারেন।

শ্রীঅমর দাশ মহাশয় গ্রামাঞ্চল ঘুরে নৈরাশ্যজনক চিত্র দিয়েছেন ঠিকই তিনি যদি শহরের বস্তিতে বস্তিতে ঘোরেন তাহলে আরও ভয়ংকর শোচনীয় চিত্র তুলে ধরতে পারবেন এবং তাই দেখে স্বয়ং কল্লোলবাবুরও হৃৎকম্প হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আজ শহরের ঘরে ঘরে টি-বি ক্যানসার আলসার হরেক রকম রোগের আস্তানা। কিন্তু কাকে দোষ দেব বলুন। শহরের যুবক-যুবতীরাও অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে।

স্বাধীনতার পর অনেক পরিকল্পনা হয়েছে অনেক বড় বড় শিল্প কল-কারখানা বসেছে। সেগুলি শুধু শহরের লোক দখল করে বসেনি গ্রামের লোকও সেখানে যথেষ্ট আছে। এই পরিকল্পনার জন্য যত ব্যয় হয়েছে গ্রামের অধিবাসীরাই তার বেশী ভোগ করেছে। বড় বড় জলাধার বাঁধ সেচ প্রকল্প নতুন রাস্তা নির্মাণ নতুন রেলপথ স্থাপন বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন এসব কি শহরবাসীদের জন্য! তাছাড়া গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চাষ আবাদের জন্য নানারূপ পরিকল্পনা উপদেশ শিক্ষা বিস্তারের জন্য কি খরচ কিছু হচ্ছে না। কলকাতা শহরে একটি নতুন হাসপাতাল হয়েছে কি স্বাধীনতার পর? কিন্তু লোকসংখ্যা কতগুণ বেড়েছে তা সকলেই জানেন।

গ্রাম থেকে আগত এম-পি ও এম-এল-এগণ গত ২৫ বছরে গ্রামের জন্য ভূমি-সংস্কার জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ভূমিহীন কৃষকদের জমিদান ইত্যাদির আইন করেছেন। কিন্তু তবু কেন গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা স্বনামে বেনামে শত শত বিঘা জমি নিজেদের দখলে রেখেছেন? এটাও কি শহরবাসীর দোষ! গ্রামে ভূমিহীন চাষী জমি পাওয়ার জন্য আন্দোলন করছে এবং আমাদের গভর্ণমেণ্ট সে আন্দোলন সফল করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত শহরের কর্মহীন শ্রমিকদের জন্য বড় বড় কারখানা ও কোম্পানীর অংশ দিয়ে দেবার জন্য আইন তৈরী হল না।

আজ যদি বলা যায় শহরের লোকের অর্থে গ্রামের লোক মজা লুটছে সেটা কি অন্যায় হবে। আয়কর বিভাগে দেখুন শুধু শহরের অবস্থাপন্ন চাকুরিজীবীরা কর দিয়ে ফতুর হচ্ছেন। কিন্তু গ্রামের বহু অবস্থাপন্ন কৃষক যাদের আয় শহরের চাকুরিজীবীদের থেকে বেশী মহানুভব সরকার বাহাদুরকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছেন। আজ পর্যন্ত দেশে কৃষি আয়কর নেবার কথা কোন সভ্য বলছেন না কেননা তাঁরা তো গ্রামের এম-পি এবং এম-এল-এ।

কল্লোলবাবু বলেছেন যে 'পত্রিকা মারফৎ কোন চাকুরীর বিজ্ঞাপন জেনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে আবেদন করলেও আমাদের বিশেষ কোন লাভ নেই। এই অবস্থা শহরের ছেলেদেরও। চাকরী সকলে পায় না। কল্লোলবাবুর গ্রামের একজন বুড়ো দাদু বলেছেন—'মন্ত্রী বল এম-এল-এ বল সবার ত শহরেই আড্ডা। তাহলে আগে ত শহরের কথা। তবে ত গ্রাম। কিন্তু সত্যই কি শহরের উন্নতি হয়েছে? তাই যদি হত তাহলে কলকাতা একটা নরককুণ্ড কেন?

কল্লোলবাবু জানাচ্ছেন—স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শিলান্যাস করলেন অথচ হাওড়া-আমতা ব্রডগেজ রেল লাইনের ভবিষ্যৎ কি! পাতাল রেল কোথায়! কলকাতার দ্বিতীয় হুগলী সেতুর কাজের অগ্রগতি কিরূপ! অতএব সেই প্রবাদটি মনে রাখা দরকার...... 'না আঁচালে বিশ্বাস নেই।'

কল্লোলবাবু লিখেছেন—'গ্রামের যুবক-যুবতীর মধ্যে শতকরা আশীজন যখন বুকের রক্ত ঢেলে ফসল ফলায় তখন গ্রামের সেই যুবক-যুবতীরা ঘরে বসে মাইলো চিবোয় সজনের পাতা সিদ্ধ করে খায় শালুকের মূল কাঁচা চিবোয় আর শহরে রেশনে চাল অথবা গম বাড়ানোর আবেদন মঞ্জুর হয় কেন?' উনি বোধ হয় জানেন না যে কলকাতার লোক পচা অখাদ্য আতপ চাল রেশনে পায়। গ্রাম বাংলার চাল চোরাপথে এসে কলকাতার লোকের পকেট খসিয়ে নিয়ে যায়। এই চোরাচালানের জন্য কারা দায়ী? গ্রামের লোক নিশ্চয়। তার মধ্যে আছে জোতদার আর বড় বড় কৃষক। কেন গ্রামের জোতদাররা চাল মজুত করে গ্রামবাসীদের খেতে দেয় না? এর জন্য শহরের লোকের কি করার আছে!

শেষের দিকে কল্লোলবাবু অনেক প্রশ্ন করেছেন। যেমন—কেন গ্রামে ভাল মাস্টার আসে না? কেন গ্রামে একজন ভাল ডাক্তার আসে না? কেন গ্রামের যুবক-যুবতী (অধিকাংশ)-দের গায়ে পরনে জামা-কাপড় জোটে না? ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক 'কেন'র উত্তর উনি একটু চিন্তা করলেই পেয়ে যাবেন। শহরের বুকে লাখ লাখ টাকা খরচ করে যে পূজোগুলো হয়, তাতে কি শহরবাসীর আন্তরিক সাড়া আছে? অনেকের কাছে এই পুজোগুলি ভীতি স্বরূপ এবং এর থেকে রেহাই পাবার জন্য অনেকে শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। তবে কেন এই পুজো! এর পিছনে কি কোনো কোনো রাজনৈতিক উস্কানি নাকি কিছু লোকের ফালতু রোজগারের মতলব?

একটা কথা আমরা ভুলে যাই। সেটা শুধু আমরা পাঠ্য-পুস্তকেই পড়ি কিন্তু কাজে লাগাই না—'সেলফ হেলপ ইজ দ্য বেস্ট হেলপ'—

জগতে কেউ কারো উন্নতি করাতে পারে না। মন্ত্রীদের বুলি নেতাদের বাণী ও উপদেশ—সব শুকনো কথা তাতে চিড়ে ভেজে না। নিজেদের উদ্যমই হল প্রকৃষ্ট পথ। আজ জাপান ইউরোপ আমেরিকা যে উন্নতি করেছে তা দেশবাসীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল নিজেদের উদ্যোগে। সরকারী উদ্যোগে নয়। আমাদের দেশে সরকারী উদ্যোগ মানে জনসাধারণের অর্থের অপচয়। কলকাতার স্টেট ট্রান্সপোর্ট তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

শিশিরকুমার পাল
আদ্রা, পুরুলিয়া।

যুবহতাশা

গত ৩রা জানুয়ারী সাপ্তাহিক অমৃতে যুবক-যুবতী বিভাগে প্রকাশিত 'যুবহতাশা' নামক সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটি পড়ে ভাল লাগল। কেন যুবমন হতাশায় ভরে যায়? এর জন্য কারাই বা দায়ী? এর সমাধানই বা কি? এসব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আরও সাক্ষাৎকারে রচনাটি পূর্ণাঙ্গ হলে আরও ভাল লাগত।

শ্রীমান সন্তোষ রায়ের মন্তব্য পড়ে এইটুকু বুঝেছি তিনি এখন জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাহীন। বেকারীর অন্ধকারে দিশেহারা ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে অন্ধকার। পরীক্ষা? সে তো জুয়োচুরি! আর ওসব সার্টিফিকেট দিয়ে কিছু হবে না। সত্যি কথা বলতে কি শ্রীমান সন্তোষ রায়ের মন্তব্য পড়ে মনে হলো এ যেন শুধু শ্রীমান সন্তোষ রায়ের মন্তব্য নয় আমাদের সমাজের সামগ্রিক যুবক-যুবতীর মনের একটা নিখুঁত ছবি তিনি তাঁর মন্তব্যের মধ্য দিয়ে বেশ পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

যুব মনে এত হতাশা কেন? এজন্য দায়ী কারা? আমার মনে হয় এজন্য

আমাদের সমাজ অনেকাংশে দায়ী। এ সমাজকে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়তে হবে। সমাজের কুচক্রী স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে। পরিবেশকে সুন্দর শোভন আকারে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে (শুধু শহরে নয় গ্রামেও) নতুন কল-কারখানা বসাতে হবে। ব্যাপকভাবে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস প্রথা চালু করতে হবে। তাহলে এর অনেকটা সমাধান আশা করা যায়। কারণ একটার সঙ্গে অন্যটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বেকারী ঘুচলে যুব মনের হতাশা অনেক কমে যাবে।

সবিতা রায় শ্যামলী বসু সন্ধ্যা রায় স্বপন সেন ও শুভ্রা ব্যানার্জী সবাই হতাশার রোগে ভুগছেন। শ্রী আর চক্রবর্তী তাঁর পরিশ্রমের তুলনায় পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না। এসব পড়ে খুব দুঃখ লাগে। এঞ্জিনীয়ার তরুণ ভাদুড়ী একজন সামান্য কেরানী। ভিকটোরিয়া কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ষোড়শী শ্যামলী বসুর মতে মেয়েরা নাকি অনেকাংশে পরাধীন। তাঁর কথা অবশ্য কিছুটা সত্যি। এও সত্যি যে আমাদের সমাজ এখনও অবাধ মেলামেশার মত উপযুক্ত স্থান হয়ে ওঠেনি।

স্বপন সেন একজন শিক্ষিত বেকার। সে চায় পরিশ্রমের বদলে একটু মানুষ হয়ে বাঁচার অধিকার। কিন্তু তা তাঁর জীবনে হয়তো হয়ে উঠবে না। প্রেমিকাকে সে তার ভালবাসা হয়তো জানাতে পারবে না। জীবনসঙ্গিণীরূপে গ্রহণ করা তাঁর যেন কোন অধিকার নেই। কিন্তু কি দোষ তাঁর? এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? অনেক জায়গায় দেখা গেছে প্রেমিক প্রেমিকা হয়তো আত্মহত্যা করেছে। কারণ অবশ্য হতাশাই বেশী। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ হতাশা আসে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ফলে।

সুরেন্দ্রনাথ মহিলা কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী শিখা দাসকে বিয়ের কথা বললে তিনি সমাজের রাজপুত্তুরদের কথা উল্লেখ করলেন। কথাটা অবশ্য ঠিক। যাঁরা বায়না আর দাবীর বহর নিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন তাঁরা তো এক একজন রাজপুত্তুরই বটে। আরও তিনি বললেন, আমাদের মত কালো মেয়ের বিয়ে হওয়া কি কম কথা!

ভাবতে অবাক লাগে কালো মেয়ের যে সৌন্দর্য থাকে লাবণ্য থাকে তারাও যে গৃহকর্মে নিপুণা নম্রস্বভাব ও চরিত্রগুণে সুন্দরী হয়ে উঠতে পারে একথা আমাদের সমাজের হয়তো কেউ ভেবে দেখেন না। পণ প্রথাও যুবতী মেয়েদের হতাশার আরও একটা কারণ।

কার্তিক দত্ত
সম্পাদক—'বিশালাক্ষী'
খোলাপোতা, ২৪ পরগণা।

(২)

আপনাদের বহুল প্রচারিত ও বহুপঠিত সাপ্তাহিক পত্রিকার উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লক্ষ্য করে যারপরনাই উল্লসিত হচ্ছি। পত্রিকায় যুবক-যুবতী বিভাগের সংযোজন নিঃসন্দেহে পত্রিকার বৈচিত্র্য তথা আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। ৩রা জানুয়ারী '৭৫ সংখ্যার 'যুবহতাশা' শিরোনামায়ুক্ত লেখাটি মধ্যবিত্ত সমাজের যুবক-যুবতীদের এক বড় অংশের মনের প্রতিফলন একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। তামাদী-হয়ে-যাওয়া বস্তা-পচা এই শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর সংগত কারণেই যুবক-যুবতীদের বিরূপতা আসা স্বাভাবিক। যে শিক্ষা বাঁচতে শেখায় না, যে শিক্ষা অর্জিত জ্ঞানকে হাতে-কলমে প্রয়োগে বিন্দুমাত্র সাহায্য করে না, সে শিক্ষা-ব্যবস্থায় আকাট মূর্খেরও পণ্ডিত বনে যাওয়ায় বাধা নেই, কিংবা যে শিক্ষা মানুষে মানুষে গড়ে তোলে দুস্তর ব্যবধান—সে শিক্ষাকে শিক্ষা-শিক্ষা খেলা কিংবা নেশার রকমফের বলতে বাধা কি? যুবক-যুবতীদের জীবনের মূল্যবান কয়েকটা বছর এই নেশায় আটকে রেখে যখন বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন তারা হয় স্বাভাবিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে অথবা অদৃষ্টবাদের অসহায় শিকারে পরিণত হয়।

এ নেশায় মজলে 'পাড়ানির কড়ি' অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের সহজ সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা সীমিত জেনেও মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেমেয়েদের এ নেশায় আসক্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কেননা এ খেলা এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দেয়। অনেকের কাছেই এই সোনালী ভবিষ্যতের ছবি মরীচিকার চেহারা নিলেও কেউ কেউ তো 'মামার জোর' ছাড়াই শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উদার হস্তে বিলিয়ে দেওয়া কয়েকখানা কাগজের জোরেই জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাই পাশ করার উপর মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেমেয়ে তথা তাদের গুরুজনদের এত ঝোঁক। তাই তারা তাদের সমস্ত ন্যায়-নীতিকে বিসর্জন দিয়ে এই কাগজের দু'চারটে হস্তগত করার দুরন্ত নেশায় মসগুল।

তাদের প্রয়াস বোধগম্য। কিন্তু নীতি-বাগীশ সেই সব রাজনীতিবিদগণ এবং সেই নিয়ম আঁকড়ে থাকা শিক্ষকমহাশয়রা কি লক্ষ্য করছেন না— তাঁরা কিভাবে ক্ষতি-সাধন করে চলেছেন যুবসমাজের তথা দেশের ভবিষ্যতের। এই শিক্ষার নিগড়ে বেঁধে রেখে একদিকে তাঁরা যুবজনের মনে বপণ করছেন হতাশার বীজ, অন্যদিকে তাদের করে তুলছেন নীতিহীন ও উচ্ছৃংখল। এই ভাবেই তাঁরা দেশের ভবিষ্যত নাগরিক তৈরীর কঠিন দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

স্কুলের শেষ পরীক্ষা 'স্কুল ফাইনাল' হল কি 'হায়ার সেকেণ্ডারী' থাকল তাতে কিছু আসে যায় না, যদি না তাতে ছাত্রদের সত্যিকারের স্বাবলম্বী করে তুলতে পারে। কিন্তু এর বদলে তারা যদি— কয়েকটা কাগজের লোভে সুবিধাভোগী নেশাগ্রস্ত অসামাজিক, অসহায় হয়ে সমাজের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকে তার চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর কিছু নেই। তাই শিক্ষার আমূল সংস্কারের আশু প্রয়োজন। এ পরিবর্তনের ধরণ কিরকম হওয়া দরকার সেটা সুধীসমাজ নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ভালই জানেন। তবু যদি তাঁরা দেখেও দেখব না, শুনেও শুনব না নীতি অনুসরণ করতে চান তো করুন। কিন্তু তাঁরা জেনে রাখুন, ইতিহাস কারো তোয়াক্কা করে না। ইতিহাসের কাঠগড়ায় তাঁদের উঠতেই হবে।

রত্না সেনগুপ্তের 'মহিলারা এখনও সেই তিমিরে' এর ওপর লেখাটায় মেয়েদের কোলে ঝোল টানা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও— শ্রীমতী সেনগুপ্তার যুক্তি বাস্তবনির্ভর— একথা মানতেই হবে।

অরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিরাটী, কলিকাতা-৫১।

নেশা ও মাদকতা

'নেশা ও মাদকতা' শিরোনামা দেখে খুব ঔৎসুক্যের সঙ্গে শ্রীঅমর দাশের 'নেশা ও মাদকতা' (অমৃত, ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৭৪ 'যুবক যুবতী' বিভাগে : ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা) পড়তে শুরু করলাম। আশা ছিল, সমসাময়িক পটে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ জীবনে বিভিন্ন সময়ে নেশা ও মাদকতা বিষয়ক যে সমস্ত ঘটনা ঘটে (অনেক ক্ষেত্রে মর্মান্তিক), তাদের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে কিছু জানতে পারব। কিন্তু রচনাটি পড়া শেষ করে মনটা হতাশায় ভরে গেল। আলোচনার বহুলাংশে শহুরে কেন্দ্রিকতা আবেগপ্রবণতা রয়েছে, অথচ যুক্তিপূর্ণ তথ্য কম এবং অসম্পূর্ণ।

প্রথমত :— শ্রীদাসের আলোচনার ভূমিকায়—কলকাতায় যুবক-যুবতীদের অবসর বিনোদের নয়নাভিরাম তীর্থভূমিগুলোকে—'কৃষ্ণ সাগরের বালুকা বেলার' সঙ্গে তুলনা করার কোন যুক্তি আছে বলে আমার মনে হয় না। কিংবা বাঁধ ভাঙা হাজার হাজার তরুণ সকলেই যে এই কল্পিত সাগরের পাড়ে আছাড় খেয়ে পড়ছে এমন চিত্রও আমার সন্ধানি দৃষ্টিতে আমি কখন দেখিনি।

দ্বিতীয়তঃ :— শ্রীঅনিল হাজরা এবং অধ্যাপক শ্রীমজুমদার বোধহয় খবর রাখেন না অবাধ নেশা ও মাদকতার ফলে পশ্চিমী

মানুষও আজ নিয়ত ভুগছে অবসাদে ও অশান্তিতে। কারণ যুবক-যুবতীদের এই অবাধ নেশা ও মাদকতা থেকে আসছে অবাধ যৌন উপভোগের আকাঙ্ক্ষা এবং সেখান থেকে তাদের (যুবক-যুবতীদের) মধ্যে আসছে চুরি ছিনতাই, নরহত্যা, আত্মহনন এবং যৌন রোগ। অবাধ উপভোগের ফলে যুবক-যুবতীদের যৌন রোগের বৃদ্ধির হিসাব হল ঃ নিউইয়র্কে পাঁচ-শ পারসেন্ট। সানফ্রান্সিসকোতে গত দু-বছরে দু-গুণ বেড়েছে লসএঞ্জেলস-এর অবস্থা তথৈবচ (এই সব সংখ্যার মধ্যে আবার হিপ্পিরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ)। সুতরাং ওয়েস্টার্ন সোসাইটিও আজ ইম-ব্যালান্সড্।

তৃতীয়ত ঃ—চারুচন্দ্র কলেজের ছাত্র শ্যামল দাস, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের ছাত্রী সুপ্তা সেনগুপ্তা এবং কুমারী রাধা সরকারের মন্তব্যে সত্যতা থাকলেও মেডিকেল কলেজের ডাক্তার সাহার মন্তব্যে শুধু অসত্য নয় আমাদের সমাজকে সম্পূর্ণভাবে হেয় করার চেষ্টা হয়েছে। ডাক্তার সাহাকেই প্রশ্ন করি, কোথায় কবে দেখেছেন? — কোন প্রকৃত গরীব যুবক-যুবতী অভাবের (দৈন্যের) জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ড্রাগ মেনড্রেকস এল. এস. ডি. সোনারিল লেপটিন খায়? এবং ডাক্তার সাহার মনে রাখা উচিত ছিল যে আমাদের সমাজের শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থান করে।

চতুর্থ ঃ— শ্রীমতী শুক্লা রায়ের বর্ণিত 'কিশলয়' ঠিক যেন হিন্দি ফিল্মের নায়ক। শ্রীমতী শুক্লা দেবী কি হিন্দি সিনেমার খুব ভক্ত? তবে শ্রীমতী রায়ের পরের মন্তব্য— 'হিন্দি সিনেমা, ইয়াংকি কালচার বন্ধুদের উস্কানি আর এসব ওষুধের সহজলভ্যতাই এইসব ছেলেদের নেশায় অভ্যস্ত করার জন্য দায়ী'—অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও মূল্যবান, যেমন বর্তমানে বোম্বের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে যে সমস্ত হিন্দি ছবি প্রকাশিত হচ্ছে সেই সমস্ত ছবির সংখ্যাগত দিক ও গুণগত দিক এক করা বড়ই কষ্টকর ব্যাপার। বরং বলা যায় বোম্বে ফিল্ম নিশ্চিতভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে সংখ্যাগত দিকেই ঝুঁকে রয়েছে। বোম্বে ফিল্ম দর্শকদের (শতকরা ৬০ ভাগ-এর) মনের উপর এমন কতকগুলি পরিবেশ উপস্থাপিত করে চাপ সৃষ্টি করে যে তারা (উল্লিখিত দর্শকরা) সঠিক কোন পথ খুঁজে না পেয়ে ক্রমশঃ মনুষ্যত্বের অবলুপ্তি ঘটিয়ে নিম্ন অভিমুখে যেতে শুরু করে এবং অ্যামেরিকা এই বোম্বে ফিল্ম সংস্থাকে ব্যবসাগত দিকে লক্ষ্য রেখে যত স্থূল ধরনের ছবি দান করছে ততই তার ফল স্বরূপ আমাদের মধ্যে গড়ে উঠছে শ্রীমণ্ডল বা জগদীশবাবুর হতাশা সূচক মন্তব্য।

কল্লোল সরকার,
সম্পাদক, 'ঝংকার'
২৪ পরগণা।

বনফুলের গল্প

সুসাহিত্যিকের হাতে পড়লে সাহিত্য যে কত সুন্দর, গভীরতাপূর্ণ ও অর্থবহ হয়, তার প্রমাণ পেলাম 'অমৃত'-এর বিনোদন সংখ্যায় প্রকাশিত বনফুলের 'ব্যবধান' শীর্ষক গল্পটির মধ্যে। গল্পটির জন্য শ্রদ্ধেয় বনফুলকে অশেষ ধন্যবাদ জানালাম ও তার সঙ্গে অমৃতের পাতায় প্রকাশের জন্য আপনাকেও আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। স্বল্প পরিসরে অত্যন্ত কম কথায় কত গভীর জিনিস ভাষা-নৈপুণ্যে কত সহজে প্রকাশ করা যায়—বনফুলের এই গল্পটি তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আজকের বেশির ভাগ গল্প-লেখকদের দেখি বড্ড বেশি বকতে, ফেনিয়ে ফেনিয়ে এক কথা বার বার বলার মধ্যে আসল বক্তব্যটাই দেখি হারিয়ে যেতে। এবং এর ফলে পাঠকের মনে কোনই দাগ বসে না সাহিত্যের মাধ্যমে—পাঠককে দেখি যে-খেই ধরে সে এগোচ্ছিল তা থেকে বার বার হারিয়ে যেতে! পরে গল্প পাঠ করে নিজের মনে পাঠককে বলতে দেখি—'বাঁচা গেল, অনেক কষ্টে গল্পটা শেষ করা গেল।'

আজকের সমাজচিত্র বনফুল যেভাবে স্বল্প কথায় তাঁর এই 'ব্যবধান' গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন তা' সত্যিই অতুলনীয়। মানুষ আজ তার মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত আছে সামান্য কিছু অর্থের খাতিরে! মানুষের আজ কি অধোগতি! এভাবের গল্প সাহিত্যিকদের মারফৎ প্রকাশিত হোক, সকল পত্র-পত্রিকায় বিশেষভাবে, যাতে এই কলমের খোঁচায় আজকের মানুষ তার হারানো বিবেক বা চেতনাকে ফিরে পায় ও সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠে। 'পেন ইজ মাইটার দ্যান দ্য শোর্ড'—একথাটা প্রমাণ করবার জন্য সাহিত্যিকরা যেন উঠে-পড়ে লাগেন এটুকুই আমার বক্তব্য। সমাজকে বাঁচানোর গুরুদায়িত্ব তো তাঁদেরই।

বারিদবরণ ঘোষ,
'মণ্ডন' [illegible], [illegible]পাড়া, চুঁচুড়া।

পুনশ্চ প্রসঙ্গে

গত ২০শে ডিসেম্বর '৭৪ সংখ্যার 'অমৃত'-তে—কৃপণক রচিত 'পুনশ্চ' শীর্ষক রচনায়—কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের রচিত শ্লোকগুলি পড়ে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

বিস্মিত এই কারণে যে— আজ বিজ্ঞান ও সভ্যতার কল্যাণে আমরা অনেক নতুন ওষুধ আবিষ্কার করেছি। অনেক গুরুতর রোগও এখন উন্নত চিকিৎসার দ্বারা দূর করা যাচ্ছে, কিন্তু যখন এত আয়োজন ছিল না, কিন্তু প্রয়োজন ছিল তখন সেই প্রাচীনকালেও, শরীর সুস্থ ও নীরোগ রাখার জন্য কি অপূর্ব বিধান ছিল।

কবিরাজ রামচন্দ্র মহাশয়ের রচিত শ্লোকগুলি অনুসরণ করলে কাউকে সহজে ডাক্তার ও অষুধের সাহায্য নিতে হবে না বলে আমার ধারণা।

এ জাতীয় আরো রচনা 'অমৃত'র পাতায় দেখতে চাই এই দাবী জানিয়ে ও আবারও আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

মৃণাল বণিক,
দুর্গাপুর-৪ বর্ধমান।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

অমৃত-এর ১৪ বর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅমল সেনগু[illegible] পত্রটি আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। শারদীয় অমৃত-এ প্রকাশিত শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধের বিবরণ সম্পর্কে শ্রীসেনগুপ্ত যে সংশয় প্রকাশ করেছেন তার জবাবে জানাই, শরৎচন্দ্রের ৫৭-তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে 'শরৎ বন্দনা' নামে দেশব্যাপী যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সে সময় শরৎ বন্দনা কমিটির উদ্যোগে 'শরৎ বন্দনা' নামে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্রকে নিবেদিত সমকালীন সাহিত্যিকবৃন্দের শ্রদ্ধার্ঘ এই গ্রন্থে সংকলিত হয়। সংকলন গ্রন্থটিতে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও ভারতী সম্পাদক সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়—তিনজনের প্রবন্ধেই 'বড়দিদি' ভারতীতে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যে তা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে কথার উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ প্রকাশের কালে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই জীবিত ছিলেন, এমন কি অসিতকুমার হালদারও। কখনও কেউই এ প্রসঙ্গে কোন প্রশ্ন তোলেন নি। সুতরাং, শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বিবরণ যে সঠিক সে বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।

সমীরকান্তি বিশ্বাস
মহাবোধি ভবন, কলকাতা-১

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

TO MOTHER

Come on the wings of sleep
Grave or with a smile.
Come ere the hushed tide neap
Or tangling thoughts beguile

তন্দ্রার পাখায় এসো রমা,
নিথর৷ বা মৃদুহাসিবরে,
যবে মৌন আনন্দলহরী
অশান্ত চিন্তারা ভ্রান্ত করে।

Out from a planet's gloom
All aspects call to thee,—
Life is our stirless tomb
Light on our darkened sea.

ধরার আঁধার দীর্ণ করি
প্রতি ভাব ডাকে মা তোমায় :
ভূগর্ভে—নিস্পন্দ প্রাণ যত,
আলোক—সিন্ধুর তমসায়।

শ্রীঅরবিন্দ শতমুখে প্রশংসা করতেন চ্যাডউইকের এক স্বপ্নপ্রতিমা লিলিয়ার উদ্দেশে লেখা কয়েকটি অপরূপ কবিতা যাকে ইংরাজীতে বলে dream come true তাই অবান্তর মনে হলেও এ-কবিতাগুচ্ছকে প্রেমের কবিতাকে বলা চলে আত্মিক (psychic) প্রেরণায় লেখা। আমি নিচে মাত্র তার একটি কবিতার শেষ স্তবকের উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

Your name is fading music upon
my worship's mouth;
It spills in languorous fragrance
from lillies of the South;
It is the odorous night-flower
wherewith your locks are
bound. —
Or the moon-pale soul of roses
caught in a mesh of sound.

ক্ষীয়মান মূর্ছনার মতন নামটি তোমার
কাঁপে পূজার অধরে আমার:
দক্ষিণে যে-লিলি ফোটে তার মন্থর
সুবাস ঝরে উচ্ছলসম্ভার:
ছড়িয়ে আছে সেই রজনীগন্ধার
সুগন্ধ তোমার কান্ত কুন্তলে :
কিম্বা গোলাপের পান্ডুর হিয়ার মতন
যে ধরা দেয় ঝঙ্কার অমলে'

চ্যাডউইকের সঙ্গে দিনের পর দিন আলোচনা করতাম নানা ইংরাজ কবির কাব্য ছন্দ নিয়ে। ছন্দ যে অনিন্দ্যনীয় হয়ে উঠেছিল শ্রীঅরবিন্দেরই দেশনায়—বিশেষ করে ইংরাজী কোয়ান্টিটেটিভ ছন্দ। এ-ছন্দের নানা মধুর মিড় (euphony) তার সূক্ষ্ম শ্রুতির কাছে ধরা দিত যার ফলে তার কবিতা এত প্রাণস্পর্শী তথা সুকুমার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার কাব্যের গুণগানে এখানে সমাপ্তি টেনে ফিরে আসি স্মৃতিচারণে—কী ভাবে সে পুরোদস্তুর ইংরাজ হয়েও হিন্দু যোগের রসজ্ঞ হয়ে উঠেছিল।

তাকে তার আত্মীয়-স্বজন ক্রমাগত ডাকত বিলেত থেকে। কিন্তু সে প্রায়ই বলত :

"My die is cast, Dilip, I can't look back any more, for I don't find life in Europe worth while"

(আমার নিয়তি ফিরে চাইতে মানা করে আমাকে—পাশ্চাত্যে জীবন আমার কাছে মনে হয় না বরেণ্য)। তাকে পরম দিশা দিয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম বাণী—সে প্রায়ই উদ্ধৃত করত তাঁর একটি চিঠি :

It is especially difficult for the Christian to be of a piece, because the teachings of Christ are on quite another plane from the consciousness of the intellectual and vital man trained by the education and society of Europe —the latter, even as a minister or priest has never been called upon to practise what he preached in entire earnest. But it is difficult for human nature anywhere to think, feel and act from one centre of true faith, belief or vision. The average Hindu considers the spiritual life the highest, reverses the **sannyasi**, is moved by the bhakta; but if one of the family circle leaves the world for spiritual life, what tears, remonstrances, lamentations. It is almost worse than if he had died a natural death. It is not conscious mental insincerity—they will argue like Pundits and quote **shastra** to prove you in the wrong it is unconsciousness, a vital insincerity which they are not aware of and which uses the reasoning mind as an accomplice.

"That is why we insist so much on sincerity in the Yoga—and that means to have all the being consciously turned towards the one Truth—the one Divine. But that is, for human nature one of the most difficult of tasks, much more difficult than a rigid asceticism or a fervent piety. Religion itself does not give this complete harmonised sincerity—it is only the psychic being and the one-souled spiritual aspiration that can give it."

আর্জব প্রায়ই বলত গুরুদেব কী চমৎকার লেখেন—কী গভীর, ঋজু, প্রাঞ্জল—কোথাও কি অস্পষ্টতার লেশও আছে? বলত : 'তিনি শুধুই আলো ঝরান তাপকে পাশ কাটিয়ে—ঠিক যেমন তাঁর আশ্চর্য ঋষিনেত্র!'

কিন্তু তবু ওর মুখে প্রায়ই বিষাদের ছায়া দেখতাম। জিজ্ঞাসা করলে হেসে উড়িয়ে দিত বলত : 'বিষাদ নয় দিলীপ, তবে জগতের যে-রূপশ্রী চোখে পড়ে দিনের পর দিন—আনন্দকে ঠাঁই দিই কোন্ কল্পনার আরামবাগে বলো তো?' বলে দেখিয়েছিল দুটি কবিতা (POEMS. 285-6) —শেষেরটির নাম 'শ্বেত বিহঙ্গ'। মিসটিক কবিতা—শেষের স্তবকে ছিল :

O running of Light in the
Silence,
O silvery morning star,
May the Dawn be the word-
less answer
Of a beauty no loss can mar.

(নিথরের বুকে তুমি কে আলো উধাও!
রুপালি প্রভাতী শুকতারার ঝঙ্কার!
উষা যেন হয় তব অপরূপ শ্রীর
অনির্বচনীয় সাড়া, নাই ক্ষয় যার।)

আর্জবের POEMS -এর প্রাক্‌কথনে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বড় সুন্দর ভাষ্য দিয়েছেন তার দৃষ্টিভঙ্গির তথা প্রকাশসুষমার। তার শেষ দুটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেই এ-অধ্যায়ের সমাপ্তি টানি :

"The mere literary critic will admire the delicate dream-like beauty of these poems, but unless his insight is more than merely literary, he will go no deeper, for

* চ্যাডউইককে শ্রীঅরবিন্দ নাম দিয়েছিলেন 'আর্জব'। এই নামে তার ৩২৯টি কবিতা POEMS নামে লণ্ডনে ছাপা হয়েছিল ১৯৫০ সালে—
John M. Watkins 21 Cecil Court London W.C. 2:
দার্শনিক বুদ্ধিবাদী মনীষীর যোগী ও কবিরূপে নবজন্ম হয়েছিল বলেই তার প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি।

they deal with the mysteries of the inner life and only he who can read their symbols will be able to penetrate to their heart. For Arjava, as shown in the poem entitled **Correspondences**, Nature was a shrine in which each form seen in the flickering firelight of the senses was a shadow of realities that lay within, shining in the magical light of the secret Moon which was the Master-Light of all his seeing, the central image of so many of his poems.

In the midst of our personal sadness at his early departure let us remember that this Path is one which leads through many worlds and that, as Sri Krishna said, **nehabhikrama naso'sti**, for him who treads it there can be no loss of effort."

অর্থাৎ, যাঁরা কেবলমাত্র সাহিত্যের সমালোচক তাঁরা এ-স্বপ্নালু কবিতাগুচ্ছের পেলব সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে পারেন কিন্তু যদি সাহিত্যের চেয়ে আরো গভীরের ডুবারি হতে না পারেন তাহলে ঐ পর্যন্তই হবে তাঁদের বোধের পরিধি—কেন না এ-কবিতাগুলির উপজীব্য—মানুষের অন্তর-জীবন, তাই যাঁরা প্রতীকের তাৎপর্যের অনুধ্যান করতে সক্ষম কেবল তাঁরাই শুনতে পাবেন এ-সব ভাবের অন্তর্গূঢ় বাণী। আর্জব প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মন্দিররূপে—যে-মন্দিরে ইন্দ্রিয়ের চঞ্চল-আলোয়-দেখা প্রতি রূপায়ণকেই দেখে-ছিলেন তিনি এক আন্তর সত্তার প্রতিবিম্বরূপে। তাই তিনি চাক্ষুষ করে-ছিলেন যে, প্রতি রূপই এক নিহিত চন্দ্রের প্রভায় দীপ্ত। এই অলোক চন্দ্রই ছিল তাঁর অন্তর্দর্শনের পরা প্রভা, তাঁর নানা কবিতারই কেন্দ্রীয় প্রতিভাস।

তাঁর অকালমরণের জন্যে আমাদের ব্যক্তিগত বিষাদকে কাটিয়ে উঠতে হলে আমাদের মনে রাখা চাই যে, এ-জীবন বহু জগতের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে এসেছে। মনে রাখা চাই কৃষ্ণের অভয়বাণী যে, নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি— এ-পথের পথিকের কোনো প্রচেষ্টাই বিফল হতে পারে না।

(৬ই জুলাই, ১৯৩৯)

(চব্বিশ)

১৯২৮ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত একটানা পণ্ডিচেরি থেকে মনে হল—আত্মীয়-স্বজনের ডাকে একবার কিছুদিনের জন্যে সাড়া দিলে মন্দ কি? এ আট বৎসরে শতাধিক বাংলা গান বেঁধেছিলাম সেগুলি কেবল আশ্রমের সীমিত চক্রের মধ্যে গেয়ে মন তৃপ্ত পাচ্ছিল না। তাই আরো চাইলাম সাড়া দিতে বাইরের বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধে। এ-সাড়া চাওয়া মানে যে প্রশংসা চাওয়া তা জানতাম কিন্তু এ আট বৎসরে আমার মধ্যে অনেক মতিগতির রূপান্তর হলেও আমার কবি-সুরকার-সাহিত্যিক অভিমান বেশ সজাগ ছিল—আরো এই জন্যে যে আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অনামী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদী কবিতা সমেত। শ্রীঅরবিন্দ একটি পত্রে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন লিখে যে, প্রায় প্রতি শিল্পীর মধ্যেই ঘুপটি মেরে বসে থাকে এক গণনেতা যে চায় যশ, মান করতালি জয়ধ্বনি মাল্যতিলক। যে যোগী হতে চায় তার এসব চাওয়া চলবে না—কেন না তাকে চাইতে হবে শুধু ভগবানের সেবক হতে মানুষ বা শিল্পের বাহন হতে চাওয়া তার পক্ষে হবে পরধর্ম।

("Every artist—there are rare exceptions—has got something of the public man in him, in his vital physical parts, which makes him crave for the stimulus of an audience, social applause, satisfied vanity, fame etcetera. All that must go absolutely if he wants to be a yogi and his art a service not of man or his own ego but of the Divine."

কিন্তু আমি নিজেকে বোঝালাম যে আমি যখন স্বধর্মে আস্থিত যোগী (শ্রীঅরবিন্দ একটি পত্রে আমাকে উপাধি দিয়েছিলেন "born Yogi"), যখন আমি কেবল ভাগবতী গীতিই গাই কবিতা ও গল্পেও শুধু ভাগবতী কথাই বলি তখন এত ভয় করার কী আছে—বিশেষ যখন স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ রয়েছেন আমার রক্ষাকবচ? 'হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার'—ভোলা মন! চল তুই কপাল ঠুকে গান গেয়ে যা অনুক্ষণ।

মনে মনে জানতাম অবশ্য যে যোগপন্থী হয়ে ফের সামাজিক মেলামেশা গানবাজনার স্রোতে গা ভাসিয়ে চললে শেষটায় হয়ত দেখব—নীল মোহানায় না পৌঁছে অজান্তে এসে পড়েছি কোনো শূন্য হাটের আঘাটায়— কে বলতে পারে? মনের জোর? হায় রে, আমি কি স্বামী বিবেকানন্দ না রামতীর্থ? তবে এক ভরসা—ভুল-ভ্রান্তি অনেক করলেও ভাবের ঘরে চুরি করেছি খুব কম আর যখনি করেছি এমন মনঃকষ্ট পেয়েছি যে সে-সাজা ভুলিনি কোনোদিনই।

এই রকম বকম বকম করে শেষটা কুহু-ধ্বনি করে উঠলাম:

যে পেয়েছে গুরু তোমার আশিস প্রীতি,
প্রবাসেও সে তো রবে না একেলা আর:
যেথা যাবে পাবে তোমাকেই প্রাণে নিতি

বেসুরোয়ও শুনি প্রেমের বাঁশি তোমার।

মনকে আশ্বাস দিলাম: 'ভোলা মন, ইংরেজী বাংলায় মিলিয়ে তুই তিন-চার শো কবিতা লিখেছিস—আর অভয় পেয়েছিস বলে গেয়েছিস আনন্দের রাগমালা—তবু ইতস্তত—যাবো কি যাবো না—পরীক্ষায় ফেল করলে কী গতি হবে...এই সব দুশ্চিন্তা? 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'! বলেন নি কি ঠাকুর গীতায়?'

---

* শ্রীঅরবিন্দের এ চিঠিটি অনামী-তে প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম সংস্করণে।

বলা বাহুল্য শ্রীঅরবিন্দও আশ্বাস দিলেন: মা ভৈঃ। ফল—সোজা কলিকাতা-প্রয়াণ—পিতৃতুল্য মেজমামা মহানন্দে ট্রেন ভাড়া পাঠালেন।

(পঁচিশ)

কলকাতায় এসেই পড়ে গেলাম গানের আবর্তে। এখানে গান ওখানে গান, সেখানে গান, রেডিও গ্রামোফোন সভা-সমিতি—ভাগ্যক্রমে সে সময়ে টেলিভিশন আসেনি এদেশে তাই রগ ঘেঁষে বেঁচে গেছি—এ হৃসনীয় পুতুল নাচে নাচতে হয়নি সেজেগুজে।

কিন্তু সত্যিই ভালো লাগত সেই সব আসরে গান গাইতে যেখানে শ্রোতারা শুধু গান শুনতে চান না গানের মাধ্যমে তাঁর কথা শুনতে চান যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন 'গানের ওপারে।' এই সব আসরে প্রায়ই গাইতাম 'বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম'—আর বিপুল সাড়া পেতাম উদ্বেল হৃদয়ের চোখের জলের, ভক্তির উচ্ছ্বাসের। তখন মনে মনে প্রণাম করতাম গুরুদেবকে—আর মন কেমন করত। তবু এমনিই মানুষের মন যে গুরুদেব সুদূরে হলেও নানা শ্রোতা ও শ্রোত্রীর সাড়ায় আনন্দ পেতাম বৈকি। সাধে কি গুরুদেব সাবধান করে দিয়েছিলেন—জনগণমনের করতালি চেও না, গেয়ে চলো! কিন্তু ঠাকুরকে উদ্দেশ করে—জনতার চিত্ত-রঞ্জন করতে, মঞ্চে উঠে মাল্য তিলকের পুরস্কার পেতে নয়। মন মাঝে মাঝে ধমকাত—কারণ আমি গুরুদেবের তিরস্কার অনেক সময়েই ভুলে যেতাম, সব বুঝেও অবুঝের মতন সেই সব ছোট সুখ আত্ম-প্রসাদ উচ্ছ্বাসে মনকে রাঙিয়ে তুলতাম যাদের রং ধোপে টেঁকে না। দেখতাম নিজের মধ্যে দুটি রূপ পাশাপাশি [illegible] করছে। এ বলছে: 'এসবই [illegible] খেলা', ও বলছে: 'কতকটা বটে কিন্তু জীবন তো শুধু নির্মায়িক বিজনতার পীঠ নয় নানা অশ্রু-হাসি আলোছায়া হারজিৎ উদয়-অস্তের রংগমঞ্চও বটে। আমরা চাই দুঃখকে পাশ কাটিয়ে একটানা সুখের কারবার চাই বিরহের আঁধারকে দাবিয়ে মিলনের দেয়ালি চাই ছায়াহীন আলো কাঁটাহীন গোলাপ বন্ধন-হীন মুক্তি। জীবনে সবই চলচঞ্চল তাই চাই এমন আনন্দধাম যেখানে চপলা অচলা প্রেম—নিষ্কাম স্বপ্নও জাগরণের মরুতে ফুলবাগান বসায়। কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে—আমি লিখতে বসেছি এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের স্মৃতিচারণ তাঁর কাছে কী পেয়েছি তার সুখবর দিতে—দুঃখ-সুখের দ্বৈতলীলার ব্যাখ্যা করে দার্শনিক উপাধি পেতে নয়। আমি জিজ্ঞাসু তীর্থযাত্রী মাত্র কেবল সদ্গুরুর কৃপায় দিশা পেয়েছি মায়াকুঞ্জবাসী সোনার হরিণের পারে এক দিশারি পরশমণির যার ছোঁওয়ায় বিফলতার পতিত জমিতেও সোনা ফলে?

(ক্রমশঃ)

পারিস, রোম, নিউইয়র্ক ওয়াশিংটন লণ্ডন ঘুরে ফ্যাশন যখন আরব সাগর পাড়ি দিয়ে ভারতের মাটিতে এসে পৌঁছয়, তখন প্রায়শই পশ্চিমে নতুন ফ্যাশন, নতুন হুজুগ শুরু হয়ে যায়। কারণ ফ্যাশনের হাওয়া এদেশে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে কেটে যায় বারোটি মাস, পুরো একটি বছর। পুরো একটি বছর আগেই বর্তমানে কলকাতার বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার ইয়াসমিন আরিফ ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়েছেন। ইরানের এই মহিলা ফ্যাশন ডিজাইনিং-এর প্রফেশান গ্রহণ করেছেন অন্ততঃ পাঁচ বছর আগে। স্থানীয় একটি বিউটি পারলারে কাজ শিখতেন। সেখান থেকে সোজা স্টেটস্-এ। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের ট্রেণিং। ট্রেণিং কমপ্লিট করে সেখানেও একটি বিউটি পারলারে কাজ করেছেন। বিউটি পারলারে অবশ্য তিনি ফ্যাশন ডিজাইন করেননি। বিউটিশিয়ান হিসেবে কাজ করেছেন। ফ্যাশন ডিজাইনার-এর ট্রেণিং শেষ করার পর বিউটিশিয়ানের ট্রেণিং নিয়েছেন এক বছর। তারপর হঠাৎ ভারতে কেন?

শ্রীমতী আরিফ হাসতে হাসতে বললেন দ্যাটস এ ভেরী নাইস কোশ্চেন .....কেন যে ভারতে এলাম তা আমি নিজেই জানি না। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার একজন ইণ্ডিয়ান বান্ধবী জুটে গিয়েছিল। সে আমায় অনুরোধ করল। আমিও চলে এলাম। ইচ্ছে আছে জানুয়ারী মাসে দেশে ফিরে যাব। এই এক বছর সময়ে আমি দেখলাম এখানে ফ্যাশন ডিজাইনিং এর বিরাট ফিল্ড। অনেক কাজ পড়ে আছে। বিশেষ করে কলকাতায়। এখানকার মেয়েরা মোটেই সচেতন নন। কি রকম ড্রেস করলে ভাল দেখাবে সেটা জানা নেই। কোন্ সময়ে কোন পোষাক পরলে ভাল দেখাবে তাও জানা নেই। রংয়েও ফ্যাশন আছে।

রূপ সজ্জা

এ বছরে লাল তো ও বছরে কমলা, এ বছর কালো মোজা তো ও বছর সাদা লেস। আমরা অনেক সময় হাতেকলমেও কাজ করি। দরকার হলে করতে আপত্তি কি। তবে এ বিষয়ে যাঁরা বিখ্যাত পোষাকের দোকান চালান তাঁরাই উদ্যোগী হবেন। নিত্য নতুন কাট-ছাঁট, নতুন ফ্যাশনের প্রবর্তন, রীতিমত ক্রিয়েটিভ ব্যাপার। অনেকটা নেশার মত কাজ করি আমরা। আমাদের ইচ্ছে করে দেশে দেশে ঘুরে সব জায়গায় মেয়েদের দেখি।

ফ্যাশনের জন্ম ফ্রান্সে। আর সেই নবজাতক তৎক্ষণাৎই ছুটতে শুরু করে সারা ইউরোপে। প্যারিসের পরেই ফ্যাশনেবল বলে নাম আজকাল ইতালী এবং রোমের। অনেক ফ্যাশনের জন্ম আজকাল রোমেই হচ্ছে। জার্মাণীর মেয়েরাও ফ্যাশনের জন্যে তাকিয়ে থাকে ফরাসীদের দিকেই। আমেরিকার নিউ ইয়র্কেও ইদানীং নিত্য নতুন ফ্যাশন। ইউরোপের মেয়েরা সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে সাগর পারের এইদিকে।

লেটেস্ট ফ্যাশন কি?

ঃ গত কয়েক বছর ধরে ফ্যাশন চলছিল মিনি-র। জামার ঝুল ছোট হতে হতে এমন পর্যায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, যারপর আর যাওয়া যায় না। এক সময় আমেরিকায় বলা হত মিনি হাই, ম্যাক্সি হাই। মানে হচ্ছে মিনি মিনি করে পাগলামি করা আর ঠিক হবে না। ফ্যাশন এখন একটু চেঞ্জ চাইছে। এ তো খুবই স্বাভাবিক। কারণ মিনি যতদূর যাবার গেছে আর কোথায় যাবে। কয়েক বছর আগে থেকে আমেরিকায় মিনি-র ঝুল বাড়াতে শুরু করেছে। ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী ও লণ্ডনেও। আমরা যারা ফ্যাশন ডিজাইন করি তারা কিন্তু এতেও খুশী নই, ঝুল—আরো, আরো নামাতে চাইছি। ফ্রান্সে মিডি ফ্যাশন পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে। মিডি অর্থাৎ

মিডল। এ রকম পোষাক এখানেও চলছে। বম্বে এবং দিল্লীতে তো তাই দেখেছি। ফ্যাশনের ব্যাপারে কলকাতা ভীষণ ব্যাকওয়ার্ড।

'মিডি' ফ্যাশন সম্পর্কে আরেকটু বলুন।

ঃ মিনি আর ম্যাক্সি বেশ কিছুদিন ধরে রাজত্ব করল। ম্যাক্সি যেন মেয়েদের সনাতন নারীত্ব আর মহিমাসুলভ ব্যক্তিত্ব এনে দেয়। 'মিনি' দুষ্টুমি, সেক্সি ভাব আনে। এই চপলতা আর সেক্স তো তারুণ্যের প্রতীক। ফ্যাশনের চিরাচরিত প্রশ্নের উত্তর বোধহয় 'মিডি'। মিডির জন্ম বেশী দিনের নয়। ইতিমধ্যেই এই মন-মোহন রংয়ের পোষাক জনপ্রিয় হয়েছে। আমার মতে মিডি হচ্ছে ভীষণ কমফোর্টেবল এবং এলিগ্যান্ট। এই নবতম পোষাক হচ্ছে হাঁটুর বেশ কিছুটা নিচে, পায়ের মাঝামাঝি —অনেকটাই তিরিশ দশকের মতন।

বিউটিশিয়ান হিসেবে আপনার কাছে পোষাক পরিচ্ছদের গুরুত্ব কতখানি।

ঃ শুধুমাত্র সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের পোষাক পরিচ্ছদ পরলেই হল না। তার জন্য চাই সুন্দর ফিগার। ফিট না করলে কোনো কিছুতেই ভাল লাগে না। স্লিম হতে হবে। প্রতিদিন ম্যাসাজ করাতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটাই নিজের ওপর নির্ভর করে। এইট্টি পার্সেন্ট নিজের ওপর। টুয়েন্টি পার্সেন্ট আমরা হেল্প করতে পারি। ডায়েটিংএর ব্যাপার সম্পূর্ণই নিজের ওপর। অনেকে আছেন ওয়েস্টার্ন প্রথায় ডায়েটিং করেন। সেটা মস্ত ভুল। ডায়েটিং করতে হবে একান্তভাবে ভারতীয়

রূপ সজ্জায়

প্রথার। এ-ছাড়া আছে ফিগারেট প্রথা। অনেকের ধারণা বয়সের ভার মেদের বাহুল্য বাড়িয়ে দিচ্ছে। অথবা গ্রন্থিগুলোই দৈহিক স্থূলতার জন্য দায়ী। ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই তা নয়। পৃথিবীর শত-করা আটানব্বই জন লোক মোটা হয়ে যান প্রয়োজনাতিরিক্ত আহারের দরুন। পরিশ্রম আর গৃহীত খাদ্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকা উচিত। মেদবহুল অসুন্দর দেহকে সুন্দর করে তুলতে কিছু যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। 'হেলথ ওয়াকার' এমনি একটি যন্ত্র। এর ওপরে পনেরো মিনিট হাঁটা মানে পাহাড়ী চড়াই-উৎরাই ভেঙে এক ঘণ্টা হাঁটার সামিল। ম্যাসেজ বেড-এর ওপর শুয়ে পড়লে আপনার স্নায়ুগুলো মেন্ডে হবে। রোয়িং কাঁধ হাত, বুক, পা আর তলপেটের ব্যায়ামের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। এর জন্য কষ্ট করে জলাশয়ে যাবার প্রয়োজন হয় না একটা ঘরে রাখা যন্ত্রের ওপর বসেই তা করা যায়। এমনকি প্রয়ো-জন মত জলের চাপ নিয়ন্ত্রিত করা চলে। 'ভাইব্রেটর বেল্ট'-এর ব্যবহার দেহে অনা-বশ্যক মেদের বাহুল্য কমিয়ে দেয়। রোলার ব্যবহার করলে হাত, পা, উরু পশ্চাৎদেশ তলপেট আর কোমরের মেদের বাহুল্য কমে যায়। সবশেষে স্টীম বাথ। এসবের সঠিক ব্যবহার হলে দেখতে ভালো লাগবে নিজেকে এবং পছন্দমত পোষাক-পরিচ্ছদ পরলে আপনাকে পরী না হোক বেশ দেখাবে। যথাসম্ভব ক্যাসুয়াল ড্রেস পরবেন। আমার বিশেষভাবে পছন্দ ইন্ডিয়ান [illegible]।

—স্বপনকুমার ঘোষ

উপন্যাস

মেঘ বাঁচার

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

[বৃদ্ধ বঙ্কিম দত্ত অমিয়কে নিজের হাতে করে মনের মত গড়েছেন। কিন্তু এক এক সময় তাঁর মনে হয় সেই অমিয়ও যেন কেমন পাল্টে যাচ্ছে। তার কথার প্রতিবাদ করে নিজের মতকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করে। যেন মনে হয় অমিয় তাকেই অস্বীকার করবার চেষ্টা করছে ইদানীং। অমিয়, তার স্ত্রী নীহার সবাই যেন কেমন এড়িয়ে চলতে চাইছে। সংসারের ওপর কর্তৃত্ব হারাচ্ছেন যেন তিনি। তবু একসময় নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে অমিয় বা তার স্ত্রী নীহার নয়, তাদের বংশধরদের আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চান বঙ্কিম দত্ত।

নাতি রঞ্জুকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখেন। তাকে নিজের মত করে গড়তে চান।

কিন্তু সেই রঞ্জুই দাদুর ব্যবহারে বিস্মিত। বাবা অমিয়র এক গরীব পুরনো বন্ধু তাদের বাড়িতে আসায় দাদুর অবহেলা এবং উষ্মা প্রকাশ দেখে তার খুব খারাপ লাগল। না হয় দাদু সারা জীবন জজিয়তি করেছে আর তার বাবা বার-এ্যাট-ল। আর ঐ লোকটা ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া মানুষ। রঞ্জুর এটা ভালো লাগে নি।

সেদিন তার সঙ্গে বাবার বাল্যবন্ধু, যাঁর নাম রুদ্রেন্দু, দেখা হবার পর অদ্ভুত লাগছিল। যত দেখছিল ততই ভাল লাগছিল তাকে।

রঞ্জু ভাবল, পৃথিবীতে তাহলে এখনও এমন একজন দুজন মানুষ আছে যাঁদের কাছে সারাদিন বসে থাকতে ভাল লাগে আর কান পেতে তাঁদের গল্প কেবল শুনে যেতেই ইচ্ছে করে।]

।। বারো ।।

এই মানুষকে এক কাপ চা—কাপ কোথায় ভাঁড়, ছোট মাটির ভাঁড়ে একটু-খানি চা খাইয়ে কি খুব বেশি কিছু করে ফেলেছে সে!

মোটেই না।

নিজের কাছে খারাপ লাগছে তার।

অন্তত সঙ্গে একটি কেক খাওয়ান উচিত ছিল না কি। ছোট দোকান হলেও কাচের বয়ামে বেশ বড় বড় কেক ছিল। সুজির বিস্কুটও যেন ছিল। সেই কখন, প্রায় সূর্য ওঠার আগে বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়েছেন। সব তো শুনল রঞ্জু। তারপর বাড়ি ফিরবেন বেলা কটায় তার ঠিক নেই। দমদম কি এখানে। খিদে পাওয়া স্বাভাবিক।

আর খিদে যে পেয়েছে তখন ভুট্টা খাওয়া দেখেই রঞ্জু বুঝতে পেরেছিল।

হুঁ, খুবই খারাপ লাগছে তার। কাজেই এখন রঞ্জু মনে মনে ঠিক করল, কেবল দেশলাই না, বিড়ি যেমন খান সিগারেটও তিনি খান নিশ্চয়। সেই আমলে যাঁরা স্বদেশী-টদেশী করতেন তাঁরা নাকি একদম সিগারেট খেতেন না। যাদের স্মোক করার অভ্যেস থাকত তাঁরা বিড়ি টানতেন। যেমন পাতলা মিলের ধুতি না পরে মোটা খদ্দর পরতেন। আর খুব করে নাকি চরকা ঘোরাতেন। চরকা ঘুরিয়ে সুতো কাটতেন সারাদিন।

তিনি কোনোদিন চরকা ঘোরাননি।

তাঁর বাবা সতীশ বাড়ুয্যের ছিল চরকার সুতো কেটে স্বদেশী করার নেশা।

তাঁর বাবা সতীশ বাড়ুয্যের ছিল একেবারে ভিন্ন। বলে তিনি টিপে টিপে খুব হাসছিলেন। বেশ রগড় করে কথাগুলি বলছিলেন।

হুঁ, কথা প্রসঙ্গেই বোমা পিস্তলের সঙ্গে চরকা খদ্দর বিড়ি ইত্যাদি ব্যাপার-গুলিও এসে গিয়েছিল। কান পেতে রঞ্জু শুনেছে। এসব কিছুই তার জানার কথা নয়। কবে দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার আগের ঘটনা। সে তখন জন্মায়ও নি।

শুনতে শুনতে সব কিছু স্বপ্নের মতন ঠেকছিল তার।

এখনও ঠেকছে।

ঠিক এই সময় এখন বেলা বারোটা বাজে, কর্নেল সিম্পসনকে মারতে বিনয় বাদল দীনেশ রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঢুকে পড়েছিল।

উঁহু, তাদের পরনে হেঁটো খদ্দরের ধুতি ছিল না মাথায় গান্ধী-ক্যাপ ছিল না। ছিল দামী ইউরোপীয়ান পোশাক। তা না হলে দারোয়ান গেট-এর কাছে আটকে দিত যে তিনজনকে।

স্বপ্নের ঘোর নিয়ে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরের মধ্যে রাস্তা ক্রশ করে রঞ্জু, সিগারেট বিড়ির দোকানটার দিকে ছুটছে। দেশলাইয়ের সঙ্গে দুটো নতুন উইলস-ফ্লেক কিনে তাঁকে খেতে দেবে সে ঠিক করে ফেলল। নিশ্চয় তিনি আপত্তি করবেন না। এই সঙ্গে নিজের পকেটের সিগারেটটা সে দিতে পারত। দুমড়ে মুচড়ে গেছে। ওটা দেওয়া চলত না। পকেট থেকে ওটা ফেলে দিয়ে তার মনটা হালকা ঠেকছিল।

কিন্তু এই মানুষকে দশ নয়ার এক ভাঁড় চা ও দুটো উইলস-ফ্লেক খাওয়ান কি যথেষ্ট হল!

তাঁর জন্য আরও কিছু করতে পারলে রঞ্জুর ভাল লাগত। আরও কিছু করা উচিত।

তাই বলো। এখন জলের মতন জিনিসটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

তার বুকের ভিতর প্রচণ্ড জ্বালা আক্রোশ দুঃখ ও সেই সঙ্গে কুণ্ডলী পাকান ধোঁয়ার মতন রাশি রাশি গ্লানি জমতে লাগল। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। রুদ্রেন্দু খারাপ ছেলে, কুপথগামী। তার সঙ্গে অমিয়কে, সুপ্রিয়কে মিশতে দিও না। তা হলে এই দুটো ছেলেও গোল্লায় যাবে উচ্ছন্নে যাবে। তাদের লেখাপড়া হবে না। মানুষ বলে লোকের কাছে কোনোদিন পরিচয় দিতে পারবে না চিরকাল মাথা হেঁট করে চলতে হবে। সেই সঙ্গে বঙ্কিমবাবুও লোকের চোখে ছোট হয়ে যাবেন। এমন যে কৃতী পুরুষ, ম্যাট্রিক জেনারেল-স্কলার, ল' পরীক্ষায় ফার্স্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে মুন্সেফের চাকরি—হাজারে কটা ছেলে এমন হয় রঞ্জুও শুনেছে

বংকিম দত্ত আগে মুন্সেফ ছিল পরে জজ হয়ে জাঁদরেলি করে—কাজেই এমন জ্ঞানী-গুণী, নামী মানুষের সন্তান দুটি মূর্খ হয়ে থাকবে সতীশের ছেলে ও তার দলের আরও পাঁচটা বখে যাওয়া ছেলের সঙ্গে মিশে অমিয় সুপ্রিয় গোল্লায় যাবে, জীবনটাকে নষ্ট করবে. শুধু কি তাই বোমা পিস্তল নাড়াচাড়া করে পুলিশের খাতায় যদি একবার নাম ওঠে সেদিক থেকেও বংকিমবাবুর নিজের কত ভয় কত অসুবিধে. সরকারী চাকরি তাঁর পদোন্নতির পথ চিরকালের জন্য সীলড হয়ে যাবে—হয়তো চাকরিই থাকবে না। সুতরাং সাবধান সাবধান—বাড়ির ত্রি-সীমানায় রুদ্রেন্দুকে বা তার কোনো বন্ধুকে ঘেঁষতে দেবে না—

অমিয় ও সুপ্রিয়র ওপর সারাক্ষণ কড়া নজর রাখ। হুঁ, সুপ্রিয় এখনও বাচ্চা। তা হলেও তো ছেলে দুদিন পরেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে—চারদিকে যেমন বিচ্ছিরি কাণ্ডকারখানা আরম্ভ হয়েছে সুতরাং রুদ্রেন্দুর সঙ্গে তো নয়ই, বাইরের কোনো ছেলের সঙ্গেই এদের দুজনকে মিশতে দেবে না। যতক্ষণ স্কুল স্কুলে—তারপর সারাক্ষণ ঘরে আটকে রাখ, দরজায় তালা দিয়ে রাখ। ঘরে বসে লেখাপড়া করুক কি গল্পের বই পড়ুক কি খেলাধুলো করুক বা পড়ে পড়ে ঘুমোক যা খুশি করুক কিন্তু বাইরে ঘোরাফেরা নয়, কারো সঙ্গে মেলামেশা নয়।

কথাগুলি বলার সময় রুদ্রেন্দু যদিও হাসছিলেন। লজ্জায় দুঃখে রঞ্জুর মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল। মুখটা কালো হয়ে গিয়েছিল তার।

চা শেষ করে মাটির ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে তিনি ঠাট্টা করে বলছিলেন, "আর একটা বোমা ফাটালাম হে'—ঠাট্টাটা কাকে? নিশ্চয় ঐ বুড়ো বংকিম দত্তকে—কেননা এখনও রুদ্রেন্দুকে বুড়োর ভয়. রুদ্রেন্দু সেদিন তাদের বাড়ি যেতে বুড়ো যেমন চেহারা করেছিল। আর রঞ্জুর বাবা যখন রতনকে চা দিতে ডাকে—ওফ ভাবা যায় না, কী অভদ্র নির্লজ্জের মতন ব্যবহার করেছিল আশী বছরের লোকটা।

না এতকাল রঞ্জু প্রায় কিছুই জানত না। একটু-আধটু শুনেছিল, এই পর্যন্ত। এখন ভাল করে শুনল।

এখন সব জানল। এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে বুড়োকে তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে ক্ষুদিরাম কুপথগামী ছিল, তাই তোমাদের অত বড় হাইকোর্টের সামনে ঘটা করে আজ তার স্ট্যাচু বসান হয়েছে বুঝেছ দাদু। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বিনয় বাদল দীনেশ উচ্ছন্নে গিয়েছিল গোল্লায় গিয়েছিল, আর তাই তাঁদের সম্মান দেখাতে তাঁদের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে ডালহৌসী স্কোয়ারের নাম পাল্টে এখন বিনয় বাদল দীনেশ বাগ করা হল, বি বি ডি বাগ। আর একটা ষণ্ডাগুণ্ডা মূর্খ চাটগাঁয়ের মাস্টারদা সূর্য সেন—তার নামেও কলকাতায় রাস্তা হয়ে গেল। সেই গোল্লায় যাওয়া ছেলেদের একজন রুদ্রেন্দু এমন কত কত বকাটে সেদিন—

—এই রঞ্জু!

থমকে দাঁড়াল সে।

ঝকঝকে রোদ্দুরে তিনটি মুখ।

তিন জোড়া চোখের পাতা কাঁপছে। ঠোঁটে হাসি।। দ্রুত শ্বাস পড়ার দরুণ নাসারন্ধ্র স্ফীত হচ্ছে, সঙ্কুচিত হচ্ছে পরমুহূর্তে।

—কোথায় চললি দল বেঁধে সব। হাসতে গিয়ে রঞ্জু অবশ্য হাসতে পারল না। একটা অস্বস্তি দেখা দিল তার তাকানোর মধ্যে। যেন ঠিক এই সময় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা না হলে ভাল লাগত তার।

—কোথায় আবার যাব! তোর কাছে গিয়েছিলাম আর কি। তোকে খুঁজছি।

—বাড়ি গিয়েছিলি?

—হ্যাঁ, অমিত থুতনি ঝাঁকাল। শুনলাম তুই চুল কাটতে বেরিয়েছিস:

—কে বললে!

—কে আবার বলবে শোভেন মাথা ঝাঁকাল। দারোয়ানের মতন সারা দিন গেট আগলে বসে থাকে কে?

—অ দাদু, দাদু বলেছে!

—হ্যাঁ বলেছে মানে কি, দেখলাম ফায়ার হয়ে আছে বুড়ো তোর ওপর। পার্থ খুক করে হাসল। তোর কথা জিজ্ঞেস করতেই কেমন না গরম হয়ে উঠল। বললে কেন, কি দরকার ওকে এখন?

—তারপর!

—ঐ যা হোক একটা মিছে কথা তক্ষুনি বানিয়ে বলতে হল আর কি। শোভেন শব্দ করে হাসল।

—কি বলেছিলি! একটা ঢোক গিলে রঞ্জু মুচকি হাসল। এক সেকেণ্ডের জন্য যদিও। তক্ষুনি আবার গম্ভীর হয়ে গেল।

—বললাম একটা বই আছে ওর কাছে। ফেরত নিতে এসেছি।

—কি বই জিজ্ঞেস করল?

—না।

অমিত বলল, বইয়ের কথা জিজ্ঞেস করবে কি। ছুঁচলো চোখ করে বুড়ো বার বার আমাদের মাথার চুল দেখছিল।

—তারপর। আবার একটা মুচকি হাসি রঞ্জুর ঠোঁটে উঁকি দিয়ে তখনই মিলিয়ে গেল। বলল, তোমরা এত বড় বড় চুল রাখ কেন তাই না?

—না, তা বলল না। মুখে বলল না, তবে যেমন করে না তিনজনের মাথার দিকে তাকাচ্ছিল — বুঝলাম বুড়ো আমাদের কাউকেই খুব একটা পছন্দ করছিল না।

—কেন তোদের তিনজনকেই তো দাদু চেনে, তোরা কিছু আজ নতুন যাস নি অম্বুজা নিলয়ে।

—হ্যাঁ, চেনে তো বটেই। অমিত ঘাড় বেঁকাল। আমায় বলল তুমি ক্যাপ্টেন গুহর নাতি না! পার্থকে বলল, তুমি তো আমাদের বালিগঞ্জ প্লেসের বিখ্যাত মানুষ—মিনিস্টারের ভাইপো। শোভেনকে বলল তুমি ডকটর গাঙ্গুলীর ছেলে তোমাকেও আমি চিনি।

—মানে বাজিয়ে দেখল আর কি।

কদিন যাচ্ছিস না তোরা তাই চেহারার গোলমাল হচ্ছিল—বুড়ো হয়ে রোজই চোখের তেজ কমে আসছে কিনা।

—মানে তোর দাদুর কেবল ভয়, রঞ্জুর চোখে চোখ রেখে পার্থ হাসল। এই বুঝি রঞ্জু রকবাজ বকাটে ছোঁড়াদের সঙ্গে মিশে গেল। তাই না?

অস্পষ্টভাবে রঞ্জু মাথা নাড়ল।

—হুঁ তারপর কি বলল দাদু!

—বলে কি বাড়ি নেই, দু ঘন্টা আগে সেলুনে চুল কাটতে গেছে, এখনো ফেরার নাম নেই রাস্কেলটার।

—সেলুন ফাঁকা পেলে তো চুল কাটব। মিনমিনে গলায় রঞ্জু বলল।

—কেন এক্ষুনি চুল তোর কাটার হয়েছে কি। অমিত তার থুতনিটা নাচাল। খুব একটা বাড়ে নি তো তোর চুল। রঞ্জুর মাথায় হাত বুলোল সে।

—কি বলব আক্ষেপের সুরে রঞ্জুর। বুড়োর মাথায় পোকা ঢুকেছে। এখুনি আমাকে নেড়া না করে ছাড়বে না।

—ঐ বুড়োটুড়োরা এমন বলেই, বলল আর তুইও কিনা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছিস নেড়া হয়ে যেতে. কী ছেলে রে বাবা। শোভেন অবাক হবার চেহারা করল।

—তা এখন কোথায় চললি শুনি? পার্থ ভুরু কুঁচকালো।

এক সেকেণ্ড চিন্তা করল রঞ্জু। সিগারেট-বিড়ির দোকানটা কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ল চায়ের দোকান ঘন্টা দুয়েকের মত এই সময়টায় বন্ধ থাকে সে জানে কিন্তু সিগারেট-বিড়ির দোকান—

—কি হল, পার্থ এবার রঞ্জুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়। তার চোখ অনুসরণ করে রাস্তার ওপারে বিড়ি-সিগারেটের দোকানটা দেখল সে। ওই দোকানে যাচ্ছিস নাকি! একটা ক্লেকটেক খাওয়াবি?

—না ভাই, এখন আমি বাড়ি যাব। মিথ্যা কথা বলতে হল রঞ্জুর। তাছাড়া আমার সঙ্গে পয়সাও নেই।

—ভ্যাট শোভেন ধমক লাগাল। রঞ্জুর প্যান্টের পকেটে চাপড় মারে। এই তো অনেক পয়সা ঝনঝন করছে রে।

—মাইরি, চুল কাটার পয়সা। রঞ্জু কুঁকড়ে যায়, করুণ চোখে তাকায়। দাদু টায় টায় হিসেব করে দিয়েছে।

—ছেড়ে দে শোভেন। পার্থ বিরক্ত হয়। তারপর রঞ্জুর চোখে চোখ রাখে। অনুকম্পার দৃষ্টি পার্থর। আমরা খাওয়াব। খাবি? রঞ্জুর কাঁধ ধরে সে ঝাঁকুনি দিল।

রঞ্জু হঠাৎ কথা বলে না। লজ্জা পায়। পার্থ দুদিন তাকে সিগারেট কিনে খাইয়েছে অস্বীকার করবে কেমন করে। শোভেন একদিন খাইয়েছে। অমিত অবশ্য আজও খাওয়ায় নি। কিন্তু এই পর্যন্ত রঞ্জু কাউকে একটা চারমিনারও খাওয়াতে পারে নি। এমন গোনাগুনতি পয়সা আনে সে বাড়ি থেকে।

—আয়। পার্থ তার হাত ধরে টানতে গেল। আমি আজ আবার তোকে খাওয়াব। গোল্ডফ্লেক খাবি?

—না ভাই রঞ্জু অনুনয়ের চোখে পার্থর মুখটা দেখল। ভিড়ের জন্য চুল কাটা হল না। এখন বাড়ি না ফিরলে দাদু আস্ত রাখবে না।

—ওফ! তোর দাদুই তোর বারোটা বাজিয়ে দেবে দেখছি। পার্থ বলল।

—আমি হলে এমন দাদুকে চা-কফির সংগে খুব করে স্লিপিং ট্যাবলেট খাইয়ে সারাক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রাখতাম।

—এই বয়সে বেশী ট্যাবলেট খাওয়ালে —অমিত হেসে ফেলল, বুড়োকে আর চোখ খুলতে হবে না।

—না, খুলত চোখ পার্থ ঠোঁট মুখ বেঁকাল। আমি তাই চাইছিলাম। এমন একটা দাদু সারাক্ষণ শকুনের মতো কাঁধে চেপে থাকবে, এদিক-ওদিক ঘাড় ফেরাতে দেবে না সিনেমায় যেতে পারবে না লুকিয়ে এক-আধটা সিগারেট খাওয়া চলবে না—ভাবা যায়! আমি হলে এমন দাদুকে ঠিক মেরে ফেলতাম, নয়তো নিজে একদিন সুইসাইড করতাম।

অসহায় টলটল চোখে রঞ্জু পার্থকে দেখছিল। তার বন্ধুদের মধ্যে পার্থই সবচেয়ে সুখী। সারাক্ষণ ডাকচাপ দিতে, চোখে চোখে রাখতে দাদুটাদু বলতে কেউ নেই ওর। কাকা মিনিস্টার ব্যস্ত মানুষ। বাবার প্ল্যাস্টিক গুড্সের কারখানা। ব্যস্ত মানুষ। অনেক পয়সা ওদের। বালিগঞ্জ প্লেসের এতটা জমি জুড়ে রাজবাড়ির মতন বিশাল বাড়ি। ওদিক দিয়ে লোকে হাঁটলেই হাঁ করে তাকিয়ে পার্থদের বাড়িটা দেখে।

—শোন, এবার শোভেন রঞ্জুর কাঁধে হাত রাখল। একটা দারুণ ইমপর্টেন্ট কথা আছে তোর সঙ্গে, তাই তোকে খুঁজছিলাম।

—সেটা পরে হবে, আগে ওকে জিজ্ঞেস কর শীল্ডের ফাইন্যাল খেলা ও দেখতে চায় কিনা। বেশ রাগের সুর পার্থর যেন রঞ্জুর দিকে ভাল আর তাকাতে ইচ্ছে করছে না। শোভেনের সঙ্গে কথা বলছে।

—হ্যাঁ, শোন, রঞ্জুর কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিল শোভেন। আমরা এখন নান্টুদার কাছে যাচ্ছি এই তো এখানেই, রাসবিহারীর মোড়ে থাকেন—খুব একটা দূরে যেতে হবে না। নান্টুদা ফাইন্যাল খেলার টিকিট জোগাড় করে দেবেন, ভীষণ হাত আছে। তুই যদি যাস চলে আয় মুখ না দেখলে নান্টুদা কিছুতেই একস্ট্রা টিকিট দেবেন না—মানে আমি পার্থ আর অমিত গেলে ঐ তিনখানা টিকিটই শুধু আদায় করা যাবে। বলে তোর জন্য বাড়তি টিকিট আনা যাবে না, সবাইকে একসঙ্গে যেতে হচ্ছে।

একটা ধিকধিকি উৎসাহের আগুন রঞ্জুর চোখে উঁকি দিয়ে তখন আবার নিবে গেল। যেন ইচ্ছে করে নিবে যেতে দিল সে। সিগারেটের দোকানটা এখনও খোলা আছে। আড়চোখে ওদিকটা দেখে আর একবার সে মাথা ঝাঁকাল। —এখন হয় না ভীষণ বেলা হয়ে গেছে, দাদু......

—হোপলেস, ছেড়ে দে শোভেন। নাক চোখ কুঁচকে পার্থ গজরাতে থাকে।—একটি ঘরকুনো ছেলে হয়েছেন আমাদের ফ্রেন্ড! ভাবতেও বিচ্ছিরি লাগে। আয় অমিত, আমরা হাঁটি। শোভেন চলে আয়।

পার্থ আর দাঁড়াল না। অমিতকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটে।

রঞ্জু দুজনের পিছনটা দেখে। পার্থর গায়ে অরেঞ্জ কালারের গেঞ্জি। অমিতের ব্রাউন সার্ট। দুপুরের রোদে দুটো রঙ ভীষণ ঝকমক করছে চোখে লাগে, যেন এক মিনিটের বেশী ওদিকে তাকান যায় না।

—শোন! শোভেন মিটিমিটি হাসে। রঞ্জু ওদিক থেকে এদিকে চোখ ফেরায়। শোভেন ওদের দুজনের পিছনটা আর একবার দেখে নিয়ে রঞ্জুর চোখে চোখ রাখল। —এবার তোকে ইমপর্টেন্ট খবরটা বলতে হয়। খুব সিক্রেট, কাউকে বলবি নে। এটা বলবার জন্যই পার্থ ও আমি সেই সকাল থেকে তোকে খুঁজছি। মাঝখানে অমিতটা জুটে গেল। ওর সামনে বলা যায় না। তাই কায়দা করে পার্থ এখন ওকে ডেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

—কি খবর? রঞ্জুর চোখ গোল হয়ে উঠল। তবে কি নান্টুদার কাছ থেকে শীল্ড খেলার টিকিট আনার ব্যাপারটা বড় নয়, ভাবল সে, তার চেয়েও বড় জরুরী খবর শোভেন নিয়ে এসেছে! শোভেনের আপন পিসতুতো দাদা এই নান্টুদা। রাসবিহারী এভিন্যুর মোড়ে থাকেন। এককালে মোহনবাগান ক্লাবের কোচ ছিলেন। গত বছর তাদের চার বন্ধুকে লীগের খেলার চারখানা টিকিট দিয়েছিলেন, কি খবর শুনি? বার বার ইমপর্টেন্ট বলছিস। ঢোক গিলে ও সেই সঙ্গে একটু ফ্যাকাসে হয়ে উঠে রঞ্জু শোভেনকে দেখল।

—টুবলি পার্থকে চিঠি লিখেছে। শোভেন আর হাসে না। নীল খামে করে এত বড় এক চিঠি।

—টুবলি! আকাশ থেকে পড়ার চেহারা হল রঞ্জুর। মানে অমিতের সেকেন্ড বোনটা! ফিসফিসিয়ে বলল সে।

—হ্যাঁ রে। শোভেন ভেংচি কাটল। এমন ক্যাবলাপনা করিস না তুই এক এক সময়। যেন ফার্ণ রোডের টুবলিকে তুই কোনকালে দেখিস নি। চিনিস না।

—বাঃ চিনব না কেন! রঞ্জু আবার একটা ঢোক গিলল। কবে দিয়েছে চিঠি! কি লিখেছে?

—কাল বিকেলে। কি আবার লিখবে! লভ-লেটার লিখতে গিয়ে মেয়েরা কি লেখে জানিস না!

না, সে জানে না, কোনো মেয়ে তাকে আজও চিঠি লেখেনি। অসহায় চোখে রঞ্জু শোভেনকে দেখতে লাগল।

—সাবধান অমিতকে কিন্তু বলবিনে! শোভেন চোখ পাকাল।

—ধেৎ, ওকে বলব কেন। রঞ্জু মাথা নাড়ল। ওর আপন বোন যে।

—দু পৃষ্ঠা জুড়ে চিঠি। শোভেন দুটি আঙুল তুলে দেখাল। অনেক কিছু লিখেছে। পার্থ আমাকে সবটা খুলে দেখিয়েছে। ব্যাস—কেমন মেয়ে, পার্থকে নিয়ে ইলোপ করতে চাইছে। বলছে আমরা দূরে কোথাও চলে যাব। সেখানে গিয়ে বিয়ে করব।

—ইস কী বিচ্ছিরি! রঞ্জু না সিঁটকাল। ভীষণ বাজে মেয়ে।

—স্প্ল্যানাডের একটা মিষ্টির দোকানে উঁহু, কে সি দাশ নয়, এদিকটায় এলিটের পাশে সুইট হোম বলে একটা বেশ বড় নতুন দোকান হয়েছে, গত শুক্রবার পার্থ এলিটে একটা হিন্দী বই দেখে সবে বেরিয়েছে, টুবলি বুঝি ওদিকটায় ঘুরতে গিয়েছিল—ব্যাস রাস্তায় পার্থর সঙ্গে দেখা—দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গে 'পার্থদা খাব।' পার্থ ওকে সুইট হোমে নিয়ে গিয়ে প্রায় সাত আট টাকা খরচ করে খাইয়ে দেয়। পয়সার তো অভাব নেই তার। আর টুবলিও খেতে আরম্ভ করলে থামতে চায় না।

—এত খাইয়েছিল বলেই ও আস্কারা পেয়েছে, আর পার্থকেও দুম করে চিঠি লিখতে সাহস পেয়েছে। রঞ্জু বলল।

—হুঁ, পার্থও তাই বলছে। শোভেন ঘাড় নাড়ল। এখন মুস্কিল কি ডোভার লেনের একটি মেয়ে—তুই দেখেছিস শ্যামলা রং একটু রোগা, পিঙ্কু নাম, ভাল নাম বুঝি বন্দনা—ও-ই হল পার্থর আসল গার্ল-ফ্রেন্ড। কাজেই এখন টুবলির চিঠির কি জবাব দেবে পার্থ ভেবে পাচ্ছে না আমাদের সঙ্গে কনসাল্ট করতে চাইছে আমার সঙ্গে তোর সঙ্গে।

—চিঠির জবাব না দিলেই হল। রঞ্জু প্রায় চোখ বুজে বলল, পার্থ ওটা ছিঁড়ে ফেলে দেবে, কি পুড়িয়ে ফেলবে—ব্যাস সেখানেই সব ফুরিয়ে যায়। এই নিয়ে এত ভাবনার কি আছে।

—হুঁ, তা পারে, পার্থও তাই বলছিল কিন্তু চট করে তেমন কিছু সে করতেও যে পাচ্ছে না।

—কেন?

—বলছে গায়ের রঙটা ওর আগুনের মতন, হেলথটাও দুর্দান্ত ভাল। সেদিক থেকে পিঙ্কু প্রায় কিছুই নয়। সেদিন মিষ্টির দোকানে খুব কাছাকাছি হয়ে বসেছিল তো দুজন, যতবার টুবলি কথা বলছিল কি হাসছিল কি বাদশাভোগ রাজভোগ ভেঙে মুখে পুরছিল ওর গালে চিবুকের দুপাশে গলার নিচে কাঁধের কাছে আঙুরের মতন বড় বড় ডিম্পল তৈরি হচ্ছিল, তৈরি হচ্ছিল ভাঙছিল আবার তৈরি হচ্ছিল।

(ক্রমশঃ

পুনশ্চ

বিগত সংখ্যার 'পুনশ্চ'র মধ্যে আমরা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ও সেই সঙ্গে ৫ম বর্ষের (১২৮৫, চৈত্র) 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা থেকে তাঁর 'তৈলদান' নামক একটি নিবন্ধ উদ্ধৃত করে দিই। এই ধরনের বহু সরস প্রবন্ধ যেমন তিনি লিখেছিলেন, তেমনি শিক্ষা সম্বন্ধে, সাহিত্য সম্বন্ধে এবং ঐতিহাসিক বিষয় সম্বন্ধেও বহু মূল্যবান নিবন্ধ রচনা করে গিয়েছেন। উক্ত নিবন্ধগুলির মধ্যে 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত কলিকাতা সম্বন্ধে একটি নিবন্ধের অংশবিশেষ এখানে আমরা প্রকাশ করলাম। নিবন্ধটির নাম 'কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্বে'। যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, সে সময় থেকে বর্তমান সময়ের কথা ধরলে, এর সঙ্গে আরও ৯২ বছর যোগ দিতে হয়।

।। কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্বে ।।

অদ্য মহানগরী কলিকাতার কতকগুলি প্রাচীন কথা পাঠকদিগকে উপহার দিব। যাহা বলিব, তাহা হয় প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি, না হয় কোন নব্য বা প্রাচীন গ্রন্থে পড়িয়াছি, নিজে তাহার সত্যতা কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই, সুতরাং কিছু কিছু ভুল হইবার সম্ভাবনা।...

এই যে কলিকাতা নামক স্থান এক্ষণে নানা অট্টালিকায় পরিপূর্ণ দেখিতেছেন, 'সিটি অফ প্যালেসেস' নাম দিলেও যথাযথ বর্ণনা হয় না, ভাবুন দেখি দুইশত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৬৮৩ সালে ইহার কিরূপ অবস্থা ছিল। বাগবাজার হইতে খিদিরপুর পর্যন্ত এই সমস্ত ভূভাগে তিনটি ছোট ছোট গ্রাম ছিল। যেখানে এইক্ষণে ফোর্ট উইলিয়ম বিরাজমান, সেখানে গোবিন্দপুর, লালদীঘি ও গঙ্গার মাঝখানে কলিকাতা, হাটখোলার উত্তর সমস্ত সুতানুটী। কলিকাতা বলিলে যেমন ঐ ক্ষুদ্র গ্রামটি বুঝাইত তেমনি একটি বৃহৎ পরগণাও বুঝাইত। সুতানুটী বলিলে একটি তালুকও বুঝাইত। একটি রাস্তা দিয়া এই তিনটি গ্রামে যাওয়া যাইত। সেইটি এখন চিৎপুর রোড। প্রতি গ্রামে দুই ঘর, এক ঘর কারিয়া ভদ্রলোক, ঘর কত জেলিয়া, ঘর কত সোনারবেণে মাত্র বাস করিত। চিৎপুর রোডের অল্প দূরেই জলা-জঙ্গল ছিল। এমন কি, সময়ে সময়ে বাঘেরও দৌরাত্ম্য হইত। সেইরূপ গ্রাম এক্ষণে গঙ্গার ধারে দেখা যায় না। কোঠা-বাড়ী এক-একটা ছিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু দোতলা একেবারেই ছিল না। কারণ, তখন নবাবের হুকুম ব্যতিরেকে কেহই দোতলা বাড়ী করিতে পারিত না এবং নবাবের হুকুম আনাইতে পারে, এইরূপ লোক এ তিন গ্রামে না থাকাই সম্ভব। ইহার মধ্যে আবার শুনিয়াছি, গোবিন্দপুর নূতন পত্তন। আন্দুলের দত্তচৌধুরী-বংশীয় গোবিন্দচন্দ্র দত্ত নামক এক ব্যক্তি ঐ গ্রাম পত্তন করেন এবং এই হইতেই হাটখোলার দত্তদিগের উৎপত্তি হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন হাটখোলার দত্তেরা হাটখোলায় আসিয়াছেন কিনা সন্দেহ। সুতানুটীতে অনেক দিন হইতে একটি হাট ছিল, কিন্তু সে হাট কোন জন কর্তৃক স্থাপিত, জানিবার কোন উপায় নাই।

কলিকাতার নিকটে কালীঘাট বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ পীঠস্থান ছিল, এবং চিৎপুর কালীর নিকট নরবলি হইত বলিয়া বহুকাল প্রসিদ্ধ ছিল। শুনিয়াছি, ইংরাজেরা যখন প্রথম মান্দ্রাজ হইতে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে আইসেন, তখন তাঁহারা হাটখোলার ঘাটে জাহাজ লাগাইয়া একজন ধোবাসিয়া চাহিয়া পাঠান। হাটের লোকে ধোবাসিয়ার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ঐ হাটখোলার বসাকদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। বসাকেরা একজন ধোবা পাঠাইয়া দেন। তদবধি ধোবারা অনেকদিন ইংরাজদের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল। তদবধি সেকালে কান্ত ধোবা বলিয়া একজন ইংরাজের অনুগ্রহে বিলক্ষণ সঙ্গতিশালী ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

বাঙ্গালায় ইংরাজ-বাণিজ্যের সূত্রপাত হইতেই সুতানুটীতে ইংরাজদিগের কিছু না কিছু কারবার ছিল, কারণ নিজ হুগলীতে যখন ইংরাজদের খুব কারবার চলে, তখনও সুতানুটীর উপর তাঁহাদের বিলক্ষণ টান ছিল দেখা যায়। বোধহয়, চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদের যেমন বরাহনগরে ছোটখাট একটি কুঠী ছিল, সুতানুটীতেও ইংরাজদের সেইরূপ অল্পবিস্তর কিছু কারবার ছিল। যখন মোগলদের সহিত যুদ্ধে ইংরাজকে হুগলীর ব্যবসা ফেলিয়া পলায়ন করিতে হয়, তখন তাঁহারা দিনকতক চানকে ও দিনকতক সুতানুটীতে ছিলেন। যাহা হউক, ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে তাঁহারা কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর এই কয়েকখানি গ্রামের জমিদারী ক্রয় করিতে অনুমতি পান এবং ঐ সময়ে তাঁহারা লালদীঘি ও গঙ্গার মধ্যে পুরান কেল্লাটি নির্মাণ করেন এবং তদবধি কলিকাতায় তাঁহাদের ভরাভর হয়। তদবধি চার্নক সাহেব কলিকাতার সংস্থাপনকর্তা এবং তাঁহার সময় হইতেই ইংরাজদের চানকের বাগান ও আলীপুরের বেলভেডিয়ার উৎপত্তি। জব চার্নক সাহেবকে এদেশীয় লোকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তিনি এদেশীয় একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়াছিলেন। কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ গোরস্থানে তাঁহার গোর অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়।

১৬৯৮ সাল হইতে ১৭৫৭ পর্যন্ত কলিকাতার প্রথম যুগ বলিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে কলিকাতা একটি সামান্য গ্রাম হইতে নগরের আকার ধারণ করে। ফরাসীদের হাতে যেমন ফরাসডাঙ্গা, ওলন্দাজদের হাতে যেমন চুঁচুড়া, দিনেমারদের হাতে যেমন শ্রীরামপুর একটি ছোটখাট সহর, ইংরাজদের হাতেও কলিকাতা তেমনি ছোটখাট সহর হইয়াছিল। পূর্বোক্ত চারিটি সহরেরই এই যুগের মধ্যে উৎপত্তি, তন্মধ্যে ফরাসডাঙ্গাই কিছু বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, কারণ ফরাসী গবর্ণর ডিউপ্লের মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি ইউরোপ হইতে এ যুগের মধ্যে কেহ আর আইসেন নাই।

এই যুগে কলিকাতায় বহু সংখ্যক ব্যবসায়ী লোক আসিয়া বাস করে এবং বহুসংখ্যক অট্টালিকা নির্মিত ও বাজার সংস্থাপিত হয়। এই সময়ে চিৎপুর রোডের পশ্চিমে বহুসংখ্যক ভদ্রলোকের বাস হয়, এবং পূর্বে বড় বড় বাগান প্রস্তুত আরম্ভ হয়। জলা ও জঙ্গল কাটিয়া বাগান প্রস্তুত করা বড় সহজ ছিল না, প্রায়ই জলার মধ্যস্থলে পুষ্করিণী কাটিয়া সেই মাটি চারিদিকে ছড়াইয়া বাগানের জন্য জমি বাহির করিতে হইত।...এই সময়ের দুইটি বাগানের কিছু ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে—একটির নাম হালসী বাগান ও অপরটির নাম উমীচাঁদের বাগান। হালসীবাগান গোবিন্দরাম মিত্রের বাগান, উহা ইংরাজ জমিদারীর বাহিরে, কিন্তু গোবিন্দরাম মিত্রই বহুকাল অবধি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর ব্লাক জমিদার ছিলেন। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে যখন মহারাষ্ট্রখাত খনন হয়, তখন গোবিন্দরাম মিত্রের অনুরোধে ইংরাজেরা হালসীবাগান খাতভুক্ত করিয়া লন। মহারাষ্ট্রখাত এখনও কলিকাতার মিউনিসিপালিটির সীমা। অনেকে মনে করেন, বাগবাজারের খালই বুঝি মহারাষ্ট্রখাত, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বাগবাজারের খালের একটু দক্ষিণে একটি খানা আছে, সেই খানা ক্রমে ক্রমে আসিয়া সার্কিউলার রোডের পূর্বদিকের খানার সহিত মিলিয়া গিয়াছে। এইখানা বরাবর বাগবাজারের খালের মুখ হইতে শিয়ালদহ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রখাত নামে অভিহিত ছিল। মহারাষ্ট্রখাত কলিকাতার চতুর্দিকে কখনই ছিল না। মহারাষ্ট্রখাত শেষ হইবার পরেই বহুবাজারের রাস্তা। ঐ রাস্তা তৎকালেও বিদ্যমান ছিল। উহা দ্বারা পূর্বদিক হইতে আসিয়া একেবারে পুরান কেল্লায় উঠা যাইত।...

তৎকালেও চৌরাঙ্গা নামক স্থান ছিল এবং সেই স্থানেই সাহেবেরা বাস করিতেন। কিন্তু সে চৌরাঙ্গার সহিত এখনকার চৌরাঙ্গার তুলনা হয় না। তখনকার চৌরাঙ্গাতেও জলা ও জঙ্গল ছিল। তখন মহারাষ্ট্রখাতের মধ্যে অনেক জায়গায় চাষবাস হইত। এমন কি, ১৭৭৮ সালে যখন ওয়ারেন হেষ্টিংস মহারাজা নবকৃষ্ণকে সুতানুটীর তালুকদারী প্রদান করেন, তখনও ঐ তালুকের মধ্যে অনেক জায়গায় চাষবাস হইত, কারণ, ঐ দলীলে চাষবাসের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

(আগামীবার সমাপ্য)

—[illegible]

বিজ্ঞানের কথা

আমাদের নিশ্বাসের বাতাস কি বিশুদ্ধ ?

বাতাসে এমন সমস্ত উপকরণ এমন প্রচুর পরিমাণে থাকতে পারে যা মানুষ ও তার পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই যদি হয় তাহলে বলতে হবে বাতাস দূষিত হয়ে গিয়েছে। দূষিত বাতাস দূষিত জলের মতোই জনস্বাস্থ্য বিপন্ন করে। আমাদের দেশে দূষিত জলের সমস্যা নিয়ে অনেক কথাবার্তা শোনা যায় অনেক ব্যবস্থাও নেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু দূষিত বাতাসের সমস্যা এখনো পর্যন্ত তেমন আলোচিত নয়। অথচ ওয়াকিবহাল বিজ্ঞানীদের ধারণা ভারতে শিল্পায়নের সংগে সংগে বিশেষ করে কয়েকটি বড়ো শহরে বাতাস দূষিত হয়ে উঠছে এবং তা যাতে না হয় সেজন্য কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনেরও প্রয়োজন আছে। 'সায়েন্স টুডে' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের ভিত্তিতে বিষয়টি নিয়ে কিছু আলোচনা তুলতে চাই।

*

বাতাস আমরা খাই না। খাই খাদ্য, পান করি জল। কিন্তু প্রশ্বাসের সংগে বাতাসও আমরা শরীরের মধ্যে টেনে নিই। এমনিভাবে যা-কিছু আমরা শরীরের মধ্যে গ্রহণ করি—কি খাদ্য, কি পানীয়, কি বাতাস— পরিমাণের দিক থেকে বিচার করলে তাদের মধ্যে বাতাসের স্থানই কিন্তু সবচেয়ে ওপরে। স্পষ্ট হিসেবের মধ্যে আসা যাক। সারা দিনে-রাতে আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিই মোট প্রায় ২২০০০ বার (তার মানে ঘন্টায় প্রায় ৯১৭ বার, মিনিটে প্রায় ১৫ বার বা মোটামুটি প্রতি চার সেকেণ্ডে একবার)। আর সারা দিনে-রাতে শরীরের মধ্যে বাতাস টেনে নিই প্রায় ১৬ কেজি। ষোল কিলোগ্রাম! সারা দিনে-রাতে আমরা খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করি এই পরিমাণের চেয়ে কম। কাজেই বুঝতে অসুবিধে হয় না যে আমাদের শরীরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রবিষ্ট হয় যে-বাতাস তার বিশুদ্ধতা বজায় রাখাটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

দুঃখের কথা, আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত এই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সম্পর্কে তেমন সচেতনতা তৈরি হয়নি।

*

বাতাস দূষিত হয় কিসে? যদি বাতাসের সংগে মিশে থাকা ধুলো ও গ্যাসের পরিমাণ ক্ষতিকর রকমের বেশি হয়ে যায়। ব্যাপারটাকে একটু বিশদ করা যাক—বাতাসকে দূষিত করে তোলে যেসব গ্যাস ও ধুলো সেগুলো কী? কোথা থেকে আসে? মানুষের শরীরে কী ক্ষতি করে?

প্রথমে গ্যাসের কথা। বাতাসের সংগে মিশে থাকা ক্ষতিকর গ্যাস হতে পারে সালফার ডাই-অকসাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অকসাইড, হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড, কার্সিনোজেনিক (যা থেকে ক্যানসার রোগ হতে পারে) হাইড্রোকার্বণ, কার্বণ মনোকসাইড ও অকসিডেন্ট।

সালফার ডাই-অকসাইডের উৎস সাধারণত হয়ে থাকে পাওয়ার হাউস, সালফিউরিক অ্যাসিডের প্ল্যান্ট, পেট্রোলিয়াম শিল্প, তেল পরিশোধন ও গৃহস্থবাড়ির ব্যবহৃত জ্বালানী। বাতাসের সঙ্গে এই গ্যাস শরীরে প্রবেশ করলে মানুষের দম বন্ধ হয়ে আসে, গলা ও চোখ জ্বালা করে, শ্বাস-প্রশ্বাসের রোগ দেখা দেয়।

হাইড্রোজেন সালফাইডের উৎস রেয়ন প্ল্যান্ট, পেট্রোলিয়াম শিল্প, ভূগর্ভস্থ নর্দমার মল, ট্যানিং শিল্প, রং উৎপাদন তৈল পরিশোধন। মানুষের ওপরে ক্রিয়া—শ্বাসনালীর জ্বালাযন্ত্রণা ও বিবিধ পীড়া।

নাইট্রোজেন ডাই-অকসাইডের উৎস—অ্যাসিড উৎপাদন, মোটরগাড়ি থেকে নিঃসৃত ধোঁয়া, বিস্ফোরক পদার্থের কারখানা। মানুষের ওপরে ক্রিয়া—জ্বালাযন্ত্রণা, ব্রংকাইটিস, ফুসফুসের পীড়া।

হাইড্রোজেন ফ্লুরাইডের উৎস—সার শিল্প, রসায়ন শিল্প, অ্যালুমিনিয়াম শিল্প। মানুষের ওপরে ক্রিয়া—হাড়ের অসুখ, দাঁতের অসুখ, শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুখ।

কার্সিনোজেনিক হাইড্রোকার্বণের উৎস—জৈব রসায়ন শিল্প, যানবাহন ও মোটরগাড়ি। মানুষের ওপরে ক্রিয়া—ক্যানসার।

কার্বণ মনোকসাইডের উৎস—জ্বালানী গ্যাস, মোটরগাড়ি থেকে নিঃসৃত গ্যাস, খনি, ব্লাস্ট ফারনেস। মানুষের ওপরে ক্রিয়া—বিষক্রিয়া, দুর্ঘটনা।

অকসিডেন্টের উৎস—বিশেষ পদ্ধতিতে জৈব উপকরণ থেকে উৎপন্ন ফটোরাসায়নিক সামগ্রী। মানুষের ওপরে ক্রিয়া—ফুসফুসের জ্বালাযন্ত্রণা।

অতঃপর ধুলোর কথা। ধুলো আসে খনি ও খাদ থেকে, পটারি ও সেরামিক কারখানা থেকে, কারখানার স্তূপ থেকে, পাওয়ার স্টেশন থেকে। বাতাসের সংগে এই ধুলো শরীরে প্রবেশ করলে শ্বাসপ্রশ্বাসের নানারকম পীড়া দেখা দেয়। ধাতুর গুঁড়োকেও এক ধরনের ধুলো বলা যেতে পারে, বাতাসের সংগে এই ধুলো শরীরে প্রবেশ করার ফল বিষক্রিয়া।

*

বিভিন্ন প্রকারের গ্যাস ও ধুলোর যে বিবরণ পাওয়া গেল তা থেকে বোঝা যাচ্ছে বাতাস দূষিত হয় শিল্পের প্রসার হওয়ার ফলে এবং একই এলাকায় একই সংগে অনেক শিল্প গড়ে ওঠার ফলে। শিল্পায়নের দিক থেকে ভারতের চারটি বড়ো শহরের নাম এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে—কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, কানপুর। এই শহরগুলোতে কল-কারখানা যেন জট পাকিয়ে আছে, ফলে অবস্থা প্রায় দম বন্ধ হওয়ার মতো আর শ্বাস-প্রশ্বাসের পীড়া প্রচুর। আর বিশেষ করে শীতকালে শহরগুলোতে ধোঁয়াশার (ফগ) দাপটে দারুন এক অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি হয়।

এই চারটি শহরে বাতাসের গুণাগুণ পরখ করে দেখার দীর্ঘমেয়াদী এক কর্মসূচীর প্রয়োজন অবশ্যই আছে। তারই সূচনা হিসেবে নাগপুরের কেন্দ্রীয় জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে (সম্প্রতি যার নাম হয়েছে জাতীয় পরিবেশ ইঞ্জিনীয়ারিং গবেষণা ইনস্টিটিউট) এই চারটি শহরে কয়েকটি নির্বাচিত এলাকার বাতাসের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়কাল ছিল ১৯৬৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৬৯ সালের মার্চ। বাতাসে মিশে থাকে যে-সব ক্ষতিকর গ্যাস ও বাতাসে ভেসে বেড়ায় সেসব কণিকা সেগুলোর পরিমাপ নিয়ে যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছে তার বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

বোম্বাইয়ে সারা বছর ধরে অনুকূল বায়ুপ্রবাহ থাকে তবে তাপমাত্রার ওঠানামা যথেষ্ট। কল-কারখানা সবচেয়ে বেশি জট পাকিয়ে আছে যে চেম্বুর-ট্রম্বে এলাকায়, সেখানেই বাতাসও সবচেয়ে দূষিত—শহরের বাকি অংশের তুলনায় দ্বিগুণ বেশি। গোটা শহরকে ধরলে বাতাসে সালফার ডাই-অকসাইডের পরিমাণ খুব বেশি নয়, কিন্তু টুকরো টুকরো অংশে কোথাও কোথাও অত্যধিক। অন্য তিনটি শহর সম্পর্কেও একই কথা।

সম্ভবত সামুদ্রিক পরিবেশ ও ভূগর্ভস্থ নর্দমার বোঝাই মলের দরুন বোম্বাইয়ের বাতাসে সালফাইডের মাত্রা কিছুটা বেশি।

বাতাসে ভেসে থাকা কণিকা ও ধুলোর মাত্রা এই চারটি শহরেই বিশ্বের অন্য যে-কোনো শহরের চেয়ে বেশি। পশ্চিমের বড়ো বড়ো শহরে সাধারণত এই মাত্রা হয়ে থাকে প্রতি ঘনমিটারে ১৫০ মাইক্রোগ্রাম। আর বোম্বাইয়ে প্রতি ঘনমিটারে ২৩৮ মাইক্রোগ্রাম। দিল্লীতে প্রতি ঘনমিটারে ৭০০ মাইক্রোগ্রাম।

দিল্লীতে ধুলোর মাত্রা যেমন সবচেয়ে বেশি তেমনি তাপমাত্রায় ওঠানামাও অনেক ঘনঘন, বিশেষ করে শীতের মাসগুলিতে। ফলে বাতাস দূষিত হওয়ার কারণগুলো আরো জোরালো হয়ে উঠতে পারে। দিল্লীর বাতাসে কোথাও কোথাও সালফার ডাই-অকসাইডের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত।

তুলনাগত বিচারে এই চারটি শহরের মধ্যে বাতাস সবচেয়ে দূষিত কলকাতায়। কলকাতার বায়ুপ্রবাহের বেগ অপেক্ষাকৃত কম, তাপমাত্রার ওঠানামা যথেষ্ট ঘনঘন। সালফার ডাই-অকসাইডের মাত্রা বিশেষ করে বিকেল ও সন্ধ্যার দিকে যথেষ্ট বেশি। মোটরগাড়ি থেকে নিঃসৃত কার্বণ মনোক-সাইডের মাত্রা কলকাতার বাতাসে কতখানি তা বিশেষভাবে দেখা হয়েছে। তা হচ্ছে প্রতি দশ লক্ষে ৩৫ ভাগ (যানবাহনের চলাচল যখন সবচেয়ে বেশি)। এদিক থেকে কলকাতা রয়েছে যানবাহন চলাচল খুবই বেশি বিশ্বের এমন সমস্ত শহরের সমস্থানে।

কলকাতা শহরের বাতাসে ধুলোর পরিমাণ প্রতি ঘনমিটারে ৫৩০ মাইক্রোগ্রাম। কলকাতায় ধুলোর ঝড় ওঠে না, কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কাঁচা রাস্তায় যানবাহন চলাচলের দরুণ এই ধুলোর উৎপত্তি।

আবহাওয়ার দিক থেকে কানপুর অনেকটা দিল্লীর মতো। বাতাস দূষিত হওয়ার কারণগুলোও এই দুই শহরে মোটামুটি একই রকম।

১৯৬৯ সালের অকটোবর থেকে উল্লিখিত সংস্থাটি ভারতের নয়টি শহরে বাতাসের গুণাগুণ অবিরাম পরখ করার জন্য পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এই নয়টি শহর হচ্ছে আমেদাবাদ, বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লী, হায়দ্রাবাদ জয়পুর, কানপুর, মাদ্রাজ ও নাগপুর।

এই নয়টি শহরের বাতাসে কী পরিমাণ সালফার ডাই-অকসাইড ও ভাসমান কণিকা আছে তার একটি পরিমাপ (১৯৭০ সালের) পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্রগুলো থেকে পাওয়া গিয়েছে।

সালফার ডাই-অকসাইডের মাত্রা (প্রতি ঘনমিটারে মাইক্রোগ্রাম): ১০-৬৬ (আমেদাবাদ) ৪৭-১১ (বোম্বাই) ৩২-৮৮ (কলকাতা), ৪১-৪৩ (দিল্লী), ৫-০৬ (হায়দ্রাবাদ) ৪-১৫ (জয়পুর), ১৫-৯৭ (কানপুর), ৮-৩৮ (মাদ্রাজ) ও ৭-৭১ (নাগপুর)।

বাতাসে ভাসমান কণিকার মাত্রা (প্রতি ঘনমিটারে মাইক্রোগ্রাম) : যথাক্রমে ৩০৬-৬, ২৪০-৮, ৩৪০-৭, ৬০১-১, ১৪৬-২ ৪২৬-১, ৫৪৩-৫, ১০০-৯ ও ২৬১-৬।

আমাদের দেশে শহরগুলোর রাস্তায় যেসব মোটরগাড়ি চলে তার মধ্যে বেশ কিছু খুবই খারাপ অবস্থার। এই সমস্ত খারাপ অবস্থার মোটরগাড়ি থেকে নিঃসৃত গ্যাসে কার্বণ মনোকসাইডের মাত্রাও হয়ে থাকে খুবই বেশি। মাপ নিয়ে দেখা গিয়েছে কখনো কখনো এই মাত্রা ৫-৫ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন মোটরগাড়ির নির্ধারিত মাত্রা হচ্ছে মাত্র ১-৫ শতাংশ।

কলকাতায় মোটরগাড়ি থেকে নিঃসৃত গ্যাসে বাতাস যতোখানি দূষিত করা হয় তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে নিউইয়র্ক, শিকাগো, লন্ডন, ওয়াশিংটন ইত্যাদি শহরের সঙ্গে—যদিও শেষোক্ত শহরগুলোতে মোটরগাড়ির চলাচল কলকাতার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। এদিক থেকে কলকাতার অবস্থা নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মোটরগাড়ি থেকে নিঃসৃত গ্যাসে বাতাস দূষিত হলে তা ক্যানসার রোগের কারণ হতে পারে। কলকাতার রাস্তায় একমাত্র স্টেটবাসগুলো যে পরিমাণ ধোঁয়া ও কালি ছাড়তে ছাড়তে চলে তার সঙ্গে কলকাতার অধিবাসীদের মধ্যে ক্যানসার রোগীর অনুপাত কষলে কিছু একটা সম্পর্ক বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

কলকাতার মতো শহরের পক্ষে আরো মুশকিল, শহরের পরিকল্পনাহীন যথেচ্ছ বাড়বৃদ্ধি। এখানে বসত-এলাকার পাশেই গড়ে উঠেছে এমন সব কলকারখানা যার চিমনি থেকে বিষাক্ত গ্যাস নিঃসৃত হয়। অথচ কলকারখানা থেকে বসত-এলাকা অন্ততপক্ষে ৩০০ থেকে ৬০০ মিটার দূরে থাকা উচিত। অবস্থা দেখে মনে হয়, গোটা শহরটাকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে পারলে তবেই একমাত্র এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

তবে আশার কথা, কলকাতা নিয়ে যাঁরা ভাবছেন তাঁরা মনে করেন এই দুরূহতম ও জটিলতম অবস্থা থেকে কলকাতার ও ভারতের অন্য যে কোনো শহরের মুক্তি সম্ভব। সেজন্য অবশ্যই চাই কড়াকড়ি আইন ও সুপরিকল্পিত পুনর্নির্মাণকার্য।

ঘর ঠান্ডা করার যন্ত্র

ঘরের বাতাস দূষিত করে

যাকে বলা হয় এয়ার-কন্ডিশনার, বা বাতাস ঠান্ডা করার যন্ত্র সেটি ঘরে বসিয়ে ঠান্ডা বাতাসে আরামের নিশ্বাস নিতে নিতে এমন ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক যে দরজা-জানলা-আঁটা বাতানুকূল ঘরের বাতাস বুঝি পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ। কথাটা ঠিক নয়। কানাডার দুই বিজ্ঞানী নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন, এয়ার-কন্ডিশনার বসানো ঘরের বাতাসে অ্যালুমিনিয়মের গুঁড়ো ভেসে বেড়ায়। এবং এই গুঁড়োর মাত্রা যদি বেশি হয় তাহলে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ও বিশেষ পীড়ার কারণ হতে পারে।

এয়ার-কন্ডিশনার যন্ত্র তৈরি হয় অ্যালুমিনিয়মে এই কারণে যে অ্যালুমিনিয়ম মরচেরোধী। তার ওপরে বাতাসের সংস্পর্শে এসে এই অ্যালুমিনিয়মের উপরেও একটা অকসাইড আস্তরণ পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যেভাবেই হোক, এয়ার-কন্ডিশনার থেকে নিঃসৃত বাতাসের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়মের ক্রিয়া ঘটে যায় এবং গুঁড়ো গুঁড়ো অ্যালুমিনিয়ম বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

—অয়স্কান্ত

ফেরেস্তা

সৈয়দ ইকবাল

মরিয়মকে অবাক করে ব্যাপারগুলো একে একে ঘটছিল; সংসারের হঠাৎ এ পরিবর্তন মরিয়মের অকল্পনীয়। মরিয়ম তো সংসারে ব্যাপার-স্যাপার ভালো করেই জানে, সেইতো ধেনু মোল্লার বড় মেয়ে আর মা-মরা সংসারে বড় মেয়েরা সংসার সম্বন্ধে একটু বেশী জানে।

মা ক' বছর হয় মারা গেছেন, ঠিক সে জানে না। তবে মার মুখ আজকাল স্বপ্নে সে এক-এক রাতে এক-এক ধরনের দেখে। সঠিক কোনটি তার মা'র মুখ মরিয়ম ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

সংসারে নানা কাজ থেকে দুপুরে একটু অবসর পেলেই ভাবনার ঘোড়সাওয়ার তাকে ঝাপটে ধরে যেন মেঘে-মেঘে ভেসে চলে ঐ দুপুরবেলার অবসরে সে নানাকথা ভাবে, কখনো ভেবে আনন্দ লাগে, কখনো দুঃখ পায় কখনো আবার অন্য কথা ফেলে মা'র কথা ভাবতে তার ভীষণ ইচ্ছে হয়, মা' কে ভাবতে ভালো লাগে, তখন ভাবনার সঙ্গে ভাবনা ট্রেনের কামরার মত জুড়ে-জুড়ে অনেকদূর পর্যন্ত চলে যায়। তবু কিন্তু তার ভালো করে মনে পড়ে না মায়ের মুখের আদল শুধু মনে পড়ে কোলাহল, পাড়ার লোকদের জটলা।

বড়ভাইয়া নাকি তখন বেঁচে ছিল, সে ট্রাক একসিডেন্ট করে মারা যায় সেই ট্রাকটা চালাতো। ভাইয়া ট্রাকে করে হাসপাতাল থেকে মার মরা দেহ নিয়ে ফিরতে পাড়ার লোকেরা এসে জড় হয়েছিল।

মরিয়ম অনেকের মুখে শুনেছে, মা নাকি খুব সুন্দরী ছিল সে নাকি মা'র মতোই হয়েছে। কিন্তু সে তো আজকাল কিছুতেই মা'র মুখটা স্মরণ করতে পারে না। মাকে ভাবতে গেলে মনে পড়ে কালো ধুমসো ট্রাকের কথা, আর অনেক লোকের জটলা-কোলাহল।

পল্টির মা একদিন চুপিচুপি তাকে বলেছিল, মা নাকি ঘরেই মরে গিয়েছিল বড়ভাইয়া তবু সবার কথা অগ্রাহ্য করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সংসারের অভাব আর বাপজানের জ্বালাতনে তার মা নাকি আত্মহত্যা করেছিল। সংসারের অভাব অনটনের জন্য আত্মহত্যা করতে হয় তাদেরকে ফেলে ওমন করে মরে যেতে হয়। মা'র উপর মাঝে মাঝে তার ভীষণ রাগ হয়।

মা মরার পর ভাইয়া নাকি কেমন হয়ে পড়েছিল, সব কিছু যেন অবচেতনভাবে করছে, আসলে কিছুতেই যেন তার খেয়াল নেই। মা'র বড় আশা ছিল ছেলেকে মানুষ করার অথচ ভাইয়া পড়া-লেখা ছেড়ে বখে গেলো। কয়েকদিন বাইরে বাইরে কাটিয়ে ঘরে ফিরতে মা কিছু বল্লেই বিশ্রী গালাগাল দিত। মরার কিছুদিন আগে মা নাকি শুনেছিল ভাইয়া রহিম মুন্সির ড্রাইভার ছেলেটির সঙ্গে মদ খায়। সেদিন ভাইয়া ফিরতে মা ভীষণ রেগে তাকে চড় মারতে গেলে ভাইয়া ঢুলে-ঢুলে চোখে মার হাত মুচড়ে দিয়ে চিৎকার করে বলে ছিল—হারামজাদী তুই আমার মা-না, তোর বাপের খাই না, তোর দাদার খাই না তুই কইবার ক্যারে, আমার যা ইচ্ছা করমু।

সেদিন থেকে মা নাকি ভাইয়ার সঙ্গে আর কথা বলতো না মরবার আগে পর্যন্ত বলেনি।

মা মরার পর ভাইয়া কাঁদেনি, ভাইয়ার চোখে নাকি কেউ জল দেখেনি, তবে পাগলের মত দৌড়-ঝাঁপ করেছে আর বার-বার কাফনের কাপড় সরিয়ে মার বুজে থাকা চোখের পাপড়ি হাত দিয়ে মেলে ফ্যাস-ফ্যাসে ভাঙ্গা গলায় বলেছে—মা মা, তুমি রাগ কইরো না, আমি তোমার পোলা, মা মা, ও মা, আমি তোমার পোলা।

তার কিছুদিন পরই ভাইয়া ট্রাক এক্সিডেণ্ট করে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা যায়। মরার আগেও নাকি রক্তাক্ত ঠোঁটে বিড়-বিড় করে বলছিল—মা, মা ও মা, আমি তোমার পোলা, তুমি রাগ কইরো না।

মা ভাইয়া মরার পর বেশ অনেক দিন গড়িয়েছে। তার বয়সও বেড়েছে তেমনি অভাব-অনটন আগের চেয়ে তাদের সংসারে আরো শক্তভাবে পেঁচিয়ে ধরেছে। সংসারের এই অভাব-অনটনে মরিয়মও মাঝে-মধ্যে অসহ্য হয়ে উঠে কিন্তু মা'র কথা মনে পড়তে ভয় হয়, শত অভাবে ও নিজেকে সামলে নেয়, ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে উপোষ করে তবু মরার কথা চিন্তে করে না সে কথা ভাবলেই ম'র মরার কথা মনে পড়ে, ভয় হয়।

কিন্তু হঠাৎ দেশে যুদ্ধের সঙ্গে-সঙ্গে বাপজানের সংসারে পরিবর্তন দেখে বার-বার সে অবাক হয়।

দেশের চতুর্দিকে তখন ভীষণ উত্তেজনা, মুক্তিযুদ্ধের নানা অদ্ভুত রাখা-ঢাকা খবর আর পাকিস্তানী সৈন্যদের অত্যাচারে নানা খবর কাল-বৈশাখীর দমকা বাতাসের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

এমন দিনে প্রথম তার বাপজান আনলো দুবস্তা চাল এবং ঝুড়ি ভর্তি কাঁচা আনাজ, বেশ কটা দেশী মুরগী।

তার যে বাপজান বাড়ি বাড়ি আর মসজিদ মসজিদ ঘুরে সপ্তায় তিন দিন ভাতের চাল জোটাতে পারতো না, সেই বাপজানকে হঠাৎ দুবস্তা চাল আর ঝুড়ি ভর্তি সব্জী আনতে দেখে মরিয়ম অবাক হয়ে বাপজানকে প্রশ্ন করেছিল—এগুন কে দিল বাপজান?

ধেনু মোল্লা হেসে আনন্দে গদ গদ কণ্ঠে বলেছিল—ফেরেশ্‌তা।

তারপর থেকে তাদের সংসারে খাওয়া-দাওয়ার অভাব ঘুচে যায়। তারপর কদিন যেতেই এক গাদা লাল-নীল দামী শাড়ি-ব্লাউজ তার সোনার কয়েক গোছা চুড়ি নিয়ে ফেরে।

মরিয়ম বর্ষায় ছল-ছল নদীর মত যৌবন মাখা দেহে শাড়িগুলো এলো-মেলো-ভাবে জড়িয়ে আবার প্রশ্ন করেছিল—বাপ-জান এগুন কে দিল? ধেনু মোল্লা মেয়ের প্রশ্ন এড়াতে বাইরের দিকে চলে যায়। তার পর মরিয়মকে আর চেনা যেত না তার ফর্সা সুন্দর দেহে রঙ্গিন শাড়িগুলো তাকে যেন দ্বিগুণ সুন্দরী করে তুলে ছিল।

মরিয়ম কিন্তু তারপরও কয়েক বার অবাক না হয়ে পারে নি। যেমন সেদিন বিরাট সেগুন কাঠের পালংক লোক নিয়ে ধরা-ধরি করে ঘরে এনে তুলেছিল, অত বড় পালংক মরিয়ম জীবনে কখনো দেখেনি, তাই অবাক হয়ে বাপজানকে জিজ্ঞেস না করে পারেনি—বাপজান, এই পালংকটাও ফেরেস্তায় দিছে? ধেনু মোল্লা শব্দ করে হেসে উঠে হাসি থামাতে-থামাতে বলে—হ্যাঁরে হ্যাঁ, ফেরেস্তায় দিছে। এবং এর পর যখন ধেনু মোল্লা ছেলে-মেয়েদের এনে তুলল বিরাট পাকা একতলা বাড়ীতে তখন মরিয়ম অবাক হয়েছিল দুধের মত সাদা রঙের সুন্দর সুন্দর পর্দাওয়ালা বাড়ী দেখে কথাটা অনেকক্ষণ চেপে রেখে শেষ পর্যন্ত আর চেপে রাখতে না পেরে বলে ফেলেছিল মরিয়ম—এ বাড়ীডায় আমরা থাকুম, এত বড় বাড়ী আমাগো কেডায় দিলো বাপজান?

ধেনু মোল্লা নতুন ঘরের জিনিষপত্র গোছ-গাছের ব্যস্ততায় ছোটা-ছুটি করতে করতে চেঁচিয়ে বলেছিল—কতবার কমুরে মুখপুড়ি, ফেরেস্তায় দিছেরে ফেরেস্তায়!

তারপর থেকে মরিয়ম ছোট ভাই-বোন-দের নিয়ে থাকলেও বিরাট বাড়ীটায় কেমন যেন একা একা মনে হয় তার।

বাপজান সারাদিন বাইরে বাইরে থাকে। সে কাজ সেরে দুপুরের দিকে সাজতে বসে, সময় কাটাতেই যেন এক গাদা শাড়ী-গয়না থেকে বেছে বেছে একটা পরে তারপর ঘুরে বেড়ায় ঘরে ঘরে। ঘুরে ঘুরে দেখে দেয়ালে টাঙ্গানো বিরাট বাঁধানো ছবিগুলো, হরিণের শিংওয়ালা মাথা, মাটিতে বিছানো কার্পেট আর দরজায় জানালায় টাঙ্গানো সুন্দর ফুল-পাতা আঁকা পর্দা ঘুরে ঘুরে এক সময় ক্লান্ত হয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে, দাঁড়িয়ে দেখে, বাইরে আশে-পাশে যতটুকু দেখা যায়। চতুর্দিকে কেমন যেন নির্জনতা একটু দূরে দূরে নিঃসঙ্গ সুন্দর সুন্দর বাড়ীগুলো পরস্পরের দিকে করুণভাবে চেয়ে যেন দাঁড়িয়ে। এমন নির্জনতা দেখে তার বার বার মনে পড়ে পল্টির মা'র কাছে শোনা রাক্ষসের গল্প। দুপুরে পথে একটা লোকও দেখা যায় না বিশ্রামরত অজগরের মত এঁকে-বেঁকে শুয়ে থাকা কংক্রিট জমানো কালো রাস্তা কাঁপিয়ে হঠাৎ একদিক থেকে অন্যদিকে ছুটে যায় জলপাই রঙের ট্রাক, আর ট্রাক ভর্তি ঝলন্ত গোঁপওয়ালা সৈন্যরা এদিক ওদিক জানালায় জানালায় চোখ বুলিয়ে নিমিষে হারিয়ে যায়।

কখনো চোখে চোখ পড়লে মরিয়ম পর্দা ফেলে দেয় জানালা থেকে সরে আসে।

দুপুরে ভীষণ গরমের জন্যে সেদিন ধেনু মোল্লা দুপুরেই বাড়ীতে ফিরে আসে।

খোলা দরজার বিরাট পর্দা সরিয়ে বৈঠকখানায় পা দিতেই তার চোখে পড়ে লাল কার্পেটের উপর মরিয়মের নীল শাড়ী পড়ে আছে। হঠাৎ ধেনু মোল্লার পা টলে উঠে, এলোমেলো পায়ে দৌড়ে মরিয়মের কামরায় গিয়ে ঢোকে সে, মরিয়ম কই।

মেঝেয় পাতা কার্পেটের কোণে হঠাৎ চোখ পড়ে তার। মরিয়ম চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বোতামহীন ব্লাউজের দুপাল্লা দুদিকে নুয়ে গেছে। ফর্সা বুক বাতাসের দোলে গাছের পাতার মত থির-থির করে কাঁপছে। আঁচড়ের অসংখ্য দাগ, ফুলে উঠেছে লাল আলপনার মত। কালচে হয়ে এসেছে ভীষণভাবে চেপে রাখা উরুর খাঁজে জমে থাকা রক্ত।

ধেনু মোল্লা মেয়ের দিকে আর তাকাতে পারে না, হাঁটুমুড়ে মেয়ের কাছে বসে পড়ে। কান্নায় ডুকরে ওঠা কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে—মা বল মা, তোর এ অবস্থা কেডায় করলো? চুপ কইরা থাকিস না। বল মা, বল, আমি সৈন্যসাহেবগো দিয়া তার জান বাহির কইরা আনমু বল মা!

মরিয়ম অতি কষ্টে চোখ খুলে তাকাতে ধেনু মোল্লা আবার চেঁচিয়ে ওঠে—বল মা, কেডায় করছে তোর এই অবস্থা।

মরিয়ম ক্লান্তির ভারে চোখের পাতা আবার বন্ধ করতে করতে মৃদু স্বরে বলে—ফেরেস্তা।]

সেকালের সঙ্গীতগুণী

বুলবুল, না অর্ধনারীশ্বর ?

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নানা বৈচিত্র্যের সংবাদ আছে অনাথনাথের সঙ্গীতজীবনে। তাঁর মূল পরিচয় রাগসঙ্গীতের শিল্পী বলে। খেয়াল টপ্পা ঠুংরি রীতিমত শিখেছেন। তার মধ্যে টপ্পা গান গাইতেন না আসরে। খেয়াল ঠুংরির চর্চাই প্রথম থেকে তাঁর সঙ্গীত-জীবনকে অধিকার করে রেখেছে। এই দুই অঙ্গেই তাঁর অন্তরের সাধন। দরবারে আসরে সম্মেলনে বেতারে খেয়াল ঠুংরির গুণীরূপেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। তা হলেও বাংলা গানের শিল্পী হিসেবেও তাঁকে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতে দেখা গেছে। গ্রামোফোন রেকর্ডের কথা বলা হয়েছে আগে। আরো একটি জানাবার মতন ঘটনা আছে এ ব্যাপারে।

তখনো বিশের দশক চলেছে। বাংলায় চলচ্চিত্র জগতে নির্বাক ছবি হলেও সে সময় গৌরবের যুগ। ম্যাডান থিয়েটার প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীগুলির চিত্রায়নে বাঙালী দর্শকদের চিত্তজয় করছেন। সে সময় ক্রাউন সিনেমায় দেখা দেয় তাঁদের 'কপালকুণ্ডলা।' দুর্গাদাস 'নবকুমার', প্রবোধ বসু 'কাপালিক', দানীবাবু শ্যামার কুলীন স্বামী পেসেন্স কুপার 'মতিবিবি'-রূপে মনে রাখবার মতন নির্বাক অভিনয় করেছিলেন—বিশেষ প্রথম তিন নাট্যশিল্পী। দীর্ঘকাল ধরে ছবিখানি প্রদর্শিত হয়েছিল। প্রথমে শ্যামবাজারের ক্রাউন সিনেমায়। তারপর ভবানীপুরের এমপ্রেসে। তখন সেই বাক-হীন 'কপালকুণ্ডলা'র অগণিত দর্শকরা দুটি মধুর সংগীত শোনবার সুযোগ পেতেন। সে এক অভিনব উপরিলাভ। নির্বাক যুগে সুর-মুখরতার অ-পূর্বসৃষ্ট পরিবেশ। সেই গান দুখানি পরিবেশিত হত কাহিনীচিত্রের দুটি নাট্যক্ষণে। প্রথম দিকে যখন গঙ্গাসাগর সঙ্গমে নবকুমারকে একা পরিত্যাগ করে যায় সহযাত্রীরা—তখন সেই গঙ্গা-দৃশ্যের সঙ্গে পর্দার পাশ থেকে শোনা যেত উদাত্ত কণ্ঠে গঙ্গার স্তোত্র গান—দ্বিজেন্দ্রলালের অমর রচনা 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' আর শেষ দৃশ্যে, শ্মশানের গঙ্গাতীরে কপালকুণ্ডলার নিমজ্জনের পর সকরুণ বামা-কণ্ঠের গানে দর্শকদের চিত্ত ভাবাকুল হয়ে উঠত—'কোলে তুলে নে মা শ্যামা।'

দুখানি গানই চিত্রনাট্যের যেন অঙ্গ হয়ে যায় অনুরূপ রসানুভবে, সঙ্গীতের অনুষঙ্গে। সেই অসংখ্য দর্শকদের অনেকেই জানতেন—এই দুই বিপরীত কণ্ঠে একই গায়ক এমন মনোহারী গান শোনাচ্ছেন। আর সে তরুণ শিল্পীর নাম অনাথনাথ বসু। তাবৎ শ্রোতাদের প্রশংসায় তিনি সেসময় ধন্য হতেন প্রতিদিন।

তাঁর ৬০ বছরের সুদীর্ঘ সঙ্গীত-জীবনে এমনি অগণিত শ্রোতাদের তিনি বিভিন্ন আসরে মুগ্ধ করে এসেছেন। অনাথনাথের এই সঙ্গীত-ধারার উৎস কোথায় কিভাবে তার বিকাশ ও বিবর্ধন ঘটে, কেমন করে সেই আশ্চর্য প্রতিভার স্ফুরণ হয় স্বভাবের প্রেরণায় এবং আবাল্য,—সে বৃত্তান্তও রীতিমত নাটকীয়।

আর তা জানবার জন্যে যেতে হবে অনেক কাল পিছিয়ে। কলকাতা থেকে অনেক দূরে। সেকালের অখণ্ড বাংলার খুলনা অঞ্চলে। কপোতাক্ষ নদীতীরের একটি গ্রাম-বসতিতে।

এক টাকায় বারোখানা গান। গ্রামোফোন রেকর্ড। কলের গান। কেনবার জন্যে নয় শুধু শোনার দাম। বারোখানা গান এক টাকায়।...

ঠিক ফেরিওলা নয়। গ্রামোফোনের ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী বলা যায়। একজনের কাছে থাকে গ্রামোফোন যন্ত্র। একটি বাকস, তার ওপর আটকানো চোঙ্গা। আর একজন রেকর্ড বাজাবার লোক। কালো চকচকে রেকর্ডের চাকতি। কলের হাতল ঘুরিয়ে সেই সব রেকর্ড সে বাজায়। লোকদের বুঝিয়ে দিতে পারে—কার গান, কেমন গান। টাকা দিয়ে শুনতে চাইলে এক একটি কলের গান বাজিয়ে শোনায়—এই হল লালচাঁদ বড়ালের গান। এবার শুনুন মানদাসুন্দরীর। এখন পান্নাময়ীর কীর্তন হবে।...

এমনি বারোখানি কলের গান কেউ কেউ শোনে এক টাকা দিয়ে। আর সেই সঙ্গে এক ক্ষুদে শ্রোতাও। দশ-এগারো বছরের একটি ফুটফুটে ছেলে। সুশ্রী মুখ চোখ। একহারা গৌরবর্ণ চেহারা কলের গানের লোক দেখলেই সে থেকে যায় সঙ্গে সঙ্গে। যে টাকা দিয়ে রেকর্ড শোনে সেখানেই সে দাঁড়িয়ে যায়। সেই চোঙ্গার নীচে বাকস। তার ওপর ঘুরছে ঝকঝকে কালো রেকর্ডের চাকা তার মাঝখানেও ঘুরতে থাকে ছবিটি ঃ ধবধবে শাদা কুকুর চোঙ্গার সামনে বসে গান শুনছে। ঠিক তেমনি চোঙ্গা আঁটা রয়েছে রেকর্ডের পাশেই, মুখ তার সরু থেকে হয়ে উঠেছে কত বড়। আর তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে সুন্দর এক একখানি গান। ছেলেটি এক মনে শুনে নেয় সেই সব কলের গান। লালচাঁদ বড়ালের 'ওরা কেমন মা তা কে জানে,' 'ধিনতা ধিনা পাকা নোনা'। মানদাসুন্দরীর 'আর কবে দেখা দিবি মা হর রমা'। পান্নাময়ীর 'শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজ-বিহারী'। যত গান এদের কাছে আছে, সমস্ত তার শোনা চাই। যতক্ষণ না শুনতে পায়, দলটির সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। আর ইস্কুলে যাওয়া হয় না সেদিন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। গান সব শোনে আর শিখে নেয় গুনগুন করে।

কপোতাক্ষ নদীর ধারে। খুলনা জেলার সেই অঞ্চলটিতে। খেসড়া আর রাড়ুলিতে। বাঁকা আর কাঠিপাড়ায়।

পাশাপাশি সেখানে চারখানি গ্রাম। লোকে একসঙ্গে তাদের নাম করে—রাড়ুলি, খেসড়া, বাঁকা, কাঠিপাড়া। গ্রাম চারটির প্রথম ইংরেজী অক্ষর নিয়ে অঞ্চলের একটি মাত্র ইস্কুলের নাম হয়েছে—আর কে বি কে ইনস্টিটিউশন। তারই এক ছাত্র ওই ছেলেটি। এ অঞ্চলের সবাই তাকে চেনে। অনাথ তার নাম। অনাথনাথ বসু। খেসড়ার দত্তবাড়ির ছেলে।

কি সুন্দর অনাথের গানের গলা। চমৎকার গাইতে পারে অতটুকু ছেলে। যেমন মিষ্টি গলা তেমনি শুনে শুনেই গান শিখে নেবার ক্ষমতা তার। ওই সব রেকর্ডের গান সে কেমন নকল করে গায়। তাছাড়া কীর্তনও গাইতে পারে কীর্তনীয়াদের মতন। কলের গানের 'ধিনতা ধিনা পাকা নোনা', 'আর কবে দেখা দিবি মা হর রমা' এসব গান অবিকল শুনিয়ে দেয়। আর আসরে শোনা কত কীর্তন...

অনাথদের পৈত্রিক বাস খলিশখালি গ্রামে। খেসড়া থেকে [illegible] ক্রোশ। কিন্তু সে থাকে মামার বাড়ি [illegible]। শৈশবেই পিতৃহীন। তাই মামার বাড়িতেই একেবারে ছেলেবেলা থেকে মানুষ।

অনাথের [illegible]শ-এগার বছর বয়স হল, ১৯০৭।৮ সালের কথা। গ্রামোফোনের প্রথম যুগ তখন। তার ৬।৭ বছর আগে পত্তন হয়েছে গ্রামোফোন রেকর্ডের ব্যবসা। সাধারণের ভাষায়—কলের গান। তার বহু জনপ্রিয় গায়ক লালচাঁদ বড়াল। তারপর গায়িকাদের মধ্যে আছেন মানদাসুন্দরী পান্নাময়ী। কৃষ্ণভামিনী।

তাঁদের রেকর্ড নিয়ে ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীদের নানা জায়গায় দেখা যায়। কলকাতা থেকে অনেক দূরে দূরে পূর্ব বাংলার জেলায় জেলায়। মফঃস্বল শহরে, গ্রামে পর্যন্ত। পল্লীবাসীদের কাছেও পৌঁছয় কলের গান।

গ্রামোফোনের এমনি ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীরা আসে সেকালের খুলনা জেলাতেও। কপোতাক্ষর সেই অঞ্চলে। চারখানি বর্ধিষ্ণু গ্রাম নিয়ে ঘনিষ্ঠ একটি এলাকা—যদিও মাঝ দিয়ে কপোতাক্ষ বয়ে চলেছে।

নদীর এপারে রাড়ুলি বাঁকা, কাঠিপাড়া। ওপারে শুধু খেসড়া। খেয়া নৌকো পারাপার করে খেসড়া থেকে রাড়ুলি।

চারটি গ্রাম যেন একটিমাত্র অঞ্চল। আর তার কেন্দ্র হল রাড়ুলি—বাংলার বরেণ্য সন্তান প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ধারণভূমি। তাঁর পৈত্রিক বাসের গৌরবেই গরীয়ান এ পল্লী। বিজ্ঞান-চর্চা ও দেশসেবায় তখন উৎসর্গ করা প্রাণ প্রফুল্লচন্দ্রের। তিনি প্রধানত কলকাতা-নিবাসী বটে। কিন্তু গ্রামের সঙ্গে যোগও তাঁর নানাভাবে আছে। এ অঞ্চলের ওই একটি মাত্র উচ্চ বিদ্যালয় আর কে বি কে পত্তন হয় তাঁরই পৈত্রিক গৃহে। পরে তার নিজস্ব বাড়ি হয়েছিল। তাঁর পিতা হরিশ-চন্দ্রই স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা।

রাড়ুলি বাঁকা কাঠিপাড়ার পড়ুয়ারা আসে আর কে বি কে-তে। তেমনি পারানির নৌকোয় খেসড়া থেকেও। অনাথ নামে ছেলেটিও এই ইস্কুলে আসে। তার আত্মীয় সম্পর্ক আছে প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে। হরিশ-চন্দ্র হলেন তার পিতা অপীন্দ্রকৃষ্ণ বসুর পিসতুতো দাদা।

খেয়া পারাপার করে সে রাড়ুলিতে পড়তে আসে বটে। কিন্তু লেখাপড়ায় তার মন নেই একেবারে। গান তার সমস্ত মন কেড়ে নিয়েছে। গান শুনতে পেলে আর কিছু চায় না সে। আর যে গান শোনে, তা-ই মুখে মুখে শিখে নেয়। তারপর মিষ্টি গলায় যখন গাইতে থাকে, ভারি ভাল লাগে সকলের।

যত কলের গান এদিকে এসেছে, সবই সে শিখেছে। তা ছাড়াও গানের অভাব নেই এ অঞ্চলে। কীর্তনের খুবই চলন আর প্রভাব এদিকে। গোটা বৈশাখ মাসেই গ্রামে গ্রামে কীর্তনের আসর বসে যায়। বাইরে থেকে কীর্তনীয়ারা আসে বড় বড় কীর্তন আসরে। অনাথের মামার বাড়িতেও আসর হয়। তখন নবদ্বীপ কলকাতায় অনেক নাম-করা কীর্তনীয়ার গান শুনতে পায়। তা ছাড়া আছে শ্রাদ্ধ বাসরের কীর্তন। এ জন্যেও কলকাতা থেকে কীর্তনীয়া আনে অবস্থাপন্ন লোকেরা।

একবার কলকাতার বিখ্যাত কীর্তন গায়িকা হেমাঙ্গিনীও এসেছিলেন। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রথম আসেন তিনি, খেসড়ার কাছেই একটি গ্রামে। কিন্তু তারপর এত মজুরো আসতে লাগল আশ-পাশের গ্রাম থেকে যে তিনি বেশ কিছুদিন রয়ে গেলেন। রইলেন তিনি অনাথদের বাড়িতেই। খেসড়ায়। সেখান থেকেই কাছাকাছি গ্রামে হেমাঙ্গিনী কীর্তন গাইতে যেতেন। অনাথের জননীকে বলতেন—মা। অনাথকে বলতেন, 'আমার ছেলে তোমারই বয়সী। সে ও গান গায়। তার নাম সতীশ। কলকাতায় গেলে তার সঙ্গে আলাপ করো।'

সেই হেমাঙ্গিনীর মুখে অনেক কীর্তন সেবার শুনেছিল অনাথ। পালা কীর্তনে হেমাঙ্গিনীর খুব নাম ছিল সেকালে।

তা ছাড়া অনাথের মামার বাড়িতেই কীর্তনের রীতিমত চর্চা। মেজ মামা অবিনাশ দত্ত একজন সখের কীর্তনীয়া।

এই সব সূত্রেই অনাথের ছেলেবেলা থেকে কীর্তনের সঙ্গে পরিচয়। কীর্তন সে তখন থেকেই গায়। আর এ গানের জন্যেও অঞ্চলের সকলেই তাকে জানে। অনেকেই ভালবাসে তার গান শুনতে। অবাক হয়ে ভাবে—অতটুকু ছেলের কি করে এমন সুললিত কণ্ঠ হল! লালচাঁদ বড়াল মানদাসুন্দরীর গান সে গাইতে পারে কি করে!

কিন্তু যারা তার বংশের কথা জানে তারা আশ্চর্য হয় না। খলিশখালি গ্রামের অপীন্দ্রকৃষ্ণ বসু হলেন অনাথের পিতা। তিনি ত একজন ভাল গায়ক। সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর এস্টেটে কাজও করতেন অপীন-বাবু। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরদের জমিদারী ছিল নোয়াখালিতেও। সেখানেই শায়েস্তা-নগরে অপীনবাবু চাকরীসূত্রে থাকতেন। আর তাঁর মৃত্যুও হয় শায়েস্তানগরেই, দিন-কয়েকের অসুখে। অনাথ তখন মাত্র ১৫ দিনের শিশু।

অপীনবাবু ভাল টপ্পা গাইতেন। হিন্দুস্থানী টপ্পা। রাগসংগীতের চর্চা করতেন। তবে সঠিক জানা যায় না, কার কাছে তাঁর শিক্ষা। সৌরীন্দ্রমোহনের দরবারী গুণীদের কাছে শিখতে পারেন হয়ত।

অনাথের সঙ্গীতকণ্ঠ সেই উত্তরাধিকার-সূত্রেই পাওয়া। পিতার হঠাৎ মৃত্যুর জন্যে জন্মস্থান মামার বাড়িতেই সে থেকে যায়। সে পরিবারে তখন ওই একটিমাত্র ছোট ছেলে। তার ওপর সেকালের মামার বাড়ি। তাই বড় হতে থাকে রীতিমত আদরে-যত্নে। কোন শাসন বারণের বালাই নেই। যেন একটি মুক্ত পাখির জীবন।

খলিশখালির অপীনবাবু রাগসঙ্গীত গাইতেন। আর এখানে খেসড়ার বাড়িতে কীর্তনের চর্চা। সেই কীর্তনের সুরের মধ্যে অনাথ বড় হতে লাগল। আর শুনে শুনে গাইতে আরম্ভ করলে কীর্তন। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য রকমের গানও। যেমন লালচাঁদ বড়াল মানদাসুন্দরীর বাংলা টপ-খেয়াল। উত্তরজীবনে অনাথনাথের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল গুণী খেয়াল গায়ক বলে। তার সূত্রপাত সেই খেসড়া গ্রামে, কলের গানের জন্যে। আর সেই সঙ্গে গায়ক পিতার উত্তরাধিকারে।

সঙ্গত যন্ত্রের হাতেখড়িও ওই বাল্যকাল থেকেই। মেজ মামা অবিনাশ বাড়িতে কীর্তন গাইতেন। আর তাঁর সে গানের সঙ্গে খোল বাজাতে ব্রত অনাথ। কীর্তনের সঙ্গে তার এই খোল বাজানোও শুনে শুনে নিজে শেখা। এই ছন্দ জ্ঞানও যেন তার সহজাত। গ্রামের উৎসবে পুজো-পার্বণে ঢাক-ঢোল বাজত। আর সেই ৯।১০ বছরের ছেলেটি তার নিখুঁত নকল করে অবাক করত সকলকে।

একই সঙ্গে গান আর সঙ্গতে উত্তর-কালে যিনি অসামান্য শিল্পী হয়েছিলেন—কপোতাক্ষর গ্রামাঞ্চলে এ সবই তার পূর্বা-ভাস। উষাকালের অর্ধস্ফুট কাকলি যেন।

কপোতাক্ষ তীরের একটি বন্ধনহীন বিহঙ্গ। এমনি করে বৃদ্ধি পায় দিন দিন। তার শুনে শুনে গান গাওয়া। সবই নিজে নিজে শেখা। স্বয়ং শিক্ষক। এমনি গান-বাজনার মধ্যে ১২-১৩ বছরের হয়ে ওঠে অনাথ।

তার গান শুনে অনেকেই সুখ্যাতি করে বটে। কিন্তু একজন শোনান অন্য রকম কথা। ওই বাঁকা গ্রামের সতীশ রায়। আর কে বি কে'র একজন শিক্ষক তিনি। তাঁরও সঙ্গীতের সখ। বেহালা বাজান। গানও খুব ভালবাসেন। সেজন্যে অনাথকেও। কিন্তু কথা শোনান আর এক ধরনের

তাকে বলেন, 'ওরে অনাথ' তুই লেখা-পড়া ছেড়ে দে। তোর মামারা বৃথাই তোকে ইস্কুলে দিয়েছেন। লেখাপড়া তোর দ্বারা হবে না। গানই তোর হবে। তবে গান-বাজনা শেখ ভাল করে। আর এ গাঁয়ে থেকে কিছু করতে পারবি না। কল-কাতার মতন শহরে যা। তবে ভাল করে শিখতে পারবি।'

বালকের আশ্চর্য লাগত তাঁর এ ধরনের কথা। ঠিক বুঝতে পারত না কেমন করে তা সম্ভব। কোন উত্তর তার মুখে জোগাত না।

কিন্তু সতীশবাবু তাকে প্রায়ই বলতেন ওই রকম। আবার এক একদিন সাহস দিতেন, "ভয় করিস নি। ভগবান ঠিক একটা উপায় করে দেবেন। কলকাতায় চলে যা, কলকাতায় চলে যা। এ গাঁয়ে পড়ে থাকলে তোর কিছু হবে না।'

১৩।১৪ বছরের বালক। ভাবতে পারে না, কি করবে। এ বিষয়ে পরামর্শও কারুর সঙ্গে করবার উপায় নেই। তবে মনের মধ্যে মাঝে মাঝেই তোলপাড় করে সতীশবাবুর কথাগুলো।

এদিকে তার গান বাজনায় ঝোঁক বটে। কিন্তু আর একদিকে রীতিমত জ্ঞানপিঠে সে। আর তেমনি সাহসী। ভয়ডর কাকে বলে জানে না। যথেষ্ট বুদ্ধিমান, লেখাপড়ায় ভাল না হলেও তবু অনাথের ধারণার বাইরে ছিল, দূরে কলকাতায় চলে যাওয়া। কলকাতার কথা সে আত্মীয়স্বজন অনেকের কাছেই অনেক শুনেছে। তাই কলকাতা তার মনে ছিল স্বপ্নের জগৎ হয়ে। সেখানে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব বোধ হত।

এমন সময় সেই অভাবিত ঘটনাই ঘটে গেল। আর কি আকস্মিক ভাবেই।

অনাথের বয়স তখন ১৪ বছর। স্টীমারে চেপে ও অঞ্চলে বেড়ানো আগে ত কতদিনই হয়েছে। কিন্তু সেদিন কি যে যোগাযোগের লগ্ন ছিল তার ভাগ্যে।

কপোতাক্ষ নদীতে নিয়মিত স্টীমার চলে। খুলনা থেকে সাতক্ষীরা। সেরে

সাতক্ষীরা থেকে খুলনায়। খেসড়া রাড়ুলি, থেকে-খুলনা পৌঁছয় সন্ধ্যে সাতটায়।

দুরন্ত স্বভাব অনাথ মাঝে মাঝেই স্টীমারে চেপে বসে। ঘুরে আসে কাছাকাছি। এ লাইনের ইনসপেকটর তার খুবই জানা লোক। কীর্তন শুনতে তিনি বড় ভালবাসেন। অনাথকে দেখতে পেলেই তিনি বলেন গান শোনাতে। তিনি থাকলে স্টীমারে তার টিকিট লাগে না। ইচ্ছে মতন বেড়িয়ে আসে কপোতাক্ষর ওপর দিয়ে। তবে সে ওদিকে খুলনা পর্যন্ত যায় নি কখনো।

সেদিন স্টীমারে উঠতেই ইনসপেকটরের সংগে দেখা।

'আজ তোর গান না শুনে ছাড়ছি না। চল্ আমার কেবিনে। আশ মিটিয়ে কেত্তন শুনব।'

কীর্তন-পাগল ভদ্রলোক অনাথের গান শুনতে বসলেন, হাতের কাজ সেরেই। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল গানে গানে। অনাথের অনেক কীর্তন গাওয়া হল স্টীমারের কেবিনে কেবিনে।

তখন অনাথেরও সময়ের জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ মনে হতেই বললে, 'এ কি? একেবারে খুলনা এসে যাবে যে?, তাহলে আর আজ রাত্তিরে ত বাড়ি ফিরতে পারব না? সন্ধ্যের পর ওখান থেকে স্টীমার ফেরে না ত?'

ইনসপেকটর বললেন, 'তার জন্যে কি হয়েছে? আমি আজ রাতে কেবিনেই তোর থাকবার ব্যবস্থা করে দেব। কাল সকালে প্রথম স্টীমারেই বাড়ি চলে আসবি।'

খুলনা পৌঁছে, তিনি চলে গেলেন ডিউটির পরে। যাবার আগে কর্মচারীদের বলে অনাথের সব ব্যবস্থা করে দিলেন। কেবিনে খাওয়ার পর রাতটা থাকবে। তারপর সকালে সেই স্টীমারেই ফিরে যাবে খেসড়ায়। গ্রীষ্মকাল। কোন অসুবিধা হবে না তার কেবিনে রাত্রিবেলা থাকতে।

বিকালের জলখাবার ভদ্রলোক আগেই তাকে খাইয়েছিলেন। রাতের খাওয়া অনাথ সেরে স্টীমার ঘাট থেকে বেড়াতে গেল রেল স্টেশনে। কাছেই।

আগে কখনো তার রেল গাড়ি চড়া হয়নি। মনে মনে বললে 'আজ রেল দেখে আসি।'

প্ল্যাটফর্মে তখন কলকাতা যাবার ট্রেণ দাঁড়িয়ে। দেখতে গিয়ে হঠাৎ রেলে চড়বার কথা মনে হয়ে গেল।

আর কিছু না ভেবেই অনাথ উঠে পড়ল গাড়িতে। সেটি সেকেণ্ড ক্লাস। একজন মাত্র যাত্রী ছিলেন কামরায়। একটু পরেই ট্রেণ চলতে আরম্ভ করে দিল।

কলকাতায় চলল যে!

যাক না! দেখি কি আছে বরাতে! সতীশবাবুর এতদিনের কথার আজ এসপার-ওসপার হোক।

১৪ বছরের গ্রাম্য ছেলে পাড়ি দিলে কলকাতায়। এই প্রথম রেলের যাত্রী। তাও বিনা টিকিটে। এক বস্ত্রে। সংগীহীন। পকেটে শুধু আনা তিনেক পয়সা। একমাত্র সম্বল —গান! আর সেই সতীশবাবুরেই আর এক আশ্বাস—ভগবান ঠিক একটা উপায় করে দেবেন! ভয় করিসনি!

চলন্ত গাড়িতেই মাথায় পরিকল্পনা জাগতে লাগল। কি অবস্থায় পড়তে হবে ট্রেণের মধ্যে স্টেশনে কলকাতায়! কি করে আত্মরক্ষা সম্ভব! বিশেষ টিকিটের ব্যাপার।

সহযাত্রীই সংকটের সূচনা করলেন। সন্দিগ্ধ চোখে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'এদিকে কোথায় বাড়ি', 'কোন স্কুলে পড়' 'কতদূর যাচ্ছ' ইত্যাদি।

এ অঞ্চলের অনেক জায়গাই অনাথের জানা। নাম ধাম দিয়ে কোনক্রমে এসব প্রশ্ন-মালার জাল থেকে উদ্ধার পেলে।

তারপর আর একটি মোক্ষম জিজ্ঞাসা-- 'একা কলকাতায় যাচ্ছ কেন?'

'সেখানে গুরুজনের অসুখ। টেলিগ্রাম পেয়ে দেখতে যাচ্ছি। বাড়িতে আর কেউ নেই যাবার মতন।'

এমনি সব কথাবার্তার মধ্যে ভদ্রলোকের টিকিটখানি চেয়ে নিলে অনাথ। যেন এমনি দেখবার জন্যে। আর কথায় কথায় যেন অন্য-মনস্ক হয়েই মুখে পুরে দিলে।

খানিক পরেই ভদ্রলোকের খেয়াল হল। 'কই আমার টিকিট?'

'এই যে' বলে অপ্রস্তুত হয়েই মুখ থেকে বার করে দিলে টিকিটটা। কিন্তু তারই মধ্যে কাজ সিদ্ধ হয়েছে। টিকিটের খানিকটা মুখস্থ করে নিয়েছে, ভাগ্যক্রমে নম্বরের দিকটাই।

আরো ভাগ্যের কথা সারা রাতের মধ্যে কোন 'চেকার' গাড়িতে এল না।

সকালবেলা একেবারে শিয়ালদা স্টেশনে অগ্নিপরীক্ষার পালা! লোহার গেটের সামনে টিকিট দেখাতে না পেয়ে রেল কর্মচারীর সংগে যেতে হল খোদ স্টেশন মাস্টারের সামনে। তখনো জবরদস্ত ইংরেজ আমল। সালটা বোধহয় ১৯২১। সেকালের চলতি কথায়—শিয়ালদার সেই স্টেশন মাস্টার একজন 'লাল মুখ'।

কিন্তু তিনি মুখ বেশি লাল না করে কোমল কণ্ঠেই জানতে চাইলেন, 'টিকিট করো নি?'

'করেছিলাম। কিন্তু আর একজন যাত্রী টিকিটটা নিয়ে ভুলে মুখে দিয়ে ফেলে। তার খানিকটা কোনরকমে ফেরৎ পেয়েছি।'

বলে, টিকিটের সেই টুকরো পকেট থেকে বার করে দেখাল। সাহেব বিশ্বাস করলেন কিনা, কে জানে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন যাবে কোথায়?'

এতক্ষণ পরে অনাথের চোখে জল দেখা গেল। সত্যি সে নিজেই জানে না, এই অচেনা বিরাট শহরে যাবে কোথায়?

তাকে কাঁদতে দেখে সাহেব সহানু-ভূতির সংগে জানতে চাইলেন, 'কলকাতায় তোমার আপনার লোক কেউ নেই?'

তা আছেন। মনে পড়েছে এক মামার কথা। তাঁর নাম ঠিকানা অনাথ সাহেবকে জানাল।

তখন সায়েব তার সংগে লোক দিলেন, সেই ঠিকানায় পৌঁছে দেবার জন্যে। সেই লোকের সংগে বরাবর ট্রাম গাড়িতে এসে, মামার দেখাও পেয়ে গেল। কিন্তু তিনি তাকে দেখে আর বৃত্তান্ত শুনেই অগ্নিশর্মা— 'এক্ষুণি বাড়ি ফিরে যা। আমি তোকে রাখতে পারব না।'

'বাড়ি আমি ফিরব না। গান শিখতে এসেছি। গান ভাল করে শিখবই। চলে যেতে আসিনি।' সুস্পষ্ট উত্তর। 'আমায় তাহলে এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।' বলে তাঁকে এক মাসতুত ভগ্নীপতির নাম জানালে অনাথ। মামা রাজি হলেন।

ভবানীপুরে যদুবাবুর বাজারের কাছে আশ্রয় মিলল শেষ পর্যন্ত। ক...পাড়া গ্রামের এই আত্মীয় অনাথকে কাছে রাখলেন বটে। কিন্তু নিজেই নানা অসুবিধার মধ্যে থাকতেন। অনাথও সব কষ্ট মেনে নিতে প্রস্তুত হয়েই রয়ে গেল সেখানে।

ভগ্নীপতি ভরসা দিলেন, 'এখানে থাকো। আর ওস্তাদও খোঁজা যাক।'

কিন্তু নিঃসহায় নিঃসম্বল ছেলেটির জন্যে কোথায় পাওয়া যাবে ওস্তাদ? তবে সেই আত্মীয় তাকে জানাশোনা নানা জায়গায় নিয়ে যেতে লাগলেন। তার গান শুনেন সবাই। যদি কোন দিক থেকে সুরাহা হয়, সংগীতজীবনের কোন সুযোগ আসে। এই একমাত্র আশা।

অনাথের ভগবৎ-দত্ত সুকণ্ঠ আর রেকর্ড, কীর্তনের আসর ইত্যাদি থেকে নিজে শেখা গান কাজে লাগল এবার। গান শুনে সকলেই সুখ্যাতি করতেন। আর মনোবল বাড়ত গায়কের। সেই সংগে ভাল করে ওস্তাদী গান শেখবার আশা, বড় গায়ক বলে প্রতিষ্ঠা পাবার আশাও মনে জেগে থাকত।

এমনি ভাবেই কলকাতায় তার দিন যায়।

—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(ক্রমশঃ)

খেলার জগতে মেয়ে

খেলা থেকে গ্লাইডিং-এ
জয়িতা ব্যানার্জি

বেথ্ন স্কুলের ছাত্রী থাকাকালেই জয়িতা ব্যানার্জী স্কুল এথলেটিকসে তার যোগ্যতা প্রমাণ করে। তারপর বেথ্ন কলেজে বি-এ ক্লাসের (পার্টওয়ান) ছাত্রী হিসেবে খেলাধ্লা এবং সাঁতার চালাতে থাকে। এই সময় ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরে যোগ দেবার স্যোগ পায়। এন-সি-সির নিজস্ব এয়ারউইং না থাকলেও জয়িতা ক্রীড়াকুশলতা ও ক্যাডেট হিসাবে যোগ্যতা প্রকাশের ফলে গ্লাইডিংয়ের স্যোগ পায়। মেয়েটি এরই মধ্যে আটবার গ্লাইডিং করেছে। জয়িতা বলে, গ্লাইডিংয়ের জন্যে আমরা আটজন বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে 'ইন্টারভিউ-এ' বাছাই হই। মেডিক্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমিই সর্বপ্রথম গ্লাইডার চালাবার স্যোগ পাই এবং এপর্যন্ত আটবার উড়তে পাই। 'গ্লাইডিং'-এ এন-সি-সির ক্যাডেটদের মধ্যে আমিই প্রথম স্যোগ পেয়েছি। বাটটা ফ্লাইট ট্রেনারের সঙ্গে উড়তে হবে। তারপর একা গ্লাইডার চালাবার স্যোগ পাব।

—গ্লাইডারে উড়তে তোমার ভয় হয় নি?

—গ্লাইডারে চড়া বা চালান সম্পর্কে অনেকরকম কথা শ্নেছি। সবাই বলেন, এ খ্ব কঠিন কাজ। মাটি থেকে গ্লাইডার উড়ানোর ব্যবস্থা হয়। আমি আর প্রশিক্ষক গ্লাইডারে বসে থাকি। মাটি থেকে উইঞ্চের সাহায্যে গ্লাইডারটি আকাশে ৮০০ থেকে হাজার ফ্ট ওপরে তুলে দেবার পর গ্লাইডারটিকে পাইলটিং করে সাত থেকে দশ মিনিট ধরে আকাশে একটা চক্কর দিয়ে নামতে হয়। ব্যাপারটা বিমান চালানরই মত। উঠবার সময় আমার একট্ও ভয় হয় নি। তবে গ্লাইডারের চারিদিক খোলা বলে পাশ দিয়ে জোর হাওয়া বয়। তাতে প্রথম প্রথম কিছ্টা অস্বস্তি হত। এখন আর হয় না।

—তোমরা কতজন ইন্টারভিউ দিয়েছিলে?

—আমাদের কলেজের 'ইউনিট ফার্স্ট বেঙ্গল গার্লস ব্যাটালিয়ন থেকে প্রায় ৪৫ জনকে পাঠান হয়েছিল। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর মেডিক্যাল পরীক্ষায় আটজন মনোনীত হই।'

—এরোমডেলিং না করে গ্লাইডিং করতে অস্মবিধা হয় নি?

—না। সঙ্গে প্রশিক্ষক থাকায় অস্বিধা অন্ভব করি নি। তবে আগে এরোমডেলিং করা থাকলে গ্লাইডিংয়ের কলাকুশলতা বেশ কিছ্ জানা হয়ে যায়। তাতে স্বিধা হয়। অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান যায়। এন-সি-সিতে শীঘ্রই এরোমডেলিং স্র্ হবে, এবং তাতে কিছ্ মেয়েকেও নেওয়া হবে।

—মেয়েদের মধ্যে একক গ্লাইডার নেই?

—না, এখনও পর্যন্ত নেই। মেয়েদের পক্ষে গ্লাইডিংয়ে প্রধান অস্বিধা দৈহিক উচ্চতা। আমাদের প্রায় অধিকাংশের উচ্চতাই ৫ ফ্ট ২ ইঞ্চির বেশী হয় না। অথচ কমপক্ষে দৈহিক উচ্চতা ৫ ফ্ট ৪ ইঞ্চি না হলে গ্লাইডারের ফেমারে পা ছোঁয় না। তাতে যন্ত্র চালাতে একট্ অস্বিধা হয়।

জয়িতা বলে, আমাদের প্রশিক্ষক টি কে মিত্র ছাত্রীদের প্রতি খ্ব সহান্ভূতিসম্পন্ন। কয়েকবার গ্লাইডিং করার পর কেমন যেন নেশা ধরে যায়। আকাশে উড়তে অপূর্ব লাগে। আমার ধারণা গ্লাইডিং বিমান চালানোর চেয়েও রোমাঞ্চকর। নামবার সময়ই সবচেয়ে থ্রিলিং লাগে। ঠিক ঠিক ভাবে ল্যাণ্ডিং করতে না পারলে কি পরিণাম হবে ব্ঝতেই পারছেন।

জয়িতা জানায়, ধীরেন মজ্মদারের উদ্যোগে ও যাদবপ্র ইউনিটের সিও অমিতাভ সেনের অন্মতিতে মেয়েরা এরোমডেলিংয়েরও স্যোগ পায়। জয়িতা এপর্যন্ত তিনটি মডেলিং করেছে। অবশ্য এরোমডেলিংয়ের সাজসরঞ্জাম ও জার্মান ইঞ্জিন পাওয়া এখন খ্বই দ্রূহ ব্যাপার। এরোমডেলিংয়ের প্রশিক্ষক এন সি হালদার ও এ চৌধ্রী। জয়িতার ধারণা

এরোমডলিং আগে করলে গ্লাইডিং খুব সহজে শেখা যায়।

—তবে কথা হচ্ছে, এরোমডলিং ও গ্লাইডিং দুই-ই খুব ব্যয়সাধ্য। ব্যক্তিগত-ভাবে সবার পক্ষে তাই এই দুটি বিষয় শেখা সহজ হয় না। গ্লাইডারে ওড়া এখন খুবই সীমাবদ্ধ। কারণ, জ্বালানী তেলের দাম খুব বেড়েছে। এক ঘন্টা উড়তে ৪৫ টাকার মত ব্যয় হয়।

জয়িতা অমৃতবাজার পত্রিকার সহকারী বার্তা সম্পাদক ললিতমোহন ব্যানার্জির কন্যা।

বেথুন স্কুলে থাকতে জয়িতা ১৯৬৬তে জাতীয় স্কুল ক্রীড়ায় পশ্চিম বাংলার সাঁতার দলে ছিল। পরের বছর রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতায় ছোটদের বিভাগে তৃতীয় হয়। ১৯৬৫তেও রাজ্য স্কুল সাঁতারে দক্ষতার নজীর রেখেছিল জয়িতা। এছাড়া কলকাতায় এবং রাজ্য সাঁতারের আসরে এই মেয়েটি বিভিন্ন বিভাগে পদক ও ট্রফি লাভ করে। জাতীয় স্কুল সাঁতারে চিৎ ও বুক সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

এথলেটিকেও জয়িতা বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিল। স্কুলের আসরে দৌড়, বর্শা ছোঁড়া ও সটপুট ছোঁড়ায় পদক জয় করে। ব্যাডমিন্টনে ১৯৭০-এ নবম শ্রেণীর ছাত্রী থাকাকালে জয়িতা স্কুল ও কলেজ ছাত্রীদের প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের পরিচালিত শারীরিক সক্ষমতার প্রতিযোগিতায় জয়িতা 'টু স্টার সার্টিফিকেট লাভ করে। ১৯৭৩ ও '৭৫ ও কলেজ স্পোর্টসে বিজয়িনী হয়। এদিকে গানেও জয়িতার দক্ষতা আছে। ১৯৭২-এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত প্রতি-যোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। ১৯৭৯-এ জয়িতা এন-সি-সির রাজ্য শুটিং প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে। জয়িতা এখন এন-সি-সিতে সার্জেন্ট পদে উন্নীত হয়েছে। আর যাদবপুরস্থ এয়ার স্কোয়াড্রনে এরোমডলিংয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এন-সি-সিতে মেয়েদের মধ্যে জয়িতাই প্রথম গ্লাইডার-চালিয়ে। নানারকম খেলাধুলো এবং সাঁতারে পটুত্বের ফলেই জয়িতা শরীর ও মনকে একটা সুসংবদ্ধ সপ্রতিভ শৃঙ্খলায় তৈরী করতে পেরেছে।

প্রসঙ্গতঃ জয়িতা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে সাঁতারেই আমি খুব একাগ্রতার সঙ্গে অনুশীলন করতাম। আমার প্রশিক্ষকও আমার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে খুব আশা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু ক্লাব সংগঠকদের বিরূপ ব্যবহারের ফলে আমি শেষপর্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে সাঁতারে ইতি দিই। আমার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ঘিরে নানারকম গণ্ডগোল দেখা দিতে থাকায়, আমাকে বাধ্য হয়ে 'জল ছেড়ে একেবারে উঠে আসতে হয়।' আবহাওয়া হাল্কা করার জন্য বলি, তাতে তো ভালই হয়েছে। জল ছেড়ে একেবারে আকাশে ওড়ার ব্যবস্থায় যোগ দিয়েছে।

—তা বটে। কিন্তু, কি জানেন ছোটবেলা থেকেই জল আর সাঁতার আমার খুব ভাল লাগে। স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নেমে খুব 'থ্রিল' অনুভব করতুম।

প্রশ্নের উত্তরে জয়িতা বলে, ঠিকমত সুযোগ সুবিধা পেলে এদেশের মেয়েরাও জীবনের নানাদিকে পশ্চিমী মেয়েদের মত সুযোগ্য হতে পারে। বাবা আর মায়ের উৎসাহ আর সহযোগিতা পেয়েছি বলেই এতটা করতে পারছি। আমাকে সাঁতার শেখাবার ব্যবস্থা বাবাই করেন। আর মা যোগান উৎসাহ।

—ভবিষ্যতের ইচ্ছা কি?

—আশা করছি গ্লাইডিং আর এরোমডলিংএ ভাল করে রপ্ত হয়ে ক্রমে দক্ষ পাইলট হয়ে উঠতে পারবো।

—অময়

দেশ বিদেশের খেলা

নবজন্মের রাণী

আন্তর্জাতিক জিমনাস্টিকের আসরে সোভিয়েট রাশিয়ার একাধিপত্য সুপ্রাচীন। পুরুষ বিভাগে বিজয় পতাকা অবিচ্ছিন্ন-ভাবে সগর্বে উড্ডীন থাকলেও মহিলা বিভাগে রুশ আধিপত্যের অবসান ঘটে। চেকোশ্লাভাকিয়ার ভেরা ক্লাসলাভোস্কার আবির্ভাবে রাশিয়ার সুদীর্ঘকালের প্রতি-ষ্ঠিত মহিলা জিমনাস্টিকের সাম্রাজ্য বেহাত হয়ে যায়।

এক দশক পর চেক তরুণী ভেরা স্বস্থানে অবিচল থেকে সংসার জীবনে প্রবেশ করে প্রতিযোগিতামূলক জিম-নাস্টিকস থেকে বিদায় নিলে রাশিয়া মহিলা বিভাগের হারানো শীর্ষাসনটি ফিরে পায়। মিনস্ক শহরে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় জিম-নাস্টিকসের আসরে সোভিয়েট রাশিয়ার মহিলা বিভাগে সর্বোচ্চ পয়েন্ট সংগ্রহ করে হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করে। এই প্রতি-যোগিতায় ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে রাশিয়ার দুই নবাগতা তরুণী। এক-জনের নাম লুডমিলা তুরিশেভা। অপর জনের নাম তামারু লাজাকোভিচ। উভয়েই ৩৮—৮৫ পয়েন্ট সংগ্রহের সুবাদে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ান। এই সময় তুরিশেভা ছিলেন উত্তর ককেসাস অঞ্চলের গ্রোজনীর টিচার্স ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রী ও লাজাকোভিচ বাইলোরাশিয়ার ভিটেকস শহরের ফিজিক্যাল ট্রেণিং স্কুলে অধ্যয়নরত ছাত্রী।

ইউরোপীয় জিমনাস্টিকসের এই প্রতি-যোগিতায় সমান পয়েন্ট অর্জনের ভিত্তিতে দুজনে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ান হলেও ফ্রি একসারসাইজে সবচেয়ে বেশী পয়েন্ট (৯—৯) পাওয়ায় কর্তৃপক্ষ তুরিশেভাকেই ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার প্রদান করেন। যুগোশ্লাভাকিয়ার লুবজানায় আয়োজিত বিশ্ব জিমনাস্টিকসের আসরেও সোভিয়েট রাশিয়ার প্রায় দীর্ঘ এক দশকের হারিয়ে-যাওয়া স্বর্ণ আসনটি সযত্নে কুড়িয়ে আন-লেন লুডমিলা তুরিশেভা। এই দিক থেকে তুরিশেভাকে রুশ মহিলা জিমনাস্টিকসের নবজন্মের রাণী বলে অভিহিত করা যায়।

তুরিশেভার আবির্ভাবে রাশিয়ার মহিলা জিমনাস্টিকসে নতুন যুগের জন্ম হয়। এবং তার প্লাস্টিক বাড়ির মত নমনীয় অথচ নিখুঁত সুন্দর অংগসঞ্চালনের কাছে চেক তরুণীদের স্বর্ণযুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তুরিশেভাকে প্রাচীন রুশ তারকা লারিসা পেত্রিক লারিসা লাতিনিনা ইভানোভাদা তামারা ম্যানিনা জিনাইদা ভরোলিন প্রমুখদের যোগ্য উত্তরসূরী বলে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়।

ইউরোপীয় জিমনাস্টিকসে সাফল্যকে স্মরণ করে মিউনিখ অলিম্পিকের প্রাক্‌কালে সোভিয়েট মুলুকের দুই নতুন প্রতিভা তুরিশেভা ও লাজাকোভিচকে ঘিরে যে নয়া প্রত্যাশা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তা মিথ্যে প্রতিপন্ন হয় নি। আন্তর্জাতিক জিমনাস্টিক ফেডারেশনের মহিলা বিভাগের চেয়ারম্যান বার্থে ভিল্লানসেটের ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গেছে অক্ষরে অক্ষরে। কিংবা রুশ

তুরিশ্চেভা

মহিলা জিমনাস্টিক দলের শিক্ষিকা এবং এককালের বিশ্বসেরা জিমনাস্ট লারিসা লাতিনিনার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে পরিপূর্ণভাবে।

মিউনিখ অলিম্পিকে রুশ মহিলা জিমনাস্টিক দলে তুরিশ্চেভা ও লাজাকোভিজ ছাড়া উঠতি প্রতিভাদের মধ্যে ছিলেন কোসছেল বুরদা ও করবুট। ৩৮০-৫০ পয়েন্ট পাওয়ার সূত্রে এই দল চ্যাম্পিয়ানসিপের গৌরব অর্জন করে। দ্বিতীয় পর্বে জার্মানী ৩৭৬-৫৫ পয়েন্ট লাভ করে এবং হ্যাঙ্গেরী ৩৬৮-২৫ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

স্বর্ণকন্যা তুরিশ্চেভা ৭৭-০২৫ পয়েন্ট সংগ্রহের সুবাদে মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ান (হর্সভল্টে তৃতীয় ১৯-২৫০ আনইভেনবারে চতুর্থ ১৯-৪২৫ বিম ব্যালেন্সে পঞ্চম ১৮-৮০০ ও ফ্লোর একসারসাইজে দ্বিতীয় ১৯-৫৫০ পয়েন্ট)।

তুরিশ্চেভাকে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে পূর্ব জার্মানীর—কারিন জান্সের কাছে। কারিন জান্স ৭৬-৮৭৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত মহিলা চ্যাম্পিয়ানের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এ ছাড়া আনইভেনবার (১৯-৬৭৫) ও হর্সভল্টে (১৯-০২৫) সর্বোচ্চ পয়েন্ট লাভ করে কারিন জান্স স্বর্ণপদক জয় করে শক্তিশালী রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে খর্ব করার চেষ্টা করেন। রুশ তরুণী লাসকোভিচ ৭৬-৮৫০ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তৃতীয় হন।

গত এক দশকের মহিলা জিমনাস্টিকে রুশ বার্থতাকে ভোলবার অভিপ্রায়ে সম্ভাবনাময় প্রতিভার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে প্রশিক্ষক ভ্লাদিস্লাভ রাসটোরোটস্কি লুডমিলা তুরিশ্চেভাকে আবিষ্কার করেন। তখন গ্রোজনীর মেয়ে তুরিশ্চেভার বয়স মাত্র পনের। স্কুলের ছাত্রী তুরিশ্চেভা ঐ বয়সেই ইউ এস এস আর কাপ বিজয়ী। পরবর্তীকালে স্বীকৃতির সিঁড়ি বেয়ে একের পর এক সোনা কুড়িয়েছেন অলিম্পিকের আসর পর্যন্ত।

মিউনিখ অলিম্পিকের অবসানলগ্নে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন তুরিশ্চেভাকে—সব শ্রেষ্ঠের স্বীকৃতি লাভ করে আপনার অনুভূতি কেমন? বিনয়ী স্বল্পবাক রুশ তরুণী উত্তরে বলেছেন—আমার সাফল্য একক নয়। দলীয়। সতীর্থদের সাহায্য অনুপ্রেরণা না পেলে আমি এতটা এগিয়ে যেতে পারতাম না। তাই আজকে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি লাভের আনন্দ সতীর্থদের সঙ্গে সমান অংশে ভাগ করে নিতে চাই।

তুরিশ্চেভা মনে-প্রাণে খাঁটি ও আদর্শ জিমনাস্ট। দৈহিক নমনীয়তা ও নিখুঁত নির্ভুল অংগসঞ্চালনের সঙ্গে অসীম ধৈর্য ও একাগ্র নিষ্ঠা তুরিশ্চেভার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। ইভেন্ট অনুযায়ী দেহকে ইলাস্টিক রবারের মত স্বেচ্ছায় সুন্দর ভঙ্গীতে রূপদান করাতে তুরিশ্চেভা অনন্যা।

তুরিশ্চেভার স্বপ্ন অবসর জীবনে তিনি একজালের খ্যাতনামা জিমনাস্ট ও বর্তমান রুশ দলের প্রশিক্ষক লারিসা লাতিনিনার মত জিমনাস্টিকের সাধনাতেই আত্মমগ্ন থাকবেন।

—প্রশান্ত দাঁ

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

পার্টির শেষে শ্যামলাল বলেছিল শাণ্ডেলীকে ডা কপাল ডাক্তার চক্রান্ত। তার আগে শাণ্ডলী কিছু জানত না। জানবার পর আর মরবার আগে একজনের সঙ্গেই তাকে হেঁটে যেতে দেখা গেছে—সে হেমাঙ্গ বোস।

সুতরাং হেমাঙ্গ বোসই সেই প্রিয়জন যে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে হানা দিয়েছে শাণ্ডেলার সব শোনার পর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে হোটেলে।
সরিয়ে দিয়েছে তিন চক্রান্তকারীকে; প্রমাণ দু নম্বর ক্লু—হেমাঙ্গ বোসের হাত।

কলকাতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্ট বিজয়ী ভারতীয় দলের অধিনায়ক মনসুর আলি খাঁ মাঠের দর্শকদের প্রতি প্রত্যাভিনন্দন জানাচ্ছেন। ফটো : অমৃত

খেলাধূলা

দর্শক

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ

তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট

১ম দিন (ডিসেম্বর ২৭)

ভারতের প্রথম ইনিংস ২৩৩ রানের মাথায় শেষ হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসের কোন উইকেট না-খুইয়ে ১৪ রান সংগ্রহ করেছিল।

২য় দিন (ডিসেম্বর ২৮)

ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস ২৪০ রানের মাথায় শেষ হলে তারা মাত্র ৭ রানে এগিয়ে যায়। ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না-খুইয়ে ৮ রান সংগ্রহ করে।

৩য় দিন (ডিসেম্বর ২৯)

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ২০৬ রান দাঁড়ায় (৬ উইকেটে)।

৪র্থ দিন (ডিসেম্বর ৩১)

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ৩১৬ রানের মাথায় শেষ হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ১৪৬ রান সংগ্রহ করেছিল। খেলায় জয়লাভের জন্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আরও ১৬৮ রানের দরকার ছিল। হাতে জমা ছিল ৭টা উইকেট এবং একদিনের পুরো খেলার সময়।

৫ম দিন (জানুয়ারী ১, ১৯৭৫)

বেলা ১১টা ৫৫ মিনিট সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস ২২৪ রানের মাথায় শেষ হলে ভারত ৮৫ রানে জিতে যায়।

কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারত ৮৫ রানে জিতেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতের এটা [illegible] দ্বিতীয় জয় তথা ভারতের মাটিতে [illegible]ম জয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ভা[illegible] প্রথম জয় ৭ উইকেটে, পোর্ট অ[illegible] পনের ২য় টেস্ট, ১৯৭০-৭১।

১৯৭৫ সালের [illegible] ১ জানুয়ারী তারিখে ১২টা বা[illegible] পাঁচ মিনিট বাকি সময়ে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের তৃতীয় টেস্ট খেলার [illegible] পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। ওয়েস্ট ই[illegible] বাঙ্গালোরের প্রথম টেস্টে ২৬৭ রানে এব[illegible] দিল্লীর দ্বিতীয় টেস্টে এক ইনিংস ও [illegible] রানে জয়লাভের সূত্রে বর্তমানে ২—[illegible] খেলায় এগিয়ে মাদ্রাজের চতুর্থ টেস্ট [illegible] খেলতে নামবে।

ভারতের এই [illegible]হাসিক জয়লাভে বিশ্বনাথ এবং চন্দ্রশে[illegible] অবদানই ছিল সবথেকে বেশী। দলে[illegible] সংকট সময়ে বিশ্বনাথ পরিত্রাতার [illegible]কা নিয়ে প্রথম

কলকাতার তৃতীয় ক্রিকেট টেস্টে 'ম্যান অব দি ম্যাচ'—জি আর বিশ্বনাথ। তিনি ভারতীয় দলের পক্ষে উভয় ইনিংসে সর্বোচ্চ রান করেন—১ম ইনিংসে ৫২ এবং ২য় ইনিংসে ১৩৯ (উভয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান)। তাছাড়া তিনটে 'ক্যাচ' ধরেন—১ম ইনিংসে দুটো এবং ২য় ইনিংসে একটা (চন্দ্রশেখরের বলে কালিচরণকে)। —ফটো : অমৃত

কলকাতার তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২য় ইনিংসে সহজেই ঘায়েল করে ভারতের জয়লাভের পথ প্রশস্ত করে দেন এই দুই বোলার—বি এস চন্দ্রশেখর এবং বি এস বেদী। শেষ ৫ম দিনে চন্দ্রশেখর ৪৪ রানে ৩টে এবং বেদী ১৫ রানে ৩টে উইকেট নিয়েছিলেন।
—ফটো : অমৃত

ইনিংসে ৫২ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩৯ রান করেছিলেন। তাছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে কালিচরণের 'ক্যাচ' লুফে ভারতের অনুকূলে খেলার মোড় ঘোরাতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। বিশ্বনাথ ছিলেন 'ম্যান অব দি ম্যাচ'। ভারতের জয়লাভের পথে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন চন্দ্রশেখর। খেলার শেষ পঞ্চম দিনে তাঁরই বলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিনজন নামকরা ব্যাটসম্যান পর-পর আউট হয়ে যান—১৬৩ রানের মাথায় লয়েড (৪র্থ উইকেট), ১৭৮ রানের মাথায় কালিচরণ (৫ম উইকেট) এবং ১৮৬ রানের মাথায় জুলিয়েন (৬ষ্ঠ উইকেট)। এই তিনজন খেলোয়াড়ের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসে। এই দিন বেদীর বলে আউট হন মারে, গিবস এবং রবার্টস। হোল্ডার রান-আউট হন।

চতুর্থ দিনে পূর্ব দিনের অপরাজিত ৭ম উইকেট জুটি বিশ্বনাথ (৭৫ রান) এবং ঘাবড়ি (৫ রান) যখন দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামেন, তখন ভারতের রান ছিল ২০৬ (৬ উইকেট)। দলের এই সংকট সময়ে শেষ পর্যন্ত ৭ম উইকেট জুটিতে বিশ্বনাথ এবং ঘাবড়ি দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে দলের অতি মূল্যবান ৯১ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। ঘাবড়ি ২৭ রান করে দলের ২৮৩ রানের মাথায় আউট হন। অপরদিকে বিশ্বনাথ ৩৭৫ মিনিট খেলে ১৩৯ রান করে আউট হন দলের ৩০১ রানের মাথায়। বিশ্বনাথের এই ১৩৯ রানে ছিল ২৩টা বাউন্ডারী। টেস্ট খেলায় বিশ্বনাথের এটা তৃতীয় সেঞ্চুরী। বিশ্বনাথ তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে ১৯৬৯-৭০ সালে কানপুরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেঞ্চুরী (১৩৭ রান) করেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে বিশ্বনাথ ছাড়া আরও পাঁচজন খেলোয়াড়—লালা অমরনাথ, দীপক সোধন, কৃপাল সিং, আব্বাস আলি বেগ এবং হনুমন্ত সিং নিজ নিজ খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করলেও টেস্ট খেলায় তাঁরা দ্বিতীয় সেঞ্চুরী করতে পারেননি। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে বিশ্বনাথকে নিয়ে যে ছয় জন খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করেছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র বিশ্বনাথই দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরী করেছেন।

চতুর্থ দিনে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ৩১৬ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৩০৯ রানে এগিয়ে যায় এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩১০ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে ৩ উইকেটের বিনিময়ে ১৪৬ রান সংগ্রহ করে। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে দেখা গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলায় জয়লাভ করতে আরও ১৬৪ রানের প্রয়োজন। হাতে জমা ৭টা উইকেট এবং একদিনের সময়। এই সময়ে ৭ উইকেটে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৬৪ রান সংগ্রহ করা ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে মোটেই অসম্ভব ছিল না। অপরদিকে বর্তমান টেস্ট সিরিজের প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারতের শোচনীয় পরাজয় স্মরণ করে ভারতের অতি বড় গোঁড়া সমর্থকও এই তৃতীয় টেস্ট খেলায় ভারতের জয় সম্পর্কে কল্পনা করতেও ভরসা পাননি। তবু অনুষ্ঠানে যাতে কোন ত্রুটি না থাকে, তার জন্যে শেষ পঞ্চম দিনের খেলায় অনেকেই মাঠে সঙ্গে এনেছিলেন শাঁখ, কাঁসর-ঘণ্টা, বিউগিল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র।

শেষ পঞ্চম দিনে ভারতের জয়লাভের পথে খেলার মোড় ঘুরিয়েছিলেন চন্দ্রশেখর। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পরপর তিনজন প্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যান—অধিনায়ক লয়েড, কালিচরণ এবং জুলিয়েন চন্দ্রশেখরের বলে আউট হন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের তখন ৬টা উইকেট পড়ে ১৮৬ রান। পঞ্চম দিনে চন্দ্রশেখরের সেই সময়ের বোলিং পরিসংখ্যান ছিল : ওভার ৩'৪, মেডেন ০, রান ৩০ এবং উইকেট ৩। চন্দ্রশেখরই ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়লাভের সকল আশা নির্মূল করে দিয়েছিলেন। তার পরে বেদী তিনজনকে আউট করেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২২৪ রানের মাথায় বেদীর বল খেলতে গিয়ে রবার্টস বোল্ড আউট হলে খেলা শেষ হয়ে যায়। ফলে ভারত ৮৫ রানে জয়ী হয়। ঘড়িতে তখন ১১টা বেজে ৫৫ মিনিট। খেলা ভাঙবার নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। জয়লাভের আনন্দে সারা মাঠ ফেটে পড়ে—কাঁসর-ঘণ্টা, শাঁখ এবং বিউগিল-ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে ওঠে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত : ২৩৩ রান (বিশ্বনাথ ৫২, মদনলাল ৪৮, গাইকোয়াড় ৩৬ এবং মনসুর আলি ৩৬ রান। রবার্টস ৫০ রানে ৫ এবং হোল্ডার ৪৮ রানে ২ উইকেট)
ও ৩১৬ রান (ইঞ্জিনীয়ার ৬১, বিশ্বনাথ ১৩৯ এবং ঘাবড়ি ২৭ রান। রবার্টস ৮৮ রানে ৩, হোল্ডার ৬১ রানে ৩ এবং উইলেট ৫১ রানে ২ উইকেট)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২৪০ রান (রয় ফ্রেডেরিকস ১০০ এবং মারে ২৪ রান। মদনলাল ২২ রানে ৪ এবং বেদী ৬৮ রানে ২ উইকেট)
ও ২২৪ রান (কালিচরণ ৫৭ এবং রিচার্ডস ৪৭ রান। চন্দ্রশেখর ৬৬ রানে ৩ এবং বেদী ৫২ রানে ৪ উইকেট)

সোবার্সের 'স্যার' উপাধি লাভ

ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথ ১৯৭৫ সালের ইংরেজি নববর্ষে যাঁদের সরকারী খেতাব দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে 'স্যার' উপাধি লাভ করেছেন এই দুজন ক্রীড়াবিদ—প্রখ্যাত দৌড়বীর ডাঃ রজার ব্যানিস্টার এবং সর্বকালের বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ চৌখস টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবার্স।

১৯৫৪ সালে ডাঃ রজার ব্যানিস্টার সর্বপ্রথম ৪ মিনিটের কম সময়ে ১ মাইল দৌড় অতিক্রম করেন। ডাঃ ব্যানিস্টার

স্যার গারফিল্ড সোবার্স

সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডের স্পোর্টস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদ থেকে অবসর নিয়েছেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রাক্তন অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্সের বর্তমান বয়স ৩৮। তিনি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে গত বছর অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সোবার্সের বিবিধ বিশ্ব রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে। এখানে উল্লেখ্য, সোবার্সকে নিয়ে এপর্যন্ত ৭ জন ক্রিকেট খেলোয়াড় 'স্যার' উপাধি লাভ করেছেন—ইংল্যাণ্ডের তিনজন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তিনজন এবং অস্ট্রেলিয়ার একজন। সোবার্সের আগে এই ৬ জন ক্রিকেট খেলোয়াড় 'স্যার' উপাধি লাভ করেছেন—স্যার পেলহাম ওয়ার্ণার (ইংল্যাণ্ড), স্যার জন বেরী হবস (ইংল্যাণ্ড), স্যার ডোনাল্ড জর্জ ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া), স্যার লিয়ারি কনস্ট্যানটাইন (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), স্যার লিওনার্ড হাটন (ইংল্যাণ্ড) এবং স্যার ফ্র্যাংক ম্যাগলিনি ওরেল (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)।

সোবার্সের টেস্ট পরিসংখ্যান

খেলা ৯৩ ইনিংস ১৬০ নট-আউট ২১ বার মোট রান ৮০৩২ (বিশ্ব রেকর্ড) এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৬৫ নট আউট (বিশ্ব রেকর্ড) গড় ৫৭.৭৮ সেঞ্চুরী ২৬টা এবং ক্যাচ ১১০। বোলিং : বল ২১২৮৭ মেডেন ৯৭১ রান ৮০০৪ এবং উইকেট ২৩৫ (গড় ৩৪.০৫) এক ইনিংসে পাঁচটা করে উইকেট ছয় বার।

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট

মেলবোর্নে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিত থেকে গেছে। মাত্র ৮ রানের জন্যে অস্ট্রেলিয়া খেলায় জিততে পারেনি। পঞ্চম দিনের খেলা যখন শেষ হয়, তখন অস্ট্রেলিয়ার হাতে জমা ছিল দুটো উইকেট এবং জয়লাভের জন্যে দরকার ছিল মাত্র ৮ রানের।

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ২৪৪ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৪৬ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং কোন উইকেট না-খুইয়ে ৪ রান সংগ্রহ করে।

এখানে উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্টে ১৬৬ রানে এবং দ্বিতীয় টেস্টে ৯ উইকেটে জয়লাভের সূত্রে ২—০ খেলায় (ড্র ১) এগিয়ে আছে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যাণ্ড : ২৪২ রান (অ্যালান নট ৫২ এবং এডরিচ ৪৯ রান। লিলি ৭০ রানে ২, টমসন ৭২ রানে ৪ এবং ম্যালেট ৩৭ রানে ২ উইকেট)

ও ২৪৪ রান (অ্যামিস ৯০, লয়েড ৪৪ এবং গ্রেগ ৬০ রান। লিলি ৫৫ রানে ২, টমসন ৭১ রানে ৪ এবং ম্যালেট ৬০ রানে ৪ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ২৪১ রান (রেডপাথ ৫৫ এবং মার্শ ৪৪ রান। উইলিস ৬১ রানে ৫, গ্রেগ ৬৩ রানে ২ এবং টিটমাস ৪৩ রানে ২ উইকেট)

ও ২৩৮ রান (৮ উইকেটে। জি এস চ্যাপেল ৬১ এবং মার্শ ৪০ রান। গ্রেগ ৫৬ রানে ৪ এবং টিটমাস ৬৪ রানে ২ উইকেট)

আন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিক্স

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত আন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ছাত্র বিভাগে বিদ্যাসাগর কলেজ (সান্ধ্য) এবং ছাত্রী বিভাগে শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশীপ পেয়েছেন ছাত্র বিভাগে বিদ্যাসাগর কলেজের (সান্ধ্য বিভাগ) বুদ্ধদেব দাস এবং গোপাল দাস (যুগ্মভাবে)। এঁরা দুজনেই ১০ পয়েণ্ট করে সংগ্রহ করেছেন। ছাত্রী বিভাগে শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের কুমারী সিক্তা গোস্বামী ১৪ পয়েণ্ট সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

প্রতিযোগিতার প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে এসে বিশ্ববিদ্যালয় মাঠ-সংলগ্ন ট্রাম লাইন অতিক্রম করতে গিয়ে বারাসত গভর্নমেণ্ট কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী ভারতী দাশ ট্রাম চাপা পড়ে মারা যান। তাঁর স্মরণে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান পরিত্যক্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড আগামী বছর থেকে তাঁর নামে ছাত্রী বিভাগে একটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব ঘোষণা করেছেন।

মাঠের নায়ক

তপন ভট্টাচার্য

'ছিলাম ফুটবলের গোলকীপার, হলাম শেষ পর্যন্ত ক্রিকেটের উইকেটকীপার। ফুটবল আমার ধাতে সইলো না। একদিন গুডবাই জানিয়ে ফুটবল মাঠ থেকে চলে এলাম। আজ মনে হচ্ছে ভুল করি নি, কারণ ক্রিকেট আমায় দাঁড়াবার সুযোগ দিয়েছে, স্বীকৃতি দিয়েছে, দিয়েছে প্রতিষ্ঠা।'

কথা হচ্ছিল ময়দানের কালীঘাট তাঁবুতে বসে উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান তপন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। উইকেটরক্ষক হিসেবে ভাল, না ব্যাটসম্যান হিসেবে তপন বেশী কাজের তা নিয়ে তর্ক না তুলে এই মুহূর্তে বলা চলে যে, সার্থক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তাঁর নিরলস সাধনা চলছে। নিষ্ঠা একাগ্রতা এবং শান্ত সংযত চিন্তাধারা অটুট থাকলে তপন সার্থকনামা হবেনই।

একথা শুধু আমাদের মত মেঠো লোকের ধারণাই নয় ভারতের তথা দুনিয়ার অন্যতম কৃতী উইকেটরক্ষক ফারুক ইঞ্জিনীয়ারের ধারণাও বটে। কলকাতায় সদ্য-সমাপ্ত ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ খেলতে এসে ফারুক এক ফাঁকে তপনকে দেখে গেছেন। তপনকে ও'র ভাল লেগেছে। অথবা ঘুরিয়ে বলা যায়, ফারুকের চোখে পড়ে গেছেন তপন।

তপন ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৯ সালের পয়লা নভেম্বর পূর্ব কলকাতার ৪০।বি অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জি লেনে (বেলেঘাটা)। দাদুর আমল থেকেই ওখানে বসবাস। মা এবং বাবা তাঁদের বড় ছেলে তপনকে ছেলেবেলা থেকেই খেলাধূলায় উৎসাহ যোগাতেন। সন্তোষবাবু নিজেও এককালে ভাল ভলিবল খেলোয়াড় ছিলেন। খেলোয়াড় ছিলেন বলেই বোধহয় ছেলেকে খেলার মাঠে অতোটা উৎসাহ নিয়ে আর আশা নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা বলে তিনি ছেলের পড়াশুনোর ব্যাপারে কখনও রাশ ছাড়েন নি। তপন স্কুলের পড়াশুনা করে নিজের পাড়ায় দেশবন্ধু স্কুলে। ১৯৬৬ সালে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে ভর্তি হন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। ওখান থেকে ১৯৭০ সালে ডিসটিংশন নিয়ে বি এস সি পাশ করার পর ল কলেজে।

ফাইনাল ল' পরীক্ষাও তপনের ইতিমধ্যে হয়ে গেছে।

স্কুলে ফোর, ফাইভে পড়ার সময় থেকেই তপনের ক্রিকেটে হাতেখড়ি হয়েছে। অবশ্য তখন ফুটবলও চলছিল পুরোদমে। কলকাতার মাঠে বেলেঘাটা ক্লাবের হয়ে বছর তিনেক গোলপোস্টের নীচে দাঁড়িয়েছেনও তিনি। দেশবন্ধু স্কুলের হয়ে ৬৫ সালে দিল্লীতে সুব্রত ট্রফিও খেলেছেন। কিন্তু এত দূরে এগিয়েও ফুটবল তপন ছেড়ে দিলেন সরে দাঁড়ালেন ফুটবল মাঠ থেকে। শুরু হল সিরিয়াস ক্রিকেট।

ঘরোয়া ক্রিকেট লীগে খেলার আমন্ত্রণ পেলেন আজকের হিন্দুস্থান ইস্পাত কারখানার সুপারভাইজার (খিদিরপুর ডক) তপন ১৯৬৪ সালে নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটের (জুনিয়ার ডিভিসন) মাধ্যমে। তার পরের বছর ১৯৬৬ সালে কোচবিহার ট্রফিতে বাংলা রাজ্য স্কুল দলে খেলার সুযোগ হল। সুযোগ হল খেলার পরের বছরের আসরেও। ১৯৬৬ সালে আন্তঃ আঞ্চলিক স্কুল ক্রিকেটে পূর্বাঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন বোম্বাইয়ে উইকেটরক্ষক তথা ব্যাটসম্যানরূপে। নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট থেকে চলে এলেন ৬৭ সালে ইস্টবেঙ্গলে। ৬৯ সাল পর্যন্ত ঐ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবেই রইলেন। পরের বছরে আমন্ত্রণ এলো মোহনবাগান থেকে। গেলেনও। কিন্তু সে শুধু এক বছরের জন্যই। ৭০ সালে আবার ফিরে এলেন ইস্টবেঙ্গলে। ৭০ থেকে ৭৩ পর্যন্ত একটানা ঐ ক্লাবেই কাটলো জমজমাটভাবে। অবশেষে ৭৪ সালে কালীঘাট ক্লাবে এলেন সুখ্যাত কোচ সুনীল দাশগুপ্তের টানে।

ইতিমধ্যে তপন ১৯৬৮ সালে পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে খেললেন। সেমিফাইনালে সম্বলপুরের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৬৮ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ২০ রান করেছিলেন তপন। অবশ্য ঐ রান তেমন কিছু মনে রাখার মত নয় আজকের কালীঘাটের লম্বা চওড়া তাজা টসটসে ছেলে তপন ভট্টাচার্যের। তারচেয়ে তপনের ১৯৬৫-৬৬ সালের আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটে আসামের বিরুদ্ধে ৭১ এবং ওড়িশার বিরুদ্ধে অপরাজিত ৩৫ রানের স্মৃতিই রমণীয়। ঐ স্মৃতির পাশে ৬৯ সালের স্মৃতিও তপনকে জড়িয়ে আছে। সে বছর লীগে কালীঘাটের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের উইকেটকীপার ছিলেন তিনি। ক্যাচ লুফেছিলেন পাঁচটি, স্টাম্পড করেছিলেন দুজনকে। ১৯৭০ সালে মোহনবাগানের হয়ে ইস্টার্ন রেলের সঙ্গে নকআউট সেমিফাইনাল খেলায় ক্যাচ লুফেছিলেন তিনটি, স্টাম্পড করেছিলেন দুজনকে।

চলতি মরশুমে তপন ইতিমধ্যেই দুটি সেঞ্চুরী করেছেন। প্রথমটি সিনিয়ার লীগে গ্রীয়ারের বিরুদ্ধে (১১৫)। অন্যটি সি সি বির বিরুদ্ধে (১২০ অপরাজিত)। গতবারও লীগে দুটি সেঞ্চুরী ছিল তাঁর (এরিয়ান্স এবং দক্ষিণ কলকাতার বিরুদ্ধে)' ১৯৭৪-৭৫ সালে রণজি ট্রফি খেলার প্রথম সুযোগ তপন পেয়েছেন জোড়হাটে। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আসাম। ১৯৭১-৭২ সালে আন্তঃ ইস্পাত প্রকল্প ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় (জামশেদপুর কিনান স্টেডিয়াম) তপন সেরা ব্যাটসম্যানের স্বীকৃতি পান টিস্কোর সঙ্গে হিন্দুস্থান ইস্পাতের খেলাকে কেন্দ্র করে। প্রথম ইনিংসে রান করেছিলেন ৭৮ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৮। ৭২-৭৩ সালেও আন্তঃ ইস্পাত ক্রিকেটে তিনি একই সম্মানে ভূষিত হন (সেরা ব্যাটসম্যান)। খেলা হয়েছিল সেবার ভিলাইয়ে।

তপনের সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে ক্রিকেট এবং ক্রিকেটের সেই গোরো মার পুল ও হুক। আর প্রিয় হচ্ছে লাইট কলারের পোশাক-পরিচ্ছদ। আদর্শ ফারুখ ইঞ্জিনীয়ার।

'কিন্তু ফারুকের মত তো অফ-ড্রাইভ করতে পারো না তুমি?' আমি প্রশ্ন করি। 'সত্যিই পারি না, কোন দিন কোন বিষয়ে ফারুকের ধারে কাছেও বোধহয় যেতে পারবো না। তবে অফ ড্রাইভ করতে পারি না কেন জানেন? ছোটবেলায় পড়ে গিয়ে বাঁ হাতটা না আমার কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার হয়ে গিয়েছিল। বাঁ হাতটায় তাই জোর বড় কম পাই যে'—তপন নির্বিধায় উত্তর দেন।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

আরতি ভট্টাচার্য। ফটো ঃ অমৃত

বায়োস্কোপিক

হ্যাঁ, যা নিয়ে শুরু করেছিলাম, সেটা শেষ পর্যন্ত কেমন চমকপ্রদভাবে শেষ হল—সেটা শুনুন। পার্থপ্রতিমকে কেন্দ্র করে আমরা সবাই হতভম্ভ হয়ে সেই সিনেমা হাউসের লবিতে দাঁড়িয়ে আছি। কাবুলী-ওয়ালা, শেষপর্যন্ত একজন কাবুলে তেড়ে-ফুঁড়ে এসে গ্যাঁটের পয়সা খর্চা করে পার্থ-পরিচালিত নিরেট বাংলা ছবি দেখতে ঢুকেছে এই সংবাদেই আমাদের অচৈতন্য হয়ে যাবার কথা, বায়োস্কোপের লোকেদের নার্ভ নিতান্তই একস্ট্রা স্ট্রং—তাই ঠ্যাঙের ওপর ভর দিয়ে তখনও সটান দাঁড়িয়ে আছি, বিশেষ করে পার্থপ্রতিমের তো বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ার দাখিল, গেট-কীপার হাতের টর্চ ঘুরিয়ে আমাদের আশ্বস্ত করল। সে নিরাসক্ত কণ্ঠে বললে—অত ঘেবড়ে যাচ্ছেন কেন? এক্ষুনি ইন্টারভ্যাল হবে, তখন ব্যাপারটা বাজিয়ে নেবেন।

ইয়েস, দারুণ যুক্তিপূর্ণ কথা, এটা আমাদের কারো খেয়াল হয়নি

ছবির সম্পাদক তরুণ দত্ত আমাদের সংগেই ছিল। এক নম্বরের ছটফটে মানুষ। সে বললে—আমি বরং হাউসের ভেতরটায় একবার ঘুরে আসি। দেখি ব্যাটা বাস্তবিক কি করছে—

বলে আমাদের মতামতের অপেক্ষা না করেই ও হুট করে ঢুকে পড়ল হলের মধ্যে। আবার পরক্ষণেই বেরিয়ে এল। —আচ্ছা কোন রো-তে বসেছে দাদা, মানে কাবুলেটা?

গেট-কীপার বললে—ঢুকেই বাঁ দিকে থার্ড রো-তে চারটে চেয়ার ছেড়ে বসেছে। গিয়ে দেখুন আবার সটকে গেছে কিনা—

তরুণ কথাটা শুনেই ঢুকে পড়ল।

তারপর মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এল। উত্তেজনায় তার মুখটা থমথম করছে। বললে—হ্যাঁরে, বাস্তবিক একটা কাবুলে, বেশ পুরুষ্টু সাইজের। বসে বসে ছবি দেখছে একমনে।

ব্যস, আমাদের দফা নিকেশ।

—পার্থ, তুই কেলেঙ্কারী বাধিয়েছিস। বিমলমামাকে বলে ছবি এক্ষুনি আফগানিস্থানের জন্যে বুক করার ব্যবস্থা কর। শুনেছি জানি কাবুলে তিন-চারটে ভাল ভাল সিনেমা-হল আছে। ওখানে রিলিজ হলে তোর ছবি একেবারে গোল্ড মাইন হয়ে যাবে।

আমরা এইসব নিয়ে বিস্তর হৈ-চৈ করছি, এই সময় সেখানে রবি ঘোষ নগদ এসে হাজির। পার্থর সে-ছবিতে রবিদা একটা চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছিল। আর আমাদের সঙ্গে রবিদার রিলেশনটাও খুব গাঢ়। সেদিন রবিদার হাতে সম্ভবতঃ কোন কাজ ছিল না। তাই সন্ধ্যের ঝোঁকে ঝোঁকে হাউসে এসে হাজির। ভাবখানা, যাই এক পেট আড্ডা দিয়ে আসি। খুব একটা প্যাড়দারি (শব্দটা রবি ঘোষেরই সৃষ্টি। প্যাড়দার মানে প্রকান্ড বুদ্ধিজীবী। আঁতেল। আঁতেল টু দ্য ইনফিনিটি। প্যাড়-দার তাকেই বলা চলবে যিনি ভোর পাঁচটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত মানুষজন পশু পক্ষী ঈশ্বর এবং শয়তানকে ক্রমাগত জ্ঞান দিয়ে বেড়াবে। অথচ ওই বস্তুটি ভুলেও কারো কাছ থেকে গ্রহণ করবে না।) ভঙ্গীতে।

আমরা জটলা করছি দেখে রবিদা জানতে চাইল—এখানে বিটোফেনের সেভেনথ সিম্ফনি বাজছে কেন?

পার্থপ্রতিম দ্রুত বলল—রবিদা, একটা কান্ড হয়েছে—

—কী কান্ড? প্রকান্ড না ছোট কান্ড?

—না না, ঠাট্টা নয়। একটা কাবলীওলা টিকিট কেটে আমার ছবি দেখতে ঢুকেছে—

—যাঃ।

—সত্যি বলছি।

—কখন?

—এই তো ইভনিং-শোতে—

শুনে রবিদা একটু চিন্তা করে বলল—এটা আমি জানতাম। বলে রবিদা একটু খুক খুক করে হাসল। তারপর বলল—এ-ছবিতে আমার আউটস্ট্যান্ডিং অভিনয়ের খ্যাতি এই কদিনে এত ছড়িয়েছে যে, কাবুলীওয়ালারা পর্যন্ত ছবি দেখতে ছুটে আসছে। এটা আমি গোড়াতেই জানতাম। এখন দেখবে, পাঞ্জাবী সিন্ধি, গুজরাটী মারাঠী তেলেগু তামিলনাড়ুর দর্শকেরা ছুটে আসবে প্রতিদিন। এ তো সবে কলির সন্ধ্যে—

রবিদা এমন বলল যে আমরা সবাই হেসে গড়াগড়ি। বাস্তবিক, কলকাতার শ্রেষ্ঠ প্যাড়দার যে স্বয়ং রবি ঘোষ—এ-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

ইতিমধ্যে ইন্টারভ্যালের ঘণ্টা বাজল। দর্শকেরা হুড়মুড় করে হল থেকে ফুটপাতের সব মালপত্র কেনবার জন্যে বেরিয়ে আসছে, এমন সময় লবির কোণার দিকে বেশ একটা হট্টগোল শোনা গেল। আমরা ছুটে গিয়ে দেখি, মাল ক্যাচ, একটি মাঝবয়সী লোককে একজন কাবলেওয়ালা ঠিকই চেপে ধরেছে লোকটা কেঁউ কেঁউ করছে আর কাবলেটা তাকে যাচ্ছেতাই সব ডায়লাগ দিচ্ছে।

রবিদা তখন সবে অটোগ্রাফ দিচ্ছে দু-একটা। বলল—আমি ব্যাপারটা এই রকমই অনুমান করেছিলাম। ওই লোকটাকে ফলো করেই কাবলেটা হলে ঢুকেছে। নইলে মাথা-খারাপ, কাবলে কখনও বাংলা বায়োস্কোপ দেখে? হিন্দী বায়োস্কোপ ছেড়ে?

মজবুর/অমিতাভ বচ্চন/প্রবীণ বাবী

ক্রুদ্ধ কাবলে যা বলল তা হচ্ছে—মশাই এই লোকটা থাকে বালিগঞ্জে, আঠারোশো টাকা নিয়েছে সেই বছর দুয়েক আগে। তারপর থেকে আর দেখার নাম-গন্ধ নেই, শুধু ন্যাজে খেলাচ্ছে। তা আজ বাছাধনকে ধরেছি। ভেবেছিল সিনেমা হলে ঢুকে নজর এড়িয়ে হাওয়া দেবে, কিন্তু আমি পেছু ছাড়িনি, আঠার মত সেই তখন থেকে পেছনে লেগে আছি। দাও টাকা দাও—

লোকটা বলল—এঃ, সর্বক্ষণ যেন তোমার জন্যে টাকার বাণ্ডিল সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হবে। ঢের দিয়েছি। আর পারব না। নিয়েছিলাম আঠারোশো, এই দু-বছরে দিয়েছি ছ শোশো, বস—।

সঙ্গে সঙ্গে পক্ষে আর বিপক্ষে দু-দল লোক বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কাবুলের পক্ষ-সমর্থনকারীরা হেঁকে বলল—টাকা না দিলে আজ ছাল ছাড়িয়ে নেব, আর লোকটির সমর্থকেরা সাফ জানিয়ে দিল—একটা আধলাও আর নয়, তেমন চেষ্টা করলে চামড়া খুলে টান করে তাতে আজ ঢুগঢুগি বাজিয়ে তবে বাড়ি যাব। দেখি কার ক্ষমতা টাকা আদায় করে—

দু দলে কাজিয়ে লেগে যায় আর কি! আমরা হাঁ হয়ে সব শুনছি। জোর ইন্টারেস্টিং। এমন সময় হলের লাস্ট বেল বেজে উঠল। স্লাইড দেখানো শেষ, এবার মূল ছবি শুরু। দেখতে হল না, মুহূর্তে লবি ফাঁকা। সায় কাবলে সমেত। সে-ও হলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। নগদ পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে সিনেমা দেখার ওই এক হ্যাঙ্গামা, ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছেয়—ছবির শেষ পর্যন্ত না দেখলে মন ওঠে না, তা ছবি সে যতই মন্দ হোক না কেন!

একবার প্রদীপ ওরফে মঞ্জু দাশগুপ্তের সঙ্গে আমাকে কেওড়াতলা শ্মশানে পর পর দুদিন রাত্রিবাস করতে হয়েছিল। না না, কোন সৎকার-টৎকার উপলক্ষে নয়, মঞ্জুদা প্রেম করে একটা মেয়েকে বিয়ে করতেই দুই বাড়িতে প্রচণ্ড হট্টগোল, মঞ্জুদার দাদা হচ্ছেন খ্যাতনামা চিত্র-পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত, এই বিয়েতে তাঁর বিন্দুমাত্র মত ছিল না, তিনি যাহা সংবাদ পেলেন ছোটভাই রেজিস্ট্রী ম্যারেজ করেছে, ব্যস, রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে স্ত্রীকে বললেন—তোমার আস্কারাতেই মঞ্জু এতদূর অধঃপাতে গেছে, দুম করে বিয়ে করেছে সে-ছোকরা—

এমন সময় মঞ্জুদা হাসি-হাসি মুখে বাড়ি ঢুকছিল, পড়ল স্রেফ তোপের মুখে—গেট আউট, গেট আউট গেট আউট—

মঞ্জুদা হতভম্ব। —কে? আমি?

—ইয়েস তুমি। আমার অমতে বিয়ে করেছ শুনলাম, ইজ ইট এ ফ্যাক্ট?

মঞ্জুদা ইতঃস্তত করে, ঘাড় চুলকে—মানে মতামতের কথা—

—অর্থাৎ আমার মতামতের কেয়ার না করেই বিয়ে করছ। অতএব গেট আউট—

[illegible] ছি ছি কি কাণ্ড, সুকুমারদা তত ক্ষেপে যান—রেজিস্ট্রি করে বিয়ে! ছিঃ। মঞ্জু ইউ প্লিজ গেট আউট, আমার ব্লাড প্রেশার চড়ে যাচ্ছে—

অতএব মঞ্জুদা আউট। সুকুমার দাশগুপ্ত তখন উত্তমকুমার মালা সিনহাকে নিয়ে 'সাথীহারা' ছবির শুটিং করছেন। আর মঞ্জু দাশগুপ্ত তখন 'অবাক পৃথিবী' ছবির সঙ্গে যুক্ত। ফিল্ম লাইনের সবাই এই উজ্জ্বল মেধাবী অক্লান্তকর্মী তরুণকুশলী মঞ্জু দাশগুপ্তকে ভালবাসত। সুচিত্রা সেন নিজের ছোটভাইয়ের মত স্নেহ করতেন মঞ্জুদাকে। উত্তমকুমার বিশেষ পছন্দ করতেন এই তরুণ যুবককে। তরুণকুমার ছিল মঞ্জুর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। সবাই জানে—'অবাক পৃথিবী' ছবিটি তরুণকুমার নিজে প্রযোজনা করেছিল শুধু মঞ্জুকে চলচ্চিত্র শিল্পে একটা প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যে। মঞ্জু নিজের পায়ে দাঁড়াক, নাম করুক, বড় হোক—এটা সবাই চেয়েছে কিন্তু মঞ্জুদা সেই সবাইকেই বোকা বানিয়ে, সবাইকেই বেদনায় মুহ্যমান করে একদিন পালিয়ে গেছে, সে স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ, বারান্তরে বলব।

একেবারে বোল্ড আউট মঞ্জুদা। আমাদের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিয়ের প্রসঙ্গটা একদম চেপে গিয়েছিল। হঠাৎ তরুণকুমারের মুখে ফাঁস হয়ে গেল। উত্তমকুমার মঞ্জুকে বলে দিয়েছিলেন, বিয়ে করে বো নিয়ে সোজা আমার বাড়িতে চলে আসবি।

মঞ্জুদা তাই-ই করেছিল। রেজিস্ট্রি

তিন পরী ছয় প্রেমিক
তিলক চক্রবর্তী/যূঁই বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্কুর/শাবানা আজমি/ অনন্ত নাগ

রাজশ্রী বসু/ফটো : অমৃত

অফিস থেকে সোজা উত্তমকুমারের বাড়ি। গুরু দুজনকেই আশীর্বাদ করেছিলেন, গুরুপত্নী সোনার হার দিয়ে নতুন বৌয়ের মুখ দেখেছিলেন। তারপর হেভি খ্যাঁট। যাতে আমরা নাকি বাদ।

এসব খবর মঞ্জুদা বোল্ড আউট হওয়ার পর সব পাওয়া গেল। খোকন আমাকে বললে—মঞ্জুদার মেজাজ খুব খারাপ, সাবধানে কথা বলবে খোকা নইলে কপালে তোমার দুঃখু আছে।

পরদিন আমার শুটিং নেই। মঞ্জুদারা 'অবাক পৃথিবীর' শুটিং শেষ করে ল্যাবরেটরীতে এল। উত্তমকুমার ওকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছেন।

আমায় দেখে মঞ্জুদা ইসারায় কাছে ডাকল—কিরে, কি কচ্ছিস?

—স্রেফ আড্ডা।

—চল চা খাওয়া যাক।

চা খেতে খেতে আমি কিন্তু কিন্তু হয়ে প্রশ্ন করলাম—শুনলাম তুমি নাকি আলাদা হয়ে গেছ?

মঞ্জুদা আমার দিকে চমকে ফিরে তাকাল। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল—বুড়ো (তরুণকুমার) তাই বললে বুঝি?

আমি ইতঃস্তত করে বললাম—না, ঠিক বুড়োদা বলেনি, তবে এই রকম গুজব শুনছি। তা কোথায় আছ? বৌদি কোথায়?

—বৌদি? সে তার বাপের বাড়িতে আপাততঃ ফিরে গেছে। আর আমি একটা ইণ্টারেস্টিং জায়গায় আছি পরপর ক'রাত?

—কোথায়?

—শ্মশানে!

—যাঃ!

—বাস্তবিক। বিশ্বাস না হয় আমার সঙ্গে একরাত কাটিয়ে দেখ, তুই তো লেখার রসদ খুঁজিস, পেয়েও যেতে পারিস। ফোর্থক্লাস জায়গা কিন্তু—

কাট-টু-কাট আমরা রাসবিহারীর আড্ডা সেরে রাত সাড়ে এগারোটায় শ্মশানমুখো।

মঞ্জুদা বললে—দাঁড়া, আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। বলে পশ্চিম দিকের একটা পাঞ্জাবী হোটেলে আমাকে নিয়ে ঢুকল। বেশ গর্মাগর্ম তড়কা আর রুটী হলো দু-প্লেট। সর্দারজী মঞ্জুদার মুখের দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—ভগবান তেরা ভালা করে মঞ্জু—

মঞ্জু সহাস্যে বলল—করবে করবে, সময় হলে ঠিকই করবে সর্দারজী, ঘাবড়াও মৎ।

সর্দারজী পয়সা নেবার পাত্রই নয়। [illegible] দিয়ে দিল। আর দিল দুটো নিমের দাঁতন।

এটা পাঞ্জাবী হোটেলের রেওয়াজ। রাত্রের খাবার খেলে ওরা খদ্দেরকে একটা করে নিমের দাঁতন দেয়। এখন ব্যবস্থা কি-রকম আর জানি না।

হোটেল থেকে বেরিয়ে আমরা সেই নিশুতি জনবিরল রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে এলাম শ্মশানঘাটে। আমার এমনিতেই গা ছমছম করছিল—হ্যাঁ মঞ্জুদা, ওখানে শোবে কোথায়?

—ব্যবস্থা আছে। ঘাবড়াচ্ছিস কেন।

দেশবন্ধুর স্মৃতি স্তম্ভের বেদী তখন অন্ধকার। সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে মাঝে মাঝে যেন জোনাকীর আলো ঝিলিক দিচ্ছে। মঞ্জুদা বললে—বোর্ডাররা শুয়ে বিড়ি টানছে। মহেন, এই মহেন—

ছোট করে হাঁক পাড়তেই কোথায় ছিল সেই লোকটা। অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে একা, যেন হানচ ব্যাক অফ ন'ত্রেদাম, কোটরাগত চোখ দুটো জ্বলছে যেন, গায়ে ছেঁড়া একটা শার্ট, পরনে ছেঁড়া হাফ-প্যান্ট, যেমন কুচ্ছিৎ তেমন কদাকার, ফ্যাস-ফেঁসে গলায় বললে—বাবু নাকি? সঙ্গে উটি কে?

—আমার বন্ধু।...জায়গা ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ বাবু, দু আনা—

—এই নাও—বলে মঞ্জুদা ওকে দু-আনা পয়সা দিল। লোকটা মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারের আড়ালে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এল। হাতে দুটি আস্ত খান ইঁট।

—চলেন বাবু, শালাদের উৎপাতে জায়গা রাখবার উপায় নেই। যতসব।

গজগজ করতে করতে মহেন আমাদের বেদীতে নিয়ে এসে বলল—এই গঙ্গার ধারটাতে আজ শুয়ে পড়েন। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে যাবে।

এতক্ষণে সব পরিষ্কার হলো। থান ইঁট দুটি আসলে হচ্ছে বালিশ। আর বালিশের ওয়াড় হচ্ছে খবরের কাগজ। বেদীতে অনেকগুলো লোক ততক্ষণে দিব্যি নাক ডাকিয়ে নিদ্রা যাচ্ছে। আকাশে মরা জ্যোৎস্না। আদি গঙ্গার জলে সেই আলো বিদ্যুতের ঝিলিক হানছে।

মঞ্জুদা বলল—এখনও সব বোর্ডার এসে পৌঁছায়নি। যত রাত বাড়বে তত আমদানি হবে। এ-একটা বিচিত্র জগৎ। রঞ্জিত আমাকে এই জায়গাটার সন্ধান দিয়েছিল। এখানে এখন যারা শুয়ে আছে, তাদের মধ্যে সমাজের সব স্তরের লোক আছে। বটতলার উকিল, ভবঘুরে গায়ক, বেকার কবি ব্যর্থ প্রেমিক মাতাল বেশ্যার দালাল পকেটমার মস্তান সন্ন্যাসী লেখক সাংবাদিক গোঁসাদার গেরস্থ—ঘটনাচক্রে এখানে এসে সবাই রাত কাটাচ্ছে। আর ওই মহেন হচ্ছে এখানকার অলিখিত ঠিকাদার। ওকে চারটে পয়সা দিলেই তুমি এখানে একটা রাত স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারবে। অথচ সারাদিন কিন্তু কাউকেই এখানে দেখতে পাবে না—

—বিড়ি আছে এট্টা—হেঁড়ে গলায় আমাদের পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল—থাকলে দিন, দেশলাই আছে আমার কাছে—

মঞ্জুদা বল—না বিড়ি নেই।

লোকটা সংগে সংগে বলল—তা হলে বক্তৃতা না করে এখন শুয়ে পড়ুন। কাল সকালে কথা হবে।

মঞ্জুদা হেসে বলল—সিগ্রেট আছে। দেবো?

অন্ধকারের মধ্যে থেকে শুধু একটা হাত বেরিয়ে এলো। মঞ্জুদার কাছ থেকে সিগ্রেট নিয়ে সে হাত যথাস্থানে ফিরে যাবার আগেই শোনা গেল—নিন, এবার রাত জেগে যত খুশী গল্প করুন। দেশলাই দরকার হলে বলবেন, জেগেই রইলাম—

বাতাসে ... গন্ধ। মঞ্জুদা ... কেউ

সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে ভেসে এলো উদাত্ত কণ্ঠ—ব্যোম ব্যোম শংকর, কাটা হবেন টংকর, যিস্কো খানা উস্কো পিনা,—মহাদেউ কে প্রেসাদ বিনা—যাঃ শালা—

আর সেই কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে কলকণ্ঠ শোনা গেল—বল হরি হরিবোল, বল হরি হরিবোল, বল হরি হরিবোল...

অদূরে কে যেন হাসল—আমি মাত্তর পৌণে দুশো গজের মধ্যে শুয়ে আছি, একদিন এখান থেকে গড়াতে গড়াতে শালা ঠিকই নিজের চিতেয় গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠব। কাউকে কষ্ট করে আর বয়ে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে না। শুধু তোমরা দাদারা এট্টু হরিবোল আওয়াজটা দিয়ে দিও। তার বদলে আমি সব্বাইকে এক নম্বর বাংলা মাল খাইয়ে দেব—

একজন চেঁচিয়ে জানতে চাইল—মুখাগ্নি?

—সেটা আগেই সেরে রেখেচি রে শালা, আমি অত কাঁচা মাল নইরে কানাই—

—আমি কানাই না ব্রাদার, আমি গুপী—

—ঠিক আছে গুপেদা, মুখাগ্নি নিয়ে তুমি শালা নিজে এখন ভেবে মর। কাল প্রাতঃকালে বাড়ি গিয়ে ওকম্মোটি যেন-তেন প্রকারে সমাধা করে তবে রাতে এখানে ফিরে এসো, বুঝেচ বাবা—

—বুঝেচি!

মঞ্জু বললে এরা থাকে। আপন আপন সাধনার মার্গে। নিজের নিজের তপস্যায় বিভোর হয়ে। নে শুয়ে পড়। চুপচাপ শুনে যা, দেখবি কোথা দিয়ে রাতটা কেটে গেছে।

পাশের একটা লোক, মঞ্জুদা ফিস ফিস করে বলল—ও হচ্ছে চোর। সারারাত এ-বাড়ি ও-বাড়ি চুরির চেষ্টায় ঘুরবে, সাকসেসফুল না হলে ঘুরে ঘুরে এখানে চলে আসবে। গেরস্থকে গালাগালমন্দ করে ভূত ভাগিয়ে দেবে। আর যদি ঘুরে না আসে তো বুঝতে হবে নিশ্চিত কারো ... নাশ করে নিজের ডেরায় ফিরে গেছে।

অন্ধকার ততক্ষণে চোখে সয়ে এসেছে। দেখি গায়ে কালো গেঞ্জি আর কালো হাফপ্যান্ট পরে একটা কুৎসিৎ দর্শন লোক বসে বসে খৈনি টিপছে। লোকটার পায়ের কাছে কয়েকটা ভারি ধাতব জিনিস মরা জ্যোৎস্নার আলোয় চিক চিক করছে। এরপর লোকটা, ঠিক যেন বিড়াল, নিঃশব্দ লঘু পদসঞ্চারে উঠে কোথায় যেন যাত্রা করল।

(চলবে)

—রঞ্জন মজুমদার

অর্জুন/স্বরূপ দত্ত

ফ্লোর থেকে বলছি

দিনের বেলায় সিঁদুর দাও—রাতের বেলায় সিঁদুর মোছ। দিনের বেলায় ঘোমটা দাও—রাতের বেলায় খেমটা নাচো। প্রসাদের এই চাওয়া-পাওয়ার মাঝখানে লতা একদিন অনুভব করে—এই যে ঘর ঘরের বাহির লোহার প্রকান্ড ফটক পর্যন্ত তার অনেক অধিকার ছড়িয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে মনের মধ্যে সেটা মেঘ হয়ে জমেছে। কখনও বৃষ্টি হয়েছে কখনও হয়নি। কিন্তু ঝড় উঠেছে। তুমুল ঝড়। সমাজের বাইরে আর মধ্যে সংস্কারের যে পাঁচিল ঝড়ে সেটা ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়েছিল। মনে-প্রাণে ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েছিল লতা। সে চেয়েছিল সমস্ত গন্ডী পেরিয়ে পরিপূর্ণভাবে নারী হতে। তা হয় না। রাখালবাবু লতাকে পুত্রবধূ ভাবতে পারতেন যদি তার একটা ছেলে থাকত। এই কথা শুনে লতার মন ভরে গিয়েছিল। নতুন জীবনের স্বাদ পেয়ে এইভাবে তার জীবনের গতি পরিবর্তিত হতে চলেছিল। হয়নি। যথাসময় প্রসাদ তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে—তুমি আমার কেপ্ট। বাঁধা মেয়ে। যা খুশী তাই করতে পারি। সোনাগাছি থেকে ত আর মুখ দেখতে আনা হয়নি।... এই ধরনের কথা শুনে এক একবার লতার মন বিদ্রোহী হয়েছিল। প্রথম যখন শিমুলতলায়—অসহ্য হয়ে লতা চলে গিয়েছিল। বাকস প্যাঁটরা নিয়ে রওনা দিয়েছিল কলকাতার উদ্দেশ্যে। পথঘাট জানা নেই শোনা নেই। হাঁটতে হাঁটতে সে এসে দাঁড়িয়েছিল একটা ভগ্নপ্রায় জীর্ণ অট্টালিকার সামনে। তাকে অনুসরণ করতে করতে প্রসাদ চলে এসেছিল। লতা রওনা দেবার পর প্রসাদ বুঝতে পেরেছিল ওর এভাবে চলে আসাটা ঠিক হল না। যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে আত্মসম্মান? লোকে কি বলবে? লতা সাজানো বউ? একটা বেশ্যাকে এনে রেখেছে সে? সব কিছু ধুলোয় মিশিয়ে যাবে যে! তাই অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রসাদ লতাকে ফেরং এনেছিল। লতার সরল মন এতসব বুঝে উঠতে পারেনি। সে ভেবেছিল প্রসাদ তার ভুল বুঝতে পেরে ছুটে এসেছে। তাছাড়া সে একমাসের চুক্তিতে এসেছে। এভাবে চলে যাওয়াটাও তো সমীচীন নয়। প্রসাদ তো [illegible] বলেছে সে [illegible] বাঁধা মেয়েছেলে।

স্নোফক্স ক্যাবারে /ক্যামেরাম্যান অনিল গুপ্ত উত্তমকুমার এবং পরিচালক দিলীপ মুখার্জি।

ফটো : অমৃত

আজ এখানে তার এই যে সম্মান সেটা তো পাবার কথা ছিল না। প্রসাদের বউ সেজে থাকা—বেশ ভালই তো। কদিন পরেই তো আবার নিজেদের লোকজনের কাছে ফিরে যেতে হবে। ওই পরিবেশ ওই সমাজ থেকে সে তো কোনদিনই বেরিয়ে আসতে পারবে না। তাহলে এই দুদিনের জন্য প্রসাদের মন ভাঙ্গার কোন মানে হয় না। এই যে এখানকার সুন্দর মানুষজন তাকে কি সেইভাবে গ্রহণ করবে যখন জানতে পারবে বৃত্তান্ত।......

লতা ফিরে আসে। লোহার ফটক পেরিয়ে আবার সেই বিরাট দরজা। দরজা খুললেই ঘর। ঘরের মধ্যে পুরোনো আমলের সব আসবাবপত্র। দেওয়ালে বিরাট আকারের ছবি কাঁচের চারপাশে ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো। কাচগুলো ভেঙ্গে গেছে। ধুলো জমে গিয়েছে। কিন্তু ছবিগুলো আছে। ছবিগুলো সব প্রসাদের পূর্বপুরুষের। পূর্বপুরুষের নীলরক্ত ওর গায়ে মিশে আছে। একদা এখানে এই ঘরে লাল রঙের ফরাসের ওপর প্রসাদের পূর্বপুরুষরা হয়তো অনেকটা এইভাবেই মেয়েমানুষ নিয়ে ফূর্তি করেছে। মদের ফোয়ারা ছুটেছে। এখন আবার সেই একই দৃশ্য। প্রসাদ একটা নকশা কাটা পাঞ্জাবী পরে গায়ে চাদরটা

হায়দ্রাবাদের নিজাম/মহরতে প্রযোজক প্রতাপ আগরওয়াল অরুণ মুখার্জি মাঃ রাণা ভানু ব্যানার্জি শিউলি মুখার্জি অরুন্ধতী দেবী তপন সিংহ প্রতিভা ব্যানার্জি হেমন্ত মুখার্জি বাবুল আরতি ভট্টাচার্য স্বরূপ দত্ত সুস্মিতা সান্যাল আর এন জালান বাচ্চু আইচ সতোন চ্যাটার্জি ও ভীষ্ম গুহঠাকুরতা। ফটো ঃ অমৃত

জড়িয়ে ঢুলুঢুলু চোখে এগিয়ে এসে সোফায় বসে আয়েস করে। সামান্য দূরত্বে দাঁড়িয়ে লতা। প্রসাদ লতাকে কাছে ডাকে। লতা এগিয়ে আসে। এক হাতে মদের গ্লাস অন্য হাতে লতার নরম শরীর প্রসাদ এই মুহূর্তে নিজেকে হায়দ্রাবাদের নিজাম ভাবলেও ভাবতে পারে। মাথার ওপরে ঝাড় লণ্ঠন। চারিদিকে বড় বড় আয়না। ঘরের মধ্যে হালকা আলো। ক্যামেরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়।...

শিমুলতলায় যে বাড়িতে শুটিং করা হয়েছিল তারই ইনটিরিয়র—ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে সেট ফেলা হয়েছে। হুবহু যেন ওই বাড়ির ইনটিরিয়র ডেকোরেশন। এই পরিবেশে পরিচালক বিজয় চট্টোপাধ্যায় 'বারবধূ' ছবির শুটিং করছেন। সুবোধ ঘোষের এই বিখ্যাত ছোট গল্প অবলম্বনে মঞ্চসফল নাটক ইতিমধ্যে কয়েকশো রজনী অতিক্রম করেছে। নাটকের সংগে চলচ্চিত্রের প্রভেদ অনেকখানি। এই ছবির চিত্রনাট্য ভাবা হয়েছে একেবারে অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে। নাটকের বিষয়বস্তু যেভাবে বিস্তার লাভ করেছে চিত্রনাট্যে সেভাবে নয়। চিত্রনাট্যে লতার জীবন-তৃষ্ণা আর জীবন-যন্ত্রণার অনুচ্চারিত নাটক। নায়িকার মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রনাট্য বিস্তার লাভ করেছে চিত্রনাট্যে সেভাবে গঙ্গোপাধ্যায় চিত্রনাট্য রচয়িতা। একটা ভাল ছবির চেষ্টা আপাতদৃষ্টিতে। পরিচালকের কর্মপদ্ধতি দেখে এক একটা দৃশ্য দেখে টুকরো টুকরো সট দেখে আমার এই মনে হয়েছে। এই ছবি 'বারবধূ' যে কোন শিল্প সচেতন দর্শকের মনে চিরস্থায়ী ছাপ রাখতে সক্ষম হবে।

প্রসাদের ভূমিকায় রূপ দিচ্ছেন সমিত ভঞ্জ। আমার ধারণা হচ্ছে এই ছবিতে সমিতকে দর্শকরা পছন্দ করবেন। অনেকদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে চরিত্র সৃষ্টি। লতার চরিত্রে রূপ দিতে বম্বে থেকে এসেছেন গীতা যিনি 'গরম হাওয়া' ছবিতে অসাধারণ কাজ করে বিখ্যাত হয়েছেন সম্প্রতি। হঠাৎ গীতাকে এই চরিত্রের জন্য সিলেক্ট করা হল কেন? পরিচালকের বক্তব্য—কলকাতার অনেক নায়িকাই লতা করার জন্য রাজী হল না। শর্মিলাকে যোগাযোগ করা হচ্ছিল। সেখানে ডেট প্রবলেম দেখা দিল। রেহানা সুলতানাকেও যোগাযোগ করা হয়েছিল ঠিক এই সময় 'গরম হাওয়া' মুক্তি পেয়েছে। দেখা হল। দেখেই গীতার জন্য অনুসন্ধান। যোগাযোগ। অ্যাপ্রোচ করতেই গীতা রাজী। নো ডেট প্রবলেম। কিন্তু বাংলা ভাষায় সংলাপ উচ্চারণ—গীতা এখনো শিখছেন। প্রথম যা দেখেছিলাম তার চেয়ে অনেকটা ইমপ্রুভ করেছেন। তিনি আশা করছেন ডাবিং-এর সময় অর্থাৎ আরো দু-তিন মাসের মধ্যে বেশ ভাল করে রপ্ত করে নিতে পারবেন।

এই ছবির অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে আছেন— রবি ঘোষ [illegible] চট্টোপাধ্যায় সুব্রত সেনশর্মা প্রবীর ভট্টাচার্য শিপ্রা চক্রবর্তী সাধনা রায়চৌধুরী শোভা সেন মাস্টার দিব্যেন্দু এবং সোমা দে। সোমা এখানে একটা বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করছেন। চরিত্রের নাম 'মমতা'। প্রসাদের এই নিঃসংগ মেয়েটিকে ভালো লাগে। মমতাকে কোনো একটা দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিমুলতলায় চেঞ্জ-এ আনা হয়েছিল। স্থির তার চোখ দুটি। একটা সময় আসে প্রসাদকে সে ফিরিয়ে দিতে পারে না। মমতার সান্নিধ্যে প্রসাদের মধ্যে একটা বড় রকমের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মমতা এমন একটা চরিত্র যে এক এক জায়গায় গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে যার বহুল প্রকাশের চেয়ে নৈর্ব্যক্তিক স্থিরতা প্রতিধ্বনি করে—তার ভূমিকা আলোচনার দাবী রাখে।

চিত্রগ্রহণ করছেন শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পনির্দেশনা ঃ সুনীল সরকার। সম্পাদনা করবেনঃ গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালকঃ আনন্দশংকর। একখানি নজরুলের গান রেকর্ড করা হয়েছে। ছবির শুটিং শেষ হয়ে এসেছে।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

নাট্যমঞ্চ

অনুভবের 'উল্টোরথের ভেঁপু'

উল্টো রথের ভেঁপু নাটকের দৃশ্য

নাটক কিংবা তার বক্তব্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাংলায় নতুন কিছু না হলেও মাঝে মাঝে এমন এমন নাটক দর্শকরা উপহার পায় যা অনেক সময় রীতিমত চমকের সৃষ্টি করে।

ইদানিং বেশীর ভাগ নাটকেরই মূল চরিত্র অত্যন্ত সাম্প্রতিক। সেই রাজনৈতিক হানাহানি কালোবাজারী স্মাগলার ওয়াগন ব্রেকার বিভ্রান্ত চরিত্রভ্রষ্ট যুবসমাজ নেতাদের ব্যঙ্গচরিত্র চিত্রন এবং শাসক শ্রেণীর যথেচ্ছাচার পুলিশের ঘুষ খাওয়া ও নীরব দর্শকের ভূমিকা এবং ভঙ্গুর বাস্তব সমাজের রেখাচিত্র প্রায়শই ইদানিংকার নাটকে কোন না কোনভাবে উপস্থিত থাকে। এবং সব নাটকেরই মূল ভূমিকা থাকে এদের মুখোস খুলে দিয়ে নির্মম কষাঘাত করা। কোন কোন নাটকে ভয়ঙ্কর পরিণামের ও হুঁসিয়ারী বা সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়।

কিন্তু 'উল্টোরথের ভেঁপু' সেদিক থেকে আমাকে বিস্মিত এবং চমকিত করেছে। আমাকে অবাক করেছে প্রথমত এ নাটকের কুশীলবদের সংলাপ। এমন বুদ্ধিদীপ্ত অথচ কাব্যময় সংলাপ সচরাচর দেখা যায় না (নাট্যকার-নির্দেশক দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত)।

অনুভব প্রযোজিত এই নাটকের মূল চরিত্র দুটি। এবং তাদের কল্পনায় উপস্থাপিত দুটি নারী চরিত্র।

এ নাটকের গল্পাংশ অতি সামান্যই। দুটি পুরনো বন্ধুকে ঘিরে তাদের একে অপরের কাছে মিথ্যা ভাষণের মাধ্যমে নাটকের বিস্তার।

হঠাৎই এক সন্ধ্যার অন্ধকারে নাটকীয়ভাবে দুই বাল্যবন্ধুর মধ্যে দেখা হোল কোলকাতার প্রায় নির্জন এক পার্কে।

পুনর্মিলনের প্রথম পর্যায়ে উভয়ের স্কুল জীবনের রোমন্থন টুকরো টুকরো স্মৃতির আদান প্রদান।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বিলিতি কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী বন্ধুর প্রেমের এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রূপী বন্ধুর স্ত্রীর সংগে কাল্পনিক সংলাপ বিনিময়। এবং তৃতীয় পর্যায়ে কার্যকারণে একে অপরের কাছে ধরা পড়ে যাওয়া।

তখন দেখা গেল এতক্ষণ সংলাপ দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের যে সৌধ গড়ে তুলেছিল দুই বন্ধু তার সবটাই মিথ্যা। আসলে দুজনেই স্মাগলার।

মোটামুটি এই গল্প। কিন্তু মঞ্চে তার উপস্থাপনায় প্রচুর মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন নাট্যকার।

আর অভিনয়েও অবাক করেছেন মূল চরিত্রাভিনেতারা। বিশেষ করে শ্যাম (তাপস দত্তগুপ্ত) চরিত্রের অভিনেতার সাবলীল অভিনয় দর্শককে রীতিমত অবাক করেছে। তারপরেই নাম করতে হয় নীলুর (অসীম ভাদুড়ী) অভিনয়। বস্তুত এঁরা যে অভিনয় করেছেন একথা নাটকের কোথাও মনে হয়নি। একমাত্র শেষ দৃশ্য ছাড়া।

এরপরেই নাম করতে হয় দ্বৈত ভূমিকার (মালা ও রুণু) অভিনেত্রী গীতা ভট্টাচার্যের কথা। এর অভিনীত চরিত্রে একটু সিনেমার প্রভাব থাকলেও বলতে বাধা নেই অপেশাদার নাটকে এমন অভিনেত্রীর সচরাচর দেখা পাওয়া যায় না।

কিশোর শ্যাম (দেবাশীষ মজুমদার) ও কিশোর নীলু (অলক রায় ঘটক) একটি দৃশ্য হলেও ভালই করেছে। ফ্ল্যাশ ব্যাকটিও সুপ্রযুক্ত।

ফলওয়ালা (মুক্তরাম পাল) আইসক্রিমওয়ালার (ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়) নাটকে তেমন ভূমিকা না থাকলে তাদের উপস্থিতি নাটকের পক্ষে সহায়ক হয়। দুই ইনসপেকটরের (যথাক্রমে শান্তজিৎ সেনগুপ্ত ও শিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) আর একটু অনুশীলনের প্রয়োজন আছে।

নাট্যকারের সংলাপ ছাড়া আর যা ভাল লেগেছে তা হোল দুই বন্ধুর কাল্পনিক সংলাপের সংগে সংগে যথাক্রমে তাদের কাল্পনিক প্রেয়সী ও বিলাসী মদ্যপ স্ত্রীর মঞ্চে বিচরণ। নাটকে এ এক নতুন পরীক্ষা সন্দেহ নেই।

আশাকরি সেই দৃশ্য কটি ভবিষ্যতে আরো চমকপ্রদভাবে উপস্থাপিত হবে।

এ নাটকের আর একটি বড় সম্পদ এর মঞ্চ সংস্থাপন। শিল্পী নিতাই ঘোষ সেখানে আশ্চর্য কল্পনাশক্তি ও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর ফ্রেমিং এর পরিকল্পনা অভিনব। পিন্টু বসুর আলো নাটকের সহায়ক হয়েছে। চিত্ত ভাদুড়ীর রূপসজ্জা চারিত্রানুগ। তবে সংগীতের (রাজেশ্বর ভট্টাচার্য) ভূমিকা আর একটু পরিবেশ অনুযায়ী হলে সেটা নাটকের পক্ষে সহায়ক হবে বলেই আমার অনুমান।

অনুভবের এটি নতুন নাটক। আশা করবো এ নাটক ভবিষ্যতে আরো চমক নিয়ে দর্শকদের কাছে উপস্থিত এবং সমাদৃত হবে।

—নাট্যসমালোচক

কোরাসের 'মজন্তালী সরকার'

কোরাস নাট্যগোষ্ঠীর 'মজন্তালী সরকার' নাটকে নির্দিষ্ট কোন ঘটনা নেই তবে আদ্য মধ্য অন্ত দিয়ে যেমন নাটককে বিভক্ত করা হয় তেমনি এতে কয়েকটি পর্ব আছে। যাকে এদের ভাষায় নাটকের উপস্থাপনায় পরই বলা হয়েছে কৃষি পর্ব বাণিজ্য পর্ব এবং অন্তিম পর্ব।

নাটকের মূল চরিত্ররা বলা যায় একেবারে হাল আমলের। আর তার অন্তরালে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ নাটকটিকে আগাগোড়াই সুগার কোটেড করে রেখেছে।

নাটকের কুশীলব চাষী জোতদার মজুত-দার ভণ্ডামির অক্ষম শাসক কর্ণধার জজবাবু বিপ্লবী ছাত্র ইত্যাদি। মজন্তালী সরকারকে এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে চতুর আত্মসর্বস্ব রাষ্ট্রীয় কর্ণধার রূপে। যে স্বেচ্ছায় বিভিন্ন সমাজ বিরোধীদের হাতের পুতুল। সময় বিশেষে অসহায়।

সমগ্র প্রহসনটি নিবেদন করা হয়েছে যাত্রাধর্মী অপেরার ঢঙে। পর্ব ভাগ করে।

কৃষক শ্রমিক বা বিদ্রোহী নিয়ে নাটক করা নতুন নয়। যাদের শোষক হিসেবে জোতদার কালোবাজারী মুনাফাখোর এবং সরকারী যন্ত্রকেও বহু নাটকেই উপস্থিত করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন পরিবেশে এবং অবস্থায়।

কিন্তু মজন্তালী সরকার নাটকে তার উপস্থাপনা কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। বেশ একটা হাল্কা চালে বক্তব্য বলা হয়েছে। প্রারম্ভে কথক—খুড়ো ভাইপো। প্রকাশের মাধ্যম গান। গান দিয়ে মুখবন্ধ করে নানা চরিত্রকে টেনে এনে তাদের দিয়ে অভিনয় করানো হয়েছে শোষিত এবং চরিত্রগুলির ভূমিকায়। তাদের সংলাপ কখনো কখনো তীক্ষ্ণ এবং ব্যঞ্জনা-ধর্মী হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে পুরনো এবং চটুল মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। এটুকু পরিহার করতে পারলে বোধহয় নাটকের আবেদন আরও মর্মগ্রাহী হোত।

ঘাঁটি তক্কো আর গপ্পো/শাওলী মিত্র

স্বীকারোক্তি/সুমিত্রা মুখার্জি

খুড়ো ভাইপোর গানেই তো সে কথা উচ্চকণ্ঠে বলে দেওয়া হয়েছে। অন্যত্র এর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন ছিল কি?

অবশ্য একথাও ঠিক কিছু কিছু ব্যঙ্গ হাল্কা হলেও দর্শকরা উপভোগ করেছেন তবে পেছনের পর্দায় প্রতিফলিত দৃশ্যগুলি কিন্তু নাটককে এগিয়ে দেবার পক্ষে সহায়ক হয়নি। তার জন্য হয়তো আলোকসম্পাতই দায়ী।

অভিনয়ে মানব (তাপস চক্রবর্তী) বলরাম চাষী (বাউল ঠাকুর—নাটকের পরি-চালক) তেলবাবু (দীপক ঘোষ) জজবাবু (অরুণ মন্ডল) এবং পুলিশ (দেবকুমার বিশ্বাস) অত্যন্ত মুন্সিয়ানার পরিচ

সৈনিক : সুতপা কানুনগো, অঞ্জন দাস

দিয়েছেন। আর অবাক করেছেন ভাইপো (অলক নায়েক)। খুড়োর (বিলাস মুখার্জি) অভিনয়ও স-প্রাণ। কিন্তু গানের ক্ষেত্রে তিনি সহজ হয়েও কেমন একটু আড়ষ্ট। গানটা আরও প্রাণবন্ত হলে তাঁর অভিনয়ও খুলতো।

মজন্তালী সরকার নাটকের মূল লক্ষ্য-চরিত্র হলেও স্টেজে তাকে খুব বেশী সময়ের জন্য উপস্থিত করা হয়নি। তাই অনেক সময় তার উদ্দেশ্যে বাণ নিক্ষিপ্ত হলেও সেটা যেন রাজার মাকে কুব্জা বলে গাল পাড়ার মতই থেকে গেছে। তবে মজন্তালী সরকারের (রঞ্জিত গাঙ্গুলী) অভিনয় আমার ভাল লেগেছে। তার নির্দিষ্ট কোন চরিত্রকে অনুসরণ করার প্রয়াস তাই বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

তারক চ্যাটার্জি সুনীল দেবনাথ রঞ্জিত ঘোষ চন্দন দাশগুপ্ত ধ্রুব রায় (?) সুধাংশু সেন কমল বসু ঠাকুর শরদিন্দু আইচ সুধাময় গৌতম-এর অভিনয় মোটামুটি। ছাত্র দীপংকর বিশ্বাস ও কিপ্ট কুলী (শঙ্কর সরকার) আর একটু স্বাভাবিক হলে ভবিষ্যতে ভাল অভিনয় করবেন।

ছবিতে গানের একটা বড় ভূমিকা আছে। সুরে (দীপক চক্রবর্তী) কিছু মিশ্রণ থাকলেও সুর রচনা প্রশংসনীয়।

আলোর (দিলীপ মিত্র) কাজ কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল। রূপকারের ভূমিকা (প্রহ্লাদ পাল) সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়েছে।

সবশেষে নিবেদন সামগ্রিকভাবে নাটকের গতি একটু মন্থর জজবাবুর বিচার দৃশ্য সুঅভিনীত হয়েও দর্শককে উৎকর্ণ করে না। আর নজরুলের 'কারার ঐ লৌহকপাট' সঙ্গীত সহ ঐ দৃশ্যটির অভিনয় মনকে খুব নাড়া দেয় নি। আর গানটির সঙ্গে শুধু লিপ দিয়ে আসল কণ্ঠকে নির্বাক রাখা হোল কেন? তাতে এদিক ওদিক হবারই সম্ভাবনা বেশী।

যন্ত্রসঙ্গীত মাঝে মাঝে খুবই ভাল।

স্ত্রীভূমিকা বর্জিত নাটকটির রচয়িতা যথাক্রমে বাউল ঠাকুর ও উমানাথ ভট্টাচার্য।

নাট্যসমালোচক

স্যার চার্লস চ্যাপলিন

পৃথিবীর কাছে আজও বিস্ময় যে ছোট-খাটো মানুষটি রূপক অর্থে নাট হামসুনের 'হাঙ্গার' উপন্যাসের সেই ভ্যাগাবন্ড নায়ক চার্লি চ্যাপলিন পঁচাশি বছর বয়সে পদার্পণ করে ইংলন্ডেশ্বরীর ইচ্ছায় স্যার খেতাবে ভূষিত হলেন।

এই সঙ্গে আরো যে দুজন বিস্ময়কর ব্যক্তিকে ঐ খেতাবে সম্মানিত করা হোল তাঁরা হলেন যথাক্রমে ক্রিকেটের যাদুকর গারফিল্ড সোবার্স এবং রূপকথার মত রসিক পাঠক মহলে যার খ্যাতি সেই রস-সাহিত্যিক পি জি ওডহাউস।

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজকীয় দরবারে এই স্যার উপাধি নববর্ষের উপহার হিসেবে বিতরণ করা হয় গত ১ জানুয়ারী।

গত ৬০ বছর ধরে পর্দার প্রথমে মূক এবং পরে প্রায় নির্বাক এবং নির্বিকার অনবদ্য কৌতুক ও হাস্যরস পরিবেশনের জন্য চার্লি চ্যাপলিনকে উক্ত উপাধিতে অভিষিক্ত করা হোল। বিটেনের রাণী তাঁকে 'নাইট কমান্ডার অফ দি অর্ডার অফ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার' খেতাব দিলেন তাঁকে।

যে চার্লি চ্যাপলিন তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিতে রেখে গেছেন সেই সব হাসি কান্না বেদনা ব্যঙ্গের কষাঘাত, পৃথিবীর দরিদ্র মানুষের প্রতি মমত্ব তাদের মর্মবেদনা তাদের প্রতি সুখী মানুষের যে বঞ্চনা আর অবহেলার কথা স্মর্ণা করে—যিনি লক্ষ কোটি মানুষের মুখে নির্মল হাসি ফুটিয়েছেন। অন্যদিকে তাদের চোখে এনেছেন জল যাঁর সমকক্ষ প্রতিভার আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে পদক্ষেপ ঘটে নি সেই মানুষটিকে এই স্যার খেতাব দিয়ে তাঁকে গৌরবান্বিত করা হোল না স্যার খেতাবটিই সার্থকতার গৌরবে চিহ্নিত হোল তার বিচার করবেন পৃথিবীর লক্ষ কোটি চার্লি ভক্তরা।

তবু চার্লি চ্যাপলিন আমাদের মনের মণিকোঠায় সেই যাদুকর চার্লিই থেকে যাবেন চিরকাল।

এ সপ্তাহের ছবি

পিয়ালী পিকচার্স নিবেদিত 'মৌচাক' ছবিটি ১০ জানুয়ারী থেকে রূপবাণী অরুণা ভারতী প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। কাহিনী—সমরেশ বসু, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা অরবিন্দ মুখার্জী সঙ্গীত—নচিকেতা ঘোষ, প্রধান ভূমিকায়—উত্তমকুমার সাবিত্রী চ্যাটার্জি রণজিৎ মল্লিক মিঠু মুখার্জি সুলতা চৌধুরী তরুণকুমার অনুপকুমার দুর্গাদাস ব্যানার্জি প্রভৃতি।

নীরদা সুন্দরী

গিরিশ যুগের শেষ শিখা

বিগত মঙ্গলবার ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭৪ বেলা ১১টা ৫ মিনিটে নির্বাপিত হয়ে গেল গিরিশ যুগের শেষ-শিখা নীরদাসুন্দরীর জীবনদীপ। ক্লাসিক মনমোহন মিনার্ভা আলফ্রেড স্টার নাট্যনিকেতন তদানীন্তন কালের প্রায় প্রতিটি রঙ্গশালায় বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করে নীরদাসুন্দরী খ্যাতি অর্জন করেন। নৃত্য গীত ও অভিনয়ে সমান দক্ষতা ছিল তাঁর। তিরিশ বছর পূর্বে মঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। আত্মীয়স্বজন ও উত্তরাধিকারীহীনা নীরদাসুন্দরীকে নিজ বাড়ীতে এনে আশ্রয় দিয়েছিলেন শান্তি গুপ্তা। শান্তি গুপ্তার শ্যামপুকুর স্ট্রীটস্থিত গৃহের একতলায় তিনি থাকতেন। নীরদাসুন্দরীর পরিচর্যার জন্য জয়া নামে একজন পরিচারক নিয়োগ করা হয়েছিল। মৃত্যুর শেষ সময় পর্যন্ত জয়াই পরিচর্যা কাজে নিযুক্ত ছিল। তাছাড়া শ্রীমতী আশা ও শান্তি গুপ্তার পরিজনের মাঝেই নীরদাসুন্দরীর দেখাশুনা করতেন। আমৃত্যু সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করতেন বিশ্বরূপার কর্ণধার রাসবিহারী সরকার। বিগত ১৯৭৪-এর প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গ সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে শ্যামপুকুরের গৃহে গিয়ে প্রায় দু'শ' সাতজন সদস্যসহ আমরা অন্যান্যদের সঙ্গে নীরদাসুন্দরীকে অভিনন্দন জানিয়ে আসি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এমনি পুরোন যুগের শিল্পীদের প্রতি দেশবাসী, তথা জাতীয় সরকারকে অবহিত করে তোলা। কিন্তু পরম বেদনার কথা, কেউই এ-বিষয়ে তৎপর হননি।

নীরদাসুন্দরীর মৃত্যু-সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন নাট্যশালা ও শিল্পীদের জানিয়ে দেওয়া হয়। সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সংস্থার বিজয় রায়, শ্যামল রায়-চৌধুরী, সর্বজিৎ বসু, সুরেন্দ্রনাথ কাংকারিয়া ও অন্যান্য সভাগণসহ আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসি। বিশ্বরূপার পক্ষ থেকে শ্রীরাসবিহারী সরকার শোভাযাত্রা ও শবদাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। তাছাড়া বিশ্বরূপা, স্টার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার ও প্রতাপ মেমোরিয়ালের চতুর্মুখ থেকে শিল্পীর মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এবং সংশ্লিষ্ট থিয়েটারগুলি ও-দিনের নাট্য-প্রদর্শনীতে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বলে জানা যায়।

নীরদাসুন্দরী নিজে বলতেন মৃত্যুর পূর্বে, যে তাঁর বয়স ১০২ বৎসর হয়েছিল। অনেকেরও তাই বিশ্বাস। তাহলে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জন্ম হয়েছিল বলেই ধরে নিতে হয় এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সখীর দলের মধ্য দিয়ে যখন তিনি ক্লাসিক থিয়েটারে সর্বপ্রথম যোগদান করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ২৬। যা অস্বাভাবিক। কারণ সখীর দলে যাঁরা প্রথম নামতেন, তাঁদের বেশীর ভাগের বয়সের সীমারেখা ১০ থেকে ১৬-র মধ্যেই সীমিত থাকতো। গিরিশচন্দ্রের দোললীলা ক্লাসিক থিয়েটারে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ মঞ্চস্থ হয়।

দোললীলায় নীরদাসুন্দরীর সঙ্গে অন্যান্য যাঁরা ছিলেন সখীর দলে তাঁদের মধ্যে সুশীলাবালা, ভুবনেশ্বরী ও বিনোদিনী (হাঁদি)-র কথা উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে সুশীলাবালাই বেশী খ্যাতি অর্জন করেন। দোললীলার সময় নীরদাসুন্দরীর বয়স আনুমানিক ১৫ বছরের বেশী ছিল না। তাই তাঁর জন্ম-সাল ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে হওয়াই স্বাভাবিক এবং ১০২ নয়, ৯১ বৎসর বয়সে নীরদাসুন্দরী পরলোকগমন করলেন। ক্লাসিকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নির্মলা নাটকে বাঁশরী এবং গুপ্তকথায় অধীরা। মিনার্ভায় ঝকমারি নাটকে দীপ এবং গিরিশচন্দ্রের গৃহলক্ষ্মীর ফুলিরূপেই নীরদাসুন্দরী প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কিন্নরী নাটকের নাম-ভূমিকায় নীরদাসুন্দরী বিস্ময়কর অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দেন। নীরদাসুন্দরী অভিনীত অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে ভাগ্যচক্র—হেনা, ক্লিওপেট্রা—চারমিয়ান, আহেরিয়া—কেতু, কালাপাহাড়—রঙ্গিলা, রামানুজ—চমাম্বা, চিত্তরোদ্ধার—ময়না উর্বশী—চিত্রলেখা দুমুখো সাপ—অতসীবিবি সীতা—তুঙ্গভদ্রা ডাক্তার—মণিমালা, চিরন্তনী—মিস চ্যাটার্জি, ওথেলো—এমিলিয়া, ঝড়ের রাতে—মাসীমা, আঁধারে আলো — রঙ্গিণী, মা—অরবিন্দের মা, স্বর্ণলঙ্কা—সুর্পণখা আবুল হাসান দেবদাস—উমা দুসপুরুষ—সাতু ধাত্রীপান্না—শীতলসেনী প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্রে কৃষ্ণকান্তের উইল আর মানভঞ্জনের কথাই বলা চলে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের পর থেকে নীরদাসুন্দরীর বহু অভিনয়ই আমি দেখেছি। সব অভিনয়ের কথা মনে নেই। তাছাড়া শেষের দিকে যেসব চরিত্রে তাঁকে দেখেছি, সেসব চরিত্রও মনে রেখাপাত করার মত খুব কমই ছিল। তুঙ্গভদ্রা, শীতলসেনী, সাতু—এই তিনটি চরিত্রের কথা ভুলবার নয়। কিন্নরী ও অন্যান্য চরিত্রের অভিনয় সম্পর্কে যথেষ্ট প্রশংসা শুনেছি। গৃহলক্ষ্মীর ফুলির জন্য ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন।

গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমর দত্ত ধর্মদাস সুর চুণীলাল দেব নৃপেন্দ্র বসু, তারাসুন্দরী কুসুমকুমারী দানীবাবু অপরেশচন্দ্র শিশিরকুমার কঙ্কাবতী সরযূবালা ছবি বিশ্বাস জহর গাঙ্গু[illegible] প্রভৃতির সঙ্গে নীরদাসুন্দরী অ[illegible] করেছেন গিরিশচন্দ্রের কাছ থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন আবার পরবর্ত[illegible] গোষ্ঠীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন প্রায় ৫০ বছর নীরদাসুন্দরী মঞ্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ৫০ বছরে মাঝে মা[illegible] ছেদ পড়েছে বহুবার। তাই আর্থিক সঞ্চ[illegible] কিছুই ছিল না।

নীরদাসুন্দরীই গিরিশযুগের শে[illegible] অভিনেত্রী ছিলেন। প্রাচীনাদের ম[illegible] সন্তোষকুমারী (তেলেনা) ও ইন্দুবা[illegible] প্রভৃতিই বেঁচে আছেন। নাট্য-ইতিহাসে[illegible] বহু উপাদান এঁদের কাছ থেকে আহরণ ক[illegible] সম্ভব হয়েছে। এঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সং[illegible] উপাদান সংগ্রহের একটি উৎস রুদ্ধ হ[illegible] গেল।

নাট্য সংগ্রহশালা তথা থিয়েটার আ[illegible] কাইভস প্রতিষ্ঠা এবং গবেষণা-কে প্রতিষ্ঠায় জাতীয় সরকার আজও নিষ্ক্রি[illegible] আর এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য অতীত সম[illegible] যেমন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তেমনি না[illegible] ইতিহাসে নানান বিকৃতির অনুপ্র[illegible] ঘটছে। এ-বিষয়ে জাতীয় সরকারের প্র[illegible] দৃষ্টি আকর্ষণ করে নীরদাসুন্দরীর প্র[illegible] আমরা আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

—কালীশ মুখোপাধ[illegible]

জলসা

কলা সংগমের অনুষ্ঠান

কলাসঙ্গমের তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান প্রসংগে চোখের সামনে ছবির মত ভেসে ওঠে শিল্পশ্রীমণ্ডিত মঞ্চসজ্জা। ওপরে ঝোলানো বেলোয়াড় ঝাড়ের নকসার আলো শিল্পীদের আসনের দুপাশে নানারঙা ফুলের বাগানের দৃশ্যরচনা ও পুষ্পগুচ্ছের সারি দিয়ে মঞ্চের প্রান্তসীমা সৃষ্টি সব মিলিয়ে যেন পারস্য কবিদের গুলবাগিচায় পরিণত হয়েছিলো রবীন্দ্রসদন মঞ্চ।

সঙ্গীতানুষ্ঠানের স্মরণীয় শিল্পী পণ্ডিত লালগুডি জয়রামন। এ'র বেহালা আগেও শুনেছি। কিন্তু সেদিনের মেজাজ মনে রাখবার মত। শিল্পী পরিবেশিত রাগ-গুলি হোলো যথাক্রমে চক্রবাকম্ মধুবন্তী মোহনম্ ও ধর্মবতী। শেষ করেছেন স্ব-রচিত একটি রাগ দিয়ে—যার সঙ্গে আদল আসে আমাদের জয়জয়ন্তীর। হিন্দুস্থানী সংগীতের মত এত উপাদান সম্ভার নেই, নেই শিরিকশার অফুরন্ত তানসম্পদ মীড়ের বাহার অথবা ছড়-টানার শব্দবৈচিত্র্য। কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় ঢঙের ছোট ছোট তান বিস্তারের পরিসরগুলি যেন গীতিকবিতার রসে পরিপূর্ণ। গমকের মধ্যে হৃৎকম্পন সৃষ্টিকারী গর্জন ছিল না। ছিলো ওজস্ ও আকৃতি আর এইখানেই ঘটেছিলো পাণ্ডিত্য ও শিল্পবোধের অপূর্ব সংহতি।

চক্রবাদমে স্বপ্রয়োগের চমক বিহ্বলতা মধুমন্তীর আলাপনে কল্পনার রঙিন ছটা মোহনমে বিভিন্ন রাগের মালা-গাঁথা এত-গুলি মনোহারীত্বের সমন্বয় হলেন একাধারে স্রষ্টা ও শিল্পী জয়রাম। মৃদঙ্গ সঙ্গত-কারী বিম্বান ভেলোর রামবর্ধন কৃতিত্বের একটা বড় অংশীদার।

পণ্ডিত যশরাজ পরিবেশিত বেহাগ খাম্বাজ ও আড়ানা অত্যন্ত প্রাঞ্জল। বিশেষ করে মন্দ্রসপ্তকে অনায়াসবিহারে ও রাগের ক্রম উন্মীলন শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে।

পরভীন সুলতানার পূরিয়া ধ্যানেশ্রী ও বাগেশ্রী শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে কণ্ঠমাধুর্যের কারণে। কিন্তু খেয়ালের ভাবগাম্ভীর্যতা অথবা গাম্ভীর্যের অভাব এ অনুষ্ঠান মনে কোনো দীর্ঘস্থায়ী রেশ রাখতে পারে নি। ফৈয়াজ আহমেদ খান ও নিয়াজ আহমেদ খানের ইমনকল্যাণ রাগরূপ পরিবেশনার পরিপ্রেক্ষিতে নিখুঁত।

সরোদে আমজেদ আলি খাঁর হংসধ্বনি ধ্বনিগাম্ভীর্য সৃষ্টি দ্রুত—ডান হাতের বাজ ও বাঁ হাতের সুরেলা টিপের সমন্বয়ে।

কলাসংগমের সবচেয়ে আকর্ষণীয় শিল্পী ছিলেন যামিনী কৃষ্ণমূর্তি। এবার তাঁর দীর্ঘ তিন ঘন্টাব্যাপী ভারতনাট্যমে ভারতের এই সুপ্রাচীন মন্দির নৃত্যের ঐতিহ্য অনাহত রেখেও শিল্পীর প্রগতিশীল মনের অগ্রগতির ছন্দই যেন তাঁর নূপুরনিক্কনের মতই ধ্বনিত হয়েছিল। এর আগের নৃত্যানুষ্ঠানে শ্রীমতী যামিনী দেখিয়েছেন আঙ্গিক সমৃদ্ধি দেহলাবণ্য ও অনু-শীলনীর সমন্বয়ে শিল্পী কোথায় পৌঁছতে পারেন। কিন্তু এবারের অনুষ্ঠানে শিল্পী আরও গভীর ভাবের ভাবুক। সেই জন্যই অন্তর্মুখীন সৌন্দর্যে প্রতিটি নৃত্য অপরূপ।

বর্ণম অংগের প্রেমগীতির নৃত্যরূপ নটভনারের ছন্দর নকসায় অনুরূপ ধ্বনিতে নূপুরের উত্তর প্রত্যুত্তরের কাব্যসৌন্দর্য প্রতিটি মুহূর্তকে মুখর করে তুলেছিল।

পদম অঙ্গে শিল্পী পেশ করলেন তাঁর নিজস্ব দুটি রচনা—শিবতাণ্ডব ও মহিষ-মর্দিনী। অভিনয় চাউনীর ভঙ্গীর ঘন ঘন রূপান্তর আর তাঁর দীর্ঘ দুটি হাতের সঞ্চালনের লাবণ্যে এই সৃষ্টিধর্মী নাচের বক্তব্যকে তিনি রসোত্তীর্ণ করেছেন। বিষয়-বস্তুত গাম্ভীর্য সজ্জার শিল্পকৃতির পরিচ্ছদের বর্ণবাহার সব মিলিয়ে যেন পুরাণবর্ণিত দেবমূর্তি হয়ে ওঠেন। শিব-তাণ্ডবে পুরুষের দৃপ্ত ওজস মহিষ-মর্দিনীতে নারীর সংগ্রামকঠোর রূপ আর রোমাণ্টিক নৃত্যে প্রণয়িনীর লীলাচমুখর লাস্য কখনও নিশ্চল ভাস্কর্যসৌন্দর্যে কখনও গতিমুখরতায় কখনও সঙ্গীত ও নৃত্যের মনোহর মিতালীতে আশ্চর্য রূপসৃষ্টিতে পৌঁছেছিল।

সংগ্রামী দুই তরুণ শিল্পী : দুর্ভাগ্য-ক্লিষ্ট বাংলাদেশে অভাবের অন্ত নেই। কিন্তু প্রতিভার দৈন্য কোনদিনই ঘটে নি। প্রতি-

দিনের সংগ্রামে লিপ্ত থেকেও আত্মবিকাশের স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিতে পারেন নি—এমনই দুই তরুণ শিল্পী হলেন গৌরাঙ্গ সাহা ও কালিদাস নাগ। একজন উচ্চাঙ্গ ও রাগ সংগীতে অপরজন বাংলা গানের ধারা তথা রবীন্দ্রনাথ নজরুল অতুলপ্রসাদ ও লোক-সংগীতকে নিষ্ঠার সঙ্গে আয়ত্ত করেছেন।

সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়াম হল ও রবীন্দ্র সদনে যথাক্রমে গৌরাঙ্গ সাহা ও কালিদাস নাগের একক প্রোগ্রাম শোনবার সুযোগ ঘটেছিল। গৌরাঙ্গ সাহা তাঁর সংগীত প্রতিষ্ঠান গীতাঞ্জলি এবং কালিদাস নাগ সপ্তারিণীর তরফ থেকে নিবেদিত হয়েছেন।

২৫ মার্চ প্রথম গৌরাঙ্গবাবুর গান শুনে আশ্চর্য হন নি এমন একজন শ্রোতাও ছিলেন না। ইনি চানাচুর বিক্রী করে একাধারে জীবন জীবিকা ও সংগীত সাধনা শুরু করেন। সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও অমরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর শিক্ষা একনিষ্ঠতা ও অধ্যবসায়ের মিলিত শক্তিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্রতে অনেকাংশে সার্থক হয়েছেন।

সেদিন তাঁর একক অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধে ছিল রবীন্দ্রসংগীত। স্বসৃষ্ট সুর ও কথায় গাওয়া তাঁর রাগাভিত্তিক বাংলা গানে একাধারে পাওয়া গেল তাঁর সাধনা ও ভাব-কল্পনার মধুর ছবিখানি। কিন্তু বিস্ময়ের বাঁধ ভেঙেছে দ্বিতীয়ার্ধে। এখানে পরিবেশিত মালকোষ রাগে খেয়াল রাগশুদ্ধতায় সংযমে ও গাম্ভীর্যে যথার্থ উচ্চাঙ্গ সংগীতের মানে প্রতিষ্ঠিত। এর পর একে একে দাদরা লাহরবা ও শ্যামাসংগীতে তিনি বহুমুখী সংগীত অনুশীলনীর স্বাক্ষর রেখেছেন। তবলা ও সারেংগী সঙ্গতে ছিলেন যথাক্রমে পুত্র সুজিত সাহা ও বাচ্চালাল মিশ্র।

আর এক স্বপ্নতন্ময় তরুণ কালিদাস নাগ। শিল্পীকে শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে শ্রীমতী কানন দেবী বলেন মধ্যবিত্ত ঘরের সংগ্রামের মধ্যে লিপ্ত থেকেও সংগীতসাধনায় আত্মনিয়োগ করে কালিদাস বাঙালীর সহজাত শিল্পপ্রবণতার উজ্জ্বল নজীর রেখেছেন।

প্রথম পর্যায়ে শ্রীনাগ নজরুলের ভাব-সংগীত প্রেমসংগীত ঝুমুর ও লোক-সংগীতের নানান দিক মেলে ধরেন। এর পর লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের আসর উপভোগ্য হয়ে ওঠে ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের নাচ ও গান দিয়ে। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন কালিদাস নাগ নৃত্য-পরিচালনায় আরতি মজুমদার ও ধূর্জটি সেন। মধুর কণ্ঠ ও পরিবেশনার আন্তরিকতায় কালিদাসবাবু সার্থক। কিন্তু স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পীদের কৃপণতা বেদনাদায়ক।

—চিত্রাঙ্গদা

আজ তো জী লে
জয়া ভাদুড়ী ও ড্যানি

সর্ব ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদ : সর্ব-ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদের সাপ্তাহিক বৈঠকের সংগীত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন সাগর বন্দ্যোপাধ্যায় রঞ্জিৎ দে রঞ্জিৎ মুখার্জি দীপক নাগ অরুণ ভট্টাচার্য সুনীল পাল এবং আরো কয়েকজন। সংসদের কার্যালয় (৪০।১ বনমালী সরকার ষ্ট্রীট) বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ও সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে এ কথা জানান সংসদ সভাপতি শ্রীহরিদাস ঘোষ।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 17th January, 1975
Phone 55-5231 (14 lines)

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি

২৪ জানুয়ারী ১৯৭৫

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মনিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩০.০০	টাকা ৪০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১৪ বর্ষ

অমৃত

৩৭ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 24th January, 1975 শুক্রবার, ১০ মাঘ, ১৩৮১

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীদীপক দে

সম্পাদকীয়

সমস্তিপুরের শিক্ষা

সমস্তিপুরে বোমা বিস্ফোরণের ফলে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্রের মৃত্যু হিংসাত্মক রাজনীতির এক শোচনীয় ও মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত। ষড়যন্ত্রকারীরা কত ব্যাপক ও নিখুঁত প্রস্তুতি করে এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করেছিল বিস্ফোরণের অব্যর্থ লক্ষ্য থেকেই তা বোঝা যায়। যদিও তার রহস্য এখনও উদ্ঘাটিত হয় নি। আহতদের মধ্যে মোট চারজনের মৃত্যু হয়েছে। ললিতনারায়ণের ভাই বিহারের সেচমন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্র মরতে মরতে বেঁচে উঠেছেন।

গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডের পর স্বাধীন ভারতে এই প্রথম একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতার এমন অপঘাত মৃত্যু ঘটল আততায়ীর হাতে। সরকারী নিরাপত্তা ব্যবস্থার যতই কড়াকড়ি থাকুক না কেন হত্যাকারীদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে মিশ্রজীকে রক্ষা করা যায় নি, এটা খুবই লজ্জার ও উদ্বেগের বিষয়। এর জন্য বিহার সরকারের গাফিলতি কতটা দায়ী তা সি-বি-আইয়ের তদন্তে পরিষ্কার বোঝা যাবে। তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে মিশ্রজীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেমন শিথিল ছিল তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারেও তেমনি অদূরদর্শিতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। গোটা বিষয় নিয়েই ব্যাপকতর তদন্তের প্রয়োজন আছে।

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে হিংসার আবহাওয়া আজ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। গত এক দশকে তার নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া গেছে। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেও বহু ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক পথে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়ে থাকে, এ ঘটনা আজ আর বিরল নয়। এর জন্য শাসক দল এবং বিরোধী দল সকলেই কমবেশি দায়ী। শুধু এক পক্ষের ওপর দোষ দিয়ে কেউ নিজের দায়িত্ব স্খালন করতে পারবেন না। কারণ হিংসাত্মক ঘটনা সমস্তিপুরেই প্রথম ঘটল না। দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কারণে চূড়ান্ত হিংসার বিস্ফোরণ আমরা লক্ষ্য করেছি। ললিতনারায়ণের মৃত্যু তারই পরিণতি মাত্র। হিংসা বৃহত্তর হিংসাকে ডেকে আনে। একজনের মৃত্যু আরও দশজনের মৃত্যুতে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা চরিতার্থ করে। দুর্নীতি, লোভ এবং ক্ষমতা লিপ্সা ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজজীবনকে কলুষিত করে ফেলেছে। গান্ধীজির কথা মুখে উচ্চারণ করলেও মূলত তাঁর নীতি আজ রাজনীতি ক্ষেত্রে অল্পই অনুসৃত হয়ে থাকে। বিরোধীদের মধ্যে উগ্রপন্থী যারা ষাটের দশকের শেষদিকে তাদের প্ররোচনায় পশ্চিম বাংলায় ও অন্ধ্রে বহু রক্তপাত ঘটেছিল। সেই উগ্রপন্থীদের দমন করা গেলেও হত্যার রাজনীতি একেবারে দমন করা যায় নি। বামপন্থী আমলে দলীয় কলহে বহু রাজনৈতিক কর্মীর মৃত্যু ঘটেছে। কংগ্রেসী আমলেও দলীয় দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছে অনেকে। বিরোধী পক্ষের সঙ্গে সরকারের সদ্ভাব নেই। অথচ পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে বিরোধীরা হল সরকারী দলের বিকল্প। নির্বাচনে একদল যাবে অন্য দল আসবে, এই [illegible] নিয়ম। কিন্তু আমাদের দেশে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কটা প্রায় সাপে নেউলের মতো হয়ে যাচ্ছে। এই তিক্ততা সমাজদেহের অন্যত্রও ফুটে বেরুচ্ছে।

আজ চিন্তা করবার সময় এসেছে এভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র অবাধে চালানো সম্ভবপর কিনা। ভোট দ্বারা যদি জনমত বিচারের মাপকাঠি আমরা গ্রহণ করে থাকি তাহলে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের অবসান ঘটানোর জন্য সকলেরই কঠোর সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। পারস্পরিক দোষারোপের দ্বারা এই সন্ত্রাস থেকে জাতীয় জীবনকে মুক্ত করা যাবে না। কঠোরতম নিরাপত্তার মধ্যেও সন্ত্রাসবাদী তার ঘৃণিত হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করতে পারে। প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন মহাত্মা গান্ধী কিংবা প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে নিরাপত্তা রক্ষীরা বাঁচাতে পারে নি। এমনকি কেনেডি হত্যার আসল রহস্য পর্যন্ত উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয় নি। আমাদের দেশের রাজনীতিতে হিংসার আবহাওয়া ক্রমশ বাড়ছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য গান্ধীজি যে-পথ দেখিয়ে গিয়েছিলেন কোনো দলই সে-পথ আজ অনুসরণ করছে না। তার ফলে যে কোনো উপায়ে প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করার জন্য সবাই ব্যগ্র। গণতান্ত্রিক পথে তা করা হল কিনা এ নিয়ে কারো বিশেষ মাথাব্যথা নেই। এটা খুবই দুঃখের ও উদ্বেগের বিষয়। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র নিয়ে আমরা গৌরব করি। কিন্তু পার্লামেন্টের ভিতরে এবং বাইরে যে আচরণ আমরা করি তাতে সে গৌরব কি খুব বাড়ছে?

এর জন্য আজ সকলকেই নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে। সকলকেই একথা উপলব্ধি করতে হবে যে রাজনীতির জগত থেকে হিংসা দূর করতে না পারলে সমস্তিপুরের মতো ঘটনা রোধ করা যাবে না। এই উপলব্ধি সরকার ও বিরোধী দল উভয়েরই হওয়া প্রয়োজন। পরস্পরের প্রতি সহনশীল হয়ে তাদের উভয়কে একমাত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই নিজ নিজ কর্মসূচী রূপায়ণের সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। সমাজজীবন থেকে অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি ও নিষ্ঠুরতা দূর করার জন্য সরকারকে যেমন আন্তরিক হতে হবে, বিরোধীদেরও তেমনি থাকতে হবে সতর্ক ও সজাগ। গণতান্ত্রিক সহনশীলতা ছাড়া পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন সম্ভবপর নয়। হিংসার আবহাওয়া দূর করতে হলে এই বিশ্বাস ও সহনশীলতা অর্জন করা আজ বিশেষ প্রয়োজন। মিশ্রজীর মৃত্যু তাই দেখিয়ে দিয়ে গেল।

আরো ভোরের প্লেনের শব্দ

বুদ্ধদেব গুহ

শেষ রাত্রে, আধো ঘুমে আধো জাগরণে অশেষ বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল। বোধ তখনও জড়ানো, চেতনা অস্পষ্ট, বুকের মধ্যে একটা চাপা কষ্ট।

কষ্টটা কোনো একটা কারণে নয়। বিভিন্ন কারণে। এখন অশেষের বুকের মধ্যে সে কারণগুলোও এ মুহূর্তে সরল বা সমান্তরাল নয়। কারণগুলো লেজে ভর দিয়ে দাঁড়ানো অনেকগুলো ভয়াবহ সাপের মত ফনায় ফনায় জড়াজড়ি করে আছে। তারা এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে যে তাদের কোনোটাকেই আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না—তাদের পরিচয় বোঝা যাচ্ছে না—অথচ তারা যে দলবদ্ধ হয়ে অঙ্গাঙ্গী হয়ে বিরাজ করছে এ-কথা অশেষ নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছে।

অশেষের মাথার কাছে জলের গ্লাস আছে—পায়ের কাছে একটা বাড়তি কম্বল আছে—পায়ের কাছে পাশে একটা কোলবালিশও আছে। কিন্তু অশেষের পিপাসা পেলেও, শীত করলেও কোলবালিশটাকে কোনো না-পাওয়া-উষ্ণতার প্রতিনিধি করে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে যে কম্বল জড়িয়ে গুটিসুটি হয়ে শোবে তারও উপায় নেই এই মুহূর্তে

ওর মস্তিষ্ক ওর আশেপাশে, ওর জীবনে, কি আছে না আছে সে সম্বন্ধে সচেতন কিন্তু সে সবকিছুকে হাত বাড়িয়ে নেওয়াতে এক প্রচণ্ড অনীহা জন্মেছে তার। এই অনীহা জন্মিয়েছে তার হৃদয়।

তাই এই শেষ রাতে, তার আধো-জাগরিত মস্তিষ্কও বহু আঘাতে আঘাতে অবশ শ্রান্ত-ক্লান্ত হৃদয়ের অন্তর্মর্মদেব সে অবচেতনের বাহির দরজার শেষ সিঁড়িতে ভিখিরী ছেলের মত সমর্পণ-ভরা করুণ চোখে চেয়ে আছে।

প্রতি রাতেই ওকে এই সময় একটা অদ্ভুত নিশ্চেষ্টতা আবিষ্ট করে। ওর বুকের মধ্যে ও যাদের ভালোবেসেছিল, ভালো চেয়েছিল, যাদের ভালো করেছিল তাদের উদাসীনতা ও স্বার্থপরতা তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত নড়েচড়ে। যন্ত্রণায় ও স্থির হয়ে যায়—অস্থির হতে ইচ্ছা করে, কিন্তু পারে না। শেষ রাতের কালো কম্বল—বাইরের নিস্তব্ধ ঘুমন্ত জগৎ, শিশিরের ফিসফিসে ক্ষীণ স্বর—কদাচিৎ কোনো সকুণ্ঠ কুকুরের হঠাৎ-ডাক তাকে সেই বুক-ভরা গুমরে-মরা চাপা কষ্টের বালাপোষ মুড়িয়ে শুইয়ে রাখে।

এই অন্ধ গলি থেকে অশেষ বেরোতে চায়। আলো খোঁজে। পথ খোঁজে। কিন্তু পায় না। এই তিল-তিল করে মৃত্যুর দিকে অবধারিতভাবে এগিয়ে যাওয়ার কোনো মানে খুঁজে পায় না ও। এর চেয়ে দৌড়ে গিয়ে মৃত্যুকে বরণ করা ঢের ভালো বলে মনে হয় ওর।

সমস্ত সময়টুকুতেই যে যন্ত্রণা পায় এমনও নয়। এরই মধ্যে কখনও কখনও ভালো-লাগা ভালোবাসার কথা মনে আসে ওর বহুদিন ধরে বাঁধিয়ে-রাখা পুরোনো তেল-রঙা বিষণ্ণ ছবির স্মৃতির মত।

রাণুর কথা মনে পড়ে। আজ কত বছর হয়ে গেল। সেই রাণু ও আজকের রাণুতে কত তফাৎ। রাণু একদিন দেখা করতে এসেছিল—দাঁড়িয়েছিল বালিগঞ্জের কোয়ার্টার পাশের গলির মোড়ে। ছিপছিপে তন্বী রাণু, সবে টাইফয়েড থেকে উঠেছে, তখনও খুব দুর্বল—তবু চোখের উজ্জ্বলতা কমেনি একটুও। ঝিনঝিনে গলায় রাণু বলেছিল 'আমি এসে গেছি অনেকক্ষণ!'

রাণু একটা বাদামী ফ্রেমের হালকা চশমা পরেছিল। সেদিন রাণুর পাশে পাশে একটু হাঁটতে কত ভাল লাগত অশেষের।

আজও লাগে, কিন্তু লাগে কিনা তা জানার কোনো অবকাশ আজ আর নেই। সে-রাণু নেই, সে-অশেষ নেই।

অশেষ ভাবে ওর মধ্যে কি কারোই ভালোবাসা বা ভালো ব্যবহার পাওয়ার মত কোনো যোগ্যতাই নেই। এত ভালোবেসেও, ভালোবাসার জনকে সুখে রাখার জন্যে, সম্মানিত দেখার জন্যে, গুরুজনদের মুখোজ্জ্বল করার জন্যে এত কিছু করার পর কি ওর এই-ই পাওনা ছিল পৃথিবীর কাছে। পৃথিবীতে কি আপনজন বলে কেউই থাকে না—নিজের কাছে নিজে ছাড়া আর সকলেই কি পর? সকলেই কি যে-যার স্বার্থ নিয়ে, সুখ নিয়ে, সুখের চেষ্টা নিয়ে এতই ব্যস্ত যে, যে অশেষ তাদের এই সুখ দেওয়ার জন্যে জীবনের সবচেয়ে ভাল সময়ের সমস্তটা ব্যয় করল সেই ধূলি-মলিন সত্যর দিকে পিছু-ফিরে তাকাবার মত অবসর কি আজ কারোরই নেই?

আবার একবার পাশ ফিরে শুল অশেষ।

ইতিমধ্যে একটা কাক ডাকল নিম-গাছের মগডাল থেকে। বলল, কা-খা। তার-পর অনেকগুলো কাক একই সঙ্গে ডেকে উঠলো।

অশেষ আবার পাশ ফিরে শুল। এই সময়টা, যখন ভোরের আলো ফুটি-ফুটি করে, কাক-শালিখের ঘুম ভেঙে যায়—যখন শহরের বড় রাস্তা দিয়ে জল-প্রপাতের মত শব্দ করে দ্রুতবেগে ফাঁকা বাস ছুটে যেতে থাকে, তখন মুহূর্তে-মুহূর্তে পাশ ফিরতে থাকে—অশেষ।

এই সময়টায় ওর কষ্টটা তীব্রতম হয়।

ও জানে কষ্টটার হাত থেকে ওর নিস্তার নেই যতক্ষণ না আলো ফোটে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পরিচিত পৃথিবী জেগে উঠতে থাকে। পাশের ঘরে রাণু বাথরুমে যায়—জল পড়ার শব্দ আসে কানে, দরজা খোলার শব্দ, দুধওয়ালা-কাগজওয়ালার পরিচিত পায়ের শব্দ। পাশের বাড়ির দারোয়ানের গলা-খাঁকারি, গ্যারেজে ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া গাড়ি স্টার্ট করার নানারকম উৎকট আওয়াজ—তার সঙ্গে কাক, শালিখ, চড়াই—সকলের ডাক।

অশেষ এক অন্ধকার পথহীন যন্ত্রণার গুহা থেকে বেরিয়ে আলোয় এসে পৌঁছয়। রোজ সকালে। তখন ওর মনে হয় এই আলোটাই বুঝি সত্যি, অন্ধকারটাই মিথ্যা। কিন্তু ও জানে, আবার আগামীকাল শেষ রাতে ওর নিশ্চিতভাবে মনে হবে ওর জীবনে অন্ধকারের মত ধ্রুব-সত্য আর কিছু নেই। একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা, অন্ধকার এই-ই সব। যতক্ষণ কাজের মধ্যে থাকে—সব ভুলে থাকে। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়ে রাখা, ডুবিয়ে রাখা ছাড়া কাজের আর কোনোই প্রয়োজন নেই আজ। কাজের ফল স্বরূপ যাদের যাদের উপকার হওয়ার কথা ছিল তাদের সকলেরই উপকার সাধিত হয়ে গেছে। আজ সে কাজ করল কি করল না তাতে অন্য কারোই কিছু আসে যায় না। প্রয়োজনের যন্ত্র, ছাই-ফেলার ভাঙা কুলোর এখন কোনোই দাম নেই কারো কাছে। তবু অশেষ ভাবে ভাগ্যিস কাজ আছে, কাজ ছিল।

আজ ছুটির দিন। কাজের দিন নয়।

ছুটির দিনগুলো নিয়ে অশেষের বড়ই সমস্যা। ও জানে না কি করে এই দীর্ঘ অকাজের দিন কাটাবে।

একদিন ছিল।

একদিন ছিল যখন, রাণুর সঙ্গে মুখোমুখি বসে অনেক গল্প করত।

সমস্ত গল্পই আজ শেষ হয়ে গেছে। অশেষ বারে বারে বক্তব্যর মধ্যে তার পুরোনো গন্তব্যে ফিরে আসার চেষ্টা করেছে—বার বার সমস্ত আন্তরিকতার সঙ্গে—কিন্তু রাণু বলে যে, আজ আর নাকি বেলা নেই। অশেষের বেলা ফুরিয়েছে।

অথচ ওর নতুন কোনো গন্তব্য কি ছিল?

অশেষ জানে, রাণুও জানে ছিলো না।

অশেষ সেই দ্বিতীয় গন্তব্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না। কারণ সেই দ্বিতীয় গন্তব্যই একমাত্র হল সে কখনও কোনো দাবী করেনি অশেষের উপর। কিছু-মাত্র কখনও চায়নি অশেষের কাছে। কিছু দেয়ওনি অশেষকে। তবু, একটা ঘর ছিল অশেষের মনের মধ্যে যেখানে গিয়ে বসলে দু-দণ্ড শান্তি পেত সে। এই বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত, চিৎকৃত স্বার্থপর জগতে কিছু-ক্ষণের জন্যে ভালো লাগায় ভরে উঠত সে। সেই সুখও তার কপালে সইল না।

রাণুর অশেষকে কি দেবার ছিল এবং কিছুমাত্র দেবার ছিল কিনা তা নিয়ে রাণু কোনোদিনও মাথা ঘামায়নি—কিন্তু অশেষ যদি কোথাও কিছু পেয়ে গেছে আচমকা ঝড়ের-ফুলের মত তা নিয়েও অশান্তি কম হয়নি। আজ অবশ্য আর কোনো অশান্তি নেই। এখন অশেষের মনে পূর্ণ শান্তি। অত্যন্ত বেদনাদায়ক পীড়ার পর যখন মৃত্যু আসে, সেই মৃত্যুর অব্যবহিত পরের শান্তির মত ধূপ-ধুনো জ্বালা অগুরু-চন্দনের গন্ধভরা এক দারুণ শান্তি বিরাজ করছে এখন অশেষের মনে। সারাদিন করে। —রাতের প্রথম প্রহরগুলিতেও। শুধু শেষ রাতে যন্ত্রণার সাপগুলো আবার কিলবিলিয়ে ওঠে।

এক কাপ চা খেয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছিল ও। মোড়ের দোকানে গিয়ে দুটো পান খেলো। আজকালকার ছেলে-মেয়েরা পান খাওয়া পছন্দ করে না খায়ও না। অশেষ যেন সেজন্যেই আজকাল বেশী করে পান খায়। সংসারে কেউই যখন তার ভাললাগা মন্দলাগা নিয়ে মাথা ঘামায় নি তখন ওই বা কেন অন্যের ভালো লাগা মন্দলাগা নিয়ে মাথা ঘামাবে?

একা একা উদ্দেশ্যহীনভাবে পথে হাঁটতে হাঁটতে ওর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে আসে। পানের দোকানের আয়নায় ওর মুখের ছায়া পড়ে। ও নিজেকে চিনতে পারে না। কেমন একটা নিষ্ঠুরতার ছাপ পড়েছে তার মুখে—ডাকাত ডাকাত মনে হয় নিজেকে আয়নায়। নিজের মনে হাসে অশেষ। যতই নিষ্ঠুর তাকে দেখাক না কেন, ও জানে যত নিষ্ঠুরতা তা সব ওর নিজেরই প্রতি। ডাকাতি করে থাকলে নিজেই ও নিজের সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছে। অন্য কারোই কিছু নিতে পারেনি ও। বরং অন্য সবাই-ই বড়ো গেছে, জে[illegible] গেছে এই অরক্ষিত সুগম মানুষটার [illegible]; ওরা ছিনি-মিনি খেলছে ওকে নিয়ে যেমন করে গাড়ি-চাপা পড়ে মরে যাওয়া ছিন্নভিন্ন বেড়ালের বাচ্চাকে নিয়ে ধারালো ঠোঁটের কালো কাকেরা করে।

পথের ধারে টিপ বিক্রী করছিল একটা লোক। টিপ ও টিপ-পরার ছাঁচ মাটিতে ঢেলে।

অশেষ দাঁড়ালো একটুক্ষণ। কাউকে টিপ কিনে দেয়, কি টিপের ছাঁচ কিনে দেয় ভালোবেসে এমন লোক নেই ওর। তাছাড়া যদি বা ভুল করে কিনে ফেলে কাউকে হাতে করে দেয়ও—সে হয়ত বলবে কি দরকার ছিল? অথবা আমার অনেক আছে। তাদের ত সবই আছে, আছে সবকিছুই। যাদের কিছু দিতে ইচ্ছে করে তাদের কি নেই তা বিচার করে দিতে গেলে ত দেওয়াই হয়ে ওঠে না। দেওয়ার আনন্দেই মানুষ কাউকে ভালোবেসে কিছু দেয়—যারা তা নিতে না জানে তাদের দিয়ে লাভ কি? আগে আগে অনেক দিন এমন ভুল করেছে। যা দেখেছে কিনে নিয়ে এসে পৌঁছেছে ভালোবাসার জনদের কাছে। তারা আবরো ধমকে বলেছে কি দরকার ছিল? অথবা বলেছে, আমার অনেক আছে।

অশেষ কিছু কিনবে না।

টিপ ত নয়ই। টিপওয়ালার সামনে দাঁড়িয়ে টিপের ডিজাইনগুলো দেখছে ও, এমন সময় ওর পাশে এসে বিদেশী দুটি ছেলেমেয়ে দাঁড়ালো। ওদের চেহারা সত্যিই তাকিয়ে থাকার মত। শুধু চেহারাই নয়, ওদের ব্যক্তিত্বও। ওরা নিজেরা নীচু গলায় কি যেন আলোচনা করল—জিনিসগুলো কি তাই বোঝার চেষ্টা করছিল হয়ত।

অশেষ ওদের ব্যাখ্যা করে বোঝাল জানল ওরা অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছে আজ, কালই চলে যাবে মাদ্রাস। অশেষ টিপ-ওয়ালার কাছ থেকে ছাঁচ নিয়ে সিঁদুরে ডুবিয়ে একটা টিপ পরিয়ে দিল মেয়েটিকে। ওরা দুজনে খিলখিল করে হেসে উঠলো। ধন্যবাদ দিল ওকে। অশেষ কটা টিপ আর ছাঁচ কিনে মেয়েটিকে দিল। ওরা কি যে খুশী হল সে বলার নয়।

ছেলেটির নাম জিম, মেয়েটির নাম ক্যারল।

ওরা বলল, আমাদের একটু কেনাকাটার ছিল তাই ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুমি কি খুব ব্যস্ত? আমাদের একটু পথ দেখিয়ে দেবে?

পথ দেখাতে গিয়ে অশেষ পথ হারাতে বসল।

ঘন্টা তিনেক ঘুরে ফিরে ওরা তিনজনে খাওয়ার জন্যে এসে ঢুকল একটা মোটামুটি রেস্তোরায়।

অশেষ শুধোলো, তোমাদের কতদিন বিয়ে হয়েছে?

জিম হাসল। জবাব দিল না।

ক্যারল সামান্য অপ্রতিভ হল, কিন্তু তা অশেষের মত আকাট লোকের প্রশ্ন শুনেই। সে বলল, বিয়ে হয়নি ত আমাদের।

জিম বলল, হবেই যে এমন কোনো কথাও নেই। পৃথিবীটা বড় ঠান্ডা জায়গা, আমরা দুজনে দুজনের উষ্ণতায় বন্দ হয়ে পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছি। আপাততঃ একসঙ্গে আছি, থাকছি। চিরদিন নাও থাকতে পারি।

ক্যারল চাকরী করে সেক্রেটারীর। জিম বিজ্ঞাপন-সংস্থায় কাজ করে।

অনেকক্ষণ খেতে খেতে গল্প হল ওদের সঙ্গে। ভারী ভাল লাগল অশেষের। অনেক অনেকদিন পর ওর মনের গুমোট কেটে গেল যেন কিছুক্ষণের জন্যে।

তারপর এক সময় ওরা চলে গেল ওদের হোটেলের দিকে।

অশেষ ফিরে আসতে লাগল ওর ঠিকানায়। প্রত্যেক জীবিত মানুষ, গরু, কুকুরেরও একটা করে ঠিকানা থাকে। সেই ঠিকানায় ফিরে আসতে লাগল অশেষ, ফিরে আসতে হয় বলে—গরু যেমন সূর্য ডুবলে গোয়ালঘরে, কুকুর যেমন শীতের রাতে চট-ভরা কাঠের বাকসে—তেমন অশেষও ফেরে। মানুষের কোনো বিশেষ সময় থাকে না ঠিকানাতে ফেরার।

হাঁটিতে হাঁটিতে অশেষ ভাবছিল যে, এই জিম আর ক্যারলরা বেশ আছে। কেমন আমি-ময় জগৎ এদের। ও জগতে উত্তম-পুরুষই আসল। অন্য কোনো লোকের স্থান নেই সেখানে। জিম বলছিল আমি আছি বলেই জগৎ আছে। আমাকে ঘিরেই সমস্ত পৃথিবীর অস্তিত্ব। আমার সুখটাই মুখ্য, সেটাই একমাত্র কাম্য, আমি যেভাবেই তা পেতে চাই না কেন? সে সুখ আমি ছিনিয়ে নিই কেড়ে নিই পৃথিবীর কাছ থেকে। আমি নইলে এ জগতের দাম কতটুকু।

অশেষ শীতের রোদের মধ্যে হাঁটিতে হাঁটিতে বলে উঠল ঠিক ঠিক।

কিন্তু অশেষের সংস্কারাবদ্ধ, কর্তব্য-পীড়িত কূপমন্ডূক বুকের মধ্যে থেকে ক্ষীণ শব্দ ওঠে—টিক্ টিক টিক।

ভোরের শব্দের মত ওর মাথার মধ্যে অনেক মিশ্র শব্দের স্বর বাজে। অশেষ বুঝতে পারে এ জন্মের মত, একজন দারুণ বাঙালি গড়ি-গড়ি ভদ্রলোকের মত বাকি জীবনটা—যদি বাকি কিছু থেকে থাকে জীবনের—সেই বাকি জীবনটা টিকটিকির মত শেষ রাতে বুকের টিক টিক নিয়েই বাঁচতে হবে।

বহু পুরুষ ধরে অশেষরা এমনি করেই ছানাপোনা নিয়ে ন্যাজে-গোবরে, বর্ষায় পুঁইশাকের চচ্চড়ী ও শীতে ফুলকপি ধনেপাতা খেয়ে বেঁচে এসেছে। এই বদ্ধতা ঘন কচুরীপানার মত তার ও তাদের মনের জল ভরে রয়েছে। এই প্রজন্মে এমনভাবে বাঁচা ছাড়া অন্যভাবে বাঁচার কথা ভাবার মত বুকের পাটা অশেষের নেই।

উল্টোদিকের ফুটপাত দিয়ে দুটি অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে হেঁটে আসছিল—খিলখিল করে হাসছিল—সরল সপ্রতিভ ওদের মুখ—ওদের হয়ত অনেক দোষ আছে যে-সব দোষ অশেষের ছিল না—কিন্তু জীবনের মানে সম্বন্ধে ওদের মনে কোনো অস্পষ্টতা নেই। সূর্যের আশীর্বাদ লেগেছে ওদের কপালে, ওদের কান ভরে আছে ভোরের প্রাণের শব্দে।

অশেষ মনে মনে ওদের আশীর্বাদ করল। বলল, তোমরা বেঁচো, জীবনে যেমন করে বাঁচা উচিত তেমন করে। আমরা শেষ রাতের যন্ত্রণার মধ্যে নিঃশ্বাস নিই ও প্রশ্বাস ফেলি ফেলেছি এতদিন; তোমরা ভোরের সুস্থ দ্বিধাহীন আলোয় বেঁচো। বেঁচে থাকার জন্যে, বেঁচে থাকার দাবীতে কারো সঙ্গে, কোনো মত পথ বা সংস্কারের সঙ্গেই তোমরা সন্ধি করো না। তরুণ ঘোড়া যেমন ক্ষুরে ক্ষুরে বিদ্যুৎ ছিটিয়ে ধুলো উড়িয়ে গর্বভরে লাফিয়ে বাঁচে, তোমরাও তেমনি করে বেঁচো।

এই বাংলার খবর

যোজনার আকার

পাঁচ নম্বর পাঁচসালা যোজনার দ্বিতীয় বছর, অর্থাৎ ১৯৭৫-৭৬ সালে পশ্চিমবাংলার যোজনার আকার বৃদ্ধির জন্যে রাজ্য সরকারের চেষ্টা সফল হতে চলেছে। এই ব্যাপার নিয়ে আলাপ-আলোচনার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় সদলবলে দিল্লী গিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশনের নতুন ডেপুটি চেয়ারম্যান হয়েছেন পরমেশ্বর নারায়ণ হাকসার। এই কাজের দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর প্রথম কাজ হয়েছে, আগামী আর্থিক বছরের যোজনা সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করা। সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে আলোচনা এই পর্বেরই অঙ্গ। চলতি আর্থিক বছরের তুলনায় আগামী বছরে যোজনার জন্যে বরাদ্দ বাড়ানো রাজ্য সরকারের ইচ্ছা। এই বছর বরাদ্দ ছিল ১৫০ কোটি টাকার মতো। যোজনা কমিশনের সঙ্গে কথাবার্তার পর কলকাতায় ফিরে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই অংক আগামী বছরে ১৭০ কোটি টাকা করতে কমিশনের কর্তাব্যক্তিরা রাজি হয়েছেন। গোটা চতুর্থ পাঁচসালা যোজনায় পশ্চিমবাংলার জন্যে বরাদ্দ হয়েছিল ৩২০ কোটি টাকা। আর পঞ্চম যোজনার প্রথম দু' বছরেই বরাদ্দ দাঁড়াচ্ছে ৩২০ কোটি টাকা।

তবে এই ১৭০ কোটি টাকার বার্ষিক যোজনা রূপায়ণের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বাড়তি সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা তা এখনও ঠিক হয় নি। বছর তিনেক ধরে যোজনা খাতে এই রাজ্যের জন্যে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ বাড়েনি। সেই ৪৫ কোটি টাকার কাছাকাছিই আটকে আছে। রাজ্য সরকার বারবার বলছেন, কেন্দ্রীয় সাহায্য বাড়াতেই হবে, কারণ তা না হলে রাজ্য সরকারকে নিজস্ব সূত্রে বাড়তি টাকা যোগাড় করতে হবে, কিন্তু সে সুযোগ কম। আগামী আর্থিক বছরের যোজনার মোট ব্যয়বরাদ্দ ঠিক হলেও কোন খাতে কতো খরচ করা হবে তা এখনও পাকা হয় নি। তবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, চাষবাস, সেচ আর বিদ্যুতের ওপর বেশি জোর দেওয়ার জন্যে যোজনা কমিশন পরামর্শ দিয়েছেন।

নির্বাচনী জল্পনা

লোকসভা, এমন কি রাজ্য বিধানসভার আচমকা নির্বাচনের সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা এখনও জোরদার। পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসী মহলের খবর দিয়ে কেউ জানাচ্ছেন, এই নির্বাচন আগামী মার্চের শেষের দিকে হতে পারে। আবার এ-খবরও প্রকাশিত হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলকে বলেছেন, এপ্রিলের ২৭ অথবা মে'র ৪ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যে কংগ্রেস হাইকমান্ড তৈরি। এইসব খবরের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট কথা শোনা গেল কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিশনার টি স্বামীনাথনের মুখে। তিনি জানালেন যে, মে মাসের গোড়ার আগে নির্বাচন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কলকাতায় তিনি আরো জানিয়ে গেলেন যে, নির্বাচন কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ শেষ না হলে নির্বাচন হতে পারবে না আর ঐ কাজ শেষ হবে এপ্রিলের মাঝামাঝি। সারা দেশে ভোটার-তালিকা সংশোধনের কাজ শেষ হতেও ফেব্রুয়ারী পার হয়ে যাবে।

এদিকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার সুশীল বর্মা জানিয়েছেন যে, পশ্চিমবাংলায় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ পুরোদমে চলছে। ইতিপূর্বে, অর্থাৎ ১৯৭৩ সালে যে সংশোধিত ভোটার তালিকা তৈরি হয়েছে তা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই তালিকা সম্বন্ধে কারো কোনো দাবি বা আপত্তি থাকলে তা শোনা হবে। তা ছাড়া বাড়ি-বাড়ি গিয়ে খোঁজ-খবর করে তালিকা সংশোধনের কাজও চলছে, শেষ হবে জানুয়ারীর মধ্যে।

নির্বাচন কেন্দ্রের সীমানা পুনর্নির্ধারণের জন্যে কেন্দ্রীয় কমিশন এই রাজ্যে এসে পৌঁছবেন জানুয়ারীর শেষে। পশ্চিম-বাংলায় কমিশনের সদস্যেরা দিন সাতেক থাকবেন। সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ যে তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার, এ-কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মৈত্র প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মসমিতির সভায়। এ-বিষয়ে দলীয় সুপারিশ প্রস্তুত পাকা করে ফেলার জন্যে প্রদেশ কংগ্রেস উদ্যোগী হয়েছে। এর জন্যে একটি কমিটিও তৈরি হয়েছে। তাতে আছেন অরুণবাবু, কংগ্রেসের তিন সাধারণ সম্পাদক এবং অর্থমন্ত্রী শংকর ঘোষ।

পথ দুর্ঘটনা

কলকাতার রাস্তাঘাটে যেভাবে দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে তাতে রাজ্য সরকার বেশ ভাবিত হয়ে পড়েছেন। নানা ধরনের যানই এই সব দুর্ঘটনায় জড়িত, তবে ইদানিং মিনি বাস হয়ে দাঁড়িয়েছে কলকাতার পথচারীদের ত্রাস। সরকারেরই দেওয়া হিসেবে জানা যায়, গত ছ' মাসে মিনি বাস চাপা পড়ে পাঁচজন নিহত ও ৪৪ জন গুরুতর জখম হন আর ২৮২ জন সামান্য চোট পান। গত এক বছরের এক হিসেব নিলে দেখা যায়, মিনি বাসের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে ৩৯৪৫টি। তার মধ্যে ৪৮৪টি মামলায় সাজা দেওয়া হয়েছে।

পথ দুর্ঘটনা নিবারণ, বিশেষ করে বিভিন্ন শ্রেণীর যানের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে কী করা যায় তা বিবেচনার জন্যে রাজ্য সরকার পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের এক বৈঠক ডেকেছিলেন। ঐ বৈঠকে এই সমস্যা মোকাবিলার জন্যে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়। ট্রাফিক সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তিতে সাধারণত দেরি হয়। তাই আপাতত তিন মাসের জন্যে সপ্তাহে অন্তত একদিন ভ্রাম্যমাণ আদালত গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। মিনি বাসের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রতিটি গাড়ির সঙ্গে স্পীড গভর্নর বা গতিনিয়ামক যন্ত্র বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাবও সরকার ভেবে দেখছেন। তবে মিনি বাস তৈরি করে এমন এক প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে যে, এই ধরনের যন্ত্র বেঁধে দেওয়ার নাকি অসুবিধে আছে। পুলিশ মহল কিন্তু এই ওজরের ওপর তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এদিকে, পুলিশ জুলুম চালাচ্ছে, এই অভিযোগে শ'খানেক মিনি বাসের চালক রাইটার্স বিল্ডিংসের সামনে একদিন অবরোধের সৃষ্টি করেন।

ট্রেন দুর্ঘটনা

ট্রেন দুর্ঘটনা নিশ্চয়ই বিরল ব্যাপার নয়, কিন্তু শিয়ালদহের কাছে যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল তার ধরণ একটু বিচিত্র। শিয়ালদহ ডিভিসনের দমদম আর উল্টোডাঙা স্টেশনের মাঝখানে চিৎপুর কেবিনের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আপ শান্তিপুর লোক্যাল জানুয়ারীর ৭ তারিখে সন্ধ্যায় যখন ঐ জায়গায় এসে পেঁছয় তখন ঐ ট্রেনের শেষের দিকের কামরা থেকে হঠাৎ 'আগুন, আগুন' চীৎকার ওঠে। ঐ কামরার যাত্রীদের মধ্যে দারুণ আতংক দেখা দেয়। কেউ ট্রেন থামবার আবেদন জানিয়ে চীৎকার করতে থাকেন. আবার কেউ কেউ চলন্ত ট্রেন থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকেন। এমন সময় উল্টো দিক থেকে আসছিল ডাউন ডানকুনি লোক্যাল। রেল লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন ঐ ডাউন ট্রেনের চাকার তলায় কাটা পড়েন। নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়। পরে জানা যায় ঐ নিহতদের মধ্যে সকলেই বাংলা[illegible]শের লোক। তাঁরা এসেছিলেন এদেশে তাঁদের আত্মীয়-পরিজনের ব[illegible]।

ঐ দুর্ঘটনার দিন সময়মতো ট্রেন না-থামানোর অভিযোগে আপ ট্রেনের গার্ডকে মারধোর করা হয়। তিনি রীতিমতো জখম হন। পরে অনুসন্ধানে জানা যায়, আপ ট্রেনের ঐ কামরাটিতে আদৌ কোনো আগুন লাগে নি। সন্দেহ করা হচ্ছে, ছিনতাইকারীরা নিজেদের সুবিধে করে নেওয়ার জন্যে আগুন ধরেছে বলে রটিয়ে দেয়।

পৌরসভায় ভূত

কলকাতা পৌরসভা থেকে 'ভূত' তাড়াবার উদ্যোগ শুরু হচ্ছে। 'ভূত' মানে ভুতুড়ে কর্মচারী। এঁরা আছেন শুধু বেতনের খাতায় নামে। এঁদের নামে সেই বেতন কেউ না কেউ সই করে মাসের পর মাস তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে পৌরসভার বছরে কতো টাকা গলে যাচ্ছে তার সঠিক কোনো হিসেব নেই। কারণ ভুতুড়ে কর্মচারী যে ঠিক কতো তা পৌরকর্তারাও জানেন না। একটি সংবাদে প্রকাশ, শুধু আবর্জনা সাফাই বিভাগেই নাকি এই ধরনের ভুয়া কর্মীর সংখ্যা দেড় হাজার। অন্যান্য বিভাগেও রয়েছে এই ধরনের ভুয়া কর্মী।

কোন বিভাগে এই ধরনের ভুয়া কর্মী আছে সে সম্পর্কে খোঁজখবর করার জন্যে পৌর প্রশাসক শিবপ্রসাদ সমাদ্দার পৌর কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ পাওয়ার পর পৌর কমিশনার আবার বিভাগীয় প্রধানদের কাছে [illegible] পাঠিয়েছেন। তাছাড়া পৌর সংস্থার [illegible] এ-বিষয়ে আলোচনা করা হবে। ভুয়া কর্মী ছাড়াও পৌরসংস্থায় রয়েছেন বহু উদ্বৃত্ত কর্মী অর্থাৎ যাঁরা [illegible] থাকেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের কোনো কাজ নেই। আবর্জনা সাফাই বিভাগেই এই ধরনের কর্মীর সংখ্যা [illegible] ময়লা ফেলা গাড়ির অধিকাংশই বিকল বলে [illegible] নিচ্ছেন। তাঁদের নিয়ে কী করা যায়, সে-বিষয়েও আলোচনা হবে।

১৩।১।৭৫ —দেবদত্ত

খাদ্যের অবস্থা খুবই ভাল
— জগজীবন রাম

দেশে বিদেশে

মিশ্রের মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক

ললিতনারায়ণ মিশ্র তাঁর জীবৎকালে যদি রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে এসে থাকেন তাহলে তাঁর মৃত্যুও কম বিতর্কের বিষয় হবে বলে মনে হচ্ছে না। ২ জানুয়ারী তারিখে সমস্তিপুরে একটি অনুষ্ঠানে যে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ললিতনারায়ণ সহ চারজন মারা গেছেন সে সম্পর্কে যখন একদিকে কেন্দ্রের সি-বি-আই অনুসন্ধান চালাচ্ছেন এবং ললিতনারায়ণের চিকিৎসার কোন বিভ্রাট হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য যখন বিশেষজ্ঞদের আর একটি কমিটি গঠিত হয়েছে তখন ঐ শোচনীয় মৃত্যু সম্পর্কে রাজনৈতিক বিতর্ক কিন্তু সমানেই চলেছে—এইসব অনুসন্ধানের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করেই।

মিশ্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করার জন্য দিল্লীতে যে সভা আহ্বান করা হয়েছিল সেখানে একটি অত্যন্ত জোরালো বক্তৃতা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন ললিতনারায়ণের হত্যা একটি সুপরিকল্পিত ঘটনা এবং এটা বিহারে জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনেরই ফল। ললিতনারায়ণ আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন না এই মর্মে জয়প্রকাশ যে মন্তব্য করেছেন তার উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী ব্যাগতভাবে বলেন : 'তাঁর নিশানা সঠিক কে তা আমি ভালভাবেই জানি।' ললিতনারায়ণকে হত্যা করার চক্রান্তের সঙ্গে তাঁকে জড়িত করার যে চেষ্টা হচ্ছে তার সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন : 'এই ঘটনা থেকে যাঁরা রাজনৈতিক সুবিধা সংগ্রহ করতে চান তাঁরা তাহা মিথ্যা রটনা করছেন এবং এমন কি কংগ্রেসের লোকরাও সেই মিথ্যার দ্বারা বিভ্রান্ত হচ্ছেন। ওরা আমাকে মেরেও বলবে আমি সেই হত্যার পরিকল্পনা করেছি।'

শ্রীমতী গান্ধী বলেন : ললিতনারায়ণ যে শহীদের মৃত্যুবরণ করলেন তাতে এখন দেখা গিয়েছে জয়প্রকাশের আন্দোলন থেকে উদ্ভূত ঘৃণা ও হিংসার আবহাওয়া আমাদের দেশকে বাঁচাতে পারবে কিনা। তিনি বলেন ঘৃণা ও বিদ্বেষ একটা হিংসার কালকে ডেকে আনবে অথবা আমরা জাতি গঠনের অধিকতর জরুরী কাজে আত্মনিয়োগ করব—এই দুটি পথের একটিকে আমাদের বেছে নিতে হবে।'

শ্রীমতী গান্ধীর এই মন্তব্যের তীক্ষ্ণ উত্তর দিতে দেরি করেন নি সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ। তাঁর আন্দোলন বিহারে ঘৃণা ও হিংসার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে এই অভিযোগ অস্বীকার করে জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেছেন বিহারের গত নয় মাসের আন্দোলনে সরকার প্রচন্ড নির্যাতন চালানো সত্ত্বেও বহু লোক আহত এবং হাজার হাজার নারী পুরুষ ও শিশু কারারুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মাত্র একজন পুলিশ কনস্টেবল মারা গেছেন এবং ঐ ঘটনার জন্যও তিনি নিজে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। জয়প্রকাশ দাবী করেন যে বিহারে তাঁর আন্দোলন যেমন শান্তিপূর্ণ ও সুশৃংখলভাবে পরিচালিত হয়েছে তার নজির আমাদের দেশে এই ধরনের গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে এমন কি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও পাওয়া যাবে না। তাঁর এই দাবীর সত্যতা যাচাই করে দেখার জন্য তিনি একদল নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষককে বিহার সফর করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

সর্বোদয় নেতা অভিযোগ করেছেন : 'মনে হচ্ছে (শ্রীমতী গান্ধী) যেন সি পি আই-এর সাহায্য নিয়ে দেশের মধ্যে একটা বিকারের ঘোর তৈরি করার চেষ্টা করছেন। এর একটাই উদ্দেশ্য হতে পারে বলে মনে হয়। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাপক নির্যাতনের একটা সাফাই তৈরি করে তাঁর নিজের একনায়কতন্ত্রী শাসন সারা দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া।'

ইতিমধ্যে ললিতনারায়ণের মৃত্যু সম্পর্কেও আর একটি বিতর্কও তোলা হয়েছে। ঐ বিতর্কের বিষয়টি হচ্ছে বোমা বিস্ফোরণে আহত ললিতনারায়ণ ও অন্যান্যদের চিকিৎসার ব্যাপারে কোন ভুল বা গাফিলতি হয়েছে কিনা। দানাপুর হাসপাতালে যে সব সার্জন ললিতনারায়ণের দেহে অস্ত্রোপচার করেছিলেন তাঁদের একজন ডাঃ ইউ এন শাহী বলেছেন যে সব সার্জন দ্বারভাঙা থেকে সমস্তিপুরে গিয়েছিলেন তাঁদের যদি ললিতনারায়ণকে পরীক্ষা করতে দেওয়া হত তাহলে তাঁকে হয়ত বাঁচান যেত। ডাঃ শাহী বলেন এই সার্জনদের কেন যে ললিতনারায়ণকে পরীক্ষা করতে দেওয়া হয় নি এবং কোন্ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মত যে তাঁকে পাটনায় নিয়ে আসা হচ্ছিল সেটা ঈশ্বর জানেন। ডাঃ শাহী এবং অধ্যাপক আর ভি পি সিংহ এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে বলেছেন। [illegible] দাবি করেছেন সমস্তিপুরের বি[illegible] ঘটনার পিছনে কোন ষড়যন্ত্র ছিল [illegible] এবং ঐ ঘটনার পর রাজ্য প্রশা[illegible] তরফে কোন গাফিলতি হয়েছিল কি[illegible] সে বিষয়ে যেন অনুসন্ধান করা হয়।

বিহার সরকার যদিও ললিতনারায়ণের চিকিৎসার ব্যাপারে গাফিলতি বা দেরির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তা হলেও কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য পাঁচজন সদস্যের একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। ঐ কমিটির প্রধান হবেন সশস্ত্র বাহিনীর মেডিক্যাল সার্ভিসেসের ডিরেক্টর জেনারেল এয়ার মার্শাল অজিত নাথ।

ললিতনারায়ণের এই আকস্মিক মৃত্যু বিহারে কংগ্রেসের ঘরোয়া রাজনীতিতে যে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে সেটা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাচ্ছে। ললিতনারায়ণের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে রাজ্য সরকার যে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে বিহার বিধানসভার কিছু কংগ্রেস সদস্য মুখ্যমন্ত্রী আবদুল গফুরকে নেতৃত্ব থেকে অপসারণের ও মন্ত্রিসভার রদবদলের দাবিতে মুখর হয়ে উঠেছেন। যাঁরা এই দাবি করেছেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন কংগ্রেস এম এল এ ও সমস্তিপুরের বিস্ফোরণে আহতদের অন্যতম উমেশপ্রসাদ সিং। ঘটনাটির মর্মান্তিক [illegible] ব্যক্ত করে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী গফুর সেদিন সমস্তিপুরের ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না কেন।

* * *

আনন্দ-সংবাদ

মাদ্রাজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারত ১০০ রানে জয়ী হয়ে বর্তমানে খেলার ফলাফল সমান (২—২) করেছে।

(বিস্তৃত খবর আগামী সংখ্যায়)

শেখ-ইন্দিরা আলোচনা

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও কাশ্মীর নেতা শেখ আবদুল্লা নিজের নিজের প্রতিনিধি মারফৎ এতদিন ধরে যে আলোচনা চালাচ্ছিলেন তার সূত্র ধরে তাঁরা একটি বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ঠিক কি আলোচনা হয়েছে তা কোন পক্ষ থেকেই প্রকাশ করা হয় নি। তবে আলোচনা যে ধারায় অগ্রসর হচ্ছিল তা থেকে অনুমান করা যায় যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য হিসাবে কাশ্মীরকে কতখানি স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়া হবে সেটাই ছিল দুই নেতার মধ্যে আলোচনার মুখ্য বিষয়। শেখ আবদুল্লা আওয়াজ তুলেছিলেন যে কাশ্মীরকে ১৯৫৩ সালের আগের অবস্থায় অর্থাৎ তিনি কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত হওয়ার

আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই দাবি স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ হবে দেশময় বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রা ব্যবস্থার মত নিতান্ত অপরিহার্য কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি ছাড়া অন্য সব বিষয়ে কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার মেনে নেওয়া। এই দাবি মেনে নেওয়ার অর্থ হবে শেখ আবদুল্লার গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসেরও গতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এটা মেনে নেওয়া। কাশ্মীরের জন্য এই বিশেষ অধিকার মেনে নিলে অন্যান্য রাজ্যে তার কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে সেটাও কেন্দ্রীয় সরকারকে বিবেচনা করতে হবে।

শেখ আবদুল্লার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর শ্রীমতী গান্ধীর এই আলোচনার পর এখন বোঝা যাবে কাশ্মীরে শেখকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনে কাশ্মীর সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানে তাঁর সহযোগিতা পাওয়ার জন্য ভারত সরকার তাঁর দাবি মেনে নেবেন কিনা অথবা ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য শেখ আবদুল্লা বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিক হিসাবে তাঁর দাবিটা এবার একটু খাটো করে নেবেন কিনা।

* * *

ইন্দোচীনে নতুন লড়াই

দক্ষিণ ভিয়েতনামে মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে থিউয়ের সৈন্যবাহিনীর নতুন যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় দুই বছরের পুরোনো যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে। এই যুদ্ধবিরতি চুক্তি অবশ্য কোনদিনই খুব কার্যকর হয় নি। দুই পক্ষই ইদানীং পরস্পরের বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ আনছিলেন। চুক্তির সর্ত মেনে চলা হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখার জন্য যে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল গঠন করা হয়েছিল তাঁরাও উভয় পক্ষের অসহযোগিতার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন রকম কাজই করতে পারছিলেন না।

এই না-শান্তি - না-যুদ্ধের অবস্থার মধ্যেই মুক্তিবাহিনী একটি প্রচণ্ড অভিযান চালিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের তেরোটি প্রদেশের মধ্যে বৃহত্তম প্রদেশ ফুওক লং দখল করে নিয়েছেন এবং তার ফলে সে দেশে একটা নতুন সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। এই অভিযান আরম্ভ করার আগে উত্তর ভিয়েতনামের প্রধান সেনাপতি জেনারেল গিয়াপ হ্যানয় রেডিও থেকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েতনামে এখনও যেভাবে হস্তক্ষেপ করছে সেটা যুদ্ধবিরতি চুক্তির বিরোধী এবং আমেরিকা যদি এটা বন্ধ না করে তাহলে তার ফলভোগ করতে হবে। তিনি তাঁর কথা রেখেছেন। সফল সামরিক অভিযান চালিয়ে মুক্তিবাহিনী এখন সায়গনের ৩৫ কিলোমিটারের মধ্যে এসে পড়েছে।

আমেরিকা এই পরিস্থিতিতে কিছুটা ফ্যাসাদে পড়েছে। তার আশ্রিত সায়গন সরকারকে এই বিপদের সময় সাহায্য করা তার পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে। একে তো ঘরের ভিতর থিউ সরকারের মনোবল খুবই ক্ষীণ। ছাত্র বুদ্ধিজীবী ধর্মীয় নেতা প্রভৃতি তাঁর সরকারের অযোগ্যতা দুর্নীতি ও নির্যাতনের জন্য অত্যন্ত ক্ষুব্ধ সামরিক বাহিনীর নেতাদের মধ্যে ঐক্য নেই। ফুওক লং এর সামরিক বিপর্যয়ে প্রেসিডেন্ট থিউয়ের রাজনৈতিক অবস্থা আরও সংগীন হয়ে উঠেছে। এই সময় আমেরিকা তাঁকে সাহায্য দিয়ে কতখানি চাঙা করে তুলতে পারবেন বলা কঠিন। তাছাড়া ইন্দোচীনে সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারে মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাত শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে আমেরিকার সপ্তম নৌবহরের বিমানবাহী জাহাজ 'এন্টারপ্রাইজ' সমেত গোটা দশেক যুদ্ধ জাহাজের একটি টাস্ক ফোর্সের গতিবিধি সারা পৃথিবীতে নতুন জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করছে। এই টাস্ক ফোর্সের লক্ষ্য দক্ষিণ ভিয়েতনাম অথবা পশ্চিম এশিয়া সেটা অবশ্য এখনও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।

—পুণ্ডরীক

আগামী সংখ্যায় গল্প লিখবেন

আশাপূর্ণা দেবী

ফাদার দ্যতিয়েন

রোজনামচা

আমার দিদিমা গল্প করতেন, বিশ্বযুদ্ধপূর্ব যুগে (আমার দিদিমার যাবতীয় গল্পই বিশ্বযুদ্ধপূর্ব যুগের) একজন ইংরেজ, ফ্রান্সে বেড়াতে গিয়ে দেখেন, শুল্ক-দপ্তরে যে-মেয়েটি বসে ছাপ মারছে, তার চুল নাকি ঘন লাল; সঙ্গে সঙ্গেই বৌয়ের কাছে পোস্টকার্ড পাঠিয়ে ভদ্রলোক জানান : 'ফ্রান্সের নারীমাত্রই লোহিতকেশা!'

দিদিমার গল্পের ঐ নায়কটি ক্ষণিকের পর্যটক সাংবাদিকের প্রতীক, সাধারণীকরণের অভ্যাস যার মজ্জাগত। দিদিমা বলতেন, 'এক দেশে দশ দিন থাক একটা বই লিখবে; এক দেশে দশ মাস থাক একটা বিশ্বকোষ লিখবে, এক দেশে দশ বছর থাক, আর কিছুই তোমার লিখতে কলম সরবে না!...' দিদিমার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আমি ভুলিনি, সাংবাদিক-সুলভ প্রলোভনের ফাঁদে ঠ্যাং দিতে চাই না তারস্বরে ঘোষণা করতে চাই : বাংলাদেশে মাত্র উনিশটি দিন কাটিয়ে আমি যা লিখতে বসেছি, তার প্রতিটি বাক্যে সুধী পাঠক যেন হয়তো, বোধ হয়, কিছুটা, কতকটা প্রভৃতি সতর্কতামূলক অব্যয় মনে মনে যোগ করে নেন।

এবার তাহলে শুনুন : এ-দেশের ছেলেমেয়েদের গিরিশ, গিরীশ, অলকা, অলোকা প্রভৃতি যত কঠিন কঠিন নামই থাকুক না কেন ওরা সবাই নিজ নিজ নামের অর্থ বোঝে। ও-দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা কিন্তু আপন নামের অর্থ বোঝেও না, বোঝার কৌতূহলও বোধ করে না। আর 'আম্মা জানেন' বলে প্রশ্নকর্তাদের ঠেকানোর উপায় ওদের নেই—আম্মা নিজেও তা জানেন না!...আম্মা এটুকুই জানেন যে কথাটা সুন্দর কথাটা মিষ্টি, কথাটা নাকি ধর্মসংক্রান্ত রচনায় পাওয়া যায় (!) বলেই তিনি বড় মেয়ের নাম রেখেছেন আফ্রোজ — সুলতানা আফ্রোজ। আর বারো চন্দ্রমাস যেতে না যেতেই ১৩৭৩ হিজরী সনের মহরম মাসে খোদা-তালা যখন আরেকটি শিশুকে বেহেস্ত থেকে পাঠিয়ে সালেহা বেগমের সংসারকে আলো-কিত করলেন, আফ্রোজের আব্বা তখন —আকিকা অনুষ্ঠানে—একটা খাসি নিজের হাতে জবাই করে গরীব-গুরবাদের খাইয়ে, সাত দিনের বাচ্চাটির মাথা মুড়িয়ে (ওর চুলের সমান ওজন-পরিমাণ কাঁচা রূপো চাঁদ খয়রাত করে) ওর নাম রাখলেন : সুলতানা মাহফ্রোজ। সুশীল-সুনীল বিভা-নিভা প্রভৃতি জোড়া হয় যখন, আফ্রোজ-মাহফ্রোজ হবে না কেন?... ওগুলো অবশ্য স্কুলের নাম; মাহ্‌ফ্রোজের বাড়ির নাম কাঁচ, ওর বুবুকে সবাই ডাকে পুষ্প বলে।

এ-দেশের ও-দেশের সংস্কৃতিগত পার্থক্য যতই থাকুক না কেন মিল আছে ডাকনামের। এমন কি স্বাধীনতাসংগ্রামের পর থেকে ও-দেশের ডাকনাম বাড়ির ত্রিসীমানা পেরিয়ে সামাজিক আমদরবারে প্রকৃত মর্যাদা লাভ করেছে। খামের ঠিকানা এইভাবে লিখবেন—মোস্তফা গোলাম ফারুক বাচ্চু...বিলকিস আরা জাহান বেবী...। ষোড়শী বেবী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ('সম্মান' অর্থাৎ 'সম্মানাস্পদ শ্রেণী') ছাত্র বাচ্চুর নববিবাহিত আহ্লাদিয়া। বাপের বাড়িতে দিন গোনে। রোজ চিঠি দেয়, রোজ চিঠি পায়। আর হ্যাঁ, চিঠি দেওয়ার আরেক কায়দা আছে : কেয়ার অফ টেয়ার-অফ লিখে বিদেশিয়ানা ফলাবেন না যেন! লিখবেন প্রযত্নে! না, 'সাইদুর রহমানের প্রযত্নে' না, 'প্রযত্নে সাইদুর রহমান!' আর পত্রপ্রাপকের নামের আগে লিখবেন : প্রতি ('অমুকের প্রতি' না 'প্রতি অমুক')। স্বদেশিয়ানার পরিচয় বটে!

আমার খুদে বন্ধু শৈলেন ক্লাস ফোরে পড়ে; আমার গরবীখানায় ইংরেজি শিখতে আসে। রোজ আসে না, সেই দিনই আসে, ওর পাড়ায় যেদিন খেলার সংগী জোটে না, কিংবা শ্রীমানের রিপোর্ট পর্যবেক্ষণান্তে শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র দাস যেদিন তাঁর আত্মজকে মা-শীতলার বাহনের সঙ্গে তুলনা করে পৈত্রিক ভদ্রাসনের চৌহদ্দিকে নিরলঙ্কৃত করতে যুক্তকরে অনুরোধ জানান। হোম-ওয়ার্ক হিসেবে শৈলেনকে আমি বলি রাস্তার দুধারের দোকানের ইংরেজি নাম টুকে নিতে। বাংলাদেশের শৈলেনরা কিন্তু ঐ ধরনের কসরতে বঞ্চিত; বাংলাদেশের যাবতীয় দোকানের নাম-ঠিকানা বিশুদ্ধ বাংলা হরফে লেখা। রাস্তাগুলির উর্দু নাম পর্যন্ত স্বদেশপ্রেমের ফলে আলকাতরার প্রলেপের অন্তরালে আত্মগোপন করেছে।

ইংরেজির সর্বনাশ হল, বাংলাভাষার পৌষ মাসকে ত্বরান্বিত করে : পাকিস্তানি আমলে কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ডের প্রকাশনে তৎসম-সর্বস্ব পরিভাষা-কোষ (ভূবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব...) মুদ্রিত হয়েছে। প্রভোস্টকে আজ ওরা বলে প্রাধ্যক্ষ, গেজেটকে বলে ঘোষপত্র, folklore কে বলে লোকলোর...হাসপাতালে যেতে কিংবা 'হাতির চোখ' artichoke খেতে যারা দ্বিধাবোধ করে না, 'লোকলোর' বলতে তাদের বাধাটা কোথায়?

হ্যাঁ, যাবতীয় নাম বাংলা করা হয়েছে বটে এমন কি ব্যাংকের নামও পর্যন্ত : উত্তরা, জনতা, পুবালী সোনালী রূপোলী অগ্রণী...একমাত্র যেন ব্যতিক্রম : চেয়ারম্যান আর ভাইস-চেয়ারম্যান! পঞ্চায়েতের নির্বাচন আসন্ন; রংবেরংয়ের বিজ্ঞাপনে জন-সাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে, কাঁচি মার্কায় ঘড়ি মার্কায়, কলসি মার্কায় ছাপ দিয়ে তারা যেন প্রার্থী গোলামকে 'দেশ ও দশের খিদমত' করার সুযোগ দেয়।

অনুমোদিত প্রতীক আছে বত্রিশটি (না, আওয়ামী লীগের নৌকা কিংবা অন্য কোনো পার্টির প্রতীক ব্যবহারযোগ্য নয়): আছে হাতি গাভী বাঘ, আছে লাঙ্গল কোদাল মই, আছে হুঁকো তালা ছাতা, আছে আম ও আনারস সাইকেল ও উড়োজাহাজ আর সাহেবী টুপি। বলা বাহুল্য [illegible]তের আবাদের চামাভুষোর পর্দানশীন পল্লী-সমাজ ঐ ধরনের উৎকট শিরস্ত্রাণ দেখেনি কোনো জন্মে তবে রাজধানীর প্রতিটি চৌ-রাস্তায় তার হদিস মেলে : বিলাতী তন্ত্রের বিগত দিনগুলির স্মৃতিস্বরূপ কনেস্টবলী মুণ্ডভূষণ।

ওর মধ্যে আমারও এক ভোটপ্রার্থী সুহৃদ রয়েছেন; নেলসন ডি ক্রুজ তাঁর নাম, মাটিভাঙ্গার তিনি মাতব্বর। মানচিত্রে খুঁজবেন না! জায়গাটা বাকেরগঞ্জ জেলায় পাদ্রীশিবপুরের এক উপপল্লী—সতেরো ঘর গেরস্তের বাস: প্রতিটি ঘরই মৃন্ময়; নেল-সনের ঘরটি আবার দোতলা। ভদ্রলোকের নির্বাচনী চিহ্ন কিন্তু বাসগাড়ি। ভদ্রভাবে জিগ্যেস করলাম, ওনার সহধর্মিণীর চৌদ্দ-পুরুষের দৃষ্টিপথে ঐ কলিযুগের বাহনটি কোনো দিন পড়েছে কি না? ভদ্রভাবে তিনি উত্তর দিলেন : না! 'বাস' তিনিও চাননি, চেয়েছিলেন মাছ কিম্বা ঢোল কিম্বা মোম-বাতি...তবে কিনা অসুবিধে অল্পই : অঞ্চলের মৌলানা বলেছেন, বিবিরা ভোট দেবে না!

দিয়েছে কি না, জানি না; তবে খৃস্টান মাতব্বর নেলসন নির্বাচিত হয়েছেন পঞ্চা-য়েতের সদস্যপদে : স্বাধীন বাংলা সত্যই ধর্মনিরপেক্ষ দেশ।

গোয়েন্দা ধাঁধা

পদ্মরাগ হংস

শার্লক হোম্‌স্‌

স্যার আর্থার কোনান ডয়াল

তুচ্ছ একটা টুপী। ময়লা, তেলচিটে, ফুটো, রবার-ইলাস্টিক ছেঁড়া এবং আকারে বেশ বড়ই—শার্লক হোমসের মাথাও গলে যায়। শুধু এই টুপী দেখে কি বলা যায় টুপীর অধিকারীর চেহারা কি রকম, বয়স কত, বউয়ের সঙ্গে বনিবনা আছে কিনা, আগে ট্যাঁক গরম থাকত, এখন ফতুর, ঘরে বসে কাজ করতে অভ্যস্ত এবং চরিত্রে আর সে-দৃঢ়তা নেই?

আর কেউ না পারলেও শার্লক হোমস পারে। বেকার স্ট্রীটের আইবুড়ো-ফ্ল্যাটে বসে সেই জ্ঞানই দিচ্ছিল ওয়াটসনকে। লোকটা লেবুতেল মাখে, কেন? না, তেলের দাগে লেবুর গন্ধ। লোকটা মাথার কাজ করে বেশী, কেন? না, যার টুপী এত বড় তার মগজও নিশ্চয় বেশ বড়। লোকটা ঘরে বসে কাজ করতে অভ্যস্ত, কেন? না, টুপীর গায়ে নরম আঁশের মত বাদামী ধুলো লেগে—যা রাস্তার ধুলোর মত ধূসর আর বালিভরা নয়। লোকটার হাতে তিন বছর আগে টাকা ছিল—এখন নেই; কেন? না, এই ফ্যাসানের টুপী তিন বছর আগেই বাজারে পাওয়া যেত। দামী টুপী। কিন্তু টুপীটা ফুটো হয়ে যাওয়ার পরেও আর একটা কেনবার পয়সা জোটেনি। শুধু তাই নয়, টুপীর গায়ে এত ধুলো লেগে কেন? ঘরে বউ থাকলে এবং সে-বউ পতিঅন্ত প্রাণ হলে এত ধুলো তো জমবার কথা নয়?

ফস করে ওয়াটসন বলে উঠল—'ঘরে বউ না থাকলে?'

'কিন্তু এ-লোকটা ব্যাচেলর নয়। সেই জন্যেই তো রাজহাঁসের পায়ে লেবেল লাগিয়ে দিতে যাচ্ছিল বউকে। লেবেলে লেখা ছিল—মিসেস হেনরী বেকারকে দিলাম।' টুপীর মধ্যেও লেখা রয়েছে দ্যাখো 'এইচ, বি'। অর্থাৎ বউয়ের মন জোগাতে যাচ্ছিল হেনরী বেকার। বউকে যে খোশামোদ করে প্রৌঢ় বয়েসে, তার চরিত্রে দৃঢ়তা থাকবে কোথায়? লোকটা বয়েসে প্রৌঢ় কি করে ধরলাম বুঝেছো তো? স্রেফ পাকা চুলের চেহারা দেখে। আরো শুনতে চাও?'

ওয়াটসন বললে—'একটু খুলে বলো। গুলিয়ে যাচ্ছে।'

হোমস্‌ বললে—'পিটারসনকে চেনো তো? ফুর্তি পেলে আর কিছু চায় না। বড়দিন উপলক্ষে ফূর্তি করে ও বাড়ী ফিরছিল। গুজ স্ট্রীটের মোড়ে দেখলে একদল গুণ্ডা একজনকে আক্রমণ করেছে। লোকটার ঘাড়ে একটা রাজহাঁস। গুণ্ডাদের মারবার জন্যে লাঠি তুলতেই লাঠির ঘায়ে একটা দোকানের কাচ ভেঙ্গে ফেলল লোকটা। ঠিক সেই সময়ে পিটারসনকে ইউনিফর্ম পরে দৌড়ে আসতে দেখে টুপী আর রাজহাঁস ফেলেই দৌড়োলো চো-চাঁ করে। গুণ্ডারাও মিলিয়ে গেল গলির মধ্যে।

'পিটারসন টুপীটা দিয়ে গেল আমাকে। রাজহাঁসের মালিককে না পেয়ে নিয়ে গেল কেটেকুটে ঝোল রাঁধতে।'

ঠিক এমনি সময়ে হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এল পিটারসন। চোখ বড় বড় করে বললে—'মিঃ হোমস! মিঃ হোমস! এটা কী! এটা কী?'

পিটারসনের হাতের তেলোয় একটা নীলবর্ণ পদ্মরাগমণি। আকারে মটরদানার মত। কিন্তু আশ্চর্য দ্যুতিময়।

'কোত্থেকে পেলে?' খাড়া হয়ে বসে বলল হোমস্‌।

'হাঁসের পেট থেকে!'

'সর্বনাশ! এ তো চোরাই হীরে হে। কসমোপলিটান হোটেলে কাউণ্টেসের গয়নার বাকস ভেঙ্গে চুরি গেছে এই সেদিন। মনে পড়েছে?'

'খুব মনে পড়েছে! চাঞ্চল্যকর সেই চুরির ঘটনা কি ভোলবার! হোটেলের ওপর-তলার পরিচালক জেমস রাইডার চিমনী-মিস্ত্রী ডেকে এনেছিল কাউন্টেসের ঘরে। চুল্লীর একটা শিক নাকি এঁটে বসাতে হবে। ঘুরে এসে সে দেখলে, শিকটা টাইট করা হয়েছে বটে, কিন্তু মিস্ত্রী উধাও সেই সঙ্গে গয়নার বাকস থেকে পদ্মরাগও উধাও!

মিস্ত্রী এখন হাজতে। পদ্মরাগ শার্লক হোমসের ঘরে। কিন্তু কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! এ-হীরে রাজহাঁসের পেটে গেল কি করে? রাজহাঁস কি হীরে খায়?

টনক নড়ল শার্লক হোমসের। তখুনি কাগজ পেন্সিল নিয়ে লিখে ফেলল একটা বিজ্ঞাপন। হেনরী বেকার যেন অবিলম্বে তাঁর টুপী আর রাজহাঁস ফিরিয়ে নিয়ে যান।

যথাসময়ে আবির্ভূত হলেন হেনরী বেকার। হাঁসটাকে কেটে-কুটে খেয়ে ফেলা হয়েছে শুনে মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু তার বদলে আর একটা হাঁস পেয়ে আহ্লাদে গদগদ হয়ে বলে গেলেন হাঁসটাকে তিনি কিনে ছিলেন কোত্থেকে।

ঠিকানা মত জায়গায় হাজির হল হোমস্‌। সঙ্গে ওয়াটসন। সেখান থেকে ঠিকানা নিয়ে গেল আর একটা জায়গায়। সেইখানেই দেখা হয়ে গেল একটা বেঁটে-খাট ইঁদুরমুখো লোকের সঙ্গে। সে এসেছে সেই হাঁসটি ফিরে পেতে।

শার্লক হোমস্‌ অমায়িক হাসি হেসে লোকটাকে ডেকে নিয়ে এল এক পাশে।

বলল—কি নাম আপনার?

'জন রবিনসন।'

'ছিঃ ছিঃ, মিথ্যে নাম নয়—সত্যি নামটা বলুন।'

মুখ লাল হয়ে গেল ইঁদুরমুখো লোকটার। বললে—'জেমস্‌ রাইডার।'

'ঠিক, ঠিক। কসমোপলিটান হোটেলের পরিচালক। আসুন, আমার ঘরে আসুন। আমার নাম শার্লক হোমস্‌। অন্যেরা যা জানে না, আমি তা জানি।'

একান্ত বন্ধুর মতই জেমস্‌ রাই-ডারকে বেকার স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে এনে তুলল হোমস্‌। সিন্দুক খুলে নীলবর্ণ পদ্মরাগ বের করতেই মনে হল মূর্ছা যাবে রাইডার।

গম্ভীর কণ্ঠে বলল হোমস—'খেল খতম, মিঃ রাইডার। কিন্তু এ-কাজ করলেন কেন?'

রাইডার তখন চোখ উল্টে যায় আর কী! তাড়াতাড়ি কয়েক ফোঁটা ব্রান্ডি দিয়ে চাঙ্গা করা হল তাকে। তারপর শোনা গেল তার অদ্ভুত কাহিনী।

নীলবর্ণ পদ্মরাগের কথা কাউন্টেসের ঝিয়ের মুখে শুনে অবধি লোভ জেগে-ছিল রাইডারের। তাই হীরে চুরি করে পালিয়েছিল তার বোনের বাড়ী। তার আবার হাঁস মুরগীর কারবার। আনাড়ী চোরের ভয় একটু বেশী হয়। রাইডারের সাহস হল না পদ্মরাগটাকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটবার। তাই চোখের সামনেই একটা হাঁস দেখে হীরেটাকে আঙ্গুল দিয়ে ঠেলে নামিয়ে দিল গলা দিয়ে। তারপর বড়দিনে খাবার জন্যে একটা হাঁস চাইল বোনের কাছে। বোন বলল—বেশ তো, নিয়ে যাও যেটা খুশী।

হাঁসটাকে অন্যান্য হাঁসের মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে বাড়ী এল রাইডার। কাটবার পর দেখলে সর্বনাশ হয়েছে। অবিকল একই রকম দেখতে আর একটা হাঁসকে সে নিয়ে এসেছে। পদ্মরাগ-হংস পড়ে আছে বোনের কাছে।

তক্ষুনি ছুটল রাইডার। কিন্তু কপাল মন্দ। গিয়ে দেখল সে-হাঁস চালান হয়ে গেছে অমুক দোকানে। তাই হাঁসটার খোঁজে গিয়েছিল দোকানে।

কিন্তু শার্লক হোমস্‌ কি করে জানলেন যে, তার নাম জেমস রাইডার—জন রবিনসন নয়? পুলিশ পর্যন্ত আঁচ করতে পারেনি তার কুকীর্তি—হোমস্‌ পারলেন কি করে?

পারবেন আপনি জবাব দিতে? একান্তই যদি না পারেন, ...পৃষ্ঠা দেখুন।

অদ্রীশ বর্ধন

(গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান ৪৬ পৃষ্ঠায়)

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

অরুণচন্দ্র গুহ

নেতাজী সুভাষ—ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় নাম। সাধারণ শান্তিপ্রিয় বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নিজের মেধার পরিচয় দিয়ে তিনি যান বিলেতে—ভারতীয়দের পক্ষে সর্বোচ্চ সরকারী পদের (আই সি এস-এর) জন্য পরীক্ষা দিতে। তাও কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করলেন; কিন্তু সরকারী কাজে যোগ না দিয়ে সর্বত্যাগী গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশসেবার কাজে যোগ দিলেন। তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায় হল—এক জাতীয় সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়ে—সৈন্য পরিচালনা করে—ভারতের কতকটা অংশ ইংরাজ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করেন। জীবন তাঁর বৈচিত্র্যময়—দেশসেবা ও ধর্মানুরাগের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব তাঁর যৌবনে অস্থিরতা এনেছিল। ছাত্র অবস্থায় একটা ঘটনায় কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হলেন। রাজনৈতিক জীবনে দুবার কংগ্রেসের সভাপতি হন এবং দ্বিতীয়বার তিনি জয়ী হন—ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতা গান্ধীর বিরোধিতা সত্ত্বেও। কিন্তু তারপর কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হন। মা'র প্রতি তাঁর একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল; কিন্তু তবুও মা'র মনে দুঃখ দিয়ে গৃহত্যাগ করলেন—মুক্তির সন্ধানে। দুর্গম স্থানে দু' মাস ঘুরে—দেখলেন নিজের মুক্তিসাধনা তাঁকে শান্তি দেবে না। আবার ফিরে এলেন মা'র কোলে।

ভারতের আর কোনো রাজনৈতিক নেতার জীবনে এমন অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিভিন্ন ভাবধারার খেলা দেখা যায় না। তবুও ঐ ধর্মাকর্ষণ তাঁর মন হতে দূর হয়নি। তাই কিছুদিন একটা দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন—যার উদ্দেশ্য ছিল—অদ্বৈত মত প্রচার করে ইংরাজের মনোভাব পরিবর্তন করা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সুভাষ ঐ পথের ব্যর্থতা বুঝতে পারলেন। তারপর তাঁর যোগাযোগ ঘটে যুগান্তর বিপ্লবী দলের সঙ্গে—হয়ত খুব ঘনিষ্ঠভাবে নয়। কিন্তু ওটেনের উপর হামলায় যাদের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন—অনঙ্গ দাস, সতীশ দে প্রভৃতি—এঁরা সবাই যুগান্তরের সভ্য ছিলেন: যুগান্তরের ভূপেন্দ্রকুমার দত্তর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ হয়।

এক বছর বসে থেকে—আশুতোষ মুখার্জির সাহায্যে তিনি আবার কলেজে পড়ার অনুমতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পান। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজে আর ঢুকতে পারলেন না; এবার ভর্তি হলেন স্কটিশচার্চ কলেজে। যৌবনে তাঁর উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন—স্বামী বিবেকানন্দ। এই শতাব্দীর প্রথম দুই দশককে বলা চলে বিবেকানন্দের যুগ। তাঁর বাণী আমাদের সকলকেই উদ্বুদ্ধ করেছে, দেশ ও জনসেবার জন্য প্রেরণা দিয়েছে। এখানে একটা কথা বলতে চাই—তৎকালীন রাজনীতির উপর ধর্ম ও নীতিবিরোধ একটা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ধর্ম অর্থে আমরা পূজা-অনুষ্ঠান—বারোয়ারী পূজা বা ধর্মীয় গোঁড়ামী মনে করতাম না; একটা নিষ্ঠা ও নীতিবোধ দ্বারা চালিত হতাম। তার মধ্যে একটা প্রধান কথা ছিল ত্যাগ ও জনসেবা। সুভাষের মধ্যে এ ভাবটা খুবই প্রবল ছিল। জেলেও দেখেছি রুগ্ন জেলসহবাসীদের সেবা করতে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল।

অসহযোগ আন্দোলন হতে সুভাষের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ হয়। বলা চলে আমরা একযোগেই বহু বছর কাজ করেছি। অসহযোগ আন্দোলনের জন্য তিনি আই সি এস পদ ত্যাগ করলেন। কিন্তু তবু যখন আর্তের সেবার আহ্বান এল—তখন রাজনীতির খ্যাতি ও উত্তেজনা ত্যাগ করে, তিনি উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণের কাজে ছুটে গেলেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও একটি ত্রাণ কমিটি সংগঠন করে। সুভাষ তাঁর ভার নিয়ে উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলার বিভিন্ন স্থানে ত্রাণকার্য পরিচালনা করেন। কয়েক মাস ধরে অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় তিনি ত্রাণ সংগঠন পরিচালনা করেন। তাঁর একনিষ্ঠ সেবা গভর্নর লর্ড লিটনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাঁরা তাঁর সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে

কাজ করেছেন সুভাষ তাঁদের সঙ্গে একই-ভাবে বাস করতেন—একই খাদ্য খেতেন। এটা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই সময়ই সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা হয়।

সুভাষচন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলী নিয়ে আমি আলোচনা বিশেষ করতে চাই না; তা প্রায় সকলেরই জানা। তাঁর সঙ্গে একযোগে বহু বছর আমরা কাজ করেছি; একসঙ্গে জেলে থেকেছি। তাই তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ আমার হয়েছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে, গান্ধীর চেয়ে চিত্তরঞ্জন তাঁকে বেশী আকর্ষণ করেছিলেন। এর একটা প্রধান কারণ, চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর স্বভাব ও প্রকৃতিগত মিল ছিল বেশী। প্রতিটি পদে গান্ধী কতগুলি মূল সূত্র দিয়ে বিচার করতেন। সে সব নীতির এতটুকু ব্যতিক্রম, তিনি সহ্য করতেন না। তাঁর কথা ছিল—
the means must be as good as the end.

কিন্তু অপর কোনো নেতাই এ নৈতিক বিধি এমনভাবে মানতেন না। চিত্তরঞ্জন একবার এমনও বলেছিলেন— No means is mean. কোন পন্থাই বর্জনীয় নয়—[illegible] সাফল্যলাভের জন্য। গান্ধীর একটা মূল সূত্র ছিল—অহিংসাকে মৌলিক নীতি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। অন্যান্য সব নেতারই মত ছিল—হাঁ, অহিংস পথেই আমরা চলব—কর্মনীতি হিসাবে, মৌলিক নীতি হিসাবে নয়। গান্ধীর কাছে চরকায় সুতো কাটা একটা প্রধান নীতি: সত্যাগ্রহ বা আইন-অমান্য করতে হলে চরকায় সুতো কাটা অবশ্য পালনীয়। গান্ধীর নেতৃত্ব তখন এমন অবিসংবাদিত ছিল, যে অন্যান্য নেতারা জানতেন—তাঁকে ছাড়া ভারতের জনতাকে কেউ নাড়া দিতে পারবে না; কোন গণ-আন্দোলন গান্ধীর আহ্বান ভিন্ন সম্ভব ছিল না। তাই প্রত্যক্ষভাবে গান্ধীর বিরোধী হবার সাহস কোন নেতার হয়নি। কিন্তু সে সাহস হয়েছিল চিত্তরঞ্জন দাশের। পরে চিত্তরঞ্জন জয়ী হলেন: গান্ধী তাঁর স্বরাজ পার্টিকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলেন। গান্ধী এমনও বলেছিলেন—শিশু যেমন মাতৃবক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, আমিও তেমনি স্বরাজ দলের সঙ্গে জড়িয়ে থাকব।'

চিত্তরঞ্জনের আবেগময় স্বভাব, রাজনৈতিক বেপরোয়া ভাব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে খুঁৎখুঁতে মনোভাবের অভাব—এসব সুভাষকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। অসহযোগ আন্দোলনে বহু লোক সুখের ও আরামের জীবন ত্যাগ করেছিলেন; কিন্তু চিত্তরঞ্জনের ত্যাগের কোন তুলনা হয় না। চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের এই বিশেষত্বই সুভাষকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু গান্ধীর প্রতিও তাঁর আস্থার অভাব ছিল না। জওহরলাল যেভাবে গান্ধীর নীতিবাদিতা ও চরকার প্রতি বিশেষত্ব আরোপকে সহ্য করেছেন, সুভাষ তত সহজে তা করেন নি। তাই দীর্ঘকাল কংগ্রেসের নেতৃত্ব করেও, তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। এই বিদ্রোহ অবশ্য গান্ধী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে।

১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতীয় রাজনীতির গতির সঙ্গে তাল রেখেই চলেছেন। নিজের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলার সুযোগ তিনি পান—দেশ হতে পালিয়ে গিয়ে। তাঁর গৃহের সামনে অষ্টপ্রহর পুলিশ পাহারা থাকত; তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যে পথে তিনি পা বাড়ালেন—১৯৪১ সালের ১৬ই জানুয়ারী—সে পথ ছিল প্রতি পদে বিপদসঙ্কুল। সুভাষচন্দ্রের দৈহিক গঠন ছিল সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। গৌরবর্ণ, দীর্ঘ সুগঠিত দেহ: মুখমণ্ডলে ও চক্ষুতে ছিল একটা বিশেষ দীপ্তি। ভারতের সর্বত্র তিনি সুপরিচিত। ঐ শারীরিক গঠন ও দেশব্যাপী খ্যাতি যাঁর তাঁর পক্ষে নীরবে দেশ হতে বেরিয়ে যাওয়া; তাও আবার যুদ্ধকালীন সতর্কতা এড়িয়ে সাধারণ লোকের পক্ষে কল্পনার বাইরে। কিন্তু সুভাষ এবং কেবল সুভাষই ঐ পথে পা বাড়াতে সাহস করতে পারেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গোপন ছিল। তাঁর বাড়ীর বাইরে বোধহয় কেউই জানত না। ১৬ জানুয়ারী রাত ৯টার সময় একটা গাড়ী নিয়ে এল: তাঁর ঘনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শিশির গাড়ী চালিয়ে আনলেন। পরিবারের অনেকে একে একে এসে তাঁর কাছ হতে বিদায় নিয়ে গেলেন। রাত ১টার সময় ২০ বছরের শিশির গাড়ী চালিয়ে নিয়ে গেলেন ভাবিষ্যৎ নেতাজীকে। পরিধানে ছিল পাঠান মুসলমানী পোশাক। ভোর হবার পূর্বে ঐ গাড়ী পৌঁছল ধানবাদের কাছে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র অশোকের নিবাসে। সমস্ত দিন বিশ্রাম করে সন্ধ্যার পর তিনি একা বেরিয়ে পড়েন: কিন্তু একটা নির্দিষ্ট স্থানে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। কিছু সময় পর অশোক ও শিশির গাড়ী নিয়ে সেখান হতে সুভাষকে তুলে নিয়ে যান গোমো স্টেশনে। ভাইপোদের বললেন—'আমি যাচ্ছি—তোমরা ফিরে যাও।'

এত বাধা পথে ঠিক যে কোথায় যাচ্ছেন, খুব সঠিক হয়ত সুভাষ নিজেও জানতেন না। তবে তাঁর মনে একটা পূর্ণ পরিকল্পনা ছিল: কোথায় যাবেন—কি কি বিপদ ও বাধা তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে আসতে পারে—তা তিনি জানতেন। পেশোয়ার, পেশোয়ার হতে কাবুল, তারপর বার্লিন—সব তাঁর মনে ঠিক ছিল। হিটলারের আত্মজীবনী তিনি পড়েছিলেন: ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি হিটলারের বিদ্রূপ উক্তি তিনি নিশ্চয় জানতেন। তিনি এ-ও জানতেন যে হিটলারের মনে ইংরাজ জাতি ও সাম্রাজ্যের প্রতি সমর্থনসূচক একটা মনোভাব ছিল। তবুও তিনি হিসাব করলেন—ইংরাজই আজ হিটলারের প্রধান শত্রু। তাই শত্রুর শত্রু হিসাবে হয়ত ভারতের বিপ্লবী নেতার প্রয়াসকে হিটলার একেবারে অগ্রাহ্য করবেন না; হয়ত অন্তত নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যও ভারতকে সাহায্য করবেন। তিনি ১৯ জানুয়ারীতে পেশোয়ারে পৌঁছান। মহম্মদ জিয়াউদ্দিন নামে একজন বীমার দালাল হিসাবে তিনি সেখানে যান। সেখান হতে কাবুল যাবেন; এর ব্যবস্থার জন্য ৭ দিন তিনি উৎকণ্ঠায় সেখানে অপেক্ষা করেন। সীমান্ত প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে তাঁকে দুর্গম পথ পার হতে হবে। তাঁর অতি বিশ্বস্ত অনুগামী উত্তমচাঁদ, আকবর খাঁ ও ভগৎ রাম তাঁকে সাহায্য করেন। আকবর খাঁ ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে কলকাতা গিয়ে তাঁর সঙ্গে সব ঠিক করে এসেছেন। তারপর সীমান্ত অতিক্রম করে তিনি কাবুল পৌঁছান। তখন কতকটা নিরাপদ হলেন—কারণ ইংরাজ সরকারের অধিকারের বাইরে তখন। ভগৎরাম তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত তাঁর প্রতি বিশেষ অনুকূল মনোভাব দেখালেন না। যদিও জার্মেনী ও রাশিয়ার মধ্যে তখন যুদ্ধ শুরু হয়েছে। অবশেষে এ পর্যন্ত তারা রাজী হল যে ইতালীয় পাসপোর্ট নিয়ে সুভাষ সোভিয়েট অঞ্চল দিয়ে পার হয়ে জার্মেনীতে যেতে পারবেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বার্লিন পৌঁছলেন; কিন্তু সেখানেও জার্মেনি সরকার তাঁর প্রতি খুব সহানুভূতি বা সমর্থন দেখাল না। অনেক দিন পর হিটলারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিক্ততায় তার অবসান হয়। হিটলার তাঁকে বললেন—১৫০ বছরেও ভারত স্বাধীন হবে না। তবু জার্মান সরকার কিছু সাহায্য দিতে রাজী হল। সুভাষের অসাধারণ আত্মবিশ্বাস ছিল; অন্য কেউ হলে ঐ প্রচেষ্টা ত্যাগ করতেন। ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার ও ইন্ডিয়া লীগ স্থাপন করে তিনি কাজ শুরু করেন। জার্মান সরকারও ভারতবর্ষের জন্য একটা বিশেষ বিভাগ বা দপ্তর স্থাপন করল। কিন্তু সুভাষের মতো প্রেরণাময় লোকের পক্ষে এই ধীর ও মন্থর গতিতে তুষ্ট থাকা সম্ভব নয়। তাঁর সুযোগ এল—বেশ কিছুকাল পর—১৯৪১ সনের ডিসেম্বরে যখন জাপান বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। তখনই

সুভাষ বার্লিনস্থ জাপ-রাষ্ট্রদূতকে জানালেন যে তিনি জাপানে যেতে চান।

আমরা তাঁর প্রবাস জীবনের বিস্তারিত কাহিনীর মধ্যে যেতে চাই না। কিন্তু মূল ঘটনাগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করতে হয়। জার্মেন ও জাপ সরকারের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা চলে; জাপ সরকার সুভাষকে পেতে আগ্রহী। সেখানে রাসবিহারী বসু এর পূর্বেই জাপ সরকারের সহযোগে কাজ শুরু করেছেন। বন্দী ভারতীয় সেনাদের নিয়ে এক বাহিনী গঠন করে, ইংরাজ সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। রাসবিহারী চাইছিলেন সুভাষ জাপানে এসে সেই দায়িত্ব নিক। সুভাষও বুঝেছেন যে জার্মেনিতে থেকে তিনি বিশেষ কিছু করতে পারবেন না; তাই তিনিও জাপান যাবার জন্য আগ্রহী। কিন্তু দীর্ঘ পথ; শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া খুবই কঠিন। অনেক আলোচনার পর ঠিক হয়—একমাত্র উপায় হল ডুবোজাহাজে যাওয়া। বিপদ তাতেও অনেক। শেষ পর্যন্ত জাপান হতে জানালো—হ্যাঁ, আসতে পারে—কিন্তু বিপদের দায়িত্ব তাঁর। সুভাষ তাতে দমবার পাত্র নন; একটু হেসে বললেন—হ্যাঁ ওটা কোনো বাধা নয়। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে অর্থাৎ জাপান যুদ্ধে যোগ দেবার ১ বছর ২ মাস পর—তিনি কিয়েল নৌ বন্দর হতে জার্মেন ডুবোজাহাজে উঠলেন। জার্মেন ডুবোজাহাজ হতে সমুদ্রের মধ্যেই সুভাষ ও তাঁর একজন সঙ্গীকে জাপানী ডুবোজাহাজে তুলতে হবে। এ কাজ খুবই কঠিন; ডুবো অবস্থায় তা সম্ভব নয়। তাই ডুবোজাহাজ জলের উপর উঠল; ২৮ এপ্রিল রাত্রে আফ্রিকার উপকূলে পর্তুগীজ-শাসিত অঞ্চলের কাছাকাছি। রাত্রে দুটি জাহাজ সমুদ্রের বুকে ভেসে উঠে সামনা সামনি দাঁড়াল। আলো জ্বালানো বিপদজনক; শত্রু-পক্ষের জাহাজ বা উড়োজাহাজ বহু দূর হতেও আলো দেখতে পাবে। রাতটা ঐভাবে কাটল।

পরদিন সমুদ্রে ভীষণ ঝড়; দুই জাহাজ পাশাপাশি আসা অসম্ভব। আবার রাত্রের অন্ধকার এল—তারপর এল আবার দিনের আলো। কিন্তু তখনও সমুদ্র খুব ক্ষুব্ধ; কিন্তু আর দেরী করা চলে না। তাই কোন রকমে একটা ভেলা তৈরী করে সুভাষকে ও তাঁর সহচরটিকে তাতে তুলে দেওয়া হল। ভেলার সঙ্গে একটা কাছি বেঁধে তার এক মাথা জাপানী জাহাজের দিকে ছুঁড়ে দিল। ঐ কাছি ধরে টেনে ভেলাটিকে জাপানী জাহাজের গায় লাগানো হলো। সুভাষ ও তাঁর সহচরের সর্বাঙ্গ ভিজে গেল ঢেউয়ের জলে। যে কোন সময়েই তরঙ্গের আঘাতে জলে পড়ে যেতে পারতেন। এই অবস্থায় তিনি জাপানী ডুবোজাহাজে উঠলেন। জাহাজটি আবার সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিল। ২৯ এপ্রিল জাপানী জাহাজ ফিরে চলল তার আস্তানার দিকে—ভারত মহাসাগর পার হয়ে। মে মাসের ৬ তারিখে সুভাষকে নামানো হল পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সাবাঙ্গ নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে। এই বিপদ-সঙ্কুল যাত্রাকে তিনি পরে বিবৃত করেছেন—এটা একটা বৃহৎ আনন্দজনক ব্যাপার।

এর পর কি হয়েছে বা তিনি কি করেছেন তা আজ সুবিদিত। ভারতের পূর্ব প্রান্তের একটা অংশ দখল করে স্বাধীন ভারতীয় সরকারের অন্তর্গত এলাকা বলে তিনি ঘোষণা করেন। শেষ পর্যন্ত আমেরিকার অ্যাটোম বোমার ঘায়ে জাপান আত্ম-সমর্পণ করে। এর পূর্বে বহুবার স্বাধীন জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক হিসাবে ভারতের প্রতি বহু বেতার ভাষণ দিয়েছেন। তিনি দেশত্যাগ করেন কংগ্রেসের বিদ্রোহী হিসাবে; কিন্তু তাঁর ওখানকার ভাষণে কংগ্রেস বিরোধিতার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। ভারতের ২।৩টি রাজনৈতিক দল তখন সুভাষকে কদর্য ভাষায় গাল দিয়েছে; তাদের কাগজে তাঁর সম্বন্ধে আপত্তিজনক বিদ্রূপাত্মক ছবি ছেপেছে। কিন্তু কংগ্রেস বা কোন কংগ্রেস নেতা, তাঁর সম্বন্ধে কোন নিন্দাসূচক কথা বলেনি। তিনি যখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তখন লেখক ও যুগান্তর দলের সহকর্মীরা তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেনি। বিধ্বস্ত কংগ্রেস সংগঠনকে পুনর্গঠনের দায়িত্ব তাঁরা নিয়েছিলেন। কিন্তু যেদিন তাঁরা শুনলেন যে সুভাষ গৃহ হতে পলায়ন করেছেন, তখন তাঁর দুঃখবরণের দুর্জয় ক্ষমতায় তারা মুগ্ধ হয়েছে। তারা এ-ও বিচার করেছে, ভিতরে কংগ্রেস তরফ থেকে বৃটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে নানাভাবে বিব্রত করেছে; সুভাষ বাইরে হতে তাই করবেন।

তখন তিনি যেসব বেতার ভাষণ দিয়েছেন তাতে বার বার গান্ধী পরিচালিত আন্দোলনের সুখ্যাতি করেছেন। গান্ধীর নেতৃত্বে যে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাকে তিনি একটা 'অবিস্মরণীয় ঘটনা' (an unforgettable incident) বলে বর্ণিত করেছেন। তিনি খুব পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন—ভারতকে স্বাধীন করার দায়িত্ব ভারতবাসীর; অন্যের উপর সে দায়িত্ব ছেড়ে দিলে সেটা জাতীয় অপমান। তিনি বলেছেন পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম প্রধান শক্তিশালী জাতি হল ইংরাজ; তারা যদি রাজনৈতিক মতের বিভেদ ভুলে, অপরের সহযোগিতা ও সাহায্য নিতে পারে, আমরা কেন পারব না? কস্তুরবা গান্ধীর মৃত্যু উপলক্ষে তিনি যেসব বেতার ভাষণ দেন, তাতে গান্ধীর প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। তখন তিনি কস্তুরবাকে জাতির জননী বলে অভিহিত করেছেন—

> I pay my humble tribute to the memory of that great lady who was the mother of the Indian people.

তাঁর বেতার ভাষণে সুভাষ বারবার গান্ধীকে জাতির জনক বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ এই গান্ধীই তাঁর দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে আপত্তি করেছেন ও বাধা দিয়েছেন।

ভারতের ভূমিতে যখন নেতাজী [illegible] অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করেছেন—[illegible] তিনি ঘোষণা করেছিলেন—এই সর[illegible] নিতান্তই অস্থায়ী—সংগ্রাম পরিচা[illegible] জন্য; স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই এই সরকার তার কার্যভার ও ক্ষমতা জাতির হাতে সমর্পণ করবে। পরিশেষে একটা কথা বলেই তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করব। যখন ভারতের অভ্যন্তরে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ, দেশকে ভাগ করার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল—তখন নেতাজী হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে ঐসব অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষাভাষী সমস্ত ভারতীয়কে সংঘবদ্ধ করেছিলেন। ধর্মের বা ভাষার বিভেদ তখন তাদের মনেও আসে নি। এটা সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের ও সংগঠন শক্তির একটা বিশেষ নির্দেশক। তাঁর ধ্বনি—'জয়হিন্দ'—সকলে সমানভাবে উদাত্ত কণ্ঠে উল্লাসের সঙ্গে চিৎকার করে বলছেন। সে ধ্বনি আজ আমাদের জাতীয় ধ্বনি।

সুভাষের জীবনের শেষ ঘটনা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে এবং আজও চলছে। যে প্লেনে বা উড়োজাহাজের দুর্ঘটনায়, তাঁর জীবন শেষ হয় বলে খবর প্রচারিত হয়—তাতে তার সহচর ছিলেন—হবিবুর রহমান। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট নেতাজীর অমর আত্মা দেহত্যাগ করেন রাত্রি ৮-৩০ মিনিটে। ২০ আগস্ট তাঁর দেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধিত হয়। ঐ প্লেনের অপর ৩।৪ জন জাপানী সহচর—যারা ঐ দুর্ঘটনায় জীবন হারান নি তাঁরাও সুভাষের মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। অনর্থক একটা ভুয়ো আশা লোকের মনে জীইয়ে রাখার কোন সার্থকতা নেই। যে সুভাষ সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করেছেন—তিনি আজ ৩০ বছর পালিয়ে থাকবেন—একথা বলা তাঁর স্মৃতির প্রতি অপমান। হবিবুর রহমানের মাধ্যমে তাঁর শেষ বাণী তিনি পাঠিয়েছেন—'দেশে ফিরে গিয়ে বলো—আমি শেষ পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছি।'

নেতাজী সুভাষের প্রতি লেখক তাঁর শ্রদ্ধা জানিয়ে আবেদন করতে চায়—তাঁর দেশপ্রেম, তাঁর সাহস ও কষ্টবরণ—এসব যেন আমাদের যুবকদের উদ্বুদ্ধ করে।

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

[সোনাখড়ি গ্রামের ভবনাথ ঘোষ আর দেবনাথ ঘোষ দু ভাই। ভবনাথ বড়। অল্পবয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর ভবনাথ সংসারের হাল টেনেছেন, ভাইকে মানুষ করেছেন। কলকাতার ছোট আদালতে ওকালতী পরীক্ষা দেওয়া দেবনাথের হল না। পরে বিদেশে জমিদারী সেরেস্তার ম্যানেজার হয়েছিলেন। সেই কৃতী ভাই দেবনাথ আট বেহারার পাল্কিতে সোনাখড়ি ফিরেছেন।

পুজোর আনন্দে গ্রাম গুলজার। সব বাড়িতেই আত্মীয় পরিজনের ভিড়। এর মধ্যেই খুচরো পরব এক ধরনের পুজোই—ধান বনকে সাধ খাওয়ানো। আর এক পরব গারসিও এই সময়েই। সধবা-বিধবা ছেলে-বুড়ো সবাই মেতে উঠলো। ওদিকে ভোর হতেই আহ্লাদ বৈরাগীর গলায় আগমনী সুর বেজে উঠল।

আর ছেলে ছোকরাদের আনন্দ দেখে কে। গ্রাম সুদ্ধ মানুষ পুষ্পাঞ্জলি দেবে। অতএব বিস্তর ফুল চাই। আর ফুল জোগাড় করতে হলে ভোররাতে দল বেঁধে বেরুতে হবে।

সেই কথা ভেবেই কত আনন্দ। সেই দলের পান্ডা জল্লাদ। কমলকেও সে সঙ্গে নিল। তারপর ভোর ভোর রাতে একদল গ্রামের ছেলে পথে বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু তরঙ্গিনীর মন বড় চঞ্চল। বুকের মধ্যে তার টনটন করে ওঠে। ষষ্ঠী গেল মহাসপ্তমীও এসে গেল কিন্তু তার মেয়ে এখনও এলো না।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঢংঢং ঢংঢং নতুন বাড়ির রোয়াকে দাঁড়িয়ে যথারীতি সে ঘন্টা বাজিয়ে দিল। বৈঠকখানা ভরে গেছে। যাদের পার্ট নেই, তারাও অনেকে এসেছে কলকাতার প্লেয়ারের নামে। ফরাসের ঠিক মাঝখানটিতে কর্ণ জেঁকে বসেছে। দাগ-চোক-কাটা রং-বেরং-এর জামা গায়ে, ঝুলপি ও গোঁফ মুখে, কথাবার্তায় বাঁকাটান। শকুনি তার গা ঘেঁসে পাশে বসেছে, সে মানুষটি একেবারে নিঃশব্দ—ঘাড় নাড়ছে একটু আধটু, কদাচিত ফিসফাস করছে একেবারে কর্ণের কানের উপর মুখ নিয়ে।

কর্ণ বলল অর্জুন কে মশায়? তিনি উঠুন। তাঁর সঙ্গে অনেক কাজ আমার। অর্জুন ভাল করে শুনে নিতে চাই।

ওঠো হারু—

বলে গায়ে ধাক্কা দিয়ে মাদার তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। চার মাস ধরে সকলের খবরদারি করে এসেছে, সময় কালে এখন তার নিজেরই বুক ঢিবঢিব করছে। কর্ণ বলে, হল কি মশায়? ধরুন, লক্ষ্যভেদের সিন—গুরু জ্যেষ্ঠ, যদি অনুমতি করেন, মনে মনে শ্রীকৃষ্ণ আচার্যকে প্রণাম করে আমি লক্ষ্যভেদে অগ্রসর হব।' প্রম্পটার কোথায়, ধরিয়ে দিন—

মাদার সগর্বে বলে, প্রম্পটারের ধার ধারিনে, টনটনে মুখস্থ। প্রম্পটার লাগবে না [illegible]।

কর্ণ সহাস্যে বলে, আমার কিন্তু লাগবে, ব্যবস্থা রাখবেন। নিত্যিদিন লেগেই আছে আপনাদের মতন একটা-দুটো নয়—কাঁহাতক মুখস্থ করে বেড়াই?

কিন্তু একী হল হারুর একটি বর্ণও যে মনে পড়ে না। ঘেমে উঠল সে। গোঁফ-ঝুলপি সহ বড় বড় চোখ মেলে কর্ণ তাকিয়ে আছে, তাতে যেন আরও ভয় লাগে।

বিরক্ত স্বরে মাদার বলে, বোবা হয়ে গেলে একেবারে, হল কি তোমার?

হারু সকাতরে বলল, জল—

ঢকঢক করে পুরো গেলাস জল খেয়েও অবস্থার ইতরবিশেষ হল না। বোঁ বোঁ করে মাথা ঘুরছে। সকলকে পাঠ শিখিয়েছে সকলের উপর তম্বি করে এসেছে, নিজের বেলা লবডংকা: অর্জুনের পাঠ একবর্ণও মনে আসে না। নই থুলে কর্ণ নিজেই তখন লেগে গেল। গোড়া ধরিয়ে দিলেও হয় না, সম্পূর্ণ পড়ে যেতে হয়। শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠের মতন হারু কোনরকমে আবৃত্তি করে যায় কথাগুলো।

অন্যদেরও মুখ শুকিয়েছে। কণ্টু অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য সাজবে ফিসফিসিয়ে বিজয়কে বলল ম্যানেজারের এই হাল—না-জানি আমাদের কপালে কী আছে?

এর মধ্যে আনকোরা-নতুন হলেও বাহাদুর বলতে হবে বলাই মন্ডলকে। সখী বসে দেওয়া হয়েছিল—অন্ট সখীর একজন। সমস্ত বর্ষাকালটা হারু সরকার কাঁধে কাঁধে রয়েছে। তা কাঁধে বওয়ার ছেলেই বটে—চেহারাটা যেমন, নাচে গানেও তেমন উতরেছে। ড্যান্সিং-মাস্টার নরেন পাল বলে, আস্ত প্রতিভা একখানা। কিন্তু নরেন পালের হাতেও রইল না পুরোপুরি—সখী থেকে নিয়তির পার্টে প্রোমোশন। বয়সটা কিছু কাঁচা—কিন্তু নিয়তির কত বয়স, পুঁথি-পত্রে সঠিক কিছু লেখে না—সোনাখড়ির নিয়তি কিছু কাঁচাই না হয় রইলেন। নিয়তির গান আছে, এবং গানের সঙ্গে মুখচোখের ভঙ্গিমা আছে রীতিমত। কয়েকটা দিনের পেয়াজের পরে দুটো জিনিসই এলোই এমন দেখান দেখাল, ঝানু থিয়েটার-দর্শক কালিদাসের চোখে নীহারবালার ছবি ভেসে উঠল। বলিহারি বেটা! বলে মহোল্লাসে বুকে টেনে নিল সে বলাইকে।

বলে, কলকাতায় যাবি তো বল। আমাদের অফিসক্লাবের ড্রামায় তোকে নিয়ে নেবো। আমিই ক্লাবের সেক্রেটারি। এই বয়সে এমন আরো যে কদ্দুর উঠবি ঠিক-ঠিকানা নেই। এখানকার হ্যাঙ্গামা চুকে-বুকে যাক, কলকাতায় যাব, অফিসে যাতে ঢোকানো যায় দেখব। লেখাপড়া কদ্দুর করেছিস রে?

হিমচাঁদের সর্বব্যাপারে রং-তামাসা। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, এম-এ পাশ দিয়েছে।

হেসে কালিদাস বলে, এম-এ কে চাইছে? এম-এ'রাই বরঞ্চ চাকরির বিনে ফ্যা ফ্যা করে বেড়ায়। বলি, ইংরেজি-বাংলা পড়তে-টড়তে পারিস?

বলাই বলে, বাংলা পারি—

হিমচাঁদ টিপ্পনী কাটল: আমাদের হারু যদি বই পড়ে বসে। নিয়তির পাঠ পড়ানোর সময় কম বেগ দিয়েছে! ওকে কলকাতা নাও তো হারু সরকারকেও ওর সঙ্গে নিতে হবে।

কালিদাস বলে, বাংলা আর ইংরেজি একটু একটু শিখে নে, অফিসের বেয়ারা হতে পারবি। বেশি কিছু নয়—নামটা-ধামটা পড়তে পারলেই হবে।

গাওনা সপ্তমীর দিন—মাঝের কটা দিন ঘোর বেগে রিহার্সাল চলল। সকাল সন্ধ্যা দুইবার কোন কোন দিন। বিচিত্র কুর্তাধারী কর্ণ ফরাসের কেন্দ্রস্থলে, বাক্যহীন শকুনি পাশটিতে বসে। পাঠ বলা ছাড়া শকুনির ঠোঁট নড়ে না, পাঠও বলে মিনমিন করে—নিজে ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না।

মাদার ঘোষ জিজ্ঞাসা করল: আসরেও এইভাবে বলবেন নাকি?

কর্ণ অভয় দিয়ে সহাস্যে বলে, গলা ফাটাবে, শুনবেন তখন। আসরে [illegible]

ফাটাতে যাবে কেন, কথাবার্তাতেও তাই কঞ্জুস। শক্তি জমিয়ে রাখছে, স্টেজে গিয়ে ছাড়বে।

প্রতিমার ঠিক সামনা-সামনি উঠান সম্পূর্ণ পার হয়ে আশফল গাছটার ধারে স্টেজ বেঁধেছে। প্রকাণ্ড উঠান, দেদার মানুষ বসতে পারবে। তাতেও না কুলায়, রাস্তা অবধি ঝাঁটপাট দেওয়া রইল। পাটি মাদুর নারকেল-পাতা যা পাওয়া যায় নিয়ে সব বসে পড়বে।

সন্ধ্যা হতে না হতে লোক আসা শুরু হল। নাম এতদূর ছড়িয়েছে, নিজেদের অমন চালু থিয়েটার সত্ত্বেও রাজিবপুর থেকে এই পথ ঠেঙিয়ে হারান পূর্ণশশী ইত্যাদি পাঁচ-সাত জনের একটা দল এসে পড়ল। আসুন, আসুন—বলে হিরু পথ অবধি এগিয়ে আপ্যায়ন করে। চোখ টিপে দেয় : সপ সতরঞ্চি মাদুর কিছু এইবার পেতে দিক।

বলে, বসুন, পান-তামাক খান। প্লের অনেক দেরি, সেই রাত দশটা। হাটে হাটে কাড়া দেওয়া হয়েছে শোনেননি? আপনাদের ওখানেও তো তাই। নইলে হয় না, খাইয়ে-দাইয়ে হেঁসেলের পাট চুকিয়ে মেয়েলোকে এসে বসেন। তাঁদের নিয়েই তো থিয়েটার।

বসা তো সারারাত্তির ধরেই আছে। ঘটকর্পূর হয়ে এক্ষুনি কেন বসতে যাবে?

বসল না তারা, চতুর্দিক ঘুরে ঘুরে দেখছে। মণ্ডপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হারান টিপ্পনী কাটে : মা-দুর্গা যে কচি খুকি—মুখ টিপলে দুধ বেরোবে। সিংহ কইগো, এ তো একটা হুলো বেড়াল।

পূর্ণশশীও জুড়ে দেয় : গণেশের কেবল শুঁড়েরই বাহার—ভুঁড়ি কই? গণেশ কারে কয়, আমাদের মুৎসুদ্দি-বাড়ি গিয়ে দেখে আসুক।

প্রতিপক্ষ রাজিবপুরেরা কী না-জানি রাজা-উজির মারছে,—সোনাখড়ির এরা কজন আশেপাশে এসে পড়ল। নিমচাঁদ শুধয় : কি বলছ তোমরা?

হারান বলল, সারা সোনাখড়ির মধ্যে এই তো সবেধন নীলমণি—তা নজর ধরে কই। রাজিবপুরে আমাদের সাত-সাতখানা পুজো। সামান্য লোক ভূষণ দাস, বাজারখোলায় দোকান করে খায়—তার বাড়ির ঠাকুরখানাই মেপে দেখগে। অন্ততপক্ষে এর দেড়া।

পূর্ণশশী বলে আর মুৎসুদ্দি-বাড়ির ঠাকুর দেখলে তো ভির্মি লেগে যাবে। তোমাদের গণেশ ভুঁড়ি-শূন্য, তিনজনে হাত-ধরাধরি করেও তাঁদের গণেশের ভুঁড়ি বেড়ে আনতে পারবে না। নাদায় করে গরুকে জাবনা খাওয়ায় না—সেই নাদা আস্ত একখানা কাঠামোর সঙ্গে বেঁধে তার উপরে মাটি লেপে ভুঁড়ি বানিয়েছে।

হারান বলে, তোমাদের দুর্গা, দেখতে পাচ্ছি, এক ফচকে ছুঁড়ি। দশহস্তে দশ-প্রহরণ ধরে অসুর নিধন করবেন, এই দুর্গা দেখে কেউ ভরসা পাবে না। হাঁ, মা-দুর্গা কারে কয় দেখে এসো মুৎসুদ্দি-বাড়ি। লম্বা-চওড়া পেল্লায় মূর্তি—মাথার মুকুট চণ্ডী-মণ্ডপের ছাতে গিয়ে ঠেকেছে।

পূর্ণশশী বলল, দালানকোঠা বানানোর সময় মিস্ত্রিরা ভারা বেঁধে কাজ করে। এ দুর্গা গড়তেও তেমনি ভারা বাঁধতে হয়েছিল। সাজপত্তোর পরিয়ে কাজ সম্পূর্ণ করে পঞ্চমীর দিন ভারা খুলে দিয়েছে। না খুললে লোকে ঠাকুর দেখতে পায় না।

দত্তবাড়ির নারায়ণ দাস বলল : ভারা তো খুললেন—কিন্তু আরতির ভাবনা ভেবেছেন? পঞ্চপ্রদীপ ঠাকুরুনের মুখের উপর ঘোরাতে হয়। তার কোন্ উপায়?

খুব সোজা—। উপায় হিমচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে বাতলে দেয় : প্রতিমার সামনে একটা বাঁশ পুঁতে বাঁশের মাথায় কপিকল খাটিয়ে নাও গে। পুরুতের কোমরে দড়ি-বাঁধা—আরতির সময় কপিকলে দড়ি টেনে পুরুতকে ছাত অবধি টেনে তুলবে, হয়ে গেলে নামিয়ে দেবে।

কালিদাসও এসে পড়েছে, সে বলল, সে না-হয় হল—বিসর্জনে কি হবে? মণ্ডপ-এর ছাতে মাথা ঠেকেছে, মাকে তো আস্ত বের করা যাবে না। টুকরো করতে হবে।

হারান হেলা ভরে বলল, তাতে শেষ হবে না। বিসর্জনের মন্তোর পড়া হয়ে গেলে প্রতিমা তখন আর দেবী থাকেন না, পুতুল হয়ে যান।

কালিদাস বলল, আমাদের কলকাতাতেও একবার ঠিক এমনি হয়েছিল। চুনোপুকুরে আর বেনেপাড়ায় পাল্লাপাল্লি। চুনোপুকুর ঐ মুৎসুদ্দি-বাড়ির মতোই ঠাকুর গড়ে বেনে-পাড়াকে গো-হারান হারিয়ে দিল। প্রতিমা বিসর্জন দুই খণ্ড করে হল। তাই নিয়ে বেনেপাড়া এমন শোধ তুলল, চুনোপুকুর আর মুখ দেখাতে পারে না।

হিমচন্দের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে প্রশ্ন করে : বলো তো হিমে-দা, কী হতে পারে?

হিমচাঁদ বলল, আমার মাথায় আসছে না, খুলে বলো। আমাদেরও তো তাই করতে হবে।

গণেশের বিসর্জনটা বাদ রেখে বেনেপাড়া তাকে কাচা পরাল গলায় ধড়া ঝুলোল—গুরুদশায় লোকে যেমন সাজ নেয়। চুনো-পুকুরের বাড়ি বাড়ি সেই গণেশ দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। কী ব্যাপার? গণেশর মা অপঘাতে গেছেন, প্রাচিত্তিরের (প্রায়শ্চিত্ত) জন্য কিছু কিছু ভিক্ষে দিন আপনারা।

আসরে সপ পড়েছে, কিন্তু ভদ্রলোকে বসবেন কি, ছেলেপুলে যেখানে যত ছিল ধুপেধাপ করে বসে পড়ল। মাথার উপর সামিয়ানা ছাতের মতন, নিচের ঘাসবন চাপা দিয়ে সপ পেতেছে—বেশ কেমন ঘর-ঘর লাগে। বসেও সুখ হয় না, গড়িয়ে পড়া—পাক খেতে খেতে গাড়ির চাকার মতন এদিক সেদিক গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। জায়গা নিয়ে কলরব ধাককাধাককি। ভচলোকে এর মধ্যে বসেন কোথা, দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বিশেষ, রাজিবপুর থেকে এই যে কটি এসেছেন।

হিরু এসে রে-রে করে পড়ল : কি হচ্ছে —আসর পাতা হল তোদের জন্য নাকি থিয়েটার তো রাত-দুপুরে। খেয়েদেয়ে কায়েমি হয়ে বসবি, তা নয় এখন থেকেই উঠোনে কুমড়ো-গোড় লাগিয়েছে।

কর্ণ, শকুনি, কলকাতার প্লেয়ার, পুজো-বাড়ির ধুমধাড়াক্কার মধ্যে নেই, তারা স্বতন্ত্র। সমুদ্দুর পুকুরের বাঁধানো চাতালে কামিনীফুল তলায় চুপচাপ বসে বসে সিগারেট ফুঁকছে। আকাশে চাঁদ, জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভরে গেছে, ফুলের গন্ধ বাতাসে ভুরভুর করছে।

মাদার ঘোষ যাচ্ছিল দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে বলে, আপনারা এখানে? ভদ্রলোকেরা আসছেন, সবাই আপনাদের কথা বলছেন। কথাবার্তা বলবেন চলুন।

কর্ণ ঘাড় নাড়ল : উঁহু, বলুন গিয়ে খুঁজে পাচ্ছিনে। কথাবার্তা যত কিছু স্টেজ-এর উপর থেকে। ঐ ভয়েই তো পালিয়ে আছি। এখনই কথাবার্তায় লেগে যাই তো স্টেজের কথা শুনতে যাবে কেন লোকে?

লোকে লোকারণ্য। রোয়াকে চিক টাঙানো, মেয়েদের জায়গা সেখানে। তাতে কুলোয়নি, উঠানের সামিয়ানার নিচে একদিকে বুড়ো ও ছোট মেয়েদের আলাদাভাবে বসানো

হয়েছে। বসে বসে পারে না আর লোকে। সামনের ড্রপসিনে অরণ্য-পাহাড় সে পাহাড় অচল অনড় হয়ে রয়েছে।

জল্লাদ বলল, দশটা বাজুক, তবে তো নড়বে।

দশটা আর কখন বাজবে শুনি? সকাল হতে চলল, এখনো এদের দশটা বাজে না।

বক্তা রাজিবপুরের এক ভদ্রজন। কালো কারে বাঁধা ট্যাঁকঘড়ি ঝুলিয়ে এসেছেন। পকেট থেকে ঘড়ি বের করে খুট করে ডালা খুলে দেশলাই জেবলে দেখে নিয়ে বললেন, এগারো বাজতে চলল—দশ মিনিট বাকি।

গ্রামের উপর শ্লেষ বিদ্রূপে পড়ছে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজিবপুর দলের মধ্যে—জল্লাদের আর ধৈর্য থাকে না। বলল, ঘড়ি নয় আপনার ওটা ঘোড়া। লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। কালিদাসদা কলকাতা থেকে তোপের সঙ্গে ঘড়ি মিলিয়ে এসেছেন, চালাকি নয়। সেজেগুজে তৈরি আছে সব, দশটা বাজা মাত্তোর ও-পাহাড় উপরে উঠে গিয়ে রাজদরবার বেরিয়ে পড়বে।

বলে তো দিল—কিন্তু মনের মধ্যে বিষম উদ্বেগ, সাজঘরে কী কাণ্ড হচ্ছে না-জানি। রাজিবপুরেরা দলবদ্ধ হয়ে খুঁত ধরতে এসেছে, এখন সেটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। ড্রপ তুলতে সাত্য সাত্য সকাল করে না ফেলে। এখন সাজঘরে ঢুকতে দেবে না, কর্ণের ঘোরতর আপত্তি, বাজে লোক ঢুকে গেলে গোঁফ চুল কবচ কুণ্ডল ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে স্পষ্ট বলে দিয়েছে।

শুনতে পেয়ে জল্লাদ আগেভাগে উপায় করে রেখেছে। সাজঘরের বেড়া ফুটো করে রাখবে, গোড়ায় ভেবেছিল। তাতে কারো না কারো নজর পড়ে যাবে গরু-ছাগলের মতন তাড়িয়ে তুলবে। চালের উপরে উলুর ছাউনি, ভেবেচিন্তে তারই খানিকটা সে ছিঁড়ে-খুঁড়ে রাখল। বৃষ্টি-বাদলা না হলে উপর দিকে কেউ নজর দিতে যায় না। পদ্মকোষার ডালে বসে অধীর উৎকণ্ঠায় জল্লাদ সাজঘরের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছে, আর গজরাচ্ছে ওদের গয়ংগচ্ছ কাজকর্মের জন্য।

তড়াক করে একসময় গাছ থেকে সে লাফিয়ে পড়ল।

কি রে, কি পড়ল ওখানে?
শেয়াল-টেয়াল হবে—

উইংস-এর পাশে এক হাতে পেটাঘড়ি আর হাতে হাতুড়ি নিয়ে একজনে দাঁড়িয়েছে। ড্রপসিনের দড়ি ধরে আছে একজন—ঘণ্টা দিয়েছে কি সিন উঠে যাবে। এইবার, এই-বার—আহ্লাদে লাফাতে লাফাতে জল্লাদ আসরে ছুটল। আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে: সাপ, সাপ—

লোকজনে ঠাসাঠাসি, সাপের আতঙ্ক সব উঠে পড়েছে।

উঁহু, সাপ তো নয়—লতাপাতা দেখে সাপ ভেবেছিলাম।

খিলখিল করে হেসে জল্লাদ মনের মতন জায়গা নিয়ে বসে পড়ল।

মাদার ঘোষ বলে, শয়তান কি রকম দেখ। জায়গা পাচ্ছিল না, চালাকি করে জায়গা নিয়ে নিল। এতও মাথায় আসে ওর।

থিয়েটার চলছে। লোকে সাংঘাতিক রকম নিয়েছে, খানিক এগুতেই বোঝা যাচ্ছে এই-বার। বিশেষ করে শকুনি আর জামদগ্ন যখন স্টেজে আসেন। ঝণ্টু জামদগ্ন সেজেছে। শকুনি এতদিন যে মুখ খোলেননি—ওস্তাদের মার শেষরাত্রে সেই খেল দেখাবে বলেই বোধ হয়। মুখের কথা না ফুটতেই হেসে লোকে লুটোপুটি খাচ্ছে।

মাদার ঘোষ আসরে বসেনি, ঘুরে তদারক করছে। উত্তেজিতভাবে সে সাজঘরে ঢুকে কালিদাসকে ধরল: দেখেশুনে খরচ-খরচা করে তোতলা প্লেয়ার নিয়ে এলে তুমি?

কালিদাস বলে, আমি আর দেখলাম কোথা? অজিতবাবুর মতন অতবড় প্লেয়ার সার্টিফিকেট দিলেন, তার পরে ইস্কুলের ছেলের মতন আমি কি আর পাঠ ধরতে যাব? খালি সার্টিফিকেটই নয়, বলে দিলেন, শকুনি না নিয়ে আমিও কর্ণ হয়ে প্লে করতে যাচ্ছিনে।

কথাবার্তার মধ্যে কর্ণ এগিয়ে এসে পড়লেন: কি হয়েছে?

মানে, ঐ শকুনি ভদ্রলোক একটুখানি—

তোতলা। একটু নয়, অনেকখানি। কিন্তু দোষ কি হল তাতে? পার্বলিক স্টেজের শকুনি খোনা সুরে অ্যাকটো করেন, তার জন্যেই না অত প্রশংসা। আমাদের শকুনি খোনা নয়, তোতলা। শকুনি খোনার বদলে তোতলা হলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে, কোন মহাভারতে আছে বলুন তো একথা?

অগত্যা মাদার ঘোষ শকুনিকে ছেড়ে স্বগ্রামবাসী ঝণ্টুকে নিয়ে পড়ল: তোর জামদগ্ন দেখে লোকে হেসে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। বলি, অমন অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য—তাঁকেও ভাঁড় বানিয়ে ছাড়লি?

ঝণ্টু কাতর কণ্ঠে বলে, হাসলে আমি কি করব? তোতলামি করছি নে, পাঠও ঠিকঠাক মুখস্থ আমার।

মুখ ছেঁচে উঠিস কথায় কথায়—ও কি রে?

আমি নই মাদারদা, দাঁড়িয়ে করাচ্ছে। ওর মতো ছারপোকা না কি—মুখে লাগালে কুটকুট করে। বদলে দিতে বলছি, সে নাকি

হবার জো নেই। ঘোড়ায় সেমনাট নিয়ে বেরিয়েছি, সারাক্ষণ ওটা চালাতে হবে।

পুজো-পুজোর ব্যাপারে ঃ সেকালে পৃষ্ঠপোষকরাও অবাধ ছিল, এ কি প্রামাণিক ছিল না? পরামাণিক চোখ শ্রেণীচ্যুত দাড়ি কামিয়ে নিয়েছেন, সে নাকি হতে পারবে না।

সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিনদিন কাটল। বিজয়া দশমী, মণ্ডপের অবসান আজ, প্রতিমা বিসর্জন। ভোর থেকে শুয়ে শুয়ে আহ্লাদ বৈরাগির গান শোনা যাচ্ছে বৈরাগির মা খঞ্জনি বাজাচ্ছেন ঃ

মা তোরে আর পাঠাবো না।
বলে বলুক লোকে মন্দ
কারু কথা শুনবো না।
আমরা মায়ে-ঝিয়ে করব ঝগড়া
জামাই বলে মানব না।

লাফ দিয়ে কখন উঠে পড়ে মণ্ডপে ছুটল। শেষ দিন। সোনার্ডুর বারোমাস নিত্যদিন যেমন আজকের দিনটা বাদ দিয়ে কাল থেকে আবার তেমনি ধারা হয়ে যাবে। মায়ের এই দিনগুলোয় আমোদের জোয়ার এসেছিল।

আকাশ প্রসন্ন আজ। মন্দ বাতাসে পাতা কাঁপছে, পাতার শিশির টপটপ করে ঝরে পড়ছে। পল্টু আগেই উঠে এসে দাঁড়িয়েছে। আরও সব এসেছে। প্রতিমায় আঙুল দেখিয়ে কমল বলে, দেখ দিকি, মা যেন কাঁদছেন। ভাল করে দেখ, তাই না?

ঠিক তাই। ভিজে চোখ মা-দুর্গার—কেঁদেছেন খুব, মুখের উপরেও যেন অশ্রু চিহ্ন। কার্তিক গণেশ লক্ষ্মীরও তাই। সরস্বতীর নয় কেবল।

মিনো বলল ঠাকরুন বাপ-সোহাগী মেয়ে কিনা—মায়ের বাড়ির চেয়ে বাপের কাছে—মহাদেবের কাছে ও'র বেশি পছন্দ।

ঘোড়ার ডিম।

প্রতিমার কাছে মাটির মেজেয় জল্লাদ পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল, জেগে উঠে সে কথা বলে উঠল। প্রতিমার পাহারায় সে, পুজো-আচ্চা মিটে লোকজন সমস্ত বিদায় হয়ে গেলে আরও কজনের সঙ্গে পালা করে তারা রাত জাগে, ঘুমোনোর সময় ঐখানে ঘুমায়। পুজোর কদিন একদম বাড়ি যায় না। অহোরাত্র বাইরে থাকার মওকা জুটেছে, বাড়ি আর যেতে যাবে কেন? মা-দুর্গার সেবায় দেবীর পদাশ্রয়ে পড়ে আছে—বাপ যজ্ঞেশ্বরও এ বাবদে জোরজার করতে সাহস পান না। দেবী চটে যাবেন।

জল্লাদ বলে উঠল, কান্না না কচু। ঠাকুরমশায় কাল রাত্রে চুপিসাড়ে গর্জন তেল মাখিয়ে গেছেন। আমরা ক-জনেই জানি কেবল।

গর্জনতেল মাখিয়ে থাকেন বেশ করেছেন, না মাখালেও কাঁদতেন ঠাকুরুন ঠিক। এতজনের চোখ ছলছল, ও'র চোখ কতক্ষণ আর শুকনো থাকতে পারে? বিশেষ করে মেয়েছেলে যখন। ফুলের আজও খুব দরকার—ফুল আর বেলপাতা। বেলপাতায় দুর্গানাম লিখবে—সেই বেলপাতা ও ফুলে অঞ্জলি দেবে মা-দুর্গার কাছে। দুর্গার পতিগৃহে যাত্রা—যারা অঞ্জলি দিচ্ছে, তাদেরও বছরের যাত্রা সারা হয়ে থাকল আজকে এই একদিনে। পাঁজিতে দিনক্ষণ খুঁজে বেড়াতে হবে না—অদিনে-কুদিনে যেমন খুশি যাতায়াত চলবে, সর্বক্ষণেই মহেন্দ্রযোগ-অমৃতযোগ।

রাত থাকতেই তাই ফুল তোলা লেগে গেছে। সাজি নিয়েছে কেউ কেউ ডালা, কেউ-বা পাশের পাশের মানকচু পাতাই ছিঁড়ে নিয়েছে একটা। স্বর্ণচাঁপা-গাছের মাথায় জল্লাদ। শিশিরে-ভেজা ডালপালার উপর পা সরে সরে যাচ্ছে—মগডাল অবধি বেয়ে বেয়ে ফুল তুলে বেড়াচ্ছে, কোঁচড় ভরতি করছে। স্থলপদ্ম মেলা ফুটেছে—দেখতে দেখতে সকল পাড়ার সবগুলো গাছ ন্যাড়া হয়ে গেল। গাঁদা টগর বেলা যুঁই গন্ধরাজও অল্পাধিকতর মিলল। এবং শিউলি—

শিউলিতলায় ছোট ছোট মেয়ে—পায়ে মল নাকে নোলক, কর্মকারপাড়ার এরা সব। জনা দুইতিন গাছ ঝাঁকাচ্ছে, ফুরফুর ঝরে ফুল পড়ছে খুঁটে খুঁটে আঁচলে তুলছে মেয়েরা। ফুল ছিঁড়ে শিউলির বোঁটায় কাপড় ছোপাবে এরা। এমনি সময় জল্লাদের দঙ্গল এসে পড়ল। মেয়েগুলো তো দৌড়—দে দৌড়। মল বাজে ঝুন-ঝুন করে—শজারু পালানোর সময় যেমন হয়।

শানাই বাজে শেষরাত থেকে। এক শানাইদার পোঁ ধরে আছে অপরে সুর খেলাচ্ছে। কান্নার সুর—কথা নেই কিন্তু একটু শুনলেই চোখে জল বেরিয়ে আসে। গিরিকন্যা বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন। সে বড় দুঃখকষ্টের সংসার—জামাই ভিখারী বাউণ্ডুলে গেঁজেল। মা-মেনকার মনে বড় ব্যথা। সেই ব্যথা শানাই-এর সুর হয়ে মানুষের কলজে নিংড়ে কান্না বের করে আনে।

দেড় প্রহর বেলার মধ্যে যাত্রা সারা করতে হবে দেবেন্দ্র চক্রবর্তী পাঁজি দেখে বলে দিয়েছেন। তাড়াহুড়ো পড়ে গেল। পূজা অন্তে পুরুতঠাকুর শান্তিজল ছিটাচ্ছেন এইবার। শ্রীশ্রীদুর্গাসহায়-লেখা বেলপাতা কোঁচার খুঁটে শাড়ির আঁচলে বেঁধে এনেছে সব। কাপড় চোপড়ে সর্বশরীর পরিপাটিরূপে ঢাকা—শান্তিজলের ছিটে পায়ে না লাগে।

শাস্ত্রীয় কাজকর্ম সারা। এই কদিন দেবী হয়ে ছিলেন ছোঁয়া চলত না—ভক্তিভরে প্রণাম করে লোকে জোড়হাতে দূরে দাঁড়িয়ে থাকত। সেই গৌরবের বিসর্জন হয়ে গিয়ে এখন যিনি মণ্ডপে আছেন নিতান্তই ঘরের মেয়ে ছাড়া তিনি কিছু নন। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। সংস্কৃত মন্ত্রপাঠের ইতি—ঘরোয়া বাংলা কথাবার্তা সেই মেয়েটির সঙ্গে। অপরাহ্ন বেলা ঢাক-ঢোল-শানাইয়ে পাড়াবাড়ি তোলপাড়। গাঁয়ের মধ্যে যত মেয়ে আর বউ আছে আসতে কারো বাকি নেই। বিদায়ের বরণ—সধবা ও কুমারীরা একের পর এক প্রতিমার সামনে এসে হাতের কারুকৌশল দেখাচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

ভাগ্য নিয়ন্তা হোতে পেরেছিলেন। তিনি শুধু ব্যক্তি মানুষ নন, সমগ্র সমাজের মুক্তি তিনি চেয়েছিলেন। তাঁর আদর্শ হোল মানুষের একতা ও এই বিশ্বেই সর্বোত্তম জীবনের বিকাশ।'

রাষ্ট্রপতি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন সারা বিশ্বের ঐক্যবোধের বিকাশে ভারতের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। শ্রীঅরবিন্দ সেই ভূমিকাকে আরো দৃঢ়তর করেছেন। এই মহান সাধক প্রচার করেছিলেন যে সমগ্র মানবজাতিই এক নতুন একাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হবে। শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্নকে সফল করে তোলার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি।

আলোচনাচক্রে অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে এটাই আশ্চর্যের বিষয় যে অরবিন্দ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর জীবনদর্শন দেশে প্রচার করেছেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় অরবিন্দের ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের বাণীর ওপরেও আলোকপাত করেন।

একটু আক্ষেপের সুরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় বলেন জনসাধারণের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের বাণী সেইভাবে প্রচারিত হয়নি যেমনভাবে প্রচারিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বাণী। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ সমিতিকে রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ অনুসরণ করার অনুরোধ জানান।

● কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন স্মরণসভা

এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে সম্প্রতি কবি সাবিত্রীপ্রসন্নের অশীতিতম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হোল। কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন স্মৃতিরক্ষা সমিতি আয়োজিত এই স্মরণসভার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবাংলার রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঅতীশচন্দ্র সিংহ। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে সাহিত্যিক সাংবাদিক শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত এবং শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

অনুষ্ঠানে কবি সাবিত্রীপ্রসন্নের সাহিত্যকীর্তি ও জীবন সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা হয়। উদ্বোধক সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছাড়াও এ আলোচনায় অংশ নেন ডঃ নলিনাক্ষ সান্যাল।

● সাহিত্য প্রতিযোগিতা

তরুণ লেখকদের একটি সংস্থা 'আত্মপ্রকাশ' একটি গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। নাম দেবার শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ১৫ জানুয়ারী। যোগাযোগের ঠিকানা—তপন ভট্টাচার্য সম্পাদক আত্মপ্রকাশ শিবরামবাটী বলরামবাটী হুগলী।

● ইউনেস্কোর সাহায্য

বিশ্ব হিন্দী সম্মেলন সার্থক করে তুলতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (ইউনেস্কো) ৪৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। এই অর্থে বৈদেশিক প্রতিনিধিদের ভ্রমণ খরচ ও অন্যান্য খরচ প্রদান করা হবে।

নতুন বই

অর্থনৈতিক রচনা-বিচিন্তা — শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় এবং প্রবুদ্ধনাথ রায় সম্পাদিত। দি নিউ বুক স্টল। ৫।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। কলকাতা—৯। দাম সাত টাকা।

অর্থনীতি শাস্ত্রটির বয়স দুশ বছরের হলেও বাঙলা ভাষায় এই বিষয়ে সাধারণ পাঠকের উপযোগী বিশেষ কোন বই লেখা হয় না। পত্রপত্রিকার আলোচনা অথবা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যগ্রন্থ ছাড়া এই জাতীয় গ্রন্থের জিজ্ঞাসু পাঠকের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। অথচ বিষয়টি বর্তমান জীবন ও চিন্তাধারাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে। সেকারণে অর্থনৈতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে আজ আরও সচেতন হওয়া দরকার।

বর্তমান সুসম্পাদিত গ্রন্থখানি হাতে নিয়ে একথা বার বার মনে পড়বে। আজকাল প্রায়ই কয়েকটি শব্দ শোনা যায়, যেমন জনসম্পদ সবুজ বিপ্লব টাকার দাম বেকার সমস্যা ভূমি-সংস্কার কালো টাকা। অথচ এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব বিশেষভাবে চোখে পড়ে। বর্তমান গ্রন্থে এই সব বিষয়কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সাবলীলভাবে। বেশীর ভাগ রচনা শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়ের। অমৃত পাঠকের কাছে তিনি সুপরিচিত। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও আয় বন্টন পরিবারের ভোগ-পরিকল্পনা আর্থিক কল্যাণের নতুন মাপকাঠি ষষ্ঠ অর্থ কমিশন কৃষি-শ্রমিক ভারতের বাণিজ্য—একাল-সেকাল প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর আলোচনা সুচিন্তিত এবং যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন সম্পৎ মুখোপাধ্যায়।

'আজকের পশ্চিমবঙ্গ' পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করেছেন ভবতোষ দত্ত শ্যামাদাস ভট্টাচার্য প্রবুদ্ধনাথ রায় শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য সম্পৎ মুখোপাধ্যায় পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী এবং ধীরেশ ভট্টাচার্য।

এ'দের আলোচিত বিষয়ের মধ্যে আছে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্যা ভূমি-সংস্কার কৃষি ও কৃষক সমস্যা শিল্পোন্নয়ন বেকার সমস্যা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প জলসেচ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা প্রভৃতি।

'সমাজতন্ত্র ও বাংলাদেশ' এবং 'বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যথাক্রমে অজিতকুমার সেনগুপ্ত এবং মীরা রায়।

এই জাতীয় একখানি মূল্যবান গ্রন্থ সম্পাদনার জন্য সম্পাদকদ্বয় ধন্যবাদার্হ।

সংকলন ও পত্র পত্রিকা

সাগ্নিক : সম্পাদনা পঙ্কজ সিংহ। গ্রাম ও ডাকঘর নুরকণা। বর্ধমান। দাম দু টাকা।

কবিতা গল্প রম্যরচনা প্রবন্ধ অনুবাদ কবিতা ছড়া প্রভৃতিতে ভরা সাগ্নিক-এর শারদ সংকলনটি। পরেশ মন্ডল শিশির ভট্টাচার্য অনাথেশ্বর কোঙার সমরেশ মন্ডলের কবিতা, জীবন সরকারের গল্প এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। ছাপা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন।

বিশালাক্ষী : সম্পাদক কার্তিক দত্ত। মথুরাপুর। খোলাপোতা। ২৪ পরগণা। দাম দু টাকা।

লিখেছেন শ্যামল সরদার পান্নালাল মল্লিক জগদীশ বসু সুকুমার দে কল্লোল সরকার স্বপন বিশ্বাস এবং আরও অনেকে।

অন্যদিন। সম্পাদক শিশির ভট্টাচার্য। ৫৮।১২৮ লেক গার্ডেন্স। কলিকাতা-৪৫। দাম এক টাকা।

রীতিমতো পরিচ্ছন্ন রুচির এই পত্রিকাটির শারদ সংকলনে কবিতা সংক্রান্ত দুটি নিবন্ধ লিখেছেন চন্দ্রশেখর রায় এবং সন্তোষকুমার অধিকারী। কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র শিশির ভট্টাচার্য জীবন সরকার শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় দীপেন রায় তারাপদ রায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন। প্রচ্ছদ এবং ছাপা উন্নত মানের।

ঝংকার। সম্পাদক কল্লোল সরকার। খোলাপোতা। ২৪ পরগণা। দাম এক টাকা।

পবিত্র জানা রায় এবং শ্যামল সরকারের প্রবন্ধ এবং কল্লোল সরকারের গল্প এই সংখ্যার বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা।

সাহিত্যচিন্তা। সম্পাদনা কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। ৩১১ গাঙ্গুলীবাগান। কলকাতা-৪৭। দাম দেড় টাকা।

লিখেছেন ভবতোষ দত্ত অচ্যুত গোস্বামী রাম বসু শঙ্খ ঘোষ অমল দাশগুপ্ত তরুণ সান্যাল রত্নেশ্বর হাজরা আশিস সান্যাল এবং আরও অনেকে।

লেখনী। সম্পাদক সুবীর সাহা। ৮৮।৩বি মৃণাল পার্ক থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

লিখেছেন কালিদাস রায় তরুণ সান্যাল মণীন্দ্র রায় নরেন্দ্রনাথ মিত্র শরৎ মুখোপাধ্যায় অশ্বিন মিত্র এবং অমৃত আচার্য

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এ-ফল ফলল বহুভাগ্যেঃ দেখা পেলাম একটি কন্যাশিষ্যার—উমা বসু ডাক নাম হাসি। তার কথা আমি ফলিয়েই লিখেছি আমার 'ছায়ার আলো' রমন্যাসে—যদিও দিনের পর দিন তার কাছে যা পেয়েছি তার সূচীপত্রও দিতে পারিনি। কলকাতার নানা জটলার হামলা থেকে সেই আমাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। প্রথমে তাকে গান শেখাতে যেতাম সকালে—সপ্তাহে দুবার কি তিনবার। তারপর চার পাঁচবার—শেষে রোজ সকালে বিকালে। তার মুখে আমার নানা সুর ও গান শুনে সে যে কী আনন্দ পেতাম—সত্যিই মনে হত—এ ঠাকুরের করুণা! কোনো শিষ্য বা শিষ্যার গান শুনে আমি জীবনে এত আনন্দ পাইনি। তার কিন্নরী কন্ঠের নানা ভাব বিভাব দোলা মিড়—সর্বোপরি হৃদয়াবেগের স্পন্দন আমাকে সত্যি অভিভূত করত। আমি বাংলাদেশ ছেড়ে বহু বৎসর অজ্ঞাতবাস করার ফলে লোকে আমাকে সুরকার শিরোপা দেয়নি। এজন্যে আমার মনে খেদ ছিল বহুদিন—যদিও এখন মুক্তি পেয়েছি সব খেদ ক্ষোভ অনুযোগ থেকে। তবু থেকে থেকে এখনো একটা কথা মনে হয়—হাসি যদি আজ থাকত তবে তার মুখে আমার গান শুনে লোকে মানতই মানত যে দিলীপকুমার শুধু কবি ও গায়ক নন অনন্যতন্ত্র সুরকারও বটে। দুঃখের বিষয় যুগের সঙ্গে রুচি বদলেছে— এ-যুগের উপাস্য সিনেমার তারকা আরাধ্য সিনেমার গান লক্ষ্য সিনেমার যশ। তাই উমার গানের লংপ্লেয়িং রেকর্ড আজও বেরুলো না।

কিন্তু না এ-ও প্রত্যাশা। অতুলপ্রসাদের একটি বাউল গান আমার বড় প্রিয়ঃ

মিছে তুই ভাবিস মন!
তুই গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা
গান গেয়ে যা আজীবন।
আজি তোর যার বিরহে নয়নে অশ্রু বহে
হয়তো তাহার পাবি দেখা গানটি
হলে সমাপন।

কবি বা সুরকার বলে জয়টীকা পাওয়া এই-ই তো শেষ কথা নয় শেষ কথা হল—গানের গোমুখী যিনি তাঁকে তাঁর গানের গঙ্গাধারায় নিবেদন করে গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজায় কৃতকৃত্য হওয়া। হাসির মুখে 'তব চিরচরণে দাও শরণাগতি রূপের বাথা ছন্দে' বা 'শ্রীচরণে নিবেদনে জানাই এ মিনতি' বা অমর কবি নিশিকান্তের 'আঁধারের এই ধরণী আলোর লীলায় তুলব ভরি' * আরো বহু গান।

শুনতাম আর আমার কানে কেমন যেন জনতার হিল্লোল কল্লোল থেমে যেত—বাজত শুধু তার আত্মকথন ঃ 'আমি আলো-ছায়া আঁকা পাখী'।

গুরুদেবকে তার কথা লিখতে তিনি তাকে আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন এবং পরে তার একুশ বৎসর বয়সে দেহান্ত হবার পরে লিখেছিলেন একটি সুদীর্ঘ পত্র ১৯৪২ সালে ঃ উমার বিকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিভার পূর্ণিমাপ্রকাশের পথে হঠাৎ মেঘ ছেয়ে এল—এ-ট্র্যাজেডিকে শোকাবহ বলা যেতে পারত যদি আমাদের জীবন-লীলার শেষ অঙ্ক হত ইহলোকের জন্ম-সিন্ধি। সে প্রস্থান করেছে আত্মিক শান্তি-নিদ্রায় বিশ্রাম করতে — এ-বিশ্রামের মধ্যে দিয়েই সে গড়ে উঠবে পরবর্তী জীবন-লীলার জন্যে। *

সে ছিল সত্যিই অনন্যা—নানাদিকেই। স্নেহেও যেমন কোমল, প্রতিভায়ও তেমনি উজ্জ্বল, সরলতায়ও যেমন সুন্দর, পবিত্রতায়ও তেমনি অপরূপ। ইষ্ট ও গুরুর করুণার একটি বিশিষ্ট অবদান বলেই আমি তাকে বরণ করেছিলাম—যেমন পিতা করে তার আদরিণী দুলালীকে। কিন্তু তবু চিরবিচ্ছেদ আনন্দ নয়—বেদনারই প্রসূতি। কেবল সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করেছিলাম যে এ-বেদনাও আমার দুরভিসারের সহায় হয়েছিল মহাগুরুর অপার স্নেহাশিসের আলোয়।

---

* উমার অকালমৃত্যুর আগে রবীন্দ্রনাথ তার মুখে আমার শেখানো এই গানগুলি শুনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে চিঠি লেখেন—সে পত্রটি আমার 'তীর্থঙ্করে' ছাপা হয়েছে। তীর্থঙ্কর নবসংস্করণ সম্ভবত আগামী বৎসর আত্মপ্রকাশ করবে।

* পরিশিষ্টে শ্রীঅরবিন্দের এ-দীর্ঘ চিঠিটি বিন্যস্ত হল।

(ছাব্বিশ)

১৯২০ সালে কাশীতে প্রবাসী বাঙালীরা প্রথম সভা করেন—সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমি সে-আসরে পিতৃদেবের হাসির গান, স্বদেশী গান ও (অবাঙালী শ্রোতাদের জন্যে) মীরার ভজন গেয়েছিলাম—'প্রভু মোহে চাকর রাখো জী'। এ-গানটির শৈলী আমার স্বকীয়—বহু শ্রোতাই আনন্দ পেয়েছেন এখনো পান। ১৯২৪-এ পুণায় সেসুনে হাসপাতালেও আমি মহাত্মাজীকে এ-গানটি শোনাই যে-বিবরণ আমার তীর্থঙ্কর ও এ্যামং দি গ্রেট-এ লিপিবদ্ধ হয়েছে। কলকাতায়ও এ-গানটি আমার অনেক বাঙালী বন্ধু ভালো-বাসতেন, তাই গাইতাম মাঝে মাঝে। দানবীর শ্রীযুগলকিশোর বিড়লা আমার মুখে এ-গানটি শুনে খুশী হয়েছিলেন। আমি কোথাও উমাকে নিয়ে এ-গানটি গেয়েছিলাম। তারপরে শ্রীযুগলকিশোর তাঁর সেক্রেটারীকে পাঠান আমার কাছে। আমি স্টোর রোডে বিড়লা হৌসে যেতেই তিনি এ-গানটি শুনতে চাইলেন। গাইলাম। পরে তুলসীদাসের ভজনও গাইলাম সানন্দে। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বলেছিলেন ঃ যত পারো গেয়ো কেবল পার্টি নিমন্ত্রণ হররা এসব বর্জন করো। তোমার গানে লোকের মনে ভক্তি জাগে...ইত্যাদি।

("If you sing of the Divine, what more splendid means can there be of spreading devotion in the hearts of others,—that too is a work for the Divine.")

শ্রীযুগলকিশোরকে একথা বললাম যখন তিনি আমার জন্যে একটা ভোজ দিতে চাইলেন। তিনি শুনে খুশীই হলেন মনে হল। কিন্তু তারপরই বললেন তাঁর বিশেষ ইচ্ছা আমি আমেরিকা গিয়ে হিন্দুধর্ম প্রচার করি। আমি হেসে তাঁকে বললাম ঃ মাফ করবেন—আমার পিতৃদেবের একটি গান মনে করিয়ে দিলেন আপনি ঃ

নতুন কিছু করো একটা
নতুন কিছু করো।...
কিম্বা সবাই ওঠো, টাউনহলে জোটো,
হিন্দুধর্ম প্রচার করতে
আমেরিকায় ছোটো।

শ্রীযুগলকিশোর এক গাল হেসে বললেন কিন্তু আপনি প্রচার করবেন গান গেয়ে—

আমার মনে হয় এসব গানে...ইত্যাদি তারিফ।

আমি বললাম : সে হয় না জী। আমি আজ গুরুদাস। তাই তিনি আদেশ না দিলে কোথাও যেতে পারি না।

শ্রীযুগলকিশোর বললেন : আচ্ছা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে আমাকে জানাবেন। বলবেন তাঁকে যে, আপনাকে আমি আমেরিকায় পাঠাতে চাই—গানের মধ্যে দিয়ে হিন্দুধর্মের মহিমা কীর্তন করতে।

আমি বললাম : মিথ্যে আপনাকে ভরসা দিয়ে কি হবে জী? গুরুদেব কখনোই এ-ধরনের প্রচারে মত দেবেন না। তিনি চান সব আগে আমরা ভগবানকে লাভ করে তাঁর বাহন হই।

শ্রীযুগলকিশোর বললেন : কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ—

আমি বললাম : কোথায় বিবেকানন্দ আর কোথায় আমি! তাছাড়া তিনি তাঁর মহগুরুর আদেশ পেয়েছিলেন লোকশিক্ষা দেবার। আমি সবে যোগের পথে পা দিয়েছি।

শ্রীযুগলকিশোর একটু চুপ করে থেকে বললেন : আমি শুনেছি আপনি আজ নিঃস্ব। আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি কি?

আমি বললাম : আমি নিঃস্ব কে বলল? আমার যা কিছু দরকার গুরুদেবের কাছে সবই পাই।

কিন্তু...কিছু মনে করবেন না...কাপড়-চোপড়...বা ট্রেনভাড়া বাবদ—

না জী। বহু ধন্যবাদ। ট্রেনভাড়া আমার বন্ধুরা দেন। কাপড়-চোপড়—গুরুদেব।

শ্রীযুগলকিশোর (একটু চুপ করে থেকে) : যদি আপনাদের আশ্রমের জন্যে কিছু পাঠাই?

আমি (সানন্দে) : খুব ভালো কথা—নিশ্চয়ই তাঁর চরণে নিবেদন করব আপনার গুণগান করে।

শ্রীযুগলকিশোর (হেসে) : গুণগানের জন্যে কথা নয়। কেবল আমার দুঃখ এই যে, আপনি আমেরিকায় যেতে নারাজ। তবে আপনার কথা ঠিক। গুরুবরণ যখন করেছেন তখন তাঁর মতে না চললে চলবে কেন?

ফিরে এসে উমাকে বললাম। সে কিন্তু হায় হায় করে উঠল। বলল : আহা। তুমি আমেরিকায় গিয়ে সবাইকে গান শোনালে... ইত্যাদি।

আমি : হাসি! আমি যেখানে গিয়েছি সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই... ইত্যাদি।

উমা : কিন্তু কেন তিনি দেখা দেন না মন্টুদা?—যখন তোমাকে এত ভালোবাসেন...ইত্যাদি।

আমি : তাঁকে গুরু করলে বুঝতে... ইত্যাদি।

উমা : রক্ষে কর মন্টুদা! পর্দানসীন গুরু আমার সইবে না। আমি চাই তোমার মতন গুরু—যে জ্ঞানের ধ্যানের কথা বলতেও জানে, হাসতেও জানে, ভালোবাসতেও জানে, আর ডাক দিলে সাড়া দিতেও জানে। না, তিনি আমার মাথায় থাকুন—কেবল তুমি থেকো আমার পাশে...ইত্যাদি।

কথাগুলি একটু রংচং দিয়ে বললাম—তবে প্রায়ই এই ধরনের কথা হত আমাদের মধ্যে—সহজ, বেপরোয়া, নির্ভাবনা...

বলতে বলতে বিরলাজীর সেক্রেটারী এসে তিন হাজার টাকা দিয়ে গেলেন। উমা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল বলল : নাচতে জানলে নাচতাম মন্টুদা।

* * *

এই থেকেই শুরু হল আমার জীবনের এক নতুন পদক্ষেপ। গুরুদেবকে টাকাটা পাঠাতে তিনি আশীর্বাদ পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি ঠিক করলাম—আমার প্রাক্-যৌগিক জীবনে আমি যেমন চ্যারিটি কন্সার্ট করতাম এর ওর তার জন্যে, এখন থেকে চেষ্টা করব আশ্রমের জন্যেও গান গেয়ে কিছু টাকা তুলতে।

কিন্তু সেবার প্রাইভেট আসরে গান গেয়ে আশ্রমের জন্যে কিছু চাঁদা তুললেও পাবলিক আসরে গাইনি। তবে উমার দেহান্তের পরে বম্বে ও আমেদাবাদে গিয়ে গান গেয়ে প্রথম দশ হাজার টাকা নিবেদন করি গুরুচরণে। কিন্তু সে পরের কথা। উমার অধ্যায়টি শেষ করি—কেন যে এমন ফুলের মতন মেয়েকে এত দুঃখ পেতে হল......

এসব কথা বলেছি আমার 'ভূস্বর্গ-চঞ্চল' গ্রন্থে তথা আমার 'ছায়ার আলো' রমন্যাসে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ যার মৃত্যু-শয্যার ঘোর দুর্দশনে আমাকে কলকাতা পাঠিয়েছিলেন, তার কথা কিছু অন্তত না বললেই নয়।

* * *

১৯৩৭ সালে দু'মাস থাকব বলে মার্চ মাসে কলকাতায় গিয়ে উমার টানে পাঁচ মাস কাটিয়ে ফিরলাম আশ্রমে ১৫ আগস্টের দু'দিন আগে। গুরুদেবকে কলকাতা থেকে সব কথাই লিখতাম, তিনি আশীর্বাদও পাঠাতেন, তবে সংক্ষেপে। মাঝে মাঝে মনে আশঙ্কা যে আসত না এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। তবে প্রার্থনা করতাম—যখনই মনে হত পরমহংসদেবের কথা : 'সাধু সাবধান!' কিন্তু তারপরেই মনে হত—'পালিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাওয়া বিড়ম্বনা। অমর কবি নিশিকান্ত অকারণ লেখেননি :

পালাবি কোন্‌খানে তুই?
বাঁধনের জাল যে পাতা!
তারে না কাটিস যদি,
বৃথা তোর সাধন সাধা।

জীবনের পরীক্ষা হাজার কঠিন হলেও পাশ করতেই হবে—যদি পথচলায় দু-চারবার হোঁচট খেতে হয় তাহলেও। উমার ক্ষেত্রে আমার একটা মস্ত বাঁচোয়া ছিল এই যে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পরে আমার প্রথম মনে হয়েছিল—আমি তার পিতা সে আমার মেয়ে। তাই আমাদের উভয়েরই মন নির্মল ছিল, কারণ সে-ও আমাকে দিত সেই ভক্তি যা কন্যা দেয় তার পিতাকে, আমিও তাকে বরণ করেছিলাম পিতৃস্নেহেই বলব।

কিন্তু আসক্তির তো একটিমাত্র [illegible] নয় : পিতাও অত্যধিক কন্যামুখী হ[illegible] পুরোপুরি ভগবৎমুখী হতে পারে [illegible] এ-সনাতন সত্যটিও আমার জানতে [illegible] ছিল না, তাই থেকে থেকে প্রার্থনা জা[illegible]তাম : গুরুদেব এমন যদি হয় তুমি আমাকে ছাড়িয়ে নিও যেমন নিয়েছ আমার অন্য স্নেহাস্পদদের কাছ থেকে। কিন্তু প্রার্থনা করলেও আমি চাইতাম না এ-স্নেহ থেকে মুক্তি পেতে বিশেষ করে এই জন্যে যে, হাসি সব আগে ছিল আমার শিষ্যা। কে না জানে—শিষ্যও যেমন গুরুকে চায়, গুরুও তেমনি চান শিষ্যকে। আর এ-চাওয়া বড় মধুর দুদিক থেকেই, কেননা এ-সম্বন্ধের মূলে আছে একটি বিচিত্র উপলব্ধি, যার প্রথম পাদ হল—নিজের সৃষ্টিকে শিষ্যের বিকাশের মধ্যে নতুন করে দেখা, দ্বিতীয় পাদ—নিজেকে তার মধ্যে দেখা। এ আমার কথার কথা নয়, আমি তাকে যেসব গান শেখাতাম তার কলকণ্ঠে সে-সব গানের প্রতি মিড় মূর্ছনা ভাব ভক্তির উচ্ছ্বলনের আয়নায় প্রত্যক্ষ দেখতে পেতাম—আমি যেন জন্ম নিয়েছি তার মধ্যে। তাকে ভালোবেসে আমি সত্যিই উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম আত্মজা কাকে বলে। তাই আমি আরো বুঝতে পেরেছিলাম—কেন শ্রীঅরবিন্দ আমাকে "a friend and a son" বলে সনাক্ত করেছিলেন। একথা বলার উদ্দেশ্য নয় যে, আমি শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তি-রূপের প্রতিচ্ছবি, আমি বলতে চাই শ্রীঅরবিন্দ আমার মধ্যে কিছুটা দেখতে পেয়েছিলেন—শিষ্যের আধারে আত্মসৃষ্টির প্রতিফলন।

(ক্রমশ)

যুবক যুবতী

তনুশ্রী রাহা

বিবাহ ব্যবস্থা

মানুষ সামাজিক জীব। সেই অনাদি অতীত থেকে মানবজাতির সৃষ্টি অব্যাহত আছে। কেউ বা এই সৃষ্টির মূলে পরমপিতা ব্রহ্মের করুণা চাক্ষুষ করেন আবার কেউ আদম ও ইভের জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেন। বিজ্ঞানী তাঁর সন্ধানী দৃষ্টিতে সৃষ্টির উৎসে প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলন দেখতে পান। এভাবেই আমরা পৃথিবীতে আসি, প্রকৃতি ও পুরুষ শক্তির ক্রম অনুসারে কেউ পুরুষ আবার কেউ নারীতে রূপ পরিগ্রহ করি। সংসারজীবনে নারী পুরুষের মিলন অনিবার্য, না হলে মানবজাতি অবলুপ্ত হবে। মননশীল মানুষের মধ্যে নারী ও পুরুষের বন্ধন রচনার যে সামাজিক বিধি রয়েছে তারই নাম বিয়ে। দুয়ের জীবন সুন্দর করার জন্যই বিয়ে দরকার। কেউ হয়তো বলবেন, নারী প্রকৃতিগতভাবে অবলম্বননির্ভর। তার পরিপূর্ণ বিকাশ পুরুষকে অবলম্বন করেই। জীববিজ্ঞানী তাঁর চুলচেরা বিচারে দেখাবেন সৃষ্টি ও জৈবিক প্রয়োজনেই বিয়ে। আজকের সমাজে যুবক যুবতীদের বিয়ে নিয়ে অনেক সমস্যা —রূপ গুণ অর্থ আরো কত কি! যুবক যুবতীরা এ বিষয়ে কতদূর কি ভাবছেন জানা যাক।

নদীয়া জেলার গঙ্গামনোহরপুর গ্রামের পল্লীবালা বীণা গুহর সঙ্গে কথা হল। বিয়ের গল্প তুলতে লজ্জায় তার মুখ হয়ে উঠলো লাল। কোনমতে সে ভাবটা কাটিয়ে উঠতে হেসে বললাম—আচ্ছা বীণা, আজকে যদি তোমায় একটা বয়স্ক লোকের সঙ্গে তোমার বাবা বিয়ে ঠিক করেন তুমি রাজী হবে?

—ধেৎ, বাবা তা করবেন কেন? এখন কি সেই যুগ আছে যে ঘাটের মড়া বুড়োর সঙ্গে নাবালিকার বিয়ে হবে?

—ধরো যদি এমনটি হয় ......

—আমি কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলবো, না খেয়ে থাকব। তবে আজকাল এমন ঘটনা গ্রামেও কম ঘটে। পাড়ার ছেলেরা তাহলে বুড়োকে মেরে ঠাণ্ডা করে দেবে।

পোষাকে আশাকে চাল-চলনে গ্রামেও তো শহরের ছোঁয়াচ দেখছি, লাভ ম্যারেজ শুরু হয়নি—জিজ্ঞাসা করি।

—হ্যাঁ, তবে খুব কম। তেমন সাহসী ছেলেমেয়ে না হলে লাভম্যারেজ করা গ্রামের সমাজে কঠিন।

—কেন বলো তো!

—যখন থেকে কাপড় ধরেছি তখন থেকেই গ্রামের রাস্তায় মা বাবা একা চলতে দেন না। বড় ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দেন না। একা কোন ছেলের সঙ্গে কথা বললেও লোকে কানাঘুষো আরম্ভ করে।

—এতসব ঝামেলা, তাহলে লাভম্যারেজ হয় কি করে?

দু-একজন বেপরোয়া ছেলে মেয়ে আছে, তারা লুকিয়ে লুকিয়ে চিঠি দেয় দেখা করে। দরকার হলে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে রেজিস্ট্রী করে।

—তোমার কি ইচ্ছে?

এবার লজ্জায় সে মুখ ঘুরিয়ে নিল। আস্তে আস্তে জানালো—মা বাবা যেখানে দেখে দেবেন ......

বীণা গুহ

অর্থনৈতিক জীবনের রূঢ় বাস্তবতায় ছেলেমেয়েরা প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বিয়ে করতে চাইছে না। যারাও করছে তারা খুঁজছে চাকুরীরতা পাত্রী। অন্য আরো একটা জিনিষ লক্ষ্যণীয় যে সব পাত্রপক্ষই সুন্দরী ফর্সা পাত্রী চাইছেন। অন্যদিকে পাত্রীপক্ষ খুঁজছেন ভালো পাত্র—ব্যাঙ্ক কর্মী চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, ডাক্তার এই সব। তাহলে দুটো জিনিস দু পক্ষ থেকে আসছে। রূপ আর অর্থ। রূপ জিনিসটা ভগবান প্রদত্ত। সেই জন্মলগ্ন থেকে চলে আসছে। শ্যামবর্ণা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা মেয়ের ছড়াছড়ি আমাদের দেশে। সবাই যদি ফর্সা সুন্দরী মেয়ে ছাড়া বিয়ে না করে, এদের কি হবে? এই প্রশ্নের সমাধান চাইলাম কলকাতার শ্রীবাবলু বসাকের কাছে। বয়সে তরুণ, আদর্শবাদী। আমার প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ মাথা চুলকে ভাবলেন, তারপর বললেন, বলতে পারি তবে আপনি যদি না হাসেন...

আমি বললাম—না না হাসব কেন, আপনি নিঃসংকোচে বলুন।

—না না বলবো না। এই প্রস্তাব শুনে সবাই আমাকে যাচ্ছেতাই বলবে।

—ভয় কি, আপনার মনের কথা আপনি বলবেন না?

—তাহলে শুনুন। নিজেদের মধ্যে একটা আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং থাকলে কালো মেয়েদের বিয়ে নিয়ে কোন সমস্যাই দেখা দেবে না। যেসব যুবক বন্ধুরা সুপুরুষ ফর্সা তারা অপেক্ষাকৃত শ্যামবর্ণা তরুণীদের বিয়ে করবেন আর যেসব তরুণী সুন্দরী ফর্সা তারা একটু কম সুন্দর কালো যুবকদের বিয়ে করবেন তাহলে কোন ঝামেলাই হবে না।

—হঠাৎ আপনার মাথায় এ বুদ্ধি এলো কেন? আর কেনই বা আপনি ফর্সা-কালোর সংমিশ্রণ করছেন?

—সুন্দরের প্রতি সবারই একটা সহজাত আকর্ষণ আছে। তবে ফর্সা-কালো

মিশে থাকলে একটা সৌন্দর্য সাম্যের সৃষ্টি হবে—কারো কোনো খেদ থাকবে না। তাছাড়া...

—কিছু বলতে চাইছেন?

—আজকের ছেলেরা সবাই ফর্সা মেয়ে বিয়ে করতে চায়, যাতে তাদের ছেলেমেয়েরাও ফর্সা হয়। তাই ফর্সা-কালো মিলে থাকলে ভবিষ্যতেও ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে অসুবিধা হবে না।

—ভারী মজার প্রস্তাব তো! তবে এই ত্যাগ কি সহজে আমরা করতে পারব? এটাই সন্দেহ।

—চেষ্টা করলেই সম্ভব হবে। আমি নিজেও প্রস্তুত, বন্ধুদেরও সেকথা বলছি।

—ওঃ। কিন্তু আপনার ভাগে ফর্সা মেয়ে পড়ছে, তাই হয়তো আপনার এতো উৎসাহ!

—না না তা নয়।—হাসতে হাসতে জবাব দিলেন।

সত্যি কালো মেয়ের বিয়ে নিয়ে যা সমস্যা তাতে বাবলুবাবুর এ ধরনের প্রস্তাব খারাপ কি!

আমাদের দেশে বিয়ের সঙ্গে আরো অনেক সমস্যা জড়িয়ে আছে। এর মধ্যে সব-চেয়ে বড় হল পণপ্রথা ও যৌতুক সমস্যা। আমার এক বন্ধু (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) পণপ্রথার স্বপক্ষে। তার যুক্তি, টাকার জোরে অনেক অচল মেয়েও বাজারে চলে যায়। পণপ্রথা উঠে গেলে সে সব মেয়ের বিয়ে হবে না। তাছাড়া অনেক অর্থ শেষ করে পড়াশুনা চাকরী পেয়ে তার রিওয়ার্ড হিসাবে পণের টাকা ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। এতে ধনবৈষম্যও কিছুটা কমবে। তার মতে, বন্ধু মহলে কার বিয়েতে কে কত টাকা বা কি পেয়েছে এর ওপরে অনেক সময় পদ-মর্যাদা নির্ভর করে। আর এক বন্ধু (বাবার ভয়ে নাম লিখতে বারণ করেছে) অভিযোগ জানিয়েছে, সে বিয়েতে নগদ টাকা থেকে শুরু করে কিছুই চায় নি, তবে তার মা-বাবা অনেক সময় দ্বিমুখী আপাতবিরোধী মনোভাব পোষণ করেন। যখন মেয়ের বিয়ের ব্যাপার, তখন তাঁরা পণপ্রথা ও যৌতুকের ঘোরতর বিরোধী; কিন্তু ছেলের বিয়ের বেলায় এর প্রকট সমর্থক। আজকের যুবক-যুবতী এ নিয়েও মাথা ঘামান। বিবেকানন্দ রোডের শ্রীঅসিতকুমার ঘোষের সঙ্গে কথা হলাম।

—আচ্ছা মিঃ ঘোষ, আপনি তো বিয়ে করেছেন...

—না, না এখনো ও পাট হয় নি—মুচকি হেসে প্রতিবাদ জানালেন।

—ওঃ সরি, ঠিক আছে, একদিন তো বিয়ে করবেন, আপনি কি পণপ্রথা সমর্থন করেন?

—না, আমি কখনো এটা সমর্থন করি না। আমার বিশ্বাস সমাজের যে পর্যায়ে মেয়ের বাবার অসহায় অবস্থার মধ্যে পণ-প্রথার জন্ম হয়েছিল সেই স্তর থেকে আমরা এখন অনেক এগিয়ে এসেছি।

অনেকে আবার পণ চান না, তবে কিছু নগদ টাকা আর সাজিয়ে-গুজিয়ে বিয়ে দেবার প্রস্তাব করেন—এ বিষয়ে আপনি কি বলেন?

—এটাও ঠিক পছন্দ করি না। তবে যাদের সামর্থ্য আছে তারা নিশ্চয়ই এসব বিষয়ে অরাজী হন না। তবে এ বিষয়ে অভিভাবকদের মন আরো উদার না হলে অনেক সময় নিজের ইচ্ছে থাকলেও ছেলে-মেয়েরা কিছু করতে পারে না।

—দেনাপাওনার ব্যাপারটা আপনি কি চোখে দেখেন?

—আমি দিদিদের বিয়ে দিয়ে ফতুর হয়ে গিয়েছি। ও বিষয়ে আর কি বলব। তবে এটুকু বলতে পারি জোরাজুরি না করে তাদের ইচ্ছার ওপরই ছেড়ে দেওয়া ভালো।

—এমনও তো আছে, কিছু না চাইলে অনেক মেয়েপক্ষ কিছুই দেন না। বিয়েতে জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়ার একটা সুযোগ সবাই ছাড়তে রাজী হবে কি?

হ্যাঁ এ ধরনের ঘটনাও ঘটে। তবে সামর্থ থাকলে সাধারণত কোন বাবা-মাই মেয়ে-জামাইকে খালি হাতে বিয়ে দেন না।

আমাদের যে ম্যারেজ সিস্টেম চলে আসছে তার কি কোন পরিবর্তন আপনি আশা করেন?

—দিন দিন সব কিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে। এটাও পাল্টাবে সন্দেহ নেই। অগ্নি-সাক্ষী-করা বিয়ের পিঁড়ি থেকে অনেকেই এখন কোর্টে রেজিস্ট্রেশন করছেন। আজকের দুর্দিনে লোক-লৌকিকতা করে এতো অপচয় না করাই ভালো।

—বিনিময় বিয়ে আপনার কেমন লাগে?

—মন্দ কি, হয়তো কারো ছেলে ভালো, কিন্তু মেয়ে তেমন নয়। আবার অন্য কারো হয়তো ঐ ধরনের সমস্যা। তারা উভয় বিনিময় প্রথায় বিয়ে দিতে পারেন। অনেকেই করছেন।

অমরাবতীর অষ্টাদশী তরুণী তনুশ্রী রাহার সঙ্গে দেখা হল। সুন্দর মুখশ্রী স্নিগ্ধ সুগঠনা দীর্ঘাঙ্গী মুখে চপল হাসি। বিয়ের কথা বলতে অত লজ্জা নেই। জানালেন—জানেন আমার বিয়েতে আমি খাট ফার্নিচার-পত্র কিছুই নেব না। যে ছেলে নগদ টাকা চাইবে তাকেও বিয়ে করব না। তবে মার কাছ থেকে সব গয়নাপত্র আদায় করে নেব।

—ছেলের বেলায় সব ফাঁকি—আর নিজের বেলায় সব কিছু? মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করি, কোনো কিছু ঠিকঠাক করেছেন নাকি?

—তেমন কিছুই এখনো করি নি। তবে লাভ-কাম সোস্যাল ম্যারেজ আমার পছন্দ। জীবনে এমন কিছু ঘটলে মা-বাবার সম্মতি-ক্রমেই সব কাজ হবে।

—মা মাসীদের যেভাবে বিয়ে হয়েছে সে বিয়ে আপনার পছন্দ নয়?

—পুরো অপছন্দ নয়, তবে খানিকটা। আজকের যুগে আমার অজ্ঞাতসারে আমার পতিদেবতার নির্বাচন হয়ে যাবে এটা ভাবাই যায় না। সবচেয়ে বাজে লাগে দেখা-শোনার পালাটা। যে আসবে তার সামনেই সেজে-গুজে বসতে হবে......বিশ্রী! মেয়েরা কি এখনো সব দয়ার পাত্রী?

বাবলু বসাক

আসিতকুমার ঘোষ

তনুশ্রী দেবীর বন্ধু পাশেই ছিলেন। বনানী দেবী প্রতিবাদ জানালেন। তার মতে মেয়েদের ভালোমন্দ মা-বাবাই ভাল বোঝেন। নিজেরা বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদও তাই এতো বাড়ছে। বলুন—সব মেয়ের পক্ষে তো আর প্রেমিক জোটানো সম্ভব নয়। আর সব ছেলেরাও প্রেমিকা খুঁজে পায় না। তাদের বিয়ে এভাবে দেখে-শুনেই হয়।

—তোর যত সেকেলে চিন্তা। তনুশ্রী দেবী প্রতিবাদ করলেন। যেখানে ভুল বোঝাবুঝি, হৃদয় নেই — প্রকৃত ভালবাসা নেই, স্বার্থের হিসাব-নিকাশ সেখানে মোহ কাটলেই বিবাদ বিচ্ছেদ আসে সর্বত্র নয়।

বনানী দেবী এবার বলে ওঠেন—ওর কাছে গন্ধর্ব মতে বিয়ে আরো থ্রিলিং। চোখে মুখে তার রাগের চিহ্ন।

—না না, জোর করে নিয়ে বিয়ে করা বর্বরতা—একেবারেই অচল। যদি আমাদের সমাজে স্বয়ংবর প্রথা আবার চালু হয়? জিজ্ঞাসা করি।

—বিপদ আছে, যদি অচেনা ছেলেরা আসে- বিয়ের লোভে কিছু বদমায়েস এসে জোটে? তবেই মুস্কিল। মজা করতে গিয়ে ইহকালটা কেঁদেই মরতে হবে। আর বেকার ছেলে হলে দুজনে না খেয়ে স্বয়ংবরসভায় শ্রাদ্ধ করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

—অমর দাস

করেছি। এমনকি যে সরষে নিয়ে এত বিতর্ক সে সরষের মধ্যে ভূত। 'চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিনী' প্রবন্ধেও শব্দটি ব্যবহার করেছি। আশ্চর্য দে মহাশয়ের নজরে কিছুই পড়ে নি। তাহলে কি প্রবন্ধটি ভালভাবে না পড়েই তিনি দু'টি দীর্ঘ পত্র লিখেছেন? আলোচ্য যক্ষিনী প্রসঙ্গে দশচূড় শব্দটি ব্যবহার করা নিতান্তই ভুল একথা কিন্তু কখনও বলি নি—এখনও বলি না। বরং আলোকচিত্রের পরিচয় 'পঞ্চচূড় যক্ষিনী' শব্দ ব্যবহার করায় দে মহাশয় তাঁর প্রথম পত্রে লিখেছিলেন—'সে দু'টি আসলে দশচূড় যক্ষিনী'। বর্তমান পত্রলেখকের বক্তব্য ছিল, এগুলি আসলে পঞ্চচূড়। কারণ পাঁচটি আয়ুধের ডুপ্লিকেশনের ফলে দশটি আয়ুধের সৃষ্টি হয়েছে। তবে বিভিন্ন প্রবন্ধে সাধারণ পাঠকদের (এবং দে মহাশয়ের মত মূর্তিতত্ত্ব শিক্ষানবীশদের) কথা মনে রেখে পঞ্চচূড়ের সঙ্গে দশচূড় শব্দটি ব্যবহার করেছি।

(৫) পরিশেষে দে মহাশয় বর্তমান পত্রলেখকের একটি প্রবন্ধে (নিমজ্জিত নগরী হরিনারায়ণপুর) ব্যবহৃত একটি আলোকচিত্র সম্পর্কে চায়ের পেয়ালায় ঝড় তুলেছেন। এ অজুহাতে তিনি নানা রূঢ় ও অসত্য মন্তব্যও করেছেন। শ্রীদে লিখেছেন 'ধরা যাক অসাবধানতা বশতঃ ছবি ছেপেছেন কিন্তু প্রবন্ধের ওই লিখিত অংশটি?' শ্রীদে ব্যক্তিগত পত্রটির ফটোস্টাট কপি ছাপাবার হুমকিও দিয়েছেন। এ বিষয়ে অমৃত-পাঠক সমাজের নিকট কিছু বক্তব্য নিবেদন করি, পাঠকগণই বিচার করুন—(ক) দে মহাশয় পত্র দিলে আলোকচিত্রের ত্রুটি অকপটে স্বীকার করি। শ্রীদে প্রশ্ন তুলেছেন—'প্রবন্ধের ওই অংশটুকু?' এর উত্তর দে মহাশয়কে লিখিত ঐ পত্রেই রয়েছে। সেখানে লিখেছিলাম যে হরিনারায়ণপুরে প্রায় অনুরূপ একটি ভগ্ন সূর্য মূর্তির পাদপীঠ পাওয়া গেছে। দে মহাশয় এ অংশটুকু প্রকাশ করেন নি। চিঠির ফটোস্টাট কপি প্রকাশ করুন লেখকের বক্তব্য সত্য বলে প্রমাণ হবে। শ্রীদে এ বিষয়ে অসত্যের আশ্রয় নিয়েছেন। কয়েক শত নেগেটিভের মধ্যে প্রায় একই ধরনের দু'টি ভগ্ন সূর্য মূর্তির আলোকচিত্র থাকাতে এ ত্রুটি ঘটেছে। প্রবন্ধে পরিবেশিত তথ্যে কোন ভুল নেই। সামান্য আলোকচিত্রের ভুলের জন্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি নি। বিশেষতঃ যখন মূর্তি দু'টি প্রায় একই রকম ও পাশাপাশি অঞ্চলের। (খ) শ্রীদে কেন তখন এই ত্রুটি অমৃত-পাঠকের দৃষ্টিগোচর করেন নি? এক ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনিই বা কেন লক্ষ লক্ষ পাঠকের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছেন? আর আজ কোন স্বার্থের সন্ধানে দীর্ঘ দু' বছর পরে তার এ ন্যায়বোধ বিকশিত হল? (গ) শ্রীদে প্রবন্ধকারকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। ব্যক্তিগত পত্র যিনি লেখেন ও যাঁকে লেখেন উভয়েরই সম্পত্তি। উভয়ের অনুমতি ভিন্ন তা প্রকাশ করা কোন্ সভ্য সমাজে বিশ্বাস রক্ষার কর্ম? (ঘ) শ্রীদে বর্তমান পত্রলেখককে সত্যকে বিকৃত করার দায়ে দায়ী করেছেন। তাঁর মতে প্রত্নচর্চা যাঁরা করেন তাঁরা দায়িত্বশীল ও নির্ভরশীল হবেন। বর্তমান পত্রলেখকের গবেষণা ও রচনার ওপর দে মহাশয় যে কতটা ভরসা রাখেন, দে মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে তার প্রমাণ দিচ্ছি। কিছুকাল আগেও তিনি পত্রলেখককে লিখেছেন—'তুমি যে কাজ করেছ বা করছো তার মূল্য অপরিসীম।' দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের বন্ধুকে তিনি কি তাহলে 'ধাপ্পা' দিয়েছেন?

গৌরীশংকরবাবু বা তাঁর নিকট পরিজনের লেখা কিছু পত্র যে বর্তমান পত্রলেখকের কাছে নেই এমন নয়। সে সব চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কুরুচি ও অসামাজিক কাজে অনীহা আছে। নবকুমার প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যকে অনুসরণ করার মত বাঙালী এখনও আছে—'তুমি অধম বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন।'

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-৩১।

প্রাকৃতিক সম্পদ ও আমরা

গত ৬ ডিসেম্বর সংখ্যায় আমার উপযুক্ত শিরোনামসহ পত্র প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ। সামগ্রিকভাবে আমার বক্তব্য ভারতের মত উন্নতিশীল দেশগুলোর প্রাকৃতিক (মূলত খনিজ) সম্পদ সংরক্ষণের ব্যাপারে অত দৃঢ় মনোভাব না নিলেও চলে। উন্নত দেশগুলো যখন এইসব সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারের সব পথ নিঃশেষ করেছে তারপর এগুলোর সীমার ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে সংরক্ষণের ওপর জোর দিচ্ছে। অবশ্য জনমতের চাপ আছে বৈকি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এক টন আভ্যন্তরিক কয়লা উত্তোলনের জন্য বর্তমানে আবাদযোগ্য জমি নষ্ট করতে হয় প্রায় ৪৭৬৪ একর। অতএব সে দেশে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ত থাকবেই। কিন্তু আমাদের দেশে যদি বিশাল সম্পদ কাজে না লাগাই সংরক্ষণের জুজো ধরে তবে আমাদের এই দুঃসহ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ত আরও পিছিয়ে পড়বে। ১৯৭২-এ স্টকহোমে অনুষ্ঠিত সভায় ব্রাজিলের প্রতিনিধি প্রকাশ্যেই বলেছিলেন যে উন্নতিশীল দেশগুলির সংরক্ষণের জন্য অত মাতামাতি করা উচিত না কারণ আমাদের অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ কাঁচামাল ব্যবহারের ব্যাপারে 'Technological backwardness' অর্থাৎ আমাদের প্রধানত দৃষ্টি দিতে হবে এগুলোর সবচেয়ে উপযোগী ব্যবহারের ওপর। এ-ছাড়া উন্নত দেশগুলো যারা এতকাল প্রায় সমগ্র বিশ্বের ওপর প্রভুত্ব করে এসেছে তাদের কাছে এটি মোটেই সুখের নয় যে অনুন্নত দেশগুলো কাঁচামালের সরবরাহকারী হিসেবে বিশ্বের অর্থনীতির গতি নিয়ন্ত্রণ করুক। সুতরাং সম্পদ থাকলেই যে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে হবে তাও নয়। তবে আমাদের প্রয়োজন ও ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগুলো ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়।

সেদিক দিয়ে বিচার করলে আমাদের আকরিক লোহা রপ্তানী না করার কোনো কারণ নেই। এ বছর আকরিক লোহা রপ্তানী করে আমরা পাব প্রায় ২০০ কোটি টাকা সে জায়গায় ফিনিশড লোহা ও ইস্পাত বাইরে পাঠিয়ে পাব প্রায় ৪০ কোটি টাকা। যতদিন না বিশ্বের বাজারে ফিনিশড মালের চাহিদার সুযোগ নিতে পারছি ততদিন আকরিক লোহা আমাদের রপ্তানী করতে হবে। এর জন্য এদেশে এর অভাবের কোন কারণ নেই। যোজনা কমিশনের হিসেব অনুযায়ী ১৯৭৮-৭৯ নাগাদ আমরা উৎপন্ন করব প্রায় ৬৫ মিঃ টন আকরিক লোহা তার মধ্যে মাত্র ১৮ মিঃ টন লাগবে এদেশের কারখানাগুলির জন্য। এ জন্য এম এম টি সি ও গোয়ার খনির মালিকেরা প্রায় ৫৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন। অথচ তাঁদের বক্তব্য তাঁরা উপযুক্ত দাম পাচ্ছেন না। ফলে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। অথচ সম্প্রতি জয়পুরে অনুষ্ঠিত ইন্দো-জাপান বিজনেস কমিটির বৈঠকে জাপ নেতা অভিযোগ করেছেন যে ভারত প্রতিশ্রুত সরবরাহের ৬০ শতাংশও ঠিক সময়ে সরবরাহ করতে পারে না। মনে রাখতে হবে জাপান আমাদের মোট আকরিক লোহার ৮০ শতাংশ ক্রেতা। ফলে আমরা জাপানের বাজার হারাতে বসেছি। কিছুদিন আগে জাপানের মোট চাহিদার ৩০ শতাংশ সরবরাহ করতাম আমরা। বর্তমানে এটি কমে দাঁড়িয়েছে ১২ শতাংশ-এ এবং ১৯৮০ [illegible] এটি মাত্র ১০ শতাংশ-এ দাঁড়াবে। অথচ এই সময়ে জাপান তাঁদের আকরিকের আমদানী বাড়াবে ১৫০ মিঃ টন থেকে ১৮৫ মিঃ টনে এবং বর্তমানে বিশ্বের বাজারে যে মোট গড়ে ৩৩০ মিঃ টন আকরিক লোহার ক্রয়-বিক্রয় হয় সেটি এই সময়ে বেড়ে দাঁড়াবে ৫৩৬ মিঃ টনে এবং ১৯৮৫ নাগাদ ৬৮৮ মিঃ টনে। অর্থাৎ উপযুক্ত মূল্যে ও ঠিক সময়ে সরবরাহ করতে পারলে আমরা এ থেকে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা পেতে পারব। শুধু তাই নয় ইতিমধ্যে ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ১০৫০ মিঃ টন (১৯৮০) এবং ১২৭৫ মিঃ টন (১৯৮৫ হিসাব ইন্টারন্যাশনাল আয়রণ ও স্টীল ইনস্টিটিউট লন্ডন)। অর্থাৎ আমাদের এখন থেকেই এর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। শুধু আকরিক লোহা নয় অন্যান্য খনিজ দ্রব্য যথা বক্সাইট ম্যাঙ্গানীজের আকরিক ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই যতটা পারা যায় সুযোগ নিতে হবে। সম্প্রতি জাপান এই রকম আভাসও দিয়েছে [illegible] আকরিক লোহা ও অন্যান্য [illegible] সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। উপযুক্ত মূল্যে

সরবরাহ করার জন্য তাঁরা দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তিও করতে চান। ইতিমধ্যে অবশ্য আমরা যন্ত্রে ফিনিশড মাল রপ্তানী করতে পারি তার চেষ্টা নিশ্চয়ই করতে হবে। এই সঙ্গে জাপান ছাড়া অন্যান্য দেশেও রপ্তানীর চেষ্টা করতে হবে। সম্প্রতি ইউরোপের ও আমেরিকার বাজারে ভাল দামে আমরা আকরিক লোহা সরবরাহের বরাত পেয়েছি। এ জন্য আরও চেষ্টা চালাতে হবে যাতে বিশ্বের বাজারের একটা ভাল অংশ আমরা দখলে রাখতে পারি। এর জন্য ক্রেতা দেশগুলির সঙ্গে
Time-bound tie-up Co-operation
-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দিন দিন প্রতিযোগিতা তীব্রতর হচ্ছে। কোন আদর্শগত কারণ দেখিয়ে সেদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে আমাদের পক্ষে আত্মঘাতী হবে। উপযুক্তভাবে এগোতে পারলে (যা নিশ্চয়ই সম্ভব) ১৯৭৮-৭৯ নাগাদ আমরা এইসব রপ্তানী করেই প্রায় ৭০০।৮০০ কোটি টাকা পেতে পারি। তার জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন এখনই।

দেবাদিত্য চক্রবর্তী
পদার্থ বিদ্যা বিভাগ আই আই টি
খড়্গপুর-২।

যুব হতাশা

অমৃতে পত্রিকার ১৮ পৌষ সংখ্যায় যুবক-যুবতী-তে 'যুব হতাশা' সম্বন্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সবিতা রায় যা বলেছেন দাদার সংসারে সে গলগ্রহ হয়ে আছে। লেখাপড়া শিখে চুপচাপ অথর্ব হয়ে সব হজম করতে কষ্ট হচ্ছে' দেখে আমি বিস্মিত হলাম।

আর এক সাক্ষাৎকারে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্রী শিখা দাস নিজেই স্বীকার করেছেন, কালো মেয়ের বিয়ে দেওয়া সোজা নয়। কালো কারো পছন্দই হয় না। দেখে মর্মাহত হলাম। বিয়ে ছাড়া কি অন্য সার্থকতার রাস্তা নেই?

আধুনিক কালের মেয়েরা যুগের সঙ্গে তাল রেখে নিজের পায়ে এগিয়ে যাবেন এই তো নিয়ম। কেউই তাঁদের বাধা দেবেন না বা দেবার সাহস পাবেন না। কিন্তু তাঁরা নিজেরাই একটা প্রাচীর তুলে সে-বাধা টপকাতে পারছেন না। বিয়ে না হবার জন্যে যুবকেরা তো হতাশ হন না। অনেকেই বিয়ে করতে পারেন না, এবং চাকরী না পেয়ে ব্যবসাতেও নেমে পড়ছেন। বেকার যুবতীরাও সেইরকম হতাশায় না ভুগে যুবকদের সঙ্গে তাল রেখে কোনো একটা স্বাধীন ব্যবসাতে নেমে পড়ছেন না কেন? সামান্য একটা চাকরীর স্থায়িত্ব আছে, কিন্তু তাতে কি সংসার চলে? বরং নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্ব-উপার্জিত অর্থে কারও গলগ্রহ না হয়ে বাঁচার চেষ্টা করা ভালো নয় কি!

এ-সম্বন্ধে সত্তর দশকের যুবতীদের আপত্তিটা কোথায়?

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
আসানসোল বর্ধমান

সেকালের সংগীতগুণী

'সেকালের সঙ্গীতগুণী' নিবন্ধে অতীতের ইতিহাসের ছড়িয়ে থাকা ঘটনা ও শিল্পীদের সাধনার নানা কাহিনীকে সযত্নে কুড়িয়ে এনে সুন্দর একটি মালা গেঁথে শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় যথার্থ সঙ্গীত-সাধকের ব্রত সম্পন্ন করছেন। সঙ্গীত-রসিকদের পক্ষ থেকে তিনি আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। লেখার ভঙ্গী আন্তরিক বলেই কৃত্রিমতা আড়ষ্ট নয় এবং সেইজন্য এত জীবন্ত। অমৃত পত্রিকা প্রগতিশীলতা ও ঐতিহ্যের মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে, যেসব শিল্পীরা (দিশরকণা, বাহাদুর খাঁ প্রমুখ) প্রথম শ্রেণীর গুণী হয়েও নানান উদ্দেশ্যমূলক কারণে সংগীতসমাজে অবহেলিত, অমৃতে পত্রিকা তাঁদের প্রতি যথার্থ সম্মান দেখিয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'সেকালের সঙ্গীতগুণী'র একটি বিশেষ মূল্য আছেই। তাছাড়া সে যুগের সামাজিক প্রথা ও পটভূমি সম্বন্ধেও অনেক চমকপ্রদ তথ্যও এতে আছে। ইতিহাস তার দাম দেবে।

আমার একটি অনুরোধ। জগদীপকে গুণীসমাজের দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে দেওয়া হোলো কেমন করে সে সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে তিনি বলুন।

সন্ধ্যা সেন

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

কিছুকাল আগে 'অমৃতে' পত্রিকায় অমল সেনগুপ্ত ভবানী মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধের প্রসঙ্গেই অসিতকুমার হালদারের একটি লেখা উদ্ধৃত করে প্রশ্ন তুলেছেন—রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' না 'পণ্ডিত মশাই' কোন্ বইটা প্রথম পড়ে শরৎচন্দ্রের লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন? এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—প্রথমতঃ পণ্ডিত মশাই প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগেই যিনি 'ভারতী'তে বড়দিদি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন ভারতীর তৎকালীন সহকারী সম্পাদক সেই সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য' গ্রন্থে লিখেছেন—পাঠকদের কৌতূহল জাগাবার জন্য সম্পাদিকা সরলা দেবীর নির্দেশে ভারতীতে প্রথম দু-মাস লেখকের নাম ছাড়াই বড়দিদি প্রকাশিত হলে তখন বড়দিদি পড়ে রবীন্দ্রনাথ লেখকের নাম জানবার জন্য আগ্রহান্বিত হন। ঐ সময় অবনীন্দ্রনাথের জামাতা সৌরীনবাবুর বন্ধু মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় একদিন সৌরীনবাবুকে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন—বড়দিদি এঁরই এক বন্ধু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। রবীন্দ্রনাথ তখন সৌরীনবাবুর মুখে শরৎচন্দ্রের কথা শোনেন এবং শরৎচন্দ্রের লেখারও প্রশংসা করেন।

সৌরীনবাবু এই যে কথাটা লিখেছেন এ-কথা মোটেই অবিশ্বাস করার মত নয়। কারণ ভারতী রবীন্দ্রনাথের বাড়ীর কাগজ। তাই যে যখনই এর সম্পাদনা করুন না কেন ভারতী বেরুলে এক কপি করে যে রবীন্দ্রনাথের কাছে যেত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোন পত্রিকা বিশেষ করে বাড়ীর পত্রিকা হাতে এলে সেটা উল্টে পাল্টে দেখাও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বাভাবিক। তার কাগজে যেখানে প্রত্যেক লেখার সঙ্গেই লেখকের নাম আছে অথচ একটা বড় লেখায় নাম নেই, ক্রমশঃ হয়ে বেরুচ্ছে এবং এটা কার লেখা এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল হওয়াও স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ এ সম্বন্ধে আরও একটা কাহিনী যা শুধু সৌরীনবাবুর বা অন্য কারও লেখাতেই নয় একরূপে লোকের মধ্যে প্রচলিত হয়ে আসছে সেটা হল—নবপর্যায় 'বঙ্গ-দর্শন' তখনও প্রকাশিত হচ্ছে। তবে রবীন্দ্রনাথ তখন সম্পাদনার ভার ত্যাগ করেছেন। সহকারী সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদক হয়েছেন। ঐ সময় ভারতীতে বড়দিদির লেখা [illegible] শৈলেশবাবু [illegible] [illegible] আপনি [illegible] [illegible] ছিলেন না [illegible] [illegible] রবীন্দ্রনাথ শৈলেশবাবুর [illegible] [illegible] আমার লেখা [illegible] [illegible]। কোন পত্রিকায় [illegible] লেখা। কিন্তু লেখক [illegible] না।

তৃতীয়তঃ ১৯১৩ সেপ্টেম্বরে পণ্ডিত মশাই প্রকাশিত [illegible] শরৎচন্দ্রের বড়দিদি [illegible] ও অন্যান্য [illegible] বইগুলি প্রকাশিত হয় [illegible] ও [illegible] অন্যান্য [illegible] ১৩১৯ (১৯১৩) [illegible] মাসে [illegible] গল্প [illegible] বিরাজ হয়ে পড়েন। [illegible] প্রশংসা [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] গল্পের [illegible] সাহিত্যিক [illegible] রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিত মশাই [illegible] [illegible] দেখা নিশ্চয়ই পড়েছিলেন।

এখন অসিতবাবুর লেখাটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য [illegible] চারুবাবু রবীন্দ্রনাথের হাতে পণ্ডিত মশাই দিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিত মশাই পড়ে প্রশংসা করেছিলেন এ-সবই সত্য, কিন্তু অসিতবাবু যে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে চিনতে পারেননি না এ সম্বন্ধে আমার মনে হয় অসিতবাবু বহুকাল আগের কথা স্মৃতি থেকে লিখতে গিয়েই এটুকু ভুল করেছেন।

গোপালচন্দ্র রায় কলকাতা-১২।

জোনাকিও পড়লে পোড়ে, হায়

—সত্য গুহ

এবার বিদায় বলো, গঙ্গাও তো ছুটে যায় সমুদ্র-সংগমে
তোমার বিশ্বাস প্রেমজনিত শরীর সহ হৃদয়ের দাগ
পুণ্য হয় ঠাণ্ডা-কাম গঙ্গার কর্দমে—জলে, ভুলে যাওয়া যায়
গৈরিক পলিতে স্মৃতি, রক্তিম আহ্লাদী ক্ষত মুখের—স্তনের
উঠে যায় স্নানে, জানো, ধুয়ে যায় তলপেটের আলপনা অবধি
ঝরঝরা শরীর গঙ্গা, বেণী শুকনো, শান্তনুর ভালোবাসা ছেঁড়া
গতিবেগে শরীরের বজায় সতীত্ব, তুমি ইচ্ছা করো, নদী
তেমন চূড়ান্তভাবে সঙ্গম পিয়াসী শুধে ঋণ চুল-চেরা
কয়েক বর্ষের তীব্র কামার্ত খেলার, বলো, দিয়েছ সোহাগ
কৃতজ্ঞতা তার জন্য, ভালোবেসে পড়েছিনু ক' ঋতু বিভ্রমে
জীবন বদল করে নিয়েছ গঙ্গার সঙ্গে, কী মূল্য প্রেমের
ব্যাঙ্কারের ভল্টে ভরা সোনাদানা জহরত বিয়ের কুসুম
তোমার ফুলশয্যা হবে—মালা হবে, আর কি চাই; নির্জন নিঝুম
দোলন-চাঁপার বুক, মোম ছাড়, জোনাকীও পড়লে পোড়ে হায়॥

নিস্তার পর্বের কবিতা॥

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

জানি তোমার বৈরাগ্যের উৎস   অচরিতার্থের অভিমান
অফলপ্রসু বোধিদ্রুমে

স্বপ্ন-মন্থনে উঠে এলো কবন্ধ
আর উত্থিত অমৃতে নেই অধিকার তোমার স্বেদ-মন্থিত অমৃতের
তুলে নিয়েছে বিষভাণ্ড ওই হাতে
শিরায়োপশিরায় ওই হাতে প্রভুর ইঙ্গিতে
শিখে নিয়েছো নিবৃত্তি যা হৃতসর্বস্বের প্রেতপুরাণ
তোমার নির্মাণ যায় প্রত্যাখ্যাত ঋতুর ছায়ায় অবসন্তের সাম্রাজ্যে
গোপন দুঃখের শুকনো পাতা জড়ো করে জ্বালিয়ে দাও আগুন
তাতে শীত পোহাও

তাপ হারালে জড়াবে হিমঋতুর সাপ
পাতাল থেকে উঠবে ধোঁয়ার কুণ্ডলী
আর গ্রাস করবে তোমাকে
নিঃশ্বাসে ঝরাও স্ফুলিঙ্গ ওই অম্বর
তুমি যার আরোহী   এইভাবে
দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় ছুটবে তুমি টগবগিয়ে
হয়ে উঠবে নিজেই তেজী ঘোড়া
বেগের সঙ্গে চৈতন্য দাও বেঁধে   লক্ষ্য করো মৃতের গতিবিধি
ওদের ভাষা
শব্দ থেকে প্রিয় কোনো ঈশ্বর   জানো কি তার নাম
তিনিই শব্দ
ভালোবাসো ওই শব্দকেই   জন্মমুহূর্তের সঙ্গী
আমরণ তার আসঙ্গ
আর সাধান করো সেই মন্ত্র   শব্দে শব্দে বেঁধে দিচ্ছ সেতু
নিখিল পারাবারের
বৈরাগ্যের উৎস তোমার নৈঃসঙ্গ্য
আর বঞ্চিত স্বপ্ন কটোমায়া
[illegible] পথের রৌদ্র হিম পরিবর্ত দেয় না প্রায় কিছুই
বাঁধা শিকড়গুচ্ছ শিকড়   বাড়ায় দাও হাত আর
হরণ করো ভাণ্ড
মৃত্যু থেকে ছিনিয়ে নেয় তোমার তোমার স্বেদ রক্তের পরিণাম

—[illegible]

দুটি কবিতা॥ তুষার চৌধুরী

আলফা ও ওমেগার মধ্যে

আলফা ওমেগার মধ্যে অর্বুদ ইঁদুরছানা ঈগলপাখির ভয়ে মরে
আলফা ওমেগার মধ্যে অর্বুদ ইঁদুরছানা ঈগলপাখির ভয়ে মরে
গির্জার কুহকে যাই না কিন্তু গির্জা আমাদের পুরস্কৃত করে
মেয়েদের কাছে যাই ও মেয়েরা আমাদের অভিজ্ঞতা দ্যায়
কাল পঞ্জিকায় পাই তোমাদের কুশলসংবাদ তোমরা নক্ষত্র তিথির
ভেতরে রয়েছ তোমরা জন্মই পেলে না
কিন্তু আমরা জন্ম পেয়ে গেছি নারী বসতির ভিড়ে
ভিক্ষুকদের আগে ছড়িয়েছি খুদকুঁড়া কিছু
পাখিপাখালির মাঠে

আমি তো শিশুর হাতে সঁপেছি ঈশাকে
পথচারীদের আমি দিয়েছি বাতাস আর জল
আমি কুকুরের পায়ে দিয়েছি শেকল
এভাবে ক্রমেই গর্ভবস্তু থেকে মেধাবী মেকুর উঁকি মারে
সান্ধ্য লৌকিকতা থেকে তবু স্পষ্ট অলৌকিকতায় স্বস্তি পাব
আমার আঙুলগুলি মার্বেলের শব্দ করো লাফাবে লোহার
বারান্দায়
শিশু এসে বলে যাবে 'শ্বাসনালী পেয়েছে পাথর'
নারী এসে বলবে 'প্রিয় খুলো না উত্তর'
বন্ধ করে দরজা জানলা স্মৃতিময় শান্ত গোলচাঁদ'
বিকেলে শহরতলী যাই দেখি দণ্ডিত কিশোর একঠায়
আমাকেই চোখ ঠারে ভয়ংকর শীত মাঘপ্রকৃতি ও আমার বিবাহ
হলে ভালো হয় যদি ওম দিতে পারে মনমানুষী কিঞ্চিৎ
অনেক স্বাধীনকর্ম করা হলো অপর তদন্ত অনবদ্য নয় জানি
তবু তো বিকেলে যাই ঘুরে আসি আমাদের বাস্তুভিটা দেশ

পুনরপি ও চতুর্দশ পদী

যেকোনো স্ত্রীলোক জানে হা খোলা রোদ্দুরে তার মোলায়েম ত্বক
কিঞ্চিৎ মলিন হবে সে জানে বৃক্ষের খোঁজে উড়ে
গেছে তুলোট পাখিরা
যেখানে বাগান ছিল দুরারোগ্য ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে নির্দয় বালক
শিশিরের উপযোগ রোদ্দুর কী আর জানে উবে গেলে হীরা
উন্মুক্ত বোতাম কাঁদে খলিফার ঘরে তবু উজ্জ্বল
বিষয় কিছু আছে
এর চেয়ে ঢের বেশী পর্যবেক্ষণীয় দুটি অন্তর্ভুক্ত করা যায়—
আমাদের আলোচাসূচীতে
কুকুরকে নিয়ে কিছু বলা যায় বেড়াল বিষয়ে কিছু কিছু মাসে
যা যা মানুষের হিতে
প্রাসঙ্গিক শৌখীন আসবাব মানে যেসবের ক্ষয়ক্ষতির তদারকে
বাস্তবিক গৃহস্থেরা বাঁচে

যেকোন যুবতী জানে চাঁদনীরাত এরা জোৎস্না ঘুটঘুটে আঁধার
বলতে কী বোঝায় কেন শুক্রগ্রহ টের পেয়ে পুরুষেরা নীল
অগোচরে
গিয়েছিল শূন্যে ভেসে তিমি ও তিতির বারংবার

দাঁড় কাকের মত চিন্তাসূত্র ঝুলে আছে গবেট মস্তকে
উদ্ভ্রমকারী শব্দ বাক্যবন্ধ পক্ষান্তরে স্বাধীনতা চিন্তাশীল [illegible]
[illegible]

দু' কানের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে ছিদ্র দুটো বন্ধ করে রাখতে তার ইচ্ছে করছে। কোনো শব্দটব্দ শোনা যাবে না। কিন্তু আলস্যের জন্য হাত দুটো কানের কাছে তুলতে পারছে না।

মুখটা বেজায় শুকনো দেখাচ্ছে। স্বাভাবিক। পেটের খোল পিঠের কাছে গিয়ে ঠেকেছে। স্বাভাবিক। রাত্তিরে রাগ করে সে খায়নি। পেট ব্যথার নাম করে সন্ধ্যার পরই দোরে খিল এঁটে শুয়ে পড়েছে। মা বুঝতে পেরেছিল। টুটুন বুঝতে পেরেছিল।

বাবা বুঝতে পারেনি।

আর ওই বুড়ো শকুনটা।

যদি বুঝত যে রাগ করে রঞ্জু খায়নি, এই নিয়ে আবার একটা চেঁচামেচি করত। অশান্তি বাধিয়ে দিত।

ওই বুড়োর ভয়েই মা এসে আর তাকে খেতে সাধেনি। টুটুনকেও পাঠায়নি।

আচ্ছা, বুড়ো কি একশ' বছরের পরমায়ু নিয়ে এসেছে!

এই ভেজালটেজাল খেয়ে আর কলকাতার ধুলো-ধোঁয়া গিলে একশ' বছর মানুষ বাঁচতে পারে? সম্ভব?

বুড়োকে যত দেখছে তত সে অবাক হচ্ছে। আশী বছর পার করে দিয়েছে। ইয়া কর্ণ!

ওদিকে অমিতের দাদু নাকি কত ভোগেন সারা বছর। অথচ অনেক বেশি পয়সা ভদ্রলোকের। সারাজীবন বড় চাকরি করেছেন। চেহারা কত ভাল ছিল। ভাল খাওয়াদাওয়া করেছেন। কিন্তু বুড়ো-বয়েসের অসুখবিসুখগুলি ঠিক ধরেছে। প্রেসার, ডায়বেটিজ। এটাই তো স্বাভাবিক। আর এ-বাড়ির খিটখিটে রোগা চেহারার কত বাবুই ঐ যে বলে, তেঁতুল কাঠের মতন শক্ত হাড়।

—কে?

—আমি টুটুন।

—দরজা ঠুকছিস কেন! রঞ্জু রেগে গেল।

—মা ডাকছে, চা হয়ে গেছে, ওঠ।

—বলে দে আমার পেট ব্যথা করছে, খাব না।

—এখুনি দাদু বেড়িয়ে ফিরবে।

—ফিরুক না, বালিশ থেকে মাথাটা তুলল না রঞ্জু। ঘাড়টা ঘুরিয়ে দরজার দিকে চোখটা ধরে রাখল। টুটুন আর ঠুকঠুক শব্দ করছে না। কিন্তু ঠিক দাঁড়িয়ে আছে ওপাশে, রঞ্জু টের পায়। নখ দিয়ে পাল্লার গায়ে আঁচড় কাটছে।

—কেন দাঁড়িয়ে আছিস? আমি আজ সারাদিন বিছানা ছেড়ে উঠব না। দোর খুলব না। চা খাব না। চান করব না। ভাত খাব না—মাকে গিয়ে বল।

জলে বুড়বুড়ি কাটার মতন শব্দ করে টুটুন হাসল।

—ক'দিন উপোস থাকবি, রাগ করে ক'বেলা না খেয়ে থাকতে পারবি!

—যতদিন পারা যায়। বিড়বিড়িয়ে বলল রঞ্জু। তারপর খচ্ করে একটা কথা মনে পড়তে বালিশ থেকে মাথাটা তুলে জ্বলজ্বলে চোখে দরজার পাল্লা দুটো দেখল। কতদিন মানুষ উপোস থাকতে পারে জানিস? ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল সে।

—ক'দিন শুনি? টুটুন খুক করে হাসল।

—কিছু তো জানিস না, এই জীবনে কিছু জানবিও না। জানার ইচ্ছে নেই, জানার স্কোপও নেই তোদের। কেবল পিকনিক করতে, সাজগোজ করতে, তোতা-পাখির মতন ক্লাসের দু'পাতা পড়া মুখস্থ করতে শিখেছিস আর খেতে আর ঘুমোতে। এই জন্যই তো এ-দেশের এই অবস্থা। সাতাশ বছর আগে ইন্ডেপেন্ডেন্ট হয়ে আর কিছু না পারি ভিক্ষুকের সংখ্যা আর বেকারের সংখ্যা আমরা মন দিয়ে বাড়িয়ে যাচ্ছি, অন্য কোনো দেশই আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারছে না।

চিৎকার করে কথাগুলি বলতে ইচ্ছে করছিল রঞ্জুর। বলল না। এত সব জিনিস ওই নেয়াপাতি ডাবের মতন টুটুনের ছোট্ট মাথাটায় ঢুকবে না।

দরজার বাইরে দাঁড়ানো শ্যাম্পু-করা হালকা বাদামী চুলে ঢাকা মাথার ছবিটা চিন্তা করে কেমন একটা ঘেন্নায় বিরক্তিতে রঞ্জু আবার চোখ বুজলো।

তাছাড়া, সে খুব ভাল জেনে গেছে, এসব কথা এ-বাড়িতে বলা পাপ। এখানে শুধু লেখাপড়ার কথা, পরীক্ষায় কি করে ভাল রেজাল্ট করবে তার কথা, লেখাপড়া শিখে কি করে তুমি বড় চাকরি করবে, দু'-হাতে রোজগার করে গাড়ি-বাড়ি করে সুখে থাকবে তার কথা—এছাড়া অন্য কোনো কথা নেই এখানে।

দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল দুটো শক্ত করে একভাবে শুয়ে রইল সে। পাল্লার গায়ে টুটুন আর আঁচড় কাটছে না। বোঝা গেল আর ওখানে ও দাঁড়িয়ে নেই। চলে গেছে।

বুঝলি, কল্পনার ছোট বোনটার সঙ্গে রঞ্জু কথা বলতে লাগল। একফোটা জল না গিলেও মানুষ দু' মাসের বেশি উপোস থাকতে পারে। লাহোর কনস্পিরেসি কেস-এর আসামী যতীন দাস পেরেছিলেন। তেষট্টি দিন উপোস থাকার পর মারা যান। ইচ্ছেটাই এখানে বড়। ইচ্ছে করলে আমিও দু'মাস না পারি দশদিন ঠিক না খেয়ে থাকতে পারব।

কিন্তু রঞ্জু জানে টুটুনকে এসব কথা বলার বিপদ কোথায়। এখুনি গিয়ে মাকে বলবে, বাবাকে না, বাবা নিজের ভাবনা ও খেয়াল খুশি ছাড়া অন্য কারো কথায় কান দেয় না, একদিক থেকে বাবা যে কত ভাল—হুঁ, যদি মা রান্নার ওদিকটায় ব্যস্ত থাকে, দাদুকে বলবে টুটুন। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো টের পেয়ে যাবে রঞ্জু কার কাছে এসব শুনে এসেছে। এতদিন তো তার মুখে এমন সব কথা শোনা যায়নি।

কাজেই মুখ বুজে রইল সে। মুখ বুজে থাকবে। আর কাঠের মতন শক্ত হয়ে শুয়ে থাকবে।

চড়ুই দুটোর আর শব্দ ছিল না।

বোঝা গেল চড়ুই-চড়ুইনী জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। বারান্দায় চায়ের টেবিলের কাছে ঘুরঘুর করছে। এখন সেখানে পাউরুটি বা বিস্কুটের গুঁড়োটুঁড়ো পড়বে।

চায়ের পট ও কাপ-ডিস নাড়াচাড়ার শব্দ হচ্ছে ওদিকে সে শুনতে পেল।

—হোক।

যা সে প্রতিজ্ঞা করেছে। উঠবে না, দরজা খুলবে না, খাবে না। সারাদিন খিল এঁটে বিছানায় শুয়ে থাকবে। বাড়ির লোক তাই চাইছে, বাড়ির লোক মানে ঐ বুড়ো শকুনটা। শকুনটা যা বলবে, মাকে বাবাকে তাই মেনে চলতে হবে। যেন বাবা রোজগার করছে না বলে শকুনটাই এ-বাড়ির গার্ডিয়ান। সর্বেসর্বা। যা উনি বলবেন সবাইকে তা শুনতে হবে। একচুল এদিক-সেদিক হবার উপায় নেই। বনাস্—কেমন ডিকটেটরের মতন মেজাজ। একদম ছেলেকে বেরোতে দেবে না—তালাবন্ধ করে ঘরে আটকে রাখ বৌমা। অমিয়, তোমায়ও আমি সাবধান করে দিচ্ছি, এখন থেকে যদি ছেলের ওপর কড়া দৃষ্টি না রাখ, ছেলেকে ভাল করে শাসন না কর এই সন্তানের জন্য সারাজীবন তোমাকে চোখের জল ফেলতে হবে। অনুতাপ করতে হবে। মনে রেখো হাত-পা গজিয়েছে তোমার খোকনের, চোখ খুলে গেছে। চুল কাটার নাম করে সকাল ন'টায় বেরিয়ে গিয়ে বেলা একটায় তিনি বাড়ি ফিরেছেন গোল্লায় যাবার অধঃপাতে যাবার এই উপযুক্ত বয়েস কিনা।

বাড়ি ফিরে কাল দুপুরে ভাত খেয়েছিল রঞ্জু। যদি ভাত খাবার আগে কথাগুলি শুনত, তবে কক্ষনই সে খেত না। তখন থেকেই উপোস থাকত।

বিকেলে আর টিফিন খায়নি। রাত্রেও কিছু না, একদম উপোস এবং কতদিন না খেয়ে সে থাকতে পারে বাড়ির সবাইকে দেখিয়ে দেবে। উপোস থেকে সবাইকে সে মজা দেখাবে।

অ্যাঁ, ভাবা যায়! কাল বিকেলে নিচে পর্যন্ত নামতে দেওয়া হয়নি তাকে। নিশ্চয় লেকের ধারে শোভেন, পার্থ তার জন্য অপেক্ষা করছিল। টুবালির ব্যাপারটা নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করত ওরা।

তবে টুবালির চিঠি ও পার্থকে নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না তার। তার দুঃখ হচ্ছিল একজন ভাল লোকের সঙ্গে কথা বলেছিল সে। এ-বাড়ির চোখে সেটা সাংঘাতিক অপরাধ। সেলুনে জায়গা পাওয়া যায়নি, তখুনি বাড়ি ফিরে এল না কেন রঞ্জু। গাছতলায় বসে ওই মানুষটার সঙ্গে কী বলছিল এতক্ষণ! কী কথা থাকতে পারে বাপের বয়সী একটা লোকের সঙ্গে ওইটুকুন ছেলের!

ওফ্, সারাটা বিকেল কী লম্ফঝম্প করল না বুড়ো! বেশ তো, আর আমি বাইরে যাচ্ছি না, দোরও খুলছি না। ঐ লোকের সঙ্গে আর দেখা হওয়ার কি তাঁর সঙ্গে বসে গল্প করার ভয় রইল না। যে ক'দিন পারি আমি এই বিছানায় শুয়ে কাটাব। ভাল কথা বলা, ভাল জ্ঞানের কথা যখন এ-বাড়ির চোখে—বিশেষ করে ওই

খুড়ে শকুনটার চোখে পাপ, তখন আমি খারাপ কথা ভাবব, খারাপ আলোচনা করব। হুঁ, নিজে নিজে। এন্তার কুচিন্তা করব। দেখি কে আমায় বাধা দেয়।

আমার পড়ার ঘরে আমার বিছানায় আমি স্বাধীন। আমি লর্ড। এখানে এসে বুড়োর বলার কিছু নেই। বাবা বা মা বা টুটুন—কেউ এসে দেখছে না আমি কি ভাবছি, আমি কি করছি এখন।

তাই করেছিল সে রাত্রে। দুবার। জেদ করে। বাড়িসুদ্ধ লোকের ওপর শোধ তুলতে।

যেমন একদিন সর্দিজ্বর নিয়ে গা-গরম অবস্থায় মা-র সঙ্গে জেদ করে গুনে গুনে দশ বালতি জল মাথায় ঢেলে সে চান করেছিল। মা-র কথা শোনেনি। এক বছর আগের ঘটনা।

আগের দিন লুকিয়ে একটা সিনেমা দেখতে মা-র কাছে সে একটা টাকা চেয়েছিল। ভাল ইংরেজী বই ছিল। জাংগল পিকচার। মার-কাটারি হিন্দী ছবি না। এই ছবি স্টুডেন্টরাও দেখতে পারত। লাইন দিয়ে টিকিট পাওয়া যাচ্ছিল না। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে তার নিজের কাছে কিছু জমেছিল। আর একটা টাকা হলেই হয়ে যেত। এক টাকা কি আর মা-র কাছে ছিল না। ইচ্ছে করে দেয়নি। মা দেয়নি। দাদু বকবে, দাদু আপত্তি করবে। দাদুর ভয়ে দেয়নি।

দাদু কোথা থেকে জানত? কেমন করে বা দেখত যে সে সিনেমায় যাচ্ছে? ফ্লু হয়ে ঠায় তিনদিন বুড়ো নিজের ঘরে আটকা এখন। বিছানা থেকেই নামছিল না। অন্য দিনের মতন যদি নিচে বারান্দায় বসে থাকত, তবে হয়তো দেখতে পেত গেট খুলে রঞ্জু বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ম্যাটিনি শো দেখতে। কী রাগ হয়েছিল না মা-র ওপর।

সেই রাগে তেমন একটা জেদ চেপেছিল মাথায়, কাল রাত্রে খারাপ কাজটা করার সময়। দু' বছর আগে ক্লাস নাইনে থাকতে তারাপদর কাছে ওই নোংরা জিনিসটা সে শিখেছিল। সবচেয়ে বড় বয়স্ক ছেলে ছিল তারাপদ তাদের ক্লাসের। পর পর তিন বছর ফেল করে ক্লাস নাইনেই থেকে যাচ্ছিল কিনা। এই জন্য কিন্তু তারাপদর মনে এক ফোঁটা দুঃখ ছিল না। ভীষণ বড়লোকের ছেলে। দামী স্যুট পরে একটা সাদা ক্যাডিলাক গাড়ি চড়ে রোজ স্কুলে এসেছে। কালো লম্বা ছিপছিপে চেহারা। তখনই জুলপি রাখছিল। চেহারাটা পরিষ্কার মনে পড়ে রঞ্জুর। কালো চেহারায় সাদা দাঁত বের করে যখন হাসত মন্দ লাগত না দেখতে। ছুটির পর ক'দিনই শোভেন পার্থ অমিত ও রঞ্জুকে, মানে তাদের গ্রুপটাকে একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে চপ-কাটলেট খাইয়েছে। এখন নাকি পড়াশোনা একদম ছেড়ে দিয়েছে। খেলার মাঠে এদিকে একদিন হঠাৎ শোভেনের সঙ্গে দেখা তারাপদর। আজকাল নাকি সে রেস খেলছে আর খুব ড্রিংক করছে। হেসে শোভেনকে বলছিল;

সেই তারাপদর মুখটা রঞ্জু কাল রাত্রে ক'বারই মনে করেছে। ইচ্ছে করে মনে করেছে। রেস্তোরাঁয় বসে তারাপদ এত ন্যুড ছবি দেখাত তাদের। তার প্যান্টের পকেটে থাকত সব। কোথা থেকে যে সে এসব জোগাড় করত।

দু'বছর আগে দেখা নোংরা ন্যাংটো ছবিগুলি নতুন করে কাল রাত্রে চোখের সামনে ভেসে উঠতে দিল রঞ্জু। ইচ্ছে করে দিল। এই বাড়ির বুড়োটাকে জব্দ করতে। রুদ্রেন্দুর সঙ্গে কথা বলা যখন অপরাধ, তখন খারাপ জিনিসই দেখুক সে, খারাপ কথা ভাবুক, খারাপ কাজ করুক। জানতে পারলে বুড়ো খুশী হবে না? হওয়া উচিত।

এই তো এখন। বিছানায় শুয়ে আর একটা মুখ তার মনে পড়ছে। ক্লাস এইটে পড়ে সে তখন। সামার ভেকেসান। বুড়ো হঠাৎ একদিন দুপুরে ঘুমোচ্ছিল। চোখে তো ঘুম নেই। সারাদিন ঘুমোয় না। জেগে থেকে বাড়ি পাহারা দেয়, নিচে বারান্দায় বসে গেট পাহারা দেয়। কাজেই রঞ্জু সেদিন মস্ত সুযোগ পেল।

আগের দিন কাগজওয়ালার কাছে ক'টা পুরোনো খাতা বেচে কিছু পয়সা জমেছিল হাতে।

লিচু খেতে ইচ্ছে করছিল তার।

ক'দিন ধরে লাল টকটকে লিচু ঝাঁকায় নিয়ে ফেরিওয়ালারা পাড়ায় ঢুকে খুব ঘোরাঘুরি হাঁকাহাঁকি করছিল। উঁহু, বাড়িতে ডাকে নি সে। টুটুনটাকে ভাগ দিতে হত। তাছাড়া ফেরিওয়ালার লিচুর চেয়ে ফলের দোকানের লিচু ভাল হবে জানত সে। তাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা মার্কেটের কাছে চলে গেল।

সেখান থেকেই ঘটনাটা ঘটতে শুরু করে। বেশ বয়স্ক লোক। মাথায় টাক। ওদিকে আবার একটা ঝোলা গোঁফ রেখেছিল। পরনে নীল ট্রাউজার। ফিকে বাদামী রঙের সার্ট গায়। রঞ্জুর পাশে দাঁড়িয়ে লিচু কিনল। একশ'। আর রঞ্জু কিনল মোটে পঁচিশটা। এর বেশি পয়সা ছিল না তার পকেটে।

খোসা ছাড়িয়ে রঞ্জু টপাটপ গালে পুরছে। লোকটা তখনও খাচ্ছে না। লিচুর ছড়াটা হাতে ঝুলিয়ে রঞ্জুকে দেখছে।

—মিষ্টি? হঠাৎ লোকটা প্রশ্ন করল।

—হুঁ। রঞ্জু ঘাড় নেড়ে দোকানের সামনে থেকে সরে আসে। লোকটাও তখন সরে আসে।

—তুমি কোনদিকে যাবে?

—ওদিকে। তর্জনী তুলে রঞ্জু ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনস-এর দিকটা দেখায়।

—আমিও ওদিকে যাব, চল। লোকটা রঞ্জুর সঙ্গে হাঁটে।

খুব একটা অবাক হয় না রঞ্জু। এক-দিকে যেতে হলে এমন কত লোকই সঙ্গে হাঁটে। তবে সে টের পাচ্ছিল লোকটা তার খুব গা-ঘেঁষে হাঁটছিল। যেন ইচ্ছে করে রঞ্জুর কাঁধে একবার কনুইটা ঠেকায়, রঞ্জুর গায়ে কোমরটা ঠেকায়, এই রকম। তবে ওদিকের ফুটপাথটাও সরু। পাশাপাশি হয়ে দুজনে হাঁটতে গেলে মাঝে মাঝে গায়ে গা ঠেকতই। যে জন্য রঞ্জু জিনিসটা তেমন গ্রাহ্য করছিল না বা এর মধ্যে তেমন 'কিছু' দোষ দেখছিল না। হাঁটতে হাঁটতে লোকটা অল্প শব্দ করে এক সময় হাসল।

—হাসছেন কেন? রঞ্জু জিজ্ঞেস না করে পারল না।

—তুমি খেতে খেতে সব কটা লিচু সাবাড় করে আনলে দেখছি। আমি 'কিন্তু' একটাও মুখে দিতে সাহস পাচ্ছি না।

—মিছিমিছি। রঞ্জু প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল। মজঃফরপুরের লিচু। ফলওয়ালা বার বার বলছিল, শোনেন নি?

—হ্যাঁ, ওরা বলে বটে। কিন্তু...

—খেয়ে দেখুন একটা। খেয়ে দেখুন, বেশ মিষ্টি। রঞ্জু মুখে বলল আর লোলুপ

চোখে লোকটার হাতে ঝোলান মোটা ছড়াটা দেখল। একশ লিচু, ইয়ার্কি! অথচ লোকটা একটাও মুখে দিচ্ছে না। যেন দেখে রঞ্জুর খুব অস্বস্তি লাগছিল।

—ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ—বলেই ছড়া থেকে একটা লিচু ছিঁড়ে নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে লোকটা মুখে পুরল আর সঙ্গে সঙ্গে এমন চেহারা করল, কেউ বুঝি তাকে বড় করে একটা চিমটি কেটেছে।

—কি হল! রঞ্জু হাসতে গিয়ে অবাক হয়। টক?

—হুঁ! যা ভেবেছি।

রঞ্জু অপ্রস্তুত। এর উত্তরে কি বলার আছে বুঝতে না পেরে শব্দ না করে হাঁটতে থাকে।

—তোমার কচি মুখ কচি দাঁত বুঝেছ। সব লিচুই এই বয়সে মিষ্টি লাগে। আমি বুড়ো হতে চলেছি তাই একটা লিচু গালে ফেলতে না ফেলতে দাঁতগুলো টকে গেল। টেনে টেনে হাসছিল লোকটা।

তা হলে এতগুলি লিচু কি করবে? ফেলে দেবে? রঞ্জু ভাবল। তা কি আর কেউ ফেলে দেয়।—নিজের মধ্যেই উত্তর পেল সে। বাড়ি নিয়ে যাবে। ওর ছেলে-মেয়েরা খাবে, নয়তো ভাইপো-ভাইঝিরা বা . .

মনে আছে, তার ভাবনা শেষ হবার আগেই লিচুর ছড়াটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে লোকটা বলছিল, নাও, তুমি খাবে। সে কি! রঞ্জু যেন তখন আকাশ থেকে পড়ে। আপনি পয়সা দিয়ে কিনেছেন!

—তাতে কি। আমি দিচ্ছি তোমাকে। আদর করে কি এক ছড়া লিচু তোমাকে দিতে পারি না। রঞ্জুকে আর কিছু বলার সুযোগই দিল না লোকটা। কেমন যেন জোর করে রঞ্জুর মুঠোর মধ্যে লিচুর ছড়াটা গুঁজে দিয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে টিপে টিপে হাসছিল।

আর কিছু বলতে পারে নি রঞ্জু। মাগনা এত বড় লিচুর ছড়াটা হাতে পেয়ে তার ভীষণ লজ্জা করছিল। চোখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছিল সে।

—চা খাবে? তক্ষুনি তার কাঁধে হাত রেখে লোকটা তাকে টানছিল, —এই তো একটা রেস্তোরা দেখছি এসো এসো।

সরাসরি না বলতে রঞ্জুর আটকাচ্ছিল। ঘুরিয়ে বলল, এখন আমার চা খেতে ইচ্ছে করছে না।

—চা না খাও, কেক খাবে পুডিং খাবে। এসো।

সামনেই প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড। প্যারা-ডাইস। পশ্চিমের তেরছা রোদ লেগে পিতলের হরফটা ঝকমক করছে। এক কাপ চায়ের দাম যেখানে সত্তর নয়া। আপত্তি করবে? রঞ্জুর বুকের ভিতর দুব দুব শব্দ হচ্ছে তখন, তাদের ক্লাসের অমিত কদিনই বলেছিল প্যারাডাইসের মতন পুডিং সাউথের কোনো রেস্তোরা করতে পারে না। অমিতের কথাটা ভাবতে ভাবতে লোকটার সঙ্গে পর্দাঘেরা একটা [illegible] সে [illegible]

ওফ, দুটো কেক ও একটা পুডিং খাইয়ে ও একশ লিচু উপহার দিয়ে লোকটা সেদিন যা করেছিল না! চ্যাবসা মোটা মোটা আঙুলে রঞ্জুর গাল দুটো টেনে লাল করে দিয়েছিল। একবার তাকে কোলে বসাতে চেয়েছিল। পারে নি। ধাক্কা দিয়ে রঞ্জু সরিয়ে দিয়েছে। আর একবার হুমড়ি খেয়ে তার গালে চুমু খেয়েছিল। রঞ্জু একটা কিল বসিয়ে দেয় তার বুকে তখন। তেমন লাগে নি যদিও। দাঁত ছড়িয়ে লোকটা ফ্যা ফ্যা করে হাসছিল। আর হাঁপ ফেলার মতন শব্দ করে বলছিল, আহা কি মিষ্টি মুখটা, কেমন টকটকে রং তোমার। রঞ্জু চেঁচামেচি করে নি। বা পালিয়ে আসতেও চেষ্টা করে নি। সে তো আর মেয়েছেলে নয়। কাজেই সে-ধরনের কিছু ভয়ডর তার ছিল না। তার খুব খারাপ লাগছিল। দু নম্বর পুডিংটা খেতে খেতে বাঁ-হাতের পিঠ দিয়ে বার বার গালটা সে মুছছিল। দেখে লোকটা তাড়া-তাড়ি পকেট থেকে রুমাল বের করে নিজের হাতে তার গাল মুছে দেয়। চুমু খেতে গিয়ে এক গাদা লালা লাগিয়ে দিয়ে-ছিল সে তার গালে।

আজ সব মনে পড়ছে। তারপর আর কোনোদিনই লোকটার সঙ্গে দেখা হয় নি। আজ দেখা হলে রঞ্জুকে কেক পুডিং খাওয়াত না ঠিকই বা একশ লিচুর একটা ছড়া কিনে তাকে উপহার দিত না। তিন বছরে রঞ্জু অনেক ঢ্যাঙা হয়ে গেছে। গাল দুটোও আর সেদিনের মতন নরম তুলতুলে নেই। বা লাল টুকটুকে গায়ের রং। কিন্তু দেখা হলে ভাল ছিল। রঞ্জু সঙ্গে করে সোজা অম্বুজানিলয়ে নিয়ে আসত তারপর দাদুকে বলত, এই আমার একজন বন্ধু। সতীশ বাড়ুয্যের ছেলেকে রুদ্রেন্দুকে তোমার পছন্দ হয় না। একে তোমার খুব ভাল লাগবে দাদু—একদিন দুপুরে আমাকে একটা চায়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে এই এই করেছিল বন্ধুটি।

বাঁ-কাত ছেড়ে রঞ্জু ডান-কাত হয়ে শুল। চড়ুই দুটো আবার এসে ঢুকেছে। কিচকিচ করছে। আগের চেয়ে একটু কম। খেয়েটেয়ে এসেছে। দরজায় টোকা। রঞ্জু আবার কান খাড়া করল।

—কে!

—আমি।

এবার ঝপ করে রঞ্জু উঠে বসল।

—কি চাইছিস শুয়োর! গর্জন করে উঠল সে।

—কর্তাবাবু বেড়িয়ে ফিরেছেন। দরজার ওপিঠ থেকে রতন বলল, মা তোমাকে ডাকছে।

—এখান থেকে সরে যা। বন্ধ পাল্লা দুটোর দিকে চেয়ে রঞ্জু চোখ লাল করল। যদি বেরিয়ে আসি তোকে আমি আস্ত রাখব না।

—বাবু ডাকছে তোমাকে।

—এসে সাংঘাতিক মার লাগাব কিন্তু ইডিয়েট। এখান থেকে পালা।

—বাবু বলছে তুমি চা টোস্ট খাবে। [illegible]

—বাবাকে গিয়ে বল আমার পেট ব্যথা করছে। খাব না। সারাদিন উপোস থাকব।

দরজার বাইরেটা চুপ হয়ে গেল। গেল? রঞ্জু হাঁকল। কেউ আর শব্দ করছে না। চলে গেছে। আবার টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল সে। এই রাস্কেলটার জন্য কাল এটা হল। তাকে খুঁজতে খুঁজতে হারামজাদা চাকর সেই মোড়ের ডিসপেনসারীর পিছনের গলিতে রাধাচূড়া গাছটার কাছে গিয়ে হাজির। আগের দিন বাড়িতে রুদ্রেন্দুকে দেখেছিল। ব্যস বাড়ি এসে দাদুকে ঠিক বলে দিল পাজিটা। তা না হলে বুড়োর জানার কথা ছিল না, কোথায় কার সঙ্গে বসে রঞ্জু বেলা একটা পর্যন্ত গল্প করছিল। ওফ, সেই আমলের কত বিপ্লবীর কথা কাল জানতে পারল রঞ্জু রুদ্রেন্দুর মুখে। ক্ষুদিরাম কানাইলাল শহীদ যতীন দাস গোপীনাথ। চা খেতে খেতে তিনি বল-ছিলেন। রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঢুকে বিনয় বাদল দীনেশের সেই ভয়ংকর অ্যাকশনের ঘটনা। শুনতে শুনতে এক একবার রঞ্জুর শরীরের লোম দাঁড়িয়ে পড়ছিল। তারপর এক সময় দেশলাই কিনে আনতে সে উঠে যায়। রাস্তায় শোভেনদের সঙ্গে দেখা। কি করে যে সে তখন ওদের এড়িয়েছিল! তার মন পড়ে ছিল ছোট্ট চায়ের দোকানের সামনে রাধাচূড়া গাছতলায়। দেশলাই নিয়ে ফিরে যেতে বিড়ি ধরিয়ে বাবার বন্ধু না না বাবার বন্ধু বলে সে আর তাঁকে ভাববে না বাবা তাঁর কাছে কিছুই নয়, বাবা অনেক পিছনে অনেক ছোট, বাবার তুলনায় রুদ্রেন্দু অনেক বড়, অনেক এগিয়ে গিয়েছিলেন, বাবা এই জীবনে কি করল? বঙ্কিম দত্ত অবশ্য উল্টোটা ভাবে। যার যেমন [illegible] ছেঁড়া জামা ছেঁড়া জুতো পরা একটা [illegible] চেহারার লোকের সঙ্গে বাবা [illegible] বেলায় খেলাধূলো করত ভাবতে বুড়োর লজ্জা ঘেন্না—এই তো আমাদের দেশ—

হ্যাঁ, দেশলাইটা হাতে পেয়ে খুশী হয়ে বিড়িটা ধরিয়ে নিয়ে রুদ্রেন্দু চাটগাঁর সেই মাস্টারদা সূর্য সেন আর তাঁর দলের গল্প করছিলেন। ওফ, কত ঘটনা কত ঘটনা! আর্মারি রেড, জালালাবাদের যুদ্ধ ধলঘাটের সংঘর্ষ, পাহাড়তলীর ইউ-রোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দার নামে একটি মেয়ের—সংক্ষেপে মোটা মোটা ঘটনাগুলো বলে যাচ্ছিলেন তিনি—হেসে একবার বলছিলেন সব খুঁটিয়ে বলতে গেলে রাত হয়ে যাবে হে আর এক-দিন ভাল করে বসে সেদিনের বিপ্লবের ভাল করে গোটা ইতিহাসটা তোমাকে শোনাব।

রঞ্জু খুশী হয়ে ঘাড় কাত করেছিল—ঠিক তখন ঘাড়টা ফেরাতেই সামনে অম্বুজা-নিলয়ের শয়তান চাকরটা। উঃ, রঞ্জুর মাথায় যেন তখন খুন চেপেছিল। তাকে দেখে মিটিমিটি হাসছিল শুয়োরটা। রঞ্জুর ইচ্ছে করছিল কেরোসিন কাঠের বাক্সের নীচে বিছান বড় পাথরটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারে।

(ক্রমশ)

অঙ্গনা

আসবাবপত্রের পরিচ্ছন্নতা

নতুন বাড়ী গাড়ী আসবাবপত্র সব মিলিয়ে একটা ঝকঝকে পরিবেশে মানুষ দিন কাটাতে ভালবাসে। নতুন বৈচিত্র্যপূর্ণ আসবাবে ঘর সাজাতে সব মহিলাই আগ্রহী। দিনান্তে ক্লান্ত দেহ সুন্দর পরিবেশে এলিয়ে দিতে পারলে একটা পরম তৃপ্তি পাওয়া যায়। তেমনি মনোরম পরিবেশে বসে অবসর যাপন করাতেও একটা ফূর্তি একটা গর্ব আছে। যিনি এই পরিবেশ রচনা করেন গর্বের অধিকারিণী তিনিই।

বাড়ীতে প্রবেশের পর অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করা হয় বৈঠকখানাতে। বড় বড় দামী দামী সুন্দর আসবাবে বৈঠকখানা বা বসবার ঘর সাজিয়ে গৃহিণী তাঁর সুরুচির পরিচয় দিয়ে থাকেন। মানানসই স্থানে আসবাবপত্র সাজানো থাকলে গৃহে পদার্পণ করা মাত্রই আমাদের মনে সে বাড়ীর গৃহিণীর রুচি সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে ওঠে। এমনও অনেক সময় দেখা যায় যে দামী দামী আসবাবে গৃহিণীর ঘর সাজানোতে যত নজর সেগুলির পরিচ্ছন্নতার তত নজর নেই। সেখানেই অতিথির ধারণার পরিবর্তন ঘটে। তিনি গৃহিণীর চরিত্রের একটা দিক প্রত্যক্ষ করতে পারেন। সঙ্গতি থাকলে ব্যয় করে দামী জিনিস ক্রয় করা যত সহজ সেগুলিকে সযত্নে রক্ষা করা তত সহজ নয়। বহু পরিবারে লক্ষ্য করা যায় আসবাবপত্র পরিষ্কার করার সব দায়িত্বই দাস-দাসীর ওপর ন্যস্ত। গৃহিণী তাদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত কখনই তিনি সেগুলির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সচেতন নন। এর ফলে গৃহিণীর অসাক্ষাতে দাস-দাসীর কাজে গাফিলতি বাড়তে থাকে। তারা আসবাবপত্রের ওপর ওপর ধুলো ঝেড়ে গৃহিণীর মনোরঞ্জন করে। অন্যদিকে গৃহিণীর অসাক্ষাতে আসবাবপত্রের কাঁকে ফাঁকে ধুলোর আস্তর ক্রমে বাড়তে থাকে।

সুদৃশ্য কার্পেটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দরজা-জানলার পর্দা ক্যালেন্ডার ছবি ঘরের শ্রীকে আরও রমণীয় করে তোলে। কার্পেট বিছানো ঘরের শোভা যত বাড়ে সেটি পরিষ্কার রাখতে নজরকে আরও সজাগ রাখতে হয় যাদের ওপর নিয়মিত কার্পেট ঝাড়ার দায়িত্ব তারা সে কাজটি এড়িয়ে অনেক সময় ঘর পরিষ্কারের ধুলোও কার্পেটের নীচে মজুত করতে শুরু করে। এ যেমন অস্বাস্থ্যকর তেমনি মূল্যবান সুদৃশ্য জিনিসের সৌন্দর্যও হ্রাস করে অনেকখানি। আসবাবপত্রের সঙ্গে ঘরের দেওয়ালের রংও উজ্জ্বল হওয়া দরকার। এমনও বহু গৃহিণী আছেন যাঁরা ঘরের ফ্যানের দিকে কোন নজরই দেন না। অথচ কোন ঘরকে পরিপাটি করে সাজাতে হলে ফ্যানটির রং ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সুযোগ-সুবিধা মত ফ্যানটিকে মাঝেমধ্যে রং-করিয়ে নিয়ে আসতে হবে অছাড়া সাবান দিয়ে মুছে ফেলার সুযোগটুকু তো গৃহকর্ত্রীর নিজের হাতেই।

ঘরে সুন্দর সুন্দর ক্যালেন্ডার ও ফটো টাঙিয়ে অন্যদের আকর্ষণ করেন অনেকে। অথচ ক্যালেন্ডারের পিছনে ঝুল মাকড়সার জাল ক্রমশঃ বেড়ে বেড়ে তা ছবির পিছন ছাড়িয়ে সামনে এলে তবে গৃহিণীর দৃষ্টি সেখানে পড়ে। ফটোর যে অংশ দেওয়ালের সঙ্গে লেগে থাকে সেখানে প্রায়ই লম্বা ময়লার একটা কালো দাগ পড়ে যায় যদি মাঝে মাঝে সেখানটা পরিষ্কার করা না হয়। পাখীর পালকের ঝাড়ন অথবা ফুলঝাড়ু দিয়ে নিয়মিত ধুলো ঝাড়লে ঝুলের আর কোন প্রশ্নই ওঠে না। ফটোর কাচ ফুলদানী অ্যাসট্রের সৌন্দর্য শুধু নিয়মমাফিক ধুলো ঝাড়লেই রক্ষা করা সম্ভব নয় মাঝে মাঝে তা ঘষে মেজে সাফ করতে হয়। ধাতুপাত্র হলে সে জিনিষের পালিশের অবর্তমানে শুকনো ছাই নিয়ে ঘষলেই ধাতুপাত্র পরিষ্কার হয়ে যাবে। এছাড়া দিনের পর দিন শুধু ওপর ওপর ঝাড়ার ফলে একটু একটু ধুলো-বালি তেল-কালি সোফার গায়ে নানা দাগ ধরিয়ে দেয়। সোফার কাপড়ের আস্তরটুকু শুধু পরিষ্কার করে ক্ষান্ত হলেই সোফার যথাযথ যত্ন করা হয় না—সেগুলিকে পরিষ্কার করতে হলে সপ্তাহে অথবা মাসে একদিন সোফার প্লাস্টিক জাতীয় ঢাকা হলে টুথব্রাশ সাবান দিয়ে ঘষলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সোফার কোন কোনাকে জল গড়িয়ে না ঢোকে।

কাঠের আসবাবপত্রে আঁচড়ের দাগ বা তার পালিশ নষ্ট হয়ে গেলে সে জিনিসের আর সৌন্দর্য থাকে না তাই মাঝে মাঝে অবকাশটুকুতে কাজের ফাঁকে দিয়ে কাটিয়ে সেগুলির সৌন্দর্য ফেরাতে প্রয়াসী হতে হয়। সে হিসেবে খাবার টেবিলকে সুন্দর রাখতে গৃহিণীকে সচেষ্ট থাকতে হয়। টেবিল ম্যাটের ওপর প্লেট সাজিয়ে খাবার পরিবেশন করলেও টেবিলের ওপর খাবারের কিছু জল গড়িয়ে পড়বেই। কাঠের টেবিল হলে প্লাসটিক বিছিয়ে নেওয়ার রেওয়াজই সবচেয়ে ভাল। গরম কিছু হঠাৎ ভুলবশত রাখলে প্লাসটিক ভেদ করে কাঠের ওপর তার যে সাদা সাদা দাগ পড়ে সেটা গৃহিণীর কুরুচিরই পরিচায়ক। অথচ এ ভুল যে কোন সময়েই হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া সাবান জল বা সোডার জল কাঠের বার্ণিশ তুলে দিয়ে একটা ফ্যাকাসে দাগ ধরিয়ে দেয়। টেবিলে তেল খাবার সব মিশিয়ে ছোট বড় দু-একটা দাগ মাঝে মাঝে ধরে যায় তখন সেই স্থানটি সূঁচালো কোন জিনিস দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষে তুলে ফেলতে হবে। সামান্য গরম জলে একটু ভিনেগার দিয়ে টেবিলটা নরম একটা কাপড়ের টুকরো দিয়ে পুঁছে নিতে হবে। তারপর ফার্ণিচার ক্রীম দিয়ে টেবিলটির ওপর আস্তে আস্তে ঘষতে হবে। ফার্ণিচার ক্রীম পালিশ ডাস্টার দিয়ে ঘষে দিলেই বার্ণিশ আবার নতুনের মত চকচকে হয়ে ওঠে।

চামড়ার ওপর তেলে আর ধুলোতে মিলে স্বাভাবিক রং নষ্ট করে দেয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই সে জিনিসের সৌন্দর্য অনেকখানি ম্লান হয়ে যায়। তাই মাঝে মাঝে ফার্ণিচার পালিশ লাগিয়ে চামড়ার চকচকে ভাবটা যতদূর সম্ভব বজায় রাখতে হবে। পালকের ঝাড়ন দিয়ে গদিগুলি ঝাড়ার সময়ে তাতে একটু প্যারাফিন লাগিয়ে নিয়ে ঝাড়তে হবে। আসবাবপত্রের কাপড়ের ঢাকাগুলি ধোয়াকাচার পর মিনিট পনেরো কুড়ি সোডার জলে ভিজিয়ে রাখা ভাল। তাতে রং-এ একটু ঔজ্জ্বল্য দেখা যায়।

আয়না আলমারির কাচ, ফটোর কাচ পরিষ্কার করতে হলে পুরনো খবরের কাগজ জলে ভিজিয়ে তা ভাল করে নিংড়ে ঘষে ঘষে কাচের ময়লা তুলতে হবে। তবে এখানেও লক্ষ্য রাখা দরকার জল কোনমতেই কোন জোড়া বা ফাঁকে ঢুকে না যায়। কাগজ দিয়ে কাচ ঘষার সঙ্গে সঙ্গেই শুকনো একটা পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো দিয়ে তা পুঁছে নিতে হবে নাহলে কাচে দাগ পড়ে যায়।

সুরেখা তরুণীর নাচ করা হাতের মতোন রং-পরিবর্তনের উদাসীনতা তার সৌন্দর্যের কতটা হানিকর তা বলা বাহুল্য। অফিসের বাবুনী স্কুল-কলেজের ছাত্রী অনেকেই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। সাদা রং প্রথম প্রথম সাবানের গুঁড়ো দিয়ে ধুয়ে নিলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। কিছুকাল ব্যবহারের পর তা পেট্রোল দিয়ে পুঁছে নিতে হয়।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মানুষের একটা স্বাভাবিক অভ্যাস। সে অভ্যাসটা যাদের নেই তাঁরা সময়ের অজুহাতে অযত্নকৃত কাজের ভারের কথাই বলে থাকেন। অথচ এটাও যে তাঁদের কাজের একটা প্রধান অংশ তা কি অস্বীকার করা যায় ?

[illegible] চৌধুরী

রূপসীর খাতা

এখন থেকে আবার নতুনভাবে শুরু করব শরীরের—বিশেষ করে মুখ, হাত, পা গলা ও চুলের কিভাবে যত্ন পাওয়া যায় ও সুন্দর করা যায় তার আলোচনা। তবে এই সব সৌন্দর্য পরিচর্যা সবই বাড়ীর তৈরি সামগ্রী দিয়ে করা হবে। ঘরের ডিম দুধ মধু তেল জল সবই নানাভাবে নানান কিছুর সহযোগে খুব ভালো ও তাজা প্রসাধন-সামগ্রী তৈরি করতে পারে—এ-সম্বন্ধে আপনাদের বেশ কিছু ধারণা আমি আগেই দিয়েছি। তবে এবারে আপনাদের সুবিধার জন্য আরও সবিস্তারে ও সঠিক ধারা অনুযায়ী সেগুলি সাজিয়ে দিচ্ছি। আশা করছি এতে আপনাদের উপকারও হবে আর ব্যবহার করতেও সুবিধা হবে।

সবচেয়ে প্রথমে মুখ থেকেই শুরু করা ভাল। মুখ দেহের এমন একটা অংশ যা সর্বপ্রথমে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। সুতরাং সেই মুখের পরিচর্যা যথেষ্ট যত্নসহকারে করা উচিত। ঘরে তৈরী করার জন্যে কতকগুলি জিনিস থাকলে আরও ভাল হয়। তবে না থাকলে হাতেই করতে হবে। যদিও তাতে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দুটোই প্রচুর দরকার। তা খাঁটি নির্ভেজাল কিছু পেতে হলে পরিশ্রম তো করতেই হবে। আজকাল বিলাতী ভাল জিনিস বাজারে পাওয়া যায় না। তাছাড়া ঘরে তৈরি তাজা জিনিসের কাছে বিলাতী জিনিসও দাঁড়াতে পারে না। তবে যাঁরা এই সব মেশিন কিনে নিতে পারেন তাঁরা কিন্তু আরও ভাল ও বেশী পরিমাণে প্রসাধনী তৈরি করতে পারবেন। আমি কয়েকটি মুখ পরিষ্কার করার ও মুখের ত্বককে সুন্দর ও সতেজ করার এবং মুখের ওপরের আচ্ছাদন সম্বন্ধে আলোচনা করব—আপনাদের যেটা সুবিধা হয় তৈরি করে লাগাবেন।

মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য ও মুখের ত্বক তাজা ও সতেজ রাখার জন্য কি কি করা যায় : (১) মুখের ত্বক পরিষ্কার করার সবচেয়ে সহজ ও ভাল উপায় সবারই জানা আছে। দুধের সরের সঙ্গে কমলালেবুর খোসা বাটা বা কাঁচা হলুদ বাটা বেশ করে ফেটিয়ে তাতে সামান্য পরিষ্কার ময়দা দিয়ে সেটা মুখের ওপর ও গলায় লাগাতে হবে আঙ্গুলের ডগা দিয়ে, তারপর সেটা ১০ মিনিট পরে আস্তে আস্তে গোল করে ঘষে ঘষে তুলতে হবে। এতে ত্বক মসৃণ ও পরিষ্কার হয়।

(২) মুখের ত্বক পরিষ্কারের জন্য দ্বিতীয় সামগ্রী হোলো (অবশ্য যাদের ত্বক খসখসে বা মুখে গোটা ব্রণ ইত্যাদি আছে, তাদের জন্য নয়।) দই এক কাপ বাড়ীর পাতা দই হলেই সবচেয়ে ভাল—সেই দই-এর সঙ্গে এক চামচ মধু মিশিয়ে তা বেশ করে ঘেঁটে নিতে হবে সামান্য গরমে, তারপর সেটা ঠান্ডা করে রেখে দিতে পারেন মেশিনে। অথবা একটু পরে সেটা মুখে মাখুন। মুখের ওপর মেখে বেশ ১০।১২ মিনিট রাখতে হবে। পরে তুলো ভিজিয়ে (গোলাপ জলে) আস্তে আস্তে মুছে ফেলতে হবে। পরে সামান্য গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে মুখ পরিষ্কারও হয়, আবার ত্বকের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

(৩) কাগজি বাদাম গ্রাইন্ডার মেশিনে দিয়ে ঘাঁটতে হবে। যখন বাদামগুলো থকথকে মতন হয়ে যাবে তখন তাতে মধু মেশাতে হবে। ধরুন ছোট বাটির এক বাটি বাদাম পেষা ও তাতে বড় চামচের এক চামচ মধু দিয়ে বেশ করে ফেটিয়ে তাতে সামান্য দুধ দিতে হবে যাতে করে একটু তরল অথচ থকথকে পেস্ট মতন তৈরি হয়। তাই দিয়ে মুখে বেশ থুপে থুপে লাগিয়ে রাখতে হবে এবং মিনিট দশ পরে সামান্য গরম জল দিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেলতে হবে। তারপর ঠান্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে মুখ পরিষ্কারও হয় এবং ত্বকও উজ্জ্বল থাকে। এমনকি দেখা গেছে যে, রংও পরিষ্কার হচ্ছে। শুধু একটু যত্ন—একাজ আর কিছু নয়।

দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে মুখের ওপরের বেস। অর্থাৎ সাজার আগে বা এমনি মুখ পরিষ্কারের পর ত্বককে তাজা ও সুন্দর রাখার জন্য যা প্রয়োজন।

(১) এতে দুটি ডিমের কুসুম, দুই বড় চামচ ভিনিগার ও আধ কাপ অলিভ তেল দরকার। ডিমের কুসুম ও ভিনিগার বেশ করে মেশিনের সাহায্যে বা হাতে দিয়ে এমন ভাবে ফেটিয়ে নিতে হবে যাতে গোটা বা ডেলা পাকান ডিম না থাকে। এইভাবে ফেটাতে ফেটাতে সেটা যখন নরম হয়ে আসবে, তখন আস্তে আস্তে তাতে তেল ঢালতে হবে এবং আবার তেলসুদ্ধ ফেটিয়ে নিতে হবে। এইভাবে ঘেঁটে নিলে বেশ এক কাপ মতন একটা পদার্থ তৈরি হবে। সেটি ঠান্ডা মেশিনে রেখে অন্ততঃ দিন সাতেক ব্যবহার করা যায়। মুখ পরিষ্কার করে তারপর মুখে এটা মেখে তারপর মুখটা শুকিয়ে রাখতে হবে অন্ততঃ ২০ মিনিট। তারপরে তুলো দিয়ে সামান্য ভিজিয়ে (গোলাপ জলে) মুখ মুছে ফেলতে হবে।

(২) লোশনের সঙ্গে কমলালেবুর রস এক চামচ বেশ করে মিশিয়ে সেটা মুখে মেখে রাখলে একটা উজ্জ্বল সুন্দর ভাব ফোটে। তবে এটা তৈরি করে রাখা যায় না।

সুতরাং মুখ পরিষ্কার করে তাতে এইভাবে মুখের ওপর মেখে রাখলে ত্বক পরিষ্কার, মসৃণ ও সেই সঙ্গে উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়। এরপর আরও আলোচনা করব মুখ সম্বন্ধে। কিভাবে মুখের ওপর একটা আচ্ছাদন তৈরি করে বাইরে বেরোতে হয়—যাতে কিনা রোদ বৃষ্টি জলে বা ধুলোতে ত্বকের ক্ষতি হয় না।

—বহুবর্ণিনী

রূপসজ্জা

ফ্যাশন মডেল 'লক্ষ্মী'

বিউটি পার্লারে বসে লক্ষ্মী'র সঙ্গে কথা হচ্ছিল। লক্ষ্মী ফ্যাশন-মডেল। হাসামুখী সুন্দরী তরুণী। সাজগোজ দেখে এই হাসামুখী যুবতীকে আজকের কোন আধুনিকা বলেই মনে হচ্ছে। ঘন চুলের রাশি কান ছাড়িয়ে ঘাড়ের ওপরে এসে শিথিল কবরীতে রূপায়িত। ইয়া বড় বড় কানের গয়না প্রায় চিবুক ছোঁয়া, আর পরনের জামাটির হাত কাঁধের আগেই নিঃশেষ হয়েছে। অর্থাৎ স্লিভলেস। একে বলে সারারা। ম্যাচ করে জামা প্যান্ট পরার পাগলামী দেখা গেল না ও'র মধ্যে। জিনসের প্যান্ট। আকাশী রঙের কাপড় দিয়ে তৈরী সারারা—মিড ওপেন। লক্ষ্মী প্রসঙ্গত বললেন : ম্যাচ করে কাপড় চোপড় পরার পাগলামী ছিল বিশ তিরিশ দশকের বৈশিষ্ট্য। চল্লিশ শেষ হল, পঞ্চাশে এল উল্টো রঙকে মেলানোর বাহাদুরী। লালের সঙ্গে হলুদ। কালোর সঙ্গে ঘন নীল। সবুজের সঙ্গে লাল ইত্যাদি। এখন আবার রঙে রঙ মেলানোর যুগ ফিরে এসেছে। আর বিশেষ করে চলছে হাল্কা রঙ। আমারও খুব পছন্দ হাল্কা রঙ। কিন্তু রঙে রঙ মিলিয়ে পরতে হবে তার কোনো মানে নেই। জানবেন ফ্যাশন মডেলদের কাছে রঙ একটা ভাইটাল ব্যাপার। সিলেকশান অফ কালার যদি সঠিক না হয়, তবে অনেক সময় বিজ্ঞাপন মার খায়। এব্যাপারে অবশ্য বিজ্ঞাপনদাতাদের সহযোগিতা চাই। ফ্যাশন মডেল সিলেকশন থেকে শুরু করে নানারকম পোজ ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার। তা না হলে পয়সাই শুধু খরচা হবে, কাজ হবে না। অর্থাৎ জমবে না।

লক্ষ্মী ছোটখাট কোম্পানীর হয়ে মডেল হয়েছেন। এখনও তেমন কোন বৃহত্তর সুযোগ আসে নি। এরই মধ্যে টুকরো টুকরো কিছু অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় হয়েছে। যেমন, অনেকেই মডেল গার্ল অর্থে, ধরে নেয় বললেই বুঝি মেয়েটা জামা কাপড় খুলে দাঁড়িয়ে যাবে। আমি এ-ধরনের মডেলিং-এর ঘোরতর বিরোধী। নুড মডেল যাঁরা করেন তাঁরা করেন, আমি তার মধ্যে নেই—থাকবও না। কারণ আমার মনে হয় একটা মেয়েকে জামা কাপড়ে যত ভাল লাগে, তাকে জামা কাপড় ছাড়া কিছুতেই তেমন ভালো লাগতে পারে না। লক্ষ্মী নিজে নিজেই জামা কাপড় ডিজাইন করতে পারেন। আমাদের সামনে কয়েকবার কস্টিউম চেঞ্জ করে এলেন। একবার পরে এলেন মিড-রিপ ওপেন সালওয়ার কামিজ। আরেকবার আমব্রেলা কাট ড্রেস। তবে ও'র খুব পছন্দ ক্যাজুয়াল ড্রেস। মিনি-তে আপত্তি আছে। ম্যাক্সি বেশ ভাল। তবে ড্রেস স্থান কাল পাত্র বিশেষেও নির্বাচন করা দরকার। কথা বলতে বলতে লক্ষ্মী এক সময়ে থামলেন।

আমি প্রশ্ন করলাম : মডেলিং-এর যে কোর্স আছে তাতে কি আপনি জয়েন করেছেন?

: কলকাতায় এই বিষয়ে কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমি অনেকদিন ধরে খোঁজখবর করছি, সেরকম প্রাইভেট কোন

অর্গানাইজেশনও নেই। তাই আমার পক্ষে জয়েন করা সম্ভব হয়নি। ইচ্ছে আছে দিল্লীতে গিয়ে কোর্স জয়েন করব।

এখন আপনি কি করছেন?

: এখানে এসে ফ্যাশন ডিজাইনিং শিখি আর প্রত্যহ এক ঘন্টা করে শর্টহ্যান্ড ক্লাশ করি।

: হঠাৎ 'মডেলিং'-এর প্রতি ইনটারেস্টেড হলেন কিভাবে?

দিল্লীতে আমার অনেক বান্ধবী আছে যারা এইভাবে জীবিকানির্বাহ করছে এবং মাসে অনেক টাকা রোজগার করছে। ওরা আমাকে প্রায়ই বলত আমার নাকি অপূর্ব ফিগার। মডেলিং-এর পক্ষে আইডিয়াল। কেন আমি করছি না। এই করে আমার মাথায় পোকা ঢুকে গেল। গত কয়েক মাস আগে আমি যোগাযোগ করতে শুরু করি। দেখছি কলকাতায় মডেলিং-এর ফিল্ড ভীষণভাবে সীমিত। স্কোপ খুবই কম। সারা কলকাতায় ফ্যাশনের জোয়ার আসা দরকার। তা না হলে বড় বড় পাবলিসিটি কোম্পানী বম্বে অথবা দিল্লী থেকে মডেল গার্ল এনে কাজ করাবেন। এখানে অনেক সুন্দরী তরুণী আছেন যাঁরা এইভাবে জীবিকানির্বাহ করতে উৎসাহী। শুধুমাত্র অবাঙালী তরুণীরা এলেই চলবে না। বঙ্গ ললনাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। তাদের দিবানিদ্রা ত্যাগ করে শরীরের প্রতি যত্ন নিতে হবে। বেশী রাত জেগে শরীর খারাপ করা চলবে না। আর সব সময় হাসিমুখে থাকতে হবে। বিজ্ঞাপনে বেশীর ভাগই হাসিখুশী মুখ চায়। অতএব দাঁতের প্রতি যত্নবান হতে হবে। তা না হলে হাসবার স্কোপই থাকবে না যে।

—নিরুপমা

রান্না করে দেখুন

শীতের দিনে মটরশুটি

শীতের সবজীর রাজা যদি হয় টোম্যাটো তাহলে মটরশুটি রাণীর পদ পেতে পারে অনায়াসেই যদিও মটরশুটি কলকাতার বাজারে সারা বছরই পাওয়া যায়—কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে তার দাম অত্যধিক এবং উৎকর্ষতার দিক থেকে তা খাটো। সেইজন্যে শীতের দিনেই আশ মিটিয়ে মটরশুটি খেয়ে নিন। মটরশুটি দিয়ে নানা রকম পদ রান্না করা যায়। বিখ্যাত মটরশুটি কচুরী মটরশুটির পোলাও ইত্যাদি রান্না করার প্রণালী তো সব বাঙালী গৃহিণীই জানেন। তাই আর সেগুলি তৈরী করার কথা বলব না। যে সব পদগুলি বাঙালীর রান্নাঘরে বিশেষ প্রচলিত নয় সেগুলির কথাই বলব।

মটরশুটির এই পদগুলি রাঁধতে বেশী তেল ঘি লাগে না—মটরশুটি কেনাতেই যা খরচ। রান্না করায়ও বিশেষ ঝামেলা নেই।

কীমা মটরশুটি :

উপকরণ : ২৫০ গ্রাম খোসা ছাড়ানো মটরশুটি, ২৫০ গ্রাম মিহি করে কোটা কীমা, বড় পেঁয়াজ ২টি আদা এক টুকরো রসুন ৪ কোয়া গরম মশলার গুঁড়ো ১ চা চামচ পাকা টোম্যাটো ২টি ধনে পাতা ১ আঁটি কাঁচা লংকা ২টি লংকার গুঁড়ো ১ চা চামচ চিনি ১ চা চামচ নুন ও হলুদ আন্দাজ মতো ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। পেঁয়াজ আদা ও রসুন বেটে রাখুন। ২। কড়াইয়ে ঘি দিয়ে তাতে বাটা মশলা ভাজতে থাকুন। ৩। কীমা নুন হলুদ লংকার গুঁড়ো ও টুকরো করে কাটা টোম্যাটো মশলার মধ্যে দিয়ে দিন এবং ভাল করে কষুন। ৪। সমস্ত জল মরে গেলে ছাড়ানো মটরশুটি কীমার সঙ্গে মিশিয়ে দিন এবং অল্প জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিন। ৫। জল শুকিয়ে গেলে এবং কীমা ও মটরশুটি সুসিদ্ধ হয়ে গেলে চিনি কাঁচা লংকার কুচি গরম মশলা ও ধনে পাতার কুচি মিশিয়ে নামিয়ে নিন। রুটির সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন—খেতে চমৎকার লাগবে।

মটরশুটির ঘুগনি :

উপকরণ : ৫০০ গ্রাম ছাড়ানো মটরশুটি ২৫০ গ্রাম ছোট ছোট টুকরো করে কোটা আলু চার চা চামচ সরু সরু করে কুচোনো আদা কাঁচা লংকা চারটি এক আঁটি কুচানো ধনে পাতা নুন আন্দাজ মতো সামান্য ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। কড়াইয়ে ঘি দিয়ে আলু ও মটরশুটি ভাল করে নাড়াচাড়া করে নিন। ২। আলু ও মটরশুটি যাতে সেদ্ধ হয়ে যায় সেই আন্দাজ মতো জল দিন। ৩। নুন ও আদাকুচি মিশিয়ে দিন। ৪। আলু ও মটরশুটি সেদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে ধনে পাতা কুচি ও কাঁচা লংকা মেশান। সামান্য ঝোল রাখবেন। এই ঝোলের রং সবুজ হয়। চুমুক দিয়ে খেতে অতি সুন্দর। এই ঘুগনি জলখাবার হিসেবে অথবা রুটির সঙ্গেও খাওয়া চলে।

মটরশুটির বড়া :

উপকরণ : ২৫০ গ্রাম মটরশুটি একটু আটা বা বেসন সামান্য হিং ২ চা চামচ লংকার গুঁড়ো আন্দাজ মতো নুন ও ভাজবার জন্যে সর্ষের তেল।

প্রস্তুত প্রণালী : ১ কাঁচা মটরশুটি শিলে ভাল করে পিষে নিন। ২। তেলে ভাজলে যাতে ছেড়ে না যায় সেইজন্যে আন্দাজ মতো আটা বা বেসন মিশিয়ে হাত দিয়ে ফেটিয়ে নিন। ৩। নুন ও লংকার গুঁড়ো মেশান এবং হিং সামান্য জল দিয়ে পিষে মিশিয়ে দিন। ৪। সমস্ত মিশ্রণটা হাত দিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিয়ে বড়ার মতো করে গরম তেলে ভাজুন। ভাত ও ডাল দিয়ে এই বড়া খেতে অত্যন্ত উপাদেয়।

মটরশুটির নিমোনা : উপকরণ : মো মটরশুটি ২৫০ গ্রাম আলু ২৫০ গ্রাম নুন ও হলুদ আন্দাজ মতো সামান্য হিং লংকা ১ কাপ টক দই অল্প তেল বা ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। কাঁচা মটরশুটি বেটে নিয়ে দই ও সামান্য জল এবং লংকা ফেটিয়ে নিন। ২। আলু মাঝারি সাইজের টুকরো করে কাটুন। ৩। কড়াইয়ে জল বা ঘি দিয়ে তাতে হিং ফোড়ন দিন। নুন হলুদ দিয়ে আলুর টুকরোগুলো ভাজতে থাকুন। ৪। আলু ভাজা হয়ে গেলে দই ও মটরশুটি মিশ্রণটি আলুর মধ্যে ঢেলে দিন। ৫। আলু সেদ্ধ হয়ে গেলে এবং ঝোল মরে মটরশুটি ভাজা ভাজা হয়ে গেলে তরকারি নামিয়ে নিন। এই তরকারি শুকনো শুকনো হবে এবং রুটি বা লুচির সঙ্গে খেতে ভাল লাগবে।

মটরশুটির পরোটা : উপকরণ : অর্ধ কেজি আটা ২০০ গ্রাম ছাড়ানো মটরশুটি একটু হিং ১ চা চামচ লংকার গুঁড়ো আন্দাজ মতো নুন ভাজবার জন্যে ঘি বা বাদাম তেল।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। আটা নুন ও ঘিয়ের ময়ান দিয়ে শক্ত করে মেখে রাখুন। ২। মটরশুটি সেদ্ধ করে হিং দিয়ে বেটে রাখুন। লংকার গুঁড়ো ও নুন মেশান। ৩। আটার লেচি বেটে তার মধ্যে মটরশুটির পুর করে দিন। ৪। একটু ঘি দিয়ে গোল করে বেলে নিয়ে পরোটার মতো করে তাওয়ায় ভাজুন।

মটরশুটি ভাতে : উপকরণ : ২৫০ গ্রাম ছাড়ানো মটরশুটি, আন্দাজ মতো নুন, তেল ও কাঁচা লংকা।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। মটরশুটি শিলে বেটে নিন। পাতলা কাপড়ে বেঁধে ফুটন্ত ভাতের মধ্যে ছেড়ে দিন। ২। ভাতের ফেন গালা হয়ে গেলে এবং ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কাপড়ের পুঁটলিটা বার করে নিন। ৩। নুন তেল ও কাঁচা লংকা দিয়ে মেখে ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সাধনা মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ

কলিকাতা দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ।।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ইংরাজেরা ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে তিন
য়র জমিদারী পাইয়া আপনাদিগের
ান্সেলের একজনকে জমিদার করিতেন,
ন দুই হাজার টাকা করিয়া মাহিয়ানা
তেন। চারি-পাঁচ মাস অন্তর জমিদার
। হইত অর্থাৎ কাউন্সেলের সকল
ারেরাই কিছুদিন করিয়া দুই হাজার
। মাহিয়ানা মারিতেন। তিনি কাজকর্ম্ম
ই করিতেন না, কখনও দুই-একটা
করিতেন। তাঁহার অধীনে একজন ব্লাক
দার থাকিতেন, তাঁহারই হাতে
দারির ভার থাকিত। ব্লাক জমিদারের
য়ানা ত্রিশ টাকা ছিল। কুমারটুলীর
দগের আদিপুরুষ গোবিন্দরাম মিত্র
২০ খৃঃ অব্দে ব্লাক জমিদার পদে
ক্ত হন, তাহার পূর্ব্বে ঐ পদে কে
ন, তাহা জানা যায় না। কিছুদিন পরে
বন্দরাম মিত্রের বেতন ত্রিশ টাকা হইতে
শ টাকা হয়। কারণ, তিনি কোম্পানীর
ট আরজী করেন যে ত্রিশ টাকার ব্লাক
দার নামক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সম্ভ্রম রক্ষা
হয় না। গোবিন্দরাম মিত্রের মন্দির
রে রোডের ধারে অদ্যাপি বর্ত্তমান
। গোবিন্দরাম মিত্রের একজন কর্ম্মচারী
লী সরকার তৎকালের একজন প্রসিদ্ধ
ছিলেন। হাটখোলার দত্ত মহাশয়েরা
মানে ও কুলমর্য্যাদায় কলিকাতার সর্ব্ব-
। ছিলেন কিন্তু তাঁহারা সরকারী কোন
। কখনও লিপ্ত হয়েন নাই।

নকুড় ধর নামক এক ব্যক্তি এই সময়ে
ধারণ সম্পত্তিপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি
তে সুবর্ণবণিক। ইংরাজ মহলে তাঁহার
ণ প্রতিপত্তি ছিল। ইংরাজেরা তাঁহাকে
াসা না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন
ইংরাজ গবর্ণমেন্টের নিকট কোন চাকরী
তে হইলে লোক নকুড় ধরের নিকট
ারী করিত। এমন কি ১৭৪৮-৪৯
র প্রসিদ্ধ নবকৃষ্ণও নকুড় ধরের নিকট
দারী করিতেন এবং ১৭৫০ সালে নকুড়
তাঁহাকে হেষ্টিংস সাহেবের মুন্সী
া দেন। নকুড় ধরের প্রকাণ্ড কারবার
। নকুড় ধর নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁহার
ত্র রাজা সুখময়। সুখময়ের বংশধরেরা
পি নকুড় ধরের অতুল ঐশ্বর্য্য
োগ করিতেছেন।

ড়বাজারের মল্লিকেরাও তৎকালে
ণ ধনী ছিলেন। ইঁহাদের বাণিজ্য-
ায় বিলক্ষণ বিস্তৃত ছিল। উল্লিখিত
কয়েকটি পরিবার ভিন্ন কলিকাতায় অন্য
কোন প্রসিদ্ধ পরিবারের উল্লেখ এ যুগে
পাওয়া যায় না। পাথুরিয়াঘাটার
প্রসিদ্ধ ঠাকুর-পরিবারের আদি অন্বেষণ
করিয়া এ যুগে কিছু পাওয়া যায় না। যে
দুই-এক ঠাকুরের নাম পাওয়া যায়, তাঁহারা
গোবিন্দরাম মিত্রের অধীনে বাজার ইজারা
লইতেন, অর্থাৎ গোবিন্দরাম মিত্র অল্প
টাকায় বেনামী করিয়া সমস্ত বাজারগুলি
ডাকিয়া লইতেন এবং পরে বিলক্ষণ লাভ
করিয়া ঐগুলি বিলি করিতেন। যে সকল
লোককে বিলি করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে
দুই-একজন ঠাকুরের নাম পাওয়া যায়।
তৎকালে বাজার ইজারা লওয়ায় বিলক্ষণ
লাভ ছিল। বাজারে দ্রব্যাদি আসিলে
জমিদার চাল, ডাল, লবণ, তেল সকল
দ্রব্যেরই উপর কর লইতেন। সুতরাং
তৎকালে বাজার করায় জমিদারের বিলক্ষণ
লাভ ছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ইজারাদারও
বিলক্ষণ লাভ করিত। কোম্পানী জমিদার
হইয়া যে কয়টি বাজার স্থাপন করিয়াছিলেন,
তাহার বন্দোবস্তের ভার গোবিন্দরাম মিত্রের
হাতে ছিল। গোবিন্দরাম মিত্র তাহা হইতে
বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিত।
বর্ত্তমান ঠাকুর পরিবারের স্থাপয়িতা
দর্পনারায়ণ ও নীলমণি আগামী যুগের
লোক। এই সময় কলিকাতায় বহুসংখ্যক
অট্টালিকা প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যে ইংরাজ-
দিগের গবর্ণরের বাটী, কৌন্সিল বাটী, চার্চ্চ,
কোর্ট হাউস প্রভৃতিই প্রধান।
প্রাচীন পুষ্করিণী।

১৭৫৭খৃঃ অব্দ হইতে কলিকাতার
তৃতীয় যুগের উৎপত্তি। এই যুগে প্রথমে
রাজা নবকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব। রাজা নবকৃষ্ণ
পলাশী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দাদাকে লিখিয়া
পাঠান, 'দাদা, দালান দেও, এইবার পূজা
করিতে হইবে। নবকৃষ্ণ মহাসমারোহে পূজা
করিলেন, সমস্ত ইংরাজদিগের নিমন্ত্রণ
হইল। কলিকাতা এমন কি সমস্ত ভারত-
বর্ষের যুগ পরিবর্ত্তন হইল। এই সালে
ইংরাজেরা নূতন কেল্লা নির্ম্মাণ করেন।
তাহাতে গোবিন্দপুর গ্রামটির সমস্ত
লোককে উঠাইয়া দিতে হয়। গোবিন্দপুরের
অধিবাসীরা এওয়াজি যে জমি পান, তাহাতে
শাঁখারীটোলা, ডিঙ্গেভাঙ্গা, বহুবাজার,
মলঙ্গা প্রভৃতি স্থানে লোকের বসবাস হয়।
তাহারা যখন গোবিন্দপুর হইতে উঠিয়া
এই সকল স্থানে বাস করেন, তখনও এখানে
বাঘের ভয় বিলক্ষণ ছিল। এই সময়
মুরশিদাবাদেরও প্রধান প্রধান লোক আসিয়া
কলিকাতায় বাড়ী করেন। তাহার মধ্যে
দেওয়ান দুর্লভরামের পরে রাজা রাজবল্লভ
বাগবাজারে এবং মহারাজা নন্দকুমার, এখন
যেখানে বিডন স্কোয়ার হইয়াছে, তাহার
সন্নিকটে প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করেন।

অতএব পলাশী যুদ্ধের পরই
মুরশিদাবাদ অবসন্ন হইতে লাগিল এবং
কলিকাতার জাঁক বৃদ্ধি হইতে লাগিল।
ক্রমে কোম্পানীর চাকরী করিয়া কলিকাতার
লোকে খুব বড়মানুষ হইতে লাগিলেন।
ইঁহাদের মধ্যে নীলমণি ঠাকুর, পাথুরিয়া-
ঘাটার ঘোষেরা ও জোড়াসাঁকোর সিংহেরা
প্রধান।

কলিকাতায় যে সকল বড় বড় বাটী
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মূলে অন্বেষণ
করিতে গেলে বাণিজ্য ধরা বাবসাই দেখিতে
পাওয়া যাইবে। সমুদ্রগামী এই সকল লোক
নদীর বাঁকে বহুদূর অগ্রসর হইয়া মুচি-
খোলা, ফলতা প্রভৃতি স্থানে অপেক্ষা
করিত। জাহাজের নিশান দেখিয়া জানিত, এ
বাড়ুজ্যে মহাশয়ের জাহাজ, মিত্তির
মহাশয়ের জাহাজ, এটা দত্ত মহাশয়ের
জাহাজ। নূতন জাহাজ দেখিলেই তাঁহারা
তাড়াতাড়ি আক্রমণ করিতেন এবং অল্প
সময়ের মধ্যেই অধিকার করিয়া লইতেন।
যখন যেমন সমস্ত ব্যবসায় ইংরাজদিগের
হাতে গিয়াছে, তখন এরূপ হয় নাই। অনেক
দেশীয় লোকও এ ব্যবসায়ের লাভের অংশ
ভোগ করিত। এই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য
অংশের লোকও ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে
আগমন করেন।

তৎকালে যে সকল সমৃদ্ধিশালী লোক
কলিকাতায় বাস করিতেন, তাঁহাদের উদারতা
অত্যন্ত অধিক ছিল। নবকৃষ্ণ ও রামদুলালের
দানশক্তি চিরকাল প্রসিদ্ধ থাকিবে। ইংরাজ
ঐতিহাসিক লেখকেরা নবকৃষ্ণকে বিলক্ষণ গালি
দিয়া থাকেন। কিন্তু নবকৃষ্ণের কার্য্যকলাপ
দেখিলে তাঁহাকে বিলক্ষণ উদারমনা বলিয়া
বোধ হয়। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন,
মাতৃশ্রাদ্ধে নয় লক্ষ টাকা খরচ করেন, কিন্তু
মুসলমানদিগের মসজিদ ও খৃষ্টানদিগের
চার্চ্চ নির্ম্মাণেও সাহায্য করেন। পাথুরিয়া-
ঘাটার গীর্জ্জার জমি নবকৃষ্ণের প্রদত্ত।
হাতীবাগানের জমিও নবকৃষ্ণের প্রদত্ত। রাজা
নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট নামক রাস্তাটি সমস্তই নবকৃষ্ণের
ব্যয়ে নির্ম্মিত। পূর্ব্বযুগে যেমন নকুড় ধর
ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে পরস্পর মিল
করাইয়া দিতেন, এ যুগে রাজা নবকৃষ্ণ
ঠিক তেমনি ছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেন্টে
কোন অনুগ্রহলাভ করিতে হইলে নবকৃষ্ণের
উমেদারী করিতে হইত। নবকৃষ্ণ অনেক
লোকের চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন। রাম-
বাগানের দত্তেরা নবকৃষ্ণের কেরাণীর বংশ।
নবকৃষ্ণের এক পণ্ডিতের সভা ছিল, জগন্নাথ
তর্কপঞ্চানন তাহার প্রধান রত্ন।

কলিকাতার প্রাচীন কথা বলিতে গিয়া
আমরা নবকৃষ্ণের এত কথা বলিলাম, তাহার
কারণ এই যে, নবকৃষ্ণই কলিকাতার এই
তৃতীয় যুগের প্রধান ব্যক্তি। ১৭৭০ খৃঃ
অব্দে হেষ্টিংস সাহেব তাঁহাকে সুতানটী
তালুক মৌরসী দিয়া তাঁহার পদ-মর্য্যাদা
আরও বৃদ্ধি করিয়া দেন।

সেকালে কলিকাতায় বহুসংখ্যক
কেরাণী ছিলেন। তাঁহারা বিশুদ্ধ ইংরাজী
জানিতেন না, ইংরাজী জানিলে তাঁহাদের
কেরাণীগিরি করিতে হইত না। কেরাণী
কেবল নকল করিত। আসলে যদি মাছি
মরিয়া থাকিত নকলেও তাহারা মাছি
মারিয়া রাখিত, সেই অবধি মাছিমারা
কেরাণীর প্রসিদ্ধি জন্মিয়াছে।

—ক্ষপণক

আর্থিক প্রসঙ্গ

সোনাদানা

ইতিহাস :

—আমরা সোনাদানা লইয়া কি করিব, আমাদের খাদ্য দাও। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে দস্যুরা এইরকম কিছু উক্তি করেছিল। এই ধরনের উক্তি কিন্তু প্রচলিত—প্রতিষ্ঠিত ধারণার বিরোধী। দেখা যায়, মানুষের ছ' হাজার বছরের লিখিত ইতিহাসে স্বর্ণের প্রতি আকর্ষণ কখনও হ্রাস পায় নি। বস্তুত যখন থেকেই মানুষ সঞ্চয় করতে শিখেছে তখন থেকেই সে তার সঞ্চয় সংরক্ষণের ভারার্পণ করেছে ঐ ধাতুকে। কত সভ্যতার উদ্ভব ও বিলুপ্তি, কত জাতির উত্থান ও পতন, কত ঘটনার বিস্মৃতির মাঝে স্বর্ণ তার ঔজ্জ্বল্য এবং আকর্ষণ মোটেই হারিয়ে ফেলে নি। কবি ব্রাউনিং-এর অনুসরণে বলা যায় : আর সবই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা অক্ষত রয়ে গেছে তা হল সোনা।

আগুনে পড়লে সোনা ঠিক হয়ত অক্ষত থাকে না, আবার ধ্বংসও হয় না। তা ছাড়া নবরূপ গ্রহণ যোগ্যতা সোনার মত আর কোন ধাতু পদার্থের নেই। এক আউন্স স্বর্ণপিণ্ডকে পিটিয়ে ১০০ বর্গফুটের পাতে পরিণত করা চলে। ঐ পাত এত পাতলা যে তার মধ্যে দিয়ে আলোকরশ্মিও যেতে পারে। আবার এক আউন্স সোনা থেকে ৫০ মাইল লম্বা তার তৈরী করা যেতে পারে। স্বাভাবিক অবক্ষয়ের দিক দিয়ে ধাতুর মধ্যে সোনা সম্পূর্ণ সমান্তরাল-বিহীন—স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণনির্মিত দ্রব্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সম্পূর্ণ অক্ষতই থেকে গেছে। পরিশেষে ঐ পীতবর্ণ নয়ন-বিমোহনও বটে।

এই সব বস্তুগত কারণের জন্যে সোনা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছিল। আমাদের দেশে শ্রাদ্ধাদিতে সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে স্বর্ণদান বিশেষ রূপে গণ্য। ৩,৫০০ বছর আগে মিশরীয়রা তাদের নৃপতি তুতান খামেনকে সমাহিত করেছিল সম্পূর্ণ স্বর্ণনির্মিত শবাধারে পুরে। দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াবার সময় ইহুদিরা যখন একেশ্বরের উপাসনা থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়েছিল তখন তাদের উপাস্য দেবতা ছিল স্বর্ণ গো-বৎস।

বর্তমান :

আজকের দিনে কিন্তু স্বর্ণের মোহিনী-শক্তির কারণ কিছুটা ভিন্নপ্রকৃতির। কতকটা মিলটনের অনুসরণে লর্ড কেইন্স সোনার প্রতি আকর্ষণকে বর্বর যুগের ধ্বংসাবশেষ বলেই বর্ণনা করেছিলেন এবং তাঁর ও তৎপরবর্তী যুগের অর্থনীতিবিদরা আধুনিক অর্থ-ব্যবস্থার ওপর স্বর্ণের অযৌক্তিক প্রভাব হ্রাসের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করেছেন। ফলে আমরা স্বর্ণসমতা মান (গোল্ড প্যারিটি স্ট্যাণ্ডার্ড), কাগজী স্বর্ণ (এস ডি আর) ইত্যাদির কথা শুনেছি এবং কোন কোন সময় এই সব পরিবর্তিত-ব্যবস্থায় কিছুটা আস্থাস্থাপনও করেছি। শেষ পর্যন্ত কিন্তু দেখা গেল যে দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস অত সহজে নষ্ট হয় না।—বিপদের সময় মানুষ তাকেই আবার আঁকড়ে ধরে। বর্তমানের অকল্পিত মুদ্রাস্ফীতিজনিত বিপর্যয়ের দিনে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগতভাবে মানুষ আবার স্বর্ণপূজারী হয়ে উঠেছে—স্বর্ণের মধ্যেই সম্পদের চূড়ান্ত মূল্য, শেষ আশার বাণী খুঁজে বেড়াচ্ছে। এব্যাপারে রাজনৈতিক মতাদর্শ, অর্থ-ব্যবস্থার প্রকারভেদ ইত্যাদি সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগেকার দিনে রাজ-রাজড়ারা অভিযানকারীদের আদেশ দিতেন : যত পার সোনা নিয়ে এস। এখনকার দিনে রাষ্ট্রনায়করা প্রায় সেইরকম নির্দেশই দিচ্ছেন : যত পার সোনা নিয়ে এসে কোষাগারে ভর—অন্তত আখেরে কাজে লাগবে।

ব্যক্তি-সমুদয়ও তেমনি আখেরে কাজে লাগবার জন্যে তাদের ব্যক্তিগত কোষাগারে যত পারে সোনা ভরবার চেষ্টা করছে। সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে টাকাকড়ির যখন আর বিশেষ কোন মূল্য নেই, মুদ্রামূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষা করা (সরকারের অন্যতম অপরিহার্য অর্থনৈতিক কার্য বলে পরিগণিত) যখন আর কোন সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না তখন লোকে সোনাকে আবার শেষ নিরাপত্তা বলে মনে করবে বৈকি। ফলে কয়েক বছর ধরেই চলেছে বিশ্বজনীনভাবে স্বর্ণমৃগয়া।

স্বর্ণমৃগয়ার ফল :

এই স্বর্ণমৃগয়ার স্বাভাবিক ফল হল মূল্যবৃদ্ধি। ফল স্বাভাবিক হলেও বৃদ্ধির মাত্রাকে অস্বাভাবিক বা অকল্পিত বলে বর্ণনা করতে হয়। খোলা বাজারে ১৯৭০ সালে—অর্থাৎ ঠিক পাঁচ বছর আগে—সোনার দাম ছিল ট্রয় আউন্স প্রতি ৩৭-৩৮ ডলার। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তা গিয়ে পৌঁছোয় ১১০ ডলারে। অর্থাৎ পাঁচ বছরে ঠিক পাঁচগুণ দাম বৃদ্ধি। ট্রয় আউন্স বলতে বোঝায় ফ্রান্সের ট্রয়েস-এর আউন্স

বা সাধারণ ১০৯৭ আউন্সের সমান। সোনার মাপ এই ট্রয় আউন্সেই করা হয়। এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য : খোলা বাজারে দাম যখন আউন্স প্রতি ১৮০—১৯০ ডলার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখন সোনার সরকারী দাম ছিল (এখনও আছে) ট্রয় আউন্স প্রতি ৪২-২২ ডলার। আমাদের দেশে বর্তমানে ১০ গ্রাম বিশুদ্ধ স্বর্ণের সরকারী মূল্য ৮৪-৩০ টাকা। আর বাজার-দাম? মোটকথা স্বর্ণমূল্যের ফলে শুধু যে সোনার দাম বৃদ্ধি ঘটেছে তাই নয়, বিভিন্ন দেশে ঘোষিত সরকারী স্বর্ণমূল্যও বাস্তবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিবিহীন হয়ে পড়েছে।

ভবিষ্যৎ :

১৯৭৪ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বর্ণপিণ্ড সঞ্চয় অবৈধ ছিল। জাপানে ছিল ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত। তবে স্বর্ণপিণ্ড না হলেও স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চয়ে আইনগত কোন বাধা ছিল না। তাই বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খোলা বাজারে স্বর্ণমুদ্রার দাম আকাশছোঁয়া হয়েছিল, এবং ফলে স্বর্ণমুদ্রার ফলাও কারবার চলছিল। সোনার দাম কমাবার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে স্বর্ণপিণ্ড সঞ্চয় নিষিদ্ধকরণ আইন প্রত্যাহার করে এবং পরে বিগত ৬ জানুয়ারী তারিখে নিলামের মাধ্যমে ২ কোটি ৬০ লক্ষ আউন্স সোনা বিক্রীর সিদ্ধান্ত করে। এর ফলে পৃথিবীর দুটো প্রধান সোনার বাজারের কেন্দ্রে—লন্ডন ও জুরিখে—সোনার দাম প্রথমে বহু পরিমাণ বেড়ে গিয়ে পরে আবার কমতে শুরু করে। প্রশ্ন হলো : ভবিষ্যতে কি হবে? চাহিদা ও যোগানের অন্যতম সরল নীতি অনুসারে চাহিদা অপরিবর্তিত থেকে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে দাম কমার দিকেই যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোনা বাজারে ছাড়ার দরুন যোগান বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার কোন তারতম্য ঘটেছে কিনা, তা বোঝা যাচ্ছে না। সুতরাং ভবিষ্যৎ দাম কি হবে তা বলা সম্ভব নয়, তবে মজুত সোনা ছাড়ার দিকের চেয়ে উৎপাদন-সম্ভাবনার দিক দিয়ে বিচার করে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।

উৎপাদন-সম্ভাবনা :

এ পর্যন্ত নাকি সমগ্র বিশ্বে ৮০ হাজার টন সোনা খনি থেকে উত্তোলন করা হয়েছে এবং এক টন সোনা সংগ্রহ করবার জন্যে এক লক্ষ টন মাটিকে উত্তোলন করতে হয়। সোনার দাম যে এত বেশী তার এও একটা কারণ। স্বর্ণখনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের যদি মজুরি বৃদ্ধি করা হয় তাহলে সোনার দামও স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। সবচেয়ে বেশী সোনা যে দেশে উৎপন্ন হয় সেই দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্প্রতি স্বর্ণখনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে। এর ফল সোনার দামে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। দক্ষিণ আফ্রিকার উৎপাদনের পরিমাণ হল ৭০০ মেট্রিক টনের মত বা সমগ্র বিশ্বের উৎপাদনের মোটামুটি অর্ধেক। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকার উৎপাদনেই মোট যোগানের পরিমাণ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে। এর আরও কারণ হলো যে দ্বিতীয় বৃহত্তম স্বর্ণ উৎপাদক সোভিয়েত ইউনিয়নের সোনা (উৎপাদনের পরিমাণ বছরে ৩৭০ মেট্রিক টন) খোলা বাজারে আসে না। সুতরাং আপনাকে-আমাকে যা স্পর্শ করবে তা হল দক্ষিণ আফ্রিকার উৎপাদন-ব্যয়। তাছাড়া বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির দিনে অন্যান্য উৎপাদনকারী দেশেরই বা উৎপাদন-ব্যয় কম থাকার সম্ভাবনা কোথায়? অপর দিকে আবার দাম যদি কমেই যায় তবে উৎপাদন-হ্রাসের ঝোঁকও দেখা দিতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষেত্রে যা নাকি ঘটতে চলেছে।

মার্কিনী দৃষ্টান্ত :

অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কাজ—মজুত সোনা বাজারে ছাড়ার কাজ—শুরু করেছে তা যদি চালিয়ে যায়, আর পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি স্বর্ণ-কুবের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ করে তবে সোনার দাম পড়তে বাধ্য। কিন্তু গোটা-দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটবে কি? এদের মত বিভিন্ন রাষ্ট্রও যে স্বর্ণমূল্যের ব্যাপারে হওয়ায় এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। সমগ্র বিশ্বব্যাপী সোনার দাম এত বেড়ে যাওয়ার ফলেই আমাদের দেশে সোনার চোরা চালানের পরিমাণ বিশেষ কমে যায়, কারণ দামের পার্থক্য না থাকায় ঐ কারবারে আর বিশেষ লাভ থাকে না। চোরা চালান কারবারীরা সোনার পরিবর্তে ঘড়ি, ট্রানজিস্টার, আমেরিকান সিগারেট, মদ এবং রাইফেল-রিভলবারের দিকেই ঝোঁকে।

উপসংহার :

অতএব সব দিক দিয়ে মনে হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে দাম কমার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। মেয়ের বিয়ের কথা যদি ভাবতে শুরু করে থাকেন তবে একথা মনে রাখবেন। কারণ, যৌতুক দিতে না হলেও কিছু অলঙ্কার ত দিতে হবেই। আর অলঙ্কার মানেই হলো স্বর্ণালঙ্কার—সোনাদানার ব্যাপার।

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

প্রদর্শনী

আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস্-এর বাৎসরিক প্রদর্শনী

ভারতবর্ষের তাবৎ চারুকলার পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানগুলির বাৎসরিক প্রদর্শনী ইদানীং আচারসর্বস্ব অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। চারুশিল্পের বাজার যতই প্রসারিত হয়েছে, যতই এ বাজারে পেশাদার চারুশিল্প ব্যবসায়ীদের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে, ততই বৃহৎ চারুকলার পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে দক্ষ এবং প্রতিভাবান শিল্পীদের সম্পর্ক ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে। বোম্বাইয়ের বোম্বে আর্ট সোসাইটি দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্ট অ্যাণ্ড ক্রাফট সোসাইটি কলকাতার আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস এমনকি খোদ ললিত কলা আকাদেমির বাৎসরিক প্রদর্শনীতে যতই উঠতি হবু-শিল্পী বা অবসরপ্রাপ্ত শিল্পীদের কাজের ভিড় বেড়েছে ততই দক্ষ এবং প্রতিভাবান শিল্পীদের কাজ কমেছে। কলকাতায় যেখানে চারুকলার কোন বাজার নেই পেশাদার শিল্পব্যবসায়ী নেই সেখানেও দক্ষ এবং প্রতিভাবান শিল্পীরা সাধারণতঃ বৃহৎ পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানের স্বারস্থ হন না; শিল্পীরা নিজেদের গোষ্ঠী করে কাজ করেন প্রদর্শনী করেন। অথচ একদা বৃহৎ পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানগুলির বাৎসরিক প্রদর্শনী সত্যি সত্যিই বাৎসরিক শিল্পকার্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারত। এসব প্রদর্শনীতে দক্ষ এবং প্রতিভাবান শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ কাজের মেলা বসে যেত। তার থেকে বোঝা যেত চারুশিল্পের গতি-প্রকৃতি। আর আজ এসব প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক প্রদর্শনীতে সেরকম কাজই বেশী যা অন্য যেসব শিল্পী যাঁরা এসব প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন না তাঁরা করে ফেলেছেন পাঁচ বছর আগে। এটা একটা সর্বভারতীয় সমস্যা। কোন একটি প্রতিষ্ঠানের সমস্যা নয়।

আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস-এর ৩৯তম বাৎসরিক প্রদর্শনীতে এমন কিছু দেখা গেল না যা রীতি বা শৈলীগতভাবে অদৃষ্টপূর্ব না হলেও এমন একটি অভিনব সৃষ্টি যা বিশেষভাবে চিহ্নিত হবার দাবী রাখে। কিছু কিছু দক্ষ কাজ ছোটখাট ভাল লাগার মতন কাজ অতি অবশ্যই দেখা গেছে। কিন্তু তা-ই কি সব?

তবে এবারকার আকাদেমির প্রদর্শনী দেখে মনে হল, ভারতের শিল্পকলা চর্চা এখন আর কলকাতা-শান্তিনিকেতন দিল্লী বরোদা-আহমেদাবাদ বোম্বাই মাদ্রাজ হায়দরাবাদের মধ্যে আবদ্ধ নেই। রাজস্থানেও বেশ কিছু দক্ষ তরুণ শিল্পী অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে শিল্পচর্চা করতে শুরু করেছেন। এটা অবশ্যই বলতে চাচ্ছি না যে উপরোক্ত কয়েকটি কেন্দ্র ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও শিল্পচর্চা হয় না। হয় অবশ্যই তবে অন্য কোথাও চারুকলাচর্চার কোন সাংগঠনিক চেহারা দেখা যায় না এবং কোন নিজস্বতা দেখা যায় না। এবারকার আকাদেমি প্রদর্শনী দেখে মনে হল রাজস্থানে এখন অনেক শিল্পী কাজ করছেন সেই কাজের মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রচেষ্টার একটা যৌথরূপও প্রকাশ পেয়েছে। এবং এঁদের কাজ দেখে মনে হয়েছে এঁরা ঠিক অন্য জায়গার মতন কাজ করছেন না। এঁদের সকলের মধ্যেই জ্যামিতিক বিমূর্তনের প্রতি একটা পক্ষপাত দেখা যায়। রাজস্থানের চিত্রকলার ঐতিহ্য এবং রাজস্থানের আধুনিক নাগরিকীকরণের ও শিল্পোন্নয়নের পশ্চাদপরতার পরিপ্রেক্ষিতে জ্যামিতিক বিমূর্তনের প্রতি এই পক্ষপাত বিস্ময়জনক। সুতরাং এখনই বলা দুষ্কর এই প্রবণতা স্থায়ী হবে কিনা?

প্রদর্শনীর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে আছে মাদ্রাজের কে এম আদিমূলমের দুটি রঙিন ড্রইং অমলনাথ চাকলাদারের জলরঙের দুটি ছবি গৌতম চৌধুরীর একটি তেলরংয়ের ছবি হরেন দাসের একটি লিনোকাট প্রিন্ট রিণি দাশগুপ্তের একটি লিথোগ্রাফ প্রিন্ট রাজস্থানের সন্তোষ জৈনের দুটি নাগরিক দৃশ্য রাজস্থানের সুভাষ কেকরের একটি বিমূর্ত নিসর্গচিত্র লতিকা কাট-এর (বরোদার) দুটি ধাতু ঢালাইয়ের ভাস্কর্য শানু লাহিড়ীর পিকাসোর স্মৃতির প্রতি নিবেদিত তেলরঙের ছবি অসিত মণ্ডলের একটি জাপানী ধরনের অলংকারধর্মী অভিব্যক্তিমূলক ছবি কার্তিক পাইনের দুটি দুয়ানিয়র রুশোমুখী ছবি রাজস্থানের কাজী সামির হাসানের একটি বিমূর্ত ছবি হায়দরাবাদের ডি এল এন রেড্ডির একটি সুররিয়্যাল ছবি ইন্দোরের চন্দ্রশেখর শর্মার একটি বিমূর্ত ছবি এবং মহারাষ্ট্রের কে এস বিশ্বম্ভর-এর ধাতু-ঝালাই কা নির্মিত একটি ভাস্কর্য। প্রদর্শিত সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশো; অতএ উল্লেখযোগ্য কাজের সংখ্যা বেশ কম।

—প্রণবরঞ্জন রায়

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

চিমনী-মিস্ত্রীকে ঘরে ঢুকিয়েছিল কে? জেমস্ রাইডার। সে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই ঘরে ঢুকে গয়নার ভাঙ্গা বাকস দেখেছিল কে? জেমস্ রাইডার।

তবে কি চুল্লীর শিকটা ইচ্ছে করেই আলগা করে রেখেছিল জেমস্ রাইডার? এঁটে দেওয়ার অছিলায় মিস্ত্রী ডেকে এনেছিল—চুরির অপবাদ তার ঘাড়ে চাপাবে বলে?

খুব সম্ভব তাই। মিস্ত্রী তো এসেছিল চুল্লী সারাতে—সে জানবে কি করে অমুক জায়গায় গয়নার বাকস আছে? তাছাড়া গয়নার বাকস ভাঙবার মতলব নিয়ে এলে গয়নার বাকসটাই আগে ভাঙত—শিকটাকে এঁটে দিয়ে যেত না।

এই অনুমানের ভিত্তিতেই রাইডারকে জেরা করতে সব কবুল করে বসল সে।

জীবন

গোপাল ভট্টাচার্য

প্যাণ্ডেলের মধ্যে ওই ওপরে মাত্র একটি দু'শ ওয়াটের বাল্ব বীকন লাইটের মতো জ্বলছিল। বাকি সব আলো নেভানো।

প্যাণ্ডেলের নীচে তক্তায় শরীর হেলিয়ে আধেক বসা, দু-তিনজন পুরুষ-মানুষ উৎসবের বিষয়ে, বিশেষ প্রসূন ও গগনের রাজযোটক মিলের (লম্বায় গগন প্রসূনের কাঁধে পড়ে, স্বাস্থ্য দুজনারই মাপসই, রঙ দুজনারই মাজামাজা, চুল ও ভ্রূর দিক দিয়ে গগন প্রসূনকে টেক্কা দেবে) কুকুর-ডাকা-রাতের-স্বরে আলোচনা করছিল। চতুর্দিকে কেমন নেতিয়ে-পড়া ভাব, ক্লান্তির আচ্ছন্নতায়।

খানিক সময় পূর্বে ওরা বাসরঘরে প্রবেশ করেছে। ওরা মানে প্রসূন ও গগন। আগে প্রসূন নিজেই ঢুকেছে। পরে গগনকে মেয়েরা ঠেলে দিয়েছে।

এখনও গগন টেবিলের কোণায় হাত চোখ-ঢাকা ঘোমটা মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ও বুঝতে পারছে ওর সমস্ত শরীরে ইচ্ছাকৃত হাসিতে উজ্জ্বল অনেকগুলো দৃষ্টি সেঁটে আছে।

কপাটের পাল্লা দুটো খোলা। গগনের চিত্তের লাল রঙের ওপর বড়ো মোটা হাতে তুলি চালালো প্রসূন—খিলটা দাও।

কুঁজো হতে জল ঢালার শব্দের মতো শব্দ উঠলো বাইরে মেয়েদের হাসির।

গগনের মাথাটা আরও একটু ঝুঁকলো। পরে ঘোমটা ঈষৎ সরিয়ে গগন প্রসূনের চোখে চাইলো।

প্রথমে কটা রেখা জাগলো প্রসূনের কপালে। পরে ওগুলো মিলিয়ে গেল। এবং ওর, মানে প্রসূনের মনে হলো—গগনের চোখ দুটো যেন দুটো নক্ষত্র—বহুদূরে আকাশে কাতর হয়ে কাঁপছে।

কপাটের পাল্লা দুটো সন্তর্পণে বন্ধ করলো প্রসূন। খিল তুললো। আজ আর ছিটকিনি দিল না বা তালা দিল না কপাটের কড়ায়। কারণ বাইরে লোকজন রয়েছে। আলো জ্বলছে।

একে একে জানালার পাল্লাগুলো বন্ধ করলো প্রসূন। পরে ঘরের মেঝের

মাঝখানে এসে দাঁড়াল ও। বহুদিনের ব্যবহারে বৈচিত্র্যহীন ঘরখানাকে এই মুহূর্তে বড়ো অদ্ভুত লাগছিল প্রসূনের। ওর বাবার আমলের ঘর। বিবাহের পূর্বে চুণকাম করানো হয়েছে, জানলা-কপাটের গায়ে রঙ পড়েছে, টিউব-লাইট একটা ও একটা সবুজ আলো করা হয়েছে। আর দেয়ালে টাঙানো হয়েছে একখানা নতুন ছবি।

উত্তরে খাট। খাটের ব্যাটনে বেলফুলের মালা জড়ানো। প্রসূন খাটের কারুকার্য, ব্যাটন পায়া লক্ষ্য করছিল। নতুন খাট। গগনরা দিয়েছে।

—কত দাম নিয়েছে খাটটার? হঠাৎ প্রসূন প্রশ্ন করলো।

—দাদা জানে। গগন প্রসূনের চোখ থেকে দৃষ্টি সরালো না।

—কিছু শোনোনি?

—না। গগন এবার দৃষ্টি সরিয়ে হাতের আংটিতে ফেললো।

সরে এলো প্রসূন। জামা খুললো। ঝোলা কাঠিতে ঝুলিয়ে দিল কাপড়টা খসখস করছে, ফুলে উঠছে সাবানের ফেনার মতো। প্রসূন কাপড় খুলে লুঙি পরার কথা ভাবলো। গগনকে দেখলো প্রসূন। যতটা পারলো কাপড়টা গুছিয়ে নিল। টিউব-লাইট অফ করলো। সবুজ আলোটার সুইচ টিপলো।

সবুজ আলো নজরে পড়া মাত্রই প্রসূনের হাতের চেটোর উল্টোপিঠের অত্যন্ত ফুলো ফুলো শিরাগুলোকে মনে পড়লো। কারখানায় কাজ দেখতে দেখতে কতদিন ও নিজের হাতের শিরাগুলোকে দেখেছে।

টেবিলের কোণায় হাত মাথা নীচু গগনের পা দুটো ঈষৎ কাঁপছিল।

খাটেতে বসলো প্রসূন। গগনকে চোখের মণিতে তুলে বললো—তুমি যে লজ্জার বিজ্ঞাপন দেখাতে শুরু করলে। আর বিজ্ঞাপন দেখাতে হবে না। এসে বোসো। গুছিয়ে তো নিলে।

তাড়াতাড়ি ঘরখানার কপাট ও জানলাগুলো দেখলো গগন। বন্ধ। এবার অনুমান করতে চেষ্টা করলো বাইরে শব্দগুলো পেঁৗছেছে কিনা। ওর লজ্জা লাগছিল।

গগন নিজের পানে তাকাল। বেনারসী শাড়ি পরনে, মিলিয়ে ব্লাউজ দুহাতে আনাব ও ফুলের গয়না কড় লাল বালা।

গগন ভাবছিল, যত জানা-চেনা ভাব-ভালোবাসাই থাক, টোপর পরে সাত পাক ঘুরে মালা বদল করে যে-বিয়ে তার মর্যাদাই আলাদা। ওর (প্রসূনের) সবই যেন লোহা-লক্কড়। মাল (লোহা) ঘেঁটে ঘেঁটে নজরটাও লোহা বনে গেছে।

দুটো কাগজে সই করলুম বিয়ে হয়ে গেল। একটা দিন একটু খরচ হলো, তার-পর গোটা জীবন তো পড়ে রইলো যত পারো খরচ বাঁচাও।

বেনারসী শাড়ি খুস খুস আওয়াজ তুলে খাটে এসে বসলো গগন, প্রসূনের পাশে।

—অনেক খরচ হয়ে গেল, না? গগনের প্রশ্ন।

—নিশ্চিন্ত হয়েছ? প্রসূনের স্বর কেমন ঝাল-ঝাল।

—নিশ্চিন্ত তুমিও হয়েছ। তবুও গগন গলাটা তুলো তুলো রাখলো।

প্রসূন অমনি গগনের পানে তাকাল। পালিশ-করা লোহার মালের ওপর রোদ্দুরে যেমন ঠিকরয়, ওর দৃষ্টি তেমন ঠিকরলো।

গগন প্রসূনের হাঁটুতে হাত রাখলো।

—এই নিয়ে আজকের দিনটাও নষ্ট করবে!

সামান্য নিস্তেজ হলো প্রসূন। তথাপি সেই প্রশ্নই তুললো।

—আমি কিভাবে নিশ্চিন্ত হলুম!

গগনের দৃষ্টি শীতের বিকেলের মতো শান্ত ঠান্ডা। আজও ও ঘেঁৎ ঘেঁৎ করবে। গগন ভাবলো, প্রসূন আমায় অগ্রাহ্য করতে শুরু করেছে মাস দুয়েক আগে থেকেই, ওকে বলার পর।

গগন বললো—আমার একারই নয়, তোমারও মান-ইজ্জৎ প্রতিপত্তি ব্যবসা সব পাঁকে ডুবতো।

ওদের কয়াতলায় অনেক দিনের জমা শ্যাওলার ছবিটা মনে পড়লো প্রসূনের। গগনের হাতখানা সরিয়ে দিল ও।

—আমি কী তা অস্বীকার করছি। প্রসূনের গলার স্বর লোহা লোহা।

—আমি কী তাই বলছি! কেবল ঝগড়া করছো কেন? জানো, প্রথম দিন ঝগড়া দিয়ে শুরু করলে যতদিন বাঁচবো ঝগড়া হবে।

গগনের চোখ দুটো যেন ডবডবিয়ে উঠলো।

প্রসূন বললো—তোমার খেয়ালের জন্যে কত টাকা দেনা হলো সে-খবর রাখো?

—তবে আর ফুলশয্যা হয়ে কাজ নেই খাতা-কলম নিয়ে বসে পড়ো।

গগন চেয়ে চেয়ে দেখছিল, প্রসূন ওর কম বয়েসের ফোটোখানার দিকে তাকিয়ে সিগারেটের দৈর্ঘ্য কমাচ্ছে।

—ও শোধ হয়ে যাবেখন। প্রসূনের হাতের ওপর হাত রাখলো গগন। নিজের ভেতরের উত্তাপ প্রসূনের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চাইলো—আমার বাবা, দাদা কত দেনা করে দিদিদের বিয়ে দিয়েছিল। তার-পর আস্তে আস্তে সে-সব দেনাও শোধ হয়েছে। আমার বিয়েতেও দাদা দেনা করেছে। সে-দেনাও শোধ হবে। আর তোমার দেনা শোধ হবে না!

কে জানে গগনের উত্তাপে প্রসূন তাতলো কিনা। সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রসূন বললো—একখানা মাত্র লেদ মেসিন থেকে সব দেনা শোধ করতে হবে। এই বাজার, কাজকম্ম নেই, মালের দাম হু-হু বেড়ে যাচ্ছে। চারিদিক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

প্রসূন বলেছিল, ও যা নগদ পাবে সেটা কারবারে ঢালবে, রেজিস্ট্রী করে বিয়ে হলে পঞ্চাশ টাকার ভেতরে হয়ে যাবে।

সবুজ আলোটাও আস্তে আস্তে নিভলো। সাপ্লাই গেল। অমনি প্রসূন বললো—এই এক হয়েছে। যখন-তখন কারেন্ট ফাঁক। গগন প্রসূনের কাঁধে হাত স্থাপন করলো—কী ভাবছো?

আর প্রসূন বললো—বাইরে জিনিস-পত্তর পড়ে রয়েছে। অন্ধকার। খাটা-খাটনি হয়েছে। যদি সবাই ঘুমিয়ে পড়ে! প্রসূন উঠলো। গগন প্রসূনকে ধরলো—সবাই অমনি ঘুমিয়ে পড়ছে। দায়িত্ব নেই। তোমার ভাইয়েরা রয়েছে। আমরাও তো জেগে আছি।

গগন দু হাতে প্রসূনকে ধরে বসালো। কাঁধে মাথা রাখলো।

বড়দির ফুলশয্যার রাতের গল্পটা (বড়দির মুখে শোনা) মনে পড়ছিল গগনের। বড়ো জামাইবাবু একটা হীরে-বসানো আংটি পরিয়ে দিয়েছিল দিদির হাতে। ঘরের মধ্যে ওরা নতুন করে মালা বদল করেছিল। জামাইবাবু গোড়ে মালা কিনে রেখেছিল। তারপর ওরা গল্প করে করেই পাখীদের ডাক শুনতে পেয়েছিল ভোরে। তাতেও নাকি ওদের মনে হয়েছিল, বড়ো তাড়াতাড়ি পাখীরা ডাকতে শুরু করে দিল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বলে উঠলো। আলো জ্বলতেই প্রসূনের দৃষ্টি হেঁপ্টে হেঁপ্টে হাজির হলো দেয়ালের

ট্রু-টোন
হেয়ার কণ্ডিশনার মেশানো অনবদ্য হেয়ার ডাই

এই কলপ খুব সহজেই সারা মাথায় সমান ভাবে লাগানো যায়। চুলের রঙ নকল বলে ধরাই যায় না। তাছাড়া, এই হেয়ার ডাইতে হেয়ার কণ্ডিশনার থাকায় চুল নরম, উজ্জ্বল আর পরিপাটী থাকে।

TRU-TONE

TRU-TONE

* নামকরা হেয়ার ড্রেসাররাও এই হেয়ার ডাই ব্যবহার করেন।
* চুলের যত্নের ব্যাপারে পৃথিবীর অগ্রণী মার্কিন কোম্পানী—হেলেন কার্টিস-এর [illegible] কারিগরীর সাহায্যে তৈরী হেয়ার ডাই।

জি. এথারটন এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

নতুন ছবিটার ওপর। হাতখানা গগনের হাতের ওপর।

গগনেরই দাদার অফিস থেকে একটা বড়োরকমের অর্ডার পায় প্রসূন। ফলে কিছু বেশ লাভ হয়। ওর দাদা বলেছিল, গগন ও প্রসূন ওর কারখানার নামে একটা ক্যালেণ্ডার করুক।—ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার। ছবিওয়ালাই ক্যালেণ্ডার করেছিল প্রসূন।

অনেকেই সুখ্যাতি করে ছবিটার। গগনের দাদা, গগনও। তাই প্রসূন সেই ছবি একখানা বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙিয়েছে।

উত্তাল তরঙ্গ সংক্ষুব্ধ এক সমুদ্র। শুধু জল আর জল। সমুদ্রের ওপর ভাসমান এক জাহাজ। জাহাজে যাত্রী একজন। বহু দূর প্রান্তে সবুজের চিহ্ন। অর্থাৎ উর্বর ভূখণ্ড।

প্রসূনের হাত শিথিল হলো। দৃষ্টিও। অমনি সোজা হয়ে বসলো গগন। প্রসূনের দৃষ্টির পিছু পিছু দৌড়লো ও। ওইরকম ক্যালেণ্ডার ওর ঘরেও আছে একটা।

—কী দেখছো? প্রশ্ন গগনের।

—ভদ্রলোক ওই ভূখণ্ডে পৌঁছুতে পারবে না সমুদ্রে ডুববে, তাই ভাবছি।

—ডুববে কেন! পৌঁছবে। নিঃসংশয় কণ্ঠ গগনের।

গগন প্রসূনকে আদর করতে থাকলো। আদরে আদরে চাঙ্গা।

—তুমি একলা ছিলে, এবার আমি তোমার পাশে। আমরা পৌঁছবেই।

পূর্বের মতো আজও প্রসূনের বড়ো ইচ্ছে হলো। প্রসূন প্রশ্ন রাখলো।

—ধরো, হঠাৎ আমি সমুদ্রে পড়ে গেলুম!

আমিও ঝাঁপ দোবো। কিন্তু শব্দগুলো মুখস্থের মতো লাগলো ওর। প্রসূন প্রশ্ন করলো অমনি—কিন্তু আমার কারখানা!

চমকে উঠলো গগন। প্রসূনের স্বামীরূপে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়া উচিত ওর এ পর্যন্ত ভেবেছে। কিন্তু পরের কথা চিন্তা করেনি ও। মরিয়া হলো গগন।

—আজও যত অমঙ্গলের কথা তোমার। কী তুমি!

তুমি আমায় সাহায্য করতে তো? প্রসূন সেই একই জায়গায়।

গগনের কানে প্রসূনের কণ্ঠস্বর ভিক্ষের মতো ঠেকলো। তাড়াতাড়ি প্রসূনের একখানা হাত নিজের মুঠোয় আশ্রয় দিল।

—আজ তুমি নিশ্চয় সিদ্ধি খেয়েছ। এতদিন পরে এই প্রশ্ন! আমি তোমায় সাহায্য করবো না তো কে করবে!

প্রসূন কিন্তু ভিন্নরকম ভাবছিল। ছিল ও একজন, হলো দুজন, ক'মাস পরেই হবে তিনজন। খরচ বাড়তেই চললো। ও ডুববে, না পৌঁছবে।

প্রসূন প্রশ্ন করলো— তোমার দাদাকে বলবে তো?

গগনের দাদা নিজের অফিসের অর্ডার পাইয়ে দেয় প্রসূনকে। ধারে মাল পেতে সাহায্য করে ওকে। ওই সূত্রেই ওদের বাড়ি যাওয়া। তারপর গগনের সঙ্গে পরিচয় হলো। সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়েছে ক্রমশঃ।

মাঘ মাসের শেষ, ঠাণ্ডা ততো না থাকলেও গগন কেমন একপ্রকারের অসুবিধে বোধ করতে থাকলো।

গগন ভাবছিল, ওর মেজো-জামাইবাবুর কারখানা আছে। এইভাবেই দাদা ওকে সাহায্য করতো। তারপর বাড়িতে যাওয়া-আসা। থেকে থেকে মেজদির বিয়ে হলো। এখন দাদা মেজো-জামাইবাবুকে তেমন পাত্তা দেয় না, এড়িয়ে যায়।

গগন বললো—আমি কী বলবো! এখন তুমি তার ভগ্নীপতি হলে, আদায় করে নেবে। তোমার জোর বাড়লো।

বড়ো চমৎকার লাগলো। টেবিলে ফুলদানীতে রজনীগন্ধার স্টিক, গোলাপ ফুলের স্তবক। চমৎকার গন্ধ পাচ্ছিল প্রসূন।

প্রসূন গগনের হাত সংগ্রহ করে আদর করতে থাকলো। অল্পক্ষণের মধ্যে গগনের হাতের লালাগুলোকে নিয়ে পড়লো।

—ভারী সুন্দর ডিজাইন দেখছি। যেন ছাঁচে ফেলা মাল।

গগন আড়ষ্ট হচ্ছিল, এখুনি প্রসূন যদি প্রশ্ন করে, এতে ক'ভরি সোনা আছে, গগন?

কোথা হতে একটা প্রজাপতি এলো। দেয়ালের বাঁধানো ছবিটার ওপর বসলো, থপ্ থপ্ ডানা ঝাপটাচ্ছিল। গগন যেন হাতে তালি বাজিয়ে উঠলো—দ্যাখো দ্যাখো, এত রাতে আমাদের ঘরে প্রজাপতি! খুব মঙ্গলের চিহ্ন, বলো!

প্রসূন গগনকে টেনে নিল। আর কতরকমের গন্ধ পেল গগন।

গগনের কানে প্রসূন ফিসফিসিয়ে বললো—আমাদের পুরানো বাড়ি, এতটুকু ঘর, তোমার পছন্দ হয়েছে?

অমনি প্রসূনের মুখে হাত চাপা দিল গগন।

—বড়ো বাজে বকছো তুমি আজ!

অমনি একটা আনন্দ তৈরী হলো। আনন্দটা প্রসূনের ঠোঁটে ফুটলো, তা হতে গগনের বুকে ভাসলো। গগন ওর ঘরের এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। কেমন করে ঘর সাজাবে ও কী তাই ভাবছিল?

পশ্চিমের দেয়ালে বড়ো দেয়াল-ঘড়ি একটা। ঘড়িটাতে কাঁটায় কাঁটায় বারোটা বেজেছে। লক্ষ্য করলো গগন, ওটা বন্ধ। গগন প্রশ্ন করলো—ঘড়িটাতে দম দেবারও সময় হয় না তোমার? হেসে ফেললো প্রসূন—ওটা অচল ঘড়ি।

—সারাওনি কেন? অমন ঘড়িটা!

তখনও হাসছিল প্রসূন—ওটা দেখতেই বড়ো। বিক্রী করলে যন্ত্রপাতিগুলোও কেউ কিনবে না। বাবার ঘড়ি। বাবা যতদিন বেঁচেছিল, সারাতো, আবার খারাপ হতো। আবার সারাতো। বাবা গেল, সেই থেকে ওই অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

প্রসূনের কথার ধরণে গগনও হাসলো। বললো—তাহলে ওর ওপর একখানা কাগজ সেঁটে দাও। অচল ঘড়ি, আবার বারোটা বেজে রয়েছে। এমন বিশ্রী ব্যাপারটা!

গগন হাসলো ছোট্ট করে। প্রসূন হাসলো বড়ো করে। হাসতে হাসতেই প্রসূন বললো—টাকা দিলেও ওটাকে দেখলেই যে মনে পড়বে ওটা অচল। ওটাতে বারোটা বেজে আছে।

দুজনেই হাসতে গিয়ে কিছু শব্দ সৃষ্টি করে ফেললো। হেসে হেসে ধবধবে সাদা বিছানায় গড়িয়ে পড়লো।

হাসি থামলে প্রসূন বললো—বুড়োদের কাণ্ড! একটা বাজে ঘড়ির পেছনে খরচ। কী না পুরানো ঘড়ি! কোনো মানে হয়।

গল্প করতে করতে প্রজাপতি দেখতে দেখতে ফুলের গন্ধ পেতে পেতে সময় কেটে যাচ্ছিল।

এবারে গগন প্রশ্ন করলো—একটা কথা বলবো। আমায় ছুঁয়ে বলো, রাগ করবে না।

—না। ওকে ছুঁয়ে দিব্যি গালতে প্রসূনের এতটুকু দেরী হলো।

একটু হাসলো গগন। একটু ইতস্ততঃ করলো। তারপর বললো,

—কী করবো বলো! তাড়াতাড়ি বিয়েটা হয়ে যাবার জন্যে আমি তোমায় মিথ্যে বলেছিলুম। আমি 'মা' হতে যাচ্ছি না কিন্তু। প্রসূনের হাতের উল্টোপিঠের ওপর হাত রাখলো গগন। প্রসূনের চোখের ওপর নিজের চোখ।

কেমন এক প্রকারের শারীরিক সুস্থতা অনুভব করলো প্রসূন। যেন ভীষণ মাথা ধরেছিল হঠাৎ মাথা ধরা উবে গেল।

কিন্তু আশ্চর্য, প্রসূন হাসতে চাইলো পারলো না; গগনের চোখে তাকিয়ে থাকতে চাইলো, পারলো না।

বাঁধানো ছবিটার ওপরের সেই প্রজাপতিটা, যেটা এতোক্ষণ ডানা ঝাপটাচ্ছিল, টপ্ করে পড়ে গেল নীচে। গগন যেন ককিয়ে উঠলো—যাঃ! ওটা গেল। একটু দ্যাখো না গো!

পায়ের পাতায় দাঁড়িয়ে পড়লো গগন।

এদিকে প্রসূন আপনার দেহটা বিছানার ওপর ফেলে দিল। চোখ বুজলো ও।

মাঠের নায়ক

রবি ব্যানার্জি

পিতার পদাংক অনুসরণের সূত্রে ক্রিকেট অঙ্গনে আবির্ভাব এবং উত্তরকালে দেশজোড়া স্বীকৃত লাভের নজীর ভারতে বিরল ঘটনা নয়। আজকের মনসুর আলি খান (পাতৌদি), অশোক মানকাদ, অংশুমান গাইকোয়াড় প্রণব রায় তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

পিতৃ গুণাবলীর ধারক ও বাহক হিসেবে আরও যে নামটি ঐ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তা হোল বাংলার রবীন ব্যানার্জির। ঘরোয়া বা বড়ো ক্রিকেটে রবীনকে এখন আর পুরো নামে কেউ ডাকেন না। সবাই জানেন, সবাই চেনেন রবি ব্যানার্জি বলে। কালীঘাট তথা বাংলার রবি প্রখ্যাত টেস্ট ক্রিকেটার সুধাংশুশেখর ব্যানার্জির ছেলে। সুধাংশুশেখর ব্যানার্জি বললে অনেকের হয়তো চিনতে অসুবিধে হবে কিন্তু আটপৌরে নাম—মণ্টু ব্যানার্জি বললে ভারতের কোন ক্রিকেট অনুরাগী না তাঁকে চিনবেন?

মণ্টু ব্যানার্জি ছিলেন মূলতঃ বোলার। ছেলে রবি, বোলার ব্যাটসম্যান দুই-ই। মিডিয়াম পেস বোলার চৌত্রিশ বছরের জোয়ান ছেলে রবির রান এবং উইকেটের হিসেব করলে পাহাড়-প্রমাণ হয়ে যাবে। ভবিষ্যৎ তো পড়েই রয়েছে। এই বয়সেই কত দেশ-বিদেশে যাওয়া হোল, খেলা হোল, কত প্রতিষ্ঠা হোল; কত সম্মান জুটলো আবার সেই সঙ্গে জুটলো অসম্মান আর কত উপেক্ষা। অতীত স্মৃতিচারণের মাঝখানে ঐ অসম্মান, উপেক্ষার প্রসঙ্গ রবির কণ্ঠকে আবেগ উত্তাপে রুদ্ধ করে। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রবি ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবেই সোচ্চার হয়ে ওঠেননি এতদিন। প্রতীক্ষা করেছেন সুবিচারের, শুভ বুদ্ধির উদয়ের। বলা বাহুল্য ধৈর্য ও প্রতীক্ষার পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। রবিকে দূরে সরিয়ে রাখা কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১০ জানুয়ারী আবার তিনি রণজি ট্রফি খেলেছেন বাংলার হয়ে।

রবি আজ যদি প্রশ্ন তোলেন কেন তাঁকে খেলোয়াড়জীবনের সেরা সময়টিতে অযৌক্তিক এক আশঙ্কায় মাঠের বাইরে

যারা জানেন, তাহলে ঐ প্রশ্নের জবাব দেবেন কে? আর কি জবাবই বা দেবেন? রবি ইংল্যাণ্ডে ল্যাংকাশায়ার লীগে খেলেছেন, অস্ট্রেলিয়ায় খেলেছেন, গোভার স্কুলে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। কেউ তাঁর বল সম্পর্কে কোন সন্দেহ করেননি, বিধি ভঙ্গের কোন প্রশ্ন তোলেননি, অ্যালফ গোভারের মত ক্রিকেট-পণ্ডিতের চোখেও যিনি নিখুঁত বোলার, সেই রবি ব্যানার্জিকে 'চাকার' বলে চিহ্নিত করলেন এ-দেশের কোন মহা-পণ্ডিত? রবির ডেলিভারী অ্যাকসন দেখে লোতার প্রশ্ন করেছিলেন : চাকার সংজ্ঞা কি? কে তোমার চাকার বলেছেন? ননসেন্স!' রবির মুক্তিস্নান হোল।

১৯৫১ সালের মার্চ মাসে বেলেঘাটার ৪৮ নম্বর অবিনাশ ব্যানার্জি লেনে রবির জন্ম। লেখাপড়া পাড়ার দেশবন্ধু স্কুলে এবং পরবর্তী পর্বে সিটি কলেজে (কমার্স)। পার্ট-ওয়ান পরীক্ষার পর পার্ট-টুর জন্য প্রস্তুতি চলছে মাঠের ক্রিকেটের সংগে সমান তাল রেখে। বাড়ীর আবাল-বৃদ্ধবনিতা ভীষণ ক্রিকেট অনুরাগী। গোটা বাড়ী জুড়েই একটা ক্রিকেটের আবহাওয়া বর সাম্রাজ্য। ছোটবেলায় ক্রিকেট চলতো বাড়ীর বাগানে। একটু বড় হতেই কাকা মধুসূদন ব্যানার্জী নিয়ে গেলেন শেয়ালদার নেতাজী সুভাষ ইনস্টিট্যুটে (দ্বিতীয় ডিভিসন)। এমনিভাবে বছর দুয়েক কাটলো। তারপর ১৯৬৬-তে বাবা মণ্টু ব্যানার্জি রবিকে তুলে দিলেন কালীঘাট ক্লাবের প্রশিক্ষক সুনীল দাশগুপ্তের হাতে। সুনীলবাবু মনপ্রাণ দিয়ে রবিকে ব্যাটিং বোলিং আর ফিল্ডিং (রবি ফিল্ডিং করেন কভার পয়েন্টে) শেখালেন। রবিও শিখলেন মনপ্রাণ দিয়ে। ১৯৬৬-৬৭ সালে খেললেন জামসেদপুরে বাংলা স্কুল দলের হয়ে আসাম ও বিহারের বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম প্রতি-দ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচে। দলভুক্তি বোলার হিসেবেই। আসামের বিরুদ্ধে উইকেট পেলেন সাতটি (৪+৩) এবং রান করলেন ৫০ (অপরাজিত)। বিহারের দু' ইনিংসে উইকেট পেলেন (৫+৪) ৯টি। রান ৩৭। প্রতিযোগিতার মূল পর্বে মাদ্রাজের চীপকে পূর্বাঞ্চল স্কুলের প্রতিনিধি রবি দক্ষিণা-ঞ্চলের উইকেট পেলেন মাত্র একটি। রান ৩৭। ম্যাচে পূর্বাঞ্চলের হার হোল কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়েই। ৬৮-৬৯ সালে পূর্বাঞ্চল অবশ্য এর বদলা নিল সর্ব-ভারতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে। স্কুল ক্রিকেটে সেবার তিনটি ম্যাচে রবির সংগৃহীত উই-কেটের সংখ্যা ছিল বাইশ, দীপংকরের উনিশ।

ঐ বছরই ভারতীয় স্কুল দল গেল অস্ট্রেলিয়া সফরে। রবিকে দল থেকে বাদ দেয় তখন কার সাধ্য? সফরের গোড়ায় ঠাণ্ডায় কাবু হয়ে পড়ায় চারটি ম্যাচ রবির পক্ষে খেলা সম্ভব হয়নি। সিডনী টেস্টে তিনি ছিলেন দলের দ্বাদশ ব্যক্তি। ঐ টেস্টে আজকের সাড়া-জাগানো টমসন ৬টি উইকেট পেয়েছিলেন। মেলবোর্নে দ্বিতীয় টেস্টে রবি তিনটি উইকেট পান। রান করেন ৪০। ভারত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে জেতে ৬ উইকেটে। তৃতীয় টেস্টে ক্যান-বেরায় ভারত অস্ট্রেলিয়াকে হারায় ১০৪ রানে। রবি ৩৭ রানে ৩টি উইকেট পান। এডিলেডে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩৬ রান এবং ৬টি উইকেট লাভও উপেক্ষণীয় নয়। দলের অধিনায়ক ছিলেন রাজা মুখার্জি। ৬৯-৭০ সালে শ্রীলংকা সফর-কারী ভারতীয় স্কুল দলেও স্থান হয়েছিল রবি ব্যানার্জির।

৭০-৭১ সালে রবি ব্যানার্জি বাংলার হয়ে প্রথম রণজি ট্রফি খেলেন। বরাত বোধহয় ভাল ছিল না, তা না হলে ওপেনিং বোলাররূপে দলভুক্ত হয়েও ওড়িশার বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে বল করার সুযোগ পেলেন না কেন? দ্বিতীয় ইনিংসে অবশ্য রবিকে বল করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। চার ওভার বল করে ৬ রানে একটি উইকেট পেয়েছিলেন। নওগাঁয় আসামের বিরুদ্ধে ৬ ওভার বল করে ১২ রানে ২টি উইকেট নেন রবি (২টি ক্যাচ ড্রপড)। কিন্তু তার-পর বিহারের বিরুদ্ধে রবিও ড্রপড। ৭৩ সালে ঘরোয়া লীগ ও নক-আউট ক্রিকেট আসরে সর্বোচ্চ উইকেটধারী হয়েও বাংলা দলে ঠাঁই হোল না। ৭৩-৭৪ সালে বাংলা দলে স্থান হোল বটে তবে রিজার্ভ হিসেবে (বিহারের বিরুদ্ধে)।

বিহারের ঐ দলটিই রুসি মোদী একাদশ নাম দিয়ে কলকাতার পি সেন ট্রফি খেলতে এসে ১২৭ রানে পাঁচটি উই-কেট পেলেন রবি। কিন্তু আশ্চর্য, এত করেও মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বাংলা দলে রইলেন তালিকার বাইরে। তারপরই সেই দলীপ ট্রফির ঘটনা। বোম্বাইয়ে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলার সময় আম্পায়ার মামসা 'নো-বল' ডাকলেন। এরপরও তিনি রণজি ট্রফিতে খেলেছেন কিন্তু বোলিংয়ে বিধি লংঘন করার কোন ইঙ্গিতই কোন-দিন পাননি আম্পায়ারদের কাছ থেকে।

কিন্তু কিছুতেই দমাতে পারেনি রবিকে। ১৯৭৩ সালে চলে গেলেন ইংল্যাণ্ডে রয়টন ক্লাবের হয়ে সেন্ট্রাল ল্যাংকা-শায়ার ক্রিকেট লীগ খেলতে। প্রথম বছর, তাই দ্বিতীয় বা 'বি' টিমে খেলতে হোল। দুটি ম্যাচে উইকেট পেলেন আটটি। তার-পরেই প্রমোশান, প্রথম একাদশে অর্থাৎ 'এ' টিমে। প্রথম একাদশে খেলতে নেমে প্রথম ম্যাচেই ২২ রানে ৬টি উইকেট মিললো। কাগজে কাগজে রবিকে নিয়ে সোরগোল উঠলো। পরের তিনটি ম্যাচে আরও ১৫টি উইকেট (৫+৫+৫)। ১২টি ম্যাচ ৩৬টি উইকেট।

ল্যাংকাশায়ার সেন্ট্রাল কাউন্টি লীগ মরসুমের শেষে সোজা চলে গেলেন কল-কাতার ছেলে রবি 'ওভস্ ওয়ার্থ' শিক্ষা-কেন্দ্রে (১৭২ ইস্ট হিল, লণ্ডন, এস-ই) ক্রিকেটের দ্রোণাচার্য অ্যালফ গোভারের কাছে শিক্ষার্থীরূপে। তারপর লণ্ডন থেকে কল-কাতায় ফিরে এলেন। ফিরে এলেন আবার কালীঘাট ক্লাবে।

সাংসারিক জীবন রবির বড় সুখের। মা আছেন, বাবা আছেন, পত্নী আছেন (মধুমিতা ব্যানার্জি) আর আছেন অগণিত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং সেই সংগে হিন্দুস্থান স্টীলের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্পেশাল ওয়েলফেয়ার-এর (স্পোর্টস) চাকরীটিও।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

রেনেট স্টেচার

দেশবিদেশের খেলা

ট্র্যাকে দ্বিপদকী

প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সাফল্যের নিদর্শন স্বর্ণ। প্রত্যেক প্রতিযোগীর শ্যেন-দৃষ্টি থাকে একটি পদকের দিকে। নিজের সব কলাকৌশল ও সর্বশক্তির বিনিময়ে পেতে চায় সেরা সম্মান সোনার পদক।

মিউনিখ অলিম্পিকের আসরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার সুবাদে অনেকেরই গলায় ঝুলছে সোনালী সোনার পদক। কিন্তু ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানের দুটি বিভাগে (১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে) দ্বিপদক জয়ের নমুনা অত্যন্ত নগণ্য বললেই হয়। ট্র্যাকে মাত্র তিনজন এই গৌরবের অধিকারী। পুরুষদের মধ্যে ফিনল্যান্ডের দূরপাল্লার দৌড়বীর লাসে ভিরেন ও রাশিয়ার দূরপাল্লার দৌড় প্রতিযোগী ভ্যালেরী বোরজভ-এর নাম করতে হয়। মহিলাদের মধ্যে পূর্ব জার্মানীর একমাত্র রেনেট স্টেচার এই গৌরবে গৌরবান্বিতা।

ইতিপূর্বে মহিলা অ্যাথলেটিকসে আরও চারজন ট্র্যাকে দ্বিমুকুট পেয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এঁরা হলেন যথাক্রমে নেদারল্যান্ডের ফ্যানি ব্যাংকার্স কোয়েন অস্ট্রেলিয়ার আরজোরি জ্যাকসন ও বেটিকাথবার্ট ও আমেরিকার উইলমা রুডলফ। ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে উইলমা স্বল্পপাল্লার দৌড়ে দুটি স্বর্ণপদক কুড়িয়েছিলেন। কেবল ব্যতিক্রম ঘটেছিল টোকিও ও মেক্সিকো অলিম্পিকে

বিগত অলিম্পিকে পূর্ব জার্মানীর তরুণী রেনেট স্টেচার ১১-১ সেকেন্ডে ১০০ মিটার ও ২২-৪ সেকেন্ডে ২০০ মিটার পথ অতিক্রম করে প্রথম হওয়ার সূত্রে মহিলা স্প্রিন্টারদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে রইলেন। স্টেচার এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার শক্তিশালী প্রতিভা রিয়েলিনী বয়েল। তিনি ১১-২ সেকেন্ডে ১০০ মিটার ও ২২-৫ সেকেন্ডে ২০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী।

মিউনিখ অলিম্পিকে রেনেটের অনায়াস সাফল্য অভাবনীয় নয়। ১৯৬৯ সালে ইউরোপীয় অ্যাথলেটিকসে ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মহিলা স্প্রিন্টারদের সারিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। সেই সঙ্গে রিলে দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে সোনা জয় করেন। ড্রেসডেনের জাতীয় অ্যাথলেটিকসেও রেনেট ২০০ মিটার দৌড়ে ২২-১ সেকেন্ডে শেষ করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়েন। ইতিপূর্বে স্প্রিন্টে বিস্ময়কর মহিলা চি চেং-এর রেকর্ড ছিল ২২-৪ সেকেন্ডে।

১৯৭২ সালের অনেক আগেই রেনেট স্টেচার বিশ্বের দ্রুততম মহিলার আখ্যায় ভূষিতা। ১৯৭০ সালে তিনি ১১-০ সেকেন্ডে ১০০ মিটার পথ অতিক্রম করে আমেরিকার ওয়োমিয়া টায়াস-এর নজীর ম্লান করে দেন। আর ২২-৪ সেকেন্ডে ২০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় পদক লাভ করে রেনেট ২০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করেন ও নতুন অলিম্পিক রেকর্ড রচনা করেন। তিনি ১০-৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়ে নিজেরই করা ১০-৯ সেকেন্ডের বিশ্ব রেকর্ড ভাঙেন। ইতিপূর্বে ১৯৭০ সালে আমেরিকার নিগ্রো তরুণী উইমা প্রতিষ্ঠিত ১১ সেকেন্ড ছিল মহিলাদের শতমিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে রেনেটই প্রথম মহিলা যিনি প্রথম শত মিটার দৌড়ে এগার সেকেন্ডের বেড়াকে স্বকীয় নৈপুণ্যে ভঙ্গ করেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ব জার্মানীর মেয়ে রেনেট স্টেচার নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয়।

স্বল্প পাল্লার দৌড় প্রতিযোগিতার বিশ্বের দ্রুততম মহিলা বলে সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত হলেও ট্র্যাকে রেনেটের অ্যাথলেট জীবনের সূচনা হয় দূরপাল্লার প্রতিযোগিনী হিসেবে। তের বছর বয়সে স্বদেশের এক ক্রসকান্ট্রি প্রতিযোগিতায় রেনেট প্রথম অংশ গ্রহণ করেই সকলের নজরে পড়েন। পরে অবশ্য কেমি টরগাউ এন্টার-প্রাইস স্পোর্টস ক্লাবে এসে প্রশিক্ষকের নির্দেশে রেনেট একশত ও দুশত মিটার দৌড়ে অনুশীলন শুরু করেন। দক্ষ প্রশিক্ষক দেহের গঠনভঙ্গী দম স্টেপিং প্রভৃতি নিরীক্ষণ করে বুঝেছিলেন রেনেট স্প্রিন্টে সম্ভাবনাময়ী। প্রশিক্ষক স্বল্পপাল্লার দৌড়ের পথে সেদিন পরিচালিত না করলে আজ রেনেটের কৃতিত্বপূর্ণ ভাগ্য আজ কোথায় গিয়ে ঠেকত কে জানে।

কয়েক বছর পর রেনেট পুরানো ক্লাব থেকে বিদায় নিয়ে এ সি মোটর জিনা ক্লাবে যোগদান করেন। এখানে এসেই প্রশিক্ষক গার্ট স্টেচার-এর অধীনে রেনেটের অ্যাথলেট জীবনের সোনায় মোড়া দিনগুলির জন্ম হয়। তারপর একের পর এক সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে রেনেট স্টেচার আজ বিশ্বের দ্রুততম মহিলা। কুমারী জীবনে যৌবনের ১৯৭১ এর জুন মাসে প্রশিক্ষক গার্ট স্টেচারের জীবনসঙ্গী হয়ে নতুন জীবন যাপন শুরু করেন।

—প্রশান্ত দাঁ

খেলার জগতে মেয়ে

ছাত্রী কাবাডি নেত্রী সুস্মিতা গাঙ্গুলী

সুস্মিতা গাঙ্গুলী ছেলেবেলা থেকেই কাবাডি খেলায় মত্ত হয়। গত বছর কলকাতার বিহারীলাল কলেজের মাঠে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের কাবাডি প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের নেতৃত্ব করার ভার পড়ে সুস্মিতার ওপর। এ এখন উত্তরপাড়া রাজা প্যারীমোহন কলেজের ছাত্রী। সেদিন খেলার পর সুস্মিতাকে কাবাডি খেলা নিয়ে নানা প্রশ্ন করি।

—তুমি এত খেলা থাকতে কাবাডিই বেছে নিলে কেন?

—কারণ প্রথমতঃ এই খেলাটিই একেবারে খাঁটি দেশীয় খেলা। দ্বিতীয়তঃ এ খেলা সহজেই শেখা যায় তাছাড়া নিজেদের বাড়ীর কাছেই অনুশীলন করা যায়। আরও সুবিধে হল এ খেলা খেললে শরীর খুব মজবুতও হয় সুস্থও থাকে। আমরা যারা কাবাডি খেলি তাদের পক্ষে সব খেলাই আয়ত্ত করা সম্ভব।

—খেলার জন্য বাড়ী থেকে কোন রকম বাধা আসে না?

—না। বাড়ীর সবাই আমার খেলাধুলায় উৎসাহই দেন। আমরা দুই বোন আর পাঁচ ভাই। বাবা শম্ভুনাথ গাঙ্গুলী বালী জুট মিলের কর্মচারী। আজকের খেলাধুলার ক্ষেত্রে বাংলার মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা আর পিছিয়ে নেই। কলেজীয় শিক্ষালাভে তারা যেমন এগিয়ে আসছে তেমনি এগিয়ে আসছে নানা খেলাধুলার আসরেও। কদিন আগে একটি মেয়ে জানালো যে তারা ফুটবল দল গড়তে আগ্রহী। পাঞ্জাবের মত এখানেও হ্যান্ডবল খেলায় মেয়েদের দল গঠিত হয়েছে। সুস্মিতা প্রসঙ্গতঃ জানায় যে সে পাতিয়ালার জাতীয় প্রশিক্ষক কেশব দত্তের কাছে রাজ্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুসারে কাবাডি প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

সুস্মিতা বালী চৈতনপাড়ার বালী গার্লস স্কুল থেকে পাশ করে। ১৯৭০-এ হাওড়া জেলা কাবাডি সংস্থায় খেলার সুযোগ পায় এবং নিজের ক্রীড়াকুশলতা প্রকাশ করে। ১৯৭১-৭২ মরশুমে কলকাতায় আয়োজিত মেয়েদের আন্তঃ জেলা কাবাডি প্রতিযোগিতায় হাওড়া দলে খেলার সুযোগ পায় সুস্মিতা। পরের মরশুমে অর্থাৎ ১৯৭২-৭৩-এ ও জয়পুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কাবাডি প্রতিযোগিতায় পশ্চিম বাংলা দলে মনোনীত হয়। সেবার পশ্চিম বাংলা তৃতীয় স্থান অধিকার করে: বাংলা দলের পক্ষে এ বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। ১৯৫৮ সালের পর প্রায় ১৫ বছর পশ্চিম বাংলায় কাবাডি চর্চা এক রকম স্তব্ধ হয়ে থাকে। ১৯৭২-এ আবার নতুন করে পশ্চিমবঙ্গে কাবাডি এসোসিয়েশন গড়ে ওঠে এবং এই সংস্থা রাজ্যের ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের কাবাডি খেলার সংগঠন করে। বর্তমানে লীগ ও নকআউট প্রথায় কাবাডি খেলা চলছে। সারা রাজ্যে সুসংহত কাবাডি সংগঠনের প্রয়াসও চালান হচ্ছে।

কাবাডি খেলার প্রতি সুস্মিতার প্রবল আগ্রহ থাকলেও এথলেটিকস এবং খো-খো খেলাতেও ওর কুশলতা প্রকাশিত হয়েছে। স্কুল ক্রীড়ায় সুস্মিতা বাংলার খো-খো দলে বাছাইরূপে স্থান পেয়েছে।

সুস্মিতা বলে জানেন অনেক বড় বড় খেলোয়াড় এই কাবাডি খেলে শরীর মজবুত করেছেন। এ খেলায় শরীর এমন নমনীয় হয় যে যেকোনও খেলায় সাফল্য অর্জন করতে কাবাডির সাহায্য নেওয়া যায়: একদিকে দম বাড়ে অন্যদিকে শরীরের পেশী বলিষ্ঠ হয়। আমি জানি ফুটবল প্রশিক্ষক প্রদীপ ব্যানার্জির মত খেলোয়াড়রা কাবাডি খেলে শরীর তৈরী করেছেন।

—তোমাদের কলেজে কাবাডি খেলার চর্চা হয়?

—কলেজের অধ্যক্ষ আমাদের এ খেলায় খুব উৎসাহ দেন। উনিও কাবাডি খেলার একজন বড় সমর্থক। মেয়েদের মধ্যে কাবাডি খেলার চল বাড়লে ভলি বা বাস্কেট বলের মত আমরা এই খেলাতেও সর্বভারতীয় সুনাম অর্জন করতে পারব।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কাবাডি দলের (মেয়েদের) ম্যানেজার অধ্যাপিকা সুনন্দা সরকার তাঁর মেয়েদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। কলকাতা দলের মেয়েরা যেমন খেলার প্রতি একাগ্র তেমনি নিয়মনিষ্ঠ বলে শ্রীমতী সরকার জানালেন। কথায় কথায় জানলাম শ্রীমতী সরকার স্কুল জীবনে কাবাডি খেলেছেন। বর্তমানে ইনি বাড়ুয়ার বিবেকানন্দ মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা। শ্রীমতী সরকার বললেন বিশ্ববিদ্যালয় দলের মেয়েরা কাবাডি খেলায় যে রকম উৎসাহী তাতে তাঁর বিশ্বাস এখানকার মেয়েরা সহজেই বোম্বাই পুনা ও নাগপুরের মেয়েদের মতই কুশলতার পরিচয় দিতে পারবেন। নতুন দল হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা এবারের আসরে প্রাথমিক লীগের বাধা টপকে যেভাবে চূড়ান্ত লীগে পূর্বোক্ত তিনটি দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তাতে শ্রীমতী সরকার মনে করেন কলকাতার ছাত্রীরা কাবাডিতে সর্বভারতীয় মানে সহজেই পৌঁছে যাবে।

দলনেত্রী হিসাবে সুস্মিতা গাঙ্গুলীও বললে আমার দলের সব খেলোয়াড় সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে বদ্ধপরিকর। আমরা যদি আরও বেশী খেলার সুযোগ পাই তাহলে আমরা বোম্বাই নাগপুর বা পুনার মেয়েদের সঙ্গেও কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারব—এ বিশ্বাস আমার আছে।

সুস্মিতার সঙ্গে কথা বলে এই ধারণাই হল যে এখনকার যুগের এই মেয়েরা খেলার আসরকে মামুলী ব্যাপার বলে মনে করে না। এরা ছেলেদের মতই একনিষ্ঠভাবে খেলাধুলা নিয়ে চিন্তা করে। সুস্মিতা এক প্রশ্নের উত্তরে বলে যদি সংগঠন আর সরকার আমাদের একটু সাহায্য করেন যেমন অনুশীলনের ব্যবস্থা পুষ্টিকর খাবার আর প্রশিক্ষণ—তাহলে পশ্চিম বাংলার কাবাডি দল দেশের মধ্যে সেরা হয়ে উঠবে। আমাদের মধ্যেই— স্কুল কলেজে— এমন অনেক মেয়ে আছে যারা উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা ও পরিবেশের অভাবে খেলার আসরে আসতে পারছে না। অথচ এরা এলে আমাদের শক্তি বাড়বে একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

কথাগুলি চিন্তা করার মত। আসার সময় শুভেচ্ছা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে এ আশ্বাসও দিলাম এদিকে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।

—[illegible]

কলকাতার ইডেন উদ্যানে আসন্ন ৩৩তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা উপলক্ষে নির্মিত 'প্র্যাকটিশ হল'-এর উদ্বোধন করছেন আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস ফেডারেশনের সভাপতি মিঃ রয় ইভান্স এবং পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায়।

খেলাধূলা

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট

সিডনিতে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ১৭১ রানে জয়ী হয়ে ১৯৭৪-৭৫ সালের টেস্ট সিরিজে 'এ্যাসেজ' জয় করেছে। এই সিরিজের মোট ৬টি টেস্ট খেলার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া তিনটি টেস্ট খেলায় জয়ী হয়ে ৩—০ খেলায় এগিয়ে গেছে। তৃতীয় টেস্ট খেলায় জয়—পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। এই অবস্থায় ইংল্যান্ড বাকি দুটি টেস্ট খেলায় জয়ী হলেও অস্ট্রেলিয়ার হাত থেকে ইংল্যান্ড 'এ্যাসেজ' খেতাব ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এখানে উল্লেখ্য, চার বছর আগে এই সিডনি মাঠেই ইংল্যান্ড 'এ্যাসেজ' খেতাব [illegible] অস্ট্রেলিয়ার

প্রথম দিনে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের চারটে উইকেট খুইয়ে ২৫১ রান সংগ্রহ করেছিল। অস্ট্রেলিয়ার নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় রিক ম্যাকোসকার ৩০ রান করেন এবং গ্রেগ চ্যাপেল ৫৯ রান করে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের কিছু পরে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৪০৫ রানের মাথা শেষ হয়। গ্রেগ চ্যাপেল দিনের সর্বোচ্চ ৮৪ রান করে আউট হন। ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের তিনটে উইকেট খুইয়ে ১০৬ রান তুলেছিল। তারা অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৪০৫ রানের থেকে ২৯৯ রানের পিছনে ছিল, হাতে জমা ছিল প্রথম ইনিংসের ৭টা উইকেট।

তৃতীয় দিনে চা-পানের সময় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ২৯৫ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ১১০ রানে এগিয়ে দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নামে এবং এক উইকেটের বিনিময়ে ১২৩ রান সংগ্রহ করে। ইংল্যান্ডের পক্ষে সর্বোচ্চ ৮২ রান করেন উইকেটকীপার এ্যালান নট। তাঁর পরই নতুন অধিনায়ক জন এডরিচের ৫০ রান উল্লেখযোগ্য। নট (৮২ রান), আন্ডারউড (২৭ রান) এবং টিটমাসের (২২ রান) দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার দরুণ ইংল্যান্ডকে বেশী রানের ব্যবধানে পিছিয়ে পড়তে হয়নি।

চতুর্থ দিনে চা-পানের আগে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের ২৮৯ রানের মাথায় (৪ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সেঞ্চুরী করেন রেডপাথ (১০৫ রান) এবং গ্রেগ চ্যাপেল (১৪৪ রান)।

খেলায় অস্ট্রেলিয়া বিরাট ৩৯৯ রানের ব্যবধানে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করে খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪০০ রান সংগ্রহ করা ইংল্যান্ডের পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। তারা জয়ের কথা ছেড়ে দিয়ে শেষ পঞ্চম দিন পর্যন্ত নট-আউট থেকে খেলা ড্র করার চেষ্টাই করে-

১৯৭৪ সালের ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী মোহনবাগান দলের অধিনায়ক নিমাই গোস্বামী ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদের হাত থেকে সিমলা ট্রফি গ্রহণ করছেন।

ছিল। চতুর্থ দিনে তারা কোন উইকেট না-খুইয়ে ৩৩ রান তুলেছিল।

কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সে-চেষ্টা শেষপর্যন্ত সফল হয়নি। পঞ্চম দিনে ২২৮ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ১৭১ রানে জিতে যায়। শেষ দশম উইকেটের জুটিতে আর্ণল্ড এবং অধিনায়ক এডরিচ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রায় একঘণ্টা উইকেট কামড়ে থেকেও শেষরক্ষা করতে পারেননি। এডরিচ ৩৩ রান করে নট-আউট থেকে যান। অস্ট্রেলিয়ার অফ-স্পিন বোলার অ্যাসলে ম্যালেট খেলার এক সময় মাত্র ৩ রান দিয়ে ৩টে উইকেট (গ্রিগ নট এবং টিটমাস) পেয়েছিলেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ৪০৫ রান (ম্যাকোসকার ৮০ ইয়ান চ্যাপেল ৫৩ এবং গ্রেগ চ্যাপেল ৮৭ রান; আর্ণল্ড ৮৬ রানে ৫ এবং গ্রিগ ১০৪ রানে ৪ উইকেট)

ও ২৮১ (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। রেডপাথ ১০৫ এবং গ্রেগ চ্যাপেল ১৪৪ রান। আন্ডারউড ৬৫ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড : ২৯৫ রান (এডরিচ ৫০ এবং নট ৮২ রান। টমসন ৭৪ রানে ৪ উইকেট)

ও ২২৮ (টনি গ্রিগ ৫৪ এবং এডরিচ নট আউট ৩৩ রান। ম্যালেট ২১ রানে ৪ উইকেট)

ভারত সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল

কটকের বরবাটী স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল এক ইনিংস ও ৭৬ রানে পূর্বাঞ্চলের বিপক্ষে জয়ী হয়। ১৯৭৪-৭৫ সালের ভারত সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এটা পঞ্চম জয়—দশটি খেলায় অংশ গ্রহণ করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এপর্যন্ত মাত্র একটা খেলায় হেরেছে, ভারতের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্ট খেলায়।

প্রথম দিনে মাত্র ১৮৭ মিনিটের খেলায় পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইনিংস ১৪৫ রানের মাথায় শেষ হয়। দলের সর্বোচ্চ রান (৪৯) করেন দলজিৎ সিং। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের স্পিন বোলাররা ৭টা উইকেট পান—অফ-স্পিনার পাডমোর একাই পান ৫টা উইকেট ৪৪ রানে। প্রথম দিনের বাকি সময়ের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ একটা উইকেট খুইয়ে ১০১ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের ৩৪৮ রানের মাথায় (৭ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে এবং পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংসের একটা উইকেট পড়ে ৬২ রান উঠেছিল। গোপাল বসু ৪৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন। দ্বিতীয় দিনের খেলার এক সময়ে বাংলার ন্যাটা স্পিন বোলার দিলীপ দোসী দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন—১০টা বলে মাত্র এক রান দিয়ে ৩টে উইকেট নিয়ে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাত্র ৫ রানের বিনিময়ে ৪টে উইকেট খুইয়ে এক সময় দারুণ সংকটের মধ্যে পড়েছিল।

শেষ তৃতীয় দিনে লাঞ্চের ১৬ মিনিট আগে পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংস ১২৭ রানের মাথায় শেষ হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস এবং ৭৬ রানে জিতে যায়। ব্যারেট মাত্র ৮ রান দিয়ে ৪টে উইকেট নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে সর্বোচ্চ রান (৫৮) করেছিলেন গোপাল বসু।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পূর্বাঞ্চল : ১৪৫ রান (দলজিৎ সিং ৪৯ রান। পাডমোর ৪৪ রানে ৫, হোল্ডার ২৪ রানে ২ এবং ব্যারেট ৪৫ রানে ২ উইকেট)

ও ১২৭ রান (গোপাল বসু ৫৮ রান। ব্যারেট ৮ রানে ৪, হোল্ডার ২৮ রানে ২ এবং পাডমোর ৩২ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৩৪৮ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেঃ বেচান ৭৮, কালিচরণ ৬৪ এবং রিচার্ডস ৭৬ রান। দিলীপ দোসী ৯১ রানে ৪ উইকেট)

ডুরাণ্ড কাপ

১৯৭৪ সালের ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মোহনবাগান ৩—১ গোলে ফাগোয়ার জগজিৎ কটন মিলস দলকে হারিয়ে মোট ৭-বার ডুরাণ্ড কাপ জয়ের গৌরব লাভ করে। এর আগে মোহনবাগান ডুরাণ্ড কাপ পায় ১৯৫৩, ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬৩-৬৫ সালে (উপর্যুপরি ৩-বার)। তাছাড়া দু'বার রানার্স-আপ হয়—১৯৫০ এবং ১৯৬১ সালে।

এ-বছরের সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ১—০ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে এবং জগজিৎ কটন মিলস ৪—০ গোলে সিমলা ইয়ংস দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

ফাইনালে বিজয়ী মোহনবাগানের পক্ষে হ্যাট-ট্রিক করেন রাইট-ইন উলগানাথন। এখানে উল্লেখ্য, ডুরাণ্ড কাপের ফাইনাল খেলায় এই প্রথম হ্যাট-ট্রিক হল।

রঞ্জি ট্রফি

বাংলা বনাম বিহার

কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে বাংলা বনাম বিহারের পূর্বাঞ্চলের লীগের খেলাটি অমীমাংসিত থেকে গেছে। বাংলার প্রথম ইনিংসের ৪৫৪ রানের উত্তরে বিহার প্রথম ইনিংসে ২৬৯ রান করেছিল এবং ফলো-অন করে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটের বিনিময়ে ১১৫ রান সংগ্রহ করেছিল।

লীগের খেলায় বাংলা মোট ২১ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে পূর্বাঞ্চলের চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এবং রানার্স-আপ হয়েছে বিহার। দু' দলই এখন মূল প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। বাংলা খেলবে দক্ষিণাঞ্চলের রানার্স-আপ কর্ণাটকের সঙ্গে এবং বিহার খেলবে পশ্চিমাঞ্চলের চ্যাম্পিয়ান বোম্বাইয়ের সঙ্গে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বাংলা : ৪৫৪ রান (পলাশ নন্দী ১০১ এবং অম্বর রায় ১৬৪ রান। শেখর সিংহ ৭৪ রানে ৩, অজয় ঝা ৮১ রানে ৩ এবং সন্দীপ রায় ৮৭ রানে ২ উইকেট)

বিহার : ২৬৯ রান (আনন্দ শুক্লা ৭২ এবং সাকসেনা ৬৩ রান। অশোক ভট্টাচার্য ১০৮ রানে ৬ এবং দিলীপ দোসী ৫৮ রানে ৩ উইকেট)

ও ১১৫ রান (৫ উইকেটে। রমেশ সাকসেনা ৩৭ রান। টি জে ব্যানার্জি ১২৩ রানে ২ উইকেট)

ভারতীয় সংগীত আজ সারা পৃথিবীর

সন্ধ্যা সেন

অন্তহীন দুর্বিপাকে আজ ভারতীয় জীবন বিপর্যস্ত। মরতে বসেছে আমাদের অনেককিছুই—কিন্তু ভাগ্যের নিদারুণ আঘাতেও যে বস্তুটিকে মেরে ফেলতে পারেনি সে হোলো ভারতীয় শিল্পীদের সংগীত সাধনা, যাকে নির্দ্বিধায় তপস্যার পর্যায়ে ফেলা যায়। সারা পৃথিবীতে আজ ভারতের আসন সবচেয়ে উঁচুতে এই সংগীতেরই দৌলতে। সম্প্রতি সাগরের ওপার পার থেকে এসেছেন বেশ কয়েকজন ভারতীয় শিল্পী। লন্ডন ও আমেরিকা থেকে এসেছেন কমলেশ মৈত্র; ব্রিটেন থেকে দীরেন্দ্রশংকর; আমেরিকা থেকে চিত্রেশ দাস জার্মানী থেকে শংখ চ্যাটার্জি; লন্ডন থেকে ইমরাৎ খাঁ ও জাপান থেকে কল্যাণী রায়। এঁদের অভিজ্ঞতার ছবিগুলিই আমার এই বক্তব্যকে প্রমাণ করবার পক্ষে যথেষ্ট।

কমলেশ মৈত্র উদয়শংকরের দীর্ঘদিনের সংগীত পরিচালক। এছাড়া শিল্পের ক্ষেত্রে সরোদ বাদক ও তবলাতরংগ বাদকরূপেও এঁর জনপ্রিয়তা আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছেছে। ইনি মাস দুই আগে পন্ডিত রবিশংকরের আহ্বানে গিয়েছিলেন লন্ডন ও আমেরিকায়। জর্জ হ্যারিসন আয়োজিত ও দেশে এই প্রযোজনার নাম জিরো প্রাডাকসন) ইন্ডিয়ান মিউজিক ফেস্টিভেলে যোগ দিতে। এই সবই রবিশংকর রচিত পরিচালিত এবং অনুষ্ঠানে তাঁরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাযুক্ত সিম্ফনী অর্কেস্ট্রার অংশগ্রহণ করেছেন।

"এই সিম্ফনী অর্কেস্ট্রা কি ধাঁচের?"—

এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমৈত্র বললেন—'বেদ কে সুরু। গণেশ বন্দনা সরস্বতী বন্দনা। তারপর ধ্রুপদ ধামার ঠুংরী টপ্পা লোকসংগীত ও রাগ সংগীতের সুর মিলে এক আশ্চর্য সুরলোক। বাজাতে বাজাতে আরও মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিলো গন্ধর্বলোকে পৌঁছে গেছি—আবার কখনও মনে হলো স্বর্গের গন্ধর্বলোক বুঝি বা নেমে এসেছে।'

মিলিত যন্ত্রের ধ্বনি সংগীতগুলির একটির নাম হোলো 'অনুরাগ'। এই অংশটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে—এই সংগীতের রূপ দিয়েছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নামকরা শিল্পীরা। আর নানান বাদ্যযন্ত্রের এই যে সংলাপ রচিত হয়েছিলো কিরবানী জয়ন্ত ইত্যাদি শুদ্ধ রাগ দিয়ে গভীর ভাবের অনুরণন সৃষ্টি হয়েছিলো—যেমন মর্মছোঁওয়া তেমনই উপভোগ্য একটা মজার ভাবকে পরিস্ফুট করবার জন্য জ্যাজ মিউজিকের টাইপের অবতারণা। মোটকথা সবরকম মিউজিকের ভেরিয়েশন—তাল ছন্দ সুর আর একটার পর আর একটার পর্যায় এত সুসংবদ্ধ যে—মনে হয়েছিলো এখানে—এছাড়া অন্যকিছু ভাবা যায় না।

এদেশের নামী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন চৌরাসিয়া (বাঁশী) গোপালকৃষ্ণ (বেহালা) শিবকুমার (সন্তুর) কার্তিক দাস (সেতার) দিল্লীর সত্যজিৎ পাওয়ার (বিচিত্রবীণা) মাদ্রাজের এন সুব্রামানিয়া (বেহালা) টি ভি গোপালকৃষ্ণান (মৃদংগ) সুলতান খাঁ (সারেংগী) হরিহর রাও (সেতার) বোম্বের বিজরাম দেশাই রাও (সেতার)। পাশ্চাত্য শিল্পীদের মধ্যে হলিউডের প্রায় সব লিডিং আর্টিস্টই এ-অর্কেস্ট্রায় অংশগ্রহণ করেছেন।

'দু-একজনের নাম করুন না—বেশী জায়গা যদিও নেই—'

যেমন ধরুন বিলি প্রেসটান (কি-বোর্ডের বিখ্যাত শিল্পী) টম স্কট (ব্লোয়িং ইনস্ট্রুমেন্টের মাস্টার)। এমিল রিচার্ড (সবরকম তালযন্ত্রে সিদ্ধ) জর্জ হ্যারিসনতো ফিল্ডেই। যে কোনো দুরূহ তাল ও সুর এঁরা যে কোনো স্পীডে নিখুঁতভাবে বাজাতে পারেন।

আনন্দবিস্ময়ের রোমাঞ্চ লেগেছিলো যখন দেখলাম ইউরোপের এইসব দিকপাল শিল্পীরা ভারতীয় রাগসংগীত বাজাচ্ছেন তাঁদের যন্ত্রে এবং অত্যন্ত নিখুঁতভাবে। আর এর মূলে আছেন রবিশঙ্কর এবং আলি আকবর। ওঁরা ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে এত ওয়াকিবহাল যে ঝাঁপতাল রূপক তাল ধামার শোতারা শুনেই চিনে নিতে পারেন এবং শোনে হাতে তাল দিয়ে। যেসব মিউজিশিয়ানদের নাম করলাম নিজেদের কম্পোজিশনেও এঁরা এইসব ভারতীয় তাল ব্যবহার করেন। অথচ এই কঠিন কাজ ওঁরা এত অনায়াস দক্ষতায় করে থাকেন যে শোনার সময় সেইটেই স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হয়।

আমাদের সংগীতকে ভালবেসেই ওঁরা আমাদের ধর্ম জীবনযাত্রা বেশভূষাকে এমনভাবে আপনার করে নিয়েছেন যে বিদেশকে এখন আর বিদেশ বলে মনে হয় না। মানে ওরা

রবিশংকরের (হাতে অমৃত) সঙ্গে কমলেশ মৈত্র

যেন নিজেদের দেশেই আছি অবশ্য ওদেশের ক্লাইমেট যদি মানিয়ে নেওয়া যায়।

'ওখানের সংগীতধারা এখন কোনদিকে?'

পাঁচ-ছ বছর আগে যখন গিয়েছিলাম তখন ভারতীয় সংগীতের প্রতি ওদের ভালবাসা ও শেখবার আগ্রহ দেখে আনন্দ হয়েছিলো কিন্তু সংগে সংগে প্রশ্নও মনে জেগেছিলো এটা ওদের হুজুগে নয়তো? কিন্তু এবার গিয়ে দেখলাম—ও'রা শুধু নিষ্ঠা সহকারে শিখছেনই না এমনভাবে আয়ত্ত করেছেন যে তারিফ না করে উপায় নেই। এসব দেখেশুনে মনে হয় সংগীতের জগতে দুই প্রত্যন্ত দেশের ব্যবধান কমে আসছে। আর এই অঘটন ঘটিয়েছেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাঙালী। বড়কর্তা (উদয়শংকর) নাচে ছোটকর্তা (রবিশংকর) আর আলি আকবর সংগীতে। ইন্ডিয়ান মিউজিককে এ'রা পৃথিবীর মিউজিকের সবচেয়ে ওপরে তুলে দিয়েছেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আর একটি পরিবেশনযোগ্য সংবাদ হোলো জর্জ হ্যারিসনের পরিচালনায় জিরো প্রডাকশনের এই অর্কেস্ট্রা বিভিন্ন ইম্প্রেসেরারিওবৃন্দ পরম সমাদরে আমেরিকা ও ইউরোপের প্রায় তিরিশ চল্লিশটি সহরের স্টেডিয়ামে পরিবেশন করেছেন এবং করবেন। আর ওদেশের একক এবং সমবেত বাজনা অনুষ্ঠান তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলেও সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছে রবিশংকরের অর্কেস্ট্রা এবং এ জয় ভারতীয় সংগীতের।

ভারতীয় সংগীত ও রবিশংকর প্রসংগে ইহুদী মেনুইনের শ্রদ্ধার্ঘের কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি:—টু দি ইন্ডিয়ান কোয়ালিটি অফ সিরেনিটি দি ইন্ডিয়ান মিউজিশিয়ানস ব্রিংগস অ্যান এগজল্টেড পারসোন্যাল এক্সপ্রেশন অব ইউনিয়ন উইথ দি ইনফিনিট অ্যাজ ইন ইনফিনিট লাভ।

নিজের অনুভূতি—রবিশংকর হ্যাজ গট মি এ প্রেসাস গিফট। থ্রু হিম আই হ্যাভ এ্যাডেড এ নিউ ডাইমেনশন টু মাই এক্সপিরিয়েন্স অফ মিউজিক।

ওদেশে বর্তমান তরুণ সম্প্রদায় প্রসংগে "বাট টু দি ইয়ং পিপল হু গিভ দেয়ার মাইন্ড এ্যান্ড হার্ট টু রবিশংকরস আর্ট, হি হ্যাজ মেড সেন্স এ্যান্ড গ্রট অর্ডার আউট অফ কেয়স ফর হি হ্যাজ রেসটোরড দি ফান্ডেমেন্টাল এ্যান্ড সুপ্রীম ভ্যালু অফ ডেডিকেটেড ওয়ার্ক অফ সেলফ কনট্রোল অফ ফেইথ এ্যান্ড অফ দি ভ্যালু অফ লিভিং।"

চিত্রেশ দাস—(প্রহ্লাদ দাসের পুত্র) ক্যালিফোর্ণিয়ায় ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ পরিচালিত আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিকে কথক নৃত্যের অধ্যাপকরূপে গত চার বছর ধরে যুক্ত আছেন। উপস্থিত কয়েকমাসের ছুটিতে তিনি কোলকাতায় এসেছেন।

চিত্রেশকুমারের কাছে আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিকের নানামুখী সাংস্কৃতিক ধারার এক মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া গেলো।

চিত্রেশ দাস

চিত্রেশ শিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে নানা মঞ্চে একক নৃত্যানুষ্ঠানেও উপস্থিত হন। ওদেশের নৃত্যগীতের দর্শকদের সম্বন্ধে শিল্পীর অভিমত হোলো এই যে কিছুদিন ধরে কোনো শিল্পীর গান বা বাজনা শুনেই তার সম্বন্ধে ওদের আগ্রহ ফুরিয়ে যায় না। প্রত্যেকবার প্রতি অনুষ্ঠানেই মঞ্চ পূর্ণ থাকে এবং প্রতিটি দর্শক অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেন আগের নাচের ঐ বিশেষ অংগগুলির সংগে পরের তফাৎটা কোথায় বা কোনো ইম্প্রোভাইজেশন হয়েছে কিনা। যদি হয়ে থাকে সেটা আগের চেয়ে সুন্দর অথবা নিকৃষ্ট কিনা। আর পরং ভাও টুকরো এখন যেন এদের নিজেদের জিনিস হয়ে উঠেছে। এর ফলে আমাকেও সব সময় সচেতন থাকতে হয় যাতে নাচে ষ্ট্যান্ডার্ড কখনও আগের চেয়ে নিম্নমানে না হয়। শিল্পী হিসাবে এতে আমি লাভবানই হয়েছি।

শিক্ষক হিসাবে ওদের নিষ্ঠা অধ্যবসা মননশীলতা আমায় মুগ্ধ করেছে। যাঁ শিখতে আসেন তাঁরা মস্তবড় বিদ্বান বিদুষী। কেউ প্রফেসর কেউ রিসার্চস্কলা কেউ ডকটরেট ইঞ্জিনীয়ার ডাক্তার। কি শেখবার সময় তাঁদের শিশুর মত সরল বাধ্যতা এবং সকল আত্মাভিমান বর্জি নম্রতা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয় কোনো দেশের শিল্পের প্রতি যথা অনুরাগ না জন্মালে এ বস্তু সম্ভব নয় আর শেখেনও কত ক্ষিপ্রগতিতে। যে গ্রহণশীল তেমনই বুদ্ধিসমৃদ্ধ তেমনই শ্রম শীল। ধামার চৌতাল ঝং একতাল এস বোল ওরা কি নির্ভুলভাবে বলে হাত পায়ের বিট দিয়ে। শুনবেন? বলেই চি তার ছোট্ট টেপরেকর্ডার মেশিনটি চালি দিলেন। শোনা গেল মধু কণ্ঠ উচ্চা কখনও একক কখনও দ্বৈত কখনও সমবে কণ্ঠে মাত্রায় মাত্রায় তালিসমেত ধা ধা। ধেই ধা। কতন। তেটে। ধেইনা তেটেকেটে। গজি ঘেনে—বলেই কি উল্ল সোমের ধা-তে থামল। চিত্রেশের মাকি স্ত্রী জুলি—সুন্দর করে এলোখোঁপা সাড়ী পরে যখন হাসিমুখে ঘরে "কেমন আছেন?" বলে দাঁড়ালো পায়ের ধুলো নিলো—মনে হোলো আম সহোদরা বহুদিন বাদে বিদেশ থেকে এসেছে। চোখে জল এসে গেলো। আজ আমাদের এত কাছে? আর নয় তরোয়াল নয়, বন্দুক নয় বোমা শুধুমাত্র গীতসুধারসে বিদেশী বিগলিত আর সেই মুগ্ধতায় ওরা আম ঘরের সেবাপরায়ণা বধূ এবং বা গেই (দেখলাম জুলি চা করে নিয়ে মিণ্টি খেতে চাইলাম না বলে পাঁপড় দিলো নিজের হাতে)। এরপর নাচ দেখলাম মারা গুনে তা শুনলাম। সত্যি অঘটন আজও ঘটে

'এইটুকু দেখেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন সন্ধ্যাদি? একবার আমেরিকা চলুন! দেখবেন সেখানে বাবা (আলি আকবর খাঁ সাহেব) কি কান্ড করেছেন। চুপচাপ শান্ত মানুষটি। কিন্তু স্ব-দেশের কালচারকে কিভাবে বিদেশীর ঘরের জিনিস করে তুলেছেন। ওরা শুধু পরিশ্রম ও নিষ্ঠা দিয়ে গান বাজনা নাচই শিখছে না। আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিক ঠিক ভারতীয় সাধকের আশ্রমের মতই হয়ে উঠেছে। আমেরিকানরা ত বটেই গ্রেট ব্রিটেন চীন জাপান থেকেও ছাত্রছাত্রীরা প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে শিখতে আসছেন। এঁরা আমাদেরই মত পাজামা পাঞ্জাবী ধুতি চাদর শাড়ী আলোয়ান গায়ে দেন। আমাদেরই মত খাঁ সাহেবকে (গুরু) বাবা বলে ডাকেন। এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। মাটিতে বসে শেখেন। আর আমাদের দেশের ডাল ভাত সুক্তো মাছ রান্নায় ছেলেমেয়েরা এদেশের মেয়েদের মতই এক্সপার্ট হয়ে উঠেছেন। ওখানে নিজেরাই রান্নাবান্না করি। ওরা রাঁধে আমাদের খাওয়ায় আমরা রাঁধি ওদের খাওয়াই। যদি বলি আজ ডাল করা পাকা গিন্নীর মত জিজ্ঞেস করে কিরকম ডাল হবে? পাতলা না পুরু। রুটির সংগে ত? তাহলে পুরুই করি। শুধু তাই নয়। সকাল সন্ধ্যায় মা কালী বা সরস্বতীর ছবির সামনে ধূপ জ্বালিয়ে নানা এবং আমাদের মতই ওরাও সন্ধ্যা আহ্নিক করে। কাজেই সবদিক দিয়ে একটা যেন ভারতীয় উপনিবেশ মত গড়ে উঠেছে যেখানে এদেশী ওদেশী সবাই ভারতীয়। মাঝে মাঝে রবুদা আসেন জর্জ হ্যারিসনও আসেন ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে। শিক্ষা দেন। আর ভারতবর্ষ থেকে যখন যে শিল্পীই ওদেশে সাংস্কৃতিক সফরে যান বাবা তাকে কলেজে আমন্ত্রণ করেন। তাঁর গান বাজনার অনুষ্ঠান করে ছাত্রছাত্রীদের শোনান। সবাই রান্না করে পরিবেশন করে তাদের সেবা করেন। একেবারে খাঁটি ভারতীয় পরিবেশ। বাবা সংগীত শেখানোর সংগে সংগে ওদের হৃদয়গুলিও যেন জয় করে নিচ্ছেন। না দেখলে এ দৃশ্য কল্পনা করা যায় না। চিত্রেশ অন্যমনস্ক-ভাবে আবার টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দিলেন। সমবেতকণ্ঠে ধ্বনিত হোলো 'তুহি অনন্ত হরি হরি'। ধ্রুপদ। মনে হোলো আমাদের দেশের শিল্পীরাই গাইছেন।

মনে পড়ে গেলো গুরু আলাউদ্দিনের প্রতি তাঁর গুরু উজীর খাঁর মৃত্যুকালীন আশীর্বাদ 'পৃথিবীর যেখানে চন্দ্রসূর্য উঠবে সেখানেই তোর জয়গান ধ্বনিত হবে।' আলি আকবর রবিশংকরের এই দিগ্বিজয় ত তাঁরই জয়।

বীরেন্দ্রশংকর—বিদেশে ভারতীয় নৃত্য ও সংগীতের জনপ্রিয়তা সৃষ্টির দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় উদয়শংকর ও রবিশংকর সাফল্যের যে বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন সেই প্রেরণার শক্তিতেই তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র বীরেন্দ্র-শংকর লন্ডনে প্রতিষ্ঠা করেছেন

বীরেন্দ্রশংকর

সাংস্কৃতিকী। উদ্দেশ্য— গঠনমূলক এবং নিয়মিতভাবে ভারতের সংগে ওদের শিল্প ও সংস্কৃতির বিনিময়। ১৯৫৪তে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়বার জন্য লন্ডনে গেলেও গতানুগতিক পথের বাঁধাধরা স্বচ্ছিতে ছেড়ে বিদেশে (প্রধানতঃ ব্রিটেনে) শিল্প ও সংগীত প্রচারের মাধ্যমে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে কাছাকাছি নিয়ে আসার উদ্যমকে কেন্দ্রীভূত করেন। সাংস্কৃতিকী তারই মূর্তপ্রতীক। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি শুধু সংগীত ও নৃত্যকে নয়, বাংলা নাটকও মঞ্চস্থ করেছেন। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীতে রবীন্দ্র-সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেছেন।

১৯৬৪ সালে ইঁন পিকাডেলী থিয়েটারের মত অভিজাত প্রেক্ষাগৃহে সর্বপ্রথম বাংগালী শিল্পী ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর সরোদ উপহার দেন। ১৯৬৫ সালে কমনওয়েলথের ডিরেক্টর জেনারেলের অনুষ্ঠানে বীরেন্দ্রশংকর অনেকগুলি সংগীতাসরের আয়োজন করে তাঁর সর্বাঙ্গীন সার্থকতায় একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

প্রতি বছর এইভাবে নানা অনুষ্ঠান প্রযোজনা করতে করতে ১৯৭০ সালে কুইন এলিজাবেথ হলে মঞ্চস্থ তাঁর আর্ট অফ ইন্ডিয়া সম্বন্ধে গ্রেট ব্রিটেনের প্রসিদ্ধ সমালোচক রেজিনাল্ড ম্যাসির মন্তব্য হোলো **'নেভার বিফোর হ্যাড লন্ডন হার্ড সে মাচ অফ ইন্ডিয়ান মিউজিক অ্যাট ওয়ান টাইম। ফর বীরেন্দ্রশংকর ইট ওয়াজ এ ট্রায়াম্ফ অফ প্রেজেনটেশন'**। এ-উৎসবে উপস্থিত ছিলেন হাই-কমিশনার মিঃ পন্থ ও জর্জ হ্যারিসন। উদ্বোধক রবিশংকর।

'এতদিন সরকারী বা অন্য কোনো অর্থনৈতিক সাহায্যের অভাবে আমার প্রতিষ্ঠানকে প্রতি পদে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। অবশেষে ১৯৭০ সালে ভারত সরকার ৫৫,০০০ টাকা দিতে সম্মত হয়েছেন।

বাংলাদেশের জন্য অর্থ সংগ্রহার্থে আয়োজিত 'কনসার্ট ইন সিমপ্যাথি' সাংস্কৃতিকীর এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। এ-উৎসবে বাংলার মাটির গান (ক্যালকাটা ইউথ কয়ার, নির্মলেন্দু চৌধুরীর) তথা সব অঞ্চলের লোকসংগীত দিয়েই তার দুর্দশার কাহিনী নিবেদন করায় অনুষ্ঠানটি মর্মস্পর্শী হয়েছিলো। এছাড়াও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জাজসংগীত গায়ক মিঃ কলিন ডেভিস ও মিস ক্লিওলাইন এই প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। গ্রেট ব্রিটেনের অনেক শিল্পীও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭২ সালে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন নৃত্যের পুরোধাস্থানীয় শিল্পী যামিনী কৃষ্ণমূর্তি উমা শর্মা এবং হিন্দুস্থানী সংগীতে গিরিজা দেবীকে নিয়ে বীরেন্দ্রশংকরের অনুষ্ঠান ও-দেশের কলা-রসিকদের আনন্দ দিয়েছে।

পরিবেশনা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত 'আমি স্টার সিস্টেমে বিশ্বাস করি না; করি শিল্পীদের যথার্থ উত্থানে। এই জন্য বক্স-অফিসের আর্টিস্টদের নিয়ে যাবার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম নামী অথচ গুণীব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিল্পীদের আমি নিয়ে যেতে চাই। এতে এঁদের ফ্রাসট্রেশনের আক্রমণ থেকে বাঁচানো এবং আত্মবিশ্বাসে সাহায্য করা দুটি কাজই হয় যোগ্য পরিবেশনার আংগিকে এঁদের ফ্রাসট্রেশনের আক্রমণ থেকে বাঁচানো নিবেদন করবার চেষ্টা করি। এদেশের সংগীত সভাগুলি যেন কোলাহলের হাট। তাছাড়া ডিসিপ্লিনের বড় অভাব।

আমি এমনভাবে প্রোগ্রামের সময় বেঁধে দিই যাতে একজনের অনুষ্ঠান আরেক অনুষ্ঠানের বারটা বাজিয়ে না দেয়।'

বীরেন্দ্রশংকরের মতে একদিন খেয়াল, একদিন ঠুংরী, একদিন শুধু নৃত্য— এইভাবে অনুষ্ঠান পরিবেশিত হলে যে-কোনো দেশের নানান ঘরানা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে নিতে পারবে এবং ওয়্যারহাইন লায়িস দি ডিউটি অফ দি ইম্প্রেসারিও।

১৯৭৪ সালে লন্ডনে সাংস্কৃতিকের পরিবেশিত উৎসবে যোগ দিয়েছেন শ্রীমতী সুনয়না (কত্থক নৃত্য), হাজারীলাল (কত্থক গুরু), রাজা ও রাধা রেড্ডী

ইমরাত খাঁ

(কুচিপুরী নৃত্য) প্রহ্লাদ শর্মা (এঁদের গুরু) মীরা খিরোদকার (কণ্ঠসংগীত), রণধীর রায় (এস্রাজ), কার্তিককুমার (সেতার), ইন্দরলাল (সারেঙ্গী), সুভাষকুমার।

এঁদের অনুষ্ঠান জেমস্ কেনোডি প্রমুখ সমালোচকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আদায় করেছে।

সম্প্রতি সাংস্কৃতিকের ব্যানারে বেড ফারার প্রযোজিত ও সাইমন হিংকলি পরিচালিত একটি রঙিন চলচ্চিত্র মুক্ত হয়েছে। সেদিন ব্রিটিশ কাউন্সিল দেখানো হোলো। ৫০ মিনিটের ছবি। নাম রিদমস ইন এ ল্যান্ডস্কেপ। ভারতীয় শিল্পীদের নৃত্য, সংগীত এবং ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে এদেশের শিল্প ও সংস্কৃতির মেজাজটি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রাগসংগীতের সঙ্গে সঙ্গে রাজেশ্বরী দেবীর কণ্ঠে আবহগীতিরূপে 'নীলাঞ্জন ছায়া'ও শোনা যায়। এ-বছর এসে বীরেন্দ্রশংকর দিল্লীতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দারুণ খুশী হয়েছেন। বললেন 'এত অজস্র কাজের মধ্যেও ইন্দিরাজী আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। আমার বক্তব্য মন দিয়ে শুনেছেন, আগ্রহ দেখিয়েছেন— এতেই আমি খুব ইনস্পায়ার্ড।'

বীরেন্দ্রশংকর এখন বোম্বাই-এ। আবার কলকাতায় এসে এ-বছরের অনুষ্ঠানের শিল্পী (দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ) মনোনীত করে অনুষ্ঠান-তালিকা আমাদের পেশ করবেন বলে জানিয়েছেন।

গত আট বছর ধরে **ইমরাৎ খাঁ** নিয়মিতভাবে বছরের মধ্যে ছ' মাস ইউরোপের নানা দেশে থাকেন। ও-দেশের শিক্ষাকেন্দ্রে সেতার শেখানো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া। প্রধানতঃ এই দুটিই তাঁর কাজ। সম্প্রতি তিনি ফিরেছেন।

ইমরাৎ খাঁ সাহেবের প্রথম অনুষ্ঠান ছিলো বেলজিয়ামে এবং সেখানের প্রধান শহরগুলিতে। টেলিভিশনেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। শিল্পীর উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলি হয়েছিলো প্রধানতঃ মিউনিখ, সেন্ট হলফেন, বি বি সি (টি ভি) ইয়র্ক মিউজিক ফেস্টিভেল (কুইন এলিজাবেথ হলে) ডার্টিংটন হলে (ইংল্যান্ড) এবং প্যারিস ফেস্টিভেল অফ ইন্ডিয়া সর্বত্রই এঁর অনুষ্ঠান বিদগ্ধ মহলের অকুণ্ঠ অভিনন্দন পেয়েছে।

'কিন্তু আমাকে অভিভূত করেছে দুটি শহরের বাছা বাছা শ্রোতাদের সামনের আসরটি। আমি সুরবাহারে আলাপ বাজিয়ে সেতারে বাজালাম দেশ এবং ভৈরবী। ওঁরা যেন আমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন।

আর এক স্মরণীয় অনুষ্ঠান হয়েছিলো কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে শ্রোতা ছিলেন এক বিরাট মহিলাসংঘ যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন নিহত মানবাত্মার জন্য প্রার্থনায়। মনে হচ্ছিলো যেন আমার স্নেহময়ী বোনেদের কাছে বাজাচ্ছি। বাজনা শুনে ওঁরা এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে সকলে এসে আরো একবার ওখানে যাবার অনুরোধ জানালেন। এই আমন্ত্রণকে আমি ভারতীয় সংগীতের জয় বলেই মনে করি।' আবেগ ভরে বললেন ইমরাৎ খাঁ।

সুইস বর্ডারের কাছে ব্ল্যাক ফরেস্টে ইমারৎ খাঁ আমন্ত্রিত হয়ে ছিলেন শুধু বাজাতে নয় সংগীত শিক্ষা দিতেও। শিল্পীর মতে এখানে ভারতীয় সংগীতের প্রচুর সম্ভাবনা আছে কারণ এঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক। সংগীতের শুদ্ধতায় এঁরা বিশ্বাসী। ইমারৎ খাঁর সেতারবাদনের ওপর একটি তথ্যচিত্রও হচ্ছে।

কল্যাণী রায়ের সঙ্গে
জাপানী ছাত্রছাত্রী

মিউনিখ ও অন্য শহরে প্যালেসের অনুষ্ঠানগুলি এল-পি ডিস্কে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও হল্যান্ডের আমস্টারডাম, ট্রপিক্যাল ইনস্টিটিউটের সংগীত উৎসব, চেলটেনহেম উৎসব ম্যাঞ্চেস্টারের ইমরাৎ খাঁ বাজিয়েছেন। তাঁর অধিকাংশ অনুষ্ঠানই বি-বি-সি থেকে প্রচারিত হয়েছে দীর্ঘস্থায়ী সময় দিয়ে। (১০টা থেকে ১২-১৫ অবাধ বিরামহীনভাবে) আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোলো বিগ বেনের বিরাট ব্রিজ ব্লক করে ট্র্যাফিক বন্ধ করে দিয়ে ইমরাৎ খাঁর এক বিরাট অনুষ্ঠান করা হয়েছিলো "সেখানের ভীড় তুমি কল্পনা করতে পারবে না সন্ধ্যা, আর অত ভীড়ের মধ্যে ছুঁচ পড়ার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়—এমনই ওদের ডিসিপ্লিন। তুমি আর একটা খবর শুনে খুশী হবে 'উউলবাই কনস্পিরেসি' ছবিটিতে অংশ গ্রহণ করেছেন সিডনি কয়েটার এবং পরিচালক এ-ছবির সঙ্গীতস্রষ্টা **ইমরাৎ খাঁ**। ভারতীয় ও ইউরোপীয় দু জাতের সঙ্গীতই আমি এতে নিয়েছি কিন্তু মেশাইনি। আলাদা, আলাদা রেখেছি। যথাস্থানে এবং বিষয়বস্তুর প্রয়োজনানুসারে।"

এবারের সফর ছিলো খাঁসাহেবের অষ্টমবারের অভিযান। আবার যাবেন এপ্রিলে। কারণ ওখানের শীর্ষস্থানীয় সংগীত প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইনি সেতার শেখাচ্ছেন।

এনায়েৎ খাঁন ঘরানার আর এক শিল্পী **কল্যাণী রায়** এসেছেন জাপান [illegible] এর আগে শ্রীমতী রায় মরিশাসে গেছেন। জাপানে তিনি জনপ্রিয়তায় [illegible] স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন একটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায়।

১৯৭৩ সালে ইন্দো-জাপান কালচারাল ডেলিগেশনের নেতা ভারত সফরকালে সৌরভের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এসেছিলেন ওঁরা যখন পৌঁছুলেন ঠিক সেই সময় কল্যাণী রায়ের বাজনা চলছিলো। সেই বাজনা ওঁরা সৌরভের কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে টেপরেকর্ড করে নিয়ে যান। এবার জাপানে বাজানোর আমন্ত্রণ পেয়ে সৌরভের অধ্যক্ষা শ্রীমতী নমিতা চট্টোপাধ্যায় (তানপুরায়) মানিক দাস (তবলা) এবং কল্যাণী রায় ওখানে সাংস্কৃতিক সফরের সময় হঠাৎ বাজারে গিয়ে দেখেন ওঁদের রেকর্ড-গ্রামোফোনের বিরাট দোকানের সামনে ঝুলছে এক বিরাট ছবি কল্যাণী রায়ের। তার নীচে এবং ওপরে লেখা এল-পি ডিস্ক—"**লিভিং হেরিটেজ অফ ইণ্ডিয়ান মিউজিক, ইণ্ডিয়ান কুইন অফ সেতার।**" বার হয়েছে কলাম্বিয়া কোম্পানীর লেবেলে। কাফি কানাড়া, পিলু, লোকসঙ্গীত হেমন্তলিনী ইত্যাদির দুখানি এল-পি। ওঁরা ত অবাক! এরকম কোনো এল-পি ত করেন নি? পরে খবর নিয়ে জেনেছেন

টেপরেকর্ড-ধৃত সেই বাজনা ওঁরা এল-পি ডিস্কে বার করেছেন। নমিতা চ্যাটার্জি ওঁদের সরাসরি চার্জ করলেন "আর্টিস্ট অথবা সৌরভ প্রতিষ্ঠানকে না জানিয়ে রেকর্ড করাটা কোনদেশী ভদ্রতা? জাপানী উত্তরে কর্তৃপক্ষ আচার চুরি করতে যেয়ে ধরা-পড়া শিশুর মত মাথা চুলকে বললেন, 'ওনলি টু রেকর্ডস ম্যাডাম। প্লিজ ফরগিভ।'' বলেই হন্তদন্ত হয়ে ৪টি এল-পি রেকর্ড এনে দুজনের হাতে দিলেন। কভারের শিল্পকাজ, রঙের বাহার, চোখ জুড়ানো ডিজাইন সর্বোপরি নিজের বিরাট ছবি দেখে কল্যাণী রাগ ভুলে খুশীতে ডগমগ হয়ে ওঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটি এল-পি ডিস্ক করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসলেন। তাঁরা কালবিলম্ব না করে পরের দিনই একেবারে স্টুডিওতে রেকর্ড করে নিয়ে তবে ছাড়া দিলেন।

কল্যাণী রায় সেপ্টেম্বরে জাপান গিয়েছিলেন এম কে ইন্টারন্যাশন্যাল সংস্থার আমন্ত্রণে। সংস্থার উদ্দেশ্য জাপানের সঙ্গে পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গীতের পরিচয় ঘটানো। কল্যাণীর বাজনা ওদেশের উঁচুমহল থেকে সুরু করে সকল শ্রেণীর শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছে। ইনি বাজিয়েছিলেন টোকিও, ইয়োকোহামা, কিয়োটো এবং ওসাকায়। এসব অনুষ্ঠান ছাড়াও পাঁচটি টেলিভিশনের অনুষ্ঠান যেসব বিদগ্ধ রসিকদের তারিফ আদায় করেছে তাঁদের মধ্যে ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক ও টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন শ্রীআজুমা। জাপানে প্রীতি পরিবারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সাকুরা দিয়ে কল্যাণী তাঁর অনুষ্ঠান সমাপ্ত করতেন। ভূপালী, কামোদ ইত্যাদি ভারতীয় রাগ-ভিত্তিতে এ-সুর ইম্প্রোভাইজেশনের পর যখন—'সাকুরা'য় এসে পৌঁছতেন প্রচণ্ড করতালিতে প্রেক্ষাগৃহ যেন নেচে উঠত। যেসব রাগকে শ্রীমতী রায় ওদের চেনামহলে স্থান করে দিয়েছেন সেগুলি হোলো ইমন, দরবারী কানাড়া, হাম্বীর, খাম্বাজ, কাফি, যোগ, পিলু।

সঙ্গীতানুষ্ঠান ছাড়াও শ্রীমতী রায়ের আঁকা ছবিগুলির একটি চিত্র প্রদর্শনীতে তাঁর শিল্পীব্যক্তিত্বের আর একদিক উদ্ভাসিত হয়েছে।

শ্রীমতী রায়ের সঙ্গে তবলা বাজিয়ে দারুন প্রশংসা পেয়েছেন মানিক দাস। তানপুরায় ছিলেন নমিতা চট্টোপাধ্যায়।

শংখ চ্যাটার্জি :

যন্ত্রসঙ্গীত ছাড়া তালবাদ্যও যে ওদের কতটা আকৃষ্ট করেছে তারই বিবরণ পাওয়া গেলো সুখ্যাত তবলাবাদক শংখ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে। ১৯৭৪এ ২০ ডিসেম্বর বার্লিনে মেটা মিউজিক ফেস্টিভেলে ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ সাহেব

শংখ চট্টোপাধ্যায়

ও তাঁর পুত্র সুজাদ খাঁর সঙ্গে বাজাবার জন্য গিয়েছিলেন। খাঁ সাহেবের হাতের মাধুর্যে ওঁরা মুগ্ধ। অবাক হয়েছেন বালক সুজাতের তৈরী হাতের ক্ষিপ্রতা দেখে। আর শংখবাবু নিজের আলাদা কোনো স্বীকৃতি আশা করেন নি। বোধহয় সেইজন্যই আশ্চর্য হয়ে গেছেন যখন বাজনার শেষে নাম-করা সমালোচক ও শিল্পীর দল ওঁর কাছে এসে তবলার বিট, গঠন ও বাদনশৈলীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন তাঁর বাদনদক্ষতাকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়ে। এরপর লণ্ডনের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এবং তারপর বার্লিনেও বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরোদের সঙ্গে (রেডিও প্রোগ্রাম) বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান করেছেন।

বার্লিনেও ইণ্ডিয়ান উইকে তাঁর বাজনা শুনে হাততালির ঝড় বয়ে গেছে এবং রসিক-সমাজের একযোগে তাঁকে সাড়া দিতে হয়েছে।

শংখ চট্টোপাধ্যায়ের তবলা ওঁদের এমনই মুগ্ধ করেছে যে ওখানের শীর্ষস্থানীয় সংগঠকদের বিশেষ অনুরোধে একটি কসমোপলিটান লোকসঙ্গীতের সুরের সঙ্গে ওঁকে তবলা বাজাতে হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারী ইনি আবার জার্মান মাঞ্চেন গ্লোন রেডিও টেলিভিশনে যোগ দিতে। ১২ এপ্রিল বার্লিনে রিয়াস টেলি-ভিশন অনুষ্ঠানে ইনি আমন্ত্রিত হয়েছেন একক তবলাবাদক রূপে অনুষ্ঠান করবার জন্য। টেলিভিশনে শুধুমাত্র তবলা লহরা বাজাবার জন্য আমন্ত্রণই প্রমাণ করে দিচ্ছে তবলা এবং শংখ চ্যাটার্জি ওঁদের মনে কতটা গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে।

এছাড়া ওখানের শীর্ষস্থানীয় চিত্র-পরিচালক করিন থম-এর সঙ্গে শ্রীচট্টোপাধ্যায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন একটি ছবির আবহসঙ্গীত রচনার জন্য। মিউজিক হবে শুধু তবলার বোলের ওপর। অন্য কোনো সঙ্গীত থাকবে না। এ আমন্ত্রণও শংখবাবুর কৃতিত্বের পুরস্কার।

শিল্পীর বক্তব্য 'আমার ইচ্ছে ভারতবর্ষের এতবড় একটা সঙ্গীতের ঐতিহ্যকে ওরা ভালবাসুক, গ্রহণ করুক। এজন্য আমি পরিশ্রমের কার্পণ্য করব না। মিউনিখে ইমরাৎ খাঁর এক জার্মান স্টুডেণ্ট নাম এ্যালীগ্রমান। তিনি সেতারে একটি এল-পি করলেন বিভিন্ন ভারতীয় রাগের ওপর। আমি তাঁর অনুরোধে তাঁর সঙ্গেও বাজিয়েছি। ইট ওয়াজ মাই লেবার অফ লাভ।''

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় এ্যালীগ্রমান জার্মানের এক নাম-করা গিটারিস্ট।

এসব দেখে শুনে আমি আশাবাদী হয়ে উঠছি আমাদের দেশের সম্বন্ধে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা হয়তো বা গরীব। সঙ্গীতের জগতে আজ ভারতবর্ষ সকল দেশের ঊর্ধ্বে। আলি আকবর রবিশংকর থেকে শুরু করে তাঁদের পরবর্তী যুগের তরুণ শিল্পীগোষ্ঠীও এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

—সন্ধ্যা সেন

পূর্ণেন্দু পত্রী-বিমল ভৌমিক
পার্থপ্রতিম চৌধুরী
নীতিশ মুখোপাধ্যায়-ইন্দর সেন

বাংলা ছবির নতুন দিক

স্বপন কুমার ঘোষ

...আজকাল যখন-তখন লোকে বলে, শুনতে পাই, বাংলা তথা ভারতীয় ছবি গোল্লায় যাচ্ছে। কথাটা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যে।... (শিল্প, ছবি ও ভবিষ্যৎ। ঋত্বিক ঘটক)

পূর্বসূরীদের এই বিশ্বাসের ওপর আজকের তরুণ চলচ্চিত্রকাররা দাঁড়িয়ে আছেন। হ্যাঁ নিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন—দু'একজন বাদে। কারণ ইদানীং বাংলা ছবির শৈল্পিক দিক অনেকটাই গত 'অমানুষ' জাতীয় ছবির প্রচণ্ড প্রতাপ, বড় বড় বুকনির নেপথ্যে অনেকটা ঘোমটার নীচে খ্যামটা নাচে। তবুও এরই মধ্যে বাংলা ছবির জগতে তরুণ চলচ্চিত্রকারদের একটা দল তৈরী হয়েছে। এঁরা নতুন কিছু করার চেষ্টা করছেন, নতুন কিছু করার কথা ভাবছেন। অবশ্যই নিজের নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী। ক্ষমতা থাকলেও সাধ্য কম। এখানে ভাল ছবি নির্মাণ করা নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। ভাল বলতে, যেসব ছবি গুণগত দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় তরুণ চলচ্চিত্রকাররা একটা নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন। যেমন পূর্ণেন্দু পত্রী, বিমল ভৌমিক, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, নীতিশ মুখোপাধ্যায় এবং ইন্দর সেন। যাঁদের নাম উল্লেখ করলাম তাঁদের সকলের ক্ষমতা একরকম নয়। হওয়ার কথাও নয়।

অতএব উদ্দেশ্য এক নয়। **পূর্ণেন্দু পত্রী :** পৃথিবী জুড়ে শিল্পের যে সৌধ গড়া হচ্ছে, তাতে আমার নিজের হাতে গড়া একখানা নকসা কাটা ইঁটের যোগান দিতে—এই উদ্দেশ্যেই আমার ফিল্ম করা।

পার্থপ্রতিম চৌধুরী : আজকের ছায়াছবি শুধুমাত্র ছায়া নয়, শুধু ছবিও নয়; তার চেহারার বৈশিষ্ট্যে, তার চেতনার ধমনীপ্রবাহে কতকগুলো মূলসূত্র কাজ ——। এই মূলসূত্র আধুনিক জীবন-দর্শনের টানা-পোড়েনের ঠাসবুনোনিতে বাঁধা। এই জাতীয় চিন্তাধারার বাইরে এসে ছবি করার অর্থ উদ্দেশ্যবিহীন।

নীতিশ মুখোপাধ্যায় : প্রশ্নটা যদি দর্শকদের মনোরঞ্জন অথবা শিল্পগত ভাবনার পরিণতির প্রক্ষেপণ এই দুটি ভাগমুখী উদ্দেশ্য সম্পর্কে করা হয়ে থাকে—তবে নিশ্চয়ই বলবো দর্শকদের নিছক মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যেই ছবি করবো একথা এখনো মনে হয়নি। 'নিছক' কথাটা ব্যবহার করলুম কেন সেটা বলি। দর্শকদের মধ্যেও তো রুচির প্রভেদ আছে। কেউ আনন্দ পান সস্তা এবং তাৎক্ষণিকতায় হাততালি দিয়ে। কেউবা সন্তুষ্ট হন সত্যিকারের শিল্পসম্মত কোন কিছুতে। কিন্তু 'মনোরঞ্জন' কথাটা উভয়ের মধ্যেই নিহিত। প্রভেদ শুধু একজনের দেখাতেই শেষ, আরেকজনের দেখার পরেও কিছু বাড়তি পাওয়া। এই বেশী কিছু দিতে পারাটাই বোধহয় মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। ছবি করতে গিয়ে যদিও বুঝতে পারি এই ধরনের মনস্ক দর্শকদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য, তবুও একথা কে না ভাবে আমার ছবি সর্বস্তরের দর্শকদের আনন্দ দিক। আমার তৈরী ছবি সবাই দেখুক—কিন্তু যাঁরা জাতীয় অব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী, তাঁদের ক্ষেত্রে তো এরকম অঘটন কখনই হবার নয়। তাই কি করবো বলুন, উদ্দেশ্য বদল হয় না।

বিমল ভৌমিক : যে উদ্দেশ্য নিয়ে একজন কবি কবিতা লেখেন, চিত্রকর ছবি আঁকেন, গাইয়ে গান করেন ঠিক সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি ছবি করি। সেটা শিল্প হয়ে উঠলো কি উঠলো না সে বিচারের ভার আমার ওপর নেই। তবু উদ্দেশ্য একই। নিজেকে বিকীর্ণ করা। আমার বোধ-বুদ্ধি অভিজ্ঞতা, আমার আবেগ, আমার স্বপ্ন আমার প্রতিবাদ, আমার যন্ত্রণা সবাইকে ছুঁয়ে যাক তোলপাড় তুলুক সকলের মধ্যে। আমার অনুভব ও আবেগে আলোড়িত হয়ে আমার মতো করে আমারই আয়নায় সবাই নিজেকে দেখুক—উদ্দেশ্য এইটাই।

ইন্দর সেন : ছবি করার জন্য ছবি করি। অর্থাৎ এটাই আমার পেশা। বলতে পারেন একজিস্টেন্সের জন্য। যে কোন ইনটারেস্টিং বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি করতে পারি। তবে সবকিছুর মধ্যে একটা বক্তব্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি। এছাড়া ছবি করার মধ্যে আনন্দ আছে—সেই উদ্দেশ্যেও।

এই তরুণ চলচ্চিত্রকারদের চিত্রনির্মাণের প্রস্তুতি চলে স্বতন্ত্রভাবে। বেশীরভাগ সময়ে স্বাভাবিক নিয়মে হয় না। কারণ অর্থসংকট। তবুও এরই মধ্যে যতদূর সম্ভব...।

পূর্ণেন্দু পত্রী : প্রথমে গল্প বাছি। তারপর চিত্রনাট্য লিখি। লেখার আগে মনে মনে দেখতে চেষ্টা করি নানান দিক থেকে কি কি ছবি চোখে আসে। তারপর লেখার কাজ। লিখতে গিয়ে যখন কলম আর চলে না, জট পাকিয়ে যায়, তখন ঘর অন্ধকার করে দিয়ে ক্লাসিকাল রেকর্ড বাজাই। দেশী এবং বিদেশী। এতে আশ্চর্য কাজ হয়। এক এক করে কল্পনার দরজা খুলতে থাকে। যেহেতু আমার বেশীরভাগ ছবিই আউটডোরে তৈরী, ফলে চিত্রনাট্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে লোকেশান দেখে নিতে হয়। লোকেশানকে চোখে দেখেই আমার আসল চিত্রনাট্য তৈরী হয়। তারপর তো বাঁধা গতের কাজ

বিমল ভৌমিক : আসলে যেদিন থেকে কোনো একটি বিষয়বস্তু হঠাতই মনের মধ্যে ধরে ঝাঁকানি দিতে শুরু করে, ঘুমন্ত ভাবনার বুদ্বুদ স্তূপে ছড়িয়ে দে আগুনের শিখা, ছবি তৈরীর কাজ সেদিন থেকেই শুরু। বিষয়বস্তুটা ক্রমে বাড়

বাড়তে ক্রমে অবয়ব পেতে থাকে। নির্বস্তুক, বস্তুময় হয়ে ওঠে। গদ্যময় তথ্যগুলো কাব্যময় তত্ত্বের চেহারা পায়। কাহিনী আর গল্পের খোলস ছেড়ে আরো কিছুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতে থাকে—আমি আছি, আমার গতি আছে, ছন্দ আছে, রূপ আছে—ঠিক তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় চিত্রনির্মাণের কাজ। তারপর সকাল দুপুর সন্ধ্যে রাত্রি দেওয়ালে রূপোলী চরিত্রেরা কথা বলে, হাসে, কাঁদে, স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখায়। এইভাবেই চলে আমার প্রাথমিক চিত্রনির্মাণের প্রস্তুতি। মনে মনে গাঁথা হল চিত্রনাট্য, আলো জ্বলল, শুটিং হল, চরিত্রগুলো নিজের নিজের মতন করে ঠিকঠাক নির্দেশ পালন করে গেল। মনের এডিটিং টেবিলে কাটাকুটি চলল। তারপর হঠাৎই একদিন মনটা হাল্কা হয়ে যায়, বোঝা যায় ছবি হয়ে গেছে। আমি যা ভাবছি সেটা ছবি হয়ে উঠেছে। ব্যাস তারপরের কাজটুকু মুদ্রারাক্ষসের দাক্ষিণ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে প্রহর গুনি। কাঞ্চনমূল্য দিয়ে কে আমার চতুষ্কোণ ভাবনাকে কিনে নেবে।...

পার্থপ্রতিম চৌধুরী : হয়তো অনেক, অনেকদিন আগে থেকে একটা গল্প আমার মনকে নাড়া দিয়েছে। সেটা নিয়ে হঠাৎ করে একদিন ভাবতে বসে যাই। মনের মধ্যে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর। চটপট চিত্রনাট্য লিখে ফেলি। হয়তো সেটা ছবি নাও হতে পারে অথবা গল্প কেনার ক্ষমতা আমার নাও থাকতে পারে। প্রস্তুতি আমার চলছে, চলছে এবং চলবে। এরই মধ্যে একটা ছবি যদি করা গেল তখন মাথায় অনেক চিন্তা। চিত্রনাট্যের খাতা বারবার দেখতে হয়। নির্ভর করতে হয় প্রযোজকের ওপর। আমার মনের মধ্যে যে ছবি ছিল, অনেক সময় ওলট পালট হয়ে যায়। তবুও একই নিয়মে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। থাকতে হয়।

নীতিশ মুখোপাধ্যায় : আমাদের 'একদিন সূর্যের নির্মাণ যজ্ঞের প্রস্তুতি? বলতে দ্বিধা হচ্ছে কেননা ফিল্ম ট্র্যাডিশন-এর সঙ্গে তুলনা করলে নিতান্ত ছেলে খেলা মনে হবে। আমাদের মহরতের পয়সা ছিল না—ক্যামেরার ওপর জবাফুলের মালা পরানোও ছিল না। না মেক-আপম্যান, না প্রোডাকশন কন্ট্রোলার, না প্রোডাকশন বয়, না আর্ট ডিরেকটর—কেউ না। সবই আমরা। যেহেতু পয়সা নেই। কিন্তু কিছু সহৃদয় টেকনিসিয়ান্স ছিলেন। আর আমাদের ফিল্ম কেনার জন্যে রাত জেগে একজনের কমার্সিয়াল ছবি আঁকা—আরেকজনের টিউশানি—আরেকজনের ওভারটাইম করা—এই প্রচেষ্টাটুকু ছিলো। আর ছিল কলকাতার রাস্তা ঘাট মাঠ। এই হলো আমাদের প্রস্তুতি।

ইন্দ্রপ সেন : প্রস্তুতিটা প্রধানতঃ হয় মনে মনে। মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটা সাজাতে পারলেই আমার ছবির প্রস্তুতি শেষ হয়। তারপর তো ছকে বাঁধা কাজ।

প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলেই যে ঠিকভাবে ছবি করা যাবে—এরকম নিশ্চয়তা নেই। প্রতি পদক্ষেপে অনিশ্চয়তা। কি ঘটবে জানি না'র হাতছানি। প্রসঙ্গত,

পূর্ণেন্দু পত্রী : চিত্রনাট্য অনুযায়ী কাজ পৃথিবীতে কেউ করতে পারেন না। বা করেন না। ইমপ্রোভাইজেশন কোথাও না কোথাও ঘটে। তারপর অর্থাভাব বা অন্য কোনো অসুবিধের ফলে অনেক জিনিস যেমন ভাবা থাকে, তেমন করে তোলা যায় না। 'ছেঁড়া তমসুক'—চিত্রনাট্যানুযায়ী কাজ করতে পেরে সন্তুষ্ট। শতকরা পঁচাত্তর ভাগ। বাকী পঁচিশভাগ টেকনিক্যাল ত্রুটি আমার হাত নেই। অনেকে প্রশ্ন করেন এই ছবিতে এমন কি কোন অংশ আছে যা আপনি করতে চান নি? নেই। আমি যা করতে চেয়েছি তাই করেছি। দর্শকদের দিকে চোখ রেখে ছবি করা আমার চরিত্রে নেই। দর্শকরা ছেঁড়া তমসুক' ছবিতে যা দেখতে চেয়েছিল, তা পায় নি বলেই ছবিটি দীর্ঘদিন চলে নি। যে কোন পরিচালকই তাঁর ছবি না চললে দুঃখিত এবং মর্মাহত হন। আমিও হয়েছিলাম। তাই বলে পরবর্তী ছবিতে দর্শক মনোরঞ্জনের জন্যে কুকমী কোম্পানীর কাছ থেকে সুগন্ধ মশলার প্যাকেট কিনে এনে মুখরোচক ছেঁচড়া বানানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।

বিমল ভৌমিক : একটা চিত্রনাট্য এবং একটি গঠিত চলচ্চিত্রের মধ্যে হাজার যোজন ফারাক। মাঝখানে মুদ্রারাক্ষসের হাঁ। যদিবা তার খাঁই যথাসম্ভব মেটানো গেল তবু মাঝখানে আছে হাজারটা যন্ত্রের দৌরাত্ম্য অন্ততঃ কয়েকজন জ্যান্ত মানুষের কাণ্ড-কারখানা। সবগুলোকে সুরে বেঁধে সৃষ্টির সার্থক অর্কেস্ট্রা তৈরী করতে যে ওস্তাদি দরকার, আমার মধ্যে নিশ্চিত তার ঘাটতি আছে। নইলে যে ভাবনায় মথিত হয়ে চিত্রনাট্য তৈরী হয়, তৈরী ছবিতে তার সিকি অংশেও আসে না কেন? বাস্তবের হাড় জিরজিরে ঘোড়া ভাবনার পক্ষীরাজ হলেও রূপকথায় চলে বটে, কিন্তু চলচ্চিত্রে চলে না। এখানে সবকিছুই ফলেন পরিচয়তে। এখানে অর্থানুকূল্যের বড়োই অভাব। চরিত্রের শিল্পী নির্বাচন থেকে শুরু করে একেবারে শেষ পর্যন্ত আগাগোড়াই একটা আপোসের গদ্যময় কাহিনীই হচ্ছে 'দিবারাত্রির কাব্য'। অনেক কিছুই করা সম্ভব ছিল, করা উচিত ছিল। আনন্দ-হেরম্বের প্রেমের পুরো পর্যায়টাকেই 'কংক্রীট' থেকে 'অ্যাবস্ট্রাকশনে' নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আনন্দের চন্দ্রকলা নাচ আনন্দের আত্মাহুতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা থেকে অতীন্দ্রিয়ের দিকে মানস অভিযানের হিন্দু মিথোলজিক্যাল রূপকল্প—উচিত ছিল তত্ত্বগতভাবে উপস্থিত করা। ছবিটাকে প্রায় ষড়যন্ত্র-মূলকভাবেই, এমন একটা ছেদ এ মুক্তি দেওয়া হয়েছিল যেখানে হিন্দি ছবি মার মার কাট কাট করে চলে। প্রযোজক নতুন, পরিবেশক নতুন, ব্যবসায়িক জগতের কৌটিল্যে তাঁরা অদীক্ষিত ছিলেন। এছাড়াও কারণ আছে দর্শক রুচি। এ ছবির বিষয়-বস্তু গভীর, আগাগোড়াই সিরিয়াস। হৈ হৈ রৈ রৈ করা দর্শকের অনুগ্রহধন্য হবার যোগ্যতা এ ছবির অনিবার্যভাবেই অনুপস্থিত। নিজের ছবির জন্যে [illegible] দর্শক তৈরী করতে হলে সংখ্যাগত ও [illegible] গুণগত দু'দিক থেকেই অনেক বেশী ছবি করা দরকার। সে সুযোগ নেই। তবুও অজস্র অভিনন্দন পেয়েছি। পেয়েছি উৎসাহ এবং প্রেরণা অনেকের কাছ থেকেই। ভালো ছবির দর্শক নেই—একথা সত্যি নয়, দর্শক আছে। এবং সেইসব দর্শকদের ওপর ভরসা রেখেই আরো ভালো ছবির স্বপ্ন বুনে চলেছি; কোনো পরীক্ষ-নিরীক্ষাই একেবারে ব্যর্থ হয় না। আমারো হয় নি।...আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে আর যাই হোক শিল্প হয় না। আপোস রফা করতে হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই, কিন্তু তা আদর্শের শিকড় ধরে টান দেয় নি। প্রযোজকদের সঙ্গে আপোস করতেই হয়, এব্যাপারে গোঁড়া নাস্তিক হলে তাকে আর ছবি করতে হবে না। প্রশ্ন মাত্রা নিয়ে। যতটুকু আপোস করলে মূল আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হতে হয় না, ততটুকু তো সবাইকেই করতে হয়। আমাকেও হয়েছে। তাছাড়া প্রযোজক মাত্রেই দৈত্য বিশেষ এ ধারণাটাও ভুল। লগ্নী টাকার নিরাপত্তার খাতিরে কিছু কিছু ফরমাস তাঁরা করেন করতেই পারেন, কিন্তু সেটা এতবড়ো বিপজ্জনক কিছু নয় যে তার জন্যে আদর্শ টাদর্শ সব একেবারে বিকিয়ে বসতে হয়।

পার্থপ্রতিম চৌধুরী : চিত্রনাট্য ধরে কাজ করা কখনই সম্ভব হয় না। সময় এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী অনেক সময় নিজেকেই অনেক কিছু বদলাতে হয়। আবার অনেক কিছু বদলাতে হয় প্রযোজকদের কিম্বা পরিবেশকদের কথার ওপর। অর্থাৎ সোজা কথায় কম্প্রোমাইজ। এটা আমার চিরকালের স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু করতে হয়েছে। 'যদুবংশ' ছবির যে চিত্রনাট্য আমি তৈরী করেছিলাম সেটার অনেকটাই করা যায় নি। অনেক ব্যাপারে আমাকে কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে। এর জন্য আমি আপাততঃ নিজেকেই দায়ী করতে চাই। এছাড়া জেনে নিতে হবে দর্শকদের—গল্পের বোঝা বয়ে বেড়ানোই শুধুমাত্র আজকের সিনেমার একমাত্র দায়-দায়িত্ব নয়; কনটেন্টের সঙ্গে সঙ্গে ফর্মের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে সব দেশের চলচ্চিত্রে তা লক্ষণীয়। আজকের ছবিতে গল্প বলার আধুনিক ভঙ্গিটি শিল্প-সচেতন এবং শিল্পঘনিষ্ঠ; আর সেই ভঙ্গি বা স্টাইল অফ ট্রিটমেন্ট লাইনকেই ধরতে হবে দর্শকদের, অন্ধকারে বসে যাঁর প্রক্ষিপ্ত আলোর দিকে চোখ রাখে সেই সব দর্শকদের। দর্শক তৈরী হয় একথা বলা ভুল, শতকরা নব্বই ভাগ দর্শককে এখনো তৈরী করার দায়িত্ব আমাদের সৃষ্টির শেষ রাগিণীকে বিলম্বিত করতে পারবে না।

নীতিশ ম্বখোপাধ্যায় : আমাকে খ্বব একটা চিত্রনাট্য অন্বযায়ী কাজ করতে বাধা পেতে হয় নি। তব্ব মাঝে মাঝে একট্ব অস্ববিধে দেখা দিয়েছে বৈকি। সেটার প্রথম কারণটা আর্থিক এবং দ্বিতীয় কারণ লোকেশান নির্বাচন। যেমন ধর্বন ব্বষ্টি চাই কিম্বা ঝড় চাই। ক্যামেরা নিয়ে অপেক্ষা করে আছি তো আছি। অগত্যা সিকোয়েন্স বদলাও এবং একই কারণে লোকেশান। চিত্রনাট্য রচনার বেলায় এবং ছবিটি নির্মাণের সময়ট্বকু আমরা দার্বণভাবে বিশ্বস্ত ছিলাম। তবে সেদিন যা করেছি আজকে তা তো ভাবতে পারি না। আজকে নতুন কথা। এখন মনে হচ্ছে অনেক কিছ্ব করা যেতো। ছবিটা আরো আধ্বনিক এবং আরও কিছ্বটা অতিরিক্ত নাটকীয় মাত্রা য্বক্ত হতে পারতো। এ ছবি সেই কারণেই বক্স অফিসের আন্বক্ল্য পায় নি, তা নয়। বকস অফিসের আন্বক্ল্য পাবার মতো ছবি নয় বলে। আমি বলতে চাইছি আমাদের দেশের শতকরা পঁচানব্বইজন স্টার সমেত নাচ-গান, হৈ-হ্বল্লোড়, চড়া নাটক এবং আদ্যিকালের সেন্টিমেণ্ট এবং বাংলা ছবির সাম্প্রতিক অবদান—বহ্ব গ্বন্ডার সঙ্গে জনপ্রিয় নায়কের মারপিট ইত্যাদি কিছ্বই নেই 'একদিন স্বর্য' ছবিতে। স্বতরাং...। তব্ব ম্বষ্টিমেয় যাঁরা ছবিটি দেখেছেন, তাঁদের উপস্থিতি অম্বল্য মনে করি। এবং সেই কারণেই সবাইকে হিন্দি ছবির মতো বাংলা ছবি তৈরী করতে হবে স্বীকার করি না। এতেই বাংলা ছবি বাঁচবে—মানি না।

ইন্দর সেন : চিত্রনাট্য অন্বযায়ী কাজ করা যায় না। এটা খ্বব প্র্যাকটিক্যাল কথা। এর অবশ্য প্রধান কারণ অর্থসংকট। তাছাড়া শ্বটিং চলাকালীন নিজের প্রয়োজনেই সংলাপ বদল করতে হয়, অনেক ক্ষেত্রে সিকোয়েন্স। সিচুয়েশন ইত্যাদি চেঞ্জ করা হয় বক্তব্যকে একসটেন্ড করার জন্য। আমার ইচ্ছে থাকলেও অর্থাভাবের জন্য করা সম্ভব হয় না। 'পিকনিক' ছবি ঘিরে আমার অনেক ভাবনা ছিল। সেটা র্বপায়িত হতে পারে নি। আমাকে বহ্বক্ষেত্রে কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে। বিশেষ করে টেকনিক্যাল ফ্রণ্টের ক্ষেত্রে। তবে ছবিতে এমন কোন অংশ ছিল না বা করা হয় নি যা আমার একেবারেই অপছন্দ ছিল। আরো বেটার নিশ্চয়ই করা যেত। সেটা এখন আর ভেবে লাভ কি। ছবি ভাল হয়নি কিম্বা বকস অফিসের আন্বক্ল্য পায়নি—সম্প্বর্ণ আমারই দোষ। 'পিকনিক' ছবিটি আপনারা যা দেখেছেন সেটা ইনকমপ্লিট—জোর করে কমপ্লিট করা হয়েছিল। আমার মতে এভাবে কোনো ছবি কমপ্লিট করা উচিত নয়। অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট এই ধরনের কম্প্রোমাইজ করাটা ভুল। সব ছবিতেই আমাকে কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে কার্বর সঙ্গে নয় নিজের সঙ্গে। তবে ভাল ছবি তৈরী করাই আমার আদর্শ। একেবারে আদর্শ-চ্যুত হয়ে ছবি করা অর্থাৎ সব বিকিয়ে দিয়ে ছবি করা এখনো সম্ভব হয়নি। আমি আপাততঃ এই সিদ্ধান্তে এসে পেঁৗছেছি যে সম্প্বর্ণভাবে নিজের কথা প্রকাশ করার সময় এখনো আসে নি।

তাহলে এখন এই সময়—ঠিক কোন সমস্যার প্রতিফলন সবচেয়ে জর্বরী বলে ধরে নেওয়া যায়? এর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটানো কতদ্বর সম্ভব?

প্বর্ণেন্দ্ব পত্রী : আমি ঠিক এভাবে ভাবি না কখনো। আমার কাছে সবসময়ই জর্বরী মাত্র একটি। যখন যে ছবি করছি। তার মধ্যে যে ধরনের সমস্যা আছে, তাকে কিভাবে ফ্বটিয়ে তুলবো। হঠাৎ শ্বধ্ব চলচ্চিত্রের ওপরেই এত দায় কেন, রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটানোর জন্যে? আর কোন শিল্পমাধ্যমের কি এসব দায় নেই। এত দ্বঃখ-দ্বর্দশা ও দারিদ্র্য যদি রাজনৈতিক চেতনাকে দানা বাঁধতে না পারে, চলচ্চিত্র কি এতই শক্তিমান যে শ্বধ্ব সেইই আলাদীনের প্রদীপ নিয়ে হাজির হবে? 'কলকাতা একাত্তর' তো রাজনৈতিক ছবি। অত হৈ চৈ করে চলেছে। তারপরেই তো একটানা দ্বর্ভিক্ষ। কি এমন ঘটল তারপর?

বিমল ভৌমিক : জর্বরী সব সমস্যাই। যখন যেটা চলছে। তবে ধরতে হবে তার শিকড়। ধরতে হবে প্রত্যেকটা এলোমেলো হওয়ার ঝ্বটি। সমস্যা সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারলে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটানো নিশ্চয়ই সম্ভব। রাজনৈতিক চেতনা কেন সামাজিক চেতনাও। যে কোন সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে পারলেই জীবনের জটিল কেন্দ্র আবিষ্কার করা যায়।

পার্থপ্রতিম চৌধ্বরী : সবচেয়ে জর্বরী হচ্ছে বেকার সমস্যা। বেকারী, দারিদ্র্য, ঘরোয়াগানভাঙ্গা, ছেলেমেয়েদের উৎকেন্দ্রিকতা, রাজনীতি ইত্যাদি ইত্যাদি সমকালীন সমস্যা তুলে ধরা চলচ্চিত্রকারের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। আমাদের এখানে সেন্সরশিপের অনেক রকম অস্ববিধা আছে। সেসব বাঁচিয়ে পলিটিকাল ছবি করা যেতে পারে, কিন্তু এ দ্বারা রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটানো কতদ্বর সম্ভব তা এখনো যথাযথ-ভাবে নির্ধারিত হয় নি। বঞ্চনাই শেষ কথা নয়। শেষ কথা হলে তো নতুন কিছ্ব করার স্বপ্ন দ্বঃস্বপ্নই থেকে যাবে।

ইন্দর সেন : যে কোন সমস্যাই তুলে ধরা জর্বরী। আজকের সমস্যা—আন-এমপ্লয়মেন্ট, ইকনমিক ডিপ্রেশান, ফ্রাস্ট্রেসান প্রভৃতি। এর যে কোন একটি নিয়ে ছবি করা যেতে পারে। তবে সমস্যার গভীরে যেতে হবে, রিয়েল কারণটা খ্বঁজে বার করতে হবে। ফ্রাস্ট্রেশন বলতে য্ববসমাজ। অনেকে বলে থাকেন অ্যাংরি ইয়াংম্যান। অ্যান্টি সোস্যাল—এ ধরনের বলাটা ঠিক নয়। সবাই অ্যান্টি সোস্যাল নয়। এপর্যন্ত যে কটি ছবি হয়েছে তাতে ভাসা ভাসা দেখানো হয়েছে। এতে সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়নি। অবশ্য সাহস যে আমার আছে তা নয়। পক্ষান্তরে একটা কথা বলা যায় ইদানীং তর্বণদের ফ্র্যাস্ট্রেটেড হওয়াটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক অথবা সামাজিক যে কোন চেতনার বিকাশ ঘটানো অনেকখানি সম্ভব, সেরকমভাবে ছবি তৈরী করতে গেলে বলা যেতে পারে। এখনই নয়।

নীতিশ ম্বখোপাধ্যায় : বর্তমান অবস্থায় কথা বলাটাই সমস্যা। স্বতরাং এর মাঝখানে কোনটা সবচেয়ে বেশী জর্বরী এবং ছবিতে তার কোন্বটির প্রতিফলন হওয়া উচিত সেটা বাছাই করা শক্ত। তব্ব মনে হয় এটা নির্ভর করে পরিচালকের অন্বভবের ওপর। আমার কাছে সেটা জর্বরী। যে সমস্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেহেতু ফিল্ম একটা মাস মিডিয়াম তাই তার মাধ্যমে যে কোন চেতনার বিকাশ ঘটানোর ফল স্বদ্বরপ্রসারী। প্রশ্নটা রাজনীতি নিয়ে—তাই ফিল্ম ও রাজনীতির উপস্থাপনা শিল্পের শর্তেই হওয়া উচিত।......

......সকল শিল্পকে হতে হবে জীবন-অন্বগামী। জন্মই জীবন। শিল্প জন্ম। এই কথাটা আমরা কখনো ভুলে যেন না যাই। যত ক্লেদাক্ত, বিষাক্ত অভিশাপের ভিতর দিয়ে আমাদের বেরোতে হবে, হবে। শিল্প আমাদের এই দায়িত্ব দিয়েছে।......

(ঋত্বিক ঘটক। শিল্প, ছবি ও ভবিষ্যৎ)

প্রেক্ষাগৃহ

আজনবী

প্রযোজনাঃ সামন্ত এণ্টারপ্রাইসেস

ছকে বাঁধা কাহিনী হলেও

সকলের জন্যে একটি আনন্দদায়ক ছবি

প্রেম অন্ধ। উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, কোনও কিছুরে বাধা মানে না বা ধার ধারে না সে। রোহিত মধ্যবত্ত পরিবারের ছেলে আর রেশমী ধনী পিতার একমাত্র কন্যা। কিন্তু দুজনে দুজনকে ভালবাসে, সেজন্যে কোন শক্তিকেই ওরা পরোয়া করে না। বাড়ীর অনেকের মতের বিরুদ্ধেই ওরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোল। রোহিত একটি সাধারণ ব্যবসায়িক ফার্মে চাকুরী করতো, ওর রোজগারে ঠিকমতো সংসার চলছিল না। কারণ রেশমীর নিজের জন্যেই বেশ অর্থ খরচ হোত প্রতি মাসে। অলসভাবে দিন কাটানো ছাড়া, বাড়ীতে বিশেষ কিছু করবার ছিল না রেশমীর। ওদের ফ্ল্যাটের অপর এক প্রতিবেশী শিল্পীর অনুরোধে রেশমী ছবি আঁকতে শুরু করলো। এবং নিজেকে ও রোহিতকে সচ্ছল রাখবার আশা নিয়ে রেশমী ফ্যাসান মডেলের চাকুরীর জন্যে আবেদন করলো। একদিন রোহিতের অফিসের ডিরেক্টার ওকে কয়েকটি ছবি দেখিয়ে বললো, আমাদের ব্যবসায়ের প্রচারের জন্যে এরকম একজন রেশমীর মতো মডেল চাই। এদিকে 'রেশমী' ফ্যাশান প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে বিদেশে বেড়াবার সুযোগ পেল। কিন্তু আসন্ন মাতৃত্ব বাধা হয়ে দাঁড়ানোর ফলে রেশমী রোহিতকে আগত সন্তানকে নষ্ট করতে বললো। কিন্তু আচমকা এক দুর্ঘটনা ঘটায় সন্তান আর এল না ওর কোলে। এর জন্য ভুল বোঝাবুঝি হওয়ায় রেশমী বাবার কাছে চলে গেল। রোহিতও পুরনো চাকুরী ছেড়ে স্টেশন মাস্টারের চাকুরী নিল। এই স্টেশনেই এক রাত্রে সোনিয়া নামে এক তরুণী এল ৫ লক্ষ টাকার মায়ের অলংকার নিয়ে দুই কুচক্রীর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। রোহিত আশ্রয় দিয়েও ঐ দুই কুচক্রীর হাত থেকে বাঁচাতে পারলো না সোনিয়াকে। মিথ্যা মামলায় রোহিতকে সোনিয়াকে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করা হোল। শেষে রেশমীর সাক্ষ্যর জন্যই রোহিত সসম্মানে মুক্তি পেলো।

বক্স অফিসের দিকে নজর রেখে, ছকে বাঁধা কাহিনী নিয়ে আজনবী ছবিটি পরিচালনা করেছেন শক্তি সামন্ত। অভিনয়ে— রাজেশ খান্না (রোহিত), জীনৎ আমন (রেশমী), যোগিতাবলী (সোনিয়া), প্রেম চোপড়া (জামাইবাবু), আসরাণী (প্রতিবেশী) স্ব-স্ব ভূমিকানুযায়ী ভাল অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায়— চন্দ্রশেখর রাজমেহরা মদনপুরী শ্যামা কুন্দন লীনা মনমোহন-এর

আজনবী/জীনত আমন

অভিনয় যথাপূর্বং। আর ডি বর্মনের সুরারোপে গানগুলি সুগীত হলেও একাধিক গানে উনি পূর্বেকার সুর ব্যবহার করেছেন। আলোকচিত্র গ্রহণে অলোক দাসগুপ্ত কৃতিত্ব দেখালেও, সম্পাদক বিজয় চৌধুরীর সম্পাদনার কাজ উন্নত হতে পারতো। অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ পরিচ্ছন্ন। সকলের মনোরঞ্জনের জন্য প্রমোদচিত্র হিসাবে অবশ্য আজনবী সকলকে আনন্দ দেবে।

—চিত্রদূ

নাট্যমঞ্চ

কলকাতার বাঙালী দর্শকদের কাছে এবারকার নববর্ষের সবচেয়ে বড় উপহার বোধহয় আকাদমি মঞ্চে নয়াদিল্লীর যাযাবর নাট্য গোষ্ঠী কর্তৃক পরিবেশিত দুটি নাটক। রসরাজ অমৃতলাল বসুর ব্যঙ্গ নাটক 'বাবু' এঁরা দুদিন অভিনয় করেন এবং একদিন অভিনয় করেন উৎপল দত্ত কর্তৃক বাংলা রূপান্তরিত শেকসপীয়রের 'মিডসামার নাইটস ড্রিম' অবলম্বনে 'চৈতালী রাতের স্বপ্ন।'

বস্তুত এঁদের অভিনয় দেখতে দেখতে আমরা রীতিমত বিস্মিত হয়েছি। তার একটি বড় কারণ হয়তো এই যে বাংলার বাইরের কোন নাট্য গোষ্ঠী (বিশেষ করে রাজধানীর মত জায়গায়) যে এমন প্রাণবন্ত এবং উপভোগ্য নাটক আমাদের উপহার দিতে পারবেন তেমন প্রত্যাশা আমাদের ছিল না।

এর জন্যে আমরা দুটি নাটকের পরিচালক শ্রীগোপীনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবিমল ব্যানার্জী এবং যাঁদের উদ্যোগে কোলকাতায় বসে নয়াদিল্লীর যাযাবর গোষ্ঠীর নাটক পরিবেশন দেখা সম্ভব হোলো সেই স্থানীয় 'গান্ধার' নাট্য গোষ্ঠীর প্রতি প্রারম্ভেই আমরা আমাদের সানন্দ অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি।

রসরাজ অমৃতলাল বসুর 'বাবু' আপাত প্রহসন হলেও মূলত সিরিয়াস নাটক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী জাতির অবক্ষয়ের চিত্র সেকালের মত এ কালেও সমান আবেদন বয়ে আনে। এক দিকে সমাজ এবং ধর্মের মূলে মূর্খের মত কুঠারাঘাত, অন্যদিকে ঘরের নারীকে বাইরে আধুনিকতার নামে টেনে এনে একজাতীয় মানুষের উদ্দেশ্য সিদ্ধি-চিন্তা যেন আজও সত্য। যার মূলে সেই অর্থ এবং সিভিলাইজেশন নামক বস্তু-দ্বয় কাজ করে।

কথাটা আবার নতুন করে মনে হোল যাযাবরের 'বাবু' নাটকটি দেখে।

বাংলাদেশ, বিশেষ করে কলকাতা শহর নাট্য আন্দোলনের পীঠস্থান। এখানে গ্রুপ থিয়েটারের দলগুলি নিত্য নতুন ভাবনার নাটক আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে চমক এবং ভাবনার সৃষ্টি করেন। এ থেকে একটা কথা স্পষ্ট যে, আমরা বাংলাদেশের বাঙালীর সামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে অত্যন্ত সচেতন বলেই এটা সম্ভব হচ্ছে।

কিন্তু বাংলার বাইরের নাট্যগোষ্ঠীর নাটক পরিবেশনের মধ্যেও এমন সচেতন চিন্তা আমরা সাধারণত আশা করে থাকি না। তার একটা বড় কারণ, বাঙলার বাইরে বিভিন্ন রাজ্যে যে সব বাঙালী আছেন, তাঁরা সাধারণত চাকুরীর প্রয়োজনেই প্রবাস জীবনযাপন করেন। এবং কোন উপলক্ষ্যে যখন কোন নাটক পরিবেশন করে থাকেন, তা সাধারণ অবসর বিনোদন এবং নিছক মনোরঞ্জনের খাতিরেই তা করে থাকেন। তাঁরা সেই সংবাদে বেছে নেন ঐতিহাসিক, পৌরাণিক বা সাধারণ সামাজিক নাটক। যাতে সমস্যা বা জোরালো বক্তব্যের পরিবর্তে থাকে মনোরঞ্জক চিন্তা।

কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, নয়াদিল্লীর যাযাবর গোষ্ঠী 'বাবু' পরিবেশন করে আমাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন।

শুধু নির্বাচনেই নয়, এঁদের টোটাল টীমওয়ার্কও আমাদের বিস্মিত করেছে। ফলে কোন দৃশ্য যেমন স্বতন্ত্রভাবে উপভোগ করেছি, তেমনি আবার কোন কোন কোন দৃশ্যে আমাদের নির্বাকও করে রেখেছে।

আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল। সেটা হোল নাটক দেখতে দেখতে কখনই আমাদের মনে হয়নি যে, সখের নাটকে দলের রিহার্সাল দেওয়া নাটক দেখছি আমরা। যেন এঁরা আমাদের ঘরের মানুষেরাই নাটকের প্রয়োজনে এসে বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন। বোধহয় সেইজন্যই এ নাটকে অতি নাটকীয়তার প্রচুর অবকাশ

নয়াদিল্লীর যাযাবরের বাবু

বাবু নাটকে উৎপল মুখার্জি এবং ছবি সেন

থাকা সত্ত্বেও এঁরা আশ্চর্য স্বাভাবিক অভিনয় করে গেছেন।

অভিনয়ে আমাদের সর্বাধিক আনন্দ দিয়েছেন নাটকের মূল চরিত্র কটি: যথা ষষ্ঠীচরণ বটব্যালরূপী সুপ্রিয় রায়চৌধুরী, ফটিকচাঁদরূপী গোবিন্দ চক্রবর্তী, সজনীকান্তর ভূমিকায় শিবশেখর সরকার, বাঞ্ছারামের ভূমিকাভিনেতা উৎপল মুখার্জি, অশ্বিনীপ্রকাশরূপী শ্যামল রায়চৌধুরী, তিনকড়িবাবুর ভূমিকায় অমরেশ দত্ত এবং কন্দর্প কান্তির ভূমিকাভিনেতা দিলীপ ঘোষ। বৃদ্ধার সঙ্গে দিলীপ ঘোষের দৃশ্যটি বোধকরি এ নাটকের শ্রেষ্ঠ দৃশ্য। এই অংশে কন্দর্পকান্তির পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় সংলাপ, বিশেষ করে বৃদ্ধাকে বিধবা বিবাহে উদ্বুদ্ধ করার মানসে কাব্যিক সংলাপ এবং তার উত্তরে বৃদ্ধার বিস্ময়, খেদ ও মর্মজ্বালাকর অর্ধোস্ফুট বিলাপ যেন দৃশ্যসহ এখনও কানে বাজছে। বৃদ্ধা আজিমার ভূমিকাভিনেত্রীর (সুশীলা গাঙ্গুলী) সেই বিস্ময়কর সহজ এবং স্বাভাবিক অভিনয় দীর্ঘকাল মনে থাকবে।

এর পরেই আর দুটি দৃশ্য সজনীকান্তের স্ত্রীকে ফিটের ব্যারাম থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য বরুণ থেকে যাওয়া এবং দৈত্যদলিনীর হস্তে স্বামীর চুলের মুঠি ধরে টেনে নেওয়ার এবং শেষ দৃশ্যে বটব্যালের বৌকে সাহেবে টেনে নিয়ে যাওয়ায় বাঙালী বীরপুঙ্গবদের ভীত সন্ত্রস্ত আস্ফালনের দৃশ্য দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে।

অন্যান্য ভূমিকায় পুরুষ চরিত্রে দামোদর (শচীন গোস্বামী), ভজহরি (তুষার মণ্ডল), নদেরচাঁদ (তুষার মিত্র), ভাগবতে (সজল মিত্র) ও গবেচরণ (ভোঁদুং মিত্র) স্বাভাবিক এবং সুন্দর।

স্ত্রী চরিত্রে আর বিস্মিত করেছেন

গান্ধারীর সম্পাদক প্রণবকৃষ্ণ মিত্র যাযাবর (দিল্লী) সম্পাদক রবীন ভট্টাচার্যের হাতে স্মারক উপহার দিচ্ছেন গান্ধারের তরফ থেকে।

নীরদার ভূমিকায় অনিতা সিংহ ও ক্ষমাসুন্দরীর ভূমিকাভিনেত্রী ছবি সেন। আরতি ভট্টাচার্যর দৈত্যদলিনী, আরতি গণ চৌধুরীর শ্রীমতী আমাদের আনন্দ দিয়েছেন। ছোট্ট মেয়ে ঈপ্সিত গণ চৌধুরীর শোধিকারিণী মিণ্টি।

সেকালের পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার পক্ষে আবহসংগীত নাটকের সহায়কই হয়েছে। প্রারম্ভের মুখবন্ধ-সংগীতের প্রয়োগও সুন্দর। নির্মল ভট্টাচার্যের সংগীতপরিচালনা সার্থক।

বৃদ্ধাকে ঘিরে নাচের দৃশ্যটি দর্শকদের খুশী করেছে। আমাকে আকর্ষণ করেছে তাদের সহজ এবং সাবলীল ভঙ্গীটি। পাঁচটি মেয়েই (রেনু মুখার্জি, আলপনা সান্যাল, অনুরাধা চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্না সান্যাল ও নন্দা সমাজদার) নাচে সুপটু। এর জন্য অবশ্যই কৃতিত্ব নৃত্যপরিচালিকা শ্রীমতী আরতি গণ চৌধুরীর।

মেকআপ (শংকর সান্যাল) প্রায়শই নিখুঁত এবং উচ্চপ্রশংসার যোগ্য। আলো (পিণ্টু বোস) সেই অনুপাতে উচ্চমানের হলে খুশী হতাম।

শেষের কথা। নয়াদিল্লীর যাযাবর নাট্যগোষ্ঠী গত ১৪ বছর ধরে যেসব নাটক মঞ্চস্থ করে এসেছেন তার কোনটাই দেখার সৌভাগ্য ঘটেনি এই নাট্যসমালোচকের। তবে তাদের নিষ্ঠার প্রমাণ অবশ্যই পেয়েছি 'বাবু' এবং 'চৈতালী রাতের স্বপ্ন'তে। আর সেই জন্যেই কোলকাতাবাসী নাট্যমোদীদের বহুকাল মনে থাকবে তাঁদের। এই সঙ্গে আমরা আশা কোরবো এমনি মাঝে মাঝেই তাঁরা এসে আমাদের আনন্দ দিয়ে যাবেন। সেই সঙ্গে রাজধানীর অন্যান্য নাট্যগোষ্ঠীও।

('চৈতালী রাতের স্বপ্ন' নাটকের আলোচনা আগামী দু' এক সংখ্যার মধ্যেই করবার বাসনা রইল।

নাট্য সমালোচক

মজবুর

অমিতাভ বচ্চন

প্রযোজনা : সুচিত্রা ফিল্ম প্রাইভেট লিমিটেড
কাহিনী ও অভিনয়ে সকলের ভালোলাগা ছবি

রবি ভর্মা এক ট্রাভেলিং এজেন্সীতে কাজ করে। বিধবা মা, পঙ্গু বোন ও ছোট ভাইকে নিয়ে তার সংসার। সবাই তার ওপর নির্ভরশীল। সেই রবির পরিচিত সুরেন্দ্রনাথ সিনহা এক বর্ষার রাতে তার কাছ থেকে টিকেট কিনে ফেরার পথে এক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হয়।

পুলিশ সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ খুঁজে পেলেও আততায়ীর সন্ধান না পাওয়ায় রহস্য যেমন একদিকে ঘনীভূত হয়ে ওঠে, অন্যদিকে রবিও মনে মনে ভয় পেয়ে যায়।

এই অবস্থায় সুরেন্দ্রনাথের ভাই নরেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত খুনীর যে সন্ধান দিতে পারবে তাকে পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবে বলে ঘোষণা করে।

এদিকে রবি একদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে ও পরীক্ষার পরে জানতে পারে যে, তার ব্রেন-টিউমার হয়েছে এবং ছ' মাসের মধ্যে তা অপারেশন না করলে সে মারা যাবে। তখন তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। যদি সে মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তাহলে সে-ই ঐ টাকাটা পেতে পারে এবং সেই টাকা তার মৃত্যুর পর তার সংসারের লোকেদের কাজে লাগবে।

সেই মিথ্যার আশ্রয় নিয়েই শেষ পর্যন্ত রবিকে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেলে যেতে হয়। জেলের হাসপাতালে একদিন তার ব্রেন-টিউমার সার্থকভাবে অপারেশন হয়। একটু সুস্থ হয়েই রবি আসল খুনীকে খুঁজে বের করার জন্য হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যায়। তখনই ঘটনাচক্রে এক দাগী চোরের কাছে জানতে পারে যে, সুরেন্দ্রনাথের আসল খুনী তার নিজেরই ভাই নরেন্দ্রনাথ।

এর পরে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই নরেন্দ্রনাথ ধরা পড়ল এবং রবি মা ভাই বোন এবং প্রণয়িনী নীলার মুখে হাসি ফুটিয়ে বাড়ী ফিরে এলো।

অভিনয়ে অমিতাভ বচ্চন, পরভিন বাবী, ফরিদা জালাল সুলোচনা, প্রাণ, রেহমান অপূর্ব অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় জয়শ্রী টি, ম্যাকমোহন, ললিতা কুমারী ইফতেখার নীনা ভিসজো ইত্যাদি মোটামুটি ভালই অভিনয় করেছেন।

আলোকচিত্র গ্রহণে নরিমান ইরাণী, সম্পাদনায় দাশ ধিয়ামাতে, শিল্প-নির্দেশনায় দেশ মুখার্জী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সংগীত পরিচালনায় লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল ছবির মুড অনুযায়ী সুর দিয়েছেন।

মূল গল্পটির সঙ্গে বিদেশী ছবির মিল, বিশেষ করে ৩৬ ঘণ্টে নামক হিন্দী ছবিটির সঙ্গে এর কাহিনীগত মিল দেখে অনেকেই বিস্মিত হবেন। তবে পরিচালক রবি টাণ্ডন সারা ছবির মধ্যে একটা সাসপেন্স সৃষ্টি করতে পেরেছেন সন্দেহ নেই।

—চিত্রদূত

বিদেশী ছবি

কলকাতায় বিদেশী ছবির হাল

কলকাতায় এবার বড়দিন এবং নববর্ষে ইংরেজী ছবির সেই রমরমা অবস্থা নেই। অথচ গত বছরও এই সময়টায় কলকাতার বিদেশী ছবির হলগুলিতে ইংরেজী ছবি আসর জমিয়ে ছিল।

এবার সেখানে যাও দু'টো ছোটদের বই রিলিজ হয়েছে, তার মধ্যে একটা পুরনো— সেই 'সাউণ্ড অফ মিউজিক' এবং অন্যটি ডাব করা রাশিয়ান ছবি। এটা অবশ্য নতুন।

অন্যান্য শ্রেণীর জাগা হলগুলিতেই [illegible] হিন্দী ছবি। [illegible] ছবি দেখার বড়দিন এবং নববর্ষে তেমন ভাল কাটেনি—একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

এটা সুলক্ষণ কিনা জানি না, তবে শুধু অ-ভারতীয়রাই নয় বিদেশী ছবি ভালবাসেন এমন ভারতীয় দর্শকরাও এতে নিরাশ হয়েছেন নিশ্চিত, একথা বলতে পারি।

তবে কলকাতার বিদেশী ছবির দর্শকরা একটা আশায় বুক বেঁধে আছে। সেটা হোল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত ছবির কিছু অংশ এখানে দেখাবার কথা আছে। সে-আশা যদি পূর্ণ হয়, আমাদের একটা খেদ মিটবে।

এই সঙ্গে সরকারী ব্যবস্থায় ঐসব

ছবির কিছু কিছু যদি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে দেখাবার ব্যবস্থা হয়, তাহলে সেটা হবে আরও আনন্দের।

জানি না সরকারী ব্যবস্থা এ-ব্যাপারে কতদূর সার্থক হতে পারবে।

তবে আমরা দিল্লীর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছি। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে না হোক, অন্তত উৎসবের ছবি কয়েকটা এসে এ-শহরকে সজীব করে তুলুক।

সংবাদপত্র এবং পত্র-পত্রিকায় উৎসব অনুষ্ঠান এবং উৎসবে প্রদর্শিত কয়েকটা ছবি দেখেই যদি কলকাতার বিদেশী ছবির দর্শককে তুষ্ট থাকতে হয়, তার চেয়ে আর ক্ষোভের কিছু নেই।

বিদেশী ছবির টুকিটাকি

দু'জন প্রথম শ্রেণীর আমেরিকান ফুট-বল খেলোয়াড় এবার হলিউডের পাদপ্রদীপে আসছেন। তাঁরা হলেন জিম প্লাংকেট ও জেনে ওয়াশিংটন।

এ'রা যে-ছবিতে অভিনয় করবেন তার নাম 'এয়ারপোর্ট ১৯৭৫'। এ-ছবির ভূমিকা-লিপিও দারুণ আকর্ষণীয়। যেমন চার্লটন হেসটন, সুসান ক্লার্ক, গ্লোরিয়া সোয়ানসন কারেন ব্ল্যাক, জর্জ কেনেডি তো থাকছেনই, তার সঙ্গে আছেন পল হেরাল্ডের মেয়ে মণিকা হেরাল্ড, লরেটা ইয়ং-এর মেয়ে জুডি লুইস।

ছবির কাহিনীকার আর্থার হেইলি। ছবিটি ইউনিভার্সালের।

মৌচাক

মিঠু মুখার্জি/রঞ্জিত মল্লিক

ইউনিভার্সালের আর একটি ছবি 'দি স্টিং' ইতিমধ্যেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সাড়া জাগিয়েছে।

'দি স্টিং'-এর পরিচালক জর্জ রয় হিল এবং কাহিনীকার ডেভিড এস ওয়ার্ড।

এই ছবিটি সাতটি একাডেমী এ্যাওয়ার্ড এবং শ্রেষ্ঠ ছবি ও শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য পুরস্কৃত হয়েছে।

*

এ্যালফ্রেড হিচকক ৭৫ বছরে পদার্পণ করে তাঁর ৫৩তম ছবিটিতে হাত দিয়েছেন। তিনি ভিকটর কানিং-এর উপন্যাস 'দি রেইনবো প্যাটার্ন' চিত্রায়িত করছেন। এ-ছবির চিত্রনাট্য করেছেন 'নর্থ বাই নর্থ ওয়েস্ট' খ্যাত আর্নেস্ট লেম্যান।

রয় পল ম্যাডসেন একজন চলচ্চিত্র-বিশেষজ্ঞ। তিনি একাধারে লেখক, শিল্পী, শিক্ষাবিদ, লেকচারার, এ্যানিমেটর এবং চলচ্চিত্র-প্রযোজক। চলচ্চিত্রের উপরে তাঁর একাধিক গবেষণামূলক বইও আছে। কি করে ছবি তৈরি করতে হয়, কি তার ধারা, ছবিকে বিষয়বস্তুতে কিভাবে সমৃদ্ধ করতে হয়—এসম্পর্কে তিনি বহু গবেষণা ও হাতে-কলমে কাজ করেছেন।

সম্প্রতি আলোচনাসহ তাঁর কাজের কিছু কিছু নমুনা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয় ইউ এস আই এস প্রেক্ষাগৃহে। প্রতিটি অনুষ্ঠানই বিষয়-বৈচিত্র্যে ও আলোচনায় মনোজ্ঞ হয়েছিল।

—শ্রা র চ

বিবিধ সংবাদ

জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী সংগীত সম্মেলন : সম্প্রতি রামমোহন মঞ্চে দু'দিনব্যাপী জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী সংগীত সমাজ (কলেজ অফ মিউজিক) আয়োজিত জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে সার্জেন কমোডর জি সি মুখার্জি ও হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী। প্রথম দিনে শান্তা মুখার্জির গজল বিশেষ উপভোগ্য হয়। এর পর উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হয় নলিনচন্দ্র মালাকারের খেয়াল ও তারাপ্রসাদ গোস্বামীর সুকণ্ঠের খেয়ালে। অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল প্রভাতী চ্যাটার্জির গান দিয়ে। দ্বিতীয় দিন শুরু হয় বিকাশ-কুসুম হালদারের টপ্পা গান দিয়ে, ইনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই দিনে জয়কৃষ্ণ সান্যালের ধ্রুপদ-ধামার, কৃষ্ণা ঘোষের ঠুংরী প্রশংসিত হয়। পরেশ বণিকের বাগেশ্রী প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। জয়ন্তী মুখার্জির নৃত্য, নানকু মহারাজ, রামনাথ মিশ্র ও বাচ্চালাল মিশ্রের সারেঙ্গী শ্রোতাদের মনোহরণ করে। শিবচন্দ্র মুখার্জির দরবারী কানাড়া সকলকে চমৎকৃত করে। মীরা ব্যানার্জির খেয়াল ও ঠুংরি এক কথায় অপূর্ব। ফটিকচন্দ্র দাসের সেতার ও গোবিন্দ ভড়ের খেয়াল উপভোগ্য হয়। শেষ শিল্পী প্রসূন ব্যানার্জি খেয়াল-ঠুংরি গেয়ে তাঁর পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। সহযোগী শিল্পীদের মধ্যে রাজীবলোচন দে, তপন আদিত্য ও পাঁচুগোপাল দাস উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন

বিগত শুক্রবার ১৯ জানুয়ারী সন্ধ্যায় রবীন্দ্রকাননে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের উদ্বোধন উৎসবে পৌরোহিত্য করেন যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ আর প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী ভাষণে সন্তোষ ঘোষ বলেন যাত্রা শিল্প যেন তার নির্ভেজাল রূপটিকে বজায় রাখতে পারে সিনেমা এবং থিয়েটারের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেললেই হবে তার অপমৃত্যু।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যাত্রাশিল্পী ও কর্মীদের সুচিকিৎসা এই শিল্পের সংগে জড়িত শিল্পী ও কর্মীদের লেখাপড়ায় সাহায্য দান ও একটি স্থায়ী স্টেডিয়াম নির্মাণকল্পে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের এই আয়োজনকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সভাপতির ভাষণে যুগান্তর সম্পাদক সুকমলকান্তি ঘোষ পূর্বের এবং বর্তমানের যাত্রাশিল্পের গতিপ্রগতি নিয়ে বিশ্লেষণ করে বলেন, বর্তমানের সংগেও সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে যাত্রাশিল্প। যেকোন শিল্পকলাই যুগধর্মকে অনুসরণ করেই রূপায়িত হয়। যাত্রাশিল্পের ক্ষেত্রেও তাই পরিলক্ষিত হচ্ছে। যাত্রাশিল্পের সামনে আছে বিভিন্ন সমস্যা। সেসব সমস্যার সমাধানে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের সভাপতি সুহৃদ রুদ্র তাঁর ভাষণে প্রমোদকর থেকে যাত্রাশিল্পকে রেহাই দেবার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান। সম্পাদক অমল সরকার, শম্ভুনাথ ঘোষ এবং শৈলেন মহান্তিও জনসাধারণ, অতিথিবৃন্দ ও সুধীজনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তৃতা করেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে ঐদিন রাত ৭টায় নাট্যকোম্পানী কর্তৃক মা মাটি ও মানুষ নাটক অভিনীত হয়। ৯ জানুয়ারী থেকে ২৬ জানুয়ারী পর্যন্ত ১৭ দিনে ১৮টি যাত্রা নাটক অভিনীত হবে। এগুলি হলো মা মাটি মানুষ, ফেরারী ফৌজ, সিঁদুরে দিওনা মুছে, বন্দী, কে ঠাকুর ডাকাত, সম্রাট অন্ধকাসুর, সোনাডাঙার বৌ, নিজেরে হারায়ে খুঁজি, মাও-সে-তুং, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, মা যদি মন্দ হয়, বিপ্রদাস, স্বর্ণ গোলক, বউ কেন কাঁদে, আঁধারে আলো, পাগলা গারদ, বিদ্রোহী নজরুল প্রভৃতি।

২৬ জানুয়ারী সমাপ্তি অধিবেশনে সম্মেলনের পক্ষ থেকে গোষ্ঠবিহারী ঘোষ সূর্যকুমার দত্ত, মহেন্দ্র দত্ত ও নাট্যকার ব্রজেন্দ্রকুমার দেকে সম্বর্ধনা জানানো হবে।

নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১)

নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত নানা কারণে বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। নাট্য প্রযোজক, অভিনেতা ও নাট্যকার ছাড়া নাট্য-সাংবাদিকতা জগতেও তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। সর্বোপরি ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে হীরালাল সেনের অগ্রাধিকার সম্ভব হতো না যদি অমর দত্ত না থাকতেন। বিভিন্নমুখীন প্রতিভার সমন্বয় ঘটেছিল অমর দত্তের মধ্যে। অমর দত্তের জীবনীর মধ্য দিয়ে বাংলার নাট্যশালার একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় তুলে ধরবো।

শনিবার ১ এপ্রিল, ১৮৭৬, বাংলা ২০ চৈত্র, ১২৮২ রাত ৮টায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন নাট্যরথী অমর দত্ত। বৃহস্পতিবার ৬ জানুয়ারী ১৯১৬ রাত ৬টা দশ মিনিট, বাংলা ২১ পৌষ, ১৩২২ সালে পরলোকগমন করেন।

অমর দত্তের পিতৃপুরুষ বাংলাদেশের সুখ্যাতনামা কায়স্থ পরিবার। স্বনামধন্য লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের চার পুত্রের মধ্যে দ্বারকানাথ ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ। বাগবাজারের প্রখ্যাত বসু বংশে দ্বারকানাথ বিবাহ করেন। দ্বারকানাথের স্ত্রীর নাম ছিল রক্ষাকালী। পিতামাতার চার পুত্রের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। ধাম মনীষী ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। চোরবাগানের পৈতৃক বাড়ী বিক্রয় করে অমরেন্দ্রনাথের পিতা হাতিবাগানে নতুন বাড়ী ক্রয় করেন। রাধা সিনেমার উত্তরদিকস্থ এই গৃহে বর্তমান সমবায়িকা প্রতিষ্ঠিত।

চোরবাগানের স্কুলে বাল্য শিক্ষা। পরে আনন্দ লেনের কটন স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। কিন্তু পড়াশুনায় মন বসে না।

চোরবাগানের বাড়ীতে বেঙ্গল থিয়েটারের দুর্বাসার পারণ নাটকের অভিনয় অমরেন্দ্রনাথের মনে গভীর রেখাপাত করে। তখন তার বয়স তের বছর। স্টার থিয়েটারে নমকহারাম নাটক দেখেও অমরেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন কিন্তু দুর্বাসার পারণ-এর অভিনয় তার মনে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথের পিতৃ বিয়োগ ঘটে। ছোটবেলা থেকে আদরে আদরে মানুষ। পিতার মৃত্যুর পর মধ্যম ভ্রাতা হীরেন্দ্রনাথের শাসনও মেনে চলতেন না সব সময়ে। অভিনয়ের স্পৃহা অমরেন্দ্রনাথকে পেয়ে বসে। স্বনামধন্য অভিনেতা অঘোরনাথ পাঠক তখন সিটি থিয়েটারের সংগে জড়িত। অমরেন্দ্রনাথ অঘোরবাবুর সংগে দেখা করেন থিয়েটারে সুযোগ লাভের জন্য। অঘোরনাথ দিনের বেলা র‍্যালী ব্রাদার্সে কাজ করতেন। অমরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথ ছিলেন অঘোরনাথের উপরওয়ালা। স্বভাবতঃই অমরেন্দ্রনাথকে সাহায্য করতে তিনি অস্বীকৃত হন। অমরেন্দ্রনাথ কৈশোরেই যেসব বন্ধুদের নিয়ে গোপনে নাট্যসাধনা করতেন তাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের শ্যালক পুত্রদ্বয় চুনীলাল দেব ও নিখিলকৃষ্ণ দেবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

শেষ পর্যন্ত গিরিশচন্দ্রের সঙ্গেই দেখা করেন অমরেন্দ্রনাথ। অমরেন্দ্রনাথের মাতুল দেবেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন গিরিশচন্দ্রের পিসতুতো ভাই ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। অর্থাৎ অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের আত্মীয়। এই আত্মীয়তাসূত্রেই গিরিশচন্দ্র অমরেন্দ্রনাথদের বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। আত্মীয়ের ছেলে তাছাড়া এত অল্প বয়সে অমরেন্দ্রনাথের পক্ষে থিয়েটারে যোগদান করা উচিত নয় বলে গিরিশচন্দ্র উপদেশ দিলেন।

শতবর্ষ স্মরণে

ইতিমধ্যে দানীবাবু, সতীশ চট্টোপাধ্যায় নৃপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির সংগেও অমরেন্দ্রনাথের হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আড্ডা দেওয়া আর থিয়েটার দেখা অমরেন্দ্রনাথের নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকলের পরামর্শে অমরেন্দ্রনাথের মতিগতি ফেরাবার জন্য তাঁর দাদারা সুন্দরী মেয়ে দেখে তার বিয়ে দিলেন। অমরেন্দ্রনাথের স্ত্রীর নাম ছিল হেমনলিনী দেবী।

সুন্দরী স্ত্রীও মন ফেরাতে পারলেন না অমরবাবুর। স্টার থিয়েটারে চন্দ্রশেখর নাটকের অভিনয় দেখতে যেয়ে শৈবলিনী চরিত্রে তারাসুন্দরীকে দেখে অমরবাবুর কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে নিজেদের বাগানবাড়ীতে আড্ডা জমান। তারাসুন্দরীর কাছে নৃপেনবাবু এখানেই নৃত্য শিক্ষা করেন।

অমরেন্দ্রনাথের নাট্যজীবনের প্রস্তুতিও শুরু হয় বাগমারীর বাগানবাড়ীতে। এখানেই প্রতিষ্ঠা করেন ইণ্ডিয়ান ড্রামেটিক ক্লাবের। এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া নিয়ে ইণ্ডিয়ান ড্রামেটিক ক্লাব নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ প্রথম অভিনয় করেন। দ্বিতীয় অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় মিনার্ভা মঞ্চে। গিরিশচন্দ্র তখন মিনার্ভায়। এই সময় নবীনচন্দ্রের সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দেন গিরিশচন্দ্র। পলাশীর যুদ্ধ নাটকে অমরেন্দ্রনাথ সিরাজদ্দৌলা চরিত্রে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। পলাশীর যুদ্ধের

তৃতীয় অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল কারিন্থিয়ান স্টেজে। দানীবাবু ক্লাইভ চরিত্রে অভিনয় করেন। বেঙ্গল থিয়েটার স্টেজে গিরিশচন্দ্রের 'বিষাদ' নাটকের অভিনয়েও অলক চরিত্রে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেন। এই অভিনয়ে নবীনচন্দ্রসহ গিরিশচন্দ্র উপস্থিত থাকেন এবং তারাসুন্দরীর বিষাদ চরিত্রের অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পলাশীর যুদ্ধ, বিষাদ বা বেল্লিক-বাজারের কৃতকার্যতায় অমরেন্দ্রনাথ খুশী থাকতে পারলেন না। বিকাশোন্মুখ প্রতিভার আত্মপ্রকাশের তাড়নায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটার তখন সাময়িকভাবে বন্ধ। গোপাল-বাবু ছিলেন অমরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ধীরেন্দ্রনাথের বন্ধু। অমরেন্দ্রনাথকে অনুজের মতই তিনি স্নেহ করতেন। সেই দাবীতে অমরেন্দ্রনাথ গোপালবাবুর সঙ্গে দেখা করে এমারেল্ড থিয়েটার লীজ নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গোপালবাবু বন্ধুর ছোটভাই হিসেবেই অমরেন্দ্রনাথকে থিয়েটার গৃহ লীজ দিতে অস্বীকার করলেন। অমরেন্দ্রনাথ তখন গোপালবাবুর অন্যতম বন্ধু শ্যামামাধব রায়ের মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত গোপালবাবুকে রাজী করাতে সক্ষম হন।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় মহাপ্রস্তুতি। নিজ সম্প্রদায়ের নামকরণ করলেন ক্লাসিক থিয়েট্রিক্যাল কম্পানী। শুক্রবার ১৬ এপ্রিল, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ সন্ধ্যা ৭টায় গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটারে অমর দত্ত আত্মপ্রকাশ করলেন গিরিশচন্দ্রের 'নলদময়ন্তী' নাটক নিয়ে।

বালেশ্বরের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দের উপস্থিতিতে অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। তখন বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিনয় দেখতে আমন্ত্রণ জানানো হতো। সব ক্ষেত্রেই যে তারা মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দিতেন বা নাট্যামোদিদের অভিবাদন জানাতেন তা নয়। সাধারণ দর্শকদের মতই তারা, অভিনয় দেখতেন। তাঁদের এই উপস্থিতিই বিশেষ ঘটনা হিসেবে প্রচার করা হতো।

নলদময়ন্তীর সঙ্গে বেল্লিকবাজারও অভিনীত হয়। অভিনয়াংশে ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ—নল। তারাসুন্দরী—দময়ন্তী. অঘোরনাথ পাঠক—কলি। তা ছাড়া কুসুম-কুমারী সরোজিনী নয়নতারা শরৎ কুমারী মহেন্দ্রলাল বসু অঘোরনাথ পাঠক গোবর্দ্ধন ব্যানার্জি প্রমথনাথ দাস প্রভৃতি ছিলেন। সর্বোপরি ছিলেন মঞ্চাধ্যক্ষরূপে ধর্মদাস সুর। নাট্যামোদীদের আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন শিল্পী ও বিশেষজ্ঞদের নামের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ বিশেষণ ব্যবহার করা হয়। নাট্য জগতে প্রচারের ক্ষেত্রে অমর দত্ত যে অভিনবত্ব এনেছিলেন তার পরিচয় নল-দময়ন্তী থেকেই পাওয়া যায়। যেমন তারা-সুন্দরীকে 'দি স্টার অফ দি স্টার থিয়েটার' কুসুম কুমারীকে 'দি জুয়েল অফ দি মিনার্ভা থিয়েটার' সরোজিনীকে লিলি অফ দি এমারেল্ড থিয়েটার' এবং নয়নতারা আর শরৎ কুমারীকে 'রোজেস অফ দি সিটি থিয়েটার' বলে প্রচার করা হয়।

তাছাড়া দৃশ্যাবলী সম্পর্কে প্রচার করা হয়েছিল : 'একটা ক্ষুদ্র কমলকোরক হইতে দলে দলে অপ্সরাগণ বহির্গত হইয়া পদ্মে পদ্মে দাঁড়াইয়া নৃত্যগীত করিবে।'

সময়াভাবের জন্য নতুন নাটক নিয়ে আবির্ভূত হতে না পারার জন্য অমরবাবু হ্যান্ডবিলে দুঃখ প্রকাশ করেন। হ্যান্ড-বিলের ভাষা থেকে বোঝা যায় অমর দত্ত প্রথম থেকেই নাট্যামোদী জনসাধারণকেই তাঁর নাট্য-জীবনের সবচেয়ে বড় বিচারক মনে করতেন। জনসাধারণের প্রীতি কামনাই ছিল তার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য।

নলদময়ন্তীর পর নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ ও গিরিশচন্দ্রের লক্ষণ বর্জন মঞ্চস্থ হলো ১৭ এপ্রিল ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে।

দক্ষযজ্ঞ বিবাহ বিভ্রাট তরুবালা হারা-নিধি হীরার ফুল বিল্বমঙ্গল মঞ্চস্থ হবার পর ২১শে মে মঞ্চস্থ হলো অমর দত্ত নাট্য রূপায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী। ব্রজেশ্বর ও প্রফুল্লরূপে অমর পরিত্যাগ করেন। অমরেন্দ্রনাথ কিছুটা দত্ত আর তারাসুন্দরী চমৎকৃত করলেন সকলকে। দেবীচৌধুরাণী নাটকে মঞ্চোপরি নদীবক্ষে বজরা এবং সেই বজরায় লোমহর্ষক ডাকাতির দৃশ্যে দর্শকবৃন্দ মোহিত হলেন। হারানিধি আর দেবীচৌধুরাণী অসম্ভব জনপ্রিয়তার্জন করলো। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২ জানুয়ারীর অমৃতবাজার পত্রিকায় দেবী-চৌধুরাণীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হয়।

২১ জুন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষে সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হলো হরিরাজ। শেকসপীয়রের হ্যামলেট নাটক অনুসরণে হরিরাজ নাটকের খসড়া রচনা করেন বিশ্বকোষ সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব। এই খসড়া থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকটি রচনা করেন নগেন্দ্র-নাথ চৌধুরী। হরিরাজ নাটকের রচনা নিয়ে নানান বাকবিতণ্ডা আছে। যাই হউক হরিরাজ অসম্ভব জনপ্রিয়তার্জন করে আর নামভূমিকায় অমর দত্ত অদ্ভুত অভিনয় কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

এই সময় থেকে প্রতি বুধবার নিয়মিত অভিনয় প্রথাও চালু করেন অমরেন্দ্রনাথ। হরিরাজে ছোটরাণী প্রথমে শ্রীলেখা চরিত্রে অভিনয় করে। কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পর ছোটরাণী ক্লাসিক পরিত্যাগ করলেন শ্রীলেখা চরিত্রে অভিনয় করেন তারাসুন্দরী।

(ক্রমশঃ

—কালীশ মুখোপাধ্যা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলি-কাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

Regd. No. [illegible]
Gram : AMRITA Calcutta-700003 AMRITA Phone 55-5231 (14 lines)